ভারতবর্ষ

[চতুর্থ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—পৌষ, ১৩২৩ হইতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪]

বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক সূচী

অর্থনীতি

আলোচনা

ইতিহাস

উপন্যাস

কবিতা

গল্প

জীবনী

জ্যোতিষ

দর্শন

পুরাতত্ত্ব

ভ্রমণ-কাহিনী

রঙ্গ, রহস্য ও ব্যঙ্গ

বিবিধ

শিকার-কাহিনী

শিল্প-বিজ্ঞান

সঙ্কলন

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

সমালোচনা

সম্পাদকীয়

সাহিত্য

চিত্র-সূচি

পৌষ, ১৩২৩

মাঘ, ১৩২৩

ফাল্গুন, ১৩২৩

চৈত্র, ১৩২৩

বৈশাখ, ১৩২৪

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

"অই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা,
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা !"—রবীন্দ্রনাথ

Emerald Ptg. Works.

শিল্পী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(12) Music পৌষ, ১৩২৩

দ্বিতীয় খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

কীর্ত্তন

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ]

বেহাগ—কাওয়ালী

যদি স্নেহের ফুলদলে দলিয়া চরণ-তলে
গোকুল ছাড়িয়া কালা যাবে গো।
তবে কেন এ তৃষিত চিতে ঢালিলে অমিয়-ধারা
এমন মধুর বেণু-রবে গো।
নয়নের বারি বহিবে উছলিয়া,
কেঁদে গলে' যাবে পাষাণের হিয়া,
সাধেরি বৃন্দাবন তোমারি বিহনে
চির পিপাসিত রবে গো।
নিতি নিতি আসি গোঠে তোমারি চরণে লুটে
ধন্য মানি গো মোরা প্রাণে,
না জানি কি অপরাধে ঘটিল এ পরমাদ,
বঞ্চিত হইনু ও চরণে গো।
না ফুরাইতে বেলা সাঙ্গ কি হ'ল খেলা
নীরবিল বাঁশরীর তান ?
হের রাখাল পাগল-পারা, দু'নয়নে বহে ধারা
ধৈরয না মানে পরাণ গো।
সখা নয়নের অন্তরালে যাবে যদি যাও চলে
চিরদিন বাজুক বাঁশী প্রাণে,
একবার ফিরে চাও হাসি হাসি কথা কও
ভালবাসি জীবনে মরণে গো।

আন্বীক্ষিকী *

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাম্পদম্।
বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥"

স্বৈরাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সহসা কোনও কার্য্য করিবে না,—অবিবেকিতা মানুষকে ভীষণ আপদের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। যে বিমৃষ্যকারী, গুণলুব্ধ সম্পদ্‌রাশি স্বয়ং আসিয়া তাহাকে সাদরে বরণ করে। সুতরাং বিমৃষ্যকারিতাই মানুষের পুরুষার্থলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

অন্তঃকরণে পুরুষার্থসম্পদ্ লাভের উদ্বেল আকাঙ্ক্ষা থাকিলে মানুষ তাহার উপায় জানিবার জন্যই প্রথমতঃ ব্যাকুল হইয়া উঠে। স্নেহবৎসল পিতার ন্যায় শাস্ত্রই আমাদিগকে সেই পুরুষার্থপ্রাপ্তির সদুপায়ের উপদেশ করিয়াছেন। নৈসর্গিক মোহতমসাচ্ছন্ন মনুষ্য সমাজকে একমাত্র শাস্ত্রই স্বর্গাপবর্গের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক দেখাইয়া দেয়। শাস্ত্রানুশীলনেই মানুষের সদসদ্‌বিবেকের উন্মেষ হয়; তাহার ফলে আর তাহাকে বিবিধ আপদের কঠোরতায় উদ্বেজিত হইতে হয় না। সুতরাং যে শাস্ত্র-মন্দিরের অভ্যন্তর, জ্ঞান ও ধর্ম্মের পবিত্র হবিঃপ্রদীপে উদ্ভাসিত, দুঃখের ঘনান্ধকার হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে একমাত্র তাহার আশ্রয় গ্রহণ করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে উচিত।

এই শাস্ত্র চতুর্দ্দশবিধ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥" ১।৩

ঋগ্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র—এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রই সকলের মূলস্তম্ভ। কারণ, বেদের প্রামাণিকতার অবধারণ করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের মুখাপেক্ষা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপিত না হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-জগতে এক মহা বিপ্লবের আবির্ভাব হয়। চার্ব্বাক-বৌদ্ধাদির উদ্ভাবিত কুতর্কের প্রভাবে বেদের অপ্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত হইলে, বহু বিত্তব্যয় ও কঠোর আয়াস স্বীকার করিয়া লোকে বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে আস্থাবান্ হইবে কেন? যাহার মুখাপেক্ষা করিয়া মীমাংসাদি শাস্ত্র সমাদৃত হইয়া থাকে, সেই বেদই যদি অপ্রমাণ হইয়া পড়ে, তখন তদুপজীবী সেই-সেই শাস্ত্রসমূহের আর কোনই উপযোগিতা থাকে না। এই জন্য বেদের প্রামাণ্য স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সুদৃঢ় যুক্তি-তর্কের সহায়তায় নাস্তিকের মতবাদ খণ্ডন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রই এই বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজে-কাজেই অন্যান্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা ন্যায়শাস্ত্রের উপাদেয়তাই অবশ্য স্বীকরণীয়। এই ন্যায়শাস্ত্রের আর এক নাম আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা (১)।

জীবমাত্রেই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চিরদিন ব্যাকুল। দুঃখের আঘাত এতই অসহ্য যে, ভবিষ্যৎ অশুভের আশঙ্কা থাকিলেও মানুষ আত্মহত্যা করিয়া আপাত-দুঃখের তাড়না হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। এই ভীষণ সংসারারণ্যে দুঃখ-দুর্দ্দিনের ভাগই অধিক, কদাচিৎ সুখ খদ্যোত মুহূর্ত্তের জন্য আত্মপ্রকাশ করে। সুদুঃসহ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ এতই উৎপীড়িত যে, ক্ষণিক সামান্য সংসার-সুখ কাহারও নিকট স্পৃহনীয় হয় না,—সকলেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি প্রার্থনা করে। এক অপবর্গ ব্যতীত, অনন্তকালের জন্য দুঃখের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। ধর্ম্মানুষ্ঠানের মাহাত্ম্যে জীব স্বর্গে গমন করিলেও, আবার "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—পুণ্যক্ষয় হইলে কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া দুঃখের অতলস্পর্শ পারাবারে নিপতিত হয়। কিন্তু জীব যদি একবার নিঃশ্রেয়স-দশা লাভ করিতে পারে, তবে আর

* যশোহর সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন-শাখার অধিবেশনে পঠিত।

(১) "আন্বীক্ষিকী দণ্ডনীতিস্তর্কবিদ্যার্থ শাস্ত্রয়োঃ।"—অমরকোষ

তাহাকে ভীষণ দুঃখের তাড়না সহ্য করিতে হয় না। এই নিঃশ্রেয়সংলাভের উপায় কি ?—শ্রুতি বলিয়াছেন,

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ।"—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬

মুমুক্ষুর আত্মদর্শনই পরম ইষ্টসাধন। আত্মদর্শনের উপায় কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—

'শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের হেতু। শ্রুতির দ্বারা আত্মশ্রবণের পর মননে অধিকার হয়। অনুমিতিরই নামান্তর মনন। শ্রবণের পর এই যে আত্মমননের উপদেশ আছে, এই মননের প্রণালী, একমাত্র ন্যায়শাস্ত্রেই বিশদ ও বিশুদ্ধভাবে অভিহিত হইয়াছে। এই জন্যই এই শাস্ত্রের অন্বর্থ নাম—'আন্বীক্ষিকী'। ন্যায়ভাষ্যের রচয়িতা বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণ মন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।"—১।১।১

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আপ্তবাক্যের দ্বারা পরিজ্ঞাত বস্তুর পশ্চাৎ জ্ঞানের নাম অন্বীক্ষা, সেই অন্বীক্ষার নির্ব্বাহক বলিয়া ইহার নাম আন্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র। ন্যায় শব্দও আন্বীক্ষিকীরই সমানার্থক। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ ও নীলকণ্ঠ 'আন্বীক্ষিকী' শব্দের এইরূপ অর্থই করিয়াছেন (২)। মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক আত্মার হিতসাধন করে বলিয়া মনু রাজন্যবর্গের শিক্ষণীয় শাস্ত্রের মধ্যে এই আন্বীক্ষিকীকে আত্মবিদ্যারূপে বিশেষিত করিয়াছেন (৩)।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদে কথিত হইয়াছে, যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য, শ্রুতিসম্মত আন্বীক্ষিকীর প্রভাবেই বেদবেদান্ত-কোবিদ বিশ্বাবসুর উদ্ভাবিত অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য শেষে বিশ্বাবসুকে বলেন,—

"এষা তেঽন্বীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্থী সাম্পরায়িকী।"

শান্তি, মোক্ষ, ৩১৮ অঃ, ৪৭ শ্লোঃ

[চতুর্থী ত্রয়ীং বার্ত্তাং দণ্ডনীতিঞ্চাপেক্ষ্য সাম্পরায়িকী মোক্ষায় হিতা"—নীলকণ্ঠ টীকা।]

—ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী—এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যার মধ্যে চতুর্থী বিদ্যা আন্বীক্ষিকীই মোক্ষবিধায়ক।

আন্বীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত্র মোক্ষবিধায়ক বলিয়া নারদাদি মহর্ষিরা এই শাস্ত্র বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি নারদ, ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন—এই পঞ্চাবয়ব বাক্যের গুণ-দোষজ্ঞ ছিলেন। নারদ যখন যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম উপদেশ করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে নারদের বেদবেত্তৃত্ব প্রভৃতি অন্যান্য নানাগুণের বর্ণনার পর অভিহিত হইয়াছে,—

"পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।"—

মহা, সভা, ৫ অঃ, ৫ শ্লোঃ।

নারদের তর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার কথা ছান্দোগ্য-উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে।

নারদ, আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে "অধীহি ভগবঃ" বলিয়া সনৎকুমারের সন্নিধানে উপনীত হইলে, তিনি নারদকে বলিলেন,—"তুমি কি কি জান, তাহা আমার কাছে বল ; তা'র পর তোমার অনধিগত বিষয়ে তোমাকে উপদেশ করিব। সনৎকুমারের এই আদেশ শুনিয়া নারদ বলিলেন,—

"ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং

---

(২) শ্রবণাদনু পশ্চাদীক্ষা অন্বীক্ষা উন্নয়নং তন্নির্ব্বাহিকা সেয়মান্বীক্ষিকী ন্যায়তর্কাদিশব্দৈরপি ব্যবহ্রিয়তে।"—১।১।১

"প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্য পশ্চাদীক্ষণ মন্বীক্ষা,
সা প্রয়োজন মস্যামিত্যান্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা।"

নৈষধচরিত, ১০ম সর্গ, ৮২ শ্লোকের টীকা।

শ্রবণমনু ঈক্ষা যুক্ত্যা আলোচনং অন্বীক্ষা মননং, তৎপ্রধানামান্বীক্ষিকীম্।"—মহা, শান্তি, মোক্ষ, ৩১৮ অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকের টীকা।

(৩) ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥"

—৭ অঃ, ৪৩ শ্লোকঃ।

মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"আত্মনে যা হিতা আন্বীক্ষিকী তর্কাশ্রয়া, তাং শিক্ষেত। সাহ্যপ-যুজ্যতে ব্যসনাভ্যুদয়য়োঃ পরমচিত্তসংক্ষোভোপশমায়। যা তু বৌদ্ধ-চার্ব্বাকাদি-তর্কবিদ্যা, সা নাতীব কুত্রা কাচিদুপযুজ্যতে, প্রত্যুতাস্তিক্যমুপহন্তি যো নাতিনিপুণমতিঃ। অর্থাৎ অনুকূল তর্ক-সম্বলিত যে আন্বীক্ষিকী বিপদ্ এবং সম্পদে চিত্তের ক্ষোভাতিশয় অপনোদন করে বলিয়া আত্মার মঙ্গল-বিধায়ক, তাহা শিক্ষা করিবে। এবম্ভূত আন্বীক্ষিকীই একান্ত উপযোগী। বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদির তর্কবিদ্যার কুত্রাপি উপযোগিতা নাই, প্রত্যুত তাহা অদূরদর্শীর আস্তিক্য-বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দেয়।

চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং—"

ছান্দোগ্য, ৭ অঃ, ১ম খণ্ড, ৪৭৬।২

আচার্য্য শঙ্কর, ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "........ বাকোবাক্যং তর্কশাস্ত্রং একায়নং নীতিশাস্ত্রং—"

আন্বীক্ষিকীর মাহাত্ম্যে যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, ইহা, কামন্দকীয় নীতিসারেও কথিত হইয়াছে,—

"আন্বীক্ষিক্যাত্মবিজ্ঞানং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রয়ীস্থিতৌ।
অর্থানর্থৌ তু বার্ত্তায়াং দণ্ডনীত্যাং নয়ানয়ৌ ॥ (৪)

* * * *

আন্বীক্ষিক্যাত্মবিদ্যা স্যা দীক্ষণাৎ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈক্ষমাণস্তয়া তত্ত্বং হর্ষশোকৌ ব্যুদস্যতি॥"

২য় সর্গ বিদ্যাবিভাগ-প্রকরণ, ৭ম ও ১১শ শ্লোক।

সর্ব্বপ্রধান নীতিশাস্ত্রকার চাণক্য, স্বরচিত অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চারিপ্রকার বিদ্যার মধ্যে আন্বীক্ষিকীরই প্রাধান্য ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আন্বীক্ষকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ।"

* * * *

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ত্রয্যাম্। অর্থানর্থৌ বার্ত্তায়াম্। নয়ানয়ৌ দণ্ডনীত্যাং বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণা লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করোতি—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা ॥ (৫)

ইতি বিনয়াধিকারিকে প্রথমেঽধিকরণে বিদ্যাসমুদ্দেশে আন্বীক্ষকীস্থাপনা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।"

[বিদ্যা চতুর্ব্বিধ,—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। এই চারিপ্রকার বিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীতে ধর্ম্মাধর্ম্মের, বার্ত্তায় অর্থানর্থের ও দণ্ডনীতিতে নয়ানয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায় ও সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়রূপে উদ্‌গীত, আন্বীক্ষিকীই যুক্তির দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ বিদ্যার বলাবল নির্ণয়ের পথ দেখাইয়া দিয়া লোকের উপকার-সাধন, বিপদে-সম্পদে চিত্তচাঞ্চল্য-নিবারণ এবং প্রজ্ঞা, বাক্য ও কার্য্যের উৎকর্ষ সম্পাদন করে।]

চাণক্যের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইল যে, আন্বীক্ষিকী কেবল পারলৌকিক কল্যাণেরই হেতু নহে, লৌকিক ব্যাপারেও আন্বীক্ষিকীর অত্যন্ত উপযোগিতা আছে। আন্বীক্ষিকী যে লোকযাত্রানির্ব্বাহের অত্যন্ত সহায়, তাহা কামন্দকের নীতিসারেও উপদিষ্ট হইয়াছে (৬)।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যার এই সর্ব্বোপযোগিতার জন্যই প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ "অলঙ্কার চিন্তামণির" 'কবিশিক্ষাপ্ররূপণ' নামক পরিচ্ছেদে মন্ত্রীর বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অভিজ্ঞতার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে (৭)।

দুঃখপঙ্কনিমগ্ন মানবকুলের অশেষ কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরম কারুণিক মহর্ষি অক্ষপাদ, এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেন (৮)। বেদের ন্যায় এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যাও বিশ্বস্রষ্টারই প্রথম আবিষ্কার। বিশ্ব-

(৪) ভারবির দ্বিতীয় সর্গের ষষ্ঠ শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ আন্বীক্ষিক্যাং তু বিজ্ঞানং—ইত্যাদি রূপে এই শ্লোকটী মনুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতায় এ শ্লোক নাই।

(৫) "সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈর্বিভজ্যমানা প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা ॥"—এই ভাবে এই শ্লোকটী ন্যায়ভাষ্যের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কথিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, চাণক্য ন্যায়ভাষ্যের প্রণেতা বলিয়া যে মতবাদ প্রচারিত আছে, তাহা অমূলক নহে। কারণ, শ্লোকটীর চতুর্থ চরণ "বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা"—এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ভাষ্যকারের এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে, আমিই অর্থশাস্ত্রের বিদ্যাসমুদ্দেশ-পরিচ্ছেদে এই আন্বীক্ষিকীর প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছি।

(৬) "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
বিদ্যাশ্চতস্র এবৈতা লোকসংস্থিতিহেতবঃ॥"

২য় সর্গ বিদ্যাবিভাগপ্রকরণ, ২য় শ্লোক।

(৭) "মন্ত্রী শুচিঃ ক্ষমী শূরোঽনুরক্তো বুদ্ধিভক্তিমান্।
আন্বীক্ষিক্যাদিবিদ্ দক্ষঃ স্বদেশমহিতোদ্যমী।"

১ম পরিচ্ছেদ, ৩৪ শ্লোক।

(৮) "যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।"

ন্যায়বার্ত্তিক ১ম পৃঃ।

"পরমকারুণিকো হি মুনির্জগদেব দুঃখপঙ্কমগ্ন মুদ্দিধীর্ষুঃ শাস্ত্রং প্রণীতবান্।"—ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য, ১ম পৃঃ।

"অথ জগদেব দুঃখপঙ্কমগ্ন মুদ্দিধীর্ষুরষ্টাদশ বিদ্যাস্থানেষভ্যর্হিততমামান্বীক্ষিকীং পরমকারুণিকো মুনিঃ প্রণিনায়।"—তত্ত্বচিন্তামণি, ১১০ পৃঃ।

কর্ত্তার কোন্-কোন্ অঙ্গ হইতে বেদাদি বিদ্যার উৎপত্তি হইল, বিদুর এইরূপ প্রশ্ন করিলে, মৈত্রেয় ঋষি বলিয়াছিলেন যে, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী প্রভৃতি মোক্ষধর্ম্মাদিসাধক বিদ্যা, ভগবানের হৃদয়াকাশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিল (৯)। জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও এই কথারই প্রতিধ্বনি স্বরূপ "ন্যায়মঞ্জরী"র প্রথমে লিখিয়াছেন যে,—অক্ষপাদের পূর্ব্বে বেদ প্রামাণ্যের নিশ্চয়তা কিরূপে হইত, এরূপ শঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। কারণ, সৃষ্টির প্রথম হইতেই বেদের ন্যায় আন্বীক্ষিকী প্রভৃতি বিদ্যারও প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। সংক্ষেপ বিস্তাররূপে সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া মহর্ষি অক্ষপাদ প্রভৃতিকে সেই-সেই বিদ্যার কর্ত্তা বলা হয় (১০)।

চার্ব্বাকদর্শন ভিন্ন আর সকল দর্শনেই অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মহর্ষি-পরিশোধিত ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানের বিশদ ও বিশুদ্ধ প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া, আস্তিকমাত্রকেই ইহার শ্লাঘনীয়তা মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতে হয়। অলৌকিক তথ্যসকলের নির্ণয় করিতে হইলে অনুমানের সহায়তা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। মহর্ষি অক্ষপাদ ন্যায়দর্শনের সেই অনুমানের নানা-বিধ সদুপায় আবিষ্কার করিয়া জগতের এক মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন। যথার্থরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে হইলে অনুমান-প্রণালী যে সুবিদিত করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রধান সংহিতাকার মনুও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
এয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মতত্ত্বমভীপ্সতা ॥"—(১১)
১২শ অঃ, ১০৫ শ্লোঃ

[যিনি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র—এই প্রমাণত্রয়ে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা উচিত।]

ধর্ম্মতত্ত্বের নিরূপণকালে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্যের মধ্যে অনুমান-প্রণালীরই যে অধিক উপযোগিতা, মনু ইহার পরের শ্লোকে তাহাও বিবৃত করিয়াছেন,—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥"
১২শ অঃ, ১৯ শ্লোঃ।

[যে বেদাবিরোধী তর্কের সাহায্যে শ্রুতি-স্মৃতির বিচার করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়; অন্য সহস্র উপায়েও ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করা যায় না।]

মানব-সমাজের পরম কল্যাণকামী ভগবান্ মনু আরও বলিয়াছেন যে, অন্যূন দশজন বিদ্বানের পরিষদ্ ধর্ম্মসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ করিবেন, তদনুসারেই সাধারণের ধর্ম্মজীবন অতিপাতিত করা উচিত;—কদাচ সেই পরিষদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবে না। কাহাদিগকে লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত হইবে, মনু তাহারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিনঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্ দশাচরা ॥"—
১২শ অঃ, ১১১ শ্লোঃ।

[বেদত্রয়জ্ঞ, বেদাবিরুদ্ধন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, তর্কনিপুণ, নিরুক্ত-শাস্ত্রবিদ্, মানবাদিধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ —ইঁহারা যে সভাতে থাকেন, তাহাকেই ধর্ম্মনির্ণায়ক পরিষদ্ বলা হয়।]

কুল্লূকভট্ট, এই শ্লোকের টীকায় 'হৈতুক' শব্দের অর্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—"শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধন্যায়শাস্ত্রজ্ঞঃ"। ভাষ্যকার মেধাতিথিও বলিয়াছেন, "অনুমানাদিকুশলস্তর্কী"। সুতরাং ধর্ম্মনির্ণায়ক পরিষদে মহর্ষিপ্রণীত তর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতের সদ্ভাব যে অত্যন্ত প্রয়োজন, ইহা মনুরই ব্যবস্থা-সিদ্ধ। মনু ইহার পরে যে বলিয়াছেন,

---

(৯) "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥"
ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ১২শ অঃ, ৪৪ শ্লোঃ ॥

"ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিক্রমেণোৎপত্তিমাহ আন্বীক্ষিকীতি। আন্বীক্ষিক্যাদ্যা মোক্ষধর্ম্মকামার্থবিদ্যাঃ। * * * দহ্রতঃ হৃদয়াকাশাৎ।"—শ্রীধরস্বামীর টীকা।

(১০) "নন্বক্ষপাদাৎ পূর্ব্বং কুতো বেদপ্রামাণ্য নিশ্চয় আসীৎ। অত্যল্পমিদমুচ্যতে। * * * আদি সর্গাৎ প্রভৃতি বেদবদিমা বিদ্যাঃ প্রবৃত্তাঃ। সংক্ষেপ বিস্তর বিবক্ষয়া তু তাংস্তাংস্তত্র তত্র কর্ত্তৄনা-চক্ষতে।"—ন্যায়মঞ্জরী, ৬ পৃষ্ঠা।

(১১) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য—এই তিনটিই মনুর মতে প্রমাণ,—তাহা মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন,

—"তদেব চ প্রমাণত্রয়ং মনোরভিমতম্। উপমানার্থাপত্ত্যাদেশ্চানু-মানান্তর্ভাবঃ।"

একোঽপি বেদবিদ্ ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥"

১২।১১৩

[একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাকেই উপাদেয় বলিয়া জানিবে, বেদানভিজ্ঞ দশসহস্র লোকের মতও প্রামাণিক নহে।] এখানেও 'বেদবিদ্' শব্দ উপলক্ষণ, একজন ভাল স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ, বা একজন প্রকৃত নৈয়ায়িক যদি ধর্ম্মোপদেশ করেন, তবে তাহাও সাদরে গ্রহণীয়। এই জন্যই কুল্লূকভট্ট উক্ত মনুবচনের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"বেদবিচ্ছব্দোঽয়ং বেদার্থধর্ম্মজ্ঞপরঃ। এতচ্চ উপলক্ষণং স্মৃতিপুরাণমীমাংসান্যায়শাস্ত্রজ্ঞোঽপি গুরুপরম্পরোপদেশবিচ্চ জ্ঞেয়ঃ। তথা "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

এ পর্য্যন্ত আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, কি লৌকিক কর্ম্মে, কি পারমার্থিক ব্যাপারে—সর্ব্বত্রই তর্কবিদ্যার সবিশেষ উপযোগিতা আছে।

মহর্ষি কণাদ ও অক্ষপাদের প্রণীত শাস্ত্রকে উদ্দেশ করিয়াই নানা গ্রন্থে তর্কবিদ্যা বা আন্বীক্ষিকীর এইরূপ আত্যন্তিক উপযোগিতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেন না, এই ঋষি প্রণীত আন্বীক্ষিকীই বেদের বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত তাহার প্রামাণ্যসংস্থাপক। যে সকল নাস্তিক বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, নানাবিধ অসৎ তর্কের উত্থাপন করিয়া বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করে, সেই বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদির আন্বীক্ষিকীর কুত্রাপি উপযোগিতা নাই। এই জন্যই মনুসংহিতায় যাদৃশ তর্কশাস্ত্রের উপকারিতার কথা অভিহিত আছে, তাহার বিশেষণরূপে "বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা," "শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধঃ" প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার মেধাতিথি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "যা তু বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি তর্কবিদ্যা সা নাতীব কৃত্বা কচিদুপযুজ্যতে, প্রত্যুতাস্তিক্যমুপহন্তি যো নাতিনিপুণমতিঃ।"—(২য় অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকের ভাষ্য) রামায়ণ ও মহাভারতে এই বেদবিরুদ্ধ আন্বীক্ষিকীরই নিন্দা বিঘোষিত হইয়াছে (১২)।

ভগবান্ মনুও এইরূপ বেদবিরুদ্ধ তর্কাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥"

২।১১

[যে ব্যক্তি বৌদ্ধচার্ব্বাকাদির তর্কশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের মূলস্তম্ভস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুপুরুষেরা দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় সমস্ত কর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করিবেন।]

এই মনুবাক্যস্থ 'হেতুশাস্ত্র' শব্দের অর্থ যে 'বৌদ্ধচার্ব্বাকাদির তর্কশাস্ত্র, তাহা মেধাতিথি, কুল্লূকভট্ট, গোবিন্দরাজ, নারায়ণ প্রমুখ সকল ব্যাখ্যাকারই স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন (১৩)।

বাৎস্যায়ন, বিশ্বনাথ, মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ প্রমুখ সর্ব্বজ্ঞপ্রায় মনীষিগণ "আন্বীক্ষিকী" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য যে অর্থ করিয়াছেন, তদনুসারে মহর্ষিবিরচিত ন্যায়শাস্ত্রই একমাত্র আন্বীক্ষিকী পদবাচ্য, ইহা অভিব্যক্ত হয়। কেন না, শ্রুতিসম্মত অনুমানের বিশুদ্ধ প্রণালী, এই ন্যায়শাস্ত্রেই

---

(১২) "কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলাহ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্ব্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥"

অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০ সর্গ, ৩৮-৩৯ শ্লোঃ।

"অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিত মানিকঃ।
তস্যেয়ং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজঃ॥"—

মোক্ষ, ২৮১ অঃ, ৪৭-৪৯ শ্লোঃ।

(১৩) "হেতুশাস্ত্রং নাস্তিক তর্কশাস্ত্রং বৌদ্ধচার্ব্বাকাদিশাস্ত্রং যত্র বেদোঽধর্ম্মায়েতি পুনঃ পুনরুদ্ঘোষ্যতে তাদৃশং তর্কমাশ্রিত্য—" মেধাতিথি।

"হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ বেদবাক্যং অপ্রমাণং বাক্যত্বাৎ বিপ্রলম্ভকবাক্যবদিত্যাদি প্রতিকূলতর্কাষ্টম্ভেন চার্ব্বাকাদি নাস্তিক ইব নাস্তিকো যতো বেদনিন্দকঃ।"—কুল্লূকভট্ট।

"অসৎ তর্কশাস্ত্রাবলম্বনেন নিন্দেৎ, নাস্তি পরলোক ইত্যেবং স্থিতপ্রতিজ্ঞো বেদনিন্দক:—" গোবিন্দরাজ।

"হেতুশাস্ত্রং শ্রুতিবিরোধি তর্কশাস্ত্রম্।—নারায়ণ।

উদ্‌গীত হইয়াছে। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"— এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'মন্তব্যঃ' অর্থাৎ অনুমাতব্যঃ— এই বিধিবাক্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া ন্যায়শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কণাদ ও অক্ষপাদ এই উভয় মহর্ষিই বেদানুগত অনুমানোপায়ের এক-এক অংশ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। লোকে যাহাতে অনুমিতির উদ্দেশ্য, বিধেয় ও হেতু প্রয়োগে দিগ্‌ভ্রান্ত না হয়, এই অভিপ্রায়ে কণাদের বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য ও লক্ষণাদির বিচারই বহুলভাবে লিখিত হইয়াছে; আর অক্ষপাদের ন্যায়দর্শনে প্রমাণভাগেরই নানাবিধ দোষগুণের আলোচনা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনই পরস্পরের মুখাপেক্ষা করে। দুই-একটী সামান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এই উভয় দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় একই। এই জন্যই হরিভদ্র কৃত "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে"র 'তর্করহস্যদীপিকা' নামক টীকায় কথিত হইয়াছে যে,—"নৈয়ায়িক বৈশেষিকানাং হি মিথঃ প্রমাণতত্ত্বানাং সংখ্যাভেদে সত্যপ্যন্যোন্যং তত্ত্বানামন্তর্ভাবনেঽল্পীয়ানেব ভেদো জায়তে। তেনৈতেষাং প্রায়ো মততুল্যতা।"—(এসিয়াটিক সোসাইটী প্রকাশিত পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠা)।

ন্যায়দর্শনে ষোড়শ পদার্থের ও বৈশেষিক-দর্শনে সপ্ত পদার্থের নিরূপণ থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে উভয় দর্শনের পদার্থাংশে মতবিরোধ নাই। কেন না, গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থই বৈশেষিক-দর্শনে উপদিষ্ট সপ্ত পদার্থেরই অন্তর্ভূত হয়। গৌতমের প্রমাণ, প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থকে কিরূপে কণাদের দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভূত করিতে হইবে, তাহার বিবরণ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র দিনকরী টীকার প্রথমে লিপিবদ্ধ আছে।

এখন শঙ্কা হইতে পারে,—গৌতমের ষোড়শ পদার্থ যেন কণাদের সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভূত হইল, কিন্তু গৌতম যে ষোড়শ পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ত কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভাব হয় না। কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের মধ্যে পৃথিব্যাদি-ভেদে দ্রব্য নয় প্রকার, রূপ, রসাদি ভেদে গুণ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার—ইত্যাদি অন্যান্য পদার্থ ও নানা অবান্তর ভেদে বহুবিধ। গৌতম ত এই সমস্ত পদার্থের নির্ব্বচন করেন নাই। তিনি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে 'প্রমেয়ে'র নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন,—কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থই এই প্রমেয়ের অন্তর্ভূত হইতে পারিত, কেন না, এমন কোন্ পদার্থ আছে, যাহা প্রমেয় অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় না হয়? কিন্তু মহর্ষি গৌতম, "আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃ প্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাব ফল দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।"—(১।১।৯) এই সূত্রে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ ভেদে কেবলমাত্র দ্বাদশ প্রকারেই প্রমেয়কে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রমেয়ের মধ্যেও মহর্ষি কণাদের উপদিষ্ট সমস্ত পদার্থ অন্তর্ভূত হয় না। তবে কি বৈশেষিক-দর্শনোক্ত অন্যান্য পদার্থ স্বীকারে গৌতমের সম্মতি নাই?—নিশ্চয়ই আছে। যে সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে মিথ্যা-জ্ঞান থাকিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না—যে যে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তির সবিশেষ উপযোগী, মহর্ষি গৌতম তাহারই নিরূপণ করিয়াছেন। তা'ই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—

"অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ম্, তদ্‌ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়ম্। অস্য তু তত্ত্বজ্ঞানাদপবর্গো মিথ্যাজ্ঞানাৎ সংসার ইত্যত এতদুপদিষ্টং বিশেষেণেতি"—(১।১।৯ সূত্রের ভাষ্য) উদ্দ্যোতকরও ভাষ্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ন্যায়বার্ত্তিকে" এই কথাই আরও পরিস্ফুটভাবে বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট, "ন্যায়মঞ্জরী"তে এ বিষয়ে আর একটু খুলিয়া লিখিয়াছেন যে,—

"প্রমাণে এব জ্ঞাতে সতি তদ্‌বিষয়োঽর্থঃ প্রমেয়মিতি প্রজ্ঞায়ত এব কিং তেন লক্ষিতেন। তস্মাদ্ বিশিষ্টমিহ প্রমেয়ং লক্ষ্যতে।

"জ্ঞাতং সম্যগ সম্যগ্ বা যন্মোক্ষায় ভবায় বা।
তৎপ্রমেয়মিহাভীষ্টং ন প্রমাণার্থমাত্রকম্॥"—

(৪২৭পৃষ্ঠা)

[প্রমাণ জানিলে, প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ যে প্রমেয়, তাহা সহজেই জানা যায়; প্রমেয়ের আর লক্ষণ করিতে হয় না। এই জন্য কতিপয় বিশিষ্ট প্রমেয়ের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয় ও মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে সংসারে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সেই সমস্ত প্রমেয়ই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত; এই জন্যই প্রমাণসিদ্ধ পদার্থমাত্রের উল্লেখ করেন নাই।]

এখন শঙ্কা হইতে পারে, দ্রব্য-গুণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানও ত মুক্তির উপযোগী,—কেন না, "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ—" এই শ্রুতিতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায়রূপে আত্মমনন উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আত্মমনন অর্থাৎ আত্মাতে 'তন্ন' 'তন্ন' রূপে আত্মেতর নিখিল পদার্থের ভেদজ্ঞানরূপ অনুমিতি করিতে হইলে আত্মেতর সকল পদার্থই জানা আবশ্যক। সুতরাং, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির উপযোগী হইয়া পড়িতেছে। এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক-দর্শনে সূত্র করিয়াছেন, —"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্" (১।১।৪)। তবে মহর্ষি গৌতম, এই দ্রব্য, গুণাদি অন্যান্য প্রমেয়ের লক্ষণ না করিয়া কেবল আত্মা প্রভৃতি বারটী প্রমেয়ের লক্ষণ করিলেন কেন? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায়, দ্রব্য-গুণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, মোক্ষের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে, এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি গৌতম, প্রমেয়ের মধ্যে দ্রব্যাদি পদার্থের লক্ষণ করেন নাই। "ন্যায়সূত্রবিবরণে" রাধামোহন গোস্বামী বিদ্যাবাচস্পতিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি আর একটু অধিক লিখিয়াছেন যে, "—অপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্" এই সূত্রে "তু" শব্দ 'চা'র্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে 'তু' শব্দের দ্বারা দ্রব্য, গুণাদি অনুক্ত সমুচ্চয়েরও লাভ হইতে পারে। অতএব সাক্ষাৎ বা পারম্পরিকভাবে দ্রব্যাদি যাবৎ প্রমেয়, মোক্ষের প্রযোজক হইলেও ক্ষতি নাই। আত্মাদি প্রমেয় প্রধান বলিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১৪)।

দ্রব্য, গুণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ উপযোগী না হইলেও পারম্পরিকভাবে এই সকল পদার্থজ্ঞানের মোক্ষে উপযোগিতা আছে, এই জন্য বরদরাজ, স্বকৃত "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে গৌতমোক্ত 'প্রমেয়' পদার্থের নিরূপণাবসরে দ্রব্য, গুণাদি পদার্থেরও নির্ব্বচন করিয়াছেন (১৫)।

আত্মাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ উপযোগী কেন?—আত্মাদির প্রকৃত স্বরূপ জানিতে না পারিলে, 'আমি সুন্দর' এই যে শরীরে আত্মার অভেদভ্রম বদ্ধমূল আছে, ইহার বিনাশ হইতে পারে না; এবং এই মিথ্যা জ্ঞানের সমূলোচ্ছেদ না ঘটিলে—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" (১।১।২)—সূত্রোপদিষ্ট অপবর্গ-মার্গে আরোহণ করা যায় না। আত্মাদি দ্বাদশবিধ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যে মুক্তির সাক্ষাৎ উপযোগী, ইহা বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি গৌতম "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"—এই প্রথম সূত্রের পর তাহার 'অনুবাদ'রূপে আবার দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়া মোক্ষের ক্রম প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এইরূপ সমাধানের উপরেও পুনর্ব্বার শঙ্কা হইতে পারে যে, মহর্ষি গৌতম যখন—যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ উপযোগী, সেই সকল পদার্থেরই নিরূপণ করিতেছেন, তখন প্রমাণ বা সংশয়াদি পদার্থের পৃথক কীর্ত্তন

(১৪) "আত্মত্বাদিকং ন প্রমেয়মাত্রবিভাজকং সংযোগাদীনামপি প্রমেয়ত্বাদ্ দ্বাদশধেতি বিভাগানুপপত্তেঃ; কিন্তু মোক্ষহেতু প্রমেয়বিভাজকম্। তথা চ তু শব্দঃ পুনরর্থে। এতে পুনঃ প্রমেয়ং প্রকর্ষেণ মেয়ম্। প্রকর্ষশ্চ মোক্ষ হেতুজ্ঞানবিষয়ত্বম্। অথবা তু শব্দশ্চার্থে। তথাচোক্তানুক্তসমুচ্চয়লাভঃ। এবং প্রমেয়মাত্রস্য সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা মোক্ষপ্রযোজকত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ। আত্মাদীনাঞ্চ প্রাধান্যেন বিশেষনির্দ্দেশঃ। তত্রাপি পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রাধান্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমনির্দ্দেশঃ।"—ন্যায়সূত্র বিবরণ, ১ম অধ্যায়, ১ম আহ্নিক, ৯ম সূত্রের ব্যাখ্যা। (১৯ পৃঃ)।

(১৫) "ননু নিঃশ্রেয়সোপযোগীনি দ্রব্যাদীনি প্রমেয়ান্তরাণি সন্তি তানি কুতঃ সূত্রকারৈর্ণ লক্ষিতানি তত্রাহ।

মোক্ষে সাক্ষাদনঙ্গত্বাদক্ষপাদৈর্ণ লক্ষিতম্।
তন্ত্রান্তরানুসারেণ ষট্কং দ্রব্যাদি লক্ষ্যতে॥

সত্যং দ্রব্যাদীন্যপি নিঃশ্রেয়সোপযোগীনি বিদ্যন্তে, তানি ত্বাহত্য নিঃশ্রেয়সানঙ্গত্বাদক্ষপাদা ন লক্ষয়াঞ্চক্রুঃ। বস্তুত তেষামপি পরম্পরয়া তদুপযোগোঽস্তীতি কাণাদতন্ত্রমনুসৃত্য লক্ষণমাচক্ষ্মহে ইতি। তানিদানীং পদার্থানুদ্দিশতি।

দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম জাতিশ্চৈতৎত্রয়াশ্রয়া।
বিশেষঃ সমবায়শ্চ পদার্থাঃ ষড়িমে মতাঃ॥"—

তার্কিকরক্ষা, ১২৯—৩০ পৃঃ।

এখানে ভাব পদার্থ অভিপ্রায়েই "পদার্থাঃ ষড়িমে মতাঃ" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। নতুবা কণাদের মতে অভাব যে পদার্থান্তর—সুতরাং সাকল্যে সপ্তপদার্থই যে বৈশেষিক দর্শনের অনুমত, এ কথা বরদরাজ পরে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এবং লক্ষিতা ষট্ পদার্থা, এতত্তামেব ভাবাত্মকং বিশ্বমন্তর্ভবতি। ভাবব্যতিরিক্তোঽভাব ইতি তেন সহ সপ্তৈব পদার্থা ইতি নিয়মঃ।"—১৬৩ পৃঃ।

করিলেন কেন? সংশয়াদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ত মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ উপযোগী নয়। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ন্যায়বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈলক্ষণ্য-রক্ষার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বিদ্যাতেই পৃথক্ পৃথক্ 'প্রস্থান' কীর্ত্তিত হইয়াছে। ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও আন্বীক্ষিকী—এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যার মধ্যে অগ্নিহোত্র, হবনাদি ত্রয়ীর প্রস্থান, হলশকটাদি বার্ত্তার প্রস্থান, স্বামী অমাত্যাদি দণ্ডনীতির প্রস্থান, আর আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যার প্রস্থান,—সংশয়াদি। সুতরাং সংশয়াদি পদার্থের নিরূপণ না থাকিলে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রস্থানভেদ রক্ষিত হয় না। এই উদ্দেশ্যেই সংশয়াদি পদার্থ প্রমেয়ের অন্তর্ভূত হইলেও আবার পৃথগ্‌ভাবে এই পদার্থগুলি নিরূপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও 'ন্যায়বার্ত্তিক'কার উদ্যোতকর, সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্ নিরূপণের এই উদ্দেশ্যই বর্ণন করিয়াছেন।

অথবা প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির আপেক্ষিক সাক্ষাৎ অঙ্গ, এইরূপ বিবক্ষানুসারেই ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থ প্রধানভাবে পৃথক কীর্ত্তিত হইয়াছে,—এবং তাদৃশ বিবক্ষার অভাববশতঃই অপ্রধানভাবে দ্রব্যগুণাদি পদার্থের কীর্ত্তন আছে। "'তর্কভাষা"র ব্যাখ্যাকার বিশ্বকর্ম্মা, স্বকৃত "ন্যায়প্রদীপ" নামক টীকায় এই কথাই বলিয়াছেন (১৬)

বৈশেষিক দর্শনোক্ত দ্রব্য-গুণাদি পদার্থের যথাযথ নির্ব্বচন যে মহর্ষি গৌতমেরও অনুমত, তাহা—"সগুণ দ্রব্যোৎপত্তিবৎ তদুৎপত্তিঃ (৩।১।২৬), "দ্রব্যগুণধর্ম্মভেদাচ্চোপলব্ধিনিয়মঃ" (২।১।৩৫), "অনেক দ্রব্য সমবায়াদ্ রূপ বিশেষাচ্চ রূপোপলব্ধিঃ" (৩।১।৩৬), "গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দানাং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যা অপ্‌তেজোবায়ূনাং পূর্ব্বং পূর্ব্বমপোহ্যাকাশস্যোত্তরঃ" (৩।১।৬২)—ইত্যাদি ন্যায়সূত্রের পর্য্যালোচনা করিলে অনুভূত হয়।

অতএব বৈশেষিক দর্শনোপদিষ্ট সপ্ত পদার্থেই যে মহর্ষি গৌতমের সম্মতি আছে, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। শঙ্করমিশ্র স্বকৃত "বাদিবিনোদ" গ্রন্থের এক স্থানে কোন্ কোন্ দার্শনিকের মতে কি কি পদার্থ, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থসন্দর্ভে কণাদ ও গৌতম এই উভয় মহর্ষিই যে দ্রব্য গুণাদি ভেদে সপ্ত পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা অতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে (১৭)।

মনন করিতে হইলে যে সকল পদার্থজ্ঞানের অত্যন্ত আবশ্যকতা, সেই সমস্ত পদার্থ ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনে বিশদ ও বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া এই উভয় দর্শনেরই নাম আন্বীক্ষিকী। "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ"—বেদবাক্যে আত্মশ্রবণের পর উপপত্তি অর্থাৎ হেতুপ্রয়োগের দ্বারা আত্মমননের ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য অলৌকিক বস্তুর অনুমানের সাক্ষাৎ ও পারম্পরিক কারণসমূহ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য আস্তিক সম্প্রদায়ের নিকট এই উভয় দর্শনই পরম আদরের সামগ্রী। প্রকৃত পক্ষে, ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী পদবাচ্য হইলেও চার্ব্বাকাদির বেদবিরুদ্ধ তর্কশাস্ত্রও আন্বীক্ষিকী শব্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্যই কৌটিল্য স্বকৃত "অর্থশাস্ত্রে"র বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণে লিখিয়াছেন,—

"সাংখ্যং যোগো লোকায়তঞ্চেত্যান্বীক্ষকী।"

এখানে 'সাঙ্খ্য' শব্দে বৈশেষিক দর্শন উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেন না, 'জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সঙ্খ্যায়ন্তে যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাঙ্খ্যম্' এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থানুসারে পদার্থ নিরূপণপর বৈশেষিক শাস্ত্রই 'সাঙ্খ্য' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী, 'সাঙ্খ্য' শব্দের পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'যোগ' শব্দের অর্থ এ স্থলে ন্যায়দর্শন। পূর্ব্বকালে নৈয়ায়িকগণ যে, 'যৌগ' নামেও আখ্যাত হইতেন, তাহার পরিচয় "ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ে"র টীকায় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রাচীন টীকাকার গুণরত্নসূরি লিখিয়াছেন,—

"অথাদৌ নৈয়ায়িকানাং যৌগাপরাভিধানানাং লিঙ্গাদি

---

(১৬) "যদ্যপি দ্রব্যাদিষু ষট্‌সু পদার্থেষু প্রমাণাদি ষোড়শানাং রূপণমন্তর্ভবতি, তথাপি প্রমাণাদীনাং সাক্ষান্নিঃশ্রেয়সাঙ্গত্ববিবক্ষয়া প্রাধান্যেন পৃথককীর্ত্তনম্। ষণ্ণাংতু তদবিবক্ষয়াঽপ্রাধান্যেন।"—ন্যায়প্রদীপ, ১০৭ পৃষ্ঠা।

(১৭) "কণাদ গৌতমীয়াশ্চ সপ্ত পদার্থান্ মন্যন্তে। তে চ দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়াভাবাঃ।"—
প্রয়াগস্থ পাণিনি কার্য্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থের ৫৩ পৃষ্ঠা।

ব্যক্তিরুচ্যতে।'—(এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং এখানে 'যোগ' শব্দের অর্থ যে ন্যায়দর্শন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কৌটিল্য এইভাবে বৈশেষিক দর্শন, ন্যায়দর্শন ও লোকায়ত অর্থাৎ চার্ব্বাক দর্শন—ত্রিবিধ শাস্ত্রকে আন্বীক্ষিকী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই তিনপ্রকার আন্বীক্ষিকীর মধ্যে প্রথম দুইটি দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, তৃতীয় লোকায়ত দর্শন বেদনিন্দক। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হয় নাই।

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥"

ইত্যাদি কারিকায় কণাদ ও বুদ্ধের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইপ্রকার প্রমাণ কথিত হইয়াছে। তবে কি বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় নাই? কারণ, শব্দকে প্রমাণ বলিয়া না মানিলে শব্দাত্মক বেদও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। এ শঙ্কার সমাধান এই যে, বৈশেষিক দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু শব্দ পৃথক প্রমাণ নহে, তাহা অনুমানেরই অন্তর্ভূত (১৮)। মহর্ষি কণাদ শব্দের পৃথক্ প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন না—এই কথাই "এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্" (৯।২।৩)—এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন,—"শব্দাদীনামপ্যনুমানেঽন্তর্ভাবঃ।"—শব্দাদি প্রমাণ অনুমানেরই অন্তর্ভূত। মহর্ষি কণাদ যে আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাহা "তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (১।১।৩)—এই সূত্রেই প্রকটিত হইয়াছে।

শব্দ প্রমাণ হইলেও, সকল শব্দেরই প্রামাণ্য নাই। যিনি সত্যবাদী, তাঁহার উচ্চারিত শব্দই প্রমাণ বলিয়া গণ্য। বক্তার দোষ-গুণ অনুসারেই বাক্যের মিথ্যাত্ব বা সত্যত্ব বধারিত হইয়া থাকে। আপ্তপুরুষের উচ্চারিত নির্দ্দোষ বাক্যকেই সকলে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে। প্রবঞ্চক পুরুষকে লোকে দুষ্ট বলিয়া জানে, এই জন্যই তাহার বাক্যে কেহ আস্থা স্থাপন করে না। সুতরাং বক্তার দোষেই শব্দ অপ্রমাণ হইয়া পড়ে, নতুবা শব্দ স্বাভাবিক দুষ্ট অর্থাৎ অপ্রমাণ নহে। 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধরাচার্য্য লিখিয়াছেন;—

"শব্দে কারণ বর্ণাদি দোষা বক্তৃনুরাশ্রয়াঃ।
ন হি স্বভাবতঃ শব্দো দুষ্টোঽ সুরভিবান্ধবৎ॥"—
(২১৬ পৃঃ)

এই জন্যই লৌকিক বাক্যের মধ্যে যিনি যথার্থ বক্তা, তাঁহার বাক্যই প্রমাণ, অন্য বাক্য প্রমাণ নহে। কিন্তু বৈদিক বাক্য সমস্তই প্রমাণ। কেন না, বেদের রচয়িতা ঈশ্বর। এখন প্রথমতঃই শঙ্কা হইতে পারে যে, কোন্ প্রমাণ-বলে ঈশ্বরের সদ্ভাব সিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রণীত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত করিবে? ঈশ্বরকে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না,—বেদে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু বেদ যে প্রমাণ, তাহা ত অগ্রে ব্যবস্থাপিত করা চাই। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য—অনাদি, অনন্তকাল তাহার সত্তা আছে, এই জন্যই তাহা প্রমাণ। এ ব্যবস্থা তার্কিকেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, নিত্য হইলেই প্রমাণ হয় না,—নির্দ্দোষত্বই প্রামাণ্যের প্রতি হেতু। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ ও মন নিত্য, কিন্তু তাহা যদি কোনও আগন্তুক দোষ-দূষিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রামাণ্য থাকে না। উন্মাদ অবস্থায় চিত্ত বিকৃত হইয়া গেলে দুঃখভোগের সময়েও 'আমি সুখী' বলিয়া মনে হয়। উন্মত্তের এই যে মানসিক সুখানুভূতি, ইহা কি প্রমাণসিদ্ধ? কিন্তু আবার চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিত্য না হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত তাহাতে কোনও দোষ না জন্মে, ততদিন তাহা প্রমাণ বলিয়াই পরিগণিত হয়। কাজে-কাজেই নিত্য হইলেই প্রমাণ হইতে পারে না,—বেদ যে নির্দ্দোষ, তাহা প্রতিপন্ন করা চাই। বস্তুতঃ, বেদ যে নিত্য নহে,—অন্যান্য বাক্যের ন্যায় বেদবাক্যও যে কাহারও প্রণীত, তার্কিক-সম্প্রদায় নানা উপায়ে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে এখন বেদ-প্রামাণ্য সিদ্ধি করিবার উপায় কি? এই উপায় নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই দার্শনিক জগতে তার্কিকগণ প্রাধান্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তার্কিকগণ প্রথমতঃ অনুমান রূপ প্রমাণের সহায়তায়

(১৮) শব্দোপমানয়োর্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে।
অনুমানগতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতম্॥"—
ভাষাপরিচ্ছেদঃ, ১৪১ শ্লোক।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। এই অনুমানের আকার এই,—

"ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ।" যে-যে বস্তুতে কার্য্যত্ব বিদ্যমান, অর্থাৎ যাহাদের উৎপত্তি হয়, তাহাদের একজন কর্ত্তা থাকে। কর্ত্তা ব্যতিরেকে কোনও পদার্থই উৎপন্ন হইতে পারে না! আমরা সকলেই জানি, ঘট যে উৎপন্ন হইল, কুম্ভকার তাহার নির্ম্মাণ না করিলে ঘট কখনই উৎপন্ন হইতে পারিত না। উৎপাদশীল বস্তুর একজন কর্ত্তা আছে, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং এই বিপুল পৃথিবী যখন উৎপন্ন বস্তু, তখন নিশ্চয়ই তাহার একজন কর্ত্তা থাকিবে। কিন্তু আমাদের মতন সাধারণ মনুষ্য ইহার কর্ত্তা হইতে পারে না,—যিনি ইহার কর্ত্তা, তাঁহারই নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর-সাধক এই অনুমান-প্রণালী যে নির্দ্দোষ, এ সম্বন্ধে ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রের নব্য-প্রাচীন গ্রন্থসমূহে নানাবিধ বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত অনুমান ভিন্ন ঈশ্বর-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যবিধ অনুমানিক রীতিও নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকরা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই নিবন্ধে সেই সকল জটিল বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা সম্ভবপর নহে। "কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে ঈশ্বর-সাধক যে সকল অনুমান-প্রণালী লিখিত আছে, তাহা অনেকেরই সুবিদিত;—শঙ্কর মিশ্রের নব-প্রকাশিত "বাদিবিনোদ" গ্রন্থেও ঈশ্বর-সিদ্ধির একাদশ প্রকার অনুমান-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অনুমানরূপ প্রমাণ-বলে সিদ্ধ এই ঈশ্বর যে অস্মদাদি অপেক্ষা একজন অসাধারণ পুরুষ, তাহা তাঁহার কার্য্য-বৈচিত্র্য দেখিয়াই অনুমিত হয়। এই জন্যই ত্রিলোক-পরিপালক ঈশ্বরের নাম, 'পুরুষোত্তম'।—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যে লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"—

গীতা, ১৫।১৬

এই ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রেই অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অনুমানের প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বাহ্য আয়তন কিছুমাত্র বিকৃত না হইলেও,—রাম কোনও বস্তু দেখিতে পায় না ও কোনও শব্দ শুনিতে পায় না, এই জন্য লোকে তাহাকে যে অন্ধ ও বধির বলিয়া অবধারণ করে, এই অবধারণের নামই অনুমিতি। সুতরাং অনুমিতির কারণ অনুমান যে অপ্রমাণ নহে, ইহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে। গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বকৃত "তত্ত্বচিন্তামণি"র 'অনুমিতি নিরূপণ' পরিচ্ছেদের শেষে বলিয়াছেন যে,—'অনুমান প্রমাণ নহে' ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তুমি যে সকল উপায় অবলম্বন করিবে, তাহাতে প্রকারান্তরে অনুমানেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

এই অনুমানরূপ প্রমাণকে কি ভাবে নির্দ্দোষরূপে দণ্ডায়মান করিতে হইবে, তাহার সমীচীন উপায়-সকল তর্কশাস্ত্রের অনুমান-খণ্ডে কথিত হইয়াছে। কেবল হেতু, সাধ্য, পক্ষ দেখাইতে পারিলেই অনুমান প্রমাণ হয় না। "নরশিরঃ-কপালং শুচি প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ, শঙ্খবৎ," "হীরকং লৌহলেখ্যং পার্থিবত্বাৎ, ঘটবৎ"—ইত্যাদি অনুমানাভাস যে কেন যথার্থ জ্ঞানের জনক হইবে না, তাহার সিদ্ধান্ত গৌতম-কণাদের উপদিষ্ট আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার অনুশীলন ব্যতীত জানিবার উপায় নাই।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি তার্কিকগণ নির্দ্দোষ অনুমানের সাহায্যে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, এই রাগদ্বেষশূন্য সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরের প্রণীত বলিয়াই বেদ প্রমাণ। সৃষ্টি-বৈচিত্র্য-বিধাতা করুণাময় পরমেশ্বরের বিস্ময়াবহ ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াই আস্তিকেরা বেদবাক্যে বিশ্বাস করেন (১৯)। প্রচলিত বেদগ্রন্থই সেই পরমেশ্বরের প্রণীত—সুতরাং প্রমাণ, ইহা শিষ্ট-পরম্পরা-পরিগ্রহ দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। তা'ই নব্য নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ গদাধর ভট্টাচার্য্য, "সামান্যনিরুক্তি"র বিবৃতির শেষে বলিয়াছেন,—"আগমে প্রামাণ্যগ্রহশ্চ শিষ্টপরিগ্রহাদিনৈব ভবতি।"

ঈশ্বর কি ভাবে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিলেন ত সুখময় করিলেন না কেন—ইত্যাদি শঙ্কার সমাধানও আন্বীক্ষিকী-বিদ্যার গ্রন্থসমূহেই সুস্পষ্টভাবে অভিহিত হইয়াছে। আন্বীক্ষিকীর উপকারিতা শতমুখে কীর্ত্তন করিলেও শেষ করা যায় না। সুতরাং আজ আমরা এই-খানেই প্রবন্ধের সমাপ্তি করিলাম। উপসংহারে কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি,—

প্রকাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডং নিহিতমিব ভাণ্ডং করতলে
স্বলীলা কৈবল্যাজ্জনয়তি পুনঃ সংহরতি যঃ।
স কোঽপ্যেবং দেবঃ কৃতচরণসেবঃ সুরনরৈ
রশেষং কল্যাণং কলয়তু সভাধিষ্ঠিতসতাম্॥

ইতি শম্।

---

(১৯) "কর্ত্তা য এব জগতামখিলাক্ষবৃত্তি
কর্ম্ম প্রপঞ্চ পরিপাক বিচিত্রতাজ্ঞঃ।
বিশ্বাত্মনা তদুপদেশপরঃ প্রণীতা
স্তেনৈব বেদরচনা ইতি যুক্তমেতৎ॥
আপ্তং তমেব ভগবন্ত মনাদিমীশ
মাশ্রিত্য বিশ্বসিতি বেদবচঃসু লোকঃ।
তেষামকর্ত্তৃকতয়া ন হি কিঞ্চিদেবং
বিস্রম্ভমেতি মতিমানিতি বর্ণিতং প্রাক্॥"—
ন্যায়মঞ্জরী, ২৪০ পৃঃ।

সাহিত্যের ভাষা

[ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল]

তারাশঙ্করের রেস্‌লাস্ ও কাদম্বরীর ভাষার দিন গিয়াছে; অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ ও উপাসক-সম্প্রদায়ের দিন গিয়াছে; বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসেরও দিন গিয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান বঙ্গভাষার ভিত্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের যুগ হইতে অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইয়াছে; এখন তাঁহাদের ভাষা সেকালের ভাষা; সংস্কৃতশব্দবহুল, সমাসবহুল ভাষা একালের অশ্রদ্ধেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাও সত্বর অতীত যুগের মধ্যে গণনীয় হইবে; সে ভাষাকেও সমুদ্রগর্ভে নিহিত করার জন্য তরঙ্গ উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ, সাহিত্যের ভাষা কি হওয়া উচিত—এই কথা লইয়া গুরুতর তর্ক উঠিয়াছে। সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা এক দলের মতে একবারেই পরিত্যাজ্য; তাঁহারা বলেন যে, চলিত কথোপকথনের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত। অন্য দল বলেন যে, সাধু বাঙ্গালা ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হওয়ায় উপযুক্ত। উভয় পক্ষেরই যুক্তির সমর্থক অনেক কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু কেবল চলিত কথোপকথনের ভাষা কিরূপে সাহিত্যের ভাষা হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

প্রথমতঃ, চলিত কথাবার্ত্তার ভাষার নিরাকরণের উপায় দেখিতে পাই না। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রকোষ্ঠের যে প্রদেশে বঙ্গভাষা প্রচলিত, তাহা সুবিস্তীর্ণ; কিন্তু প্রতি যোজনেই ভাষার কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন হয়। পাশ্চাত্য বঙ্গদেশের অর্থাৎ রাঢ়ের ভাষার পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিত অনেক প্রভেদ। উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়ে প্রভেদ আছে; বঙ্গে ও বরেন্দ্রে প্রভেদ আছে। এই ত দেশের কথা। পাত্রের কথা আরও দুরূহ। উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের ভাষার সহিত অন্যান্য শ্রেণীর অর্থাৎ কৃষক প্রভৃতির ভাষার অনেক পার্থক্য আছে। আবার কালে-কালেও ভাষার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। তবে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় চলিত ভাষা কি? চলিত কথাবার্ত্তার ভাষা কি? কোন্‌টি সাহিত্যের ভাষা হইবে?

কলিকাতা প্রকাণ্ড সহর; বঙ্গের রাজধানী; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। রাজনৈতিকদিগের ভাষায় না হউক, এখনও কার্য্যতঃ কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। দিল্লী নামমাত্র রাজধানী; বঙ্গের রাজধানী এখনও ভারতবর্ষের রাজধানী। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সহর কলিকাতার ভাষাই কি সাহিত্যের ভাষা হইবে? আমাদের তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই; কারণ আমরা কলিকাতার লোক; ঢাকা, চট্টগ্রাম অথবা মুরশিদাবাদবাসী নই। আমাদের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়, বড়ই ভাল কথা। কিন্তু আবার এক প্রশ্ন,—'আমাদের' শব্দের অর্থ কি? কলিকাতায় সকল জেলার লোক আছে, সকল শ্রেণীর লোক আছে। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, যশোহর, ঢাকা, রংপুর, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি সকল জেলার লোকেই কলিকাতা সহর গিস্‌গিস্ করিতেছে। তাহাদের পরস্পরের ভাষার পার্থক্য আছে। কলিকাতায় বহুকালবাসীদের ভাষার সহিত, মফঃস্বল প্রদেশ হইতে যাঁহারা অল্প দিন আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভাষার মিল নাই। উচ্চশ্রেণীর ভাষার ও কুলীদের ভাষার মিল নাই। এমন কি, কলিকাতায় বহুকালবাসী কায়স্থ-ব্রাহ্মণদের ভাষা ও সুবর্ণবণিকদের ভাষা এক নহে। যাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, কলিকাতা সহরেই কত প্রকার চলিত কথাবার্ত্তার ভাষা আছে; কলিকাতার বেবিলনের ভাষার বিসম্বাদ।

কলিকাতায় উচ্চশ্রেণীর সমাজে "গেলুম" "খেলুম" প্রচলিত। কলিকাতা প্রবাসী হুগলী-বর্দ্ধমানের লোকেরা এখনও "গেনু" "খেনু" ছাড়েন নাই। তাঁহারা এখনও কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের ভাষা ব্যবহার করেন। আবার নদীয়া জেলার লোকেরা "গেলাম" "খেলাম" বলেন। কেহ-কেহ যাহাকে "তক্তপোষ" বলেন, কলিকাতার লোকেরা তাহাকেই "চৌকী" বলেন। শব্দের কথা ছাড়িয়া দিলেও,

প্রত্যয়ের কি? ভাষায় প্রত্যয় ত এক হওয়া আবশ্যক। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কলিকাতায় প্রত্যয়েরও প্রভেদ অনেক। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় বর্ষে স্যার রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা গদ্য গ্রন্থ। ইহার ভাষা কি সাহিত্যের ভাষা হইবার উপযুক্ত? কখনই নয়। এ ভাষা নাগরিকও নহে, প্রাদেশিকও নহে; সাধু নহে, অসাধুও নহে। রবীন্দ্রনাথ কবিকুলের প্রথম শ্রেণীর; তিনি আমাদের দেশের উজ্জল রত্ন। তিনি আমাদের আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার গৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। কিন্তু তাঁহার গদ্যের ভাষা সহনীয় নহে। "একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইলে, কোনো বড় জিনিষকে ঠিক বড় করিয়া দেখা যায় না" (সঞ্চয় ১পৃ ৩।৪ ছত্র)। কোন শব্দের "ন" এ ওকার দেওয়ায় আপত্তি নাই; কিন্তু "কোনও" লেখায় তাৎপর্য্য বেশি বুঝা যায়। যাহা হউক "বড় করিয়া" কি? আমরা জানি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের লোকেরা "কৃ" ধাতু খুব ব্যবহার করিয়া থাকে। "খাওয়া হইল" স্থলে তাহারা "খাওয়া করা হইল" বলিবে। কলিকাতার বা হুগলীর চব্বিশপরগণার ভাষায় "বড় করিয়া" ব্যবহার হাস্যোদ্দীপক। হইতে পারে "বড় করিয়া" প্রভৃতি কলিকাতার ঠাকুরদের ভাষা; তাহা আমরা জানি না। বোলপুরের ভাষাও হইতে পারে।

"যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি, তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিষকে খাটো করিয়া লই" (১ পৃষ্ঠা ৪।৫ ছত্র) "খাটো" কি? কলিকাতায় অনেকেই "ছোট দেখি" বলিবে। দার্শনিক উক্তিটির অর্থ কি, তাহা দূরে থাকুক, অদ্য আমরা কেবল ভাষার কথা বলিতেছি। "পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিত মত যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বাঁচাই শক্ত হয়।" আমরা ক্ষীণবুদ্ধি, সাদাসিধা লোক, "একান্ত করিয়া"র অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। "জগতের গভীর মাঝখান'টি'তে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ ইত্যাদি।" (৬ পৃষ্ঠা) "সঞ্চয়ের" পাঠকগণ ভাষা বুঝিয়াছেন কি? "বিশ্বের বিপুল বোঝা" সাধুও নয়, অসাধুও নয়।

স্থানান্তরে দেখা যাউক—"কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেন না জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস।" (২৬ পৃঃ ১২-১৪ ছত্র)। "মরিতে" কেন? "চায়" বলিতে হইলে "মর্‌তে" বলাই প্রচলিত। হয় লেখ "মর্‌তে চায় না" না হয় লেখ "মরিতে চাহে না।" "ভেদটাকেই," অদ্ভুত প্রয়োগ; ভদ্র-সমাজে এরূপ অসাধু প্রয়োগ নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Slang বলা যায়। আমরা ত কখন "চোখে" বলি না, "চখে" বলি; "চ"এ ওকার দেওয়া চো কখন শুনি নাই। "সেইটেই" না "সেইটাই"—সেইটেই প্রকৃত Slang; নিম্নশ্রেণীর লোকেরই কথা। এরূপ সাধু, অসাধু ও নীচ শ্রেণীর ভাষার মিশ্রণে কি বাঙ্গালাভাষা গঠিত হইবে? এককালে আদি-ব্রাহ্মসমাজের ভাষা বড়ই সংস্কৃত শব্দপূর্ণ থাকিত। স্যার রবীন্দ্র একবারে অপর কেন্দ্রে গিয়াছেন।

এরূপ মিশ্রণের আবশ্যকতা কি? আমরা জানি যে ভাষার গঠন কোন এক ব্যক্তির আয়ত্তাধীন নহে। উহা ক্রমশঃ স্বতঃ-গঠিত হয়। নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের ভাষা উচ্চ-শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশ্রণে পরিবর্ত্তিত হয়; আবার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মিশ্রণে সাধুভাষাও কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যা অনেক অধিক, তবে তাহাদের ভাষাই কি বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা হইবে? কিন্তু কোন দেশে, কোন কালে নিম্নশ্রেণীর ভাষা সাহিত্যের ভাষায় পরিগৃহীত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে এরূপ ন্যায়, রুচি ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতিকূলে চেষ্টা কেন?

উচ্চশ্রেণীর ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হইলেও সে বিভিন্নতা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ভাষার বিভিন্নতা অনেক অধিক। নিম্নশ্রেণীর ভাষা কদাচই সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী বঙ্গদেশের সাহিত্যের ভাষার আদর্শ; সে ভাষা সকল শ্রেণীর সকল প্রদেশের বাঙ্গালীই সহজে বুঝিতে পারে; কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর চলিত কথাবার্ত্তার ভাষা সকলের সুবোধ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

সাহিত্যের ভাষা ও চলিত কথোপকথনের ভাষা কোথাও ঐক্য নয়, কোথাওই এক ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন এককালের চলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা

বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু অনেক কারণে তাহারও পরিবর্ত্তন হয়। ভিত্তির পরিবর্ত্তন হয় না বটে; উপরের গঠনের ক্রমশঃ কাল-সহকারে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যখন আর পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব হয় এবং সাহিত্যের ভাষার ও চলিত ভাষার পার্থক্য অত্যধিক হয়, তখন সাহিত্যের ভাষাকে মৃত (dead) বলা যায়। সাহিত্যের ভাষা যতক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল, ততক্ষণ ইহা জীবন্ত (living)। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন নিম্নশ্রেণীর ভাষার মিশ্রণে নহে।

"জগৎটা চলচে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানেও আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখচি, নইলে দেখা চলে' 'জানা চলে' পদার্থটা থাকৃতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটাই বিদ্যার মায়া" (১১৮পৃঃ ১৮-২২ ছত্র)। আমরা জানি না, কত সাহিত্যিক এইরূপ ভাষা চালাইতে অগ্রসর। কতকগুলি "টা" প্রয়োগই কি প্রকৃতিপুঞ্জের ভাষা? তিন ছত্রের ভিতর পাঁচটি "টা"। আবার স্যার রবীন্দ্রনাথের 'টা'ই ভাল লাগে, 'টি' ভাল লাগে না। কলিকাতায় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা কত "টা" ব্যবহার করেন জানি না; এইমাত্র জানি, "টা" হীনত্ব-প্রকাশক, "ছেলেটা" ও "ছেলেটি"তে কি প্রভেদ, তাহা অনেকেই বুঝেন।

আমাদের আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।" রসাত্মক বাক্যই কাব্য। যে বাক্যে রসের উদ্দীপন হয়, তাহাই কাব্য। রস অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র ইত্যাদি। শব্দ ও শব্দবিন্যাস রস-উদ্দীপনের একটি বিশিষ্ট কারণ। একটী প্রবাদ আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাস ও বররুচির সহিত যাইতে-যাইতে সম্মুখে একটী পত্রবিহীন শুষ্ক বৃক্ষ দেখিয়া সহচর কবিদিগকে দৃশ্যটির বর্ণনা করিতে বলিলেন। বররুচি বলিলেন "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"; কালিদাস বলিলেন "নীরসঃ তরুবরঃ পুরতো ভাতি।" দুইটীর এক অর্থ; কিন্তু শব্দচয়নে ও শব্দবিন্যাসে প্রভেদ। কোন্‌টিতে তৃপ্তি অধিক হয়? সকল ভাষায়ই তাহাই। বর্ণনা স্থলে, রসের উদ্দীপন স্থলে, এক প্রকার ভাষার প্রয়োজন; মোটামুটি বুঝাইবার জন্য চলিত কথাবার্ত্তার ভাষার প্রয়োজন। কিন্তু চলিত কথায় অর্থ নহে—Slang বা নিম্নশ্রেণীর ব্যবহারের ভাষা। ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত, যাহা সাহিত্যের ভাষা হইতে যৎকিঞ্চিৎ পৃথক্, তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; তাহাই সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত। উভয়ে পার্থক্য নাই বলিলেই হয়; যে টুকু পার্থক্য আছে, তাহার সামঞ্জস্য সহজেই হইবে; আপনা হইতেই হইবে। কিন্তু যতদূর সম্ভব, সকল ভাষায়ই রস থাকা উচিত। শুষ্ক কাষ্ঠ উনুনের মুখে ভাল; তদ্দ্বারা সহজে ভোজ্য-দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া রসনার ও উদরের তৃপ্তি হয় বটে। কিন্তু রস শব্দে সাহিত্যিকেরা জিহ্বার বা উদরের বিষয়ীভূত দ্রব্য ভাবেন না; রসের বিষয় মনে, হৃদয়ে। রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ এবং শৃঙ্গার, হাস্য ও করুণে প্রভেদ এই। "শুষ্ক কাষ্ঠে" ও "নীরস তরুতে" প্রভেদ এই।

"ঈশ্বর আছেন এইটুকমাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলিনে।" "বিশ্বাসকে" লিখিলেই কি মনের ভাব প্রকাশ করা যাইত না? "বলিনে" গ্রাম্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যবহার্য্য হইতে পারে; কলিকাতার কথা দূরে থাকুক, কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী প্রদেশের ভদ্র-সমাজেও "বলিনে", "করিনে" ব্যবহৃত হয় না; "বলি না," "করি না"র স্থলে "বলিনে" "করিনে" চলিবে কি?

আমরা এককালে ভাষাবিজ্ঞানবিৎ মোক্ষমুলার প্রভৃতির মতানুসারে মনে করিতাম, ভাষা দ্বারা কোন্ জাতি মূলে আর্য্য ও কোন্ জাতি মূলে অনার্য্য—সেমেটিক, মোঙ্গোলীয় বা দ্রাবিড়ী, তাহা ঠিক করিতে পারা যায়। এখন দেখিতেছি, ভাষাবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের সে কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইতে পারা যায় না। বঙ্গদেশের সাঁওতালরা বেশ বাঙ্গালা কথা কহিয়া থাকে। ছোটনাগপুরের যে সকল মুণ্ডা হুগলী প্রভৃতি জেলায় কিছুদিন কাজ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেছে। কিছুদিন পরে তাহারা খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ, ভাষা জাতিগত নহে; সমাজ ও অভ্যাস ভাষার মূল। অনেক অনার্য্য জাতি আর্য্য ভাষা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। সাধু বা সাহিত্যের ভাষা অতি সহজেই নিকৃষ্ট জাতিরা শিক্ষা করিয়া থাকে। পাঠশালায় তাহাদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিশুপাঠ গ্রন্থ পড়িতে হয় না। ভদ্র-সমাজের ছায়ায় ভাষারও সংস্কার হয়। প্রয়াগ-তীর্থে গঙ্গার শুভ্র সলিলের ও যমুনার মেঘবর্ণ সলিলের প্রভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; কিন্তু প্রয়াগ-তীর্থ হইতে এক ক্রোশ দূরে উভয় সলিল এরূপ মিশ্রিত হয়

যে, যমুনার কাল-জলের অস্তিত্বই থাকে না, বলা যাইতে পারে। ভাষারও তাহাই। অসাধুভাষা অতি সহজেই লয় প্রাপ্ত হয়, এবং ভদ্র-সমাজের ভাষা অভদ্রেরও ভাষা হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রাদেশিক ভাষা অথবা নিকৃষ্ট জাতির ভাষা সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই। সাহিত্যের ভাষা সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর বোধগম্য করিবার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর (slang) অথবা কোন প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করায় ক্ষতিরই সম্ভাবনা; লাভ কিছুই নাই। উপরের শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে যোগ্যতমেরই জয় হইবে; নিম্নস্তরের ভাষা ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হইবে ও সাহিত্যের ভাষা সেই স্থান অধিকার করিবে। "ধন্না" "ধরণা" হইবে; "এইটেই" "এইই" হইবে। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, কেবল কথাবার্ত্তার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে না।

অন্য দেশের সাহিত্যের ভাষার সহিত তুলনার বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলেও, দুই-একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া অযৌক্তিক নহে। ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভাষা ইংরাজী। ইংরাজের নিকট দাসত্বের জন্যই আমরা এই ভাষা শিক্ষা করি। ইহা ইংরাজ-রাজ্যের সাহিত্যিক ভাষা; স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ড ও মান দ্বীপে ইহাই সাহিত্যের ভাষা। কিন্তু এ ভাষা কি সর্ব্বপ্রদেশের, সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের কথাবার্ত্তার ভাষা? ইহা শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর ভাষামাত্র। এমন কি, ইহা লণ্ডন নগরের অধিকাংশ লোকের ভাষা নহে।

ফরাশী দেশেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। ব্রিটানির ভাষা প্রভান্সেল ভাষা হইতে পৃথক্; কিন্তু ফরাসী সাহিত্যিক ভাষা একই। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে; আর কালি-কলম নষ্টের আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ যাঁহারা বিপরীত ভাবেন, তাঁহারা ভাষার গতি ও প্রকৃতি আদৌ জানেন না। সাহিত্যের ভাষা ক্রমশঃ প্রকৃতিবর্গের ভাষা হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিবর্গের বা প্রাকৃত ভাষা শনৈঃ-শনৈঃ সাহিত্যের ভাষায় মিশ্রিত হয়। পরস্পরের বিদ্বেষ নাই; গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিশ্রিত হইয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

সাধু বা সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষার আর একটী বিশেষ উপকারিতা আছে। সে উপকারিতা সমগ্র ভারতবর্ষের, কোন প্রদেশের নহে। উত্তর ও পাশ্চাত্য ভারতবর্ষের ভাষা আর্য্য ভাষা—সংস্কৃতমূলক। সকলগুলিই প্রাকৃতের রূপান্তর। আপাততঃ বাঙ্গালা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী ও উড়িয়া বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে, তাহারা মূলে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃতমূলক শব্দের অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইলে, প্রাদেশিক ভাষা সমূহের সহজে একত্ব সম্পাদিত হইবে। আমরা সহজেই গুজরাটী বা মহারাষ্ট্রী বুঝিতে পারিব; মহারাষ্ট্রীয়েরাও সহজে বাঙ্গালা বুঝিতে পারিবে। ভারতবর্ষে সাহিত্যের ভাষা এক হইলে আমাদের একত্বের সূত্রপাত হইবে। এক কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাগধী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা এবং ভদ্র-সমাজের পরস্পরের পত্রাদি ও কথোপকথনের ভাষা ছিল। এখন সে দিন গিয়াছে; ভ্রমসংকুল ইংরাজী এখন আমাদের পরস্পরের কথোপকথনের ও বক্তৃতার ভাষা। আমাদের সাহিত্যের ভাষা নাই। যাহাতে ভারতবর্ষের সম্যক মিলনের জন্য একটী সাহিত্যের ভাষা হয়, তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা আবশ্যক। প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষা থাকিবেই; কিন্তু একত্বের ভিত্তি এক সাহিত্যিক ভাষা। কিন্তু তজ্জন্য আমরা কিছুই আয়োজন করিতেছি না।

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪৬)

নির্ম্মল বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ধীরা আজ কয়দিন হইতেই বোধ করি অসুস্থ। তাহার স্বভাব-মৃদু চলন আজকাল অধিকতর মন্দ হইয়াছে—স্বল্প-ভাষ প্রায় বন্ধ। মুখে তাহার যে একটি সকরুণ হাসির অস্পষ্ট রেখা একবিন্দু অশ্রুজলের মতই সর্ব্বদা স্পন্দিত হইত, সেটুকু যেন অধিকতর করুণ দেখাইয়া নির্ম্মলের চিত্তকেও বেদনাশ্রু মাখাইতেছিল। সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসিয়া দু'জনে ইদানীং অনেক সময় পড়াশোনা করিত। এ কয় দিন ধীরা পূর্ব্বের ন্যায় ছাদে আসিলেও বেশ বুঝা যায় যে, সে আর বঙ্কিম বাবুর পুস্তকের পাঠ মন দিয়া শুনিতেছে না। মন তাহার যেন উদাস হইয়া, কোথাকার কোন্ বিজনান্ধকারে একা একা শূন্যে চাহিয়া আছে। নির্ম্মল পুস্তক পাঠ করিতে করিতে বারেবারে পুস্তক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লক্ষ্য করে, ধীরা অত্যন্ত অন্যমনস্ক! যাহার চক্ষু দেখে না—কর্ণ তাহার বড় মন দিয়া শোনে; কিন্তু আজ সেই দৃষ্টিহীন বিশাল নেত্রদু'টির ন্যায় কর্ণদ্বারও যেন রুদ্ধ। বইখানা মুড়িয়া রাখিয়া নির্ম্মল তাহার কাছে সরিয়া আসিল। উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শরীর কি ভাল নেই, ধীরা?"

আবার সেই শরীর! ধীরার বক্ষে দুর্জ্জয় অভিমানের তরঙ্গ সবলে ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া উঠিল। হতভাগিনী ধীরার এই ছাই শরীরটাই কি সব? ধীরা বলিতে কি শুধু তাহার এই ছার শরীরটাকেই বুঝায়? তাহার আর কিছু কি নাই? কঠোর তিরস্কারের অনুকল্প ক্ষীণ হাসি হাসিয়া সে সংক্ষেপে উত্তর কহিল—"ভালই আছে।"

"ঠিক বল্‌ছো? অসুখ হয় ত লুকিয়ে রেখো না; এখান থেকে সহর আবার অনেক দূর। এখানে—এমন কি একখানি গাঁ পর্য্যন্ত নেই।"

ধীরা এ কথার জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল বলিতে লাগিল—"ক'দিন থেকে মনে হচ্চে, তোমার কি অসুখ করেছে। নতুন-ঝি তখন তোমায় বলছিল, তুমি কিছু খেতে পারো নি। রাত্রে একবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে মনে হলো—যেন তুমি ক্রমাগত এ'পাশ-ও'পাশ কর্‌চো; জেগে আছ কি না, সেটা ঠিক বুঝতে পারলেম না, তাই সাড়া দিলেম না। মুখটাও আজ বড় শুকিয়ে গ্যাছে। কেন ধীরা! কি হয়েছে, আমায় তুমি বল্‌চো না কেন? মাথা ধরেছে? সর্দ্দি হয়নি তো? কি হয়েছে? সেই ঝড়ের রাত্রের ঠাণ্ডা লেগেছিল বুঝি? এইবার না হয় এসো, বাড়ী ফেরা যাক্। রাত্রে একটু-একটু হিম পড়তে আরম্ভ হয়েছে; কোন্ সময়ে কখন্ তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে, কি হতে কি হবে। আর জলের উপর থেকে কাজ নেই।"

এই বাড়ী ফিরিবার কথা কাণে প্রবেশ করিবামাত্র ধীরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। বন্ধনমুক্ত বন্দীর মনে আবার তাহার কারাগারের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। আবার সেই নিরানন্দ গৃহ-কোটরে তাহাকে রুদ্ধ হইতে হইবে? 'নিরানন্দ'? 'গৃহ-কোটর'? হায় রে! তাহার আবার আনন্দ কোন্‌খানে! স্বাধীনতার মুক্ত ভূমিই বা তাহার কোথায়? কিন্তু হোক তা', তবু এ'ও তাহার পক্ষে অনেক ভাল! হায়! কেন সে এর অধিক লোভ করিতে যায়? সেখানে গেলে এটুকুও তো আর পাইবে না!

নতুন-ঝি বলিল "দিদিমণি! তোমার শরীলটা বুঝি ভাল নেই? খাওয়া-দাওয়া তো একপেরকার ত্যাগ করেচ। তা' কিছু ওষুধ-বিষুধ খাও না,—যাতে বেশ ক্ষিদে-টিধে হয়। জামাই বাবুকে বল্‌বো—"

যে কখনও কাহাকেও 'তুমি' ছাড়িয়া 'তুই' বলে না, সেই সকলের নিকট বিনীত-মূর্ত্তি ধীরা আজ সহসা এই কথায় ভীষণভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—"পোড়ারমুখি! ওষুধ খাবে, না, ছাই খাবে! খবরদার, কারুকে কিছু তুই বল্‌তে পা'বিনি।"

ঝি অবাক হইয়া গিয়া কহিল—"সে কি দিদি, একে

তোমার এই কাহিল শরীর, ওষুধ-বিষুদ সময়ে করলে একটা বড় রকম কিছু হতে পাবে না ; নৈলে—"

সেই রকমই অনলবর্ষী জ্বালাময় স্বরে বালিকা পুনশ্চ গর্জ্জিয়া উঠিল "হয় হবে, আমার হবে,—তোর তাতে কি ? তুই চুপ করে থাক্।"

তার পরই অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল। ঝি তখন অপ্রতিভের একশেষ হইয়া চাহিয়া রহিল।

ধীরা এই যে নিজের বুভুক্ষু চিত্তের নিদারুণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় জ্বলিয়া, সুগভীর অভিমানে আবক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া রহিল, ইহার কিছু ফল ফলিল কি ? কি ফল ফলিবে ? সংসারের জীব হইয়াও তো নির্ম্মল সংসারী নয়। সে কেতাবে পড়িয়াছে, পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা পরম ধর্ম্ম ! তাই সে নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও সেই পরার্থ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ধীরার জন্য ভ.বনায় সে রাত্রে ঘুমাইয়াও স্বস্তি পায় না। কিসে সে ভাল থাকে, একটু সুখে থাকে, এই চিন্তায় তাহার অধিকাংশ কালই কাটিয়া যায় ! আহা বিধি-বিড়ম্বিতা ! কিন্তু বিধাতা যা করেন—তাঁহাকে সাজে ; মানুষ হইয়া সে তাহাকে এতটুকুও উপরি-কষ্ট দিতে পারিবে না। সে জানে, প্রায় সকল লোকেই নিজের-নিজের স্ত্রীকে আদর করে, যত্ন করে, এবং ভালও বাসে।—কিন্তু সে যত্ন-আদরে, সে ভালবাসায় তাহাদের অনেকখানিই স্বার্থগন্ধ মিশ্রিত থাকে। তাহাদের সেই দেওয়ার মধ্যের প্রায় অর্দ্ধেকটুকুই তাহাদের নিজের প্রাপ্য। সে ইহার সহিত সেই ইন্দ্রিয়-গন্ধপূর্ণ স্বার্থ-সুখ-বিজড়িত ভালবাসার তুলনা করিতে গিয়াই যেন লজ্জায় মরিয়া যায়। নিজের অজ্ঞাতেই তাহার নিজের মনের কাছে কোন্ সময়ে যে তাহার প্রতিজ্ঞা-পাঠ আপনা হইতে হইয়া গিয়াছিল,—আদালতে দাঁড়াইয়া—"ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া" ইত্যাদি রূপ হলফ-পাঠের চেয়েও তাহার গুরুত্ব তাহার নিকটে অল্প নহে। তাই ধীরার শরীর-মনের উপরে এতটুকু দাবী না রাখিয়া, সে প্রাণপণে তাহাকে ভালবাসিতেছিল। এইটাই তাহার চোখে স্বামিত্বের আদর্শ বোধ হইয়াছিল। তাই, ধীরার মনের খবর তাহার নর তড়িত কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেমন করিয়া সে বুঝিবে? সে তাহাকে তাহার বয়স্থা ছোট বোনের মতই সাবধানে রক্ষা করিতেছিল। সে জানিয়া-শুনিয়া তাহার কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটিতে দেয় নাই, আর প্রাণ থাকিতে কখনই তা দিবে না।

এই সময় হঠাৎ একদিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল ! মধ্য-শরতের এক সুবিমল চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলা মনোমোহিনী সন্ধ্যায় নদীতীরে কিছুদূর ঘুরিয়া আসিয়াই, সেই প্রস্ফুট হৈমজ্যোৎস্নালোকে নির্ম্মল তাহার সম্মুখে এই সুদূর বর্ম্মাদেশের জনসম্বন্ধবিহীন নির্জ্জন গিরি-নদীর বক্ষস্থলে অতর্কিতভাবে সহসা তাহার আবাল্য-কৈশোরের প্রিয়তম বন্ধু যতীশ্বরকে দেখিতে পাইল। এ সাক্ষাৎ নির্ম্মলের পক্ষে একান্তই অপ্রত্যাশিত। এ সংসারে যাহা পাওয়া সহজ এবং সম্ভব নয়, তাহা পাওয়ার মত সুখদাতা বুঝি কিছু নাই ! পিসি-মার ছেলেকে পাইয়া, আজ সেই দুর্ল্লভ রত্নপ্রাপ্তির সুখে বিভোর হইয়া, নির্ম্মল তাহাকে যেন শিশুর মত আনন্দে, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল—"যতি, তুমি ! তুমি এসেছ ? আঃ ! কত দিন পরে যতি ! কত দিন পরে তোমায় দেখ্‌লাম।"

যতীশ্বর নির্ম্মলের অপেক্ষা মাস-কতকের ছোট। দু'জনে চির দিন বড় ভাব। সে হাসিয়া উত্তর করিল—"তোমার কাছে কি এখনও কালচক্র পূর্ব্বের মত চলে নিমু-দা ? আমরা বলি, বুঝি সে সব অচল হয়ে গ্যাছে।" প্রথম সাক্ষাতেই এই প্রচ্ছন্ন অভিমানটুকু ব্যক্ত হইল।

এই সূচিকা-বেধে নির্ম্মলের কি করিবে ? সে তখন আশাতীত আনন্দে বালকের মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে হাসিতে-হাসিতে অজস্রধারে প্রশ্ন বর্ষণ করিল—'সকলে কেমন আছেন, এবং আছে ? পিসিমা ? পিসে-মহাশয় ? বড়-দা (পিসিমাতার জ্যেষ্ঠপুত্র) ? নবীন (উঁহারই সর্ব্ব কনিষ্ঠ) ? মেয়েরা...... ? একজনের নাম শুধু মুখে আনিতে পারিল না,—কণ্ঠাগ্রে হর-কালকূটের ন্যায় সেই গরলটুকু আট্‌কাইয়া রহিল,—বুঝি এমন আনন্দোচ্ছ্বাসও সহসা সেই দুষ্ট স্মৃতির তাড়নায় প্রহত হইয়া উঠিল। যতী-দা কি সব শুনিয়াছে ? তিনি কি জগৎ-সমক্ষ হইতে এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক চাপিয়া রাখিবেন ? কেন রাখিবেন ? অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্যও এ-সব গুপ্ত পাপ সর্ব্বজনবিদিত হওয়া উচিতই তো বটে !

যতীশ্বর কহিল, "দেখ্‌লেম, তোমার এই সাগর-পারে যাত্রার ঋষি অগস্ত্যচ্ছন্দ—মহাপ্রস্থান ! অগত্যা, এই দুর্যোগ

উপস্থিত দেখে, নিজেই একটা লাফ মার্‌লেম! সত্যি নিমু-দা, তোমার ব্যাপারখানা কি বলো তো? বউ কি আর কারু হয় না? কিন্তু বধূ-সমুদ্রে এমন করে তলিয়ে যেতে সবাই পারে না। মা বলেন—"

এমন সময় তাহাদের পশ্চাতে মৃদু-মৃদু অলঙ্কার-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। উভয়েই ফিরিল। নির্ম্মল তথনই যতীর হাত ছাড়িয়া দিয়া, সেইদিকে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া বলিল, "ধীরা, যার কথা তোমায় প্রায়ই বলি, সেই আমার ভাই যতী এসেছে।"

ধীরা মৃদুস্বরে কলের মত কহিয়া উঠিল—"ভারী খুসী হলেম। আপনার গল্প আমি অনেক শুনেছি।"

যতীশ্বর তাহার বৌদিদির এই লজ্জাহীনতায় ঈষৎমাত্রায় বিস্ময় বোধ করিলেও, তৎক্ষণাৎ ধীরাকে নমস্কার করিয়া সহাস্যে কহিল—"এসেছি বটে, বৌদি, কিন্তু বড় ভয়ে-ভয়েই এসেছি; আশা-ভরসা সমস্তই একরকম ত্যাগ করে এসেছি।"

বিস্মিতা ধীরা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

"কি জানি দিদি, তোমার কটাক্ষ-ফুলশরে যখন আমার নিমু-দা'র মত মহাদেব আজ হিমালয়বাসী, তখন আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী যে একটি তীরেই ঘায়েল হয়ে পড়বে,—তা আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বে শুনেছিলুম, এ বিদ্যাটা কামরূপ-কামাখ্যারই একচেটে ছিল; কিন্তু এখন ভারতের সকল বিদ্যার মত এই কটাক্ষ-বিদ্যাটাও দেখ্‌ছি সাগর-পার হয়েছে।"

ধীরা ও নির্ম্মল উভয়েরই বক্ষ ভেদ করিয়া দুইটি ক্ষুদ্র শ্বাস একসঙ্গে উত্থিত এবং একসঙ্গে পতিত হইল। যতী তাহার শব্দ শুনিতে পাইলেও মর্ম্ম বুঝিল না। সে আপন ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিল—"অনেকদিন ধরেই আস্‌বো-আস্‌বো করছি; মা কিছুতেই আস্‌তে দিতে চান না। বোধ করি তিনি মনে করেন, একটি-একটি করে বাড়ীর সব ছেলেগুলির যদি মানব-জন্ম ঘুচে 'ভেড়া'-জন্ম দাঁড়ায়, তা'হলে বড় সুবিধের হবে না। তা, আমি তাঁকে অনেক করে, বুঝিয়ে এসেছি যে, আমি এখানে ত্রি-রাত্রি বাস করে, ঐ নিরীহ জীবের উপনিবেশ-স্থাপন বৃদ্ধি করবো না—এবং চাই কি কটাক্ষ-বিদ্ধাহত হবার উপক্রম দেখ্‌লেই একটু—"

ধীরা ঈষৎ চঞ্চল হইয়া "আমি নতুন ঝিকে ডেকে দিই গে, সে এসে ঠাকুরপোর খাবার দাবার যোগাড় করে দিক।" এই বলিয়া চলিয়া গেল। তখন প্রসঙ্গ চাপা পড়িল। নির্ম্মলকে নীরব দেখিয়া যতীশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"কি নিমু-দা, ট্রেস্‌পাস্‌ করিচি বলে রাগ করলে না কি?"

নির্ম্মল তখন চট্‌কা-ভাঙ্গা হইয়া উত্তর করিল—"না;—তুমি বোধ করি জান না?"

"কি?"

"আমার স্ত্রী অন্ধ।"

"সত্যি!" বলিয়া যতী বিস্ময়ে আঁৎকাইয়া উঠিল—"ওঃ! বুঝেছি। আমায় মাপ করো; আমি—আমরা কেমন করে তা জান্‌বো। বুঝেছি 'কামাখ্যার' সঙ্গে এই সাগর-পারের দেশের এইখানেই আস্‌মান-জমিন্ ফরথ্।"

(৪৫)

যতীশ্বর এল্-এম্-এস্ পাশ-করা ডাক্তার। কলিকাতায় সে এই সবেমাত্র প্র্যাক্‌টিস সুরু করিয়াছে। তাহার বড় দু'তিনটি মক্কেলের মধ্যে একটি ধনী মাড়ওয়ারী মক্কেল সম্প্রতি কোন ব্যবসা-কার্য্যের জন্য রেঙ্গুণে আগমন করায় সে তাঁর সঙ্গে আসিয়াছিল। রেঙ্গুণে আসিয়া এই জলযাত্রার কাহিনী শুনিয়া সে বড় দুঃখিত হইল, কিন্তু হাল ছাড়িল না। তিন-চারি দিনের ছুটী লইয়া সে জলপথেই ইহাদের খোঁজে আসিল,—সঙ্গে নিশানা দিবার জন্য ব্রজর নিকট হইতে একজন লোক চাহিয়া লইয়াছিল।

নির্ম্মলের পক্ষে এ ক'টা দিন স্বপ্নের মত সুখের। দুই বৎসরাধিক কাল সে নিজের দেশ, ভূমি, আত্মীয়জন হইতে নির্ব্বাসিত। সে সব এখন তাহার নিকট যেন কোন্ সুদূর অতীতের স্মৃতি। তাই এই একঘেয়ে জীবনের মাঝখানে এই কয়টি দিনের আকস্মিক অভ্যুদয় তাহার নিকট একান্ত আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয়দিন নিজের সুখে সে আর সব কথা ভুলিয়া গেল; এমন কি ধীরার তত্ত্বাবধানেও ত্রুটি করিতে লাগিল।

যতী একদিন কথাটা পাড়িল। সে বলিল—"নিমু-দা, সব জিনিষই দেখ্‌ছি দূরে থেকে দেখায় ভাল। দেশে থাক্‌তে মনে করতুম, তোমার খুব সুখ। সত্যি কথা বল্‌তে কি—এত চেষ্টা-যত্নেও যখন সারাদিনে দু'টো টাকাও আন্‌তে পারিনে, তখন—এক-এক সময় তোমার উপরে মনে-মনে একটু হিংসাও করেছি; ভেবেছি—তোমার কি বরাতের

জোর! উপকথাকে সার্থক করে, এক রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব পেয়ে দিব্যি মজা করচো; আর আমরা—যাক্, এখানে এসে সে ভ্রমও এবার ঘুচলো। দেখ্‌লুম, মোহরের গদি পেতে বসলেই মানুষ সুখী হয় না।"

নির্ম্মল এ কথার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না,—করিতে গেল, কিন্তু পারিল না। বাস্তবিকই কি সে সুখী হইয়াছে?

দু'জনে বজরার ছাদে তেমনই নক্ষত্রালোকে বসিয়া ছিল। যতীশ্বর তখন বলিতেছিল—"তুমি দেশে যাও না—মা কত দুঃখ করেন; বলেন এত করে' মানুষ করলুম,—ধনী হয়ে নির্মু আমায় একেবারেই ভুলে গেল। আমাদেরও এতে বড় দুঃখ হতো, রাগ হতো;—কিন্তু দেখ্‌ছি তোমার পায়ে সোণার শেকল বাঁধা—তোমার কোথাও নড়বার উপায় নেই। আচ্ছা নিমু-দা,—চিরদিন এই কাণা ঘাড়ে বয়ে—তোমার কি সুখ হবে মনে করেছিলে? এর চেয়ে গরীব থাক্‌তে, সে সুখে থাক্‌তে। এ যে এক বিষম গলগ্রহ!"

নির্ম্মল ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিল; করুণকণ্ঠে সে কহিল, 'না যতি, ধীরা অন্ধ বলে' আমার মনে কোন খেদ নেই—সে যদি এমন দুর্ভাগ্য না হতো, তা' হলেই বরং আমার অবস্থা আমার আরও সহ্য হতো না।"

তীরে নিকটে কোথাও অনেক সুগন্ধ ফুল ফুটিয়া থাকিবে; বাতাস বড় গন্ধ-ভারাকুল। নদীর জল আনন্দে বহিয়া যাইতেছে। যতীশ্বর অস্ফুট সন্দেহে নির্ম্মলের মুখের দিকে দৃষ্টি করিল,—"সে আবার কি?"

নির্ম্মলের মুখ যেমন থাকে, তেমনই বিষাদ-প্রচ্ছন্ন, গাম্ভীর্য্যময়। সে ধীরে-ধীরে উত্তর করিল—"সে কথা আমি তোমায় বল্‌তে পারবো না; কিন্তু ঠিক জেনো, তুমি যে লাগতই আমায় জিজ্ঞাসা করবো,—'তোমার সে হাসিমুখ আজ কোথায়?' 'তোমার মনে সুখ কই?' 'তুমি অমন হয়ে গ্যাছ কেন?"—তা যদি সত্যই তেমন কিছু ঘটে থাকে, তা আমার স্ত্রীর অন্ধত্ব তার হেতু নয়।"

যতী বোধ করি এ কৈফিয়তে সবিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইল না। অথচ বক্তার কণ্ঠস্বরও অবিশ্বাস করার পক্ষে বিপক্ষ সাক্ষ্য। কিন্তু তথাপি সে অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে আবার প্রতিবাদ করিল—"তুমি যা' বলেই ঢাকা দাও নিমু-দা', ঢাকা ত ভাই পড়বে না। আমি বল্‌ছি, তুমি এই ঐশ্বর্য্যের রত্ন সিংহাসনে বসেও এতটুকু সুখী নও। শুধু সুখী নও বল্‌ছি কেন, ঘোর অসুখী! বল্‌বে,—এ সব বিষয়-চিন্তা? অসম্ভব! বিষয়-চিন্তা কি এই এমন রম্য প্রকৃতির মাঝখানে এই পরস্পরাশ্রয়ী নবদম্পতির মধ্যে এমন কালো ছায়া ফেলতে পারে? তদ্ভিন্ন, তোমাদের মধ্যে প্রেম কই? তুমি কি বল্‌তে চাও,—তুমি স্ত্রীকে যথার্থ ভালবাস?"

নির্ম্মল এই সদৃঢ় প্রশ্নে ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্থির স্বরে সে উত্তর করিল—"হ্যাঁ, আমি বল্‌তে চাই—আমি ধীরাকে প্রাণাধিক ভালবাসি। হয় ত—হয় ত যাদের চোখে দৃষ্টি আছে, তাদের যত ভালবাসা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। আমার ত এখন তাকে সুখী করা, তাকে সুখে রাখা—এই জীবনের একমাত্র ব্রত! আর ত এ জন্মে আমার অপর কোন কাজই নেই।"

"পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন?"

"তা কেন? আমি তাকে ভালবাসি। ভালবাসার কাছে আত্মবিসর্জ্জন কি এমন নূতন?"

"ভাল ত ছাই বাসো! যে তোমায় চোখে দেখলে না, তাকে কেমন করে সত্যকার ভালবাসতে পারো? আচ্ছা, যদি এত ভালই বাস,—তা'হলে দু'জনে স্বতন্ত্র থাক কেন? এ সব কি ভালবাসার পরিচয়?"

নির্ম্মল মৃদু হাসিল—"এটাকে কি তোমার বড়ই অলক্ষণ মনে হলো? আমি তাকে যে ভালবাসি, তা' নিজের জন্য তো বাসিনে,—শুধু তারই জন্য তাকে ভালবাসি। আর ইচ্ছা আছে,—এমনই চিরদিন যাতে বাসতে পারি, সেই চেষ্টাই করবো।"

যতীশ্বর একটু চুপ করিয়া রহিল। তার পর স্রোত ফিরাইয়া লইয়া সেও হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"তা একরকম মন্দ ঠাওরাওনি। কিন্তু আমি ভাব্‌চি, তোমাদের এই বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্যতে হবে কি? সন্তান ত তোমাদের হবে না;—ভোগ করবে কে? শুনেছি তোমার শ্বশুরের অনেক কষ্টের টাকা।"

"জনসাধারণের চাইতে ভোগ কর্ব্বার অধিকতর যোগ্য পাত্র আর কে আছে?"

"তা বটে,—কিন্তু তবু—। যাক্; ও সব ভেবে কিছু কূলকিনারা পাওয়া যায় না। কেন না, এদিকেও যে একটা মস্ত ভাব্‌বার বিষয় রয়েছে। ধরো, যদিই তোমার স্ত্রীর

গর্ভে সন্তান জন্মায়—খুবই সম্ভব যে, সেও মায়ের অন্ধত্ব নিয়েই জন্মাতে পারে। ' তার চেয়ে সন্তান তোমাদের আদৌ না হয়, সেই ভাল। তুমিও বোধ করি এই দিকটাই দেখেছ? তা' তোমার এ জীবনটা দেখ্‌ছি কাট্‌বে ভাল।"

নির্ম্মলের আর অধিকক্ষণ এ প্রসঙ্গ চালাইতে ভাল লাগিতেছিল না। এ সব কথা তাহার নিকট আলোচনার বস্তু নয়। নেহাৎ বাল্যবন্ধু ও বহুদিনের অদর্শনের পর সাক্ষাৎ—তাই অনেকখানি চিত্তদ্বার সে ইঁহার নিকট আজ মুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তা' যতটা হইয়া গিয়াছে, সেই যথেষ্ট,—আর না। সে নীচে যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল—"মন্দই বা কি কাট্‌বে? কেটে যাবে এক রকম।"

যতীও উঠিল—"নাঃ, পৃথিবী জায়গাটা বড় সুবিধের নয়। আমি ক্রমেই দেখছি, এর চারিদিকেই গলদ্! সুখ এখানে কোথাও খুঁজে পেলাম না। নিমু দা', তোমার সেই আমাদের বাড়ীর বামুন-মাসিকে মনে পড়ে?"

নির্ম্মল কোন উত্তর দিল না, কেবল দাঁড়াইয়া ছিল—আবার বসিল। ইহা দেখিয়া যতীশ্বরও ফিরিয়া আসন গ্রহণ করিল, এবং তাহার এই কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া প্রশ্ন ব্যতিরেকেও উত্তর পূরণ করিতে লাগিল।

"বামুন-মাসিকে আমরা বরাবরই খুব ভাল বলে জানি। দেখেছ তো, রূপে-গুণে, বুদ্ধি-বিবেচনায় তাঁর মত মেয়ে-মানুষ আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে কোথায় কটা দেখা যায়? কিন্তু সে বেচারি চিরদিনটা কি কষ্টেই না কাটালে! আবার তাঁর অমন যে মেয়ে,—সেই মেয়েরই বা কপাল কি? বুঝতেই পারচো বোধ হয়—আমি অপর্ণার কথা বল্‌ছি? অপর্ণাকে তোমার মনে আছে? তা' অবশ্য আছেই;—তেমন মেয়েরও—আমাদের দেশে জন্মে—দর নেই, আদর নেই। এই সব দেখে সংসারে, সমাজে কেমন যেন অভক্তি ধরে যায়।"

নির্ম্মল এ সকল কথা ভাল করিয়া শুনিতে পাইতে-ছিল না। আবার তাহার সমুদয় চিত্ত ব্যাপিয়া যেন সেই ছবি বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তর-বাহির আবার যেন আজ সহসা অপর্ণাময় হইয়া গেল। এই বিশ্ব-সংসার, এই নক্ষত্রখচিত নৈশ-প্রকৃতি, এই বন্ধু যতীশ্বর—এমন কি তাহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলা পতিগতপ্রাণা ধীরা,—সমস্তই যেন একে-একে তাহার নিকট হইতে মুছিয়া গেল। ধীরার প্রতি নিজের চিরবিশ্বস্ত ভালবাসার শপথ আর তাহার বুঝি স্মরণও রহিল না। কেবলমাত্র সেই সর্ব্ববিলোপের মধ্য হইতে চোখে জাগিতে লাগিল, অপর্ণার অপরূপ কৈশোরশ্রীমণ্ডিতা ভাস্বর রূপ! আর কাণে বাজিতে লাগিল, নিজের সেই প্রতিজ্ঞার অর্দ্ধোক্তি-সহিত একটি শব্দ—অপর্ণা, অপর্ণা, অপর্ণা!

আজ কত দিন পরে তাহার পিপাসাতুর মানস-চকোর এই নিদাঘতপ্ত মধ্যদিবসে এই একটি বিন্দু বারিপাত লাভ করিয়াছিল। নিস্তরঙ্গ হৃদয়-সাগর পরিপূর্ণই ছিল। সেখানে এতটুকু বায়ু-হিল্লোল প্রবাহিত হইবামাত্রই অসংখ্য-অসংখ্য বীচি-বিক্ষেপ আরম্ভ হইল। যেন মহাপ্রলয়ের পর বিরাট স্তব্ধতা ভেদ করিয়া অকস্মাৎ শব্দ-ব্রহ্মের আবির্ভাব হইল। সে শব্দ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বাচক প্রণব নহে—তাহা অপর্ণা! অপর্ণা!! অপর্ণা!!!

নির্ম্মল যেন সমধিক গম্ভীর, অধিকতর চুপচাপ হইয়া রহিয়াছে। হাসি তাহার মুখে আর বড়-একটা দেখাই যাইত না; যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, এখন তাও ফুরাইয়া গেল। যতী কেবল অবাক্ হইয়া তাহার মুখ দেখে, আর মনে-মনে ভাবে,—পয়সা হইলে যদি মানুষের তেমন মুখ এমন হয়, তবে কাজ নাই অমন পয়সায়! সে খুব স্পষ্ট দেখিতে পায়,—নির্ম্মল ঘোর অসুখী। সে অন্ধ ধীরার উপর ইহার দায় ফেলিয়া মনের মধ্যে তাহাকে গালি দেয়। সে কেন ইহার ঘাড়ে চাপিল?

এ দিকে নির্ম্মলের যেন প্রাণ বাহির হইবার জোগাড় হইয়াছিল। এই ত আজবাদে কাল যতী চলিয়া যাইবে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া এ কয়দিনেও সে একবার 'তাঁহাদের' কুশল সংবাদ লইতে পারিল না। আর কখন কি এ সুযোগ আসিবে? সে দিন যতী নিজেই কথা পাড়িল—অমন সুবিধা! কিন্তু ও নামে যে কি আছে—নির্ম্মল যেন কেমনধারা হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করা হইল না।

আবার এক দিন কথা পড়িল। কি কথায় কি কথা উঠিয়া শেষ অপর্ণাদের কথা উঠিয়া পড়িল। এই নামের যে বড় মোহিনী শক্তি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার ফলে অবশ্য নির্ম্মল সম্মোহিত হইয়া পড়িল। সে আর কোন কথাই কহিতে পারিল না।

যতীশ্বরের মনটী ভাল। বিশেষ, সে অপর্ণাদের বড় ভালবাসিত। সে নির্ম্মলের এই ঔদাস্যে বিরক্ত হইয়াছিল; তাই একটু রাগ করিয়াই বলিল—"সাধ করে কি বলি, নিমু-দা, পয়সা হলেই মানুষ বদলে যায়?"

নির্ম্মল তখন রোমাঞ্চিত, আনন্দপরিপ্লুত শরীর-মনে ঊর্দ্ধে চাহিয়া একটি নাম ধ্যান করিতেছিল; যতীশ্বরের অনুযোগ তাহার বাহ্য-সংজ্ঞাবিহীন চিত্তে প্রবেশ-পথ পাইল না। তখন যতী ঈষৎ বিস্ময় অনুভব করিয়া অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে বলিতে লাগিল,—"তুমি তাদের এতটা তুচ্ছ করলে নিমু-দা; কিন্তু হোক্ গরীব, তাদের মহত্ত্ব তোমারি চাইতে অনেক বেশী। অপর্ণার মা তোমায় যথার্থই ভালবাসতেন। তোমার খবর শোনবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতার কথা আমি জানি। সেই কথার জন্যই তোমার কাছে তাঁদের কথা পেড়েছিলেম। তাঁদের জন্য ভিক্ষে চাইনি। অসুখের সময় আমি সর্ব্বদা তাঁকে তাঁর বাড়ীতে দেখ্‌তে গেছি। রোগের প্রথম দিকে দু'তিন দিন তাঁর ভালরূপ জ্ঞান ছিল না। সে সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি—তখন তিনি ক্রমাগতই তোমার নাম করতেন। আমার একটা কৌতূহল হয়—তুমি কি তাঁদের কোন আশা দিয়ে এসেছিলে?"

সে দিনের সেই সংখ্যাতীত হীরকোজ্জ্বল নক্ষত্র-খণ্ড-বিভাষিত, মহাকাশ যেন এতটুকু সঙ্কীর্ণ ঝিনুকের ডালার মত ছোট হইয়া নির্ম্মলকে চাপিয়া ধরিল। সে ঊর্দ্ধমুখে হাঁফ টানিয়া, কষ্ট-রুদ্ধশ্বাসে কোন মতে অস্ফুটে কহিল "কেন?"

"না,—আমার কেমন মনে হয়েছিল। বামুন-মাসি অসুখের ঘোরে কি যেন ঐ রকম গোটাকত কথা বল্‌তেন। ভাল মনে নেই,—'তবে এত বড় আশা দিলে কেন? আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি। বাবা নির্ম্মল! তুমিও বিশ্বাসঘাতক!—তবে আর কাকে বিশ্বাস কর্‌বো!' এম্‌নি যেন কি সব কথা একটু-একটু মনে হচ্ছে। সেও তো প্রায় বছর খানেক হয়েও গেল।"

নির্ম্মল দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল। তাহার হৃদয়মধ্যে এতদিন যে বহ্নি-জ্বালা অদৃশ্যভাবে ধূমায়িত হইতেছিল, আজ এই বায়ু-প্রবাহ-স্পর্শে অকস্মাৎ সেই অগ্নি জ্বালা চারিদিক দিয়া ব্যাপিয়া প্রচণ্ডরবে গগনস্পর্শী-শিখায় চতুর্দ্দিক অগ্নিময় করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই সর্ব্বভুক, সর্ব্বধ্বংসী অগ্নি-পর্ব্বত তাহার অস্থি-মাংস দাহ করিয়া—যেন তাহার সকল শরীরের শোণিত শোষণ করিতে লাগিল। সে 'বিশ্বাসঘাতক!' জীবন্ত চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিলেও বোধ করি সে আগুন এমন করিয়া জ্বলে না! পাপের আগুনের এম্‌নি অনির্ব্বাণ জ্বালা!

কতক্ষণ জ্বলিয়া-জ্বলিয়া যখন জ্বালা একটুখানি প্রশমিত হইয়া আসিল, তখন নির্ম্মল দেখিল তাহার মস্তক যতীশ্বরের কোলে। যতী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। এইবার প্রবলবেগে দুই চক্ষে জলধারা বহিল। তা হোক পুরুষ মানুষ।—পুরুষ মানুষকে ত আর ভগবান পাষাণ দিয়া তৈরি করেন নাই!—বিশেষতঃ, নির্ম্মল ত এখনও বয়সে বালক মাত্র! যেই মুখের কাছে মুখ নত করিয়া বড় সহানুভূতির সহিত আ-বাল্যের সেই পরম সুহৃদ্ মৃদু-মৃদু উচ্চারণ করিল—"বুঝেছি! নিমু-দা',—এইবার সব বুঝেছি।—বাস্তবিক তোমার বড় দুঃখের জীবন!" অমনি প্রাণপণে বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া,—কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম—সমস্ত সেই স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, অনন্ত জল-প্রবাহ ঘোর রোলে ছুটিয়া আসিল। শিশুর মত রোদন করিয়া সে বন্ধুর হৃদয়ে মুখ লুকাইল; বলিল—"যতি, যতি, মহা-পাপিষ্ঠ, নরাধম আমি—আমি বাস্তবিকই তাঁর কাছে ঘোর বিশ্বাসঘাতক।"

তারপর এক সময় শান্ত হইয়া বন্ধুর স্নেহ-সুশীতল সহানুভূতিপূর্ণ প্রশ্নে-প্রশ্নে নির্ম্মল নিজের অশ্রুধৌত হৃদয়ের বাকি তাপটুকু উজাড় করিয়া দিল। অপর্ণার মাকে বাক্‌দান হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত নিজের সম্বন্ধীয় সকল কথাই সে বন্ধুকে জানাইল, কিছুই গোপন রাখিল না। সব বলা হইলে, শেষকালে বলিল,—"তিনি বোধ করি আর এ পৃথিবীতে নেই? আর থাকিলেও তাঁর কাছে আমি ক্ষমার প্রত্যাশা করিতে পারিনে। নৈলে হয় ত একবার দেশে যেতেম।"

সব শুনিয়া যতী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আজ সবই পরিষ্কার হয়ে যাচ্চে। আমার মনে আছে—যে দিন তোমার বিয়ের খবর আমাদের বাড়ী পৌঁছায়—সেই দিন—হয় ত—হাঁ ঠিক!—সেই খবর শুনেই রাঁধ্‌তে-রাঁধ্‌তে অপর্ণার মা হঠাৎ সেই রান্নাঘরেই মূর্চ্ছা,

যান!—সেই থেকেই তাঁর কঠিন্ন পীড়া।—কিন্তু যাক্, যা' হয়ে গেছে, তাতো আর ফেরবার নয়। অপর্ণার মা বেঁচে আছেন,—হয় ত এখন একটু সুখেই আছেন। অপর্ণারও ভাল বে'থা হয়ে থাকবে। মিথ্যে সে পূর্ব্বকথা স্মরণ রেখে নিজেকে অধিকতর অসুখী করো না। তাতে ফলই বা কি?"

এই বলিয়া যতীশ্বর অপর্ণাদের কথা যাহা-যাহা জানিত, সমস্তই বলিল। "শুনেছি মাতামহ রাধিকাপ্রসন্নর আর কেউ নেই, অপর্ণার মাই ওঁর বিষয়ের অধিকারিণী। কাজেই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অপর্ণা অপাত্রে পড়বে না। তার জন্য নয়—আমি তোমার জন্যই ভাব্‌চি। তুমি চিরদিন এই নিরানন্দ, নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করবে কি সুখে? অন্যের মত নও যে,—"

কথাটা শেষ হইতে না দিয়াই নির্ম্মল সহসা সতেজ স্বরে বাধা দিল, অসন্তোষের সহিত কহিয়া উঠিল—"ও সব কথা মনেও এনো না, ছিঃ! আমার কি? সে যদি যথার্থ সুখী হয়ে থাকে—তা'হলে আমার মনে আর কোন দুঃখ নেই। আমি আমার ধীরাকে যথার্থ বড় ভালবাসি।"

নির্ম্মল প্রফুল্লভাবে এই কথা বলিয়া যেন বহুদিন পরে পরম নিশ্চিন্ততার অতি মধুর হাসি হাসিল। অপর্ণা সুখে আছে—সে 'নিশ্চয়' সুখী হইয়াছে।—আর কি সুখ!

যতীশ্বর মনে-মনে একটু দুঃখের হাসি হাসিল। মনে-মনেই বলিল—তুমি নিজের মনকেই বোঝাও—আমায় আর তোমার বুঝাইয়া কাজ নাই।

(৪৮)

ইহার পর হইতে নির্ম্মল নিজের মনকে বাস্তবিকই একপ্রকার করিয়া বুঝাইতে লাগিল। সে এই কথা মনে করিল যে,—এখন আমার আর অপর্ণাদের চিন্তার আবশ্যক করে না। তাহারা এখন সুখে আছে,—'নিশ্চয়' এত দিনে তাহার ভাল বিয়ে হইয়াছে—সে এখন খুবই সুখী। তা' আমিও এইবারে একটু সুখী হই না কেন। ধীরাকে ত আমি নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসি, তবে তাহাকে লইয়া আমারই বা সুখী না হইবার কারণ কি আছে? পাপের দণ্ড? তা' সে ভগবান যখনই দিবেন, মাথা পাতিয়া লইব,—সেজন্য বৃথা ভাবিয়া মরিলে ত আর পাপক্ষালন হইবে না!

ধীরাকে মনে করিতেই মনে পড়িল,—এ কয় দিন তাহার কথা সে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিল। এই কথা মনে পড়ায় লজ্জায় সে অধোবদন হইল। তা' যাই হোক, যতীশ্বর এখানে আসিয়া বড় ভাল করিয়াছিল।—সে না আসিলে ত আর অপর্ণার এই 'নিশ্চিত সুখের' খবরটা সে পাইত না!

যতীশ্বরের ছুটির মেয়াদ ফুরাইলে, আবার এই সমাজ-সম্বন্ধবিহীন, জন-বিরল নদীবক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা দু'জনে একা, অনন্য-সহায় হইয়াই রহিল। কিন্তু বুঝি পূর্ব্বের হৃদয় আর কাহারও মধ্যে ছিল না। এই একটি অনাহুত আগন্তুক অকস্মাৎ তাহাদের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া তাহাদের একটানা জীবন-নদীর স্রোতে পরিবর্ত্তনের হাওয়া বহাইয়া গেল। হাওয়া থামিলে দেখা গেল, পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে!

নির্ম্মল ধীরাকে বেশী করিয়া যত্ন করে, কাছে-কাছে থাকে। সন্ধ্যায় ছাদে বসিয়া, ভাল দেখিয়া বাছিয়া বই পড়িয়া তাহাকে বড় যত্নে শুনায়। আদর-যত্নের কোনই ত্রুটি ছিল না। যদি ধীরার মনোজগতে এতবড় একটা বিপ্লব উপস্থিত না হইত—যদি তাহার হৃদয়রাজ্যে তখন অহোরাত্র ধরিয়া একটা তুমুল সংগ্রাম না চলিতে থাকিত, তাহা হইলে সে অভাগিনী এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিত যে, স্বামীকে সে এতদিন যেমন করিয়া চাহিয়াছিল, এখন সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে তেম্‌নি করিয়াই পাইতে পারে। স্বামী তাহার নিকট আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুত। শরৎ-জ্যোৎস্নায় কৌমুদী-বিধৌত ধীরার মুখ নির্ম্মলের চোখে আজ-কাল বড় সুন্দর ঠেকে। রাত্রে বিদায়-চুম্বন তাহার মর্ম্মরশুভ্র ললাটখানির উপর মুদ্রিত রাখিয়া সে সেদিন অতি স্নেহ-সন্তর্পণে দুই হাতে তাহার মুখ-খানা তুলিয়া ধরিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তার পর আবার সেখানাকে আদরে ভরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বাস্তবিকই তাহার মনের মধ্যে বুঝি তাহারও অজ্ঞাতে একটা পরিবর্ত্তন ধীরে, অতি ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। বুঝি ইহা যতীশ্বরের সেই পত্নী-সম্বন্ধীয় আলোচনারই ফল। মানুষের মন অনেক বিষয়ে এমনই নিস্তরঙ্গ

জলরাশিবৎ স্থির, অচঞ্চল থাকে ; কিন্তু তাহাতে বাতাস বহিলেই নানারূপ তরঙ্গ, বুদ্‌-বুদ্‌, ফেনার সৃষ্টি হয়। ধীরাকে নির্ম্মল কখনও পত্নী-ভাবে দেখে নাই ;—সে নিজেকে তাহার স্বামীর পরিবর্ত্তে অভিভাবক বলিয়াই মনে করিত। আজ সে সম্বন্ধের একটু যেন বদল হইয়াছিল।

কিন্তু এদিকে যে কি হইয়াছে—কত বড় যে একটা ধ্বংসময়-যুগান্তর এই কয়টিমাত্র দিনে ধীরার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে—সে খবর জানে কে ? তাহার ঐ পদ্ম-পলাশবৎ বিশাল দুটি নেত্রে ঐ দুটি নীলকান্ত মণি যদি অভ্যন্তরিক আলো-চ্ছায়া প্রতিফলিত করিতে পারিত, —তা হইলে হয় ত সেই আলোকে তাহার অন্তর্দৃশ্য দেখিয়া তাহার স্নেহময় স্বামী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া কি যে করিবে, ঠিক পাইত না ! ভিতরটায় তাহার—মহাসমর শেষে রণস্থলের যে অবস্থা সেইরূপ—শোণিতাপ্লুত—শবরাশি-পরিবেষ্টিত ;—শ্মশান-বৈরাগ্যে চিত্ত তাহার তখন গৈরিক-ধারী—সর্ব্বত্যাগী !

জ্যোৎস্নাতরঙ্গে তরঙ্গিত ছাদের পরে সেদিনও বাঁশি বাজিতেছিল। ধীরা বাঁশি শুনিতে ভালবাসে, তাই নির্ম্মল এখন প্রায়ই বাঁশি বাজায়। কিন্তু ধীরা বোধ করি বাঁশির সে মোহমন্ত্রে আর তেমন করিয়া মুগ্ধ হইতে পারে না। কিম্বা হয় ত তাহার ঘোর অন্যমনস্কতায় সমাচ্ছন্ন চিত্তে সে সুরের লহরী প্রবেশপথেই বাধিত হয়। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে,—এক, শ্রোত্রীর চিত্ত হয় ত সংসারের দুঃখ, বেদনা, মান, অভিমান, আশা, আনন্দ, সুখ, স্পৃহা, এ সকলেরই অতীত অপর কোন কিছু গভীরতর বিষয়ান্তরে গাঢ় নিমগ্ন থাকায় এ জগতের সমস্তই তাহার নিকট ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে ; অপর এই যে,—বাঁশিতেও আর সে আশাহীনের অকথ্য যন্ত্রণা, করুণা, ক্রন্দন,—যাহা জড় প্রকৃতি হইতেও অশ্রু আহরণ করিত, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাঁশি পূর্ব্বে নিজের অব্যক্ত কান্নাই কাঁদিত, এখন সে অন্যেরচিত্ত-বিনোদনের মোসাহেবি পাইয়াছে।

নির্ম্মল এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করিল,—ধীরা তাহার সহিত আজকাল আর বড়-একটা কথা কহে না। না ডাকিলে সে নিজে হইতে তাহার কাছেও আসে না। সে রাত্রে বৃষ্টির সময় বজরা বড় দুলিতেছিল ; বাতাসে খুব জোর। নির্ম্মল উঠিয়া আসিয়া ধীরাকে বিনিদ্র বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কাছে যাবো ধীরা ?" ধীরা সংক্ষেপে উত্তর দিল—"না।" সে আবার প্রশ্ন করিল, "তোমার ভয় করচে না ত ?" আবার উত্তর হইল—"না।" নির্ম্মল এ উত্তরের উপর আস্থা স্থাপন করে নাই—সে তাহার বিছানার মধ্যে আসিয়াছিল। কিন্তু ধীরা তেমন করিয়া নিজেকে আজ আর তাহার কাছে নিবেদন করিয়া দিল না, —যেমন ছিল, তেমনই একপাশে স্থির হইয়া শুইয়া রহিল। নির্ম্মল আজ সর্ব্ব প্রথম ধীরার এই নির্লিপ্ত ব্যবহারে কিছু বিস্মিত,—হয় ত বা একটু দুঃখিতও হইল।

সে দিন আবার অনেক রাত্রি অবধি বাঁশি বাজাইয়া, বাঁশি ফেলিয়া যখন নির্ম্মল ধীরার দিকে চাহিল, ইহার পূর্ব্বের কথা অমনি তাহার স্মরণ হইল। কতদিন এইরূপে বংশীবাদন শেষে ধীরার দিকে চোখ পড়িলে সে তাহার সেই হৈম-কৌমুদিপ্রতিভাসিত শুভ্র গণ্ডযুগলে স্থূল, শুভ্র মুক্তা-মালার ন্যায় অশ্রুধারা লক্ষ্য করিয়া নিজের অসম্বরণীয় আবেগাশ্রু নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার গগননীল নেত্রদু'টি তাহারই মত অন্ধ আকাশে সুধীরে সংস্থাপিত,—যেন দৃষ্টিহীনা নিজের চিত্ত দিয়া সেই অসীমের অনন্ত রহস্য লেখা পাঠ করিতেছিল ! মন তাহার এ পৃথিবীর মধ্যে নাই। কাছে আসিয়া—সেই জ্যোৎস্নাধৌত লতাগাছি সাদরে নিজের বাহুমধ্যে তুলিয়া লইয়া নির্ম্মল সাদরে ডাকিল—"ধীরা !"

"কি ?" বলিয়া ধীরা মুখ ফিরাইল। কিন্তু কই, আজ স্বামীর এই স্নেহস্পর্শে তাহার সেই স্পর্শ-লোভাতুর কাঙ্গাল চিত্ত ত পাগল হইয়া উঠিল না ? এ কি পরিবর্ত্তন !

নির্ম্মল তাহার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া স্নেহতরল কণ্ঠে কিছু বলিবার জন্য বলিল—"এইবার বাড়ী যাবে ধীরা ?"

মৃদু, ধীর কণ্ঠে ধীরা উত্তর করিল—"যাবো।"

পূর্ব্বে এ প্রশ্নে ধীরা ব্যাকুল হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিত। সবটা না বুঝিলেও নির্ম্মল বুঝিত,—সে বাড়ী যাইতে চায় না। সেই জন্যই শত অসুবিধা তুচ্ছ করিয়া সে এই জলের বাসা ভাঙ্গিতে পারিতেছিল না। আজ তাই তাহার মুখে অনায়াসে "যাবো"—উত্তর শুনিয়া আবার সে একবার বিস্ময় অনুভব করিল।

একদিন একটুখানি প্রকাশ পাইল। জল যখন ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতে থাকে, তখন আরোহী কিছুই জানিতে পারে না। পরিশেষে যখন সেই জলে নৌকা ভরিয়া উঠে—তখনই নৌকারোহী অতি প্রবল অবস্থায় এই এতটুকু ছিদ্রপথের ক্ষুদ্র শত্রুর সম্মুখীন হয়। তা এ অবস্থায় আরোহী যদি সন্তরণপটু হন, তিনি রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন; কিন্তু সেই জলভারে-ভরা, জীর্ণ তরিখানি অতল-তলে নিমজ্জনের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় থাকে না।

ধীরার প্রাণ যে আগুনে রাত্রিদিন গুমিয়া-গুমিয়া পুড়িতেছিল, সে দিন তাহারই একটু স্ফুলিঙ্গ একটা দমকা বাতাসে উড়িয়া আসিল। নির্ম্মল 'পারিবারিক-প্রবন্ধে' "স্ত্রী-শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িতেছিল। মহর্ষি-প্রণীত, শাস্ত্র-সাগর-মথিত সুধাভাণ্ডসমতুল্য এই পুস্তকখানি বংলার গৌরবের ধন! যাঁহাদের বিশ্বাস—বঙ্গনারী তাঁহাদের পতির সেবিকামাত্র, তাঁহারা এই পুস্তকের পতি পত্নীর সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি অনুধাবন করিলেই দেখিতে পাইবেন,—তাঁহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত, ইহার কোনই ভিত্তি নাই। নির্ম্মল পড়িতেছিল—"'আমি তোমার, ওরা তোমার বলেই আমার।' যিনি এই মন্ত্র দিবেন, তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সত্য-সত্যই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। অনৃতবাদী শঠতাসম্পন্ন গুরুর মন্ত্র—অরি-মন্ত্র। উহার দ্বারা দীক্ষার ফল ফলে না। এই জন্য কর্ত্তাভজারা বলে, মানুষ ধর্ত্তে হলে মর্ত্তে হয়। যদি তুমি কাহাকেও ধরিতে চাও—অর্থাৎ নিতান্ত নিজস্ব করিতে চাও, তবে আপনি মর, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থেক না, একবারে তাহার হইয়া যাও।"

পাঠ হইতে মুখ তুলিয়া নির্ম্মল এক সময় দেখিল—ধীরা উঠিয়া বসিয়াছে। এতক্ষণ সে বালিসে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল। তাহাকে বসিতে দেখিয়া সে পড়া থামাইতেই, ধীরা বলিল—"আজ এই অবধি থাক।"

কেন 'থাক'—ধীরা তাহা কিছু না বলিলেও, নির্ম্মল সরলভাবে অনুমান করিয়া লইল যে, তাহার ঘুম পাইয়া থাকিবে। সে তখনই বই বন্ধ করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া আলো পুস্তক নীচে পাঠাইয়া দিল; তারপর তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"নীচে যাবে? চল।"

"যাই" বলিয়া ধীরা আবার যেমন তেমনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিল, উঠিবার কোন চিহ্নই সে প্রকাশ করিল না; যেন বড় চিন্তাভারাকুল—বড়ই অন্যমনা। নির্ম্মল কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিল; তার পর তাহাদের কামরার ক্লক্ ঘড়ি'তে দশটা বাজার শব্দ শোনা গেলে, তখন তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল—"রাত হয়েছে, এসো নীচে যাই—" অসুখ করার কথাটা কই আজ আর তো সে উল্লেখ করিল না? তা করিলেও বুঝি আজ আর ধীরার কাণে সেটা বেসুরা বাজিত না। আজ আর সে দিনের সে ধীরা নাই। বুঝি সে ধীরা মরিয়াছে; অথবা তাহারই এই পুনর্জীবন হইয়াছে। সে এই স্পর্শে সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিয়া যেন দ্বিধার সময় মাত্র হাতে না রাখিয়া এক নিশ্বাসে কহিয়া উঠিল—"আমার একটা কথা আছে; বল, কথাটা রাখ্‌বে?"

এ কি! এ কার কথা—? কে এ—স্বামীকে সাধারণ নারীজন-সুলভ আবদারের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া অনুরোধ শুনাইতে চায়? এ কি সেই ধীরা? নির্ম্মল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই চন্দ্রচ্ছায়া-প্রতিবিম্বিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সেই নিবিড় কৃষ্ণ-কাদম্বিনীতুল্য কেশকলাপপরিবেষ্টিত, স্থির-সৌদামিনীপ্রভা অতি সুন্দর, অতি শান্ত মুখ! চন্দ্রার্দ্ধবৎ সেই ক্ষুদ্র ললাটপ্রান্তে সুবঙ্কিম সেই সূক্ষ্ম দুটি ভ্রূলেখা, আর তন্নিম্নে মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে আকস্মিক বিপুল কৃষ্ণমেঘ-ছায়াপাতে দীপ্তিশূন্যবৎ সজল, সুন্দর বৃহৎ গাঢ় নীলিমানীল নেত্র;—তাহা তেমনই রহস্যময়, তেমনই কুহেলিকাপূর্ণ। মানসিক বিস্ময় দমন করিয়া নির্ম্মল অতি মধুর, স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিল—"শুন্‌বো বই কি; তোমার কথা শুন্‌বো না? কি বল্‌বে বল?"

"তুমি আবার বিয়ে করো, আমার এই অনুরোধ।"

নির্ম্মল এই কথা শুনিয়া এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিল যে, তাহার নৈকট্যবশতঃ ধীরাও তাহা জানিতে পারিল। নির্ম্মল সামান্য ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কথা কেন?"

ধীরার এইবার একটু মুস্কিল হইল। সংসারের লোকের মত সে ছলনা-চাতুরী জানে না,—মিথ্যার আশ্রয় লইতে কখনও শিক্ষা করে নাই। এ প্রশ্নের উত্তর

খুঁজিয়া না পাইয়া; তাই উত্তর দিবার চেষ্টা ত্যাগ করিল।

তখন নির্ম্মল তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ধীরে-ধীরে তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। অতি সাবধানে মাথাটি তাহার নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া বড় আদরেরই স্বরে কহিল—"ছিঃ, এ কথা কি বল্‌তে আছে?"

এই সকল ঈপ্সিত সুখস্পর্শ কিছুদিন পূর্ব্বে—এমন কি যতদিন পর্য্যন্ত ত্যাগে ও মোহে, দেবীতে ও মানবীতে মহা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল,—তখনও ধীরা লাভ করিতে পাইলে, হয় ত সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হারাইয়া সে শুধু সেই স্পর্শ-সুখময় বাহু মূলেই আপনার জন্মজন্মান্তরের সমুদয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি করিতে পারিত। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। আজ কঠোর তপঃসিদ্ধা সন্ন্যাসিনী নিজের সর্ব্বস্ব মহাহবে স্বামী-দেবতায় স্বাহা মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া দিয়াছে। নিজের জন্য আর ত কিছুই সে বাকি রাখে নাই! বঙ্গের মহোপদেশ কহিয়াছেন;—"যদি কাহাকেও আপনার করিতে চাও, তবে আপনি মর।"

সে স্বামীর কাঁধ হইতে সেই স্বর্গ-নন্দনের সন্তানক-সম্ভার হইতে মাথা তুলিয়া স্থির হইয়া বসিল; বলিল—'আমায় নিয়ে সুখী হওয়া তোমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি কাণা, আমি কখনও তোমার কোন কাজেই লাগ্‌বো না। সে অদৃষ্ট যখন আমার নয়, তখন আমার জন্য তুমি চিরদিন কেন দুঃখ পাবে, তুমি বিয়ে করো।"

এত কথা,—এমন বাঁধনযুক্ত অথচ মর্ম্মের মধ্য-হইতে-বাহির-করা প্রাণোৎসর্গকর বচন;—এ কেমন করিয়া, কবে, কাহার কাছে এই সংসারাতীতা সরলা অন্ধ বালিকা শিখিল? নির্ম্মল হৃদয়মধ্যে অত্যন্ত আঘাত পাইয়া আজ সামান্য সাধারণ জীবের মতই নিজের স্ত্রীকে অকস্মাৎ নিজের বক্ষমধ্যে অতি নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। অশ্রু-কম্পনে তাহার কণ্ঠ-ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল;—কষ্টে সেই ব্যথিত রোদনোচ্ছ্বাস রোধ করিয়া কহিল—"বুঝেছি, তুমি যতীশ্বরের সঙ্গে আমার সে দিনের কথাবার্ত্তা সব শুন্‌তে পেয়েছিলে, কিন্তু তা যদি পে'য়ে থাক, তবে সেই সঙ্গে এও তো শুনেছ ধীরা, আমি তোমায় পেয়ে অসুখী নই! আমি তোমায় ভালবাসি! লোকে যে যাই মনে করুক, তুমি আমার এ ভালবাসায় বিন্দুমাত্র সংশয় করো না, কর্‌লে আমার বড্ড দুঃখ হবে।"

এই বলিয়া নির্ম্মল তাহাকে পুনঃপুন চুম্বন করিল। সে চুম্বনে, সেই স্বরে একটা সুগভীর ভালবাসা ব্যক্ত হইল; এবং সেই সঙ্গে তাহার মুখের উপর ফোঁটা-দুই বড় বেদনা-বিজড়িত অশ্রুবিন্দুও ঝরিয়া পড়িল। ধীরা এই সব অপ্রার্থিত-পূর্ব্ব, আশাতীত লাভে কি রকম হইয়া গিয়া নিজের স্থির সঙ্কল্প তখনকার মত একপ্রকার যেন ভুলিয়াই গেল, আর কোন কথাই তাহার সে দিন আর বলা হইল না।

এ কি সংসারের রীতি! বাসনা যখন হৃদয়ের কানায়-কানায় পরিপূর্ণ, অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার আগুনে প্রাণ যখন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে, কাম্য তখন কোথায়? কিন্তু যেই সেই কামনার বিলোপ হইয়া গেল, আকাঙ্ক্ষা যখন আর রহিল না, তখন সেই বাসনা-যজ্ঞের বাঞ্ছিত ফল আশার অতীত হইয়াই যে ফলিয়া উঠিল! কিন্তু তখন আর তাহাতে কি প্রয়োজন? হৃদয়মধ্যে আর তো সে আসক্তি নাই!

(ক্রমশঃ)

নীরবতা

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

নীরবে বরষ আসি নীরবে চলিয়া যায়,
অসীম সাগর-পাশে নীরবে তটিনী ধায়।
নীরবে কুসুম ফোটে, নীরবে পড়িছে ঢলে;
নীরবে এসেছি ভবে, নীরবে যাইব চলে।

তাঁর সে অমৃত বাণী নীরবে আমার প্রাণে—
করি প্রাণ সুশীতল বাজিছে মধুর তানে।
নীরবে পূজিব আমি আমার সে দেবতায়,
নীরবে মাতিব আমি নীরব সে সাধনায়।

ফুলের বংশ-মর্য্যাদা

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি-এ]

পুষ্পোদ্যান

আমরা ইতস্ততঃ কত বিবিধ আকারের, বিভিন্ন আয়তনের ও বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য ফুল দেখিতে পাই; কিন্তু কখনো ভাবি না যে, মানুষের চিত্তরঞ্জন ছাড়া ইহাদের আকার, বর্ণ বা গন্ধের অন্য কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বাস্তবিক, মানুষের বা জীবজন্তুর মধ্যে যেমন উচ্চ-নীচ, উন্নত-অবনত ভেদ আছে, উদ্ভিদের মধ্যেও ঠিক তাহাই আছে। অনাদি কাল হইতে উদ্ভিদ-জগৎও একটী নির্দিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়া উন্নতির অভিমুখে চলিয়াছে। ফুলের গঠনে, গন্ধে ও বর্ণে এই উন্নতি বা অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। বস্তুতঃ ফুলের লক্ষণ ধরিয়া, আমরা উদ্ভিদের আভিজাত্য নির্ণয় করি। ফুলই আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়—কোন্ উদ্ভিদ উন্নতি-সোপানের কত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। সুতরাং, ফুলের আকার-প্রকার, বর্ণ ও গন্ধ সকলেরই একটা মহান্ অর্থ আছে। এই গুলিই ফুলের ভাষা। উহা ঠিক-ঠিক বুঝিতে হইলে, ফুলের একটু অঙ্গ-পরিচয় প্রয়োজন।

আদর্শ ফুল পূর্ণাঙ্গ, অর্থাৎ উহার সমস্ত অঙ্গগুলি বর্ত্তমান আছে। ফুলের সচরাচর চারিটী অঙ্গ; যথা—(১) Calyx বা কুণ্ড; (২) Corolla বা ছদটী; (৩) পুংকেশর বা Andraeceum: (৪) গর্ভাশয় বা Gynaeceum। এই চারিটি অঙ্গ তাহাদের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ সমেত চারিটী বৃত্তাকার চক্রে (whorl) পুষ্পাসনের (receptacle) চারিদিক সজ্জিত। নিম্নস্থ আলেখ্য দর্শনে উহাদের চক্রবিন্যাস বুঝা যাইবে।

গর্ভকেশর পরাগ-কেশর গর্ভ কেশরের মধ্যভাগ

চিত্র (ক) পূর্ণাঙ্গ ফুলের অঙ্গ ও অংশ সজ্জা

কেন্দ্রস্থানে পুষ্পাসনের শিরোভাগে গর্ভাশয় অবস্থিত। তাহার চতুর্দ্দিকে পুং-কেশর সজ্জিত, পুং-কেশরের বহির্দ্দিকে ছুটা, এবং ছুটার বহির্ভাগে কুণ্ড।

(১) গর্ভাশয় এক বা ততোধিক গর্ভ-কেশরে carpel) গঠিত। গর্ভকেশরগুলি পরস্পর যুক্ত বা বযুক্তাবস্থায় থাকিতে পারে।

গর্ভকেশর সচরাচর তিন অংশে গঠিত। (১) ভকোষ; (২) গর্ভনালী (style) (৩) গর্ভমুখ Stigma)। গর্ভকোষ বা বীজাধারে (Ovary) বীজ-ঙ্কুর হয়। গর্ভমুখে পরাগ-সংযোগ হয়। এই পরাগ ত্রাকারে গর্ভনালী বাহিয়া গর্ভকোষে প্রবেশ করিয়া ঙ্কুর সহিত মিলিত হয়। মিলনের ফল বীজ-সঞ্চার।

(২) পুং-কেশর কয়েকটী পরাগ-দণ্ডের (Stamen) যোগে গঠিত। এই পরাগদণ্ডগুলি বিযুক্ত বা মিলিত বস্থায় থাকিতে পারে। পরাগ দণ্ডের সচরাচর দুইটী শ;—(১) পরাগ-সূত্র; (২) উহার শীর্ষস্থিত পরাগ-কোষ anther)। ইহাতে পরাগ-রেণু উৎপন্ন হয়।

(৩) ছুটা বা (Corolla) কয়েকটী দল বা Petal এ ত। এই দলগুলিও বিযুক্ত বা মিলিতাবস্থায় থাকিতে রে। ইহারা দেখিতে নানা আকারের ও নানা বর্ণের । ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য—বর্ণবাহারে কীটাদিকে লুব্ধ রিয়া আনা, এবং তাহাদের সাহায্যে পরাগ-সঞ্চার ঘটাইয়া লওয়া। এইজন্য ইহা আকর্ষণ-চক্র (attractive whorl) বলিয়া কথিত হয়।

(৪) কুণ্ড বা Calyx সর্ব্বশেষ চক্র। ইহার অংশগুলিকে Sepal বা "পল" কহে। উহারাও দলের মত বিযুক্ত বা মিলিতাবস্থায় থাকিতে পারে। ইহাদের বর্ণ প্রায়ই হরিৎ। ক্বচিৎ বা অন্য বর্ণও হয় (যথা দাড়িম্বে)। ইহারা পুষ্পকে মুকুলাবস্থায় বাহিরের উৎপাত হইতে রক্ষা করে। এই জন্য ইহাদের নাম রক্ষণ-চক্র (Protecive whorl)।

গর্ভাশয় ও পুং-কেশর উভয়েই ফুলের অত্যাবশ্যক ইন্দ্রিয়। ইহাদের একটি না একটির থাকা নিতান্ত প্রয়োজন; নচেৎ উদ্ভিদের বংশ রক্ষা অসম্ভব। যে ফুলে কেবলমাত্র গর্ভাশয় আছে, তাহা স্ত্রী-পুষ্প। যাহাতে কেবল মাত্র পুং-কেশর আছে, তাহা পুং-পুষ্প।

ছুটা ও কুণ্ড উভয়ের সাধারণ নাম আবরণ-চক্র (enveloping organs); উহারা না থাকিলেও চলে। অনেক পুষ্পে (যেমন ভেরাণ্ডা, বট ইত্যাদি) উহা নাই।

সংক্ষেপে ফুলের অঙ্গ-পরিচয় হইল। এইবার উহাদের বংশ-পরিচয় হইবে। এই বংশ-পরিচয়ে ফুলের অভিব্যক্তি বা ক্রমোন্নতির ধারা বুঝা যাইবে।

আমরা নিত্যই দেখিতেছি, ফুলের আকার, আয়তন ও বর্ণগত কত বৈচিত্র্য। এই সব বৈচিত্র্যের মূলে ফুলের অঙ্গ-চতুষ্টয়ের আকার, আয়তন, বর্ণ ও সজ্জাগত তারতম্যই প্রধান। এই সমস্ত বৈচিত্র্য বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা ও

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার ফলে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলিকে ফুলের অভিব্যক্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন :—

১। প্রথম লক্ষণ—অনাবৃত বা অচ্ছদ অবস্থা হইতে আবৃত বা সচ্ছদ অবস্থা-প্রাপ্তি। অনেক ফুলে কেবল জনন-যন্ত্রই আছে: আবরণ-চক্র অর্থাৎ ছটা ও কুণ্ড নাই। ইহারা নিম্নজাতীয় ফুল, এবং অতি প্রাচীন জাতীয়। বলিয়া রাখা ভাল,— মানুষের বংশ-মর্য্যাদা যেমন বংশের প্রাচীনতার উপর নির্ভর করে, উদ্ভিদের সেরূপ নহে। উহাদের দেহযন্ত্রের জটিলতা এবং উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী অঙ্গ-গঠন-প্রণালীই বংশ-মর্য্যাদার প্রধান লক্ষণ। প্রাচীন বংশে জন্ম এবং গুণহীনতা উহাদের কাছে একার্থবোধক। উহাদের কাছে মানুষের অনেক শিখিবার আছে।

সর্ব্ব-নিম্নজাতীয় ফুল সম্পূর্ণরূপে আবরণহীন। উহাকে নগ্ন-পুষ্প বলা হয়। পানের ফুলে এই আবরণাভাব দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতীয় ফুলে আবরণ-চক্রের প্রথম উন্মেষ। কিন্তু তাহাতে ছটা বা কুণ্ডের ভেদ দেখা যায় না। একটিমাত্র আবরণ চক্র জননাঙ্গগুলিকে ঘেরিয়া থাকে। উহা দেখিতে তুঁষ বা আঁইসের মত। ধান, বট, ভেরাণ্ডা, নারিকেল প্রভৃতির ফুলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাকে 'একাবরণ' বা Perianth বলে। রজনীগন্ধা, লিলি প্রভৃতিতে ইহার খুব সুন্দর বিকাশ। আরো উন্নত জাতীয় ফুলে ছটা বা কুণ্ডের ভেদ দেখা যায়। তবে তখনো উহাদের, বিশেষতঃ ছটার তত বিকাশলাভ ঘটে না। গোলাপ, ধুতুরা প্রভৃতিতে ছটা ও কুণ্ডের ভেদলাভ ও বিকাশ-প্রাপ্তি চূড়ান্ত মাত্রায়।

পুষ্পদেহে ছটা ও পুং-কেশরের সম্বন্ধ-নির্ণয় লইয়া প্রাচীন উদ্ভিদজ্ঞগণের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে, কতকগুলা অনাবশ্যক 'দল' পুং-কেশরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ কিন্তু ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, কতকগুলা অনাবশ্যক পরাগ-কেশর পাপড়িতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এ একটা শ্রম-বিভাগের কৌশলমাত্র। এই মতটাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কেন না পরাগ-কেশর ফুলের একটা অত্যাবশ্যক ইন্দ্রিয়। এই হেতু ফলের অগ্রজন্মা হওয়ারই কথা। আগে পাপ্‌ড়ি ছিল,
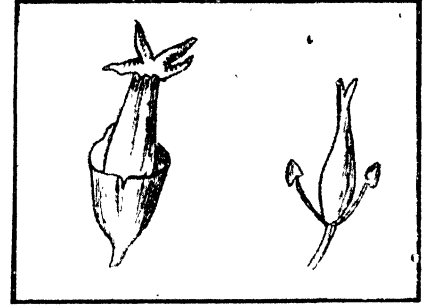
একাবরণযুক্ত পুষ্প নগ্ন পুষ্প

পরাগ-কেশর ছিল না, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? এ যেন পায়ের আগে আঙ্গুলের জন্ম-কথার মত!

তার পর পরাগ-কেশর হইতে পাপড়িতে পরিবর্ত্তন এটা অনুমানমাত্র নহে; ইহা পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। পদ্ম, গোলাপ, জবা প্রভৃতির পাপড়ি ও পরাগ-কেশর পরীক্ষা করিলে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে, পরাগকেশর হইতেই পাপ্‌ড়ির জন্ম। পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে—তাহা পরাগ কেশরগুলা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে।
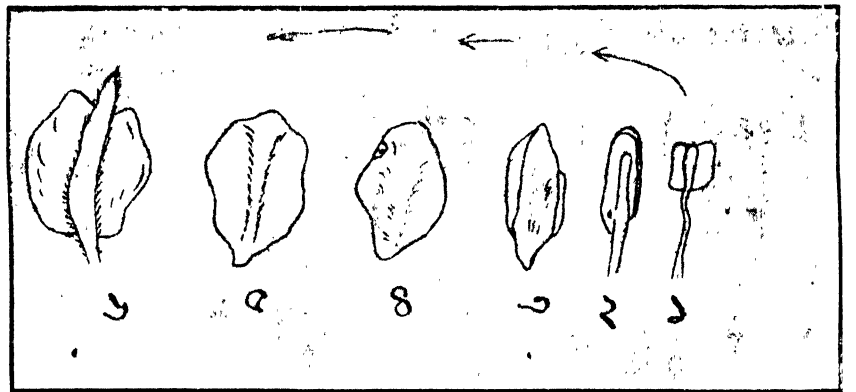
পরাগ-কেশর ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া দলে পরিণত হইতেছে

ছটা-সৃজন যে পরতঃ-সম্মিলনকে লক্ষ্য করিয়া—তাহা বেশই বুঝা যায়। ইহাই অভিব্যক্তির প্রথম সোপান।

দ্বিতীয় লক্ষণ—পুষ্পাঙ্গের অংশ-সংখ্যার অনির্দ্দিষ্টতা

হইতে নির্দ্দিষ্টতা-প্রাপ্তি। সোজা কথায় এই দাঁড়ায়—অনেক ফুলে গর্ভ-কেশর, পুং-কেশর, ছটা বা কুণ্ডের অংশগুলি সংখ্যায় অনেক। অনেক ফুলে উহাদের সংখ্যা পরিমিত। গোলাপ এবং ধুতুরা ফুল পরীক্ষা করিলেই দুইটা কথাই পরিষ্কার হইবে। গোলাপ বা চাঁপা ফুলে দেখা যায়, গর্ভ-কেশর, পুং-কেশর বা পাপ্‌ড়ি সংখ্যায় অনেক; আর বৃদ্ধির সহিত সে সংখ্যা যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ধুতুরায় কিন্তু বিপরীত ব্যাপার। মুকুলাবস্থায় অঙ্গের যতগুলি অংশ, পরিণত অবস্থাতেও তাই। এই অনির্দ্দিষ্ট-সংখ্যকতা হইতে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যকতা প্রাপ্তি ফুলের উন্নতির একটা লক্ষণ। উন্নতির অর্থ কি? কম পরিশ্রমে, কম আয়োজনে, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার। যদি দুইটা পুং-কেশরে ও চারিটা পাপ্‌ড়িতে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে একশ'টার প্রয়োজন কি? জীবনী-শক্তির নিয়মিত ব্যয় উন্নত জীবের একটা প্রধান লক্ষ্য।

এই যে অঙ্গাংশের সংখ্যা-নির্দ্দেশ, ইহা বর্ত্তমান বা আধুনিক ফুলে তিন প্রকারে দেখা যায়। কোন জাতীয় ফুলে (যথা, লিলি, রজনীগন্ধা) অঙ্গাংশগুলির সংখ্যা তিন বা তিনের কোন গুণিতক। এই সব ফুলকে Trimerous বা ত্র্যংশিক ফুল বলা যায়। এক বীজদলীয় সমস্ত পুষ্পই এই লক্ষণাক্রান্ত। অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতীয় ফুলে (দ্বিবীজদলীয়—আম, জাম, সীম, শুঁটী ইত্যাদি) অঙ্গাংশগুলি হয় ৪, না হয় ৫ সংখ্যক; না হয় উহাদেরই কোন গুণিতক, ৮।১৬।৩২ বা ১০।১৫।২০ ইত্যাদি। এই সব ফুলকে চত্বারাংশিক (Tetramerous) বা পঞ্চাংশিক (Pentamerous) বলা হয়। সরিষা ফুল চত্বারাংশিক, ধুতুরা পঞ্চাংশিক। অংশগুলির মধ্যে সজ্জার একটু বিশেষত্ব আছে। এক অঙ্গের অংশগুলি অপর অঙ্গের অংশগুলির পশ্চাৎ বা পুরোবর্ত্তী নহে; পরন্তু একান্তরবর্ত্তী (alternate)।

খ, 'ক' এর পশ্চাৎবর্ত্তী।
'ক' 'খ' এর পুরোবর্ত্তী।
'ক' 'গ' ও 'ঘ' এর একান্তরবর্ত্তী।
'গ' ও 'ঘ' পার্শ্ববর্ত্তী।

তৃতীয় লক্ষণ—ফুলের ঊর্দ্ধে-গর্ভতা হইতে অধো-গর্ভতা-প্রাপ্তি। এইটী বুঝিতে হইলে, ঊর্দ্ধগর্ভ, অধোগর্ভ বা পরিগর্ভ কাহাকে বলে, বুঝিতে হইবে। যদি পুষ্পাসনের শিরোভাগে গর্ভকেশর স্থাপিত থাকে, এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি নিম্নভাগে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ পুষ্পকে ঊর্দ্ধগর্ভ পুষ্প বলে, (সীম, শুঁটী ইত্যাদি)। যদি গর্ভ পুষ্পাসনের অধোভাগে অবস্থিত হয়, এবং অন্যান্য অংশগুলি ঊর্দ্ধভাগে
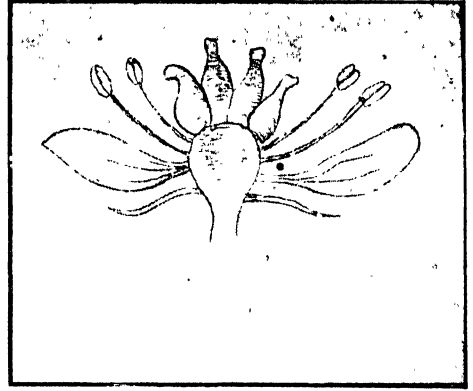
চিত্র (৭) ঊর্দ্ধগর্ভ পুষ্প
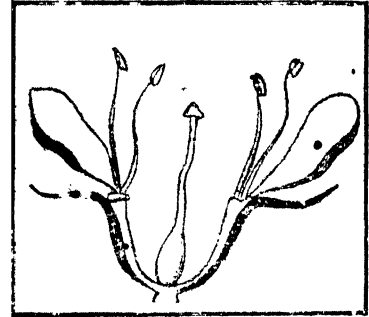
চিত্র (৮) পরিগর্ভ পুষ্প
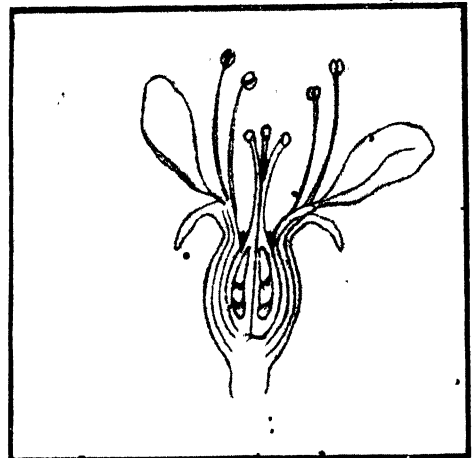
চিত্র (৯) অধোগর্ভ পুষ্প

অবস্থিত থাকে, তবে ঐ পুষ্পকে অধোগর্ভ পুষ্প বলা যায়। গর্ভসংস্থান যদি এমন হয় যে, পুষ্পাসন কুণ্ডাকারে গর্ভকে বেষ্টন করিয়া থাকে, এবং ছটা বা কুণ্ড উহাকে বেড়িয়া অবস্থান করে, তবে তাহাকে পরিগর্ভ পুষ্প বলা যায়।

লাউ বা কুমড়া ফুল—অধোগর্ভ।
পদ্ম, চাঁপা—ঊর্দ্ধগর্ভ,
গোলাপ—পরিগর্ভ।

উন্নতির পথে পদার্পণ করিয়া ফুল ঊর্দ্ধগর্ভতা ত্যাগ করিয়া অধোগর্ভতা লাভ করিতে সচেষ্ট। এইরূপ গর্ভসংস্থান উন্নত জাতীয় পুষ্পের একটা লক্ষণ। উদ্দেশ্য বোধ হয় এই—গর্ভাশয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। উহাই বীজাধার এবং ভবিষ্যদ্বংশের সূতিকাগৃহ; সুতরাং, উহাকে খুব সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য। বীজাধার অনাবৃত অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত থাকিলে, কীট-পতঙ্গাদির অত্যাচার বা অন্য কোন উৎপাতে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তা' ছাড়া, মধুস্থালীকে নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যও হইতে পারে।

পরিগর্ভ অবস্থাটা যেন উন্নতির পথে মধ্যাবস্থা-জ্ঞাপক। এই হিসাবে পদ্ম হইতে গোলাপ বেশী উন্নত এবং গোলাপ হইতে লাউ আরো বেশী উন্নত। কিন্তু একটামাত্র লক্ষণেই উন্নতি ও অবনতি বিচার সমীচীন নহে, এমন কি ঠিকও নহে।

চতুর্থ লক্ষণ ফুলের বিযুক্তগর্ভতা হইতে মিলিতগর্ভতা লাভ। ফুলের গর্ভাশয় হয় একটা, না হয় কয়েকটি গর্ভকেশরে গঠিত। যে ক্ষেত্রে অনেকগুলি গর্ভকেশর লইয়া

চিত্র (৫) উন্নত শ্রেণীর একাবরণ পুষ্প

গর্ভাশয় গঠিত, সেখানে হয় গর্ভকেশরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন (পদ্ম, চাঁপা), না হয় গর্ভকেশরগুলি পরস্পর মিলিত (যেমন ধুতুরা)। গর্ভকেশরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে উহাকে বিযুক্তগর্ভ (Apocarpous) বলে; আর পরস্পর সংযুক্ত হইলে, উহাকে মিলিতগর্ভ (Syncarpous) কহে।

চিত্র (১০) মিলিত গর্ভাশয় (জবা)

এই বহুগর্ভকেশরকে মিশাইয়া গর্ভাশয়ে পরিণত করিবার চেষ্টাতে উদ্ভিদের বীজপোষণ সম্বন্ধে বেশ একটু কৌশল অবলম্বনের লক্ষণ দেখা যায়। উন্নত জাতীয়ের এইরূপ কৌশল-প্রদর্শন জীবন যুদ্ধে জয়ী হইবার চেষ্টা বই আর কি? বহুগর্ভকে মিলিত করিয়া এক-গর্ভে পরিণত করাতে পরিমিত পরিশ্রমে, বেশী প্রাণরসে অল্প কয়টি বীজকে পোষণ করার যে আয়োজন, ইহা প্রকৃতি-দেবীর পাকা গৃহিণীপনার পরিচয় দেয় না কি?

পঞ্চম লক্ষণ—বহুদলতা হইতে একদলতা-প্রাপ্তি। বহু অংশকে মিলিত করিয়া এক অংশে পরিণত করার এই যে চেষ্টা, এ শুধু গর্ভকেশরেই নিবদ্ধ নহে; দলের সম্বন্ধেও ইহা খাটে। ছটার বিভিন্ন অংশের নাম দল (petal)। এই দলগুলি বিচ্ছিন্নাবস্থা ও মিলিতাবস্থা—উভয়াবস্থাতেই দেখা যায়।

যে ফুলে দলগুলি বিচ্ছিন্নাবস্থায় আছে, তাহাকে বহু-দল-পুষ্প (Polypetalous) বলে (গোলাপ, জবা); যাহাতে মিলিতাবস্থায় আছে, তাহাকে মিলিত-দল পুষ্প (Syinpetalous বা Gamopetalous) বলে (ধুতুরা, তামাক ইত্যাদি)। এই মিলিত বা বিযুক্ত ভাব কুণ্ডেও
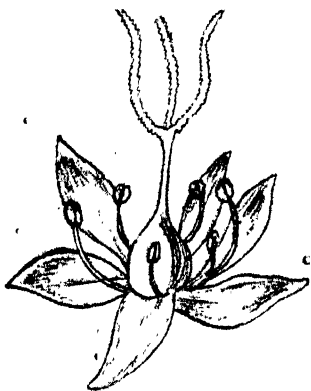
দেখা যায়; এবং ঐ লক্ষণ ধরিয়া মিলিত-পল (Gamosepalous) বা বহু-পল (Polysepalous) কথা ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ফুলের এই মিলিতদলত্বের একটা মস্ত অর্থ আছে। ফুলের ক্রমোন্নতির সহিত ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর।

সচরাচর দলগুলি মিলিত হইয়া নলের বা কলিকার বা বাটীর (cup) আকার ধারণ করে। এই নলাকার আবার কোন-কোন ফুলে সরলভাব ত্যাগ করিয়া বক্র, কুব্জ বা ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছে (তুলসী, দ্রোণ ইত্যাদি)। ইহা একটা উন্নতির লক্ষণ। এই উন্নতির লক্ষণ কিসে, তাহা আমরা নবম লক্ষণ বিচারকালে বিশদভাবে আলোচনা করিব। এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে,—বিযুক্ত-দল পুষ্প—যুক্ত-দল পুষ্প হইতে উন্নতির নিম্নস্তরে বিরাজ করে।

ষষ্ঠ লক্ষণ—সমাঙ্গভাব ত্যাগ করিয়া অসমাঙ্গভাব গ্রহণ। অনেক ফুলে (শিয়াকাঁটা, সরিষা, কুন্দ) অঙ্গের অংশগুলি আকারে, আয়তনে ও বর্ণে সমান। অপিচ, অংশগুলি পুষ্পাসনের উপর এমনিভাবে সজ্জিত যে, মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া একটা ব্যাস-রেখা টানিলে উহা ফুলটিকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিবে। ইহাই সমাঙ্গতার (actinomorphy) লক্ষণ। বিভক্ত খণ্ডদ্বয় সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে সমান না হইলে বুঝিতে হইবে, ফুলটা অসমাঙ্গ (Zygomorphic)।
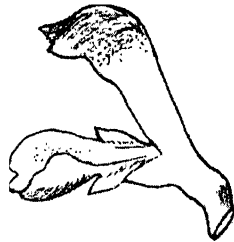
চিত্র (১১) বিযুক্তদল অসমাঙ্গ পুষ্প (সীমজাতীয়)

সমাঙ্গ—মিলিত দল

অসমাঙ্গ—মিলিত দল (তুলসী)

অসমাঙ্গতা উন্নতির চিহ্ন কিসে, তাহা আমরা নবম লক্ষণ বিচারকালে দেখিব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষণের একত্র-সংযোগে ফুলের নানা বিচিত্র মূর্ত্তি হয়। সীম, তুলসী, দ্রোণ, দোপাটী, অর্কীড অসমাঙ্গ ফুলের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সপ্তম লক্ষণ। পুষ্পশাখায় পুষ্পের সজ্জা (Inflorescence) বা বিন্যাস একক (solitary) হইতে গুচ্ছক (cluster)। কোন-কোন উদ্ভিদে একটি বোঁটায় একটি ফুল, এবং এমন কি এক শাখায় একটি। আবার অনেক উদ্ভিদে এক শাখায় অনেক ফুল স্তবকে স্তবকে, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া থাকে। যেখানে এক বৃন্তে এক ফুল একক, সেখানে প্রায়ই ফুলের আয়তন বৃহৎ, এবং বর্ণ ও বাহার বিচিত্র। কিন্তু গুচ্ছতে ফুলের আয়তন ছোট, বর্ণেরও তত বাহার থাকে না; তবে গন্ধের তীব্রতা থাকে। বহু ফুল একত্র মিলিয়া-মিশিয়া একটা সম্প্রদায় গঠন করে, এবং উন্নত জাতীয় ফুলেরা এরূপ সমাজ-গঠন পছন্দ করে। উদ্দেশ্য—বহুতে মিলিয়া এক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কাজটা নিশ্চিতরূপে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে। এই সমাজ-গঠনের আবার দুইটি ধারা। এক ধারায় দেখা যায়, পুষ্প-দণ্ডের দুইধারে ফুল গুচ্ছে-গুচ্ছে সাজান থাকে। এই স্তবক-রচনাকে "মঞ্জরী" বলা যাইতে পারে (যেমন মালতী, আম, দ্রাক্ষা, মরীচ)। দ্বিতীয় ধারায় একটি হরিৎবর্ণ আধারের মধ্যে (involucre) পুষ্পাসনের মাথার উপর ফুলগুলি দল বাঁধিয়া সজ্জিত হয় (যেমন গাঁদা, সূর্য্যমুখী ইত্যাদি)। এইরূপ সজ্জিত পুষ্পগুলি বিন্যাসগুণে একটিমাত্র পুষ্পের মত দেখায়। অথচ ইহারা অসংখ্য পুষ্পের উপনিবেশ

মাত্র। ইহারাই মিশ্র-পুষ্প (Composites)। ইহাদের বিন্যাসকে (Inflorescence) 'শিরোনিভ'-সজ্জা (Head) বলা যায়। এই জাতীয়ের প্রত্যেক পুষ্পটিকে 'পুষ্পক' (floweret) কহে।
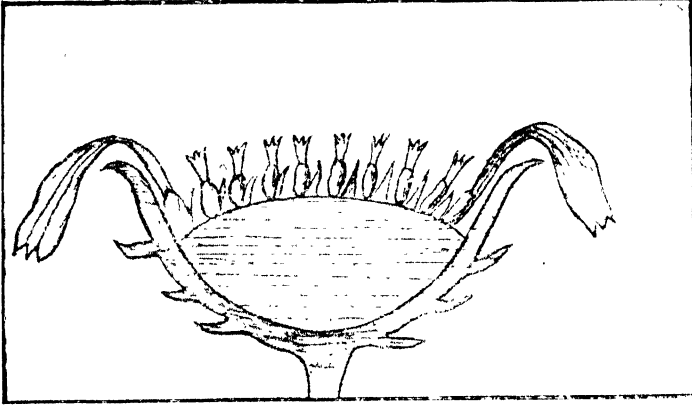
সূর্য্যমুখী জাতীয় মিশ্র পুষ্পের পুষ্প সজ্জা

চিত্র (১৩ ক) মিশ্র পুষ্পের একটী পুষ্পক

অনেকের ধারণা, গাঁদা বা সূর্য্যমুখী একটি ফুল; বাস্তবিক তাহা নহে। উহারা মিশ্র-পুষ্প ; অর্থাৎ অসংখ্য পুষ্পের

চিত্র (খ) মৌমাছির প্রিয় আদর্শ ফুল

সমষ্টি। এইরূপ সজ্জা চরমোন্নতির প্রকৃষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। এই হিসাবে গাঁদা, সূর্য্যমুখী পুষ্পরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাতবর্গ। কিন্তু শুধু এই এক লক্ষণের জন্যই তাহা নহে। গাঁদা যে ফুলজাতির মধ্যে বংশগৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার অন্যান্য হেতু প্রবন্ধশেষে বর্ণিত হইবে।
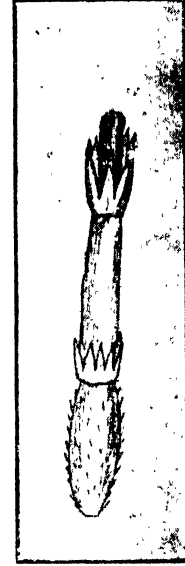
শেষ কথা স্তবক বা গুচ্ছ সজ্জাই যে আভিজাত্যের একমাত্র লক্ষণ, তাহা নহে। অনেক নিম্নজাতীয় ফুল গুচ্ছাকারে সজ্জিত। তবে কথা এই, ফুলজাতি এইরূপ সজ্জাকে উন্নতির সহায়ক দেখিয়া এই সজ্জা অবলম্বন করিয়াছে।

অষ্টম লক্ষণ—শ্বেত বা পীত হইতে লাল বা নীল বর্ণে রূপান্তর-প্রাপ্তি। অর্থাৎ সাদা বা হলুদ রঙ্গের ফুল লাল বা নীল, কমলা বা বেগুনি ফুলের অপেক্ষা হীন জাতি। ফুলের মধ্যেও বর্ণভেদে জাতিভেদ আছে! তবে ইহাদের মধ্যে whites ('শ্বেতকায়'রাই) হীন জাতি। লাল বা নীলেরা "ব্লু-ব্লাডের" (Blue blood) অধিকারী। আমাদের মধ্যে যেমন অনেক ইচ্ছানুকারীরা শ্বেতবর্ণ লাভের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন, ফুলেদের মধ্যে যাহারা আভিজাত্য প্রয়াসী, তাহারা কিন্তু শ্বেতবর্ণ পরিহার করিতে চেষ্টা করে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি ?

এই বর্ণের সহিত কীটাদিযোগে পরাগ-মিলনের একটা সম্বন্ধ আছে। কীটাদি বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ফুলের উপর আসিয়া বসে। এইরূপে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বেড়াইতে থাকে এবং অলক্ষ্যে এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের

গর্ভমুখে সংস্পৃষ্ট করে। তা' যেন হইল। বর্ণের রূপান্তর ঘটে কেন? এ কথার উত্তর নবম লক্ষণ বিচারকালে দেওয়া যাইবে। উপস্থিত বর্ণ-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আরো দু' একটি কথার উল্লেখ করিয়া এ আলোচনার শেষ করিব।

Grant Allen ফুলের বর্ণ-পরিবর্ত্তন ব্যাপারের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, ফুল শ্বেত বা পীতবর্ণ হইতে ফিঁকে লাল, কমলা ও গোলাপী হইয়া ঘোর বেগুনি ও নীল এবং ঘোর নীলের দিকে অগ্রসর হয়। কচিৎ ইহার বিপরীত গতি দেখা যায় (১)। অবশ্য ইহা উন্নতির গতি। অনেক ফুল উচ্চবর্ণ ত্যাগ করিয়া আবার হীনবর্ণ অবলম্বন করিয়াছে;—কিন্তু ইহা উন্নতির ধারা নহে; অনেক আর্য্য ব্রাহ্মণও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়।

এই যে বর্ণের বাহার এবং উহার পরিবর্ত্তন, উহা কেবল ছটাতে নিবদ্ধ। এই জন্যই ছটার নাম আকর্ষণ-চক্র। এই ছটা প্রথমে বিযুক্ত দল হইল; তার পর অসমাঙ্গরূপ ধারণ করিল; তার পর গঠন-গত জটিলতা লাভ করিল; অবশেষে নানা রংএ চিত্রিত হইল। সর্ব্বশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশটুকুতে মাত্র বর্ণ-বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ হইল। অর্কিডফুলে (ভুঁইচাঁপা জাতীয়) এবং বাঘনখার ফুলে এই শেষ লক্ষণটীর অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। Sir Alfred R. Wallace ঠিকই বলিয়াছেন, ফুলের বা জন্তুর যে অংশ যত জটিলতরভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অংশে রংএর খেলা তত মনোহর (২)।

নবম লক্ষণ।—স্বতঃ-সম্মিলন হইতে পরতঃ-সম্মিলন-সংঘটন-চেষ্টা। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের সপুষ্পক উদ্ভিদ-গণের মধ্যে স্ত্রী ও পুংপুষ্পদিগের মধ্যে স্বতঃ-সম্মিলন ঘটিত; অর্থাৎ একই ফুলের পরাগ তাহারই গর্ভকেশর-স্পৃষ্ট হইয়া বীজ-সঞ্চার করিত। এই ব্যাপার বায়ুর সাহায্যে ঘটিত। এখনো অনেক ফুলে তাহাই ঘটে। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, উদ্ভিদ যেন বুঝিতে পারিল, স্বগোত্র সম্মিলনে অনেক কুফল। বংশধরেরা ক্ষীণায়ু ও দুর্ব্বল-দেহ হইতে লাগিল। উদ্ভিদ তখন পরগোত্রমিলন অবলম্বন করিল; অর্থাৎ এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের গর্ভকেশরে সংপৃক্ত হওয়াইবার উপায় করিতে লাগিল। কিন্তু উদ্ভিদ ত স্থাবর। কে দূর হইতে পরফুলের পরাগ বহন করিবে? প্রকৃতি দেখিলেন, ফুলের বিবাহে ভ্রমর ও কীটপতঙ্গকে ঘটকালী কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। কিন্তু কীটপতঙ্গ ত ব্যাগার খাটিবে না? এ জগতে বিনা বখশীসে কে কার ব্যাগার খাটে? প্রকৃতি তখন ফুলে মধু সঞ্চার করিলেন। এই মধু হইল ব্যাগারের দর্শনী (fee)! কোন কোন স্থলে প্রকৃতিকে প্রবঞ্চনা অবলম্বন করিতে হইল। কেবলমাত্র বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে কীটপতঙ্গকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা হইল; যেমন শিমূলের ফুলে। কোথাও কোথাও বা প্রকৃতি মধু ও বর্ণবাহার দুইএরই আয়োজন করিলেন। তদবধি নানাজাতীয় কীটপতঙ্গ, এমন কি পক্ষীরাও ফুলের পরতঃ-সম্মিলন ঘটাইয়া আসিতেছে। এই পরতঃ-সম্মিলনকে নিশ্চয়তর করিতে ও স্বতঃ-সম্মিলনকে ব্যর্থ করিতে ফুলের শারীর-যন্ত্রে আরো কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পুং-কেশরকে গর্ভমুখ হইতে নিম্নমুখী করা হইয়াছে; অনেক ফুলে বা গর্ভমুখ এবং পুং-পরাগ-কোষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিপক্ক হয় ইত্যাদি।

কীটপতঙ্গ সহযোগে পরাগ-মিলন চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রকৃতি যেন দেখিলেন, একই ফুল নানা জাতীয় কীটের বিহার-ভূমি হইয়া পড়ায় যেন পরতঃ-সম্মিলন ব্যাপারটা তেমন সন্তোষজনক ফল দিতেছে না। তিনি তখন দেখিলেন, এক-একটি ফুলকে এক-এক জাতীয় বিশেষ কীট বা পতঙ্গের দ্বারা পরাগ-পৃক্ত করিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি তখন পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। কোন-কোন ফুলের ছটার অংশগুলিকে নলাকারে গঠিত করা হইল, এবং এমনি একটা বক্র বা ন্যুব্জ গঠন দেওয়া হইল যে, কোন এক বিশেষ আকারের কীট তাহাতে মধু-সংগ্রহার্থ প্রবেশ করিতে পারিবে, অন্য কীট পারিবে না। এমন অনেক দস্যু কীট আছে, যাহারা ফুলের মধু অপহরণ করে, কিন্তু পরাগ-সঞ্চার করিতে পারে না। প্রকৃতি আবার ফুলকে শুধু স্বার্থ-রক্ষণোপযোগী গঠন দিয়াই ক্ষান্ত নহেন। যে কীট যে বর্ণের পক্ষপাতী, তাহার প্রিয় ফুলকে প্রকৃতি সেই বর্ণে রঞ্জিত করিবেন।

Lord Avebury ফুলের বর্ণের সহিত কীটের সম্বন্ধ বিষয়ে অসংখ্য মনোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মৌমাছি নীলবর্ণের পক্ষপাতী; গুবরেপোকা পীতবর্ণ পছন্দ

(১) Vide, the Colour of Flowers—Grant Allen, page 17 (Macmillan—1891).

(২) Ibid, page 21.

করে, মাছি শ্বেতবর্ণের অনুরাগী। প্রজাপতি লাল ফুলে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য স্ব-স্ব প্রিয় বর্ণ ছাড়া তারা অন্য বর্ণের ফুলের কাছে যে যায় না, তাহা নহে। অন্ততঃ প্রজাপতি ও দ্বিরেফ আবহমান কাল হইতে এ সম্বন্ধে একটা মস্ত দুর্নামের ভাগী হইয়া আছে। তবে মৌমাছি ও প্রজাপতির নীল বা লাল বর্ণের উপর এত ঝোঁক যে Lord Avebury উন্নত জাতীয় সমস্ত ফুলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নাম দিয়াছেন Bee-flowers এবং Butterfly-flowers.

দেখা গেল, ফুল স্বতঃ-সম্মিলন প্রথা ত্যাগ করিয়া পরতঃ-সম্মিলনের প্রথা অবলম্বন করিতে গিয়া, কীটপতঙ্গাদির মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই কীটাদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য মধু, গন্ধ ও বর্ণ-বাহারের আয়োজন করিয়াছে; এবং সর্ব্বশেষে বিশেষ-বিশেষ কীট বা পতঙ্গের পক্ষপাতী হইয়া তাহারই দেহ-প্রবেশোপযোগী অঙ্গ-গঠন লাভ করিতে গিয়া অসমাঙ্গ আকার লাভ করিয়াছে; এবং তাহারই প্রিয় বর্ণের দ্বারা নিজের ছটাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে।

উপরিউক্ত নয়টী লক্ষণের সাহায্যে উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত-গণ ফুলের আভিজাত্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কোন একটি বা দুইটি লক্ষণ দেখিয়া ফুল-বিশেষের বংশ-মর্য্যাদা নির্ণয় করা যায় না। তবে যে ফুলে নয়টি লক্ষণের বেশী সংখ্যা বর্ত্তমান, তাহাকে আভিজাত্য হিসাবে শীর্ষস্থান দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের পরিচিত এমন কোন ফুল আছে কি, যাহাকে এই লোভনীয় 'পরমপদ' দেওয়া যাইতে পারে? নিশ্চয়ই আছে। গাঁদা, সূর্য্যমুখী, বিলাতী ডেজি এই শ্রেণীর ফুল। সংক্ষেপে, যাবতীয় মিশ্র-পুষ্প (composites) আধুনিক পুষ্পরাজ্যের শীর্ষস্থানীয়; এবং কেবল এই জন্য যে:—(১) উহাদের জননাঙ্গ ছটা ও কুণ্ডের দ্বারা আবৃত; (২) উহাদের অঙ্গচতুষ্টয়ের অংশগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক; (৩) উহাদের প্রত্যেক ফুলটি অধোগর্ভ; (৪) উহাদের গর্ভাশয় মিলিত-গর্ভকেশরে গঠিত; (৫) উহাদের ছটা যুক্ত-দল এবং নলাকার; (৬) উহাদের অঙ্গাংশগুলি অসমান; (৭) উহাদের পুষ্প-বিন্যাস গুচ্ছক (শিরোনিভ); (৮) উহাদের বর্ণ শ্বেত বা পীত হইতে কিছু উন্নততর; এবং (৯) উহাদের পরাগ-মিলন কীটাদি সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন, বিপুলকায় অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি এত মহামহীরুহ থাকিতে গাঁদা, সূর্য্যমুখী উদ্ভিদবংশের অভি-জাত বর্ণ! সত্যই তাই। পণ্ডিতপ্রবর Grant Allen কি বলেন শুনুন, "Size counts for little. The Oak and the Pine, the Acacia and the Rose are lower in the scale of life than the Thistle and the Daisy" (৩)

উপসংহারে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ফুলের বংশ-মর্য্যাদা ও উদ্ভিদের বংশমর্য্যাদা একই অর্থবোধক। কোন্ উদ্ভিদ উন্নতি সম্বন্ধে কত উর্দ্ধে, তাহা তাহার ফুলের বংশ-মর্য্যাদা দেখিয়া বুঝা যাইবে। সুতরাং, কোন এক উদ্ভিদের বংশমর্য্যাদা স্থির করিতে হইলে, দেখিতে হইবে ইহা অপুষ্পক না সপুষ্পক। যদি সপুষ্পক হয়—তবে উহার পুষ্প নিম্নজাতীয় না উচ্চজাতীয়। ফুলের পূর্ব্বকথিত নয়টী লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলেই উদ্ভিদের বংশমর্য্যাদাও ঠিক হইবে।

(৩) Grant Allen—

বাসনা

[বধূ রাণী শ্রীসরোজিনী দেবী]

জনম অবধি এ জীবনে সাধ বড়ই আছিল মনে,—
বসিয়া বিজনে ও রাঙ্গা চরণ পূজিব হৃদয়াসনে।
শুধু আশাসার হইল আমার আসা মাত্র বুঝি ভবে—
জীবন প্রদীপ নিভে গেলে, আর কবে বা আরতি হবে?
পতিতপাবন হে নাথ! এখন পতিতায় কৃপা করি—
কর কৃপাদান করুণা-নিধান পুরাও সে আশা হরি!
আসিছে সন্ধ্যা দেখিতে দেখিতে আয়ু যে অস্ত যায়—
মনের বাসনা মনেতে বিলীন হইবে কি ব্রজরায়!
মরু মাঝে হায় তৃষিতের প্রায় ছুটাছুটি হবে সার—
পাব না তোমারে—জীবন ভরিয়া রহিবে এ দুখ-ভার?

শরৎ-প্রতিভা

(গুণ-বিবেচন—Appreciation)

[রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ

প্রায় আট-নয় মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। আমি সিনেট্ অফিসের সিড়ি দিয়া নামিতেছিলাম, তখন সুধীবাবু (শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া একটি লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া সুধীবাবু দু-একটি কথার পর বলিলেন, "আপনি শরৎবাবুকে চেনেন না? ইনি একজন ভাল ঔপন্যাসিক।" আমি বলিলাম, "ইহাঁর লেখা আমি পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইনি কি-কি বই লিখিয়াছেন?" তখন সুধীবাবু ইহাঁর রচিত কয়েকখানি বইয়ের নাম করিলেন। আমি তাহার এক-খানিও পড়ি নাই! আমি বলিলাম, "ইনি ত আমাকে ইহাঁর কোন বই দেন নাই।" শরৎবাবু বলিলেন, "আমি দিলে কি আপনি পড়িবেন"? আমি কতকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলাম, "ঠিক যে পড়িব, এরূপ বলিতে পারি না; তবে আপনি বই দিয়া দেখিতে পারেন।" বস্তুতঃ, আমি মনে করিয়াছিলাম, অনাড়ম্বরবেশী শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি এখনকার সাহিত্য-বাজারের কোন সামান্য ব্যবসাদার গল্প-লেখক। সুধীবাবু তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহার প্রশংসা করিয়া চলিত ভদ্রব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র। আজ-কাল ত গল্প-লেখক বঙ্গসাহিত্যের হাটে-পথে। রাঁধুনি বামণের হাতে যাঁহারা রন্ধনের কাজ ও চাকরাণীর হাতে ঘরের অন্য-অন্য কাজ সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া, উপাধান আশ্রয় করিয়া দিন-রাত্রি নিষ্কর্ম্মাভাবে কাটান, এইগুলি সেই নব্যসম্প্রদায়ের মহিলাদেরই মুখরোচক হয়।

উক্ত ঘটনার তিন-চারি মাস পরে গুরুদাসবাবুর দোকান হইতে আমি কতকগুলি বই পাই। তাহার মধ্যে "বিন্দুর ছেলে" নামক গল্পের বইখানি একদিন হঠাৎ শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতে বসি। "বিন্দুর ছেলে" ও "রামের সুমতি" এই দুইটি গল্প পড়িয়া আমি যেন নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম। চরিত্রগুলি এমন স্পষ্ট,—মনে হইল, যেন তাহারা সজীব হইয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে। সাধারণতঃ গল্প-লেখকেরা বদ্ধপরিকর হইয়া দুই রকমের চরিত্র-রচনা করেন,—ভাল এবং মন্দ। যে ভাল তাহার গুণের শেষ নাই, যে মন্দ তাহার দোষের সীমা নাই। অত্যাচারী ক্রমাগত পীড়ন করিতেছে, সহিষ্ণু ক্রমাগত সহ্য করিতেছে। করুণ রসের সৃষ্টি করিবার জন্য লেখকদের কেহ কোন ভাসুরের দ্বারা দেবর-পত্নীর চুলের মুঠি ধরাইয়া তাহাকে ভিটা হইতে তাড়াইতেছেন, ক্ষয়রোগকাতর বিধবা তথাপি সেই ভিটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। কোন স্থানে দীন দরিদ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাল-লাঙ্গল বন্ধক রাখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পড়ার খরচ চালাইয়া তাহাকে উকিল তৈয়ারী করিতেছেন, পরে সেই কনিষ্ঠভ্রাতা শ্বশুরের অর্থ-গৌরবে এবং ওকালতীর পশার জমাইয়া, চির-সহিষ্ণু দয়াময় জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পশুর মত গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে; বড়ভাই তখনও ছোট ভাইএর মঙ্গল-কামনা করিতে ছাড়েন নাই। এইরূপ অত্যাচারের বর্ণনা পাঠ-কালে যে সত্য-সত্যই কোন সময়ে চক্ষুর জল না পড়ে, এমন কথা আমি বলিব না। কিন্তু গ্রন্থকার যাহাকে ভাল করিয়া গড়িবেন, তাহার মুখে সাদারঙ্গ ঘষিয়া-ঘষিয়া তাহা চক্-চকে করিয়া দিবেন; এবং যাহাকে খারাপ করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাকে কাল কালিতে স্নান করাইয়া বানর বানাইয়া ছাড়িবেন, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাহা ছাড়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বরতাকে অনেক সময় ইহাঁরা করুণরসের প্রতিপোষক মনে করিয়া সাহিত্যিক কলা-শিল্পজ্ঞানের একান্ত অভাব দেখাইয়া থাকেন। একদা কোন একখানি প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া একটা দৃশ্য বড় সাংঘাতিক মনে হইল। ষ্টেজের উপর একটা ছেলেকে শোয়াইয়া তাহার খুল্লতাত বিষয়-লোভে তাহাকে বিষ

প্রয়োগ করিতেছেন ; জোর করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া ধীরে-ধীরে বিষ দেওয়া হইতেছে ; বালকটি তীব্র যন্ত্রণায় যতই হাত-পা ছুড়িতেছে, ততই দর্শকের দল বেজায় রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ করুণ-রসের উদ্রেক করা কতকটা সহজ। যদি ষ্টেজের উপর কোন অভিনেতা বমি করিয়া বীভৎস রস প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান, তবে বোধ হয় এইরূপ সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

কিন্তু সাহিত্যিক রস-সৃষ্টির আইন-কানুন অত স্থূল নহে। রক্ত-মাংসের মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে, তাহাকে দোষে-গুণে রচনা করিতে হয় ; তবেই তাহাকে আমাদের একজন বলিয়া চিনিতে পারি। রামচরিত্র ত অবশ্যই আদর্শ চরিত্র ; কিন্তু বাল্মীকির হাতে তিনি রক্তমাংসের মানুষ হইয়াছেন,—মহাকবি নিশ্চয়ই পুতুল গড়িতে চেষ্টা পান নাই। গুহক চণ্ডালের গৃহ ছাড়িয়া একরাত্রি তিনি একটা বড় গাছের শাখায় বাস করিয়াছিলেন। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, পশুর গর্জ্জন ; মনোরমা সীতা ঝটিকা-দলিতা বল্লরীর ন্যায় তাঁহার কণ্ঠ-লগ্না,—এমন সময় দুঃসহ কষ্টে কালসর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, "এমন কি কখন শুনিয়াছ লক্ষ্মণ, যে কোন পিতা জগতে আমার মত ছন্দানুবর্ত্তী পুত্রকে এইভাবে বর্জ্জন করিতে পারে ? রাজা দশরথ একান্ত কাপুরুষ ও স্ত্রৈণ ; তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও, নতুবা কৈকেয়ী নিশ্চয়ই আমার মাতাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবে।" কৌশল্যা রামের বনগমন-উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়া রামচন্দ্র শয়ন করিতে অভ্যস্ত, সে কেমন করিয়া তাহার লৌহ সাবলের মত দৃঢ় বাহু আশ্রয় করিয়া নিদ্রা লাভ করিবে ?" পাছে রামের চিত্র কঠোর হয় ; এই ভয়ে কৃত্তিবাস এ সকল অংশ বাদ দিয়াছেন। লক্ষ্মণ রুখিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্।" এ কথা বাঙ্গালা রামায়ণে পৌঁছায় নাই। হনুমান্ রাবণকে প্রথম দিন দেখিয়া বলিয়াছিল, "কি গম্ভীর রাজোচিত মূর্ত্তি ! কি ধৈর্য্য ! কৌপিনধারী রামচন্দ্র ইহাঁর সঙ্গে বিরোধ করিয়া কি করিবেন ?" সুতরাং বাল্মীকিকৃত রাম নিছক ভালমানুষটি নহেন, এবং রাবণও নিছক দুষ্ট লোক নহে।

বড় কবি ও লেখকেরা শাস্ত্র ধরিয়া কিম্বা সামাজিক হিসাবে—কি ভাল, কি মন্দ তাহার একটা নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া, চরিত্র-গঠন করেন না। তাঁহাদের কল্পনা তাঁহাদিগকে এমন একটা জায়গায় লইয়া যায়, যেখানে সজীব ব্যক্তিরা চলাফেরা করে। কবি ও লেখক অতি স্পষ্টভাবে মনশ্চক্ষে যাহা দেখেন, তাহাই লেখনীমুখে প্রতিভাত হয়। আদর্শ আঁকিবার চেষ্টা করিয়া কেহ কখনও খুব উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। সুখে-দুঃখে, আলো-আঁধারে, দোষে-গুণে এই বিশ্ব ! ইহাতে যাহা উচ্চ ও বড়, তাহা কেবলই উচ্চ ও বড় নহে। হিমালয় পর্ব্বতে এমন গহ্বর আছে, যাহা হইতে পাতাল পর্য্যন্ত দেখা যায়।

বহু দিন পরে বাঙ্গালা-সাহিত্যে শরৎ বাবুর গল্পে সজীব মানুষ দেখিলাম। দেখিলাম, ক্রুদ্ধ সর্পিনীর ন্যায় স্ত্রীলোকের হৃদয়ও কুসুম-সুকুমার হইতে পারে। ভ্রাতৃবধূ ভাসুরকে কঠোর কথা বলিলে, সর্ব্বদাই তিনি দীন-হীন ভালমানুষ সাজিয়া গর্ব্বিতা ভ্রাতৃ-বধূর কৃপাপাত্র হইবার প্রত্যাশী নহেন,—বড়-মানুষ ভ্রাতার বাটীর পার্শ্বে কুটীরে থাকিয়া সারাদিন খাটিয়া প্রাণান্তশ্রমে উপজীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। ইহাঁর গল্পে পাড়ার সেরা বদমাইস ছেলেটার মত এমন কোমল চরিত্র বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরৎ বাবুর প্রধান চরিত্রগুলির অনেকের মধ্যে প্রধান দোষ আছে ;—তাহা সত্ত্বেও তাহা লইয়াই তাহারা শ্রেষ্ঠ। এমন যে সোণার পুতুল নারাণী, সেও স্নেহান্ধ এবং নিজের স্নেহ-পাত্র সম্বন্ধে দোষ দেখিতে অপটু। লেখক সু, কু লইয়া তাঁহার ছবিগুলি আঁকিয়াছেন, তাহার কোনটিই এক রঙ্গের হইয়া যায় নাই ; দোষেগুণে যেরূপ সংসার, শরৎ বাবুর অঙ্কিত চিত্রগুলিরও সেইরূপ কোন দিকে আলো পড়িয়া উজ্জ্বল হইয়াছে, কোন দিকটা বা আঁধার রহিয়া গিয়াছে। মোটের উপর, চরিত্রগুলির প্রত্যেকের দোষেগুণে এমন একটা বিশেষত্ব আছে—যে উহারা জীবন্ত মানুষের মতন হইয়াছে। লেখকের সহৃদয়তা এত বেশী যে, একান্ত কোপন, একান্ত অভিমানী ও কাণ্ড-জ্ঞানহীন চরিত্রের ভিতরকার মাধুর্য্যের উৎসের তিনি সন্ধান করিয়াছেন। ইউজিন-সুর মাদার রঞ্জ, এবং ভিক্টর হিউগোর নটারডামের কুব্জ বাহিরে কুৎসিত হইয়াও ভিতরের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব হইয়াছেন। লেখকেরা ভিতর দেখাইয়াছেন বলিয়াই আমরা বাহিরের কুৎসিতও যে

"কৃষ্ণকান্ত উইলখানি পড়িয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে।"

—কৃষ্ণকান্তের উইল—প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

ভিতরে সুন্দর হইতে পারে, তাহা বুঝিয়াছি। "পণ্ডিত মশাই" গল্পের নায়িকার মত অতবড় সাংসারিক-বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোককে প্রধান নায়িকা করিয়া দেখান সহজ নহে। কিন্তু যে অন্তর্য্যামী বিধাতা কুসুমের হৃদয়ের সন্ধান রাখেন, তিনি গল্প-লেখকের হাতে ভিতরটা দেখিবার ও দেখাইবার চাবিটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কুসুমের অভিমান, কুসুমের রাগ, তাহার অশ্রুতপূর্ব্ব স্বামী-প্রেমের উপর দাঁড়াইয়া, সকল দোষের মধ্যে অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। আমরা দুর্দ্দান্ত বালক রামের দোষগুলিকে পর্য্যন্ত ভালবাসিতে শিখিয়াছি। লেখকের প্রবল সহানুভূতি আমাদের টিকি ধরিয়া লইয়া এমন সকল জিনিষকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে, যাহা প্রথমতঃ একান্ত দোষের মনে হওয়া স্বাভাবিক। রাম যে তাহার দিদিমাকে ডাইনী বুড়ি বলিত, ডাক্তারের কলমের আমগাছগুলি কাটিয়া ফেলিবার ও তাহার বাড়ীতে আগুন ধরাইবার ভয় দেখাইত, চুরি করিয়া গৃহস্থের শশা খাইত, এমন কি তাহার মাতৃসমা বৌদিদির চোখে পেয়ারা ছুড়িয়া মারিয়া ফুলাইয়া দিয়াছিল—এ সকল আমাদের চক্ষে, তাহার চরিত্রের অসামান্য স্নেহ-প্রবণতাগুণে, মধুর বোধ হইতেছে। জননী যে গুণে ছেলের দোষ দেখিয়াও দেখেন না, তাহাকে ভাবের অমৃতে ডুবাইয়া রাখেন, শরৎ বাবুর ভিতরে সেই গুণ, প্রীতি ও সহানুভূতি—এত বেশী যে, তিনি পাঠকের চিত্ত মাতৃ-হৃদয়ের ন্যায় সুকোমল করিয়া গড়িয়া ফেলেন। "রামের সুমতি" গল্পটির মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর গল্প আমি বাঙ্গালা সাহিত্যে পড়ি নাই। রাম তাহার ভ্রাতৃবধূকে ভালবাসিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিল; ইহা সত্য যে, তাহার প্রকৃতির সমস্ত উদাস উচ্ছৃঙ্খলতা সেই ভালবাসায় পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু যে দিন সে সেই স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছিল, সে দিন যেন সিংহ-শাবক মেষ হইয়া গিয়াছিল। বউদিদিকে সে পেয়ারা ছুড়িয়া ব্যথা দিয়াছিল, এ কষ্ট তাহার রাখিবার জায়গা ছিল না। সে নিজের কপালে পেয়ারা ঠুকিয়া বুঝিতে চেষ্টা পাইতেছিল, সে আঘাতের পরিমাণ কত! সে নিজেকে কত মিথ্যা সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল; বাহিরে নিজের তেজ বজায় রাখিবার জন্য কত বিফল চেষ্টা পাইয়াছিল;—কিন্তু যেদিন বউদি তাহাকে ডাকেন নাই, খাইতে দেন নাই, সে দিন তাহার সমস্ত বালক-প্রকৃতি ত্রাসে শুকাইয়া উঠিয়াছিল; সে দিন তাহার উদ্দামভাব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রেণু হইয়া গিয়াছিল। অত অল্প জায়গায় এরূপ প্রবল ভাবের করুণ-রস সৃষ্টি করিতে বঙ্গীয় অন্য কোন আধুনিক লেখক পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

প্রচলিত রাশি-রাশি ছোটগল্পের করুণ-রস "রামের সুমতি" গল্পের তুলনায় সিন্ধুর নিকট বিন্দু। বস্তুতঃ, রামের সমস্ত দোষ আমরা জননীর চক্ষে মার্জ্জনা করিয়া থাকি। নৈতিক হিসাবে উঁহারা যত বড়ই হউক না কেন, লেখক তাহা বৃন্দাবনের লীলার ন্যায় মধুর করিয়া তুলিয়াছেন, সেখানে চুরি-মারামারি, মান-অভিমান —সকলই স্নেহের মূল্যে বিকাইয়া গিয়াছে। নারাণী যেদিন স্বামীর শপথ উপেক্ষা করিয়া রামের জন্য রাঁধিতে বসিল, সে দিন তাহার মূর্ত্তি রাফেলের অমর তুলিকায় আঁকা ম্যাডোনা-মূর্ত্তির ন্যায় আদর্শ মাতৃমূর্ত্তি। সেই রান্না, সেই পরিবেশনের কথা—চক্ষের জলে পড়া যায় না; প্রবীণ সমালোচক অক্ষয় সরকার মহাশয়কে উহা পড়িয়া শুনাইতেছিলাম; তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "আপনি আমার চক্ষুর পীড়া বাড়াইয়া দিলেন।"

গল্পগুলির আর একটা বাহাদুরী এই,—উহা আদৌ ফেনাইয়া লেখা হয় নাই। আজ-কাল বাজে কথা, বিশেষ প্রকৃতি-বর্ণনা এত বেশী দেখা যায় যে, উহার দ্বারা গল্পভাগ প্রায়ই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। শরৎ বাবুর ভাষায় সংযম আছে; সংযত দুই-একটি কথায় তাঁহার চরিত্রগুলির অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় সাধারণ লেখকগণের কথার বাহুল্যে তাহাদের নায়কনায়িকাগণের প্রকৃতি ঢাকা পড়ে মাত্র।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সকল দিক্ দিয়া দেখিলে, "রামের সুমতি" গল্পটিই বোধ হয় লেখকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে এত ঘটনার বাহুল্য আছে যে, ইহার প্রত্যেক চিত্র একটি মহাকাব্যের অধ্যায়ের মত। রাম এক পায়ে দাঁড়াইয়া রহিল; কিরূপে দাঁড়াইতে হয় তাহা তাহার পাঁচ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ শিখাইতে গেলে, তাহার গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল, এই ব্যাপারে নারায়ণী একটু হাসিলেন। অশ্বত্থগাছ উঠানের উপর রূপনকালে রামের অবিশ্রান্ত আদেশ প্রদান, গোবিন্দের ছোট একটা

ঘটি করিয়া জল আনা, এক ডালের দিকে ইঙ্গিত করায় রামের সতর্ক করিয়া দেওয়া, কারণ আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে গাছ বাড়িবে না, কালী গরুর ভয়ে বাঁশের বেড়া দেওয়া, কোথাও বা রামের কাঠি দিয়া বেলের আটা খোঁচাইয়া বাহির করা এবং সেই ঘটনা শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের গম্ভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করা, কখনও রামের কঞ্চির দ্বারা পাখীর খাঁচা প্রস্তুত করা, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবিতে যেন সমস্ত বাল্যলীলার একটা জগত আমাদের চক্ষের সুমুখে খুলিয়া গিয়াছে। এই শিশুলীলার মধ্যে মাতৃরূপিণী বউদিদির আদর-আব্দার ও বাহিরের শত প্রকার অসহ্য গঞ্জনা যেন সমস্ত দৃশ্যটি স্নেহাসারে অভিষিক্ত করিয়া রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গল্পে লেখক সূক্ষ্ম তুলি ধরিয়া যে সকল চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণনগরের কারিগরের হাতের তৈয়ারী মাটির মূর্ত্তির মত এক-একটি ভিন্ন প্রকারের, এবং প্রত্যেকটিই অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অতি স্বাভাবিক বলিয়া তাহাদের গঠন-নৈপুণ্য আমাদের চক্ষু এড়াইতে পারে; কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, নিত্য দাসী কিরূপ স্পষ্টবাদিনী; এবং বহুদিন এক মনিবের গৃহে থাকায় গৃহের ধাতটি সম্বন্ধে তাহার কিরূপ অভিজ্ঞতা। ভোলা চাকর ছোট হইলেও কিরূপ প্রভুভক্ত, অনুগত এবং সখ্যভাবে আবদ্ধ। নারাণীর মাতার মত চরিত্রের বঙ্গীয় গৃহে অভাব নাই; ইহাঁদের প্রভাবে কত গৃহের শান্তি চিরতরে চলিয়া যাইতেছে। বড়ভাই গোবেচারী, কিন্তু তিনিও নিতান্ত ভালমানুষটি ন'ন্; তাঁহার ভিতরেও দুষ্ট পরামর্শ গ্রহণের প্রবৃত্তিটি বিলক্ষণ আছে; গিন্নির ভয়ে অনেক সময় সেই প্রবৃত্তিটি খেলা করিতে সাহস পায় নাই। এই সকল চরিত্রের আশে-পাশে দুই-একটি ছোট চরিত্র উঁকি মারিতেছে; তাহারা লেখকের অবহেলার রেখাপাতেও যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার বাবুর সাক্ষ্য মান্য করিবার ভয়ে এক বৃদ্ধ রোগী বলিয়া উঠিয়াছিল, "উনি বাবু কি বলিয়াছেন আমি ত তাহা শুনি নাই, কাণের ভিতর কুইনাইনে ভোঁ ভোঁ করিতেছে।" এইরূপ দুই-একটি কথায় পাড়াগেঁয়ে ভীরুস্বভাব গৃহস্থের ছবি অতি স্পষ্টভাবে চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিয়াছে; এই বিচিত্র ঘটনা, চরিত্র ও পুঞ্জীভূত গৃহস্থালী-তত্ত্ব চালচিত্রের মত, "নারাণী ও রামের" বাৎসল্যকে মহিয়সী শোভা প্রদান করিয়াছে। বউদিদির শোক এবং সংযত বাক্যে আধ-প্রকাশিত সুগভীর মাতৃপ্রেম উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রেমের সংযম কতদূর তাহা দুই একটি ব্যবহার ও বাক্যে বুঝিতে পারা যায়; নারাণীকে তাহার মাতা যখন দুধ লইয়া খাইবার জন্য সাধাসাধি, অনুরোধ, ও গঞ্জনা-মূলক বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, নারায়ণী তখন দু'এক চুমুক দুধ খাইল। সাধারণ গল্প-লেখকেরা নিশ্চয়ই এ জায়গায় লিখিতেন, নারায়ণী কিছুতেই দুধ খাইতে রাজী হইল না। কিন্তু লেখক শুধু বলিলেন, নারায়ণীর কথা-কাটাকাটি করিতে ভাল লাগিল না, এজন্য তিনি দুধ খাইলেন; দুধ নিশ্চয়ই তাঁহার বিষের মত ঠেকিয়াছিল। তথাপি তাঁহাকে খাইতে হইয়াছিল, বিষ হইতে তিক্ত মায়ের কথার জ্বালা এড়াইতে। যখন তিনি রামের অবস্থা জানিবার জন্য কৌতূহলে মরিয়া যাইতেছিলেন, তখনও হৃদয়হীনা মায়ের নিকট সে কথা শুনিলেন না, যাহাতে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল সেই কথা দর্প করিয়া তাহার মাতা তাহার কাণে বিজয়-ভেরীর মত বাজাইতে আসিয়াছিলেন। নারাণী তাঁহার প্রাণান্ত কৌতূহল চাপিয়া রাখিয়া অন্যদিক হইতে রামের সংবাদ জানিতে চেষ্টা পাইলেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এত বড় সংযম প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অথচ গভীরতম বাৎসল্যের ইহাই স্বভাব; শরৎবাবু অবহেলায় দুই-একটি কথায় যেরূপ মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন, সুদীর্ঘ বর্ণনায়ও অনেক সময় তাহা পাওয়া যায় না।

"রামের সুমতি"র শেষটি বড়ই স্বাভাবিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাম বউদিদির স্নেহের বলে এত বড় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কিছুতেই বউদিদির পর নহে। বউদিদির স্বামী তাহার বৈমাত্রেয় ভাই—তাহার পর; কিন্তু বউদিদি তাহার মাতৃসমা—তাঁহাকে ছাড়া সে জানে না, কিছুতেই তাঁহাকে সে পর ভাবিতে পারে না। বউদিদি বুড় হইয়া মরিয়া যাইবে, এ কথাও তাহার অসহ্য। বউদির ছেলেটি তাহার নিত্য-সহচর, তাহার একান্ত স্নেহাস্পদ, 'আপনার' বলিয়া এই চিরাগত বিশ্বাস যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন রাম একবারে কি একটা হইয়া গেল! ক্ষুদ্র একটি পুঁটুলি লইয়া যখন সে অকূল সংসারের পথে একক দাঁড়াইল এবং ভোলাকে দিয়া বৌদিদির নিকট হইতে একটি টাকা পাথেয় চাহিল, তখনকার তাহার মূর্ত্তি, ও ডাক্তারের বাড়ীতে

কলমের আমের চারা কাটিবার ভয় দেখাইবার সময়কার মূর্ত্তি—এই দুইটি মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পৃথক। এখনকার রাম আর সে রাম নাই; দু'দিনের মধ্যে সে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে; তাহার পায়ের নীচে যে জমি ছিল, তাহা সরিয়া গিয়াছে—তাহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহার বাল্য-প্রকৃতি একবারে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় নারায়ণী তাহার মাতাকে বিনীত-ভাবে স্বগৃহ হইতে বিদায় লইতে বলিলেন। রাম বলিল, "না, উনি থাকুন; আমি উঁহাকে আর কোন উৎপাত করিব না, আমি ভাল হইয়াছি।" সুতরাং দিগম্বরী ঠাকুরাণীর থাকা-না-থাকা গল্পের উদ্দেশ্যের নিকট তুল্য হইয়া পড়িল, রামের সুমতি হইল; অর্থাৎ তাহার লীলামধুর, দুর্দ্দান্ত অথচ কোমল, আবদার-প্রশ্রিত অথচ একান্ত নির্ভরশীল, শিশু-প্রকৃতি ঘা খাইয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। এখন দিগম্বরী তাহার প্রতি যত অত্যাচার করিবেন, মুখ ভেঙ্গাইবেন ও শাপান্ত করিবেন, সে সকল নদীতরঙ্গে শৈল-কঠিন তীরভাগের ন্যায় সে নীরবে সহ্য করিবে, ইহা আমরা যখন বুঝিলাম, তখন শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর থাকা-না-থাকায় আমাদের আর কোন কৌতুহল-সম্বন্ধ রহিল না। গল্প স্বাভাবিক-ক্রমে এইখানে শেষ হইল। এই গল্পটি বাৎসল্য ভাবের পরিণতি। সেই বাৎসল্য কত গভীর, তাহা যেদিন নারায়ণী তাঁহার মায়ের মুখে রামের মৃত্যু-কামনার শাপ শুনিয়াছিলেন, তখন একবার "মা" কথাটি রোষকম্পিত স্বরে উচ্চারণ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। মধুর 'মা' কথাটি সেদিন শত বজ্রের শক্তি ধারণ করিয়া দিগম্বরীর অন্তরাত্মা কম্পিত করিয়া দিয়াছিল। বিনা বক্তৃতায়, অতি অল্প কথায় শরৎবাবু তাঁহার চরিত্রগুলি এইভাবে জীবন্ত করিতে পারিয়াছেন।

শরৎবাবু একটি তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন—তাহা আমার নিকট বড় আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। এটি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান ভাব; কিন্তু শরৎবাবু বৈষ্ণব শাস্ত্র হইতে তাহা পান নাই। ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বড়রকমের স্নেহ শুধু রক্তমাংসের সম্পর্কজাত নহে, তাহা ভগবানের দান, তাঁহার ইচ্ছায় জন্মে। কোথায়ই বা উহার উৎপত্তি না হইতে পারে? শুধু মাতাই যে স্নেহের অধিকারিণী, তাহা নহে। একটা কাল ছেলে কোলে পাইয়া গর্ব্ব, অভিমান ও রূপের মূর্ত্তিস্বরূপ বিন্দু তাহাকে মায়ের অপেক্ষা বেশী স্নেহ করিতে শিখিল; স্নেহের গণ্ডী কতদূরে টানিতে হইবে, কুলজী শাস্ত্র হইতে আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি। কেহ সে গণ্ডী অতিক্রম করিলে "মায়ের চেয়ে যে বেশী ভালবাসে তাকে বলে ডাইন" প্রভৃতি রূপ কটূক্তি করিতে পারি। কিন্তু মনুষ্য-প্রকৃতির ক্ষেত্র অবাধ; সে প্রকৃতির লীলা কোথায় থামিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের ভিতরে যে আত্মা আছেন, তিনি পরকে আপন করেন ও আপনকে পর করেন; তিনি আইন-কানুনের ধার ধারেন না। বৈষ্ণবেরা এই নিষ্কাম প্রেমকে জড়-নিয়মের বশবর্ত্তী মনে করেন না; রক্তের সংস্রবে যে স্নেহ হয়, উহা তাহা হইতে বড়। এই কথা বুঝাইতে—দৈবকী হইতে যশোদার মাতৃভাব বেশী ফলাইয়া দেখাইয়াছেন। নন্দই আমাদের চক্ষে আদর্শ পিতা, বসুদেব নহেন; অথচ ইহাঁরা কে? ইহাঁরা কৃষ্ণের কেহই নহেন। যখন প্রভাসে যাইয়া তাঁহারা নিজের ভুল বুঝিলেন, তখন তাঁহারা প্রাণ ছাড়িতে চাহিলেন, কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারিলেন না। শরৎবাবুর 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'মেজ দিদি' প্রভৃতি গল্পে পরকে আপনা হইতেও আপন করিয়া দেখাইতেছেন। কোন্ মাতা, বিন্দুর মত, নারাণীর মত স্নেহশীলা? অপার্থিব প্রেম কোন্ ক্ষুদ্র উপলক্ষে, কোন্ অনির্ব্বচনীয় সূত্র আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে আসিয়া সিংহাসন পাতিবে তাহা বলা যায় না। স্বামী হইতেও কেহ বেশী আত্মীয় হইতে পারে—এই তত্ত্বের উপর পরকীয় রস স্থাপিত; মাতা হইতেও অধিকতর স্নেহশীলা হইতে পারেন—ইহাই আমরা শরৎবাবুর অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রে দেখিতে পাই। বস্তুতঃ শাস্ত্রবিহিত বাঁধা ঘাটে প্রেম ও স্নেহ সচরাচর বিচরণ করে বলিয়া মনে করিও না যে, উহারা নিগড়বদ্ধ। উহাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। কোন্ অনির্ব্বচনীয় নিয়মে প্রেম কোথায় কাহার জীবনকে ধন্য করিতে উপস্থিত হয়, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? মুক্ত আকাশ ও বায়ুর ন্যায় প্রেমের ক্ষেত্র অসীম; উহা কোন্ দুয়ার দিয়া চন্দ্র-কিরণের মত কাহার হৃদয় ছুঁইবে,—কে বলিবে? স্নেহের এই অনির্ব্বচনীয়ত্ব, এই গূঢ় গতি-বিধি শরৎবাবুর লেখায় আমরা দেখিতে পাই। বৈষ্ণবদিগের মুখে এই সুর শুনিয়াছি বলিয়া, উহা আমাদের কাণে এত মিষ্টি লাগিয়াছে। আর একটি ভাব আমরা শরৎবাবুর লেখায় পাই। তাহা

স্নেহের রাজ্যে আগন্তুকের দৌরাত্ম্যের সাংঘাতিক ফল। একান্নভুক্ত পরিবার যেখানে স্নেহ-মায়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে শত দোষ সত্ত্বেও তাহা অনড়, অটল। রামের এত অশিষ্টতা এবং অনিবার্য্য দোষগুলি লইয়াও নারায়ণীর সংসার বেশ চলিতেছিল; কিন্তু এত আঘাতেও যাহা নড়ে নাই, সহানুভূতিশূন্য আগন্তুকের নিঃশ্বাসে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল।

বিন্দু ও অন্নপূর্ণার ঝগড়া-বিবাদে যে গৃহে সর্ব্বদা ঝড় বহিত, তাহা এলোকেশীর আগমনে কিরূপ হইয়া গেল। এটি একটি নিত্য-পরীক্ষিত সত্য যে, কোন পরিবারে যদি নৈতিক মহৎ অপরাধ না থাকে, তবে শত দোষ সত্ত্বেও তাহা শুধু মমতার বন্ধনে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু আগন্তুকগণের অযাচিত আত্মীয়তা তাহা একদিনও সহ্য করিতে পারে না। যে সকল ভাব অনভ্যস্ত, তাহার উৎপাতে গৃহস্থালী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। "রামের সুমতি" ও "বিন্দুর ছেলে" পড়িয়া পাঠক এই কথাটি বেশ বুঝিতে পারিবেন।

শরৎবাবুর "চন্দ্রনাথ" উপন্যাসখানি বহু পূর্ব্বের লেখা। যতই প্রবীণতা ও চুলের পক্কতা বাড়িয়া যায়, ততই যে লেখা উৎকৃষ্ট হয়, এ বিশ্বাস আমাদের নাই। "চন্দ্রনাথ" পুস্তকের উপসংহারভাগ অতুলনীয়। একটি জাতিচ্যুতা মেয়েকে শিক্ষিত ও ধনী যুবক চন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়াছিলেন; সরযূ নিজের কুলকলঙ্ক জানিয়াও স্বামীর নিকট গোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাহা বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ধরা পড়িয়া গেল। তখন চন্দ্রনাথ ও সরযূর প্রেম গাঢ় হইয়াছে; সরযূ নিজ কুলকলঙ্কের কথা সর্ব্বদা হৃদয়ে ঢাকিয়া রাখিয়া স্বামীর প্রতি ভালবাসা বাহিরে দেখাইতে ভয় পাইয়াছে। তাহার তাসের ঘর কখন ভাঙ্গিয়া যায়, সে ভয় তাহার সর্ব্বদা ছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথের সরল, অকপট প্রেম সরযূকে যথাসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া তাহাকে যেন বুকে করিয়া রাখিয়াছিল। যখন একটা বিকট সত্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়িয়া গেল, তখন এই অবস্থায় সংসারে যতটা তোলপাড় হইবার কথা, ততটা হইল। নানা বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া চন্দ্রনাথ সরযূকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বাহিরে যাহাকে ত্যাগ করিয়া কাশী পাঠাইয়া দিলেন, হৃদয় তাহার জন্য অবিরত কাঁদিতে লাগিল; তিনি কেমন করিয়া বিরহী যক্ষের মত চারি বৎসর ব্যথায় কাটাইয়াছিলেন, তাহা শরৎ বাবু সংযত কথায় জানাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ সরযূর জন্য বাহিরে শোক প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু অন্তরে পুড়িতেছিলেন। চারি বৎসর পরে একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সাহেবী পোষাকে কাশীর অলিগলি সন্ধান করিয়া চন্দ্রনাথ কৈলাস খুড়োর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সরযূ অসহ্য মনঃকষ্টে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। দাসীর মুখে শুনিল, তাহার ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাহিরের ঘরে এক সাহেব পায়চারি করিতেছে। রান্না ফেলিয়া সরযূ যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভাব কি হইল, তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে। চন্দ্রনাথ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া আসিয়াছিলেন, প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিলেন;—আর সরযূর পক্ষে সে মিলন অপ্রত্যাশিত আনন্দের ও দুঃখের উৎস। কিন্তু সরযূর এক ফোঁটা চোখের জল কেহ দেখিল না। সে স্বামীকে প্রণাম করিয়া বাড়ীর সকল খবর জিজ্ঞাসা করিল। উপন্যাসকার লিখিয়াছেন, সরযূ রাঁধিল, বাড়িল, স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল, যেন—পূর্ব্বে স্বামী বাড়ী আসিলে যেরূপ হইত, এ তেমনই হইয়াছে; এত বড় ব্যাপার যে মধ্যে ঘটিয়াছে—তাহা কিছুই বোঝা গেল না; কেবল চন্দ্রনাথের আসিতে সেদিন যেন একটু দেরি হইয়াছে এই মাত্র। এই শেষের কথার মূল্য অনেক। ইহাতে লেখকের অসামান্য সাহিত্যিক-বুদ্ধি ও মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম-জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। কি প্রাণান্ত চেষ্টায় সরযূ তাহার চিত্ত-সংযম রক্ষা করিয়াছিল, তাহা এই একটি ছত্রে প্রমাণিত হইতেছে; সংযমের বাঁধ একটু ভাঙ্গিয়া চিত্তের উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা মুহূর্ত্তের জন্য উছলিয়া পড়িতেছিল, এই ছত্রটি তাহাই বুঝাইতেছে। ঐ দেখ আঘাতে-আঘাতে সে বাঁধ ধীরে-ধীরে টুটিয়া যাইতেছে। চাবি ফিরাইয়া দিবার উপলক্ষে সরযূ জানিতে চাহিল, নূতন বউকে চাবি দেওয়া হয় নাই কেন। সরযূ ভাবিতেছিল, চন্দ্রনাথ আর এক বিবাহ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরতম দেশে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ছিল,—তিনি হয় ত বিবাহ করেন নাই। চন্দ্রনাথ ঠাট্টা করিয়া বলিল,

"তাহাকেই দিয়াছি।" এই ঠাট্টা সরযূর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইল; সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহার মূর্চ্ছার কারণ বুঝিতে পারেন নাই; সংযত-বাক্ সরযূ এ পর্য্যন্ত তাহার চিত্তের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া আসিয়াছিল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর যখন চন্দ্রনাথ বলিল, "আমার এক স্ত্রী সে, পুরাতন হইয়াও আমার চক্ষে নিত্যই নূতন!!" এই কথায় সরযূ হাতে স্বর্গ পাইল; স্বামী তাহাকে লইয়া আর ঘর করিবেন না, তথাপি তিনি আর বিবাহ করেন নাই, এই কৃতজ্ঞতায় সরযূর চিত্ত ভরপুর হইয়া গেল। তাহার পর চন্দ্রনাথ আহার করিতে বসিয়াছেন। দু'প্রহরের সময়ে পাতে একরাশ লুচি দেখিয়া চন্দ্রনাথ সরযূকে অনুযোগ দিলেন; দিনের বেলায় যে তিনি লুচি খান না, ইহা কি সরযূ ভুলিয়া গিয়াছে? সরযূ কিছু না বলিয়া চক্ষের এক বিন্দু অশ্রু সামলাইয়া লইয়া ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি আমার হাতে খাইবে?" এই ব্যাপারে চন্দ্রনাথ আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না; বলিলেন, "সরযূ, দু'পুরবেলা আমার চক্ষে জল না দেখিলে কি তোমার তৃপ্তি হইবে না?" তখন সরযূ ভাত আনিয়া দিতেছে। বহু দুঃখ সহিয়া সে সংযমের বাঁধ রাখিয়াছিল, কিন্তু অতি সুখে আর পারিল না। সে উচ্ছিষ্ট থালা হাতে করিয়া ভাল করিয়া কাঁদিবার জন্য রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। শরতের রাত্রিতে যেরূপ ফুলের পাপড়ির উপর ধীরে-ধীরে নীহার-বিন্দু জমিয়া উঠে, এই মিলন-চিত্রে সেইরূপ করুণরস ক্রমে-ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের কোন স্থানে এ ভাবের সংক্ষিপ্ত রচনায় করুণ-রসের এরূপ অপর্য্যাপ্ত, মুক্ত পরিচয় আর পাই নাই।

গ্রন্থকারের আর একটি গুণ—নানা বিরুদ্ধভাবাপন্ন চরিত্রের সৃষ্টি। মানুষ যে কত প্রকারের বিরুদ্ধ অবস্থা-চক্রে পরস্পর-বিরোধী মনোভাব লইয়া কাজ করিতে পারে, তাহা শুধু "পল্লী-সমাজে"র রমার নহে, "পণ্ডিত মশাই" গল্পে কুসুম চরিত্রেও বিশেষ রূপ দেখা যাইতেছে। রমা যাহার ভালবাসার জোরে প্রাণ ধারণ করিতেছিল, তাহার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া তাহাকেই জেলে পাঠাইল, এইরূপ অসম্ভব ঘটনা কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা পাঠকগণ "পল্লী-সমাজ" পড়িয়া বুঝিবেন। এরূপ অবস্থা-সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া নিগূঢ় মনস্তত্ত্বের আভাস দিতে শরৎবাবু সিদ্ধহস্ত। রমার চরিত্র দুর্ব্বোধ প্রহেলিকা বা অস্বাভাবিক হয় নাই। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যই দেন, বা প্রিয় ব্যক্তিকে জেলেই পাঠান, তাঁহার হৃদয় বুঝিতে পাঠকের তিলার্দ্ধকালও বিলম্ব হয় না, এবং তাহা বুঝিয়া পাঠক কিছুতেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে পারেন না। "পণ্ডিত মশাই" গল্পের কুসুম যাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারিলে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতার্থতা লাভ করে, তাঁহারই মাতার দত্ত সোণার বালা ফেরৎ পাঠাইয়া তাহার হৃদয় নিষ্ঠুরভাবে ছিড়িয়া ফেলিতেছে—এই বিসদৃশ বিরুদ্ধ মনের ভাব ও বিচিত্র উপকরণের রাশি লইয়া শরৎ বাবুর প্রতিভা অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছে। তাঁহার "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী" শেষ হয় নাই; কিন্তু তাহার গোড়ায় যে অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির একের পর অপরের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কখনও নিঃসঙ্গ গহনে, খরস্রোতা নদীর মুখে, বিদ্যুৎ, মেঘ ও গোক্ষুর সর্পের সহযোগে ভয়াবহ হইয়াছে, কোথাও বা ইন্দ্রের "রাম"-নামের উপর অগাধ বিশ্বাস ও বিপদে ভ্রূক্ষেপহীন বীরত্বে, অত্যুজ্জ্বল কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

পুস্তকখানি শেষ হয় নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা আর মন্তব্য প্রকাশ করিব না। আমি শরৎবাবুর সকল বই পড়ি নাই; যাহা পড়িয়াছি, তাহা লইয়া এই সামান্য প্রবন্ধ লিখিলাম।

শরৎবাবুর "চরিত্রহীন" উপন্যাসের খসড়া অনেকটা পড়িয়াছি, সমস্তটা পড়িবার সুযোগ হয় নাই; বোধ হয়, লেখাই হয় নাই; কিন্তু যতটা পড়িয়াছি, তাহাতে সাবিত্রীর মত চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব নূতন নক্সা বলিয়া মনে হইয়াছে। সাবিত্রী ভদ্রলোকের মেয়ে হইয়াও গ্রহবৈগুণ্যে পতিতার ন্যায় সমাজে নিগৃহীতা হইয়াছিল। তাহার বৃত্তান্ত শেষ পর্য্যন্ত জানি না; কিন্তু সে যে নিষ্কলঙ্কা, তাহা বুঝিতে বাকি নাই। তথাপি, লোকের চক্ষে যে সে কলঙ্কিতা, ইহা তাহার দুরদৃষ্টের ফল ছাড়া আর কি বলা যায়! কিন্তু সে যাহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিল, তাহাকে তাহার নিজের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যের ফলে কলঙ্কের আওতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সে যেরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিল, তদ্রূপভাবে ত্যাগ-স্বীকার করিতে কে কবে পারিয়াছে? যখনই তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী

সতীশ কোমলভাব লইয়া তাহাকে পূজা করিতে আসিয়াছে, সে তখনই নিজেকে এতটা হেয় করিয়া দেখাইয়াছে, ও এমনই তীক্ষ্ণ কথায় তাহাকে মর্ম্মন্তিক কষ্ট দিয়াছে যে, সে পূজার ফুল ফেলিয়া দিয়া হৃদয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সাবিত্রী তাহাই চায়। তাহার আরাধ্য দেবতা যে তাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া সামাজিক কলঙ্কের ভাগ লইবে, ইহা সে চাহে না; যাহাতে সে ঘৃণা করে, সে তাহাই চায়। এই ত্যাগই প্রকৃত প্রেম। যাহাকে লাভ করিলে সে স্বর্গের কিন্নরী কি দেবী হইতেও চাহিত না, তাহার সঙ্গে মিলনের পথে সে নিজের হাতে রচিত কাঁটার বেড়া দিয়া মনে-মনে তৃপ্তিলাভ করিতেছে; প্রণয়ীর মনে এইরূপে ঘৃণা জাগাইয়া সে দুঃখে পুড়িয়া মরিতেছে; সে নিজে সমস্ত সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, প্রিয়সঙ্গ হইতে নিজেকে ঠেকাইয়া রাখিতেছে। প্রণয়ীর সঙ্গলাভ করিয়া, কিম্বা শুধু সেই সঙ্গসুখের আশায় রমণীরা অনেকই সহিতে পারেন; কিন্তু পাছে কোনরূপ লোকগ্লানির নিঃশ্বাস তাহার প্রণয়ীর গায়ে লাগে, এই আশঙ্কায় কে কবে সাধ করিয়া সাবিত্রীর মত সর্ব্বত্যাগিনী, তপস্বিনী সাজিয়াছে? এই ত্যাগের ফলে তাহার জীবনের ফুল্ল আশা-কুসুমগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, এবং সে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইতেছে। সাবিত্রী-চরিত্রে ভোগের স্পৃহা নাই; প্রেমিককে ত্যাগ করিয়া সাবিত্রী প্রেমের মহিমা অতুলনীয় করিয়া দেখাইতেছে। এই প্রেমে অপর কোন সাধ নাই, সুখ নাই, প্রিয়ের শ্রেয়ঃই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। ইহা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সকল দুঃখ বুক পাতিয়া লয়। যিনি আরাধ্য, তাঁহাকে নির্ম্মল ও সর্ব্ব আপদের বাহিরে রাখিবার জন্য পাইয়াও তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এই প্রেম চিত্তের গুপ্ত-বৃন্দাবনের আরাধনা; ইহা বাসনার চিতানলে সতী-দাহ। এই প্রেম ভোগবতী গঙ্গা। ইহা, যিনি হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পারেন, তিনি বুঝিবেন। যে মুহূর্ত্তে প্রণয়ী আসিয়া নিজে ধরা দিতে চাহিতেছে, সে সময়ে কেন সাবিত্রী নিজের মুখে নিজে কালি মাখিয়া সতীশকে বিমুখ, ক্রুদ্ধ, এমন কি, অনুতপ্ত করিতেছে; কখনও বা সন্দিগ্ধ সতীশের মস্তকের সমস্ত উৎকট সিদ্ধান্তগুলিতে মৃদুস্বরে সায় দিয়া, ইচ্ছা করিয়া কেন সে সতীশের হৃদয়ে আঁকা নিজের উজ্জ্বল ছবি মলিন করিয়া ফেলিতেছে,—সেই গূঢ় তত্ত্ব হয় ত সাধারণ পাঠকের চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে। সাবিত্রী চরিত্রের নিগূঢ় আত্ম-ত্যাগ, নিজেকে লাঞ্ছিত করিয়া প্রণয়ীকে পবিত্রতা-দান, যাঁহার নিকট মান-রক্ষা করাই স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয়, তাঁহার নিকট সাধ করিয়া নিজেকে অপমানিত করা—ছোট করিয়া, হেয় ও ঘৃণ্য করিয়া আঁকা,—ইহা কত বড় প্রেমের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। এই অসামান্য আত্মসংবরণের ক্ষমতা সাধারণ নায়িকায় বিরল। সাবিত্রী আয়েসার ন্যায় প্রেমের জ্বলন্ত বক্তৃতা করে নাই, কুন্দ-নন্দিনীর ন্যায় নিজে নিরীহ হইয়াও সরলতার দ্বারা প্রিয়ের সংসার পোড়াইয়া ছারখার করে নাই; বিনোদিনীর মত প্রেমের উদ্দাম ও অন্তরলীলা দেখায় নাই, এমন কি শরৎ বাবুর নিজের অঙ্কিত কুসুমের ন্যায় আত্মাভিমানের দ্বারা প্রেমকে ঠেকাইয়া রাখে নাই; কিন্তু আশ্চর্য্য আত্মসংবরণ-শক্তি তাহাকে অতুলনীয় গৌরবশ্রী দান করিয়াছে। চণ্ডী-দাসের আত্মনিবেদনের কথায় তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝান যাইতে পারে—"আমি নিজ সুখ-দুখ কিছু না জানি, তোমার কুশলে কুশল মানি।"

উপসংহারে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে নববলদৃপ্ত, অসামান্য প্রতিভাশালী এই লেখকের অভ্যুত্থানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বাঙ্গালায় আধুনিক লেখকগণের মধ্যে বাৎসল্য-রস এ পর্য্যন্ত কেহ প্রচুররূপে দান করেন নাই, সকলেই দাম্পত্য ও স্বাধীন প্রেমের দীপশিখা লইয়া সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। একমাত্র রবিবাবুর 'ছুটি' গল্প ছাড়া রসটির উপাদেয় নিদর্শন আধুনিক সাহিত্যে বিরল ছিল। শরৎবাবু এই রস অপর্য্যাপ্তরূপে ঢালিয়া দিয়া বঙ্গদেশের ঘরে-ঘরে অমৃত বহাইয়া দিয়াছেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কবিচন্দ্র

[শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

এমন এক দিন গিয়াছে, যখন বঙ্গের প্রায় ব্রাহ্মণ-পল্লীতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর কল্যাণে সাধারণ ব্রাহ্মণগণমাত্রেই কিছু-না-কিছু সংস্কৃত আলোচনা করিতে পাইতেন। অবশ্য, এ কথা স্থির যে, সকলেই কিছু কৃতবিদ্য হইতেন না; কিন্তু প্রত্যেক বিদ্যার্থীই বাণীর অর্চ্চনা করিতে বিমুখ ছিলেন না। যাঁহার প্রকৃত কবিত্বশক্তি থাকিত না, তিনি জোড়া-তাড়া দিয়া অতি কটমট কবিতাও প্রস্তুত করা অভ্যাস করিতেন; অন্ততঃ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির নিমন্ত্রণ পত্রটা কবিতাতেই লিপিবদ্ধ করিতেন।

যাঁহার ভাগ্যে বাণীর কৃপালাভ হইত, তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেশময় রাষ্ট্র হইত। এইরূপ একজন সংস্কৃত-অধ্যায়ী, না-পণ্ডিত, না-অপণ্ডিত-প্রকৃতির স্বভাব-কবির নাম এক সময় যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ঘোষিত হইত। ইঁহার প্রকৃত নাম অদ্যাপি শ্রুত হই নাই। সাধারণতঃ ইনি "কবিচন্দ্র" নামে পরিচিত। অদ্য এই কবির কবিত্বালোচনা সহ ইঁহার জীবনী যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই "ভারতবর্ষের" পাঠক-পাঠিকার নিকট বিবৃত করিব।

যশোহর জেলার প্রসন্ন-সলিলা নবগঙ্গা-তীরে মাগুরা উপবিভাগের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-প্রধান বারুইখালি গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময়ে বৈদিক-ব্রাহ্মণবংশে "কবিচন্দ্র" জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বহুদিন অপুত্রক থাকিয়া পরিশেষে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় একমাত্র পুত্র কবিচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জনশ্রুতিতে প্রকাশ যে, সন্ন্যাসীর আদেশেই ইঁহার কবিচন্দ্র নামকরণ হয়। এই কবির বিস্তৃত জীবনী জানিবার জন্ম বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু জানিতে পারি নাই। মাত্র বিশৃঙ্খল, অসংবদ্ধ কবিতা, আর বসতিস্থানের পরিচয় এবং দুইটি পুত্রের নাম ভিন্ন অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশবাসী কবিতাপ্রিয় স্বদেশ-গৌরবপ্রিয় ব্যক্তিগণ কবিচন্দ্রের বাস-ভবন লইয়া নানা কথা বলিয়া থাকেন। প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধানের সময় একজন বিক্রমপুরবাসী পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, কবিচন্দ্র পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী; আবার নবদ্বীপবাসী একজন পণ্ডিত বলেন, কবিচন্দ্র নবদ্বীপের লোক। আমরা কিন্তু স্থির জানি যে, এই কবি যশোহরের মাগুরা মহকুমার বারুইখালির অধিবাসী। কেন না কবিতা বলিতেছে,—

"বারুইখালি গ্রামে বাস
নাহি গোরু হাল চাস
কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তর নোমাঞ্জার
তাহাতে নাহিক ভাব্য,
ভুঁইগুলি ভরা হাস্ত
হলে শস্য বারো ভুতে লুটে খায়।
ইত্যাদি।

এই গ্রাম নবগঙ্গার তীরে। আবার ইহার নিকটে কুঠিয়াল উইলিয়ম সেভি সাহেবের নীলকুঠি আছে। কবিচন্দ্রের কবিতায় তাহার প্রকাশ আছে। ইত্যাদি কারণে আমরা ইহাকে যশোহরবাসী বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।

একদিন কবি তৎকালের নব-নির্ম্মিত কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হইয়া কলিকাতার বর্ণনা করিয়া মামুদসাহীর রাজা শশিভূষণকে শুনাইয়াছিলেন; যথা—

"কোম্পানী জগদীশ্বরী।
করুণয়া ধন্বাবতারা কলৌ।
ধন্বাস্তে পরিপালয়ন্তি সকলানিংরাজ ভূপালকাঃ
তেষা মাতনুতেহখিলং নিরুপমা কীর্ত্তির্বিচিত্রাশ্রয়া
কিং ব্রতমস্ত গুণংগুণেঃ সুবসাগা দেব নরা—শত্রবঃ,
যত্রশ্রী নিমু মল্লিকাদি ধনিনো লজ্জাবতী স্বর্গভূঃ
ইস্তক চিৎপুর বরাবর কহি কিছু মহিমা দক্ষিণে—টালিগঞ্জঃ
স্থানে স্থানে কুকেশা তরুণ রুচিকরা সুরকি-বান্ধা—সুরাস্তা।
কেচিৎগচ্ছন্তিরঙ্গৈঃ রবিকিরণ সমৈর্ভূমি পাদৈশ কৈচিৎ
কেচিৎ গাড়িসঘোড়া, খট্‌মট্ নিনাদৈ র্ঘর্ঘরি ঘোরনাদৈঃ।
গালপাট্টা চুলপিযুক্তৈঃ সুকনকবলয়া
শালদোশালা কৈর্ব্বা জামাযোড়া বিনামা
স্বশিরশি সুগরম পেচি পাগড়ি বিলিটৈঃ।
বিবি সাহেব গোরা কতিকতি নিস্তয়া কুঞ্জ জামা ফুটোপেঃ
নষ্টা বেশ্যা সুকেশা গলিগলি গলিষু ত্যক্তালজ্জা ভ্রমন্তি।
রম্যা দোকান সজ্জা লুচিসরপুরিয়া শুভ্র সন্দেশপূর্ণা,
কলিকাতা তুল্য রম্যং নহি খলু জগতি স্থানমেবাস্তি কিঞ্চিৎ।

এইরূপ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

কবিচন্দ্রের কবিতা আমরা আর সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যাহা করিয়াছি, তাহা প্রায়ই বাঙ্গলা, সংস্কৃত আর হিন্দি মিশ্রিত।

কোন সময় কবি খলিসাখালি নামে কোন গ্রামে নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে

গিয়া আতিথ্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই খলিসাখালি গ্রাম কিন্তু বর্ত্তমানে অচিহ্নিত। কেন না এই নামে দক্ষিণবঙ্গে ৩.৪টী গ্রাম আছে। তাহার মধ্যে বর্ত্তমান যশোহরের গ্রাম দুইটি কৃষিপল্লী—আর খুলনা জেলার সাতক্ষীরা উপবিভাগের খলিসাখালি ভদ্রপল্লী। প্রসিদ্ধ যাত্রা-গীতের অধিপতি ইন্দুবাবু এই গ্রামের অধিবাসী। বোধ হয় কবি-চন্দ্রের বর্ণিত খলিসাখালি এই গ্রাম। ইহার বর্ত্তমান অবস্থান এবং মূর্ত্তি দেখিলে অনুমান হয় যে, কবিচন্দ্রের এই গ্রামের বর্ণনা ঠিকই। তিনি বলিয়াছিলেন—

(১) "নব নল নির্ম্মিত দরমা-শয্যা
(২) ভর্ত্তুরি জীবতি বিধবা ভার্য্যা
(৫) পরিমিততুম্বিফল জলপাত্রং
(৬) মশক নিবারণ করযুগ মাত্রং
(৩) তৈলাভাবে পিঙ্গলকেশা
(৪) দ্বিজবর-রমণী শফরি-বেশা।
(৭) ভেক জলৌকা মূষিক ব্যালি
(৮) বিধিনা নির্ম্মিত খলিসাখালি।"

আবার তথায় আহার্য্য দ্রব্যের সহিত সামান্যমাত্র তৈল পাইয়া বলিয়াছিলেন—

"তৈলং মুস্কভি সম্যক—ভালকরে ভেজে না
কিংপূর্ণ হস্তপাদৌ: ;
লজ্জাযুক্তা পুমাংসা যদি কিছু দিতে চায়—
তত্র বৈরি মাগিরা।"

একদিন কবিচন্দ্র তাঁহার বাসভবনের পূর্ব্বাংশেস্থিত বালুটিয়া গ্রামের রাজা সীতারাম রায়ের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ যদুনাথ মজুমদারের উত্তরাধিকারীর নিকট শীতঋতুতে গিয়া বলিলেন—

"শীতে নাহং কুচুড়ি-মুচুড়ি
মাঘ মাসস্য রাত্রৌ,
বস্ত্রাভাবে বাপুরে-বাপুরে কম্পতে সর্ব্বগাত্রং,
তস্মাত্রজন সভায়ং দীয়তাং বসনমে
দেশে দেশে নগরে নগরে তোর কীর্ত্তি
মুই ফিরাইমু রে।

নড়াইল জমীদার-বংশের সুপ্রসিদ্ধ চাকলা কাছারির দ্বারপণ্ডিত প্রসন্ন তর্করত্নের নিকট শুনিয়াছি যে, কবিচন্দ্র তাঁহার জন্মভূমির সংলগ্ন "ধনহরা" গ্রামে সত্যনারায়ণের নিমন্ত্রণে গিয়া গৃহে আসিয়া স্ত্রীর ব্যবহারে বলিয়াছিলেন—

"শ্রুত্বাগ্রামান্তরে হং ভাল পাকা শির্ণী সত্যনারায়ণস্য
রাত্রৌতীব্রান্ধকারে চখে কিছু দেখিনে ঘাগুতা খাই কপালে।
গত্বাতত্র গ্রামে পাইলাম আটখানি বাতসার শেষে
ভুক্ত্বাথেদাম্বিতোহং ফিরে এলেম ঘরেতে বউ বলে—কি"লারে"।

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণের গৃহিণীরা যে অধিক তেজ-গর্ব্বিনী হন, তাহা কবিচন্দ্রের এই কবিতায় আমরা সুন্দর অনুমান করিতে পারি না কি?—যাহা হউক, কবি অর্থের আশায় নলডাঙ্গার রাজসমীপে উপস্থিত হইলে কৌতুকপ্রিয় রাজা তাঁহাকে বৃদ্ধ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি আর এরূপ কষ্ট ভোগ করিবেন না"—তাহাতে উপস্থিত-কবি কবিচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"গতেরর্দ্ধস্ততরর্দ্ধং রত্তেরর্দ্ধার্দ্ধকার্দ্ধকং
দৈগুণ্যং কবিচন্দ্রস্য ধনাশা জীবনাশয়ো:"

এই সময় রাজা বাহাদুর না কি বলিয়াছিলেন যে, "আপনি এত বড় কবি, আপনার আবার অর্থাভাব কি?" কবিচন্দ্র উত্তর করিলেন—

চন্দ্র: পদ্মাপ্রিয়াঽস্তি সপত্নীসেবক: কবি:।
ইতি পদ্মালয়ারোষাৎ কবিচন্দ্রংনপশ্যতে।"

এই কবির কবিত্ব প্রভা দেশে এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, নিম্ন-শ্রেণীর লোকে পর্য্যন্ত তাঁহাকে "কবি" বলিয়া যথেষ্ট সম্মান করিত। একদিন তাঁহার গৃহে চোর গিয়া উপস্থিত। সেকালের ব্রাহ্মণ-গৃহে আলমারি বা সিন্ধুক-বাক্স ছিল না ;—দ্রব্যাদি বংশনির্ম্মিত "মাচার" উপরে সজ্জিত থাকিত। চোর গৃহে গিয়া মাচার উপর উঠিয়া ঘটি-বাটি থালা নাড়াচাড়া করিতেছে ;—কবিচন্দ্র আর তাঁহার দুই পুত্র সেই গৃহে নিদ্রিত আছেন। পিত্তল-কাঁসার শব্দে কবিচন্দ্র বলিতেছেন—

ঘণ্টা ঘটি আর বাটি—
ত্রিপদী ছোট ঘটি গাড়ু ডাবর ঝারি
হা কেশা মহেশা নিল-নিল নিলয়ে
হাচোরে হাচোরেরে।

মহেশ ন্যায়ালঙ্কার আর কেশবলাল কবিচন্দ্রের দুই পুত্র। চোর কবিতা শুনিয়া ভয়ে-ভক্তিতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

ইঁহার কবি-প্রতিভা দীপ্তিমতী হইলে চাউলিয়া কুঠির মালিক উইলিয়ম সেভী একদিন কবিচন্দ্রকে বলিলেন—"পণ্ডিত, তুমি না কি ভাল কবিতা প্রস্তুত করিতে পার? আমার নামে একটী কর দেখি।" কবিচন্দ্র কহিলেন…"না হুজুর, আমি তাহা করিব না ; তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার ক্রোধ আসিবে।" সাহেব জেদ ধরিলেন—"না করিতেই হইবে।" তখন অগত্যা কবিচন্দ্র কহিলেন—'

"ইহজগতিকর্ত্তা কুঠ্যাল—শমনপ্রায় উগ্রাঠ্যাল
যোজন দাদন লয়তিচ কুঠ্যাং ইহজন্মানি তৎ বহু লটখট্যাং
যস্যভূমৌ নভবতিনীলং কর্ণে মলটে পৃষ্ঠে কিলং।

কোন এক সময় সাতক্ষীরার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী প্রাণনাথ বাবু কবিচন্দ্রকে কহিলেন—"আচ্ছা কবিচন্দ্র, রাজকন্যা সতী ভুতুড়ে শিবের স্ত্রী হইল—ইহা লইয়া তুমি দক্ষ-প্রজাপতির উক্তি একটী শ্লোক এখনি যদি বলিতে পার, তবে আমি তোমায় বিদায় দিব, নতুবা কিন্তু নহে।" উপস্থিত-কবি কবিচন্দ্র তখন বলিলেন—

ব্যাঘ্রম্যাজিন বস্ত্রমস্ত উচ্ছিকি হাউলি শ্মশানে বটে
ভেযাংভস্ম সদা ধরে একি দশা আদমিকা এয়েছো ঘটে

বৃন্দাবনস্থ পীঠে উঠি হর—ঘড়ি তামাম মুলুক ফেরে
এবস্তুতমনপীরে মম সুতা গৌরি দেনা থুক্ মেরে।

আবার এক সময় নলদী পরগণার দুইজন চতুর বৈষয়িক ব্যক্তি বারুইখালি গ্রামের কতকটা জমি অধিকার করিয়াছিল। তাহাতে কবিচন্দ্রের পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর জমি কিছু অপহৃত হয়। এই-জন্ত কবিচন্দ্র কহিলেন—

আদৌ মৃত্যুঞ্জয় গোলোক বাবু নলদিনিবাসি তারা
দুয়োর + + + বেটা কলিযুগে ব্রহ্মোত্তর ভূমি-হরা।

তৎকালের যশোহর বড় অপকৃষ্ট স্থান ছিল। কবিচন্দ্র বলিতেছেন—

যশোহরে কিমাশ্চর্য্য!
প্রাণদা যমদূতিকা
ভোজনং যত্র তত্র
শয়নং হট্টমন্দিরে। ইত্যাদি

আতিথ্যে অতৃপ্ত হইয়া কোন স্থানের উপর চটিয়া কবি যাহা বলিয়াছিলেন—তাহাতে যশোহরের প্রসিদ্ধ দ্রব্য কচুর পরিচয় আছে। যথা—

কচুর ঝালং কচুর ঝোলং কেবলং কচুরাম্লং
ভোজন কচুপাত্রেন মুখ শুদ্ধি কচু কচুঃ।

এই কবি যে কেবল এইরূপ হাস্যরসপ্রধান কবিতাই লিখিতেন, তাহা নহে। ইঁহার লিখিত কবিতা সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারিলে বৃহৎ একখানি কবিতা-পুস্তক হয়; কিন্তু অনুসন্ধানে কোথাও লিখিত ভাবে এই কবির কবিতা পাই নাই। লোকের মুখে মুখে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, ইঁহার উৎকৃষ্ট ভক্তি প্রকাশক আধ্যাত্মিক কবিতাও আছে। যশোহর ইতনা গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র তর্করত্নের নিকট কবিচন্দ্রের উৎকৃষ্ট একটী আধ্যাত্মিক কবিতা যাহা পাইয়াছি, তাহা এই,—

মনে করি মহেশ্বরী চরণ চারু সেবা করি
হরিস্মরণ পূর্ব্বক সুরধুনী তীরে মরি।
স্থিতি সুরধুনী তটে ইহন্ত বাঞ্ছা বটে
অদৃষ্ট বশতো ঘটে ভ্রমণ মাত্র গোহালটে।"

ইত্যাদি প্রকারের [illegible] কবিতা এই কবির প্রণীত বলিয়া মধ্যবঙ্গে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শুনা যায়, কবিচন্দ্র ধনী লোকের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াও তাঁহাদের গুপ্ত-রহস্য কবিতায় প্রকাশ করিতে বিমুখ ছিলেন না। এইরূপ দুই-চারিটী কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি—কিন্তু শিষ্টতা-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিলাম না।

দুগ্ধজাতখাদ্য

ছানা

শ্রীবিপিনবিহারী সেন

দুগ্ধ উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইয়া উত্তপ্ত অবস্থায় উহার মধ্যে পুরাতন ছানার জল অল্প-অল্প করিয়া দিতে থাকিলে উহার পনিরময় অংশ চাপ বাঁধিয়া পৃথক হইয়া পড়ে। তখন উহা একখানি কাপড়ে বাঁধিয়া কিছু সময় ঝুলাইয়া রাখিয়া, উহার জল নির্গত হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ছানা বলে। ইহাকে রাসায়নিক ভাষায় "ক্যালসিয়ম কেসিনেট" বলা যায় এবং যে হরিদ্রাভ জল নির্গত হইয়া যায়, তাহাকে ছানার জল বা ছোয়ে (whey) বলে। ঐ জল তাহার পরদিবস ছানা প্রস্তুত করিবার সময় বীজস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপ জ্বাল দেওয়া খাঁটি দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ছানা কোমল এবং সুস্বাদু। ইহার মধ্যে দুগ্ধের প্রায় সমুদায় উপাদানই ন্যূনাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। একশত ভাগ ছানার মধ্যে

২২·৩৩ ভাগ কেসিন বা পনিরময় পদার্থ
১৮·৬৪ ভাগ মেদময় পদার্থ বা মাখন
১·৬৩ ভাগ লবণময় উপাদান
·৩৮ ভাগ দুগ্ধ শর্করা এবং
৫৭·০২ ভাগ জল প্রাপ্ত হওয়া যায়।
১০০·০০

ছানা গুরুপাক এবং মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর এবং শক্তি-সংস্থাপক। ইহাতে শর্করার পরিমাণ অতি সামান্য; এই নিমিত্ত বহুমূত্র রোগে ছানা পথ্যরূপে নিরাপদে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফট্‌কিরি, টারটারিক এসিড নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি পদার্থ এবং তেঁতুলের জল দ্বারাও দুগ্ধ হইতে ছানা অধঃক্ষিপ্ত (precihitate) করা যাইতে পারে। একই দুগ্ধ হইতে ছানা এবং মাখন উভয়ই প্রস্তুত হইতে পারে। এই উপায়ে ব্যবসায়ী-গণ অধিকতর লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু এই সকল ছানার মধ্যে মাখনের অংশ না থাকায় বা নিতান্ত কম থাকায় উহা অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং পূর্ব্বোক্ত ছানার ন্যায় সুস্বাদু নহে। কাঁচা দুগ্ধ কিছু সময় রাখিয়া দিলে উহার মেদ কণিকাগুলি উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন উহা মন্থন করিয়া অতি সহজেই উহার মেদময় অংশ তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ মাখনতোলা দুগ্ধের মধ্যে শতকরা

৩·১১ ভাগ অন্নসার
·৭৫ ভাগ মেদময় পদার্থ বা মাখন
·৭৪ ভাগ লবণময় উপাদান
৪·৭৪ ভাগ দুগ্ধ-শর্করা ও
৯০·৬৬ ভাগ জল থাকে।
১০০·০০

সুতরাং ইহা অনেকটা সদ্য ঘোলের ন্যায় সারবান। মাখন-তোলা দুগ্ধ উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া লইয়া উহাতে পুরাতন ছানার জল অথবা অন্য যে কোন প্রকার বীজ দিয়া ছানা কাটান যাইতে পারে। অথবা উত্তমরূপে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত করিয়া, মন্থন-যন্ত্র সাহায্যে উহার মাখন তুলিয়া লইলে যে ঘোল অবশিষ্ট থাকে, তাহা মৃদু জ্বালে চড়াইয়া দিলে উহার মধ্যস্থিত ছানা অধঃক্ষিপ্ত হয়। উহা

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জল শূন্য করিয়া লইয়া সোডার জলে ধৌত করিয়া পুনরায় পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়, নতুবা শীঘ্র "টকিয়া" যায়। এইরূপে ছানা উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বায়ুশূন্য পাত্রে রাখিলে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিলে একটি বেশ লাভজনক ব্যবসায় হয়। কিন্তু একমাত্র বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর তিন চারি লক্ষ টাকার ছানা উৎপন্ন হইলেও ছানা এবং ছানা হইতে প্রস্তুত খাদ্যাদি বঙ্গদেশের বাহিরে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ছানা আমাদিগের একটি উপাদেয় খাদ্য। সামান্য পরিমাণে লবণ অথবা চিনির সহিত অন্নাদির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা গুরুপাক, কিন্তু মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর এবং শক্তি-সংস্থাপক। নিরামিষভোজিগণ ছানা দ্বারা পলান্ন, কালিয়া, দালনা, প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া রসনা তৃপ্তি করিয়া থাকেন। চিনির রস সহযোগে ইহা হইতে অমৃত-রসাবলী, সন্দেশ, মনোহরা, রসগোল্লা, পানতুয়া, গোলাপজাম, কালজাম, রসমুণ্ডি, লালমোহন, ক্ষীরমোহন, ছানাবড়া প্রভৃতি অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর মিষ্টান্ন সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছানার জল

ছানা তুলিয়া লইলে যে হরিদ্রাভ জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে আমরা ছানার জল বা whey বলি। অম্লরসাদি পদার্থ সংযোগে দুগ্ধের মধ্যে দ্রবীভূত ভাবে তরলাকারে অবস্থিত পনিরময় পদার্থ চাপ বাঁধিয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং দুগ্ধের মাখনের অংশও উহার সহিত বিজড়িত হইয়া থাকে; কিন্তু অবশিষ্ট দুগ্ধ-লাল (lacto albumin), দুগ্ধ-শর্করা (lactose) এবং লবণময় উপাদান সকল এই ছানার জলের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পনির এবং মাখনের অংশও যে একেবারে নাই এ কথা বলা চলে না; কিন্তু তাহাদের পরিমাণ এতই অল্প যে উহা ধর্ত্তব্য নহে। ছানার জলে শতকরা ৮১৯ অংশ পনির এবং ০·২৩ অংশ মাত্র মাখন থাকে; এই নিমিত্ত ইহা অতিশয় লঘুপাক। ইহা পাকস্থলীর প্রদাহ এবং ক্ষত, গ্যাসট্রিক্ জ্বর, অন্ত্র-প্রদাহ, অন্ত্র-ক্ষত, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি এবং অন্ত্রের পীড়া ঘটিত রোগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্য। এই সকল স্থানে ফটকিরি অথবা আদৌ টক না হইতে পারে এরূপ পরিমাণে পাতিনেবুর রস দিয়া ছানা কাটাইয়া উহা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লওয়া উচিত। আজকাল কেসিনের অভাব পূরণের নিমিত্ত কেহ-কেহ স্যানাটোজেন সহ ছানার জল পথ্যরূপে ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। স্যানাটোজেনের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে, ফটকিরি দ্বারা ছানা কাটান উচিত।

পনির

ছানা ও পনির উভয়ই একশ্রেণীর পদার্থ; উভয়েরই মধ্যেই পনিরময় পদার্থ এবং মাখনের পরিমাণ অধিক এবং দুগ্ধ-শর্করার অংশ সর্ব্বাপেক্ষা কম। উভয়ই গুরু পাক এবং মাংস অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। প্রভেদের মধ্যে এই যে, ছানার মধ্যস্থিত "অম্লসার চাপ বাঁধিলেও বিশুদ্ধ কেসিনে পরিণত হয় নাই; কিন্তু পনিরের মধ্যস্থিত অম্লসার উদ্ভিদাণু-বিশেষের সাহায্যে কেসিন বা পনিরে পরিণত হইয়াছে এবং পনির অপেক্ষা ছানার মধ্যে জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। সাধারণতঃ গো-মেষাদির পাকস্থলীজাত রেনেট নামক এক প্রকার পদার্থ অথবা Lad's bedstraw বা রেনেট নামক এক প্রকার অম্লরসবিশিষ্ট ঘাসের দ্বারা দুগ্ধ হইতে পনির প্রস্তুত হয়। কাঁচা দুগ্ধের মধ্যে রেনেট দিয়া কিছু সময় রাখিয়া দিলে উহা বসিয়া এক প্রকার দধির ন্যায় পদার্থে পরিণত হয়; উহা কাপড়ে বাঁধিয়া অথবা cheese press নামক যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া চাপ দিলে উহার জলীয়াংশ নির্গত হইয়া যায়, তখন মধ্যস্থিত জমাট-বাঁধা অংশ গোলাকার তাল পাকাইয়া "পাকিবার" জন্য কয়েক দিন রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে উহার মধ্যে নানাপ্রকার সুগন্ধি অম্লরস জন্মিতে থাকে। উহাই পনিরের সুগন্ধের কারণ। এই সমুদায় পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। সময়-সময় পনিরের মধ্যে tyrotoxicon "টাইরোটক্সিকন্" নামক এট্রোপিনের (atropine) ন্যায় বিষাক্ত একপ্রকার পদার্থ জন্মে। পনির পাকিবার সময় উহার মধ্যে নানাপ্রকার কীট জন্মে; ইহারাই পনিরের নীল, সবুজ, লাল প্রভৃতি বর্ণের কারণ; ইহাদের দ্বারাও আমাদের শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না। ইহাদের মধ্যে "চিজহপার" (Cheese-hopper) নামক এক প্রকার কীট আছে; তাহারা লম্ফ প্রদানের জন্য বিখ্যাত। পনিরের মধ্যে উহার তৃতীয়াংশ অম্লসার, তৃতীয়াংশ মাখন এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ জল। উহার মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণে ধাতব লবণ ও দুগ্ধ-শর্করা আছে। পনির মাংসের দ্বিগুণ পুষ্টিকর এবং তিনগুণ শক্তি-সংস্থাপক, কিন্তু অতিশয় গুরুপাক। অল্প পরিমাণে ক্ষার, লবণ অথবা সোডা মিশ্রিত করিয়া ভাত, রুটী প্রভৃতি পদার্থের সহিত উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে, অপেক্ষাকৃত সহজে জীর্ণ হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট বা হগ্ সাহেবের বাজার প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে পনির পাওয়া যায়।

শিখগুরুদিগের ইতিহাস

দ্বিতীয় গুরু "অঙ্গদ"

১৫০৪—১৫৫২

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরী]

"সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান্,
সংকল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।"—হেমচন্দ্র

ভারতবর্ষ বিবিধ ধর্ম্মের লীলা-নিকেতন। এখানে জগতের প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্মই প্রচারিত হইয়াছিল। এইখানেই ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার নির্ব্বাণমুক্তি-বিষয়ক ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। এই খানেই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা এবং সম্প্রদায়সমূহের সৃষ্টি হয়। ইহারই শ্যামল ক্ষেত্রে বাবা নানক শিখধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিষয়নিস্পৃহ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। সেই শিখ জাতিই এখন কালের অপরিহার্য্য প্রভাবে একটি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

অতীতের কাহিনী বড়ই মধুময়ী। অতীতের ইতিহাস পাঠ করিতে সকলেরই উৎসাহ ও আনন্দ হয়। শিখদিগের অতীত ইতিহাস নানা রহস্যজনক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সেই সকল ঘটনা সম্যক্‌রূপে বিদিত হইতে কাহার না কৌতূহল জন্মে? নানক যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, আত্মত্যাগই তাহার মূলমন্ত্র। সেই আত্মত্যাগই শিখদিগের জাতীয় জীবন সমুন্নত এবং অতিশয় গৌরবের বিষয়ীভূত করিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য, গুরুর জন্য, তাহারা আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ দেখাইয়াছে। এই গুণেই মুসলমানদিগের দ্বারা অতীব নৃশংসভাবে উৎপীড়িত হইয়াও তাহারা স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে। তাহা না হইলে, শিখজাতি বহুদিন পূর্ব্বেই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইত। গুরু নানকের পর আরও নয়জন গুরু শিখদিগের অধিনেতা হইয়াছিলেন। নানক অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণী শিষ্যকে গুরুর পদে নির্ব্বাচিত করার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার দুইটি পুত্রসন্তান ছিল, কিন্তু উভয়ের কেহই সেরূপ গুণান্বিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার প্রিয় শিষ্য অঙ্গদকে (লানা) গুরু নির্ব্বাচিত করিয়া যান।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি (অঙ্গদ) বিতস্তা নদীতীরবর্ত্তী একটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটীর নাম খাদুর। ইহা Gowindwalএর নিকটবর্ত্তী। অঙ্গদ জাতিতে ক্ষত্রী (তিহন) ছিলেন। লানা তাঁহার প্রকৃত নাম। অঙ্গদ নামটি গুরুদত্ত। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াই গুরুদেব তাঁহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। লানা অন্তরের সহিত গুরুকে ভক্তি করিতেন। তাঁহার ভক্তি উদ্দীপনাময়ী। তিনি গুরুর জন্য জগতে যাহা কিছু প্রিয় সমস্তই উৎসর্গ করিতে পারিতেন। গুরুর জন্য তিনি স্বীয় প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। তাঁহার গুরুভক্তি সম্বন্ধে একটি উক্তি আছে। একদিন শিষ্যমণ্ডলীপরিবৃত নানক পথিপার্শ্বে একটি গতপ্রাণ মনুষ্য দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "আমার উপর যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে এই মৃতদেহ ভক্ষণ কর।" এ আদেশ পালন করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হইলেন; এমন কি, তাঁহার পুত্রদ্বয়ও পশ্চাৎপদ হইলেন। কিন্তু লানা এই আদেশ পালন করিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি আহার করিতে যাইবেন, এমন সময় গুরু অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বলিলেন, "আমার আত্মা নিশ্চয়ই লানার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব আজ হইতে লানা ও আমি এক আত্মা।" তিনি সেই দিন হইতে লানাকে "অঙ্গিখুদ" বা "অঙ্গদ" (আমার আত্মা) নামে অভিহিত করিলেন। অঙ্গদ স্বীয় পরিশ্রমে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা স্বকীয় ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। নিজের জন্য শিষ্যদিগের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। নানকের বিষয় তিনি যাহা জানিতেন, এবং তৎসংক্রান্ত যে সমস্ত ঘটনা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, সমস্তই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি "বলসিন্ধু" নামক নানকের জনৈক সহচরের নিকট অধিক ঋণী। ইহা ছাড়া তিনি আদি-গ্রন্থে স্বয়ং বহু ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়া যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছিলেন। নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি কাংরার সন্নিকটবর্ত্তী "ঝাওলামুখী"তে অবস্থিত দেবীর উপাসনা করিতেন, এবং দেবীর আরাধনার্থ প্রতি বৎসর তথায় পদব্রজে গমন করিতেন। কিন্তু নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর, তিনি আর সেখানে যাইতেন না,—কায়মনোবাক্যে গুরুর পূজা করিতেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গুরুর সেবাই ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র উপায়। গুরুর সন্তুষ্টি-সম্পাদন ব্যতিরেকে মানুষের কখনই মুক্তি হইতে পারে না। এইজন্য তিনি গুরুকে আন্তরিক ভালবাসিতেন এবং ভক্তি করিতেন। এই আন্তরিক ভক্তির জন্যই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই গুরুর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন; এবং অবশেষে স্বয়ং গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। নানকের মৃত্যুর পর দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে, এবং বহুযত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, তিনি শিখধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার করিয়াছিলেন। শিখধর্ম্মের এই উন্নতি-বিধানের জন্য শিখগণ অনেকাংশে তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম ভিন্ন নানকের পর শিখ-ধর্ম্ম এত বিস্তৃত হইতে পারিত না। তিনি "ডেরা বাবা নানক" হইতে তাঁহার প্রধান আশ্রম-স্থান স্বগ্রাম "খাদুরে" স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ১৫৫২ খৃঃ অব্দে তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে একটি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ শিখদিগের গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর "খাদুরে"ই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

এ জগতে সমস্তই নশ্বর—কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। মানুষ কালসিন্ধুতে তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায়। তাই কবি গাহিয়াছিলেন :—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

যায় সকলই, থাকে কেবল গুণধর্ম্ম ও কীর্ত্তি। ধন জন্মান্তরহায়া; ধর্ম্ম একমাত্র সুহৃদ যে মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়। কীর্ত্তিমান ব্যক্তি মরিয়াও বাঁচিয়া থাকেন। গুরু অঙ্গদ বহুদিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম আজও অনন্ত ভাস্করবৎ প্রতি শিখহৃদয়ে উজ্জ্বল

রহিয়াছে। তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে আজও প্রতি শিখের মস্তক ভক্তিভরে নত হইয়া পড়ে।

—

উল ও উলীবস্ত্র।

[শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী]

অন্যান্য প্রকারের বস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যুক্তপ্রদেশে যে সকল বস্ত্র তৈয়ার হয়, তাহার প্রকার ভেদ বহু নহে। যদি কোন বস্ত্র বহু পরিমাণে তৈয়ার হয়, তাহা কেবলমাত্র কম্বল। মুজঃফরনগর এবং ব্যারাইচের কোন-কোন গ্রামে উত্তম কম্বল তৈয়ার হইয়া থাকে। সাত ফুট লম্বা চার ফুট চওড়া কম্বলের দাম এক টাকা। লুই নয় ফুট দীর্ঘ এবং ছয় ফিট প্রস্থ হইলে তিন টাকা হইতে চার টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। ১৪ ছটাক ওজনের কম্বলে ১০ আনা লাভ হয়। এই কম্বল একজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোকের দুইদিনব্যাপী পরিশ্রমের ফল।

পার্ব্বত্য-প্রদেশে উলনির্ম্মিত বস্তুর প্রকারভেদ যথেষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। "পশ্মিন ও "জুলমা" কম্বলজাতীয় গরম বস্ত্র। পাথা বা পাখু কিনারাবিশিষ্ট গরম কাপড়ের নাম। মোটা উলের আঁজি-কাটা কার্পেটের নাম "চেরা।" ইহার ১৫ বর্গ ফিটের দাম ২০ টাকা।

"ছু" ও "বলা" রমণীগণের বস্ত্র সুতরাং হাল্কা।

"চুটক" এক প্রকারের কার্পেট। ইহার নির্ম্মাণের বিশেষত্ব আছে। পড়েনের দুই বা তিনটা সুতার পর একটা মোটা এবং আলগা সুতা অন্তর্নিহিত করা হয়; পরে তাহাকে কাটি দ্বারা উপরে টানিয়া তানার সুতার মধ্যবর্ত্তী করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কতক-গুলি রন্ধ্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে—যাহার মধ্য দিয়া অন্য একটি কাটি প্রবিষ্ট করাইয়া রন্ধ্রগুলি সমান করিয়া ছুরি দ্বারা কাটা হয়। এক প্রকারের আট ফিট লম্বা এবং চার ফিট চওড়া কার্পেটের দাম ২০ হইতে ২৫ টাকা।

ভুটিয়াগণ চোগা নামক এক প্রকারের মোটা কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকে। ইহাতে বড়-বড় কোট তৈয়ার হয়। উল ও তুলার সংমিশ্রণে ধোসার জন্ম। ধোসাই গোরখপুরের বিশেষত্ব। ইহার তৈয়ারিতে তানায় ইংরাজি তুলাএবং পড়েনে উল ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে এক টাকা পাঁচ আনা খরচ পড়ে, কিন্তু দুই টাকায় বিক্রয় হয়। লভ্যাংশ ১১ আনা দুই বা তিন দিনের মেহনতের ফল।

যে সকল সহরে দেশী প্রক্রিয়ায় চিনি তৈয়ারি হয়, তথায় 'কাঁচা চিনি দাবাইবার জন্য মোটা উলের থলির বড়ই দরকার। বেরিলি এবং সাজাহানপুরে এই প্রকার থলির প্রভূত কারবার দৃষ্ট হয়।

আসন বা জায়নামাজ।

আসন এবং জায়নামাজের উদ্দেশ্য এক। ইহাতে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টদেবতার পূজা চলে। হিন্দুরা আসন বলে; মুসলমানেরা জায়নামাজ বলিয়া অভিহিত করে। আসন এবং জায়নামাজের পার্থক্য এই যে, শেষোক্তটীতে মসজিদের নক্সা অঙ্কিত এবং কোরাণের শ্লোক মুদ্রিত থাকে। আসন বা জায়নামাজ হয় নামদার মত ঠেসিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, নচেৎ কার্পেটের মত বুনা হইয়া থাকে। রাজ-পুতানা হইতে মথুরা বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী নগরে আসন বা নামদার বহু পরিমাণে আমদানী দৃষ্ট হয়।

শাল।

সংযুক্ত-প্রদেশের অনেক স্থানেই শালের ব্যবসা ছিল। কাশ্মিরী শালের আধিক্য এবং উৎকর্ষতাপ্রযুক্ত স্থানীয় শাল সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাপার এত দূর গড়াইয়াছিল যে, কাশ্মীরি শাল প্রদর্শনীতে আসিয়া য়ুরোপীয়ানদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে শালের ব্যবসা ফ্রান্স পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্রান্স এবং প্রুসিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সংঘটনে শাল ব্যবসা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কটলণ্ডে বিবাহের সময় কন্যাকে এক-খানি কাশ্মীরি শাল যৌতুক স্বরূপ দিতে হইত।

শাল-বুনা।

তাঁতে যখন তানা লাগান হয়, তখন নক্সানবিশ "তারাগুরু" এবং শিক্ষাগুরুকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন্ রঙ্গের কত গোছা সুতা লাগাইতে হইবে। নক্সানবিশ প্রথমে নমুনা লইয়া আইসে। তখন তারাগুরু নক্সা দেখিয়া রংএর নাম, সুতার সংখ্যা ও তাহা কোথা কোথা যাইবে, বলিয়া দেন। অতঃপর কারিগরেরা তোজী অর্থাৎ সূচ তৈয়ার করে। ইহাতে প্রায় ৪ গ্রেণ গেরুয়া রঙ্গিন সুতার গোছা লাগান হয়।

"তারাগুরুর" হুকুমমত তোজিকে সুতার গোছায় বিঁধিয়া দেওয়া হয়। কাপড়ের মুখ দক্ষিণ দিকের কাপড়ের জমীর দিকে থাকে। পশ্চাতে যেখানে সূচসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলে, সেখানে বয়ন-কার্য্য চলিতে থাকে। বয়নকালীন ৪০০ হইতে ১৬০০ শত সূচ শ্রেণিবদ্ধ হইয়া থাকে।

যখন গুরু দেখে যে একদিকের কাজ হইয়া গিয়াছে, তখন 'তুফতীন' অর্থাৎ পাঞ্জা সজোরে লাগান হয়।

একজন লোক কিনারা হইতে মাকু যতদূর যাইতে পারে, ততদূর নিক্ষেপ করে। মাকু অর্দ্ধদূর পর্য্যন্ত যায়। অপর ব্যক্তি মাকুকে ধরিয়া লইয়া পশ্চাতের দিকে নিক্ষেপ করে। এই প্রকারে শাল বুনা হয়।

শালের মহার্ঘতা "তুফতিন" অর্থাৎ পাঞ্জার সংখ্যার উপর নির্ভর করে। শালের মধ্যদেশকে "মতন" "কিনারা" অথবা পালু কহে। শালের বিভিন্নতা ঐ "মতনের" উপর নির্ভর করে।

যখন "মতন" সাদা হয়, তখন শালকে "থালী মতন" বলে। যদি চার রং-বিশিষ্ট হয় তবে "চার বযান", অথবা যে মতনে ফুল ইত্যাদি হয়, তাহাকে চাঁদ, এবং কোন ফুল হইলে "কুঞ্জ", অথবা যদি দুই দিকে বেল বুটা থাকে তবে "দো-রখা" কহে। শালের রং সাদা, কাল, গুলেনার (ঘোর লাল), কিরমিজি (লাল), উদা (বেগুনে), ফীরোজী, নীল, জঙ্গারী (সবুজ) এবং হলুদ বর্ণ হইয়া থাকে।

"রামপুরী" চাদর এক রকমের পাতলা শালকে কহে। ইহাতে প্রধানতঃ উল এবং রেশমের সংমিশ্রণ থাকে।

কার্পেট বা দরি।

মিশর দেশ কার্পেটের প্রাচীন ঘর। মেমফিস্, থিবস্, ব্যাবিলন, এবং জিনেরা এই স্থান চতুষ্টয়ে কার্পেট বুনা হইত। সার জর্জ্জ বার্ডউডের মত এই যে, ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে ব্যাবিলন হইতে কার্পেট আসিয়াছে। ইহার উল্লেখ আইন-ই-আকবরিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্রাট আকবর কার্পেট-বয়নের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। আকবরের সময়ে আগরা, ফতেপুর, লাহোর, এলাহাবাদ, জৌনপুর, নেরোয়ান এবং আলোয়ার ইত্যাদি স্থানে কার্পেট তৈয়ারি হইত।

এক্ষণে দেখা উচিত, হিন্দুস্থানে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে কার্পেট ছিল কি না? সার জর্জ্জ বার্ডউড বলেন যে, মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বে বারহুত স্তূপ এবং অজান্তার গুহায় কার্পেটের নক্সা বিশেষরূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, হিন্দুস্থানে অতি আদিকাল হইতেই কার্পেট বুনা হইত।

কালীন বা গালিচার কাজ ভারতবর্ষের বহু স্থানে হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের কালীন পারস্য দেশের কালীন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় কঠিন উলে উত্তমরূপে রং জমে না।

সংযুক্ত-প্রদেশের জেলখানায় যে সকল কালীন তৈয়ার হয়, তন্মধ্যে আগরার কালীন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মির্জ্জাপুরও কালীনের জন্য বিখ্যাত। সংযুক্ত-প্রদেশের নানা স্থানে কালীন তৈয়ার হইয়া থাকে; যথা—মোরাদাবাদ, কানপুর, বুলন্দসহর, ঝান্সি, এবং আগরা। জেলখানা ব্যতীত সহরেও কালীন ব্যবসায়ের অনেক ইংরেজি দোকান আছে। আগরা জেলখানায় প্রত্যেক বৎসর ৫০০০ গজ দরি তৈয়ার হইয়া থাকে। এই কাজ ৬ মাস হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। শিখিবার জন্য ৮.৯ বৎসর বয়স্ক বালকগণকে নিযুক্ত করা হয় এবং তাহাদিগের সহিত এই চুক্তি হইয়া থাকে যে, যত দিন তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা বেতন পাইবে না।

শিক্ষক যদি মূর্খও হয়, তথাপি সে স্বীয় কার্য্যে নিপুণ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপনের বিশেষ প্রচলন নাই। আড়ত হইতেই লোকের ও কার্য্যের উন্নতি হইয়া থাকে। মেলায় বস্ত্র প্রেরণ করিলে, কোন্ স্থানে কিরূপ বস্তু তৈয়ার হয়, তাহা জনসাধারণে জানিতে পারে। বিজ্ঞাপনের রীতিটা ভারতবাসীর শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় বিজ্ঞাপনের জোরে কাজ হয়। য়ুরোপীয়গণ বিজ্ঞাপনপ্রিয়। তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে বিজ্ঞাপনই ব্যবসায়ের মূল বস্তু। বিজ্ঞাপন দিতে হইলে পূর্ব্বে অবশ্য কিছু ক্ষতি-স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সে ক্ষতির পূরণ হইয়া অবশেষে অনেক লাভ থাকে। এরূপ ক্ষতি-স্বীকার অন্তে লাভদায়ক বই ক্ষতিজনক নহে।

হিন্দুস্থানী দরি।

কলিকাতা, বোম্বাই, পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি স্থানে সূতি দরি আগরা হইতে প্রেরিত হয়। য়ুরোপে দরি কানপুর হইতে গিয়া থাকে। আগরা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দরি জর্ম্মণি এবং আমেরিকায় প্রেরিত হয়। Aloe fibre (মুঁজ) নির্ম্মিত চটাই সূতি বা উলী কাপড়ের স্থান অধিকার করিতেছে। বেরিলীর সেণ্ট্রাল জেলে মুঁজ নির্ম্মিত কার্পেট তৈয়ার হইয়া থাকে।

কার্পেটের তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রাদি

কার্পেটের তাঁতের দুইটী খুঁটী উন্নত এবং দুইটী সমতল কড়ি থাকে। উন্নত খোঁটাদ্বয়ের উচ্চতা ৬ বা ৭ ফিট। সমতল কড়ির প্রস্থ কার্পেটের পরিমাণোপরি নির্ভর করে। দুইটী কড়ির প্রত্যেকে প্রত্যেকটীর সমান্তরালে অবস্থিত। উপরিস্থ কড়ি নীচেকার কড়ি হইতে ৬ বা ৭ ফিট উপরে থাকে।

মির্জ্জাপুরে নিম্নস্থিত কড়িটী গর্ত্তের মধ্যে নিহিত থাকে। এই গর্ত্ত দুই ফিট গভীর এবং প্রায় আড়াই ফিট চওড়া। গর্ত্তের নিম্নদেশ হইতে প্রায় একফুট উচ্চে কড়িটা লাগাইতে হয়। অন্যান্য স্থানে গর্ত্ত করিবার প্রথা নাই; নিচেকার কড়িটা জমি হইতে প্রায় ১ফুট বা আঠার ইঞ্চি উচ্চে অবস্থিত থাকে। তানার সূতা উপরিকার কড়িতে গুটাইয়া রাখা হয়, কিন্তু সূতার শেষ ভাগটা নিম্নকার কড়িতে বাঁধা গিয়া থাকে। কড়ি মাত্রেরই শেষাংশে একটী করিয়া দুইটী রন্ধ্র আছে। কড়িদ্বয় উন্নত খুঁটিতে এরূপভাবে সংলগ্ন থাকে যে, সেই গর্ত্তে কাষ্ঠ বা লৌহ-নির্ম্মিত দণ্ড লাগাইয়া তাহাদিগকে সহজে ঘুরাইতে পারা যায়। এই দণ্ডের নাম "টাং।" যখন অধিক তানার আবশ্যক হয়, তখন উপরিস্থিত কড়ি দক্ষিণ হইতে বাম দিকে টাংএর দ্বারা ঘুরান হয় এবং তানার সূতা আবশ্যকানুযায়ী খোলা গিয়া থাকে। কিয়ৎপরিমাণে কার্পেট বুনা হইলে তানার সূতা নিম্নকার কড়িতে বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে ফিরাইয়া গুটান হয়। উপরিস্থিত কড়িতে তানাকে দৃঢ় করিয়া ঘুরাইবার জন্যও "টাং" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরকার কড়ি যাহাতে পড়িয়া না যায় এবং সূতার টানও যাহাতে যথাবৎ রক্ষিত হয়, তজ্জন্য একটা দণ্ড অগুস্থিত ছিদ্রের ভিতর দিয়া নিম্নস্থিত কড়ির সহিত সূতা দ্বারা দৃঢ় করিয়া বাঁধিতে হয়। নিম্নকার কড়িও উল্লিখিত প্রণালীতে স্বস্থানে অবস্থিত থাকে। পার্থক্য এইটুকুমাত্র যে দণ্ডটা না লাগাইয়া জমির উপরে থাকে। ইহাতেই নিম্নকার কড়ি নড়িতে পারে না।

তাঁতিরা তানার সম্মুখে একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত পাটার উপর উপবেশন করে। এই পাটা দুই ফিট চওড়া। তাঁতিদিগের পা গর্ত্তের ভিতর থাকে। যে সকল স্থানে গর্ত্ত করার প্রথা নাই, সে সকল স্থানে জমির

উপর থাকে। এই পাটা যাহার উপর অবস্থিত, তাহার নাম "ওর্টা"। দুইটা মঞ্চ জমি হইতে এতটা উচ্চে থাকে যে, তাঁতিদিগকে উপবিষ্ট হইয়া বুনিবার সময় নত হইতে হয় না।

উলের রঙ্গিন দড়ি-তাল বাঁধিয়া মস্তকোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূতার সাহায্যে ঝুলিতে থাকে। এই তালকে "কুবলি" কহে।

দুইটা "বাই"—যাহার ব্যবহার আমরা পরে বর্ণনা করিব—একটা চওড়া কাষ্ঠে দুইটি দড়ি দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই চওড়া কাষ্ঠ বাইয়ের সহিত তানার সমান্তরালে সন্নিবিষ্ট কড়ির উপর এবং নীচে গমন করিয়া থাকে। সমান্তরালে সন্নিবিষ্ট কড়িকে "পাশবন্দ" বলে এবং যে চওড়া কাষ্ঠ বাই-সংলগ্ন থাকে, তাহাকে "কমন" কহে।

তাঁতিরা ছুরি, কাঁচি এবং পাঞ্জা ব্যবহার করিয়া থাকে।

কার্পেট বয়ন

বয়নের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ক্রিয়া ভিন্ন বয়নকার্য্য হইতে পারে না :—

(১) তানাকে জমির উপর বিস্তার করণ,—

(২) তানাকে টানা দেওয়া,—

(৩) বাই প্রস্তুতি,—

(৪) তানাকে দৃঢ় করিয়া বন্ধন,—

(৫) "কমন"কে বাইয়ে সংযোগ পূর্ব্বক তানাকে টানিয়া পাশবন্দের নিকটে জোর করিয়া রক্ষণ।

উল্লিখিত ক্রিয়ার প্রত্যেকটীর আমরা বর্ণনা নিম্নে করিতেছি—

তানার বিস্তৃতি

জমিতে প্রথমে তিনটী খোঁটা গাড়া হয়। তাঁতি বৃত্তবৎ তানার সূতা লইয়া খোঁটার উপর বাঙ্গালা ৪ (চারের) আকৃতিমত দিয়া থাকে। প্রত্যেক ছিদ্র-স্থানে যথায় বক্রীভূত সূতা আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে, তথায় দুইটুক্‌রা সূতার দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই সূতার নাম "রশ্মি"। ইহা দ্বারা সংলগ্নীভূত তানার সূতা ঠিক থাকে। তানার প্রান্তাবস্থিত সূতা পাছে জড়াইয়া ফাঁশ লাগিয়া যায়, তজ্জন্য দুই প্রান্তে এক-এক জোড়া সূতা দ্বারা এরূপভাবে গাঁট বাঁধা হয় যে, সে গাঁট সহজেই খুলিয়া যাইতে পারে। এই ক্রিয়াকে "দুর্চ্চন" কহে।

যথেষ্ট সংখ্যায় সূতা বিস্তার হইলে খোঁটার উপর হইতে তানার সূতাকে খুলিয়া লওয়া হয়। প্রান্তাবস্থিত খোঁটাদ্বয়ের স্থানে তানার প্রস্থ অপেক্ষা সামান্য স্থূল দুইটা লৌহদণ্ড দিয়া খোঁটার সূতা উঠাইয়া লওয়া যায়।

তানাকে টানা দেওয়া

তানার এক ইঞ্চির ভিতর কত সূতা আছে, তাহা জানিবার জন্য তানা মাপা হয়। এই সময়ে সূতা জোড়া-জোড়া হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে থাকে। তানাকে এখন গুটাইয়া লইয়া টানা দেওয়া হয়।

যেরূপ প্রথায় তানাকে টানা দিতে হয়, তাহা এই ;—উপরিস্থিত কড়িতে একটা দণ্ড সংলগ্ন করা হয়। নিম্নের কড়ি এখন খালি পড়িয়া থাকে। সমান্তরালস্থিত কড়িতে লৌহ গজাল বা ক্ষুদ্র সূতাদ্বারা দণ্ডকে সংলগ্ন করিতে হয়। কড়িতে যে সকল ছিদ্র হয়, তাহাতে সূতা বাঁধা গিয়া থাকে। ইহাকে "নথি" বলে। তানা এখন লম্বভাবে উপরিস্থিত কড়িতে ঝুলিতে থাকে। তানাকে গুটাইতে হইলে উপরিস্থিত কড়িকে ঘুরাইতে হয়। যথেষ্ট পরিমাণে তানার সূতা গুটান হইলে, নিম্নস্থ কড়িতে দাণ্ডা লাগান হয়। পরে প্রায় কুড়িগাছা সূতা উপরকার কড়ি হইতে লইয়া পাক দেওয়া হয়। এই পাক দেওয়ার নাম "মুরির"। তানা এখন ডবল সূতায় পূর্ণ; প্রত্যেক সূতার সহকারী আছে। "রশ্মির" শেষভাগ উন্নত দুই খোঁটাতে বাঁধা হইলে পরে, উপরিস্থিত কড়িতে সূতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এই ক্রিয়ার নাম "গাড় উঠানা"। চার জোড়া সূতা লইয়া শীর্ষস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং উপরিস্থ সূতার শেষভাগ সামান্য বাহির হইয়া থাকে। যখন কুঁড়ি জোড়া সূতা শ্রেণীবদ্ধ হয়, তখন উপরে একটুক্‌রা বাঁশ লাগাইয়া বাঁধিতে হয়। ইহাতে সূতা ঢিলা পড়ে না। তানা এইরূপে প্রত্যেক কুড়ি জোড়া সূতায় বিভক্ত হয়। পরে তাঁতিরা উন্নত খোঁটা হইতে "রশ্মিকে" ঢিলা করিয়া উপরকার কড়ির দিকে লইয়া যায়। অতঃপর সূতার শ্রেণী ঠিক না করিলে চলে না। ইহার নাম "তার বিঠানা"। প্রত্যেক জোড়া সূতা "রশ্মির" দুই দিকে সমানভাবে বিস্তৃত থাকে ; নতুবা সূতা জড়াইয়া যাইবার বা কম হইবার সম্ভাবনা থাকে। প্রাগুক্ত প্রণালীতে নিম্নস্থিত কড়ির সূতা ঠিক করা হয়।

বাইভরা

সিকি ইঞ্চি মোটা একটা সরল দণ্ড তানায় লাগান হয়। এই দণ্ডকে "বাজ" বলে। এই "বাজের" দুই প্রান্তে একটী অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা শক্ত বাঁশে সংলগ্ন করা হয়। ইহাকে "গুল্লা" বলে।

গুল্লায় ফাঁশ বাঁধিবার জন্য এবং সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগের তানা সূতার শ্রেণী দেখাইবার জন্যই "বাজের ব্যবহার"। বাজ বাঁধা হইলে "গুল্লাকে" পাশবন্দে একটুকরা সূতা দ্বারা বাঁধা হয়। তানার সূতা গুল্লার মধ্য দিয়া গমন করে।

সম্মুখস্থ সূতার শ্রেণী এক গুল্লার মধ্য দিয়া যায়, এবং পশ্চাতের সূতার শ্রেণী অন্য গুল্লার ভিতর দিয়া গিয়া থাকে। দুই গুল্লাই পরস্পর পরস্পরের সমান্তরালে একের উপর অপরটী অবস্থিত থাকে। নিম্নস্থ গুল্লায় সম্মুখস্থ সূতার শ্রেণী থাকে, এবং সচরাচর প্রথমেই পূর্ণ করা হয়। উপরস্থ গুল্লা পশ্চাতের সূতার শ্রেণীতে পূর্ণ থাকে।

যদি প্রথম সূতাকে আমরা ১ বলিয়া গণিতে আরম্ভ করি, তবে দেখা যায় যে, সম্মুখস্থ শ্রেণী ২, ৪, ৬, ইত্যাদি সূতার দ্বারা পূর্ণ হয় এবং পশ্চাতের শ্রেণীতে ১, ৩, ৫, ইত্যাদি এক গুল্লার ভিতর দিয়া যায় এবং ২, ৪, ৬ ইত্যাদি অন্য গুল্লার ভিতর দিয়া গিয়া থাকে।

বাইয়ের ক্রিয়া

তানা বর্ণনাকালে আমরা বলিয়াছি যে, দুইটা সমান্তরালাবস্থিত বাঁশের টুকরায় (গুল্লা) ফাঁশ থাকে, যাহার মধ্য দিয়া তানার একের-

পর অন্ত সূতা গমন করে। এই গুল্লায় "কমন" সংলগ্ন থাকে। "কমন"কে পাশবন্ধের নীচে এবং উপরে ঠেলিয়া দিতে পারা যায়। কমনকে উপরে উঠাইয়া দিলে সম্মুখভাগের শ্রেণীবদ্ধ সূতা আকর্ষিত হইয়া পড়ে না, যাইবার রাস্তা প্রস্তুত হয়। এইরূপে "কমনকে" নীচে ঠেলিয়া দিলে পশ্চাৎভাগে শ্রেণীবদ্ধ সূতা সম্মুখে আইসে এবং তন্মধ্যে দিয়া পড়েন যাইবার রাস্তা হয়। তাঁতিদিগের পরিভাষায় বলিতে হইলে "কমন"কে উপরিভাগে ঠেলিলে সূতাকে "দমবলা" কহে, এবং নীচে ঠেলিলে সূতার শ্রেণীকে "দমাসত্র" কহে। তানার প্রত্যেক সূতাই বাইয়ের মধ্যে দিয়া গমন করে। দুই বা ততোঽধিক বাইয়ের জোড়া তানার প্রস্থ অনুসারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক জোড়া জোড়া ২ বা ৩জন তাঁতির পর্য্যবেক্ষণে থাকে। সম্মুখস্থ চার জোড়া বাইয়ের ক্রিয়া দেখিবার জন্য ৮জন তাঁতি নিযুক্ত থাকে।

তানাকে যন্ত্রে টানা দেওয়াই শক্ত ব্যাপার। নিপুণ ব্যক্তি ব্যতীত এ কার্য্য সাধারণে পারে না। তানা রীতিমত টানা না হইলে কার্পেট ঢিলা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বয়ন কার্য্য

উপরস্থ বাই শক্ত করা হইলে, সূতার গোছা দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে, এবং নিম্নস্থ বাই শক্ত করা হইলে, সূতার গোছা বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার নাম "তার খিচনা"। সূতা দুই দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর নিম্নস্থিত কড়িসংলগ্ন তানার প্রান্তভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অনন্তর তানার উভয় পার্শ্বে "কিনার পেঁচ" বাঁধা হয়। সূতী সূতা ২০টী হইতে ২৪টা উত্তমরূপে পাকাইয়া "কিনার পেঁচ" তৈয়ার হইয়া থাকে। এই সূতার চতুর্দ্দিকে উলের টুকরা বা সূতীর গোছা বাঁধা হয়। ইহাই কার্পেটের দুই দিকে থাকে। "কিনার পেঁচ"টা তানা অপেক্ষা দৃঢ়তর না হইলে প্রান্তদেশ দৃঢ় হয় না বলিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে হয়। কিনার পেঁচের বরাবর গাঁট বাঁধিতে হইলে তানার প্রথম তিনটী সূতার প্রান্তভাগ লইয়া "কিনার পেঁচ" এবং সূতার খেইয়ের সহিত পাক দিতে হয়। ইহার পরের গাঁটটা তানার দুইটী সূতার প্রান্ত এবং কিনার পেঁচের সহিত দিতে হয়। কিনার পেঁচ ঠিক করা হইলে "বোধ খিচনা" আরম্ভ হইয়া থাকে। বাই সকল উপর নীচে গমন করিলে পড়েনের সূতা বাম হইতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ হইতে বাম দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায় একইঞ্চি কার্পেট বুনা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পড়নের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহার পরেই গাঁট লাগান আরম্ভ হয়।

গাঁট লাগাইবার প্রক্রিয়া কিরূপ তাহা বলিতেছি। একটুকরা উল সম্মুখবর্ত্তী সূতার নীচে এবং উপর দক্ষিণ হইতে বাম দিকে দিয়া এবং পরে পশ্চাৎ দিকের সমান সূতার নীচে দিয়া গলাইয়া উপরে লইয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়া গাঁট বন্ধনানন্তর ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হয়। ছুরিটা দক্ষিণ হস্তে এবং উল বাম হস্তে থাকে। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সম্মুখস্থ সূতা পুরতঃ টানিয়া উলকে নীচে দিয়া গলাইয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উপরে লইয়া আসা হয়। পরে পশ্চাৎ শ্রেণীর সহকারী সূতা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা পুরতঃ টানিয়া সূতাকে উপরে ও নীচে লইয়া যাইতে হইবে। সূতার প্রান্তভাগ সম্মুখে আসিলে ফালতু সূতাটা দক্ষিণ হস্তস্থিত ছুরি দ্বারা কাটা হয়। "কমনের" প্রান্তভাগ উপরিস্থিত কড়ির দিকে আসিলে অর্থাৎ "দম বলা" হইলে গাঁট বাঁধা সুরু হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীতে গাঁট বাঁধা সমাপ্ত হইলে, পড়েন সেই "দমে" নিক্ষেপানন্তর পিটিয়া না দিলে চলে না। "বাইকে" চালিত করিয়া পড়েনের সূতা অন্ত দিক দিয়া লইয়া গিয়া পাঞ্জা দ্বারা পিটিয়া দিতে হইবে। "বাই"কে উপর উঠাইয়া কার্পেটের বহিঃনিক্রান্ত প্রান্তভাগ অঙ্গুলি দ্বারা টানিয়া কাঁচি দ্বারা কাটিতে হয়। এইরূপে কার্পেট বুনা হইয়া থাকে।

ভিন্ন-ভিন্ন উলের উপকরণে গাঁট বাঁধিয়া তাঁতিরা নমুনা প্রস্তুত করে। কার্য্য সমাধা হইলে, এক ব্যক্তি রুল করা কাগজ হইতে নমুনা কিরূপ হইবে, তাহা বলিয়া দেয়। এই নমুনায় কোথায় গাঁট বা কোথায় কিরূপ রং লইতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া চিহ্নিত থাকে। নমুনা সহজ হইলে ও পরিচিত থাকিলে, তাঁতিরা মন হইতে যথাস্থানে গাঁটাদি লাগাইয়া কার্পেট তৈয়ার করে।

উত্তম কার্পেটে তানা বা পড়েনের সূতা সম্পূর্ণ লুক্কায়িত থাকে। বিচার করিবার জন্য কার্পেটের বিপরীতভাগ দেখিতে হয়। গাঁটকে উত্তমরূপে না ঠুকিলে তানা বা পড়েনের সূতা প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব।

কার্পেটের প্রস্থ অনুযায়ী গড়ে প্রত্যেক দুই ফিটে একজন করিয়া তাঁতি নিযুক্ত হয়। কার্পেটের কিনারাভিমুখে উত্তম কারিকরগণ উপবিষ্ট হইয়া মধ্যস্থিত কারিকরগণের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। নিপুণ কারিকরগণ প্রথমে একই বর্ণের গাঁট বাঁধে। মনে কর দুইটা লাল গাঁটের পর তিনটা সবুজ ও তৎপরে ৪টা লাল গাঁট বাঁধিতে হইবে। তাঁতি কিন্তু দুইটা লালের পর তিনটা সবুজ গাঁট দিবে না। সবুজের স্থান ছাড়িয়া প্রথমে সমস্ত লাল গাঁট বাঁধিয়া লইবে।

জেব-উন্নিসার চরিত্রে কলঙ্কারোপ।*

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহে' জেব-উন্নিসার চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত করায়, কয়েকজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের বিরাগভাজন হইয়াছেন; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, কয়েক-

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ মহাশয় ১৯১৬ সালের Modern Review পত্রে *Zeb-un-nissa's Love affairs* প্রবন্ধে জেব-উন্নিসার কলঙ্ক-কালিমা ক্ষালন করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তাঁহারই ইংরেজী প্রবন্ধের সার সঙ্কলন। যদুবাবু এই প্রবন্ধটি লিখিবার পর এ সম্বন্ধে আরও যাহা কিছু নূতন তথ্য পাইয়াছেন, তাহাও এই প্রবন্ধে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জন মুসলমান উর্দ্দু গ্রন্থকারই সর্ব্বপ্রথমে জেব-উন্নিসার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন—বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ দিয়াছেন, নিজে কিছুই সৃষ্টি করেন নাই।

আকিল খাঁ বা অন্য কাহারও সহিত জেব-উন্নিসার অবৈধ প্রণয়-ব্যাপার আওরংজীবের রাজত্বকালে রচিত—অথবা আওরংজীবের মৃত্যুর অর্দ্ধশতাব্দী পরে, লিখিত কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। মুঘল সরকারী ইতিহাসে বা কোন রাজকর্ম্মচারীর লিখিত ইতিহাসে এ কথা না থাকা স্বাভাবিক; কারণ এই শ্রেণীর লেখক সাধারণতঃ রাজপরিবারের কলঙ্কের কথা গোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু আওরংজীবের রাজত্বকালে যাঁহারা বে-সরকারী ইতিহাস (private history) রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ ব্যাপারই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন;—এ বিষয়ে ফার্সী ভাষায় লিখিত ভীমসেন ও ঈশ্বরদাস নামক দুইজন হিন্দু ঐতিহাসিকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাফি খাঁ আওরংজীবের মৃত্যুর ২৫ বৎসর পরে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন;—তিনি এবং 'মাসির-উল-উমারায়' (মুঘল রাজ্যের অভিজাতবর্গের জীবন-কাহিনী-সম্বলিত অভিধান) গ্রন্থকার উভয়েই নির্ভয়ে ইতিহাস-চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পর্য্যটকদ্বয়, বার্নিয়ার ও মানুষী—বিদেশীর চক্ষুতে সমস্ত লিখিয়া গিয়াছেন; আওরংজীব বা তাঁহার বংশধরগণের ক্রোধভাজন হইবার কোন ভয় তাঁহাদের ছিল না। বিশেষতঃ মানুষীর গ্রন্থ রাজ্যসংক্রান্ত এত অধিক কলঙ্ককথায় পূর্ণ যে, ঐতিহাসিক আর্ভিন মানুষীর রচিত মুঘল ইতিহাসকে *Chronique bcandaleuse* (অর্থাৎ কলঙ্ক-কাহিনী) নাম দিয়াছেন। জেব-উন্নিসার চরিত্র-কলঙ্কের কোনরূপ সংবাদ যদি মানুষী জানিতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি তাহা লিখিতে ভুলিতেন না। খাফি খাঁর ন্যায় লেখক—যিনি জহাঙ্গীর ও নূরজহানের লজ্জাজনক ব্যাপার উদ্‌ঘাটন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই, তিনিও জেবের চরিত্রে কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। জেব-উন্নিসার প্রণয়-কাহিনী আধুনিক উর্দ্দ নভেল-লেখকদের (সম্ভবতঃ লক্ষ্ণৌ সহরের) উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত। লাহোরের মুন্‌শী অহমদুদ্দীন খাঁ, এ মহাশয়ের তথাকথিত জেবের জীবন-চরিত "দুরর্‌-ই-মক্‌তুম্‌" গ্রন্থ বর্ত্তমানে প্রচলিত। এই গ্রন্থকার আবার পুস্তক-রচনাকালে মুন্‌শী মুহম্মদ উদ্দীন খালিকের "হাইয়াৎ-ই-জেব-উন্নিসা" নামক কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

বিবি Westbrook এর *Diwan of Zeb-un-nissa* (Wisdom of the East Series: 1913) পুস্তকের ভূমিকায় জেবের প্রণয়-ব্যাপারের যে ইতিহাস সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ অহমদুদ্দীনের উর্দ্দ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। তিনি লিখিতেছেন;—

"১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আওরংজীব অসুস্থ হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেওয়ায়, বাদশাহ্‌ পরিবারবর্গ ও দরবারসহ লাহোরে গমন করেন। এই সময়ে সম্রাটের উজীরের পুত্র আকিল খাঁ লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সৌন্দর্য্য ও বীরত্বের জন্য আকিল খাঁর খ্যাতি ছিল; অধিকন্তু তিনি একজন কবিও ছিলেন। আকিল খাঁ জেবের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি বেগমের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়িলেন। নগররক্ষার ব্যপদেশে তিনি রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহণে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, উদ্দেশ্য একবার যদি জেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সৌভাগ্যক্রমে একদিন প্রত্যুষে তিনি 'গুল-আনার' (ডালিম পাতার রং) বর্ণের পরিচ্ছদ-পরিহিত জেব-উন্নিসাকে প্রাসাদোপরি দেখিতে পাইলেন। তিনি বেগমকে উদ্দেশ করিয়া কবিতায় বলিলেন,—'প্রাসাদের ছাদে রক্তিম ছবি দেখা দিল।' জেব ইহা শুনিয়া উত্তরে বলিলেন, 'অনুনয়-বিনয়, বল-প্রয়োগ বা সুবর্ণমুদ্রার সাহায্যে তাহাকে লাভ করা যায় না।'

"জেব-উন্নিসা লাহোরে বাস করিতে বিশেষ পছন্দ করিতেন; তথায় তিনি একটি উদ্যানও নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। একদিন তিনি নর্ম্মসখীদিগের সহিত উদ্যানের নির্ম্মাণ-কার্য্য দেখিতে গিয়াছিলেন। আকিল খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া, মজুরের ছদ্মবেশে, মাথায় চুন সুরকীর হাঁড়ি লইয়া প্রহরীদিগকে অতিক্রমপূর্ব্বক উদ্যানে প্রবেশলাভ করিলেন। জেব সঙ্গিনী যুবতীদের সহিত তখন 'চসার' খেলিতেছিলেন। আকিল খাঁ তাঁহার নিকট দিয়া গমনকালে বলিলেন, 'তোমার সন্ধানে আমি পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।' জেব এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন,—'তুমি বায়ুর আকার ধারণ করিলেও আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না।' জেবের সহিত আকিল খাঁর ঘনঘন সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, এদিকে নানারূপ জনরব দিল্লীতে আওরংজীবের কর্ণে পৌঁছিতে লাগিল। বাদশাহ্‌ স্থির করিলেন যে, অবিলম্বে কন্যার বিবাহ দিয়া সমস্ত গোলের নিষ্পত্তি করিবেন। জেব পিতাকে জানাইলেন যে, তিনি স্বীয় ইচ্ছামত স্বামী বরণ করিয়া লইবেন; যাঁহারা তাঁহার হস্তপ্রার্থী, তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রতিকৃতি পাঠাইয়া দেন। জেব আকিল খাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করিতে মনস্থ করিলেন। আওরংজীব আকিল খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু জেবের একজন ব্যর্থ-প্রেমিক আকিলকে লিখিলেন,—'একজন সম্রাট্-কন্যার ভালবাসার পাত্র হওয়া ছেলে-খেলার কাজ নহে। সম্রাট্ আওরংজীব তোমার সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছেন; দিল্লী পৌঁছিবামাত্রই তুমি তোমার পরিণাম বুঝিতে পারিবে।' আকিল খাঁ স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই সম্রাট্ তাঁহার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন; এই ভয়ে তিনি এ বিবাহে সম্মত হইলেন না, এবং সম্রাট্‌কে তাঁহার কর্ম্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন।

"জেবের স্মৃতি কিন্তু আকিল খাঁর মন হইতে দূরীভূত হয় নাই; তিনি জেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য গোপনে দিল্লী গমন করিলেন;—আবার তাঁহারা উদ্যানে মিলিত হইলেন। বাদশাহ্‌ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। জেব হঠাৎ পিতাকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় প্রেমাস্পদকে অবিলম্বে স্নানের জল রাখিবার একটি বৃহৎ ডেকের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। সম্রাট্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই ডেকের মধ্যে কি আছে?' জেব উত্তর করিলেন, 'গরম করিবার জল।' সম্রাট্ বলিলেন,—'তবে

অগ্নি-সংযোগ করিয়া জল গরম কর।' সম্রাটের আদেশ প্রতিপালিত হইল। এই সময়ে জেব স্বীয় প্রেমিক অপেক্ষা আত্মসম্মানের কথাই বেশী করিয়া ভাবিয়াছিলেন;—তিনি জলপাত্রের নিকট গিয়া চুপি-চুপি আকিল খাঁকে বলিলেন, 'যদি তুমি আমাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া থাক, তবে আমার মান বাঁচাইবার জন্য মৌনাবলম্বন কর।' জেব-উন্নিসার একটি কবিতায় আছে—'প্রকৃত প্রেমিকের পরিণাম কি?' (উত্তর) 'লোকের তৃপ্তির জন্য আত্মদান করা।' ইহার পর জেব সলিমগড় দুর্গে বন্দী হ'ন।" (pp. 14-17)

এক্ষণে দেখা যাউক, উপরিউক্ত বিবরণ কতদূর সত্য। যাঁহারাই মানুষী (i, 218) ও বার্ণিয়ার (p.13) পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, এই দুইজন ভ্রমণকারী জেবের পিতৃস্বসৃ জহান্-আরার চরিত্রে দোষারোপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ডেকের মধ্যে লুক্কায়িত সেই বেগমের গুপ্ত প্রেমিককে উপরিউক্ত প্রকারে হত্যা করা হইয়াছিল। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, জহান্-আরার কলঙ্কের কাহিনী অসাধু ঊর্দ্ধু গ্রন্থকার জেবের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আকিল খাঁর জীবনের ঘটনা ইতিহাস সাহায্যে যাহা জানা যায়, তাহা উপরিউক্ত ব্যাপারের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে।

মীর অস্করী (পরে আকিল খাঁ নামে অভিহিত হ'ন) পারস্যের খাফের একজন অধিবাসী ছিলেন—দিল্লীর উজীরের পুত্র ছিলেন না। সম্রাট্ শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে তিনি আওরংজীবের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন, এবং আওরংজীবের দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্ত্তা রূপে অবস্থানকালে তাঁহার 'জিলদর' (অর্থাৎ সম্রাটের অশ্বারোহণকালে তাঁহার পার্শ্বচর) ছিলেন। আকিল খাঁ ইতঃপূর্ব্বেই একজন কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং ভনিতায় 'রাজী' নাম দিয়া বহু কবিতা লিখিয়াছিলেন। আওরংজীব যখন সিংহাসন অধিকারার্থ দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হ'ন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে দৌলতাবাদের দুর্গে রাখিয়া যান (১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর)। আকিল খাঁ ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে আওরঙ্গাবাদের শাসনকর্ত্তার কর্ম্ম করেন এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে প্রায় ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত দৌলতাবাদ-দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে পৌঁছিয়া, তিনি দুই মাস পরেই গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—মীয়ান-দুয়াবের—ফৌজদার নিযুক্ত হ'ন। কিন্তু ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই পদ অন্য এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়। পরবর্ত্তী নভেম্বর মাসে (১৬৬১ খ্রীঃ) শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন, আকিল খাঁ কিছুদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করেন; এই ছুটি মঞ্জুর হয় এবং তিনি নগদ ৭৫০ টাকা বৃত্তি পাইয়া কিছুদিন লাহোরে অবস্থান করেন। আকিল খাঁর এই দরখাস্ত হইতে জানা যায় যে, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০এর ঊর্দ্ধ ছিল। কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আওরংজীব ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন সপরিবারে লাহোর অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়ে (২রা নভেম্বর) আকল খা রাজদর্শনে উপস্থিত হন; সম্রাট্ তাঁহাকে এই সময়ে সঙ্গে লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে দরবার-গৃহের দারোগার পদ (Supdt. of the Hall of Audience) প্রদান করেন (জানুয়ারী ১৬৬৪)। এই সময় আকিল খাঁ যে নিশ্চয়ই সম্রাটের খুব অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; কারণ ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহার পদোন্নতি হয় এবং পরবৎসর মে মাসে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে উপহার লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে আকিল খাঁ ডাকচৌকীর দারোগার (Postmaster-Genl) পদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন এবং পরবর্ত্তী সাত বৎসর, ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত, কেমন করিয়া তিনি কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। এই সময়ের পর হইতে আকিল খাঁ মাসিক ১০০০, টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় 'দ্বিতীয় বখ্‌শী'র (Paymaster) পদ লাভ করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিল্লীর সুবাদারের পদ লাভ করিয়া আকিল খাঁ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি এই পদ ত্যাগ করিতে চাহিলে, বাদশাহ উত্তরে তাঁহাকে যে স্নেহসূচক পত্র দেন, তাহা বিদ্যমান আছে।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সম্রাটের আদেশে আকিল খাঁকে জল গরম করিবার ডেকের মধ্যে মারিয়া ফেলিবার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। সিংহাসন-অধিকারার্থ যুদ্ধের পূর্ব্বে আওরংজীবের পরিবারবর্গ যে দুর্গে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ৪০ বৎসরের কম-বয়স্ক কোন লোকের উপর থাকা কখনই সম্ভবপর নহে; কাজেই আকিল খাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম যে ৮৫ বৎসরের অধিক ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

এখন আকিল খাঁর জীবন-চিত্র হইতে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ সময়ে তিনি ও জেব-উন্নিসা একই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(ক) ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদে—ন্যূনাধিক ১০ মাসের জন্য।

(খ) ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে এক সপ্তাহের জন্য।

(গ) ইহার পর হইতে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ পর্য্যন্ত সময় দিল্লী ও আগ্রার রাজদরবারে।

(ঘ) ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে জেব-উন্নিসা দিল্লী হইতে আজমীরে পৌঁছেন। ইহার অনেক পূর্ব্বেই মাড়োয়ার ও মিবারের সহিত যুদ্ধ হেতু বাদশাহ্ আকিল খাঁ সহ আজমীরে আগমন করেন; কাজেই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস (বন্দী হওয়া) পর্য্যন্ত প্রায় ৮ মাস কাল আকিল খাঁ ও জেব একই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(ঙ) ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীতে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আকিল খাঁ যদি বাদশাহের অনুপস্থিতিতে জেবের সহিত প্রেমালাপ করিয়া থাকেন, তবে প্রথম ও শেষোক্ত

সময়েই তাহার অবকাশ ঘটিয়াছিল ; কারণ এই সময়ে বাদশাহ্ অন্তর্ধ ছিলেন।

আকিল খাঁর রাজকার্য্য হইতে অল্পদিনের জন্ম অবসর-গ্রহণ এবং লাহোরে অবস্থান করার (১৬৬১ খৃঃ অক্টোবর...১৬৬৩ খৃঃ) মূলে যে কখনই সম্রাটের বিরাগ ছিল না, তাহার কারণ এই অবসর-প্রাপ্তিকালে আকিল খাঁ বরাবর বাদশাহের নিকট হইতে উপযুক্ত বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আকিল খাঁর রাজধানী ও সম্রাটের পরিষদ্‌বর্গ হইতে সুদীর্ঘ ১০ বৎসর কাল দূরে অবস্থান, এবং এই দশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ৭ বৎসর সম্রাটের কোনরূপ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত থাকা—আমাদিগকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয় যে, এই সময়ে তিনি বাদশাহের ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন।

তবে কি ইহা জেবের সহিত অবৈধ প্রেমালাপের শাস্তি? ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভগিনী জেব-উন্নিসাকে লিখিত কুমার অক্‌বরের একখানি পত্রে লিখিত আছে,—

"সম্রাট্ এক্ষণে আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, আকিলের মোহর-যুক্ত কোন প্যাকেট (nalwo) প্রাসাদস্থ অন্তঃপুরিকাগণের কক্ষে লইয়া যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ; কাজেই ইহা সুনিশ্চিত যে, এক্ষণে (আমাকে?) কাগজপত্র বিশেষ বিবেচনা করিয়া পাঠাইতে হইবে।"

এই আকিলই কি তবে জেব-উন্নিসার প্রণয়াস্পদ কবি—আকিল খাঁ রাজী? না, তাহা নহে। এই সময়ে কুমার অক্‌বরের শিবিরে মুহম্মদ আকিল নামে একজন মুল্লা অবস্থান করিতেন। ইনিই পরে অক্‌বরের স্বপক্ষে, আওরংজীবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ম পাঁতি ('ফতোয়া') দিয়াছিলেন এবং ফলে, অক্‌বরের পরাজয়ের পর বাদশাহ কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ ও শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন। জেব-উন্নিসা ধর্ম্মগ্রন্থ কুরাণে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন ; তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান-ধর্ম্মগ্রন্থের কয়েকখানি ভাষ্য রচিত হইয়াছিল ; কাজেই তাঁহার সহিত মুল্লা মুহম্মদ আকিলের ন্যায় একজন বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্বা-লোচনাকারীর পত্র-ব্যবহার যে কেহ সন্দেহের চক্ষে দেখিত না,—ইহা ত স্বাভাবিক। উপরিউক্ত পত্রের লেখক ইহাই বলিতে চাহেন যে, তাঁহার নিজের মোহরযুক্ত প্যাকেট পাঠাইলে পাছে শত্রুহস্তে পতিত হয়, এই কারণে তিনি ভগিনী জেবকে যে সমস্ত গোপনীয় পত্র লিখিতেন, তাহা আকিলের পত্রের মধ্য দিয়া প্রেরিত হইত ; কাজেই তাহা বিনা বাধাবিঘ্নে জেবের নিকট পৌঁছিত। পত্রখানির শেষাংশ হইতে এ কথা আরও পরিস্ফুট হইবে ;—"তোমাকে পত্র লিখিতে বিলম্ব হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, পাছে আমার পত্র অন্ত লোকের (অপরিচিত লোক, অর্থাৎ শত্রুর) হস্তে পতিত হয়।"

যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, জেব-উন্নিসার সহিত আকিল খাঁ রাজীর ষড়্‌যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া বাদশাহ্ কন্যার সহিত আকিল খাঁর পত্র-ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাহা একেবারে অযৌক্তিক হইবে ; কারণ এই ব্যাপারের কয়েক মাস পরেই আকিল খাঁ বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ দিল্লীর শাসনকর্ত্তার পদলাভ করিয়াছিলেন—আর এই দিল্লীতেই পরবৎসরের প্রারম্ভে জেব বন্দী হইয়া প্রেরিতা হ'ন।

জেব-উন্নিসা পিতার আদেশে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বন্দী হ'ন ; সরকারী ইতিহাসে অতি স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভ্রাতা অক্‌বরের বিদ্রোহ-ব্যাপারে লিপ্ত থাকাই তাঁহার বন্দীত্বের একমাত্র কারণ।

আর একটী কথা, যদি কেহ জেব-উন্নিসার এই কঠোর কারাবাস-কালে, তাঁহাকে ও আকিল খাঁকে লইয়া মনে-মনে একটি প্রেমময় কাব্যরচনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক হইবে ; কারণ তৎকালে জেব ৪৩ বৎসর বয়স্কা প্রৌঢ়া রমণী, এবং আকিল খাঁ তখন ৭২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। একটা আধুনিক জনপ্রবাদ আছে যে, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে যখন মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী আগ্রায় বাদশাহের নিকট আনীত হ'ন, সেই সময়ে জেব প্রথম-দর্শনেই শিবাজীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও একখানি উপন্যাসে বর্ণনা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া প্রণয়িযুগল পরস্পর অঙ্গুরী-বিনিময় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল! কিন্তু তাহা উপন্যাস—অন্য কিছু নহে! সমসাময়িক কোন ফার্সী ইতিহাস দূরে থাকুক, মহারাষ্ট্র-ভাষায় লিখিত শিবাজীর কোন জীবনচরিতকার বলেন না যে বাদশাজাদী, শিবাজীর কারাবাসকালে তাঁহার দুর্ভাগ্যের জন্ম সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য কোন কারণে না হউক, একমাত্র জেব-উন্নিসার সুশিক্ষা ও সৌন্দর্য্য-বোধই যে, তাঁহাকে শিবাজীর ন্যায় একজন অশিক্ষিত দক্ষিণী হিন্দুর সহিত প্রেমে পড়িতে বিরত করিত,—ইহা ত স্বাভাবিক। এই কাহিনীটী যে কেবল অনৈতিহাসিক, তাহা নহে, পরন্তু অস্বাভাবিক!

ততোভ্রষ্টঃ

[শ্রীহেমনলিনী দেবী]

সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর প্রভাত মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাল হইতে ফিরিতেছিল, পথে বন্ধু রাখালের সঙ্গে দেখা হইল। অর্দ্ধাহারের ক্ষুধায়, পরিশ্রমে, প্রভাত যেন দু'প্রহরের ফুলটির মত শুকাইয়া উঠিয়াছে; আর, মধ্যাহ্ন-নিদ্রার পর দ্বিতীয়-নম্বর চুল ফিরাইয়া, পান চিবাইতে-চিবাইতে রাখাল সকালে টাট্‌কা-তোলা তাজা ফুলকপিটির মত—আসিয়া উপস্থিত হইল।

"এই যে, আমি তোদের বাড়ীই যাচ্ছিলাম। এত দেরি কেন আজ বল্ দেখি ?"

রাখালের কথায় একটু শুষ্ক হাসিয়া প্রভাত বলিল, "বটে, কেন ? আমায় কি কর্‌বি এখন ?"

"দরকার আছে—তোকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে যাচ্ছি। আমার যে বিয়ে রে !—"

প্রভাত সোৎসুক উল্লাসে বলিল, "বলিস্ কি রে ? কবে ?"

রাখাল খুব হাসিয়া বলিল, "এই তেইশে; তবে আজই বিয়ের সব-চেয়ে সেরা দিন; আজ আমি তার সঙ্গে পরিচিত হতে যাচ্ছি।"

"সে আবার কি ?"

প্রভাতের পিঠে চড় বসাইয়া রাখাল বলিল,—"ভাল কথা বাবু সমজাতেই পারেন না! চিরটা দিন মড়া কেটে-কেটে তুই নিজেই মরে গেছিস্, প্রভাত; তা' নইলে এতখানি বয়স হল—বিয়ে কর্‌তে চাস্ না ? যাক্, তোর সঙ্গে তামাসা পোষাবে না; আসল কথা শোন্। আজ বৈকালে আমি সেই মেয়েটিকে দেখ্‌তে যাব, বুঝেছিস্। তোকেও যেতে হবে—শীগ্‌গীর বাড়ী ঘুরে আয়—যা।"

চলিতে-চলিতে তাহারা একটা বড় গাড়ী-বারান্দাওয়ালা বাড়ীর ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছিল। প্রভাত বলিল, "পরশুও ত কিছু বলিস্ নি, আজই হঠাৎ বিয়ে পেলি কোথায় ? কল্‌কাতায়, না আর কোথাও ?"

"কল্‌কাতায় না ত কি! তোদের বাড়ীর মোড়েই যে! গল্প যা শুন্‌ছি, ভাই, মনু-দা' ত কনের রূপ-গুণ বল্‌তে অজ্ঞান হয়ে উঠেছেন।"

প্রভাত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমাদের পাড়ায় কার বাড়ী বল্ দেখি ?"

ঠোঁট চাপিয়া মৃদুহাস্যে রাখাল বলিল, "গণেশ ডাক্তারের বাড়ী।"

"ওঃ" !—বলিয়াই প্রভাত হঠাৎ থামিয়া গেল। তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়াছে, কলিকাতার স্কুল-কলেজের ছুটির সময়; রাস্তায় যেন হঠাৎ জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তার দুই ধারে—ফুটপাথে স্কুল-কলেজের ছেলের দল;—পথে গাড়ী-ঘোড়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। খাবারওয়ালাদের ডাক খুব বেশি-বেশি শোনা যাইতেছে। তাহাদের সম্মুখ দিয়া বালিকাপূর্ণ দুই-তিনখানি স্কুলের গাড়ী গুম্-গুম্ শব্দে চলিয়া গেল।

রাখালের মন আনন্দ-চিন্তায় উৎফুল্ল থাকিলেও প্রভাতের সেই নীরব ভাব সে বুঝিল। ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "তোর আবার কি হল প্রভাত ?—চুপ করলি যে ?"

"হবে আবার কি—চল্ না!" বলিয়া প্রভাত যেন জোর করিয়া সে চকিত ভাব দূর করিয়া, বন্ধুর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে-করিতে চলিতে লাগিল। বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া রাখাল বলিল, "যাবার সময় ডাক্‌ব, কেমন ?—তৈরি হয়ে থাকিস্—দেরী হয় না যেন।"

প্রভাতের মুখভাব চকিতে বিবর্ণ হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে হাসিয়া বলিল,—"ব্যাপার ত সব জানিস্; বাড়ী গিয়ে স্নান করব, ভাত খাব, তার পর সাজ-সজ্জা আছে। যদি আমার দেরিই হয়—তোরা চলে যাস্। আমার যাবার ঠিক নেই।"

আপত্তি শুনিয়া রাখাল রাগ করিতে লাগিল। বহু দিন হইতে সে প্রভাতকে এই দিনের নিমন্ত্রণ দিয়া রাখি-

য়াছে,—আজ 'মা' বলিলে ভাল হইবে না! সন্ধ্যার সময় যাত্রার কথা, তখন প্রভাতের কি কায? যাইতেই হইবে! ইত্যাদি কথা জানাইয়া, তাগিদ্ দিয়া সে চলিয়া গেল।

(২)

গণেশ বাবুর কন্যার সহিত রাখালের বিবাহের কথায় প্রভাতের চমকিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ চার বৎসর হইতে ঐ মেয়েটির সহিত স্বয়ং প্রভাতেরই বিবাহের কথা স্থির ছিল। উভয় পক্ষই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু বিবাহ ভাঙ্গিয়াছে প্রভাত নিজে। সে জন্য মাতার রোদন, দাদামহাশয়ের বকুনি—সব সে সহ্য করিয়াছে। আপত্তির কারণ খুব বড় কথা নয়,—তবু সে ওজর কাটাইতে কাহারও সাধ্য হয় নাই। কাণ্ডটা যদিও কর্ত্তার ভাষায় এ কালের ইংরিজি-পড়ার বথামি ছাড়া আর কিছু নয়—তবু সে বেয়াদবীর উত্তরে কোন যুক্তিযুক্ত ভাষা না পাইয়া, বৃদ্ধ নবীন বাবু খালি রাগিয়া, বকিয়া অনর্থমাত্র করিয়াছিলেন।

প্রভাতের বক্তব্যের মূলে তাহার জীবন-কাহিনী জড়িত ছিল; তাহা এই। নবীন বাবু স্বনামা-পুরুষ—নিজের চেষ্টায় পুলিশের সামান্য কাযে ঢুকিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উচ্চ পদ অধিকার করিয়া জীবনটি সার্থক করিয়া লইয়াছিলেন; অর্থাৎ, রায় বাহাদুর পদবী হইতে ধন-দৌলত, ঘর-বাড়ী সব জুড়াইয়া কলিকাতার মধ্যে তিনি একজন বড়লোক। তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র কন্যা উমা। মাতৃহীনা বালিকাকে রায়-বাহাদুর ধনী-গৃহে না দিয়া সৎস্বভাব বিদ্বান পাত্রে বিবাহ দিয়াছিলেন। বৎসর তিন-চার পরে যখন জামাতার ভাগ্য-নির্ণয়ের সময় আসিল, বি-এল পরীক্ষার পর যখন শরৎ বর্দ্ধমানে আসিয়া কায সুরু করিল, তার কিছুদিন পরেই উমার কপাল ভাঙ্গিল; চারিমাসের শিশু প্রভাতকে পিতৃহীন করিয়া তরুণ যুবা, অন্য জগতে আপনার কায দেখিতে চলিয়া গেল।

সেই হইতে উমা পিতৃ-গৃহে বাস করিয়া আসিতেছে। তাহার বিমাতা সাধারণ বিমাতার ন্যায় সপত্নী-কন্যার প্রতি বিরূপা ছিলেন না। তাঁহার পুত্রদের সহিত প্রভাত সমভাবেই পালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার পর দুঃখিনী মাতার প্রাণে আশা ও আনন্দের কিরণ ফুটাইয়া এইবার সে ডাক্তারী পরীক্ষায়ও পাশ হইয়াছে। তারপর বিবাহের কথা!

গণেশ বাবু এ পাড়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার। ধনী রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে মান্য করিতেন। পাশাপাশি বাড়ী বলিয়া উভয় পক্ষের নারী-মহলেও কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। গণেশ বাবুর চারি পুত্রের পর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, একমাত্র কন্যা উষা; ইহারই সহিত প্রভাতের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির ছিল। শিশুকাল হইতে পিতৃহীন বালক প্রভাতকে তাঁহারা ভালবাসিতেন। ডাক্তারের কথাতেই নবীন বাবু তাহাকে মেডিকেল কলেজে দিয়াছিলেন। তখন উষা ছোট। ইতোমধ্যে বালক ও বালিকা বিবাহযোগ্য হইল। গণেশ বাবু নবীন বাবুকে আপনার ইচ্ছা জানাইলেন, এবং দুই পক্ষ হইতে আনন্দের সঙ্গে এই বাঞ্ছিত পরিণয় স্বীকৃত হইয়া গেল।

সেই বৎসরই বিবাহ হইত; কিন্তু প্রভাত আপত্তি তুলিল—সে পরীক্ষায় পাশ না হইয়া কিছুতেই বিবাহ করিবে না! মাতা অবাক, মাতামহ রাগ করিলেন; কিন্তু প্রভাত তাহাতে টলিল না। মাতার নিকট এমন কথা বলিল যে, তিনি তাহাতে ভয় পাইয়া, পাছে সে সেই কথা তাঁহার পিতার নিকটও বলিয়া বসে—ভাবিয়া নিজেই কিছুদিনের জন্য বিবাহ বন্ধ রাখিবার কথা পাড়িলেন। তিনি তাঁহার স্বামীর তেজস্বী স্বভাবের সবটুকুই জানিতেন; কাহারও সাহায্য লইতে সে দরিদ্র যুবা যে কতখানি পীড়া বোধ করিতেন, তাহা তাঁহার হাড়ে-হাড়ে বোঝা ছিল। প্রভাত ত তাঁহারই সন্তান! সে যে এক কথায় মাতামহের আশ্রয় ছাড়িয়া দারিদ্র্যের আঁধার কুটীরে লুকাইয়া যাইতে পারে, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

কিন্তু গণেশ ডাক্তারও সহজে ছাড়িবার পাত্র ন'ন্। প্রভাতের পরীক্ষার অপেক্ষায় তিনি আজ চারিবৎসর কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়াছেন। উষার বয়স পোনের উত্তীর্ণপ্রায়। কিন্তু, বিশেষভাবে স্থির ছিল, তাই উভয় পক্ষই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

প্রভাত পাশ হইলে কথাটা আবার জাগিল। কন্যাকর্ত্তা বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উমার বিমাতাও নিজের সংসারে জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলেন। প্রভাতকে কেহ কিছু না বলিলেও, সে সকলি দেখিল ও বুঝিল। হঠাৎ একদিন তাহার বড়-মামা মোহিত আসিয়া মাতা ও দিদিকে জানাইল—"প্রভাত এখন বিয়ে করতে পারবে না।"

সে আবার কি কথা! উমা চক্ষু স্থির করিয়া বলিলেন,

"সে আবার কি কথা? বৈশাখ মাস অকাল; জ্যৈষ্ঠ মাস— সে মাসে তো জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে হতেই পারে না। এখন না হলে হবে কবে?"

মোহিত বলিল, "বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের কথা কি বলছ! সে যে উপার্জ্জন না করে বিয়ে কর্‌বে না।" বলিয়া সে একে-একে প্রভাতের বিবাহ না করিবার কারণগুলি বলিয়া গেল। প্রভাত বলিয়াছে—সে এই সবেমাত্র ডাক্তার হইয়াছে.—হাস্‌পাতালে ছয় মাস খাটিয়া যাহা পাইবে, তাহা কিছু নয়। পরে যাহা উপার্জ্জন হইবে—তাহাতে গণেশ ডাক্তারের কন্যাকে আনিয়া সুখী করিতে পারিবে না, নিশ্চয়। কারণ, আজ তাহারা দুইজন হইবে; পর বৎসরেই তিন-জন, বাঙ্গালা দেশে আর যাহা হোক, মা ষষ্টীর যেমন অযাচিত কৃপা,—চার বৎসরের মধ্যে পাঁচছয়টি প্রাণীর ভার-গ্রহণ অনিবার্য্য। সে দলবলের ধাক্কা সাম্‌লান একজন পশারহীন ডাক্তারের কর্ম্ম নয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহার নিজের মাথা রাখিবার স্থান নাই, সে আবার স্ত্রী-সন্তান লইয়া কোথায় স্থাপন করিবে? দাদা মহাশয় তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ—কোথায় সেই এখন তাঁহাকে সাহায্য করিবে, না, উল্টা একটা পূরা সংসারের ভার আনিয়া তাঁহার মাথায় তুলিয়া দিবে? এখন কিছুতেই বিবাহ হইতে পারে না। সে যখন মাসিক তিনশত টাকা আয়ের উপায় করিতে পারিবে, তখন যদি বিবাহের ইচ্ছা হয়—দেখা যাইতে পারে। এখন সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। যদি কেহ জেদ করেন, তবে তাহাকে সে পথেরও বিধান দেখিতে হইবে। ইত্যাদি।

শুনিয়া উমা কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহিণী রাগিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এখন বুঝি তাঁহারা প্রভাতের উপার্জ্জনের জন্য হাঁ করিয়া আছেন! এত লোকের বাস চলিতেছে,—আর প্রভাত বাবুর বৌয়ের আর এ বাড়ীতে স্থান কুলাইবে না,—ইত্যাকার বকিয়া-ঝকিয়া স্বামীকে সকল কথা জানাইলেন।

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি; এতটাই যদি তার মনে ছিল, তবে এতদিন সে ভদ্রলোককে ফাঁকিতে ফেলে রাখ্‌লে কেন? ষোল বৎসরের কুমারী মেয়ে নিয়ে তিনি এখন কি করেন!"

উত্তরে প্রভাত বলিল, "কল্‌কাতা সহরে টাকা থাক্‌লে অর্দ্ধেক রাত্রিতে বর এনে দিতে পারি। বলুন না, আমিই ভাল পাত্র খুঁজে দিচ্চি!"

কথাটা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া গেল। বৈকালে ডাক্তারের বাড়ীর একজন আত্মীয় আসিয়া জানাইলেন যে, স্ত্রী-প্রতিপালনের ভার এখন প্রভাতকে লইতে হইবে না। যতদিন আবশ্যক, ততদিন তাঁহারা মেয়েকে নিজেদের নিকট রাখিবেন। আর ইচ্ছা হয় যদি, প্রভাত তাঁহার ডিস্‌পেন্সারীর কর্ত্তা হইয়া নিজের কাযও চালাইতে পারে।

কথা শুনিয়া গৃহিণী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। উমাও যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। এমন কুটুম্ব কাহার হয়? কিন্তু কর্ত্তা বলিলেন, "আমরা ত ভালই জানি চিরদিন; কিন্তু তোমার গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে কি জবাব দেন্‌ তা ত্যাখ।"

এমন কথার পরেও প্রভাত রাজি হইল না! শ্বশুরের অনুগ্রহ? অসম্ভব! চিরদিন পরের দুয়ারে মানুষ—দরিদ্র বলিয়াই গণেশ ডাক্তার তাহাকে এ অপমান করিতে সাহস পাইয়াছেন! বিবাহ,—সে ত মানুষ নিজের শক্তিতেই নির্ভর রাখিয়া করে। আর যাহারা তা না করে,—এমন লোক গণেশবাবু যথেষ্ট পাইতে পারেন, গরীব বেচারা প্রভাতকে ধরিয়া টানাটানি কেন? সে এখন বিবাহ করিবে না।

পুত্রের কথার পূর্ব্বাংশ বাদ দিয়া উমা শেষ কথাটাই সকলকে জানাইলেন। বিবাহ নিঃসন্দেহভাবে ভাঙ্গিয়া গেল।

(৩)

কিন্তু তবু,—সেদিন প্রভাত রাখালের কথা শুনিয়া সুখী হইতে পারিল না। বিবাহ বা অমনি কিছুর কথা তাহার মনে আসে নাই,—কিন্তু তবু—এত শীঘ্র? আর তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাখালেরই সহিত!

প্রথমটা তাহার বুকের রক্ত বড় বেশি জোরেই 'ধ্বক্‌' করিয়াছিল। পরে সে ধীরে-ধীরে আপনি বুঝিতে চেষ্টা করিল যে, তাহার সহিত বিবাহ না হইলে, যে-কাহারও সহিত হোক,—সে মেয়ের বিবাহ হইবেই। আর রাখাল? ক্ষতি কি, যে-কেহই তাহার স্বামী হোক্‌ না, তাহাতে তাহার কি আসে যায়? তবে বিবাহের পক্ষে রাখাল খুব

প্রার্থনীয় নয় বটে। ধনীর সন্তান হইলেও সে সুশিক্ষিত নয়, স্বভাব মন্দ না হইলেও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানা নাই।

কিন্তু তাহাতে কি? গণেশ বাবুর কন্যার বিবাহ,—পাত্রের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া সে মরে কেন? দরিদ্র প্রভাত অপেক্ষাও কি রাখাল অযোগ্য?—না, তাহা নহে। তবে রাখালের সহিত তাহার বিবাহে আর একটা বিপত্তি—এই যাহা আরম্ভ হইয়াছে! বন্ধু-পত্নীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটিবে। এই কি উচিত? কিম্বা—কিম্বা, কি জানি কি! প্রভাত ভাবিয়া বুঝিল, রাখালের সহিত উষার বিবাহে এইখানেই তাহার দ্বিধা আসিতেছে।

কিন্তু সে চিন্তাকেও সে সবলে দূর করিল। কেন? সে কন্যার সহিত তাহার কি যোগ, যে তাহার ভবিষ্যৎ নৈকট্যে সে ভয় পাইতেছে?—অন্য কোন বালিকা রাখালের স্ত্রী হইলে কি সে এ আশঙ্কা বোধ করিত? তবে উষার জন্য সে উদ্বিগ্ন হয় কেন? ছি! এ অন্যায়! এ দুশ্চিন্তার বীজ তাহার মনের গোপন স্থলে ঢাকা ছিল দেখিয়া সে আপনার উপরও রাগিয়া গেল। সে এই বিবাহে যোগ দিয়া আন্তরিক আনন্দে এই কুৎসিৎ দুশ্চিন্তাকে সমূলে তুলিয়া ফেলিবে বলিয়া স্থির সংকল্প করিল, এবং রাখালের সঙ্গে যাইবার জন্য যত শীঘ্র পারিল—আহারাদি সারিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিল।

রাখালের দল বড় অল্প ছিল না। সকলে মিলিয়া এসেন্সের সুগন্ধ ছড়াইতে-ছড়াইতে যখন ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গণেশ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেশ পথে দাঁড়াইয়া ছিল, মোটরারোহী সুবেশ যুবকদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে আনিল।

প্রভাত লক্ষ্য করিয়াছিল, নরেশ তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছে। সেও লজ্জিত না হইল, এমন নয়। বার-বার মনে হইল, না আসিলেই ভাল হইত। এ যেন অতি ধৃষ্টতা প্রকাশ হইয়া গেল।

গণেশ বাবুও তাহাকে দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন, বোধ হয়। তাহার সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হইল না। পরিচিত স্থলে এ অপমানটুকু প্রভাতকে একটু জোরে বিঁধিল। সেও কন্যাপক্ষের কাহারও সহিত পূর্ব্ব-পরিচয়ের কোন ভাব না দেখাইয়া, সহযাত্রীদের সহিত হাসি-তামাসায় ব্যস্ত থাকিবার ভাণ করিতে লাগিল।

ঘরে বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো। হল-ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলের আশেপাশে তাহারা বসিয়াছিল। অবিশ্রাম গান চলিতেছে। তাহার মাঝে-মাঝে কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষের তরুণ দলে ইংরাজি-বুকনিপ্রধান কৌতুকালাপ, থিয়েটারের অনুকরণ বা রবিবাবুর কবিতার উদ্ধৃত রসবৈচিত্র্য। অন্যমনস্কতার মধ্যেও প্রভাত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হাসিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নরেশ দু'একটি বালক-বালিকার মধ্যবর্ত্তিনী উষারাণীকে লইয়া আসিল। পশ্চাতে গণেশ বাবু। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "আমার মেয়েটির আজ অসুখ হয়েছিল,—তাই একটু দেরি হয়ে গেল, মন্মথবাবু!"

মন্মথ রাখালের পিশ্‌তুতো ভাই ও এই বিবাহের ঘটক। সে বিনয়ের সহিত গণেশ বাবুকে আপ্যায়িত করিয়া দিলেও বুঝিল, কন্যাটির অসুস্থতা ছাড়াও এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে, যাহাতে সদাপ্রফুল্ল, উৎসাহী ডাক্তার আজ মর্ম্মাহত। বিবাহ ব্যাপারটাতে আর তাঁহার কিছুমাত্র ঔৎসুক্য নাই।

অন্যান্যেরা কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাতের অবকাশ পায় নাই। নীল সাড়ীর কোমল বর্ণ-মাধুর্য্যের মধ্যে কিশোরী উষার পরম সুন্দর মুখখানি,—কালো চুলের নীচে ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ-রেখা এবং সুগঠিত আকৃতিটির দিকে চাহিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

রাখালও যে কতখানি খুসি হইয়াছিল—তাহা বলা যায় না। সার্টের বোতামের দিকে তাহার অত্যন্ত মনোযোগের মধ্যেও, মনটি যে তাহার সেই দিকেই আকৃষ্ট ছিল, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। সে ভাল করিয়া চাহিতেছিল না বটে, কিন্তু একবার চাহিয়া যাহা দেখিয়া লইয়াছে, তাহাই যে তাহার পক্ষে প্রচুর। তাহার তৃপ্তিশীতল চক্ষু দু'টি দেখিয়া সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

সে লক্ষ্য করিল না, কিন্তু তাহার বন্ধুবদলের অনেকেই দেখিল যে, সেই সুন্দরী বালিকাটিকে বেশভূষায় যতখানি সাজাইয়া তোলা হইয়াছে, মনটি ততোধিক বিশৃঙ্খল। সদ্যোরোদনের সজল রক্তাভা তাহার বড়-বড় চোখদু'টিকে বর্ষার গোলাপের ন্যায় বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শুষ্কতার মধ্যেও ঠোঁটদুটি ফুলিয়া লাল হইয়া আছে। তাহাকে অনেক প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতার স্পষ্ট অনুজ্ঞা সত্ত্বেও সে শুধু নামটিমাত্র বলা ছাড়া, অন্য কোন কথা কহিল না।

কিন্তু সেজন্য কোন কথা উঠিল না। পাত্রী চলিয়া যাওয়ার পর, মিষ্টান্নের থালা আসিয়া সকলের চিত্তের তিক্ত-কষায় প্রভৃতি বিস্বাদ-রসকে নিঃশেষে মুছিয়া আপনার স্বনামধন্য রসধারা ছড়াইয়া দিল। সবাই সব ভুলিয়া চর্ব্বিত তাম্বুলের গোলাপী গন্ধে ও রক্ত বর্ণে ওষ্ঠ হইতে অন্তর পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিয়া ফিরিয়া চলিল। অন্যান্য সকলে উচ্চ হাস্য-কোলাহলে পথের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও দলের মধ্যে দুইজন নীরব ছিল। তাহাদের মধ্যে এক-জনকে লইয়া সকলেই রহস্য করিল; সে রাখাল। আর একজনের নিস্তব্ধতা কেহ বুঝিতেও পারিল না,—সে প্রভাত। বন্ধুরা যাহা বলিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; ভাবী পত্নীর অসাধারণ রূপ দেখিয়া আনন্দেই রাখাল চুপ করিয়া ছিল বটে; কিন্তু প্রভাত যে কেন কোণে বসিয়া পথ দেখিতে তন্ময় হইয়াছিল, তাহার কারণ সে হঠাৎ নিজেই বুঝিতে পারিল না।

(৪)

রাখাল প্রভাতকে নিজের বাড়ী ঘুরাইয়া থিয়েটারে লইয়া গেল; তখন আপত্তি করিবার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছাও তাহার ছিল না। একলা বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া অপেক্ষা, তখন পাঁচজনের সঙ্গে আমোদে মিলিয়া সে আপনাকে অনেকখানি স্বচ্ছন্দ ভাবিল। সকালে বাড়ী আসিয়া কিন্তু সে স্বাচ্ছন্দ্যটুকু থাকিল না। মোহিত বলিল, "কাল যে রাখালের কনে দেখতে যাচ্ছি বলে' গেলে, তা সে কনে কে তা বুঝি জানতে না তুমি,—নয়?" মোহিতের এ প্রশ্নের কারণ না বুঝিয়া সে বলিল—"সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম—" "হাঁ, আমিও বাবাকে তাই বল্‌ছিলাম যে, সে জান্‌লে কখ্‌নো যেতো না।" প্রভাত বিস্মিত হইয়া বলিল "সে কি? দাদামশায় জান্‌লেন কি করে?" "তা জানিনে,—বড্ড রাগ কচ্ছিলেন কিন্তু।" প্রভাত ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সে বুঝিতে পারিল না,—যদি সে গিয়াই থাকে, ত অপরাধ হইল কোথায়? মোহিত হাসিতেছিল; বিরক্ত হইয়া প্রভাত বলিল, "রাত্রির খবর হঠাৎ এখানে এলই বা কি করে?" "ভিতরে গিয়ে শোন গে না।" বলিয়া মোহিত চলিয়া গেল। ঘরে-বাহিরে ধাক্কা খাইয়া প্রভাতের চিত্ত আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। রাখালের সহিত গিয়াছিল বলিয়া অনুতাপ হইতে লাগিল। রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছে;—সে যে কি স্বপ্ন! সে সারা জীবন স্বপ্নেও সে সকল স্বপ্নের কল্পনা করে নাই। নারীর রূপ সম্বন্ধে পুঁথিতে সে অনেক কথা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বাস্তব জীবনে তেমন কোন দৃশ্য বা ঘটনার উদাহরণ পায় নাই। স্বপ্ন আজ তাহাকে সারা রাত্রি ধরিয়া নারী ও তাহার রূপের বিদ্যুদ্বিকাশের মধ্যে ঘুরাইয়া মারিয়াছে। স্বপ্ন স্বপ্নেরই ন্যায় মিলাইয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতির আঘাত বিদ্যুতান্তে বজ্রের জ্বালার ন্যায়ই দগ্ধ করিতেছে যে! এতটা যে কেন হইল, তাহা ত সে মোটেই বুঝিতে পারিল না!

ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া সে স্নান করিতে গেল। বারান্দা দিয়া যাইবার সময় দেখিল, দিদিমার মুখ গম্ভীর, মাতা তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া গেলেন। কলঘরে গিয়া দেখিল, তাহার ছোট মাসীটি—গৌরী, জল ঘাঁটিতেছে, ও তার জন্য বুড়ি ঝি বারণ করায় বকাবকি, দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছে। সে প্রভাতকে দেখিয়া পলাইবার উপক্রম করিল; বাধা দিয়া প্রভাত বলিল, "শোন্ গৌরী-মা,—শুনে যা।"

ঝি বলিল, "কেমন, এইবার! এখন জলছড়া দে না।" বলিয়া সে উঠানে গিয়া বাসন মাজিতে বসিল।

গৌরীর 'বড় ছেলে' কখনও তাহার সহিত কথাও কহে না, আজ হঠাৎ সে ডাকিল কেন? গৌরী তাহার দুষ্টামি-ভরা চোখ দুটি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিল। প্রভাত বলিল, "মুখে আঙ্গুল দিস্‌নে, কথা শোন্। সত্যি বল্ ত মা,—কাল দাদামশায় আমার কথা কি বল্‌ছিলেন?" গৌরীর বিনুনী দুলিয়া উঠিল; সে সবেগে বলিল, "তোমায় ত বকেন নি!" "তবে কাকে বক্‌ছিলেন?" "ওঃ! সে তো আমাকেই গাল দিচ্ছিল—আমি ডাক্তারদের বাড়ী গিছলুম বলে'।" "তুইও সেখানে গেছ্‌লি না কি? কখন?" "কাল সন্ধ্যায় যখন উষিকে দেখ্‌তে গেছ্‌লে তোমরা।" প্রভাতের মুখ বিবর্ণ হইল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"তার পর?" "তার পর আর কি? নরেশ দা বল্লে তুমি শুদ্ধ এয়েছ। তা শুনে উষি কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল,—বাইরে যেতে চাইলে না। তার বাবা খুব বক্‌তে লাগ্‌লেন। তার পর কচুরীর ময়দার জন্য—" "থাম্, নরেশ গিয়ে কি বল্লে সব বল্ দেখি; সব বল্‌বি, কিছু বাদ দিবিনে।" এবার বালিকা চঞ্চল হইল। ঘাড়

নাড়িতে-নাড়িতে বলিল,—"সব আমার মনে নেই কিন্তু!" "যা মনে মনে আছে তাই বল্ না, শীগ্‌গীর বল্—"

বালিকা অনেক বেশি কথার মধ্যে যাহা বলিল, তাহা হইতে প্রভাত আর নূতন কিছু পাইল না। কেবল ঐ এক কথা, সে গিয়াছে শুনিয়াই উষা কাঁদিয়াছে।

কাঁদিয়াছে! কিন্তু কেন কাঁদিয়াছে? লজ্জায় কি? কেন কিসের লজ্জা তাহার? বাল্যকালে সে অনেকবার শিশু উষাকে দেখিয়াছে; কিন্তু বিবাহের সম্বন্ধের পর সে আর তাহাদের বাড়ী যায় নাই। তাহাকে লজ্জা? অথবা সে রোদন কেন, তাহা কে জানে?

(৪)

সে দিন রবিবার, আহারের ত্বরা ছিল না। প্রায় বার-টার সময় প্রভাত খাইতে গেল। উমা সেখানে ছিলেন না, গৃহিণী সকলের খাবার গুছাইয়া আহ্নিকে বসিয়াছিলেন। সকলের শেষে প্রভাত খাইতে বসিল। তাহার আহারে রুচি ছিল না, তবু সে জোর করিয়া খাইতে লাগিল। মাছের তরকারী খুব ভাল হইয়াছে বলিয়া দিদিমাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাতে তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আহারান্তে নাতিকে পান দেওয়াটা গৃহিণীর নিত্য কার্য্য; "দাদার তো এখনও বৌ আসেনি, ততদিন আমিই সে সাধ মিটিয়ে নিই—তার পর নতুন কনে এসে ত আমায় তাড়িয়ে দেবে।" বলিয়া নিজের হাতের পান কর্ত্তা ও প্রভাতকে ভাগ করিয়া দিতেন।

আজ প্রভাত দেখিল, উপর হইতে তাহার মামী, মোহিতের বধূ, পান পাঠাইয়াছে গৌরীর হাতে। মুহূর্ত্তে প্রভাতের বুকের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। পান কয়টি হাতে করিয়া নীরবে দিদিমার কাছে তাঁহার আসনের পাশে রাখিয়া দিয়া যেন অশ্রু-সংবরণ করিতে করিতে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল।

দিদিমা বলিলেন, "কি হল; পান কি কর্ব্ব আমি?" প্রভাত উত্তর না দিয়া দুয়ার পার হইল। তখন তিনি আবার ডাকিলেন, "শোন্—শোন্,—" প্রভাত বাহির হইতে বলিল, "আমায় আর কেন দিদি-মা, আমি ত"—প্রিয় দৌহিত্রের কাতর স্বর স্নেহময়ীকে পীড়া দিল। আহ্নিকের মালা কপালে ছোঁয়াইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। "এদিকে আয় রে, এদিকে আয়—শোন।" বলিয়া পানগুলি তাহার হাতে দিয়া একটু মিষ্ট হাসিলেন। প্রভাত মুখ ভার করিয়া ছিল; তিনি বলিলেন "তোর জ্বালায় গেলাম, কি যে কর্ব্ব!" "বাড়ী থেকে দূর করে দাও।" "তাতে তোরও যে বড় দুঃখ, এমন ত বোধ হয় না। যাবার জন্যই ত তৈরি হচ্চিস্।" প্রভাত আর উত্তর করিল না, তাহার চোখ সত্যই ছল্-ছল্ করিতেছে। গৃহিণী বলিলেন "নে, নে—আর ছেলে-মানুষী করে না। তোর যা ইচ্ছা তাই করবি, আর আমরা কিছু বল্লেই বাবুর রাগ!" "রাগ? আমার আর রাগের স্থান কৈ দিদি-মা? কিন্তু তোমরা যদি রাগ কর তবে আমি দাঁড়াই কোথা? আমার আর মাথা রাখবার ঠাঁই দেখ্‌ছি না ত!" গৃহিণীর মুখ এতটুকু হইয়া গেল। দূরে উমাকে দেখিয়া বলিলেন, "শোন্ গো মেয়ে, তোর ছেলের কথা শুনে যা। কথা শুনে তো আকাশ পাতাল উল্টে যাচ্ছে।" উমা উত্তর করিলেন, "কথার ওস্তাদ ত চিরদিন আছেই। আমার কপাল—তোমরা কি কর্ব্বে!"

প্রভাত যাইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া উমা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "চার বৎসরের কবুল ভেঙ্গে কাল আবার তাদের বাড়ী গিয়েছিলি কেন, বল্ ত? এটা তোর অপমান, না তাদের?" প্রভাতের মুখ অত্যন্ত ম্লান। গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তুই চুপ কর ত বাছা! অত বড় বেটাছেলেকে অমন-ধারা বলিস্‌নে;—যা তুই চান্ করগে যা।" উমা চলিয়া গেলে তিনি প্রভাতের হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "সত্যি দাদা, অন্যায় হয়েছে তোমার; খুব অন্যায় হয়ে গেছে!" প্রভাত কি উত্তর দিতে গিয়া কথা কহিতে পারিল না; গৃহিণী তাহা বুঝিলেন। সস্নেহে কহিলেন, "তোর যাওয়া শুনে উষা কি কান্নাটা কেঁদেছিল, তা জানিস্? তার মা, বাপ কি বলেছিল, শুনেছিস্?" প্রভাত মনে-মনে শিহরিল। তবু মনের ভাব মনে চাপিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "কাঁদবার কি কথা ছিল এর মধ্যে, তা ত বুঝলাম না, দিদি-মা!" "কাঁদবার কারণ নেই? বলিস্ কি প্রভাত? তবে হাঁ তুই তা বুঝবি না বটে;—তা না হলে বিয়ে ভাঙ্গবি কেন?"

প্রভাত নীরব থাকিল। গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "হিঁদু ঘরের মেয়ে, বয়স হয়েছে; চিরকাল সতী সাবিত্রীর কথায় প্রাণ ঢেলে ভক্তি দিয়ে এসেছে;—বল্ দেখি, সে মেয়ে

যাকে আজ চার বৎসর ধরে স্বামী হবে জেনে—ভালবাসা মালবাসা চুলোয় যাক্,—তবু যা হোক কিছু ভাব্‌ত'ত বটে? তারপর সে বিয়ে ত ফুরিয়ে গেল,—হিঁদু ঘরের মেয়ে বলেই সব চুপ্ থেকে গেল। কিন্তু তারই বিয়ের তুই যদি ফটা করে বরের বন্ধু সেজে হাসি-তামাসার রঙ্গ দেখাতে যাস্, ত তার মনে কি হয়, তা বুঝতে পারছিস্ নে কি?" প্রভাতের প্রাণের মধ্যে আর ভাষার শব্দ ছিল না, অজ্ঞাতসারে তাহার চোক বুজিয়া আসিতেছিল। গৃহিণী বলিলেন,—"বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে দাদা! রূপের কথা ছেড়ে দিলেও, অমন ধীর, শান্ত মেয়ে আজকালের দিনে বড়-একটা দেখা যায় না। এ বাড়ীতে বিয়ে হবে বলে আমাদের দেখে কি খুশীই হত। বাড়ী গেলে লুকুত; কিন্তু তারি মধ্যে—" বলিতে-বলিতে তিনি চক্ষু মুছিলেন। "মনের দাগ রে দাদা, এ আর কিছু নয়। আমরাই যাই এত কষ্ট পাচ্ছি—তা সে একটা কচি মেয়ে বৈ ত না! বিয়ে কি, বর কি,—সে জ্ঞানটুকু—"

"থাম দিদি-মা, অত করে ব'লো না আর।" গৃহিণী তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। টানিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিলেন, "তুইও অমন করিস্ নে দাদা, যা হবার তা হবেই। তোর সঙ্গে ওর ভাবী ছিল না—হবে কোত্থেকে বল? কিন্তু কাল মেয়ের কান্না দেখে ওদের বাড়ীশুদ্ধ সবাই কেঁদে মরেছে,—এ শুনে দুঃখ হয় না কি?"

এবার প্রভাত বালিশে মুখ লুকাইল। গৃহিণী বলিলেন, "যাক্, তুই আর ভাবিস্ নে; এমন হয়েও থাকে। তাদের বিয়ে হলেই সব চুকে যাবে।" বালিশের ভিতর হইতে করুণ স্বরে উত্তর আসিল, "আমায় আগে বলনি কেন দিদি-মা!" গৃহিণী বলিলেন, "কি বল্‌তাম আগে? বল্‌বার তো কিছু ছিল না ভাই! তা ছাড়া, বল্লেও কি তুই বিয়ে করতিস্?" প্রভাত এবার মুখ তুলিল। গৃহিণী দেখিলেন, সে কাঁদে নাই বটে, কিন্তু বৈশাখের মধ্যাহ্নের ন্যায় একটা দীপ্ত রৌদ্রাভা তাহার মুখশ্রীকে একেবারে ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। ব্যথায় তাঁহারও মন ভরিয়া উঠিল। তিনি নীরব ছিলেন, কিন্তু প্রভাত সবেগে বলিয়া উঠিল, "করতাম্ বোধ হয়, দিদি-মা!"

বাহিরে ফিরিওয়ালা ডাকিতেছিল,—"কুল্পিবরফ্, আইস্‌ক্রিম।" সাম্‌নে পানওয়ালা গাহিতেছিল,—"রাঙ্গালা চন্দ মুখে লাজ লাগে হো, নাহেরা সে ফিরি আইলা, পিয়া লারা কোরিয়া!" গীতের অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু সুরের মাধুর্য্য সমস্ত কোলাহলের উপর নিজের মোহিনী মায়া বিস্তার করিতেছিল। গৃহিণীর চিত্ত যেন চারিদিক্ হইতে জুড়াইয়া আসিল। সাদরে নাতির মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন "আমাদের বলায় কিছু হত না বাবু; যা হয়েছে সে ঐ মেয়েকে দেখেই। আচ্ছা রস্, আমি উপায় ঠাউরাচ্ছি।" চকিতভাবে মাথা তুলিয়া প্রভাত বলিল,—"না, না—দিদিমা,—না।" "তোর না-না আমি শুন্‌তে চাইনে, তুই চুপ কর।" বলিয়াই তিনি হাস্যমুখে বাহিরে চলিয়া গেলেন। প্রভাত তাঁহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, —কিন্তু তখন তাহার বুকের মধ্যে একটা বাষ্প ঠেলিয়া উঠিতেছিল, বাধায় কণ্ঠরোধ হইল। সে বলিতে চাহিতে-ছিল 'এ চেষ্টা অন্যায়।' কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে গোপন ব্যথা নিঃশব্দে শীতল হইয়া আসিতেছিল—ঐ চেষ্টামাত্রের সম্ভাবনায়। প্রচুর উষ্ণতার পর এ কোমল স্নিগ্ধতার সুখানুভবটুকু সে তখনই উড়াইয়া দিতে পারিল না। কথা বলিতে গিয়াও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

(৫)

সে একটু ঘুমাইয়াছিল। দিবানিদ্রা তাহার অভ্যাস নয়,—ঘুম ভাঙ্গিতেই শরীরে গ্লানি বোধ করিতে লাগিল। আজ মোহিতের কলেজ নাই—সে উপরে বধূর ঘরে। নীচের বারান্দায় তাহার শিশু মামা-মাসীরা বাপের ভয়ে নিঃশব্দে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। নিজের আল্‌মারীর মধ্যে সজ্জিত রাশিকৃত পুস্তকের প্রতি চাহিয়া প্রভাত কি ভাবিল।—আলস্য! আজ আর কিছুই ভাল লাগে না, অলসতা তাহার বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমাইয়া দিয়াছে। সে ভাবিল,—এত বড়-বড় বই সে পড়িয়াছিল কেমন করিয়া?

প্রভাত মুখ-হাত ধুইয়া নীচে আসিয়া দেখিল, দাদামশায় তখনও নিদ্রিত। কিন্তু হলঘরে ও কে? গণেশ বাবু ডাক্তার না? দিদিমার সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। তাহার মন ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উঠিল; দিদিমার এ কি অধৈর্য্য—ছি! কিন্তু তখনই স্মরণ হইল, সময়ও যে নাই,—কালই ত বিবাহ! প্রভাত বঙ্গগৃহিণীবর্গের সরল কর্ত্তব্য-

নিষ্ঠা ও মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়া একটু খুসিও হইল। কিন্তু গণেশবাবু কি ভাবিবেন ! নিজের পরিবারদের সহিত গণেশবাবুর যে কতখানি ঘনিষ্ঠতা, তাহা প্রভাত জানিত, তিনি অমত প্রকাশ করিলে গৃহিণী যে কতখানি অপমানিত হইবেন, তাহা ভাবিয়া সে বিরক্তি-ব্যথিত হইল। আর—আর, তাহার নিজের মনোভাবের অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা,—তাহাও কি এমনিভাবে প্রকাশ হইয়া গেল ? ছি ছি—কি লজ্জা ! কি দুর্ভাগ্য !

তখন বেলা আড়াইটা, রৌদ্রে বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না। সে উঠান ঘুরিয়া বারান্দায় উঠিতে উদ্যত, এমন সময় গৃহিণী ডাকিলেন, "প্রভাত না কি, শোন্—একটা কথা শুনে যা।" অনিচ্ছুক পদে প্রভাত ঘরে আসিলে—তাহাকে সম্মুখের অসন দেখাইয়া ডাক্তার বলিলেন,—"বোস !"

খানিকক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরে ডাক্তার বলিলেন, "তোমার দিদিমা যা বলছেন, তা বোধ হয় তুমি জান ?"

তাড়াতাড়ি গৃহিণী বলিলেন "জানে বৈ কি, ওর কথা না নিয়ে কি আমি কথা কই ?—জানিস্ প্রভাত, ইনি তোর কথা পেলে এখনও সে বিয়ে ভাঙ্গবেন—বলছেন।" "হাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর ত এখনও আমি তোমাকে ছাড়া আর কারুকে কন্যা দিই না। জানি না কেন,"—বলিয়াই তিনি একটু থামিয়া বলিলেন, "একটু ভেবে বল বাবা, আমার উপস্থিত অবস্থার কথা ভেবে উত্তর দাও। বুঝতে পারছ ত, সব সুস্থির না করে এ কথা নিয়ে আমি গোল করতে পারব না।"

প্রভাতের মুখে উত্তর নাই ; তাহার মুখ একবার লাল্, আবার তখনই সাদা হইয়া উঠিতেছিল।

দিদিমা বলিলেন, "কি রে, একেবারে কথা কস্‌নে যে ?" তাঁহার মুখ বিরক্তিপূর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু ব্যথিত-শঙ্কিত অথচ বিনয়-মধুর দৃষ্টিতে প্রভাত তাঁহার প্রতি চোখ তুলিতেই সে ভাব ফিরিয়া স্নেহের প্রচুর আবির্ভাবে দুইচক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া গেল। তিনি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "বেশি কথা ত নয় ভাই, বিয়ে করতে তোর ইচ্ছে আছে কি না, সেই কথাটি ডাক্তার বাবুর সুমুখে খুলে বল্ একবার, তার পর আমি দেখে নেব এখন।"

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন,—"বাড়ীর কারুরই ইচ্ছে নয় যে, তোমার সঙ্গে ছাড়া আর কোথাও বিয়ে হয়। কাল্ থেকে আমার বাড়ীতে কান্নাহাটির গোল—বিয়েবাড়ী, কি আর কোন বিশ্রী কাণ্ড, তা বোঝা যাচ্ছে না। তুমি যদি এতটুকু মনুষ্যত্বের অভিমান রাখ প্রভাত, তবে নিজের আত্মীয়-স্বজন আর আমাদের পরিবারের মনে কষ্টের কারণ ঘটতে দিও না।" আবার সেই কথা, সেই কান্নাহাটির গোল ! "বাড়ীর কারু ইচ্ছে নয়—কার-কার ইচ্ছা নয় ? এ 'কারু' কথাটার মধ্যে কাহার কথা বিশেষভাবে জড়িত ?—প্রভাত নিজের শরীরে একটা ঝিম্-ঝিম্ ভাব ও মস্তিষ্কে প্রবল রক্তাধিক্য অনুভব করিল।

ঘড়ির কাঁটা টিক্-টিক্ শব্দ করিতেছে ; দিদি-মা নীরব নয়নে, তাহারই পানে বদ্ধদৃষ্টি ; মনের উদ্বেগ দমন করিয়া ডাক্তার গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রভাত কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইল না। সে দরিদ্র, কিন্তু লক্ষ্মী যে স্বয়ং উপযাচিকা !

সে অন্যমনে একখানা খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। হাসির সুরে গৃহিণী বলিলেন,—"ও বইএর মধ্যে তোর কথার জবাব লেখা নেই, যা বল্‌বি চট্ করে বলে ফেল্ না বাবু !" অস্ফুট স্বরে উত্তর হইল, "কি বল্‌ব দিদি-মা, আমি ত বলেছি তোমায়।" সে থামিয়া গেল। এক গাল হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "শুন্‌লে ডাক্তার ?"

ডাক্তারেরও মুখ হর্ষোৎফুল্ল। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "সুখী হলাম বাবা। আমি তবে যাই,—এর উপায় দেখতে হবে কি না !"

"উপায় !"—কথাটা শুনিবামাত্র আবার প্রভাতের বুকে যেন ঘা লাগিল। বিবাহ-বন্ধের উপায় ত ?—দু' চারিটা ছলনা-প্রবঞ্চনা করিয়া মিথ্যা ওজর তুলিয়া রাখালদের সহিত বিবাহ-বন্ধের চেষ্টামাত্র ! কথাটা ভাবিতেই তাহার নিজের হৃদয়ের সমস্ত রক্ত তিক্ত হইয়া গেল। উপায় ! ছি, ছি ! আর কি কোন উপায় নাই ? এ বিবাহ রোধ করিবার জন্য ছলনা ছাড়া কি কোন উপায় নাই ? যদি সত্যই এ বিবাহ করিতে হয় তবে—উপায় ?

সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্বেও উপায়হীনতার দারুণ দ্বিধায়—বন্ধুত্ব ও স্বার্থ দুইএর সংঘাতে সে কাঁপিয়া উঠিল। গমনোন্মুখ ডাক্তারের নিকট আসিয়া অস্থিরভাবে বলিল,—"আচ্ছা,

একটুখানি অপেক্ষা করুন আপনি, এখনি গোল করবেন না। আমি সন্ধ্যার পর ঠিক্ জবাব দেব।"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন?—সে আবার কি কথা, সন্ধ্যার পর আবার কি বল্‌বি?" বিস্মিতা গৃহিণীর প্রতি একবার অর্থসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরভাবে ডাক্তার বলিলেন; "তাই ভাল; আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার অপেক্ষা করব।" তিনি আর দাঁড়াইলেন না। পাছে দিদি-মা প্রশ্ন করেন, এই আশঙ্কায় প্রভাতও সেই সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

রাস্তার বাহির হইয়া সে অন্যমনস্ক ভাবে একবার পানের দোকানে দাঁড়াইল; সেখান হইতে ঘড়ি মেরামতের দোকান; তাহার পর চৌরাস্তার মোড়ে রাম সরকারের সঙ্গে বৃথা কথাবার্ত্তায় খানিকটা সময় কাটাইয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।—ভাবনার স্থিরতা ছিল না; কি ভাবিয়া না ভাবিয়া, সে হঠাৎ ট্রামে চড়িয়া বসিল। সৌভাগ্যক্রমে গাড়ীতে তাহার পরিচিত কেহ ছিল না; নিজের চিন্তায় অন্যমনস্কভাবে সে পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

কলেজ ষ্ট্রীটের বড়-বড় বাড়ীগুলা দৃষ্টির সম্মুখে বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় চলিয়া যাইতেছিল। পাশে গোলদীঘিতে বিষম জনতা। প্রভাত সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, কিন্তু ফিরিতেও তাহার ইচ্ছা নাই।

ধর্ম্মতলার সম্মুখে আসিয়া সে ট্রাম হইতে নামিল। ফিরতি গাড়ীতে ফিরিবে কি না ইহাই ভাবনা। অন্যমনে চলিতে চলিতে সে গীর্জ্জার সম্মুখে আসিল।

অগণ্য মোটর, ফিটন, ল্যাণ্ডো, মেম, সাহেবের যুগল-মূর্ত্তি বহন করিয়া মাঠের দিকে ছুটিয়াছে। গঙ্গার অগাধ জলরাশির দৃশ্য ও সে স্থানের সর্ব্ববিধ শান্তি উপভোগ করিবার জন্য তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছিল; নীরবে সেও সেই পথ ধরিল। বাগানের দেবদারু গাছগুলিতে নূতন পাতা দেখা দিয়াছে, বিলাতি লতায় নূতন বসন্তের ফুল। পথচারিণী বিদেশিনীদের পরিচ্ছদে শীতবস্ত্রের সে স্থূল জড়তা নাই, তাহার পরিবর্ত্তে স্বচ্ছ, শুভ্র বাসন্তী বেশ। তাহার মন ক্রমে সুস্থ হইতেছিল।

আউটরাম ঘাটের উপর আসিতেই সে চমকিয়া দেখিল, দূর হইতে রাখাল তাহাকে ডাকিতেছে। কি অন্যায়! সে ত ইহা চাহে নাই—ইচ্ছা করে নাই।

তবু যাইতে হইল। কয়েকটি বন্ধু লইয়া সে আমোদ করিতে গিয়াছে। প্রভাতকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। গান-গল্প অবিশ্রাম চলিতেছে। রাখালের মুখে প্রচুর হাস্যোল্লাস দেখিয়া প্রভাত শিহরিয়া উঠিল, নব বিবাহের নবীন হর্ষেই এ আনন্দ। আহা! বন্ধু হইয়া বন্ধুর এ সুখে সে বাধা দিবে কি করিয়া?

প্রভাত নীরবে বসিয়া ছিল। একজন বলিল,—"প্রভাত, আজ এমন কেন হে?" মৃদু হাসিয়া সে বলিল,—"কে কেমন? বেশ ত আছি।" "ছাই আছিস্, দিন-রাত কলম আর মড়া নিয়ে গেলি, ভাল থাক্‌বি কি করে?—আমি বলছি প্রভাত, তুই শীগ্‌গীর বিয়ে করে ফ্যাল্।"

রাখালের কথায় সকলে উচ্চকণ্ঠে হাসিল। নলিন্ বলিল, "তা ত বটেই; বিয়ে করতে পেলে মানুষের মনের যে কতখানি চিকিৎসা হয়, প্রভাত ডাক্তারের চেয়ে আজ তুই-ই তা বেশি জানিস বটে!"

"সে ওষুধের খবর তুইও কম জানিস্ নে, দাদা। তোর ত সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা; তুইই বল্ না যে, আমি যা বল্‌ছি তা ঠিক কি না?" নলিন্ উত্তর করিল, "অভিজ্ঞতা? কি জানি,—উহুঁ:! আমার জ্ঞান ঠিক্ তোদের মত নয়। রাখাল, তোর মত আমি বিয়ে পরীক্ষাটা পাশ্ কর্ত্তে পারিনি বোধ হয়। সে দিক্‌টায় সুবিধা মত —কিছু হয়নি আমার।" আবার সকলে হাসিল। রাখাল বলিল,—"কেন, বৌ পছন্দ হয় নি?" নলিন বলিল, "পছন্দ হলেও হয়েছে,না হলেও তাই,—সে কথা আর জিজ্ঞেস্ করিস নে।" বাধা দিয়া চারিদিকে প্রশ্ন উঠিল, "কেন, কেন?" তখন নলিন বলিল, "আরে গেল যা, কেন আবার কি?—আমার ঘরের ভিতরের সে 'কেনর' উত্তর আমি ঢোল বাজিয়ে বল্‌ব না কি?" "বল্‌বি নে সত্যি?" "না, কেন বলব?—বেশ্—আমি বেশ্ আছি ভাই, ভগবান যাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, তাকে নিয়ে আঁধার ঘরের ঘরকন্নার মত আমার দিন যাচ্ছেই। আমার কথা ছেড়ে দে। আমি রাখ্‌লার কথা বলছি। ওকে খুসি দেখে কিন্তু আমার বড্ড হিংসে লাগ্‌ছে ভাই।" রাখাল মুখ নীচু করিয়া হাসিল। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু তাহার নয়নকোণে,

ওষ্ঠপ্রান্তে লজ্জার আভাটুকুর মত লাগিয়া ছিল। বন্ধুর্গ তাহার আনন্দ-বাহুল্য দেখিয়া সুখী হইল বটে, কিন্তু তাহারই মধ্যে কাহারো চিত্তে ঈর্ষার নীলছায়া দেখা দিয়াছিল কি না স্থির নাই। প্রভাত গোপনে নিঃশ্বাস ফেলিল।

অনেকক্ষণ পরে নলিন প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা রাখাল, ধর যদি তোর এই বৌ মরে যায়—তবে তুই কি করিস্?" "কি?" রাখাল সবেগে মাথা তুলিল। প্রবোধ বলিল, —"কি বলিস নলিন?" "কিছু না! মরা বল্লেই তো মানুষ মরে না ভাই। না সত্যি, বিয়ে, ভালবাসা—এই সব নিয়ে আমার একটা সন্দেহ চিরদিনই আছে। মানুষ বিয়ে করে—ভালবাসে, তা নিয়ে কতই বাড়াবাড়ি করে;—আবার সে মরে গেলে দিনকতক বাদে আবার নূতন বিয়ে করে বসে। তাই মনে হয়, এর মধ্যে কতটুকু সত্যি—কোন্‌খানটা মিথ্যে।" "দুটোই সত্যি, এর মধ্যে ঢের কথা আছে। কিন্তু তা নিয়ে তোর এত ভাব্‌বার দরকার কি ভাই?" "কিছু না। কিন্তু জানি রে;—এই বিয়ে ব্যাপারটায় আমার বড্ড বেশি—অনেক কথা মনে পড়ে যায়। চারদিকের সাদা কালো কতই কি!" "বটে?—কিন্তু আমার মনে হয়, সব সময় কালর চিন্তাটা ঠিক্ নয়।"

এবার রাখাল কথা কহিল। ঘাড় তুলিয়া স্থির স্বরে বলিল, "কাল যদি আসেই—তবে জীবনটাও কাল হয়ে যাবে দুর্ভাগ্য ত কাল মুখ চেয়ে আলো হয়ে যাবে না ভাই!", "কি রকম?" সকলে সোৎসুকে তাহার দিকে চাহিল। "সে কথার মানে?" "মানে আর কি! যা ধর্‌তে বলি, তাই বল্‌ছি। সে যদি মরেই যায় ধর্, তা হলে আমার জীবনটাও অমনি কাল হয়ে যাব। সাধারণ সকলেরই কথা আমি জানিনে, কিন্তু ঐ মেয়েটির মত যার স্ত্রী হয়, সে যে আবার তাকে হারিয়ে কেমন করে অন্য বিয়ের নাম মুখে আন্‌তে পারে, এট্টা ত আমার ধারণায় আস্‌ছে না এখন!" "বটে রে ছোক্‌রা, এত দূর নাকি?—" "এ আর দূর হল কি? আর তোরা যে আমায় এতদূর ছোটলোক ভাব্‌ছিস—তাই বুঝি ঠিক্?" "আহা! ভায়া আমার প্রেমে পড়েছে রে, প্রেমে পড়েছে। তোরা ওকে কেউ কিছু বলিস্ নে," বলিয়া প্রবোধ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল। সুযোগ পাইয়া সুকণ্ঠ নীরদ প্রেম-বিহ্বলতার অভিনয়ে গান ধরিয়া ফেলিল—

"তুমি বড় বেদনার মত বেজেছ প্রাণে,
আমার মন যে কেমন করে মনই তা জানে।
বড় আশা বড় নেশা বড় আকিঞ্চন
তোমারি লাগি,
বড় সুখে বড় দুখে—বড় অনুরাগে
রয়েছি জাগি;
এ জীবনের মত আর হয়ে গেছে যা' হবার'
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ টানে।"

গানের প্রথমে সকলেই হাসিয়াছিল; কিন্তু গীত-শেষের ভাব ও স্বরমাধুর্য্যে স্থানটি তখন পরিপূর্ণ;—সকলেই নির্ব্বাক। চিরহাস্যময়, চপলপ্রকৃতি রাখালের চোখ দুটিও আজ অন্তরের আভায় চক্ চক্ করিতেছে। হাস্যহীন ওষ্ঠপ্রান্তে স্থির বিষাদচ্ছায়া।

প্রভাতের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহারই প্রতি চাহিয়া ছিল। গীত-শেষে সে দৃষ্টিতে স্থির মীমাংসার দৃঢ়তা ভাসিয়া উঠিল। সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইতেই নলিন বলিল, "যাচ্ছ না কি?" "যাই, একটা কায আছে।" বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি উঠিতে লাগিল। ডাক্ দিয়া রাখাল বলিল, "কাল সন্ধ্যার পরই, ওরে শুন্‌ছিস্?" "হাঁ", বলিতে-বলিতে প্রভাত চলিয়া গেল। একজন বলিল, "লোকটা চিরকেলে কাটখোট্টা, হাসি তামাসার ধার দিয়েও যায় না।" "কিন্তু বড় ভাল। বিপদে-সম্পদে—লোকে যাকে বন্ধু বলে—এ ঠিক্ তাই।" বলিয়া রাখালও উঠিল।

(৭)

ঘাট পার হইয়া প্রভাত বাড়ীর পাশ দিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন হাইকোর্টের পথ ধরিল। মাথায় আঘাত লাগিলে মানুষ যেমন খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া যায়, তাহার মনের মধ্যেও সেইরূপ বেদনাব্যাকুল জ্ঞানহীনতার ভাব আসিয়াছিল। কর্ত্তব্য ও স্বার্থ, আত্ম ও পরচিন্তা,—দুইই তাহার চিত্তে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। কি করিবে, না করিবে—কিছুই ঠিক পাইল না। অন্যমনস্কতায় সে কেবল পথ ভুল করিতে লাগিল। রাত্রি বেশি হইতেছিল, তাহার ক্রমেই শ্রান্তি বোধ হইতেছিল। ঘুরিয়া আসিয়া সে ট্রাম ধরিল।

অনতিবিলম্বে তাহাকে গণেশ বাবুর বাড়ী যাইতে হইবে, যা হোক কিছু উত্তরও দিতে হইবে। কিন্তু কি

উত্তর দেওয়া যায়? নিজের সুখ-দুঃখ তখন তাহার মনের পাতা হইতে মুছিয়া শুধু উষা ও রাখালের চিন্তা বিয়োগের অঙ্কের মত সারি দিয়া পড়িয়া ছিল। ইহার মধ্যে কোন্‌টি ছোট—কোন্‌টি বড়? কাহার সঙ্গে কাহাকে বাদ দিবে?

প্রথমে উষা; বালিকা বয়স হইতে সে যে চিন্তাকে মনে স্থান দিয়া ভক্তি-প্রীতির ধারাবর্ষণে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, আজ তাহার দ্বারা সে ভাবনা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। বালিকার হৃদয়ে সে জন্য যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ত সামান্য নয়! সে ব্যথা তুচ্ছ নয়—অবহেলার নয়—প্রভাত তাহা বিশেষভাবেই বুঝিয়াছে যে!

কিন্তু নারী-হৃদয়ের এই বিশ্লেষণের মাঝে প্রভাত লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, তাহার নিজের সুখ-চিন্তাও ইহার সহিত সমানভাবে জড়িত। বিবাহের সম্ভাবনার সময় সে এদিকে দৃষ্টি করে নাই, হস্তগত হীরকখণ্ডের মূল্য সম্বন্ধে তখন তাহার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না। তাহার পর নির্ব্বোধ বালকের মত—পশুর মত—বাঁদরের মত,—যখন সে রত্ন হেলায় ছুড়িয়া ফেলিল, অমূল্য মণি দূরে পড়িয়া সূর্য্যালোকে ঝলকিয়া উঠিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল, সৌন্দর্য্য জ্ঞান ফিরিল, মূল্য-বোধ হইল। নিজের মূর্খতা বুঝিয়া তবে উষার দুর্ভাগ্য মানিল।—সে কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহা নিজেরই জন্য!

তাহার পর, আজ? আবার সেই পরম সুখের ধন, অতুল্য রূপ, প্রশংসমান গুণ, আর তাহারই প্রতি আকৃষ্ট প্রাণটি আজ তাহারই করতলে আসিতেছে। এ বিবাহে সে সুখী হইবে, উষা সুখী হইবে, তাহাদের পরিজনবর্গ সুখী হইবেন।

কিন্তু রাখাল?—রাখালের কথা মনে হইতেই প্রভাতের সমস্ত চিত্তবৃত্তি ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। সে আজ কি আনন্দেই ভাসিতেছে! কিন্তু কাল যখন শুনিবে যে, তাহার এত সাধের পরিণয় শুধু বন্ধুদ্রোহের দ্বারাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন সে কি করিবে? কি ভাবিবে?

ভাবী পত্নী জ্ঞানে সে রূপময়ী উষাকে প্রাণমন ঢালিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। প্রেম ও বিরহের প্রত্যেক অনুভূতি আজ তাহার শিরায়-শিরায় প্রবাহিত। কিন্তু কাল যখন শুনিবে—তাহার এই নবজাত সুখ, এই বেদনামধুর আনন্দ,—কেমন লজ্জাদায়ক কুৎসিত ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, তখন তাহার মনে যাহা হইবে, তাহা কি উষার, তাহার ও তাহাদের পরিজনবর্গের বেদনা অপেক্ষা লঘুভাবে আসিবে? না, কখনই না। চঞ্চলপ্রকৃতি শিশু-স্বভাব রাখাল যে পৃথিবীর নিকট শুধু আদরই পাইয়া আসিয়াছে! সেই ধনীর দুলাল, বন্ধুর বাৎসল্য-পালিত বন্ধু,—সুকুমার-চিত্ত, তরুণ-প্রাণ, তাহার নবজাত প্রেম-আশার উপর বন্ধুর কৃতঘ্নতার এত বড় খড়্গাঘাত সে কখনই অম্লান মুখে সহ্য করিতে পারিবে না। হয় এই আঘাত তাহার জীবনের বর্দ্ধনী শক্তির রসধারা শুকাইয়া ফেলিবে, নয় তো সংসারে যাহা সর্ব্বত্র ঘটে, প্রতিহিংসার দানবী মূর্ত্তি আসিয়া তাহার প্রেমের দেবাসনে স্থান গ্রহণ করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে বিভীষিকা বিস্তার করিতে থাকিবে। কি বিশ্রী ব্যাপার সে;—তাহার জীবনের কতদূর অধঃপতনের মূল এখানে গ্রথিত, তাহা ভাবিতেও প্রভাত শিহরিল।

কি করা উচিত এক্ষণে? রাখালের কথা বাদ দিলে, তাহার পক্ষে চারি দিকেই সুন্দর। কিন্তু ঐ কথাটা ত্যাগ সে করে কি করিয়া? পরের কথা ছাড়িয়া আপনার সুখকে বরণ করিয়া লইলে, হয় ত একটু—একটু কেন, অনেকখানিই শান্তি, তৃপ্তি পাওয়া যায়; কিন্তু সে শান্তির গায়ে ঘৃণিত স্বার্থচিন্তার মসীবর্ণ—তাহার চির জীবনের সমস্ত শুভ্রতার উপর কলঙ্কের মত লাগিয়া থাকিবে; আজীবন সে এ কালি সহিবে কেমন করিয়া?

অসহ্য,—তাহা সে পারিবে না! শুধু উষার জন্য ত নয়, এ বিবাহ যে সে আপনার তৃপ্তির জন্যই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে। নিশ্চয় তাই,—ইহাতে তাহার নিজেরও সন্দেহ নাই। মিথ্যা তাহার স্বজন-বাৎসল্যের ভাণ! উষার রোদনে তাহার ব্যথার কথা মিথ্যা! সে উষার চক্ষু-জলে অমৃত-বর্ষণের তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল! দুঃখ তাহার দুঃখে নয়—সে ব্যথা শুধু তাহাকে হারাইবার ভয়ে।

হাঁ, আজ সে জগতের মধ্যে একজন স্বার্থপর, আত্ম-সুখান্বেষী, হীনপ্রকৃতি মানব ছাড়া আর কিছু নয়। বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রাণে নিঃশব্দে ছুরিকাঘাত তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়;—ধিক্!

উষা ত বিবাহে প্রস্তুত ছিল। সে কাঁদিয়াছে তাহার

নতি নির্লজ্জ নির্ম্মমতায়! গণেশ বাবুও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য জামাতায় কন্যাদান—ইচ্ছায় না হোক, সকলই স্থির করিয়াছেন। আর তাহার মাতা, মাতামহ উষার পরিবর্ত্তে অন্য বধূ পাইলে যথেষ্ট সুখী হইবেন। তবে সে এতটা অগ্রসর হইল কেন? নিজের জন্যই নয় কি?

লুব্ধ হৃদয়, ঘৃণিত প্রাণ, কর্ত্তব্যবোধহারা আত্মসুখ—তাতে ধিক্ তাহাকে!

সে গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিল। তাহার স্বাভাবিক ধীর গতি তখন অস্বাভাবিক দ্রুত; একজন ফেরিওয়ালার গা ঘেঁসিয়া যাওয়াতে সে রাগ করিয়া বক্-বক্ করিতে লাগিল।

সম্মুখে ডাক্তারের প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ী সাজওয়ালার লোক দড়ী দিয়া বাড়ীর মাপ লইতেছিল। দুয়ারে উজ্জ্বল আলোকের নিকট নরেশ দাঁড়াইয়া। বাড়ীর ছোট ছেলেটি কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে কি খেলা করিতেছে। সে সকল বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া প্রভাত সোজা উপরে উঠিয়া গেল; নরেশ কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে কর্ণপাত করিল না।

* * * *

গণেশ বাবু বলিলেন,—"তুমি যে এই উত্তরই দেবে, তা আমি তখনই বুঝেছিলাম। কিন্তু দিদি-মার কাছে মিলমানুষিটুকু দেখান হয়েছিল কেন বাবু?" নিজের বক্তব্য বলিয়া শেষ করার পর আর বেশি কথা বলার মতো তাহার ছিল না, প্রভাত চুপ করিয়া থাকিল।

ডাক্তার বলিলেন, "ভালই হয়েছে। তোমার মত 'হিতে বিপরীত' ছোক্‌রা নিয়ে আমারও পোষাত না। আপনার ভালমন্দ যার নিজের জ্ঞান নাই!—ঢের দেখেছি, সত্যি ঢের দেখেছি—কিন্তু তোমার মত বেয়াড়া ছেলে জন্মেও আমার চোখে পড়েনি!" প্রভাতের রক্ত গরম হইতেছিল, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল, "তবে আমি এখন আস্‌তে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে। আমার বাড়ীতে দাঁড়ান তোমার পক্ষে একটুও কর্ত্তব্য নয় জেনো। আর আমি তোমায় বারণ করে দিচ্ছি, বিয়ের সময় যেন বন্ধুর বন্ধু সেজে আমার ঢলাতে এসো না।" "না, তা আসিব না নিশ্চয়; তবে আপনি এটা জেনে রাখ্‌বেন, যে বর আমার বন্ধু—আমার চিরদিনের বন্ধু,—সে বন্ধুত্ব ঘুচ্‌বে না কখনও!"

মুখ বিকৃত করিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"বেশ্, বেশ্; খুব ভাল কথা; আমি ও-সব নভেলি অ্যাক্ট থিয়েটারে ঢের শুনেছি, আর শুনতে চাইনে—যাও!"

তিনি বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতেছিলেন, কিন্তু প্রভাত তাহা শুনিয়াও শুনিল না, আহত পক্ষীর মত মুখ ফিরাইয়া সবেগে চলিয়া গেল।

(৮)

বাড়ী আসিয়া সে দেখিল তাহার খাবার সাজাইয়া দিদি মা তখনও বসিয়া। সে দুয়ার হইতে ডাক্ দিয়া বলিল, "আমার খাবার তুলে নাও, আমি আজ খাব না।" "কেন—কোথাও খেয়েছিস্ না কি?"—বলিতে বলিতে দিদি-মা বাহিরে আসিলেন। প্রভাত সিঁড়িতে উঠিতেছিল, তিনি দ্রুতপদে তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলি বুঝি?" তাঁহার মুখ আনন্দ-দীপ্ত। প্রভাত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "হাঁ।" সে তখন উপরে উঠিয়াছে, তাহার সঙ্গে আসিয়া বয়স্কা স্থূলাঙ্গী গৃহিণী হাঁফাইতেছিলেন। বারান্দায় আসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "তার পর, কি হল রে? কাল সকালেই গায়ে হলুদের তত্ব পাঠাতে হবে,—সব কথা বল্ দেখি।" "না, ও-সব কিছু দরকার নেই। তুমি কাউকে বল—আমার ঘরে একগ্লাস জল দিয়ে যাক্!" "সে আবার কি! দরকার নেই কি কথা রে? বিয়ের তত্ব লাগবে না!" প্রভাত তখন ঘরে ঢুকিয়াছে, সেখান হইতে উত্তর আসিল,—"এ বাড়ীতে এখন কারু বিয়ে হবে না; তুমি ব্যস্ত হয়ো না দিদি-মা!" "ওমা-ওমা-ওমা"—গৃহিণী আরও কি বলিতেছিলেন; প্রভাত তখন ঘরে খিল্ দিয়াছে।

ঘরে গিয়া সে খানিকক্ষণ বিছানায় বসিল। টেবিলের উপর আলো ছিল, কিন্তু তাহার চক্ষে সমস্ত ঘরখানা ধোঁয়া-ধোঁয়া বোধ হইতেছিল। জিহ্বা তালু শুকাইয়া গিয়াছে;—চোখ মেলিয়া থাকিতে কষ্ট হয়, অথচ বুজিতেও পারে না। একটু আগে গরম লাগিয়াছিল, আবার তখনি সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া শীত বোধ হইল। সে শুইতে চেষ্টা করিয়াও আড়ষ্টভাবে বসিয়াই থাকিল।

রাত্রি অনেক; ধীরে-ধীরে তাহার চেতনা ফিরিতে

লাগিল। সে যাহা করিয়াছে,—বা তাহার ফল, সে সকল ভাবিবার শক্তি তখন মোটে ছিল না; তবু সে অন্তরের দিকে চাহিতেই ভয় পাইল; এত কষ্ট—সেখানে আজ কি যন্ত্রণা! টেবিলে কতকগুলা শিশি পড়িয়া ছিল, সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই প্রভাত দাঁড়াইল। সেগুলি নাড়াচাড়া করিয়া নাম পড়িয়া রাখিয়া দিল। তারপর সামনের কাচের আল্‌মারী খুলিয়া একটা ছোট শিশি বাহির করিল। "মরফিয়া? হাঁ এই ঠিক্, খেলে দিব্যি ঘুম হবে।" বলিয়া কয়েক ফোঁটা মেজার গ্লাসে ঢালিয়া খানিকটা জল মিশাইয়া খাইয়া ফেলিল।—"খামোকা কেন ভেবে মরি—এবার ঘুমাই—ঠিক্ ঘুম হবে, ঠিক্ হবে—সব ঠিক্ হয়ে যাবে আবার!"

বিছানায় সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল; তাহার পর ঘুমাইল,—সত্যই ঘুমে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

* * * *

সকালে অনেক বেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। তখনও চোখে ঘুম লাগিয়া আছে। সর্ব্বাঙ্গে গ্লানি, কিন্তু সেই তন্দ্রালু ভাব তাহার মনের উপরও মোহের মত জড়াইয়া চিন্তার বেদনা ঢাকিয়া রাখিল।

তাহার দুয়ারে আজ ডাক আসিল না, সেও তাহা চায় নাই। বহুক্ষণ—কখনও চোখ বুজিয়া, কখন মেলিয়া, সে বিছানায় পড়িয়াই থাকিল। সামনে দুটি জানালা খোলা। মৃদু বাতাসের সহিত প্রবল শব্দ-বৈচিত্র্য ভাসিয়া আসিতেছে। সম্মুখে ফুটপাথে লোক-চলাচল দেখা যায়। হঠাৎ প্রভাত দেখিল, রাঙা কাপড় পরা ঝি-চাকরের দল হাতে ও মাথায় নানাবিধ সামগ্রী রঙিন্ আবরণে ঢাকিয়া সারিসারি চলিয়াছে।

তাহারা ক্রমে গণেশবাবুর বাড়ীতে উঠিল। ঊষার গায়ে হলুদের তত্ত্ব! নিশ্চয়ই তাই! তবে রাখালের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গেল। প্রভাতের বুকের মধ্যে সমস্ত রক্ত ধড়্‌ফড়্ করিয়া তখনি থামিয়া গেল,—আঃ!

এখনও কি আফিমের নেশা আছে? কৈ না, সে তো এখন বেশ সুস্থ। হাঁ সুস্থ। সে আবার দেহে-মনে অত্যন্ত সুস্থতা বোধ করিল। ঊষার বিবাহ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, 'বাঁচি কিম্বা মরি' প্রশ্নের হাত হইতে প্রভাত এবার মুক্ত। দূর হউক ভবিষ্যৎ—আর সে ভাবনা ভাবা যায় না!

বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া সে দেখিল, দিদি মা উপরে—মাতাও বোধ হয় সেইখানে। সে নিশ্চিন্ত মনে কলঘরে গিয়া প্রচুর জলে স্নান করিল। রাঁধুনীর নিকট হইতে একটু গরমজল লইয়া চা খাইল। ভাত প্রস্তুত, সে একবারও তাহা দেখিল না। তার পর কি মনে হইল—খোলা আল্‌মারীর উপর খানকত বাসি লুচি পড়িয়া ছিল, একটু চিনিমাত্র সহায়ে সেগুলি খাইয়া ফেলিল। রাঁধুনীকে বলিল, "আমি কলেজ যাচ্ছি, আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো।"

সন্ধ্যায় সে বাড়ী ফিরিতেছিল। তখন গণেশবাবুর দুয়ারে লোকারণ্য, ভিতরে সানাই বাজিতেছে। বাড়ীর উঠানে মাতার সহিত সাক্ষাৎ—তিনি তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন। উপরে তখনও আলো জ্বলে নাই, পূজার ঘরটি ঝাঁট্ দিয়া দিদি-মা সন্ধ্যা জ্বালাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ঔষধের গ্লানি ও অর্দ্ধাহারে তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তবু সে জোর করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। গৃহিণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। তখন প্রভাতই ডাকিল,—"দিদি-মা আমার উপর রাগ করেছ কি?" "জানিনে" বলিয়া গৃহিণী দিয়াশলাই ঘসায় মন দিলেন। "দিদি মা, ও দিদি-মা শোন; একটা কথা শোন আমার!" বাতিটি ঘরের চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে কপালে ছোঁয়াইয়া পিলসুজে রাখিয়া গৃহিণী বলিলেন—"বল্ না, কাণ আছে।" প্রভাত তাঁহার নিকট মাটিতে উবু হইয়া বসিল। কেমন পাগলের স্বরে বলিল—"দিদি মা, আমি এবার বিয়ে করব দিদি মা, তোমরা কনে ঠিক কর।"

"কি বলছিস্?" গৃহিণীর স্বর রোষ-গর্জ্জিত। প্রভাত তাঁহার পা-চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ঠিক্ বলছি, দিদি-মা। তোমরা যা বলবে, তাই করব; আর মিথ্যা নয়।" "ঠিক্ বলছিস্?" "ঠিক্ বলছি,—ঠিক্ বলছি, দিদি-মা—ঠিক্ বলছি এবার। দ্যাখ একবার!" তাহার কাতর স্বরে গৃহিণীর চিত্ত গলিয়া গেল। "ওঠ্, আর পাগ্‌লামো করো না।" বলিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার পর আদেশের স্বরে বলিলেন, "তবে আমি এই মাসেই বিয়ে দেব, বুঝলি? আটাশে দিন আছে।" "এই মাসেই—আটাশেই?—আচ্ছা তাই সই—তাই হোক্।"

ঘরে সাঁঝের শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। প্রদীপে ঘৃতের স্নিগ্ধতা জ্বলিয়া যাইতেছে; ধূপ আপনি দগ্ধ হইয়া সুগন্ধে চারিদিক পূর্ণ করিয়া দিল।

বিবাহে বিবিধ বাধা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন এম্-এ]

বরো বরয়তে রূপং মাতা তত্ত্বং পিতা পণম্।
বান্ধবাঃ * পদ্যমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

গৌরচন্দ্রিকা

মামি † উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল উপাধিধারী, উপার্জ্জনশীল, বয়সও নিতান্ত অল্প নহে, ত্রিশে পড়িয়াছি—অথচ আজও বিবাহ হয় নাই। শীঘ্র য় হইবে তাহার সম্ভাবনাও দেখি না, কেন না, কথায় বলে, বল, বুদ্ধি, ভরসা—তিন দশকে ফরশা।' দোজবরে বর ইলে বরং তাহার পঞ্চাশোর্দ্ধেও বনগমনের পরিবর্ত্তে পুনরায় বিবাহ ঘটিতে পারে (যদিও শেষে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'র াপটে তাহার 'যথারণ্যং তথা গৃহম্' হইয়া দাঁড়ায়); াহার পক্ষে বয়সের বাধাটা বাধাই নহে, সে যে কাঁচিয়া াণ্ডুষ করিতেছে। কিন্তু যে ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাইবুড়, তাহার আর কোন আশা নাই। শুনিবামাত্রই লাকের সন্দেহ হয়, নিশ্চিত 'কিঞ্চিৎ কুলে দোষঃ'; অথবা মারও কোন গুরুতর দোষ আছে। বাস্তবিক, বাঙ্গালীর রে ভাত থাকুক না থাকুক, এ শুভ কার্য্যটা শীঘ্র শীঘ্রই য়। বাঙ্গালী মা-বাপ মনে করেন, ছেলের বিবাহ দিয়া ফলিতে পারিলে, তাহার একটা 'হিল্লে' হয়, অর্থাৎ কূল সংসার-সমুদ্রে সে একটা কূল পায়; 'নাতীর াতী স্বর্গে বাতী'র আশাও তাঁহাদিগকে এ কার্য্যে ৎসাহিত করে; আর মহাপ্রভুর সময় হইতে শচীমাতার ত সকল বাঙ্গালী মাতারই ভয়, কামিনীর কাঞ্চনশৃঙ্খলে বাঁধিলে পাছে পুত্রটি বিবাগী হইয়া যায়। আজকাল আবার বিলাত-পলায়ন, বিড়ালাক্ষী-বিবাহ, ব্রাহ্মিকা-বাহ, বিপ্লববাদীর দলে মেশা প্রভৃতি আরও বিস্তর উপসর্গ যুটিয়াছে। এমন দেশে ও এমন সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমার এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকে। সেই জন্যই কথাটা পাড়িলাম। ভুক্তভোগী হাড়ে-হাড়ে আমার দুঃখের কাহিনীর যাথার্থ্য অনুভব করিবেন; আর যাঁহাদের আজও ফাঁড়া কাটে নাই, তাঁহারা আমার দশা দেখিয়া সাবধান হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে এই ভাগ্যহীনের মত ঠেকিয়া শিখিতে না হয়। দাঁত থাকিতে তাঁহারা যেন দাঁতের মর্য্যাদা বুঝেন। কথায় বলে,

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

অতএব যাঁহাদিগের কাঁচা বয়স, তাঁহারা 'শুভস্য শীঘ্রম্' নীতি অনুসরণ করিয়া বসন্তের টীকা লওয়ার ন্যায় সকাল-সকাল শুভকর্ম্মটা সারিয়া ফেলুন, অজাতশ্মশ্রু অবস্থায়ই সঞ্জাতশ্মশ্রু হইয়া জামাই-আদরে আহার-বিহারের বন্দোবস্ত করুন, আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

প্রথম বাধা

একে কুলীনের ছেলে, তাহাতে বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলাম, কাণা, খোঁড়া, কালা, কুঁজো, বোঁচা, খাঁদাও নহি—পুরুষের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট—ঘরেও 'অন্ধ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' অবস্থা নহে; 'একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্?' সুতরাং উপনয়নের পর হইতেই বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু আসিলে কি হয়? 'গুণ হয়ে দোষ হ'ল আমার বিদ্যায়।' পিতাঠাকুর মহাশয় কোট ধরিলেন,—ছেলের লেখাপড়া সাঙ্গ না হইলে বিবাহ দিবেন না; বিবাহ হইলে না কি পাঠ্য-পুস্তকের পাতায়-পাতায় নানা ভঙ্গীর ফোটোর আবির্ভাব হইয়া পাঠার্থীর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়; অতএব ছাত্রজীবনে 'ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্'

* অর্থাৎ পদ্যে রচিত প্রীতি-উপহার।

† আপনারা ভুল বুঝিবেন না। লেখক নিজের ঢাক নিজে জাইতেছেন না অর্থাৎ আধুনিক প্রণালীতে আত্মকাহিনী লিখিতেছেন । বৃত্তান্তটি আগাগোড়া কাল্পনিক।

পালনীয়, পাঠ-সমাপনান্তে গৃহী হওয়াই প্রশস্ত ইত্যাদি অনেক সারগর্ভ বচনে তিনি মাতাঠাকুরাণীকে নিরস্ত করিলেন। তিনি আধুনিক আয়ুষ্কালের হারে মনুবচনের ব্যাখ্যা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, পাশকরা যুবকের বিংশত্যধিক বর্ষ বয়সেই বিবাহ বিহিত। অথচ পিতৃদেবের শুনিয়াছি উপনয়নের পরেই আইবুড় নাম ঘুচিয়াছিল; এমন কি, পিতামহীর অনুরোধে বিবাহের সুবিধার জন্য উপনয়নটা নবমবর্ষেই সারা হইয়াছিল, এমন কথাও শুনিয়াছি। তাঁহার ইহাতে লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটা দূরে থাকুক, বিবাহের পর হইতেই তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। [ইহাকেই বলে, 'নিজের বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাত'। যাক্, গুরুজনদিগের সম্বন্ধে এতটা personal (ব্যক্তিগত?) হওয়া বেয়াদবি।] লোকে বলিত, সে সবই মাতৃদেবীর পয়ে। তা' 'পয়' জিনিশটা কি এ বংশে মাতৃদেবীই নিঃশেষ করিয়াছেন? [আবার বেয়াদবি করিতেছি।] মা-আমার ছিলেন নিরীহ ভালমানুষ; তাঁহার বড় সাধ ছিল, ছোট্ট একটি রাঙ্গা টুক্‌টুকে বৌ আসিয়া ঘরময় গুড়্‌গুড় করিয়া বেড়াইবে, আর তিনি সেই বিড়ালশিশুর চঞ্চল লীলা দেখিয়া জননীজন্ম সার্থক করিবেন; কিন্তু পরম পূজনীয় পিতৃদেবের শাস্ত্রব্যাখ্যার দাপটে তাঁহার সে সাধ স্নেহময় হৃদয়-সাগরে জল বুদ্‌বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া পরক্ষণেই বিলীন হইল।

দ্বিতীয় বাধা

আমার শিক্ষা-সমাপ্তির পর পিতৃদেব ঘটকদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন। কিন্তু তখন আবার আর এক বাধা উপস্থিত হইল। সাধে কি বলে, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'? কুলে-শীলে মিল, গণ-বর্ণে মিল, এ সব ত চাইই; পরন্তু, উপযুক্ত পরিমাণ গণপণ, বরাভরণও মেলা চাই। আমার শিক্ষায় বরাবর যে ব্যয় পড়িয়াছে, সেই টাকাটা মূলধন ধরিয়া এত বৎসর মায় সুদ কত টাকা হইত, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব খাড়া করিয়া তিনি দশ হাজার টাকা বরপণ হাঁকিলেন! তিনি গণিতশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, তাঁহাকে হিসাবে আঁটিয়া উঠে, কাহার সাধ্য? প্রতিবেশীরা প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিতেন, "ভাই হে, হিসাবের অত মারপেঁচ না বুঝ, 'পাঁচটি পাশে পাঁচটি হাজার সোজা রূল্ অভ থ্রী ('Rule of Three)' এটুকু ত বুঝ? আর জমিদারীর বেলায় বিশগুণ পণ ধমে, আমি দ্বিগুণ পণ দশ হাজার ধরিতেছি, বেশী কি?' 'ছেলে কি মাটির চেয়েও সস্তা?" তাঁহার পুত্রের শিক্ষার খরচটা মায় সুদ কন্যাকর্ত্তার কাছ হইতে একতরফা ডিক্রী করিয়া কেন আদায় করিবেন, এ কথা লইয়া কেহ তর্ক করিতে আসিলে, তিনি ত্বরিত জবাব দিতেন,—"এখনকার ছেলেরা রোজগার করিয়া মা-বাপকে কিছু দেয় না, স্ত্রীর পাদপদ্মেই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেয়; অতএব ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের কন্যাই যখন পাত্রের উচ্চশিক্ষা কল্পতরুর সুবর্ণফল একা-একা ভোগ করিবে, তখন শিক্ষার খরচাটা কন্যার পিতা দিবেন না ত কি পাড়ার লোকে দিবে?" ইহার উপর আর তর্ক চলে না।

পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণীরও অবশ্য একটা মত ছিল। আজকাল আর পিতৃদেব তাঁহার ন্যায্য কথার প্রতিবাদ করিতেন না। সুতরাং মা-আমার মন খুলিয়াই নিজের সাধ জানাইতেন। বাবা বলিয়াছিলেন,—'পাঁচটি পাশে পাঁচটি হাজার, সোজা রূল্ অভ থ্রী!' মা তাহার সহিত মিল রাখিয়া সংক্ষেপে বলিলেন,—"হীরে-মুক্তোয় মুড়ে আন্‌বো বৌমা লক্ষ্মী-শ্রী!" ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আরও বলিলেন,—"মা-লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন, এক গা গয়না না হইলে কি করিয়া চিনিব যে তিনি মা-লক্ষ্মী, না আর কেউ? আর নগদ-ফগদ আমি অত বুঝি না। তবে বেহাই যদি ভদ্রলোক হন, তা' হলে দানসামগ্রী, নমস্কারী, ফুলশয্যা ও বারমাসে তের তত্ত্ব অবশ্য বেশ সৌষ্ঠবমত দিবেন—পাঁচজনকে দিয়া, দেখাইয়া যেন সুখ হয়; আমি কিছু খাবও না, মাখ্‌বও না। আমার অমুকের কল্যাণে আমার কি খাওয়া মাখার দুঃখু আছে গা?" দু'জনের দু'রকম রা, কিন্তু হরে-দরে হাঁটু জল নহে, একেবারে অতলস্পর্শ! সুতরাং সব সম্বন্ধই ভাসিয়া গেল। কুল ভাঙ্গিলে হয় ত চড়া দর মিলিত, কিন্তু কুলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পিতাঠাকুর মহাশয় (Engenics) সুপ্রজননবিদ্যার বিলাতী কেতাব হইতে রাশি-রাশি অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিতেন। তাঁহার বিদ্যার বৈচিত্র্য ও গভীরতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর! আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে তাঁহা অপেক্ষা ধনী ও সম্ভ্রান্ত হইয়াও 'সুবর্ণসুযোগ' পাইয়া কুল ভাঙ্গিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু এ বিষয়ে পিতাঠাকুর মহাশয় আশ্চর্য্য-রকম (Conservative) রক্ষণশীল ছিলেন।

আমি সব শুনিতাম, কিছু বলিতাম না ; কতক লজ্জায়, কতক ভয়ে, কতক অবহেলায়, আর কতক মজা দেখার জন্য, উচ্চবাচ্য করিতাম না। হায়! তখন বুঝি নাই, শেষে কাহার মজা কে দেখিবে!

এইভাবে কয় বৎসর গেল। হঠাৎ মাতা-পিতা উভয়েই স্বর্গারোহণ করিলেন। আমি আইবুড়ই রহিয়া গেলাম।

তৃতীয় বাধা

যখন মাতা-পিতার স্বর্গলাভ হইল, তখনও বিবাহের বয়স উৎরাই নাই ; স্বাধীন ও উপার্জ্জনশীল হইয়াছিলাম। অবশ্য নিজে উদ্‌যোগী হইয়া বিবাহ করিতে পারিতাম। আর ঘন-ঘন সম্বন্ধ আসা কালাশৌচের জন্যও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু আবার এক নূতন বাধা আসিয়া আমার সাধে বাদ সাধিল।

'নয় শ পঞ্চাশ দাও'—আমার এমন খাঁই নাই, কুলশীল, কোষ্ঠী-বিচারেরও ধার ধারি না (আমার ওসব কুসংস্কার নাই, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' আমার মূলমন্ত্র)—কেবল আমি চাই, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী জীবনসঙ্গিনী প্রণয়তরঙ্গিণী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী হইবেন। অতি ন্যায্য কথা, অথচ ঘটক-ঘটকীরা বলিলেন, ইহাও একরকম ধনুকভাঙ্গা পণ। তাঁহারা তর্ক যুড়িলেন, 'সবাই যদি এই পণ করিয়া বসে, তাহা হইলে ত হিন্দুর ঘরের পাঁচ-পাঁচীগুলা বিকাইবে না। আর পাত্রগুলিও ত এক-এক কন্দর্প নহেন ; তাঁহাদের জননী-ভগিনীরা যত রূপসী, তাহাও আমাদের অছাপি নাই ;' ইত্যাদি। [শেষ কথাটা বলিলেন ঘটকী ঠাকুরাণীরা।] আমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া পাড়ার বিজ্ঞেরা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, এ সঙ্গত কথা বটে ; গৃহিণী সুশ্রী না হইলে তাঁহার গর্ভজাত কন্যাগুলি পার করার বেলায় যে ফাঁফরে পড়িতে হইবে। আর বিশেষ বাপাজীর নিজের যা' চেহারা!" (লোকগুলার অনধিকার-চর্চ্চা দেখুন!) সমবয়স্কেরা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "দাদা, ঠিকই বুঝেছ! সকালে যে মুখ দেখিয়া উঠিতে হইবে, 'সেই মুখখানি' যদি লক্ষ্মীর মত না হইয়া লক্ষ্মীর বাহনের মত হয়, যাঁহাকে শয়নকালে শয্যার্দ্ধ (অনেক সময়ে অর্দ্ধেকেরও বেশী) ছাড়িয়া দিতে হইবে, 'অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে' নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে আচম্বা দেখিয়া যদি পত্নীর পরিবর্ত্তে অন্য-কিছু ভ্রমে আঁতকাইয়া উঠিতে হয়, তাহা হইলে বড় মুস্কিল বটে!" [লোকগুলার কি আস্পর্দ্ধা!] কিন্তু এ সব নিষ্কারণ-বন্ধুর আলোচনায় আমি তুষ্টও হই নাই, রুষ্টও হই নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার সাহস—স্নায়বিক ও 'নৈতিক'—উভয়ই যথেষ্ট, আমি অযাত্রাও মানি না, ভূতপেত্নীও মানি না। আর আমার রত্নগর্ভার গর্ভে যে হীরার টুকরা পুত্র না জন্মিয়া মাটীর ঢিবি কন্যা জন্মিবে, এরূপ আশঙ্কাও আমার মনে স্থান পায় নাই। সুতরাং এ সব কথা সুবুদ্ধির মত হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। তবে আমি প্রকৃত কি কারণে সাকারা সুন্দরী, ডানাকাটা পরী, স্বর্গের 'অপ্সরী' বিদ্যাধরী, 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' চাহি, তাহা 'প্রকাশ করিয়া' কহিতেছি। আপনারা শুনিয়া নরজন্ম সার্থক করুন।

কাহিনী

শিশুকালে শৈশব-সুলভ চপলতার দোষে যখনই কোন-রূপ বায়না ধরিয়া কান্না যুড়িয়া দিতাম, তখনই স্নেহময়ী মা, পিসি-মা, ঠাকুমা প্রভৃতি 'রাঙ্গা বৌ আনিয়া দিব, তাহার সহিত খেলা করিবে,' এই বলিয়া শান্ত করিতেন। কৃষ্ণ-নামে যেমন শ্রীরাধার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইত, আমার তেমনই রাঙ্গা বৌএর নামে ক্রন্দন থামিত। জানি না, সেই অজ্ঞান শিশুচিত্তে রাঙ্গা বৌএর কি মোহিনী শক্তি অনুভূত হইত! হয় ত গুরুজনের বাক্য বলিয়া এই স্তোকবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম, এমন কি, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে, এ আশাও মনে-মনে পোষণ করিতাম। তবে তখনকার মনের ভাব এখন এ বয়সে ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। সকলেই ত কূপর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা রবীন্দ্রনাথ নহে। যাহা হউক, এইরূপে 'সুকুমার শিশুকাল শিক্ষার সময়' অতিবাহিত করিলাম।

যখন নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলাম না, তখন ঠাকুমার মুখে রূপকথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িতাম। আর সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে কোন্‌ অচিন দেশের অচিন পুরীর কেশবতী রাজকন্যার মুখখানি, রাক্ষসপুরীর বন্দী অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকুমারীর মুখখানি, এইরূপ কত সুন্দর-সুন্দর মুখ স্বপ্নেও মনের ভিতর ওলটপালট করিত। সেই সুমধুর কল্পনার সোণার কাঠীর পরশে শরীর রোমাঞ্চিত হইত, হৃদয় সুখের সায়রে ভাসিত।

এইরূপে বাল্যেই কোমলচিত্তে সুন্দরী বধূর ছবিখানি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল।

তাহার পর স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া, কয়েক বৎসর পরেই যখন লুকাইয়া-লুকাইয়া ইংরেজী, বাঙ্গালা উপন্যাস, নবন্যাস, রমন্যাস, রহোন্যাসের স্বাদগ্রহণ করিতে শিখিলাম (ইহার মধ্যে ফরাসী ও ফার্শী কেতাবেরও অনুবাদ ছিল), তখন কত নায়িকা-উপনায়িকা-প্রতিনায়িকার দর্শন পাইলাম, কত তিলোত্তমা-মনোরমা, মৃণালিনী-কুন্দনন্দিনী, রোহিণী-শৈবলিনী, রাধারাণী-কমলমণি, ইন্দিরা সুভাষিণী, লবঙ্গলতা-সূর্য্যমুখী, কত ফ্লোরা-রোজা, রেবেকা-রাওয়েনা, মানস-নয়নে প্রতিভাত হইলেন; তাঁহারা সকলেই মনোমোহিনী সুন্দরী। ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গাতে অনুমানে বুঝিলাম, গৌরাঙ্গিনী না হওয়াতেই তাহার এই দুর্দ্দশা। প্রথম যৌবনে এই সব লঘু-সাহিত্যপাঠে ভবিষ্যৎ সংসারসঙ্গিনীর যে মানসী প্রতিমা গড়িলাম, তাহা একেবারে চিত্তপট যুড়িয়া রহিল। কাহার সাধ্য, সেই উজ্জ্বল চিত্র মুছিয়া ফেলে?

আবার যখন কিঞ্চিৎ রসবোধ হইলেই কলিকাতায় পাঠকালে থিয়েটার দেখা সুরু করিলাম, তখন এইসব নায়িকা-উপনায়িকা-প্রতিনায়িকার ভূমিকা লইয়া যাহারা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইত, তাহাদের ছলাকলা, লাস্যলীলা ও (কৃত্রিম) রূপরাগ-দর্শনে অন্তর্নিহিত রূপ-লালসা ও সৌন্দর্য্য পিপাসা আরও বর্দ্ধিত হইল। শৈশবে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, প্রথম-যৌবনে তাহা পল্লবিত হইতে লাগিল।

যাক্, এ সব বাজে বই ও বাজে কায লইয়া আর বাগাড়ম্বর করিব না। বাহিরের উপসর্গ ছাড়িয়া দিয়া, খাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলির ধাতু কিরূপে আমার প্রকৃতিতে মিশিল, এক্ষণে সেই কথা বলি।

বলা বাহুল্য, পরীক্ষা পাশ করিবার প্রয়োজনে ও প্রলোভনে যে সকল সাহিত্যগ্রন্থ প্রাণপণে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি ও প্রোফেসারের পদপ্রান্তে বসিয়া সরস ব্যাখ্যাবিবৃতিসহ অধ্যয়ন করিয়াছি, সেগুলির মর্ম্ম অস্থিতে-অস্থিতে মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম-যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড় পাইয়া যে সকল মনোমোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ের দ্বার দিয়া "প্রাণের প্রাণ-মাঝারে' প্রবেশ করিয়াছে, যাহাদিগের স্মৃতি উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়া, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে, পাঠাগারে-পরীক্ষামন্দিরে, শৌচাগারে-জলখাবারের ঘরে, ছাত্রাবাসে-ক্রীড়াঙ্গনে ছায়ার মত haunt করিয়াছে, যাহাদিগের 'প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত' রহিয়াছে, সেগুলিকে,

"ভোলা যায় কি কথার কথা?
প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা।
শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িতা লতা।"

এখন বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, পাঠ্য-পুস্তকগুলি কতক বিলাইয়া দিয়াছি, কতক বিক্রয় করিয়াছি, অধ্যাপকের মৌখিক বক্তৃতা ও ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখিত লম্বা-লম্বা নোট, প্রকাণ্ডকায় অর্থপুস্তক ও প্রশ্নোত্তরমালা, রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ-কণ্ঠস্থ করা, পরীক্ষাফলের জন্য উৎকণ্ঠা, সংবাদপত্রে পরীক্ষার ফল-প্রকাশ, পাশের আনন্দ,—সবই অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে, সে সকলের স্মৃতি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পঠদ্দশায় পাঠ্যপুস্তকের মারফত যে সব আদর্শ-সুন্দরীর সাক্ষাৎকার-লাভে ধন্য হইয়াছি, তাহাদিগকে ত ভুলিতে পারি নাই। তাহারাই স্থায়িভাব, তাহারাই স্থাবর সম্পত্তি। They have come to stay.

'প্রলয়ের জলে হায়
যদি বিশ্ব ভেসে যায়
তবু না ভুলিব তায়,
রাখিব কণ্ঠেরি হারে।'

যৌবনে দৃষ্ট সুন্দরী-স্বপ্ন (Dream of Fair Women) এখনও যে চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে স্বপ্ন টুটিবার নহে, সে মোহ ঘুচিবার নহে, সে স্মৃতি ভুলিবার নহে। রাজমিস্ত্রীরা ভাড়া বাঁধিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করে, নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে ভাড়া খুলিয়া লয়, সুধাধবলিত সৌধ নয়নের সমক্ষে শোভা পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষাও সেই ভাড়াবাঁধা; ভাড়া বহুদিন হইল খুলিয়া লইয়াছে; কিন্তু এখনও সুন্দরীকুলের সুধামাখা মুখ হৃদয়-ক্ষেত্রে শোভা পাইতেছে। এক-এক করিয়া বলি আপনারা শ্রবণ করিয়া কর্ণ পবিত্র করুন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা-রূপ সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া (আমাদের সময়ে মাতৃকুলাসনের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন মহল বাড়ীতে প্রবেশ করিতে

হয়। প্রথম মহল্ল এল-এ বা এফ-এ পরীক্ষা (আধুনিক নাম ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ মধ্য পরীক্ষা)। এই মহলে প্রবেশ করিতে গিয়াই গোল্‌ড্‌স্মিথের 'পরিত্যক্ত পল্লী'তে The bashful virgin's sidelong looks of love অর্থাৎ 'অজ্ঞাতোপযমা নবযৌবনা'র 'তরল নয়নে তেরছ চাহনি'তে প্রাণে বিজলী খেলিয়া গেল। The matron's glance that those looks reproved অর্থাৎ বর্ষীয়সী পুরন্ধ্রীর তিরস্কার-সূচক উগ্রদৃষ্টি যেমন উক্ত তরুণীর হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তেমনই আমারও মনে স্থান পাইল না। আর শৌণ্ডিকালয়ে সেই ব্রীড়াবতী বালার সুরাপাত্র প্রসাদী করিয়া দেওয়ার কথা—

The coy maid half-willing to be prest
Shall kiss the cup to pass it to the rest,

নবীনা গোপকুমারীর গীত ও নবীন গোপ যুবকের দোয়ারকির কথা—The swain responsive as the milkmaid sung—সরলা পল্লীবালার সহরবাসের কুফলের কথা প্রসঙ্গে তাহার কমনীয় সৌন্দর্য্যের কথা—

Her modest looks the cottage might adorn,
Sweet as the primrose peeps beneath the
thorn.

উপনিবেশগামিনী অশ্রুমতী নবযুবতীর প্রণয়ীর সহিত চিরবিচ্ছেদে অন্তর্গূঢ় হৃদয়-বেদনার কথা—

His lovely daughter, lovelier in her tears

* * * * *

Silent went next, neglectful of her charms
And left a lover's for a father's arms.

'ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈঃ' হৃদয়ক্ষেত্রে কি সরসতা-সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বুঝিলাম, গোল্‌ড্‌স্মিথ্ অন্বর্থনামা, তিনি খাঁটি সোণার কারবার করিতেন।

আবার এই মহলের আর একটি প্রকোষ্ঠে ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, তিনিও অন্বর্থনামা, তাঁহার কথাগুলির (words) মূল্য (worth) আছে। আহা! তাঁহার Lucy—'গোধূলিললাটে তারারত্ন যথা'

Fair as a star, when only one
Is shining in the sky,
A lovelier flower
On earth was never sown,

ও তাঁহার হৃদয়তোষিণী সহধর্ম্মিণী—

'She was a phantom of delight
When first she gleamed upon my sight
A lovely apparition sent
To be a moment's ornament,
* * * * *
A dancing shape, an image gay,
To haunt, to startle and waylay,

আমার হৃদয়-আকাশে যুগল-সুধাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আবার কবির একবারমাত্রদৃষ্টা চতুর্দ্দশবর্ষ দেশীয়া সুন্দরী শিরোমণি হাইল্যাণ্ড-কুমারীকে আমারও কবির সঙ্গে সঙ্গে কতবার বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল —

Thy elder brother I would be,
Thy father, anything to thee.

আহা! এই সব রসগর্ভ কবিতাপাঠে রসের যে রসদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার জেরে 'পদ্যপাঠে'র 'কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ' উষ্ট্রের মত জ্যামিতি-ত্রিকোণমিতি-বীজগণিত-পাটীগণিত-প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মরুভূমি অনায়াসে পার হইয়া গিয়াছি, একটুও ক্লান্তিবোধ করি নাই।

এই মহলের আর একটি প্রকোষ্ঠে উত্তর দেশের যাদুকর (Wizard of the North)—আমাদের অবশ্য খাড়া পশ্চিম—তাঁহার যে মানসী কন্যা সরঃসুন্দরীকে (Lady of the Lake) আমার সমক্ষে হাজির করিলেন, তাহার মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য কি কখন ভুলিতে পারিব ?

And ne'er did Grecian chisel trace
A nymph, a Naiad or a Grace
Of finer form or lovelier face.

আহা! যেন একাধারে গ্রীকপুরাণোক্ত দেবলোকের সকল শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, যেন প্যাণ্ডোরা, যেন তিলোত্তমা!

শুধু যে পদ্যের খাস কামরায়ই এই সব সুন্দরীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম তাহা নহে, গদ্যের গোসলখানায়ও রসের

খোরাকের অভাব ছিল না। গোল্ড্স্মিথের গদ্য-কাব্য Vicar of Wakefield এ ওলিভিয়া-সোফিয়া দুই ভগিনীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া কতবার গের (Gay) ডাকাইত-সর্দ্দার ম্যাক্হীথের (Macheath) মত আনন্দ-গদ্গদ-কণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে *—

How happy could I be with either
Were t'other dear charmer away.

আবার সেই গদ্য আখ্যায়িকার মধ্যে গ্রন্থকার যে দুইটি কবিতা গছাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে (lovely woman) রমণীয় রমণীর কথা এবং সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশধারিণী প্রেমময়ী এঞ্জেলিনার, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় রূপরাশির কথা হৃদয়-পাষাণে চিরদিনের মত সুবর্ণ-অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে।

কটমট ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিতাত্মক পুস্তক হইলেও 'জেনোফন' নামক গদ্য গ্রন্থখানি নিতান্ত ফেলনা নহে। হাজার হউক, গ্রীক জাতি সৌন্দর্য্যপ্রবণ ছিল, তাহারা সংগ্রাম-বর্ণনা ও দার্শনিকতত্ত্ব-প্রকটনের অন্তরালেও কাব্যরস ঢালিবার অবসর অবহেলা করে নাই, 'রণজয়' গায়িতে গিয়াও 'রমণীতে নাহি সাধ' বলিয়া কবুল জবাব দেয় নাই। Abradates and Panthea নামধেয় নায়ক-নায়িকার প্রেম-কাহিনীটি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আবার গ্রীক-বাহিনীর শত্রুর দেশে শত শত ক্রোশ ধরিয়া বিপৎ-সঙ্কুল অভিযান-ব্যাপারের মধ্যেও

'Some pretty female captives were
smuggled through'.

এই জবর খবরে রসিক-হৃদয় নাচিয়া উঠে। কঠোর-প্রকৃতিক ইতিহাস-বিশারদ প্রোফেসার মহাশয় যখন এই অংশটি পড়াইয়াছিলেন, তাঁহার তদানীন্তন মুখবিকৃতি এখনও বেশ মনে পড়ে! তাই বলিতে ইচ্ছা করে, শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকায় কেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র'!

বিশ্ববিদ্যালয় ত বিশ্ব-ছাড়া বিশ্বনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত নহে, সুতরাং এখানেই বা ব্যতিক্রম হইবে কেন?

ইংরেজী সাহিত্যেরই যখন এই হাল, তখন আর আদি-রসপ্রধান বলিয়া 'উচ্চশিক্ষিত'-সমাজে ধিক্কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের কথা তুলিয়া অনর্থক পুঁথি বাড়াইব না।

তাহার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন মহল বাড়ীর প্রথম মহল পার হইয়া যখন দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করিলাম, অর্থাৎ বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন যে কি রমণীয় রমণী-রাজ্যে রসসঞ্চয়ে রত হইলাম, তাহা আয়স লেখনীমুখে প্রকাশ করা অসাধ্য। (বি-এ পরীক্ষায় রস-সাহিত্যের এত রসদ-সংগ্রহ কি 'বি-এ' ও 'বিয়ে'* এই দুইটি শব্দের সাম্য বশতঃ? ইংরেজীজ্ঞ হয় ত বলিবেন, বি-এ অর্থাৎ Bachelor of Arts অবস্থায়ই যদি এই, তবে M-A. অর্থাৎ Married of Arts অবস্থায় কি হইবে? অপরং কি ভবিষ্যতি?) রসের ভাণ্ডারী এক দিকে শেক্স্পীয়ার, অপর দিকে কালিদাস। আবার শেক্স্পীয়ারের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ টেনিসন দোসর, শুধু গৌর নয়কো আমার, গৌর-নিতাই! (আজকাল আবার, সাগর বৌএর মত বঙ্কিমচন্দ্রও একটি কুঠারী পাইয়াছেন! একেবারে চতুঃসাগরী!) টেনিসনের কবিতাগুলি অধুনা এক ধাপ নীচে নামিয়াছে, অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বোধ হয়, মাতৃকুলাসনে বয়োবৃদ্ধির দরুণ এই পরিবর্ত্তন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' এখন ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মিত্ররূপে গণ্য হয়; সুতরাং এখন অনায়াসেই তাহারা 'অন্তর্ম্মধ্য' অবস্থায়ই এই সব কবিতার রসগ্রহণ-সমর্থ হয়। যাক্, জাতব্যবসার ঝোঁকে এ সব কি আলোচনা (talking shop) আরম্ভ করিলাম? আবার সেই রসের রাজ্যের কথা বলি।

দ্বিতীয় মহলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া কি দেখিলাম? দক্ষিণে ব্রহ্মর্ষি কণ্বের প্রাণসমা পালিতা দুহিতা শকুন্তলা—

---

* আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে' 'শালিবাহন' অক্ষয়ের যুগল শ্যালিকা সম্বন্ধে উক্তি স্মর্ত্তব্য:—

ডান দিকেতে তাকাই যখন
বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন
দক্ষিণেতে পড়ে টান।

---

* পল্লীগ্রামের 'বিয়ে' কলিকাতায় 'বে' হইয়াছে। ইংরেজীতে 'বি-এ' 'বে' হয়! পল্লীগ্রামের মূর্খ লোকে বুঝি বাণান করিয়া বলে, আর সহরে বিদ্বান্ লোকে বুঝি Look and Say প্রণালীতে এক ডাকেই বলিয়া ফেলে?

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ।
রনামুক্তং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥
অধরঃ কিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

আর বামে রাজর্ষি প্রস্পেরোর প্রাণসমা দুহিতা

Admired Mrianda !
Indeed the top of admiration ! Worth
What's dearest to the world ! Full many a lady
I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear : for several virtues,
Have I liked several women ; never any
With so full soul, but some defect in her
Did quarrel with the noblest grace she owed
And put it to the foil : but you, O you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best !

আহা! এই 'বিদেশিনী' যে আমার নিতান্ত আত্মীয়া দীনবন্ধুর লীলাবতীকে স্মরণ করাইয়া দেয় :—

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়।
তাই তা'রা বলিয়াছে অজ্ঞান-কারণ
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,

* * * *

লীলায় দেখিত যদি তা'রা একবার
এক স্থানে বসে হ'ত রূপের বিচার।

আবার কি দেখিলাম ? দক্ষিণে গ্রীকপুরাণোক্ত সাগর-গর্ভজা এফ্রোডাইটি দেবী (অব্রদুহিতা ?) বা হিন্দুপুরাণোক্ত ক্ষীরোদসমুদ্রোত্থিতা সুধাভাণ্ডধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় 'জগৎ-ত্রয়ললামভূতা' সাগরিকা বা রত্নাবলী 'রত্নাবলীব',

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যা পারিজাতস্য পল্লবঃ।
অম্ভোজগর্ভসুকুমারতনুস্তদাসৌ
কণ্ঠগ্রহে প্রথমরাগঘনে বিলীয়।
সদ্যঃ পতন্মদনমার্গণরন্ধ্রমার্গৈঃ
মন্যে মম প্রিয়তমা হৃদয়ে প্রবিষ্টা॥

এবং তাঁহার পার্শ্বে পাটরাণী বাসবদত্তা

আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্টিরিব।

আর বামে য়িহুদিদুহিতা 'Pretty Jessica' 'most sweet Jew' 'wise, fair and true.'
এবং তাঁহার পার্শ্বে অপূর্ব্ব সুন্দরী পোর্শিয়া

Nothing undervalued
To Cato's daughter, Brutus' Portia.

আবার এই সুন্দরীযুগলের রূপচ্ছটায় নেত্রোৎসব সম্পাদন করিয়াও পাছে পরিতৃপ্ত না হই, তাই শেক্স্পীয়ারের 'ভাই লক্ষ্মণ' টেনিসন তাঁহার Dream of Fair Women 'সুন্দরীস্বপ্নে' সুন্দরীর মহামহোৎসব লাগাইয়াছেন ; এই খোসরোজায়, এই রূপের হাটে, য়িহুদি, মৈশরী, গ্রীক, ইংরেজ, ফরাশী সকল জাতির রমণীরত্ন সৌন্দর্য্যের পশরা খুলিয়া বসিয়া আছেন। আর তাঁহার দুঃখিনী Oenone

Lovelier than whatever Oread haunts
The Knolls of Ida, loveliest in all grace
Of movement,

এবং সৌন্দর্য্যাভিমানিনী গ্রীক দেবী Here (শচী), Athene (সরস্বতী) ও Aphrodite (রতি) রূপের ঝলকে রাজপুত্র প্যারিসের ন্যায় আমার চক্ষুঃ ঝলসাইয়া দিলেন ; আশা করি, আপনাদেরও এতক্ষণে সেই দশাই ঘটিয়াছে। অতএব আর তৃতীয় মহলের খবর না দিয়া —এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

সকল কথাই খুলিয়া বলিলাম। এক্ষণে আপনারাই বিচার করুন, যৌবনের প্রথম উন্মেষ-কালে এই সকল মোহিনী মূর্ত্তি চিত্তপটে পরিগ্রহ করিয়া, এখন কিরূপে একটা

খেঁদী, পেঁচী, বুঁচী, কচি, নেড়ী, ভূতী, থাকী,
নসী, জগী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুলকী
সিন্দুরের বিন্দু-সহ কপালেতে উল্কী

পরিগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব ?*

* 'বৃত্তান্তটি আগাগোড়া কাল্পনিক'—প্রবন্ধ-লেখক আরম্ভে এইরূপ সাফাই গাহিয়াছেন ; কিন্তু ইহাকে নিরবচ্ছিন্ন কাল্পনিকই বা বলি কি করিয়া ? এই রূপোন্মাদ ও তজ্জনিত বিবাহাতঙ্ক ক্রমেই আমাদের যুবকদিগের মধ্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে না কি ? কুকুরদংশন-জনিত উন্মাদ ও জলাতঙ্ক রোগের পুরাতন ও আধুনিক উভয়বিধ চিকিৎসা আছে। কিন্তু এই নূতন রোগের প্রতিকার কি ?—সম্পাদক।

অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ

[শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

সিড্‌নি (Sydney)

সিড নি বন্দর
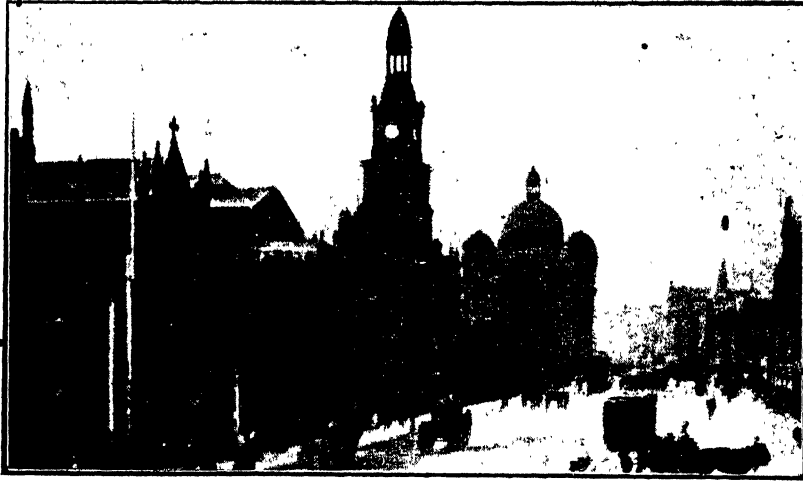
সিড্‌নি—জর্জ্জ ষ্ট্রীট, সেণ্ট এণ্ড্রুজ ক্যাথিড্রেল, টাউনহল প্রভৃতি

বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে আমাকে ভারতবর্ষের বাহিরে অনেক স্থানে যাইতে হইয়াছে। যখন যেখানে গিয়াছি, সেই স্থানের বিবরণই আমার ডাইরিতে লিখিয়া রাখিতাম। আজ সেই ডাইরি হইতে আমার অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণের এক অংশ 'ভারতবর্ষের' পাঠকপাঠিকাগণের নিকট দাখিল করিলাম। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আমি ফিজি দ্বীপে যাই, সেখান হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় যাই। ভারতবর্ষ হইতে যখন যাত্রা করি, তখনকার কথা আরম্ভ করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত

পৌঁছিতে হইলে অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হয়; এবারে আর তাহা করিতেছি না; সে ধারাবাহিক বিবরণ যদি পারি, তবে পরে একে-একে বলিব; এবার আমি অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত সিডনি নগরের বিবরণই লিপিবদ্ধ করিব; পথের কথাও বলিব না। তবে যে-দিন সিডনি বন্দরে আমি উপস্থিত হই, সেই দিনের দুইচারিটি কথা দিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব আরম্ভ করিব।

সিডনি—জর্জ্জ ষ্ট্রীট, দক্ষিণাংশ

সিড্নি—এলিজাবেথ ষ্ট্রীট

২৩শে এপ্রিল, ১৯১৫। গত রাত্রে আমাদের জাহাজ সিডনি বন্দরে (Sydney Harbour) পৌঁছিয়াছে; কিন্তু আমি কা'ল জাহাজ হইতে নামি নাই। আজ বেলা ১২টার সময় জাহাজ হইতে নামিয়া সিডনি সহরে পদার্পণ করিব, মনে করিতেছি। আজ মেঘ করিয়া রহিয়াছে, বৃষ্টিও মাঝে-মাঝে হইতেছে। আমার সঙ্গে মালপত্র বিস্তর আছে। ভাবিতে লাগিলাম মুটে কোথা পাই? বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না; আমাদের ওখানে ট্রামের ইন্‌স্পেক্টরের যে রকম টুপি মাথায় দেয়, সেইরূপ 'পোর্টার' লেখা টুপি মাথায় ও প্যাণ্টকোট-শোভিত জনকয়েক গোরা মুটে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজনকে আমার মাল নামাইতে বলিলাম। সে বসিবার ঘর (drawing room) থেকে সমস্ত মাল চুঙ্গী আফিসে (Custom Shed) নামাইয়া

বারাণসী-দৃশ্যাবলী

১। গঙ্গামহল ঘাট - কাশী ২। জ্ঞানবাপী কাশী ৩। বারাণসী ঘাট কাশী ৪। মণিকর্ণিকা ঘাট কাশী

শিল্পী—শ্রীললিতমোহন সেন। School of Arts and Crofts—*Lucknow*.

রাখিল। জাহাজের কামরা থেকে যে ক্যাবিন ভৃত্য (Boy) বসিবার ঘরে মাল আনিয়াছিল, সে বক্‌সীসের জন্য আসিল না। গোরারা বক্‌সীসের জন্য আমাদের দেশের মজুরের মত করে না। ফিজিতে যখন জাহাজ থেকে নামি, তখন চলে না। এখানে গাড়ীতে (cab). দুই জনের বেশী আরোহী বসিবার স্থান নাই, এবং কষ্টেসৃষ্টে দুইটী ছোট রকমের বাক্স সঙ্গে লওয়া যায়। মালের গাড়ী আলাদা; উহাকে এখানে Truck বলে! A. F. Field এর মালবাহী গাড়ী

সিড নি—ইয়র্ক ষ্ট্রীট

সিড্‌নি—সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেসন
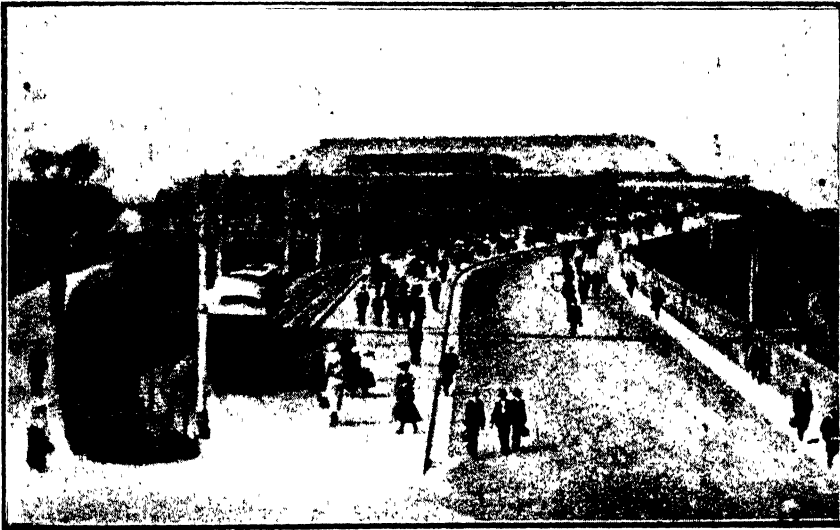
যেমন ক্যাবিন-ভৃত্য, মেথর, রাঁধুনী বকসীসের জন্য আমাকে ঘিরিয়াছিল, এ জাহাজ থেকে নামিবার সময় সে সব কিছুই দেখিলাম না। আমাদের দেশে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহাতে সপরিবারে আরোহী হইয়া, মালপত্র গাড়ীর ছাদে রাখিয়া, ৫।৬ মাইল যাওয়া চলে; এখানে তা (carrying-van) দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাদের কার্ড লইয়া আমার ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। তাহারাও আমার মাল গণিয়া-গাঁথিয়া আমাকে রসিদ দিল এবং সাড়ে সাত শিলিং ভাড়া লাগিবে, বলিয়া দিল। মালের হাত হইতে অব্যাহিতি পাইয়া কেবল হাত-ব্যাগটী (Hand-

bag) লইয়া ট্রামে উঠিয়া গন্তব্য পথাভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

এখানে ট্রামে প্রায়ই পেনির টিকিট। ট্রামের কণ্ডাক্টার ও চালকের টুপি ও পোষাক একই রকম—কাল বনাতের।

সিড নি—কাষ্টম্‌স হাউস

সিড্‌নি—সাকুলার কে

তামাকখোরদিগের জন্য কাচ দিয়া ঘেরা আলাদা বেঞ্চ আছে। বৃষ্টির সময়ে কাচের দরজা টানিয়া বন্ধ করা যায় ও আবশ্যক-মত খোলা যায়। ট্রাম থামিবার স্থানে Red postএ লেখা আছে, 'এখানে নীচের দিকের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করুন' (Wait here for down tram) 'এখানে উপরের দিকের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করুন' (Wait here for up tram)। পরিচিত কিম্বা অপরিচিতের জন্য থাকিবার স্থান এখানে আছে; তাহাদের নাম cafes, pubs (public Hotels) ও Residental chambers। তাহা ছাড়া মুক্তি-ফৌজের (Salvation Army) People's Palace নামক বৃহৎ বাড়ীতে বহু লোকের থাকিবার মত কক্ষ যথেষ্ট আছে। ঘরের ভাড়া স্থান ও ঘর-বিশেষে তারতম্য হয়। সাধারণতঃ একজনের থাকিবার মত সাজান ঘরে থাকিবার ভাড়া সপ্তাহে ৫ সিলিং ও দুইজন এক ঘরে থাকিলে প্রত্যেক জনের তিন শিলিং ভাড়া দিতে হয়; তিন শিলিংয়ের কম ভাড়া নাই। এই

People's Palaceএ একটা একজনের মত ঘর লইয়া আহারাদির ব্যয় সমেত সপ্তাহে ২৫ শিলিং পড়ে। বিদেশী লোকের পক্ষে এই People's Palaceএ বাসই সুবিধা-জনক। বাড়ীটা দশতলা। ইহার বিভিন্ন তলায় সিঁড়ি

সিড্‌নি—সেন্ট্রাল স্কোয়ার, জর্জ্জ ষ্ট্রীট

সিড্‌নি—কিং ষ্ট্রীট, পূর্ব্বমুখী

দিয়া উঠিতে হয় না; বৈদ্যুতিক উঠানামার ব্যবস্থা (electric lift) আছে; সারা দিনরাত উঠা-নামা চলিতেছে। ইহার প্রত্যেক ঘরের গায়ে নম্বর দেওয়া আছে। আপনি People's Palaceএ গিয়া সামনেই দেখিবেন, কাচের ঘরের ভিতর একটি লোক চাবির রাশি ও ক্যাস-বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। যাইবামাত্র একজনের মত ঘর কি দুইজনের মত ঘর, কত দিনের জন্য ভাড়া লইবেন, লোকটী তাহা জিজ্ঞাসা করিবে এবং হিসাব করিয়া ভাড়া লইয়া একখানি টিকিট ও নির্দ্দিষ্ট ঘরের চাবি দিবে। চাবিতে তলার (Block) ও ঘরের নম্বর লেখা আছে। এক রাত্রি বা এক দিনের জন্যও ঘর-ভাড়া লওয়া যাইতে পারে। এখানে গৃহস্থের বাড়ীতে খরচ দিয়া অতিথি (paying-

guest) হইয়া থাকা চলে ; খরচ কিন্তু বেশী দিতে হয়,—সপ্তাহে দেড় পাউণ্ড ঘরভাড়া ও আহারের জন্য লাগে।

অনেকে এখানে থাকে এক যায়গায়, কিন্তু খায় অপর যায়গায় ; তাহাতে অনেক সময় সস্তাও হয় এবং

এখানকার লোকের পোষাক-পরিচ্ছদ আমাদের দেশের সাহেবদের পোষাকের থেকে অনেক বিভিন্ন ; সকলেই প্রায় গরম কাপড়ের পোষাক ব্যবহার করে। Helmet বা sun-hat হাজারে একজনও ব্যবহার করে কি না সন্দেহ ;
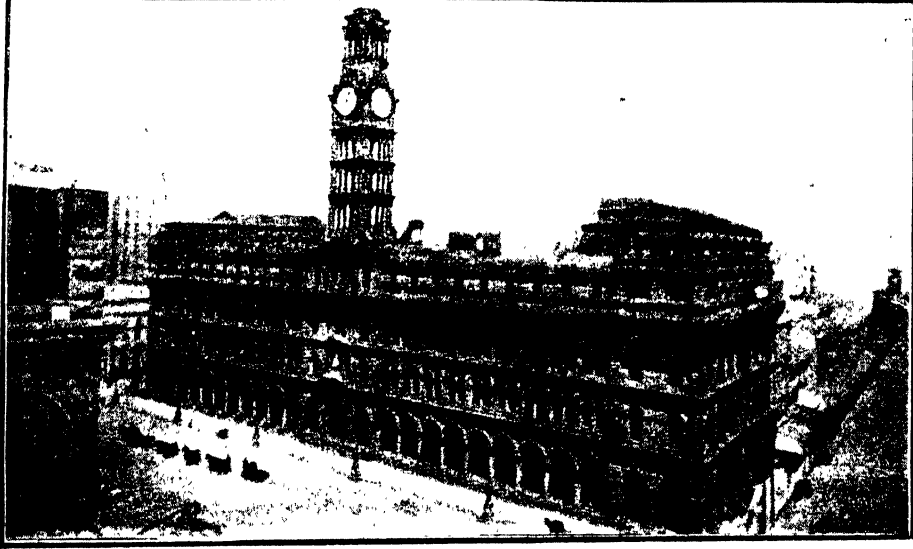
সিড নি—জেনারেল পোষ্ট আপিস

সিড্‌নি—ব্রিজ ষ্ট্রীট

ইচ্ছামত খাইতেও পাওয়া যায়। হোটেলে বা গৃহস্থের বাড়ীতে ম্যানেজার বা বাড়ীর গিন্নীর রুচি-অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুত হয়। যেদিন যে 'খানা' প্রস্তুত হয়, তাহা একখানি কাগজে লেখা থাকে। উহা ছাড়া অন্য জিনিস চাহিলে পাওয়া যায় না ; কিন্তু ভোজনালয়সমূহে (Restaurant) যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই পাওয়া যায়।

সবাই felt hat পরে। আর এখানকার মেয়েদের প্রজাপতি (butterfly) বলিলেই চলে ; তাহারা হরেক রকমের টুপি ও পোষাক লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত আছে। যে সকল বালিকা কাজ করিতে যায়, তাহারা হাতে একটি চামড়ার ব্যাগ লইয়া যায়। ১২ বৎসরের বালিকারা প্রায়ই দোকানে, আড়তে, ভোজনালয়ে কাজ করে ; অনেকে

চিত্র-প্রদর্শনীতে (Picture-show) টিকিট বিক্রয় করে। তাহারা প্রায়ই সপ্তাহে এক পাউণ্ডের কম বেতন পায় না।

এখানকার রাস্তা পাকা; বৃষ্টি পড়িলে পিছল হয় না। সিমেণ্ট-করা ফুটপাথের উপরে পিচ দেওয়া। রাস্তার দুইধারেই প্রশস্ত ফুটপাথ আছে। তাহা ছাড়া গাড়ী চলিবার জন্য প্রশস্ত রাস্তা আছে। এখানে ঘোড়ায় টানা গাড়ীর মধ্যে Cab ও truck বেশী; তাছাড়া মোটর-টাক্সি (Motor taxi) ত আছেই; জিনিসপত্র লইয়া যাইবার জন্য Carrying Companyর গাড়ীও অনেক।

এখানে মুটে খুঁজিয়া হায়রাণ হইতে হয় না, রাস্তায় দাঁড়াইলেই Carrying Companyর গাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। গাড়ীর উপরে গাড়ীওয়ালা-কোম্পানীর টেলিফোঁ নম্বর, নাম, ও ঠিকানা লেখা থাকে। টেলিফোঁ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ীর দরজায় গাড়ী আনাইতে পারা যায়। টেলিফোঁ সম্বন্ধে এখানে বড় সুবিধা। প্রতি ট্রামের মোড়ে, প্রতি ট্রামের অপেক্ষা করিবার স্থানে টেলিফোঁর ঘর আছে। ঘরগুলি কাঠে নির্ম্মিত। উহার ভিতর টেলিফোঁ-বাক্স থাকে। ঐ ঘরে কোন লোক থাকে না। ৫ মিনিট কথা কহিবার জন্য এক পেনি দিতে হয়। সেই এক পেনি আদায় করিবার জন্য সেখানে কোন লোক নিযুক্ত করা নাই। সেই সকল ঘরের দরজার ছিদ্রে একপেনী ফেলিয়া দিলে ঘরের দরজা আপনা হইতেই (automatically) খুলিয়া যায়; পরে আবশ্যকমত কথা কহিয়া চলিয়া যাইবার সময় ঐ দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কাষ্ঠফলকে লেখা আছে; সকলেই সংবাদ পাঠাইবার পর দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ টেলিফোঁর দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের বিশেষ সুবিধা হয়। ডাক্তার ডাকিতে হইবে, একপেনী খরচ করিয়া আপনার বাড়ীর রাস্তার মোড়ে গিয়া টেলিফোঁ করিয়া দিলেই হইল। এক্ষণে বড় ও ছোট দোকানে, ডাক্তারখানায়, ডাক্তারের ও dentistএর বাড়ীতে, সকল রকম গাড়ীর আস্তাবলে, Motor Garageএ, Theatreএ, Hotelএ, Police Stationএ, Fire Brigadeএ টেলিফোঁ আছে। সামান্য এক পেনী খরচে অনেক সময় পুড়িয়া মরা বা চোর ডাকাতের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এ সুবিধা আমাদের দেশে নাই। তারপর বিদেশীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত সুবিধার বিষয়; বিদেশীর স্থান না জানা হেতু কোন অসুবিধার কারণ নাই। কোন অপরিচিত স্থলে যাইতে হইলে কোন গোরা স্ত্রী বা পুরুষকে রাস্তা বা বাড়ী জিজ্ঞাসা করিলে, আমাদের দেশের মত 'আমি জানি না' এই জবাব দেওয়ার পরিবর্ত্তে এখানকার গোরারা অতি ভদ্রতার সহিত, যাহা জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহার উত্তর দেয়। কোন স্থান যদি তাহারা নিজে না জানে, অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়া দেয়; অনেক স্থানে নিজেরা সঙ্গে যাইয়া বাড়ী দেখাইয়া দেয়। তারপর রাস্তা বা বাড়ী বা কোন দোকান, বা ব্যাঙ্ক বা পোষ্ট-আফিস, নিজে চিনিয়া না যাইতে পারিলে, রাস্তার কোন পাহারা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তখনই পথ দেখাইয়া দেয়।

সিড্‌নি—কলেজ ষ্ট্রীট

কনেষ্টবলের বা পাহারাওয়ালার নাম মনে পড়িলেই আমাদের দেশের বড় লালপাগড়ীওয়ালা হিন্দুস্থানীদের কথাই মনে পড়ে। সাধারণের সহিত তাহারা ভদ্র ব্যবহার প্রায়ই করে না। এখানে তা নয়; কোন কথা রাস্তার কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অতি ভদ্রভাবে উহার উত্তর দেয় ও গন্তব্য স্থানের কথা অতি সুন্দররূপে পথিককে বুঝাইয়া দেয়। একবার বলিলে যদি না বুঝিতে পারে, যতক্ষণ না বুঝিতে পারে ততক্ষণ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশের লাল-পাগড়ীওয়ালাদের ন্যায় 'মৈ নেই জানতা হু" বলিয়া পথিককে নিরাশ করে না। এখানকার পুলিশ কনেষ্টবলদের পোষাক কাল, তাহার উপর কাল হেলমেট। এখানে ফুটপাথে স্থানে-স্থানে বেঞ্চ আছে; পথিকের বিশ্রাম করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক।

সাধারণের ভ্রমণস্থান এই সিডনি সহরে অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে Hyde Park, National Park, Municipal Park, Domain Park ই উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক Parkএ যথেষ্ট বসিবার আসন থাকে; ঘাসের উপর ও মাটিতেও অনেক লোক বিশ্রাম করে। Parkগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা হয়; এমন কি কাগজের টুকরাটিও একদণ্ড পড়িয়া থাকিতে পায় না; সর্ব্বদা লোক মোতায়েন আছে। কাগজের টুকরার কথা কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, এখানে Public Parkগুলির নিকটে যে সকল কারখানা বা দোকান আছে, উহাতে হাজার-হাজার বালিকা ও বালক কাজ করে। বেলা ১টা বাজিলেই তাহারা আপনার-আপনার বাড়ী হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্য আনিয়া পার্কের বেঞ্চে বসিয়া খায় এবং আহার শেষ হইলেই, যে সকল কাগজে জড়াইয়া খাদ্যদ্রব্য আনে, তাহা পার্কে ফেলিয়া দেয়। সেগুলি তখন-তখনই সরাইয়া ফেলিবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে।

এদেশে রাস্তায় স্থানে-স্থানে ফুটপাথের উপর টুকরা কাগজ ফেলিবার জন্য আধার রক্ষিত আছে! উহার গায়ে লেখা আছে "Keep your city clean, throw waste-paper and tram-tickets in this box instead of throwing on the foot-paths" অর্থাৎ "তোমার সহরের রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার জন্য যেখানে-সেখানে কাগজের টুকরা ট্রামের টিকিট না ফেলিয়া এখানে ফেল।" সেইজন্য, কি ব রাস্তা কি গলি, কি বাড়ীর উঠান, কোথাও আবর্জ্জনা জ না। রাস্তায় চব্বিশ ঘণ্টা ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ী যাইতেছে ঘোড়ার মলমূত্র অপসারণ করিবার ও রাস্তা পরিষ্ক রাখিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা সরকারী মেথর প্রত্যেক রাস্ত হাজির থাকে; তাহারা সমস্ত আবর্জ্জনা অবিশ্রান্ত বাক্ উঠাইয়া লয় এবং এক জায়গায় জমা করে। ঐ স্থান হইে ময়লার গাড়ী প্রত্যেক ঘণ্টায় সমস্ত তুলিয়া লইয়া যায় এখানে রাস্তায় জলের কল নাই—তবে জলপান করিবা হোটেল প্রত্যেক রাস্তায় গলির মোড়ে অসংখ্য বর্ত্তমা সেই সকল স্থানে জল, সোডা, লেমনেড, চা, কাফি সর্ব্ব পাওয়া যায়। মূল্য অতি সামান্য; এক গ্লাস জলের মূ আধ পেনি; চা, কাফি প্রভৃতিরও মূল্য অতি কম। ছাড়া রাস্তায় Oyster Palace অনেক আছে। উহা খাইবার জায়গা; তবে, হোটেল ও রেস্তোরাঁ হইতে উ পৃথক; কারণ, Oyster Palaceএ মৎস্য, কাঁকড়া ইত্যা জলচর খাদ্যের সমাবেশ থাকে মাত্র, স্থলচর জীবের মা এখানে থাকে না। Oyster Palaceএ সাধারণতঃ পেন্স দিলে ভাজা মাছ, পাঁউরুটি ১০।১২ খণ্ড, মাখন, ইত্যাদি পাওয়া যায়; বসিয়া খাওয়ারও যায়গা আে কিনিয়া লইয়াও যাইতে পারা যায়। প্রত্যেক থিয়েটার পার্কের নিকটেই ২।৪টি Oyster Palace আে Sydney Harbourএ, Coogee Manly নামক সহে সন্নিকটে স্ত্রী-পুরুষের সমুদ্রে স্নান করিবার ব্যবস্থা আে যে সকল লোক স্নানের স্থানের নিকট ঘর করিয়া রা তাহারা তোয়ালে, গামছা, নাইবার ছোট ট্রাউজার দে ২ সিলিং পারিশ্রমিক দিতে হয়। যদি স্নানের পর ভো করা যায়, তার খরচ পৃথক দিতে হয়। স্ত্রীলোকদের পৃথক ঘর আছে; উহাতে স্ত্রীলোকই সমস্ত সরবরাহ কে ব্যয় একই রকম। সিডনি সহর হইতে Coogeeতে স্না স্থানে যাইবার জন্য ট্রামগাড়ী আছে—৪ পেন্স ভাড়া লাে সমুদ্রতীরে অসংখ্য হোটেল ও চিত্রাগার আছে। এখা সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত চিত্রাগারসমূ (Picture Palace) চিত্র দেখান হয়। গদিওয়ালা আসে টিকিট ৩ পেন্স; যতক্ষণ ইচ্ছা এক টিকিটে বসিয়া থাকি

পারা যায়, কেবল বাহিরে গেলেই আবার টিকিট কিনিতে হয়। রবিবার ব্যতীত সবদিনেই এই সকল চিত্রাগার খোলা থাকে। এখানে Manly নামক আর একটি জনাকীর্ণ স্থান আছে; উহা বন্দরের অপর পারে। সেখানে ষ্টীমার যায়, ভাড়া ৪ পেন্স। প্রত্যেক ২০ মিনিট অন্তর Jackson Port, হইতে জাহাজ ছাড়ে। Jackson Port, Custom House ও Circular Quay হইতে রবিবারে বহু নরনারী Manlyতে স্নান করিতে যায়। অর্দ্ধ-উলঙ্গ যুবতী ও যুবকদের জলকেলি হিন্দুর দেবতা রাধাশ্যামের জলকেলিকেও পরাস্ত করে। এই জল-বিহারের স্থানে অনেক যুবক আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী ও অনেক যুবতী আপনার পতি খুঁজিয়া লয়।

Sydneyর প্রধান রাস্তা দুইটী ; George Street ও Elizabeth Street, শেষোক্ত Streetটি প্রথমটির অপেক্ষা দীর্ঘ ; তবে George Streetটিকে প্রধান রাজপথ এই জন্য বলে যে, বড় বড় আড়ত, দোকান ইত্যাদি এই পথের পার্শ্বেই অবস্থিত। Supreme Court ও অন্যান্য কোর্ট কাছারী ইত্যাদি Elizabeth Streetএর উপর। Elizabeth Street আবার দুই ভাগে বিভক্ত Elizabeth Street City ও Elizabeth Street Redfern। তা ছাড়া এখানে Pitt Street, York Street, King Street, Crown Street, Martin Place, Wyrward Street, Sussex Street, Park Street, College Street (Museum, Art Gallery ও Domain Church, College Streetএর উপর) Meguaril Street. ও আরও অনেক ছোট বড় ষ্ট্রীট আছে। তবে উপরিউক্ত Streetগুলি সহরের মধ্যস্থলে এবং কাজকর্ম্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। প্রতিদিন ৯টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত দোকান-পসার আফিস ইত্যাদি খোলা থাকে। শুক্রবার এখানে সপ্তাহের বেতন দিবার দিন; সেইজন্য শুক্রবার রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সিডনিতে দোকান সব খোলা থাকে। সিডনির বাহিরে অন্য অন্য স্থানে শনিবার রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত দোকান আদি খোলা থাকে ও শুক্রবার বেলা ১টায় বন্ধ হইয়া যায়। সিডনিতে শনিবার ১টার সময় সব কাজ বন্ধ হয়; রবিবার একেবারে বন্ধ থাকে। থিয়েটার এখানে রবিবার বাদ রোজ রাত্রে ৮টা হইতে ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত হয়; আমাদের দেশের মত সারারাত্রি ধরিয়া থিয়েটার হয় না। এখানকার বড় বড় ২।৪টি থিয়েটারের নাম Adelphi, Majestic, Tivoli, Little Theatre. এখানকার থিয়েটারের Gallery Stageএর সম্মুখে ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; Stall Box ও Reserved Box উহার নীচে। Galleryতেও carpet পাতা থাকে। Galleryর টিকিট দুই রকম; ২ সিলিং দিলে টিকিট লইবামাত্রই থিয়েটারের ভিতর যাওয়া যায়; ১ সিলিংএর টিকিট কিনিলে থিয়েটার আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়; আরম্ভ হইবার ৫ মিনিট আগে প্রবেশ করিতে দেয়। থিয়েটারের সময়ে ছোট ছোট ছেলেরা থিয়েটারের ভিতর চিনার বাদাম ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য ফেরি করে। সিডনি সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিব।

মানসী

[শ্রীঅমিয়া দেবী]

কোন্ কল্পনার পুরে,—মন্দাকিনী কূলে
নন্দনের গন্ধ-ঘেরা পুষ্প-কুঞ্জতলে
যৌবনশ্রী-বিভূষিতা ফুলময়ী তুমি ?
জীবনের আরাধিতা ওগো চিত্তরাণী !
নয়নের অন্তরালে,—চির শ্রান্তিহীন
ঘুরে মরে আশাতুর লুব্ধ অতি দীন—
রাজীব ও চয়ণের রক্তরাগ চুমি—
অতৃপ্তি বেদনাকুল-ক্ষুব্ধ হিয়াখানি।

সঙ্গীত-মুখর, তব চরণ-রঞ্জন—
মঞ্জীরে বাজিয়া ওঠে বক্ষের গুঞ্জন ;
প্রাণের শোণিত-রাঙ্গা মূরতি তোমার
স্বপনের ছায়ালোকে ওঠে বিকশিয়া,
কল্পনার সিংহাসনে চিরবিরাজিতা
ওগো বরণীয়া দেবী, কাছে এসো আজ,
বিরহীর যুগব্যাপী অশ্রু সাধনার—
নিয়ে এসো সফলতা,—ওগো মোর প্রিয়া

নিষ্কৃতি

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার নয়নতারা গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেবা এম্‌নি নিরেট, এম্‌নি ভরাট যে, তাহার কোন এতটুকু ফাঁক দিয়া আর কাহারও কাছে ঘেঁসিবার যো ছিল না। সিদ্ধেশ্বরী এমন সেবা তাঁর এতখানি বয়সে কখনও কাহারও কাছে পান নাই। তবুও কেন যে তাঁহার অশান্ত মন অনুক্ষণ শুধু ছল ধরিয়া কলহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল, এ রহস্য জানিতেন শুধু অন্তর্যামী। সেদিন সকালে সিদ্ধেশ্বরী ছয়মাসের রোগীর মত হেলিয়া, টলিয়া রান্না-ঘরের বারান্দায় আসিয়া ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত, দুর্ব্বল কণ্ঠে, বোধ করি বা সুমুখের দেয়ালটাকেই উপলক্ষ্য করিয়া, বলিতে লাগিলেন, "আপনার জন বটে মেজ-বৌ। সে না থাক্‌লে, আমাকে দেখ্‌ছি বেঘোরে মরতে হ'ত। এমন সেবা-যত্ন আমার মায়ের পেটের বোন্‌ থাক্‌লে করতে পারত না।" শৈল ঘরের ভিতরে রাঁধিতেছিল, সমস্তই শুনিতে পাইল। এই কয়টা দিন সে বড়-জায়ের ঘরেও যায় নাই, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহে নাই। এখনও চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুনরায় সুরু করিলেন, "আর, পরকে খাওয়ানো-পরানো শুধু অধর্ম্মের ভোগ—ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। আর, এই আমার মেজ-বৌ। মুখের কথাটি খসাতে হয় না, হুঁ-হাঁ করে এসে পড়ে। আমি হেঁটে গেলে তার বুকে বাজে। আমার পোড়া কপাল যে, এমন মানুষকেও, আমি পরের ভাঙ্‌চি শুনে, পর মনে করেছিলুম।"

শৈলর চুড়ির শব্দ, হাতা-বেড়ি নাড়ার শব্দ সবই তাঁহার কাণে আসিতেছে। এত কাছে উপস্থিত থাকিয়াও সে যখন এত বড় মিথ্যা অভিযোগের কোন জবাব দিল না, তখন আর তাঁহার অধৈর্য্যের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহার চিঁ-চিঁ কণ্ঠস্বর এক মুহূর্ত্তেই সবল ও সতেজ হইয়া উঠি[illegible] বলিলেন, "মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসে[illegible] তা' যে কারুকে দিয়ে একটুখানি পড়িয়ে শুন্‌ব, আমার জো'টি পর্য্যন্ত নেই। পরকে খাওয়ানো-পরানো আ[illegible] কিসের জন্যে?" নীলা ছোটখুড়ীর কাছে বসিয়া তাঁহা[illegible] সাহায্য করিতেছিল; সেইখান হইতে কহিল, "সে চিঠি মেজ-খুড়িমা তোমাকে দু'তিনবার পড়ে শোনালেন, [illegible] আবার কবে নতুন চিঠি এল?"

"তুই সব কথায় গিন্নীপনা করতে যাস্‌নে নীলা" বলিয়া মেয়েকে একটা ধমক্‌ দিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলি[illegible] "চিঠি শুন্‌লেই হল? তার জবাব দিতে হবে না? কে[illegible] তোর ছোটখুড়ি কি মরেছে যে, আমি ও-পাড়ার লে[illegible] ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাব?"

নীলাও রাগ করিয়া বলিল, "চিঠি লেখবার কি [illegible] কেউ নেই মা, যে আজ সংক্রান্তির দিনটায় তুমি খুড়িমা[illegible] মরিয়ে দিচ্চ?"

আজ সংক্রান্তি, সে কথাটা সিদ্ধেশ্বরীর স্মরণ ছিল [illegible] তিনি এক মুহূর্ত্তেই একেবারে পাংশু হইয়া বলিলেন, "[illegible] যে অবাক্‌ করলি নীলা? বালাই, ষাট! ষাট! মর[illegible] কথা আমি তোকে আবার কখন্‌ বল্‌লুম লা? পেটের [illegible] আমাকে মুখ-নাড়া দেয়। কাল যার বিয়ে দিয়ে এনে কো[illegible] পিঠে করে মানুষ কর্‌লুম, সে আমার ছায়া মাড়ায় না; [illegible] যে রোগে ভুগ্‌চি, তবু ত' আমার মরণ হয় না! আজ থে[illegible] আর যদি এক ফোঁটা ওষুধ খাই ত আমার অতিবড়—"

কান্নায় সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তি[illegible] আঁচলে চোখ মুছিতে-মুছিতে নিজের ঘরে গিয়া একেব[illegible] মড়ার মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা পাশের বারান্দায় জানালার আড়ালে দাঁড়াই

দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল; এখন ধীরে-ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিল। আস্তে-আস্তে বলিল, "একখানা চিঠির জবাব দেবার জন্যে আবার তার খোসামোদ করতে যাওয়া কেন দিদি? আমাকে হুকুম করলে ত দশখানার জবাব লিখে দিতে পারতুম।" সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না; পাশ ফিরিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন।

নয়নতারা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা'হলে এখুনি কি সেটা লিখে দিতে হবে দিদি?"

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বড় বকাও মেজ-বৌ। বল্‌ছি সে এখন থাক্—সে তুমি পারবে না। তা' না—"

নয়নতারা রাগ করিল না। যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়, সেখানে তার ক্রোধ-অভিমান প্রকাশ পাইত না। সে নীরবে উঠিয়া গেল।

বেলা দু'টা-আড়াইটার সময় সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে ডাকিয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর খুড়িমা ভাত খেয়েছে রে?"

নীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "খাবেন না কেন? রোজ যেমন খান, তেম্‌নিই ত খেয়েছেন।"

সিদ্ধেশ্বরী হুঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শৈল চিরকালই অত্যন্ত অভিমানী। সামান্য কারণেই সে খাওয়া বন্ধ করিত, এবং তাই লইয়া সিদ্ধেশ্বরীর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। হাতে ধরিয়া, খোসামোদ করিয়া, গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া নানা প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইত। অথচ, সেই শৈল এবার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এত গঞ্জনাতেও কেন যে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, ইহার কোন কারণই তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার এই ব্যবহার তাঁহার কাছে যতই অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক ঠেকিতে লাগিল, ততই তিনি অন্তরের মধ্যে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোন মতে একটা প্রকাশ্য কলহ হইয়া গেলেই তিনি বাঁচেন —কিন্তু তাহার ধার দিয়াও শৈল যায় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ নীরবে করিয়া যায়। তাহার আচরণে বাড়ীর কেহ কিছুই দেখিতে পায় না; যিনি দশবছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই শুধু ভয়ার্ত্ত চিত্তে অনুক্ষণ অনুভব করেন, শৈলর চারিপাশে একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া, তাহাকে শুধু ঝাপ্‌সা, দুর্নিরীক্ষ্য করিয়াই আনিতেছে।

নীলা কহিল, "মা আমি যাই?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, শুনি?"

নীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সিদ্ধেশ্বরী তখন ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া, চেঁচাইয়া কহিলেন, "কোথায় যেতে হবে শুনি? ছোটখুড়ির সঙ্গে তোর এত কি লা, যে একদণ্ড আমার কাছে বস্‌তে পারো না? বসে থাক্ হারামজাদী, চুপ করে এইখানে। কোথাও তোকে যেতে হবে না।" বলিয়া নিজেই ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন।

নয়নতারা মৃদুপদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল "ছি মা, বড় হয়েচ, দু'দিন পরে শ্বশুর-ঘর করতে চলে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও, বাপ-মায়ের সেবা করে নাও। মায়ের কাছে বস্‌বে, দাঁড়াবে; সঙ্গে-সঙ্গে থেকে দু'টো ভাল কথা শিখে নেবে; এ সময়ে কি যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত? যাও, কাছে বসে দু'দণ্ড পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, দিদি ঘুমিয়ে পড়ুন। রোগা শরীরে অনেকক্ষণ জেগে আছেন।"

নীলা মেজখুড়ির প্রতি প্রসন্ন ছিল না। মুখ তুলিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বাড়ীর মধ্যে যার-তার সঙ্গে আর কার সঙ্গে সারাদিন কাটাই মেজ খুড়িমা? তুমি কি খুড়িমার কথা বল্‌চ?" তাহার রুষ্ট, আরক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া নয়নতারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমি কারো কথা বলিনি নীলা, আমি শুধু বল্‌চি, তোমার রোগা মায়ের সেবা-যত্ন করা উচিত।" সিদ্ধেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়াই বলিলেন, "সেবা যত্ন কর্‌বে! আমি ম'লেই বরঞ্চ ওরা বাঁচে।"

নয়নতারা কহিল, "ভাল, ওই না হয় ছেলেমানুষ, জ্ঞান-বুদ্ধি নেই; কিন্তু, ছোট-বৌ ত ছেলেমানুষ নয়! তার ত বলা উচিত, যা নীলা, দু'মিনিট গিয়ে তোর মায়ের কাছে বোস্! না সে নিজে একবার আস্‌বে, না, মেয়েটাকে আস্‌তে দেবে।" নীলা কি একটা জবাব দিতে গিয়াও চাপিয়া গিয়া মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমাকে সত্যি

বল্‌চি মেজবৌ, আমার এমন ইচ্ছে করে না যে, শৈলর আর মুখ দেখি। আমার যেন ছুটি চক্ষের সে বিষ হয়ে গেছে।"

নয়নতারা কহিল, "অমন কথা বোলো না দিদি। হাজার হোক্ সে সকলের ছোট। তুমি রাগ করলে তাদের আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এ কথাটা ত মনে রাখতে হবে? ভাল কথা। এ মাসে উনি পাঁচশ কত টাকা পেয়েছিলেন, তার খুচ্‌রো ক'টাকা নিজের হাতে রেখে বাকী টাকা তোমাকে দিতে দিলেন; এই নাও দিদি" বলিয়া নয়নতারা আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল। উদাস মুখে সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "নীলা, যা, তোর ছোটখুড়িকে ডেকে আন্, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখুক।"

নয়নতারার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। এই টাকা দেওয়া ব্যাপারটা উপলক্ষ্য করিয়া সে কল্পনায় যে সকল উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আগাগোড়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু যে সিদ্ধেশ্বরীর মুখে আনন্দের রেখাটি মাত্র ফুটিল না, তাহা নয়; এই টাকাটা তুলিবার জন্য অবশেষে সেই ছোটবৌকেই কি না ডাক পড়িল,—সিন্দুকের চাবি এখনও তাহারই হাতে! বস্তুতঃ, এই টাকাটা দেওয়া সম্বন্ধে একটুখানি গোপন ইতিহাস ছিল। হরিশের দিবার ইচ্ছাই ছিল না, শুধু নয়নতারা মস্ত একটা জটিল সাংসারিক চাল্ চালিবার জন্যই স্বামীকে নিরন্তর খোঁচাইয়া-খোঁচাইয়া ইহা বাহির করিয়া আনিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর এই নিস্পৃহ আচরণে এতগুলা টাকা ত জলে গেলই, উপরন্তু রোষে, ক্ষোভে তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল।

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। ছয় দিন পরে সে বড়জায়ের মুখের পানে চাহিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কি আমাকে ডাক্‌ছিলে?" শৈলর মুখের মাত্র এই ছুটি কথার প্রশ্নই সিদ্ধেশ্বরীর কাণের মধ্যে যেন অজস্র মধু ঢালিয়া দিল। তিনি চক্ষের পলকে বিগলিতচিত্তে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "হাঁ দিদি, ডাক্‌ছিলুম বৈ কি। অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে; তাই নীলাকে বল্‌লুম, যা মা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে আন্, টাকাগুলো তুলে ফেলুক। এই নাও," বলিয়া তিনি শৈলর প্রসারিত ডান হাতের উপর নোট কয়খানি ধরিয়া দিলেন আজ আর তাঁহার এমন ইচ্ছা হইল না যে বলেন, এ টাকা কখন্ কাহার কাছে পাওয়া।

শৈল আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া ধীরে-সুস্থে টাকা তুলিতে লাগিল, চাহিয়া চাহিয়া নয়নতারার অসহ্য হইয়া উঠিল। তথাপি ভিতরের চাঞ্চল্য কোন মতে দমন করিয়া, একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "তাই তোমার দেওর কাল আমাকে বল্‌লেন, দিদি, 'জাঠ্‌তুত-খুড়তুত ভাই নয়, মায়ের পেটের বড় ভাই। তাঁর খাব না পরব না ত আর পাব কোথায়? তবু, মাসে-মাসে এম্‌নি পাঁচশ'-ছ'শ টাকা করেও যদি দাদাকে সাহায্য করতে পারি ত অনেক উপকার।' কি বল দিদি?"

সিদ্ধেশ্বরীর হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বোধ করি তাঁহার গাম্ভীর্য্যের হেতু অনুমান করিতে পারিল না। কহিল, "শ্রীরামচন্দ্র কাঠ-বিড়াল নিয়ে সাগর বেঁধেছিলেন। তাই তিনি যখন-তখন বলেন, বড় বো'ঠান মুখ ফুটে যেন কারো কাছে কিছু চান্ না; কিন্তু তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাক্‌বে না? যার যেমন শক্তি কায়-কোরে তাঁকে সাহায্য করা ত চাই। নইলে বসে বসে শুধু গুষ্টি-বর্গ মিলে খাবো, বেড়াবো, আর ঘুমোব, তা' করলে কি চলে? তোমারও ত হরি-মণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই। আমাদের জন্যে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিলে তো তোমার চল্‌বে না। ঠিক কি না সত্যি করে বল দিদি?"

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "তা সত্যি বই কি!"

শৈল সিন্দুক বন্ধ করিয়া সুমুখে আসিয়া সেই চাবিটা তাহার রিঙ্ হইতে খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধীর ভাবে কহিলেন, "এটা কি হ'ল ছোটবৌ?"

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ক'দিন ধরেই ভেবে দেখ্‌ছিলুম দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। আমার অভাব চারদিকে—মতিভ্রম হতে কতক্ষণ? কি বল মেজদি?"

নয়নতারা কহিল, "আমি ত তোমার কোন কথাতেই নেই ছোট বৌ, আমাকে মিছে কেন জড়াও?"

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, "মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন, শুন্‌তে পাই কি?"

শৈল কহিল, "একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, তার মানে নেই। এম্‌নি ত তোমাদের শুধু আমরা থাচ্চি, পরচি। না পারি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে, না পারি গতর দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু তাই বলে কি চিরকাল করা ভালো?"

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধ রোষে মুখ রাঙা করিয়া কহিলেন, "এত ভাল করে থেকে হলি না? এত ভাল-মন্দর বিচার এতদিন তোদের ছিল কোথায়?"

শৈল অবিচলিত স্বরে বলিল, "কেন রাগ করে শরীর খারাপ করচ দিদি? তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগ্‌চে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগ্‌চে না।"

ক্রোধে সিদ্ধেশ্বরীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নয়নতারা তাঁহার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির না হয় ভাল না লাগ্‌তে পারে, সে কথা মানি; কিন্তু, তোমার ভাল লাগ্‌চে না কেন ছোট বৌ?"

শৈল ইহার জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, "বলে যা পোড়ার-মুখী, কবে তুই বিদায় হবি—আমি হরির-নোট দেব। আমার সোণার সংসার ঝগড়া-বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে দিলি। মেজ বৌ কি মিছে বলে যে, কোমরের জোর না থাক্‌লে মানুষের এত তেজ হয় না? কত টাকা আমার তুই চুরি করেচিস্ তার হিসেব দিয়ে যা।"

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখ অগ্নিকাণ্ডের মত মুহূর্ত্ত কালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু, পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছিন্ন শাখার ন্যায় শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজ বৌ; সে আমাকে এম্‌নি করে অপমান করে গেল! কর্ত্তারা বাড়ী আসুন, ওকে আমি উঠনের মাঝখানে যদি না আজ জ্যান্ত পুঁতি, ত আমার নাম সিদ্ধেশ্বরী নয়!"

(৭)

সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল—তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। আজকার দৃঢ়-নির্ভরতা কাল সামান্য কারণেই হয় ত শিথিল হইতে পারিত। শৈলকে তিনি চিরদিন একান্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু, দিনকয়েকের মধ্যেই নয়নতারা যখন অন্যরূপ বুঝাইয়া দিল, তখন তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে, কথাটা ঠিক যে, শৈলর হাতে টাকা আছে। এবং এ টাকার মূল যে কোথায়, তাহাও অনুমান করা তাঁহার কঠিন হইল না। তথাপি সে যে স্বামি-পুত্র লইয়া এই সহর অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কোন মতেই থাকিতে সাহস করিবে না, ইহাও তিনি জানিতেন। রাত্রে বড়কর্ত্তা তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া চোখে চস্‌মা আঁটিয়া গ্যাসের আলোকে নিবিষ্ট-চিত্তে জরুরি মকদ্দমার দলিল-পত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "তোমার কাজ-কর্ম্ম করে লাভটা কি, আমাকে বল্‌তে পারো? কেবল শূয়ারের পাল খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্রি খেটে মরবে?"

গিরিশের খাওয়াবার কথাটাই বোধ করি শুধু কাণে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, "না, আর দেরি নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্চি।"

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "খাওয়ার কথা তোমাকে কে বল্‌চে! আমি বল্‌চি, ছোটবৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন। এতদিন যে তাদের এত করলে, সব মিছে হয়ে গেল, সে খবর শুনেচ কি?"

গিরীশ কতকটা সচেতন হইয়া বলিলেন, "হুঁ, শুনেছি বৈ কি। ছোট বৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল। সঙ্গে কে গেল—মণিকে—" মকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এইভাবেই থামিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"আমার একটা কথাও কি তোমার কাণে তুল্‌তে নেই? আমি কি বল্‌চি, আর তুমি কি জবাব দিচ্চ। ছোটবৌরা যে বাড়ী থেকে চলে যাচ্চে।"

ধমক খাইয়া গিরীশ চম্‌কাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্চেন?"

সিদ্ধেশ্বরী তেম্‌নি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, "কোথায় যাচ্চে, তার আমি কি জানি ?"

গিরীশ কহিলেন, "ঠিকানাটা লিখে নাও না।"

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে, অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পোড়া কপাল! আমি নিতে যাবো তাদের ঠিকানা লিখে! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট না হবে ত তোমার হাতে পড়া কেন ? বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন ?" বলিতে-বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাপ-মা যে তাঁহাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পরে সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার উদ্বেগ ও মনস্তাপের আর অবধি রহিল না। কহিলেন, "আজ যদি তুমি দু'চক্ষু বোজো, আমি না হয় কারো বাড়ী দাসীবৃত্তি করে খাবো, সে আমাকে করতেই হবে তা' বেশ জানি;—আমার মণি-হরি যে কোথায় দাঁড়াবে তার—"বলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন এতক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া একেবারে দুই চক্ষু ভাসাইয়া দিল।

জরুরি মকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ গিরীশের মগজ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রীর আকস্মিক ও অত্যুগ্র ক্রন্দনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি ক্রুদ্ধ, গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন—"হরে ?"

হরি পাশের ঘরে পড়িতেছিল, ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। গিরীশ প্রচণ্ড একটা ধমক্ দিয়া বলিলেন, "ফের যদি তুই ঝগড়া করবি, ত ঘোড়ার চাবুক তোর পিঠে ভাঙ্‌ব। হারামজাদার লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা আর ঝগ্‌ড়া। মণি কই ?"

পিতার কাছে বকুনি খাওয়াটা ছেলেরা জানিতই না। হরি ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, "জানিনে।"

"জান না ? তোদের বজ্জাতি আমি টের পাইনে বটে ? আমার সব দিকে চোখ আছে, তা' জানিস্ ? কে তোদের পড়ায় ? ডাক্ তাকে।"

হরি অব্যক্ত কণ্ঠে কহিল, "আমাদের থার্ড মাষ্টার ধীরেন বাবু সকালে পড়িয়ে যান।"

গিরীশ প্রশ্ন করিলেন, "কেন সকালে ? রাত্রে পড়ায় না কেন, শুনি ? আমি চাইনে এমন মাষ্টার। কাল থেকে অন্য লোক পড়াবে। যা' মন দিয়ে পড়গে যা, হারামজাদা, বজ্জাত।"

হরি শুষ্ক, ম্লান মুখে মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে-ধীরে প্রস্থান করিল। গিরীশ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "দেখেচ, আজকালকার মাষ্টারগুলোর স্বভাব ? কেবল টাকা নেবে, আর ফাঁকি দেবে। রমেশকে বলে দিয়ো,কালই যেন এই পরাণ বাবুকে জবাব দিয়ে অন্য মাষ্টার রেখে দেয়। মনে করেচে, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে!"

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর মুখের প্রতি শুধু একটা রোষ-কষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

গিরীশ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুচারুরূপে সমাপন করিয়াছেন মনে করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

টাকা জিনিষটা সংসারে যে আবশ্যক বস্তু, এ খবর সিদ্ধেশ্বরীর যে জানা ছিল না, তাহা নয়; কিন্তু, সে দিকে এতদিন তাঁহার খেয়াল ছিল না। কিন্তু লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার ছোঁয়াচ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ-মনে এই ব্যাধি ধীরে-ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।

আজই খাওয়া-দাওয়ার পর শৈল এ বাটী হইতে বিদায় লইবে, এইরূপ একটা জনশ্রুতিতে সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়া একটা সুদীর্ঘ ক্রন্দন বাহির হইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। তিনি সেইটা কোনমতে নিবারণ করিয়া জ্বরের ভান করিয়া বিছানাতেই পড়িয়াছিলেন, নয়নতারা আসিয়া নিকটে বসিল। গায়ে হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার ডাকা উচিত কি না জিজ্ঞাসা করিল। সিদ্ধেশ্বরী ও-দিকে মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে বলিলেন—না।

নয়নতারা বিরক্তির কারণ অনুমান করিয়া ঠিক ঔষধ দিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"তাই আমি ভাব্‌ছিলুম দিদি, লোকে কি করে হাতে এত টাকা করে। আমাদের পাড়ার যদুবাবু গোপালবাবু হারাণ সরকার কেউ ত আমার বট্‌ঠাকুরের অর্দ্ধেক রোজগার করে না, তবু তাদের কারও লাখ টাকার কম ব্যাঙ্কে জমা নেই। তাদের পরিবারদের হাতেও দশ বিশ হাজারের কম নেই।"

সিদ্ধেশ্বরী ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "কি করে তুমি জানলে মেজবৌ ?"

নয়নতারা কহিল, "ইনি যে ব্যাঙ্কের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারা সব এঁর বন্ধু কি না। কা'ল গোপাল বাবুর স্ত্রী আমার কথায় অবিশ্বাস করে বল্লে, এ কি একটা কথা মেজবৌ, যে, তোমার দিদির হাতে টাকা নেই ? যেমন করে হোক—"

সিদ্ধেশ্বরী জ্বর ভুলিয়া উঠিয়া বসিয়া নয়নতারার সম্মুখে চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"বাক্স পেঁট্‌রা তুমি নিজের হাতে খুলে দেখ না মেজবৌ, সংসারের খরচের টাকা ছাড়া কোথাও যদি লুকোনো একটা পয়সা দেখ্‌তে পাও। যা করবে ছোট-বৌ। আমার কি একটা কথা বল্‌বার জো ছিল ? এমন সোয়ামীর হাতে পড়েছিলুম, মেজবৌ, যে কখনো একটা পয়সার মুখ দেখ্‌তে পেলুম না। তেম্‌নি শাস্তিও হয়েচে। এখন সে সর্ব্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্চে—কি করবে তার ? কিন্তু আমার হাতে টাকা থাক্‌লে সে টাকা ঘরেই থাকৃত, না, এমনি করে জলে যেত, তা বল দেখি মেজবৌ ?"

মেজ বৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, "সে ত সত্যি দিদি।"

সিদ্ধেশ্বরীর মন শৈলর বিরুদ্ধে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে তিনি নিজেই শৈলকে মানুষ করিয়া, নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, "একটা লোক রোজগারী, আর এত বড় সংসার তাঁর মাথায়। তাঁরই বা দোষ দিই কি করে বল দেখি ?"

নয়নতারা সায় দিয়া বলিল, "সে ত সবাই দেখ্‌তে পাচ্চে দিদি।"

একটু চুপ করিয়া নয়নতারা মৃদু-মৃদু বলিতে লাগিল, "আমাদের গাঁয়ের নন্দ মিত্তির একজন ডাকসাইটে কেরাণি। ছোট ভাইকে মানুষ করতে, লেখা-পড়া শেখাতে, —তার ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে, নিজের হাতে আর কাণা কড়িটি রাখ্‌লে না। বড়বৌ বল্‌তে গেলে ধম্‌কে জবাব দিত—"

সিদ্ধেশ্বরী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক আমার দশা আর কি।"

নয়নতারা কহিল—"তা' বই কি। বড়বৌকে নন্দ মিত্তির ধম্‌কে বল্‌ত, 'তোমার ভাবনা কি ? তোমার নরেন রইল। তাকে যেমন মানুষ করে উকিল করে দিলুম, বুড়ো বয়সে সেও আমাদের তেম্‌নি দেখ্‌বে। মনে ভেবো, সে তোমার দেওর নয়, সন্তান।' কিন্তু এম্‌নি কলিকাল, দিদি, সেই নন্দ মিত্তিরের চোখে ছানি পড়ে যখন চাক্‌রিটি গেল, তখন নরেন উকিল—সহোদর ভাই হয়ে দাদাকে টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে পৈত্রিক বাড়ীটার অংশ পর্য্যন্ত নিলাম ডেকে নিলে। এখন নন্দ মিত্তির ভিক্ষে করে খায়, আর কেঁদে-কেঁদে বলে স্ত্রীর কথা না শুনেই এখন এই অবস্থা। তবু ত সে খুড়তুত-জাঠ্‌তুত নয়, মায়ের পেটের ভাই।"

সিদ্ধেশ্বরী মনে-মনে শিহরিয়া উঠিলেন, "বল কি মেজ বৌ ?"

নয়নতারা বলিল, "মিছে নয় দিদি, এ কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে।"

সিদ্ধেশ্বরী আর কথা কহিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার এক-একবার মনে হইতেছিল, শৈলকে ডাকিয়া নিষেধ করেন; এবং কি করিলে যে তাহাদের যাওয়ায় বিঘ্ন ঘটিতে পারে,মনে-মনে ইহারও নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু নন্দ মিত্তিরের দুরবস্থার ইতিহাসে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে বিকল হইয়া গেল। শৈলকে বাধা দিবার আর তাঁহার চেষ্টামাত্র রহিল না।

গিরীশ তখন আদালতের জন্য প্রস্তুত হইতে উঠি-উঠি করিতেছিলেন; রমেশ আসিয়া কহিল, "আমি দেশের বাড়ীতে গিয়েই থাক্‌ব মনে করচি।"

"কেন ?"

রমেশ কহিল, "কেউ বাস না করলে বাড়ী-ঘর-দোরও ভেঙ্গেচুরে যায়, আর, জমি-যায়গা-পুখুর-টুখুরগুলোও খারাপ হয়ে যায়। আমারও এখানে কোন কাজ নেই; তাই বল্‌চি।"

"বেশ কথা! বেশ কথা!" বলিয়া গিরিশ খুসি হইয়া সম্মতি দিলেন। ছোট ভাইয়ের প্রার্থনার ভিতরে যে কত গৃহ-বিচ্ছেদ, কতখানি মনোমালিন্য প্রচ্ছন্ন ছিল, সে সংবাদ ভদ্রলোক কিছুই জানিতেন না। তিনি আদালতে বাহির হইয়া যাইবার পরেই শৈল বড়জায়ের ঘরের

চৌকাটের নিকট হইতে তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং সামান্য একটা তোরঙ্গ মাত্র সঙ্গে লইয়া দুই ছেলের হাত ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিছানার উপর কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিলেন এবং নয়নতারা নিজের দোতালার ঘরের জানালা খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

(৮)

গোটাদুই প্রকাণ্ড খাট জোড়া করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সারারাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ীর কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেন না। সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, অনেকবার উঠিতে হইত; কোন দিনই সুস্থ, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পাইতেন না; অথচ, শৈল কিম্বা আর কেহ যে এই সকল উৎপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে, এ অধিকারও কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার এত বড় অসুখের সময়েও জ্যাঠাইমার বিছানা ছাড়া কোন ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিল না। কানাইয়ের শোয়া খারাপ, তাহার জন্য এতটা স্থান চাই; ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েল ক্লথের ব্যবস্থা; বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর একপ্রকার বন্দোবস্ত; পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধা বোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত,—খেঁদির বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কি না, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় চাপা পড়িয়াছে কি না, এই সব দেখিতে-দেখিতে আর বকিতে বকিতেই সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত। আজ শোবার সময় বিছানার এতখানি যায়গা যে খালি পড়িয়া থাকিবে, শৈলর যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরীর সে হুঁস ছিল না। নয়নতারার শতকোটী মাথার দিব্যর পর তিনি রাত্রে নীচে হইতে খাইয়া ঘরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ শৈলর ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কে যেন তাঁহার বুকে মুগুর দিয়া মারিল। ঘরে আলো নাই, দরজা দুইটা খোলা;—সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে বিপি[ন] এবং খুদে ঘুমাইতেছে—বাকি বিছানাটা তপ্ত-মরুর ম[ত] শূন্য খাঁ-খাঁ করিতেছে। নিজের অপরিসর স্থানটুকুতে তিনি নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেই দু'[টি] নিমীলিত চোখের কোণ বহিয়া তখন অজস্র তপ্ত অশ্রুতে তাঁহার মাথার বালিস ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বাটী[র] ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্য[ন্ত] খুঁত্‌-খুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আ[র] কাহাকেও এক বিন্দু বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার ব[দ্ধ] সংস্কার ছিল, নিজে উপস্থিত না থাকিলেই ছেলে[রা] নানাপ্রকারে ফাঁকি দিয়া কম খায়; এবং এ ফাঁকি তি[নি] ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে। দৈবাৎ কো[ন] গতিকে কোন ছেলের খাওয়া চোখে দেখিতে না পাই[লে] তাহাকে জেরা করিয়া, তাহার পেটে হাত দিয়া অনুভ[ব] করিয়া, নানা রকমে সিদ্ধেশ্বরী প্রতিপন্ন করিবার চে[ষ্টা] করিতেন—সে কিছুতেই ন্যায্য আহার করে নাই। এ[বং] এই অন্যায়টুকু সংশোধন করিতে হতভাগ্য ছেলেটাকে তখনই তাঁহার চোখের উপর দাঁড়াইয়া একবাটি দুধ খাই[তে] হইত। শৈল ছেলেদের হইয়া মাঝে-মাঝে লড়াই করিত জবরদস্তি খাওয়ানর অপকারিতা লইয়া তর্ক করিত; কি[ন্তু] সিদ্ধেশ্বরীকে আন্তরিক ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা ভিন্ন তাহা[তে] আর কোন ফল হইত না। সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটা[র] পানে চাহিতেন, তখনই দেখিতেন—সে রোগা হই[য়া] যাইতেছে। এই লইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা, অশান্তির অব[ধি] ছিল না। আজ বিছানায় শুইয়া তাঁহার কেবলই ম[নে] হইতে লাগিল, দেশের বাটীর বহুবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হয় [ত] কানাইয়ের খাইয়া পেট ভরে নাই, এবং পটল নিশ্চয়ই [না] খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় ত তাহাকে তুলি[য়া] খাওয়ানো হইবে না, হয় ত সে সারারাত্রি ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করিবে;—কল্পনায় যতই এই সকল দুর্ঘটনা তিনি স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, ততই রাগে, দুঃখে, বেদনায় তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। পাশের ঘরে গিরীশ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অনেক রাত্রে স্বামী শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে হাত দিয়া ঘু[ম] ভাঙাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, মানলুম যেন পটলকে শৈল নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু, কানাই ত আর তার পেটে

ছেলে নয়;—তার ওপর তার জোর কি?" গিরীশ ঘুমের ঝোঁকে জবাব দিলেন, "কিছু না।"

সিদ্ধেশ্বরী আশান্বিতা হইয়া শয্যাংশে বসিয়া বলিলেন, "তা'হলে, আমরা নালিশ করে দিলে যে তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে। পারে কি না, ঠিক বোলো?"

গিরীশ অসংশয়ে বলিলেন, "নিশ্চয় শাস্তি হবে।"

সিদ্ধেশ্বরী আশায়, আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "সে যেন হোলো; কিন্তু ধরো পটল। তাকে ত আমিই মানুষ করেচি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, সে আমাকে ছাড়া থাক্‌তে পারে না, চাই কি ভেবে-ভেবে তার শক্ত অসুখ হতে পারে, তা'হলে হাকিম কি রায় দেবে না যে, সে তার জ্যাঠাইমার কাছেই থাকুক। বেশ! অম্‌নি তোমার নাক ডাক্‌চে—আমার কথা বুঝি তবে শোন নি!" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর পায়ের উপর সজোরে একটা নাড়া দিলেন।

গিরীশ জাগিয়া উঠিয়া কহিলেন—"নিশ্চয় না।"

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, "কেন নয়? মা বলেই যে ছেলেকে মেরে ফেল্‌বে, মহারাণীর কিছু এমন হুকুম নেই? কালই যদি মেজ-ঠাকুরপোকে দিয়ে উকিলের চিঠি দিই, কি হয় তা' হলে?" বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তরের আশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে স্বামীর নাসিকা-ধ্বনি শুনিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সারারাত্রি তাঁহার লেশমাত্র ঘুম আসিল না। কখন্ সকাল হইবে, কখন্ হরিশকে দিয়া উকিলের চিঠি পাঠাইয়া ছেলের দাবী করিবেন, চিঠি পাইয়া তাহারা কিরূপ ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া কানাই ও পটলকে রাখিয়া যাইবে, এই সমস্ত আশা ও আকাশ-কুসুমের কল্পনা তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ করিয়া রাখিল।

প্রভাত হইতে-না-হইতে তিনি হরিশের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন, "মেজঠাকুরপো, উঠেচ?"

হরিশ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, "দেরি করলে চল্‌বে না, এখ্‌খুনি ছোট ঠাকুরপোদের নামে উকিলের চিঠি লিখে দরওয়ান দিয়ে পাঠাতে হবে। তুমি বেশ করে একখানা চিঠি লিখে বলে দাও যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব না পেলে নালিশ করা হবে।"

হরিশকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করা বাহুল্য। সে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিল, "ব্যাপারটা কি বল দেখি বড়-বৌ? বোস, বোস—কি, কি নিয়ে গেছে? দাবীটা একটু বেশি করে দেওয়া চাই, বুঝ্‌লে না?"

সিদ্ধেশ্বরী খাটের উপর আসন গ্রহণ করিয়া দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া তাঁহার দাবীটা বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া হরিশের হর্ষোজ্জ্বল মুখ কালি হইয়া গেল। কহিল, "তুমি কি ক্ষেপেচ বড়বৌঠান? আমি বলি বুঝি আর কিছু। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তুমি করবে কি?"

সিদ্ধেশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "তোমার দাদা যে বললেন, নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে!"

হরিশ কহিল, "দাদা, এমন কথা বল্‌তেই পারেন না। তোমাকে তামাসা করেচেন।"

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া কহিলেন, "এতটা বয়স হ'ল, তামাসা কাকে বলে—বুঝিনে ঠাকুরপো? তোমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে, ছেলে দু'টোকে কাছে আনি। তাই কেন স্পষ্ট করে বল না?"

হরিশ লজ্জিত হইয়া তখন বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, এ দাবী আদালত গ্রাহ্য করিবে না। তার চেয়ে বরং আর কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়া জব্দ করা যাইতে পারে। আমাদের উচিত এখন তাই করা।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "তোমার উচিত তোমার থাক্, ঠাকুরপো; আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, এখন মিথ্যে দাবী-দাওয়া করতে পারব না। পরকালে আমার হয়ে ত আর তুমি জবাব দিতে যাবে না। তুমি না লেখো, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেন বাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনিগে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কি একটা কাজে বাজার-খরচের হিসাব লইয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর সরকার গণেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন। সে বেচারা নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, বারো গণ্ডা টাকার উপর আরও দু-টাকা খরচ হওয়াতেই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী এ কর্ম্মে নূতন ব্রতী। তাঁহার নূতন ধারণা—তাঁহাকে নির্ব্বোধ পাইয়া সবাই টাকা চুরি করে। অতএব চক্রবর্ত্তীও

যে চুরি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তর্ক করিতেছিলেন,—"পঞ্চাশ টাকা যে এক আঁজ্‌লা টাকা, গণেশ! আমি লেখাপড়া জানিনে বলেই কি তুমি বুঝিয়ে দেবে যে, বারো গণ্ডার ওপর মোটে দুটি টাকা বেশি খরচ হয়েচে বলে এই পঞ্চাশ-পঞ্চাশটে টাকা সব খরচ হয়ে গেছে,—আর কিছু নেই? আমি কি এতই বোকা?"

গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিল, "মা, দিদিকে ডেকে না হয়—"

"নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে? সে আমার চেয়ে বেশি বুঝ্‌বে? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই করে হিসেব দেবে, সে হবে না বল্‌চি। না সে যাবে, না আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। পোড়ার-মুখীকে দশ বছরের মেয়ে বৌ কোরে ঘরে আন্‌লুম। বুকে করে মানুষ করে এত বড় করলুম, এখন সে তেজ করে বাড়ীর দু-দুটো ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তা যাক্। আমিও খবর রাখ্‌চি। কানাই-পটলের কোন দিন এতটুকু অসুখ শুন্‌তে পেলে দেখ্‌ব কেমন করে সে ছেলে রাখে! তা' এখন যাও—দুপুর-বেলা মনে করে বলে যেয়ো, এতগুলো টাকা কোথায় কি করলে।" বলিয়া গণেশকে বিদায় দিলেন। সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মেজবৌ আসিয়া কহিল, "দিদি, বল্‌তে পারিনে, কিন্তু, আমিও সংসার চালিয়েচি, টাকা-কড়ি, হিসেবপত্র সব রেখেচি। ছোটবৌ নেই বলে যে এত ঝঞ্ঝাট তুমি সহ্য করবে, আর আমি বসে-বসে দেখ্‌ব, সে ভাল নয়। আমার কাছে কারো চালাকি করে হিসেব গোল করবার জো নেই।"

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন,—"সে ত ভাল কথা মেজ-বৌ। আমার এই রোগা শরীরে এত হাঙ্গামা কি ভাল লাগে! শৈল ছিল,—যেখানকার যত টাকা তার হিসেব করা, খরচ করা, ব্যাঙ্কে পাঠানো সমস্তই তার কাজ। এ সব কি আর আমাকে দিয়ে হয়? বেশ ত, এখন থেকে তুমিই কোরো মেজবৌ।" বলিয়া সিন্দুকের চাবিটা কিন্তু নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। নয়নতারা সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়াও লোহার সিন্দুকের চাবিটা আর নিজের আঁচলে বাঁধিতে সমর্থ হইল না। নয়নতারা অত্য[ন্ত] কৌশলী এবং চতুর, অনেকখানি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কা[জ] করিতে পারিত। কিন্তু এই একটা তাহার বড় রকমে[র] গোড়ায়-গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরী[হ] লোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহা[র] ফল ভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না। [সে] শত্রুপক্ষকেও যেমন সন্দেহ করিতে শিখে, মিত্রপক্ষে[র] উপরও তেমনি বিশ্বাস হারায়; সুতরাং সিদ্ধেশ্বরী যে মুহূ[র্তে] ছোটবৌয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠি[ক] সেই মুহূর্ত্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।

(৯)

কোন একটা অভাব লইয়া—তা সে যত গুরুতর[ই] হৌক, মানুষ অনন্তকাল শোক করিতে পারে না। সি[দ্ধে]শ্বরীর কাছে তাঁহার শয্যার শূন্যতা ক্রমশঃ পূর্ণ হই[য়া] আসিতে লাগিল। শৈলর ঘরের দিকটা তিনি মাড়াইতে পারিতেন না, এখন সে বারান্দা স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যান-মনেও পড়ে না; কানাই-পটলের সম্বাদ তিনি বিবিধ উপা[য়ে] সংগ্রহ করিবার জন্য অহরহঃ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, এ[খন] সে উৎকণ্ঠার অর্দ্ধেক তিরোহিত হইয়া গেছে। এইরূ[পে] সুখে-দুঃখে এক বৎসর ঘুরিয়া গেল।

সে দিন হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর কাণে গেল যে, দেশের বি[ষয়] লইয়া আজ ছয় মাস ধরিয়া ছোট-দেবরের সহিত তাঁহা[র] মামলা চলিতেছে। মকদ্দমা চালাইতেছে হরিশ নিজে[।] দাওয়ানী ত চলিতেছেই; গোটাদুই ফৌজদারীও ইতিমধ্যে হইয়া গেছে। খবর শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে, ভাবন[ায়] পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি করি[বার] মত সম্বাদ জানার সুবিধা হইবে না জানিয়া, তিনি সন্ধ্যা সময় হরিশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব[লি]লেন, "বল কি ঠাকুরপো, ছোট-ঠাকুরপো করচে তোম[ার] দাদার সঙ্গে মামলা?"

হরিশ উচ্চ অঙ্গের একটুখানি হাস্য করিয়া কহি[ল], "তাই ত হচ্চে, বৌঠান্!"

সিদ্ধেশ্বরী মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস হয় না, মেজ-ঠাকুরপো। এখনো যে চন্দ্র-সূর্য্য উঠ্‌চে!"

নয়নতারা খাটের এক ধারে বসিয়া খেঁদিকে ঘুম পাড়াইতেছিল, মৃদু স্বরে কহিল, "সে ত উঠ্‌চেই দিদি। আর এই ছোট-দেওরকেই তোমরা হাজার-হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিতে। সে সব-ত তখন যায় নি, যাচ্চে এখন।"

সিদ্ধেশ্বরী দুঃসহ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোকদ্দমা কেন?"

হরিশ বলিল, "কেন! দেখ্‌লুম, মোকদ্দমা না করে আর উপায় নেই। দেশের বিষয়ই বিষয়। দেখ্‌লুম, আমরা গেলে আমাদের মণি-হরি-বিপিন-ক্ষুদে এক কাঠা জমি-জায়গা ত পাবেই না—দেশের বাড়ীতে হয় ত ঢুক্‌তে পর্য্যন্ত পাবে না। ধর না বড়-বৌ, দেশে যা' কিছু আছে, সমস্ত দখল করে বসে গেছে। খাজনাপত্র আদায় করচে, খাচ্চে-দাচ্চে—একটা পয়সা পর্য্যন্ত দেবার নাম করে না। বিষয় যা-কিছু তা ত দাদাই করেছেন, অথচ দাদার চিঠির একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না,—এমনি নেমকহারাম রমেশ। আমি ও-বাড়ী থেকে তাকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

সিদ্ধেশ্বরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তারাই বা ছেলেপিলে নিয়ে যাবে কোথায়?"

হরিশ বলিল, "সে খবরে আমাদের ত দরকার নেই, বড় বৌ।"

সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদা কি বল্‌লেন?"

হরিশ বলিল, "দাদা যদি তেমন হতেন, তা হলে ত ভাব্‌না ছিল না, বড়বৌ। যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, রমেশ তাঁর খেয়ে-পরে, তাঁর টাকায় তাঁরই বিষয় নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েচে, তখনই তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেই জড়িয়ে তোলবার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে আমাকে সেটা ফাঁসাতে হয়েচে।"

নয়নতারা ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, ছোট-ঠাকুরপোই যেন দোষী; কিন্তু, আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোট-বৌ কি করে এতে মত দিলে? আমরা আর সবাই দুষ্টু, বজ্জাত হতে পারি; কিন্তু সে তার বট্‌ঠাকুরকে ত চেনে। তাঁকে জেলে দিয়ে সে কি সুখ পেত?"

সিদ্ধেশ্বরীর আপাদ-মস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তথা হইতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ যথারীতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিতেই তাহার অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা আজ তাঁহারও চোখে পড়িল। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "আজ কখন্ জ্বর এল?"

সিদ্ধেশ্বরী অভিমানভরে বলিলেন, "তবু ভালো, জিজ্ঞেসা করলে!"

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "বিলক্ষণ! জিজ্ঞেসা করিনে ত কি? পর্শু ও ত মণিকে ডেকে বল্‌লুম, তোর মাকে ওষুধ-টষুধ দিস্? তা' আজকালকার ছেলেগুলো হয়েচে সব এম্‌নি যে, বাপ-মাকে পর্য্যন্ত মানে না।"

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর বোলো না। পনর দিন হয়ে গেল, মণি তার পিসীর ওখানে এলাহাবাদে গেছে, আর তুমি তাকে পর্শু জিজ্ঞেসা করলে! কখনো যা' করনি, তা কি আজ করবে? তা' নয়, আমি সে জন্যে আসিনি। আমি এসেচি জান্‌তে, ব্যাপারটা কি? ছোট-ঠাকুরপোর সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা কিসের?"

গিরীশ মহা খাপা হইয়া উঠিলেন,—"সেটা একটা চোর! চোর! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে! বিষয়-পত্র সব নষ্ট করে ফেল্‌লে। সেটাকে দূর করে না দিলে দেখ্‌চি আর ভদ্রস্থ নেই—সমস্ত ছারখার-ধ্বংস করে দিলে।"

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, তা' যেন দিলে; কিন্তু, মাম্‌লা-মকদ্দমা ত শুধু-শুধু হয় না, টাকা খরচ করা ত চাই? ছোট-ঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথায়?"

ইতিমধ্যে হরিশ নামিয়া আসিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাইতেছিল, দাদার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিল। সেই জবাব দিল—"টাকার কথা ত এই-মাত্র মেজবৌ বলে দিলে বড়-বৌঠান! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে হাজার-চারেক নিয়েছিল, সেটা ত হাতে আছেই; তা' ছাড়া, ছোটবৌমার হাতেই ত এতদিন টাকাকড়ি সমস্ত ছিল—বুঝেই দেখ না!"

গিরীশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আমার

সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে,—কিছু কি আর রেখেচে হে হরিশ! সেটা একেবারে বেহেড লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে! শুক্রবার দিন কোর্টে এসে বলে—বাড়ী-ঘর-দোর মেরামত করতে হবে, পাঁচশ টাকা চাই!"

হরিশ অবাক হইয়া গেল—"বলেন কি? সাহস ত কম নয়!"

গিরীশ কহিলেন,—"সাহস বলে সাহস! একেবারে লম্বা ফর্দ্দ—এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথাতে হবে; এটা না বদ্‌লালে নয়, ওটা না করলেই চলে না। শুধু কি তাই? সংসারের অনাটন—শীতের কাপড়-চোপড় কিন্‌তে হবে,—ধান কিনে, আলু কিনে রাখ্‌তে হবে—এম্‌নি হাজারো খরচ দেখিয়ে আরও তিনশ টাকার দরকার।"

হরিশ অসহ্য ক্রোধ কোনমতে সংবরণ করিয়া শুধু কহিল—"নির্লজ্জ! তার পরে?"

গিরীশ বলিলেন, "ঠিক তাই! হতভাগার একেবারে লজ্জা-সরম নেই—একেবারে নেই। এই আটশ টাকা নিয়ে তবে ছাড়্‌লে।"

"নিয়ে গেল? আপনি দিলেন?"

গিরীশ বলিলেন, "নইলে কি ছাড়ে? নিয়ে তবে উঠ্‌ল যে!" হরিশের সমস্ত মুখখানা প্রথমটা অগ্নিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই ছাইয়ের মত হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, "তা'হলে মাম্‌লা-মকদ্দমা করে আর লাভ কি দাদা?" গিরীশ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,"কিছু না, কিছু না। নিজের সংসারটা যে চালিয়ে নেবে, হতভাগার সেটুকু ক্ষমতাও নেই—এম্‌নি অপদার্থ হয়ে গেছে। শুনি, বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ডা বসিয়ে দিনরাত তাস-পাশা চল্‌চে, আর খাচ্চেন, ঘুমোচ্চেন—বাস্! মানুষ যেমন শিব স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েচে তাই—বুঝ্‌লে না হরিশ!" বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই মাতিয়া উঠিয়া হো হো রবে হাসিয়া ঘর ভরিয়া দিলেন।

হরিশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিতে-বলিতে গেল, "আচ্ছা, আমি একাই দেখ্‌চি।"

মাঘ মাসের বাইশে মকদ্দমার দিন ছিল। বিশে গিরীশের এক জ্ঞাতি-কন্যার বিবাহে কন্যার পিতা আসিয়া গিরীশকে চাপিয়া ধরিলেন, "দাদা, তুমি উপস্থিত থেকে আমার মেয়ের বিবাহ দাও,এই আমার বড় সাধ। তোমা[illegible] একটি দিনের জন্যেও অন্তত: দেশে যেতে হবে।" 'ন[illegible] শব্দটা গিরীশের মুখ দিয়া বাহির হইবার জো ছিল না তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, "যাব বই কি ভা[illegible] নিশ্চয় যাব।"

কন্যার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কি[illegible] এই 'নিশ্চয়' কথাটার বাস্তবিক অর্থ যথাকালে যে কি হই[illegible] তাহা সব চেয়ে বেশি জানিতেন সিদ্ধেশ্বরী। সুতর[illegible] প্রতিশ্রুতির বিবরণ যদিচ স্বামী বিস্মৃত হইয়াছিলেন, [illegible] হন নাই।

বিশে সকালে গিরীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলে[illegible] "বল কি! আজ যে আমার সেই জয়পুরের মক—"

"না, সে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। উকি[illegible] হয়ে পর্য্যন্তই ত মিছে কথা বলে আস্‌চ—আজ এক[illegible] কথাও রাখো। পরকালের ভয় কি তোমার এতটু[illegible] হয় না?"

গিরীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "পরকাল? তা ব[illegible] —কিন্তু—"

"না, কিন্তুতে হবে না, তোমাকে যেতেই হবে। যাও[illegible]" অতএব গিরীশকে দেশে যাইতে হইল।

যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিলে[illegible] "ছেলে দুটোকে—" বলিয়াই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে" বলিয়া গিরীশ বাহির হই[illegible] পড়িলেন। কিন্তু কি হবে, তাহা স্বামি-স্ত্রীর কেহই বুঝি[illegible] না। নয়নতারা গা টিপিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে অন্তরালে ডাকি[illegible] কহিল, "ও-বাড়ীতে কিছু খেতেটেতে বট্‌ঠাকুরকে মা[illegible] করে দিলে না কেন?"

সিদ্ধেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন[illegible]"

নয়নতারা মুখখানা বিকৃত-গম্ভীর করিয়া বলিল, "ব[illegible] যায় কি দিদি।"

সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। আঁচ[illegible] মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, "সে তু[illegible] পার মেজবৌ। শৈলর গলা কেটে ফেল্‌লেও সে তা পার[illegible] না।" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মকদ্দমার তদ্‌বির করিতে দুই-একদিন পূর্ব্বে জেল[illegible] যাইবার জন্য রমেশ ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। [illegible]

সেখানে ছিল না। সে ঠাকুরঘরের মধ্যে দেহ হইতে তাহার সর্ব্বশেষ অলঙ্কারখানি খুলিয়া ফেলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গলবস্ত্র, যুক্তকরে মনে-মনে বলিতেছিল, "ঠাকুর, আর ত কিছু নাই; এইবার যেমন করিয়া হোক্ আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমার ছেলেরা না খাইয়া মরিতেছে, আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কাল-সার হইয়াছেন—"

"ওরে কেনো—ওরে পটুলি—"

শৈল চমকিয়া উঠিল,—এ যে তাহার ভাশুরের কণ্ঠস্বর! জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিনিই বটে। পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, সেই শান্ত, স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি! চিরকাল যেমনটি দেখিয়া আসিয়াছে, ঠিক তাই। কোথাও কোন অঙ্গে যেন এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কানাই পড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল; পটল খেলা ছাড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। তাহাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।

রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

গিরীশ কহিলেন, "এমন সময় কোথায় যাওয়া হবে?" রমেশ কুণ্ঠিত অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "জেলায়—"

গিরীশ চক্ষের পলকে বারুদের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন,"—হতভাগা,লক্ষ্মীছাড়া, তুমি আমারই খাবে-পরবে, আর আমারই সঙ্গে মামলা করবে? তোমাকে এক সিকি-পয়সার বিষয়-আশয় দেব না,—দূর হও আমার বাড়ী থেকে; এক্ষণি দূর হও—এক মিনিট দেরি নয়—এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও—"

রমেশ কথা কহিল না, মুখ তুলিল না; যেমন ছিল তেম্‌নি বাহির হইয়া গেল। দাদাকে সে যেমন ভক্তি-মান্য করিত, তেম্‌নি চিনিত। এই সব তিরস্কারের অন্তঃশূন্যতা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়া সে তখনকার মত মুখ বুজিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন শৈল আসিয়া দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। গিরীশ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এস, এস, মা এস।" সে স্বরে, উত্তাপ নাই, জ্বালা নাই—বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া কোন লোকের সাধ্য নাই যে বলে, এই মানুষটাই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে ওরূপ ভাবে চীৎকার করিতেছিল।

গিরীশের নজরে কোনদিন কিছু পড়ে না; কিন্তু, আজ কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করিল। শৈলর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তোমার গায়ে গয়না দেখ্‌চিনে কেন ছোট-বৌমা?"

শৈল অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল। গিরীশের কণ্ঠস্বর পুনরায় এক-এক-পর্দ্দা চড়িতে লাগিল—"ঐ হতভাগা শূয়ার বেচে খেয়েচে। গয়না কার? আমার! ওকে আমি জেলে দিয়ে তবে ছাড়্‌ব।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

*   *   *

বাইশে মকদ্দমার দিন অপরাহ্ণ-বেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া হুগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিল; এবং ধরা-চূড়া না ছাড়িয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল।

নয়নতারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল; খবর পাইয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু হরিশ সেই যে পাশ ফিরিয়া নীরব হইয়া রহিল, কেহই তাহার মুখ হইতে একটা জবাবও বাহির করিতে পারিল না।

মকদ্দমায় যে হার হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই;—দুই জায়ে নিরন্তর বুঝাইতে লাগিলেন,—মকদ্দমায় হার-জিত আছেই,—তা'ছাড়া, এখনও হাইকোর্ট আছে, বিলাতে আপীল করা আছে—এরই মধ্যে এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িবার কিছুমাত্র হেতু নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই দু'টি স্ত্রীলোকের যে আশা-ভরসা ছিল, নিজে উকিল হইয়াও হরিশের তাহার কণামাত্রও দেখা গেল না। সিদ্ধেশ্বরী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হরিশের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "মেজ-ঠাকুরপো, আমি বল্‌চি, তোমাদের হার হবে না। যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি হাইকোর্ট কর। আমি আশীর্ব্বাদ করচি, তুমি জিত্‌বেই।"

এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, বোঠান, সে জো নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্টই বল, আর বিলাতই বল—কোথাও কোন রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই দাদার নামে খরিদ ছিল;—বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি সর্ব্বস্ব ছোটবৌমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এসেচেন; রেজেষ্ট্রি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। দেশের দিকে মুখ ফেরাবারও আর পথ নেই

দুই জায়ে মুখোমুখী হইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পর গিরীশ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত। কাণ্ড-জ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকি রাখিল না।

গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন, যে, এ ছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না। হতভাগা, নচ্ছার, বোম্বেটে ছোট-বৌমার গয়নাগুলা বেচিয়া খাইয়াছে, আর একটু হইলেই বাড়ীর ইঁটকাঠ পর্য্যন্ত বেচিয়া খাইত—সাত পুরুষের বাস্ত-ভিটার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাডুবি হইতে মুখুয্যে-বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন।

শুধু সিদ্ধেশ্বরী একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন, ভাল-মন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চোখ-দু'টিতে জল তখনও টল-টল করিতেছিল;—দুই পা[য়ের] উপর মাথা পাতিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে-ধী[রে] বলিলেন,—"আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে, য[া] যা মুখে এলো—বলে গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি তাঁদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে কথা আজ যেমন আ[মি] বুঝেচি এমন কোন দিন নয়।"

গিরীশ মহা খুসি হইয়া মাথা নাড়িয়া বারংবার বলি[তে] লাগিলেন, "দেখ্‌লে বড়-বৌ, আমার সব দিকে নজর থা[কে] কি না! রমেশ, কালকের ছোঁড়া, সে আমার চোখে ধু[লো] দিয়ে আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্ট করে দেবে! এম[ন] কায়দা বেঁধে দিয়ে এলুম যে, আর সেখানে বাছাধ[নের] চালাকিটি চল্‌বে না!" বলিয়া কি-জানি নিজের কে[ান] হাসির কথায় নিজেই হো হো শব্দে হাসিয়া ঘর-দ্বার পরি[পূর্ণ] করিয়া ফেলিলেন।

জীবলীলা

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

গভীর আঁধার রাত্রি, গম্ভীরে গর্জ্জিছে মেঘ,
দৈত্যের সংগ্রাম যেন আস্ফালিছে বায়ু বেগ!
তীক্ষ্ণ তরবারি যেন দীর্ণ করে মেঘরাশি,
সর্পসম খেলে যায় বিকট বিজলি-হাসি।
অদূরে ছুটিছে ডরে নীরবে শৃগালদল,
আছাড়ি পড়িছে কূলে জাহ্নবীর কাল জল।
উন্মত্তা জাহ্নবী যেন গ্রাসিতে সবেগে ধায়—
পড়িছে কাঁপিয়া কূল প্রবল তরঙ্গ-ঘায়।
ক্ষণপ্রভা ক্ষণকাল ঝলসিল চারিধার,
নিমেষে গ্রাসিল তারে মসীলিপ্ত অন্ধকার।

একা আমি, কেহ নাই—ছিল যাহা তাহা নাই—
প্রাণহীন শিশু মোর গঙ্গা-কোলে পেলে ঠাঁই!
সোহাগের শতপাকে বাঁধা ছিল সে আমার,
ভীষণ দুর্য্যোগ, তবু রাখে ঘরে—সাধ্য কার!
কড়্ কড়্ গর্জ্জে মেঘ—প্রতিধ্বনি কেঁপে উঠে;
হাহা রবে অট্টহাস্যে পাগল পবন ছুটে!
তবুও, তবুও তার স্থান নাই গৃহে আর!
গৃহস্বামী নহি শুধু—আমি ত জনক তার!
অমন মোহিনী মায়া ধরিল রাক্ষসী-বেশ—
কোথা স্নেহ প্রাণে আর—কঠিন কর্ত্তব্য শেষ!

মৃত্যু যেই তারে আসি সহসা করিল গ্রাস,
নিষ্পন্দ হইল হৃদি, স্তব্ধ আঁখি, রুদ্ধ শ্বাস!
নিশ্চল শোণিত-স্রোত, শীতল শিথিল কায়—
প্রতি অঙ্গে মৃত্যু তার ভ্রূকুটি করিয়া চায়!
ক্ষুদ্র শিশু, নহে ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি আশ্—
নিষ্ঠুর মৃত্যুর তায় কিবা তীব্র উপহাস!
ক্রীড়ারত মৃগশিশু চকিতে চমকে চায়,
সম্মুখে শার্দ্দূল-দৃষ্টি তীরসম বিঁধে গায়!
বিদ্যুৎ-বিকাশে দেখি, ডুবে-ডুবে ভেসে উঠে
শিশু মোর বাহু মেলি—কল্লোল লইয়া ছুটে!

এরি নাম জীবলীলা! প্রকৃতির এই খেলা!
অফুটন্ত ফুলদলে করে শিশু হেলাফেলা!
প্রকৃতি প্রচণ্ড রণে—ধরা-বক্ষে হাহাকার—
হো হো হো হো মৃত্যু হাসি ঢালে গাঢ় অন্ধকার!
ক্ষুদ্র দীপশিখা মত তমঃ মাঝে দেহ লয়ে
কেঁপে কেঁপে জলে প্রাণ পবনের ভর সয়ে!
জীবনের পূর্ব্বভাগ—নহি তত্ত্ব সমাচার!
সম্মুখে দাঁড়ায়ে মৃত্যু, কি বিরাট অন্ধকার!
সত্য দেখি, জন্মে—যায়,—পরলোক-তমসায়—
ধরণীর ধূলি শুধু দুই মুষ্টি বেড়ে যায়!
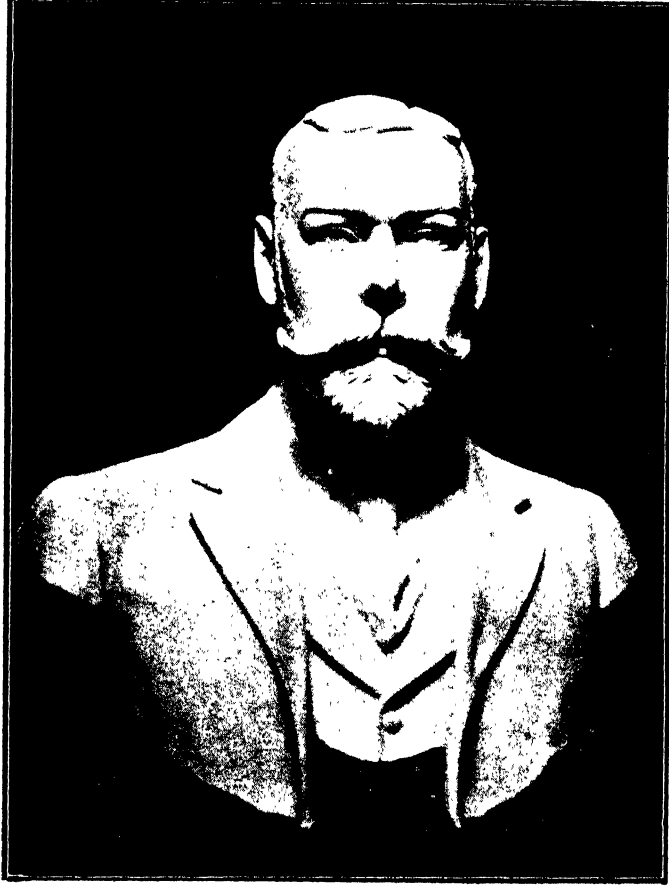
ভাস্কর-পরিচয়

মহামহিম ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়

আমরা ইতঃপূর্ব্বে এক নবীন ভাস্কর, শ্রীযুক্ত কারমোরকারের পরিচয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি; অদ্য বিশেষ আনন্দের ও গৌরবের সহিত বোম্বাই-নিবাসী আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাস্করের পরিচয় দিতেছি। তাঁহার পরিচয় তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি হইতেই সকলে পাইবেন। এই ভাস্করের নাম মিঃ ভি, ভি, ওয়াঘ (Mr. V. V. Wagh.) ইনি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। ইনি অনেক বড়লোকের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহামহিম ভারত-সম্রাট্ মহোদয় এবং আমাদের সর্ব্বজনভক্তিভাজন, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট শ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের মূর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আমরা এতদ্‌সহ সেই দুইখানি ও মিঃ ওয়াঘ নির্ম্মিত আরও কয়েকখানি মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত করিলাম। তিনি কবি-সম্রাট্-সার রবীন্দ্রনাথেরও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী মিঃ ওয়াঘকে ধন্যবাদ-সূচক যে পত্র তাঁহার সেক্রেটারীর দ্বারা লিখাইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—"Her Excellency the Lady Hardinge has asked me to let you know that she is highly pleased with the bust you have prepared of H. E. The Viceroy and thinks it is

পর কগত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ
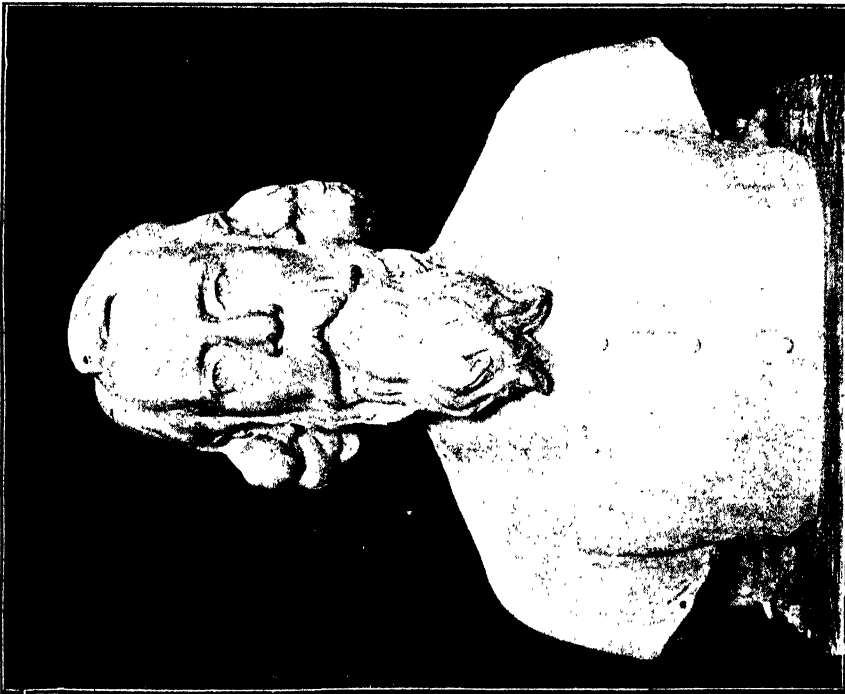
কবিসম্রাট্ স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়

an extremely good likeness. Please allow me to congratulate you on your success."

আমরা আমাদের 'নবীন ভাস্কর' প্রবন্ধে পরলোকগত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের যে মূর্ত্তি মিঃ কারুমোরকারের নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, মিঃ ওয়াঘ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সে মূর্ত্তি কারমোরকারের নির্ম্মিত নহে; মিঃ ওয়াঘেরই নির্ম্মিত; মিঃ কারমোরকার ঐ মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সামান্য সাহায্য করিয়াছিলেন মাত্র। মিঃ ওয়াঘের ঠিকানা—গিরগাঁও, বোম্বাই।

বোম্বায়ের গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড ওয়েলিংডন মহোদয়
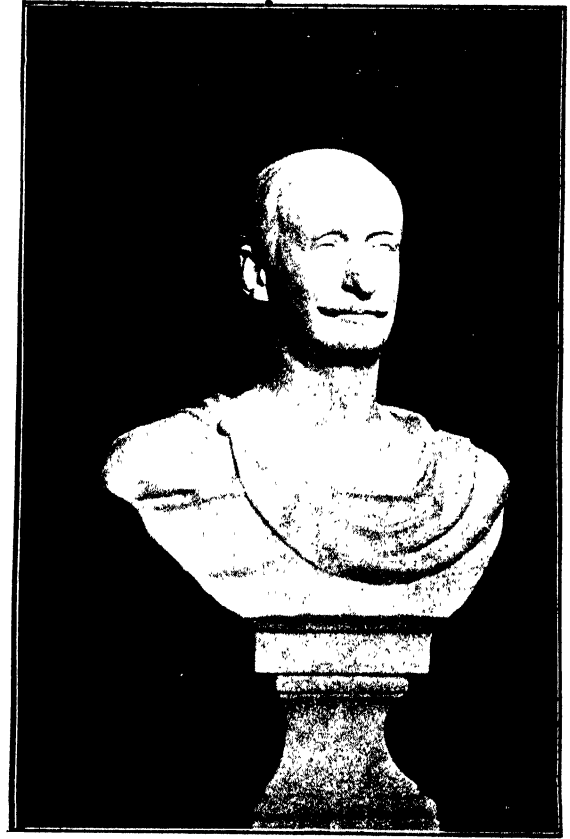
ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়

নবীনচন্দ্র

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়]

ভাবের ভুবনে নবীন বন্যা বহায়েছ তুমি হে কবিবর,
গেঁথেছ অমল মণির মালিকা মথি' বারুণীর রত্নাকর।
বঙ্গের নীল অম্বরতলে তোমার কণ্ঠকাকলি উথলে,
মধুমঙ্গল রাগিণী তোমার মুগ্ধ করেছে আপন পর।
যৌবনে এই বিশ্ব দেউলে লভিয়াছ কবি গভীর জ্ঞান,
নন্দন-ফুল-আনন্দ-রসে ধন্য হয়েছে তোমার ধ্যান।
ফুটিল তোমার মর্ম্মোৎপল দিগ্‌দিগন্তে সুধাপরিমল—
লভিলে মায়ের পুণ্য প্রসাদী আশীর্ব্বাদের দুর্ব্বাধান।
অমর প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, রৈবতকের উদার শ্লোক,
সব্যসাচীর পাঞ্চজন্যে ধ্বনিত করিলে মর্ত্ত্যলোক।
কৃষ্ণলীলার অমৃত-পুলিনে হয়েছ অতিথি শেষপথ চিনে',
শান্তি সুখের চিরবসন্তে ফুটালে সত্য অরুণালোক।

আজিকে তোমার প্রতিভাদীপ্ত প্রসন্নমুখ সৌম্য ধীর,
ফলিত চিত্রকরের তুলিতে—নহ তুমি আজ এ পৃথিবীর।
জানিনে কোথায় রূপজালে হায় ভাবের ত্রিবেণীধারা—
ধরা যায়!
স্মৃতির বাসরে জয় যৌতুকে কীর্ত্তি মুকুটে উচ্চশির।
ধন্য জনম, ধন্য জীবন, মৃত্যুবিজয়ী বিরাট্ মন,
মরণ তোমারে অমর করেছে, দিয়াছে যশের পুষ্পাসন।
জ্যোতির্ম্ময়ী সে বীণাবাদিনীর বর লভিয়াছ সাহিত্যবীর,
নিরমাল্যের শরৎ মধুতে ফুল্ল মানস কমল-বন।
স্বর্গ-স্বপন সত্যের রূপে হয়েছে তোমার অন্তরঙ্গ,
শত মন্দার-চন্দ্র-মল্লী কবিতাকাননে করিছে রঙ্গ;
দেবের চিত্ত নবীন পুলকে বন্দনা করি নব নব শ্লোকে,
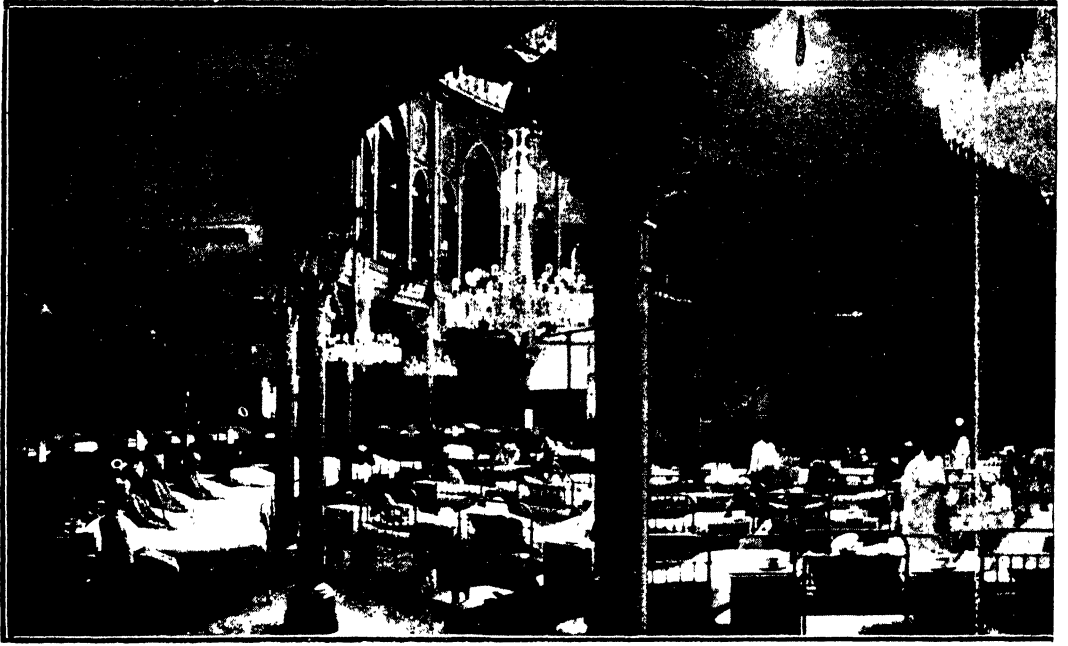
ব্রাইটন রাজপ্রাসাদে

ব্রাইটন রাজপ্রাসাদে হাসপাতাল

[শ্রীজলধর সেন]

য়ুরোপে মহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিতেছে ; প্রতিদিন তাহার সংবাদ আসিতেছে। এই যুদ্ধে যে কত লোক হতাহত হইতেছে, তাহার হিসাব করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। আরও কতদিন যে এ সংহার-লীলা চলিবে, তাহা লীলাময়ই বলিতে পারেন।

এই ভীষণ যুদ্ধে যাহারা হত হইতেছে, তাহারা স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু যাহারা আহত হইতেছে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায়, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে না। সুসভ্য দেশে তাহা হইবার যো নাই; অসংখ্য আর্ত্তসেবক ও সেবিকাগণ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এই সকল আহত ব্যক্তিকে তুলিয়া আনিতেছেন, তাহাদের সেবা করিতেছেন, তাহাদের ঔষধ-পথ্যের বিধান করিতেছেন, তাহাদিগকে সুস্থ ও সবল করিতেছেন। যুদ্ধের জন্ত যেমন গোলাগুলি, রসদের আয়োজন হইয়া থাকে, তেমনই আহতগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্তও বিপুল আয়োজন, প্রচুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের ব্রাইটন নগরে আহতগণের শুশ্রূষার জন্ত একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আজ আমরা তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। এত হাসপাতাল থাকিতে ব্রাইটনের সামরিক হাসপাতালের কথাই বলিতেছি কেন, তাহার কারণ আছে। এ হাসপাতালের বিশেষত্ব আছে। আগে সেই বিশেষত্বের কথাই বলি।

ইংরেজের সহিত জর্ম্মণের যুদ্ধ। ইংরেজ ভারতের রাজা; ইংলণ্ডের রাজা আমাদের ভারতের সম্রাট্। ইংরাজ জাতি যেমন সম্রাটের প্রজা, ভারতবাসীও তেমনই তাঁহার প্রজা। ইংরেজ যেমন এই মহাযুদ্ধে সম্রাটের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য, ভারতবাসীও তেমনই বাধ্য। রাজভক্ত ভারতবাসী তাই এই যুদ্ধে ইংরেজের জন্ত প্রাণপাত করিতেছে; দলে-দলে দেশীয় সৈন্ত ভীষণ রণক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে; কিন্তু তাহারা অসীম শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতেছে, আহত হইতেছে। এই আহত ভারতীয় সৈন্তগণের চিকিৎসা, সেবা ও শুশ্রূষার জন্ত যে বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারই বিবরণ আমরা দিতেছি।

ইংলণ্ডে যে সকল হাসপাতাল আছে, তাহা আহত ইংরেজ সৈন্তেই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সে সকল হাসপাতালে ভারতীয় সৈন্ত-গণের স্থান সঙ্কুলান হইল না। সুবিধাজনক স্থানের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল; তেমন ভাল স্থান মিলিল না। তখন ব্রাইটনের রাজপ্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ভারত-সম্রাটের প্রিয়তম ভারতীয় সন্তানগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্ত ভারত-সম্রাটের আদেশে ইংলণ্ডের
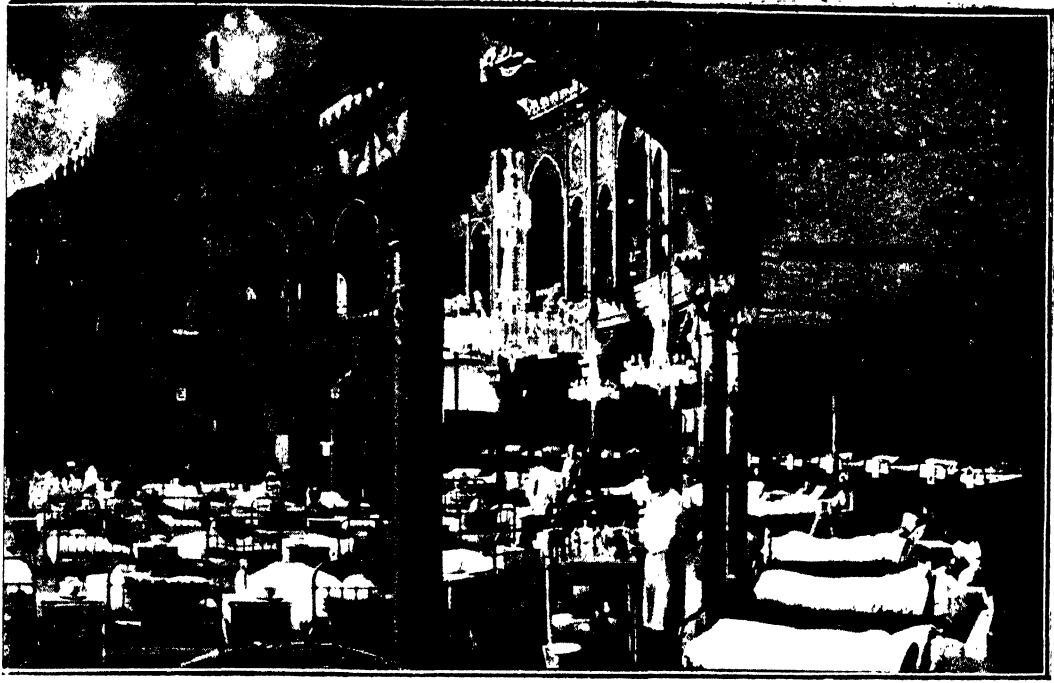
সামরিক হাসপাতাল

মধ্যে মনোহর রাজভবন—ব্রাইটনের রাজপ্রাসাদে ভারতের আহত সন্তানগণের অবস্থানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইংলণ্ডের বড়-মানুষেরা আহত ইংরেজগণের হাসপাতালের জন্য তাঁহাদের বড়-বড় অট্টালিকা ছাড়িয়া দিয়াছেন; আর ভারতের কুটীরবাসী দরিদ্র সৈন্যগণের অবস্থানের জন্য ভারত-সম্রাট্ তাঁহার ব্রাইটনের রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ কথা মনে করিলেও প্রাণে আনন্দ হয়, হৃদয় পুলকিত হয়, আর আমাদের মহামহিম দীনবান্ধব ভারত-সম্রাটের চরণে ভক্তিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। সেই জন্যই এত হাসপাতালের কথা ফেলিয়া আমরা ব্রাইটন হাসপাতালের বিবরণই লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই হাসপাতালের বিবরণ পাঠ করিলে সকলেই সমস্বরে আমাদের দয়ার সাগর ভারত-সম্রাটের জয়গান করিবেন; এবং ভারত-সম্রাট্ ও ইংরেজ জাতির দয়ার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইবেন।

এখন প্রথমে ব্রাইটন রাজপ্রাসাদের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাইটন সামান্য একটা গ্রাম ছিল। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা তৃতীয় জর্জ্জের ভ্রাতা কম্বরলণ্ডের ডিউক (The Duke of Cumberland) এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের দৃশ্য দর্শনে এখানে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই সময় প্রিন্স অব ওয়েল্‌স (পরে রাজা চতুর্থ জর্জ্জ) এখানে বেড়াইতে আসেন, এবং এই স্থানের সৌন্দর্য্য দর্শনে এখানে একটী ছোট বাড়ী ক্রয় করেন। তাহার পর তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন এই স্থানে মধ্যে-মধ্যে বাস করিবার ব্যবস্থা করেন। পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, চারিদিকের জমি গ্রহণ করা হয় এবং ইংলণ্ডের তাৎকালিক প্রধান-প্রধান স্থপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থানে একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বিলাতী ধরণে নির্ম্মিত নহে, ভারতীয় স্থাপত্যের অনুকরণে এই বিশাল ও সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। পাঠকগণ চিত্রাবলি দর্শন করিলেই তাহার প্রমাণ পাইবেন। সেই সময় হইতেই এ স্থানের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে নূতন নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে থাকে, চারিদিকে সুরম্য উদ্যান গঠিত হয়; যেখানে যাহা সাজে, তাহারই দ্বারা এই প্রাসাদের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়। নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যে এই প্রাসাদের কক্ষগুলি সুশোভিত করা হয়। এই প্রাসাদের আস্‌বাব পত্রের জন্যই বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। রাজা চতুর্থ জর্জ্জ, রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই ব্রাইটন রাজপ্রাসাদে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অস্‌বরণ (Osborne) ষ্টেট ক্রয় করেন এবং সেখানে প্রকাণ্ড রাজভবন নির্ম্মাণ করেন। সেই সময় হইতে তিনি অস্‌বরণ প্রাসাদেই মধ্যে-মধ্যে অবস্থিতি করিতেন, ব্রাইটনে বড় বেশী আসিতেন না। পরলোকগত সম্রাট্ এডওয়ার্ড এই অস্‌বরণ প্রাসাদ ব্রিটিশ অফিসারদিগের হাসপাতালের জন্য দান করিয়াছিলেন, আর তাঁহার উপযুক্ত বংশধর আমাদের সম্রাট্ এই ব্রাইটন প্রাসাদ আহত ভারতীয় অফিসারগণের হাসপাতালের জন্য দান করিয়াছেন।

রয়েল প্যাভিলিয়ন—পূর্ব্বপার্শ্ব
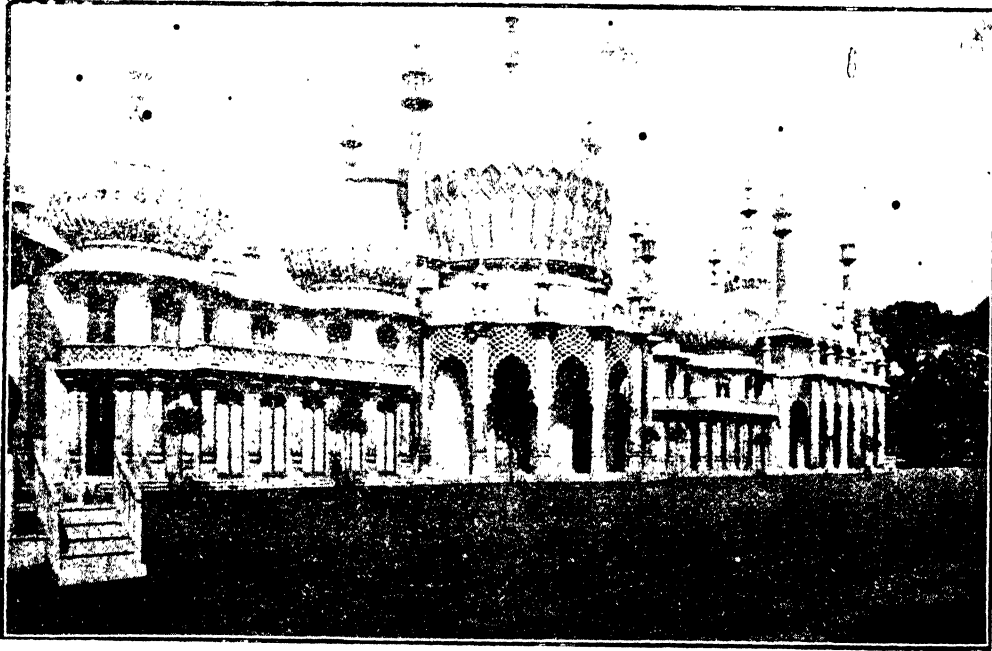
ময়দানে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আহত সেনাগণ

এইবার হাসপাতালের কথা বলিব। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত ভারতীয় সৈনিক আহত হইবে, তাহাদিগকে ইজিপ্টে ও মার্সেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে; কিন্তু হঠাৎ এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল; আহতদিগকে বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। তখন, কোথায় স্থান পাওয়া যাইবে, সেই চিন্তাই রাজপুরুষগণের মনে প্রবল হইল। এই সময় সম্রাট মহোদয় ব্রাইটন রাজপ্রাসাদ ভারতীয় আহত সৈন্যগণের হাসপাতালের জন্য দান করিলেন। কিন্তু রাজ-প্রাসাদকে হাসপাতালে পরিণত করা ত সহজ কথা নহে। ইংরেজ-

রয়েল প্যাভিলিয়ন—পশ্চিম পার্শ্বের প্রধান প্রবেশদ্বার
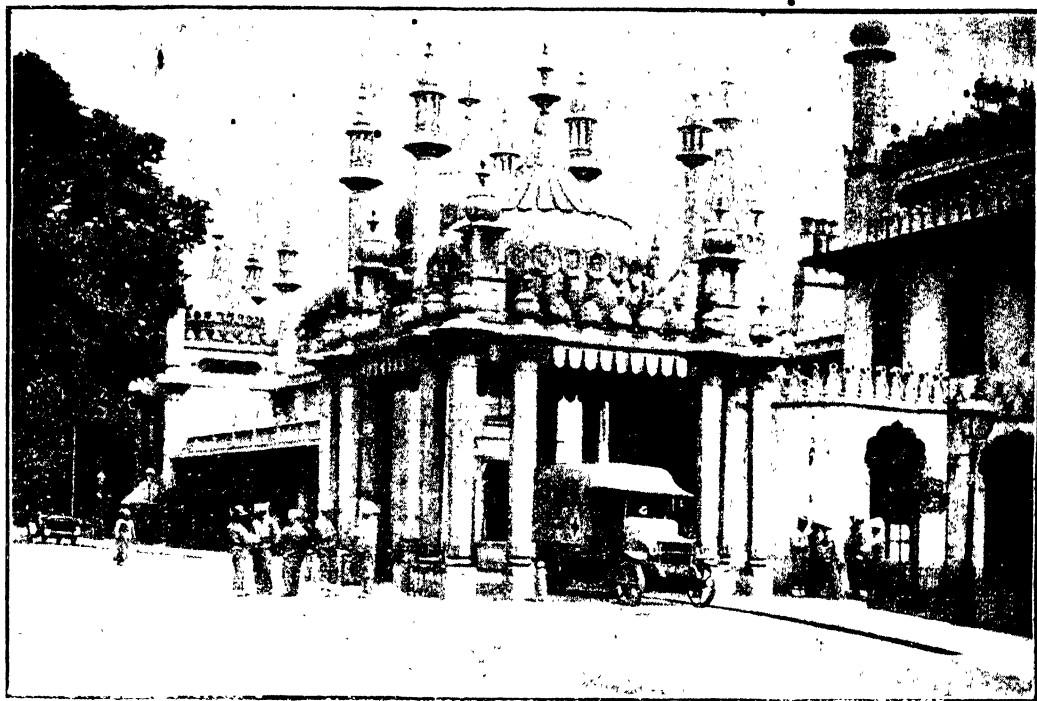
তাস-খেলা

দের উপযোগী হাসপাতালের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; কিন্তু ভারতীয় সৈন্যগণের জন্য ব্যবস্থা করা বিশেষ সময় সাপেক্ষ এবং ইহাতে বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। ভারতীয় সৈন্যগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, গুরখা, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি আছে; তাহাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন; তাহার পর হিন্দুর মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণী আছে; এক শ্রেণীর হিন্দু অপর শ্রেণীর কাহারও রন্ধনকরা অন্ন রুটী স্পর্শও করে না। হাসপাতালে এ সকলেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে; হাসপাতালের জন্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত যাহা-যাহা প্রয়োজন, তাহা করিতে হইবে। শুধু বৈজ্ঞানিক বা বহুদর্শী স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ হইলেই হইবে না; ভারতবাসীদিগের সমস্ত কোন-কোন অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে শ্রীহীন করা হইবে না; ঘর দ্বার যেমন আছে, তেমনই রাখিতে হইবে, অথচ তাহারই মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, গুরখা, শিখ, প্রভৃতির আচার, ব্যবহার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে হইবে,—কেহ যেন কিছুতেই বলিতে না পারে যে, এই হাসপাতালে কোন প্রকার অনাচার হইতেছে।] আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ মারা গেলে, তাহার জাতীয় রীতি অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে সমাধিস্থ বা শ্মশানভস্মে পরিণত করিতে হইবে। আহারাদি সম্বন্ধে যাহাদের যে নিয়ম আছে, তাহা সর্ব্বাংশে রক্ষা করিতে হইবে; বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম-কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই সমস্ত খুটি নাটি বিলাতের

মহামহিম ভারত-সম্রাট হাবিলদার গঙ্গাসিংহকে আই-ও-এম উপাধি ও পদক দিতেছেন

অবস্থা যাঁহারা বিশেষভাবে জানেন, তাঁহারাই এই সকল ব্যবস্থা করিতে সমর্থ। স্বয়ং লর্ড কিচেনার মহোদয় এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, রাজপ্রাসাদকে হাসপাতালে পরিণত করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন; সার ওয়ালটার লরেন্স (Sir Walter Lawrence Bart. G. C. I. E) মহোদয় এই হাসপাতাল সজ্জিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিস্তৃত রাজপ্রাসাদকে হাসপাতাল করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে যে কি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। যেমন-তেমন বাড়ী নহে—রাজপ্রাসাদ; এবং সেই প্রাসাদ কত দিন হইতে কত বহুমূল্য আসবাবপত্রে শোভিত রহিয়াছে। সে গুলিকে রক্ষা করিতে হইবে; নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বা সুন্দর রাজপ্রাসাদের মত স্থানে, ব্রাইটনের মত নগরে, অত বড় রাজপ্রাসাদে ব্যবস্থা করা বড় সহজ কথা নহে। তাহার পর সময় অতি কম। তাড়াতাড়ি সমস্ত করিতে হইবে, অথচ কোন বিষয়ে অঙ্গহানি বা কোন ত্রুটী থাকিতে পারিবে না, ভারত-সম্রাটের ইহাই আদেশ এবং রাজপুরুষ-গণের ইহাই বাসনা। এমন ব্যবস্থা কর্ম্মকুশল ইংরেজেই সম্ভবে। সার ওয়াল্টার লরেন্স অতি সামান্য সময়ের মধ্যেই অসাধ্য-সাধন করিলেন। আর একজন তাঁহার সঙ্গী হইলেন। ইঁহার নাম কর্ণেল জে, এন ম্যাক্লিয়ড (Colonel J. N. Mac Leod C. I. E., I. M S.); ইনি হাসপাতালের সুব্যবস্থার ভার লইলেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা করা বড় সহজ হইল না; বড়-বড় হল; তাহাকে খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইবে, অথচ প্রাসাদের দেওয়ালে, মেজেয় যে
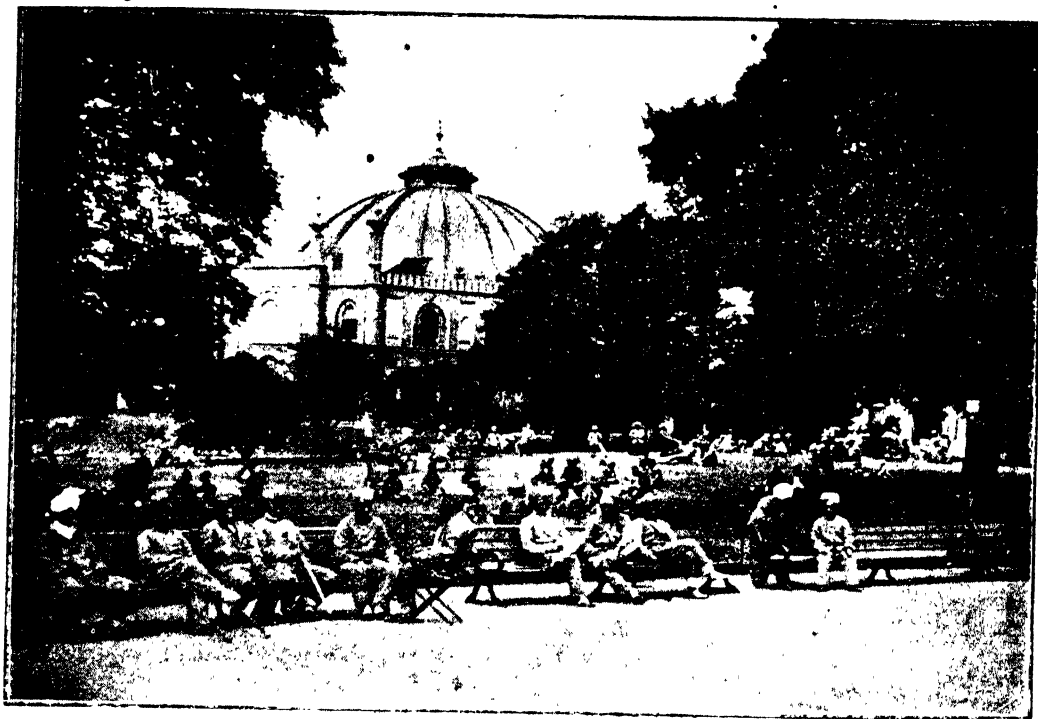
উদ্যানে বায়ু সেবন

রোদ-পোহান

গরমের দিনে

লর্ড কীচেনার জমাদার মীর দোস্ত ভি সি, আই-ও-এমএর সহিত করমর্দ্দন করিতেছেন
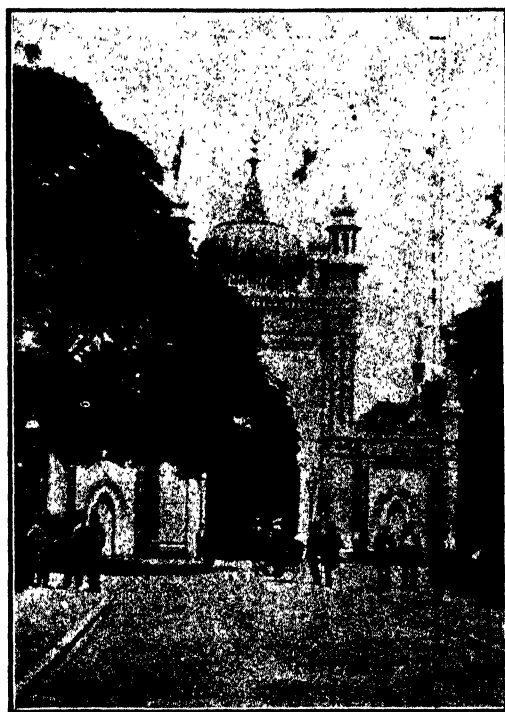
রয়েল প্যাভিলিয়ন—উত্তর দিকের ফটক

সমস্ত কারুকার্য্য আছে, তাহা নষ্ট করা হইবে না; আহতদিগের যাহাতে যথারীতি শুশ্রূষা করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; নানাপ্রকার অস্ত্রোপচারের আয়োজন করিতে হইবে। এ সকল ব্যবস্থাই যথারীতি হইল।

এইবার খানাপিনার ব্যবস্থার কথা বলি। হিন্দু সিপাহীরা যাহার-তাহার প্রস্তুত খাদ্য স্পর্শও করে না। আমাদের দেশে প্রবাদই আছে, 'বার রাজপুতের তের চুলা'। ব্রাইটনেও একরকম তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে তিন শ্রেণীর রন্ধনশালা নির্ম্মিত হইয়াছে; কতকগুলি মুসলমানের জন্য, কতকগুলি আমিষভোজী হিন্দুর জন্য, আর কতকগুলি নিরামিষভোজীর জন্য। তবে রন্ধনশালায় আমাদের দেশের মত চুলা প্রস্তুত করা হয় নাই, জ্বালানী কাঠও আমদানী করা হয় নাই, আর বসিয়া রাঁধিবারও ব্যবস্থা হয় নাই। দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া গ্যাসের সাহায্যে রান্না করিতে হয়। সিপাহীদের প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা যখন কৌশল শিখিয়া লইল, তখন তাহারা এই বিলাতী বন্দোবস্তের খুব তারিফ করিতে লাগিল। বাঃ! এ ত বেশ বন্দোবস্ত, কোন রকম 'দিক' হইতে হয় না, এবং উনানে ফুঁ পাড়িতে-পাড়িতে চক্ষু রক্তবর্ণও হয় না, নাকে-মুখে ধোঁয়াও যায় না।

এইবার খাদ্যের ব্যবস্থার কথা বলি। মুসলমানেরা গো-মাংস ছাগ ও পক্ষী মাংস আহার করিয়া থাকে; শিখ ও গুরখারা ছাগ ও পক্ষী মাংস খাইয়া থাকে; কিন্তু ব্রাহ্মণ সিপাহীরা মৎস্য-মাংস স্পর্শও করে না; গো-মাংস দেখিলে তাহারা সে অঞ্চল ত্যাগ করিয়া থাকে। শূকর মাংসে মুসলমানদিগেরও তেমনই আপত্তি। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া এই হাসপাতালে এই ব্যবস্থা হইয়াছে যে, গো-মাংস বা শূকরের মাংস এ হাসপাতালের সীমার মধ্যেও আসিতে পারিবে না। যাহারা ছাগ বা পক্ষী মাংস আহার করে, তাহাদের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন স্থান আছে; মুসলমানেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাংস প্রস্তুত করিয়া থাকে, হিন্দুরা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাগ বলি প্রদান করে। তাহার পর, যেখানে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই সংগ্রহ করা হয়; সিপাহীদিগের জন্য উৎকৃষ্ট আটা, ময়দা, নানা প্রকারের ডা'ল, বিশুদ্ধ ঘৃত অগ্নিমূল্যে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে; প্রতিদিন নানা প্রকার তরকারী দেওয়া হয়। এই সমস্ত রন্ধন করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর রন্ধনকারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাতে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না হয়, কাহাকেও কোন প্রকার অনাচার সহ্য করিতে না হয়, তাহার জন্য অতি সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

একজন পাঠান, একজন গড়োয়ালী ও দুইটী গুর্খা যুবক

চিকিৎসার কথা না বলিলেও হয়। যাহাদের জন্য সদাশয় ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট এমন রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছেন, যাহাদের জন্য এত ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

আহতগণের মধ্যে যাহারা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠে, তাহাদের ভ্রমণের

জন্য অনেকগুলি মোটর ও নানাপ্রকার যান সর্ব্বদা হাজির থাকে। শুধু কি তাহাই? এই রাজপ্রাসাদে একটী কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে; সেই কার্য্যালয়ে প্রতিদিন ইংরেজ মহিলা ও পুরুষগণ প্রেরিত কত প্রকার উপহার-দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হয়; ভারতীয় আহত সৈন্যগণের চিত্তবিনোদনের জন্য ইংরেজ নরনারীর যত্ন ও আগ্রহ অতীব প্রশংসনীয়। বিলাতে যে সমস্ত চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার্থী ভারতবাসী ছাত্র আছেন, তাঁহারা অনেকেই স্বেচ্ছাক্রমে এই হাসপাতালের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই হাসপাতালে ৭২৪ জন আহত ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা আছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১৫ অব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত দুই হাজারের অধিক আহত ব্যক্তি এই হাসপাতালে আসিয়াছিল; অনেকেই সুস্থ হইয়া কেহ বা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে, কেহ-

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম করিতেছি। (১) জমাদার মীর দাস্ত; ইনি ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করিয়াছিলেন; (২) জমাদার পঞ্চম সিং মাহার, ইনি মিলিটারী ক্রস লাভ করিয়াছিলেন; (৩) সুবাদার-মেজর ফতে সিং নেওয়ার, ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্ডার ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, (৪) সুবাদার শশিধর তাপা, ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ইণ্ডিয়ান অর্ডার অব মেরিট লাভ করিয়াছিলেন; সুবাদার কেদার সিং রাওয়াত, ইনি ইণ্ডিয়ান সারভিস্ মেডেল পাইয়াছিলেন; এবং (৬) হাবিলদার গগনা সিং, ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ইণ্ডিয়ান অর্ডার অব মেরিট লাভ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত পদক বিতরণের পর মহামহিম ভারত-সম্রাট হাসপাতালের প্রত্যেক স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সকলের সঙ্গেই কথা বলিয়াছিলেন; প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে আহত সৈনিকগণকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

পরলোকগত লর্ড কিচেনারও অনেক বার এই হাসপাতাল

চাকতি খেলা

কেহ বা দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে এই হাসপাতালে কেবল নয়টী রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রধান-প্রধান রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা এই হাসপাতালের কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন; প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, ষ্টেট সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলেই মধ্যে-মধ্যে এই হাসপাতালে আগমন করিয়া থাকেন। অন্য কথা দূরে থাকুক, মহামহিম ভারত-সম্রাট মহোদয়, পরম দয়াশীলা সম্রাজ্ঞী মহোদয়া ও সম্রাট-জননীও কয়েকবার এই হাসপাতালে আগমন করিয়াছিলেন। মাননীয় সম্রাট মহোদয় প্রথমবার এখানে আগমন করিয়া আহত সৈন্যগণের মধ্যে যাঁহারা ভিক্টোরিয়া ক্রস মিলিটারী ক্রস ও নানা সম্মানসূচক পদকের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সেই সকল পদক স্বহস্তে দান

পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন; কাহারও কোনপ্রকার অসুবিধা হইতেছে কি না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করায় সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছিল যে, তাহারা এখানে রাজার হালে রহিয়াছে। সত্য-সত্যই তাহারা রাজার হালেই রহিয়াছে।

আমরা এই প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকখানি ছবি দিলাম; তাহা হইতেই পাঠকগণ ব্রাইটন রাজপ্রাসাদ ও প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানের শোভা দেখিতে পাইবেন এবং আহত ভারতীয়গণকে কেমন রাজার হালে রাখা হইয়াছে এবং স্বয়ং ভারত-সম্রাট ও রাজপুরুষগণ কেমন তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাহার পরিচয় পাইবেন। ব্রাইটন হইতে প্রকাশিত হাসপাতালের বিবরণ পুস্তিকা হইতে আমরা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও চিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছি।

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ

হিন্দ

১। সরস্বতী, অক্টোবর ১৯১৬।

ভারতীয় স্ত্রীয়োঁকা বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক হরি রামচন্দ্র দিবেকর।

আমাদের শিক্ষাপ্রণালী পুরুষগণকেই জীবিকানির্ব্বাহের সামর্থ্য দিতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ত আমরা ধরিতেই পারি না। উচ্চ-শিক্ষার ফললাভ হইতেও আমরা বঞ্চিত আছি।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধেও সমস্যাটা সেইরূপই দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে মত-বিরোধ যতই হ্রাস হইতেছে, শিক্ষা প্রণালীর দোষগুলি ততই সুবৃহৎ হইয়া জটিলতা আরও বাড়াইয়া দিতেছে।

মহিলা বিদ্যালয়, হিঙ্গণে, পুনা
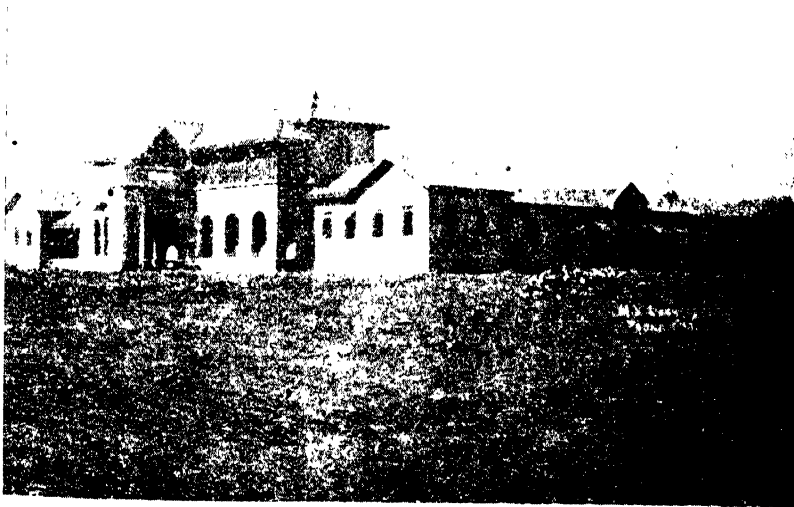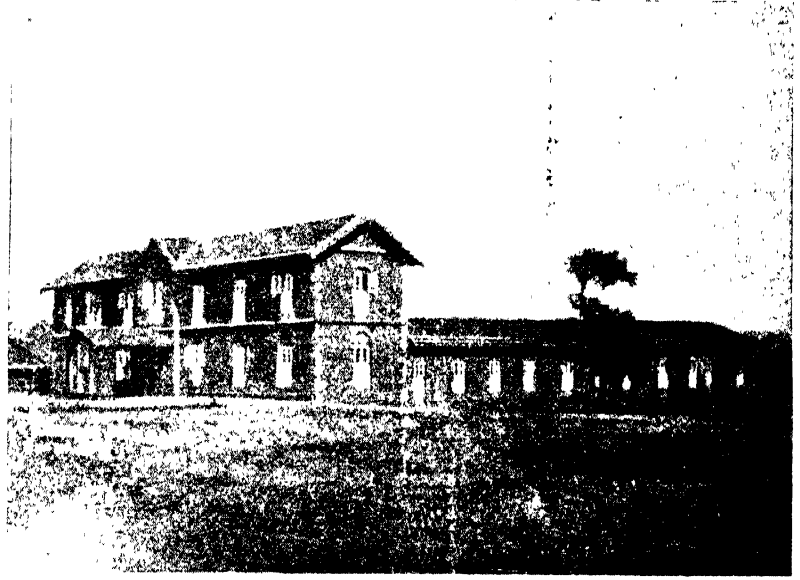
জাতীয়তার অভাব অথবা মাতৃ-ভাষার প্রতি অনাদর মেয়েদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেশের যে সকল মহিলা দেশান্তরে গমন করেন, তাঁহারা আমাদের জাতীয় পোষাক, কিংবা জাতীয় ভাষা—কোনটাই ত্যাগ করেন না, করিতে পারেনও না।

মহিলাশ্রম, হিঙ্গণে, পুনা

এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার প্রধান দোষ হইতেছে যে, ইংরাজী ভাষার কঠিন পাতে মুড়িয়া সে শিক্ষাটা মেয়েদের সাম্‌নে ধরা হয়। সেটা যে কতদূর সহজ-পাচ্য, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। পুরুষদের শিক্ষাই ইংরাজী ভাষার মধ্যস্থতার জন্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মেয়েদের সময় ও সুবিধা পুরুষের অপেক্ষা অল্প। ইংরাজী ভাষায় তাহাদের শিক্ষা দেওয়ায় পদ্ধতি হওয়ায়, বিশেষ প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তাহারা শিখিতে পারে না, অথচ, কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করিয়া সংসারের সুখশান্তি হইতে বঞ্চিত হয়।

এ দেশে অনেকেই বোধ হয় শ্রীযুক্ত করবের নাম জানেন না। ইনি মহা বিদ্বান নহেন, ভাল বক্তা নহেন, অথবা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীও নহেন। কিন্তু ইনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। বলিতে গেলে, ইনি মহারাষ্ট্রদেশে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করেন। দেশে যখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে, বাগবিতণ্ডা হইতেছে, সেই সময় করবে মহাশয় পুণা সহর হইতে ৪ মাইল দূরে একটি অনাথ-বালিকাশ্রম স্থাপন করেন। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র তুচ্ছ করিয়া, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় হিঙ্গনে যাইয়া তিনি বালকাদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং দ্বিপ্রহরে অন্ন-সংস্থানের জন্য ফার্গুসন কলেজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। এইরূপ কষ্টে তিনি উক্ত আশ্রমটীকে তিন বিভাগে বিভক্ত করেন—অনাথ বালিকাশ্রম, মহিলা বিদ্যালয় ও নিষ্কাম কর্ম্মমঠ। বিংশতি বৎসর ধরিয়া ইনি স্ত্রী-শিক্ষার জন্য যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা মহারাষ্ট্রদেশে কাহারও অবিদিত নহে। ১৯১৫ সালে ইনি ভারত-বর্ষীয় সামাজিক পরিষদের সভাপতি হন। সেই সময় ইনি যে অভি-ভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিধান ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেন। ইঁহার ইচ্ছা ছিল, 'মহারাষ্ট্র মহিলা-বিশ্ব-

যুদ্ধক্ষেত্রে ষ্টাফ অফিসার ও লেফ্টেনাণ্ট হিতেন্দ্র

বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু "উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ" অর্থাভাবে এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই। পরে করবে মহাশয়ের সহকারী শ্রীযুক্ত মহাদেব কেশব গাড়গীল আপনার সমস্ত সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে দান করেন। এই বিদ্যাপীঠের উদ্যোক্তৃগণ দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া কাজ আরম্ভ করেন—(১) মাতৃভাষার দ্বারা মহিলাদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদান (২) প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষাদান। ১৯১৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী "ভারতবর্ষীয় মহিলা বিদ্যাপীঠ" স্থাপিত হইয়াছে। ৬০ জন সভ্য লইয়া বিদ্যাপীঠের সাধারণ-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিদুষীগণ আছেন—শ্রীমতী সরলাবাই নাইক; লাহোরের শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী; আহমদা-বাদের শ্রীমতী বিদ্যাগৌরী রমণভাই, এম্-এ, নীলকণ্ঠ; বাঙ্গালোরের শ্রীরঙ্গমা, ও মান্দ্রাজের মিসেস্ মার্গারেট কজিন্স্। সভাপতি হইলেন শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। সহকারী সভাপতি ফার্গুসন কলেজের প্রিন্সিপাল মাননীয় শ্রীযুক্ত পারঞ্জপ্যে।

এখানকার উচ্চশিক্ষা তিন বৎসরে সমাপ্ত হয়। প্রথম বৎসরে মাতৃভাষা, ইংরাজীভাষা ও ভারতীয় শাসন-পদ্ধতি শিখান হয়। দ্বিতীয় বৎসরে মাতৃভাষা, ইংরাজীভাষা, ব্রিটিশ রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি, গৃহশিক্ষা ও চিকিৎসাশাস্ত্র। তৃতীয় বৎসরে মাতৃভাষা, ইংরাজী-ভাষা, সমাজশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও শিশুপালন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত যে-কোনও একটি বিষয় তিন বৎসরই শিক্ষা করিতে হয়—সংস্কৃত, ন্যায়শাস্ত্র, গণিত, চিত্রকলা, সঙ্গীত, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইংরাজী, শিক্ষাবিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্র।

এখন করবে-প্রতিষ্ঠিত মহিলাশ্রম ও মহিলা-পাঠশালা ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অন্য কোনও বিদ্যালয় নাই। আশ্রমে উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যার্থিনীর সংখ্যাও কেবল নয় জন। কিন্তু ইহাতে নিরুৎসাহ হইবার কোনও কারণ নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় নাই এবং ইংরাজ-সরকারের এই বিপদের দিনে পরিচালকগণ সাহায্য-প্রার্থনা করাও সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। আশা করি, এই উদ্যম সফলতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের একটি কল্যাণ সাধন করিবে।

২। চিত্রময় জগৎ—সেপ্টেম্বর, ১৯১৬।

শ্রীমতী তাপীবাই হর্ডিকর, বি-এস্-সি, এম্-এ।

শ্রীমতী তাপীবাই হাডিকর গত মে মাসে বোম্বাই ইউনিভার্সিটির বি-এস্ সি ও এম্ এ পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

অধ্যাপক ঘোণ্ডো কেশব করবে বি-এ

ইনি ১৮৮৯ খৃঃঅব্দে ভূমিষ্ঠ হন। এক বৎসর বয়সেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা বিনায়ক রাব সামান্য চাকরী করিতেন। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। ছয় বৎসর বয়সে তাপীবাই কাগলের বালিকাবিদ্যালয়ে প্রেরিতা হন। ১২ বৎসর বয়সে তাপীবাইয়ের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময় ইঁহার অগ্রজ নীলকণ্ঠ রাও বি এ পাস করিয়া কোহ্লাপুরে চাকরী করিতেছিলেন এবং অন্য সহোদর শিবরামপন্ত ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে প্লেগরোগে তাপীবাইয়ের স্বামীর মৃত্যু হয়। তাপীবাই কোহ্লাপুরে ভ্রাতার নিকট বাস করিতে গেলেন। নীলকণ্ঠ রাও ইঁহাকে ইংরাজী শিখাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ইনি পুণায় প্রোফেসার করবে-প্রতিষ্ঠিত অনাথ-বালিকাশ্রমে প্রেরিত হন। এই স্থানে ইঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তাপীবাই পুনার নিউ ইংলিশ স্কুলে পড়িতে লাগিলেন। সেথান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন ও ফার্গুসন কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৯১৩ সালে বি-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হন। ১৯১৪ সালে বি-এস্‌সি পাশ করেন এবং এই বৎসর এম্-এ পাশ করিয়াছেন। শারীর-বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে ইনি বি-এ, এবং উদ্ভিদ বিদ্যায় এম্-এ পাশ করিয়াছেন।

স্ত্রী-শিক্ষার সমস্যাটা বিশদরূপে আলোচনা করিবার জন্য ইনি য়ুরোপে যাইতে অভিলাষ করিয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে যাওয়া হইতেছে না। দেশীয় জমিদারগণ কেহ কি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন না? আজকাল সাধারণতঃ শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে তাপীবাইয়ের মত সর্ব্বগুণ সম্পন্না মহিলা অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ইনি অস্থায়ীভাবে নাগপুরের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ অব স্কুলস্ পদে কাজ করিতেছেন।

৩। জৈনহিতৈষী—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর, ১৯১৬।

জৈনধর্ম্মকে পালনেবালে বৈশ্যহী ক্যোঁ?—

এই সংখ্যার জৈনহিতৈষীতে শ্রীযুক্ত ভগবান দীনজি এই প্রশ্নটি উত্থাপিত করিয়াছেন—"প্রথমে ক্ষত্রিয়গণই জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারা বৈশ্য হইয়া গেলেন কিরূপে?" এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া উক্ত লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়গণ লোকহিতকর কার্য্য শেষ করিয়া ব্যবসায় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং সেই হইতে বৈশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় নাই। জৈনধর্ম্মের উত্থান-পতনের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পারঞ্জ্যপ্যে

প্রথম কথা হইতেছে এই যে, শুধু ক্ষত্রিয়গণই জৈনধর্ম্মের উপাসক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এমন কি অনার্য্যগণও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এ সম্প্রদায়টা একটা জাতি বা সমাজবিশেষ নহে—ইহা একটি সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। তবে ক্ষত্রিয়গণই বিশেষ করিয়া এই সম্প্রদায়ের অঙ্গপুষ্টি করেন। তাহার কারণ এই যে, যে জাতির মধ্যে সাহস, বীর্য্য, উদারতা ও সততা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল বিশেষ করিয়া বিকাশ পাইত, তাঁহারাই জৈন (কর্ম্মশত্রুন্ জয়তি ইতি জিনঃ) হইতে পারিতেন ও হইতেন।

অহিংসা-ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচারের পর যে ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈশ্য হইয়া পড়িলেন, এ কথার মূলে কোনও যুক্তি নাই। কারণ, অহিংসা-ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার কখনই হয় নাই; কারণ, সে সময়েও, অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এ দেশেও পশুপক্ষী অবাধে ধ্বংস হইত। তাহা ছাড়া, যদি অহিংসা-ধর্ম্মের বহুল প্রচার বাস্তবিকই হইয়াছিল স্বীকার করি, তবু ক্ষত্রিয়গণের নিজ বৃত্তি ত্যাগ করার কোনও কারণ দেখি না। তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় সেই ক্ষত্রিয়ই থাকিতে পারিতেন।

তৃতীয়তঃ, যদিও এ সময় আমরা সচরাচর জৈনগণকে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই—তাহা হইলেও, এখনও ভারতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জৈনের অভাব নাই। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটে অনেক ব্রাহ্মণ জৈন আছেন। রাজপুতানায় শত শত পরিবার এখনও অসিজীবি। দক্ষিণ-দেশে 'কাসার' নামক জাতি পিতল কাঁসার জিনিস প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। ইহাদের অনেকেই জৈন—এবং শিল্প-বৃত্তি অবলম্বন করার জন্যই ইহারা শূদ্র বলিয়া কথিত হয়।

এখন দেখিব, জৈনধর্ম্ম প্রধানতঃ বৈশ্যের ধর্ম্মে কিরূপে পরিণত হইল। প্রথমতঃ, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন প্রথানুযায়ী জৈনধর্ম্মের আদর্শ খর্ব্ব হইয়া পড়ে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই অহিংসার কথাই দেখুন না। এক সময় জৈনগণ, জৈনপন্থীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তনদী বহাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। কিন্তু অধুনা সামান্য শ্রাবকগণও প্রাণীহত্যার ভয়ে রাত্রে প্রদীপ জ্বালেন না এবং দন্তমার্জ্জন বন্ধ করিয়া মুখবিবরকে দুর্গন্ধের বিলাসগৃহ করিয়া রাখেন। সেইরূপ, জৈনধর্ম্মের যে সকল জীবনপ্রদ তত্ত্ব ছিল, যাহার দ্বারা মানুষ কর্ম্মবীর, কার্য্যক্ষম, সৎ ও মহৎ হইতে শিখিত, সেই আদর্শগুলি খর্ব্ব হইয়া পড়ে। জৈনগণও ক্ষাত্রধর্ম্ম অর্থাৎ জৈনধর্ম্মের তেজোময় সত্তটুকু ভুলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রাহ্মণ-শূদ্রগণ আপন-আপন বৃত্তি কিরূপে হারাইলেন? ব্রাহ্মণদের বৃত্তি ছিল—যজন, যাজন, পঠন ও পাঠন। কিন্তু জৈনধর্ম্মে কাহারও জন্য আর একজনকে ভগবানের নিকট ওকালতী করার নিয়ম ছিল না। একজন পূজা করিলেই যে আর একজন তাহার ফল পাইবে, জৈনধর্ম্ম ইহা মানে না। তারপর উপদেশ ও

শ্রীমতী তাপীবাই হর্ডিকর।

অধ্যাপনা-কার্য্য জৈন মুনিগণ করিতেন। ফলে ব্রাহ্মণগণ ধীরে ধীরে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

তার পর শূদ্রগণের কথা। ইহারা চিরকাল নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। ইহাদের জ্ঞানশক্তির বিকাশ করিবার প্রয়াস পুরাতন ভারতে হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহাদিগকে যাহা বুঝান যায়, তাহাই ইহারা মাথা পাতিয়া বুঝিয়া লয়। সম্ভবতঃ, যে সকল শূদ্র জৈনপন্থী হয়, তাহারা পরবর্ত্তী-কালে শৈবসম্প্রদায়ের উত্থানের সময় কোনও শৈবাচার্য্য কর্ত্তৃক শৈবসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়। দক্ষিণে এখনও 'কাসার' দিগের কোন-কোনও গ্রামে জৈন মন্দির দেখা যায়। কিন্তু সে গ্রামের 'কাসার'গণ এখন শৈব। অথবা এমনও হইতে পারে যে, জৈনপন্থীদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় অনেক শূদ্র ব্যবসায়-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে।

এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা জৈনসম্প্রদায়ের বিদ্বানগণকে আহ্বান করিতেছি।

স্পর্শ-মণি

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত]

(ক)

এ অতি প্রাচীন কাহিনী; সুতরাং ইহা প্রাচীনেরই পুনরাবৃত্তি। অতীত যুগ হইতে ইহার অভিনয় হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহা চিরন্তন।

এক সময়ে মগধ-সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য ছিল। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলী-পুত্রের ঐশ্বর্য্যের, ক্ষমতার, বাণিজ্যের গৌরব-খ্যাতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইত। দেশ-দেশান্তর হইতে বিচিত্র বণিকজাতি বিচিত্র অর্ণবপোতে মগধে বাণিজ্য করিতে আসিত। আবার মগধের বণিক-সম্প্রদায় দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইত। শোন এবং জাহ্নবী-সঙ্গমে নগরশ্রেষ্ঠ পাটলীপুত্র বিচিত্র মানব-জাতির বিচিত্র পণ্যসম্ভারের বিপণি ছিল। নদীবক্ষে অগণন বাণিজ্য-পোত পরিদৃষ্ট হইত। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যময় নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর জীবনের শেষ দৃশ্য কি করুণ!—শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু-দৃশ্য। গভীর নিশীথে নিদ্রিত নগরের শেষ প্রান্তে মগধ-রাজপ্রাসাদলাঞ্ছিত বিশাল প্রস্তর-ভবনের এক প্রশস্ত কক্ষে পালঙ্কোপরি মুমূর্ষু শ্রেষ্ঠী। ক্ষীণ দীপালোকে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখমণ্ডল কি গম্ভীর! উন্মুক্ত গবাক্ষপথ হইতে জাহ্নবীবক্ষে নৈশ ছবি,—দেশ-দেশান্তর হইতে আগত অসংখ্য বাণিজ্যপোত,—উন্মুক্ত নৈশ আকাশের জ্যোতিঃ,—ঊর্দ্ধে তারকামালার অস্পষ্ট আলোকে জাহ্নবীবক্ষে ঘুমাইতেছে। কক্ষাভ্যন্তরে মুমূর্ষুর অতি কাছে, বক্ষের নিকটে, এক আলুলায়িতকুন্তলা মূর্চ্ছিতপ্রায় বালিকা। পদতলে এক যৌবনময়ী অনিমেষে মুমূর্ষুর মুখ চাহিয়া নীরবে অবিরল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। আর কেহ নাই,—এই বিশাল ভবনে মাত্র এই দুইজন মৃতের কক্ষে; কেন না, ইহারাই মাত্র শ্রেষ্ঠীর আপনার। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মুমূর্ষুর শেষ বাণী—শ্রেষ্ঠীর সমস্ত জীবনেরই বাণী—

"মা, আমার এই বালিকা কন্যাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলাম। এত দিন তুমি বালিকার পরিচারিকা ছিলে, আজ হতে মা হ'লে।"

তার পর বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শ্রেষ্ঠীর কথা মগধ ভুলিতে বসিয়াছে। সবই আছে,—সেই বাণিজ্য, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই গৌরব। শোন ও জাহ্নবী-বক্ষে অগণন বাণিজ্য-তরণী বিরাজ করিতেছে; সমুদ্রের পরপারের কত বিচিত্র দেশ-দেশান্তর হইতে কত বিচিত্র বণিকজাতি কত বিচিত্র পণ্য বহিয়া মগধে বাণিজ্য করিতে আসিতেছে। পূর্ব্বেও যেমনি, এখনও ঠিক্ তেমনি। কেবল সেই শ্রেষ্ঠী-ভবনের, সে বাণিজ্যে, সে ঐশ্বর্য্যে, সে গৌরবে কোন অংশ নাই। এখন কেবল রাজপথে দাঁড়াইয়া নদীবক্ষে বাণিজ্য-তরণীর উপর দাঁড়াইয়া, বিদেশী বণিককে মগধের বণিককুল অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয়—ঐ স্তব্ধ বিশাল প্রস্তর-ভবন মগধের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের।

"শ্রেষ্ঠীর কে আছেন?"

"একটি অন্ধ যুবতী কন্যা।"

"আর?"

"আর শ্রেষ্ঠীর সমস্ত জীবনের বাণিজ্য-অর্জ্জিত ধনরত্ন, মণিমুক্তা।"

বিদেশী বণিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিত, "হায়, এত ঐশ্বর্য্য—কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই! অন্ধ কন্যা কাহাকে লইয়া ভোগ করিবে?" মনে-মনে বলিত, "আহা, আমি যদি এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাইতাম!"

(খ)

নগরের পথে-পথে সারি-সারি বিচিত্র আলোকমালায় উদ্ভাসিত নয়নমুগ্ধকর বিপণিশ্রেণী। নীল, পীত, রক্ত,—কত বর্ণের বস্ত্র বিচিত্র চিত্রপটে বিপণির অঙ্গ-শোভা করিয়া স্তরে-স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। বিচিত্রগঠন শ্বেত-কৃষ্ণ

(চ)

উজ্জয়িনীর রাজকবি মগধের রাজসভায় আহূত হইয়াছেন। বসন্তোৎসবের পরদিন কবি মগধের রাজসভায় আপন কবিতা পাঠ করিবেন, আপন রচিত ছন্দ গান করিবেন। পাত্রমিত্র, সভাসদ, পৌরজনবর্গ রাজসভায় সমাগত। স্বয়ং মগধরাজ মগধের রাজাসন—ময়ূরাসনে উপবিষ্ট। কিন্তু উজ্জয়িনীর রাজকবি কোথায়? আর প্রতীক্ষা করা যায় না। মগধরাজ সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন। ঠিক সেই সময় এক সুন্দর দেবোপম যুবা পাগলের মত রাজসভায় আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল। কণ্ঠে তাহার বহুমূল্য মুক্তার মালা।

"কে তুমি?"

"উজ্জয়িনীর রাজকবি—ছিলাম,—কিন্তু এখন আর নাই। প্রভু, মগধ আমার কবিতা শুনিয়াছে, মুগ্ধ হইয়া এই মুক্তার মালা উপহার দিয়াছে। আমার গান শেষ হইয়াছে। বীণা জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি, আমারও বিসর্জ্জন হইয়াছে।" এই বলিয়া কবি দ্রুত রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া, প্রাসাদ-তোরণ পার হইয়া রাজপথে জন-স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

ক্ষণকাল রাজসভা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ রহিল। মগধরাজ ধীরে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। রাজসভা ক্রমে শূন্য হইল। দেখিতে দেখিতে উজ্জয়িনীর রাজ-কবির কথা পাটলীপুত্রের গৃহে-গৃহে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

"সখি সুপ্রিয়া, সে উজ্জয়িনীর কবি আমারই কবি, সে মুক্তার মালা আমারই কণ্ঠের মালা।"

সুপ্রিয়া চমকিয়া উঠিল, সখীর মুখচুম্বন করিল।

"সখি, আমি সে কবির সন্ধানে চলিলাম। সে মুক্তার মালা চুরি করিয়াছে, চোরের দণ্ড-বিধান করিব।"

"না—না—আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ো না।—আমি অন্ধ।" কিন্তু সখী অন্ধের মুখের কথা শুনিল না। কবির সন্ধানে পাটলীপুত্রের পথে-পথে গৃহে-গৃহে চর প্রেরণ করিল। কিন্তু সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

দিন রজনীর গর্ভে প্রবেশ করিল। রজনীর শিয়রে চন্দ্র উদিত হইল। ক্রমে রজনী গভীর হইল। চন্দ্রকিরণ গাঢ়তর সুতরাং উজ্জ্বলতর হইল। সমস্ত নগর সুপ্তিমগ্ন। সুপ্রিয়া জাগিয়া শ্রেষ্ঠী-ভবনের বৃহৎ তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া। আজ সে অবগুণ্ঠিতা। রজনীর শেষ যামে অবগুণ্ঠিতা সুপ্রিয়া দেখিল, তোরণ-দ্বারে কে আসিয়া দাঁড়াইল। সুপ্রিয়া কিছুই বলিল না।

"আমি আসিয়াছি, এই লও তোমার মুক্তার মালা।"

সুপ্রিয়া কথা কহিল না। মুক্তার মালা ফিরাইয়া দিল। বহুক্ষণ তাহারা নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে তরুণ কবি আবার বলিল, "আমি আর একবার আসিব। আগামী বাসন্তী-পূর্ণিমায়, ঠিক এমনি নিশীথে, মুক্তার মালা ফিরাইয়া দিতে।"

কবি চলিয়া গেল। সুপ্রিয়া অবগুণ্ঠন খুলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। রজনী প্রভাত হইল। রজনীর কথা, কবির কথা, আগামী বাসন্তী-পূর্ণিমার কথা সুপ্রিয়া কিছুই অন্ধ স্বপ্নময়ীকে বলিল না।

(ছ)

বৎসর অতীত হইয়াছে। বাসন্তী-পূর্ণিমার উৎসব ফিরিয়া আসিয়াছে। "সখি, এত কিসের আয়োজন, এত কিসের সাজ-সজ্জা?" "আজ বাসন্তী-পূর্ণিমা।" "তা'তে আমাদের কি?" "আজ আমাদেরই বাসন্তী-পূর্ণিমা।" সুপ্রিয়া সখীকে আলিঙ্গন করিল। মনে মনে বলিল,—আজ তোমার কবি আসিবে। বহুবৎসর পরে শ্রেষ্ঠীর বিশাল অন্ধকার ভবন দীপমালায় আলোকিত হইল। "সখি, এস তোমায় সাজাইয়া দি।" "দাও।"

সুপ্রিয়া অন্ধ সখীকে অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত করিল, সুকুমার রক্তিমাভ কপোল শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিত করিল। চন্দনচর্চ্চিত মুখমণ্ডল সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, শুভ্র বসনে আবৃত করিল।

"সখি, মুক্তার মালা নাই, সাজ অসম্পূর্ণ রহিল। আমি মুক্তার মালা নিয়ে আসি।" সুপ্রিয়া মুক্তার মালার সন্ধানে তোরণ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রজনীর শেষ যাম উপনীত।

"অতিথি, এস, আমাদের গৃহ পবিত্র কর। আমি গৃহ-স্বামিনীর সখি, তাঁহার হইয়া আমি আপনাকে বরণ করিতেছি—এস দেবতা।"

"আমি মুক্তার মালা ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছি। যদি ফিরাইয়া লন, তবেই আপনাদের গৃহে অতিথি হইব।"

"আপনি নিজ হস্তে যদি সে মালা তাঁর কণ্ঠে পরাইয়া দেন, তবেই তিনি ফিরাইয়া লইবেন, নতুবা নয়।"

এই শুভ রজনীতে কবির বীণার কথা মনে পড়িল।

"কারোবার সঙ্গে পাড়ার রাণুর আর দেখা হইল না।"

[illegible]

শিল্পী — শ্রীভবানীচরণ লাহা

কুসুম-সজ্জিত দিব্য প্রকোষ্ঠে কবি নীত হইল। মুকুতা-খচিত দীপের স্নিগ্ধ আলোকে কবি দেখিল, শ্বেত-মর্ম্মরতলে সেই অবগুণ্ঠনবতী! কবির সমস্ত হৃদয় মঞ্জরিয়া উঠিল। লুপ্তধ্বী বীণা ঝঙ্কারিয়া উঠিল।

"দেবি, আমি আসিয়াছি। তোমার এ মুক্তার মালা ফণীর কুণ্ডলী হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমার বক্ষে দংশন করিতেছে। তোমার মুক্তার মালা তুমি ফিরাইয়া লও।"

কবি আপন কণ্ঠ হইতে মোচন করিয়া সে মুক্তার মালা আপন মানস-প্রতিমার কণ্ঠে পরাইয়া দিল। দেবী মূর্চ্ছিত হইয়া কবির চরণপ্রান্তে পতিত হইল।

* * * * *

পূর্ণিমা রজনীর অবসান। রজনীর সাক্ষী পূর্ণচন্দ্র অস্তমিতপ্রায়। পূর্ব্বগগনে উষার আলোক ফুটিয়া উঠিল। কুঞ্জে-কুঞ্জে পাখীরা জাগরণী গাহিল।

কবি মূর্চ্ছিতা প্রিয়তমাকে আপন অঙ্কে লইয়া স্তব্ধ বসিয়া আছে! দীপের তৈল নিঃশেষ হইয়াছে, উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কবি দেখিল, প্রিয়তমার নিদ্রিত নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। উজ্জ্বল প্রদীপালোকে সে অশ্রুসিক্ত প্রিয় মুখমণ্ডল কবি আপন বক্ষে তুলিয়া লইল। উষার বাতাস মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া দীপ নির্ব্বাপিত করিল। অন্ধকার প্রকোষ্ঠ মুহূর্ত্তে উষালোকে হাসিয়া উঠিল।

"দেবি, দেবি!" দেবী নির্ব্বাক। শুধুই অশ্রু। "দেবি, আঁখি মেল, চাহিয়া দেখ—আমার মুখে চাও।" "প্রিয়তম!" "বল।" "আমি অন্ধ!" কবি শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহার মুখমণ্ডল অন্তরের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দেবি, আমি তোমার অন্ধ-চক্ষু উন্মীলিত করিতে আসিয়াছি।" কবি প্রিয়তমার অশ্রুপ্লাবিত অন্ধ-নয়ন চুম্বন করিল,—নয়ন উন্মীলিত হইল। "স্বামিন্!—তুমিই ত!—বাহিরে এসে দেখা দিলে! দেবতা, আর একটিবার; আমি দু'নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখিব।" কবি দ্বিতীয় নয়ন চুম্বন করিল। স্পর্শে অন্ধ-নয়ন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। নয়নে নয়ন মিলিত হইল।

অবিনশ্বর

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

আজি ছিন্ন সূত্র তার, বিশুষ্ক কুসুমভার
জীর্ণ দলে নাহি আর সে মধু-সৌরভ,
তবু তার স্পর্শ-সুখে আজিও এ ভাঙ্গাবুকে
ব্যথায় বিস্মৃতি আসে, বিষাদে গৌরব;
হ'ক্ শ্লথ, হ'ক্ ম্লান কত মান, অভিমান
পুষ্পে পুষ্পে গাঁথা তায়, তোমার আমার,
তোমার আপন হাতে তোমারি প্রণয় সাথে
গ্রথিত যে অনুরাগে সেই ফুলহার।

চাহি পথ ব্যগ্র-চক্ষে আজি তার শূন্য কক্ষে,
কর্ম্মক্লিষ্ট শ্রান্ত বক্ষে দিতে আলিঙ্গন;
দাঁড়ায় না কেহ নিতি, মূর্ত্তিমতী যেন প্রীতি
সোহাগে হৃদয় ভরা, অমৃতে বচন;
শ্রীহীন, সম্পদহীন, নিরানন্দ নিশিদিন,
সে আলয় আজো তবু আশ্রয় আমার,
প্রতি ভূমিখণ্ডে তার আজিও যে অনিবার
চরণ-অরুণ-রাগ-অঙ্কিত তোমার।

সাময়িকী

আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্ণর, মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড কার-মাইকেল মহোদয় বিগত অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তিনটি মহৎ অনুষ্ঠানের আবাসস্থানের শিলা-বিন্যাস করিয়াছেন; প্রথম রঙ্গপুর কলেজ, দ্বিতীয় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, তৃতীয় রমেশচন্দ্র সারস্বত-ভবন। এই তিনটি অনুষ্ঠানই যে বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়, তাহাতে মতভেদ নাই। উত্তর বঙ্গে কলেজের সংখ্যা অন্য বিভাগের তুলনায় কম; সুতরাং রঙ্গপুরের অধিবাসীবৃন্দ যে বহু অর্থ দান করিয়া একটি কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, এবং আমাদের সদাশয় গবর্ণর বাহাদুরের নাম যে সেই কলেজের সহিত সংস্পৃষ্ট করিলেন, ইহাতে আমরা সকলেই গৌরব অনুভব করিতেছি।

তাহার পর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কথা। রাজ-সাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি বাঙ্গালীর শ্লাঘার বস্তু, আমাদের গৌরবস্তম্ভ, আমাদের অতীতের দেবস্মৃতিমন্দির। এই মন্দিরের ইতিহাস আমাদেরই পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই দেবমন্দিরের ভক্তিমান পূজক; সুতরাং এই সমিতির অধিনায়কগণ আমাদের নমস্য। কেমন করিয়া এই পূজকদল প্রথমে সমবেত হ'ন, তাহার বিবরণ আমরা জানি; এই স্থানে সেই কথা সংক্ষেপে বলিব। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১৯১০ অব্দে দীঘাপতিয়ার কুমার, ধীমান শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম-এ মহাশয়ের আগ্রহে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ কয়েক-জন শিক্ষিত ব্যক্তি রাজসাহীর অনতিদূরবর্ত্তী দেওপাড়া নামক স্থানে পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে গমন করেন। তাঁহারা সেখানে আশাতীত ফললাভ করায় বিশেষ উৎসাহিত হ'ন। শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর তখন একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন এবং নিজেই সমস্ত ব্যয়ভার বহনে সম্মত হ'ন। তাঁহার পরই এই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হয়, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই অনুসন্ধান কার্য্যে একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত হন। তাহারই ফলে আজ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির গৃহে ২৫১টি প্রস্তরমূর্ত্তি ও শিলা, ২২টি ধাতুমূর্ত্তি, ১০খানি তাম্রশাসন ও ছয়খানি প্রস্তরলিপি বিরাজিত; তাহারই ফলে আজ অনুসন্ধান-সমিতির গৃহে ৯৬০খানি হস্তলিখিত পুঁথি (ইহার মধ্যে ৯৫০ খানিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) এবং ৬১৮ খানি বহুমূল্য মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে; ইহারই ফলে আজ বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর সমিতি-মন্দিরের শিলা-বিন্যাস করিবার জন্য রাজসাহী উপস্থিত হইয়াছিলেন; ইহারই ফলে 'রাজমালা' 'লেখমালার' ন্যায় পুস্তকসকল বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রী, শোভা ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর এই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মন্দিরের শিলা-বিন্যাস উপলক্ষে বলিয়াছিলেন:—"The researches of some of the members of the Varendra Research Society, especially of the Director Babu Akshay Kumar Maitra, and of the Secretary Babu Ramaprasad Chanda (whose recent erudite work on the Indo-Aryan races many of you have no doubt read) have made your Society's name known far and wide. Without their scholarly guidance the Society could have done little, and without the generous aid of the Vice-patron my friend Mr. Sarat Kumar Roy, it could have accomplished nothing" উপরিলিখিত মন্তব্যের সার মর্ম্ম এই যে, "আপনাদের সমিতির কয়েকজন সদস্যের, বিশেষতঃ আপনাদের পরিচালক বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও আপনাদের সম্পাদক বাবু রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়দ্বয়ের অনুসন্ধানের ফলে আপনাদের সমিতির নাম সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে; বাবু রমাপ্রসাদ চন্দের অল্পদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত

পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকখানি আপনারা সকলে নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন। ইঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতগণের পরিচালনাধীন না থাকিলে আপনাদের সমিতি অতি সামান্য কাজই করিতে পারিত; এবং আমার বন্ধু মিঃ শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে আপনাদের সমিতি কিছুই করিতে পারিত না।" মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর ঠিক কথাই বলিয়াছেন, কুমার শরৎকুমারের একান্ত আগ্রহ, অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রভূত অর্থব্যয়ই বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সাফল্যের একতম কারণ; তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়-রমা-রাধাগোবিন্দের অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্য, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী মহাশয়গণের গবেষণা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির শিরে বিজয় মুকুট পরাইয়া দিয়াছে।

———

মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির আবাস-ভবনের শিলা-বিন্যাস করিবার পর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গবর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ করিবার সময় বলিয়াছিলেন—"He has now been graciously pleased to confer on it a lasting honour by laying the foundation stone of its building, which, with the advance of liberal education, is bound to be looked upon as a temple of knowledge to which our future generations must turn for accurate information about the antiquities of this country" অর্থাৎ মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর আজ যে ভবনের শিলা-বিন্যাস করিলেন, জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশ আমাদের দেশের পুরাকাহিনী অবগত হইবার জন্য এই ভবনকে জ্ঞান-মন্দির বলিয়া ভক্তিভরে অভিবাদন করিবে। ভগবানের নিকট আমরাও এই প্রার্থনা করি; আমরাও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমারের কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—

যাবৎ কূর্ম্মো জলধি-বলয়াং ভূতধাত্রীং বিভর্ত্তি
ধ্বান্তধ্বংসী তপতি তপনো যাবদেবোগ্ররশ্মিঃ।
স্নিগ্ধালোকাঃ শিশিরমহসা যামবৃত্যশ্চ যাবৎ
তাবৎ কীর্ত্তির্জয়তু ভুবনে রাজপুত্রস্য শুভ্রা।

এইবার রমেশচন্দ্র সারস্বত-ভবনের কথা বলি। পরলোকগত মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালীর, শুধু বাঙ্গালীর কেন-শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই অপরিজ্ঞাত নহে। তিনি বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। এই যে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, রমেশচন্দ্রই ইহার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর গৌরবস্থল রমেশচন্দ্র পরলোকগত হইবার পর ভাগলপুরে যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে রমেশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রমেশচন্দ্র সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর বরোদার মহারাজ গায়কবাড়ের রাজ্যে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। সেইজন্য রমেশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর মহানুভব গায়কবাড় মহোদয় তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-ভাণ্ডারে প্রথম পাঁচ হাজার টাকা দান করেন এবং ভবিষ্যতে আরও কিছু দিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাহার পর হইতেই রমেশচন্দ্র-সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হয়; এবং ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি মহোদয়গণ এই কার্য্যে ব্রতী হ'ন। কাশিমবাজারের মহারাজা দানশীল সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি এই ভবনের জন্য দান করিয়াছেন; সাহিত্য-পরিষদের ভূমিও মহারাজই দান করিয়াছিলেন। সেদিন এই ভূমিতে আমাদের মাননীয় গবর্ণর মহোদয় রমেশচন্দ্র-সারস্বত-ভবনের শিলা-বিন্যাস করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে যে সমস্ত পুঁথি, শিলালিপি, প্রস্তরমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই সারস্বত-ভবনে প্রদত্ত হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর এই ভবনের শিলা বিন্যাস উপলক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন; সাহিত্যের উন্নতিতেই যে জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয়, এ কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। এই ভবন-নির্ম্মাণ-ভাণ্ডারে দশহাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে; আরও চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। যাঁহারা এ কার্য্যে অগ্রণী, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে এ অর্থ সংগ্রহে বিলম্ব হইবে না

এখন একটু সঙ্কোচের সহিত একটী কথা বলিতে চাই। শুনিয়াছি, অনেক দিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের একজন বিচারপতি একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, "তিনজন বাঙ্গালী এক সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিল, আর তাহারা কিছুদিন পরে ঝগড়া-বিবাদ, ফৌজদারী-দেওয়ানী করিল না, এ কথাটা যে সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" কথাটা আমরাও বড় সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। যৌথে কিছু আমাদের দ্বারা হয় না; তাহার শত-শত দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর থাকিতে কথাটা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? সুধু যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই ইহা দেখা যায়, তাহা নহে,—আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের বড়ই গৌরবের বস্তু; সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যতঃ কিছু না শুনিলেও, লোক-পরম্পরায় নানা মতান্তর, কথান্তর ও মনান্তরের কথা মধ্যে-মধ্যে আমাদের কর্ণগোচর হয়, এবং আমরা ক্ষোভে মস্তক অবনত করি; বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, এখনও একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিতেছেন; তাই এই অল্প ছয় বৎসরের মধ্যেই তাহার এতদূর উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঐ এক ভয়, আমরা কি দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে পারিব? এই মিলনের অন্তরায় যে কি, তাহা আমরা আমাদের বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা সকলেই ওস্তাদ হইতে চাই; সকলেই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি; সাগরেদি করা আমাদের পোষাইয়া উঠে না। আমার মত বা সিদ্ধান্ত যদি কোন সমিতিতে গৃহীত না হইল, তাহা হইলেই আমার আত্মাভিমান আহত হয়; আমি সে সমিতির সহিত সুধু যে আমার সম্বন্ধ লোপ করি তাহা নহে, সর্ব্ব-প্রকারে সে সমিতির, সে অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হই। ইহারই জন্য আমাদের কত সদনুষ্ঠান যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসের সেবা করি, ইহাতে ত মানুষকে উন্নত করে, মানুষের হৃদয়কে উদার ও প্রশস্ত করে; কিন্তু আমাদের মধ্যে ত তাহা দেখি না; আমরা ত দেখিতে পাই, স্বল্প দুই-দশজন বরেণ্য ব্যক্তি বাদে, আমরা সকলেই হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতায় জর্জ্জরিত, আমাদের দশজনের বারটা হাল। এই সকল দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে আমাদের বর্ত্তমান শুভানুষ্ঠানগুলি আমাদেরই দোষে হয় ত নষ্টশ্রী হইয়া যাইতে পারে। এত আনন্দ, এত আশার মধ্যেও ঐ একটু আশঙ্কা মনে হয় বলিয়াই কথাটা খুলিয়া বলিলাম।

আমাদের দেশের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education) লইয়া বহুদিন হইতে অনেক কথাবার্ত্তা, অনেক বিবেচনা-বিচার হইয়া আসিতেছে; বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পরলোকগত মহামতি গোখলে মহোদয় অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; শুনিয়াছি, সে চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশ হইতেই তিনি না কি বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের শিক্ষাবিভাগ বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে কত বিধান করিলেন, কত বিধান উল্টাইলেন, তাহাও অনেকেই অবগত আছেন। কি ভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে যে ভাল হয়, তাহা শিক্ষাবিভাগ সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই মনে হয়। প্রথমে কিছুদিন দেখিলাম, পাঠশালার ছাত্রদিগকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি অনেক বিষয়েই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। তাহার পর দেখা গেল, অনেক বিষয় তুলিয়া দিয়া সাহিত্য, কৃষি, শিল্প ও গণিত শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের প্রচলন হইল; পরে দেখা গেল, কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রদানের আয়োজন হইল; কিন্তু ইহার একটীতেও আশানুরূপ ফললাভ হইল না; পাঠশালার শিক্ষা বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী হইল না। তাহার কারণ এই যে, পল্লীগ্রামের পাঠশালায় যে সকল ছেলে অধ্যয়ন করিতে আসে, তাহাদের অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে না; কেবল পুস্তক-পাঠের ব্যবস্থায় পাঠশালার শিক্ষা চলিতে পারে না; উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান; কৃষিকার্য্যের পরেই শিল্পকার্য্য; পাঠশালায় এই দুইটী বিষয়ের কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; তাহার সঙ্গে-সঙ্গে লিখন-পঠনের কার্য্য চালাইতে হইবে। প্রাথমিক পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা ও শুভঙ্করী শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি; তাহার সঙ্গে-সঙ্গে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। এখন যেমন দেখিতে পাই যে, ছোট-ছোট ছেলেরা পাঠশালায়

অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করে—"এইরূপে কৃষকেরা ধান কাটে ভাই।" ইহাতে যে কি শিক্ষা হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইহা না করিয়া কৃষি ও শিল্পকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে এবং ছেলেদিগকে নানা ব্যবসায় অবলম্বনের দিকে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিলে অধিক কাজ হইতে পারে; কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়াও পল্লীগ্রামে কঠিন কার্য্য নহে।

অনেকে হয় ত বলিবেন, শিক্ষার ফর্দ্দ খুব বড় হইল। পাঠশালার মধ্যে এত কারখানা খোলা কি সহজ ব্যাপার? আর এ সকল শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবে কে? পল্লী-গ্রামের দরিদ্র লোকেরা কি এত খরচ কুলাইতে পারে? আমরা বলি যে, ইহাতে ব্যয় নাই। আমাদের দেশের সকল পল্লীতেই কৃষিক্ষেত্র আছে; অনেক গ্রামেই কর্ম্মকার ও স্বর্ণকারের দোকান আছে, সূত্রধরের কারখানা আছে; তন্তুবায় ও জোলার তাঁতও অনেক স্থানেই আছে, দরজীর দোকানও, সর্ব্বত্র না থাকিলেও, কোন-কোন গ্রামে আছে। যে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত আছে, সেই গ্রামে যে-যে শিল্পীর দোকান বা কারখানা আছে, সেই সকল কারখানাতেই ছাত্রগণের শিক্ষা হইতে পারে; পাঠশালার সকল ছাত্রকেই নিজ-নিজ পছন্দমত কোন-না-কোন কারখানায় কাজ শিখিতেই হইবে। পাঠশালার শিক্ষক মহাশয়েরাই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। ছাত্রেরা দুই ঘণ্টা পড়াশুনা করিল, তাহার পর দুইতিন ঘণ্টা এই সকল কারখানায় বা দোকানে কাজ শিখিল। কারখানা বা দোকানের অধিকারীরা ইহাতে কোন আপত্তিই করিবেন না; তাঁহারা এই সকল শিক্ষা-নবীশদিগের নিকট হইতে অনেক সহায়তাই লাভ করিবেন; তাঁহারা বিনাখরচায় কাজের লোক পাইবেন। কৃষকের ছেলে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবে, কেতাবী শিক্ষাও লাভ করিতে পারিবে। এই সকল ছাত্রের মধ্যে যাহারা অধিক লেখাপড়া শিখিতে উৎসুক হইবে, তাহারা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা অন্য স্কুলে যাইবে।

কেহ হয় ত বলিবেন, এ কেমন কথা? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে কি ছুতার-কামারের কাজ শিখিবে? তাহারা কি মাঠে চাষ করিবে? তাহারা কি তাঁত বুনিবে? তাহারা লেখাপড়া শিখিবে, পরে বি-এ, এম-এ হইবে, উকিল-ডাক্তার হইবে, না হয় মাষ্টার হইবে, নিতান্ত না হয়, অন্য চাকুরী করিবে, কেরাণী হইবে। ইহাতে ত কাহারও আপত্তি নাই; সূত্রধরের বা কর্ম্মকারের কাজ ছেলেবেলায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিলে পরে তাহার উকিল, ডাক্তার বা কেরাণী হইবার কোনই বাধা জন্মিবে না। বড়লোকের, ভদ্রলোকের ছেলের কোন শিল্প শিক্ষা করিলে ত আর জাতি যায় না। আমরা ত দেখিতে পাইতেছি, আমাদের দেশের ছাত্রগণের শতকরা নব্বই জনের বিদ্যা, যে কারণেই হউক, বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত পৌছিতে পায় না; তাহারা কেহ বা বাঙ্গালা স্কুলেই পাঠ শেষ করে, কেহ বা ইংরাজী স্কুলের দুই, চারি, পাঁচ শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াই পাঠ শেষ করে; তখন তাহারা অনন্যগতি হইয়া কেরাণীগিরির উমেদারী করে; কারণ, বিদ্যালয়ে তাহারা যেটুকু বিদ্যালাভ করিয়াছে, তাহাতে কেরাণীগিরি ছাড়া তাহারা আর কি করিতে পারে? কিন্তু তাহারা যদি প্রথম হইতেই লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু না-কিছু শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিত, তাহা হইলে তাহারা এমন করিয়া দরখাস্ত হাতে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত না, নিজে যে শিল্প শিক্ষা করিয়াছে, তাহাতেই লাগিয়া যাইত, শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইত—তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিত।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমাদের দেশে এখন সর্ব্ব প্রধান সমস্যা হইয়াছে অন্নসমস্যা। বিদ্যাউপার্জ্জন করিতে হইবে বৈ কি, জ্ঞানানুশীলন করিতে হইবে বৈ কি, কিন্তু সৎপথে থাকিয়া অন্ন-সংস্থান সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে; তাহার পর আর সব। আমাদের স্কুল কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের সম্বল ত পুঁথিপড়া বিদ্যা। অবশ্য উকিল বা ডাক্তারের কথা বলিতেছি না, তাঁহারা ত অর্থকরী বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহারা কি কার্য্যের উপযুক্ততা লাভ করিয়াছেন? কিছুই না। কেহ হয় ত বলিবেন যে, এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা আর কিছু না পারুন, স্কুল-মাষ্টারী করিতে পারেন। আমরা বলি, তাহাও পারেন না। পূর্ব্বে যখন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের দ্বারা নিম্নশ্রেণী পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল, তখন মাষ্টারী করাটাও শিক্ষা হইত; এখন তাহাও হয় না। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে কার্য্য-করী শিক্ষা দিতেই হইবে। তাহা হইলে শুধু অন্নসমস্যা কেন, অনেক সমস্যার মীমাংসা হইবে।

দান

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

(১)

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতে বিবাহ-প্রথাটা বরাব চলিয়া আসিতেছিল। শুনিয়াছি, পিতা-পিতামহ আদি করিয়া সকলেই যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং কাহা-রও কোন কালে বিবাহে অনিচ্ছা দেখা যায় নাই।

কিন্তু এমন বিবাহ-কুশল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও উক্ত সনাতন লোভনীয় কার্য্যে আমার মোটেই আগ্রহ ছিল না। বয়সও প্রায় ত্রিশ হইয়াছিল।

ত্রিসংসারের মধ্যে এ সংসারটায় মা-ই একমাত্র সম্বল। অন্য দুই সংসারে আর কেহ ছিলেন কি না, এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাই নাই।

নিজ গ্রামে ২০৲ মাহিনায় একটা কাজ করিতাম। সামান্য হইলেও, মাতা-পুত্রের তাহাতে রাজার হালে চলিয়া যাইত।

মার অনুরোধে এ যাবৎ অনেক মিষ্টান্ন, এমন কি পৌষ-সংক্রান্তির দিন ২০।২৫ খান পিঠা পর্য্যন্ত বিনা-আপত্তিতে গলাধঃকরণ করিয়াছি; কিন্তু বিবাহটা কোন রকমেই করিয়া উঠিতে পারি নাই।

তাই মা সময়ে-সময়ে দুঃখ করিয়া বলিতেন—"বাবা, তুই কি চিরকালই কার্ত্তিকের মত থাক্‌বি?" এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, মা আদর করিয়া বা দুঃখ করিয়া আমাকে কার্ত্তিক বলিলেও, আমার চেহারাটা মোটেই কার্ত্তিকের মত ছিল না। বরং তৎকনিষ্ঠ গণেশের সহিত আমার একটু সাদৃশ্য দেখা যাইত,—অবশ্য শুঁড়টা বাদে।

কিন্তু যে দিন বাড়ীর পাশে আমা অপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট হেমেন্দ্রপ্রসাদের মহা ধুমধামে বিবাহ হইয়া গেল, সেই দিন হইতে মা আমার বিবাহের জন্য একেবারে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড যুক্তি ঠাওরাইয়া, মা আমাকে তাহার পরদিনই পাকড়াও করিলেন। যুক্তিটি এই—"বাবা, তোকে শীগ্‌গির বিয়ে কর্‌তে হবে।"

যুক্তি অকাট্য হইলেও বলিলাম—"মা, এ কথার ত এক-রকম মীমাংসা হয়েই আছে; আর ও কথা কেন?"

"এর আর মীমাংসা কি হবে বাবা? আমার কথা রাখ্‌, ও-সব সৃষ্টিছাড়া কথা ভুলে যা।"

"মা, ঐ কথাটা বাদ দিয়ে তুমি যা বল্‌বে, তাই আমি শুন্‌বো।"

"কেন বাবা, আমার কি মনিষ্যি-জন্মের একটা সাধ আহ্লাদ নেই? সবাই ছেলে বৌ নিয়ে মনের সুখে ঘর-কন্না কচ্চে, আমি পোড়াকপালী এমন কপাল নিয়েও জন্মে-ছিলাম!" মা বসনাঞ্চলে চক্ষুমার্জ্জনা করিলেন।

মার ক্রোধ, বিরাগ বা ভৎর্সনা সকলি হাসিমুখে সহিতে পারি, কিন্তু চোখের জল দেখিলে কোন রকমেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারি না।

খুব নরম হইয়া বলিলাম—"মা, তুমি বল্‌ছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ ২০৲ মাত্র মাইনে সম্বল নিয়ে কি বিয়ে করাটা ভাল?"

"কেন বাবা, যারা বিয়ে করে, সবাই কি ১০০৲ টাকা উপায় করে? আর তুই যে আমায় ছেড়ে বিদেশে যেতে চাস্‌নে, তার কি হবে? একবার বিদেশে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করে দেখ দেখি, তুই ত আমার মুখ্যু ছেলে ন'স্‌।"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"আচ্ছা মা, তুমি যখন আমায় বিদ্যায় বৃহস্পতি ঠাউরেছ, একবার বিদেশে চাকরির চেষ্টা করে দেখি। যদি হয়, তোমার যেমন ইচ্ছা বৌ ঘরে এনো।"

জন্মাবধি মাকে ছাড়িয়া খুব কমই বিদেশে গিয়াছি; তাই বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবিতেই মনটা কেমন বিষণ্ণ

হইয়া উঠিল। আমি জানিতাম যদি আমি বিদেশে যাই আমার চেয়ে মারই বেশী কষ্ট হইবে। মা কিন্তু সে কথাটী স্বীকার কর্‌তে চান্ না। হায় মাতৃহৃদয়!

(২)

চাকরির জন্য ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া একটি লোক বলিয়াছিল—"একটা চাকরি কি আর কর্‌তে পারি নে? তবে দেয়ই বা কে, পাই বা কোথায়?"

বড় চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া দেখিলাম—আমারও ঐ দুইটি মাত্র অসুবিধা।

একজন হিতৈষী বন্ধু বলিলেন—"দেখ হে ভায়া, একটা কাজ কর্ত্তে পার?"

"কাজ খুবই কর্ত্তে পারি; কিন্তু দেয় কে?"

"না হে, সে কাজ নয়; একটা ইয়ে, এই চেষ্টা দেখতে পার?"

"কি শুনি?"

"ও-পাড়ার বিপিনবাবুকে চেন, বিপিন মিত্তির—যিনি চাটগাঁয়ে কাজ করেন?"

"একটু-একটু চিনি।"

"তাঁকে গিয়ে একবার ধর; তিনি ইচ্ছা কর্‌লে একটা ৪০।৫০ টাকার চাকরি অনায়াসে যোগাড় ক'রে দিতে পারেন। এই সপ্তাহ খানেক হ'ল, একমাসের ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ী এসেছেন।"

"আচ্ছা একবার চেষ্টা করে দেখি, যদি হয়।"

যে দিন বন্ধুটির কাছে এই খবর পাই, সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভাগ্যক্রমে বিপিনবাবুর সহিত পথে দেখা হইল। তাঁহাকে একটু দীনতা জানাইয়া বলিলাম—"যদি একটী চাকরি করে দেন, বড়ই উপকার হয়।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি First Art পাশ করেছিলে না?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—"আজ্ঞা হাঁ।"

"আচ্ছা, আমার সঙ্গে কা'ল একবার দেখা কোরো; আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি"—বলিয়া বিপিনবাবু চলিয়া গেলেন।

একটা মোটা চাকরির প্রায় অর্দ্ধেক হস্তগত করিয়া আমিও হৃষ্টচিত্তে বাটী ফিরিলাম।

(৩)

পরদিন আহারাদি সাঙ্গ হইলে, দু'পুর বেলায় বিপিনবাবুর বাড়ী গেলাম। বাহির হইতে "বিপিনবাবু, বিপিনবাবু" বলিয়া গোটা-কয়েক ডাক দিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। আমার স্বরটা স্বভাবতঃই উচ্চে, তথাপি উচ্চতর স্বরে ডাকিলাম—"বিপিনবাবু বাড়ী আছেন?"

এবার একটা ক্ষীণ উত্তর পাইলাম—"কে ডাক্‌ছ বাবা, এদিকে এস।"

আমি দুয়ার ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক বর্ষীয়সী ঘরের দাওয়ায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। আমার দিকে খানিক চাহিয়া তিনি বলিলেন—"তোমাকে ত চিন্‌তে পারছি না বাবা।" আমি বলিলাম—"আপনি আমাকে কখন দেখেন নি বোধ হয়। আমি মাঝের-পাড়ার ভবানী চৌধুরীর ছেলে!"

"ওঃ! তুমি আমাদের অন্নদার ছেলে! আহা, তোমার মার সঙ্গে ছেলেবেলায় কত খেলাই করেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিপিনবাবু কি বেরিয়েছেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধা যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"তুমি বিপিনকে খুঁজছো? সে ত এ বাড়ীতে থাকে না।"

বিধবার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত।

আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না;—বলিলাম—"তিনি কি নিজের বাড়ীতে থাকেন না? আপনি ত তাঁর মা?"

"আর বাবা! বড় হ'লে কারো কি আর বুড়ো মাকে মনে থাকে? তাকে তার শ্বশুরবাড়ী খোঁজ করলে দেখ্‌তে পাবে। মাঝে-মাঝে যখন ছুটী নিয়ে আসে, শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে।"

কথা কয়টি বলিতে বিধবার শীর্ণ চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

অসমাপ্ত জপ শেষ হইলে, পরিহিত জীর্ণ পট্টবস্ত্রের অঞ্চলখানি গলায় দিয়া, পুত্রপরিত্যক্তা জননী দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

একটি অর্দ্ধস্ফুট প্রার্থনা শুনা গেল—"ঠাকুর, তাদের সুখে রেখ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। বাড়ী আসিয়া মাকে সব জানাইয়া বলিলাম—"মা, বড় চাকরি আর বৌ—এ দু'টো জিনিষই এ যাত্রায় বাবা বিশ্বনাথকে দিলাম।"

মার স্নেহপূর্ণ চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া আসিল।

বঙ্কিম প্রতিভা

(২)

[অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য]

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির উপর সচরাচর দুইটি দোষ আরোপিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, তিনি "মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু, সখা" এ সকলের ছবি আঁকেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি কোন আদর্শ-চরিত্রের সৃষ্টি করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রে মাতৃ-চিত্রের কতদূর উন্মেষ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-পরিপূর্ণ প্রবন্ধমালায় আমাদের বক্তব্য প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন। তাহার পুনরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সতীন ও সত্মা জাতীয় প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্কিম-গ্রন্থে বাঙ্গালী পরিবারের অন্যান্য সম্পর্কও যথাসম্ভব বাদ পড়ে নাই। বঙ্কিম-প্রতিভার এইরূপ ত্রুটি যখন দেখান হয়, তখন যে তাহার প্রতিবাদ করা একান্ত প্রয়োজন, তাহা আমরা মনে করি না। আমগাছ কাঁঠাল-গাছ নহে—এ কথা বলিলে আমগাছকে লজ্জায় মাথা নত করিতে হয় না—তাহা সকলেই বুঝেন। সেইরূপ বঙ্কিম-প্রতিভার বিশেষত্ব যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারি—তাহা হইলে এরূপ গোলযোগ গোড়াতেই মিটিয়া যায়। সে কথা ভুলিয়া যাইয়া অনেকে উৎসাহভরে প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হন যে—চন্দ্রশেখর বা প্রতাপ আদর্শ পুরুষ নহে, ইত্যাদি। রমন্যাস কখনও আদর্শ-চরিত্র রচিবার ক্ষেত্র হইতে পারে না। সেরূপ প্রত্যাশা করা মহাভ্রম। রমন্যাসের পাত্র-পাত্রী, ইংরাজীতে যাহাকে hero, heroine বলে—যাহাকে "কাব্যের নায়ক-নায়িকা" বলিয়া আমরা অনেকটা অনুবাদ করিতে পারি—সেই জাতীয় হইবেই। এরূপ পাত্র-পাত্রীর বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, ইহারা সম্ভব কি না—মনুষ্যের যে সকল ধর্ম্ম, তাহার বিরোধী কি না। ইহারা যদি কাষ্ঠপুত্তলিকা না হইয়া জীবন্ত নরনারী হয়, তাহা হইলেই সহৃদয়গণ সন্তুষ্ট। অবশ্য প্রফুল্ল, কিম্বা সীতারাম কিম্বা জীবানন্দ প্রভৃতি চরিত্রের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কারণ, এ সব স্থলে স্বীকার করিতেই হইবে—বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শাত্মক উপন্যাস রচনাতেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিম-প্রেমিক মাত্রকেই স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বঙ্কিম-চন্দ্রের ত্রয়ী" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত সন্দর্ভে তিনি বলেন যে "এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র purpose বা উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; ক্ষেত্রের প্রতি, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের প্রতি, আলেখ্যের আলো ও ছায়ার প্রতি তিনি তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নাই।" তিনি "সিদ্ধান্ত লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, চিত্রকলার প্রতি তেমন নজর রাখিতে পারেন নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই রাখেন নাই।" "কিন্তু এক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী নির্দ্দোষ; তিনি সন্ন্যাসীর" ও আমরা বলি, সন্ন্যাসিনীর "চিত্র অনেকটা নিখুঁত করিতে পারিয়াছেন।" উড়িষ্যার রাজপথ-আলো-করা—শ্রী ও জয়ন্তীর সেই যুগল সন্ন্যাসিনীমূর্ত্তি আদর্শ কি না বলিতে পারি না—কিন্তু অপার্থিব যে, সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সীতারামের শেষ পরিচ্ছেদে "শ্রী" বলিতেছে "সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের সকল চরিত্রসৃষ্টির ইহাই মূলমন্ত্র।

আর এক কথা। বঙ্কিমচন্দ্র নিখুঁত আদর্শ চরিত্র রচিতে পারেন নাই—এ অপবাদ যদি যথার্থই সত্য হয়—তাহা হইলেও, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার কতটুকু লাঘব হয়—তাহাও বিবেচনার বিষয়। তবে এই অপবাদের গুরুভার বহন করিতে তাঁহার সঙ্গীর অভাব হইবে না। সেক্সপীয়র সম্বন্ধেও এরূপ সমালোচনা হইয়াছে। তা ছাড়া, প্রায় স্থলেই দেখা যায় যে, আদর্শ-চরিত্র আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, আদর্শ-চরিত্র গঠনের একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম—একটা prescription বা নির্ণীত ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অনায়াসেই এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারেন। নায়ক ও নায়িকার কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় তাহাদিগের

কিরূপ হাবভাব-চেষ্টা হয়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আছে। এই জাতীয় আদর্শ-চরিত্রে কল্পনার খেলা, ব্যক্তিগত অনুভূতির ও মানবহৃদয়জ্ঞানের যতটা পরিচয় না থাকে, নীতিশাস্ত্র ও সভ্যজন-প্রশংসিত মামুলী অলঙ্কারে ভূষিত করিবার চেষ্টা ততোধিক প্রকট হয়। ফলে, আদর্শ-চরিত্র স্বাভাবিক, বাস্তবানুগত ও সম্ভব না হইয়া বিপরীত হইয়া পড়ে; হয় দেবতা, নয় সয়তান হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু মানুষ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি প্রায় কোন স্থলেই এই অসম্ভাব্যতা দোষে দুষ্ট নয়—এ কথা বোধ হয় জোর করিয়া বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-রচনার প্রণালীর মূল কোথায় ও তাঁহার "অন্তর হতে অন্তরতম" বিশিষ্টতা কি? - এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, Sir Walter Scottএর মত তিনি Wizard of the East—প্রাচ্য সাহিত্যরাজ্যের অপূর্ব্ব যাদুকর। তিনি গল্পলেখকের রাজা। Dickens, Thackeray, Tolstoy or Dostoievsky or Les Misearbles-লেখক Hugoর মত তিনি দরিদ্র, অধঃপতিত, উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর মানবের জীবনকাহিনী লিখিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উপন্যাসও রম-ন্যাসের সদৃশ। এইখানে তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক। তিনি আদি, বীর, রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি প্রায় রসেরই অবতারণা করিয়াছেন;—কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু, যাহা সুন্দর, যাহা শোভন, যাহা মনোরম, তাহার উপর নিবদ্ধ ছিল। জীবনরহস্যের যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখ-কষ্টের দিক্ ফুটিয়া উঠে নাই। সংসারের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তিনি বিরক্ত ও বিষণ্ণ না হইয়া—মানুষের জীবনের অতি হীন, কদর্য্য, অবনত অংশ হইতেও সৌন্দর্য্যের চয়ন করিতেন। তাঁহার উপন্যাসের যে philosophy—তাহার বিশিষ্টতা এইখানে। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার এ জাতিকে কত শতাব্দী ধরিয়া জর্জ্জরিত করিয়াছে—সামাজিক কুপ্রথায় জাতির মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল করিয়াছে,—স্বার্থপরতা, নীচতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞতা কত জঞ্জাল না সৃষ্টি করিয়াছে,—এ সকলের মধ্যে থাকিয়াও, বঙ্কিমচন্দ্র—বাঙ্গালীর অতীত ও বর্ত্তমানের অন্তরে শুধু সৌন্দর্য্যের খনিই সঞ্চিত আছে—কেবল এরূপ আভাস ও ইঙ্গিতে কেন, তাঁহার উপন্যাসাবলি পূর্ণ রাখিয়াছেন? এরূপ সরসতা ও প্রীতির মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র স্বদেশানুরাগই কারণরূপে বর্ত্তমান। বঙ্কিম-প্রতিভার দ্বিতীয় মূলকথা ইহাই। সঙ্গতের মধ্যে সুরপঞ্চমের মত এই দেশপ্রীতি বঙ্কিমের সকল উপন্যাসেই প্রায় ধ্বনিত হইতেছে। বাঙ্গালীর মনে পৌরুষের অভিমান জাগাইতে বঙ্কিমচন্দ্রই অগ্রণী। তাই তাঁহার উপন্যাসে বঙ্গবীরের এত ঘন-ঘন আবির্ভাব। প্রায় নায়কই heroic। অসিধারণে ক্ষিপ্রহস্ত। শত্রুর সহিত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ। আজ দেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিবার জন্য চারিদিকে একটা আগ্রহ হইয়াছে; দুঃখ, দৈন্য কলুষ ও দৌর্ব্বল্য ঘুচাইয়া প্রকৃত সংস্কার করিবার, জাতিকে উন্নত করিবার বাসনা দেখা দিতেছে। বঙ্কিমের সময়ে হয়ত ইহা অসম্ভব ছিল। কিন্তু আজ যে ইহা সম্ভাব্যের মধ্যে আসিয়াছে—তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্র। দেশকে ভালবাসিতে, দেশের মধ্যে মধুর ও মনোরম পদার্থ যে বহু, তাহা বুঝাইতে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম শিক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার দুইটী দিক্ আছে। এক দিকে তিনি সাহিত্যের সৃজক শিল্পী—সৌন্দর্য্যের নব নব উন্মেষে ব্যাপৃত—কবি। অপর দিকে—তিনি দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা মনীষী। মনুষ্য-সমাজ যত পুরাতন ও পরিণত হইতেছে, ব্যক্তিমাত্রকেও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ততই একাধিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। প্রাচীনকালের মত এখন আর প্রতিভার বা শক্তির সেরূপ একাগ্রতা, সেরূপ অনন্যনিষ্ঠতা দেখা যায় না। এখন যিনি কবি, তিনিই সমালোচক—যিনি ঔপ-ন্যাসিক, তিনিই আবার দার্শনিক। সুকুমারকলাবিশেষের পরিপুষ্টি ও প্রকৃষ্টতার পক্ষে এরূপ বহুমুখিতা ও ব্যাপকতা সর্ব্বথা হিতকর বা অহিতকর তাহার সম্যক্ আলোচনা এস্থলে অসম্ভব;—তবে ইহার দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে যে সুপ্রচুর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এরূপ ভূয়োদর্শন শিল্পীর পক্ষে একেবারে নিষ্ফল নহে;—প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষভাবে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা শিল্পীর দৃষ্টির পরিধিকে বিস্তৃত করে—তাঁহার কল্পনাকে সহস্র-চক্ষু করিয়া তুলে। সে যাহা হউক, বঙ্কিম-চন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিক নহেন—তিনি যুগপৎ দার্শনিক ও কর্ম্মতত্ত্বান্বেষী, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক। এতদিকে

তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার উপন্যাস এত শিক্ষাপ্রদ; কারণ, তিনি কল্পনার মনোরম কুঞ্জে বিলাসী প্রজাপতির মত যে শুধু ভ্রমণ করিতেন, তাহা নহে—তিনি মধু-সঞ্চয়ী ভ্রমরের মত যাহা সত্য, যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা পথ্য, তাহারও আহরণ করিতেন। এই মধু আহরণ করিতে যাইয়া তিনি পরিশেষে এদেশের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছিলেন;—বাঙ্গালার প্রবণতা কোন্ দিকে—বাঙ্গালার সাধনার বস্তু কি—তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী এইরূপে দুইটী বিভিন্ন প্রকার রচনায় ব্যাপৃত ছিল বলিয়া—তাঁহার intellectual self, তাঁহার বুদ্ধি ও প্রতিভা, মতামত ও ধ্যান-ধারণার বিষয়ে এত সুস্পষ্ট তথ্যরাশি সহজে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। শুদ্ধ কবির বা ঔপন্যাসিকের যথার্থ আন্তর-আকৃতি সচরাচর এত সুন্দরভাবে পাঠক সমাজে ধরা দেয় না। তাহার কারণ, শুদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক একটা যবনিকা, একটা তিরস্করিণীর অন্তরাল হইতে আমাদিগকে আপন অস্তিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া ফেলিতে পারি না। কারণ, ধরিতে যাইলে তিনি কবির মত বা ঔপন্যাসিকের মত এমন একটি কৈফিয়ৎ দিবেন যাহাতে বুঝিব যে, যিনি ঔপন্যাসিক তিনি তাঁহার চিত্রিত চরিত্ররাজির কোনটীর মধ্যে নাই; যিনি কবি, কাব্য তাঁহার অভিব্যক্তি হইলেও, তাঁহার মায়িক অভিব্যক্তিমাত্র। যদি কবি-মানুষটীকে,—তাঁহার প্রকৃত মতামতকে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি ভিন্ন অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে। একজন পাশ্চাত্য কবিই সাফাই গাহিয়াছেন "A poet is the most unpoetic of Souls"। এ কথা যদি সত্য হয়, —আমরা কি প্রকাণ্ড ভ্রমেই না ডুবিয়া আছি!

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সে আপদ্ নাই;—তিনি আত্মগোপন না করিয়া নানা প্রকারের রচনার মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন—আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। যখন তিনি মনে ভাবিলেন যে, উপন্যাস-রচনার লুকোচুরির ভিতর হইতে তিনি নিজের কথা দেশবাসীকে সহজ করিয়া, স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয় ত পারিবেন না—তখন তিনি প্রবন্ধে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার অপূর্ব্ব উপহার "কমলাকান্ত"—তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশমালা—"বিবিধপ্রবন্ধ।" এই বিবিধপ্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা করা এই স্থলে আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি ইহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির একটা তালিকা দিয়া যাই—তাহা হইলেই একটী সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হইবে। তাই সংক্ষেপে ও সাবধানে এই সকল প্রবন্ধের দু'একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থলের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। বিবিধ-প্রবন্ধে দেখিতে পাই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা পুরাণ-বর্ণিত পুরুভুজের মত অসংখ্য বাহু প্রসারিত করিয়া, আমাদিগের চিন্তার যাবতীয় বিষয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রথমতঃ, তিনি একজন নিপুণ সাহিত্য-সমালোচক। উত্তর-চরিতের উপর তিনি যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, শকুন্তলা, মিরাণ্ডা ও দেস্‌দিমোনা-চরিত্রের তুলনায় তিনি যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, গীতি-কাব্যের স্বরূপসম্বন্ধে যে কয়টী বহুমূল্য সূত্র তিনি নিবদ্ধ করিয়াছেন, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের কবিতার বিশেষত্ব যেরূপ সহৃদয়তার সহিত তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিত্তের সমধিক প্রসাদজনক ও প্রীতিকর। তদ্ভিন্ন, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার এমন একটী গুণ আছে, যাহা আমরা আধুনিক লেখকদিগের সন্দর্ভে প্রায় দেখিতে পাই না। সেইটী হইতেছে স্পষ্টতা ও যৌক্তিকতা। বঙ্কিম-চন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনাও তাঁহার উপন্যাসেরই মত আমাদিগকে সবলে আকৃষ্ট করে। এই সকল সন্দর্ভের মধ্যে ভাষার কুজ্ঝটিকা নাই; যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই—যাহার আভাষমাত্র পাইয়াছি, সেরূপ সত্যের দূর হইতে অস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই;—কথার আবরণে যুক্তি ও অনুভূতি-ক্ষমতার অভাবকে লুক্কায়িত রাখিয়া বিজ্ঞ নাম কিনিবার যন্ত্রণাকর প্রয়াস নাই। যাহা আছে, তাহা নির্ভয়ে, সরল ও সহজভাবে, সুচিন্তিত ও সুনির্ণীত তত্ত্বের খ্যাপন। এই সুলক্ষণ তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধেও আছে। ফলে, শুষ্ক গবেষণা সরস আকার ধারণ করিয়াছে;—যাহা অস্পষ্ট ছিল—দুর্বোধ্য ছিল—অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা সুস্পষ্ট উজ্জ্বল ও সুখবোধ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমের এ লেখনী-শিল্প আধুনিক সাহিত্যিকগণের মানস-ফলকে অনপনেয়ভাবে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল ছোট-ছোট প্রবন্ধ আজ-কাল কেন যে যথাযথ ভাবে অনুশীলিত হয় না, বুঝিতে পারি না। আমরা Addisonএর essay পাঠ করিতে নিবিষ্ট-চিত্ত।

যদিও পাঠান্তে প্রায় রচনাগুলিকেই কলিকাতার বাজারের জলীয় দুগ্ধেরই মত বিস্বাদ বলিয়া মনে হয়, তথাপি ইংরাজী-শিক্ষিত আমরা তাহার প্রশংসায় পরাঙ্মুখ নহি। এই সকল বৈদেশিক নাতি-সরস প্রবন্ধ অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা কত উপাদেয়, কত মর্ম্মস্পর্শী, কত হৃদয়গ্রাহী, তাহা তুলনা করিলেই বুঝা যায়। সাধারণ সামাজিক কথা লইয়া অনাবিল ও অকষ্টকল্পিত হাস্যকৌতুকে পরিপূর্ণ প্রবন্ধ "লোক-রহস্য" ভিন্ন অন্য কোথায় আমরা দেখিতে পাইব? এই সকল fable Æsopএর নীতিকথার সমান জাতীয়, অথচ বর্ত্তমান সময়োপযোগী। তাহার পর, অতি সাধারণ বিষয় উপলক্ষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল লোকশিক্ষাকর সাময়িক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাদের উপযুক্ত আদর আজকাল কোথায়? এ সকল রচনার তিনিই যে পথ-প্রদর্শক, সে কথা আমরা যেন বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, বঙ্গদর্শন মাসিক-সাহিত্যের প্রথম নমুনা হইলেও, আজ পর্য্যন্ত কোন মাসিকপত্র প্রবন্ধ-গৌরবে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। এই বঙ্গদর্শনে "বিজ্ঞান রহস্য" নামে যে অমূল্য আলোচনারাজি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের মূল্য এখনও অপরিহীন রহিয়াছে। সাধারণের জ্ঞাতব্য সামান্য-সামান্য-বিষয়ে এরূপ প্রস্ফুট টগরের মত প্রসাদময়, প্রকাশময়, জ্ঞানদায়ক, নাতিহ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ রচনা আজকাল বড়ই বিরল হইয়া উঠিতেছে। এখন যিনি কল্পনাকুশল লেখক, সাহিত্যে যিনি সৃষ্টি করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তিনিই বলেন যে, পাঠশালার গুরুগিরি বা স্কুলের মাষ্টারি করা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কখনও এ আদর্শ মানিতেন না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তিনি ভাষার সরসতায় ও ঝঙ্কারে, কল্পনার বৈচিত্র্যে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে বঙ্গবাসীকে শুধু তৃপ্তি দিয়াই নিজ কর্ত্তব্য সমাপ্ত মনে করিতেন না; পাঠকের বোধগম্য হওয়া বা না হওয়াকে তিনি কখনও অবহেলার বা অবজ্ঞার বিষয় মনে করিতেন না। তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের প্রবর্ত্তিত কাব্যের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, নিজ অনন্যসাধারণ লেখনী চালিত করিতেন। তাই যুক্তির সূত্র বর্জ্জন করিয়া শুধু রসাত্মক বাক্যের মালা গাঁথিয়াই, প্রতিভাবানের দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিলাম, এ কথা তিনি মনে স্থান দিতে পারিতেন না। লোকশিক্ষা যে সাহিত্যরচনাকারক মাত্রেরই উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, ইহা তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়-বৈচিত্র্য হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী যে তাঁহার হৃদয়ের কতখানি স্থান পূর্ণ করিয়াছিল, বাঙ্গালীর অতীতের ইতিহাস, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান হীনাবস্থা, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা ও উপায়, এই সকল বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার মন যে সতত ব্যাপৃত থাকিত, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—বিবিধ প্রবন্ধ। তাঁহার লিখিত "বাঙ্গালার কলঙ্ক" ও "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে ইতিহাস-বিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় বলিয়াছেন—"যে যুগে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মার্শমান্ এবং ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস ব্যতীত ইতিহাসবিষয়ক অপর পাঠ্য-পুস্তক ছিল না, সেই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর শত-শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।" তাঁহার "ভারতকলঙ্ক" প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধ-বাদী বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপে বাঙ্গালার অতীতকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি যে মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন, তাহা নহে;—বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতেও তিনি অক্লান্তবুদ্ধি ছিলেন। প্রমাণ—তাঁহার "বাহুবল ও বাক্যবল," তাঁহার "বঙ্গদেশের কৃষক," "মনুষ্যত্ব কি?" "রামধন পোদ" প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধ। শ্লেষ্মাপ্রধান জাতি আমরা—জড়তা আমাদের ধর্ম্ম। তাই আমরা এমন রত্নের সম্মান করি না। বুঝিতে পারি না—এই ক্ষণজন্মা পুরুষ এই দুর্ভাগ্য জাতির উন্নতিকল্পে কতটা চিন্তা ব্যয় করিয়াছেন। এখন অনেকে বলেন—বঙ্কিমের উপদেশ প্রাচীন হইয়াছে, পুরাতন হইয়াছে;—আমরা এখন উন্নতির পথে সোজা চলিতেছি;—আগে মুখ করিয়া আছি;—বঙ্কিমের জ্ঞান-গবেষণা আর আমাদিগের কোন প্রয়োজনে বা উপকারে আসিতে পারে না। বঙ্কিমকে অতিক্রম করিবার দিন এখনও আসে নাই, কখনও আসিবে কি না, সন্দেহ। তাঁহাকে অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে—তাঁহার মতামত, বাণী ও উপদেশকে পিছনে ফেলিবার পূর্ব্বে—তাঁহার প্রবন্ধগুলিকে আত্মসাৎ করা প্রয়োজন। সেই কারণে যখন দেখি, গভীর আলোচনা ছাড়িয়া বঙ্কিমের শুধু উপন্যাসেরই পঠন-পাঠন হইতেছে, তখন আমার মনে হয়, যে আমাদিগের উন্নতি—অগ্রসর হইয়া নহে ফিরিয়া যাইয়া,—মুখ ফিরাইয়া নহে—মস্তক অবনত করিয়া। এখনও বঙ্গভাষাভাষীকে বহুদিন বঙ্কিমের উদ্দেশে বলিতে হইবে—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নং"

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাট্‌কা একসুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়াদশেক ছোট-বড় রুদ্রাক্ষ-মালা এবং একজোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়—সাজ-গোজ করিয়া, খানিকটা ধূনির ছাই মাথায়, মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, "বাবাজী, বলি আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্চে?" দেখিলাম, তাঁহারও রস-বোধ আছে। তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাচ্ছল্যভরেই বলিলেন, "হ্যায় একঠো।" "তবে, লুকিয়ে আনো না একবার।"

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতেরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটু-খানি টিনমোড়া আরসি। তা হোক একটুখানি, দেখিলাম যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে—আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি দিনকয়েক পূর্ব্বেই রাজারাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন! তা যাক্।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরু-মহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "বেটা, মহিনা এক আধ ঠহ্‌রো।"

মনে-মনে "বহুত আচ্ছা" বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায়-কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরূহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভণ্ড-পাষণ্ডেরা কি প্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎ-পাদপদ্মে মতি-স্থির করিতে হইলেই বা কি-কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন-ঘন মুখবিবর দ্বারা শোষণ করতঃ নাসারন্ধ্রপথে শনৈঃ-শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য্য উপকার, তাহা বুঝাইয়া দিলেন; এবং এ বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ, সে ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্দ্ধন করিলেন। এইরূপে সেদিন মোক্ষপথের অনেক নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইয়া গুরু-মহারাজের তৃতীয় চেলাগিরীতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেমনি। চা, রুটি, ঘৃত, দধিদুগ্ধ, চূড়া শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান; আবার ভগবৎ পদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সে দিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে, আমার শুক্‌নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রধান কাজ না হইলেও একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ, সাত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাপর কর্ত্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্বর ডিঙাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর ল্যাঙড়াইতে লাগিলাম। এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে, এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না; আমি বলিতেছি,—বাঙলা দেশের মত সেখানকার মেয়েরা "হাতজোড়া—আর একবাড়ী এগিয়ে দেখ" বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকুরি না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিত না। ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না। এম্‌নি দিন যায়। দিন

পনর ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত,—থাক্ মোক্ষসাধন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর বাঁচি না। অন্যান্য বিষয়ে বাঙালী যত সেরাই হোক, এ বিষয়ে বাঙালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশি অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সে দিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিকভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরু মহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা
যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—"

অর্থাৎ ষ্ট্রাইক্ দি টেন্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়! সন্ন্যাসীর যাত্রা কি না! পা-বাঁধা টাট্টু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কসিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পোঁট্‌লা-পাট্‌লি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তার পরে রওনা হইয়া ক্রোশদুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে 'আস্তানা' ফেলা হইল। যায়গাটি মনোরম, গুরু মহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা' ত হইল,—কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পৌঁছিতে যে কয় জন্ম লাগিবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিনজনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্ত্তির জন্য চেষ্টা-চরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ীর খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি বাঙালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে বোনা গুনচটের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গিটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি; কিন্তু, বাঙালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত-দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। তাহার কারণ এই যে, দশ-এগারো বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন-উদাস চাহনি, আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙলা করিয়া বলিলাম। কহিলাম, "চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি মা।" প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠোঁট দু'টি বারদুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ, সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্ব্বেই—মেয়েটি কাঁদিতে-কাঁদিতে এক নিঃশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল,—"তুমি কোথা থেকে আস্‌চ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমান জেলায়? কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন?"

আমি কহিলাম, "তোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমানের রাজপুরে?"

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, "হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারি, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারি। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ী এসেচি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে, কিচ্ছু জানিনে। ঐ যে অশথ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ী। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে—এরা বলে, না,—সে কলেরায় মরেচে।"

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখ্‌চি পুরা হিন্দুস্থানি, অথচ, মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙালীর মেয়ে। এতদূরে এ বাড়ীতে এদের শ্বশুর-বাটীই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল!

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদি গলায়-দড়ি দিলে কেন?"

সে কহিল, "দিদি রাজপুরে যাবার জন্যে দিনরাত কাঁদ্‌ত,—খেত না, শুত না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।"

প্রশ্ন করিলাম, "তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?"

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝ্‌তে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিন রাত কাঁদি; কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?"

মেয়েটি কহিল, "আমরা যে তেওয়ারি। আমাদের বর ও দেশে ত পাওয়া যায় না।"

"তোমাকে কি এরা মারধর করে?"

"করে না? এই দেখ না" বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া, উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিল, "আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।"

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে-পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল "আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বল্‌বে ত? আমাকে একবার নিয়ে যেতে—নইলে আমি—" আমি কোনমতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াই দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা আবেদন আমার দুই কাণের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদির দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ কথাটাও 'লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, এবং এও মার-ধর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে যাত্রার সঙ্কল্প করিয়াছে। তুমি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে বলা যায় না। খুব সম্ভব তোমার চিঠিপত্র ইহারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্দ্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম জানি না সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কি না; এবং পৌঁছাইলেও সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এম্‌নি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে; এবং এই আদর্শ হিন্দু-সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল; এই উপায়েই সনাতন হিন্দু জাতিটা আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। তখন ইহার প্রচণ্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছু নাই। কে কোথায় দু'টো হত-ভাগা মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিবে বলিয়া, ইহার কঠোর বন্ধন এক বিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগ্‌লামি। কিন্তু মেয়েটার কান্না যে লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই এ প্রশ্ন নিজের নিকট হইতে থামাইয়া রাখে যে—কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল-ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত-মহাসাগরের অনেক ছোটখাটো দ্বীপের অনেক ছোটখাটো জাতিরা মানুষ সৃষ্টির সুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফরিকা আছে, আমেরিকা আছে; তাহাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা য়ুরোপের অনেক জাতির অতি-বৃদ্ধ-প্র-পিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা ঝাঁক বাঁধিয়া দেখা দেয় না। এমনি এক-আধটা কচিৎ, কদাচিৎ আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙালী মেয়েদুটি'র খোট্টার ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারির মনে বোধ করি আসিয়াছিল। কিন্তু সে

বেচারা এই দুরূহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যাদুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সমাজ এই দুটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সেই পঙ্গু, আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ 'জাতিভেদ' বলিয়া যে একটা বড়রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই। এই-রকম একটা কথা। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না,—'হয় নাই' 'হবে না' বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেম্‌নি কঠিন। যাক্ গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, 'সাধু বাবা' আজ যেন কিছু বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন; বলিলেন, এ গ্রামটা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়; সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক করে না; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে আজ আর তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা' ছাড়া এই সকল বেহারী পল্লীগুলাতে কোনরকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না। ইতিপূর্ব্বে বাঙলার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি; কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা জলবায়ু,—কোনটাকেই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শুধু কেবল পালাই-পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায়-পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-কর-তালের সঙ্গে কীর্ত্তনের সুর কাণে আসে না। দেবমন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলাও সেরূপ গম্ভীর, মধুর শব্দ করে না। এ দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই তেমন মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না! এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর, মনে হইতে লাগিল, কিন্তু, এই সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত, নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোন দিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি;—তা' হোক্, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পর দিন তাঁবু ভাঙিয়া যাত্রা করা হইল; এবং সাধু-বাবা যথাশক্তি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হোক, কিম্বা অন্তর্যামী মুনি আমার মন বুঝিয়াই হোক, পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা' সে এখন থাক্। পাপ-তাপ অনেক করিয়াছি, সাধুসঙ্গে দিনকতক পবিত্র হইয়া আসিগে। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে যায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোটা-বাঘিয়া। আরা ষ্টেসন হইতে কোশ-আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সদাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈত্রিক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ, এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না পারা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি,—গোপনে তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে, তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। অতএব তাঁর নাম রামবাবু। কি সূত্রে যে রাম বাবু এই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া যে জমি-জমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন, অত কথা জানি না! এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটিতিনচার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকাল-বেলা শোনা গেল, এই ছোটা-বড়া বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচসাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত

মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবাটা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং 'সাধুবাবা' অবিচলিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বারচারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথাই বলিব। নিছক পেটের দায়ে 'সাধুজী' আপনারা ত অনেকই জানেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও এই দুটা দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিটাও যে আমার খুব মোটা,তাও নয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বল্পতাই বলুন,—খুব বেশি; এবং প্রাণের ভয়টা ইহাদের নিতান্তই কম। 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছে; কিন্তু কি করিলে অনেক দিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের 'সাধু বাবার'ও এ ক্ষেত্রে তাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধুনির ছাই এবং দু' ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে সকল বস্তু হু হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রীক কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারিদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড় ছেলেটির বসন্ত দেখা দিয়াছে, এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচৈতন্য। বাঙালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গল্পের মধ্যে মাসখানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ, কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে দুটি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত ঢের দূরের কথা। তবে, মাঝের একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন পনর পরে, রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী দাদা, তুমি ত সত্যিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চলে গেলে, তারা কথখনো বাঁচবে না। কই, যাও দেখি, কেমন করে যাবে?" বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল। রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি আর যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, "প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও; আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" প্রভু ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া, নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারম্বার সতর্ক করিয়া দিয়া, সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্প দিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী-লীলার অবসানে উক্তরাধিকার-সূত্রে টাটু এবং উট-দু'টা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক্—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারী রূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা—লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া, হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পলাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না। যে বাড়ীতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তাঁর পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর-গাড়ীতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেক দিন আগেই দিতেন,—শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন-পাঁচ-ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এম্নি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম, রাত-জাগা এবং পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম, অপরাহ্ণবেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি ন'টা-দশটার সময় টের পাইলাম, জ্বর হইয়াছে। সে দিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসী দাদা,

তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্য্যন্ত চল না ?" আমি বলিলাম, "তাই যাব। কিন্তু তোমাদের গাড়ীতে আমাকে একটু যায়গা দিতে হবে।"

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন সন্ন্যাসী দাদা ? গাড়ী ত দু'টোর বেশী পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে যায়গা হচ্চে না।"

আমি কহিলাম, "আমার হাঁটবার যে ক্ষমতা নেই দিদি। সকাল থেকেই বেশ জ্বর এসেচে।"

"জ্বর ? বল কি গো ?" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নূতন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে। বাড়ীর ভিতরে ঘরে-ঘরে তালা বন্ধ—জনপ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম, তাহার সুমুখ দিয়াই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ ৫।৬ খানি গরুর-গাড়ী মৃত্যু-ভীত নরনারী বোঝাই লইয়া ষ্টেশনে যাইত। সারা দিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যূষেই ষ্টেশনের কাছে একটা গাছতলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না; সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড ছিল। পূর্ব্বে এটি মোসাফিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বৃষ্টি বাদলার দিন গরু বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোক ষ্টেশন হইতে একজন বাঙালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায়, জনকয়েক কুলির সাহায্যে, এই শেডখানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি এই যুবকটির কোন পরিচয়ই দিতে পারিলাম না; কারণ, কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস-পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে, তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন, এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন; দু'পুর বেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন,—ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে, ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম, আর বেশিক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর ৫।৬ ঘণ্টাও স্থায়ী হয়, ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব, যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে আর করাই হইবে না।

তা বটে; কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন, তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবিলাম গরীবের টেলিগ্রাফের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি !

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁহার ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, "যতক্ষণ আমার হুঁস আছে, ততক্ষণ মাঝে-মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা-হোক্, আপনি আর কষ্ট করবেন না।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত 'মুখ-চোরা' প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া বলিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি শুধু 'না না' বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, "আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেহ নেই। তবে, পাটনায় পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখান পোষ্ট-কার্ড লিখে দেন, যে, শ্রীকান্ত আরা ষ্টেসনের বাইরে একটা টিন শেডের মধ্যে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছে, তা' হলে—"

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। "আমি এখনি দিচ্চি ! চিঠি এবং টেলিগ্রাম দুইই পাঠিয়ে দিচ্চি" বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে-মনে বলিলাম, 'ভগবান্, সংবাদটা যেন সে পায়।'

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায়

হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম সেটা আইস-ব্যাগ। চোক মেলিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপর শুইয়া আছি। সুমুখে টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটাদুইতিন ঔষুধের শিশি; এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর কে-একজন লাল চেক্ র‍্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তার পরে একটু-একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা ন্যাড়া করিয়া দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো—এম্নি কত কি ব্যাপার।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম, ইনি একজন বাঙালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো উনিশের বেশি নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুস্বরে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "বঙ্কু, বরফটা একবার কেন বদ্‌লে দিলিনে বাবা।" ছেলেটি বলিল, "দিচ্চি; তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তার বাবু যখন বলে গেলেন বসন্ত নয়, তখন ত আর কোন ভয় নেই মা।"

পিয়ারী কহিল, "ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বল্‌লেই কি মেয়ে মানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাব্‌না করতে হবে না বঙ্কু, তুই শুধু বরফটা বদ্‌লে দিয়ে শুয়ে পড়—আর রাত্রি জাগিস্‌নে।" বঙ্কু আসিয়া বরফ বদ্‌লাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে-আস্তে ডাকিলাম, "পিয়ারী?"

পিয়ারী মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দু-গুলা আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, "আমাকে কি চিন্‌তে পারচ? এখন কেমন আছ কা—"

"ভাল আছি। কখন্ এলে? এ কি আরা?"

"হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ী যাব?"

"কোথায়?"

"পাটনায়। আমার বাড়ী ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?"

"এই ছেলেটি কে রাজলক্ষ্মী?"

"আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছ থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা কোয়ো না, ঘুমোও—কাল সব কথা বল্‌ব।" বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান হাতখানি মুঠার মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বিশ্বদূত

আমাদের নূতন গভর্ণর

আগামী মার্চ্চ মাসের শেষে আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় লাট কার্মাইকেল বঙ্গের মসনদ ত্যাগ করিবেন। তাঁহার স্থানে আর্ল অব রোনাল্ডশে বঙ্গের লাট হইবেন—ইহাই আমাদের সম্রাট আদেশ করিয়াছেন। ইনি জেটল্যাণ্ডের মার্কুইসের পুত্র। জন্ম ১৮৭৯ সালের ১১ই জুন। ইনি ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯০৭ সালে বিবাহ করিয়াছেন। ইহার সহধর্ম্মিণী কর্ণেল মার্ভিন আর্চডেলের ২য়া কন্যা সিলিনী মহোদয়া। আর্লের একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা আছে। তিনি ভারতে, সিংহলে, পারস্যে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন।—দৈনিক বসুমতী।

টাটার কারখানা

পার্শি ধনকুবের টাটার প্রতিষ্ঠিত লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার নাম কে না শুনিয়াছে? এত বড় লোহার কারখানা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া উহার কার্য্য চলিতেছে, লাভও হইতেছে বিস্তর। গত ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্ট আমরা পাইয়াছি। উহাতে প্রকাশ, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে কোম্পানী লাভ করিয়াছেন মোট আটষট্টি লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয় শত ছাপান্ন টাকা। ফলে কোম্পানীর সাধারণ অংশীদারেরা এবার শতকরা পনের টাকা ও বিশেষ অংশীদারেরা শতকরা ১৮০৷৷০ টাকা লভ্যাংশ পাইবেন। এমন অতিকায় লাভের কল্পনা মসীজীবি বাঙ্গালীর নিকট আকাশ-কুসুম মাত্র। টাটা কোম্পানীর অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি ভারতীয় শিল্পিসমাজে নূতন যুগ আনিয়াছে।—বাঙ্গালী।

বাঙ্গালী পল্টন

বাঙ্গালী পল্টন কমিটির অনারারী সেক্রেটারী ডাক্তার এস, কে মল্লিক মহাশয় বড়লাটের সামরিক সেক্রেটারীর নিকট এই মর্ম্মে খবর

পাঠাইয়াছিলেন—"আমাদের মহামান্য বড়লাট মহোদয়কে জানাইবেন যে, বাঙ্গালা দেশে যুদ্ধে ব্রতী হওয়া যদিও নূতন কার্য্য, তথাপি কর্তৃপক্ষের আদেশ ও অনুমতি পাইবার আটচল্লিশ দিন মধ্যে বাঙ্গালী পল্টনের ডবল কোম্পানী পূর্ণ হইয়াছে। যুদ্ধের সময় এরূপ হওয়া, রেকর্ড করিয়া রাখার উপযুক্ত বিষয় বটে। উচ্চ এবং সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত যুবকগণ সাম্রাজ্যব্যাপী উল্লাস ও উত্তেজনার ফলে এবং আত্মনিয়োগ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া সাধারণ সিপাহী সৈন্যের পদে ভর্ত্তি হইয়া সীমান্তে গিয়াছে।"—নায়ক।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট মারা গেলেন! অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী—যুবরাজের, অপঘাত-মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় তিনি যে যুদ্ধ বাধাইয়াছেন, তাহার পরিণাম দেখিয়া গেলেন না! তবে, পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা অবশ্য তিনি বুঝিয়াই গিয়াছেন। সুতরাং এই ইউরোপ-এসিয়াব্যাপী যুদ্ধের পরিণাম যে তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে হইল না, বৃদ্ধ বয়সে যে তাঁহাকে মনস্তাপের উপর মনস্তাপ পাইতে হইল না, সেটা তাঁহার পক্ষে ভালই হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি আমাদের শত্রু ছিলেন। আজ তিনি মৃত। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য এখনও আমাদের শত্রু; অষ্ট্রিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট—তিনিও আমাদের শত্রু; কিন্তু মৃত, বৃদ্ধ সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ আর আমাদের শত্রু নহেন। তিনি এখন শত্রুতা-মিত্রতার অতীত। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি। ইউরোপে তিনি এই লোকক্ষয়কর, দেশধ্বংসী, যুগান্তরকারী মহাসমর বাধাইয়া যে অতি-পাতক সঞ্চয় করিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় পরলোকে তাঁহার পক্ষে যতখানি শান্তিলাভ সম্ভবপর, তাহা হইতে তিনি যেন বঞ্চিত না হন, ইহাই আমাদের কামনা।—দর্শক।

ইংলণ্ডে সংবাদপত্রের মূল্যবৃদ্ধি

বর্ত্তমান নভেম্বরের ২৮এ তারিখ হইতে ইংলণ্ডের টাইমস প্রভৃতি সমুদয় দৈনিক পত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইবে; কারণ, কাগজের মূল্য বৃদ্ধি জন্য পূর্ব্বের মূল্যে সংবাদপত্র দেওয়া চলিতে পারে না। আমরা এদেশে কাগজ ও অর্থ সকল বিষয়েরই মূল্য-বৃদ্ধি-হেতু দাঁড়াইয়া মরিতেছি। তাহার পর, এই মারাত্মক ক্ষতি সহ্য করিয়াও যে সাদা কাগজে "পত্রিকা" বরাবর বাহির করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যে ব্লীচিং পাউডার বা সাদা করিবার গুঁড়া দ্বারা কাগজের বর্ণ সাদা করা হইত, তাহা প্রধানতঃ সুইডেন হইতে আসিত; কিন্তু কি বিবাদ হওয়ায় সুইডেন তাহা ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দেশ হইতে ঐ গুঁড়া যাহা ইংলণ্ডে আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশ যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতের জন্য গভর্ণমেণ্ট লইতেছেন; অবশিষ্ট অতি যৎসামান্য ইংলণ্ডের বাজারে যাইতেছে। তাহাতে সেখানকার কাগজের একাংশের জন্যও কুলাইবে না, ভারতে আসিবে কিরূপে? এজন্য ইংলণ্ড হইতে ভারত-সেক্রেটারী ভারত গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আগামী বৎসর রেলওয়ে ও সমস্ত সরকারী আফিসে সাদা কাগজের যতদূর সম্ভব কম খরচ করিয়া যেন বাদামী কাগজে সমস্ত কার্য্য চালান হয়। সুতরাং আমাদের বিশ্বব্যাপী গভর্ণমেণ্টই যখন বাধ্য হইয়া বাদামী কাগজ ব্যবহার করিতে চলিলেন, তখন কীটানুকীট আমাদের উহা ব্যবহার বিনা যে অন্য পথ নাই, তাহা বলা বাহুল্য। সংযোগী সঞ্জীবনী ত এখন হইতে বাদামী কাগজ ব্যবহার করিতেছেন—সময়।

পুস্তক পরিচয়

চীবর

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত, মূল্য এক টাকা চারি আনা।

বইখানির নাম 'চীবর' অর্থাৎ চীর, কিন্তু বাহিরে দেখিয়া তাহা মনে হইল না। কারণ, মলাটটি অতি উত্তম রঙ্গিন সিল্কে আবৃত; আবার ভিতরে পড়িয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাতেও ইহা যে "জননী বঙ্গভাষার জন্য কবিতার চীবর" মাত্র, তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না—বরং ইহাকে একটি লোভনীয় 'মহার্ঘ বসন' বলিয়াই মনে হইল।

কবি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার পাঠক-সমাজের নিকট অপরিচিত নহেন। প্রথমতঃ তিনি দীনবন্ধু বাবুর সুযোগ্য পুত্র; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার 'আকিঞ্চন' নামক কাব্যগ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে একজন সহৃদয় কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পড়িয়াও আমরা সবিশেষ প্রীত হইয়াছি। 'আকিঞ্চনে' যে রস অবতারণার পরিচয় পাওয়া যায়, এ কাব্যগ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

বঙ্কিমবাবুর কবিতা আজকালকার ফ্যাসন্ অনুযায়ী শুধু শব্দ-পরিপূর্ণ, জটিল কাব্যসমূহের অন্তর্গত নহে। ইহাতে কথার জিমন্যাষ্টিক্ নাই,—শুধু শ্রুতির অনুরোধে এক লাইনে ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য প্রভৃতি যুক্তাক্ষরগুলি ঢুকাইয়া ছন্দ নাচাইবার চেষ্টা নাই। হয় তো ইহাতে দু'একজন নব্য সম্প্রদায়ের লোক যথেষ্ট মনস্তুষ্টি লাভ না করিতে পারেন, কিন্তু যে বাঙ্গালী কাশীরাম কৃত্তিবাস পড়িয়া মুগ্ধ হ'ন,

যাঁহার হৃদয়াবেগ 'সুরধুনী' কাব্যের তরল প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, নবীনচন্দ্রের ললিত ছন্দ যাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, তিনি বঙ্কিম বাবুর কবিতাপাঠে প্রীতিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

কারণ, বঙ্কিমবাবুর কবিতায় একটি জিনিষ আছে, যাহা আজকালকার কবিদিগের মধ্যে দুর্লভ—সেটি আন্তরিকতা। বঙ্কিমবাবু হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি অনুভব করিয়াছেন, সেইজন্যই তাঁহার কবিতাগুলি অপূর্ব্ব ভক্তিরসে উছলিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ছন্দ 'লাফাইতেছে' না বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, বঙ্কিমবাবুর কবিতা ভাবদ্যোতক হইলেও সুশ্রাব্য হয় নাই। বস্তুতঃ, তাঁহার শব্দসম্পদ্ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, অপিচ, মধুরধ্বনি ও সুমোহন প্রসাদগুণে তাহা অতিশয় শ্রুতিমধুর হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যে কোন পৃষ্ঠা খুলিলেই পাওয়া যাইবে। আমরা 'যমুনা' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটীর মাত্র ৪ লাইন তুলিয়া দিলাম—

"কাল জলরাশি, কালতটে আসি
খুঁজিছে কি সেই কাল রূপরাশি?
আকুলি 'ব্যাকুলি' উঠিছে উথলি
শুনিতে কি তার সুমোহন বাঁশী?"

আবার ১০১ পৃষ্ঠার শেষ দুই স্তবক—

"নীরদ নীলিম বারি
নীপবন সারি সারি
নীলাম্বর তলে সবে মিলে আছে নীলিমায়।
এইখানে নিশিদিন
এ নীলে হইয়া লীন
মধুময় হ'য়ে র'ব এ মধুর মহিমায়।"

এইরূপ সর্ব্বত্র। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই কয় পংক্তিতে একটি ভাবও দুর্ব্বোধ্য নয়, মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের মত তাহারা আপনা হইতেই মানস-গগনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

মূল কথা, বঙ্কিমবাবু পুরাতন দলের কবি। তাঁহার সাময়িক ও ফরমাসী কবিতাগুলি দেখুন। 'অর্চ্চনা', 'প্রবাহিনী', 'সঙ্কল্প', 'সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন' 'সমর মঙ্গল', 'কৃষ্ণনগর', 'দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি' প্রভৃতি সকল সাময়িক কবিতাগুলিই সুপাঠ্য। এরূপ কবিতা ঈশ্বরগুপ্ত অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। এরূপ কবিতা হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাবলীতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি ফরমাসী হইলেও কষ্টকল্পিত নহে—এগুলিও নহে। নমুনা স্বরূপ 'অর্চ্চনা' কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"এ জীবন হোক্ চির অর্চ্চনা তোমার,
প্রতি কর্ম্ম হোক্ তব পূজা-উপচার,
এ প্রতি নিশ্বাসে তব হোমাগ্নি জ্বলুক,
সকল সম্ভোগ সেথা আহুতি পড়ুক,
এক পলকে এই নয়নে আমার
প্রকাশ হউক দীপ তব বন্দনার"— ইত্যাদি।

কবিত্বশক্তি না থাকিলে মাত্র ফরমাসে এ সকল উচ্চভাব বাহির হয় না।

এইবার গ্রন্থকারের ভক্তিরসাশ্রিত কবিতাগুলির পরিচয় দিব। 'ধ্রুব' শীর্ষক বিস্তৃত পদ্যটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি—এমন কি স্থলে স্থলে অশ্রুসংবরণ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। চৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় সমস্ত কবিতাগুলিই সুমধুর ও ভক্তিরসাপ্লুত। গৌরাঙ্গের বর্ণনা দেখুন—

"সে যে প্রাণ পেতে দিয়ে
প্রাণ-ভিক্ষা মেগে নিয়ে
চ'লে যায় পথে পথে সবার দুয়ার দিয়া,
সকলের দেওয়া প্রাণে ভিক্ষাপাত্র পুরাইয়া।
সে যে ক্ষমা, সে যে স্নেহ,
পতিতের নিত্য গেহ,
অপাপ হৃদয়খানি পাপীকে ছাড়িয়া দেয়,
আপনাকে ফেলে দিয়ে পরকে কুড়ায়ে লয়।
সে যে কেঁদে কেঁদে ধায়,
কাঁদাইয়া চলে যায়,
সে যে হরিনাম দিয়ে ডেকে আনে হরিনাম
সে যে নামে চিররুচি, জীবে দয়া অবিরাম।"
"সে যে হরিনাম দিয়ে ডেকে আনে হরিনাম"

—কি সুন্দর বর্ণনা! আন্তরিকতা না থাকিলে কি এরূপ ভক্তির প্রস্রবণ বহিতে পারে? আর একটি কবিতায় বলিতেছেন—

"তোমার প্রমাণ হরি! আমার এ পাপভার'
তোমার প্রমাণ হরি! এ দুখের পারাবার,
নহিলে কে বল আর
নামাইবে সেই ভার?
এ দুস্তর পারাবারে কে আনিবে তরী তার?
তোমার প্রমাণ হরি! এ দুঃখের পারাবার॥

কয়জনের এরূপ হরিভক্তি আছে?

"আমি" "তুমি" প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কবিতা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেগুলিও উপরিধৃত পদ্যনিচয়ের ন্যায় সরল ও মর্ম্মস্পর্শী। 'তুমি' কবিতার প্রথমেই—

"ক্ষুদ্র বেলাভূমি পরে সিন্ধুর বিস্তৃতি প্রায়
'আমার' গণ্ডীর পারে কি অনন্ত দেখা যায়।"

কি সুন্দর ব্যঞ্জনা। আবার...

"এ ভূমায় ভাসিতেছ
'আমি' হ'য়ে আসিতেছ
আপনি অস্ফুট তুমি, আমাতেই ফুটিতেছ.
ব্রহ্মাণ্ডে আঁটে না যাহা, অণুতে তা রাখিতেছ?"

এরূপ অল্প অথচ সরল কথায় সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রায়ই দেখা যায় না।

বঙ্কিমবাবুর বইয়ের সামান্যমাত্র পরিচয় উপরিউদ্ধৃত অংশগুলি হইতে পাওয়া যাইবে। ফলতঃ সমস্ত গ্রন্থই ঐরূপ মধুর, পবিত্র ও সংযতভাবে পরিপূর্ণ। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"এ হীন সেবকে কৃতার্থ কর মা
তার জীবনের চির সেবা ল'য়ে"

আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এ প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।

বীরভূম বিবরণ

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় সম্পাদিত ; মূল্য দুই টাকা মাত্র।

বীরভূম হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির প্রাণস্বরূপ; তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের অনুসন্ধানের ফলে বীরভূমের অনেক পুরাতত্ত্ব-উদ্ধার হইয়াছে। তাহারই কিয়দংশ লইয়া এই প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে হেতমপুর-কাহিনীই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত ভদ্রপুর-কাহিনী, সুপুর-কাহিনী, ভাণ্ডীরবন-কাহিনী, বক্রেশ্বর-কাহিনী, কেন্দুবিল্ব-কাহিনী প্রভৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। এ যাবৎ যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সমস্তই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বীরভূমের বিবরণ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বাহাদুরের চেষ্টা ও যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বীরভূম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইয়াছি। এই বিবরণ-পুস্তকে যে সমস্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পুস্তকের মূল্য আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির কার্য্যে সকলেরই উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য। এই সংস্করণে অনেক মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে ; ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শকুন্তলা

শ্রীসীতানাথ বসু ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত ; মূল্য বার আনা।

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের আখ্যানভাগ লইয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে. কিন্তু ইহা অনুবাদ নহে ; সম্পাদকদ্বয় মূল আখ্যানের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া ঠিক বাঙ্গালা ধরণে এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। এ উদ্যম এই নূতন এবং ইহা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। এই নাটকে যে কয়েকটি গান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লেখকের কবিত্বশক্তি ও রসবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই নাটকখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি ;—আমরাও পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের কথায় বলিতেছি—"এরূপ অপূর্ব্ব নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় দ্বারা বহুল প্রচার সহৃদয় মাত্রেরই প্রার্থনীয়।"

কনকচাঁপা

শ্রীনিষিকান্ত সেন প্রণীত, মূল্য আট আনা মাত্র।

এখানি বালকবালিকাদিগের জন্য লিখিত সুন্দর, সচিত্র উপদেশ-পূর্ণ পুস্তক। ছবিগুলি যেমন উৎকৃষ্ট, লেখাও তেমনি সরল। বালকেরা কেন, তাহাদের পিতামাতাও এই পুস্তকখানি দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে বালক বালিকাদিগের জন্য যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনখানি হইতেই এই কনকচাঁপা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

পুরীতীর্থ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত ; মূল্য এক টাকা

এই পুস্তকখানিতে উৎকলের পঞ্চতীর্থের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের লীলাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুরীতীর্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা প্রয়োজন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই ; তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে হইলে যে প্রকার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইতে হয়, লেখক শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ে তাহার অভাব দেখিলাম না। তাঁহার রচনাভঙ্গীও সুন্দর। এখন পুরীতীর্থ আমাদের ঘরের কাছে হইয়াছে, অনেকেই এই তীর্থে গমন করিতে ইচ্ছুক। এই পুস্তকখানি যদি তাঁহারা পাঠ করেন, তাহা হইলে পুরী-তীর্থে গমন করিয়া তাঁহারা কোন অসুবিধা ভোগ করিবেন না এবং কার্য্যেরও অনেক সাহায্য হইবে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়া প্রকৃত ভক্তের কার্য্যই করিয়াছেন।

কেদার-বদরী পরিক্রমা

শ্রীসন্তোষকুমার দাস প্রণীত ; মূল্য আট আনা।

এখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে; ইংরাজীতে যাহাকে guide বলে, এখানি তাহাই। কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের পথ ঘাট, তীর্থস্থান, হাটবাজার, খরচ-খরচা সমস্ত কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; তীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও প্রদত্ত হইয়াছে। এই ছোট পুস্তকখানি কেদার-বদরীর পথের যাত্রীদিগের বিশেষ কাজে লাগিবে ; মূল্যও অতি সামান্য—আট আনা মাত্র।

কর্ম্মফল

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত ; মূল্য এক টাকা।

এখানি উপন্যাস। লেখকের এই প্রথম উদ্যম ; প্রথম উদ্যমে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। পুস্তকখানির আখ্যানভাগ মন্দ নহে, লেখকের লিপিকুশলতাও আশাপ্রদ ; চরিত্র চিত্রাঙ্কনে স্থানে-স্থানে ত্রুটী থাকিলেও মোটের উপর গল্পটী জমিয়াছে। ভবিষ্যতে এই লেখক সিদ্ধকাম হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। পুস্তকে ত্রিবর্ণ চিত্রখানি না দিলে কোনই ক্ষতি হইত না।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন

(বাঁকীপুর)

আগামী বড়দিনের সময় বাঁকিপুরে যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন' হইবে, তাহাতে যাহারা সভাপতি, শাখা-সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল।
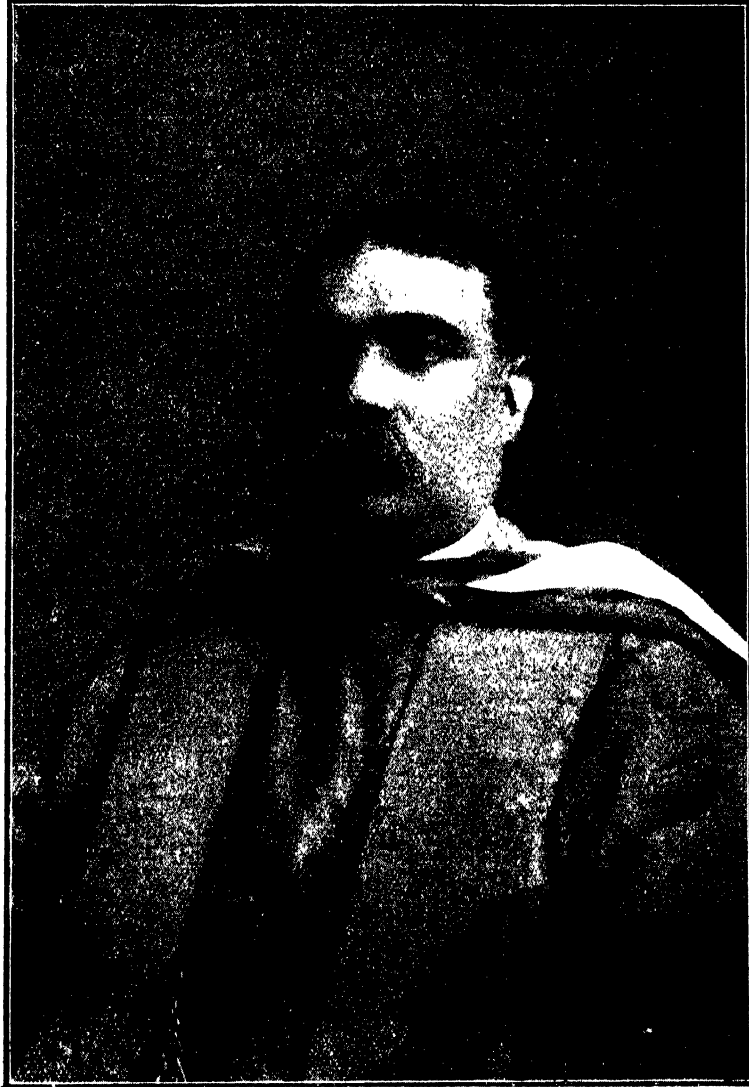
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী

(সম্মেলনের প্রধান সভাপতি)

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার
(সাহিত্য শাখার সভাপতি)

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম-এ,বি এল
(বিজ্ঞান শাখার সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কাব্যকণ্ঠ এম-এ,বি-এল
(দর্শন-শাখার সভাপতি)

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল
(ইতিহাস-শাখার সভাপতি)

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]
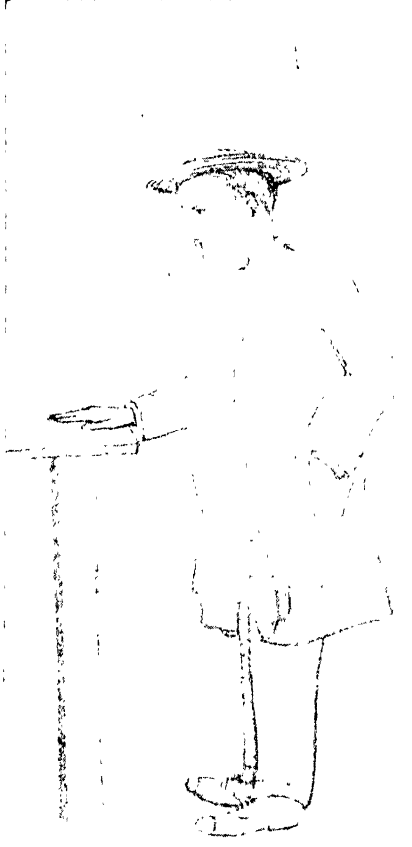
উকীল

সাক্ষীরে জেরা করিব, বাসনা —
অগ্নির কণা নয়নে ঝরে ;
হায় রে এদিকে না সরে ভারতী,
কণ্ঠ পিঁজরে গুমরি মরে।
তর্কেই যদি পাকা নই, যদি
বলিতে গেলেই পড়িব থেমে,—
তবে কেন হ'নু বি-এল ? কারণ,—
পাশ করেছিনু বি-এ ও এম্-এ।

ব্যারিষ্টার

তেত্রিশ কোটী আছেন দেবতা,
থাকুন স্বর্গ উজল কোরে ;
তেত্রিশ ছেড়ে ছত্রিশ থাক্,
আমি ত সবারে চাইনি ওরে !
আমি চেয়েছিনু অচলা লক্ষ্মী,
চেয়েছিনু কৃপা-কণিকা তাঁর ;
লক্ষ্মীর লাগি গৃহ তেয়াগিনু,
হইনু সুদূর সাগর পার ;
হায়, রে ভাগ্য ! কোথায় কমলা,
কনকপুঞ্জ শিখর চূড়ে ?
অনিমন্ত্রিত সুপ্তি-দেবতা
উড়ে এসে বসে চেতনা জুড়ে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

মানসী ও মর্ম্মবাণী—কার্ত্তিক, ১৩২৩

১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ—এই রচনাটির মাথার উপরে বড়-বড় অক্ষরে 'বিবরণ' কথাটা লেখা আছে, তাই রক্ষা;—নহিলে ইহা পড়িয়া ইহাকে বিবরণ বলিয়া বুঝিবার বা জানিবার আর কোনও উপায় নাই। বিবরণের অর্থ ব্যাখ্যান বা বর্ণন।—এ অর্থ গ্রাহ্য করিলে বলিতেই হইবে, রচনাটির নামকরণ একটুও ঠিক হয় নাই। বিবরণ মনে করিয়া যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই সে রসে বঞ্চিত হইবেন। আর, তালিকা হিসাবেও যে এ লেখা সার্থক হইয়াছে, এমনও মনে করি না। যিনি তালিকা মনে করিয়া ইহা পড়িবেন, তিনিও নিরাশ হইবেন। কেন না, ১৩২২ সালে প্রকাশিত অনেক পুস্তকেরই নাম এই রচনা-মধ্যে আদৌ সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বেশী কথা বলিব কি, ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত "মীন-চেতনের" মতন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থেরও নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত ইহাতে দেখিলাম না। কেবল এইটুকু নহে,—এই অসম্পূর্ণতাই ইহার একমাত্র দোষ নহে। অন্যান্য ত্রুটী চিহ্নেও ইহার সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। ১৩২০ সালে প্রকাশিত "৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ" নামে একখানি অনুবাদিত উপন্যাস—যাহাকে ইতঃপূর্ব্বে এই লেখকই একবার 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন—সেই গ্রন্থখানিকে এবার তিনি ১৩২২ সালের পুস্তক বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন! ভ্রম-সংশোধনের এমন চমৎকার নিদর্শন আর কোথাও কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! এই সকল কারণেই বলিতেছিলাম, ইহা বিবরণও হয় নাই—তালিকাও হয় নাই। ইহা হইয়াছে—লেখকের মনগড়া কতকগুলা কথার একটা জগাখিচুড়ি-বিশেষ! লেখক কতকগুলা বহির নাম লইয়া যেন 'লটেরী' খেলা করিয়াছেন! ভাল, মন্দ, এবং না-ভাল-না-মন্দ, এই তিন রকম মন্তব্য লইয়া নিজ-খেয়ালমত তিনি বহুবিধ পুস্তকের উপরেই তাহা বর্ষণ করিয়াছেন! ফলে, "মানে-মানে" ও "রাতডুপুরের" মত 'রাবিশের' ভাগ্যে ভাল সার্টিফিকেট পড়িয়াছে, এবং ক্ষীরোদ বাবুর 'নিবেদিতা' ও 'বাদশাজাদীর' ভাগ্যে মন্দ সার্টিফিকেট পড়িয়াছে! প্রথম দুইখানি পুস্তক লেখকের মতে কেন ভাল, এবং শেষোক্ত পুস্তক দুইখানিই বা কেন মন্দ, তাহার কোন কারণ তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। লেখক সম্ভবতঃ নিজের উক্তিকে আপ্তবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করেন!

নিজের উক্তিকে লেখক যাহাই মনে করুন, পাঠকদের কিন্তু ধারণা অন্যরূপ। তিনি যখন ইতঃপূর্ব্বে একবার "৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ" নামক উপন্যাসকে 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন অনেকেই তাহা পড়িয়া হাসিয়াছিল;—তখন হইতে অনেকেরই বিশ্বাস যে, তিনি পুস্তকের মলাট বা বিজ্ঞাপন দেখিয়াই পুস্তক আলোচনা করিয়া থাকেন। এরূপ বিশ্বাস করাটা পাঠকদের পক্ষে অন্যায় বা অসঙ্গত হইয়াছে, এমনও মনে হয় না। কারণ, এ লেখাটিতেও তাঁহার, না পড়িয়া মন্তব্য প্রকাশের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে তাহার একটা নমুনা দিতেছি। লেখক 'কণ্ঠহার' নামক একখানি নাটককে 'ডিটেক্‌টিভ্ আখ্যানমূলক নাটক' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মনে হয়, এ তত্ত্বটুকু তিনি থিয়েটারের 'প্লাকার্ড' হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। কারণ, যে সমঝদারের এ গ্রন্থ পড়া আছে, তিনি ইহাকে গার্হস্থ্য-প্রধান না বলিয়া কিছুতেই 'ডিটেক্‌টিভ আখ্যানমূলক নাটক' বলিতে পারেন না। কোনও পুস্তকে ডিটেক্‌টিভের চরিত্র থাকিলেই তাহাকে 'ডিটেক্‌টিভ আখ্যানমূলক' বলিতে হইবে, এমন কোনও আইন নাই। 'Les Miserables'এ সুন্দর এক ডিটেক্‌টিভের চরিত্র আছে; কিন্তু তা' বলিয়া এমন কে আছে যে, সে গ্রন্থকে 'ডিটেক্‌টিভ আখ্যানমূলক উপন্যাস' বলিতে অগ্রসর হইবে?

লেখককে এইখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তিনি 'বাসিফুল' 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' 'পুরাণ-কথা' ও 'মীনচেতন' প্রভৃতি যে সকল সুলিখিত গ্রন্থের নামোল্লেখটুকু পর্য্যন্ত করেন নাই, তাহাদের দশা কি হইবে? তিনি ভাল, মন্দ, এবং না-ভাল-না-মন্দ—এই তিন রকম শ্রেণী-বিভাগ করিয়া অনেক গ্রন্থেরই সদ্গতি করিয়াছেন; কিন্তু বাকী বহি বেচারীরা কোথায় গিয়া আশ্রয়লাভ করিবে? স্বর্গে, মর্ত্ত্যে কিংবা পাতালে কোথাও কি তাহারা স্থান পাইবার যোগ্য নহে? ত্রিশঙ্কুর মতন কি তাহারা তবে শুধু শূন্যে ঝুলিয়াই জীবন কাটাইবে?

লেখক বলিতেছেন,—"বঙ্কিমের মত, অক্ষয় সরকারের মত নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও কঠোর সত্যসন্ধ সমালোচনার সময় ও প্রয়োজন আসিয়াছে।"—এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই মন্তব্যের সঙ্গে-সঙ্গে লেখক যে 'নির্ভীক ও কঠোর সমালোচনা'র পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিদ্রূপেরই উদ্রেক করে। প্রবন্ধের একদিকে তিনি জানাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের বর্ত্তমান গল্প ও উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে তিনি "নিজের কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ।", অন্যদিকে, ক্ষীরোদ বাবুর বেলায় তিনি বলিতেছেন,—"বাদশাজাদী তাঁহার লেখনীর উপযোগী হয় নাই।...'নিবেদিতা' তাঁহার

বিশিষ্টতা বা কৃতিত্বের পরিচয় অতি অল্পই দিয়াছে। উপন্যাসখানি টানিয়া-বুনিয়া বাড়ান হইয়াছে।"—ক্ষীরোদ বাবুর বেলায় লেখক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর বেলায় তিনি একান্ত বিনয়ী! একের সময় তিনি খাঁটি ক্ষত্রিয়, অন্যের সময় তিনি গোঁড়া বৈষ্ণব! 'সত্যসন্ধ সমালোচনা'র এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না!

শুধু নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা নহে। এ প্রবন্ধমধ্যে এমন স্থানও আছে, যেখানে নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে-সঙ্গে লেখকের সূক্ষ্ম-দর্শিতাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটোরাধিপতির 'শ্রুতি-স্মৃতি' এবং এক লেখিকার 'উল্কা' গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখক যে দুইটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দুইটি মত যিনি একত্রে মিলাইয়া পড়িবেন, তিনিই আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। 'শ্রুতি-স্মৃতি'র ভাষা লেখকের নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে "আড়ম্বরশূন্য, সরল" বলিয়া বোধ হইয়াছে। আর 'উল্কা'র ভাষা সম্বন্ধে তিনি নির্ভীকভাবে বলিতেছেন,—"উল্কা'র গল্পের রচনায় সমাসবহুল বাক্যাবলী ব্যবহারের প্রলোভন লেখিকা সংবরণ করিতে পারেন নাই। এরূপ রচনা সীতার বনবাসের যুগে মানাইত, আজ-কাল কি শোভন হইবে?"—কিন্তু প্রত্যক্ষ-দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত বলিতেছে,—'উল্কা'র ভাষা যতই সমাস-বহুল হউক, 'শ্রুতি-স্মৃতি'র ভাষা তাহার চেয়ে সমাস-বহুল এবং সংস্কৃত ঘেঁষা।—সে ভাষার নিকট 'সীতার বনবাসে'র ভাষাকেও অনেক সময় মাথা হেঁট করিতে হয়। কিন্তু লেখক এমন সহজ সত্য কথাটার মূলে কেন যে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

এই ত প্রবন্ধের দশা! কিন্তু লেখকের বিশ্বাস যে, এই প্রসঙ্গে "সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে গতি লক্ষ্য করিয়া যা' দু'চারি কথা তিনি বলেন, তাহাতে সাহিত্যের উপর একটা পরোক্ষ ফল ফলে।"—লেখকের এই কথা শুনিয়া রাগ হয় না,—বরং হাসি পায়! বুঝি একটু দুঃখও হয়। মনে পড়ে, হাম্ পদ্ম রায়ে'র গল্প।

লেখক নানাবিধ পুস্তক সম্বন্ধে নানাবিধ মতামত প্রদান করিয়াছেন।—সে সমস্ত মতামত ওজন করিয়া দেখিবার আমাদের অবসর নাই; এবং তাঁহার ন্যায় সকল গ্রন্থই যে পড়িয়াছি, এমন স্পর্দ্ধাও আমরা রাখি না। তবে শরৎ বাবুর উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সকল অন্যায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। শরৎ বাবুর লেখা এখন বাঙ্গালার পাঠক-সমাজে সুপরিচিত, সমাদৃত।—সে লেখার অযথা সমালোচনা উপেক্ষা করাটা উচিত মনে করি না।

তাঁহার প্রথম নম্বরের মন্তব্য এই—"'মেজদিদি' গল্পটি তাঁহারই (শরৎ বাবুর) 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'র হুবহু অনুকরণ।"—ছাপার অক্ষরে এমন মন্তব্য যে কখনও বাহির হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। লেখক বোধ করি, তিনটি গল্পেই একটি করিয়া ছেলে ও একটি স্নেহশীলা রমণী দেখিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন! বঙ্কিম বাবুর আয়েষা, মতিবিবি, রোহিনী, কুন্দ প্রভৃতি রমণীগণ অপরের প্রণয়ীকে ভালবাসিয়াছিল, সুতরাং স্থির করিতে হইবে, বঙ্কিমবাবু কি ভয়ানক লোক,—কেবলই নিজের অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন! ঘটনার বিভিন্নতা বুঝিব না, উদ্দেশ্যের পার্থক্য দেখিব না, চরিত্রগত বিশেষত্ব লক্ষ্য করিব না,—শুধু নাম দেখিয়াই একটিকে অন্যের হুবহু অনুকরণ বলিয়া ঘোষণা করিব, এরূপ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় এই বাঙ্গালা দেশেই দেখিতে পাই। 'রামের সুমতি' গল্পে রাম ক্রমক্রমে তাহার স্নেহের পাত্রীকে পেয়ারা ছুড়িয়া মারিয়া—নিজের কপালে একশো-বার ঠুকিয়া ঠুকিয়া দেখিতেছে, তাহাতে কতখানি ব্যথা লাগিতে পারে; এ চিত্র অনিন্দ্যসুন্দর। আবার 'মেজদিদি' গল্পে কেষ্ট সমস্ত উৎপীড়ন স্বীকার করিয়াও নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত দুপুরটা ঘুরিয়া তাহার মেজদিদিকে গোটাদুই কাঁচা পেয়ারা আনিয়া দিল,—এ চিত্রেরও চমৎকারিত্ব বলিয়া বুঝানো যায় না। কিন্তু যত গণ্ডগোল ঐখানেই! লেখক হয় ত বলিবেন, যখন দুই জায়গাতেই পেয়ারার কথা আছে, তখন নিশ্চয়ই একটি আর একটির হুবহু অনুকরণ! শরৎবাবুর যদি originality থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এবার পেয়ারার পরিবর্ত্তে আমড়ার আমদানী করিতেন! যাহা হৌক, 'মেজদিদি' গল্পের বিশেষত্ব কি, তাহা যিনি রবিবাবুর "স্ত্রীর পত্র" পড়িয়াছেন, তিনি অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। 'মেজদিদি'—'স্ত্রীর পত্রে'রই পাল্টা জবাব। গল্পের আর্টকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোনও কিছুর জবাব দেওয়া অসাধারণ শিল্পীর কাজ। 'মেজদিদি'তে শরৎ বাবু সেই শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। তর্কের তুফানে গল্পের গতি কোথাও একটুও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে গল্পের আখ্যান-বস্তু পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি এ গল্পকে "বিন্দুর ছেলের" অনুকরণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে সাহিত্যালোচনার পরিবর্ত্তে 'মাসপঞ্জী' লেখাই যুক্তিসঙ্গত।

লেখকের দ্বিতীয় মন্তব্য হইতেছে—"'দর্পচূর্ণ' গল্পটির প্রথমাংশ বেশ সুন্দর, শেষটা লেখক বড়ই তাড়াতাড়ি করিয়া সারিয়াছেন।"—লেখক ক্ষমা করিবেন, তাঁহার রসানুভূতির এখানেও আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। 'দর্পচূর্ণ' গল্পটি ঠিক একটি নিটোল মুক্তার মত। গল্পের বিষয়টি নিতান্ত সামান্য নহে,—আজকালকার মস্ত একটা সমস্যা—Rights of Women। এই abstract, অশ্ব-ডিম্বের ন্যায় নিরাকার Rights of Women অপেক্ষা আমাদের ঘরের নারী-জাতির স্বভাবজাত, জন্মগত কর্ত্তৃত্ব যে কত উচ্চ, কত শান্তিময়, তাহাই লেখক অদ্ভুত artএর সহিত প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এদেশের আধুনিক কোনও গল্প যদি পাশ্চাত্য-ভাষায় অনুবাদিত করিয়া দেখাইবার থাকে, তাহা হইলে সে এই 'দর্পচূর্ণ'। বঙ্গনারীর তথাকথিত হীনতার ও দাসীত্বের এমন সুন্দর উত্তর গল্পা-কারে প্রকাশিত হইতে আর দেখি নাই। ইন্দুর পরিবর্ত্তন যে আকস্মিক বা অস্বাভাবিক নহে, তাহা গল্পটি একটু মন দিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার স্বামীর অসুখ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা বা ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার যে ধাপে-ধাপে দর্পহরণের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। লজ্জা-শীলা, ছোট বউটির স্বামীর প্রতি কর্ত্তৃত্বসূচক নিষেধ, বিমলাকে

নরেন্দ্রের গ্রন্থোৎসর্গ, পাশের ঘরে ভগিনীপতির আগমনজনিত উল্লাস, আর সর্ব্বশেষে নরেন্দ্রের কারাবাস,—এ সমস্ত ঘটনাই ইন্দুর দর্পহরণের চিত্র ফুটাইবার জন্য অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত সাজানো হইয়াছে। ইহাতেও যিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বলিবেন, গ্রন্থের শেষটা বড়ই তাড়াতাড়ি হইয়াছে, তিনি কাব্য পড়িবার 'যোগ্য অধিকারী' নহেন। গিরিশচন্দ্র একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী শ্রোতাকে কোনও কিছু বুঝাইতে হইলে, এক কথার জায়গায় দশটা কথা বলিতে হয়। কিন্তু তিনি আজ জীবিত থাকিয়া এই রচনা পড়িলে বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার অনুমান ঠিক নহে! এ দেশে এমন লোকও আছে, যাহার কাছে একশত কথাতেও একটা ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে না!

লেখকের তৃতীয় নম্বরের মন্তব্য—"'আঁধারে আলো' গল্পটির উপসংহার ভাগ উজ্জ্বল; গোড়ার অংশটি জঘন্য রুচির পরিচায়ক।"—কিন্তু যৎসামান্য বুদ্ধি খরচ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, গল্পের গোড়ার অংশের আঁধারটুকু না থাকিলে, উপসংহারভাগ অত উজ্জ্বল হইত না। গোড়ার অংশটুকু উপন্যাসের উৎকর্ষতার পক্ষে সহায়তাই করিয়াছে। যিনি এ কথা হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তিনি রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতাটি পাঠ করিবেন। এ দুইটি রচনারই মূল বিষয় এক,—শুধু অঙ্কন প্রণালী বিভিন্ন। কাব্য গ্রন্থে বারাঙ্গনার নাম শুনিলেই চটিতে হইবে, এমন কোনও কারণ দেখি না। তাহা হইলে, 'বিল্বমঙ্গলে'র মত অপূর্ব্ব নাটককেও জঘন্য রুচির পরিচায়ক' বলিয়া 'বয়কট' করিতে হয়। 'আঁধারে আলো'র নায়ক-চরিত্র—আদর্শ-চরিত্র। সে চরিত্র মাহাত্ম্য যে ভাবে সমস্ত জঞ্জাল ছাড়াইয়া আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিবার মতন সামগ্রী। সে চরিত্র এত পবিত্র যে, তাহার ছায়ামাত্র দেখিয়া এক চপল-স্বভাবা বারনারীও তাহার সমস্ত কলঙ্ক চিরদিনের মত মুছিয়া ফেলিল! কিন্তু হায়, এ লেখকের দৃষ্টি শুধু সেই নীচের জঞ্জালের দিকেই নিবদ্ধ হইয়া আছে!

লেখকের চতুর্থ অনুযোগ এই—"তাঁহার 'রমা'-চরিত্রে 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুকেই আর এক ভাবে দেখি।"—যদি আর এক ভাবেই দেখিলেন, তবে সাদৃশ্য আছে বলিয়া দুঃখ কেন? রমা ও বিন্দুর জীবনধারা, চিন্তা-প্রণালী ও হৃদয়ের ভাব সমস্তই বিভিন্ন। কিন্তু তবু এই সকল বিভিন্নতার অন্তরাল হইতেও লেখক আসল একত্বটুকু আবিষ্কার করিয়াছেন!—কত আর বলিব! আশ্চর্য্যের কথা এই, এমন ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ লেখাও সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়াছিল! আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যিনি প্রতিবর্ষে এইরূপ 'বিবরণ' পাঠ করিয়া নিজের সাহিত্যজ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারই উপর এখনও ঐ ভার দিয়া সাহিত্য-পরিষদ নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন!

এ লেখার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, লেখক সব-জান্তা। 'শিলিমপুরের পাষাণ-প্রশস্তি' হইতে 'বাক্‌লার ইতিহাস' পর্য্যন্ত, 'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' হইতে 'জঙ্গিপুরের গ্রাম্য-শব্দ' পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই লেখক কিছু-না-কিছু বলিয়াছেন! ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, কাব্য, নাটক ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেই তিনি অম্লানবদনে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি বাছিয়া দিয়াছেন! রুষ, ফরাসী, জর্ম্মান, সুইডিস্ ও নরউইজিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি কিছু-কিছু বোল ছাড়িয়াছেন! দেখিয়া-শুনিয়া—অধিক আর কি বলিব, শুধু অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি—

"That one small head could carry all he knew."

সুবর্ণবণিক-সমাচার—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

সুবর্ণবণিক-জাতির বর্ণনির্ণয়—

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, এম্-এ এই প্রবন্ধটি লিখিতেছেন। প্রবন্ধের প্রথম প্যারাতেই তিনি সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—"যে চেষ্টা সত্যের উপর—ঋতের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে। সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন যেখানে, সেইখানেই সিদ্ধি মূর্ত্তিময়ী হইয়া প্রকাশিত হয়।"—বলা বাহুল্য, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু বলিতে বড়ই লজ্জা বোধ হয়, যাঁহার কলম হইতে সত্যের ঐ গুণগানটুকু বাহির হইয়াছে, তিনিই এই প্রবন্ধ-মধ্যে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন!—পরের জিনিষ না বলিয়া লইয়া নিজের প্রবন্ধের অঙ্গ পুষ্ট করিয়াছেন।

মনে পড়ে, গত বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে এই 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠাতেই এই বিমলাচরণ বাবু রাধাকুমুদ বাবুর 'Indian Shipping' গ্রন্থের আলোচনা-কল্পে বলিয়াছিলেন,—"রাধাকুমুদ বাবু অপর যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার প্রায় অধিকাংশ উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থে সেইগুলির নামোল্লেখ না থাকায় আমরা দুঃখিত।"—কে জানিত, এই দুঃখ আজ আমাদের আবার এই লেখকের জন্যই করিতে হইবে! তাঁহারই ভাষা ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া আজ অনায়াসে বলিতে পারি, 'Macdonell ও Keith সাহেবদ্বয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Vedic Index of Names and Subjects' হইতে তিনি অনেক স্থানই ছত্রের পর ছত্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, সেই পুণ্যশ্লোক লেখকদ্বয়ের বহুপরিশ্রমলব্ধ পাদটীকাগুলিও গ্রহণ করিয়া নিজের প্রবন্ধের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। অথচ কোথাও একবারও সেই লেখকদের নাম উল্লেখ করিবার অবসর পান নাই।

আমরা নিম্নে 'Vedic Index' ও বিমলাচরণ বাবুর প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি মূল ও অনুবাদের পাঠোদ্ধার করিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, বিমলাচরণ বাবু অনুবাদে কিরূপ সিদ্ধহস্ত!

'Vedic Index' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫২ পৃষ্ঠায় আছে—

'The most regular names are Brahmana, Rajanya, Vaisya, and Sudra (Rigveda. X. 90. Taittiriya Samhita vii. 1, i, 4 5; Aitareya Brahmana, Vii. 19, 1; Satapatha Brahmana, i, 1, 4, 12; iii. 1. 1, 10; v. 5, 4, 9; Panchavimsa Brahmana, vi. 1, 6—11.), or later Brahmana, Kshatriya, Vaisya, and Sudra. (Brihadaranyaka Upanishad, i. 2, 27; Madhyamdina

i. 4, 15 ; Satapatha Brahmana, vi, 4, 4, 13 ; xiii. 6, 2. 10 ; Vajasaneyi Samhita, xxx, 5) There are many other variants : Brahmana, Ksatra, Sudranyan ; Brahman. Rajanya, Sudra, Arya ; Brahman, Rajanya, Vaisya, Sudra ; Deva, Rajan. Sudra, Arya ; (Atharva Veda xix. 62, 1) and Brahman, Kshatra, Vis, and Sudra. (Brihadaranyaka Upanishad 1. 2, 13.). [In other cases the fourth class is represented by a special member.] Brahmana. Ksatriya, Vaisya and Chandala (Chandogya Upanishad v. 10, 7.).

বিমলাচরণবাবু তাঁহার প্রবন্ধে উল্লিখিত অংশের কেমন অনুবাদ করিয়াছেন দেখুন—"বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণের যে কয়টি নাম পাওয়া যায় আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম।

১। ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র (ঋগ্বেদ, ১০।৯০, তৈত্তিরীয় সংহিতা—৭, ১—১,৪।৫ ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৭।১৯,১ ; শতপথ ব্রাহ্মণে, ১—১, ৪,১২ ; ৬—১ ১।১০ ; ৫—৫ ৪ ৯ ; পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ৬—১।৬—১১।

২। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ আছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।২,২৭ মাধ্যন্দিন ১ ৪,১৫) ; শতপথ ব্রাহ্মণ ৬—৪।৪.১৩ ; ১৩-৬,২।১০ ; বাজসনেয়ী সংহিতা—৩০,৫)

৩। অন্যত্র বর্ণভেদ এইরূপ দেখা যায়—(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, শূদ্রাযৌ। (খ) ব্রাহ্মণ, রাজন্য, শূদ্র ও আর্য্য। (গ) ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র। (ঘ) দেব, রাজ, শূদ্র, আর্য্য (অথর্ব্ববেদ—১৯।৬২।১) (ঙ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বিশ্‌, শূদ্র (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।২।১৩) (চ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চণ্ডাল (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১০।৭)

পাদটীকা সমেত মূল—

Originally the prince could sacrifice for himself and the people, but the Rigveda itself shows cases, like those of Visvamitra and Vasishtha illustrating forcibly the power of the purohita, though at the same time the right of the noble to act as purohita is seen in the case of Devapi Arshtishena (Yaska, Nirukta ii. 10, explaining Rigveda x. 98.) * * * It has, however, been opposed by some scholars such as Haug (Brahma und die Brahmanem, 1871), Kern (Indische Theorien over de Standen Verdeeling 1871) Lwdwig (Translation of the Rigveda 3, 237—243), and more recently by Oldenberg (Religion des Veda, 373 et, seq.), and by Geldner (Vedische Studien 2. 46, n.) * * * by Pischel (Vedische studien 2. 218.), Geldner (Vedische Studien 3, 152), Hopkins (J. A. O. S. Vol 19, page 18.) and Macdonell (Sanskrit Literature. 145) --Vedic Index vol. II. Pages 249, 250.

পাদটীকা সমেত অনুবাদ—

"পূর্ব্বে রাজগণ নিজের জন্য তথা প্রজার জন্য যজ্ঞাদি করিতে পারিতেন, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে জোর করিয়া পৌরোহিত্যের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

* * * *

যাস্কের নিরুক্তে (২।১০), ১০।৯৮ ঋকের ব্যাখ্যায় লিখিত আছে যে 'দেবাপি আর্ষ্টিসেন' ব্রাহ্মণেতর জাতি হইয়া পৌরোহিত্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিলাতী পণ্ডিতগণের মধ্যে Martin Haug, (Brahma Und die Brahmanem 1871.) Kern (Indische Theorien over de Standen Verdeeling 1871.) Ludwig (Translation of the Rigveda) Oldenberg (Religion des Veda.) Geldner (Vedische Studien) পূর্ব্বমতের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে গুণ ও কর্ম্মদ্বারা অথবা গুণ এবং বংশদ্বারা এবং কখনও বা শুধু বংশদ্বারা বর্ণ স্থিরীকৃত হইত। যাঁহারা দেবাপি প্রভৃতির বর্ণদ্বারা স্থির করিতে চান যে, ইঁহাদের সময় জাতিভেদ ছিল না, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত মতের পোষণ করেন। এ সম্বন্ধে Pischel (Vedische Studien 2 146n') Geldner (Vedische Studien 3 152.) এবং Hopkins (J. A. O. S. Vol 19.) বিশেষ বিচারপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।"

'কপি' করিতে গিয়াও লেখক 'ফুটনোট' এক-আধটু গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হোক, প্রবন্ধের মধ্যে এখনও এমন স্থান অনেক আছে, যাহা এই Vedic Index গ্রন্থের 'Arya' ও 'Varna' নামক অংশ দুইটি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, অথচ তাহা আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। বাহুল্য ভয়ে সে সব আর উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা উক্ত ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম ভাগের ৬৪ ও ৬৫ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় ভাগের ২৪৭ ও ২৫৭ পৃষ্ঠা পড়িতে পারেন। পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, এই পাতা কয়খানির অনেকগুলি লাইনই "সুবর্ণ-বণিকজাতির বর্ণ-নির্ণয়" রচনা-মধ্যে বেমালুম ঢুকিয়া গিয়াছে। একের বহু পরিশ্রমের ফল, অন্যে বিনা আয়াসে ভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু সত্যকে ঠেকাইয়া রাখিবে কে?

রচনাটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আমাদের অনুরোধ, লেখক যেন বারান্তরে তাঁহার এই সমস্ত আত্মসাতের কথা যথাযথভাবে উল্লেখ করেন।*

* দেব-মন্দিরে পীরিতের কথা লইয়া দুর্গেশ-নন্দিনী উপলক্ষে গত কার্ত্তিক মাসের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' যে দুই চারি ছত্র লেখা হইয়াছিল, তাহা স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের কথা ; অনবধানতা বশতঃ (inverted coma) বন্ধনী-চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছিল। 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে'র লেখক গতমাসে তাহা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। আমরা তাহা পাঠকবর্গকে জানাইয়া ত্রুটি স্বীকার করিলাম।— সম্পাদক।

শব্দ-ব্রহ্ম

(চাটনি)

[শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়, বিদ্যানন্দ, বি-এ]

শব্দও যা, ব্রহ্মও তা। আদিতে কেবল শব্দ ছিল, সেই শব্দ আকাশে পরব্রহ্মের নিকট ছিল; এবং সেই শব্দই পর-ব্রহ্ম ছিল। ইহা বেদের বচন, এবং এই শব্দাত্মক ব্রহ্মের অপর নাম বেদ। নিম্নে শব্দ-মাহাত্ম্যের কএকটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

"গোলযোগ"। পণ্ডিত মহাশয় মস্ত এক বাজার-হিসাবের ঠিক দিতেছিলেন। চারিদিকে পাঠশালার বালকেরা চীৎকার করিয়া পাঠাভ্যাস করিতেছিল। এক-দল অবিরাম উচ্চরবে উচ্চারণ করিতেছিল, "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই।" তাহাদেরই সম্মুখে শিশুশিক্ষার অন্যদল ক্রমাগত, প্রত্যুত্তরেই যেন, তারস্বরে বিজ্ঞাপন করিতেছিল—"যত কয়, তত নয়।" এই কোলাহলে বৃদ্ধ পণ্ডিতের হিসাবে মনঃসংযোগ হইতেছিল না; তাঁহার ঠিকে ভুল হইতেছিল। মনোযোগের অভাবে ঠিকে কেবলই "গোল" বা শূন্য ০ যোগ হইতেছিল। অর্থাৎ ডান হাত হইতে ৪৯ কড়ার ১ কড়া না নামিয়া শূন্য নামিতেছিল, আর বাঁ হাতখানি স্মৃতির অভাবে শূন্য বা রিক্ত থাকিতেছিল। তাঁহার হিসাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় এত গোলযোগ কেন?" হিসাব হইতে মাথা না উঠাইয়াই পণ্ডিত ছাত্রদের প্রতি ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "চুপ চুপ, তোদের এত গোলযোগ কেন?" সেই অবধি ছেলেরা বুঝিল গোলযোগের অর্থ কোলাহল।

"এবং"। 'এবং' কথাটি সংস্কৃত মন্দির হইতে অভদ্রের বাংলায় প্রবেশ করিয়া জাতিধর্ম্ম খুইয়া বসিয়াছে। অক্ষয়-কুমার দত্তের পিতামহ মহাশয় রামায়ণ-প্রসঙ্গে লিখিয়া-ছিলেন, রাম বনে গিয়াছিল, এবং (এই প্রকার) লক্ষ্মণ গিয়াছিল। তাঁহার নাতিরা লিখিলেন রাম এবং লক্ষ্মণ বনে গিয়াছিল। ভুল হইল কি? না হে না; পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন এবমস্তু।

"কোর্টবাবু"। কোর্টে বাবুর সংখ্যা শত সহস্র। তার মধ্যে একজন বিশেষ চিহ্নিত। বাদ-প্রতিবাদ, বাক্‌বিতণ্ডা তাঁহাকে বেশী করিতে হয় না; উকীল ও মোক্তার দ্বারা কার্য্য সারিয়া থাকেন। ইঁহার লাভালাভের হারজিতে সমজ্ঞান, ইনি বিকারবিহীন; অপিচ হাকিমের সুবিচারের প্রতি বিশেষ আস্থাবান। ইনিই কোর্টের মধ্যে সকল বাবুর সেরা। এজন্য ইঁহার নাম "কোর্ট বাবু"।

"মুন্সেফি চৌকি ও বেঞ্চ"। কলেজে বিশিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপনা-জন্য chair স্থাপিত হইয়া থাকে। সুদূর মফঃস্বলে দেওয়ানি বিচারের সুবিধার জন্য মহকুমা হইতে কতগুলি চেয়ার বা চৌকি কোম্পানির আমলে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পুরাতন চৌকিগুলি এখনও বিদ্যমান—ভাঙ্গিয়া যায় নাই। পূর্ব্বে একাধিক হাকিমের জন্য দীর্ঘ বেঞ্চ দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য, এগুলি চেয়ারের ন্যায় হাতওয়ালা ও বেতের ছাউনি। রেলওয়ে ওয়েটিং-রুমে নমুনা দ্রষ্টব্য। বিলাতে ভোটের বিচারের প্রাবল্য, সুতরাং সেখানে বেঞ্চের আধিক্য। পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ সভ্যভাবে বেঞ্চে উপবেশন করেন। এখন হাকিমেরা বেঞ্চ পছন্দ করেন না, চেয়ার দেওয়া হয়।

"লাট সাহেব"। ইংরাজী আমলের প্রথমে বাবুরা সাধারণতঃ অনেক ইংরাজী শব্দে আকার দিয়া উচ্চারণ করিতেন। যেমন কলেজ স্থলে কালেজ, লর্ড স্থলে লার্ড। বড় বড় সাহেবেরা তোষামুদের কাছে সকলেই "মি-লার্ড" ছিলেন, পদ্মলোচনও মি-লার্ড বলিয়া গিয়াছিলেন। আসল লর্ডগণ ক্রমশঃ লাড হইতে লাট উপাধি লাভ করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "লাট সাহেবের" বন্দোবস্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের নাম লাটের খাজনা।

"পাট and jüte।" ইংরাজী জুট শব্দটার ভিতর পরব্রহ্ম কোথায় আছেন? পাটের আঁশগুলি সংহত-কেশ বা জটতুল্য। উড়িষ্যাদেশে পাটের নাম জ‍ুট। কোম্পানির আমলে এক সাহেব কর্ম্মচারী (ডাক্তার থক্সবরো) ১৭৯৫ সনে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার ওড়িয়া মালীর কাছে জ‍ুটের বিষয় অবগত হইয়া—উহার চাষ রপ্তানি দ্বারা বিস্তর লাভের কথা বিলাতে ডিরেক্টারদের জানান। ইংরাজী চিঠি-পত্রে জ‍ুট পরিশেষে Jute নাম ধারণ করে। বিস্ময়ের কারণ নাই, কারণ কালীক্ষেত্র হইতেই ক্যালকাটা নামের সৃষ্টি।

"হাওয়া-গাড়ী"। তখন মোটর গাড়ীর এদেশে নূতন আমদানী,—দেশী নামকরণ হয় নাই। সদর রাস্তার ধারে বারাণ্ডায় বসিয়া এক বাবু মুখের ভিতর একেবারে তিন-চারিটি পান গুঁজিয়া, একান্ত মনে মগজে তামাকের ধোঁয়া লাগাইতেছিলেন; অভিপ্রায়, ক্ষণকাল কন্যাদায় চিন্তা ধূম্রাবৃত করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখা। সহসা পেছনদিকে ধূলার ঝড় তুলিয়া বোঁ করিয়া এক মোটর গাড়ী চলিয়া গেল। নাবালক পুত্র এই অদৃষ্টপূর্ব্ব গাড়ী হাঁ করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এটার নাম কি?" বাবু ভাবিলেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাই তো ঘোড়া নাই, এঞ্জিন নাই—কিসে চলে! পেছনে ঝড়ো বাতাস, বোধ হয় হাওয়ায় ঠেলে নিচ্চে। তখন ছেলেকে বলিলেন, "হাওয়া-গাড়ী রে বাবা, হাওয়া-গাড়ী।" তদবধি ঐ নামকরণ।

"আচার"। আমের আচার, কুলের আচার প্রভৃতি নানা ফলের আচারের আস্বাদ কে না গ্রহণ করিয়াছেন? পূর্ব্ববঙ্গে যাহা কাসন্দ বা কাসন্দি—বর্দ্ধমান-বাঁকুড়ায় তাহাও শুধু "আচার" মাত্র। এগুলি কুলকামিনীগণ কুলাচার মতে অতি নিষ্ঠা ও শুচি সহকারে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আচারবর্জ্জিতা যে-সে স্ত্রীলোকের হাতে ইহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম নাই; করিলেও ভাল হয় না। এক পাড়ায় একাধিক সদাচারসম্পন্না প্রাচীনা বিধবা না থাকিলে, সেই একজনকেই বাড়ী-বাড়ী গিয়া "আচার" সম্পাদন করিতে হয়। এই সদাচার হইতে আচারের উৎপত্তি।

"ঠাকুর"। বাঙ্গালীরা অনার্য্য নহেন, তাহা সুনিশ্চিত। তবে কথা এই, 'ঠাকুর' এই অনার্য্য কথাটা কেন আমাদের মাথার মণি হইল। ব্রাহ্মণ, গুরুজন, এমন কি দেবদেবী—যাঁহারা প্রণম্য, সকলেই ঠাকুর বা ঠাকুরাণী। ইহার উৎপত্তি-স্থল এত দিনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা মুদ্রিত নয়নে জপের মালা ঠক্‌ঠকাতেন; খড়ম পায়ে—ঠক্ ঠক্ ঠক্কর শব্দে পদচারণা করিতেন। ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকে এইজন্য ঠক্কুর বলিত। ইহাই ঠাকুর শব্দের মূল। কিমধিকমিতি।

নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পৎ

শালিবাহন রাজপুরীর অবশেষ

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, বিএ]

পুরাতন শালিগ্রাম নদীয়া মুড়াগাছার প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। শালিগ্রামের নীচে পূর্ব্বে ভাগীরথী বাহিতা ছিলেন। এখনও 'কাল্‌সীর বিলে' ভাগীরথীর অবশেষ রহিয়াছে। গ্রামের অদূরে 'গুড়গুড়ে'র খাল ও 'বেলেদ' নামে জলাশয় দৃষ্ট হয়। শুনা যায় শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্যযাত্রার সময়ে শালিগ্রামের নিকট 'সাহেবতলা'র ঘাটে "ডিঙা" (জাহাজ) বাঁধেন। সদাগরের ডিঙার শিকল নাকি ঘাটে একটী গাছের গুঁড়িতে আট্‌কান হইয়াছিল। এ সময়ে বিষ্ণু মাঝি ঘাটে খেয়া দিত, শুনিলাম। (আমি কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে কোন বিষ্ণু মাঝির নাম পাই নাই।)

কথিত আছে, বহুকাল পূর্ব্বে শালিগ্রামে শালিবাহন নামে এক নরপতি ছিলেন। এই শালিবাহনের গড়, ভিটা ও প্রতিষ্ঠিত জলাশয় প্রভৃতি পুরাতন শালিগ্রামে

এখনও দেখান হইয়া থাকে। গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে জঙ্গলাকীর্ণ শালিবাহন রাজার ভিটা প্রায় ২৫০ বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত আছে। ইহার প্রায় চারিধারে সারিবন্দি বাঁশের ঝাড়। * ইহারই স্থানবিশেষে 'তেথাকি বাঁশের ঘেড়' দেওয়া 'তেথাকি গড়' দৃষ্ট হয়। এক একটী গড় প্রায় দশহাত প্রশস্ত ও উচ্চ। উত্তর দক্ষিণে গড়ের দৈর্ঘ্য ২০০০ হাত। 'কেঁচো পুষ্করিণী, গড়ের দক্ষিণ অংশের সীমানা। তেথাকি গড় ও তেথাকি বাঁশ দেখিলেই বোধ হয় যে শত্রুর আক্রমণ হইতে স্থানটীর রক্ষার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। পুরাকালে এ প্রদেশে যে বাঁশ দিয়া দুর্গ-সংরক্ষণের রীতি ছিল, তাহা প্রাচীন প্রসঙ্গে জানা যায়। উজানী মঙ্গলকোটের বিক্রম-রাজের বাঁশের দুর্গের কথা গৌড়ের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে বর্দ্ধমান দুর্গের বর্ণনায় আছে—

"চৌদিকে ঘেরা বেড় বাঁশ
বুরুজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্ছ
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস।"

গড় হইতে পশ্চিম মুখে যাইলে দুধারে পুষ্করিণী দেখা যায়। দূরে তরঙ্গায়িত পাহাড়ী জমি। এখানে রবিখন্দ জন্মে। ইহার পশ্চিমোত্তর ভাগে 'চাঁদ'পুষ্করিণী এবং পশ্চিমভাগে 'শালিক্ষেত্র' ও তন্নিম্নে 'শালিক্ষেত্র পুষ্করিণী' নামে বিশুষ্ক জলাশয়। পুকুর-পাড়ে বহুল পলাশ ও খর্জ্জুর বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। শালিক্ষেত্র নামক স্থানটিতে এক সুবৃহৎ বটতরু ও তাহার পাদমূলে ঘন বন দৃষ্ট হয়। গাছটীকে 'যোগাতী'-গাছ ও স্থানটীকে 'যোগাতীতলা' বলে। কথিত আছে, যখন রাজা স্বাধীন ছিলেন, তখন প্রতি বৈশাখ মাসে যোগাতী বা যোগাদ্যার পূজা মহা ধূমধামের সহিত হইত। শালিক্ষেত্রে যোগাদ্যাদেবীর কোন মূর্ত্তি এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগাদ্যার পূজা প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে এখনও কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ক্ষীরগ্রামে হইয়া থাকে। তথায় দেবীর পুকুর পাড়ে শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরার বিষয়ে যে অলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণের 'গৃহস্থ' পত্রিকাতে 'উজানি' নামে প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে।

গড় হইতে কিছু দূরে 'বসনভিটা' ও 'মহাশয়দের ভিটা' নামে দুইটী ভিটা দেখান হইয়া থাকে। 'বসনভিটা' বসন-লক্ষ্মীর আলয়ের অবশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঠাকুরের চিহ্নাদি এখন আর কিছু নাই। 'মহাশয়ভিটা' বসনভিটার লাগাও। 'মহাশয়' অর্থে রাজজ্ঞাতি বুঝা যায়। সম্ভবতঃ মহাশয়েরা ক্ষিতীশ-বংশাবলীর সংশ্লিষ্ট হইবেন। * ভিটার জঙ্গলের ভিতর দিয়া নীচে উঁকি দিলে ঘন বন-পত্রান্তরালে রজতশুভ্র জলাশয় দেখা যায়। ইহার নাম 'রাজপুষ্করিণী'। এখানে শিবের একটী ভগ্ন দেউল আছে। শিবলিঙ্গের পূজা সময়-বিশেষে হয়।

'মহাশয়ভিটা' অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। এখানে একটী ক্ষুদ্র মৃৎফলক পাইয়াছি। ফলকটীর বয়স ২০০ বৎসরের বেশী নহে। ইহার অধিকাংশ অক্ষরই চটিয়া গিয়াছে। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছে।

শালগাঁয়ে 'মহাশয়দের' বাস শালিবাহনের অনেক পরে; সাধারণের এইরূপ ধারণা। শালিবাহনের সময়ের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা নাই। গ্রামের মুরুব্বি পরেশ সেক প্রাচীনদের কাছে শুনিয়াছে যে, শালিগ্রামের রাজাদের গোষ্ঠীপতি বামুণপুকুরে ছিল। যোগাদ্যাপূজার স্থানটীকে এখনও লোকে 'শালিক্ষেত্র' বলে। এই শালিক্ষেত্র হইতে 'শালিবাহন রাজার 'জাঙ্গাল' বাহির হইয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে।

---

* পূর্ব্বে বাঁশ-ঝাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর থাকিত, শুনা যায়।

* নরেন্দ্রের পরপুরুষেরা নবলা, সিমলা, আমুনে, দুর্গাপুর ও শালগাঁ গ্রামে অবস্থিত আছেন। "ক্ষিতীশ-বংশাবলী"—পরিশিষ্ট।

কাটোয়ার নিকটে মঙ্গলকোট উজানীতে বিক্রম নামে এক সামন্ত-রাজা ছিলেন, তাহার কতকটা নিদর্শন মিলে। চণ্ডীকাব্যোক্ত সিংহলে রাজা শালবাণের অস্তিত্ব কাল্পনিক মাত্র। প্রবন্ধোক্ত শালিগ্রামে ও "ভারতবর্ষে" রাখালরাজ বাবুর আলোচিত সিংহলপাটনে শালিবাহন নামে নরপতির বিষয়ে প্রবাদ শুনা যায়। বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন নাম কালে গৌরবকর উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ কালে শকজাতির কোন শাখা পূর্ব্ব-ভারতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী কালে শক জাতির কোন দলপতির শালিবাহন নাম গ্রহণ করা বিচিত্র নয়। চণ্ডীকাব্যের 'শালিবান নরমণি'র সহিত প্রবন্ধকথিত শালিবাহনের সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। চণ্ডীকাব্য রচনার সময়ে বাঙ্গালারই কোন শালি-বাহনের কথা লেখকের মনে ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

গ্রামে

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি,এ]

সহর ছেড়ে এলাম যবে, দশ বছরের মেয়ে,
কোলাহলের আমোদ গেল নীরবতায় ছেয়ে।
পাড়াগাঁয়ে শ্বশুর-বাড়ী, কেমন করে মন,
লাগে না যে মোটেই ভাল গভীর নিরজন।

কোথায় গেল লোকের সারি, গাড়ী ঘোড়ার গোল,
নিত্য উজান জীবন-নদী, সদাই উতরোল,
হেথায় নিতি বেণুর ব'নে হাওয়ার হুড়াহুড়ি,
যায় না হেঁকে খেল্‌না, কাচের বেলোয়ারি চুড়ি।

মাটীর দেয়াল, খড়ের চালা, গোবর-দেয়া মেজে;
এলাম কোথা রংকরা সে সাধের বাড়ী ত্যজে।
নূতন নূতন সঙ্গী, তাদের নূতন ধরণ কথা,
থেকে থেকে জাগছে মনে নূতনতর ব্যথা।

ছাড়া কোকিল ডাক্‌ছে গাছে, পোষ্‌মানা সব পাখী,
মানুষ চেয়ে বন্‌বিহগের অধিক ডাকাডাকি।
কে যেন মোর সব ভুলায়ে ডাক্‌ছে করুণ স্বরে,
'কঙ্কাবতী বোনটী আমার আয় রে ফিরে ঘরে।'

সহর ছেড়ে এসেছি আজ পাঁচটী বরষ শুধু,
ভ্রমরী আজ করেছে পান বনফুলের মধু।
কপোতী আজ কপোত সনে নীড় বেঁধেছে বনে,
প্রাসাদেরি খোঁপ্‌টী তাহার কচিৎ পড়ে মনে!

জগতেরি বিপুল বুকে ছড়িয়ে ছিল প্রাণ,
সকল কাজে চক্ষু ছিল, সকল কথায় কাণ।
বাচাল আজি হয়ে গেছে আপনা হতে মূক,
ভুলায়েছে গুঞ্জরণে আস্বাদনের সুখ।

পর্ণ আবাস ভুলিয়ে দেছে পিতার রাজগৃহ,
বুঝেছি হায় পশুপাখী তরুলতার স্নেহ।
অর্দ্ধ-অশন, ছিন্ন-বসন, কোলে-পিঠে ছেলে;
চাইনে যেতে কোথাও আমার পাগলা-ভোলা ফেলে।

তীর্থ আমার, স্বর্গ আমার ক্ষুদ্র গৃহকোণ,
সফল আমার পুণ্যিপুকুর, সফল আরাধন।
দিলেন যবে ব্রহ্মচারী আমার করে কর,
চিন্‌তে তখন পারি নি যে আমার মহেশ্বর!

গোলোক চেয়ে সাগর ভাল মধুর নিরজন,
চরণ-সেবা করতে যদি পাইগো নারায়ণ।
পেরেছি হায় বুঝতে সতীর আনন্দটী আজ,—
শিবকে পেলে শ্মশান ভাল, কৈলাসে কি কাজ।

কাজ কি আমার রত্ন, মণি, রাণীর আভরণ,
কোলটী জুড়ে থাকুক আমার সোণার গজানন।
ইন্দ্রালয়ের গৌরব, সুখ তোমরা সখি লহ;
আমার থাকুক্ কমলবন ও স্নেহের কালিদহ।

প্রতিধ্বনি

পল্লীবাণী

আমাদিগকে আবার পল্লীতে ফিরিতে হইবে,—আবার পুরাতন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে—আবার বিলাস ত্যাগ করিয়া সরলভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে। ইংলণ্ড এতদিনে আপনার ভুল বুঝিয়াছে, আবার পরিত্যক্ত পল্লী জনপূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে—আবার অবজ্ঞাত কৃষির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছে। পল্লীর লোক সহরের বিলাসের আস্বাদ পাইয়াছে. তাই বিলাতে পল্লীতে সহরের আস্বাদ দিবার ব্যবস্থা করা হইবে—পল্লীতে পাঠাগার, রঙ্গালয়, সভাগৃহ বায়স্কোপ এ সব দিবার কথা হইতেছে। এ দেশে অত চাই না। এ দেশে পল্লীর স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, সে দিকে একটু দৃষ্টি দিলে—দেশের লোকের সঙ্গে সরকার সহযোগিতা করিলে,—গ্রামে পাঠশালার ও চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু মূলে চাহি আমাদের উদ্যোগ, আমাদের চেষ্টা;—যে আদর্শ করিয়াছি, সেই আদর্শের সমাদর। যদি আবার বিলাস পরিহার করিয়া, পূর্ব্বের আদর্শ বরণ করিয়া, আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ করিয়া, সমাজ-শাসন সংস্থাপিত করিয়া, মিতাচারী হইয়া অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া বাসেই সুখ ও শান্তির সন্ধান করিতে পারি, তবেই বাঙ্গালীর এ বাংলার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল; নহিলে দারিদ্র্যের নিপীড়নে তাহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। বাঙ্গালী কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?—উপাসনা।

বাঙ্গালা ভাষা ও বিজ্ঞান।

সম্প্রতি সরকারী বেসরকারী সকল লোকেই ভারতীয় ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। আমরাও সেই কথার সামান্য আলোচনা করিব। প্রথমতঃ ভারত-বাসীর নিকট ভারতীয় ভাষা কিরূপ তাহা দেখা যাউক। আমরা শুধু বাঙ্গালা লইয়াই বিচার করিব। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২'১ জন কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সে সমস্ত পুস্তক পাঠ করে সুকুমারমতি শিশুগণ। কিন্তু তাহাতে থাকে কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্যান্তর্গত বিষয়সমূহ। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় শিশুগণ এরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারে। শুধু বুঝিতে পারে নহে, যদি শিক্ষক উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হন, তাহা হইলে সামান্য চেষ্টাতেই শিক্ষার্থী শিশু অনায়াসে তাহার গূঢ় ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কেন এরূপ হয়। প্রথমতঃ বালককে ভাষার দিকে মন দিতে হয় না। সে শুধু বিষয়টী কি তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করে। কাজেই সে বুঝে।—বিজ্ঞান।

বিবেকানন্দ-বাণী

কয়েকজন পরিচিত ভক্তের সহিত কথোপকথন কালে স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল—"হিন্দুধর্ম্মকে অপরাপর ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য দান করা।' সনাতন ধর্ম্মকে ক্রিয়াশীল ও আত্মবিস্তারশীল হইতে হইবে; তাহাকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে প্রচারকদল প্রেরণে সমর্থ হইতে হইবে; ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণকে স্বমতে আনয়ন করিতে, এবং তাহার নিজের যে সকল সন্তান কুহকে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে পুনরায় টানিয়া লইতে সমর্থ হইতে হইবে; পরিশেষে জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন নূতন ভাবসমূহ নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তি তাহার চাই। যে মুহূর্ত্তে কোন জাতি বা সম্প্রদায় আপনাকে জীবশরীরের ন্যায় সুসংহত এবং একতাবদ্ধ বলিয়া জানিতে পারে, সেই মুহূর্ত্তেই যে উহা অপর জাতি বা সম্প্রদায়সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে—একথা স্বামিজী জানিতেন কি না বলিতে পারি না। আবার, তিনি নিজেই যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মের মধ্যে এই স্বস্বরূপজ্ঞান পুনরুদ্বোধনে সহায়ক হইবেন, এ কথাও তিনি জানিতেন কিনা বলা কঠিন। যাহাই হউক না কেন, "হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি আবিষ্কার করাই" প্রথম হইতে তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল, ইহা তাঁহার নিজ মুখের উক্তি। তিনি স্বতঃই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই গুলিকে আবিষ্কার করিয়া পুনরায় ঘোষণা করাই জননীস্বরূপ হিন্দু-ধর্ম্মকে তাঁহার আয়ু ও বল যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এই আনন্দজনক প্রত্যয় জন্মাইয়া দিবার একমাত্র পন্থা। বুদ্ধ ত্যাগ ও নির্ব্বাণ প্রচার করিলেন, অমনি তাঁহার দেহাবসানের দুই শত বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হইল; কারণ, এইগুলি জাতীয় জীবনের সার বস্তু। স্বামিজীও সেইরূপ সার বস্তুসকলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকেই প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিলেন—ফল যাহা হয় হউক।—উদ্বোধন।

ভারতে বস্ত্রশিল্প

১৯১৩-১৪ সালে ১,১৬,৩২,৯১৫৮৮ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালে ১,২২,০৪,৪২,৫৪৫ গজ কাপড় হইয়াছিল। অতএব আলোচ্য বৎসর ৫,,৬১,৫০,৯৫৭ গজ কাপড় অর্থাৎ শতকরা ৫,৬ কম উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসরে রপ্তানীর হার কিছু বেশী। ১৯০৮-০৯ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্য্যন্ত কত কাপড় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে গিয়াছে তাহার পরিমাণ—

১৯০৮-০৯	...	...	৭,৭৯,৮৮,৯৬৪ গজ।
১৯০৯-১০	...	...	৯,১৮,৩৭,৫৫৮ গজ।
১৯১০-১১	...	...	৯,৯৭,৮৮,৩১৫ গজ।
১৯১১-১২	...	...	৮,১৪,২৯,৪১০ গজ।
১৯১২-১৩	...	...	৮,৬৫,১২,৮১২ গজ।
১৯১৩-১৪	...	...	৮,৯৩,৩৩,৭১৬ গজ।

—কৃষক।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত অসিতচন্দ্র কাব্যবিনোদ প্রণীত "দেবব্রত" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তীর "মধ্যলীলা" নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। দক্ষিণা দুইটাকা।

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল প্রণীত উপন্যাস "উমা ও রমা"— নামেই অনুপ্রাসের ঝঙ্কার; দুইটি রজত-মুদ্রার ঝঙ্কারের সহিত বেশ সামঞ্জস্য থাকিবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত উপন্যাস –"মাতৃমন্দিরে" এক টাকা প্রণামী দিলে পাঠক প্রবেশাধিকার পাইবেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অরক্ষণীয়া" উপন্যাস আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানদার বৌভাতে ॥০ আনা যৌতুক না দিলে পাঠক-সমাজকে স্বর্ণ পিসির গালি খাইতে হইবে।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী প্রণীত-"পরম-কল্যাণ গীতা" প্রকাশিত হইয়াছে। দর্শনী দেড়টাকা।

শ্রীযুক্ত রাধানাথ কাবাসী প্রণীত "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি তত্বসার" দেড় টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

"বিয়ের বাজার" শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত অন্বর্থনামা, সময়োপযোগী প্রহসন। ছয়আনা রেস্ত সংগৃহীত হইলেই এই বাজারে কেনা-বেচা চলিবে।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-জ্যোতিষ-তীর্থ প্রণীত "হোরাবল্লভ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য একটাকা।

শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত "ইন্দুমতী"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ১।০ মাত্র।

হরিসাধন বাবুর বিচিত্র রহস্যপূর্ণ নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস "লালচিঠি" প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিকে নূতন টাইপে মুদ্রিত, সোণার জলে রেশমী কভারে বিচিত্র বাঁধা, আর চারিখানি নেত্ররঞ্জন হাফ্‌টোন ছবি। মূল্য ১॥০

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু বঙ্গদেশের কতিপয় খ্যাতনামা জমিদার-বংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া "ভারত-গৌরব" নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় এবার "সাংঘাতিক উইলে"র 'প্রোবেট' লইয়া এগার আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। আবার কেহ 'কোডিসিল' বাহির করিবেন না ত?

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গল্প-গ্রন্থ "পঙ্ক-পল্লব" প্রকাশিত হইয়াছে। পল্লব-পিছু দুই আনা হিসাবে একুনে 'দরমাহা' দশআনা। হিসাবের গরু বাঘে খায় না।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস "ময়ূখ" যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই আটআনা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর প্রণীত "পর্ণপুট" কাব্য-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার "ঋতুমঙ্গল" নামক আর একখানি কাব্য যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্ধু প্রণীত "উগ্রক্ষত্রিয় পরিচয়" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মূল্য চারি আনা মাত্র।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্-এ, ভারতবর্ষে 'ননদ ভাজ', 'শাশুড়ী বধূ', ও 'দুই ভগিনী' নামে যে তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই তিনটি এবং 'একান্নবর্ত্তী পরিবার' নামক আরও একটী প্রবন্ধ একত্রে "কাব্যসুধা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। একটি রজতমুদ্রার বিনিময়ে পাঠকপাঠিকাগণ এই কাব্যসুধার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

গত কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষে "বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ-ফেলের সংখ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-আর-এস মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "...জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য এক প্রেসিডেন্সী কলেজ ভিন্ন অন্য কোন কলেজে মানমন্দির নাই।" শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাশয় এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছেন, কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজেও (St. Xaviers College) একটি ভাল মানমন্দির আছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

জননী

Emerald Ptg Works

শিল্পী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মাঘ, ১৩২৩

দ্বিতীয় খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বাণী-বন্দনা

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

দেবি সরস্বতি পদযুগসেবিষু
সদয়ে কেশবকান্তে
তব সমতা খলু দৈবতবৃন্দে
নৈব ভবতি সিতকান্তে।

স্বীয়নিঃস্বসুত- দুঃখশতাহত-
হৃদয়োচ্ছ্বসিতকৃপাতঃ
সাপত্ন্যোদ্ভব- বৈরনিবারণ-
কামনয়া কিমু মাতঃ —

অঙ্গে শ্রিয়মধি- দধতী রাজসি
পদ্মাসদ্মনি ভাসি
লক্ষ্মীসোদর- শীতরশ্মিমপি
শিরসি স্বে নিদধাসি।

অন্যদেবগণ- সেবনমন্ব
প্রয়ো ন ফলতি লোকে
ভবদারাধন- শর্ম্মদকর্ম্মণি
সপদি সুফলমবলোকে।

বিদ্যাধনময়ি বিতর কৃপাময়ি
হর মানস মভিমানং
জগতি প্রকটয় ভগবতি ভারতি
তব নির্ম্মলমহিমানম্।

বেদে কালের বিভাগ

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(১)

ঋগ্বেদে চন্দ্র দিবস সকলের প্রজ্ঞাপক-চিহ্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (১)। অতএব বর্ত্তমান কালে যেমন আমরা চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি দ্বারা পক্ষ (২) ও তিথি গণনা করি, বৈদিক যুগেও যে সেইরূপ গণনা করা হইত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বৈদিক যুগে প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে ধরা হইত। চন্দ্রের তিথি গণনাই ইহার মূল। সম্ভবতঃ, এক পূর্ণিমা হইতে পর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কালই মাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেইজন্য অথর্ব্ববেদে পৌর্ণমাসী প্রথম যজ্ঞার্হা ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩)। চন্দ্র বৈদিক কালে 'মাস' নামেও অভিহিত হইত (৪)। মাস সকল দ্বারা বৎসর উৎপন্ন হয়, ইহাও ঋগ্বেদে দেখিতে পাই (৫)।

(১) অয়ং দ্যোতয়দ দ্যুতো ব্যক্তূন্দোষাবস্তোঃ শরদইন্দু রিন্দ্র।
ইমং কেতু মদধু র্ন চিদহ্নাং শুচি জন্মন উষসশ্চকার ॥৬,৩৯,৩

অর্থঃ—হে ইন্দ্র ! এই ইন্দু-অনুজ্জ্বল রাত্রি সকল, দিবারাত্রি শরৎ সকলকে প্রদীপ্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বকাল হইতে দেবগণ, এই সোমকে দিবস সকলের প্রজ্ঞাপক-চিহ্ন করিয়া স্থাপন করিয়াছেন ; (সোম) উজ্জলজন্মা উষাসকলকে করিয়াছেন।

নবো নবো ভবতি জায়মানোহ্নাং কেতু রুষসোমেত্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বিদধাত্যায়ন প্রচন্দ্রমা স্তিরতেদীর্ঘ আয়ুঃ ॥
১০.৮৫.১৯

অর্থঃ—দিন সকলের চিহ্নস্বরূপ (চন্দ্র) জন্মিয়া প্রতিদিন নূতন-নূতন রূপলাভ করেন (শুক্লপক্ষে) ; (কৃষ্ণপক্ষে) উষা সকলের পূর্ব্বে আগমন করেন। আগমন করিয়া দেবতাদিগকে হবির্ভাগ প্রদান করেন। চন্দ্রমা আয়ু বর্দ্ধিত করেন।

(২) চিতয়ন্তঃপর্বণা পর্বণা বয়ং। ঋগ্বেদ, ১।৯৪।৪ ; অর্থঃ— আমরা পর্ব্বে-পর্ব্বে (তোমাকে) জানাইয়া।

(৩) পৌর্ণমাসী প্রথমা যজ্ঞিয়াসীদহ্নাং রাত্রীণামতি শর্বরেষু।
অথর্ব্ববেদ, ৭.৮৫.৪

অর্থঃ—দিবস রাত্রিদিগের (মত) চিহ্নিতদিগের মধ্যে পৌর্ণমাসী প্রথম যজ্ঞার্হা ছিলেন।

(৪) সূর্য্যামাসা মিথ উচ্চরাতঃ। ঋগ্বেদ, ১০।৬৮।১০

অর্থঃ—সূর্য্য চন্দ্রমা দুইটীকে উর্দ্ধে বিচরণ করাইয়াছিলেন।

(৫) সমানাং মাস আকৃতি। ঋগ্বেদ, ১০৮৫৫

অর্থঃ—মাস বৎসরের কর্ত্তা।

যদিও চন্দ্র দিন-রাত্রির চিহ্ন, তথাপি ঋগ্বেদের ঋষি মনে করিতেন, তাহারা অগ্নির সন্তান। ৬) ঋগ্বেদের যুগে দেখিতে পাই, ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে বৎসর গৃহীত হইয়াছে (৭)। ৩০ দিনে মাস হইলে ৩৬০ দিনে এক বৎসর হয়।

(৬) অরুষস্য দুহিতা বিরূপে স্তৃভিরন্যা পিপিশে সূরো অন্যা।
মিথস্তুরা বিচরন্তী পাবকে মাম শ্রুতং নক্ষতঋচামানে॥
ঋগ্বেদ, ৬৪৯৩

অর্থঃ—অগ্নির বিভিন্ন রূপবিশিষ্ট দুইটি দুহিতা (আছে)। একটি নক্ষত্র সকলের দ্বারা, অপরটি সূর্য্যের দ্বারা অলঙ্কৃতা। পবিত্রকারিণী, গমনশীলা, পরস্পর বাধাদানকারিণী, স্তোত্রকারী আমার মননীয় স্তোত্রকে ব্যাপ্ত কর।

[সায়ন অরুষস্য অর্থে সূর্য্যস্য করিয়াছেন। কিন্তু এই ঋকের পূর্ব্ব ঋকেই অগ্নিকে অরুষ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১ ১৬৪।১১ ঋকে দিনরাত্রিকে অগ্নির যমজপুত্র বলা হইয়াছে।]

(৭) দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চতস্থুঃ ॥
ঋগ্বেদ, ১।১৬৪ ১১

অর্থঃ—১২টী অর (অর্থাৎ redius) যুক্ত ঋতের (অর্থাৎ বৎসরের) চক্র দ্যুলোকের চারিদিকে ঘুরিতেছে ; তাহারা জরাগ্রস্থ হয় না। অগ্নির ৭২০ মিথুন পুত্র ইহাতে আছে।

[উদ্ধৃত ঋকে দুহিতা না বলিয়া দিবা ও রাত্রিকে পুত্র বলা হইল। এই বিষয় লইয়া ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন,

স্ত্রিয়ঃ সতী স্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্নবিচেতদন্ধঃ।
১।১৬৪ ১৬

অর্থঃ—স্ত্রী হইলেও তাহাদিগকে পুরুষ বলা হয়। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখে, অন্ধ বুঝিতে পারে না।]

যস্মান্ মাসা নির্মিতা স্ত্রিংশদরা সংবৎসরো যস্মিন্ নির্মিতা দ্বাদশারঃ।
অথর্ব্ববেদ, ৪।৩৫।৪

অর্থঃ—যাহাতে ৩০টি অরযুক্ত মাস সকল নির্ম্মিত, যাহা হইতে ১২ অরযুক্ত সংবৎসর নির্ম্মিত।

[একটি বর্ষচক্রকে ১২টি অর বা radius দ্বারা ১২টি ভাগ করিলে এক-একটি মাস হইবে ; একটি মাসকে পুনরায় ৩০টি অর দ্বারা ৩০ ভাগ করিলে ৩০ দিন উৎপন্ন হয়। অতএব ৩৬০ দিনে বৎসর বিভক্ত হইল।]

আমাদের মনে হয়, ৩০ দিনে মাস, ঋগ্বেদের সময়ের বহু পূর্ব্বকালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঋগ্বেদের যুগে ১২ মাসে বৎসর বুঝাইবার জন্য, একটী বৎসর চক্রের কল্পনাও করা হইত। তাহাতে যেন ১২টী 'অর' (অর্থাৎ Radius) আছে। ইহা দ্বারা এক বৎসরে ১২ মাস আছে বুঝাইত। এই চক্রের পরিধি ৭২০ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে অগ্নির পুত্ররূপী দিন-রাত্রি অবস্থান করে—মনে করা হইত।

বর্ত্তমানকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, মনুষ্যের সভ্যতা-বিকাশের স্তর আছে। এককালে মনুষ্য পশু-পালন, গোচারণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; তখন তাহারা কৃষি-কার্য্য জানিত না। মনুষ্য এই কালে এক স্থানে প্রায় আবদ্ধ থাকিত না। গো, মেষ ও ছাগল লইয়া তাহারা এক দেশ হইতে অপর দেশে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তখন কুকুর তাহাদের অত্যন্ত উপকারী জন্তু ছিল। মনে হয়, কৃষিকার্য্য প্রচলনের আদি হইতে মনুষ্য একটী নির্দ্দিষ্ট দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই জন্য প্রায় সকল প্রাচীন জাতি আপন-আপন দেশে আদিকাল হইতেই বাস করিতেছে—এইরূপ প্রবাদ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাহা হউক, কৃষি-যুগের আদিতে পশু-পালনের প্রাধান্য যে বর্ত্তমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষি-কার্য্যের উন্নতি হইলে, মনুষ্য-সমাজে পশু-পালন কমিয়া যায়। এইজন্য আমরা প্রথম বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে পশু-হরণ লইয়া যুদ্ধ দেখিতে পাই; পরে ভূমি-হরণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ঋগ্বেদ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আর্য্যগণ ঋগ্বেদ রচনা-কালে কৃষি-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তবে ঋগ্বেদের মধ্যে অতি প্রাচীন কালের ঋষি ও তাঁহাদের কার্য্য প্রভৃতির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাঁহাদের সভ্যতার প্রাচীন স্তরের বিষয় কিছু-কিছু জানিতেন; এবং প্রাচীন ঋষিদিগের গান ও স্তোত্র তাঁহাদের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল না।

আমরা এক্ষণে সেই প্রাচীন স্তরের বিষয় কিছু আলোচনা করিব। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে অঙ্গিরা ঋষি-বংশের উল্লেখ আছে। ইঁহারা অগ্নির সন্তান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বোধ হয় ইঁহারাই অগ্নিপূজার প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া অগ্নি হইতে উদ্ভূত এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন (৮)। নবগ্ব ও দশগ্ব এই দুইটী অঙ্গিরা-বংশ প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইঁহারা, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবদ্বয়ের সাহায্যে, পণি নামক দানবদিগের নিকট হইতে, পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত ঊষা, সূর্য্য, গো এবং অর্ক উদ্ধার করেন। বৃহস্পতি নবগ্বদিগের সহিত এবং ইন্দ্র দশগ্ব-দিগের সহিত পণিদিগের অভিমুখে যুদ্ধার্থে গমন করেন। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পণিদিগের প্রধান 'বল' নামক দানবকে সংহার করেন এবং বৃহস্পতি অদ্রি ভাঙ্গিয়া ঊষা, সূর্য্য, গো এবং অর্ক বাহির করিয়া আনেন। এই যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, ইন্দ্র সরমা নাম্নী কুক্কুরীকে গো প্রভৃতির অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। সরমা এই কার্য্যে সফল হওয়ায়, যজ্ঞের অংশ-ভাগিনী হয় এবং তাহার তনয়ও যজ্ঞাংশের অধিকারী হইয়াছিল। নিম্নে ঋক্ উদ্ধার করিয়া আমাদের উক্তির সমর্থন করা গেল (৯)।

---

(৮) বিরূপাস। ইৎ। ঋষয়ঃ। তে। ইৎ। গম্ভীর। বেপসঃ। তে। অঙ্গিরসঃ। সূনবঃ। তে। অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে॥১০।৬২।৫

যে। অগ্নেঃ। পরি। জজ্ঞিরে। বিরূপাসঃ। দিবঃ। পরি। নবগ্ব। নু। দশগ্বঃ। অঙ্গিরস্তমঃ। সচা। দেবেষু। মংহতে॥ ঐ।৬

অর্থ:—বিবিধ রূপযুক্ত ঐ সকল ঋষি গম্ভীরকর্ম্মা; তাঁহারা অঙ্গিরার পুত্র। তাঁহারা অগ্নি হইতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা অগ্নি হইতে জন্মিয়াছেন, (তাঁহারা) দিব্যলোকের উপরে বিবিধ রূপ-যুক্ত; নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেবতাদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দান করেন।

(৯) কিং। ইচ্ছন্তী। সরমা। প্র। ইদং। আনট্। দূরে। হি। অধ্বা। জগুরিঃ। পরাচৈঃ। কা। অস্মেহিতিঃ। কা। পরিতক্ম্যা। আসীৎ। কথং। রসায়াঃ। অতরঃ। পয়াংসি॥ ঋগ্বেদ ১০।১০৮।১

ইন্দ্রস্য। দূতীঃ। ইষিতা। চরামি। মহঃ। ইচ্ছন্তী। পণয়ঃ। নিধীন্। বঃ। অতিস্কদঃ। ভিয়সা। তৎ। নঃ। আবৎ। তথা। রসায়াঃ। অতরং। পয়াংসি॥ ঐ ২

অয়ং। নিধিঃ। সরমে। অদ্রিবুধ্নঃ। গোভিঃ। অশ্বেভিঃ। বসুভিঃ। নিঋষ্ঠঃ। ঐ।৭

আ। ইহা। গমন্। ঋষয়ঃ। সোমশিতাঃ। অয়াস্যঃ। অঙ্গিরসঃ। নবগ্বাঃ। তে। এতং। ঊর্বং। বি। ভজন্ত। গোনাং। অথ। এতৎ। বচঃ। পণয়ঃ। বমন্। ইৎ॥ ঐ ৮

অর্থ:—সরমা কি প্রার্থনা করিয়া এখানে আসিয়াছ? বিপরীত মুখে গমন করিতে পারা যায় না যে পথে, তাহা (এস্থান হইতে) দূরে

দেখা যাইতেছে যে, যে সময়ে অঙ্গিরাবংশীয় নবগ্ব ও দশগ্বগণ যজ্ঞ করিতেন, সে সময়ে কুকুর যজ্ঞের অংশ প্রাপ্ত হইত। আরো দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যদিগের শত্রু পণিগণ তাঁহাদের গোধন হরণ করিয়া লইত; এবং তাহা উদ্ধারের

রহিয়াছে। আমাদিগের নিকট কি প্রয়োজনে আসিয়াছ? তোমার ভ্রমণের কারণ কি? কিরূপে নদীর জল উত্তীর্ণ হইয়াছ? ১

হে পণিগণ! (আমি) ইন্দ্রের দূতী; (তাঁহার) দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি! (পাছে) লম্ফ দিয়া পার হই এই ভয়ে আমাকে রক্ষা করিয়াছে; তখন নদীর জল উত্তীর্ণ হইয়াছি। ২

হে সরমে! পর্ব্বতে রক্ষিত হইয়া এই ধন লুক্কায়িত (আছে): গো, অশ্ব, (ও) বহুমূল্য ধন সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ। ৭

সোমপানে মত্ত অযাস্য (অর্থাৎ স্তোত্রস্বামী বৃহস্পতি) ও নবগ্ব অঙ্গিরা ঋষিগণ এখানে আসিবেন। তাঁহারা এই বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করিয়া লইবেন। হে পণিগণ! তখন তোমাদের এই সকল বাক্য উগ্‌রাইতে হইবে।

সখা। হ। যত্র। সখিভিঃ। নবগ্বৈঃ। অভিজ্ঞু। আ। সত্বভিঃ। গাঃ। অনুগ্মন্। সত্যং। তৎ। ইন্দ্রঃ। দশভিঃ। দশগ্বৈঃ। সূর্য্যং। বিবেদ। তমসি। ক্ষিয়ন্তং॥ ঋগ্বেদ, ৩.৩৯।৫

অর্থঃ—যথায় সখা (অর্থাৎ বৃহস্পতি) সত্ববান্ নবগ্ব সখাদিগের সহিত জানুর উপর ভর করিয়া গোসকলের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেইস্থানে দশজন দশগ্ব সহিত ইন্দ্র অন্ধকারে অবস্থিত সূর্য্যকে যথার্থ লাভ করিয়াছিলেন।

[এই ঋকের 'সখার' অর্থ সায়ন 'ইন্দ্র' করিয়াছেন। কিন্তু পণিদিগের সহিত এই যুদ্ধে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দুইজনে ছিলেন। ইন্দ্র দশগ্বদিগের সহিত ছিলেন দেখা যাইতেছে। অতএব নবগ্বগণ বৃহস্পতির সহিত ছিলেন, অনুমান হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।১০৮।৮ ঋকে অযাস্য, নবগ্বদিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। অযাস্য অর্থে স্তোত্রকর্ত্তা। বৃহস্পতি দেবগুরু ও দেবলোকের স্তোত্রকারী ছিলেন। অতএব বৃহস্পতিই নবগ্বদিগের সহিত গিয়াছিলেন।]

সঃ। সুষ্টুভা। সঃ। স্তুভা। সপ্তবিপ্রৈঃ। স্বরেণ। অদ্রিং। স্বর্য্যঃ। নবগ্বৈঃ। সরণ্যুভিঃ। ফলিগং। ইন্দ্র। শক্র। বলং। রবেণ। দরয়। দশগ্বৈঃ॥ ঋগ্বেদ, ১।৬২।৪

সুন্দর স্বামী তিনি (অর্থাৎ বৃহস্পতি) সুন্দর স্তোত্রের দ্বারা, তিনি স্তব দ্বারা (৪) স্বরের দ্বারা সাতজন নবগ্ব বিপ্রের সহিত অদ্রিকে, (এবং) শক্র ইন্দ্র অনুগামী দশগ্বদিগের সহিত রবের দ্বারা ফলিগবলকে, বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রস্য। অঙ্গিরসাং। চ। ইষ্টৌ। বিদৎ। সরমা। তনয়ায়। ধাসিং। বৃহস্পতিঃ। ভিনৎ। অদ্রিং। বিদৎ। গাঃ। সং। উস্রিয়াভিঃ। বাবশন্ত। নরঃ॥ ঋগ্বেদ, ১।৬২।৩

অর্থঃ—ইন্দ্রের ও অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে সরমা নিজ পুত্রের নিমিত্ত অন্ন পাইয়াছিল (অর্থাৎ যজ্ঞে কুকুর অংশ পাইয়াছিল।) বৃহস্পতি অদ্রি ভাঙ্গিয়া গো লাভ করিয়াছিলেন; নেতাগণ গোসকলের সহিত হর্ষসূচক শব্দ করিয়াছিলেন।

(১০) ঋতবানঃ। প্রতিচক্ষ্য। অনৃতা। পুনঃ। আ। অতঃ। আ। তস্থুঃ। কবয়ঃ। তে। বাহুভ্যাং। ধমিতং। অগ্নিং। অশ্মনি। নকিঃ। সঃ। অস্তিঃ। অরণঃ। জহুঃ। হি। তং॥ ২২৪.৭

অর্থঃ—সত্যবান্ কবিগণ (অর্থাৎ অঙ্গিরাগণ) অসত্য (অর্থাৎ পণিদিগের দ্বারা গাভী অবরোধ স্থান) দেখিয়া, তথা হইতে পুনরাগমন করিয়া মহৎ পথে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা বাহুদ্বয়ের দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করিলেন—সেই অরণিজাত (অগ্নি) পূর্ব্বে তথায় ছিল না। তাহাকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) (পণিদিগের) পর্ব্বতে নিক্ষেপ করিলেন।

নিমিত্ত ইন্দ্র ও বৃহস্পতির পূজা করিতে হইত। ইহা কৃষিকালের ঘটনা নহে; পশুপালনই এই যুগের প্রধান কার্য্য ছিল। সেইজন্য কুকুর এত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন অগ্নি উৎপাদন করিবার উপায় অঙ্গিরাগণ বাহির করিয়াছেন। পণিগণ বোধ হয় অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার উপায় জানিত না। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পণিদিগের পার্ব্বতীয় গৃহে নিক্ষেপ করারও উল্লেখ দেখিতে পাই (১০)।

আর একটী বিশেষ কথা আমরা অঙ্গিরাদিগের সম্বন্ধে অবগত হই। তাঁহাদের সাংবৎসরিক যজ্ঞ দশমাসব্যাপী ছিল। যখন ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল, তখনও বোধ হয় অঙ্গিরাবংশীয়গণ বৎসরে দশমাস যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু অপরাপর ঋষিবংশ তখন দ্বাদশমাসে সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। প্রাচীন অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণ কেন দশমাসেই দ্বাদশমাসের যজ্ঞ শেষ করিতেন, এই প্রশ্ন স্বতঃ আমাদের মনে উদয় হয়। ইহার উত্তরে তিলক মহোদয় একটী মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অঙ্গিরাগণ উত্তরমেরুবাসী ছিলেন। কারণ, তথার কোন স্থানে নয় মাস ও কোন স্থানে দশ মাস আমাদের মত দিনরাত্রি হয়, এবং অবশিষ্ট সময়ে দীর্ঘ রাত্রি বর্ত্তমান থাকে। অতএব নয় মাস দিনরাত্রিযুক্ত স্থানে অবস্থিত নবগ্বগণের নয় মাসে সাংবৎসরিক যজ্ঞ এবং দশমাস দিনরাত্রিযুক্ত স্থানে অবস্থিত দশগ্বদিগের দশমাসে ঐ যজ্ঞ সমাধা করিতে হইত।

যদিও সায়ণ নবগ্বদিগকে নয় মাস যজ্ঞকারী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ঋগ্বেদে—নবগ্বগণ

দশমাসব্যাপী যজ্ঞ করিতেন বলিয়া বর্ণনা দেখিতে পাই (১১)।

পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ পশু-পালন যুগের লোক ছিলেন বলিয়া, ইন্দ্রকে গাভী উদ্ধারের জন্য আহ্বান করিতেন। তখন বৃষ্টির তেমন আবশ্যকতা না থাকায়, ইন্দ্র বৃত্রবধে আহূত হইতেন না। বৃত্রবধে মরুৎগণ ইন্দ্রের সহায়। এই প্রাচীন কালে মরুৎগণের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। ইন্দ্র এক্ষণে গাভী, উষা, সূর্য্য এবং অর্ক উদ্ধার করিতেছেন। গাভী পশুপালন কালের প্রধান পশু; যদিও ঋগ্বেদে একস্থলে গাভী, অশ্ব ও বহুমূল্য ধনে পণিদিগের পর্ব্বত পূর্ণ বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই, কিন্তু অপর সকল স্থলে কেবল গাভীরই উল্লেখ আছে। অতএব অঙ্গিরাদিগের সময়ে অশ্ব আর্য্যদিগের গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে গণিত হয় নাই মনে হয়। ঋগ্বেদ এইকালের বহু পরে রচিত হইয়াছিল; এজন্য ঋগ্বেদের কালের কোন ঋষি অশ্বের নাম ভ্রমক্রমে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। আর একটী কথা। অর্ক বা মন্ত্র উদ্ধার করিবারও উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, পশু-পালনের কাল হইতেই মন্ত্র বা স্তোত্র রচনা আরম্ভ হইয়াছে। উহারাই বোধ হয় নিবিদ নামে অভিহিত হইত।

সূর্য্য যখন মকর ক্রান্তির নিকটে গমন করে, তখন রাত্রির পরিমাণ বাড়িয়া যায়; সূর্য্য অনেক দক্ষিণে চলিয়া যায় বলিয়া তাহার তেজ অত্যন্ত কমে; উষাকাল কুয়াশায় আবৃত হয় বলিয়া উষা ফুটিয়া উঠে না; হিম পড়িতে থাকে, তাহাতে বৃক্ষ পত্রশূন্য হয়। পৃথিবীর কোন-কোন স্থলে সেই সময়ে সূর্য্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না। অঙ্গিরাগণ পৃথিবীর সেইরূপ কোন দেশে অবস্থান করিতেন, যে স্থানে শীতকালে সূর্য্য কিছুকাল অন্তর্হিত হইত। কারণ ঋগ্বেদের মধ্যে ইহাও বর্ণিত আছে যে, বৃহস্পতি যখন গো উদ্ধার করিলেন, দেবগণ তখন রাত্রিতে অন্ধকার এবং দিবসে আলোক স্থাপন করিলেন; অর্থাৎ দিন-রাত্রির বিভিন্নতা উৎপন্ন হইল। (১২)

উষাকাল হইতেই আর্য্যগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতা-দিগকে আহ্বান করিতেন। সূর্য্য উদিত হইলে যজ্ঞ আরম্ভ হইত। অতএব যে কালে উষা ও সূর্য্য দেখা যাইত না, সে কালে যজ্ঞ বন্ধ থাকিত। অঙ্গিরাগণ বোধ হয় এই কালে পণিদিগের নিকট হইতে গাভী উদ্ধারে বহির্গত হইতেন। এই যুদ্ধযাত্রায় কুকুর তাঁহাদের অগ্রগামী হইত এবং তাঁহারা অগ্নি দ্বারা পণিদিগের বাসস্থান দগ্ধ করিতেন। পণিগণ দক্ষিণদিকে বাস করিত—কারণ, সূর্য্য দক্ষিণদিকে গমন করিলেই অপহৃত হইত। ঋগ্বেদের এক স্থলে, দক্ষিণা দানে লোকে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া স্বর্গে যাইতে পারে—এইরূপ বর্ণিত আছে। দক্ষিণা শব্দ দান ও দক্ষিণদিক—দুই বুঝায়। যখন সূর্য্য দক্ষিণদিক হইতে আগমন করে, তখন লোকে যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণাদান করিত। বর্ত্তমান কালে সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইলে, মুক্তিস্নান করিয়া লোকে ব্রাহ্মণদিগকে দান করে। এই সকলের মূলে, ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ কোন-কোন ঋষি সূর্য্য ও চন্দ্রকে এরূপ অবস্থায় মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা

---

(১১) অনূনোৎ। অত্র। হস্তযতঃ। অদ্রি। আর্চন্। যেন। দশ। মাস। নবগ্বঃ। ঋতং। যতী। সরমা। গাঃ। অবিন্দৎ। বিশ্বানি। সত্যা। অঙ্গিরাঃ। চকার। ঋগ্বেদ, ৫.৪৫।৭

ধিয়ং। বঃ। অপ্সু। দধিষে। স্বঃসাং। যয়া। অতরন্। দশ। মাসঃ। নবগ্বাঃ। অয়া। ধিয়া। স্যাম। দেবগোপা। অয়া। ধিয়া। তুতুর্যাম। অতি। অংহঃ॥ ঋগ্বেদ, ৫ ৪৫ ১১

অর্থঃ—এই যজ্ঞে হস্তস্থিত প্রস্তর (অর্থাৎ সোমরস বাহির করিতে ব্যবহৃত নোড়া) শব্দ করিতেছে। যাহার দ্বারা (অর্থাৎ সোমের দ্বারা) নবগ্বগণ দশমাস পূজা করিতেন। যজ্ঞে গমনকারিণী (অর্থাৎ যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিতে গমনকারিণী) সরমা গো সকলের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল; অঙ্গিরাগণ (গো সকলের দ্বারা) সকল সত্য (সৃষ্টি) করিয়াছিলেন। হে দেবগণ! তোমাদিগের স্বর্সাধীকে জলের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলে। যে (ধী) দ্বারা নবগ্বগণ দশ মাস উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ধী দ্বারা (আমরা) রক্ষকদেবতা হইব। এই ধী দ্বারা পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইব।

(১২) অভিশ্যাবং ন কৃশনেভি রশ্বং নক্ষত্রেভিঃ পিতরো দ্যামপিংশন্।
রাত্র্যাং তমো অদধুর্জ্যোতিরহন্ বৃহস্পতির্ভিনদদ্রিং বিদদ্ গাঃ॥
১০।৬৮।১১

অর্থঃ—বৃহস্পতি (যখন) পর্ব্বত ভগ্ন করিয়াছিলেন ও গোলাভ করিয়াছিলেন, (তখন) পিতা সকল রাত্রিতে অন্ধকার ও দিবসে জ্যোতিঃ রক্ষা করিয়াছিলেন; কপিলবর্ণ অশ্বকে যেমন (লোকে) স্বর্ণ আভরণ দ্বারা (অলঙ্কৃত করে) সেইরূপ নক্ষত্র সকল দ্বারা দিব্যলোক অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ও তাঁহাদের বংশধর ব্রাহ্মণগণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র, এইরূপ যুক্তি অবস্থান করিতেছে। অঙ্গিরা ঋষিগণ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবদ্বয়ের সাহায্যে মকরক্রান্তিতে অবস্থিত সূর্য্যকে পণিদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচিত হইত। (১৩) সেইরূপ যখন সূর্য্য স্বর্ভানু দ্বারা আবৃত হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছিল, তখন অত্রি ও অত্রিপুত্রগণই মন্ত্রদ্বারা তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেন, অন্য কেহ সমর্থ ছিল না, এইরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। (১৪) অতএব গ্রহণকালে অত্রিবংশীয় ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র।

ঋগ্বেদের যুগে দক্ষিণ হইতে সূর্য্য উঠিলে যে যজ্ঞ হইত, তাহা প্রাচীন অঙ্গিরা ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত যজ্ঞ বলিয়াই অনুমান করি। ঋগ্বেদের কালে আর্য্যগণ ভারতে থাকায় মকরক্রান্তিতে সূর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হইতে দেখেন নাই। বোধ হয় সেইকালে ঋষিগণ মনে করিতেন, অঙ্গিরাগণ সূর্য্যকে পণিদিগের পর্ব্বত হইতে উদ্ধার করায় ও পণিদিগের বল নামক দানব নষ্ট হওয়ায়, সূর্য্য দক্ষিণদিকে গমন করিলেও আর আবদ্ধ থাকেন না। শীতকালের যজ্ঞে যে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা, আমরা শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে জানিতে পারি।

And during the following year he performs the animal sacrifices of the seasons: Six (victims) sacred to Agni in the Spring; 6 to Indra in the summer; 6 to Parganya or to Maruts, in the rainy season; Six to Mitra and Varuna in the autumn; 6 to Indra and Vishnu in the winter, and 6 to Indra and Brihaspati in the dewy season,—Six seasons are a year. XIII, 5, 4, 28

অঙ্গিরা-ঋষিবংশে দশমাসব্যাপী যজ্ঞ হইবার আর এক কারণ আছে মনে করি। দেখা গিয়াছে, অঙ্গিরাগণ পশুপালন যুগের ঋষি। তখন কৃষিকার্য্য ছিল না বলিয়া, ঋতুদিগের প্রতি মনুষ্যের তেমন লক্ষ্য ছিল না। তিথি, পক্ষ, মাস সেকালে চন্দ্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বুঝা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, মনুষ্য পশুপালন-যুগেই আপনাদের সন্তান ও গাভীর বৎস কত দিন গর্ভে অবস্থান করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির করিয়াছিল। সেই সময়টি দিন, পক্ষ ও মাস হইতে বিভিন্ন বলিয়া একটি একক (বা Unit) রূপে গৃহীত হইয়াছিল। এইরূপে 'দশমাস' (১৫) সেইকালে সংবৎসর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সংবৎসর শব্দটি সংবৎস হইতে উৎপন্ন। যথা—

যৎ। সংবৎসং। ঋভবঃ। গাং। অরক্ষং। যৎ। সংবৎসং। ঋভবঃ। মাঃ। অপিংশন্॥ ঋগ্বেদ, ৪.৩৩।৪

সংবৎসং সংবসন্তি ভূতানি যস্মিন্ ইতি সংবৎসঃ সংবৎসরঃ ইতি সায়ন।

---

(১৩) আবিঃ। অভূৎ। মহি। মাঘোনং। এষাং। বিশ্বং। জীবং। তমসঃ। নিঃ। অমোচি। মহি। জ্যোতিঃ। পিতৃভিঃ। দত্তম্। আ। অগাৎ। উরুঃ। পন্থাঃ দক্ষিণায়াঃ। অদর্শি। ঋগ্বেদ, ১০।১০৭।১

অর্থঃ—ইহাদিগের ইন্দ্র সম্বন্ধীয় মহৎ (জ্যোতিঃ) বিশ্বজীবকে অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পিতাদিগের দ্বারা দত্ত (অর্থাৎ অঙ্গিরাদিগের দ্বারা) মহৎ জ্যোতিঃ (অর্থাৎ সূর্য্য) আসিলেন ; ; দক্ষিণার মহৎ পথ দেখা দিল।

(১৪) গ্রাব্ণঃ। ব্রহ্মা। যুযুজানঃ। সপর্যন্। কীরিণা দেবান্। নমসা। উপশিক্ষন্। অত্রিঃ। সূর্য্যস্য। দিবি। চক্ষুঃ। আ। অধাৎ। স্বর্ভানো। অপ। মায়াঃ। অঘুক্ষৎ॥ ৫.৪০.৮

যং। বৈ। সূর্যং। স্বর্ভানুঃ। তমসা। অবিধ্যৎ। আসুরঃ।

অত্রয়ঃ। তম্। অনু। অবিন্দন্। নহি। অন্যে। অশক্নুবন্॥ ঐ।৯

অর্থঃ—অভিযুত সোমের সহিত স্তোত্র সংযুক্ত করিয়া পূজা করতঃ, দেবতাদিগকে নমস্কারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, অত্রি সূর্য্যের জ্যোতিঃ দিব্যলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন (এবং) স্বর্ভানুর মায়া নিবারণ করিয়াছিলেন।

আসুর স্বর্ভানু যে সূর্য্যকে অন্ধকার দ্বারা আবৃত করিয়াছিল, তাহাকে (অর্থাৎ সূর্য্যকে) অত্রিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যে সমর্থ হয় নাই। [বোধ হয়, অত্রিগণ পরে সূর্য্যলোকে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এখানে এইরূপ অর্থও প্রকাশ করিতেছে।]

(১৫) এব। ত্বং। দশমাস্য। সহ। অব। ইহি। জরায়ুণা।
ঋগ্বেদ, ৫।৭৮.৮

অর্থঃ—হে দশমাস অবস্থানকারী (শিশু), সেইরূপ তুমি জরায়ু সহিত বহির্গত হও।

দশ। মাসান্। শশয়ানঃ। কুমারঃ। অধি মাতরি।

নিঃ ঐতু। জীবঃ। অক্ষতঃ। জীবঃ। জীবন্ত্যাঃ। অধি॥ ঐ ৯

অর্থঃ—মাতার উপর দশমাস শয়ান আছে যে কুমার (সে) বহির্গত হউক। অক্ষত জীব জীবিতা জননী হইতে (বহির্গত হউক)।

শিশু গর্ভে দশমাস বাস করিয়া যখন বহির্গত হয়, তখন সে বৎস নাম প্রাপ্ত হয়। কারণ সে এক্ষণে এক বৎসর বয়স্ক। যতগুলি দশমাস সে জীবিত থাকিবে, তাহার বয়সও তত বৎসর হইবে। আমাদের মনে হয়, গর্ভের দশমাস গণনা হইতেই পশুপালন কালের বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল। অঙ্গিরাগণ সেইজন্য দশমাসব্যাপী যজ্ঞকে সংবৎসর যজ্ঞ মনে করিতেন। প্রাচীন কালের ল্যাটিন জাতিদিগের বৎসরও দশমাসব্যাপী ছিল। সেইজন্য তাহাদের শেষ মাসের নাম December বা দশম মাস। যেমন তিথিদিগের নাম সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, মাসদিগের নামও সেইরূপ সংখ্যা দ্বারা অভিহিত হইয়াছিল মনে করি। ল্যাটিনদিগের মধ্যে তাহাই দেখিতে পাই। সেই প্রাচীন কালের যজ্ঞ, চন্দ্রের অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হিসাবে হইত (১৬)। সূর্য্যের সহিত যজ্ঞের সংযোগ বোধ হয় আর্য্যদিগের মধ্যে অঙ্গিরাগণই প্রথম স্থাপন করেন। তাঁহারা সূর্য্যের মকর-ক্রান্তি হইতে উত্তরায়ণের সময় একটি যজ্ঞের প্রথম সৃষ্টি করেন। কারণ, তাঁহারা এই সময়েই সূর্য্যকে লাভ করিয়াছিলেন উক্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় 'দশ' একটি Unit বা একক হওয়ায়,আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে Decimal notation উৎপন্ন হইয়াছিল। পশুপালন কালেই এই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রায় সকল আর্য্য-ভাষায় দশ হইতে শত সংখ্যার মিল দেখা যায়; অতএব আর্য্যগণ সেইকালে একত্র ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

সংস্কৃত—দশন্; পারসিক—দহ; ল্যাটিন—Decem; গ্রীক—Deka; এংগ্লো স্তক্সন—Tien, Tyn, Tig; জারমান—Zehn; লিথুনিয়ান—Deszimtis; রুসিয়ান—Desiat (*e*); গেলিক—Deich; ডেনিস—Ti; আইসল্যাণ্ড—Tiu, Tigr।

'দশ' সংখ্যাবাচক শব্দ দিশ বা দিক্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে প্রমাণ করা যায়। দশ সংখ্যার পর আর এক দশ সংখ্যা যোগ দিলে দ্বিদশ বা বিংশ, আর এক দশ যোগ দিলে ত্রিদশ বা ত্রিংশ, এইরূপে শত সংখ্যা পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মূলে দশ রূপ একক যে বর্ত্তমান তাহাতে সন্দেহ থাকে না। শত সংখ্যা পর্য্যন্ত অনেক আর্য্য ভাষায় সমান।

সংস্কৃত—শতং; ল্যাটিন—Centum; গ্রীক—*é*-Katon = One-Hundred; জারমান—Hund-ert; ইংরাজী—Hund-red; লিথুনিয়ান—Simtas; গথিক—Hunda।

[অনেক স্থলে হ = শ; Latin ভাষায় C = শ; গ্রীক K = ল্যাটিন C]।

আমাদের মনে হয়, পশুপালন যুগে যে সময়কে বৎসর বলা হইত, তাহার সহিত ঋতুক্রমে বৎসরের কোন সম্বন্ধ ছিল না বলিয়া, তাহাদের দশম মাসের পর প্রথম মাস হইত এবং বিভিন্ন বৎসরের প্রথম মাস বিভিন্ন ঋতুতে পড়িত। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কালে মুসলমানদিগের মাস এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই প্রাচীন যুগে যে সৌর বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাই না। পরবর্ত্তী ঋগ্বেদের যুগে সৌর বৎসর তেমন স্থির নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। ঋগ্বেদের যুগে ঋভুগণ সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পরে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

পশুপালনের পরে যখন কৃষিকার্য্য আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ করে, সেই সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টি জলবায়ুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কারণ, অকালে জমিতে বীজ বপন করিলে শস্য ভাল হয় না। বিভিন্ন শস্যের জন্যও বিভিন্ন কাল নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল কালকে ঋতু আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল দেখিতে পাই। (১৭) আমাদের মনে হয়, পশুপালন কালে উৎপন্ন স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় ঋতু শব্দই পরবর্ত্তী যুগে শস্য বপন সম্বন্ধীয় কালে প্রযুক্ত হইয়াছিল। বৈদিক যুগে প্রত্যেক মাসকে ঋতু বলা হইয়াছে। (১৮) কৃষিযুগেই বারমাসে বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা ঋতুদিগের ক্রম দেখিয়া স্থির

(১৬) চিত্রয়স্তঃ পর্বণা পর্ব্বণা বয়ং। ১।৯৪৪

(১৭) দেবহিতিং জুগুপু র্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো ন প্রমিনস্ত্যেতে। ঋগ্বেদ, ৭।১০৩।৯

অর্থঃ—নেতাগণ দেববিধান রক্ষা করিলেন। দ্বাদশের (অর্থাৎ বৎসরের) ঋতুকে (তাঁহারা) হিংসা করেন না।

(১৮) যা দেবী পঞ্চ প্রদিশো যে দেবা দ্বাদশর্ত্তবঃ। অথর্ব্ববেদ, ১১।৮।২২

অর্থঃ—পঞ্চ প্রদেশের যে দেব, দ্বাদশ ঋতু দেব সকল।

হইয়াছিল। প্রত্যেক ঋতু যে দুই-দুই মাসব্যাপী তাহাও এইকালে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে এই সকল নির্দ্ধারণে ক্রম ছিল মনে হয়। যখন জলবায়ুর দিকে মানুষের লক্ষ্য নিপতিত হইল, তখন গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয় দেখিয়া, কোন প্রধান ঋতুর পুনরাবির্ভাব দ্বারা সেই ঋতুর নামে বৎসর প্রথম নাম প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদে দেখা যায়, হিম ও শরৎ এই দুই ঋতুর নামের দ্বারা বৎসর বুঝাইত। (১৯) ইহার কারণ এই যে, সেই-সেই ঋতুর পুনরাগমনে কৃষি-বৎসর পূর্ণ হয়—এই জ্ঞান প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল। হিম ও শরৎ নামের মধ্যে প্রথম হিম নামেই বৎসর বুঝাইয়াছিল, তৎপরে শরৎ শব্দ দ্বারা বৎসর বুঝাইয়াছে অনুমান করি। দেখা গিয়াছে, পশু-পালন যুগে অঙ্গিরা ঋষিগণ হিম ঋতুতে গাভী উদ্ধারে বহির্গত হইতেন এবং পণিদিগের নিকট হইতে গাভী জয় করিয়া আনিতেন। পরবর্ত্তী কৃষিযুগে যে এই প্রথা তিরোহিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। এতদ্ভিন্ন অঙ্গিরা-গণ এই কালে একটি যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াও ইহাকে প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণেই মনে হয়, প্রথম হিম শব্দ দ্বারা কৃষি বৎসরের নামকরণ হইয়াছিল। কৃষি-কার্য্যের ক্রমোন্নতির সহিত হিম শব্দের পরিবর্ত্তে শরৎ ঋতুর নাম বৎসরার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। কারণ শরৎকাল কৃষি-সম্বন্ধীয় একটি বিশেষ কাল। কিম্বা ইহাও হইতে পারে, কোন স্থানের আর্য্যগণ হিম এবং অপর স্থানের আর্য্যগণ শরৎ শব্দ দ্বারা বৎসরের নাম রাখিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে আমরা বৎসর অর্থে আর একটি শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখি। তাহা 'সমা'। (২০) সম শব্দের বহুবচনে সমা উৎপন্ন। ইহার অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমান-সংখ্যক দিবসযুক্ত মাসের সমষ্টি। আরো যে সকল ঋতু একটি সমাতে বর্ত্তমান ও যে ক্রমানুসারে বর্ত্তমান, অপরটিতেও সেগুলি সেই সংখ্যা ও সেই ক্রমে বর্ত্তমান। অতএব 'সমা' শব্দ দ্বারা দ্বাদশ মাসযুক্ত কৃষি-বৎসরের ঠিক নামকরণ হইয়াছে। পশুপালনযুগের 'দশমাস'-ব্যাপী 'সংবৎসর' নামটিও ক্রমে কৃষিযুগের বৎসরে আরোপিত হইয়াছে। কারণ কৃষিকর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির সহিত 'দশমাস'ব্যাপী বৎসরের যুক্তিযুক্ততা অনুভূত হইত না।

ঋগ্বেদের যুগ যে কৃষিযুগের আদি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষিযুগে মনুষ্য ভূমির আদর বুঝিয়াছে। সেইজন্য এই কালে দেশ জয়, জল জয়, খাল কাটা, অরণ্য দগ্ধ করা প্রভৃতি কার্য্যই প্রধান ছিল। ইন্দ্র ও অগ্নি এই সকল কার্য্যে সোমাভিষবকারীর প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি যুদ্ধের দেবতা ও দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। আর্য্য-জাতি যখন দেশজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন পণি, বৃত্র, মুর, যাতুধান, রাক্ষস, কিমীদিন্, দাস প্রভৃতি জাতি তাঁহা-দিগের শত্রু ছিল (২১)। আর্য্যগণ আপনাদিগকে আয়ু, নহুষ, মনু প্রভৃতির সন্তান বলিতেন। সেইজন্য আয়ব, নাহুষ, মানব বা মানুষ শব্দ দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইত। (২২) বৃত্র দনুবংশে জন্মিয়াছিল। দেবতাগণ সুদানব ছিলেন। গ্রীক ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, প্রাচীন কালে তাহাদের মধ্যে এক জাতিকে দনৈ বলিত এবং এসিয়া-মাইনরে অতি প্রাচীন কালে আয়োনিয়ান জাতি ছিল। ঋগ্বেদের আয়ু-বংশ গ্রীক-দিগের মধ্যে আয়োনিয়ান নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর দনৈগণ বেদের দনুর বংশ বলিয়াই বোধ হয়। মনে হয়, সেকেন্দার সাহের জয়ের সময় হইতে গ্রীকগণ ভারতে যবন নামে অভিহিত হইয়াছে।

(১৯) শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ। ঋগ্বেদ, ২৩৩,২

অর্থঃ—ভেষজদিগের সহিত শত হিম ব্যাপ্ত কর।

মাড়িঃ শরদ্ভির্দুরো বরন্ত বঃ। ঋগ্বেদ, ২।২৪।৫

অর্থঃ—মাস সকলের দ্বারা, শরৎ সকলের দ্বারা, তোমাদের দ্বার বিস্তার কর।

(২০) সমানাং মাস আকৃতি। ঋগ্বেদ, ১০৮৫।৫

অর্থঃ—মাস বৎসরদিগের অংশ বা উৎপাদক।

ইন্দ্রঃ সীতাংনিগৃহ্ণাতু তাং পুষা নুযচ্ছতু।

সা নঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরামুত্তবাং সমাং॥ ঋগ্বেদ, ৪৫৭৭

অর্থঃ—ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, তাহাকে পুষা অনুগমন বা নিয়মিত করুন। সেই পয়স্বিনী (গাভী-সদৃশা সীতা) পর-পর বৎসরকে আমাদিগের নিমিত্ত (শস্যরূপে) দোহন করুন।

(২১) মিথুনাদহ যাতুধানা কিমীদিনা। ১০.৮৭.২৪

দহ সহমুরান্ ক্রব্যাদে। ১০।৮৭।১৯

হিংস্রং রক্ষাংসি। ১০.৮৭.৯

(২২) সঃ। পূর্ব্বয়া। নিবিদা। কব্যতা। আয়োঃ। ইমাঃ। প্রজাঃ। অজনয়ৎ। মনূনাং। ১.৯৬.২

মনুষঃ- ১০।১০৪।৪ মানুষেষু—১৫৮৬

কৃষি কার্য্যের আদিতে যখন ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল, তখন চন্দ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে ৩৬০ দিনে বৎসর, চন্দ্রের দ্বারা উৎপন্ন ১২ মাসের ঠিক সমান নহে। প্রত্যেক পাঁচ বৎসরে চন্দ্র সম্বন্ধীয় একটি অধিক মাস পরিলক্ষিত হইত। ঐ মাসটি পঞ্চম বৎসরে উৎপন্ন হইয়া সপ্তম ঋতু বা ত্রয়োদশ মাস আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। (২৩) যে পাঁচ বৎসরে এইরূপ সামঞ্জস্য করা হইত তাহাদের প্রত্যেকে একটি নাম পাইয়াছিল। যথা—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, ইদ্বৎসর, ও বৎসর। (২৪) সংবৎসরের যাহা প্রথম চান্দ্র-মাস হইতে পারিত, উহাই বৎসরের ত্রয়োদশ মাস বলিয়া গৃহীত হইত। শতপথ ব্রাহ্মণের ৬।২।২।১৮ অংশে এই বিষয় লইয়া বিচার করা হইয়াছে। জুলিয়াস এজ্জেলিং তাহার অনুবাদ ঠিক করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে করি। পাঠক এই অংশ পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন, সেইকালে ঋষিগণ প্রত্যেক ৫ম বৎসরে ফাল্গুন মাসের ১ম দিনে একটি পূর্ণিমা ও শেষ দিনে আর একটি পূর্ণিমা প্রাপ্ত হইতেন। এই চান্দ্র-মাসটিকেই ত্রয়োদশ মাস ধরা হইত।

যদিও চান্দ্র-বৎসরের সহিত ৩৬০ দিনে বৎসরের মিল করা হইয়াছিল, কিন্তু চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরের সামঞ্জস্য বিধানের কোন স্পষ্ট কথা দেখিতে পাই না। এমন কি বৈদিক যুগে সৌর বৎসরের উল্লেখই দেখিতে পাই না। ঋগ্বেদে চন্দ্রকেই ঋতুকারী বলিয়া বর্ণিত দেখি এবং সূর্য্য চন্দ্রের তেজ লাভ করিয়াই জ্যোতিষ্মান হয়—এইরূপ জ্ঞান দেখিতে পাই। বৈদিক যুগে চন্দ্রের যে উচ্চ স্থান ছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের বেদব্যাখ্যাকারগণ ঠিক বুঝেন নাই। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। যদিও চন্দ্রের জ্যোতিঃ লাভ করিয়াই সূর্য্য জ্যোতিষ্মান হয়—এইরূপ কল্পনা করা হইত, কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলে চন্দ্র ম্লান হয়, ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। (২৫)

পূর্ব্বাপরং চরতো মায়ৈ যতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরিযাতো অধ্বরম্।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ॥

—ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।১৮।

অর্থঃ—পর্য্যায়ক্রমে গমনকারী সূর্য্য ও চন্দ্র শিশুসদৃশ ক্রীড়া করিতে-করিতে যজ্ঞে গমন করেন; ইঁহাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ সূর্য্য) ভুবন সকল দর্শন করেন, অন্য (চন্দ্র) ঋতু সকল করিয়া পুনঃ-পুনঃ জন্মলাভ করেন।

সোম যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ পরিবৎসর কালীন বাক্য স্তোত্র করিয়া উচ্চারণ করিতেছেন।

---

(২৩) সাকং জানাং সপ্তথমাহু রেকজং ষড়িদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ॥

ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।১৫

অর্থঃ—একত্র উৎপন্নদিগের ৭ম একাকী জন্মিয়াছে বলে। ছয় জন যমজ, ঋষি ও দেবজাত; তাহাদের স্বরূপ বিভিন্ন কালে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিষ্ঠাতার জন্য বিবিধ রূপযুক্ত হইয়া চলিয়াছে।

[এই ঋকে ৬টী ঋতু যমজ (অর্থাৎ দুই দুই মাসে এক ঋতু হয়) বলা হইল। ৭ম একাকী অর্থাৎ একমাসব্যাপী।]

বেদ মাসো ধৃত ব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে॥

ঋগ্বেদ, ১।২৫।৮

অর্থঃ—ব্রতধারী (বরুণ) প্রজাযুক্ত দ্বাদশ মাস জানেন। যাহা (মাসদিগের) নিকট জন্মায় (অর্থাৎ অধিক মাস) তাহাও জানেন।

অহোরাত্রৈর্বিমিতং ত্রিংশদঙ্গং ত্রয়োদশং মাসং যো নির্মিমীতে তস্য।

অথর্ব্ববেদ, ১৩।৩।৮

অর্থঃ—৩০টি অঙ্গ যুক্ত ত্রয়োদশ মাস অহোরাত্র দ্বারা পরিমিত, (তাহাকে যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার............।)

(২৪) ইদা বৎসরায় পরিবৎসরায় সংবৎসরায় কৃণুতা বৃহন্নমঃ।

অথর্ব্ববেদ, ৬।৫৫।৩

অর্থঃ—ইদাবৎসরকে, পরিবৎসরকে, সংবৎসরকে বৃহৎ নমস্কার কর।

Thou art Samvatsara,—thou art—Parivatsara,—thou art Idâvatsar,—thou art Idvatsara,—thou art Vatsara,—May thy dawns prosper.

শত পথ ব্রাহ্মণ, ৮।১।৪।৮

সংবৎসরস্য তদহঃ পরিষ্ঠ যন্মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব।

ঋগ্বেদ, ৭।১০৩।৭

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রত ব্রহ্মকৃণ্বন্ত পরিবৎসরীণং।

ঋগ্বেদ, ৭।১০৩।৮

অর্থঃ—হে ভেকগণ! সংবৎসরের সেই দিন আসিয়াছে যে (দিনে) প্রাবৃট হইয়াছিল।

(২৫) বৈশ্বানরং কবয়ো যজ্ঞিয়াসোঽগ্নিং দেবা অজনয়ন্নজুর্যম্।
নক্ষত্রং প্রত্নমমিনৎ চরিষ্ণু যক্ষস্যাধ্যক্ষং তবিষং বৃহন্তম্॥

ঋগ্বেদ, ১০।৮৮।১৩

অর্থঃ—কবি, যজ্ঞার্হ, দেবগণ অজর বৈশ্বানর অগ্নিকে জন্মাইয়াছেন। দর্শনীয়দিগের মধ্যে অধ্যক্ষ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), প্রাচীন, ক্ষমতাবান্‌দিগের মধ্যে বৃহৎ নক্ষত্রকে (অর্থাৎ চন্দ্রকে) গমনশীল (অগ্নি) ম্লান করেন।

অয়মকৃণোৎ উষসঃ সুপত্নীরয়ং সূর্যে অদধাজ্জ্যোতিরন্তঃ।
অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু ত্রিতেষু বিন্দদমৃতং নিগূঢ়ম্॥
—ঋগ্বেদ, ৬।৪৪।২৩।

অর্থঃ—ইনি (অর্থাৎ সোম) শোভন পতিযুক্ত ঊষাদিগকে করিয়াছেন। ইনি সূর্য্যের মধ্যে জ্যোতিঃ স্থাপন করিয়াছেন; তিনপ্রকার রত্নবিশিষ্ট ইনি দিব্যলোকের তিন শোভনীয় স্থানে স্থাপিত অমৃতকে লাভ করিয়াছেন।

বারমাসে বৎসর হয়—ঋগ্বেদের যুগে স্থির হইয়াছিল; ঐ বারমাসের নাম কিন্তু টীকাকারদিগের সাহায্যে ঋগ্বেদ পাঠ করিলে দেখিতে পাই না। ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে মাসকেই ঋতু বুঝাইত; কারণ, চন্দ্রের দ্বারা মাস হইত এবং ঋতুও হইত দেখান গিয়াছে। দুই-দুই মাসে একটি ঋতু হইত—ঋগ্বেদে ইহাও স্থির হইয়াছে। ৬টি ঋতুর মধ্যে ৫টি ঋতুর নাম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হই এবং অথর্ব্ববেদে ৬টির নামই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২৬) অথর্ব্ববেদে ২৮টি নক্ষত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। টীকাকারদিগের সাহায্যে ঋগ্বেদ পাঠ করিলে একটি-দুটি ছাড়া নক্ষত্রদের নাম পাওয়া যায় না। এই সকল বিষয় পরে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

(২৬) গ্রীষ্মো হেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ শরদ্ বর্ষাঃ স্বিতে নো দধাত। অথর্ব্ববেদ, ৬.৫৫.২।

মহানিশা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৪৯)

এই ঘটনার পর দু'তিন দিন চুপচাপ কাটিয়া গেল। সে দিনের সেই নৈশ-আলোচনা যে খোলা জানালার মধ্য দিয়া, সম্ভবতঃ জানালার নিকট অবস্থিতা ধীরার কাণে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা নির্ম্মল বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া লজ্জায় সে মরিয়া গেল। সে দিনের সেই আলোচনায় সংসারের গতি সম্বন্ধে ধীরা যে একটা গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছে, এবং ইহা তাহার স্বার্থলেশহীন-মহদন্তঃকরণ যে অসুখে ভরাইয়া তুলিয়াছে। ইহাতে কোনই সংশয় নাই। ধীরা বুঝিয়াছে, সে অন্ধ, সে নির্ম্মলের ন্যায় একজন চক্ষুষ্মানের গলগ্রহ! তাই নিজেকে সে বলি দিতে প্রস্তুত; কিন্তু নির্ম্মল'তো কই ধীরার নেত্রের কটাক্ষ-লাভের জন্য একটুও লালায়িত নয়! অন্ধত্ব তাহার নিকট দুঃখের বিষয় তো বটেই; কিন্তু এ ভিন্ন নিজের পক্ষ হইতে আর তো কোন অভাবই সে কখন এজন্য অনুভব করে নাই! সে এই কথা কেমন করিয়া আজ ধীরার নিকট প্রমাণ করিবে? বিশেষতঃ এই ক'দিন ক্রমাগত এই সকল কথা তোলাপাড়া করিতে-করিতে তাহার এমনও ধারণা জন্মিয়াছে যে, এখন যদি অপর্ণা আসিয়া তাহার সেই রাজরাজমোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহা হইলে নির্ম্মল হয় ত সভয়ে সেই লোক-বিমোহিনী মূর্ত্তি হইতে দৃষ্টি ছিনাইয়া লইয়া,—তাহার এই বক্ষলীনা ক্ষুদ্র মুখটিকেই বিপুল করুণায় বক্ষে চাপিয়া ধরে। ধীরার প্রতি তাহার প্রেম যে তুচ্ছ নয়, ইহা বুঝিয়া নিজের উপরে সে কিছু তুষ্টিই বোধ করিল! এই ধীরার চেয়ে তাহার আপনার বলিতে আজ আর কে আছে? সে তাহার প্রিয়া, প্রিয়তরা, প্রিয়তমা! তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহার সংসার,—তাহার সমাজ,—তাহার জীবন।

আবার একদিন ধীরা ঐ কথা পাড়িল। বলিল—"তুমি অপর্ণাকেই কেন বিয়ে করো না?"

এই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি শুনিয়া নির্ম্মল কিছুক্ষণ স্তম্ভিত রহিল; তার পর কাতর হইয়া কহিল—"আজকাল এ সব কথা তুমি বারেবারে কেন বলচো ধীরা? আমি কি তোমার কাছে কিছু দোষ করেছি?"

ধীরা তাহার তেমন কণ্ঠস্বরেও বিচলিত হইল না;

কহিল—"কেন যে বলি, জানি নে;—কিন্তু এই আমার মনের একমাত্র সাধ,—তুমিই বা কেন তা বিশ্বাস করতে পারবে না?"

"তোমায় ভালবাসিনে, এই তো?"

ধীরা এবার ক্ষণকাল পরে উত্তর করিল; সে মৃদুস্বরে কহিল—"না, না, আমার বিশ্বাস নয়। ভালবাস বলেই আমি তোমায় চিরদিন দুঃখ পেতে দিতে পার্ব্বো না;—আমার সে সহ্য হবে না।"

স্বামীর সহিত এমন পাকা গৃহিণীর মত গুছাইয়া কথা বলিতেও ধীরার আর একটুও বাধিল না।

নির্ম্মল আবার স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর কিছুক্ষণ পরে একটু সামলাইয়া লইয়া কথা কহিল; বলিল,—"তুমি কেন মনে করচো,—আর একটা বিয়ে করতে পেলেই আমি সুখী হব? কিসে তুমি মনে করচো,—তোমাতে আমার সুখ নেই? সুখ তো বাইরে নয়, আমার মনে;—আমি সুখী কি অসুখী, তা আমার চেয়ে কে বেশী জানবে। যতী যা বলেছে, সে সব ভুলে যাও,—সকল লোকের মন ঠিক এক রকম হয় না; স্থির জেনো, আমার মনে আর কোনই দুঃখ নেই।"

ধীরা অবিশ্বাস করিতে জানে না, কিন্তু এবার দ্বিধাগ্রস্ত হইল; সে গোপন করিতে জানে না;—দ্বৈধভাব প্রকাশ করিয়াই বলিল—"কিন্তু তুমি তো অপর্ণাকেই ভালবাস?"

এই সংসারের বহির্ভূতা, সর্ব্ববঞ্চিতা বালিকা—যাহাকে শিশুর চেয়ে বেশী কিছু মনে করিতে পারা যায় না, তাহার মুখে একেবারে এমন স্পষ্ট, এমন অকাট্য কথা শুনিয়া নির্ম্মল যেন ক্রমেই অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল। তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি করা দুঃসাধ্য হইতেছিল। কিন্তু সেও তো প্রতারক নয়। আশ্চর্য্য গোপন না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"অপর্ণার কথা তোমায় কে বলেছে? তাকে আমি ভালবাসি,—তুমি এ কথা কেমন করে জানলে?"

অতি মৃদুস্বরে ধীরা বলিল—"তোমারই মুখে শুনেছি।"

"আমার মুখে!"

"হাঁ—তোমার অসুখের সময় তুমি সর্ব্বদাই প্রলাপের মধ্যে 'অপর্ণা অপর্ণা' বলে চীৎকার করে উঠতে, আর—" ধীরা নীরব হইল। নির্ম্মল যে এই সময়টায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, তাহা চোখে না দেখিয়াও সে মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারিল। তাহাকে থামিতে দেখিয়া নির্ম্মল কোন মতে প্রশ্ন করিল "আর—?"

"বাবার কাছে তুমি বলেছিলে—দেশে তুমি একজনকে বিয়ে করতে বাগ্‌দত্ত; তুমি তাকে বিয়ে করো। এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে আমি বল্‌ছি,—আমি তাতে একটুও দুঃখিত হবো না,—আমি বরং তাতে অনেক বেশী সুখী হবো। আমরা দুজনে এক সঙ্গে থাকবো। সে আমার বোন হবে।"

তখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল কহিল—"ধীরা! আমি তোমার কাছে কোন কথা আর গোপন কর্ব্বো না। তোমার মত পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর কাছে যে লুকোচুরি করতে পারে, সে অতি পাষণ্ড। আমি অপর্ণাকে একদিন ভাল হয় ত খুবই বেসেছিলাম; কিন্তু তাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি বলে যত দুঃখ আমার হয়েছিল,—তাকে পাইনি ব'লে তার শতাংশের একাংশও আমার বোধ করি হয়নি। কিন্তু এখন? আমার যতদূর বিশ্বাস, আমি তোমায় এখন অপর্ণার চেয়ে কম ভালবাসিনে। বিশেষ—অপর্ণা এখন খুব সম্ভব বিবাহিতা, তার সম্বন্ধে এ সব আলোচনা করাই এখন আমাদের অন্যায়। আর যদি সে বিবাহিতা নাও হয়,—তথাপি আমি তাকে বিবাহ করতে কিছুমাত্র উৎসুক নই। আমার মনে আত্মসুখেচ্ছা বিন্দুমাত্র নেই—এ কথা তুমি আমার বৃথা গর্ব্ব মনে করো না। আমি কায়মনে তোমার সুখ চাই; তুমি বিশ্বাস করো—তাতেই আমি সুখী হবো।"

"কিন্তু তাতে আমার তো সুখ হবে না।"

"কেন বারেবারে এমন অন্যায় জেদ করচো ধীরা? আমার মনে এতে কত ব্যথা লাগে, তুমি তার কিছুই জানো না। আমি এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করবো না; তোমায় আজ সমস্ত স্পষ্ট করেই বলছি;—আমি একবার একজনের কাছে একপ্রকারে বিশ্বাসহন্তা হয়েছি, কিন্তু আমার এ পেশা নয়। বারবার এ একই পাপ আমার দ্বারা ঘটবে না। তোমার বাবা আমায় চিনতেন, তাই, ভিখারীকে রাজা করে দিয়ে গেছেন। তুমি আমায় চেনো না, তাই এমন কথা বারেবারে বল্‌চো।

ধীরা, তোমার স্বামী তত নরাধম নয়, এই বিশ্বাসটুকু তুমি রেখো।”

নির্ম্মল উঠিয়া চলিয়া গেল; তার পর ধীরার অনুমতি না লইয়াই মাল্লাদের ডাকিয়া বাড়ী ফিরিবার হুকুম দিয়া, উত্যক্তচিত্তে নদীর তীরে-তীরে খানিক ঘুরিয়া আসিল। ধীরার চিত্ত হইতে এই সাঙ্ঘাতিক চিন্তা কেমন করিয়া মুছিয়া ফেলিবে, ইহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না। একবার যতীশ্বরের উপর, একবার নিজের উপর ক্রোধ হইতেছিল। ধীরার উপরও একটু রাগ হইল,—কি এমন কথা সে বলিয়াছিল? সে যাহা ধরে, তাহা ছাড়ে না কেন?

(৫০)

সেদিন অমন স্পষ্ট করিয়া সব কথা বলিয়া নির্ম্মল নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়াছিল যে, তাহাকে বুঝিতে এর পর আর ধীরার পক্ষে অসুবিধা হইবে না। এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ ওইখানেই চুকিয়া গেল।

ধীরা আজকাল আর তেমন চিন্তাভারাকুল, ক্ষণ-চমকিত নয়। সে নিজেই আজকাল যেন তাহার স্বামীর মনের উপর গোয়েন্দা-গিরি করিবার জন্য অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ। সে বুঝিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে পরিবর্ত্তনের উচ্ছ্বাস বড় জোর করিয়াছে। সে পূর্ব্বেও তাহাকে যত্ন আদর করিত, এখনও করে। কিন্তু পূর্ব্বে যাহাতে প্রাণ ছিল না, এখন তাহা প্রাণময়। ধীরা বুঝিল—তাঁহার সেদিনের কথায় আতিশয্য-দোষ ঘটে নাই, সত্য-সত্যই তিনি তাহাকে ভালবাসেন এবং নিত্যই সে ভালবাসার বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে। ধীরা ক্লিষ্ট হইল, ভীত হইল, সুখী হইল না। ধীরা দেখে,—নির্ম্মল তাহার কাছে বসিলে সহজে উঠিয়া যায় না; বসে যখন, তখন এত কাছে বসে যে, তাহার নিশ্বাস-সুরভি তাহার অঙ্গস্পর্শ করে, তাহার দেহে তাহার দেহ স্পৃষ্ট হয়। তাহার আদর পূর্ব্বে বসন্ত-পবন-হিল্লোলের ন্যায় মাত্র ত্বক-স্পর্শী ছিল, এক্ষণে তাহার মধ্য দিয়া হৃদয়ের আবেগ-স্পন্দন, উচ্ছ্বাসময় কল-কল্লোল, শ্রুত হয়। থাকিয়া থাকিয়া সে আর তেমন বিমনা হয় না, দীর্ঘনিশ্বাস তাহার মধ্যে তেমন করিয়া কই জমিয়া উঠে না। রাত্রে আর সে গল্প করিতে তাহার শয্যাপ্রান্তে আশ্রয় না লইয়া প্রায়ই তাহার সঙ্কীর্ণ শয্যার একাংশ অধিকার করিয়া শুইয়া পড়ে,—অনেক রাত্রে, কোন দিন সে ঘুমাইবার পরেও উঠিয়া যায়। আরও ধীরা লক্ষ্য করিল,—পূর্ব্বে সে পুঁথির কথাই তাহার সহিত কহিত, এখন তা'ছাড়াও অনেক কথা কয়।

বজরা হেলিয়া-দুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, নদী চলিয়াছে, তীরের দৃশ্যাবলী অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হইতে-হইতে চলিয়াছে। নির্ম্মল কহিল—“আর আমাদের বাড়ী পৌছিতে দু'তিন দিনের বেশী দেরি নাই। ভয় হচ্ছে, বাড়ী গিয়ে এবার ভাজের আদরে আমায় না ভুলে যাও।”

সে এখন তাহার সহিত এই রকম সামান্য হাস্য-পরিহাসও করিয়া থাকে। পূজার দেবীর ক্রমেই প্রেয়সীর পদে অবনতি ঘটিতেছিল না তো?

ধীরা হাসিল,—ভোরের আলো লাগিয়া সারা রাত্রির জাগরণক্লান্ত তারকাটি যেমন হাসিয়া উঠে, তেমনই হাসিল। তার পর অন্য কথা পাড়িল, বলিল—“দাদা হঠাৎ যে এ রকম বিয়েটা করে ফেল্লেন?”

“ভগবান সুমতি দিয়েছেন।”

“কে জানে কেমন বউ!”

“বউকে—আলোকনাথের মেয়েকে আমি অনেক বারই দেখিছি। দেখতে মেয়েটি কিছুই ভাল নয়! তবে আসল যা—ত ভাল; মানুষ খুবই ভাল। তোমার দাদা এইবার সুখী হতে পার্ব্বেন।”

শুনিয়া ধীরা নীরবে মনে-মনে ভ্রাতার শুভকামনা করিল। পরে বলিল, “বউএর মুখ দেখে লোকে কত কি দেয়,—আমি তো বউ দেখ্‌তে পাবো না,—তুমি বৌদিকে আমার অলঙ্কারের মধ্যে সব চেয়ে যেখানি দেখ্‌তে ভাল,—সেইখানি আমার হয়ে দিও।”

“আমি কেন,—তুমি নিজেই দেবে—এই বলিয়া ব্যথিত নির্ম্মল অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে গেল। ধীরা আবার সেইরূপ রিক্ত হাসি হাসিয়া উত্তর করিল,—“সে একই কথা।”

নির্ম্মল বুঝিল,—ধীরা দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা আর দুজন নাই, এখন দুজনে এক হইয়াছে। এই কথাই সে জানাইল।

ছাদবিলম্বী কাচাবরণরুদ্ধ স্নিগ্ধ নীল আলোকে সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কামরাটি একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। সেই

আলোর অভাবে ধীরার ক্ষুদ্র শুভ্র মুখখানি পরীলোকের একটি নীল-পরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নির্ম্মল তাহার পাশে শুইয়া গল্প করিতে-করিতে পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে বারে-বারে সেই মুখখানি বিপুল স্নেহভরে চাহিয়া দেখিল। কাহার সাধ্য আছে যে, ইহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? আচ্ছা, একজন নর দুইজন নারীকে কি যথার্থই ভালবাসিতে পারে না? তা কেন পারিবে না। এক ব্যক্তি তার দুইটি ভাইকে, দুই জন বন্ধুকে তো ভালবাসিতে পারে; তবে কেন দুই,—না, বোধ হয় তা পারে না। কই আজকাল তো আর অপর্ণার মুখ তাহার চিত্তপটে তেমন সুস্পষ্ট নাই। পরস্ত্রী বলিয়া তাহার ধ্যানের প্রতিমাকে সে যে বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাই ধীরার এই কল্যাণীমূর্ত্তি তাহার হৃদয়াসনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

কথায়-কথায় দুর্ভাগ্যক্রমে, সেকালের সতীদাহের কথা উঠিল; নির্ম্মলের প্রপিতামহী স্বামীর সহিত বড় ঘটা করিয়া নাকি সহমরণে গিয়াছিলেন। সে কত বাদ্যভাণ্ড হইয়াছিল; পুষ্প-লাজ বর্ষিত, খৈ-কড়ির ছড়াছড়ি, দর্শকের হুড়াহুড়ি হইয়াছিল। সতীর সিঁথার সিন্দূর, সতীর চরণরেণুকণা পাইবার জন্য জন-সঙ্ঘের সে কাড়াকাড়ি থামান যায় না। এ গল্প নির্ম্মল বাড়ীতে শিশুকাল হইতেই শুনিয়া আসিয়াছে; যেমন-যেমন শুনিয়াছিল, ধীরার নিকট গল্প করিল। ইনি স্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু যখনই স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন, অমনি পুত্র সঙ্গে স্বামীর উদ্দেশে শ্মশানে আসিয়া সময়োচিত সজ্জা, ক্রিয়ানুষ্ঠানাদি সম্পাদন পূর্ব্বক স্বামীর বামে বসিয়া, তাঁহার চরণ-ধারণান্তর হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "বড় যে তফাতে রেখেছিলে!—এইবার কি হয়? সেখানে তো ছুট্‌কী সপত্নী যাচ্চে না, এখন যে আমারই সেবা খেতে' হবে!"

গল্প শেষ হইয়া গেল; নির্ম্মল চোখ মুছিল; ধীরা কিছু কহিল না, তাহার চোখে জলের রেখাও ছিল না। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বলো দেখি—আমি তোমার কোন্ কাজে লাগ্‌বো?" গল্প শুনিয়া যেন তাহার মনে আবার একটা বল আসিল।

নির্ম্মল বলিল—"ফের সেই কথা!"

"না না, তুমি আমায় বারণ করো না। ওগো আমায় বল্‌তে দাও গো, বল্‌তে দাও!—না বলে যে আমি থাক্‌তে পারিনে,—" বলিতে-বলিতে ধীরা বিছানার উপর অস্থির হইয়া উঠিয়া বসিল। নির্ম্মলও ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছিল; এই ব্যাকুলতাময় কাতরোক্তিতে তাহার মন যেন কেমন হইয়া গেল—সে আর তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া তার পর একটু শান্ত হইয়া কহিল,—"লোকে কেন বিয়ে করে?"

"ঘর-সংসার করবে বলে, ভালবাসবে বলে,—ভালবাসা পাবে বলে।"

"শুধু কি তাই? বইএর লেখকেরা তো লিখেছেন, সন্তানের জন্য বিয়ে করে।"

"তা বেশ তো।"

"তবে তুমি কেন আবার বিয়ে কর্‌বে না? তুমি তো জানো, আমার সন্তান হলে সে অন্ধ হতে পারে!" বলিয়াই সে আপনার কথায় আপনি শিহরিয়া উঠিল। স্বামী-পুত্রের এই সর্ব্বনাশ সাধন করিতেই কি এই নারীদেহ লাভ করিয়া সে জগতে আসিয়াছে?

নির্ম্মল এ কথায় সহসা উত্তর দিতে পারিল না; যখন পারিল, তখন বলিল,—"তা কি সব সময় হয়? না-ও তো হ'তে পারে।"

"সম্ভব তো হওয়ারই বেশি!"

সে চুপ করিয়া রহিল; যে এমন অকপট,—সংসারের কৃত্রিম লজ্জা-জ্ঞান পর্য্যন্ত যাহার আজও জন্মে নাই—তাহার কাছে মিথ্যা বলা যে বড় কঠিন। বুঝি অতি ইতরেও তা পারে না। বাহ্য দৃষ্টি না থাকিলেও অন্তরে-অন্তরে তাহার যে বিশোকা-জ্যোতিঃর ন্যায় অতিশয় ভেদ্য, তীব্র আলোর শিখা জ্বলে, মনের মধ্যের কলঙ্কবিন্দুও তাহাতে বুঝি গোপন থাকে না। ধীরা ইত্যবসরে কহিল,—"তবে কেন তুমি বিয়ে কর্‌বে না?"

নির্ম্মল এতক্ষণে উত্তর ভাবিয়া পাইয়াছিল; সে জবাব দিল,—"সন্তান কি সবারই হয়? আমাদেরও না হয় নাই হলো? আমরা আমাদের ধন দেশের, দশের কার্য্যে নিয়োগ করে তাকে সার্থক করবো! তা ভিন্ন তুমি যখন কেবলই ঐ এক কথাই ধরে বসে থাকবে, তখন আরও একটা কথা তোমায় বলি শোন; যদি ইচ্ছা থাকতো, তবু আমি আর বিয়ে করতে পারতেম না। তুমি বর্ত্তমানে আমি আর কা'কেও বিয়ে করবো না; করলে আমাদের

হিন্দুবিবাহ সত্ত্বেও আমি দণ্ডনীয় হবো ;' এই কথা আমি তোমার বাবা ও অপর দশজনের সাক্ষাতে লিখে দিয়েছি, তা দস্তুরমত রেজিষ্ট্রী করা দলিল হয়ে আছে। তুমি কি চাও,—তোমার খেয়াল রক্ষা করে আমি জেল খাটি ?"

"আচ্ছা আমি মরে গেলে ত তুমি আবার বিয়ে কর্‌বে ?"

"তা আমি এখন তোমায় প্রতিজ্ঞা করে বল্‌তে পারিনে।"—এই কথা বলিয়া নির্ম্মল অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ধীরার কান্না শুনিয়া আবার ফিরিয়া তাহার কাছে আসিল। সে অব্যক্ত কণ্ঠে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া তাহার বড় মমতা হইল ; কিন্তু তাহার বাড়াবাড়ি অত্যাচারে আজ তাহার উপর ক্রোধের পরিমাণটা একটু বেশিই হইয়া গিয়াছিল ; তাই,—এবং তাহাকে এই উপলক্ষ্যে একটু শাসিত করিবার মতলবেও বটে, কিছু চড়া গলায় বলিল,—"তবে কেবল-কেবল ও রকম কথা বলো কেন ? ফের যদি এ সম্বন্ধে একটি কথা বল্‌বে, আমি আর তোমার কাছে আস্‌বো না। ছিঃ, তুমি এত বড় স্বার্থপর, কেবল নিজের কথাই ভাবতে জানো—আমার কষ্ট তোমার কি মনে হয় না।"

ধীরা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল ; নির্ম্মল অনুতপ্ত চিত্তে তাহাকে ধীরে-ধীরে নিজের বক্ষে তুলিয়া লইল। নিজের চক্ষের জল আগে মুছিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিতে-দিতে অশ্রু-স্পন্দিত গাঢ়স্বরে বলিল—"আর কখনো তুমি এসব কথা বলবে না বলো ? তা'হ'লে আমিও তোমায় আর কখনো বকবো না।" ধীরা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘাড় নাড়িল 'না'।

"নিজেকে তুমি আমার অযোগ্য মনে করে এত দুঃখ কেন পাচ্চো ধীরা ? তুমি দেখ্‌তে পাও না—আমি পাই, এই তো আমাদের মধ্যে প্রভেদ ! তা যদি এরই জন্য তুমি নিজেকে এতই অসুখী করে রাখো, তাহ'লে—আমি আমাদের মধ্যে এ ব্যবধান না হয় আর রাখবো না। দুজনে এক রকম হলে তো আর কা'কেও কাহারও অযোগ্য মনে করবার কিছু থাক্‌বে না ?"

ধীরা স্বামীর বক্ষে শিহরিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া গদ-গদ্ কণ্ঠে উত্তর করিল, "তুমি এবারকার মতন আমায় মাপ করো। আমি তোমায় আর কখন কিছু বলবো না।"

সমস্ত মিটিয়া গেল !—গেল কি ?

(৫১)

জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী। সাগর-গামিনী বেগবতী ইরাবতী অবিরাম কলকল গদগদ স্বরে পুলকময় প্রণয়-সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়াছেন। হৃদয়েশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তে সে বেগ বুঝি এমন অসংবরণীয় হইয়াছিল। বিপুল বেগে, উল্লাস-কল্লোলে নাচিয়া-নাচিয়া বিরহিনী দীর্ঘ বিরহের অবসানানন্দে এক্ষণে উন্মাদিনী-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তীরে শালের শ্রেণী আর বড় দেখা যায় না। অদূরে সৌধ-মন্দিরময়ী নগরীর উপকণ্ঠ অল্প দৃশ্যমান হইতেছে। সহর বেশী দূর নয়। আকাশ, পৃথিবী, জলস্থল সমস্তই আজিকার শারদ-জ্যোৎস্নায় আলোকস্নাত ! আজ তাহাদের নৌকা-যাত্রার শেষ রজনী বলিয়াই বুঝি তাহা এমন মাধুরীভরা ! আজ বাতাস বড় মিষ্টি, গাছের মধ্যস্থিত পাখীর গান তেমনি সুমিষ্ট ; আবার ছাদের উপর, এই শেষবারের জন্য গালিচা-শয্যায় অর্দ্ধশায়িতা ধীরার মৃদুমন্দ হাসিটুকু সামাদানের সম্মুখে বই খুলিয়া উপবিষ্ট নির্ম্মলের চোখে ততোধিক মিষ্টতর ঠেকিতেছিল। সে পুস্তক পাঠ করিতেছে ; মধ্যে-মধ্যে পাঠ বন্ধ করিয়া দু'জনে দু'একটা কথাবার্ত্তা হইতেছে। আজ কারণে-অকারণে ধীরা বারেবারে হাসিতেছে, নির্ম্মলের হাত লইয়া আপন মনে সে ক্রীড়া করিতেছে,—নির্ম্মল একবার কি কথায় হাসিয়া, তাহাকে আদর করিয়া চুম্বন করিল, অমনই সেও তাহার প্রতিদান করিল। এমন আর কখনও করে নাই।

দু'জনে যে কথা হইতেছিল, তাহার একাংশ এইরূপ—"আচ্ছা, যাঁরা সতী হ'ন, তাঁরা স্বর্গে গিয়ে তাঁদের স্বামীকে ফের পান তো ?"

"নিশ্চয়।"

"যদি তাঁর আরও সতীন থাকে,—আর তারাও যদি স্বামীর সঙ্গে পুড়ে মরে, তা হলে কি হয় ?"

"তা' হলে ?" নির্ম্মল একটু ভাবিল,—ভাবিয়া-চিন্তিয়া উত্তর করিল,—"বোধ করি মর্ত্ত্যের মানুষের মত স্বর্গের তাঁদের মন এত সঙ্কীর্ণ থাকে না ; সেখানে অনেককেই একজনে হয় ত সমান ভালবাসতে পারে।" ধীরা স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ফেলিল, পরে হাত দিয়া নির্ম্মলের হাতটা একটু ঠেলিয়া দিল, বলিল—"পড়ো।"

নির্ম্মল পড়িতে লাগিল "আহা এমন দিন কি হবে ?

শবসাধন সিদ্ধ হবে? মরা আবার বাঁচিবে? মহানিশা তো উপস্থিত। কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ?"

সমস্ত পৃথিবীর সকল ধ্বনি নিঃশেষ হইয়া ধীরার কাণে বাজিল "মহানিশা তো উপস্থিত। কৈ সে সাধক মহাপুরুষ কৈ?" '**মহানিশা!**' এই তো মহানিশা? তাহার জীবনই তো এক মহানিশা! আবার মহানিশা কোথায়? এ অফুরন্ত রাত্রির কাছে আর কোন্ নিশা মহত্তর? তবে 'সাধক পুরুষ' কোথায়, তা কেউ জানে না; কিন্তু মহাপুরুষ ব্যতীত সাধনায় সামান্যেরও তো কিছু অধিকার আছে। সে মহাপুরুষ নহে, কিন্তু সাধনা করায় তাহারই বা এমন বাধা কি? আজিকার এই রাত্রি! কেমন এ রাত্রি? এই নিশা—কেন **মহানিশাই** হোক না?

ঘড়িতে মহাশব্দে অর্দ্ধরাত্রি ঘোষণা করিল। এই অর্দ্ধরাত্রিই মহানিশা! অপ্রতিভের একশেষ হইয়া নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল "উঃ করেছি কি! ভয়ানক রাত হয়ে গ্যাছে যে! এসো ধীরা এসো, আমরা এইবার নিচে যাই।"

"যাই" বলিয়া উঠিয়া ধীরা স্বামীর হাত ধরিল; হাত ধরিয়া বজরার রেলিংএর দিকে তাহাকে আকর্ষণ করিল; কহিল "আজই তো শেষ, আর একটু থাকো না।"

"দু'জনে বজরার ধারের নিচু রেলিংএর নিকট আসিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল। দ্যুলোক, ভূলোক সমস্তটাই তখন একাকার হইয়া জ্যোৎস্নার আলোকে ডুবিয়া গিয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ প্রভায় অগণ্য নক্ষত্র-জ্যোতিঃ জোনাকীর চেয়েও হীনপ্রভ প্রতিভাত হইয়া সেই নীলাভ রজত-সমুদ্রে যেন সাঁতার কাটিতেছে। নীচে নদীজলেও সেই চাঁদ, সেই তারা,—অধিকন্তু তাহারা উর্দ্ধে এক, নিম্নে বহু। প্রতি তরঙ্গ এক-একটি চাঁদের টুক্‌রা বুকে লইয়া নাচাইতেছিল, চুম্বন করিতেছিল। এইরূপে সেই নদীবক্ষে কোটি চন্দ্রের আজ উদয় হইয়াছে। ধীরা জিজ্ঞাসা করিল "আজ কি? আজ কি অন্ধকার রাত্রি?"

"না, আজ পূর্ণিমা।"

"পূর্ণিমা!" ধীরার মুখ সেই পূর্ণিমার অকলঙ্ক চাঁদের মতই উজ্জ্বল দেখাইল। "চাঁদ এখন কোথায়?"

"ঠিক আমাদের মাথার উপর।"

"নদীর জলে চাঁদের ছায়া পড়েছে? আমাদের ঠিক সামনের জলে জ্যোৎস্না আছে?"

"হ্যাঁ, পড়েছে বই কি, সমস্ত নদীর বুকেই যে আজ চাঁদের মালা গাঁথা।"

ধীরা অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিল; ক্ষণপরে নত হইয়া স্বামীর পদধূলি তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় দিল; অতি মধুর স্নিগ্ধ পুষ্প-পরিমলটুকুর মত ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিল "আমায় ক্ষমা করো। তোমার জীবন ব্যর্থ করে রেখে কিছুতেই আমি থাকতে পারলুম না। আর আশীর্ব্বাদ করো, যেন এ **মহানিশা** এই আলোর তরঙ্গে এবার প্রভাত হয়।"

প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাবধান হইবার পূর্ব্বেই সেই চন্দ্রালোক-প্রমোদিত আলোকোজ্জ্বল সলিলরাশি বিপুল বেগে আলোড়িত করিয়া একটা শব্দ হইল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে বৃত্তাকারে জলরাশি আহত করিয়া জলোচ্ছ্বাস উঠিল। নির্ম্মল দেখিল তাহার পাশে ধীরা নাই! একটা গভীর আর্ত্তনাদে সেই সুপ্তিমগ্ন নৈশ প্রকৃতির অঙ্কস্থিত জীববৃন্দকে সচকিত করিয়া পরক্ষণেই আর-একটা বৃহত্তর সলিলবৃত্ত সেই গলিত-সুবর্ণধারাবৎ সলিলবক্ষে রচিত হইল; নির্ম্মল জলে ঝাঁপ দিল।

বাতাস তখন বড় মধুর বহিতেছিল, নিদ্রাহীন পাখীর গান তদপেক্ষাও মধুময়! উপরের আকাশের চাঁদ মধুর হাসির তরঙ্গে তরতর করিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন, নীচের চন্দ্রচ্ছায়া শুধু দীর্ণ-বিদীর্ণ—শোকাহত।

৫২

অনেক বড়-বড় শোক মানুষকে সহ্য করিতে হয়; সে তুলনায় নির্ম্মলের এ শোক কতটুকু? তবে শোনা যায়, গভীর ক্ষত শুকাইয়া গেলেও উহার চিহ্ন কখন মুছে না। নির্ম্মলের শোক গভীর, তাই তাহার দাগ মিলাইল না। নির্ম্মলের চীৎকারে মাল্লাদের ঘুম ভাঙ্গিল; ধীরার পতন তাহারা জানিতে পারে নাই, নির্ম্মলের পতন-শব্দ তাহাদের কাণে গিয়াছিল। অর্দ্ধচেতন নির্ম্মলকে তাহারা টানিয়া তুলিল। ধীরার কথা যখন জানিতে পারিল, তাহারা প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তময় স্রোতোজলের গভীর প্রবাহ মধ্যে তৎক্ষণে সেই ঝরিয়া-পড়া ক্ষুদ্র যূথিকাটি অবিরল বায়ুবিতাড়িত তরঙ্গ-চালনার আঘাতে কোথায় কোন্ অনির্দ্দেশ্য পথে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাকে কি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

নিজের প্রতি ক্ষমাহীন গভীর শোকে নির্ম্মল ধীরার পরিত্যক্ত শয্যাতলে লুটাইয়া রহিল। কতবারই দুরন্ত লোভ তাহার চারিদিক হইতে সূর্য্যকরোজ্জ্বলা, জ্যোৎস্না-তরঙ্গভঙ্গময়ী নদীতরঙ্গের রূপে কুলুকুলু কলতানে তাহার কাণে-কাণে প্রলোভনের মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল। বায়ু বারংবার বজ্রনাদে শাসন করিয়া কহিয়া কহিল "ও কালা মুখ কারও কাছে দেখাস্‌নে, যেখানে সেই পতিপ্রাণা গিয়াছে—তুইও সেইখানে যা!" নির্ম্মল অসংবরণীয় লোভে উঠিয়া বসিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা কঠোর হস্ত এই প্রলোভনের তীব্র-মদিরা তাহার ওষ্ঠ হইতে কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। সে বলিয়াছে,—আত্ম-হত্যা দ্বারা তুই কি সেই সতীলোকে স্থান পাইবি? তার সেই নিষ্কাম প্রেমের সাধনা, আর তোর এই অনুতাপের জ্বালা কি এক? সেকালের সতীরা স্বামীর চরণ বক্ষে ধরিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইতেন,—ইহও সম্পূর্ণ নিষ্কাম প্রেম নহে; ইহাতেও পূর্ণ 'মদীয়' ভাব বর্ত্তমান। এই মদীয়তাই সংসারে স্থিতি-শক্তি। এ' না থাকিলে সংসার, সমাজ গঠিত হইত না। কিন্তু "তদীয়তার" স্থান ইহারও অনেক ঊর্দ্ধে! সকলি তোমার; এ সকল তোমার বলিয়াই আমার! তা সেই তুমিই যদি আমার জন্য সুখী হইলে না, তবে আমার এ জীবনে কাজ কি? তুমি বলিতেছ—তুমি অসুখী নও? আমি বলিতেছি,—তোমার মনে সুখ নাই। কিছুমাত্র সুখ নাই! সংসার, সমাজ, পিতৃপুরুষ এঁদের উপরে তোমার যে কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি তোমার হানি হইল,—মানবদেহ পাইয়া যদি সমাজের যথাযথ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেই পারিলে না—তবে তোমার জীবনে যথার্থ সুখ কোথায়? তোমার জন্ম তো অফলা; জীবন তো তোমার ব্যর্থ! আমার জন্য তোমার এই ক্ষতি! এ কি আমি সহিতে পারি? আমি কে? তোমার জন্যই আমি। যেখানে তোমার পথে এতটুকু বাধা, সেখানে এতটুকু ক্ষুদ্র কঙ্কর-কণ্টকের চেয়ে আমার দাম বেশি নয়। আমি তোমার সুখের পথ, ধর্ম্মের পথ, যশের পথ মুক্ত করিয়া দিয়া সরিয়া গেলাম! তোমার জন্য যদি তোমাকেই না ছাড়িতে পারিলাম, তবে তোমার প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা কই?

হায়, সেই তদাত্মময় গভীর প্রেমের সঙ্গে কি তাহার এই গ্লানিময় ধিক্কারপূর্ণ কলঙ্কলাঞ্ছিত জীবন বিনিময়যোগ্য? তার পর, যাহাদের বিশ্বাস, মরিলে এ পৃথিবীর সব জ্বালা জুড়ায়, মরণ তাহাদের বড় বন্ধু। কিন্তু যারা পর-লোকে বিশ্বাসী, মরণে তাহার এমন কি লাভ? যেখানে আছি, যাহা আছি, এক রকম সহিয়া গিয়াছে; আবার নূতন করিয়া একটা আরম্ভ করিতে হইবে, এই তো! পাপীর মরণকে বড় ভয়। নির্ম্মলের মরণকে ভয় ছিল না, কিন্তু ভক্তিও খুব বেশি নাই। সে মনে-মনে বলিল, আমার যা গতি হইবে, সে তো দিব্যচক্ষেই দেখতে পাচ্চি; তার উপর সাধ করিয়া আবার অগতির চেষ্টা করি কেন? এই সব পাপের দণ্ড! ইহার হাত ছাড়াইয়া পালাইতে গেলে সে আমায় ছাড়িয়া দিবে কি? বোধ করি সঙ্গে-সঙ্গেই যাইবে। তবে পাপ বাড়াইয়া কি ফল? সহ্য করে পাপ খণ্ডন করাই ভাল।

দাসদাসীদের সে বাড়ী পাঠাইয়া দিল। তাহারা ধীরার জন্যই এতদিন সঙ্গে ছিল; সে গরীব, গরীবের মতই সে থাকিবে; দাসী চাকরে কি প্রয়োজন?

বজরা ইরাবতীর মোহানার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথম শোকো-চ্ছ্বাসে সকল মানুষেরই মত নির্ম্মলও মনে-মনে স্থির করিয়াছিল, এ জন্মে আর এ বজরা সে ত্যাগ করিবে না। ধীরার সমাধিস্থল এই নদীবক্ষই তাহার একমাত্র আশ্রয়; জীবনের অবশিষ্ট দিন ইহার অঙ্কেই সে কাটাইবে।

এমন করিয়া দিন-পনের কাটিয়া গেল। সান্ত্বনা, সুধীবাক্য, অথবা কর্ম্ম, এই সকল শোকঘ্ন বস্তুর একান্তা-ভাবে নির্ম্মলেরও অনুতাপ-বিদ্ধ গভীর শোক-ক্ষতের লাঘব হইতে পাইল না। সে তাহার সেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ধীরাময় হইয়া রহিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে যথা-নিয়মিত পালঙ্কে শুইয়া সে সারি-সারি খোলা জানালাগুলির মধ্য দিয়া ইরাবতীর বক্ষে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া গভীর চিন্তাকুল বলিয়া মনে হইলেও মনের ভিতর তাহার চিন্তার তরঙ্গ মাত্র ছিল না, তাহা বায়ুলেশহীন, স্তব্ধ! শোকে যেমন সমস্ত ভস্ম করে, তেমনই সে চিন্তাশক্তিকেও বাদ দেয় না। তখন অতীতের স্মৃতিমাত্রই সম্বল হয়, ভবিষ্যৎ তখন সেই শোকসাগরে ডুবিয়া যায়।

বাহিরে বাতাস ছিল, নদীর জল বায়ুসন্তাড়িত, তরঙ্গময়; জল-তরঙ্গ সূর্য্য-কিরণে ঝলমল করিতেছে। বজরা অতি মৃদুমন্দগমনে, যেন উদ্দেশ্য-হীন গতিতে, বুঝি আরোহীর অন্তরের অনুকৃতিতেই, কোন্ অনির্দ্দেশ্য যাত্রাপথে গমন করিতেছিল।

বাহিরে কি একটা ঘটিয়াছিল;—সহসা কিসের একটু গোলমাল শোনা গেল। একখানা মোটর-ষ্টীম-লঞ্চ শব্দ করিয়া বজরার কাছ-বরাবর আসিল; তারপরই এই বজরা হইতে মাঝিমাল্লাদের সম্মানসূচক অভিবাদন-সম্ভাষ শোনা গেল। দেখিতে-দেখিতে জরির জুতা-পায়ের শব্দের সহিত কামরার মধ্যে কেহ প্রবেশ করিল। তখন মুখ ফিরাইয়া নির্ম্মল দেখিল, সে ব্রজরাজ!

ব্রজ হ্যাট্ ও ছড়ি ফেলিয়া নিজের রুমালে ঘর্ম্ম মোচন করিতে-করিতে ভগিনীপতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল—

"হ্যাঁ নির্ম্মল! তোমার এ রকমটা কি? ক'দিন হয়ে গ্যালো, ফিরলেও না, একটা খোঁজখবরও দিলে না,—এ কি! অ্যাঁ! তোমার এ কি রকম বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে! অসুখ থেকে উঠেও তো এর চাইতে ভাল এসেছিলে, অ্যাঁ!"

নির্ম্মল আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোর বিস্ময়ের তাড়নায় তাহাকে একটা সময়োচিত সম্ভাষণ করিতেও তাহার ভুল হইয়া গিয়াছিল। শুধু বিস্ময় নয়, বিস্ময়ের সহিত অল্লাধিক লজ্জা ও ভয়ও বিমিশ্র ছিল;—আর সকলের প্রধান হইয়া উঠিতেছিল শোক!

"দাঁড়িয়ে রৈলে কেন? বসো—বসো,—ছি ছি! এমন করেই কি শরীর মাটী করতে হয়? দুঃখ সংসারে কার না আছে? আমারই কি দুঃখ হয় নি? কালা হোক্,—যা হোক্, তবু তো মার পেটের একটা বোন ছিল।—সে থাক্তে তাকে কখনও একদিনও আদর করিনি, যত্ন করিনি বটে, কিন্তু—"

এই কথা বলিতে-বলিতে ব্রজ ললাট হইতে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া আবার চোখমুখ মুছিল; তারপর নিকটস্থ হইয়া নির্ম্মলের হাত ধরিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহের সহিত তাহাকে খাটের উপর বসাইল এবং নিজেও তাহার পাশে বসিল। বাস্তবিকই নির্ম্মলকে ভাল করিয়া না দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। তাহার উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি নিবিয়া গিয়াছে, চোখের কোলে বৃত্তাকারে কালি পড়িয়াছে, পরিপুষ্ট মুখ শুকাইয়া লম্বা ও সরু হইয়াছে, গলার ও কাঁধের হাড় অনেকখানি সরু হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ তাহার গায়ের সে কাঁচা সোনার বর্ণ,—ব্রজ যাহার বিশেষ করিয়াই হিংসা করিত,—তাহা আর নাই।

কিন্তু আজ ব্রজ ইহাতে খুসী হইল না। সে তাহার দিকে অনুযোগমিশ্রিত করুণায় চাহিতে-চাহিতে কহিতে লাগিল,—"নিজেকে কি করে ফেলেছ! নিজের যে আর কিছু রাখোনি নিমু! এমন করে শরীরপাত করলেই কি তাকে ফিরে পাবে? তা যখন পাবার উপায় নেই,—তখন মিথ্যে আত্মঘাতী হয়ে লাভ কি?"

এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল,—"হ্যাঁ, বল্‌ছিলাম কি,—কিন্তু যেমন তার মৃত্যু-সংবাদটি পেয়েছি, অম্‌নি বুঝতে পেরেছি, আমি সত্যি-সত্যি তাকে যে দেখতে পার্‌তুম না, তা নয়! বরং তখন—এম্‌নি আশ্চর্য্য—তখন হঠাৎ মনে হলো, কেনই বা এতদিন তাকে একটু আদর করিনি! দুটো মিষ্টি কথা কখন তাকে কেন বলিনি? তাকে যে আমি ভালবাসতেম, সে তো তা কখন জান্‌তে পারলে না! তাকে আমি ভালবাসতেম, কেন তাকে তা জানালেম না। তাকে জানাবো কি? নিজেই এ কথা যে কখন জানতে পারিনি—সে যাবার এক মিনিট আগে পর্য্যন্তও না। এ কি আশ্চর্য্য?" ব্রজর স্বর ভগ্ন হইয়া আসিতেছিল; নির্ম্মল অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই দেখিল তাহার দুই চোখ জলপরিপূর্ণ। সহসা ভরা-গাঙ্গে জোয়ার বহিল—ফোঁটা দুই জল তাহার পুরুষ-কঠিন গণ্ডের উপর ঝরিয়া পড়িল। নির্ম্মল বুঝিল এ কি জল! পাষাণবিদারি সলিলটুকু যমুনা-কাবেরি-গঙ্গা-গোদাবরী-সরস্বতী কাহারও চেয়ে কম পবিত্র নয়! তখন আর কি রক্ষা থাকে? নির্ম্মল তখন নিজের এই অশ্রুহীন শোকের এতদিনের সমস্ত জমান জল সেই ভ্রাতৃ-স্নেহের বাতাসম্পর্শে এক মুহূর্ত্তে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। সেই অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে অনেকখানি আগুন নিভিল।

(ক্রমশঃ)

শিল্প-সংবাদ

[শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ এম এ-এস্ (জাপান), এম-আর-এ-এস্ (ইংলণ্ড)]

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে বঙ্গদেশে নূতন-নূতন কলকারখানা স্থাপন করিবার অনেক আয়োজন হইয়াছে ; —কেহ-কেহ আংশিকরূপে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন ;—কিন্তু চলিবার মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া, অনেক সময়েই উদ্যোক্তাদের, বিশেষতঃ শিল্পীদের (Experts) উপর দোষ চাপাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চান। কোন্-কোন্ ব্যবসায়ে
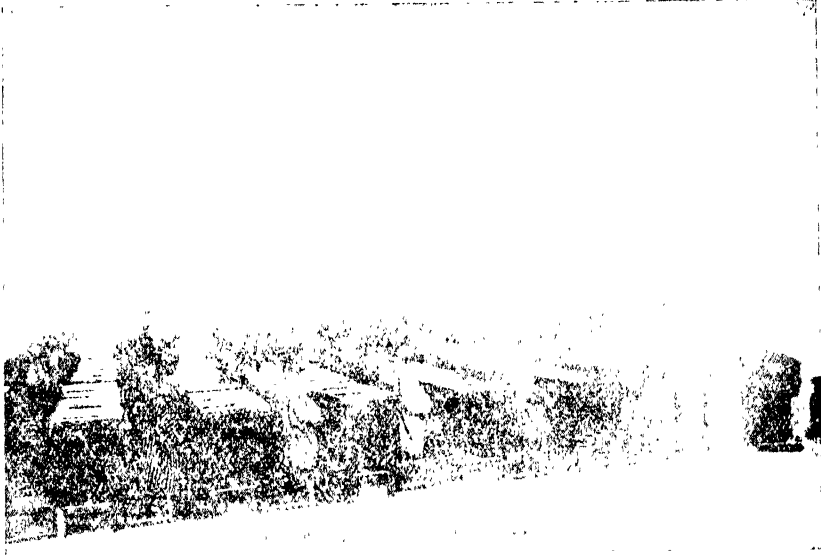
জাপানী কটন-মিলে মেয়ে-স্কুল

মেয়ে-স্কুলের আর একটী শ্রেণী

অনেকেই শেষ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। কল-কারখানাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবিহীন ব্যক্তিগণ কারখানা না কি-কি প্রতিবন্ধক আছে, এবং সেই সমস্ত অন্তরায় কি উপায়ে দূর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে, এবং

সম্ভবপর হইলে তাহার প্রতিকার বিধানে, অনেকেই সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু সেজন্য শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে অকিঞ্চিৎকর কোন একটা মতামত প্রকাশ করিতে তাঁহারা কখনও বিরত নহেন। যাহাদের এ বিষয়ে একটু বলিবার অধিকার

উজীর চা-বাগান

হাতে চুরুট প্রস্তুত

আছে, তাহাদিগকে বলিবার সুযোগ দেওয়া এবং ধৈর্য্য-সহকারে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা, যেন সময়ের অপ-ব্যবহার বলিয়া অনেকেই মনে করেন।

প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে মজুর সস্তা (labour cheap) এবং দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপাদান-সামগ্রীর (raw materials) অভাব নাই; তবে কেন আমাদের দেশীয় শিল্পদ্রব্য-নির্ম্মাতাগণ (manufacturers) সস্তায় ভাল জিনিষ দিতে পারে না? উপর-উপর দেখিতে গেলে ঐরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। কারবারের ভিতর প্রবেশ না করিলে, কথাটা তলিয়ে বুঝা একটু শক্ত।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাইতেছে, আমাদের দেশের মজুর (labour) খুব মহার্ঘ এবং raw materials ও সস্তায় প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় রহিয়াছে। বিশেষে অন্ততঃ আটআনা দিতে হয়; কাজেই দৃষ্টতঃ, আমাদের দেশের মজুর ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের মজুর অপেক্ষা অনেক সস্তা। কার্য্যতঃ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

জাপানী চরকা

সিগারেট প্যাকিং

মজুর (Labour)

প্রথমতঃ মজুর (labour) সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক্। ভারতবর্ষে কোন-কোনও স্থানে দুই-আনা মজুরী দিলে একটি কুলিকে দশঘণ্টা খাটান যায়; সেই স্থলে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে একটি কারখানার কুলিকে স্থল-ঐ সব দেশের একটা কুলি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অন্তত. চারিটি কুলির সমান কাজ করে।

মিঃ রামজে ম্যাকডোন্যাল্ড (Mr. Ramsay Mac donald M. P.) ভারতভ্রমণকালে বোম্বায়ে একটি কাপড়ের কল দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই মিলের ম্যানে-

আর একজন ইংরাজ। তিনি রামজে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড মহোদয়কে বলিয়াছিলেন "লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, ভারতে মজুর সস্তা। প্রত্যেক তাঁতে লাঙ্কেশায়ারের (Lancashire) মজুর অপেক্ষা বোম্বায়ের মিলে ভারতীয় মজুরকে বেশী পয়সা দিতে হয়। লাঙ্কেসায়ারের একটি মেয়ে-মজুর এখানকার চারিটি পুরুষ-মজুরের সমান কার্য্য করে।" (Indian Daily News, 20th February 1914)। আমার নিজের বিদেশের অভিজ্ঞতাও কতকটা সেইরূপ।

সিগারেট প্যাকিং

সিগারেটের কল

"*Cotton manufacture.*—One Lancashire weaver can look after six looms at a time, against only one loom by an Indian mill-hand."

"*Mining.*—The average daily output of coal per miner employed is ½ ton in India,

and 2½ tons in England"—Professor Jadunath Sarkar's Economics of British India]

কেহ-কেহ হয় ত বলিবেন, আমাদের দেশে যখন

স্পিনিং মিলের মেয়ে-স্কুলে পুষ্প-সজ্জা

মেয়ে-স্কুলসংলগ্ন থিয়েটার-হল

কুলির অভাব নাই, তখন বিদেশের কার্য্যকুশল এবং কার্য্যতৎপর একটি কুলিকে আটআনা দেওয়া, আর আমাদের দেশের অপটু (unskilled) চারিটি কুলি আটআনা দিয়া নিযুক্ত করা সমানই কথা—উৎপন্নের হিসাবে যখন কোন লোকসান দেখা যায় না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, কুলির খরচ উভয়ক্ষেত্রে সমান থাকিলেও, অবান্তর খরচ (indirect expense) একটির অপেক্ষা অপরটির অনেক বেশী। সিগারেট প্যাকিং কিম্বা দিয়াশলাইর প্যাকিং হইতে ইহা বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রত্যেক কুলিকে তাহার কাজের জন্য এক সেট করিয়া যন্ত্রপাতি দিতে হইবে; প্রত্যেকের বসিবার জন্য টুল, বেঞ্চ ইত্যাদি চাই,—কাজ করিবার টেবিল চাই,—

জিনিষ তাহারা প্রস্তুত করিবে, তাহা রাখিবার পাত্র প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চাই (প্রত্যেকের কাজের অনুপাতে মজুরীর তারতম্য হয় বলিয়া সমস্ত জিনিষ এক পাত্রে রাখিলে চলিবে না) ইত্যাদি। একটি কার্য্যদক্ষ কুলিকে প্রথম কিনিবার খরচ এবং মাঝে-মাঝে তাহাদের মেরামত ও বদলাইবার খরচ আছে—কাজেই প্রথমতঃ এক-এক দফাতেই চতুর্গুণ বেশী খরচ দেখা যাইতেছে।

(ক) অপটু মজুরের জন্য খরচ বাড়িল।
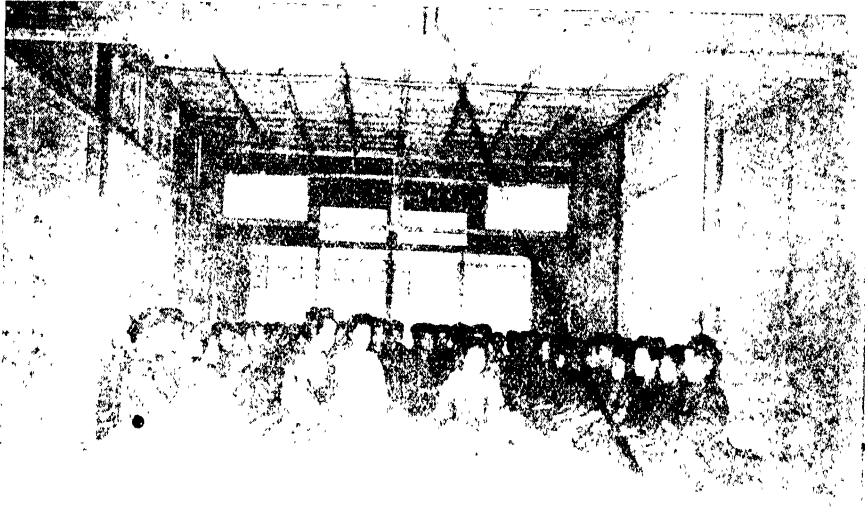
মেয়েদের অতিথিসৎকার-শিক্ষা

পুরুষ কুলীদের স্কুল

উপরিউক্ত জিনিস ও আসবাব একটি করিয়া দিলেই চলে, সেই স্থলে চারিজন অপটু কুলি নিযুক্ত করিতে হইলে ঐ সমস্ত জিনিষ চারি প্রস্থ চাই। প্রত্যেক চারি সেট জিনিষের

দ্বিতীয়তঃ, একটি ঘরে ২০ জন লোক (skilled hands) কাজ করিতে পারে; সেখানে ৮০ জন (চতুর্গুণ) অশিক্ষিত মজুর (unskilled hands) দরকার হইলে, ঘরের

আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে; অর্থাৎ ঐ মাপের চারিটি ঘর অথবা প্রায় চতুর্গুণ একটি ঘরের আবশ্যক হইবে।

(খ) অপটু মজুরের জন্য কারখানার বাড়ীভাড়া বাড়িল; কিম্বা মূলধন খরচ করিয়া বড় বাড়ী প্রস্তুত

(গ) পরিদর্শনের খরচ (cost of supervision) বাড়িল।

একটি ঘরে একটি কিম্বা দুইটি আলো হইলে চলিত—সেস্থলে চারিটি ঘরের জন্য চারিটি কিম্বা আটটি আলো চাই।

(ঘ) আলোর খরচ বাড়িল।

সূতার কলে মেয়ে স্কুলের আর একটী শ্রেণী
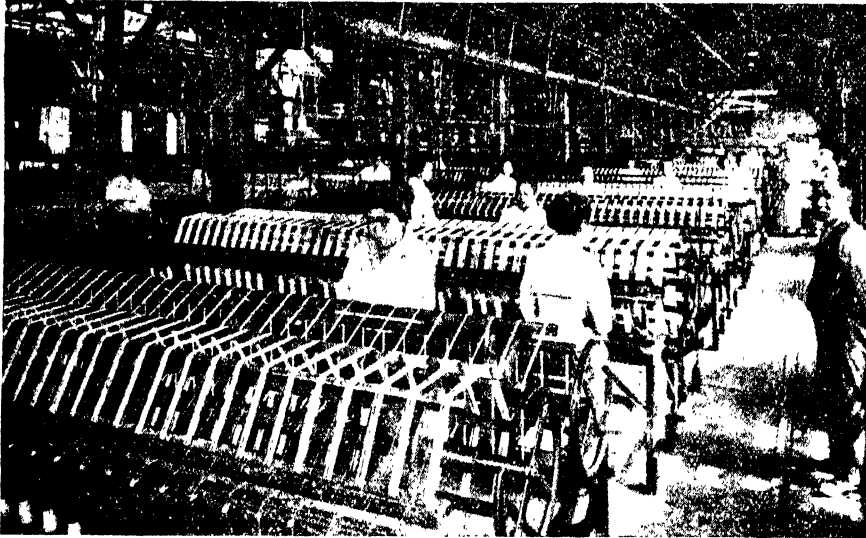
সূতার কলে রীলিং রুম

করিবার দরকার হইল। একটি কামরায় একটি পরিদর্শক হইলে চলিত; এখন চারিটি ঘরের জন্য চারিজন পরিদর্শক চাই।

দৈনিক কার্য্যের হিসাব রাখিবার কাজ চারিগুণ বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং কাগজ কলমের খরচ এবং আফিসের আনুসঙ্গিক কেরাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(ঙ) Stationery এবং কেরাণীর খরচ বাড়িল। অপর পক্ষে, আটআনার একটী কুলিকে একদিন খাটাইবার পরিবর্ত্তে দুই আনার কুলিটীকে চারিদিন খাটাইলে indirect expense অর্থাৎ বাড়ীভাড়া, টাকার সুদ, আলো, অপরাপর কারখানার লোকদের মাহিয়ানা ইত্যাদির খরচ অনেক বেশী পড়ে। তদুপরি অপটু হস্তের কাজে জিনিষপত্রের লোকসান অধিক হয়, জিনিষ দেখিতে সুন্দর ও মনোরম হয় না, বাজারে কম দরে বিক্রীত হয়। দৃষ্টতঃ, সস্তা মজুর দ্বারা কাজ করাইতে গিয়া পরোক্ষভাবে নানা দিক্ দিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাই আমাদের দেশে কথায় বলে "মুলোর চেয়ে দেঁড়ে বাড়ে।"

অধিকন্তু অনেক স্থলে কারখানায় অনবরত পরিবর্ত্তন-শীল লোক দিয়া কাজ করাইতে হয় বলিয়া, মজুর শিখাইয়া লইবার সুযোগও কম ঘটে। মজুর তৈয়ারী সময়-সাপেক্ষ। উপযুক্ত সময় পাইলে—ভারতীয় মজুরও কার্য্যকুশল এবং কার্য্যতৎপর হইবে; তখন ভারতীয় মজুর বিদেশী মজুর অপেক্ষা সস্তা হইবে। যদিও তখন মজুরী বেশী দিতে হইবে, কিন্তু ইউরোপ অপেক্ষা ভারতে খাওয়ার খরচ কম পড়ে বলিয়া (standard of living comparatively low) ভারতীয় মজুর অপেক্ষাকৃত কম খরচেই পাওয়া যাইবে।

ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে মেয়ে-কুলিরা কল-কারখানাতে কাজ করে। মেয়ে-মজুর সর্ব্বত্রই পুরুষ-মজুর অপেক্ষা সস্তা। দিয়াশলাইর বাক্সে কাঠি-ভরা, সিগারেট প্যাক করা, সিগার প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজে ১৪।১৫ হইতে ২০।২১ বৎসর বয়সের মেয়েরাই সুদক্ষ এবং নিপুণ; তাহাদের কার্য্যকুশলতা ও হস্তচালনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহই সিগারেট গণনা করিয়া প্যাকেটে ভর্ত্তি করে না—হাতের অনুভূতিতেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার গণনা করিয়া লয়,—কখনও এক প্যাকেটে ১০টীর বেশী, কিম্বা কম হয় না। আমেরিকার বড় সিগারেট কারখানাতে সিগারেট প্যাকিংএর জন্য কল ব্যবহৃত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী আমেরিকান ব্যবসায়ী সিগারেট প্যাক্ করিবার কল-বিক্রয়ার্থ জাপানে আনিয়াছিলেন। জাপানের Imperial Government Tobacco Monopoly Bureau প্রথমে কলের কার্য্য দেখিতে চান। কলের সঙ্গে-সঙ্গে কলের পাশে বসিয়া জাপানী মেয়েরা প্যাকিং করিতে আরম্ভ করে। ফলে দেখা যায়, কল ও তাহাদের হাত সমান চলিয়াছে। এখনও জাপানে সিগারেট-প্যাকিং হাতে চলিতেছে।

সেখানে মেয়ে-কুলিরাই সিগারেটের কল চালায়। ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও সেই ব্যবস্থা। তাঁত চালাইবার জন্য, সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অন্যান্য নানা কারখানার কাজে মেয়ে-কুলিরাই বেশী নিযুক্ত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সিগারেট, দিয়াশলাই ইত্যাদির প্যাকিংএর কার্য্যে ১৪।১৫ হইতে ২০।২১ বৎসর বয়স্কা মেয়েরাই বিশেষ উপযুক্ত। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে, ঐ বয়সে মেয়েদের হাতের অঙ্গুলিগুলি বেশ ক্ষিপ্র এবং কোমল (pliant and nimble) থাকে বলিয়া, তাহাদের হাতের কাজ বেশী বয়সের মেয়েদের অপেক্ষা দ্রুত এবং পরিষ্কার হয়। আমাদের দেশে মেয়ে-মজুর বেশী না পাওয়াতে, কাজের অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, Labour এর খরচ বেশী পড়ে।

১৯০৬-১৯০৭ সনের জাপানের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায়, তথায় শতকরা ৯৫.৫ জন মেয়ে এবং ৯৮.৫ জন পুরুষ লিখিতে-পড়িতে পারে। খবরের কাগজ জাপানের অধিকাংশ নরনারীই পড়ে বলিয়া, দেশের কথা সকলেই সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। দেশের উন্নতিকল্পে সকলেরই সাধারণত সমবেত চেষ্টা আছে। কর্ত্তব্যজ্ঞান সকলেরই অল্পবিস্তর আছে বলিয়া কারখানার কাজ পরিদর্শনের খরচ (cost of supervision) আমাদের দেশ অপেক্ষা সেখানে অনেক অল্প। কোন-কোন বড় কারখানার চতুঃসীমাতে (Compound এ) কুলিদের জন্য (মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই) বোর্ডিং, স্কুল, থিয়েটার-হল্, হাস্পাতাল, বাজার ইত্যাদি আছে। তাহাদের বাহিরে আসিবার তেমন দরকার হয় না।

বলিতে লজ্জা হয়, জাপানে আমাদের বাড়ীর ৫২ বৎসরের বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহার মাসিক ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা বেতন হইতে প্রতি মাসে ৷৵৫ খরচ করিয়া দৈনিক খবরের কাগজ কিনিত; কিন্তু বাবুদের একখানিও খবরের কাগজ ছিল না!! অপর একটী পরিচারিকা বাড়ীতে দৈনিক পত্রিকা না রাখাতে দুইমাস কাজ করিয়া চলিয়া

গিয়াছিল। প্রথম দুই মাস সে পাশের বাড়ী হইতে প্রত্যহ কাগজ আনিয়া পড়িত।

The Hon'ble Mr. M. B. Dadabhoy, C.I.E. 7th. Indian Industrial Conferenceএর সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে বলিয়াছেন—"লোকে মনে করে ভারতবর্ষে মজুর সস্তা এবং লোকও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থা ঐ উভয় ধারণারই অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে মজুর সস্তাও নয়—যথেষ্টও নয়। দিন-দিনই মজুরের অভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সমস্ত শিল্পের কারখানাতেই নিয়মিতরূপে যথেষ্ট সংখ্যক মজুরের অভাবে অল্পাধিক ক্ষতি হইতেছে। দৃষ্টতঃ ভারতীয় কুলির মজুরী কম; কিন্তু তাহাদের কার্য্যকুশলতা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতে দেখা যায়, উহা বাস্তবিকই অতি মহার্ঘ। অধিকন্তু, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে এবং তাহারা একসঙ্গে বেশী ক্ষণ কাজ করিতে অসমর্থ। তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ এক রকম নাই।" দায়িত্ববোধ কম থাকিলে কাজ পরিদর্শনের খরচ (indirect labour expense) বাড়িবে।

কাঁচা মাল (Raw materials)

লোকে কথায় বলে 'যা নাই ভারতে তা নাই জগতে'। কাঁচা মাল (raw materials) সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিতে হইলে, একটী নির্দ্দিষ্ট কারখানা লইয়া। আলোচনা করিলে বুঝিতে সহজ হইবে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই "বন্দেমাতরং ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর" নাম শুনিয়াছেন। এই কারখানাটী ডাক্তার (এক্ষণে সার) রাসবিহারী ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের টাকায় ১৯০৭ সনে কলিকাতার টালিগঞ্জে স্থাপিত হয়। জাপান, জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিল্পবিজ্ঞান-সমিতির কৃতী ছাত্র মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায় এই কারখানার ম্যানেজার ও Expert ছিলেন। ইহার প্রস্তুত দিয়াশলাই অষ্ট্রীয়া, সুইডেন ও জাপানে প্রস্তুত দিয়াশলাই অপেক্ষা গুণে এবং কার্য্যকারিতায় নিকৃষ্ট নহে—মূল্যও সমতুল্য। তবে সেই দিয়াশলাই চলিল না বা চলিতেছে না কেন?

মিঃ আনন্দপ্রকাশ ঘোষের প্রস্তুত দিয়াশলাইও বেশ সুন্দর হইয়াছে। মিঃ ঘোষ কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কোন্নগরের "ম্যাচ-ফ্যাক্টরীতে" ছিলেন। ইনিও আমাদের শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির ছাত্র—জাপান, জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন।

ম্যাচ-এক্‌স্পার্টকে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দিয়াশলাইর উপযুক্ত কাঠ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, ইহা বোধ হয় কেহই আশা করেন না।

গভর্ণমেণ্টের বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা এবং অন্যান্য Expertগণ যে সমস্ত কাঠ দিয়াশলাইর কাঠির জন্য উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,সেই সমস্ত কাঠের নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রথমে ম্যাচ-Expertকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। মনে করুন, একটী কাঠ উপযুক্ত বিবেচিত হইল, এবং সেইটী দার্জ্জিলিংএর পাহাড় হইতে আনিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দার্জ্জিলিং হইতে দিয়াশলাইর কাঠ কলিকাতায় আনীত হইত। দার্জ্জিলিং হইতে রেলে কলিকাতায় কাঠ আনিতে যে খরচ পড়ে, আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে তদপেক্ষা ভাল কাঠ অনেক অল্প খরচে কলিকাতায় আসে।

The Hon'ble Mr. Dadabhoy ভাড়া সম্বন্ধে বলেন—"বিদেশ হইতে যে জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানি হইতেছে, তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের অসমান প্রতিযোগিতার প্রধান কারণ আমাদের দেশের রেলে মাল পাঠাইবার মারাত্মক ভাড়া। ভারতের ভিতরে কয়েক শত মাইল রেলে স্বদেশজাত জিনিষ পাঠাইবার ভাড়া অপেক্ষা হাজার-হাজার মাইল দূরবর্ত্তী বিলাত হইতে যে-কোনও ভারতীয় বন্দরে মাল আনাইবার জাহাজ-ভাড়া অনেক কম। এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাহাই।

অনেকেই হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পেন্সিলের কাঠ (American cedar) সস্তা ও ভাল হয় বলিয়া আমেরিকা হইতে পেন্সিলের জন্য কলিকাতায় কাঠ আনীত হয়। ভারতবর্ষের পাহাড়ে ও জঙ্গলে উপযুক্ত কাঠ আছে মনে করিলে পেন্সিল-নির্ম্মাতার চলিবে না। তাঁহাকে দেখিতে হইবে, সেই কাঠ পাওয়া সহজসাধ্য কি না, এবং তাহা সস্তায় সংগ্রহ করা যাইবে কি না। সস্তায় সংগ্রহ করিবার পক্ষে অন্তরায় এই, যিনি আমার কারখানায় কাঠ যোগাইবেন, তাঁহার কাঠ হয় ত সাধারণতঃ পার্ব্বত্য

ত্রিপুরা কিম্বা আসাম প্রদেশ হইতে আসে। আমার একটী ক্ষুদ্র কারখানায় কাঠ যোগাইতে তাঁহাকে যদি দার্জ্জিলিং পাহাড়ে যাইতে হয়, তবে দর যে একটু বেশী পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, নূতন স্থান হইতে কাঠ আনাইয়া একটি মাত্র দিয়াশলাইর কারখানায় কাঠ সরবরাহ করিলে লাভের পরিমাণ (margin of profit) কতই থাকিবে?—শতকরা হিসাবে লাভের অঙ্ক বেশী দেখা যাইতে পারে; কিন্তু মোট কার্য্য-সমষ্টি (volume of business) অত্যল্প বলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ যে কয় টাকা লাভ হইবে, তাহা অনেক কাঠ-ব্যবসায়ীর পক্ষে যথেষ্ট প্রলোভনের জিনিষ (Sufficient inducement) নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নূতন স্থানে অল্প পরিমাণ অর্ডার দিতে হইলে কাঠ-ব্যবসায়ীকেও বেশী দর দিয়া কাঠ সংগ্রহ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ দিয়াশলাইর জন্য Poplar কাঠ ব্যবহৃত হয়। Aspen সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাঠ। দিয়াশলাইর কাঠ আমান (in round logs) এবং আর্দ্র অবস্থায় ফ্যাক্টরীতে আনিতে হয়; শুষ্ক হইলে কার্য্যকরী হয় না। কাজেই এক-সঙ্গে বেশী পরিমাণ কাঠ কারখানায় মজুত করিয়া রাখা চলে না। Mr. Troup, (The Imperial Forest Economist) বলেন—সিমুল কাঠ (Bombax Malaboricum) এবং গেঁও কাঠ (Excelsa Agallocha) দিয়াশলাইর পক্ষে বেশ উপযুক্ত। আসামের জঙ্গলে সিমুল কাঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গেঁও কাঠ সুন্দরবনে পাওয়া যায়। আসামের কাঠে যে ভাল দিয়াশলাইর কাঠি হয়, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছি। এক্ষণে একটি কথা এই, এক স্থান হইতে অনবরত একই রকমের কাঠ সময়মত না পাওয়াতে কখনও সুন্দরবন হইতে, কখনও দার্জ্জিলিং হইতে, আর কখনও বা আসাম প্রদেশ হইতে কাঠ আনাইতে হয়। ভিন্ন-ভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রকমের কাঠ আনাইলে শিল্পী (Expert) তাঁহার নিপুণতা দ্বারা কাঠকে season করিয়া সমভাবে আনিতে যতই কেন চেষ্টা করুন না, কাঠের প্রকৃতিগত পার্থক্য একটু থাকিয়াই যাইবে। কাঠে পার্থক্য থাকিলে দিয়াশলাইর গুণেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য পরিলক্ষিত হইবে। কয়েক দিন যাঁহারা একরকম কাঠের ম্যাচ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা অপর কাঠ দ্বারা নির্ম্মিত দিয়াশলাই পাইলেই বলিবেন—এবারকার ম্যাচ্ ঠিক পূর্ব্বের মত হয় নাই, এবং সঙ্গে-সঙ্গে কেহ কেহ হয় ত Expertদের সম্বন্ধে যা-তা একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিবেন।

আনুসঙ্গিক দ্রব্য

(Accessory materials—Labels)

আজকাল বিদেশ হইতে আমদানি দিয়াশলাইর বাক্সের উপর নানা রংএ চিত্রিত লেবেল দেখিতে পাওয়া যায়। 'বন্দে মাতরং' দিয়াশলাইর বাক্সে এক-রংএর একটি নারিকেল গাছের ছবি দেওয়া হইয়াছে। এক-রংএর লেবেল দেখিতে সুন্দর নয় বলিয়া পাইকারগণ ঐ দিয়াশলাই লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া শোনা যায়। কারবার চালাইতে হইলে ক্রেতাগণের রুচি-অনুসারে দ্রব্যের নির্ম্মাতাকে চলিতে হইবে। লেবেলের জন্য ছোট দিয়াশলাইর কারখানার পক্ষে ছবির ছাপাখানার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এক-রংএর ছাপাতে যত খরচ, চারি-রংএর হইলে ছাপাইবার খরচ তাহার প্রায় চতুর্গুণ পড়িবে। এদেশে এক-রংএ ছাপাইবার খরচ আর ইউরোপে চারি-রংএর খরচ প্রায় সমতুল্য। বাহিরের চাক্‌চিক্যে সুদর্শন এবং দামে সুবিধা হয় বলিয়া যদি আমাদের বিদেশী লেবেল ব্যবহার করিতে হয়, তবে যে পরিমাণ টাকার লেবেল বিদেশ হইতে আসিবে, ঠিক সেই পরিমাণ টাকার অর্ডার হইতে দেশীয় লেবেলের কারখানাটি বঞ্চিত হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ক্রমোন্নতির পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিবে। একটি শিল্পের সহিত অপর একটি শিল্পের এমন ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে, একটির পুষ্টি অন্যটির পরিপুষ্টির সহিত কখনও আংশিকরূপে, কখনও বা সম্পূর্ণরূপে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

ইউরোপ হইতে লেবেল ছাপাইয়া আনিলে প্রথমাবস্থায় কি-কি অসুবিধা ঘটে, দেখা যাক্। সিগারেটের বাক্সের লেবেল সময়-সময় বিলাত হইতে ছাপাইয়া আনান হয়। (বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের নানা কারখানায় বহু লেবেল বিদেশ হইতে আসিতেছে)। বিদেশ হইতে আনিতে হইলে অন্ততঃ ছয়মাস চলিবার মত মাল এক-সঙ্গে অর্ডার দেওয়া চাই। সময়মত মাল পাইবার অসুবিধা ছাড়াও অল্প পরিমাণে অর্ডার দিলে দর বেশী দিতে হয়। বিলাত হইতে

প্যাকেট আসিয়া পৌছিবামাত্র বিলাতি মহাজনগণ ব্যাঙ্কের মারফৎ সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লয়। সিগারেট-প্যাকেটগুলি না ফুরান পর্য্যন্ত একসঙ্গে অনেক টাকা আবদ্ধ রহিল। টাকাটা আবদ্ধ না থাকিলে, বৎসরের মধ্যে অল্পে-অল্পে উহা অনেকবার খাটিতে পারিত এবং অল্প মূলধনে কারবার চালাইবার সুবিধা হইত।

অল্প সময়ের মধ্যে টাকার আদান-প্রদান হইলে কি সুবিধা হয়, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আমেরিকার Mr. Wayland বলেন—"যদি কোন ব্যবসায়ী আজ এক হাজার ডলারের লৌহ ক্রয় করিয়া কা'ল তাহা বিক্রয় করে, তবে সাধারণতঃ সে তাহার পারিশ্রমিক এবং ব্যবসায়-চাতুর্য্যের বাবদ (Labour and skill) চার্জ্জ করিয়া কেবলমাত্র টাকার একদিনের সুদ ধরিয়া লয়। যদি তাহাকে বিক্রীর জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিতে" হয়, তবে একবৎসরের সুদ ধরিয়া দাম কষিতে হইবে; নচেৎ ঐ কাজে তাহাকে লোকসান দিতে হইবে। কিন্তু মাল আজ কিনিয়া কা'ল বিক্রয় করিয়া সেই টাকা যদি লৌহতেই খাটান যায়, তবে হয় ত বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ বার উহার ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারে। পঞ্চাশ বার ক্রয়-বিক্রয় হইলে তাহার labour and skillএর পুরস্কার সে বৎসরে পঞ্চাশ বার পাইতে পারে। মালটি বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র বিক্রীত হইলে তাহার পারিশ্রমিক ও ব্যবসায় চাতুর্য্যের (labour and skill) পারিতোষিক সে একবার মাত্র পাইবে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকবার টাকা খাটাইতে পারিলে ব্যবসায়ী তাহার labour and skillএর জন্য অল্প চার্জ্জও করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, শীঘ্র-শীঘ্র টাকার আদান-প্রদান ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই লাভজনক।

আর একটি প্রয়োজনীয় কথা। বিলাত হইতে বিশেষ কোন এক মার্কার দশ লক্ষ সিগারেট-প্যাকেট আসিয়া পৌছিল। কয়েকদিন সিগারেট বাজারে দেওয়ার পর দেখা গেল, ঐ মার্কার সিগারেট লোকের মনের মত হয় নাই। সেই মুহূর্ত্তেই সিগারেট-ব্যবসায়ীকে ঐ মার্কার সিগারেট বন্ধ করিয়া নূতন ব্র্যাণ্ডের সিগারেট বাজারে দিতে হইবে। বাজারে যে মালের একবার বদনাম রটিয়াছে, উহা ঠিক ঐ নামে বাজারে বেশী দিন রাখিয়া আরও বদনাম কেনা ব্যবসায়ীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। ঐ ব্র্যাণ্ডটি বন্ধ করিতে হইলে, বিদেশ হইতে আনীত সমস্ত প্যাকেটগুলিই বরবাৎ (dead stock) হইয়া যাইবে। দেশে অল্পমূল্যে সুন্দর প্যাকেট পাওয়া গেলে, ব্যবসায়ীকে সে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, বা সমস্ত টাকাটা একসঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় না।

এখন হয় ত ধারণা করা সহজ হইবে যে, labour and raw materials—যাহার উপর কারখানায় প্রস্তুত জিনিষের পড়্‌তা (cost of production) বেশী নির্ভর করে—তাহার কোন্‌টি বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সপক্ষে আছে। খুব নিপুণতা এবং ক্ষিপ্রতার সহিত ভাল সিগার প্রস্তুত (roll) করা শিখিতে, একটি জাপানী মেয়ের ৩।৪ বৎসর সময় লাগে। আমাদের কারখানার কুলিদের কাজ শিখাইতে সে রকম সময় কয়জন Expert পাইয়া থাকেন? কারবার খুলিতে খুলিতেই লাভ দেখাইতে না পারিলে, কিম্বা ডিভিডেণ্ড না দিলে, রক্ষা নাই। যে কারখানার সঙ্গে দেশের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের নামের সংস্রব আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যৌথ-কারবারের অনেক অংশীদার দুই-একবার টাকা দিয়া স্ব-স্ব অংশের দেয় বক্রী টাকা (uncalled capital) বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন, ঘরে যাহা রহিল তাহাই লাভ। ক্ষেত্রবিশেষে লাভ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে টাকার অভাবে অনেক কারখানাকে দুই-এক বৎসর চালাইয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে। এ স্থলে জানা আবশ্যক, Industry cannot be built in a day. Nothing venture, nothing gain.

Raw materials সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, একটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে একই রকম জিনিষের কতকগুলি কারখানা এক সময়ে থাকিলে কাঁচা মালের একটা আবশ্যকতা (demand) জন্মিবে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে দ্রব্য প্রস্তুত করণের উপাদান-সামগ্রী সুলভ মূল্যে সংগৃহীত হইবার পক্ষে সুবিধা জন্মিবে। বর্ত্তমানে সে সুবিধা আমাদের নাই।

কারখানার স্থান-নির্ব্বাচন (Location of factory)

স্থান-নির্ব্বাচনের উপর কারখানার ভবিষ্যৎ উন্নতি-অবনতি অনেকটা নির্ভর করে। অনেকেরই মনে হইতে

পারে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে দিয়াশলাইর কাঠ জন্মে, তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কারখানা স্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। যদি অন্যান্য economic conditions e, g, raw and accessory materials, facility of transport, labour, market, climate ইত্যাদি অনুকূল থাকে, তবে সেই স্থানই যে কারখানার উপযুক্ত স্থান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

জাপানে কোবে (Kobe) সহরের অন্তর্গত হিয়োগো নামক স্থানে দিয়াশলাইর কাঠি প্রস্তুত করিবার বহুসংখ্যক কারখানা আছে; তথায় কেবল কাঠিই প্রস্তুত হয়, ম্যাচ হয় না। ঐ সকল কারখানা হইতে জাপানের নানা সহরে দিয়াশলাইর কাঠির সরবরাহ হয়। কাঠি আমান কাঠ অপেক্ষা আয়তনে ছোট বলিয়া অল্প খরচেই রেলে কিম্বা জাহাজে পাঠান যায়। বঙ্গদেশে দুই-একটি ম্যাচ্-ফ্যাক্টরীর জন্য দার্জ্জিলিং কিম্বা সুন্দরবনে কাঠির কারখানা রাখিয়া কলিকাতায় দিয়াশলাইর কারখানা রাখিলে পোষাইবে না। কারণ একটি অতি ক্ষুদ্র কাঠির কারখানা 'বন্দে মাতরং' কারখানার মত ৪।৫টি দিয়াশলাইর কারখানার উপযোগী কাঠ অনায়াসে সরবরাহ করিতে পারে। বঙ্গদেশের ২।১টি কারখানার জন্য একটি স্বতন্ত্র কাঠির কারখানা কিরূপে চলিবে? আমাদিগকে উক্ত দুই কারখানাকে স্বতন্ত্র না রাখিয়া এক স্থানে এক সঙ্গে রাখিতে হয়। এক করিলে অসুবিধা এই—কাঠ কাটা, কাঠি প্রস্তুত করা, ফ্রেমে কাঠি ভরা ইত্যাদির জন্য অন্ততঃ একটা করিয়া কল চাই ("বাঁশ চাছিয়া" কিম্বা "ঢেঁকাগাছের ডাল"দিয়া কাঠি প্রস্তুত করিলে চলিবে না)। কাঠ কাটিবার এবং কাঠি বানাইবার কল ২।৩ ঘণ্টা চালাইলেই হয় ত সেই দিনকার ম্যাচ প্রস্তুত করিবার মত কাঠি প্রস্তুত হইতে পারে; বাকী ৭।৮ঘণ্টা কল দুইটিকে বসাইয়া রাখিতে হয়। কল labourএর প্রতিনিধিস্বরূপ। [illegible]মী ২।৪টি কলকে দিনের বেশী সময় বসাইয়া রাখিতে [illegible]ইলে (capital lying idle) জিনিষের পড়্তা (cost of [illegible]roduction) বেশী পড়িবে এবং সেই কারণে কারখানাকে [illegible]তিগ্রস্ত হইতে হইবে। অধিকন্তু, অনেক সময় কারখানার [illegible]ত্থোক্তাগণ উপযুক্ত স্থানের উপর তেমন লক্ষ্য না রাখিয়া, [illegible]বং সময়-সময় Expertদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া [illegible]জেদের অভিলষিত স্থানে কল স্থাপন করেন।

জাপানে ওসাকা ও কোবে সহরে রাস্তায় বাহির হইলেই সাধারণ লোকের বাটীর সম্মুখে রাশি-রাশি দিয়াশলাইর খালি বাক্স স্তূপীকৃত করিয়া রৌদ্রে রাখিতে দেখা যায়। ফ্যাক্টরী হইতে বাক্সের কাঠ কাল দাগ কাটিয়া বাড়ী বাড়ী দেওয়া হয় এবং বাড়ীর মেয়েরা অবসরমত দিয়াশলাইর বাক্স প্রস্তুত করিয়া কারখানাতে দিয়া কিছু-কিছু উপার্জ্জন করে। ইহাতে ঘরে বসিয়া অনেক গৃহস্থ-পরিবারের উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া দিবার সহায়তা করে। এই খানেই কুটীর শিল্পের (cottage-industry) সূত্রপাত। রেঙ্গুনের চুরুট কতকটা এই রীতির অনুসরণ করিয়া প্রস্তুত হয়।

আমাদের দেশে অনেকেই বলেন, এ দরিদ্র দেশ গৃহ-শিল্পের পক্ষেই উপযোগী—এখানে বড় বড় কলকারখানা করা ভুল। যাঁহারা manufacturing businessএর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন, এবং বাজারে প্রতিযোগিতার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা হয় ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এ ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে কুটীর-শিল্প একটী স্থানীয় বাজার (local market) ছাড়া অন্যত্র একটী subsidiary বা feeder industry ব্যতীত নিজে একটি স্বতন্ত্র industry হিসাবে স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে কি না সন্দেহ। তবে যে সকল শিল্পে হস্ত-নৈপুণ্যের বিশেষ দরকার, এবং যে কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

কেহ-কেহ ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ইতালী, সুইজারলণ্ড, বেল-জিয়াম প্রভৃতি দেশের কুটীর-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবিদের সংখ্যা হইতে প্রতিপন্ন করিতে চান যে, যখন য়ুরোপে কুটীর-শিল্প এখনও বহু পরিমাণে বিদ্যমান, তখন আমাদের দেশে কুটীর-শিল্প স্থাপনে বাধা কি? বরং কুটীর শিল্পের দিকেই আমাদের বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, য়ুরোপে কুটীর-শিল্পের বৃদ্ধি 'বড়-বড় কারখানার সঙ্গে-সঙ্গে হইতেছে, এবং ঐ সকল ক্ষুদ্র শিল্প বড়-বড় কারখানারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বরূপ। একটি কারখানায় প্রস্তুত জিনিষ (manufactured product) অনেক সময় অপর কারখানার কাঁচা মাল (raw material) স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। একটা বড় শিল্পের সঙ্গে পাঁচটা ছোট শিল্পের উৎপত্তি অনায়াসেই হইতে পারে—যেমন, একটী সিগারেট-ফ্যাক্টরীর সঙ্গে-সঙ্গে (১) সিগারেট প্যাকেট ছাপান, (২) প্যাকেট প্রস্তুত, (৩) কার্ড-বোর্ডের বাক্স প্রস্তুত,

(৪) সিগারেটের কাগজের নল (mouth-piece), (৫) সিগারেটের জন্য রঙ্গিন টিনের বাক্স প্রভৃতির উৎপত্তি কতকটা সহজ ও স্বাভাবিক।

সিগারেটের mouth-piece, প্যাকেট ইত্যাদি জাপানের দিয়াশলাইর বাক্সের মত কলিকাতার কোনও পল্লীতে ঘরে-ঘরে তৈয়ারী হইতেছিল। জাপানে প্রস্তুত জিনিষের সহিত দামের প্রতিযোগিতায় না পারায় কলিকাতায় সিগারেট mouth-piece করা বন্ধ হইয়াছে—প্যাকেট প্রস্তুত এখনও চলিতেছে।

জিনিষ বাজারে চালাইবার ব্যবস্থা

(Marketing of Manufactured Articles).

জিনিষ প্রস্তুত করা অপেক্ষা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা অধিকতর কষ্টসাধ্য। অনেকেই মনে করেন, কারখানায় জিনিষটী প্রস্তুত হইবামাত্রই বিক্রী, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই পয়সা। নগদ মূল্যে কোন পাইকারই কারখানা হইতে জিনিষ লয় না,—ধারে দেওয়া চাই। আমাদিগের কারবারের মূলধন কম বলিয়া জর্ম্মণির ব্যবসায়ীদিগের মত বেশী সময়ের জন্য ধারে জিনিষ দিয়া আমাদের ব্যবসায়ীরা বসিয়া থাকিতে পারেন না। তাহারা নিজেদের দেশে নিজেরাও বেশী দিনের ধার (credit) পায় এবং আমাদের পাইকার-দিগকেও বেশী দিনের credit দিতে সক্ষম হয়। এমনও শোনা যায়, ব্যবসায়ীরা ধারে মাল না দেওয়াতে কোন-কোন পাইকার—খরিদ্দার কারখানাবিশেষের মাল চাওয়াতে—উত্তরে বলিয়াছেন, এই মাল বাজারে চলে না, তাই উঁহারা তাহা রাখেন না। উপরন্তু, আমাদের দেশীয় পাইকারগণ বিদেশ হইতে আনীত মাল অপেক্ষা স্বদেশী মালের উপর বেশী হারে কমিশন দাবী করে। Mr. J. N. Gupta M. A., I. C. S., তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের Industrial Surveyর রিপোর্টে স্বদেশী সাবানের কার-খানা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"আমাদের ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া পাইকারদিগের কমিশনের হার নির্দ্ধা-রণের চেষ্টা না করিয়া একে অন্যের অপেক্ষা বেশী কমিশন দিবার প্রলোভন দেখাইয়া নিজেদের কারখানার মাল কাট্‌তি করাইতে প্রয়াসী হন। সাবানের কারখানার পরিচালকগণ শতকরা ৩০।৩৫ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন দিয়া থাকেন। এক বাক্স Daffodil সাবান, যাহা প্রস্তুত করিবার খরচ নয় আনা মাত্র, তাহা বাজারে বিক্রী হয় পনর আনায়। অতিরিক্ত কমিশনই দাম বৃদ্ধির কারণ। কমিশনের মাত্রা কমাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে স্বদেশী সাবান বিদেশী সাবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। সাবানের কারখানাগুলির মধ্যে "Trades Union" স্থাপন করিয়া কমিশনের হার নিরূপণ করাই প্রতিকারের একমাত্র উপায়।" অতি উচ্চ মাত্রায় কমিশন দিতে হয় বলিয়া কারখানার লাভের অংশ কম দাঁড়ায়; সুতরাং সাবানের qualityর উন্নতি এ কয় বৎসরে যতটা আশা করা গিয়াছিল, তাহা হইতে পারে নাই। Expertদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই; কারণ তাঁহারা তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছেন। Indian Industrial Exhibition এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনীতে তাঁহাদের প্রদর্শিত সাবানের রাসায়নিক পরীক্ষার ফলই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতির সুযোগ্য সেক্রেটারী দেশমান্য রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের উদ্যোগে ১৯১০ অব্দের জানুয়ারী মাসে 'Manufacturer's Association of Bengal' নামে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ম্যানুফ্যাক্‌চারারদের মধ্যে একতা স্থাপন (Trades Union বা Manufacturer's Guild) করিয়া ন্যায্য কমিশনে পাইকারদের মাল দেওয়া। উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশন 'এলবার্ট হলে' নসীপুরের অনারেবল মহারাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে হইয়াছিল। স্বদেশী ম্যানুফ্যাকচারার অধিকাংশই অতি আগ্রহ-সহকারে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং একসঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেবলমাত্র একটী সাবান ফ্যাকটরীর একজন সুপরিচিত স্বত্বাধিকারী এই বলিয়া দূরে সরিয়াছিলেন "He was a believer in the survival of the fittest. He had no faith in combination." এই সমিতি স্থাপনের কিয়দ্দিন পরে ঠিক একই উদ্দেশ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আর একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষোভের বিষয় এই যে, উভয় সমিতিই পরস্পরের সহায়তার (Co-operation) অভাবে লোপ পাইয়াছে!

অসমান ও অন্যায্য প্রতিযোগিতা
(Unfair and Unequal Competition).

প্রতিযোগিতা সমভাবে উৎপন্ন দ্রব্য এবং তাহার বিক্রয়ের উপর হিতকর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু অত্যধিক মূলধনে পরিচালিত কারবারের অসাধু ও অসমান প্রতিযোগিতা নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র কারখানাগুলির অস্তিত্ব-রক্ষার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়।

সুবৃহৎ কারবারগুলি (Trust form of Organization) কি কি উপায় অবলম্বন দ্বারা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারবারগুলিকে বিনষ্ট করিতে প্রয়াস পায়, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে :—

(১) নির্দ্দিষ্ট বাজার-চলিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারখানা-জাত দ্রব্যের কাট্‌তি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অত্যধিক সুলভ মূল্যে নিজেদের (বড় কারখানার) জিনিষ প্রচলন করা, কিন্তু অন্যত্র উক্ত দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ সমভাবে রাখা।

(২) অন্য কারখানাজাত মাল একেবারে বিক্রয় না করিয়া কেবল Trustএরই মাল কাট্‌তি করাইবার সর্ত্তে উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া (সেই প্রলোভনে পাইকারগণ Trust এর মাল সরবরাহ করিতে বিশেষ তৎপর হয়)।

(৩) প্রতিযোগী কারখানাকে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উৎপন্ন মালের পড়্‌তা (cost price) অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা।

(৪) প্রতিযোগী কারখানাগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে কিছুদিনের জন্য বিনামূল্যে নিজেদের মাল বিতরণ করা এবং আইন-আদালতের ক্ষতি-পূরণের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া অপর কারখানাজাত বাজার-চলিত জিনিষের মার্কা নকল করা (Imitation Brand)।

(৫) ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারখানাগুলি যাহাতে লাভজনক না হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে অধিক মূল্য দিয়া অতিরিক্ত কাঁচা মাল খরিদ করিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি করা (increasing the price of raw materials)।

সব-জান্তা (Expert).

আমাদের কারখানার পরিচালন প্রকৃত পক্ষে এক প্রকারই অভিনয়। আমাদের দেশবাসীরা আশা করেন, কোন বিষয়ে কৃতি (Expert) একাধারে একই সময়ে ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিৎ, কারিগর, হিসাবপত্র-রক্ষক, কার্য্যাধ্যক্ষ, কারখানার বাটী পরিদর্শক, জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে ওস্তাদ, বাজার দালাল, Travelling এজেণ্ট ইত্যাদি সবই হইবেন।

জিনিষ-নির্ম্মাণ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ভার একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা (Factory manager এবং Business Manager) অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। কারবারের লাভালাভ, সস্তায় কাঁচা মাল খরিদ, এবং বেশী দরে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর অধিকতর নির্ভর করে। এই কাজ সাধারণতঃ Business ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত থাকে এবং তাঁহারই কার্য্যকুশলতায় কারখানার উন্নতি এবং তদভাবে অবনতি নিরন্তর ঘটিয়া থাকে। অপর পক্ষে মাল প্রস্তুত করিবার ব্যয়-লাঘব-বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ফ্যাক্‌টরী ম্যানেজারের প্রধান কার্য্য। প্রত্যেক কারখানায় যোগ্যতানুসারে কার্য্য-ভার অর্পণ এবং দায়িত্বভার বিভাগ না করিয়া দিলে, শৃঙ্খলার সহিত সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন।

অল্প মূলধনে কারখানা স্থাপন (Establishment of a factory with Insufficient Capital)

কারবারের উন্নতি প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—টাকা এবং মাথা। বাঙ্গালীর মাথা নাই, এ কথা কে বলিবে? তবে ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির মস্তিষ্ক-বিকাশের তারতম্য হইতে পারে, স্বীকার করিতে হইবে। একজন ভাল আইনজ্ঞ, বড় উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টারের মাথা ঠিক একই সময়ে আইন এবং কারবারে সমভাবে না খেলিতেও পারে। কাজেই শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মত সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া লওয়ায় অসুবিধা আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কেহ-কেহ ধৈঞ্চা গাছের ডাল দিয়া কিম্বা বাঁশ চাঁছিয়া-দিয়াশলাইর কাঠি প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বাঁশের কঞ্চির ভিতর সীস ভরিয়া পেন্সিলও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সব কথা শুনিলে এখন হাসি পায়—তখন কিন্তু কথাগুলি বেশ লাগিত।

প্রত্যেক কাজেই শিক্ষানবীশ দরকার। যাঁহারা বিদেশ হইতে শিল্প-বাণিজ্য শিখিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারাই যে এই বিষয়ে পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহা বলি না। তাঁহারা, বলিতে গেলে শিল্প-বাণিজ্যের A. B. C. মাত্র শিখিয়াছেন। তবে

বক্তব্য এই যে, যাঁহারা সেই A.B. C. পর্য্যন্তও জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে Expertদের ডিঙ্গাইয়া Technical detailsএ হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। অর্থের বলে অনেকে কারখানার ডিরেক্টার হইতে পারেন বটে, কিন্তু অর্থ থাকিলেই মাথা থাকিবে, এ কথা সর্ব্বত্র স্বীকার করা যায় না। এ স্থলে একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশের কোনও একটি টেক্নিক্যাল্ বিদ্যালয়ে ডিরেক্টারদের সভায় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল যখন কলেজের জন্য Voltameter ও Amperemeter আনাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন একজন ডিরেক্টার বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, বিদ্যালয়ের আয় অতি সামান্য বিধায় এই দুইখানা দামী জর্ম্মাণ পুস্তক আনান সুবিধা হইয়া উঠিবে না। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম-এ উপাধিধারী—পাঁচবৎসর জর্ম্মাণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল জর্ম্মাণীতে ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ডিরেক্টর মহোদয় Voltameter এবং Amperemeter দুইখানা জর্ম্মাণ বই বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন !

উপযুক্ত মূলধন সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত কারখানা স্থাপন বিধেয় নহে। কাগজে-কলমে যে-কোন কারবারে লাভ দেখান যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময় বিপরীত ফল দাঁড়ায়। স্বদেশীর সময়ে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নূতন-নূতন ফ্যাক্টরী স্থাপনই যেন একটা বড় স্বদেশী কাজ বলিয়া অনেকে মনে করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, টাকার অভাবে ৩।৪ বৎসর চালাইয়া অনেক ফ্যাক্টরী বন্ধ করিতে হইয়াছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে, এখন আর কেহই নূতন কারখানা স্থাপনের জন্য টাকা বাহির করিতে প্রস্তুত নহেন। সস্তায় যা তা কল কিনিয়া যাকে-তাকে দিয়া কাজ আরম্ভ করিলে জিনিষ খারাপ হয়, দাম বেশী পড়ে এবং পরিণামে অনুশোচনা করিতে হয়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, একটি শিল্প দাড় করাইতে পারিলে, তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঁচটি কুটীর-শিল্প আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়। যৌথকারবার ছাড়া বেশী মূলধন সংগ্রহ করা সুকঠিন। জাতীয় চরিত্র গঠিত না হইলে যৌথকারবারের স্থায়িত্ব অসম্ভব। দেশের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের নামে মুগ্ধ হইয়া বহুলোকে দেশী কোম্পানীর অংশ ক্রয় করে। খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই Prospectusএ নিজেদের নাম দিবার অনুমতি দিয়া একটিবারও কারখানায় পদার্পণ করেন না, বা কারখানা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণনা করেন না। কোম্পানীর (যৌথকারবারের) বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র উপযুক্ত সময়ে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করার অপরাধে বঙ্গদেশে Ex Judge এবং Ex-Presidentকে পর্য্যন্ত, আদালতে দণ্ডনীয় হইতে হইয়াছে —অন্যে পরে কা কথা।

ফ্যাক্টরী পরিচালন (Management of factory)

ফ্যাক্টরী সুচারুরূপে পরিচালনার উপর লাভালাভ নির্ভর করে। ম্যানেজার এবং Expertকে কারখানার আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডিরেক্টারদের সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনধিকার-চর্চ্চা। কারখানায় নিযুক্ত লোকদের কাজের জন্য ম্যানেজার ডিরেক্টারদের নিকট দায়ী থাকিবেন। উকীল, মোক্তার, ডাক্তারদের একই সময়ে নিজেদের ব্যবসা চালান এবং কোম্পানীর ডিরেক্টর থাকা কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়। ম্যানেজার এবং Expert কারখানাটিকে যাহাতে নিজের কারখানার মত মনে করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে প্রথম হইতেই যত্নবান হইতে হইবে। Expertকে ২।১ বৎসর রাখিয়া নিজের একটি লোককে কাজ শিখাইয়া লইয়া বিদায় দেওয়ার স্পৃহা অনেক কারখানার স্বত্বাধিকারীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম হইতেই Employer এবং Employeeর আন্তরিক বিরুদ্ধভাব পোষণ কারখানার পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক। জিনিষ প্রস্তুত করিবার গুপ্ত রহস্য (trade secret) শিখিবার জন্যই কৃতী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশে যান। বিনা পয়সায় তাঁহার নিকট হইতে trade secret কাড়িয়া লইবার চেষ্টা অতীব গর্হিত কার্য্য। পৃথিবীর অপরাপর জায়গায় trade secret যে কত সযত্নে রক্ষিত হয়, তাহা সাঙ্ঘাইয়ের বৃটিশ কন্‌সাল Sir Pelham Warrenএর নিম্নলিখিত চিঠিখানা পাঠে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে :—

H. B. M. Consulate-General,

Shanghai, 10th February, 1909.

To

His Excellency the Right Honorable Sir

Claude Macdonald, G.C.M.G., G.C.V.O., K.C.B., His Britannic Majesty's Ambassador at Tokyo, Japan.

Sir,

I conveyed to the Chairman and General Manager of the British Cigarette Company the request contained in your despatch of the 30th ultimo that Mr.—be allowed to enter their factory at this port for a short period to study its workings.

In reply, the Chairman informs me that he is unable to extend to Mr.—the privilege suggested. His Company, he stated, has consistently refused such requests in the past, and would regard any deviation from this inflexible rule as a dangerous precedent. It is, however, with deep regret that he finds himself obliged to refuse the courtesy suggested by you.

I have etc.

(Sd.) Pelham Warren

Consul-General.

Expert এবং Employer এর পরস্পরের বিরুদ্ধভাব সময়-সময় এতদুর গড়ায় যে, কারখানার স্বত্বাধিকারীগণ কাঁচা মাল (raw materials) ক্রয় করিবার সময় জিনিষের গুণাগুণ Expertকে দিয়া পরীক্ষা না করাইয়াই অনেক সময় নিজেরা মাল ক্রয় করেন—এমন কি দাম পর্য্যন্ত Expertকে জানিতে দেন না। এমতাবস্থায় কারখানায় প্রস্তুত জিনিষ খারাপ হইলে কে দায়ী হইবে, এবং raw materials এর দাম না জানিলে জিনিষের পড়্‌তাই বা কিরূপে কমিবে? ফ্যাক্‌টরীটি পরিণামে ফেল হইলে, Expert এর উপরেই সমস্ত দোষ ন্যস্ত হইবে—কারণ, তাঁহার সপক্ষে দুটো কথা বলিবার লোক নাই!

অনেক কারখানার পরিচালকগণ সময়ের মূল্য তেমন উপলব্ধি করেন না। দশ-পনর মিনিট কুলিরা বসিয়া সময় কাটাইলেও তাঁহারা কিছু মনে করেন না। যে কারখানায় সহস্র লোক কাজ করে, সেখানে প্রত্যেক দশমিনিট করিয়া সময় নষ্ট করিলে, এক হাজার কুলি দৈনিক প্রায় ১৬৬ ঘণ্টা নষ্ট করিবে। প্রত্যেক ঘণ্টার মূল্য অর্দ্ধআনা করিয়া ধরিলে, বৎসরে (মোটামুটি ৩০০ দিনে) প্রায় ১৫৫৬৲ টাকা লোকসান হইবে। সুদসহ টাকার অঙ্ক আরও বাড়িয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন (Advertisement)

মালের কাট্‌তিতে লাভ। কাট্‌তি বেশী হইলে অল্প লাভে সস্তা দরে জিনিষ দেওয়া যায়। কৌশলে বিজ্ঞাপনের বলে কারখানাবিশেষের জিনিষ অত্যল্প সময়ে বাজারে পরিচিত হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার কাট্‌তি বৃদ্ধি হয়। কেহ-কেহ বিজ্ঞাপনের খরচ অযথা খরচ মনে করেন। বিজ্ঞাপন দিতে অনুরোধ করাতে একটি সিগারেট কারখানার স্বত্বাধিকারী বলিয়াছিলেন—"আরে ভাই, advertisement সে ক্যা হোগা।" বন্দেমাতরং ম্যাচ্ কোথায় পাওয়া যায় এবং কলিকাতাতেই যে ইহার ফ্যাক্টরী, এ কথা হয় ত অনেকেই জানেন না।

আমাদের কর্ত্তব্য (Our Duty)

এই যে চারিদিকে কারখানা ফেল হইতেছে—ইহাতে কি আমাদের দমিয়া যাওয়া উচিত? আমরা কি ফেলের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি না? শক্তি-প্রয়োগ এবং টাকা খরচ ছাড়া কে কোন্ দিন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছে? আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের দিকে শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই ছিল না; সুতরাং ফেলের মধ্য দিয়া অভীপ্সিত ফলের দিকে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অন্যান্য দেশের শিল্প-বিস্তারের ইতিহাস এই সত্য প্রতিপাদন করিতেছে। আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ইহাই আমাদের জাতীয় মূলধনের ভিত্তি-স্বরূপ। দাতাকর্ণ কার্ণেগি (Mr. Andrew Carnegie) বলেন—"তোমরা কি জান, যাহারা নিজেরা নিজেদের জন্য কারবার আরম্ভ করে, তাহাদের মধ্যে statistics হইতে দেখা যায়, শতকরা ৯৫জন ফেল হয়? আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা জানি (Carnegie—'Wealth and its Uses').

Mr. N. P. Gilman তাঁহার খ্যাতনামা পুস্তকের ('Profit-Sharing between Employer and

Employee') ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যাহারা নিজেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০।৯৫ জন ফেল পড়ে—ইহা ব্যবসায়ীদের জীবন হইতে দৃষ্ট হয়।" একজন ফরাসী লেখক বলেন—"একশতজন কারবারীর মধ্যে দশজন লাভবান হয়, পঞ্চাশজন টলমল অবস্থায় চালায়, আর চল্লিশজন দেউলিয়া হয়।"

১৯০৮ সালে এক আমেরিকাতেই ১৪,০৪৪টি ব্যবসায় ফেল পড়িয়াছিল। ঐ বৎসর তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩৫টি কারবার বেশী ফেল হইয়াছিল। এই ফেলের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে—হাজার-করা ৩৪২টি মূলধনের অভাবে, ২১৬টি অজ্ঞতার জন্য, ১৮৯টি দুর্ঘটনায়, ১১৫টি সততার অভাবে, ৪০টি অনভিজ্ঞতার ফলে, ২২টি অবহেলায়, ১০টি দূষণীয় ধার দেওয়ায়, ১৮টি অপরের দেউলিয়া হেতু, ১৮টি প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ১০টি অপরিমিত ব্যয়ে এবং ১০টি ভাগ্য-পরীক্ষায় ফেল পড়িয়াছে (American Machinist).

উকীল-ব্যারিষ্টারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র একটি সীমাবদ্ধ কেন্দ্রে। ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে। যাহারা শত-শত বৎসর ধরিয়া অজস্র অর্থব্যয়ে নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া কোন একটি জিনিষকে পৃথিবীর বাজারে একচেটিয়া করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, একদিনেই তাহার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীকে সমভাবে দাঁড়াইতে হইবে—এ আশা সুদূর-পরাহত। আমরা পরে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া, অল্লায়াসে এবং অল্প খরচে পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীদের অভিজ্ঞতার ফলভোগ করিতেছি সত্য, কিন্তু অপরাপর অসমান প্রতিযোগিতার কারণগুলি সম্যক দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাদিগের নূতন শিল্পীকে একটু খাটিতে হইবে।

কি-কি কারণে বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সস্তায় জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে না, কিম্বা বাহ্য চাক্‌চিক্যে লোকের মন মুগ্ধ করিতে পারিতেছে না, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আসুন, আমরা সকলে তৎসমুদয় কারণ দূরীকরণার্থ বদ্ধপরিকর হই—বক্তৃতা ছাড়িয়া কাজে প্রবৃত্ত হই। ভারতের এ দারিদ্র থাকিবে না, সুদিন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।

শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী।

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাহাতে অচৈতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তারি-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা-কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল; কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে লইয়া জন-দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে, এবং সহরের ভাল-মন্দ নানাবিধ চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে, অন্য ক্ষতি না হৌক, ''ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারি কহিল, "বঙ্কু, আর দেরি করিস্‌নে বাবা, এইবেলা একখানা সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ী রিজার্ভ করে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখ্‌তে আর সাহস করিনে।" বঙ্কুর অতৃপ্ত নিদ্রা তখনও দু'চক্ষু জড়াইয়া ছিল; সে মুদিত নেত্রে অব্যক্ত স্বরে জবাব দিল, "তুমি খেপেচ মা, এ অবস্থায় কি নাড়া-নাড়ি করা যায়?"

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, "আগে তুই উঠে চোখে-মুখে জল দে দেখি; তার পরে নাড়ানাড়ির কথা বোঝা যাবে। লক্ষী বাপ আমার, ওঠ্।" বঙ্কু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া ষ্টেসনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে-ধীরে ডাকিলাম, "পিয়ারি?" আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপর ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটু-

খানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সেই কোমল স্বরে কহিল, "ঘুম ভাঙল ?"

"আমি ত জেগেই আছি।" পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, "জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন ?" "তা ত বরাবরই কর্‌চি পিয়ারি। আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'ল ?"

"তেরোদিন" বলিয়া সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীর ভাবে কহিল, "দেখ, ছেলেপিলেদের সাম্‌নে আর আমাকে ও বলে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী বলে ডেকেচ, তাই কেন বল না ?"

দিন-দুই হইতেই আমি পূর্ণ সচেতন ছিলাম। আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, "আচ্ছা।" তার পরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে মনে সেই কথা-গুলা একটু গোছাইয়া লইয়া বলিলাম, "আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচ ; কিন্তু, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েচি, আর দিতে চাইনে।"

"তবে, কি করতে চাও ?"

"আমি ভাব্‌চি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চার দিনেই বোধ হয় এক রকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই কয়টা দিন অপেক্ষা করে বাড়ী যাও।"

"তখন তুমি কি কর্‌বে শুনি ?"

"সে যা হয় একটা হবে।"

"তা' হবে" বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তার পরে সুমুখে উঠিয়া আসিয়া, খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, "তিন-চার দিনে না হোক্ দশ বারো দিনে এ রোগ সারবে তা' জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে, আমাকে বল্‌তে পারো ?"

"আসল রোগ আবার কি ?"

পিয়ারী কহিল, "ভাব্‌বে একরকম, বল্‌বে একরকম, করবে আর একরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। তুমি জানো যে, একমাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না— তবু বল্‌বে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও। ওগো দয়াময় ! আমার উপর যদি তোমার এতই দরদ তবে—যাই হোক্ গে—সন্ন্যাসী 'নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে ! এসে দেখি, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে অঘোর, অচৈতন্য ! মাথাটা ধূলো-কাদায় জট পাকিয়েচে ; সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা ; হাতে দু-গাছা পেতলের বালা। মা গো মা ! চেহারা দেখে আর কেঁদে বাঁচিনে !" বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টল-টল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়া-তাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল—"বঙ্কু বলে, 'ইনি কে মা ?' মনে-মনে বল্‌লুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে কথা আর কি বোল্‌ব বাবা ! উঃ কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে। মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দু'জনের চার চক্ষুর দেখা হয়েছিল ! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয়নি, দেবে না ! সহরের মধ্যে যে বসন্ত দেখা দিয়েচে—সবাইকে নিয়ে ভালোয়-ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি !" বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম। একজন ছোকরা ডাক্তার-বাবু অনেক প্রকার ঔষধের সরঞ্জাম লইয়া আমাদের পাটনা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে সঙ্গে গেলেন।

পাটনায় পৌছিয়া বারো-তেরো দিনের মধ্যেই এক-প্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকলে পিয়ারীর বাড়ী এবং ঘরে-ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। এমন যে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা নয়। জিনিসগুলি ভালো এবং বেশি মূল্যের, তা বটে ; কিন্তু, এই মাড়োয়ারী-পাড়ার মধ্যে, এই সকল ধনী ও অল্পশিক্ষিত সৌখীন মানুষের সংস্রবে এত সামান্য জিনিসপত্রেই এ সন্তুষ্ট রহিল কি করিয়া ? ইতিপূর্ব্বে আমি আরও যতগুলি এই ধরণের ঘর-দ্বার দেখিয়াছি, তাহাদের সহিত কোথাও কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। সেখানে ঢুকিলেই মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালও অবস্থান করে কি করিয়া ? ইহার ঝাড়, লণ্ঠন, ছবি, দেয়ালগিরি, আয়না, গ্লাসকেসের মধ্যে আনন্দের পরিবর্ত্তে আশঙ্কা হয়—সহজে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবকাশটুকুও বুঝি মিলিবে না। বহু লোকের বহুবিধ কামনা-বাসনার উপহাররাশি এম্‌নি ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি ভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিপাতমাত্রেই মনে হয়, এই অচেতন জিনিষগুলার মত তাহাদের সচেতন

দাতারাও যেন একটুখানি জায়গার জন্য ইহারই মধ্যে এমনি ভিড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষারেষি ঠেলাঠেলি করিতেছে। কিন্তু এ বাড়ীর কোন ঘরে আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত একটা বস্তুও চোখে পড়িল না; এবং যাহা চোখে পড়িল, সেগুলি যে গৃহস্বামিনীর আপনার প্রয়োজনেই আহৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার নিজের ইচ্ছা এবং অভিরুচিকে অতিক্রম করিয়া আর কাহারও প্রলুব্ধ অভিলাষ যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া যায়গা জুড়িয়া বসিয়া নাই, তাহা অতি সহজেই বুঝা গেল। আরও একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এমন একটা নাম-জাদা বাইজীর গৃহে গান-বাজনার কোন আয়োজন কোথাও নাই। এ-ঘর সে ঘর ঘুরিয়া দোতালার একটা কোণের ঘরের দরজার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহা ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম। কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার কিছুই নাই। মেজেটি শাদা পাতরের, দেয়ালগুলি দুধের মত শাদা ঝক্-ঝক্ করিতেছে। ঘরের একধারে একটি ছোট তক্ত-পোষের উপর বিছানা পাতা; একটি কাঠের আনলায় থানা-কয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলমারি! আর কোথাও কিছু নাই। জুতা-পায়ে প্রবেশ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইল; চৌকাটের বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে আসিলাম। বোধ করি ক্লান্তি-বশতঃই তাহার শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হইলে ঘরে আর কিছু বসিবার যায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিতাম। সুমুখের খোলা জানালা ঢাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ; তাহারই ভিতর দিয়া ঝির্-ঝির্ করিয়া বাতাস আসিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা মিষ্ট শব্দে চকিত হইয়া দেখিলাম, গুন-গুন করিয়া গান গাহিতে-গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এ দিকে একেবারেই তাকায় নাই,—সোজা আনলার কাছে গিয়া শুষ্কবস্ত্রে হাত দিতেই, আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—"ঘাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন?" পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "অ্যাঁ—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছ? না, না, বোস-বোস,—যেতে হবে না; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আস্চি" বলিয়া লঘু-পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া, হাসিয়া কহিল, "আমার ঘরে ত কিছুই নেই; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে, বল ত? আমাকে নয় ত?"

আমি বলিলাম, "আমাকে এম্নি অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত করলে, আর শেষে তোমাকেই চুরি কোরব? আমি এত লোভী নই।"

পিয়ারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। কথাটায় সে যে ব্যথা পাইতে পারে, বলিবার সময় তাহা ভাবি নাই। ব্যথা দিবার ইচ্ছাও ছিল না, থাকা স্বাভাবিকও নয়। বিশেষতঃ, দুই-একদিনের মধ্যেই আমি প্রস্থানের সঙ্কল্প করিতেছিলাম। বেফাঁস কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "নিজের জিনিস বুঝি কেউ চুরি কর্‌তে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি?"

কিন্তু এত সহজে তাহাকে ভুলানো গেল না। সে মলিন মুখে কহিল, "তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না;—দয়া করে সে সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে, এই আমার ঢের।"

তাহার শুদ্ধ, স্নাত, প্রফুল্ল হাসি-মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল বেলাটাতেই ম্লান করিয়া দিলাম দেখিয়া, একটা বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সেই হাসি-টুকুর মধ্যে কি যে একটা মাধুর্য্য ছিল যে, তাহা নষ্ট হইবা-মাত্রই ক্ষতিটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফিরিয়া পাইবার আশায় তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিলাম, "লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জান। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধূলোবালির উপরেই মরে থাকতে হোতো, কেউ ততদূর গিয়ে একবার হাঁসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা পর্য্যন্তও কোরত না। সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে,—সুখের দিনে না হোক্, দুঃখের দিনে যেন মনে করি,—নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলেই কথাটা মনে পড়েছিল, তা' এখন বেশ বুঝ্‌তে পারি।"

"পারো?"

"নিশ্চয়।"

"তা'হলে আমার জন্যই প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল?"

"তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"তা'হলে ওটা দাবী করতে পারি বল?"

"তা' পারো। কিন্তু আমার প্রাণটা এত তুচ্ছ যে, তার 'পরে তোমার লোভ হওয়াই উচিত নয়।"

পিয়ারী এতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল, "তবু ভাল যে, নিজের দামটা এতদিনে টের পেয়েচ"। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল "তামাসা থাক্—অসুখ ত এক রকম ভাল হ'ল, এখন যাবে কবে মনে করচ?"

তাহার প্রশ্নটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কহিলাম, "কোথাও যাবার ত এখন আমার তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাক্‌ব ভাব্‌চি।"

পিয়ারী কহিল, "কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আস্‌চে। বেশীদিন থাক্‌লে সে হয় ত কিছু ভাব্‌তে পারে।"

আমি বলিলাম, "ভাবলেই বা। তাকে ত তোমার ভয় করে চল্‌তে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও আমি নড়চিনে।"

পিয়ারী বিরস মুখে বলিল—"তা কি হয়!" বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পরদিন বিকাল বেলায় আমার ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে শুইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হয় নাই। একটা চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলাম, "বঙ্কু, কি পড় তুমি?"

ছেলেটি অতিশয় সাদা-সিধা ভালমানুষ। কহিল, "গত বৎসর আমি এণ্ট্রান্স পাশ করেচি।"

"এখন তা'হলে বাঁকিপুর কলেজেই পড়চ ত?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

"তোমরা ক'টি ভাই-বোন?"

"ভাই আর নেই। চারিটি বোন্।"

"তাদের বিয়ে হয়ে গেছে?"

"আজ্ঞে, হাঁ। মা-ই বিয়ে দিয়েছেন।"

"তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন?"

"আজ্ঞে, হাঁ, তিনি দেশের বাড়ীতেই আছেন।"

"তোমার এ মা কখনো তোমাদের দেশের বাড়ীতে গেছেন?"

"অনেক বার। এই ত পাঁচ-ছ' মাস হ'ল এসেছেন।"

"সেজন্য দেশে কোন গোলযোগ হয় না?"

বঙ্কু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হলোই বা। আমাদের 'একঘরে' করে রেখেচে বলে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করতে পারিনে! আর অমন মা-ই বা ক'জনের আছে?"

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, 'মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে?' কিন্তু চাপিয়া গেলাম। বঙ্কু কহিতে লাগিল, "আচ্ছা, আপনিই বলুন, গান-বাজ্‌না করাতে কি কোন দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দে পরচর্চ্চা ত করেন না? বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই ৮।১০ জন ছেলের পড়ার খরচ দেন; শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন?"

আমি বলিলাম, "না; এ তো খুব ভাল কাজ।"

বঙ্কু উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তবে বলুন ত! আমাদের গাঁয়ের মত পাজী গাঁ কি আর কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে-বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠা-বাড়ী তৈরী হ'ল। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বল্‌লেন, 'দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইঁট-খোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই।' তিনচার হাজার টাকা খরচ করে তাই করে দিলেন, ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না। অমন জল—কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এম্‌নি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মরে যায় যে, আমাদের কোঠা-বাড়ী তৈরী হ'ল। বুঝলেন না?" আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "বল কি হে! এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না?"

বঙ্কু একটু হাসিয়া কহিল, "তাই ত। কিন্তু সে কি বেশী দিন চলে? প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না; কিন্তু, এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্চে—বামুন-কায়েতরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্চে—কিন্তু তবু, পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট?"

আমি কহিলাম, "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্‌বার যে একটা কথা আছে, এ যে দেখি তাই।"

বন্ধু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক তাই! এমন গাঁয়ে আলাদা, একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন?" প্রত্যুত্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। হাঁ, না—স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বন্ধুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যই ভালবাসে। অনুকূল শ্রোতা পাইয়া ভক্তির আবেগে সে দেখিতে-দেখিতে মাতিয়া উঠিল, এবং তাঁহার অজস্র স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ এক সময়ে তাহার হুঁস হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, "আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, কাল সকালেই আমি যাচ্চি।"

"কাল?"

"হাঁ, কালই।"

"কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্চে?"

বলিলাম, "সকাল পর্য্যন্ত তাই মনে হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন মনে হচ্চে না। আজ দুপুর থেকেই আবার মাথাটা ধরেচে।"

"তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই" বলিয়া ছেলেটি চিন্তিত-মুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া, তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম। যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে, ছেলেটি লজ্জা পাইল বটে, এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল; কহিল, "আপনি এখন যাবেন না।"

"কেন বল দেখি?"

"আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন।" বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট্‌ করিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলাম, ছেলেটি খুবই সরল বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে বলিয়াছিল, 'আর বেশী দিন থাক্‌লে আমার ছেলে কি ভাব্‌বে।' কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া মনে হইল; এবং মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; এবং সে যে সংসারে সব দিক দিয়া সর্ব্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে যে মুহূর্ত্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত-পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাহুক, কিন্তু এ কথাও ত সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোন মতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসা-মত্ত বসন্ত-দিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না; কিন্তু এই নামটা পর্য্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এ কথা আমার স্মরণ হইল।

চোখের উপর সূর্য্য অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া-চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে-মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না! আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এত দিন চলুক না, স্নেহ যত মাধুর্য্যই ঢালিয়া দিক না, উভয়ের মনের কলুষ যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবার বেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বন্ধুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে-মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি,—কিন্তু তখন যেন মনের মধ্যে লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া, হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে পাই নাই—ছল করিয়া, একখানি অতি সূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া

না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ক হইয়া সেইখানেই বসিয়া ছিলাম; সন্ধ্যার সময় ধুনোচিতে ধূপ-ধুনা দিয়া, সেটা হাতে করিয়া, রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর-একটা ঘরে যাইতেছিল; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন, ঘরে যাও।"

হাসি পাইল। বলিলাম, "অবাক্ করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "হিম না থাক্, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্ ভাল?"

"না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা, গরম কোন বাতাসই বইচে না।"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথা-ধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা ত সত্যি? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না? রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিয়ে দিতে পারে না? এ বাড়ীর চাকরগুলোর মত বাবু চাকর আর পৃথিবীতে নেই।" বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার ভুলের জন্য বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে-আস্তে কহিল, "এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বল্‌বার জো নেই যে, তুমি রেগে থাক্‌লে মিছিমিছি বাড়ীশুদ্ধ লোকের দোষ দেখ্‌তে পাও!"

কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম "রাগ কেন?"

রতন কহিল, "সে কি কারো জানবার জো আছে? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু-শুধু হয়, আবার শুধু-শুধুই যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাক্‌তে পারলেই, চাকর-বাকরের প্রাণ গেল!" দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল, "তখন তোদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে রতন? আর বড়লোকের বাড়ীতে যদি এত জ্বালা, ত আর-কোথাও যাসনে কেন?"

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, "তোর কাজটা কি? ওঁর মাথা ধরেচে—বঙ্কুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আট্‌টা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্। কাল থেকে আর-কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্,—এখানে হবে না। বুঝ্‌লি?"

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওডিকোলন-জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল সকালেই না কি বাড়ী যাবে?" আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই, প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম—"হাঁ, কাল সকালেই যাব।"

"সকালে কটার গাড়ীতে যাবে?"

"সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ী জোটে।"

"আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কারুকে না হয় ষ্টেসনে পাঠিয়ে দিইগে।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তার পরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দ-সাড়া নীরব হইল; বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি, যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু-শুধু হয়। কথাটা আর-কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু, পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি। এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি না-ই থাক্, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়,—বোধ করি কারও চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক্, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতিবড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোন দিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্য্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে, ত সে আলাদা কথা; কিন্তু, আমার উপর রাগ করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময়

তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া, ও-দিকের দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল,—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া, আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তার পরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল; পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু, তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি! তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্তই বুঝিলাম। যে গোপনে আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু, এই নির্জ্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙিল। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে; মাথা এত ভারি যে শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবু যাইতেই হইবে। এ বাটীতে নিজেকে আর একদণ্ডও বিশ্বাস নাই—সে যে কোন মুহূর্ত্তেই ভাঙিয়া পড়িতে পারে। নিজের জন্যও তত নয়; কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জন্যই রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে-মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলেমেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনিয়া বাহির করিয়া আনিব—এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন-অধ্যায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল,"এখন দেহটা কেমন আছে?"

বলিলাম, "খুব মন্দ নয়। যেতে পারব।"

"আজ না গেলেই কি নয়?" "হাঁ, আজ যাওয়া চাই।" "তা'হলে বাড়ী পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।"

তাহার অবিচলিত ধৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আমি বাড়ীতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব।" পিয়ারী কহিল, "দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেসা করব।"

বাহিরে পাল্কিতে যখন উঠিতে যাইতেছি,দেখি—দ্বিতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদা-দিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্ব্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এম্‌নি গম্ভীর, এম্‌নি স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজিও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে তখন কত-বড় একটা আসন্ন-বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই! কি জানি, আজিও তেম্‌নিধারা একটা কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাল্কিতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পাল্কি লইয়া ষ্টেসন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে-মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, 'লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না না ভাই, এ ভালই হইল যে আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহ-জীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ কথা আমি চিরদিন স্মরণ রাখিব।'

(প্রথমপর্ব্ব সমাপ্ত)

মাল্য-গ্রথন-কলা

[রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম-এ]

পূর্বকালে গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্যাদি চৌষট্টি কলা গণ্য হইত। কতকগুলি অদ্যাপি আছে, কতকগুলি লুপ্ত হইয়াছে, কতকগুলি মরমর হইয়া আছে। দেহের শোভার নিমিত্ত কতকগুলি কলার উৎপত্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাল্য-গ্রথন-বিকল্প একটা। ফুলের মালা গাঁথা সেই কলা। ফুল দিয়া আর এক কলা ছিল। সেটা পুষ্পাস্তরণ। ইদানী বর-কন্যার ফুল-শয্যায় প্রাচীন কলার যৎকিঞ্চিৎ ঝারা দেখিতে পাওয়া যায়। কড়ির আলনা, কড়ির পেড়ী, কড়ির ঝারা আর কই? ওড়িয়্যায় এখনও ফুলের ঝারা, কড়ির ঝারা, কড়ির পেড়ী প্রভৃতি বাজারে বিক্রি হয়। এখানে মাল্য-গ্রথন-কলাও আছে। পূর্বকালের এই কলার নিদর্শন পুরীতে সুস্পষ্ট আছে। জগন্নাথ-দেবের নিমিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ পুষ্প সংগৃহীত হয়, মাল্য ব্যতীত নানাবিধ পুষ্প সজ্জা রচিত হয়। এখানে কয়েকটি প্রধান
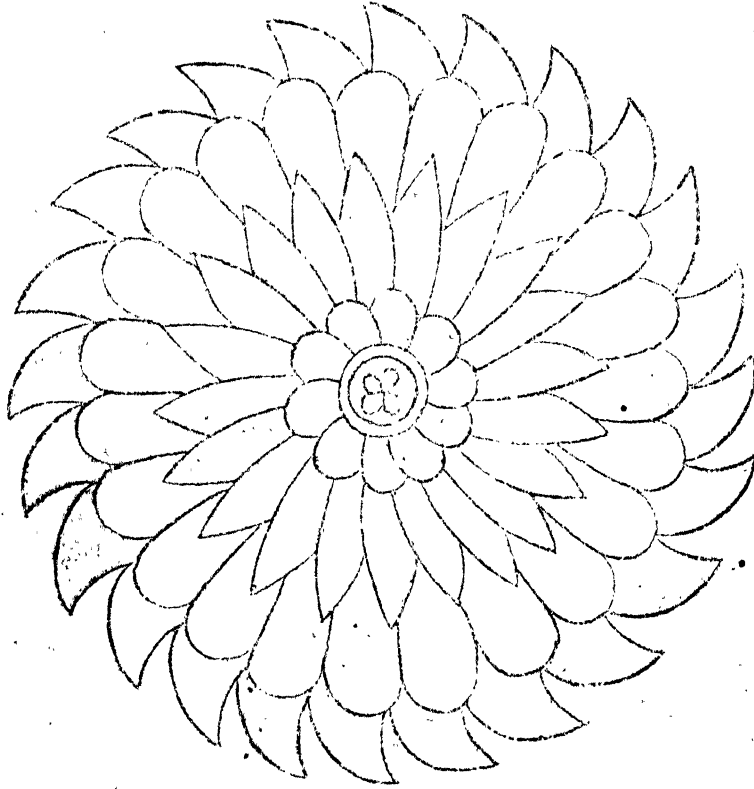
সুভদ্রাদেবীর কর্ণের তডকী

চিহ্ন আছে। যাহা আছে তাহাতে কলা-কৌশল দেখি না; দেখি অন্য দ্রব্যের বাহুল্য। বঙ্গদেশে মাল্য-গ্রথন শিক্ষা দেওয়া হয় না। পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে ফুলের ঝারা ঘর শোভা করিত। এখন গ্রামেও কদাচিৎ সোলার ফুলের পুষ্প-সজ্জা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। পুরীর এক ইস্কুলের পণ্ডিত শ্রীহরিহর মিশ্র মহাশয় কয়েকটি পুষ্প-সজ্জার চিত্র লিখিয়া দিয়াছেন। এই সকল ও তাঁহার বর্ণনা হইতে পাঠক পূর্বকালের মাল্য-গ্রথন-বিকল্পের আভাষ পাইবেন।

প্রতিদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চারিবার পুষ্প-বেশ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে "বড় সিঙ্গার" বেশ উৎকৃষ্ট। এই বেশে ঠাকুরের শয়ন হয়। 'সিঙ্গার' শব্দ সং 'শৃঙ্গার' শব্দের অপভ্রংশ। পুরীতে ইহা 'সিংহার' রূপেও উচ্চারিত হয়।

১। 'নাকুয়াসী'। ইহা শ্রীজগন্নাথ ও বলদেবের নাসিকার আভরণ। 'নাকুয়াসী' না থাকিলে কোন প্রকার ভোগ হইতে পারে না। এ দেশের স্ত্রীলোকে নাকে 'বশুনী' নামক স্বর্ণ-নির্ম্মিত এক অলঙ্কার পরিয়া থাকে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও নারীর নাসাগ্রে 'বেশর' দুলিত। 'নাকুয়াসী' 'বশুনী'র প্রকারান্তর। যে বালকের বড় ভাই কিংবা বইন মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে 'অ-প্রত্যয়' বলে। সে বালককে নাক বিঁধাইয়া 'বশুনী' কিংবা অন্য কিছু অলঙ্কার পরিতে হয়। জগন্নাথ ও বলদেব 'অ প্রত্যয়' বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্বদা 'নাকুয়াসী' পরিয়া থাকিতে হয়। নাকের সূত্র হইতে 'নাকুয়াসী' শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 'কটি-সূত্র' হইতে যেমন 'কড়সী', 'নাক-সূত্র' হইতে তেমন 'নাকসী' বাঙ্গালায় হইতে পারিত। 'নাকুয়াসী' প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কার পুষ্প-রচিত।

২। 'চন্দ্রিকা'। ঠাকুরদ্বয়ের মস্তকে প্রথমে

৩। 'চূড়' এবং তদুপরি 'চন্দ্রিকা' শোভা পায়। দুই-ই 'বড় সিঙ্গার' বেশে লাগে। 'চন্দ্রিকা' গাঁথিতে নানাবিধ ফুল লাগে। বহু পরিশ্রম ব্যতীত ইহার গ্রন্থন সম্পন্ন হয় না।

৪। 'অলকা'। ইহা পুষ্পগুচ্ছবিশিষ্ট মাল্য। স্ত্রীলোকে চূর্ণকুন্তল আচ্ছাদন করিয়া অলকা দ্বারা মুখের শোভা
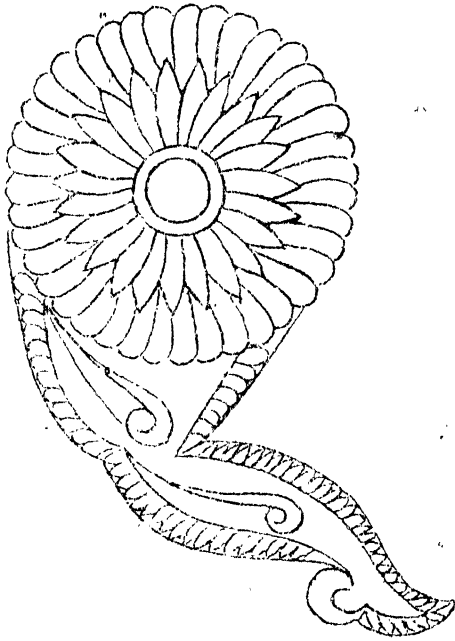
কুণ্ডল
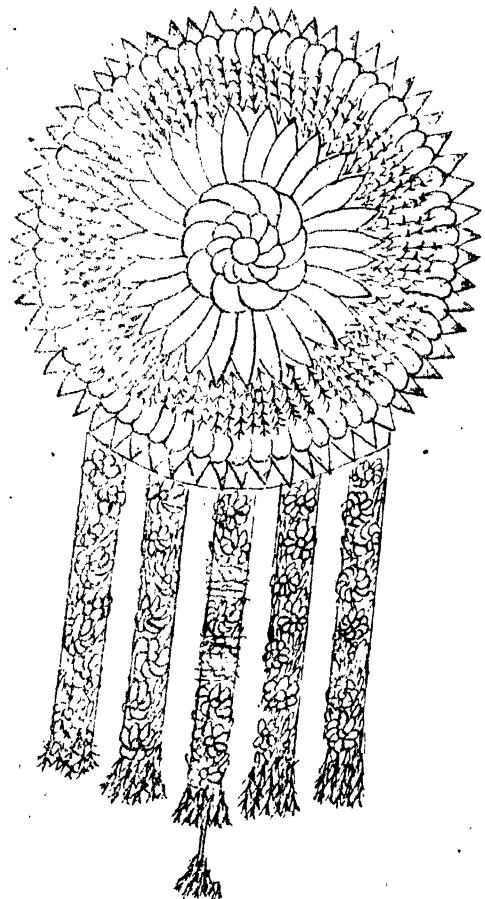
করপল্লব

বৃদ্ধি করে পুষ্পালকাও সেইরূপ ঠাকুরের মুখ-শ্রী সম্পাদন করে।

৫। 'কুণ্ডল'। ঠাকুরদ্বয়ের কর্ণভূষণ।

৬। 'তডকী'। ইহা সুভদ্রাদেবীর কর্ণভূষণ। এ দেশের স্ত্রীলোকে কানে সোণার 'কাপ্' পরে। 'তডকী' 'কাপে'র প্রকারান্তর। সংস্কৃতে 'তালপত্র' নামে এক কর্ণ-ভূষণ ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহা 'তাডঙ্গ' নামে খ্যাত

মস্তকে চন্দ্রিকা
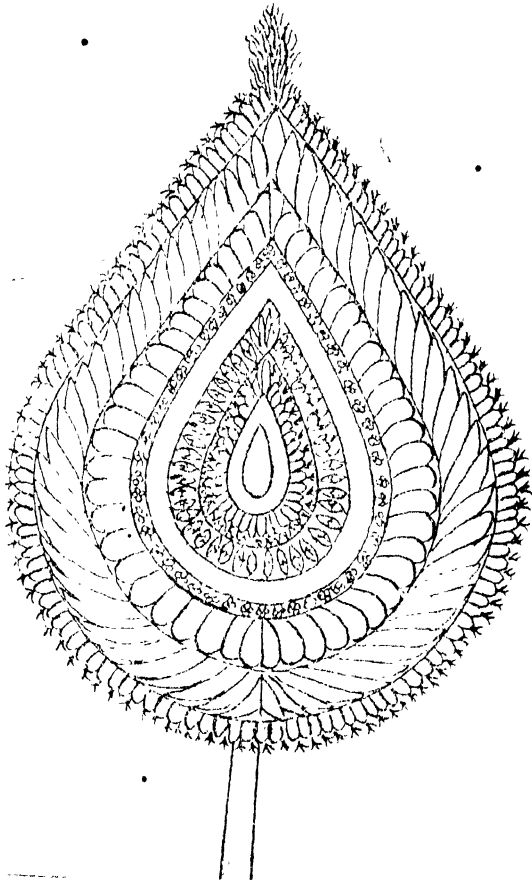
হইয়াছিল। ইহাই ক্রমে 'টেঁড়ী' নাম পাইয়াছিল। 'তডকী' প্রাচীন 'তালপত্র'।

৭। 'গুণা'। 'তডকী'তে কতকগুলি ফুল ঝুলিতে থাকে। ফুলের পরিবর্তে 'ঝারা' (সং ধারা) থাকিলে তাহাকে 'গুণা' বলা হয়। 'গুণা' স্ত্রীলোকের নাসাভরণ। 'নাকুয়াসী' স্থানে 'গুণা' পরা হয়। 'কর-পল্লব' ও 'গুণা'র রচনায় প্রভেদ আছে। 'কর-পল্লবে' মালা ঝুলিতে থাকে, 'গুণা'য় ফুলের ঝারা ঝুলিতে থাকে।

৮। 'ঝুম্পা-তিলক'। ইহা মাল্য-বিশেষ। এমন গাঁথা হয় যে, ঠাকুরের তিলক-স্থলে থাকিলে রামানুজী তিলকের মত দেখায়। 'বড় সিঙ্গার' বেশে এই তিলক ধারণ করানো হয়। 'দক্ষিণ পার্শ্ব' মঠ হইতে আসে।

৯। 'অধর'। ইহাও এক ক্ষুদ্র মাল্য। সুগন্ধ পুষ্প ব্যতীত অন্য পুষ্পে হইতে পারে না। অধর স্পর্শ করিয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম 'অধর-মাল্য' হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের এই মাল্য ধারণের পর বিমলা লক্ষ্মী ও শীতলা দেবী ব্যতীত অন্যে পাইতে পারে না।

১০। 'পাটী মালা'। ইহা অতি ক্ষুদ্র মাল্য। সুরভিতম পুষ্পে গ্রথিত। জগন্নাথ দেবের বাম ভুজের অগ্রে মণ্ডিত হয়। তিনি সুগন্ধ গ্রহণ করিবেন বলিয়া বাম ভুজে থাকে। কেবল 'বড় সিঙ্গার' বেশে থাকে। পুরীর রাজগৃহ হইতে এই মাল্য প্রত্যহ আসে এবং দেবতার ধারণের পর রাজারই প্রাপ্য, অন্যে পাইতে পারেন না।

১১। 'কর-পল্লব। ইহা ঠাকুরের করে লগ্ন হয়। 'বড় সিঙ্গার' বেশ ব্যতীত অন্য বেশে লাগে না।

১২। 'চউসরা'। মাল্য বিশেষ। 'বড় সিঙ্গার' বেশে লাগে। চারিটি মালা একত্র করিয়া 'চউসরা' রচিত হয়। সাধারণ মালা হইতে ইহার গ্রন্থন ভিন্ন। সং 'চতুঃসর' শব্দের অপভ্রংশে 'চউসর' শব্দ। সং 'সর' অর্থে মাল্য, ছড়া।

১৩। 'শ্রীপয়র'। ইহা চৌদ্দ হাত দীর্ঘ। শ্রীভুজ হইতে শ্রীপদ পর্য্যন্ত লম্বমান থাকে বলিয়া নাম 'শ্রীপয়র'। দৈর্ঘ্যে, স্থূলতায়, সৌন্দর্যে এই মাল্য শ্রেষ্ঠ। নানা পুষ্পে রচিত হয়। সুনা গোস্বামী মঠাধীশ ও রবীন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রত্যহ এই মাল্য প্রদান করেন।

১৪। 'ঘাঘ্‌ড়া'। ইহাও বিভিন্ন-বর্ণ পুষ্পমাল্য। ঠাকুরের কটিদেশে থাকে, প্রায় চারি আঙ্গুল মোটা।

এইরূপ মালা কেবল ঠাকুরই পরেন না। রাজারাও পরেন। সে কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইতেছে মালা গাঁথাও যেমন-তেমন কর্ম নহে। বঙ্গদেশে ঠাকুর-প্রতিমায় এবং কদাচিৎ পূর্বেকার কৃষ্ণ-যাত্রায় প্রাচীন ভূষণ দেখিতে
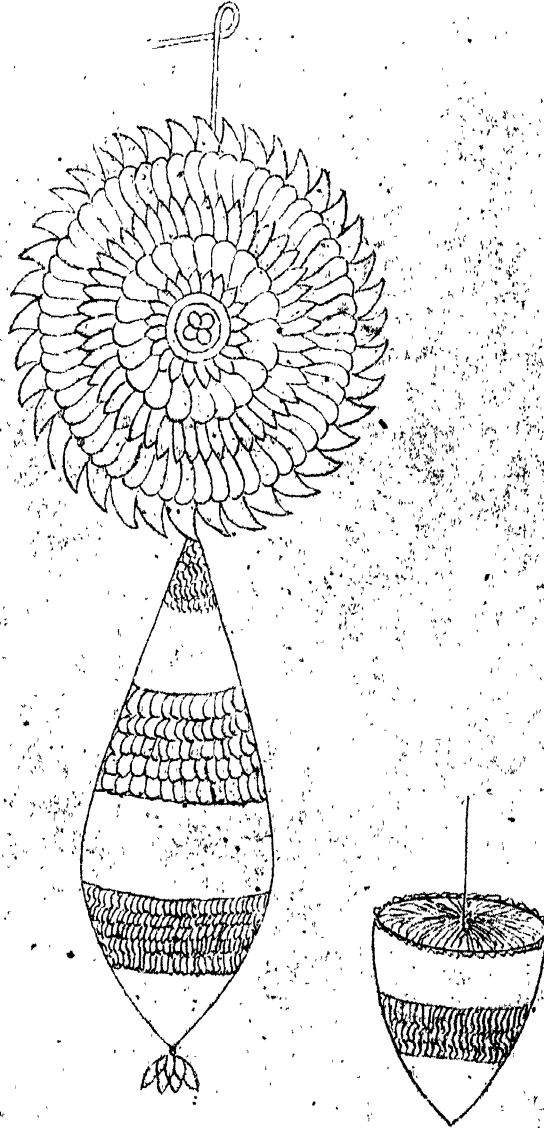
নাসিকার নাকুয়াসী

পাওয়া যায়। ডাক-সাজে যে কলা-কৌশল প্রদর্শিত হয়, তাহা পূর্বকালের কলার নিদর্শন। আমার মনে হয়

ওড়িয্যার ডাক-সাজ বঙ্গদেশের অপেক্ষা সুন্দর। প্রতিমা ভাল হয় না, কিন্তু যে-সে প্রতিমার সাজে মোহিত হইতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণ

[শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]*

সিড্নি

(২)

সিডনি সহরের অনেক বিবরণ আমার পূর্ব্ব পত্রে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি; রাস্তা ঘাটের অনেক পরিচয়ও দিয়াছি। এক্ষণে অন্যান্য বিষয় লিখিতেছি। এখানে Public Park অনেকগুলি আছে; উহার মধ্যে Domain নামে একটি Park আছে, উহার নাম ঠিক Domain নহে, কিন্তু উহার সম্মুখে Domain নামক গির্জ্জা থাকায়
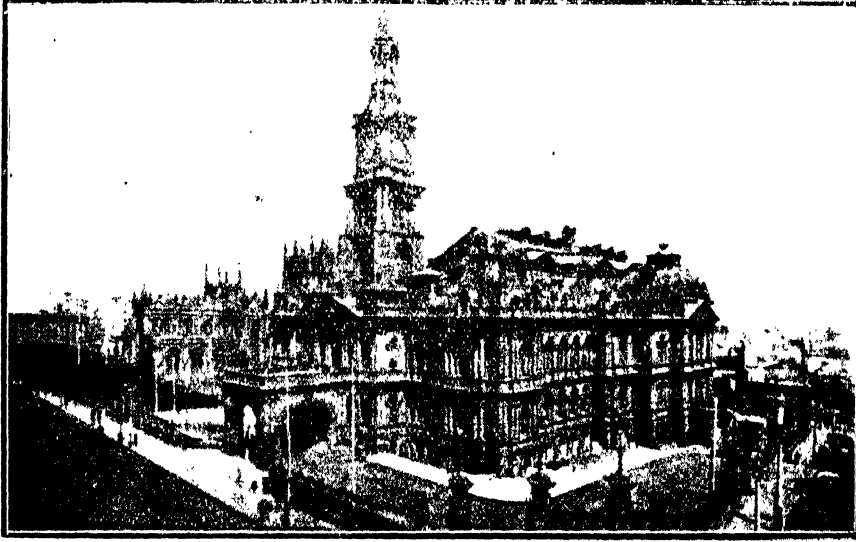
টাউন হল—সিডনি
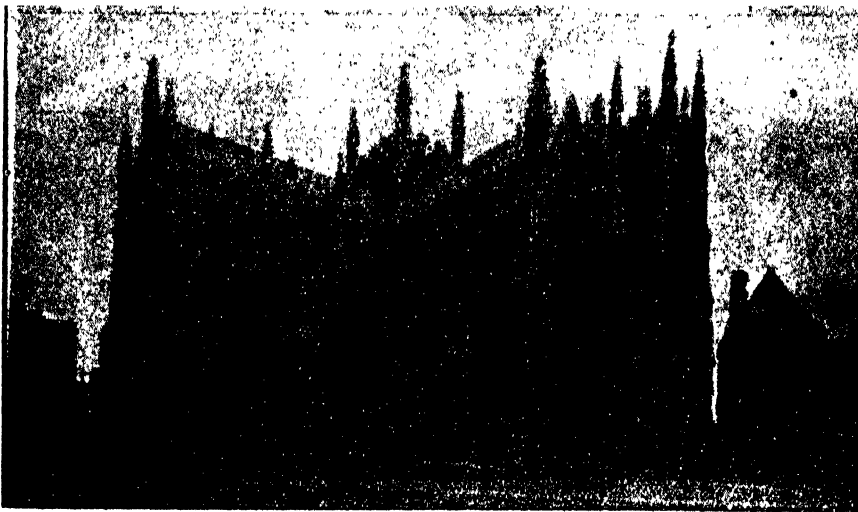
সেণ্ট এণ্ড্রু ক্যাথিড্রাল—সিডনি

* বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত 'অষ্ট্রেলিয়া-ভ্রমণে' ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 'অতুলচন্দ্র' ছাপা হইয়াছিল।—সম্পাদক

কুইন ভিক্টোরিয়া মার্কেট—সিডনি

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়

সিডনি—এ, এম, পি বিল্ডিংস

উহা Domain নামেই পরিচিত। রবিবারেই এখানে লোক-সমাগম বেশী হয় এবং লোক-সমাগমের কারণও যথেষ্ট আছে। নানা শ্রেণীর, নানা ধর্ম্মের বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, বালিকা রবিবারে বেলা দুইটা হইতে Domain আসে; কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে, কেহ কেহ বা নাই। Domainএ বক্তৃতা দিবার জন্য অনেক লোক ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত হইয়া আসে। ধর্ম্মের সম্বন্ধে বড় বেশী বক্তৃতা হয় না; বেশীর ভাগ শ্রমজীবি-সম্প্রদায় (Labour party); Socialist partyও বক্তৃতা দিবার জন্য আসে। তাহাদের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে অনেক সময় শ্রমজীবি-

ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট হাউস—সিডনি
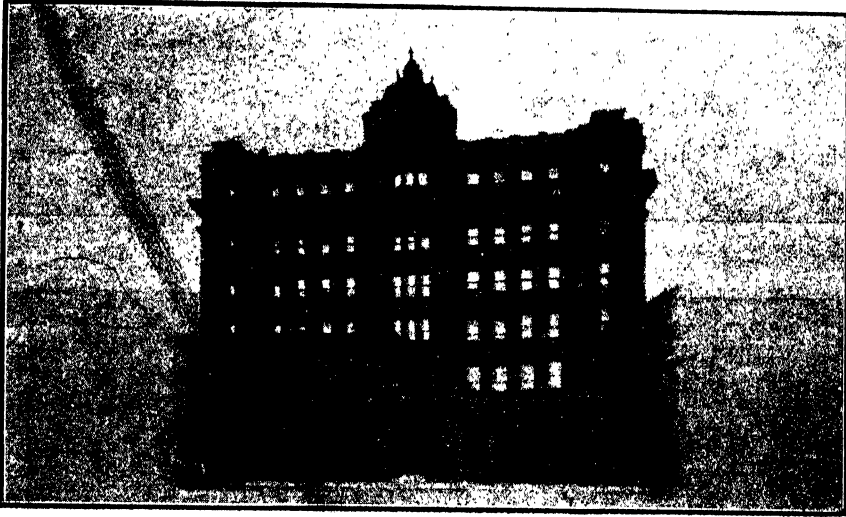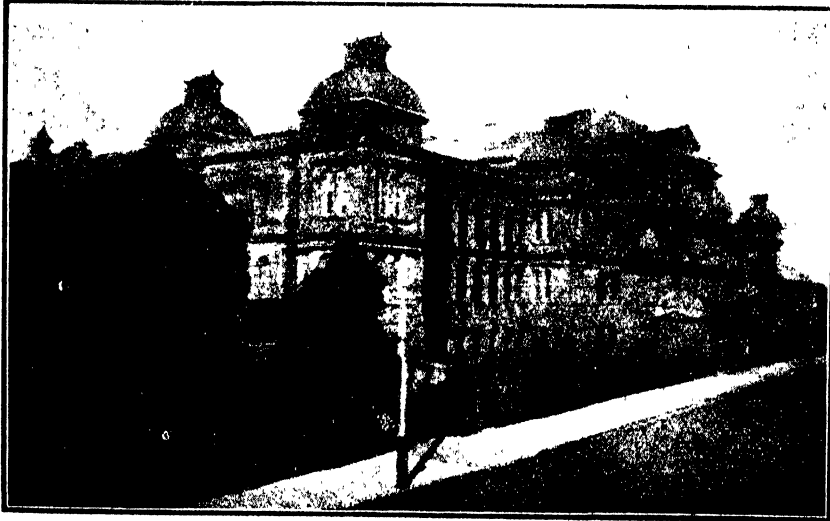
সিডনি হাসপাতাল

অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে। বাগান অবশ্য সমস্ত রাত্রিই খোলা থাকে। অনেকে এখানে রাত্রিযাপনও করিয়া থাকে; তবে শীতকালে parkএ রাত্রিযাপন করা কত আরাম-দায়ক, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিবার দরকার বোধ হয় দিগের উপর ধনীদিগের অত্যধিক পীড়নের কথা শুনিয়া হৃদয়ে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। অনেক সময় ধনী (capitalist) দলভুক্ত লোকও ঐ স্থানে উপস্থিত থাকেন, এবং শ্রমজীবিদলের বক্তৃতার বিরুদ্ধে তাঁহারা বক্তৃতা দেন।
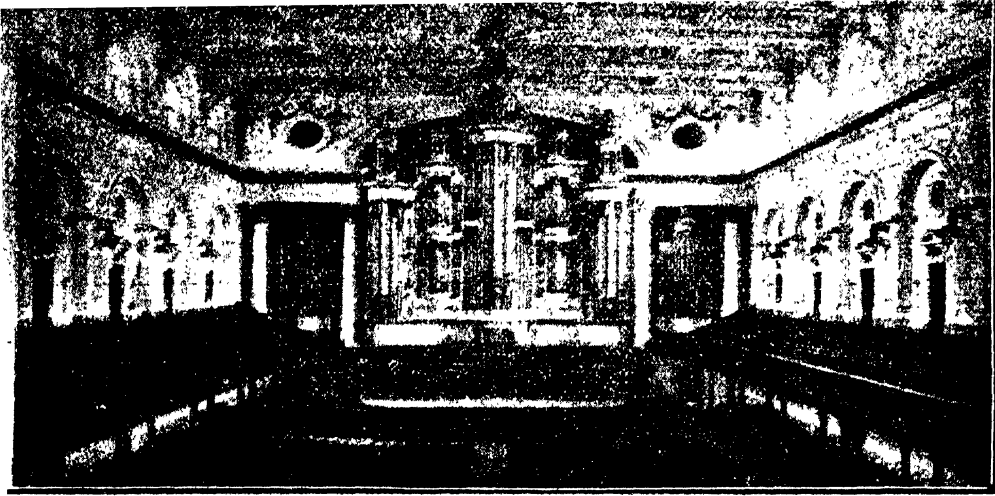
টাউন হলের অভ্যন্তর—সিডনি

মার্টিন প্লেস—সিডনি
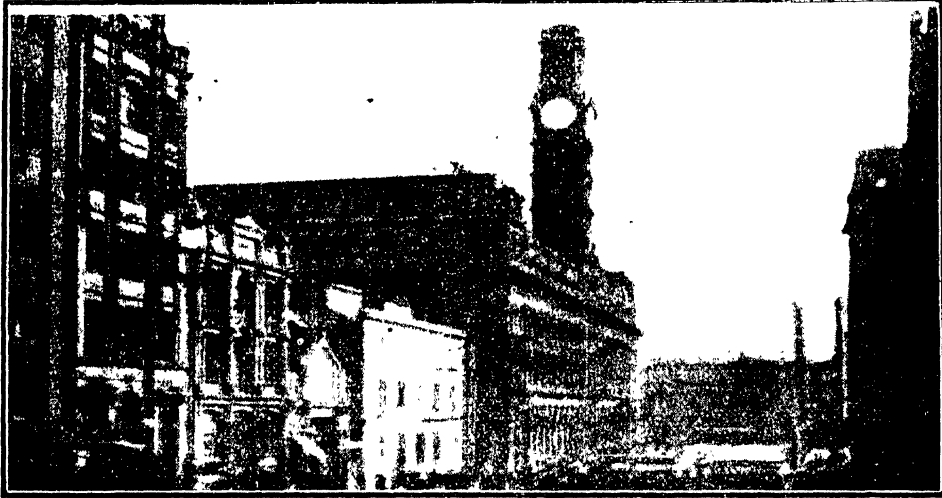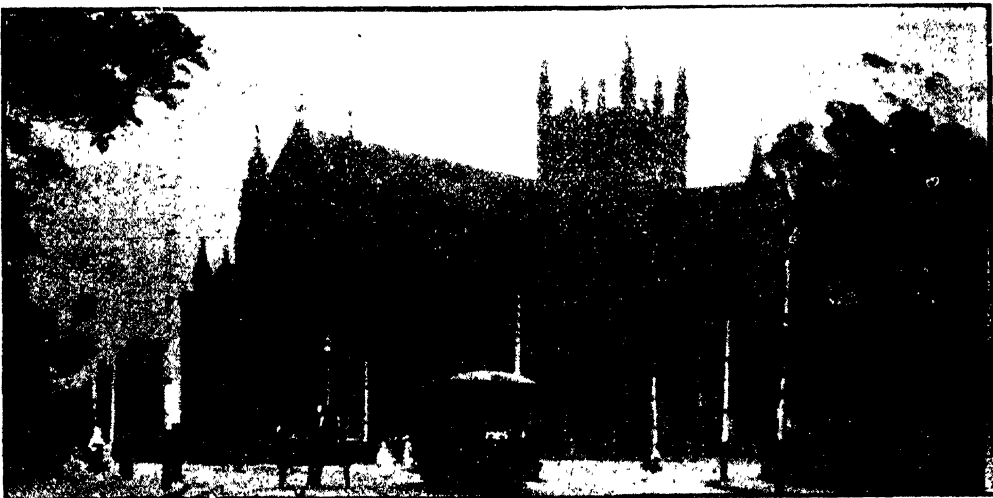
সেণ্ট মেরীর গির্জ্জা—সিডনি

অনেক সময় এমনও হয় যে, তুই দলের মধ্যে ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়; তবে আমাদের দেশের মত গালাগালি বা কুৎসাপ্রচার প্রায়ই হয় না; শ্রোতৃবর্গ প্রায়ই মধ্যস্থ হইয়া, ঐরূপ বাক্-বিতণ্ডার মীমাংসা করিয়া দেয়।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, অষ্ট্রেলিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র। এখানে ২০ জন দূরে থাকুক ১০০ লোকের জনতাকেও 'বে-আইনি জনতা' (unlawful assembly) বলিয়া ধরা হয় না। বক্তাগণ যে কোন বিষয়েই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারে; তাহাতে কেহ বাধা দেয় না। পুলিশের লোকেরা অবশ্য উপস্থিত থাকে, কিন্তু কোন বক্তাকে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিতে বা বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিতে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না।

একজন আমেরিকান নিগ্রো প্রতি রবিবারে এই ডোমেন পার্কে বক্তৃতা দিতে আসে। সে নানা বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকে; অনেক সম্ভ্রান্ত গোরা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাহার বক্তৃতা শুনেন। অনেক সময়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও ঐ ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া থাকে। আমি কিন্তু কোন Indianকে এ পর্য্যন্ত রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। মধ্যে-মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে তুই-একটা বক্তৃতা হয়, কিন্তু সে সকলই খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে। খৃষ্টানদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। Israelites, Methodist, Salvation Army, প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের বক্তৃতা শুনিতে অনেক সময় বেশ ভাল বোধ হয়।

Domain আসিবার রাস্তায় আমাদের দেশের মেলার ন্যায় অনেক দোকান বসে। নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির দোকানই প্রায় বসিয়া থাকে ;- খাবার জিনিস, নানারকম ফল, চিনের বাদাম (এখানে যাহাকে Pea nut বলে); তাহা ছাড়া ওজন হইবার কল লইয়াও ২।৪ জন লোক এখানে আসিয়া বেশ তুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সিড্‌নি সম্বন্ধে এই পত্রে অতি কমই লিখিতে পারিলাম। তবে এবারেও কয়েকখানি ছবি দিলাম। এই ছবিগুলি দেখিলেই পাঠকগণ সিড্‌নি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-বি]

জমিদার

আমি রাজা, মোর রাজ্যে চিরানন্দ, চির মহোৎসব,
নাহি দুঃখদৈন্যলেশ।—জলাভাব? তাও কি সম্ভব?
গ্রামে-গ্রামে দীঘি, ডোবা, খাল, বিল আদি জলাশয়,
বিমল হরিতকান্তি, পানাঢাকা, চির শান্তিময়।
যাদের শীতলক্রোড়ে সন্তাপিত অঙ্গ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়; মানুষ, মোষ, মেষ, বৃষ হৃদয় ভরিয়া
পান করি লয় সুধা, প্রাণময় লক্ষ জীবাণুর,
সাগ্রহে, দশটা মাস। তবু আজ শুনি এ কি সুর।
চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ, কীর্ত্তিনাশা দৃপ্ত কোলাহল,—
"পিপাসায় কণ্ঠ ফাটে; বক্ষ ফাটে; দাও দাও জল।"
"কোথা জল? কোথা জল?"—অভ্রভেদী শব্দ হাহাকার—
—অকৃতজ্ঞ কৃষকের দুর্বিনীত দারুণ চীৎকার।—
বৈশাখের খরদাহে তপ্ত, দগ্ধ ধরণীর ধূলা,—
শুকাইছে নদী-নালা, শুষ্ক হয় পুষ্করিণীগুলা;
সে দোষ আমার নহে। লাইমেড সোডা প্রভৃতিতে
আমি করি নাই মানা নিদারুণ তৃষ্ণা নিবারিতে।
অন্নকষ্ট? মিথ্যা কথা। শস্যভারে নম্র বঙ্গভূমি,
বিরাজে শ্যামল ক্ষেত্র দিক্ হতে দিগন্তর চুমি;
এ সব কাহার? এই পরিপূর্ণ অক্ষয় ভাণ্ডার
চিরমুক্ত কার তরে? কৃষকেরি। তবু অনাহার?
নাহি চাই রাজকর, শস্যভাগ। লই শুধু টাকা,
অপেয়, অখাদ্য, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ অতি, রজতের চাকা,
—Nominal value—তবু অনাহারে মরে যে দুর্ভাগা,
কে তারে আহার দিবে? বিধাতার অভিশাপ দাগা
তার ভালে। শীর্ণকায় প্রজাগণ? সে ভাই বরাত!
আমিও ত জন্মিয়াছি বঙ্গদেশে, খাই ডাল, ভাত।
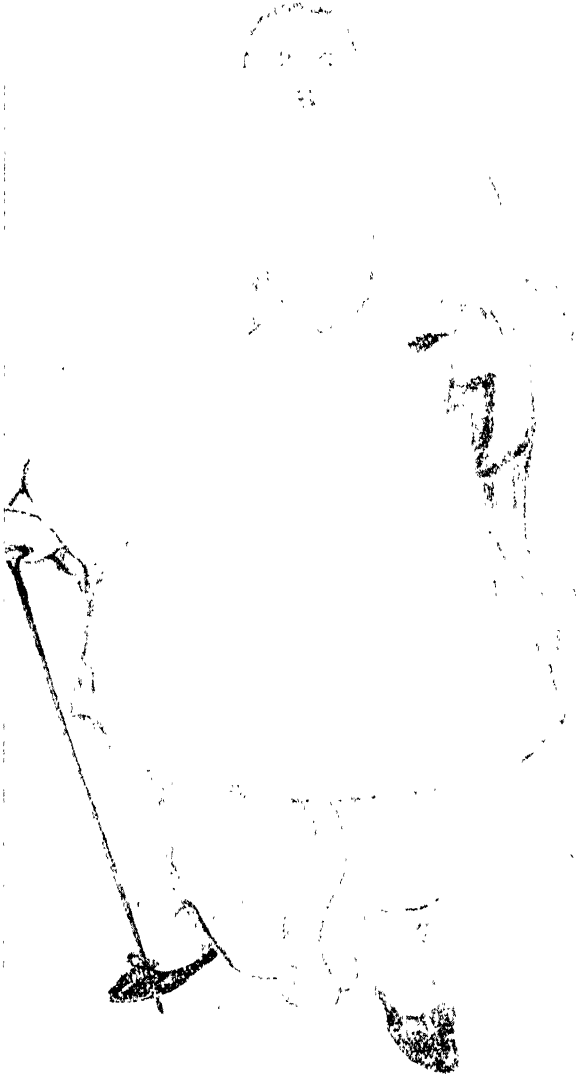
জমিদার

তবু দেখ ফুলি রোজ ; পাঞ্জাবী সে গেঞ্জি সম আঁটে,
পদভরে প্রতিদিন আন্‌কোরা Pump shoe জোড়া ফাটে।

কলেরা, বসন্ত, জ্বরে জর্জ্জরিত, অৰ্দ্ধমৃত দেশ ?
জানি তাহা। কিন্তু হায়, উপায়ের না পাই উদ্দেশ।
রোগ, শোক দেবতার হাত। আছে একটা সম্বল,
পলায়ন ! তাই আমি পরবাসী। গ্রাম্য মূর্খদল,
তারাও বাঁচিতে পারে পলাইয়া আমারি মতন
সহরের সৌধচূড়ে, নিরাপদে, নিরুদ্বিগ্নমন।
তবে কেন পড়ে থাকা, রোগমাখা দুঃখমসী-আঁকা,
অন্ধঘন বাঁশবন, অন্ধতম ঝোপঝাড়ে ঢাকা,
পিচ্ছিল বন্ধুর ভূমি, চড়া, গাড়া, গভীর কৰ্দ্দম,
পাগলা শৃগাল, জোঁক, সর্প, ভেক, বৃশ্চিকে দুর্গম
পাড়াগাঁর পূতিগন্ধে, নাক গুঁজে চোখ মুখ বুজে ?
শরীরের রস দিয়া কেন তবে, আত্মনাশ খুঁজে
পুষ্ট করি তোলা দুটো পেট-জোড়া প্লীহা ও লিভার ?
অজ্ঞতা ? সে হতে পারে। তুমি চাও শিক্ষার বিস্তার
না হয় করিনু সেটা। তার পরে কোন বেটা করে
বল ত আমার কাজ ? কে সাজিবে পান ? সমাদরে
কে দুলাবে তালবৃন্ত ক্লান্তিহরা, যবে শ্রান্তকায়
দিবসের তন্দ্রাশেষে, সন্ধ্যাকালে ঢলে তাকিয়ায় ?
সট্‌কা এগিয়ে দেওয়া, সুকোমল অঙ্গে তেল-ঘসা,
কে করিবে এই সব ? তাড়াতাড়ি কে তাড়াবে মশা
ভুঁড়ি হতে, হস্ত যেথা অৰ্দ্ধ-পথে ব্যর্থ ফিরে আসে,
হারায় দৃষ্টির সীমা, জ্ঞান মৌন নিষ্ফল প্রয়াসে ?
আমি করি অন্য রূপে প্রজাদের দুঃখের লাঘব।
বার মাসে তের পৰ্ব্বে বেড়ে যায় প্রজারি বৈভব।
প্রজাই বাজায় বাঁশি, কাঁসি, ঢোল। দেখে হৃষ্ট-চিতে
হাজার-হাজার মুদ্রা ফুঁকে দিই আতস বাজিতে।
দেশের ভূস্বামী আমি, মোর কাজে লাভবান্ সবে।
এই দেখ ঘটা করে প্রতিবার শারদ-উৎসবে,
কতশত নিরন্নেরে তপ্তলুচি পোলাও খিলাই,
জীর্ণ চীর দরিদ্রেরে শান্তিপুরী চাদর বিলাই।

মাইকেল এঞ্জেলো

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ধর্ম্মের সহিত চিত্রকলায় উন্নতির যে কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, য়ুরোপীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা কিছুতেই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইটালী খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়; এবং সেই ইটালীর মধ্যে রোম নগরই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-জগতের কেন্দ্র। সম্ভবতঃ এই কারণে, ইটালীতেই জগতের শ্রেষ্ঠ সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা এই সকল সুনিপুণ চিত্রকরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী অঙ্গে ধারণ করিয়া জগতের অন্যতম দ্রষ্টব্য পদার্থে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত সংস্রব না থাকিলে, ধর্ম্মপ্রাণ চিত্রশিল্পী সকল তাঁহাদের হৃদয়-মন প্রাণ ঢালিয়া কার্য্য না করিলে, ইটালীতে চিত্রবিদ্যায় এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হইত কি না, তাহা সন্দেহস্থল।

এরিথ্রিয়ান সিবিল (অদৃষ্টবাদিনী)

চিত্রকরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং রোম নগরেই তাঁহাদের চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা সবিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। রোম নগরের মধ্যে আবার পোপ মহোদয়ের ভাটিকান প্রাসাদ ও রোম নগরের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মালয়—

প্রবন্ধান্তরে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পী রাফেল শান্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চিত্রকর-সমাজে মাইকেল এঞ্জেলোর স্থানও অতি উচ্চে। তিনিও পোপের সুরম্য প্রাসাদ—

ভাটিকান নামক অট্টালিকা চিত্রিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং সে কার্য্য তিনি সুন্দররূপেই সমাধা করিয়াছিলেন।

ফ্লোরেন্সের চিত্রকরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো ব্যোনারোটি দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতার নাম লাডোভিকো ব্যোনারোটি; মাতা ফ্রান্সেস্কা ডী নেরী। লাডোভিকো ব্যোনারোটির সামান্য বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহারই আয়ে তাঁহাদের কোনরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তৎকালে অভিজাত শ্রেণীর ভদ্রলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কলকারখানায় কার্য্য করা তাদৃশ সম্মানজনক বিবেচনা করিতেন না; সেই কারণে, লাডোভিকো সম্পত্তির আয়ে কষ্টে সংসার চালাইলেও, আয়-বৃদ্ধির জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করেন নাই; বরং 'মোটাভাত মোটাকাপড়ে'র সংস্থান থাকায় তিনি সন্তোষ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

লাডোভিকোর দ্বিতীয় পুত্র মাইকেল এঞ্জেলো ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। মাতার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় শিশুর লালন-পালনের ভার একজন ধাত্রীর হস্তে অর্পিত হয়। মাইকেলের পর লাডোভিকো-পত্নীর আরও তিনটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

Child is the father of the man কথাটী মাইকেল এঞ্জেলোর পক্ষে বিলক্ষণ খাটে। শৈশবেই শিল্প-সাধনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ পায়;; এবং পিতার আপত্তি সত্ত্বেও দৃঢ়চিত্ত বালক চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। তাঁহার এই চিত্রকর-বৃত্তি অবলম্বনের; প্রবৃত্তি স্বাভাবিক কি না, সে বিষয়ে একটু রহস্য আছে। যে ধাত্রী স্বীয় স্তন্যদানে মাইকেলকে পালন করিয়াছিলেন, তিনি কোন প্রস্তর-খোদাইকারকের পত্নী ছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো গর্ব্বভরে বলিতেন, মার্ব্বেল প্রস্তর খোদাইকারকের স্ত্রীর স্তনদুগ্ধ পান করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শিল্পী হইবার প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। এ কথা কতদূর সম্ভবপর, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন।

আদি-জননী ইভার সৃষ্টি

পিতা পুত্রকে বংশ-মর্য্যাদার হানিকর এই সঙ্কল্প পরিহার করাইতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল। বস্তুতঃ, চিত্তের এইরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে, বোধ করি আজ জগতে মাইকেল এঞ্জেলোর নাম চিরস্মরণীয় হইত না। পিতার সমস্ত উপরোধ, অনুরোধ, তাড়না, ভৎর্সনা অগ্রাহ্য করিয়া, ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে মাইকেল এঞ্জেলো ঘিরলানডাইও-ভ্রাতৃগণের কারখানায় সহকারীর পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং তাঁহার কিছু পারিশ্রমিকও নির্দ্ধারিত হইল। ঘিরলানডাইও-ভ্রাতৃগণের অন্যতম—ডোমেনিকো প্রথমে রত্নবণিকের কার্য্য শিক্ষা করেন, এবং পরিশেষে ফ্লোরেন্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবার বিংশতি বর্ষ পরে মাইকেল এঞ্জেলো রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ফ্রেস্কো' চিত্রকর বলিয়া যে খ্যাতিলাভ করেন, ঘিরলানডাইও-ভ্রাতৃগণের কারখানাতেই তাহার সূত্রপাত হয়। তৎকালে ফ্লোরেন্স নগরের চিত্রকরমাত্রেই তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তত্রত্য ব্রানকাক্সি গির্জ্জার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলি নকল করিতে যাইতেন। মাইকেল

"একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মচড়াইতেছে— কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটু তবলায় ঘা দিতেছে।"

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা।

শ্রীকান্তের ভ্রমণ দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এঞ্জেলোকেও প্রচলিত রীত্যনুসারে তথায় গিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। মাসাকসিও নামক একজন চিত্রকর ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ চিত্রগুলি অঙ্কন করিয়াছিলেন, এবং সেগুলি ফ্লোরেন্স নগরে তখনও প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন বলিয়া বিবেচিত হইত।

মাইকেল এঞ্জেলো প্রথমে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু ভাস্কর্য্যের প্রতিই তাঁহার অধিকতর স্বাভাবিক ও আন্তরিক অনুরাগ ছিল। যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। মাইকেলের ভাস্কর্য্য শিক্ষার সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইল। ঘিরলানডাইও ব্রাদার্সের কারখানায় তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই লোরেঞ্জো ডি মেডিসি নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে ভাস্কর্য্য শিক্ষায় বিলক্ষণ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; এবং প্রভুর অনুকম্পায় তিনি মেডিসির উদ্যানে লোরেঞ্জোর স্থাপিত ভাস্কর্য্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভার্থ গমন করিলেন। তিন বৎসর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার পর, মাইকেলের উৎসাহদাতা ও অভিভাবক লোরেঞ্জো

নোয়ার মেষ বলি
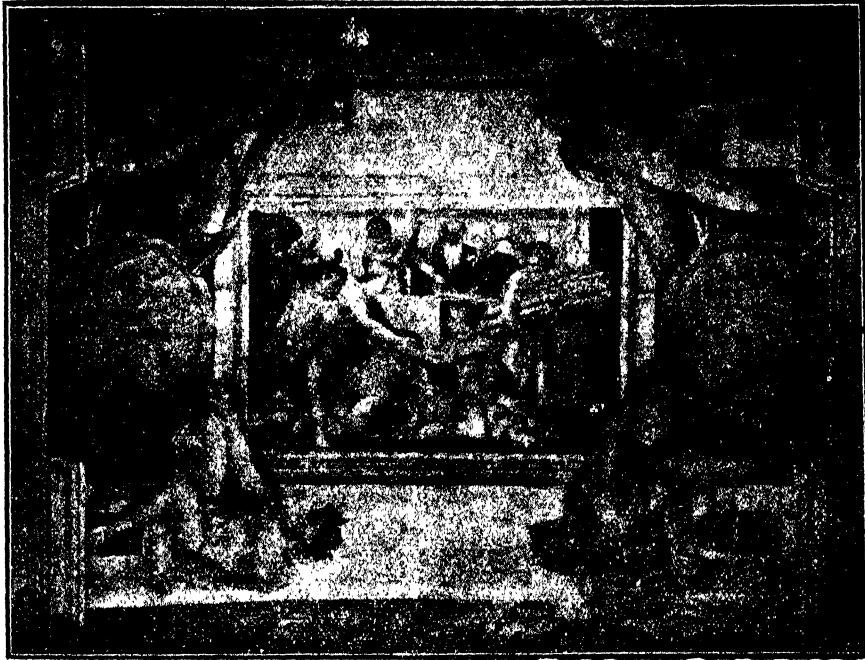
সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের সৃষ্টি

জগদীশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিতেছেন

পরলোকে গমন করিলেন। লোরেঞ্জোর পুত্র পিয়েরো ডি মেডিসি পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার গুণাবলীর অধিকারী হইতে পারেন নাই। সুতরাং মাইকেল এঞ্জেলোকে শীঘ্রই তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বলোনা নগরে গমন করিতে হয়। এ সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় বিংশতি বর্ষ। ইতোমধ্যে তিনি ভাস্কর্য্য-বিদ্যা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বলোনা নগরে অবস্থান কালে সুবিখ্যাত আলডোভ্রাণ্ডি পরিবারভুক্ত এক ব্যক্তির আদেশে মাইকেল এঞ্জেলো সেণ্ট পেট্রোনিয়াসের গির্জার অন্তর্গত সেণ্ট ডোমিনিক অংশের জন্য দুইজন ঋষির মূর্ত্তি এবং একটী দেবদূতের মূর্ত্তি গঠন করেন। বলোনা নগরে একবৎসরকাল অবস্থিতির পর মাইকেল এঞ্জেলো ফ্লোরেন্সে প্রত্যাগমন করেন। তখন ফ্লোরেন্সের মহাসভার জন্য একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং ঐ গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য কয়েকজন শিল্পী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মাইকেলের অনুপস্থিতি কালেই তাঁহার নাম শিল্পিগণের তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। ফ্লোরেন্সে আসিয়া মাইকেল কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে তিনি সেণ্ট জনের বাল্যাবস্থার একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে আরও দুই-একটি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে, তাঁহার শিল্পকুশলতা দর্শনে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে রোম নগরে যাইতে পরামর্শ দেন। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষভাগে তিনি সর্ব্বপ্রথম রোম নগরে পদার্পণ করেন। কিন্তু যাঁহাদের আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মাইকেল রোমে গমন করেন, তাঁহারা তথায় তাঁহার তাদৃশ সমাদর করিলেন না। ইহাতে মাইকেল কিছু বিপন্ন হইলেন। অবশেষে জাকোপো গলি নামক একজন সম্ভ্রান্ত রোমান ভদ্রলোক, এবং একজন ফরাসী কার্ডিনালের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। রোমান ভদ্রলোকটীর জন্য মাইকেল কিউপিড ও ব্যাচাসের প্রতিমূর্ত্তি এবং ফরাসি কার্ডিনালের ফরমাসে "পায়েটা" (অর্থাৎ যীশুর মৃতদেহের উপর রোরুদ্যমানা মাতা মেরীর) মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। ইহার মধ্যে ব্যাচাস ও পায়েটা এখনও বর্ত্তমান আছে। এই দুইটি মূর্ত্তিতে ভাস্করের শিল্প-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। এই দুইটি প্রতিমূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মের বোধক। ব্যাচাস কামুক ও মদ্যপদিগের দেবতা, এবং অপবিত্রতার নিদর্শন; আর, দ্বিতীয়টিতে পুত্রশোকাতুরা জননী মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া অব্যক্ত শোকে অধীরা হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার

জগদীশ্বর ভূমি ও জল পৃথক্ করিতেছেন

বাবা আদমের সৃষ্টি

াক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মাইকেলের শিল্পকৌশলে া মূর্ত্তিতে অপবিত্রতা ও পবিত্রতার দুইটি বিরুদ্ধ ভাব সম্পূর্ণ-প ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রথমবার মাইকেল পাঁচবৎসর মাত্র রোমে বাস করেন। তৎকালে রাজনীতিক কারণে ফ্লোরেন্সে বিষম অশান্তি বিরাজমান ছিল। সেই সকল গোলযোগের মধ্যে শিল্প চর্চ্চা সম্ভবপর নহে বলিয়া,

মাইকেল রোম নগরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা আরও হীন হইয়া যাওয়ায়, তিনি পুত্রের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিবার আশা করিতেছিলেন, এবং পুত্রকে ফ্লোরেন্সে প্রত্যাগমনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন। পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাইকেল ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হ'ন। পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে তিনি উদাসীন ছিলেন না। পিতা ও ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ, নিজের উন্নতি অবহেলা করিয়া, তিনি ফ্লোরেন্সে বাস করিতে লাগিলেন। এখানেও কিন্তু তাঁহাকে কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতে হয় নাই। ফ্লোরেন্সে আসিবামাত্র তিনি কার্ডিনাল ফ্রান্সেস্কো পিকোলোমিনির নিকট আহূত হইলেন।

বাবা আদমের সৃষ্টি (এক অংশ)

প্রলয়

পোপ দ্বিতীয় পায়াসের সম্মানার্থ সায়েনার গির্জায় বেদীর সান্নিধ্যে কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, মাইকেল এঞ্জেলো সেই ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মাইকেল এখানে চারিটির অধিক মূর্ত্তি গঠন করিতে পারেন নাই; সেগুলিও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতের তৈয়ারী ছিল না। অন্যত্র অধিকতর লোভনীয় কার্য্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে অগষ্টিনো ডি-এণ্টোনিও নামক একজন স্থপতি একটি সুবৃহৎ অখণ্ড মার্ব্বেল প্রস্তর হইতে ডেভিডের এক বিরাট প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। মাইকেল এঞ্জেলো এই মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ করেন। ইহার অপর নাম—দি জায়েন্ট (The giant বা দানব)। একে ত অপরে ইহা বহুকাল পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল; তাহার উপর মূর্ত্তিটীও প্রকাণ্ড, এবং একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে গড়িতে হইয়াছিল। সুতরাং

নোয়ার পশু বলি

স্বর্গ-চ্যুতি

নিখুঁতভাবে মূর্ত্তিটী গঠন করিতে মাইকেল এঞ্জেলোকে যে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদিন লোকের ধারণা ছিল যে, ঐ মূর্ত্তির গঠন সম্পূর্ণ করা একজন শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মূর্ত্তির গঠন যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন ইহার চমৎকারিত্ব দর্শনে সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ফ্লোরেন্স নগরের প্রধান-প্রধান শিল্পী আহূত হইয়া বিচার-বিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই মূর্ত্তির গৌরব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইলে, ইহা সিগনরীস্থ প্রাসাদের ছাদের উপর স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মূর্ত্তিটী ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে উহা একাডেমী অব ফাইন আর্টস গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ইহার পর মাইকেল এঞ্জেলো আরও কয়েকটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; তাহার সকলগুলি তিনি নিজে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

ভাস্করের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও মাইকেল চিত্র বিদ্যায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। এই সময়ে ফ্লোরেন্স নগরে এঞ্জেলো ডোনি নামক একজন ভদ্রলোক চিত্র বিদ্যার অনুশীলনে চিত্র-শিল্পিগণকে উৎসাহ দিতেন। তিনি রাফেল ও মাইকেল এঞ্জেলো—উভয়েরই অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে মাইকেল হোলি ফ্যামিলী (Holy Family) বা ধার্ম্মিক পরিবার নামক একখানি চিত্র অঙ্কন করেন। উহা এক্ষণে ফ্লোরেন্সের উফিজি (Uffizi) নামক প্রাসাদে রক্ষিত আছে। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ডেভিডের মূর্ত্তিগঠন সম্পূর্ণ হইলে, মাইকেল ফ্লোরেন্সের রাজসরকার হইতে একটী বিরাট চিত্রাঙ্কনের ভার প্রাপ্ত হন। কয়েক মাস হইতে লিওনার্ডো ডা-ভিন্সি এঞ্জিয়ারির যুদ্ধের রহস্য-চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল-গৃহের সুপ্রকাণ্ড হলের দেওয়ালে এই চিত্র অঙ্কিত হইতেছিল। ঐখানেই মাইকেল অপর একখানি চিত্র অঙ্কন করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। ১৩৬৪ অব্দের পিসান যুদ্ধ-সংক্রান্ত ঘটনাবলী হইতে মাইকেল নিজের চিত্রের জন্য কাস্‌সিনার যুদ্ধ-ঘটনা মনোনীত করিলেন। ফ্লোরেন্সের সেনারা একসময়ে স্নান করিতেছিল, এমন সময়ে শত্রুরা আসিয়া অতর্কিতভাবে সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহাই কাস্‌সিনার যুদ্ধ-ঘটনা। মাইকেল এই চিত্র প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এরূপ সময়ে (১৫০৫ অব্দে) পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস তাঁহাকে আহ্বান করায় তিনি চিত্রখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া রোম নগরে গমন করিতে বাধ্য হ'ন। এইখানে তাঁহার চিত্রকর ও ভাস্কর-জীবনের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়।

জলপ্লাবন

বাদশাহ শাহজাহান তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের স্মৃতি-রক্ষার্থ তাজমহলের কল্পনা করিয়াছিলেন। পত্নীর জীবদ্দশাতেই এই কল্পনা হইয়াছিল; বাদশাহ তাঁহার মহিষীকে বলিয়াছিলেন,—'আমার পূর্ব্বে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, আমি তোমার এমন স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করাইব, যাহা জগতে অনন্তকাল ধন্য হইয়া

থাকিবে, যাহার তুলনা থাকিবে না, যাহার সমতুল্য অপর কোন স্মৃতিচিহ্ন অপর কেহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসও অনেকটা ঐরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তবে তাঁহার কোন প্রিয়তমা পত্নী ছিল না, তাই তিনি নিজেরই জন্য অতুলনীয় সমাধিভবন নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়াছিলেন। মোগল বাদশাহ-মহিষী মমতাজমহলের মৃত্যুর পর তাজমহল প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়; পোপ জুলিয়াস স্বীয় জীবদ্দশাতেই আপনার সমাধি-ভবন মনের মতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইতে চাহিয়াছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলোকে রোমে আনাইয়া পোপ মহোদয় এই সমাধি-ভবন (sepulchral monument) নির্ম্মাণের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। মাইকেল এঞ্জেলো প্রথমে একটী নক্সা প্রস্তুত করেন। পোপ মহোদয় তাহা মঞ্জুর করিলে, শিল্পী উপযুক্ত মার্ব্বেল-প্রস্তর নির্ব্বাচন ও সংগ্রহ করিবার জন্য ১৫০৫-১৫০৬ অব্দের শীত-ঋতু কারারার মার্ব্বেল-খনিতে যাপন করেন, এবং উপযুক্ত প্রস্তর নির্ব্বাচন করিয়া সেগুলি খনন ও উত্তোলনপূর্ব্বক জাহাজে তুলিয়া দিয়া রোমে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। পরবর্ত্তী বসন্ত ঋতুতে মাইকেল রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং মার্ব্বেল-প্রস্তর আসিয়া পৌঁছিলে, সেগুলি লইয়া পূর্ণোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

আদি জননী ইভার সৃষ্টি

কিন্তু পোপ মহোদয়ের মনের স্থিরতা কিছুমাত্র ছিল না। মাইকেল এঞ্জেলোর অনুপস্থিতিকালে তিনি উর্ব্বিনো নগরের ব্রামাণ্টি নামক চিত্রকরকে আনাইয়া সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা পুনর্নির্ম্মাণের ভার তাঁহার

বাবা আদমের সৃষ্টি (অপর অংশ)

হস্তে অর্পণ করেন। ব্রামাণ্টি মাইকেলের বন্ধু ত নহেনই, বরং উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা—কাযে-কাযেই একটু শত্রুতার ভাবও—ছিল। মাইকেল এঞ্জেলো বলেন, তাঁহার ঐ প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকর ব্রামাণ্টি তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া পোপের দ্বারা তাঁহাকে সমাধি-ভবনের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সিক্‌স্‌টাইন চ্যাপেল (Sixtine Chapel) ফ্রেস্‌কো চিত্র দ্বারা ভূষিত করিবার জন্য নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে চিত্রকলা, স্থাপত্য—বা ভাস্কর্য্য কোন কার্য্যই আর পরিচালন করা অসম্ভব হইল, যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হওয়ায় কলাশিল্পের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিল। পোপ জুলিয়াস যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তায় এতটা আত্মসমর্পণ করিলেন যে, প্রস্তাবিত সমাধি-ভবন বা গির্জ্জার সৌষ্ঠব-সাধনের কথা তাঁহার মনেই রহিল না। মাইকেল এঞ্জেলো অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া তাঁহার পারিশ্রমিকের তাগাদা করিবার উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমে তাঁহাকে কয়েক দিন হাঁটাহাঁটি করাইয়া শেষকালে জবাব দেওয়া হইল। ভাব-গতিক দেখিয়া মাইকেল জীবন-হানির আশঙ্কায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া সহসা অশ্বারোহণে রোম নগর ত্যাগ করিয়া একেবারে ফ্লোরেন্সে চলিয়া গেলেন। পোপের লোকেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পিছু-পিছু বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল ; কিন্তু তিনি ফ্লোরেন্সের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করায় আর তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। ১৫০৬ অব্দের এপ্রেল মাসে মাইকেল রোম হইতে পলাইয়া আসেন। তাহার পরও রোম হইতে তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য বহু তাগিদ আসিয়াছিল ; কিন্তু মাইকেল সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বারব্ধ যুদ্ধের চিত্র সম্পূর্ণ করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এ দিকে পোপ মহোদয় যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়ীর বেশে বলোনা নগরে প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আবার চিত্রকলায় মনোযোগ দিবার অবসর আসিয়া উপস্থিত হইল। পোপ মাইকেল এঞ্জেলোকে বলোনা নগরে আহ্বান করিলেন। বলোনায় মাইকেলের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, তিনি নিরাপদে তথায় যাতায়াত করিতে পারিবেন, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের পূর্ণ পারিশ্রমিক পাইবেন—পোপ মহোদয় শপথ-পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, মাইকেল বলোনা নগরে গিয়া পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পোপও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বলোনা নগরে যুদ্ধজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পোপ মহোদয়

শেষ বিচার

শেষ বিচার (বামদিকের ঊর্দ্ধভাগ)
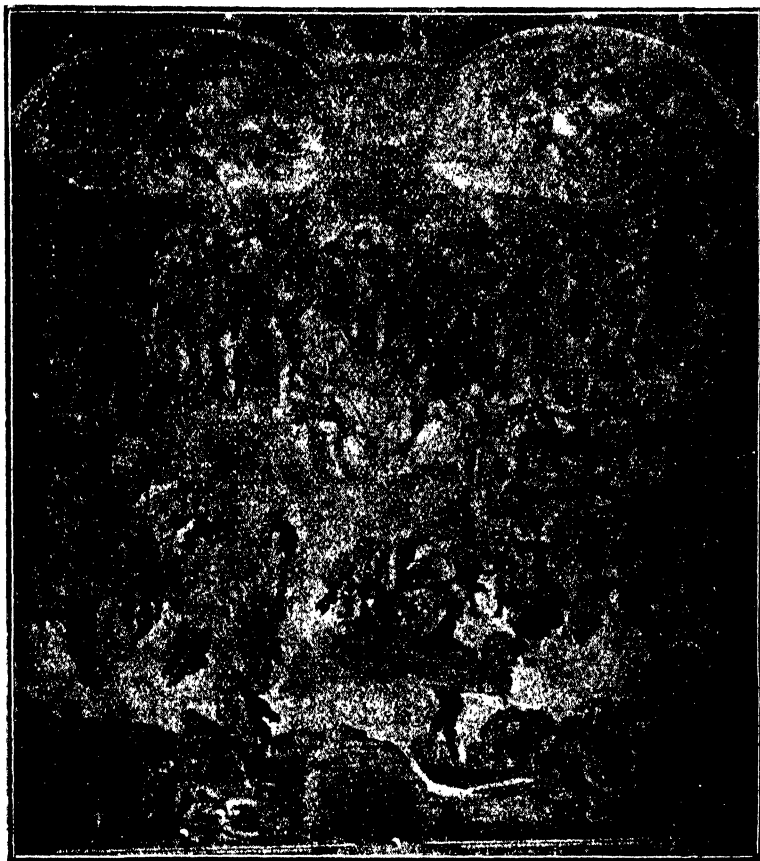
তাঁহার নিজের সমান মাপের একটী পিত্তলময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য মাইকেলকে আদেশ করিলেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়া যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তিন বৎসর পরে একটা বিপ্লবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বলোনা লইতে পোপ মাইকেলকে সঙ্গে লইয়া রোম নগরে ফিরিয়া আসেন। এখানে প্রথমে মাইকেল যে সমাধি-ভবন নির্ম্মাণের ভার পাইয়াছিলেন, এবারও তাহা বাকী রহিল। তিনি প্রথমে সিক্সটাইন গির্জ্জার ছাদের নিম্নভাগ চিত্রিত করিতে আদিষ্ট হইলেন।

এইখানে রাফেলের সহিত মাইকেল এঞ্জেলোর একটু তুলনা করিবার প্রয়োজন হইতেছে। রোমে পোপের প্রাসাদে এবং গির্জ্জায় রাফেল যখন চিত্রাঙ্কনে আদিষ্ট হ'ন, তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত বিষয়-নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু মাইকেলের সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাঁহাকে ফরমাসী চিত্র অঙ্কন করিতে হইয়াছিল। সকলেই জানেন, ফরমাসী কার্য্যের অপেক্ষা নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কৃত কার্য্য অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। সিক্সটাইন গির্জ্জায় চিত্রাঙ্কন কালে মাইকেল নিজের ইচ্ছামত চিত্রের বিষয়-নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলে তাঁহার চিত্রগুলি কেমন হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন; কিন্তু তিনি যে ফরমাসী চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহাও উৎকর্ষে অন্য কাহারও অপেক্ষা হীন ছিল না। এমন কি কাহার-কাহারও মতে এই চিত্র-গুলিই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছিল এবং তাঁহার উৎসাহও অনন্য-সাধারণ ছিল। কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তি কখনও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অবসর পায় নাই, এবং ঘটনাচক্রের সহিত সংগ্রাম করিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইত। এই কারণে তিনি আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার সুযোগ প্রায় পাইতেন না। তবে, সৌভাগ্যক্রমে এই গির্জ্জার চিত্রগুলি তিনি শেষ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই-গুলির জন্যই তিনি চিত্রময় জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বিশ্ব-সৃষ্টির সময় হইতে জলপ্লাবন পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের পৌরাণিক অংশের অধিকাংশ চিত্রই তিনি এখানে চিত্রিত এবং তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিয়াছিলেন। সাড়ে চারি বৎসরে এই কার্য্য সমাধা হয়।

শেষ বিচার (দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধভাগ)

ইহাতে তিনি অপরের নিকট্ হইতে সামান্যই সাহায্য পাইয়াছিলেন। অনেকে বরং তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার সম্মুখেই রাফেলের প্রশংসা করিয়া বলিত, রাফেল মাইকেলের অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট শিল্পী। রাফেল স্বয়ং অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার সমব্যবসায়ীর নিন্দা করিয়া আপনাকে জাহির করিবার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত হিতৈষী বন্ধুবর্গ মাইকেলের নিকট তাঁহার প্রশংসা করিয়া-করিয়া মাইকেলের মন তাঁহার বিরুদ্ধে এমন বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল যে, উভয়ের একত্রে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

সিস্টাইন গির্জ্জায় চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ হইবামাত্র মাইকেল পোপ জুলিয়াসের সমাধিভবনের কার্য্যে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু চারি মাসের মধ্যেই পোপের মৃত্যু হইল। সমাধিভবনটী যত বড় এবং যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ হওয়া উচিত বলিয়া পোপের নিজের মনে ধারণা ছিল, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা তত বড় এবং তেমন জমকালো সমাধি-নির্ম্মাণ করাইতে চাহিলেন না। সুতরাং একটী মাঝারি আকারের ভবনের কল্পনা হইল, এবং প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র-ভূষিত হইয়া কল্পনাটি এমন সুন্দর দাঁড়াইল যে কাহারও ক্ষোভের বা আক্ষেপের কোন কারণ রহিল না।

পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের মৃত্যুর পর জিওভান্নি ডি মেডিসি দশম লিও নাম ধারণ পূর্ব্বক পোপের পদ গ্রহণ করিলেন। এই মেডিসি-পরিবার ছলে-বলে-কৌশলে ফ্লোরেন্সের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। মেডিসি-পরিবার পুরুষানুক্রমে মাইকেল এঞ্জেলোর বংশের হিতৈষী ছিলেন ; সুতরাং পোপ দশম লিও যে মাইকেলকে অনুগৃহীত করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু মাইকেল স্বদেশভক্ত, জন্মভূমির প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এখন তিনি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেন, কি নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মুক্ত করিবেন,—শ্যাম রাখিবেন, কি কুল রাখিবেন—ইহা ভাবিয়া অধীর হইলেন। ফলে, তিন বৎসর

কার্য্য করিবার পর দ্বিতীয় জুলিয়াসের সমাধির যতটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই খানেই তাহা ছাড়িয়া দিয়া, দশম লিয়োর ফরমাসী কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে আত্মবিনিয়োগ করিতে হইল। কিন্তু রাজনীতিঘটিত নানা কারণে দশম লিওর প্রস্তাবিত কার্য্য শেষ করা হইল না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় গুণবান চিত্রকরের বসিয়া থাকিবার অবসর কোথায়? মাইকেল ফ্লোরেন্স নগরে ফিরিয়া আসিলে নানা লোকে তাঁহাকে নানা কার্য্যের ফরমাস দিতে লাগিল। আবার বহুসংখ্যক ছাত্র জুটিয়া তাঁহাকে গুরু-পদে বরণ করিতে সমুৎসুক হইল। এক কথায় বলিতে গেলে, এই প্রতিভাবান,- কিন্তু দুর্ভাগ্য— চিত্রকর ও ভাস্কর নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে একাদিক্রমে কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষ করিবার সময় পাইতেন না, সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতির দুই-তিনটী কার্য্যে প্রায় একই সময় হস্তক্ষেপ করিতে হইত। এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি চিত্র ও ভাস্কর্য্য জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।

সমাধি

চিত্রকরের পক্ষে প্রণয়িনীর অনুসন্ধানে চিত্তবিক্ষেপ ঘটান যে তাঁহার সাধনার পথে মহাবিঘ্নকর, মাইকেলের ধারণাও অনেকটা সেইরূপ ছিল। তিনি স্বীয় সাধনায় এমন একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত থাকিতেন যে, অপর কোনরূপ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তাঁহার বয়স যখন ৬০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ ঘটে, এবং তিনি প্রেমের কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন (চিত্রকরের জীবন বাস্তবিকই অদ্ভুত!)। তবে মাইকেল প্রেমকে কখনও চিত্রানুরাগের উপরে প্রাধান্য দেন নাই। কবি, চিত্রকর ও ভাস্কর যে বিশ্বপ্রেমিক! অনন্ত, উদার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের অনুরাগের পাত্র; সামান্য মানবী-প্রেমে তাঁহাদের চিত্ত কখনও বিভ্রান্ত করিতে পারে না।

মাইকেলের প্রেমাস্পদের নাম ভিক্টোরিয়া কোলোনা। তিনি বিধবা ছিলেন। তাঁহার লোকান্তরিত স্বামীর নাম মার্কুইস পেসকারা। মাইকেল কখনও তাঁহার এই প্রণয়পাত্রীর সহিত প্রেমালাপ করেন নাই—কেবল দূর হইতে তাঁহার উদ্দেশে দুই-একটী কবিতা লিখিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন। এইরূপে প্রেমের সাধনায় দশ বৎসর কাটিয়া যায়। এই সময়ে ভিক্টোরিয়া কোলোনার মৃত্যু হয়। ইহাতে মাইকেলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পরেও তিনি কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্প-প্রতিভা যে অনন্যসাধারণ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার দীর্ঘ জীবনে শিল্প-সাধনার অবসরও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহার নিত্য-সহচর ছিল। তাঁহার নিজের চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভাস্কর্য্যের পক্ষপাতিনী, কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনার এই সাধনার পথে তিনি পদে পদে বাধা পাইয়া আসিয়াছেন। অধিকন্তু, তাঁহাকে জীবনের প্রায় অধিকাংশ কালই বাধ্য হইয়া চিত্রকলার অনুশীলন করিতে হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছার অনুসরণ করিতে পারেন নাই; প্রায়শঃই তাঁহাকে অপরের ফরমাস অনুযায়ী চিত্রাঙ্কন করিতে হইয়াছে। এইরূপে, নিজের ইচ্ছার ও প্রবৃত্তির বিরোধী কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেও, তিনি মানবজাতিকে যে চিত্র সম্পদে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তিনি যদি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে ভাস্কর্য্যের যে কতখানি উন্নত হইতে পারিত, তাহা অনুমান করাও বোধ করি দুঃসাধ্য।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১৫)

ম্যাক্‌ফার্‌সন্‌, জ্যাক্‌সন, ষ্টিয়ার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, গ্লোভার, ফিয়ার, কেম্প, ক্যাম্বেল, নরম্যান,

ট্রেভর, বেলী, সিটন.কার, স্যর বার্ণস পিকক্‌, মর্গান, লক

ইংরাজি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই মধুসূদন য়ুরোপ হইতে কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই সুকীয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনোহর বাসভবনের বহির্ভাগের দ্বিতল কক্ষ-সমূহ মধুসূদনের অবস্থানের নিমিত্ত ইংরাজি ফ্যাসানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, যতদিন না ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে মধুসূদনের পসার-প্রতিপত্তি হয়, ততদিন মধুসূদন উক্ত বাটিতে অবস্থান করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ! য়ুরোপ-প্রবাসের ভীষণ যন্ত্রণার অরুন্তুদ-স্মৃতি, স্বদেশ-প্রত্যাগমনের সঙ্গেসঙ্গেই মধুসূদনের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। প্রতীচ্য-সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ-অনুপ্রাণিত মধুসূদন দেশীয় মহল্লায় না থাকিয়া, ইংরাজ-মহল্লা মনোনীত করিলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়াই মধুসূদন, গবর্ণমেণ্ট-হাউসের পশ্চিমদিকে অবস্থিত স্পেনসেস্‌ হোটেলে উঠিলেন। তিনি এই হোটেলে আড়াই বৎসর বাস করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুদিন Mrs. Herring's Hotelএ অবস্থান করিয়াছিলেন। ফরাসী মন্ত্র দীক্ষিত মধুসূদন, বিশ্রাম-বাসের নিমিত্ত ফরাসী-পল্লী চন্দন-নগরের গঙ্গাতীরে একটি 'ভিলা' ভাড়া করিয়া তথায় অবকাশ বিনোদন করিতেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ একটি রম্য-নিকেতনেও মধুসূদন কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতায় স্পেনসেস্‌ হোটেলেই তিনি ছিলেন।

কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পরেই মধুসূদনের

কোন পূর্ব্বতন বন্ধু একদিন পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বাসা নিলে ?" মধুসূদন হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বামুন-পাড়ায়, বামুন-পাড়ায়।" বন্ধু বলিলেন, 'বামুন-পাড়া কি হে ?' মধুসূদন বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ে যে পাড়া সকল পাড়ার মাথা, সেই পাড়াকে বামুন-পাড়া বলে। কলিকাতার মধ্যে সাহেব "পাড়াই সহরের মাথা ; তাই সেখানে আছি।"

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবিবর লর্ড জর্জ্জ বায়রণের বিলাস-বাসনের ও বড়-মানুষীর অনেক কাহিনী টমাস মূর বিরচিত 'লর্ড বায়রণের জীবন-চরিতে' প্রকাশিত হইয়াছে ;—পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন, এ বিষয়ে লর্ড বায়রণ ও মাইকেল মধুসূদন উভয়েই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বী।

স্পেনসেস্ হোটেলে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বহুদিন পরে য়ুরোপ হইতে মধুসূদনের আগমন-সংবাদে পুলকিত হইয়া বন্ধুগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মধুসূদন প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিয়া, তাঁহার স্বভাব-সুলভ মধুর বচনে আপ্যায়িত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হইবামাত্র মধুসূদন তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন, এবং আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চুম্বন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ক্ষান্ত হন না ; শেষে বিদ্যাসাগর বহু চেষ্টায় মধুসূদনের আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতে-করিতে বলিলেন, "এই হোটেলে বাস অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। আমি তোমার জন্য একটি অতি সুন্দর বাটী সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি সেখানে চল না কেন, বেশ সুখে থাকিবে।" কিন্তু হায়, মধুসূদনের অদৃষ্টে সুখ কোথায় ? তিনি এ কথার উত্তরে বলিলেন, "এখানে বেশ ভাল আছি, এ নিমিত্ত আর আপনার ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই।" বিদ্যাসাগর কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন যে, মধু হোটেল হইতে নড়িবেন না, তাঁহার চেষ্টা বৃথা। কাজেই তিনি এ সম্বন্ধে তখন আর কোন কথা না বলিয়া বিদায় লইলেন ; বিদায়-কালে মধুসূদন আবার তেম্নি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন ও নৃত্য করিলেন। পরে বিদ্যাসাগর মধুসূদনের ব্যয়-লাঘবার্থে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

রামকুমার বিদ্যারত্ন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, মধুসূদন তাঁহাকে দুইভুজ প্রসারণ পূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন এবং পণ্ডিতকে পাশে বসাইয়া তাঁহার কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, নানা কথায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে একদিন মনস্বী রমেশচন্দ্র একটি বন্ধুকে লইয়া মধুসূদনের সঙ্গে পরিচিত হইতে গমন করেন। মধুসূদনের ব্যবহারে ও অভ্যর্থনায় পরম প্রীত হইয়া রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন ;—"It was in this year (1867) that I had the pleasure of first seeing the great poet. A friend who accompanied me was as great an admirer of Madhusudan's poetry as I myself, and Madhusudan did us the favour of reading some portions of his Meghnad to us. He was then, what he always was in life, genial, kind-hearted, and good, but careless and improvident. Misfortunes darkly closed over the last years of his life, and within six years after I had seen him so genial and so full of life, Madhusudan was no more."

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যারিষ্টাররূপে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার-লাভের নিমিত্ত মধুসূদন প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার বার্ণস্ পিককের নিকট আবেদন করিলেন। মহামতি স্যার বার্ণস্ পিকক্ তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের আবেদন পত্র গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ব্যারিষ্টাররূপে প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিলেন। মাননীয় লক্, বেলী, নরম্যান ও কেম্প-প্রমুখ বিচারপতিরা স্যার বার্ণস্ পিককের প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিলেন। বিচারপতি গ্লোভার ও সিটনকার লিখিলেন, মধুসূদনকে এখনই ব্যারিষ্টাররূপে প্রবেশাধিকার দেওয়া হউক। সকলেই মত দিলেন, কিন্তু জজ জ্যাক্সন ও ম্যাকফারসন্ গোল বাধাইলেন। জ্যাক্সন লিখিলেন, অগ্রে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত হউক ; সিটনকার লিখিলেন, "আমি মধুসূদনের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তিনি প্রবেশাধিকার পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।" এ কথা তিনি দরখাস্তের পশ্চাতে লিখিয়া দিলেন এবং মাননীয় বিচারপতি

শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহোদয় সিটনকারের মন্তব্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিলেন। জজ ম্যাক্‌ফারসন্ ঘোর আপত্তি করিলেন, মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব-ইতিহাস সুবিধাজনক নহে, ইত্যাদি কথা লিখিয়া মধুসূদনের প্রবেশাধিকারে বিঘ্ন-উৎপাদন করিলেন। জ্যাক্‌সন্ ও ম্যাক্‌ফারসন্ উভয়ে দেশীয়-বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারা দেশীয়দিগকে হাইকোর্টে প্রবেশাধিকার দানে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; তদুপরি আবার মধুসূদনের বিদ্বেষ্টাগণ তাঁহার বিপক্ষে ঈর্ষামূলক অলীক অপবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। যাহাতে মধুসূদন হাইকোর্টে প্রবেশ না করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক কামনা ছিল। মহামতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত এ সকল বিষয় মধুসূদনকে জ্ঞাত করেন।* তাঁহার সম্বন্ধে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের কিরূপ অভিমত, তাহা জানিবার জন্য জজেরা মধুসূদনকে কতকগুলি প্রশংসাপত্র দাখিল করিতে বলেন। মধুসূদন সে সময়ের দেশের ও সমাজের শিরোমণিদিগের প্রশংসাপত্র পেশ করিয়া, পুনরায় দরখাস্ত দিয়া, তাঁহার আবেদন তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করাইয়া, বিদ্বেষ্টাদিগের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করেন, এবং প্রচণ্ড প্রবাহবৎ প্রতিঘাতে হিমাদ্রি-সদৃশ বাধাবিঘ্ন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সদম্ভে হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন।

আমরা অর্থব্যয়ে মহামান্য হাইকোর্টের দপ্তরখানা হইতে এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ সকলের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

To

The Hon'ble Sir Barnes Peacock, Kt.

Chief Justice.

Hon'ble Sir,

Having had the honour of being called to the Degree of a Barrister by the Hon'ble and ancient Society of Gray's Inn, I humbly solicit the favour of being admitted an advocate of the High Court.

I became a student in Michaelmas Term 1862 and was called to the Bar in Michaelmas Term 1866. My name stood on the roll for seventeen Terms as I was obliged to reside on the Continent for a time on account of ill health. The number of Terms, which I formally kept was ten. I attended public lectures for a whole educational year and studied with a Barrister of our Inn.

1, Spences Hotel,
Calcutta,
20th Feb, 1867.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Michael Madhusudan Datta.

Some testimonials were sent with the above letter: They are not in the record.

6-3-67 :—CHIEF JUSTICE SIR BARNES PEACOCK proposed that Mr. Michael M. Datta be admitted as an advocate. He kept only 10 terms. Justice Loch, Bayley, Norman, and Kemp also signed the proposal.

JUSTICE LEWIS JACKSON :—I should wish to make some inquiries before acceding to this application.

7-3-67 :—JUSTICE GLOVER :—I think the applicant should be admitted as nothing appears against him.

JUSTICE SETON KARR :—I propose that he should be admitted at once. From all I have heard of this gentleman, he is quite fitted for admission, and we lately admitted Baboo Manmohan Ghose who, if I remember right, had only kept 8 terms.

---

* এ সম্বন্ধে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিয়াছিলেন, 'Sumbho Nauth says, that our enemies seem to have won the ears of the Judges, and that the antidote must be as strong as the poison."

Justice Seton Karr's endorsementwas also signed by Justice Sambhu Nath Pandit.

25-3-67 :—Justice A. G. Macpherson. :—I think that Mr. Datta ought not be admitted as an Advocate without further and more satisfactory evidence of his being a person whom it is proper to admit. Mr. Datta's antecedents and former position as Interpreter of the Calcutta Police Court are not suggestive of his being such a person. While the letters annexed to his application are quite insufficient to lead me to suppose that he is. The opinion expressed by Babu Digamber Mitter (if worth anything in itself) is to my knowledge opposed to that entertained by many persons. It is remarkable that Mr. Datta produces no letter from any one in England, and none from any of the Govt. Officers with or under whom he served before he went there.

26-3-67 :—Justice Norman withdrew his assent to Mr. Datta's admission.

4-4-67 :—Justice Phear :- In view of the short number of terms and the general bad reputation of Mr. Datta I cannot consent to his admission, until his qualifications have been made to appear by definite testimony and his character has been satisfactorily cleared.

Justice Seton Karr :—The delay in disposing of Mr. Datta's case is the cause of much prejudice to his interests. The matter is very extensively talked of in native circles and all sorts of vague rumours are in circulation. His case should be disposed, one way or another, with the least practicable delay.

Justice Norman :—I feel a doubt whether what we know is sufficiently definite to justify us in excluding him. Peterson is decidedly for his admission. Beyond saying that he is unpleasant and gets drunk at times he knows no harm of him and says he is a very clever intelligent man.

Chief Justice Peacock :- Mr. Justice Norman has been good enough to make some inquiries of Mr. Peterson who, it was understood, knew something about Mr. Datta's character. Considering the general character of Mr. Datta as far as I have been able to ascertain it, I withdraw my proposal for his admission. I was not aware that there was any imputation upon his general character and repute when I proposed to admit him.

25-4-67 :— Letter of Mr. Datta to the court :—I beg leave to enclose several certificates from some of the most respectable native gentlemen to whom I have the honour of being known. I trust that these certificates will be found satisfactory.

TESTIMONIALS.

I

From Raja Kali Krishna Bahadoor and Coomar Hurrendra Krishna Bahadoor.

Member of the Bengal Legislative Council.

We have much pleasure in certifying that Mr. Michael M. Datta is well known to us. He is a gentleman by birth and held in esteem by our countrymen, possessing as he does, an unexceptionable character and no common order of literary abilities We would be glad to see him admitted as an Advocate of Her Majesty's High Court.

Calcutta.
Sobha Bazar,
14th April, 1867.

(Sd) Raja Kali Krishna Bahadoor
" Hurrendra Krishna

II.

From Babu Rommanauth Tagore,

Member of the Bengal Legislative Council.

I have much pleasure to state that Mr. M. M. S. Datta is of a respectable family, his father was a first-rate Pleader in the Sudder Court and was highly respected by all of us. Although my personal acquaintance with Mr. Datta is not of a long duration, still from what I have seen of him I can affirm that he is a highly intelligent and educated gentleman. From what I hear of his character and ability, I have every reason to believe that he would prove an acquisition to the profession which he has adopted.

Calcutta, (*Sd*) ROMMANAUTH TAGORE.
16th April, 1867

III.

From Pundit ISWARA CHANDRA VIDYASAGARA, and Baboo Prosunno Coomar Surbadhicary, Principal, Sanscrit College, and Babu Rajkrishna Banerjea, Assistant Professor, Presidency College.

MR. MICHAEL M. DATTA, Barrister-at-Law, is born of a very respectable and well-connected family. His father, the late Baboo Rajnarain Datta was a distinguished Pleader of the late Sudder Court. Mr. Datta is a man of splendid talents and varied and extensive literary attainments, of which he has made an ample display in several of his Poems and Dramas in Bengali. These works have at once made his name dear and respected to his countrymen, and have secured him an enviable reputation as an Author. His knowledge of the English Language and literature is such as would do credit to an educated Englishman. He is, besides, well-acquainted with Sanscrit, Persian, Greek, Latin, French, German, and Italian. He is well-known to be an honest, sincere, generous, and high-minded gentleman. On the whole, he is, in our humble opinion, an ornament to his country. We shall be exceedingly delighted to see him admitted to the Bar of the Calcutta High Court.
Calcutta 23th April 1867.

(sd.) ISWARA CHANDRA SHARMA.
" Prosunno Coomar Surbadhicary.
" Raj Krishna Banerjea.

IV.

From Roy Kishen Kishore Ghose Bahadoor, and Baboos Onoocool Chander Mookerjea, Mohesh Chunder Chowdry, Unodapersaud Banerjea, and Dwarkanath Mitter.

Pleaders, Calcutta High Court.
15th April, 1867.

We have much pleasure in certifying that we have known Mr. M. M Datta for several years. He is a gentleman by descent. We have always known and heard him spoken of as an upright and honourable man. His high literary talents, varied acquirements, and excellent character, have always secured for him the respect and good-will of his countrymen and they would be really glad to see him admitted to the Bar of the High Court.

(sd.) Kishen Kishore Ghose.
" Onoocool Mookerjea.
" Mohesh Chunder Chowdry.
" Unodapersaud Bannerjea.
" Dwarkanauth Mitter.

V,

From Boboo Jotendra Mohun Tagore.
Honorary Secretary, British Indian Association.

I have much pleasure in certifying that I have

known Mr. Michael M. Datta for several years and that I have always found him an honourable gentleman of unblemished character. I shall be glad to see him as an Advocate of the Calcutta High Court.

Calcutta, 13th April, 1867.

(sd.) Jotindra Mohun Tagore.

VI.

From Baboo Heraloll Seal.

Mr. Michael M. Datta, Barrister-at-Law, has been known to me for years. He is a gentleman of brilliant abilities, extensive literary attainments and unexceptionable character. I shall be very glad to see him admitted to the Bar of the Calcutta High Court.

Calcutta, 22nd April, 1867.

(sd) Heraloll Seal

VII.

From Baboo Rajendralala Mitra,
Director of the Wards' Institution,
Manicktolla, 14th April 1867.

I have much pleasure in certifying that I have known Mr. Michael M. Datta both personally as well as by repute for some years. He is a gentleman by birth and education and held in great estimation by the majority of his countrymen for his uncommon literary abilities. He is the author of some of the best Poetical Works in the Bengali Language and his father was a successful Vakeel of the late Sudder Court. I know nothing against his character as a gentleman and am of opinion that there are few men in this country who better deserve the honour of being admitted as an Advocate of Her Majesty's High Court in Calcutta.

(sd.) Rajendralala Mitra.

VIII.

From Baboo Peary Chand Mittra,
Vice-President, Agricultural and Horticultural Society of India.
Calcutta, 15th April, 1867.

I have much pleasure in certifying that Mr. Michael M. Datta belongs to a very respectable family and is of very respectable connections. I have known this gentleman for many years. He possesses high and varied attainments and an excellent character, and is an honour to his country. He is very popular with his countrymen and I feel sure that like me they will all rejoice at his admission as an Advocate in the High Court. His constant association with Englishmen has much elevated his ideas and I should be surprized and disappointed if a sense of honour and a sense of duty were not the normal condition of his mind, as I have every reason to believe that they are. In all sincerity I wish him every success.

(sd) Peary Chand Mittra.

IX.

From Prince Gholam Mahomed.
Russapugla, the 16th April, 1867.

I have much pleasure in certifying that although I am not personally acquainted with Mr. Michael M. Datta, I have always heard him spoken of as a gentleman of high character and great literary talents. Mr Datta's late father was a well known gentleman in this neighbourhood.

(sd) Gholam Mahomed,
Son of late Tippoo Sultan.

X.

From Baboo Rajendro Mullick Roy Bahadoor and Baboo Debendro Mullick.

We have much pleasure in certifying that Mr

M. M. Datta is known to us for years. We consider him a gentleman of good and respectable character and great abilities, and in every way worthy of the Bar.

Calcutta 15th April 1867.

(sd.) Rajendro Mullick
Debendro Mullick
(True copies)
Michael M. Dutta,
Barrister-at-Law.

রামগোপাল ঘোষ ও দিগম্বর মিত্রের লিখিত প্রশংসাপত্র মধুসূদন পূর্ব্বে দিয়াছিলেন; সে দু'খানি পাওয়া যায় নাই। তদ্ভিন্ন যাদবকৃষ্ণ সিংহ, ডাক্তার ও সি দত্ত, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং রমানাথ লাহা, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজনাথ মিত্র এবং তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্নীগণ মধুসূদনের চরিত্র সম্বন্ধে অতি উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর উদ্ধৃত হইল না।

প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের সমস্ত প্রাড়্‌বিবাকগণ ঐ সকল প্রশংসাপত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জ্যাক্‌সন ও ম্যাক্‌ফারসনের আর কিছুই বলিবার রহিল না। সকলেই বুঝিলেন যে, মাইকেল মধুসূদন কি দরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তিনি বিদ্বজ্জন-সমাজের কোন্ শ্রেণী অধিকার করিয়া আছেন। জজেরা সকলে মে মাসের ৩রা তারিখে একত্র বসিয়া, একমত হইয়া, মধুসূদনকে ব্যারিষ্টাররূপে হাই-কোর্টে প্রবেশাধিকার দান করিলেন।

3-5-67. Full Court Resolution :

Read a letter dated the 25th April 1867 from Mr. Michael M. Datta Bar-at-Law enclosing several certificates submitted with reference to Court's letter calling upon him to produce further certificates of character and good repute.

Resolved that Mr. Datta be admitted an advocate of the High Court on the strength of his certificate of call and the testimonials now submitted.

মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে পারদর্শিতা সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভোলানাথ চন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, পরমেশ্বরম্ পিলে, রামচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ মনস্বীগণ এবং হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরার, সমাজ-দর্পণ, বঙ্গমিহির প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের সম্পাদকগণ মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ের অনুকূলে-প্রতিকূলে নানা অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এ স্থলে সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কঠোর, নীরস, শুষ্ক ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহার ন্যায় মহাকবির সরল হৃদয়ের উপযুক্ত ছিল না। প্রখরবুদ্ধি মধুসূদন ফৌজদারী আইনে তাঁহার পুলিশকোর্টে থাকার সময় হইতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হাইকোর্টে তিনি তাহার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। বড়, ছোট, মধ্যবিত্ত নানা শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে তিনি প্রথম-প্রথম অনেক মোকদ্দমা পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথম-প্রথম তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গৌরদাসবাবুকে লিখিত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর তারিখের পত্রাংশ হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন। মধুসূদন লিখিতেছেন;—"I am afraid, old fellow, I shan't be able to go to your part of the world this time, unless very heavily paid, for I have work (criminal) almost every day and you know I am bound to make as much money as I can and not to neglect work for pleasure."

কিন্তু সাহিত্য ও কবিতার দিকে তাঁহার হৃদয়ের প্রবণতা এত গভীর ছিল যে, ব্যবহারশাস্ত্রের পার্থিব জ্যোতিঃ তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই লিখিয়াছিলেন "nursed on the lap of poetry he was not the man to suck the moisture of life from the dry bones of law" বঙ্গমিহির লিখিয়াছেন; "মাইকেলের ব্যবস্থা-শাস্ত্র বিষয়েও বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তিনি ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতা পুলিশের দ্বিভাষী ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবহারজীবের ব্যবসায় তাঁহার প্রিয় ছিল না। কাব্য-শাস্ত্রের আলোচনায় সময় কর্ত্তন

করিতে ভালবাসিতেন। অবকাশ-সময়ে কবিতারচনা ও কাব্যপ্রিয় জনগণের সহিত কথোপকথন করিতে আমোদ বোধ করিতেন।" তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের প্রধান অন্তরায় হইল তাঁহার কণ্ঠস্বর। মধুসূদনের প্রথম যৌবনের সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রৌঢ়ে আর মধুর ছিল না। বহুদিন হইতেই—দূর মান্দ্রাজ প্রবাসে—তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল; তিনি উচ্চকণ্ঠে ভগ্নস্বরে বক্তৃতা করিতেন। তদুপরি তাহা অতিশয় তেজপূর্ণ ছিল। তাহা সকল সময়ে প্রাড়বিবাকদিগের প্রীতিকর হইত না। তিনি অনেক সময়ে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। অন্যান্য ব্যবহারাজীবের ন্যায় তোষামোদের দ্বারা বিচারকদিগের মনস্তুষ্টি সাধন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এমন কি সার লুইস্ জ্যাক্সনের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বিচারককে তিনি গণনার যোগ্যই বিবেচনা করিতেন না। জ্যাক্সনের ভয়ে সমগ্র বিচারালয় শঙ্কিত ছিল। তাঁহার সহিত মধুসূদনের সর্ব্বদাই বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক হইত। ইহাতেও তিনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বন্ধু গৌরদাস জজদিগের সহিত মধুসূদনকে তর্কবিতর্ক করিতে নিষেধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "Michael can ne'er brook anybody's bullying তা তিনি যিনিই হউন না কেন?" আমত তেজস্বিতায় তিনি অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; তবুও নত হইয়া কখনও আপনার গৌরব লাঘব করেন নাই। আমরা এইস্থলে তাঁহার বিচারালয় সম্বন্ধীয় কয়েকটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিলাম।—

একবার বিচারপতি কেম্প (F. B Kemp) সাহেবের এজলাসে একটি খুনী মোকদ্দমায় মধুসূদন আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদি পক্ষের লোকেরা বলে, যে ইহারা খুন করিবার জন্য সমস্ত রাত্রি বাহিরে অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন জজকে বলিলেন 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী'—এই ঘোর শীতে তাহারা বাহিরে কি করিয়া সমস্ত রাত্রি থাকিতে পারে। উক্ত বাঙ্গালা কবিতা শুনিয়া কেম্প সাহেবের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, ওরূপ হিমে সমস্ত রাত্রি বাহিরে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বিশ্বাসে তিনি অভিযুক্তদিগকে সুবিচার করিয়া মুক্তিদান করিলেন। কেম্প সাহেব খুব ভাল বাঙ্গালা জানিতেন। পেস্কার মামলার নথী পড়িতে না পারিলে বলিতেন "আমাকে দিন্, আমি পড়িয়া দিতেছি।"

বিচারপতি জ্যাক্সন সাহেবের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বাগবিতণ্ডা চলিত, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারও দুই-তিনটি বিবরণ দিতেছি।

একবার মধুসূদনকে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে শুনিয়া মিঃ জ্যাক্সন্ কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "The Court orders you to plead slowly, the Court has ears." মধুসূদন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন; "But pretty too long, my lord."

আর এক সময়ে একটি মক্কেলের পক্ষ হইতে মধুসূদন একখানি দরাখাস্ত পেষ করিতে চাহিলে মিঃ জ্যাক্সন বলেন, "you can keep over the petition till the vacation is over." ইহাতে মধুসূদন বলেন, "My Lord, for all that time the sword of Damocles will hang on my client's head.' জ্যাক্সন বলেন "I can assure you that your client has never heard of Damocles or his sword."

একদিন কোন মোকদ্দমায় মধুসূদন কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই জজ জ্যাক্সন বলেন, "তুমি অনেক বাজে বকিয়া থাক, কেবল কবিতা বল।" এ কথায় মধুসূদন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমি বাজেই বকি, আর কবিতাই বলি, কিম্বা নরম্যান-বিজয়ের ইতিহাসই বলি, তাঁহা তোমাকে শুনিতেই হইবে, কারণ আমি তোমাকে বলি নাই, বেঞ্চকে বলিতেছি।"

বিচারপতি জ্যাক্সন এক চক্ষে একটি গোল চশমা (Monocule) দিতেন। তিনি যখন ঐ চশমা লাগাইয়া তীব্র দৃষ্টিতে কোন কৌন্সুলী বা উকীলের দিকে চাহিতেন, তা তিনি যিনিই হউন না কেন, তাঁহাকে বসিতেই হইবে। একদিন মধুসূদন যেমন বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, অমনি জ্যাক্সন সাহেব সেই এক চক্ষে চশমা লাগাইয়া মধুসূদনের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিলেন। মধুসূদন তৎক্ষণাৎ তাঁহার springএর চসমা নাকের উপর লাগাইয়া তেমনিই তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। ইহাতে জ্যাক্সন থতমত খাইলেন; ভাবিলেন, এ ব্যক্তি বড় সহজ নহে। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীকার বলেন "বাঙ্গালী

হইয়াও তিনি সার লুই জ্যাক্‌সনের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজের তীব্র কটাক্ষকে প্রতিকটাক্ষপাত করিতে ভীত হইতেন না। বিশ্লেষণ করিলে, অনেক বিষয়ে, এইরূপ তাঁহার প্রতিভার ও প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে।"

আবার অন্যদিকে তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। বিশ্বম্ভর লাহার সহিত জয়মিত্রের গলির ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রের একটি মামলায় মধুসূদন সার চার্লস পলের সহিত প্রতিবাদীর তরফে কৌন্সুলী নিযুক্ত হন। তাহাতে সার চার্লস পল মধুসূদনকে অগ্রে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন,—"In this case you are to play the first fiddle and I the second."

একবার কোন জজ-আদালতে প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে-করিতে মধুসূদন বুঝিলেন যে, জজ-সাহেব বাদীর পক্ষে বড়ই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তখন মধুসূদন আর থাকিতে না পারিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করেন; তাহার প্রথম পংক্তি এইরূপ ছিল ;—

Like a *Machranga* stoops the plaintiff.

ইত্যাদি।

কবিতা শুনিয়া বিচারক অতীব প্রীত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে মধুসূদনকে বলিলেন, "আপনি কবি, কবিতাতে বলিতে পারেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আইনের সহিত কবিতার কোন সংস্রব দেখি না।"

সার জন বড্‌ফিয়ার মধুসূদনের সময়ে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। অনেকে বলিতেন, তিনি ভারি খরচে। তাহাতে মধুসূদন বলেন, "ও আর কত খরচ করিবে? উহার ন্যায় শুষ্ক গণিতাভিজ্ঞ ও চতুর ব্যবহারাজীব (A dry mathematician and acute lawyer like him) আর কি খরচ করিতে পারে? বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করুক, তার বাৎসরিক আয় ত পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র।"

কাব্যামোদী ও নাট্যামোদী বন্ধুগণকে পাইলে মধুসূদন কাজকর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। স্পেনসেস্ হোটেলে মধুসূদন তাঁহার কক্ষে বসিয়া মক্কেলের নিকট মোকদ্দমার বিবরণ শুনিতেছেন, এমন সময়ে ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র প্রমুখ নাট্যামোদী বন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র মধুসূদন, মক্কেলদিগের কার্য্য তৎক্ষণাৎ শেষ করিয়া, তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হয় দেখিয়া, বন্ধুগণ ভবিষ্যতে হোটেলে আসিয়া আগে খানসামার নিকট হইতে খবর লইতেন যে, মধুসূদন মক্কেলের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন কি না। তাঁহারা যখন শুনিতেন, অপর কেহ উপস্থিত নাই, তখন সংবাদ দিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবিষ্ট হইতেন।

একদিন মধুসূদন বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন বিখ্যাত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তাঁহার জন্য বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখিতে পাইয়াই মধুসূদন তৎক্ষণাৎ বার-লাইব্রেরী হইতে বহির্গত হইয়া, সেক্‌হাণ্ড করিয়া আদালতের সম্মুখস্থ ৭নং ওল্ড পোষ্ট-অফিস ষ্ট্রীটে তাঁহাকে নিজের চেম্বারে লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহাকে কথোপকথনে আপ্যায়িত করিলেন।

মধুসূদনের পূর্ব্ব-পরিচিত এক ব্রাহ্মণ কোন মোকদ্দমার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। মধুসূদন জানিতেন, ব্রাহ্মণ 'সখী-সম্বাদ' গান করিতে বিশেষ পটু। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যারিষ্টার অগ্রে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশ-পনরটি সখী-সম্বাদ শ্রবণ করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে, তাঁহার কাগজপত্র দেখিয়া, মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন-কালে, মধুসূদন দেখিলেন যে, আদালতের বাহিরে রাস্তার ধারে কতকগুলি কিশোরবয়স্ক বালক পরিত্যক্ত, ছিন্ন, প্রক্ষিপ্ত কাগজপত্র হাটকাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শকট হইতে অবতরণ করিয়া বালকদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইল। মধুসূদন, তাহারা সেখানে কি করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। তন্মধ্য হইতে হরিমোহন সেন গুপ্ত নামে একটি বালক বলিল 'মহাশয়, লেখাপড়া করিব বলিয়া, আদালতের পরিত্যক্ত ছিন্ন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া আমরা সাদা-কাগজ, ব্লটিং, নিব্ প্রভৃতি খুঁজিতেছি।" এই কথা শুনিয়া মধুসূদন তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক বালকের হস্তে একএকটি সিকি দিয়া বলিলেন "তোমরা বাড়ী যাও এবং ইহাদ্বারা কাগজ কলম কিনিয়া লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া মধুসূদন চলিয়া গেলেন। পরে বালকেরা যখন জানিতে পারিল যে, যিনি তাহাদিগকে সিকি দিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন

স্বয়ং মাইকেল, তখন তাহাদের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল কালীপ্রসন্ন দত্তকে তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন "ওহে, তোমরা আমাকে তোমাদের বালীর দত্ত করে নাও না।" কালীপ্রসন্নও হাসিয়া উত্তর দিতেন, "তা শুধু বালির দত্ত কেন, আমরা সবই পারতুম্, তবে তুমি যে একেবারে গোড়া কেটে ফেলেছ।"

মধুসূদনের ব্যারিষ্টারি-ব্যবসায়ের কথা আমাদিগকে মধ্যে-মধ্যে উল্লেখ করিতে হইবে। তাঁহার সকল স্মৃতিই মধুময়। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে প্রথম বৎসরে মাসিক দেড়হাজার হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার আয় হইয়াছিল; পরে আর বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু তাঁহার বিপুল ব্যয়ের ইয়ত্তা কে করিবে? বঙ্গমিহির বলেন,—"তিনি নিজে যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, পরিমিতাচারী হইলে তাহাতেই তাঁহার সুখসচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। বড়লোকের ন্যায় থাকিব, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং অর্থের অভাব কখনই দূর হয় নাই।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপের করাল অর্থকৃচ্ছ্রতার ভীষণ স্মৃতি তাঁহার স্মৃতিমন্দিরে আর ছিল না। তাহা চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। স্পেন্সেস্ হোটেলে মাইকেল মধুসূদন একাকী বাস করিতেন; কিন্তু তিনখানি বড়-বড় ঘর তাঁহার অধিকৃত ছিল! তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে সতত পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন! দেশী, বিলাতী যে যেরূপ খানা খাইত, তিনি তাঁহাকে সেইরূপ খাদ্য দানে তৃপ্ত করিতেন। তাঁহার মদ্যের ভাণ্ডার (Celler) সতত উন্মুক্ত ছিল। হাইকোর্টের এটর্ণী-কৌন্সলী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলকেই তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে মদ্যপানের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেন। তাঁহার মুন্সী কার্য্যান্তে যখন বিদায় লইতে যাইত, তখন তিনি বলিতেন "Moonshee, don't go away :—Boy! give him a peg! তাঁহার নিজের খরচ হাজার টাকার কমে কিছুতেই কুলাইত না। তদুপরি আবার তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যা য়ুরোপে বাস করিতেছেন; সেখানে পুত্রকন্যা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে; তজ্জন্য প্রতিমাসে কলিকাতা হইতে তাঁহাদিগকে অনূন পাঁচশত টাকা পাঠাইতে হইত। ব্যারিষ্টারি-ব্যবসায়ে আরও উন্নতির আশা করিয়া, মধুসূদন কিছুতেই ব্যয়-সঙ্কোচ করিলেন না। আয়ের অধিক ব্যয় হইতে লাগিল;—য়ুরোপ হইতেই বিপুল ঋণভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন; তাহা পরিশোধিত হয় নাই; আবার এক্ষণে ঋণের উপর ঋণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এদিকে য়ুরোপে যথাসময়ে অর্থ প্রেরিত না হওয়াতে মধুসূদনের পত্নী ও পুত্রকন্যার ক্লেশের সীমা রহিল না। মধুসূদন ভীষণ উদ্বিগ্ন ও উন্মত্তবৎ হইয়া আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হস্ত প্রসারিত করিলেন। কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, ভীতি, দ্বিধাবোধ, কিছুই নাই, তেমনি তেজের সহিত মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখিলেন। আমরা সেই তেজোগর্ভ পত্রখানির কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম; তাহাতে পাঠক মধুসূদনের সেই সময়ের অবস্থা জানিতে পারিবেন।

"My dear Vid.

I am glad you are better, for I want you to get me a thousand Rs. from Onoocool for Europe. If you had been a vulgar or common man like most of those who surround you, I should hesitate to ask you to involve yourself again on my account, especially old Sirish is assuming war like attitudes. But though a Bengali, you are a man, and I believe you would risk anything to help a friend in such distress as I am! My poor wife is almost as badly off as I was when I first wrote to you, and I am perfectly helpless. What money I am making this month, I am paying to my hotel people, for I do not like the idea of being indebted here. Something is due to my position and some sacrifices are necessary. If you were a vulgar fellow, I should (I repeat) hesitate to write to you in this strain, * * * But as you are, one of natives' nobleman, tho' a Beng—you will (unless I am greatly mistaken) feel for me, and sympathize with me. I have been very thoughtless perhaps, and have not managed matters well; but don't punish innocent people for my folly. If you don't get me this money before the French mail of the 25th, they will nearly perish in Europe"

উক্ত পত্রের আর একস্থলে লিখিতেছেন,—

"You and I – my good Vid—have often done desperate things, and looked to the chapter of accidents to neutralize the effects of our benevolent folly. What has been the result? You are the greatest Bengalee that ever lived—people speak of you with glowing heart and tearful eyes, and even my worst enemies dare not say that I am a bad fellow!—Be bold and help me again * * * * you must know that I won't be refused * * * and don't write to me a vulgar letter saying this and that like a d-d Bengali and politely refusing my prayer. In conclusion, I appeal to Issur Chunder Vidyasagara my friend, and let him act as Issur Chunder Vidyasagara ought to act under present circumstances."

Yours ever affectionately
Michael M. Dutt.

ইংলণ্ডে ডাক্তার সামুয়েল জনসন্ অর্থব্যয় সম্বন্ধে কাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত অলিভার গোল্ডস্মিথের অভাবপূরণে সতত তৎপর হইয়াও, তাঁহার অভাব-মোচনে অসমর্থ ছিলেন। আর পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে হিন্দুকুলচূড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অসাধারণ অপরিমিতব্যয়ী মাইকেল মধুসূদনের বিশ্বগ্রাসী ধনক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহার ধনভাণ্ডার সতত উন্মুক্ত রাখিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে গোল্ড্স্মিথ, বায়রণ, মধুসূদন তিনজনেই তুল্যমূল্য! সমাজ-দর্পণ-সম্পাদক লিখিয়াছেন; "মাইকেল অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি কখন-কখন স্পষ্টই বলিতেন, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা বৎসরে না হইলে ভদ্রলোকের কিরূপে চলিতে পারে? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি, মাইকেলের অনেকটা ধরণ গোল্ডস্মিথের সহিত এক হয়! গোল্ডস্মিথ কখনও শান্তিভোগ করিতে পারেন নাই। আমোদপ্রিয়তা বিষয়ে মাইকেল তাঁহার অপেক্ষাও অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়। গোল্ডস্মিথ উলঙ্গ হইয়া অর্থীকে সর্ব্বস্ব দান করিতেন; আমাদের মাইকেলও এইরূপ ছিলেন। ঘরে খাবার নাই, স্ত্রী-পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হওয়াই ক্লেশকর; অথচ মাইকেলের দানশক্তি কমে না।"

"* * আমরা এ স্থলে ইহাও বলি যে, মাইকেল গোল্ডস্মিথের অপেক্ষা উন্নতমনা ছিলেন। যে জনসন্ তাঁহার এত উপকার করিতেন, গোল্ডস্মিথ তাঁহারই ঈর্ষা ও নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমাদের মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে উপকৃত হইয়া চিরকাল তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুসূদনকে ঋণস্বরূপ অর্থদান করিয়াছিলেন; নিজের নিকট অর্থ না থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর অপরের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া মধুসূদনকে দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের উত্তমর্ণগণের মধ্যে শ্রীশ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি টাকার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। মধুসূদনও সে সময়ে বিপন্ন;—তিনি শকটারোহণকালে পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন; তাঁহার অর্দ্ধরুদ্ধ, ভগ্ন, কণ্ঠস্বর ক্রমেই আরও রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কাজেই আশানুরূপ উপার্জ্জন হইতেছিল না। তাহার উপর, তাঁহার পরশ্রীকাতর বিদ্বেষ্টাগণ তাঁহার অনিষ্টসাধনে তৎপর হইয়া, ক্রমান্বয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে চারিদিকে তাঁহার সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করিতেছিল। এই দুঃসময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার সেই সময়ের সাংসারিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমরা সেই পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এবং তাঁহার ব্যারিষ্টারী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া, বর্ত্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

My dear Vid.

I am sorry you are not well. I can't leave my bed!—Now what shall I say about S. If it would mortify "you to be dragged to a Court of law," it would make me mad. Surely S can't be so hard-hearted. You know I have no money and have been getting on very indifferently since last November on account of my throat and general health. Don't you think Onoocool could be induced to do something? I have not been out for the last fortnight and don't know when I shall be on my legs again. People who dislike the idea of your being so kind to me, might have told you a hundred things

about my careless extravagance and all that; but I tell you that nothing but a miracle could enable a fellow to pay off a debt of 5000 Rs; live like a gentleman, maintain a wife and children in Europe etc, the very first year of his professional career.

You must excuse the somewhat bitter tone of this letter. I have got out of my bed (to which I am confined by fever brought on by a severe accident) and feel a great deal of pain. I have, moreover, learned that certain persons have been trying to poison your mind against me. You are not a fool and that is my consolation.

I shall write to N--myself—I don't see why I shouldn't, and we shall see what we can do to raise some money during the approaching holidays.

Yours in pain
Michael M. Dutt.

P. S. There are men whom Nature has given the hearts of bill-collecting sircars. They would keep their wives and daughters naked (if they could) to save money. Such men might tell you anything against me; but I tell you, I have not been so successful as জনরব is pleased to give out.

M. M. D.

উপরিউক্ত পত্রপাঠে বুঝা যায় যে, মধুস্থদন তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের প্রথম বৎসরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদত্ত ঋণের কিয়দংশ (সম্ভবতঃ ২।৩ হাজার টাকা) পরিশোধ করিয়াছিলেন। আরও কিছু দিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। যে বিপুল ব্যয়, তাহাতে কোথা হইতে কি হইবে?

পুর্ব্বোক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বুভুক্ষু ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার প্রদত্ত অর্থের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মহাউৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধৈর্য্যচ্যুত, উত্তেজিত ও কাতর হইয়া মধুস্থদনকে অর্থের জন্য ক্রমাগত তাগাদা করিয়াছিলেন। ন্যায্য ব্যয়ই সঙ্কুলান হয় না; কাযেই সে অবস্থায় মহাসহিষ্ণু মধুস্থদনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর্য্যুপরি তাগাদায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়াই তাঁহাকে উপরিউদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তিনি মধুস্থদনের জন্য বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞ মধুস্থদন বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। একখানি পত্রে মধুস্থদন বিদ্যাসাগরকে লিখিয়াছিলেন;—

1. Spences' Hotel.

My dear Vidyasagar.

Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. you know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course You have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden. * * If we can in this way save the estate let us do so, if not let them go. I wish I could run over and see you. Perhaps I shall do so next Saturday.

With affectionate regard
Sir, yours
M. S. Dutt.

এই সময়ে নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁহার তালুক-আবাদ প্রভৃতি ভূ সম্পত্তি তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল। তাঁহার পত্তনীদার সুযোগ বুঝিয়া কয়েক সহস্রমাত্র মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব চিরতরে গ্রাস করিয়া বসিল! মধুস্থদন সেই অর্থের কিছুই পাইলেন না—সমস্তই ঋণদাতাগণের হস্তে চলিয়া গেল! বিরাট ঋণস্তূপ তেমনই উত্তুঙ্গ হইয়া রহিল—তাহার একটি কণিকাও স্খলিত ও চ্যুত হইল না।

য়ুরোপে পত্নীপুত্রকন্যা অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়াছেন; কাজেই মধুস্থদন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই

সময় ছোট-আদালতের জজ ফেগ্যান সাহেব কর্ম্মত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্কল্প করাতে, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত পদের জন্য লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতে পত্র লেখেন। আমরা পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

1. Spences' Hotel.
17-10-68.

My dear Vid.

I understand that Fagan of the "Small" is going to retire and Nui Thompson is to be moved into his place. Can you put in a word for me to your "potential" friend the Lieut. Governor? They want a Barrister and post like that would save me and mine. Although a Brahmin, you are no descendant, I am sure, of that irascible old fellow Durvasa, and I can't believe that any folly of mine could turn away that noble heart from

Your very loving but
unfortunate.
Michael M. Dutt

P. S.—There is no time to be lost. There isn't another man in Calcutta (Black or White) from whom I would ask such a favour. If you have ceased to be my friend, the sooner I hear of the calamity the better.

M. M. D.

কিন্তু ফেগ্যান সাহেব সেই সময়ে পেনসন্ লইলেন না। তিনি আরও প্রায় ছয় বৎসর কাল উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়া গেলেন। কাজেই মধুসূদনের সেই পদ প্রাপ্তির সুযোগ আর ঘটিল না। দেড় বৎসর পরে তিনি সমবেতনে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল রেকর্ডের পরীক্ষকের উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; যথাস্থানে সে বিষয় উল্লিখিত হইবে।

পীড়িতাবস্থায় উত্থান-শক্তিরহিত মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতে না পারায় একটি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। নৈরাশ্যে ও বেদনায় মধুসূদনের কবিতায় প্রাবৃট তটিনীর কূলপ্লাবিনী প্রবাহ আর ছিল না ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ চিরদিন কিরূপ অগ্নিদীপ্ত ছিল, নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন !—

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে ?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ?
কর্ম্মনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে ?
বঙ্গের সুচূড়ামণি ক'রে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন! এহেন রতনে ?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

আকালের মা

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

আকালের বৎসরে জন্ম বলিয়া বাপ-মা ছেলের নাম রাখিয়াছিল আকাল। নিঃস্ব কৃষকের গৃহে, অভাবের কঠোর তাড়নার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, আকাল যথা-সম্ভব সুখে-স্বচ্ছন্দে লালিত-পালিত হইয়াছিল। বেশী বয়সের ছেলে, সুতরাং মাতা-পিতার স্নেহ-যত্নটা সে খুব বেশী পরিমাণেই ভোগ করিতে পাইয়াছিল।

ইহার উপর আকাল তিন-বৎসরে পা দিয়াই যখন মা-বাবা ছাড়া গরুকে গউ, লাঙ্গলকে আগল, এবং হুঁকাকে উয়া বলিতে শিখিল, তখন মাতাপিতা তাহার ধীশক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইল। মা বলিত, "গরু-লাঙ্গল নিয়েই কাটাতে হবে কি না, তাই ঐগুলাই আগে চিনেছে।"

চিন্তামণি মাথা নাড়িয়া বলিত, "তা হবে না বৌ; আকাল যদি বাঁচে, ওকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। আমার আকালকে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে লাঙ্গল করতে দেব না।" স্বামীর আশাপ্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বড় বৌ সহাস্যে উত্তর করিত, "হাঁ, হাঁ, চাষার ছেলে আবার মানুষ হবে?"

চিন্তামণি বাঁ-হাত দিয়া আকালকে জড়াইয়া ধরিয়া, ডানহাতে ধরা হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে বলিত, "হবে না? নিশ্চয়ই হবে। দেখো তুমি, আকাল যদি বাঁচে, আর আমিও যদি বেঁচে থাকি, তবে ভিক্ষে করেও"—আকালকে স্বামীর বাহুবেষ্টন হইতে টানিয়া লইয়া বড় বৌ তাড়াতাড়ি বলিত, "তাই হবে গো, তাই হবে; তোমার ছেলে হাকিম দারোগাই হবে।"

মায়ের মুখে কচি হাতখানি চাপড়াইতে-চাপড়াইতে আকাল অস্ফুটস্বরে বলিত, "দোগ্‌গা অব।" পতি-পত্নী উভয়েই হাসিয়া উঠিত। চিন্তামণি কিন্তু আশা পূর্ণ করিবার অবসর পাইল না। আকালের বয়স চারি বৎসর পূর্ণ না হইতেই, চিন্তামণির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। সে একদিন ছিন্ন, মলিন রোগশয্যায় শুইয়া, আকালের হাতের একগণ্ডুষ জল পান করিয়া ইহলোকের পরপারে চলিয়া গেল। যাইবার সময় রোরুদ্যমানা পত্নীকে বলিয়া গেল, "আকালকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করো, তোমার কষ্ট দূর হ'বে।"

স্বামীর মৃত্যুতে আকালের মা দিনকতক কাঁদাকাটা করিয়া, বার বার আকালের মুখের দিকে চাহিয়া, বুক বাঁধিয়া সংসারের ভার মাথায় তুলিয়া লইল।

সংসার চলিবার তেমন কোন উপায় ছিল না। জমি-জমা সামান্যই ছিল, খাজনা দিতে না পারায় তাহারও অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া গেল। যে দুই-এক বিঘা রহিল, তাহাতে দুই-তিন মাসের মাত্র অন্নসংস্থান হইতে পারে। কিন্তু চাষার মেয়ে এজন্য ভয় পাইল না। সে গোবর কুড়াইয়া, ঘুঁটে বেচিয়া, পরের ধান ভানিয়া আপনার ও পুত্রের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তাহার প্রধান ভাবনা হইল, সে কি উপায়ে স্বামীর শেষ আদেশ পালন করিবে? অসহায়া, দরিদ্রা বিধবা কিরূপে ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবে? যে এই প্রস্তাব করিয়াছিল, সে আর ইহজগতে নাই; কিন্তু আকালের মা তো আছে? সে থাকিতে আকাল মূর্খ হইবে?

আকাল পাঁচ বৎসরে পড়িলে, বিধবা তাহার হাতে খড়ি দিয়া তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিল।

মাতার তীব্র শাসনে আকালের এক বেলাও পাঠশালাকে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। এক-এক দিন সে পাঠশালায় যাইতে ঘোর আপত্তি জানাইত; কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিকিত না। পুত্রের সকল মিনতি, সকল ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করিয়া আকালের মা নিজে রোরুদ্যমান পুত্রকে পাঠশালায় ধরিয়া দিয়া আসিত, পুত্রের করুণ ক্রন্দনে তাহার মাতৃহৃদয় একটুও বিচলিত হইত না। কোন-কোন দিন সে পাঠশালায় গিয়া দেখিয়া আসিত, আকাল তথায় উপস্থিত আছে কি না।

পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কৃষক-রমণীর এই প্রকার আগ্রহ ও তীব্র শাসন দেখিয়া, পাড়ার অনেকে টিট্‌কারী দিয়া বলিত, "চাষার ছেলে এবার বিদ্যাসাগর হবে।" কেহ

বা আকালের মার মুখের উপর তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিত, "ও আকালের মা, তোর ছেলে না জজ হবে?"

আকালের মা এক গাল হাসিয়া বলিত, "তাই আশীর্ব্বাদ কর বাবা, তাই আশীর্ব্বাদ কর।

সন্ধ্যার সময় পাঠশালা হইতে প্রত্যাগত হইয়া আকাল যখন মাতাকে স্বীয় অঙ্গে গুরুমহাশয়ের নিষ্করুণ বেত্রাবাতের চিহ্ন দেখাইত, তখন বিধবা তাহার উপর স্নেহকোমল হাতখানি বুলাইতে-বুলাইতে বলিত, "মার না খেলে কি লেখা-পড়া হয় বাবা?" কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মাতৃহৃদয় এমনই একটা বেদনায় আকুল হইয়া উঠিত যে, পুত্রের সাক্ষাতেও সে চোখের জল রোধ করিতে পারিত না। মায়ের চোখে জল দেখিয়া আকাল সান্ত্বনার স্বরে বলিত, "তুই কাঁদিস্ না মা, আমাকে বেশী লাগেনি।"

মাতা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পুত্রের মুখখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিত।

গুরুমহাশয় চাষার ছেলে আকালকে প্রথম-প্রথম অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিতেন। কিন্তু ক্রমে চাষার ছেলের বুদ্ধির নিকট অনেক বামুন-কায়েতের ছেলের বুদ্ধি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল; তখন তাঁহাকে আপনার ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে হইল, "ব্যাটা যেন গোবরে পদ্মফুল।

(২)

নয় বৎসর বয়সে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া আকাল গ্রামের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইল। আকালের মা স্কুলের সেক্রেটারীর নিকট অনেক কাঁদা-কাটা করিয়া এবং বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার বাড়ীর ধান ভানিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া আকালকে অবৈতনিক ছাত্র করিয়া লইল।

স্কুলে মাহিনা দিতে না হইলেও ছেলের স্কুলের বই, কাগজ, জামা, কাপড় প্রভৃতি যোগাইতেই বিধবাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইত। ঘুঁটে বেচা, ধান ভানা ছাড়া সে এখন বাড়ীতে শাকসব্জী, লাউগাছ, কুমড়াগাছ প্রভৃতি জন্মাইয়া বিক্রয় করিত। একটী গাই ছিল; ঘাস কাটিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইত, এবং তাহার দুধটুকু বিক্রয় করিয়া ছেলের বই কিনিবার খরচ জোগাড় করিত। কিন্তু এততেও সব সময় কুলাইত না; অনেক সময় তাহাকে উপবাস দিয়া খোরাকীর চাল বাঁচাইয়া বেচিতে হইত। টানাটানির সময় নিজে ফেনটুকু খাইয়া ভাতগুলি ছেলের জন্য তুলিয়া রাখিত। কষ্ট সহ্য করিতে হইলেও সে ছেলেকে মানুষ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিত না।

আকাল মায়ের কষ্ট কতক বুঝিতে পারিত, সময়ে-সময়ে প্রতিবাদ করিত। কিন্তু উচ্চাশয়া বিধবা তাহার সে প্রতিবাদে কর্ণপাত করিত না; বলিত, "আগে বাবা, তুই মানুষ হ', তার পর আমাকে ক্ষীর, সর, ছানা খাওয়াস্। তখন যদি তোর কথা না শুনি, তবে আমি কৈবর্ত্তের মেয়েই নই।"

কথাগুলা বলিবার সময় ভাবী সুখের আশায় বিধবার মুখখানা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আকালও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় মন বাঁধিয়া সঙ্কল্প করিত, "মানুষ হ'য়ে যদি কোন দিন মায়ের এই কষ্ট দূর করতে পারি, তবেই আমার জন্ম সার্থক।"

এইরূপ দুঃখ-কষ্ট, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া অনেক-গুলা বৎসর কাটিয়া গেল। শেষে, আঠার বৎসর বয়সে, আকাল যেদিন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে স্থান অধিকার করিল, সে দিন আকালের মা'র উচ্চ আশা সফলতা-পথে অনেকটা অগ্রসর হইল। বিধবা সে দিন জোড়া পাঁঠা দিয়া গ্রাম্য দেবতা শীতলাদেবীর মানসিক শোধ করিল।

এইবার কিন্তু আকালের মা এমন একটা ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে পতিত হইল যে, সে কোনদিকেই কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না। এবার আকালের পড়া আর গ্রামের স্কুলে চলিবে না, কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতে হইবে। সে পড়ার খরচ ঘুঁটে কাঠ বেচিয়া, ধান ভানিয়া চালান যাইবে না; এমন কি, আকালের মা আপনাকে বিক্রয় করিলেও তাহাতে কুলাইয়া উঠিবে না। তবে উপায়!

আকালের মা ভাবিল, "হায়, এত দূরে আসিয়া শেষে মাঝ দরিয়ায় হাল ছাড়িতে হইল!"

(৩)

"তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি ওখানে বিয়ে করব না।"

সস্নেহে আকালের মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে আকালের মা বলিল, "তা কি হয় বাপ, আমি যে কথা দিয়েছি।"

আকাল একটু রাগিয়া বলিল, "কেন কথা দিলে? বিষয় দেখে বুঝি?"

হাসিতে-হাসিতে আকালের মা বলিল, "পাগল! বিষয় আমার কি হবে? তুই যে আমার সাতরাজার ধন মাণিক।" "তবে কেন কথা দিতে গেলে?" "সাধে কি দিয়েছি? তোর পড়ার সুবিধা হবে ব'লেই এ কাজ করেছি।"

ছেলে মায়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া ছিল, রাগিয়া উঠিয়া বসিল; জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ছাই হবে! আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।" পুত্রের অসম্মতির কারণ বুঝিয়া মায়ের মুখ আনন্দে প্রফুল্ল হইল, বুকটা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। স্নেহগদগদ কণ্ঠে আকালের মা বলিল, "কি করবি বাপ, আমার কাছে থাক্‌লে তো পড়াশুনা হবে না।" আকাল বলিল, "না হয় না হবে।"

আকালের মা বলিল, "ছিঃ আকাল, এতদিনে তোর এই হ'ল? তিনি স্বর্গে গেছেন, আমি মহাপাতকী পড়ে আছি। তাঁর আশা ছিল, তোকে মানুষ করতে হবে। সে জন্য আমি না খেয়ে, না প'রে তোকে মানুষ করবার চেষ্টা করছি। তুই মানুষ হ'লে আমার সব কষ্ট সার্থক হবে। কিন্তু তুই আমাকে সে আশায় নিরাশ কর্‌বি?"

আকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিধবা মৃদু হাসিয়া বলিল, "হাঁ রে আকাল, আমাকে ছেড়ে থাকতে তোর কষ্ট হ'বে, কিন্তু তোকে ছেড়ে দিতে আমার কি কষ্ট হবে, তা বুঝতে পারিস্ কি? তুই যে আমার"—বিধবার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; এক ফোঁটা জল চোখের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। মায়ের চোখে জল দেখিয়া, তাঁহার সেই স্নেহভরা কাতরোক্তি শুনিয়া, আকাল আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর মা, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।" মাতা নীরবে পুত্রের মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিল।

হাজারিপাড়ার বৃন্দাবন সামন্ত বেলেঘাটায় গুড় ও চাউলের কারবার করিয়া অল্পদিনের মধ্যে অনেক টাকার মালিক হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে বাড়ী-বাগান, পুকুর, জমি-জমা প্রভৃতি যাহা করিয়াছিল, তাহা একজন জমিদারেরই অনুরূপ। লোকে বলিত, "বৃন্দাবন লক্ষপতি হইয়াছে।" ইহার উপর বৃন্দাবন যখন ন'পাড়ার চৌধুরী বাবুদের নিকট হইতে হাজারিপাড়ার মহলটা ইজারা লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, তখন অনেকেই বলিল, "বৃন্দাবন টাকার কুবের।" কেহ বলিল, "টাকার কুমীর।" কিন্তু একমাত্র কন্যা কালীতারা ছাড়া বৃন্দাবনের এই কুবেরসদৃশ ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী আর কেহ ছিল না। পুত্রলাভের জন্য যাগযজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলেও যখন অদৃষ্টের রুদ্ধদ্বার কিছুতেই উন্মুক্ত হইল না, এবং দেহস্থৌল্যে গৃহিণী সন্তান-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ অসম্ভাব্যতা জানাইয়া দিল, তখন বৃন্দাবন হতাশ হইয়া ভাবিল, বিধাতার লেখার উপর কলম চলিবে না। যাহা হইবার নয় তাহা যখন হইবে না, তখন যাহা আছে, তাহাকেই অবস্থার উপযোগী করিয়া লইয়া সুখী হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সুতরাং বৃন্দাবন স্থির করিল, মেয়েটিকে একটি সৎপাত্রের হাতে দিয়া জামাইটিকেই আপনাদের পুত্রস্থলে অভিষিক্ত করিতে, এবং পরের ছেলেকে আপনার করিয়া হৃদয়ের পুত্রস্নেহের প্রবল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কালীতারার বয়সও একাদশ অতিক্রম করিয়াছিল। সুতরাং পাত্রের অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে ঘটক ছুটিল।

চাষীর ঘরে লেখাপড়া-জানা ভাল ছেলে সহজে পাওয়া যায় না। যে দুই-একটি পাওয়া গেল, তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, সুতরাং তাহারা ঘরজামাই হইতে স্বীকৃত হইল না। ঘটকেরা গ্রামের পর গ্রাম তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

অবশেষে তাহারা আকালের সন্ধান পাইল। বৃন্দাবন যেমন চায়, ঠিক তেমনটি। আকালের মা প্রথমে ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু শেষে যখন বুঝিয়া দেখিল যে, ইহাতে আকালের পড়াশুনার খুব সুবিধা হইবে, এবং ভবিষ্যতে সে এত বড় একটা বিষয়ের মালিক হইয়া বসিবে, তখন সে সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না।

আকাল শুনিয়া ইহাতে আপত্তি করিল, কিন্তু মাতার মঙ্গলেচ্ছাপূর্ণ জেদের নিকট তাহার আপত্তি টিকিল না। বৃন্দাবন আসিয়া ছেলে দেখিল; এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিল। কিন্তু ভাবী জামাতার বাড়ী-ঘরের অবস্থা দেখিয়া সে প্রস্তাব করিল যে, বিবাহটা তাহার নিজের বাটীতেই সম্পন্ন হইবে। তাহার একমাত্র

কন্যার বিবাহে যেরূপ উৎসব-আড়ম্বরের সম্ভাবনা, এই ক্ষুদ্র গৃহে তাহার স্থান-সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। অতএব বিবাহ সেইখানেই হইবে। বেহান সেইখানেই গিয়া পুত্রের বিবাহে আমোদ-প্রমোদ করিবেন।

আকালের মা বৃন্দাবনের প্রস্তাবে সম্মতি দিল, কিন্তু নিজে সেখানে যাইতে স্বীকার করিল না। পুত্রের বিবাহ তাহার অগোচরে হইবে, ইহাতে তাহার একটু কষ্ট হইল, কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য যখন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তখন এই কষ্টটুকুও একেবারে অসহ্য হইবে না।

বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বৃন্দাবন পাল্কী বেহারা পাঠাইল। আকালের মা ছেলেকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিল।

বামুন-পিসি বলিলেন, "আকালের মা, বড় ঘরে ছেলের বিয়ে দিলি বটে, কিন্তু ছেলে শেষে পর না হয়!"

আকালের মা বলিল, "ছেলে কি কখন পর হয় মা-ঠাকরুণ?"

বামুন-পিসি বলিলেন, "হয় বৈ কি, অনেক কাঠকুড়ুনীর ছেলে রাজগদী পেয়ে মা-বাপকে চিন্‌তে পারে না।"

আকালের মা সহাস্যে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা, আমার আকাল আমার রাজাই হোক্, সেই আমার চার-পো সুখ।"

"মাগী কি হাবা" বলিয়া বামুন-পিসি স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন। আর আকালের মা ঘরে ঢুকিয়া অন্তরে বাহিরে একটা বিরাট্ শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল।

(৪)

বিবাহের কয়েকদিন পরে আকাল যখন ভৃত্য সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিল, তখন আকালের মা একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। সে আকালের জামা, কাপড়, জুতা, ঘড়ি, চেন, আংটী, কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা দেখিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না; আহ্লাদে তাহার বুকটা যেন দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। আর আকাল ভাবিয়া পাইল না, সে শ্বশুরের বড় বাড়ীর এই চাকরটিকে তাহার ভাঙ্গা মেটে ঘরের কোথায় বসাইবে। ইহার উপর চাকরটা যখন বাড়ীর এদিকে-ওদিকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল, তখন আকালের মনে হইল, দেশের লোককে আপনার প্রভুত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে চাকরটাকে সঙ্গে আনিয়া সে কি অন্যায় কাজই করিয়াছে!

মা কয়দিনের পর আজ আদর করিয়া ছেলেকে খাওয়াইতে বসিল। ছেলেও খাইল বটে, কিন্তু তেমন পাত চাটিয়া খাইল না, মাতৃদত্ত খাদ্যে বুঝি তেমন সুধার আস্বাদও পাইল না। মা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে আকাল, তারা কেমন যত্ন-আত্তি করে?" আকাল বলিল, "খুব। জামাইবাবুর খাওয়া-পরা নিয়ে বাড়ীশুদ্ধ অস্থির।" মাতার হৃদয় আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। না হইবেই বা কেন? তাঁহার ছেলের মত গুণের ছেলে কি পাওয়া যায়? এমন ছেলেকে কে না আদর-যত্ন করিবে? তার-পর মাতাপুত্রে কত কথা হইল। ছেলে শ্বশুরের কত বড় বাড়ী, বাড়ীতে কয়টা ঘর, ঘরে লোকজন, চাকর দাসী কত, কয়টা পুকুর, পুকুরে কত বড় মাছ, বিবাহের সময় কত মাছ মারা হইয়াছিল, কত ঘটা, কত বাজনা, নাচ তামাসা হইয়াছিল, একে একে সে সব পরিচয় দিল। মা শুধু ছেলের মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার মুখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য দেখিতে লাগিল। শেষে মা যখন জিজ্ঞাসা করিল, বৌটি কেমন, কত বড়, ইত্যাদি, তখন আকাল মুখ নামাইয়া একটু লজ্জার হাসি হাসিল। শেষে মায়ের জেদে সংক্ষেপে উত্তর দিল, "মন্দ নয়।" এই সকল কথাবার্ত্তা হইলে বিধবা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর পড়ার বন্দোবস্ত কি হ'লো?" আকাল বলিল, "সে সব ঠিক হয়েছে। আমি আসছে হপ্তায় কলকাতায় যাব।"

বিধবা বলিল, "দেখিস্ বাবা, বেশ মন দিয়ে লেখাপড়া করিস্। মনে রাখিস্, এই লেখাপড়ার জন্যই তোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আর এই দুঃখিনী মাকে ভুলে থাকিস না, মাঝে-মাঝে চিঠিপত্র দিস্।"

দুইদিন মাতার নিকট থাকিয়া আকাল ভৃত্যসহ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। বিধবার শূন্য গৃহ আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

(৫)

আকাল কলিকাতায় যাইবার প্রায় এক মাস পরে মাকে একখানা পত্র দিয়াছিল। তাহার পর তিনচারিমাস কাটিয়া গেল, কিন্তু আকালের মা আর পুত্রের কোন পত্র পাইল না। ডাক-পিয়ন পাড়ায় আসিলেই আকালের মা তাহার পাছু-পাছু ছুটিত, কিন্তু পিয়নের মুখে 'পত্র নাই'

শুনিলেই ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত। ঘরে আসিয়া সে ক্ষুব্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভাবিত, "পড়া-শোনার জন্য আকাল চিঠি লিখ্‌তে সময় পায় না। তাই হোক, সে পড়া শোনাই করুক, আমার চিঠিতে দরকার নাই।" কিন্তু পিয়নকে দেখিলেই সে তাহার পশ্চাতে না ছুটিয়া থাকিতে পারিত না।

পত্র না আসিলেও আকালের মা মাঝে-মাঝে পুত্রের সংবাদ পাইত। হাজারিপাড়ার দুই চারিজন চাষী গ্রামের হাটে তরকারী বেচিতে আসিত। তাহারা সময়ে সময়ে আসিয়া আকালের মার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিত, এবং বৃন্দাবন বাবুর জামাই যে ভাল আছে, এ সংবাদ শুনাইয়া যাইত। সম্মুখে গ্রীষ্মের ছুটি। সে ছুটিতে আকাল নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে।

আকালের মা এখন আর গাইএর সব দুধটুকু বেচিত না, কতকটা ঘরে রাখিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিত, আকাল আসিলে খাইবে। গাছের নারিকেল সব না বেচিয়া কয়েকটা তুলিয়া রাখিল; আকাল নারিকেল-নাড়ু খাইতে ভালবাসে! একটা ডাঙ্গা জমিতে কিছু সরু ধান হইয়াছিল; আকালের মা চাউল প্রস্তুত করিয়া সে সরু চাউলগুলি পুত্রের জন্য তুলিয়া রাখিল।

গ্রীষ্মের বন্ধ আসিল। স্কুলের লম্বা ছুটি পাইয়া ছেলের দল পাড়া যেন মাথায় করিয়া তুলিল। আকালের মা পুত্রের আগমন-প্রত্যাশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল। চাষীদের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের জামাই বাবু আসিয়াছে। কিন্তু আকালের মা ছেলের দেখা পাইল না।

ছুটি ফুরাইল। পাড়ার ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। ভাঁড়ের ঘিয়ে দুর্গন্ধ হইল, নারিকেল পচিয়া গেল, চাউলে পোকা ধরিল, কিন্তু আকাল আসিল না। আকালের মা পচা জিনিসগুলা ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন জিনিস সংগ্রহে মনোযোগ দিল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর পূজার ছুটি। আকালের মা পূজার ছুটির আশায় দিন গণিতে লাগিল।

বর্ষা গেল, শরৎ আসিল; পূজাও নিকট হইল। চারিদিকে ঢাকে কাঠি পড়িল। প্রবাসীরা দলে-দলে আসিয়া গ্রাম জাঁকাইয়া তুলিল। ছেলেরা নূতন কাপড়, নূতন জামা, জুতা পরিয়া বাহির হইল। আকালের মা উদ্বেল-হৃদয়ে পথের দিকে চাহিয়া প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতে লাগিল; কিন্তু আকাল আসিল না। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিজয়া কাটিয়া গেল, আকালের মা ছেলের দেখা পাইল না।

আকালের মা আর থাকিতে পারিল না। ভাবিল, "আকাল নাই আসুক, আমিই তাহাকে দেখিতে যাইব। কুটুমবাড়ী, তাতে কি? ছেলের চেয়ে কি মান লজ্জার ভয় বেশী?"

ক্ষার-মাটি কিনিয়া আনিয়া আকালের মা আপনার ময়লা কাপড়খানি কাচিয়া লইল। পরদিন সেই কাপড়খানি পরিয়া, ঘরে চাবী দিয়া হাজারিপাড়া অভিমুখে যাত্রা করিল।

(৬)

হাজারিপাড়া প্রায় চারি ক্রোশ দূরে। আকালের মা আহারাদি করিয়া বাহির হইয়াছিল, সুতরাং সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বেই সে হাজারিপাড়ায় পৌঁছিল, এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বৃন্দাবন সামন্তের বাটীতে উপস্থিত হইল। বাড়ী দেখিয়াই তাহার তাক্‌ লাগিয়া গেল। এত বড় দোতলা পাকা বাড়ী, আর তাহার ছেলে এই বাড়ীর জামাই, ভবিষ্যতে ইহার মালিক! পুত্রের গৌরবে বৃদ্ধার হৃদয় গৌরবপূর্ণ হইয়া উঠিল; সে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই এক মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?" বৃদ্ধা বলিল, "আমি আকালের মা।"

প্রশ্নকর্ত্রী বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে এক প্রৌঢ়া বসিয়া ছিল; সে একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "কে লা ক্ষীরি?" ক্ষীরী বা ক্ষীরোদা মুখ ফিরাইয়া বিস্ময়সূচক স্বরে বলিল, "বলে, জামাই বাবুর মা!" প্রৌঢ়া বলিল, "দূর!" তখন আরও দুই তিনজন যুবতী, বালিকা ছুটিয়া আসিল; এবং এই সমাগতা বৃদ্ধা কে, তাহা জানিবার জন্য এমন একটা অবজ্ঞা-সূচক ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল যে, আকালের মা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহার ন্যায় দীনা বৃদ্ধা যে জামাই-বাবুর মা, ইহার অপেক্ষা সেই রমণীমণ্ডলীর নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় যেন আর কিছুই নাই।

সহসা অদূরে জুতার শব্দ শুনিয়া আকালের মা সেই দিকে চাহিল। দেখিল, আকাল সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিতেছে। তাহার পরণে কালাপেড়ে ধুতি, তাহার কোঁচা জুতার উপর লুটাইতেছে, গায়ে ফুলকাটা মিহি কাপড়ের পাঞ্জাবী, পায়ে পম্প-সু, মাথায় তেড়ী, হাতে রূপা-বাঁধান ছড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের জনতা দেখিয়া আকাল সেইদিকে ফিরিয়া চাহিল। চাহিতেই বৃদ্ধার চোখে তাহার চোখ পড়িল। আকাল অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করিয়া, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। বৃদ্ধার বুকে কে যেন সপাং করিয়া ছেলের হাতের সেই ছড়ির এক ঘা বসাইয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে পুত্রের বিরাগের কারণও বুঝিতে পারিল। এরূপ দীন বেশে ধনী কুটুম্বের বাড়ীতে আসিয়া সে যে ভাল কাজ করে নাই, এবং ইহাতে পুত্রের অবমাননা হইয়াছে, ইহাই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু যত দোষাই হউক, সে মা ত বটে! পুত্র হইয়া তাহাকে এতটা অবজ্ঞা করা কি ঠিক হইয়াছে?

অদূরোপবিষ্টা প্রৌঢ়াই গৃহিণী। তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে অভ্যাগতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা বাছা তুমি? কোথা হ'তে আসছ?"

আকালের মা ততক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে; সুতরাং গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আমার নাজিরপুরে বাড়ী গো, আকালের মা আমায় পাঠিয়েছে।" "ওঃ, জামাইবাবুর মা পাঠিয়েছেন? এস মা, ব'স।"

রোয়াকের উপর একখান আসন পাতিয়া দিলে আকালের মা গিয়া বসিল। সমাগত রমণীগণ তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই বাবুর মা ভাল আছেন?" ঈষৎ হাসিয়া আকালের মা বলিল, "হাঁ, ভাল আছে। অনেক দিন ছেলেকে দেখ্‌তে পায় নি, তাই—" "তাই তোমাকে দেখ্‌তে পাঠিয়েছে। আহা, মায়ের প্রাণ ত বটে।" দণ্ডায়মানা ক্ষীরোদা বলিল, "তায় ঐ একটি মাত্র ছেলে।" আকালের মা দণ্ডায়মানা যুবতী ও বালিকাগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে-করিতে বলিল, "আমাদের বৌ মা কোন্‌টী।" ক্ষীরোদা তাহাদের মধ্য হইতে এক কিশোরীকে দেখাইয়া বলিল, "এই যে।" কিশোরী লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল। আকালের মা বলিল, "দিব্যি মেয়ে। বেঁচে থাক, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্।" গৃহিণী বলিলেন, "তাই তোমরা আশীর্ব্বাদ কর মা, বেঁচে থাক্। আমারও ঐ এক শিবরাত্রির সল্‌তে।" এখন দলের মধ্য হইতে এক যুবতী বলিল, "হাঁ গা, তবে যে তুমি আগে বল্‌লে 'আমি আকালের মা'?" আকালের মা বলিল, "তামাসা ক'রে বলেছিলাম। আর তামাসাই বা এমন কি, ধরতে গেলে আমিও তোমাদের জামাইবাবুর মা। ও ত আমারই মাই খেয়ে আমারই হাতে মানুষ হয়েছে। হয় নয়, তোমাদের জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা কর।"

রাত্রিতে আকালের মা কিছু খাইল না, কেবল একঘটি জল খাইয়া দাবায় একটা মাদুর পাতিয়া পড়িয়া রহিল। ইতোমধ্যে পূর্ব্বোক্তা যুবতী আসিয়া তাহাকে কহিল, "হাঁ গো বাছা, তোমার কথাই ঠিক।" আকালের মা বলিল, "কি কথা মা?" যুবতী বলিল, "জামাই বাবুও বল্‌লে যে, তুমিই তাকে মানুষ করেছ বটে। ছেলেবেলায় তার মায়ের শক্ত ব্যায়াম হয়, সে সময়ে জামাই বাবু তোমার কোলেই মানুষ হয়েছে।" বৃদ্ধা মৃদু হাসিল। তাহার হাসির অন্তরালে যে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস লুক্কায়িত ছিল, যুবতী তাহা দেখিতে পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, উপরের ঘরে বসিয়া আকাল হার্ম্মোনিয়মের সুরের সহিত গলা মিশাইয়া গাহিতেছে,—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।

(৭)

পরদিন প্রত্যূষে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া আকালের মা যখন বাড়ীর বাহিরে আসিল, তখন আকাল সম্মুখের ছোট ফুলবাগানে পাদচারণা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া আকালের মা থমকিয়া দাঁড়াইল; তার পর পুত্রের দিকে স্নেহাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেশ সহজ সহাস্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা, ভাল আছ ত?" আকাল মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল, "হাঁ।" বৃদ্ধা বলিল, "তোমার মাকে কিছু বল্‌বার আছে?" আকাল শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার এদিকে-ওদিকে চাহিল। অদূরে মালী গাছে জল দিতে-দিতে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল। আকাল ধরা-গলায় বলিল, "ব'লো, ভাল আছি।" "হরি করুন সুখে থাক বাবা, রাজরাজেশ্বর হও!" স্নেহার্দ্র কণ্ঠে

কথাগুলি বলিয়া বৃদ্ধা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কিছু দূর গিয়া পাছু ফিরিয়া আর-একবার উৎসুক দৃষ্টিতে আকালের দিকে চাহিল। তার পর আর তাহাকে দেখা গেল না। আকাল একখানা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। তখনও যেন কে দূর-দূরান্তর হইতে স্নেহকাতর কণ্ঠে বলিতেছিল, "রাজরাজেশ্বর হও!"

হায়, কি ভীষণ প্রতিদান এই স্নেহভরা আশীর্ব্বাদ! তীব্র অবজ্ঞা, নিদারুণ অকৃতজ্ঞ! তা তাহার প্রতিদানে স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ—'সুখে থাক, রাজ্যেশ্বর হও!' স্নেহের ভিতর এ কি কঠোর শাস্তি! আশীর্ব্বাদের অন্তরালে এ কি ভীষণ বজ্রজ্বালা! সে জ্বালায় আকালের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল।

তাহার মনে পড়িল, সেই ক্ষুদ্র, ভগ্ন কুটীর; মনে পড়িল, স্নেহময়ী কল্যাণময়ী জননী; মনে পড়িল তাহার জন্য তাঁহার কঠোর সেই পরিশ্রম, অর্দ্ধাশন, অনশন! পুত্রের মঙ্গলের জন্য জননীর সেই মহান্ আত্মত্যাগ! মনে পড়িল, পুত্রের উন্নতির জন্য,সুখের কামনায় পরের হস্তে তাহাকে সমর্পণ,—মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব বলিদান! আর সেই পুত্র? তুচ্ছ মানের ভয়ে, লজ্জার খাতিরে, সেই দীনা, হীনা, কল্যাণময়ী জননীর প্রতি তীব্র অনাদর-প্রকাশ, তাহাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা, একবার মা বলিয়া ডাকিয়া দুঃখিনীর সকল দুঃখ-দৈন্য মুছাইয়া দিতেও অক্ষমতা! তথাপি ক্রোধ নাই, ক্ষোভ নাই, বিরাগ নাই। তথাপি সে হৃদয় হইতে তেমনই স্নেহধারা উচ্ছ্বলিত হইয়া পুত্রকে প্লাবিত করিয়া দিতে চায়; অকৃতজ্ঞ পুত্রের মুখের উপর তেমনই করুণাভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিতে পারে—"সুখে থাক বাবা, রাজ্যেশ্বর হও!" কি দুর্জ্জেয় মাতৃহৃদয়!

আকালের ইচ্ছা হইল, একবার চীৎকার ডাকে, "মা, মা, দুঃখিনী মা আমার!"

চাকর আসিয়া বলিল, "বাবু, চা তৈরী।"

আকাল উঠিয়া স্খলিত-পদে ভৃত্যের অনুগমন করিল।

সে দিন আকালের কিছুই ভাল লাগিল না। আহার, বেশভূষা, গাল্প-গল্প, সকলেই সে দিন অরুচি। যে দিকে যায়, সেই দিকেই যেন একখানা বিরাগের লেশশূন্য স্নেহভরা প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পায়। সংসারের সকল কথার মধ্যেই যেন শুনিতে পায়—'সুখে থাক বাবা।' আকালের বুকের ভিতর যেন সাগরের তরঙ্গ উঠিতে-পড়িতে লাগিল।

রাত্রিতে কালীতারা বলিল "দেখ না, তোমাদের দেশের সেই মেয়েটা সকালে যাবার সময় আমার মাথায় হাত দিয়ে মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল, দেখে আমার ভয় হ'ল। মাগী যেন—"

আকাল এমনই তীব্র দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল যে, সে আর কথা শেষ করিতে পারিল না।

পরদিন জামাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন হইল।

আকালের ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া গিয়া মাতার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে; কিন্তু সাহস হইল না। এত বড় অপরাধ করিয়া সে কোন্ মুখে মাতার সম্মুখে দাঁড়াইবে!

কিন্তু পাঁচ ছয় দিন এই অরুন্তুদ যাতনা ভোগ করিবার পর যখন তাহা ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল, এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহার চিকিৎসার জন্য সহর হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন, তখন আকাল একদিন সকালে উঠিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক-বস্ত্রে নাজিরপুর অভিমুখে ছুটিল।

(৮)

বেলা প্রায় প্রহরাতীত, তখন আকাল বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা, মা, মা!" উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া কোন উত্তর না পাইয়া আকাল আবার আকুলকণ্ঠে ডাকিল, "মা, মাগো!" বামুনপিসী তখন নদীতে স্নান করিয়া সে বাড়ীর সম্মুখ দিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি দরজায় মাথা গলাইয়া বলিলেন, "কে রে আকাল? কখন্ এলি?" আকাল হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "আমার মা, মা কোথায়?"

বামুনপিসী হাতের মালাছড়াটা গলায় ফেলিয়া বলিলেন, "তোর মা? সে যে বৃন্দাবনে গেছে?" "এঁ্যা" বলিয়া আকাল রৌদ্রতপ্ত উঠানের উপর বসিয়া পড়িল। বামুনপিসী তখন তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "কেন, হয়েছে কি? এই সে দিন ত সে তোকে দেখে ফিরে

এল। এসে তোর কতই সুখ্যাতি করলে। তুই খুব সুখে আছিস্, মানুষের মত মানুষ হয়েছিস্—ব'লে কত আহ্লাদ তার। তার পর বুড়ী বললে, 'মাঠাকুরুণ, আর এ বয়সে ঘুঁটে কুড়িয়ে মরি কেন ?' জমি-জায়গা-ভিটে সব সাড়ে-বাইশ গণ্ডা টাকায় হারু মোড়লকে বেচে বুড়ী পরশু সকালে বৃন্দাবনে চলে গেছে। কপাল ভাল, বুড়ীর কপাল ভাল।"

ক্ষমাহীন অপরাধের গুরু ভার হৃদয়ে চাপিয়া আকাল নীরবে বসিয়া রহিল। সে বুঝিল, কি জন্য মাতার স্বেচ্ছায় এই নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ!

চক্র

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ]

চাকা কবে, কে প্রথম আবিষ্কার করিল, জগতের ইতিহাসে সে কথা লেখা নাই। সেই আবিষ্কর্ত্তাকে কোন বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার উপাধি দিয়াছিল কি না বা কোন বৈজ্ঞানিক সভা অবৈতনিক সভ্য করিয়া লইয়াছিল কি না, মানব-সভ্যতার ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় সে কথা পাওয়া যায় না। চক্রপাণি যে দিন শঙ্খ-গদা-পদ্ম ফেলিয়া শুধু চক্রের সাহায্যে দানবদলন করিয়া চক্রের শক্তি ও মহিমা কীর্ত্তিত করিলেন, চক্রের সৃষ্টি তাহারও বহু পূর্ব্বে; কারণ, দ্বাপরের পূর্ব্বে ত্রেতাতেও চক্রনির্ম্মিত রথে রাবণ সীতাহরণ করিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক,রোমক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য যে কোন সভ্যজাতির সভ্যতার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সকল সভ্যতার মূলে ঐ চাকা। ট্রয়ের যুদ্ধের chariot হইতে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধের জেপেলিন, সবমেরিণ্ অবধি সর্ব্বত্রই চাকার অব্যাহত প্রভাব। Factoryর কলকারখানার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া এই চাকা পৃথিবীর কত জাতিকে যে তুলিয়া ধরিয়া ঐশ্বর্য্য-মদগর্ব্বে গর্ব্বিত করিতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? বিজ্ঞানের যে এত পসার,—চাকার সৃষ্টি না হইলে, আজ সেই বিজ্ঞান কোথায় দাঁড়াইত?

চাকা আবিষ্কৃত না হইলে এই পৃথিবীর দশাটা কি হইত, একবার ভাবিয়া দেখিলে হয়। চাকা না থাকিলে রথ চলিত না, সুতরাং ত্রেতায় রাম-রাবণের যুদ্ধ হইত না, দ্বাপরে অর্জ্জুন সারথির চাকরি যাইত; আর কলিতে পাপী মানব রথস্থ বামন দেখিয়া পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করিতে পারিত না। চাকা না থাকিলে যদিচ কাহারও 'বিঘোরে বিহারে এক্কা চড়িয়া' ধাক্কা খাইয়া অক্কা পাইবার যো হইত না, কিন্তু শনিবার ট্রেণে চাপিয়া অনেক হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী-যাত্রা বন্ধ হইত। Motor-car-ডাকাতি চাকার অভাবে বন্ধ হইত বটে, কিন্তু তাহা হইলে অনেক বায়স্কোপ কোম্পানি Motor car-elopement এর ছবি দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে পারিত না। চাকা না থাকিলে বর্দ্ধমানে গোরুরগাড়ী, মেলায় নাগরদোলা ও কবিতায় চক্রবাক্-চক্রবাকীর সাক্ষাৎ মিলিত না। ভাগ্যে সংসারে চাকা ছিল, তাই কেরাণী বাজার-খরচ-বাঁচান পয়সায় ট্রাম ভাড়া করিয়া আপিস যাতায়াত করিতে পারে, এবং বৃষ্টির দিন ট্রাম বন্ধ হইলে তাহার বড়বাবু ছ্যাকড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে। চাকা ছিল, তাই বাঙ্গালী-ব্যারিষ্টার Week-end এ দার্জ্জিলিংটা ঘুরিয়া সোমবার Court করিতে পারে এবং পূজার আড়াই মাস P. & O কোম্পানীর ষ্টীমারে চড়িয়া বিলাতটা একবার পাড়ি দিয়া আসিতে পারে। চাকা না থাকিলে Statics এর Wheel & Axle এর আঁক কসিতে হইত না বটে, কিন্তু Fizeau Lightএর Velocity বাহির করিতে পারিত না, Savart Soundএর frequency গণিতে পারিত না এবং জগদীশচন্দ্রের resonant recorder আবিষ্কৃত হইত না। চাকার কল্যাণে আমরা শৈশবে Perambulator, যৌবনে bi-cycle এবং বার্দ্ধক্যে rickshaw চড়িয়া মানব-জনমের সফলতা লাভ করি।

চাকা যদি বলিয়া বসে, কাল থেকে আর আমি চলিব

না, তাহা হইলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়ায়, একবার দেখা যাউক।

সকাল-বেলা উঠিয়া দেখিব, ঘড়িটি বন্ধ হইয়া আছে, কলে জল নাই—টালার Pumping Station বন্ধ। Spinning mill, চরকা সব অচল, মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়ার আর উপায় নাই। ছাপাখানা সব পাততাড়ি গুটাইয়াছে, সুতরাং কাপড় ছাড়িয়া তালপাতার পুঁথি ভিন্ন পড়িবার আর কিছু নাই। কুমারের চাক বন্ধ—উনানে হাঁড়ি চড়িবে না। কলে তৈয়ারি জিনিষের কারবারীরা গণেশ উল্টাইয়াছে। হাওড়া, শিয়ালদহ ষ্টেশনে চামচিকার বাসা হইয়াছে, Hackney Carriage Stand এ গাড়োয়ানের কচকচি নাই। Steamer সব জেটিতে কাৎ হইয়া আছে। থাকিবার মধ্যে আছে উড়ে বেহারার পাল্কি, মহাজনের ভড়, আর পাড়াগাঁয়ে medical practitioner-দিগের জন্য ডুলি। সুবিধার মধ্যে স্ক্যাভেঞ্জার গাড়ীর ছ্যাড়ছ্যাড়ানিতে ভোরের ঘুমটা ভাঙ্গিবে না এবং মোটর-গাড়ী চাপা পড়িয়া প্রাণ, ও গরুর গাড়ী চাপা পড়িয়া জরিমানা দেওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিবে না, বায়স্কোপের film ঘূরিবে না, গ্রামোফোনে রোহিণীর 'মেরো না, মেরো না' শোনা যাইবে না, দেওয়ালিতে চরকি বিক্রয় হইবে না, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক ঘুরিবে না এবং বড়দিনে গড়ের মাঠে Rinkএ Skating দেখা দিবে না।

চাকা ছিল তাই তার দেখাদেখি আমাদের 'দুঃখানি চ সুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে' এবং 'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ'।

চক্রের মান বাড়াইবার জন্য সূর্য্য চক্রবন্ধু এবং

ভরতার্জ্জুন মান্ধাতৃ ভগীরথ যুধিষ্ঠিরাঃ।
সগর নহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ॥

চক্রের সৃষ্টি না হইলে অভিমন্যু চক্রব্যূহের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইত না, কাশীর চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য লোপ পাইত, কুলাচার্য্যের রাশিচক্র প্রস্তুত করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইত, তান্ত্রিকের ভৈরবীচক্রের সাধনা হইত না, মহাজন চক্রবৃদ্ধি হারে খাতকের রক্তশোষণ করিতে পারিত না, এবং সংসারচক্রে কুচক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া নভেলী নায়কের এত নাস্তানবুদ হইত না।

অধিক আর কি বলিব, এই চক্রেরই দৌলতে মাদৃশ ব্রাহ্মণের বরাতে মাঝে-মাঝে গোল-গোল চক্রাকার জুটিয়া যায়। অতএব চক্রের জয় হৌক, জয় হৌক, জয় হৌক!

বঙ্কিম-প্রতিভা

[অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, এম-এ]

(৩)

জগতে কতকগুলি এমন সদ্‌ভাষিত আছে—যাহা মনুষ্য-সমাজের গঠন হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত শোনা গিয়াছে; তথাপি সেগুলি পুরাতন হয় নাই- সেগুলির মূল্য কমিয়া যায় নাই। মুসা-প্রচারিত দশ আজ্ঞার কথা স্মরণ করুন। রোমীয় Twelve Tablesএর কথা স্মরণ করুন। অশোকের শিলালিপির শিক্ষার কথা ভাবুন। আসল কথা হইতেছে ইহাই যে, সন্নীতির, সৎকার্য্যের ও সচ্চরিত্রের বিষয়ে জ্ঞাতব্য নূতন তত্ত্ব খুব অল্পই আছে; কিন্তু অনুষ্ঠেয় বিষয় বহু—সদা-নূতন। সত্য, ন্যায় ও দয়া—ইহাদের গৌরব বুঝিতে হইলে, অতীতের স্কন্ধে ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু সত্য, ন্যায় ও দয়া আমাদের চিন্তা ও আচারে প্রকাশ করিতে হইলে সাধনা আবশ্যক। সে সাধনার আবশ্যকতা চির-বর্দ্ধমান। প্রতি মানবশিশুর জন্মের সহিত তাহাদের দাবী নূতন আকার ধারণ করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলন-তত্ত্বে ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় এই জাতীয় হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রথিত সত্য-সকলেরই অবতারণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব তিনি বিশেষ কিছু যদি না দিয়া থাকেন, তাহাতে কালের অনুপযোগিতা সপ্রমাণ হয় না।

কেন না, এ সব সনাতন্ তত্ত্বের বিপর্য্যয়বাদেই নূতনত্ব পাওয়া যায়—সমর্থনে নহে। আমাদের কর্ত্তব্যের ও সাধ্যের সীমা বর্ণনা করিতে ইংরাজীর তর্জ্জমা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আমরা শুধু পুরাতন মদ্যকে নূতন বোতলে পূরিতে পারি—পুরাতন প্রতিমার নূতন সাজ পরাইতে পারি। এ সব বিষয়ে আমাদের সাধ্য এই সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না; এবং এই পাত্রান্তরিত করা বা বেশ-পরিবর্ত্তন করার নিদর্শন বঙ্কিমে দুষ্প্রাপ্য নহে। Herbert Spencerএর মানসিক সাধনার ত্রয়ী বিভাগ ও Auguste Comteএর প্রত্যক্ষবাদ ও Goetheএর Culture মন্ত্র বঙ্কিম-চিত্তের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পক্ষে অনুশীলন-তত্ত্ব ও গীতা-ব্যাখ্যা উভয়েই সাক্ষ্য দিতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধেকে Spencer ও Comteএর প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত প্রণালীতে মানসিক সাধনার যে গতি ও ক্রম বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা উপস্থিত ক্ষণের উপযুক্ত কি না? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে দার্শনিকই সমর্থ—অন্যে নহে। আবার "নাসৌ নিমুর্যস্য মতং ন ভিন্নং" এ কথা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ খাটে—অন্য কোন বিষয়ে তত নহে। "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ।" সেই তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শন-শাস্ত্র প্রতি যুগে যে নব-নব আকার ধরিবে, তাহা নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ। তথাপি দেখি যে, দার্শনিকগণ মরিয়াও অমর। তাঁহারা যে সকল সজীব মত প্রচার করেন, তাহা একেবারে বিপর্য্যস্ত হয় না। তাঁহাদের আড়ম্বর চলিয়া যায়—ডাল-পালা ঝড়িয়া পড়ে; কিন্তু তাঁহাদের সারভূত অংশ বিশ্বের আধ্যাত্মিক প্রবাহের উপর চিরদিন ভাসমান থাকে। এই হিসাবে Goethe, Comte এবং Spencer যে-যে ভাবের অবতাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাহাতে যদি সত্যের অংশ থাকে, তাহা হইলে সেই সকল ভাব ঐ তিন মহাপুরুষের নাম সঙ্গে লইয়া চিরন্তন হইয়া যাইবে। Comte বিশ্বমানব-পূজা, বিশ্বমানব-সংযোগ ও সেবার যে ভাব প্রচার করিয়াছেন, তাহা মানবাত্মার চিত্তফলকে চিরতরে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্য সভ্যতার—বাস্তব সভ্যতার—ইহাই উচ্চতম আদর্শ। নিরীশ্বরবাদী হইলেও Comteই জগতকে ঐ আদর্শের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। সে দীক্ষা আমরা পরিহার করিতে পারি নাই—পারিব বলিয়াও মনে হয় না। আবার ঐরূপ Spencerএর দানও এক অপূর্ব্ব ভাবসম্পদ্, যাহাকে আমরা Evolution বা বিবর্ত্ত বা ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তিবাদ বলিয়া জানি। এই মহার্ঘ দান আজিও এ জগতের ভাবের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে। সমাজতত্ব, মনস্তত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান সকল বিষয়েই এই বিবর্ত্তনবাদ প্রযুক্ত হইয়াছে—এবং প্রযুক্ত হইয়া মানুষের দৃষ্টিকে আরও দূরগামী করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাবরাজ্যের এই দুই মহাজনকে বঙ্গীয় পাঠকের নিকট সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মত সরল ও সতেজ ভাষার অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভব হইত না।

তার পর সেই নিরুপম রচনা—"কমলাকান্তের দপ্তর।" জগতের কোন্ সাহিত্যে ইহার তুলনা পাওয়া যায়, তাহা জানি না। হাস্য-করুণার এমন হরগৌরী মূর্ত্তি আর কোথায় দেখিয়াছি, তাহা মনে পড়ে না। ইংরাজীতে Charles Lambএর রচনায় এই রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে এই ভক্তিরসাপ্লুততা, ভাব-গদ্গদতা নাই। কমলাকান্ত বাহিরে উদাসীন; কিন্তু তাঁহার প্রাণটী বর্ষাকালের বাঙ্গালার স্রোতস্বিনীর মত ভাবের প্রবাহে কূলে-কূলে পরিপূর্ণ। তাঁহার কথাবার্ত্তায় শ্লেষ আছে, কিন্তু বিদ্বেষ নাই—রসিকতা আছে, কিন্তু ভাঁড়ামি নাই—কৌতুক আছে, কিন্তু কলঙ্কলেপ নাই। মানুষের মনে কত হীনতা, কত ক্ষুদ্রতা, কত নির্বুদ্ধিতা, কত ভণ্ডতা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা নিপুণ বৈদ্যের মত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু দোষ দেখিলেও তাহাতে নির্ম্মম বিদ্রূপের বাণ ক্ষেপণ করেন নাই। সমস্ত রচনার ভিতর হইতে মানুষের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাল হউক, মন্দ হউক,—দৃপ্ত হউক, অধঃপতিত হউক, তথাপি মানুষ যে মানুষ, মানুষই যে মানুষের একমাত্র সহায় ও সঙ্গী, এ কথা তিনি আমাদের ভুলিতে দেন নাই। এই সদিচ্ছা ও সমানুভূতির ব্যাপকতা আছে বলিয়া, কমলা-কান্তের দপ্তর এত মধুর, এত মর্ম্মস্পর্শী। পরিহাস আছে, কৌতুক আছে, দোষদর্শন আছে;—কিন্তু তাহারই সঙ্গে যাহা সৎ, যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা উদার, যাহা উন্নত, তাহার দিকে প্রতি প্রবন্ধেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ আছে। এই যে ভাব-প্রবণতা, এই যে idealism, এই যে মর্ত্ত্যের হীন পরিবেশ

ছাড়িয়া আনন্দ ও ব্যাকুলতার রাজ্যে উপস্থিত হইবার, পাখা মেলিয়া উড়িবার চেষ্টা—ইহাই এই অপূর্ব্ব দপ্তরের বিশেষত্ব। "কে গায় ওই" প্রবন্ধের শেষে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই বুঝাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন,"সংসারে এক সঙ্গীত আছে, সংসার-রসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত কি আর শুনিব না? সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই—সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্যহৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।"

এই দপ্তরের কেন্দ্রস্বরূপ কমলাকান্ত-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক কল্পনা। এরূপ চরিত্র বাঙ্গালাতেই সম্ভবে—অন্য কোথাও নহে। কমলাকান্ত উদাসীন—কমলাকান্ত সংসারে নির্লিপ্ত। আফিমের নেশাকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে স্বপ্নের ও খেয়ালের ছবিতে পরিপূর্ণ করিয়া সংসারের দিন কয়টা কাটাইয়া দেওয়াই তাহার সঙ্কল্প। সংসারের অভিজ্ঞতার কিছুই তাহার অভাব ঘটে নাই; কিন্তু সংসারের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, লাভ ক্ষতি, জয়-পরাজয়ের ঘূর্ণীপাকে তাহাকে টানিতে পারে নাই। সংসার-রঙ্গমঞ্চে কমলাকান্ত দর্শক—অভিনেতা নহে। কমলাকান্ত দেখে, আর ভাবে—ভাবে, আর স্বপ্ন দেখে। জগতের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সে বিষণ্ণ হইয়াছে—ব্যথিত হইয়াছে—সন্তপ্ত হইয়াছে; সুখ যে অচিরস্থায়ী, সৌভাগ্য যে চঞ্চল, জীবন যে নশ্বর, বন্ধুত্ব যে স্বার্থময়, এ সকলই সে বুঝিয়াছে। তবু হাল ছাড়ে নাই, মানুষকে ঘৃণা করে নাই—বিরক্তের মত সমাজকে দূর-ছাই বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। সে বুঝিয়াছে—মনুষ্য-হৃদয়ে শুধু আত্মাদর আছে—তবু নিজের জন্য সে মনুষ্যপ্রীতি-কেই বরণ করিয়াছে। ভীষ্মদেবের মত অনেকেই তাহাকে পাগল বলিবেন। কিন্তু এইরূপ পাগলামিই জগতের সার—এইরকম কুর্কেটা পাগল মিলিয়াই যুগে-যুগে সমাজকে সংহত রাখিয়াছে, স্বার্থের সংঘর্ষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে দেয় নাই। খোসনবীশ বলিতেছেন—"এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।" কমলাকান্ত যে বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে আর ফিরে নাই—তাহা আমরা জানি; আর আমাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া মানি। কমলা-কান্তের পর "পঞ্চানন্দ" হইয়াছে, গোবর-গণেশ হইয়াছে—কিন্তু তেমনটি আর হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য লইয়া, ভাবরাশি লইয়া, তাঁহার উপন্যাসগুলির শিক্ষা লইয়া মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহার ভাষা, তাঁহার রীতি লইয়া সহৃদয়-সমাজে ঐকমত্য অবশ্যম্ভাবী। এ ভাষার আর তুলনা নাই। এ রীতির আর দ্বিতীয় নাই। হয় ত সবুজপত্র-সম্পাদক মহাশয় বলিবেন—ইহা সাধুভাষা নহে—ইহা চলিত ভাষা। নাম লইয়া আমরা এ স্থলে বিরোধ করিতে চাহি না। আমরা বলি, সাধুই হউক, আর চলিতই হউক—ইহাই আদর্শ বঙ্গভাষা, আদর্শ লিখন-রীতি। রাজার নামাঙ্কিত রজত-খণ্ডের মত বাঙ্গালা-সাহিত্যের রাজ্যে এই রীতিই চলিবে—অন্য মুদ্রা সব মেকী,—হয় খাদে ভরা, না হয় ওজনে ভারি ও আওয়াজে কটু। এ স্থলে সাহিত্যের অবলম্বনীয় ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কি বলিয়াছেন, তাহা অবধান করা উচিত। কারণ, তাঁহার এই মন্তব্য শুধু পরোপদেশে পাণ্ডিত্য নহে—এই মন্তব্যকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি নিজ রচনাকে সতত গঠিত ও সংযত করিতেন। "অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন,—সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ-গৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। * * প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও—কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃত-বহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য্য হয়,

তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে, তাহাতেও আপত্তি নাই; নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সী, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে,—অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনায় উৎকৃষ্ট রীতি।" আজ বাঙ্গলা ভাষায় অনেকে "বেওয়ারিশ মাল," "সরকারি ময়দা" হিসাবে যথেষ্ট মর্দ্দন, নিষ্পেষণ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন। অকারণে অপ্রয়োজনে, "বাক্ বশ্যেবানুবর্ত্ততে" এই অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব রীতির উদ্ভাবন করিয়া, ভাষা-জননীকে উন্নতির রেলপথে তুলিয়া দিলাম—এরূপ স্পর্দ্ধা করিতেছেন। দেশবাসী জনসাধারণ এই সকল অপূর্ব্ব শিল্পিগণের কৃতিত্ব দেখিয়া প্রায় স্থলেই "মধুসূদন" স্মরণ করিতে বাধ্য হয়। কারণ, তাহারা দেখিতেছে, এ ভাষায় তাহারা কথা কহে না—এ ভাবে তাহারা চিন্তা করে না। তাহাদিগের পরিচিত কতকগুলি শব্দ লইয়া, সেই সকল শব্দে নূতন তাৎপর্য্যের আরোপ করিয়া, এবং অশ্রুতপূর্ব্ব অন্যান্য শব্দ ও সংযোজন-প্রণালীর সাহায্যে এক অদ্ভুত প্রহেলিকা উপস্থিত করিয়া আধুনিক সাহিত্যিকগণ শুধু তাহাদিগকে বিড়ম্বিত করেন। ইহা হইতে প্রকৃত "চলতি" ভাষার আকাশ-পাতাল প্রভেদ—চল্‌তি ভাষা নাম লইলেও ইহা একান্ত অচল—'প্রতি গ্রন্থিতে বাতরোগে আক্রান্তের' মত পঙ্গু। বাঙ্গালার হাটে, বাজারে, গোষ্ঠিতে, উৎসবে, সমাজে, সংকীর্ত্তনে যে ভাষা চলে, ইহা সে ভাষা নহে। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিগণের বঙ্গানুবাদ শিখিবার ক্লাসে নির্ম্মিত হইতে পারে—কিন্তু যে "জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ"—তাহার মধ্যে এ সামগ্রী অতি দুষ্প্রাপ্য, অতএব অগ্রাহ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ "চল্‌তি" ভাষার প্রবর্ত্তন করেন নাই—অনুমোদনও করিতেন না। ইংরাজি সাহিত্যে Macaulayর রীতিতে যেরূপ প্রবাহ, যেরূপ স্বচ্ছতা দেখিতে পাওয়া যায়,বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিম-রীতিতেও সেইরূপ। মেঘদূতের মত ইহাও কামচর—সকল রসের, সকল বিষয়ের, সকল ভাবের উপযোগী হইতে পারে। এ ভাষার যথাযথ বিশ্লেষণ করতঃ যদি বিবরণ দিতে হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র এক প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। এ ভাষা আতঙ্কে কণ্টকিত করে, ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত করে। কভু বা চন্দ্রিকোজ্জ্বল বাসন্তী নিশীথে কোকিলের কুহুরবের মত হৃদয়কে নবীন করিয়া সুখ-স্বপ্নে বিভোর করিয়া ফেলে—কভু বা আবার সকল বন্ধন-বিহীন জীবন্মুক্ত বৈরাগীর উদাসীন বাণীর মত গৃহহারা করিয়া আমাদিগের প্রাণকে পরপারের পথিকের মত উপেক্ষার মন্ত্রে মুগ্ধ করে। এ ভাষার বলে সকল সুখের আধার, শান্তির তীর্থক্ষেত্র, বাঙ্গালার গৃহস্থ-মন্দির চক্ষুর সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। বীরত্বের দর্প, স্বদেশ-প্রেমিকের আত্মত্যাগ, রাজনীতিকুশলের কূটচক্র, যোদ্ধার নির্ভীক চাতুরী—এ সমস্তকেও এই ভাষা প্রতিবিম্বিত করিয়াছে। বাসরের পরিহাস-কথা, মৃতপ্রায়ের নিরাশ কণ্ঠস্বর, আর্ত্তের ক্রন্দন, পদদলিত নির্য্যাতিতের সর্ব্বনাশকর সাহস, রাজপুরুষের লোকাতিশয় প্রভুত্ব, ভাবের পাগলের গদ্গদতা—কিছুতেই এ ভাষার দৈন্য প্রমাণ করিতে পারে নাই। পরিশেষে দর্শনশাস্ত্রের ও ধর্ম্মতত্ত্বের নীরস ব্যাখ্যাও ইহা বাকী রাখে নাই। পরন্তু সরলতা ও স্পষ্টতা গুণে অতি জটিল প্রতিপাদ্যকেও সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। এমন রীতির উদ্ভাবন বাণীর বরপুত্রে, জাতীয় প্রতিভার অনন্যসাধারণ উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি একা বঙ্কিমচন্দ্রেই সম্ভব হইয়াছিল। আধুনিক রীতিসকলে নূতনত্ব থাকিতে পারে, বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজনের উপাদেয়ত্ব নাই। এমন প্রসন্নতা নাই—এমন অপ্রতিহত পরিস্ফুরণ নাই। ইহা ছাড়া, বঙ্কিম-রীতির আর-একটী বিশেষত্ব আছে—যাহা ক্রমশঃ দুর্ল্লভ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে কারণে অনেক সময়ে কালিদাসকে Shakespeareএর উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়—সেই কারণে বঙ্কিমের রচনা-প্রণালীরও এত খ্যাতি, এত চমৎকারিত্ব। কালিদাসের মত বঙ্কিমচন্দ্র কথার মাত্রা সবিশেষ বুঝিতেন। পদের প্রয়োগে যে একটি অনুপাত রক্ষা করা কর্ত্তব্য—একটি সুষমার খাতির লক্ষ্য করা উচিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অদ্বিতীয় নিদর্শন। সে মাত্রা, সে সুষমা-রক্ষার নিয়ম সূত্রাকারে নিবদ্ধ করা কঠিন। যিনি বাক্‌শিল্পীর সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই বুঝিতে পারেন—মিতভাষিত্বের কি গুণ। বঙ্কিম-

চন্দ্রের এ বিষয়ে অসাধারণ তীক্ষ্ণ অনুভূতি ছিল। রস-সৃষ্টির জন্য—অথবা বর্ণনার স্বাভাবিকতার জন্য, কতটুকু বলা প্রয়োজন—কোথায় বা নিরস্ত হওয়া উচিত—কতটুকু পর্য্যাপ্ত, কিসের অধিক বাহুল্য ও বিরক্তিকর—এ বিষয়ে তাঁহার সুনিপুণ দৃষ্টি ছিল। তৃপ্তির মাত্রা ছাড়িয়া কখন্ আমরা তিক্ততার মাঝে আসিয়া পৌছাই—সেই সূক্ষ্ম সীমারেখা সততই যেন তাঁহার মানস-নয়নপথে ভাসিত। তাই বঙ্কিম-সাহিত্যের সৌন্দর্য্য অধিকবার পড়িলেও অন্তর্হিত হয় না। বঙ্কিমের ভাষা গদ্য হইলেও, সর্ব্বত্রই পদ্যের মত আবৃত্তির উপযোগী—উচ্চারণে সুমধুর। আজকালকার বাঙ্গালা গদ্য কণ্টকাকীর্ণ বন্য পথের মত পদে-পদে গতিকে ব্যাহত করে। এ হিসাবেও বঙ্কিমচন্দ্র এখনও বহুদিন আমাদিগের পথ-প্রদর্শক ও উপদেশক হইবার উপযুক্ত। রচনা শিল্প-শিক্ষার জন্য বর্ত্তমান লেখকগণের তাঁহার পদতলে ভক্তিভরে—একবার নহে, সহস্রবার—সমাসীন হওয়া উচিত।

পরিশেষে তাই পুনরায় মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোনো হিসাবেই প্রাচীন হইয়া যান নাই। এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তাঁহার গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচার ও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান আদর। এই মহনীয় সম্পদের অধিকারী হইয়া বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও হৃদয় যে কি পরিমাণে হৃষ্ট, পুষ্ট ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা ও পরিমাপ করিতে হইলে আমার অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিমতী কল্পনার প্রয়োজন। বঙ্গমাতার সহিত বঙ্গমাতার অকৃত্রিম সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-প্রতিমা আজ বাঙ্গালীর গৃহে-গৃহে, বাহ্য ও অন্তরস্থ মন্দিরে—পূজিত হইতেছে। যাহার মুখে প্রথম শৈশবে বাঙ্গালী বুলি ফুটিয়াছে—সেই এ পূজার অধিকারী। এ পূজার আবশ্যক—শুধু জাতীয় হৃদয়তা—বাঙ্গালীর জাতীয় রসভাব, আশা-ভরসা, বাসনা ও চিন্তায় আত্মবিসর্জ্জন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শিখ-গুরুদিগের ইতিহাস

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরী]

তৃতীয় গুরু "অমরদাস"

১৫০৯—১৫৭৪

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুরু অঙ্গদ পরলোকগত হইলে তাঁহার প্রিয় শিষ্য অমরদাস গুরুর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে জাতিগত বন্ধন ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিখদিগের গুরুপদ ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া যায় না। "মামলায় চলে না দাওয়া, ওয়ারিশ-সূত্রে যায় না পাওয়া।" গুরু নিয়োগের ক্ষমতা গুরুরই অধিকার। তিনি মৃত্যুকালে যাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাঁহাকেই শিখদিগের নেতৃ-পদে অভিষিক্ত করিয়া যান। সুতরাং স্বীয় চরিত্রবলে যিনি গুরুর প্রিয়পাত্র হইতে পারেন, তিনিই এই অভিলষিত পদের অধিকারী হন। গুরু অঙ্গদ এইরূপেই গুরুপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে পরবর্ত্তী গুরু-নির্ব্বাচনও এই নিয়মেই হইয়াছিল। নৈতিক সাহস ও গুরুভক্তির প্রভাবেই অমরদাস অঙ্গদের প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন।

১৫০৯ খৃঃ অব্দে অমৃতসর জেলার অধীন ভাস্করী-গ্রামে অমরদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বল্ল ছত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতা তাদৃশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। অমরদাস বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন করেন। অর্থাভাববশতঃ তিনি সামান্য সামান্য পণ্য-দ্রব্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া বিক্রয় করিতেন। তাদৃশ মহাত্মার শৈশবকাল এইভাবেই কাটিয়াছিল। নিয়তির গতিতে তিনি কালে শিখধর্ম্মের একজন পরিচালক হইলেন।

অল্প বয়স হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মের বীজ প্রোথিত হইয়াছিল। তিনি ফকিরগণের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসিতেন। এই সূত্রে তিনি অঙ্গদের জন্মভূমি খাড়ুর গ্রামে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ

করেন। তখন হইতেই তিনি প্রায়ই সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। গুরুর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। গুরুর জন্য নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না, অকাতরে প্রাণপণ যত্নে গুরুর সেবা করিতেন। নিজের আহারের নিমিত্ত এক পয়সাও গুরুর নিকট হইতে লইতেন না। তিনি লবণ ও তৈলের ব্যবসায় করিতেন। তাহা হইতে যাহা লাভ হইত, তাহাতেই তাঁহার ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হইত। তিনি গুরুর স্নানের জন্য প্রত্যহ খাদুর হইতে দুইক্রোশ দূরবর্ত্তী নদী হইতে জল আনিতে যাইতেন। কিন্তু কখনও গুরু-গৃহের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। কথিত আছে, একদিন রাত্রি ঘন-তমসাবৃত ছিল; তদুপরি ভীষণ ঝড়, ক্ষণে-ক্ষণে চপলার চকিত আলোক ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। ঈদৃশ নিশাতেও অমরদাস গুরুর জন্য নদীতে জল আনিতে গেলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন-কালে একটি গভীর খাদে পড়িয়া যান। বহুকষ্টে কোনরূপে উঠিয়া তিনি পুনরায় নদীগর্ভ হইতে জল লইয়া গুরু-গৃহে গেলেন। কিন্তু তাঁহার এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে একটি কথাও গুরুর গোচর করিলেন না। পরদিন গুরু অঙ্গদ লোকমুখে এই কথা শুনিয়া অমরদাসের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে গুরু পদে মনোনীত করিলেন। অমরদাস তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাঁচটি পয়সা ও একটি নারিকেল উপঢৌকন-স্বরূপ প্রদান করিলেন।

অঙ্গদের মৃত্যুর পর অমরদাস গুইনডোয়ালে তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিলেন। তিনি অসীম উদ্যমের সহিত শিখধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি অমায়িক এবং মধুর ছিল। তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মোপদেশে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক শিখধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি অতি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। কবিতাগুলির প্রায় অধিকাংশই "গ্রন্থে" দেখিতে পাওয়া যায়। নানকের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীচাঁদ বর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "উদাসী" শিখদিগকে তিনি সংসার-নিরত শিখগণ হইতে পৃথক করেন। তিনি সতী-দাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিতেন, যে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পর ধীর-ভাবে সংসারের সমস্ত প্রলোভন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সতী। শুধু আত্মদাহ করিলেই সতী হওয়া যায় না। অনেক কাপুরুষও প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু ভক্তি দিতে পারে কয় জন? তিনি বিধবা-বিবাহের প্রশ্রয় দিতেন। বোধ হয় তাঁহার ন্যায় উদার-প্রকৃতিক ব্যক্তির সংসর্গে আসিয়া আকবর শাহ সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শিষ্যগণ-প্রদত্ত অর্থ দ্বারা অমরদাস বাওয়ালি নামক চুরাশি অবতরণিকা সমন্বিত একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন। এই সমস্ত অবতরণিকার স্থানে-স্থানে আতপ নিবারণার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে। শিখদিগের বিশ্বাস যে, এই চুরাশি অবতরণিকার প্রত্যেকটিতে স্নান করিলে পাপ দূরীভূত হয়, ও স্বর্গ-গমনের পথ প্রশস্ত হয়। অদ্যাপি এই স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়, এবং গুরুর সম্মানার্থ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লোকজন এইখানে সমবেত হয়। অমরদাস শিখ ধর্ম্মের প্রসারের জন্য তাঁহার দ্বাবিংশতি জন প্রিয় শিষ্যকে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অমরদাসের মোহন নামে একটি পুত্র ও মোহিনী নাম্নী একটি কন্যা ছিল। কন্যা পিতৃভক্তির জন্য অমরদাসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। রামদাস নামক জনৈক সোধি ছত্রী, জাট যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উত্তরকালে অমরদাস কন্যার ভক্তিশ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়া তদীয় স্বামী রামদাসকেই গুরুপদে মনোনীত করেন। ১৫৭৪ সালের ১৪ই মে অমরদাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। অমরদাসই শিখদিগের গুরুপদে বংশানুক্রমের প্রবর্ত্তন করেন।

চতুর্থ গুরু "রামদাস"

দরিদ্রের কুটীরেই অধিকাংশ মহানুভব ব্যক্তির জন্ম হয়। বিধির বিচিত্র লীলা। কোথায় কঠোর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বুদ্ধি বিকৃত হইবে, তাহা না হইয়া তাহাদের প্রতিভা জ্বালামুখীর ন্যায় উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতরই হইয়া থাকে। দারিদ্র্যই যেন তাহাদের সম্পদ, তাহাদের স্পর্শমণি। ইহার স্পর্শেই যেন তাহাদের প্রকৃতি উত্তরোত্তর বিবিধ মনুষ্যত্ব বিধায়ক গুণনিচয়ে বিভূষিত হইয়া উঠে। ইহা যেন সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত Lamarckএর বিবর্ত্তনবাদ নীতির (Evolution Theory) মত। ধনীর সুধা-ধবলিত গৃহে যে মহৎ লোকের জন্ম হয় না এমন নহে। তবে তথায় বিলাসিতার আবিল পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অতি অল্প লোকেই স্বীয় চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে। সেখানে পদে-পদে সুপথভ্রষ্ট হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। পৃথিবীর ইতিহাস সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিলে দরিদ্রের গৃহে মহৎ লোকের জন্মের বহু উদাহরণই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। গুরু রামদাস ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রামদাস পিতামাতার সহিত তাঁহাদের আদিনিবাস লাহোর নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গুইনডোয়ালে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। অর্থই জগতে সুখসাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করে, অভাব মোচন করে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের প্রীতি আলাপে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। অর্থ যেন পুষ্প-সুরভিবিশেষ। যতক্ষণ পুষ্পে গন্ধ থাকে, ততক্ষণই লোকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়; গন্ধ চলিয়া গেলে আর কেহই তাহার আদর করে না। মানুষের সঙ্গে অর্থেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। যতদিন অর্থ থাকে, ততদিন "আমি হিতৈষী," "আমি বন্ধু" বলিয়া লোকে চারিদিক হইতে মধুলোভী অলিকুলবৎ আসিয়া পরিবেষ্টন করে। তাহারা আসে অর্থলোভে। রামদাসের সেই অর্থই ছিল না। সুতরাং তাঁহার বন্ধুবান্ধবও ছিল না। ছিলেন শুধু ভগবান। রামদাস স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, সুদূর ভবিষ্যতে গুরু অমরদাসের জামাতৃ-সম্পর্কে আসিয়া তিনি শিখগুরুর সিংহাসন উদ্ভাসিত করিবেন। তিনি এক-জন সামান্য ব্যবসায়ীমাত্র ছিলেন। শ্রমজীবিগণকে আহার্য্যবিক্রয়ই তাঁহার উপজীব্য ছিল। পণ্য-বিক্রয়লব্ধ সামান্য লাভ হইতে তিনি পিতা

মাতার ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া অমরদাসের কন্যা ভেনী (মোহিনী) তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। রামদাস অতি গুরুভক্ত ছিলেন। অমরদাস তাঁহাকে শিখগুরু নির্ব্বাচিত করেন। রামদাস শান্তিপরায়ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। স্নিগ্ধ, বিমল জ্যোতিঃ-সম্পন্ন পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় মধুর প্রকৃতির লোককে সকলেই ভালবাসে। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত নিশীথে মরিলেও সুখ আছে। কবি বলিয়াছেন ;—

"হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;—আমিও পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।"

সেইরূপ মধুর-প্রকৃতির লোক যদি দরিদ্রও হয়, তাহা হইলেও সে সকলের আদরের পাত্র। রামদাসও এই গুণে সকলের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। রামদাসের আর একটী গুণ ছিল,—সেটী তাঁহার সরল ভাষায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিবার শক্তি। তাঁহার বক্তৃতা ও প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া বহু লোক শিখধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি অধিকাংশ সময়ই লেখাপড়ায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার লেখনীপ্রসূত বিষয়গুলি শিখদিগের "গ্রন্থ" উজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার সময়ে শিখ-ধর্ম্ম বিস্তৃত হওয়ায়, তিনি শিষ্যগণের স্বেচ্ছাদত্ত বহু অর্থ লাভ করিতেন। এ সমস্ত অর্থ তিনি লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতেন, এবং নিজেও সমারোহের সহিত বাস করিতেন। এক সময়ে তৎকালীন ভারতের অধীশ্বর সম্রাট আকবর তাঁহার চরিত্রে ও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গোলাকৃতি একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেই জমির নাম ছিল "চক্র রামদাস।" এ স্থানে একটী পুরাতন পুষ্করিণী অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল। তিনি সেটীর সংস্কার করেন এবং তাহার নাম রাখেন "অমৃতসর"। ইহার মধ্যে হরমন্দির নামে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা অধুনা ইংরাজিতে "Golden Temple" নামে পরিচিত। এখানে প্রত্যহই ভগবানের নাম গান হয়। রামদাস "অমৃতসরের" চতুর্দ্দিকে অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র মন্দির ও ফকিরগণের জন্য কুটীরসমূহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বহু দেশ হইতে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। রামদাস নিজেও সময়ে-সময়ে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থানটী সুরম্য হর্ম্ম্যরাজিশোভিত একটী সুন্দর নূতন নগরে পরিণত হইল। লোকে ইহাকে "গুরু—কা—চক" বলিত। বোধ হয় স্থানটী গুরু রামদাসের—সেই জন্য। অধুনা ইহার নাম "অমৃতসর"। এ নামটীও রামদাস-প্রদত্ত। অমৃতসর শিখদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি শিখদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত বলিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত শিখগণ পূজা-উপলক্ষে এ স্থানে আসিয়া জাতীয় একতা বৃদ্ধি করিবার অবসর পান। এক সময়ে রামদাসের স্বদেশ-হিতৈষণায় প্রীত হইয়া সম্রাট আকবর তাঁহার অনুরোধে লাহোরের অধিবাসিগণকে এক বৎসরের রাজকর হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। সে বৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। এই রাজকর রহিত না হইলে বহু লোককে অনশনে মরিতে হইত। রামদাসের তিনটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ মহাদেব একজন ফকির। দ্বিতীয় পৃথ্বীদাস একজন সাংসারিক ব্যক্তি। কনিষ্ঠ অর্জ্জুন পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে রামদাস ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার স্মৃতিকে বরণীয় ও স্মরণীয় করিবার জন্য বিতস্তা নদীতীরে তাঁহার একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

গ্রাম্য-গাথা ও প্রবচন-প্রসঙ্গ

[শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

যে সমুদয় গীত, গাথা ও প্রবচনমালা বঙ্গের পল্লীসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, উপেক্ষায় লোপ পাইতে বসিয়াছে, তৎসমস্ত সংগৃহীত হইলে বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডার যে এক বহুমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী লাভ করিতে পারেন, এ কথা একটু দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা যায়। নব্যবঙ্গের অবশ্য সংগৃহীতব্য এই শ্রুতি-স্মৃতি-সমূহ, বাণী-মন্দির-সজ্জার এই স্বভাব-সুন্দর উপকরণরাজি বাঙ্গলার গৌরবের সামগ্রী। কত মহাপুরুষের জীবন-কথা, কত আদর্শের মহনীয় চিত্র, কত দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, বিগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক ঘটনাসমূহের বিচিত্র কাহিনী, অতীতের কত সর্ব্বজন-প্রিয় মহোৎসবাদির বিবরণ, কত সুগম, জটিল দর্শন-বিজ্ঞান গণিত-জ্যোতিষের সরল মীমাংসা, কত ধর্ম্মোপদেশ যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে সত্যসত্যই বিস্মিত হইতে হয়। মানবের নৈতিক-চরিত্র গঠনে, তাহাকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতে, সমাজ, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়াবলির সুশিক্ষা প্রদানে, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত অশন-শয়নাদি দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের নিয়ম নির্দ্দেশে, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবের আরম্ভ ও সমাপ্তির ইঙ্গিতে, এই গুলি যে কিরূপ কার্য্যকরী—অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আধুনিক বিদ্যামন্দিরে অধ্যয়ন না করিয়াও, অতীতের তথাকথিত অশিক্ষিত, পল্লীবাসী জন-সাধারণ, যে আপনাদের শান্তিপূর্ণ মধুময় জীবন নিষ্কলঙ্কভাবে অতি-বাহিত করিয়া গিয়াছেন, এই সমস্ত প্রবচনমালাই তাহার একতম কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(১) "নরা, গঙ্গাবিশেশর,
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয় ;
বাইশ বলদা, তের ছাগলা
ভেবে ভেবে বয়া পাগলা।"

(২) "কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মন্দ মন্দ দিছে বা,
যাও শ্বশুর বাঁধগে আল, আজ নয় ত হবে কাল।"

(৩) খেটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ;
ঘরে বসে পুছে বাত, এ বছর যেমন তেমন আর বছরে হা-ভাত"

(৪) "মুখ হলসা ভেতর বুঝো' দীঘল ঘোমটা নারী
পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল অতি মন্দকারী"।
(৫) পুবে বাঁশ পশ্চিমে হাঁস, দেখে শুনে করগে বাস"।

ইত্যাদি খনার বচন ও ডাকের কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এলো দেশে
শুয়ো পোকাতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে"

ইত্যাদি ছড়াগুলি সর্ব্বজনপরিচিত। আমাদের বীরভূমে একটি ছড়া প্রচলিত আছে—"রেতের ঠাকুর কেদার রায়, রেতে আসে রেতে যায়।" এই কেদার রায়ের নিবাস ছিল সিউড়ি মহাম্মদাবাদের নিকটবর্ত্তী 'আঙ্গারগড়ে' গ্রামে। ইনি মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারে চাকুরী করিতেন। জননীর গঙ্গাস্নানে গমনের সুবিধার জন্য স্বীয় বাসগ্রাম হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত এক পথ নির্ম্মাণ সে কালে ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। দিবাভাগে নবাব-দরবারে কার্য্য করিয়া রজনীযোগে অশ্বারোহণে বাটী প্রত্যাগমন করিতেন এবং রাস্তার কার্য্যাদি পরিদর্শন ও মজুর বিদায় করিয়া প্রাতে পুনরায় মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেন। তাই জনসাধারণ তাঁহার পরিচয় দিয়া গিয়াছে, 'রেতের ঠাকুর কেদার রায়'! রায় মহাশয়ের নির্ম্মিত পথের শেষ নিদর্শন স্থানে-স্থানে এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে। বীরভূমে এমন শত-শত গাথা নিত্য গীত হইয়া থাকে। আর একটির উল্লেখ করিতেছি।

"আলিনকী বাহাদুর পাগড়ী সে বাঁধে তলোয়ার
এক ঘরি মে লুঠ লিয়া কলকেত্তা বাজার"

প্রবাদ,—রাজনগরের যুবরাজ আলিনকী খাঁ কিছুদিন,নবাব সিরাজ-দ্দৌলার অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণের সময় সেনাপতি আলিনকীও তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন, এবং কলিকাতা-যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কেহ কেহ এমন ও বলেন যে "আলিপুর" তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হৃতবৈভব, বিগত-গৌরব রাজনগরের—বীরভূমের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজধানীর লক্ষ্ণুয়ের মুসলমানগণ আজিও একখণ্ড জীর্ণবস্ত্র "লুঠের কাপড়" বলিয়া থাকেন; বস্ত্রখণ্ড বৎসরের মধ্যে একবার—মহরমের সময়—"তাজিয়ায়" বাঁধিয়া দিয়া গৌরবোৎফুল্ল হৃদয়ে অতীত স্মৃতির তর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে ডাকের কথায় কোন ধর্ম্মভাবমূলক গাথার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মভাবমূলক নিম্নোক্ত গাথাটি পঞ্জিকার পৃষ্ঠেও আশ্রয়লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই;—

"পাশমোড়া পাশমোড়া, তার সাক্ষি ভীমে ছোঁড়া,
অষ্টমি নবমী দুটি, ছেলে দুটোর জনমতিথি,
ক্ষ্যাপার চৌদ্দ ক্ষেপির আট, বুঝে সুঝে কাল কাট,
ইথে যদি করিস হেলা, চলে যাস্ ঠুঁটোর মেলা,
তাও যদি না পারিস্, ভগার খালে ডুবে মরিস্"

প্রথমতঃ শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভৈমী একাদশীর কথা। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বা জন্মাষ্টমী ও শ্রীরামনবমী; অনেকে ইহার মধ্যে রাধাষ্টমী এবং সীতানবমীর উল্লেখ করিয়া থাকেন। ক্ষ্যাপার চৌদ্দ, ক্ষেপীর আট—শিব-চতুর্দ্দশী এবং শারদ শুক্লাষ্টমী, (যাহা বীরাষ্টমী দুর্গাষ্টমী নামে খ্যাত)। ঠুঁটোর মেলা শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র এবং ভগার খাল হইতেছেন শ্রীগঙ্গাদেবী। যাঁহারা "গোদা জম" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিলেই গীতি-গাথাগুলি বৌদ্ধভাব-দ্যোতক বলিয়া মনে করেন,—ক্ষেপার চৌদ্দ, ক্ষেপির আট, ঠুঁটোর মেলা ও ভগার খাল প্রভৃতি শব্দ তাঁহাদের অনুধাবনযোগ্য। শিব, দুর্গা, জগন্নাথ এবং গঙ্গা-দেবী ঐরূপ অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন, অথচ এই ছড়াটি আনুষ্ঠানিক হিন্দুর কতকগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিতেছে।

জীবনে বহু ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিকেই প্রায় বলিতে শুনি "বাবা! আমার জীবন দুঃখেই গেল, আমার এই দুঃখের জীবনে "যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা"! এই একটিমাত্র ছোট কথায় তাঁহাদের জীবনব্যাপী রোদনের বেদন-ব্যথা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। মনে পড়িয় যায়, সেই সীতা-বিবাহের জন্য মিথিলা-যাত্রা, পথে তাড়কা-বধ, সেই হরধনুর্ভঙ্গ, সেই রাজ্যাভিষেক দিবসে রাম-বনবাস; মনে পড়িয়া যায়, পঞ্চবটীর সেই করুণকাহিনী, অশোকবনের সেই মর্ম্মভেদ ক্রন্দন, সেই রাম রাবণের যুদ্ধ, সেই অগ্নি-পরীক্ষা; তার পর প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেই রাজ-রাজেশ্বরীর নির্ব্বাসন, শেষে পাতাল-প্রবেশ। জানি না কোন্ অজ্ঞাত-নামা মণিকারগণ এই পরশমণিগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাঁদাইতেও জানিতেন, হাসাইতেও পারিতেন; তাই সে কালের পল্লী-জীবন এত সুখের ছিল। এদেশের গানওয়ালারা এমনি সুরবোদ্ধা ছিলেন—জাতীয় জীবনের মুখতন্ত্রীটিতে তাঁহারা এমন এক সুর বাজাইয়া তুলিতেন, যাহাতে সমগ্র দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া যাইত, সমগ্র জাতীয় হৃদয়ে একটা ভাবের স্পন্দন জাগিয়া উঠিত। আধুনিক কালের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাকর স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ভিন্ন আমরা পল্লীবাসিগণ অপর কাহারো নিকট এই সুর শুনিতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

"যে পদ-প্রভাবে পাণ্ডবের জয়
যে পদের গুণে বলী বদ্ধ হয়"

গানের এক-একটী চরণে জাতীয় জীবনের এক-একটা অধ্যায়, এক-একখানা পুরাণ মানস-পটে চিত্রিত হইয়া যায়!

একটা জিজ্ঞাসার কথা আছে—"মধুক্ষপেও না"? পল্লীগ্রামের কথায় কথায় ব্যবহৃত হয়। রাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্যামের সহিত আপনার এখন একটা কথাও হয় না?' আমি বলিলাম, 'না।' রাম হয় তো আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবে, "মধুক্ষপেও না?" এই "মধুক্ষপা" যে কোন মধু-রজনীর,কোন মিলন-পূর্ণিমার ইঙ্গিত করিতেছে, কে বলিবে? পল্লী প্রচলিত কত উৎসবই যে লোপ পাইতে বসিয়াছে, বক্রেশ্বর,কেন্দুবিল্বের মত কত বৃহৎ-বৃহৎ মেলা যে দুর্ব্বৃত্তগণের দুষ্ক্রিয়ার লীলাস্থলীতে পরিণত হইতেছে, শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী কুলাঙ্গনাগণের

অগম্য হইয়া উঠিতেছে; কত ব্রহ্মদৈত্যের মেলা, কত সাধু-সন্ন্যাসীর স্মৃতি-পীঠ, কত সংক্রান্তির গাজন, কেবল কেনা বেচার আড্ডায় পরিণতি লাভ করিয়াছে, কে তাহার সংবাদ রাখে? কে সেগুলির সংস্কার-সাধন করে? শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশে কে সেগুলির উন্নতিবিধান করিয়া দেয়? পবিত্রতা আনিয়া দেয়? অন্ততঃ সেগুলিকে একটী আনুনপুর্ণ মিলন-মেলায় পরিণত করে? প্রতিধ্বনি বোধ হয় উপহাস করিতেছে—কে? অথচ এ সবে তেমন পরিশ্রম নাই, ব্যয়বাহুল্য নাই, উপস্থিতির জন্য অনুরোধ নাই, টিকিট বিক্রয় নাই, বিজ্ঞাপন বিলি নাই, নূতন-পঞ্জিকা আনিয়া নূতন নূতন দিন স্থির করিবার কোন আবশ্যকতা নাই! সমস্তই প্রস্তুত আছে, চিরকালের জন্য তাহার দিন বাঁধা, সে দিন সকলেই জানে, নির্দ্দিষ্ট দিনে ক্রেতা-বিক্রেতা, দর্শক আপনা-আপনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। হইবে সব! কেবল হইবে না আমাদের দ্বারা কোন কাজ! আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া রহিব। যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া পরানুকরণপ্রিয়তাই যাহারা আয়ত্ত করিয়াছে, এ তিমির দূর করিতে তাহাদের জীবনে সে "মধুক্ষপা" আর আসিবে না; মিলন-মেলার কোন্ মধু-রজনী সে—যে মেলায় শত্রু-মিত্র-ভেদাভেদ থাকিত না, ঈর্ষা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব কলহ স্থান পাইত না, যে মিলন মধুক্ষপার মতই অম্লান, সুন্দর ও মধুময় ছিল, যে উৎসব বিধাতার বিশ্ব-সৃজন স্মৃতির আদিম মহোৎসব, যে রজনী—মানবের নবজীবনলাভের "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোহধ্যজায়ত, ততো রাত্র্যজায়ত" মন্ত্রের জননী, হায়! আজি তাহা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, বাসন্তী-উৎসবের ক্ষীণ চিহ্ন আজিও বহুস্থানেই বর্ত্তমান আছে। এই প্রবচনের মূলে সেই বাসন্তী-উৎসব।

কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য"-পত্রে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের দেশ-প্রচলিত—

"একনেড়ে কুলে বেঁড়ে তাল গাছে থাকে,
যে ছেলেটা কাঁদে তার কাণে ধরে নাচে।"

ছড়াটীকে

"কাঁধ কাটা বলে আমি তাল গাছে থাকি
যে ছেলেটা কাঁদে তার কাঁধে ধরে নাচি"।

ইত্যাকার সংস্কৃত রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তৎপ্রসঙ্গে "তাল-কলিঙ্গ দেশ" "কন্ধকাটা জাতি" ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। আমাদের শিশুকালের সেই একনেড়ে-ভীতি কিন্তু এখনো সময়ে-সময়ে মনে পড়ে। জানি না ঠাকুর মহাশয় ইহাকে সুদূর অতীতের বৌদ্ধ বা মুসলমান-ভীতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবেন কি না। "কুলে বেঁড়ে" বোধ হয় কুলহীন বা জাতিভ্রষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জাতিত্যাগি হিন্দু, বৌদ্ধ (বৌদ্ধ শ্রমণগণ মস্তক মুণ্ডন করিতেন অর্থাৎ নেড়ামাথা ছিলেন) বা কালাপাহাড়ের অভিনয় করিবে, আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু তালগাছের মীমাংসা করিতে পারিলাম না।

বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুপ্রধান পল্লীতে পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্ব-রাত্রিতে "পৌষ আগলাইবার" প্রথা প্রচলিত আছে। স্থানভেদে এ সম্বন্ধে নানারকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথা গীত হইয়া থাকে। আমাদের বীরভূমি অঞ্চলে নিম্নোক্ত ছড়াটি প্রচলিত আছে,—

"পৌষ মাসে পৌষ আগোলা, ধান কাপাসে ঘর আলা,
এস পৌষ যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না,
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস, না যাও ছাড়িয়ে,
গাল ভরে' পান দেবো কটোরা পুরিয়ে,
আঁদারে পাঁদাবে পৌষ, বড় ঘর চেপেই বোস্"

পৌষ মাঘ "ধান কাপাসে ঘর আলো" করিলেও বৈশাখ, অগ্রহায়ণ প্রভৃতি পুণ্য মাস থাকিতে পৌষকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এত আগ্রহ কেন? পল্লীগ্রামের লোক বৈশাখ মাসকে বিশেষ পুণ্যপ্রদ বলিয়া মনে করে। অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষমূলে জল-সেচন, দেবদ্বিজে সমধিক সম্ভ্রম-প্রদর্শন, প্রতি রজনীতে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য বৈশাখ মাসে অতিশয় যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এদিকে শ্রীভগবানের নিজ মুখের বাক্য—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ" (১) কবিকঙ্কনের খুল্লনা বারমাস্যা বর্ণনায় বলিতেছেন,

"মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান"

এ সব ত প্রাচীন কালের "মান পত্র"। তথাপি ছত্রিশ অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া "ঠ" এর মাথায় মাত্রা দেওয়ার মত এই পৌষের এত আদর কেন? আমাদের অনুমান হয়, "মাঘী পূর্ণিমার" সহিত ইহার কিছু সংস্রব আছে। পঞ্জিকায় দেখিতে পাই "মাঘী পূর্ণিমায়াং কলিযুগোৎপত্তি"। এই জন্যই বোধ হয় কলি-ভয়ভীত নরনারী মাঘের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পৌষমাসকে সম্মান দেখাইয়া কলির প্রতি আপনাদের আন্তরিক অপ্রীতির পরিচয় প্রদান করে।

পল্লী-প্রচলিত কিম্বদন্তীগুলির মূলে যে কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে সত্য ঐতিহাসিক না হইলেও তাহার মূল্য আছে। হইতে পারে, কোন ঘটনার সম্বন্ধে হয় ত এমন এক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত যাহার এতটুকুও মিল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রবাদ, হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। একটু শ্রদ্ধার সহিত অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়,—প্রবাদোল্লিখিত ঘটনাটি দেশের চক্ষে কিরূপ-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল, দশজনে তাহার কতটুকু অংশ কিরূপ-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত প্রবাদের মধ্যে তাহার একটী সুন্দর চিত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের মনে হয়, ইতিহাসের কঙ্কালমালা অপেক্ষা ক্ষেত্রবিশেষে এই সজীব জিনিসগুলির সাহায্যে অন্ততঃ দেশকে চিনিয়া লওয়া সহজ হইতে পারে। "সু" হউক আর "কু" হউক, দেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-সংস্কারের বেষ্টনি পরিত্যাগ করিয়া তথ্য-নির্ণয়ের চেষ্টা যে সেই দেশের সমস্তটা দেখিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, ইহা বলা বাহুল্য মনে করি। কবি

যে বলেন "রটে যা তা সব সত্য নহে" এবং কবির মনোভূমি "রামের জনম ভূমি অযোধ্যায়" চেয়েও সত্য,—কতকগুলি অতি-কল্পনা পল্লবিত মনোভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া কথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। সমস্তগুলিই যে "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়া যায়, তাহার কোন মাথার-দিব্য-দেওয়া নিয়ম নাই। যাহা ঘটে নাই, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু যাহা ঘটিতে পারিত বা যাহা সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, প্রবাদের মধ্যে এমন অনেক জিনিসও পাওয়া যায়। সুতরাং আদর্শ গড়িবার পক্ষে সেগুলির উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে।

আবার এমন অনেক সংগীত বা কবিতা আছে, যাহার কোন ধারাবাহিক অর্থ-সঙ্গতি বা উদ্দেশ্য নাই। যাহা পবিত্র শিশু-হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসের মতই সরল, মধুর এবং কৌতুকাবহ। জানি না কোথায় পল্লীমায়ের সেই চিরশিশু সন্তানগণ, কোথায় প্রকৃতি-দেবীর সেই আদরের দুলালেরা, যাঁহারা এই সমস্ত গীতি-গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন! একটি ক্ষুদ্র কবিতার উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। শীতের প্রভাতে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট পল্লী-বালক-বালিকাগণ প্রায় প্রতিদিনই সমস্বরে এই ছড়াটি আবৃত্তি করিতে থাকে।

"রোদ আয় রে ছটাফটা, ছাগল দেব গোটা-গোটা,
সুয্যির মা বুড়ি, কাঠ কুড়াইতে গেলি,
'ছ' খানা কাপড় পেলি, 'ছ' বৌকে দিলি,
সে বৌ কই? শাকে জল দিচ্ছে; সে শাক কই?
গরুতে খেয়েছে; সে গরু কই? বনে গিয়েছে;
সে বন কই? পুড়ে গিয়েছে; সে ছাই কই? উড়ে গিয়েছে;
কলা গাছের আড়ে, কলা পড়ে দুপ দাপ্
বুড়ি খায় কুপ কাপ্'
খেঁক শিয়ালির লোটাকান দুব্বো ভরা রোদ' আন্।"

এ ছড়ার অর্থ-সঙ্গতি কি থাকিতে পারে! প্রথমত "ছটা ফটা রোদ" আসিলে "গোটা গোটা ছাগল" দেওয়ার কথাটায় একটু খট্‌কা থাকিয়া যায়। আমাদের মনে হয়, সম্মুখস্থ অগ্নিদেবকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার ক্রোধ-বহ্নি উদ্দীপ্ত করিবার জন্যই হয় ত বলা হইয়াছে, "রোদ" আসিলে অগ্নিদেবের বাহন "গোটা গোটা ছাগল" গুলি রৌদ্র দেবের উদ্দেশেই নিবেদন করিয়া দেওয়া যাইবে। যেহেতু অগ্নিদেবও বোধ হয় শীতের ভয়ে বেশ জমকালো রূপে জাঁকিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এদিকে পরক্ষণেই সূর্য্যদেবকে ক্রোধান্বিত করিবার জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করা হইয়াছে তাঁহার বৃদ্ধা জননীকে! "সুয্যির মা বুড়ি, কাঠ কুড়াইতে গেলি" সর্ব্বনাশ! একে বুড়ি তায় কত বড় লোকটার মা! বোধ হয় "দানে" কার্য্যোদ্ধার না হওয়ায় এদিকেও এই "দণ্ডের" প্রয়োগ! কিন্তু দুঃখের বিষয় 'মা'কে' কাঠ কুড়াইতে পাঠাইয়া সত্যিকার কাঠ-কুড়ানির ছেলের সস্ত্রীক বাবু-সজ্জায় পরিভ্রমণ আজিকার দিনে সম্ভবপর হইলেও সেকালের সূর্য্যদেবের পক্ষে (পত্নী ছায়ার সহিত) লোক-সমাজে বাহির হওয়া কিরূপ লজ্জাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কবি তাহা অনুধাবন করেন নাই। যাহা হউক, "সুয্যির মা" তো 'ছ' খান কাপড় পাইয়া বসিলেন এবং প্রাপ্তিমাত্রেই ছয় বধূকে দান করিয়া ফেলিলেন। কাপড়গুলি বোধ হয় শীত-নিবারণের উপযোগী ছিল! কবি এতক্ষণ নীরব ছিলেন। কাঠ কুড়াইতে গিয়া বনের মধ্যে কাপড়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কতটুকু, বুড়ির কয় পুত্র ছিল, সকলেরই বিবাহ হইয়াছিল কি না, এতগুলি শীতাতুর বালক-বালিকাকে উপেক্ষা করিয়া বধূদিগকে বস্ত্রদান বুড়ির পক্ষে মার্জ্জনীয় হইতে পারে কি না, ইত্যাদি কোন বিষয়েরই কৈফিয়ৎ দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার বধূ দেখিবার খেয়াল চাপিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "সে বৌ কই"? কোন বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বধূ দেখিবার এই আগ্রহ বুড়ির বোধ হয় তেমন পছন্দ হইল না। তিনি একটা ওজর দেখাইয়া দিলেন 'শাকে জল দিচ্ছে'। "সে শাক কই"? বুড়ি—কতকালের বুড়ি তিনি জানিতেন 'কাঙ্গালকে' শাকের ক্ষেত দেখাইলে তাহার পরিণাম কিরূপ হয়। বুড়ি বলিলেন "গরুতে খেয়েছে"। "সে গরু কই?" বধূ দেখিবার ইচ্ছাটা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? বধূর সহিত এই জিনিষটার পার্থক্য উপলব্ধি করা কি এতই কঠিন—কবির পক্ষে—যে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সে গরু কই?" আমরা আর কি বলিব। বুড়িই উত্তর দিলেন "বনে গিয়েছে"। "সে বন কই"? "পুড়ে গিয়েছে" "সে ছাই কই"? "উড়ে গিয়েছে"। বুড়ির সঙ্গে এই আলাপটা কোথায় দাঁড়াইয়া চলিতেছিল, পূর্ব্বাহ্নে তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই। এখন দেখিতেছি সেটা যেখানেই হৌক, কথাপ্রসঙ্গে বুড়ি বোধ হয় এক কদলী-কাণ্ডের মূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন আর যায় কোথায়,—কবি অমনি গাহিয়া উঠিলেন—"কলা পড়ে দুপ দাপ, বুড়ি খায় কুপ কাপ্"! অপবাদ দেওয়া বৈ কি!

ব্যাপার দেখুন ত, কি কাণ্ডটাই না হইয়া গেল! সেই ছয় বধূ, শাকের ক্ষেত, এবং গরু যে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানাই নাই। একটা বনই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এমন কি তাহার ছাইগুলি পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, কবি দিব্য নিশ্চিন্ত! যেমন তিনি বুড়িকে কলা-গাছতলায় যাইতে দেখিলেন, অমনি আওড়াইয়া গেলেন—কলা পড়ে দুপ দাপ ইত্যাদি!

অতঃপর খেঁকশিয়ালির লোটকান (আদৌ তাহার কাণই কিরূপ জানি না) যে কিরূপে দুর্ব্বাভরা রৌদ্র আনয়ন করিবে আমরা তাহার মীমাংসা করিতে অক্ষম। সুতরাং ইতি করিতে বাধ্য হইলাম।

বিজ্ঞান-রহস্য

[শ্রীহরিদাস হালদার]

নাইট্রোজেন

সত্যযুগের মান্ধাতার আমল হইতে আমাদিগের যে পঞ্চ ভূত ছিল, এখন তাহাদের স্থান অসংখ্য ভূত আসিয়া দখল করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজেন একটি অতি অদ্ভুত ভূত। ইনি আমাদের বায়ু-

রাশির শতকরা আশী ভাগ অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। দেখিলে বোধ হয়, ইনি অতি নির্ব্বিরোধী লোক'—কাহারও ভালতেও নাই, মন্দতেও নাই। ইনি হাইড্রোজেনের মত নিজেও পোড়েন না, অক্সিজেনের মত অপরকেও পোড়ান না। এজন্য বৈজ্ঞানিকেরা ইঁহাকে inert বা জড়ভরত বলেন।

বাহিরে দেখিতে জড়ভরত হইলেও, নাইট্রোজেনের পেটে-পেটে কিন্তু বিলক্ষণ বদমায়েসী আছে। এই ভূত গোপনে অন্যান্য অনেক ভূতের সঙ্গে রাসায়নিক প্রেম করেন; কিন্তু সে প্রেম সদাই বিচ্ছেদোন্মুখী। এই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইবার সময় ইনি বিবট চীৎকার করিয়া মহাপ্রলয় উপস্থিত করেন। যে সকল ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই নাইট্রোজেনের যোগে উৎপন্ন হয়। আমরা প্রত্যেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৪৫০ শত গ্যালন নাইট্রোজেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসের মধ্যে লইয়া থাকি। এই পরিমাণ নাইট্রোজেন হইতে প্রায় বিশ সের ডাইনামাইট্ প্রস্তুত হইতে পারে। রণক্ষেত্রে এই ডাইনামাইট্ ফাটিয়া তন্মধ্যস্থ অন্যান্য ভূতের সঙ্গে বিচ্ছেদ বাধাইয়া যখন নাইট্রোজেন পৃথক হইয়া দাঁড়ায়, তখন যে কি প্রলয় কাণ্ড ঘটে, তাহা কল্পনা করিতে হৃদ্‌কম্প হয়। এই যে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে উভয় যুযুৎসু পক্ষ, "munition" "munition" করিয়া অস্থির হইয়াছেন, তাহা আর কিছুই নহে—কেবল এই নাইট্রোজেনের ওড়ন—পাড়ন। ডাইনামাইট্, লিডাইট্, ট্রাইনাইট্রো-টিউলন প্রভৃতি সমস্তই শুদ্ধ এই ভূতের বিশ্বসংহারক মূর্ত্তি; আর আধুনিক যুদ্ধ বিগ্রহ হইতেছে—ইঁহারই তাণ্ডব-নৃত্য। জগতের বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, এই বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে জনার্দ্দনরূপী নাইট্রোজেন যেষাং পক্ষে অধিকতর প্রসন্ন হইবেন, সেই পক্ষই জয় লাভ করিবে। সুতরাং মিত্র-পক্ষকে এই ভূত-সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভূত আবার অতি শান্ত মূর্ত্তিতে জীব-জগত ও উদ্ভিদ জগতের যাবতীয় সৃষ্টি-স্থিতি কার্য্যেও সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। মাছ, মাংস, ছানা প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে আমরা 'proteid' বলি—যাহা না খাইলে শরীর-ধারণ একেবারেই অসম্ভব হয়—তাহাদের প্রধান উপকরণ হচ্চেন এই নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেনকে কোন না-কোন প্রকারে আত্মসাৎ করিয়াই লতাগুল্ম-তরুরাজি বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া পত্রপুষ্পে শোভিত হয়, এবং যথাকালে ফলশস্য প্রদান করে। কতকগুলি দুষ্ট ভূতের সঙ্গে মিশিয়া যে নাইট্রোজেন বিশ্ববিধ্বংসী হইয়া দাঁড়ান, সেই নাইট্রোজেনই আবার ক্ষেত্রানুসারে সৎ-সঙ্গলাভ করিয়া জগৎ-সংসারকে সৃজন ও পালন করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের চক্ষে এই অদ্ভুত ভূতই একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।

ধূলি-কণা

রাজমার্গে হাওয়াগাড়ীগুলি যে ধূলি উড়াইয়া যায়, তাহাতে পথিকদিগকে অস্থির হইতে হয়। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মতে ধূলির তুল্য মানুষের শত্রু নাই; এমন রোগের বীজ নাই, যাহা ইহাতে না থাকিতে পারে। তাই মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ সহরের ধূলি ধ্বংস করিবার জন্য অশেষ প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। জগতের সর্ব্বত্রই এই ধূলিকণার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার সতত সংগ্রাম চলিতেছে।

কিন্তু, ধূলি কি বাস্তবিকই আমাদের এতদূর শত্রু? বিশ্ব সংসারে ধূলির কি আবশ্যকতা নাই? আছে বই কি। ভগবানের রাজ্যে অনাবশ্যক বলিতে কিছুই নাই। বায়ুস্তরে সূক্ষ্ম ধূলিরাশি আদৌ না থাকিলে, গগনের নয়নরঞ্জন স্নিগ্ধ নীলিমাময় সৌন্দর্য্য থাকিত না; দিবা দ্বিপ্রহরেও তাহা অমাবস্যার নিশীথ গগনের ন্যায় ঘনমসী বর্ণের বলিয়া পরিদৃশ্য হইত, এবং মধ্যাহ্নকালে নক্ষত্র সকল আমাদের নয়নগোচর হইত। উড্ডীয়মান অসংখ্য ধূলিকণাতে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যালোক সকল স্থানকে অল্প বিস্তর আলোকিত করে। সুতরাং জগতে ধূলির অস্তিত্ব না থাকিলে 'diffused light' বা ছায়ালোক থাকিত না, এবং আমাদিগকে দিবাযোগে ঘরের মধ্যে আলো জ্বালিয়া কাজ করিতে হইত।

অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে দরজার ছিদ্র দিয়া যে রৌদ্ররশ্মি প্রবেশ করে, যদি গৃহের মধ্যে আবদ্ধ বাতাসে ধূলি না উড়িত, তাহা হইলে সেই রৌদ্ররশ্মির রেখা কেহ দেখিতে পাইত না। এইরূপ একটি সামান্য পরীক্ষার দ্বারা আচার্য্য টিণ্ডাল প্রমাণ করিয়াছেন যে, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম গগনে যে সুন্দর স্বর্ণকান্তির ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বায়ুমণ্ডলে উড্ডীয়মান এই ঘৃণিত ধূলিরাশিরই প্রসাদাৎ। সমুদ্র-সলিলে ধূলির সংমিশ্রণ না থাকিলে, তাহার নীল বর্ণ থাকিত না, এবং কবি রবীন্দ্রনাথ "নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল" বলিয়া ভারত-জননীর বন্দনা করিতে পারিতেন না।

আকাশে ভাসমান অসংখ্য ধূলিকণা না থাকিলে মেঘ ও বৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইত না। বায়ুমণ্ডলে যে জলীয় বাষ্প সর্ব্বদা অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহা ঠাণ্ডা হইলে, এই সকল কঠিন ধূলিকণার এক-একটিকে কেন্দ্র করিয়া এক-একটি অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক বারিবিন্দুর সৃষ্টি করে। এই অগনন বারিবিন্দুর সমষ্টিকেই আমরা মেঘ বলি; এবং ইহাদের পরস্পর মিলন ও অধঃপতনকেই বৃষ্টি বলি। জন্ এটকিন নামক একজন বৈজ্ঞানিক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একটি সামান্য পরীক্ষার দ্বারা এই তথ্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি একটি কাচের বোয়েমের মধ্যে ধূলিশূন্য বিশুদ্ধ বায়ু, এবং আর একটি বোয়েমের মধ্যে ধূলিময় অবিশুদ্ধ বায়ু রাখিয়া তাহাদের মধ্যস্থ বায়ুকে কৌশলে অধিক শীতল করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, এইরূপে ঠাণ্ডা করিলে দ্বিতীয় বোয়েমের ধূলিময় বায়ুর মধ্যে কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি হয় এবং প্রথম বোয়েমটিতে তাহা হয় না।

এই সকল হচ্চে বিজ্ঞানশাস্ত্র-সম্মত রজোমাহাত্ম্য। আমাদের প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রে এই ধূলিরূপ অদ্ভুত পদার্থের আরও অনেক প্রকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রানুসারে এই রজঃ বিসর্গের ন্যায় আশ্রয়স্থানভাগী হইয়া আরও অনেক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যলাভ করে।

সেইজন্তই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন ব্রাহ্মণের পদরজ: বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন; এবং সেইজন্যই সম্ভবত: রাধাপ্রেমের ভক্তগণ ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়া ধন্য হন।

সর্পাঘাতের কতিপয়-চিকিৎসা প্রণালী

[শ্রীঅনুতোষ দাসগুপ্ত এম-এ]

সরকারী রিপোর্টে জানা যায়, এই দেশে প্রতি বৎসর প্রায় তেইশ হাজার বা ততোধিক লোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। সর্পভয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; শীতপ্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত কম। নিউজিল্যাণ্ড এবং আইসল্যাণ্ড দ্বীপে সর্প দেখিতে পাওয়া যায় না। শীত ঋতুর অবসানে সর্পকুল বিবর ত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষণে বহির্গত হয়। ইহারা বহুকাল পর্য্যন্ত অনাহারে বাঁচিতে পারে। সকল সর্পের বিষ থাকে না। দেশভেদে বিষধর সর্পের সংখ্যা শতকরা—পনর হইতে কুড়ি। সর্পের বিষ শীতকালে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং গ্রীষ্মের সময় সমধিক প্রবল হয়। সর্পদষ্ট প্রাণীর শারীরিক আয়তন অনুসারে বিষক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে। ভাইপার নামক সর্পের একবারমাত্র দংশনে একটি মূষিক কিংবা পায়রা সহজেই বিনষ্ট হয়; কিন্তু পুন:পুন: দংশনে একটি অশ্বের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। মেজর ওয়াল সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে ৬৯ প্রকার বিষধর সর্প দেখিতে পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে ৪০ প্রকার সর্প স্থলচর, এবং অবশিষ্ট ২৯ প্রকার সর্প সামুদ্রিক। অসামুদ্রিক জলচর সর্পের বিষ নাই। ভারতবর্ষে সচরাচর চারিপ্রকার সর্পদ্বারা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তন্মধ্যে গোক্ষুর সর্পই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। যে পরিমাণ বিষদ্বারা একটি পূর্ণবয়স্ক লোকের মৃত্যু ঘটিতে পারে, গোক্ষুর সর্পের একবার মাত্র দংশনে তাহা অপেক্ষা দশ হইতে বিশ গুণ অধিক বিষ নির্গত হইয়া থাকে। কতকগুলি সর্পের বিষ মৃদুবীর্য্য, এবং অল্প পরিমাণে নি:সৃত হয়, উহাদের দ্বারা একবার মাত্র দংশনে মনুষ্যের মৃত্যু হয় না।

বিষধর সর্পের উপরের মাড়িতে দুইটি রন্ধ্রযুক্ত বৃহৎ, তীক্ষ্ণ দন্ত থাকে; উহাদের মূলদেশে এক একটি থলীর ভিতর বিষ সঞ্চিত থাকে। দংশন করিবামাত্র নিমেষের মধ্যে এই বিষ নির্গত হইয়া ক্ষত মুখে প্রবেশ করে। এই দন্তদ্বয়ের পশ্চাদ্দেশে কতকগুলি বীজদন্ত থাকে; এবং এগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে পুনরায় দন্তোদ্গম হয়। যতবার ভাঙ্গিয়া যায় ততবারই দন্তোদ্গম হয়। সাপুড়িয়াগণ সদ্য:ধৃত গোক্ষুর সর্প লইয়া যেরূপ ক্রীড়া কৌতুকাদি প্রদর্শন করে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা নানারূপ কৌশল এবং ক্ষিপ্রতার সহিত সর্প ধরিয়া থাকে। সর্পবিষ শ্বেতসার (Starch) ঘটিত আঠার ন্যায় তরল পদার্থ। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা জানা যায়, ইহা ক্ষার কিংবা অম্লগুণাত্মক নহে। ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে মিশ্রিত হইলে জল ঘোলা হয় এবং জল অপেক্ষা ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী এবং ইহা উত্তাপ পাইলে দানাযুক্ত হয়। কথিত আছে, এই বিষ সেবন করিলে কোনরূপ অনিষ্ট হয় না, কিন্তু মুখে কিংবা অন্যস্থানে কোন প্রকারে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

সর্প ঘাতের চিকিৎসার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হয়, এবং অনেক রকম ঔষধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে কোনরূপ উপদেশ প্রদান কিংবা আলোচনা করা সম্পর্কে লেখক সম্পূর্ণ অনধিকারী। তথাপি সাধারণের অনুসন্ধান-স্পৃহা জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে অধীতবিদ্যা এবং প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি ঔষধের বিষয় বর্ণিত হইবে। প্রকৃত বিষধর সর্পে দংশন করিলে অধিকাংশ স্থলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। তাহার কারণ, সর্পবিষ এইরূপ সদ্য: প্রাণহর যে, অনেক স্থলে চিকিৎসকের শরণাগত হওয়ার পূর্ব্বেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ওঝা দ্বারা চিকিৎসা করাইবার পদ্ধতি এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। অনেক সময় উহাদের নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী হার মানিয়া যায়। কিন্তু উহাদের হাতেও লোকের মৃত্যু হয়। যে সকল ক্ষেত্রে ওঝা এবং চিকিৎসকের হাতে প্রতীকার হইয়াছে জানা যায় তাহার প্রত্যেক রোগীই বিষধর সর্পদ্বারা আহত হইয়াছে কি না তাহা অনেক স্থলে জানিতে পারা যায় না। সচরাচর লোকে বিষধর এবং বিষহীন সর্পের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, এবং বিষহীন সর্পের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। এই কারণে অনেক স্থলে ওঝা কিংবা চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কিন্তু অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ ওঝা সর্পবিষের অমোঘ ঔষধ অবগত আছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রত্যেক বিষেরই প্রতিষেধক আছে। দ্রব্যগুণে অবিশ্বাস করা চলে না। কিন্তু সাপুড়িয়াগণ অনেক স্থলে মিথ্যা কবচ ও নানা প্রকার গাছের শিকড় ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত প্রতারণার ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইয়াছে, এবং স্থলবিশেষে দ্রব্যগুণে বিশ্বাস ক্রমশ:ই লোকের মন হইতে অপনীত হইতেছে। সর্পাঘাত, শৃগাল-কুকুরের দংশন ও অনেক প্রকার দুশ্চিকিৎস্য পীড়ার অব্যর্থ ঔষধ আমাদের দেশে অনেকে জানিতেন, কিন্তু অপরকে শিখাইতেন না। ঔষধ শিখাইলে না কি ঔষধের গুণ থাকে না! এই কারণে যুগযুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল ঔষধের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ক্রমে-ক্রমে লোপ পাইতেছে। মধ্যে-মধ্যে সংবাদ-পত্রাদিতে ২।১টা ঔষধের বিষয় জানিতে পারা যায়। তাহার মধ্যে কতকগুলি অতিশয় দুর্ল্লভ, এবং কতকগুলি স্থানভেদে বিবিধ নামে পরিচিত হওয়ায়, সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না। করবী ফুলের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু করবী ফুল বলিলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী যে ফুল বুঝিবে, পশ্চিমবঙ্গবাসী সে ফুল মনেও স্থান দিবে না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী যাহাকে করবী ফুল বলে, পশ্চিমবঙ্গবাসী তাহাকে 'কলকে-ফুল' বলিয়া থাকে; এবং করবী-ফুল বলিলে সচরাচর যাহাকে শ্বেত ও রক্ত করবী বলা হয় তাহাই মনে করিবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে করবী কিংবা কলকে-

ফুলকে স্বর্ণঘটী বলা হয়। থোড় এবং মোচা পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিকট একার্থবোধক; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী "থোড়" বলিলে,—কদলী-বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সারভাগ বুঝিবে। এইরূপ, বৃক্ষাদির স্থানভেদে ভিন্ন-ভিন্ন নাম হওয়াতে, একই নাম ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থবোধক হওয়াতে, বৃক্ষলতাদি বাছিয়া প্রকৃত ঔষধ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া থাকে, এবং অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইতে হয়। এই কারণে অনেক সময় প্রকৃত ঔষধ পাওয়া যায় না, এবং তজ্জন্য চিকিৎসা বিফল হইয়া থাকে। ঔষধ-প্রয়োগেও বুদ্ধি ও বিবেচনার বিশেষ দরকার। চিকিৎসা বিদ্যায় অনেকেই পারদর্শী হন, কিন্তু হাতযশ সকলের হয় না। কুইনিন ম্যালেরিয়া জ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ, কিন্তু অপব্যবহারে ইহাদ্বারা কুফল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। উপযুক্ত মাত্রায় নিয়মিতরূপ ব্যবহার না করিলে, জ্বর বন্ধ হইয়া আবার হইতে পারে। একবারে অধিক মাত্রায় সেবন করিলেও বধিরতা ও অন্যান্য অনেক প্রকার অপকার হইতে পারে। ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশতঃ ইহা সকলের নিকট সমান আদৃত নহে। সেইরূপ, সর্পাদির ঔষধ অজ্ঞলোকের হস্তে ব্যবহৃত হইলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ঔষধেরই একটা প্রয়োগ-বিধি আছে। তাহা অমান্য করিলে ঔষধে কায হয় না। এই কারণে ঔষধ জানা থাকা সত্ত্বেও সকল ওঝা বা চিকিৎসক সমান ফল দর্শাইতে পারেন না।

সর্পে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ করিবার জন্য, উপরে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হয়। বাঁধিবার উপযুক্ত দড়ি তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না; সুতরাং হতবুদ্ধি না হইয়া পরিধেয়-বস্ত্র ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া ফেলা উচিত। বিপদের সময় এইরূপ সাধারণ উপায় মনে হয় না। তৎপরে আহত স্থান চিরিয়া উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ-শলাকা দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। এই কার্য্য যত শীঘ্র সমাধা হয়, ততই উপকারী। ইহার পর ডাক্তারগণ সচরাচর পটাসিয়ম পার্ম্মাঙ্গেনেট জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধুইয়া দেন। সর্পাঘাত-চিকিৎসার জন্য এক প্রকার অস্ত্র পাওয়া যায়; উহার বাঁটের মধ্যে পটাসিয়ম পার্ম্মাঙ্গেনেট সর্ব্বদা রক্ষিত থাকে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত চুষিয়া লওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই বিষাক্ত রক্ত কাহারও উদরস্থ হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার দন্তের মাড়িতে কিংবা মুখের ভিতর অন্য স্থানে ক্ষত থাকিলে, তদ্দ্বারা তাহার রক্তের সহিত এই বিষের সংযোগ ঘটিলে তাহার মধ্যে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং এই প্রণালী সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ নহে।

ঈশার মূল নামক লতাবিশেষ সর্পাঘাতের একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ—এ কথা অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু এই গাছ সকলে চিনেন না; এবং যাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, ইহা আমরা চিনি, তাঁহাদের মধ্যেও সকলে চিনেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই গাছের সবিস্তার বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইংরেজী উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে এই গাছ Artistolochia Indica নামে অভিহিত হইয়াছে। এই গাছ লতাবিশেষ, সচরাচর বৃক্ষাদি বেষ্টন করিয়া বৰ্দ্ধিত হয়। কাণ্ড পঞ্জরিত (ribbed), পত্রসমূহ বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট; ২ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা, ১ হইতে ২ ইঞ্চি চওড়া। কচি পাতাগুলি লম্বা ও সরু; বড় পাতাগুলির উপরিভাগ চওড়া, এবং নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে বোঁটার দিকে অল্প বা অধিক চেরা। পত্রের প্রান্তদেশ ঈষৎ তরঙ্গায়িত। প্রত্যেক পত্রে ৩টী কিংবা ৫টী শিরা থাকে, এবং পত্রগুলি পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট। পুষ্পবৃন্তের বিপরীত দিকে এক-একটী ক্ষুদ্র উপপত্র আছে। পুষ্প সবুজবর্ণ, সরু এবং লম্বা। পাপড়ি, পরাগকোষ প্রভৃতি গর্ভকোষের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। বীজগুলি ত্রিকোণাকার ও পক্ষযুক্ত। Dr. Hooper প্রণীত Flora of British India, Roxburgh প্রণীত Flora Indica এবং Prain প্রণীত Bengal Plants নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই লতার যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Stem twining, shrubby, quite glabrous, young shoots striated. Leaves from linear to ovate-oblong; base cuneate, rounded, or shallow-cordate, waved, 3 or 5 nerved; bract opposite base of peduncle. Petiole very slender. Perianth straight, greenish; base globose, tube shortly funnel shaped. Flowers hermaphrodite; calyx tubular; superior; stamens 6; ovary inferior, 6 locular, Capsule half to two in. long, oblong, grooved; seeds flat, triangular and winged.

এই গাছের সদ্যোছিন্ন পত্র উগ্রগন্ধযুক্ত, এবং প্রায় কুইনিনের মত তিক্ত। ইহার শুষ্ক পত্র চর্ব্বণ করিলে এক প্রকার মিষ্ট আস্বাদ পাওয়া যায়, এবং ইহার রস অত্যন্ত উত্তেজক। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই গাছ জন্মে। নেপাল হইতে নিম্নাঙ্গে, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে, দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সর্ব্বত্র এবং সিংহলে তিন হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চস্থানে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে স্থানভেদে এই গাছ ঈশার মূল, ঈশমূল, ঈশমল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক মুসলমানের নিকট জানা গিয়াছে, সাপুড়িয়াগণ ঈশার মামুদ নামক লতা সর্পদংশনে ব্যবহার করে। সম্ভবতঃ এই গাছও ঈশার মূলের নামান্তর মাত্র। পৃথিবীর অনেক স্থলে এই জাতীয় গাছ সর্পবিষঘ্ন বলিয়া পরিচিত। আমেরিকাতে Aristolochia জাতীয় আর এক প্রকার গাছ জন্মে; উহার নাম Aristolochia Serpentina, এবং তথায় উহাকে ভার্জ্জিনিয়া সর্পমূল (Verginia Snake-root) বলা হয়। সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রজ্ঞ বেলফোর সাহেব লিখিয়াছেন, "Birthworts have pungent, aromatic, stimulant, and tonic properties, some have been celebrated for their effects on the uterus, othesr as antidotes for snake-bites" অর্থাৎ এই জাতীয় গাছগুলি

কটু, উগ্রঘ্রাণযুক্ত, উত্তেজক ও বলবর্দ্ধক। কতকগুলি জরায়ুর উপর বিশেষ কার্য্যকারী, অপরগুলি সর্পাঘাতের প্রতিষেধক বলিয়া বিখ্যাত। J. Reynolds Green প্রণীত Botanyতে লেখা আছে 'Many of the species are regarded in various parts of the world as useful in the treatment of snake-bites'" অর্থাৎ এই জাতীয় অনেক গাছ পৃথিবীর অনেকাংশে সর্পাঘাত-চিকিৎসায় উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে এরিষ্ট লোকিয়া ইণ্ডিকা অর্থাৎ ঈশার মূল সর্পাঘাতের ঔষধ বলিয়া পরিচিত। পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে এই গাছ সর্প বিষঘ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শার্দ্দূল-চর্ম্মে পরিহিত সর্পবেষ্টিত মহাদেব হিমালয়ে শ্বশুরবাড়ীতে গমন করিলে শাশুড়ী বরণ করিতে আসিলেন। বরণ-ডালাস্থিত ঈশারমূলের আঘ্রাণে ভীত হইয়া মহাদেবের কটিবেষ্টিত সর্প পলায়ন করিলে পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মখানি খসিয়া পড়িল, এবং মহাদেব দিগম্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। এ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গান হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"ঈশ্বর প্রতিকূল, বরণকুলায় ছিল ঈশ্বরমূল,
গন্ধে ফণী পলায় ত্রাসে, বাঘাম্বর প'ল খসে,
বসলেন নেংটা হয়ে ঠ্যাংটা চেপে
বাবাজি ভুতের বাউল "

এই গাছ সর্পবিষঘ্ন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও ইহার প্রয়োগ-প্রণালী অনেকেরই জানা নাই। যাহা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা অস্পষ্ট, এবং তাহাতে নির্ভর করা চলে না। কতিপয় সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত এবং অনুসন্ধিৎসু ইংরেজ এই দেশে বহুকাল পূর্ব্বে এই ঔষধের সন্ধান পাইয়া তাহা যে প্রণালিতে ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নিম্নলিখিত ঘটনাবলী হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

R. Lowther Esq. বহুকাল পূর্ব্বে এলাহাবাদে কমিশনার ছিলেন। তিনি এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তির আরোগ্য-সাধন করিয়াছেন। Mr. Breton, Deputy Collector of Customs এই গাছটী তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রেটন সাহেবের বাড়ীর সন্নিহিত একটী উইঢিপির ভিতর একটা গোক্ষুর সর্প আশ্রয় লইয়াছিল। একদিন কতকগুলি সাপুড়িয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে ঐ সাপটা মারিয়া ফেলিতে বলেন। একটী সাপুড়িয়া ঐ স্থানের অনেকটা খুঁড়িয়া গর্ত্তটা কোন্ দিকে গিয়াছে, তাহা ঠিক করিবার জন্য হাত প্রবেশ করাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ গর্ত্তস্থিত সর্প তাহার অঙ্গুলিতে দংশন করে। তাহা দেখিয়া দলের একটি লোক নিকটস্থ খালের তীরবর্ত্তী একটি গাছ হইতে কতকগুলি পাতা লইয়া আইসে, এবং তাহার রস ক্ষতস্থানে রগড়াইয়া লোকটাকে সুস্থ করে। মিঃ ব্রেটন তৎক্ষণাৎ লোকটীকে লইয়া গিয়া সেই গাছটি বাড়ীতে আনিয়া নিজের বাগানে রোপণ করিয়া রাখেন। সাপুড়িয়া বলিল, ঐ গাছের শিকড় তাহারা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে, এবং উহা দ্বারা সর্পাঘাতের চিকিৎসা করে।' ব্রেটন সাহেব এলাহাবাদে নিযুক্ত হইলে গাছটি তথায় লইয়া আসেন, এবং উহা দ্বারা অসংখ্য সর্পাহত রোগীর প্রাণরক্ষা করেন। তৎপর তিনি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে বদলী হইলে কমিশনার মিঃ লোথারকে এই গাছটি দিয়া যান। তিনিও এই গাছটি দ্বারা অনেক লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। একবার একটি সর্পাহতা স্ত্রীলোক মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার নিকট আনীত হইয়াছিল। তাহাকে অত্যধিক মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করাইয়া সুস্থ করা হয়। স্ত্রীলোকটীকে বাড়ী লইয়া যাওয়ার সময় সঙ্গে একটি পাতা দিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, পুনরায় যন্ত্রণার উদ্রেক হইলে যেন উহা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কোনরূপ যন্ত্রণার উদ্রেক না হওয়া সত্ত্বেও রাত্রি ১টার সময় উহা পুনরায় সেবন করান হয়। তাহাতে রোগিনীর এতদূর মত্ততা হইয়াছিল যে সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়।

আর-একদিন একটি হিন্দু যুবতী স্ত্রীলোককে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আনা হয়। স্ত্রীলোকটীকে মৃতপ্রায় দেখিয়া জনৈক কর্ম্মচারী কমিশনার সাহেবকে ঔষধ প্রদান করিতে নিষেধ করেন, পাছে কোন ফল না দেখিলে ঔষধের উপর লোকের বিশ্বাস কমিয়া যায়। রোগিনীর নাড়ীর স্পন্দন ছিল না, এবং গাত্র পাথরের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার স্বামী অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করায় সাহেব তিনটী মধ্যমাকৃতি পাতা উত্তমরূপ পিষ্ট করিয়া দশটী গোলমরিচসহ এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অতিকষ্টে রোগিনীর মুখ খুলিয়া সেবন করাইয়া দেন। ঔষধ পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে সাহেব লোকের সাহায্যে রোগিনীকে উঠাইয়া বসাইয়া রাখিলেন। ৮।১০ মিনিট পরে রোগিনীর নিম্নওষ্ঠে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিতে পারা গেল। তৎপর রক্ত-সঞ্চালনের সহায়তার জন্য রোগিনীকে কয়েকজন লোকের সাহায্যে দাঁড় করাইয়া হাঁটাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল রোগিনী নিজের পায়ের উপর ভর করিতে চেষ্টা করিতেছে। তখন তাহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইতে আদেশ দেওয়া হইল। কয়েক মিনিট পরে রোগিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং তাহার একটু চৈতন্য-সঞ্চার হইল। ইহার পরই রোগিনী চীৎকার করিয়া বলিল, 'আমার বুক জ্বলিয়া যাইতেছে।' তখন তাহাকে আর একটি পাতা ছেঁচিয়া এক আউন্স জলের সহিত খাওয়ান হইল। এ সময় তাহার বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয় মৃত মানুষের মত শীতল ছিল। কিছুকাল পরে রোগিনী ক্ষতস্থান দেখাইয়া দিল। স্থানটী গোলাকার, এবং মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। সাহেব ঐ স্থানে একটী পাতার রস উত্তমরূপে ঘষিয়া দিলেন, এবং স্ত্রীলোকটীকে দুই ঘণ্টাকাল হাঁটাইলেন। স্ত্রীলোকটী শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিয়া বাড়ী প্রস্থান করিল। পরদিন সে সাহেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সাপটাকে মারিতে পারা যায় নাই;—স্ত্রীলোকটী উহাকে "কালাসাপ্প" (kobra-kapelle') বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল।

একবার বর্ষার প্রারম্ভে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে এই কমিশনার সাহেবের নিকট আনা হয়। স্ত্রীলোকটী খুব প্রাতঃকালে অন্ধকারে ঘর-ঝাঁট দেওয়ার সময় সর্পাহত হয়, এবং সকলকে ডাকিয়া বলে,

"আমাকে ইঁদুরে কামড়াইয়াছে" এ কথায় কাহারও খেয়াল হইল না। এবং স্ত্রীলোকটী শিশুকে স্তন্যপান করাইবার জন্য বিছানায় গিয়া শুইল। কিছুকাল পরে লোকে দেখিতে পাইল, স্ত্রীলোকটী অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং মুখ হইতে ফেন নির্গত হইতেছে। সকলে তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে মনে করিয়া ওঝা ডাকিয়া আনিল। ওঝা একঘণ্টাকাল নানারূপ চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়া তাহাকে কমিশনার সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বলিল। সাহেবের নিকট আনীত হইলে তিনি দেখিলেন স্ত্রীলোকটীর দেহ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন তিনি দেহটাকে সৎকার করিতে আদেশ দিয়া শিশুটীকে অবিলম্বে আনিতে আদেশ করিলেন। শিশুটীকে আনা হইলে, সাহেব দেখিলেন, শিশু সম্পূর্ণ অচেতন, কিন্তু তখনও প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয় নাই; শরীরে তাপ আছে; মাথাটী স্কন্ধদেশ হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সোজা করিলে পুনরায় ঝুলিয়া পড়ে। সাহেব তৎক্ষণাৎ এরিষ্টলোকিয়ার একটী ক্ষুদ্র পাতার তিন ভাগের একভাগ ছোট টেবিল-চামচ পরিমিত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার পাকস্থলীতে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ৪৫ মিনিট পরে শিশু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মেলিল, এবং কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া শান্ত হইল। পরদিবস প্রাতঃকালে শিশুটীকে সুস্থাবস্থায় আনিয়া সাহেবকে দেখান হইল।

এই ঔষধ কি ভাবে এবং কিরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ফল দর্শিতে পারে, উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে বুঝিতে পারা যায়। রোগীর অচেতন অবস্থায় এই পাতার রস সূচল পিচকারী (Hypodermic Syringe) দ্বারা শরীরের ভিতরের রক্তের সহিত সংযোগ করিয়া দিলে উপকার দর্শিতে পারে।

জনৈক বৃদ্ধ এবং বহুদর্শী ভদ্রলোকের নিকট শুনিয়াছি, তিনটী ঘেঁটুফুল গাছের (ভাঁট গাছ=সংস্কৃত ভণ্টক—Volkameria infortunata) প্রধান শিকড় (top-root) তিনটী লইয়া সাতটী গোলমরিচসহ বাঁটিয়া সর্পাহত রোগীকে খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। * কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আমেরিকার জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কদলীবৃক্ষের কাণ্ডের রস সর্প-বিষঘ্ন বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন। কেহ-কেহ বলেন, কলমী-শাকের রস (Convolvulus j repens) অর্দ্ধ ছটাক পরিমিত মাত্রায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে সেবন করাইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। অনেক চিকিৎসকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই রস সেঁকোবিষের (arsenic) প্রতিষেধক। জয়পালের বীজের রস (Croton tiglium) চোখে দেওয়ার পর চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিলে, সর্পাহত ব্যক্তির জীবনের আশঙ্কা থাকে না বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার গুণ সম্বন্ধে Flora Indica-প্রণেতা সুবিখ্যাত Roxburgh লিখিয়াছেন,

"Tamul Physicians say, It cures all veneral complaints and bites of venomous animals"

I. Arthur Thomson, M. A. স্বপ্রণীত প্রাণীতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকে (Outlines of Zoology) লিখিয়াছেন, যে সর্পদ্বারা আহত হওয়ার পর, তাহার পিত্তরস ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।—"It is interesting to notice a recent discovery, requiring amplification, that the bile of a poisonous snake is an antidote to its venom."

বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি পীড়ার আক্রমণ নিবারণ কিংবা নিরাকৃত করিবার জন্য টীকা লওয়ার পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ রোগের বীজাণু সূক্ষ্মমাত্রায় অন্য জীবদেহে প্রবেশ করাইয়া উহা হইতে উৎপন্ন বীজাণু কিংবা রসবিশেষ মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করান হয়। ইহা দ্বারা রোগের আক্রমণ নিবারিত কিংবা নিরাকৃত হইয়া থাকে। ক্ষিপ্ত কুক্কুর কিংবা শৃগালে দংশন করিলে কসৌলীতে এই প্রণালীতে চিকিৎসা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক-মতে সর্পাঘাতে মৃত্যু নিবারণের জন্য এইরূপ টীকার ব্যবস্থা আছে। একটী ঘোড়াকে সর্পদ্বারা দংশন করাইতে হয়। ঘোড়াটী কয়েকদিন রোগের যন্ত্রণা ভুগিয়া নিরাময় হইলে পুনরায় ঐ সর্পদ্বারা দংশন করাইতে হয়। এইরূপ ৩,৪ বার দংশন ও প্রতীকারের পর এই ঘোড়া হইতে serum গ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করাইলে উক্ত জাতীয় সর্পের দংশন হইতে জীবননাশের আশঙ্কা থাকে না। যে দেশে একজাতীয় সর্পের সমধিক উপদ্রব, সেখানে এই প্রণালী দ্বারা উপকার দর্শিত পারে।

ভারতবর্ষ, সিংহল, আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন-কোন অংশে এক প্রকার প্রস্তর সর্পাঘাত-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেনেণ্ট সাহেব (Sir James Emerson Tennent K. C. S., LL. D.) স্বপ্রণীত গ্রন্থবিশেষে এই প্রস্তরের বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রস্তর চেপটা, বাদামের আকৃতিবিশিষ্ট এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সর্পাহত ব্যক্তির ক্ষতমুখে এই প্রস্তর ৫।৬ মিনিট লাগাইয়া রাখিতে হয়। প্রস্তরখণ্ড ক্ষতমুখ হইতে রক্ত চুষিয়া কিছুক্ষণ পরে পড়িয়া যায়, তখন রোগীর কোনরূপ জীবনের আশঙ্কা থাকে না।

১৮৫৪ সালের মার্চ্চমাসে টেনেণ্ট সাহেবের একজন বন্ধু কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী সহ বিনটেনি সহরের নিকটবর্ত্তী অরণ্যের পার্শ্বস্থিত রাস্তা দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, দুইজন তামিল হঠাৎ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটি গোক্ষুর সর্প ধরিয়া আনিল। তৎপরে সাপটাকে চুপড়ীর মধ্যে রাখিবার সময় সাপটা

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার পর জনৈক বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলাম, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-প্রদেশের কোন এক সন্ন্যাসীর নিকট একটী যুবক সর্প-বিষের ঔষধ শিখিয়া তাহা পরীক্ষার্থ বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার পি, সি, রায় মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই ঔষধও পূর্ব্ব বর্ণিত ঘেঁটু ফুলের মূলের রস, এবং গোলমরিচসহ সেবন করিতে হয়। ডাক্তার পি, সি, রায় মহোদয় না কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই ঔষধ বিষঘ্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঘটনা সত্য হইলে, এই পরীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত-বৃদ্ধ ও বহুদর্শী ভদ্রলোকের উক্তি সমর্থিত হইতেছে।—প্রবন্ধ-লেখক।

এক ব্যক্তির হাতে ৩.৪ স্থানে কামড়াইয়া দেয়। ক্ষত হইতে প্রবল বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। অপর লোকটী তৎক্ষণাৎ দুইখানি সর্প-বিষের প্রস্তর ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিল, এবং আহত ব্যক্তির স্কন্ধ হইতে হস্ত পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। লোকটীর যন্ত্রণা শীঘ্রই কমিয়া গেল, এবং তাহারা সর্পটা লইয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল।

কেণ্ডীর ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিষ্টার লেভেলিয়ার ১৮৫৩ সালে টেনেণ্ট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, একবার তিনি একটি সাপুড়িয়াকে জঙ্গলে সর্প অন্বেষণ করিতে দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে গর্ত্ত হইতে একটী সর্প বাহির হইয়া তাহার উরুতে দংশন করে। লোকটা তৎক্ষণাৎ আহত স্থানে সর্প-প্রস্তর লাগাইয়া দেয়। ১০ মিনিট পরে ক্ষতস্থান হইতে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া যায়। তখন সে লেভেলিয়ার সাহেবকে বলে যে, তাহার জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই। এই ঘটনার পরে উক্ত লোকটাকে লেভেরিয়ার সাহেব অনেকবার সুস্থশরীরে দেখিয়াছিলেন।

টেনেণ্ট সাহেব এইরূপ একখানা প্রস্তর কয়েকবার ব্যবহৃত হওয়ার পর সংগ্রহ করিয়া সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফেরাডে (Faraday) মহোদয়ের নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। ফেরাডে সাহেব রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন, উহা একখণ্ড দগ্ধ অস্থিমাত্র। (a piece of charred bone) পর্য্যায়ক্রমে কয়েকবার উহা দ্বারা রক্ত শোষণ করিয়া উহাকে দগ্ধ করা হইয়াছে! প্রথমতঃ উত্তাপ প্রয়োগে উহা হইতে কতকটা জলীয়াংশ এবং এমোনিয়া বাহির হইয়া গেল। বায়ুতে আরও অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করা হইলে, উহার সমুদয় কার্ব্বন পুড়িয়া বাহির হইয়া গেল, এবং কেবলমাত্র প্রস্তরের আকারানুরূপ ভস্মাবশেষ পড়িয়া রহিল।

ডাক্তার ড্রেভি লিখিয়াছেন, মেনিলাবাসী সন্ন্যাসিগণ এই "প্রস্তর" প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করে। তিনি ইহার রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তদ্দারা ফেরাডে সাহেবের মত সমর্থিত হইয়াছে।

আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে ব্যবহৃত প্রস্তরের প্রস্তুত-প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে মিষ্টার হার্ডি থানবার্গের নিকট যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইল।

একটি হরিণ-শৃঙ্গের কিয়দংশ ঘাস দ্বারা জড়াইয়া তাহা একখণ্ড তামার পাতে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া কাঠ কয়লার অগ্নিতে ফেলিয়া দিতে হয়। আগুন নিভিয়া গেলে দেখা যায়, ঐ শৃঙ্গ অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। তখন উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। সর্পাঘাতের ক্ষতস্থান একটু চিরিয়া উহা লাগাইয়া নীচে একটি জলপাত্র রাখিতে হয়। কয়েক মিনিট পরে প্রস্তরখণ্ড জলের মধ্যে পড়িয়া যায়। তখন উহা নেকড়া দ্বারা শুষ্ক করিয়া ক্ষতস্থানে পুনরায় লাগাইতে হয়। একমিনিট পরেই উহা পুনর্ব্বার জলের মধ্যে পড়িয়া যায়। তখন উহা পূর্ব্বের ন্যায় বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শুষ্ক করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে হয়। কিন্তু এবার প্রায় লাগাইবামাত্রই পড়িয়া যায়। মেক্সিকো প্রদেশে অপারস্থরা নামক নগরে একটি লোককে রেটল সর্পে দংশন করিয়াছিল। হার্ডি সাহেব স্বয়ং তাহাকে এই প্রণালীতে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছেন।

এতদ্দেশে নকুল ও সর্পের যুদ্ধ অনেকেই দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ নকুল সর্পের প্রবল শত্রু; সর্প দেখিলেই আক্রমণ করে, এবং অধিকাংশ স্থলে সর্প হারিয়া যায়। অনেকে সর্পের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নকুল পুষিয়া থাকেন।

বিষ নামাইবার সময় ওঝাগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার আধ্যাত্মিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা জানি না। দর্শক-দিগের কোলাহল ও ব্যস্ততা নিবারণ করিয়া স্থিরভাবে ও একাগ্রচিত্তে কাজ করিবার জন্য, শ্রম-লাঘবের হেতু এবং রোগী ও অন্যান্য ব্যক্তির মনে ভরসা ও বিশ্বাস সঞ্জাত করিবার নিমিত্ত, মন্ত্রোচ্চারণের দরকার হইতে পারে। রোগীকে গামোছা দ্বারা প্রহার করা, ঝাড়া, চাপ দেওয়া, বসান, দাঁড় করান প্রভৃতি দ্বারা রক্ত সঞ্চালন ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালন কার্য্য সাধিত হয়।

উপসংহারে নিবেদন এই, যাঁহারা এরিষ্টলোকিয়া, এবং সর্পবিষের অন্যান্য ঔষধ সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য অবগত আছেন, এবং যিনি যখন যেরূপ ঔষধের সন্ধান পান, তাহা দেশের ও দশের উপকারার্থ প্রকাশিত করিবেন। এই সমুদয় ঔষধ যথার্থ ফলপ্রদ বলিয়া সপ্রমাণ হইলে জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে। যে সকল পাঠক-পাঠিকা তাঁহাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধৈর্য্য-সহকারে এই প্রবন্ধ পাঠ সমাপন করিলেন, তাঁহারা এই অযোগ্য লেখকের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

"ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল।"

'গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহিমের পরম বন্ধু ছিল সুরেশ। একসঙ্গে এফ-এ পাশ করার পর সুরেশ গিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইল; কিন্তু মহিম তাহার পুরাতন সিটি কলেজেই টিকিয়া রহিল।

সুরেশ অভিমানক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিল, "মহিম, আমি বার-বার বলিতেছি, বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া কোন লাভ হইবে না। এখনও সময় আছে; তোমারও মেডিক্যাল কলেজেই ভর্ত্তি হওয়া উচিত।"

মহিম সহাস্যে কহিল, "হওয়া ত উচিত; কিন্তু, খরচের কথাটাও ত ভাবা উচিত।"

"খরচ এমনই কি বেশি যে, তুমি দিতে পার না? তা'ছাড়া তোমার স্কলারশিপও আছে।" মহিম হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ অধীর হইয়া কহিল, "না, না, —হাসি নয়, মহিম, আর দেরী করিলে চলিবে না, তোমাকে এরই মধ্যে আসিয়া এ্যাডমিশন লইতে হইবে, তা' বলিয়া দিতেছি। খরচপত্রের কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে।"

মহিম কহিল, "আচ্ছা।"

সুরেশ বলিল, "দেখ মহিম, কোন্‌টা যে তোমার সত্যকারের আচ্ছা, আর কোন্‌টা নয়—তাহা আজ পর্য্যন্ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু, পথের মধ্যে তোমাকে সত্য করাইয়া লইতে পারিলাম না, কারণ, আমার কলেজের দেরি হইতেছে। কিন্তু, কাল-পর্শু'র মধ্যে এর যা-হোক একটা কিনারা না করিয়া আমি ছাড়িব না। কাল সকালে বাসায় থেকো, আমি যাব।" বলিয়া সুরেশ তাহার কলেজের পথে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দিন পনের কাটিয়া গেছে। কোথায় বা মহিম, আর কোথায় বা তাহার মেডিক্যাল কলেজে এ্যাড্‌মিশন লওয়া! একদিন রবিবারের দুপুরবেলায় সুরেশ বিস্তর খোঁজা-খুঁজির পর একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল। সোজা উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিল, সুমুখের একটা অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে ঘরের মেজের উপর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কুশাসন পাতিয়া ছয়সাতজন ছাত্র আহারে বসিয়াছে। মহিম মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া কহিল, "হঠাৎ বাসা বদ্‌লাইতে হইল বলিয়া তোমাকে সংবাদ দিতে পারি নাই; সন্ধান করিলে কি করিয়া?" সুরেশ তাহার কোন উত্তর না দিয়া ধপ্‌ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল, এবং একদৃষ্টে ছেলেদের আহার্য্যের প্রতি চাহিয়া রহিল। অত্যন্ত মোটা চালের অন্ন; জলের মত কি একটা দাল; শাক, ডাঁটা এবং কচু দিয়া একটা তরকারি, এবং তাহারই পাশে দু'টুক্‌রা পোড়া-পোড়া কুম্‌ড়া-ভাজা। দধি নাই, দুগ্ধ নাই, কোন প্রকার মিষ্ট নাই; এক টুক্‌রা মাছ পর্য্যন্ত কাহারও পাতে পড়িল না।

সকলের সঙ্গে মহিম অম্লান-মুখে, নিরতিশয় পরিতৃপ্তির সহিত এইগুলি ভোজন করিতে লাগিল। কিন্তু চাহিয়া-চাহিয়া সুরেশের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে কোন-মতে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সামান্য কারণেই সুরেশের চোখে জল আসিয়া পড়িত।

আহারান্তে মহিম তাহার ক্ষুদ্র শয্যার উপর আনিয়া বন্ধুকে যখন বসাইল, তখন সুরেশ রুদ্ধস্বরে কহিল, "বার-বার তোমার অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না মহিম।"

মহিম নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

সুরেশ কহিল, "তার মানে—এমন কদর্য্য বাড়ী যে সহরের মধ্যে থাকিতে পারে, এমন ভয়ানক বিশ্রী খাওয়াও যে কোন মানুষ মুখে দিতে পারে, চক্ষে না দেখিলে এ আমি কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তা সে যাই হোক, এ যায়গার তুমি সন্ধান পাইলেই বা কিরূপে, আর তোমার সাবেক বাসা—তা সে যত মন্দই হোক, ইহার সহিত তুলনাই হয় না,—তাই বা পরিত্যাগ করিলে কেন?"

বন্ধু-স্নেহ বন্ধুর বুকে আঘাত করিল। মহিম আর তাহার নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারিল না; আর্দ্র-স্বরে কহিল, "সুরেশ, তুমি আমার গ্রামের বাড়ী দেখ নাই;

তা হইলে বুঝিতে, এ বাসায় আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইতে পারে না। আর খাওয়া,—আরও পাঁচজন ভদ্রসন্তান যাহা সচ্ছন্দে খাইতে পারে, আমি পারিব না কেন?"

সুরেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এ কেনর কথা নয়। ভাল-মন্দ জিনিস সংসারে অবশ্যই আছে। ভাল ভালই লাগে, মন্দ যে মন্দ লাগে তাহাতে আর সংশয় নাই। আমি শুধু জানিতে চাই, তোমার এত দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি হইয়াছে?"

মহিম চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল—কথা কহিল না।

সুরেশ কহিল, "তোমার প্রয়োজন তোমার থাক্, আমি জানিতে চাহি না। কিন্তু, আমার প্রয়োজন তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়া। আমি গাড়ী ডাকিয়া তোমার জিনিস-পত্র এখনই আমাদের বাড়ী লইয়া যাইব। এখানে তোমাকে ফেলিয়া রাখিয়া যদি যাই,—চোখে আমার ঘুম আসিবে না, মুখে অন্ন রুচিবে না। তোমাদের বাসার চাকরকে ডাক, একটা গাড়ী লইয়া আসুক।" বলিয়া সুরেশ মহিমকে টানিয়া তুলিয়া স্বহস্তে তাহার বিছানা গুটাইতে প্রবৃত্ত হইল।

মহিম বাধা দিয়া টানা-হেঁচ্‌ড়া বাধাইয়া দিল না। কিন্তু শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, "পাগ্‌লামি করিয়ো না, সুরেশ।"

সুরেশ চোখ্ তুলিয়া কহিল, "পাগ্‌লামি কিসের? তুমি যাবে না?"

"না।"

"কেন যাবে না? আমি কি তোমার কেহ নই? আমার বাড়ী যাওয়ায় কি তোমার অপমান হবে?"

"না।"

"তবে?"

মহিম কহিল, "সুরেশ, তুমি আমার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নাই; সংসারে এমন আর কয়জনের আছে, তাহাও জানি না। এতকাল পরে এ বস্তু আমি একটুখানি দেহের আরামের জন্য খোয়াইয়া বসিব, আমাকে কি তুমি এত বড়ই নির্ব্বোধ পাইয়াছ?"

সুরেশ কহিল, "বন্ধুত্ব জিনিসটি তোমার ত একার নয় মহিম। আমারও ত তা'তে একটা ভাগ আছে। খোয়া যদি যায়, সে ক্ষতি যে কত বড়, তাহা বুঝিবার সাধ্য আমার নাই—আমি কি এতই বোকা? আর, এত সতর্ক-সাবধান, এত হিসাবপত্র করিয়া না চলিলেই এ বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হইয়া যায় ত যাক্ না মহিম। এমনই কি তার মূল্য যে, সে জন্য শরীরের আরামটাকে উপেক্ষা করিতে হইবে!"

মহিম হাসিয়া বলিল, "না, এবার হারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে নিশ্চয় জানাইতেছি সুরেশ। তুমি মনে করিয়াছ—সখ করিয়া দুঃখ সহিতে আমি এখানে আসিয়াছি, কিন্তু তাহা সত্য নয়।"

সুরেশ কহিল, "বেশ ত, সত্য নাই হইল। আমি কারণ জানিতেও চাহি না;—কিন্তু যদি টাকা বাঁচানই তোমার উদ্দেশ্য হয়, আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাক না—তাহাতে ত তোমার উদ্দেশ্য মাটি হইয়া যাইবে না।"

মহিম ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে কহিল, "এখন থাক্ সুরেশ। কষ্ট যদি সত্যই হয়, তোমাকে জানাইব।"

সুরেশ জানিত, মহিমকে তাহার সঙ্কল্প হইতে টলানো অসাধ্য। সে আর জিদ্ না করিয়া একরকম রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু বন্ধুর এই থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থাটা চোখে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে সূচ বিঁধিতে লাগিল।

সুরেশ ধনীর সন্তান এবং মহিমকে সে অকপটে ভালবাসিত। তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, কোনমতে সে বন্ধুর একটা কিছু কাজে লাগে। কিন্তু, মহিমকে সে কোনদিন কোন সাহায্য লইতেই স্বীকার করাইতে পারে নাই,—আজিও পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বছর পাঁচেক পরে দুই বন্ধুতে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

সুরেশ—"তোমার উপর আমার যে কত বড় শ্রদ্ধা ছিল মহিম, তাহা বলিতে পারি না।"

মহিম—"বলিবার জন্য তোমাকে ত পীড়াপীড়ি করিতেছি না, সুরেশ।"

সুরেশ—"সে শ্রদ্ধা বুঝি আর থাকে না।"

মহিম—"না থাকিলে তোমাকে দণ্ড দিব, এরূপ ভয় ত কখনও দেখাই নাই।

সুরেশ—"তোমাকে কপটতা দোষ দিতে তোমার অতি-বড় শত্রুও কখনো পারিত না।"

মহিম—"শক্র পারিত না বলিয়া কাজটা যে মিত্রও পারিবে না, দর্শন-শাস্ত্রের এমন অনুশাসন ত নাই।"

সুরেশ—"ছি ছি, শেষকালে কি না একটা ব্রাহ্ম মেয়ের কাছে ধরা দিলে? কি আছে ওদের? ঐ ত শুক্‌নো কাঠপানা চেহারা, বই মুখস্ত করিয়া করিয়া গায়ে কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পর্য্যন্ত যেন নাই। ঠেলা দিলে আধখানা দেহ খসিয়া পড়িবে বলিয়া ভয় হয়—গলার স্বরটা পর্য্যন্ত এম্‌নি চিঁচিঁ করে যে শুনিলে ঘৃণা হয়।"

মহিম—"তা' হয় সত্য।"

সুরেশ—"দেখ মহিম, ঠাট্টা করগে তোমাদের পাড়া-গাঁয়ের লোককে, যে, ব্রাহ্ম-মেয়ে কখনো চোখে দেখে নাই; মেয়েমানুষ ইংরাজীতে ঠিকানা লিখিতে পারে শুনিলে যাহারা আশ্চর্য্যে অবাক্ হইয়া যায়,—তিনি চলিয়া গেলে যাহারা সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দাওগে তোমার গ্রামের লোককে, যাহারা ইঁহাকে একটা দেব-দেবী মনে করিয়া মাথা লুটাইয়া দিবে। কিন্তু আমাদের বাড়ী ত পাড়াগাঁয়ে নয়—আমাদের ত অত সহজে ভুলানো যায় না।"

মহিম—"আমি তোমাকে শপথ করিয়া বলিতেছি সুরেশ, তোমাদের সহরের লোককে ভুলাইবার আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই। আমি তাঁকে আমাদের পাড়াগাঁয়ে লইয়াই রাখিব। তাহাতে ত তোমার আপত্তি নাই?"

সুরেশ রাগিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, "আপত্তি নাই? শত, সহস্র, লক্ষ, কোটী আপত্তি আছে। তুমি সমস্ত জগতের বরেণ্য, পূজনীয় হিন্দুর সন্তান হইয়া কি না একটা রমণীর মোহে জাত দিবে? মোহ! একবার তার জুতা-মোজা, সৌখীন পোষাক ছাড়াইয়া লইয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের রাঙা শাড়ীখানি পরাইয়া দেখ দেখি, মোহ কাটে কি না! তখন ঐ নির্জ্জীব কাঠের পুতুলটার রূপ দেখিয়া তোমার ভুল ভাঙে কি না! কি আছে তার? কি পারে সে? বেশ ত, তোমার যদি সেলাই আর পশমের কাজেই এত দরকার, কলিকাতা সহরে দর্জ্জির ত অভাব নাই! একখানা চিঠির ঠিকানা লিখাইবার জন্য ত তোমাকে ব্রাহ্ম মেয়ের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। তোমার অসময়ে সে কি বাটনা বাঁটিয়া, কুট্‌না কুটিয়া তোমাকে এক মুঠা ভাত রাঁধিয়া দিবে? রোগে তোমার কি সেবা করিবে? সে শিক্ষা কি তাঁহাদের আছে? ভগবান না করুন, কিন্তু সে দুঃসময়ে সে যদি না তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসে, ত আমার সুরেশ নামের বদলে যা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিয়ো, আমি দুঃখ করিব না।"

মহিম চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ পুনরায় কহিতে লাগিল, "মহিম, তুমি ত জানো, আমি তোমার মঙ্গল ভিন্ন কখনো ভুলিয়াও অমঙ্গল-কামনা করিতে পারি না। আমি অনেক ব্রাহ্ম মহিলা দেখিয়াছি। দুই-একটি ভালও যে দেখি নাই, তাহা নয়; কিন্তু, আমাদের হিন্দুঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁহাদের তুলনাই হয় না। তোমার বিবাহেই যদি প্রবৃত্তি হইয়াছিল, আমাকে বলিলে না কেন? আচ্ছা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; আর তোমার সেখানে গিয়া কাজ নাই। আমি কথা দিতেছি, এক মাসের মধ্যে তোমাকে এমন কন্যা বাছিয়া দিব যে, জীবনে কখনো দুঃখ পাইতে হইবে না। যদি না পারি, তখন না হয় তোমার যা ইচ্ছা করিয়ো—ইহার শ্রীচরণেই মাথা মুড়াইয়ো, আমি বাধা দিব না। কিন্তু, এই একটা মাস তোমাকে ধৈর্য্য ধরিয়া আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। বল রাখিবে?"

মহিম পূর্ব্ববৎ মৌন হইয়া রহিল,—হাঁ, না, কোন কথাই কহিল না। কিন্তু, বন্ধু যে বন্ধুর শুভকামনায় কিরূপ মর্ম্মান্তিক বিচলিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিল।

সুরেশ কহিল, "মনে করিয়া দেখ দেখি, মহিম, ব্রাহ্ম না হইয়াও তুমি যখন প্রথম ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াত সুরু করিলে, তখন কি তোমাকে বারংবার নিষেধ করি নাই? তোমার জন্য এত বড় এই কলিকাতা সহরের মধ্যে কি একটাও হিন্দু-মন্দির ছিল না যে, এই কপটতার কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল? এম্‌নিতর একটা-না-একটা বিড়ম্বনার ভিতরে যে অবশেষে জড়াইয়া পড়িবে, আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম।"

মহিম এবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, "তা' যেন করিয়াছিলে; কিন্তু আমি ত করি নাই যে, আমার যাওয়ার মধ্যে কপটতা ছিল? কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুরেশ, তুমি ত নিজে ভগবান পর্য্যন্ত মান না যে, হিন্দুর ঠাকুর-দেবতা মানিবে! আমি ব্রাহ্মের মন্দিরেই যাই, আর হিন্দুর মন্দিরেই যাই, তাহাতে তোমার কি আসে-যায়!"

সুরেশ দৃপ্তস্বরে কহিল, "যাহা নাই, তাহা আমি মানি না। ভগবান নাই, ঠাকুর দেবতা মিছে কথা। কিন্তু যাহা আছে,

তাহাদের ত অস্বীকার করি না! সমাজকে আমি শ্রদ্ধা করি, মানুষকে পূজা করি। আমি জানি, মানুষের সেবা করাই মনুষ্য-জন্মের চরম সার্থকতা। যখন হিন্দুর বংশে জন্মিয়াছি, তখন হিন্দু-সমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ। আমি প্রাণান্তে তোমাকে ব্রাহ্ম-ঘরে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মের দল-পুষ্টি করিতে দিব না। কেদার মুখুয্যের মেয়েকে বিবাহ করিবে বলিয়া কি কথা দিয়াছ?"

মহিম—"না, কথা যাহাকে বলে, তাহা এখনও দিই নাই।"

সুরেশ—"দাও নাই ত? বেশ। তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাক গে; আমি এই মাসের মধ্যেই তোমার বিবাহ দিয়া দিব।"

মহিম—"আমি বিবাহের জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছি, তোমাকে কে বলিল? তুমিও চুপ করিয়া বসিয়া থাক গে; আর কোথাও বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

সুরেশ—"কেন অসম্ভব? কি করিয়াছ? এই স্ত্রীলোকটাকে ভালবাসিয়াছ?"

মহিম—"আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু, এই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সহিত কথা বল সুরেশ।"

সুরেশ—"সম্ভ্রমের সহিত কথা বলিতে আমি জানি, তোমাকে শিখাইতে হইবে না। আমি সম্ভ্রান্ত মহিলাটির বয়স কত জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

মহিম—"জানি না।"

সুরেশ—"জান না? কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ কিম্বা আরও বেশি—কিছুই জান না?"

মহিম—"না।"

সুরেশ—"তোমার চেয়ে ছোট, না বড়--তাহাও বোধ করি জান না?"

মহিম—"না।"

সুরেশ—"যখন তোমাকে ফাঁদে ফেলিয়াছেন, তখন নিতান্ত কচি হবেন না,—অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত নয়। কি বল?"

মহিম—"না, তোমার পক্ষে কিছুই অসঙ্গত নয়। কিন্তু, আমার এখন একটু কাজ আছে সুরেশ, একবার বাহিরে যাইতে চাই।"

সুরেশ কহিল, "বেশ ত মহিম, আমারও এখন কিছু কাজ নাই,—চল তোমার সঙ্গেই একটু ঘুরিয়া আসি।"

দুই বন্ধুই পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলার পর সুরেশ ধীরে-ধীরে কহিল, "তোমাকে আজ যে ইচ্ছা করিয়াই ব্যথা দিলাম, এ কথা বোধ করি বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই?"

মহিম কহিল, "না।"

সুরেশ তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন দিলাম মহিম।"

মহিম হাসিল। কহিল, "পূর্ব্বেরটা যদি না বুঝাইলেও বুঝিয়া থাকি, আশা করি এটাও তোমাকে বুঝাইতে হইবে না।"

তাহার একটা হাত সুরেশের হাতের মধ্যে ধরা ছিল। সুরেশ আর্দ্রচিত্তে তাহাতে ঈষৎ একটু চাপ দিয়া বলিল, "না, মহিম তোমাকে বুঝাইতে চাহি না। সংসারে সবাই ভুল বুঝিতে পারে, কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না। তবুও আজ আমি তোমার মুখের উপরেই বলিতেছি, তোমাকে আমি যত ভালবাসিয়াছি তুমি তার অর্দ্ধেকও পার নাই। তুমি গ্রাহ্য কর না বটে, কিন্তু তোমার এতটুকু ক্লেশও আমি কোন দিন সহিতে পারি না। ছেলেবেলায় এই লইয়া কত ঝগড়া হইয়া গেছে, একবার মনে করিয়া দেখ। এখন, এতকাল পরে যার জন্য আমাকেও পরিত্যাগ করিতেছ, মহিম, তাঁকে লইয়াই জীবনে সুখী হইবে, যদি নিশ্চয় জানিতাম, আমার সমস্ত দুঃখ আমি হাসিমুখে সহ্য করিতে পারিতাম; কখনও একটা কথা কহিতাম না।"

মহিম কহিল, "তাঁকে লইয়া সুখী না হইতে পারি, কিন্তু, তোমাকে ত্যাগ করিব কেমন করিয়া জানিলে?"

সুরেশ—"তুমি কর, বা, না কর, আমি তোমাকে ত্যাগ করিব।"

মহিম—"কেন? আমি ত তোমার ব্রাহ্ম-বন্ধু হইতেও পারিতাম।"

সুরেশ—"না, কোনমতেই না। ব্রাহ্মদের আমি দু'-চক্ষে দেখিতে পারি না—আমার ব্রাহ্ম-বন্ধু একটিও নাই।"

মহিম—"তাহাদের দেখিতে পার না কেন?"

সুরেশ—"অনেক কারণ আছে। একটা এই যে, যাহারা আমাদের সমাজকে মন্দ বলিয়া ফেলিয়া গেছে, তাহাদিগকে ভাল বলিয়া আমি কোনমতেই কাছে টানিতে পারি না।

তুমি ত জান, আমাদের সমাজের প্রতি আমার কত মমতা। সে সমাজকে যাহারা দেশের কাছে, বিদেশের কাছে, সকলের কাছে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহাদের ভাল তাহাদের থাক্‌, আমার তাহারা শত্রু।"

মহিম মনে-মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল; কহিল, "এখন কি করিতে বল তুমি?"

সুরেশ কহিল, "তাহাই ত এতক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত বলিতেছি।"

মহিম—"আচ্ছা, আরও একবার বল।"

সুরেশ—"এই যুবতীটির মোহ তোমাকে যেমন করিয়া হোক্‌ কাটাইতে হইবে। অন্ততঃ একটা মাস দেখা করিতে পারিবে না।"

মহিম—"কিন্তু তাতেও যদি না কাটে? যদি মোহের বড় আরও কিছু থাকে?"

সুরেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "ও সব আমি বুঝি না মহিম। আমি বুঝি, তোমাকে ভালবাসি; এবং আরও কত বেশী ভালবাসি আমার আপনার সমাজকে। তবে, একটিবার ভাবিয়া দেখো, তোমার ছেলেবেলার সেই বসন্তের কথাটা, আর মুঙ্গেরের গঙ্গায় নৌকা ডুবিয়া যখন দুজনেই মরিতে বসিয়াছিলাম। বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিলাম বলিয়া আমাকে মাপ করিয়ো মহিম। আমার আর কিছু বলিবার নাই, আমি চলিলাম।" বলিয়া সুরেশ অত্যন্ত অকস্মাৎ দ্রুতবেগে পিছন ফিরিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুরেশের একদিকে গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, অন্যদিকে অন্তরটা ছিল তেম্‌নি কোমল, তেম্‌নি স্নেহশীল। পরিচিত-অপরিচিত কাহারও কোন দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে, তাহার কান্না আসিত। সে ছেলেবেলায় কখনো একটা মশা-মাছি পর্য্যন্ত মারিতে পারিত না। জৈন মাড়ওয়ারীদের দেখাদেখি, কতদিন সে পকেট-ভরিয়া সুজি এবং চিনি লইয়া, ইস্কুল কামাই করিয়া, গাছতলায়-গাছতলায় ঘুরিয়া পিপীলিকা-ভোজন করাইয়াছে। জীবনে কতবার যে মাছ-মাংস ছাড়িয়াছে এবং ধরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য কি করিয়া যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্কুলে মহিম ছিল ক্লাসের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল ছেলে। অথচ, তাহার গায়ের জামা-কাপড় ছেঁড়া-খোঁড়া, পায়ের জুতা জীর্ণ, পুরাতন, দেহটি শীর্ণ, মুখখানি ম্লান;—এই সব দেখিয়াই সে তাহার প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এবং, অত্যল্প কালের মধ্যেই উভয়ের এই আকর্ষণ বন্যার জলের মত এম্‌নি বাড়িয়া উঠে, যে, সমস্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের তাহা একটা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। মহিম ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, এই চারিটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসে, এবং স্বগ্রামস্থ একজন মুদীর দোকানে থাকিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এই সময় হইতেই সুরেশ অনেক প্রকারে বন্ধুকে নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিবার চেষ্টা করে; কিন্তু, কিছুতেই তাহাকে রাজী করাইতে পারে নাই। এইখানে থাকিয়াই মহিম কোনদিন আধপেটা খাইয়া, কোনদিন উপবাস করিয়া এণ্ট্রান্স পাশ করে। ইহার পরের ঘটনা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই দিন হইতে সপ্তাহ মধ্যে সুরেশ মহিমের দেখা না পাইয়া, তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ কি একটা পর্ব্ব-উপলক্ষে স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। বাসায় আসিয়া শুনিল, মহিম সেই যে সকালে বাহির হইয়াছে, এখনো ফিরে নাই। সে যে পটলডাঙ্গার কেদার মুখুয্যের বাটীতেই ছুটির দিনটা কাটাইতে গিয়াছে, সুরেশের তাহাতে সংশয়-মাত্র রহিল না।

যে নির্লজ্জ বন্ধু তাহার আশৈশব সখ্যের সমস্ত মর্য্যাদা সামান্য একটা স্ত্রীলোকের মোহে বিসর্জ্জন দিয়া সাতটা দিনও ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না—ছুটিয়া গেল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের বহ্নি সুরেশের বুকের মধ্যে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল বিচার না করিয়াই, গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া, সোজা পটলডাঙ্গার দিকে হাঁকাইতে কোচমানকে হুকুম করিয়া দিল। এবং মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'ওরে বেহায়া! ওরে অকৃতজ্ঞ! তোর যে প্রাণটা আজ এই স্ত্রীলোকটাকে দিয়া ধন্য হয়েছিস, সে প্রাণটা তোর থাকিত কোথায়? নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দুই-দুইবার কে তোকে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে? তাহার কি এতটুকু সম্মানও রাখিতে নাই রে!'

কেদার মুখুয্যের বাড়ীর গলিটা সুরেশের জানা ছিল,

সামান্য দুই একটা জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা গাড়ী ঠিক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অবতরণ করিয়া সুরেশ বেহারাকে প্রশ্ন করিয়া সোজা উপরে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নীচে ঢালা-বিছানার উপর একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে-ছিলেন; তিনি চাহিয়া দেখিলেন। সুরেশ নমস্কার করিয়া নিজের পরিচয় দিল—"আমার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়,—আমি মহিমের বাল্য-বন্ধু।"

বৃদ্ধ প্রতি-নমস্কার করিয়া চসমাটি মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, "বসুন।"

সুরেশ আসন গ্রহণ করিয়া কহিল, "মহিমের বাসায় আসিয়া শুনিলাম, সে এইখানেই আছে; তাই মনে করিলাম, এই সুযোগে মহাশয়ের সঙ্গেও একবার পরিচিত হইয়া যাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য—আপনি আসিয়াছেন। কিন্তু মহিমও এদিকে দশ-বারোদিন আসেন নাই। আমরা আজ সকালেও ভাবিতেছিলাম, কি জানি তিনি কেমন আছেন।"

সুরেশ মনে-মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কিন্তু তার বাসার লোক যে বল্‌লে—"

বৃদ্ধ কহিলেন, "আর কোথাও গেছেন বোধ হয়। যা'-হোক, ভাল আছেন শুনিয়া নিশ্চিন্ত হলেম।"

পথে আসিতে-আসিতে সুরেশ যে সকল উদ্ধত সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বৃদ্ধের সম্মুখে তাহাদের ঠিক রাখিতে পারিল না। তাঁহার শান্ত মুখের ধীর মৃদু কথাগুলি তাহার ভিতরের উত্তাপ অনেক পরিমাণে শীতল করিয়া দিল। তথাপি সে নিজের কর্ত্তব্যও বিস্মৃত হইল না। সে মনে-মনে এই বলিয়া নিজেকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, যে, ইনি যত ভালই হোন, ব্রাহ্ম ত বটে। সুতরাং ইঁহার সমস্ত শিষ্টাচারই কৃত্রিম। ইহারা এম্‌নি করিয়াই নির্ব্বোধ ভুলাইয়া নিজেদের কাজ আদায় করিয়া লয়। অতএব, এই সমস্ত শিকারী প্রাণীদের সম্মুখে কোনমতেই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কাজ ভুলিলে চলিবে না;—যেমন করিয়াই হোক, ইহাদের গ্রাস হইতে বন্ধুকে মুক্ত করিয়া লইতে হইবে। সে কাজের কথা পাড়িল; কহিল, "মহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু। এমন বন্ধু আমার আর নাই। যদি অনুমতি করেন, তাঁর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দুই একটা কথার আলোচনা করি।"

বৃদ্ধ একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। আপনার নাম আমি তাঁর মুখেও শুনেছি।"

সুরেশ কহিল, "মহিমের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ কি স্থির হইয়া গেছে?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "হাঁ, সে একরকম স্থির বই কি।"

সুরেশ কহিল, "কিন্তু মহিম ত আপনাদের ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত নয়। তবুও বিবাহ দিবেন?"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন। সুরেশ কহিল, "আচ্ছা, সে কথা এখন থাক। কিন্তু তাহার কিরূপ সঙ্গতি, স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা আছে কি না, পাড়াগাঁয়ে বিরুদ্ধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে, ভাঙা মেটে বাড়ীর মধ্যে আপ-নার কন্যা বাস করিতে পারিবেন কি না, না পারিলে তখন মহিম কি উপায় করিবে, এই সকল চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি?"

বৃদ্ধ কেদার মুখুয্যে একেবারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "কই এ সকল ব্যাপার ত আমি শুনি নাই। মহিম কোনদিন ত এ সব কথা বলেন নাই?"

সুরেশ কহিল, "কিন্তু আমি এ সকল চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, মহিমকে বলিয়াছি, এবং আজ এই সকল অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার জন্যই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনার কন্যার বিষয় আপনি চিন্তা করিবেন; কিন্তু আমার পরম বন্ধু যে এই দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া অসহ্য ভারে চিরদিন জীবন্মৃত হইয়া থাকিবেন, সে ত আমি কোন মতেই ঘটিতে দিতে পারি না।"

কেদার পাংশুমুখে কহিলেন, "আপনি বলেন কি সুরেশ বাবু?"

"বাবা?" একটি সতেরো-অঠারো বছরের মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া পিতার কাছে একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

"কে, অচলা? এস মা, বোস। লজ্জা কি মা; ইনি আমাদের মহিমের পরম বন্ধু।"

মেয়েটি একটুখানি অগ্রসর হইয়া গড় হইয়া সুরেশকে প্রণাম করিল। সুরেশ দেখিল, মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপ্‌ছিপে পাত্‌লা গঠন। কপোল, চিবুক, ললাট—সমস্ত

মুখের ডোলটিই অতিশয় সুশ্রী এবং সুকুমার। চোখ-দুটির দৃষ্টিতে একটি স্থির-বুদ্ধির আভা। প্রণাম করিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল। সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া চক্ষের পলকে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন, "মহিমের ব্যাপারটা শুনিয়াছ মা? আমরা ভাবিয়া মরিতেছিলাম, সে আসে না কেন? ঐ শোন! ইনি তার পরম বন্ধু বলিয়াই ত কষ্ট করিয়া জানাইতে আসিয়াছিলেন, না হইলে কি হইত বল ত? কে জানিত, সে এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন মিথ্যাবাদী! তাহার পাড়াগাঁয়ে শুধু একটা মেটে ভাঙা বাড়ী। তোমাকে খাওয়াইবে কি—তাহার নিজেরই মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান নাই। উঃ—কি ভয়ানক! এমন লোকের মনের মধ্যেও এত বিষ ছিল! অ্যাঁ!"

কথা শুনিয়া অচলার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। কিন্তু সুরেশের সমস্ত মুখের উপর কে যেন কালী লেপিয়া দিল। সে নির্ব্বাক কাঠের পুতুলের মত মেয়েটির পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।　　　[ক্রমশঃ]

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ*

[মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী]

"সাজাইতে মাতৃভাষা,　　　সদা যা'র মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর,　　　মুছাতে নয়ননীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ মর্ত্ত-ধরণী 'পরে অমর সমান॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া, মাতৃভাষার চরণ-কমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, নানা রোগ-জর্জ্জর বঙ্গভূমির প্রিয় সন্তানবৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন-আপন সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেই-টুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে, মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে, বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে, অদূর-ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেন না, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া, বঙ্গভাষা এই প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জনগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী-হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নপর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিক-তররূপে আরব্ধ করিতে হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকে বলেন, "এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে-বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে? এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালাভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি?"—ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে

* বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

দশ বৎসর বা দশশত বৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায়, উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঔদাসীন্যে চলিবে না। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই, এক হিসাবে তাহার কিছুই নাই; সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালীজাতির যদি জগতে কালজয়ী হইবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য, বৎসরে একবার কেন, যদি প্রয়োজন বুঝা যায়, একাধিকবারও এতাদৃশ সম্মিলনের অধিবেশন অনভিপ্রেত নহে। চাই উৎসাহ, চাই উদ্যম। আমার মাতৃভাষাকে জগতের বরণীয় করিয়া তুলিব,—একা আমি নহি, আর-দশজনেও যাহাতে আমার মাকে 'মা' বলিতে পারিলে, নিজেকে ধন্য, কৃতার্থস্মন্য মনে করিবে, এমনভাবে আমার মাকে গড়িয়া তুলিব,—প্রাচ্য-প্রতীচ্য-নির্ব্বিশেষে আমার মার অধিকার প্রসৃত হইবে,—এইরূপ ধারণা লইয়া যদি আমরা কাজ করিতে পারি, তবে, আজ যাহা স্বপ্ন বা একান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা করস্থ আমলকবৎ হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং, যাহাতে বঙ্গবাসীর মনে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার স্পৃহা সতত জাগরূক থাকে, তজ্জন্য, এবং মধ্যে-মধ্যে বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণের প্রীতিপ্রণয়ের আদান-প্রদানের জন্য, এইরূপ সম্মিলন যে একান্ত আবশ্যক, ইহা অবিসংবাদে বলা যাইতে পারে।

বাঁকিপুর দশম সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ সেই মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। যে স্থানে একদিন ভারতের তদানীন্তন একচ্ছত্র সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বানপূর্ব্বক মগধের স্মরণীয় মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন,—যে পাটলী-পুত্রের পুরাচিহ্নসমূহের সামান্য একটু অংশ-প্রাপ্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ সতত উদ্গ্রীব, ভারতের নবীন ইতিহাসের প্রতি পত্রে যে প্রাচীন নগরের স্মৃতি বিজড়িত থাকিবে,—সেই পাটলীপুত্রে আজ বঙ্গের সারস্বতসেবকগণ সম্মিলিত হইয়াছেন,—ইহা বাঙ্গালীর বিশেষ শ্লাঘার কথা, এবং অদ্যকার এই দিন,—বঙ্গবাসীর তথা বঙ্গের ভবিষ্য জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় বস্তু। পার্থিব ব্যাপারে আজ বঙ্গ এবং বিহারের মানচিত্র পৃথগ্‌ভূত হইলেও, অপার্থিব সারস্বত ব্যাপারে এই উভয় প্রদেশই যে একসূত্রে গ্রথিত, অদ্যকার এই সম্মিলন তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এই জাতীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্বে-পূর্ব্বে যে সকল মনস্বী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির পরিচয় নূতন করিয়া আমি আর কি দিব? সেই সকল সুযোগ্য সাহিত্যরথিগণের স্পৃহনীয় আসনে আপনারা আমাকে বসাইয়া সেই মহার্হ আসনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে আমাকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এইরূপ কার্য্যে, বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মহাসম্মিলনে, আমি সভাপতিরূপে কার্য্য করিব। আমি সাহিত্যিক নহি, বঙ্গবাণীর সেবকগণের যে গৌরব, আমি তাহার ভাজন হইবার যোগ্য নহি, ইহা আমি যতটা জানি, এবং বুঝি, বোধ হয় অন্যে ততটা জানেন না, বা বুঝেন না। বঙ্গের যে সকল কৃতী সন্তান প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণে এবং নিঃস্বার্থ-ভাবে বঙ্গভারতীর অর্চ্চনা করেন, সেই সকল মহাত্মার কোন কাজে, কোন উপকারে আমি আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে চরিতার্থ হই। সভাগণ, আপনারা আমাকে সে সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছেন। সাহিত্য-সাধকগণের সেবা করিতে যাহার অভিলাষ, তাহাকে সাহিত্য-সাধন-যজ্ঞের ঋত্বিক্‌রূপে মনোনীত করায়, উক্ত যজ্ঞের অগৌরব হইয়াছে, এবং তাহার সে সাধেও বাদ সাধিয়াছেন।

প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তার পর যখন ক্রমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোনমতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি, আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু অপলাপে লাভ কি? যে সম্পদ্ থাকিলে, যে শক্তি থাকিলে মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করা যায়, দুর্ভাগ্য আমি, আমার সে সম্পদ্ বা শক্তি নাই। আমি মধ্যে-মধ্যে ভাবিতাম, কবে এমন দিন আসিবে, যখন আমার শিক্ষিত

দেশবাসিগণ আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়, চালচলনে প্রকৃত বাঙ্গালীর মতন হইবে। কবে দেখিব, দেশের যাঁহারা মুখপাত্রস্বরূপ, সমাজের যাঁহারা নেতা, বঙ্গভাষা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা। কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙ্গালী আর এখন বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বসমক্ষে কথা বলিতে, বা প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, বা বঙ্গবাসী বঙ্গভাষার সেবকরূপে নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন্ না। আজ ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়, নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্গত হয় যে, সে সুদিন আসিয়াছে, আমার সেই আবাল্যধ্যেয় সুসময় আজ আমার সম্মুখে বর্ত্তমান। এক দিকে, দেশের যাঁহারা ভবিষ্যৎ আশার স্থল, যাঁহাদের বিবেচনার উপর বঙ্গদেশের অদৃষ্ট নিহিত, সেই শিক্ষার্থী যুবকগণ আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজভাষার সহিত বঙ্গ-ভাষার আলোচনা করিতেছেন। আর দু'দিন পরে যাঁহারা ইচ্ছা করিলে তর্জ্জনীহেলনে দেশের লোক-মত পরিচালন করিতে পারিবেন, সেই যুবকবৃন্দ বঙ্গভাষার চর্চ্চায় মনো-নিবেশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার আসন পড়িয়াছে; শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্শ্বে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাসিনীর সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। আর ঐ দেখ, অন্যদিকে, যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সৌভাগ্যদেবতার আদরের সন্তান, তাঁহারাও বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার ইহা পরম কল্যাণের কথা। বাঙ্গালীর ইহা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে আমি জাতীয় সাহিত্যগঠন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, "দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দর-তর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, বিদেশীয় আয়ুধেও সন্নদ্ধ হইতে হইবে।" সুতরাং জাতীয় সাহিত্য-গঠন সম্বন্ধে অদ্য আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যগঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বদ্বৃন্দেরও আরাধ্য হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে হইবে; এবং সেই চিন্তা-প্রসূত উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। তবেই ত বঙ্গভাষা অমরত্ব লাভ করিবে। যদি এমনভাবে বঙ্গসাহিত্য গঠিত হয়, এমন সম্পদে বঙ্গসাহিত্য সুসম্পন্ন হয় যে, সেই সম্পদের উৎকর্ষে পৃথিবীর অপরাপর মনীষিগণেরও চিত্ত আমার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়,—আজ যেমন আমরা অনেক অনর্ঘ এবং শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশের অনেক ভাষা শিখিতে প্রয়াস করিয়া থাকি, সেইরূপ বঙ্গভাষায় যদি এমন অনেক উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট বিষয় আবিষ্কৃত এবং উপনিবদ্ধ হয়, যাহা কৃতবিদ্যমাত্রেরই সর্ব্বথা অবশ্য শিক্ষণীয়, অথচ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় ঐ-ঐ বিষয়সমূহ এতাবৎকাল লিখিত হয় নাই,—তাহা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিদ্বদ্বৃন্দই সাগ্রহে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন। সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলেই, যাহাতে বঙ্গভাষাও অপরাপর ভাষার ন্যায় শিখিতে হয়, না শিখিলে অনেক আবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়, সুতরাং অন্য শত ভাষার শিক্ষাতেও পূরা মানুষ হওয়া যায় না, যদি এমনই ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্-বৃদ্ধি করা যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে, বাঙ্গালার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের, তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমনভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে

স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিশাল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই; ধীরে-ধীরে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক, আমার জননী বঙ্গভাষাকে, অনন্তকালরূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া, বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে। বিষয়টা আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাক্। একদেশের ভাষা অন্য দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার কারণ প্রধানতঃ দুইটি, একটি রাজনৈতিক কারণ, অপরটি ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্য।

রাজার জাতির ভাষা না শিখিলে, রাজার জাতির ভাষায় বিজ্ঞতা-লাভ না করিলে, নানারূপ অসুবিধা, সুতরাং বিজিত জাতির বিজেতার ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। ধরিয়া লউন, আমাদের ইংরাজ যদি আজ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইতেন, তাহা হইলে এই বিশাল পৃথিবীতে ইংরাজীভাষাই প্রধানতঃ প্রচলিত হইত। সেরূপ কোনও সম্ভাবনা আমাদের বঙ্গভাষার নাই, সুতরাং প্রথমোক্ত কারণে বঙ্গভাষা জগতের ভাষা হইতে পারে না। কিন্তু রাজভাষা না হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক ভাষা দেখিতে পাই, যাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীর নিকট অনাদৃত নহে, প্রত্যুত যথেষ্ট আদৃতই হইয়া থাকে। যেমন ইংরাজিভাষা। সমগ্র পৃথিবী ইংরাজের রাজত্ব না হইলেও, অনেক স্বাধীন দেশেও এই ভাষার আদর দেখিতে পাই। এইরূপ রুষদেশীয় ভাষাও এখন অনেক দেশে যথেষ্ট সমাদৃত, যেখানে হয় ত এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একজনও রাষিয়ান দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের গর্ব্বের কারণ, ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধার বিজয়-বৈজয়ন্তী, সংস্কৃতভাষা, অথবা ইউরোপের লাটিন এবং গ্রীকভাষা কোন্ দেশে অনাদৃত? কোন্ মেধাবী ব্যক্তি এই সকল ভাষা শিখিয়া কৃতার্থ হইতে না চান্? ফরাসী ভাষায় যে সকল বিশিষ্ট-বিশিষ্ট জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি আছে, তাহার অনুবাদমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া, কোন্ আজীবনছাত্র মনস্বী উক্ত ভাষা অভ্যাস না করেন? এই সকলের কারণ কি? ঐ-ঐ ভাষায় এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা না শিখিলে সেই-সেই বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন, এ কথা অবিসংবাদে স্বীকার করা যায় না। মনে করুন, গণিত এবং রসায়ন শাস্ত্র; রাষিয়ান ভাষায় গণিত এবং রসায়নশাস্ত্রের এত অধিক পর্য্যালোচনা ও গবেষণা আছে যে, সেই-সেই শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে সেগুলি অবশ্য-দ্রষ্টব্য। যদি কেহ অঙ্ক বা রসায়নশাস্ত্রে প্রকৃত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে চান, ঐ-ঐ বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান-পিপাসা, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে চান,—তবে তাঁহাকে রুষীয় ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে; অন্যথা সে সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের, অথবা কেবল ইংলণ্ড কেন, জগতের গৌরবভাজন মহাকবি সেক্ষপীয়রের অমৃতময়ী লেখনীর রসাস্বাদ করিবার জন্য কোন্ সুরসিক ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে না চান? রাজনৈতিক কারণ ব্যতিরেকেও রাসিয়ান্ এবং ইংরাজী ভাষার প্রতি এত যে আদর, জ্ঞানার্থীদের এত যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রকৃত কারণ হইল, তত্তৎ ভাষায় ঐ সমুদয় মহার্ঘ বিষয়ের সন্নিবেশ। যদি অঙ্ক এবং রসায়ন বিষয়ে রাষিয়ান্ ভাষা অতটা সম্পন্ন না হইত, বা সেক্ষপীয়ার, মিলটন, বাইরণ প্রভৃতির অপূর্ব্ব কল্পনালোকে, বা নিউটনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারে ইংরাজি ভাষা সমলঙ্কৃত না হইত, তবে রুষিয়া এবং ইংরাজের অনধিকৃত দেশসমূহেও এই-এই ভাষার কি এত গৌরব কদাচ বৃদ্ধি পাইত? ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় সংস্কৃতভাষার ইউরোপেও যে এত আদর, তাহার কারণ কি? পরাধীন ভারতের প্রাচীনতম ভাষার প্রভাব স্বাধীন পাশ্চাত্য জগতে যে ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, কালে এমন এক দিন আসিবে, যখন, পশ্চিমের প্রত্যেক বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কোন-না-কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য সংস্কৃতভাষার অনুশীলন করিবেন। কবে, কোন্ দিন, কত শত-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে বসিয়া, ক্রৌঞ্চমিথুনের কবি, তাঁহার তপঃসিদ্ধ বীণায় ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, আর আজও ঐ দেখ, সকল দেশের সুপণ্ডিত ব্যক্তিই সেই ঝঙ্কার শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া আছেন। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসের মহাভারত, ভারতের অপৌরুষেয় বেদ-সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃতভাষায় উপনিবদ্ধ বলিয়া, সকল দেশের জ্ঞান-পিপাসুই এই ভাষায় আস্থাসম্পন্ন। মহাকবি কালিদাস, শিপ্রাতটে বসিয়া যে মোহন বংশীধ্বনিতে ভারতবর্ষ উদ্‌ভ্রান্ত, একেবারে তন্ময় করিয়া গিয়াছেন, আজও সে বাঁশরী-ঝঙ্কারের যেন বিরাম হয় নাই। ঐ দেখুন, ইউরোপের মেধাবী সন্তানগণ, ঐ মনোজ্ঞ সঙ্গীতের রসা-

স্বাদের আশায়, সংস্কৃতভাষার অনুশীলন করিতেছেন। এ দেশীয় শকুন্তল নাটকের বিদেশীর-কৃত অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়াও সুকবি গেটে আত্মহারা হইয়াছিলেন। জগতের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল প্লেটো, ইউক্লিড, পিথাগোরাস, এরিষ্টটল প্রভৃতির মনীষা-সাগরোত্থিত রত্নমালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক গ্রীক্ ভাষা এই মরধামে অমরতা লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক আধিপত্যে উল্লিখিত ভাষাসমূহ অকিঞ্চিতকর হইলেও জ্ঞানের আধিপত্যে, সম্পদের আধিপত্যে ঐ-ঐ ভাষা জগতের শিক্ষিত সমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনের চন্দ্র-সূর্য্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণবের বেলাভূমিতে ঐ যে সমুদয় প্রাচীন মনীষিগণের সুচিন্তা-রত্নমণ্ডিত সৌধাবলী শির উত্তোলনপূর্ব্বক, স্মরণাতীত কাল হইতে দাঁড়াইয়া আছে, জগতের ঐহিকবাদিগণের পরস্পর বাদ-বিসংবাদ দর্শনে যেন নীরবে হাসিতেছে,—ঐ সকল মনীষা-মন্দিরের কোন দিন বিলোপ ঘটিবে না। নানাবিধ বিপ্লবে ভারতবর্ষ ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইলেও সেই প্রাচীন কাল হইতে বেদাদি-রত্নহারে সুশোভিত হইয়া সংস্কৃত-ভারতী একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি সংস্কৃতভাষায় বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা প্রভৃতি উপনিবদ্ধ না হইত, যদি কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতি অমর কবিকুলের সযত্নগ্রথিত মণিময় হারে সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত না হইত, তবে কি আজ এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনেও সংস্কৃতভাষা এমনই অক্ষতদেহে ভারতীয় সভ্যতার কিরীটরূপে শোভা পাইত? ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল, সম্পদ্। যে ভাষায় যত সম্পদ্, যে ভাষা যত অধিক সুচিন্তা-প্রসূত-বিষয়ে বিমণ্ডিত, সেই ভাষার প্রসার জগতে তত অধিক। সে ভাষা যে দেশেরই হউক না কেন, সকল বিদেশীয়েরাই আন্তরিক যত্নসহকারে সেই ভাষার সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবেন। এইরূপ সংস্কারে হৃদয় দৃঢ় করিয়া, বঙ্গভূমির প্রকৃত সুসন্তানের ন্যায়, আমরা যদি বঙ্গভাষার আলোচনা করিতে পারি, কালে বঙ্গভাষা জগতের শিক্ষণীয় ভাষা হইবে। বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্ব-স্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া যান, —এবং এই প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন এক দিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাবীণ্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হ'ন, তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব-স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। অবশ্য তাহাতে বঙ্গভাষা জগতের সর্ব্বত্র একাধিপত্য করিবে না সত্য, কিন্তু রাষিয়ান্, গ্রীক্, লাটিন্, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয়রূপে গৃহীত হইবে।

অবশ্য এইরূপ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করা দু'এক দিনে বা দু'দশবৎসরে সম্ভব নহে, বা আরম্ভমাত্রেই ফললাভের আশা নাই। কিন্তু যদি যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্য-সাধারণ-কমনীয়,—নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্য,—বাঙ্গালী নিজের-নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্ব স্ব উপার্জ্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার, নিজ-নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত-যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে। আজ যাহা অসম্ভব মনে হইতেছে, কাল তাহা একান্ত সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইবে। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার গৌরব-কেতন কালের অক্ষয় গগনে বাঙ্গালার, তথা বাঙ্গালীর বিজয়প্রশস্তি ঘোষণা করিবে। এই সকল ব্যাপার করিতে হইলে, এই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তীর্থজলে অভিষেকের এবং সংযমের প্রয়োজন। বিনা অভিষেকে বা বিনা সংযমে যজ্ঞ-বেদিতে উপবিষ্ট হইতে নাই। দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল

করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্য মায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এই প্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্ব্বক,—কোন-একটা নূতন-কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে,—এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে। আমাদের যাহা উত্তম, যাহা কিছু সৎ, উদার, অপূর্ব্ব ও অনুপম, তাহা বঙ্গভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিব, বাঙ্গালার সম্পত্তি বাঙ্গালার মাতৃভাষার ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রাখিব, দেশের ধন স্বহস্তে দেশকে বঞ্চিত করিয়া বিদেশে বিলাইয়া দিব না, এমন করিয়া ধনের উপচয় করিব, বৃদ্ধি করিব, যাহাতে জলধির জলের ন্যায় আমার মাতৃভাষার ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরাশি, যে যত পারে গ্রহণ করিলেও, কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। উষার অরুণচ্ছটায় যেমন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়, তেমনই আমার মাতৃভাষার আলোক-চ্ছটায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত হইবে, ভাস্বর হইবে। এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ সংস্কারে চিত্ত বলীয়ান্ করিয়া তপস্বীর ন্যায় একাগ্র-হৃদয়ে বঙ্গবাণীর সেবা করিতে হইবে। নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই, বাঙ্গালার মাটী বড়ই উর্ব্বর। বঙ্গদেশ বড়ই সুজন্মা। অধিকাংশ স্থলই দেবমাতৃক, ক্বচিত নদীমাতৃক; আপনা হইতেই বিধাতার কৃপায় বঙ্গে মেধাবীর আবির্ভাব হয়। চিরকাল হইয়া আসিতেছেও। কোথাও বা সামান্য সেচনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুফল লাভ সর্ব্বত্রই নিশ্চিত। ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস, কুমারহট্টের রামপ্রসাদ, কৃষ্ণ-নগরের ভারতচন্দ্র, খানকুলের রামমোহন, পিলের দাশরথি প্রভৃতি এই বঙ্গেরই ছায়াশ্যামল পল্লীবাটের সুস্বাদু ফল। প্রভাকরের ঈশ্বর, আলালের টেকচাঁদ, নীলদর্পণের দীনবন্ধু, কপোতাক্ষীর মধুসূদন এই বঙ্গেরই অলঙ্কার। বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন যে বঙ্গভাষার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সে ভাষা বা সেই দেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখনও, এই ঘোর বিপর্য্যাসের মধ্যেও যে দেশে এবং যে ভাষায় পৃথ্বীরাজের ন্যায় উপাদেয় মহাকাব্য প্রণীত হয়, সে দেশের এবং সেই ভাষার শক্তি যে কত বিপুল, তাহা মনস্বিমাত্রেরই সহজে বোধগম্য হইবে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় এমনই একটা সঞ্জীবনী-শক্তি আছে, যাহাতে বঙ্গে কোন দিন কৃতীর অভাব হয় না, হইবেও না। যেমন অবস্থাতেই বাঙ্গালীকে ফেলিয়া দাও না কেন, বঙ্গ-সন্তানের হৃদয়ে কখনও নৈরাশ্য বা দৌর্ব্বল্য আসে না। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা পৌরুষহীন নহে। মেকলের উক্তির প্রতিবাদ যখন বিধাতাই বাঙ্গালীর দ্বারা করাইতেছেন, তখন অপরের সে সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, চণ্ডীদাস গোবিন্দদাসের বঙ্গে, রামবসু নিধুবাবুর বঙ্গে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের প্রবাহ শ্রীচৈতন্যের বঙ্গে কখনও ভাবের বা রসের অভাব হইবে না। প্রাণের অভাব হইবে না। উপাদানের অভাব নাই, কেবল উদ্যোগের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব। এই ত, সামান্য উদ্যোগেই ভীরু-বাঙ্গালী বীর-বাঙ্গালীতে উন্নীত হইতে চলিয়াছে। যাহাদের ঢক্কায় বাঙ্গালীর ভীরুত্ব নিনাদিত হইত, এখন তাহাদেরই কলমধুর বীণায় বাঙ্গালীর বীরত্ব অনুরণিত হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, আছে সব, মালমসলা কিছুরই অভাব নাই, এখন কেবল জনকয়েক সুশিক্ষিত, কল্পনাকুশল স্থপতি বদ্ধপরিকর হইলেই সঙ্কল্পিত বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ আমার যে কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। জগতের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ বঙ্গ-ভাষা অধিকার করিয়া বসিবে। অনতিবিস্তৃত বঙ্গসাহিত্য ক্রমে বিশাল বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইবে।

এই অসাধ্য সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ সংযমের প্রয়োজন, কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সভ্যগণ, আপনারা আমাকে এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যেমন আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও যদি, আমার ধারণার অনুরূপ, আমার বিবেকের অনুকূল সত্য, কঠোর বলিয়া, সম্প্রদায়বিশেষের স্তুতিনিন্দার দিকে লক্ষ্য করিয়া, প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত সম্মানের অপব্যবহার করা হইবে। তাই, আপাততঃ ঈষদ্ অপ্রিয় হইলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, আমি বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত অসাধ্যসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে, যদি কোন দলাদলি, কোনরূপ বিরোধী ভাব থাকে, তবে তাহা পরিহার

করিতে হইবে। মতভেদ নিন্দার কথা নহে, কিন্তু মতভেদ হইলেই যে প্রণয়ভেদ হইবে, আত্মীয়তাভেদ হইবে, ইহা ত আমি বুঝি না। বঙ্গভাষা এখনও বঙ্গের বাহিরে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে নাই। এখনও ভারতের বহির্দ্দেশে বঙ্গভাষার বংশীধ্বনি সম্যকভাবে পৌছায় নাই। যে ভাবে, যেরূপে আমি বঙ্গভাষাকে গঠিত করিবার কথা বলিলাম, সেই হিসাবে বঙ্গভাষার এই সবে কৈশোর; এরূপ অপরিপক্ক বয়সে, তাহাতে অন্তঃকলহের কীট প্রবেশ করিতে দিলে, অচিরাৎ সমস্ত উদ্যম, উদ্‌যোগ পণ্ড, ভস্মসাৎ হইবে। হিমাদ্রির চিরতুষারস্নিগ্ধ অভ্রভেদী কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাহারা পৌঁছিতে চাহে, উপত্যকার কঙ্করময় কণ্টকক্ষেত্রেই তাহাদের ক্লান্তি জন্মিলে চলিবে কেন? মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে, একটা মহাত্যাগ চাই। বিনা ত্যাগে লাভ হইতে পারে না। আমার ভাবিতেও দুঃখ হয়, যে, এই সবে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সানুরাগ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র, আর ইহারই মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি। আমি সানুনয়ে বলি, সনির্ব্বন্ধে বলি, আমরা সকলেই এক মার সন্তান; বঙ্গভূমি এবং বঙ্গভাষা আমাদের সকলেরই জননী; মাতৃপূজায় দীক্ষিত হইয়া, মায়ের মন্দিরে তুচ্ছ অলীক এবং ক্ষণিক যশের প্রলোভনে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বিরোধ করিতে নাই। বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বহু কোটী বঙ্গবাসী বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে, তবে ঐ সঙ্কল্পিত সৌধের মাত্র ভিত্তি-প্রোথন হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে, কঠোর কার্য্যে, বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন, সাহায্য করুন। মায়ের মন্দির-গঠনে সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার। তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য পরিমাণে দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন। মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্ম্মাণ করিব। কে কি পরিমাণে মাতৃমন্দিরের দ্রব্যসংগ্রহ করিলেন, ইহার হিসাব-নিকাস করিব না, এখন হিসাব-নিকাসের সময়ও নহে; করিতে হয়, আমাদের অধস্তন বংশধরেরা তাহা করিবে। আমরা কেবল গড়িয়াই যাইব, কাজ করিয়া যাইব। এই সময়ে, কাহাকেও মনঃপীড়া দেওয়া বা সাময়িক মোহের কুহকে অন্ধ হইয়া আত্মাভিমানের চরিতার্থতা বিধান করিতে যাওয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। কোন-প্রকার অসংযমের আধিক্য হইলেই, এই সঙ্কল্পিত স্বর্ণসৌধের আশা সমূলে ধ্বংস হইবে, বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার আশা আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, হে বঙ্গ-সাহিত্যের হিতৈষিবৃন্দ, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ জাতীয় সৌধের স্থপতিবৃন্দ,—ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বিরোধ বিস্মৃত হইয়া, একই লক্ষ্যে চিত্তস্থির করিয়া, ধীরে-ধীরে অগ্রসর হউন, সমস্ত ভুলিয়া, আপন ভুলিয়া,—ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ও মলিন স্বার্থের পুঁটুলিগুলি দূরে এককোণে সরাইয়া রাখিয়া, একমনে, একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতি ক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিবেন। ধনি-নির্ধননির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন "বান" আসে, তখন অনেক আবর্জ্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে সত্য, কিন্তু সেই আবর্জ্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জ্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য, কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম, সৎ, যাহা নির্ম্মল, নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, তদিতর কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য, কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই। দেশের সর্ব্বত্র, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল উপকথা, রূপকথা শুনিতে-শুনিতে মাতা বা মাতৃষ্বসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল গল্প, সেই "সাতভাই-চম্পা",—সেই "পক্ষিরাজ ঘোটক", সেই 'শিব-

ঠাকুরের বিয়ে', প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়ন-রঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। বটতলায় যে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্বার উপলব্ধি না করে, ততদিন প্রকৃত মানুষই হইতে পারে না। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই,কি অর্জ্জন এবং কতটুকুই বা বর্জ্জন করিতে হইবে, এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে; মা নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গ-সন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী আনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবৰ্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয়-জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য-নির্ম্মাণে স্পৃহা। সেই স্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতির হৃদয়ে দেখা গিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া, হাল ধরিয়া বসিতে হইবে। যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সে পক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে। যে সময়ে এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত, তখন কি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মতামত লইয়া আত্মবিচ্ছেদ শোভা পায়? যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবৰ্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে। অঙ্কুরটির মস্তক ভগ্ন করিয়া লাভ কি? আপামর-সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি আনুরক্তি জন্মে,—আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই,—এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া যাহাতে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তৎপক্ষে চেষ্টাপর হইতে হইবে। এই সময়ে ভুলিলে চলিবে না, যে, যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন আলেখ্যের পশ্চাদ্ভাগ বিশেষ দক্ষতার সহিত কল্পিত না হইলে, যেমন মূল চিত্র যতই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হউক না কেন, কিছুতেই তেমন মনোরম হয় না, তদ্রূপ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, মুষ্টিমেয় বঙ্গসন্তান, স্ব-স্ব জ্ঞানগরিমায় যতই বিমণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশে, অথবা চতুর্দ্দিকে ঐ যে কোটি-কোটি বাঙ্গালী পড়িয়া আছে, শিক্ষিতগণ যতদিন না উহাদিগকে নিজের সান্নিধ্যে টানিয়া আনিতে পারিবেন, ততদিন, বঙ্গের প্রকৃত অভ্যুদয় হইল, এ কথা স্বীকার করিতে পারিব না। শাখা প্রশাখা, পত্র-পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই ত বৃক্ষ। এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহা-দিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালীজাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুধী-মণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে, অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, তাহা যতদিন না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে; একটী সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অগ্নিতে অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থার্জ্জনের জন্যও শিক্ষা নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আত্ম-বিকাশ লাভ করা। হৃদয়ের মার্জ্জনা করা। দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থ করা। এই ভাবে যদি একবার তৈরি হইয়া উঠে, ক্রমে একটা জাতি তৈরি হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারে গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না, অর্থ ত কোন ছার। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে চাই, সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই; পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে,—ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। তখন আর তাহাকে প্ররোচিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কষ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি ঠিক বুঝিতে বা ধরিতে

না পারি, যে, আমি কি চাই, কোন্ বস্তুটি পাইলে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইবে। যদি একবার আমার সেই অভিপ্রেত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তবে সেইদিকে আমার হৃদয়ের যে গতি হইবে, এমন কেহ নাই, যে, সে গতি রোধ করিতে পারে। বাঙ্গালীজাতির ইতর-ভদ্র সকলের মনে একবার কোনক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মদীয় জাতীয় অভ্যুদয় গ্রথিত; বঙ্গদেশের অদৃষ্ট, বঙ্গবাসীর অদৃষ্ট, বঙ্গভাষার ভূয়োবিস্তারের উপর নিহিত। যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতরভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বসাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব। যখন ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা এক ভাবে, এক উন্মাদনায় বিভোর হইয়া উঠে, একমনে সকলে মধুর বাসন্তীমূর্ত্তির পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। যদি সারা বঙ্গদেশটাকে একভাবে, একই উন্মাদনায় বিভোর করিয়া তুলিতে পার, তোমার জননী বঙ্গভাষার ভুবন-মোহিনী-মূর্ত্তির বিমলপ্রভায় বাঙ্গালী জন-সাধারণের হৃদয় বিভাসিত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে, তোমার দ্বিভুজা বঙ্গভারতী দশভুজার মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীর সমক্ষে অবতীর্ণা। দেখিবে, বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে তোমার বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে। "বাঙ্গালীর মাটী, বাঙ্গালার জলে" পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার ভাবিয়া দেখ, জন্ম-জন্মান্তরে কত পুণ্য করিয়াছিলে, কত তপস্যা করিয়াছিলে, তাই এমন মধুর বাঙ্গালায় আসিতে পারিয়াছ। স্নিগ্ধশ্যামল কাননকুন্তলা বঙ্গভূমির বক্ষের ক্ষীরধারায় যাহাদের দেহ পরিপুষ্ট, বঙ্গের নিত্যনীল-নবীন নভশ্চন্দ্রাতপতলে শিশিরস্নাত দূর্ব্বাসনে যাহাদের উপবেশন, আর কলকণ্ঠ শুক-কোকিলের মধুর কাকলীতে যাহাদের কর্ণবিবর পরিপূর্ণ, তাহাদের হৃদয়ে কল্পনার অভাব হইবে কেন? সম্মুখে যাহার পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী, তাহার কণ্ঠ পিপাসায় শুকাইবে কেন? বঙ্গবাসী, তোমাদের কিসের অভাব? তোমরা কাহার চেয়ে কম? কিসে দুর্ব্বল? বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহাদের আদর্শ গ্রন্থ—সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা যাহাদের আদর্শ সতী—রাম, যুধিষ্ঠির, শিবি, দধিচি, ভীষ্ম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ নায়ক—ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন যাহাদের আদর্শ ভ্রাতা, তাহাদের আবার অভাব কিসের? অতীতের বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালা হইতে একবার এই দিকে তাকাও; ঐ দেখ,—তোমাদের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অক্লান্তশ্রমে, তোমাদেরই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ কত মনোহর পত্রপুষ্প-পল্লবে, বঙ্গসাহিত্যের মণ্ডপ সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপাতী যত্নে রত্নমণ্ডপের রত্নবেদিতে আমার রত্নহারবিভূষিতা বঙ্গবাণীর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তোমাদের এখন পূজায় বসিতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যসেবিগণ, সদ্ভাব-চন্দনে মনঃপ্রাণ চর্চ্চিত করিয়া, তোমাদের সাহিত্য-মণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হও। একবার সাতকোটী বাঙ্গালী সমস্বরে বঙ্গভারতীকে "মা" বলিয়া ডাক,—দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে ডাকে চমকিয়া উঠিবে। আকাশের গায়ে, সমুদ্রের বক্ষে, পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ শিখরে সে ডাকের সাড়া পৌছিবে। বঙ্গভারতী বিশ্বভারতীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবেন। সাময়িক স্তুতিনিন্দা, বাদ-বিসংবাদ, স্বার্থচিন্তা প্রভৃতি একপদে বিস্মৃত হইয়া একবার সাধকের মত, যোগীর মত, ব্রতদীক্ষিতের মত, সংযতভাবে জননী বঙ্গভাষার পাদ-পূজায় প্রবৃত্ত হও, একবার মাতৃ-প্রেমে, জাতীয় প্রেমে, জাতীয় সাহিত্যের প্রেমে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া, সাতকোটি কণ্ঠে, উদাত্ত স্বরে মাতৃভাষাকে "মা" বলিয়া ডাক দাও, বিশ্ব কাঁপাইয়া একবার বল—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ,
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাইবে গান॥"

দেখিবে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড প্রতিধ্বনিতে মুখর করিয়া, তোমাদের এই আবেগস্খলিত গীতি দিব্যধামে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিবে, স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে, প্রান্তরে কান্তারে বঙ্গভারতীর বীণার অনুরণন হইতেছে, বঙ্গভাষার মধুর বাঁশী সুমধুর লগ্নে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে, চিরনবীনা ধরণী রোমাঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালীর দেবতাকে বক্ষে আসন পাতিয়া বসাইতেছেন।

মনে রাখিও, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। কল্পনার

অগম্য স্থান নাই। মানুষের যে কত অসীম শক্তি, তাহা মানুষ নিজে অনেক সময়ে বুঝিতেই পারে না। তাহা যদি পারিত, তবে এই পৃথিবীর দশা এতদিনে অন্যপ্রকার হইত। আমার বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; এই প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের জন্য, যাহা সঙ্গত মনে হইবে, তাহাই অসঙ্কোচে করিব। এই মন্ত্রে পরিপূত হইয়া ব্রত আরম্ভ কর। সিদ্ধি হইবে। কালে অমর হইতে পারিবে। বাঙ্গালীজাতি ও তাহার বঙ্গভাষা জগতে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যদি কখনও নৈরাশ্যের ভীষণ মূর্ত্তিতে চমকিয়া উঠ, কালের করাল কশা দর্শনে ভীত হও, তখন তোমারই বরণ্যে কবি হেমচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া জলদ প্রতিম-স্বনে তোমার দেশবাসীকে শুনাইও—

"হোথা আমেরিকা নব-অভ্যুদয়
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

আর সেই সঙ্গে বলিও—হে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যমন্দিরের ভবিষ্য-স্থপতিবৃন্দ,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে',
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে',
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

লাবণ্য

[নিতান্ত গল্প নয়।]

[শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল]

দুইদিন মাত্র আমি তাহাকে দেখিয়াছি। তার নাম যে লাবণ্য, ইহাও কেবল আমার অনুমান মাত্র। প্রথম যে দিন তাহাকে দেখি, সে দিন তা'র সঙ্গিনী তা'কে "লাবী" বলিয়া ডাকিয়াছিল।

সে দু'দিনের দেখাতেই কিন্তু তার ছবিখানি মনের ভিতরে চিরদিনের মতন বসিয়া গিয়াছে। তার রং গৌর কি শ্যাম—বলিতে পারিব না। তার মুখের গড়ন কি, তাহাও জানি না। তার দেহ-যষ্টি যদি তোমরা আমাকে আঁকিয়া দিতে বল, আমি সুনিপুণ চিত্রকর হইলেও, তাহা আঁকিতে পারিতাম না। সে যে কেবল একটি অপূর্ব্ব ভাব-মূর্ত্তি হইয়া আমার চক্ষে ফুটিয়াছিল। মনের মধ্যে আজিও সেই মূর্ত্তিটিই জাগিয়া আছে।

তখন আমি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতাম। বৈঠকখানায় আমাদের বাসা ছিল, কয়লাঘাটে যাইয়া স্নান করিতাম। কখনও বা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতাম, কোনও দিন বা দেরী হইয়া যাইত, ৮টা ৯টার আগে বাসা হইতে বাহির হইতেই পারিতাম না।

একদিন,—তখন ফাল্গুন মাস, নূতন বসন্তের হাওয়া দক্ষিণ হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; শীত গিয়াছে কিন্তু গরম পড়ে নাই,—এইরূপ দেরীতে স্নান করিতে চলিলাম। ভোরে গেলে, বৌবাজারের বড় রাস্তা দিয়াই যাইতাম; এ দিন কোণাকোণি চাঁপাতলার ভিতর দিয়া গেলাম।

এই পল্লীর এক দুতালা বাড়ী হইতে দুইটি স্ত্রীলোক আমার আগে-আগে গঙ্গাস্নান করিতে যাত্রা করিল। দেখিয়া আমার কেমন একটা কৌতূহল হইল,—ইহারা আবার গঙ্গাস্নান করিতে যায় কেন? লোকমুখে শুনিয়াছিলাম ইহাদের গঙ্গাস্নান একটা লোক-সংগ্রহের ফন্দি মাত্র। কথাটা মনে পড়িল। ইহাদের গতিবিধি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। ইহাদের কথা-বার্ত্তা শুনিবার জন্য পেছনে-পেছনে চলিলাম।

স্ত্রীলোক দুটিই পূর্ণ যুবতী, দেখিতেও সুন্দরী। গড়নটি দু'জনারই সুগোল, সুঠাম! একবার, কেন জানি না, দু'জনাই মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতের দিকে চাহিল। দেখিলাম,

রূপসী বটে। আর, একটির মুখে রূপের চাইতেও লাবণ্য বেশী। দেখিয়া মনটা একটু নরম হইল।

ইহাকে সম্বোধন করিয়া, তাহার সঙ্গিনী বলিল—"হা লো লাবী, বাড়ীওয়ালি তোরে কাল অমন করে বক্‌ছিল কেন?"

"দু মাসের ঘরভাড়া পড়ে আছে। তার আর দোষ কি? ঐ দিয়েই ত তারও দিন চালাতে হয়।"

"দু-বছর ভাড়া গুণে এসেছিস্, তাতে আর এক মাস দু'মাস কি সবুর সয় না? তার জন্য অত বকাবকি কেন? আমি ভাই অত সইতে পারি না।"

"তা কি করব, ভগবান যখন যা দেন, তাই সইতে হয়।"

"তোর ভগবান তোরে তবে একটা ভাল বাবু জুটিয়ে দেন না কেন? তা হ'লেই ত সব গোল মিটে যায়। তোর ত রূপের অভাব নাই।"

"লাবী" ইহার কোনও উত্তর দিল না। খানিক পরে তার সঙ্গিনী আবার কহিল—"আর ভগবানেরই বা দোষ দেই কিসে। তুই ত দিনরাত ঘরের কোণেই ব'সে থাকিস্। নইলে তোর ভাবনা ছিল কি? এত দিনে তুই আপনি অমন দু'চারখানা বাড়ী কর্‌তে পার্‌তিস্।"

"লাবী" কোনও কথা কহিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল। মনে হইল যেন কাঁদিতেছে। পাশ কাটাইয়া একটু এগিয়ে গিয়া, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মুখখানি দৈন্যে নুয়াঁইয়া পড়িয়াছে, আর আনত-পক্ষ্ম চক্ষুদুটি হইতে দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। দেখিয়া প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। চোখে পথ দেখিয়া চলা ভার হইল। রাস্তার পাশে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাতে উঠিয়া বলিলাম "বৈঠকখানা চল্।"

২

বহু দিন ঐ মুখখানি যেন আমার চিত্তে লাগিয়া রহিল। কতবার দেখিতে সাধ গিয়াছে, আবার কি জানি যদি দেখিতে পাই, এই ভাবিয়া ভয়ে প্রাণ শুকাইয়াও গিয়াছে। ঐ ভয়েই ঐ পথে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু যখনই পথে-ঘাটে কোনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতাম, তখনই ঐ মুখখানি প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। ঐ মুখে সে দিন যে ট্রেজেডির ছায়াপাত দেখিয়াছিলাম, তার রহস্য-ভেদ করিবার জন্যও মাঝে-মাঝে মনটা একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিত। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা সাহসে কুলাইল না;—সমাজের ভয়েও পারিলাম না, তার ভয়েও পারিলাম না।

৩

দুই বৎসর পরে আমার ৺গুরুদেব আবার কলিকাতায় আসিলেন। তাঁর কাছে প্রায়ই যাইতাম। গুরুভাইরা অনেকেই যাইতেন। দু'-একটি তাঁর সঙ্গেই থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন কাশীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি নবীন যুবক। দৃঢ়িষ্ট, বলিষ্ঠ দেহ হইতে যেন ব্রহ্মচর্য্য ফাটিয়া পড়িতেছে। অপূর্ব্ব গৌরকান্তি; সুগোল, সুঠাম গঠন; আকর্ণায়ত চক্ষু দুটি যেন সর্ব্বদা ভাবে ঢলঢল থাকিত। বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও সাধন ভজনে আমরা তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের মতনই ভক্তি করিতাম। আদর করিয়া আমরা তাঁহাকে গোরা বলিয়া ডাকিতাম। গুরুদেব চিরদিনই তাঁহাকে 'ব্রহ্মচারী' বলিয়া ডাকিতেন। গুরুদেব চাঁপাতলার নিকটেই বাসা করিয়াছিলেন। আমাকে প্রতিদিন সেই যুবতীদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই তাঁহার কাছে যাইতে হইত। আর মাঝে মাঝে সেই মুখখানি মনে হইয়া, প্রাণটা চঞ্চল হইয়া উঠিত।

একদিন রবিবার, প্রাতে ৯টার সময়, গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনে যাইতেছিলাম। হঠাৎ ঐ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া, অপূর্ব্ব উন্মত্ত কীর্ত্তন হইতেছে শুনিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এই পল্লিপথে যাইতে-যাইতে রসকীর্ত্তন মাঝে মাঝে শুনিয়াছি, টহলিয়া বৈষ্ণবেরা বাড়ীতে-বাড়ীতে নামাকীর্ত্তনও করে, জানি। কিন্তু এ কীর্ত্তন যে অন্য ভাবের! এ ত কেবল গলার সুর নয়,—এ কীর্ত্তনে প্রাণটা যেন গলিয়া তরল হইয়া বাহির হইয়া, বাষ্প হইয়া, বায়ুসাগরে মিশিয়া, ঊর্দ্ধতম স্বর্গলোকে প্রাণেশ্বরের পানে হিল্লোলে হিল্লোলে ছুটিয়া, উড়িয়া যাইতেছে!

এ গান, অমন করিয়া, এখানে গায় কে? দুইজনে গাহিতেছে,—একটি সুর সরু, একটি মোটা। দুই সুরে কি অপূর্ব্ব সঙ্গতই না মিলিয়াছে! হঠাৎ একটা সুর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ'ত অপরিচিত নয়! পথে লোক দাঁড়াইয়া গেল। আমিও চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে কীর্ত্তন আরও মাতিয়া উঠিল। খোলের

তালে তালে যেন উদ্দাম নৃত্য হইতেছে, মনে হইতে লাগিল। আর বাহিরে থাকিতে পারিলাম না। দরজা ভেজান ছিল, অঙ্গুলিস্পর্শে খুলিয়া গেল। বাড়ী ঢুকিয়া দেখিলাম, সেই "লাবী" অধোবদনে গান গাহিতেছে, তার মুখখানি যেন মাটিতে লুটাইতেছে, চোখের জল টস্‌টস্ করিয়া মাটীর উপরে পড়িতেছে,—মনে হইল সমগ্র প্রাণটাও যেন ঐ মাটীতে মিশিয়া যাইতেছে। তার সেই সঙ্গিনী করতালে তাল দিতেছে। একটি বৈষ্ণব খোল বাজাইতেছে। আর আমাদের "গোরা" "লাবীর" সঙ্গে-সঙ্গে গাহিতেছে—

তুহুঁ দীনদয়াল, দীনবন্ধু!
তুহুঁ দীনদয়াল, দীনবন্ধু!—

আর বাহু তুলিয়া, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনে গেলে, তিনি বলিলেন—"আজ রাত্রে আমার এখানে আসিয়া আহার করিবে। বাড়ী ফিরিয়া না গেলে যদি অসুবিধা না হয়, এখানেই শুইয়া থাকিবে। আমার ঘরেই তোমার জন্য একটা বিছানা করিয়া রাখিতে বলিব।"

গভীর রাত্রে জাগিয়া দেখি গোরা গুরুদেবের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে, আর তিনি নিমীলিত-নেত্রে ভাবাবিষ্ট হইয়া তার পিঠে হাত বুলাইতেছেন। একটু শান্ত হইলে বলিলেন—"ব্রহ্মচারী, কাল্‌কের বৃত্তান্তটি আদ্যোপান্ত বল।" আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই কথা শুনিবার জন্যই আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন—(তাঁর কথা ঠিক পুনরুক্তি করা আমার পক্ষে অসাধ্য, তবে তার মর্ম্মটুকু এই)—"আমি কাল প্রাতে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় দুটি স্ত্রীলোককে দেখি। তারাও গঙ্গাস্নানে যাইতেছিল। দেখিয়াই আমার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাদের একজনার মুখখানি বড় মিষ্টি লাগিল। আমি তাদের সঙ্গে-সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গেলাম। তাড়াতাড়ি গঙ্গায় নামিয়া সংক্ষেপে স্নানাহ্নিক সারিয়া, তাদের প্রতীক্ষায় তীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারা যখন ফিরিল, আমিও তাদের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফিরিলাম। ক্রমে তারা নিজের বাড়ীতে ঢুকিল, আমি তাদের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। একবার সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আবার গেলাম। আবার ফিরিয়া আসিলাম। তখন অনেক দূর চলিয়া গেলাম। কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিলাম। এবার তাদের বাড়ী ঢুকিয়া পড়িলাম। তারা তখন আরও তিনচারিটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বারান্দায় বসিয়া ছিল। আমাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। একজন একখানা কুশাসন আনিয়া আমাকে বসিতে দিল। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় যাহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, আমি কুশাসনখানা সরাইয়া তার একটু কাছ-ঘেঁসিয়া বসিলাম। চাহিয়া দেখি, তার মুখখানি জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটি মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে; শরীর মৃদু কাঁপিতেছে। আমি মনে করিলাম, আমারই মত তারও হৃদয়ে অনুরাগের উদ্রেক হইয়াছে। আমি তার হাতখানি ধরিতে গেলাম, সে সরিয়া গেল। আমি বলিলাম, "আমি একেবারে ভিখারী নই। এই দশটি টাকা আমার কাছে আছে।" সে ঝরঝরে কাঁদিতে লাগিল, ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন তার সঙ্গিনী আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—"আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা পতিতা। পাপ ব্যবসা করিয়া দিন কাটাই। কিন্তু আমরা নিজেদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছি বলিয়া, আপনার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব না। আপনি আমাদের দেবতা, আপনার পা ছুঁইবার আমরা যোগ্য নই। আপনি আমাদের এ পাপ-গৃহকে পায়ের ধূলা দিয়া আজ পবিত্র করেছেন। আপনি বসুন, আমরা আপনার পায়ের তলে বসিয়া ঠাকুরের নাম করি, শুনুন।" এই বলিয়া একজনকে খুলি ডাকিতে পাঠাইল; নিজে করতাল লইয়া আসিল; আর একজনকে হারমোনিয়াম আনিতে বলিল। খুলি বুঝি কাছেই থাকে। করতাল, হারমোনিয়াম আনিতে-আনিতে সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই স্ত্রীলোকটি গান ধরিল—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।

কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি ॥
রূপ রঘুনাথপদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

আরও দু'তিন জন এই গানে যোগ দিল। আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিলাম। এতদিন সাধনভজন করিয়া শেষে গণিকার মুখে ধর্ম্মোপদেশ পাইতে হইল। মনে হইল, সকলি বৃথা। মান গেল, ধর্ম্ম গেল, এ জীবন আর রাখি কেন? এরূপ ভাবিতে লাগিলাম। ইহাদের গান শেষ হইলে, অধোমুখে উঠিয়া আসিতেছি, এমন সময় সে গাহিতে লাগিল—প্রথমে গুন্-গুন্ করিয়া, শেষে আত্মহারা হইয়া, গলা ছাড়িয়া, প্রাণ ঢালিয়া গাহিতে লাগিল—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়,
দিয়া তুলসী তিল, দেহ সঁপিনু
দয়া নাহি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোস, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঁই ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী হয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥

আবার ধরিল—

তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুতমিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি, মন তাহে সমপিল
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব হম পরিণাম নিরাশা,
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতএ' তোহারি বিশোয়াসা ॥

এইখানে আসিয়া তার গানের পদ ফুরাইল; কেবল প্রাণপণে "তুমি দীনদয়াল. দীনবন্ধু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তার পরে কি হইল আমার মনে নাই। অনেক রাত্রে জাগিয়া দেখি—এখানে, এই বাড়ীতে, নিজের বিছানায় শুইয়া আছি।"

গুরুদেব আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি যাহা-যাহা যেরূপ দেখিয়াছিলাম, বলিলাম। গোরা কখন চলিয়া আসিয়াছিলেন, আমি জানি না। কিরূপে কখন বাড়ী ফিরেন, তাও জানি না। শুনিলাম, পথে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলেন। একটি গুরুভাই তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া গাড়ী করিয়া লইয়া আসেন।

গোরা বলিল—"ঠাকুর, আমার এ দুর্গতি হইল কেন?"

গুরুদেব বলিলেন—"তোমার বহুভাগ্যবলে এটি হইয়াছে। তুমি এ সকল স্ত্রীলোককে বড় ঘৃণা করিতে। ভগবান তাই তোমার দর্প চূর্ণ করিলেন। মানুষমাত্রকেই যে ভক্তি করিতে না পারে, অন্য ধর্ম্মকর্ম্ম তার যাই হউক না কেন, সে কখনও ভগবানকে পায় না।"

গোরার কাণে এ কথা গেল কি না, বুঝিলাম না। সে আরও আকুল হইয়া বলিল—"আমার সকলই নষ্ট হইল। এই মন লইয়া এই ভেক আমি রাখি কেমন করিয়া?"

গুরুদেব বলিলেন—"ভয় নাই, ব্রহ্মচারী, ভয় নাই। ভগবানের রাজ্যে কিছুই বিফলে যায় না। একটিও সাধু-ইচ্ছা নষ্ট হয় না। সময়মতে তার ফল ফলেই ফলে। তোমার সাধন-ভজন ত বাস্তবিক বিফলে যায় নাই। যাকে দেখিয়া তোমার চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছিল, সে ত সামান্য ব্যক্তি নয়। ইহার ভিতরে যে বস্তু বাস্তবিক তোমার প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছিল, কাম তাহাকে সহজেই নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু কোনও দিন সৃষ্টি করিতে পারিত না; সামান্য রক্তমাংসের টানে তোমাকে টলাইতে পারিত না। আর এ ধাক্কা খাওয়া তোমার প্রয়োজন ছিল। তুমি সন্ন্যাস লইয়া স্বভাবকে শুদ্ধ করার চাইতে রুদ্ধ করার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলে। তাই তোমার প্রকৃতি এই প্রতিশোধ তুলিয়াছে। ও-পথের অসারতা দেখাইতেই ভগবান তোমার এই দশা ঘটাইয়াছেন। যে আঁধারে তোমাকে আজ ঘেরিয়াছে, তারই ভিতর হইতে সত্যের আলো ফুটিবে। সেই আলোতে তুমি সাধন-পথ খুঁজিয়া পাইবে। আর সে-পথে এই রমণীই তোমার গুরু হইবেন। আজ হইতে তুমি নামের সঙ্গে ইঁহার রূপ জড়াইয়া লইবে। ঐ রূপেতেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে।"

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

মনের বিকাশ।

আমরা এমন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের মনে এখন নানা ভাবের উদয়, নানা অবস্থার সংঘটন হইতেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মনের বিকাশ হইতেছে, অবস্থার জটিলতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু যখন আমাদের জীবনের প্রথম সূচনা হইল, তখন আমাদের মনের অবস্থা কেমন ছিল? হারবার্ট বলেন, মনের প্রথম অবস্থায় মনের কোন জটিলতা ছিল না—অনুভূতি ছিল না, ইচ্ছা ছিল না, চিন্তা ছিল না। ইহার একই অবস্থা ছিল—এ অবস্থা জ্ঞানের নয়, ভাবের নয়, কর্ম্মের নয়।

ইহা কি তবে একবারে নির্গুণ ছিল? একবারে নির্গুণ ছিল না—মাত্র ইহার দুইটি গুণ ছিল। ইহা আপনার পরিবর্ত্তন আপনি আনিতে পারে না—ইহা যেমনটি আছে, তেমনটি থাকিয়া যাইবে; এবং যদি কোন প্রকারে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তবে নিজেকে সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া পূর্ব্ব অবস্থায় পুনরানয়ন করিতে পারে না। তখন

"তোমায় সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহস্র ক্রন্দন,
তাহার উত্তাপ-স্রোতে ভেসে যায় তৃণের মতন।"

ইহার আর একটি গুণ এই যে, বাহ্যশক্তি কর্ত্তৃক ইহার চাঞ্চল্য উৎপাদিত হইলে; ইহাও ঐ শক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করিতে সমর্থ।

হারবার্ট আরও বলেন যে, প্রথম অবস্থায় সকলেরই মন একপ্রকার;—ধনীর সন্তান এবং দরিদ্রের সন্তান, শিক্ষিত ব্যক্তির সন্তান এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির সন্তান—সকলেরই মন প্রথম অবস্থায় একরকম—কোন পার্থক্য নাই। হারবার্টের এ প্রকার অনুমান একবারে অসম্ভব নয়। ইহাতে কতটুকু সত্য আছে জানি না, তবে কিছু সত্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। মন প্রথম অবস্থায় সুপ্ত। বাহ্যবস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতে এই সুষুপ্তি নষ্ট হয়। কিন্তু বাহ্যশক্তি একবারেই মনের নিকট পৌছিতে পারে না। বাহ্যশক্তি মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুপ্ত মনকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় মনুষ্য-শরীরের অংশমাত্র। হারবার্ট বলিয়াছেন যে, প্রথম অবস্থায় সকলের মন একপ্রকারের, কিন্তু তিনি ত বলেন নাই যে, সকলের শরীরও প্রথম অবস্থায় একপ্রকারের! অতএব জন্ম সময়ে সকলের মন এক হইতে পারে, কিন্তু শরীরের গঠনের পার্থক্য হেতু মনের এই সাম্যতা অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়। দুইটি বালক এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিল। দুইজনেরই মন এক রকম। কিন্তু একজন অন্ধ, আর একজন চক্ষুষ্মান। একজন দর্শনেন্দ্রিয়জনিত সুখের অধিকারী হইল, আর একজন তাহাতে বঞ্চিত হইল। দুইজনের মনের সাম্যতা নষ্ট হইয়া গেল। কেবল যে শরীর যন্ত্রের গঠন-প্রণালীই মনের পার্থক্য সৃজন করে, এমন নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বহুল পরিমাণে এ পার্থক্যের হেতু। একজন হয় ত বিলাসিতার কোমল ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইতেছে; আর একজন হয় ত দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিপীড়িত হইতেছে। একজনের বাসস্থান হয় ত জনতাপূর্ণ, কোলাহলপূর্ণ নগর, আর একজনের আবাসভূমি হয় ত শান্তিময় সামান্য পল্লীগ্রাম। একজনের পিতামাতা হয় ত শিক্ষিত, আর একজনের পিতামাতা হয় ত নিরক্ষর। শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-বিহার আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষিত হয়, এবং এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে মনেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

কোন একটি পরিবারের সন্তান-সন্ততির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আকার-প্রকার বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর,—দেখিবে, তাহার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে—কিন্তু এই বিশেষত্বটুকু অন্য আর একটি পরিবারে দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে, এবং এই বিশেষত্ব বংশপরম্পরানুগত। পিতার আকৃতির সহিত পুত্রের আকৃতির সাদৃশ্য বিরল নহে। কেবল যে

আকৃতিগত সাদৃশ্যই লক্ষিত হইবে, এমন নহে। বিশেষভাবে প্রণিধান কর,—দেখিবে, মনোগত বিশেষত্বও আছে,—এক-এক পরিবারের এক-এক রকম মনের ভাব। এ ভাবও বংশপরম্পরানুগত।

"বাছারে!
বিনা পরিচয়ে আমি চিনেছি তোমারে।
সেই সুভদ্রার মুখ, পার্থ অবয়ব,
সেই সুভদ্রার প্রাণ, পার্থের প্রভব।
অর্জ্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?
ত্রিদিবের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ধরার,
তাঁহাদের পুত্র বিনা কে পাইবে আর?"

পিতার মনের ভাবের সহিত সন্তানের মনের ভাবের অনেক সাদৃশ্য থাকে। এক গৃহস্থের দুইটি সন্তান। বাল্যাবস্থায় তাহাদের মনের অবস্থা প্রায় এক ছিল। পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে দেখিলে, একজন যুদ্ধবিদ্যায়, আর একজন কাব্যালোচনায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। একজন কর্ম্মঠ, নির্ভীক এবং উদ্ধত—আর একজন আলস্যপরায়ণ, নিস্তেজ এবং শান্তিপ্রিয়। উহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এক ছিল না; উহাদের শিক্ষাও একরূপ হয় নাই। একজনকে পাহাড়-পর্ব্বতে, বন জঙ্গলে, ঝড়-বৃষ্টিতে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে, আর একজনকে হয় ত প্রকৃতির অত্যাচার একবারেই সহ্য করিতে হয় নাই—সুরম্য সুসজ্জিত অট্টালিকাতেই হয় ত কাল কাটাইতে হইয়াছে। একজনকে কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; আর একজন হয় ত নিরন্তর নিরাপদে সুখ-শান্তিতে কালাতিপাত করিয়াছে। উহাদের শিক্ষা পৃথক, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও পৃথক বলিয়া মনের বিকাশও বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাহ্যশক্তিনিচয় মনের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে।

একখানি গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইঁট কাঠ প্রভৃতি কতকগুলি উপকরণের আবশ্যক। কিন্তু এই উপকরণগুলি বাহিরের শক্তিতে সঞ্চিত হইতেছে, বাহিরের শক্তিতেই সজ্জিত হইতেছে—গৃহের নিজের কোন শক্তি নাই। ইহার কোন অঙ্গ নষ্ট হইলে ইহাকে পুনরায় মেরামত করিবার শক্তি গৃহের নাই। কিন্তু বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে—জল বায়ু উত্তাপ ইত্যাদি ইহার উপাদান;—এ উপাদান কোন বাহিরের শক্তিদ্বারা সঞ্চিত হইতেছে না। বীজের নিজেরই অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। এই শক্তিসাহায্যে সূর্য্য হইতে উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে, মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিতেছে, আকাশ হইতে বায়ু গ্রহণ করিতেছে; নিজের উপকরণ নিজেই সংগ্রহ করিতেছে; যাহা পুষ্টিকর তাহাই গ্রহণ করিতেছে, অপুষ্টিকর দ্রব্য ত্যাগ করিতেছে। নিজের ভিতর হইতেই নিজের পত্র পল্লব ফল পুষ্প প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে ক্রমে-ক্রমে বিকাশ করিয়া বৃক্ষটিকে পূর্ণাবয়ব করিয়া তুলিতেছে। ইহার একটি পল্লব কাটিয়া ফেল—দেখিবে সেখানে আর একটি পল্লব অঙ্কুরিত হইতেছে। বৃক্ষটির মত আমাদের মনেরও বিকাশ হইতেছে। এ বিকাশও অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রসূত! ইহাতেও উপকরণের আবশ্যক। এই অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে উপকরণগুলির আদান-প্রদান গ্রহণ-প্রত্যাখান, সংযোগ-বিয়োগ, মিলন-বেষ্টন প্রভৃতি কার্য্য হইতেছে। এই প্রকার ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানসিক শক্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে। মনের মূল শক্তি, বংশানুগত শারীরিক এবং মানসিক বিশেষত্ব, পারিপার্শ্বিক সামাজিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থা—এই কয়টি মনের বিকাশ এবং পুষ্টিসাধনের উপায়। বীজ ব্যতীত বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না। মূল শক্তি ব্যতীত বিকাশ অসম্ভব। শক্তিহীন বস্তুর স্বপ্রকাশ অসম্ভব। স্বপ্রকাশ এবং বিকাশ নামান্তর মাত্র। মন আত্মপ্রকাশে সমর্থ, কারণ মনের নিজস্ব শক্তি আছে। এই নিজস্ব শক্তিটিকে মূল-শক্তি বলা যায়। মূল-শক্তি ব্যতীত মাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে বিকাশ অসম্ভব। এই মূল-শক্তি একবারে সহায়-সম্বলবিহীন নহে। শরীর এবং মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। প্রত্যেক মানুষের অবয়বগত বিশেষত্ব আছে। এ বিশেষত্বটুকু বংশানুগত। প্রত্যেক মানুষের মানসিক বিশেষত্বও আছে; এ বিশেষত্বও শরীরগত বিশেষত্বের ন্যায় বংশানুগত। ইহা সকল সময়েই স্বোপার্জিত নহে, শিক্ষালব্ধ নহে। মানসিক শক্তির বিকাশের প্রাক্কালে ইহা যে একবারে নিষ্কলঙ্ক, একবারে পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত, তাহা বলা যায় না। শরীরের সহিত মনের সান্নিধ্যহেতুই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, মনের উপর পূর্ব্বসংস্কারের আভাস আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। শরীর ব্যতীত প্রাথমিক

অবস্থা সকলেরই সমান হইতে পারে,—মূল-শক্তি সকলেরই এক প্রকার হইতে পারে; কিন্তু এরূপ মন আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় নহে। তবে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, জীবনের প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন মনের ভিতর যতটুকু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, পরে ততটুকু হয় না।

শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ, সবল হইলে মনকেও সুস্থ ও সবল করিতে পারা যায়। শরীর দুর্ব্বল হইলে মানসিক শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীরের উন্নতি-সাধন প্রয়োজন। জল, বায়ু, আহার, সংযম, ব্যায়াম ইত্যাদির উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। জল বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক শক্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, পারিবারিক আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি ইত্যাদি মনের বিকাশে সহায়তা করে—ইহাদিগকে সামাজিক পারিপার্শ্বিক শক্তি বলা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে বংশানুগত "পুরাতনের" উপর নূতনের ছায়া পতিত হইয়া নূতনের সৃষ্টি হইতেছে।

এক হইতে সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত মানুষের মন অবস্থার দাস, পারিপার্শ্বিক শক্তির ক্রীড়নক মাত্র। এখন মন একপ্রকার নিষ্ক্রিয়। এখনও চিন্তার উন্মেষ হয় নাই। ভূতের পা তালগাছের মত; রাক্ষসে মানুষ খায়, এই প্রকার রূপ-কথা শুনিতে ভালবাসে; সুতরাং এ অবস্থায় কল্পনা-শক্তির কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। এখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য বড়ই প্রবল। এটি সাদা, ওটি কাল; এটি শক্ত ওটি নরম; এটি মিষ্ট ওটি তিক্ত, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সঞ্চয়ে মন নিরত। এ অবস্থায় মানুষ বড়ই স্বার্থপর থাকে। নিজের সুখ দুঃখ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। ইচ্ছাশক্তির এখনও তেমন বিকাশ হয় নাই—ইচ্ছাকে যদৃচ্ছা সঞ্চালিত এবং সংযত করিবার শক্তি এখনও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মন অত্যন্ত ক্রিয়া-শীল। এখন আর সে অবস্থার দাস নহে, এখন আর সে অবস্থা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় না;—অবস্থাকেও সে পরি-চালিত করিতে পারে। এখন সে পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের উপর আধিপত্য সংস্থাপনে সচেষ্ট। এখন আর সে অবস্থার আদেশানুযায়ী কাজ করে না, অবস্থাকে নিজের আদেশের বশীভূত করিতে সচেষ্ট। সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে সকল জ্ঞানের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, এখন সেই উপকরণগুলিকে স্মৃতিপটে ধারণ এবং স্মরণ করিবার শক্তি হইয়াছে। এই সময় স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রবল। এখন যাহা অভ্যাস করা যায়, বোধ হয় জীবনে আর তাহা ভোলা যায় না। অভিজ্ঞতার কষাঘাতে কল্পনাশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। বাস্তবের সম্মুখে অবাস্তবের কাহিনী আর ভাল লাগে না। এখন আর উপকথায় আমোদ পাওয়া যায় না, কিন্তু উপন্যাস-পাঠে যথেষ্ট আমোদ পাওয়া যায়;—কিন্তু উপন্যাস যদি অস্বাভাবিক ঘটনাবলির বিশ্বাস মাত্র হয়, তবে সে উপন্যাস-পাঠে কৌতূহল জন্মে না। এই সময় তর্ক-শক্তি এবং বিচার-শক্তি ক্রমশঃই প্রস্ফুটিত হয়। অনুভূতির জটিলতাও ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এখন কেবল নিজের সুখ-দুঃখের জন্য লালায়িত নহি। এখন পরের জন্যও ভাবিতে শিখিতেছি। এখন আর কেবল ইন্দ্রিয়-সুখে সন্তুষ্ট থাকি না—এখন জ্ঞানে সুখ পাই, কর্ম্মে সুখ পাই, ধর্ম্মে সুখ পাই, সৌন্দর্য্যে সুখ পাই। এখন ইচ্ছাশক্তিকে সংযত করিতে, নির্দ্দিষ্ট পথে, কর্ত্তব্যপথে চালাইতে পারি। চতুর্দ্দশ হইতে একবিংশতিবর্ষ কালের মধ্যে মানুষ অনেক পরিমাণে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়। এখন সে স্বাবলম্বন শিক্ষা করিয়াছে—নিজেকে অনেকটা স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। এখন তাহার দৃষ্টি বহির্মুখী নহে—অন্তর্মুখী। প্রথম অবস্থায় যে জ্ঞান সংগৃহীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় অবস্থায় যে জ্ঞান স্মৃতিপটে সঞ্চিত হইয়াছিল, এখন সেই সঞ্চিত জ্ঞানের শৃঙ্খলা সম্পাদনে সচেষ্ট। অনাবশ্যক জ্ঞানগুলি সংহার করিয়া আবশ্যক জ্ঞানগুলির সংরক্ষণে এখন সচেষ্ট।

দ্বিতীয় অবস্থায় অভ্যাসের বলে অবোধ্য এবং অর্থহীন ভাষাকেও স্মৃতিপটে ধরিয়া রাখা যাইত; কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু এখন কোন জিনিষ বা ভাষা মনে রাখিতে হইলে ইহার অর্থবোধ আবশ্যক এবং স্মৃতির সহিত ইহার সাদৃশ্যের অনুসন্ধান আবশ্যক। এখনকার স্মৃতি জ্ঞানসম্ভূত,—অভ্যাসপ্রসূত নহে। এ সময়ের অনুভূতি জ্ঞানের সহায় এবং কর্ত্তব্যের প্রবর্ত্তক। মানুষের মন এইরূপে ক্রমশঃই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে অন্তর্নিহিত আত্ম-শক্তির বিকাশ করিয়া জ্ঞানের দিকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

"ফুল কহে ফুকারিয়া—ফল, ওরে ফল,
কতদূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্!
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি!" (ক্রমশঃ)

অবাক্ জলপান

[শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম-এ, বি-এল]

সে আজ প্রায় বিশবৎসরের কথা। তখন আমি কলিকাতায় মর্টগেজের দালালী করিতাম। 'দালালী করিতাম' কথাটা বোধ হয় ঠিক হইল না। কেন না দালালী করিয়া রোজগার করার চেষ্টায় কিছুদিন ধরিয়া অনেক ঘোরাঘুরি করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু একটি পয়সাও ঘরে আনিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। তখন কলিকাতায় থাকারও আমার একটু সুবিধা ছিল। আমাদের দেশের জমীদারবাবুদের জোড়াসাঁকোতে একখানি বাড়ী ছিল। সেখানে থাকায় বাটী-ভাড়াটা বাঁচিয়া যাইত। তাহার উপর, বাবুদের একজন হিন্দুস্থানী বেহারাও ছিল; মাঝে-মাঝে তাহাকে একআধ আনা পয়সা দেওয়ায়, তাহার সাহায্য বিশেষ পাওয়া যাইত। আহারের জন্যও বড় ভাবিতে হইত না। রাস্তার অপর পারেই চাটুয্যের হোটেল ছিল। এটী খোলার ঘরে নিজেদের-ঘরে-তৈয়ারী "হিন্দু-ভদ্রলোকদিগের-আহারের-স্থান"-মার্কা সাইন-বোর্ডওয়ালা হোটেল। পার্ব্বণী দুই আনা ছিল; কিন্তু আমি বাঁধা খদ্দের, তাহার উপর দু'বেলায় পাঁচ আনা দিতাম বলিয়া, উহার মধ্যেই একটু উনিশ বিশ করিয়া চাটুয্যে স্বহস্তে আমার থাকিবার দোতালার ঘরে খাবার দিয়া যাইত। একটি তারের খাঁচা ছিল; আমি বাটী না থাকিলেও, বেহারার নিকট হইতে ঘরের চাবি লইয়া চাটুয্যে সযত্নে ভাতের থালা খাঁচা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া যাইত।

সে দিন রবিবার, বেলা তখন সাড়ে-এগারটা। বৈশাখ মাস, রৌদ্রের খুব তেজ। ঘরের জানালাগুলি প্রায় সব বন্ধ। তখনও আমার স্নান হয় নাই। গাত্রে তৈলমর্দ্দন শেষ হইয়াছে, ঘাড়ে গামছা ফেলিয়াছি, স্নান করিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইব, এমন সময় দেখি—রমণীবাবু ঘরে ঢুকিলেন।

রমণীবাবু আমাদের জেলারই, ভাতনা গ্রামের জমিদার। শান্ত, গম্ভীর প্রকৃতি, বয়স আন্দাজ ৪৪ হইবে। চেহারার বিশেষত্বের মধ্যে বেশ একজোড়া বড় ও মানানসই গোঁফ এবং সম্মুখের মাথাজোড়া টাক।

রমণীবাবু আসিতেই আমি "আসুন, আসুন; কবে এলেন?" বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলাম।

তিনি রৌদ্রে আসিয়া বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছিলেন; বলিলেন, "হচ্ছে সে সব, পরে হচ্ছে। এখন এক ছিলিম তামাক দিতে বল দেখি।" এই বলিয়া টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন; এবং টেবিলের উপর একখানি হাতপাখা পড়িয়া ছিল, সেখানি লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। কয়েকটী কলিকায় তামাক সাজা ছিল। আমি একটিতে আগুন দিয়া গড়গড়ার উপর দিলাম। একটু ধরিয়া উঠিলে, রমণীবাবু আস্তে-আস্তে টানিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তামাক বেশ ধরিয়া উঠিলে, রমণীবাবু ধূমপানে শ্রান্তি দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তোমাদের এখানে থাকার জায়গা আছে?" আমি বলিলাম "কাহার?" উত্তরে বলিলেন, "কাহার আবার, আমার। আমি ৪।৫ দিন এখানে থাকিতে চাই।" আমি খুব আগ্রহের সহিত বলিলাম, "কেন হইবে না? এই ঘরেই দু'জনে বেশ থাকিব। আপনি উঠিয়াছেন কোথায়?" "আমি, আমি ছাতুবাবুদের বাটীতে আছি, বীডন ষ্ট্রীটে। তাঁহারা আমার দূর আত্মীয়।" ভাবে বোধ হইল—কেন আসিতে চান, সেটা ভাঙ্গিতে অনিচ্ছুক। আমিও আর খোঁচাইলাম না। রমণীবাবু একটু পরে বলিলেন "খাওয়ার কি রকম ব্যবস্থা কর?" আমি বলিলাম, "ঐ যে ঢাকা আছে। নীচে এক চাটুয্যের হোটেল আছে, সেখান থেকে আনিয়ে নি।" "দেখি, দেখি, কি রকম দেয়।" আমি খাঁচাটি তুলিয়া লইলাম; রমণীবাবু ভাতের থালার কাছে উঠিয়া গিয়া, ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন। "ঝোল, ডাল, একটা তরকারী, আলুভাজা; আবার অম্বলও একটু আছেন। তা' এতেই আমার বেশ চলবে। একটু রাবড়ি-টাবড়ি আনিয়ে নিলেই হ'বে। আমার আবার একটু আফিম খাওয়া আছে কি না, একটু গব্যরস চাই। তা' এখন তুমি স্নান কর। আমি বৈকালে রোদ পড়লেই আসব।" এই বলিয়া তিনি আস্তে-আস্তে চলিয়া গেলেন। আমি ক্রমে স্নানাহার করিয়া রবিবারের

পাওনা দিবানিদ্রা শোধ দিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই ঝাঁকা-মুটের মাথায় একটি জোন্‌সের তিনতালার ষ্টীলট্রাঙ্ক ও একটি সতরঞ্চ-জড়ান বিছানা ও তাহার হাতে একটি ছোট ছিলিম-মাথায় সনল গড়গড়া দিয়া রমণীবাবু আসিয়া পৌছিলেন। সে দিন আমি আর বাহির হই নাই। সন্ধ্যায় প্রত্যহ নিকটেই বোসেদের বাড়ীতে পাশার আড্ডায় যাইতাম। দুই-একজন বন্ধু আড্ডায় যাইবার সময় আমাকে ডাকিয়া যাইতেন। কোন দিন বা আগেই আমি একেলা যাইতাম। সেদিনও ২।১ জন ডাকিতে আসিলেন; আমি রমণীবাবুকে ফেলিয়া যাইতে পারিব না বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলাম।

সন্ধ্যা হইল। বাবুদের সরকারী বেহারা একটি হিংক্‌সের ল্যাংটা আলো পুরাতন গোল-পাথরের টেবিলের উপর দিয়া গেল। বেহারাকে দিয়া রমণীবাবুর বিছানাটী পূর্ব্বেই পাতা হইয়াছিল। তিনি আস্তে-আস্তে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় গুড়গুড়িটী টানিতেছিলেন। রাস্তায় সব গ্যাসের আলো জ্বালা হইয়া গিয়াছে। কিছুদূর হইতে ফেরিওয়ালার ক্ষীণ স্বর আসিল "অবাক্ জলপান"। হঠাৎ রমণীবাবু গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া, নলটি হাতে ধরিয়া, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সকালের ট্রেণটা কখন ছাড়ে হে?" তিনি হঠাৎ এরূপ ব্যস্ত হওয়ায় আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম। কিছুদিন থাকিবার কথা! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন, রেলের খবরে কি হইবে?" তাঁহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই খুব নিকট হইতে ফেরিওয়ালার আওয়াজ, আসিল "অবাক্ জলপান—নারকোলে ঘুগনি—ঈ......।" রমণীবাবু বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! বেটা এখানেও এসেছে! ওহে, ওহে, ওকে ডাক। ডেকে বল, আমি ওকে আটআনা পয়সা দিচ্ছি, ও যেন এখানটায় না হাঁকে। একটু দূরে গিয়ে ডাকুক।" কিছুতেই ছাড়িলেন না। তাহাকে ডাকিলাম। আটআনা পয়সার পরিবর্ত্তে এ পাড়াটায় চুপ করার কথা বলিলাম। সে কিছুতেই রাজী হইল না। এরূপ অদ্ভুত অনুরোধে সেও বেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সে বলিল, "বাবু, আমাদের এই করে খাওয়া। না ডাক্‌লে কি করে খদ্দের পাব। আমায় মাপ কর্‌বেন।" সে নীচে নামিয়া গেল, ও বোধ হয় একটু দুষ্টামি করিয়াই, ঘন-ঘন ও জোরে হাঁকিতে-হাঁকিতে গেল "অবাক্ জলপান—গরমাগরম।"

রমণীবাবু খুব চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে খুব একটা বিরক্তি ও মাথার মধ্যে একটা খুব গোলমাল চলিতেছে, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, আমাকে কালই যেতে হ'বে। তুমি আমাকে কাল নূতনবাজার থেকে কিছু বাজার করে দিয়ে রেলে উঠিয়ে দিও।" আমি তাঁহাকে এরূপ ব্যগ্র হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে কথার কোন পরিষ্কার জবাব দিলেন না। আহারাদি সারিয়া শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না। আমি রাত্রিতে দু'বার উঠিয়াছিলাম। দু'বারই তাঁহাকে গুড়গুড়ি টানিতে ও এপাশ-ওপাশ করিতে দেখিয়াছিলাম। শয়ন করার পূর্ব্বে ৪।৫টী কলিকায় তামাক সাজাইয়া শুইয়াছিলেন। খুব ভোরেই উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া রমণীবাবু আমাকে উঠাইলেন। সব কলিকা কয়টীই রাত্রিতে পোড়াইয়াছেন দেখিলাম।

আমি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া তাঁহাকে লইয়া নূতনবাজারে গেলাম। একটী ঝুড়ি ও কিছু ফল-মূল,তরিতরকারী কিনিয়া লইয়া বাটী ফিরিলাম। চাটুয্যেকে বলিয়া গিয়াছিলাম; সে তাঁহাকে ৯৷৷০ টার মধ্যেই ভাত দিয়া গেল। স্নানাহার সারিয়া একখানি সেকেণ্ডক্ল্যাস কেরাঞ্চি করিয়া রমণীবাবুকে লইয়া হাওড়া রওনা হইলাম। টিকিট করিয়া মালপত্র সহিত তাঁহাকে একটী ইণ্টার ক্ল্যাসের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলাম। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রমণীবাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। একটী কুলিকে দু'টী পয়সা দিয়া গুড়গুড়িটীতে জল ভরাইয়া, একছিলাম তামাক সাজাইয়া লইলাম। ট্রাঙ্কের মধ্যেই একটি টিনের দু'মুখো চুঙ্গিতে তাঁহার তামাকের সরঞ্জাম থাকিত।

একটু পরে রমণীবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের এ সকল জায়গায় পোষায় না। বড় গোলমাল।" আর কিছু আমিও ভাঙ্গিলাম না। ট্রেণ ছাড়ার সিটি পড়িল, রমণীবাবুর মুখের ভাব প্রায় পরিষ্কার হইয়া উঠিল।

একজন ফেরিওয়ালার ডাকে মানুষকে যে এত বিরক্ত করিয়া তাহাকে সহর-ছাড়া করিতে পারে, ইহা কল্পনা করা যায় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

সেদিন আমার স্নানাহার করিয়া বাহির হইতে একটু বেলা হইয়া গেল।

দাদা মশায় *

[শ্রীআমোদর শর্ম্মার খসড়া হইতে গৃহীত]

"দাদা মশায়, আপনার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, গঙ্গাপানে পা করেছেন, মায়ার বাঁধন সবই একে-একে কেটে ফেলেছেন, আর এই পাপ নেশাটা ত্যাগ করতে পারেন না? এ ত সঙ্গেও আসে নি, সঙ্গেও যাবে না। জঞ্জালের রাশ যে ঝাঁট দিয়ে শেষ করতে পারি নে। গুলেতে, ছাইএতে, আধপোড়া কয়লাতে, দেশলাইএর কাঠীতে একাক্কার। দিন দু'বার ঝাঁট দেবার কথা, এ যে সাত বারেও জড় মরে না।"

বসন্তরাণী—ষোড়শী, সুন্দরী, ফিটফাট, শেমিজশাড়ীপরা, চুলবাঁধা, টিপপরা, সিঁদূরে উজ্জ্বল সীঁথি, পায়ে আলতা, হাতে বাড়ন—এই বলিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

বুড়া দাদামশায় কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"নাত্‌নী, তোরা আজকাল সৌখীন হয়েছিস্—এখন আর তোরা দাঁতে-মিশি দেখনহাসি হ'তে চাস্‌নে, আমলা-মেথীর গন্ধ স'স্‌নে, নাত্‌জামাইরাও এখন হুঁকো-কলকেকে অসভ্যতা মনে করে নস্যির শিশি ধরেছে। তোরা এখন বদ নেশা বলে নাক-সিট্‌কাবি বই কি? তা, তোর যদি ননীর মত নরম হাতে বারে-বারে বাড়ন ধর্‌লে কড়া পড়ে যায়, এত গোলে কাজ কি? আমার কাছে অস্তরখানা রেখে যাস্, আমিই ঝাঁটপাট দিয়ে রাখ্‌ব। নাত্‌জামাইএর নস্যি-সিক্‌নি-মাখা রুমালগুলো তিনবেলা সাবান করতে ত কই আলিস্যি করিস্‌নে? বুড়ো দাদা মশায়ই বুঝি বড় বোঝা?"

নাত্‌নী দাদামশায়কে ঢিলটি মারিয়া পাটকেলটি খাইয়া একটু নরম সুরে বলিল, "তা, দাদামশায়, মন্দ কি বলিছি? নেশার বশ হওয়া কি ভাল? আর আমাকে ত বড় খোঁটা দিলেন, দিদি-মা থাক্‌লে কি তাঁর নথনাড়া খেয়ে এমনি মুখের ওপুর জবাব দিতে পার্‌তেন? সে যে শক্ত মাটি!"

এবার নরম সুরটা দাদামশায়ের পালা। আজ ত্রিশ বৎসর হইল, গৃহিণী একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া, স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তা পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে মেয়েটিকে মানুষ করিয়া, একটি দরিদ্র যুবকের সহিত বিবাহ দিয়া মেয়েজামাই ঘরে রাখিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মোত্তর কয় বিঘার উপর নির্ভর করিয়া একরকম সুখে-দুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন। বিধাতার তাহাও সহিল না। কন্যাটিও একটি শিশু-কন্যা রাখিয়া, আজ পনর বৎসর হইল, মাএর কোলে চলিয়া গিয়াছে। জামাতা বাপাজী চাপরাশ হারাইয়া শ্বশুরগৃহ ছাড়িয়াছেন, ও আবার দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান্, সুতরাং শিশু-কন্যাটির কখন খোঁজ লন নাই। অকালবৃদ্ধ দাদামশায় নাত্‌নীটিকে মানুষ করিয়া, যথাসময়ে তাহারও একটি দরিদ্র-সন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিয়া কাছে রাখিয়াছেন। নাত্‌জামাই কালেজে পড়ে। এখন পূজার ছুটিতে যুগল মিলিয়াছে।

এমন করিয়া দিদি-মার কথা তুলিলে বুড়ার মনটা কেমন হইয়া যাইবে, মুখরা, যৌবন-গর্ব্বিতা নাত্‌নী তাহা ভাবে নাই।

দাদামশায় ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"ছেলেবেলায় গুরুমশায়ের পাঠশালে গুড়ুকটানা অভ্যেস করেছিলাম। গুরুমশায়ের তামাক সাজ্‌তে গেলে এ অভ্যেস আপনিই হয়ে পড়ে। গুরুমশায়ের দাগা বুলুতে বুলুতে হাত পাকে নি, কিন্তু তাঁর তামাক সাজ্‌তে-সাজ্‌তে নেশাটা পেকেছে। এর জন্য বাবার কাছে কত ধমক, কত মার খেয়েছি, তবু এ অভ্যেস ছাড়্‌তে পারি নি। এত লাঞ্ছনায়ও যা'র মায়া ত্যাগ করতে পারি নি, আজ পঞ্চাশ বচ্ছর যার মায়ায় বদ্ধ হয়ে রয়েছি, সবাই ছেড়ে গেলেও যে কখনও আমার ওপর বিমুখ হয় নি, সেই ছেলেবেলাকার বন্ধুকে আজ একফোঁটা একটা মেয়ের কথায় ত্যাগ করব? আমার জীবনে তোদের দুটির টুকটুকে মুখ, আর এই কলিহুঁকোর কাল কুচ্‌কুচে মুখ ছাড়া আর ভগবান্ কি রেখেছেন?"

একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলিয়া দাদামশাই একটু দম নিলেন। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধরা-ধরা

* রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে সান্ধ্য-সম্মেলনে পঠিত।

গলায় বলিতে লাগিলেন,—"আর তোর দিদিমার কথা বল্‌লি? তা' সে ত আর তোদের একালের মত সৌখীন মানুষ ছিল না; তখনকার কালের বৌঝীরা নিজেরাও দোক্তা-তামাক, মিশি-মাজনের মান রাখ্‌ত; আর পুরুষ-মানুষের গুড়ুক টানার মর্ম্মও বুঝ্‌ত। আহা! সে থাক্‌লে কি আর বুড়ো বয়েসে হাত পুড়িয়ে, টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে-দিতে হাঁফ ধর্‌ত। হায়! আমার কি তেমন বরাত, যে, তার সেই শাঁখাপরা হাতের সাজা তামাক আমার কপালে বেশী দিন সইবে?"

এবার দাদামশায়ের দীর্ঘনিশ্বাসটা একটু জোরে-জোরে পড়িল, গলাটাও একেবারে ধরিয়া গেল। তিনি মুখখানি ভার করিয়া তামাক সাজিতে বসিলেন।

বসন্তরাণীও এবার একটু বেশীরকম অপ্রস্তুত হইল। সে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "দাদামশায়, ঘাট হয়েছে। কোন্ কথায় কোন্ কথা এসে পড়বে, জান্‌লে আমি পোড়া ঝাঁট-পাটের কথা তুল্‌তাম না। তা' আপনি দুঃখু কর্‌বেন না, আমি সাত বারের জায়গায় না হয় দিনে দশবার ঝাঁট দেব এখন।"

তা'র পর একটু থামিয়া বুদ্ধিমতী নাত্‌নী বুড়াকে খুসী করিবার জন্য বলিল, "তা, আমিই না হয় দিদিমার হয়ে একবারটি তামাক সেজে দিচ্ছি, আপনি একটু তাঁর গল্প করুন।"

বুড়াকে আর বেশী অনুরোধ করিতে হইল না। তিনি নিঃশব্দে নাত্‌নীর দিকে তামাক, টিকে, কল্‌কে, দিয়াশলাই সরাইয়া দিলেন, কিন্তু চট্ করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না—অনেকক্ষণ শিবনেত্র হইয়া থাকিলেন।

তা'র পর, তামাক সাজিয়া টিকে ধরাইয়া ফুঁ দিতে দিতে বসন্তরাণী একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—"দাদামশায় তামাক তৈরি, খাবেন না? দিদিমার ধ্যানে বসেছেন না কি?" দাদামশায় আনমনে হুঁকাটি লইয়া কয়েকটা টান দিয়া একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মুখ হইতে অনেকটা ধোঁয়া বাহির করিয়া এবং নাক হইতে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন,—

"তোর দিদিমার গল্প শুন্‌বি? তবে ভাল হয়ে বোস্। সে যে অনেক কথা।

"আমার যখন চোদ্দ বছর বয়েস, তখন একটি আট বছরের কনের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল। কনে বউএর মা ছিল না, তাই বিয়ের পর বছর না ঘুরতেই আমাদের বাড়ীতেই তা'র স্থিতি হ'ল। আমি বিয়ের পরেই পাঠশাল ছেড়ে দিলাম। তখন লায়েক হয়েছি, আর কি পাততাড়ি বগলে করে' পাঠশালে যাওয়া চলে? বাবাও কিছুদিন পরে মারা গেলেন, সুতরাং নিষ্কণ্টক হলাম! দিনের বেলায় বুড়োদের তামাক সেজে ধরিয়ে দেওয়ার ছলে কসে 'দুটান' দিয়ে দিতাম। রাত্রে চারপোয়া সুবিধা হত। হাত পুড়িয়ে টিকে ধরাতে হ'ত না। সেই বেচারা বালিকাকে দিয়েই কাযটা সেরে নিতাম। তা'র মুখে কথা ছিল না, হুকুম-মাত্র সব তৈরি। তা'র এই গুণে সেই বয়সেই তা'র উপর ভালবাসা হ'ল। যতদিন বেঁচে ছিল, সে একদিনের তরেও এ কাযে অবহেলা করে নি। তবে দিনের বেলায় অবিশ্যি তা'কে এ কাযে পাওয়া যেত না।

"তুই যে বল্‌ছিলি, তোর দিদিমার ধ্যানে আছি কি না, সে কথা বড় মিথ্যে নয়। এত তন্ময় হয়ে বুড়ো তামাক টানে কেন, মনে করে তুই হাসিস্। কিন্তু আমি যেন হুঁকোয় মুখ দিলেই সেই একখানি মুখ—টিকেয় ফুঁ দিতে-দিতে রাঙা হয়ে উঠেছে—তাই চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই। আর তাই দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সংসারের সব ধান্ধা ভুলে যাই, যে দুটো শোক বুকের উপর পাষাণ হয়ে বসেছে, তাও যেন ভুলে যাই; তখন মনে হয়, কোন শোক-তাপ পাই নি, সংসারের কোন দুঃখ-জ্বালা জানি নি, সেই আধ-বালিকা, আধ-যুবতী, সুশীলা সতীর সেবা পেয়ে সুখের সাগরে ভেসে যাচ্ছি। তাই চক্ষুঃ বুজে আসে; তোরা ভাবিস্ বুড়োর বুঝি ঝিমুনি ধরেছে।"

এতখানি বক্তৃতার পর দাদামশায় আবার হুঁকায় মুখ দিয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন, ও ক্রমে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। বসন্তরাণী দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতে-ছিল, এমন সময়ে সান্ধ্য-ভ্রমণের পর প্রত্যাগত স্বামীর কাসীর সাড়া পাইয়া খাস্‌কামরার দিকে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইল—অসময়ে বুড়ার চট্‌কা না ভাঙ্গে।*

* 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র আমলে নিরবলম্বে একটা গল্প লিখিবার শক্তি না থাকাতে বিষবৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছিলাম। সে দুই বৎসরের কথা। এবার সাহস করিয়া একটা ছোট-গল্প লিখিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের তামাক সাজিতেন, তাঁহারাও ওস্তাদ গ্রন্থকার হইয়া উঠিয়াছেন; আর 'বঙ্কিম চর্চ্চরী' বানাইয়া হাত পাকাইয়াছি, একটা ছোট গল্প লিখিতে পারিব না?—লেখক।

সাময়িকী

প্রতি মাসেই 'সাময়িকী' লিখিত হইতেছে; লিখিবার বিষয়েরও অভাব নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালা দেশে কৃতী লেখকেরও যথেষ্ট সদ্ভাব হইয়াছে। কিন্তু লিখিবার প্রধান উপকরণেরই যে অভাব হইতেছে—কাগজ যে ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হইতেছে, বহুমূল্য হইতেছে, দুষ্প্রাপ্য হইতেছে; এবং যে প্রকার অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে হয় ত কিছুদিন পরে অপ্রাপ্য হইবে। যাঁহারা পুস্তক-লেখক তাঁহারা অনেকেই পুস্তক-প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছেন; যাঁহারা অর্থশালী এবং সখের সাহিত্যিক, তাঁহারা কাগজের মূল্য-বৃদ্ধির দিকে না চাহিতে পারেন, কিন্তু এ দেশে যাঁহারা সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রের পরিচালনা করেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তায় পড়িতে হইয়াছে। য়ুরোপের সংবাদ-ও সাময়িক-পত্রের স্বত্বাধিকারী মহাশয়েরা কেহ বা পত্রিকার আয়তন হ্রাস করিয়াছেন, কেহ বা পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশেও অনেক ইংরাজ সম্পাদক পত্রের মূল্য-বৃদ্ধি করিয়াছেন,—তাঁহারা আর ক্ষতিস্বীকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালা সংবাদ-ও সাময়িক-পত্রের স্বত্বাধিকারী মহাশয়েরা এতদিন নীরবে ক্ষতি সহ্য করিতেছেন; কিন্তু এ ভাবে বেশী দিন চলিতে পারে না। বাঙ্গালা-দেশের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের স্বত্বাধিকারী মহাশয়গণের সমবেত হইয়া এই কাগজের দুর্ম্মূল্যের দিনে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শরৎবাবুকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এমন অনেক কথা আছে, যাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই প্রনিধান করা কর্ত্তব্য। তাই আমরা সেই পত্রখানি এই স্থানে যথাযথ প্রকাশিত করিলাম।—

"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু,

দৈবক্রমে আপনার একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। তাহার পর আপনার সব বই আনিয়া পড়িয়াছি। অতি-মানুষ কদাপি দেখা যায়।

আপনি সাধারণ জীবনেরই কথা লিখিয়াছেন,—যাহা-দ্বারা জাতীয় জীবন রক্ষিত হইতেছে। তাহাতে যে কি মহত্ত্ব আছে ও কি মহত্ত্ব সম্ভব, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, অথচ আমাদের সম্মুখেই ঘটিতেছে।

অপ্রাকৃত ও অসম্ভাবিত চরিত্রের কথা বলেন নাই। বহুভাষী নবনীগঠিত পুরুষের পরিবর্ত্তে পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীকে পুতুলরূপে না আঁকিয়া তাহার নারীত্ব দেখাইয়াছেন।

যাহা ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা চিরন্তন তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। প্রচলিত সমাজের নিষ্ঠুরতা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত নহে, পরন্তু ইহা বালকের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন ক্রূরতার ন্যায়। জ্ঞান ও তর্কদ্বারা যাহা অপ্রতিষ্ঠিত থাকে, অনেক সময়ে হৃদয়ের পরিচালনে তাহা সম্ভাবিত হয়।

কারণ, এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ হইতে কে পরিত্রাণ পাইয়াছে —সে কথা স্মরণ থাকিলে কে অন্যের বোঝা বাড়াইতে চায়? যে দুঃখ কাহারও জীবন ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই দুঃখই আবার অন্যকে দুঃখের অতীত করিয়া দেয়।

সফলতা যে কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়! আপনার 'পথনির্দ্দেশ' পড়িতে-পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে, অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না, কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম যে, যে পথটা বড় তাহা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অনেক বিষয়ে আমাদের প্রযত্ন সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা ব্যর্থ করিবার জন্যও অনেক নিরাশার কারণ উদ্ভূত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। তাহার একটী এই যে ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইলে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। আর একটী এই যে, বহু প্রয়াসে পূর্ব্বে যাহা সাধিত হইয়াছিল, সফলতা আসিলে পরে সেগুলি অল্প আয়াসেই সম্পন্ন করিতে চাহি। যদি সফলতা আসিয়া থাকে, তবে তাহা ত দেবতারই করুণা, আমাদের তাহাতে কি বলিবার আছে?—কেবল বলিবার কথা এই যে, যে করুণা আমাদের অনুপযুক্ত জীবনে

প্রসারিত হইয়াছে, সেই দান যেন আমাদের জীবনকে আরও পূর্ণতর করিতে পারে। যে মহত্বের কথা বলিয়াছি, তাহা তখনই শক্তিবান হইবে, যখন লেখকের জীবন লেখা হইতেও মহত্তর হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু"

এবার বড়দিনে ভারতবর্ষে সভা-সমিতির বন্যা আসিয়াছিল; চারিদিকে সুধু সভা, সমিতি, সমাজ, সম্মেলন। আমাদের বাঙ্গালা দেশের প্রধান নগরী, ভারতের পূর্ব্বতন রাজধানী কলিকাতায় এই বড়দিনে সভাসমিতির ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়। এক 'আর্য্য-সমাজ' এবার কলিকাতার মুখ-রক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের মধ্যে কেবল মেদিনীপুরে 'মোক্তার-সম্মেলন' হইয়াছিল। আর বড়দিন, ছোটদিন পার হইয়া পৌষের শেষে 'বিক্রমপুর সম্মেলন' এবং কলিকাতার 'তিলিজাতির সম্মেলন' হইয়াছিল। আর যা কিছু সমস্তই বঙ্গের বাহিরে; তবে বঙ্গের বাহিরে হইলেও 'ভারতবর্ষে'র বাহিরে নহে। এতগুলি সভা, সমিতি, সম্মেলনের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, এবং এই কাগজের মহার্ঘতার দিনে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাও যায় না। আমরা এই সকল সম্মেলনের নাম উল্লেখ করিতেছি, এবং তাহারই মধ্যে দুই-চারিটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত দুই-এক কথা বলিতেছি।

কোন্‌টির নাম সর্ব্বাগ্রে করিব, তাহাও ভাবিয়া পাইতেছি না। বলিতে গেলে, জাতীয় মহাসমিতিই (National Congress) এই সকল সম্মেলনের পথিপ্রদর্শক; তাহার নামই প্রথমে করা সঙ্গত, এ সম্মান তাহারই প্রাপ্য। আমরা সুধু নামই করিব। রাজনীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা আমরা নানা কারণেই করি না। সে ভার যাঁহারা স্কন্ধে লইয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরই সুদৃঢ় স্কন্ধে ন্যস্ত থাকুক। এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন লক্ষ্ণৌয়ে হইয়াছিল। বাদসাহী নগরে দীর্ঘশ্বেতশ্মশ্রুলম্বিত, শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেক দিন পূর্ব্বে সুরাটে মহাসমিতিতে যে গৃহ-বিচ্ছেদ হইয়াছিল, যে দুই দল হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌয়ে সেই দুই দল এক হইয়াছে। রাজনীতি সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে, এবারও তাহাই হইয়াছিল, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর একদিন কন্‌গ্রেসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আগামী বৎসরে কোথায় অধিবেশন হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

কন্‌গ্রেসের পরই সেই মণ্ডপে আরও কয়েকটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে (১) একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলন। কুচবিহারের রাজমাতা, পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দুহিতা, শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভ্যাসানি মহাশয় 'যুগধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; আরও অনেকে অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। (২) ভারতীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতি। দেরাদূনের প্রসিদ্ধ উকিল, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃস্বরূপ মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব এই সভায় আলোচিত হইয়াছিল। (৩) ভারতীয় শিল্প-সম্মেলন। মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতার একটি অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিয়াছেন "For over a century we have been in a state of industrial paralysis and helpless dependence. It is a long descent from providing the luxuries for the ancient Empires of Asia and Europe to become the mere purveyors of food and raw materials for the more enterprising nations of to-day. The whole world is being stirred with new aspirations, and India feels the throb of the new life pulsating through her veins." অর্থাৎ এক শতাব্দীর অধিককাল আমরা শিল্পসম্বন্ধে অসাড় ও পরপ্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছি। যাহারা এককালে এসিয়া ও য়ুরোপের কত দ্রব্য সরবরাহ করিত, তাহারা এখন কাঁচামাল ও রসদ সরবরাহ করিয়া জীবন যাপন করিতেছে; ইহা বড়ই গুরুতর পতন। কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার সাড়া পড়িয়াছে; এবং ভারতের ধমনীতেও সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা

পরিলক্ষিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় তাঁহার এই বক্তৃতায় ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন এবং অনেক আশার বাণী শুনাইয়াছেন। (৪) নিখিল-ভারতীয় হিন্দু-মহাসম্মেলন। শ্রীযুক্ত দেওয়ান মাধব রাও সি, আই, ই মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। (৫) মাদকদ্রব্য-ব্যবহার-নিবারণী সমিতি। মাদ্রাজের মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় বি, এন, শর্ম্মা বাহাদুর এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে অনেক সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। (৬) মস্লেম লীগ। মাননীয় শ্রীযুক্ত এম, এ, জিন্না মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌয়ের বিবরণ অতি সংক্ষেপে শেষ করিয়া আলিগড়ে উপস্থিত হইতে হইল। এখানে 'মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি এই সম্মেলনে উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে, যথা—(ক) আগামী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় ইস্লাম ইতিহাস পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হউক; (খ) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু ছাত্র ফেল হয় কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা হউক; (গ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মুসলমানকে ভাইসচ্যালেন্সার নিযুক্ত করা হউক; (ঘ) ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পারস্য ভাষায় এম-এ পরীক্ষা গৃহীত হউক। ইত্যাদি।

আলিগড়ের পরেই এলাহাবাদের কথা। এবার এলাহাবাদে সমগ্র ভারতের কায়স্থ মহাসম্মেলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এই সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বাঙ্গালার কায়স্থগণের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের কথা বলিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও অবরোধ-প্রথা রহিত করিবার প্রসঙ্গও উত্থাপিত করিয়াছিলেন। এ সকল গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে, অন্যান্য সম্মেলনের কথা মোটেই বলা হইবে না। অতএব আমরা সম্মেলনগুলির পরিচয় প্রদান করিয়াই এবারকার 'সাময়িকী' শেষ করিব।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ত্যাগ করিয়া আমরা একেবারে ভারতপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্রে অবতীর্ণ হইলাম। এই পুণ্যভূমি পাটলীপুত্রে এবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল। বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালী মহোদয়গণ, বঙ্গমাতার কৃতী সুসন্তানবৃন্দ এবার বিহারে, বাঁকিপুরে সাহিত্য-সম্মেলনের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। যেখানে মাননীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ রায় বাহাদুরের মত অক্লান্তকর্ম্মা সাহিত্য-সেবকের বাস, যেখানে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বর্ত্তমান, যেখানে শ্রীমান যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের মত সাহিত্য-সেবক, দৃঢ়ব্রত যুবকের কর্ম্মস্থলী, যেখানে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহের ন্যায় সবল ও উদারহৃদয় বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ রহিয়াছেন, যেখানে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপাত করিয়া অতিথি সৎকারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেখানকার সম্মেলন যে সুন্দর হইবে, সেখানকার কর্ম্মীবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টার উপর যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। উপরে যাহাদের নাম করিলাম, তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রাণতা দেখিয়া, পূর্ণেন্দুবাবুর আগ্রহ দেখিয়া, যদুবাবুর ব্যবস্থা দেখিয়া, যোগীন্দ্রনাথের সেবাপরায়ণতা দেখিয়া, মথুরবাবুর আতিথেয়তা দেখিয়া সমাগত সাহিত্যিকগণ অতুল প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সব কথা এখন থাকুক।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার একটী অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতেই, তাঁহার অভিভাষণ যে কি সুন্দর হইয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুবাবু বলিতেছেন—

সরস্বতীপ্রমুখ বঙ্গের সাহিত্যিকগণ! আসুন! এই প্রাচীন মগধরাজ্য, এই ভারতের চিরসাধের পাটলিপুত্র আপনাদের চরণরেণুতে পবিত্র হউক্। মগধের প্রতি ভূমিতে, প্রতি প্রস্তরখণ্ডে, কত গুপ্তকথা নিহিত আছে, মগধের আকাশপটে কত লোমহর্ষণ, কত বিশ্ববিকম্পন, কত মর্ম্মসংবেদন ভাবের প্রতিধ্বনি হইতেছে, আজ আপনাদিগকে দেখিয়া কল্পনারাজ্যে সেই প্রাচীন স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। সাহাবাদ জেলার জঙ্গল-প্রদেশে এখনও আরণ্য অশ্ব বিচরণ

করিতেছে। হয় ত তাহাদের বৈদিক নাম কীকট এবং তাহারা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বৈদিককালের নিদর্শনীস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। বকচর অঞ্চলে এখনও বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম-স্থান যেন দেবরাজ শুনঃশেফের কাতরোক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মহাভারতের গিরিব্রজ এখনও উচ্চশিরে ভীম ও জরাসন্ধের দ্বন্দ্বযুদ্ধকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে। রাজগৃহ এখনও বুদ্ধদেবের পবিত্র গাথাসকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ এখনও গৌতম বুদ্ধের সম্বোধি-লাভ ঘোষণা করিতেছে। এখনও যেন আমরা কল্পনার চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি যে, জটিল মহাকশ্যপ নিরঞ্জনার নীরে যজ্ঞের সামগ্রীসকল চিরকালের তরে ভাসাইয়া দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে কুসুমপুর নিজ মস্তক উত্তোলিত করিতে লাগিল। কৌটিল্যের নীতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এক মহারাজ্যের বীজরোপণ করিতে লাগিল। পাটলিপুত্রের কাষ্ঠপ্রাচীর ও কাষ্ঠস্তম্ভ, কুমড়াহাঢ়ের ও বুলন্দবাগের ধ্বংসাবশেষ এখনও আপনাদিগকে চন্দ্রগুপ্তের দারুময় সহরের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। কিন্তু তাঁহার নগর-শাসন-প্রণালী, বিচিত্র ব্যবস্থার কিছুই দেখিতে পাইবেন না।"

এবার সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়। তাঁহার অভিভাষণ আমরা স্থানান্তরে প্রকাশিত করিলাম। এই সুন্দর অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা অভিভাষণটী পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

সাহিত্য-সম্মেলনের চারিটী শাখায় চারিজন সভাপতি হইয়াছিলেন; সাহিত্য-শাখায় বারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়, ইতিহাস-শাখায় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়, দর্শন-শাখায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় এবং বিজ্ঞান-শাখায় শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতি-কাব্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছিলেন অন্য কোন কথাই বলেন নাই; এবং গীতি-কাব্যের আলোচনাতেও তিনি বর্ত্তমান গীতি- কবিদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের কবিত্ব-সৌন্দর্য্যই তিনি কবির ভাষায় বলিয়াছেন।

ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অভিভাষণ মুদ্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়বাবু দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছেন; তাই তাঁহার অভিভাষণের মূল কথাগুলি স্মারকলিপিস্বরূপ ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সভাস্থলে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিজয়বাবুর পার্শ্বেই সেই স্মারকলিপি হস্তে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। দেবকুমার বাবু বিজয়বাবুর সেই স্মারকলিপি হইতে বক্তব্য কথার সূত্র ধরাইয়া দিতে লাগিলেন, আর বিজয়বাবু বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ফল এই হইল যে, স্মারকলিপিতে যাহা-যাহা ছিল, তদতিরিক্ত অনেক কথা, অনেক তত্ত্ব বিজয়বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছিলেন; সেগুলি ত তখন কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই; সুতরাং তাঁহার সেই মুদ্রিত স্মারকলিপিই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা তাহারই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। বিজয় বাবু বলিতেছেন—

"এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিয়া হইতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পর্য্যন্ত আমাদের সকল মালগুদামে যে-সকল উপকরণ রক্ষিত হইতেছে, তাহা বাছাই করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ কারিগরেরা মন্দির গড়িবেন, এবং খ্যাতি লাভ করিবেন; মন্দিরের ভবিষ্যৎ পুরোহিতেরা বিলক্ষণ দক্ষিণা পাইয়া সুখী হইবেন। সেই যশ এবং দক্ষিণা এখন লাভ করিবার জন্য যদি কোন ভারবাহক উৎকণ্ঠিত বা উৎসুক হয়েন, তবে তিনি আপনার কর্ত্তব্য করিতে পারিবেন না। সংগৃহীত পাথরের দু'চারিখানি সাজাইয়া যদি কেহ ঘর গড়িয়াছেন ভাবেন, তবে তিনি বড়ই ভুল করিবেন। যে সাহিত্য চিত্ত বিনোদনের জন্য, তাহার পাকা মন্দিরে চণ্ডীদাসের দিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া আসিতেছে, অনেক সুস্বাদু ভোগ

নিবেদিত হইতেছে। সে ভোগের লোভে সে মন্দিরের দরজায় আমরা সকলেই হুড়াহুড়ি করিয়া থাকি; এমন কি, ইয়োরোপ-আমেরিকার লোকেরাও হাত পাতিয়া ভোগ লইয়াছে, এবং আমাদের একালের কবি-পুরোহিতকে অনেক দক্ষিণা দিয়াছে। ইতিহাস লইয়া এত গৌরবলাভের দিন এখনও আসে নাই; সে দিন বহু দূরে। এখন ইতিহাসের নামে দেখিতে পাই যে, চারিদিকের চালাঘরে কেবল ইট-পাথরের পালা, এবং কোথায়ও বা প্রত্নতত্ত্বের ঢেঁকিতে, ব্যাকরণের মুষলে খানকতক ইট ভাঙ্গিয়া সুরকি করা হইতেছে। যাঁহারা খ্যাতি ও দক্ষিণা চাহেন, এই কচ্‌-কচির ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান নাই। যাঁহারা এ কথা বুঝিয়া-সুঝিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারবাহক হইতে চাহেন, তাঁহারাই নিষ্কাম ব্রত লইয়া আসুন। এখানে খ্যাতিও নাই, দক্ষিণাও নাই; বরং উল্টা একটুখানি নিগ্রহলাভের সম্ভাবনা আছে। সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না করিয়া, যে ঘটনা ঠিক যাহা, তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিয়া, সংগ্রহ করিতে হইবে; উহাতে যদি চিরদিনের পোষা সংস্কারের গায়ে আঘাত লাগে, যদি আপনার দলের লোকেরা অন্যদলের লোকের কাছে উপহসিত হয়, যদি ইয়োরোপীয়দের চক্ষে ভারতের কোন রীতি বা অনুষ্ঠান অসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও অসঙ্কোচে সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে।"

এবারকার ইতিহাস-শাখার অধিবেশনে একটু বিশেষত্ব ছিল। সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য বি-এ মহাশয় একটি নূতন প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ,—একে অপরের মুখাপেক্ষী; সুতরাং সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস-শাখাকে কেবল ইতিহাস-শাখা নামে অভিহিত করিলে, ভূগোলশাস্ত্রের অমর্য্যাদা করা হয়। শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁহার প্রস্তাবের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাদের সার মর্ম্ম এইরূপ:—

(১) ভূগোল এখন আর স্কুলের ভূগোল নহে। এ সংস্কার সকলকে দূর করিতে হইবে। ভূগোল এখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত। এখন উহা আর দ্বীপ, উপদ্বীপ, মহাদেশ, উপত্যকা, নদী প্রভৃতির লক্ষণ (Definition) ও ঐ-সকলের উদাহরণের তালিকাতেই পর্য্যবসিত নহে। এখন কার্য্য-কারণ, উৎসর্গ 'অপবাদ' সূত্র ও ব্যভিচার প্রভৃতি উহাকে স্থান লাভ করিয়াছে।

(২) মানব-জীবন-যাত্রার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভূভাগের বিবরণই এখন ভূগোল নামে আখ্যাত হইতেছে। তাই এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র Geographical Society এবং ভারতেও Geographical Survey Department চালিত হইতেছে।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতিক বিশেষত্ব, উৎপন্ন দ্রব্যাদি, আমদানি, রপ্তানি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিবরণী ভূগোল-শাস্ত্রের অন্তর্গত। ইহা হইতে বর্ত্তমান সভ্যতা ও দেশসমূহের অবস্থা নির্দ্ধারিত হইতেছে। সমাজ ও দেশের হিত-কামনা করিতে হইলে, ভূগোলের আলোচনা সর্ব্বথা প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের পারিবার্ষিক অবস্থার বিবরণ লিখিতে পারেন, কার্য্য-কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন, অনেক সমস্যারও সমাধান করিতে পারেন। বাজে কথার পরিবর্ত্তে ভ্রমণ কাহিনীতে মূলতঃ এই বিষয় থাকা উচিত। এইরূপ বিবরণ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অন্তর্গত না হওয়ায়, ইতিহাস-শাখার নাম ইতিহাস ও ভূগোল-শাখা—এইরূপ করিতে হইবে।

সুখের বিষয়, প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং আগামীবার হইতে ইতিহাস শাখার নাম হইবে—ইতিহাস ও ভূগোল-শাখা।

দর্শন-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় যে দুইটি অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও আমরা এবার দিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর অভিভাষণে দর্শন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে; উপযুক্ত দার্শনিকগণ তাহার আলোচনা নিশ্চয়ই করিবেন। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় প্রজনন-বিদ্যা (Eugenic) সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁহার এই সুন্দর অভিভাষণ উপলক্ষ করিয়া সময়ান্তরে প্রজননতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের শেষ করিলাম।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহারও পরিচয় আমরা দিতে পারিলাম না। এত সভা সমিতি এইবার বড়দিন উপলক্ষে হইয়াছিল যে, তাহাদের নাম করিয়াই উঠিতে পারিলাম না। তবে এবার 'সাময়িকী'ই সভাসমিতির কথা, বলিয়া আমরা অন্য কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম না, এবং সভাসমিতির নামোল্লেখ করিতে গিয়াও, স্থানাভাবে কয়েকটির কথা একেবারেই বলিতে পারিলাম না; তজ্জন্য সেই সকল সমিতির উদ্যোক্তাবর্গের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

নব্যভারত—কার্ত্তিক, ১৩২৩।

উপন্যাসে ধর্ম্ম-প্রচার—গত শ্রাবণের 'নব্যভারতে' প্রকাশিত "ধর্ম্ম-প্রচার" শীর্ষক ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে' যে দুই-একটি কথা লিখিয়াছিলাম, তাহারই প্রতিবাদ ছলে 'নব্যভারতে'র লেখক এ সংখ্যার 'নব্যভারতে' অনেক কথাই বলিয়াছেন।

লেখক বলিতেছেন,—"কোন-কোন পাঠক ও সমালোচক বিবেচনা করেন যে, যে উপন্যাসে বা কাব্যে ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার সমুদয় চিত্রই সংযমের বা পুণ্যের চিত্র হওয়া আবশ্যক। এইটি একটী মস্ত ভুল।"—ভুল যে মস্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবে, কাহার দ্বারা, কোন্ কাগজে ঐ 'মস্ত ভুল'টি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা লেখক-মহাশয় বলিয়া দিলে ভাল করিতেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন,—"মনুষ্য-হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। রাবণ ব্যতীত রামায়ণ হইত না, দুর্য্যোধন ব্যতীত মহাভারত হইত না।"—তারপর এই উক্তির পুনরাবৃত্তিই বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। বঙ্কিমের পূর্ব্বে কিম্বা পরে, কখনও কাহাকেও উহার উণ্টা কথা লিখিতে দেখি নাই। অতএব, জ্ঞানেন্দ্রবাবু আজ কোন্ সমালোচকের 'মস্ত ভুলে'র সংশোধন করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইলেন, তাহাই একবার জানিতে ইচ্ছা করে।

প্রবন্ধের আর একস্থানে লেখক বলিয়াছেন,—"জগৎসিংহের মহৎ চরিত্রে এবং বিমলার দৌত্যকার্য্যে অসংযম দেখা যায়। এই অসংযম অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমবাবু অতি সুন্দরভাবে নীতি-শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, এই অসংযমের পরিণাম ভীষণ হইয়াছিল। এই অসংযমে, জগৎসিংহের দেহে রুধির-ধারা বহিয়াছিল, বিমলা বিধবা হইয়াছিল, জগৎসিংহের প্রণয়িনী তিলোত্তমা কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়াছিল।"—গায়ের জোরে বলিলে উপায় নাই, কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী খুঁজিয়া দেখিলে, তাহার ভিতর বঙ্কিমের অমন কোনও উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলাল একবার কোনও এক অর্থহীন কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিয়া রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"পণ্ডিতেরা কালিদাসের প্রসারিত অঙ্গুলিদ্বয় হতে দ্বৈতবাদের শাস্ত্র এবং মুষ্টি হতে পঞ্চভূতের সমষ্টির তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন।"—এ ভাবে চেষ্টা করিলে শুধু দুর্গেশনন্দিনী কেন, বটতলারও যে কোনও এক উপন্যাস হইতে ধর্ম্ম-প্রচার করা চলে; কিন্তু এ ধরণের মনগড়া কথাকে উপন্যাসকারের 'উদ্দেশ্য' বলিয়া পরিচয় দেওয়াটা কি সঙ্গত? দুর্গেশনন্দিনীর যে রক্তারক্তি-ব্যাপারকে লেখক অসংযমের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই ব্যাপারকে আবার সংযমের বা সহৃদয়তার ফল বলিয়া বুঝানও ত কঠিন মনে করি না। যদি বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সকল ঘটনার দ্বারা "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" কথাটারই মর্ম্ম বুঝাইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলেই বা কি দোষ হয়?—তাহার উত্তরেই বা লেখক কি বলিতে পারেন? সংযমের ফল যদি সুখ, আর অসংযমের ফল যদি দুঃখ দেখানই দুর্গেশনন্দিনীর উদ্দেশ্য হয়, তবে জগৎসিংহই বা পরিণামে কেন সুখের মুখ দেখিলেন? আর ওসমানই বা সারাজীবনটা কেন দুঃখের দাব-দাহ সহ্য করিলেন?

জননীর সন্তান-রক্ষার চেষ্টাকে লেখক যেখানে পরোপকার-ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইবার জন্য নানা তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, সেই স্থানটাই এ প্রবন্ধের সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য অংশ। গতবারেও এই কথা তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এতটা বিস্তারিতভাবে নহে। গতবারের কথা শুনিয়া আমরা হাসিয়াছিলাম বলিয়া, লেখক এবার বলিতেছেন,—"মহামান্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'আমি (অর্থাৎ আমার আত্মা) ভিন্ন সকলই পর।' 'Ascent of Man' এবং 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' গ্রন্থে উক্ত কথাতে যিনি যত হাসিতে ইচ্ছা করেন—হাসুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। ক্ষুদ্র আমি 'পর' শব্দ ঐরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।"—কিন্তু কাব্য ও দর্শন কি এক জিনিষ? 'পর' শব্দের ঐ অর্থ গ্রহণ করিলে শুধু রমা কেন, 'সীতারামে'র গঙ্গারামকেও অনায়াসে পরোপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে! রমা নিজের সন্তান-রক্ষার ভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছিল; কিন্তু গঙ্গারামের ভাবনার

বিষয় আরও গুরুতর!—সে নিজের জীবন-রক্ষার চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। 'আত্মা' ভিন্ন সকলই যখন পর,' তখন জীবন জিনিষটাও যে 'পর', সে কথা বলাই বাহুল্য। গঙ্গারাম সেই জীবনের জন্য, অর্থাৎ পরের জন্য অনেক কার্য্যই করিয়াছিল। অতএব, জ্ঞানেন্দ্র-বাবুর যুক্তি মানিতে হইলে বলা যায় যে, বঙ্কিমবাবু গঙ্গারামের সৃষ্টি করিয়া পরোপকার ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা এখন এই যে, বঙ্কিমের উপন্যাস হইতে ঐ ধরণের ধর্ম্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিলে কি বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর গৌরব বাড়িবে? পশু-পক্ষীতেও যে শিক্ষা জানে, তাহাই শিখাইবার জন্য কি 'সীতারামে'র সৃষ্টি? শাবক-স্নেহে শিবা ঘোর দুর্য্যোগে যমুনা পার হইয়া গেল! বসুদেব তাহাই দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে করিয়া যমুনা পার হইলেন। যে স্নেহ বসুদেবকে পথ দেখাইয়াছিল, পিতৃস্নেহকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, সেই মাতৃস্নেহকে 'পরোপকার' বলিয়া পরিচয় দিলে কি তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে?

লেখক তাঁহার রচিত "উত্তমানন্দ স্বামীর বক্তৃতা"র উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"যাঁহারা বঙ্কিম-নিন্দাতে হর্ষলাভ করেন, তাঁহারা সেই রচনা পড়িলে পরিতৃপ্ত হইবেন; তাহা পাঠ করিতে পারেন।"—কিন্তু 'বঙ্কিম-নিন্দাতে হর্ষলাভ' করিতে পারে, এমন বাঙ্গালী এখন আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙ্গালার সাহিত্য-গুরু।—তাঁহার নিন্দায় বাঙ্গালী কখনও সুখী হইতে পারে না। তবে তাঁহার কাব্যগত কোনও দোষ-প্রদর্শনকে লেখক যদি 'বঙ্কিম নিন্দা' বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথায় অংশ্য সায় দিতে আমরা পারিব না। বঙ্কিমের নিন্দা অসহ্য বটে, কিন্তু বঙ্কিমের লেখায় যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে তাহার কথা কেন বলিব না? সত্যই সাহিত্যের প্রাণ। ভক্তি বা বাৎসল্য কিছুর খাতিরেই সে সত্যকে বলি দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ, সমালোচকের পক্ষে উহা মহাপাপ। সমালোচক স্তাবকও নহে, নিন্দুকও নহে,—সাহিত্যের বিচারক। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহার 'উত্তমানন্দের বক্তৃতা'তে বঙ্কিমবাবুর রচনাবলীর যে ভাবে দোষ দেখাইয়াছিলেন, সেটাও বাড়াবাড়ি। এবং এখন যাহা করিতেছেন, এটাও বাড়াবাড়ি। দোষ-প্রদর্শনেই হউক, আর গুণ-কীর্ত্তনেই হউক, বাড়াবাড়িটা কিছুরই ভাল নহে। সমালোচকের পক্ষে উহা বিষের ন্যায় পরিত্যাজ্য।

বঙ্কিমের আদর্শে বঙ্কিমের সমালোচনা করিতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত বলিয়াছিলাম বলিয়া লেখক মহাশয় রাগ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমার মত ক্ষুদ্র সমালোচক এবং বঙ্গে অন্য যত সমালোচক জীবিত আছেন, তাঁহাদের পক্ষে অসাধারণ প্রতিভাশালী বঙ্কিমের আদর্শে বঙ্কিমের সমালোচনা করা সামান্য দুর্ব্বল ক্ষুদ্র প্রজার পক্ষে মহামহিম সম্রাটের শাসন-কার্য্যের অনুকরণ করার ন্যায়, বামনের পক্ষে চাঁদ ধরিবার জন্য উদ্বাহু হওয়ার ন্যায় বাতুলের কার্য্য।"—কাহারও আদর্শে কিছু লিখিতে চেষ্টা করিলে যে তাহা 'বাতুলের কার্য্য' হয়, জীবনে এই প্রথম শুনিলাম। লেখক মহাশয় বোধ করি জানেন না যে, বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের শিখাইয়া গিয়াছেন,—"শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই।"* কিন্তু এ সব সোজা কথাও যে কখনও বুঝাইয়া বলিতে হইবে, তাহা মনে করি নাই।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ, ১৩২৩

চিত্র বিভ্রাট—বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "বংশীধারী" নামক রঙ্গীন চিত্রটি ইতিপূর্ব্বেই ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসের 'মানসী'তে মুদ্রিত হইয়াছিল। গত মাসেরও একখানি রঙ্গীন ছবি ঐরূপ এক পূর্ব্ব-প্রকাশিত চিত্রের পুনর্মুদ্রণমাত্র। 'মানসী' এমন করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যুদ্ধের জন্য যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে নিত্য-নূতন 'ব্লক' করিয়া ছবি ছাপান যে কঠিন কথা, তাহা জানি। কিন্তু সে কঠিন কথা সরল ভাষায় স্বীকার করিলেই যখন সকল গোল চুকিয়া যায়, তখন মাসিকের বক্ষে এ বিড়ম্বনা কেন?

অবশ্য, চিত্র-সংখ্যা বাড়াইবার পক্ষে যে উহা এক উৎকৃষ্ট উপায়, তাহা অস্বীকার করি না। সে দিন 'প্রবাসী'র 'সূচী'র মধ্যে দেখিলাম তাহার মলাটের আঁকা-বাঁকা কালীর ধ্যাবড়া-টুকুও 'রঙ্গীন-চিত্র' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে!

এই চিত্র প্রসঙ্গে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র চিত্রের কথা মনে পড়িল। ইংরাজীতে যাহাকে Illustrated paper বলে, সে হিসাবে এই 'বিবিধার্থ সংগ্রহই বোধ হয় এ দেশের সর্ব্বপ্রথম সচিত্র মাসিকপত্র। প্রায় ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে এই কাগজখানির জন্ম হয়। সেই সময়ে ইহাকে সচিত্র করিবার জন্য ইহার পরিচালকবর্গ কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কতটা অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা এখনকার কাগজ-পরিচালকদের—যাঁহারা বিজ্ঞাপনের 'ব্লক' ছাপিয়াই কাগজকে 'সচিত্র' মনে করেন—তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' হইতে সে বিবরণটুকু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—"এতদ্দেশে উত্তম চিত্রকরের অভাবে আমরা সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইতেছি। যে কোন নূতন বিষয়ের বর্ণনা করিতে মানস করি, ছবির অভাবে তৎক্ষণাৎ তাহাতেই হতাশ হইতে হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল ছবি এতৎপত্রে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে; সুতরাং আমরা যে যে ছবি প্রকাশিত করিতে মানস করি, তাহা না হইয়া আমাদিগের বিলাতস্থ সাহায্যকারী যাহা পাঠান, তাহাই প্রকাশিত করিতে হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল এতদ্দেশে কি প্রকারে কথকেরা কথকতা করিয়া থাকেন, তাঁহার ও তৎশ্রোতাদিগের একখানি ছবি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, তদুত্তরে অপর পৃষ্ঠে মুদ্রিত ছবিখানি প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার প্রতি দৃষ্টিমাত্র পাঠক মহাশয়েরা জানিতে পারিবেন যে, আমাদিগের মানস কি পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে। কোথায় যোগাসনারূঢ় ভট্টাচার্য্য পুরাণ পাঠ করিতে করিতে লোকের মন মুগ্ধ করিবেন, কোথায় কানে দুলওয়ালা খোঁপাবাঁধা উপুড়-হইয়া-বসা স্ত্রীমূর্ত্তি উপস্থিত।"

* বঙ্গদর্শন—পৌষ; ১২৮১।

ইহা হইতে বুঝা যায়—যে, তখনকার দিনে পত্রিকাধ্যক্ষেরা পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য কিরূপ প্রাণপাত চেষ্টা করিতেন। সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচারই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—যেমন-তেমন করিয়া একখানা বিলাতী কাগজ হইতে ছবি তুলিয়া লইয়া, এবং তাহারই আবার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া দায়ে খালাস হইতেন না। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়—দুঃখও হয় যে, এ সব কেলেঙ্কারী এখনকার কাগজেই দেখিতে পাইতেছি। এ কথার প্রমাণ—এ সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'। ইহার "আফ্রিকার পরিণয়-প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধ—যাহা পড়িয়া নিরীহ পাঠকেরা হয় ত ভাবিতেছেন যে ইহা বহু অধ্যয়ন ও গভীর গবেষণার ফল—সেই রচনাটী "Customs of the World" নামক ইংরাজী গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আজকালকার প্রথা-মত সে কথা ত কুত্রাপি স্বীকৃতই হয় নাই;—তাহার উপর লেখক উদ্ধৃত ছবিগুলির সম্পূর্ণ ভুল পরিচয় দিয়াছেন। ৫০৫ পৃষ্ঠার যে ছবিখানি 'পূর্ব্ব আফ্রিকা'র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আদৌ পূর্ব্ব আফ্রিকার নহে—আসল কেতাবে তাহা উত্তর আফরিকার চিত্রাবলীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক বোধ করি এখানে একটু মৌলিকতার পরিচয় দিতে গিয়াছিলেন! তার পর, ৫০৩ পৃষ্ঠায় যে ছবিখানি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার নীচে লেখা আছে—"সুসজ্জিত বর' (পশ্চিম আফ্রিকা)।" এই চিত্র-পরিচয়টি সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যরসের উদ্দীপক। কারণ, মূল গ্রন্থ এ ছবিখানির পরিচয় দিতেছে—'A mask of a secret society.' তারপর নীচে টীকা এই—'In Southern Nigeria there are innumerable societies, most of them secret, some partly religious, a few formed simply for entertainment. Masks are often worn by particular members to instil terror into the uninitiated.'—অনুবাদকের অনুগ্রহে ভয় দেখাইবার মুখোসও শেষে বর-বেশে পরিণত হইল! এমন করিয়া খোদার উপর খোদকারি যিনি করিতে পারেন, তিনি ধন্য!

নারায়ণ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

চলিত ভাষা ও সাধুভাষা—ইহা একটি উপাদেয় রচনা। লেখকের সকল কথার সহিত এক মত হইতে না পারিলেও, লেখক ইহাতে যে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'সাধু ভাষাকে' কৃত্রিম বলিয়া, 'বয়কট' করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদেরই কথার উত্তরে লেখক বলিতেছেন,—"এই ভাষা প্রতিদিন আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া উহা যে কৃত্রিম, এ কথা বলিতে পারি না। মানুষের মধ্যে যে কবি-অনুভূতি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কবিতার ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভাষা সে অনুভূতির সহজ নৈসর্গিক ফল। ভাবের যে গভীর প্রেরণা, তাহার বশেই সাহিত্যে ভাষা গঠিয়া উঠিতেছে। বাহিরের কর্ম্ম-জীবনের সংঘর্ষে যেমন আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে; অন্তরের ভাব-জীবনের, চিন্তা-জীবনের সংঘর্ষে তেমনি কবিতার, সাহিত্যের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ উভয় ভাষাই প্রকৃতির দা[ন] প্রকৃতির সহিত উভয়ের জীবন্ত সংযোগ।"

তবে ভাষার এই আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক কবির কাব্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে যে একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হই[ল] না। লেখকের মতে,—"সাধারণে সকলে বুঝিল বা না বুঝিল, তাহা[র] সহিত কাব্য-সৃষ্টির কোনই সম্বন্ধ নাই। কবি শুধু দেখিবেন, নিজে[র] অন্তর, নিজে তিনি বুঝিলেন কিনা, তাঁহার মধ্যে যে কবি-পুরুষ, তাহা প্রাণস্পর্শী হইল কি না! অপরের অনুভূতির সহিত মিলাইয়া দেখিবা[র] তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, তাহা উচিতও নয়।"—এ কথা আমর[া] স্বীকার করি না। গিরিশচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন,—"নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—একখণ্ডে মন নিজ ভূমিকা[য়] তন্ময়, অপরখণ্ড সাক্ষীস্বরূপ দেখে যে তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কি না—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কি না।"—আমাদের মনে হয়, এই কথা শুধু অভিনয় সম্বন্ধে নহে—সমস্ত কলাবিদ্যা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কবিকেও দুইটা মন লইয়া কাব্যসৃষ্টি করিতে হয়। কবির একটা মন লেখে, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মন দেখিয়া থাকে—লেখাটি ঠিক হইতেছে কি না? কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। সে নিজের ভাবটিকে অপরের মধ্যে বিলাইবার জন্যই ব্যস্ত,—বিলাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়। পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যই লেখক ও পাঠক দুই জনের যোগেই প্রস্তুত হইয়াছে। কেহ নিজ সম্প্রদায়কে, কেহ বা দেশকে নিজের কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। যিনি পাঠকের মনের সহিত আপোষ করিয়া চলিতে পারেন না, তিনি নিজের অন্তর হাজার বুঝিলেও তাঁহার রচনা ব্যর্থতা বহন করিবেই।

প্রবাসী—পৌষ; ১৩২৩

কবি ও ঋষি—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত নহে,—সুলিখিতও নহে। ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এ রচনায় তাহারই কতকটা উদ্গার দেখিলাম। প্রথম খানিকটা মুখস্থ কথা বলিয়া লেখক শেষকালে আসল কথাটি পাড়িয়াছেন;—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ একজন প্রধান ঋষি, তাঁহাকে আমরা বুঝিতে পারিলাম না, আমাদের বাঁচিয়া ফল কি—ইত্যাদি ইত্যাদি! এইরূপ গোড়ায় একটা জমকালো রকমের হেডিং দিয়া অনেকেই আজকাল শেষ দিকটায় রবীন্দ্রনাথকে লইয়া পড়িতেছেন! যেমন কোন-কোন বিজ্ঞাপনের আরম্ভে দেখা যায়—কি ভীষণ যুদ্ধ!—জর্ম্মানী যায়-যায়! কিন্তু শেষে সেই চাটুর্য্যে কোম্পানীর 'চা' বা রায় কোম্পানীর ক্যাশবাক্স!

যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য লেখক যে এক ভীষণ অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে অনেকেরই চক্ষু স্থির হইবে! সে যুক্তিটি এই,—"আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কাব্যকুঞ্জ অনেক কবির মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বোধ হয় ঋষি-কবি বলা যায় না। এ কথা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের সহিত তর্কের কোন প্রয়োজন দেখি

না।"—কেমন জব্দ! এইবার তর্ক কর! লেখক শাসাইয়াছেন, তিনি আর তর্ক করিবেন না। বিরুদ্ধবাদীরা সম্ভবতঃ এবার মারা পড়িবেন!

আরও একটু মজা আছে! রবীন্দ্রনাথ যে একজন বড় কবি, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য লেখক কোথাকার এক North American Review হইতে কবিবরের খানিকটা প্রশংসা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে তিনটি তত্ত্ব বুঝা গেল। যথা (১) রবীন্দ্রনাথকে বড় কবি বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে, বিদেশী লেখকের সার্টিফিকেট চাই। (২) রবিবাবুর লেখার সহিত এই মার্কিন পত্রখানির যতটুকু পরিচয় আছে—এই বাঙ্গালী লেখকের তাহার চেয়ে বেশী নাই। (৩) মার্কিন দেশেও এখানকার মত আনাড়ি সমালোচকের দুর্ভিক্ষ নাই। এই মার্কিন সমালোচক,রবীন্দ্রনাথের দুই-চারিটা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—As far as I know, no Western poet yet born has done precisely this. Not Milton; he is far too grandiose for the human heart, Not Wordsworth; he is at once too subtle and too ponderous. And not the great mystic poets of the West......Not even Dante......"—ইহার উপর আর কথা চলে না! সাহেব যখন বলিয়াছেন, তখন ইহা বেদ-বাক্য! বিচার-বুদ্ধি ইহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিলে, তাহাকে জবাই করিতে হইবে! সমালোচনার এই সব ভঙ্গী দেখিয়া রবীন্দ্রনাথেরই একটা অনেক দিনের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি একবার লিখিয়াছিলেন,—"ভাল কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস আজকাল দেখা যায়। তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সহজ হয় না, সুন্দর হয় না, অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক হইয়া উঠে।"—এ কথার যাথার্থ্য আজ আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

পরিচারিকা—অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২৩

এখানি নূতন মাসিক পত্রিকা;—একখানি অধুনালুপ্ত পুরাতন কাগজের নাম লইয়া সবে দুইমাস হইল ইহা বাহির হইয়াছে। ইহার প্রথম প্রবন্ধ "পূর্ব্বকথায়" যদিও বলা হইয়াছে,—"যাওয়া আসা সকলই নিয়মের অধীন, সেই ভরসায় পরিচারিকা আজ আবার ফিরিয়া আসিল।"—কিন্তু কাগজখানি পড়িয়া একবারও মনে হইল না, যে 'পরিচারিকা' গিয়াছে, সেই 'পরিচারিকাই আবার ফিরিয়া আসিল।' নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সম্বন্ধ-সূত্রের কোনও সন্ধানই পাইলাম না। পুরাতন পরিচারিকার বিশিষ্টতা কিছুই ইহাতে নাই।

এই প্রবন্ধেরই আর একস্থানে আছে,—"তখনকার দিনে মুখ্যভাবে যাহা স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল, এখনকার দিনে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ঠিক যদি সে সেই উদ্দেশ্যেই আবার ফিরিয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহার ললাটে বোধ হয় লজ্জার ছাপ পড়িবে না।"—শিক্ষায় সমাজ—সেই শিক্ষার কথায় কোনও কালে কোথাও 'লজ্জার ছাপ' পড়ে নাই—পড়িতে পারেও না। লজ্জা বা কলঙ্কের ছাপ সেইখানেই পড়ে, যেখানে কথায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বলিতে দুঃখ হয়, এই দুই সংখ্যার 'পরিচারিকা' দেখিয়া আমাদের সেই আশঙ্কাই হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য মহৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে 'পরিচারিকা' কোন চেষ্টা, কোন সাধনাই করিতেছে না। এমন বিশেষ কিছু ইহাতে নাই—যাহাতে বুঝা যায়, এ কাগজখানি স্ত্রী-শিক্ষার জন্যই প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য মাসিকে সাধারণতঃ যেমন গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদি বাহির হইয়া থাকে, ইহাতেও সেই গড্ডালিকা-প্রবাহ দেখিলাম। অতএব, কেমন করিয়া বলিব, এ 'পরিচারিকা' পূর্ব্ব 'পরিচারিকার'ই ধারা বজায় রাখিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

তবে কোন বিশিষ্টতাই যে এ কাগজের নাই, অবশ্য এমনও বলিতে পারি না। বিশিষ্টতা ইহার ফুটিয়াছে—ইহার "মাসিক কবিতা সমালোচনা"য়।—সমালোচনার এমন মজার ভঙ্গী, এমন অপরূপ মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোনও কাগজে দেখি নাই। যিনি ইহা লিখিতেছেন, তিনি একদিকে সমালোচনার আইন গড়িতেছেন, অন্যদিকে সঙ্গে-সঙ্গে সেই গড়া-আইনের মাথায় পদাঘাতও করিতেছেন! সমালোচন-জগতে এমন মৌলিকতা, এমন নূতনত্ব কোনও লেখকই কখনও দেখাইতে পারেন নাই! এ কথার প্রমাণস্বরূপ দুই তিনটা নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

লেখক উপদেশ দিতেছেন,—"যাহা সমালোচনার যোগ্য নহে তাহার সম্বন্ধে বেশী কথা বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাহা সমালোচনার যোগ্য তাহাকে নিন্দাই হোক্ আর প্রশংসাই হোক, তাহা যুক্তি ও সঙ্গত কারণ দেখাইয়া করিতে হইবে। সমালোচকের বাক্য যখন আর্ষ বা দৈব নহে—তখন তাহাতে যুক্তি ও সঙ্গতি চাই।"—অথচ এই লেখকেরই এই সমালোচনার মধ্যে আছে,—"শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'লুকোচুরি' চলনসই। 'নিরুত্তর' স্ত্রী-কবিগণের শ্রেষ্ঠা শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর রচনা—কবিতাটি অতি সুন্দর। বিশ্বনাথ দর্শনে—শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা—মিল ইত্যাদি আছে বটে, তবে ইহার এক বিন্দুও কবিতা নহে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। কথায় ও কার্য্যে এই অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া হাসি আসে না?

তার পর লেখক বলিতেছেন,—"সুলেখকের কবিতাকে এক কথায় বিদায় দেওয়াও আমি অবিচার মনে করি।"—এতই যখন বিচার-বুদ্ধি, তখন লেখক কেমন করিয়া কিমনে করিয়া গিরিজানাথ ও নবকৃষ্ণ প্রভৃতির মত সুকবির 'কবিতাকে এক কথায় বিদায়' দান করিলেন? শুধু ইহাই নহে। এইরূপ বিচার বুদ্ধির পরিচয় ইহাতে আরও আছে। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের একটি কবিতা পড়িয়া লেখক বলিতেছেন,—"তাঁহার এ ক্ষেত্র নহে—জানি না কোন্ অর্ব্বাচীন তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে।...মনোরঞ্জন বাবু যদি কবিতা লিখিতে নাই জানেন—তাহাতে তাঁহার লজ্জার কোনো কারণ নাই—লিখিতে চেষ্টা করাতেই, আমাদের লজ্জা বোধ হইতেছে।"—লজ্জা আছে?

অমন অসংযত ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ হয় না, আর মনোরঞ্জন বাবুকে কবিতা লিখিতে দেখিয়াই লজ্জা! লেখক জানিতে না পারেন, কিন্তু মনোরঞ্জন বাবু আজ নূতন নহে—এখনকার অনেক কবি ও কবিবরের জন্ম হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেছেন। 'পাহাড়িয়া পাখী'র নাম দিয়া তিনি অনেক কাগজে অনেক কবিতাই লিখিয়াছেন। পুরাতন বঙ্গদর্শন ও নবজীবনের পাতা উল্টাইলেও তাঁহার কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সব না জানিয়া না শুনিয়া লেখক যে রকম মাথা গরম করিয়াছেন, তাহাও সামান্য লজ্জার বিষয় নহে!

লেখক দুঃখ করিয়া বলিতেছেন,—"সমালোচনায় সাধারণতঃ গালাগালিকেই মেরুদণ্ডস্বরূপ ধরা হয়।"—কিন্তু এ জন্য দুঃখ কেন? এ কথার উদাহরণত তাঁহার এই রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। যথা,—"সম্পাদক মহাশয় ত একবারে তালহারা। এস্থলে শ্রীমানই একটু হিসাবী হইলে ভাল হইত। এই 'বিমূঢ়তা'—লেখকের—না সম্পাদকের?"—সত্য বলিতে কি, এই লেখাটিই এই কাগজের সব চেয়ে বড় কলঙ্ক। সম্পাদিকা মহাশয়া এমন জঘন্য রচনা ছাপিয়া যথেচ্ছাচার ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না।

পরের কবিতা সম্বন্ধে পরিচারিকাকে এইরূপ লম্ফঝম্ফ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ হয় ত ভাবিতে পারেন যে, 'পরিচারিকা' নিজে এ সম্বন্ধে দোষশূন্যা;—তাহার পৃষ্ঠায় ভাল ভাল কবিতাই বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু 'পরিচারিকার' কবিতা কিরূপ, তাহাও একটু বিশ্লেষণ করিয়া এখানে দেখাইতেছি।

হেমন্তোৎসব—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের রচনা। কবিতার প্রথমেই দেখিতে পাই "বঙ্গের ভাইভগ্নী মঙ্গল দিনে নির্ম্মল প্রাণে তাদের অন্তরভরা পঞ্চ যাগের অগ্নি মন্থন করিতেছে।"—আমরা জানি, অরণি মন্থন করিয়া পূর্ব্বতন ঋষিরা অগ্নি উৎপাদন করিতেন। কিন্তু অগ্নি মন্থন (সে আবার অন্তরভরা অগ্নি) এই নূতন শুনিলাম!

"এস সুস্নানপূত, সস্নেহচিতে গৌরবধৃত রঙ্গে,"

অর্থাৎ হে ভগ্নি, সুস্নানপূত হইয়া চিত্তে স্নেহরস সিঞ্চন করিতে থাক! স্নানান্তে সস্নেহে সে 'রঙ্গ' অর্থাৎ বর্ণ 'গৌরবধৃত' হইবে, তার পরই সবই নির্ম্মল সবই পবিত্র যেমন 'কুন্দদশন মন্দহসন' আর 'শুভ্র বসন অঙ্গে' উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সুতরাং, কবি ডাক ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"ওগো বিশ্বে আজিকে নিঃস্ব কে আছে?"

অর্থাৎ বিশ্বে আজি আর কেহ নিঃস্ব রহিল না। কারণ, "বিত্ত কি শুধু অর্থে?" ভগ্নীভ্রাতার এমন "সম্প্রীতি" হ'তে 'মর্ত্তে' আর কোন্ সম্পদ মূল্যবান!

"ওগো ভগ্নীভ্রাতার সম্প্রীতি হ'তে সম্পদ কিবা মর্ত্তে?"

তা 'সম্প্রীতি' যেন হইল, কিন্তু ছন্দের 'সম্প্রীতি' রহিল কি?

"ওগো শুদ্ধ যে নামে আহ্বানে হয় চক্ষু সলিল পূর্ণ,"

এ 'চক্ষু সলিল' সম্ভবতঃ আনন্দাশ্রু! কিন্তু "গণ্ড যাদের শুষ্ক হেরিলে বক্ষ যে হয় চূর্ণ" ইহার অর্থ কি! 'গণ্ড শুষ্ক' হওয়ার বক্ষ যে চুরমার হইয়া যাইবে সেই বা কেমন বক্ষ! 'গণ্ড' কি তবে তেলে অথবা 'চক্ষু সলিলে' হরদম্ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে? নহিলে, সর্ব্বনাশ! কবি বলেন, "বক্ষ যে হয় চূর্ণ।" অতএব অধর ওষ্ঠ, চক্ষু প্রভৃতি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের শুষ্ক কাঠ হইলেও ক্ষতি নাই, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে অন্ততঃ যেন কাহারও 'গণ্ড শুষ্ক' না থাকে।

"হের, অদ্য তাদের হৃদ্য মিলনে বিশ্বে নেমেছে স্বর্গ,"

এই 'হৃদ্য মিলনে' (সম্ভবতঃ বহুকালের বিবাদ মিটিয়া যাওয়ার পর) বিশ্বে স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে, এবং,—

"ওই পুণ্য-নয়ন-পল্লবছায় সঞ্চিত অপবর্গ।"

কিন্তু 'স্বর্গ' আর 'অপবর্গ' কি একই জিনিষ! আমরা বেদের কথা জানি না, তবে যেন মনে হয়, স্বর্গসুখ খুঁজিলে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির সম্ভাবনা নাই। মুক্ত পুরুষের কর্ণে স্বর্গের কোলাহল কখন প্রবেশ করে না।

"কার যত্নের ধন রত্ন পরম মৃত্যুসাগরে মগ্ন,
আহা অদ্য সে শোক সদ্য হইয়া কণ্ঠের স্বরে লগ্ন।"

'অদ্য' 'সদ্য' প্রভৃতি পদ্য লেখায় মানায় ভাল, কিন্তু 'শোক কণ্ঠের স্বরে লগ্ন' হইলেও 'সদ্য' কেমন করিয়া হয় তাহা ত বুঝিলাম না।

"কর' দীর্ঘ আয়ুর যজ্ঞীয় চরু অর্ঘ্য বলিয়া যাগ্য।"

'দীর্ঘ আয়ুর' এই 'যজ্ঞীয় চরু'কে 'অর্ঘ্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে। বেশ কথা! পাদ্য যেন উহ্য রহিয়াই গেল! কিন্তু, আচমন নির্ব্বাসন লাভ করিল কেন!

"লাজ-কুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠন ফেলি সঙ্কোচ বাধা বন্ধ,
আজ হিন্দুর এই পুণ্য প্রথায় অর্পিল প্রেমানন্দ।"

অর্থাৎ ভাইফোঁটা দিতে 'লাজ-কুণ্ঠিতা' ভগ্নী যখন 'সঙ্কোচ বাধা বন্ধ' অবগুণ্ঠনখানি ফেলিয়া দিলেন তখন "হিন্দুর এই পুণ্য প্রথায় অর্পিল প্রেমানন্দ।" এমন ভরপুর 'প্রেমানন্দ' 'সদ্য' হইয়া আর কোনও কবিতে দেখা দেয় নাই! মনে হয় না, অথচ বরাবর মজা আছে। আরও নমুনা দেখাইতেছি,—

"ওই অন্তর ঘন মন্তরে বোন রক্ষার টীকা অঙ্কে"

এই যে 'অন্তর ঘন মন্তর' ইহা গুরুমুখে না জানিলে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না, সুতরাং অনধিকার চর্চ্চায় আমাদের প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু, 'অঙ্কে' অর্থে কি উৎসঙ্গে? তা' রক্ষার টীকা ত' কপালে দেওয়া হইয়াছে, তবে কি 'অঙ্কে' মানে আঁকিয়া?

"তাহে কুগ্রহ যত নিগ্রহ লভে মঙ্গল তার শঙ্খে।"

এই 'রক্ষা টীকা অঙ্কে' করিয়াই শঙ্খধ্বনি উঠিয়াছে, সুতরাং কুগ্রহের আর নিগ্রহের দুরন্ত নাই! তারপরেই,—

"তার চন্দন চুয়া সিন্দুর ভাতি ভাস্বর করে মূর্ত্তি,"

এ কাহার মূর্ত্তি? ফোঁটা রহিল ভায়ের কপালে, মূর্ত্তি ভাস্বর করিল কি ভগিনীর? কেন না,—

"শুধু তাম্বুল যার সম্বল তার অন্তরে ক্ষতিপূর্ত্তি।"

ভগিনী যে বাটা দিয়াছিল, তাহাতে 'শুধু তাম্বুল' কেন, মিষ্টান্ন প্রভৃতিও ছিল, তবে কোন্ 'ক্ষতির পূর্ত্তি' হইবে!

"কর ভক্তি আনতশীর্ষে তাহার ধান্য দুর্ব্বা বৃষ্টি."

অর্থাৎ ভগিনী ছোট, তাই "ভক্তি আনত শীর্ষ।" কিন্তু ঐ দিনে ছোট ভগ্নী হইলেও ভ্রাতৃ-শীর্ষেই 'ধান্য-দুর্ব্বা-বৃষ্টি' করিয়া থাকে। রাঢ়, সাতসইকা ও সপ্তগ্রাম এই তিন অঞ্চলের ত' এই প্রথা বলিয়াই জানি, তবে কবি কোন্ অঞ্চলের কোন্ পল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেখানকার রীতি কিরূপ, তাহা না জানিলে এবিষয়ে আর কিছু বলা সঙ্গত মনে করি না।

"তার গুপ্ত-সহন দুঃখ দহন নির্ব্বাণে কর দৃষ্টি।"

এখানে কি বুঝিব? ভগ্নীর গৃহে অন্ন নাই, অথবা বৈধব্য-যন্ত্রণা, কিম্বা স্বামীর অত্যাচার—কোন্ কারণে 'গুপ্ত-সহন-দুঃখের অগ্নি নির্ব্বাণ' করিতে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে? কিন্তু কবির প্রতিভা পরক্ষণেই সে ভ্রম দূর করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"কর প্রার্থনা যেন ভগ্নীর গৃহে লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষে,
তার সিন্দুর যেন সুন্দরতর অক্ষয় হয়ে হর্ষে।"

অতএব বুঝা গেল ভগ্নীর পতি-বিদ্যমানতার অভাব নাই। তবে 'গুপ্ত-সহন-দুঃখ-দহন' কি! শাশুড়ীর গঞ্জনা! কবি পুরুষ হইয়া সেটুকু প্রকাশ করিয়া বলিতে ভীত হইলেন কেন? ভগ্নীর 'সঙ্কোচ বাধা বন্ধ' দূর করিয়া যখন 'প্রেমানন্দের' আশা হইয়াছে, তখন এ 'গুপ্ত দুঃখ' ব্যক্ত করিলেই ত হইত!

দ্বিতীয় কবিতা শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহের "নিবেদন"—ইহার হেঁয়ালি নামকরণ করিলে কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু দেখিতেছি মাসিকের পৃষ্ঠায় কবিতা রূপেই ইহার প্রকাশ, এবং রক্ষাকবচ রূপে—আধ্যাত্মিক ভাব বুকে করিয়া ইহা টলমল করিতেছে!

"বয়ে গেছে শুভক্ষণ, চলে গেছে প্রিয়জন কোন্ অজানায়!"

এ প্রিয়জন চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে শুভক্ষণ ব'য়ে যাওয়ার সম্বন্ধটা কি, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই!

"কেহ ঝরে কেহ ফলে, সবে তবু যায় চলে!
শেষ করি খেলা!"

"তবু" কথাটার কোনও সার্থকতা আছে কি? দুইটা অক্ষরের যিনি কাঙ্গাল, তিনিও "তবু" কবি!

"খসে গিয়ে ভেসে যাওয়া, পলে পলে ভেঙ্গে দেওয়া
পরিচিত স্নেহ,"

"খসে' গিয়ে" ভেসে যেতে নদীকুলের বৃক্ষপত্র দেখিয়াছি, কিন্তু আবার "পলে পলে ভেঙ্গে" কে দেয়! তার পর "পরিচিত স্নেহ" বোধ হয় আধ্যাত্মিকতার একটা নমুনা!

যাই হোক, কবি পুলকচন্দ্র এইবার "বিপুল পুলকে" গান গাহিবার আয়োজন করিয়া বলিতেছেন,—

"হাসিয়া উঠিবে সবে সকৌতুকে, তুমি তবে
দিবে কি অভয়?"

অবশ্য কবি কিছু লাজুক, কিন্তু তিনি উত্তরের আর অপেক্ষা না রাখিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন,—

"সবার আড়ালে একা তোমায় আমায় দেখা—
নিমেষের জয়!"

এই নিমেষটুকু কাহার জয়-ঘোষণা করিল? কবির না দর্শকের? আমাদের বিশ্বাস, কবি লাজুক হইলেও নিজেরই জয়-ঘোষণা করিয়া লইলেন!

"হে করুণাময়ি!
তোমার চরণ সেবি' ধন্য হব ওগো দেবি,
—হব আমি জয়ী!"

আবার "করুণাময়ী" কেন? "সবার আড়ালে একা" অমন দেখার পর করুণাময়ীর মাতৃত্বে ব্যথা লাগে যে!

"শুধাবে না কোনো কথা, জানাবে না কোনো ব্যথা,—
জাগে হাহাকার!"

হাহাকারের জাগরণ কিরূপ! কেবল ড্যাস্ দিয়া কবিতা লিখিলেই কি ভাবুকতার পরিচয় দেওয়া হয়? কেবল ড্যাস্ সম্বল করিয়া ভাবের এমন বিষম গ্যালপ্ (gallop) বড় একটা দেখা যায় না।

"বুকেতে পাতিয়া কান্ শোন যদি থাকে প্রাণ,—
বিলাপের সুর,
নহে রক্ত রাগে আঁকা নহে, নহে, নহে, ফাঁকা
চিত্ত ভরপুর!"

এই যে ড্যাস-মার্কা "বিলাপের সুর" কাহার বুকে কান পাতিয়া কাহার কানে শুনিতে হইবে? এই যে "বিলাপের সুর" শুধু ড্যাস মার্কা হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা আবার "রক্ত রাগে আঁকা নহে ফাঁকা" ফাঁকা নয়, নয় নয়—কবি তিন সত্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তও আবার ভরপুর!

ইহার পর এই কবিতার আরও যে বার লাইন আছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। কারণ, সে কয়টি ছত্রই কবির ভাষায় বলি—

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তব দান!—"

'ভারতবর্ষে'র আর স্থান নষ্ট করিব না। বলিতে গেলে 'পরিচারিকার' প্রায় সকল কবিতা সম্বন্ধেই এইরূপ আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা করিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই। এখনকার নবীন কবিদের অত্যাচারে এখন অনেক পাঠকই কবিতা পড়া একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কবিতার ব্যভিচার যদি কমিবার হয়, তবে পাঠকগণের এই উপেক্ষার ফলেই কমিবে!—আমাদের কথা এই যে, যে কাগজে ভাল কবিতার এত দৈন্য, যে কাগজের অঙ্গ হইতে এখনও আঁতুড়ে-গন্ধ ছাড়ে নাই, সে কাগজের এত বিক্রম শোভা পায় না।

প্রতিবাদ

[শ্রীমহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম-এ, এম-আর-এ-এস]

বিগত পৌষ মাসের "সাহিত্য-প্রসঙ্গে" সুবর্ণবণিক জাতির বর্ণনির্ণয় সম্বন্ধে "সুবর্ণবণিক সমাজের" পত্রে আংশিক প্রকাশিত প্রবন্ধের সমালোচনা পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। প্রবন্ধের লেখক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, এম-এ মহাশয়।

যিনি নিরপেক্ষ সমালোচকের পবিত্র আসনে বসিতে চাহেন, তিনি এই সত্যটুকু জানেন না যে, ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের সমালোচনা চলিতে পারে না। বক্তার সম্পূর্ণ অভিমত বা তাঁহার বক্তব্য জানিতে না পারিলে তাহার উপর কিছু বলা চলে না। আমাদের বিশ্বাস মাসখানেক ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে বোধ হয় আপনার সমালোচককে হস্ত কণ্ডুয়ন করিতে হইত না। সমালোচক মহাশয় কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু-প্রমুখ মনীষীদিগের সে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া অন্যের ভ্রম সংশোধন করিতে চাহেন, তিনি কি দেখাইতে পারেন যে আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বাহিরে এরূপ কার্য্য কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমাদের ত ধারণাই হয় না।

বিমলাবাবু সম্পূর্ণ প্রবন্ধটী সুবর্ণবণিক-পত্রের সম্পাদকের নিকট কার্ত্তিক মাসের মধ্যভাগেই প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ সম্পাদক মহাশয় সমগ্র প্রবন্ধটী প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। পৌষ সংখ্যায় উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সুবর্ণ-বণিক সমাচার পৌষ সংখ্যা ও ভারতবর্ষ পৌষ সংখ্যা একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে কি আমরা বলিতে পারি না, সমালোচনার ব্যপদেশে লেখক মহাশয় যে সকল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কতদূর ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। সত্যপরায়ণ বিমলা বাবু "সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ" করেন নাই, 'পরের জিনিষ না বলিয়া লইয়া নিজের প্রবন্ধের অঙ্গপুষ্টি" করেন নাই। তিনি যাঁহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়াই প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় বলি—"জাতিতত্ত্ব লইয়া য়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে আমরা বহু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। John Wilson এর Indian Caste, H. H. Risleyর Tribes and Castes of Bengal, Sherring এর Hindu Tribes and Castes, Senart এর Les castes Dans l' Inde প্রভৃতি গ্রন্থে * জাতিতত্ত্বের যথেষ্ট উপকরণ আছে। বৈদিক-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে Macdonell এবং Keithএর বৈদিক-সূচি (Vedic Index) হইতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। দেশীয় লেখকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আর্য্যাবর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনাংশও গ্রহণ করিয়াছি। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (Cal. Review, 1880, pp, 273 etc) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রভৃতি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সুবর্ণ-বণিক্ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৺কুঞ্জলাল ভূতি, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর, ৺নিমাইচাঁদ শীল, পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত D. R. Bhandarkarএর বর্ণ-সম্বন্ধীয় আলোচনাও বিশেষ গবেষণামূলক। ইঁহাদিগের গবেষণাব্যঞ্জক লেখনীর মধ্যে আমরা 'যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং' পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি।" এক কথায় বিমলা বাবু যতদূর সম্ভব একটি প্রমাণ-পঞ্জী (Bibliography) তাঁহার প্রবন্ধের শেষে দিয়াছেন। আর এই গবেষণমূলক প্রবন্ধ সঙ্কলন করিতে তিনি যে কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যে কি ভাবে লিখিত হয়, তাহা যাঁহারা জানেন না,—ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্কলন করিতে হইলে কি করা উচিত, তাহা যাঁহাদের অজ্ঞাত, তাঁহাদের ঐরূপ প্রবন্ধ সমালোচনা করিবার চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সাহিত্য প্রসঙ্গ লেখক যাহাকে 'আত্মসাৎ' বলিয়াছেন, তাহা আত্মসাৎ নহে, তাহা গ্রহণ, সত্য উদ্ধারের চেষ্টা—মতবাদের পোষক প্রমাণ।

এক্ষণে একটা কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি ? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, তিলি, প্রভৃতি জাতির বিবিধ মাসিক পত্রিকা সকল বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, কিন্তু কৈ 'ভারতবর্ষের' সমালোচক মহাশয় তাহাদের কোনও প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া কখনও আলোচনা করেন নাই, আর আজ নবজাত সুবর্ণ-বণিক সমাচার পত্রের বিমলাবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন কেন ? সত্যের খাতিরে যে তিনি ইহা লেখেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; কারণ তাহা হইলে তাঁহার উক্ত পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা উচিত ছিল ; তৎপরে আলোচনা করিলে শোভন হইত। জানি না ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্ররোচনায় বা ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ ইহা লিখিত হইয়াছে কি না ?

* On the origins of caste and Tribal names and the practical value of ascertaining them"—By R. C. Temple. Summary of the Law and custom of Hindoo Castes (Govt. Publication) Indo Aryans By R. L. Mitra Brief view of the Caste system &c—By J. C, Nesfield. Aryan Witness—By Rev, K. M. Banerjee. Ethnology of Bengal—Dalton etc.

শোক-সংবাদ

৺লালমোহন বিদ্যানিধি

শান্তিপুর ক্রমশঃ পণ্ডিতশূন্য হইতে চলিল। পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন গিয়াছেন, রামনাথ তর্করত্ন গিয়াছেন, গোপালচন্দ্র গোস্বামী ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণনাথ বিদ্যারত্ন, প্রভৃতি মনীষিগণ একে-একে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আবার পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ও সহসা নর-লোকের অন্তরালে গমন করিয়াছেন। তিনি বিগত ১২ই আশ্বিন তারিখে আত্মীয় স্বজনগণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। বয়স বেশী হইলেও, তাঁহার শরীর বেশ সবল ছিল। তিনি ৩।৪ ক্রোশ পথ অক্লেশে হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন। বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমে স্কুল-সব্‌ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। পরে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সরল, মিষ্টভাষী ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইতেন। দেশের শুভ অনুষ্ঠানে ও সভাসমিতিতে যোগদান করিতে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। দূরস্থানে সাহিত্য-সম্মেলনেও আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন ও প্রবীণ সাহিত্য-

৺লালমোহন বিদ্যানিধি

৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবিগণের অন্যতম পুরুষ; তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন ও বান্ধবের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনেকগুলি গ্রন্থ আছে,—সে গুলি চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার "সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। শান্তিপুরের খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক মহাশয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের ছবি ও জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রেরণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর-জীবনী-লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বাঙ্গলা সাহিত্যসেবী ও বাঙ্গালী পাঠক-মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। তাঁহার কয়েকখানি সুলিখিত গার্হস্থ্য বাঙ্গলা উপন্যাসও বহু বাঙ্গালী পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে। সেই চণ্ডীচরণ বাবু সে দিন ট্রামগাড়ীর নীচে পড়িয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন। গত ৭ই পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে চণ্ডীবাবু ভবানীপুর—রসারোডে মাননীয় সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময় ট্রামে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যান এবং গাড়ীখানি তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। প্রায় বৎসরখানেক হইল, চণ্ডীবাবুর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যাপক, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকায় শিক্ষা সমাপন করিয়া ভারতে প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে লুসিটানিয়া জাহাজের যাত্রী হইয়াছিলেন; জার্ম্মাণ সবম্যারিণের নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ জলমগ্ন হয়। সেই সময়ে ইন্দু বাবুও জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এক্ষণে, পিতারও অপঘাতে মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুকালে চণ্ডীবাবুর বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় আজীবন সাহিত্য সেবীর এমন শোচনীয় জীবনাবসানে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺গুরুচরণ মহলানবীশ

৺গুরুচরণ মহলানবীশ

৺গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। গত ১১ই পৌষ তিনি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এবং সমাজের সেবাতেই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কার, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির দেহাবসানে ব্রাহ্মসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পরলোকগত মহলানবীশ মহাশয়ের পুত্রদ্বয়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মহালানবীশ পিতার গুণ-গ্রামের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ভগবান এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের শোকাপনোদন করুন।
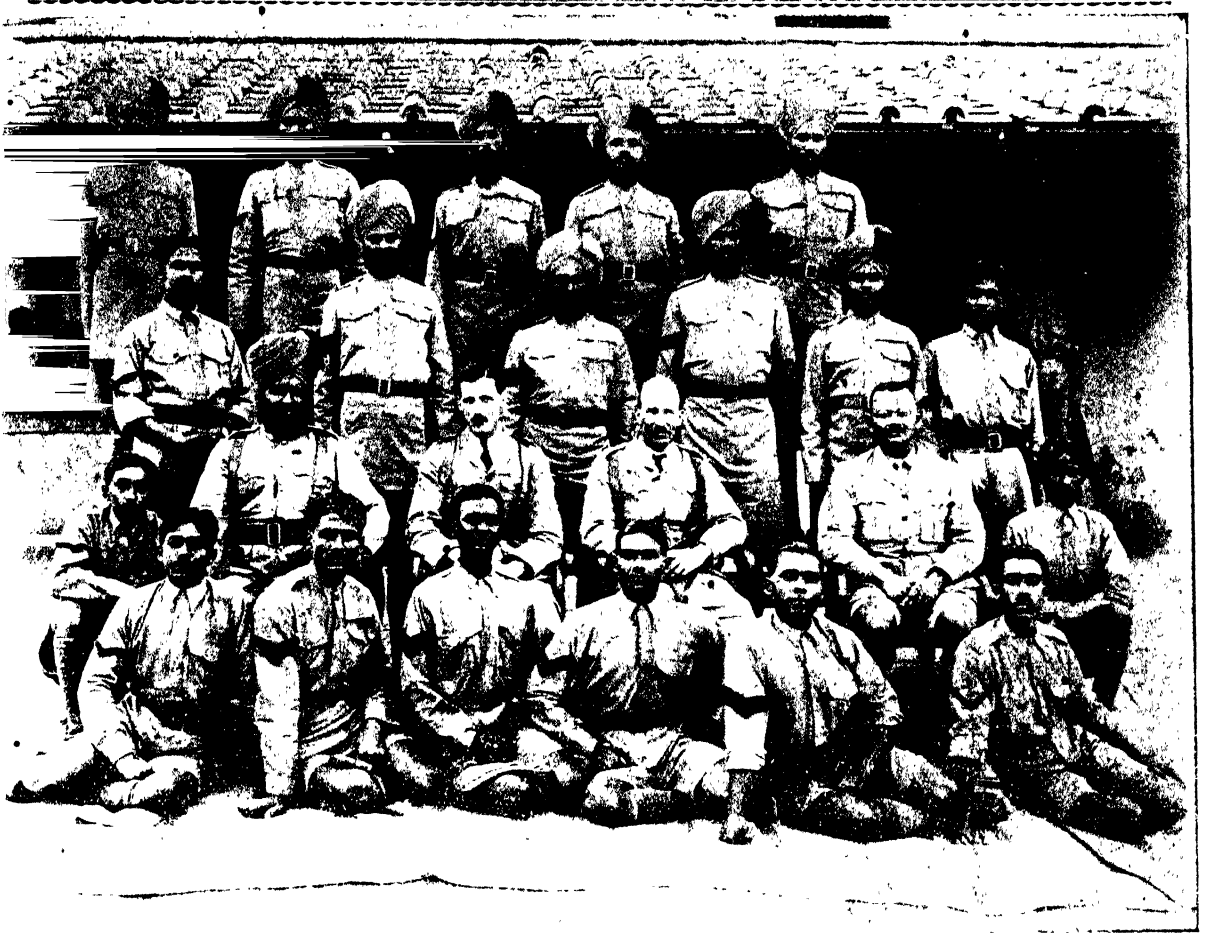
বাঙ্গালী ডবল কোম্পানীর নন-কমিসন্ড অফিসারগণ

মাতৃভাষার গ্রন্থকার

[শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী]

ছাপাও ছাপাও, গ্রন্থ ছাপাও, অমর হবে এই ত সুখ!
কেতাব কাটে. না হয় কীটে, ভুলে যাও এ গদ্যটুক।
দিশী ভাষা পড়ুক চাষা, অন্দরেও তা সাজে খানিক,
কেন না,'কোল' কর্ত্তার ভোগে, গিন্নীর ভাগে 'গাদার' দিক্।
আফিস্ করতে ঠায় দুপুরে বাবুরা যান জন্মাবধি,
বিরহিনীর দিবানিদ্রার দিশী-পুঁথি মহৌষধি।
মামলার জুয়ায় পয়সা খেলে, বিলাস-পূজায় পরিপাটী,
কেতাব কিঁন্‌তে কড়ির অভাব, হা রে আমার পোড়ামাটী!
ব্যবহারজীব কানুনে তার দিশী-ভাষা পড়া শাস্তি,
চিকিৎসকের পোকা-শাস্ত্রে এ ভাষার জীবাণু নাস্তি।
সওদাগরী আফিসগুলো দেখ্‌তে কেতাব-কীটের বাসা,
কড়া-ক্রান্তির হিসাব এ যে, খাপ খাবে কি মাতৃভাষা?
চণ্ডী-দেউল গেছে ভেঙ্গে, বৈঠকখানায় ভাষা-ভীতি,
কথকঠাকুর কেরাণী আর হাফ্ আখড়াই অতীত স্মৃতি।
ঠাণ্ডা মুলুক রটায় যখন গ্রীষ্মপ্রধান ভাষার জাঁক,
নকলনবীশ ধার করে হোক্, বাজিয়ে আস্‌ছেন জয়ঢাক।
মোড়লদের এ মেহেরবাণী, না পড়ে'ই বাহবা ভাল!
জন যারা, গণ যারা, লিখ্‌লে পড়্‌লে দেখ্‌বে আলো।
চালাও কলম, চালাও জোরে, ছবি উঠ্‌বে ছাপার বুকে,
পেশাদারী সমঝদাররাও সাধু বল্‌বেন ছাতি ঠুকে।
দেনার দায়ে মাথা বিক্রী, ভাষা ভাবের অস্থি-সার,
ইনিই হচ্ছেন মরা দেশের মাতৃভাষার গ্রন্থকার।

কলিকাতার বর্ত্তমান সেরিফ রায় শ্রীযুক্ত হরিরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর

চটি জুতা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

গায়ের মাঝে মহেশ কোটাল্ সত্যি বটে বড়ই পাজি,
জমিদারকে বেগার দিতে কোন মতেই হয় না রাজি।
অতি দরাজ বুকখানা তার, লোহার মত শরীরখানা,
চোক দুটাতে আগুন জ্বলে, ভ্রূ দুখানা বেজায় টানা।
জমিদারের পাইক এসে রাজার তলব্ জানায় তারে ;
মহেশ গিয়া হাজির হল প্রণাম ক'রে, তাঁহার দ্বারে।
বাবু বলেন "কোটাল্ বেটার বাড় হয়েছে দেখ্‌ছি বড়,
আমায় তুমি বেগার দিতে, নিত্য নূতন ওজর কর'।
বেরোও তুমি গাঁ হতে মোর, সবার চেয়ে তুমিই পাজি,
জমিদারকে বেগার দিতে, কিছুতে তুই হস্ না রাজি।"

মহেশ বলে—"হুজুর তোমার, এত চাকর-বাকর তবু,
হাল্‌খানা মোর কামাই করে, বেগার কেন চাইছ প্রভু।
ছেলে মেয়ে নেইক আমার, গ্রামটা ছেড়ে না হয় যাব,
অনেক দেশে অনেক গাঁয়ে, এমন কুঁড়ে অনেক পাব।"
শুনে বাবু অধিক রেগে, জুতাটা পা হতেই খুলে'
মার্লেন ছুড়ে, লাগ্‌ল গিয়া 'বাবরি-বাঁধা' তাহার চুলে।
মহেশ রেগে বল্‌লে কেঁদে "রক্ষা পেলে বামুন বলে',
এর প্রতীকার কর্‌বো আমি, যাবে না এ দুঃখ মলে।"
'বাবরি চুলে' জড়িয়ে যাওয়া চটি জুতা মাথায় করে,
মহেশ কোটাল্ পালিয়ে গেল সেই দিনে সে গ্রামটা ছেড়ে।

কেটে গেছে বিশটা বরষ, বাবু যাবেন বৃন্দাবনে,
পত্নী এবং নাত্‌নী তাঁহার ছাড়বে না ক, যাবেই সনে।
রেল ত তখন হয়নি দেশে, যেতে হবে নৌকাযোগে ;
ভরসা নাই ত ফির্‌বে কি না, দস্যু না হয় মারবে রোগে।
কাটোয়াতে শাঁখাই ঘাটে প্রণাম করে গঙ্গা-মায়ি,
হর্ষে লয়ে যাত্রী কত চল্‌লো মাঝি নৌকা বাহি।
দশ বার দিন কাট্‌ল সুখে, ঝড়টা বড়ই উঠলো আজি,
ফেল্‌ছে মোঙ্গর, পুঁত্‌ছে খুঁটা, 'সামাল' 'সামাল' ডাকছে মাঝি।
বিপদ আসে বিপদ সনে, বোম্বেটে 'ছিপ' আস্‌ছে ছুটে,
যাত্রীদেরে মার্‌বে প্রাণে, নেবে সকল অর্থ লুটে।
মাঝিরা সব ভাগের ভাগী, পলায় দূরে নৌকা ছেড়ে,
দস্যুদলে নৌকা ধ'রে, যা ছিল সব নিচ্ছে কেড়ে।

জমিদারের হস্ত বেঁধে, টাকার ছোট বাক্‌স সনে,
তুল্‌লে লয়ে 'ছিপের' পরে, উঠলো কেঁদে সঙ্গীগণে।
দস্যুদিগের কর্ত্তা যিনি, গলে তাঁহার অক্ষমালা,
পরিধানে পট্ট-বসন, দুই বাহুতে স্বর্ণবালা।
তারার মত চক্ষু উজল, অধরে তাঁর মিষ্ট হাসি,
সম্মুখেতে দস্যু সেনা, পার্শ্বে প্রচুর অর্থরাশি।
ইঙ্গিতে তাঁর জমিদারের খুলে দিলে বাঁধনগুলা,
আসন ত্যজি দস্যুপতি নিলেন দুটি পায়ের ধূলা।
জমিদার ত কাঁপছে ভয়ে, কখন পড়ে গলায় ফাঁসি,
থেকে থেকে দস্যুদলে, উঠ্‌ছে ভীষণ অট্টহাসি।
হুকুম দিলেন দস্যুপতি "নৌকা উঁহার দাওগে ছাড়ি।
দ্বিগুণ ক'রে দাওগে ফিরি, এনেছ ওঁর যে সব কাড়ি।
ব্রাহ্মণ উনি, গুরুর গুরু, সম্মানেতে না হয় ত্রুটি,
আশীষ করুন হে দ্বিজবর, প্রণাম আমার জানাই কোটী
ভাবেন বাবু 'সত্যি আজি, পড়েছি কোন্ ইন্দ্রজালে,
দস্যু এমন সদয়-হৃদি, মিল্‌তো শুনি সত্যকালে।'
বলেন কাঁদি "হে মহারাজ, নও হে তুমি দস্যুপতি,
এ মহত্ত্ব সেই দেখাবে, সদয় যারে বিশ্বপতি।
কোন্ জনমের বন্ধু ছিলে, আপন ছিলে আপন চেয়ে,"—
বল্‌তে কথা আট্‌কে গেল, অশ্রু এল চক্ষু বেয়ে।
কৃতাঞ্জলি দস্যুপতি প্রণমি তাঁর চরণতলে,
মাগেন ক্ষমা কাতর ভাবে, চক্ষু ভরি উঠলো জলে।
"ক্ষমা করুন হুজুর মোরে, কেবল ক্ষমা-ভিক্ষা নিতে,
পথের মাঝে এমন করে, হলো খানিক কষ্ট দিতে।"
খুলে মাথার পাগড়ীখানি, ছিন্ন চটি বাহির করে,
বল্‌লে "দেখুন, আশীষ তব রাখিয়াছি মাথায় ধরে।
প্রভুর চরণ-পরশ-পূত এ জুতা মোর মাথার মণি,
প্রজা আমি, জমিদারের যা পেয়েছি তাতেই ধনী।"
মূর্চ্ছা হয়ে পড়েন বাবু ; মূর্চ্ছা শেষে দেখেন চেয়ে,
নৌকাতে সব তেমনি আছে, তা'রা কিছু যায়নি নিয়ে।
কেটে গেছে সকল বিপদ, নাচছে তরী জলের তালে,
'ছিপের' রেখা যাচ্ছে মিশে চক্রবালের অন্তরালে।

মনিয়া

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

(১)

ট্রেণ শক্তিপুর পৌছিতেই নীলিমেশ নামিয়া পড়িল।

শক্তিপুর জংসন; এখানে ট্রেণ প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবে। আরও ৫।৬টা ষ্টেসন পরে কৌমুদীরেখা। কৌমুদীরেখায় নীলিমেশের দিদিরা থাকেন; নীলিমেশ সেখানে বেড়াইতে যাইতেছে। পশ্চিমে সে আর একবার আসিয়াছিল।

প্লাটফর্মের উপর একটি অন্ধ হিন্দুস্থানী বালক দাঁড়াইয়া ছিল; নীলিমেশ তাহার নিকটে আসিল। অন্ধ বালক পদশব্দ পাইয়া বলিল—"বাবুজী, হাম ঘর যায়েক।"

নীলিমেশ জিজ্ঞাসা করিল- "তোমার ঘর কোথায়?" বালক কিন্তু তাহার কোন উত্তর দিল না; নিতান্ত ক্ষুণ্ণ-স্বরে বলিতে লাগিল—"হাম ঘর যায়েব।"

দেখিতে দেখিতে অন্ধ-বালকের চারিপাশে দুই চারিটি লোক জমিয়া গেল। ষ্টেসনের একজন লোক আসিয়া বলিল—"এ চোট্টা, আবি হিঁয়াসে নিকালো।"

ভীতিত্রস্ত বালক ধীরে-ধীরে প্লাটফর্ম ত্যাগ করিল। বালকের ভীতি-বিহ্বল ম্লান মুখ থাকিয়া-থাকিয়া নীলিমেশের মনে উদিত হইতে লাগিল। 'একবার দেখিয়া আসি ছেলেটি কোথায় গেল' ভাবিয়া সেও প্লাট্‌ফর্ম ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

বালকটি তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া একটি গাছের তলায় বসিয়া পড়িয়াছিল। নীলিমেশ নিকটে আসিয়া তাহাকে একটা সিকি দিল। বালক দৃষ্টিহীন চক্ষু তুলিয়া বলিল—"বাবুজি, হাম্ পয়সা নেই মাংতা, হাম্ ঘর যায়েব।"

নীলিমেশ ভাবিয়াছিল যে বালক ভিক্ষার জন্যই ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল। ইহাতে সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল। ২।৪ জন লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাপু, ইহাকে তোমরা কেহ জান? ইহার বাড়ী কোথায় যদি বলিতে পার, আমি ইহাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে পারি।"

সমবেত লোকদিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধ বলিল—"ইহার বাটি কোথায় জানি না; হয় ত এ বালকও সে কথা বলিতে পারে না! প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার সময় আমি ইহাকে এই গাছতলায় প্রথম দেখিতে পাই; তখন ও এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। আমি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু বালক কিছুই বলিতে পারে নাই। আমার বোধ হয় কেহ ইহাকে চুরি করিয়া এখানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"

ব্যথিত হইয়া নীলিমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"কে ইহাকে খাইতে দেয়?"

বৃদ্ধ বলিল—"কে আর দিবে বাবুজী! আমরা পাঁচ-জনে যাহা সামান্য দিতে পারি, তাই খাইয়াই এক রকম বাঁচিয়া আছে। এই গাছের তলাতেই সারাদিন পড়িয়া থাকে; কিন্তু ট্রেণ আসিলে আমাদের শত নিষেধ সত্ত্বেও ষ্টেসনে ছুটিয়া যায়। বোধ হয় ভাবে—যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সে যদি আবার ফিরাইয়া লইয়া যায়।" করণায় নীলিমেশের হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিল, সে ভাবিল, হয় ত ইহার পিতামাতা কেহই নাই। সেও পিতৃ-মাতৃহীন; তাহার হৃদয় বালকের জন্য সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে-ধীরে পৃথিবীকে জড়াইয়া ধরিতেছিল। আকাশে ফুলের মত এক-একটি করিয়া তারাগুলি ফুটিতেছিল। শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু বক্ষের ভিতর তীব্র কম্পন জাগাইয়া তুলিতেছিল।

নীলিমেশ ভাবিল—প্রবাসে গৃহহীন, আত্মীয়শূন্য জীবন কি কষ্টকর! আমি যদি আজ এই অবস্থায় পড়িতাম, মনে করিয়া নীলিমেশ শিহরিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, —"ইহাকে আপাততঃ দিদির বাড়ীতে লইয়া যাই, তার পরে দেশে ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" নীলিমেশ বৃদ্ধকে বলিল—"দেখ, এ যদি স্বীকৃত হয়, আমি ইহাকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি; যদি ইহার পিতামাতার সন্ধান না হয়, আমার নিকটেই চিরদিন থাকিবে।" বৃদ্ধ সাগ্রহে বলিল,—"কেন স্বীকৃত হইবে না বাবুজী? তাহা

হইলে ছেলেটী ত বাঁচিয়া যায়।" বালককে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল,—"এ লেড়কা, বাবুকা সাথ ঘর যায়েব ?" বালক ব্যাকুল-আগ্রহে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নীলিমেশের দিকে তাহার শীর্ণহস্ত বাড়াইয়া দিল। নীলিমেশ সস্নেহে তাহার হাতখানি হাতের ভিতর লইল।

একখানি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া নীলিমেশ গাড়ীর ভিতর বালককে আপনার পাশে বসাইল। বড় শীত বলিয়া বালকের গায়ে আপনার উষ্ণ শীতবস্ত্রখানি জড়াইয়া দিয়া, নিজে ওভার কোট্‌টা বাহির করিয়া গায়ে দিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধটি সঙ্গে-সঙ্গে প্লাটফর্মে আসিয়াছিল; নীলিমেশকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু, বিশ্বনাথজী আপনার মঙ্গল করিবেন।"

(২)

নীলিমেশের ভগ্নীপতির নাম পৃথ্বীশবাবু, দিদির নাম দেবী। নীলিমেশের ঘোড়ারগাড়ীখানি যখন পৃথ্বীশবাবুর তরুচ্ছায়া-বেষ্টিত গৃহের দ্বারদেশে পৌঁছিল, তখন সে গৃহখানি বালকবালিকাগণের আনন্দকোলাহলে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। রাত্রি হইলেও তাহারা তখনো তাহাদের ছোটমামার অপেক্ষায় জাগিয়া ছিল।

অন্ধ বালকের হাত ধরিয়া নীলিমেশ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল; দেবী ও পৃথ্বীশবাবুকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। ভ্রাতার আগমনে উৎফুল্ল হইয়া দেবী অন্ধ-বালকের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রথমে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন! আনন্দের আতিশয্য একটু কমিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"নীলি, এ কে রে ?" নীলিমেশ একটু হাসিয়া বলিল—"দিদি, ইহাকে শক্তিপুর ষ্টেসনে কুড়াইয়া পাইয়াছি। ইহার কেহ নাই; আমি ইহাকে আমার কাছে রাখিব।"

দেবীর মুখে সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিল। তিনি একবার ভাল করিয়া বালকের দিকে চাহিলেন। বালকের মুখশ্রী সুন্দর; সেই সুন্দর মুখের নিমীলিত চক্ষু দুটি যেন সকলের করুণা ভিক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, কে যেন একখানি সুন্দর চিত্র আঁকিয়া তাহার চক্ষুদুটি অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়! কে বলিবে, ইহা চিত্রকরের ভ্রম না চিত্রের দুরদৃষ্ট!

দেবী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"আহা কেহ নাই! তা তুই এনেছিস্, বেশ করেছিস্।"

দেবী ও পৃথ্বীশবাবু মিলিয়া নীলিমেশের জন্য একটি ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সাজাইবার উপকরণ বহুমূল্য না হইলেও নীলিমেশের রুচিসঙ্গত ছিল। তাহার প্রধান উপকরণ এক আলমারী-ভরা ভাল-ভাল ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থ।

বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর দেবী বলিলেন—"নীলি, তোর ঘর পছন্দ হইয়াছে ত ?" নীলিমেশ বলিল—"হাঁ, খুব পছন্দ হইয়াছে! তবে ঘরটায় আর একটা বিছানা চাই, ছেলেটিকে আমার ঘরেই রাখিব। উহার শরীর বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি যত্ন করিয়া উহাকে ভাল করিব।" দেবী ভাবিলেন—"আহা নিজে ছেলে বয়সে মা-হারা কি না, তাই মাতৃহীনের দুঃখ ওর বড় বাজিয়াছে।"

অন্ধ বালক নীলিমেশের ঘরে স্থান পাইল। কুড়াইয়া পাওয়া বলিয়া নীলিমেশ তাহার নাম দিল—হারানিধি; ডাক-নাম হইল, মনিয়া। মনিয়ার বয়স ৮।৯ বৎসর।

(৩)

মনিয়া প্রাঙ্গণে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার চক্ষে দৃষ্টি না থাকিলেও সে পশ্চিম আকাশের পানে চক্ষু রাখিয়াছিল। সূর্য্য তখন দিবস-শেষে বিদায় লইতেছিলেন। তাঁহার স্বর্ণরশ্মি তরুশিরে দীপ্তি পাইতেছিল। প্রিয়জনের নিকট বিদায় লইবার সময় সে যেমন তাহার যা-কিছু আদরের দ্রব্য সকলই সেই প্রিয়জনের চরণোপান্তে অর্পণ করিয়া যায়, সূর্য্যও তেমনি বসুধার নিকট তাঁহার ঐশ্বর্য্য সুবর্ণ-কিরণটুকু সঁপিয়া দিয়া বিদায় লইতেছিলেন।

সূর্য্য কাহাকে বলে, পৃথিবী কি, মনিয়া হয় ত তাহা জানেই না। সূর্য্যের বিদায়-দৃশ্য মনিয়া হয় ত কখন দেখে নাই। তথাপি তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, আজ যেন এই বিদায়-দৃশ্যই সে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। সে বিষণ্ণ চিরকালই, তবু আজ যেন একটু বেশী কাতর। সে কাহাকেও মনোভাব প্রকাশ করে না, হয় ত সে প্রকাশ করিতেই জানে না; কিন্তু আজ যেন সে কিছু বলিতে চায়; আজ যেন সে কাহারো গলা ধরিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে চায়।

সন্ধ্যার সামান্য পূর্ব্বে নীলিমেশ ভ্রমণ করিয়া গৃহে

ফিরিল। মনিয়াকে তদবস্থায় দেখিয়া নীলিমেশ সস্নেহে তাহার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মনিয়া, কি ভাব্‌ছিস্?"

মনিয়া একটু চমকিত হইয়া বলিল—"কিছুই না বাবুজী।" নীলিমেশ স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল,—"না মনিয়া, নিশ্চয়ই তুই সব সময়ে কি ভাবিস্। তোর দুঃখ কি আমায় বল্।"

মনিয়া কোন উত্তর দিল না; তাহার দৃষ্টিহীন নয়নের প্রান্ত দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। নীলিমেশ তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিল,—"আচ্ছা, তোর ও সব কিছু বলিতে হইবে না। কিন্তু কখন তুই হাসিস্ না কেন মনিয়া?" এবার মনিয়া কথা কহিল, বলিল—"তা তো জানি না বাবুজী।" নীলিমেশ তাহাকে লইয়া ঘরের ভিতর গেল।

পরদিন প্রাতর্ভ্রমন হইতে ফিরিয়া আসিয়া নীলিমেশ শুনিল—মনিয়া তখনও উঠে নাই। ডাকিতে গিয়া দেখিল তাহার গা আগুনের মত গরম। নীলিমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"জ্বর হইয়াছে, মনিয়া?" মনিয়ার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল; অতি কষ্টে বলিল—"হাঁ বাবুজী।"

ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন—"বড় weak heart, একটু সাবধানে রাখিবেন।"

দিন কয়েক একই ভাবে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পর মনিয়ার রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। নীলিমেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। মনিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—"বাবুজী, এহি রোজ হাম ঘর যায়েব।" কথার ভাবে ও স্বরে নীলিমেশ চমকিত হইল। পরদিন উষার আলোকের সঙ্গে-সঙ্গে মনিয়ার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল। নীলিমেশ কাঁদিয়া কহিল—"কিছুতেই তোরে রাখ্‌তে পারলাম না মনিয়া।"

(৪)

কৌমুদীরেখা হইতে দুই ক্রোশ দূরে গঙ্গা। বালক-বালিকার মৃতদেহের সৎকার কৌমুদীর একটা বিলেই সম্পন্ন হইত। নীলিমেশ বলিল "মনিয়াকে গঙ্গায় লইয়া যাইব।"

গঙ্গার বালুকা-সৈকতে মনিয়ার দেহ রাখিয়া চিতা সাজান হইতেছিল। এক হিন্দুস্থানী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ স্তব গাহিতে-গাহিতে স্নান করিয়া যাইবার সময় দূর হইতে চিতাসজ্জা দেখিলেন। যে চিরকালের জন্য এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহাকে একবার দেখিবার জন্য হয় ত মানুষমাত্রেরই একটা আগ্রহ হয়।

ব্রাহ্মণ ধীরে-ধীরে মৃতদেহের নিকট আসিলেন। মনিয়ার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া তিনি চমকিত হইলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার কি যেন একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীলিমেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবুজী, এটি কি আপনার ভৃত্য?"

নীলিমেশ বলিল—"না, আমি ইহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।" ব্রাহ্মণের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আগ্রহের সহিত বলিলেন—"কোথায়, কেমন করিয়া ইহাকে পাইয়াছিলেন, যদি দয়া করিয়া বলেন।"

নীলিমেশ উত্তর দিল—"আমি কৌমুদীরেখা আসিবার পথে ইহাকে শক্তিপুর ষ্টেসনে অসহায় অবস্থায় পাইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, ইহার বাপ-মার সন্ধান করিয়া দেখিব, কিন্তু কোন সন্ধান পাই নাই। বোধ হয় তাঁহারা জীবিত নাই।"

নীলিমেশের মনে পড়িল সেই অতীতের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যা, যেদিন সে মনিয়ার শীর্ণ হস্ত দুটি ধরিয়া তাহাকে ভরসা দিয়াছিল। নীলিমেশের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের দেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনিয়াকে স্পর্শ করিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। পরে নীলিমেশের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"বাবুজী, ইহার মা মরে নাই, কিন্তু মরিলেই ভাল হইত। হতভাগ্যের বাপও বাঁচিয়া আছে। এ আমারই পুত্র।" নীলিমেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনার?" ব্রাহ্মণ এবার অবিচলিত স্বরে বলিলেন—"হাঁ বাবুজী। আপনি ইহাকে দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ইহার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা কর্ত্তব্য। কিন্তু বেশী বলিতে পারিব না; সে সে বড় ঘৃণিত কাহিনী। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহাকে স্ত্রী বলিতাম, সে আমার এই অন্ধ পুত্রকে লইয়া এক লম্পটের সহিত আমার গৃহ পরিত্যাগ করে। সম্ভবতঃ কিছু দূর গিয়া সে এই দুর্ভাগ্য সন্তানকে পথে ত্যাগ করিয়াছিল।"

বলিতে-বলিতে ব্রাহ্মণের অবিচলিত ভাব দূরে গেল; ঘৃণা ও নিরাশা-মিশ্রিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—"পুত্রটী জন্মান্ধ, তাই আমি উহাকে বড়ই ভালবাসিতাম। পুত্রের

অদর্শনে আমি বড়ই কাতর হইলাম। দিন কয়েক অনুসন্ধান করিলাম। পরে, কি জানি কেন মনে হইল, যে আমার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত আশা ভঙ্গ করিয়া গেল, তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ফিরিতে হইবে, এমনই অপদার্থ আমি! আমি অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিলাম। ভাবিলাম—যিনি দিয়াছিলেন, তিনিই আবার ফিরাইয়া লইয়াছেন।"

মুখ ফিরাইয়া ব্রাহ্মণ মনিয়ার মৃতদেহ একবার বুকের উপর তুলিয়া লইলেন। তাঁহার সমস্ত ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া গেল। মনিয়ার মৃত্যু-কালিমাচ্ছন্ন মুখখানিতে একবার শেষ চুম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"বাবুয়া! বহুৎ তকলিফ পায়া রে।" দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার আঁখিপ্রান্ত হইতে গড়াইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ পুত্রের দেহ যথাস্থানে রাখিলেন, তার পর—"প্রণাম বাবুজী" বলিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাতীর ত্যাগ করিলেন।

নীলিমেশ অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেই বালুকাতটে বসিয়া রহিল।

দূরে বৈরাগ্য-প্রয়াসী ব্রাহ্মণের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতে লাগিল:—

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়ং অতীব বিচিত্রঃ।

বিশ্বদূত

মহীশূরে শিল্প-প্রতিষ্ঠা

মহীশূর দরবার রাজ্য-মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি:—

(১) চন্দন তৈলের কারখানা—একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আর একটি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

(২) ইক্ষুর চিনির কারখানা।

(৩) বাষ্পীয় উত্তাপে গুড় প্রস্তুত করিবার কারখানা।

(৪) সাবানের কারখানা।

(৫) গরম কাপড়ের কল। তুমকুর জিলা সমিতি এইরূপ একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন। তাহার মোট মূলধন ৫০ হাজার টাকা।

(৬) কলের তাঁতের প্রতিষ্ঠা। বিলাত হইতে কলের তাঁত আনাইয়া লোকের বাড়ীতে দেওয়া হইবে।

(৭) তুলার বীজের তৈলের কারখানা। এই জন্য একটি যৌথ-কারবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

(৮) বোতাম প্রস্তুত করণ। এ জন্য একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৯) বনজ কাষ্ঠের গুণপরীক্ষা।

(১০) উদ্ভিদ হইতে রঞ্জনের জন্য বর্ণ প্রস্তুত করা।

মহীশূর দরবার এই দশ দফা কাজে হাত দিয়াছেন। সরকারের পরীক্ষা সফল হইলে ক্রমে দেশের লোক লাভ দেখিয়া ব্যবসা করিতে পারে। এইরূপ সাফল্যেই সাতটি ইক্ষু-চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য পরীক্ষার সাফল্যফলে অন্যান্য ব্যবসাও প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রথম পরীক্ষার কাজ সরকারের; তাহার পর লাভ দেখিলে দেশের লোকই ব্যবসা আরম্ভ করে। জাপানী সরকার এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াই দেশে শিল্পের পত্তন করিয়াছেন। আমরাও এ দেশে সরকারকে এইরূপ ব্যবস্থাই করিতে বলিতেছি। মান্দ্রাজে সরকার এইরূপ কার্য্য করায় তথায় একাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ দেশে নানাবিধ ব্যবসার সুবিধা আছে; কিন্তু আরম্ভে যে উদ্যোগ, আয়োজন ও অর্থব্যয়, তাহারই অভাবে লোক সে সব ব্যবসার পত্তন করিতে পারিতেছে না। লোক যদি সরকারের অভিজ্ঞতার সাহায্য পায়, তাহা হইলেই অনেকে সাহস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এ সব বিষয়ে বিদেশের অভিজ্ঞতায় দেশীয় দরবারসমূহে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ইংরাজাধিকারে সে সকলের প্রবর্ত্তনে বিলম্বের কারণ কি? —বসুমতী

পরার্থে আত্মপ্রাণদান

দুঃখের কথা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গত ২৭শে ডিসেম্বর বুধবার স্নানের সময় রাজসাহীর গোপাল কবিরাজ মহাশয়ের ব্রাহ্মণী ও চাকরাণী পদ্মার ঘাটে জলে পড়িয়া ডুবিবার উপক্রম হইলে তদ্দৃষ্টে স্থানীয় উকীল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন। স্ত্রীলোক দুইটীর প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; স্ত্রীলোক দুইজনের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের জীবন হারাইলেন। ঐখানে জলের পাক আছে। দুই একবার হাবুডুবু খাইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন কিছুই স্থির করা গেল না। কলেজের ছাত্রগণ, পুলিশ ও অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক বহু চেষ্টা করিয়াও কোনই সন্ধান করিতে পারিলেন না। এদিকে মা শরশয্যায়। এই দুর্ঘটনার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র শোকে মৃত্যু কামনায় মাথায় ইষ্টকাঘাতে রক্তারক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন।

ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ৺হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি দ্বিতীয়পুত্র। বংশের মধ্যে ইনিই কৃতী সন্তান। এম. এ, বি, এল পাশ করিয়া দুই বৎসর হইতে রাজশাহী জজকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন। ইঁহার মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই তুষ্ট ছিলেন। ইনি হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং সন্তরণপটু ছিলেন। কিন্তু কিছুই কিছু নয়। নিয়তি কাহারও বাধ্য নয়। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, ইঁহাদিগের শান্তি বিধান করুন। —হিন্দুরঞ্জিকা

ইক্ষুর চাষ

আসামে ইক্ষুর চাষ সফল হইয়াছে। কামরূপ জেলায় নলবাড়ীর নিকটে খাগড়াবাড়ীতে সরকারী কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইক্ষুর ফলন খুব বেশী হইয়াছে। তিন বৎসর ব্যাপী পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে, উত্তর-কামরূপ আখের চাষের পক্ষে সম্যক উপযোগী। যত্ন করিয়া চাষ করিলে এত আখ উৎপন্ন হইতে পারে যে তাহাতে কতকগুলি বড় বড় চিনির কারখানা সুন্দররূপে চলিতে পারে। প্রথমে জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত এবং মজুরের অভাবে পরীক্ষার কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছিল; পরে চেষ্টা করিয়া এই বাধা দূর করা হয়। তারপর, যুদ্ধের দরুণ চাষের সরঞ্জামের অভাব উপস্থিত হয়; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল অভাবই মিটাইয়া লইতে পারিয়াছেন। এখন ২৭০ একার জমিতে অতি উৎকৃষ্ট আখ জন্মিয়াছে। অভিজ্ঞগণের বিশ্বাস, যে সকল দেশে চিনি উৎপন্ন হয়, সেই সকল দেশে চিনি উৎপাদনের উপযোগী যে সকল সুবিধা আছে, আসামে সে সমস্ত সুবিধা ত আছেই; অধিকন্তু, আসামে এমন কতকগুলা অতিরিক্ত সুবিধা আছে, যাহা অন্য কোন দেশে নাই। অর্থাৎ ব্যবসায়ের হিসাবে চিনি উৎপাদনের যে সরকারী পরীক্ষাক্ষেত্র আসামে আছে, চিনি-উৎপাদক অপর কোন দেশের সে সৌভাগ্য নাই। ভারতের চিনির প্রতিযোগী জাভা, মরিসস, কিউবা, হাওয়াই, জামেকা, দক্ষিণ আফরিকা, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশের চিনির কারখানাওয়ালারা আসামের বিশেষ বিশেষ সুবিধাগুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না, কিন্তু কোন মতে তাহা লাভ করিতে পারিতেছে না। কেবল একটী বিষয়ে এখনও আসামের পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আসামজাত ইক্ষুতে চিনির পরিমাণ কতখানি তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবে পরীক্ষা এখনও চলিতেছে এবং পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এই পরীক্ষায় সফলতা লাভ হইলে—যে পরিমাণ ইক্ষু ইদানীং উৎপন্ন হইতেছে তাহাতে—পরীক্ষাক্ষেত্রের নিকটে ১০ টা কারখানা স্থাপন করিলেও অনায়াসে চলিয়া যাইবে। এখন যে ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে গুড় প্রস্তুত হইতেছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, আসামে চিনির কারখানা ভালরূপ চলিলেও তাহাতে দেশে চিনির অভাব কতদূর মিটিবে এবং চিনির দর কমিবে কি না, অর্থাৎ জাভা, মরিসস প্রভৃতি স্থানের চিনির সহিত আসামী ইক্ষু-চিনি প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে কি না, ইহাই বিবেচ্য। কারণ, কেবল চিনি উৎপাদন করিলে চলিবে না, তাহা বাজারে চালান দিবার সুবন্দোবস্ত প্রথমেই করা দরকার। তাহা না হইলে, ঐ চিনি—লঙ্কায় সোণা সস্তা—গোছের হইয়া থাকিবে। আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি, ভারতে রেলওয়ে ভাড়া এত বেশী যে এক স্থানে কোন জিনিস প্রচুর এবং সস্তা হইলেও ভারতের অন্যত্র তাহা লইয়া গিয়া ব্যবসা করিতে গেলেই পড়তা এত বেশী পড়ে যে, তাহাতে বিদেশীয় জিনিসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠা ভার। সর্ব্বাগ্রে এই মহা সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে সস্তার চিনি কাহারও ভোগে আসিবে না। ষ্টীমারের অপেক্ষা রেলের মাশুল স্বভাবতঃই কিছু বেশী পড়ে তাহা স্বীকার করি; কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, ভারতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যে কোন জিনিসই রেলপথে লইয়া যাওয়া যাউক না কেন, সেই জিনিস সুদূর জার্ম্মাণী, রুষিয়া, জাপান, এমন কি আমেরিকা হইতে আনাইলেও জাহাজ ভাড়া কম পড়ে। এই কারণেই এ দেশে দেশালাই, লেড পেনসিল প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নচেৎ, এ দেশে দেশালাই বা পেনসিলের উপযোগী কাঠের অভাব নাই। সুতরাং আসামে ইক্ষুর চাষ ভাল হইলেও, এবং সস্তায় প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইলেও, জলপথে ও স্থলপথে তাহা অল্প খরচে অন্যত্র চালান দিবার ব্যবস্থার উপর আসামী-চিনির ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। ইহার উপায় কি?

—দর্শক

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চেষ্টায় বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। সমিতি অক্লান্ত চেষ্টায় সে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। বড় দিনের ছুটিতে কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখ সমিতির সদস্যগণ দিনাজপুর বালুঘাটের নিকটে মহিসন্তোষে একটি পুরাতন মসজেদের অবশেষ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। দেখিয়া বুঝা যায়, মসজেদটি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহিসন্তোষের একটি দরগায় রক্ষিত একখানি শিলালিপিতে প্রকাশ,—গৌড়ের রাজা বারবাক শাহের শাসনসময়ে (১৪৭১ খৃষ্টাব্দে) এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একটি মসজেদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দরগার নিকটেই একটি জঙ্গলাকীর্ণ মৃৎস্তূপ ছিল—লোক ইহাকে বারদুয়ারী বলিত। স্তূপের উপর একটি স্তম্ভ দেখা যাইত। সমিতির সদস্য শ্রীযুত দেবেন্দ্রগতি রায় স্তূপ খনন করিয়া দুইটি স্তম্ভ পাইয়া সমিতিকে সংবাদ দেন। সংবাদ পাইয়া সমিতির সদস্যগণ বড় দিনের ছুটীতে তথায় যাইয়া খনন-কার্য্য আরম্ভ করান। তাহারই ফলে সেই প্রসিদ্ধ মসজেদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।—বসুমতী।

ব্রহ্মদেশের শেষ রাজা

ব্রহ্ম দেশের শেষ স্বাধীন নরপতি থিব বিগত শনিবার মধ্য রাত্রিতে বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি নগরে হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল হতভাগ্য অতি প্রাচীন রাজ বংশে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিনের জন্য কোটি কোটি নরনারীর দণ্ডমুণ্ডের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া পরে অতি শোচনীয় অবস্থায় শেষ জীবন অতিবাহন করিতে বাধ্য হয়েন, রাজা থিব তাঁহাদেরই অন্যতম। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মিন্দুনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র থিব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি রাজবংশের বহু ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করেন এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। ব্রহ্মদেশের পশ্চিমে বৃটিশ সাম্রাজ্য, পূর্ব্বদিকে ফরাসী রাজ্য কোচীন। ব্রহ্মরাজ থিব ইংরাজের সহিত মনোমালিন্য করিয়া ফরাসীর সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করেন। ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ থিবর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দুই সপ্তাহ মধ্যেই রাজধানী মন্দালয় অধিকার পূর্ব্বক থিবকে বন্দী করেন। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন। সেই সময় হইতে ৩২ বৎসর পরে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিল। —হিতবাদী

প্রতিধ্বনি

ভাষার কথা

(১) যাঁহারা সাহিত্য-সম্রাটের দোহাই দিয়া কলিকাতার slang লিখিত-ভাষায় চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

(২) কোন প্রতিভাশালী লেখক হয় ত নিজের প্রতিভাবলে কোন অঞ্চলের slang লিখিত-ভাষায় চালাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু অন্যে তাহা করিতে গেলে নিশ্চয়ই ভাষাবিভ্রাট হইবে।

(৩) কোন প্রতিভাশালী লেখক অন্য নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে যে একটা নূতন ভাষার আবিষ্কার করিতেই হইবে এমন কোন মাথার দিব্য নাই। তিনিও অনেক পরিমাণে প্রচলিত ভাষায় লিখিতে বাধ্য হন, তাঁহার style স্বতন্ত্র।

(৪) সাধারণ লেখকগণ প্রচলিত ভাষায়ই লিখিবেন, "নূতন কিছু করার" লোভ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৫) কথোপকথনের ভাষা লিখিত-ভাষায় চালাইতে কোন বাধা নাই; কিন্তু তাহা প্রাদেশিকতা বর্জ্জিত হইবে।—

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন

সেকাল ও একাল

শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে, সুখ দুঃখ উভয়েরই অনুভূতি বর্দ্ধিত হয়। জনশিক্ষার ফলে, সেকালের অপেক্ষা একালে সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি ও উপায় বাড়িয়াছে। ইহাতে সুখের জমা অপেক্ষা ক্লেশের খরচ বাড়িয়াছে কি না, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। "If the capacity to feel pleasure partakes in the general advance of mental faculty, then we have a greater capacity for pleasure than our forefathers. But it must be remembered that along with the increased capacity of feeling pleasure goes the increased capacity of feeling pain, and it is by no means certain that the latter does not outrun the former."

সেকালের লোকে ধর্ম্মের জন্য মারামারি কাটাকাটি করিত। এখনকার লোকে ধর্ম্মযুদ্ধকে (crusade) সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া নাক সিঁটকায় বটে, কিন্তু বাণিজ্য ("exploitation") বা রাজ্য-জয়ের ("imperialism") ধুয়া ধরিয়া রক্তনদী বহাইতে দ্বিধা বোধ করে না। সেকালের অপেক্ষা একালে সুবিধা বাড়িয়াছে ইহা ঠিক, কিন্তু সুখশান্তি বাড়িয়াছে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।—মানসী।

বজ্রাঘাত ও বৃক্ষ

Scientific American নামক বিখ্যাত পত্রিকায় জার্ম্মানীতে কোন্ কোন গাছ বজ্রাঘাতে বেশী নষ্ট হয় তাহার একটা হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, ওক গাছ শতকরা ৩২,১, মার্চ্চ ৯.৫ ফার ৩.৮ দেবদারু ১.৮ স্কচফার ·.৯, বার্চ্চ ১,৪ বিচ ·.৩ অল্ডার ·.·। আমাদের দেশেও বহুজাতীয় বৃক্ষ বজ্রাঘাতেই অধিক ধ্বংস হয়, তাহার হিসাব করা আবশ্যক। মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর বজ্রপতন অনেকটা নির্ভর করে। নদী তীরবর্ত্তী সাঁতা জমীতে যে সমস্ত বৃক্ষ জন্মে বা জলাশয় সন্নিকটস্থ বৃক্ষাদিতে বজ্রপতন বেশী হইয়া থাকে। যে সমস্ত বৃক্ষের মূল অনেক গভীরতা পর্য্যন্ত প্রোথিত হয়, সেই সমস্ত বৃক্ষেই বজ্রাঘাত অধিক হওয়া সম্ভাবনা। যে সময় ঝড় ও মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত হইতে থাকে সে সময়ে এরূপ বৃক্ষতলে আশ্রয় লওয়া উচিত যেন সে বৃক্ষ বায়ু বজ্রপতনের অনুকূল না হয়।—বিজ্ঞান

বিলাতে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যা।

কেহ যেন মনে না করেন, পৃথিবীর সকল দেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী বেশী আত্মহত্যা করে। প্রমাণস্বরূপ আমরা ইংলণ্ডে আত্মহত্যার একটি তালিকা দিতেছি।

বৎসর	আত্মঘাতী পুরুষ	আত্মঘাতিনী নারী
১৯০১	২৩১৮	৮০৩
১৯০২	২৪৬০	৮০৭
১৯০৩	২৬৪৭	৮৭১

১৯০৪	২৫২৩	৮২২
১৯০৫	২৬৮৮	৮৬২

পুরুষ বা নারী যে-জাতির বেশী আত্মহত্যা করুক, উহা একটি সামাজিক ব্যাধি; উহার চিকিৎসা চাই। ইউরোপের সকল দেশের গড় ধরিলে আত্মঘাতীর সংখ্যা আত্মঘাতিনীর সংখ্যার ৩।৪ গুণ। এইজন্য সেখানকার অবস্থা ও ভারবর্ষের অবস্থা বিভিন্ন বলিয়া, চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। কেহ মনে করেন, বাঙালীর মেয়েরা উপন্যাস পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে! কিন্তু ইউরোপের মেয়েরা যে শতগুণ বেশী উপন্যাস পরে?—প্রবাসী।

কলেরা ও পাথরকুচির পাতা

চকদীঘির জমিদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর "হিন্দু পেট্রিয়টে" লিখিয়াছেন,—আমি অনেক দিন হইতে ওলাওঠার একটি ঔষধ জানি; যে সব স্থানে রোগীর চিকিৎসার কোন সুবিধা নাই সেই সব ক্ষেত্রে এই ঔষধটি ব্যবহারে বিশেষ ফল ফলিতে দেখিয়াছি। যে সব ওলাওঠা রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদিগের শতকরা ৬০ জনেরও অধিক লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম সমূহে পথে ঘাটে, পাথর কুচি গাছ নামে এক প্রকার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছের দুই তিনটি পাতার রস নদীর জল ও গোল মরিচ চুর্ণের সহিত মাড়িয়া খাইতে হয়। রোগী প্রথম বার ঔষধ খাইবার পর যদি একটু ভাল না হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় বার ঔষধ খাওয়াইতে হয়। রোগীর অবস্থা পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত চারিবার ঔষধ সেবন করা আবশ্যক। কিন্তু শেষ দুইবার অধিক পাতার রস ব্যবহার করা উচিত নয়। পূর্ণ বয়স্ক রোগীর পক্ষে ঔষধের এই মাত্রা। ঔষধটি সন্ন্যাসিদত্ত, আমি ইহার রাসায়নিক শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানি না।—স্বাস্থ্য-সমাচার।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ। একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদিগকে উদরান্নসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় না, যে শিক্ষা আমাদিগকে জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার জন্য শক্তিশালী করিয়া দেয় না, তাহা কি করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায় হইবে? বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষা বিতরণ করিতেছেন তাহাতে অন্য যে উদ্দেশ্যই সাধিত হউক না কেন, জীবনযুদ্ধে টিকিয়া অন্নসংস্থানের উপায় বিধান করিবার উপযুক্ত শিক্ষা যে প্রদান করিতেছেন না—একথা সকলেই বুঝিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকগণের কাছে অন্নসমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির মাত্রাও বাড়িতেছে। আমরা সংসারী, আমরা গৃহস্থ, আমরা বাস্তবজগতের জীব। আমরা চাই আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীতবিদ্যার সাহায্যে সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে; পিতৃ-পিতামহের ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিবে; ক্ষুধিতকে অন্নদান করিবে; আশ্রিতকে প্রতিপালন করিবে; অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিয়া বংশের গৌরব বর্দ্ধন করিবে। আর দেশের অধিকাংশ লোকই আমাদের মত ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আমরা শিক্ষার বিলাসিতা চাহি না। নিরন্নদেশ তাহা চাহিতে পারে না। যে শিক্ষা অন্নসংস্থানের উপায় সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম তাহা আমাদের মতে শিক্ষার বিলাসিতা মাত্র। দিন দিন এই শিক্ষা আবার এত ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে যে আমাদের ভয় হয় নিকট ভবিষ্যতে অভিভাবকগণ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ করিবেন না। কি লাভের আশায় তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া ছেলেকে পড়াইবেন? যে প্রধান কারণে তাঁহারা দুহিতাকে শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করেন না, সেই কারণেই তাঁহারা পুত্রদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। এখনও জনসাধারণের মনে একটা বিশ্বাস রহিয়াছে যে তাহাদের পুত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করিলেই তাহারা অর্থোপার্জ্জনক্ষম হইবে; কিন্তু এ ভ্রম ক্রমশঃই ভাঙ্গিতেছে; ক্রমশঃই শিক্ষার খরচ বাড়িতেছে; কিন্তু শিক্ষিতের আয় করার ক্ষমতা যেন কমিয়া যাইতেছে। এ অবস্থা বেশী দিন চলিলে অর্থব্যয় করিয়া কেহ আর পোষাকী শিক্ষাগ্রহণে অগ্রসর হইবে না; বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট ত প্রাথমিক শিক্ষাকেই অবৈতনিক করিতে পারিতেছেন না—উচ্চাঙ্গের শিক্ষা যে সুদূর ভবিষ্যতেও অবৈতনিক করিতে পারিবেন এমন মনে হয় না। তাই আমরা ভীত হইয়াছি। ইহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পোষাকী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুতন্ত্রতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কৃষি, শিল্প-বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় বড় বড় ইমারত করিয়া দুই দশটা বিজ্ঞান কলেজই খোল, আর পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজই খোল, শিক্ষা জনকয়েক লোকের মধ্যে তাহাদের অলঙ্কার স্বরূপ আবদ্ধ থাকিবে; জনসাধারণের তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

—গম্ভীরা।

পুস্তক-পরিচয়

ময়ূখ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এই নূতন উপন্যাসখানি আটআনা সংস্করণ গ্রন্থমালার একাদশ গ্রন্থ। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা দেশে পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারের কাহিনী উপন্যাসের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিহাসে পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক ভয়াবহ কাহিনীর বর্ণনা আছে; তাহারই একটী কাহিনী লইয়া ময়ূখ লিখিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আলোচ্য উপন্যাসেও তাহা দেদীপ্যমান। গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্য ও ঘটনা সমাবেশ শক্তি অতীব প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসখানি পাঠ করিলে পর্ত্তুগীজ আমলের বাঙ্গালার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সাগরের ডাক

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এখানি নাটক; কিন্তু নাটক বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝি, এখানি তাহা নহে—ইহা সাগরের ডাক! মধু এই নাটকের নায়ক। সে সাগরের ডাক শুনিয়াছে; তাই সকলকে ডাকিয়া সেই ডাক শুনাইতেছে। গ্রন্থকার এই 'সাগরের ডাকে' যে গভীর অধ্যাত্ম চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা বড়ই উপভোগ্য; অনেক তত্ত্বকথা এই সুন্দর ডাকে পরিস্ফুট হইয়াছে। গদ্যে লিখিত হইলেও এই পুস্তকখানি অনেক কাব্য অপেক্ষাও মনোরম।

উমা ও রমা

শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

'উমা ও রমা' একখানি সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে বর্ত্তমান সময়ের একটী চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ, আমাদের মহিলা সমাজের শিক্ষা দীক্ষা কোন্ পথে পরিচালিত হইতেছে, এবং তাহাতে সমাজের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কি বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, কৃতী গ্রন্থকার নানা ছবি সৃষ্টি করিয়া তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। উমা ও রমা, এই দুইটী চরিত্র পাশাপাশি রক্ষিত হওয়ায় বিশেষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের সহিত সমস্বরে আমরাও বলিতেছি 'মা উমা, এস, আবার বঙ্গের—ভারতের গৃহে গৃহে দেখা দাও।'

নচিকেতা

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য বার আনা।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের উপাখ্যান ও তত্ত্ব 'নচিকেতা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। জীব কি, জগৎ কি, মোক্ষ কি, ব্রহ্ম কি ইত্যাদি অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়াই সমস্ত উপনিষৎ শাস্ত্র। সেই তত্ত্ব সহজে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি যে সকল সরল উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন, 'নচিকেতার' উপাখ্যান তাহার অন্যতম! অতুলবাবু তাহাই বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গ্রন্থকার কেবল সুলেখক নহেন, তিনি উপনিষদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন এবং তাহারই অংশ আমাদিগকে বিলাইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন কথা, তাঁহার রচনার ইতিহাস ও তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হইল। দ্বিজেন্দ্রলালের গুণমুগ্ধ সুলেখক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এই জীবন চরিতের লেখক; দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয় বন্ধুগণ কবির জীবন কথার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং এই জীবনকথা যে সুন্দর হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বাবু দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে যেখানে যে কথাটুকু পাইয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে দিয়াছেন। আরও এক কথা, তিনি নিজে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা ও তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে বড় বেশী কথা বলেন নাই, আমাদের দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন? আমরা যে এ পুস্তকখানি পরম আগ্রহে এবং বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য—দ্বিজেন্দ্রলাল যে আমাদের 'ভারতবর্ষের' প্রতিষ্ঠাতা। এই সুন্দর জীবন কথা প্রকাশিত করিয়া নবকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সাবিত্রী

৺সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

এই সুন্দর উপন্যাসখানি যিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি আর ইহজগতে নাই, তিনি নিন্দা প্রশংসার অতীত স্থানে, অতি অকালে চলিয়া

গিয়াছেন। তিনি এই একখানি উপন্যাসই লিখিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসখানির নাম 'সাবিত্রী'। সতীশবাবু যে সাবিত্রী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সতী সাবিত্রীরই অনুরূপ হইয়াছে। গ্রন্থকার এই চিত্র অঙ্কনে যে প্রতিভার, যে সমবেদনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। সতী সাবিত্রীর পবিত্র চরিত্রের ন্যায় এই সাবিত্রী কাহিনী গৃহে গৃহে পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই পুস্তকখানিই সতীশ বাবুর নিঃসন্তান বিধবার একমাত্র সম্বল। কাশীবাসিনী অনাথার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ফোয়ারা

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ প্রণীত ;

দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য একটাকা।

১৩১৭ সালে 'ফোয়ারা'র প্রথম সংস্করণ হইয়াছিল, আর অল্পদিন পূর্ব্বে দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, অথচ আমরা বলি যে, বাঙ্গালা পাঠকের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। এ কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এই ছয় বৎসরে 'ফোয়ারা'র মত বইয়ের দশটা সংস্করণ হইত। এমন বই, এমন সরস সুন্দর জিনিষ বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়ই দুর্লভ; এই 'ফোয়ারা'য় "আধিব্যাধি শোকতাপ ক্লিষ্ট সংসার পথিকের" বহুদণ্ডের "তরে শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর" হইবে। 'ফোয়ারা' রসের ফোয়ারা, চিন্তাশীলতারও ফোয়ারা; বইখানি পড়িয়া যেমন নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করা যায়, তেমনই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেও হয়। এবার যদি শীঘ্র শীঘ্র বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ফুরাইয়া না যায়, তাহা হইলে ললিত বাবুকে উপদেশ দিব—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্—"

বৈরাগ্য-শতকম্

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদ

মূল্য চারি আনা মাত্র।

এখানি মহাকবি, বিরাগী ভর্ত্তৃহরি প্রণীত বৈরাগ্য শতকম্' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। 'বৈরাগ্য-শতকম্' মূল সংস্কৃত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্লোকগুলি কি সুন্দর, প্রাণস্পর্শী! কন্যাশোক-কাতর বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি কন্যা শোকে সান্ত্বনা পাইবার জন্য এই শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ করেন। অনুবাদ অতি সুন্দর ও সুললিত হইয়াছে। আমাদের স্থানাভাব; তবুও একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"বলি মাংসে আক্রমণ করেছে বদন,
মস্তকে ধবল কেশ হয়েছে শোভন,
শিথিল হতেছে ক্রমে অঙ্গ সমুদয়,
আশারি কেবল দেখি নব-অভ্যুদয়।"

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস "ময়ূখ" আট আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের "সাহিত্য-পঞ্জিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচসিকা। পুস্তকখানি বাঁকিপুর সাহিত্য-সম্মিলনে বিতরিত হইয়াছিল এবং তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় 'রহস্য-লহরী'র লীলাচ্ছলে এবার 'রোজার ঘাড়ে ভূত' চাপাইয়াছেন। ভূত নামাইতে হইলে এগারআনা দক্ষিণা লাগিবে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের "ধম্মপদ" তৃতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিল। মূল্য দেড়টাকা।

ব্রহ্মর্ষি সাংকেতানন্দ পরমহংস প্রণীত "মহানির্ব্বাণ দর্শন" প্রকাশিত হইল। মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ক্ষত্রবীর" নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত নূতন উপন্যাস "মণিমন্দির" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা মাত্র।

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত নূতন প্রহসন "একে আর" প্রকাশিত হইল। মূল্য ছয় আনা।

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন পুততুণ্ড মহাশয় "নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী" সঙ্কলন ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মূল্য এক টাকা মাত্র।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত "সাধনা" নামক নূতন সামাজিক নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। পাঁচ-সিকা ব্যয়ে যে কেহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "মোতি মহল" মাঘের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনগুপ্ত প্রণীত "যোগমায়া ঠাকুরাণী" অর্থাৎ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণীর জীবন-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
12, Simla Street, CALCUTTA.

শিবপূজা

শিল্পী— শ্রীভবানীচরণ লাহা

Emerald Ptg. Works, Calcutta

ফাল্গুন, ১৩২৩

দ্বিতীয় খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীরাধা

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

বন্দি তোমায় চিন্ময়ী গো, কানুর জীবন-কুঞ্জরাণি!
অন্ধ ভুবন পন্থহারা শুন্‌তে তোমার পুণ্যবাণী।
বিশ্বরমে! রূপ্‌শ্রীতে ঐ রসের সেরা মূর্ত্তি রাজে,
মন্ ঘিরে প্রাণ-মঞ্জীরে মোর তোমার মোহন মন্ত্র বাজে।
সকল রূপের রাজ্ঞী তুমি, ফুট্‌লে যে তাই পদ্মদলে,
যে দিন তোমার বিকাশ, সে কি হর্ষ-প্লাবন জলে-স্থলে!
দেব্‌তা অবতীর্ণ হ'ল দেখ্‌তে সে রূপ স্বর্গপথে,
তোমায় হেরি' থম্‌কে দাঁড়ায় সূর্য্য কোটী ভর্গ-রথে।
চারণ-ঋতু শরৎ তোমার গায় আরতি বন্দনাতে,
আগমনী গায়িল অযুত দোয়েল কোকিল চন্দনাতে।
যে দিন প্রথম চাইলে তুমি চরণ ব্রজের বক্ষে ফেলে,
শ্যাম ধরণীর অঙ্গে সে দিন শিল্প ব্যাকুল অক্ষি মেলে।

তন্বি ! তোমার জীবন-পুঁথির বয়স-পাতের রম্য ভাঁজে,
হোলির মোহন পৃষ্ঠা যে দিন খুল্লে মধুর কুঞ্জমাঝে ;
বঁধুর প্রেমের হর্ষ সে দিন ভারত-নারীর মর্ম্মে গলে,
বসন্তরাজ শিউরে উঠে নিখিল হিয়ার রন্ধ্রতলে।
বিস্ময়ে শ্যাম তরুর শিরে কুসুম চাহে ঘোম্‌টা খুলি,
রচ্‌লে একি রঙ্গময়ী, জীবন-শ্লোকের ছন্দগুলি।
কান্ত-রসানন্দে যে দিন মহারাসের মঞ্চে এলে,
মধুর প্রেমের অনন্ত রস দিতে ধরার বক্ষে ঢেলে ;
সেই মানবের পুণ্য দিনে সঙ্গীতে সব ছন্দ উঠে,
প্রেম-জগতের অন্তর-আঁখি ভাবের আলোয় উঠ্‌লো ফুটে
সে দিন সারা বিশ্ব জুড়ে বাজ্‌লো কানুর মোহন বাঁশী,
পূর্ণ চাঁদের আলোর ছটায় সপ্ত ভুবন উঠ্‌লো হাসি,
তার আগে আর রম্য প্রভাত হয়নি কো এ মর্ত্ত্য মাঝে,
তেমন শোভার পূর্ণিমা আর হয়নি কভু পুণ্য সাঁঝে ;
তার আগে আর কেউ জগতে হয়নি ছোট প্রিয়ার লাগি',
নারীর পায়ে লুটায়নি কেউ নারীর মানের ভিক্ষা মাগি' ;
সেই হতে যে নিখিল সতী পতি-সেবার ধর্ম্মে বাঁচে,
আত্ম-সমর্পণের লীলা তাদের বুকের রক্তে নাচে,
অনন্ত আজ বর্ষ পরে তেম্‌নি বহে রসের ধারা,
পূর্ণ-রসানন্দময়ী আপন রসে আত্মহারা !
স্রোতের ছলে নীল্‌ যমুনায় তোমার রসানন্দ চলে,
আজিও যে তাই বৃন্দাবনে চিত্ত প্রেমানন্দে গলে।
কাম্‌-কামনা ধ্বংসি' নরের দেহের তৃষায় শান্তি দিতে,
কানুর সনে ক'র্‌লে লীলা তত্ত্বময়ী বিশ্বহিতে ;
তোমার প্রণয়-সিন্ধুজলে অন্তরে প্রেম-অন্ধ কালা,
বন্দি চিদানন্দময়ী বৃন্দাবনানন্দ বালা !

বেদে কালের বিভাগ

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে ও শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা ঋতু সম্বন্ধীয় মাস-দিগের নাম প্রাপ্ত হই (১)। এই সকল শব্দ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায় ; এমন কি, সেই সকল স্থলে উহাদের মাস অর্থ করিলে কোন দোষ হয় না। যেমন নভঃ শব্দ আকাশ ও বর্ষা এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ঋগ্বেদে পর্জ্জন্য-দেবকে 'কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ' (২) বলা হইয়াছে। এস্থলে "বর্ষণকারী নভঃ (ঋতু) করেন" অর্থ করিলে কোনই দোষ দেখা যায় না। হেমন্তঋতুর মাসদ্বয়ের নাম সহ ও সহস্য। ঋগ্বেদে বৃহস্পতিকে সহবাহক অশ্বগণ বহন করে বলা হইয়াছে (৩)। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি হিমঋতুতে পনিদিগের নিকট হইতে অঙ্গিরাদিগের সাহায্যে সূর্য্য, উষা, গো এবং অর্ক উদ্ধার করেন। সেইজন্য হিম ঋতুতে যে যজ্ঞ হইত, তাহার দেবতা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি। শতপথ ব্রাহ্মণেও ইন্দ্র ও বৃহস্পতি হিম ঋতুর দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৪)। এই স্থলের 'সহ' শব্দ ঋতু বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে করি। ঋগ্বেদের একটী সূক্তে সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যার সহিত সোমের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। যখন সূর্য্যা পতি-গৃহে গমন করেন, তখন শুক্র নামে দুইটী বলদ তাঁহার মনোরথকে টানিয়াছিল, (৫) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাই। এই শুক্র শব্দে শুক্র ও শুচি নামক গ্রীষ্ম ঋতুর মাসদ্বয়ের উল্লেখ আছে মনে করি।

---

(১) বসন্ত ঋতুর মাসদ্বয়—মধু, মাধব (তৈঃ সং ১,৪ ১৪)
(শতপথ ৭।৪;২।২৯)

গ্রীষ্ম	„	„ —শুক্র, শুচি	(শতপথ, ৮।২।১।১৬)
বর্ষা	„	„ —নভঃ, নভস্য	(ঐ ৮,৩,২,৫)
শরৎ	„	„ —ইষ, উর্জ্জ	(ঐ ৮,৩,২,৬)
হেমন্ত	„	„ —সহ, সহস্য	(ঐ ৮,৪ ২ ১৪)
শিশির	„	„ —তপঃ, তপস্য	(ঐ ৮,৭।১;৫)

"তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১ ৪,১৪) ও বাজসনেয়ি সংহিতায় (২২,৩১) দ্বাদশ মাসের নাম আছে ; যথা,—মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভঃ, নভস্য, ইষ, উর্জ্জ, সহঃ, সহস্য, তপঃ, তপস্য। কোন্ কোন্ মাসে কোন্-কোন্ ঋতু, তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪,৪,১১) তাহার উল্লেখ আছে। যথা,—মধু-মাধব—বসন্ত, শুক্র-শুচি—গ্রীষ্ম, নভঃ নভস্য—বর্ষা, ইষ-উর্জ্জ—শরৎ, সহঃ-সহস্য—হেমন্ত, তপঃ-তপস্য—শিশির।" আচার্য্য যোগেশচন্দ্রের "আমাদের জ্যোতিষী" পৃঃ—১৫৫-৫৬।

(২) দূরাৎ সিংহস্য স্তনথা উদীরতে যৎ পর্জ্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যঃ নভঃ। ৫,৮৩৩

অর্থ :—যখন পর্জ্জন্যদেব আকাশকে বর্ষণযোগ্য করেন, (তখন) দূর হইতে সিংহের গর্জ্জন উঠে। (সায়নসম্মত অর্থ); কিম্বা—যখন পর্জ্জন্যদেব বর্ষণকারী নভ (ঋতু) করেন, (তখন) দূর হইতে সিংহের গর্জ্জন উঠে।

(৩) তং। শগ্মাসঃ। অরুষাসঃ। অশ্বা। বৃহস্পতিং।
সহবাহঃ। বহন্তি। ৭ ৯৭,৬

অর্থ :—সেই বৃহস্পতিকে বলবান্, অরুণবর্ণ, সহবাহক অশ্বগণ বহন করে।

[সায়ন 'সহবাহঃ' অর্থে 'সংহত্য বাহকাঃ' বলিয়াছেন। এইরূপ অর্থ বিশেষ সন্তোষজনক নহে—কারণ এক সঙ্গে বহন করে, বলিয়া লাভ কি ? বরং হেমন্ত ঋতু বহনকারী অশ্বগণই বৃহস্পতিকে বহন করে, বলায় বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।]

(৪) শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩,৫,৪;২৮

(৫) মনো অস্যা অন আসীৎ দৌরাসীদুতচ্ছদিঃ।
শুক্রাবনড়্বাহাবাস্তাং যদযাৎ সূর্যা গৃহম্॥

অর্থ :—তাঁহার (অর্থাৎ সূর্য্যার) মন রথ হইয়াছিল, এবং দৌ (অর্থাৎ আকাশ) উহার ছাদ হইয়াছিল ; দুইটি শুক্র বলদ হইয়াছিল, যখন সূর্য্যা (পতি) গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

সায়ন শুক্রৌ অর্থে "দীপ্তৌসূর্য্যাচন্দ্রমসাবনড়্বাহৌ" করিয়াছেন। সূর্য্যা কিন্তু সূর্য্যের কন্যা এবং চন্দ্রের স্ত্রী ; বিবাহের পর তিনি চন্দ্রের গৃহে গমন করিতেছেন। এমন স্থলে সূর্য্য এবং চন্দ্রকে বলদরূপে বর্ণনা

ইষ ও উর্জ শব্দদ্বয় সাধারণতঃ বেদে অন্ন ও বল অর্থে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। দধিক্রাবা নামে অশ্বদেবতা ইষ ও উর্জ্জ উৎপাদন করিয়াছেন, এইরূপ বর্ণিত আছে (৬)। সায়ন উহাদের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এস্থলে শরৎ ঋতুর মাসদ্বয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কালেই অশ্বমেধ যজ্ঞ হইত। এক স্থলে আমরা অশ্বিদ্বয়কে মাধ্বী বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখি (৭)। মাধ্বী অর্থে মধুদ্বয়। যে ঋতু মধু ও মাধব নামে অভিহিত, তাহার সহিত অশ্বিদ্বয়ের যোগ থাকাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহারাই রথে করিয়া মধুর আধার লইয়া জগৎ মধুময় করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

যদিও আমরা ব্রাহ্মণের কালে প্রচলিত ঋতু সম্বন্ধী মাসের নামগুলি ঋগ্বেদেও প্রাপ্ত হইলাম, তত্রাচ এই সকল নাম ঋগ্বেদের কালে যে ঐরূপ অর্থেই প্রচলিত ছিল, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। খুব সম্ভব প্রচলিত ছিল, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের যুগে বর্ষকে একটী চক্ররূপে কল্পনা করা হইত। ঐ চক্রের নাভি (অর্থাৎ কেন্দ্র) হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যে রেখা টানা হইত, তাহাকে 'অর' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। বৎসরে যতগুলি ঋতু আছে, তাহাদিগকে চক্রের অরে বিভক্ত অংশ দ্বারা দেখান হইত। যে দেশে ছয় ঋতু বর্ত্তমান, তাহা ছয়টী অরযুক্ত চক্র দ্বারা বুঝান হইত। চক্রে পাঁচটী অর থাকিলে ৫টী ঋতুযুক্ত দেশ বুঝাইত। সেইরূপ কোন দেশে তিনটী ঋতু থাকিলে, চক্রে তিনটী অর সন্নিবেশিত হইত। ঋগ্বেদে ৩, ৫, ও ৬ অরযুক্ত চক্রের উল্লেখ আছে (৮)। সে কালে ১২ মাসকে ১২টী ঋতু বলায় ১২টী অরযুক্ত

করা যে অস্বাভাবিক, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। রমেশবাবু এই জন্য উহার অর্থ দুইটী শুক্র তারা করিয়াছেন; কিন্তু ঋগ্বেদের কোন স্থলে শুক্র শব্দ দ্বারা শুক্রতারাকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এজন্য রমেশ বাবুর অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আমার অনুমান হয়, শুক্রদ্বয় অর্থে শুক্র ও শুচি মাসদ্বয়। যেমন পিতা মাতা উভয় বুঝাইতে হইলে মাতরৌ বা পিতরৌ হইতে পারে, সেইরূপ শুক্র ও শুচি বুঝাইতে 'শুক্রৌ' প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই সূক্তে সূর্য্যার মনকে রথরূপে ও আকাশকে রথের ছাদরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এস্থলে শুক্র ও শুচি ঋতু বা মাসদ্বয়কে ঐ রথের বলদ কল্পনা করিলে ভাববিরোধ না হইয়া বরং সুসঙ্গত হয়। ঋগ্বেদে উষাকে 'শুচি' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। যথা—

শুক্রা কৃষ্ণাদজনিষ্ট শ্বিতীচী? — শুক্রা স্তনুর্ভিঃ শুচয়ো রুচানাঃ। ৫.৫১.৯

অর্থ:—উষা সকল দেহ দ্বারা জ্যোতিযুক্ত, পবিত্র ও মনোহর। উষা দুই নহে বহু; কিম্বা এক বলিতে পারি। বেদে অনেক স্থলে উষাকে বহু বলা হইয়াছে।

অগ্নিকে শুক্র ও শুচি শব্দদ্বয় দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। যথা

আ। আগাৎ। শুচিঃ। শুক্রঃ। অর্থঃ। রোরুচানঃ। ৪.১.৭

শুক্র (অর্থাৎ উজ্জ্বল), শুচি (অর্থাৎ পবিত্র) স্বামী (অগ্নি) রক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছেন।

এস্থলে শুক্র ও শুচি অগ্নির বিশেষণ। অতএব দুইটী শুক্র দ্বারা অগ্নিকে বুঝাইতেছে না।

(৬) দধিক্রাব্ণঃ ইষ উর্জ্জো মহো যদ মগ্মহি মরুতাং নাম ভদ্রম্। ৪.৩৯.৪

অর্থ:—দধিক্রাবার ইষ উর্জ (এবং) মরুৎদিগের যে মহৎ কল্যাণদায়ক নাম (তাহা) মনন করি।

দধিক্রাবেষ মূর্জং স্বর্জনৎ। ৪.৪০.২

দধিক্রাবা ইষ, উর্জ (ও) স্বর্গ উৎপাদন করিয়াছেন।

(৭) উরু বাং রথঃ পরিনক্ষতি দ্যামাযৎ সমুদ্রা দভি বর্ত্ততে বাং। মধ্বা মাধ্বী মধু বাং প্রুষায়ন্ যৎ সীং বাং পৃক্ষোভুরজন্তপকাঃ॥ ৪.৪৩.৫

অর্থ:—(হে অশ্বিদ্বয়)! তোমাদিগের রথ বিস্তীর্ণ দিব্যলোকে গমন করিতেছে। সমুদ্র হইতে তোমাদিগের অভিমুখে উহা আবর্ত্তন করিতেছে। হে মধুদ্বয়! (অধ্বর্য্যুগণ) তোমাদিগকে মধুযুক্ত মধু সেচন করিতেছেন। যেন তোমাদের অন্ন সর্ব্বত্র পরিপক্ক হয়।

পৃক্ষাসো অস্মিন্ মিথুনা অধিত্রয়ো দৃতি স্তুরীয়ো মধুনো বিরপ্শতে। ৪.৪৪।১

অর্থ:—মিথুনের (অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়ের) এই স্থানে (অর্থাৎ রথে) তিন প্রকার অন্ন (রহিয়াছে)। চতুর্থ, মধুর কলস বিরাজ করিতেছে।

(৮) দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত। তস্মিন্ সাকং ত্রিশতান্ শঙ্কবোর্পিতাঃষষ্টির্ন চলাচলাসঃ॥ ১।১৬৪।৪৮

অর্থ:—দ্বাদশ প্রধি (অর্থাৎ Segments) যুক্ত এবং নাভি হইতে উৎপন্ন তিনটী (অর) যুক্ত একটী চক্রকে কে জানে? তাহাতে একত্র তিনশত ষষ্টি সংখ্যক শঙ্কুর মত চরাচর (ব্যাপিয়া) অর্পিত আছে।

[এস্থলে চক্রের পরিধি বার ভাগে বিভক্ত হইয়া বার মাস প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনটী অর দ্বারা তিন ঋতু দেখান হইয়াছে। ৩৬০ শঙ্কু অর্থাৎ গোঁজ ঐ চক্রের পরিধির উপর স্থাপন করিয়া বৎসরের দিন সকল বুঝান হইয়াছে। এই চক্র চরাচর ব্যাপিয়া অবস্থিত। যে দেশে তিন ঋতু বর্ত্তমান, তাহার কথাই এই ঋকে বলা হইয়াছে এবং ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন দেশের সন্ধান কেহ জানেন কি?]

চক্রেরও উল্লেখ দেখা যায়। চক্রের পরিধি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াও ১২ মাস দেখাইবার পদ্ধতি ছিল। পরিধির অংশকে প্রধি বলা হইত।

ঋগ্বেদের কালে দিনরাত্রিকেও ৩০ ভাগে বিভক্ত করা হইত। এই ত্রিশ ভাগের প্রত্যেক ভাগ পরে মুহূর্ত্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল (৯)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাসে ত্রিশ দিন ছিল বলিয়া, দিনকেও ৩০ ভাগে বিভাগ করিবার রীতি উৎপন্ন হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ পাঠ করিলে আমরা ২৮টী নক্ষত্রের নাম প্রাপ্ত হই (১০)। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তাহাদের নামকরণ হইয়াছে।

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্নাতস্থু র্ভুবনানিবিশ্বা।

তস্য নাক্ষ স্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনা না দেব ন শীর্যতে

স নাভিঃ॥ ১।১৬৪ ১৩

অর্থ :—পঞ্চ অরযুক্ত ঘূর্ণিত চক্রে বিশ্বভুবন অবস্থান করিতেছে। উহার অক্ষ ভূরি ভারেও নত হয় না ; নাভির সহিত (উহা) অক্ষয়, শীর্ণ হয় না।

[এই স্থলে আমরা ৫টী অরযুক্ত চক্র দ্বারা, যে দেশে ৫ ঋতু বর্ত্তমান, তাহার সন্ধান পাইতেছি। এই চক্রের অক্ষ (অর্থাৎ axle) আছে। এই অক্ষ চক্রের নাভির (অর্থাৎ Centre) মধ্য দিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অক্ষ দুইটী অচল স্থানের উপর বিধৃত না হইলে চক্র কিরূপে ঘুরিবে? ঋগ্বেদে আমরা ধ্রুবলোকের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। উহাই বিশ্বের এক অন্তে নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। আর্য্যগণ মনে করিতেন পৃথিবী বিশ্বের অপর প্রান্তে নিশ্চল রহিয়াছে। অতএব অক্ষ এই দুই স্থানে স্থাপিত আছে, আর্য্যগণ মনে করিতেন। এই বিষয়ে পরে আরো বিস্তৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।]

পঞ্চ পাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিবআহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণং।

অথে মে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়্‌রে আহু অর্পিতম্‌॥

১।১৬৪ ১২।

অর্থ :—দিব্যলোকের দূর অর্দ্ধে (অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে স্থিত). দ্বাদশ আকৃতি (অর্থাৎ মাস) যুক্ত পিতার (অর্থাৎ বৎসরের) পঞ্চ অংশকে পুরীষী কহে ; উহাদের ঊর্দ্ধ ৭ অংশকে বিচক্ষণ (বলে)। (পিতাকে) ছয় অরযুক্ত চক্রে অর্পিত বলা হইয়া থাকে।

[এ স্থানে চক্রটীতে ছয়টী অর রহিয়াছে। অতএব যে স্থানে ছয় ঋতু আছে তাহার কথা বলা হইল।]

দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।

আপুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতি

শ্চতস্থুঃ॥ ১।১৬৪।১১

অর্থ :—ঋতের (অর্থাৎ বৎসরের) দ্বাদশ অরযুক্ত চক্র দিব্যলোকের চতুর্দ্দিকে পুনঃপুনঃ চলিতেছে, তাহা জীর্ণ হইবার নহে। এই স্থানে ৭২০ অগ্নির মিথুন পুত্র (অর্থাৎ দিবা, রাত্রি) ছিল।

[এই স্থানে বার অর দ্বারা ১২ মাসকে বুঝাইতেছে। উহারা যে ১২টী ঋতু তাহাও বুঝান হইল। অগ্নির ৭২০ পুত্র এই চক্রের পরিধিতে আছে। চক্র ঘুরিতেছে বলিয়া দিবার পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবা আসিতেছে। অর্থাৎ চক্রের যে অংশে দিবা বর্ত্তমান, সেই অংশ পৃথিবীর উপরিভাগে আসিলে পৃথিবীতে দিবা হয় এবং রাত্রির ভাগ আসিলে পৃথিবীতে রাত্রি হয়, এইরূপ কল্পনা করা হইত। সেইরূপ ঋতুগণ নাভি হইতে উৎপন্ন অরদিগের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া পৃথিবীতে ঋতু দেখিতে পাওয়া যায়।

(৯) ত্রিংশৎ। ধাম। রাজতি। বাক্‌। পতঙ্গায়। ধীয়তে।

প্রতি। বস্তোঃ। অহ। দ্যুভিঃ॥ ১০।১৮৯।৩

(ঋগ্বেদ); ৬.৩১.৩ (অথর্ব্ববেদ)

প্রত্যহ দিবারাত্রির ত্রিশটী স্থান (অর্থাৎ মুহূর্ত্ত) দীপ্তি সকলের দ্বারা বিরাজ করিতেছে। বাক্য, পতনশীলের নিমিত্ত (অর্থাৎ সূর্য্যের নিমিত্ত) (উহাদিগকে) ধারণ করেন, বা ধ্যান করেন।

[প্রত্যেক দিনের ত্রিশ ধাম বাক্য ধারণ করেন। কারণ সময়ের জ্ঞান বাক্য দ্বারাও হইতে পারে। কতগুলি স্তোত্র পাঠ করিলে দিন-রাত্রি শেষ হয়, সম্ভবতঃ তাহা অবধারিত হইয়াছিল। এইরূপে সেকালে স্তোত্র-পাঠ দ্বারা সময় নির্দ্ধারিত হইত বলিয়া অনুমান করি।] কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে মুহূর্ত্ত শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

15 Muhurtas are equal to one day or one night. Kautailla's Arthasastra, p. 133.

Translated by R. Shama Sastry.

(১০) সুহবমগ্নে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্ত ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।

পুনর্বসূ সূনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘা মে॥ অথর্ব্ব,১৯।৭ ২

হে অগ্নি! কৃত্তিকা ও রোহিণী শোভন হবিযুক্ত হউন ; মৃগশিরা মঙ্গলকর (হউন)। আর্দ্রা সুখকর (হউন) ; পুনর্বসূ প্রিয়-সত্য বাক্য-যুক্ত (হউন) ; পুষ্য চারু বা শ্রেয়ঃপ্রদ (হউন) ; অশ্লেষা দীপ্তিযুক্ত (হউন) ; মঘা আমার অয়ন (হউন)।

পুণ্যং পূর্বা ফল্গুন্যৌ চাত্র হস্ত শ্চিত্রা শিবা স্বাতি সুখো মে অস্তু।

রাধে বিশাখে সুহবা নুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্র মরিষ্ট মূলম্‌॥ ঐ।৩

এখানে পূর্ব্বফল্গুনীদ্বয়, হস্ত, মঙ্গলকারিণী চিত্রা ও স্বাতী আমার সুখকর হউন। রাধা সংজ্ঞক বিশাখা, সুন্দর আহ্বানযুক্ত অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, অরিষ্ট নিদান মূল সংজ্ঞক শোভন নক্ষত্র (আমার শ্রেয়ঃপ্রদ হউন)।

অন্নং পূর্বা রাসতাং মে আষাঢ়া উর্জং দেব্যুত্তরা আ বহন্তু।

অভিজিন্মে রাসতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্‌॥ ঐ ৪

পূর্ব্বাষাঢ়া আমার অন্ন প্রদান করুন। উত্তরাষাঢ়া দেবী বলকর

ব্রাহ্মণের কালে ২৮টী নক্ষত্রের পরিবর্ত্তে ২৭টী নক্ষত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার কারণ কি? চন্দ্র ২৭·২৩ দিনে একবার নক্ষত্র-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। প্রথমে ঐ সময় ২৮ দিন মনে করায়, নক্ষত্রমণ্ডলকে ২৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়; পরে উহা ২৭ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালেও ২৭ নক্ষত্র লইয়া রাশিচক্র গঠিত। অথর্ব্ববেদের অভিজিৎ নক্ষত্র ব্রাহ্মণের কাল হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। চন্দ্র যে এই সকল নক্ষত্রের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ অথর্ব্ববেদে রহিয়াছে (১১)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৪।১০) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৫।১) নক্ষত্র সমূহের (২৭টির) নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় চন্দ্র নক্ষত্রদিগের নিকটে আছে ও তাহার গতি আছে (১২)। অনুমান করি, ঋগ্বেদের কালেই নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্রের ভ্রমণ পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। এই কালে সমস্ত নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছিল কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে অথর্ব্ববেদের নাক্ষত্রিক নাম অবগত হইয়া ঋগ্বেদ অন্বেষণ করিলে উহাদের কতকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ঋক্ উদ্ধার করিয়া কতকগুলি নাম দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঋগ্বেদে রেবতী নাম প্রাপ্ত হই। সায়ন ইহার 'ধনবতী' অর্থ করিয়াছেন। পুনর্ব্বসু শব্দও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু উহা অগ্নি ও সোমের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (১৩)। অঘা ও অর্জুনী এই দুই শব্দ একটী ঋকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১৪)। সায়ন 'অঘা' অর্থে মঘা এবং 'অর্জুন্যোঃ' অর্থে ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের অপর কোন স্থলে এই নামে নক্ষত্রগুলির উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। তবে হননশীল অর্থে অঘা শব্দ এবং শুভ্রবর্ণ অর্থে অর্জুনী শব্দ ঋগ্বেদে বর্ত্তমান (১৫)। ঋগ্বেদে মঘা শব্দও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইন্দ্রের একটী

অন্ন (আমার দিকে) বহন করুন। অভিজিৎ আমায় পুণ্য প্রদান করুন। শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠা (অর্থাৎ ধনিষ্ঠা) সুন্দর পোষণ করুন।

আ মে মহচ্ছতভিষগ্ বরীয় আ মে দ্বয়া প্রোষ্ঠ পদা সুশর্ম্ম।

আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগং ম আমে রয়িং ভরণ্য আ বহন্তু। ঐ।৫

মহৎ শতভিষক্ শ্রেষ্ঠ (ফলদান করুন); দ্বিপ্রকার প্রোষ্ঠপদ (অর্থাৎ পূর্ব্ব ভাদ্রপদ ও উত্তর ভাদ্রপদ) আমায় সুন্দর গৃহ (দান করুন)। রেবতী ও অশ্বযুগ্দ্বয় ভাগ্য (দান করুন); ভরণ্য তাহাদিগকে (অর্থাৎ ধনদিগকে) বহন করিয়া আসুন।

(১১) যানি নক্ষত্রাণি দিব্যন্তরিক্ষে অপ্সু ভূমৌ যানি নগেষু দিক্ষু।
প্রকল্পয়ং শ্চন্দ্রমা যান্যেতি সর্ব্বানি মমৈতানি শিবানি সন্তু॥

অথর্ব্ববেদ ১৯৮।১

যে সকল নক্ষত্র দিব্যলোকে, অন্তরীক্ষে, জলের স্থানে, যাহারা নগ সকলের দিকে, যাহাদিগের মধ্যে চন্দ্রমা প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন, এই সকল আমার মঙ্গল করুন।

অষ্টা বিংশানি শিবানি শাগ্মানি সহ যোগং ভজন্তু মে। ঐ।২

২৮টী মঙ্গলকর সুপ্রদানকারী (নক্ষত্র) আমার জন্য একমত হউন।

(১২) চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি। ঋগ্বেদ, ১।১০৫।১

দিব্যলোকে সুন্দর রশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা, জল সকলের মধ্যে দ্রুত গমন করিতেছেন।

অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ। ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২

আরো এই সকল নক্ষত্রদিগের সমীপে সোম রক্ষিত আছেন।

(১৩) স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি। ৫।৫১।১৪

অর্থ:—হে মিত্রে বরুণ! মঙ্গল করুন। হে পথস্থিত রেবতি! মঙ্গল করুন!

[রেবতীকে পথস্থিত বলা হইয়াছে। ইহা কোন পথ? আমার মনে হয় আকাশে যে পথে চন্দ্র, সূর্য্য ভ্রমণ করেন, ইহা সেই পথ। অতএব রেবতী নক্ষত্রকেই বুঝাইতেছে।]

অস্মান্ সিসক্ত রেবতি। অগ্নি সোমা পুনর্বসূ অস্মে ধারয়তাং রয়িং॥ ১০।১৯।১

হে রেবতি! আমাদিগকে ধন দাও। হে পুনর্বসূ অগ্নি ও সোম! আমাদিগকে ধন ধারণ কর।

[সায়ন পুনর্বসূ অর্থে 'পুনঃ পুনঃ আচ্ছাদনকারী' করিয়াছেন।]

(১৪) অঘাসু হন্যন্তে গাবো র্জুন্যো পর্য্যুহ্যতে। ১০।৮৫।১৩

সায়ন-সম্মত অর্থ:—মঘা নক্ষত্রে গো সকলকে তাড়াইয়া লইতেছে; ফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ের দিকে বহন করিতেছে।

কথায় কথায় অর্থ:—অঘা সকলে গো সকলকে হনন করিতেছে, অর্জুনীদ্বয়ের দিকে বহন করিতেছে।

[সূর্য্যার বিবাহে সূর্য্য উপঢৌকন স্বরূপ গোধন পাঠাইতেছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য এই বর্ণনা।]

(১৫) ইন্দ্রাগ্নী। তপন্তি। মা। অঘাঃ। অর্য্যঃ। অরাতয়ঃ। ৬।৫৯।৮

অর্থ:—হে ইন্দ্র ও অগ্নি! হননকারী, আক্রমণকারী অরাতিসকল আমাকে তাপ দিতেছে।

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।

উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যাস্পরি॥ ১।৪৯।৩

অর্থ:—হে শুভ্রবর্ণা উষা! পক্ষযুক্ত পক্ষীসকল, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল তোমার। (তোমার) পশ্চাৎ ঋতুদিগকে দেবলোকের অন্ত হইতে উপরে প্রেরণ করা হয়।

প্রসিদ্ধ নাম মঘবান্ (১৬)। মঘ অর্থে ধন। মঘ শব্দের বহুবচনে মঘা বা মঘানি। অথর্ব্ববেদে মঘা নামেই নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। কারণ ৫টী তারাতে মঘা নক্ষত্র শালাকার বা লাঙ্গলাকারে অবস্থিত (১৭)। বৈদিক যুগে এই নক্ষত্রের মঘা নাম দেওয়া হইল কেন? অথর্ব্ববেদে ইহাকে 'অয়ন'ও বলা হইয়াছে। অতএব এই নক্ষত্রই ইন্দ্রের নক্ষত্র এবং সূর্য্য এই স্থানে আসিলেই অথর্ব্ববেদের যুগে দক্ষিণায়ন ও বর্ষা আরম্ভ হইত বলিয়া মনে করি; কারণ ইন্দ্রই বর্ষার দেবতা (১৮)। মঘায় দক্ষিণায়ন হইলে রোহিণীতে বিষুবন্ থাকিত। এই ঘটনা খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ বৎসরে হইয়াছিল (১৯)। অতএব অথর্ব্ববেদে নক্ষত্রদিগের নামকরণের কাল ৩০০০ খৃঃ পূর্ব্বে ছিল বলিয়া অনুমান করি।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে চিত্রা শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নে একটী ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে।

অবিড্ডি। ইন্দ্র। চিত্রয়া। নঃ। উতী ২।১৭।৮
অর্থঃ—হে ইন্দ্র! আমাদিগকে চিত্রা দ্বারা রক্ষা কর। সায়ন বলেন যে উতী শব্দ উত্যা হইবে এবং চিত্রয়া শব্দ উত্যার বিশেষণ হইবে। তাহা হইলে 'চিত্রয়া' অর্থে বিচিত্র বা নানাবিধ হইবে।

আর একটী ঋকে চিত্র অর্কের উল্লেখ আছে। সেখানেও ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইতেছে (২০)।

দেখা যাইতেছে যে, কোন-কোন নক্ষত্রের নামকরণ ঋগ্বেদের কালেই হইয়াছে। রাশিচক্রের অন্তর্গত নক্ষত্র ভিন্ন অপর কতকগুলি নক্ষত্রের নামও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ধ্রুব নাম ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। ইহা বরুণের আলয় (২১)। সপ্তর্ষিমণ্ডলেরও উল্লেখ আছে (২২)। সরমা ও শ্বা এই দুই তারার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঋগ্বেদের অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র সরমা নামে দিব্যলোকের কুকুরীকে পণিদিগের দ্বারা অপহৃত উষা, সূর্য্য, গো ও অর্কের সন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিলেন (২৩)। এই কার্য্যে সিদ্ধ হওয়ায় সরমা ও তাহার পুত্র যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুত্রের নাম শ্বা (২৪)। অতএব সরমা ও শ্বা এই দুইটাকে দিব্যলোকের কুকুর বলা যাইতে

---

(১৬) এব। হি। ত্বাং। ঋতুথা। যাতয়ন্তং। মঘা। বিপ্রেভ্যঃ দদতং। শৃণোমি। ৫।৩৩।১২

অর্থ:—এই প্রকারে তোমাকে ঋতুক্রমে (হে ইন্দ্র!) বিপ্রদিগকে ধন প্রেরণকারী ও দানকারী বলিয়া শ্রবণ করি।

[মঘা মঘানি ধনানি ইতি সায়ন।]

যঃ। ইথা। মঘবন্। অনু। জোষং। বক্ষঃ। ৫।৩৩।২

অর্থ:—হে মঘবন্! যে (তুমি) এইরূপে প্রীতি বহন কর।

(১৭) আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" ৪৩৫ পৃঃ।

(১৮) বৃষা। ত্বা। বৃষণং বর্ধতু। দ্যৌঃ। বৃষা। বৃষভ্যাং। বহসে হরিভ্যাম্।

সঃ। নঃ। বৃষা। বৃষরথঃ। সুশিপ্র। বৃষক্রতো। বৃষা। বজ্রিন্। ভরে। ধাঃ। ৫।৩৬।৫

অর্থ:—(হে ইন্দ্র!) বর্ষণকারিণী দ্যৌ তোমাকে বর্ষণক্ষম করিয়া বৃদ্ধি করুন; বর্ষক (তুমি) বৃষ (অর্থাৎ পুং) অশ্বদ্বয় দ্বারা বাহিত হও। তিনি বর্ষক বৃষরথযুক্ত; হে সুশিপ্র, বজ্রবান্! আমাদিগকে বর্ষক, বর্ষণকর্ম্মা তুমি যুদ্ধে ধারণ কর (অর্থাৎ রক্ষা কর)।

(১৯) আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" ১ পৃঃ।

(২০) ন ঋতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিং চ নারে মহামর্কং মঘবঞ্চিত্রমর্চ। ১।১১২।৯

হে মঘবন্! তোমাকে দূরে রাখিয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। মহৎ চিত্র অর্ক পূজা কর।

(২১) যস্য শ্বেতা বিচক্ষণা তিস্রো ভূমিরধিক্ষিতঃ।
ত্রিরুত্তরাণি পপ্রতু র্বরুণস্য ধ্রুবং সদঃ
স সপ্তানা মিরজ্যতি ... ...॥ ৮।৪১।৯

অর্থ:—যাঁহার শ্বেতবর্ণ জ্যোতিঃ সমূহ অন্তরীক্ষের তিন ভূমি, তিন ঊর্দ্ধস্থিত (দিব্যলোক) পূর্ণ করিয়াছে, সেই বরুণের লোক ধ্রুব (বা অচল)। তিনি সপ্তলোকের ঈশ্বর।

(২২) তেষা মিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্ত ঋষীন্ পর একমাহুঃ। ১০।৮২।২

অর্থ:—যেখানে সপ্তঋষিগণ তাঁহাদের ইষ্ট সকল ভোগ করিয়া আনন্দিত রহিয়াছেন, তাহারও ঊর্দ্ধে 'এক' কে বলে।

(২৩) ঋতস্য। পথা। সরমা। বিদৎ। গাঃ। ৫।৪৫।৮

অর্থ:—সরমা ঋতের পথদ্বারা গো সকল জানিয়াছিল।

ইন্দ্রস্য। অঙ্গিরসাং। চ। ইষ্টৌ। বিদৎ। সরমা। তনয়ায়। ধাসিং। ১।৬২।৩

অর্থ:—ইন্দ্রের ও অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে সরমা পুত্রের জন্য অন্ন পাইয়াছিল।

(২৪) শ্বানং। বস্তঃ। বোধয়িতারং। অব্রবীৎ। সংবৎসরে। ইদং। অদ্য। বি। অখ্যত। ১।১৬১।১৩

পারে। ইংরাজীতে Procyon ও Sirius নামে যে দুই নক্ষত্র আছে, মনে হয় শ্বন্ ও সরমা এই দুই নক্ষত্র। Siriusকে Alpha Canis Major বলা হয়। Sirius তারার আধুনিক সংস্কৃত নাম মৃগব্যাধ, লুব্ধক। এই তারা-দ্বয় মিথুনরাশিস্থ। ঋগ্বেদে কিম্বদন্তীরূপে এই গো-অন্বেষণ ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। দিব্যলোকে যেমন কুকুর আছে, সেইরূপ দিব্যলোকে বরাহের উল্লেখও ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হই। রুদ্রদেবকে দিব্যলোকের বরাহ বলা হইয়াছে (২৫)।

আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায়, বৈদিক ঋষি উহাকে সিন্ধু নাম দিয়াছেন ; স্বর্গে ৭টী নদী আছে, এইরূপ উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় (২৬)। ইহাদিগের সাহায্যে আর্য্যগণ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণের পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গতির ব্যাখ্যা করিতেন। আমরা নক্ষত্রদিগকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকেই গমন করিতে দেখি। এই গতির ব্যাখ্যায় ঋত চক্রের কল্পনা করা হইয়াছিল। ঋত চক্রের বিপরীত দিকে গমন—অত্যন্ত বলবান, শ্রেষ্ঠ দেবতা ভিন্ন অপর কাহারও সাধ্য ছিল না (২৭)। কিন্তু শ্রেষ্ঠ দেবতারাও এই ৭টী নদীর সাহায্যেই পরিভ্রমণ করিতেন এইরূপ কল্পনা করা হইত বলিয়াই মনে হয় (২৮)। যে সকল দেবতা এইরূপে ভ্রমণ করিতে পারেন, তাঁহাদের বিষয় ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা নিমেষশূন্য, অমর, পূজনীয় ও জ্যোতির্ম্ময় রথযুক্ত (২৯)। এই বর্ণনা দ্বারা গ্রহদিগের কথাই বুঝায়। চন্দ্র, সূর্য্য ভিন্ন মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিগ্রহ প্রাচীন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের উল্লেখ আছে। ঋষিগণ বুধকে পুষা এবং শুক্রকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়াছিলেন। এ কথা পরে ঋক্ উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিব। সম্ভবতঃ মঙ্গলগ্রহই মরুৎগণের আবাসস্থান। কিন্তু শনিগ্রহকে কি নামে আর্য্যগণ ডাকিতেন তাহা স্থির করিতে পারি নাই।

বস্ত বলিয়াছিলেন যাকে জ্ঞানদাতা (অর্থাৎ বৎসর পূর্ণ হইল এই জ্ঞান) বলিয়া জানিও ; অদ্য সংবৎসর পূর্ণ হইয়াছে, ইহাকে (অর্থাৎ জগৎকে) বিশেষরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

(২৫) দিবঃ। বরাহং। অরুষং। কপর্দিনং। ত্বেষং। রূপং। নমসা। নিহ্বয়ামহে। ১।১১৪।৫

অর্থ :—দিব্যলোকের অরুষ (অর্থাৎ অরুণবর্ণ), জটাযুক্ত, তেজোময় রূপযুক্ত বরাহকে নমস্কার দ্বারা সর্ব্বদা আহ্বান করি।

(২৬) সু+আধ্যঃ। দিবঃ। আ। সপ্ত। যহ্বীঃ। রায়ঃ। দুরঃ। বি। ঋতজ্ঞাঃ। অজানন্। ১।৭২।৮

অর্থ :—শোভন কর্ম্মযুক্তা, দিব্যলোকের ৭টী মহতী (নদী) আসিয়াছেন ; যজ্ঞ জ্ঞান-সম্পন্নগণ ধনের দ্বারা বিশেষরূপে জানিয়াছেন।

অস্মৈ। আপঃ। মাতরঃ। সপ্ত। তস্থুঃ। নৃভ্যঃ। তরায়। সিন্ধবঃ। সুপারাঃ ৮।৯৬।১

সাতজন জল মাতা ইহার নিমিত্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রের নিমিত্ত) ছিলেন ; সুখে পারকারিণী সিন্ধু সকল নেতাদিগের উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত।

অবর্ধয়ন্। সুভগং। সপ্ত। যহ্বীঃ। শ্বেতং। জজ্ঞানং। অরুষং মহিত্বা। ৩।১।৪

অর্থ :—সাতটী মহতী (নদী) শুভ্রবর্ণ, অরুষ (অর্থাৎ ঈষৎ অরুণ বর্ণ, অতএব সুন্দর), জাত সুভগকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) মহত্ত্ব দ্বারা বর্দ্ধিত করেন।

(২৭) কিং। ইচ্ছন্তী। সরমা। প্র। ইদং। আনট্। দূরে। হি। অধ্বা। জগুরিঃ। পরাচৈঃ। ১০।১০৮।১

অর্থ :—সরমা কি প্রার্থনা করিয়া এখানে আসিয়াছ? পরাঙ্মুখে গমন করিতে পারা যায় না যে পথ তাহা এইস্থান হইতে দূরে রহিয়াছে। [ইন্দ্রের দূতী সরমা যখন গো অন্বেষণে স্বর্গীয় সপ্ত নদী পারে পণিদিগের দেশে আসিয়াছিল, তখন পণিগণ এই কথা বলিয়াছিল। কারণ সূর্য্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের মধ্যগত পথে কেবল শ্রেষ্ঠ দেবগণই যাতায়াত করিতে পারেন। সরমা কিরূপে আসিল, ইহাতে পণিগণ বিস্মিত হইয়াছিল।]

(২৮) আ। সূর্যঃ। অরুহৎ। শুক্রং। অর্ণঃ। অযুক্ত। যৎ। হরিতঃ। বীতপৃষ্ঠাঃ।
উদ্না। ন। নাবং। অনয়ন্ত। ধীরাঃ। আশৃন্বতীঃ। আপঃ। অর্বাক্। অতিষ্ঠন্। ৫।৪৫।১০

অর্থ :—সূর্য্য কমনীয় পৃষ্ঠযুক্ত অশ্বদিগকে যোজন করিয়া শুভ্র উদকে আরোহণ করিয়াছেন। ধীরগণ (অর্থাৎ দেবগণ) উদকে নৌকার মত আনয়ন করিতেছেন। (তাহা) শ্রবণ করিয়া বারিসমূহ নিম্নমুখ হইয়াছে।

(২৯) নৃচক্ষসঃ। অনিমিষন্তঃ। অর্হণা। বৃহৎ। দেবাসঃ। অমৃতত্বং। আনশুঃ।
জ্যোতিঃ রথাঃ। অহিমায়াঃ। অনাগসঃ। দিবঃ। বর্ষ্মাণং। বসতে। স্বস্তয়ে। ১০।৬৩।৪

অর্থ :—দেবতাদিগের দ্রষ্টা, নিমেষশূন্য, পূজনীয়, মহৎ দেবগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময় রথযুক্ত, অহিমায়াযুক্ত (অর্থাৎ শত্রুর দ্বারা অবধ্য হইতে পারা যে জ্ঞানে এরূপ জ্ঞানযুক্ত), পাপরহিত দিব্যলোকের উচ্চস্থানে সকলের মঙ্গলের জন্য বাস করেন।
[সাধারণ নক্ষত্রগণ নিমেষযুক্ত অর্থাৎ twinkling। মহৎ দেবতাগণ নিমেষবিহীন এবং জ্যোতির্ম্ময় রথযুক্ত, অতএব ভ্রমণশীল।]

মহানিশা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫১

মানুষ মনে-মনে যত বড়-বড় সঙ্কল্পই করুক—তাহা থাকে না। প্রতিজ্ঞা করা শক্ত নয়, রক্ষা করাই কঠিন। নির্ম্মল যে স্থির করিয়াছিল, আর সে রেঙ্গুনে সেই বাড়ীতে ফিরিবে না, সে সঙ্কল্প সে রাখিতে পারিল না। ব্রজ তাহাকে ছাড়িল না; এবং ব্রজর অনুরোধ এড়ান তাহার পক্ষে একটুও সহজ নয়।

যখন বাড়ী ফিরিল, তখন কাজে-কাজেই কাজ-কর্ম্ম সব আপনা হইতেই তাহার হাতে উঠিয়া বসিল! তাহারা যে এতদিন এই জন্যই হাঁ করিয়া তাহার পথ চাহিতেছিল,—না উঠিয়া করে কি? তখন নির্ম্মলই বা আর কি করিবে? যথাপূর্ব্ব আফিসে বসিয়া হিসাব দেখিতে, কেরাণীদের কাজ লইতে, অংশীদারদের সহিত পরামর্শ আঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। না করিলেই বা দিন কাটে কিরূপে? যদি প্রিয়জন হারাইয়া এ পৃথিবীতে আবার স্থায়ী হইতে চাও, তবে যত পারো, নিজেকে খাটাইও; তিলমাত্র বিশ্রাম লইও না, অতীতের পানে চাহিয়া দেখিও না, ভবিষ্যৎকে কাছে ঘেঁষিতে দিও না। কেবল হাড় ভাঙ্গিয়া কাজ কর, একটুখানি ভুলিবে। আর যদি ইহার সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইতে পার, হারান ধনটিকে তাঁহাতেই সমর্পণ করিতে পার, অনেকখানি শান্তি পাইবে। ইহা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই।

নির্ম্মল ব্রজর সহিত পূর্ব্বে কখনও মুখ তুলিয়া কথা কহে নাই, এখন কহে। কহে যে,—নির্ম্মলের সাহস বৃদ্ধি তার কারণ নয়; ব্রজর পরিবর্ত্তনই ইহার মূল। ধীরার প্রতি অবিচারের খেদটা সে তাহার স্বামীর উপর দিয়া মিটাইতেছিল। ধীরা যে এই স্বামীকেই সুখী করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, এ কথা সে নির্ম্মলের নিকটই শুনিয়াছিল।

একদিন দু'জনে অনেক তর্ক হইল। নির্ম্মল ধীরার সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া এক অংশে ধীরার জন্য কোন স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপন করিতে, এবং অপরার্দ্ধ যাহাদের বিষয় তাহাদেরই ফিরাইয়া দিতে চাহিল। সে জানিত, ব্রজ এই সম্পত্তি দানটাকে এক সময় বড় কঠিন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। তাহার যখন আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, তখন কেন সে অপরের ন্যায্য পাওনা কাড়িয়া লইবে, লইয়াই বা তাহার লাভ কি?

কিন্তু ব্রজ এ কথায় কর্ণপাত করিল না। অনেক ক্ষণ বাদানুবাদের পর সহসা সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"তোমার দরকার না থাকে,—তুমি বিলিয়ে দাওগে, লুটিয়ে দাওগে, রাস্তায় ছড়িয়ে দাওগে! আমি কেন আমাদের দান করা জিনিষ ফিরিয়ে নিয়ে দত্তাপহারী হব? বাবা যখন দিয়েছিলেন, তখন আমি অবশ্য সুখী হইনি। কিন্তু যখন দেওয়া হয়ে গ্যাছে,—তিনি বর্ত্তমান নেই, তখন তাঁর দেওয়া জিনিষ ফিরিয়ে নেওয়ার আমার কিসের অধিকার?"

তার পর কিছু ঠাণ্ডা হইয়া বলিল—"এত তাড়াতাড়ি কেন? তুমি এই ছেলেমানুষ; সাম্‌নে চিরজীবন পড়ে আছে; ব্যস্ত হবার দরকার নেই। স্রোতের মুখে সব ফেলে দিয়ে বসে-বসে দেখ, কোথায় কি নিয়ে যায়!

ব্রজ কি আজকাল অদৃষ্টবাদী হইয়াছে না কি? নিজের জীবনেরই দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তা' হওয়া কিছু বিচিত্রও নয়।

যতীশ্বর মধ্যে আর একবার আসিয়াছিল। নির্ম্মলকে একবার দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সে অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

এবার সে ব্রজর সঙ্গে একত্রে পরামর্শ আঁটিয়া মাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। পিসিমা আসিয়া ভাইপোর ঐশ্বর্য্যে বিস্ময়ানন্দ এবং শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তার পর মাথার দিব্য দিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনেক অশ্রুজলও অবশ্য বর্ষিত

হইল। অগত্যা আর কোন আপত্তিই টিঁকিল না। প্রধান আপত্তি ব্রজ নিজেই কাটাইয়া রাখিয়াছিল। সে বলিল, "তোমায় দু'মাসের ছুটী দিচ্চি; সেই পর্য্যন্ত যেমন করে হয়, আমি তোমার কাজ চালাবো; কিন্তু তার চাইতে বেশি দেরি না হয়। তা'হ'লে পেরে উঠ্‌বো না।"

ব্রজ নিজের জীবন-যাত্রার অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া তুলিয়াছিল। নির্ম্মলও তাহা জানিত। এখন সে ইচ্ছা করিলে, নির্ম্মলের সাহায্যে ব্যতিরেকে, অনায়াসেই আফিস চালাইতে পারে। পারিবে না কেন? সেও ত অক্ষম, অথবা মূর্খ নয়।

নির্ম্মল তাহার কারবারের অংশ ব্রজকে বেচিয়া ফেলিতে চাহিল। ইচ্ছা, যখন যাইতেছে, তখন আর এখানে ফিরিবে না।

ব্রজ এ প্রসঙ্গে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, তাহার পৃষ্ঠের পরিবর্ত্তে টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, কহিয়া উঠিল—"তুমি মহাপাষণ্ড, নির্ম্মল! তুমি এর মধ্যেই ভুলে গেছ,—বাবা তাঁর বিষয়-কারবার সম্বন্ধে আমার চেয়েও তোমাকে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন! তা' তুমি ভুলে যেতে পার; কিন্তু আমার সেটা বড় মর্ম্মান্তিক হয়েছিল কি না,—আমি তাই ভুলিনি!"

নির্ম্মল এখন বুঝিল, তাহার হাত-পা এ বাড়ীর সঙ্গে চিরকালের মতই বাঁধা—উদ্ধারের উপায় নাই। যাত্রা-কালে অতীত স্মৃতির সহস্র বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালায় জ্বলিয়া, সে বাষ্প-পরিপূর্ণ সজল মেঘের মত স্তম্ভিত হৃদয় লইয়া কোন মতে সবার কাছে বিদায় লইল। ব্রজ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল। তার পর উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—"প্রিয়, প্রিয়, শুনে যাও।"

প্রিয়ম্বদা লজ্জায় জড়সড় হইয়া দেখা দিল। না আসিলে রক্ষা নাই, সে তাহা জানিত।

ব্রজ কহিল—"তোমার ঠাকুরজামাই দেশে যাচ্চেন। তোমার জন্য সেখান থেকে কিছু আন্‌তে হয় ত' ওঁকে বলে দাও না।"

প্রিয় নির্ম্মলকে বড় আপনার বলিয়া জানিত। তাহাদের দরিদ্রাবস্থায় নির্ম্মলের কাছে তাহারা বড় সহানুভূতি পাইয়াছিল। এখনও তাহাদের বাড়ীর সবাইকারই কেমন একটা ধারণা যে, তাহাদের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের মূলে নির্ম্মলের হাত আছে। সে ছলছল-নেত্রে নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিতেই, নির্ম্মল তাহাকে নমস্কার করিল। সম্বন্ধে সে এখন নির্ম্মলের মাননীয়া।

প্রিয় লজ্জায় ব্রজর দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি করিলে, ব্রজ তাহাকে কি এক ইঙ্গিত করিল। প্রিয় নতমুখে তখন বলিল—"দেশে যাচ্চেন, আমায় কি এনে দেবেন বলুন?"

নির্ম্মল ক্ষীণভাবে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই বল?"

"আমার ঠাকুরঝি নেই,—আবার আমায় একটি ঠাকুরঝি এনে দেবেন। একা-একা আমার বড় কষ্ট হয়,—" বলিতে-বলিতে সত্য-সত্যই তাহার দু'টি চোখ ছলছলিয়া আসিল। ধীরাকে না দেখিয়াও তাহার জন্য তাহার মনে বড় অভাব বোধ হইয়াছিল।

এমন সময় ব্রজও তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া অনুরোধের স্বরে কহিল,—"যথার্থ নির্ম্মল! যদি আমার উপরে তোমার কিছুমাত্র ভালবাসা থাকে ভাই, তা'হ'লে আমাদের এই অনুরোধটি তোমায় রাখতেই হবে। আমার বোন অকালে চলে গ্যাছে—আমায় আর একটি বোন এনে দাও। আমি ধীরাকে কখন যত্ন-আদর করিনি,—এবার তাকে করবো।"

তখন আবার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। ব্রজ কাঁদিল, প্রিয়ম্বদা কাঁদিল, নির্ম্মল কাঁদিতে-কাঁদিতে বিদায় লইল।

৫২

মেয়েমানুষে কথা চাপিতে পারে না। নির্ম্মলের পিসিমাও ত মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু ন'ন; তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের আয়ত্ত দেখিয়াই তাঁহার আগমনের আসল উদ্দেশ্যটি জ্ঞাপন করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটি অনূঢ়া, বয়স্থা কন্যার সংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, —"আমাদের বামুন-কায়েতের ঘরে বড় মেয়ে, ভাল মেয়ের ভাবনা কি? এখন এদের মধ্যে যাকে তোর পছন্দ, নিজে চোখে দেখে বিয়ে কর। তোর কিসের বয়েস—" ইত্যাদি।

নির্ম্মল প্রথমে চুপ করিয়া রহিল। তার পর চুপ করাতেও একটা উল্টো উৎপত্তি হয় দেখিয়া, অগত্যা পিসিমার সহিত তর্ক করিতে বসিল। তর্ক করিতে গিয়া দেখিল, সেখানেও সে দুর্ব্বল। কলেজে পাশ্চাত্য ন্যায় তাহার পাঠ্য থাকিলেও, সে তর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে

পারে নাই। তা'ছাড়া, মা-পিসিমাদের সহিত যথাশাস্ত্র তর্ক করাও চলে না। তখন সব দিকে হাল ছাড়িয়া দিয়া, সে আবার চুপ করিয়াই শুনিতে লাগিল।

পিসিমা অনেক বড়-বড় যুক্তি দেখাইলেন। নির্ম্মলের শ্বশুরের উইলের খবর শুনিয়া আসিয়াছিলেন,—তাহাকেই একটা বড় নজীর করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোর শ্বশুর যে তোর এতটা করলে, তাঁর কথাটাও ত তোর রাখতে হয়? তিনি উইলে লিখে গেছেন যে, যদি তাঁর মেয়ে মারা যায় ত তার সমস্ত সম্পত্তি তার স্বামীকে অর্শাবে, এতে কেউ কোন আপত্তি তুলতে পারবে না।" আরও শুনলুম, লিখে গেছেন যে, 'তাঁর মেয়ে যদি অল্প বয়সে মারা যায়, তা'হলে জামাই আবার যেন বিয়ে করেন—তাঁর এই অনুরোধ। শুধু বিয়ে করা নয়, তাঁর জামায়ের দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁর কন্যার মত তাঁর বাড়ীতে ইচ্ছা হলে বাস করতেও পাবে। তার গর্ভের ছেলেরা—তাঁর নিজের দৌহিত্র না জন্মালে—তাঁর ত্রিরাত্রির অশৌচাধিকারী হবে।' তা নিমু, যাই হোক বাবা, এমন শ্বশুর কেউ কখন পায়নি। তা, এ শ্বশুরের অনুরোধ বলো, আর আদেশই বলো—এ তোমার ঠেল্‌লে পরে মহাপাতক হবে।"

নির্ম্মল আর একবার পিসিমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। শ্বশুর যে কারণে এইরূপে নিজের জলগণ্ডুষের একটি কণা বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহার সে নিদারুণ আতঙ্ক কার্য্যে পরিণত হয় নাই,—ব্রজ স্বজাতি-কন্যা বিবাহ করিয়াছে। উক্ত কন্যার গর্ভজ পুত্র পিতৃপুরুষের যথার্থ পিণ্ডাধিকারী হইতে পারিবে। আর এখন তাঁর দৌহিত্র পাতানর প্রয়োজন হইবে না।—কিন্তু পিসিমা কিছুতেই কিছু বুঝিলেন না। শেষে নিজের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার দাদা থাকিলে, বউ থাকিলে কি হইত, এ প্রশ্ন তুলিলেন। তখন অগত্যা হার মানিয়া, নির্ম্মল রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

কিন্তু চারিদিকই যখন শত্রুবেষ্টিত, তখন সে পলাইবেই বা কোথায়? উপরে গিয়া ডেক-চেয়ারে বসিয়া অনন্ত-বিস্তার জলরাশির পানে চাহিয়া-চাহিয়া সে ধীরার কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে-ভাবিতে মনে পড়িয়া গেল, ধীরার দৃষ্টিহীন চোখ-দু'টি ঠিক যেন এমনি গভীর নীল, এমনি রহস্যময়, এমনি অতলস্পর্শ ছিল। আর ভিতরেও তাহার বুঝি এইরূপই রত্নের আকর লুকান ছিল। সে সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

যতীশ্বর কিছুক্ষণ হইতে পাশের চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছিল। ডেক এখন অনেকখানি জনহীন। রৌদ্রের তাপ এখনও সম্পূর্ণ দুরীভূত হয় নাই; তাই প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যে যাহার কামরায় বিশ্রাম লইতে নিযুক্ত আছে।

যতী চেষ্টা করিয়া আশ-পাশ দু'একটা বাজে কথা কহিতে লাগিল। নির্ম্মল বেশি কথা কাহারও সহিত কহে না। ধীরার মৃত্যুর পর এই দশ-এগার মাস ধরিয়া সে এক প্রকার মৌনাবলম্বনই করিয়াছিল;—একেই ত কখনও বেশি কথা কহা তাহার স্বভাব নয়।

এম্‌নি করিয়া যতীশ্বর নিজেকে একটু প্রস্তুত করিয়া লইয়া, তার পর বক্তব্যটি ফাঁস করিল। বলিল—"ক'দিন ধরেই তোমায় একটা কথা বল্‌বো-বল্‌বো কর্‌ছি।"

কথাটা যে কি—সে সম্বন্ধে নির্ম্মলের একটা আন্দাজ ছিল। কাজেই তাহা শুনিবার জন্য সে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রদর্শন না করিয়া, পরম গম্ভীরভাবে গাম্ভীর্য্যময় সমুদ্র-বক্ষেই লক্ষ্য স্থির রাখিল।

যতীশ্বর তাহাকে প্রশ্নবিমুখ দেখিয়া আপনিই কহিল—"শোকে আচ্ছন্ন হওয়া পৌরুষ নয়, নিমু-দা! যে চলে গ্যাছে, তার জন্য বৃথা অত আকুলতা—কেবল তমোগুণকে প্রশ্রয় দেওয়া বই ত ন।" যতীশ্বর গীতা পড়িয়াছিল।

নির্ম্মল মনে-মনে চটিতেছিল। তাহার এখন একটুতেই রাগ হয়,—বিশেষ ধীরাকে ভুলিবার কথায়। সে শ্লেষের সহিত কহিয়া উঠিল—"ঠিক্! মৃতের স্মৃতিকে অতলজলে ডুবিয়ে দেওয়াই মনুষ্যত্ব—ইহাই সত্ত্বগুণ।"

যতীশ্বর এই টিপ্পনি শুনিয়া কিছু অপ্রতিভ হইল,—"তাই কি বলেছি? মৃতের স্মৃতি আমাদের পূজার বস্তু। কিন্তু জীবিতের দুঃখ কি আমাদের করুণার জিনিষ নয়?"

"হতে পারে; কিন্তু আমরা ত বুদ্ধ বা যীশুখৃষ্ট নই, যে, সবার দুঃখ দূর কর্ব্বো।"

"একজন সবার দুঃখ দূর না করতে পারি; কিন্তু প্রত্যেকে ত প্রত্যেকের জন্য করা যায়? আমি সবার কথা বলছিনে,—ব্যক্তিবিশেষের কথাই বল্‌ছি—অপর্ণার কথা বল্‌ছিলুম।"

নির্ম্মলের হৃদয় ব্যাপিয়া যে বিরক্তিটা জমিয়া উঠিতে-

ছিল, তাহা এককালে সূর্য্যোদয়ে কোয়াসার মতই কাটিয়া গেল। সে স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টিতে যতীশ্বরের মুখের দিকে চাহিল। তাহার প্রশ্ন বুঝিয়া তখনই যতী উত্তর করিল—"অপর্ণা আজও অবিবাহিতা!"

জলের উপর সর্ব্বদাই 'ভূমিকম্প' হয়—সে কিছু বিচিত্র নয়। নির্ম্মলের শরীরের মধ্যেই প্রবল কম্পন আরম্ভ হইল। যতী কহিতে লাগিল—"আর-বছর তোমার কাছ থেকে গিয়ে অপর্ণাদের খবর জানবার জন্য আমার মনে একটা কৌতূহল জন্মেছিল। খবর নিলেম। জান্‌তে পারলেম, তার তখনও বিয়ে হয় নি, বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্চে। আমার জানা একটি ভাল ছেলে ছিল,—ছেলেটি আমাদের কালেজেই থার্ডইয়ারে পড়ে। আমি তার সঙ্গে বিয়ের কথা ঘটকের মুখ দিয়ে বলে দিলুম। শুনলুম, বিয়ের ঠিক হয়ে গ্যাছে, পাকা-দেখাও হয়ে গ্যাছে বলে শোনা গেল। তার পর আর কোন খবর-টবর নিই নি। তোমার স্ত্রী যে আমি চলে আসার পরই জলে ডুবে যান, সে খবর ত আর আমরা কেউ পাইনি; তা'হলে অবশ্য এত সব আর করা যেত না। যাই হোক, যখন ফাল্গুনমাসের মাঝামাঝি আন্দাজ হঠাৎ এই খবরটা পেলুম,—তখন হঠাৎ আবার অপর্ণার খবর জান্‌তে কেমন ইচ্ছা হলো। নিজেই সেবার বাকুল গেলুম। গিয়ে শুনলুম—"

যতী এইখানে একটু থামিল। নির্ম্মল ঠায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সব কথা সে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। মনে অস্পষ্ট একটা ভীতি জাগিতেছিল।

"গিয়ে শুনলুম, সব উল্টে গ্যাছে। অপর্ণার মায়ের ঠাকুদ্দা মারা গেছেন, তাঁর বৈমাত্র সম্পর্কের এক নাতি এসে বিষয় দখল করেছে, তাদের সঙ্গে বনেনি। বাড়ীর পুরনো সরকার তাদের নিয়ে ত্রিবেণী গেছে। ত্রিবেণীতেও খবর নিলুম। জানতে পারলুম, বামুনমাসি মারা গ্যাছেন, তার পর তারা যে কোথায় গ্যাছে, সে খবর অনেক দিন আর পাই নি।"

নির্ম্মল এইবারে প্রশ্ন করিল—"তার পর?"

"তার'পর বিস্তর খোঁজ-তল্লাস করতে-করতে হঠাৎ এই সে দিন জান্‌তে পেরেছি, আমাদেরই একটি ডাক্তার ফ্রেণ্ডের শ্বশুরবাড়ীর মুহুরী—অপর্ণার অভিভাবক বেহারি চক্রবর্ত্তী। তারা ভবানীপুরে রয়েছে। এই সে দিন আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলুম; অপর্ণার বিয়ে এখনও হয়নি। কিন্তু একটা কি যেন ভিতরে-ভিতরে ঘটেছে, সেটা ঠিক বোঝা গেল না। বিয়ের কথা কিছুতেই কেউ আলোচনা কর্‌তে চায় না। তোমার কথা উঠ্‌লো; তোমার স্ত্রী মারা গ্যাছে, তাও বল্লুম। অপর্ণা শেষটা আমার সঙ্গে এমন তাচ্ছল্য ব্যবহার করতে লাগ্‌ল, যে, বেশ বুঝতে পারলুম, যাতে আমি আর না আসি, এ তারই মতলব! শেষে অনেক কষ্টে বেহারির কাছ থেকে এটুকু কথা বার করতে পেরেছি, যে, আগামী ১৫ই শ্রাবণ অপর্ণার বিয়ে। বর কোথাকার, কেমন, সে সব খবর কিছুতেই বার করতে পারিনি। কোন মতেই কোন কথা দু'জনের একজনও বল্‌তে চায় না। বোধ করি, দেখে শুনে সমস্ত পৃথিবীর উপরেই ওদের কেমন একটা অশ্রদ্ধা জন্মে গ্যাছে! তাই বল্‌চি নিমু দা, তোমার কি এখন অপগতর জন্যই শুধু শোক করা উচিত? অথবা যে এখন পর্য্যন্ত এত দুঃখ ভোগ করচে, তার মুখ চেয়ে নিজেকে সামলান্ কর্ত্তব্য?"

নির্ম্মল কোনই জবাব দিল না। জবাব দিবে কি,—সে ত আর এ সকল কথা শুনিতেছিল না। তাহার হৃদয়-সাগরে তখন এই চক্র মথিত সলিলরাশির মতই চিন্তারাশি উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া, প্রবল জল-কল্লোলের ধ্বনি তুলিতেছিল। আর সেই ধ্বনিকেও পরাভব করিয়া একটি সকরুণ মিনতি তাহার উভয় কর্ণকুহরে বাজিয়া-বাজিয়া বলিতেছিল—"তুমি অপর্ণাকেই বিয়ে করো।"—আবার শুনিল—"তুমি ত অপর্ণাকে ভালবাস! তুমি ত তাকে বিয়ে কর্ব্বে বলে বাগ্‌দত্ত ছিলে! তবে কেন বিয়ে কর্ব্বে না?"

ভগবান! ভগবান্! তবে কি তুমি অপর্ণাকে স্থান করিয়া দিবার জন্যই দুঃখিনী ধীরার স্থানটুকু খালি কর্‌লে? ধীরা, ধীরা, লোকে বলে তুমি দেখ্‌তে পেতে না—তুমি অন্ধ! কিন্তু তুমি কি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেয়েছিলে যে, আজও সেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধা তারই প্রতীক্ষায় অনূঢ় জীবন যাপন কর্‌ছে? তাই কি অম্‌নি করে সরে গেলে?

যতীশ্বর বলিল "কি বলো? আর দিন নেই, আজ তো ৭ই শ্রাবণ হ'লো। ১৫ই শ্রাবণ বোধ হয় বিয়ে।"

নির্ম্মল জবাব দিবার পূর্ব্বেই ধীরা আসিয়া তাহার সম্মুখে

দাঁড়াইল। মৃদু-মধুর হাসি হাসিয়া, তাহার হইয়া সে-ই জবাব দিল,—"ধীরার এই শেষ অনুরোধ ছিল।"

তার পর নির্ম্মল বলিল, "কিন্তু—"

যতী ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল—"কিন্তু তো থাকবেই। কিন্তু কিন্তুর জন্য 'কিন্তু' হলে ত চলবে না দাদা! এ কিন্তুটা উভয় পক্ষীয় যে, কাজেই দুদিকের দুটো 'কিন্তু'কেই এক প্রকারে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।"

নির্ম্মল চলোর্ম্মিমালাবিমণ্ডিত অপার নীরধির বক্ষ চাহিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল। নিজের জন্য নহে,—সত্যের জন্য সে অপর্ণাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য! সুখের আশা আর তাহার বিন্দুমাত্র নাই, কিন্তু অপরকে সুখী করার চেষ্টা যে ত্যাগ করিতে পারে না। ধীরা ইহাতে অধিকতর অসুখী হইবে।

৫৩

দ্বারে কড়া নড়িতেই ঠিকা ঝি সকৃড়ি বাসন মাজিতে-মাজিতে উঠিয়া বাঁ হাতে দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। সেই পথে কে প্রবেশ করিবে, ইহা জানাই আছে; তাই অপর্ণা এতটুকু উঠানখানির পাশে, একমাত্র টগর-গাছটার কাছে, দেওয়ালে ঠেস দিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনই রহিল। কিন্তু একটু পরেই সে নিজের ভুল বুঝিয়া, মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া দেখিল—যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে বিহারী নয়। ইহার জুতার শব্দ ছেঁড়া চটির শব্দ নহে, এবং ঈষৎ অগ্রসর হইয়াই সে শব্দটা হঠাৎ সঙ্কোচের মধ্যে মিলাইয়া গেলেও, তাহা জোয়ান পুরুষের পায়ের শব্দ; চিন্তা-জরাতুর প্রবীণের নয়।

অপর্ণা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিতেই, এক নব্য যুবকের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। পতিত হইয়াই কিন্তু সে দৃষ্টি তখনি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। শৈলেশ-রাজতনয়া যেমন অতর্কিত-দৃষ্ট সাধনের ধন মহাদেবকে সম্মুখে দেখিয়া "ন যযৌ, ন তস্থৌ" হইয়াছিলেন, অপর্ণার তেজীয়ান্ দৃষ্টিরও আজ বুঝি সেই অসহায় দশা! কিছুক্ষণ এমনি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া থাকিয়া, প্রথমে নির্ম্মল নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল; যেহেতু বিস্ময়ের ঢেউটা তাহার দিক্ হইতেই গিয়াছিল, তাহার দিকে আসে নাই। সে এক পা অগ্রসর হইয়া, সহজ ভাব ধারণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া, একটু কৃতকার্য্যও হইয়া, কথা কহিল; জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল আছ ত অপর্ণা?"

অপর্ণার চিত্ত হইতে তখনও আশ্চর্য্যের ঘোর কাটিয়া যায় নাই। সে জবাব করিল—"ভালই আছি। আপনি?"

"আমিও ভাল আছি।" এই উত্তর দিয়া নির্ম্মল এমন একটু বিষন্ন হাসি হাসিল, যাহা চোখে পড়িলে দ্রষ্টার পক্ষে অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়। অপর্ণা নেত্র নত করিয়া ছিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না।

ঝি বাসন মাজিয়া রান্নাঘরে তুলিতেছিল। একটা বিড়াল এঁটো-কাঁটাগুলার মধ্যে নিজের খাদ্যান্বেষণে রত রহিয়াছে; আর কেহ কোনখানে নাই। চারিদিকে চাহিয়া নির্ম্মল অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বেহারীবাবু কোথায়?"

"তিনি বাড়ী নেই।" অপর্ণা পায়ের আঙ্গুল দিয়া উঠানের মাটি খুঁড়িতে লাগিল। নির্ম্মল আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কখন বাড়ী ফিরবেন।"

"তা বলা যায় না।" অপর্ণা যথা কার্য্য করিতে লাগিল। একটু সলজ্জ, কুণ্ঠিত।

"ফির্তে কি বেশি রাত হবে? আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি সকালেই আস্তুম; কিন্তু হঠাৎ রাস্তায় কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে আমাদের গাড়ীতে অন্য একটা গাড়ীর ধাক্কা লাগে। যতী—আমার ভাই যতীশ্বরের পায়ে তাইতে ভারি একটা চোট লেগেছে। তাই তখন আসা হলো না, এখন—"

"যতী-দা এখন কোথায়?"

"সে কলেজ হাঁসপাতালে। আমি এখনই তার কাছে ফিরে যাব। ডাক্তার বলেছেন, দু'-তিন দিনেই সেরে যাবে, কিছু ভয় নেই।"

অনেকক্ষণ কেহই আর কোন কথা কহিল না। বুঝি ইহাদের পরস্পরকে জানাইবার এবং পরস্পরের কাছে জানিবার সব কথাই ঐ কথা-কয়টির মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে!

অগত্যা নির্ম্মল বিদায় লইল। অপর্ণা তাহাকে একটু বসিতেও বলিল না; বিহারীর আসার সম্বন্ধে আশামাত্র দিল না,—কাজেই অপেক্ষা করিবার কিছু ছিল না; মনে বুঝি সে রকম শক্তির অভাবও ঘটিতেছিল। কর্ত্তব্যের খাতিরে আসিয়াছে—কিন্তু সঙ্কোচ কাটে কেমন করিয়া? যতী সহায় ছিল,—সেও ভাগ্যক্রমে আজ শয্যাগত; আবার সময়ও সংক্ষেপ।

"তবে না হয় লোকে একটু নিন্দাই করবে—এই রকমই থাক না কেন ?"

"যাদের অনেক আছে—তাদের কাছে লোকনিন্দা হয় ত তুচ্ছ! কিন্তু যাদের কিছুই নেই—তাদের কাছে এটা নেহাৎ সামান্য নয়। কেন আমি আমার নামে মিছামিছি কুৎসা রটতে দেব ?—লোক-গঞ্জনা কেনই বা সহ্য করব ?"

নির্ম্মল এবার আর সহ্য করিতে পারিল না। খপ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"বেহারির জন্য নিজেকে ত চিরদিনের মত বলিদান করতে পারচ ; এতে কি লোকে হাসবে না ?"

"সে হাসি হয় ত খুব অসহ্য নাও হ'তে পারে, নিমু-দা।—আজও যে এই একটা আশ্রয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, আপনাদের মত বড়মানুষদের দোরে-দোরে রাঁধুনি-বৃত্তি করে যে আমায় খেতে হচ্চে না,—সে কার জন্য ? সে আমাদের ইজ্জত মান সমস্তই এই যে বজায় রেখেছে, এর কাছে ধৃষ্ট লোকের একটু অর্থহীন হাসি কি আর খুব বেশি বাজবে ?"

এই কথাটা এমন সত্য, আর এম্নি নির্ঘাত, যে, নির্ম্মল শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না।

তখন অপর্ণা আবার বলিল ;—অতি শান্ত জ্বালা-লেশহীন অনুনয়ের স্বরেই কহিল—"আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। শুনেছি, আপনি শোকার্ত্ত। তা' আপনাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছাও আমার মোটেই নেই। আপনার কাছে আমাদের কিসের দাবী ? প্রতিশোধের কথা তুলেছিলেন ; কিসের প্রতিশোধ ? আপনারা যে অনুগ্রহ করে মধ্যে-মধ্যে খবরটুক নেন, তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ। তার বেশি সম্বন্ধ মুনিব-ভৃত্যের নয়। আপনি দয়ালু, তাই দয়া করতে এসেছেন ; নইলে কে এত করে ? কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—আমি সে দয়া নেবার যোগ্য নই। তিনি আমার মাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন ; মরণকালে তাঁকে বড় শান্তিতেই তিনি মরতে দিয়েছেন।—তিনি আমায় ভালবাসেন, আমি আর কবে তাঁর কি কর্ব্বো ? আমার যা সাধ্য, তাই করতে চেয়েছি। আমি এতেই সবচেয়ে সুখী হবো। আর অন্য কামনা আমার মনে নেই। কারণ, আমি মনে করি, এতে আমার মাতৃঋণের কিছু পরিশোধ হবে।"

এই বলিয়া অপর্ণা সরিয়া দাঁড়াইল। নত হইয়া স্থাণুবৎ অচল নির্ম্মলকে প্রণাম করিল। তার পর হাসিমুখ তুলিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—"আপনারা দুজনেই মহৎ, আমিই অতি ক্ষুদ্র ; এ পৃথিবী থেকে শুধু ঋণী হয়েই না গিয়ে, যতটা পারিব, তার কিছু যেন শোধ করে যেতে পারি—এই কথা বলুন। মাও মৃত্যুকালে এই আশীর্ব্বাদ করে গেছেন।"

নির্ম্মল তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল না ;—কোন কথাই সে কহিল না। ক্ষণমাত্র পরে নীরবেই উঠিয়া চলিয়া গেল। জুতা, ছাতা যেখানকার সেইখানেই যে পড়িয়া রহিল, তাহাও তাহার আদৌ হুঁস হইল না। এদিকে কোন্ সময় নিকষ-কৃষ্ণ, ঘন মেঘজালে শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত আকাশ আবার ছাইয়া গিয়াছিল—কখন ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি প্রকৃতির ব্যাকুল বেদনাশ্রুর ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহা কেহ জানিতেও পারে নাই। এক্ষণে হু হু করিয়া সেই টিপি-টিপি জলের ধারার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বাতাস ঘোর রোলে হাহাকার করিয়া উঠিয়া, চীৎকার শব্দে বলিয়া উঠিল—হায়, হায়, হায় !

বিহারী ভিজা ছাতা র'কে মেলিতে গিয়া দেখিল একজোড়া চক্‌চকে দামী জুতা উঠানে পড়িয়া ভিজিতেছে ; আর সেই মাটির রোয়াকের উপর, সেই ঘনায়মান মেঘ-সন্ধ্যার স্তিমিতালোকের মধ্যে, আকাশের তড়িল্লতা বুঝি স্থানভ্রষ্ট হইয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে। আকাশে থাকিয়া-থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকিতেছে ; ঝাঁকিয়া-ঝাঁকিয়া বৃষ্টি প্রবলতর হইয়া আসিতেছে ; বাতাস্ হা-হা করিয়া শোকের গান গাহিয়া-গাহিয়া উঠিতেছে। আর এই জনহীন গৃহ মধ্যেও সেইরূপই রূপের তরঙ্গে শোকের তরঙ্গ একসঙ্গে যমুনা-গঙ্গার মত একধারায় মিশিয়া তরঙ্গিত হইতেছে। বিহারীর মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ দেখা দিল। মুনীববাড়ী—তাঁহাদের জামাইয়ের কোন বন্ধুর পা ভাঙ্গিয়া পতন উপলক্ষে, কোন দূর-প্রবাসীর একটা নাম যেন সে বারংবার উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিল। তার পর এই জুতা জোড়া—এ কাহার ? নিকটে আসিয়া অধীর উত্তেজনায় সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"কে এসেছিল ?"

বিহারীর সাড়া পাইয়া অপর্ণা তখনই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বিহারী তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া কহিল—"তুমি কাঁদছিলে অপর্ণা !"

অপর্ণার রোদনাক্ত মুখে তখনই আবার গর্ব্বের চিহ্ন ফুটিতে গেল, কিন্তু সুস্পষ্টরূপে বুঝি তাহা ফুটিল না। আকাশের বিদ্যুতের মতই শুধু একবার সেই জমাট মেঘস্তরের উপর চকিত হইয়া মিলাইয়া গেল। তথাপি সে হাসিয়া কহিল—"আমার কি কাঁদবার কিছুই নেই?"

"থাকবে না কেন? কিন্তু তোমার মা যেদিন স্বর্গে যান—আমি কেঁদেছি, তুমি ত কই সে দিনও কাঁদ নি?"

"মা নরক ছেড়ে স্বর্গে গেলেন, তাতে কান্না পাবার কি ছিল বল ত।"

বিহারী এবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সাহসভরে কহিল "আজ তোমার স্বর্গ থেকে নরকে পতন হলো বুঝি—কে এসেছিল?"

"কে আবার করে তোমার বাড়ী আসে! স্বপ্ন দেখচো না কি?"

"তা' হলে, বল্‌বে না! কিন্তু আমি বল্‌তে পারি। বল্‌বো?"

"না,—বল্‌বার দরকার নেই; আমি শুনতে চাইনে।"

"নির্ম্মল এসেছিল?"

"কে সে! আমি কোন নির্ম্মলকে জানিনে।"

"জান্‌বে না কেন, খুব জানো। তবে এই হতভাগা বেহারির গলায় দড়ি দেবে বলে, তাকে তুমি বিদায় করে দিয়েছ। কেমন, না?"

"দিয়ে থাকি খুব করেছি,—সে আমার কে, যে দোব না?"

"তোমার কেউ না,—আমার সব। আর আমি তোমায় ভয় করিনে, অপর্ণা! এক্ষণি যেথান থেকে পাই—আমি তাকে ফিরিয়ে আনচি।"

সেই অবিরল শ্রাবণ ধারার মধ্যে ঘনায়মান মেঘান্ধকারে প্রৌঢ় বিহারী বলিষ্ঠ যুবকের মত একলাফে সেই কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে বাহির হইয়া গেল।

তখন আবার সেই আর্দ্র মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া অপর্ণা কাঁদিয়া বলিল—"মা গো, আজ তুমি কোথায়?"

বৃষ্টি তখনও থামে নাই। বর্ষণভারাতুর আর্দ্র বায়ু তখনও থাকিয়া-থাকিয়া হু হু করিয়া যেন কাহার বিদায়-কান্না কাঁদিয়া উঠিতেছে। আকাশে মধ্যে-মধ্যে বরণের আলো ঘুরাইয়া মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি হইতেছিল। গাছে একগাছ টগর ফুল বিনিময়ের মালার মত শুভ্র হইয়া আছে, আর অপরিচ্ছন্ন মৃত্তিকায় তখনও সেই রাশি করা ফুটন্ত পদ্ম পড়িয়া। বিহারী আগ্রহমথিত, আনন্দনিরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল "উঠে দেখ্‌ ভাই অপর্ণা, একবার চেয়ে দেখ্‌।—আজ সাত রাজার ধন মাণিক কুড়ায়ে ঘরে এনেছি;—ওরে দিদি, একবার ভাল করে তুই শুধু চেয়ে দেখ্‌!"

ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে নির্ম্মল কহিল—"অপর্ণা! তুমি তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তবু আবার এসেছি, অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে পার্ব্বে কি?"

শিশুর মত প্রাণখোলা আনন্দের হাসি হাসিয়া সুখবিহ্বল বিহারী কহিয়া উঠিল, "আমায় দিদি দিনের মধ্যে সাতবার অমন তাড়ায়, আমিও সাতবার ঘুরে-ফিরে আসি। এবার থেকে তুমিও তাই করবে দাদা! তাতে ত গৌরব ভিন্ন তোমার লজ্জা নেই। অন্নপূর্ণার দোষে শিব যে ভিখারী! বিশ্বেশ্বর ত সে দরবারে রাজা ন'ন!"

(সমাপ্ত)

শিলং-ভ্রমণ

[শ্রীহেমনলিনী দেবী]

কোথায় পাহাড়ে যাইতে হইবে কথা উঠিতেই, আমাদের প্রধান সঙ্গী বলিয়া উঠিলেন,—"আর যেখানে হয় চল, কিন্তু দার্জ্জিলিংয়ে নয়।" সকলে বলিল "কেন?" তখন তিনি বলিলেন—"বাঃ! সেখানে ডিকি যায়, জিমি যায়, টমি যায়—সেইখানে আমি যাব?' সে হইতে পারে না।" উত্তর হইল "তবে কোথায় যাইবে—ধবলাগিরি, না কাঞ্চনজঙ্ঘা?" তিনি বলিলেন, "না; সে সব জায়গায় ট্রেণ নাই, মোটর নাই; এমন কি, টঙ্গার ডাকও যায় না; কি করিয়া যাওয়া যায়? তবে যাওয়া যায় কোথায়?" তিনি বলিলেন "কেন, শিলংটা ত এখনও নূতন হইয়া আছে? মাসিকপত্রগুলায় 'খাসিয়া জাতি'র বিবরণ ও ছবি ঢের বাহির হইলেও, প্রকৃত 'ভ্রমণ' এখনও ত দেখিনি! সে নূতন দেশ, সেই খানেই যাইব।"

এলিফেন্টা জলপ্রপাত—সম্মুখ ও প্রধান দৃশ্য

প্রকৃত কথা তাহা নয়। আষাঢ় মাস শেষ হইয়া আসিতেছিল। হিমালয়ের পর্ব্বতগুলিতে তখন প্রচুর বর্ষা নামিয়াছে। স্বাস্থ্য ও সুবিধার হিসাবে সে সকল স্থানে যাওয়া উচিত নয় বলিয়া, অনেকেই ভয় দেখাইয়া পাহাড়ে উঠিবার

বাধা উপস্থিত করিতেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়েই সংবাদপত্রে শিলংএর বর্ণনাচ্ছলে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল যে, "ভ্রমণকারিগণ বর্ষার সময় একবার শিলংয়ে আসুন! শিলং-গৌহাটি রোডের এবং স্বয়ং শিলংএর দৃশ্য বর্ষায় যেমন অতুল্য মূর্ত্তি ধারণ করে, এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষতঃ, তখন সেখানকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবিকল ইংলণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থার সমান হইয়া উঠে বলিয়া, সাহেবরা এখানে আসিতে ভালবাসেন। শিলংএ ভ্রমণের অত্যন্ত আরাম,—পাহাড়ের সর্ব্বত্র মোটর চলে" ইত্যাদি।

এই বিজ্ঞাপনের ফাঁদেই আমাদের ভ্রমণকারীর চিত্ত ধরা পড়িয়া গেল। নানা অসুবিধা, দূরত্ব—সকলই স্বীকার করিয়া শিলং-যাত্রাই স্থির হইল। "সাহেবগঞ্জ—মনিহারী"র পথ খোলা থাকিলে, ঐ পথ আমাদের পক্ষে নিকট হইত; কিন্তু যুদ্ধের জন্য সেখানে ষ্টীমার লাইন খোলা নাই; অগত্যা কলিকাতা ঘুরিয়াই যাইতে হইবে। অনেক বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া, সেই বিষম বর্ষার প্রবল বৃষ্টি মাথায় লইয়া, আমরা দুর্গা স্মরণ করিয়া বাড়ীর বাহির হইলাম।

ওয়ার্ডস্ লেক

যথাসময়ে কলিকাতা ত্যাগ করা গেল। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় শিয়ালদহ হইতে শিলং-মেল ছাড়িল। বর্ষায় সে খাসিয়া পাহাড়—শিলং কেমন হইবে, ঠিক জানি না; কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশের দিগন্ত-বিস্তৃত যে সকল শ্যামল দৃশ্য রেলপথের দুইপাশে অঙ্গ মেলিয়া ছিল, তাহার তুলনাই বা কোথায় মেলে? কলিকাতার পর রাণাঘাট—এটুকুকে নগরের উপকণ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কারণ, নাগরিক সভ্যতার ঐশ্বর্য্য, চেষ্টা, উদ্যম, পরিচ্ছন্নতা এই পথটির দুই দিক জুড়িয়া আপনার অধিকারের আসন পাতিয়াছে। খড়দহ, টিটাগড়, বারাকপুর, নৈহাটি,—ইহাদের দিকে চাহিলে অনেকখানি গ্রাম্যভাবাপন্ন কলিকাতা বলিয়া ভ্রম হয়। রাণাঘাটের পর ক্রমশঃ বঙ্গজননীর সরল, গ্রাম্য-চিত্রের পুনঃ পুনঃ পটপরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

"অবারিত মাঠ, গগন ললাট, চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।"

তাহাদের ঘরকন্না, মাঠ-ঘাট, গরু-বাছুর ইত্যাদি সমন্বিত বায়স্কোপের ন্যায় সজীব চিত্রগুলি রেলের দুইপাশে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথের ধারে রথের পুনর্যাত্রার একটি গ্রাম্য

মেলা দেখিলাম। ছোট গ্রামের ছোট রথখানি; তাহাকে ঘিরিয়া স্ত্রী-পুরুষ, বালকবালিকারা মেলা জমাইতেছে। মুড়ি সন্দেশের সঙ্গে পান-সিগারেট সমানভাবে বিকাইতেছে। চরকীবাজী, নাগরদোলা,—কোন সরঞ্জামের অভাব নাই। সব-চাইতে অদ্ভুত লাগিল,—মেলা হইতে গ্রামে ফিরিবার পথে এক অদ্ভুত সাঁকো। বর্ষার জলে কোন নদীর জল বাড়িয়া, বা অমনি কোন কারণে, সেতুর তলায় অনেকখানি স্থান জুড়িয়া অল্প জল ও গভীর পাঁক

লেক—অপর পার্শ্ব

জমিয়া আছে। তাহারই উপর দুইই দিকে দুটি মোটা বাঁশ থামের আকারে দাঁড়াইয়া। সেই বাঁশের উপরে-নীচে আড়াআড়ি-ভাবে আরও দুটি লম্বা বাঁশ ফেলা। উপরেরটি ধরিয়া নীচেরটায় পা রাখিবার পথ। দৈবাৎ হাত বা পা ফস্‌কাইলে সেই গভীর পঙ্কে পতন অনিবার্য্য। কিন্তু সেই বিচিত্র পুল বাহিয়াই শিশু, স্ত্রী, বৃদ্ধ—সবাই ভিড় করিয়া যাতায়াত করিতেছে। আমাদের গায়ে কাঁটা দিল, কিন্তু তাহারা দিব্য সহজভাবে হাসি গল্পের সঙ্গে শিশু কোলে, বাজারের বোঝা লইয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে পোড়াদহে ট্রেণ থামিয়া ঠিক সূর্য্যাস্তের সঙ্গে "হার্ডিঞ্জ ব্রীজ" পার হইল। পদ্মার নূতন পুল,—ইহার নির্ম্মাণের সময় কয় বৎসর ধরিয়া বড় হাঁকডাক হইয়া গিয়াছে। আমাদের একজন ব্যবসাদার সঙ্গী, তাঁহাদের দেশের বড় বড় পাহাড়-ভাঙ্গা অত পাথর আসিয়া কোথায় পড়িয়াছে, দেখিবার জন্য খুব গলা বাড়াইলেন; কিন্তু পদ্মার গভীর জলরাশির মধ্যে তাঁহাদের সেই প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড 'বোল্‌ডার' যে কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে, তাহার আর চিহ্নও নাই।

সান্তাহারে গাড়ী বদল করা গেল। রাত্রি সাড়ে-নয়টা দশটার সময় ট্রেণ গৌহাটির পথ ধরিল। আমাদের পক্ষে এবার পথটি নূতন; কিন্তু বর্ষা-রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টি চলিল না। তবে—কি জানি কোন্ দেবতার শুভদৃষ্টিতে—তিস্তা নদীর উপর দুইবার বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল; তাই সেই দেবীচৌধুরাণীর লীলাভূমি ত্রিস্রোতাকে তৃষিত নয়নে দেখিয়া লইলাম। হাঁ, নয়ন ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী বৈ কি! দীর্ঘ সেতুর দুই পাশে বিপুল বর্ষার জল-রাশি,—নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সহসা-প্রকাশিত বিজলী-আলোকে ঝলসিতা, মায়াময়ী অপরূপা তিস্তা; বঙ্কিম-বর্ণিত জ্যোৎস্না-

রজনীর বিচিত্রা ত্রিস্রোতার স্মৃতির উপর আর একটা বিচিত্রতার সৃষ্টি করিল। তখন বিচলিত অথচ তৃপ্ত চিত্তে আসিয়া শয্যায় পড়িয়া সেই বাঞ্ছিত দৃশ্যের স্বপ্ন-কামনায় ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

প্রভাতে মাথা তুলিয়া দেখি, আমাদের সঙ্গি-সঙ্গিনীরা সেই শীতল বাতাসের মধ্যেই চারিদিকের জানালা খুলিয়া দেখিতেছে, ও ব্যগ্র চীৎকারে নিদ্রিতদের ডাকাডাকি করিয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছে। শেষরাত্রিতে গোলোকগঞ্জ পার হইয়া এখন আমরা আসামের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। চারি-পাশের সমস্ত দৃশ্যই পরিবর্ত্তিত; উত্তরে দূরে-দূরে গগণস্পর্শী কোমল, নীলবর্ণ পর্ব্বতমালা অনবরত সঙ্গে-সঙ্গে চলিতেছে। দক্ষিণে কৃষ্ণপ্রায় ঘনশ্যাম বনানীর কোলে-কোলে ছোট-ছোট অসভ্য পল্লীগুলি। ঐশ্বর্য্য বা সভ্যতার দাগটি পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বুকের উপর কাপড় পরিয়া জেলের মেয়েরা সে দেশের তে-কোণা জালে মাছ ধরিতেছে। পুরুষরা চাযের ক্ষেতে কাদার উপর কার্য্যে মগ্ন।

সরভোগ ষ্টেশনটি ইহারই মধ্যে একটু বড় ষ্টেশন। সাহেবদের মধ্যে চাএর ব্যাপার চলিতে লাগিল; আমরা ৺কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডার নিকট ধরা পড়িয়া তাহার প্রশ্নজালে বিব্রত হইতে লাগিলাম। বুঝিলাম সে আমাদের সঙ্গ লইল। কামাখ্যা-দর্শনে কাহারও অনিচ্ছা নাই; কিন্তু তথায় যাত্রার সুবিধা হইবে কি না, সেও সন্দেহ হইতেছিল। দশটা বাজিয়া গেল। দূরের পাহাড় ক্রমশঃ সরিয়া পাশাপাশি হইয়াছে। মেল্ ট্রেণ সকল স্থানে থামে না; কিন্তু পার্ব্বত্য পথ বলিয়া ক্রমশঃ গতি ধীর হইয়া যাইতেছে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। মনে-মনে পথের অবসান কামনা করিতেছিলাম। এমন সময় দেখা গেল, সম্মুখে পাহাড়ের বাঁকের নীচে বিশাল-কলেবর নদী বহিয়া চলিয়াছে!

লেক—আর একটী দৃশ্য

"ব্রহ্মপুত্র, ঐ ব্রহ্মপুত্র!" আমাদের বালকবালিকারা চেঁচাইয়া উঠিল। আমিনগাঁও আসিয়াছি তবে।

সেখানে তখন মেঘ নাই; মাথার উপর সূর্য্য আগুন ঢালিতেছে। অনেকখানি পথ চলিয়া ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলাম। পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ষ্টীমার। একখানি ছোট জাহাজ তাহাকে টানিয়া চলিয়াছে বলিয়া এঞ্জীনের তাপ বা বিকট দৃশ্যের কোন বালাই নাই। স্থানে-স্থানে

এলিফেণ্টার নিম্ন অংশ

সাহেব মেমেরা মধ্যাহ্ন আহারে বসিয়াছেন। নিজেদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার সমস্ত জ্বালাটুকু হাসির বাতাসে উড়াইবার চেষ্টায় অন্তরালে বসিয়া আমরা সেই বিচিত্র আহার-পানের কত কি অদ্ভুত সমালোচনা জুড়িয়া দিলাম।

সম্মুখে নদীর কূল জুড়িয়া গৌহাটী সহর। বাঁকা নদীর গতিতে কখনও দেখা যায়, কখনো বা পাহাড় আগাইয়া দৃষ্টি রোধ করে। নদী হইতে যতদূর দেখা যায়, শুধু পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, ঢেউ খেলাইয়া যাইতেছে। সবুজ—ঘননীল—নীল—তার পর ক্রমশঃ ধূসর। শুনিলাম, ঐ সবের পর থাসিয়া পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে। উহাদের অতিক্রম করিয়াই শিলংএ যাইতে হইবে।

ঐ পর-পর পাহাড়—সবগুলি লঙ্ঘন! একবার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মোটরে একজন মাত্র চালকের সাহায্যে এত বড়-বড় পর্ব্বত পার হওয়া? এমনি পথে একবার বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। সেই কথা মনে পড়িতে আরও ভয় হইতেছিল। কিন্তু উপায় কি, এ যাত্রার পথই যে এই। কিন্তু তবু সাহস এই যে, পথটি দস্তুরমত যান-পথ। উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা এই পথে যাতায়াত করিতেছেন। এখানে তেমন বিপদের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নাই।

ষ্টীমার আসিয়া পাণ্ডুঘাটে দাঁড়াইল। অনতিদূরে ষ্টেশন। সেখান হইতে রেলে গৌহাটি যাওয়া যায়। পথে কামাখ্যা ষ্টেশন। নদীর তীরে আমাদের ক্ষণকালের

বিশ্রাম ও আহারের স্থান—ক্ষুদ্র বাসাটি। যাহার ইচ্ছা হইল সে ব্রহ্মপুত্রের তুষার-গলা শীতল জলে স্নান সারিয়া সেখানে উঠিল। এইবার তীর্থ-দর্শনের পালা আরম্ভ! পাণ্ডা মহাশয়ের বক্তৃতার চোটে সবাই তখন কামাখ্যার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ষ্টীমারেই স্থির হইয়াছিল যে, গৌহাটিতে একদিন অপেক্ষা করিয়া তীর্থ ও স্থানীয় দৃশ্যগুলি দেখিয়া লইতে হইবে। ক্ষণকাল দৃষ্টিতে গৌহাটী উমানন্দর মূর্ত্তি এত সুন্দর লাগিল যে, তাহার আকর্ষণ এড়াইয়া যাওয়া কষ্টকর। পরামর্শ স্থির, কিন্তু দেবতার পাহাড়ে উঠা ও নামা অসম্ভব। অবশেষে অনেক কথার পর—কামাখ্যা যাওয়ার প্রসঙ্গ শেষ হইবার পর—আমাদের প্রধান সঙ্গী বলিলেন—"সব বুঝি; কিন্তু এই যে এত অর্থব্যয় করিয়া আমরা দেবীর পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি,—আবার কি শীঘ্র এখানে আসার কোন সম্ভাবনা আছে? একটি শ টাকা ইহার জন্য নষ্ট হোক্—একখানি মোটর আমরা ছাড়িয়া দিই এবং লোক-জন ছেলের দল সব চলিয়া যাক্,—দেবদর্শন না করিলে যাঁহাদের মনে কষ্ট হইবে, শুধু তাঁহারাই থাকুন।"

শিলং—পার্শ্ব দৃশ্য
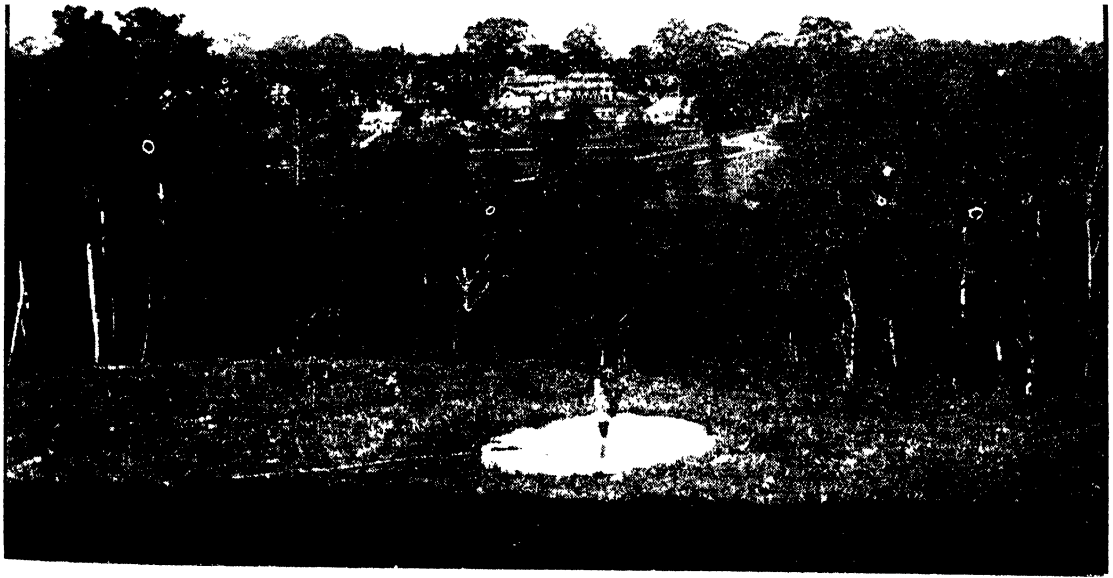
ইচ্ছা অনুরূপ;—পাণ্ডুর বাসায় আসিতে, পথেই মোটর-ওয়ালার দল আসিয়া গ্রেপ্তার করিল!—পূর্ব্বের সংবাদ-অনুযায়ী তাহারা মাল ও যাত্রীর কারগুলি লইয়া পাণ্ডু ষ্টেশনে হাজির হইয়াছে; সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রা না করিলে, তাহারা অন্য—এখনই শিলংএ ফিরিয়া যাইবে। অনেক বাদানুবাদ হইল,—তাহারা টেলিফোঁর পর টেলিফোঁ চালাইল; কিন্তু না—আজই তাহাদের শিলং পৌছানো চাই। অর্থাৎ আজ না গেলে তাহাদের দেওয়া সব-কটি মুদ্রা নষ্ট!

বিশ্রামের জন্য মাত্র দুই ঘণ্টা সময়—ইহার মধ্যে তাই হইল। মাইল তিন পথ চলিয়া আমরা একেবারে কামাখ্যা পর্ব্বতের সিঁড়ির নিকট নামিলাম ও প্রায় সমস্ত সাথীগুলিকে লইয়া অন্য মোটর দুখানি পবনবেগে শিলংএর পথে অদৃশ্য হইল।

(২)

৺কামাখ্যা পর্ব্বতের কোল ঘেঁসিয়া মোটরলাইন, আর তাহারই সমান্তরালে কয়েক হাত দূর দিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। মোটর হইতে তাহার দ্রুতগতির জন্য ভাল বোঝা যায় না; কিন্তু ট্রেণে বসিয়া কামাখ্যা পাহাড়ের

দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। ৺ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটি ঠিক চূড়ার উপর, ট্রেণ যতদূর চলে—আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়টি যেন পাণ্ডুঘাট পর্য্যন্ত সম্মুখেই আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কি ঘন বন সেখানে! পর্ব্বতের উপর দিয়া অমন সুন্দর পথ-ঘাট, পাণ্ডাদিগের সেই বড়-বড় দোতালা বাড়ী—অত বস্তী, নীচে দাঁড়াইয়া তাহার কোন চিহ্নও ত দেখা যায় না। মাথা তুলিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, আসাম-প্রকৃতি-সুলভ সেই কৃষ্ণাভ অন্ধকার বন। তৃতীয় প্রহরের প্রথম তীব্র রৌদ্রে—আমরা ভাবিলাম ছায়াটুকু নিশ্চয় পাইব, তাহার পর ভাগ্যে যাহা হয়।

ক্রমে মাতার শ্রীমন্দিরের উচ্চ চূড়া দেখা যাইতে লাগিল। তখন অত কষ্ট সব যেন সার্থক মনে হইল।

পথের পাশে কত দেবতারই মন্দির। সবগুলিই নূতন সংস্কৃত ও প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই মহারাজ দ্বারভাঙ্গার পুণ্যনাম জড়িত। পূর্ব্বে ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া কামাখ্যা মন্দির ও পার্শ্বদৃশ্য যেমন শ্রীহীন ভাবিয়াছিলাম, প্রকৃত অবস্থা মোটে সেরূপ নয়। পার্ব্বত্য-দৃশ্যের সঙ্গে মহিমময় উচ্চ দেউল—চিত্রবৎ সুন্দর পথঘাট, বাড়ী, পুষ্করিণী, যাহা দেখিলাম, তাহাতেই চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

পোলো গ্রাউণ্ড
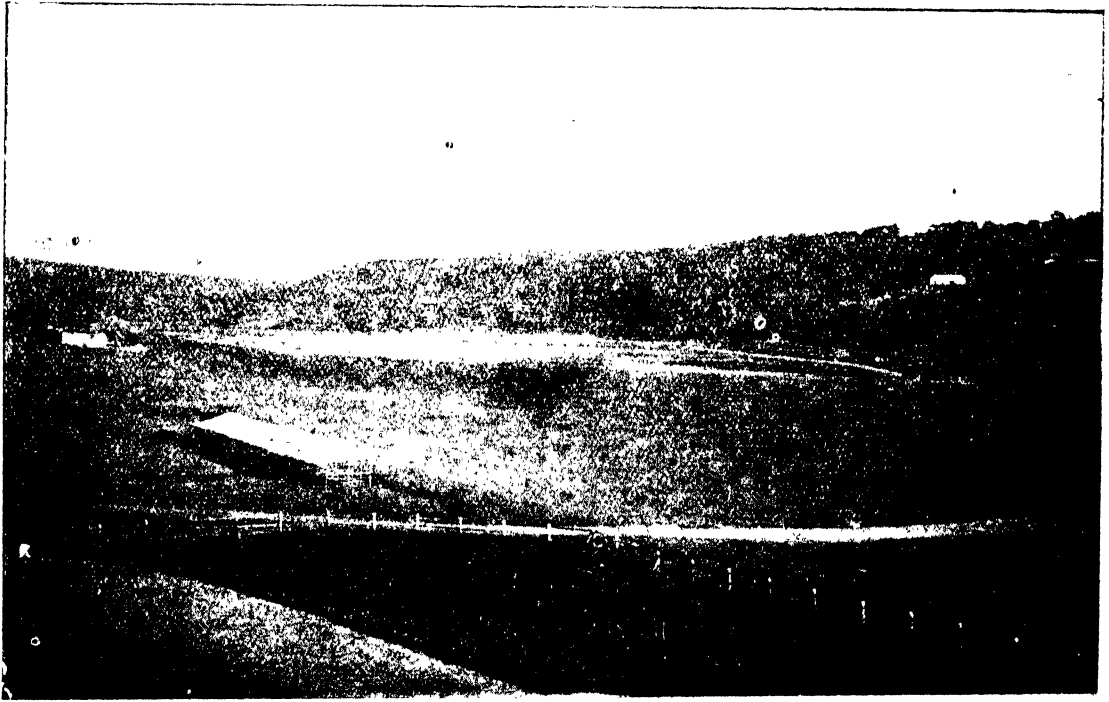
প্রথমতঃ পথটা সত্যই তাই,—ঢালু, পরিষ্কার—উঠিতে কোন কষ্ট নাই। কিন্তু যত উঠিতে লাগিলাম, ততই খাড়া উঁচু হইতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ হইল রৌদ্র। তখন পশ্চিমের সূর্য্য সোজা মুখের উপর। পথ তাতিয়া আগুনের খোলার মত হইয়াছে। উৎসুক যাত্রী-দলের চরণ ও গল্পমুখর জিহ্বা ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিল। একাদশীর অপরাহ্ণ; সদাচারী ব্রাহ্মণ ও বিধবাদের সেদিনের অবস্থা স্মরণীয়।

তাহার পর ধীরে-ধীরে পার্ব্বত্য সুন্দর গ্রামখানি ও

শাক্ত হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ সাধ,—দুর্গম পথের ভীষণ যাত্রার পর এই মহাগুপ্ত পর্ব্বতের অতি গোপন গুহায় মহাদেবীর গুহা-পীঠস্থান দর্শন;—দেবীর চরণে প্রণাম, তাঁহার ভক্তদের চরণেও শত-শত প্রণিপাত! শুধু তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াই তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করি—আর কিছু না।

পরে আমাদের পাণ্ডা মহাশয়—শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ শর্ম্মার বাটীতে আসিয়া টানা-পাখার তলে—সুন্দর শয্যায় আশ্রয় লইয়া, বারংবার মাতার কৃপা স্মরণ করিতে লাগিলাম। তীর্থস্থানের পাণ্ডারা সাধারণতঃ যাত্রীদের অনেক যত্ন করিয়া

থাকেন দেখিয়াছি; কিন্তু কামাখ্যা তীর্থের এই সম্পন্ন পাণ্ডারা সপরিবারে সাগ্রহে যেমন পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলেন, এমন আর কোথাও দেখি নাই।

কাঠের ফ্রেমে ছেঁচা-বাঁশের বেড়া সাজাইয়া জানালা-দরজা-সজ্জিত, চুনকাম করা সুন্দর দোতলা ঘর। উঁচু পাহাড়ের শীতল প্রচুর বাতাসে গ্রীষ্ম বলিয়া কোন কষ্ট বোধ হয় না। ডাবের জল, পাকা পেঁপে, সুমিষ্ট কদলী, অসময়ের তরমুজ, খরমুজ,—সমস্তই সেই পর্ব্বতের নিজস্ব সম্পত্তি। তাহার উপর পাণ্ডাপরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুমিষ্ট বাক্য, মধুর অকপট পরিচর্য্যা;—শ্রান্তি যেন নিবাইয়া দিল।

সর্ব্বোপরি কি অপরূপ দৃশ্য! এত বড় সৌন্দর্য্যই বা সাধারণতঃ কোথায় দেখা যায়? পূর্ব্বে যতদূর দৃষ্টি চলে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া কামরূপের নিবিড় পর্ব্বতমালা,—তাহার যেন সীমা নাই, শেষ নাই। গ্রাম, ঘর, লোকালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না; শুধু অরণ্য আর পর্ব্বত;—অবশেষে সেই পর্ব্বতের তরুণ, কিশোর শিশুরা আসিয়া পা ডুবাইয়াছে—ঐ মহাজলপ্রবাহী, বিশাল ব্রহ্মপুত্রের ঠিক মাঝখানে! জলের মধ্যেই কত ছোট-ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া বসিয়া আছে; তাহাদের পায়ের তলায় জল আছড়াইয়া গুরুগম্ভীর শব্দে ডাক দিতেছে;—সে জলের উচ্ছলতার সীমা নাই—বর্ণনা নাই!

ব্রহ্মপুত্রে তখন বন্যা;—কূল ছাপাইয়া, চড়া ডুবাইয়া নদ-জল তাহার পাশের পাহাড়গুলির উপত্যকার মাঝে-মাঝে খেলা করিতেছে। জল;—শুধু পাহাড়, আর জল! ও-পাশের পর্ব্বত-চূড়ার স্থির প্রতিবিম্ব জলে ভাসিতেছে। আর এ-পারটি অস্তপ্রায় রক্ত সূর্য্যের দীপ্ত আলোকে ঝলমলায়মান বারিরাশির উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া! তাহার পায়ের তলায়, পাহাড়ের ছায়ায়, নদীতীরে একটু স্থান পাইয়া গৌহাটী সহর আপনার ক্ষুদ্র দেহখানি সাজাইতে ব্যস্ত;—দূর হইতে তাহার শুভ্র, সজ্জিত মূর্ত্তি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

উমখরা নদী

ক্রমে সূর্য্য নামিয়া গেলেন। নদ-জলে পাহাড়ের ছায়া ঘন হইতে লাগিল। তাহার পরই শুক্লা-একাদশীর উজ্জ্বল চাঁদ তাঁহার জ্যোতিঃর ভাণ্ডার খুলিয়া আবার এক নূতন শোভার অপূর্ব্ব অভিনয় দেখাইতে লাগিলেন। আমরা

কিন্তু তখন সে রূপে মন ডুবাইতে পারি নাই,—জীবিতাধিক প্রিয় যারা, তারা প্রায় নিঃসঙ্গে কোথায় কোন সুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ যাঁহার দর্শন-আশায় তাহাদের ছাড়িয়াছিলাম, সে আশা পূর্ণ হওয়ার পর—আর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। পরে যখন শুনিলাম যে, ভোর সাড়ে-সাতটায় সার্ভিসের মোটর গৌহাটি ছাড়িয়া যাইবে ও রিজার্ভ মোটরের ন্যায় তাহারা আমাদের উঠাইয়া লইতে আসিবে না, তখন ত আর ভয়-ভাবনার অন্ত ছিল না।

সঙ্গে রুগ্ন;—পাহাড় নামিতে ডুলী চাই; গৌহাটী যাইতে গাড়ীর প্রয়োজন; দ্বাদশীর পারণাদিও সে দিনের অবশ্য কর্ত্তব্য! অথচ গ্রীষ্ম-দিনের সাড়ে সাতটার মধ্যে কি করিয়া এ সব সম্ভব হইবে, ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

কিন্তু উৎসাহী, অধ্যবসায়শীল তারিণীচরণ ভয় পান নাই,—তিনি নিজে সমস্ত ঠিক্ করিয়া দিবেন বলিয়া বড় বেশিই সাহস দিতেছিলেন। আমাদের মনোভঙ্গ দেখিয়া গ্রামের থিয়েটারের বাচ্চাদের জুটাইয়া নাচ-গানের আয়োজন করিয়া দিলেন।

অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গী ও গানের সুর এবং ভাষা শুনিয়া হাসি সম্বরণ করা দুষ্কর। এ দেশী টানে ক্ষীরোদ বাবু, দ্বিজু বাবুর নাটকের মধুর ভাষার যে কি শ্রাদ্ধ হইতেছে, তাহা না শুনিলে বোঝা যায় না। যা হোক, তবু শ্রদ্ধা বটে, বাঙ্গালী নাট্যকারের গানের উপর ইঁহাদের ভক্তির সীমা নাই।

সে রাত্রিতে যা ঘুম হইল, তাহা আর বক্তব্য নহে। ভাবনা যে কেমন করিয়া শ্রান্তি-সমাচ্ছন্ন, দুর্জ্জয়, নিদ্রাকে পরাস্ত করে, সে দিন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। দুই দিনের পথশ্রান্ত উপবাসী ব্রাহ্মণের মুখে কি করিয়া যে পারণের গ্রাস উঠিবে, তাহা ভাবিয়া আরও উত্তেজনা আসিয়াছিল।

শিলং 'বার্ডস-আই' দৃশ্য

কিন্তু পাণ্ডাবাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ধন্য। এ দিকে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত আমাদের কাছে ঘুরিয়া আবার ভোর তিনটায় তাঁহারা রান্না সুরু করিয়াছিলেন। পাঁচটায় উঠিয়া দেখি, চা-দুধ হইতে লুচি-তরকারী, সন্দেশ, ফল-মূল সমস্ত হাজির আছে! ও-দিকে স্নানের জল ও পূজার ফুল-চন্দন প্রস্তুত। পাণ্ডা মহাশয়ও তাঁহার প্রতিশ্রুতি রাখিয়াছেন; সেই রাত্রিতে

পাহাড় ভাঙ্গিয়া লোক পাঠাইয়া গৌহাটি হইতে গাড়ী পাল্কীও উপস্থিত করিয়াছেন।

ভাবনার শেষ হইল; যথাসময়ে গৌহাটির মোটর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। মালের বড়-বড় লরী,—তাহারই উপরে বেঞ্চ সাজাইয়া থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জারের স্থান ও ক্রমোচ্চ সুবিধার সেকেণ্ড ও ফাষ্ট ক্লাস 'কার'গুলি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

প্রায় সাড়ে আটটার সময় মোটরগুলি সব একসঙ্গে গৌহাটী ছাড়িল। পঁয়ষট্টি মাইল দীর্ঘ এই মোটর পথটি অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল; গভীর খদের পাশ দিয়া মুহুর্মুহু লুপ্, বিপরীত-মুখে কখন যে কি আসে, তাহা দেখিবার উপায় নাই। সুতরাং এ পথে অত্যন্ত সাবধানে যাতায়াত করিতে হয়। সেইজন্য এই মোটর কোম্পানী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পথটি ইজারা লইয়া একেবারে আপনাদের
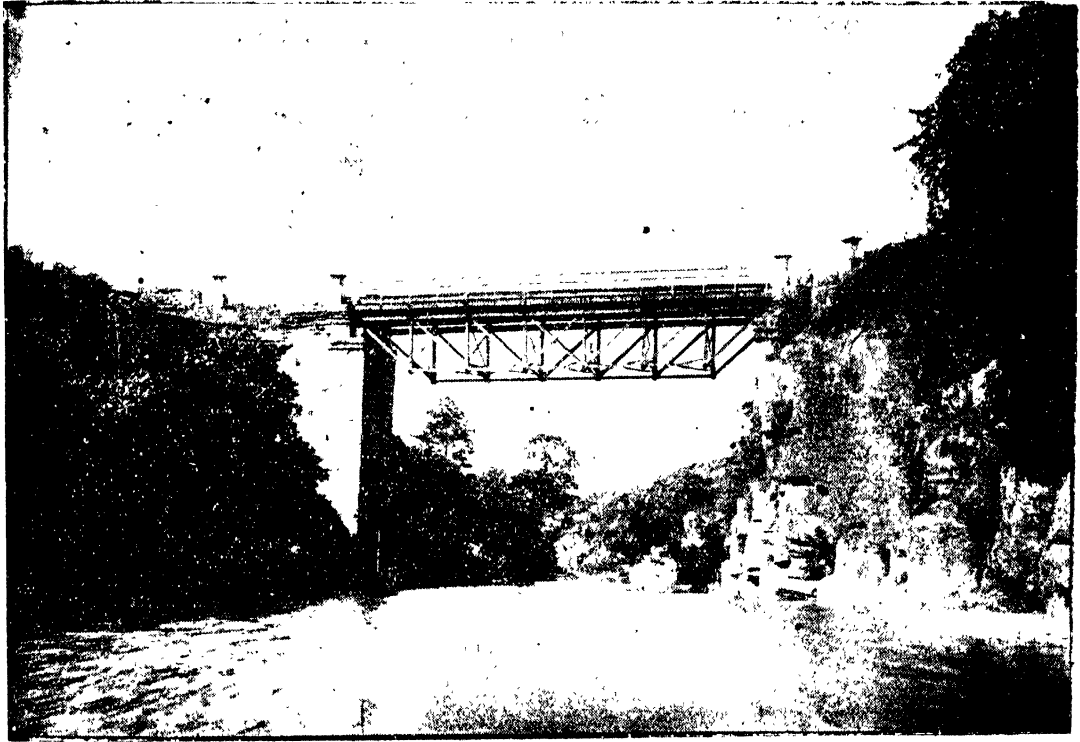
বরপাণী পুল—বরপাণী পর্ব্বত

আমাদের গাড়ী দাঁড়াইতে একজন আসিয়া বলিল,—"আপনারা কি 'অমুক' দলের লোক?" উত্তর শুনিয়া বলিল, "তবে ঐ ঘরে গিয়া বসুন, কথা আছে।"

কি কথা হইল জানি না; অল্পক্ষণ পরে দেখি, আমাদের কল্যাকার সেই মোটরখানিই দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা যায় নাই, কি আদেশ পাইয়া গৌহাটিতেই বসিয়া ছিল, কিছু ক্ষতিপূরণ লইয়া আবার আমাদের লইয়া যাইবে! কথা মন্দ নয়—'দণ্ড' লাগিলেও যত লাগিবার কথা তাহার সিকিও ক্ষতি হইল না; অথচ সার্ভিসের মোটর হইতে ইহা সর্ব্বাংশে সুন্দর।

হাতে রাখিয়াছেন, যাহাতে অন্য কাহারও মোটর তাঁহাদের অজ্ঞাতে অসময়ে বাহির হইতে না পারে।

টেলিফোঁর দ্বারা সব সংবাদ স্থির হইলে, উপযুক্ত সময়ে শিলং ও গৌহাটি হইতে একসঙ্গে মোটর ছাড়া হয় ও মধ্যে নাম্পো ষ্টেশনে দুই দল একত্র হইয়া আবার দুই দিকে বাহির হইয়া যায়। নাম্পোর দুই পাশে,—গৌহাটির দিকে বানীহাট্ ও শিলংএর নিকট উমরাওন্ নামে আরও দুইটি ছোট আড্ডা আছে; কিন্তু তাহাতে বিপরীতমুখী গাড়ীর মিলন হয় না; শুধু সম্মুখ-যাত্রী সব ক'খানি সেখানে দাঁড়ায় ও ড্রাইভাররা বিশ্রাম করে। যত ঘণ্টা যত মিনিটে সে সকল

স্থানে পৌঁছিবার কথা—চালকদের সাধ্য নাই যে, তার ব্যতিক্রম করে। এ হিসাবে লাইনটি ঠিক্ রেল লাইনের ন্যায় সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খলে পরিচালিত।

গৌহাটির পর খানিকটা পথ সমভূম; কিন্তু তবু সুন্দর। দূরে উঁচু পাহাড় ক্রমে সরিয়া আসিতেছে; বনের নিবিড়তা ও উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; ছোট নদীতে খর জলস্রোত—পুলের উপর দিয়া পূর্ণ-বেগে মোটর ছুটিয়াছে।

এক মাইল গিয়া পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ হইল। এইবার হাসি আসিতেছে, হাতের কলম ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে! সঙ্কুল বিস্তৃত আসামী অরণ্য। দূরের দৃশ্য কিছুই দেখা যায় না। শুধু সেই নিস্তব্ধ, নির্জ্জন ছায়ার কোলে-কোলে নিমেষে-নিমেষে ঘূর্ণ্যমান অদ্ভুত পার্ব্বত্য পথ। চালকের দৃষ্টি ফাঁক যায় না—অনবরত হাত ঘুরিয়া চলিয়াছে—তাহার কথা বলিবার অবকাশ নাই।

যাত্রীরা ক্রমে অবসন্ন হইতেছেন; সে ঘূর্ণীতে স্থির থাকা সাধারণ মানুষের কর্ম্ম নয়। মোটর যখন চলে, তখন যা'হোক একটু বাতাস পাওয়া যায়; কিন্তু একটু থামিলে প্রাণ যেন বাহির হইতে থাকে। ছায়ার অভাব
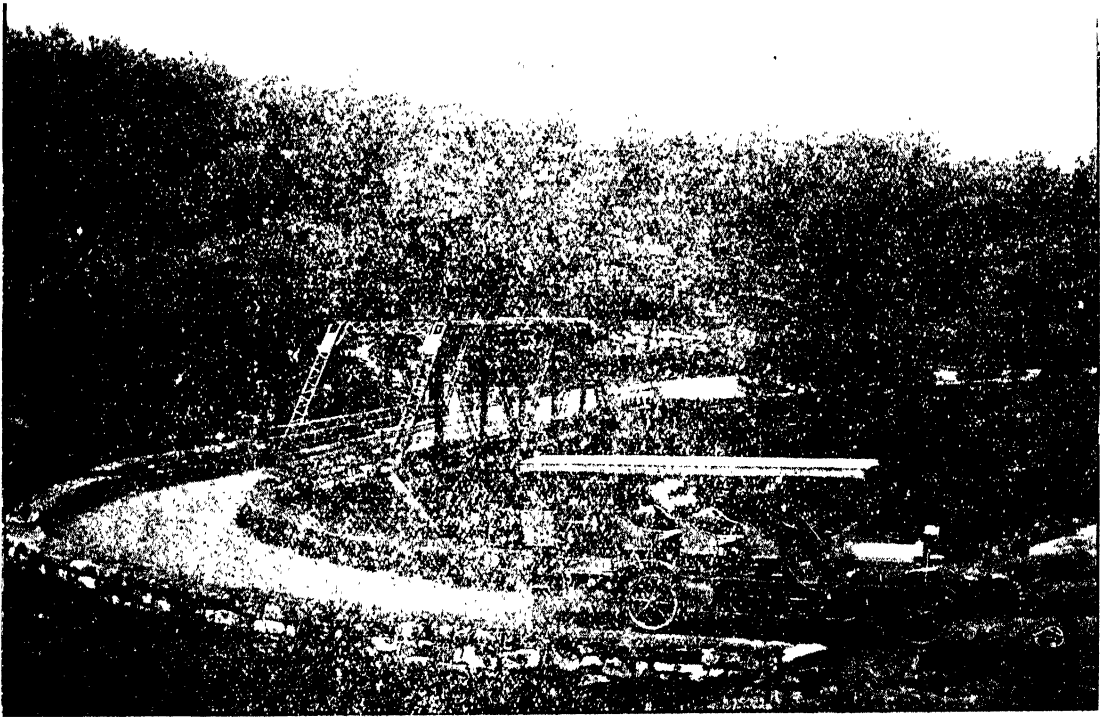
শিলং—চেরাপুঞ্জী রোড

যে দৃশ্য সম্মুখ দিয়া পশ্চাতে চলিতে লাগিল, তাহার বিবরণ লিখিয়া জানাইব কেমন করিয়া? যাঁহারা পার্ব্বত্য-পথে কখনও যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন ত ইহার মর্ম্ম অন্যে বুঝিবেন না।

আকাশ-স্পর্শী পর্ব্বতের গায়ে-কাটা অল্প-পরিসর পথ; তাহার পাশে কোথাও ঢালু, কোথাও খাড়া খদ্ নামিয়া গিয়াছে। নীচে ছোট-বড় নুড়ির গায়ে খরস্রোতা নদী তর্-তর্-বেগে নামিয়া যাইতেছে। পাহাড়ের গায়ে অজস্র শঠীর বন, বেতের ঝোপ, আর সেই কৃষ্ণবর্ণ গভীর গুল্ম- নাই; কিন্তু কি দুরন্ত, গুমোট গ্রীষ্ম—বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন ফুটিতে সুরু হইয়াছে! শিলং-এর শীতের গল্প শুনিয়া আমরা সঙ্গে পোঁটলা বাঁধিয়া গরম কাপড় লইয়া চলিয়াছি বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ী আত্মীয় খুব ঠাট্টা সুরু করিলেন।

সাড়ে দশটার পর গাড়ী নাম্পো ষ্টেশনে আসিল। শুনিলাম, হাজার ফিটের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি। এত পাহাড় উঠিয়া-নামিয়া মোটে এইটুকু আসিলাম? চালক বলিল, বড় পাহাড় উঠিয়া আবার নামিয়াছি যে! নাম্পো খাসিয়া গণ্ডগ্রাম। পাহাড়ের ঢালু গায়ে সরকারী ষ্টেশন, ডাকঘর

বাজার, ডাকবাংলা ইত্যাদি। সাহেবদের মোটর ক'খানি গিয়া সোজা বাঙ্গলায় উঠিল।

আমরা গ্রীষ্মে অস্থির হইয়াছি দেখিয়া ড্রাইভার বলিল, "কষ্ট হয় ত ডাকবাংলায় চলুন, এখানে একঘণ্টা দাঁড়াইতে হইবে।" কিন্তু অনর্থক আমরা সেথানে গিয়া কি করিব? আর অতগুলি মেম্ সাহেবের মধ্যে "হংস মধ্যে বক্—" দাড়াইবই বা কোথায়?

ইতিমধ্যে শিলং-প্রত্যাগত "ইউরোপীয়ান্" দলও সেখানে জুটিলেন। প্রভাতে নবজাগ্রত পক্ষীবহুল বৃক্ষের আচ্ছন্ন; পথের ঝরণার নির্ম্মল পানীয়ের আশায় আমরা তাহা স্পর্শ করিলাম না। বাঙ্গালী যাত্রী নাই বলিলেই হয়। ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা অধিকাংশ খাসিয়া। একজন আসিয়া আমাদের নাম ধাম, কোথায় যাইতেছি, কেন, কি বৃত্তান্ত, কোন্ ঠিকানায় কাহার কেয়ারে উঠিব, কি উদ্দেশ্যে চলিয়াছি,—সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া লইল। তাহাতে আমাদের বিরক্তি দেখিয়া সাদরে, সসম্ভ্রমে বুঝাইল যে, "এখানের নিয়মই এই। শিলং পথের যাত্রীদের নিকট সব পরিচয় না পাইলে সেখানে যাইতে দেওয়া হয় না।"

শিলং—গৌহাটী রোড

ন্যায় ডাক-বাংলাটি যেন চঞ্চল, মুখর হইয়া উঠিল। মধ্যাহ্নে তৃষিত, ক্ষুধার্ত্তের দলে;—পান-আহারের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। খান্‌সামারা বিব্রতভাবে যেন নাচিতে লাগিল।

আমাদের দেশীয়রা পথের ধারের সেই সামান্য বাজার হইতে কলা, কাঁঠাল, পাউরুটি কিনিল। আমাদের ভাগ্যে পাণ্ডা-প্রদত্ত ডাব ব্যতীত আর কিছুই জুটিল না! কদলী বিস্বাদ, কাঁঠাল অর্দ্ধ-'পক্ক'। পরন্তু সেই পরিপুষ্ট মিষ্ট ডাবের জলে ও শস্যে আমরা অতৃপ্ত ছিলাম না। পথের ধারে বৃহৎ জলাশয়। অর্দ্ধেক জল কণ্টকিত পত্র, ফলে

নাম্পো হইতে বহুদূরে শিলং পাহাড়ের দৃশ্য। চালক দেখাইয়া বলিল, "ঐ দেখুন শিলংয়ের ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দিগন্তব্যাপী নীল জলদমালার ন্যায় আকাশ-চুম্বী পর্ব্বতের দেহে সবুজ, শুভ্র, কতবর্ণের আভাস দেখা যায়। কিন্তু এই পঁয়ত্রিশ মাইল দূর হইতে গৃহাদির দৃশ্য দেখা যাইবে? অসম্ভব মনে হইতে লাগিল। কিন্তু সেখান হইতে দৃশ্যমান পর্ব্বত-তরঙ্গের সর্ব্বোচ্চে দণ্ডায়মান গভীর নীল মহাপর্ব্বতের প্রতি চাহিতে ভক্তি-বিস্ময়ে মন ভরিয়া গেল। এত উঁচু? হিমালয় নয়, কিছু না—

কিন্তু ঐ সামান্য (?) খাসিয়া পাহাড়ের এমন অপরূপ ভীম-ভৈরব-কান্তি! এতটা ধারণা ছিল না সত্য। তাহার অর্দ্ধাংশ নিম্নে জলন্ত রৌদ্রে কি যেন সবুজ বর্ণের বিচিত্র বিন্যাস, থাকে-থাকে সবুজের স্তর নামিয়াছে। চালক বলিল, "ঐ বাগানবাড়ী ইত্যাদি"। তাই কি? কি জানি, দেখা যাইবে।

গ্রীষ্মে যখন আমাদের ধৈর্য্যকে পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিল, তখন সমস্ত সঙ্গী-মোটরগুলি চলিয়া যাওয়ার বহুক্ষণ পরে, বকুনির পর বকুনি খাইয়া হেলিতে দুলিতে আমাদের পাঞ্জাবী ড্রাইভার-প্রবর গাড়ীতে দম লাগাইতে লাগিলেন। "কুছ পরবায় নেই, উও লোক সব পিছ রহেগা"—বলিয়া কৌতুক-পরিহাস করিয়া ভীষণ বেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

এবার পথের মূর্ত্তি ক্রমশঃ অন্য রূপ ধরিতেছে। পর্ব্বত লঙ্ঘন অপেক্ষা উত্থানের ভাগই বেশি। সামনের উঁচু পাহাড়ে শিল্লংয়ের ছবি ঢাকিয়া গেল। পথের নীচে নদী যেন রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরিতেছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথরের বুকে বর্ষাস্ফীতা তরঙ্গিণীর সে অদ্ভুত খেলা না দেখিলে বোঝা যায় না। প্রপাতের পর প্রপাত,—বড়-বড় হাতীর পিঠ বহিয়া জল যেন লাফালাফি আরম্ভ করিয়াছে! কখনো পাহাড় হইতে একেবারে বহু নিম্নে ঝম্প—কখনো পাষাণ-সঙ্কুল গুহা-পথে বাধার ভৈরবোচ্ছ্বাস,—ছল-ছল, কল-কল ভীষণ শব্দ!

দুই পাশে বিশাল মহারণ্য। দীর্ঘ তরুর তলদেশ লতা-পত্রাচ্ছন্ন;—আর সেই লুণ্ঠিত গুল্মরাশির সঙ্গে মিশিয়া পার্ব্বত্য-নির্ঝরের ছোট-বড় জলধারা আসিয়া সেই বৃহৎ নদীতে পড়িতেছে। পতনস্থল আরও উচ্ছল, আরও কলরবপূর্ণ। আমাদের সাথী কয়টি সকলে একপাশে ঝুঁকিয়া সেই নদীর যাত্রা-পথটিই দেখিতে লাগিলেন।

রৌদ্রের তেজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল, বাতাস মধুর, উষ্ণ। ব্যবসায়ী বলিলেন, "এই ত আপনাদের শীত এসেছে, এবার কম্বল বাহির করুন!"—এবার আমাদেরও সাহস আসিয়াছে; উত্তর হইল, "থাম, এখনই পথ ফুরায় নি; এখন 'বিহা কাঁ বিহান্' মাত্র।"

ঘণ্টাখানেক পরে সে বনের দৃশ্য শেষ হইল। তাহার পর আর এক নূতন শোভা। তরুলতাশূন্য, নবীন দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত পর্ব্বতের অভিনব মূর্ত্তি 'আসে-পাশে, পুরোভাগে' সমুদ্র-তরঙ্গের মত লুটাইয়া পড়িল। প্রায় দশ-বার মাইল যতদূর দৃষ্টি চলে—সেই অন্তহীন শ্যামলতা, পথের মাথার উপর শ্যাম, পায়ের তলায় শ্যাম—আর হাত বাড়াইলে সেই পর্ব্বতমালার রমণীয় নারী-মূর্ত্তির কোমল শ্যামাঞ্চল-খানি স্পর্শ করিয়া আসা যায়। স্তরে-স্তরে পাহাড়, তাহার গায়ে পাহাড়িয়ারা শস্য বুনিয়াছে। বেষ্টনীভরা নির্ঝর-জল—যেন জলের সোপান নামিয়া যাইতেছে। পর্ব্বতের মাথার উপর বিদ্যুতের তার—গা বহিয়া মোটর-পথ—আর নীচে সেই সেই ভীষণা নদী।

ইহাই বরবানী পাহাড়। নদ-নদীর লীলায়, শস্য-সম্পদে ইহা এ দেশের খ্যাতনামা স্থান। বুঝিলাম, ইহারই শ্যামল চিত্র নাম্পো হইতে শিলং পাহাড়ের গায়ে আঁকা দেখিয়াছিলাম,—পাহাড়ের উঁচু-নীচু স্তরবিন্যাস দূর হইতে রেখার পর রেখার ন্যায় দেখাইতেছিল।

বড়-বড় নদীর উপর, প্রপাতের উপর, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ব্রিজ বহিয়া আমাদের মোটর শিলং পাহাড়ের তলে আসিয়া পড়িল। সেখানে তখনও রৌদ্র; কিন্তু পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া দেখি তাহার সমুচ্চ দেহখানি যেন শুভ্র মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে। দেখিয়াই বুঝিলাম—ইহাই সেই চালক-কথিত গৃহ-দৃশ্য।

পথের প্রকৃতিও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। পাহাড়ের গায়ের সে লজ্জাবতী লতার স্থলে ফার্ণের আকারে নানাবিধ লতা গুল্ম। ফুলের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়াছে। পাথর বহিয়া ঝরঝর জল বহিতেছে—তাহাতে নানাবিধ শ্যাওলা। একটি ছোট গাছ ছিঁড়িয়া চালক বলিল, "ইহাই খাসিয়া পাইন। দেখিবেন, সেখানে এই গাছের কত সুন্দর-সুন্দর বন আছে। পাহাড়ে ইহা ভিন্ন বড় গাছই নাই।"

ছোট্টো একটুখানি ঝাউয়ের চারার মত কচি গাছ-টুকু, দেখিয়া ত হাসিয়া বাঁচি না! এই সেই পাইন! আল্পসের, হিমালয়ের ছবিতে যার সুদীর্ঘ বিচিত্র চিত্র দেখিয়া চিরদিন মুগ্ধ আছি, সেই পাইন! ভুল ভুল; মানুষটা বাহাদুরী দেখাইতেছে মাত্র।

কিন্তু, না—ভুল তাহার নয়, আমাদেরই। শিলং-এ উত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে মেঘমণ্ডিত-অবয়ব বৃক্ষশ্রেণীর মহিমময় দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চিক্কণ-কান্ত, দীর্ঘায়ত, বিশাল-কলেবর তরু, পাষাণবক্ষ হইতে যতদূর পারে পর্ব্বতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। শূন্যে অবকাশ পাইয়া তাহারা

সর্ব্বত্রই পাহাড়কে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সে বনের কি শোভা!—কাণ্ডে-কাণ্ডে লতালিঙ্গন; কোথাও নগ্ন দেহের শুভ্রতা;—উর্দ্ধচূড়, কৃষ্ণবর্ণ পত্রগুচ্ছের মাথায় কোমল, সবুজ পত্র-কলিকা। নিবিড় বন, কিন্তু কোথাও আঁধার নাই। ঝুরি-ঝুরি পাতার অবকাশে তুষারমণ্ডিত শূন্যদৃশ্য মেঘছায়া-লিপ্ত সমুদ্রের ন্যায় দেখাইতেছিল।

উর্দ্ধে উঠিবার সবটুকু বেগ চালক ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার দৃষ্টি তন্ময়। ঘড়-ঘড় শব্দে পথ মুখরিত করিয়া গাড়ী কেবল উপরে উঠিতে লাগিল। ঘূর্ণীর সীমা নাই। একটি পর্ব্বতকেই পুনঃ পুনঃ বেষ্টন করিয়া, অদ্ভুত দৃশ্যের মায়া দেখাইতে-দেখাইতে মোটর শিলংএর গা বহিয়া উঠিতে লাগিল।

এইবার আমাদের ব্যবসায়ীর দর্পচূর্ণ হইয়াছে। শীতের মাত্রা অনেকক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল; আমরা নিজের-নিজের বস্ত্রাদির সদ্ব্যবহার ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁহার সেই পাৎলা পাঞ্জাবী ও উড়ানিখানিকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন; অর্থাৎ কখন মাথায়, কখনো গায়ে জড়াইতেছিলেন। লজ্জায় অন্য কাহারও নিকট চাহিবেনও না; আর কেহ দিতে গেলে (অবশ্য তাহা ঠাট্টায় কণ্টকিত!) রাগিয়া "কেন, এমন আর কি শীত যে, মলিদা মুড়ি দিতে হবে? বেশি-বেশি হয় তো আমার কোট বাহির করিব" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন।

মোটর ক্রমে শিলংএ উঠিল। তাহার পর সেই মেঘরাজ্য বহিয়া দ্রুতগামী যানের উদ্ধশ্বাস যাত্রা!—জলকণবাহী প্রবল বায়ু মাথা, মুখ আর্দ্র করিয়া যাইতেছে। যে দিকে দৃষ্টি চলে, শুধু মেঘ আর মেঘ। শূন্যপথে রৌদ্র দেখা যায়; কিন্তু পাইন্-বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতছায়ার মধ্যে সে পথে পর্ব্বত-গাত্রে লুণ্ঠিত মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। উড্ডীয়-মান বাষ্পরাশি পাহাড়ের গায়ে আট্‌কাইয়া গিয়াছে। কখনও বা ঝর-ঝর্ করিয়া বৃষ্টিই হইয়া গেল।

আমাদের সাহসী বন্ধুর চক্ষু স্থির হইয়া আসিতেছিল! সিল্কের বাহারে কোটে তাঁহার শীতরোধ হয় নাই;—উড়ানী পাগড়ীতে পরিণত হইল, মোজাশূন্য চরণ দুটি মোটরের তপ্ত স্থানটিতে বসিল; উত্তেজনা বাড়াইবার জন্য তখন তিনি বাঙ্গালা ভাষা ত্যাগ করিয়া নিজের মাতৃভাষার ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পশ্চাতে উপবিষ্ট পরিহাস-সম্বন্ধীয়েরা যে হাসিয়া অস্থির হইতেছে, সে দিকে যেন তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই; মোটর-চালকের সহিত শিলংএর বৃত্তান্ত লইয়া কতই যেন ব্যস্ত!

ক্রমে পথের অবসান হইয়া আসিল। উর্দ্ধে—দূরে, শিলংএর শ্রেণীবদ্ধ ক্রমোচ্চ অবস্থানটি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। বনভাগ কিছু হাল্কা, পর্ব্বত যেন ঈষৎ সমতলের ন্যায়; প্রপাত-মুখর একটা বড় নদীর পুল পার হইয়া আমরা সেই পার্ব্বত্য নগরীর সজ্জিত বাজারে প্রবেশ করিলাম।

(৩)

শিলংএর নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সাধারণ পার্ব্বত্য দেশের যেমন হয়, প্রায় তেমনই। সেই গিরিগাত্রবাহী উচ্চ-নীচ পথ,—সর্ব্বত্রব্যাপী অজস্র কুসুমসম্ভার, আর চারিদিকে দণ্ডায়মান অরণ্যসমাকুল পর্ব্বতমালা!

এখানকার বনের বিশেষত্ব—সেই খাসিয়া পাইন,—যাহার প্রকৃত নাম 'ফার'। তথায় ঘন-সন্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ সুন্দর ফার-বৃক্ষরাজি ভিন্ন অন্য গাছ প্রায় নাই-ই।—কচিৎ অন্যান্য দু'একটা পার্ব্বত্য-বৃক্ষ দেখা যায়; কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। আরও দেখা যায়, হিমসম্ভূত বিচিত্র শৈবালের শোভা! পথের ধারে-ধারে পাহাড়ের গায়ে তাহারা যেন বিচিত্র বর্ণের ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে!—অন্যান্য পর্ব্বত-নগরীর তুলনায় শিলংএর সুবিধা এই যে, এখানে প্রায় সর্ব্বত্রই মোটর চলে। কিন্তু এ সকল স্থানে পদব্রজে ভ্রমণের যে আরাম, ঐ দ্রুতগামী শব্দায়মান যানে সে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীটোলা—লাবান্ দেখিতে তত সুশ্রী নয়; কিন্তু সাহেব মহল্লাগুলি মনোরম। যেন অতি সন্তর্পণে ছবি আঁকিয়া, পাহাড়টিকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বক্র পথের উপরে সারি-সারি সজ্জিত জাপানী ফ্যাসানের বাংলো, বিলাতী ফুলে-ফুলে আচ্ছন্ন উদ্যান, পথ-রেখা—বেষ্টনী। উইলো, সাইপ্রস্—হিমালয়ান্ ও জাপানী পাইন্, এই সকলের সমাবেশে বন্য-পর্ব্বতকে সাহেবেরা যেন স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত করিয়াছেন।

তাহার পরই—পথরেখার গা-বহিয়া খদ্ নামিয়া নীচের নদীতে শেষ হইয়াছে। পিচ্ ও নাস্‌পাতীর জঙ্গল; ছোট-ছোট ফারের ঝোপ্। নদী কোথাও দেখা যায়, কোথাও বা সে শুধু তার ঝঙ্কৃত কলতানে নিজের অস্তিত্বটুকু জানাইয়া দেয়।

নির্ঝর-লীলার যেন সীমা নাই!—যেখানে যে পথে যাও—পর্ব্বতগাত্রবাহী দ্রুতগামী জল-স্রোত ও পথনিম্নের "উগ্রখরা" নদী যেন সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছে।—যেখানে কচিৎ সে নদী দূরে চলিয়া যায়, সেখানেও সেই প্রবাহিত শত-নির্ঝর-ধারা নীচে নামিয়া নিজেরাই এক-একটি ক্ষুদ্র নদী স্বজন করিয়া লয়।—শুনিলাম, বর্ষার জন্যই শিলংএর এ নূতন মাধুর্য্যটির সৃষ্টি হইয়াছে। জলের এ অপূর্ব্ব লীলা বা মেঘের সেই ক্ষণপরিবর্ত্তিত হিমপ্রকৃতিসুলভ দৃশ্য অন্য সময় প্রায় দেখা যায় না।

সর্ব্বত্রই নয়নরঞ্জন দৃশ্যাবলী, বৃহৎ-বৃহৎ বন, উঁচু পাহাড়-পার্ব্বত্য-পথ-বিহারিণী পাষাণ-সঙ্কুলা গিরিনদীর মহিমময় দৃশ্যগুলি বাদ দিয়াও, যাহা মনুষ্য-রচিত তাহারই বা তুলনা কোথায়? "ওয়ার্ডস্ লেক" নামক শিলংএর বিখ্যাত হ্রদটি দেখিতে কি কম সুন্দর?—অনেকগুলি জলধারা ধরিয়া বাঁধ দিয়া সেই হ্রদ বা ঝিল্‌টির সৃষ্টি; আঁকিয়া-বাঁকিয়া, পর্ব্বতের ছায়া বুকে লইয়া, উদ্যানমধ্যবর্ত্তিনী সেই পরম সুন্দর জলরাশি!—আলো-ছায়া, লতাফল, বিশ্রাম স্থান, নৌ বিহার,—সমস্ত মিলাইয়া এই স্থানটির মত আরাম উপভোগের জায়গা শিলংএর আর কোথাও পাওয়া যায় না। জলের উপর অপূর্ব্ব সজ্জার সুন্দর সেতু, বাঁধের পাশ বহিয়া বক্র-পথে প্রপাত লীলার বিচিত্র জলযাত্রা না দেখিলে লিখিয়া বোঝানো যায় না।—তাহার স্বজনে মনুষ্য হস্তের উদ্যম ও কারুকার্য্য পরিস্ফুট; তবু সর্ব্বত্রব্যাপী সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া তাহা এমন স্বভাবচাতুর্য্য দেখাইতেছে যে, সেই লম্বিত সলিল-সোপান—উৎক্ষিপ্ত পথচ্যুত বক্রধারার জল-রাশি মানুষের দ্বারা চালিত বলিয়া বোধ হয় না।

হ্রদের এক পাশে উচ্চ স্থানে সাহেবদের ক্লব। আশে-পাশে আরও কয়েকখানি সজ্জিত গৃহ। কিন্তু এ অঞ্চলে বাঙ্গালী বা অন্য কৃষ্ণকায়দের বাস বা ভ্রমণ কিছু সাবধান-তার ব্যাপার, খোলা গা বা পুরুষের মাথায় খোলা ছাতা—এখানে নিষিদ্ধ!—"ইউরোপিয়ান্ ষ্টাইল" নামক সম্পূর্ণ বিদেশী সামগ্রীটুকু লইয়া এখানে যেমন বিড়ম্বনা দেখিলাম, এমন বোধ হয় আর কোথাও হয় না। আমাদের সাধারণ বাঙ্গালীদের উচিত নয় যে, শিলংএর সাহেবপাড়ায় গিয়া বাসা লন। তাঁহাদের পক্ষে সেই মোটরের অগম্য স্থল—কুৎসিত 'লাবান'ই শ্রেয় বাসস্থান!

সভ্য খাসিয়াদের আবাসপল্লী মোটেরত মন্দ নয়। তাহাদের ঘর-দ্বার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায় প্রায় ইংরাজ-পল্লীর মতই সুশ্রী;—তবে এই খাসিয়ারা প্রায় সকলেই খৃষ্টান ও ধনাঢ্য। সাধারণ অসভ্য খাসিয়াদের পার্ব্বত্য-কুটীর আবার তেমনি বিশ্রী ও অপরিচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের চরম নিদর্শন।

শিলং সহরটি এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের প্রায় শিখর-দেশে অবস্থিত বলিয়া, ইহার পর চারিদিকে কোথাও আর উচু চূড়া দেখা যায় না। পাহাড়ের কোথাও সামান্য-সামান্য সমতলভূমি, আর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ছোট-বড় পর্ব্বত চূড়া।

এই পাহাড়গুলির গায়েও মোটর-পথ চলিয়াছে। সে পথে বেড়াইলে খাসিয়া ও উপনিবেশিক নেপালীদের দরিদ্র, সরল জীবন যাত্রার অনেক চিত্র দেখা যায়। এখানকার জলবায়ু নেপালীদের নিজেদের দেশের জলবায়ুর সদৃশ; শরীর সুস্থ থাকে বলিয়া অসংখ্য নেপালী এখানে আসিয়া স্থায়ী আড্ডা পাতিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে তাহাদের কুটীর, ক্ষেত্র, সব্জি বাগান। কেহ বা বিস্তর ছাগল ও গরু পুষিয়া সংসার চালাইতেছে। মোটরের কাযে তাহাদের প্রয়োজন হয় ও তাহাতে যথেষ্ট পারিশ্রমিক পায় বলিয়া পঞ্জাবীরাও দলে দলে আসিয়া জুটিতেছে।

মরুভূমি মাড়বার দেশের অনেক জাঠ কৃষককেও এখানকার সুলভ উর্ব্বর ভূমির মালিকরূপে অধিষ্ঠিত দেখিলাম।

খাসিয়াদের কথা বেশি কিছু বলিবার নাই; কারণ ইতিপূর্ব্বে বহুবার তাহাদের কথা আলোচিত হইয়া গিয়াছে। অন্য দেশের অসভ্য পার্ব্বত্য-জাতির তুলনায় ইহারা ভদ্র ও ইহাদের পরিচ্ছদাদি সভ্য। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া ইহাদিগকে অনেক শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। ইহা-দের মধ্যে ধনশালী লোকও অনেক আছেন; তাঁহারা বেশ পরিচ্ছন্ন। ছবি দেখিয়া বা খাসিয়াদের কথা শুনিয়া আমরা পূর্ব্বে যাহা ধারণা করিয়াছিলাম—প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তেমন নয়।

বলেও তাহারা অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় অনন্য-সাধারণ। স্ত্রীলোকদের পর্য্যন্ত পায়ের গঠন দেখিলে, শ্রমশীলতা ও বলিষ্ঠতার আভাষ পাওয়া যায়। 'থাপা'

নামক এক প্রকার আসনে (পিছনে বেষ্টনীওয়ালা মোড়ার মত) দিব্য বলিষ্ঠকায় পুরুষদের বসাইয়া খাসিয়ারা দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠে ও নামে। পুরস্কারের প্রলোভন-ব্যগ্র 'খাপা'-বাহীরা কখনো কখনো এমন প্রতিযোগিতার দৌড় দেখায় যে, তাহাদের শক্তি, সাহস ও অভ্যাস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

মোট কথায় শিলং সহরটি কোমল, রমণীয়, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেশ। জলে স্থলে, গৃহাদির বিচিত্র বিন্যাসে, অন্যান্য পার্ব্বত্য নগরীর তুলনায় ইহা কোন অংশে নিন্দনীয় নয়। বরং দার্জিলিঙ্গের উগ্র শীত, স্যাঁতসেঁতে ভাবের বিরক্তিকর অবসাদের শিথিলতার হাত এড়াইয়া এখানে যেন স্বস্তি পাওয়া যায়।

আবাস-বাটিগুলিও তেমনি আরামপ্রদ; শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সর্ব্বকালের উপযোগী ভাবে নির্ম্মিত এই কাচ-প্রধান কাঠের বাসস্থান, একান্ত গোঁড়া হিন্দু ব্যতীত সকলের পক্ষেই সুখের স্থান।—আর শিলংএর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ফুল। যে কোন বাড়ীই হউক না কেন, আনন্দদর্শন, ছায়া-সুকুমার ফার বন ও ফুলের বাগান তাহার চারিদিকে চিত্রের শোভা পাতিয়াই রহিয়াছে! তবে 'লাবানের' কথা স্বতন্ত্র।

শিলংএর বাজারও মন্দ নয়। বিশেষ বড় না হইলেও, প্রয়োজনীয় বা সৌখান সামগ্রী প্রায় সমস্তই পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া গ্রীষ্মকালে সেখানে তরী-তরকারীর বড় সুখ। কপি, আলু, মটরশুটি অসম্ভব সস্তা; শিম, বেগুন, মূলাও যথেষ্ট।

কিন্তু মাছের সুবিধা মোটে নাই। সপ্তাহে দুই দিন হাট—সেই দুইদিন ব্রহ্মপুত্রের বড় মাছ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাও প্রায় পচা ও দুর্ম্মূল্য। অন্য দিনে খাল-ঝিলের ছোট মাছ—বহুমূল্য মাগুর, সিঙ্গিমাছ খুঁজিলে পাওয়া যায়।

মাংসও সুবিধামত নয়। সকালে পাওয়া কঠিন; দশটার পর যা পাওয়া যায়, তাহাতে কোন মতে চলে মাত্র।

হাসির কথা—এখানে মাটি পাওয়া যায় না! প্রচুর বালিমিশ্রণা পাওয়া যায়, তাহাতে কোন মৃৎপাত্র প্রস্তুত হয় না বলিয়া, এখানে সরাখানিরও অসম্ভব দাম। কদলী, শাল বা কোনরূপ বড় পাতা পাওয়া যায় না বলিয়া, আমাদের পত্রাভ্যস্ত হাতে রন্ধনের বড় অসুবিধা। কলে সর্ব্বত্র ঝরণার জল সরবরাহ হয় বলিয়া, প্রায় মধ্যে-মধ্যে জলের অল্পতা, বিবর্ণতা বা অভাবও ভোগ করিতে হয়। কল বন্ধ হইলে কিন্তু আর কোথাও জল মিলিবার উপায় নাই! চারিদিকে নদীর মালা ছড়ান, কিন্তু তাহা এত নীচে যে সেখান হইতে জল আনা একেবারে অসম্ভব।

অন্য সব যাহাই হউক, এখানে প্রাণান্ত হয় তাম্বূল-বিলাসীগণের। গোহাটি হইতেই এ অঞ্চলে গাছ-পাণের ব্যাপার সুরু হইয়াছে। বরোজের সে কোমল, সুগন্ধ, মিষ্ট পাণের পরিবর্ত্তে গাছের উপরে লম্বিত তাম্বুল-লতার পুরু, ঝাল, বিস্বাদ পাণ খাইতে যেন জিভ্ আড়ষ্ট হইয়া আসে। খাসিয়া স্ত্রী-পুরুষে অসম্ভব রকম পাণ খায়। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের মুখে সর্ব্বদাই পাণের রং কষ বহিয়া আছে। পথে-ঘাটে, কাযে বা ভ্রমণে যে অবস্থায় হৌক্ না কেন, পাণের সরঞ্জাম তাহাদের সঙ্গে থাকে।—কিন্তু ঐ পাণ। আমাদের দেশী পাণ খাইয়া সে দেশের মেয়েরা বড় খুসী হইত।

শিলংএর সাধারণ কথা বা দৃশ্যের হিসাব এমনি। তবে প্রাকৃতিক রূপ দেখিতে গেলে ত অল্প দিনে বা অল্প কথায় শেষ হয় না। প্রতিদিনের প্রতিকালের মধ্যে ইহার স্বতঃ-পরিবর্ত্তিত মাধুর্য্য—সে ত চিত্রিত করিয়া দেখানো কঠিন। মেঘে, জলে, ছায়ায়, রৌদ্রে, গন্ধে, বায়ুতে অথবা জ্যোৎস্না রাত্রিতে এবং সূর্য্যোদয়ের নিরুপম সৌন্দর্য্যের চঞ্চল লীলা-বৈচিত্র্য শুধু দেখিবার সামগ্রী।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছড়াছড়ির মধ্যেও কয়েকটী সুন্দর ও বৃহৎ জলপ্রপাত সকলেই দেখিতে যান। তাহার মধ্যে এলিফেণ্টার দুইটি এবং বিডন ও বিশপ্ প্রপাতই শ্রেষ্ঠ। "এলিফেণ্টা" শিলং চেরাপুঞ্জী রোডের ধারে, পথ হইতে প্রায় আধমাইল দূরে, একটি দুর্গম পর্ব্বত সঙ্কটের মধ্যে অবস্থিত। সেখানে যাইতে হইলে শিলংএর সর্ব্বোচ্চ চূড়া পার হইয়া যাইতে হয়। সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্যের অপেক্ষাও এই পথ ও প্রপাতটির দৃশ্য গৌরব-গম্ভীর ও হৃদয়-স্তম্ভন।

অপর প্রপাত দুইটি শিলং হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে "শিলং-গোহাটি" রোডের ধারে অবস্থিত; এবং এলিফেণ্টা অপেক্ষা উচ্চ স্থান হইতে পড়িলেও দেখিতে তত সুন্দর নয়; জলও অল্প।—এখানে যাইবার পথ আরও দুর্গম।

চেরাপুঞ্জী পথের নিকট "মৌস্‌মাই" নামক ভীষণ উচ্চ প্রপাতটিই এ দেশের—কেবল এ দেশের কেন, উচ্চতায় সে পৃথিবীরই সমস্ত প্রপাতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। কিন্তু সেই ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের পর তাহার রূপের ন্যূনতা ঘটিয়াছে। প্রচুর জলরাশি নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রপাত-পথে আর সে অজস্র বর্ষণ নামে না। তবু সেই ভীম-দর্শন আকাশচুম্বী কৃষ্ণ-পাষাণের অঙ্গপ্রবাহী চিক্কণ জলধারা—তাহাও কম সুন্দর নয়!

শীত বা বর্ষার সময় চেরাপুঞ্জী পথের যাত্রীগণ যেন সঙ্গে শীতবস্ত্র রাখেন। এই পথে অত্যন্ত শীত ও কোয়াসা। আমরা সকলে এখানে আসিয়া, অসম্ভব বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া, বড় কষ্ট ভোগ করি ও তাহারই ফলে মহা অসুস্থতায় শিলং ত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

পথে গৌহাটিতে আমাদের থাকিতে হইয়াছিল। বাংলা দেশের মধ্যে চট্টগ্রাম ও এই আসাম,—ইহাদের মত সুন্দর স্থান ত আর নাই! তাহারও মধ্যে কর্ণফুলী-চুম্বিতা চট্টলা রূপসীর অপেক্ষাও এই গিরিচূড়া-গর্ভ ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশিবেষ্টিতা পর্ব্বত-কিরীটিনী গৌহাটি আরও সুন্দর, আরও মহিমময়ী। দেড় কিম্বা দুই হাত প্রশস্ত সুদীর্ঘ শাল্‌তীই ব্রহ্মপুত্রের সাধারণ নৌকা। ইহাতে বসিয়া সে ভীষণ পাষাণ-কণ্টকিত নদবক্ষে বিচরণ—যতখানি ভয়ের, ঠিক্ ততখানিই আনন্দের। গৌহাটি সহরটিও স্থানে-স্থানে অপরিস্কার হইলেও অধিকাংশই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। অতখানি বিচিত্র শ্রীমণ্ডিত শিলং দেখিবার পরও গৌহাটির রূপ বড় ভাল লাগিয়াছিল। বাঙ্গালীপাড়ায় অনেক পাকা বাড়ী আছে বটে, কিন্তু সাহেবদের বাংলা ও সরকারী বাটীগুলি প্রায় শিলং ফ্যাসানে কাঠে ও টিনে প্রস্তুত। সহজসাধ্য বলিয়া সাধারণ গৃহস্থদের বাসস্থানও সে দেশের মত কাঠ ও বাঁশের বেড়ায় সুন্দরভাবে রচিত। সেখানে বাসের কোন কষ্ট নাই। এখানেও পথে-ঘাটে অনেক খাসিয়া দেখা যায়।

ফিরিবার পথে সান্তাহার পার হইয়া পদ্মার মধ্যে—অন্তিম বর্ষার বিচিত্র বন্যার অপরূপ দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে আমরা কলিকাতায় আসিলাম। "নদী ছাড়ি কল কল্লোল জল এল পল্লীর কাছে রে"। ধানের ক্ষেত ভাসাইয়া ছোট-ছোট গ্রামগুলির মাঝ দিয়া সেই সলিল-প্রবাহ, তাহার উপর ডিঙ্গা ও গামলায় আরোহী নরনারীদের যাতায়াত, পল্লী বালকদের জলক্রীড়া, রমণীগণের গৃহচিত্র; আত্রাই ও পদ্মার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য—সবগুলি মিশিয়া সত্যই তখন প্রাণে গীতধ্বনি বাজিতে লাগিল। "শত বরষের ভাব-উচ্ছ্বাস, কলাপের মত হয়েছে বিকাশ, আকুল পরাণ চাহিয়া আকাশ কলরবে ক'রে যাচে রে; হৃদয় আমার নাচে রে, আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে।"

বায়ু ও তাহার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ *

[ডাক্তার শ্রীহরিধন দত্ত রায় বাহাদুর]

সুস্থভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে জ্ঞান সর্ব্বদা আমাদের মনে জাগরূক রাখা দরকার এবং যাহার অভাবে আমাদের পদে-পদে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা লইয়া আলোচনা যতই করা হয়, ততই মঙ্গল। পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে, নিত্য সংঘর্ষণের মধ্যে থাকিয়াও, কি উপায়ে নিজ-নিজ শরীর রক্ষা করা সম্ভব, তাহা সকলেরই জানা উচিত। এজন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রচার সর্ব্বত্র ও সকলের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। বালক-বালিকা, যুবা-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র—সকলেরই এই জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সমাজে এই জ্ঞান সম্যক প্রসার লাভ করিয়াছে—বলা যায় না। নানাবিধ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মধ্যে এখনও আমরা বাস করিতেছি। এখনও এমন অনেক অশিক্ষিত নরনারী আছে, যাহাদের আদৌ ধারণাই হয় না যে, যে বায়ু তাহারা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে, যে জল তাহারা পান করে, যে দ্রব্য তাহারা ভোজন করে, তাহাদের ভিতর নানাবিধ ব্যাধির কারণ লুক্কায়িত থাকিতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র, গাত্র-চর্ম্ম, মলমূত্র ও প্রশ্বাসের সহিত যে ব্যাধির

* কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত।

কারণ বীজ অন্যত্র পরিচালিত হইতে পারে, এ বিষয় তাহাদের বুদ্ধির অতীত। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, কেমন করিয়া সামাজিক রীতি-নীতি, ব্যক্তিগত সংস্কার, আচার-ব্যবহার, নিবাসভূমি, গৃহ, জনতা, জল, বায়ু প্রভৃতির সহিত ব্যাধির সংক্রমণের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। যখন কোন মহামারী উপস্থিত হয়, তখন তাহারা নিজ অদৃষ্টের ও কর্ম্মফলের, বা ভগবানের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কখন বা ভূত প্রেত কর্ত্তৃক ঐরূপ হইতেছে বিশ্বাসে, নানারূপ অদ্ভুত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে।

মানবদেহ রক্ষা করিতে হইলে আমরা যে সকল পদার্থের উপর সর্ব্বদা নির্ভর করিতে বাধ্য, তাহার মধ্যে বায়ুই সর্ব্বপ্রধান। এই "বায়ু এবং তাহার সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের কি সম্বন্ধ" তাহাই আমরা অদ্য আলোচনা করিব। বায়ু না পাইলে কেহই স্বল্পকালও জীবন-ধারণ করিতে পারে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই ক্রন্দন করে; এই ক্রন্দনের উদ্দেশ্যই—নিঃশ্বাসের সহিত বায়ু গ্রহণ করা। জীবনের সেই প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন অবিরামভাবে সে নিঃশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং এই নিঃশ্বাসের সহিত বায়ু তাহার শরীরে প্রবেশ করে। বায়ুশূন্য স্থানে জীবন অসম্ভব এবং ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ুর প্রবেশ বন্ধ হইলেই প্রাণবিয়োগ হয়।

জীবন-ধারণের পক্ষে কেবল যে বায়ুর প্রয়োজন, তাহা নহে, ঐ বায়ু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। দূষিত বায়ুর মধ্যে বাস করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যদি আমরা একটী প্রাণীকে একটা ঢাকনার মধ্যে রাখি, তাহা হইলে অল্প সময় পরেই ঐ প্রাণীটি হাঁপাইতে থাকে, এবং কিছুক্ষণ পরে মরিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, রুদ্ধ পাত্রস্থিত অল্প পরিমাণ বায়ু ঐ প্রাণীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে শীঘ্রই দূষিত হইয়া পড়ে। তখন ঐ দূষিত বায়ুতে থাকিয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। সময় থাকিতে বিশুদ্ধ বায়ু উহার ফুস্‌ফুসের ভিতরে প্রবেশ করাইলে ঐ প্রাণীটি বাঁচিয়া যায়।

বিশুদ্ধ বায়ু কি—বুঝিতে হইলে, বায়ুর উপাদান কি, তাহা জানা দরকার। প্রাচীনকালে বায়ুকে একটী মূল পদার্থ বলা হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার মধ্যে দুইটি বাষ্পের অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়াছিল। আরও শতবর্ষ পরে ঐ দুইটি বাষ্প পৃথকীকৃত হইয়াছে। এই দুইটি বাষ্পের নাম Oxygen ও Nitrogen; এবং ১ ভাগ Oxygen ও ৪ ভাগ Nitrogen এর মিশ্রণে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। বায়ুর মধ্যে এই দুইটি বাষ্প সহজে পৃথক করা যায় এবং উভয়ের মিশ্রণে বায়ু উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উভয়েরই পৃথক অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় না। Oxygen ও Nitrogen ব্যতীত বিশুদ্ধ বায়ুতে Carbonic Acid বাষ্প, Ammonia, জল, বাষ্প ও অপর কয়েকটী পদার্থ অল্পপরিমাণে থাকে।

Oxygen চক্ষে দেখা যায় না, ইহার বর্ণ বা গন্ধ নাই। ইহাই প্রাণিগণের জীবন-ধারণের প্রধান সহায়; ইহার অভাবে কোন জীবই বাঁচিতে পারে না। ইহার আর একটি গুণ—দহন-কার্য্যে সহায়তা করা। বাস্তবিক, ইহা না থাকিলে, কোন পদার্থ দগ্ধ হইত না।

Nitrogen ও অদাহ্য মূল পদার্থ এবং বর্ণ ও গন্ধবিহীন। ইহার দাহিকা-শক্তি নাই এবং ইহা জীবন-ধারণের সহায়তা করে না। কিন্তু জীবন-ধারণের সহায়তা না করিলেও, বায়ুতে ইহার অস্তিত্বের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যদি বায়ুতে কেবলমাত্র Oxygen থাকিত, তাহা হইলে দহন-কার্য্য এত সত্বর ও প্রচণ্ডভাবে সম্পাদিত হইত যে, আমাদের পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব হইত। দাহ্য-পদার্থ অগ্নিসংযোগে অতি অল্পক্ষণেই জ্বলিয়া শেষ হইয়া যাইত। এমন কি কোন দাহ্য পদার্থই গৃহকার্য্যে আমরা নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারিতাম না। যদি বায়ুতে Nitrogen মিশ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের দেহাভ্যন্তরে দহন-কার্য্য এত প্রচণ্ডভাবে চলিত যে, শীঘ্র দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। বাস্তবিক, Nitrogen এর ন্যায় দাহিকাশক্তিশূন্য বাষ্প মহাতেজস্কর দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট Oxygen এর সহিত মিশ্রিত থাকিয়া ইহার প্রবল ধ্বংসকারী শক্তির মৃদুত্ব সম্পাদন করিয়া বায়ুকে সৃষ্টি-রক্ষার উপযোগী করিয়াছে। এইটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল রহিয়াছে, তাহার আভাস পাইয়া আমরা স্বতঃই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি।

Carbonic Acid বাষ্প।—বায়ুর মধ্যে প্রতি ২৫০০ ভাগের মধ্যে ১ ভাগ Carbonic Acid Gas পাওয়া যায়। যদি উহা এই পরিমাণের বেশী উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ঐ বায়ু দূষিত বলিয়া পরিগণিত হয়। নানাবিধ কারণে

ইহার ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জীবনের শ্বাসক্রিয়া, নানা-দ্রব্যের পচন ও উৎসেচন ক্রিয়া হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রশ্বাসের বায়ুতে Carbonic Acid বাষ্পের অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়। চূণ মিশ্রিত জলের ভিতর দিয়া ঐ বায়ু প্রবেশ করাইলে উহাতে জল ঘোলা হইয়া যায় এবং Carbonic Acid এর অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই বাষ্পও অদৃশ্য, এবং বর্ণ ও গন্ধবিহীন। ইহাও দহন কার্য্যের সহায়তা করে না। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী।

Ammonia—বিশুদ্ধ বায়ুতেও অল্প পরিমাণ ammonic বাষ্প পাওয়া যায়। দশ লক্ষ ভাগ বায়ুতে ইহার পরিমাণ ১ ভাগ মাত্র। ইহার গন্ধ উগ্র, ইহা বর্ণবিহীন ও অদৃশ্য। জীবজ পদার্থের পচনে ইহা উৎপন্ন হয়। গোর-স্থান, নর্দ্দামা প্রভৃতির বায়ুতে ইহা বেশী পাওয়া যায়।

জলীয় বাষ্প—বায়ুতে সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকে। আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়তই জল বাষ্পাকারে পরিণত হইতেছে, ও বায়ুর সহিত তাহা মিশিতেছে। বায়ুর মধ্যে ইহার অস্তিত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ইহা হইতেই শিশির, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এগুলি ব্যতীত বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে অল্প পরিমাণ Ozone, ও সামান্য পরিমাণ জৈবিক (organic) পদার্থ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বায়ুতে অতি সামান্য পরিমাণে আরও কয়েকটি মূল পদার্থের অস্তিত্ব কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ বায়ুর ধর্ম্ম।—বিশুদ্ধ বায়ু গন্ধ ও বর্ণবিহীন, স্বচ্ছ ও অদৃশ্য। বায়ু সঞ্চালিত হইলে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। ইহা স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ চাপে সঙ্কুচিত হয় এবং চাপ দূর হইলে আবার প্রসারিত হয়। ইহার একটি প্রধান কার্য্য—শব্দ বহন করা। বায়ু না থাকিলে, আমরা শব্দ শুনিতে পাইতাম না। বায়ুর ভার আছে; আমরা যতই উর্দ্ধদেশে উঠি, ততই উহার চাপ কম বোধ হয়। বেলুনে উঠিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরী-কৃত হইয়াছে যে, বায়ুর এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ-ইঞ্চি স্থানের উপর ৭৷৷০ সের। এই চাপ আমাদের চতুর্দ্দিকে সমভাবে বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না, নতুবা আমাদের বাঁচিয়া থাকা দুরূহ হইত।

বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান কি, তাহা সংক্ষেপে আলোচনার পর, এক্ষণে আমরা—কি প্রকারে বায়ু সর্ব্বদা দূষিত হইতেছে—তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, এবং সঙ্গে-সঙ্গে উহার সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের কি সম্বন্ধ, তাহারও বর্ণনা করিব। যতগুলি কারণে বায়ু দূষিত হয়, তাহার মধ্যে জীবজন্তুর—

শ্বাসক্রিয়া

একটি প্রধান। ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে, মানবদেহে কিরূপে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, তাহা বুঝা আবশ্যক। আমাদের বক্ষ-গহ্বরের মধ্যে Lungs বা ফুসফুস নামক যন্ত্র আছে। ইহার গঠন স্পঞ্জের ন্যায়। যেমন স্পঞ্জের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুপূর্ণ ছিদ্র দেখা যায়, তেমনি ফুসফুসের মধ্যে অসংখ্য বায়ুপূর্ণ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কোষ আছে। আমাদের মুখ-গহ্বরের পশ্চাৎভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া কণ্ঠনালী (Bronchus) ভিতরে নামিয়াছে; এবং তাহা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষে অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নলীতে পরিণত হইয়া সমুদায় ফুসফুসের ভিতর বিস্তৃত আছে। অবশেষে ইহা অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বায়ুকোষে পরিণত হইয়াছে। এই কোষগুলির মধ্যে বায়ু বিদ্যমান থাকে, এবং এগুলি একরূপ অতি সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত। এই আবরণের একদিকে বায়ু এবং অন্যদিকে অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রক্তবাহী কৈশিক শিরাপুঞ্জ বিদ্যমান আছে।

শ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়া।—যখন আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, তখন বাহিরের বায়ু ফুসফুস মধ্যস্থিত বায়ুকোষগুলির মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহাতে সেগুলি স্ফীত হইয়া উঠে। ইহারই নাম নিঃশ্বাস টানা। ইহার পরক্ষণেই বক্ষ-প্রাচীরের চাপে ঐ বায়ুকোষগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং তাহার ফলে ভিতরস্থ বায়ুর অধিকাংশ প্রশ্বাসরূপে বাহির হইয়া যায়। ইহারই নাম প্রশ্বাস ফেলা। নিঃশ্বাসের সহিত গৃহীত বায়ু বায়ুকোষের চতুর্দ্দিকে স্থিত কৈশিক শিরাবাহিত রক্তের অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। বাস্তবিক বায়ু ও রক্ত এই দুইটির মধ্যে তখন কেবলমাত্র একটি অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান বিদ্যমান থাকে। ফলে বায়ুস্থিত oxygen বাষ্প রক্তের সহিত যাইয়া মিশে এবং রক্তের ভিতর হইতে Carbonic acid বাষ্প বায়ুতে চলিয়া যায়। তখন oxygen-মিশ্রিত রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্য দিয়া দেহের সর্ব্বত্র পরিচালিত হয়।

এইরূপে রক্তের সহিত oxygen বাষ্প আমাদের দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইতেছে ; এবং আমাদের পেশী, মেদ, স্নায়ু ইত্যাদি সমস্ত শারীরিক উপাদান ঐ oxygen শোষণ করিয়া লইতেছে। ঐ অক্সিজেনের সাহায্যে সর্ব্বত্র দহন-ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে ; এবং তাহার ফলে Carbonic acid প্রভৃতি দূষিত পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। সেই দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে আনীত হয়। তখন আবার রক্তের সহিত সেই দূষিত পদার্থ ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সে পরে প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। এইরূপে শ্বাস ও প্রশ্বাসের দ্বারা নিয়ত আমাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থ রক্ত শোধিত হইতেছে।

যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসরূপে পরিত্যাগ করি, তাহাতে প্রতি ১০০০০ ভাগে ৩০০ হইতে ৪০০ ভাগ Carbonic acid বাষ্প পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ বায়ুতে উহার পরিমাণ ১০০০০ ভাগে ৪ ভাগ মাত্র। অতএব শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় শতগুণ অধিক Carbonic acid বাষ্প যোগ করিয়া দিতেছি এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার Oxygenএর ভাগ কমাইয়া দিতেছি। আমরা প্রতি মিনিটে গড়ে ১৮বার নিঃশ্বাস লইলে প্রতিদিন প্রত্যেকে প্রায় ২৬০০০ বার শ্বাস গ্রহণ করি ও তাহা ত্যাগ করি। অতএব সমুদায় জীব-জন্তুর শ্বাসক্রিয়া হইতে নিয়ত কত বেশী পরিমাণে বায়ু দূষিত হইতেছে, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

কার্ব্বনিক এসিড মিশ্রিত বায়ু নিঃশ্বাসরূপে গৃহীত হইলে, রক্তের সহিত অক্সিজেন-মিশ্রণের বিঘ্ন হওয়ায় দেহের ক্ষতি হয়। বায়ুতে ঐ বাষ্পের সামান্য আধিক্য হইলে, তাহা সেবনে কমবেশ কষ্ট অনুভূত হয়। শতকরা ৫ ভাগ থাকিলে তাহাতে দৈহিক অবসন্নতা আসিয়া পড়ে এবং মাথা ধরে। ইহারও বেশী হইলে তাহা সেবনে ক্রমে সংজ্ঞালোপ হয় ও শেষে মৃত্যু অবধি সংঘটিত হয়। এইরূপ কারণে মৃত্যু হইয়াছে, এমন ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে। বহুদিনের পুরাতন কূপে উদ্ভিদাদি পচিয়া Carbonic এসিড বাষ্প পরিপূর্ণ হইলে, যদি সহসা কেহ তাহার ভিতরে নামে, তখনি তাহার সংজ্ঞালোপ হয়। তখন অতি শীঘ্র তাহাকে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে না আনিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা—ভবানীপুরে একটি বৃহৎ মিউনিসিপ্যাল ড্রেণ পরিষ্কার করিবার জন্য একটি ধাঙ্গড় বালক তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ ড্রেণ তখন Carbonic এসিড বাষ্পে পূর্ণ ছিল। ইহাতে প্রবেশ করিলে ঐ বালক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। তখন পথিকগণের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হয়। এবং নফরচন্দ্র কুণ্ডু নামক জনৈক মহানুভব যুবক ঐ বালককে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়া ড্রেণের মধ্যে নামেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহাতেই তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হয়। এই মহাত্মার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য ঐ স্থানের নিকট একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। খনির মধ্যে বা জাহাজের খোলের মধ্যে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প জমায় মজুরদের প্রাণহানির ঘটনা অনেক শুনা গিয়াছে।

অর্গ্যানিক পদার্থ।—প্রশ্বাসের সহিত জীবজন্তুর দেহের ভিতর হইতে নির্গত অর্গ্যানিক পদার্থ বাহিরে আসিয়া পড়ে। তাহাতেও বায়ু বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই পদার্থ আমাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্টকারী। বাষ্পাকারে থাকায় ইহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু বেশী পরিমাণে জমিলে বায়ুতে একটি দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। যথায় বায়ু-সঞ্চালনের ভাল বন্দোবস্ত নাই, তথায় বেশী লোক একত্র থাকিলে বায়ুতে ঐ গন্ধ পাওয়া যায়। বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু হইতে সহসা ঐ স্থানে যাইলে ঐ গন্ধ বেশ অনুভূত হয়। নিঃশ্বাসের সহিত ঐ অর্গ্যানিক পদার্থপূর্ণ বায়ু বারবার ভিতরে টানিয়া লইলে, দেহে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং তাহাতে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। অন্ধকূপ-হত্যার বিষয় আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। যে ঘরে বাহিরের বায়ু চলাচলের সম্ভাবনা নাই, সেথায় বহুলোক একসঙ্গে বেশীক্ষণ থাকিলে, তাহাতে অনেকে যে মরিয়া যাইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এরূপ ঘটনা স্থানে-স্থানে ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

বহুলোকের একত্র বাসের দোষ।—কলিকাতা সহরে এবং অনেক সময়ে পল্লীগ্রামেও নানা কারণে আমরা বহু পরিবার লইয়া অতি সঙ্কীর্ণ কোটার মধ্যে বাস করি। যদি তদুপরি অজ্ঞানতাবশতঃ বাড়ীর মধ্যে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে ফল বিষময় হইয়া উঠে। গৃহের অভ্যন্তরস্থ রুদ্ধ বায়ু বহুলোকের শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে হইতে নানারূপ

বিষাক্ত পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। ঘরে রোগী থাকিলে তাহার দেহ হইতে দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া বায়ুতে মিশে। ছোট-ছোট শিশুগুলি বিছানায় মল, মূত্র ত্যাগ করে, এবং অনেক সময় তাহা বহুক্ষণের জন্য ঘরের মধ্যেই থাকিয়া যায়। এইরূপে গৃহবাসীদের শ্বাসক্রিয়া, রোগীর পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থ ও গৃহে সঞ্চিত মলমূত্রাদি দ্বারা ঘরের অক্সিজেন শীঘ্রই শোষিত হইয়া যায়। ঘরে প্রদীপ বা কেরোসিনের আলোক থাকিলে তাহাতেও অক্সিজেন শোষিত হয়। তখন সেই ঘরের বায়ুতে বাস করিলে পীড়া উৎপন্ন হয়।

উপযুক্ত পরিমাণ দরজা-জানালাবিহীন অপ্রশস্ত বিদ্যালয়-গৃহে বহুক্ষণ অধ্যয়ন করা, যেখানে যাত্রা-থিয়েটার, সভা-সমিতি বা উৎসবের কারণ অনেক লোক জড় হইয়াছে, সে স্থানে বেশীক্ষণ থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

দূষিত বায়ু সেবনের ফল।—প্রশ্বাস-ত্যক্ত দূষিত বায়ু ক্রমাগত সেবনে আমাদের অবসন্নতা আসে, মাথা ধরে ও গা-বমিবমি করে। কাহারও বা গাত্রদাহ ও জ্বর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিছু দিন ঐরূপ বায়ুতে বাস করিলে, নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। জনাকীর্ণ সহরে বাস করিয়া এ জন্য অনেকে অল্পায়ু হয়। বাস্তবিক সহরের দূষিত বায়ুতে বাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ঠাণ্ডা-লাগা।—সাধারণের মধ্যে "ঠাণ্ডা-লাগার" একটি অমূলক সংস্কার আছে। ফলে অনেকেই তাহাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘরের দরজা-জানালা সর্ব্বদা বন্ধ রাখিতে ব্যস্ত; এবং রাত্রে পাছে ঠাণ্ডা লাগে সেই ভয়ে, বায়ু-সঞ্চালনের যাবতীয় পথগুলি বিশেষভাবে বন্ধ না করিয়া শয়ন করেন না। দরজা বা জানালায় কোনরূপ ছিদ্র বা ফাটা থাকিলে তাহাও কাগজ বা কাপড় দ্বারা বেশ করিয়া আঁটিয়া বন্ধ করা হয়। কেহ-কেহ আবার শীতের ভয়ে মুখ পর্য্যন্ত চাপা দিয়া নিদ্রা যায়, এবং তাহাতে প্রশ্বাসের দূষিত বায়ু পুনঃ-পুনঃ সেবন করিয়া থাকে। ঠাণ্ডা-লাগার ভয়ে বন্ধ-দ্বার ঘরে বহুপ্রাণী একত্র বাস করিয়া অনেক সময় পীড়িত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ আচরণ অতীব অস্বাস্থ্যকর। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অতীব গর্হিত বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশে বার মাসের মধ্যে অতি অল্প দিনই বাহিরের বায়ু বেশী শীতল হইয়া থাকে। দেহ আবশ্যক মত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মুক্ত বাতাসে থাকিলে কখনই আমাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক প্রবীণ চিকিৎসকদের মতে, এমন কি শীতকালেও, রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া শয়ন করিলে, স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতীত ক্ষতি হয় না। সকল সময়েই, বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশের পথ না রাখিয়া কোন গৃহে শয়ন করা উচিত নহে। শীতকালে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ-গৃহে শয়ন করিলে, হঠাৎ ঐ ঘরের বাহিরে গমন করার প্রয়োজন হইলে, তখনই বাস্তবিক আমাদের ঠাণ্ডা-লাগার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। ঘরে বায়ু-চলাচল হইলে, ঘর ঠাণ্ডা থাকে; এবং সেরূপ ঠাণ্ডা ঘর হইতে বাহিরে আসিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডায় আসাই বিপদ-জনক, এ কথা বুঝিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

দহন-ক্রিয়া।—আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ু বিকৃত হইবার আর একটি প্রধান কারণ—দহন-ক্রিয়া। যাবতীয় দাহ্য পদার্থ দগ্ধ হইবার সময় বায়ু হইতে অক্সিজেন শোষণ করে এবং দহনের ফলে কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি পদার্থ উৎপন্ন হয়, ও সেগুলি বায়ুতে মিশে। রন্ধন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত কাঠ, কয়লা ইত্যাদি, আলোকের জন্য ব্যবহৃত তৈলের প্রদীপ, গ্যাস, কেরোসিন, মোমবাতি প্রভৃতি হইতে সর্ব্বদাই আমাদের চতুর্দ্দিকের বায়ু বিকৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শত-শত কল-কারখানা, রেলের ইঞ্জিন, জাহাজ ও ষ্টীমারগুলিতে বহু পরিমাণ কয়লা নিত্য পোড়ান হইতেছে। এই সকল কারণে নানাবিধ দূষিত বাষ্প ও ধূমে বায়ু সর্ব্বদাই দূষিত হইতেছে। ফলে কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তামাকের ধূম হইতেও বায়ু কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত হয়। শ্মশান-ভূমিতে যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শবদাহ করা হয়, তখন সেখানে নানাবিধ অনিষ্টকারী বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে নিকটস্থ বায়ু দূষিত ও দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে। এজন্য শবদাহের স্থানের নিকট বাস করা উচিত নহে।

কার্ব্বন মনক্সাইড বাষ্প।—দহন-কার্য্যের সঙ্গে-সঙ্গে

প্রায়ই আর একটি অতীব বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়; তাহার নাম কারবন মনক্সাইড বাষ্প। মুক্ত স্থানে দহন কালে ঐ বাষ্প বেশী উৎপন্ন হয় না, কিন্তু রুদ্ধ স্থানে অক্সিজেনের অভাব হেতু এই বাষ্প প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গৃহের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে আগুন জ্বালিলে, শীঘ্রই ঐ ঘরে প্রচুর পরিমাণে কার্ব্বন মনক্সাইড বাষ্প জমিয়া যায়, এবং তখন গৃহের বায়ু সাতিশয় বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই বাষ্প সেবনে মাথা-ধরা, মাথা-ঘোরা ও দেহের অবসাদ উৎপন্ন হয়। অধিক পরিমাণে সেবনে রোগীর প্রলাপ উপস্থিত হয় ও শীঘ্রই সংজ্ঞালোপ হয়; এবং ক্রমে তাহা হইতে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শীঘ্র সংজ্ঞালোপ হয় বলিয়া ঐ রোগী নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিতে পারেন না। এই বিষাক্ত বাষ্প সেবনে মৃত্যুর ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে। অনেকে শীতকালে শীত-নিবারণের জন্য ঘরের মধ্যে আগুন রাখেন। চিমনিবিশিষ্ট ঘরে অথবা খোলার কিম্বা পাতার ঘরের মধ্যে বাহিরের বায়ুর প্রবেশ একবারে বন্ধ না হওয়ায় ঐ আগুন হইতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলেও যদি পাকা ইমারতের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঐ আগুন জ্বালা হয়, তাহা হইলে ঘরে যাহারা শয়ন করিয়া থাকে, তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা। অনেক চিকিৎসকই এইরূপ দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সূতিকা-গৃহ ও মনক্সাইড বাষ্প।—আমাদের দেশে সূতিকা-গৃহে এইরূপ দুর্ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটিয়া থাকে। আপনারা জানেন যে, অনেক পরিবারে সূতিকাগৃহে প্রসূতি ও সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে তাপ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সেজন্য ঘরের মধ্যে কাষ্ঠ, কয়লা বা গুল জ্বালাইয়া প্রচণ্ড আগুন করা হয়। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিলে, শীঘ্রই সেই ঘর carbon monoxide বাষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন ঘরের ভিতরস্থ অধিবাসীগণের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্ব্বে দরমা, হোগলা, প্রভৃতি দ্বারা সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইত। তাহাতে সহজে বাহিরের বায়ু প্রবেশ করিতে পারিত বলিয়া বেশী দুর্ঘটনা হইত না। কিন্তু কলিকাতায় ইমারতের ঘরে দরজা বন্ধ করিলে বায়ু-প্রবেশ একবারে রহিত হয়। তখন ভিতরস্থ আগুন হইতে এ ঘরের বায়ু একেবারে দূষিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সূতিকাগৃহের মধ্যে প্রসূতি, সন্তান ও ধাত্রী প্রভৃতির জীবন-সংশয় হইয়াছে, এমন ঘটনা অনেক চিকিৎসকই দেখিয়াছেন। কখন-কখন ইহা হইতে মৃত্যুও সংঘটিত হইয়াছে। এরূপ বিপদ ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর হইতে রোগিগণকে মুক্ত বাতাসে বাহির করিয়া আনিতে হইবে। তাহাতেই জীবন-রক্ষার আশা থাকে। বিলম্ব করিলে Carbon monoxide বাষ্প রক্তের সহিত মিশিয়া তাহা বিকৃত করিয়া ফেলে এবং তখন রোগীর মৃত্যু হয়। (আশা করি আপনারা সকলেই রুদ্ধ সূতিকা-গৃহে আগুন রাখা কতদূর বিপজ্জনক, তাহা উপলব্ধি করিবেন।)

সূতিকা-গৃহ।—সূতিকা-গৃহের আগুনের কথা বলিতে যাইয়া আমাদের দেশের সূতিকাগারের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। এখনও আমাদের সমাজে সূতিকা-গৃহ সম্বন্ধে এমন ভয়ানক গর্হিত ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে যে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকদের কথা কিম্বা নিতান্ত অক্ষম পরিবারের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত কিংবা ধনীর বাটীতেও অনেক সময় যেরূপ জঘন্য ব্যবস্থা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আত্মসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর একস্থানে বলিয়াছেন যে, যখন তিনি এ দেশের সূতিকাগারের বিষয় ভাবেন, তখন তিনি আপনাকে সভ্য জাতি অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিতে নিতান্ত লজ্জিত হন। বাস্তবিক, যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবেন। আমার জীবনে কখন-কখন ইংরাজ ডাক্তারের সহিত ঐরূপ জঘন্য সূতিকাগৃহে রোগীর চিকিৎসার জন্য মিলিতে হইয়াছে। যখনই এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি, তখনই ইংরাজকে আমার স্বজাতির সূতিকাগৃহের এই ভয়ানক অবস্থা দেখিবার অবসর দেওয়ায় নিজে নিজে কুণ্ঠিত বোধ করিয়াছি। না জানি ইংরাজেরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের বিষয় কি মনে করেন! আমাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি বাহিরে সভ্যতার ভান করিলেও পারিবারিক জীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও ঔদাস্য ও মূঢ়তা প্রকাশ

করিয়া থাকেন। স্বীকার করি যে, ক্রমে উন্নতি হইতেছে; কিন্তু এখনও সেই জঘন্য প্রথা চলিতেছে এবং তাহার ফলে কত প্রসূতি ও শিশু-সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? প্রাণহীন আমাদের সমাজ—এ বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া হয় ত স্বীকারই করিবে না।

সাধারণতঃ বাটীর নিম্নতলের যে ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং অন্য কোন কাজে লাগিবে না, সেইটিই সূতিকা-গৃহরূপে নির্ব্বাচিত হয়। ইহার উপর আবার পাছে ঠাণ্ডা লাগে, সেই ভয়ে বায়ু-সঞ্চালনরহিত ঘরই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর ভাগ্যে অধিকাংশ বাটীই ছোট ও তাহাতে সম্যক আলোক ও বায়ু খেলে না। নিম্নতলের ঘরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে, এমন বাটী বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ অবস্থায় সূতিকা-গৃহের জন্য সাধারণতঃ কিরূপ ঘর নির্ব্বাচিত হয়, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ঐ জঘন্য ঘরে আর্দ্রতা হেতু এবং বায়ু ও আলোকের অভাবে সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। নিকটে নর্দ্দামা বা পাইখানা থাকিলে আরও চমৎকার হইয়া উঠে। প্রসূতির জন্য প্রায়ই জীর্ণ, ছিন্ন, মলিন বস্ত্র এবং একখণ্ড কন্থা বিছানা স্বরূপ দেওয়া হয়। তক্তপোষের ব্যবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না। একখণ্ড মাদুর (তাহাও আবার ছেঁড়া, পুরাতন ও ময়লা) মেঝের উপর বিছাইয়া প্রসূতিকে ও সদ্যপ্রসূত শিশুকে রাখা হয়। যাঁহারা আবার অধিকতর বুদ্ধিমান, তাঁহারা একটি শয্যা পুরুষানুক্রমে প্রসব গৃহের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দেন। একটি প্রসূতির ব্যবহারের পর আবার তাহা তুলিয়া রাখেন, ও সময়ান্তরে অন্য প্রসূতির জন্য তাহা ব্যবহৃত হয়। এরূপ অবস্থার মধ্যে একমাস কাল বাস করা কি ভয়ানক, তাহা কি আমাদের ভাবা উচিত নয়? যে সময় প্রসূতি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে, যখন তাহার স্বাস্থ্যের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক, তখনই আমরা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নানা বিভীষিকায় তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখি। কোন-কোন পরিবারের মধ্যে সূতিকাগৃহের এক কোণে প্রসূতির পরিত্যক্ত ফুল বা placenta মাটি-চাপা দিয়া কয়েক দিন অবধি রাখিয়া দেওয়ার জঘন্য প্রথা প্রচলিত আছে। তিন-চারি দিনে ঐ ফুল পচিয়া গৃহস্থিত বায়ুকে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত করিয়া ফেলে। সূতিকাগৃহের পূর্ব্বোক্তরূপ কুব্যবস্থার ফলে অনেক সময় সাংঘাতিক রোগ আসিয়া পড়ে। কিন্তু যদি কুসংস্কারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু এবং আলোকপূর্ণ পরিষ্কার ঘরে প্রসূতিকে রাখার ব্যবস্থা করি, এবং তাঁহাকে পরিষ্কার বস্ত্র ও বিছানা ব্যবহার করিতে দিই, তাহা হইলে কত রোগ-শোক-তাপ হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। শিশুদের নাড়ী কাটিবার পর, ক্ষতস্থানে মলিন পদার্থ লাগিলে, সাংঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইতে পারে। না বুঝিয়া অশিক্ষিত লোকে ইহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলে। এইরূপে যে আমাদের দেশে কত শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তাহার সংখ্যা করা কঠিন। অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনে সহজেই ইহা নিবারণ করা যায়। কিছুদিন হইতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি দ্বারা কতকগুলি শিক্ষিত ধাত্রী নিয়োজিত হইয়াছে। তাহারা কোন-কোন বস্তির মধ্যে ও দরিদ্র অক্ষম পরিবারের ভিতর যাইয়া বিনা পারিশ্রমিকে স্ত্রীলোকদিগকে সূতিকাগার সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য-গুলি বুঝাইয়া দিতেছে, ও প্রসবকালে তাহাদিগকে রীতিমত সাহায্য করিতেছে; এবং মিউনিসিপালিটি প্রসবকালীন অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করিতেছে। এই ব্যবস্থা হইতে ভবিষ্যতে অনেক সুফল আশা করা যায়।

পচন বা উৎসেচন।—বায়ু দূষিত হইবার আর একটি প্রধান কারণ, পচন বা উৎসেচন-ক্রিয়া। আমাদের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ উদ্ভিজ ও জীবজ পদার্থ পচিতেছে, ও তাহা হইতে নানাবিধ দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হইয়া বায়ুকে দূষিত করিতেছে। ঘরে ইন্দুর পচিলে কি বিকট গন্ধ হয়, তাহা সকলেই জানেন। মাছের আঁইস, কাঁটা প্রভৃতি যেখানে ফেলা হয়, সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে কি বীভৎস গন্ধ বাহির হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। ঐরূপ অন্ন-ব্যঞ্জনের ভুক্তাবশিষ্ট ভাগ ও তরিতরকারির খোসা বা পরিত্যক্ত অংশ কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে, সেখানে কি দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাও আমাদের অবিদিত নহে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্য সাধারণতঃ পচনশীল। আর্দ্রতা ও তাপের সাহায্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা বিকৃত হইয়া

পড়ে, এবং তাহা হইতে নানাবিধ দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে।

কলিকাতায় নিত্যপরিত্যক্ত আবর্জ্জনাদি বাটী হইতে রাস্তায় ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে; সেগুলি মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত অনুসারে প্রত্যহ স্থানান্তরিত হইবার কথা। কিন্তু নানা কারণে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়—এবং ফলে নিয়তই সহরের বায়ু কলুষিত হইতেছে। আমাদের গৃহস্থালীর ক্রিয়া-কলাপের সহিত বায়ু দূষিত হইবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটি সকলেরই বুঝা উচিত। বোধ হয়, সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহা নিবারণ করা সম্ভব হইবে, এবং তাহাতে বায়ু দূষিত হইবার একটি প্রধান কারণ দূরীভূত হইবে। কলিকাতায় স্থানে-স্থানে এই আবর্জ্জনা এত বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয় যে, তাহা হইতে সেই স্থান বাসের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। অনেক বাটীর আশে-পাশে অপ্রশস্ত স্থানে বহুদিনের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে, এবং ক্রমে সেই স্থান নরকসদৃশ হইয়া উঠে। টেরেটিবাজার, বড়বাজার, জোড়াবাগান প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে এমন অনেক আবাসবাটী আছে, যাহার ভিতর মধ্যাহ্নকালেও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না, এবং তাহার ভিতরস্থ প্রাঙ্গণ ও অন্যান্য অপ্রশস্ত স্থান বহুকাল-সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল বাটীতে প্রবেশ করিলে একটি বিকট দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। কিরূপে যে সেখানে, এমন কি সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও, বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন। এরূপ সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশির মধ্যে নানাবিধ কীট উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং মাছির উৎপাতে নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি বাসের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর আবির্ভাব হইলে, সেথানকার অধিবাসিগণ সহজেই ঐ সকল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দলে-দলে মরিয়া যায়। আমাদের মিউনিসিপালিটি সহরের আবর্জ্জনা দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও, যত দিন অবধি দেশের জন-সাধারণ—ঐরূপ আবর্জ্জনাদি হইতে কিরূপ ক্ষতি হয়—তাহা উপলব্ধি না করে, এবং নিজ নিজ বাসভবন হইতে সমস্ত প্রকার ময়লা, এমন কি অল্প পরিমাণে জমিলেও, প্রত্যহ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট না হয়, ততদিন বিশেষ সুফলের আশা করা যায় না। জোর করিয়া আইনের সাহায্যে কলিকাতার ন্যায় বিস্তৃত সহরের নানাপ্রকারের লোককে তাহাদের বাসভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে বাধ্য করা কতদূর সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, মিউনিসিপাল বন্দোবস্তে কোন দোষ বা অভাব একেবারে নাই। বরং বলিতে বাধা যে, সরু সরু গলিগুলির ভিতর হইতে প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া ময়লা দূরীকরণের বন্দোবস্ত মিউনিসিপালিটির অবিলম্বে করা উচিত, এবং আরও অন্যান্য কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় উন্নতির প্রবর্ত্তনে কালবিলম্ব কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, যতদিন না আমরা এ সম্বন্ধে নিজ-নিজ পালনীয় কর্ত্তব্যটুকু সমুচিত রূপে পালন করিতে শিখি, ততদিন কেবল মিউনিসিপালিটীর উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না।

Dust-bins বা ময়লা ফেলিবার আধার।—বাটীর আবর্জ্জনাদি আমরা নিয়ত রাস্তায় ফেলিয়া থাকি। সেগুলি পচিয়া রাস্তাকে দুর্গন্ধময় করে; ফলে, অপ্রশস্ত গলিগুলির ভিতর এজন্য অনেক সময় চলা ভার হইয়া পড়ে। মিউনিসিপালিটী রাস্তার ধারে ধারে আবর্জ্জনা ফেলিবার dust bin বা লোহার আধারের ব্যবস্থা করিয়াছে। এগুলি দিনে কোথাও বা একবার এবং কোথাও বা দুইবার করিয়া পরিষ্কার রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। প্রাতে ময়লার গাড়ী আসিয়া উহা সাফ করিয়া যাইবার পরে তাহাতে আবর্জ্জনা ফেলিলে, উহা সারাদিন সেখানে পড়িয়া থাকে, এবং পরদিন প্রাতের পূর্ব্বে তাহা দূরীকৃত হয় না। ফলে তাহা পচিয়া বায়ুকে কলুষিত করে। ময়লার গাড়ী আসিবার পূর্ব্বেই সমুদায় আবর্জ্জনা dust-binএর মধ্যে ফেলিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সারাদিনের সঞ্চিত ময়লা একত্র করিয়া একবারে বাহিরে ফেলার অনেক অসুবিধা আছে। দ্বিপ্রহরে ভোজনাদি শেষ হইবার পর সকল পরিবারেই অনেক আবর্জ্জনা জমে। তখন সেগুলি বাটীর মধ্যে জমাইয়া রাখিলেও বিপদ। অতএব আমাদের ঐ অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শীঘ্র আবশ্যকমত বন্দোবস্ত করা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও কর্ত্তব্য—বাটীর চতুর্দ্দিকের রাস্তাগুলি পরিষ্কার রাখিবার জন্য যখন তখন তথায় ময়লা না ফেলা। দুঃখের বিষয়, অল্প লোকেরই এদিকে দৃষ্টি আছে। হয় ত যেমন ময়লার গাড়ী চলিয়া গেল, অমনি বাড়ীর ময়লা বাহিরে

ফেলা আরম্ভ করা হইল। ফলে, আমরা সরু সরু গলি-গুলিতে প্রায় সর্ব্বদাই ময়লা দেখিতে পাই। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি হইলে গালাগালি দিবার অধিকার আমাদের আছে; এবং আমাদের ন্যায্য দাবী আমরা যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ কিছুতেই আমরা ক্ষান্ত হইব না। কিন্তু নিজ-নিজ কর্ত্তব্যের অংশটুকু পালন না করিয়া, কেবল অন্যের উপর দোষারোপ করিলে, আমরা বিশেষ সহানুভূতি পাইব বলিয়া মনে হয় না।

কলিকাতার বস্তিগুলি।—কলিকাতায় অনেক দরিদ্র পরিবার খোলার ঘরের বস্তিগুলিতে বাস করে। এগুলির অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। খোলার ঘরগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এবং ঘরের ভিতরে ও অপ্রশস্ত পথগুলিতে নিয়ত আবর্জ্জনাদি জমিয়া থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে ড্রেণ ও পাইখানার বেবন্দোবস্তে, ও যত্রতত্র মলমূত্র পরিত্যক্ত হওয়ায় সমুদয় স্থানটি বীভৎস ভাব ধারণ করে। নানাবিধ জৈব পদার্থ পচিয়া বায়ুকে সর্ব্বদা দূষিত করিয়া রাখে। নিয়ত এই দূষিত বায়ুতে বাস করিয়া বস্তির অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানি হয়। সেখানে সহজেই সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হয় ও তাহা হইতে বহু ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দুর্গন্ধময় অপরিষ্কার বাজার।—কলিকাতার স্থানে স্থানে যে সকল বাজার আছে, তাহাদের মধ্যে কোন-কোনটী এত নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত যে, তাহা সহরের কলঙ্ক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নানা কারণে সেগুলি সম্যক পরিষ্কৃত হয় না এবং জঞ্জাল পচিলে তাহার চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত হইয়া উঠে। বাজারের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। অতএব সেগুলি পরিষ্কার রাখার বন্দোবস্ত সাধ্যমত করিতে হইবে। অধুনা মিউনিসিপ্যালিটির অর্থে কোন-কোন স্থানে বাজার নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলির সহিত অন্যান্য বাজারের কি পার্থক্য তাহা দেখিলে, আমরা সকলেই মিউনিসিপ্যালিটির নির্ম্মিত বাজার যাহাতে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়, সে ইচ্ছা না করিয়া থাকিতে পারি না।

মলমূত্র ইত্যাদি।—বায়ু কলুষিত হইবার আর একটি কারণ, স্থানে-স্থানে মলমূত্র সঞ্চিত থাকা। এই সহরে পূর্ব্বে অনেক কুয়া-পাইখানা ছিল। তাহাতে আবহমানকাল হইতে মলমূত্র সঞ্চিত হইয়া পচিত এবং তাহা হইতে উত্থিত বাষ্পে বায়ু কলুষিত হইত। এক্ষণে সেই বীভৎস প্রথা রহিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও শত-শত মেথর-খাটা পাইখানা সহরে রহিয়াছে। এগুলি রীতিমত পরিষ্কৃত হইলে ততদূর দোষের হয় না; কিন্তু নানা কারণে ইহার অধিকাংশই অতি জঘন্য অবস্থায় থাকে, এবং বহুদিনের সঞ্চিত মলমূত্র তাহাতে পচিয়া বায়ু কলুষিত করে। পাইখানার বিকৃত ময়লা যখন স্থানান্তরিত হয়, তখন কি দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিয়াছি। মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক নিয়োজিত মেথরেরা প্রত্যহ খাটা-পাইখানাগুলি হইতে ময়লা বহন করিয়া যখন ডিপোর মধ্যস্থিত ড্রেণের মধ্যে তাহা ঢালে, তখন তৎসংলগ্ন স্থানগুলির নিকট যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। ড্রেণ-পাইখানা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে কলিকাতার এই সকল অসুবিধা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। ড্রেণ-পাইখানা হইতে দুর্গন্ধ হয় না, এ কথা আমরা বলি না; বরং ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, জল ঢালিয়া পরিষ্কার না রাখিলে, তাহা হইতেও বায়ু দূষিত ও নানাপ্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এগুলি খাটা-পাইখানা অপেক্ষা অনেক কারণে বাঞ্ছনীয়, এ কথা বলিতেই হইবে। পাইখানাগুলিতে যাহাতে মলমূত্র জমিয়া না থাকে, তৎপ্রতি আমাদের সকলেরই সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষদেরও উচিত, যাহাতে সহরের সমস্ত পাইখানাগুলি পরিষ্কৃত থাকে, সে বিষয়ের সম্যক ব্যবস্থা করা।

Sewer Gas.—আধুনিক ব্যবস্থা অনুসারে কলিকাতায় যাবতীয় মলমূত্রাদি ড্রেণের ভিতর দিয়া সহরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়, এবং শেষে তাহা বিদ্যাধরী নদীতে যাইয়া পড়ে। এই ড্রেণের মধ্যে নানাবিধ অর্গানিক পদার্থ পচিয়া যে সকল বাষ্পের উৎপত্তি হয়, তাহার কতক অংশ বাহিরে আসিয়া সহরের বায়ুকে নিশ্চয় দূষিত করে। ড্রেণের এই Sewer Gasএর মধ্যে নানাবিধ বিষাক্ত বাষ্প পাওয়া যায়। সহরের প্রশস্ত পথগুলির মধ্যে অবস্থিত ড্রেণ হইতে ঐ বাষ্প বাহির হইয়া শীঘ্র বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া যায়; ও সূর্য্যালোকের সংস্পর্শে তাহার দোষ দূরীভূত হওয়া সম্ভব। কিন্তু সরু-সরু গলির মধ্যে এবং মুক্ত-স্থানশূন্য বাটীর মধ্যে এ Sewer Gas

প্রবেশ করিলে, তাহা হইতে অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। যাহাতে Sewer Gas না জমিতে পারে, সেজন্য বাটীর ড্রেণের মধ্যে নিয়ত জল ঢালিয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। মিউনিসিপাল নিয়ম-অনুসারে প্রত্যেক বাটীর ড্রেণে Master trap নামক কৌশল সংযুক্ত আছে। ইহার উদ্দেশ্য—বাহিরের Gas বা অন্য ময়লা বাটীর ভিতরে না আসিতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, ইহার অধিকাংশই ভগ্ন বা অকর্ম্মণ্য অবস্থায় রহিয়াছে; এবং যে জন্য তাহার ব্যবস্থা, তাহা সফল হইতেছে না। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ড্রেণের বন্দোবস্তগুলি বেশ কার্য্যোপযোগী অবস্থায় রক্ষিত না হইলে উহা হইতে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা আছে।

সহরে পশুপালন—সহরের মধ্যে পশু-পালনের ফল-স্বরূপ বায়ু দূষিত হইতে দেখা যায়। অনেকগুলি পশু একত্র রাখা হইলে প্রায়ই সেখানকার বায়ু কলুষিত হইয়া উঠে। কলিকাতার যেখানে গোয়ালাদের বসতি, সেখানে সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

গোশালা—অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে নোংরার মধ্যে বহু-সংখ্যক গরু একত্র থাকায়, গোশালাগুলি বীভৎস আকার ধারণ করে। যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এগুলির অবস্থা ধারণা করা কঠিন। অনেক গৃহস্থের বাটীতে গরু আছে। পল্লীগ্রামে বাসগৃহ হইতে কিছু দূরে গোশালা থাকে; কিন্তু সহরে স্থানাভাববশতঃ অনেকে শয়নঘরের নিকটেই গরু রাখে। একে ত বাটীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, তাহাতে আবার গাভীগণের মল-মূত্রাদি হইতে ও তাহাদের শ্বাসক্রিয়ায় বায়ু আরও দূষিত হইয়া উঠে। গোমূত্র, গোময়, জাবনা ইত্যাদি পচিলে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয় ও তাহা হইতে রোগোৎপত্তির সহায়তা হয়। ঘরে গরু রাখিলে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু ইহাতে এত অসুবিধা ও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা যে, সঙ্কীর্ণ বাটীর মধ্যে গরু রাখিবার চেষ্টা না করাই উচিত। বাটীর প্রাঙ্গণে বহু ছাগল হাঁস, মুরগী, প্রভৃতি পুষিলে তাহাতেও বায়ু দূষিত হয় এবং বাটী নিতান্ত নোংরা হইয়া পড়ে। কলিকাতা সহরের স্থানে স্থানে গো, মহিষ, অশ্ব, ছাগল প্রভৃতি জন্তু বিক্রয়ের জন্য হাট আছে। এই হাটগুলি পশুগণের মলমূত্রে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ এবং সেখানে সর্ব্বদাই বিকট দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। তথাকার বায়ু সর্ব্বদাই দূষিত থাকে, এবং তত্রস্থ অধিবাসীদের নানা রোগ হইতে দেখা যায়।

অশ্বশালা—কলিকাতার মধ্যে বাটীর নীচের ঘরে অশ্ব রাখিবার ব্যবস্থা অনেকেই করেন। ইহাও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-অনুমোদিত নহে। অশ্বশালা প্রায়ই অপরিষ্কার থাকে এবং তথায় রোগ জন্মিতে পারে। বাসগৃহ হইতে দূরে, মুক্তস্থানে অশ্বশালা নির্ম্মাণ করা উচিত এবং তাহা সমুচিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। সহরের মধ্যে এখনও অনেক ঠিকাগাড়ীর আস্তাবল আছে। এগুলিতে বহু অশ্ব একত্র থাকায়, প্রায়ই অতি বীভৎস অবস্থা উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে নিয়ত সহরের বায়ু কলুষিত হইয়া থাকে। আইনের সাহায্যে এগুলিকে পরিষ্কার রাখা অতীব কঠিন। জনাকীর্ণ পল্লীর মধ্যে ঠিকা-গাড়ীর আস্তাবল থাকিতে দেওয়াই উচিত নহে। যত শীঘ্র সম্ভব, সেগুলিকে সহরের প্রান্তদেশে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

গোরস্থান।—গোরস্থানের বায়ুতে নানাবিধ দূষিত বাষ্প থাকে। জীবদেহ মাটীর মধ্যে পচিলে, ঐ সকল বাষ্প উৎপন্ন হয়। এজন্য মানবের বাসস্থান হইতে বহু দূরে গোর-স্থানের ব্যবস্থা করা উচিত। কলিকাতা সহরে এখনও কোন কোন গোরস্থান, বস্তি বা জনমণ্ডলীর বাসস্থানের সন্নিকটে অবস্থিত এবং ইহার মধ্যে কয়েকটী এরূপ অযত্নরক্ষিত ও অপরিষ্কার যে, তথাকার বায়ু দূষিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অনেক অর্থব্যয় করিয়া সরকার হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও মুসলমানদিগের জন্য এক্ষণে সহরের প্রান্তদেশে গোর-স্থানের জায়গা করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে সহরের মাঝখানে গোর দেওয়া বন্ধ হইবে। হিন্দুদের শবদাহ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনু-মোদিত এবং পাশ্চাত্য-জগতেও এক্ষণে সে কথা স্বীকার করা হয়। কিন্তু বদ্ধমূল সংস্কার সহজে যায় না। এমন কি বিজ্ঞান-শিক্ষা-গর্ব্বিত সুসভ্য ইউরোপবাসীরাও গোর দিবার প্রথা উঠাইতে পারেন নাই। জনকতক মহানুভব ব্যক্তি দাহের প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইতে বেশী কিছু ফল হইয়াছে মনে হয় না। আমাদের সহরেও মিউনিসিপালিটী একটি

Crematorium বা গ্যাস দ্বারা মৃতদেহ সৎকার করিবার কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বেশী ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না।

শিল্প ও বাণিজ্য হইতে বায়ু দূষিত হওয়া।—কতকগুলি শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায় সহরের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়, যাহা হইতে বায়ু অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে। নানাবিধ শিল্পকর্ম্মের ও নানাপ্রকার দ্রব্যের কারবার সহরের মধ্যে যতই বাড়িতেছে, ততই নানা কলকারখানার ভিতর অশেষবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বহু দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে। কল কারখানার কলুষিত বায়ুর মধ্যে বেশী দিন কাজ করিলে, স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা ও তাহাতে অকালে মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশে শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে ঐ বিপদের বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। সাবধানতা অবলম্বনে ইহার প্রতিকার সম্ভব; অতএব কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। আপত্তিজনক শিল্প-ব্যবসাগুলি সহরের মাঝখানে বা যত্র-তত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী এক্ষণে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বহুদিনের স্থাপিত কোন-কোন ব্যবসা সহর হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করা এখনও সম্ভব হয় নাই। শুটকী মাছের গন্ধের জন্য এখনও টেরিটি-বাজারের নিকট দিয়া যাইতে হইলে নাকে কাপড় দিতে হয়। সকলেই জানেন, চামড়ার ব্যবসায়ের দরুণ কলুটোলা প্রভৃতি কোন কোন স্থানের বায়ু সদাসর্ব্বদা কিরূপ কলুষিত হইয়া থাকে। অধুনা ঐ ব্যবসা সহরের একপ্রান্তে স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং অল্প দিনের মধ্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ধূলিকণা।—পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি ব্যতীত নিত্য ধূলিকণা সংযোগে আমাদের বায়ু দূষিত হয়। অনেক সময় ধূলিকণা চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতা সহরের বায়ুতে ইহার অস্তিত্ব সকল সময়েই আছে। স্থান ও কারণ অনুসারে, বালি মাটী কয়লা, ধাতুচূর্ণ, পুষ্পরেণু, অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদকোষ, পাট, তূলা প্রভৃতির আঁশ নানাবিধ রোগোৎপাদক বীজাণু, অশেষপ্রকার কীট ও অন্যান্য জীবজ পদার্থ বায়ুতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে। সহরের বায়ুতে নানা কারণে এগুলির আধিক্য দেখা যায়। কলিকাতার রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও ধূলার হাত হইতে এড়াইবার সম্ভাবনা নাই। সততই নিঃশ্বাসের সহিত ঐ ধূলিকণা আমরা দেহের ভিতরে টানিয়া লইতেছি। সহরের কোন-কোন পল্লীতে ইহার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। উদাহরণ স্বরূপ অসংখ্য ডালগোলা পরিপূর্ণ আহীরিটোলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডাল-গোলাগুলি এ স্থান হইতে দূর করিবার প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে।

উচ্চ পর্ব্বতের ও সমুদ্রের বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা প্রায়ই থাকে না। সেইজন্য বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য রোগীকে ঐ সকল স্থানে পাঠান হয়। ধূলিকণা নিঃশ্বাসের সহিত ক্রমাগত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিলে, ঐ যন্ত্রমধ্যে প্রদাহ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে কাশরোগ জন্মিতে পারে। নানাবিধ রোগের বীজাণু ঐ ধূলিকণার সহিত আমাদের দেহের ভিতর প্রবেশলাভ করে, এবং তখন আমরা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি। বসন্ত, হাম, হুপিংকফ, টাইফয়েড জ্বর, প্লেগ, ডিপথিরিয়া, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি ব্যাধিগুলি প্রায়ই ঐরূপে আমাদের আক্রমণ করে। কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মল বা বমি, যক্ষ্মারোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মা যথা তথা নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুর সাহায্যে সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হয়, এবং তখন সহজেই মানবদেহে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। বায়ুতে ধূলিকণা না থাকিলে বীজাণু তাহাতে অবস্থিতি করিতে পারে না। অতএব বায়ু হইতে ধূলিকণা দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।

যক্ষ্মারোগ—ধূলিকণার সহিত যে সকল রোগের উৎপত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তন্মধ্যে যক্ষ্মাই সর্ব্বপ্রধান। বহু জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরে প্রায় সর্ব্বত্রই এই রোগের বীজাণু বায়ুর মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। অধুনা এই রোগের প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে আমাদের দেশের কত অমূল্য জীবন যে অকালে নষ্ট হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যতই লোকসংখ্যা বাড়িতেছে এবং বিশুদ্ধ বায়ুর যতই অভাব হইতেছে, ততই এই রোগের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। মুক্ত স্থানের বায়ুতে যক্ষ্মার বীজাণু সূর্য্যালোক ও প্রচুর অক্সিজেন সংযোগে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু জনতাময় স্থানের ধূলিমিশ্রিত কলুষিত বায়ুর মধ্যে ঐ বীজাণু সত্বর সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত

মস্কো হইতে নেপোলিয়নের সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন

Emerald Ptg Works, Calcutta

হয় এবং তাহাদের সংক্রামকতাও বর্দ্ধিত হয়। এই জন্যই রুদ্ধগৃহে বহুলোক একত্র বাস করিলে, ঐ রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার বড়ই সম্ভাবনা। যক্ষ্মারোগীর সহিত এক ঘরে সারা দিন বাস করা অতীব অনুচিত; ইহাতে সুস্থ লোকও অচিরে ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ছাত্রাবাসের মধ্যে, বস্তিনিবাসীদের মধ্যে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রপরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবই যে ইহার একটি বিশেষ কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং এ কথা স্মরণ রাখিয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। কলিকাতার হেল্‌থ্ অফিসার বলেন যে, ভদ্র হিন্দু মুসলমান পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা যেরূপ বাটীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, তাহাতে সম্যক সূর্য্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব ঘটায় ক্রমেই তাঁহাদের মধ্যে এই রোগের বিস্তার হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে মহিলাদের অবরোধ-প্রথা চলিত আছে। এই অবরোধ প্রথা ভাল কি মন্দ, এবং তাহা দূর করা উচিত কি না, তাহা লইয়া আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরে কি হইবে তাহা জানি না; কিন্তু ঐ প্রথা এখনও এমন দৃঢ়ভাবে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে যে, উহার পরিবর্ত্তনের কথা বা শিথিলতার প্রস্তাব বাতুলতা বলিয়াই পরিগণিত হইবে। যাহাই হউক না কেন, আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যাঁহারা আমাদের দেশের ও সমাজের নায়ক, তাঁহারা যেন ভাবিয়া দেখেন যে, যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্য আমাদের বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য কি না। আমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যতটুকু প্রয়াস করা কর্ত্তব্য ও সাধ্য, তাহা কি আমরা করিয়া থাকি? য়ুরোপের কোন-কোন স্থানে পূর্ব্বে যক্ষ্মারোগের বেশ প্রাদুর্ভাব ছিল; কিন্তু স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বিস্তারের গুণে এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলে উহার উপশম হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশে কাশরোগ হইবার সম্ভাবনা বেশী; অথচ তথায় যখন এরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, তখন আমাদের কি নিশ্চেষ্ট থাকা ভাল দেখায়?

যক্ষ্মা নিবারণ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্যালোক ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে রোগের জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যক্ষ্মারোগের বিস্তার নিবারণ করিতে হইলে এই দুইটার সাহায্য লইতে হইবে। গৃহের বায়ুপথগুলি সেজন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। কাশরোগে ফুসফুসের কিয়দংশ নিঃশ্বাস-গ্রহণ-কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে, এবং তখন উহার কার্য্যকারিতার ব্যাঘাত হওয়ায় দেহের রক্তও যথোচিত পরিস্রুত হয় না। এ অবস্থায় যদি গৃহের দরজা-জানালা বন্ধ রাখিয়া রোগীকে তাহার অত্যাবশ্যক বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিত করি, তাহা হইলে তাহার রোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমে মৃত্যু সংঘটিত হইবে; ইহা বিচিত্র কি? অমূলক ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত; এবং এই ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা চালিত হইয়া প্রত্যহ আমরা রোগীর কত যে অনিষ্ট করি, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবশ্যকমত বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকে না। যতক্ষণ রোগী দূষিত বায়ুর মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ তাহার রোগের প্রতিকারের আশা সুদূর-পরাহত। পাশ্চাত্য দেশে অধুনা যক্ষ্মারোগীর জন্য Open air treatment প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে সারা দিন-রাত্রি রোগীকে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে বাস করিতে হয়; এই চিকিৎসার ফলও সবিশেষ আশাপ্রদ হইয়াছে। আর আমরা ইহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া কত আত্মীয়-স্বজনকে অকালে হারাইতেছি ও তাহাদের বিয়োগজনিত শোকে কাতর হইয়া মনস্তাপে কাল অতিবাহিত করিতেছি।

কেরোসিন ল্যাম্প।—আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত হইবার আর একটি কারণ কেরোসিনের আলোক হইতে ভূষা জমা। বহু লোকের ঘরে ডিবা করিয়া কেরোসিন জ্বালান হয়। চিমনি না থাকায় ইহাতে অত্যন্ত কালি পড়ে এবং ঐ ভূষা বায়ুতে মিশিলে নিঃশ্বাসের সহিত ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করে। এরূপ স্থলে আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন, নাকের ভিতর অঙ্গুলি দিলে তাহাতে অনেক ভূষা লাগিয়া যায়। ভূষা মিশ্রিত বায়ু গ্রহণে সর্দ্দি ও কাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রন্ধনের ধূম।—কলিকাতা সহরে বহুলোকের রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য নানা উপায়ে অগ্নি উৎপন্ন করা হয়। ফলে, যে ধূম জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই বায়ুকে দূষিত করিতেছে। ইহার সহিত কলকারখানা হইতে নির্গত ধূম মিলিত হইয়া কলিকাতার বায়ুকে সর্ব্বদা সাতিশয় কলুষিত করিতেছে।

শীতের সময় সন্ধ্যাকালে আমাদের চতুর্দ্দিকে একটি বিরাট ধূমের আবরণ দেখা যায়, তাহা আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে হাওয়ার সহিত শীঘ্র স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা বেশী জমিতে পারে না, কিন্তু ঠাণ্ডা পড়িলে তাহা বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়। অনেক গৃহস্থের বাটীতেই প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রন্ধনঘর হইতে বহির্গত ধূম দ্বারা বাটীর অধিকাংশ স্থান কিছুক্ষণের জন্য ধূমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অতি অল্প বাটীতেই ধূমনির্গমনের জন্য সমুচিত ব্যবস্থা দেখা যায়; বাসবাটী হইতে রন্ধনগৃহ দূরে অবস্থিত এরূপ ব্যবস্থা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। ধূম-সমাচ্ছন্ন বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে আমাদের ফুস্‌ফুসের পীড়া উৎপন্ন হয়।

রন্ধন-কার্য্যের জন্য আগুন অপরিহার্য্য, এবং আমাদের সকল গৃহস্থকেই উনান জ্বালিতে হইবে। কিন্তু উনানের আগুন হইতে নিয়ত ধূম বাহির না হয়, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা কি একবারে অসম্ভব? ইচ্ছা করিলে এবং একটু যত্ন করিলে, ঐ ধূমের পরিমাণ খুব কমান যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে অধিক ধূম হয়, সেরূপ কোন দাহ্য পদার্থ উনানে পোড়ান উচিত নহে। রন্ধনগৃহ হইতে ধূম-নির্গমনের প্রশস্ত পথ করিয়া দেওয়া উচিত এবং এজন্য Chimney প্রস্তুত করিতে পারিলে ভাল হয়। যে সকল কার্য্যে বা ব্যবসায়ে অত্যন্ত ধূম উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলি জনাকীর্ণ পল্লী হইতে দূরে ব্যবস্থিত হওয়া উচিত। Lord Curzon তাঁহার শাসনকালে কলিকাতা সহরের ধূম হইতে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া, ইহা যতদূর সম্ভব কমাইবার জন্য একটা Smoke Nuisance Commission গঠন করিয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই কমিশন সহরের ধূম নিবারণের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছেন। কলকারখানা, জাহাজ প্রভৃতি হইতে অবাধে ধূম উদ্গীরণ এখন বন্ধ করা হইয়াছে, এবং সহরের মধ্যে অবস্থিত চিমনীগুলির উচ্চতা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সহরে ইটপোড়ান, কোক কয়লা তৈয়ারী করা প্রভৃতি অত্যন্ত ধূম-উৎপাদক ব্যবসা রহিত করা হইয়াছে। তাঁহাদের চেষ্টায় সম্যক ফল পাওয়া গেলে আমাদের সহরের বিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যতদিন না আমরা সকলেই সহরের মধ্যে ধূম নিবারণে সাধ্যমত সচেষ্ট হই, ততদিন আশানুরূপ ফল হইবে না।

বায়ু দূষিত হইবার কারণগুলি আলোচনা করিবার পর এক্ষণে দূষিত বায়ু কিরূপে পরিষ্কৃত হয়, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধান অনুসারে বায়ুস্থিত দূষিত পদার্থ শীঘ্র নষ্ট হইয়া আবার তাহা জীবগণের নিঃশ্বাসোপযোগী হয়। কতকগুলি প্রাকৃতিক উপায়ে নিয়ত বায়ু পরিষ্কৃত হইতেছে। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন বায়ুর ভিতরস্থ নানাবিধ দূষিত পদার্থ জলের সহিত ভূতলে পতিত হয়। আকাশে বিদ্যুৎপাত হইলে বায়ুর অনেক দোষ বিদূরিত হয়। সূর্য্যালোক হইতে আমাদের প্রভূত উপকার হয়; বাস্তবিক সূর্য্যকিরণে অনেক দূষিত পদার্থ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে দূষিত বায়ু আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। জোরে বাতাস বহিলে চতুর্দ্দিকের মুক্ত স্থান হইতে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া সহরের কলুষিত বায়ুকে দূর করিয়া দেয়। বায়ুর মধ্যে নিয়ত একটি প্রবাহ চলিতেছে। এই বায়ু সঞ্চালনের সঙ্গে-সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু বাহির হইতেছে এবং তাহার স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। এই বায়ু-সঞ্চালন না থাকিলে দূষিত বায়ু ঘর হইতে বাহির হইত না, এবং তাহা হইলে কেহই ঘরের মধ্যে সুস্থ দেহে বাস করিতে পারিত না। গৃহের মধ্যস্থিত দূষিত বায়ু অপেক্ষাকৃত ভারী; এজন্য প্রাকৃতিক নিয়মে উহা বাহিরের বিশুদ্ধ লঘু বায়ুর সহিত ক্রমে মিশিতে থাকে। ইহার ফলে গৃহস্থিত বায়ুর দূষিত অংশ বাহিরে বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিমাণে এরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হয় যে, ঐ বায়ু আবার জীবগণের নিঃশ্বাস গ্রহণের উপযোগী হইয়া পড়ে।

বায়ু পরিষ্কৃত হইবার আর একটি আশ্চর্য্য কৌশল আমরা স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাই। জীবগণ যেমন বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতেছে ও Carbonic Acid বাষ্প তাহার মধ্যে পরিত্যাগ করিতেছে, তেমনি নানাবিধ উদ্ভিদ দিবাকালে বায়ুস্থিত Carbonic Acid বাষ্পের সাহায্যে পুষ্ট হইতেছে। সবুজবর্ণবিশিষ্ট বৃক্ষ-পত্রাদি সূর্য্যালোকের সাহায্যে বায়ুস্থিত Carbonic Acid বাষ্প হইতে

তাহাদের পোষণ-উপযোগী অঙ্গার গ্রহণ করে, এবং তখন উহার অক্সিজেন অংশ বায়ুতে মিশিয়া যায়।

বাস্তবিক দিবাভাগে উদ্ভিদগণের পোষণ-ক্রিয়ার ফলে চতুর্দ্দিকের বায়ু কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প হইতে কতকটা মুক্ত হয়। এক কথায় বলা যায় যে, জীবগণ যাহা দুষ্ট বলিয়া প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করে, উদ্ভিদেরা তাহা পোষক রূপে গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে যে অক্সিজেন বায়ুতে যাইয়া মিশ্রিত হয়, জীবগণ তাহাই আবার নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার একটি আশ্চর্য্য কৌশল বুঝিতে পারা যায় এবং বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া পড়ে।

কতকগুলি কৌশলে আমাদের বাসগৃহের ভিতর বায়ু-সঞ্চালনের সহায়তা করা যায়। আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই সকল কৌশল অবলম্বনের বিশেষ দরকার হয় না। গ্রীষ্মের আতিশয্যবশতঃ নয়মাস কাল অক্লেশে আমরা ঘরের দরজা-জানালা খুলিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে পারি এবং তখন বাহিরের বায়ু ভিতরে আনিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বহুলোক এমন কি গ্রীষ্মকালেও সদাসর্ব্বদা দরজা-জানালা বন্ধ রাখিয়া নিয়ত দূষিত বায়ুতে বাস করে এবং তাহাতে নিজেদের অসুস্থ ও রুগ্ন করিয়া ফেলে। যখন এখানে শীত পড়ে, তখনও শয়নগৃহে আবশ্যক পরিমাণ মুক্ত বায়ু প্রবেশের পথ খোলা রাখিতে হইবে। এজন্য একদিকের জানালা বা খড়খড়ির অন্ততঃ কিয়দংশ খোলা রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। খড়খড়ির পাখি একটু খোলা রাখিলে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, অথচ তাহাতে ঠাণ্ডা লাগার কোন সম্ভাবনা থাকে না। ঘরে সার্শি থাকিলে, যখন সেগুলি সমস্ত বন্ধ করা হয়, তখন ঘরটি একটি বৃহৎ বন্ধ বাক্সের ন্যায় হইয়া পড়ে এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। শীতপ্রধান দেশে ঘরের দেয়ালের উপরিভাগে মুক্ত বায়ু প্রবেশের জন্য পথ রাখা হয়। যাঁহারা কিছুতেই দরজা জানালা খুলিবেন না, তাঁহাদের ঐরূপ বায়ু প্রবেশের পথ রাখিয়া গৃহনির্ম্মাণ করা একান্ত আবশ্যক।

বাটী নির্ম্মাণকালে যাহাতে প্রত্যেক ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে বাহিরের বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই সহরে শত শত পুরাতন বাটী আছে, যাহাদের গঠন-প্রণালী অতীব নিন্দনীয়। আজকাল Municipal বিধান অনুসারে চতুর্দ্দিকে খোলা জায়গা রাখিয়া যে সকল নূতন বাটী নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে নূতন ও সেই পুরাতন বাটীগুলির মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাস্তবিক, এই বিস্তৃত, জনাকীর্ণ সহরে বহু পূর্ব্বেই ঐ সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে হয় ত আমাদের আজ এত বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হইত না। দুঃখের বিষয়, এখনও ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সে জন্য অনেকে বাটী নির্ম্মাণকালে, যাহাতে উন্মুক্ত স্থান রাখিতে না হয়, সে জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করেন। যখন সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, মুক্ত স্থান না রাখিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিলে সেই বাটীতে বাস সমূহ বিপজ্জনক, তখন সকলেই নিজে-নিজে আগ্রহ সহকারে মুক্ত স্থান রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বহুজনাকীর্ণ সহরের মধ্যে ও সন্নিকটে বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ বাগানের ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক। মুক্তস্থানের বায়ু সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে ও তাহাতে সহরের স্বাস্থ্য ভাল হয়। গড়ের মাঠের ন্যায় বিস্তৃত মুক্তস্থান থাকায় কলিকাতা সহরের অনেক উপকার হইয়াছে। ঐ ময়দান না থাকিলে সহরের স্বাস্থ্য আরও মন্দ হইয়া পড়িত। বহু প্রাচীন নগর কালে বহুজনাকীর্ণ হইলে দূষিত বায়ু হইতে সংক্রামক পীড়া কর্ত্তৃক জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি হইতে অধুনা সহরের মধ্যে মুক্ত বাগান বা বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের স্থানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। নূতন গঠিত Improvement Trustও তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে সহরের চতুর্দ্দিকে বাগান স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, বহুদিন অবধি এদিকে সমুচিত দৃষ্টি না থাকায় জনাকীর্ণ সহরের মধ্যস্থলটিতে ঐরূপ মুক্ত বাগানের সংখ্যা নিতান্ত কম। জনতা ও বাণিজ্য-ব্যবসা বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে তথায় জমীর মূল্য এত বেশী হইয়াছে যে, প্রশস্ত বাগান প্রতিষ্ঠা করা বহুব্যয়সাপেক্ষ। যাহা হউক, সম্প্রতি ১০ দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Improvement Trust সহরের মধ্যে কয়েকটি বাগান স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্যামবাজার ও বেলগেছিয়ার মধ্যস্থানে খালের ধারে

একটি প্রশস্ত ময়দান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে এবং সহরের উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে বেড়াইবার জন্য উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থার প্রস্তাব হইয়াছে। আশা করা যায় যে শীঘ্রই এগুলি কার্য্যে পরিণত হইবে, এবং সহরের অন্যান্য স্থানেও প্রশস্ত মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

সহরে এক্ষণে যে সকল বাগান বা মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনটিতেই আমাদের স্ত্রীলোকেরা যাইতে পারেন না। পুরুষেরা সর্ব্বত্র বেড়াইতে পারেন, এবং ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে সহজেই তাঁহারা কোন একটি মুক্ত স্থানে যাইয়া বিশুদ্ধ বায়ু উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের বিশেষতঃ পর্দ্দানসিন মহিলাগণের পক্ষে ঐরূপ করা অসম্ভব। স্বাস্থ্যের জন্য কাহারও পক্ষে মুক্ত বায়ু সেবন একান্ত আবশ্যক হইলেও কলিকাতায় তাহা কার্য্যে পরিণত করা অতীব কঠিন। বাস্তবিক অনেকেই স্ত্রীলোকদের ব্যবহারোপযোগী কোন মুক্তস্থানের একান্ত অভাব অনুভব করিয়াছেন। প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিকাতা Corporationএ এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, আমাদের স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের জন্য সহরে একটি বাগান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক এবং সে জন্য আমি Circular Road এ অবস্থিত Greer Park নামক বাগানটি পর্দ্দা দ্বারা ঘেরিয়া মহিলাগণের বেড়াইবার উপযোগী করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। বরং দেখা যায় যে, যাহাতে স্ত্রীলোকদের পর্দ্দা-রক্ষার বিন্দুমাত্র শিথিলতা হইবার সুদূর সম্ভাবনাও আছে, তাহা আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় কাহারও-কাহারও চক্ষে নিন্দনীয়, আপত্তিজনক ও অকর্ত্তব্য নহে। আমার পর আরও দুইবার কলিকাতা Corporationএ ঐ কথা তোলা হইয়াছে এবং সম্প্রতি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার Banks নূতন আকারের ঐ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং সেজন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফলে কতদূর কি হইবে তাহা এক্ষণে বলা কঠিন।

গুম্ফ-বধ

[শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীজ।

বোতলের লঙ্কার আচারটি ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তেলটুকু পড়িয়া ছিল। আমার দিদিশাশুড়ী পাকা গৃহিণী; তিনি অপচয় দেখিতে পারেন না; সেই জন্য তৈলসমেত আচারের বোতলটি তাঁহার পোষাকের আলমারীর পিছনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে দামী জিনিস থাকে না, থাকিলে চুরি যায়। একবার একটা ঘিয়ের টিন শাল-দোশালার সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার জন্য শালগুলি কাচাইতে দুই-তিন শত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল। আর একবার ভাল সন্দেশ আসিয়াছিল, তাহা চাউলের জালায় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন; পর দিন আমাদের সংসারের ভাত এত মিষ্ট হইয়াছিল যে, কেহ তাহা মুখে তুলিতে পারে নাই।

রাজু ঝি তাহার মসীবিনিন্দিত বর্ণ উজ্জ্বল করিবার জন্য একটু তৈলের সন্ধানে ফিরিতেছিল। আলমারীর পার্শ্বে পূরা একটি বোতল সোণার বরণ সরিষার তৈল দেখিতে পাইয়া সে আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; বোতলটি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া নীচের ঘরে রাখিয়া আসিল, এবং যথাসময়ে আধবোতল তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে গেল।

দিদিশাশুড়ী পূজা শেষ করিয়া রন্ধনে বসিয়াছেন, আমি কুটনা কুটিতেছি, রাজু বাটনা বাটিতেছে। এমন সময় রাজুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব্বদেশের পঞ্চাশটি লঙ্কা একবৎসরকাল তৈল মধ্যে বাস করিয়া সস্নেহে সমস্ত তেজ তৈলকে অর্পণ করিয়া গিয়াছিল;—রাজুর কাল অঙ্গে তাহার

ফল ফলিতেছিল। সহসা রাজু শিল ছাড়িয়া উঠিল ; বলিল, "দিদি-মা তুমি সাক্ষাৎ দেবতা,—তোমার মন্নি বড় লেগেছে। ও মা জ্বলে মনু গো,—"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজু, তোর কি হয়েছে ?" দিদিশ্বাশুড়ী বলিলেন, "আমি তোকে শাপ-মন্নি দিতে যাব কেন ?" রাজু তখন দরদালানে লুটাইতেছে, আর বলিতেছে, "ও রে বামুনের জিনিস কেন চুরি করেছিনু রে—ও রে বাবা রে, গেনু রে,"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজু, আবার কি চুরি করেছিস ?" রাজু বলিল, "ও মা, তোমার নয় মা ; তোমার ত কত জিনিসই চুরি করি, এমন ত কখন হয় না,—ও গো গেনু গো—বাবুর আরসী-আলমারীর পিছন দিকে এক বোতল তেল ছিল, তাই থেকে একটু মেখেছিনু গো"—

দিদিশ্বাশুড়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ও মা, সে যে খোকার লঙ্কার আচারের বোতল।" আমি কথা কহিব কি, তাহা শুনিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলাম। বিহারী চাকরের সহিত রাজুর চিরকালের বিবাদ ; সে রাজুর দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল এবং দিদিশ্বাশুড়ীকে কহিল, "দিদিমা, মাগী ভারী চোর। মার মাথার সোনার কাঁটা ওই নিয়েছিল।" রাজু তাহা শুনিয়া বলিল, "ও গো, নিয়েছিনু গো, ও মা তোমার পায়ে পড়ি, কাল ফিরিয়ে দিয়ে যাব ; এখন বাঁচাও মা"—

এই সময়ে বাড়ীর দুয়ারে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল ; আর বড়-খোকা নাচিতে-নাচিতে আসিয়া বলিল, "ও মা, বড়মাসী আর ছোটমাসী এসেছে।" তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আমার দুই ভগিনী আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগকে দেখিয়া রাজুর শোক দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "ও গো মাসীমারা, দিদিমার মন্নি বড্ড নেগেছে ; তোমরা একটু পায়ের ধুলো দাও বাছা।" লতিকা আর অমিয়া রাজুর তৈল-চুরির কথা শুনিয়া আমার গায়ে লুটাইয়া পড়িল। রাজু তাহা দেখিয়া বলিল, "ও গো হাস কেন গো, আমি যে জ্বলে গেনু গো !" লতিকা বহু কষ্টে হাস্য-সম্বরণ করিয়া কহিল, "রাজু, তোর ভালই হয়েছে, রংটা একটু ফর্সা হবে'।" রাজু তাহা শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং লতিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "সত্যি না কি মাসীমা ? তাহ'লে আবার মাথ্‌বো।" আমার দিদিশ্বাশুড়ী রাগিয়া বলিলেন "মর পোড়ারমুখী, একদিন মেখে দাপিয়ে বাড়ী মাথায় করেছিস ; আবার মাথ্‌বি, দূর হ।" তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল ; কারণ, এই সময় ভূপেন আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

লতিকা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিল। আমি একখানা আসন পাতিয়া দিলাম। ভূপেনকে উপরে আনা হয় নাই বলিয়া দিদিশ্বাশুড়ী বকিতে লাগিলেন। রাজু বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। ভূপেন বলিল, "দিদি-মা, কর্ত্তা দিদিকে আমাদের সঙ্গে মুসৌরী লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, কাল 'তার' আসিয়াছে। দাদা কোথায় ?" দিদিশ্বাশুড়ী বলিলেন, "কি জানি ভাই, সারাদিনের মধ্যে তার তো চুলের টিকি দেখ্‌তে পাইনে, কোথায় গেছে।"

"কখন ফিরিবেন ?"

আমি বলিলাম "বড় বেশী বিলম্ব নাই।"

"তবে আমরা একটু বসিয়া যাই।"

বলিতে-বলিতে তাঁহার জুতার শব্দ পাইলাম। বড়-খোকা বলিয়া উঠিল, "মেসোমশাই, ঐ বাবা এসেছে।" লতিকা আর অমিয়া তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়া আমার ঘরে গিয়া লুকাইল। তিনি যেই ঘরে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় দুই দিক হইতে দুইজন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি ত অপ্রস্তুত। লতিকা বলিল "মুখুয্যে মশাই, আপনি কেমন লোক, আমরা একঘণ্টা আপনার জন্য বসিয়া আছি।"

"গোস্তাকি মাফ্‌ হয় বেগম-সাহেব, গোলাম তো সর্ব্বদাই হাজির আছে। দুইপ্রহর বেলায় যে অধমের কুটীরে চন্দ্রাবলির উদয় হইবে, তাহা কেমন করিয়া জানিব ? বলি সে তাম্বুল-করঙ্ক-বাহকটা কোথায় গেল ? বেগম-সাহেব, কি সেটাকে জবাব দিয়াছ ?"

অমিয়া বলিল, "জবাব দিলে কি সে যাইতে চাহে ? তিনি ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়াছেন। বড়দির সঙ্গে আর দিদিমার সঙ্গে গল্প কচ্ছেন।"

আমার বোন দুইটি সুন্দরী। যেমন-তেমন সুন্দরী নয়, তেমন রূপ দেশে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দুই বৎসর পূর্ব্বে লতিকার বিবাহ হইয়াছে। ভূপেন একটু কালো ; কিন্তু তাহার মত মুখশ্রী লতিকা বা অমিয়া কাহারও নাই। তথাপি সে লতিকার পদানত। উনি তাহার নাম রাখিয়াছেন

লতিকার তাম্বুল-করঙ্ক বাহক। ভূপেন আমাদের বড় বাধ্য। তাহার মত শান্ত, সুশীল, সচ্চরিত্র যুবাপুরুষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর আমার ইনি, দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল বই লইয়াই আছেন। হয় উপনিষদ, নয় দর্শন, আর নয় হার্ব্বর্ট স্পেনসার তাঁহার যথসর্ব্বস্ব। বাড়ীতে একটা কাজ পড়িলে আমার ভাইয়েরা আসিয়া উদ্ধার করে।

উনি ভূপেনকে ডাকিলেন। ভূপেন আসিল, লতিকা মাথায় কাপড় টানিয়া পলাইল। উনি হাসিয়া বলিলেন, "চন্দ্রাবলি, যাও কেন ?" লতিকা এক দৌড়ে দিদিমার নিকট আশ্রয় লইল। তখন তিনি ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে ভূপেন, এখন কি রাজকার্য্যে, না নিজ-কার্য্যে ?" রাজকার্য্যটা লতিকার কার্য্য, নিজ-কার্য্যটা ঘুরিয়া বেড়ানো। ভূপেন বিবাহের পুর্ব্বে না কি সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত। ভূপেন বলিল, "দাদা, কর্ত্তা দিদিকে আমাদের সহিত মুসৌরী লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন। আমরা বুধবারে যাইব। আপনিও কি যাইবেন না কি ?"

"আমাকে তো আর যাইতে লেখেন নাই। তিনি যখন লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার কন্যা অবশ্যই যাইবেন।"

"আমাকে ত যাইতে লেখেন নাই; আমি যাইতেছি কেন ?"

"বয়সের ধর্ম্ম, অথবা চাকরীটি যাইবার ভয়ে।"

"বলি দাদার চাকরীটি কি অটুট ?"

"সে ত অনেক দিন গিয়াছে ?"

"সে কি ? কবে গেল ?"

"ঠাকুরাণী যবে হইতে বচনবাগীশ হইয়াছেন।"

"আপনি যাইবেন কি না বলুন।"

"নিশ্চয় না। আমি কি তোমার মত গাড়ু-গামছা বহিয়া লইয়া যাইব ? তোমরা কে কে যাইতেছ ?"

"আমরা দুইজন,—"

"সে ত বটেই। আর কে যাবে।"

"অমিয়া যাইবে।"

"তাহার বিবাহের সম্বন্ধের জন্য এখানে রাখা হইয়াছিল, সম্বন্ধ ত হইল না, ইহার মধ্যেই লইয়া যাইবে কেন ? পুরুষ-মানুষ আর কে যাইবে ?"

"আমার এক বন্ধু।"

"বয়স কত ?"

"একুশ-বাইশ।"

"সর্ব্বনাশ! বর্ণ কি ?"

"ব্রাহ্মণ।"

"আরে সে বর্ণ নয়, গায়ের বর্ণ।"

"কনক-চাঁপার মত।"

"আরও সর্ব্বনাশ! কবিতা লেখা অভ্যাস আছে ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

ঠাকুরটির রঙ্গ দেখিলে অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। ভূপেনের বন্ধু আর যাইবার সময় পায় নাই ?

"ভূপেন, তোমরা কবে যাইবে ?"

"বুধবার পঞ্জাব-মেলে।"

"ওরে বিহারী, ফৌজদারী-বালাখানার দুইসের তামাক কিনে আন, আর বিছানার ব্যাগটা বাঁধিয়া রাখ।"

"কেন ? দাদা, কোথায় যাইবেন ?"

"জমিদারী রক্ষা করিতে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

প্রফুল্ল ছেলেটি বেশ। রূপে কার্ত্তিকও নয়, অথচ কুৎসিত, কদাকারও নয়। পোষাক-পরিচ্ছদও ভাল। দোষের মধ্যে গোঁফটি কামানো। আমি গোঁফ্ কামানো, মেয়েমুখো পুরুষ একেবারে দেখিতে পারি না। ভূপেনের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার অবস্থা খুব ভাল, অথচ পোষাকের কোন আড়ম্বর নাই। কেবল চোক দুইটি চারিদিকে ঘুরিতে থাকে; সেটা পুরুষজাতির স্বভাব।

আমরা কাশীতে আসিয়াছি। সকাল হইতে মনটা ভার হইয়া আছে; কারণ আমার সুরতির কৌটাটি চুরি গিয়াছে। কে চুরি করিয়াছে, তাহা জানি। পাছে সে সাবধান হইয়া যায়, সেইজন্য কিছু বলি নাই। ফৌজদারী-বালাখানার তামাকের টিনটা চুরি করিতে গিয়াছিলাম, খুঁজিয়া পাই নাই। চোর যদি শীঘ্র সুরতির কৌটাটি ফিরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে গড়গড়ার নলটি ভাঙ্গিয়া দিব।

আহারের পরে 'সারনাথ' দেখিতে যাইব। ভূপেন তৈল মাখিতেছে, উনি তামাক টানিতেছেন, আর প্রফুল্ল দাড়ি কামাইতে বসিয়াছে। আমি দালানের দুয়ারের পার্শ্বে বসিয়া পান সাজিতেছি। শশী সরকারকে সুরতি আনিতে চকে

পাঠাইয়াছি; সে না আসিলে যাইব না। ভূপেন বলিল, "প্রফুল্ল, গোঁফ্‌টা রাখ না কেন?" প্রফুল্ল বলিল "ছি, বড় বিশ্রী দেখায়।" কিসে বিশ্রী দেখায়, কিসে সুশ্রী দেখায়, তাহা যদি পুরুষ-জাতি বুঝিত!

ভূপেন উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সারনাথে যাইবেন, দিদি হাঁটিতে পারিবেন ত?" ঠাকুরটি বলিলেন "তোমার দিদি আর টমি কুকুর বেঙের মত থপ্ থপ্ করিয়া চলিবেন।"

"কতদূর চলিবেন?"

"এই দুইচারি কদম।"

"আর আপনি পিছন হইতে নকল করিবেন ত?"

"আমার স্বভাব বড়ই উদার। দেখ ভাই, অমন সুন্দর গজেন্দ্র-গমন দেখিলে আমি নকল না করিয়া থাকিতে পারি কই?"

"তাহার পরে কি হইবে?"

"তুমি আর আমি কাঁধে করিয়া লইয়া আসিব।"

"আপনি দিদির নিন্দা করিতেছেন, আমি তাঁহাকে বলিয়া আসি।"

"ভায়া, তোমার কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না। তিনি উৎকর্ণ হইয়া দুয়ারের পার্শ্বে বসিয়া আছেন।"

"কি করিতেছেন?"

"তাঁহার পেশা। শশী সরকার একটা পানের বরজ কিনিয়া আনিয়াছে, তিনি সারনাথের রসদ বোঝাই করিতেছেন।"

প্রফুল্ল বলিয়া উঠিল "দিদি যদি জুতা পরিয়া যান, তাহা হইলে অত কষ্ট হয় না।" ঠাকুরটি বলিলেন "ভায়া, বরবপু-খানি ত দেখিয়াছ? বিবাহের সময় দুইখানি মহাপায়া জোড়া দিতে হইয়াছিল।"

ভূপেন হাসিয়া উঠিল। ঠাকুরটি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, একটু শাসন করিতে হইবে।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, "কি পোষাক পরিয়া যাইবেন?"

ঠাকুর। এই চুরিদার পায়জামা, সলুকা, পেশোয়াজ, আর ওড়না।

প্রফুল্ল। সর্ব্বনাশ! মেয়েরা কি সকলেই এই পোষাক পরিয়া বাহির হইবেন?

ঠাকুর। বোধ হয়।

ভূপেন। শুনিস্ কেন দাদার কথা। ঐ রকম সঙ সাজিয়া কোন ভদ্রলোকের মেয়ে পথে বাহির হইয়া থাকে? লোক দেখিলে দাদার রঙ্গ বাড়ে। আজ তোমাকে পাইয়াছেন কি না, সেইজন্য শশী সরকার এক বরজ পান আনিয়াছে, সারনাথে গরুর গাড়ী করিয়া পান যাইবে।

প্রফুল্ল। মেয়েরা তবে কি কাপড় পরিয়া যাইবেন?

ভূপেন। কাপড় পরিবে কেন? যোধপুর ব্রিচেস, আর কর্কের হ্যাট পরিয়া যাইবে।

প্রফুল্ল। কাপড় পরিয়া চলিতে কষ্ট হইবে।

ভূপেন। তোর যখন বিবাহ হইবে, তখন বৌকে গাউন পরাইয়া বেড়াইতে লইয়া যাস্।

প্রফুল্ল। মেয়েরা স্কার্ট পরিলে বেড়াইতে অত কষ্ট হয় না।

ঠাকুর। প্রফুল্ল ভায়া, অমিয়া লোরেটো কন্‌ভেণ্টে পড়িত। তাহার দুটা-একটা স্কার্ট পাওয়া গেলেও যাইতে পারে; কিন্তু তোমার দিদির ত নাই! আমার একখানা পুরাণো বিলাতী কম্বল আছে, সেখানা দড়ি দিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিলে হবে না?

ভূপেন। দেখুন দাদা, অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। দিদির হুকুমে মাসে কয়বার হল এণ্ডারসনের দোকানে ছুটিতে হয়?

প্রফুল্ল। স্কার্ট পরিলেই ভাল হইত।

ভূপেন। আমি কথাটা বলিয়া আসি।

ঠাকুর। ভূপ, আমার কথাটা বলিও না ভাই; তোমাকে বাদলরামের দোকানের টাকায় এক থিলি পান খাওয়াইয়া দিব।

ভূপেন উঠিল, দরজার নিকটে আসিয়া ডাকিল "দিদি।" আমি সকল কথাই শুনিতেছিলাম। ভূপেন আসিতেই বলিলাম "আমরা সব কথাই শুনিয়াছি। দূত, তোমাকে আর সাধু সাজিতে হইবে না।" লতিকা টিফিন্ বাক্স গুছাইতেছিল, সে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল, "দিদি, জিজ্ঞাসা কর ত, আমরা কি কাপড় পরিয়া যাইব, সে খবরে প্রফুল্ল বাবুর দরকার কি?" ভূপেন বলিল "আমি কি জানি?" আমি তখন ভূপেনকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূপেন, তোমার বন্ধু বিবাহ করেন নি কেন?"

ভূপেন বলিল, "সুন্দরী পাত্রী মিলে নাই বলিয়া।"

"সারা বাঙ্গালা মুলুকে মনের মত পাত্রী জুটিল না ?"

"কই আর জুটিল ?"

"কেন, লতিকা, অমিয়া কি কুৎসিত ?"

"সে কথা কতবার বলিয়াছি। প্রফুল্ল বলে যে 'তুই অন্ধ, স্ত্রৈণ, তুই রূপের কথা কি বুঝিস ?'"

"বটে ? ও কথা এতদিন বল নাই কেন ? তোমার বন্ধুর দর্পচূর্ণ করিয়া দিতাম। আমার ভগিনীদের রূপ জগত-বিজয়ী।"

"দিদি, সে আর একবার! এই দেখুন না, দাদা কেমন জহাঙ্গীর বনিয়া আছেন।"

ঠাকুরটির সঙ্গে থাকিয়া ভূপেন কথা শিখিতেছে।

"আপনারা কি পরিয়া যাইবেন ?"

"সে খবরে তোমার দরকার কি ? আমরা তিন বোনে পেশোয়াজ পরিয়া, পায়ে ঘুমুর দিয়া সারনাথে মজুরা করিতে যাইব।"

ভূপেন আমার বাক্যবাণ সহিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। তখন আমি লতিকাকে বলিলাম "দেখ ভাই, প্রফুল্লর সঙ্গে অমিয়া কেমন মানায় ?" লতিকা বলিল "বেশ মানায়। আমি কতদিন বলিয়াছি ; কিন্তু নিজে বলে, সে বাঙ্গালীর মেয়ে বিবাহ করিবে না।"

"ছেলেবেলায় পুরুষ মানুষে অনেক কথাই বলিয়া থাকে। সকল কথা কি গায়ে মাখিতে আছে ? তোর মুখুয্যে মশাই না কি বলিত যে, কষিত কাঞ্চনের মত বর্ণ না হইলে বিবাহ করিবে না।"

"দিদি, তুমি বুঝি কালো ?"

"যা, যা, তোর আর রূপ-বর্ণনা করতে হবে না। এখন যা বলি, তাই শোন্। বাবা তো বিবাহের জন্য অমিয়াকে কলিকাতায় রাখিয়াছিলেন ; অনেকে দেখিয়াও গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ ত হইল না। প্রফুল্লর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্ব্বে, অমিয়ার সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধটা পাকাপাকি করিয়া তুলিতে হইবে।"

"কেমন করিয়া ?"

"দেখ্ না। অমিয়া ?"

অমিয়া আসিল। সে স্নান করিয়া চুল শুকাইতেছিল। তাহাকে লইয়া ভিজা চুলগুলাকে আল্‌গা বেণী বাঁধিয়া দিলাম। একটা ফিরোজা রঙ্গের হাতকাটা ব্লাউস পরাইয়া তাহার উপরে গোলাপী রঙ্গের বেনারসী সাড়ী পরাইয়া দিলাম। তাহাকে বলিয়া রাখিলাম যে, বুটের বদলে দিল্লীর জরিদার নাগরা পরিয়া যাইবে। লতিকা আর আমি এক-একখানা মোটা বিলাতী কাপড় পরিয়া, বিছানার চাদর মুড়ি দিয়া বসিলাম।

গাড়ী আসিল, আমরা উঠিলাম। আমাদের দেখিয়াই ঠাকুরটি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন। দশ মিনিট পরে দেখি, বিহারী একহাতে জলের কুঁজা, আর এক হাতে তিনটা বালিস, বগলে দুই তিনখানা মাদুর ও ঠাকুরটি এক বোতল গোলাপ-জল, একটা স্মেলিংসল্টের শিশি, ছয়টা ছাতা, ও তিনখানা পাখা লইয়া আসিতেছেন।

লতিকা ত হাসিয়াই আকুল। গাড়ীতে উঠিয়া ঠাকুরটি বলিলেন, "ও রে বিহারী, একখানা পাখা ভুল হইয়াছে। আজ যে প্রফুল্ল বাবু মূর্চ্ছা যাইবেন।"

সারনাথে গিয়া দেখিলাম, চারে মাছ আসিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পল্লব

অমিয়া বড় একগুঁয়ে, সে কোন মতেই মাথার কাপড় ফেলিয়া প্রফুল্লর সম্মুখে বাহির হইবে না। লোরেটো কনভেণ্টে পড়িয়া সে আমার মাথা আর মুণ্ড শিখিয়াছে। আমার ঔষধ ধরিয়াছে। অমিয়া যদি একদিন মাথার কাপড় খুলিয়া বাহির হয়, তাহার আগুল্‌ফচুম্বিত কেশরাশি প্রফুল্ল যদি একদিন দেখিতে পায়, তাহা হইলে একমাসের মধ্যে বরকনে বরণ করিয়া ঘরে তুলি। বোনটি আমার যেমন-তেমন সুন্দরী নয়। তরুবালার অখিল একবার দেখলে হয়!

আজ প্রতিশোধ লইয়াছি, লক্ষ্ণৌ আসিবার সময় গড়গড়ার নলটি চুরি করিয়াছি। সেইজন্য ঠাকুরটি আজ বড় নরম। আমি ত ঠাকুরটিকে চিনি। চৌদ্দ বৎসর একসঙ্গে ঘর করিতেছি। এবারে জব্দ না করিয়া ছাড়িব না। গড়গড়ার নল কোথায় গিয়াছে, তাহা ভূপেন বুঝিতে পারিয়াছে।

রেলে লতিকাকে বলিলাম "লতি, দেখিয়াছিস্ ?" লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "দেখিয়াছি।" ভূপেন আমাদের কথা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেল, কিছুই বুঝিল

না। ঠাকুরটি সিগারেট মুখে করিয়া ঢুলিতেছিলেন, কিন্তু কথা বাদ যাইতেছিল না।

ভোরবেলায় গাড়ী ছাড়িয়াছিল। সে দিন কাহারও দাড়ি কামানো হয় নাই। বাসায় পৌছিয়া ঠাকুরটি গড়গড়ার নল কিনিতে ছুটিলেন, কারণ, শশী সরকার নল চিনে না। ভূপেন ও প্রফুল্ল কামাইতেছিল। সেই দিন প্রফুল্লর কথা শুনিয়া ভূপেন একটি কুকর্ম্ম করিয়া ফেলিল; সে দাড়ির সহিত গোঁফ্‌টি কামাইল। তাহা দেখিয়া আমি ও লতিকা তিনহাত ঘোমটা টানিয়া বসিয়া রহিলাম। ভূপেন লক্ষ্ণৌ সহর দেখিবার পারমর্শ করিতে আসিয়া বিপরীত অবগুণ্ঠন দেখিয়া প্রমাদ গণিল। অনেক সাধা-সাধনার পরেও যখন আমরা কথা কহিলাম না, তখন সে অমিয়ার আশ্রয় লইতে গেল। অমিয়াও দয়া করিল না, সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া পলাইল। ভূপেন বিষণ্ণবদনে বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া, আমি বড়-খোকাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইলাম "আপনি কে? আপনি কেমন ভদ্রলোক? জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরিচিত গৃহস্থের অন্দরে ঢুকিয়াছেন?" ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে কি রে, বড়-খোকা, আমি যে মেসো মশাই?" বড়-খোকা হাসিয়া কোলে উঠিতে যাইতেছিল, আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। সে আমার শিক্ষামত বলিল, "আমার মেসোমশাইয়ের গোঁফ আছে, আপনার তো গোঁফ নাই?" ভূপেন মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে চলিয়া গেল।

লক্ষ্ণৌ সহরে ভাল গড়গড়ার নল মিলিল না, আমার কর্ত্তাটি ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, ভূপেন আর প্রফুল্ল মুখটি চুণ করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, ব্যাপার কি? লক্ষ্ণৌতে আসিয়াই যে মেঘাড়ম্বর?" ভূপেন বলিল "দাদা, সর্ব্বনাশ করিয়াছি, প্রফুল্লর কথা শুনিয়া গোঁফ্ কামাইয়া মরিয়াছি; এখন বাড়ীতে কেহ আমায় চিনিতে পারিতেছেন না।"

"কেহ না?"

"বড়-খোকা অবধি না।"

"আমার গড়গড়ার নলটি খুঁজিয়া দাও, তোমায় উদ্ধার করিতেছি।"

"সকল রোগের ঔষধ ঐ এক জায়গায়।"

"বটে, তবে একটু বিলম্ব হইবে। চল বেড়াইয়া আসি।"

অমিয়া স্কুলে ছবি আঁকিতে শিখিয়া আসিয়াছিল, বেশ সুন্দর ছবি আঁকিত। ঠাকুরমা তাহাকে গোমতী নদীর চিত্র আঁকিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন; সে আজ গোমতীতীরে ছবি আঁকিতে যাইবে। গাড়ী আসিয়াছে। আমি ও লতিকা মাথায় কাপড় টানিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছি, এমন সময় ঠাকুরটির আবির্ভাব। একহাতে পানের ডিবা, আর আমার সেই সুরতির কৌটা; আর একহাতে পিক্‌দানী, কাঁধে তোয়ালে, আর বগলে পাখা। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। ভূপেন যদি আজ গোঁফ না কামাইত, তাহা হইলে ঠাকুরটিকে এইখানেই দু'দশ কথা শুনাইয়া দিতাম।

পথে যাইতে-যাইতে ভূপেন প্রফুল্লর গাড়ীতে আর একদিকে চলিয়া গেল। আমরা গোমতী তীরে গাড়ী হইতে নামিলাম। একটা পুরানো মস্‌জিদের চাতালে বসিয়া অমিয়া ছবি আঁকিতে লাগিল, আমি ও লতিকা তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। লক্ষ্ণৌতে তখনও বেশ গরম। ঠাকুরটি গলিয়া যাইবার ভয়ে মস্‌জিদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিগারেট ধরাইলেন। এমন সময় হাঁচিতে-হাঁচিতে, কাসিতে-কাসিতে, ভূপেনের ও প্রফুল্লর প্রবেশ। চাহিয়া দেখি, ভূপেন কোথা হইতে থিয়েটারের সাজের একটা গোঁফ পরিয়া আসিয়াছে; তাহার চুলগুলা ভূপেনের নাকে ঢুকিতেছে, আর সে অনবরত হাঁচিতেছে। তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল গড়াইতেছে। ভূপেনের দুর্দ্দশা দেখিয়া অমিয়া হাসিয়া লতিকার গায়ে ঢলিয়া পড়িল। লতিকা চাতালে লুটাইতে লাগিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ভূপেনের নিকটে গিয়া বলিলাম, "ভাই, তোমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, লক্ষ্মীছাড়া গোঁফটা খুলিয়া ফেল।" তখন ভূপেন গোঁফ খুলিয়া, নাক মুছিয়া বাঁচিল।

ফিরিয়া দেখি প্রফুল্ল নিকটে নাই, সে দূরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া পলকহীন নেত্রে চিত্রাঙ্কনরতা অমিয়াকে দেখিতেছে। দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। পিছন ফিরিয়া দেখি, পানের বাটা, সুরতির কৌটা লইয়া আমার ইষ্টদেব আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন "হুজুর, বেগম সাহেব, গোলামের অপরাধ মাফ্ হয়, আমার নলটা ফিরিয়া দিতে আজ্ঞা হউক।" পানের বাটার তলায় নলটা লুকানো ছিল, তাহা বাহির করিয়া দিলাম। প্রফুল্লর তখনও দেখা শেষ হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কোরক

ভূপেন আবার গোঁফ রাখিয়াছে। এই ঘটনাটির পর ভূপেন সম্পূর্ণরূপে শাসন হইয়া গিয়াছে। এইবার ঠাকুরটির পালা। প্রফুল্ল ধীরে-ধীরে ধরা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইতেছিল। আজ হরিদ্বারে আসিয়াছি। সকালবেলায় বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। পাহাড়ের নিকটে আসিয়াছি বলিয়া সকলেই গরম পোষাক পরিয়াছি।

কোন তীর্থেই স্নান করিতে দিবে না, সুতরাং সকাল-বেলায় ব্রহ্মকুণ্ডে অথবা কনখলে গিয়া কি করিব? গঙ্গার খাল দেখিতে গেলাম। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্রের তেজ ততই বাড়িতে লাগিল। বেলা যখন দশটা, তখন ভীষণ গরম, সকলেরই পোষাক ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিলাম। তুই মিনিট পরে দেখি প্রফুল্ল কাপড় ছাড়িয়া মুখময় একটা সাদা গুঁড়া মাখিয়াছে। লতিকা বলিল পাউডার, কিন্তু আমার বিশ্বাস হইল না। ক্ষণেক পরে দেখি ঠাকুরটি ঘন-ঘন পিঠ চুলকাইতে-চুলকাইতে বাহিরে আসিলেন, এবং প্রফুল্লের মুখ দেখিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভায়া, রংটা হঠাৎ ফর্সা হয়ে গেল যে?" প্রফুল্ল বলিল, "ঘামের জন্য পাউডার মাখিয়াছি।"

"পাউডারে কি ঘামাচি সারে?"

"বেশ সারে।"

"ভায়া, আমাকে একটু দিতে পারো?"

প্রফুল্ল পাউডার আনিল, বিহারী অঙ্গময় তাহা লাগাইয়া দিল। তখন প্রফুল্লকে ও তাঁহাকে রামযাত্রার ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় দেখাইতেছিল।

অমিয়া বলিল "ছি, পুরুষ-মানুষে বুঝি পাউডার মাখে?" ফিরিয়া দেখি, অমিয়া ও লতিকা রঙ্গ দেখিতেছে। লতিকা বলিল, "মুখুয্যে মশাই আসিলে জিজ্ঞাসা করিব, তাঁর কি রঙ ফর্সা হইয়াছে?" অমিয়া কহিল, "কিছু বলিও না মেজ-দি, প্রফুল্ল বাবুর চাকর গোপাল আমার বড় অনুগত, দেখ না কাল কি তুর্দ্দশা করি।" আমি মনে-মনে বলিলাম, মনিব যখন অনুগত, তখন চাকর যে অনুগত হইবে, সে আর অধিক কথা কি? লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবি বল্ না ভাই?" অমিয়া কথা ভাঙ্গিল না, বলিল "কাল সকালেই দেখতে পাবে।"

এই সময়ে ভূপেন বাড়ীর ভিতরে আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভূপেন, কাল কোথায় যাবে?" ভূপেন বলিল, "শেষ রাত্রিতে হৃষীকেশ যাব।" সেখানে খাওয়া-দাওয়া করিয়া সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিব। ব্রাহ্মণ, চাকর আর একখানা টঙ্গা লইয়া আজ সন্ধ্যাবেলায় চলিয়া যাইব। কিন্তু দিদি, প্রফুল্ল কিছুতেই থাকিতে চাহিতেছে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? কি হইয়াছে?"

"সে বলে তাহার মন কেমন করিতেছে। যখন আসিয়াছিল, তখন বলিয়াছিল যে সে দেশে-দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে; যে দেশে অপ্সরার মত সুন্দরী মিলিবে, সেই দেশে বিবাহ করিবে। এখন সে বলে যে, তাহার বিবাহ করিবার স্পৃহা ঘুচিয়া গিয়াছে।"

মনটা হঠাৎ দমিয়া গেল। ভূপেনকে বলিলাম, "তাও কখন হয়? এতদূর আসিয়া মুসৌরী না দেখিয়া কখন ফেরা যাইতে পারে না। ভূপেন, তুমি প্রফুল্লকে বুঝাইয়া বল। সে আমার ছোট ভাইটির মত, তুমি আমার নাম করিয়া অনুরোধ কর, সে নিশ্চয় রক্ষা করিবে।" ভূপেন বাহিরে গেল, আমি ভাবিতে বসিলাম। কি হইল? ভগবান কি বিমুখ হইলেন? এমন সময় ভূপেন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, আপনার খাতিরে সে ডেরাডুন পর্য্যন্ত যাইবে, কিন্তু সে কোনমতেই মুসৌরী যাইতে চাহে না।" কি করিব, একমনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় যখন ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে বেড়াইতে গেলাম, তখন দেখিলাম যে প্রফুল্লর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি তখনও অমিয়ার দিকে নিবদ্ধ। বাবার পত্র আসিয়াছে। ডেরাডুনে বড় কলেরা হইতেছে; সেখানে অপেক্ষা করা হইবে না।

শেষ-রাত্রিতে টঙ্গায় চড়িয়া হৃষীকেশ চলিয়াছি। এক গাড়ীতে আমরা তিন ভগিনী। আর এক গাড়ীতে ভূপেন ও ছেলেরা। তিন নম্বর গাড়ীতে উনি আর প্রফুল্ল। আর শেষের গাড়ীতে চাকরেরা। গাড়ীতে উঠিয়া অবধি অমিয়া কেবল আপন মনে হাসিতেছে। রৌদ্র উঠিলে গাড়ী এক জায়গায় দাঁড়াইল। ভূপেন হঠাৎ খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া

উঠিল। মুখ বাড়াইয়া দেখি, প্রফুল্লর মুখ রুজে রক্তবর্ণ হইয়াছে, আর ঠাকুরটি যেন লজ্জায় নীল হইয়া গেছেন। তাঁহার মুখময় নীল রঙের পাউডার মাখানো। পথে জল মিলিল না, শুষ্ক নদীগর্ভ দিয়া সেই নীলবর্ণ আর লালবর্ণ মানুষ দুইটি হৃষীকেশের বাজারে পৌঁছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুসুম।

আজ বিদায়ের পালা। প্রফুল্ল কোনমতেই থাকিবে না। তাহার চোখ দুটি সর্ব্বদাই জলে ভরা। ছেলেটি বেশ। ভগবান যে কি করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। লতিকা বলিয়াছে যে, অমিয়ার শরীর ভাল নাই, রাত্রি হইতে কিছু খাইতেছে না। কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না।

বড়-খোকা আসিয়া বলিল যে, গোপাল একা দেশে ফিরিতে বড় ভয় পাইতেছে। ভূপেন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে একা ফিরিবে, কি রকম?" গোপাল আসিয়া বলিল, "বাবু আমাকে সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া একা দেশে ফিরিতে বলিয়াছেন।" ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার সঙ্গে কি কোন জিনিস থাকিবে না?"

"থাকিবে একটা ব্যাগ।"

"ব্যাগটা লইয়া আয়।"

ভূপেনের হুকুমে গোপাল ব্যাগ লইয়া আসিল। সেটা একটা চামড়ার ছোট ব্যাগ, তাহাতে তিনখানা বস্ত্র ধরে কি না সন্দেহ। প্রফুল্ল তখন ঠাকুরটির সঙ্গে গাড়ী রিজার্ভ করিতে ষ্টেসনে গিয়াছে। এই অবসরে ব্যাগ লইয়া ভূপেন চাবি খুঁজিতে বাহির হইল। উঁহারা ফিরিয়া আসিবার পরে ভূপেন ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, হাত-পা ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। সে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া বলিল, "দিদি, সর্ব্বনাশ!" আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

ভূপেন ব্যাগ খুলিয়া দেখাইল, ব্যাগে দুইখানা গেরুয়া রঙের কাপড়, একটা আলখাল্লা, অমিয়ার একখানা ফটো-গ্রাফ, তাহারই একটা পুরানো রঙের-শিশি, আর একটা শুক্‌না গোলাপ-ফুল। ভূপেন স্তম্ভিত, আমিও স্তম্ভিত। লতিকা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ, বলিলেই হইত।" অমিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, ভরা ভাদ্রের গঙ্গার মত তার দুইটি চক্ষু জলে টল-টল করিতেছে।

ভূপেন ব্যাগ লইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। গেরুয়া কাপড়, অমিয়ার ছবি, রঙের শিশি, ও মাথার ফুল দেখিয়া প্রফুল্ল মাথা হেঁট করিল। ঠাকুরটির মুখে কিন্তু বিস্ময় বা দুঃখের চিহ্নমাত্র দেখিলাম না। ভূপেন যখন জিজ্ঞাসা করিল, "গোপাল একা দেশে ফিরিবে, তোমার ব্যাগে গেরুয়া কাপড়, এ সকল কি ভাই?" তখন প্রফুল্ল ভূপেনকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল। ঠাকুরটি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে লক্ষ্ণৌতে ভূপেন যে গোঁফটা কিনিয়াছিল, সেইটা বাহির করিয়া বলিলেন "ভায়া হে, শ্বশুর-কন্যার সেবা করিয়া হাড় জর-জর হইয়াছে। ফটোগ্রাফ পূজা করিলেও হইবে না, গেরুয়া কাপড়েও হইবে না। তুমি ধাঁ করিয়া এই গোঁফটা পরিয়া ফেল দেখি, আমি পাঁজি আনিতে বলি!"

এমন মানুষও দেশে থাকে? প্রফুল্ল সত্য-সত্যই গোঁফ পরিল, এবং ঠাকুরটিকে একটা লম্বা-চওড়া প্রণাম করিল। লতিকা হাসিয়া আমার গায়ের উপরে ঢলিয়া পড়িল।

প্রফুল্ল গোঁফ রাখিয়াছে। ২৭শে আষাঢ়, বুধবার, গোধূলি-লগ্ন।

মোগল-উদ্যান

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

জগৎ-প্রসিদ্ধ পারস্যের অমর কবি ওমার খায়েম বেদনাপ্লুত কণ্ঠে বলিয়াছেন :—'My grave shall be in a spot, where the north-wind may scatter the roses over it. মহাকবির জীবনের এই চরম বাসনা ফলবতী হইয়াছিল। উত্তর-বাতাস আসিয়া গোলাপগুচ্ছকে তাঁহার কবরের উপর ছড়াইয়া দিয়াছিল।

আবার পারস্যের অন্যতম মহাকবি সাদি তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ 'গুলিস্তানের' ভূমিকায় উদ্যান সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"Mature consideration as to the arrangements of the book made me deem it expedient that this delicate garden and this densely wooded grove would, like Paradise be divided into eight parts in order that it may become the less likely to fatigue."

কবি সাদি পবিত্র কোরাণসরিফে উল্লিখিত স্বর্গীয় উদ্যানের সহিত তাঁহার মানসজাত উদ্যানকে কিরূপভাবে উপমিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলেন।

পারস্যের কবি এবং বাদশাহগণ উদ্যানের কিরূপ অনুরক্ত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আগরার চির-নূতন এবং চিরসুন্দর মর্ম্মরস্বপ্ন—আকবরের সমাধি-মন্দির, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি পৃথিবী বক্ষে মোগলের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মোগল বাদশাহগণ অনেকদিন হইল পৃথিবী-বক্ষ হইতে অপসারিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রাণোন্মাদিনী স্মৃতি আজিও অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে। তাঁহাদের অবিনশ্বর ও চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি বিশ্ব-মানবের মনে তাঁহাদের স্মৃতি চির-জাগরূক করিয়া রাখিবে।

মোগল বাদশাহগণ যে কেবল নয়নরঞ্জন হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; তৎসংলগ্ন মনোহর শোভা-সৌন্দর্য্য-বিভূষিত উদ্যানও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মোগল-সম্রাট বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "হিন্দুস্থানের প্রধান অসুবিধা এই যে, এখানে কৃত্রিম জল-প্রণালীর একান্ত অভাব। আমার ইচ্ছা, যে স্থানে আমি আমার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিব, সেই স্থানে জলোত্তোলন-যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইব। তদ্দ্বারা কৃত্রিম জলধারা উৎপন্ন হইবে এবং পরিশেষে একটি সুন্দর উদ্যানও নির্ম্মিত হইবে।"

তাঁহাদের উদ্যান-রচনা করিবার প্রধান কারণ এই ছিল যে, কঠোর ও নীরস রাজকার্য্যে সদাসর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিয়া, যখন তাঁহাদের মন-প্রাণ কঠিন হইয়া উঠিত, তখন তাঁহারা উদ্যানের মনোমোহন দৃশ্যাবলী এবং সৌন্দর্য্য দর্শনে পুলকিত হইতেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহাদের কর্ম্মক্লান্ত মন রাজনৈতিক চিন্তা পরিহার করিয়া বিমল আনন্দে পূর্ণ হইত।

মোগল বাদশাহগণ যে স্থানে সৌন্দর্য্য-দেবীর আভাষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই স্থানেই সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। চিরসুন্দর বাংলা-দেশের যে স্থানে সৌন্দর্য্যের আধার আছে, সেই স্থানেই মোগল বাদশাহ-গণের উদ্যান-বাটিকা আছে।

আমাদের মনে হয়, মোগল বাদশাহগণ চিরসুন্দরের প্রকৃত উপাসক ছিলেন। যদি তাহাই না হইবেন, তবে তাঁহারা সৌন্দর্য্যা-ধিষ্ঠাত্রী দেবীর পদাঙ্কানুসরণ করিবেন কেন?

আমাদের মনে হয়, যতগুলি বাদশাহ দিল্লীর রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই উদ্যান-রচনা সম্বন্ধে সমানভাবে মনোযোগী হয়েন নাই। বাহাদুর শার রাজত্বের অব-সানের সঙ্গে-সঙ্গে মোগল রাজত্বের পতন আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ছয়জন মোগল সম্রাট উদ্যান-রচনা সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহাদের নির্ম্মিত উদ্যানাবলীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

মোগল বাদশাহগণের আমলের সমস্ত উদ্যান এখন আর বিদ্যমান নাই। যে সকল উদ্যান সমাধিস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিমাত্র এখনও বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু সে সকল উদ্যানের মনোহারিণী শোভা নাই; বর্ণবৈতালিকের অবিরাম কলগুঞ্জনধ্বনি আর শুনা যায় না; উদ্যানস্থিত গোলাপ, চামেলি প্রভৃতি কুসুম হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া বাতাসকে সুরভিপূর্ণ করিয়া তুলে না; চত্বরের প্রান্তভাগ বহিয়া কুলুকুলু স্বরে জলধারা আর অবিরাম-গতিতে বহিয়া যায় না; উৎসের মুখ হইতে অবিরাম জলরাশি উৎসারিত হইয়া বিচিত্র হীরকমালার সমাবেশ করে না। প্রভাতের প্রথম অরুণোদয়ে দিক্চক্রবালেরই প্রান্তভাগ দিয়া বৃক্ষের নবোদ্ভিন্ন পত্রের উপর সূর্য্যকিরণরাশি পিছলাইয়া পড়ে না, নানাবিধ রাজউদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির মোহনলীলা আর দেখা যায় না। সবই কালের বিরাট গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা পুরাতনের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র।

পরিশেষে মহাকবি সাদির রচিত কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি :—

"I saw handfuls of the rose in bloom,
With bands of grass, suspended from a dome.
I said "What means this worthless grass that it
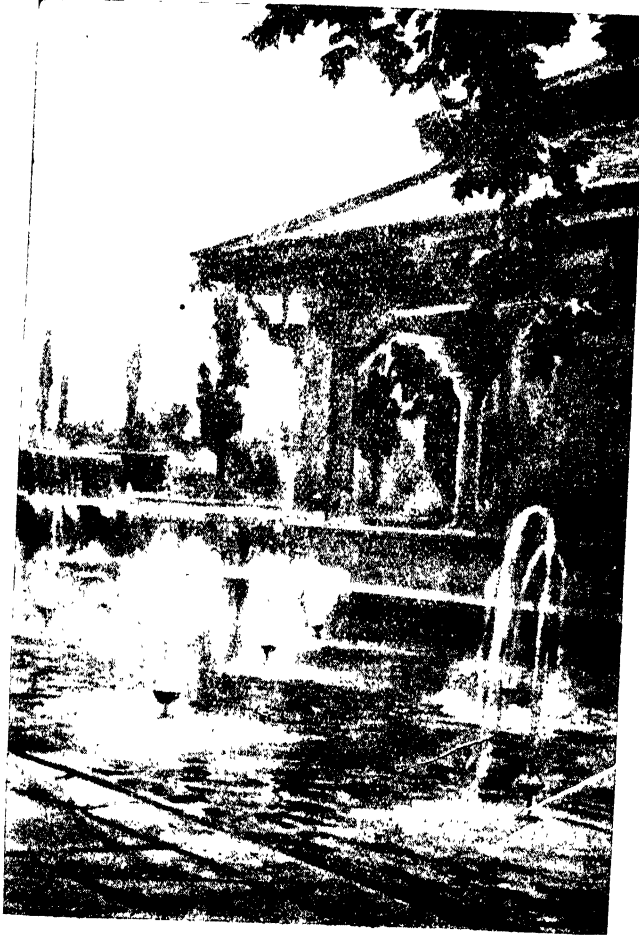
শালিমার বাগে রাণীর প্রাসাদ

Should in the rose's fairy circle sit ?"
Then wept the grass and said, "Be still ! and know
The kind their old associates ne'er forego
Mine is no beauty here or fragrance—true,
But in the garden of the Lord I grew."

বাবর :—

ভারতের প্রথম মোগল-সম্রাট বাবর কতিপয় উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা প্রদান করিলাম।

বাগ-ই ওয়াফা :—বাবর স্বলিখিত জীবনী—"তুজুক-ই-বাবরীতে" এই উদ্যানের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই উদ্যানটি কাবুলের নিকট অবস্থিত ; ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে বাবর ইহার প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবর লিখিয়াছেন ;—"আদিনাপুর দুর্গের অপর পার্শ্বে আমি একটি "চার-বাগ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম—ইহাই বাগ-ই-ওয়াফা নামে পরিচিত। ইহার সম্মুখভাগ দিয়া নদী প্রবাহিত। যে বৎসরে আমি বেহার খাঁকে পরাজিত করিয়া লাহোর ও দিবলপুর অধিকার করিয়া লই, সেই সময়ে আমি নানাবিধ কদলীবৃক্ষ আনয়ন করিয়া এই উদ্যানে রোপণ করি। বৃক্ষগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং ফলভারে অবনত হইল।

পূর্ব্ব বৎসরে আমি ইক্ষুগাছ আনিয়া এই স্থানে রোপণ করিয়াছিলাম—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বদখ্শান এবং বোখারাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এই উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল ; ইহা হইতে একটি জলধারা বহির্গত হইয়া উদ্যানের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে আর-একটি জলধারা আছে। তাহার চতুর্দ্দিক কমলানেবুল এবং দাড়িম্ব বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত। যখন বৃক্ষে হরিৎবর্ণ লেবু ফলিত, তখন ইহার শোভা অতীব রমণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী হইত।"

বাগ-ই-ওয়াফার যে চিত্রখানি আমরা মুদ্রিত করিতেছি, তাহা 'তুজুক-ই-বাবরীতে" আছে। এই আত্মকাহিনী বাবর কর্ত্তৃক তুর্কী ভাষায় লিখিত। মহামতি অকবরের একান্ত চেষ্টায় মির্জ্জা অবদুর-রহিম কর্ত্তৃক ইহা ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। অকবর স্বীয় দরবারের বিখ্যাত চিত্রকরগণের সহায়তায় 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীর" জন্য কতিপয় চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এই চিত্রে বিশন দাস নামে একজন চিত্রকরের উল্লেখ আছে। চিত্রকরের নাম দেখিয়া তাঁহাকে হিন্দু বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। চিত্রের বিষয় :—সম্রাট বাবর স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া উদ্যান-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন ; দুই ব্যক্তি পরিমাপের ফিতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। 'উদ্যানের চতুর্দ্দিকে দাড়িম্ব এবং কমলালেবু বৃক্ষসকল সজ্জিত। উদ্যানতোরণে কয়েক-জন বেগ বুঝি বা কোন নূতন বিদ্রোহের সংবাদ লইয়া দ্বারে করাঘাত করিতেছে ; কিন্তু সম্রাট তাঁহার কার্য্যে অভিনিবিষ্ট আছেন।

১৫ বৎসর পরে বাবর পুনরায় এই উদ্যান পরিভ্রমণ করিতে

গিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ আফ্‌গানদিগের সহিত যুদ্ধকালে, তিনি তিন ঘণ্টার জন্য এই উদ্যানে বিশ্রাম লাভার্থ আসিয়াছিলেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "পরদিন প্রভাতকালে আমি বাগ্‌-ই-ওয়াফায় উপনীত হইলাম। এই সময়ে উদ্যানটি বড়ই অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। তখন ডালিম ফলিবার সময়—ডালিমসকল বৃক্ষে শোভা পাইতেছে। লেবুগাছ সকল ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে—এ দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তখনও নেবু সকল পরিপক্ক হয় নাই। এই স্থানের ডালিম গাছগুলি আমার স্বদেশের ডালিম অপেক্ষা সুন্দর নয়। আমি বাগ্‌-ই-ওয়াফা দেখিয়া আর কদাপি এরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই।"

দ্বিতীয় চিত্রখানিও তাঁহার আত্মকাহিনী হইতে গৃহীত। এই উদ্যানে লাহোর হইতে সযত্নে আনীত ইক্ষু ও কদলীবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। উদ্যান-রক্ষক মৃত্তিকা-খনন এবং বীজ-বপন-কার্য্যে ব্যাপৃত। জলাধারের মধ্যস্থিত একটি উৎস হইতে জলরাশি নির্গত হইতেছে—সেই জলরাশি প্রণালীর সাহায্যে উদ্যানের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৃক্ষগুলিকে সতেজ করিতেছে।

বাগ্‌ ই-কিলান :—

সম্রাট বাবর বাগ্‌-ই-কিলানের পূর্ণ মূল্য দিয়া পূর্ব্ব স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। 'ইস্‌তালিফ' জেলার মধ্যে এই উদ্যানটী অত্যন্ত রমণীয় এবং সুন্দর। মৃত্যুর পর বাবর এই উদ্যানে সমাহিত হন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে "ইস্‌তালিফ" জেলা উদ্যানসমূহে পূর্ণ। তন্মধ্যে বাগ্‌-ই-কিলান অন্যতম। পরিশেষে ইহা মুগ্‌বেগ মীরজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এই উদ্যানের মধ্যে একটি স্রোত নিত্য প্রবাহিত হইত এবং ইহার পার্শ্বে বৃক্ষসমূহ রোপিত ছিল।

এই গ্রামের এক ক্রোশ নিম্নে, ইহার প্রান্তভাগে একটি উৎস আছে; তাহার নাম—"খাজে—সে—য়ারণ" (Khwajeh—sha—yaran)। ইহার চতুর্দ্দিক বৃক্ষদ্বারা পরিশোভিত। উৎসের দুই পার্শ্বে এবং পর্ব্বতের নিকটে কতকগুলি "ওক" বৃক্ষ আছে। উৎসের সম্মুখে 'আর্ঘণ' (Arghwan) নামক পুষ্পে স্থানটি আচ্ছাদিত। উৎসের চারিপার্শ্বে বসিবার জন্য আসন প্রস্তুত হইয়াছিল।

বাবর লিখিয়াছেন, "'আর্ঘণ' পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হইত, আমি বলিতে পারি যে, তখন পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন স্থান ইহার সহিত উপমিত হইতে পারিত না।"

রাম বাগ্‌ :—

ইহা যমুনার বামতটে অবস্থিত। অনুমানে বোধ হয়, ইহা বাবরের উদ্যান-প্রাসাদ ছিল। এই রাম বাগে, সম্রাট বাবরের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার প্রাণপ্রিয় উদ্যান "বাগ্‌-ই-কিলানে" তিনি সমাহিত হন।

জুহরা বাগ্‌ :—

ইহা রাম বাগ্‌ ও 'চিনি-কা-রৌজার' মধ্যবর্ত্তী। "চিনি-কা-রৌজা" একটি ভগ্ন সমাধিমাত্র; ইহার সন্নিকটেই 'জুহরা বাগ্‌' অবস্থিত। ইহা চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদ্যানটি জুহরার জন্য নির্ম্মিত এবং তাঁহার নামানুসারে 'জুহরা বাগ' নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে স্নানকল্পে ৬০টি কূপ আছে।

হুমায়ূন :—

দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধি-মন্দির তাঁহার উদ্যানের মধ্যেই অবস্থিত

বাগ্‌-ই-ভাফা (পাতিব্রত্যের উদ্যান)

হুমায়ূনের সমাধি দিল্লীর সকল অট্টালিকা অপেক্ষা অধিক সুন্দর। উদ্যানটি বৃক্ষলতাশূন্য এবং শ্রীহীন। ইহার বিশিষ্টতা এই যে, উদ্যানটি ভারতবর্ষের একটি পুরাতন মোগল-উদ্যান। ইহা এখন স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে।

অকবর :—

সেকেন্দ্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল-সম্রাট অকবরের সমাধি উচ্চ প্রস্তর-বেদীর উপর সংস্থাপিত। ইহা চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কেহ-কেহ বলেন—ভারত-সম্রাট অকবর নিজেই তাঁহার সমাধি-মন্দির

নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। উদ্যানটি নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে সজ্জিত।

মহামতি অকবর উদ্যান-কর্ষণ-বিদ্যায় সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। আইন-ই-আকবরীতে তাঁহার এই অনুরাগের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। আবুল ফজল লিখিয়াছেন,—

বাগ্-ই-ভাফা (পাতিব্রত্যের উদ্যান)

His Majesty looks upon plants as one of the greatest gifts of the Creator, and pays much attention to them. The horticulturists of Iran and Turan have, therefore, settled here, and the cultivation of the trees is in a flourishing state."

ভারতগবর্ণমেন্টের প্রসাদে সেকেন্দ্রার এই সমাধি-ভবন অতি সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে।

নিসিম বাগ্ :—

অকবর সম্রাট হইয়া কাশ্মীরে পদার্পণ করিবার পর, শ্রীনগরে 'হরি পর্ব্বত' নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করান; এবং শ্রীনগরের উত্তরে 'ডাল' হ্রদের তটে একটি উদ্যান নির্ম্মাণের কল্পনা করেন। এই 'নিসিম বাগ্ 'ডাল হ্রদের' উপরে মুক্ত স্থানে নির্ম্মিত হয়। এই স্থানের শীতল বাতাসের নাম হইতেই, ইহার নাম "নিসিম বাগ' হইয়াছে। এই উদ্যানস্থিত কূপ, প্রণালী এবং উৎসসকল অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নিসিম বাগ্ এবং দুর্গের অনতিদূরেই একটি হ্রদের ধারে "নাগিনা বাগ্" নামে আর একটি উদ্যান আছে।

জহাঙ্গীর :—

সম্রাট জহাঙ্গীর সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে উদয়পুরে আসিয়া কতকগুলি উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

দিলখুশা বাগ্ :—

সম্রাজ্ঞী নুরজহানের প্রীত্যর্থে এই উদ্যান 'শাহদারা" নামে অভিহিত। ইহা লাহোরের উত্তরে 'রাবি' নদীর ধারে অবস্থিত। এই দিলখুশা বাগে জহাঙ্গীর সমাহিত হইয়াছেন। দিলখুশা বাগ্ প্রকাণ্ড উদ্যান—ইহার নক্‌শা সেকেন্দ্রার অনুরূপ।

ইৎমদ্-উদ্দৌলার সমাধি :—

ইৎমদ্-উদ্দৌলা সম্রাজ্ঞী নূরজহানের জনক। তাঁহার সমাধি উদ্যানের মধ্যে স্থাপিত। বাদশাহ প্রিয়তমা মহিষীর পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করান। নূরজহানের পিতার নাম—ঘিয়াস্ বেগ্। ইনি জহাঙ্গীরের কোষাধ্যক্ষ এবং পরে প্রধান অমাত্যপদে উন্নীত হ'ন। ইঁহার বিবরণ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন।

এই সমাধি অকবরের সমাধির ন্যায় উচ্চ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। এই উদ্যানে চারিটী উৎস ছিল, এখন তাহারা শুষ্ক এবং শ্রীহীন। যখন পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সমাধির উপর ঝরিয়া পড়িত, তখন দেখিয়া মনে হইত যে, অদৃশ্য দেবতারা যেন তাঁহার কবরের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।

শালিমার বাগ্

কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ "শালিমার বাগ্" "ডাল" হ্রদের সন্নিকটেই অবস্থিত। এই উদ্যান সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। দ্বিতীয় প্রবরসেন নামক

জনৈক রাজা শ্রীনগরে 'ডাল' হ্রদের তটে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করান। তিনি ৭৯ হইতে ১৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজা প্রায়ই একটি সাধুকে দেখিতে পাইতেন—তাঁহার নাম—সুকর্ম্মস্বামী। তিনি "হারওয়ানের" (Harwan) নিকটবর্ত্তী উক্ত বাড়ীতে বাস করিতেন। এক সময়ে রাজউদ্যান সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। তারপর ঐ স্থানে এক গ্রাম স্থাপিত হয়—পরে উহা শালিমার নামে খ্যাত হয়। সম্রাট জহাঙ্গীর ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত নামানুসারে এই স্থানে একটি সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করান।

অধুনা এই উদ্যান কাশ্মীরের মহারাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত।

শালিমার দেখিতে অতীব সুন্দর। জলাধারের মধ্যস্থ উৎসসকল হইতে অবিরত জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। চারিদিকে সুন্দর ফুল-সকলের দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণ-স্নিগ্ধকর।

নিশাৎ বাগ্ :—

এই উদ্যানটি নূরমহলের ভ্রাতা আসফ খাঁ কর্ত্তৃক 'ডাল' হ্রদের তটে নির্ম্মিত। যতগুলি মোগল-উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই উদ্যানটীই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিয়া খ্যাত। এই উদ্যানের মধ্যে অনেকগুলি জলাধার আছে। তাহার মধ্য হইতে উৎস-মুখনিঃসৃত জলরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। গ্রীষ্মকালে জলাধারের উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সুবাসে চারিদিকের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। এই সব দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই সকল উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে অবস্থিতিকালে সম্রাট সাজাহান এই উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি উদ্যান দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"Nishat Bagh was altogether too splendid a garden for a subject, even though that subject might happen to be his own Prime-Minister and Father-in-law."

নিশাৎ বাগ চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই উদ্যানের বিশিষ্টতা এই যে ইহার প্রস্তর এবং মর্ম্মর-সিংহাসন দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর।

আচিবল বাগ্ :—

মোগল বাদ্‌শাহগণ দ্বারা নির্ম্মিত অনেক সুন্দর-সুন্দর উদ্যান মহাকালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আচিবল বাগ্, ভেরীনাগ বাগ্, ওয়াবাগ্ এবং পিন্‌জোর প্রভৃতির সৌন্দর্য্য এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী Bernier আচিবল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Returning from Send-bray (Bawan) I turned a little from the high road for the sake of visiting

পরম সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন উদ্যান (বাবর)

Achibal. What principally constitutes the beauty of this place is a fountain, whose waters disperse themselves into a hundred canals round the house, which is by no means unseemly and throughout the garden, especially at night when innumerable lamps, fixed in parts of the wall adapted for that purpose, are lighted under this sheet of water."

ইহার পর আর বোধ হয় 'আচিবল' সম্বন্ধে কিছুই বলিতে হইবে না।

আচিবল উদ্যানে শারদীয় সৌন্দর্য্য

নিশাত বাগ মধ্যস্থ-প্রাসাদের নিম্নতল

ভেরিনাগ বাগ—অষ্টকোণ তড়াগ
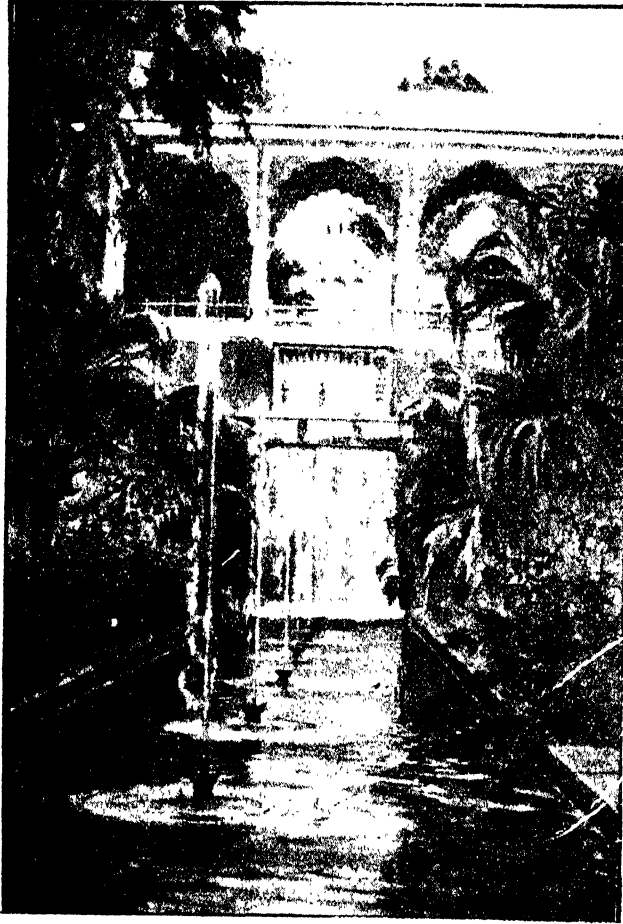
পিঞ্জর

শাহ্‌জহান

শালিমার বাগ :—

সম্রাট জহাঙ্গীরের পুত্র শাহজহান কাশ্মীরে পিতার নির্ম্মিত উদ্যানের ন্যায় একটি উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার নাম—শালিমার বাগ। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে আলিমর্দ্দন খাঁ নামক তাঁহার একজন ভাস্করের দ্বারা এই উদ্যান নির্ম্মিত হয়। এই উদ্যান তিন অংশে বিভক্ত। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২০ হস্ত এবং পরিসর ২৩৮ হস্ত। এই উদ্যানে নূনাধিক একশত উৎস আছে। বাদ্‌শাহনামা'য় এই উদ্যান সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত আছে।

তাজমহল :—

তাজের বর্ণনা আর বোধ হয় অধিক করিয়া দিতে হইবে না, কারণ সকলেই প্রায় তাহা জানেন। তাজের বিবরণ কত মহামহা চিন্তাশীল ও ভাবুক কবি ও পণ্ডিতের লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে। তাজের এমন কিছু সম্মোহনী শক্তি আছে, যে তাহার বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিলে, তাজের মোহে লেখনী অভিভূত হইয়া পড়ে।

সম্রাট শাহজহানের প্রিয়তমা দয়িতা, সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী মমতাজ এই স্থানে চিরনিদ্রায় মগ্না আছেন। কতশত বৈতালিক আসিয়া ডাকিয়া গিয়াছে, সে নিদ্রা আর ভাঙ্গে নাই। আর তাঁহার পার্শ্বেই প্রেমিক কবি-সম্রাট শাহ্‌জহান চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন।

শালিমার উদ্যানে যাইবার পথে

তাজের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে ফুরায় না। যতদিন মানব-হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের স্পৃহা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাজের মহনীয় মাধুর্য্য কেহই বিস্মৃত হইবেন না।

সম্রাট শাহজহান বড় সাধে প্রাণ-প্রিয়া মমতাজ-মহলের সমাধির উপর সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া পত্নী-প্রীতির চরম নিদর্শন রক্ষিত করিয়াছেন। মমতাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সম্রাট শাহ্‌জহান রক্ষা করিয়াছিলেন; তাহার ফল—এই তাজ।

তাজ উদ্যানের মধ্যে নির্ম্মিত। এখন আর সে তাজমহলের উদ্যানের সে মনোহারিণী শোভা নাই,—উৎসের সে [illegible]

নাই—বনবৈতালিকের কাকলিধ্বনি নাই—বাতাস আর প্রস্ফুটিত কুসুমের সুবাস বহন করিয়া আনিয়া মানবের প্রাণকে তেমন পরিতৃপ্ত করিয়া তুলে না;—থাকিবার মধ্যে আছে-তাজ। গবর্ণমেণ্ট উদ্যানটীকে যথাসাধ্য সংস্কৃত করিয়াছেন।

শালিমার বাগ :—

সম্রাট শাহ্‌জহানের অন্যতমা মহিষী আকবরাবাদী-মহল কর্ত্তৃক এই উদ্যানটি নির্ম্মিত হয়।

"শাহাজান নামা" প্রণেতা মহম্মদ সালে এই উদ্যান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কিঞ্চিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"This favourite Bagh with its lofty bulldings was made square three hundred by three hundred yards. The large tanks, rows of pearl-showing fountains and doomed buildings are similar to those in both the large gardens of Lahore and Kashmir. In short, it was finished in the course of four years, at a cost of two lakhs of rupees." ১৭৯৩ সালে সাহআলমের রাজত্বকালে Franklin সাহেব এই উদ্যান দেখিয়া লিখিয়াছেন,—"But a great part of the most costly and valuable materials have been carried away." এবং ১৮২৫ সালে বিশপ হেবার যখন দিল্লীতে ছিলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "The Shalimar gardens, extolled in Lalla Rookh, are completely gone to decay."

এই উদ্যান সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পরে ইহা বিক্রীত হয়। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। এখন দুই ভাগ কৃষির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অপর দুই ভাগে উদ্যান বিদ্যমান আছে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই উদ্যান British Residentএর গ্রীষ্মাবাসরূপে নিয়োজিত হইয়াছে; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়—ইহার অবস্থা বড় শোচনীয়।

কাশ্মীরের উদ্যান :—

সম্রাট শাহ্‌জহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকো কাশ্মীরে একটি উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহা 'সিদন' উপত্যকায় এবং বিজবেরার' সমুন্নত ভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন ঐ উদ্যান "ওয়াজির বাগ্" নামে অভিহিত। অধুনা এই উদ্যান ভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান—এখন আর 'জেদার' নদী উদ্যানের পাদদেশ চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হয় না। উদ্যানের প্রাকারসমূহ পতনোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে।

রাজকুমার দারার সযত্নরক্ষিত একটি "Album" ছিল। উহা এখন India office Libraryতে আছে। এই Albumখানি তিনি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী নাদিরা বানুকে উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে "This album was presented to his dearest and nearest friend, the Lady Nadira Begam, by Prince Mahomed Dara Shukoh, Son of the Emperor Shah Jahan—1641."

আওরংজীব :—

রোশেনারা বাগ্ :—

দিল্লীর সব্জি মন্দিরের অর্থাৎ (Vegetable Market) পশ্চিমে রোশেনারা বেগমের উদ্যান।

রাজকুমারী রোশেনারা তাঁহার নিজের উদ্যান-বাটীকায় সমাহিত আছেন। তাঁহার নামানুসারে এই উদ্যান "রোশনারা বাগ্" নামে পরিচিত। এই উদ্যানের প্রাচীর ভগ্নপ্রায় এবং ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চৌবুরজী বাগ্ ও নওয়ান কোট বাগ্ :—

কথিত আছে আওরংজীবের কন্যা জেবুন্নিসা একটি উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার নাম—চৌবুরজী বাগ্ (four-towers)। জেবুন্নিসা একাধারে চিত্রকর এবং কবি ছিলেন। এই উদ্যানটী রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি মীরাবাই নাম্নী জনৈক সঙ্গিনীকে উহা দান করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরেই নিজের জন্য একটি উদ্যান "নওয়ান কোট" এ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই উদ্যানেই তিনি সমাহিত হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, জেবুন্নিসা দিল্লীর 'তিশ-হাজারী' উদ্যানে সমাহিতা হন।

এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে আমি মিঃ ভিলিয়ার্স ষ্টুয়ার্টের পুস্তকখানিই অবলম্বন করিয়াছি এবং চিত্রগুলিও সেই পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি; তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

পাটনার কথা *

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস]

কলিকাতার প্রায় ১৭০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের ধারে পাটনা, বাঁকিপুর, দানাপুর এই তিনটি পাশাপাশি শহর লইয়া নূতন বিহার-প্রদেশের রাজধানী। পূর্ব্বদিকে পাটনা—(ডাকনাম পাটনা সিটি, গুল্‌জারবাগ, বেগমপুর)—ইহাই মুসলমানসময়ে শহর ছিল, এখন প্রধান-বাণিজ্যের কেন্দ্র। মধ্যে বাঁকিপুর—(মুরাদপুর, বাঁকিপুর, মিঠাপুর)—বর্ত্তমান শাসন-কেন্দ্র। পশ্চিমে দানাপুর, সেনা-নিবাস। পাটনা ও বাঁকিপুরে মধ্যে রাস্তার দুধারে ক্রমাগত বাড়ীঘর। কিন্তু বাঁকিপুর ও দানাপুরের মধ্যে অনেক খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। গঙ্গানদীর ঠিক দক্ষিণ পাড়েই পাটনা ও বাঁকিপুর এবং তাহাদের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে রেলপথ। কিন্তু দানাপুর সেনা-নিবাস হইতে দানাপুর রেলষ্টেসন (সাধারণ নাম "খগোল") প্রায় তিন মাইল, এবং গঙ্গাও দূরে।

বাঁকিপুরে সমস্ত সরকারী আদালত, আফিস, স্কুল-কলেজ হাঁসপাতাল, প্রধান তারঘর ও ডাকঘর, গীর্জ্জা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে। শহরটি ইংরাজের সৃষ্টি এবং সোয়া-শ' বৎসর পূর্ব্বে পাটনার জনপল্লীর পশ্চিমদিক্‌ব্যাপী খোলা মাঠে ইহার গঠন আরম্ভ হয়। এখন আবার বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশের লাটসাহেবের বাড়ী, আফিস, হাইকোর্ট, কর্ম্মচারীদিগের বাসগৃহ প্রভৃতি লইয়া এক নূতন শহর গঠিত হইতেছে। ইহার স্থান বাঁকিপুরের ঠিক পশ্চিমে, রেলের উত্তরে ও দক্ষিণে, এবং গঙ্গা হইতে কিছু দূরে,—অর্থাৎ দানাপুর ষ্টেসনে যাইবার পথে। সুতরাং পূর্ব্বপশ্চিমে ১৪ মাইল লম্বা, পূর্ব্বপ্রান্তে দেড়মাইল, পশ্চিমপ্রান্তে ২ হইতে ৩ মাইল প্রশস্ত ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়া এই শহর চারিটি স্থাপিত।

পাটনা (অর্থাৎ পাটনা সিটি) অতি প্রাচন-শহর, হিন্দু ও মুসলমানযুগে ইহাই রাজধানী ছিল। এখন ইহা একটি ফৌজদারী সব-ডিভিসন্ মাত্র; দেওয়ানী আদালত নাই, দুটি হাইস্কুল এবং একটি হাঁসপাতাল আছে। সমগ্র শহরের মিউনিসিপালিটি এখানে অবস্থিত। নূতন বিহার-গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানা এবং ডাকবিভাগের প্রধানের আফিস এখানকার পুরাতন আফিমের কারখানা দখল করিয়াছে, এবং এই দুই বিভাগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ এখানে থাকেন। বাণিজ্য-সম্পদে পাটনা সিটি এখনও প্রধান। দেশী দ্রব্যের যত আড়তদার, বিলাতী অনেক দ্রব্যের সব পাইকাড়, দেশীয় ব্যাঙ্কার এবং নানাবিধ প্রাচীন শিল্পের কারিগর এখানেই দোকান করে। বাঁকিপুরে শুধু খুচরা বেচিবার জন্য অনেকগুলি দোকান আছে। ইংরাজী ব্যাঙ্কগুলিকেও পাটনায় শাখা খুলিতে হইয়াছে। প্রাচীন ঘরের হিন্দু-মুসলমান সকলের পাটনাতেই পৈত্রিক বাড়ী আছে, যদিও এখন কার্য্য বা ব্যবসা-উপলক্ষে শিক্ষিত বিহারীসমাজ এবং সমস্ত চাকুরে বাঙ্গালীরা অধিক পরিমাণে বাঁকিপুরে বাসা অথবা নিজ বাড়ী করিতেছেন। দিন দিন বাঁকিপুর বাড়িতেছে, পাটনা কমিতেছে।

পাটনার হিন্দু নাম পাটলিপুত্র। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখানে শোণনদী গঙ্গায় পড়িত; এখন তাহাদের সঙ্গমস্থান ১২ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শিশুনাগ-বংশীয় রাজা অজাতশত্রু উত্তর-বিহার অর্থাৎ মিথিলার পরাক্রান্ত বৃজ্জিজাতির আক্রমণ রোধ করিবার জন্য তৎকালীন গঙ্গা-শোণের সঙ্গমস্থলে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন (৪৯০খৃষ্টপূর্ব্ব)। তাহার স্বাভাবিক ফলে এই দুর্গের আশ্রয় পাইয়া প্রাচীরের বাহিরে দোকানদার, চাকরবাকর, এবং সৈন্যছাড়া অন্য সব লোক ঘর-বাড়ী করায় একটা গ্রাম ক্রমে নিজ হইতে গড়িয়া উঠিল; সময়ে তাহা ধনজন-পণ্যে পূর্ণ হইল। দাক্ষিণাত্যেও ঠিক এইমত প্রত্যেক দুর্গের আশ্রয়ে কিন্তু বাহিরে একটি করিয়া গ্রাম (কোথায় বা শহর) আছে; তাহাকে পেঠ, পেট্টা বা বাড়ী বলে। অর্দ্ধশতাব্দী পরে (প্রায় ৪৪০ খৃঃ পূঃ) রাজা উদয় মগধের রাজধানী রাজগৃহ ছাড়িয়া এই পাটলি-গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা, সভাসদ্, রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উপযোগী বাড়ী নির্ম্মাণ

* বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বাঁকিপুর অধিবেশনে পুস্তিকাকারে বিতরিত।

হইতে লাগিল। পাটলিগ্রাম নগরের আকার ধারণ করিল। আরও কিছুদিন রাজগৃহ শহর নামে রাজধানী ছিল, এবং শেরেস্তা প্রভৃতি সেখানে থাকিত। কিন্তু এক শতাব্দী পরেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মগধের রাজধানী স্থায়ীভাবে পাটলিপুত্রে উঠিয়া আসিয়াছে, এবং রাজগৃহ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এই পাটলিপুত্রেই চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য-সাহায্যে সব শত্রু বিনাশ করিয়া রাজসিংহাসন কাড়িয়া লন, এবং এখানেই গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস্ তাঁহার দরবারে উপস্থিত থাকিতেন (৩০০ খৃঃ পূঃ)। গ্রীক অক্ষরে এই রাজধানীর নাম পালিবোথ্র অর্থাৎ পা(ট)লিপুত্র।

এই নাম পাটলিপুষ্প (Bignonia suaveolens) হইতে গৃহীত, এ কথা কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন গ্রন্থে কোথায় কোথায় কুসুমপুর ও পুষ্পপুর এই দুইটি নামও আমাদের শহরকে দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ কুসুমপুর দুর্গ প্রাচীরের বাহির শহরের উপকণ্ঠমাত্র। প্রত্যেক হিন্দুরাজধানীর বাহিরে বিলাসীদের প্রমোদকানন ও ফুল-বাগান থাকিত। "কুসুমপুর" বা "পুষ্পপুর" এইরূপ উপ-কণ্ঠের শ্রেণীবাচক নামমাত্র। ক্রমে শহর বাড়িয়া উপকণ্ঠ-টিকে গ্রাস করিল এবং কুসুমপুর নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব হারাইয়া পাটলিপুত্রের একটি পাড়ায় পরিণত হইল। বর্ত্তমান পাটনা সিটির পূর্ব্বদিকে "জাফরখাঁর বাগ" নামে এক প্রকাণ্ড উপবন আছে। মুঘলযুগে বাদশাহ বা কুমার-গণ যখন আসিতেন, তখন এই বাগানেই শিবির স্থাপন করিয়া সৈন্যসহিত বাস করিতেন; শহরের মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রাসাদ ছিল না। পাটনা শহর পূর্ব্বদিকে না বাড়িয়া পশ্চিমে ক্রমশঃ বাড়ায় এই উপবন নগরের পাড়া হওয়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন পাটলিপুত্র এই ৩০ বর্গমাইল ভূমিখণ্ডের একস্থানে চিরদিন আবদ্ধ ছিল না; ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সরিয়া গিয়াছে, নদীর পরিবর্ত্তনে, স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায়, অথবা রাজার খেয়ালে, এক পাড়ার জনপদ পরিত্যাগ করিয়া এক আধ ক্রোশ দূরে এক খোলা জায়গায় নূতন শহর নির্ম্মিত হইত, এবং তাহা তথায় তিন চারি শত বৎসর থাকিত; যেমন দিল্লীর দাক্ষিণে অনেক ক্রোশ ব্যাপিয়া ক্রমে পরিত্যক্ত পুরাতন দশ বারটি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাবিলন শহরেও এরূপ হইত।

কিন্তু প্রাচীন পাটলিপুত্রের কোনই গৃহ বা স্মৃতিচিহ্ন এখন দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ সেকালে এখানে সব বাড়ী কাঠের তৈয়ারি, খোলার ছাদে আবৃত হইত। এরূপ গৃহ অতি শীঘ্র ধ্বংস হয়।

প্রথম মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত (৩২৫ খৃঃ পূঃ) হইতে গুপ্তবংশ ধ্বংস হওয়া (৫৪০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত আট শতাব্দীর অধিককাল পাটলিপুত্র মগধের এবং ইহার মধ্যে পাঁচশত বৎসর সমগ্র উত্তরভারতের রাজধানী ছিল। মৌর্য্যসম্রাট্-দের সময় পাটনা নগরী গৌরবের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস (৩০০ খৃঃ পূঃ) স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন:—এই রাজধানী ৯ মাইল লম্বা, দেড়মাইল চওড়া। প্রকাণ্ড উঁচু শালকাঠের বেড়া দিয়া ঘেরা। এই বেড়াতে ৬৪টা ফটক এবং ৫৭০ উচ্চ রক্ষীমঞ্চ (বুরুজ, bastion) ছিল। বাহিরে ৩০ হাত গভীর ও ৪০০ হাত প্রশস্ত পরিখা সর্ব্বদা শোণ নদীর জলে পূর্ণ। (ম্যাক্-ক্রীণ্ডল, ৬৬-৬৮)। রাজপ্রাসাদ কাঠের কিন্তু পারস্যের রাজধানীর হর্ম্ম্য অপেক্ষাও অধিক সুন্দর। রাজবাড়ীর চারিদিকে উদ্যান, পুকুর ও ফলফুলের গাছ।

পাটনার কয়েকস্থানে ২৪ ফুট জমির নীচে প্রকাণ্ড শালকাঠের খুঁটা পাওয়া গিয়াছে। ইহা সেই বেড়ার অংশ বলিয়া বোধ হয়। কোথায় কোথায় অতি প্রশস্ত ও দূরব্যাপী শালকাঠের মঞ্চ পাওয়া গিয়াছে; ইহা প্রাচীর, পয়ঃপ্রণালী, নৌ-নির্ম্মাণ কারখানা (ডক্) হইতে পারে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের অনুমান।

মৌর্য্যযুগে নানা দেশের পণ্যে পাটলিপুত্র পূর্ণ ছিল। এত অধিক বিদেশী বণিক ও ভ্রমণকারী এখানে আসিত যে, তাহাদের জন্য রাজা পাঁচজন পরিদর্শক নিযুক্ত করেন (ম্যাক্, ৮৭)। এই শহরেই শুঙ্গবংশীয় দিক্‌বিজয়ী রাজা পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। শকপ্রভাবের সময় পাটনা ছোট হইয়া যায় (খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দী।) আবার ৪র্থ শতাব্দীর প্রথমে লিচ্ছবিরাজার জামাতা মগধের জমিদার চন্দ্রগুপ্ত নূতন রাজত্ব স্থাপন করিলেন। তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্তের সময় পাটনা আবার উত্তর-ভারতের রাজধানী হইল। সমুদ্রগুপ্তের কৃতী পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমা-দিত্যের সময় চীনপর্য্যটক ফা-হিয়েন পাটনার চরম সমৃদ্ধি ও গৌরব দেখিয়া যান (৪০০ খৃষ্টাব্দ)। "রাজপ্রাসাদের

অংশগুলি অশোকের আজ্ঞায় দানবেরা নির্ম্মাণ করে। এমন দেওয়াল, দরজা এবং প্রস্তর খুদিয়া ছবি বাহির করা মানুষের কাজ নহে।" (Beal i, lv.) জ্যোতিষী আর্য্যভট (জন্ম ৪৭৬ খৃঃ) এই স্থানে স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

তারপর গুপ্ত-সাম্রাজ্য খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল, সেই সঙ্গে পাটলিপুত্রের গৌরব ও শ্রী অস্তমিত হইল। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে হয়ত হূণেরা পাটনা লুঠ করিয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জকে উত্তরভারতের রাজধানী করিলেন। তাঁহার আদৃত চীন-পর্য্যটক ইউয়ান্ চোয়াং ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আসিয়া দেখেন যে, পাটলিপুত্র শ্মশান হইয়াছে, কোথায়ও জনমানব নাই, চারিদিকে বনজঙ্গল ও শত শত মন্দির, সঙ্ঘারাম ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ; শুধু গঙ্গার ধারে এক হাজার ঘর লোক একটি ছোট শহর করিয়া আছে। (Beal, II. 82—86.)

পালরাজগণ (নবম হইতে একাদশ শতাব্দী) পাটনায় মধ্যে মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া কিছুদিন থাকিতেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের রাজধানী ছিল না, ইহার পূর্ব্ব রাজনীতিক গৌরব ফিরিল না। তথাপি গঙ্গা, গণ্ডক ও শোণ নদীর সঙ্গমে বাণিজ্যের পক্ষে পাটনা অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থান বলিয়া, এবং কতকটা অতীত ইতিহাসের গৌরব-স্মৃতির জন্যও, পাটনা তখনও কাশীর পূর্ব্বদিকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শহর ছিল (আলবিরুনী, ১০২০ খৃষ্টাব্দ)। পাঁচশত বৎসর চলিয়া গেল, আবার রাজার শুভদৃষ্টি পাটনার উপর পড়িল। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ্ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া পাটনায় পাঁচলাখ টাকা খরচ করিয়া ইটের একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। মুঘল যুগে বিহার-প্রদেশের রাজধানী বিহার নগর হইতে পাটনায় উঠিয়া আসিল; কিন্তু আবুল-ফজল (১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ) এখানে যে কোন বড় বা সুন্দর শহর ছিল, এ কথা বলেন না, শুধু দুইটা ছোট দুর্গের (একটা মাটির অপরটা ইটের) উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় অধিকাংশ বাড়ীই খোলায় ছাওয়া ছিল, এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস-প্রিয় পাঠক শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমরা এখনও মোঘলাই-চলনে চলি, আমাদের নব-নির্ম্মিত "হাইকোর্ট ভী খাপ্‌রা-পোষ।" পাটনা সিটির কয়েকটি পুরাতন বাড়ীতে এখনও সেকালের সুন্দর কাজকরা কাঠের থাম্বা, খিলান ও জানলা দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান-যুগের স্মৃতিচিহ্ন কয়েকটি বড় ও প্রাচীন মসজিদ এবং দুই প্রসিদ্ধ গোরস্থান পাটনায় আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আওরাংজীবের পৌত্র আজীম্-উশ্‌শান এই প্রদেশের সুবাদার ছিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে বাদশাহ শহরের 'আজীমাবাদ' নামকরণ করিতে সম্মত হন। নবাবী আমলে পাটনা শহর দেওয়াল দিয়া ঘেরা হয়। এই দেওয়ালের "পূরব দরওয়াজা" ও "পশ্চিম দরওয়াজা" এখনও নামে বিদ্যমান আছে। রামনারায়ণের কেল্লাও অন্তর্ধান হইয়াছে। এই দুর্গের বাহিরে মুঘল বাদশাহজাদা আলী গৌহর (পরে দ্বিতীয় শাহ আলম) বিহার প্রদেশ মুর্শিদাবাদের নবাবের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার শেষ চেষ্টা করেন (১৭৫৯ খৃঃ)। গঙ্গার দিক্ হইতে শত্রু-আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য তীর বহিয়া যে উচ্চ দেওয়াল ও বুরুজ ছিল, তাহার অনেকাংশ নদীতে গ্রাস করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর করিতেছে, কিন্তু ড্যানিয়েলের প্রাচীন চিত্রে (১৭৮৫ খৃঃ) এখনও বেশ দেখিতে পারা যায়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বিহার-প্রদেশ স্বতন্ত্র হওয়ায় বাঁকিপুর তাহার রাজধানী বলিয়া স্থির হয়, এবং রেলষ্টেসনের উত্তর-পশ্চিম দিকে নূতন রাজধানীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। সে কাজ এখনও চলিতেছে।

বাঁকিপুরের দ্রষ্টব্য-স্থান।

(১) প্রাচীন পাটলিপুত্রের অবশেষ—বাঁকিপুর ষ্টেসনের ৩ মাইল পূর্ব্বে, রেলপথের ঠিক দক্ষিণে কুমরাহাড় নামে একটি গ্রাম আছে এবং তাহার এক মাইল দক্ষিণে ছোট পাহাড়ী ও পাঁচ পাহাড়ী নামে দুটি মাটি ও ইটের ঢিপি আছে। এই তিন স্থানে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট খনন আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ঐ পাহাড়ী দুইটি যে এক সময়ে বৌদ্ধস্তূপ ছিল, তাহা প্রমাণ হয়। কিন্তু গত ২৩ শত বৎসরে অশোকের সময়ের ভূমির তল বর্ত্তমান ভূমিতলের বারো হাত নীচে চাপা পড়িয়াছে; সুতরাং অনেক ব্যয়ে অত্যন্ত গভীর করিয়া খনন না করিলে বেশী কিছু প্রাচীন দ্রব্য বাহির করিবার আশা নাই। ১৮৯৫-৯৬ সালে ডাক্তার ওয়াডেল্ স্বয়ং আসিয়া খনন কার্য্যের পরিদর্শন করেন, এবং অধিক অর্থব্যয় করা হয়; তখন কুমরাহাড়, বুলন্দীবাগ (কুমরাহাড় গ্রামের ঠিক উত্তরে রেল-লাইনের অপর পারে) এবং অপর

দুটি নিকটবর্ত্তী গ্রামে খোঁড়া আরম্ভ হয়। তাহাতে অনেকগুলি মূর্ত্তি, খোদা-পাথর, শালের কড়ি-কাঠ বা স্তম্ভ, ছবি-কাটা ইট, এবং গৃহের ইষ্টকময় ভিত্তি বাহির হয়। ইহার মধ্যে একটি খুব বড় ও অতি সুন্দর মিশ্রিত গ্রীক ও পারসিক ধরণের স্তম্ভশীর্ষ বুলন্দীবাগে পাওয়া যায়; সেটা এখন স্থানীয় কমিশনরের বাড়ীর প্রাঙ্গণে রাখা হইয়াছে। ওয়াডেল্ বলেন যে, ঠিক এই বুলন্দীবাগেই অশোকের প্রাসাদ ছিল। কতকগুলি কাঠের ঘাট এবং পরিখা পার হইবার জন্য কাঠের শাঁকোর ভগ্নাবশেষ এবং একটি প্রকাণ্ড চকচকে অশোক-স্তম্ভের খণ্ডগুলিও খুঁড়িয়া বাহির হয়। ১৮৯৭-৯৯ সালের খননের কোন ফল হয় নাই; ইটের কয়েকটি দেওয়াল ও ভিত্তি বাহির হয়, কিন্তু তাহা হইতে কিছুই বুঝা যায় না। এখানে একটিও প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি বা ভাল মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রতন তাতার ব্যয়ে কুমরাহাড়ে আবার খনন আরম্ভ করা হয়। অনেক গভীর মাটির নীচে সমান দূরে দূরে মৌর্য্যযুগের চাকচিক্য-(বজ্রলেপ) যুক্ত অনেকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভের ভগ্ন খণ্ড পাওয়া যায়। ইহা হইতে এখানে যে একটি প্রাচীন বাড়ী ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। কিন্তু ডাক্তার স্পূনার বলেন যে, ঠিক এই বাড়ীই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রাসাদ ছিল এবং ইহা পারসিক কারিগরের দ্বারা পার্সিপলিস নামক শহরের রাজা দারায়ুসের রাজবাড়ীর অবিকল নকল। কিন্তু এখানে কোন শিলালিপি, কোন প্রস্তরমূর্ত্তি, কোন প্রাচীন মুদ্রা বা অলঙ্কার পাওয়া যায় নাই।

বুলন্দীবাগে ১৯১৫-১৬ সালে খুঁড়িয়া মূল্যবান্ দ্রব্য বাহির হইয়াছে—কড়িকাট, কাঠের দোতলা দালানের মত দুই স্তর মাচান, অসংখ্য প্রাচীন নাম বা মূর্ত্তিহীন মুদ্রা, পুরাতন মাটির বাসন ও পোড়া মাটির পুতুল ও মূর্ত্তি, ছোরা, স্বর্ণ-অলঙ্কার, অনেক মাটির সীল, বর্ম্ম, তীর, এবং একটা চার ফুট প্রশস্ত রথচক্র। কুমারাহাড়ের আশপাশে যে খনন করা হইয়াছে, তাহাতেও অনেক সীল, মাটির পুতুল ও মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি সীলে লেখা আছে "শ্রীবপেবৃহদ্-বিহারে ভিক্ষুসংঘস্য"; একটিতে "ভদতে-ল-প-গোরস"। এ সব দ্রব্য এখন স্পূনার সাহেবের বাসায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; পাটনায় যাদুঘর প্রস্তুত না হইলে সাধারণে দেখিতে পাইবেন না। কুমারহাড়ে ও বুলন্দীবাগে গভীর খনন করা স্থানে বর্ষা হইতে শীতের মধ্য পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড পুকুর হইয়া থাকে; যতদিন জল সম্পূর্ণ শুকাইয়া খননকার্য্য আবার আরম্ভ না হয় (অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

(২) মোবাদপুরের পূর্ব্বপ্রান্তে ভিখ্না-পাহাড়ী নামক এক কৃত্রিম ঢিপি আছে। ইহা বোধ হয় ভিক্ষু-রাজকুমার মহেন্দ্রের জন্য নির্ম্মিত গৃধ্রকূট পর্ব্বতের অনুকরণ। পাড়ার নামও মহেন্দ্রু! কিছু দেখিবার মত প্রাচীন চিহ্ন জমির উপরে একটিও নাই।

(৩) পাটনা সিটির দক্ষিণ প্রান্তে কমলদহ নামক জলাশয় এবং তাহার তীরে জৈন সূরী স্থূলভদ্রের মন্দির। প্রাচীন চিহ্ন অনুপস্থিত।

(৪) এই মহেন্দ্রুর প্রায় একমাইল দক্ষিণে শিবাই হ্রদের তীরে এক নূতন হিন্দুমন্দিরে ও আশেপাশে কয়েকখানি দর্শনীয় বৌদ্ধ প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। একটি হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, কিরূপে বৌদ্ধস্তূপ কালে শিবলিঙ্গে পরিণত হইল।

(৫) খুদাবখ্শ পুস্তকালয়। খাঁ বাহাদুর খুদাবখ্শ বাঁকিপুরের সরকারী উকীল এবং তিন বৎসর হাইদরাবাদ রাজ্যে প্রধান জজ ছিলেন। তিনি নিজের সংগ্রহ ও পিতা হইতে প্রাপ্ত ছয় হাজার ফারসী ও আরবী হস্তলিপি, প্রায় দুইসহস্র ইংরাজীগ্রন্থ, অনেক মুদ্রিত ফারসী-আরবী বই এবং একটি সুন্দর বড় দোতলা দালান ও সংলগ্ন জমি সাধারণের নামে লিখিয়া দিয়া এই পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ভারতে মুসলমানগ্রন্থের এরূপ প্রকাণ্ড ও মূল্যবান্ আগার আর একটিও নাই। দিল্লীর বাদশা ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের জন্য লিখিত অতি সুন্দর সুন্দর হস্তলিপি, চিত্র ও হস্তাক্ষরের নমুনা,—কয়েকজন বিখ্যাত পারসিক কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থাবলী,—মধ্য-এসিয়া, আরব ও স্পেনে লিখিত মূল্যবান্ আরবী বই—এখানে একত্র করা হইয়াছে। কতকগুলিতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, কুমার দারাশুকো প্রভৃতির হাতের লেখা, অথবা মুসলমান রাজারাণীদের মোহর আছে। এই ভাণ্ডারের তিনখানি সচিত্র হস্তলিপি হইতে মুঘল যুগে ভারতে চিত্রবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক খানারই অঙ্কনের বৎসর ঠিক জানা আছে এবং তাহা হইতে মুঘল দরবারের চিত্র-

করদের প্রণালী কোন্ সময় কিরূপ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; কোন্ প্রণালী আগে, কোন্‌টি পরে, অথবা কোন্‌টি কোন্ বাদ্‌শাহের সময়ের, তাহার সম্বন্ধে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। প্রথম, আলীমর্দ্দান খাঁ শাহজাহানের সঙ্গে প্রথম দেখা করিবার দিন (১৬৪০ খৃঃ) যে "শাহনামা" মহাকাব্য তাঁহাকে উপহার দেন, সেখানি। ইহাতে শুধু চীন চিত্রকরের আঁকা মধ্য-এসিয়ার বা "বুখারার" প্রণালীর বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত। এই প্রণালী ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লীর রাজ-সভায় হিন্দুচিত্রকরদের হাতে পড়িয়া হিন্দু ও সারাসেন্ কলার মিশ্রণে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার প্রথম অবস্থা "তারিখ-ই খানদান্ তাইমুরিয়া" নামক গ্রন্থের ছবিতে অতি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। এখানি আকবরের সভায় আঁকা; তাইমুর হইতে আকবরের রাজত্বের ২২ বৎসর পর্য্যন্ত মুঘল-ইতিহাসসম্বলিত। প্রতি চিত্রের নীচে তাহার পরিকল্পনাকারী ও সমাপ্তকারী চিত্রীদ্বয়ের নাম। ইহাদের অনেকেই হিন্দু এবং প্রায় সকলেরই নাম "আইন-ই-আকবরীর" ১ম খণ্ডের পশ্চাতে আকবরের চিত্রকরদের নামের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে আকবরের যে কয়েকখানি প্রতিকৃতি আছে, তাহা সমসাময়িক এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস যোগ্য। দর্শকেরা দেখিবেন যে, এই সব ভারতীয় চিত্রকর জল ও পর্ব্বত আঁকার চীনে-প্রথা চুরি করিয়া অতি অল্প বদলাইয়াছে; কিন্তু মুখগুলি ভারতীয়, ঐ শাহনামার মত গালফুলা, শ্মশ্রু বর্জ্জিত চীনামুখ নহে। বর্ণ ও অলঙ্কারের গৌরবে এই আকবরী যুগের চিত্রগুলি অমূল্য।

তৃতীয় গ্রন্থ, শাহজাহানের সময়ে রচিত তাঁহার ইতিহাস, নাম পাদ্‌শাহ নামা। এখানিতে ভারতীয় চিত্রপ্রণালী সূক্ষ্ম অলঙ্কারের ছটা, রঙ্গের বৈচিত্র্য এবং খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি, এবং অবয়বের কোমলতায় চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; আকবরী যুগের সেই অর্দ্ধ-কর্কশ সতেজভাব নাই, কিন্তু এখনও অবনতি আরম্ভ হয় নাই। সেই অবনতির দৃষ্টান্ত ১৬৭৬-১৭৫০ খৃষ্টাব্দের নানা সময়ে অঙ্কিত একখান ছবি-সংগ্রহে ("মুরাক্কা") স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বিংশ বৎসরে লক্ষ্ণৌএর জঘন্য চিত্রকলার উৎপত্তি; তাহার উপর ইউরোপীয় চিত্রের প্রভাব পড়িয়াছে, অথচ ইউরোপীয় ভাল ছবির মত প্রকৃতির অনুসরণ, রঙ্গে পরিপক্কতা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ নাই, কিন্তু মুঘল যুগের গুণগুলিও সব হারাইয়াছে। রণজিৎসিংহের জন্য অঙ্কিত চিত্রগুলিরও সেই দুর্দ্দশা, যেন ছেলেদের চোক ভুলাইবার জন্য আঁকা, চিন্তাশীল বা পণ্ডিত লোকের জন্য নহে। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ছবি, অতি আশ্চর্য্য কঠিন বা সুন্দর ফারসী হস্তাক্ষরের নমুনা, বাদশাহ ও যুবরাজদের স্বাক্ষর প্রভৃতি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পারস্যে, তুর্কীতে ও মধ্য-এসিয়ায় অঙ্কিত কয়েকখানি ছবিও আছে। হস্তলিপি-গুলির মধ্যে আরবী ফারসীপাঠকদের উপাদেয় অমূল্য ৪।৫ খানি গ্রন্থ আছে। সার ওয়াল্টার স্কট ওয়েভার্লি নবেল-গুলির যে প্রথম সংস্করণ বেনামী প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া ইংরাজী-পাঠক সুখী হইবেন। ভারত-সম্বন্ধে পুরাতন সচিত্র ইংরাজী অনেক মূল্যবান্ বই এখানে আছে। ফলতঃ সব ইংরাজী বইগুলির মূল্য লক্ষ টাকার উপর হইবে; ফারসী, আরবী হস্তলিপির মূল্য ৪।৫ লক্ষের কম নহে। পুস্তকাগারের বাড়ীটিও দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়; নির্ম্মাণ ব্যয় অর্দ্ধ লক্ষের উপর। দক্ষিণের পাঠাগারটি সরকারী খরচে তৈয়ারি হয়। মধ্যে খুদাবখ্‌শ্ চিরনিদ্রায় শায়িত। ইনিই ভারতীয় বড্‌লী।

(৬) স্থানীয় আর্ম্মাণী ব্যারিষ্টার মানুক সাহেব অনেক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে যে নিজস্ব চিত্রশালা আছে, তাহা দেখিলে ভারতীয় কলাসম্বন্ধে অনেক স্থির সত্য জানা যায়, এবং এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের (জাপান, চীন, তিব্বত, পারস্য, নেপাল ও মধ্য-এসিয়ার) দৃষ্টান্তের সহিত ভারতীয় চিত্রের তুলনা করিবার সুবিধা হয়। তাঁহার বাড়ীতে আকবরী-যুগের কয়েকখানি, শাহজাহানী যুগের অনেক, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শত শত ছবি আছে। মুঘল-রাজসভায় শিক্ষিত হিন্দুচিত্রকরগণ হিন্দু বিষয় লইয়া কিরূপ প্রণালীতে ছবি আঁকিতেন (যাহাকে কুমারস্বামী "রাজপুত-আর্ট" বলেন) তাহার এত বেশী ও এত সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও নাই। কতক-গুলি কৃষ্ণ-চরিতের ও যোগীদের বিষয়ে চিত্র দেখিয়া আর চোক ফিরাইতে ইচ্ছা করে না; সেগুলি এমনি গভীর ভাবাত্মক এবং এত সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে আঁকা যে, ইউরোপীয়

শ্রেষ্ঠ চিত্রের নিকট পরাস্ত হইবে না। একখানি চিত্রে রাম লঙ্কা জয় করিয়া ঠিক মুঘল-বাদশাহের মত পোষাক পরিয়া রথ, গজ, অশ্ব ও কামান লইয়া (!!!) কুচ করিতেছেন; আর একখানিতে বৃন্দাবনের গোপেরা মুঘল মনসবদারের মত জামা-পাগড়ী পরিয়া ঢাল তরবার লইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে ভেট করিতে যাইতেছেন !!! একখানি মুর্শিদাবাদের গজদন্তে খোদা কৃষ্ণলীলা ঠিক বরাহৎ স্তূপের পাথরের অল্প উঁচু ছবির (Relief) মত; একই অঙ্কন-পদ্ধতি! কিছু আধুনিক ১৪ খানি ছবিতে দূতী-সম্বাদ হইতে রাধাকৃষ্ণের মিলন পর্য্যন্ত দৃশ্যগুলি পরে পরে অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দুইখানি ছবি,—তান্ত্রিক যোগিনী এবং যমুনার পরপারে কৃষ্ণ বসিয়া, কাছে গাভী ও মহিষ আসিতেছে, চিত্র হিসাবে অমূল্য; অথচ আধুনিক "ইণ্ডিয়ান আর্টের" দোষ একটিও নাই। এ দুটি সর্ব্বোচ্চ কোন প্রতিভার পরিকল্পিত।

(৭) বাঁকিপুর ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল দূরে এক্‌জিবিশন্ রোডের ধারে ৺রাধাকিশোর ভট্টাচার্য্যের বাড়ী। ইহাকে প্যালেস্ অর্থাৎ প্রাসাদ বলা হয়, এবং ইহা দেখিলেই ঐতিহাসিক সহজে বিশ্বাস করিবেন যে, একসময়ে এখানে "ভেকীল্ রাজ্" ছিল। রাধাকিশোরবাবু চন্দননগরের সামান্য ব্রাহ্মণ সন্তান; এখানে উকীল হইয়া আসিয়া প্রতিভাবলে অগাধ টাকা উপার্জ্জন করেন। মোরাদপুরেও তাঁহার একটি বড় ও সুন্দর বাড়ী আছে। এই দ্বিতীয় বাড়ীর কাছেই রাধাকিশোরবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী ৺ গুরুপ্রসাদ সেনের বাড়ী। এই পুরুষ-সিংহ বাল্যে অত্যন্ত অভাব ও কষ্টে লেখাপড়া করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পরে বাঁকিপুরের উকীল-মহলে প্রধান স্থান অধিকার করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সাধারণের হিতকর কার্য্যে এবং রাজনীতিক আন্দোলনে এখানকার নেতা ছিলেন; স্ত্রী-শিক্ষা, সামাজিক সুনীতি, সংবাদপত্র-স্থাপন প্রভৃতিতে পথ দেখাইয়া বিহারকে মধ্য-যুগের অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আনেন। যেমন ইংরাজিতে সুলেখক এবং অর্থনীতি-রাজনীতিশাস্ত্রে দক্ষ, তেমনি চরিত্রবলে ও দেশভক্তিতে বলীয়ান্ ছিলেন। রাধাকিশোরবাবুর মোরাদপুরের বাসার প্রায় সামনে ৺বলদেব পালিতের বাড়ী। ইনি 'কর্ণার্জ্জুন' কাব্য প্রভৃতি লিখিয়া সংস্কৃতছন্দ-বাহুল্যে বঙ্গ কবিতাকে ধনী করিতে চেষ্টা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের পাটনা-প্রবাসের কোন স্মৃতি বিদ্যমান নাই; তবে ২০ বৎসর হইল ব্রাহ্মগণ একটি হাইস্কুল স্থাপন করিয়া উহাতে তাঁহার নাম সংযোগ করিয়াছেন। ত্যাগী কর্ম্মশীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় অক্লান্ত সেবায় স্কুলের প্রধানের কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং ইহাকে অতি সম্মান ও সুখ্যাতির পদে উন্নীত করিয়াছেন।

(৮) বাঁকিপুর-ময়দানের উত্তর-পশ্চিমে গোলঘর। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গার্ষ্টিন নামক এক ইঞ্জিনিয়ার ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের আদেশে এই অতিকায় গুম্বজ প্রস্তুত করেন; উদ্দেশ্য যে, শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া ভবিষ্যতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত অকালের সময় লোকে খাইয়া বাঁচিবে। নির্ম্মাণ হইবার পরে আজ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে এক দানা চাউল বা গম পড়ে নাই! এখন বিলাত যাইবার সময় সাহেব-কর্ম্মচারীরা ইহার মধ্যে বিনা ভাড়ায় আসবাব রাখিয়া যান। চূড়ায় উঠিবার ভাল সিঁড়ি বাহিরে গা বহিয়া চলিয়াছে। উপর হইতে সমস্ত দেশ অতি সুন্দর ম্যাপের মত দেখা যায়। গোলঘরের স্মৃতি-ফলকে বেশ একটু রস আছে। পাথরে খোদা আছে,—"মন্ত্রি-পরিবেষ্টিত গবর্ণর-জেনারাল এই সব প্রদেশে চিরকালের জন্য দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে যে উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহার অঙ্গস্বরূপ এই শস্যাগার কাপ্তেন জন্ গার্ষ্টিন কর্ত্তৃক ২০এ জুলাই ১৭৮৬ খৃঃ সম্পূর্ণ করা হইল। প্রথমবার শস্যে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে দ্বার বন্ধ করিবার তারিখ—"

চিরকালের জন্য বিহারে দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ করা হইবে! অথচ প্রথমবার শস্যে পূর্ণ করা এখনও ঘটিয়া উঠে নাই, ঐ তারিখের স্থান খালি রহিয়াছে। এই জন্য সাহেবেরা ইহাকে বলেন, "গার্ষ্টিনের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল।"

(৯) বাঁকিপুর ষ্টেসনের অতি সন্নিকটেই বড়লাট দ্বিতীয় হার্ডিংএর মূর্ত্তি, এবং তথা হইতে এক মাইল দূরে হাইকোর্ট; তাহার পর ছোটলাটের অধীন আফিস, বাড়ী ইত্যাদি।

(১০) শহরের প্রধান লম্বারাস্তা দিয়া পাটনা যাইবার পথে, মোরাদপুরের দুইমাইল পূর্ব্বে "পাথরের মসজিদ।" ইহার প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের পুত্র

পরবিজ শাহ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে বিহার-সুবার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি (খুব সম্ভব তাঁহার নায়েব) মঝৌলীর দুর্গ জয় করিয়া, তাহার মন্দির ধ্বংস করিয়া, তাহার প্রস্তর ও কাঠ দিয়া এই মসজিদ রচনা করেন।

(১১) গুলজারবাগপাড়া শেষ হইয়া পাটনা সিটি আরম্ভ হইবার স্থানটিতে নবাবী আমলের শহরের পশ্চিম-দরওয়াজা ছিল। এখন তাহার একমাত্র চিহ্ন দু'খানি খুব লম্বা সুন্দর লতাপাতা-কাটা কাল কষ্টিপাথর পথের দু'ধারের স্তম্ভে গাঁথা। আরও ১০।১৫ গজ দূরে ঠিক এইমত ছয়-খান পাথর একটি মসজিদের (মির্জামাসুম, ১৬১৬ খৃঃ নির্ম্মিত) বাহিরের দ্বারে গাঁথা রহিয়াছে। এই দ্রব্য এবং এই প্রকার কাজ আর কেবল রাজমহলে শূজার প্রাসাদে এবং পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এগুলি পাঠানযুগের কোন গৃহ হইতে লওয়া।

(১২) আরও অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে গিয়া, খৃষ্টানী গোরস্থান। এখানে ওয়াল্‌টার রীনহার্ড ওরফে সমরু নামক সেনানী মিরকাশিমের আদেশে যে সব ইংরাজ বন্দীদের হত্যা করে (১৭৬৩ খৃঃ) তাহাদের স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। চারিদিকে আরও অনেক পুরাতন সাহেবদের গোর। এই সিটিতে যে পর্টুগীজ গির্জ্জা আছে, তাহার প্রাঙ্গণে সেকালের অনেক ক্যাথলিক্ সাহেব ও ফিরিঙ্গির সমাধি।

(১৩) আরও এক মাইল পূর্ব্বে চকবাজার ছাড়িয়া একটি গলির মধ্যে "হরমন্দির" অর্থাৎ গুরুগোবিন্দসিংহের জন্মস্থান। (১৬৬৬ খৃঃ) রণজিৎসিংহ এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং জংবাহাদুর একটি প্রকাণ্ড শালকাঠের ধ্বজস্তম্ভ এখানে দান করিয়াছেন।

(১৪) পাটনা সিটির পীর-দামড়িয়া নামক পাড়ায় গঙ্গার তীরে একটি উচ্চস্থানে ঐ পীরের গোর এবং তৎসংলগ্ন মসজিদ আছে। নিকটে একটি হিন্দু-মন্দিরের টাকে কয়েকখানি অতি সুন্দর পুরাতন বৌদ্ধমূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তর ছিল। স্থানটি নিশ্চয়ই কোন বৌদ্ধস্তূপ অথবা মৌর্য্যযুগের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। এখন মন্দিরটি গঙ্গায় কাটিয়া লইয়াছে।

পাটনা ষ্টেসন অর্থাৎ "বেগমপুর" পাড়ায় হাইবৎজং নামক বিহারের সুবাদারের গোরস্থান, (মৃত্যু ১৭৪৮ খৃঃ)। এটি শ্বেত-মর্ম্মর এবং কাল-পাথরের নির্ম্মিত এবং কাল জাফরিকাটা বেড়ায় ঘেরা। নিকটে একটি ইমামবারা ও মসজিদ। ইহা শিয়াদের প্রধান ক্ষেত্র।

শহরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে হাজিগঞ্জ পাড়ায় শেরশাহের নির্ম্মিত (১৫৪৫ খৃঃ) সাদাসিদে কিন্তু প্রকাণ্ড ও মোটা দেওয়ালযুক্ত মসজিদ। মধ্যে প্রকাণ্ড গুম্বুজ, চারিকোণে চারিটি ছোট। গঠন-প্রণালী ঠিক পাঠান-যুগের। নিকটে অনেকগুলি পুরাতন গোর।

চকের নিকট, ঝাউগঞ্জ ডাকঘরের সম্মুখে, শায়েস্তা খাঁর নাজীর খ্বাজা আম্বর-বিরচিত (১৬৮৮) একটি মাঝারি রকম মসজিদ আছে। কারুকার্য্য তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

(১৫) বাদশাহ শাহজাহানের ভায়রা ভাই সইফ্ খাঁ মির্জা সফী, ১৬২৮ হইতে ১৬৩১ খৃঃ বিহারের সুবাদারী করার সময় "মাদ্রাসা-মসজিদ" নির্ম্মাণ করেন। (১৬২৯ খৃঃ) এটি খ্বাজা কাঁলা পাড়ায় চিমনীঘাট অর্থাৎ মিউনিসিপালিটির জল তুলিবার কলের নিকট, গঙ্গার ধারে একখণ্ড প্রশস্ত রমণীয় স্নিগ্ধ জমির মধ্যস্থলে স্থাপিত। মসজিদ কালে খারাপ হইয়া যাওয়ায়, উহার সম্মুখে কয়েক বৎসর হইল, একটি আধুনিক ধরণের লম্বা ঘর সংযোগ করিয়া দেওয়াতে উহার বাহিরের সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু মধ্যের অর্থাৎ পুরাতন দালানের অলঙ্কার অতি উত্তম। সমস্ত দেওয়াল বহিয়া ফারসী পদ্য লেখা ছিল, তাহা চূণকামে প্রায় ঢাকা পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এই মসজিদের চারিদিকের প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া চৌকশ-করা দোতলা ১৪০টি কুঠরী ছিল, তাহাতে ১৩৫ জন ছাত্র এবং ৫ জন মৌলবী স্বচ্ছন্দে বাস করিত। সইফ্ খাঁ মসজিদের সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু তাহার জমি-জমা বেদখল হইয়াছে, এমন কি কুঠরীগুলিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড মাদ্রাসা বর্ত্তমানে একটি ছোট উর্দ্দু পড়িবার মক্তবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(১৬) পাটনা সিটি ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে ক্ষেতের মধ্যে "এক কঙ্কণ কা মক্‌বেরা"। কোন নবাবের প্রিয় বেগম নিজের একখানি হীরকের কঙ্কণের দামে নিজের জন্য এই গোরস্থান নির্ম্মাণ করেন। বাড়ীটি ইটের হইলেও উচ্চ, প্রকাণ্ড ও সুন্দর। ঠিক আগ্রা-দিল্লীর পাথরের গোরগুলির প্রণালীতে গঠিত। ছাদের উপর কতকগুলি ছোট

স্তম্ভ ও কোণাকাটা নক্‌শা দেওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মুঘল-সমাধি-গুলির বিশুদ্ধ সরল মহত্ত্বব্যঞ্জক দৃশ্য নষ্ট হইয়াছে।

(১৭) এই পাড়ায় গঙ্গার ধারে পুরাতন রাজবাটী ও জলে যাইবার আবৃত পথের অল্প ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। আর তিন দিকে চাষের মাঠ। জাফরখাঁর বাগানেও একটি পুরাতন কূপ ও ২।১টি ভিটে ভিন্ন আর কোন চিহ্ন নাই। বাগানও লোপ পাইয়াছে।

(১৮) "নীচু শড়ক" অর্থাৎ শহরের প্রধান রাস্তার দক্ষিণের বড় লম্বা রাস্তা দিয়া সিটি হইতে ফিরিতে মুরাদপুরের একমাইল পূর্ব্বে "শাহ-আর্জানীর দরগা"। এই সাধু-পুরুষ পঞ্জাব হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এখানে আসেন, অনেক শিষ্য করেন, এবং এখানেই তাঁহার দেহান্ত হয়। (১৬২৩ খৃঃ) বাদশাহ তাঁহাকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার "পীরোত্তর" দান করেন। তাঁহার উচ্চ সমাধির (দরগা) নিকটে একটি প্রকাণ্ড ইমামবারা আছে। এখানে প্রতিবৎসর মহরমের উৎসবে সমস্ত শহরবাসী উপস্থিত হয় এবং নানারূপ খেলা দেখান হয়। প্রায় একলক্ষ লোকের স্থান আছে। ওয়াকৃফ্ সম্পত্তির আয় হইতে ফকীর-ভোজন হইয়া থাকে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

কয়লা

[শ্রীকালিদাস বাগ্‌চি এম-এসসি]

পৃথিবীর সব জিনিষের মধ্যে কয়লা দেখিতে অতি নিকৃষ্ট ; কিন্তু তদ্দ্বারা যে কত উৎকৃষ্ট কাজ হইতেছে, তাহা সংক্ষেপে বলা দুষ্কর। কয়লার সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে, ও তাহার ব্যবহারের আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসের যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা সুকঠিন। সাধারণতঃ তিন প্রকার কয়লা আমরা দেখিতে পাই :—(১) কাঠ কয়লা; (২) হাড় কয়লা; (৩) পাথুরে কয়লা। তিনটিই দেখিতে অত্যন্ত কাল, এবং যাহারা তাহা ব্যবহার করে ও নাড়াচাড়া করে, তাহাদের শরীরে ময়লা লাগিয়া যায়। তিনটির মধ্যে ব্যবহার-অনুসারে ও আকৃতিগত পার্থক্য অনেক। প্রথমতঃ কাঠ কয়লা ছোট-ছোট কাজে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকার, লৌহ মিস্ত্রী, তামাক খাওয়ায় সরঞ্জাম তৈয়ারীকার তাহা ব্যবহার করে। ক্ষুদ্র কাঠের 'চেলা', বাঁশের 'কুচি' এই সব জিনিষকে অর্দ্ধেক পোড়াইয়া কাঠ-কয়লা তৈয়ারী করা হয়। কাঠের মধ্যস্থিত এসেটিক এসিড্, সেলুলোজ প্রভৃতি জিনিষ, সে অসম্পূর্ণ দাহের ফলে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য শুধু কয়লা (carbon) এবং সামান্য বাজে জিনিষ রাখিয়া যায়। কাঠের কয়লাতে সেজন্য carbon-এর ভাগ বেশী। দ্বিতীয়তঃ হাড়ের কয়লা ; কাঠের মত হাড়ও অর্দ্ধ-দগ্ধ করিয়া কয়লা প্রস্তুত হয়। এই দুই প্রকার কয়লার গুণ এই যে, দুইটিই প্রভূত ছিদ্র-সংযুক্ত (porous)। তাহার ফল এই যে, অনেক পদার্থ তাহারা নিজের শরীরের মধ্যে ধারণ করিতে পারে। যথা—দুর্গন্ধময় স্থানে রাখিলে কয়লা দুর্গন্ধপূর্ণ গ্যাস গ্রাস করিয়া লয়। জলে অথবা অন্য কোন দ্রাবক জিনিষে (solution) বাজে জিনিষ, ধূলিকণা প্রভৃতি থাকিলে, কয়লার মধ্য দিয়া তাহা ফিল্‌টার করিলে পরিষ্কৃত হয়। জল ফিল্‌টার করিবার সময়ে আমরা কয়লা ব্যবহার করি এই জন্যই। হাড়ের কয়লা সাধারণতঃ চিনি, গুড়, জেলি ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ; এবং হাড়ের মধ্যে ফস্ফেট নামক পদার্থ বেশী থাকার জন্য হাড়ের কয়লা জমীর সার (manure) রূপেও ব্যবহৃত হয়। তাহাদের এ সব বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক। তৃতীয়তঃ, পাথুরে কয়লা দেখিতে শক্ত পাথরের ন্যায় এবং ইহা একটি খনিজ পদার্থ। পাথুরে কয়লার ব্যবহার প্রায় ঘরে-ঘরেই আরম্ভ হইয়াছে ; কাজেই তাহার আকৃতি বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। দেখিতে কাল হইলেও পাথুরে কয়লা অন্যান্য রকম কয়লা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

পাথুরে কয়লার আবিষ্কার প্রথম কবে হইল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহাও সম্ভবতঃ কূপ খনন করিতে অথবা রাস্তা তৈয়ারী করিতে হঠাৎ মানুষের দৃষ্টিপথে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহার বহুবিধ কার্য্যকারিতা প্রকাশ পায়। ঘরকন্নার কাজে ইহা যে কত অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ইহা হইতে বোঝা যাইবে যে, কেবল ইংলণ্ডেই সম্বৎসরে প্রায় ৮ কোটি মণ কয়লা শুধু গৃহকর্ম্মের জন্য ব্যবহৃত হয়। লৌহ তৈয়ারী করিতে, গালাই, ঢালাই এবং পিটাই করিয়া নানাবিধ আকারের করিতেও প্রায় সমান খরচ হয়। রেল, ইঞ্জিন, ষ্টীমার ইত্যাদির জন্যও প্রভূত পরিমাণে পাথুরে কয়লা

ব্যবহৃত হয়। আর একটা কাজে আজকাল তাহা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে,—আলো জ্বালান (কোল গ্যাস)—এবং কাচ, চিনে মাটি, লবণ ও রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতির কারখানাতে প্রয়োগ।

কয়লার আবিষ্কারের সঙ্গে বৃহৎ কারবারগুলির প্রবর্ত্তনের (manufactures and industries) খুবই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ইংলণ্ডে যখন Industrial Revolution হইয়াছিল, তাহার মূলে দেখিতে গেলে কয়লার আবিষ্কারই প্রধান বলিতে হইবে। কারণ, কয়লার উত্তাপ দিবার শক্তি কাজে লাগাইয়া দেখা গেল যে, মানুষের শক্তিতে যাহা সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করা যাইতে পারে। যে সব কাজ মানুষে শুধু কলের মত (mecharically) করে এবং যাহাতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় সামান্য কিছু প্রয়োজন হয় না, সে সব কাজ এই পাথুরে কয়লার উত্তাপ-শক্তির সাহায্যে যন্ত্রের দ্বারাই হওয়া সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইল। বৃহৎ কারবারের সঙ্গে-সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি আরম্ভ হইল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে Economical, Political, Industrial এবং অন্য সব রকম বিষয়েরই একটা যেন উলটপালট হইয়া নূতন নিয়ম ও বিধানের আরম্ভ হইল। জাতীয় ও রাজকীয় যে সব জটিল প্রশ্ন ক্রমশঃ দেখা দিতে আরম্ভ করিল, তাহা, যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাছে অবিদিত নহে। এক কথায় বলিতে গেলে, আধুনিক সভ্যতা-প্রবর্ত্তনের মূলে এই নিকৃষ্ট পাথুরে কয়লা যে কতখানি আছে, তাহা ঐতিহাসিকেরাই ভাল বলিতে পারিবেন। সামাজিক বন্ধন ও নিয়মের মূলেও (social) যে কয়লা কতখানি সাহায্য করিয়াছে, তাহা এখানে বলিতে যাওয়া অসম্ভব হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাথুরে কয়লা একটি খনিজ পদার্থ। কত যুগ-যুগান্তের বনজঙ্গল, গাছপাতা, লতাগুল্ম প্রভৃতি মাটি চাপা পড়িয়া ও থাকিয়া যে পাথুরে কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার হিসাব করা যায় না। পাথুরে কয়লা যে গাছ জঙ্গল ও শাক সবজী ইত্যাদি (vegetable matter) হইতে তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা হয় ত অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। বিশ্বাস না করার অনেক কারণ আছে। কয়লা পাওয়া যায় হাজার-হাজার ফিট মাটীর নিম্নে, আর গাছপালা মাটীর উপরেই দেখা যায়। বিশেষতঃ কয়লার কোন অংশই দেখিতে গাছপাতার ন্যায় নহে। তবে পৃথিবীর মাটীর স্তর ইত্যাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে (ভূতত্ব) এ বিষয় সম্যক উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীর উপরিভাগের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতেছে। এক স্থান উঁচু হইতেছে, অন্য স্থান নীচু হইতেছে। সমুদ্রগর্ভে এখানে একটি দ্বীপ হইতেছে, আবার অন্যস্থানে দ্বীপ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইতেছে। আবার ভূমিকম্প, বৃষ্টি-পতনে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়া—প্রভৃতিতে পৃথিবীর স্তরের ওলট-পালট হইতেছে। তবে এ সকল এত ধীরে-ধীরে হয় যে, আমাদের বোধ-শক্তিতে তাহা বড়-একটা আসে না। ঘড়ীর ঘণ্টার কাঁটা সহসা দেখিয়া যেমন নড়িতেছে বলিয়া বোধ হয় না, এও সেইরূপ। সমুদ্রগর্ভের মাটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা অনেক স্থলে নিকটস্থ পর্ব্বতের মাটীর ন্যায় একই পদার্থ। নদী ও প্রস্রবণে পর্ব্বত হইতে কি করিয়া পাথর-ভগ্ন ধূলিকণা সব আসিতেছে, তাহা বলার প্রয়োজন হইবে না। পৃথিবীর জন্ম হইতে (যদি তাহা ধরিয়া লওয়া যায়) এ পর্য্যন্ত যে কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে সামান্য কিছুও উপলব্ধি করিতে পারি কি না সন্দেহ।

সবুজবর্ণের লতাপাতা প্রভৃতি যে কঠিন, প্রস্তরবৎ, চক্‌চকে কাল এবং "ঢেলা" গোছের হইতে পারে, তা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কি না জানি না,—কতকগুলি ভিজা ঘাস আঁটি বাঁধিয়া সাজাইয়া রাখিলে, কিছু দিন পরে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কাল আকৃতি ধারণ করে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে চাপ, উত্তাপ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কি করিয়া লতাগুল্মের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আবার কয়লার খনিতে অনেক সময় দেখা যায় যে, কয়লার একটি চাপকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহার মধ্যে লতা পাতা প্রভৃতির বেশ সুন্দর প্রতিকৃতি পরিস্ফুট হয়। অনেক সময় বড়-বড় গাছের গুঁড়ি ও শিকড়ের আকৃতিও দেখা যায়। আবার পাথুরে কয়লাকে গুঁড়া করিয়া অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়—তাহাতে গাছের পাতা অথবা শিকড় প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, এবং পাতার ন্যায় তাহাতেও এক প্রকার তৈলাক্ত (Resines) পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায়।

এখন উপরিউক্ত দুইটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হইতে কয়লার খনির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকটা আভাষ পাইতে পারি। মনে করুন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত (volcanic eruption) পাহাড় ধ্বসিয়া যাওয়া (land-slip) ইত্যাদি যে কারণেই হউক, একটা বৃহদাকার জঙ্গল যেন ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। উপরে মাটীর চাপ, এবং নীচে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ—এই দুইয়ের সাহায্যে সেই জঙ্গলের গাছপালা-গুলির ক্রমশঃ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতেছে। কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া এই ক্রিয়া চলিতেছে। উপর হইতে নানাবিধ রস ভূগর্ভে যাইতেছে; আবার উত্তাপে কত রস ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছে। কেমন করিয়া কত রকম যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহা আমাদের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। শেষে ঐ সকল গাছপালা যখন কঠিন প্রস্তরবৎ মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সেই বন-জঙ্গলের স্থানে একটি কয়লার খনির সৃষ্টি হয়। কাজেই বলা যাইতে পারে, কয়লার খনি যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত সূর্য্যরশ্মি ও সৌরশক্তি (fossilided and concentrated solar rays and energy); কেন না, পৃথিবীর গাছ-পালার জীবন-ধারণের যে শক্তি, তাহা সূর্য্য-রশ্মি হইতেই উদ্ভূত। কয়লার আগুনে উত্তাপও বেশীই হয়।

প্রায় সব দেশেই কয়লার খনি দেখা যায়। অনেক দেশে এখনও খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সব যায়গায় কয়লা পাওয়া গিয়াছে, সে সব স্থানের স্তরের গভীরতা, এবং সে স্তর মাটীর কতখানি নীচে আছে,

তাহা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে কি না জানি না। তবে কয়েকটি বেশ আশ্চর্য্যকর ঘটনা সচরাচর দেখা যায়—কয়লার খনির অতি সন্নিকটেই লোহার খনি থাকে। ইংলণ্ডের Newcastle ও Sheffield নগরদ্বয়, বঙ্গদেশে Jherria coalfields এবং Barakar iron-mines (যেখানে টাটার ফাউণ্ডারী চলিতেছে) ইত্যাদি। এ সবের পরস্পরের নিকটে অবস্থিতির কি কোন গূঢ় কারণে আছে? লৌহ প্রস্তুত করিতে কয়লা অত্যাবশ্যক; কিন্তু গাছ-পালার মধ্যকার লৌহের কোন রস কি উত্তাপে অন্য স্তরের উপরে "চোঁয়াইয়া" ও বহিয়া গিয়া নিকটস্থ কোন স্থানে জমা হইতে থাকে? আবার বঙ্গদেশের কয়লার খনির সঙ্গে ব্রহ্মদেশের কেরোসিনের খনি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার কয়লার খনির সহিত রাসিয়ার ক্যাস্পিয়ান হ্রদের পার্শ্বস্থ কেরোসিনের খনির কি কোন সম্বন্ধ আছে? এ সব বিষয়ে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়াছে কি না জানি না। তবে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বিভিন্ন প্রকারের মাটীর স্তরের বিভিন্ন আকৃতি ও গঠন আছে—তাহা হইলে কয়লার খনির নিকটবর্ত্তী স্থানে অন্য দ্রব্যের খনি কয়লার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে হইতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন হয় না।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পাথুরে কয়লার ব্যবহার যেমন বাড়িয়াছে, তাহাতে এ কয়লার দ্বারা জ্বালানি কার্য্যাদি যে কতদিন চলিবে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কোন খনিই 'অফুরন্ত' নয়। খনি হইতে কয়লা লইতে-লইতে এমন একটা সময় আসিবে, যখন কয়লা তোলাও সুকঠিন হয়, এবং গভীরতার জন্য ভূগর্ভ হইতে তাহা তুলিয়া বাজারে দিতে মজুরী পোষায় না। কাজেই কোন-কোন খনিতে বেশী কয়লা থাকিলেও, তাহা উপরে তুলিয়া ব্যবহার করা কঠিন হয়; আর, যে সব খনিতে অল্প কয়লা থাকে, তাহা অল্প দিনেই ফুরাইয়া যায়। পৃথিবীর সমস্ত খনি হইতে বৎসরে যত কয়লা উঠে, এবং যত খরচ হয়, তাহার হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, প্রত্যেক ২০ বৎসর পর-পর কয়লার ব্যবহার দ্বিগুণ হয়; কিন্তু সে অনুপাতে কয়লার খনি দ্বিগুণ আবিষ্কৃত হয় না। কাজেই, যদি এখন নূতন কোন বৃহৎ খনি আবিষ্কৃত না হয়, তবে যেমন ভাবে চলিতেছে, তাহাতে যে কয়লা উঠিতেছে, তাহাতে প্রায় বারশত বৎসর চলিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহার ব্যবহারেও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহাতে এত শীঘ্র সব খনি ফুরাইয়া যাওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ, যতই খনি হইতে কয়লা কম উঠিবে, অর্থাৎ খনিটি 'নিঃশেষ' হইয়া আসিবে, কয়লা ততই দুর্ম্মূল্য হইবে; আবার খনি হইতে কয়লা তুলিতে যতই মাটির গভীর প্রদেশে যাইতে হইবে, ততই তাহা তুলিতে খরচ বাড়িবে। লোকে যখন দেখিবে যে, কয়লার ব্যবহার পূর্ব্বের ন্যায় সস্তা নয়, আর তাহা সে রকম সুপ্রাপ্য নয়, তখন বাধ্য হইয়া কয়লার কাজ অন্য যাহা দ্বারা হইতে ও চলিতে পারে, তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমান সময়ে কয়লাই যে একমাত্র জ্বালাইবার জিনিষ, তাহা নয়। তবে এখন পৃথিবীতে যত কয়লার খনি আছে এবং তাহাতে সম্বৎসরে যে পরিমাণ কয়লা উঠে, তাহাতে বৃহৎ ব্যাপারে কয়লা ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা যে সস্তায় সে কাজ হইতে পারে, তাহা বোধ হয় না। কাঠ যে পরিমাণে জ্বালাইবার জন্য খরচ হইতে পারে, সে পরিমাণে বৃক্ষাদি বাড়ে না বা জন্মায় না; কাজেই কাঠের ব্যবহার এখন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাথুরে কয়লা যেন কত যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত সৌরশক্তি। কয়লা জ্বালাইবার সময় আমরা সে শক্তির আভাষ পাই। কিন্তু কয়লা ব্যবহারের সময় আমরা সে শক্তির কত যে অপব্যবহার ও অপচয় করি, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রান্নাবান্নার জন্য যখন কয়লা জ্বালান হয়, তখন কয়লার অধিকাংশ উত্তাপই শূন্যে মিলাইয়া যায়। আবার শীতপ্রধান দেশে যখন কয়লা জ্বালিয়া 'আগুন পোয়ান' হয়, তখন ত সমস্ত শক্তিই যেন আকাশের তারাগুলিকে উত্তপ্ত করিতে যায়। আধসের কয়লা এক মিনিটে যে শক্তি (Energy) দেয়, তাহা প্রায় ৩০০ ঘোড়া (Horse-power) দ্বারা সে সময়ে কাজ করানরই সমতুল্য হয়। তবে কয়লা এখন এত বেশী পাওয়া যায় যে, তাহার শক্তির পরিমিত ব্যয় ও ব্যবহারের দিকে আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না। এইভাবে কয়েক শতাব্দী চলিলে, শেষে যে কি অবস্থা হইবে, তাহা এখন ভাবা যায় না। তবে কয়লার উত্তাপ-শক্তিকে অন্য ভাবে ব্যবহার করার যথোচিত চেষ্টা হইতেছে।

পাথুরে কয়লা যে কি-কি উপাদানে গঠিত ও কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থে তৈয়ারী, তাহা বলা কঠিন; তাহাতে কি-কি দ্রব্য যে নাই, তাহা বরং চেষ্টা করিয়া বলা যায়। কাঠ-কয়লাতে কার্ব্বনের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী, বাজে জিনিষ (ছাই, ashes) সামান্য। হাড়ের কয়লাতে ফস্ফেটের অংশ আছে। কিন্তু পাথুরে কয়লায় অনেক রকম জিনিষের সমাবেশ। ছাই (ashes) এর ভাগ ইহাতে কিছু সামান্য নয়। অধিকাংশ Potassium ও Iron sodium ইত্যাদি জিনিষের (Inorganic) রাসায়নিক লবণ (salt)। স্থানবিশেষে কয়লার আভ্যন্তরিক পদার্থেরও তারতম্য হইয়া থাকে—Newcastle coal, Canal coal, Bengal coal,—প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দ্বারা বিভিন্ন রকম কয়লা বলা হয়।

প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে আভ্যন্তরিক পদার্থ কি-কি আছে তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে তাহাকে একটি বদ্ধ পাত্রের মধ্যে গরম করা হয়। ইহাকে রসায়ন শাস্ত্রে Destiuctive Distillation বলে। এরূপ গরম করাতে যে সব দ্রব্য তাহা হইতে নির্গত হয়, তাহা পৃথক ভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথক পাত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। coal gas প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ কয়লাকে এরূপ একটি বদ্ধ পাত্রে জ্বাল দেওয়া হয় (heated in a closed retort)। তাহা হইতে যে সব volatile দ্রব্যাদি বাহির হয়, তাহা বিভিন্ন পাত্রে ধরা হয়। নির্গত গ্যাস যখন পাইপের মধ্য দিয়া reseroirএ যায়, তখন তাহা

হইতে বিভিন্ন প্রকারের অকেজো আবর্জ্জনা (various objectionable impurities) ধরিয়া রাখা হয়। একটি গ্যাস প্ল্যাণ্টের (কারখানা) বর্ণনা করা এখানে সুকঠিন হইবে। তবে তাহা হইতে যে সব জিনিষ (Bye-product) পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রদান করিতেছি। পরে retortএর মধ্যে কয়লার যে ঝামা-আকৃতি দ্রব্য পড়িয়া থাকে, তাহা বাজারে কোক্ নামে বিক্রয় হয়। ইহাতে ধূম একপ্রকার হয় না বলিলেই হয়, এবং carbon প্রায় সমস্ত থাকে বলিয়া আঁচও বেশী হয়। কয়লাকে Destructive Distillation করিলে যে সব দ্রব্য বাহির হয়, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :—

(১) প্রথমতঃ—কোল্ টার; ইহা আল্‌কাতরার ন্যায় গাঢ় কাল বর্ণের দুর্গন্ধময় একটি পদার্থ। ইহা একটু শীতল হইলেই শক্ত হইয়া পাথরের মত হইয়া যায়। ইহাতে পুনরায় বদ্ধ পাত্রে উত্তাপ দিলে তাহা হইতে আল্‌কাতরা Naptha Napthalene, petroleum প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়। এই কোল্ টার রাস্তা বাঁধাইতে, (ম্যাকাডাম করিতে) গ্যাসের পাইপ মাটীতে প্রোথিত করিতে, ইলেক্ট্রিক তার (Electric wire) মাটীর ভিতর চালাইতে কিরূপ দরকার হয়, তাহা কলিকাতা সহরে কাহারও অবিদিত নাই। Naphtha, Naphthalene প্রভৃতি জিনিষও অনেক কাজে দরকার হয়।

(২) নিশাদল—Sal-ammoniac; এ পদার্থটী গ্যাসের আকারে নির্গত হইয়া পরে জলে দ্রব হয়। ইহা Electric Battery, Dry cells প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ঔষধ হিসাবেও এ দ্রব্যটির দরকার অনেক। ইহাতে রাসায়নিক দ্রব্যের সংযোগে আরও অনেক দ্রব্যাদির সৃষ্টি হয়।

(৩) বেন্‌জিন্—Benzene; এটি ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের একটি তরল পদার্থ। একটু উত্তাপেই ইহা গ্যাসাকৃতি ধারণ করে এবং ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ হয়। সে জন্য ইহা প্রস্তুত করিতে বিশেষ রকম যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই বেন্‌জিন্ অনেক বিষয়ে একটি অত্যাবশ্যক পদার্থ। নানারকম পাকা রং তৈয়ারী করিতে (aniline dyes) ইহা দরকার। আমাদের দেশে কয়লার খনিতে এ পদার্থটি তৈয়ারী করিবার কোন চেষ্টা করা হয় না। Germany ইহা হইতে নানা রকমে Aniline Dyes প্রস্তুত করিয়া বাজার প্রায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে; তাহা এখন অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বেন্‌জিন্ হইতে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা রসায়ন-শাস্ত্রের কথা। বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

(৪) গন্ধক—Sulpher; ইহা প্রথমে গ্যাসরূপে নির্গত হয়। তাহা Hydrated Oxide of iron দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে আট্‌কান হয়। তাহা হইতে গন্ধক গুঁড়ারূপে পাওয়া যায়। গন্ধক একটি পরিচিত পদার্থ। ইহার প্রয়োজনীয়তার বিশেষ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

(৫) উপরে কোল্ টার্ ও বেন্‌জিনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অতি জটিল পদার্থ। উত্তাপের তারতম্য অনুসারে ইহা হইতে যে কতরূপ পদার্থ বাহির হয়, তাহা বলা দুষ্কর। তবে নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল—

(ক) কার্ব্বন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রিত পদার্থ Hydrides of amyl, Hexyl, Heptyl nonyl and Decyl.

Amylene, Hexalyne, Paraffin, Benzol, Tulol, Xylol, Cumol, Cylol, Naphthalene, Anthralene, Pyrene, Chrysene (বাঙ্গালা শব্দ না পাওয়াতে ইংরাজি নামই দিলাম)।

(খ) কার্ব্বন, হাইড্রজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণ :- Phenol, Cresol, Phlorol, Rosolic Acid, turnolic acid.

(গ) কার্ব্বন, হাইড্রজেন ও নাইট্রজেনের সংমিশ্রণ Aniline, Tulonidine, Pyridine, Picoline, Lutidine, Collidine, Parvoline, Leucoline, Cespitine, Pyrrol.

উপরিউক্ত প্রত্যেক পদার্থই অনেক বিষয়ে দরকার হয়। কোন্‌টা কোন্ কাজে লাগে, তাহার বিবরণ এখানে দেওয়া দুরূহ হইবে। ইহার মধ্যে Aniline, Tulonidine, Phenol ও Naphthalene, এ কয়টি পদার্থ হইতে প্রায় ২০০ শত রকমের রঙ্গ তৈয়ারী হয়। জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ হওয়াতে এ রঙ্গ এখন বাজারে পাওয়া যায় না। কোন্‌টা হইতে কিরূপ ভাবে রং তৈয়ারী হয়, তাহা একটী Trade Secret; তাহার জন্য এখন সবিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই সব রংএর সৃষ্টি হওয়াতে প্রাকৃতিক রং (Natural Dyes) একেবারে দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

(৬) কোল গ্যাস্ যে জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা কলিকাতা সহরে কাহারও অবিদিত নাই।

(৭) ঠিক বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কয়লা হইতে এক প্রকার এসেন্স প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার ছাত্রদিগকে দেখাইয়াছিলেন। ইহার গন্ধ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত শেফালী ফুলের ন্যায় অতি মনোরম। তিনি যখন জার্ম্মাণীতে যান, তখন শুনিয়াছিলেন যে, কয়লা হইতে এরূপ এসেন্স প্রস্তুত হয়। সেখানকার নিয়মানুসারে তিনি কারখানাতে প্রবেশ করিতে পান না। শেষে নিজের অধ্যবসায়ে সামান্য একটু পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এটা ঠিক সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না; তবে এ লেখকও সেই এসেন্সের আঘ্রাণ পাইয়াছিল। কয়লা হইতে যে পুষ্পসার উদ্ভূত হইতে পারে, সেটা কিছু অসম্ভব নয়। তবে আমাদের বিদ্যা এখনও ততদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

উপরে কয়লা সম্বন্ধে যে সামান্য একটু রাসায়নিক আভাষ দেওয়া গেল, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে—সভ্যতা, বিজ্ঞান—এ সব কয়লার নিকট কতখানি ঋণী। ভারতবর্ষে কয়লার খনির অভাব নাই; তবে আমরা চক্ষু থাকিতেও চক্ষুহীন—তাই অন্যের উদ্ভাবিত ও প্রস্তুত জিনিষের জন্য হাত পাতিয়া থাকি। বিজ্ঞানের বলে কত স্থানে কত রকম যে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির উৎপত্তি হইতেছে, তাহা আমরা খুব কমই লক্ষ্য করি। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়?

অয়ন বিচার

[অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় এম-এ]

অয়ন শব্দ, "ই" ধাতু হইতে উৎপন্ন ; ইহার অর্থ গতি, গমন। সূর্য্যের দুই প্রকার গতি উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন নামে অভিহিত। সূর্য্যের কোন্ গতিকে উত্তরায়ন ও কোন্ গতিকে দক্ষিণায়ন বলে, ইহাই এই প্রবন্ধের বিচার্য্য।

সাধারণতঃ উত্তরায়ন সময় বলিতে দেবতাগণের দিন বুঝায়। এই সম্বন্ধে প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের কয়েকটি মত উদ্ধৃত করিলাম।

যদুত্তরায়নং তদহর্দেবানাম্। দক্ষিণায়নং রাত্রিঃ। সম্বৎসরোঽহোরাত্রঃ। বিষ্ণুসংহিতা ১৯ অং।

উত্তরায়ন দেবতাগণের দিন, দক্ষিণায়ন রাত্রি এবং সম্বৎসরে এক অহোরাত্র।

তৈঃ ষড়ভি অয়নং বর্ষ দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অয়নং দক্ষিণং রাত্রি র্দেবানাম্ উত্তরং দিনম্॥
কুর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৫ম অধ্যায়।

ছয়মাসে এক অয়ন, দুই অয়নে এক বৎসর ; অয়ন দুই প্রকার, দক্ষিণ ও উত্তর। দক্ষিণায়ন দেবতাগণের রাত্রি ও উত্তরায়ন দেবতাগণের দিন।

এই বিষয়ে বহু মত উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই ; কারণ, এই সম্বন্ধে কোন মতভেদ শুনা যায় না !

এক্ষণে দুইটী বিষয় বুঝিতে ও জানিতে হইবে ; দিন কাহাকে বলে, ও দেবতাগণের দিন কি ?

সাধারণতঃ যখন সূর্য্য ক্ষিতিজের (Horizon) উপরিভাগে অবস্থান করে তখন দিন, ও যখন ক্ষিতিজের নিম্নভাগে থাকে, তখন রাত্রি হয়।

ক্ষিতিজ স্থানভেদে ও কালভেদে পৃথক-পৃথক। সব সময়েই ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু হইতে দর্শকের পা পর্য্যন্ত সংযোজক রেখাকে উভয়দিকে বর্দ্ধিত করিলে আকাশের সহিত যে দুইটি বিন্দুতে সংলগ্ন হয়, তাহাদের মধ্যে যেটি ঠিক আমাদের মাথার উপরে অবস্থিত, তাহাকে খস্বস্তিক (Zenith) বলে। যে বৃহদ্বৃত্তের সমতল পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু দিয়া গমন করে, এবং কেন্দ্রবিন্দু ও খস্বস্তিক যোজক-রেখার উপর লম্বভাবে অবস্থিত, তাহাকে ক্ষিতিজ বলে।

এই সংজ্ঞা হইতে সহজেই প্রতীত হয় যে, ক্ষিতিজ ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের দর্শকের জন্য বিভিন্ন। আবার পৃথিবীর মেরুদণ্ডের চতুঃপার্শ্বে দৈনিক আবর্ত্তনের ফলে কোন এক স্থান নিশ্চল অবস্থাতে নাই। সুতরাং এই আবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষিতিজও পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কাজেই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্ষিতিজ পৃথক। অতএব দিন-রাত্রি সকল স্থানে একই সময়ে হইতে পারে না ; ও দিন-রাত্রির পরিমাণ সব স্থানে সমান হয় না। ইহার পরে জিজ্ঞাস্য এই, দেবতাগণের বাসস্থান কোথায় ও তাঁহাদের দিন-রাত্রির পরিমাণ কত ?

এই সম্বন্ধে প্রাচীন মুনি-ঋষিগণের মত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনীষিগণের বাক্য কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

ইহ হি মেরুগিরিঃ কিল মধ্যগঃ
কনকরত্নময় স্ত্রিদশালয়ঃ।
দ্রুহিন জন্মকুপদ্মজ কর্ণিকা
ইতি চ পুরাণবিদো হবর্ণয়ন্॥
৩৯ ভুবনকোষ, সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

(ইলাবত বর্ষের) ঠিক মধ্যস্থলে মেরুপর্ব্বত অবস্থিত ; ইহা স্বর্ণ ও নানা প্রকার রত্নপরিপূর্ণ এবং দেবতাগণের বাসস্থান। ইহা ব্রহ্মার জন্মস্থান ও দেখিতে পদ্মফুলের কর্ণিকার ন্যায়। পুরাণকারগণ এই-রূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই,

সদ্রত্ন কাঞ্চনময়ং শিখরত্রয়শ্চ
মেরৌ মুরারি কপুরারি পুরাণিতেষু।
তেষাম্ অধঃ শতমখজ্বলন্ত কানাম্
যক্ষাম্বু পানিল শশীন পুরাণিচাষ্টৌ॥
৩৬ ভুবনকোষ, সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

মেরু-পর্ব্বতের তিনটি শিখর উত্তম স্বর্ণরত্নময়। ঐ শিখরগণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব বাস করেন। ইহাদের নিম্নভাগে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিস্থান।

অন্যত্র

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধ সংঘাঃ
ঊর্দ্ধেচ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ॥

মেরুস্থানে দেবতা ও সিদ্ধগণ বাস করেন এবং কুমেরুতে দৈত্য-সমূহ বাস করেন।

মেরু দেবতাগণের বাসস্থান—ইহাই ভারতভাস্কর ভাস্করাচার্য্যের মত ; তবে তিনি এই মতের জন্য পুরাণের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমরাও পুরাণকারগণের শরণাপন্ন হই।

চতুর্দ্দশসহস্রানি যোজনানাং মহাপুরী
মেরোরুপরি মৈত্রেয় ! প্রথিতা দিবি॥
তস্যাঃ সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসুচ
ইন্দ্রাদি লোকপালানাম্ প্রখ্যাতাঃ প্রবরাপুরঃ॥ ৩০
মেরোশ্চতুর্দ্দিশম্ যেতু প্রোক্তাঃ কেশর পর্ব্বতাঃ
শীতান্তাদ্যা মুনে ! তেষাম্ অতীব হি মনোরমাঃ॥ ৪৪
শৈলানাম্ অন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ
সুরম্যানি তথা তাসু কাননানি পুরাণি চ॥ ৪৫
লক্ষ্মী বিষ্ণগ্নি সূর্য্যাদি দেবাণাম্ মুনিসত্তমঃ
তাস্বায়তনঃ বর্ষাণি জুষ্টানি বর কিন্নরৈঃ॥ ৪৬
গন্ধর্ব্ব যক্ষরক্ষাংসি তথা দৈত্যেয় দানবাঃ
ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈল দ্রোণীষহর্নিশম্॥ ৪৭
বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ ২য় অধ্যায়।

হে মৈত্রেয়, চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন পরিমিত ব্রহ্মার আবাসস্থান মেরুর উপরে অবস্থিত ও স্বর্গ নামে অভিহিত। তাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের বাসস্থান। হে মুনে, মেরুর চতুর্দ্দিকে ছোট-ছোট উহার গাত্রসংলগ্ন পাহাড় অতিশয় মনোরম। পাহাড়ের মধ্যে সিদ্ধ চারণসেবিত ছোট-ছোট নদীসমূহ প্রবাহিত। লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য্যাদি দেবতাগণের ও কিন্নরসমূহের আবাসস্থান। এই সমস্ত পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদীসমূহে গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ দৈত্য ও দানব সকল দিন-রাত্রি ক্রীড়ামোদে অতিবাহিত করে।

মহাদ্বীপাস্তু বিখ্যাতাশ্চত্বারঃ পত্রসংস্থিতাঃ
ততঃ কর্ণিকসংস্থানো মেরোর্নামোমহাচলঃ ॥ ৪৬-৩৪ অঃ
সপর্ব্বতোমহাদিব্যো দিব্যৌষধিসমন্বিতঃ
ভুবনৈরাবৃত সর্ব্বোজাতরূপময়ৈ শুভৈঃ ॥ ৫৪
তত্রদেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগ রাক্ষসাঃ
শৈলরাজেঃ প্রদৃশ্যন্তে শুভশ্চাপ্সরসাংগণাঃ ॥ ৫৫
কান্তং সহস্র পর্ব্বাণম্ সহস্রোদক কন্দরম্
সহস্রশত পত্রস্তম্ বিদ্ধি মেরুনগোত্তমম্ ॥ ৬৬
বিমানযানৈঃ শ্রীমন্তিশতসংঘৈঃ দিবৌকসাম্
প্রভাদীপিত পর্য্যন্তম্ মেরুম্ পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ৬৮
তস্যপর্ব্ব সহস্রেঽস্মিন্ নানাশ্রয় বিভূষিতে
সর্ব্বদেব নিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্যনেকসঃ ॥ ৬৯
তমাবসচোর্দ্ধতলে দেবদেব চতুর্ম্মুখঃ
ব্রহ্মাব্রাহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠাস্ত্রাদিবৌকসাম্ ॥ ৭০
তত্রাস্তে শ্রীপতি শ্রীমান্ সহস্রাক্ষ পুরন্দরঃ
উপাস্যমানাস্ত্রিদশৈঃ মহাযোগৈঃ সুরর্ষিভিঃ ॥
দ্বিতীয়েঽপ্যন্তরতটে দৈবদেশে পূর্ব্বদক্ষিণে
নানাধাতুশতৈশ্চিত্রে সুরম্যামতেজসম্ ॥ ৭৮

*   *   *   *

মহাবিমানং প্রথিতং ভাস্বরং জাতবেদসম্ ॥ ৮০
সা হি তেজোবতীনাম হুতাশস্য মহাসভাঃ
সাক্ষাত্তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বদেবমুখোঽনলঃ
তৃতীয়েঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥ ৮৬
তথা চতুর্থদিগ্দেশে নৈঋত্যাধিপতিঃ সভা
নাম্নাকৃষ্ণাঙ্গনা নামবিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥ ৮৭
পঞ্চমেঽপ্যন্তরতটে এবমেব মহাসভা
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়ানাম্নাশুভবতী সতী
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮৮
পদোত্তরেতথা দেশে ষষ্ঠেঽন্তরতটেশিরে
বায়োর্গন্ধবতী নাম সভা সর্ব্বগুণোত্তরা
সপ্তমেঽপ্যন্তরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা
নাম্না মহোদয়া নাম শুদ্ধবৈদূর্য্যবেদিকা ॥ ৯০
তথাষ্টমেঽন্তরতটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ
যশোবতী নামসভা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা ॥ ৯১

ইতিবায়ুপুরাণম্।

এই সকল কর্ণিকার মধ্যে চারিটি প্রসিদ্ধ মহাদ্বীপ আছে এবং (পদ্মের) মধ্যস্থলে মেরুপর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতটি খুব উচ্চ এবং দিব্যৌষধি পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে ভুবন সকল বর্ত্তমান। এখানে দেব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, অপ্সরগণ তাহাদের কান্তাগণের সহিত বিহার করিতে দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মেরুতে সহস্র স্তর আছে এবং সহস্র জলাধার গুহা আছে এবং সহস্র-সহস্র শৃঙ্গ আছে। এই মেরুপর্ব্বতের প্রান্তবিন্দু পর্য্যন্ত ইহার ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত এবং এই ভিন্ন-ভিন্ন স্তরে নানাপ্রকার বিভূষিত দেবতাগণের বহু আবাসস্থল বর্ত্তমান। সর্ব্বোচ্চ তটে দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবেত্তাগণের বরেণ্য চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বাস করেন। সেইখানে লক্ষ্মীপতি শ্রীমান্ সহস্রচক্ষু ইন্দ্রদেব দেবতাগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া বাস করিতেছেন। দ্বিতীয়তটে পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে বহুপ্রকার ধাতু সুশোভিত, সুরম্য তেজোময় অগ্নিদেবের তেজবতী নামা মহাসভা বিরাজমান। সেখানে দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ অনল বর্ত্তমান আছেন। তৃতীয় তটে বৈবস্বত দেবের সুসংযমানাম্নী মহাসভা বিরাজিতা। চতুর্থ তটে নৈঋত্যাধিপতি ধীমান বিরূপাক্ষদেবের কৃষ্ণাঙ্গনা নামক সভা; পঞ্চমতটে জলাধিপতি মহাত্মা বরুণের শুভবতী নাম্নী সভা; ষষ্ঠ তটে বায়ুদেবের গন্ধবতী নাম্নী সভা; সপ্তম তটে নক্ষত্রাধিপতির মহোদয়া নাম্নী সভা এবং অষ্টমতটে মহাত্মা ঈশান দেবের যশোবতী নাম্নী সভা বর্ত্তমান আছে।

পরন্তু বায়ুপুরাণে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, মেরু ও স্বর্গ একই স্থান।

নাকপৃষ্ঠং দিক্ স্বর্গমিতি যেঃপরিপঠ্যন্তে
বেদবেদ্যাঃ বিদ্ধিহিশব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥
তদেতৎ সর্ব্বদেবানামবিধানে কৃতাত্মনাম্
দেবলোকে গিরৌতস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতিষুগীয়তে ॥

অন্যান্য পুরাণ হইতেও দেবতাদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

চতুর্দ্দশসহস্রানি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরূপরি বিখ্যাত দেবদেবস্য বেধসঃ ॥ ১
তত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ।
উপাস্যমানো যোগীন্দ্রর্মুনীন্দ্রোপেন্দ্র শঙ্করৈঃ ॥ ২

*   *   *   *

অত্রদেবাধিদেবস্য শম্ভোরমিত তেজসঃ।
দীপ্তমাচতনং শুভ্রং পুরস্তাধুব্রাহ্মণঃ স্থিতম্ ॥ ৫

*   *   *   *

তত্রৈব পর্ব্বতবরে শক্রস্য পরমাপুরী
নাম্নাঽমরাবতী পূর্ব্বে সর্ব্বশোভা সমান্বিতা ॥ ১০

*   *   *   *

তস্মাদ্দক্ষিণদিগ্‌ভাগে বহ্নেরমিত তেজসঃ

তেজোবতী নাম পুরী দিব্যৈশ্বর্য্য-সমন্বিতা ॥ ১৩

কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৪৫ অঃ

চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন বিশিষ্ট ব্রহ্মার মহাপুরী মেরুর উপরিভাগে অবস্থিত। সেখানে যোগীন্দ্র ও মুনীন্দ্র কর্ত্তৃক উপাস্যমান বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা বর্ত্তমান। সেখানে দেবাধিদেব অমিততেজস্বী শম্ভুর শুভ্রবর্ণ ও দীপ্ত আবাসস্থল এবং উহা ব্রহ্মার আবাসের চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত। সেই পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠের পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রের অমরাবতী নামক সুন্দর শোভিত আবাসস্থল আছে। তাহার দক্ষিণদিকে অমিততেজ অগ্নিদেবের তেজোবতী নামক দিব্যৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরী অবস্থিত।

বরাহপুরাণে ৭৮ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই,

তস্যৈবমেরোঃ পূর্ব্বেতু দেশে পরমবর্চ্চসে,

চক্রপাদ পরিক্ষিপ্তে নানা ধাতু বিরাজিতে

তত্রসর্ব্বামর পুরঃ—

সেই মেরুর পূর্ব্বভাগে পরম দীপ্তিশালী ও নানা ধাতুসমন্বিত দেবতাগণের বাসস্থান।

ইহার পরে বরাহপুরাণকার ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

অগ্নিপুরাণের ১০৮ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোক আছে।

জম্বুদ্বীপো দ্বীপমধ্যে তন্মধ্যে মেরুরুচ্ছ্রিতঃ

* * * *

শঙ্খকূটাদয়ঃ সৌম্যে মেরৌ চ ব্রহ্মণঃ পুরী

চতুর্দ্দশ সহস্রানি যোজনানাং চ দিক্ষু চ

ইন্দ্রাদি লোকপালানাং সমন্তাদ্‌ ব্রহ্মণঃ পুরঃ ॥

সমস্ত দ্বীপগুলির মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত এবং এই জম্বুদ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে মেরু দণ্ডায়মান।

* * * *

উত্তর মেরুতে ব্রহ্মার আবাসস্থল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের আবাসস্থল।

সমস্ত পুরাণকারগণের মত আলোচনা করিলে ইহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীত হয় যে, উত্তর মেরুই দেবতাগণের বাসস্থান; কিন্তু মেরু বলিতে আমাদের কি বুঝিতে হইবে, তাহাও প্রাচীন মনীষিগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ মেরু বলিতে আমরা পৃথিবীর সর্ব্বোত্তর স্থান বুঝি। বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বেষাম্‌ দ্বীপবর্ষাণাম্‌ মেরোরুত্তরতো যতঃ। ২০

মেরু সমস্ত দ্বীপবর্ষের উত্তরে অবস্থিত।

বায়ুপুরাণকার বলিতেছেন,—

সর্ব্বেষামুত্তরে মেরুর্লোকা লোকান্ত দক্ষিণে।

৫০ অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক।

মেরু সকলদেশের উত্তরে এবং লোকালোক দক্ষিণে অবস্থিত।

মেরুর অবস্থান সম্বন্ধে সিদ্ধান্তশিরোমণি ও সূর্য্যসিদ্ধান্তে কিছু আলোচনা আছে।

লঙ্কা কুমধ্যে যম কোটিরস্যাঃ

প্রাক্‌ পশ্চিমে রোমক পত্তনঞ্চ।

অধস্ততঃ সিদ্ধপুরম্‌ সুমেরুঃ

সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ ॥

লঙ্কা পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ বিষুববৃত্তে অবস্থিত, পূর্ব্বদিকে যমকোটি, পশ্চিম দিকে রোমকপত্তন, ঠিক নিম্নভাগে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু ও দক্ষিণে বড়বানল।

অন্যত্র—

কুবৃত্ত পাদান্তরিতানি তানি

স্থানানি ষড়্গোলবিদো বদন্তি।

গোলবেত্তাগণ বলেন যে এই ছয়টি স্থান ৯০ অংশ দূরে দূরে অবস্থিত।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভূগোল অধ্যায়ে মেরুর অবস্থিতি সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দেখিতে পাই।

ভূবৃত্তপাদ বিবরাস্তাশ্চান্যোন্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ

তাভ্যশ্চোত্তরগো মেরু স্তাবানের সুরাশ্রয়ঃ ॥

(পূর্ব্বকথিত) নগরসমূহ প্রত্যেকে ৯০ অংশ দূরে অবস্থিত। দেবতাদের নিলয় মেরু এই সকল স্থান হইতে ৯০ অংশ দূরে অবস্থিত। এই সমস্ত উদ্ধৃত বচন হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয়, আমরা যাহাকে ইংরাজীতে North Pole বলি, তাহাই সুমেরু এবং দেবতাদের বাসস্থান।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতিজের ঊর্দ্ধভাগে অথবা নিম্নভাগে সূর্য্যের অবস্থান অনুসারে দিবা ও রাত্রির ভেদ হয়। সাধারণ জ্যামিতির সাহায্যে ইহা অতি অল্প আয়াসেই প্রমাণিত হইতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) ঐ স্থানের ক্ষিতিজ হইতে ধ্রুবনক্ষত্রের (Pole star) দূরত্বের (Altitude) সমান। খস্বস্তিক ক্ষিতিজ হইতে ৯০ অংশ ঊর্দ্ধে। দর্শক যতই উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই তাহার অক্ষাংশের বৃদ্ধি হইবে ও ধ্রুবনক্ষত্র ক্ষিতিজ হইতে সেই পরিমাণ ঊর্দ্ধে থাকিবে। দেবতাগণ মেরুতে বাস করেন। তাঁহাদের অক্ষাংশ অর্থাৎ বিষুবরেখা হইতে দূরত্ব ৯০ অংশ। সুতরাং ধ্রুবনক্ষত্র ক্ষিতিজ হইতে ৯০ অংশ দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ উত্তর মেরুতে অবস্থানকারী দর্শকদের ক্ষিতিজ ও বিষুববৃত্ত একই।

যখন সূর্য্য ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণ করিতে-করিতে ক্ষিতিজ অর্থাৎ বিষুববৃত্তের উপরিভাগে থাকে, তখন দেবতাদের দিবাভাগ ও যখন বিষুববৃত্তের নিম্নে থাকে, তখন রাত্রি। বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত দুই বিন্দুতে চ্ছেদ করিতেছে। একটীর নাম মহাবিষুব-সংক্রান্তি ও অপরটীর নাম জলবিষুবসংক্রান্তি। গ্রহগণের স্ফুটগণনা মহাবিষুবসংক্রান্তি-বিন্দু (First point of Aries) হইতে আরম্ভ হয়। সূর্য্যের গতি-গণনারও ইহাই আদি বিন্দু। রাশিচক্র সাধারণতঃ দ্বাদশ ভাগে

বিভক্ত এবং এক-একটি ভাগের নাম রাশি। রাশিগণনাও এই বিন্দু হইতে আরম্ভ হয়। ক্রান্তিবৃত্তের যে অংশ বিষুববৃত্তের উত্তরদেশে অবস্থিত, তাহাতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, এই ছয়টি রাশির বিভাগ অর্থাৎ মহাবিষুব-সংক্রান্তি বিন্দু হইতে জলবিষুব-সংক্রান্তি বিন্দু পর্য্যন্ত এই ছয়টি রাশি; জলবিষুব-সংক্রান্তিবিন্দু হইতে মহা-বিষুবসংক্রান্তিবিন্দু পর্য্যন্ত ক্রান্তিবৃত্তের যে অংশ বিষুববৃত্তের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত, তাহা অপর ছয়টী রাশিতে বিভক্ত। সুতরাং সূর্য্য যে সময় বিষুববৃত্তের উত্তরদেশে অর্থাৎ মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত ছয়টী রাশিতে ভ্রমণ করে, তাহা দেবতাদের দিন এবং যতক্ষণ বিষুববৃত্তের দক্ষিণ দেশে থাকে অর্থাৎ তুলা হইতে মীন পর্য্যন্ত এই ছয়টী রাশি ভ্রমণ করে, তাহাই দেবতাদের রাত্রি। অন্য ভাবে বলিতে গেলে, মহাবিষুসংক্রান্তি হইতে জলবিষুবসংক্রান্তি পর্য্যন্ত (আমাদের) এই ছয়মাস দেবতাদের দিন এবং অন্য ছয়মাস দেবতাদের রাত্রি। এই সম্বন্ধে সূর্য্য-সিদ্ধান্তে এইমত পোষক বচন দৃষ্ট হয়।

মেষাদাবুদিতঃ সূর্য্য স্ত্রীন্ রাশীমুদগুত্তরম্।
সঞ্চরণ্ প্রাগহর্মধ্যম্ পুরয়েন্ মেরুবাসিনাম্॥

সূর্য্য মেষরাশির আদিতে উদিত হইয়া তিন রাশি উত্তরদিকে গমন করিলে মেরুবাসীদের দিবাভাগের প্রথমার্দ্ধ হয়।

অন্যত্র—

মেরৌ মেষাদি চক্রার্দ্ধে দেবা পশ্যন্তি ভাস্করম্
সকৃদেবোদিতম্ তদ্বদসুরাশ্চ তুলা দিশম্॥

মেরুস্থিত দেবগণ সূর্য্যকে মেষরাশি হইতে ছয় রাশি পর্য্যন্ত (রাশিচক্রের অর্দ্ধেকভাগ) ভ্রমণ করিতে দেখেন এবং মেষরাশির প্রথম ভাগে সূর্য্যকে একবার মাত্র উদিত হইতে দেখেন। এইরূপ অসুরগণও তুলারাশি হইতে সূর্য্যকে দেখে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে, সেই ছয়মাস সূর্য্য মহাবিষুবসংক্রান্তি হইতে জলবিষুবসংক্রান্তি পর্য্যন্ত ক্রান্তিবৃত্ত ভোগ করে অর্থাৎ বিষুব-বৃত্তের উত্তরভাগে থাকে; তাহাই দেবতাগণের দিন ও তাহাই উত্তরায়ন এবং যেই ছয়মাস সূর্য্য জলবিষুবসংক্রান্তি হইতে মহাবিষুবসংক্রান্তি পর্য্যন্ত ক্রান্তিবৃত্ত ভোগ করে অর্থাৎ বিষুববৃত্তের দক্ষিণদেশে থাকে, তাহা দেবতাদের রাত্রি ও তাহাই দক্ষিণায়ন।

পুরাণে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের সংজ্ঞা অন্যরূপ দেওয়া আছে। তাহা হইতেও আমরা উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

উত্তরক্রমণেঽর্কস্য দিবা মন্দগতিঃ স্মৃতা
তস্যৈবতু পুনর্নক্তং শীঘ্রা সূর্য্যস্য বৈগতিঃ॥ ৭৭
দক্ষিণ প্রক্রমেবাপি দিবা শীঘ্র বিধীয়তে
গতিঃ সূর্য্যস্য বৈ নক্তং মন্দা চাপি বিধীয়তে॥ ৭৮

* * * *

দশপঞ্চ মুহূর্ত্তং বৈ অহস্তু বিষুবে স্মৃতম্॥
বর্দ্ধন্ততো হ্রসত্যেব অয়নে দক্ষিণোত্তরে
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রিস্তু গ্রসতে অহঃ॥ ৯২

(মৎস্যপুরাণম ১২৪ অঃ।

উত্তরায়নে সূর্য্যের গতি দিবাভাগে মন্দীভূত ও রাত্রিকালে শীঘ্র হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে শীঘ্র ও রাত্রিকালে মন্দগতি হয়।.........বিষুবে দিনমান পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত; (রাত্রিমানও ঐরূপ)। উত্তর ও দক্ষিণ অয়নে ইহা হইতে দিবামানের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। উত্তরায়নে দিবা রাত্রিমানকে ও দক্ষিণায়নে রাত্রি দিবামানকে গ্রাস করে।

উত্তরায়নে ও দক্ষিণায়নে দীর্ঘতম ও হ্রস্বতম রাত্রিমানের সম্বন্ধে পুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাই।

সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শীঘ্রং মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে।
ত্রয়োদশার্দ্ধমৃক্ষাণাং মধ্যে চরতি মণ্ডলম্॥ ৭৯

* * * *

সূর্য্যোঽষ্টাদশভিরহ্নো মুহূর্ত্তৈরুদগয়নে।
ত্রয়োদশানাং মধ্যে তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তানি ঋক্ষাণি রাত্রৌ দ্বাদশভিশ্চরন্॥ ৭৪

দক্ষিণায়নে সূর্য্য দ্বাদশ মুহূর্ত্তে (পরিদৃশ্যমানার্দ্ধ) ত্রয়োদশ নক্ষত্র বিচরণ করেন ও রাত্রিকালে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত সেই কয়েকটি নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া থাকেন।...........উত্তরায়নে সূর্য্য দিবাভাগে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে ত্রয়োদশ নক্ষত্র মধ্যে এবং রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সেই পরিমাণ নক্ষত্রমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, উত্তরায়নের দীর্ঘতম দিবামান অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত ও হ্রস্বতম রাত্রিমান দ্বাদশ মুহূর্ত্ত, এক দক্ষিণায়নের দীর্ঘতম রাত্রিমান অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত ও হ্রস্বতম দিবামান দ্বাদশ মুহূর্ত্ত।

এই শ্লোক কয়টি বিশদভাবেই বলিয়া দিতেছে যে, দীর্ঘতম রাত্রি ও দিবামান অয়নদ্বয়ের সন্ধিস্থলে নহে। এই শ্লোকটি হইতে আরও কতকগুলি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি।

বিজ্ঞান-রহস্য

[শ্রীহরিদাস হালদার]

সূর্য্যদেব

সমুদ্র হইতে জল ঊর্দ্ধে উঠাইয়া বৃষ্টিরূপে চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়াই যে সূর্য্যদেবের একমাত্র কাজ, তাহা নহে। ইঁহাকে জুতা-সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত নীচ ও উচ্চ অনেক কার্য্যই করিতে হয়। ইনি সহস্র বাহু দ্বারা সহস্র দিকে সহস্র রকমের বীজাণুকে নিয়ত নাশ করিতেছেন। ইনি বিশালবপু "Scavenger"রূপে বিশ্বের যতকিছু দুর্গন্ধ ও বিষ নষ্ট করিতেছেন।

আমাদের দেহরূপ ইঞ্জিন চালাইবার জন্য উত্তাপের আবশ্যক হয়। এই উত্তাপ যে আমরা কেবল উদরস্থ Carbo-hydrate

খাদ্যের অঙ্গার হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা নহে। দেহ ও রক্তের আবশ্যক তাপের যে অংশ আমরা তপনের নিকট হইতে পাইয়া থাকি, তাহাও নিতান্ত কম নয়।

সূর্য্যদেবই বিশ্বের প্রধান চিত্রকর। একমাত্র তিনিই বৃক্ষপত্রকে সবুজবর্ণে এবং ফলপুষ্পকে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করেন। গাঢ় অন্ধকারময় গৃহের মধ্যে বীজ হইতে কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হইলে, তাহাতে (Chlorophyll) সবুজ বর্ণের একান্ত অভাব হয়। তরু-লতাগণ বোধ হয় সূর্য্যের নিকট তাহাদের ঋণের কথা অবগত আছে। তাই তাহাদের মধ্যে অনেকেই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সূর্য্যদেবের দিকে ফিরিয়া তাঁহারই মুখের প্রতি তাকাইয়া থাকে। প্রস্ফুটিত পুষ্পই তাহাদের নির্নিমেষ চক্ষু। কেবল সূর্য্যমুখী-ফুল কেন, অনেক ফুলই সূর্য্যমুখী। জীবজগতেও কীটপতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই নিজ-নিজ বর্ণ-সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহারই নিকট প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। কৃতজ্ঞ প্রজাপতি তাই সূর্য্যদেবকে তাহার পক্ষ-সৌন্দর্য্য দেখাইয়া আনন্দে উড়িয়া বেড়ায়। আর রূপগর্ব্বিতা রমণী ভুলিয়া যায় যে, তাহার গণ্ডের ও অধরোষ্ঠের যে অপূর্ব্ব রক্তিমরাগ, তাহা এই দেবতারই বিশুদ্ধ দান। তাই সে যখন তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়া গৃহান্ধকারে বাস করিতে আরম্ভ করে, তখন সূর্য্যদেবও তাঁহার উজ্জ্বল কান্তি হরণ করেন।

সূর্য্যদেবের আর একটি বড় কাজ আছে। ইনিই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিষক্। যে সকল রোগীকে ডাক্তার-বৈদ্যে আরোগ্য করিতে পারে না, তাহাদিগকে একবার সূর্য্যদেবের চিকিৎসাধীনে রাখিলে নিশ্চয়ই ফল দর্শিবে। এই কারণে আজকাল য়ুরোপে ও আমেরিকার নানাস্থানে সৌর-চিকিৎসালয় (Solaria) সংস্থাপিত হইতেছে। এই সকল চিকিৎসালয়ে সূর্য্যদেবই একমাত্র বৈদ্যরাজ, এবং রৌদ্রই তাঁহার একমাত্র সর্ব্বৌষধি মহৌষধি। তিনি রোগীদিগকে এই ঔষধে স্নান করাইয়া, এই ঔষধ সেবন করাইয়া, এবং এই ঔষধের প্রলেপ দিয়া তাহাদের যত অসাধ্য রোগ আরোগ্য করিতেছেন। রক্তহীনতা, ক্ষয়যক্ষ্মা, অসাধ্য ক্ষত, গণ্ডমালা, cervical adenitis এবং শিশুদিগের Rickets নামক দুঃসাধ্য অস্থিরোগ এই চিকিৎসায় সুন্দররূপে আরোগ্য হইতেছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের ক্ষত সত্বর আরোগ্য করিবার জন্য, আজকাল রণক্ষেত্রের নিকটে Solaria স্থাপিত হইয়া থাকে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নিত্য কিছুক্ষণ খালি গায়ে রৌদ্রে থাকিলে যে সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাই কোন অশান্ত শিশু যদি রৌদ্রে একটু ছুটাছুটি করে, অমনি তাহার মূর্খ জননী তাহাকে "সূর্য্যপক" হইতে নিষেধ করেন। পুরাণে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নারদের অভিশাপে অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; পরে তিনি সূর্য্যদেবের অনুকম্পায় রোগমুক্ত হইয়া চন্দ্রভাগাতীরে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দির একটি Solaria কি না বলিতে পারি না। বেদের ঋষিগণ অকারণে এই দেবতার উপাসনা করিতেন না। সূর্য্যদেবের নিকট জগতের চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ যে কতদূর ঋণী, তাহা তাঁহারা বিজ্ঞানবলে না জানিলেও, যোগবলে নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন।

পারের যাত্রী।

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল]

১

দিবসের শেষ আলো পড়িছে লুটিয়া
সায়াহ্ন-গগনে,
তটপ্রান্তে বনরেখা গিয়াছে মিশিয়া
দিগন্তের সনে।
শ্রান্ত বায়ু বহে ধীরে কাণে পশে আসি'
জল-কল-ধ্বনি,
কোন্ নিরুদ্দেশ পানে চলেছি না জানি
বাহিয়া তরণী !

২

শুব্ধ নভস্তল হ'তে নামিছে তিমির
ঘিরি চারিধার,
অন্তহারা জলরাশি উঠিছে উচ্ছ্বসি'
সম্মুখে আমার।
প্রবল স্রোতের বেগে ছুটিছে দুলিয়া
ক্ষুদ্র মোর তরী,
ফিরিবার নাহি পথ . বেয়ে যাব শুধু
বাঁচি কিম্বা মরি।

৩

কে জানে কোথায় কূল দিক্ নাহি হেরি
নিশার আঁধারে ;
চকিতে অলোকরেখা কভু উঠে ফুটি'
দূর পরপারে।
জানি, ওইখানে মোর তরণীর গতি
লভিবে বিরাম,
ব্যর্থ মোর সাধনার আছে ওই পারে
পূর্ণ পরিণাম।

শ্রীপঞ্চমীর পল্লী

(পল্লীচিত্র)

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

কৃষ্ণচন্দ্রপুর সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম। বহু পূর্ব্বে এখানে মহকুমা ছিল; কিন্তু নীল-বিদ্রোহের সময় মহকুমা গ্রামান্তরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মহকুমা গিয়াছে বটে, কিন্তু থানা ও সবরেজেষ্ট্রী আফিস এখনও বর্ত্তমান। তাহার উপর মিউনিসিপালিটির আবর্জ্জনা একটা ষাঁড়ের গাড়ীতে প্রত্যহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া দত্তদের আমবাগানের গর্ত্তে সঞ্চিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর একখানি ছোটখাট সহর। কৃষ্ণচন্দ্রপুরের প্রান্তবাহিনী 'কাজলা' যখন প্রশস্তকায়া ছিল, পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বড়-বড় নৌকা যখন 'পাকুড়তলার' ঘাটে নঙ্গর করিত, সুপক্ক স্বর্ণাভ ধান্য ও গোধূমের শীর্ষে যখন গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী প্রান্তর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত, গোপপল্লী পয়স্বিনী গাভীতে পূর্ণ থাকিত, সন্ধ্যায় ধূপের সুগন্ধে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ আমোদিত হইত, এবং বিভিন্ন পাড়া হইতে মৃদঙ্গ-সহযোগে হরি-সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সন্ধ্যার ধূসর আকাশ পরিব্যাপ্ত করিত, তখন গ্রামবাসীদের মনে সুখ ছিল, সৎকার্য্যে উৎসাহ ছিল, আমোদ-প্রমোদে অনুরাগ ছিল। এখন গ্রামের নানা উন্নতি হইয়াছে; উমেশ শার সরাপের দোকানে এখন 'আমোদ' বিক্রয় হইতেছে; গ্রামের ছেলেরা থিয়েটারের দল করিয়াছে; দোকানে-দোকানে বিলাতী ছাতা ও কুইনাইন বিক্রয় হইতেছে; গৃহস্থেরা ঘরে চিড়ামুড়ী না করিয়া বাজারের দোকান হইতে ছেলেদের হন্‌টলি পামারের বিস্‌কুট কিনিয়া দিতেছে; বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র গ্রাম্য ইংরাজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হরিকর্ম্মকারের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে; বিদ্যালঙ্কারের পৈত্রিক টোল এখন গোয়ালঘর হইয়াছে; সমাজের যিনি চূড়ামণি ছিলেন, তাঁহার পৌত্র এখন মহকুমার বেঞ্চ-ম্যাজিষ্টার' হইয়াছেন। একসময়ে যে দেবায়তনে নিত্য ধর্ম্মালোচনা ও কথকতার বিরাম ছিল না, সেখানে এখন রাত্রিকালে 'ফেরুপাল ফিরে-ফিরে ফুকারে গভীর!' এখন গ্রামে কাহারও মাথায় আর তালপাতার ছাতা দেখিতে পাই না, সকলের হাতে কাপড়ের ছাতা! রাজমিস্ত্রিও হাড়ের সুদৃশ্য হাণ্ডেল-শোভিত চেরা-শিকের ছাতা লইয়া মজুরী করিতে যাইতেছে। খড়মের প্রচলন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, সকলেরই চরণকমলে নানাবর্ণের চর্ম্মনির্ম্মিত উপানৎ। সুলভ দিয়াশালাই ঘরে-ঘরে গন্ধকমাখা 'পাটকাটীর' স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং 'ডিজের' হরিকেন মৃৎপ্রদীপ নির্ব্বাসিত করিয়াছে। ছেলেরা ফরাসী-ছিটের দোলাই ছাড়িয়া নানারঙ্গের আলোয়ানে, র‍্যাপারে শীত-নিবারণ করিতেছে; বৃদ্ধের অঙ্গ হইতে বালাপোষ অন্তর্হিত হইয়াছে; আর সে ধুসারও আদর নাই। বিলাতী কম্বল সনাতন লেপকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে, এবং ফড়ং ঘোষের পুত্র নীলমণি ঘোষ গো-পালন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধনপতি বাবুর খানসামাগিরি করিয়া কাবুলীদিগের নিকট ধারে চৌদ্দ-শিকায় হাসিয়াদার শাল কিনিয়া, তাহা গায়ে জড়াইয়া সিগারেট টানিতে-টানিতে তাহার ইয়ার পাঁচু বৈরাগীর দোকানে আড্ডা দিতে যাইতেছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, এখন কৃষ্ণচন্দ্রপুরের 'প্রস্‌পারিটি'র সীমা নাই। তথাপি কতকগুলি গ্রামবাসী এখনও সেকালের ধারা বজায় রাখিয়াছে, এবং গ্রামের বাজারে বারোয়ারি করিয়া সরস্বতী পূজা করিতেছে। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামখানির এক দিকে 'কাজলা' নদী, অন্য তিন দিকে মাঠ। সঙ্কীর্ণকায়া প্রবাহিনীর গতি অতিশয় বক্র; কিন্তু জল কাকচক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল; এরূপ নির্ম্মল যে, নদীর তলায় বালুকারাশি ঝক্‌-ঝক্ করিতেছে, তাহা দেখা যায়। শামুক গুগ্‌লিগুলি বালুকারাশির উপর পড়িয়া আছে; সফরী ও কাঁকলে মাছের দল ঝাঁক বাঁধিয়া স্বচ্ছ জলের ভিতর খেলা করিতেছে। স্নানের ঘাটে নামিতে-উঠিতে কষ্ট নাই; ঘাটের পাশেই শৈবালদল জলের মধ্যে অনেকদূর নামিয়া গিয়াছে; নদীর মধ্যভাগেও শৈবাল জমিয়াছে। কিন্তু স্নানের ঘাটটি পরিষ্কার, বালুকাপূর্ণ,

জলের ধারে ছোট-ছোট 'ঝোর' দিয়া ঝির-ঝির করিয়া শীতল জল ও কালো বালি উঠিতেছে।

স্নানের ঘাটে জলের ধারে একটা কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে। কতকালের কাঠ, কে বলিতে পারে? যাহারা শৈশবে একদিন এই কাঠের উপর বসিয়া কৌতুকভরে জল নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারাই বার্দ্ধক্যে লোলচর্ম্ম ও গলিত-দশন হইয়া প্রভাতে এই কাঠের উপর বসিয়া, মৃত্তিকায় শিব গড়িয়া ভক্তিভরে অনাদিলিঙ্গের পূজা করিয়াছে। ইহা কত সুদীর্ঘ জীবনের কত সুখের, কত দুঃখের, কত হর্ষবিষাদের স্মৃতির উপর বিস্মৃতির কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা প্রসারিত করিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গুঁড়িটি একটি চড়ক-গাছের অংশ। কোন্ বিস্মৃতির যুগে চড়ক-গাছের মাথাটা কোথায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, গোড়াটা স্নানার্থীদিগের পাদপীঠে পরিণত হইয়াছে। বৃদ্ধা 'মান্‌কের মা' স্নান করিতে আসিয়া কখন এই কাষ্ঠে পদস্পর্শ করিত না। তাহার পিতামহ, চৈত্রমাসে চড়ক-সংক্রান্তিতে এই চড়ক-গাছটিকে তীরে তুলিয়া, তাহার মাথায় সিঁদুর ও চন্দন লেপিয়া, গাজনের সন্ন্যাসীদের তাহা পূজা করিতে দেখিয়াছিল। সে ঠাকুরদাদার মুখে এ কথা শুনিয়াছিল; এই অশীতিপর বৃদ্ধা তখন অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা; আর তাহার 'মান্‌কে' এখন ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ;—গোপনন্দন এখন সাবালক হইয়াছে। মানকের মার ঠাকুরদাদা গল্প করিত, এই চড়ক-গাছটা সারা বৎসর নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইত, চৈত্র-সংক্রান্তির প্রত্যুষে পূজা খাইবার জন্য চাল্‌তেতলার ঘাটে আসিয়া পড়িয়া থাকিত। তাই এই ঘাটের নাম 'চাল্‌তে-তলার ঘাট'। এ ঘাটে গ্রামের পুরুষ ও সাধারণ রমণী সকলেই স্নান করে।

মাঘ মাস। শীতের প্রভাত কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন। পূর্ব্বাকাশে এখনও অরুণচ্ছটা বিকশিত হয় নাই। চাল্‌তে-তলার ঘাটের পাড়ে এখন কোন চাল্‌তে গাছ নাই, তৎপরিবর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বর্ষার উচ্ছ্বসিত, কর্দ্দমিত জলপ্রবাহ এই বৃক্ষের কাণ্ড স্পর্শ করিত; কিন্তু এখন আর নদীতে তেমন 'বান' আসে না। নদীর স্বচ্ছ জলে বটগাছের ছায়া পড়িয়াছে। অপর পারে শ্যামল ছোলার ক্ষেতে একটা কালো ষাঁড় চরিতেছে। ঘাটের পাশে কোথাও বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, তৃণরাজি-সমাকীর্ণ প্রান্তর, কোথাও আম জাম কাঁঠাল নারিকেলের বৃক্ষপূর্ণ বাগান। দূরে-দূরে দুই একটা উচ্চ ও প্রাচীন ঝাউগাছ। এই ঝাউগাছ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার নিম্নে গঞ্জ ছিল। সেই গঞ্জে নৌকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইত। নদীতীর হইতে গঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমাগমে সজীব হইয়া উঠিত। কিন্তু সে গঞ্জ আর নাই, মাটির ঢিপি মাত্র পড়িয়া আছে; সেখানে জঙ্গল হইয়াছে। কেবল ঝাউগাছ দুটি অতীতের গৌরব-কাহিনী স্মরণ করিয়া প্রভাতের বায়ুহিল্লোলে সন্-সন্ শব্দে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। আমবাগানে একটি গাছের ডালে বসিয়া একটা ঘুঘু গলা ফুলাইয়া এক-এক পা করিয়া তাহার প্রিয়তমার দিকে অগ্রসর হইয়া মধুর স্বরে ডাকিতেছে 'ঘু ঘু ঘু', 'ঘু ঘু ঘু'। গ্রামবাসীদের প্রবাদ-অনুসারে ঘু ঘু সুর করিয়া কৃষ্ণ 'জাগহে' বলে। জানি না, এই বৈতালিকের বন্দনা-গীতে বৃন্দাবনের কোন্ কুঞ্জে গতর্ম্ভিসার চন্দনচর্চ্চিত পীতবসন বনমালীর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তথাপি ঘুঘুর এই সুরব পল্লীবাসীদের সদ্যজাগ্রত কর্ণে অতীত যুগের মধুর বৃন্দাবনলীলার বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া যায়।

একটা জামগাছের শুষ্ক ডালে বসিয়া দহিয়াল শিষ্ দিতে আরম্ভ করিল; ইহা বিহঙ্গের প্রভাত-বন্দনা। শত বিহঙ্গের কলকণ্ঠে নদীতীর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নদীতীরস্থ শস্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার চৈতালী ফসল। কোথাও দূরব্যাপী শর্ষপ-ক্ষেত্র প্রকৃতিদেবীর স্বর্ণাঞ্চলের ন্যায় প্রসারিত; পীতবর্ণ শর্ষপ-ফুলে চারিদিক আলো করিয়াছে; মধ্যে-মধ্যে 'তারামণির' ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছ। তাহার বর্ণ ঈষৎ মলিন, সবুজের রেখাযুক্ত পুষ্পদলগুলির বর্ণ অপেক্ষাকৃত ম্লান। এত প্রত্যুষেও একটি বাগ্দী রমণী ঝুড়ি লইয়া তারামণির ফুল তুলিতে আসিয়াছে। ইহা মুখরোচক উপাদেয় ব্যঞ্জন। বাজারে ইহা বিক্রয় করিলে পাঁচরকম তোলা দিতে হয় বলিয়া সে ইহা গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বিক্রয় করে। ইহাতে আরও এক লাভ আছে। পল্লীরমণীগণ সাধারণতঃ চাউলের পরিবর্ত্তে তারামণির ফুল, ছোলার শাক প্রভৃতি গ্রহণ করেন, ইহারা দুই পয়সার চাউল লইয়া এক পয়সার জিনিষ দিয়া থাকে।

ক্রমে পূর্ব্বদিক লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও শুভ্র

কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন; নদীর জলের উপর কুজ্ঝটিকার শুভ্র স্তর পড়িয়াছে। ছোট-ছোট জেলে-ডিঙ্গী নদীর কিনারায় বাঁধা আছে; নৌকা ঠেলিবার বাঁশের 'নগি' জলে পুতিয়া তাহাতেই নৌকাগুলি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। কোন কোন নৌকায় বাঁশের ছৈ, কোন নৌকায় ছৈ নাই। মাছ-রাঙ্গা পাখীগুলি শিকারের প্রতীক্ষায় 'নগির' উপর বসিয়া জলসঞ্চারী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মৎস্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে এবং এক একবার ঝপ্ করিয়া জলে পড়িয়া একটি ক্ষুদ্র মৎস্য চঞ্চুপুটে লইয়া আবার নগির উপর আসিয়া বসিতেছে। দুই একটা পানকৌড়ী নদীগর্ভস্থ টোপা-পানার উপর ঘুরিতে-ঘুরিতে জলে ডুব দিতেছে, এবং অনেকদূর গিয়া জলের উপর তাহাদের লম্বা গলা তুলিয়া কি দেখিতেছে! নদীতীরস্থ শিমুলগাছের ডালে বসিয়া একটা চিল্ল বিদীর্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে; এবং দুইটি শৃগাল জলের ধারে কাঁকড়ার গর্ত্তের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁকড়ার বহির্গমনের প্রতীক্ষা করিতেছে; গর্ত্ত হইতে 'দাঁড়া' দুইটি বাহির হইলেই তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিবে। পরম ধার্ম্মিক বক শৈবালরাশির অদূরে এক চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে; ছোট-ছোট ব্যাঙ, গুগ্লি, তেচোখো মাছ তাহার লক্ষ্য।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইল। 'তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা'—কুজ্ঝটিকারাশি ধীরে ধীরে কাটিয়া গেল। নবোদিত অরুণের হৈমচ্ছটা নদীর স্ফটিক-বিমল, স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। 'গাছী' যে সকল খেজুর গাছ কাটিয়াছে, তাহাদের রস সংগ্রহের জন্য নদীতীরে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। তাহার কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুইদিকে আট দশটি ছোট-ছোট কলসী। গাছী বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইল, স্কন্ধস্থিত কলসীগুলি নামাইয়া গাছে উঠিল এবং রসপূর্ণ কলসী খুলিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। তাহার গুড়ের 'বাইনে' তখন পাড়ার অনেক ছেলে জুটিয়াছিল। তাহারা উনানের চারিদিকে বসিয়া গেল। গাছী অবসরকালে যে সকল ভাঁট, আস্যাওড়া, কালকাশিন্দা প্রভৃতি বন কাটিয়া বাইনে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দিয়া উনান জ্বালিয়া তাহার উপর খোলা চড়াইয়া দিল। খোলায় রস জ্বাল হইতে লাগিল। শীতার্ত্ত ছেলের দল উনানের অভিমুখে হস্তপদ প্রসারিত করিয়া বহ্নিসেবন করিতে লাগিল। উনানের ধূমরাশি শুষ্ক খর্জ্জুরপত্রের টাটির উপর দিয়া সবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। পরিশ্রান্ত গাছী আড়ষ্ট হাত পা উনানের আগুনে গরম করিয়া লইয়া নিশ্চিন্তমনে কলিকায় তামাক সাজিল, এবং তাহাতে আগুন দিয়া সবেগে ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল।

বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। প্রভাত-রৌদ্র বটগাছের ঘন পত্রান্তরাল হইতে ছায়াচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ বনপথের উপর ঝিক্-মিক্ করিতে লাগিল। এই পথে নদীতে স্নান করিতে যাওয়া যায়। দুই একটি গ্রাম্য যুবতী সংসারের কাজ শেষ করিয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল। মাঘের প্রবল শীতে তাহারা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, কিন্তু প্রভাতে স্নান করিতেই হইবে। তাহাদের কাহারও 'কাঁকালে' একটি পিতলের ঘড়া, কাহারও সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে, কোন প্রৌঢ়ার হাতে একটি ঘটি ও তেলের বাটী। তাহারা নদীতীরে আসিয়া ভয়ে-ভয়ে জলে নামিল, কেহ কাঠের উপর বসিয়া অঞ্চল হইতে ঘুঁটের ছাই খুলিয়া মুখ ধুইতে লাগিল; কেহ রোদে বসিয়া তেল মাখিতে লাগিল; কেহ গামছা ভিজাইয়া পদপ্রক্ষালন আরম্ভ করিল। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথায়, গল্পে, হাসিতে নদীতীর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ এক-বুক জলে নামিয়া উভয় কর্ণে অঙ্গুলি পূরিয়া ভুস্ ভুস্ করিয়া ডুব দিল, তাহার পর সূর্য্যের দিকে চাহিয়া করযোড়ে স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিল। কেহ অঞ্চল সমাচ্ছাদিত ঘড়াটি জলে ভাসাইয়া উভয় হস্তের আস্ফালনে শশব্দে কাপড় কাচিতে লাগিল।

ক্রমে দুই-একটি জেলে-ডিঙ্গী ঘাটে আসিয়া লাগিল। মেছুনীরা ঝুড়ি লইয়া তীরে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মেছুনীরা নৌকা হইতে মাছগুলি ঝুড়িতে তুলিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে চলিল। ক্ষুদ্র নদী; গভীর জল ভিন্ন রুই, নহলা, মৃগেল, কাতলা প্রভৃতি বড় মাছ পাওয়া যায় না; নদীতে 'জাল ঘিরিয়া' এই সকল মাছ সংগ্রহ করিতে হয়। বিশেষতঃ, শীতকালে মাছের সংখ্যা অল্প; তথাপি জেলেরা শেষরাত্রি হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত নদীতে জাল ফেলিয়া যে পরিমাণ 'চুণা মাছ' সংগ্রহ করে, তাহাতেই তাহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

বেলা দশটা বাজিতে না-বাজিতে গ্রামের বাজারে জনসমাগম আরম্ভ হইল। গ্রাম্য বাজারটি ইংরাজ জমীদার-কোম্পানীর সম্পত্তি। বাজারে আয় যথেষ্ট। পূর্ব্বে

ডার্পসি কৃত বাদ্যশিক্ষা

Emerald Ptg. Works, Calcutta

বাজারের দোকানগুলির অধিকাংশই খড়ের ঘর ছিল; কিন্তু একবার ব্রহ্মার কৃপায় অধিকাংশ 'খড়োঘর' ভস্মীভূত হওয়ায় তাহার পর হইতেই দোকানদারেরা খাইয়া না-খাইয়া পাকাঘর করিয়াছে। স্থানীয় অনেক লোক সাহেব জমীদারদের নিকট হইতে জমী মৌরসী করিয়া লইয়া তাহার উপর পাকা ইমারত প্রস্তুত করাইয়া দোকানদারদের ভাড়া দিয়াছে। দোকানদারেরা দোকানের সীমা ক্রমে মিউনিসিপালিটীর পথের উপর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছে; অনেক স্থলেই দুইখানি গরুর গাড়ী পাশাপাশি যাইতে পারে না। কিন্তু গ্রাম্য মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই ত্রুটি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রম করে না; তাঁহারা মফস্বল-পরিদর্শনে আসিয়া মিউনিসিপালিটীর কর্ণমর্দ্দন করেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্ণ জ্বালা হয় বটে, কিন্তু অন্য কোন ফল হয় না; কারণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কাণে তুলা গুঁজিয়া ও পিঠে কুলা বাঁধিয়া সরকারী কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন।

পূর্ব্ববঙ্গের হাট-বাজারের মত এই বাজারে টিনের ঘর নাই; কেবল মেছোবাজার টিনের-ছাদবিশিষ্ট প্রকাণ্ড দালানে বসিয়া থাকে। মেছুনীরা ও দূর পল্লীবাসী 'নিকারী' নামক মৎস্য-বিক্রেতারা এখানে বসিয়া মাছ বিক্রয় করে। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড দালানে অনেক স্থান খালি পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহার এক পাশে বসিয়া অন্যান্য দোকানদারেরা নানাবিধ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। কোথাও গ্রাম্য 'চেলুকীরা' চাউলের 'কাঁড়ি' দিয়া তাহার পাশে বসিয়া আছে, চাউলগুলি স্থানীয় ধান্যের,—মোটা ও লাল। বাজারের 'কয়াল' তাহা বিক্রয় করিয়াদিতেছে; এক টাকার চাউল বিক্রয় করিয়া দিয়া কয়াল আধসের চাউল 'কয়ালী' লইতেছে। কোথাও মুগ, কলাই প্রভৃতি রবিশস্য বিক্রয় হইতেছে। কোথাও নূতন গোল-আলুর স্তূপ। একপাশে জেলেরা কাপড়, গামছা ও কুষ্টিয়া, কুমারখালী অঞ্চলের মোটা সূতী-'র‍্যাপার' বিক্রয় করিতেছে। কুমারেরা পথের ধারে রাশি-রাশি হাঁড়ী, কলসী, সরা, মালসা, ভাঁড়, 'ছোবা' প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে। ক্রেতা হাঁড়ী কিনিতে আসিয়া তাহা বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে বাজাইয়া লইতেছে। মেছোবাজারের পাশে আর একটি বৃহৎ দালানে তরকারীর বাজার। তরকারী-বিক্রেতারা এখানে সারি দিয়া বসিয়া তরিতরকারী বিক্রয় করে। শীতকালে তরকারীর অভাব নাই; লাউ, কুমড়া, মূলা, বেগুন, মেটে-আলু, পেঁয়াজের কলি, শিম, উচ্ছে, কাঁচাকলা, সাকরকন্দ আলু প্রভৃতি বহুবিধ তরিতরকারী গ্রাম্য বাজারে বিক্রয় হইতে আসে। মূলা, বেগুণ ও গোল-আলু এ সময় পল্লীগ্রামের প্রধান তরকারী। মূলা-বিক্রেতারা দুই তিনটি মূলা একত্র বাঁধিয়া এক-এক পয়সায় বিক্রয় করিতেছে। বাগ্দিনীরা স্থানাভাব বশতঃ এই দালানের পাশে রাস্তার ধারেই বসিয়া গিয়াছে; তাহাদের ঝুড়িতে তারামণির ফুল, ছোলার শাক, চুকো ও মিঠে পালম শাক প্রভৃতিই অধিক; কাঁচাকলা, থোড়, মোচা প্রভৃতিও তাহারা বিক্রয় করিতেছে। পল্লীগ্রামে ফুলকপি ও কড়াই-শুঁটীর একান্ত অভাব। সকলে শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য কপির আবাদ করে না। কোন-কোন বাবুলোক সখ করিয়া স্ব-স্ব বাগানে কপি ও কড়াই উৎপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাগানের মালী ঝোড়ায় করিয়া তাহা বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। বাবুর বাগানের কপি সুতরাং তাহার মূল্য অসম্ভব অধিক। বাবু প্রত্যেক কপির দর ধরিয়া দিয়াছেন; তাহার উপর মালীরও কিঞ্চিৎ চাই, সুতরাং সাধারণ ক্রেতারা সে দিকে ঘেঁসিতেছে না; ভোজনবিলাসীরা এবং 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—ইহাই যাহাদের দলমন্ত্র—তাহারা তিনগুণ মূল্যে তাহা কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। শ্রীপঞ্চমীতে সকলেরই কুলের আবশ্যক বলিয়া বাবুর বাগানের নারিকেল-কুলের আজ বড় আদর; এমন কি, বাগ্দিনীরা দেশীকুল বিক্রয় করিয়াও দু পয়সা পাইতেছে। কিন্তু হরেক রকম তোলার দৌরাত্ম্যে শাকসব্জী-বিক্রেতাগণ বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাজারে কেহ কোন জিনিস বিক্রয় করিতে আসিলে তাহাকে যে খাজনা দিতে হয়, তাহাই প্রধান 'তোলা।' জমীদার-কোম্পানী বাজারের তোলা তুলিবার অধিকার প্রতি বৎসর বিক্রয় করিয়া থাকেন; বাজারের 'কয়াল'ই সাধারণতঃ তাহা কিনিয়া লয়। সে সম্বৎসরকাল বাজারের অস্থায়ী দোকানদারগণের নিকট তোলা তুলিয়া সংগ্রহ করে, তাহা লোক দিয়া বিক্রয় করে। তোলার জিনিসের বিক্রয়লব্ধ অর্থে জমীদারের খাজনা দিয়াও তাহার মাসিক দশ বার টাকা লাভ থাকে।

কয়াল প্রথম তোলা লইয়া যাইবার পর, গ্রাম্য মিউনিসি-

পালিটীর ঝাড়ুদার জুম্মন সর্দ্দার একটি ঝুড়ি লইয়া বাজারে প্রবেশ করিল। সে মিউনিসিপালিটীর চাকর, প্রত্যহ বাজারে সম্মার্জ্জনী প্রয়োগ করে, সুতরাং সে তোলা না লইবে কেন? সে যাহার যে তরকারী ধরিতেছে, তাহা ছাড়িতেছে না, বলপ্রয়োগে তাহা তুলিয়া নিজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিতেছে; তাহার পর অন্য দোকানীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এই ভাবে তোলা সংগ্রহ করিতে করিতে সে মোক্ষ মেছুনীর সম্মুখে আসিল, এবং খপ্ করিয়া তাহার মাছের ঝুড়িতে হাত পূরিয়া দিয়া একটা গল্‌দাচিংড়ি লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। মোক্ষ দেখিল তাহার চারি পয়সা দামের চিংড়িটা তোলায় যায়! সে চিংড়ির ঠ্যাং ধরিয়া টানাটানি করিতে-করিতে বলিল, "বৌনি না হতেই তুমি চার পয়সা দামের চিংড়িটা নিয়ে টানাটানি করচো? তোমার ত বেশ আক্কেল!" জুম্মন সর্দ্দার তাহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক শিকার সন্ধানে অন্যত্র গেল। মেছুনী চীৎকার করিয়া তাহাকে গালি দিতে লাগিল, এবং আর বাজারে আসিবে না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিল; কিন্তু বাজারে না আসিলে তাহারই ক্ষতি, সুতরাং পুনর্ব্বার আসিতে হয়।

এই বাজারে আরও রকম-বে-রকমের তোলা আছে। গ্রামের প্রধান বিগ্রহ 'বুড়া শিব' বাজারের অদূরে মন্দির-মধ্যে বাস করেন। তাঁহার সেবায়িতগণও চিরদিন এই বাজারে তোলা তুলিয়া আসিতেছেন, সুতরাং তোলায় তাঁহাদের মৌরুসী স্বত্ব জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ বুড়া শিবের সেবায়িত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী অতি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, মামলা-বাজ লোক। তিনি তাঁহার 'পালির' সময় প্রত্যহ চুবড়ি-হস্তে বুড়া শিবের জন্য তোলা তুলিতে আসেন, আজও আসিয়াছেন। বুড়া শিবের নামানুসারেই এই বাজারের নামকরণ হইয়াছে; সুতরাং বাজারের তোলায় শিব ঠাকুরের আঠার আনা অধিকার আছে। পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ঝুলাইয়া, ললাটে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, শাক-সব্‌জী মাছ প্রভৃতির তোলা তুলিতেছেন। মেছুনীরা তাঁহার দুর্নিবার লোভের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কোন কথা বলিলে তিনি যে ভাষায় আত্মসমর্থন করেন, তাহার শ্লীলতায় মেছুনীকে পর্য্যন্ত লজ্জা পাইতে হয়। প্রতিপক্ষকে নির্ব্বাক করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদপত্র-সম্পাদক সে ভাষার অনুকরণে সমর্থ হন নাই! চক্রবর্ত্তী এই ভাবে তোলা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুগত কোনও লোককে তাহা বিক্রয় করিতে দিলেন। যৎকিঞ্চিৎ বুড়া শিবের ভোগের জন্য রাখিলেন। এইরূপ 'আকাশ-বৃত্তিতে' পঞ্চানন ঠাকুর ও তাঁহার পোষ্যবর্গের দিন বেশ সুখেই কাটিতেছে। তাঁহার উপার্জ্জনের নানা পন্থা বর্ত্তমান! মানসিক করিয়া লোকে শিবের মাথায় যে দুধ 'চড়াইয়া' যায়, সেই নির্জ্জলা দুগ্ধে তাঁহার ক্ষীর সর ঘৃত হইতে পরমান্ন পর্য্যন্ত গব্যরস-সংক্রান্ত কোন সামগ্রীরই অভাব হয় না; তাঁহাকে গরু পুষিবারও ঝঞ্ঝাটও সহ্য করিতে হয় না। কাদী ঘোষাণী চক্রবর্ত্তীর প্রতিবেশিনী এবং চক্রবর্ত্তী-পত্নীর দেখন-হাসি! সে শিবের প্রসাদী দুধ চক্রবর্ত্তী-পত্নীর নিকট হইতে গোপনে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। সুতরাং চক্রবর্ত্তী-গৃহিণীর হাতে বিলক্ষণ দশটাকা সঞ্চিত হইয়াছে, এবং মহাজনীতে দিন-দিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তোলা আদায় করা হইলে দীর্ঘশ্মশ্রু, মুক্তকচ্ছ বৃদ্ধ মোবারক দেওয়ান ঝুড়ি লইয়া বাজারে প্রবেশ করিলেন। ইনি বংশানুক্রমে দেওয়ান সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের উত্তর প্রান্তে 'মকদুম সাহেবের দরগা' নামক একটি বহু প্রাচীন দরগা আছে। জনশ্রুতি, মকদুম সাহেব মহাপরাক্রান্ত বীর ছিলেন। তাঁহার দরগার রক্ষকেরা এখানে 'দেওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান দেওয়ান মবারক খাঁ পীরের সিন্নির জন্য প্রত্যহ বাজারে আসিয়া কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক তোলা তুলিয়া থাকেন। তাঁহার তোলা দিতে কেহই আপত্তি করে না। একবার এক বেগুন-বিক্রেতা তোলা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেওয়ান সাহেবকে না কি কি কটু কথা বলিয়াছিল, তাহার পর তাহার মুখ বাঁকিয়া গিয়াছিল, গ্রামে বহুদিন হইতে এই জনরব প্রচলিত আছে। সকলেই জানে, মকদুম্ সাহেব অত্যন্ত জাগ্রত পীর। কথিত আছে, তিনি ব্যাঘ্রে চড়িয়া মকামদিনাদি তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল না; হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, এবং হিন্দুরা সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার দরগায় সিন্নি মানত করে। তাঁহার দরগার সন্নিহিত

দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যে এখনও কয়েকটি ব্যাঘ্র আছে, তাহারা না কি নিরামিষাশী। একবার একজন শিকারী এই অঞ্চলে শিকারে আসিলে পীরের বাহন অবধ্য বলিয়া তাঁহাকে তোজদান বন্দুক লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। জনরব শিকারের পূর্ব্বরাত্রে শিকারীকে পীর স্বপ্ন দিয় ছিলেন,—তিনি একটি ব্যাঘ্রকেও গুলি করিলে দুইদিন পরে মুখে রক্ত উঠিয়া মরিবেন। গ্রামের অনেক কৃষক মাঠে ফসল পাহারা দিতে দিতে শীতের রাত্রে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছে—পীর সাহেব তাঁহার গোর হইতে উঠিয়া বাঘে চড়িয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেছেন।—এরূপ জাগ্রত পীরকে অসন্তুষ্ট করিতে কাহার সাহস হইবে ?

পীরের তোলা সংগৃহীত হইলে গ্রাম্য চৌকীদার আইনদ্দী ফাঁকি তোলা তুলিতে আসিল। সে প্রত্যহ রাত্রে "এ গেরস্ত জাগ হো !" বলিয়া নিদ্রিত গ্রামবাসীদের সতর্ক করে, এবং বাজারেও যথারীতি চৌকী দেয়, সুতরাং তাহারও তোলা লইবার অধিকার আছে। সে থানার জমাদার সাহেব—তাহার উপর-ওয়ালাকে হাতে রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে মূলাটা বেগুনটা ভেট্ দিয়া আসে; অতএব তাহার সাত খুন মাফ্ ! আইনদ্দী 'রায় সাহেব' 'খাঁ সাহেবের' ন্যায় 'ফাঁকি' উপাধিটি স্বীয় কার্য্যকুশলতা-ফলে সরকার হইতে লাভ করে নাই, এবং ইহা তাহার 'পার্সোনাল ডিষ্টিংসন'ও নহে। ইহা তাহার 'হেরিডিটারী টাইটেল্'; তাহার প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ-প্রপিতামহ পুরুষ-কারের সাহায্যে এই উপাধি গ্রামবাসীগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, তাহার সেই অজ্ঞাতনাম প্র, বা বৃদ্ধ-পিতামহ একজন মাতব্বর চাষী-গৃহস্থ ছিল। একদিন সে শীতকালে তাহার অড়হর-ক্ষেত্রে ঘাস নিড়াইতে গিয়া দেখিতে পায় একটি সুবৃহৎ ব্যাঘ্র কিছুদূরে শিকারী বিড়ালের ন্যায় বসিয়া, তাহার দিকে কটমট্ করিয়া চাহিতেছে। হঠাৎ এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া তাহার হাত হইতে নিড়ানী খসিয়া পড়িল; সে বুঝিল, বাঘটি অবিলম্বে লাফ্ দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িবে। বুদ্ধিমান মিঞা সাহেব তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল, এবং নিড়ানীটি মাটিতে পুতিয়া তাহার মাথায় নিজের 'মাথাল'টি বাঁধিয়া রাখিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দূরে সরিয়া গেল। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের ন্যায়-শাস্ত্র পড়া ছিল না; সে মিঞার চাতুর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এক লম্ফে সেই বংশ-নির্ম্মিত মাথালের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু মাথালের নীচে মানুষ না দেখিয়া বেচারা অপ্রতিভের এক শেষ! মিঞা অক্ষতদেহে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই সরস ব্যাঘ্র-মাথাল-সংবাদ সালঙ্কারে গ্রামবাসীদের নিকট বর্ণনা করিল। তখন হর্ষোৎফুল্ল গ্রামবাসীরা তাহাকে বলিল, "যেহেতু আজ তুমি বাঘকে ফাঁকি দিয়াছ—অতএব তোমাকে 'ফাঁকি' খেতাব দেওয়া হইল। এই দুর্লভ ও গৌরবজনক খেতাব তুমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকহ।" আইনদ্দী এই খেতাবের সম্মান রাখিয়াছে; সে এখন ফাঁকি দিয়া গ্রাম্য বাজার হইতে প্রত্যহ তোলা তুলিয়া নির্ব্বিঘ্নে উদর পূর্ণ করিতেছে। যদি কোন মেছুনী কোন দিন তাহাকে তাহার দাবীর অনুরূপ তোলা দিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সে পচা মাছ বিক্রয়ের অভিযোগে তাহাকে চালান দিবে বলিয়া রায় প্রকাশ করে; সুতরাং দুর্দ্দান্ত মেছুনীকেও তাহার প্রচণ্ড প্রতাপে নির্ব্বাক হইতে হয়। কোন সব্জীবিক্রেতা তাহাকে আলু বা মূলো বেগুন যথেষ্ট পরিমাণে লইতে দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলে, সে তাহাকে পাঁচ আইনে ফেলিবার ভয় দেখায়। বাজারের পণ্য-বিক্রেতাগণ আইনদ্দী ফাঁকির চাপড়াস্কে গবর্মেণ্টের আইন অপেক্ষা অধিক ভয় করে। এইরূপ বিবিধ প্রকার তোলার উপদ্রব থাকিলেও বাজারে যে যাহা আনে, তাহাই বিক্রয় হয় বলিয়া এবং এ সকল বৈধ অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান হইবে না বুঝিয়া সকলেই সহ্য করে।

আজ শ্রীপঞ্চমীর দিন বাজারের কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বাজারের প্রবেশপথে একটি প্রকাণ্ড গেট উঠিয়াছে। ইহার উপর নহবৎ বসিবে; মৃত্তিকালিপ্ত বংশ দ্বারা এই গেটের স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। গেটের উর্দ্ধে চ্যাটাইয়ের উপর মাটির পলস্তরা; তাহাতে খড়ি দিয়া রঙ্গ করিয়া মালাকরেরা তাহার উপর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। চিত্রের বিষয় পুরাণবর্ণিত গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। হাতী তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী বিরাটদেহ কচ্ছপকে শুণ্ড দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়াছে, কচ্ছপ তাহাকে সবেগে আকর্ষণ করি-তেছে। গেটের মাথায় গরুড়ের পৃষ্ঠে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী নারায়ণ; গরুড়ের দৃষ্টি সেই গজ-কচ্ছপের প্রতি সন্নিবিষ্ট, যেন সে মুহূর্ত্তে নারায়ণকে পিঠে ও গজ-কচ্ছপকে তীক্ষ্ণ

নখরে ধারণ করিয়া মুক্তাকাশে উড্ডীন হইবে! গেটের উভয় স্তম্ভে দুইজন ভোজপুরে সিপাহী সঙ্গীনসহ বন্দুক ঘাড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মুখে গালপাট্টা দাড়ী, কুণ্ডলীকৃত গুম্ফ এবং আরক্ত চক্ষু দেখিয়া মনে হয় রাজবাড়ীর দৌবে চৌবে প্রভৃতি শান্ত্রীদল তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক নিরীহ।

আজ তরকারী-বিক্রেতারা ও মেছুনীরা স্থানচ্যুত হইয়াছে; তাহারা পথের-এদিকে ওদিকে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। মেছোহাটায় আজ সরস্বতী দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি সোনালী জগ্‌জগামণ্ডিত সিংহাসনে শ্বেত-শতদলে বসিয়া আছেন। মূর্ত্তির শুভ্র, হস্তে শ্বেত বীণা, কিন্তু তাঁহার অঙ্গে চুমকির কাজ-করা বেগুনে রঙ্গের একখানি বস্ত্র আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেবীর দুইপাশে নীলাম্বরী-শোভিতা সখীদ্বয় চামর লইয়া দেবীকে ব্যজন করিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের মুখমণ্ডল হরিতালানু-রঞ্জিত, টানা-টানা ভ্রূযুগলের মধ্যে লোহিত বর্ণের ক্ষুদ্র টিপ্, অধর ও ওষ্ঠ হিঙ্গুল-রঞ্জিত। দেবী ও তাঁহার সখীদ্বয় —সকলেরই মুখ এক ছাঁচে ঢালা।

দেবীর সম্মুখস্থিত যে সুপ্রশস্ত হলটি আজ গানের আসরে পরিণত হইয়াছে, সেখানে প্রত্যহ তরি-তরকারী বিক্রয় হইত। এখানে তিন রাত্রি গান হইবে। হলের ইষ্টক-নির্ম্মিত, বিবর্ণ স্তম্ভ-গুলি লোহিত বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছে। বাজারের মনোহারী দোকানসমূহ হইতে নানা প্রকার চিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শোভাবর্দ্ধন করা হইয়াছে। কাচ দিয়া ফ্রেমে বাঁধা আর্টষ্টুডিও ও রবিবর্ম্মার পুণার চিত্রশালার ছবিই অধিক। গ্রাম্য জমীদারবাড়ী হইতে ঝাড় ও দেওয়ালগিরি প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে; গোটাকত বড় বড় হ্যাঙ্গিং-ল্যাম্পও ইতস্ততঃ ঝুলিতেছে। নানা রঙ্গের কাগজের মালায় ও ফুলে হলটি সুসজ্জিত। বাজা-রের প্রধান দোকানদার রামতারণ সাহার গদীয়ান বিশ্বরূপ প্রামাণিক এই বারোয়ারীর প্রধান পাণ্ডা। তিনি বাজারের দোকানদার ও গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই বারোয়ারী পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পূজায় লোকজন খাওয়াইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, কেবল আমোদ!

মধ্যাহ্নে পুরোহিত পূজা শেষ করিয়া নৈবেদ্য ও দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন। বাজার ভাঙ্গিলে বেলা দুইটার পর দোকানদারেরা আসরে ফরাস বিছাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। আজ সন্ধ্যাকালে পাঁচালী আরম্ভ হইবে। রাঢ় হইতে এই পাঁচালীর দল বায়না করিয়া আনা হইয়াছে। পাঁচালী ভিন্ন দুই রাত্রি যাত্রারও ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু ভাল দল বায়না করিয়া আনিবার উপযুক্ত টাকা সংগৃহীত না হওয়ায় তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী রায়পুরের যাত্রার দল বায়না হইয়াছে। ইহারা পঞ্চাশটাকা লইয়াই দুইরাত্রি গান করিবে। তবে পান তামাক ও জলখাবার স্বতন্ত্র পাইবে। এই যাত্রার দলের সকলেই নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোক, তাহারা বাড়ী হইতে খাইয়া আসিয়া গান করিবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দলে-দলে লোক পাঁচালী শুনিবার জন্য বাজারে সমবেত হইতে লাগিল। বাজারের মধ্যে আর একবিন্দু স্থান খালি পড়িয়া রহিল না। আসরের চারিদিকে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে; কেহ ছেলে কাঁধে লইয়া গান শুনিতে আসিয়াছে; পল্লীবালকগণ আসরের স্থানে-স্থানে দল বাঁধিয়া বসিয়া গণ্ডগোল করিতেছে। আসরের একপাশে ভদ্রলোকদের জন্য সংরক্ষিত কয়েক খানি বেঞ্চি পড়িয়া আছে; অনেকে তাহার উপর দণ্ডায়মান।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বেই ঝাড়, দেওয়ালগিরি, ল্যাম্প প্রভৃতি জ্বালিয়া দেওয়া হইল। অল্পকাল পরে পাঁচালী দলের গায়কেরা বাদ্যযন্ত্রাদি সহ আসরে প্রবেশ করিল। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকায় কিছু সময় কাটিল; শ্রোতৃবৃন্দ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রধান অধিকারী বল-রাম দাস বাঙ্গালীর প্রিয়কবি দাশরথী রায়ের পাঁচালী আরম্ভ করিল।

পাঁচালীর বিষয় "শ্রীমতীর কলঙ্ক-ভঞ্জন।" সুকণ্ঠ গায়কেরা কখন ছড়ায়, কখন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান করিয়া এই অমৃত-মধুর প্রেমগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। দর্শকেরা স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া ভাববিহ্বল-হৃদয়ে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল; শুনিতে-শুনিতে কোন-কোন ভাবুক ভক্তের নয়নকোণে অশ্রুসঞ্চার হইল। পল্লীরমণীবৃন্দ চিকের অন্তরালে বসিয়া একাগ্রচিত্তে পাঁচালী শুনিতে লাগিল। যে সকল রমণী ঘরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে রাখিয়া দু'দণ্ডের জন্য পাঁচালী শুনিতে আসিয়াছিল, তাহারাও

উঠিতে পারিল না; তাহারা শিশুপুত্র-কন্যার কথা ভুলিয়া গিয়া, সংসার বিস্মৃত হইয়া ভগবানের এই মধুর লীলা-কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া পাঁচালী চলিল। বাদ্যধ্বনিতে গ্রামের দূরতম প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল, ঝিল্লিধ্বনি থামিয়া গেল, শুক্ল পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ অস্তগমন করিলেন, সমগ্র গ্রামখানি গাঢ় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। পথপ্রান্তবর্ত্তী সহকার-শাখা হইতে আম্রমুকুলের সৌরভ হরণ করিয়া তুষার-শীতল নৈশ বায়ুপ্রবাহ এক-একবার হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে, শিশিরবিন্দু বৃক্ষশাখা হইতে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; শিমুল-গাছের উচ্চ শাখা হইতে শিমুলফুল মধ্যে-মধ্যে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দে মাটিতে খসিয়া পড়িতেছে; এবং নক্ষত্রের দল দূর আকাশ হইতে নিদ্রালস স্তিমিত নেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন শুব্ধ ধরণীর দিকে চাহিয়া আছে; এমন সময় গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী বাগানের অভ্যন্তরস্থিত বাঁশবনের সন্নিকটে সমবেত শৃগালের দল সমস্বরে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণা করিল, এবং তাহাদের ঐকতান বন্দনা হইতেই আর একদল শৃগাল আর একদিকে মহা উৎসাহে হুয়াধ্বনি আরম্ভ করিল। পথে জনমানবের সাড়া নাই, কেবল শৃগালের কণ্ঠস্বরে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহস্থের 'পাঁদাড়' হইতে দুই একটি কুকুর চীৎকার করিতেছে। গ্রাম্য চৌকীদারের কণ্ঠও আজ নীরব,—সে তাহার প্রকাণ্ড লাল-পাগড়ী মাথায় ও মুখে জড়াইয়া, তাহার পাঁচ হাত লম্বা তৈলপক্ব বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, তন্ময়চিত্তে পাঁচালী শুনিতেছে। গায়কেরা তখনও মধুর কণ্ঠে গায়িতেছিল,—

"ননদিনী ব'লো নগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজকুল সব হউক প্রতিকূল,
আমি ত সঁপেছি গো কুল,
অকূল-কাণ্ডারীর করে।
কাজ কি বাস, কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে,
সে কি বাসে বাস করে?"

—শুনিয়া কোন-কোন শ্রোতা দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, তর্জ্জনী ঘুরাইয়া ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "সকলে কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ করে একবার হরি হরি বলো!"—শত শত কণ্ঠের হরিধ্বনিতে সমগ্র গ্রামখানি পুনঃ-পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মধুস্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১৬)

মধুসূদন স্পেনসেস্‌ হোটেলে বাস করিতেছেন। নানা প্রতিকূল আর্থিক ও বৈষয়িক অবস্থার অবসাদ অবহেলে বিদূরিত করিয়া সদাপ্রফুল্ল কবি সতত আনন্দ-সাগরে সন্তরণ করিতেছেন! তাঁহার অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ চোগা-চাপকান পরিয়া আদালতে আবির্ভূত হন! মধুসূদন একেবারে পূর্ণ সাহেবী-পরিচ্ছদে প্রকট হইলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই প্রথম দেশীয় সাহেব এবং তিনিই তাঁহার স্বদেশীয়-দিগের ভিতর হ্যাট-কোটের প্রবর্ত্তক। প্রখর দূরদর্শী প্রতিভাবান্‌ মধুসূদন তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-রাজত্বে এমন একদিন অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন বঙ্গের শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ঘর-বাহির করিবে। আমরা জানি, অনেক গোঁড়া হিন্দু, যাঁহারা টিকি রাখিয়াছেন, পথে, রেলে জলস্পর্শ করেন না, তাঁহারাও নির্ব্বিকারচিত্তে হ্যাটকোট-নেক্‌টাই পরিয়া আফিসে যাইতেছেন, এবং এদেশে-ওদেশে বেড়াইতেছেন!

পাঠক! মধুসূদনের সেই বৃদ্ধবিদ্বেষ্টা সহাধ্যায়ী এ সম্বন্ধে কি লিখিতেছেন দেখুন;—"ইহা বোধ হয় অনেকে

অবগত নহেন যে, বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীদিগের সাহেবী পোষাক অবলম্বন করার মূলাধার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথম বিলাত-যাত্রীরা ইংলণ্ডে, এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এ দেশে চাপকান, চোগা ও দেশী টুপী ব্যবহার করিতেন; কিন্তু মাইকেল বিলাত হইতে কলিকাতায় পৌছিয়া এই সকল ব্যক্তির ফুঁ ফিরাইয়া দিলেন। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, মধু তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিল যে, যে পর্য্যন্ত তাহারা সাহেবী পোষাক অবলম্বন না করিবে, সে পর্য্যন্ত মাইকেলের পরিবার কলিকাতায় পৌছিলে, তিনি কিম্বা অন্য কোন মেম তাহাদিগকে খানায় নিমন্ত্রণ করিবেন না, কিম্বা তাহাদিগের করস্পর্শ করিবেন না, অর্থাৎ বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী-দিগকে মাইকেলের স্ত্রী মাইকেলের তুল্য সভ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন না। এই কথাতেই তাহাদের ভয় হইল, মতি 'টলিল এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের মধ্যে হ্যাট-কোট প্রচলিত হইল।" কিন্তু খ্রীষ্টীয় 'বঙ্গমিহির' মাসিক পত্রের খ্রীষ্টান-সম্পাদক এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন। "এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে স্বদেশের ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ অতি অল্প লোকেরই আছে। আর যাঁহারা বিলাত হইতে কোট-হ্যাট পরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু মাইকেলের ভাব সেরূপ ছিল না। তিনি যদিও কোট-হ্যাট পরিতেন, যদিও ঘোরতর সাহেবী আচার-ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন, তথাপি স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ঢাকা নগরে মাইকেলের অভ্যর্থনার্থ এক সভা হয়; তাহাতে মাইকেল বলেন, 'আমি যদিও ইংরাজি পোষাক পরি, তথাপি আমি বাঙ্গালী; আবার শুধু বাঙ্গালী নই, আমি বাঙ্গাল, আমার জন্মস্থান যশোহর।' ফলতঃ মাইকেল হ্যাট-কোটধারী প্রকৃত বাঙ্গালী ছিলেন।"

স্পেনসেস্ হোটেলে মধুসূদনের মধুর স্মৃতি নানা স্মৃতি-ফুলে গ্রথিত! আমরা সেই স্মৃতি-মাল্য হইতে কতকগুলি কুসুম চয়ন করিয়া পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিব।

একদিন সন্ধ্যার সময় মধুসূদন হোটেলের বারান্দায় বসিয়া অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, মুরলীধর সেন প্রমুখ বন্ধুপরিবৃত হইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের মধ্য হইতে একজন মধুসূদনকে বলিলেন "আপনি আমাদের কাছে প্যারীসের কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা আপনার প্রিয় অমিত্রাক্ষরে তাহার বর্ণনা শুনিতে ইচ্ছা করি।" তাঁহার কথা শুনিবামাত্র মধুসূদন তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, ওজঃগুণসম্পন্ন গুরুগম্ভীর অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্যারীসের মনোহারিনী বর্ণনা করিলেন! বর্ণনা শুনিয়া সকলে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গেলেন! একজন বন্ধু বলিয়া উঠিলেন "Now, I think we need not go over to Paris to see it, Michael's description tells us everything one would care to know."

মধুসূদনের আর একটি অপূর্ব্ব শক্তি সম্বন্ধে 'বঙ্গমিহির'-সম্পাদক লিখিয়াছেন;—"মাইকেল যৎকালে স্পেনসেস্ হোটেলে ছিলেন, তৎকালে এক রাত্রে তাঁহার গল্প-রচনা-শক্তির আশ্চর্য্য পরীক্ষা হইয়াছিল। বৈকালিক আহারান্তে তাঁহার পাঁচজন ইংরাজ-বন্ধু কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন, মাইকেল পাঁচজনকে পাঁচটি গল্প বলিয়া যাইতেছিলেন। প্রত্যেকে প্রত্যেক গল্পের চারি পাঁচ পৃষ্ঠা লিখিলে পর, লেখকেরা সুরাপানে অধীর হইয়া আর লিখিতে পারিলেন না; শেষে মাইকেলের কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিতে করিতে শয়ন করিতে গেলেন।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুসূদন গাড়ীতে উঠিতে গিয়া, পদ-স্খলিত হইয়া, বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন; সেই হেতু কিছুদিন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে বীরভূম সিউড়ীর জমীদার ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনকে 'কি হইয়াছে?' জিজ্ঞাসা করায়, মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন 'ভগ্নউরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে!'

মধুসূদনের কোন বন্ধু একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া মধুসূদনের নিকট গমন করিয়াছিলেন। যুবক ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও কথোপকথনের ভদ্ররীতি অবগত ছিলেন না। তিনি কথোপকথনের সময় অনেক অসংযত কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন মধুসূদন তাঁহার বন্ধুকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া, চুপে-চুপে বলিলেন, "এই যুবককে লইয়া বড়-বড় সাহেবের নিকট যাইও না, ইহাকে দেখিয়াই তাঁহারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর

নমুনা বুঝিয়া লইবেন। 'These are the specimens of educated Bengalees."

মধুসূদনের পানপাত্রে একটি মক্ষিকা পড়িয়াছিল; তিনি তাহা দেখিয়া একটি কবিতা রচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার হস্তে কবিতাটি দিয়া বলেন, 'পড় দেখি?' বন্ধু মধুসূদনের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর পড়িতে না পারিয়া, যেমন ফিরাইয়া দিতেছেন, এমন সময়ে মধুসূদনের একটি ফিরিঙ্গী বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার হস্তে কবিতাটি দিয়া বলিলেন, "just read this to the young man!" ইহা শুনিয়া বঙ্গীয় বন্ধুটি বলিলেন, "আমি পারিলাম না, সাহেব কি করিয়া বাঙ্গালা বুঝিতে পারিবে?" মধুসূদন বলিলেন "ও একজন পণ্ডিত লোক!" আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সাহেব তৎক্ষণাৎ মধুসূদনের হস্ত-লিখিত কবিতাটি পড়িয়া ফেলিলেন। কবিতাটি শুনিয়া প্রিয়বাবু বলিলেন (বাঙ্গালী বন্ধুর নাম প্রিয় বাবু) যে, কবিতায় ব্যবহৃত অনেক কথা আমাকে বাঁকা-বাঁকা ঠেকিতেছে। ইহা শুনিয়া মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বাঙ্গাল দেশের লোক, আমরা তোমাদের চেয়ে শুদ্ধ কথা বলি, তোমরা তাহা বল না, সেই জন্য তুমি আমার কথার দোষ ধরিতেছ।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে তদানীন্তন হিন্দুপেট্রিয়ট-সম্পাদক প্রসিদ্ধ ইংরাজি-লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনার প্রশংসা হইলে মধুসূদন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাঙ্গালী যতই ভাল ইংরাজি লিখুক না কেন, সহেবেরা সহজে স্বীকার করিতে চাহিবে না। শেষে বলেন "England does not want a Black Macaulay or a Black Shakespeare." তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, "রাম-গোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা লিখিলে ভাষার অত্যন্ত উন্নতি হইত।"

কবিবর কাশীরাম দাসের প্রতি তাঁহার এতই অনুরাগ ছিল যে, একদিন হোটেলে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার কোন বন্ধুকে বলেন "কাশীরাম দাসের তুল্য কবি আমাদের দেশে নাই। এমন সার্ব্বজনীন আদর (popularity) আর অন্য কোন কবিরই নাই। দেখ, তেতলাতেও পাঠ হইতেছে, দোতলাতেও পড়িতেছে! আবার দোকানে ও গাছতলাতেও সাধারণ লোকে মহাভারত সুর করিয়া পড়িতেছে।" আর হাসিয়া ভারতচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "উনি ত বকুল-ফুলের কবি।"

৺ললিতচন্দ্র রায় নামক তাঁহার পরিচিত কোন বন্ধু একদিন অতি প্রত্যূষে মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মধুসূদন হোটেলের স্নানাগারে (Bath-room) একটি চেয়ারে বসিয়া দুইটি অর্দ্ধভগ্ন কাঁচা-লঙ্কা দুই হস্তে ধারণ করিয়া, জিহ্বায় ঘর্ষণ করিতে-ছেন! তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মধুসূদন বলেন,—"অতিরিক্ত মদ্যপানে জিহ্বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, বাক্যের উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না। এইরূপ করিলে সকল দোষ কাটিয়া যায়।"

কোন বিশেষ প্রয়োজনে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন বর্দ্ধমানের শ্যামসায়ার নামক হ্রদবৎ সায়রের তীরে একটি দ্বিতল-ভবনে বাস করিতেন। মধুসূদন দ্বিপ্রহরে উত্তপ্ত-কলেবরে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া শ্যামসায়রের প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন! দেখিলেন সূর্য্যকিরণে শ্যামসায়রের তরঙ্গায়িত জলে হীরক জ্বলিতেছে; শীতল সমীরে বনফুলের সুবাস বহিয়া আনিতেছে; বন্যকপোতের মধ্যাহ্ন-গীতি, বনের ছায়া এবং নীরব-নির্জ্জন মৌনপ্রকৃতির নিস্তব্ধতায় তাঁহার কবি-চিত্ত প্রমত্ত হইয়া উঠিল! তিনি তৎক্ষণাৎ হ্যাট, কোট, নেক্‌টাই প্রভৃতি একে একে খুলিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্যামকান্তি শ্যামসায়রের শ্যামজলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, বিপুল-পুলকে অমিত-উল্লাসে ক্রমাগত সন্তরণ করিতে লাগিলেন। কূলে আর উঠিতে চান না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুইজন আত্মীয় সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন! তাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর কাণ্ড দেখিয়া কিছুতেই হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন না। ক্রমাগত হাসিতে হাসিতে উচ্চকণ্ঠে 'ওঠ' 'ওঠ' বলিয়া, বিদ্যাসাগর যতই তাঁহাকে উঠিতে বলেন, মধু ততই 'splendid' 'splendid' বলিয়া সন্তরণ করেন! শেষে বহুক্ষণ পরে মধু জল হইতে উঠিলে, বিদ্যাসাগর তাঁহাকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হোটেলে মধুসূদন ইংরাজি খানা খাইতেন। একদিন

শরীর ভাল না থাকায় খানসামাকে বলেন, "বাবুর্চ্চিকে বলিয়া দাও, যেন আমার জন্য ভাল করিয়া মুগের দা'ল প্রস্তুত করে।" আহারের সময় বাবুর্চ্চি উক্ত দা'ল আনিলে, মধুসূদন দেখিয়াই তাহাকে কষাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, বলিলেন, "তুমি যে উহা প্রস্তুত করিতে জান না, ইহা পূর্ব্বে বল নাই কেন ?" তিনি তৎক্ষণাৎ খানসামাকে খিদিরপুরে তাঁহার বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তাঁহার জন্য সুন্দর মুগের দা'ল প্রস্তুত হইলে, খানসামা উহা বোতলের ভিতর পূরিয়া হোটেলে লইয়া আসিল। এরূপ অনেক দিন তাঁহার জন্য খিদিরপুর হইতে দেশীয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া হোটেলে প্রেরিত হইত।

এই সময়ে কলিকাতায় বটতলা 'পদ্মাবতী নাটকের' অভিনয় হয়। জয়মিত্রের গলির পাঁচকড়ি মিত্র, ক্ষীরোদ-চন্দ্র মিত্র, বিডন ষ্ট্রীটের শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ প্রসিদ্ধ ধনী পুত্রগণ অভিনয়ের আয়োজন করেন। তাঁহারা পরামর্শের নিমিত্ত মধুসূদনকে সর্ব্বদা লইয়া আসিতেন। মধুসূদনও যাহাতে অভিনয় উৎকৃষ্ট হয়, সেই নিমিত্ত সতত তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সুপরামর্শ দান করিতেন। 'পদ্মাবতী নাটক' প্রথমে আদ্যোপান্ত গদ্যে লিখিত হয়। তাঁহারা তাঁহাকে ঐ নাটকের কিয়দংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলে, মধুসূদন বলেন 'তবে বুড়ী বেটীকে ডাকি'; পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন 'তোরা লেখাপড়া ত কিছু করিস্ নি, তোদের ভিতর কি কেউ কলম ধর্‌তে পারে?' তখন মণিলাল সেন নামক ছোট-আদালতের জনৈক উকীল কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। মধুসূদন তখন পুস্তকের অঙ্কের গদ্যাংশ দেখিয়া, এমনিভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে উক্ত অংশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, সকলের মনে হইল, তিনি পুস্তক দেখিয়া dictation লিখাইতেছেন।

উক্ত নাট্যসম্প্রদায়ের নাম ছিল The Bengal Amateur Theatrical Society। ইংরাজি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে, ২৪৬ নং চিৎপুর রোডের বিশাল অট্টালিকার দ্বিতল হলে 'পদ্মাবতী' নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হয়। নর্ত্তকীবেশী বালকগণের নৃত্য বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল! তাহাদিগের সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য মধুসূদনেরই উপদেশানুসারে ব্যবস্থিত হয়।

অভিনয় শেষ হইয়া গেলে নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ মধুসূদনকে বরাহনগরের ৺জয়মিত্রের গঙ্গাতীরস্থ কালী-মন্দির সমন্বিত সুরম্য উদ্যানে প্রীতিভোজ প্রদান করেন। এই প্রীতিভোজে গীতবাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল এবং অনেক গণনীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জওয়ালা-প্রসাদ ও নিমাই ওস্তাদ্‌জী নামে দুইজন দেশপ্রসিদ্ধ কালোয়াতি গায়ক আসরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

উক্ত উদ্যানে সকলে প্রভাতেই সমাগত হন। গীতবাদ্যে সময় অতিবাহিত হইলে, বেলা বারটার সময় ভোজের অব্যবহিত পূর্ব্বে মধুসূদন শরৎচন্দ্র ঘোষকে বলিলেন, "আমার মাথাটা একটু ধরিয়াছে—কেমন গ্রীষ্ম বোধ করিতেছি।" প্রত্যুত্তরে শরৎ বাবু, ক্ষীরোদ বাবু প্রভৃতি বলিলেন, 'সম্মুখেই স্নিগ্ধ-প্রবাহিনী গঙ্গা, আপনি একবার গঙ্গাস্নান করিয়া দেখুন না কেন?" মধুসূদন আপত্তি না করায়, তাঁহারা তাঁহাকে কোট্-পেণ্টালুন ছাড়াইয়া ধুতি পরাইলেন; এবং সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর করিয়া সৌরভিত ফুলেল তৈল মাখাইয়া নির্ম্মল গঙ্গাসলিলে তাঁহাকে লইয়া সকলে অবতরণ করিলেন। মধুসূদন কতকাল পরে গঙ্গার স্নিগ্ধ তরঙ্গায়িত নীরে অবগাহন-স্নানে বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া অকস্মাৎ তিনি 'মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলি' ইত্যাদি বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাষ্টক স্তোত্রম্ এমনি মধুরভাবে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ ও সমবেত জনমণ্ডলী এই অদ্ভুত ব্যাপারে মৌনমুগ্ধ হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা যখন জানিতে পারিলেন যে, স্তোত্রপাঠী অবগাহক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তৎপরে উদ্যানে সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মধুসূদন একটি টেবিলে বসিয়া পোলাও কালিয়া প্রভৃতি ভোজন করিলেন। প্রত্যাগমনকালে, যে খানসামা তাঁহাকে দেশীয় বস্ত্র পরাইয়াছিল, তাহাকে দশটাকা বক্‌সিস দিলেন। নিমাই ওস্তাদ্‌জীর গীতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কুড়ি টাকা পুরস্কার দিলেন। জওয়ালাপ্রসাদকেও পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সকলে তাঁহাকে সৌখীন গায়ক বলায় তাঁহাকে আর কিছু দিলেন না। অন্যান্য ভৃত্যাদিগকেও যথাযোগ্য পুরস্কার দিলেন। সকলে তাঁহাকে এরূপ ব্যয় করিতে নিষেধ করায়, মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন "আমার

সঙ্গে যাহা থাকে, তাহা প্রায় বাসি হয় না।" তৎপরে সকলের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া মধুসূদন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর 'কিছু কিছু বুঝি' নামে একখানি প্রহসনের অভিনয় হয়। মাইকেল অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, মাইকেল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বাঙ্গালায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন "মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে।" ইহার অর্থ এই;—পূর্ব্বের সমস্ত অভিনয় এই প্রহসনের অভিনয় মাটি করিয়া দিল। এই সময়ে মাইকেল অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফীকে টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটার করিতে অনুরোধ করেন। অর্দ্ধেন্দুও মধুসূদনের উপদেশে Public Theatre খুলিয়াছিলেন। থিয়েটার সম্বন্ধে পরে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব।

অতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রের ভগিনীপতি গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই স্পেনসেস্ হোটেলে মধুসূদনের নিকট গমন করিতেন। ইঁহারা তিনজনে টেবিলে বসিয়া মধুসূদনের সহিত ইংরাজি খানা খাইতেন। ইঁহাদের সঙ্গে একটি বালক গমন করিত। ঐ বালক ইংরাজি খানা খাইত না। ইহা দেখিয়া মধুসূদন তাঁহার উড়িয়া খানসামার দ্বারা ঠোঙ্গায় করিয়া কচুরি জিলাপী প্রভৃতি আনাইয়া দিতেন। এই সময়ে মধুসূদনের দেহের স্থূলত্ব অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি তখন ছয় ডিস খানা খাইতেন। বন্ধুরা বলিলেন "আপনি আহার কমাইয়া দিন।" কিছুদিন পরে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন "কই হে, তোমাদের কথায় খানা কমাইয়া ছয় ডিসের যায়গায় তিন ডিস করিলাম, তবুও স্থূলত্ব কমে না যে!"

বিজ্ঞান-বিষয়ে ইংরাজজাতি বেশী উন্নতি করিয়াছে, কি ফরাসীজাতি অধিক উন্নতি করিয়াছে, এই বিষয়টি লইয়া সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-ভাষাবিৎ ও Phrenologist ডাক্তার কালীকুমার দাসের সহিত ফরাসীভাষায় মধুসূদনের ঘোরতর তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয়। মধুসূদন জলের ন্যায় অনর্গল ফ্রেঞ্চভাষায় প্রায় তিনঘণ্টাকাল তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন। দুই মনস্বীর বাগ্‌যুদ্ধে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানবিষয়ে ফরাসীজাতিই যে সমধিক উন্নত, ইহা মধুসূদন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

মধুসূদন যখন যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, তখন খাঁটি সেই ভাষা বলিতেন। তিনি এক ভাষার সহিত অন্য ভাষা মিশাইতেন না। যখন বাঙ্গালা বলিতেন, তখন তাহার মধ্যে কোন ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ করিতেন না, কিম্বা ইংরাজি বলিতে-বলিতে কোন নাম দেশীয়ভাবে উচ্চারিত হইলে বিরক্তিবোধ করিতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন;—"Mr. Datta was greatly offended with any one who in the course of reading or conversation in English pronounced a Bengali name in the tame native fashion. 'It mars the genius of the English language', he would complain, 'You sacrifice the rhythm of it.'"

মধুসূদনের কোন ইংরাজবন্ধু বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া, বিদ্যাসাগর কিরূপ লোক দেখিতে চাহিলে, মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন যে, সাহেবের জন্য এক বোতল শেরী রাখিবেন—'keep a bottle of sherry.'

মধুসূদন সময়ে-সময়ে তামাক খাইতেন। নিজ-বাটীতে তিনি কখনও তাম্রকূট সেবন করিতেন না। বন্ধুবান্ধবদিগের বাটীতে কিম্বা আদালতে দেশীয় হাকিমদিগের private chamberএ বসিয়া তাঁহাদের প্রকাণ্ড আলবোলায় ধূমপান করিতেন। বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি অনেক সময়ে বারুইপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে বঙ্কিম বাবু, কালীচরণ ঘোষ, তারকনাথ মল্লিক, রামশঙ্কর সেন প্রমুখ প্রসিদ্ধ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের আদালতে প্রায়ই কর্ম্মসূত্রে গমন করিতেন। তাঁহাদের বিশ্রামকক্ষে বসিয়া আলবোলার সুদীর্ঘ সট্‌কায় ধূম উদ্গীরণ করিতেন; তামাক ফুরাইলে, চাপরাসীকে ডাকিয়া বলিতেন "চাপ্‌রাশি চিলাম্‌টো manupulate কর্ দেও।" শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ৺গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে সুন্দর মর্ম্মর-নির্ম্মিত আল্‌বোলা সট্‌কা আনিয়া মধুসূদনকে উপহার দিয়াছিলেন।

মধুসূদন পূর্ণবাবুকে বড়ই ভালবাসিতেন; তিনি

তাঁহাকে সস্নেহে 'ছোক্‌রা' 'ছোক্‌রা' বলিয়া ডাকিতেন। একদিন রহস্য করিয়া তাঁহাকে বলেন, "ওহে ছোক্‌রা, তামাক্ খাও না।" পূর্ণবাবু বলেন "তাঁহার কথা বড়ই মিষ্ট ছিল, চেহারা খুবই জাঁকালো ছিল, এবং তিনি অসাধারণ গুণবান্ ছিলেন! তিনি যে স্থানে বসিয়া গল্প করিতেন, সে স্থানটাতে এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি (Magnet) ছড়াইয়া যাইত যে, আর নড়িতে পারা যাইত না। তাঁহার কথার ভঙ্গীই এমনি বিচিত্র ছিল।" শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেন, "মাইকেল গল্প করিতেন, তাঁহার প্রতি কথাই Poetry."

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও মধুসূদন বিশেষ স্নেহ করিতেন। মধুসূদনের সহিত আদালতে জ্যোতিঃবাবুর মধ্যে-মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। তাঁহাকে দেখিলেই মধুসূদন বলিতেন 'চল হে, বিলাতে চল!' জ্যোতিঃ বাবু তাঁহার মধ্যম দাদার সহিত প্রায়ই মধুসূদনের বাটীতে আহারের নিমন্ত্রণে যাইতেন। তিনি বলেন 'হাস্যরসে তাঁহার খুবই অধিকার ছিল; তিনি খুবই হাসাইতে পারিতেন।'

একদিন গৌরদাস বাবু নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথকে তাঁহার উদ্যানে সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। আসিবার পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, পত্র লিখিয়া গৌরদাস বাবুর অনুমতি চাহেন। গৌরদাসও কোনও কথা না ভাঙ্গিয়া অনুমতি দিলেন। তারপর যেমন তাঁহারা দুইজনে গৌরদাসের বাগানে আসিলেন, অমনি একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের অভিনয় হইল! আমরা এ সম্বন্ধে নিজে কিছু না বলিয়া গৌরদাস বাবুর লিখিত স্মৃতিই উদ্ধৃত করিলাম—

"He (Raja Chunder Nath) was not aware that Madhu was one of my oldest and dearest friends. When we met, Madhu, as usual, ran with open arms to embrace me. Chunder Nath told me how the chance acquaintance of an hour had given rise to a deep attachment between them, and how he felt that without him there could be no enjoyment, specially in a party like the one we had."

মধুসূদন একদিন চুঁচুড়ায় ভূদেব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। ভূদেব তাঁহার সহপাঠী, বাল্য-বন্ধু মধুসূদনের মহান্ চিত্ত ভূদেবের প্রতি পূর্ব্ববৎ অনুরাগে অনুরঞ্জিত ছিল। আহার করিবার পূর্ব্বে মধুসূদন ভূদেবকে বলিয়াছিলেন, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব!" তিনি যখন ধুতি-চাদরে ভূষিত হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ভূদেব বাবু বলেন "ভাই মধু! এই বেশে একখানি 'মেঘনাদ বধ' হাতে নিলে, তোমাকে বেশ মানায়। হ্যাট-কোট প'রে তোমার 'Captive Ladie' নিয়ে বেড়াতে পারো।"

মধুসূদনের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাৎকালিক কোন মহিলা কবি তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে নিতান্ত বাসনা করেন। শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজবংশীয় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব এই মহিলা-কবির বিশেষ পরিচিত। তাই ব্রজেন্দ্রনারায়ণ মধুসূদনকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ প্রায়ই মধুসূদনকে নিজ উদ্যানে আমোদ-প্রমোদে প্রমোদিত করিতেন। ইংরাজি ও দেশীয় ভোজ একত্র চলিত।

কার্য্য-উপলক্ষে মফঃস্বলে গিয়া, তথায় বাসোপযোগী গৃহ না থাকায়, মধুসূদন ট্রেণেই রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, মাইকেল আসিয়া ট্রেণে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মধুসূদনের আহারের জন্য বিবিধ ভোজ্য বস্তু, মদ্য, মাংস প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, মধুসূদন গাঢ় নিদ্রামগ্ন! শিশির বাবু ডাকাডাকি করিবামাত্র মধুসূদন নেত্র অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিয়াই 'কে শিশির? শিশির?' বলিয়া জাগ্রত হইয়া পুলকে অধীর হইলেন। শিশির বাবু মধুসূদনকে সেখান হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন। সে দিন তাঁহারা সেই স্থানেই রহিলেন। তৎপরদিন অতি প্রত্যুষে যখন তাঁহারা একত্রে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময়ে শিশির বাবু মধুসূদনকে মুখে-মুখে প্রভাত-বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, মধুসূদন ওজস্বিনী ভাষায় এমনি সুন্দররূপে প্রভাত-

বর্ণনা করিলেন যে, শিশিরকুমার ভাবে বিগলিত হইয়া শিশিরবৎ হইয়া গেলেন।

পুলিস আফিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়, তাঁহার সঙ্কলিত 'Police Court Companion' নামক পুস্তক এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মধুসূদনকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের গলায় পৈতার গোছা দেখিয়া, তিনি সংস্কৃত জানেন কি না, মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ সাহসভরে উত্তর দিল 'জানি বৈ কি মহাশয় ?' মধুসূদন তাঁহাকে দু'একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলাতে, সেই ব্রাহ্মণ একটি সংস্কৃত শ্লোক এমনি অশুদ্ধভাবে, বিকৃতস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, মধুসূদন অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া, সেই নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণকে দশ টাকা দিয়া বিদায় করিলেন।

দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃদেব স্বনামধন্য ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত স্পেনসেস্ হোটেলে মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎকারে গমন করেন। যুবক সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন শুনিয়া, মধুসূদন বলিলেন, 'Let me examine you' বলিয়াই পার্শ্বস্থ পুস্তকাধার হইতে জগদ্বিখ্যাত কবি হোরেসের (Horace) মূল লাটিন গ্রন্থ লইয়া, তাহা হইতে একটি কঠিন অংশের কয়েক পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই অংশটি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে না পারায় মধুসূদন বলিলেন 'তাই ত, তুমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যাচ্চ, পাস হবে কি ?' সুরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিলেন, 'আজ্ঞে যাচ্ছি ত, দেখি চেষ্টা করিয়া, কি হয়।' পরে মধুসূদন, মনোমোহন ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া রহস্য-চ্ছলে, 'তুমি দেখ্‌ছি যত কুলী চালান দিচ্ছ' বলিয়া তাঁহাকে 'Protector of Emigrants' আখ্যায় অভিহিত করি-লেন। মধুসূদনের এই কথায় উপস্থিত মনস্বীবর্গ অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পূজনীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বি,এ, পরীক্ষায় লাটিনে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমপুত্র সুরেন্দ্রকে মধুসূদন বড়ই স্নেহ করিতেন। বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে মধুসূদন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে তাঁহার নাক টানিয়া, চিবুক ধরিয়া অতিশয় স্নেহাদর করিয়া যান। বিলাত হইতে ফিরিয়া মধুসূদন তাঁহাকে বলেন 'আমার সহিত ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কও'। উত্তরে সুরেন্দ্রবাবু বলেন 'আপনার সহিত ইংরাজি বলিতে ভয় করে, লজ্জা করে'। উত্তরে মধুসূদন তাঁহাকে রহস্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "লাজের মুখে দাও ছাই।"

সুরেন্দ্রবাবু যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাদের ইংরাজি পাঠ্যগ্রন্থে একটি ইতালীয় কবিতা উদ্ধৃত ছিল। তন্নিম্নে কবিতাটির ভাবার্থ মাত্র ছিল, বিশদ ব্যাখ্যা ছিল না। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক টনি (C. H. Tawney) ছাত্রদিগকে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে পারিলেন না; তিনি কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষা জানিতেন। কিন্তু ইতালীয় ভাষা জানিতেন না। কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকেরাও উহার ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে, ছাত্রেরা সুরেন্দ্র বাবুকে বলিল, 'মাইকেল মধুসূদন তোমাদের বাটীতে আসেন ; তুমি তাঁহার দ্বারা ইহার বিশদ ব্যাখ্যা লিখাইয়া আনিও।' ছাত্রগণের কথায় সুরেন্দ্রবাবু, যে দিন মাইকেল তাঁহাদের বাটীতে আসিলেন, সেই দিনই তাঁহাকে সেই ইতালীয় কবিতাটির বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়া দিতে বলেন। মধুসূদন তৎক্ষণাৎ তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলে, তিনি উহা টনি সাহেবকে আনিয়া দেখাইলে, সাহেব অতীব প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন। টনি সাহেব মাইকেলকে জানিতেন।

একদিন জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের রাস্তার ধারের গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় মধুসূদন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত দুই ঘণ্টাকাল ইংরাজিতে এমনি ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের কথা শুনিবার নিমিত্ত গবাক্ষের বাহিরে লোকের বিষম জনতা হইয়া গেল।

বিলাত হইতে আসিয়া প্রথমেই মধুসূদন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে একদিন দেশীয় আহারে পরিতৃপ্ত হন। পুরমহিলাগণ তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ রসনা-পরিতৃপ্তিকর ভোজ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আহারান্তে মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, "বহুদিন য়ুরোপীয় আহারের

পর অন্য দেশীয় আহারে আমি যে কি পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম, তাহা বলিতে পারি না।"

প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রকট-মূর্ত্তি মধুসূদনের আত্মশক্তিতে 'বিশ্বাস কিরূপ প্রখর ছিল, তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীরামপুরের গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর উদ্যান-ভবনে অবস্থানকালে, মধুসূদন হুগলী আদালতে কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে-মধ্যে যাইতেন। গোপীকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় কৃষ্ণলাল ও নন্দলাল চুঁচুঁড়ায় থাকিয়া হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। এক শনিবারে তাঁহারা চুঁচড়া হইতে শ্রীরামপুরে প্রত্যাগত হইতেছেন। ঘটনাক্রমে তাঁহারা ট্রেণের যে গাড়ীতে ছিলেন, মধুসূদনও হুগলী আদালতের কার্য্য শেষ করিয়া, সেই গাড়ীতেই আসিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদন তাঁহাদের ইংরাজি শিক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সে বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের বাবাকে বলিতে পার, আমি প্রত্যহ প্রাতে এক ঘণ্টা তোমাদের ইংরাজি পড়াইতে পারি।" ইহা শুনিয়া কৃষ্ণলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসিক কত টাকায় আপনি এ কার্য্য করিতে পারেন?" মধুসূদন বলিলেন, '500 Rs.' ইহা শুনিয়া কৃষ্ণলাল বিস্মিত হইয়া ইংরাজিতে বলিলেন, 'Five hundred rupees for one hour's teaching, Sir, is not a common sum!" ইহা শুনিয়াই মধুসূদন বিচিত্র ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন; "My dear boys, you should also remember, that Michael Madhusudan Datta is not a common man!"

'কাব্যপ্রিয়' জগদীশনাথ রায়, মধুসূদনের সমবয়স্ক, সহপাঠি ও একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। মধুসূদন তাঁহাকে পত্রে এবং মুখে 'my dear Jug' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা ছাত্রজীবনের স্নেহের পূর্ব্ব-স্মৃতি।

একবার মধুসূদন জগদীশ বাবুকে বলেন 'লোকে বলে অমিত্রছন্দ গীতের উপযোগী নহে।' জগদীশ বাবু বলিলেন 'এ তোমার বড় ভুল; আমি তোমাকে গাহিয়া শুনাইব।' এই বলিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ রায়কে মেঘনাদবধ কাব্য আনিতে বলিলেন। পুস্তক আনীত হইলে সুগায়ক জগদীশ বাবু ৩য় সর্গের নিম্নলিখিত অংশটি অতি মধুর রাগিনীতে সুরলয়ে গায়িলেন;—

"কালনেমী নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলাসুন্দরী।
মহাশক্তি অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে?"

গীত সমাপন হইলে মধুসূদন আনন্দে আত্মহারা হইয়া, জগদীশের কণ্ঠ জড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন! পরে বলিলেন 'আমি এই গীতটি ঐ সুরে চালাইব'।

একদিন জগদীশ বাবু ও মধুসূদনের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে বঙ্কিম বাবু কি একটি টিপ্পনী করায়, মধুসূদন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, বয়োজ্যেষ্ঠদিগের কথা শুনিয়া যাও, টিপ্পনি কাটিও না"। কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার সম্মুখে একবার কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কথা বলায়, মধুসূদন তাঁহাকে বিশেষরূপে সংযত করিয়া দিয়াছিলেন।

একটি যাত্রার আসরে মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া, ধুতি-চাদর পরিয়া, মধুসূদন ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। সে স্থলে তাঁহার পরিচিত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলেও কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি জগদীশ বাবুর সর্পচক্ষু এড়াইতে পারিলেন না। জগদীশ দু'একবার দেখিয়াই মধুসূদনকে পাকড়াও করিয়া ফেলিলে, মধুসূদন উচ্চহাস্যে বালক-সুলভ আনন্দ প্রকাশ করেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই মধুসূদন একদিন বঙ্কিমবাবুর এজলাসে গিয়াছিলেন। বিশ্রামকক্ষে বসিয়া তিনি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে জগদীশ বাবু আসিয়া, বাহির হইতে মধুসূদনের ভাঙা-ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিয়াই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, মধুসূদন তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষে ডুবিয়া গেলেন। জগদীশ বাবু তাঁহাকে একদিন নিজবাটীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। মধুসূদন য়ুরোপে বহুদিন দেশীয় রান্না খান নাই বলায়, জগদীশ বাবুর পরিবারবর্গ তাঁহার জন্য নানাবিধ শাকসব্‌জী ও তরকারী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মধুসূদন আহারান্তে পরম পরিতুষ্ট হইয়া জগদীশকে বলিলেন, "আজ আমার রসনা যে কিরূপ পরিতৃপ্ত হইল, তাহা বলিতে পারি না। অদ্য আমার বালক-কালের স্মৃতি

সমুদিত হইতেছে—আমার বাটীর মহিলারা এইরূপ রন্ধন করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন।”

একদিন জগদীশ বাবুর বৈঠকখানায় সমবেত বন্ধুবর্গ মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বিলাতের স্ত্রীলোকেরা কিরূপ সুন্দরী?’ এই কথা শুনিবামাত্র মধুসূদন দণ্ডায়মান হইয়া অভিনেতার ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, বিচিত্র ভঙ্গীসহকারে বলিলেন, ‘They are *Po r-is*’ অর্থাৎ ‘তাহারা পরী’; এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একটি দেশীয় যুবকের নাকালের কথার উল্লেখ করিলেন। মধুসূদন বলিলেন;—“বাঙ্গালার কোন এক ধনীপুত্র বিলাতে গিয়া একটি ইংরাজরমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া ফেলিলেন;—‘I love you’। মহিলাটি এই কথা শ্রবণমাত্র হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পার্শ্বের ঘর হইতে তাঁহার সঙ্গিনীরা হাস্যের কারণ অবগত হইবামাত্র, সকলে মিলিয়া এরূপ হাস্যের রোল তুলিলেন যে, বঙ্গীয় যুবাটি অপ্রতিভের একশেষ হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না।”

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কি মত, তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া মাথাটা ঝামা করিয়া ফেলিয়াছি, তত্রাচ ইহার প্রকৃত রহস্য যে কি, তাহা আজও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না?” তিনি নিজে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের প্রবণতা হিন্দু-সমাজের দিকেই ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার মতামত কখনও ঠিক বুঝা যায় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহাকে কখনও কোন কথা বলিতে শুনা যায় নাই। তিনি মহাপ্রাণ ছিলেন; তিনি সকল ধর্ম্ম ও সকল সমাজকেই আপনার ভাবিতেন; তাই তিনি কোন সমাজের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই। হিন্দু-সমাজের চূড়ামণি ব্রাহ্মণকেও বলিতে শুনিয়াছি, খ্রীষ্টধর্ম্মের আবরণে মধুসূদন একজন পূর্ণ হিন্দু’ ছিলেন। রেভারেণ্ড ডাক্তার মাক্‌ডোনাল্ড মহাশয় একটি বক্তৃতায় মধুসূদনের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন “He drew his inspirations from Jesus of Nazareth and from the well of purity.” তাঁহাদের এ সকল কথা মধুসূদনের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কোন বক্তব্য নাই। তবে তাঁহার জীবনের সাময়িক ধর্ম্মপ্রসঙ্গের উল্লেখ আমরা স্থানে স্থানে করিব। তাহা হইতেই পাঠক-পাঠিকারা মহাকবির ধর্ম্মমত বুঝিয়া লইবেন।

মধুসূদন অনেকবার নানা উদ্দেশ্যে কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার যাবতীয় কৃষ্ণনগর স্মৃতি—যাহা সংগৃহীত হইয়াছে,—এই স্থলেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা সতীশচন্দ্র মধুসূদনের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি মধুসূদনকে সমাদরে কৃষ্ণনগরে আহ্বান করিয়া অভিনন্দিত করেন। মধুসূদনের জন্য বড় বড় থালায় করিয়া কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, লেডিকেনি এবং ছানা ও ক্ষীরের প্রস্তুত বহুবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন, গৃহ-সম্মুখস্থ অলিন্দ মিষ্টান্নে মণ্ডিত দেখিয়া হাস্য করিলেন! নিজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট ভৃত্যগণকে বিতরণ করিয়া দিলেন। রাত্রে রাজপ্রাসাদে তাঁহার জন্য ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। মহারাজা ও মধুসূদন উভয়ে সুরাপানে প্রফুল্ল হইয়া প্রচুর আমোদ-প্রমোদে রজনী-যাপন করেন!

একদিন ভ্রমণান্তে মহারাজা প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছেন, মধুসূদনও পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। চলিতে-চলিতে মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, “I see Krishna Chandra followed by Bharat Chandra.”

একদিন মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদনকে বলিলেন “এতদিন আমাদের ভারতচন্দ্র বঙ্গকবিদিগের মধ্যে প্রধান আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সে আসন আপনি কাড়িয়া লইতেছেন।” এই কথায় মধুসূদন বলেন, “আপনারা ভারতচন্দ্রকে ৩০০৲ টাকার গাঁতি দিয়াছিলেন, আমাকে কি দিবেন?” ইহা শুনিয়া মহারাজ সতীশচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্পত্তি থাকিত, আমি আপনাকে ৩০,০০০৲ (ত্রিশ হাজার) টাকার জমিদারী দিতাম।”

একদিন প্রভাতে রাজপ্রাসাদে একখানি চেয়ারে বসিয়া, হাঁটুর উপরে একটি পা তুলিয়া দিয়া, চক্ষে স্প্রিংএর চশমা লাগাইয়া, সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ করিতে-করিতে মধুসূদন একখানি প্রাচীন পুঁথি পাঠ করিতেছিলেন। নিকটে মহারাজার ভাগিনেয় যুবক

শ্যামাধব রায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। শ্যামাধব সাহেবের ন্যায় চুল ছাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। পুঁথি হইতে মুখ তুলিবামাত্র মধুসূদনের দৃষ্টি শ্যামাধবের দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার সাহেবী ফ্যাসানে চুল ছাঁটা দেখিয়া মধুসূদন ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, কে তোমার কেশ এরূপভাবে ছাঁটিয়াছে?" শ্যামাধব ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপে অভিজ্ঞ হইলেও হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন 'Tailor' মধুসূদন উত্তর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন 'বালকের ইংরাজী-জ্ঞান ত খুব গভীর!' মধুসূদনের উক্তির মধ্যে 'Profound knowledge' এরূপ কথা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিকটে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন 'বালকটি কে?' মহারাজ বলিলেন 'My nephew'। মধুসূদন তৎক্ষণাৎ হাসিয়া শ্যামাধবের পিঠ চাপড়াইতে-চাপড়াইতে বলিলেন, "Your nephew! then he will pick up, then he will pick up."

মহারাজ সতীশচন্দ্র কৃষ্ণনগর কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরাজী-অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তকে ডাকাইয়া আনাইয়া মধুসূদনের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। উমেশচন্দ্র রাজপ্রাসাদে মধুসূদনের সহিত বহুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর মুগ্ধচিত্তে প্রত্যাগমন করেন।

ব্যারিষ্টার ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন কৃষ্ণনগরে মধুসূদনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লালমোহনকে Paradise Lost পাঠ করিতে দেখিয়া মধুসূদন বলিলেন, "কে তোমাদের এ কাব্য পড়ায়?" লালমোহন—'স্মিথ সাহেব' "সে পড়াতে পারে? সে জানে? আচ্ছা পড় দেখি শুনি?" লালমোহন পড়িতে লাগিলেন। কতকঅংশ শুনিয়াই মধুসূদন বলিলেন, 'ও ত হল না, আমি পড়ি, তুমি শোন!' এই বলিয়া তিনি পুস্তক না দেখিয়াই, ঐ স্থান এমনি ভাবে আবৃত্তি করিলেন যে, লালমোহন ঘোষ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন! পরবর্তী জীবনে লালমোহন মধুসূদনের কাব্যপাঠের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদাই বলিতেন, "It is still ringing in my ears!"

একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা উপলক্ষে মধুসূদন কৃষ্ণনগরে যান। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রুত হইবামাত্র স্কুল-কলেজ উজাড় হইয়া ছাত্রসমূহ, এবং সহরবাসী নানাশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দলে-দলে আদালত অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। বিদ্যালয়-গৃহ, আফিস, সমস্ত শূন্য হইয়া গেল! দেখিতে-দেখিতে বিচারালয় লোকে লোকারণ্য! হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি দেখে কে? প্রহরী-দিগের সাধ্য কি সেই জনতা সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারে? কে কাহার নিষেধ শুনে, কে কাহার কথা গ্রাহ্য করে? প্রত্যেকেই ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য বিষম ব্যগ্র! আদালতের নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ কাহারও দৃক্‌পাত নাই! কিরূপে ভাল করিয়া মধুসূদনকে দর্শন করিবে, এই আশায় সকলেই শশব্যস্ত! সদরালা জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মোকদ্দমা হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার মাইকেল মধুসূদন যখন তাঁহার ভগ্নকণ্ঠে অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন সেই কোলাহলক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তব্ধ হইয়া গেল! যে স্থানে ক্ষণপূর্ব্বে শঙ্খনাদ ডুবিয়া যাইতে-ছিল, সেস্থানে এক্ষণে সূচিকা-পতনের শব্দও শ্রুত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিল। কবি-দর্শনের যোগ্য দৃশ্য বটে!

কৃষ্ণনগরের 'অঞ্জনার' শ্যাম উপকূলে একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া গিয়া তিনি দেখিলেন, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রক্তরশ্মি অঞ্জনার কালোজলে স্বর্ণসিন্দূর ছড়াইতেছে! ঘন-কাননের বৃক্ষচূড়ায় হেমকান্তি বিহগকূজন তন্দ্রাচ্ছন্ন নিমীলিত চক্ষুর ন্যায় মুদিয়া আসিতেছে—কাননের সুরভি-সমীরের শীতলতা প্রকৃতির তপ্ত বুকে কে যেন লহরে-লহরে ঢালিয়া দিতেছে! মধুসূদন এই পরম রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া পুলক-উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন;—

"O! Anjuna, great is my delight in seeing thee. I will never forget thee, or refrain from speaking of thy charms!"

একবার কৃষ্ণনগরে আসিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন, 'দেওয়ান কার্ত্তিকরায়ের গান শুনিবার নিমিত্তই আমি এবার কৃষ্ণনগরে আসিয়াছি।'

কৃষ্ণনগর হইতে মধুসূদনের প্রত্যাগমনকালে নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার বাসভবনে মধুসূদনকে রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। প্রত্যূষে উভয়ে একত্র কলিকাতায় গমনকালে হাঁসখালিতে ঘুমন্ত মাঝিকে জাগাইবার কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে।

শান্তিপুরের গাঙ্গুলীদের মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মধুসূদন শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। একটি দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে রজ্জু বাঁধিয়া কূপ মধ্যে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; অভিপ্রায়—তাহাকে কূপের মধ্যে নামাইয়া কষ্ট দেওয়া। এই বালিকাটিকে মধুসূদন কিয়ৎকাল ধরিয়া জেরা করেন। কিন্তু ঐ কিশোরী বালিকা তাঁহার প্রশ্নসমূহের এমনি সুকৌশলে ধীরে-ধীরে উত্তর দিয়াছিল যে, মধুসূদন তাহাকে হটাইতে না পারিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন 'আমি এতদিন ব্যারিষ্টারী করিতেছি, কিন্তু তোমার মত বুদ্ধিমতী বালিকা কোথাও দেখি নাই। মা তোমার মুখে সরস্বতী বাস করেন।"

উক্ত মামলা শেষ হইয়া গেলে, মধুসূদন যখন গাঙ্গুলী মহাশয়দিগের বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন শান্তিপুর-নিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় পণ্ডিতবর জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় ছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে কাব্যালোচনা আরম্ভ হয়। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় মধুসূদনকে বলেন যে, 'আপনার কাব্য পাঠ করিয়া আমরা তাদৃশ রসানুভব করিতে পারি না।' * এই কথা শুনিয়া মধুসূদন বলেন, 'ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই আমার কাব্য পাঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহারা প্রকৃত রসগ্রহণে বঞ্চিত হন।' এই বলিয়া মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ' হইতে তৎক্ষণাৎ কিয়দংশ আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি শেষ হইবামাত্র পণ্ডিত জয়গোপাল উল্লসিত হৃদয়ে মহাকবি মধুসূদনকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; মধুসূদনও সমজদার জয়গোপালকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া গাঢ়তররূপে চাপিয়া ধরিলেন। তৎপরে মধুসূদন আরও কয়েকটি অমিত্রাক্ষর কবিতা আবৃত্তি করিলেন। সেই সময়ে 'কোকিলদূত' রচয়িতা ৺হরিমোহন প্রামাণিক এবং ৺মতিলাল মৈত্র প্রমুখ উপস্থিত সুধীবর্গ সমস্বরে 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া উঠিলেন। জয়গোপাল স্বয়ং তৎক্ষণাৎ মুখে-মুখে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিলেন। শ্লোকের ভাবার্থ এই;—"যিনি স্বয়ং মধু, তিনি যে অমৃত বর্ষণ করিয়া বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে; যাহা শুনিলাম তাহা অপূর্ব্ব! তাহা অমৃত!—অশ্রুতপূর্ব্ব! হৃদয় এখনও পুলকে নাচিয়া উঠিতেছে!" তৎপরে মধুসূদন বলিলেন "গোস্বামী মহাশয়, আপনি এত সহজে যে আমার কাব্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন, ইহাতে আমি আন্তরিক প্রীত হইয়াছি। সাধারণ পণ্ডিতেরা 'অনুষ্টুপ' অথবা পঞ্চটিকা কিম্বা আর্য্যায় কেহ কিছু না লিখিলে তাহাকে কবিতাই বলেন না; কিন্তু আপনি গণ্ডীবদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দলভুক্ত এবং সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী হইয়াও যে অমিত্রাক্ষর কবিতায় প্রীত হইয়াছেন, ইহাতে আমি নিরতিশয় সুখী হইয়াছি।"

এই কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গে জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় মধুসূদনকে বলিলেন "আপনার কাব্যে 'কুরঙ্গিনী' 'বারুনী' প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাকরণদুষ্ট পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলি পরিবর্জ্জিত হইলে কাব্যখানি শ্যামিকাহীন স্বর্ণের ন্যায় মনোহর হইত।" একটু নীরব থাকিয়া মধুসূদন বলিলেন, "গোস্বামীজি! আপনি রসজ্ঞ ও কাব্যামোদী; আমার 'কুরঙ্গিনী' শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ স্থলে অন্য শব্দ বসান দেখি।" কবি হরিমোহন ও পণ্ডিত জয়গোপাল 'অমর,' 'মেদিনী' 'ব্যাড়ী' ও 'হেমচন্দ্র' প্রভৃতি আভিধানিকদিগের শব্দসমষ্টি হইতে অনেক শব্দের অবতারণা করিয়া মনোমত কোন শব্দই নির্ব্বাচিত করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন, "আপনি যে শব্দপুষ্পে কবিতামালা গাঁথিয়াছেন, এই 'কুরঙ্গিনী' পুষ্পটি ঐ মালারই যোগ্য। আমরা দুইজনে অনেক শব্দ ঐ স্থলে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বসাইতে গিয়া দেখি, কোনটিতেই মাধুর্য্য-রক্ষা হয় না। ভাবই কবিতার প্রাণ, ভাষা ইহার পরিচ্ছদ মাত্র। আগ্রার তাজমহলের রত্নলতিকা হইতে কোন রত্ন উন্মূলিত করিয়া তাহার স্থলে অন্য রত্ন বিন্যস্ত করিলে যেমন তাহার সৌন্দর্য্য থাকে না, তেমনই আপনার কবিতা হইতে কোন শব্দ অপসারিত করিয়া তৎস্থলে অন্য শব্দের সন্নিবেশেও উহাকে শ্রীভ্রষ্ট করা হয় মাত্র।" সেই সময় হরিমোহন বলিলেন, "কবিবর! বলিতে কি, কবিতার

---

* ইতিপূর্ব্বে মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হইলে ৺জয়গোপাল গোস্বামী, 'সোয়ান পক্ষী' নাম দিয়া উক্তকাব্যের প্রতিকূল সমালোচনা করেন।

লালিত্য রক্ষা করিতে গিয়া কালিদাসও 'ত্র্যম্বকে'র স্থলে একস্থানে 'ত্রিয়ম্বক' ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

এস্থলে বলিলে বোধ হয় পুনরুক্তি-দোষে দূষিত হইব না যে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রামগতি ন্যায়রত্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রমুখ দেশপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতবর্গ প্রথমে কেহই মধুসূদনের রচিত নাটকের কি কাব্যের প্রতি অনুরক্ত হন নাই। শেষে উহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া অনেকে মধুর পক্ষপাতী হইলেন; অনেকে গুণ বুঝিয়াও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী বশতঃ 'পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ' অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মর্ম্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন! মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন অমিত্র-ছন্দকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন;—

"নব্যাং মধুধ্বনিসুসজ্জিত পাদযুগ্মাং
বিজ্ঞায় বঙ্গকবিতাং নবাসভাসেব্যাম্।
একত্র নূপুরমিতাং বলয়ং পরত্র
পাদে চ নর্ত্তনবতীং সুবতিং স্মরামি॥"

সেই সময়ে কোন কোন কবি সংস্কৃতছন্দে বাঙ্গালা কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! মধুসূদন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে লিখিয়াছিলেন;—

দেবদানবীয়ম্
মহাকাব্য
প্রথমসর্গঃ

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ দেবি!
কহো কি ছন্দো মনানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো;
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহো জননী গো, ঢালি এ পেটে।

যাহা হউক, মধুপ্রবাহে গৌড়ীয় কাব্যোদ্যান এক্ষণে রৌদ্রদীপ্ত বৈশাখের স্বর্ণোজ্জ্বল আম্রমঞ্জরীর প্রাণহরা সুবাসের ন্যায় দিগ্‌দেশ আমোদিত করিতেছে! প্রকৃত গুণবান্ কবিগণ জীবিতাবস্থায় প্রায়ই অনাদৃত হইয়া থাকেন; যথার্থ গুণীর গুণরাশি, যত দিন অতিবাহিত হয়, ততই লোকে বুঝিতে পারে। মধুসূদন এ সম্বন্ধে একটি কবিতা অনেকদিন পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাটি সম্ভবতঃ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচিত হইবারও পূর্ব্বে রচিত। পাঠক, ইহার এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, হাড়গোড়-ভাঙ্গা অদ্ভুত ভাষা দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন। ইহা ঠিক যেন খনি হইতে উত্তোলিত একখণ্ড অকর্ত্তিত অমসৃণ প্রস্তরখণ্ড। পাঠ করিলে হৃদয়ে কেমন এক বিচিত্র ভাবের উদয় এবং কৌতুক অনুভূত হয়, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উরূপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভাকালে জন্ম তার) যথা
অমৃত-সাগরতলে। কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছুকাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে; কহিল
এ-নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"
আমাদের বাল্মীকির এ দশা; কে জানে,
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি।

কবিতাটি তেজোময়ী, প্রাণস্পর্শী, কিন্তু অষ্টাবক্র মুনির ন্যায় বিকলাঙ্গী!

বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ-রচয়িতা, নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন যখন মফস্বল হইতে বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় অধ্যয়নের নিমিত্ত আগমন করেন, তখন তাঁহার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কাযেই তাঁহাকে কয়েকটি ভদ্রব্যক্তির নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইতে হইয়াছিল। তিনি মধুসূদনের নিকটেও গিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু লিখিতে অনুরোধ করায়, তিনি আমাদিগকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"প্রাণপ্রতিম নগেন্দ্রবাবু! আপনি আমার নিকট

জগদ্বরেণ্য মাইকেল মধুসূদনের জীবনী বিষয়ে কিছু জানিতে চাওয়ায়, আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা লিখিলাম।

* * * * *

"পাঠ্যাবস্থায় ৬৲ টাকা বৃত্তিতে আমার কিছুতেই খরচ কুলাইত না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ঐ সময়ে মানবদেবতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঠন্ঠনিয়াতে রাস্তার পশ্চিমধারে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে কার্য্যালয় ছিল। আমি প্রথমতঃ তাঁহার নিকট যাইয়া পুস্তক-ক্রয়ের জন্য সাহায্য গ্রহণ করি। ঐ সময়ে পূজনীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। তিনি সংস্কৃত-কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনিও আমাকে অতি স্নেহের সহিত তাঁহার প্রণীত বীজগণিত ও পাটীগণিত প্রদান করেন।

"তৎপরে আমি একখানি রঘুবংশের জন্য প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করি। ঐ সময় খুব সম্ভব হুইলার সাহেব তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থী ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন যে, 'কেন তুমি ভিক্ষা কর? খৃষ্টান হও, সকল সাহায্য পাইবে, অন্যথা তোমাকে পুলিসে দিব।' আমি তাঁহার খৃষ্টানোচিত সাধু ব্যবহারে মনে মনে হাসিয়া শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলাম। তখন তিনি কেবল নূতন সিবিলিয়ান হইয়া বম্বেতে কার্য্য করিতেছেন। আমি বাঙ্গালা পাঠশালার পণ্ডিত ৺নীলকমল ঘোষাল মহাশয়ের একটী পুত্রবধূ ঠাকুর-বাড়ীর শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীদেবীকে (সত্যেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ ভগিনী) পড়াইতাম। সত্যেন্দ্রবাবু তখন নবীন যুবক। তিনি আমাকে জেলে না পাঠাইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে চারিটি টাকা দিলেন। এ কথা এখন তাঁহার মনে নাই, কিন্তু আমার সেই শেষদিন পর্য্যন্ত মনে থাকিবে।

"ঐ সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও বিলাত হইতে দেশে আগমন করিয়াছেন। আমার অবস্থার কথা শুনিয়া তিনিও আমাকে কিছু অর্থসাহায্য করেন।

"যাহা হউক, অতঃপর আমাকে মেঘনাদবধ কাব্যের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিকট যাইতে হইল। তখন তিনি হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী অথবা লাট-ভবনের পশ্চিমদিকে এস্পেন্সেস্ হোটেলের দ্বিতলে বাস করিতেন। দ্বারবান আমার কথা জানাইলে সহৃদয়, প্রকৃত-মনুষ্য মাইকেল আমাকে ডাকাইলেন। আমি যাইয়া নমস্কার করিলে, তিনি আমার সহিত প্রায় একঘণ্টা বিশ্রাম্ভালাপ-সংলাপ করিলেন।

"তখন তাঁহার বয়স ৪২ কি ৪৩ বৎসর; চক্ষু আকর্ণ-বিশ্রান্ত, নাসিকা অত্যুন্নত ও সুগঠিত; মুখমণ্ডলে লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে ও তাহাতে প্রতিভা যেন খেলা করিতেছে। মুখে হাসি যেন লাগিয়াই আছে। অহঙ্কার নাই, দম্ভ নাই, গর্ব্ব নাই। আমি এ জীবনে মাইকেলের সে মধুরাকৃতি আর ভুলিতে পারিব না। লোকে কালবর্ণের প্রতি অরুচি প্রদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু কাল না হইয়া শুভ্রবর্ণ হইলে মাইকেলের মুখের সে ছটাই আর একরকম হইয়া যাইত। স্বয়ং কন্দর্প কালো ছিলেন, তৎপিতা কৃষ্ণও কালো ছিলেন। কালোতেই মাইকেলকে যে কি মানাইয়াছিল, তাহা অন্যের বুঝিবার অধিকার নাই।

"মাইকেলের বর্ণ কালো ছিল, কিন্তু মনটা বাঁড়ুযো মহাশয়ের ন্যায় কালো ছিল না। সেটা নিষ্কলঙ্ক শারদ শশীর ন্যায় ধপ্‌ধপে ছিল। তিনি আমার যশোহরে বাড়ী শুনিয়া যেন কত আনন্দ অনুভব করিলেন, এবং আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তখনই আমাকে নগদ ১০টি টাকা দিলেন, ও বহুবাজারস্থ ষ্ট্যান্‌হোপ্ প্রেসের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট আমাকে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থগুলি দানের এক পত্র দিলেন; এবং বলিয়া দিলেন 'তুমি অবসর পাইলেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।' আমি তাঁহার নিকট বহু অর্থ-সাহায্য পাইয়াছিলাম; তিনি সাহায্য না করিলে আমার পড়াই চলিত না।

"অতঃপর আর একদিন আমার সহাধ্যায়ী ৺ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে মাইকেল তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ভগবান আমা হইতে ২।৩ বৎসরের ছোট ছিলেন। তাহাতে তাঁহার মুখের গড়ন ও গায়ের রঙ্ বড়ই সুন্দর ছিল। মাইকেল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি আমার ভার্স বুঝিতে পার? ভাল ভার্স খুব মন দিয়া পড়িও।' ইহা বলিয়া তাঁহার গায় হাত বুলাইয়া কত আদর করিতে লাগিলেন।

"একদিন আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি লোক টাকার তাগাদা করিতে আসিলেন। পরে জানিলাম,

তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠাইয়াছেন। মাইকেল তখন রিক্তহস্ত। তিনি মনোবলে বলীয়ান্ ও প্রকৃত ধনী হইলেও বিমাতা লক্ষ্মীদেবী তাঁহার প্রতি চিরকাল প্রতিকূল ছিলেন। তিনি অতি নম্রভাবে বলিলেন, 'কেন আমাকে আপনারা লজ্জা দেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, কিন্তু এখন আমার হাত সম্পূর্ণ রিক্ত।' মাইকেল এই রিক্ত অবস্থাতেও আমাকে প্রসন্ন হৃদয়ে সাহায্য-দান করিতেন; এবং যখন ভগবান বাবুর নিকট জানিলেন যে, আমি শ্রেণীর প্রথম বালক, তখন অবধি তিনি আমার প্রতি আরও অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"বঙ্গদেশের অতি দুর্ভাগ্য যে, মাইকেল অকালে কাল-কবলে পতিত হয়েন। অবশ্য বিলাতী সভ্যতার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মৃত্যুর পর সকলে শোকসভা করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের শ্মশান-স্তম্ভ সোণা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিলে তিনি সুদীন বঙ্গভাষাকে আরও কত রত্নালঙ্কারে সুশোভিত করিয়া যাইতে পারিতেন। ফলতঃ বঙ্গদেশে তিনিই একমাত্র প্রকৃত মহাকবি ছিলেন। আর এ বঙ্গদেশে কালিদাস ও জয়দেব ফিরিয়া আসিবেন না; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস এবং প্রকৃত মহাকবি মহামনা মাইকেলও আর এ হতভাগ্য দেশে পুনরাবির্ভূত হইবেন না।

* * * *

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি!

হে বঙ্গবাসিন্! কালিদাস মরেন নাই! মাইকেলও শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন।

ভবদীয়

(স্বাঃ) শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।"

কালে মধুসূদন শিক্ষিত-সমাজে কিরূপ বরণীয় ও সমাদৃত হইয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজি কবিতাটি পাঠে পাঠক অবগত হইবেন। মনস্বীই মনস্বীকে চিনিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূদেব, বঙ্কিম, ও রমেশ এই ত্রয়ী সাহিত্যাধিপ তাঁহার প্রতিভার যথার্থ গৌরব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এ যুগেও সে গৌরব তেমনই অটুট রহিয়াছে।

MODHU SOUDAN DUTT.

Poet, who first with skill inspired did teach
Greatness to our divine Bengali speech,—
Divine, but rather with delightful moan
Spring's golden mother makes when twin alone

She lies with golden love and heaven's birds
Call hymeneal with enchanting words
Over their passionate faces, rather these
Than with the calm and grandiose melodies
(Such calm as consciousness of godhead owns)

The high gods speak upon their ivory thrones
Sitting in council high,—till taught by thee
Fragrance and noise of the world shaking sea,

Thus do they praise thee who amazed espy
Thy winged epic and hear the arrows cry
And journeyings of alarmed gods; and due
The praise, since with great verse and numbers new

Thou mad'st her godlike who was only fair
And yet my heart more perfectly ensnare
Thy soft impassioned flutes and more thy muse

To wander in the honied mouths doth choose
Than courts of kings, with Sita in the grove
Of happy blossoms, (O musical voice of love
Murmuring sweet words with sweeter sobs between!)

With Shourpa in the Vindhyan forests green
Laying her wonderful heart upon the sod
Made holy by the well-loved feet that trod
Its vocal shades; and more unearthly bright

'Thy jewelled songs made of relucent light
Wherein the birds of spring and summer and all flowers
And murmuring waters flow her widowed hours
Making melodious who divinely loved,
No human hands such notes ambrosial moved;
These accents are not of the imperfect earth;
Rather the God was voiceful in their birth,
The God himself of the enchanting flute,
The God himself took up thy pen and wrote.

('*Songs to Myrtilla, and other poems*'
—*by Aurobind Ghosh.*)

ফলিত-জ্যোতিষ*

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ]

আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তাহা পদার্থ নহে। বোধোদয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রথম প্রভাতে এ সকল পদার্থ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু এখন, জ্ঞানের অপরাহ্ণ বেলায় সে সবই অপদার্থ, তুমি আমি সব। ন্যায়শাস্ত্রের সপ্ত পদার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্টাইয়া দিলেন; আর আমরা বিদ্যাসাগরী ব্যবস্থা রদ করিয়া বলি, পদার্থ বড়ই বিরল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া শেষে বলিয়াছিলেন, চেতন পদার্থের সাধারণ নাম "জন্তু।" এরূপ স্পষ্টবাদিতা দুর্লভ!

বস্তুতঃ 'পদার্থ' আজকাল উভিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। পদার্থবিদ্যায় আমরা 'পদার্থ' 'পদার্থ' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি। "কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বল্‌তে হবে।" আপনারাই বলুন না, সে পদার্থ নিতান্ত জড়, একঘেয়ে, আড়ষ্ট নহে কি? তবে আর অপদার্থ হইতে বাকি রহিল কি?

ফলিত-জ্যোতিষের গোড়ার কথাটি এই যে, পদার্থ নাই, —শুধু ছায়াবাজি। বায়স্কোপের পটে যেমন। ছায়া দেখিয়া আমরা ভাবি পদার্থ, কিন্তু কোথায় বা পদ, কোথায় বা অর্থ? সকলেই "পদ" আর "অর্থ" খুঁজিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চষিয়া ফেলিবার জোগাড় করে। এত যে শ্রম, এত যে মারামারি-কাটাকাটি, কিসের জন্য? 'পদ' আর 'অর্থ' চাই। পদ হইলেই অর্থ আসে শুনিয়াছি, এবং অর্থ হইলে পদ গজায়; কিন্তু পদ ও অর্থ কতক হইলেও আমরা আরও অপদার্থ হইয়া পড়ি। ব্যাকরণ এখানে হারি মানে। সন্ধির সূত্রের মাঝখান থেকে পদার্থের পূর্বে কোথা হইতে যে একটি স্বরে 'অ'র আগম হয়, বুঝা যায় না।

"ফলেন পরিচীয়তে" বড় খাঁটি কথা। ম্যালেরিয়া সারিবে কি না, তাহা 'ফলেন পরিচীয়তে'; মাঝখান থেকে একটাকা সাড়ে আট আনার কোনও ভুল নাই, কেন না ফলের সঙ্গে পরিচয় পাইতে হইলেই যে মাশুল চাই; পরে সেটা সুফলই হউক আর কু-ফলই হউক। মানুষ যদি ফলের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক কায সফল হইত; কিন্তু তাহা ত পারে না, তাই ফলিত জ্যোতিষ চাই। ফল ফলিবার আগে থেকে তাহার আস্বাদ পাইতে চাই, যদি কোনও রকমে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় ব্যূহ ভেদ করিয়া দূরচক্রবালের নিম্নে ভবিষ্যতের কুঠরীতে কি রহস্য আছে, তাহা একবার চট্ করিয়া জানিয়া লইতে পারি। এই দুরাশা! করকোষ্ঠী, কপালরেখা, প্রভৃতি দেখিয়া, খড়িপাতি জুড়িয়া, খাঁ করিয়া ভবিষ্যতের ভাণ্ডার লুটিয়া আনিবার যে ব্যবস্থা, তাহারই নাম ফলিত-জ্যোতিষ।

কিন্তু এ ফলিত-জ্যোতিষ আজকাল আর বড় ফলে না। আগে এক-পোয়া আতপ চাউল, এক-ছটাক ঘি ও পাঁচটি পয়সা দৈবজ্ঞ ঠাকুরের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ট্যাঁকে গুঁজিয়া দিতে পারিলে, অনেক জিনিষ ফলিত। আজকাল এ সব

* 'দীন ধামে' পূর্ণিমা-সম্মিলনে পঠিত।

বুজরুকী আর চলে না। সেই জন্য আমি বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ফলিত-জ্যোতিষের একটি পরিবর্জ্জিত, পরিমার্জ্জিত, ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টায় আছি; তাহারই ভূমিকামাত্র আপনাদের সমীপে পেশ করিতেছি। ফলিত-জ্যোতিষে সংখ্যা-গণিত, বীজ-গণিত, অঙ্কুর-গণিত ইত্যাদি অগণিত প্রকারের গণিত লাগে। আমার এই জ্যোতিষ-তত্ত্বের জন্য একটু রসায়ন লাগে মাত্র,—সে রসায়নও আপনারা যোগ করিয়া লইবেন।

রাস্তায় কত লোকই চলে; লোক চলিতে-চলিতে, রাস্তাও যেন চলিতে আরম্ভ করে;—বিরাম নাই, শ্রান্তি নাই, পথ যেন ক্রমাগতই চলিয়াছে। চারিদিকের সুপ্ত বিশ্বের বুকের উপর দিয়া বেচারা পথ যেন পথের খোঁজে অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। যদি কেহ পথের সঙ্গে না ছুটিয়া, পথের ধারে বসিয়া একবার চলন্ত পথের সজীবতার প্রতি চুদণ্ড চাহিয়া থাকে, তবে ফলিত-জ্যোতিষের অনেক তত্ত্বই সে মুখস্থ করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু সকলেই পথের পথিক, পথের সঙ্গে চলে,—বসিবার সময় কাহারও বড় নাই। থিয়েটার কি সার্কাসে লোক যায় থিয়েটার বা সার্কাস দেখিতে,—সময় সময় নাক ডাকিয়া ঘুমাইতে। কিন্তু কেহ যদি থিয়েটার না দেখিয়া যাহারা থিয়েটার দেখিতে যায়, তাহাদের একটু দেখে, একটু তাহাদের দিকে নজর রাখে, তবে ফলিত-জ্যোতিষ সহজেই তাহার করায়ত্ত হইয়া পড়ে। শুধু একটু থেমে,—একটু ধীরে!

আজ এই পূর্ণিমা-সম্মিলনে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের অপাঙ্গদৃষ্টি ঐ কক্ষটির দিকে চকিতে একবার যাচাই করিয়া আসিতেছে। ফলিত-জ্যোতিষ গণিয়া বলিতেছে যে, ঐ কক্ষটিতে ঈশানকোণে কোনও কাষ্ঠাসনের উপরে বা নিম্নে, মৃৎপাত্রে বা কদলীপত্রে অথবা উভয়ত্র ভোজনযোগ্য সুস্বাদু অথচ প্রচুর কোনও মিষ্ট বা লবণাক্ত দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। 'দীনধামে' পূর্ণিমা-সম্মিলনের নামে যে অনেকের রসনা আর্দ্র হইয়া উঠে, ইহাও ফলিত-জ্যোতিষ। তাহা না হইলে, লোকের অনুমান সত্য হয় কেন?

গুরুঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া যখন আশীর্ব্বাদের ঘটা বাড়াইয়া দেন, তখন বুঝিতে হইবে যে বার্ষিকের দরুণ এক টাকায় এবার কুলাইতেছে না। আর হরিদাস পাল মহাশয় যখন চাঁদার খাতায় অম্লানবদনে বিশহাজার টাকা সহী করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার মস্তকের উপর রায়-বাহাদুরী ছত্র ঝুলিতেছে, নিশ্চয়। কোনও Public-meetingএ যখন দেখিবেন, যে একজন হয় ত চেয়ারে বসিয়া শয্যাকণ্ঠক-গ্রস্ত রোগীর মত ছট্‌ফট করিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে যে, তিনি একটুখানি ফুরসুদ পাইলেই ঝাঁ করিয়া উঠিয়াই বক্তৃতা করিতে লাগিয়া যাইবেন; এবং দেখিতে পাইবেন যে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সজোর করতালি যতই প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারের সূচনা করিতেছে, ততই দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তিনি তাঁহার নিরুদ্ধ বক্তৃতার স্রোত ছাড়িয়া দিতেছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র বলে, ইহাঁদের গ্রহের শান্তি করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সবই ছায়াবাজি; এই ছায়াবাজিতে বড় ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। কিছুই ঠিক করিবার যো নাই। কাহারও নিকটে আপনি হয় ত পরামর্শের জন্য গেলেন; আপনি মহা সমস্যায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া একান্ত আগ্রহের সহিত তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি তখন গণিয়া ঠাহর করিতেছেন যে কোন্ পরামর্শটি আপনার সংকল্পের অনুকূল, প্রতিকূল হইলে পাছে আপনি পরামর্শটি প্রত্যাখ্যান করেন,এই তাঁহার মনে ভয়। Delphic Oracle এর মত পরামর্শই আজকাল পাওয়া যায়, খাঁটি পরামর্শ মিলে না। সংসারের তাড়নায় আপনি যখন একটু শান্তির আশায় কোনও সদাশয় ব্যক্তির সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, তখন সেখানে গিয়া শুধু কথামালা বা হিতোপদেশের গল্প শুনিয়া আপনাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি এমন মুখোস পরিয়া রহিলেন, এমন সব আত্মবিজ্ঞাপন তিনি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সঙ্গসুখের লালসা, প্রাণের যোগের আশা কোথায় বাষ্প হইয়া মিলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা নাই। মানুষ যদি এই মুখোস ত্যাগ করিয়া, এই পোষাকী ব্যবহার দূরে রাখিয়া, একবার যদি মনে-মনে প্রাণে-প্রাণে মিশিতে পারিত!

ফলিত-জ্যোতিষ এই মুখোসের অন্তরাল থেকে, পোষাকী পরিচ্ছদের ভিতর থেকে, আসল জিনিষটা—তা পদার্থই হউক, আর অপদার্থই হউক—টানিয়া আনিবার চেষ্টা করে। আমার বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার-বন্ধু যখন পোষাকের বাহার দিয়া, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া,

পৃথিবীকে গণিয়া-গণিয়া পদাঘাত করিতে-করিতে চলিয়া যান, তখন বুঝিতে পারি যে, তিনি চটক দিয়া চুম্বকের মত পয়সাকে আকর্ষণ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু পয়সা যে তামা, লোহা ত নয়! পয়সা ধরিতে চুম্বক চাহি না, পসার চাই; চা'লের পশরা কতক্ষণ বহা চলে? ডাক্তার যখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া motor কিনিয়া বসিলেন, এবং ডবল ফি হাঁকিয়া বসিলেন, তখন আশা হইল যে এইবার পশার হইলেও হইতে পারে। সব মিথ্যা, সব ভেল্কী!

যেখানে আবার বিনয়ের ছায়াবাজি আছে, সেখানে, জ্যোতিষী, সাবধান! আজকাল সমাজই বল, সাহিত্যই বল, বিনয়ের আবরণে একেবারে পানা-পুকুরের মত হইয়া পড়িয়াছে। ভিতরে জল আছে কি পাঁক আছে, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কতকাল নরনারী যে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। বিনয় যে সভ্যতা। সভ্যতা দিয়া আমরা কেবল আসল জিনিষকে চাপা দিতেই শিখিয়াছি। বিনয় যে সৌজন্য, সৌজন্যের পাষাণ-চাপে, ভিতরের অঙ্কুরগুলি নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া গেল যে! গান করিতে বলিলে বিনয়, বক্তৃতা করিতে বলিলে বিনয়, আহারে বসিলে বিনয়, রাস্তায় দেখা হইলে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী অভিনয়ের সঙ্গে বিনয়,—বিনয়ে বিনয়ে অস্থির! আজকাল অনেক বক্তৃতার ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে হয় উপসংহার হইতে; কারণ আগাগোড়াই প্রায় বিনয়ে আচ্ছন্ন থাকে। যারা গান গায়িতে পারেন, তাঁদের বিনয় ত প্রসিদ্ধ। প্রথমেই ত বলিয়া বসেন, যে গান গায়িতে জানেন না; তারপর অনেক সাধ্য-সাধনার পর যদি বা গান গায়িতে রাজি হইলেন, তখন বিনয়ের ঝোঁকে নানাবিধ কসরৎ করিয়া গানের যে সরল শুভ্র উদারতা, তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া বসিলেন! তবে বিনয় দেখিলেই যে গায়ক অনুমান করিতে হইবে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এমন কথা কখনও বলে না। আপনারা দেখিয়া থাকিবেন, রাস্তায় চলিতে-চলিতে কতকগুলি লোক জ্বরগ্রস্ত ভালুকের মত কম্পিত, অনুনাসিক সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়াছেন; তাঁহারা সব সময়ে যে গায়ক, তাহা নহে, তবে হইতেও পারেন। সেই রকম, ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরে যাঁহারা অনর্গল আবৃত্তি করিতে-করিতে গৃহকর্ম্মের তাড়নায় বাজার করিতে চলিয়াছেন, তাঁহারও যে একজন মস্ত actor, এমন কথা জ্যোতিষ বলে না। তবে হইতেও পারেন, কিছুই বলা যায় না।

ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, "রোগটা একটু কঠিন বটে; তা' আস্তে আস্তে, অবশ্য ভগবানের ইচ্ছায়, ভাল হয়ে যাবে। আজ ত ঐ রকম ব্যবস্থা চলুক, কাল আবার ত আস্‌ছি,—দেখা যাক।" তাঁহার ললাটের রেখা, ফিয়ের জন্য হস্তের ব্যগ্রতা এবং নাড়ী ছাড়িয়া গাড়ীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি, ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তবে রোগীর প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিবেন।

মাষ্টার মহাশয় অবশ্য নিরীহ, ভাল-মানুষ, পণ্ডিত, আজ বোঝ গোছের লোক, এটা চিরকালই জানা আছে। ছেলেরা ভাবে, মাষ্টার পড়িতে-পড়িতে, আর সব ভুলিয়া মারিয়া দিয়াছে। জগৎ ভাবে, উহাদের যেতে দাও, ওরা গো বেচারী। কিন্তু জ্যোতিষ বলে, সাবধান! মাঝে-মাঝে বর্ণচোরা আম ত আছে; আগে ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া, তবে সিদ্ধান্তটা আঁটিও। জগৎ যাহা ভাবে, ছেলেরা যাহা ভাবে, মাষ্টারেরা তাহারই সাজ পরিয়া বসিয়া থাকে,—গম্ভীর, জড়, নিরুপায়! যদি এই সাজা পোষাক ফেলিয়া কেহ-কেহ একটু বাহিরে আসিয়া দুনিয়াদারীর সন্ধানটা দেখিয়া লইতে চাহে, তবে, দোহাই তোমাদের, তাহাকে যেন ভুল বুঝিও না।

ভবের বাজারে জিনিষ চিনিবার উপায় নাই; তাই একটু আধটু জ্যোতিষ চাই বই কি? এ বাজারে ত জিনিসের কেনা-বেচা হয় না, কেনা বেচা হয় বিজ্ঞাপনের। মাসিকে, সাপ্তাহিকে, পঞ্জিকায়, প্রাচীরে, পুস্তকে, প্লাকার্ডে, ট্রামে, বায়স্কোপে—কেবল বিজ্ঞাপন। এই কৃষি-প্রধান দেশে ধানের চাষ, পাটের চাষে যাহা না ফলে তাহা বিজ্ঞাপনের চাষে ফলে। কিন্তু মজা এই, সকলেই বলে—বিজ্ঞাপনে ভুলিবেন না। সকলেই বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরকে ঘৃণা করেন; তবুও কিন্তু বিজ্ঞাপন কমে না, বিজ্ঞাপনের হার কমে না। বিজ্ঞাপনের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। বিজ্ঞাপনের খাতিরে কত মাটী সোণার দরে বিকাইয়া যায়। দেশের পচা তৈল একটু বিলাতী এসেন্স মাখিয়া সুন্দরী ললনাগণের মাথায় উঠিয়া বসিয়াছে। কেবল বলিতে পারিলে হইল, কাশ্মীরের কুসুম, জাপানের প্রস্ফুটিত শকুরা-পুষ্প এবং সিরাজি-গোলাব চয়ন করিয়া তাহার নির্য্যাস হইতে

আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তিতে প্রস্তুত। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে সময়ে-সময়ে ভাষার চটুলতায় অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি বাহির হইয়া পড়ে। আমার বোধ হয়, যাহারা এই সব বিজ্ঞাপন লেখে, পরে তাহারা হয় actor না হয় নাট্যকার হইয়া উঠে। যাহা হউক, এই সকল বিজ্ঞাপনের বহর দেখিয়া কোনও পদার্থেরই খোজও পাওয়া যায় না,—সব অপদার্থ, সব বিড়ম্বনা!

আপনারা, যাহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ আমার এই ফলিত-জ্যোতিষ শ্রবণ করিলেন, হরপার্ব্বতীর কৃপায় ইহকালে অর্থ ও পরকালে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আপনারা শুনিয়াছেন কি না, সে কথা আপনারাই ভাল জানেন। আমি চেষ্টা করিলে অবশ্য গণিয়া বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ খরচ আছে। আপনাদের সকলের মুখে একরকম ভাবই প্রকট নহে। কাহারও দৃষ্টি প্রসন্ন, কাহারও উদাসীন; কেহ অবহিত, কেহ অন্যমনস্ক। কেহ শুনিতেছেন, কেহ বা অন্য জিনিষ ভাবিতেছেন; আর আমি—আমি যে বাক্য-জাল রচনা করিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে, এই জ্যোৎস্না-পুলকিত সন্ধ্যায়, আপনাদের দুই-চারিটি মুহূর্ত্ত অপহরণ করিতে, ধীরে, সন্তর্পণে, সন্দেহে অগ্রসর হইতেছি, আপনারা যদি ফলিত-জ্যোতিষ জানেন, তাহা হইলে নিশ্চিত বলিতে পারিবেন যে, সে কেবল আপনাদের ঐ ইচ্ছা বা অনিচ্ছার করতালি লাভ করিবার জন্য।

"বায়ু ও তাহার সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ"
প্রবন্ধ-লেখক—
ডাক্তার শ্রীহরিধন দত্ত রায় বাহাদুর

হিমালয়

[শ্রীগণেশচন্দ্র রায়]

গতিহীন বাক্যহীন অতীতের চিরসাক্ষী তুমি
মেলিয়া করুণদৃষ্টি ভগ্নহৃদে ভারতের পানে
চাহিয়া দেখি'ছ কিবা?—শৃঙ্গ তব নীলাম্বর চুমি'—
হৃতশক্তি দৈত্য যেন হাহাকারে ফেটে মরে প্রাণে!
অন্তর-নিহিত তব যত গুপ্ত ক্ষুব্ধ শোকরাশি
মহাশূন্যে ঢালে ও'র হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
নির্ঝরের কলশব্দ বায়ুভরে শূন্য বনে আসি
ঝঙ্কারি করুণ গীতি কাঁদিয়া সে ভ্রমে বারমাস।
তব ক্রোড়ে একদিন উঠেছিল যে গম্ভীর-ধ্বনি
গেয়েছিল ঋষিকুল সম্মিলিত স্বরে সামগান;
সে গীতের শেষ রেখা বক্ষে লয়ে ছুটেনা তটিনী?
গাহে না কি গিরিনদী অতীতের সে গৌরবতান?
বক্ষ তব একদিন ছেয়েছিল সহস্র-তাপস,
করেছিল পরিপূর্ণ তোমার এ নির্জ্জন আলয়,
ভেঙ্গেছে সে স্বপ্নময় গর্ব্বময় তোমার হরষ,
তাই স্তব্ধ ভগ্ন প্রাণে দাঁড়াইয়া আছ হিমালয়?
সভ্যতায় গরীয়সী ছিল কভু এ ভারতভূমি,
বিজ্ঞানে, দর্শনে, সত্যে অগ্রগণ্য পৃথিবী-মাঝারে,
হেরি' তা'র হীনদশা ভারতের চিরবন্ধু তুমি,
দাঁড়াইয়া বাক্যহীন—প্রাণ কাঁদে রুদ্ধ হাহাকারে!

রঙ্গ-চিত্র

ডাক্তার

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-বি]

আমি স্বাধীন ব্যবসা করবো ভাবিনু,
চাকরী করেই দিন কাটে।
আমি মোটর চড়বো মনে ছিল আশা,
হেঁটে মরি শেষে গ্রাম বাটে।

ডাক্তার

আমি ভেবেছিনু বড় Surgeon বলে
করব নিজের নাম জারী,
হায় তখন ভাবিনি রৈবে আমার
কাগজে, কলমে Surgery.
সব রোগ সারাইতে নিজের পটুতা
রটাতে হাজার বোল ফোটে,
শুধু হাঁপানি রোগীর দম ফুলে যাওয়া
ছুটাতে নিজের দম ছোটে।
আমি Diagnosis এ সিদ্ধ হস্ত
এ কথা বলবো দিবস রাত,
শুধু জ্বরের কারণ জিজ্ঞাস যদি
তবেই মাথায় বজ্রাঘাত।
আমি ভাবিনু দিনদিন ডাক্তারী বাড়ে
মোর নাম রবে গ্রাম ছেয়ে,
হায় শেষে এ কি দেখি? আছে পদীপিসী
তারে মানে লোকে সব চেয়ে।
যদি আমি দিই জ্বরে কুইনিন, আর
পদীপিসী বলে "সর্ব্বনাশ।"
তবে M. B.র মোহ অমনি যে কাটে
ফিরে আসি ঘরে হতাশ্বাস।
জানি ঘরে ঘরে মোর আদর, কেবল
ভিজিট চাইলে পাই তাড়া।
আমি Call Call ব'লে ফুকারি বেড়াই,
মেলে না Nature's Call ছাড়া।
তাই বিষ হয়ে গেছে বিশ্বজগৎ,
তেত হয়ে গেছে দিন ক'টা।
তাই ছুঁড়ে ফেলে দিছি সোলা-Hat খানা,
ছেড়ে দিছি Necktie ঘটা।
আমি Research করবো, মনে ভাবি হব—
বাংলা দেশের মেচ্‌নিকফ্,
হায় কখন তা করি লাগাই যে আছে
ছেলের colic, মেয়ের Cough.

বীরভূমের কথা

[শ্রীজলধর সেন]
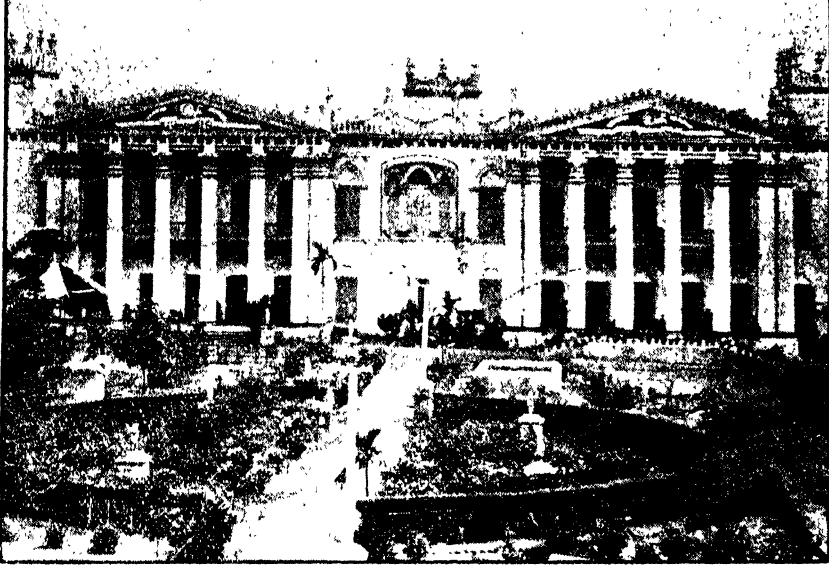
হেতমপুর—রঞ্জন-প্রাসাদ
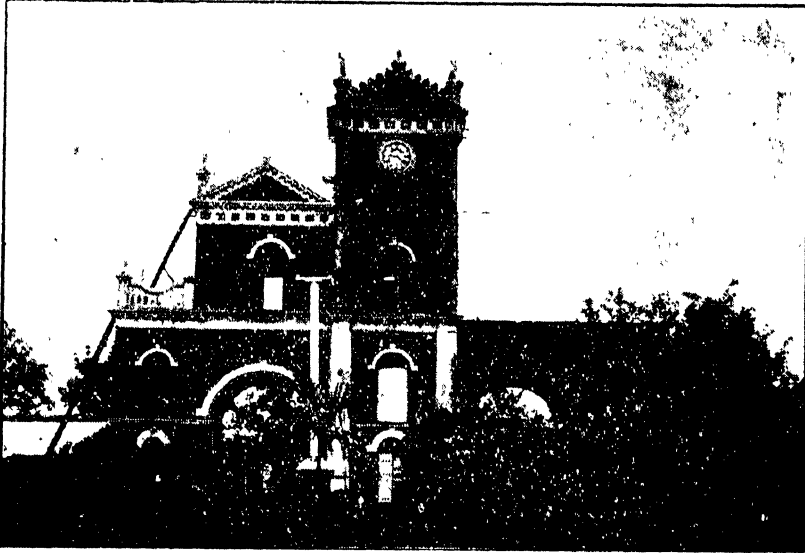
হেতমপুর—রঞ্জন-প্রাসাদের তোরণ

অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে, 'গীতগোবিন্দের' অমর কবি জয়দেবের পবিত্র ভূমি কেন্দুবিল্ব একবার দেখিব; কিন্তু এতকালের মধ্যে সে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এইবার পৌষ-সংক্রান্তিতে জয়দেবের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। হেতমপুরের মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত মহিমা-নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সস্নেহ আহ্বানে এক যাত্রায় অনেক কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়াছি,—অনেক দিনের অনেক আশা পূর্ণ হইয়াছে। মহারাজ-কুমারের ঐকান্তিক

হেতমপুর— কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

কেন্দুবিল্ব— শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের মন্দির

যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অর্থানুকূল্যে 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তাহার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে হেতমপুরে গিয়াছিলাম এবং সেই সুযোগে জয়দেবের মেলা ও সুপ্রসিদ্ধ বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনেরও সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ যদি অভয় প্রদান করেন, তাহা হইলে বীরভূমে যাহা যাহা দেখিয়া-শুনিয়া আসিয়াছি, তাহার একটা যৎসামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করি। এ কথা কিন্তু এখানেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের গা ঘেঁসিয়াও যাইব না—সে অনধিকারচর্চ্চা করিয়া তীব্র উপহাস ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয়ীভূত হইবার সাধ আর নাই। আর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,—রাম কহ—পূর্ব্বে এবম্বিধ যে দুষ্কর্ম্ম না বুঝিয়া করিয়াছি, তাহারই ফলভোগের জের এখনও চলিতেছে। সে অপরাধের মাত্রা আর বাড়াইয়া কাজ নাই। আমার উদ্দেশ্য—'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠাপূরণ এবং পাঠক-পাঠিকাগণের সহিষ্ণুতার সীমানির্দ্দেশ।

২৯শে পৌষ শনিবার 'বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির' বার্ষিক অধিবেশনের দিন স্থির করিয়া হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিলেন এবং আমাকে হেতমপুর যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পৃথক একখানি পত্রও লিখিলেন। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং ঐতিহাসিক বলিয়া আমি আহূত হই নাই ; আমাকে নিমন্ত্রণ করা স্নেহের আহ্বান। এখনকার দিনে এ আহ্বানও বড় একটা কেহ করে না। সেই কারণেও বটে এবং জয়দেবের মেলা দর্শন করিবার আগ্রহেও বটে, আমি

একটু পরেই পাঁচকড়ি বাবুকে লইয়া প্রাচ্যবিদ্যার আর্বিভাব,—আমরাও নিশ্চিন্ত!

আমাদের এ দলটি বড় সামান্য নয়। সংখ্যায় পাঁচজন হইলে কি হয়;—এই পাঁচের মধ্যে চারিজন যে এক-এক দিক্‌পাল—বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহারথ! এমন সাহিত্যেন্দ্র-সঙ্গমে আমার মত দীনও বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিল। গাড়ীর কক্ষটি আমার সঙ্গী চারিজনের আনন্দোল্লাসে চারি-চৌদ্দ ছাপান্ন জনের স্থান পূরণ করিতে লাগিল। শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ ভায়া একরাশ চিনের বাদাম কিনিয়া, সেই হাবড়া ষ্টেসনেই চর্ব্বণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, আমরাও ভাগ লইলাম। সে সময় আমাদের চিনের বাদাম ও কমলা লেবুর সদ্ব্যবহারের ঘটা দেখিলে কেহই এ কথা বিশ্বাস করিতেন না যে, ঘণ্টা-দেড়েক পূর্ব্বেই আমরা ভাত খাইয়া ষ্টেসনে আসিয়াছি।

একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন গল্প, আর গল্প—হাসি আর তামাসা! শ্রীমান সুরেশ ভায়া নোট-বুক ও পেন্সিল হাতে করিয়া বসিলেন; অভিপ্রায়, পাচকড়ি বাবু কত মজাদার কেচ্ছা করিতে পারেন, তাহার হিসাব রাখিবেন। কিন্তু গাড়ী লিলুয়া ষ্টেসনে পৌছিবার পূর্ব্বেই এত বড় 'সাহিত্য'-সম্পাদক রণে ভঙ্গ দিলেন,—নোটবুক-খানি পকেটে করিলেন।

আমরা যে গাড়ীর আরোহী, তিনি সমস্ত ষ্টেসনেই দাড়াইবেন;—শুধু দাড়াইবেন না—একেবারে হাত-পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবেন। সুতরাং আমরা যখন পাণ্ডুয়া ষ্টেসনে পৌছিলাম, তখন আমাদের একঘণ্টা পরে যে লুপ-লাইনের গাড়ী হাবড়া ছাড়িয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আমাদের পার্শ্বের প্ল্যাটফরমে দাড়াইলেন। আমি বলিলাম যে, আমাদের গাড়ী যে প্রকার গজেন্দ্র-গমনে যাইতেছেন, তাহাতে আমরা যথাসময়ে অণ্ডাল ষ্টেসনে পৌছিতে পারিব না, এবং তাহা হইলে অণ্ডাল হইতে সাঁইতে যাওয়ার গাড়ীও ধরিতে পারিব না। তাহা অপেক্ষা এখানে গাড়ী বদল করিয়া লুপের গাড়ীতে গেলেই ভাল হয়। কিন্তু লুপের গাড়ী আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, পাছে আসিয়া আগে ছাড়িয়া গেল। সুরেশ বাবু বলিলেন "দাদার এ পরামর্শটা আগে দিলেই ভাল হইত, এখন গাড়ী ছাড়িয়া গেলে আর এ পরামর্শের লাভ কি?"—প্রাচ্যবিদ্যা বলিলেন "লুপের গাড়ীতে গেলে সাঁইতে হইয়া দুবরাজপুরে পৌছিতে সেই রাত্রি সাড়ে দশটা, আর অণ্ডাল দিয়া গেলে আটটার মধ্যেই ঠিকানা-দাখিল।" প্রাচ্যবিদ্যা হেতমপুরে অনেকবার গিয়াছেন, আর আমাদের এই প্রথম গমন; এ অবস্থায় তাঁহার অভিজ্ঞতাই মানিয়া লইতে হইল। গাড়ীর বিলম্ব হইতেছে কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ ভায়া টাইম-টেবল ও ঘড়ি খুলিয়া মিলাইয়া

বক্রেশ্বরের অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী

বলিলেন "গাড়ী ত 'লেট' হয়ই নাই, বরঞ্চ একটু আগে-আগেই যাইতেছে। এ অবস্থায় অণ্ডালে গাড়ী 'ফেল' হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই; আমরা অণ্ডালে পৌছিবার আঠারো মিনিট পরে সে ট্রেণ ছাড়িবে। দাদা! কোন ভয় নাই।" এ সব কথা সবিস্তারে কেন বলিতেছি, তাহা পরবর্ত্তী নাস্তানাবুদেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। যাক্, গাড়ী

ত বর্দ্ধমানে পৌছিল। তখন চা ও বর্দ্ধমানের মিহিদানার ভোজ আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর পুত্রবধূ তাঁহার শ্বশুরের জন্য কিছু জলখাবার বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; সেই পুঁটুলি খুলিয়া দেখা গেল যে, তাহাতে তিনচারিজনের মত খাবার রহিয়াছে। সেগুলিও উড়িয়া গেল। তাহার পর গণ্ডা-পাঁচছয় কমলা লেবু! সকলেই যেন পয়সার হরির-লুঠ আরম্ভ করিলেন। আমি বয়সে সকলের বড়—আমি সঙ্গীদিগের এই অমিতব্যয়িতার প্রতিবাদ না করিয়া অম্লানবদনে তাঁহাদের ক্রীত দ্রব্যে সিংহের ভাগ বসাইতে লাগিলাম! প্রকাশ্যে বলিতে সাহসে কুলাইল না, কিন্তু মনে মনে আবৃত্তি করিলাম 'Fools give feasts and wise men eat them' অর্থাৎ বোকারা ভোজের আয়োজন করে, আর বুদ্ধিমানেরা আহার করে।

এই ভাবে আনন্দ করিতে-করিতে ত চলিলাম। কিন্তু কে জানিত যে 'যত হাসি তত কান্না, ব'লে গেছে রাম সন্না' প্রবাদটি একটু পরেই ফলিয়া যাইবে! সন্ধ্যার পর আমাদের গজেন্দ্রগামিনী গাড়ী (অনুপ্রাসের লোভে ব্যাকরণ ভুল হইল না ত!) অণ্ডালে পৌছিল। তখন কুলী ডাকিয়া জিনিসপত্র নামাইয়া সাঁইতের গাড়ীতে যাইবার জন্য কুলীদিগকে বলা হইল। কুলীরা বলিল "সাঁইতেকা গাড়ী রাত চার বাজে ছুটেগা—আবি গাড়ী কাঁহা।" সর্ব্বনাশ! বেটারা বলে কি? আর আঠারো মিনিট পরে যে গাড়ী! কুলীলোক বলিল "উয়ো গাড়ী বন্দ হো গেয়া।" ব্যস্, এই কন্‌কনে শীতে দাঁতে দাঁত লাগিতেছে,—রাত্রি চারটার গাড়ী! একেবারে চক্ষুস্থির! প্রাচ্যবিদ্যা বলিলেন "তাই ত! গাড়ী বন্ধ হ'য়ে গেছে, সে খবর ত আমাদের জানান উচিত ছিল।" আর তাই ত! সুরেশ বাবু কাতরভাবে বলিলেন "আর তাই ত কি! এখন চলুন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং-রুমে যাওয়া যাক্।" কুলীরা তখন আমাদের আদেশমত জিনিসপত্র লইয়া বিশ্রামাগারে চলিল। শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাবু বয়ঃকনিষ্ঠ, সহজে হাল ছাড়িয়া দিবার বয়স এখনও তাঁহার হয় নাই। তিনি বলিলেন "দেখি, ষ্টেসন-মাষ্টার সাহেবের কাছে যাই। শুনি দেখি, ব্যাপার কি?" আমি বলিলাম "আর ভাই ষ্টেসন-মাষ্টার! সেই রাত্রি চারটা।" হেমেন্দ্র বাবু সে কথা শুনিলেন না; ষ্টেসন-মাষ্টারের ঘরের দিকে গেলেন, আর আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে গেলাম। সেখানে দেখি এক গম্ভীর-মূর্ত্তি সাহেব চেয়ারে বসিয়া সম্মুখের টেবিলের উপর একরাশ কাগজপত্র বিছাইয়া লেখাপড়ায় নিবিষ্টচিত্ত। এ আর এক বিপদ! রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত যে 'হো হা' করিয়া কাটাইব, তাহারও উপায় নাই। একেবারে অন্ধকার দেখা গেল; কিন্তু এ অন্ধকার বেশীক্ষণ থাকিল না। আমরা ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র রাখিয়া বাহিরে আসিতেই হেমেন্দ্র বাবু আসিয়া বলিলেন "এক উপায় করে এসেছি। রাত্রি নটার সময় একখানি মালগাড়ী সাঁইতের দিকে যাইবে। ষ্টেসনমাষ্টার তাহাতে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন!" আমরা অকূলে কূল পাইলাম, মালগাড়ীই তখন পুষ্পরথ মনে হইল। হেমেন্দ্র বাবু তখন দুবরাজপুরে তার করিয়া দিলেন যে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহারথগণ মালগাড়ীতে যাইতেছেন, মহারাজকুমার যেন রাত্রিতেই গাড়ী খালাস করিয়া লন। তখন ভাবিলাম, কয়েকদিন পূর্ব্বে পার্শ্বেল গাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে বাঁকিপুরে গিয়াছিলাম, এখন মালগাড়ীতে বীরভূম সমিতিতে চলিলাম—অপরম্ বা কিম্ ভবিষ্যতি—ক্রমেই উল্‌টা দিকে প্রোমোসন হইতেছে।

ওয়েটিং রুমে আস্ত একটি সাহেবের সম্মুখে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে কতকটা সম্ভব; কিন্তু আমার সঙ্গী চতুষ্টয় এমন শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার পাত্রই নহেন; তাঁহারা তখন সেই সুদীর্ঘ প্লাটফরমে রাত্রি-ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন, আর আমি ওয়েটিংরুমে জিনিষপত্রের পাহারায় রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই হেমেন্দ্র বাবু কুলীদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিলেন "দাদা, উঠুন! গাড়ীতে যেতে হবে।" আমি বলিলাম "গাড়ী কৈ?" তিনি বলিলেন "মালগাড়ী কি আর ষ্টেসনে আসবে? সে অনেক দূরে দাঁড়াইয়াছে; চলুন।" তথাস্তু! সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে ষ্টেসন হইতে বাহির হইলাম। এত বড় যে প্লাটফরম, তাহা ছাড়াইয়া রেলের রাস্তায় নামিলাম। সেই প্রস্তর-বিস্তৃত ভয়ানক পথ, আবার তাহার মধ্যে-মধ্যে তার অতিক্রম করিতে হইতেছে; সারি-সারি মালগাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের ছায়ায় অন্ধকার আরও ঘনীভূত! সে এক বিষম ব্যাপার! পথও ফুরায় না। খানিক দূর যাইয়াই পাঁচকড়ি বাবু সেই অন্ধকারে একটা তারে বাধিয়া

পড়িয়া গেলেন; তাঁহার দুই হাঁটু একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল—রক্ত পড়িতে লাগিল। পাকা হাড়, আর ব্রাহ্মণসন্তান কষ্ট-সহিষ্ণু, তাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন; আর কেহ হইলে সেইখানেই ভূমি গ্রহণ করিতেন। তখন অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে লইয়া আমাদের সেই পুষ্প-রথের উদ্দেশে পুনরায় যাত্রা করিলাম। ষ্টেসন হইতে প্রায় এক মাইলের উপর যাইয়া আমরা আমাদের মালগাড়ীর সন্নিহিত হইলাম। সে ট্রেণখানিও ছোট নহে, অনেকগুলি মালগাড়ী অতিক্রম করিয়া গার্ড সাহেবের গাড়ী পাইলাম। তখন বহু আয়াসে সেই গাড়ীতে উঠিলাম। ই, আই, আর কোম্পানীর 'ব্রেকভ্যান' যে কত ছোট, তাহা সকলেই জানেন। সেই ছোট গাড়ীর মধ্যে এক দিকে গার্ড সাহেবের আসবাব সজ্জিত; অপর দিকে যে সামান্য স্থানটুকু ছিল, তাহাতেই আমাদের জিনিস-পত্র সাজাইলাম। তাহারই উপর অতি কষ্টে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীমান সুরেশ ও শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ বসিবার স্থান করিয়া লইলেন। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই গাড়ীর পশ্চাৎভাগে যে অল্প-পরিসর বারান্দার মত ছিল, তাহাতে কম্বল বিছাইয়া পাঁচকড়ি বাবুকে শয়ন করাইলাম। তখনও তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছিল। গার্ড সাহেবের যে রেড়ির তৈলের বাতি ছিল, তাহা হইতে একটু তৈল লইয়া সেই ক্ষতে লাগাইয়া দেওয়া হইল; সেই অন্ধকার রাত্রিতে অমন স্থানে আর কি ঔষধ মিলিতে পারে! পাঁচকড়ি বাবু বড় বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন; কিন্তু সদানন্দ পুরুষ সে যন্ত্রণার কথা কাহাকেও না বলিলেও আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি সেই অনাবৃত আকাশতলে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল; গার্ড সাহেব তাঁহার কক্ষের দুয়ার-জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিলেন; আমরা দুইটি প্রাণী সেই পৌষের শীতে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিলাম। এতক্ষণ চাঁদের দেখা পাওয়া যায় নাই; আমাদের গাড়ীও ছাড়িল, চাঁদও উঠিল। চারিদিকে চাঁদের আলো যেন হাসিয়া উঠিল।

গাড়ীতে অনেক চড়িয়াছি, কষ্টও অনেক পাইয়াছি, আজও কষ্টের মাত্রা নিতান্ত কম ছিল না; কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া আমাদের এই এত কষ্ট দূর করিবার ব্যবস্থা করিলেন। একটু পরেই আমাদের গাড়ী অজয়ের সেতুর উপর উঠিল। তখন পাঁচকড়ি বাবুকে ডাকিয়া তুলিলাম। অজয়ের সেই শোভা দেখিয়া পাঁচকড়ি বাবু একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সে শোভার বর্ণনা করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু এই দৃশ্যের উল্লেখ করিয়া পরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন —"পা ভাঙ্গে ভাঙ্গুক, কিন্তু এবার রেলগাড়ি চড়ার সকল সাধ মিটিয়াছে। এবার মালগাড়িতে গিয়াছিলাম। অণ্ডালের ষ্টেসন-মাষ্টারের কৃপায় অণ্ডাল হইতে দুবরাজপুর পর্য্যন্ত একখানা খাস মালগাড়ির ব্রেকভ্যানের বারান্দায় বসিয়া গিয়াছিলাম। সে চাঁদের আলোয় অজয়ের শোভা দর্শন বহুভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। রেলগাড়ির কামরার মধ্য হইতে দেখা এক এবং ব্রেকভ্যানের খোলা বারান্দায় বসিয়া দেখা আর। অনেকবার অজয়কে অনেক স্থানে দেখিয়াছি, এমন দেখা দেখি নাই; যেন চূর্ণীকৃত রজতরাশির বিস্তার; —সে বিস্তারের মধ্য দিয়া জলরাশি সরস্বতীর বেণীর মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া ফণীর গতিতে চলিয়া গিয়াছে। এমন অজয় না হইলে কি, অমন গীতগোবিন্দ প্রসব করিতে পারে! এমন অজয় না হইলে কি অমন জয়দেব উহার তীরে বিরাজ করেন!"

রাত্রি সাড়েদশটার সময় আমাদের মালগাড়ী দুবরাজপুর ষ্টেসনের একপ্রান্তে যাইয়া থামিল। আমরা নামিলাম। ষ্টেসনে গাড়ী ও লোকজন লইয়া অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই সন্ধ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত ষ্টেসনে হিমভোগ করিতেছিলেন। মহারাজকুমার বাহাদুরের প্রেরিত বড় বড় দুইখানি ল্যাণ্ডোতে এতক্ষণ পরে সুখাসীন হইয়া 'বাবা, বাঁচা গেল' বলিতে-বলিতে রাজভবন উদ্দেশে গমন করা গেল।

ষ্টেসন হইতে 'রঞ্জন-প্রাসাদ' প্রায় দুই মাইল। এই প্রাসাদেই আমাদের অবস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর ও মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন বাহাদুর পুরাতন রাজ-প্রাসাদে বাস করেন; এই নূতন 'রঞ্জন-প্রাসাদে' কনিষ্ঠ মহারাজ কুমারদ্বয় বাস করেন। তাঁহারা প্রাসাদের অর্দ্ধাংশ আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একটু পরেই প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখি

কর্ম্মচারীবৃন্দসহ মহারাজকুমার আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তখন আর কি? অত বড় রাজবাড়ীতে আদর-আপ্যায়ন যেমন হইতে হয়, পান-ভোজনের যেমন আয়োজন হইতে হয়, তাহা সমস্তই ছিল; আর ছিল এমন কিছু যাহা এই সভ্যতালোকে উজ্জ্বল অনেক স্থানেই পাওয়া যায় না;—তাহা অকৃত্রিম অনুরাগ—তাহাতে কৃত্রিম ভদ্রতার লেশমাত্রও নাই—একেবারে সেকেলে প্রাণখোলা আলিঙ্গন। এই জিনিসটাই আজকাল দুর্ল্লভ হইয়াছে, আমরা হেতমপুরে ইহা পাইয়াছিলাম। রাত্রি বারটার পর আমাদের আহারাদি হইয়া গেলে, পাঁচকড়ি বাবুর ক্ষতস্থানে সেই গভীর রাত্রিতে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ হইয়া গেলে, আমরা শয়ন করিবার পর, তবে মহারাজকুমার আহার করিতে গেলেন। ইহারই নাম আতিথেয়তা! আমরা মহারাজকুমার এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের আদর-আপ্যায়নে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। আহারের আয়োজনের ফর্দ্দ আর দিব না, তবে হেতমপুরের মোরব্বার কথা শীঘ্র ভুলিতে পারিব না।

পরদিন প্রাতঃকালে সহর দেখিতে গেলাম, জঙ্গলও দেখিতে গেলাম। গৌরাঙ্গদেবের মন্দির দেখিলাম। এই মন্দিরের সম্মুখে আর একটি মন্দিরে স্বর্গীয় মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। পিতৃপরায়ণ উপযুক্ত পুত্রগণ পিতা-মাতার এই মূর্ত্তিদ্বয়কে যথারীতি পূজা করিয়া থাকেন। আজকালকার দিনে, এ কথা শুনিলেও আনন্দ হয়, দেখিয়া ত চক্ষু জুড়াইল, হৃদয়ে অভূতপূর্ণ ভাবের সঞ্চার হইল।

বেলা একটার সময় কৃষ্ণচন্দ্র কলেজগৃহে বীরভূম অনুসন্ধান-সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বীরভূমের সিবিলিয়ান-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, বীরভূমের সিবিলিয়ান জজ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে (মিঃ পি, সি, দে) মহোদয়ও সভায় উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা সিউড়ি হইতে মোটরযোগে যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন। সিউড়ি, লাভপুর ও নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে অনেক ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইবার জন্য আসিয়াছিলেন; তন্মধ্যে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীর্ধার জমিদার শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ দাস মহাশয়দিগকে পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। বেলা দশটার সময় ইথোরা হইতে আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধু শ্রীমান নিখিলনাথ রায় ভায়াও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেলা একটার সময় সভার অধিবেশন। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে সভার স্থানে উপস্থিত হইলাম। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন এই সভার প্রাণ। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ে বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য চলিতেছে। এই তিন বৎসরে তিনি বীরভূমের অনেক স্থান অনুসন্ধান করিয়া অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এবং অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল তিনি 'বীরভূম-বিবরণ' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি একজন উদ্যমশীল, অক্লান্ত-কর্ম্মা সহকারীও পাইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলি দেখিলাম; বুঝিলাম ত ঐ পর্য্যন্ত! তবুও মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞতার ভান করিতে ছাড়িলাম না। আমাদের সঙ্গী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব এই সমিতির স্থায়ী সভাপতি। তিনি দুচারিটি মূর্ত্তির পরিচয় দিলেন। আমি এ-কাণ দিয়া শুনিলাম, ও-কাণ দিয়া তাহা বেমালুম বাহির হইয়া গেল।

সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। গান হইল, কবিতা পাঠ হইল, স্থায়ী সভাপতি মহার্ণব সভার উদ্বোধন করিলেন, সম্পাদক মহারাজকুমার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তাহার পর বক্তৃতার পালা। কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় বক্তৃতা করিলেন; বক্তৃতা ইতিহাস সম্বন্ধে। এইবার কলিকাতার দলের বক্তৃতা। প্রথমে শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বক্তৃতা করিলেন, তাহার পর শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বক্তৃতা করিলেন; তাঁহারা দুইজনেই ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলিলেন। তাহার পরই আমার উপর আদেশ প্রচারিত হইল। আমি দুনয়নে সর্ষপ-পুষ্প দেখিলাম। কোন কথাই জানি না,—ইতিহাসের কথা ত কিছুই জানি না; অথচ ইতিহাসের সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে। কোন প্রকারে দুই কথা বলিয়া আমি বিদায় গ্রহণ

করিলাম। তাহার পর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার সাধা গলায় বক্তৃতা করিলেন, শ্রীমান নিখিলনাথ ধীরভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় অনুসন্ধান-সমিতি সম্বন্ধে অনেক আশার কথা বলিলেন, খুব উৎসাহ দিলেন। তাহার পর ধন্যবাদ ও বিদায়-সঙ্গীত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সভার কার্য্য শেষ হইল, আমরাও অব্যাহতি লাভ করিলাম। সভাপতি মাজিষ্ট্রেট ও জজ মহোদয় আমাদিগকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া শিউড়ি যাত্রা করিলেন, আমরা পুরাতন রাজবাড়ীতে গেলাম। সেখান হইতে সন্ধ্যার পরই ফিরিয়া 'রঞ্জন প্রাসাদে' গেলাম। আমার সঙ্গী চতুষ্টয় সেই রাত্রিতেই কলিকাতায় ফিরিবেন, কারণ পরদিন রবিবারে তাঁহাদের দ্বারবঙ্গের বর্ণাশ্রম-সভায় উপস্থিত থাকিতেই হইবে। শ্রীযুক্ত সুরেশ ভায়ার বর্ণাশ্রমের তাড়া ছিল না, কিন্তু তিনি বাড়ীতে একটা রোগী ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তাই তিনিও যাওয়া স্থির করিলেন। আমি পরদিন জয়দেবের কেন্দুবিল্বের মেলা না দেখিয়া ফিরিব না; সুতরাং 'আমিই একা রইলাম প'ড়ে।' আহারান্তে কলিকাতার দল চলিয়া গেলেন, আমি বিশ্রাম লাভ করিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে জয়দেবের কেন্দুবিল্বে যাত্রা করিলাম। সঙ্গী হইলেন শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং হেতমপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বনবিহারী ঠাকুর বি, এল। পূর্ব্বদিন শীর্ষার জমিদার শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ দাস মহাশয় হেতমপুরের সভায় আসিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বে যাইতে হইলে শীর্ষা হইয়া যাইতে হয়। হরিহর বাবু তাঁহার হস্তীটী আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন; কথা এই রহিল যে, তাঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্নক্রিয়া শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া কেন্দুবিল্বে যাওয়া হইবে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে আমরা হস্তীতে আরোহণ করিয়া হেতমপুর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী শীর্ষায় গেলাম। রাস্তায় তখন দলে-দলে কেঁদুলী যাত্রী; পিপিলিকার সারির মত যাত্রীর দল তীর্থে চলিয়াছে। আমার ত লজ্জাই করিতে লাগিল। তীর্থে যাইতে হইলে কঠোর করিতে হয়; আমরা কি না রাজার হালে হাতীতে চড়িয়া তীর্থ-দর্শনে যাইতেছি। তখন বুঝিলাম, আমাদের ত তীর্থ করা নয়—আমাদের মেলা দেখা। যেমন সাধনা, সিদ্ধিও তাদৃশী; আমরা কেঁদুলীতে মেলাই দেখিয়াছিলাম, তীর্থের মহিমা উপভোগ করিতে পারি নাই। সে কথা এখন থাকুক।

বেলা নয়টার সময় শীর্ষায় হরিহর বাবুর বাড়ীতে পৌছিলাম। তিনি ত আনন্দে অধীর হইলেন। তাঁহার আদর-অভ্যর্থনায় আমরা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি স্নান-আহার শেষ করিলাম। বেলা বারটার সময় কেঁদুলী যাত্রা। শীর্ষা হইতে কেঁদুলী দুই ক্রোশ পথ। এবার আর আমাকে হাতীতে চড়িতে হইল না; হরিহর বাবু আমার সঙ্গীদ্বয়কে লইয়া হাতীতে চড়িলেন, আমি পাল্‌কীতে উঠিলাম। কিছুদূর যাইয়া এমন হইল যে, হাতী বা পাল্‌কী কিছুই চলিবার পথ পায় না—এত যাত্রীর ভিড়। তখন অতি ধীরে-ধীরে আমরা কেঁদুলীর মেলার স্থানে উপস্থিত হইলাম।

এই সেই কেন্দুবিল্ব—এই সেই পুণ্যভূমি—এই সেই মহাকবি, মহাভক্ত জয়দেব গোস্বামীর লীলা-নিকেতন! এই স্থানেই ভক্তের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের রূপ ধারণ করিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছিলেন—

"দেহিপদপল্লবমুদারম্"

ভক্ত কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলেন, অজয় আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, কেন্দুবিল্ব পবিত্র হইয়া গিয়াছিল! এই সেই কেন্দুবিল্ব—ঐ সেই পবিত্র অজয়—ঐ সেই কদম্বখণ্ডী! ঐ সেই অজয়তীরবর্ত্তী সাধনকুঞ্জ। ঐ কদম্বখণ্ডীর ঘাটে বসিয়া কবিকুল-চূড়ামণি অজয়ের জলকল্লোল শ্রবণ করিতেন,—আর ঐ স্থানে বসিয়াই হয় ত তিনি লিখিয়াছিলেন—

স্মর গরলখণ্ডনম্ মম শিরসিমণ্ডনম্—

আর তাঁহার লেখনী অগ্রসর হয় নাই; ভক্ত কেমন করিয়া শেষের কথাটী লিখিবেন! এ কথা মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চ হয়! ভক্তের জন্য ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সকলই করিতে পারেন—সকলই করিয়া থাকেন। এই সেই জয়দেবের জন্মস্থান—এই তাঁহার সাধনের স্থান—এই কেন্দুবিল্বই তাঁহার গীতগোবিন্দ! আর আজ এই কেন্দুবিল্বে সহস্র-সহস্র নরনারী সেই নর-দেবতার স্মৃতির তর্পণ করিতে আসিয়াছে—আজ এই অজয়ের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে আসিয়াছে। কি বিপুল জনসমাগম! কি তাহাদের প্রাণের

আগ্রহ। কত শত বৎসর পূর্ব্বে জয়দেব চলিয়া গিয়াছেন;—আর এই এতকাল ধরিয়া বঙ্গের অসংখ্য নরনারী এই দিনে এখানে সমাগত হইয়া জীবন সার্থক করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিবার বটে! এ স্থানের ভক্তপদরজ মাথায় করিয়া লইতে হয়। চারিদিকে অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তন হইতেছে; আখড়ায়-আখড়ায় মহোৎসব হইতেছে,—যে যাইতেছে, সেই প্রসাদ পাইতেছে! একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। এই ত গীতগোবিন্দ!

জয়দেবের পরিচয় বাঙ্গালীকে দিতে হইবে না—গীতগোবিন্দের কথা বাঙ্গালীকে শুনাইতে হইবে না। যিনি জয়দেবকে জানেন না, যিনি গীতগোবিন্দ পড়েন নাই—লেখাপড়া জানিলেও তিনি বাঙ্গালী নহেন—বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার অধিকার তাঁহার নাই। আমি জয়দেবের জীবন-কথা বলিব না—বলিবার প্রয়োজনও নাই। তবে কি উপলক্ষে এই মেলা হয়—কেন পৌষ-সংক্রান্তিতেই এখানে এত জন-সমারোহ হয়, তাহার একটা বিবরণ শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'বীরভূম বিবরণ' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মহারাজ-কুমার লিখিয়াছেন—"শ্রীজয়দেবের নিকট জাহ্নবী দেবী প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়াছেন, পৌষ সংক্রান্তির দিন অজয়ের কেন্দুবিল্বস্থ কদম্বখণ্ডীর ঘাটে তিনি হস্তোত্তোলন করিয়া দেখাইবেন। পৌষ-সংক্রান্তির দিন নিকট হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীগীতগোবিন্দ সম্পূর্ণতার অভাবনীয় সৌভাগ্যে কবির আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি মহানন্দে মহোৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে এমনি দিনে স্থানীয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে কিছু খাওয়াইতে হইবে। জয়দেব গোস্বামী আনন্দের সহিত সে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে দিন স্থির করিয়া একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। কদম্বখণ্ডীর ঘাট তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ নিরালা নিকেতনে তাঁহার জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। কবি কদম্বখণ্ডীর ঘাটেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করেন। রন্ধনাদি কোন্ স্থানে হইবে, ব্রাহ্মণগণ তাহা অবগত ছিলেন না, কদম্বখণ্ডীর ঘাটের অদূরে শবদাহ হইত (এখনো হইয়া থাকে)। সুতরাং শ্মশানে তাঁহাদের ভোজনের আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ ভোজ্যগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। নিরুপায় কবি ব্রাহ্মণসেবার্থ আনীত দ্রব্যাদির অপর কোন প্রকার সদ্ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কারে অসমর্থ হইয়া অবশেষে সেগুলিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটেই প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন। পৌষ-সংক্রান্তির মহোৎসবে কবি তজ্জন্য এবার আপন অন্তরঙ্গ বৈষ্ণববৃন্দকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার কবি-যশ-খ্যাতি, সর্ব্বাপেক্ষা সাধুত্বের প্রতিষ্ঠা তখন চারি-দিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ গঙ্গাদেবীর দর্শন-লাভ ঘটিবে শুনিয়া পৌষ-সংক্রান্তির মহোৎসবে নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত বহুজন-সমাগমে কেন্দুবিল্ব কোলাহলময়ী হইয়া উঠিল।

পৌষ-সংক্রান্তির ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত সমাগত হইল। সহস্র-সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে কেন্দুবিল্ব মুখরিত হইয়া উঠিল। সারি দিয়া অজয় কিনারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে—

"হেন কালে দুইবাহু শঙ্খ উত্তোলন।
কদম্বখণ্ডীর ঘাটে দিলা দরশন॥"

অজয় উজান বহিল। আনন্দ-চঞ্চল সমবেত জন-সঙ্ঘের মিলিত হরিবোল কেন্দুবিল্বের গগনে-পবনে ছড়াইয়া পড়িল। পূজার ফুলে অজয়ের জল ফুলময় হইয়া গেল। পূজার দ্রব্যে অজয়গর্ভ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অদ্যাপিও কেন্দুবিল্বে পৌষ-সংক্রান্তি হইতে চারিদিবস-ব্যাপী মহামেলা হয়। সেই হইতেই কেন্দুবিল্ব "জয়দেব কেন্দুবিল্ব" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।"

ইহাই মহামেলার ইতিহাস। এই মহামেলা দেখিবার জন্যই আমরা কেন্দুবিল্বে গিয়াছিলাম। আমরা যে দিন গিয়াছিলাম, সে দিন প্রায় ত্রিশহাজার নরনারী এই মেলায় সমবেত হইয়াছিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে এই মেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন, এবার জনসমাগম কম হইয়াছে—প্রতি বৎসরই পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক হইয়া থাকে।

মেলাস্থানের অদূরে কুশেশ্বর শিবের মন্দির। স্থানীয় লোকে বলিয়া থাকেন, এই শিবমণ্ডপেই জয়দেব বিশ্রাম করিতেন। শিবের পার্শ্বেই একখানি প্রস্তরে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত আছে। সেটীকে অনেকেই 'ভুবনেশ্বরী যন্ত্র' বলিয়া থাকেন। ঐ যন্ত্রে অভিষ্টারাধনা করিয়া জয়দেব শক্তিমন্ত্র

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও প্রবাদ আছে।

জয়দেব যখন বৃন্দাবনে যান, তখন তাঁহার শ্রীরাধা-মাধব বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া যান। বর্ত্তমান কেন্দুবিল্বে অধিষ্ঠিত শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ শ্যামারূপার গড় হইতে আনীত হইয়াছেন। বৰ্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী কর্ত্তৃক অনুমান ১৬১৪ শকাব্দে রাধাবিনোদ জিউর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই বিগ্রহের সেবাইত আছেন; সেবার জন্য জমিদারীও আছে। সেবা কেমন চলিতেছে, তাহা বলিতে পারি না।

সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত কেন্দুবিল্বে থাকিয়া পুনরায় গজারোহণে শীর্ষায় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানেই রাত্রিবাস করিতে হইল। পর দিন প্রাতঃকালে পুনরায় হেতমপুরে ফিরিয়া আসিলাম। সেদিন আর কলিকাতায় ফিরিবার সুবিধা হইল না। কিন্তু ভগবান আমাকে বসিয়া থাকিতে দেন নাই। আমি মধ্যাহ্নে আহারের পরই হেতমপুর হইতে চারিক্রোশ দূরে বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনে গেলাম। সেখানে পাপহরা নদী, কয়েকটি তপ্তকুণ্ড, শ্রীশ্রী৺বক্রনাথের মন্দির, অষ্টাদশভুজা মহিষমৰ্দ্দিনী মূর্ত্তি এবং দাঁইহাটের ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী ও অতিথিশালা দর্শন করিলাম। বক্রেশ্বরের বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে এই প্রবন্ধের আয়তন আরও বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং আপাততঃ সে বাসনা মনেই রাখিলাম; যদি কখন সুবিধা পাই, তাহা হইলে সে কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

তাহার পর আর কি—কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন;—তাহার পর বীরভূমের কথা বলিবার এই বৃথা চেষ্টা। উপসংহারে একটি কথা বলিবার আছে। এই প্রবন্ধে যে সমস্ত ছবি প্রকাশিত হইল, সেগুলি শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহার প্রণীত 'বীরভূম-বিবরণ' হইতে গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুরেশের একবার মনে হইল, তাহার নিষ্ঠুর সত্য অচলার বুকের ভিতর গিয়া যেন গভীর হইয়া বিঁধিল। কিন্তু পিতা সে দিকে দৃক্‌পাতও করিলেন না। বরঞ্চ, কন্যাকেই ইঙ্গিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সুরেশ বাবু, আপনি যে প্রকৃতই বন্ধুর কর্ত্তব্য করতে এসেছেন, এ কথা আমরা কেউ যেন ভ্রমেও না অবিশ্বাস করি। হোক্ না অপ্রিয়, হোক্ না কঠোর, কিন্তু, তবুও এই ত যথার্থ ভালবাসা! মা যখন তাঁর পীড়িত শিশুকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করেন, সে কি তাঁর কঠোর ঠেকে না? কিন্তু, তবু ত সে কাজ তাঁকে করতে হয়! সত্য বলচি, সুরেশবাবু, মহিম যে আমাদের প্রতি এতবড় অন্যায় করতে পারে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বছর দুই পূর্ব্বে সমাজে যখন তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তাঁর কথায়, ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজেই তাঁকে সসম্মানে বাড়ীতে ডেকে এনে, অচলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সে কি এমনি করেই তার প্রতিফল দিলে! উঃ—এতবড় প্রবঞ্চনা আমার জীবনে দেখিনি!" বলিয়া কেদার বাবু ভিতরের আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিলেন। সুরেশ এবং অচলা উভয়েই নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিল। কেদার বাবু হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়াইয়া পড়িয়া, মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, মা, অচলা, এ চল্‌বে না। কোনমতেই না। সুরেশবাবু, আপনি যেমন কর্ত্তব্যকে সকলের উপরে রেখে বন্ধুর কাজ করতে এসেছেন, আমিও সেই কর্ত্তব্যকেই সুমুখে রেখে পিতার কাজ কোরব। অচলার সঙ্গে মহিমের সম্বন্ধটা যতদূর অগ্রসর হয়েচে, তাতে যদি বিনা প্রমাণে আমার বাড়ীর দরজা তার মুখের উপর বন্ধ করে দিই, সেটা ঠিক হবে না। সেইজন্য একটা প্রমাণ চাই। আপনি মনে করবেন না সুরেশ বাবু, যে আপনার কথায় আমরা

বিশ্বাস করতে পারিনি ; কিন্তু, এটাও আমার কর্ত্তব্য। কি বল, মা অচলা ? একটা প্রমাণ নেওয়া আমাদের উচিত কি না !"

উভয়েই তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল, উচিত অনুচিত কোন মন্তব্যই কেহ প্রকাশ করিল না। কেদার বাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, "কিন্তু, এ প্রমাণের ভার আপনারই উপর সুরেশ বাবু। মহিমের সাংসারিক অবস্থা জানা ত দূরের কথা, কোন্ গ্রামে যে তার বাড়ী, তাই আমরা জানিনে।"

বেহারা আসিয়া জানাইল নীচে বিকাশ বাবু অপেক্ষা করিতেছেন।

সম্বাদ শুনিয়া কেদার বাবু শুষ্ক হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আজ ত তাঁর আস্‌বার কথা ছিল না। আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্চি।" ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "সুরেশ বাবু, আমাকে মিনিট পাঁচেক মাপ করতে হবে—লোকটাকে বিদায় করে আসি। যখন এসেচে, তখন দেখা না কোরে ত নড়বে না। মা অচলা, সুরেশ বাবুকে আমাদের পরম বন্ধু বলেই মনে করবে। যা' তোমার জানবার প্রয়োজন, এঁর কাছে জেনে নাও— আমি এলাম বলে" বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

তখন মুহূর্ত্তকালের জন্য চোখোচোখি করিয়া উভয়েই মাথা হেঁট করিল। সুরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "মহিম আমার আশৈশব বন্ধু। কিন্তু, তার ব্যবহারে আপনাদের কাছে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে।" অচলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাঁর জন্য আপনার কোন লজ্জার কারণ নেই।"

সুরেশ কহিল, "আপনি বলেন কি ! তার এই কপট আচরণে, এই পাষণ্ডের মত ব্যবহারে আমি বন্ধু হয়ে যদি লজ্জা না পাই, ত আর কে পাবে বলুন দেখি ? কিন্তু তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, সে যখন আমাকেই আগাগোড়া গোপন করে গেছে, তখন ভিতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ্ আছেই।"

অচলা কহিল, "আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের। কিন্তু, আপনি এ সমাজের কোন লোকের কোন সংশ্রবে থাক্‌তে চান্ না বলেই বোধ করি তিনি আমাদের উল্লেখ আপনার কাছে করেন নি।"

কথাটা সুরেশের ভাল লাগিল না। অচলা যে তাহারই মুখের উপর মহিমের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিবে, ইহা সে ভাবে নাই। শুষ্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এ খবর আপনি মহিমের কাছেই শুনেচেন আশা করি।" অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "হাঁ তিনিই একদিন বলেছিলেন।"

সুরেশ বলিল "আমার দোষের কথাটা সে বল্‌তে ভোলেনি দেখ্‌চি।"

অচলা ম্লান ভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, "এ আর দোষের কথা কি ! সকল মানুষের প্রবৃত্তি এক রকমের নয়। যারা আপনাদের সংশ্রব ছেড়ে চলে গেছে, তাদের সংশ্রব যদি আপনার ভাল না লাগে, ত আমি দোষের মনে করতে পারিনে।"

এই উত্তরটা যদিচ সুরেশের মনের মত, এবং আর কোথাও শুনিলে হয় ত সে লাফাইয়া উঠিত, কিন্তু, এই সংযতবাদিনী, তরুণী ব্রাহ্ম-মহিলার মুখ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাহার একান্ত বিতৃষ্ণার কথা শুনিয়া আজ তাহার কিছুমাত্র আনন্দোদয় হইল না। বস্তুতঃ, এই সব দলাদলির মীমাংসা শুনিতে সে কথাটা বলেও নাই। বরঞ্চ, প্রত্যুত্তরে নিজের সম্বন্ধে ইহাই জানিতে চাহিয়াছিল, মহিমের মুখ হইতে তাহার আর কোন সদ্‌গুণের বিবরণ তাঁহার কাণে গিয়াছে কি না। কিন্তু অচলা বোধ করি এই প্রচ্ছন্ন অভিলাষ অনুমান করিতে পারিল না ; তাই, প্রশ্নটার সোজা জবাব দিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল "আপনাদের প্রতি আমার সামাজিক বিদ্বেষ আছে কি না, সে আলোচনা মহিম করুক ; কিন্তু তার ওপর আমার যে লেশমাত্র বিদ্বেষ নেই, এ কথাটা আপনি আমার মুখ থেকেও অবিশ্বাস করবেন না। তবুও হয় ত আমি তার সাংসারিক প্রসঙ্গ এখানে তুল্‌তে আস্‌তাম না, যদি না সে আমার কাছে সে দিন সত্য কথাটা অস্বীকার করত।"

অচলা সুরেশের মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি রাখিয়া অবিচলিত স্বরে কহিল, "কিন্তু, তিনি ত কখনই মিথ্যা বলেন না।"

এইবার সুরেশ বাস্তবিকই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মুখ দিয়া যে এমন শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ বাহির হইতে পারে, ক্ষণকালের জন্য ইহা যেন সে ভাবিতেই পারিল না। কিন্তু সে ঐ মুহূর্ত্তকালের জন্য [illegible]

সংযম শিক্ষা করে নাই; তাই পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃত হইয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সে আমার বাল্যবন্ধু। আপনার চেয়ে তাকে আমি কম জানিনে। এখানে নিজেকে আবদ্ধ করে স্পষ্ট অস্বীকার করাটাকে আমি সত্যবাদিতা বল্‌তে পারিনে।"

অচলা তেমনি শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল, "তিনি ত এখানে নিজেকে আবদ্ধ করেন নি।"

সুরেশ কহিল, "আপনার বাবা ত তাই বল্‌লেন। তা ছাড়া নিজের হীন অবস্থা আপনাদের কাছে গোপন করাটাকেও ঠিক সত্যপ্রিয়তা বলা চলে না। স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করবার অক্ষমতা অপরের কাছে না হোক্ অন্ততঃ আপনার কাছেও ত তার অকপটে প্রকাশ করা উচিত ছিল।"

অচলা নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ বলিতে লাগিল, "আপনি যে এত ক'রে তার দোষ ঢাক্‌চেন, আপনিই বলুন দেখি, সমস্ত কথা পূর্ব্বাহ্নে জান্‌তে পারলে কি তাকে এতটা প্রশ্রয় দিতে পারতেন?"

অচলা তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার কাছে কোনপ্রকার জবাব না পাইয়া সুরেশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল, "আমার কাছে সে নিজের মুখে স্বীকার করেচে যে, এই কলকাতা সহরে আপনাকে প্রতি-পালন করবার তার সাধ্যও নেই, সঙ্কল্পও নেই। তার সেই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গ্রামে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হিন্দু-সমাজের মধ্যে সে যে আপনাকে একখানা অস্বচ্ছল ভাঙা মেটে বাড়ীতে টেনে নিয়ে যেতে চায়, সে কথা কি আপনাকে তার বলা কর্ত্তব্য নয়? এত দুঃখ আপনি সহ্য করতে প্রস্তুত কি না, এও কি জিজ্ঞাসা করা সে আবশ্যক বিবেচনা করে না?" বলিয়া উত্তরের জন্য চোখ তুলিয়া দেখিল, অচলা চিন্তিত, অধোমুখে, স্থিরভাবে বসিয়া আছে। জবাব না পাইলেও সুরেশ বুঝিল, তাহার কথায় কাজ হইয়াছে। কহিল, "দেখুন, আপনার কাছে এখন আমি সত্য কথাই বোলব। আজ আমি আমার বন্ধুকে বাঁচাবার সঙ্কল্প করেই শুধু এসেছিলুম,—সে বিপদে না পড়ে, এই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু, এখন দেখ্‌চি তাকে বাঁচানোর চেয়ে আপনাকে বাঁচানো আমার ঢের বেশি কর্ত্তব্য। কারণ, তার বিপদ ইচ্ছাকৃত, কিন্তু, আপনি ঝাঁপ দিচ্চেন অন্ধকারে। এইমাত্র আপনার বাবা যখন আমাকেই প্রমাণ করবার ভার দিলেন, তখন মনে হয়েছিল, বন্ধুর বিরুদ্ধে এ ভার আমি গ্রহণ করব না; কিন্তু, এখন দেখচি, এ কাজ আমাকে করতেই হবে,—না করলে অন্যায় হবে।"

অচলা কহিল, "কিন্তু তিনি শুন্‌লে কি দুঃখিত হবেন না?"

সুরেশ কহিল "উপায় নাই। যে লোক পাষণ্ডের মত আপনাকে এতবড় প্রবঞ্চনা করেচে, বন্ধু হলেও তার সুখদুঃখ চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করিনে। কিন্তু বিপদ হয়েচে এই যে, আমি তাদের গ্রামের নামটাও জানিনে। কোন উপায়ে আজ যদি সেইটে মাত্র জান্‌তে পাই, কাল সকালেই নিজে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হব, এবং সমস্ত প্রমাণ টেনে এনে আপনার বাবার সম্মুখে উপস্থিত করে বন্ধুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

অচলা কহিল "কিন্তু, আপনি কেন এত কষ্ট করবেন? বাবাকে বলুন না, তিনি তাঁর বিশ্বাসী কোন লোক দিয়ে সমস্ত সম্বাদ জেনে নিন। চব্বিশ পরগণার রাজপুর গ্রাম ত বেশি দূর নয়।"

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "রাজপুর! তা' হলে গ্রামের নামটা যে আপনি জানেন, দেখ্‌চি। আর কিছু জানেন?"

অচলা সহজ ভাবে কহিল, "আপনি যা' বল্‌লেন, আমিও শুধু ঐটুকু জানি। রাজপুরের উত্তরপাড়ায় এক-খানি মেটে বাড়ী আছে। ভিতরে গুটি-তিনেক ঘর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ—তাতে গ্রামের পাঠশালা বসে।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মহিমের সাংসারিক অবস্থা?"

অচলা কহিল, "সে-বিষয়েও আপনি যা' বল্‌লেন তাই। সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে, তাতে কোন-মতে দুঃখে-কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলে মাত্র।"

সুরেশ কহিল, "আপনি ত তা' হলে সমস্তই জানেন দেখ্‌চি।" অচলা কহিল, "এইটুকু জানি, কারণ, এইটুকুই তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আর আপনি ত জানেন, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।"

সুরেশ সমস্ত মুখ কালীবর্ণ করিয়া কহিল, "যখন সমস্তই জানেন এবং আমার চেয়েও বেশী জানেন, তখন আপনাদের সতর্ক করতে আসাটা আমার পক্ষে নিতান্তই

একটা বাহুল্য কাজ হয়েচে। দেখ্‌চি, আপনাকে সে ঠকাতে চায়নি।" অচলা কহিল, "আমি কিছু-কিছু জানি বটে, কিন্তু আপনি ত আমাকে জানাতে আসেন নি; আপনি যাঁকে জানাতে এসেছিলেন, তিনি এখনো কিছুই জানেন না। তবে, যদি বলেন, আমি যতটুকু জানি, বাবাকে জানাতে পারি।"

সুরেশ উদাস কণ্ঠে কহিল, "আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আমাকে গিয়ে মহিমকে সমস্ত কথা জানিয়ে তার ক্ষমা চাইতে হবে। তবে আমি স্থির হতে পারব।"

অচলা জিজ্ঞাসা করিল "তার কি কিছু আবশ্যক আছে?"

সুরেশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল "আবশ্যক নেই? না জেনে তার ওপর যে সকল মিথ্যা দোষারোপ আজ করেচি, সে অপরাধ আমার কত বড়, আপনি কি মনে-মনে তা বোঝেন নি? তাকে জুয়াচোর, মিথ্যাবাদী কিছু বল্‌তেই বাকি রাখিনি;—এ সকল কথা তার কাছে স্বীকার না ক'রে কেমন ক'রে আমি পরিত্রাণ পাব?"

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরে-ধীরে বলিল "বরঞ্চ আমি বলি, এ সবের কিছুই দরকার নেই সুরেশ বাবু। মনে-মনে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে প্রকাশ্যে চাওয়াই যে সকল সময়ে সব চেয়ে বড় জিনিস, এ আমি স্বীকার করিনে। তিনি শুন্‌তে পেলেই যখন ব্যথা পাবেন, তখন কাজ কি তাঁকে শুনিয়ে? আমি বাবাকেও বরঞ্চ নিষেধ করে দেব, যেন আপনার কথা তাঁকে না বলেন।"

সুরেশ কহিল, "আচ্ছা"। তারপরে অচলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করেচি, যে, মহিম কোন কারণেই এতটুকু ব্যথা না পায়, এই আপনার একমাত্র লক্ষ্য। বেশ, তাই হোক্, আমি তাকে কোন কথাই বল্‌ব না। আজ তার সম্বন্ধে আমার মনে যত কথা উঠ্‌চে, তাও বল্‌তে চাইনে, কিন্তু আপনাকে একটা কথা না বলে কিছুতেই বিদায় হতে পারচিনে।" অচলা স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি তুলিয়া কহিল "বেশ, বলুন।"

সুরেশ কহিল, "তার কাছে ক্ষমা চাইতে পেলুম না, কিন্তু আপনার কাছে চাইচি, আমায় মাপ করুন" বলিয়া সে হঠাৎ দুই হাত যুক্ত করিল।

"ছি, ছি, ও কি করেন!" বলিয়া অচলা চক্ষের নিমিষে সুরেশের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "এ কি বিষম অন্যায় বলুন ত!" বলিতে-বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

সুরেশের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই আশ্চর্য্য স্পর্শ, এই সলজ্জ মুখের অপরূপ রক্তিম দীপ্তি চক্ষের পলকে তাহাকে একেবারে অবশ করিয়া ফেলিল। সে অচলার অবনত মুখের পানে কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে-ধীরে কহিল, "না, আমি কোন অন্যায় করিনি। বরঞ্চ, আমার সহস্র কোটী অন্যায়ের মধ্যে যদি কোন ঠিক কাজ হয়ে থাকে ত সে এই। আপনি ক্ষমা করলেই আমার মনের সমস্ত ক্ষোভ ধুয়ে-মুছে যাবে।"

অচলা কাতর হইয়া কহিল, "আপনি অমন কথা কিছুতে বল্‌বেন না। যাঁকে দু'দুবার মৃত্যুগ্রাস থেকে ফিরিয়ে এনেচেন"— "তাও শুনেচেন?"

"শুনেচি। আপনার মত সুহৃদ্ তাঁর আর কে আছে?"

"না, বোধ হয় আপনি নিজে ছাড়া আর কেউ নেই। আর সেই সুবাদে আমরা দুজন"—অচলার মুখের উপর আবার একটুখানি রাঙা আভা দেখা দিল। সে কহিল, "হাঁ, বন্ধু। আপনি তাঁকে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে আপনার কোন কাজই আমি অন্যায় বলে ভাব্‌তে পারিনে! মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ, কোন লজ্জা আপনি রাখ্‌বেন না,—ক্ষমা কথাটা উচ্চারণ করলেই যদি আপনার তৃপ্তি হয়, আমি তাও বল্‌তে রাজী ছিলুম, যদি না আমার মুখে বাধ্‌ত।"

"আচ্ছা, কাজ নেই!" বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হল না, তিনি বোধ হয় ব্যস্ত আছেন। মহিমের সঙ্গে হয় ত আবার কোন দিন আস্‌তেও পারি। নমস্কার।"

অচলা একটুখানি হাসিয়া কহিল "নমস্কার! কিন্তু তাঁর সঙ্গেই যে আস্‌তে হবে, এর ত কোন মানে নেই।"

"সত্যি বল্‌চেন?" "সত্যিই বল্‌চি।"

"আমার পরম সৌভাগ্য" বলিয়া সুরেশ আর একবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া যেন নেশার মত তাহার সমস্ত দেহ মন টলিতে লাগিল। আকাশের খররৌদ্র তখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল; সে গাড়ী ফিরাইয়া দিয়া একাকী পদব্রজে বাহির হইয়া পড়িল; ইচ্ছা, কলিকাতার জনাকীর্ণ কোলাহলময় রাজপথের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ মগ্ন করিয়া দিয়া অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়।

অচলার মুখ, অবয়ব, ভাষা, ব্যবহার, সমস্তই তাহার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুনঃ-পুনঃ মনে পড়িয়া নিজেকে যেন ছোট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে মুখে সৌন্দর্য্যের অলৌকিকত্ব ছিল না; কথায়, ব্যবহারে জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধির অপক্কপত্ব কোথাও এতটুকু প্রকাশ পায় নাই; তথাপি, কেমন করিয়া যেন তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন একটা বিস্ময়কর বস্তু এইমাত্র সে দেখিয়া আসিয়াছে, যাহা এতদিন কোথাও তাহার চোখে পড়ে নাই। পথে চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি অনুক্ষণ এই প্রশ্নই করিতে লাগিল,—এ বিস্ময় কিসের জন্য? কিসে তাহাকে আজ এতখানি অভিভূত করিয়া দিয়াছে?

এই তরুণীর মধ্যে এমন কোন জিনিস আজ সে দেখিতে পাইয়াছে, যাহাতে আপনাকে আপনি হীন মনে করিয়াও তাহার সমস্ত অন্তরটা কি এক অপরিজ্ঞাত সার্থকতায় ভরিয়া গিয়াছে? ঐ মেয়েটির সত্যকার কোন পরিচয়ই এখনো তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই বটে, কিন্তু তবুও সে যে বড়, অনেক বড়, তাহাকে লাভ করা যে কোন পুরুষের পক্ষেই যে দুর্ভাগ্য নয়, এ সংশয় একটিবারও তাহার মনে উদয় হয় না কেন? ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ এক সময়ে তাহার চিন্তার ধারা ঠিক যায়গাটিতে আঘাত করিয়া বসিল। তাহার মনে হইল এই যে, মেয়েটি শিক্ষায়, জ্ঞানে, বয়সে, হয় ত সকল বিষয়েই তাহার অপেক্ষা ছোট হইয়াও এই দণ্ড কয়েকের আলাপেই তাহাকে এমন করিয়া পরাজিত করিয়া ফেলিল, সে শুধু তাহার অসাধারণ সংযমের বলে। তাই সে এত শান্ত হইয়াও এত দৃঢ়, এত জানিয়াও এমন নির্ব্বাক। মহিমের সম্বন্ধে সে নিজে যখন প্রগল্‌ভের মত অবিশ্রাম বকিয়া গিয়াছে, তখন এই মেয়েটি অধোমুখে শুনিয়াছে, সহিয়াছে, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল হইয়া তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া আপনাকে লঘু করে নাই। সর্ব্বক্ষণই আপনাকে দমন করিয়াছে, গোপন করিয়াছে, অথচ কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। মহিমকে সে যে কতখানি ভালবাসে, তাহা জানিতে দিল না সত্য, কিন্তু, তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা যে কিছুতেই তিলার্দ্ধ ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সে কথা কতই না সহজে এবং সংক্ষেপে জানাইয়া দিল! সুরেশের নিজের মধ্যে শিশুকাল হইতেই সংযম জিনিষটার একান্ত অভাব ছিল। সেই জিনিসটারই এতখানি প্রাচুর্য্য আর একজনের মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাহার শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ আপনা-আপনিই এই গৌরবময়ীর পদতলে মাথা নত করিয়া ধন্য বোধ করিল।

অনেক রাস্তা-গলি ঘুরিয়া, ক্লান্ত হইয়া সুরেশ সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিল। বসিবার ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, মহিম চোখের উপর হাত চাপা দিয়া একটা কোচের উপর পড়িয়া আছে। উঠিয়া বসিয়া কহিল, "এস সুরেশ।"

"এই যে!" বলিয়া সুরেশ ধীরে-ধীরে কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল।

মহিম কালে-ভদ্রে আসে। সুতরাং সে আসিলেই সুরেশের সানন্দ অভ্যর্থনা কিঞ্চিৎ উগ্র হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। মহিম মনে-মনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "বাসায় ফিরে এসে শুনি তুমি গিয়েছিলে। তাই মনে করলুম—"

"দয়া ক'রে একবার দেখা দিয়ে আসি। না হে? কতদিন পরে এলে মনে করতে পার?"

মহিম হাসিয়া কহিল, "পারি। কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি যে।" বলিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, গ্যাসের আলোকে সুরেশের মুখের চেহারা অত্যন্ত ম্লান এবং কঠিন দেখাইতেছে। তাহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে স্নিগ্ধ স্বরে পুনরায় কহিল, "তোমার রাগ হতে পারে, এ আমি হাজার বার স্বীকার করি সুরেশ। কিন্তু বাস্তবিক সময় পাইনে। আজকাল পড়াশুনার চাপও একটু আছে; তা ছাড়া সকালে-বিকালে গোটা দুই টিউসনি—"

"আবার টিউসনি নেওয়া হয়েছে?"

মহিম তাহার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে খুঁজেছিলে, বিশেষ কিছু দরকার ছিল কি?" সুরেশ কহিল "হুঁ। তুমি আজ না এলে আমাকে আবার কাল সকালে যেতে হ'তো।"

মহিম কারণ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। সুরেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তাহার পায়ের জুতা-জোড়াটার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি এর মধ্যে বোধ করি কেদারবাবুর বাড়ীতে আর যাওনি ?"

মহিম কহিল "না।"

"কেন যাওনি, আমার জন্যে ত ? আচ্ছা, তোমার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম। তোমার ইচ্ছামত সেখানে যেতে পার।"

মহিম হাসিল ; কহিল, "যাব না, এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম বলে ত আমার মনে হয় না।"

সুরেশ বলিল, "না হয় ভালই। তবুও আমার তরফ থেকে যাবার যদি কোন বাধা থাকে, ত সে আমি তুলে নিলুম।"

"এটা অনুগ্রহ না নিগ্রহ সুরেশ ?"

"তোমার কি মনে হয় মহিম ?"

"চিরকাল যা মনে হয়, তাই।"

সুরেশ কহিল, "তার মানে আমার খাম্‌খেয়াল। এই না ? তা' বেশ, তোমার যা' ইচ্ছে মনে করতে পারো, আমার আপত্তি নেই ; শুধু যে বাধাটা আমি দিয়েছিলুম, সেইটেই আজ সরিয়ে নিলুম।"

"কিন্তু তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"খেয়ালের কি কারণ থাকে যে, তুমি জিজ্ঞাসা করলেই আমাকে বল্‌তে হবে !"

মহিম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "কিন্তু সুরেশ, তোমার খেয়ালের বশেই যে সমস্ত সংসারে বাধা পড়বে, আর উঠে যাবে, এ হলে হয় ত ভালই হয় ; কিন্তু বাস্তব ব্যাপারে ত হয় না। তোমার যেখানে বাধা নেই, আমার সেখানে বাধা থাকতেও পারে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, তুমি সেদিন ব্রাহ্ম মহিলাদের সম্বন্ধে যত কথা বলেছিলে, আমি তা ভেবে দেখেচি। ভাল কথা, সেদিন বলেছিলে একমাসের মধ্যে আমার জন্য পাত্রী স্থির করে দেবে, তার কি হ'ল ?"

সুরেশ মুখ তুলিয়া দেখিল, মহিম গাম্ভীর্য্যের আড়ালে তীব্র পরিহাস করিতেছে। সেও গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "আমি ত ভেবে দেখলুম মহিম, ঘটকালি করা আমার ব্যবসা নয়।" তারপরে হাসিয়া কহিল "কিন্তু তামাসা থাক। এ ক'দিন আমার মান রেখেচ বলে তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ ; কিন্তু, আজ যখন আমার হুকুম পেলে, তখন কাল সকালেই একবার সেখানে যাচ্চ ত ?"

"না, কাল বিকালে আমি বাড়ী যাচ্চি।"

"কখন্ ফিরবে ?"

"দশ-পনেরো দিনও হতে পারে, আবার মাসখানেক দেরি হতেও পারে।"

"মাসখানেক ! না মহিম, সে হবে না" বলিয়া অকস্মাৎ সুরেশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহিমের ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, "আর আমার অপরাধ বাড়িয়ো না মহিম, কাল সকালেই একবার যাও। তিনি হয় ত তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন।" বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

মহিমের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সুরেশের এই আকস্মিক আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর, এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মমহিলা সম্বন্ধে এই সসম্ভ্রম উল্লেখে সে যেন বিহ্বল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আমার পথ চেয়ে বসে আছে সুরেশ ? কেদার বাবুর মেয়ে ?"

সুরেশ সহসা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "থাক্‌তেও ত পারেন ?"

মহিম আবার কিছুক্ষণ সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে যে ইতিমধ্যে ব্রাহ্মবাড়ীতে গিয়া অনাহুত পরিচয় করিয়াও আসিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার কোন মতেই মনে উদয় হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "না সুরেশ, আমি হার মান্‌চি—তোমার আজকের মেজাজ বাস্তবিক আমার বুদ্ধির অগম্য। ব্রাহ্মমেয়ে পথ চেয়ে বসে আছে,—এ কথা তোমার মুখ থেকে বোঝা আমার দ্বারা অসম্ভব।" সুরেশ কহিল, "আচ্ছা, সে কথা একদিন বুঝিয়ে দেব। তুমি বল, কাল সকালেই একবার দেখা দেবে ?"

"না, কাল অসম্ভব। আমাকে সকালের গাড়ীতেই বাড়ী যেতে হবে।"

"মিনিট কয়েকের জন্যও কি দেখা দিতে পার না ?"

"না, তাও-পারিনে। কিন্তু, তোমার কি হয়েচে বল দেখি?"

"সে কথা আর একদিন বল্‌ব,—আজ নয়। আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে তোমার কথা বলে আস্‌তে পারি কি?"

মহিম অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "পারো, কিন্তু, তার ত কিছু দরকার নেই!"

সুরেশ কহিল, "না থাক্ দরকার,—দরকারই সব নয়। আমার পরিচয় দিলে তাঁরা চিন্‌তে পারবেন?"

"একজন নিশ্চয়ই পারবেন।"

সুরেশ বলিল, "তা'হলেই যথেষ্ট। তোমার বন্ধু বলে চিন্‌বেন ত?"

মহিম বলিল, "হাঁ।"

সুরেশ এইবার একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আর চিন্‌বেন—তোমার একজন ঘোরতর ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী হিন্দু বন্ধু? না?"

মহিম কহিল, "কিন্তু, সেই ত তোমার প্রধান গর্ব্ব, সুরেশ।"

সুরেশ বলিল, "তা বটে।" বলিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ আমার বড় ঘুম পাচ্চে মহিম, আমি শুতে চল্লুম।" বলিয়া অন্যমনস্কের মত ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রশাসন

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ]

একাদশবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীতে একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ তাম্রশাসন দেখিয়াছিলাম; শুনিয়াছিলাম যে উহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্পত্তি। সেই সময় হইতে ইংরাজী ১৯১০ বা ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত তাম্রশাসনখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত ছিল। সম্ভবতঃ ১৯১২ সালে মৈত্রেয় মহাশয় উহা রাজশাহীতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমি তাম্রশাসনখানির উদ্ধৃত পাঠ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আট বৎসরের পরে গত পৌষ মাসের 'সাহিত্যে' উদীয়মান প্রত্নতত্ত্ববিৎ, রাজশাহী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম্ এ, মহাশয় দ্বিতীয়বার এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। বসাক মহাশয় গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সামন্ত লোকনাথের তাম্রশাসন ব্যতীত অধিকাংশগুলিই খৃষ্টীয় দশম, একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর লেখ। সামন্ত লোকনাথের তাম্রশাসন ও গুপ্তযুগের দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন-পঞ্চকের পাঠোদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসাক মহাশয় এই প্রথম প্রাচীন-যুগের লেখচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন। সামন্ত লোকনাথের তাম্রশাসন বসাক মহাশয় কর্তৃক ১৩২১ সনের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে, দামোদরপুরের তাম্রশাসনগুলির উদ্ধৃতপাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই; তবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের Indo-Aryans গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই লেখগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে ইন্দোরখেড়ায় আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের তাম্রশাসন ব্যতীত ভারতীয় প্রাচীন-যুগের অপর কোনও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। ধানাইদহে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রশাসন স্কন্দগুপ্তের তাম্রশাসন

সাইলক, এ্যাণ্টোনিয়ো এবং ব্যাসিনো

Emerald Ptg Works, Calcutta.

অপেক্ষা প্রাচীন, এবং প্রাচীন-যুগের অন্য তাম্রশাসনাভাবে আট বৎসর পূর্ব্বে ইহার পাঠোদ্ধার-কার্য্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। সম্প্রতি ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারিখানি প্রাচীন-যুগের তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ শ্রীযুক্ত পার্জিটার (F. E. Pargiter) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিখানি এবং দামোদরপুরে গুপ্তযুগের পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন-যুগের খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ধাতুপট্টে উৎকীর্ণ লেখের পাঠোদ্ধার-কার্য্য অনায়াস-সাধ্য হইয়াছে। সুতরাং বসাক মহাশয় ধানাইদহের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে অধিকতর সফলকাম হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বসাক মহাশয় "কুমারগুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধে আমার উদ্ধৃত পাঠ ও তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, "উদ্ধারকার্য্যে যথোচিত মনোনিবেশের অভাব ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাব এত অশুদ্ধির কারণ। তাহা না হইলে বলিতে হইবে, তিনি প্রাচীন অক্ষরের মধ্যে অনেকগুলিকে চিনিয়া লইতে পারেন নাই।" বসাক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাঁহার উদ্ধৃত পাঠ এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত মূল তাম্রশাসনের প্রতিলিপি মিলাইয়া দেখিলাম যে, বসাক মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ, যাহা আমার উদ্ধৃত পাঠের সহিত মিলে না, তাহা দুই এক স্থল ব্যতীত মূলানুগত নহে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন, শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন, সামন্ত লোকনাথের তাম্রশাসন ও শিলিমপুরের শিলালিপি পাঠ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্-সমাজে যশোলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিলাভ করিয়া প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখনও প্রাচীন লেখের পাঠোদ্ধার অপেক্ষা ব্যাখ্যা-কার্য্যই তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। সেই জন্যই বোধ হয় বসাক মহাশয়—এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে সামান্য Votive inscriptionএ "অনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে" স্থানে "সম্বৎসর শতয়ে" পাঠ অনুমান করিয়া তীব্রবেগে ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজশাহীতে অধ্যাপকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বসাক মহাশয় যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হইয়াছিল যে, তাঁহার পাঠোদ্ধারের পূর্ব্বে লেখের ব্যাখ্যা করিবার স্পৃহা কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু "মান্দার শিলালিপি" ও "কুমারগুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিয়া অনেকে হতাশ হইয়াছেন।

"কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরাপথে ব্যবহৃত অক্ষরে লিখিত। এই শতাব্দীর অক্ষরমালায় দুইটি বিভাগ আছে; পূর্ব্ববিভাগ ও পশ্চিম বিভাগ; ইহা জর্জ বুলার (George Bühler) ও হর্ণলির (A. F. R. Hoernle) মত। অদ্যাবধি কেহ এই মতের প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই। প্রত্নলিপিতত্ত্ব (Palaeography) সম্বন্ধে বুলারের বিখ্যাত গ্রন্থে এই মত প্রতিপাদিত হইয়াছে। ধানাইদহের তাম্রশাসন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরাপথের পূর্ব্বভাগে ব্যবহৃত অক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বুলারের "ভারতীয় প্রত্নলিপিতত্ত্ব" অনুসারে হরিষেণ রচিত প্রশস্তি, মানকুয়ারের মূর্ত্তির শিলালিপি, বিহার, ভিটারি ও কহাঁউতে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি এই শ্রেণীর অক্ষরে লিখিত। প্রত্নলিপিতত্ত্বে বর্ণপরিচয় না হইলে কোনও প্রাচীন লিপির পাঠ উদ্ধার হওয়া কঠিন। সামান্য পরিচয়ে প্রত্নলিপিতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করা দুর্ঘট। সময়ে-সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে প্রত্নলিপিতত্ত্বের সম্যক্ বর্ণ-পরিচয় না থাকিলেও লোকে প্রাচীন লেখের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বহুদিন পূর্ব্বে সিরাজগঞ্জের একজন বৈদ্য মাধাইনগরের একখানি তাম্রশাসনের এইরূপ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক খৃষ্টীয় দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর অক্ষরের সহিত সুপরিচিত; কিন্তু প্রাচীন-যুগের, বিশেষতঃ গুপ্তযুগের অক্ষরের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হয় না, থাকিলে তিনি "কুমারগুপ্তের রাজ্য-সময়ের তাম্রশাসন" নামক প্রবন্ধে ধানাইদহের তাম্রশাসনের যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশকালে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিতেন। ব্যাখ্যার সুবিধা হইবে বলিয়া স্বকপোলকল্পিত পাঠ, বন্ধনী ব্যতীত ব্যবহার করা প্রত্নলিপিতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত রীতিবিরুদ্ধ। বসাক মহাশয়ের ও আমার উদ্ধৃত পাঠ তুলনা করিয়া যে যে স্থলে বসাক মহাশয়ের পাঠ মূলানুগত নহে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

বসাক মহাশয়ের পাঠ

১।…স্বৎসর—শ [ে] ত ত্রয়োদশোত্ত

২।…[f] ন্দবস-পুর্ব্বায়াং পরম দৈবত পর—

৩।…। কুটু [ম্বি]…ব্রাহ্মণ-শিবশর্ম্ম-নাগশর্ম্ম-মহ—

৪। … বর্কীর্ত্তি-ক্ষেমদত্ত-গোষ্ঠক-বর্গপাল-পিঙ্গল-শুক্ষুক-কাল—

৫।…প (.?)—বিষ্ণু [দেব] শর্ম্ম-বিষ্ণুভদ্র-খাসক-রামক-গোপাল—

৬।…স (?) সু (?) শ্রীভদ্র-সোমপাল-রামাষ্ঠাঃ (?) গ্রামাষ্টকুলাধিকরণঞ্চ—

৭।…বিষ্ণুণা (?) বিজ্ঞাপিতা-ইহ খাদা (টা ?)—পারবিষয়েন্নুবৃত্ত-মর্য্যাদাস্থি [তি]—

৮।…নীবীধর্ম্মক্ষয়েণ লভ্য [তে] [ত] দর্হথ মমাষ্থানেনৈব ক্রমেণ (ণ ; দা [তুং]—

৯। …সমেত্যা (?) ভিহিতৈ (ঃ ?) সর্ব্বমেব × জ্ঞা (?) কর-প্রতিবেশি (?) কুটুম্বিভিরবস্থাপ্য ক—

১০। …×রি×কন×যদিতো× ×[তি] দবধৃতমিতি যত-স্তথেতি প্রতিপাদ্য।

১১। …বকনলা [ভ্যা] মপবিঞ্চ্য ক্ষেত্রকুল্যাবাপমেকং দত্তং-ততঃ আযুক্তক—

১২। …×ভ্রা (?) তৃ-কটক-বাস্তব্য-ছন্দোগ-ব্রাহ্মণ বরাহস্বামিনো দত্তং তদ্ব—

১৩। …ভূম্যা দা [নাক্ষে] পে চ গুণা গুণ মনুচিন্ত্য শরীর-ক (কা) ঞ্চন কস্য চি—

১৪। …আ [উ]ক্তঞ্চ ভগবতা দ্বৈপায়নেন স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা—

১৫। …[ভিঃ] সহ পচ্যতে [॥ *] ষষ্টিং বর্ষ সহস্রানি (ণি) স্বর্গেগ্ মোদতি [ভূমিদঃ] [। *]

১৬। …[পূ] র্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির [। *] মহীং [মহীমতাঙ্শ্রেষ্ঠ]

১৭। …য় [ং] সু (?) শ্রীভদ্রেন উৎকীর্ণ্নং স্থ (স্ত) স্তেশ্বরদাসে [ন]…

অস্মদীয় পাঠ

১।…[শ্রীকুমার-গুপ্ত-রাজ্য-স] স্বৎসর শত—ত্রয়োদশুত্ত [র]…

২।…[অস্যা] ন্=দিবসপূর্ব্বায়াং পরম-দৈবত পর [ম]..

৩।…ক্ষুদ্র [ক নিবাসিনঃ] ব্রাহ্মণ শিবশর্ম্ম নাগশর্ম্ম মঃ

৪।…[দে] বর্কীর্ত্তি ক্ষমবন্ত গোষ্ঠক বর্গপাল পিঙ্গল শু-(?) স্কুক কাল…

৫।…বীর্য্য দেবশর্ম্ম বিষ্ণুভদ্র খুষক উপক গোপাল…

৬।…শ্রীভদ্র স্থমনাহরণ (?) ভ্যা-- গ্রামাষ্ট কুলাধিকরণ..

৭।…চরণ বিজ্ঞাপিত.. মহাখুষাপারবিষয়ে—নিবত্তমর্য্যাদাস্থিতি…

৮।…নীবী-ধর্ম্ম-ক্ষয় মালভ্য…দর্হথমাশাস্ত নমুবক্র—লেন (?) বা…

৯। …পলে (?) ত্যভিহিত ..সর্ব্বলম্ব…করপ্রতি-প্রতিকুটুম্বিভিরবস্থাপ্যাক…

১০। পরিত্যক্তেন য বি…চ…দণ্ডকমিতি স্তস্তোগাতি প্রতিপাদ্য…

১১। …বরনালক সদ (?) বি… ছ্য--কৃত্য বস-লক (?) দত্ত ততঃ সুযুক্তক…

১২। .. ভূ (?) কটক বস্তেভ্য (?) ছান্দশ (?) ব্রাহ্মণ বরাহস্বামিনে দত্তং তদ্ব…

১৩। …ভূম্যাদান্—ক্ষেপ (?) চ গুণ্য (?) গুণমনুচিন্ত্য শরীরকল্যা (?) নকস্য চো…

১৪। …শ উক্তঞ্চ ভগবতা দ্বৈপায়নেন স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা…

১৫। …তৃভিঃ সহ পচ্যতে শষ্টি (ং)

বর্ষসহস্রাণি স্বর্গেগ্ মোদতি ভূমিদ [ঃ]

১৬। …পূর্ব্বদত্তাং দ্বিজাতিভ্য [ঃ] যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির মহী…

১৭। …[ও] য়ম্ শ্রীভদ্রেন উৎকীর্ণ্নং স্থস্কেশ্বরদাসে [ন]…

(১) দ্বিতীয় পংক্তিতে "অস্যান্দিবস" শব্দটি বসাক মহাশয় যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে আমার উদ্ধৃত পাঠ ভুল; কিন্তু ইংরাজী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষা লিখন ও পঠনে অনভ্যাস বশতঃ বসাক মহাশয় ইহা

মনে করিয়াছেন। সংস্কৃত "অস্যাহ্নিবস" ইংরাজী অক্ষরে *asyān-divasa* হয়। এই শব্দটির প্রথম দুই অক্ষর পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

(২) তৃতীয় পংক্তিতে "ক্ষুদ্রক" স্থানে "কুটুম্বিভিঃ" পঠিত হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। "ক"এর নিচে কমার ন্যায় চিহ্ন না থাকিলে "কু" হয় না। ষষ্ঠ পংক্তিতে "গ্রামাষ্টকুলাধিকরণ" শব্দে এইরূপ "কু" আছে এবং ৯ম পংক্তিতে "কুটুম্বিভি" শব্দ আছে। এই দুইটি শব্দের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "ক"এর নিম্নে কমা দিয়া "কু" লিখিত হইয়াছে এবং ৯ম পংক্তিতে "কু" অস্পষ্ট। খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত "ক" এর নিচে কমা দিয়া "কু" লেখা হইত। সুতরাং বসাক মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ মূলানুগত নহে। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, "ক" এর উপরে একটি ব্যঞ্জন আছে। মূলে "ব্রাহ্মণ" শব্দের পূর্ব্বে বিসর্গ আছে, এই কারণে "ক্ষুদ্রক" [নিবাসিনঃ] লিখিত হইয়াছিল।

(৪) চতুর্থ পংক্তিতে "ক্ষমবন্ত" শব্দ বসাক মহাশয় কর্ত্তৃক "ক্ষেমদত্ত" পঠিত হইয়াছে, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। "ক্ষ" তে "এ" দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তৃতীয় অক্ষরটি অস্পষ্ট, চিত্রে উহা "ব" বলিয়াই বোধ হয়। প্রাচীনলেখ-পাঠোদ্ধারকার্য্যে অসংযত কল্পনা প্রধান বিঘ্ন; বসাক মহাশয় কল্পনা সংযত করিলে অধিকতর যশস্বী হইতে পারিবেন।

(৫) পঞ্চম পংক্তিতে দুইটি নাম "বীনাদেব শর্ম্ম" ও "বিয্যভদ্র" পাঠ করিয়াছিলাম, বসাক মহাশয়ের মতানুসারে এই নাম দুইটি "বিষ্ণুদেব শর্ম্ম" ও "বিষ্ণুভদ্র" হইবে। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, মূলে দুইটি নামেই দ্বিতীয় অক্ষরটি "ষ্ণু" নহে, পঠনকালে ইহা "সু" অথবা "ষ্য" ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

(৬) ষষ্ঠ পংক্তিতে "শ্রীভদ্র" শব্দের প্রথম অক্ষরে "র" ফলা হয় ছিল না, নতুবা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; এইরূপ স্থলে বসাক মহাশয় "র" যোগ করিয়া বিজ্ঞানসম্মতরীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন।

(৭) ৬ষ্ঠ পংক্তির দ্বিতীয় শব্দটি "সোমপাল" পাঠ করা কঠিন, কারণ এই শব্দের আদ্যক্ষরের নিম্নে আর একটি অক্ষর আছে বলিয়া বোধ হয়। এই যুক্তাক্ষর দেখিতে "স্থ"র ন্যায়। এই শব্দের চতুর্থ অক্ষরটি "হ" কি "ল" তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তৃতীয় অক্ষরটি "পা" কি "না" তাহা বলা যায় না; কারণ "স", "ম" ও "প" তিনটি অক্ষরেই আকারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ অক্ষরটি ১২ পংক্তির "বরাহ" শব্দের সহিত তুলনীয়।

(৮) বসাক মহাশয় ৬ষ্ঠ পংক্তিতে যে শব্দটি "রামাস্থাঃ" পাঠ করিয়াছেন, তাহা একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাঁহার পাঠ কাল্পনিক। ইহার প্রথম অক্ষরটি নিতান্ত অস্পষ্ট, দ্বিতীয় অক্ষরটি "য়া" হইতে পারে এবং তৃতীয় অক্ষরটি "ত্যা" অথবা "ভ্যা" হইতে পারে।

(৯) ধানাইদহের তাম্রশাসনের প্রত্নলিপিতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন :—

(ক) "অনেক স্থলে অক্ষরের সহিত সংযোজিত 'আ' কার চিহ্নটি অক্ষরের উপরিভাগে ব্যবহৃত না হইয়া, অক্ষরের নীচের বামকোণে অঙ্কুশাকারে প্রদত্ত লক্ষিত হয়। যথা, থাসক (পং ৫) গ্রামাষ্ট (পং ৬), থাদাপার বা থাটাপার (পং ৭), গুণাগুণ (পং ১৩)।"

বসাক মহাশয়ের এই আবিষ্কারটি মৌলিক; বুলার বা কিল্‌হর্ণ কখনও এমন কথা বলেন নাই এবং জীবিত থাকিলে বলিতে ভরসা করিতেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তরাপথে ব্যবহৃত অক্ষরে স্বরবর্ণের "আ", "অ"র নিম্নে কমার ন্যায় চিহ্ন দিয়া লিখিত হইত। বুলার বলিয়াছেন :—

"Since the middle of the 5th Century, the lower portion of the left limb of A shows the curve, open to the left, which appears in all later forms of the letter; the sign of the length of A is attached to the foot of the right vertical." Buhler's Indian Palaeography, English Translation, p. 47.

এই একটি অক্ষর ব্যতীত খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোনও লেখে বর্ণের নিম্নে 'কমার' ন্যায় চিহ্ন দিয়া

আকার বিজ্ঞাপিত হয় নাই। কোনও বর্ণের নিম্নে 'কমার' ন্যায় চিহ্ন দেখিলে উক্ত বর্ণে "উ" যুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। বসাক মহাশয় তাঁহার এই নূতন আবিষ্কারের উপরে নির্ভর করিয়া ৫ম পংক্তিতে "খুষক" ও "উপক" স্থানে "থাসক" ও "রামক" পাঠ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আবিষ্কারটি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যান্য অপরূপ পাঠোদ্ধারের ন্যায় সত্য-মূলক নহে। অন্য কোনও শিলালিপিতে এক স্বরবর্ণের "অ" ব্যতীত অন্য বর্ণের নিম্নে কমার ন্যায় চিহ্ন যোগ করিলে অকারের পরিবর্ত্তে উকার বুঝিতে হয়। ধানাই-দহের তাম্রশাসনে বসাক মহাশয় যে কয়টি আকারের উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটিও গ্রাহ্য হইতে পারে না। "থাসক", "রামক" ও "থাদাপার" প্রকৃত উদাহরণ হইতে পারে না; কারণ এই তিনটি শব্দের আদ্যক্ষরে আকার সম্বন্ধে বসাক মহাশয়ের সহিত আমার মতদ্বৈধ আছে, সুতরাং ইহা প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। নবা-বিষ্কারের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বসাক মহাশয়কে অপর কোনও শব্দ, যাহার পাঠোদ্ধারে মতদ্বৈধ নাই, উদাহরণ দিতে হইবে। ত্রয়োদশ পংক্তিতে "গুণাগুণ" শব্দ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে; সুতরাং তাহাও উদাহরণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না। কেবল ৬ষ্ঠ পংক্তির "গ্রামাষ্ট" শব্দ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। "গ্রামাষ্ট" শব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষরে আকার আছে, কিন্তু এই দুইটি অক্ষরের একটিতেও নিম্নভাগে কমার ন্যায় চিহ্ন যোগ করিয়া আকার বিজ্ঞাপিত হয় নাই। বসাক মহাশয় সঙ্গগুণে কিংবা দৃষ্টিশক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ এই "গ্রামাষ্ট" শব্দে এইরূপ চিহ্ন অনুমান করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ অত্যধিক অনুমান বা কল্পনা প্রত্ন-লিপিতত্ত্বের "গৌড়ী-রীতি" হইতে পারে এবং তাহাতে যশোলাভ অনায়াসসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে তাহা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র পরিবর্জ্জনীয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বভারতে ব্যবহৃত অক্ষরে "স" ও "ষ" প্রাচীন লেখ-পাঠাভ্যাস না থাকিলে চিনিয়া লওয়া কঠিন; বসাক মহাশয় বোধ হয় এই জন্যই পঞ্চম পংক্তিতে "খুষক" শব্দে "স" দেখিয়াছেন!

(১০) সপ্তম পংক্তির প্রথম শব্দটি "চরণ" হইলেও হইতে পারে; তবে এই শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরটির নিম্নদেশ অষ্টম পংক্তির প্রথম শব্দ "নীবীধর্ম্মের" সহিত কতক পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে এবং ইহার নিম্নভাগ ক্ষয়ের জন্য অস্পষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এই শব্দটি "চরণ" কি "বিষ্ণুণা" তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। তবে ইহা স্থির যে সপ্তম পংক্তির প্রথম শব্দে তৃতীয় অক্ষর "ণ" এবং ইহাতে আকার নাই।

(১১) বিষয়ের নামের পাঠোদ্ধারকালে প্রাচীন বর্ণ-জ্ঞানের অভাব বশতঃ বসাক মহাশয় "মহাখুষাপার বিষয়ে" না পড়িয়া "ইহ থাদা (টা?) পার বিষয়ে" পড়িয়াছেন! খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তরাপথে ব্যবহৃত বর্ণমালার সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকায় বসাক মহাশয় স্বচ্ছন্দমনে এইরূপ অপরূপ উদ্ধৃত পাঠ বিদ্বৎসমাজে প্রচারার্থ "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে "ই" তিনটি বিন্দুর দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে "ই" বাম দিকে দুইটি বিন্দু ও দক্ষিণ দিকে একটি সরল রেখার দ্বারা লিখিত হইত। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে এই অক্ষরটি উপরে দুইটি বিন্দু ও নিম্নে একটি কমার ন্যায় চিহ্ন দ্বারা লিখিত হইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হরিষেণ-রচিত প্রশস্তিতে এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে কহাউঁ গ্রামে আবিষ্কৃত স্তম্ভলিপিতে যে "ই" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অক্ষরের বামদিকে দুইটি বিন্দু ও দক্ষিণদিকে একটি সরল রেখা আছে। ইন্দোরে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের তাম্রশাসনে এবং মন্দসোরে আবিষ্কৃত যশোধর্ম্ম-দেবের শিলালিপিতে তিনটি ক্ষুদ্রাকার বৃত্ত দ্বারা "ই" লিখিত হইয়াছে। গুপ্ত-যুগের "ই" সম্বন্ধে বুলার বলিয়াছেন:—

"In addition to the I of the Kusana period, there occur, owing to the predilection for letters flattened at the top, the also later frequent I with two dots above, and that consisting of a short horizontal line with two dots below, which latter is the parent of the later southern I and of that of the Nagari." Buhler's Indian Palaeography English Edition, p. 47.

এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রে ধানাইদহের তাম্রশাসনে বিষয়ের নামের পূর্ব্বে "বিজ্ঞাপিত"

শব্দের শেষ অক্ষরে আকার আছে বলিয়া বোধ হয় না; যে চিহ্ন আছে, তাহা ক্ষয়ের (corrosion) চিহ্ন বলিয়াই বোধ হয়। বিষয়ের নামের পরে বসাক মহাশয়ের মতানুসারে "নৃবৃত্ত" লিখিত আছে; কিন্তু "ন" এর উপরে "ই"-কার আছে, ইহা উপরের পংক্তির "কুলাধিকরণ" শব্দের "ক"এর "ই"কারের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অক্ষরটি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ইহা বসাক মহাশয়ের মতানুসারে "বৃ" হইলেও হইতে পারে।

(১২) অষ্টম পংক্তির প্রথম শব্দ বসাক মহাশয় কর্ত্তৃক "নীবীধর্ম্মক্ষয়েণ লভ্য [তে]" পঠিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্র বহুদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, "নীবীধর্ম্মক্ষয়" এই কয়টি অক্ষরের পরে যে অক্ষরটি আছে তাহা "মা" ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ এই অক্ষরের বামদিকে সরল রেথার উপরে একটি মাত্রা আছে। বসাক মহাশয়ের মতানুসারে ইহা "এ" কিন্তু "ণ' তে মাত্রার অভাব এবং ১২শ পংক্তিতে ব্রাহ্মণ শব্দের "ণ"র সহিত তুলনা করিলে ইহার কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

(১৩) অষ্টম পংক্তির শেষভাগের শব্দগুলি বসাক মহাশয়ের মতানুসারে "মমাস্থানেনৈব ক্রমেণ"। প্রথম "ম"তে আকার আছে, ইহার পরের অক্ষরটী "ষ", মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় "শ" মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথম "ন"তে কোনও স্বর যুক্ত হয় নাই, সুতরাং ইহা "নে" পঠিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় "ন"র ঊর্দ্ধদেশ অস্পষ্ট, ইহা "নৈ" হইতে পারে না, কারণ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে দুইটি একার যোগ করিয়া ঐকার লিখিত হইত। বসাক মহাশয়কে হরিষেণের প্রশস্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত ঐকারের আকার দেখিতে অনুরোধ করি; ফুল্লৈ (১২শ পংক্তি), দৈণ্ড (১৪শ), গ্রাহয়ৈতৈব (১৪শ), বৈদুষ্যাং (১৫শ), পরাক্রমৈক (১৭শ), বৈতস্তিক (১৮শ) পৈষ্টপুরক (১৯শ) ইত্যাদি।

(১৪) খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরাপথের পশ্চিমভাগে যে শ্রেণীর অক্ষর ব্যবহৃত হইত, তাহাতে যেরূপ আকারের "ল" দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আকারের অক্ষর ধানাইদহের তাম্রশাসনে অন্ততঃ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই স্থানেই বসাক মহাশয় "ল"র পরিবর্ত্তে "মে" পাঠ করিয়াছেন; (১) "ক্রমেন" (৮ম পংক্তি), "মেকং" (১০শ পংক্তি)।

এতদ্ব্যতীত সপ্তদশ পংক্তিতে লেখকের নামে দ্বিতীয় অক্ষরে "হ্নে" পাঠ না করিয়া "স্তে" পাঠ করিয়াছেন। বসাক মহাশয় এই তিনটি উদাহরণের মধ্যে প্রথম দুইটির যে পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থবোধের জন্য তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হইলেও গৃহীত হইতে পারে না, কারণ, এইরূপ অনুমান প্রত্নলিপিতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মতপ্রণালীর অনুমোদিত নহে। ৮ম পংক্তিতে সে অক্ষরটি বসাক মহাশয়ের মতানুসারে "মে" তাহার সহিত ধানাইদহের তাম্রশাসনের অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত "ম"র কোনই সাদৃশ্য নাই। দক্ষিণদিকের সরল রেথাটি বামদিকের বক্ররেখা অপেক্ষা কিঞ্চিদূর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং উহার শীর্ষদেশে মাত্রা আছে। ৯ম পংক্তিতে "সর্ব্বমেব" শব্দের তৃতীয় অক্ষরে এইরূপ দক্ষিণদিকের রেথার উচ্চতা ও তদুপরি মাত্রা দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ পংক্তিতে আমার মতে লেখকের নাম "স্থহ্নেশ্বরদাস", কিন্তু বসাক মহাশয়ের মতে উহা "স্তম্ভেশ্বর দাস"। পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যবহৃত পশ্চিম ও পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের বর্ণমালায় কোনও স্থানে "মে" পশ্চিম বিভাগের "ল"র ন্যায় লিখিত হইতে দেখা যায় নাই। বসাক মহাশয় যদি অন্য কোনও স্থানে এইরূপ আকারের "মে" দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা উল্লেখ করা উচিত ছিল। কেবল তাঁহার উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া অন্য প্রমাণের অভাবে এইরূপ গুরুতর কথা স্বীকার করা যাইতে পারে না। বসাক মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া অষ্টম ও নবম পংক্তিতে "ল"র স্থানে "মে" পাঠ করিলে অর্থ করিবার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তথাপি অর্থসঙ্গতির অনুরোধে, অপর কোনও বিশ্বাসজনক প্রমাণের অভাবে, অর্থসঙ্গতির লোভ পরিহার্য্য। অপর কোনও প্রাচীন লেথে এইরূপ আকারের "মে" দেখিতে পাইলে বসাক মহাশয়ের উক্তি স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(১৫) নবম পংক্তিতে "অভিহিত" শব্দের শেষ অক্ষরে "ঐ"কার যুক্ত হয় নাই; অতএব বসাক মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত শব্দের শেষে "ঐ"কার যোগ কাল্পনিক।

(১৬) উক্ত পংক্তিতে "কর" শব্দের পরে "প্রতিবেশি" দেখিতে পাওয়া যায় না, "প্রতি" মাত্র পাঠ করা যায়।

(১৭) দশম পংক্তির প্রথম শব্দটি "পরিত্যক্তেন", বসাক মহাশয় বোধ হয় প্রতিবাদের লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণ পাঠ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে ইহাও সম্ভব যে, ধানাইদহের তাম্রশাসনখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে অন্যত্র নীত হইলে যত্নাভাবে দশম পংক্তির প্রথমাংশ অধিকতর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্যই বসাক মহাশয় শব্দটি সম্পূর্ণ রূপে পাঠ করিতে পারেন নাই।

(১৮) এই পংক্তিতে মধ্যস্থলে কেবল "মিতি" স্পষ্ট আছে; তাহার পূর্ব্বের অক্ষরটি "ত" কি "ক" তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে তাহার পূর্ব্বের অক্ষরটি যে "থ" নহে ইহা নিশ্চয়। বসাক মহাশয় "যতস্তথেতি" পাঠ করিয়াছেন বটে কিন্তু "থে" অক্ষরটি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এইজন্য তাঁহার মত আদর লাভ করিবে না।

(১৯) আটবৎসর পূর্ব্বে আমি যখন ধানাইদহের তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলাম, তখনও ফরিদপুরের তাম্রশাসন-চতুষ্টয় অথবা দামোদরপুরের তাম্রশাসন-পঞ্চক আবিষ্কৃত হয় নাই। ফরিদপুরের তাম্রশাসন-চতুষ্টয় আবিষ্কৃত হইলে ধানাইদহের তাম্রশাসনের দশম পংক্তির পাঠ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পার্জীটার (F. E. Pargiter) ফরিদপুরের প্রথম আবিষ্কৃত তাম্রশাসনত্রয়ে "অপবিঞ্ছ্য" পাঠ করিলে আমি ধানাইদহের তাম্রশাসনের দশম পংক্তিতে ঐ শব্দের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং যথাস্থানে উহা স্বীকার করিয়াছিলাম।

Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, p. 302.

(২০) বসাক মহাশয়ের "ক্ষেত্রকুল্যবাপ" পাঠ সম্ভবতঃ মূলানুগত, কিন্তু আট বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুরের তাম্রশাসন-চতুষ্টয়ের অভাবে ধানাইদহের তাম্রশাসনের এই অংশ পাঠ করা অসম্ভব ছিল।

(২১) দ্বাদশ পংক্তিতে যাহা বসাক মহাশয়ের মতানুসারে "ভ্রাতৃ", তাহার দ্বিতীয় অক্ষরটি "ভূ" ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। হরিষেণের প্রশস্তি পুনর্ব্বার পাঠ করিলে বসাক মহাশয় "তৃ" চতুর্থ শতাব্দীতে কিরূপে লিখিত হইত তাহা দেখিতে পাইবেন, যথা "কর্ত্তৃপুর" (২২শ পংক্তি)। "কটক" শব্দের পরে যাহা লিখিত আছে, তাহা কল্পনা-শক্তির অত্যধিক প্রাবল্য না থাকিলে "বাস্তব্য" পাঠ করা যায় না।

(২২) বন্ধুজনের অনুরোধে বরাহস্বামীকে বেদবিদ্যা-বিশারদ করিতে গিয়া বসাক মহাশয় প্রত্নলিপিতত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। দ্বাদশ পংক্তিতে "ছান্দশ" লিখিত আছে; এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রে স্পষ্ট যাহা লিখিত আছে, বসাক মহাশয় কোন্ বিদ্যার বলে স্পষ্ট আকারটি লোপ করিয়াছেন, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। উক্ত পত্রিকার ৪৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রাকরপ্রমাদ বশতঃ "ছান্দশ" শব্দে "ন" এর নিম্নে একটি বিন্দু মুদ্রিত হয় নাই। ধানাইদহের তাম্রশাসনের মূলে এই শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে "ন"-র স্থানে "ণ" লিখিত হইয়াছে। "ন্দ" লিখিত হইলে "ন"-র মাত্রা লোপ হয় না, হরিষেণ রচিত প্রশস্তির একবিংশ পংক্তিতে "নন্দি" শব্দটি দ্রষ্টব্য। এই শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষরটির উর্দ্ধদেশে যে "ণ" আছে, তাহা পরবর্ত্তী "ব্রাহ্মণ" শব্দের তৃতীয় অক্ষরটি দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

(২৩) দ্বাদশ পংক্তির শেষ শব্দটি যে "তদ্ব", "তদ্ধ" নহে, তাহা কোনও লেখ-পাঠককে বলিয়া দিতে হয়, ইহাই আক্ষেপের বিষয়; কারণ "ব" ত্রিকোণ আকার, কিন্তু "ধ" ত্রিকোণ আকার নহে; অতএব পাদটীকায় বসাক মহাশয় যে পাঠ অনুমান করিয়াছেন, তাহা গর্হিতকল্পনামূলক।

(২৪) ত্রয়োদশ পংক্তিতে প্রথমে "ভূম্যাদানক্ষেপ" লিখিত আছে, মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৪৭১ পৃষ্ঠায় "ন" তে "অ" লোপ হইয়াছে।

(২৫) একাদশ পংক্তিতে "আযুক্তক" পাঠ করিয়া বসাক মহাশয় স্বয়ং গুপ্তযুগের আকারটি বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে বুলারের Indian Palaeography নামক গ্রন্থের তৃতীয় চিত্রের প্রথম স্তম্ভত্রয়ে মনঃসংযোগ করিতে অনুরোধ করি।

(২৬) সপ্তদশ পংক্তিতে লেখকের নাম পাঠকালে বসাক মহাশয় অত্যধিক কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের নামের প্রথম অক্ষরটি "স্থ", "স্ত" নহে। দশম পংক্তিতে "যতস্তথেতি" শব্দে "স্ত" আছে, লেখপাঠে তাদৃশ মনঃসংযোগ থাকিলে বসাক মহাশয় ইহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতেন। দ্বিতীয় অক্ষরটির নিম্নে "ভ" নাই,

কারণ, "ভ" অন্তর্বিধ এবং উপরের অক্ষরটি অপর প্রমাণা-ভাবে "মে" পাঠ করা যায় না।

বিবিধবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক দামোদরপুরে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের তাম্রশাসন-পঞ্চকের পাঠোদ্ধার ভার গ্রহণ করিয়াছেন; ভারতীয় প্রত্নবিদ্যানুশীলনকারিগণের প্রতি অযথা কলঙ্কারোপণের ভয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, প্রত্নলিপিতত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভ করিয়া তিনি যেন উক্ত তাম্রশাসন পঞ্চকের উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করেন। "কুমারগুপ্তের রাজ্যসময়ের তাম্রশাসন" পাঠ করিয়া মনে হইতেছে যে, প্রত্নলিপিতত্ত্ব অপেক্ষা পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিলে বসাক মহাশয় অধিকতর যশোলাভ করিতে পারিতেন।

দিশা-হারা।

[শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

মাতা যখন মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন, মোহিনীর বয়স তখন দশ, ছোট ভগিনী কমলিনীর তিন। পিতা রামচন্দ্র মোদকের বৃদ্ধ-বয়সের সন্তান তাহারা,—বড় আদরের মোহি-কম্‌লি। স্ত্রী-বিয়োগে রাম সংসার অন্ধকার দেখিল। সংসারে দ্বিতীয় মনুষ্য নাই। রামচন্দ্রের চক্ষুস্থির হইল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কোন্ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, কোন্ নবশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, মোহিনী তাহার কাঁটালতলার, ইঁটে-ঘেরা ধূলা-মাটির খেলাঘর ছাড়িয়া, সত্যকারের রান্নাঘরের, ভাঁড়ারঘরের হাতা-বেড়ি, হাঁড়ি-কুঁড়ি বুঝিয়া লইল। পুঁথির মালা গলায় দেওয়া কাচের পুতুল ফেলিয়া, মাদুলি-পরা অত বড় ছোট বোনটীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। পিতা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

মোহিনীর একটু বয়সে বিবাহ হইল। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মোহিনী তাহার দুষ্ট ছোট বোনটিকে বুকে ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল, পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া অনেক ফোঁপাইল। তারপর গিয়া গো-শকটে উঠিয়া বসিল। রামচন্দ্র কমলিকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

যে-পারে যখন ভাঙ্গন ধরে, তাহা কি আর বাধা মানে? মোহিনীর বিবাহের বৎসর দুই পরে রামচন্দ্রও স্ত্রীর অনুগমন করিল। তাহার বটতলার মুড়ি-মুড়কি, খই-চিঁড়ের দোকানটি চির-দিনের মত বন্ধ হইল। মোহিনী শ্বশুরালয়ে সংবাদ পাইয়া, রান্নাঘরের ভিজে মেঝেয় পড়িয়া সমস্ত দিন কাঁদিল। শাশুড়ী আসিয়া কড়ামিঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"এ কি ক'রছ বাছা? মা-বাপ কিছু চিরদিনের নয়; এক-দিন না-একদিন যাবেই। তার জন্যে এত কেন? এ বাড়ীর একটা মঙ্গল-অমঙ্গল দেখ্‌তে হবে ত?" মোহিনী চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

কম্‌লি আজ অনাথিনী। তাহার আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না। স্বামী বীরেশ্বরকে অনেক বলিয়া-কহিয়া মোহিনী তাহার দুঃখিনী কম্‌লিকে কিছুদিনের জন্য নিজের কাছে লইয়া আসিল। তাহার পিত্রালয়ের সম্বন্ধ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল।

মোহিনীর শ্বশুরের সংসারে—স্বামী, দেবর বিশ্বেশ্বর এবং বিধবা শাশুড়ী ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। এখন কম্‌লি হইল আর একজন। কিছুদিন বেশ চলিয়া গেল।

একদিন মোহিনীর চমক ভাঙ্গিল। সে দেখিল তাহার স্কন্ধে মস্ত একটা দায়িত্ব। কম্‌লি? তাহার যে বিবাহের বয়স হইয়াছে। মোহিনী অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া কি ভাবিল। তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—"ঠাকুর-পো যদি দয়া ক'রে কম্‌লিকে বে করে"—মোহিনীর প্রাণে কে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিল। ইহা কি সম্ভব? হইতেই পারে না। দুরাশা, আকাশকুসুম! তথাপি মোহিনী আত্মহারা হইয়া ভাবিতে লাগিল—"আহা, তা যদি হয়, তবে বেশ হয়। ছোট-বেলা থেকে দুটি বোনে বাপের ঘরে খেলা ক'রেছি,—শ্বশুরবাড়ীতেও দুজনে সুখে দুঃখে ঘর

করি।"—কিন্তু এ আশা, এ কল্পনা সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিতই পরিত্যাগ করিল।

কম্‌লিকে শাশুড়ীর বড় পছন্দ হইল। একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিল—"আচ্ছা বীরু! এক কাজ ক'ল্লে হয় না! আমার বিশুর সঙ্গে কম্‌লির বে দিলে হয় না? বেশ মানায় কিন্তু?" বীরেশ্বর শীতের মিষ্ট রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া ছিল। গাত্র চুলকাইতে-চুলকাইতে আরামব্যঞ্জক মুখভঙ্গী করিয়া উত্তর করিল—"বেশ ত!"

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোহিনী কুট্‌না কুটিতেছিল। মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণমাত্র তাহার শরীরে যেন একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। অন্যমনস্কে বঁটিতে একটা আঙ্গুল সামান্য কাটিয়া গেল। অপর হস্তে কর্ত্তিত আঙ্গুল চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কি সত্য? না—স্বপ্ন! যদি এ হয়—বুঝ্‌বো কম্‌লির অদৃষ্ট! কিন্তু সে যে বড় অভাগিনী। মোহিনী আর ভাবিতে পারিল না। তাহার নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে জানি না, সত্যসত্যই একদিন বিশ্বেশ্বরের সহিত কম্‌লির বিবাহ হইয়া গেল। মোহিনী মাতাপিতাকে স্মরণ করিয়া, অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কৃতজ্ঞতায় ও ভক্তিতে তাহার মস্তক কড়া-মেজাজ শাশুড়ীর চরণে যেন নত হইয়া পড়িল। অনেক দিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল।

কোন্ অপরাধে, কোন্ বিষম দোষে বলিতে পারি না,—শাশুড়ী দিন-দিন মোহিনীর উপর বড়ই রুষ্ট ও নির্দ্দয় হইয়া পড়িল। তৎ-পরিবর্ত্তে ছোট-বৌমা—কম্‌লি পাইতে লাগিল—প্রচুর আদর ও অপরিসীম সোহাগ। সঙ্গে-সঙ্গে বীরেশ্বরও স্ত্রীর উপর একটু কড়া হইয়া মাতৃভক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। শাশুড়ীর হুকুম,—সংসারের সমস্ত কর্ম্মই বড়বৌকে করিতে হইবে,—ছোট বৌমা কিছুই করিতে পারিবে না। তাহার শরীর বড় দুর্ব্বল, বড় জোর—দুইটা পান-সাজা, কি এক্ ফেরো জল গড়াইয়া দেওয়া, এই পর্য্যন্ত। মোহিনী ইহাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইল না। এ ব্যবস্থা সে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইল। সে চাহে না যে—তাহার সেই ছোটবেলাকার কম্‌লি—বোন্‌টি ঠিক 'ঝি'-এরই মত সংসারের সমস্ত খুটিনাটিতে তাহার পায়ে-পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে সুখে থাক, তাহাতেই মোহিনীর সুখ।

কম্‌লি কিন্তু এ বন্দোবস্তটাকে 'সু' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। কেন? তাহার শরীর ত বেশ আছে। তবে এ অন্যায় বিচার কেন? একলা দিদি সংসারের সমস্ত খাটুনি খাটিয়া মরিবে, আর সে বসিয়া-বসিয়া দেখিবে। নাঃ, তাহা কম্‌লি পারিবে না। যে দিদি মায়ের মত সোহাগ-স্নেহে ঢাকিয়া, বুকে-কাঁখে করিয়া এতটুকু থেকে এতবড় করিয়াছে, সেই দিদি অন্যায় বিচারে নির্যাতন ভোগ করিবে, আর—কম্‌লি, আদরের ছোট-বৌমা—অতিরিক্ত সোহাগ-স্নেহ, আদর-আব্দার অধিকার করিয়া থাকিবে;—না, কম্‌লি তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। এ কথা চিন্তা করিয়া কম্‌লি বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল; লজ্জায়, ক্ষোভে সে এতটুকু হইয়া গেল; দিদির দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপরাধীর মতই সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

'যাকে দেখ্‌তে নারি—তার চলন বাঁকা' ক্রমে ঠিক তাহাই হইল। মোহিনী এখন ভাল করিলেও শাশুড়ীর চক্ষে মন্দ হইতে লাগিল। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়েই শাশুড়ীর "পোলো পোলো, ছুঁলো ছুঁলো। কোথাকার হতচ্ছাড়া বৌ গা?" ইত্যাদি কর্কশ চীৎকারে মোহিনী সর্ব্বদাই পীড়িত হইতে লাগিল; অথচ সে নিজের দোষ বা ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না। এ অত্যাচার, এ অন্যায় তিরস্কার মোহিনী চুপ করিয়া সহ্য করিতে লাগিল। যখন অসহ্য হইত, তখন শাশুড়ীর চক্ষুর অন্তরালে গিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনের ভার লাঘব করিবার বৃথা চেষ্টা করিত। কম্‌লি অনেক দিন দিদির পক্ষে দুই একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছে;—কিন্তু, শাশুড়ীর কট্‌মটে চাহনিতে তাহা চাপিয়া গিয়াছে।

মোহিনী এখন একটি পুত্রের মাতা। তাই সে আর বড়-বৌমা বা বড়বৌ নহে। এখন তাহার ডাক-নাম হইয়াছে 'নেদোর মা।' আর কম্‌লি,—যে ছোট-বৌমা সেই ছোট-বৌমাই আছে। বরং আজকাল ডাকটিকে একটু মিষ্ট করিবার নিমিত্ত শাশুড়ী বেশ স্পষ্ট, নাকি-সুর প্রয়োগ করিয়া থাকে।

(২)

ওয়াক্—থু-থু-থু। অর্দ্ধ-চর্ব্বিত পান ফেলিয়া দিয়া

বিশ্বেশ্বর ঘটির জলে কুলকুচা করিল। প্রকাণ্ড এক কলসী জল কাঁখে করিয়া, ভিজা কাপড়ে মোহিনী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া, বিশ্বেশ্বরের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হলো ঠাকুর-পোঁ ?"

মা-কালীর মত খানিকটা জিভ্ বাহির করিয়া গামোছা দিয়া খানিকক্ষণ জিভ ঘসিয়া লইয়া বিশ্বেশ্বর উত্তর করিল—"যা হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে। পানে চুণ আর নুন দুই-ই বেশী হ'য়েছে।"

জলের কলসী নামাইতে-নামাইতে মোহিনী বলিল—"চুণ না হয় বেশী হ'তে পারে, নুন এলো কোত্থেকে ?"

"তা তোমরাই জান।" বিশ্বেশ্বর পুনরায় জিভে গামোছা ঘসিতে লাগিল।

"কি জানি ভাই, তোমার গিন্নিই আজ পান সেজেছে।"—মোহিনী সরিয়া গেল।

"কি রে বিশু ?"—গৃহের দাওয়া হইতে মাতা উৎসাহিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল। বিশু মৃদু মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিল—"বিশেষ কিছু নয়। তবে আজকাল তোমার বৌয়েরা পানেও নুন দিতে ধ'রেছে।"

"সে কি রে ? পানে নুন ? নুনে-পানে বিষ হয় যে—নুনে-পানে বিষ ! ভাল ক'রে মুখ ধুয়ে ফেল। খানিকটে তেঁতুল গুলে খেয়ে ফেল।"—বিশু ততক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছে।

"কি সর্ব্বনেশে বৌ গো ? কোন্ দিন আমার বাছাদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বে। যে কাজে যাবে, একটা না একটা কাণ্ড ক'র্‌বেই। আমার কিছুতে বিশ্বেস নেই, গো—কিছুতে বিশ্বেস নেই !"—শাশুড়ী নিজমনে বকিয়া যাইতে লাগিল। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া যে এ বাক্য-বান বর্ষিত হইতেছিল—শাশুড়ীর পার্শ্বোপবিষ্টা ছোট-বৌমা তাহা বেশ বুঝিতে পারিল; সে ধীরে-ধীরে বলিল—"আজ ত দিদি পান সাজেনি—আমি সেজেছি।" একটু গরম মেজাজে শাশুড়ী বলিল—"তুমি আবার কখন সাজ্‌লে ?"

কাপড় ছাড়িয়া, ভিজা কাপড় নিংড়াইতে-নিংড়াইতে মোহিনী আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ মা, ও-ই আজ পান সেজেছে,—আপনি যখন ঘাটে গিইছিলেন—তখন।"

চোখ রাঙ্গাইয়া শাশুড়ী বলিল—"ও কি নুন দিয়ে পান সেজেছে ? তোমারই কাজ ? তোমার হাতে-পায়ে কথা কয়; নুন-মসলা আন্‌তে গিয়ে পানে নুন ফেলেছ।"

নতমুখে নথ খুঁটিতে-খুঁটিতে কম্‌লি বলিল—"না মা, দিদি আজ নুন-মসলা আন্‌তে যায়নি। বোধ হয় আমারই হাত-টাত লেগে কি রকমভাবে পড়েছে।"

কথায় বলে—'একজন আছে সর্ব্বনাশী, সকলে মিলে তারেই দুষি।'—সংসারে কাহারও দ্বারা কোন ত্রুটি হইলে, সে দোষটা শেষ পর্য্যন্ত গিয়া চাপিত ঐ নেদোর-মার স্কন্ধেই। পানে নুন মিশাইয়া বিষ প্রস্তুত করিবার অপরাধে অপরাধী সেই নেদোর-মা-ই—শাশুড়ীর মনে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু ঐ ন্যাকা-বোকা কম্‌লিটা সে দোষ মাথা পাতিয়া লইতেছে কেন ?—রাগে গস্-গস্ করিতে-করিতে শাশুড়ী বলিল—"আমি অত কথা শুন্‌তে চাইনে। আমি দেখবো—কোথায় পান, আর কোথায় নুন।" এক লম্ফে উঠিয়া দুম্-দুম্ করিয়া শাশুড়ী গৃহে প্রবেশ করিল। মোহিনী ও কম্‌লি তাহার অনুসরণ করিল।

মাটীর দেওয়াল, খড়ের চালার ঘর; তাহাতে জানালা একরূপ নাই বলিলেই হয়। দিবালোকের গৃহ-প্রবেশ নিষেধ। পশ্চিম দিকে যে একটা ঘুলঘুলি জাতীয় জানালা ছিল, ক্রুদ্ধা শাশুড়ী গিয়া তাহার আবরণ ধরিয়া সজোরে মারিল এক টান্। রুয়ে-খাওয়া তক্তাখণ্ড ঝরঝর্ করিয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফাঁক হইয়া গেল! দেখা গেল—পানের ডাবোরের পাশে নুনের পাত্রটি পড়িয়া আছে, নুন ছড়াইয়া গিয়াছে। উত্তেজিত কণ্ঠে শাশুড়ী বলিল—"এই দেখ! নুনের পাত্তোর এখানে আসে কি কোরে ?"

হাঁড়ি-কলসীর ফাঁক হইতে একটি বিড়াল 'ম্যাও' করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিল। আগ্রহ-সহকারে কম্‌লি বলিল—"ও মা? তাহ'লে বোধ হয় বেড়ালে ফেলেছে!"

হাত-মুখ ঘুরাইয়া শাশুড়ী বলিল—"বেড়ালে ফেলেছে না—পদ্মাপারের প'দি পিসি ফেলে গ্যাছে! ঐ নেদোর-মা! আমি চেঁচিয়ে বোল্‌তে পারি—আর কেউ নয়—ঐ নেদোর-মা।"

"সত্যি বল'ছি মা—আমি এর কিছুই জানিনে। ও-ই আজ পান সেজেছে; ও কি কোরেছে, আমি কি ক'রে জানবো!" মোহিনী মাথা হেট্ করিল। করুণ কণ্ঠে

কম্‌লি কহিল—"দিদি বোধ হয় আজ এ ঘরেই আসেনি,—তবে কেন আপনি শুধু-শুধু দিদিকে"—চীৎকার করিয়া শাশুড়ী ধম্‌কাইয়া উঠিল—"তুমি চুপ্‌ কর। দিদি, দিদি, দিদি! দিদি নিজে দোষ ক'রে বোনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ডাইনে-বাঁয়ে চায় না,—এই তো দরদের দিদি তোমার। আমি হ'লে অমন দিদির দিকে ফিরেও তাকাইনে। পরম শত্রুরও যেন অমন দিদি না হয়।" ক্ষিপ্র-পদবিক্ষেপে শাশুড়ী চলিয়া গেল। স্থির, নিস্পন্দ অবস্থায় মোহিনী ভাবিতে লাগিল—তাহার অপরাধের কে বিচার করিবে? কে তাহার নালিশ শুনিবে? কোন্ অকাট্য প্রমাণে, কোন্ বিশিষ্ট উপায়ে সে তাহার কঠিন শাশুড়ীকে বুঝাইবে যে,—'ওগো আমি নিরপরাধ। আমি কিছুই জানিনে।' শতবার, সহস্রবার বলিলেও শাশুড়ী তাহা বুঝিবে না। এ অন্যায় তিরস্কার, এ অবিচারের দণ্ড তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। কেন? কেন?—মোহিনীর অন্তরের দুঃখের বেগ আজ দুষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করিয়া শাশুড়ীর এ অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিতে মুহূর্তের জন্য চেষ্টা করিল;—কিন্তু, মোহিনী ঠিক যেন এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহাদের শান্ত করিল। যাহা জীবনে কখনও হয় নাই, হইতে পারে এ চিন্তাকেও মোহিনী মনে স্থান দিতে পারে নাই, আজ ক্ষণেকের জন্য তাহাই হইল। কম্‌লির উপর তাহার আজ বড় রাগ ও অভিমান হইল। ঐ হতচ্ছাড়ী, পোড়া-মুখী কম্‌লিই যত নষ্টের মূল। ওর জন্যই আজ এত কাণ্ড। তাই যদি ক'ল্লি, তোর শাশুড়ীকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে না—দোষ দিদির নয়, তোর। মোহিনী আবার ভাবিল—ওরই বা দোষ কি? যত দোষ এই অদৃষ্টের। মোহিনী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কম্‌লি এতক্ষণ দিদির মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া ছিল। এক্ষণে তাহাকে যাইতে দেখিয়া ধীর-কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল "দিদি!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। মোহিনী ততক্ষণে দূরে চলিয়া গিয়াছে। কম্‌লি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—দিদি হয় ত তাহার উপর রাগ করিয়াছে। কথাটা ভাবিতেও তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একটা আকুল ক্রন্দনের ব্যাকুল চীৎকার যেন তাহার বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিল। দিদি তাহার উপর রাগ করিয়াছে। ইহা কি সত্য? হইতে পারে। দিদির কর্ম্মক্লান্ত কম্পিত হস্ত হইতে দিনান্তের একখানি কর্ম্মও কাড়িয়া লইয়া করিবার অধিকার কমলির নাই; উপরন্তু এই অকারণ গঞ্জনা, নির্ম্মম লাঞ্ছনা ভোগ করে দিদি কাহার জন্য? কম্‌লির রাগ হইল—স্বামী বিশ্বেশ্বরের উপর। পানে একটু নুন লাগিয়াছিল,—তা অত চেঁচামেচি না করিয়া চাপিয়া গেলেই হইত।

"ও ছোট-বৌমা! ছোট-বৌমা?"—শাশুড়ীর চীৎকারে চমকিয়া কমলি গিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। ব্যঙ্গস্বরে শাশুড়ী বলিল—"দিদির সঙ্গে কি পরামর্শ হোচ্ছিল? জোটপাট করে দু-বোনে আমাকে মারবে না কি?" কম্‌লির বাকরুদ্ধ হইল। এ কথার সে কি জবাব দিবে? দুই একটা ঢোক গিলিয়া কাঠ হইয়া রহিল। ক্ষণকাল নীরবের পর শাশুড়ী বলিল—"বোসো, অনেক কথা আছে।" কমলি বসিল।

চাপা-গলায় ধম্‌কান ও ভর্ৎসনার ভাবভঙ্গি করিয়া, হাত-মুখ ঘুরাইয়া কমলিকে শাশুড়ী অনেক কথা বলিল। তারপর অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"কেমন? মনে থাকবে ত?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, অনেক কষ্টে কমলি বলিল—"তা কেমন ক'রে পারবো মা! দিদি যদি ডাকে—"

"ডাকে—সাড়া দেবে না। মোট কথা—আমি যদি কোন দিন দেখ্‌তে পাই,—ভাল হবে না কিন্তু! মনে থাকে যেন।" শাশুড়ী স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কমলি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ীর কঠোর আদেশে, তাহার অন্তরে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধের মহা কোলাহল উত্থিত হইল।—পারবো না, কিছুতেই পারবো না। মনে থাকবে, কিন্তু পারবো না। তাই কি পারা যায়? কেন, দিদির অপরাধ? কম্‌লির গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কোন্ দোষে আজ কম্‌লি তাহার দিদিকে পর ভাবিবে? জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াই সে যাহাকে চিনিয়াছে, যাহার আঁচল ধরিয়া এত বড় হইয়াছে, যাহার যত্নে, যাহার সোহাগ-স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়া সে আজ কম্‌লি—শাশুড়ীর বড় আদরের ছোট-বৌমা, সেই মাতৃমূর্ত্তি দিদিকে সে কেমন করিয়া পর ভাবিবে! দিদি—সে ত শ্বশুরবাড়ীর 'পাতান' দিদি নয়। সে যে কম্‌লির ইহকালের, চিরকালের দিদি। কম্‌লি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইহাই কি শাশুড়ীর কর্ত্তব্য ? ভালবাসা, সোহাগ, স্নেহে বাঁধা দুজনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, একজনকে পায়ে দলিয়া, অপরকে মাথায় তুলিয়া, উভয়ের মধ্যে একটা মনোমালিন্য ও শত্রুতার ব্যবধান গড়িয়া, সুখ ও শান্তিপূর্ণ সংসারে অশান্তির সৃজন করা কি গৃহিণীর কর্ত্তব্য ? বুঝি বা ইহাই মানুষের প্রকৃতি! মানুষ অনাদৃত, লাঞ্ছিত একজনকে কেবলমাত্র কথার বিষে দগ্ধ করিয়া, পদদলিত করিয়া শান্তি পায় না। তাই অপর একজনকে আদর আহ্লাদে ঢাকিয়া, মস্তকে তুলিয়া, অনাদৃতের পেষণ-ভারের গুরুত্বটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া কতকটা শান্তি লাভ করে। সে গুরুত্বটুকু যদি অনাদৃত নিঃশব্দে হজম করিয়া লয়, তবে সে মানুষের ঈর্ষানল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, যদি সে গুরুত্বের অনুভূতিতে 'উহু-আহা' প্রকাশ করে, তবেই মানুষের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন হয়।

কম্‌লি কাঁদিতেছিল। কাহার দুইটি কোমল হস্ত তাহার চক্ষু-আবৃত হস্তদ্বয় ধারণ করিল। সে মুখ তুলিয়া দেখিল, —দিদি।

"কাঁদছিস্ কেন লা কম্‌লি ? মা কি বকেছে ?"

কম্‌লির আবেগ-উদ্বেলিত অন্তরে একটা ক্ষোভ-বিক্ষিপ্ত আর্ত্তস্বর হাহাকার করিয়া উঠিল। দিদির পায়ে মস্তক নোয়াইয়া পড়িল। অদূরে দাঁড়াইয়া শাশুড়ী সমস্তই দেখিতেছিল। কম্‌লি কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বজ্র-কঠোর কণ্ঠে শাশুড়ী হাঁকিল—"ছোট-বৌমা!" কম্‌লি নিঃশব্দে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। মোহিনী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

[৩]

টগ্-বগ্ শব্দে ভাত ফুটিতেছে। মোহিনী উনুনের মুখে জ্বালানী যোগাইয়া দিতেছে। নেদো কাঁদিতে-কাঁদিতে আসিয়া মাতার পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মোহিনী উনুনের নিকট হইতে একটু সরিয়া বসিল। নেদো দুধ খাইতে-খাইতেই মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। মোহিনী তাহার ঘুমন্ত মুখের উপর হইতে এলোমেলো চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিয়া, কপালে সামান্য কাদা লাগিয়াছিল তাহা মুছিয়া দিয়া, কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর তার মনে পড়িল, কম্‌লির কথা।—আচ্ছা, কম্‌লি এখন আমার কাছে আর আসে না কেন? কথা বলে না কেন? কত দিন, কতবার তাকে ডেকেছি;—সাড়া দেয় না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চায়, সরে চলে যায়। আমি তার কি ক'রেছি যে—আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রলো! বোধ হয় আমার উপর রাগ ক'রেছে। কই, রাগ হবার মত কিছুই বলিনি ত। তবে কম্‌লি এমন হলো কেন? শাশুড়ীর সঙ্গে ত' খুব ভাব দেখতে পাই। চব্বিশ ঘণ্টাই শাশুড়ীর কাছটিতে বসে আছে। অথচ আমার দিকে একবারও ফিরে তাকায় না। যে কম্‌লি 'দিদি' ব'ল্‌তে অজ্ঞান হ'তো, সেই কম্‌লি কি না আজ,—মোহিনী এ দুঃখের বেগ কোন মতে সহ্য করিতে পারিল না। ক্ষোভে, অভিমানে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল, চক্ষু ভরিয়া জল উছলিয়া পড়িতে চাহিল।—সেই কম্‌লি,—তখন এতটুকু; সেই বউ-বউ খেলা। ডুরে কাপড়খানি নিয়ে বল্‌তো—"দিদি, আমায় বউ ক'রে কাপড় পরিয়ে দাও না।"—সেই কম্‌লি!—মোহিনীর আজ অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল। দুই ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া নিদ্রিত নেদোর গণ্ডে পড়িল। নেদো চমকিয়া উঠিল। মোহিনী "ষাঠ্ ষাঠ্" বলিয়া অশ্রু মুছাইয়া দিল।

মোহিনীর অজ্ঞাতসারে আসিয়া, মোহিনীর প্রতিই দৃষ্টি ফেলিয়া একজন অনেকক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারও চক্ষু অশ্রুসিক্ত; চাহনি উদাস; মুখশ্রী মলিন। কম্‌লি ভয়-বিহ্বল-কণ্ঠে ডাকিল—"দিদি!" মোহিনী কোন উত্তর দিল না—মাত্র মুখ তুলিল। অপরাধিনীর মতই কম্‌লি বলিল—"দিদি, তুমি বোধ হয় আমার উপর রাগ ক'রেছ!"

"তুই ত আমার বাড়া-ভাতে ছাই দিস্‌নি কম্‌লি—যে রাগ কোরব? তবে দুঃখ হয় যে,—যাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, সে আজ ডাক্‌লে সাড়া দেয় না।"

"কেন যে সাড়া দিই না, কেন যে তোমার কাছে আসি না,—তা যদি জান্‌তে, তা হ'লে বোধ হয় তোমার এ দুঃখ হত' না দিদি!"

"জান্‌বার দরকার নেই কম্‌লি! তুই চিরদিন সুখে থাক, আমি শুধু দূরে [illegible]"

সুখ। তবে একটা কথা ব'লে রাখি—সব দিক বুঝে চল্‌বার চেষ্টা করিস্, আর ত' ছেলেমানুষটি নোস্!"

মোহিনীর কথার অন্তরালে কতখানি দুঃখ-অভিমান, কতখানি ক্ষোভ-আক্ষেপ লুক্কায়িত আছে—কম্‌লি তাহার সমস্তটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, কথাটা তাহার বুকে বড়ই বিঁধিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া দুয়ারের গা খুঁটিতে লাগিল। শাশুড়ী ঘাটে গিয়াছে, এই অবসরে সে দিদির নিকট কি যেন বলিতে আসিয়াছিল;—কিন্তু অভিমান করিয়া দিদি তাহার কথা শুনিতে চাহে না। মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু খসিয়া কম্‌লির নিজ প্রকোষ্ঠের রেশ্‌মী চুড়িতে পড়িল! একটা ঢোক্ গিলিয়া সে বলিল—"দিদি, তুমি যদি আমার উপর রাগ কর, তবে আর আমি কার মুখ—"

"এমন ভোলা মন, গামছাখানা নিতেও,—ছোট-বৌমা!" শাশুড়ী আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। কম্‌লির মাথায় বাজ পড়িল। ছুটিয়া গিয়া সে শাশুড়ীর সম্মুখে চোরের মত দাঁড়াইল। দৃঢ়কণ্ঠে শাশুড়ী বলিল—"ওখানে কি কোচ্ছিলে?" কম্‌লি নিরুত্তর।

"আর বোল্‌তে হবে না গো, বুঝেছি। বেশ—বেশ। বলে—'যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।' 'আমে-দুধে মিশে গেল, আঁস্তাকুড়ের আঁটি আঁস্তাকুড়ে র'লো।' ভাল। একবার, দুবার, তিনবার। দেখি আর কিছুদিন। কিন্তু বাছা, এই ব'লে রাখছি,—কোন দিন যদি শুন্‌তে পাই যে—'দিদি আমাকে বোকেছে। দিদি আমাকে অমুক কোরেছে।' তবে ভাল হবে না।"—স্কন্ধে একখানা গামছা ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া শাশুড়ী ঘাটে চলিয়া গেল। কম্‌লি ছুটিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। এ কি হইল? ইহা অপেক্ষা যে কম্‌লির মরণ ভাল ছিল। এই কি শাশুড়ীর আদর? এই কি শাশুড়ীর সোহাগ? স্পষ্ট করিয়া শাশুড়ী যাহা বলিয়া গেল—তাহাতে যেন বুঝায়, কম্‌লি তাহার দিদির বিরুদ্ধে শাশুড়ীর নিকট সদা-সর্ব্বদা নালিশ করিয়া থাকে। মোহিনী যদি শুনিয়া থাকে, তবে কি মনে করিবে? কেমন করিয়া কম্‌লি তাহার দিদিকে মুখ দেখাইবে? ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল; মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রান্নাঘর হইতে মোহিনী শাশুড়ীর চীৎকার শুনিয়া একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। হাতের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

(৪)

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মুখখানা ভার করিয়া, যেন খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে কম্‌লি শাশুড়ীর পাকাচুল তুলিয়া দিতে-দিতে বলিল—"মা, আজ সকালে দিদি,"—ঠিক এই সময় মোহিনী সেখানে উপস্থিত হইল। কম্‌লি কি বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া দিদির মুখের দিকে তাকাইল। মোহিনীও মুহূর্ত্তের জন্য কম্‌লিকে দেখিয়া লইল; কিন্তু সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। পায়ের নীচে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের যা কিছু সমস্ত যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে লাগিল। মোহিনী দেওয়াল-গাত্রে দেহভার রক্ষা করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে কি জন্য আসিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গেল। শাশুড়ী রুক্ষস্বরে বলিল—"কি?" মোহিনী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"এবেলা কি রাঁধবো? মাছ ত নেই।"

"কেন? মাছ কি হ'লো?"

"ঢাকা ফেলে বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।"

"বেশ হ'য়েছে। লক্ষ্মীমন্ত বৌ। এই আক্রার মাছ! যা হয় করো গে বাছা—আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না; আমি কিছু জানিনে।"—শাশুড়ী মুখ ঘুরাইয়া বসিল। মোহিনী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

সমস্ত কর্ম্ম, সকল কর্ত্তব্য, শাশুড়ীর ভর্ৎসনা—মোহিনী ভুলিয়া গেল। সমস্ত ছাপাইয়া তাহার প্রাণে কেবল একই কথা পুনঃ-পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কম্‌লি শাশুড়ীকে তাহার নামে কি বলিতেছিল—আজ সকালে সে কি করিয়াছে? কই কিছুই ত করে নাই। তবে কিসের নালিশ? যে সন্দেহ, যে অবিশ্বাস মোহিনী সে দিন হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল,—আজ তাহা পুনরায় সশস্ত্র সৈন্যের ন্যায় তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তবে কি কম্‌লি মোহিনীর নামে শাশুড়ীর নিকট লাগায়-পড়ায়? সেই জন্যই কি মোহিনী শাশুড়ীর বিষ-নজরে পড়িয়াছে? আর ইহার বিনিময়ে কম্‌লি শাশুড়ীর আদর-আহ্লাদ অধিকার করিয়া লয়! ইহাই বুঝি যাতৃ-পদের চিরাধিকৃত ধর্ম্ম! কম্‌লি কি সেই ধর্ম্ম পালন করিতেছে? অসম্ভব। এ চিন্তায় মোহিনী নির্জ্জন স্থানেও লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এ সন্দেহকে সে জোর করিয়া দুপায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিল; কিন্তু সন্দেহ

তাহাকে ছাড়িল না। মোহিনী ভাবিয়া-চিন্তিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না। ফলে কম্‌লির উপর অভিমানের মাত্রাটা অনেক বাড়িয়া গেল।

মোহিনী চলিয়া যাইবার পর শাশুড়ী বলিল—"তার পর কি বল্‌ছিলে ছোট-বৌমা?"

নিকটস্থ একটা পিতলের কলসী দেখাইয়া কম্‌লি বলিল—"হ্যাঁ, এই ঘড়ার একঘড়া জল নিয়ে, দিদি আজ সকালে ঘাটে আছাড় খেয়েছে। কোমরে বোধ হয় বেশ লেগেছে তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে! তাই বোল্‌ছিলাম—এ বেলা আমি রাঁধিগে।"

সন্দিগ্ধভাবে শাশুড়ী বলিল—"কি কোরে জানলে?"

"ও-বাড়ীর বামুনদিদি বল্‌ছিলেন। তিনিও তখন ঘাটে ছিলেন।"

কলসীটা নিরীক্ষণ করিতে-করিতে শাশুড়ী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওমা কি হবে? তাই ত বটে! দেখেছ—ঘড়াটা একেবারে গেছে। তুব্‌ড়ে-মুব্‌ড়ে দফা রফা হয়ে গেছে। আমিও তাই ভাবছি—ঘড়াটা এমন হ'লো কেন?"—যদিও ঘড়াটার কিছুই হয় নাই!

"আলক্ষ্মী গো—আলক্ষ্মী। হাতে পায়ে কথা কয়। তবুও যদি বাপের বাড়ী থেকে দু'দশটা আন্‌তো! বাসি আথার ছাই। জল খেতে একটা ফুটো ফেরোও দেয়নি।" শাশুড়ী চীৎকার করিতে লাগিল। কম্‌লির হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গেল; শরীর অবশ হইয়া গেল! বজ্রাহতের ন্যায় অনড় অচলভাবে বসিয়া শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিসে কি হইল! আসল কথা চাপা পড়িয়া সামান্য অছিলায় শাশুড়ী মোহিনীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। বাপের কথা উত্থাপনে, কম্‌লির বুকে বড়ই বাজিল। অস্পষ্ট চিত্রের মত বাল্য-স্মৃতিগুলি তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দিদির সহিত যে তাহার কতখানি সম্পর্ক, তাহা যেন সে আজ পুনরায় নূতন করিয়া উপলব্ধি করিল। শাশুড়ীর আদর-আহ্লাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ঘৃণা ও বিদ্বেষে তাহার অন্তরে এক দাবানল প্রজ্বলিত করিল। বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনই নিষ্ঠুর-মূর্ত্তি শাশুড়ীর নিকট হইতে ছুটিয়া গিয়া দিদির পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়া বলে—'দিদি গো! সুধু রাগ ক'রে চুপ ক'রে থাকলে হবে না। আমায় শাস্তি দাও। তোমার এ লাঞ্ছনা, এ গঞ্জনা আমারই জন্য! আমায় সাজা দাও দিদি।' কিন্তু দিদি তাহাকে কত দিন বলিয়াছে—'শাশুড়ী পরমগুরু। তাঁকে অমান্য করতে নেই।' কাঠের পুতুলের মতই কম্‌লি বসিয়া রহিল।

পাকশালা হইতে মোহিনী শাশুড়ীর সমস্ত কথাই শুনিতে পাইল। সন্দেহের বশে মনে করিল—এ নালিশ বোধ হয় কম্‌লিরই। কম্‌লির উপর তাহার রাগ ও অভিমান আরও অনেক বাড়িয়া গেল!

(৫)

মোহিনীর মাথাটা আজ ঠিক নাই। জল কম হেতু ভাত ধরিয়া গেল; ফেন গড়াইবার সময় পা সামান্য পুড়িয়া গেল; কিন্তু সে দিকে তাহার লক্ষ্য নাই।

ঠিক সন্ধ্যার সময় বীরেশ্বর আসিয়া দেখিল, তখনও কি ভাজা হইতেছে। তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। "এখনও রান্না হয়নি? কখন ব'লে গিইছি!"—ইত্যাদি নানারূপ গলাবাজি ও হুঙ্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

মোহিনী কি যেন ভাজিতেছিল। বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া নেদোটা জোর-গলায় কান্না সুরু করিয়াছে। অপর গৃহ হইতে শাশুড়ী চীৎকার করিতেছে—"ওগো, ছেলেটাকে একবার নাও। দোহাই তোমার।" ইত্যাদি। চার চারটা বিড়ালে মোহিনীকে পাগল করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। কোন কিছু মুহূর্ত্তের জন্য আলগা রাখিবার যো নাই। চারিদিকের চীৎকারে, ভর্ৎসনায়, তাড়নায় মোহিনী নিজেকে বড়ই বিপন্ন মনে করিল। কাতর, অস্ফুটস্বরে মোহিনী বলিল—"মাগো, আর পারি না—মরণ হ'লে হাড় জুড়োয়।"

নেদোর কান্না আর থামে না। কম্‌লি শাশুড়ীকে বলিল—"মা, আমি না হয় নেদোকে নিয়ে আসি।"

"কেন, ওর মা কি কোচ্ছে?"

"বোধ হয় হাতজোড়া আছে।"

"থাকলেই বা। যে রাঁধে সে আর চুল বাঁধে না?"

কম্‌লি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করিল না। নেদোর কান্নার আওয়াজে মোহিনী এ সব কথা কিছুই শুনিতে পাইল না।

নেদোটা কাঁদিতে-কাঁদিতে একেবারে দাওয়া

কিনারায় আসিয়া পড়িল। শাশুড়ী চেঁচাইয়া উঠিল—"পোলো, পোলো। ওগো তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, ছেলেটাকে একবার ধর।" মোহিনী তাড়াতাড়ি উনানের উপর হইতে কড়াই নামাইয়া ঢিপ্ করিয়া রাখিল। কড়াইয়ের তপ্ত আংঠায় তাহার বাঁ হাতে ছ্যাঁকা লাগিয়া গেল। এদিকে নেদোও ঢিপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। ছুটিয়া মোহিনী বাহির হইয়া আসিল; দেখিল—শাশুড়ীর পাশে ছোট-বৌ হাঁ করিয়া নেদোর দিকেই তাকাইয়া বসিয়া আছে। কম্‌লি ভাবিতেছিল—শাশুড়ীর না হয় দিদির উপরই রাগ, নেদো তার কি করেছে? মোহিনীর বড় দুঃখ হইল—কম্‌লির যত রাগ না হয় তাহার উপরেই; কিন্তু, নেদো কম্‌লির কি করিয়াছে। মোহিনীর যত রাগ হইল সেই নেদোটার উপরেই। ছুটিয়া গিয়া সে ভূলুণ্ঠিত নেদোর পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিয়া কোলে তুলিয়া লইল। এই দৃশ্যে শাশুড়ী সপ্তমে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"ওরে আমার কেরে, ছুটো আম্‌ড়া ভাতে দেরে। সোণা থুয়ে আঁচোলে গেরো। ছেলের গায়ে হাত? উনি আমার স্বগ্যের সিঁড়ি—আমাদের রাজা কোরবেন। হারামজাদি, বজ্জাত।"

বাড়ীতে চীৎকার শুনিয়া বীরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। মোহিনীর আজ ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সংসারের অবিচারে, অত্যাচারে সে আজ সত্যসত্যই আত্মহারা, দিশাহারা হইল। বীরেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"ওগো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, এমন ক'রে আর কষ্ট দিও না। তার চেয়ে ঐ বঁটিখানা নাও,—এ জঞ্জাল একেবারে চুকিয়ে দাও।"—উন্মাদিনীর মত আলুথালু বেশে মোহিনী নিকটস্থ বঁটি আনিতে ছুটিল। বিশ্বেশ্বর সেখানা দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"ছি বৌদি, তুমি ক্ষেপলে না কি?"

"না ঠাকুরপো, আমার আর সয় না। আজ আমি মাথা খুঁড়ে মরবো!"—রাগ না—চণ্ডাল। হাতের কাছেই ছিল একখানা ছোট পিঁড়ি। চোখের নিমেষে সেইখানা ধরিয়াই মোহিনী নিজের মাথায় সজোরে এক ঘা মারিল। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল। গৃহাভ্যন্তর হইতে কম্‌লি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো দিদি গো, কি সর্ব্বনাশ কোর্‌লে গো!" শাশুড়ী আরম্ভ করিল—"কি খুনে বৌ গো! বাপের জন্মে এমন বৌ দেখিনি গো! রক্ত দেখে আমার শরীর কেমন কোর্‌ছে। গা হ্যাকার-হ্যাকার কোরছে। ও ছোট-বৌমা! এখানে এসে আমার মাথায় একটু হাওয়া কর।"

অতিরিক্ত রক্তপাতে শরীর অবসন্ন হওয়ায় মোহিনী লুটাইয়া পড়িল, ক্রমে অচেতন হইল। বিশ্বেশ্বর জলপটি বান্ধিয়া রক্ত বন্ধ করিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে মোহিনীকে তাহার ঘরে শোয়াইয়া দিয়া, বারান্দায় আসিয়া সে গুম্ হইয়া বসিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বিশ্বেশ্বর আঙ্গিনায় পায়চারী করিতে লাগিল। মাতা করুণকণ্ঠে বলিল—"কি কুক্ষণে আজ রাত পুইয়েছিল—রাঁধা ভাতে কাটি পোলো না।"

কম্‌লি তাহার ঘরে বসিয়া মনে মনে ভাবিল—সে আজ কাহারও কথা শুনিবে না। কোন বাধা, কোন মানা মানিবে না। সকল আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সে আজ দিদির পাশে গিয়া বসিবে! কম্‌লি শাশুড়ীর নিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে-করিতে নিজেই নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল।

[৬]

কম্‌লির যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শাশুড়ী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া কম্‌লি গিয়া মোহিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। গভীর রজনীর ভীষণ নিস্তব্ধতায় তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, অথচ সহসা গৃহে প্রবেশ করিতেও সাহসে কুলাইল না। চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার। মুকুল-ঢাকা আমের গাছে ও ফুলে-ছাওয়া শজিনা গাছের কোলে জমাট বান্ধা অন্ধকারে জোনাকীর মেলা বসিয়া গিয়াছে। লেবুফুলের গন্ধেভরা শীতল সিক্ত মৃদু হাওয়া আসিয়া গাছগুলিকে কাঁপাইয়া যাইতেছে। আর খইয়ের মত শুভ্র ছোট শজিনা ফুলগুলি ঝুর-ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাঙ্গা মন্দিরের ফাটল হইতে পেঁচার ডাকে নৈশ-নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। আর পূর্ব্বাকাশে প্রভাতী-তারা ধক্-ধক্ জ্বলিয়া অন্ধকারের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছে। ধীরে-ধীরে কম্‌লি ভেজান-দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহকোণে তখনও একটি আলো জ্বলিতেছিল। ধীরে, অতি ধীরে গিয়া কম্‌লি

মোহিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিল। গায়ে হাত দিয়া দেখিল —উঃ! গা যেন আগুন।

কম্‌লির করস্পর্শে মোহিনী চোখ মেলিয়া ক্ষণকাল কম্‌লির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অভিমানে তাহার অশ্রু উছলিয়া উঠিল। কম্‌লি ডাকিল—"দিদি?"

"কে? ছোট-বৌ না কি? কেন? আমার কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিতে এসেছ না কি?"

উঃ! ইহা অপেক্ষা বোধ হয় বজ্রাঘাত কম্‌লি অনায়াসে সহ্য করিতে পারিত। দিদির কথাগুলি তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া শেলের মত বিঁধিল। কম্‌লি কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"দিদি, আগে আমার কথা শোন, তার পর আমাকে যে শাস্তি দেবে, আমি মাথা পেতে নেবো। আমার—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মোহিনী বলিল—"কোন কথা আর শুন্‌তে পারবো না কম্‌লি? আমি কালা হইছি। কোন কথা বুঝবো না—আমি অবুঝ হইছি। শুধু এইটুকু বুঝেছি যে—যাকে এই বুকে শুইয়ে মানুষ ক'রেছি, মুখের গ্রাস খাইয়ে বড় ক'রেছি,—সে আজ আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রেছে। আমার নামে নালিশ—ক'রতে ধ'রেছে। কেন না—এখন সে আমার 'যা',—আর কোন সম্বন্ধ নেই।"—বলিতে বলিতে মোহিনী ক্লান্ত হইয়া পড়িল। "উঃ মাগো—" বলিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কম্‌লি দিদির বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"দিদি, না শুনলেও, না বুঝলেও, আজ আমি সকল কথা ব'লে খালাস হবো। কেন যে তোমার সঙ্গে কথা বলি না, তা এক দিন তোমায় বোল্‌তে গিইছিলাম; কিন্তু তুমি শোননি। দিদি, শাশুড়ীর বড় দিব্যি—আমি যদি তোমার কাছে যাই, তোমার সঙ্গে কথা কই, তবে আমার ভাল হবে না। উঃ দিদিগো, সে দিব্যি আমি মুখে আন্‌তে পারবো না। এখন বল দিদি, আমার দোষ কি? আর কবে আমি কার কাছে তোমার নামে নালিশ কোরেছি?" কম্‌লি কাঁদিতে লাগিল।

মোহিনী অতি কষ্টে ধীরে-ধীরে বলিল—"চুপ কর্ কম্‌লি, চুপ কর্। আমার শরীর অস্থির ক'রছে। মাথা কেমন ক'রছে। উঃ বড় তেষ্টা। কম্‌লি, একটু জল—।"

মুখের উপর ঝুঁকিয়া মুখে জল দিতে গিয়া কম্‌লি শিহরিয়া উঠিল। এ কি? মস্তকের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ছুটিয়া বালিশ-বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারার মতই রক্তধারা বক্ষে গিয়া পড়িতেছে। ভীত কণ্ঠে ডাকিল,—"দিদি, ও দিদি, দিদি গো?" কিন্তু কোন সাড়া নাই! মোহিনী একবার কি বলিবার চেষ্টা করিল।

কম্‌লি মোহিনীর বুকে হাত দিয়া ডাকিল—"দিদি গো।" মুখে মুখ দিয়া বলিল—"একটা কথা বল দিদি, আর রাগ ক'রে থেক না দিদি।" কিন্তু মোহিনী নীরব, নিস্পন্দ। "ও গো, কি হ'লো গো"—বলিয়াই কম্‌লি তাহার সেই আজন্ম-পরিচিত দিদির বক্ষে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অপর গৃহ হইতে শাশুড়ী ডাকিল "ছোট-বৌমা?"

তখনও গৃহের বদ্ধ বায়ুতে যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—'ও দিদি—দিদি গো।'

সমস্ত রাত্রি থিয়েটার দেখিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে-টলিতে বীরেশ্বর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সে আজ "বঙ্গ-বধূ" অভিনয় দেখিয়াছে; অনুতপ্ত স্বামী শেষে উপেক্ষিতা স্ত্রীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়াছে। এ দৃশ্য বীরেশ্বরের নিকট বড়ই মধুর লাগিয়াছে। তাই সে মনে-মনে স্থির করিয়া চলিয়াছে—সেও আজ তাহার লাঞ্ছিতা স্ত্রীর নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করিবে।

অপর রাস্তা দিয়া একটি বালক থিয়েটার দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে-ফিরিতে, থিয়েটারেরই বক্তৃতা করিতে-করিতে চলিয়াছে—"বঙ্গের বধূ! তুমি মনটাকে কর লোহার সিন্দুকের মত, আর বুকটাকে কর শীলের মত। মনের বাহিরে শত অত্যাচার হউক—ভিতরের কিছু প্রকাশ করিও না। বুকের উপর পাহাড় গুঁড়া হইয়া যাউক—কথা বলিও না।" ইত্যাদি। আর একজন গায়িতে-গায়িতে চলিয়াছে—"সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়—।"

বীরেশ্বরও গুণ-গুণ করিয়া গায়িতে গায়িতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল—"সয় ব'লে কি এতই প্রাণে সয়—"

সাময়িকী

বর্ত্তমান্ সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর বড়দিনের সময় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতার অনেক সরকারী ও বেসরকারী ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া অতর্কিতভাবে ছাত্রাবাসগুলি পরিদর্শন করায় এবং ছাত্রগণের সহিত অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলায়, তিনি আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-দানের সভা (Convocation) হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা প্রধানাধ্যক্ষ। তিনি এই উপাধি-দানের সভায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এ দেশের ছাত্রগণ যাহাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে যত্নপর হইবেন। এক্ষণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কি না, এবং যদি তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে শিক্ষা-বিধান করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আগামী শীতকালে একটা কমিসন বসাইবার ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আগ্রহেরই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্য সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই 'কনভোকেশন'-বক্তৃতায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিবার স্থান আমাদের নাই; আমরা দুই একটি অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'You should come out with your character formed and strengthened and that character should be no unworthy one. You should come out men ready to take up the duties of citizenship and play your part in the common life,—in short men with character and purpose.' ইহার ভাবার্থ এই যে, 'হে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত-যুবকগণ' এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেন তোমরা তোমাদের চরিত্র গঠিত ও দৃঢ়ীকৃত করিয়া বাহির হইও; তোমাদের চরিত্র যেন তোমাদের শিক্ষার উপযুক্ত হয়। তোমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপযুক্ত হইয়া বাহির হইও—এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তোমরা সচ্চরিত্র ও দৃঢ়ব্রত হইয়া বাহির হইও।' শিক্ষার ইহাই ত চরম ও পরম উদ্দেশ্য! কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যুবকগণের চরিত্র-গঠনের জন্য কি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যবস্থাই করেন নাই? আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ব্যবস্থার ত ত্রুটী হয় নাই; ছাত্রগণের জন্য নানা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে; তাঁহারা যাহাতে ভাল-ভাল পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, তাহার জন্য সর্ব্বত্র ব্যবস্থা হইয়াছে; তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহার আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটু গোল আছে। আমাদের যুবকগণের হৃদয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার বীজ রোপণ করিয়া দিতেছে, তাহার অঙ্কুর দেখা দিতে না দিতেই যে নিরাশার বন্যা আসিয়া সমস্ত ডুবাইয়া, ভাসাইয়া লইয়া যায়। বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন যে, "যখন আমার বয়স ১৮ বৎসর ছিল, তখন "I have dreamed dreams and I have seen visions and I have not forgotten them. I have every sympathy therefore with those who are stirred by causes which catch the imagination and arouse enthusiasm." এটা ১৮ বৎসর বয়সেরই ধর্ম্ম। এই বয়সের ধর্ম্মে য়ুরোপীয় যুবকের হৃদয়ে যে বীজ উপ্ত হয়, কালে তাহা মহামহীরুহে পরিণত

হইয়া বিশ্ববাসীকে ছায়া দান করে;—আর আমাদের দেশের যুবকগণের হৃদয়ে এই ১৮ বৎসর বয়সে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়, তাহার কি দশা হয়, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। বড়লাট বাহাদুর এই কথা মনে করিয়াই sympathy—সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তাহার পর?"

এক দল—ইঁহারা আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব না হইলেও পরম শুভানুধ্যায়ী—ইঁহারা বলিতেছেন, আঠারো বছরের হৃদয়ে ও-সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া কাজ নাই, উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই, খুব করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিধান কর—কলেজী শিক্ষায় কাজ নাই—ও-সব imagination, aspirationই যত অনর্থের মূল—প্রাইমেরী শিক্ষা দেও,—লোকে চাষবাস, দোকানপাঠ করিয়া, ছুতার-কামার হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করুক—ব্যস্। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে অনেককে ও-সকল্‌ত করিতেই হইবে—করাই কর্ত্তব্য;—আমরাও কার্য্যকরী শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা বলিয়া ত উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করা যাইবে না! পৃথিবীর সে তামসযুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন পৃথিবীর প্রত্যেক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান চলিতেছে;—এ প্রবাহ ত রোধ করিবার যো নাই;—উচ্চশিক্ষার পথে হাজার কাঁটার বেড়া দেও, তোমাদের প্রসাদাৎ সে কণ্টক চরণে দলিত করিয়া আমাদের যুবকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবেই,—imagination ও aspiration কি আর এখন থামাইতে পারা যায়? সদাশয় বড়লাট বাহাদুর তাহা বুঝিয়াছেন। ও-কথা এখানেই আজ থাকুক।

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর আমাদের দেশের শিক্ষকগণের সম্বন্ধে একটা খুব পাকা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"At the present time it is only regarded as a form of employment which will keep the wolf from the door until briefs come in or some other permanent occupation be secured. This is not as it should be. The profession of teaching is a great and honourable profession and it should engage the whole attention of those who follow it. But this is not likely to be the case so long as teachers are paid an inadequate wage. If we are to divert students on to this road, we must increase the pay and opportunities of our teachers and magnify the status of the teaching profession. ইহার সার মর্ম্ম এই যে, অভাবের তাড়না হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রথম অবলম্বন স্বরূপ যুবকগণ শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হয়; তাহার পর মক্কেল জুটিলেই বা ভালরকম পাকা চাকুরী জুটিলেই শিক্ষকগণ শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। শিক্ষকের কার্য্য অতি মহৎ ও সম্মাননীয়; যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হ'ন, তাঁহাদের সমস্ত মনোযোগ এই কার্য্যে নিয়োজিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যতদিন শিক্ষকগণ উপযুক্ত বেতন না পাইবেন, ততদিন এ আশা সফল হইবে না। যদি উপযুক্ত ছাত্রগণকে এই দিকে আকৃষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের বেতন ও পদের গৌরব বাড়াইয়া দিতে হইবে। বড়লাট অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন। শিক্ষকেরা যে বেতন পান, তাহাতে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়াই কষ্টকর হইয়া উঠে; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া এমন অসচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন করিতে অতি অল্প লোকেই সম্মত হইতে পারেন। সেই জন্যই উচ্চ-শিক্ষিত যুবকগণ যে কার্য্যে অধিক আয়ের সম্ভাবনা আছে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে, সেই কার্য্যেই নিযুক্ত হইবার প্রয়াসী হ'ন।

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর যে শ্রেণীর শিক্ষকদিগের কথা বলিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন, তাঁহারা পাঠশালার পণ্ডিত ও গুরুমহাশয়গণ। ইঁহারা উচ্চ-শিক্ষিত নহেন; কিন্তু ভবিষ্যতে যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষা এই সকল পণ্ডিত ও গুরুমহাশয়ের হস্তেই ন্যস্ত হইয়া থাকে। পাঠশালার এই সকল পণ্ডিত ও গুরুমহাশয়ের অবস্থা যে কি শোচনীয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

তাঁহারা মাসিক যে বেতন পান বা পাইবার প্রত্যাশা রাখেন, তাহাতে এই দুর্ম্মূল্যের দিনে আধ মণ চাউলের মূল্যও হয় না। তাহার পর তাঁহারা এই সামান্য বেতন কি ভাবে পান, সে সম্বন্ধে ইংরাজ-সম্পাদক পরিচালিত একখানি সংবাদপত্রে (Statesman) কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল যে—'Punctuality in payment would seem to be a virtue which many of the District Boards in Bengal and Bihar have still to acquire. It is not at all uncommon, for example, to find the village School-teachers, who are in the employ of these Boards six month or even nine months, in arrears in the matter of their pay. It is difficult to understand how in any circumstances the Pathsala Guru manages to keep body and soul together on three Rupees a month. It need hardly be said, that under these conditions the important work of teaching the young does not attract good men, and that the men are always on the outlook for situations where they will be treated with more consideration." ইহার মর্ম্ম এই যে, "যথাসময়ে বেতন দিবার অভ্যাসটি বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশের জেলা-বোর্ডের এখনও শিখিতে হইবে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, অনেক পাঠশালার গুরুমহাশয়ের ছয় মাসের, এমন কি নয় মাসের বেতন পর্য্যন্ত বাকী পড়িয়া যায়। মাসিক তিন টাকা বেতনে এই সকল গুরুমহাশয় কেমন করিয়া প্রাণধারণ করেন, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এ অবস্থায় বালকদিগের শিক্ষাবিধানের জন্য ভাল লোক মিলিতেই পারে না; আর যাঁহারা গুরুমহাশয়গিরি করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই অন্য চাকুরীর চেষ্টায় থাকেন, এবং একটু সুবিধা পাইলেই চলিয়া যান।" এ কথা খুব ঠিক। তাহার পর মাসিক তিন টাকা বেতনে এখন যে আধ মণ চাউল হয় না, ইহা সকলেই জানেন; কাজেই গুরুমহাশয়দিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অন্য দশটা কাজ করিতে হয়,—গুরুমহাশয়গিরিটা অকিঞ্চিৎকর একটা উপলক্ষ মাত্র থাকে। সুতরাং এই সকল গুরুমহাশয় বালকদিগের শিক্ষা-দিবার জন্য কতটুকু যত্ন ও চেষ্টা করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাথমিক-শিক্ষার উন্নতি-বিধান করিতে হইলে পাঠশালাসমূহে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে। এ টাকা কোথা হইতে আসিবে? আমাদের পূর্ব্বোক্ত শুভানুধ্যায়ী মহোদয়গণ বলিবেন—'কেন? উচ্চ শিক্ষা, কলেজের শিক্ষার জন্য সরকার যে টাকা অনর্থক ব্যয় করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন, সেই টাকাটা প্রাইমারি শিক্ষায় ব্যয় করুন।' আমরা এ ব্যবস্থার সমর্থন করি না। বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ-শিক্ষার ব্যয়-সঙ্কোচ কিছুতেই হইতে পারে না; আমরা বলি প্রাইমারী শিক্ষাবিধান ও স্বাস্থ্য-বিধান, এই দুইটিই আমাদের জেলাবোর্ডসমূহের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হউক; তাহাতেও যদি না কুলায়, তাহা হইলে অবস্থাপন্ন লোকেরা প্রাইমারী-শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করুন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিধানই বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়েই অধিক ব্যয় করিতে পারিবেন না, সে প্রার্থনাও এখন করা সঙ্গত নহে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ মিটিয়া গেলে, যখন চারিদিকে সচ্ছল হইবে, তখন সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এ দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য যে অধিকতর মনোযোগী হইবেন, আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের কথা-বার্ত্তায় এবং প্রাণগত সহানুভূতিতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাইয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা এবারকার মত শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের কথা শেষ করিব। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-রাজধানী দিল্লীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ও ব্রহ্মদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরগণ শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই উদ্বোধন-বক্তৃতায় তিনি দেশীয় ভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আমরা ইংরাজী

বক্তৃতা উদ্ধৃত না করিয়া, আমাদের সুযোগ্য সাপ্তাহিক পত্র 'বঙ্গবাসী' তাহার যে সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন—"আর একটী বিষয় সম্বন্ধে আমি গুটিকয়েক কথা কহিব। আমি বেশ জানি, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ রহিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে বহুবার বিচার-বিতর্ক হইয়াও গিয়াছে। তবুও ইহা শিক্ষা-সমস্যার মূলে এমনই ভাবে জড়িত যে, এ সময়ে যখন আমরা এ দেশে শিক্ষার কথা বিশেষ ভাবে আলোচন করিতে যাইতেছি, তখন আমি ব্যাপারটাকে টানিয়া সকলের সম্মুখে জাহির করা আবশ্যক বোধ করি। আমি এ সময়ে এদেশে দেশীয় ভাষায় পঠন-পাঠনের কথা কহিতেছি। আমরা এখনও ইংরেজি ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের উপযোগিতা মানিয়া লই; কারণ ইংরেজি শিখিলে চাকুরি মিলে, আর দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষার উপযোগী তেমন পুস্তকাদিও রচিত হয় নাই। ইহার ফলে যাহা দাঁড়াইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। ছাত্রেরা কঠিন-কঠিন বিষয়গুলি বৈদেশিক ভাষায় আয়ত্ত করিতে হাবুডুবু খায় এবং অনেক স্থলে ইংরেজির সামান্য জ্ঞানে কুলায় না বলিয়া পাঠ্য-পুস্তকখানি মুখস্থ করিতে চেষ্টা করে। আমরা এই মুখস্থ-বিদ্যার নিন্দা করি; কিন্তু আমার মনে হয় ছেলেদের উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়; কারণ তাহারা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও জ্ঞানচর্চ্চা একেবারে বর্জ্জন করে না, বরং উৎসাহের সহিত পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি, এমন কি এক একখানি বই মুখস্থ করিয়া ফেলে। ইহা অবশ্য শিক্ষার একটা হাস্যজনক অভিনয়। সে দিন এ সম্বন্ধে জনৈক দেশীয় ভদ্রলোকের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলিলেন। তিনি তাঁহার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস লইয়াছিলেন। এখন ইংরেজিতে তাঁহার খুব দখল জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সে সময়ে তিনি তাঁহার পাঠ্য-বিষয় বুঝিতে পারিতেন না; কাজেই সারা বইখানি মুখস্থ করিয়াছিলেন। পরীক্ষাদান-কালে এমন একটী প্রশ্ন পড়িয়াছিল, যাহার উত্তর পাঠ্য-পুস্তকের কোন্ পাতায় আছে, তিনি জানিতেন; কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে, উহার কতটুকু অংশ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পক্ষে যথেষ্ট। তখন তিনি সারা পাতায় লিখিত বিবরণটুকু হু-বহু লিখিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আশা অপেক্ষা অনেক কম নম্বর পাইলেন। পরীক্ষকের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিয়া তিনি জানিলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত উত্তরে এত বাজে কথা রহিয়াছে যে, তিনি প্রশ্নটী বুঝেন নাই, ইহা তাঁহার উত্তর হইতে বেশ অনুমান করা যায়। আমার মনে হয়, ব্যাপারটী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দোষ সুস্পষ্ট-রূপে দেখাইয়া দিতেছে। আমি আপনাদিগকে এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যদি আমাদিগকে সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে হইত, তাহা হইলে আমরা শিক্ষায় কতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিতাম? হয় ত আমরা হতাশ হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতাম। এরূপ অবস্থায় এ দেশের ছেলেরা মন্দ উপায়ে শিক্ষা-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া আমি প্রশংসায়, উল্লাসে অধীর হইয়া পড়ি। একটী বা দুইটী উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে। হয় আমরা যতদূর সম্ভব দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিয়া সর্ব্বশেষে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিব, অথবা ছাত্রগণের ইংরেজি ভাষায় অধিকার যাহাতে আরও ভালরূপ জন্মে, তাহার চেষ্টা করিব। ইহা ছাড়া উৎকৃষ্ট শিক্ষার উপযোগী অন্য কোন মধ্যপন্থা কি আপনারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন? আমি শুনিয়াছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন উঠিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবার পর এ বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মতামত জানিতে চাওয়া হইবে। আমি ঐ সমস্যার মীমাংসা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে করিতে চাহি না; তবে আমার ইচ্ছা, এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনা করা সকলেরই উচিত। তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময় আসিবার পূর্ব্বেই যে কেবল আপনারা স্ব স্ব প্রদেশে আলোচনা-আন্দোলন করিয়া মতামত স্থির করিয়া রাখিবেন তাহা নহে, পরন্তু ভারতের যাবতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাঁহাদের অভিমত স্থির করিয়া রাখিতে পারিবেন।"

এক্ষণে অন্য একটি কথা বলি। মিঃ সি, এফ, এনড্রুজ মহাশয় আমাদের কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কয়েকটি ছোট গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া 'Hungry Stones and other Stories' নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। 'Hungry Stone' নামটি পড়িয়াই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন

যে, ইহা সার রবীন্দ্রনাথের সেই অতুলনীয় ছোট গল্প—'ক্ষুধিত-পাষাণ।' 'ক্ষুধিত-পাষাণে'র মত ছোট গল্প বাঙ্গালা-ভাষায় ত প্রকাশিত হয়ই নাই, আমরা ইংরাজী ভাষায় এবং অন্য ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনূদিত যে সকল ছোট গল্প পাঠ করিয়াছি, তাহার মধ্যেও এমন সুন্দর গল্প নাই। যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী পড়িয়াছেন, তাঁহাদেরও এই মত। আমাদের দেশে ত এ গল্পের যথেষ্ট আদর হইয়াছে; এখন এই গল্পের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া Times, Daily Telegraph, Manchester Guardian, Bookman, Birmingham Gazette প্রভৃতি বিলাতী সংবাদপত্রেও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা বাহির হইয়াছে। কেবল সে দিন দেখিলাম, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'Statesman' পত্রে ইহার প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে এবং সার রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। সমালোচনা যাঁহার যেমন ইচ্ছা, যেমন বুদ্ধি-বিবেচনা, তেমনই করিতে পারেন; কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণের কোন প্রয়োজন দেখিতে পাই না। সে কথা যাউক; এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় গল্পাদি অনূদিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের একটা কথা মনে হয়। ইংরাজী হইতে আমরা যে সমস্ত গল্প বাঙ্গালায় অনুবাদ করি, অথবা বাঙ্গালা হইতে যে সকল গল্প ইংরাজীতে অনূদিত হয়, তাহাতে কোন সমাজের অন্ধকার অংশের অনুবাদে কি লাভ আছে? আমাদের ত তাহা মনে হয় না। ধরুন, আমাদের দেশের কোন কুরীতিকে লক্ষ্য করিয়া যে গল্প বা উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের উপকার ও শিক্ষা-লাভ হইতে পারে; কিন্তু তাহা ইংরাজীতে অনূদিত হইলে, ইংরাজ পাঠকগণের মনে আমাদের সমাজ, তথা আমাদের সম্বন্ধে একটা বিসদৃশ ধারণা জন্মিয়া যায়; অনেক ইংরাজী উপন্যাসের বাঙ্গালা অনুবাদেরও এই ফল হইয়াছে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কোন গল্প বা উপন্যাস ভাষান্তরিত করিবার সময় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

শোক-সংবাদ

[রায় ৺শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি-আই-ই]

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি-আই-ই মহোদয়ের পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। ইনি বঙ্গের পরম রমণীয়, প্রকৃতির প্রিয়-লীলানিকেতন চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কৃতিত্বে বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বিদেশীর পক্ষে চিররুদ্ধদ্বার তিব্বত দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অসমসাহসী য়ুরোপীয়েরাও যে ভূমিতে পদার্পণ করিতে পারেন নাই, সেই চির-তুষারের দেশে, তিব্বতের রাজ-ধানী নিষিদ্ধ-নগরী লাসায় গমন করিয়া তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র তত্রত্য প্রধান রাজ-পুরুষ এবং প্রধানতম ধর্ম্মগুরু লামা মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক তিব্বতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, রাজনীতি, বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রাদির মর্ম্ম অবগত হয়েন। তাঁহারই সংগৃহীত তথ্য হইতে তিব্বতের ভূবৃত্তান্ত এতদ্দেশে প্রচারিত হয়। বৃটিশ-ভারত হইতে পরবর্ত্তীকালে তিব্বতে যে মিশন প্রেরিত হয়, রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিবরণ হইতে সেই মিশন যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহদুপকারের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট রায় বাহাদুরকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বতীয় ভাষায় অভিধান, ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত 'অবদান কল্পলতা' সুধীসমাজে সুপরিচিত। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে শরৎ বাবু জাপান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

হিন্দী

১। "সরস্বতী, নভেম্বর ১৯১৬—

"শিক্ষা কিস্ ভাষা মে দী জানী চাহিয়ে।"—লেখক "শ্রীপ্রকাশ।" দুই কারণে লোকে শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রথম—জ্ঞান-পিপাসা, দ্বিতীয়—জীবিকা-নির্ব্বাহ। শেষের উদ্দেশ্যটাই আমাদের দেশে শিক্ষা-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি এই উভয় উদ্দেশ্যকে এক সঙ্গে পূর্ণ করিতে সমর্থ নয়। দশ-পনর বৎসর স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিয়াও আমরা সামান্যই কাজের মত জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পারি। আজকাল ক্রমে শিক্ষিত লোকের জীবিকার উপায়গুলিও একরকম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন সমস্যা এই—শিক্ষার উক্ত উভয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে হইলে, কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত?

আমাদের দেশের শিক্ষা প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে, মাতৃভাষা দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয় না। অন্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়ায়, আমাদের সেই ভাষা শিক্ষা করিতেই অনেক সময় কাটিয়া যায়। তাহার পর খুব কম ছেলেই বিদেশী ভাষা উত্তমরূপ বুঝিতে পারে; কারণ, বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীটাও অত্যন্ত অনুপযোগী। সেই জন্য অনেকেই পঠিত বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। কাজেই আমাদের ছেলেরা মুখস্থ প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা ত নিশ্চয়ই কঠিন; সেই ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করা আরও কঠিন। কোনও বিদেশী ভাষাই সেই দেশে বহু-কাল না থাকিলে ভাল করিয়া শেখা যায় না। বিদেশী ভাষা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারায়, আমরা যে সব বিষয় অধ্যয়ন করি, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি না—উহাদের রহস্যগুলি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। ভিন্ন-ভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষ-বিশেষ শব্দগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখি—পরীক্ষামন্দিরে সেগুলি হুবহু উদ্গীরণ করিবার জন্য। ফোনোগ্রাফের মত শব্দগুলি একবার গ্রহণ করিয়া আবার বাহির করাই আমাদের কাজ। ইহাতে আমাদের জ্ঞানলাভও হয় না, বুদ্ধি এবং চিন্তা-শক্তিও বিকাশ পায় না।

কোন দেশেই মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় শিক্ষা প্রদানের নিয়ম নাই। ভারতে এইরূপ হওয়ার কারণ—এখানে রাজা ও প্রজার ভাষা বিভিন্ন। সরকারী কার্য্যে রাজার ভাষা ব্যবহৃত হয়। জীবিকা উপার্জ্জনের সুবিধার জন্য লোকে রাজভাষা শিখিতে বাধ্য হয়। ফলে রাজভাষার মধ্য দিয়া শাসক-জাতির রীতি নীতি, চাল-চলন আমাদের সমাজ ও চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়তঃ, এদেশে ভাষা অনেক। এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের ভাষা স্বীকার করেন না—বরং অবজ্ঞা করেন। ফলে এক প্রান্তবাসী আর এক প্রান্তবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিতেন; এক ধর্ম্মা-বলম্বী, এক দেশবাসী হওয়া সত্ত্বেও দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির মত বাস করিতেন। ইংরাজীভাষা ভারতের একতা-বন্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে। ইংরাজীভাষার জন্য আমরা আপনাদের চিনিতে পারিতেছি।

তৃতীয়তঃ, এ দেশের কোনও ভাষারই যথেষ্ট বল নাই। আমাদের সব ভাষারই শব্দভাণ্ডার এত হীন যে, আধুনিক জটিল বিষয়গুলি বুঝিবার ও বুঝাইবার উপায় নাই।

রাজকীয় কার্য্যে অতি অল্পই ইংরাজী-জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আমাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া রাজকার্য্যে প্রবেশ করে। এই বিষয়গুলি উহাদের কোনও কাজেই আসে না। যাহারা রাজকার্য্যে প্রবেশ করিবে মনে করে, তাহাদের এরূপভাবে সময় নষ্ট না করাই উচিত।

চতুর্থতঃ—আমাদের দেশে ভাষা অনেক আছে। এ দেশে একটি ভাষার প্রচলন না হইলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় হইবে না। আমাদের মনে হয়, ভাষা হিসাবে প্রান্ত বিভাগ করা উচিত; এবং এক-একটি প্রান্তে সেই ভাষাতেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এবং সঙ্গে-সঙ্গে যদি অন্যান্য বিশেষ প্রান্তগুলির ভাষা—অর্থাৎ যে ভাষাগুলি ঐশ্বর্য্যসম্পদে গরীয়ান—সেই ভাষাগুলি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তবে আরও ভাল হয়। যেমন ইংলণ্ডে স্কুল হইতেই ছেলেদের একটি-না-একটি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। আমাদেরও সেইরূপ হওয়া দরকার। ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রথার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান আমাদের বৃদ্ধি পাইবে, চর্চ্চাও বাড়িবে। এবং অন্যান্য প্রান্তের ভাষাগুলির সামান্য জ্ঞান থাকার জন্য সেই প্রান্তবাসীদিগের সহিত সহানুভূতিও বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ যখন প্রত্যেক ভারতবাসী নিজের প্রান্তভাষা ও অন্য প্রান্তভাষা ভাল করিয়া শিখিবে, তখন নিশ্চয়ই এমন একটা ভাষার উৎপত্তি হইবে, যদ্দারা প্রান্তবাসী পরস্পরকে নিজের ভাব ও চিন্তা বুঝাইতে পারেন। অর্থাৎ একটি lingua francaর সৃষ্টি হইবে। কোন্ ভাষা যে মুখ্যতঃ এই পদ পাইবে তাহা বলা যায় না। তবে উর্দ্ধ ভারতের প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত ইহা দ্বারা রাজনৈতিক কার্য্যও চলিতে পারে। বাংলা ভাষাও হইবে

পারে ; কারণ, বাংলা ফরাসীভাষার মত মধুর এবং বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত।

"ইন্দোর কে নয়ে জীবনে"—সম্পাদক।—ইন্দোরের মহারাজা নিজ রাজকার্য্যে একজন কনৌজিয় সজ্জনকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া একটি নূতন কায্য করিয়াছেন। ইঁহার নাম--রায় বাহাদুর মেজর রামপ্রসাদ দুবে, এম্-এ, বি-এস্‌সি, এলএল-বি। মেজর সাহেব কয় পুরুষ ধরিয়াই ইন্দোর সরকারে কায্য করিতেছেন। ইঁহার পিতা জেনারেল বালমুকুন্দ দুবে হোলকার সেনার কমাণ্ডর-ইন-চীফ ছিলেন। মেজর রামপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি খুব যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি হোলকার সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯৮ সালে মেজর হন। ১৯০০ সালে ইনি বিচার-বিভাগে বদলী হইয়া ইন্দোরের জুডিশিয়াল সেক্রেটারী হন। ইনি কিছুদিন সিভিল জজের কাজও করেন। পরে ষ্টেট গেজেটিয়ারের সম্পাদকতা করেন। তার পর কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত সেটেলমেণ্টের কার্য্য করিয়া বৃটিশ রাজের নিকট হইতে রায়বাহাদুর খেতাব পান। যখন হইতে ইনি রেভিনিউ মেম্বর হইয়াছেন, তখন হইতে ইন্দোরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ইন্দোরের প্রজাগণ ইঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করে।

২। "চিত্রময় জগৎ," অক্টোবর ১৯১৬—

"ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।"—প্রফেসার কর্বে মহোদয়ের মহিলা শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা সম্বন্ধে আমরা গত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" আলোচনা করিয়াছি।

জাপানের স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি দেখিয়া শ্রীযুক্ত কর্বের মনে হয় যে, ভারতবর্ষেও এইরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় খুলিলে হয়। ১৯১৫ সালের সামাজিক পরিষদে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি এই প্রস্তাব প্রথমে সাধারণের নিকট উপস্থিত করেন। উহা শ্রবণ করিয়া মহিলাশ্রমের আজন্ম-পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত গাডগীল প্রতিশ্রুত হইলেন যে, হিঙ্গণাতে যদি মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা দিবার জন্য কলেজ খোলা হয়, তাহা হইলে তিনি দশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা দান করিবেন। মহিলাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী সরলা বাই নায়ক কলেজের লেক্‌চার হলের জন্য চারি সহস্র মুদ্রা দিতে স্বীকৃতা হইলেন।

এই সামান্য পুঁজী লইয়া কর্বে মহোদয় কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার নাম হইল—ভারতবর্ষীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয় (Indian Women's University)।

উদ্দেশ্য—(১) দেশীয় ভাষার দ্বারা মহিলাগণকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইবে। (২) রমণীদিগের প্রয়োজন বুঝিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। (৩) প্রাথমিক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য অধ্যাপিকা তৈয়ারী করিতে হইবে।

সেই সময় অনাথ-বালিকা-শিক্ষামণ্ডলীর পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া তাৎকালিক কমিটি (Provisional Committee) গঠন করা হয়।—প্রোঃ কর্বে, প্রোঃ ভাটে, প্রোঃ লিময়ে, কাপ্টিকর, শ্রীমতী সরলাবাই নায়ক, শ্রীযুক্ত কেলকর ও শ্রীযুক্ত গাডগীল। ইঁহারা ভারতমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সভাপতি বা চান্সেলার হইলেন—ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, সহকারী সভাপতি (Vice-Chancellor) প্রিন্সিপাল রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে ; আলেখক (Registrar) প্রোফেসার যোশো কেশব কর্বে।

(১) পরীক্ষা—মহিলা বিদ্যালয়ের অধ্যয়নকাল তিন বৎসর। প্রত্যেক বৎসরের শেষে একটি পরীক্ষা হইবে। বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাশ হইলেই কলেজে ভর্ত্তি করা হইবে।

(২) অধ্যয়ন-ক্রম এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা—এই পরীক্ষার জন্য চারিটি বাধ্যতামূলক ও দুইটি ইচ্ছাধীন বিষয় থাকিবে। ইংরাজী ও মাতৃভাষা, ইতিহাস, গৃহশিক্ষা এবং গৃহচিকিৎসা এই চারিটি বিষয় নিশ্চয় পড়িতে হইবে। প্রাথমিক শ্রেণীর (Elementary course) অধ্যয়নক্রম পূর্ণ করিতে হইলে, প্রত্যেক বিদ্যার্থিনীকে এই সকল বিষয়ে certificate দাখিল করিতে হইবে—সংস্কৃত, গণিত, সেলাই, চিত্রাঙ্কন অথবা সঙ্গীত। প্রবেশিকা পরীক্ষার ইচ্ছাধীন বিষয় নিম্নলিখিতগুলির যে কোনও দুইটি—সংস্কৃত, প্রাণী ও উদ্ভিদ-বিদ্যা (Natural Sciences) সৃষ্টি ও রসায়নশাস্ত্র (Physical Sciences) ভূগোল, গণিত, হিন্দী ভাষা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও সেলাই।

"ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অওর জাপান।"—সার রবীন্দ্রনাথ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। এখানকার কাগজে সেইজন্য তাঁহার প্রশংসা ধরে না। কিন্তু সেখান হইতে আমরা বিরুদ্ধ সংবাদ পাইতেছি।

আধ্যাত্মিকতার গুরু ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। জাপানে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা ছাড়া কি আর বলিবেন? কিন্তু তাহাতে ফল কি হইল?

জাপান এখন নিজের লৌকিক বৈভব বৃদ্ধি করিতেই ব্যগ্র। সে দিন-দিন শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতির কিসে উন্নতি করিয়া য়ুরোপের প্রবল শক্তি সঙ্ঘের মধ্যে আসন ও সম্পদ পাইবে, সেই চিন্তায় মগ্ন। সে এখন বাণিজ্য-বিস্তার ও অধিকার-বিস্তারেই মনঃসংযোগ করিয়াছে ; অন্যদিকে সে তাকাইতে চায় না।

রবীন্দ্রনাথকে তাহারা যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রীত হইয়া সেখানে আধ্যাত্মিকতার কথা বলিলেন। জাপান দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল। জাপানীরা রবীবাবুর বৈদান্তিক উপদেশের স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডল একেবারেই অপছন্দ করিল।

"য়োমিউরী" নামক একখানি জাপানী পত্রিকায় মিঃ বুনো একটি খোলা চিঠি (Open Letter) লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—"পার্থিব উন্নতির চেষ্টা ত্যাগ করিয়া জাপানীরা রবীন্দ্রবাবুর উপদেশমত চলিতে মোটেই উৎসুক নয় (The Japanese are in no mood to take such advice as the poet has been offering them)। পার্থিব উন্নতির জন্য অনেকটা মানবশক্তির বৃথা অপচয় হয়। জাপানেও এক সময় এইরূপ মতই ছিল ; কিন্তু জাপান এখন সেরূপ অভিমত ত্যাগ করিয়াছে। ভারতের প্রায় লোকের বিশ্বাসই যদি

রবীন্দ্রনাথের মত হয়, তা হইলে ভারতবর্ষ যে স্বাধীন নয়—তাহা আর আশ্চর্য্য কি! (It is no wonder that India is not an independent nation, if most of the Indian people hold to ideas like Tagore).

ডাঃ ডনজো এচিনা বলেন, "জাপানকে ভারতবর্ষের শ্রেণীতে টানা রবিবাবুর উচিত হয় নাই। জাপান ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর মত জাতি। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদিও পূর্ব্বদেশের অনেকগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছে; তাই বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাকে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া সেখানে প্রাচ্য-দর্শন ও প্রাচ্য-সভ্যতার ঘূণধরা দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাওয়া পাগলামী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও নবীন সভ্যতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর মত জাপান মানিতে রাজী নয়। কারণ তাহা হইলে জাপানকে ভারতবর্ষের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

"য়োরোজু" নামক পত্রিকার সম্পাদক বলেন—"রবীন্দ্রনাথের বলিবার ভঙ্গী বড়ই মনোহর। জাপানীরা যেন সেই মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজের সভ্যতাকে গালি দিতে আরম্ভ না করেন। (The Editor warns his countrymen against being charmed by the poet's facile way of maligning the civilisation of new Japan). নৈতিক সভ্যতা রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু পার্থিব সভ্যতাকে ত্যাগ করিয়া শুধু নৈতিক সভ্যতার উপরই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হইতেছে সোণার পাথরবাটী গড়া। (A moral civilisation not built on material civilisation can only lead a country to ruin!)।

৩। মর্য্যাদা, ডিসেম্বর ১৯১৬—

"ভারতীয় স্বরাজ্য"—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন সভ্য ভারতবর্ষের প্রজাগণের প্রতিনিধিরূপে একটি অত্যন্ত বিচারপূর্ণ ও প্রভাবশালী আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছেন। শুনা যায় যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ এ দেশ হইতে যাইবার পূর্ব্বে ভারত-সচিবের নিকট একটি খসড়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে য়ুরোপে শান্তি স্থাপনার পর ভারতবর্ষকে কতকগুলি উদার রাজনৈতিক অধিকার দিবার প্রস্তাব ছিল। এতদ্দেশীয় ইংরাজগণ এই ব্যাপার শুনিবামাত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকাল যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, সেজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে ভারতবর্ষ যেরূপ রাজভক্তি ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের তের-দফার দাবী অন্যায় হইয়াছে—এ কথা বলা বিচার-বিমূঢ়তার কাজ। আমাদের রাজভক্তির প্রশংসা ত সকলেই করেন; কিন্তু ভাবী রাজনৈতিক উন্নতির সম্বন্ধে সকলেই মৌনব্রত ধারণ করিয়া থাকেন। উপনিবেশগুলির মুখ হইতে কথা বাহির হইতে-না-হইতে তাহাদের বর দিবার জন্য ব্রহ্মা ও শিবের ব্যগ্রতা উপস্থিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের নাম উঠিতেই তাঁহারা রাজভক্ত ভারতবর্ষের পিঠ চাপড়ানই যথেষ্ট পুরস্কার মনে করেন। এ সময় আমাদের কর্ত্তব্যের পথ সোজা ও পরিষ্কার। যদি আমরা এ সময় চুপ করিয়া থাকি, তবে শুধু যে দেশ ও সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব তাহা নহে—আমরা অনন্ত সময়ের প্রতিও অন্যায় করিব। স্পষ্টকথায় ভারতবর্ষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকট করা শুধু সত্য দেশভক্তি নয়, রাজভক্তিও বটে।

আমাদের বিশ্বাস যে, সরকার শাসনপদ্ধতির সংস্কার করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহাতে প্রজাগণ দেশ-শাসনে বাস্তবিক অধিকার পায় তাহা করা উচিত; এবং সমরশিক্ষা সম্বন্ধে যে সব আপত্তিজনক বাধা আছে, সেগুলি তুলিয়া দেওয়া দরকার। কারণ সেই বাধাগুলি সর্ব্বদা আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদের বিশ্বাস করেন না।

সংস্কৃত

১। শারদা—২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা—

নিষাদঃ—লেখক 'কশ্চিৎ'।—নিষাদ শব্দ বিশেষ অপ্রসিদ্ধ নয়। শ্রীরামভদ্রের সহিত নিষাদপতির সখ্য ছিল। শৃঙ্গবেরপুরাধিপতি নিষাদ-রাজ রামভদ্রের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করেন নাই। শ্রুতিব্যাখ্যানে মীমাংসকগণ আপনাদের বুদ্ধিবৈভব দেখাইয়াছেন 'নিষাদস্থপতিংযাজয়েৎ'। অনেকেই জানেন না এই নামধারী জাতি এখন আছে কি না। ঋগ্বেদে অদেবা, অব্রতা, দস্যু প্রভৃতি শব্দ যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহারা আর্য্য ছিল না।

"পঞ্চজনা" শব্দটি ঋগ্বেদে দেখা যায়। এই শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাস্কাচার্য্য বলেন—"গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে। চত্বারো বর্ণা, নিষাদপঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ।" বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থে শৌনক বলেন "নিষাদপঞ্চমান বর্ণান মন্যতে শাকটায়নঃ"। নিরুক্ত ব্যাখ্যাতা দুর্গাচার্য্য এই মতের সমর্থন করেন। ইহাতে মনে হয় বেদে নিষাদগণ পঞ্চমবর্ণ পদে স্থান পাইত।

নিষাদগণ আর্য্যদিগের প্রতিবেশী ছিলেন; এবং নিষাদপতিগণ যজ্ঞাধিকারীও ছিলেন। আর্য্যগণ তাহাদের ঋত্বিক-পদ স্বীকার করিতেন।

পুরাণের বর্ণনা আবার অন্যরূপ। ভাগবতের মধ্যে বেণোপাখ্যানে—

কাককৃষ্ণোঽতিহ্রস্বাঙ্গো হ্রস্ববাহুর্মহাহনুঃ।
হ্রস্বপান্নিম্ননাসাগ্রো রক্তাক্ষস্তাম্রমূর্দ্ধজঃ॥

পদ্মপুরাণে—

পর্ব্বতেষু বনেশ্বর তস্যবংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
নিষাদাশ্চ কিরাতাশ্চ ভিল্লানাহলকস্তথা।
ভ্রমরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥

পুরাণের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি বর্ব্বর জাতিগণ নিষাদবংশীয়। আজও মধ্যভারতে ঐ জাতীয় লোক দৃষ্ট হয়। পুরাণ ও শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, উহারা মধ্যভারতেও বাস করিত এবং নিষাদ বলিয়া পরিচিত ছিল। কালক্রমে আর্য্যগণ

তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করেন। উহারাও "জ্ঞানবিজ্ঞানবিধুরাঃ" ক্রমে অসভ্য দশা প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু সহসা একেবারে অধঃপতনের নিম্নস্তরে তাহারা পৌঁছায় নাই। ভগবান রামচন্দ্রের কোনও নিষাদরাজ বন্ধু ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, সে সময় আর্য্য ও নিষাদগণের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল।

ক্রমে আর্য্যশক্তি ইহাদের বলক্ষয় করিয়া দাসকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ইহাদের সভ্যতা ও শিক্ষা উন্মূলিত করিলে, ইহারা অসভ্য জাতিতে পরিণত হয়।

আসামী

১। আলোচনী : অগ্রহায়ণ।

নিজের ভরির ওপরত থিয় হোবা।—লেখক শ্রীজ্ঞানানন্দ জগতী।

অসুখ হইলে সুচিকিৎসক, মোকর্দ্দমায় আইনজ্ঞ উকীল এবং শোকে সান্ত্বনা দিবার প্রবীণ, সুধী ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যাহার আছে, সে ভাগ্যবান। কিন্তু এক-এক সময় মানুষ এমন অবস্থায় পড়ে যে—তাহার নিজের বুদ্ধি ব্যতীত আত্মীয় বন্ধুর বুদ্ধি-পরামর্শ পাইবার সুযোগ থাকে না। এমন অবস্থায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে না পারিলে, নিজের বুদ্ধিকে সুপথে চালাইবার যোগ্যতা না থাকিলে, তাহার পতন অনিবার্য্য।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। আজকাল দেশে উপাদান থাকা সত্ত্বেও সেই উপাদানকে কাজে পরিণত করিবার জ্ঞান ও শক্তি-উভয়েরই অভাব। ইহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা দরকার।

যে শিক্ষা স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। জ্ঞান দ্বিবিধ—(১) নিত্যকার্য্যে প্রয়োগ করিবার মত জ্ঞান; (২) অলঙ্কারের মত শোভা-সম্পাদক জ্ঞান।

আমাদের বি-এ, এম্-এ উপাধি প্রায়ই দ্বিতীয়বিধ। একটা উদাহরণ দিই। হয় ত একজন আসামী মহিলা আত্মীয়দের সঙ্গে রেলে ভ্রমণ করিতেছেন। দৈবাৎ কোনও ঘটনায় তিনি আত্মীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তাঁহার কাছে অর্থ থাকিলেও তিনি বাড়ী ফিরিতে পারিবেন কি? বোধ হয় না। প্রথমতঃ সাহস দরকার; তার পর রেল জাহাজের সময় ও ভূগোল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। আবার নৈতিক ও মানসিক বল থাকাও দরকার, নহিলে দুষ্ট জনের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন না। মনুষ্য-চরিত্রাভিজ্ঞা—নৈতিক বলসম্পন্না না হইলে তাঁহার রক্ষা নাই। কেহ বলিয়াছেন—"পৃথিবী গোল কি চ্যাপ্‌টা, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব কত, পৃথিবী ধ্বংস পাবে কি রকম করিয়া—প্রভৃতি জ্ঞান আমাদের মেয়েদের কাযে লাগে না। পৃথিবী ধ্বংস হইলে আমাদের সাধ্য নাই আমরা তাহাকে রক্ষা করি। কিন্তু কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে হইলে কোন্ প্ল্যাটফর্ম হইতে গাড়ি ছাড়ে, কোথায় টিকিট পাওয়া যায়, পথে কোথায়-কোথায় গাড়ী লাগে, কোন্ পথে গেলে খরচ কম পড়ে—প্রভৃতি জানা কি দরকার নয়?"

যে শিক্ষা আত্মবলকে—আত্মবুদ্ধিকে কাজে লাগাইবার শিক্ষা দেয়, তাহাই সুশিক্ষা। নিজের সমস্যাগুলির সমাধান নিজেরই করা উচিত। নিজের resourceএর উপর নির্ভর করিলে এক দিকে যেমন বুদ্ধির বিকাশ হয়, কার্য্য করিবার শক্তি বাড়ে, আবার অন্য দিকে নৈতিক শক্তিও সঞ্চিত হয়।

কিন্তু সকলেই যে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে, এ কথাও ভুল। সকলেই self-contained হইতে পারিলে সমাজের দরকার ছিল না। সম্মিলিত কার্য্যের প্রয়োজন সেই জন্যই। এক ভগবান ব্যতীত পরের সহায়তা উপেক্ষা করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে কেহ পারে না।

দেশের সকলে যদি এ শিক্ষাটা নিজের-নিজের পরিবারের মধ্যে প্রবর্ত্তন করেন—তবে দেশের উন্নতি হইতে বেশী সময় লাগিবে না। ইহার জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মহিলা শিক্ষার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, উন্নতি অনেক দূরে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

আমাদের কথা—

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহার "সুবর্ণবণিক জাতির বর্ণনির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে তাঁহার আত্মসাতের উদাহরণটুকু গত পৌষের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' যখন উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তখনই মনে হইয়াছিল যে, ইহার বিরুদ্ধে বিমলাবাবুর পক্ষ হইতে একটা মহা হৈ হৈ রব উঠিবে।—তাঁহার বন্ধুবর্গ আমার মাথার উপর গালাগালির ফোয়ারা খুলিয়া দিবেন।

এখন দেখিতেছি, সে অনুমান আমাদের মিথ্যা নহে। দুই-একখানা কাগজ ইতিমধ্যেই আমাকে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ ভাষায় গালি দিয়াছেন। গতমাসের 'ভারতবর্ষে'ও দেখিলাম, বিমলা বাবুর একটি

'বন্ধু' আমার ঘাড়ে কিছু কলঙ্কের ভার চাপাইয়া এক 'প্রতিবাদ' লিখিয়াছেন। আমি যে বিদ্বেষবশতঃই বিমলাবাবুর আত্মসাতের কথা বলিয়াছি, এইরূপ তাঁহাদের ধারণা।

এ অপবাদের জন্ম আমরা যে দুঃখিত বা বিস্মিত হইয়াছি, অবশ্য তাহা নহে। যে কারণে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাঁহার "বিবিধার্থ সংগ্রহে" দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সত্য বলিলে বন্ধু বিগড়ে।" যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন,—"কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্ত অপরিচিত লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষা বশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি।" যে কারণে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় বলিয়াছিলেন,—"সত্য কথা বলিতে গেলে সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্রেরা ক্রোধের বিষে জর্জ্জরীভূত হইতে থাকেন।" সেই কারণে আজ যদি আমাদিগকে গালি খাইতে হয়—বিদ্বেষী হইতে হয়, তবে সেজন্ম দুঃখ করিবার বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বিস্মিত হইয়াছি শুধু, বিমলা বাবুর এই বন্ধুটির দিনকে রাত্রি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখিয়া! বিমলা বাবু না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার দোষ হইল না—তিনি 'সত্যপরায়ণ' হইলেন! আর আমরা তাহা দেখাইয়া দিয়া অপরাধী হইলাম—বিদ্বেষী হইলাম! অথচ মজার কথা এই যে, এই বিমলাবাবু যখন গত বৎসর রাধাকুমুদ বাবুর "Indian shipping" গ্রন্থ হইতে এক ফোঁটা আত্মসাতের উদাহরণ বাহির করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুবর্গ তাহাতে বিদ্বেষের গন্ধমাত্র পান নাই!

প্রতিবাদকারী বলিতেছেন,—"সমালোচক মহাশয় কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু প্রমুখ মনীষীদিগের সে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া অন্থের ভ্রম সংশোধন করিতে চাহেন, তিনি কি দেখাইতে পারেন যে আজ পর্য্যন্ত কেহ কখনও ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন?" —ক্রমশঃ-প্রকাশ্য রচনার সমালোচনা ঠিকমত হয় না সত্য, তবে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে'র পৃষ্ঠায় উহার সম্বন্ধে কিছু বলিলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, এমন কোন কথা নাই। যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করিয়া লেখক আমাদিগকে চোখ রাঙাইয়াছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র সমালোচনার পৃষ্ঠায় একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "গ্রন্থ যেখানে সম্পূর্ণ হয় নাই সেখানে সমালোচনারও সময় উপস্থিত হয় নাই। তবে পরামর্শ দিবার এই উপযুক্ত সময় বটে।"—কথাটা খুবই ঠিক। অর্দ্ধনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যের বিচার করা চলে না বটে, কিন্তু কোথায় তাহার বেঠিক হইতেছে, কোথায় তাহার মজুর মিস্ত্রীরা-ফাঁকি দিতেছে, এ সমস্ত সেই নির্ম্মাণের মুখেই ধরা পড়ে। এবং সেই সময়েই সে সব ত্রুটি-সংশোধনেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এইরূপ হওয়াটাই উচিত। আমরা যে বিমলাবাবুর ত্রুটি দেখাইয়াছিলাম, তাহাও ঐ সংশোধনের উদ্দেশ্যে। বিমলাবাবু তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশে Colebrooke, Wilson প্রভৃতির নাম করিয়া তাঁহাদের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ঐ অংশেরই যে স্থানটুকু সব চেয়ে গবেষণামূলক—পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়, সেই স্থানটুকুই যে 'Vedic-Index' হইতে গৃহীত, তাহা তিনি ক্ষুণাক্ষরেও বলেন নাই।

তবে পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজে ঐ প্রবন্ধটির শেষ ভাগে লেখা আছে,—"বৈদিক যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে Macdonell এবং Keithএর বৈদীক সূচী (Vedic Index) হইতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।"—কিন্তু Vedic Indexএর যে স্থানটুকু তিনি অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ঐ লাইনটুকু পড়িয়া জানিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। তা'ছাড়া, তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি মহা মহা গ্রন্থের যে সব উল্লেখ আছে, সেগুলিও Vedic Indexএর 'ফুটনোটে'র অবিকল নকল। কিন্তু এ প্রবন্ধ পড়িবার সময় মনে হয়, বিমলাবাবু যেন বেদ-উপনিষদ প্রভৃতি মন্থন করিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। এ সব ত্রুটি সত্ত্বেও বিমলাবাবুর বন্ধু ঐ লাইনটিকে যথেষ্ট স্বীকারোক্তি মনে করিয়া আমাদের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—"ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্কলন করিতে হইলে কি করা উচিত, তাহা যাঁহাদের অজ্ঞাত, তাঁহাদের ঐরূপ প্রবন্ধ সমালোচনা করিবার চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।"—বন্ধুর জন্ম এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করাটা শোভন হইতে পারে, কিন্তু সার্থক হয় নাই। ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠ যদুনাথ বলিয়াছেন,—"আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তাহা নির্দ্দেশ না করিলে সাহিত্যিক অসাধুতা হয়।...ইতিহাস-লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণ-পঞ্জী দিতে বাধ্য। আইনের পুস্তক যেমন গুড়ী গুড়ী অক্ষরে ছাপা নজীরের উল্লেখে পূর্ণ না হইলে চলে না, তেমনি ইতিহাসও বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক; ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে। ইহা না থাকিলে গ্রন্থের মূল্য হানি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। আমাদের বড় দোষ যে, আমরা অনেকেই নিজের রচিত ইতিহাস বা প্রবন্ধে এইরূপ আদি বৃত্তান্তের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করার পরিশ্রমটুকু সহিতে চাহি না; হয় ত প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থের নাম মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিই।"

প্রতিবাদকারী 'প্রতিবাদে'র শেষাংশে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি জাতির বিবিধ পত্রিকা থাকিতে আমরা 'সুবর্ণ-বণিক সমাচার' পত্রের বিমলাবাবুর প্রবন্ধের আলোচনা করিলাম কেন?—ইহার উত্তর খুব সহজ। উত্তর এই যে, সে সকল কাগজে বিমলাবাবুর মতন লেখকের সন্দর্শন-সৌভাগ্য লাভ আজিও আমাদের ঘটে নাই! তবে ঘটিলে সে লেখকের বন্ধু-ভাগ্য না দেখিয়া এবারে চট্ করিয়া কিছু বলিব না মনে করিয়াছি! কারণ, যুক্তিহীন প্রতিবাদ-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে সহজে কাহার সাধ হয়।

ভারতী—পৌষ, ১৩২৩।

মাসকাবারী—কাব্যে নীতি।

কাব্যে নীতি জিনিষটার যে প্রয়োজন, এ কথা বুঝাইবার জন্য গত অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' আমরা অন্যান্য অভিমতের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রেরও একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। গত পৌষের 'ভারতীর' 'মাসকাবারী'তে দেখিলাম, একজন লেখক বিস্তর খাটিয়া বঙ্কিমের সেই মতটিকে জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! কথাটা সত্য হইলে বড়ই বিপদ। কারণ, জাল করিয়া মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি পর্য্যন্ত হইয়াছিল, শুনা যায়। 'ভারতীর' দলের ভুল ভাঙ্গাইতে গিয়া যে শেষে 'মাথাটি বাঁচানো হইবে দায়'—তাহা স্বপ্নেও মনে করি নাই!

যাহা হউক, 'ভারতীর' কথাগুলি একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কথাটি ইঁহারা নজীররূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এই—"কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।"—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি যে কবির প্রধান কাজ—এ কথা কোন্ মূর্খ অস্বীকার করিবে? 'পাঠশালার হট্টগোল,' 'গুরুমশায়ের বেতকাটি' 'কাব্যসুন্দরীর কানমলা' প্রভৃতি 'ভারতীর' উপমা ও রসিকতাগুলি একেবারেই নিরর্থক, উদ্দেশ্যহীন—ছায়ার সঙ্গে ঘুষাঘুষি মাত্র! কারণ কাব্য যে কথামালা হইবে, এমন কথা আমরা কোন কালেই বলি নাই। আমরা কবিকে যে হিসাবে শিক্ষাদাতা বলিয়াছি, তাহা বঙ্কিমের বাক্য হইতেই সুস্পষ্ট করিয়া দিতেছি। বঙ্কিম বলিতেছেন, 'এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি করাই উৎকৃষ্ট কবির উদ্দেশ্য।' এখন দেখিতে হইবে, ঐ 'দ্বারা' কথাটি দ্বারা কি বুঝায়! বুঝায় না কি যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কবির প্রধান কাজ হইলেও, তাঁহার Ultimate end —the last and greatest demand of art হইতেছে—জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান। আসল উদ্দেশ্যটি নৈতিক।—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি তাহার সোপান—means to an end. 'কাব্য-কুঞ্জবন পাঠশালার হট্টগোলে সরগরম হওয়া কাহাকে বলে জানি না,—'সোনার কাঠি আর মানুষের ঘুমন্ত মন' প্রভৃতি রূপকথার হেঁয়ালিও বুঝি না। তবে কাব্যের সহিত নীতির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—কবিরা যে জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদেরও নাই, বঙ্কিমেরও ছিল না; কারণ তিনি স্বয়ং অন্যত্র বলিয়া গিয়াছেন,—"কাব্যের দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এইজন্যই কবি ধর্ম্মের একজন প্রধান সহায়। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।" (অনুশীলন ২৭ অধ্যায়)—শুধু মুখে বলা নহে, কার্য্যেও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কবি একজন প্রকৃত শিক্ষাদাতা। তাঁহার আনন্দমঠ, রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাসগুলি এ কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। 'আনন্দমঠে'র বিজ্ঞাপনেই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক সময় নয়। সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এ গ্রন্থে বুঝান গেল।" তার পর রাজসিংহের বিজ্ঞাপনেও দেখা যায়, তিনি বলিয়াছেন—"ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ-সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।" অতএব, বুঝিতে পারিলাম না, 'ভারতী' আমাদের জালিয়াৎ ঠাহরাইলেন কেন? ইহাতে শুধু যে আমাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে তাহা নহে, বঙ্কিমের প্রতিও বিলক্ষণ অবিচার করা হইয়াছে। এত দিনেও বাঙ্গালার লেখকেরা বঙ্কিমকে চিনিতে পারিল না, ইহা লজ্জার কথা! 'ভারতী' আমাদের গালি দিন, ক্ষতি নাই। কিন্তু বঙ্কিমের লেখা লইয়া ছেলেখেলা করিবেন না। না পড়িয়া সমালোচনা অন্য পুস্তকের বেলায় চলিতে পারে, কিন্তু বঙ্কিমের লেখা লইয়া তাহা করিলে, দেশের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

সভাপতির অভিভাষণ—'বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ'।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন,—"আজিও নাকি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকে ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়।"—আনন্দের কথা, বাঙ্গালীর সে ভাব কাটিয়া গিয়াছে। সে সঙের মূর্ত্তি বাঙ্গালায় এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কাহারও ভিতর এক আধটুকু বাঙ্গালা-বিদ্বেষ থাকিলেও সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে, এমন বেহায়া বাঙ্গালী এখন একেবারেই নাই।

কেমন করিয়া ইহা ঘটিল?—ইংরেজিনবীশ বাঙ্গালীর মন হইতে কে সেই বাঙ্গালা-বিদ্বেষ দূর করিয়া দিল?—বলা বাহুল্য, একদিনে উহা হয় নাই। একজনের চেষ্টা বা যত্নেও উহা ঘটে নাই। এই সাহিত্য-প্রীতি জন্মাইবার মূলে অনেকদিন হইতে অনেক মনীষী—অনেক সাহিত্যসেবীই জলসেচন করিয়া আসিতেছেন। নাম করিতে হইলে, মৃত্যুঞ্জয় কেরী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেরই নাম করিতে হয়,—আকস্মিক ঘটনা উহা নহে।

তবে ঐ সাহিত্য-সুহৃদগণের মধ্যে সকলের চেষ্টা বা চেষ্টার ফল যে সমান হইয়াছে, এমন বলি না। সে হিসাবে যদি কাহারও নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়, তবে সে নাম বঙ্কিমচন্দ্রের। সাহিত্য-সেবায় তাঁহার প্রতিভা নিয়োজিত না হইলে বাঙ্গালা ভাষার আজ এত আদর দেখিতে পাইতাম কি না, সন্দেহ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি

সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সে সাহিত্যকে কেহ-কেহ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলেও তাহার পাঠক-সংখ্যা বড় বেশী ছিল না। বঙ্কিম হইতেই বাঙ্গালী সখ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে আরম্ভ করে। তাঁহার শিক্ষায় অনেক ইংরেজিনবীশ বাঙ্গালীই মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে অনেক সাহিত্য-সেবীই সুপথে চালিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমের নামের পরেই বাঙ্গালার রঙ্গালয় ও বাঙ্গালার সংবাদপত্র এই দুইটির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ভাষার প্রসারকল্পে এই দুইটী জিনিষও অল্প সহায়তা করে নাই। সুলভ সংবাদপত্র প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া দূরদূরান্তর হইতে অগণ্য পাঠক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, এবং নব নব রঙ্গশালা নানা উপায়ে দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্য পণ্যকে নানা দলের চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। *

তার পর মনে পড়ে' রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষের কথা। রবীন্দ্রনাথই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বিদেশীর নিকট মাননীয় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে এ চেষ্টা একেবারে হয় নাই, অবশ্য তাহা নহে।—রমেশচন্দ্র ইংরাজীতে History of Bengali Literature লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রতি বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে মনে হয়, বিলাতের বিখ্যাত 'স্পেক্টেটর' বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালি লেখক সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"The genius of the language, which is incapable of paraphrase yet can convey any subtlety of satire, any finesse of double meaning, is adopted to light, incisive, slightly bitter newspaper writing; and it is in that inslight dramas, often, we are told excessively clever and in novelettes, that the Bengali reaches his best level. He will do better then that yet, for with all his faults, he is essentially an intellectual being, with quick wits, a capacity for abstruse thinking—he has invented half a hundred philosophies and has locked away somewhere a vein of poetry in his nature, though he shows it rather often in verse which the decadents of the hour would best understand."—কিন্তু বেশীদিন যাইতে না যাইতে এ সব সুখ্যাতি বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে সেই পরের মুখের প্রশংসা আজ আবার আমাদের কাণে পৌছিতেছে।

এইবার সার আশুতোষের কথা।—বাঙ্গালা সাহিত্য সুদূর বিস্তৃত হইলেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার ছেলেদের সহিত তাহার বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা বহি হাতে করিলে তাহার অভিভাবকদল চটিয়া লাল হইতেন, এ দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু আশুতোষের কল্যাণে সে হাস্যকর দৃশ্য এখন আমাদিগকে দেখিতে হয় না। তাঁহার চেষ্টায়, তাঁহার উদ্যমে বঙ্গভাষা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানলাভ করিয়াছে।—সেই আশুতোষ এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদিগকে এই গৌরচন্দ্রিকা লিখিতে হইল,—এত কথা বলিতে হইল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, যিনি কখনও একছত্রও বাঙ্গালা লিখিলেন না, তাঁহাকে এ পদে বরণ করা কেন?—তিনি বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার 'কনিক শেকশুন্স্' লেখেন নাই সত্য, কিন্তু মাতৃভাষার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আর কোনও বাঙ্গালী করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। শুধু এই একটি সিদ্ধির জন্য তিনি অমর। এই হেতু যদি তাঁহাকে সভাপতির পদে অভিষিক্ত করা হইয়া থাকে, তবে সেটা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। বাঙ্গালাদেশে দ্বিতীয় আশুতোষ নাই। তাঁহার মত মনীষীর—তাঁহার মত সাহিত্য-সুহৃদের সাহিত্য-বিষয়ক উপদেশ আমাদের শুনিয়া রাখাও ভাল। তাঁহার মন্তব্যের মূল্য আছে—মূল্য আছে বলিয়াই চারিদিক হইতে তাঁহার অভিভাষণের আলোচনা চলিতেছে।

তবে এই আলোচনার মধ্যে নিন্দাটাই আমরা বেশী শুনিতে পাইতেছি। অবশ্য নিন্দার যোগ্য যে ইহাতে কিছু নাই, এমন বলি না। তাঁহার অভিভাষণের ভাষা অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। তাহাতে এমন কথাও আছে, যাহার সামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু এ সব দোষ সত্ত্বেও তাহাতে এমন একটা জিনিষ আছে, যাহা ইতিপূর্ব্বের অন্যান্য অভিভাষণে বড় একটা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে জিনিষটা আন্তরিকতা। তীব্র সাহিত্যানুরাগ ইহার ছত্রে-ছত্রে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি ভাষার উৎপত্তি—ভাষার গতি সম্বন্ধে গম্ভীর গবেষণা করিয়া পাঠক বা শ্রোতার নিদ্রাকর্ষণের প্রয়াস পান নাই বটে, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া বাঙ্গালীকে আশার কথা শুনাইয়াছেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে সেইটাই পরমলাভ বলিয়া মনে করি। তিনি বলিতেছেন:—"দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎপথে লইয়া যাইতে হয়, মনুষ্য করিয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতেই হইবে। পাশ্চাত্যভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজ-দেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে।"—এই কথাটাই তাঁহার 'অভিভাষণের' আসল কথা।—বাঙ্গালী যদি এখন সে কথা কাণ পাতিয়া শুনে, তবেই তাঁহার 'অভিভাষণ' সার্থক হইবে।

* রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্য-সংবাদ

মাসিক পত্রের সম্পাদকদিগের অনেক সময় বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়। কোন লেখকের কোন প্রবন্ধ বা কবিতা একটু বেশী দিন পড়িয়া থাকিলে তাঁহার ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু কোন পত্রে প্রেরিত কোন প্রবন্ধ যদি অন্য কোন পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পত্রের সম্পাদককে তাহা জানাইলে আর কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত, সুকবি শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের 'গ্রামে' কবিতার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জনের উক্ত কবিতাটি কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা কয়েক মাস পরে বিগত পৌষের 'ভারতবর্ষে' উক্ত কবিতা প্রকাশিত করি; এদিকে পৌষ মাসের 'পরিচারিকা' পত্রেও ঐ কবিতাটী প্রকাশিত হয়। 'পরিচারিকা' সম্পাদিকা মহাশয়ার পত্রের উত্তরে শ্রীমান কুমুদরঞ্জন আমাদের 'অনবধানতার' কথা বলিয়াছেন; কিন্তু আমাদের 'অনবধানতার' ত কোনই কারণ দেখিলাম না; শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন যদি আমাদিগকে পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া উক্ত কবিতাটী ছাপিতে নিষেধ করিতেন, তাহা হইলে 'অনবধানতা'র অভিযোগ আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। সত্যের অনুরোধে এই কৈফিয়ৎটুকু দিতে বাধ্য হইলাম।

অধ্যাপক শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'সমসাময়িক ভারতের' চতুর্থ খণ্ড শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ভূমিকা সহ শীঘ্রই বাজারে দেখা দিবে। অনেকগুলি বহু মূল্যবান্ রঙ্গীন চিত্র ও মান-চিত্রসহ সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য মাত্র ৩।০ টাকা। বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে এই খণ্ড উৎসর্গ করা হইয়াছে। এইখানি লইয়া 'সমসাময়িক ভারতে'র ছয় খানি প্রকাশিত হইল। আরও তিন খানি যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক মুদ্রিত "শ্রীকান্ত" নবকলেবরে প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নূতন গল্পের বই "কর্ম্মফলের টীকা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন প্রণীত "আর্য্যমহিলার ধর্ম্ম ও নীতি" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নূতন "চূড়ান্ত চাতুরী" প্রকাশিত হইল; মূল্য ৷৷০।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল প্রণীত "সতী-লক্ষ্মী" নাটক প্রকাশিত হইল; দক্ষিণা এক টাকা।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন "মতিমহল" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৷৷০।

'হসন্তিকা' শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রজ্জলিত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা ফুৎকৃত হইয়া বত্রিশ পয়সা মূল্যে বিতরিত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড়টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্য ও মিথ্যা' আট আনা গ্রন্থমালা শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'জীবনের মূল্য' এই মাসেই প্রকাশিত হইবে; মূল্য দেড় টাকা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Choudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

বসন্ত

চৈত্র, ১৩২৩

দ্বিতীয় খণ্ড]   চতুর্থ বর্ষ   [চতুর্থ সংখ্যা

সুপ্তি

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ]

শিথিল চরণে ওগো দেবি, তুমি
নামিয়া এসেছ ধরাতল,
করি' নিমীলিত পলকে অলস
জীবের জীবন শতদল ;
নয়নে আলোক মিলায়ে যায়,
ধূলি-পরে তার লুটিছে কায়,
ঘন উচ্ছ্বাসে উঠিছে নামিছে
হৃদি-পঞ্জর অবিরল।
হিংসার শ্যেন-কুটিল-নেত্রে
রাখিয়াছ তুমি নিজ কর,
এবে দর্পের বক্ষ-প্রসার
নাহি পায় তার অবসর ;
তোমার মধুর মৃদু-পরশ
না জানি কাহারে করে না বশ,
লুণ্ঠিত তাই বিজয়-মাল্য
মহীয়সি ! নিজ হৃদিপর।

নিমেষের তরে ত্রিদিবের সুধা
করি'ছ ভুবনে বিতরণ,
নিমেষের তরে দিয়েছ ভুলায়ে
এই জীবনের মহারণ ;
তব মায়াময়ী ছায়ার তলে
ভাঙ্গি'ছ বিশ্ব, গড়ি'ছ পলে,
একেরে দেখায়ে বিবিধ বরণে
করিতেছ তুমি বিচরণ ।
ওরে লাঞ্ছনা-কালিমা-লিপ্ত,
ওরে দীন হীন ছুটে আয়,
ওরে শোকে তাপে দীর্ণ-পরাণ,
আয় রে পীড়িত ক্ষীণকায় !
নাহি হেথা ভেদ, তুল্য সব,
প্রতিকূল হেথা উঠে না রব,
রহিবি সকলে হেথা জননীর
বিরাট বিশাল স্নেহছায় ।
হ'য়েছিস্ কি রে জীবন-আহবে
শ্রান্ত তপ্ত অতিশয় ?
সত্যের হেরি নগ্নমূর্ত্তি
পেয়েছিস্ কি রে মহা ভয় ?
এই জীবনের কুটিল পথ
ভেঙ্গেছে কি তোর সাধের রথ ?
আয় ছুটে আয়, তোরে আশ্রয়
দিবে এই কোল স্নেহময় ।
সুপ্তির এই মোহময় নীড়ে
থাক্ রে ক্ষণেক অচৈতন,
যা'ক্ রে জুড়ায়ে অন্তর তোর
শুধু অশান্তি-নিকেতন ।
নবীন ঊষার শীতল বায়
যখন প্রথম লাগিবে গায়
দুখবর্জ্জিত সুখ-উজ্জ্বল
ধরা-মাঝে হবি সচেতন—
সে যে শান্তির নিকেতন !

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যুগ

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ]

হিন্দুদিগের চারি যুগের কথা সকলেই অবগত আছেন। এই চারি যুগ ক্রমে সত্য বা কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামে পরিজ্ঞাত। পৃথিবীর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থিতিকালই এই চারি যুগের দ্বারা বিভক্ত। এইরূপে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের কালবিভাগই যুগ-কল্পনার লক্ষ্য। তাহাতেই প্রত্যেক যুগমানের সঙ্গে-সঙ্গে যুগধর্ম্মের উল্লেখও আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই। সুতরাং যুগ-বর্ণনায় পৃথিবীর ইতিহাসই সংক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে, বলা যায়। এ স্থলে আমরা চতুর্যুগের নাম ও কালমান সম্বন্ধে বর্ণনা প্রথমে উদ্ধৃত করিব :—

"চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ঋষয়োঽব্রুবন্।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্॥
পূর্ব্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতা বিধীয়তে,
দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব যুগানি পরিকল্পয়ন্॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবৎসতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চতথাবিঠঃ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্ততে সহস্রাণি শতানি চ॥
ত্রেতাং ত্রীণি সহস্রাণি যুগসংখ্যাবিদোবিদুঃ।
তস্যাপি ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশঃ সন্ধ্যায়ামমঃ॥
দ্বে সহস্রে দ্বাপরেতু সন্ধ্যাংশৌচ চতুঃশতে।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যং কলৌ প্রকীর্ত্তিতম্॥
দ্বে শতো তথান্যেবৈ সংখ্যাতঞ্চ মনীষিভিঃ।
এষা দ্বাদশ সাহস্রী যুগ সংখ্যাতু সংজ্ঞিতা॥

—ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মাৎস্যে ১১৮ অধ্যায়।

"ঋষিগণ ভারতবর্ষে চারি যুগ বলিয়া বলেন। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ। কৃতযুগ পূর্ব্বে, তৎপর ত্রেতা, তৎপর দ্বাপর ও কলিযুগ পরে কল্পিত হইয়াছে। কৃতযুগ চারিসহস্র বৎসর কথিত হইয়া থাকে। ইহার সন্ধ্যা তিনশত এবং সন্ধ্যাংশও তিনশত। অপর তিন যুগের যুগমান যথাক্রমে একসহস্র করিয়া কম এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-একশত করিয়া কম। (এইরূপে) ত্রেতাযুগের তিনসহস্র বৎসর; ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইশত করিয়া চারিশত বৎসর। কলিযুগ দেবতাদিগের এক সহস্র বৎসর কথিত হইয়া থাকে। ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ একশত করিয়া দুইশত বৎসর। এই দ্বাদশসহস্র বৎসর যুগমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চারি যুগের পূর্ব্বোক্ত বারহাজার দৈব বৎসর বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনুষ্যের বৎসর হিসাবে চারিযুগের মান তেতাল্লিশ লক্ষ বিশহাজার বৎসর হয় (৪৩২০০০০); যথা শব্দকল্পদ্রুমে,—

"দেবানাং দ্বাদশ সহস্রবৎসরেণ চতুর্যুগম্ ভবতি।
মনুষ্যমানেন চতুর্যুগপরিমাণং বিংশতি
সহস্রাধিকত্রিচত্বারিংশল্লক্ষম্॥"

এই দ্বিবিধ যুগমানের প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট এই বোধ হয় যে, পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টি হইতে কালগণনা করিলে পৃথিবীর বয়স তেতাল্লিশ লক্ষ বিশহাজার বৎসর হয়;—আর পৃথিবীতে মনুষ্যবিকাশ ও মনুষ্যবাসের সময় হইতে কাল-গণনা করিলে, ইহার বয়স বারহাজার বৎসর হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের গণনায়ও পৃথিবীর বয়স অত্যধিক পরিমাণেই বেশী দেখা যায়। আবার, বাইবেলে মনুষ্য ইতিহাসের গণনা ধরিয়া ইহার বয়স চারিহাজার বৎসর মাত্র হয়।

যুগমানের বিবরণ আমরা প্রদান করিয়াছি—এক্ষণে যুগধর্ম্মেরও একটু বিবরণ এখানে প্রদান করিব। আমরা প্রথমে চারি যুগে ধর্ম্মের বিকাশ সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়া, পরে কৃত বা সত্যযুগের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ উদ্ধৃত করিব :—

"আদ্যে কৃতযুগে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ সনাতনঃ।
ত্রেতাযুগে ত্রিপাদঃ স্যাদ্বিপাদো দ্বাপরেস্থিতঃ॥
ত্রিপাদহীনাস্তিষ্যেতু সত্তামাত্রেণ তিষ্ঠতি॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কূর্ম্মপুরাণ
যুগধর্ম্ম কীর্ত্তনং নাম ২৬শ অধ্যায়।

"আদি কৃতযুগে সনাতন চতুষ্পাদ ধর্ম্মই বিদ্যমান ছিল,

অর্থাৎ পূর্ণ ধর্ম্মই বিদ্যমান ছিল। ত্রেতাযুগে তিনপাদ ধর্ম্ম ও দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল। কলিতে ত্রিপাদহীন অর্থাৎ নামমাত্র ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে।

"কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ সর্ব্বধর্ম্মরতা জনাঃ।
বর্ণাশ্রমাচাররতাস্তপোব্রত পরায়ণাঃ॥
নারায়ণার্চ্চনপরাঃ শোকব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।
সত্যোক্তিভাষিণঃ সর্ব্বে সদয়া দীর্ঘজীবিতাঃ॥
এবংবিধাঃ সত্যযুগে সর্ব্বেলোকা দ্বিজোত্তম।
রাজধর্ম্ম গ্রাহিণশ্চ ভূপালোজনপালিনঃ॥
অহো সত্যযুগস্যাস্তি কঃ সংখ্যাতুং গুণান্ক্ষমঃ।
অধর্ম্মাচরণং তত্রজনাঃ কেচিন্নকুর্ব্বতে॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে ২৫শ অধ্যায়।

"কৃতযুগে পূর্ণ ধর্ম্ম, লোকসকল সর্ব্বধর্ম্মরত। বর্ণাশ্রমাচারনিরত, তপোব্রতপরায়ণ, নারায়ণার্চ্চনাতৎপর, শোক-ব্যাধিবিরহিত, সত্যবাদী, দয়াশীল, দীর্ঘজীবী, ধনধান্যসম্পন্ন, হিংসাগর্ব্ববর্জ্জিত, পরোপকারী, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। হে দ্বিজবর, সত্যযুগে সকল লোকই এইপ্রকার। রাজগণ রাজধর্ম্মা-বলম্বী, প্রজাপালক। অহো! সত্যযুগের গুণসকল পরি-গণনা করিতে সমর্থ, এরূপ কে আছ? এই যুগে লোকসকল কেহই অধর্ম্মাচরণ করে না।"

"সত্য" যুগ এই নাম দ্বারাই এই যুগের মাহাত্ম্য বিশেষ-রূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে।

ত্রেতা ও দ্বাপর এই দুইটী নামের অর্থানুধাবন করিলে বিশেষ তথ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। 'ত্রেতা' শব্দটীর 'ত্রি' শব্দের সহিত ও 'দ্বাপর' শব্দটীর 'দ্বি' শব্দের সহিত যোগ দেখা যায়। ইহাতে ত্রেতা-যুগের কালমান তিনসহস্র বৎসর হইতে "ত্রেতা" নাম হইতে পারে; বা ত্রেতাযুগে ত্রিপাদধর্ম্ম এই অর্থেও এই নাম হইতে পারে। তদ্রূপ, দ্বাপর যুগের দ্বিসহস্র বৎসর কাল-মান হইতে যেমন দ্বাপর নাম হইতে পারে, তেমনি এই যুগে দ্বিপাদধর্ম্ম হইতেও এই নাম হইতে পারে।

যুগবর্ণনায় পৃথিবীর ইতিহাস সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের পঞ্জিকায় যুগবর্ণনা পাঠ করিলে, ইহার সত্যতা স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি হইবে। পঞ্জিকায় যেমন প্রত্যেক যুগারম্ভের মাস, পক্ষ, তিথি, বার ক্রমে কাল উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই প্রত্যেক যুগের মান, অবতার, রাজা প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহাই নহে; সঙ্গে-সঙ্গে ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ও বর্ণিত দেখা যায়। এমন কি, ভিন্ন-ভিন্ন যুগে কিরূপ ভিন্ন-ভিন্ন পাত্রের ব্যবহার হইত, তাহারও বর্ণনা পাওয়া যায়। এস্থলে পাত্র সম্বন্ধে বর্ণনাটী নিম্নে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য বোধ করি:—সত্যযুগে—"ব্যবহার পাত্রং সৌবর্ণং।" ত্রেতাযুগে "ব্যবহার্য্যং রৌপ্য-পাত্রং।" দ্বাপরযুগে "তাম্রপাত্রম্ ব্যবহার্য্যম্।" কলিযুগে "ব্যবহার পাত্র নির্ণয়ো নাস্তি।" সত্যযুগে স্বর্ণপাত্রের, ত্রেতাযুগে রৌপ্যপাত্রের এবং দ্বাপরযুগে তাম্রপাত্রের ব্যবহার ছিল; কিন্তু কলিযুগে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার্য্য পাত্র নাই। পাত্র সম্বন্ধে এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ এই যে, এই পাত্রের সঙ্গেই পাশ্চাত্যযুগের সবিশেষ সম্বন্ধ আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই। প্রাচ্যদিগের চতুর্যুগের ন্যায় আমরা পাশ্চাত্যদিগেরও চতুর্যুগই দেখিতে পাই। সেই চতুর্যুগের নাম যথাক্রমে, Golden Age, Silver Age, Bronze Age, Iron Age। অনুবাদ করিলে এই সমস্ত নাম এইরূপ হয়—'স্বর্ণযুগ' 'রৌপ্যযুগ' 'পিত্তলযুগ' ও 'লৌহযুগ'। পঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাত্রের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত পাশ্চাত্য যুগ-নাম সকলের তুলনা করিলে স্বর্ণ ও রৌপ্য নামের অবিকল সাদৃশ্যই দৃষ্ট হয়। প্রাচ্য তাম্র স্থলে পাশ্চাত্য 'পিত্তল' পাওয়া যায়। কিন্তু পিত্তল তাম্রেরই মিশ্রধাতু বলিয়া তাম্রের সহিত এক বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। ইংরেজীতে যুগবাচক যে Era শব্দ আছে, তাহার মূলগত অর্থ অভিধানে যেমন সংখ্যা পাওয়া যায়, তেমনই তাম্রও পাওয়া যায়। ইহাতে তাম্রের সহিত যুগের সম্বন্ধের বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে। "লৌহযুগ" নাম পূর্ব্বোক্ত ধাতুসকলের নামের অনুসারে ও অনুকরণেই যে হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

পাশ্চাত্য পূর্ব্বোল্লিখিত যুগ নাম সকলের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। প্রাচ্য যুগ-পাত্র সকলের নাম হইতে কিন্তু আমরা ইহাদের অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যাই প্রাপ্ত হই। যথা, যে সময়ে লোকেরা স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিত, তাহাই স্বর্ণ (সত্য) যুগ। যে সময়ে রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করিত তাহা রৌপ্য (ত্রেতা) যুগ। যে সময়ে পিত্তলপাত্র

ব্যবহার করিত,তাহা পিত্তল (দ্বাপর) যুগ—যে সময় লৌহ-পাত্রের ব্যবহার করে, তাহা লৌহ (কলি) যুগ। বৈদিক সময়ে যে স্বর্ণের বহুল-প্রচার ছিল, তাহা আমরা বেদের স্বর্ণ-ময় কবচ ("বক্ষঃ সুরুক্মাঃ") ঋগ্বেদ ৫।৫৪।১১ পিশঙ্গং দ্রাপিং ঋগ্বেদ ৪।৫৩।২ (হিরণ্ময়ং কবচং—সায়ন)। স্বর্ণময় শিরো-ভূষণ ("শিপ্রাঃ শীর্ষস্থ বিততাঃ হিরণ্ময়ী :—ঋগ্বেদ ৫।৫৪।১১) প্রভৃতি বর্ণনায় জানিতে পারি। এমন কি ঘোড়ার সাজ পর্য্যন্তও যে স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল, তাহাও—"অশ্বঃ ন হেম্যাবান্" (ঋগ্বেদ ৪।২।৮) সুবর্ণসজ্জাযুক্ত অশ্ব—বেদের এই বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে, পঞ্জিকার উক্ত যুগ-বর্ণনা যে অতি পুরাকালে পাশ্চাত্যদিগের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান হয়। বস্তুতঃ, "Golden Age" বলিলে যে ধর্ম্ম ও সুখের আদর্শকাল বুঝা যায়, তাহা আমাদের 'সত্যযুগ' নামের সহিত যোগের দ্বারাই মাত্র সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টীকৃত হইতে পারে।

প্রাচ্যের সহিত যুগ-কল্পনা সম্বন্ধে কিরূপে প্রতীচ্যের সংযোগ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাই আমাদের বিশেষভাবে বিচার্য্য হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচ্যের পঞ্জিকা পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে প্রচার দ্বারাই এই সংযোগ সংঘটিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে আমরা পঞ্জিকার দুইটী নাম বর্ত্তমান দেখিতে পাই। একটী Almanac ; অন্যটী Calendar। এই উভয় নামেরই মূল প্রাচ্যভাষার সহিত সংযুক্ত বলিয়াই আমাদের মনে হয়। Almanac শব্দের সহিত আরব্য ভাষার যোগ Al এই উপসর্গ দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। Calendar শব্দটীকেও আমরা পারস্য ভাষামূলক বলিয়াই মনে করি—কারণ দরবেশ বা সন্ন্যাসী-বাচক পারস্য ভাষার Calender শব্দ ইংরেজীতে প্রচলিত দেখা যায়। এই Calender শব্দবাচ্য সন্ন্যাসী দ্বারা পঞ্জিকা রচিত হইত বলিয়াই, পঞ্জিকাকারের Calender নামেরই সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা পঞ্জিকার নাম Calendar হইয়া থাকিবে।

পঞ্জিকার Almanac ও Calendar উভয় নামেরই সংস্কৃত ভাষাতেই প্রকৃত মূল বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হয়। Almanac শব্দটির Al অংশটি পৃথক্ করিলে যে manac অংশটি অবশিষ্ট থাকে, তাহা সংস্কৃত "মানক" শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মান শব্দের অর্থ গণনা। সুতরাং যাহার দ্বারা গণনা করা যায় তাহাই 'মানক'। পঞ্জিকাতে বিশেষভাবে কালেরই গণনা হয়, এবং এই গণনা সম্বন্ধে "মান" শব্দেরও বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে, "মানক" শব্দে পঞ্জিকা বুঝান সম্ভবপর বলিয়াই মনে হইতে পারে।

ইংরেজী অভিধানে Calendar শব্দটী গণনাবাচক লাটিন Calendarium শব্দ হইতে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এই Calendarium শব্দের মূল সংস্কৃত গণনার্থক 'কল' ধাতু বলিয়াই বোধ হয়। 'কাল' শব্দের সহিত কল্ ধাতুর যোগ আছে—পঞ্জিকা কালেরই গণনা বলিয়া Calendar শব্দের মূল 'কাল' শব্দও হইতে পারে।

কল্ ধাতু হইতে কলি শব্দও নিষ্পন্ন হইয়াছে। কলি শব্দ কলি-যুগেরই বাচক। এই কলি-যুগকেই আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের কাল গণনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মূল অবলম্বন রূপে স্বীকৃত হইতে দেখি ; যথা—

"The Kaliyoga is a fixed point of time, which has been employed by the leading peoples of the world from which to date their national history and mythology ; a clear understanding of which affords the only time guide to the "march of civilisation."—Indian Review, April 1613.—The Kaliyoga by the Hon'ble Alex. Del Mar.

"কলিযুগ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়। জাতীয় ইতিহাস ও পুরাণের কাল-গণনা আরম্ভ করিবার জন্য ইহাই পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় জাতিদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার পরিষ্কার উপলব্ধিই সভ্যতার অগ্রগতির প্রকৃত প্রদর্শকের কার্য্য করে।" পঞ্জিকাতে কলিযুগের গণনা। কলিযুগেরই সহিত সম্পর্ক হইতেও, 'কলি' নামানুসারে পঞ্জিকার Calendar নাম হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

প্রকৃত-পক্ষে কলিযুগ হইতেই যে ঐতিহাসিক কাল-গণনা প্রথম আরম্ভ হয়, তাহার প্রমাণ ভিন্ন-ভিন্ন যুগ-নামেই পাওয়া যায় বলিয়া আমরা মনে করি। গণনায় কলিযুগ প্রথম ধরিলে "দ্বাপর" যুগ দ্বিতীয় হয়। দ্বাপর নামে যে 'দ্বি' শব্দের যোগ পাওয়া যায়, তাহা এই দ্বিতীয় অর্থই জ্ঞাপন

করিতেছে বলা যায়। "ত্রেতা" শব্দে যে 'ত্রি' শব্দের যোগ দেখা যায়, তাহাও "তৃতীয়" অর্থই জ্ঞাপন করে। সুতরাং 'ত্রেতা' শব্দে তৃতীয় যুগ বুঝায়। ইহা হইতে কৃত বা সত্যযুগ চতুর্থ যুগ হয়। প্রকৃত কথা এই বলিয়াই আমাদের মনে হয় যে, কলিতেই প্রথম যুগের দ্বারা কাল বিভাগের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, তৎপূর্ব্বে যুগের কোন কল্পনাই ছিল না। অতীত ইতিহাসের কাল-বিভাগ যেমন বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা হইতেছে, পুরাকালের যুগ-বিভাগও তেমনই কলিযুগের শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা হইয়াছিল। এই যুগ-গণনা শাস্ত্রকারগণ বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় অনিশ্চিত অতীত হইতে আরম্ভ না করিয়া নিশ্চিত বর্ত্তমান অর্থাৎ কলি হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতেই গণনায় কলিযুগ প্রথম হইয়াছিল। কলিযুগের উৎপত্তি সময়কে মধ্যবিন্দু ধরিয়াই শাস্ত্রকারগণ ইহার পূর্ব্বে ও পরে যুগ সকলের সন্নিবেশ করিয়াছেন।

পঞ্জিকা-রচনার সময় যে যুগ-বিভাগ প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পঞ্জিকার হর-পার্ব্বতী-সংবাদ-রূপ ভূমিকাতেই পাওয়া যায়। হর-পার্ব্বতী তান্ত্রিক দেবতা। কলিযুগে তান্ত্রিক ধর্ম্মেরই প্রাধান্য। তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময়েই পঞ্জিকা রচিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। হর-পার্ব্বতী কৈলাস-শিখরে আসীন হইয়া পঞ্জিকার বিষয় সকল সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন—ইহাই হর-পার্ব্বতী-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্জিকার সহিত কৈলাস-পর্ব্বতের যোগ আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এই কৈলাস-পর্ব্বতের নাম হইতেই যে গ্রীক্‌দিগের স্বর্গের 'কোয়লন্' (Koilon) ও রোমান্‌দিগের স্বর্গের 'কোইলাম' নাম কল্পিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এড্‌ওয়ার্ড পোকক্ (Edward Pococke), তদীয় 'গ্রীসে ভারত' (India in Greece) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"Edward Pococke locates the source of the Indus on Kailasa (31 N, 80 E) the highest mountain in the world, whose name gave Koilon or Heaven to the Greeks and Coelum to the Romans." Indian Review—August 1913. The Kaliyoga, by the Hon'ble Alex. Del Mar.

পঞ্জিকার সহিত কৈলাসপর্ব্বতের যে যোগ আমরা দেখিয়াছি, কৈলাস-পর্ব্বতের রোমান কোইলাম (Coelum) নামের সহিত যোগ হইতেই রোমানদিগের পঞ্জিকার কেলেণ্ডার নাম হওয়াও অসম্ভাবিত বোধ হয় না। ফলতঃ, পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৈইলি (Bailly) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গ্রীক্‌গণ তাঁহাদের জ্যোতিষ চেল্ডিয়া ও পারস্য যোগে ভারতবর্ষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন—

"Bailly shows that the Greeks got their Astronomy from India through Chaldea and Persia." Ibid. গ্রীকগণ যখন ভারত হইতে জ্যোতিষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন যে পঞ্জিকাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। গ্রীক্‌দিগের হইতে যখন রোমানরা সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন যে তাঁহারা ভারতীয় জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার জ্ঞানও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সহজবোধ্য।

পাশ্চাত্যগণ ইজিপ্ট হইতে যে বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ইজিপ্টও, চেল্ডিয়া এবং পারস্য যোগেই ভারতীয় জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

"It is admitted by Breasted, Burrows and other recent writers on Egypt, that the antiquity of civilisation in that country has been grossly exaggerated and they are gradually conforming to Bailly's Chronology, which lays it down without reserve that the Egyptians got their earlier dates from the Persians or Chaldeans and the latter from the Indians." Ibid.

চেল্ডিয়া ও বেবিলনিয়া যে জ্যোতিষের চান্দ্র-গণনা ও কলিকালের দ্বারা যুগ-গণনাই প্রধানভাবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হন, এবং পরে তাহা ইজিপ্টকে শিক্ষা প্রদান করেন, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Bailly তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। যে সময় বৃহস্পতি গ্রহরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং বৎসর দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হয়, সেই সময়ই তিনি পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষিক জ্ঞানের আদান-প্রদানের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সময় সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫শ শতাব্দী ও চেল্ডিয়ার ১২শ শতাব্দী বুঝাইয়া থাকে। এই সময় ফরাসী পণ্ডিত লেনরমেণ্ট (Fr. Lenormant) কর্ত্তৃক তদীয় "ইতিহাসের প্রারম্ভ" (Beginnings of History) নামক গ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে। দ্বাদশ মাসের নাম এই সময়ের উর্দ্ধে যায় বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না।

"Bailly (p. 278) proves that the Chaldeans and Babylonians got their Astronomy, which appears to have consisted mainly of lunar observations with the Kaliyoga as a starting point and the Metonic Cycle, from India and to have imparted it to the Egyptians. He dates the knowledge after the discovery of the planetary character of the Brihaspati and division of the year into 12 months which probably means the 15th Century B. C. in India and the 12th Century B. C. in Chaldea—dates which are confirmed by Fe. Lenormant in his "Beginnings of History" p. 270 He does not believe that the names of the 12 months ascend beyond this period. Indian Review. April 1913. The Kaliyoga.

পঞ্জিকায় মনু যুগাধিপতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মনু ঈজিপ্টে মিনিস (Menis) এবং ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে Minos, Menu, Mene প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈজিপ্টের মিনিসকে আমরা মনুরই ন্যায় কলিযুগের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই।

"The average date now accorded to Menes, the Egyptian Brahma as estimated severally by Lepsins, Breasted, Burrow, Bunsen, Poole and Wilkinson, is 3144 B. C., which is sufficiently close to the Kaliyoga to suggest it as the basis of the elements of these various numbers. The name of Menes and Manu alone should be enough; for he is the legendary progenitor of nearly every civilised people of the Mediterranean, such is Minos, Menu, Mene." Ibid.

পঞ্জিকাতে আমরা যুগসমস্তের অপেক্ষাও বিশালতর 'কল্প' নামক কাল-বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান যুগসকল 'শ্বেতবরাহকল্পে'র অন্তর্গত। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও আমরা কল্পের অনুরূপ Cycle (চক্র) নামক অধিকতর ব্যাপক কালবিভাগ দেখিতে পাই।

আমরা যে সত্যযুগকে পূর্ণ ধর্ম্ম ও সুখের যুগরূপে অঙ্কিত দেখিয়াছি—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের Millennium নামক ধর্ম্মযুগের কল্পনায় আমরা তাহারই চিত্র দেখিতে পাই। আমাদের যুগসকল যেমন সহস্র বৎসরের দ্বারা আমরা গণিত হইতে দেখিয়াছি, Millenniumও তদ্রূপ সহস্র বৎসরেরই বাচক। কল্পের অন্তর্গত "মন্বন্তর" নামক কালবিভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কাল ভিন্ন-ভিন্ন মনু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়াই ইহার মন্বন্তর আখ্যা হইয়াছে। এক মনুর কাল অতীত হইলে অপর মনু আবির্ভূত হইয়া রাজত্ব করিবেন এবং আবার সত্যযুগ হইতেই তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইবে—ইহাই মন্বন্তরের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। এই মন্বন্তরেরই ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের Millennium বা ধর্ম্মরাজ্যান্তে পুনর্ব্বার যিশুখ্রীষ্ট রাজত্বে বরিত হইয়াই আরব্ধ হইবে—খ্রীষ্টানুচরদিগের এইরূপ বিশ্বাস। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, Millennium ও যিশুখ্রীষ্টের অধিষ্ঠানের কল্পনা মন্বন্তরীয় কল্পনা হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপে পাশ্চাত্য যুগ-কল্পনা যে প্রাচ্য-যুগকল্পনারই প্রতিবিম্ব, তাহা আমরা প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা হইতে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি।

প্রাকৃত-দর্শনের ইতিহাস

[অধ্যাপক শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্-এস্‌সি]

প্রাকৃত-দর্শনের একখানি ইতিহাস লিখিব—এই ইচ্ছা অনেক দিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইতিহাস লিখিতে হইলে যে সকল তথ্যের প্রয়োজন, সে সকল অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে যতদূর সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে উহার আরম্ভ করা যাইতে পারে। আশা আছে, ক্রমশঃ সংগ্রহ শেষ করিয়া উহার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিব।

ইহার পূর্ব্বে দুই একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ইঁহারা একদেশদর্শী। ইঁহাদের ইতিহাসের প্রথমভাগে গ্রীক ও রোমকদিগের কথাই লিপিবদ্ধ আছে। ভারতবর্ষের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই, অথবা দৃষ্টি করিবার সুবিধা পান নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রহস্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়াই বোধ হয় ইঁহাদের চেষ্টা এই দিকে ধাবিত হয় নাই।

প্রাকৃত-দর্শনের মূল সূত্রগুলি (Fundamental doctrines) ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। উদাহরণ স্বরূপে বলি—কিছু-না হইতে কখনও কিছু আসিতে পারে না—এই মূলসূত্রটিকে লাটিন ভাষায় Ex nihil, nihil fit বলে। প্রাকৃত-দর্শনের এই মূল সূত্রটিকে গ্রীক পণ্ডিত থেল্‌স্ (Thales) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপরিষৎ হইতে য়ুরোপ গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে থেল্‌সের কাল ৬৪০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে ৫৪৬খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত। ইহার বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে এই মতবাদের উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সাংখ্য-দর্শনকার ঋষি কপিল সর্ব্বপ্রথম এই সত্য প্রচার করেন। এই সত্য প্রথম প্রচারের সম্মান কপিলের প্রাপ্য—থেল্‌সের নহে। কপিল যে থেল্‌সের বহুকাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রমাণ করিব।

আর এক কথা। য়ুরোপের পক্ষে শক্তির নিত্যতা-বাদ (Doctrine of Conservation of Energy) সেদিনকার। যতদিন না টিণ্ডাল (Tyndall) বলিয়াছিলেন যে, তাপ গতিরই একপ্রকার রূপ, ততদিন শক্তির নিত্যতাবাদ য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই মতবাদের উপরই প্রাকৃত-দর্শন প্রতিষ্ঠিত। উহাকে প্রাকৃত-দর্শনের ভিত্তি বলা হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ইহার সর্ব্বপ্রথম উক্তি পতঞ্জলির সাংখ্যে বা সেশ্বর-সাংখ্যে। প্রাকৃতদর্শনের ভাবী ইতিহাস ঋষি পতঞ্জলির ঋণ স্বীকার করিবে। প্রাকৃত-দর্শনের আরও অনেক মতবাদ (principle) ভারতীয় দর্শনসমূহে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। অতএব প্রাকৃত-দর্শনের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে ষড়্‌দর্শনের কালনির্ণয়ের প্রয়োজন।

ভারতের প্রাচীন কালের ইতিহাস এখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইহা লইয়া ভারতীয় ও য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে অনেক মতভেদ হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। অনেক বিষয় মোটামুটি ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং অনেক বিষয়ের অদ্যাপি মীমাংসা হয় নাই। আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকল বিষয়ের কিয়দংশ সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের এই আলোচনা-লব্ধ কাল-নির্ণয়ের বিরুদ্ধে যদি কেহ বলবত্তর প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন, তবে তিনি যে-যে অংশের পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিবেন, তাহা অঙ্গীকার করিব।

সর্ব্বাগ্রে বেদান্তদর্শনের কাল-নিরূপণ আবশ্যক। এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে, অন্যান্য দর্শনের কালনিরূপণ সহজ হইবে।

এই বিষয়ে আমরা প্রথমতঃ একটি ঐতিহ্যের (tradition) সত্যতা স্বীকার করিব। সেটি এই যে বেদান্তকার—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস। সমস্ত পুরাণে, এবং ব্যাকরণাদিতেও এই কথা দেখিতে পাই। গ্রন্থকারগণ হঠাৎ কোনও এক সময়ে ভুলক্রমে উদোর পিণ্ডি বুধো ঘাড়ে চাপাইলেন—এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কেহ আপত্তি করেন নাই, এমন নহে। আপত্তিকারী—অধ্যাপক ম্যুলার (Professor Max Muller)। ম্যুলারের মতে সূত্রসকল ৬০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে ২০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের মধ্যে রচিত; কিন্তু

পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার বিশিষ্ট পাণ্ডিত্য-সহকারে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। গোল্ড্‌ষ্টুকার বলিয়াছেন যে, অধ্যাপক মুলার সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক কাল সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্তই তাঁহার স্বকপোলকল্পনা-প্রসূত। বিস্তৃত বিবরণ গোল্ড্‌ষ্টুকারের পাণিনি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। পূজনীয় আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কথায় বলিতে গেলে, মুলার সংস্কৃত ভাষার কাল 'রঙ্গীন কাচের ভিতর দিয়া' দেখিতেন। বেদান্তকার দ্বৈপায়ন মহাভারত-যুদ্ধের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। মহাভারতের কাল নির্ণীত হইলে বেদান্ত দর্শনের কালও নিরূপিত হইবে। সমস্ত পুরাণের মতে ইনিই বেদ-সংকলন ও বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের প্রাচীন কাল-গণনা কলিযুগের আরম্ভ হইতেই হইয়া থাকে। ৪৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯ মার্চ্চ শুক্রবারে, উজ্জয়িনীনগরে সূর্য্যোদয়ের ২২ ঘণ্টা পরে বাসন্তী ক্রান্তিপাত (Vernal Equinox) ঘটে। ঐ মুহূর্ত্ত হইতে ছত্রিশ শত ৩৬০০ নাক্ষত্রিক বৎসর (Sidereal years) পূর্ব্বে কলিযুগ আরব্ধ হইয়াছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা আর্য্যভট্টের গণনা। অধ্যাপক ফ্লীট্ (John Faithful Fleet) এই সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ফ্লীট্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ৩১০২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তি। আর্য্যভট্টের গণনাও উহাতে গিয়া দাঁড়ায়। এক্ষণে এইটি মনে রাখিলে পৌরাণিক কালনির্দ্ধারণ বুঝা যাইবে।

ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পরমুহূর্ত্ত হইতেই কলিযুগ আরব্ধ হয়। অর্থাৎ ভাগবতের মতে ৩১০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ মহাভারতের কাল। বোম্বাই প্রদেশের ঐতিহাসিক পণ্ডিত বৈদ্য মহাশয় (C. V. Vaidya) এই মতাবলম্বী। ভাগবতকার অপর একস্থানে বলিতেছেন

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রং চ শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

অর্থাৎ অর্জ্জুনপৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ১৫১০ বৎসর ব্যবধান। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মহাপদ্ম নন্দ ৪১২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মগধের রাজা হন। স্কন্দপুরাণেও ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে :—

"ততোহপি ত্রিসহস্রেষু দশাধিক শতত্রয়ে।
ভবিষ্যন্নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি॥"

অর্থাৎ ৩০০০—৩১০=২৬৯০ কল্যব্দে মহাপদ্ম নন্দের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ২৬৯০ কল্যব্দ হইতেছে ৩১০২—২৬৯০=৪১২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। অতএব ভাগবতকারের মতে মহাভারতের কাল ৪১২+১৫১০=১৯২২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইয়া পড়ে। ফলে এই দাঁড়াইল যে, ভাগবতকার একস্থানে বলিতেছেন যে ৩১০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ মহাভারতের কাল; আবার অপরস্থানে বলিতেছেন যে ১৯২২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ মহাভারতের কাল। কোন্ কথা সত্য?

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহমিহির-প্রণীত বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, যখন সপ্তর্ষিনক্ষত্রপুঞ্জ (Great Bear) মঘা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিতেন। বরাহমিহির জ্যোতিষ-গণনা করিয়া দেখেন যে, এই ব্যাপার ২৫২৬ শক-পূর্ব্বাব্দে বা ২৪৪৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল। অতএব বরাহমিহিরের মতে ২৪৪৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ মহাভারতের কাল।

কাশ্মীর দেশের ইতিহাসের নাম রাজতরঙ্গিণী। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লণ লিখিয়াছেন যে, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে পাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ রাজতরঙ্গিণীর মতে ৩১০২ - ৬৫৩ = ২৪৪৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ১০১৫ বৎসর ব্যবধান। বিষ্ণুপুরাণের বচনটি এই :—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪১২+১০১৫=১৪২৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণেরও এই মত। মৎস্যপুরাণের মতে ঐ ব্যবধান ১০৫০ বৎসর। বিষ্ণুপুরাণে আর একটি বচন আছে; তাহা হইতে মহাভারতের কাল-নির্ণয় করা যাইতে পারে। সেটি এই :—

"সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥"
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥

এই বচনের তাৎপর্য্য হইতে গণনা করিতে গিয়া বরাহমিহির সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজতরঙ্গিণীকারও বরাহমিহিরের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানানন্দ স্বামী তৎসম্পাদিত সূর্য্যসিদ্ধান্তে বলিতেছেন যে, ১৫৯০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে অয়নান্তবৃত্ত (The great circle passing through the Solstices) মঘানক্ষত্রপুঞ্জের প্রাথমিক বিন্দুতে ছিল; এবং ঐ সময়ে অয়নান্তবৃত্ত ক্রতু ও পুলহ নক্ষত্রের মধ্য দিয়া গিয়াছিল বলিয়া উহাকে ঋষিরেখা (Line of the Rishis) বলিত। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"সপ্তর্ষি ও মঘা সম্পূর্ণ বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ; সুতরাং একটির আর একটিতে অবস্থান অসম্ভব। যেমন ভারতবর্ষের ইংল্যাণ্ডে অবস্থান, অথবা ইংল্যাণ্ডের ভারতে অবস্থান অসম্ভব, তেমনই সপ্তর্ষির মঘায় অবস্থান অসম্ভব। তবে কি পুরাণকার গাঁজা খাইয়া এই সব কথা লিখিয়াছিলেন? তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে তা নয়; তবে আমরা উহার অর্থ বুঝিতে পারি না।"

এক্ষণে বিজ্ঞানানন্দ স্বামীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, একপ্রকার সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। ইহা গ্রহণ করিতে আপত্তি করার হেতু নাই, যেহেতু অয়নান্তবৃত্ত যে ঐ সময়ে ক্রতু ও পুলহের মধ্য দিয়া গিয়াছিল, ইহা প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ (direct observation) দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। গণনায় ১৫৯০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ মহাভারতের কাল। সম্ভবতঃ শেষোক্ত গণনায় বায়ুবলনের (Atmospheric Refraction) নিমিত্ত সংশোধন (correction) প্রয়োগ করিলে আরও অনেক বৎসর কমিয়া আসিবে। বাড়িয়া যাইবে না, কারণ অয়নান্তবৃত্ত ক্রমশঃ পশ্চাতে অপসৃত হইতেছে। প্রাচীন ঋষিগণ বায়ুবলনের বিষয় অবগত ছিলেন না। য়ুরোপে নিউটন, কেপ্‌লার প্রভৃতি কেহই বায়ুবলনের কথা জানিতেন না। বৃদ্ধ বয়সে কেপ্‌লার সর্ব্বপ্রথমে এই বায়ুবলনের কথা বলেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বিষ্ণুপুরাণোক্ত মহাভারতের কাল উপর্য্যুক্ত বচনের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

এশিয়া মহাদেশীয় গবেষণার (Asiatic Researches) দ্বিতীয় খণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-প্রত্নতত্ত্ববিৎ উইল্‌ফোর্ড বলিতেছেন যে, সুবিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা ডেভিস্ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, পরাশর (দ্বৈপায়নের পিতা) ১৩৯১ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইহা তিনি (ডেভিস্) ক্রান্তিপাতবৃত্তের (Equinoctial colure) ও অয়নান্তবৃত্তের (Solstitial colure) অবস্থান পর্য্যবেক্ষণে স্থির করিয়াছেন। অতএব উইলফোর্ডের গণনার সহিত বিষ্ণুপুরাণকারের মতের উত্তম সঙ্গতি হইতেছে; কারণ, এই পরাশরের পুত্রই বেদান্তকার বাদরায়ণ।

এশিয়া মহাদেশীয় গবেষণার অষ্টমখণ্ডের ৪৯৩ পৃষ্ঠায় সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-প্রত্নতত্ত্ববিৎ কোল্‌ব্রুক্ (Sir Thomas Colebrooke) লিখিতেছেন যে, তিনি (কোল্‌ব্রুক্) বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে একটি কথা পাইয়াছেন, যাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, খৃষ্টের জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ সংকলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল। কোল্‌ব্রুক্ লিখিতেছেন :

"Hence it is clear that Dhanishtha and Aslesha are the constellations meant; and that when this Hindu Calendar was regulated the Solstitial points were reckoned to be at the beginning of one, and in the middle of the other; and such was the situation of these cardinal points in the fourteenth century before the Christian era. I formerly (Asiatic Researches, VII, P. 283) had occasion to show from another passage of the Vedas that the correspondence of seasons with months, as there stated, and as also suggested from the passage now quoted from the Vedanga Jyotish, agrees with such a situation of the cardinal points."

উদ্ধৃতাংশের ভাবার্থ এই :—

"অতএব বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ হইতে উদ্ধৃতাংশ হইতে আমি (কোল্‌ব্রুক্) স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, ধনিষ্ঠা ও অশ্লেষা নামক নক্ষত্রপুঞ্জদ্বয়কে বুঝাইতেছে; এবং যখন এই হিন্দু-পঞ্জী (বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ) শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে অয়নান্তবিন্দুদ্বয়ের একটি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রথমে, ও অপরটি অশ্লেষার মধ্যে অবস্থিত ছিল; এবং এই প্রকার অবস্থান খৃষ্টের জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ঘটিয়া-

ছিল। এশিয়া মহাদেশীয় গবেষণার সপ্তম খণ্ডের ২৮৩ পৃষ্ঠায় বেদ হইতে অন্য একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, সেই অংশে ষড়ঋতুর সহিত দ্বাদশমাসের যেরূপ সামঞ্জস্য লিপিবদ্ধ আছে, সেরূপ সামঞ্জস্য ১৪০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের সমসাময়িক কাল ব্যতিরেকে অন্য কোনও সময়েই ঘটিতে পারে না। সুতরাং বেদ হইতে উদ্ধৃতাংশের সহিত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ হইতে উদ্ধৃতাংশের উত্তম সঙ্গতি হইতেছে।"

বাদরায়ণ যে বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, এ কথা সকল পুরাণেই আছে। বস্তুতঃ ইহা একরূপ নিত্যনৈমিত্তিক কথা (Proverbial)। এই নিমিত্ত তাঁহাকে বেদব্যাস (Compiler of the Vedas) বলা হয়। এক্ষণে কোল্‌ব্রুকের কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই শৃঙ্খলাকার স্বয়ং বাদরায়ণ।

এই প্রসঙ্গে জর্ম্মণ-পণ্ডিত বেবর বলিতেছেন যে, তিনি (বেবর) কোল্‌ব্রুকের জ্যোতিষ-গণনা অন্য একজন যোগ্য জ্যোতির্ব্বিদকে আর একবার না দেখাইয়া কোনও মত প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত লাসেন্ বলিতেছেন যে, হিন্দুর প্রাচীন জ্যোতিষ সম্বন্ধে কোল্‌ব্রুকের মতই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। লাসেন্ বলিতেছেন

"He (Colebrooke) was the profoundest judge in matters of Hindu Astronomy."

[Translated from Lassen's Indische Alterth]

সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত গোল্ড্‌ষ্ট্যুকার বলেন :—

"Colebrooke's writings prove that he is a type of accuracy and conscientiousness—an author in whom even unguarded expressions are of the rarest kind, much more so errors or hasty conclusions drawn from erroneous facts. He was not only a distinguished Sanskritist, but also an excellent astronomer."

অর্থাৎ "কোল্‌ব্রুকের লেখায় সপ্রমাণ হয় যে, তিনি যাথার্থবাদী ও শুদ্ধমতির একজন আদর্শ ছিলেন। তিনি কোথাও ভ্রান্তিমূলক বা অসতর্কতাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তিনি কেবল প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, পরন্তু অতি উচ্চশ্রেণীর জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন।"

ইতিহাসলেখক উইল্‌সন্ ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন যে, ভারত-যুদ্ধ খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বা উহার নিকটবর্ত্তী কালে সংঘটিত হইয়াছিল। দ্বৈপায়ন ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব ইঁহাদের দ্বারাও বিষ্ণুপুরাণের মত সমর্থিত হইতেছে।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র—মহাভারতের সময়ে মাঘে উত্তরায়ণ হইত—এই ঘটনা হইতে বিষ্ণুপুরাণের মত সমর্থন করিয়াছেন।

'রাজাবলী' নামক সিংহলের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে গৌতমবুদ্ধের গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিবার ১৮৪৪ আঠার শত চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সিংহলে রাম-রাবণের যুদ্ধ ঘটে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র অযোধ্যারাজবংশের ষট্‌পঞ্চাশত্তম নৃপতি ; এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অযোধ্যারাজবংশের ষড়শীতিতম নৃপতি বৃহদ্বল অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হন। মহাভারতে এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ফলতঃ বৃহদ্বল রামচন্দ্র হইতে ত্রিশ পুরুষ পরবর্ত্তী। অন্যান্য পুরাণেও এই মত সমর্থিত হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বুদ্ধ শাক্যসিংহ কবে সংসার ত্যাগ করেন ? পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, বুদ্ধের মৃত্যু ৫৪৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ঘটে।* কিন্তু 'মহাবংশ' নামক ব্রহ্মদেশের ইতিহাস, সিংহলে প্রচলিত সংবৎ, সিংহলের ঐতিহ্য (tradition), অধ্যাপক মূলারের মত, পণ্ডিত গোল্ড্‌ষ্ট্যুকারের মত, ইতিহাসবেত্তা রাইজ ডেভিডের মত প্রভৃতি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি যে, ৪৭৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গৌতমবুদ্ধ কলেবর ত্যাগ করেন। তিনি ২৯ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার ৮০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। অতএব তিনি ৪৭৭+৫১=৫২৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে সংসার ত্যাগ করেন। ইহা অধ্যাপক মূলার ও পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের মত। পরিশেষে ইহা মহারাজ অশোকের শিলালিপি হইতে সমর্থিত হইয়াছে (?)। অতএব রামায়ণ-যুদ্ধ ৫২৮+১৮৪৪=২৩৭২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ঘটে। বরোদারাজ্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীবামন সোমনারায়ণ দালাল এই মত অবলম্বন করিয়াছেন।

দুই কারণে এই মতবাদটি অত্যন্ত সম্ভব ; প্রথম কারণ এই যে, যে ব্যাপার সিংহলে ঘটিয়াছিল, সিংহলের

* ইহা জর্ম্মণ পণ্ডিত লাসেনের মত।

ইতিহাসই সেই ঘটনা সম্বন্ধে প্রামাণিক; দ্বিতীয় কারণ এই রাজাবলীর এই কালনির্দ্দেশ মোটামুটি সংখ্যায় (Round numbers) নহে; সম্ভবতঃ ইতিহাসলেখক অন্যান্য প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া যথার্থ সময়টি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালবশে ঐ সকল প্রাচীন পুস্তক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মহাভারতের কালের সহিত রামায়ণের কালের প্রভেদ ২৩৭২—১৪২৭=৯৪৫ বৎসর। ত্রিশ পুরুষ যাইতে ৯৪৫ বৎসর গত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগই যে মহাভারতের কাল, তাহা ইহা হইতেও সূচিত হয়।

পণ্ডিত গোল্ড্ষ্টুকার পাণিনির ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পাণিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর লোক। গোল্ড্ষ্টুকার যতদূর গিয়াছেন, ততদূর তাঁহার উক্তি যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু এই পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন যে, যেহেতু 'বেদান্ত' ও 'বেদান্তিনঃ' শব্দ পাণিনিতে নাই, অতএব পাণিনির পূর্ব্বে বেদান্তকার বাদরায়ণ জন্মগ্রহণ করেন নাই, বা পাণিনির পূর্ব্বে বেদান্তদর্শনের অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ গোল্ড্ষ্টুকারের মতে বাদরায়ণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী; ইহা পাণিনির ব্যাকরণ হইতেই প্রমাণ হয়।

পুরাণপাঠক ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, বাদরায়ণ পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার আর একটি নাম পারাশর্য্য। বেদান্তের আর একটি নাম—পারাশর্য্যবচঃ সরোজ মমলম্। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে 'পারাশর্য্য' এই পদ ব্যবহার করিয়াছেন। পাণিনি আরও বলিতেছেন যে, গ্রন্থকার পারাশর্য্য ভিক্ষুসূত্র নামক কতকগুলি সূত্র লিখিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বে, ৮৪২ খৃষ্টাব্দে, * বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ভিক্ষুসূত্র, বেদান্তসূত্রেরই অপর নাম; এবং পারাশর্য্যমতাবলম্বীদিগকে "পারাশরিণঃ" কহিয়া থাকে। এমনও হইতে পারে যে, বেদান্তসূত্রের পূর্ব্বতন নাম 'ভিক্ষুসূত্র' ছিল।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুলার বলিতেছেন "We Should remember that Vyasa is called Parasarya, the son of Parasar and Satyavati, and that Panini mentions one Parasarya as the author of the Bhikshu-sutras, while Vachaspati Misra declares that the Bhikshu-sutras are the same as the Vedanta-sutras, and that followers of Parasarya are called Parasarins".

[Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy, page 117.]

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, পণ্ডিত গোল্ড্ষ্টুকার সকল দিক্ উত্তমরূপে দেখিয়া উঠিতে পারেন নাই। যদি গোল্ড্ষ্টুকারের মতে পাণিনির আবির্ভাবকাল খৃষ্ট-পূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও পারাশর্য্য বাদরায়ণ যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা উপযুক্ত তর্কে সিদ্ধ হইতে পারে।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, বাদরায়ণ ও কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন একই ব্যক্তি; এবং এই ব্যক্তি খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

* 'বঙ্গবন্ধুবৎসরে'—ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১৭)

দেখিতে-দেখিতে প্রায় আড়াই বৎসর অতীত হইয়া গেল। মধুসূদন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। নানা প্রতিকূল ঘটনার পারম্পর্য্যে তাঁহার ব্যবসায়ে পূর্ব্বার্জ্জিত পসার-প্রতিপত্তি দিন-দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। অর্থাগম মন্দীভূত হইয়া আসিলেও, তিনি আমীরি চালচলন, পদমর্য্যাদা ও মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত নানা স্থান হইতে বহু ঋণ করিয়াও, নিজের ও

য়ুরোপ-প্রবাসী পরিবারবর্গের ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। এত দিন তিনি উভয় দিক রক্ষা করিয়া চালাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে য়ুরোপে তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট যথাসময়ে অর্থ প্রেরিত না হওয়াতে, তাঁহারা বিশেষ কষ্টে পতিত হন। এ দিকে মধুসূদন চিন্তায় অধীর হইয়া, তাঁহার নিকট যাহা কিছু ছিল, সমস্তই পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দীর্ঘ-প্রবাস-বিধুরা বিরহিণী বহু কাল অদর্শনের পর স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত বিষম উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছেন। সেখানকার দেনা-পাওনা পরিশোধ করিয়া তাঁহার পত্নীর হস্তে যে টাকা অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে তাঁহাদের সমুদ্রযাত্রার পাথেয় সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া, প্রখর বুদ্ধিমতী রমণী আর এক দণ্ডও অর্থের প্রতীক্ষায় য়ুরোপে অবস্থান করা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিলেন না। নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার কিছু কমে যাহাতে জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার ও সন্তানদ্বয়ের ভারত-প্রত্যাগমনের সুবিধা করিয়া দেন, এই মর্ম্মে তিনি ফরাসী ভাষায় কোন ফরাসী বন্ধুর দ্বারা জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধীয় দুইখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মূল ফরাসী পত্র দুইখানির ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ কৃত ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Sir, I would solicit your influence with the Steam Navigation Company to get me a reduction in the passage-money, that I may set out on board the first ship bound for Calcutta.

I will leave France with my two young children; the elder of whom is nine years old. I have no longer any money to maintain them. A longer sojourn in France would do me no good; but make my condition worse, which is already very painful.

By collecting all the assets that I possess, I shall have at my disposal from 900 to 1000 Francs. I beg that the Managing Company will be pleased to remain satisfied with that sum. I again commend myself to your kind protection.

4, Maurepas Street,
Versailles,
13th March, 1869.

Yours faithfully
Henrietta Dutt.

জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ উপরিউক্ত মুদ্রা ব্যতীত আরও কতক পরিমাণে অর্থ চাহিয়াছিলেন। হেন্‌রিয়েটা সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উদার ফরাসী বন্ধুকে লিখিতেছেন;—

Sir,

Permit me to thank you for the kindness with which you were good enough to respond to the request that I had made for myself and my children.

I have succeeded in procuring the money necessary for our departure; and thanks to the reduction kindly made by the Managing Navigation Company, we shall be able to start on board the first ship in the month of April.

I remain, Sir,
with gratitude and the highest respect
your most obedient servant,
Henrietta Dutt.

Versailles,
30th March, 1869

এইরূপে মধুসূদনের পত্নী হেন্‌রিয়েটা সন্তান দুইটিকে লইয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রথমে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। তাঁহাদের আগমনের অল্প দিন পরেই মধুসূদন হোটেল পরিত্যাগ করিয়া, ৬নং লাউডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। এই উদ্যান-পরিবেষ্টিত সুরম্য দ্বিতল ভবনে মধুসূদন প্রায় তিন বৎসর কাল বসবাস করিয়াছিলেন। পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই বাটীর ভাড়া তখন মাসিক ৪০০৲ টাকা ছিল; এবং এই বাটীতে মধুসূদন ধনাঢ্য আমীর-ওমরাহের

ন্যায় বাস করিতেন। ইহাতে যে কত ব্যয় হইয়াছিল, কত ঋণ হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এই বাটীতে অবস্থানের সময় তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সূর্য্য তাঁহার ভাগ্যাকাশের মধ্যপথে উপনীত হইতে না হইতেই, অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল!

পাঠক! মাইকেলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়, চিত্রের পর চিত্র প্রদর্শনের ন্যায়, আমরা দেখাইব। এরূপ ঘটনাবহুল, ক্ষণস্থায়ী, তড়িতোজ্জ্বল দৃশ্যাবলী অপর কোন সাহিত্যিকের জীবনে ঘটিয়াছে কি না, আমরা অবগত নহি। আমরা বহু সাহিত্যিকের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছি; কিন্তু এ হেন বিচিত্র ঘটনাবলীর সমাবেশ অপর কোন সাহিত্যিকের জীবনে দেখি নাই। হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে, তাসো, অভিদ্ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের এবং আধুনিক ইংলণ্ডীয় মহাকবি লর্ড বায়রণের জীবন নাটকের শেষাঙ্ক যে বিশেষরূপ করুণ দৃশ্য-বিজড়িত, সে সম্বন্ধে মত-ভেদ নাই;—কিন্তু মধুসূদনের জীবন আদ্যোপান্তই এক বিরাট বিষাদান্ত বৈচিত্র্য বহুল মহানাটক; এক অপূর্ব্ব রহস্যময় ইতিহাস। সে নাটকের প্রতি অঙ্ক, প্রতি গর্ভাঙ্কই আমাদের হৃদয় কৌতূহলাক্রান্ত, উল্লসিত, ব্যথিত ও বিচলিত করে। যতই আমরা তাঁহার জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করি, যে অংশের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি, যে বিষয়েরই অনুসন্ধান করি, তাহাতেই কোন-না-কোন নূতন তথ্য, নূতন কথা, নূতন আখ্যায়িকা, নূতন ঘটনা ও নূতন রহস্য আমাদের নেত্রপথে প্রকটিত হয়। অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির ন্যায় এই অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী মানবজীবন রহস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার, অতলস্পর্শী খনি। কত লোকে তাঁহাকে কত ভাবে দেখিয়াছেন, তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কত লোকে কত কথা বলিয়াছেন; তাঁহার পরিচিত ও অপরিচিত, তাঁহার সমকালবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কত জনে যে তাঁহার সম্বন্ধে কত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অবধি নাই। আমরা কবির কথায় তাঁহার জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি;—

"হে প্রকৃতি! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তব নব নব শোভা চর্ম্মচক্ষে ভায়!
হে দ্রৌপদি! যত তোমা উঘারি উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক্, শাটী বেড়ে যায়!"

৬নং লাউডন ষ্ট্রীটের সুরম্য অট্টালিকা মধুসূদন য়ুরোপীয় ফ্যাসানে, ফরাসী আদর্শে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ভবন-বেষ্টিত উদ্যান নানা পুষ্পবৃক্ষে, লতাপাতায় পরিপূর্ণ ছিল। য়ুরোপীয় প্রণালীতে উদ্যান রচিত হইয়াছিল। এমন লতাপাতার বাহার সে সময় এ দেশের কাহারও উদ্যানে দেখা যাইত না।

কক্ষসমূহের আভ্যন্তরিক সাজসজ্জাও বিচিত্র। প্রাচীর-গাত্রে য়ুরোপীয় পৌরাণিক কাব্যসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত বিষয়ের চিত্রাবলী সুশোভিত ছিল। কৌচ, কেদারা, টেবিল, আলমিরা, ঝালর, পর্দ্দা কত অভিনব প্রকারের ছিল, তাহা বলা যায় না। পুস্তকাধারে য়ুরোপীয় বিবিধ ভাষায় রচিত মহাকবিগণের গ্রন্থাবলী (Classic Works) সজ্জিত ছিল। তিনি য়ুরোপ হইতে আসিবার সময় হোমার, দান্তে, ভার্জ্জিল, তাসো, সেক্সপীয়ার, মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিগণের ধাতু ও প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত অর্দ্ধ-মূর্ত্তিসমূহ (Bust) বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই প্রতিমূর্ত্তিগুলি তাঁহার পাঠাগারে সুন্দররূপে সজ্জিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পত্নী, কন্যা, পুত্র প্রভৃতির গৃহগুলি নূতন ধরণে সজ্জিত ছিল। সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বহির্গমনের জন্য কয়েকটি অশ্ব ও অশ্বযান ছিল। তন্মধ্যে একখানি শকট এরূপ বহুমূল্য ছিল, যে, তাঁহার ফিরিঙ্গী বন্ধুরা তাহার 'Grand Carriage' নাম দিয়াছিলেন।

এই ভবনে প্রায় প্রতি মাসেই ২।৩ বার তিনি নির্ব্বাচিত বন্ধুবর্গকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাচক তাঁহার সূপকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সে নানা-বিধ রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্যে তাঁহার সুহৃদ্গণের রসনারঞ্জন করিত; এ জন্য মধুসূদন তাহার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বাবু দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজ হইলে মধুসূদন এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া যাবতীয় ব্যবহারা-জীবগণকে ভোজ দিয়াছিলেন। পরের সুখে তিনি সতত সুখী ছিলেন।

এই সময়ে গৌরদাস বাবু মধুসূদনকে প্রায়ই নিজ-বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতেন। গৌরদাস বাবু বন্ধুগণকে খাওয়াইতে বড়ই ভালবাসিতেন। আহার সম্বন্ধে তিনি বড়ই সৌখীন ছিলেন। কেবল বহির্বাটীর থানায় নহে, ভিতর মহলেও মধুসূদন আসনে বসিয়া ভোজন করিতেন! একবার একখানি পত্রে আসনে বসিয়া খাইবার জন্য গৌর-দাস মধুসূদনকে ঢিলে পায়জামা পরিয়া আসিতে বলেন। মধুসূদন উত্তরে লেখেন—

My dear Gour,

All right. Break-fast, but how shall I manage without—at least—a spoon? Well, I suppose, you have lots. I don't mind squatting. I shall wear loose trowsers. Send bearer at 8 A. M. Yours M. M. D.

1868.

এই সময়ে মধুসূদন প্রৌঢ়ের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিরজীবনের সেই অকৃত্রিম বন্ধু-বাৎসল্য প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ছিল। আমরা তাঁহার এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক, তাহা হইতে তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের প্রতি অনু-রাগ তখনও কিরূপ গভীর ছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন। হিমালয়ের ন্যায় মহান্ হিয়া হইতে প্রেম ও প্রীতির চিরস্নিগ্ধ নির্ঝরিণী পূর্ব্বের মতন তেমনিই সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছিল।

My dearest Gour,

I went out yesterday with a friend to visit some villages beyond Bali and did not return in time to go over to yours. To-day, I happen to be engaged with Ganender Tagore. I shall partake of your "Dalbhat" to-morrow with heart-felt pleasure. In the meantime, don't let your ardour cool down, old boy.

In haste, Ever yours

M. S. Dutt.

My dear Gour,

How strange! The whole of yesterday I thought of you and asked myself repeatedly if you were coming home this year. I have just recovered from the effects of a severe accident, but I shall be very glad to go to see my dear old friend and talk of old days. Will the after-noon of Tuesday next suit you? If so, send your Merony and believe

Ever your affectionate

Michael M. Datta.

P. S.—You know, old boy, I never write letters unless I have something of importance to communicate. So, you must not blow me up for being a bad correspondent.

M. M. D.

My dear Gour!

I am sorry I never saw the letter to which you allude. If I had, I should have replied immediately.

You must know, my boy, that I go out every day, not being a Hakim Bahadur.

Need I tell you that all my available time is yours? Come by all means and receive from my lips the assurance of what I always felt and do feel for you—Sincere friendship!

Yours affly.

Michael M. Datta.

7, Old Post Office Street.

My dear Gour, *31st March, 1869.*

I happened to be at Burdwan a few days ago and there met a rather sickly specimen of our Bengali nobility—a Coomar something Roy Mullick. He was very attentive to me and showed a letter from you. Though I did not read the letter, I was and am led to believe that you have returned to your Head Station from your tour on the classic banks

of the 'Kapotaksha' and that I ought to reply to your very kind letter dated from "Bagarhat." As for me, my recollections of these parts of the country are rather hazy ; but I have no objection to revisit them with such a jolly fellow as you—though I sincerely wish you a speedy transfer to some civilized part of the country. Old Rung is come to Hooghly and looks uncommonly fat and healthy. Don't you sigh for the land of the Coles in preference to horrid dull Jessore ? I can't imagine how people can live there—unless official duties so occupy their minds as to leave no time for idle thought.

* * * *

You will perceive from the place I date this from, that I have commenced to practise in the Original side of the High Court. In the Apellate side there is not much work just now—O, these horrid Stamp Acts ! Litigation now is a luxury only for the wealthy.

The Viceroy is gone up the country and Calcutta is again dull. The Theatre people and the Operawallahs are all going away also. I sometimes think of a run up to Lucknow, but I have no one there whom I could rely upon to push me forward. One or two of our fellows have made rapid fortunes there.

When do you propose to return to us ? I suppose not before the Poojah holidays. You can't imagine how grand that picture looks. I have had it restored by a European artist.

With kind wishes,
Ever yours affly,
Michael M. Datta.

7, Old Post Office Street.
30th July, 1869.

My dear old Gour,

You cannot imagine how sorry I was to be obliged to let you leave Town without a chat on account of my chamber being full of interesting clients ! Hakim tho' you be * * you cannot command such a levy ! Well !—regrets are vain, for you are now in the salubrious regions of the Sunderbuns and your humble servant in noisy Old Post Office Street. But the holidays are coming on and then there will, no doubt, be a jolly gathering of ancient chums. In the meantime, allow me to recommend to your exalted favour the bearer of this letter, a person whose face I never saw before, but who has come to me with a very handsome letter from my old rascal of an uncle, Bansidhar Ghose of 'Katiparah.' If you can do anything for the fellow, I shall be obliged. He seems to be under the impression that a letter from me would pave the way for him nicely ;—so here you are. I hate to give letters of recommendations, but there are occasions when a poor Devil is obliged to do violence to his own feelings for the sake of others.

I have scarcely any news to give you. We are very dull here, tho' I have nothing to complain of the goddess whom Poets have called "fickle."—I am getting a fair share of business. My people are still at Ooterparah and we shall remove soon to Chandernagore. I stop in Town because living out of Town is a luxury which I can't exactly afford as a new

beginner. * * I have got to go out, so good bye.

Ever yours
Michael M. Datta.

মধুসূদনের কৌতুকপ্রিয়তার একটি কাহিনী এ স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। ৺বিহারীলাল গুপ্ত তাঁহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাতে সিবিল সার্বিস্ পরীক্ষা দিতে গমন করেন। তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর গুপ্তের বিশ্বাস যে, মনোমোহন ঘোষ বিহারীকে পরামর্শ দিয়া এ কার্য্যে লওয়াইয়াছেন। সেইজন্য তিনি মনোমোহন ঘোষের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা করেন। বিহারীবাবুর পিতা চলিয়া গেলে পর, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবীন বাবু তখন নবীন যুবক। তাঁহাকে দেখিয়া ঘোষ সাহেব বলিলেন, "বিহারীলাল গুপ্তের পিতা আমার নিকট আসিয়াছিলেন; তাঁহার ধারণা, আমিই তাঁহার পুত্রকে বিলাত যাইবার পরামর্শ দিয়াছি; তিনি রাগত হইয়া আমার সহিত ঝগড়াঝাঁটি করিয়া গেলেন। মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছে। চল মাইকেলের নিকট যাওয়া যাক্, সেখানে গেলে মন নিশ্চয়ই প্রফুল্ল হইবে। তাঁহারা দুইজনে মধুসূদনের গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, মধুসূদন একখানি গ্রন্থ-পাঠে নিমগ্ন রহিয়াছেন। মনোমোহন ঘোষ, নবীনচন্দ্রকে মধুসূদনের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "এ অসাধারণ বালক; অনেক কবিতা ইহার কণ্ঠস্থ—আপনার গ্রন্থ যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছে!" মধুসূদন, নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তোমার বাড়ী কোথায়?" নবীনচন্দ্র বলিলেন, "চট্টগ্রাম।" মধুসূদন রহস্য করিয়া বলিলেন, "চট্টগ্রাম? না আরাকান? আমার বোধ হইতেছে, বালক তুমি আরাকান-নিবাসী। চট্টগ্রামের নহ।" নবীন ঈষৎ হাস্য করিয়া যতই বলেন, "আমি চট্টগ্রামের", মধুসূদন ততই হাসিয়া বলেন "You belong to the Arracan side"। পরে মনোমোহন ঘোষ বিহারীবাবুর পিতার কাহিনীর উল্লেখ করিলে, মধুসূদন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শেষে তাঁহাকে কি বলিলে?" মনোমোহন বলিলেন, "আমি তাঁহাকে বলিলাম, জাহাজ ত এখনও ছাড়িতে বিলম্ব আছে; আপনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারেন।" ইহা শুনিয়া মধুসূদন এমন একটি কৃত্রিম অভিনয় করিলেন, যাহাতে বিহারীবাবু যেন জাহাজের উপরে রহিয়াছেন, নিম্নে তাঁহার পিতা জেঠিতে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দনের সুরে 'ও বাবা, বিহারী, তুই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয় বাবা—সাগর পার হস্‌নি' ইত্যাদি বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; আর বিহারী জাহাজের উপর হইতে ক্রোধযুক্ত রূঢ় স্বরে 'আমি কখনই যাব না, আপনি ফিরে যান্, আমি বিলাতে গিয়া বড় সাহেব হইব' ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। মধুসূদনের এই কৃত্রিম অভিনয়ে হাসিতে-হাসিতে মনোমোহন ও নবীনচন্দ্রের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহারা প্রচুর আমোদ উপভোগ করিয়া অবশেষে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

শারীরিক অসুস্থতা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি কারণে মধুসূদনের ব্যারিষ্টারি ব্যবসা বড়ই মন্দীভূত হইয়া গেল। এই সময়ে হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ-বিভাগে পরীক্ষকের উচ্চ পদ খালি হওয়াতে, মধুসূদন উক্ত পদের প্রার্থী হইলে, প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড কাউচ (Sir Richard Couch) সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। এই পদের আয় মাসিক এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। মধুসূদনের এই নিয়োগে দেশের যাবতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিখ্যাত সম্পাদকেরা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। ইংরাজ-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ইংলিশম্যান (Englishman) সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"The appointment of Mr. M. M. Datta, Barrister-at-Law, to the post of Examiner of the Privy Council Records in the High-Court, appears from every point of view quite unobjectionable. The duties pertaining to this office are of great importance, and can only adequately be discharged by an officer of approved ability and high professional character. A better choice therefore could hardly have been made, nor would it be easy

to find another Native gentleman so thoroughly intimate with the English language."

The Englishman, Monday, June 13, 1870.

দেশীয় সমাজের তাৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

Saturday, 18 June, 1870.

"We are glad to see it stated that the High Court has appointed Mr. M. S. Datta, Barrister-at-Law to be Chief Examiner of translations of Privy Council Appeals. The Englishman has paid a deserved compliment to his literary attainments in the English and Vernacular languages as well as in the Eastern and Western classics. If Mr. Datta were placed at the head of the Translation Department not only of the High Court but also of the Government, the purification of the mongrel jargon, which now passes as the Court language in the Moffusil would, we feel persuaded, be attained at no distant time.

The Hindoo Patriot, Monday, June 20, 1870.

তাঁহার এক আত্মীয় আসাম প্রদেশ হইতে তাঁহার এই নিয়োগ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। আমরা সেই পত্রাংশ উদ্ধৃত করিলাম ;—

Gowhatty, 25,6,70.

"You do not know why I am writing to you to-day. It is the newspaper that has surprised me. I saw your name in it last evening and rejoiced much with many friends and gentlemen (both Assamees and Bengelees) about your appointment as the Chief Examiner of the Privy Council papers. * *"

উক্ত পদে মধুসূদন যোগ্যতা ও কৃতিত্বের সহিত প্রায় দুই বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার পরিচিত, অপরিচিত বহু (দেশীয় ও ইয়ুরেজিয়ান,) ব্যক্তি হাইকোর্টের অনুবাদ-বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট সই সুপারিশ লইয়া আসিয়াছিলেন। চিরদয়ার্দ্রচিত্ত মধুসূদন অনেকের অভাবপূরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের নিজের বিশাল অভাব পূর্ণ হয় নাই। মাসিক হাজার টাকায় তাঁহার কি হইবে? তদুপরি তখন তিনি ঋণসাগরে আগ্রীব নিমজ্জিত! মধুসূদন এক হস্তে ঋণ পরিশোধ করেন, তৎক্ষণাৎ অপর হস্তে আবার ঋণগ্রহণ করেন! মানসিক অশান্তিবশতঃ তিনি নিয়মিতরূপে আদালতে আসিতে পারিতেন না। তাহাতেও ক্ষতি বড় অল্প হইত না। শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু মধুসূদনের সহিত হাইকোর্টে একত্র কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়কার একটি আখ্যায়িকা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; তাহা এই; —একবার তিনচারি দিন অনুপস্থিতির পর মধুসূদন আদালতে উপস্থিত হইলে, অমরনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন আসেন নাই কেন?" মধুসূদন বলিলেন, "আসিয়া কি হইবে, কাজ-কর্ম্মের অবস্থা ত দেখিতেছি!" অমরবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার বুঝি টাকার আবশ্যক নাই?" মধুসূদন,—"সে, কি? আমার টাকার আবশ্যক নাই ত কাহার আছে?" অমরবাবু,—"টাকা ত তোলাই রহিয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিয়া লইলেই ত হয়।" মধুসূদন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া অমর বাবুর মুখের দিকে তাকাইলেন। অমরবাবু বলিলেন, "ঐ দেখুন, একটা কাজ কয় দিন ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া পড়িয়া আছে, আপনি দেখিয়া দিলেই হয়, এখনই যথেষ্ট টাকা পাইবেন।" এই কথা শুনিয়া মধুসূদন,—"ক্লার্ক এ কথা আমাকে বলে নাই কেন?" বলিয়া ক্লার্ককে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাগজপত্র দেখিয়া দিলেন। অমরনাথ বাবুও তখনই বিল করিয়া প্রায় চারি পাঁচশত টাকা মধুসূদনের হস্তে দিবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনি যে অদ্য আমার কি উপকার করিলেন, তাহা মুখে আর কি বলিব?" এই বলিয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে সাংসারিক অসচ্ছলতা তাঁহাকে যেরূপ প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে ধীরচিত্তে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল! নানা

দুশ্চিন্তায় মধুসূদনের অনবদ্য স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কিছুদিনের জন্য আদালতের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। উক্ত কর্ম্ম অপেক্ষা ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিলে অধিক আয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া মধুসূদন পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একটি বড় মোকদ্দমা উপলক্ষে তিনি ঢাকা নগরে গমন করেন। ঢাকার বিশিষ্ট অধিবাসীবর্গ ও জনসাধারণ তাঁহাকে তত্রত্য পোগোজ (Pogose School) স্কুলে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, তাঁহাকে প্রদত্ত অভিনন্দনের খসড়া প্রস্তত করেন। ঢাকাবাসীরা তাঁহার ইংরাজী পরিচ্ছদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে, মহামনা মধুসূদন বলেন, "বন্ধুগণ! আমার বৈদেশিক পরিচ্ছদের জন্য আপনাদিগকে দুঃখিত হইতে হইবে না; আমার কোট বুট যদি কোন দিন,—সাহেব হইয়াছি—বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তবে একখানি দর্পণের দিকে চাহিলেই আমার সে ভ্রম দূর হইবে; আমার বর্ণই আমার জাতি স্মরণ করাইয়া দিবে।" নিম্নলিখিত কবিতায় মধুসূদন ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন—

নাহি পাই তব নাম বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ববঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে)
নিত্য-অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি।
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য, অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারো, মহৎ যে সেই তাঁর গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে;
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি!

পীড়িতাবস্থায় মধুসূদন ঢাকায় গিয়াছিলেন। তথায় শারীরিক পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি বহু ক্লেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত পত্র পড়িলেই পাঠক তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা বুঝিবেন—

Tuesday

My dear Gour,

I was nearly dead some weeks ago and had to go to Dacca where I was detained nearly 10 days and got back with much difficulty. I hear, you have taken leave on account of bad health. I shall try to see you as soon as I can.

Here's a copy of the 'Ilias' for you. I have much to say about your son and his journey to Europe.

Yours as ever
Michael M. Datta.

গৌরদাস বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসাক মহাশয়কে বিলাতে পাঠাইবার জন্য মধুসূদন য়ুরোপে থাকিতে থাকিতে এবং তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু লালবিহারী বাবুর বিলাত যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অবস্থানকালে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন তাঁহার 'হেক্টর বধ' প্রকাশিত করেন। হোমরের ইলিয়াস্ নামক কাব্যের উপাখ্যান তিনিই গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। বিচিত্র ভঙ্গীর গদ্যে, কাব্যের ভাষার শব্দাড়ম্বরে উহা রচিত হইয়াছিল। পদ্যের ন্যায় তিনি অভিনব গদ্যেরও সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সঙ্কল্পের সূচনা—রেখাপাত হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই—আরব্ধ গ্রন্থও সম্পূর্ণ হয় নাই। তিনি ইহা সংশোধন করিবার অবসর পান নাই। যখন অভিলষিত উদ্দেশ্য-তরু অঙ্কুরেই উন্মূলিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা আদৌ সমীচীন নহে। কয়েকটি সমালোচক 'হেক্টর বধ' সম্বন্ধে নানা বিরোধী মত প্রচার করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মধুসূদন বাঁচিয়া থাকিলে, অবকাশ পাইলে, সচ্ছন্দচিত্তে থাকিলে,—এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। যাহা হউক, তিনি যে কোন মহদুদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, গদ্য রচনায় 'হেক্টর বধে' তাঁহার

'হাতে-খড়ি'; আর হাতে-খড়িতেই তাঁহার গদ্য-রচনার চিরাবসান হইয়াছে। 'হেক্টর বধ' মধুসূদন তাঁহার সহপাঠী, বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। আমরা উৎসর্গপত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু

প্রিয়বর –

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩।৪ মাস স্বকর্ম্মে হস্তনিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্থে উরূপা* খণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ইলিয়াস নামক কাব্য সদা সর্ব্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল, যে এ অপূর্ব্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড-ভাষানভিজ্ঞ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়া ছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। একস্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে; (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে) সে টুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপরিউক্ত কারণটী মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ত্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্ রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। † আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কার-শাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞাত-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জ্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবি-গুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, এবং সে পরিশ্রমও যে সর্ব্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

৬নং লাউডন্ ষ্ট্রীট, চৌরঙ্গী। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত।
ইং সন ১৮৭১ সাল।

উপরিউদ্ধৃত উৎসর্গপত্র পাঠ করিয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মধুসূদনকে যে পত্রখানি লিখিয়া প্রেরণ করেন, তাহা বঙ্গভাষার মহামূল্য রত্ন! সে পত্রে মধুসূদনের পূর্ণ চিত্র প্রতিভাত হইয়াছে। এই পত্রে ভূদেব ব্রাহ্মণোচিত

* এই শব্দটি ভ্রান্তি বশতঃ একস্থলে 'ইয়ুরোপ' লিখিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় 'Europe' লেখা যায় না। 'Eu' সদৃশ যুগ্ম স্বর আমাদের নাই। 'EUROPA' উরূপা।

* Hic omnes sine dubio, et in omni genere eloquentiae, procul à se reliquit."—QUINTILIAN.

Aristot: de Poetic.—Cap. 24

উদার প্রাণে ও সরল সত্যে মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সেই দুর্লভ পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

২৮ শে মার্চ্চ ১৮৭২,
চুঁচুঁড়া।

পরম প্রণয়াস্পদ

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয় মহোদয়েষু—
ভাই,

তুমি স্বপ্রণীত হেক্টরবধ কাব্যগ্রন্থে আমার নামোল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ সম্বন্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সেই সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় বিস্মৃত হই নাই, হইতেও পারি না। যৌবন-সুলভ প্রবলতর আশা প্রণোদিত হইয়া মনে মনে যে সকল উন্নত অভিপ্রায় সঞ্চিত করিতাম, তোমার দৃষ্টান্তই বিশেষরূপে তৎসমুদয়ের উত্তেজক হইত। তোমার যৌবন কালের ভাব আমার জীবনের একটি মুখ্যতম অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। তখন আমাদিগের পরস্পর কত কথাই হইত,—কত পরামর্শই হইত,—কত বিচার ও কত বিতণ্ডাই হইত। এখনও কি তোমার সে সকল কথা মনে পড়ে? তুমি বিজাতীয় প্রণালীর কিছু অধিক পক্ষপাতী ছিলে, আমি স্বজাতীয় প্রণালীর অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। এই মতভেদ নিবন্ধন আমার যে যন্ত্রণা হইত, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? আহা! তখন কি একবারও মনে করিতে পারিতাম যে, তুমি বিজাতীয় মহাকবিগণের সমস্ত রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শোভা সম্বর্দ্ধনপুর্ব্বক বাঙ্গালার অদ্বিতীয় মহাকবি হইবে? সেই সময়ে তুমি যে সকল সুন্দর ইংরাজী পদ্য রচনা করিতে, তাহা পাঠ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইত। আমি তখন হইতেই জানিতাম যে, তুমি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সেই কাব্য যে মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, অথবা হেক্টরবধ হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তুমি ইংরাজীতে কোন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া ইংরাজ-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমি মনে করিতাম। ফলতঃ, তোমার শক্তির প্রকৃত গরিমা তখন অপ্রকাশিত এবং আমার বোধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মাণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, তুমি ইহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে। ভাই, তোমার এই বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়নের পরিশ্রম সার্থক, তোমার এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সার্থক।

কোন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা যদি সঙ্গত হইতে পারে, তাহা তোমার পক্ষেই সঙ্গত হয়। তুমি অল্পবয়সেই ইংরাজী ভাষার মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলে, যৌবনাবধি ইংরাজদিগের সহবাস করিতেছ, বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষার মূল ভাষা সমস্তের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে। ফলতঃ তোমার প্রণীত যে কয়খানি ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ আছে, তত্তুল্য ইংরাজী গ্রন্থ বোধ হয় কোন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। কিন্তু তোমার সেই গ্রন্থে আর তোমার মেঘনাদবধ প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থে কত অন্তর! তোমার বাঙ্গালা কাব্যগুলি তোমাকে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদলের মুখস্বরূপ, তাহাদিগের গৌরবস্বরূপ, এবং তাহাদিগের পথপ্রদর্শক-স্বরূপ করিয়া স্থাপন করিয়াছে।

অধিক কি লিখিব? তোমার শরীর নিরাময়, তোমার মন সচ্ছন্দ, তোমার সাংসারিক শ্রী বর্দ্ধনশীল, এবং তোমার কবিশক্তি চির-প্রভাবশালিনী থাকুক, এই আমার প্রার্থনা।

ত্বদীয়
শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

এই সময়ে মধুসূদনের সাংসারিক ও শারীরিক অবস্থা দিন দিন অবনত হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার উত্তমর্ণগণ শার্দ্দূল-যূথের ন্যায় তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। তাঁহার 'হেক্টরবধ' কাব্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মানসিক অশান্তি বশতঃ উহা পরিসমাপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সাংসারিক সুখ ও শান্তি অন্তর্হিত হইলেও, পাঠক, তাঁহার হৃদয়ের উদারতা দেখিলে বিস্মিত হইবেন। সে সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইল।

মধুসূদন স্বদেশের গ্রাম্য পাঠশালায় যে গুরুমহাশয়ের নিকটে প্রথমে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃসময়ে সেই অশীতিপর, স্থবির, গুরু বিপন্ন অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া মধুসূদনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মধুসূদন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ টাকা দেওয়ায়, তাঁহার পত্নী ঐ দানকে বাহুল্য বলাতে মধুসূদন বলেন, "হাতে টাকা থাকিলে, উঁহাকে একশত টাকা দিতাম; উঁহার বেত্রাঘাতের চিহ্ন হয়তো এখনো আমার শরীরে আছে?"

যশোহর জেলা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ কোন মকোদ্দমা উপলক্ষে মধুস্থদনের নিকট আসেন। মধুস্থদন তখন শয্যাশায়ী; কিন্তু ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র ও তাঁহার স্বদেশস্থ এই কথা অবগত হইয়া, অপর একজন ব্যারিষ্টারকে বিনা পারিশ্রমিকে ব্রাহ্মণের মকোদ্দমা চালাইবার জন্য অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিলেন এবং তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমনের নিমিত্ত, নিজের অর্থাভাব সত্ত্বেও, তাঁহাকে কুড়ি টাকা পাথেয় স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন!

মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া, তাঁহার মাতুল বংশীধর তাঁহাকে বলেন, "মধু! তুমি এতটা বিষয় মহাদেবকে হেলায় বিলাইয়া দিলে।" তাহাতে মধুস্থদন উত্তর করেন, "মামা! ব্রাহ্মণ অসময়ে আমাকে টাকা দিয়া উপকার করায়, আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। তা ও নিগ্ গে, ভায়েদের ত কোন অভাব নাই।"

মধুস্থদন তাঁহার কোন ধনাঢ্য বন্ধুর ব্যবহারে বড়ই আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন! মধুস্থদনের কোন দেশ-মান্য বন্ধু, ঐ পূর্ব্বোক্ত বন্ধুকে 'rich and great' বলিলে মহাতেজস্বী মধুস্থদন তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ দম্ভের সহিত, তেজোগর্ভ ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন দেখুন,—As for—, he is, as you say, rich and great. I have too high a notion of myself to envy him as a man; though I am too poor to despise his wealth! But away with him—not to the hangman, but to—silent contempt!"

একদিন একখানি ঠিকাগাড়ী হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটিতে অবতরণ করিয়া, মধুস্থদন কোচমানকে একটি মোহর দিলেন! এই অপব্যয়ের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলে, মধুস্থদন বলেন, "বিদ্যা-সাগর, অদ্য দুই দিন যাবৎ এই চালক আমাকে তাহার শকটে নানাস্থানে লইয়া গিয়াছে। তাহাতে অধিক আর কি দিলাম?"

আর একবার একটি প্রার্থী তাঁহার নিকট কিছু অর্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি, পকেটে যাহা কিছু ছিল, তাহাকে দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার এক পরিচিত বন্ধু উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "উহাকে কত টাকা দিলেন?" ইহাতে মধুস্থদন বলেন, 'Raj Narain Dutt's son never counts money."

প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাসকে, একত্র কোথাও যাইবার নিমিত্ত একখানি পত্রের শেষাংশে কিরূপ মধুর ভাষায় অনুরোধ করিতেছেন দেখুন;—

"* * * You can then come up to the Police about 1 o'clock and away we go like a pair of merry blades."

ভৃত্যগণের প্রতিও তিনি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তিনি তাহাদের প্রত্যেককেই অন্যত্র কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বাবুর আহার সম্বন্ধে বড়ই পারিপাট্য ছিল। নিজে যেমন বিবিধ রসনা-পরিতৃপ্তিকর খাদ্যসামগ্রী ভালবাসিতেন, তেমনি বন্ধুদিগকেও সতত খাওয়াইতে ভাল বাসিতেন। মধুস্থদন তাঁহার বাড়ীতে সতত আহার করিতেন; তাঁহার জননী কর্ত্তৃক কোন সুখাদ্য প্রস্তুত হইলে, মধুকে না খাওয়াইলে গৌরদাস শান্তই হইতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে আমরা গৌরদাস বাবুর মধুস্থদনকে লিখিত অনেক পত্র দেখিয়াছি। তাই মধুস্থদন তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাচককে তাঁহার সৌখীন খাদ্যপ্রিয় বন্ধু গৌরদাসকে দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি যে অনুরোধ-পত্রখানি লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

My dear Gour,

The bearer of this is just the man that would suit you. He is a capital cook, etc etc! If you can give him some suitable employment in your new Establishment, you will not be sorry for having such a convenient fellow. He was with Dwarkanath Tagore, Kissory and your humble servant.

Yours in haste
Michael M. S. Dutt.

খিদিরপুর নিবাসী ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধুস্থদনের বাল্যবন্ধু ছিলেন। হরিমোহন বাবুর লিখিত মধুস্থদনের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কয়েকটি স্মৃতি-পুষ্পের অখণ্ডিত পল্লব আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা

সেগুলিকে বিকৃত না করিয়া, পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম ;—

"প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গম বিধায় প্রয়াগ তীর্থরাজ হইয়াছেন! কবিবর মাইকেল এক স্থানে আপনাকে জাহ্নবী-তনয় বলিয়া মাতৃপরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যে যথার্থ গঙ্গা ও সরস্বতীর পুত্র ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। একদা তিনি 'তিলোত্তমা সম্ভব' মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে আমাকে দেখান; আমি তাহা দেখিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করি,—

"Words are like leaves, where they
most abound
Little sense is surely found
Glittering thoughts stuck out in
every line."

ইহা শুনিয়া মাইকেল বলিলেন, "বাল্মীকি প্রভৃতি আদি কবিদিগের এই সৌভাগ্য ছিল যে, তাঁহাদিগকে কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবচোর হইতে হয় নাই। কিন্তু আমরা আধুনিক লেখক; সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজি কবিদিগের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়া একস্থানে এতাধিক উদ্গীরণ করিতে হইতেছে।" মাইকেল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। * * মাইকেল স্বীয় শক্তি ও স্বীয় সাধনা জানিতেন। তাঁহার উদ্যম কিছুতেই ভঙ্গ না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

"কোন সময়ে ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ও রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল আমার সহিত মাইকেলের রচনা সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি সেই সময়ে রাজাদিগকে বলি যে, 'আপনারা তাঁহার রচনার যেরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তাঁহার সহিত কিছুকাল আলাপ করিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। এমন কি মধুর কথা এতই মধুর; তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষাও মধুর। ইহাতে তাঁহারা বলেন যে, 'মাইকেলের সহিত আলাপ করিতে আমাদের প্রবল অনুরাগ আছে,' এবং তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন।

"আমি মাইকেলকে রাজাদের অভিলাষ জ্ঞাত করি; তাহাকে বলি যে, 'রাজা সত্যশরণ ঘোষাল আপনার স্বর্গীয় পিতার নিতান্ত আত্মীয় ছিলেন; তাঁহার অন্তিম কালে রাজাবাহাদুরেরা অত্যন্ত আত্মীয়তা করিয়াছিলেন। রাজারা আপনার রচনার বিশেষ পক্ষপাতী; একবার আপনার তাঁহাদের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য।' আমার অনুরোধে মাইকেল ভূ-কৈলাসে গিয়া রাজাদিগকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

"মাইকেলের অতিশয় মাতৃভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন 'মায়ের আমি একমাত্র পুত্র।' যে পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা দেশে ছিলেন, প্রায় মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে আসিয়া তাঁহার জননীকে দর্শন দিতেন।

"মাইকেলের খিদিরপুরস্থ ভদ্রাসন বাটী আমি ক্রয় করিয়া বাস করি। ঐ বাটীতে একবার ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন মাইকেল সন্ধ্যার সময় আইসেন। নিজের বসতবাটীতে পূজার সমারোহ দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাতৃউদ্দেশে বলেন; —'মা! তুমি কোথায়? আজ আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র * তোমার বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখ! তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি!'

"কোন সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণের এক মহতী সভা হয়। ঐ সময়ে বহুতর সোণার ও রূপার হুঁকা বাহির হয়। মাইকেলের জন্যও একটি সোণার হুঁকা বাহির হইয়াছিল। ইহাতে মাইকেল রহস্য করিয়া সহাস্যবদনে পণ্ডিতবর্গকে কহিলেন;—'ঠাকুর মহাশয়েরা! এ দাসের হুঁকাটি মারিবেন না; আমার জাতি গেলে আর জাতি পাইব না!'

"ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজি প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রসমূহে তাঁহার গভীর পরিজ্ঞান সত্ত্বেও তিনি জয়দেব এবং কৃষ্ণ-লীলা-লহরী প্রভৃতি কীর্ত্তনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সখের যাত্রা কি সখের গাহনার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। একদা আমার বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে মাইকেল বদন অধিকারী কিম্বা গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, গোবিন্দ অধিকারী যথার্থ কৃষ্ণলীলা অবতারণা করিতে

* মধুসূদন যে বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন, সেই বৎসরেই আমি মাতৃহীন হই। কিন্তু আমি জাহ্নবী দাসীকে চিরদিন মাতৃ-সম্বোধন করিতাম। শ্রীহঃ—

পারে না। বদন যথার্থ ভক্ত এবং পদবিন্যাসে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা। মাইকেলের ইচ্ছানুসারে যাহাতে বদনের কৃষ্ণযাত্রা দেওয়া হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা হইয়া তাহারই যাত্রা দেওয়া হইল।

"আশ্রমোচিত ব্যবহার করিলে মনুষ্যের মহত্ব আছে, মাইকেল ইহা স্বীকার করিতেন। যদিও তিনি বাল্যাবস্থায় আপনার আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবীণ বয়সে যখন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার নিমিত্ত বিলাতে অবস্থান করেন, তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তথায় ছিলেন। মাইকেলের বর্ণ অতি কালো ছিল, জাতিতে তিনি কায়স্থ, বিষয় বৈভব মধ্যবিৎ, পিতৃত্যজ্য সম্পত্তি যাহা তিনি পাইয়াছিলেন তাহাও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে সমধিক অর্থসাহায্য করিতে পারেন না;—এই অবস্থায় সমাধ্যায়ী-দিগের নিকট যাহাতে মাইকেলের হতাদর হয়, এই অভি-সন্ধিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, 'মাইকেল আর্য্যবংশসম্ভূত নহেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া মাইকেল রোষযুক্ত হইয়া এইরূপ সদুত্তর দেন; 'আমার পিতৃপুরুষ-গণ বর্ণাশ্রম-বিহিত কার্য্য করিয়া সম্মান পুরঃসর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগী ছিলেন না; আপন সম্প্রদায়ে ও সমাজে গণ্যমান্য ছিলেন। আর জ্ঞানেন্দ্রের পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণ হইয়া, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা না করিয়া, দাসত্ব স্বীকার করিয়া, জাতিভ্রষ্ট পিরালী হইয়াছেন, এবং তদাচরণে যে সকল পাপাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে আর কোনমতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই, এমন কি ফাঁসীও যাইতে হয়।' পাঠকগণ, ইহাতে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মাইকেলের কিরূপ অভিমত ছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, 'আমি আপনাকে খ্রীষ্টধর্ম্মবিহিত কোন কার্য্য করিতে দেখি না, আপনি আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, হিন্দুধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিয়াছেন; মনুষ্যমাত্রেরই এক একটি ধর্ম্ম আছে—আপনার কি ধর্ম্ম? তাহাতে মাইকেল উত্তর দেন—'ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কোন কথা কহিতে ইচ্ছুক নহি; তবে তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য এইমাত্র বলিতে পারি যে, Do to others as you wish they should do to you." ইহা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই; ইহা ধারণা করিয়া কাজ করিলে ঐহিক সুখ আছে।' শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদিতে এই উপদেশই নানাপ্রকারে রচিত হইয়াছে; সমদৃষ্টি সুখের মূল;—সর্ব্বভূতে একাত্ম দৃষ্টি থাকিলে শোক মোহ নাই; ইহা যখন তিনি ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে "জীবনমুক্ত" বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

"মধুর কণ্ঠস্বর তেমন মধুর ছিল না। সত্য বটে লোকে যাহাকে 'চেরা' স্বর বলে, তাহাই তাঁহার ছিল! বাক্যের জড়তা ছিল না; সম্পূর্ণ স্ফুর্ত্তি পাইত—সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইত। কিন্তু 'চেরা' বশতঃ তেমন উচ্চতা ছিল না। বাক্যস্ফুরণের দীর্ঘতা ও উচ্চতা না থাকায়, যখন তিনি ব্যারিষ্টার হইলেন, তখন সেই 'ভাঙা' স্বর দূর করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

"আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর না করিয়া অনেক মহানু-ভবেরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া,কর্ম্মের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য সাঙ্কেতিক পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নেপোলিয়ান বোনপার্টি বিজয়যাত্রার সময়ে Book of Fate পরীক্ষা করিতেন। অস্মদ্দেশে প্রচলিত হনুমান চরিত্র, কাকচরিত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে মাইকেল অনুকূলতা প্রকাশ করিতেন। কোন সময়ে তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয় মিল্টন ও নেপোলিয়নের চড়িবার জন্য একটি টাটু ঘোড়া আনয়ন করেন। টাটুটি তাঁহার বাড়ীতে যাইবামাত্র মলত্যাগ করে। ইহাতে মাইকেলের পত্নী হেনরিয়েটার পরিচারিকা বলে যে, 'মা-ঠাকুরাণি, ইহা বড়ই সুলক্ষণ—আপনাদের শুভাদৃষ্ট।' ইহার ২।৩ দিবস পরেই মাইকেল একটি বড় মকোদ্দমা পাইয়া তাহাতে চারি পাঁচ হাজার টাকা পান; এবং তৎপরেই ভাগলপুরে এককালীন দুই তিনটি মকোদ্দমা পাইলেন। তাহাতেও পাঁচ ছয় হাজার টাকা উপার্জ্জন হইল। টাটুর আগমনের পরই এতাদৃশ অর্থলাভে প্রীত হইয়া, মাইকেল টাটুটিকে রৌপ্যনির্ম্মিত সাজে সজ্জিত করিয়া, তাহার পরিচর্য্যার জন্য দুইটি সহিস নিযুক্ত করিয়া, তাহাকে সযত্নে রাখিলেন।

"অর্থসঞ্চয় করিয়া রক্ষা করিতে হয়, এ বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। অর্থ থাকুক, বা না থাকুক, ব্যয় করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ধনের কিছুমাত্র মূল্য নাই, ইহাই তিনি জানিতেন।

"আমার নিকট-আত্মীয়ের একটি মকোদ্দমা ছিল। ঐ

৭ নং লাউডন ষ্ট্রীটের বাটী

পরলোকগত নাটোরাধিপ রাজা চন্দ্রনাথ

পরলোকগত নন্দলাল গোস্বামী

আত্মীয় ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া মাইকেলের নিকট গমন করেন। মাইকেল পরিচয় পাইয়া Brief লইলেন; এবং তাঁহার নিকট হইতে Fee লইলেন না। সে সময় মাইকেলের অর্থের অত্যন্ত অনাটন।' মাইকেল আমাকে রহস্য করিয়া কহিলেন 'গৃহিণী কহিতেছেন ঘরে অন্ন নাই এবং গাড়ীভাড়ার টাকাও নাই।' আমি কহিলাম, 'আমার আত্মীয় টাকা দিতে প্রস্তুত, আপনি কি জন্য লইতেছেন

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত

পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন
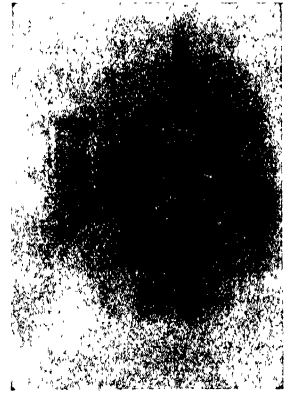
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

না?' তিনি কহিলেন 'তোমার আত্মীয়, এ জন্য অর্থ লইতে পারি না এবং তুমি লইয়া দিলে আমি বিরক্ত হইব। তোমার যদি নিজের টাকা থাকে, তুমি পাঁচটাকা গৃহিণীকে দিয়া আইস এবং কহিবে যে শীঘ্র আহার প্রস্তুত করিয়া আমাকে আদালতে বিদায় দেন।' এরূপ নিস্পৃহ ব্যক্তি এইক্ষণকার কালে অতি বিরল। নিতান্ত কষ্ট পাইলে মাইকেল আমার নিকট অর্থ কর্জ্জ করিতেন। তাহা পুনরায় চাহিলে মাইকেল বলিতেন, 'এইক্ষণে তোমার অর্থের কোন প্রয়োজন দেখি না যে, কষ্ট করিয়া আমি তাহা পরিশোধ করি। যখন তোমার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে তখন দিব।' ধন ব্যয়ের জন্য, এবং ইহার কেহ স্বামী নাই, ইহাই তিনি জানিতেন।

"আহার সম্বন্ধে মধুসূদনের কোন বিশেষ অনুরাগ ছিল না। যদিও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অবস্থান করিয়া নানা রাজভোগে তৃপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিত্য আহার যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই পরিতোষ ছিল।

"মাইকেলের পত্নী হেনরিয়েটা ফরাসী সঙ্গীতপ্রিয়

পরলোকগত কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজা সতীশচন্দ্র

পরলোকগত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিলেন এবং পিয়োনোতে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ফরাসী ফ্যাসানে বর্দ্ধিতা হইলেও, তথাপি কন্যাকে হিন্দুসঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর উপদেশ দিতেন।

"এক সময়ে (পাইকপাড়ার) রাজারা মাইকেলের পত্নী হেন্‌রিয়েটাকে হিন্দুসধবার ন্যায় সিন্দুর চুবড়ী প্রভৃতি উপহার দেন। তিনিও সীমন্তে সিন্দুর পরিয়াছিলেন। হেনরিয়েটা এমন সরলা ও পতিব্রতা ছিলেন যে, পতির সুখেই তিনি সুখী হইতেন।

মাইকেল মধুসূদনের জীবন-স্মৃতি।

— ৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

স্বর্গীয় গৌরদাস বসাক মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসাক মহাশয়ের লিখিত মধুসূদনের স্মৃতি আমরা এই স্থলেই সন্নিবেশিত করিলাম।

"প্রিয় নগেন্দ্র ভায়া—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয় সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু স্মরণ ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে মৌখিক আপনাকে সকলই বলিয়াছি; আপনার অনুরোধে আবার আমার স্মরণপথে যতটুকু আসিল, ততটুকুই লিখিয়া পাঠাইতেছি;—

মধুসূদন দত্ত যখন হিন্দু কলেজে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত সমশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখন হইতেই আমাদের বাটীতে তাঁহার যাতায়াত ছিল। তাঁহার পিতা ৺রাজনারায়ণ দত্তের সহিত আমার পিতামহ ৺রাজকৃষ্ণ বসাকের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, তখন হইতেই আমার পিতা ও পিতামহকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিষয় আন্দোলন করিতে শুনি। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মধুসূদন যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার পিতা ৺রাজনারায়ণ দত্ত একদিন আমার পিতামহের নিকট আসিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলেন যে, মধুসূদন কোথায় চলিয়া

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতেন ও স্নেহ করিতেন। তাঁহার পত্নীও আমাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। তাঁহার পাশ্চাত্য পোষাক ও রীতিনীতি হিন্দু-বালকের পক্ষে বিসদৃশ ও অপ্রীতিকর বলিয়া আমি তাঁহার ক্রোড়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি সমধিক স্নেহবশতঃ আমাকে জোর করিয়া ক্রোড়ে লইয়া মাতৃস্নেহে আমার মুখচুম্বন করিয়া অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন।

মধুসূদনের ও আমার পিতৃদেবের একই প্রকার সদানন্দ ও স্নেহময় প্রকৃতি ছিল। সেইজন্য উভয়ে অভিন্ন হৃদয়ে অকৃত্রিম বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ ছিলেন। আমিও স্বর্গীয় মধু-সূদনকে একজন আত্মীয়, পিতৃস্থানীয় জ্ঞান করিতাম। তিনি যখনই আমা-দিগের বাটীতে আসিতেন, আসিয়াই আমাদের পুরাতন ভৃত্য রঘুকে ডাকিয়া বলিতেন "যাও, মা'কে বলগে, তোমার খ্রীষ্টান ছেলে এসেছে, তাহার জন্য রুটি ঘণ্ট পাঠাইয়া দাও"। ৺পিতামহী-ঠাকুরাণীও রঘুর মুখে ঐ সংবাদ পাইবামাত্র স্বহস্ত-প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী

গিয়াছে; আমরা তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। তোমার ছেলে গৌরদাসের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব; সে এ বিষয়ের সন্ধান দিতে পারে। আমার পিতৃদেব এ সংবাদে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যাহা হউক তিনি এ বিষয়ে তৎপর হইয়া অনুসন্ধান করিবেন। পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলই মধু-স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মাইকেল মধুসূদন যখন লালাবাজার পুলিস-কোর্টের রাস্তার পূর্ব্ব-ধারের দ্বিতল বাটীতে অবস্থান করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বদা আমাদের বাটীতে আসিতেন। সেই সময়ে আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি। তিনি আমাকে

পাঠাইয়া দিলে তিনি সাদরে ভক্ষণ করিতেন; পানীয় জলের পরিবর্ত্তে তিনি Beer ব্যবহার করিতেন; তাই তাঁহাকে এক বোতল Beer পানীয়রূপে দিতে হইত। তাঁহার সহাস্য বদন-নিঃসৃত স্নেহময় বাক্যে আমার স্নেহ-প্রার্থী বালক-হৃদয় বিগলিত হইত; আমি পরমাত্মীয় জ্ঞানে তাঁহার নিকটেই থাকিতাম। আমার কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইলে, প্রায় ১৩৷১৪ বৎসর বয়সের সময়ে আমি পিতৃ-আজ্ঞায় সংস্কৃত পাঠ আরম্ভ করি ও বাঙ্গালায় যে সকল পাঠোপযোগী স্বল্পমাত্র পুস্তক ছিল, তাহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করি। সেই সময় মাইকেল মধুসূদন নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য

লিখিয়া তাহার পাণ্ডুলিপি পিতৃদেবের নিকট ও তাঁহার বন্ধুবর ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাঠ করেন ও তাঁহাদের সহিত অলঙ্কারাদি নানা সাহিত্য-বিষয়ক আন্দোলন করিয়া তাহা নিজ মতে সংশোধন করেন। তৎপরেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য লেখেন। আমি ঐ সকল কাব্য পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতাম; কিন্তু পয়ারাদি পাঠ করা অভ্যাস থাকায় বাঙ্গালা ভাষায় নবপ্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষরছন্দ উক্তরূপ পাঠ
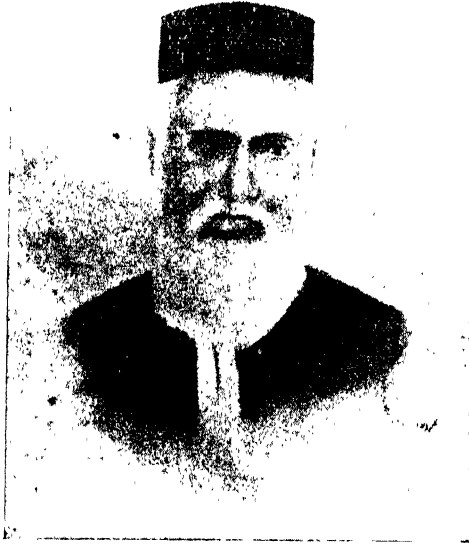
পরলোকগত জগদীশনাথ রায়

করিতে পারিতাম না। সেই সময় যখনই মধুসূদন আমাদের বাটীতে আসিতেন ও আমার সংস্কৃত পাঠের পরীক্ষা করিতেন, তখন আমি তাঁহার মুখে তাঁহার নিজ রচিত তিলোত্তমা-সম্ভব ও মেঘনাদ-বধ কাব্যের উত্তম অংশ ও অন্যান্য কবিতা আবৃত্তি না শুনিয়া তাঁহাকে ছাড়িতাম না। যদিও তখন আমার কোন রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি তাহা যে কি শ্রুতিমধুর বোধ হইত ও তাহা শুনিয়া অন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইত, তাহা সামান্য লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে পারি না। পিতৃদেব ও মধুসূদন উভয়ের অভিন্ন হৃদয় ও আত্মীয়ভাব সম্বন্ধে অধিক কি লিখিব, এক জন আর একজনকে না দেখিলে অস্থির হইয়া উঠিতেন। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ২।৩ দিন পরস্পরের সম্মিলন হওয়া চাই; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই ঘটিত। দূর দেশে থাকিলেও ঐরূপ সম্মিলন জন্য ব্যগ্র হইয়া পিতৃদেব মধুসূদনকে সেখানে যাইবার জন্য সতত আহ্বান করিতেন ও মধুসূদনও না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না। বাটীতে যে দিন কোন নূতন প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হইত, মধুসূদনকে না খাওয়াইয়া পিতৃদেবের কিছুতেই তৃপ্তিলাভ হইত না; মধুসূদন আসিতে না পারিলে তাঁহার বাটীতে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য সমস্ত খাদ্য পাঠান হইত। যদি কোন দিন মধুসূদন আমাদের বাটীতে আসিবার সময় নির্দ্ধারণ করিতেন, অথচ বিশেষ কার্য্য বশতঃ আসিবার বাধা উপস্থিত হইত, তথাপি অল্প সময়ের জন্যও একবার সেই সময় উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিয়া "গৌর, আজ আমি বড় ব্যস্ত; আজ আমাদের বেশীক্ষণ আলাপ ও কথা-বার্ত্তা হইবে না, আমি চলিলাম" বলিয়া চলিয়া যাইতেন।

সাংসারিক ও বৈষয়িক কোন বিষয় তিনি আমার পিতৃদেবের নিকট গোপন করিতে পারিতেন না। ভাগ্যক্রমে তিনি সতী স্বাধ্বী ও পতিগত-প্রাণা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। সদানন্দময় মধুসূদন ও স্নেহময়ী তৎপত্নী উভয়ের সম্মিলন "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ" এই চির-প্রসিদ্ধ মহাজন বাক্যের সাক্ষী স্বরূপ হইয়াছিল। তদীয় পত্নীও তদুপযুক্ত প্রেমময়ী ও আনন্দময়ী ছিলেন। অর্থাভাবে অসহনীয় কষ্ট হইলেও তিনি পতি-মুখ-সন্দর্শনে সকলই বিস্মৃত হইতেন। মধুসূদন স্বভাবতঃ অমিতব্যয়ী ছিলেন ও তজ্জন্য অর্থাভাব-কষ্টও তাঁহার চিরানুচর ছিল। ধন ও ঐশ্বর্য্য তিনি লোষ্ট্রবৎ দেখিতেন; লালবাজারে থাকিয়া স্বল্প আয়ে যেরূপ "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিতেন, পরে পদ ও উপার্জ্জন বৃদ্ধি হইলেও সেইরূপ তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় চতুর্গুণ হইত; তবে তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্তের পরিচয় এই যে, যত অভাবই হউক না কেন, অন্যের দুঃখ ও কষ্ট মোচনের জন্য তিনি সতত মুক্তহস্ত থাকিতেন। এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ের জন্য তাঁহার বণিতা শ্রীমতী হেনরিয়েটা যখনই কাতর হইয়া আমার পিতৃদেবকে জানাইতেন ও তাঁহার স্বামীকে পরিমিত ব্যয় করিতে অনুরোধ করিতে বলিতেন, তখনই পিতৃদেব মধুসূদনকে ঐ কথা বলিলে তিনি সে বিষয় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া

বলিতেন—"গৌর ! ও আমার দ্বারায় হবে না, আমাকে সমাজের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে হইবে।"

বেলগেছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের সময় বাঙ্গালা নাটকের অবস্থা ও দুর্গতি দেখিয়া মধুসূদনের উন্নতভাবে নাটক লিখিবার অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ প্রতিভা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে সাজঘরে (Green room) তিনি বলিয়াছিলেন—"আচ্ছা, আমি ভাল নাটক রচনা করিব।" বলিতে কি সেই দিন হইতেই তিনি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত পাঠে নিরত হইলেন। সেই সময় আমার পিতৃদেবের সহিত যখনই তাঁহার নিকট যাইতাম, তখনই তিনি নিজ সংস্কৃত অধ্যয়নের কথা কহিতেন। একদিন বলিলেন—'গৌর ! আমি রঘুবংশ শেষ করিয়াছি ও ভট্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি।' আবার একদিন শুনিলাম, পিতৃদেবকে বলিতেছেন, 'আমি ব্যাকরণ শেষ করিয়াছি ও অলঙ্কার-শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি; সংস্কৃত কাব্য পাঠ করিয়া আমার মন মোহিত হইয়াছে। আমি এখন বুঝিয়াছি সংস্কৃতভাষা সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ না হইলেও পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট ভাষা আছে, তাহার অন্যতম, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ ভাষায় এত রত্ন আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা কিছুই নহে, ইহা উন্নত ভাব প্রকাশে অসমর্থ ও উহা শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমি এবার নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ এক কাব্য রচনা করিব যে, তাহাতে বিদ্বজ্জনমণ্ডলী বিস্মিত ও বিমোহিত হইবেন।'

প্রায় ৪৪ বৎসর হইল, মধুসূদন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখনও তাঁহার সেই সমুজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ পরিশোভিত মধুর ও সর্ব্বচিত্তরঞ্জন মোহন মূর্ত্তি সতত নেত্রপথে প্রতিভাত হইতেছে। শ্যামলবর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডলের লাবণ্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিল, শ্বেতবর্ণ হইলে তাঁহার (কূটস্থ) অন্তরস্থ চেতনজ্যোতিঃ বদনমণ্ডলে সেরূপে প্রতিভাত হইত না। তাঁহার সে প্রশস্ত ললাট, যে অসাধারণ জ্যোতির্ম্ময় আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় এবং যে হাস্য-বিকশিত স্থূল ওষ্ঠাধর মুখমণ্ডলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল, ও যে ওষ্ঠাধর-বিনির্গত মধুময় বাক্য সততই কবিত্বশক্তির পরিচয় দিত, সে সকলই স্মৃতিপথে বিরাজমান রহিয়াছে, চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি কখনও তাঁহাকে দুঃখিত বা অসার সংসার-চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতে পাই নাই; সংসার-চিন্তা তাঁহার উন্নত অন্তঃকরণে কখন স্থান পাইত না; কোনরূপ তাপ তাঁহাকে কখন বিচলিত করিতে পারে নাই। কবি যে সিদ্ধপুরুষ ও ত্রিগুণাতীত, তাহা মধুসূদনের জীবনে প্রতীয়মান হইত। তিনি সদাই আনন্দময়, সদাই সকলের আনন্দবর্দ্ধক ও চিত্ত-আকর্ষক ছিলেন। কেহ তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়া জীবনে আর ভুলিতে পারিতেন না। তাঁহার তৈলাঙ্কিত প্রতিকৃতি পিতৃদেবের জীবনকালে গৃহ-ভিত্তির যে স্থানে বিলম্বিত ছিল, এখনও সেই স্থানেই, সেই ভাবেই

শ্রীযুক্ত লালবিহারী বসাক

শান্তির পথে

[শ্রীশান্তিকুমার রায়চৌধুরী]

তখন সবেমাত্র পরীক্ষা-সমুদ্র কোন মতে পার হইয়া, এম-এ উপাধি লইয়া, একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। হাতে বিশেষ কোন কাজ নাই। নভেল পড়িয়া, মাসিকের পাতা উল্‌টাইয়া ও সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া সময় কিছুতেই কাটাইতে পারিতেছিলাম না। কলিকাতার সমস্ত আমোদ-প্রমোদ পুরাতন হইয়া গিয়াছে; জীবন একটা নূতনত্বের আস্বাদ পাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণে কেবল দ্বিজু রায়ের সুর—'একটা নূতন কিছু কর' বাজিতেছিল; কিন্তু কি যে নূতন করিব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। কোন চাকুরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা ছিল না; কারণ, দাসত্বের গণ্ডীতে নিজেকে আবদ্ধ করিব না, সেটা স্থির। তবে কি করিব?—ব্যবসা, স্বাধীন ব্যবসা নিশ্চয়ই। কিন্তু কি এমন ব্যবসা আছে, যাহাতে আয় বেশী, খরচ কম, অথচ দেশে একটা নাম থাকিয়া যায়? ভাবিলাম, দেশে একটা দেশলায়ের কল খুলি; তাহা হইলে আর সুইডেন, জাপানের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষে দেশলায়ের উপযুক্ত কাঠ মেলা ভার; সুতরাং ও-আশা ত্যাগ করিতে হইল। কাপড়ের কল—হ্যাঁ, মন্দ নয়। তবে মিল চালাইতে গেলে নিজের অনেক শিক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ আমার পক্ষে কত কঠিন, তাহা আপনারা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। ও কি, হাসিবেন না, আপনারা জানেন যে, আজকাল উচ্চশিক্ষিত ধনী যুবকদের মধ্যে দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য একটা প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে; আমার পক্ষে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? আমার পিতা (মনে-মনে তাঁহার বুদ্ধির অনেক প্রশংসা করি) ইহধাম হইতে বিদায়-গ্রহণের সময় আমার জন্য যৎসামান্য (?) বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান; এবং আমি তাঁহার এক[illegible]ত্র পুত্র হইলেও, অত্যধিক আদর দিয়া আমার মস্তক [illegible]করেন নাই। কাজেই—একে উচ্চ-শিক্ষিত, তার উপর [illegible]ত টাকা; আবার বাঙ্গালার এই সময়—সুতরাং আমার দেশে যশঃ ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা হওয়া খুবই [illegible]াবিক। দেওয়ান গোবিন্দ-কাকা আমার হইয়া বেশ নির্ব্বিবাদে জমিদারী-কার্য্য চালাইতেছিলেন; আর, আমি আমার পড়া, লেখা, সমিতি, থিয়েটার, ক্লাব ও ভবিষ্যতের উচ্চ আশা লইয়া দিন কাটাইতেছিলাম।

কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা যখন বাস্তবে পরিণত করিবার সময় আসিল, তখনই প্রমাদ। বি-এ পাশ করিয়া একবার ভাবিলাম, "শ্রীবিলেত" ঘুরিয়া আসা যাউক। কিন্তু আমার সেকেলে 'মা'টার জন্য কিছুতেই বিলাত যাওয়া হইল না। শুনিয়া অবধি তিনি কান্না জুড়িয়া দিলেন। উঃ! সে কি কান্না! কিছুতেই থামান গেল না;—কাজেই ইস্তফা। আমার স্বদেশ-হিতৈষী বন্ধুরা হয় ত একটু নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন; কিন্তু কি করিব বলুন, দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য 'মা'কে কাঁদাইয়া বিলাত যাত্রা করা,—এতটা ঘোর স্বদেশী আমি নই।

যখন কার্য্যাভাবে এইরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে-ছিলাম, তখন ভাবিলাম, আচ্ছা, দিনকতক পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া দেখা যাউক,—কোন নূতন ব্যবসায়ের ফন্দী মস্তিষ্কে প্রবেশ করে কি না। যে কথা সেই কাজ। সেই সুন্দর প্রাতঃকালেই নব-ক্রীত জমিদারী সোণারপুরের দিকে রওয়ানা হওয়া গেল।

(২)

নূতন স্থান হইলেও প্রতিবেশীদিগের সহিত বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছে। কাছারীবাড়ীতে অনেকে সন্ধ্যার সময় অনুগ্রহ করিয়া পদধূলি প্রদান করেন। রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত তাস, দাবা, পাশা চলে; আর কেবল দা-কাটা তামাক—ঢালা আর সাজা, সাজা আর ঢালা। ইজিপ্সিয়ান সিগারেটের স্বাদ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। দ্বিপ্রহরে হয় নিদ্রা, না হয় নভেল পড়া। সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে হাওয়া খাওয়া। দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু যত গোল করিয়াছে পাশের ঐ পাঠশালাটি। বালকদের চীৎকার, উচ্চ সুরে নামতা-পাঠ ও পণ্ডিত মশায়ের হুঙ্কার। কিন্তু এই পণ্ডিত-মশাইটিকে আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। দুনিয়ায় অনেক লোক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন আর একটি দেখি নাই। এখানে আসিয়া সুরেশ আমার ডান হাত হইয়া উঠিয়াছে।

সে বড় কর্ম্মপটু। এল-এ পাশ করিয়া পৈতৃক জমিদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার লওয়াতে, তাহাকে দেশে থাকিতে হয়। সে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। নৌকা-বাওয়া, তাস, দাবা, পাশা খেলা, গান-বাজনা—সব বিষয়ে সে অগ্রগণ্য। গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ের সে সেক্রেটারী; সাধারণ-পাঠাগারের অনারারী লাইব্রেরিয়ান; এথ্‌লেটিক সোসাইটির কাপ্তেন ও থিয়েটার-ক্লাবের ম্যানেজার। গ্রাম্য যুবকদের সে সর্দ্দার; কাজেই, সুরেশকে বন্ধুভাবে পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। সুরেশ সুরসিক; শুধু তাহা নয়,—আমার লেখার সে একজন পাকা সমজদার। সে দিন সন্ধ্যার সময় সুরেশ ও প্রমথর সহিত গল্প করিতেছিলাম। বড় গরম। রোয়াকে সতরঞ্চি পাতিয়া আমরা আসর জমাইবার চেষ্টায় ছিলাম; কিন্তু তখনও সকলে অনুপস্থিত। কথায়-কথায় আমরা বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যিকদিগের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

হঠাৎ সুরেশ হাঁকিল, "কে যায়?" উত্তর আসিল, "আমি হরিচরণ।" "কে—কে, পণ্ডিত-মশাই? আসুন, আসুন, একবার পায়ের ধূলা দিন, একটু ধূমযাত্রা করে যান!" বলিয়া সুরেশ উঠিয়া পড়িল, ও মিনিট-দুইয়ের মধ্যে প্রজ্জলিত লণ্ঠন-হস্ত পণ্ডিত মশাইকে লইয়া প্রবেশ করিল।

তিনি আসিয়া লণ্ঠনটি নিভাইয়া থামের আড়ালে রাখিলেন; এবং পরক্ষণেই বলিলেন, "কৈ হে, তামাক হাঁক; অনেক কাজ আছে—এখনি যেতে হবে।" তৎপরে মলিন টুইল-সার্টের বোতামগুলি খুলিয়া সংবাদপত্রখানি তুলিয়া লইয়া ঘন-ঘন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সুরেশ আমার সহিত পণ্ডিত-মশা'য়ের পরিচয় করাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, "বিলক্ষণ, আমি এঁকে খুব চিনি। মহাশয়ের নাম ত যামিনীপ্রকাশ রায়; উত্তর দিকের বড়বিলের জমিদারীটা ত ঘোষ বাবুদের কাছ থেকে আপনারা কিনেছেন, নয়? মশায় এম-এ পাস। আমি সব খবর রাখি মশায়, সব খবর রাখি।" বলিয়া বিজ্ঞের মত শিরঃ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হ্যাঁ, আপনারও সব খবর আমি রাখি। তবে আলাপ করবার সৌভাগ্য ঘটেনি! আজ দীনের কুটীরে যে আপনার মত লোকের পদধূলি—" পণ্ডিত-মশাই বাধা দিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, আপনার মত মহৎ লোকের সহিত আলাপ করা ত আমার পক্ষে ভাগ্যের কথা।"

আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। বাহিরেও এক পসলা বৃষ্টি নামিল। পণ্ডিত-মশাই গল্প আরম্ভ করিলেন। কলিকার উপর কলিকা চলিতে লাগিল। তাঁহার কাজ যে কোথায় অন্তর্ধান করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কত গল্প,—হরিদ্বার, কামাখ্যা, লছমনঝোলা, দ্বারকা, মাদুরা, রামেশ্বর প্রভৃতি কত তীর্থস্থানের গল্প পণ্ডিত-মশাই বলিতে লাগিলেন। শেষে আসিল কাশ্মীরের গল্প। একটু উত্তেজিত হইয়াই পণ্ডিত-মশাই বলিতে লাগিলেন, "আহা, কাশ্মীর স্বর্গ, স্বর্গ, এ পৃথিবীর স্বর্গ। যে কাশ্মীর দেখেনি, সে কিছুই দেখেনি। কি সুন্দর সে দৃশ্য! না দেখ্‌লে বোঝান যায় না। আর কি সুন্দর সে দেশের লোকদের চেহারা! যে দিকেই চাও, সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই, চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। হুঁ,—বুঝেছেন মশায়—ও দেশে একটা আশ্চর্য্য গল্প শোনা গেল—পাহাড়ের উপরে মন্দিরে, শীতের গোড়ায় পুরুত এসে একটা প্রদীপ জ্বেলে রেখে দিয়ে যায়। তার পরে শীতকালে পাহাড় বরফে ঢেকে থাকে। চৈত্র মাসে যখন বরফ গল্‌তে আরম্ভ হয়, তখন সবাই গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখে—প্রদীপটা তখনও ঠিক জ্বল্‌ছে। অবশ্য এটা আমি শুনিছি, দেখবার সুযোগ হয়নি।"

এ রকম কত গল্প আমরা নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছিলাম। হঠাৎ তিনি বলিলেন, "বৃষ্টি বোধ হয় ধরেছে।" এই বলিয়া হস্ত বাড়াইয়া কিছুক্ষণ অনুভব করিলেন। পরক্ষণেই লণ্ঠনটি জ্বালাইয়া হাতে লইয়া "তাহা হইলে আপনারা বসুন, এগোনো যাক্" বলিয়া সিঁড়ির ধারে যাইতে লাগিলেন। আমরাও সঙ্গে-সঙ্গে গেলাম; তাঁহাকে রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। এইবার আমাদের সমস্ত গল্পের কেন্দ্র হইল পণ্ডিত-মশাই। সুরেশ বলিল "সব গাঁজাখুরি।" আর একজন বলিল, "তা' হ'লে এ সব গল্প কোথা থেকে পেলেন?" আমি বলিলাম, "হয় ত লোকটা অনেক দেশে ঘুরেচে।" সুরেশ বলিল "ধেৎ, পয়সা পাবে কোথায়?" প্রথম ব্যক্তি কহিল, "তবে কি তুমি বল্‌তে চাও যে, গল্পগুলা নিজে তৈয়ারী করেছে?"

আমি। সে সব আলাদা ক্ষমতার দরকার, যে-সে লোকে পারে না। তোমার কথা মান্‌তে গেলেও ত বুঝতে হবে যে, ভদ্রলোক বেশ লেখাপড়া জানেন।

সুরেশ। কি জানি ভাই। তবে চাষাদের কাছে

পণ্ডিত-মহাশয়ের খুব খাতির—একেবারে ডেজারটেড্ ভিলেজের স্কুল-মাষ্টার। কিছুই বোঝা যায় না ভাই। কেউ-কেউ বলে উনি গ্রাজুয়েট। আমার ত বোধ হয় সব ঢুঁঢুঁস্।—লোকটা আজ বছর-দশেক এখানে এসেছে; তার আগে কোথায় ছিল, তা বলতে চায় না। কিম্ভূতকিমাকার লোক। কারুর সঙ্গে পারত-পক্ষে মিশবে না, কিন্তু যে কাজই করতে বল না কেন, তৎক্ষণাৎ করবে। তোমার কোন সামান্য উপকারের জন্য সমস্ত দিন পরিশ্রম করতে কষ্ট বোধ করবে না! অত গম্ভীর লোক—কিন্তু ছেলেপিলেদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। লোকটার আদি-অন্ত পাওয়া ভার।" বলিয়া গড়গড়ার নলটা তুলিয়া লইল। আমি বলিলাম, "দেখ, কা'ল পাঠশালার ছুটীর পর দেখি, তোমার পণ্ডিত-মশাই যাচ্ছেন; পেছনে ছেলের দল—কেউ বক দেখাচ্ছে, কেউ বেত কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে, কেউ চাদর ধরে টানছে; আর তোমার পণ্ডিত-মশাই চেঁচাচ্ছেন 'কে রে মেধো, আয় ত এদিকে, কাণটা মলে দি। ও কি সুরেশ, পালান হচ্ছে, আচ্ছা কা'ল স্কুলে আসবে না, তখন দেখা যাবে। সুরো, ফের বদমাইসি! আচ্ছা তোমার বাবার কাছে বলে দেব।' কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কাউকে মারছে না।" সুরেশ বেশ একটা সুখটান দিয়া, নলটী প্রমথর হাতে দিয়া বলিল, "আজ যদি স্কুলে গিয়ে দেখতে, তবে আরও অবাক হ'য়ে যেতে। কালকের মেধো, যেদো, সুরো সকলেই এসেছে, কিন্তু পণ্ডিত মশাই যেন কালকের কথা একেবারে ভুলে গেছেন, এইরকম ভাব। ছেলেদের কখনও মারেন না। ছেলেরা ওঁর সঙ্গে ও-রকম বদমাইসি করে বটে, কিন্তু ভারি ভক্তি করে।"

আমি বলিলাম "বল কি, আমারও যে ভক্তির উদ্রেক হচ্ছে।"

(৩)

এই পণ্ডিত-মশাইটী কে, তা জানবার জন্য আমার মনে একটা প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে;—তাহা আমি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। লোকটার বয়স ৩৫।৩৬শের বেশী নয়; অথচ যেন বার্দ্ধক্যভাবাপন্ন। চেহারা দেখিলে এককালে যে বেশ সুপুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেখিলে মনে হয় যে, লোকটার উপর দিয়া একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। আপনার বলিবার কেহ নাই; কাহারও সঙ্গে মেলামেশাও করেন না। মাঝে-মাঝে কি বিড়বিড় করিয়া বকেন। উন্মাদ না কি? অথচ যে সমস্ত গুণের কথা শোনা গেল, তাহাতে লোকটার উপর ভক্তির উদ্রেক হয়।

পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন মাঝে-মাঝে আমার "গরীবখানায়" পদধূলি দেন। সে দিন বৈকালে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রার পর টেনিসনের ওয়ার্কসটা লইয়া একটু নাড়া-চাড়া করিতেছিলাম, এমন সময় পণ্ডিতমশাই আসিয়া বলিলেন "কি হচ্ছে মশায়?" আমি উত্তর করিলাম "এই একটু বইটই উলটান যাচ্ছে। আপনারা ত আর কেউ অধীনের প্রতি নেক্‌নজর করেন না; দুপুরবেলাটা কাটাই কি করে?"

পণ্ডিতমশায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বই?" আমি বলিলাম "আজ্ঞে, ও একখানা ইংরাজি কবিতাপুস্তক।" "নামটা শুনতে পারি কি, মুখ্যু-শুখ্যু হ'লেও বাল্যকালে একটু-আধটু ইংরাজি পড়া গিয়াছিল, নামটা বোধ হয় বুঝতে পারব।" বেশ একটু যেন শ্লেষপূর্ণ স্বরে পণ্ডিত-মশাই কথাটা বলিলেন। আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "আজ্ঞে না, তা ঠিক; ও তা—এই টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়াম্ (In Memorium) খানা দেখছিলুম।" একটু মৃদু হাসিয়া পণ্ডিতমশায় বলিলেন "আপনি বুঝি টেনিসনের ভক্ত?" "না ভক্ত-টক্ত না; তবে লাগে মন্দ নয়। বিশেষতঃ এইখানা বেশ লাগে" বলিয়া পুস্তকখানি হাতে তুলিয়া লইলাম। "হ্যাঁ, ঠিক, ইন মেমোরিয়াম্ কার না ভাল লাগে মশায়। ওটা ত আর শুধু কাব্য নয়—প্রত্যেক ছত্রে-ছত্রে দর্শনের প্রশ্নের মীমাংসা! উচ্চ অঙ্গের কাব্যমাত্রেই দর্শন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলুন, ব্রাউনিং বলুন, প্রত্যেকের কবিতা দর্শনের নামান্তর। কবিতার সৌন্দর্য্য শুধু কথা সাজানর উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ভাবের সমাবেশের উপর।" আমি অবাক্ হইয়া পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম,—একটা সামান্য পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের মুখ হইতে এইরূপ তথ্যপূর্ণ বাক্য শুনিতে কেহ আশা করে কি? পণ্ডিতমশায় ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন, "কি সুন্দর লেখা" বলিয়া গোড়া হইতে অনেকদূর আবৃত্তি করিয়া গেলেন। আমি মূঢ়ের মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে বিস্ময়ের প্রথম ঘোর

কাটিয়া গেলে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পণ্ডিতমশায়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশায়, তা হ'লে গুজব যে আপনি গ্রাজুয়েট—সেটা ঠিক ?"

"আরে রামঃ, ছ'লাইন ইংরাজি শুনিয়া যে খাতির করতে আরম্ভ করলেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি। ওসব কিছু নয়" অতি দ্রুত পণ্ডিতমশায় এই কথা বলিলেন। বুঝিলাম, ক্ষণিক উত্তেজনার বশে পণ্ডিতমশায় আপনার বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন ; তাহা এখন ঢাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।

আমি বলিলাম "মহাশয়, এখন আর গোপন করা বৃথা। আপনার জীবন যে কোনও রহস্যজালে আবৃত, তাতে আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতমশায়, যদি একদিনের জন্যও আমাকে বন্ধুভাবে ভেবে থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার জীবনের অতীত কাহিনী বলুন,—এই আমার অনুরোধ। আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, এ কথা আর কেউ ঘূণাক্ষরে জানতে পারবে না।"

দেখিলাম, পণ্ডিতমশায়ের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আপনি যা ধরেছেন, সেটা ঠিক। শুধু বি-এ কেন, তার চেয়ে আরও উচ্চ ডিগ্রী আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সব তেলচিটে কাগজ টুকরো-টুকরো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।" বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমি সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিলাম "আপনি এম-এ পাস! তবে আপনি এমন হীনভাবে জীবন-যাপন করেন কেন? আপনি ত অনায়াসেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন।"

"সে অনেক কথা, সে সব শুনে আপনার কোন লাভ নাই। এখানকার লোক কেউ সে কথা জানে না। কাউকে জীবনান্তেও কখন বলব না। আমি এদের কাছে মুখ্যু পণ্ডিতমশায়ই থাকতে চাই,—তাতেই আমার তৃপ্তি, তাতেই আমার আনন্দ।" তাঁহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। কিন্তু নির্দ্দয় আমি—তাঁহার হাতদুটী ধরিয়া বলিলাম, "পণ্ডিতমশায়, আমি যখন আপনার পরিচয় জেনেছি, তখন আপনাকে বলতেই হবে। আপনি স্থির জানবেন, এ কথা অন্য কেউ জান্‌তে পারবে না।"

তিনি আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। বোধ হয় সে কাহিনী বলিতে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। অবশেষে হৃদয়ের সব বল একত্র করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"সে আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা। আমি এম-এ একজামিন দিয়ে ভগিনীর নিমন্ত্রণে তাঁর শ্বশুরবাড়ী যাই। বাল্যকাল হইতে পিতৃমাতৃহীন বলিয়া আমার প্রতি দিদির স্নেহ খুব গভীর ছিল। পিতা বেশ সম্পন্ন গৃহেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের পরে আট বৎসরের মধ্যেই আমার ভগিনী একটী ৬ বৎসরের ছেলে লইয়া বিধবা হইলেন। আমিও সে বৎসর এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় গেলাম। দিদিকে শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিতে হইল। কারণ পিতামাতা তাহার বহু পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি মাতুলালয়ে প্রতি-পালিত, ছুটীর সময় মামার বাড়ীই যাইতাম। সেবার দিদির কাছেই গেলাম। আহা, অভাগিনী ভগিনী আমার! তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য সর্ব্বদাই আমি চেষ্টা করিতাম। কিন্তু পরিণামে আমিই যে তাঁর সর্ব্বনাশের কারণ হইব, হায়, তাহা কে জানিত! ওঃ!" পণ্ডিতমশায় একটু চুপ করিলেন। উন্মুক্ত মাঠের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "নাঃ! শুনুন, আপনাকে বলব—যদি কিছু শান্তি পাই। উঃ! অসহ্য সে জ্বালা! তার পর মশাই, ছুটীতে দিদির কাছেই গেলাম। বেশ সুখেই দিন কাটিতে লাগিল। একদিন দিদি বল্লেন, 'দেখ্‌ হরি, তুই যে ক'দিন আছিস, ছেলেটাকে একটু-একটু দেখিস্‌। ওর পড়াশুনার উপরই আমার সমস্ত নির্ভর করছে—ওই একটিমাত্র আশা নিয়েই আমি বেঁচে আছি' বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল টানিয়া দিলেন।"

(৪)

কোন কায-কর্ম্মই ছিল না আমার। শুধু দিদির আদুরে ছেলে সুবোধচন্দ্রকে লইয়া সকাল-বিকাল একটু পড়িবার ঘরে বসা। সুবোধ বদমাইসিতে বরাবরই প্রথম। কিন্তু পড়াশুনার বেলায় বড়ই গোল। তার নামে নালিশ শুনিতে-শুনিতে আমি হায়রাণ,—আজ সে মোড়লদের গাছের কাঁচামিঠে আমগুলি সব পাড়িয়া বাড়ী-বাড়ী বণ্টন করিয়া দিয়াছে ; কাল সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাধের নেবুর গাছটা কাটিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছে,—এই রকম। রাগিয়া তাহাকে শাসন করিতে চাই ; কিন্তু দিদি

সাইলক ও জেসিকা

সেক্সপীয়র মার্চেণ্ট অব ভেনিস, ২য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য

Emerald Ptg. Works.

যখন সজল চক্ষে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান—আমার কঠিন হস্ত কোমল হইয়া যায়; হাতের বেত মাটীতে পড়িয়া যায়। একদিন তাহাকে আর ক্ষমা করিতে পারিলাম না। সবেমাত্র তখন সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া বাটী ফিরিতে-ছিলাম, পথে হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, হাফ ইয়ার্লীতে সমস্ত বিষয়েই সুবোধ অত্যন্ত কম নম্বর পাইয়াছে। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। তার পর যখন বাটী আসিয়া শুনিলাম যে, সে ও-পাড়ার বাগ্‌দী ছেলেদের সহিত মারামারি করিয়াছে—তাহারা নালিশ করিতে আসিয়াছে, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। দিদির কোল হইতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া বেতগাছটি লইয়া দারুণ প্রহার করিলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় বালক চীৎকার করিতে লাগিল। 'ওরে মরে যাবে রে' বলিয়া দিদি ছুটিয়া আসিলেন। আমি গর্জ্জিয়া কহিলাম 'আপদের মরাই মঙ্গল।' দিদি তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

"অভিমানী বালক সে অপমান সহ্য করিল না—ওঃ সে তার নির্ম্মম প্রতিশোধ দিয়া গেল।" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি এত বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলাম যে একটা সান্ত্বনার কথা পর্য্যন্ত মুখ হইতে বাহির হইল না। কাপড়ের খুঁটে চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন "পর দিন সকাল-বেলা বাটীর ঝির চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—গিয়া দেখিলাম যে রান্নাঘরের দাওয়ায় দড়িতে ঝুলান সুবোধের মৃতদেহ, আর তার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিতা দিদি। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। হায় ভগবান লঘুপাপে এ গুরুশাস্তি কেন দিলে! হায় অভিমানী বালক!

"দিদির মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু আর তিনি উঠিলেন না। জ্বর হইল; ক্রমে বিকার। অনেক চেষ্টা করিলাম, যদি দিদিকে বাঁচাইতে পারি। কত বিনিদ্র রজনী দিদির পদপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। কত সময় তাঁর পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছি 'অভিমান করে চলে যেও না দিদি,—ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর।' কিন্তু শুনিবে কে? দিদি তখন অজ্ঞান। হঠাৎ একদিন দিদির চেতনা হইল—তাও ক্ষণেকের জন্য। আমি তাঁর পদদ্বয় বক্ষে টানিয়া আনিয়া বলিলাম 'মাপ কর দিদি, ছোট ভাইকে মাপ কর। আমার মত পাষণ্ডের ক্ষমা নাই জানি, তবু তুমি দেবী—তুমি ক্ষমা করতে জান।' সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়া দিদি কহিলেন 'ভাই, ছোট ভায়ের উপর কেউ কখন কি রাগ করতে পারে? ক্ষমা তোকে অনেক দিন আগেই করেছি। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। তুই কাঁদিস নি, আজ আমি পতি-পুত্র এক-সঙ্গে পাব।'

"সতীর চক্ষু চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল। শ্মশানে যখন সেই দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, তখন ভাবিলাম—এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?—আমি! নরঘাতক পাষণ্ড আমি। আর গৃহে ফিরিতে পারিলাম না। দুই বৎসর ক্রমাগত তীর্থে-তীর্থে ঘুরিলাম। অনেক সাধুর সহিত বেড়াইলাম। অর্দ্ধাশনে অনশনে, অনিদ্রায় হৃদয় পলে-পলে ক্ষয় করিয়াছি; ভাবিয়াছিলাম, এই আমার প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু শান্তি কৈ, হৃদয়ের জ্বালা নেভে কই? সকালে-সন্ধ্যায়, শয়নে-স্বপনে দুইখানি মৃত্যুপাংশু মুখ আমার হৃদয় জুড়িয়া আছে। স্মৃতি হইতে তাহাদের বিদায় দিতে পারিলাম কৈ?

"প্রতি কর্ম্মের মাঝে হৃদয়ে বাজিয়া ওঠে—আমি নর-ঘাতক। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই পদপ্রান্তে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি 'ওগো, বলে দাও—আমার প্রায়শ্চিত্ত কি?' তারা পাগল ব'লে উপহাস ক'রে চলে যায়। বদরীনারায়ণের পথে একজন সৌম্যমূর্ত্তি সাধুর সাক্ষাৎ পাইলাম। তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া প্রাণ খুলিয়া সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি স্থিরচিত্তে শুনিলেন। তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবা, আমার শান্তির পথ দেখিয়ে দাও।' স্মিত-হাস্যে মহাপুরুষ উত্তর করিলেন 'মনে করেছেন,—সংসার ত্যাগ করে পাগলের মত তীর্থে-তীর্থে বেড়িয়ে মনে শান্তি পাবেন, তাদের ভুলতে পারবেন;—সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সংসারে ফিরে যান। আপনার নির্ম্মমতায় যে বালক প্রাণ-ত্যাগ করেছে, তারই ছায়া—তারই প্রতিমা, অন্য বালকদের সঙ্গে মিশুন। তাদের ভালবেসে, তাদের উন্নতির চেষ্টা করে, বুক দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। তাতেই শান্তি পাবেন। বালকদের কাছ থেকে যত দূরে থাকবেন, ততই সেই করুণ দৃশ্য আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে—কিছুতেই দূর করতে পারবেন না। ফিরে যান, সংসারে গিয়ে আপনার সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা আপনার সেই সুবোধচন্দ্রেরই প্রতিমূর্ত্তি অন্য বালকদের সুখের জন্য

নিয়োগ করুন। নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে তাদের সুখে রাখতে চেষ্টা করুন—শান্তি ফিরে পাবেন।'

"ফিরিয়া আসিলাম। আমার অহঙ্কারের, আমার গৌরবের একমাত্র দ্রব্য ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটগুলি টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিলাম। পৃথিবীর সব সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে এই পাঠশালা খুলে বসেছি। এই বালকদের মধ্যে থেকে, এদের ভালবেসে, এদের উন্নতির চেষ্টা করে বড় শান্তি পেয়েছি। আজ আমি প্রত্যেক বালকের মধ্যেই সুবোধচন্দ্রকে খুঁজে পেয়েছি। তাদের বুকে ধরেই আমার সুখ, আমার তৃপ্তি। এই রকমেই জীবনের বাকী কটা দিন যেন কাটে—হে ভগবান!" অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

আমি নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া এই করুণ কাহিনী শুনিতেছিলাম। গল্প থামিয়া গেল, কিন্তু আমার কর্ণে তাহা তখনও ঝঙ্কৃত হইতেছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গৃহে-গৃহে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্ষুদ্র পল্লী সচকিত করিতেছে। শঙ্খের শব্দে গ্রাম্য কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। অনতিদূরে কালী-মন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। বাটীর পশ্চাৎভাগে বাঁশঝাড়ের নিকট হইতে একদল শিবা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পূর্ণ-চন্দ্রের আলোকে গ্রামখানি হাসিয়া উঠিল। কিন্তু আমি নির্ব্বাক হইয়া পণ্ডিত-মশায়ের চন্দ্রালোকবিভাসিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি স্বর্গীয় ভাব সে বদনে প্রস্ফুটিত! সেই সকলের অনাদৃত পণ্ডিতমশায় কি দেবোপম মূর্ত্তিতে আমার নিকট প্রকাশ পাইলেন! ধীরে-ধীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

একচক্রা

[মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী]

বীরভূমের প্রধান নগর সিউড়ি হইতে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে একচক্রা নগর প্রাচীনকালে বিভবৈশ্বর্য্যে গৌরবময়ী এক বহুজনাকীর্ণ স্থান ছিল। এখন ইহা একটী অনতি-বৃহৎ গ্রামমাত্র। এ সেই একচক্রা, যাহার দরিদ্র গৃহস্থের আতিথেয়তা পৌরাণিক মহিমময় ভারতবর্ষের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠাকে একদিন উজ্জ্বল গৌরবে সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল; যে একচক্রার প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ-দম্পতি মায়াময় সংসারে অনন্যসম্বল, আপনাদের স্নেহদুলাল, নয়নানন্দ নন্দন, দ্বাদশবর্ষীয় বালক নিত্যানন্দকে এক সন্ন্যাসীর করে ভিক্ষা দান করিয়া ত্যাগের মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এ সেই একচক্রা, যে একচক্রার ভুবনবিশ্রুত সুসন্তান—অক্রোধ, পরমানন্দ, দয়াময় নিতাই আপনার পবিত্র ললাট-রক্তে আজন্ম পাপাসক্ত জগাই-মাধাইয়ের দুরদৃষ্ট-শিলালেখ চিরতরে মুছিয়া দিয়াছিলেন, মহাপকে হরিপ্রেম-রসে মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দের পিতার নাম হাড়াই ওঝা, পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুরী। মাতার নাম পদ্মাবতী। ওঝা ইহাদের কৌলিক উপাধি নহে। লোকে হাড়াই পণ্ডিতকে তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য ওঝা বলিয়া ডাকিত। ইঁহারা রাঢ়ীয় সমাজের সন্দিগ্ধ শ্রোত্রীয় সিন্দুরামল্ল গ্রামী (গাঁই) ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলাচার্য্যগণ বলেন 'কশ্চিৎ বড়ালঃ কশ্চিৎ সিন্দুরামল্লবন্দ্যঃ ইতি দ্বিধাতো বীরভদ্রী শঙ্কেতঃ।'

নিতাই তনয় বীরভদ্র নাম তার।
স্বনামে হইল তার ভাবের সঞ্চার॥
সিন্দুরামল্লক গাঁই আছিল নিতাই।
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই॥
বংশগাঁই হলে করি কুল অপচয়।
উদাসীন হ'লে কভু জাতি নাহি রয়॥
উভয় বর্জ্জনে বীর শঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রচনা করিল॥

কিঞ্চিদূন প্রায় সার্দ্ধ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ১৩৯৫ শকাব্দার মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। নিতাইয়ের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নামক এক সন্ন্যাসী একদিন একচক্রায় আসিয়া উপস্থিত হন। হাড়াই পণ্ডিতের আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হইয়া বিদায়গ্রহণকালে পুরী তাঁহার নিকট ভিক্ষা' প্রার্থনা করেন। পণ্ডিত পুরীর প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলে, তিনি

আপনার তীর্থ-সহচর করিবার জন্য নিত্যানন্দকে ভিক্ষা-লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। হাড়াই ওঝা ও পদ্মাবতী অকুণ্ঠিতচিত্তে নিতাইকে সন্ন্যাসীর করে সমর্পণ করিয়া দেন। অতঃপর সন্ন্যাসীসহ নিত্যানন্দ প্রভু বীরভূমের বক্রেশ্বর তীর্থদর্শন-পূর্ব্বক বৈদ্যনাথ, গয়াক্ষেত্র প্রভৃতি বহুবিধ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পণ্ডরপুরে গিয়া উপনীত হন। এই স্থানে লক্ষ্মীপতি পুরী তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তীর্থপর্য্যটন সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সহিত নিত্যানন্দের মিলন হইয়াছিল। দীক্ষা-গ্রহণের পর নিত্যানন্দ আরো বহু তীর্থ-পর্য্যটনান্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া উপনীত হন। তথায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকারের কিয়দ্দিন পরেই তিনি বঙ্গের ব্রজভূমি নদীয়ায় আসিয়া নন্দন আচার্য্যের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

নন্দন আচার্য্যের গৃহেই শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার শুভ-সম্মিলন সংঘটিত হয়। বীরভূমের কি গৌরবের সেই দিন! কি শুভদিনে, কি পুণ্য মাহেন্দ্রক্ষণেই এই চন্দ্র-সূর্য্যের মিলন হইয়াছিল। বঙ্গের নবজীবন-প্রভাতের কি সেই মহান্ স্বর্গীয় চিত্র, যে চিত্র কল্পনানেত্রে দর্শন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ আজ অবনতশিরে ভক্তি-গদগদস্বরে উচ্চারণ করিতেছে

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

শ্রীচৈতন্যদেব এতদিন একাকী ছিলেন, এখন তাঁহার উপযুক্ত সঙ্গী জুটিল। নবদ্বীপ মাতিয়া উঠিল। উচ্চ হরিনাম কীর্ত্তনের মধুময় রোল নদীয়ার গগন-পবন ছাইয়া ফেলিল। কিছুদিন অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণসহ ইষ্ট-গোষ্টির পর নবদ্বীপের দ্বারে-দ্বারে প্রকাশ্যভাবে হরিনাম প্রচারিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে নবযুগের সঞ্চার হইল। এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন প্রথমে মাত্র দুইজন; এক—যবন হরিদাস—যিনি মার খাইয়া মৃতকল্প হইয়াও নাম পরিত্যাগ করেন নাই; আর দ্বিতীয়—আমাদের নিত্যানন্দ—যাঁহার অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী ও পিতামাতায়—গৃহে ও বিজন অরণ্যে—সমজ্ঞান ছিল; যিনি বাল্যকালেই পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অকুণ্ঠিত-চিত্তে আজন্ম-অপরিচিত ভিক্ষুকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই অক্রোধ, পরমানন্দ, দয়াবতার নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। মার খাইয়া বলিয়াছিলেন,—

মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি,
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তাহে ক্ষতি নাই
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই।

মাধাই তাঁহাকে কলসীর কানা ছুড়িয়া মারিয়াছে; ললাট হইতে দরবিগলিত-ধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে; কিন্তু তাঁহার কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি তবু সেই অধম, পতিত হতভাগাকে কোল দিবার জন্য বাহু পশারিয়া ছুটিয়াছেন। কি অপূর্ব্ব সেই চিত্র! বীরভূমিই তাহার নিপুণ তুলিকায় সে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। নিত্যানন্দের শেষ জীবন অতিবাহিত হয় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী থড়দহ গ্রামে। শ্রীচৈতন্য প্রভুর সহিত নাম বিলাইতে বিলাইতে তিনি একবার তাঁহার জন্মভূমিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু একচক্রায় আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নামে বীরচন্দ্রপুর গ্রাম ও তৎ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিমরায় বিগ্রহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ভক্তি-রত্নাকরে উল্লিখিত আছে—জাহ্নবী দেবী শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা-পথে একচক্রায় আসিয়া দুইচারিদিন অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন। ১৪৬৪ শকে শ্রীনিত্যানন্দের তিরোভাব হয়।

একচক্রার সীমা পূর্ব্বকালে বহুদূর বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ আছে যে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীর হইতে রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া নামক গ্রামের সীমান্তস্থিত বিল পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে দশ ক্রোশ এবং ই আই রেলওয়ে ষ্টেশন মল্লারপুরের পশ্চিমস্থ শিবপাহাড়ি নামক পাহাড় হইতে ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় দশক্রোশ স্থান একচক্রা নামে বিখ্যাত ছিল। বর্ত্তমান একচক্রা এখন খলৎপুর বা গর্ভবাস, বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর, কোটাসুর, ময়ূরেশ্বর বা মৌড়েশ্বর, ডবাক বা ডাবুক, অসুরালয় বা অসুলা প্রভৃতি নামে নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। খলৎপুর ও বীরচন্দ্রপুরের মধ্যে যমুনা নাম্নী একটা স্বল্পতোয়া তটিনী প্রবাহিতা হইয়া উভয় স্থানের পার্থক্য রক্ষা করিতেছে। খলৎপুর বা গর্ভবাসেই নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। প্রবাদ—নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মহেতু খলৎপুর

গর্ভবাস নামে পরিচিত হইয়াছে। গর্ভবাসে নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই পণ্ডিতের বাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বীরচন্দ্রপুরের গোস্বামী-সন্তানগণ একটা জীর্ণ মন্দির ও কতকটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে নিত্যানন্দ প্রভুর সূতিকা-গৃহের ধ্বংসস্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জীর্ণ মন্দিরটা ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহা পরবর্ত্তী কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া ঈশ্বর পুরী যেখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থান এখন বিশ্রামতলা নামে পরিচিত হইয়াছে।

একটী বকুল বৃক্ষকে দেখাইয়া বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন যে, এই বকুলবৃক্ষে আরোহণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বাল্য-ক্রীড়া করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দকে বৈষ্ণবগণ অনন্তের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, এই জন্যই বকুলবৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলির আকার সর্পের ন্যায়। আমরা সেই বকুলবৃক্ষটাকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। বাস্তবিকই বৃক্ষের কোন-কোন শাখা-প্রশাখা দেখিতে সর্পের মত। গর্ভবাসের অপর পার্শ্বে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে বীরচন্দ্রপুর। শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু এই স্থানে বঙ্কিমরায় নামক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়া একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সেই গ্রাম বীরচন্দ্রপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্যাবধি শ্রীবঙ্কিমরায় বিগ্রহ বীরচন্দ্র-পুরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। গোস্বামীগণ বলেন, শ্রীবঙ্কিম-রায়ের দুই পার্শ্বে যে দুইটি শ্রীমতী-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, তাহার একটি বসুধা, অপরটি জাহ্নবীদেবীর—অর্থাৎ বীরচন্দ্র প্রভুর মাতা ও বিমাতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহারা শ্রীরাধিকার ধ্যানে পূজিতা হইতেছেন। শ্রীবঙ্কিমরায়ের মন্দিরেই একটি দশভূজা মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। যাঁহারা শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাম্প্রদায়িক কলহের উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, বীরচন্দ্র-পুরে একজন দেশপূজ্য নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠিত এই শক্তি-মূর্ত্তি তাঁহাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রথম জীবনে নিত্যা-নন্দের অবধূত বলিয়া খ্যাতি ছিল। নিত্যানন্দের পিতৃদেব হাড়াই পণ্ডিতের গৃহদেবতা প্রাচীন দশভুজা মূর্ত্তি ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় তাহার স্থানে এই নূতন দুর্গা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন।

বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাসে বৈষ্ণবগণের কয়েকটা আশ্রমে দেবসেবা প্রতিষ্ঠিত আছে; যথা—বীরচন্দ্রপুরে বঙ্কিমরায় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। বিশ্রামতলায় রামকৃষ্ণ বিগ্রহ। কদম্বখণ্ডির আশ্রমে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ। গর্ভবাসে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ বিগ্রহ। বকুলতলায় রাধাকান্ত বিগ্রহ। গর্ভ-বাসের অদূরে চোঙাধারি বাবাজি নামক একজন সাধকের আশ্রমে গিরিধারী বিগ্রহ-মূর্ত্তির সেবা আছে। চোঙাধারী বাবাজী শতাধিক বৎসরকাল দেহ ধারণ করিয়া সম্প্রতি স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তিনি একজন ভক্তিমান্ সাধক ছিলেন। বীরচন্দ্রপুরের পশ্চিমে ডবাক্ বা ডাবুক নামক স্থান। (১) এখানে ডাবুকেশ্বর নামে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই স্থানের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই বিলুপ্তাব-শেষের উপর কতকগুলি মুসলমান গৃহস্থ বাস করিত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কৈলাসপতি নামক একজন সন্ন্যাসী ডবাকে আসিয়া উপস্থিত হন; এবং তথায় যে এক সমৃদ্ধি-শালী নগরী ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা প্রকাশ করেন। কৈলাসপতি গোস্বামী বহু চেষ্টার পর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বাহির করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় শিবের উদ্ধার-সাধনপূর্ব্বক তথায় মন্দিরাদি নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে তাঁহার মন্দির-গঠন পরিসমাপ্ত হয়। এখন যেখানে শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় যে দুইচারিজন মুসলমানের বাস ছিল, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে গোস্বামীকে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

শুনিয়াছি, এই কার্য্যে তাঁহার প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ডবাকের অনতিদূরে মৌড়পুর গ্রাম। তথায় মৌড়েশ্বর নামে শিব বিদ্যমান রহিয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবতে মৌড়েশ্বর শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কতদূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥

ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে জাহ্নবী দেবী

মৌড়েশ্বরে গিয়া কৈলা শিবের দর্শন।
যাঁরে পূজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন॥

প্রবাদ—মৌড়েশ্বরে মুকুটরায় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শিব মুকুটেশ্বর অপভ্রংশে মৌড়েশ্বরে

(১) কে জানে প্রাচীন 'ডবাক' নামের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

পরিণত হইয়াছেন। মৌড়েশ্বরের ধ্বংসস্তূপ দেখিলে রাজপ্রাসাদের অনুমান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত এই মৌড়েশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। মৌড়েশ্বরের বৈদ্যবংশ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মহিমময়ী মাতৃভূমি বীরভূমির মৌড়েশ্বর নগরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। এতদঞ্চলে এক অতি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, যে, পুরাকালে দুম্মদ সেন নামক কোন ক্ষত্রিয় নরপতি একচক্রায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল দুর্জ্জয়কোট। অনপত্য দুম্মদ সেন মদনেশ্বর শিবের নিকট প্রার্থনা করিয়া এক পুত্রলাভ করেন। তাঁহার নাম রাখেন মদন দাস। দুম্মদ সেনের পরলোক-গমনের পর মদন দাসের রাজত্ব-সময়ে রাজ্য-মধ্যে দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। 'বক' নামক এক দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস একচক্রায় আসিয়া মদন দাসকে সপরিবারে বিনষ্ট করিয়া একচক্রার আধিপত্য গ্রহণ করে। কিংবদন্তী অনুসারে রাক্ষস ও অসুর এক পর্য্যায়ভুক্ত

বীরচন্দ্রপুর—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সূতিকাগৃহ

চক্রপাণির পিতার নাম নারায়ণ; জ্যেষ্ঠের নাম ভানু। চক্রপাণির অধ্যাপকের নাম মহাকবি নয়দত্ত। নিদানের মাধবকর চক্রপাণির সমসাময়িক। চক্রপাণি-প্রণীত 'চক্রদত্ত' ও 'দ্রব্যগুণ' আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন। এতদ্ভিন্ন তিনি সর্ব্বসারসংগ্রহ শব্দচন্দ্রিকা অভিধান, এবং চরক ও সুশ্রুতের টীকা প্রণয়ন করেন। চক্রপাণি আপনার পিতা নারায়ণকে গৌড়েশ্বরের রসবত্যাধিকারী পাত্র অর্থাৎ খাদ্য-পরীক্ষক অমাত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।
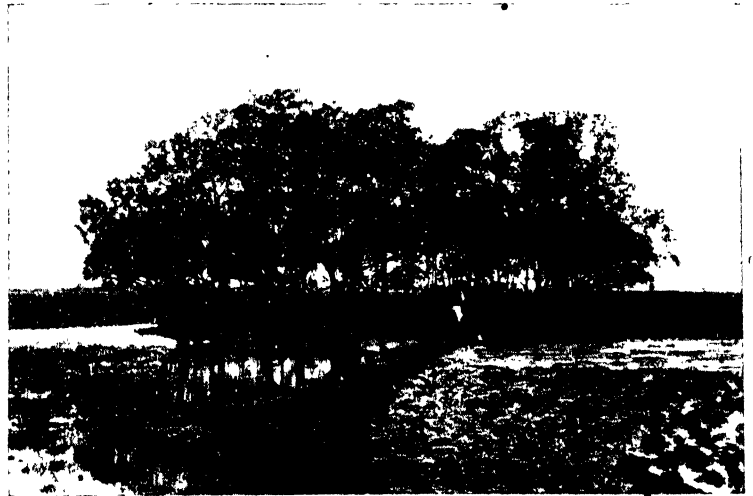
একচক্রা—পাণ্ডবতলা

'চক্রদত্ত' ও 'দ্রব্যগুণের' টীকাকার শিবদাস সেন তৎসাময়িক গৌড়েশ্বরকে নয়পাল নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে নরপতি নয়পাল ১০৪০ খৃষ্টাব্দে গৌড়সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সুতরাং প্রায় সার্দ্ধ-অষ্টশত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত চক্রপাণি দত্ত ও হইয়া যাওয়ায় তদবধি দুর্জ্জয়কোটের নাম হইয়াছে অসুর কোট। মৌড়েশ্বরের অদূরে কোটাসুর গ্রাম ও মদনেশ্বর শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কোটাসুরের দুই ক্রোশ ব্যবধানে, অসুরালয় নামক এক গ্রামের মধ্যে অসুরডাঙ্গা নামে এক উচ্চ ভূমিখণ্ড বক

রাক্ষসের বাসস্থান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে। এতদঞ্চলের জনসাধারণের বিশ্বাস—এই একচক্রা নগরী ও বক রাক্ষসের কথাই মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। বারণাবতে জতুগৃহ-দাহের পর পাণ্ডবগণ আসিয়া এই একচক্রা নগরে বাস করেন এবং ভীম কর্ত্তৃক বক রাক্ষস নিহত হয়। নিত্যানন্দের জন্মভূমি গর্ভবাসের অদূরে পাণ্ডবতলার মাঠে পাণ্ডবডাঙ্গা নামক একটি অকর্ষিত ভূমিকে পাণ্ডবগণের অবস্থিতি-স্থান বলিয়া আজিও লোকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বীরভূমে পাণ্ডব-আগমন সম্বন্ধীয় বহু প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে অণ্ডাল সিন্থিয়া লাইনের অজয় তীরবর্ত্তী পাণ্ডবেশ্বর ষ্টেসন্। তথায় ভীমগড়া নামক স্থান ও যুধিষ্ঠিরেশ্বর ও কুন্তীশ্বর

গৌড়েশ্বর মন্দির

প্রভৃতি ছয়টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মেদিনীপুরের অধিবাসিগণ বগড়ী নামক স্থান বক রাক্ষসের আবাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহাভারতে কিন্তু একচক্রার কোন ভৌগোলিক সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বক রাক্ষসের আবাসভূমি মহাভারতে বেত্রকীয় গৃহ নামে কথিত হইয়াছে। বেত্রকীয় গৃহে যে এক রাজা ছিলেন, মহাভারতে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা, "সেই বুদ্ধিহীন ভূপতি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। যদিও তিনি রাক্ষস বধ করিতে স্বয়ং অসমর্থ, কিন্তু যাহাতে এই সমস্ত লোকের চিরকালের নিমিত্ত কুশল হয়, যত্নপূর্ব্বক এমন
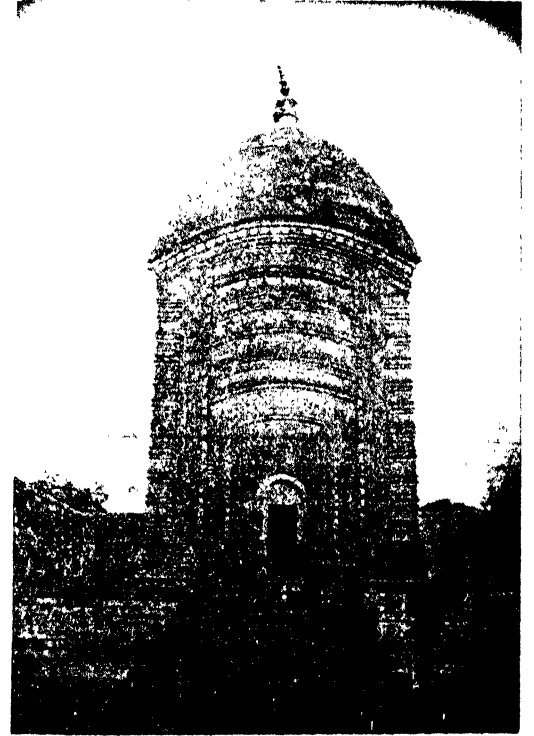
ভবাকেশ্বর শিবমন্দির

কোন উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন না।" ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই একচক্রার প্রসিদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। পঞ্চাননের কুলকারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে—

"সোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্থ কুলানুগঃ—
পুত্রাস্তে অরবিন্দাখ্য পৌত্রানাং দ্বয়মেবচ
আদিত্য শুরনৃবরৈঃ দত্যাতে বাসমুত্তমং
যয়জানো নাম গ্রামো বাসার্থেন দদৌনৃপঃ
ততশ্চতুর্দিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশ শতানিচ
সামন্তরাজরূপেণ একচক্রাবধিং দদৌ

পঞ্চদশ সহস্রানাং স্বর্ণমুদ্রাং প্রযচ্ছতে
পুত্রপৌত্রাদি ভোগেন মমাজ্ঞয়া অধীশ্বরঃ।"

কুলকারিকার মতানুসারে ৮০৪ শকে ফাল্গুন মাসে নৃপবর আদিত্যশূরের সভায় এই সোম, ঘোষ, অনাদি, বর,

বীরচন্দ্রপুর—দশাবতার-চিত্রযুক্ত বাসুদেবমূর্ত্তি

সিংহ প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থের আগমন হয়। ৮০৪ শক খৃঃ অঃ ৮৮২; সুতরাং ১০৩৩ বৎসর পূর্ব্বে এই একচক্রা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল বলিতে হইবে; অন্যথায় ইহা একটি রাজ্যের সীমান্ত-নির্দ্দেশক স্থানরূপে উল্লিখিত হইত কি না সন্দেহ। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে মৌড়েশ্বরের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে, চক্রপাণি দত্তের প্রসঙ্গে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা হইতে জানা যায়—
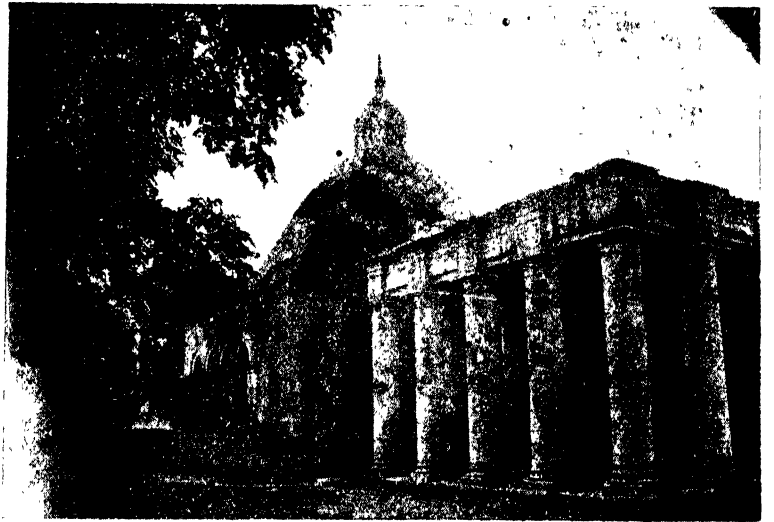
পৃথুর্ন্নৃসিংহো বিষ্ণুশ্চ লোকনাথোজনার্দ্দনঃ"
কেশবঃকৃত্তিবাসশ্চ নারায়ণনরোত্তমৌ
দণ্ডপাণিমহানন্দঃ গৌড়দেশে সমাগতঃ॥"

ইহাদের মধ্যে পৃথুর উপাধি ছিল বৃহজ্জ্যোষী, নৃসিংহের কাশপটী ও লোকনাথের আচার্য্য। কুলানন্দ রচিত গ্রহবিপ্র-কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায়, পৃথু বৃহজ্জ্যোষী 'কোট মৌড়েশ্বরে' নৃসিংহ কাশপটী 'ঋষ্যশৃঙ্গপুরে' এবং লোকনাথ আচার্য্য মধ্যরাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। গ্রহবিপ্র-সমাজ-পতিগণ তাঁহাদের রাঢ়ীয় সমাজের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'গঙ্গার পশ্চিমভাগে বালিগ্রাম সীমে।
আশি ক্রোশ মৌড়েশ্বর তাহার পশ্চিমে॥"

রাঢ়ে গ্রহবিপ্রাগমন অন্ততঃ পাঁচ-শত বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা; সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, পাচশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীর পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গবদ্ধ স্থান রূপে কোট মৌড়েশ্বর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। নরবর আদিত্যশূরের সময় মৌড়েশ্বরের এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলে একচক্রার পরিবর্ত্তে মৌড়েশ্বরই সীমান্ত-নির্দ্দেশক স্থানরূপে উল্লিখিত হইত। একচক্রা অঞ্চলে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া

বীরচন্দ্রপুর—বঙ্কিমরায়ের মূর্ত্তি

গিয়াছে। প্রাপ্ত মূর্ত্তি ও মৌড়েশ্বর প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হয় যে, তথায় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতি-পত্তি ছিল। একচক্রা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবমন্দির ও যথায়-তথায় পতিত বাসুদেব মূর্ত্তির বাহুল্য বিস্ময়জনক।

কৃষ্ণ-প্রস্তরে খোদিত বাসুদেব মূর্ত্তিগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর; কোন-কোনটা চারি হাত পরিমিত উচ্চ। বীরচন্দ্রপুরে একটি দশাবতার-চিত্রযুক্ত ভগ্ন বাসুদেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি বটবৃক্ষমূলে (ষষ্ঠীতলায়) অপরাপর বহু মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তিটী পতিত রহিয়াছে এবং ষষ্ঠী

মৌড়েশ্বর—লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি

বলিয়া পূজিতা হইতেছে। অপর মূর্ত্তিগুলি চিনিবার উপায় নাই। কালিকাপুরাণ অশীতিতম অধ্যায়ে বাসুদেব মূর্ত্তির কয়েকপ্রকার ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার বাসুদেবের অঙ্গমন্ত্র ও প্রত্যঙ্গমন্ত্রের ধ্যান আছে। এতদঞ্চলে যে বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই বাসুদেবের অঙ্গমন্ত্র ও প্রত্যঙ্গমন্ত্রের মূর্ত্তি, বাসুদেবের অর্থাৎ তাঁহার বীজমন্ত্রের প্রকৃত মূর্ত্তি কচিৎ দেখা যায়। পদ্মপুরাণে ও অগ্নিপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চালচিত্রে দশাবতার চিত্র অঙ্কিত থাকিলে তাঁহাকে ত্রিবিক্রম বাসুদেব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা কালিকাপুরাণ হইতে বাসুদেবের বীজমন্ত্রের মূর্ত্তির ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পূর্ণাচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরিস্থিতঃ
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সং বীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তেতদধোবিকচাম্বুজং
বামোর্দ্ধে চক্রমাতুগ্র্যাং ধত্তেঽধঃ শঙ্খমেবচ
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তভং হৃদিচাংশুমৎ।
ধত্তে কাক্ষহ্যধো বামে তুনিরং বাণপুরিতম্।
দক্ষিণেকোষগং খড়্গাং শন্দকং সশরাসনং
শীর্ষে কীরিটিং সদ্যোতং কর্ণয়ো কুণ্ডলদ্বয়ং।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমানাং গলস্থিতং।
দধান দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রংম্
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম।

ডবাকে প্রাপ্ত দুইটী বাসুদেব মূর্ত্তি

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের কাহারও কাহারও মতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী গুপ্ত রাজন্যবর্গের সময়ে খৃঃ অঃ ৩২০—৪৮০ খৃঃ অঃ হিন্দুভাস্কর্য্য-বিজ্ঞান পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া-

ছিল। কেহ-কেহ অনুমান করেন, প্রাচ্য-সভ্যতার চরম উন্নতিকাল খৃঃ ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দী। পূর্ব্বোদ্ধৃত ধ্যানোক্ত বাসুদেব মূর্ত্তিগুলি এই শেষোক্ত সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। বীরচন্দ্রপুর অঞ্চলের বাসুদেব মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণকাল আমরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত অনুমান করিয়া লইতে পারি। বীরভূমের অমর কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুরে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রাগুলি একই প্রকারের বলিয়া শুনিয়াছি। একটি মুদ্রা আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে 'নরবালাদিত্য' এই নাম
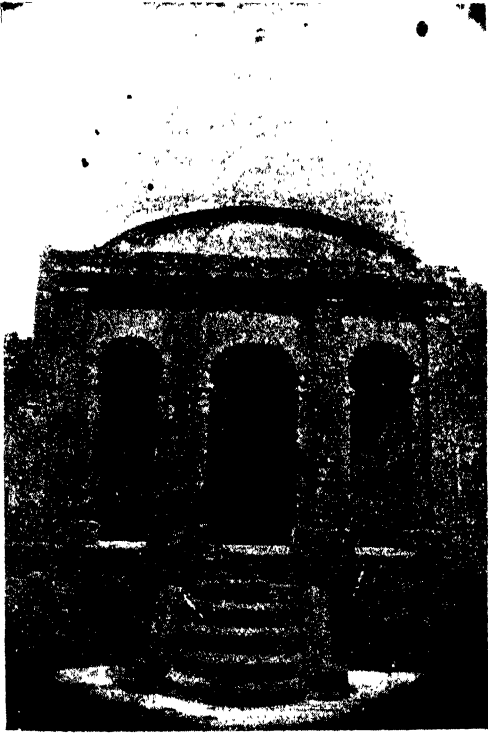
মদনেশ্বর শিবমন্দির

অঙ্কিত রহিয়াছে। অনেকেই এই 'নরবালাদিত্যকে' সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তবংশীয় 'পুরগুপ্তপুত্র' নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য বলিয়া অনুমান করেন। ইনিই তোরমানের পুত্র হূনাধিপ মিহির-কুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

আনুমানিক ৪৮০ খৃঃ অব্দে স্কন্দগুপ্তের দেবত্বলাভের পর তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন প্রথম কুমারগুপ্ত। কুমারগুপ্তের পুত্র পুরগুপ্ত। সুতরাং মালবেশ্বর রাজা যশোধর্ম্মদেবের সমসাময়িক এই নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, বীরভূমের নান্নুর প্রভৃতি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এবং গুপ্তরাজন্য সময়েই এই সমস্ত বাসুদেব মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মৌড়েশ্বরে 'পলাশবাসিনী' নাম্নী এক দেবীমূর্ত্তির পূজা হয়। শক্তি মূর্ত্তি; কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কে বা কাহারা যেন মূর্ত্তির সমস্ত অংশ চাঁচিয়া-ছুলিয়া তুলিয়া দিয়া গিয়াছে। একখণ্ড কৃষ্ণ-পাষাণ মাত্র বর্ত্তমান। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শেষ চিহ্ন নয়নপথবর্ত্তী হয়। কিন্তু তাহাতে সমগ্র মূর্ত্তির সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অসম্ভব। মন্দিরের অদূরে একটি লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমূর্ত্তি অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। এইরূপ শ্রেণীর একটি হর-গৌরীর যুগলমূর্ত্তি বক্রেশ্বর মহাপীঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত দুর্গা-সপ্তসতী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়, যেখানে-যেখানে বিশেষ শক্তি মূর্ত্তি অর্থাৎ সকলের আদি-ভূতা মহালক্ষ্মী, মহাকালী বা মহাবাণীর অথবা তাঁহাদের অংশস্বরূপা মধুকৈটভ বধাধিষ্ঠাত্রী দশবদনা কালী, কিম্বা মহিষাসুর-বধাধিষ্ঠাত্রী অষ্টাদশভুজা মহিষ-মর্দ্দিনী বা শুম্ভ-নিশুম্ভ বধাধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা সরস্বতীদেবী পূজিতা হইবেন, সেই-সেই স্থানেই হর-গৌরী, লক্ষ্মী-হৃষিকেশ ও বিরিঞ্চি-সরস্বতী এই মিথুন দেবতা (যুগলমূর্ত্তি) ত্রয় তাঁহাদের পৃষ্ঠ-দেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূজা প্রাপ্ত হইবেন। বক্রেশ্বরে পীঠাধিষ্ঠাত্রী অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দ্দিনী ও হর-গৌরীর যুগল-মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে। মৌড়েশ্বরে পলাশবাসিনী শক্তিমূর্ত্তি-সহ লক্ষ্মী হৃষিকেশের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় সুতরাং অনুমিত হইতেছে যে, পলাশবাসিনী দেবী পূর্ব্বকথিত শক্তিমূর্ত্তি-ষটকের অন্যতমা। তদ্ভিন্ন লক্ষ্মী-নারায়ণের উক্ত যুগলমূর্ত্তিটি অপর কোন কারণে থাকিতে পারে না। ভগ্নমূর্ত্তিটি যে অপর কোন স্থান হইতে আনীত হয় নাই, বিশেষ অনুসন্ধানে তাহাও অবগত হওয়া গিয়াছে। কোটাসুর প্রভৃতি স্থানেও কয়েকটি বাসুদেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত মূর্ত্তি-পরিচয় ও স্থানীয় কিম্বদন্তী আদি সময়ান্তরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

সাধনার এই নিরালা নিকেতনে—পুণ্যভূমি বীরভূমির বিজন পল্লীপ্রদেশে এইরূপ কত মহিমময় পীঠ-তীর্থ লুক্কায়িত

রহিয়াছে। যতই অনুসন্ধান করিতেছি, নিত্য-নিত্য এইরূপ নূতন-নূতন স্থানের পরিচয় লাভ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতেছি। হায়! কাহার অভিশাপে সমস্ত আজ শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে, কে বলিবে? কে বলিবে রাঢ়বঙ্গের এই মহাশ্মশানে মন্দাকিনীর পবিত্র নীরধারা প্রবাহিত করিয়া কে এই অস্থিভস্মরাশির মুক্তিবিধান করিবে? বীরভূম সেই মহা-সাধকের আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

"বিরাজ-বৌ"

(চরিত্র-বিবৃতি)

[শ্রীকাজী আবদুল্ ওয়াদুদ]

'বিরাজের' চরিত্রসৃষ্টি সাহিত্য-সংসারে অতুল; এবং ইহার স্রষ্টাকে সাহিত্য-সমাজের যে গৌরবের আসনে বসাইতে ইচ্ছা হয়,—তিনি নবীন সাহিত্যিক বলিয়া, পাঠক-সমাজ বোধ হয় এখনও তাঁহাকে তাঁর সেই প্রাপ্য সম্মান দিতে অসম্মত। আমরা তজ্জন্য দুঃখিত নহি; আমাদের আশা আছে, শরৎবাবুর লেখনীর প্রভাবেই তাঁহার প্রাপ্য সম্মান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বরণ করিবে।

'বিরাজ বৌ' গ্রন্থখানি পড়িবার কালে একটা ভাব সকলকেই বড় বেশী করিয়া লাগে,—সেটি বিরাজের 'অত্যুগ্র পতিপ্রেম'। কিন্তু শুধু এই কথা বলিলেই বিরাজের হৃদয়ের কথা বলা হয় না; এমন কি, শুধু এই ভাব লইয়া গ্রন্থের বিচার করিতে গেলে, অনেক স্থানে বিসদৃশতায় পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে। অথচ, কোন বিচারের কথা মনে না আনিয়া, শুধু বইখানি পড়িয়া গেলে, এ কথা মনে হয় না যে, গ্রন্থের কোথাও বিরোধ-সংযোগ ঘটিয়াছে। সমস্ত গ্রন্থখানি ব্যাপিয়া এমন একটি ভাবের স্পন্দন অনুভূত হয় যে, তাহা যেন বিরাজের ন্যায়-অন্যায়—সমস্ত কার্য্যকে সুশোভন করিয়া তুলিয়াছে। শিল্পী বিশেষ নিপুণতার সহিত সেই ভাবের আভাসটি মাত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; তাহাতে অতিরিক্ত রং ফলাইয়া সমগ্র সৌন্দর্য্যের হানি করেন নাই।

গ্রন্থখানির সেই বিশিষ্ট ভাবটি, বিরাজের সাধনার ভাব। বিরাজের পতিপ্রেম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অপরিসীম ভালবাসাই নহে; এই পতিপ্রেমই তাহার জীবনের একমাত্র আনন্দের সাধনা, অথবা মুক্তির সাধনা। সুখ-সম্পদ, স্বর্গ-মোক্ষ,—বুঝি বা ঈশ্বর পর্য্যন্ত, তাহার এই পতি-দেবতায় বিলুপ্ত হইয়াছেন। সে মরিয়া স্বর্গে যাইতে চায় না; সে চায়—জীবনের পরপারে তাহার জীবন-দেবতার জন্য 'দাঁড়াইয়া থাকিতে'। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, তাহার নিজের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া নয়,—পরন্তু এইজন্য সে প্রার্থনা করে যে, বিশ্বের সমস্ত শক্তিকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন, তিনি তাহার জীবন-দেবতার মঙ্গল-বিধান করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখুন; নইলে বিশ্ব-সংসার তাহার পক্ষে যে একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে!

বহু দিন ধরিয়া সে তাহার জীবনের এই চরম-সাধনায় কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে। 'নয় বৎসর বয়সে' তার বিবাহ হইয়াছে, আর 'উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সে' সে আমাদের সামনে উপন্যাসের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইল। এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সে কোন বাধা-বিঘ্ন না সহিয়া তাহার জীবন-দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছিল। তাহার 'দুষ্ট জা'-ননদ' ছিল না' যে, তাহার পূজায় বিঘ্ন ঘটাইবে। তাহার অন্যান্য আকর্ষণও ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে; তাহার মাতৃ-পিতৃকুলে কেহ নাই বলিলেই চলে, এবং তাহার 'সন্তান আঁতুড়েই মরিয়াছিল'। এমনই করিয়া চারিদিকের সব আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া দিয়া, শিল্পী তাহার চোখের সামনে নীলাম্বরের গৌর-কান্তি, অসীম স্নেহ-প্রবণতা ও 'অতুল ক্ষমার' গৌরবমূর্ত্তি তুলিয়া ধরিয়াছেন। সে সব ভুলিয়া তাহার এই দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। জগতে তাহার আপন বলিবার কেহ আছে কি না, সে খবর পর্য্যন্ত লইবার তাহার অবসর নাই। তাহার 'ছোট জা' উদার-চরিতা মোহিনী নিজে যাচিয়া তাহার কাছে প্রীতি ভিক্ষা চাহিলেও, সে তাহার দেবতার মুখ হইতে চোখ নামাইয়া

ক্ষণেকের জন্যও তাহার পানে চাহিবার অবকাশ পায় নাই। এমনই করিয়া সব ভোলা হইয়া সে তাহার দেবতার পূজায় নিরত রহিয়াছে। সে তাহার সব-কিছু দেবতার চরণে উপহার দিয়া তাঁহার মুখের হাসিটুকু দেখিবার জন্য সকল সময়ে স্বীয় চিন্তাকে তাঁহার পানে নিয়োজিত রাখিয়াছে। পুঁটির মত ছোট মেয়েটির জন্যও তাহার হৃদয়ে এতটুকু করুণা ও প্রীতি অবশিষ্ট নাই।

বিরাজের এই সাধনায় একটু বিশেষত্ব আছে। সে তাহার জীবন-দেবতাকে শুধু হৃদয়ের 'অমৃত' উপহার দিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; তাহার এই অমৃত উপযুক্ত 'উপকরণে' সাজাইয়া দেবতার পায়ে উপহার দিবার জন্য তাহার নারী-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। নারীর প্রেমের সাধনা স্বতঃই সেবার ভিতরে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে। পুরুষের মত শুধু ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া-ভাসিয়া গেলেই, তাহার প্রেম চরিতার্থ হয় না। যখন সেবায় তাহার সাধনা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যখন ক্ষমায় তাহার কামনা সুন্দর হইয়া ফুটে—তখনই তাহার প্রেম চরিতার্থ হয়; তৃপ্তির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তখনই তাহার হৃদয়ে স্বর্গের শান্তি ঢালিয়া দেয়। তাই বিরাজও তাহার দেবতার পূজার উপকরণের জন্য বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত। তাহার বেলায় আরো বিশেষ কথা এই যে, তাহার 'রাজরাণীর' প্রকৃতি দেবতার পূজায় উপকরণের অভাবে কণ্টকিত না হইয়াই পারে না। তাই বিরাজ দেবতার পূজায় একটু ঘটা করিয়াই উপকরণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে চায়।

কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে উগ্র-সাধনার আগুন জ্বালিয়াছে, উপকরণের দিকে অত মন দিলে—সে আগুন যে দিন-দিন নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে! কাজেও একটু তাহাই হইয়াছে;—জীবন-দেবতার এই গৌরবময় পূজাই তাহার সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই উগ্র সাধনা হইতে সিদ্ধির স্বাস্থ্যে পৌছিবার কথা তাহার মনে আদৌ উদিত হয় না। শুধু তাহার পূজা-গ্রহণের চিহ্ন স্বরূপ দেবতার মুখের হাসি উপভোগ করিতে পারিলেই সে তাহার সাধনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। স্বচ্ছ, সুন্দর গৃহ-মন্দিরে তাহার দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত; সে পূজারিণী সাজিয়া অমৃত-উপকরণ-গৌরবে সেই জীবন-দেবতার পূজা করিতে চায়। রাশি-রাশি সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত কুসুম পূজার নৈবেদ্যরূপে তাহার দেবতার চরণে উপহৃত হউক, তাহার চারি দিকে বিপুল পুলকে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠুক, বিজয়-গৌরবে শঙ্খ ধ্বনিত হউক, আর তাহার পূর্ণ হৃদয় সেই সমারোহ-ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে সাধনা-গৌরবে দুলিয়া-দুলিয়া উঠুক! ইহাই যে তাহার আনন্দ! ইহাই যে তাহার চরম লক্ষ্য! এ ভিন্ন সে যে আর কোন কথাই ভাবিতে পারে না! তাহার এই ভুল ভাঙিয়া দিয়া, তাহার উগ্র সাধনাকে 'মঙ্গলের' স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-লোকে পৌছাইয়া দিবার জন্য কবি যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিলে, তাঁহার প্রতিভার সমক্ষে স্বতঃই মস্তক নত হইয়া পড়ে।

বিরাজের গৌরবময়ী প্রকৃতি তাহাকে উপকরণের মোহে এত বিজড়িত করিয়াছে যে, তাহার স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাহার দেবতার পূজায় অমৃতের মত উপকরণও অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু উপকরণের উপর তার যে কোন হাত নাই! অমৃত তাহার নিজের হৃদয়ে সঞ্চিত; কিন্তু উপকরণ যে সংসারের কঠোর নিয়মে আবদ্ধ! সে যে ইচ্ছা করিলেই উহা পাইতে পারে না! কিন্তু বিরাজ সে কথা বুঝিবে কেন? উপকরণের অভাবে তাহার জীবন-দেবতার পূজার গৌরব দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতেছে,—ইহাই তাহার প্রবল বিশ্বাস। তাই যাহারা তাঁহার পূজার শঙ্খ-ঘণ্টা ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, তাহার ফুলের বাগান নির্ম্মমভাবে পেষণ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে তার 'ক্রোধ-অভিমান কথায়-কথায় বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলে'। যে পুঁটির জন্য তাহার পূজার উপকরণ এমন করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাকে কন্যার মত পালন করিলেও, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অতি নির্ম্মম বাক্য প্রয়োগ করিতে সে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না। নীলাম্বর তাহার পূজার উপকরণ একে-একে নিজ-হাতে বিলাইয়া দিয়াছে,—তাই তাহাকে অতি নিষ্ঠুর কথায় আঘাত করিতেও সে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এই নীলাম্বরই যে তাহার পূজার দেবতা! হোন্ না তিনি দেবতা। যে তাহার পূজার আয়োজন এমন নির্ম্মমের মত ব্যর্থ করিয়া দিয়া, তাহার সমস্ত জীবন মরুময় করিয়া দিল, তাহাকে সে কেমন করিয়া ক্ষমা করিতে পারে!

জীবন-দেবতার পূজার এই অমৃত-উপকরণের ঘাত-প্রতিঘাতে বিরাজের হৃদয়ে যে উদ্বেগ-অশান্তি তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি হিল্লোলে কত-শত বেদনার রেখা

অঙ্কিত! শিল্পীর তুলিকায় বিরাজের এই বুক-ভরা বেদনার চিত্র এমন সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতি তুলিকাস্পর্শের নৈপুণ্য পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়। কেমন করিয়া এমন সোণার বিরাজ বেদনার ভারে দিন-দিন অবসন্ন, উন্মাদপ্রায় হইয়া যাইতেছে, কেমন করিয়া বিরাজের হৃদয়-দেবতা সংসারের নির্দ্দয় কশাঘাত ভুলিয়া থাকিবার জন্য 'গাঁজা-গুলির' আশ্রয় লইতেছেন—তাহার সুবিস্তৃত কাহিনী পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, এ চিত্রখানি শিল্পী কত কৃতিত্বের সহিত আঁকিয়াছেন। বিরাজের এই বেদনার চিত্র সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অনুপম রত্ন।

এমন করিয়া যখন তাহার পূজার গৌরব দিন-দিন ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাহার সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তখন আর সে বাঁচিয়া থাকিবে কি লইয়া? সংসারের সবই যে তাহার পক্ষে নির্ম্মম, শূন্য! কিন্তু তবুও সে মরিতে পারিতেছে না,—'যাই-যাই করিতেছে, কিন্তু যাইতে পারিতেছে না'। এখনও তাহার একটি আকর্ষণ অছিন্নই রহিয়া গিয়াছে। এখনও যে তাহার দেবতা তাহার পানে করুণ নয়নে চাহিয়া আছেন! তাহার সব আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার এই অগৌরবের পূজাও যে দেবতা প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতেছেন! সেই দৃষ্টির আলোক ছাড়িয়া সে কি মৃত্যুর অন্ধকারের দিকে পা' বাড়াইতে পারে?

কিন্তু যে দিন দেবতা তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু পর্য্যন্ত বিরাজের দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া, তাহার জীবনের সমস্ত আয়োজন একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিলেন, সে দিন আর সে বাঁচিবে কি লইয়া! দেবতার প্রীতির চাহনিই তাহার একমাত্র জীবন-দীপের মত মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। যে দিন সে আলোটুকুও নিভিয়া গেল, সে দিন যে বিশ্বসংসার তার কাছে সত্যই এক বিরাট অন্ধকারে পরিণত হইয়া গেল! এই নিদারুণ অন্ধকারের শূন্যতায় তাহার যে বাঁচিবার কোন আশ্রয়ই নাই! তাই সে তাহার জীবনেরই মত অন্ধকার মৃত্যুতে ডুবিয়া যাইতে চলিল।

কিন্তু বিরাজ এখনই মরিবে কেমন করিয়া? তাহার জীবনব্যাপী সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবার পূর্ব্বেই সে মরিয়া যাইবে? তাহার হৃদয়ের একাগ্র সাধনা দীপশিখার মত শুধু জ্বলিয়া-জ্বলিয়াই নিভিয়া যাইবে? উহা মঙ্গলের স্নিগ্ধজ্যোতিঃতে পর্য্যবসিত হইয়া 'সুন্দর ও সার্থক' হইয়া উঠিবে না? কবি এত বড় নির্ম্মম নাস্তিক হইতে পারেন না; তিনি যে আস্তিক ভারতবাসীর বংশধর!

বিরাজের এই উপকরণ মোহ-বিজড়িত একাগ্র সাধনাকে স্বভাব-সৌন্দর্য্যে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য কবি যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিলে তাঁহাকে হৃদয় ভরিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বিধাতার মঙ্গল-বিধানে যাঁহার এমন দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার অমর লেখনীর জয় হউক। কবি অপরিসীম কৃতিত্বের সহিত বিরাজের মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার সাধনাকে বিচিত্র কৌশলে মঙ্গলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তিনি বহু পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিরাজের পতি-প্রেমের সাধনা অমৃতের মত উপকরণকেও অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিয়া চলিলে, উহা সিদ্ধির স্বাস্থ্যে পৌঁছিতে পারিবে না; উহা অমৃত-উপকরণের বিরোধ লইয়াই সময় কাটাইয়া দিবে। কিন্তু একাগ্র সাধনা যে মঙ্গলকে বরণ করিবেই। অথচ, এই উপকরণের মোহ সেই অত্যাবশ্যক কল্যাণের পথে প্রবল বাধা হইয়া রহিয়াছে।

তাই কবি এই বাধা ভাঙ্গিয়া দিয়া, বিরাজের সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে বিরাজের পতিপূজার বিশিষ্ট ভাবটুকু পাঠককে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবকাশ প্রদান করিয়াই কবি তাহার পূজার গৌরবকে ধীরে-ধীরে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দিনের পর দিন যাইতেছে, আর বিরাজও তীব্র হইতে তীব্রতর অভাব-অনটনের বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে। তাহার জীবন-দেবতার পূজার গৌরব উপকরণের অভাবে দিন-দিন ম্লান হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শেষে সে উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনের গতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের স্বতঃই ধারণা হয়, কি যেন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার অত্যাসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কবি অশেষ নৈপুণ্যের সহিত বিরাজের সাধনার গৌরবকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া কোন এক অজানা অন্ধকারের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই বিরাজের প্রতি নীলাম্বরের ওরূপ ভয়ঙ্কর আঘাতেও রসভঙ্গ হয় নাই।

কবি বিরাজকে মরিতে দিলেন না; এক্ল সাধনার আগুন যে শুধু জ্বলিয়া-জ্বলিয়াই ছাই হইয়া যাইতে পারে

না। তবে কি তিনি তাহাকে রাজেন্দ্রের বজরায় তুলিয়া দিয়া মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিলেন? এ যে বড় নিষ্ঠুর উদ্ধার! মোহিনীর মত আমাদেরও বিশ্বাস হইতে চায় না যে, বিরাজ পরপুরুষ রাজেন্দ্রের বজরায় উঠিতে পারে। সে যে এমন ভয়াবহ অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে পারে না! এখনও যে তাহার দুই চোখ দিয়া সাধনার দ্যুতি ঠিকরিয়া পড়িতেছে? আচ্ছা, একটু ভাল করিয়া দেখা যাউক, শিল্পী বিরাজের এই চিত্রখানির কোথায় কোন্ আভাসটুকু ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি বিরাজের শূন্য মরুময় হৃদয়ে কাল অন্ধকারের মত ঘনাইয়া উঠিয়াছে। সে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, শুধু সেই কাল অন্ধকারে ডুবিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়ে বিদ্যুচ্ছটা সব দিক উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া গেল। এ তো আকাশের বিদ্যুৎ নয়, ইহা তাহার অন্তরের বহুকাল-সঞ্চিত সাধনার বিদ্যুৎ। তাহার হৃদয়ে যে এত আলো রহিয়াছে, উপকরণের অভাবে তাহার পূজার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতেছে ধারণা করিয়া সে সেই আলোর সংবাদ পর্য্যন্ত রাখে নাই; তাহার চক্ষে তার সাধনার পথ ক্রমেই গাঢ় তিমিরাবৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই সাধনার শেষ-সীমায় আসিয়া যখন সে ভাবিতেই পারিতেছে না যে, তাহাকে আবার নূতন যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে; যখন তাহার শুধু এই কথা মনে হইতেছে যে, এই জীবনব্যাপী নিষ্ফল সাধনার অন্ধকার পারে আসিয়া ডুবিয়া যাওয়াই তাহার শেষ কাজ, তখন সেই 'বিরোধ কোলাহলে' তাহার সঞ্চিত সাধনা-বিদ্যুচ্ছটায় তার চিন্তার অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া 'ওপারের স্নানের ঘাট, মাচা, ইত্যাদি দেখাইয়া দিল; এই কথা বলিয়া দিল, "ওইখানে যাইয়া তুই তোর নূতন যাত্রার পথ খুঁজিয়া নে।"

বিরাজের বেদনা-বিকৃত মস্তিষ্ক বিদ্যুচ্ছটার ইঙ্গিতটুকুই বুঝিল, সব কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; এই ঘাট, মাচা ইত্যাদিও 'এতক্ষণ ঠিক যেন নিঃশব্দে চোক মেলিয়া তাহারই দৃষ্টি অপেক্ষা করিতেছিল, চোখোচোখি হইবামাত্রই ইসারা করিয়া ডাক দিল'। এমনই করিয়া অন্তর-বাহিরের আকর্ষণ যন্ত্রচালিতের মত তাহাকে ঘাটের দিকে লইয়া চলিল।

অনতিপূর্ব্বে সে তাহার জীবন-দেবতা স্বামীর মুখে অতি নিদারুণ কথা শুনিয়াছে। যে হৃদয়-দেবতাকে সে এক-মনে নয় বৎসর বয়স হইতে পূজা করিয়া আসিতেছিল, এবং যে দেবতা হাসিমুখে তাহার উপচার গ্রহণ করিয়া তাহার পূজাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন,—আজ সেই দেবতাই যখন তাহার সকল সাধনা ব্যর্থ করিয়া তাহার বুকে এমন করিয়া শেল হানিলেন, তখন সেই আঘাতের তীব্র যাতনায় দশ দিক তাহার কাছে একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার গৌরবময়ী প্রকৃতি আহত অভিমানের তীব্র দংশনে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; কোন কিছু বুঝিয়া উঠিবার সাধ্য তাহার রহিল না। তাহার সেই মানসিক বিকৃতির সময়ে কি-যেন-এক আকর্ষণ তাহাকে ওপারের ঘাটের দিকে লইয়া চলিল। ঐ ঘাট ইত্যাদির সংস্রব হেতুই রাজেন বাবুর নাম তাহার মনে পড়িয়া গেল, এবং প্রতিক্রিয়ারূপে হঠাৎ তাহার বিকৃত মস্তিষ্কে প্রতিভাত হইল যে, যে রাজেন-বাবুর বজরার দিকে তাহার সমস্ত দেহ-মন চলিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই রাজেনবাবুর নিকটে যাইয়াই সে তাহার জীবন-দেবতার আঘাত ভুলিতে পারিবে। কিন্তু সব ভুল! এ যে তাহার বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপমাত্র! সে ত নিজের শক্তিতে রাজেন বাবুর বজরার দিকে যাইতেছে না; ওপারের ঘাট ইত্যাদির বিচিত্র আকর্ষণ, এবং তাহার অন্তরের অজ্ঞেয় অনুমোদন,—এই দুইয়ে মিলিয়া তাহাকে রাজেন বাবুর বজরায় লইয়া যাইতেছে; অথচ, তাহার বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ক ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, সে নিজের শক্তিতেই যাইতেছে, অথবা আর কেহ তাহাকে লইয়া যাইতেছে।

আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি যে, সে নিজের শক্তিতে রাজেন বাবুর বজরার দিকে যাইতেছে না। কোন্ এক শক্তি তাহাকে বজরার কামরার বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াই নিজের গতি সংযত করিয়াছে। তাই বিরাজ আর কোথায় যাইবে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না,—'শুধু পাষাণ-প্রতিমার মত জলের দিকে চাহিয়া আছে।" কিন্তু জল যে চঞ্চল! এই চঞ্চলতার মধ্যে কেমন করিয়া সে তাহার ধ্রুব, মঙ্গল-যাত্রার পথ খুঁজিয়া পাইবে! অথচ এই বিরাট জলরাশির মধ্য-দিয়া ভিন্ন আর কোথায়ই বা তাহার নূতন যাত্রার পথারম্ভ সম্ভবপর হইতে পারে!

বিরাজ রাজেন বাবুর কাছে আসে নাই,—সে কথা রাজেন বাবুও বুঝিতে পারিতেছে। সে বজরার বাহিরে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। তাহার চারিদিকে লোক, অথচ সে তাহাদিগকে চোখেই দেখিতেছে না। সে যে তাহার পথ হারাইয়া বিহ্বলের মত বসিয়া আছে! কোথায় যাইবে—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। রাজেনবাবু বিরাজের এই ভাব বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল; তাই তাহার এই আকাঙ্ক্ষিত বিরাজকে অতি নিকটে পাইয়াও তাহাকে ডাকিতে পারিতেছে না। যে লোক মশাল জ্বালিয়া নিজের গন্তব্য পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে—অন্ধকার কেমন করিয়া তাহাকে বলিবে, "আমার দিকে এস, আমিই তোমার পথ!" তবুও সে একবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেষ্টা মনেই রহিয়া গেল, কথায় ফুটিয়া উঠিল না; মশাল তাহার দিকে উদ্যত হইতেই সে হতবুদ্ধি হইয়া দূরে সরিয়া গেল। তাই পুনরায় সসম্ভ্রমে তাহাকে জানাইল যে, ওরূপ স্থানু হইয়া বসিয়া থাকিলে অন্য বিপদ ঘটিতে পারে।

রাজেন বাবু বিরাজকে বিপদের বিষয়ে হুঁসিয়ার করিয়া দিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিপদের কথা যে বিরাজ আদৌ কাণে তুলিতে পারে না! সে যে বিপদের মধ্য দিয়াও আপনার যাত্রা-পথে পৌছিতে ব্যস্ত! তখনও তাহার বিকৃত মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হয় নাই। সে ভাবিল, "একজন আমাকে আহ্বান করিয়া ওই পথে গেল, ঐ বুঝি আমার পথ।" সে অজ্ঞাতসারে কামরার ভিতরে চলিল।

কিন্তু কোথা যাও বিরাজ? ও যে তোমার পথ নয়! বাস্; এইবার বিরাজ নিজেও সে কথা বুঝিয়াছে! কামীর বিলাসের স্পর্শ পায়ে ঠেকিতেই তাহার সমস্ত দেহ-মন মথিত করিয়া "মা গো" চীৎকার উত্থিত হইল। এইবার কবি বিরাজকে মৃত্যুর হাত হইতে বিচিত্র উপায়ে রক্ষা করিয়া, তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া, মঙ্গল-যাত্রার পথে দাঁড় করাইয়া দিলেন।"

"এতক্ষণে বিরাজের সব বিহ্বলতা ভাঙিয়া গিয়াছে। সে এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার অজ্ঞাতসারে সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। পথ বলিয়া দিবার জন্য এখন তাহাকে আর কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। সে এখন নিজের চেষ্টায় তাহার নূতন যাত্রার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে।

নিমেষের মধ্যে সে বজরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নিম্নে বিপুল জলরাশি চঞ্চল গতিতে বহিয়া যাইতেছে। এই জলরাশির বিশালতার মধ্যেই তাহার নূতন যাত্রার পথরেখা লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে অতল জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। এই জল সাঁতরাইয়া নিরুপকরণ হইয়া তাহাকে মঙ্গলের পারে পৌছিতে হইবে।

কবি অতি আশ্চর্য্য কৌশলেই বিরাজকে সাধনার নূতন পথে পৌছাইয়া দিলেন। তিনি তাহাকে মরিতে দিবেন না; কিন্তু শুধু ঘরের বাহির করিয়া দূরে সরাইয়া দিলেই তিনি তাহার মঙ্গল-যাত্রা অত সহজ করিয়া তুলিতে পারিতেন না। বিরাজের 'রাজরাণীর' প্রকৃতি অত ক্ষুদ্র আঘাতে তাহার পূজার গৌরব ভুলিতে পারিত না। তাই কবি তাহাকে একটু তীব্র আঘাত করিলেন। বিরাজের পতিপ্রেমের গৌরব-সাধনায় কামীর বিলাসের যে সামান্য স্পর্শটুকু লাগিয়াছিল, তাহারই আঘাতে তাহার উপকরণ-গর্ব্বিত পতি-পূজার স্মৃতি ভাঙিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এমনই হইল যে, তাহার পূর্ব্ব-পূজার উপকরণ-গৌরবের সব কথা একেবারে ভুলিয়া থাকিতে পারিলেই সে বাঁচিতে পারে। তাই বিরাজের গৃহত্যাগের পর আমরা তাহার যে সাধনার ভাব উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাতে উপকরণের অভাবের জন্য কোন বেদনা নাই, শুধু অমৃত-নিবেদনই অত্যুগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজের এই নিরুপকরণ, সুশোভন সাধনার সুদূর বাহিয়া আসিয়া তাহার জীবন দেবতাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিতেছে, এবং তাহারই অনুভূতি সেই দেবতার মুখে ক্ষমার বিপুল সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যিনি এমন করিয়া মানুষের হৃদয়ের চিত্র আঁকিতে পারেন, তিনি ধন্য।

বিরাজ ভগ্ন স্বাস্থ্যে, নির্জ্জন বিদেশে শুধু হৃদয়ের অমৃত নিবেদন করিয়া দেবতার আরাধনায় মনঃ-প্রাণ সঁপিয়া দিল। তাহার এই পূজা এমনই নিরুপকরণ যে, দেবতা তাহাকে চিনিয়া লইতে পারেন, তাহার এখন সামান্য—স্বাভাবিক রূপটুকু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নাই; সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'যদি কখনও দেখা হয়, এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে!' কিন্তু সাধনার পথে অগ্রসর হইতে-হইতে,

উপকরণহীনতার এ লজ্জাটুকুও তাহার রহিল না। এক দিন তাহার মনে পড়িয়া গেল, 'ঠিক ত! এ দেহটা কি আমার আপনার, যে, তাঁর অনুমতি ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছি! বিচার করিবার অধিকার আমার নয়—তাঁর! যা করিবার তিনিই করিবেন, আমি সব কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া ছুটি লইব।' এইবার বিরাজের সাধক-হৃদয়ে সিদ্ধির অমল জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর তার কোন খেদ নাই, উপকরণের হীনতায় কোন লজ্জা নাই। মান-অপমান, দৈন্য-গৌরব, সব অতিক্রম করিয়া তাহার সাধনা মঙ্গলে পৌঁছিয়াছে,—সেখানে পূজা, উপকরণের সব মোহ এড়াইয়া, শুধু অমৃত-নিবেদনেই পরিতৃপ্ত।

তাই বিরাজ তাহার জীর্ণ দেহ-প্রাণ দেবতার চরণে সমর্পণ করিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। দেবতা নিজে অগ্রসর হইয়া তাহার গলিত দেহ কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার সব ব্যথা এমন করিয়া জুড়াইয়া দিলেন যে, বুঝি বা তাহার মনে হইল, দেবতার এমন আশীর্ব্বাদ তার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই।

বিরাজের গৃহে ফিরিবার পর আমরা দেখিতে পাই—গৃহের প্রতি জিনিষের উপর তাহার 'তৃষ্ণা' তখনও প্রবল রহিয়াছে। কিন্তু এ তৃষ্ণায় আর পূর্ব্বের তৃষ্ণায় অনেক প্রভেদ! বিরাজের এ তৃষ্ণা তাহার হৃদয়ের অপাপবিদ্ধত্বই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়। যেমন গৌরবময়ী পূতহৃদয়া বিরাজ তাহার গৃহতীর্থ হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই অমল হৃদয়া বিরাজ পুনরায় তীর্থে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার চির-ভাস্বর হৃদয়ের কোথায় ও সামান্য কালিমা-রেখাও পতিত হয় নাই।

তাহার পূর্ব্বের অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থায় এত সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও, তাহার বর্ত্তমান সাধনার বিশিষ্টতা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গৃহের প্রতি জিনিষের উপর বর্ত্তমানে তাহার প্রবল তৃষ্ণার কথা এই যে, সে তাহার সাধনা-মন্দিরের সাজান নৈবেদ্য চোখ ভরিয়া দেখিতে চায়। কিন্তু এই নৈবেদ্যই এখন আর তাহার পূজার নৈবেদ্য নহে। ব্যাধিতে তাহার শরীর জীর্ণ, মোহিনী ও পুঁটি তাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল, কিন্তু তাহার নিজের চক্ষে জল নাই। সে এই বলিয়া আদৌ দুঃখ প্রকাশ করে না যে, ব্যাধিতে তাহার পূজার গৌরব ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহার দেবতার আরাধনা এখন আর শুধু দীপশিখার মত উর্দ্ধমুখ হইয়া জ্বলিতেছে না, উহা চারিদিকের সকলের উপর স্নিগ্ধ প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বর্গের মাধুরী ফুটাইয়া তুলিতেছে। সে মোহিনীকে পরজন্মেও এমনই কাছে পাইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছে, পুঁটিকে 'ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার' হৃদয়ঙ্গম করিতে বলিতেছে, এবং সুন্দরীকে ডাকিয়া আনিয়া ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ করিতে চাহিতেছে। কবি বিরাজের সাধনাকে এমনই সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন!

স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া বিরাজের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু এ মৃত্যু আমাদের কাছে আদৌ কঠোর বলিয়া মনে হয় না। এ ত প্রকৃতই মৃত্যু নয়! বিরাজ যে জীবনের পরপারে তাহার হৃদয়-দেবতার জন্য 'দাঁড়াইয়া থাকিতে' চলিল!

চূর্ণ-অভিমান

[শ্রীভবানীচরণ ঘোষ]

১

বিষ্ণুপুরের রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভালই ছিল; কুলগত মান-মর্য্যাদা, প্রতিপত্তিও তাঁহার বেশ ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে; সঙ্গে-সঙ্গে সমাজেও তাঁহার প্রতিপত্তির খর্ব্বতা হইয়াছে। খরচপত্র করিয়া উপযুক্ত বংশে কন্যার বিবাহ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। তিনি কুলীন নহেন, ভঙ্গ; কন্যা-বিবাহে ভঙ্গেরও অনেক ব্যয় করিতে হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন স্থানেই কন্যার সম্বন্ধ ঠিক করিতে পারেন নাই। এদিকে কন্যা ভামিনীসুন্দরী বয়স্থা হইয়া উঠিয়াছে।

অবশেষে এক পাত্র জুটিয়াছে। পাত্রের বংশের কোন প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রোত্রিয়ই বটে, কিন্তু বোধ হয় কষ্ট-শ্রোত্রিয়। ভঙ্গে এবং কষ্ট-শ্রোত্রিয়ে করণাদি প্রায় হয় না; কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে অনেক অকরণীয় ঘরও করণীয় হইয়া উঠিতেছে।

ছেলেটি ভাল। অল্প বয়সে এফ্‌-এ, পাশ করিয়া, কোন চাক্‌রীর চেষ্টা না করিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করে। প্রখর বুদ্ধি এবং চরিত্রবলে দশ বার বৎসর মধ্যেই ছেলেটী অসম্ভব ধনী হইয়া উঠিয়াছে। ধনেই ধন বাড়ায়,—ছেলেটীর উপার্জ্জন দিন-দিন আরও বাড়িতেছে। অনেক সওদাগর সাহেব, মাড়ওয়ারী হৌসওয়ালার সঙ্গে তাহার হৃদ্যতা। পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি তাহার সামান্য মাত্র ছিল, এখন ত তাহার অবস্থা অতি স্বচ্ছল। বছরে তাহার বিশ-ত্রিশ হাজার—বা তাহারও অধিক আয়। বিবাহ হয় নাই। অবস্থা খুব ভাল না করিয়া যতীন্দ্রনাথ বিবাহ করিবেন না, তাঁহার এই পণ ছিল। সদ্বংশের সুন্দরী কন্যা বিবাহে সকলেরই ইচ্ছা,—যতীন্দ্রনাথেরও অবশ্য সেই ইচ্ছা। কিন্তু সমাজে তাঁহার বংশের বিশেষ কোন পরিচয়-প্রতিষ্ঠা না থাকায়, ভাল বংশের ভাল মেয়ে পাওয়া তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়ে; সুতরাং যতীন্দ্রনাথের বিবাহে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ,—অবশেষে ভদ্র ঘরের সুন্দরী কন্যাই তাঁহার ভাগ্যে জুটিল। ভামিনীসুন্দরীর সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে ভামিনীর পিতাঠাকুরের প্রথমে যে কোন আপত্তি ছিল না, এমন নহে। কুল-মর্য্যাদাশূন্য ঘরে কন্যা-দান মানী লোকের পক্ষে অতি কঠিন। তবে, অনেকে কন্যা-বিবাহের খরচপত্রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিবাহের খরচপত্রাদির সাহায্য বাবদ যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা পাইয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের স্বভাব, চরিত্র, অবস্থা ভাল; ব্যবসায়ী-মহলে তাঁহার খুব প্রশংসা ও প্রতিপত্তি। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সম্মত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র নবীন-চন্দ্রেরও আপত্তি ছিল; কিন্তু আজ-কাল কুল সম্বন্ধে বেশী আঁটা-আঁটি প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। মেয়ে যেখানে অন্ন-বস্ত্রে, সোণা-গয়নায় সুখে থাকিবে, লোকে সেইখানেই কাজ করে। অবস্থা-গতিকে অত চেষ্টা করিয়াও সদ্বংশের ভাল ছেলে ত পাওয়া গেল না,—খরচপত্র করিবার সাধ্যও নাই; ভগিনীও বড় হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ শিক্ষিত লোক, তাঁহার অবস্থাও খুব ভাল; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও স্বীকার হইয়াছেন।

সকলের চেয়ে বেশী আপত্তি ছিল নবীনচন্দ্রের স্ত্রী রাধারাণীর। এরূপ নীচু ঘরে কাজ করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের পুত্র-কন্যার বিবাহ সময়ে মহাবিপদ উপস্থিত হইবে। বিশেষতঃ জনরব যে, বর কালো এবং কুৎসিৎ। এমন বরে ঠাকুরঝির মত পরমাসুন্দরীর বিবাহ মানাইবে কি? ঠাকুরঝি যেরূপ অভিমানী মেয়ে, টাকা লইয়া এমন পাত্রে দিলে তাহার কি সুখ হইবে? কিন্তু বৌয়ের আপত্তি কে শুনে? তবে বুড়ো বর বলিয়া পাড়ায় যে কথা উঠিয়াছে, রাধারাণীর নিকট তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হইল না। যতীন্দ্রনাথের বয়স আটাস্‌ উনত্রিশ হইয়াছে,—কিন্তু এদিকে ভামিনীও ত আঠারো পার হইয়াছে; অশোভনই বা কি?

বিবাহের সাত আট দিন পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র ভগিনীকে নিজের ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন। ভামিনী যাইয়া দেখিল, তক্তপোষের উপর শয্যায় ফরাসডাঙ্গার, শান্তিপুরে জরিপেড়ে সাড়ী, ঢাকাই বুটিদার সাড়ী, রঙ্গিন রেশমী সেমিজ, সাঁচ্চা জামদার সিল্কের জ্যাকেট—আরও কত কি সাজানো রহিয়াছে। বিস্মিত হাসিমুখে ভামিনী বলিল,—"এ কি দাদা! বৌদির জন্য না কি?"

"বৌয়ের এমন কি ভাগ্য যে, মূল্যবান্‌ এত সাড়ী, জামা তাহার মিলিবে?—তোমার পছন্দ হয় কি না এবং গায়ে লাগে কি না দেখার জন্য এগুলি যতীন্দ্রবাবু পাঠাইয়াছেন!"

ভামিনীর হাসিমুখ ম্লান হইয়া গেল—"দাদা—"

"আরও দেখ, কলিকাতা হ্যামিল্‌টনের বাড়ী হইতে যতীন্দ্র জাকরে এই নেক্‌লেস্‌ পাঠাইয়াছেন!"

লেদারের বিলাতি বাক্স খুলিয়া মণিমুক্তাময় মহামূল্য নেক্‌লেস্‌ নবীনচন্দ্র ভগিনীর সম্মুখে ধরিলেন; বলিলেন,—"তোমার পছন্দ না হইলে এটি ফেরত দিয়া অন্যরকম পাঠাইবেন।"

ভামিনী মুখ নত করিল। নবীন বলিলেন,—"ইন্‌-সিওর করা দু'হাজার টাকাও পৌঁছিয়াছে।"

ভামিনী এবার ম্লান পাণ্ডুর মুখ একটুকু উঁচু করিল;

কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল,—"তাহা রাখিয়াছ, দাদা ?"

"হাঁ, বাবার কাছে রহিয়াছে।"

ভামিনী পুনরায় মুখ নত করিল। তাহার চক্ষুতে জল আসিতেছিল, দৃঢ় চেষ্টায় ভামিনী তাহা নিবারণ করিল। এ বিবাহে যে ভগিনীর ইচ্ছা নাই, বিশেষতঃ টাকা গ্রহণ করিয়া—মূল্য লইয়া তাহাকে দান—বিক্রয় করার প্রস্তাব শুনা অবধি তাহার অভিমান যে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, নবীনচন্দ্র ভাবে-প্রকারে তাহা বুঝিয়াছিলেন। তথাপি যতীন্দ্রের প্রেরিত বহুমূল্য অলঙ্কার, মূল্যবান্ সাড়ী-জামা ইত্যাদি দেখিয়া ভগিনীর মন কতকটা নরম হইবে, ভাবী ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার চিত্তবেগ (স্ত্রীলোকের চিত্তই ত!) কতকটা শমিত হইবে মনে করিয়া, নবীনচন্দ্র ভগিনীকে সমস্ত দেখাইলেন; তবে বিশেষ যে কোন ফল হইল, নবীনের তাহা মনে হইল না। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় নাই।

ভামিনী সে ঘর হইতে নীরবে, ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। তখন তাহার চক্ষু দিয়া টস্-টস্ করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল। ভামিনী তাহা মুছিয়া ফেলিল। সেই ঘরের বাহিরেই ছাদওয়ালা একটা বারান্দা। বারান্দার বাহিরে উঠানের কোণে দাঁড়াইয়া, রাধারাণী ও জ্ঞাতিভগিনী পাড়ার শ্যামাসুন্দরীর কথাবার্ত্তার সাড়া পাইয়া সে বুঝিতে পারিল, এই বিবাহের কথাই হইতেছে। ভামিনী একটু অগ্রসর হইয়া কপাটের আড়াল হইতে শুনিতে লাগিল। শ্যামা বলিল,—"তা যাই বল, এমন ধনীর সঙ্গে কাজ, তোমাদের ত এখন সুদিনই আসিতেছে।"

রাধারাণী বলিলেন,—"আমাদের ত ভারি সুদিন! জামাই বাবু আসিয়া সোণা গয়নায় আমাকে সাজাইবে? দু'দিন পরে কুমির (কুমুদিনী—রাধারাণীর কন্যা) বিবাহ দিতে হইবে, তখন কি কোন ভদ্রলোকে আর মেয়ে নিবে?—ভঙ্গ যে ত্রিভঙ্গ হইয়া যাইবে!"

"তার ঢের দেরি আছে, সে ভাবনা আর এখন করিতেছ কেন? শুনিলাম, বর না কি ভারি কালো কুৎসিৎ?"

"শুনিয়াছি, তেমন ফরসা নয়; কুৎসিৎ'কে বলিল?"

"বুড়ো?"

"বুড়ো বলা চলে না; বয়স্ বছর সাতাইশ-আটাইশ।"

ঘরের কথা—রাধারাণী আর এগুতে চায় না; কিন্তু শ্যামা ছাড়ে না। শ্যামা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কাপড়-চোপড়ের ব্যবসায়, ভুসিমালের কারবার করিয়া না কি বিস্তর টাকা জমাইয়াছে?"

"শুনিয়াছি, খুব না কি ধনীই বটে। নতুবা, অত টাকা দিয়া নেয়?—বে'র আগেই অত সাড়ী-সেমিজ, জামা-জ্যাকেট, ব্লাউজ না কি বালুস্ দেয়?"

শুনিয়া শুনিয়া ভামিনীর দম বন্ধ হইয়া আসিল,—বুক ব্যথা করিয়া উঠিল। শ্যামা বলিতে লাগিল,—"পাড়ায় রাষ্ট্র, মিনীর না কি খুব স্ফূর্ত্তি, তার মুখ না কি সর্ব্বদাই হাসি-খুসি?"

শ্যামা আরও যেন কি বলিতেছিল; কিন্তু ভামিনীর আর সহ্য হইল না। ঘরের দূর কোণে সরিয়া গিয়া সাধ্য-মত স্বাভাবিক স্বরে ভামিনী ডাকিল,—"বৌদিদি, বৌ!" ডাক শুনিয়া রাধারাণী নিম্নস্বরে শ্যামাকে বলিল,—"ঠাকুরঝি ডাক্‌ছে, যাই। জামা জ্যাকেট দেখিয়া যাইবে?"

শ্যামা বলিল,—"না, এখন যাই, কাল আসিব।"

শ্যামা চলিয়া গেল। রাধারাণী স্বাভাবিক স্বরে ভামিনীর ডাকের উত্তর দিয়া বলিল,—"কি ঠাকুরঝি! এই আস্‌ছি।"

"আমার কাপড়খানা কোথায়?"

"এই যে ওপরে দিয়াছিলাম; আন্‌চি। এসেই তোমার চুল বেঁধে দি!"

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভামিনীসুন্দরীর বিবাহ হইয়া গেল।

২

কলিকাতা, আপার সারকুলার রোডে যতীন্দ্রনাথের বাড়ী। জমি ক্রয় করিয়া যতীন্দ্র নিজের পছন্দমত দোতলা বাড়ী তৈরি করাইয়াছেন। বাড়ীটী বৃহৎ নহে, কিন্তু সুখ-সুবিধার সম্পূর্ণ উপযোগী। বাড়ীর চারিদিকেই পাকা দেওয়াল। সেই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই এক দিকে শাক-সব্জীর, ফল-ফুলের বাগান, অপর দিকে ফুলের বাগান। ঘর-বাড়ী, উঠান-বাগান—সমস্ত স্থান ফুটফুটে পরিষ্কার। ঘরে-ঘরে আসবাবপত্র প্রচুর। চেয়ার, টেবিল, খাট, পালঙ্ক, আল্‌না, আলমারি, দেয়ালে-খাটানো বৃহৎ আরসী, ছবির আয়না—যেখানে যা প্রয়োজন, সকলই ছিল। নূতন বাড়ী,

ঝক্‌ঝকে নূতন আসবাব। ঝি, চাকরাণী, চাকর, মালী, পাচক-ব্রাহ্মণ, দরওয়ান—কিছুরই অভাব নাই। যতীন্দ্রের পিতা-মাতা নাই, ছোট একটী ভাই ছিল, শৈশবেই তাহার মৃত্যু হয়। দূরসম্পর্কীয়া এক পিসীকে নব-বধূর তত্ত্বাবধায়িকা এবং সাহায্যকারিণী স্বরূপ যতীন্দ্র বাসাবাটীতে আনাইয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথের বিক্রমপুর হইতে স্ত্রীকে লইয়া যাত্রার প্রাক্‌কালে নবীনচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—"ভাই ছেলেবেলা হইতেই মনু কিছু অভিমানিনী; সামান্য একটুতেই তাহার চোখে জল আসে। কিন্তু তুমি একটী রত্ন লইয়া যাইতেছ! কয়েকটা দিন একটু কোমল হস্তে কিঞ্চিৎ মাজা-ঘষা করিয়া নিও, দেখিবে,—অতি শীঘ্রই অতি সুন্দর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।" যতীন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"কায়মনোবাক্যে আমি তাহা করিব।"

বিবাহের তিন দিন পরে যতীন্দ্রনাথ অষ্টাদশবর্ষীয়া স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় নিজের বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে হাত-মুখ ধুইয়া যতীন্দ্র বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। আজ ক'দিন অনুপস্থিত, অনেক কাজ-কর্ম্ম দেখিতে হইবে। এদিকে চারুবালা ললিতা ভামিনীসুন্দরীর মুখ ধুইবার জল, গামোছা, টুথ পাউডার ঠিক-ঠাক করিয়াছিল। পিসীমা আসিয়া বধূর কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভামিনী নূতন-বৌ, পিসী-শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিল না; মাথার অবগুণ্ঠন কিছু নামাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পিসীমা বধূর ব্যবহারে অতি সন্তুষ্ট হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৌমা, সকালবেলায় তোমার কিছু খাওয়া অভ্যাস আছে? কিছু মোহনভোগ করিয়া দিব? চা খাবে?"

ভামিনীর হাসি পাইল। পাড়াগেঁয়ে বয়স্থা মেয়ে, শয্যা ছাড়িয়াই আহার!—চা, মোহনভোগ! সে মাথা নাড়িয়া নিষেধ জানাইল। পিসী বলিলেন,—"বৌমা, তোমার যখন যা' দরকার হয়, যা' ইচ্ছা হয়, আমাকে জানাইও। আমি কাছে না থাকিলে, চাকর আছে, ঝি আছে, যা'কে যা' বলিবে, সে তখনি তা' করিয়া দিবে। বুঝ্‌লে মা?"

ভামিনী মাথা এক পাশে একটুকু নোয়াইয়া স্বীকার জানাইল। পিসীমা তখন কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ঝি, বৌমা চা খাবেন না, যতীনের চা বৈঠকখানায় দিতে বল্।"

পিসীমা তখন সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে যতীন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর উপরতলায় আসিলেন। শয়ন কক্ষে স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন না। সে কক্ষের দক্ষিণে বিস্তৃত এবং দীর্ঘ কাশ্মীরি বারান্দা; কক্ষের মেঝেও যেমন, বারান্দাও তেমনই শ্বেত-মর্ম্মরে মণ্ডিত। যতীন্দ্র বারান্দায় স্ত্রীর দেখা পাইলেন। সেখানে দুইতিনখানা কেদারা, একখানা ইজি-চেয়ার এবং কৌচও ছিল। কিন্তু ভামিনী কক্ষ হইতে একখানা আসন আনিয়া তাহাতে বসিয়া নীচের দিকে ফুলবাগান দেখিতেছিল; স্বামীর সাড়া পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যতীন্দ্র বলিলেন,—"এই যে ইজি-চেয়ার, কৌচ রহিয়াছে,—এ সামান্য আসনে বসিয়া রহিয়াছ কেন?"

হাত ধরিয়া স্ত্রীকে কৌচের নিকট লইয়া গিয়া যতীন্দ্র বলিলেন,—"এই এখানে ব'স।"

ভামিনী সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যতীন্দ্র একখানি কেদারা কৌচের কাছে আনিয়া নিজে বসিবার উদ্যোগ করিয়া স্ত্রীকে পুনরায় অতি আদরে বলিলেন,—"বস, এই কৌচে বস।" ভামিনী নীরবে কৌচের উপর বসিল; বসিয়া মস্তক নত করিয়া নিজের পদপ্রান্তে চাহিয়া রহিল।

স্ত্রীর আয়ত চক্ষু, কৃষ্ণ সুদীর্ঘ বঙ্কিম ভ্রূ, ললিত ক্ষুদ্র কর্ণ, অনিন্দ্যকান্তি সুন্দর মুখ দেখিয়া যতীন্দ্রের চিত্ত আনন্দে উথলিয়া উঠিল। যতীন্দ্র ভাবিলেন,—"কি সৌভাগ্য আমার!"

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি লক্ষ্য করিলেন,—সে সুন্দর জরি-পেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী আর স্ত্রীর পরিধানে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে মলিনপ্রায় একখানি সামান্য বিলাতী সাড়ী ভামিনী পরিয়া রহিয়াছেন। গায়ে দুগাছি বালা আর একগাছি নোয়া, কাণে ক্ষুদ্র দুল মাত্র। যে সকল গহনা পরিয়া তিনি পূর্ব্বদিন বিকালে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত খুলিয়া রাখিয়াছেন। যতীন্দ্র বিস্মিত হইলেন; বলিলেন,—"এ কি! এ ময়লা কাপড় পরিয়াছ কেন?—কাপড় ছাড়িয়াছ, পরিষ্কার ভাল কাপড় পর নাই! সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছ কেন?"

ভামিনী মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আমি গরীব ঘরের মেয়ে, এইরূপ কাপড় পরাই আমার অভ্যাস।"

যতীন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; বলিলেন,—"মানুষ যখন যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থার অনুযায়ী ভাবেই চলে। তোমার পিতাঠাকুরের অবস্থা খুব ভাল না হইতে পারে;—কিন্তু তিনি মান-সম্ভ্রমে সকলের শীর্ষ-স্থানীয়। তাঁহার কন্যা তুমি,—তোমাকে মণিমুক্তায় সাজাইতে পারিলেও আমার তৃপ্তি হইবে না। তুমি এখানেই একটুকু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

যতীন্দ্র বারান্দা পরিত্যাগ করিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভামিনী সেইখানে বসিয়া ফুলবাগানের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—"ভোরে শয্যা হইতে উঠিয়া উঠান-আঙ্গিনা ঝাঁট দেওয়া, গোবর-ছড়া দেওয়া যার অভ্যাস, ঘর ধোয়া মুছা, বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা যার নিত্য কার্য্য—সেই আমি ভোরে উঠিয়া চাকরাণীর আনীত জলে মুখ ধুইয়া দোতালার বারান্দায় কৌচে বসিয়া হাওয়া খাইতেছি! এক দিনে যে আমাকে বাতে ধরিবে। কি সুখের পরিবর্ত্তন!"

এ দিকে কক্ষমধ্যে যতীন্দ্রনাথ বাক্স খুলিয়া ফরাসডাঙ্গার একখানি দিব্য সাড়ী, একটা সেমিজ এবং সিল্কের একটা জ্যাকেট বাহির করিলেন; কয়েক পদ গহনাও বাহির করিয়া তাহা এবং সাড়ী-জামা ইত্যাদি শয্যার উপর রাখিয়া বারান্দায় স্ত্রীর কাছে আসিলেন। স্ত্রীকে হাতে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন,—"যাও, ঘরে যাও, আমি কাপড়-জামা বাহির করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি পরিবে; আর কয়েক পদ গহনাও রাখিয়াছি, তুমি তাহাও পরিবে। আমি এইখানে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হাত ধরিয়া স্ত্রীকে কক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিয়া যতীন্দ্র দ্বার ভেজাইয়া দিলেন; তার পর সেই বারান্দায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"অতি যত্নে, অতি সাবধানে এ রত্ন নাড়া-চাড়া করিতে হইবে!"

কিছুকাল পরে ভামিনী বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া ছিটের একটা জ্যাকেট পরিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। হাতে দু'গাছা করিয়া চুড়ি, বাহুতে অনন্ত ও কাণে ক্ষুদ্র ফুলের পরিবর্ত্তে মুক্তাবসানো ইয়ারিংও সে পরিয়া আসিয়াছে। স্বামী পুনরায় তাহাকে সেই কৌচের উপর বসাইয়া,—তাহার গলায় হার নাই দেখিয়া—সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভামিনী মনে-মনে ভাবিল,—বেশ এক খেলার পুতুলই হইয়াছি! যতীন্দ্র একছড়া হার আনিয়া স্ত্রীকে বলিলেন,—"তোমার গলা খালি রহিয়াছে, এই গাছি পর। আমি পরাইয়া দিব?"

"দাও। তুমি যে আদেশ দিবে, আমি তাই পালন করিব—করিতে বাধ্য।"

"'আদেশ!' 'করিতে বাধ্য!' এ কি বলিতেছ?"

"স্ত্রী স্বামীর কথা চিরকাল পালন করে, কিন্তু আমি ত করিতে আরও বাধ্য!"

"সে কি!"

"আমাকে বিবাহ করিয়াছ, আমি তোমার স্ত্রী; শুধু স্ত্রী নই, ক্রীতা দা—স্ত্রী!"

নতমুখেই ভামিনী এত কথা বলিল। বিস্মিত যতীন্দ্র বলিলেন,—"তুমি আমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী। ক্রীতা কি বলিতেছ?"

"আমার পিতাকে দু হাজার টাকা দিয়া আমাকে আনিয়াছ!"

"তাই তুমি ক্রীতা! পাগল তুমি।—তোমার পিতাঠাকুরের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না, তাই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি মাত্র।"

"দু'দিন পরে তাহা করিতে পারিতে?"

"পারিতাম; কিন্তু তাহাতে বোধ হয় তাঁহার অসুবিধা হইত। আবার প্রয়োজন হয়, আবার করিব!"

"তবে আমার এ কলঙ্ক রাখিলে কেন?"

"কলঙ্ক?"

"ক্রীতা আমি!"

"তুমি আমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী; আমার গৃহের কর্ত্রী, সংসারের সহায়। তুমি ক্রীতা! তোমার কলঙ্ক! তুমি যে প্রাণ অপেক্ষা আমার প্রিয়, দু'দিনে আমাকে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ। বহু পুণ্যফলে যে তোমাকে পাইয়াছি!"

ভামিনী এবার মুখ তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল। চকিত দৃষ্টিমাত্র—তখনই আবার মুখ নত করিল।

এমন সময় পিসী-ঠাকুরাণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া

বলিলেন,—"বাবা, বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর, কি-কি রান্না হইবে।"

ভামিনী স্বামীকে মৃদু স্বরে বলিল,—"আমি নূতন আসিয়াছি—কি জানি, আর কি বলিব? তিনি বরাবর যেরূপ যাহা করান, তাই হইবে। আমি শিখিয়া উঠিলে তাঁহাকে আর কষ্ট দিব না।"

পিসীমা সকলই শুনিলেন; তথাপি যতীন্দ্র বলিলেন,—"পিসী, নিত্য যেমন করিয়া থাক, তাই কর। ইনি আর কি পরামর্শ দিবেন?"

পিসীমা তখন চলিয়া গেলেন। যতীন্দ্র হার-ছড়া হাতে লইয়া দাড়াইলেন; দাঁড়াইয়া স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি অনুমতি দাও, আমি হার পরাইয়া দি।"

"অনুমতি?"

"হাঁ; তুমি 'আদেশে'র কথা বলিয়াছ; আজ হইতে তোমার অনুমতি ভিন্ন আমি তোমাকে কোন কিছু করিতে বলিব না।"

ভামিনীর চক্ষুকোণে ঈষৎ হাসি দেখা দিল।

"সে কি! তুমি যখন যা বলিবে, আমি করিব। যেরূপ পরামর্শ দিবে, সেইরূপ চলিব। নতুবা আমি শিখিব কি করিয়া? তুমি ত আর অন্যায় কোন কাজ আমাকে করিতে বলিবে না! তোমার ঘর-সংসার, সুখ-সুবিধা আমি প্রাণ পণে দেখিব।"

ভামিনী উঠিয়া স্বামীর সম্মুখে অতি নিকটেই দাড়াইল। যতীন্দ্র তখন অতি যত্নে সেই সুন্দর হার স্ত্রীর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ললাটও কপালে, বিক্ষিপ্ত কবরী-মুক্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ মৃদু হস্তে সরাইয়া সেই সুন্দর ললাটদেশ চকিতে পরিচুম্বিত করিলেন। ভামিনী মুখ নত করিল। কিন্তু যতীন্দ্র সেই স্পষ্ট দিবা-লোকে লক্ষ্য করিলেন, ললাটে অধরের ক্ষণস্পর্শেই স্ত্রীর মুখ যেন চকিত, ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল। যতীন্দ্র তখন বলিলেন।—"আমি এখন যাই; কিছু কাজ আছে, বাড়ীতেই তাহা সারিতে হইবে; তার পর স্নানাহার করিয়া আফিসে যাইতে হইবে। এ ক'দিন আমার আফিস কামাই হইয়াছে।"

স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া যতীন্দ্রনাথ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন,—"সময় লাগিবে! লাগুক্, আমি নিশ্চয়ই সফল হইব।"

কিছুকাল পরেই একজন ঝি আসিল। একখানা ছোট জল-চৌকি লইয়া আসিল। বাটীভরা কুন্তলীন, আরসী, চিরুণীও আনিল। নূতন কর্ত্রীর কবরী, বেণীবন্ধন খুলিয়া চুলে তৈল মাখাইতে হইবে। ঝি ভামিনীর মাথার কাপড় সরাইয়া ফেলিয়া তাহার খোঁপা খুলিয়া ফেলিল। ক্রমে-ক্রমে বেণীগুলিও খুলিতে আরম্ভ করিল। পরে কর্ত্রীকে সেই চৌকিতে বসাইয়া তাহার চুলে তৈল মাখাইবে। কক্ষের অনতিদূরেই স্নানাগার।

দেখিয়া-শুনিয়া ভামিনী মনে-মনে কহিল,—"এরা সকলে মিলিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে, দেখ্ছি! মাথার বেণীটা খুলিতে, চুলে তেলটুকু মাখিতেও এরা আমাকে দিবে না?"

(৩)

বৈকালে তিনটা বাজিতেই যতীন্দ্র আফিস হইতে বাসায় ফিরিলেন। আফিসের পোষাক ছাড়িয়া স্ত্রীর কক্ষে গেলেন। দেখিলেন, ভামিনী পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া নিজের গায়ে, মুখে বাতাস করিতেছেন। যতীন্দ্র বলিলেন,—"সে কি! ফ্যান খুলিয়া দাও নাই কেন?"

"আমি খুলিতে জানি না।"

"বটে?"—ফ্যানের 'কী'র নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"এই দেখ, এইরূপ করিয়া বোতামটা ঠেলিয়া দিতে হয়!"

যতীন্দ্র ইলেট্রিক পাখা চালাইয়া দিলেন। বাতাস বেগে স্ত্রীর গায়ে, মাথায় লাগিতে লাগিল। ভামিনী কিছু জড়সড় হইয়া বলিল,—"বন্ধ করিয়া দিলেই ভাল হয়। কাল সারারাত এইরূপ হাওয়ায় আমার একটু ঠাণ্ডাই লাগিয়াছে।"

যতীন্দ্র তৎক্ষণাৎ পাখা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন,—"তা, রাত্রিতে তুমি আমাকে বল নাই কেন? আমি তখনই বন্ধ করিয়া দিতাম!"

"তোমার অভ্যাস আছে, বন্ধ করিয়া দিলে তোমার অসুবিধা হইবে বলিয়া বলি নাই।—আমাকে দু'খানা হাত-পাখা আনাইয়া দাও।"

"আমার অসুবিধা হইবে আশঙ্কা করিয়া পাখা বন্ধ করাও নাই, আর তুমি অসুস্থ হইয়া পড়িলে?—তোমার অসুখ করিয়াছে?"

"না, কিছু না।"

"ইলেকট্রিক পাথায় কাজ নাই।"—ঝিকে ডাকিয়া—"কানাইকে বল; ভাল দেখিয়া দু'খানা হাত-পাখা এখনি নিয়ে আসুক্।"

তখন স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া যতীন্দ্র বলিলেন,—"ওগো, আজ আফিসে আমার আত্মীয়, বন্ধু এবং অনুগত কয়েকজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহার-কাহারও মা, স্ত্রী, ভগিনী আজ সন্ধ্যার সময় তোমাকে দেখিতে আসিবেন। তাঁহাদের জন্য কিছু জলখাবার আয়োজন করাইতে হয়। আমি পিসীমাকে বলিয়াছি, তিনি সব করিবেন; তুমি—তোমারও একটুকু দেখিতে-শুনিতে হইবে।"

"অবশ্যই দেখিব। তাঁহাদের আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হইবে না।"

যতীন্দ্র পরমাদরে স্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"ঘরে লুচি, ডাল, ডালনা, ভাজা ইত্যাদি হইবে। বাজার হইতে কি-কি আনাইব?—ভাল সন্দেশ, বর্ফি, রসগোল্লা—আর কি?"

"দই, ক্ষীর, রাবড়ি,—"

"আহা! তা' ত ভুলিয়া গিয়াছি! এখনই লোক পাঠাইতেছি।"

"থালা, বাটী, গেলাশ, রেকাবী, আসন—"

"সে সব ত ঘরেই আছে, তাহাতেই কুলাইবে।"

"কত দিন যাবত যেন সিন্ধুকে পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলি মাজিয়া, ঘসিয়া, ধুইয়া নিতে হইবে না?"

"তা-ও ত বটে!—তা' সেগুলি আমি এখনি বাহির করিয়া দিতেছি; ঝি-চাকরেরা সেগুলি এখনি পরিষ্কার করিবে। আসনগুলিও বাহির করিয়া দিতেছি। তুমি মনে করিয়া না দিলে ত সব মাটি হইত! কিন্তু আজ তুমি সকল বিষয় দেখিয়া-শুনিয়া না দিলে আমার তৃপ্তি হইবে না।"

"তা' আমি দেখিব।"

"আর একটা কথা। তা' তোমার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর।"

"এমন কি কথা, কি কাজ?"

"দেখ, কয়েকটি ভদ্রমহিলা আসিবেন,—তুমি নিজের জামা, কাপড়, অলঙ্কার-পত্রাদির দিকে একটু মনোযোগ দিও।"

"দিব।"

"বেশ, বেশ!—বারাণসী একখানি শাড়ী, সিল্কের জ্যাকেট, নেকলেস—"

"যদি আদেশ কর—"

"আবার আদেশ?"

"ভাল, যদি তুমি ইচ্ছা কর, আমি তাহাই করিব; কিন্তু একটুকু ভাবিয়া—"

"কি?"

"ইহাঁরা তোমার বাড়ীতে—"

"আমার?"

"আচ্ছা, আমাদের বাড়ীতেই হউক!—ইহাঁরা আমাদের বাড়ীতে আসিতেছেন। আমার শাশুড়ী-ননদ কেহ নাই যে, তাঁহারা আমাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ইহাঁদের নিকট উপস্থিত করিবেন। আমি বড় হইয়াছি, কচি বৌ নই; আমি কি নিজেই বারাণসী শাড়ী, সিল্কের জ্যাকেট, নেকলেস, ব্রেসলেটে সাজিয়া-গুজিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব! তাঁহারা আমাকে নির্লজ্জা, অহঙ্কারী মনে করিবেন না? আমার লজ্জা করিবে না?"

ক্ষণমাত্র স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া আবেগের সহিত যতীন্দ্র বলিলেন—"মিনু, আমি মূর্খ—গণ্ড মূর্খ! সমাজ সংসারের আমি কিছুই জানি না। আমার মাতা অনেক দিন হইল স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। সংসার কাহাকে বলে, আমি একত তাহা জানি না। স্ত্রীলোকের চাল-চলন, ব্যবহার আমি একরূপ দেখি-ই নাই। আমি মূর্খ, তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইল। লক্ষ্মী তুমি, আমাকে শিখাইয়া নিও।"

ভামিনীর মুখে হাসি দেখা দিল। যতীন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"অলঙ্কার-পত্র, কাপড়, পোষাকের জন্য আমি আর কোন দিন তোমাকে কিছু বলিব না, অনুরোধ করিব না। আমার শিক্ষা হইল। দেখিলাম, এ সকল বিষয়ে তুমি আমার শিক্ষয়িত্রী!"

ভামিনী একটুকু হাসিয়াই ফেলিল। যতীন্দ্রেরও কিঞ্চিৎ সাহস বাড়িল। তিনি মৃদু হস্তে স্ত্রীর নবনীত-কোমল হস্ত উঁচু করিয়া ধরিলেন; ভামিনীও অতি সত্বর হাত সরাইয়া নিল না।

স্ত্রীকে উপদেশ দিতে যাইয়া, এইরূপে নিজে উপদিষ্ট হইয়া যতীন্দ্র সে কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—"না, বেশী দিন লাগিবে না! লাগিলেও আমি প্রস্তুত আছি। অতি যত্ন, অতি প্রয়াস ভিন্ন এমন রত্ন লাভ হয় না।"

এ দিকে সমস্ত আয়োজন শেষ হইল। ঘরের সমস্ত প্রস্তুত হইল, বাজারের জিনিসপত্র আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই মেয়েরা উপস্থিত হইলেন। ঘরে-ঘরে ইলেক-ট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিল। ফাল্গুন মাসের শেষ, কলিকাতায় গরম পড়িয়াছে, ঘরে-ঘরে ইলেকট্রিক পাখা চলিতে লাগিল। সমাগতা রমণীগণের যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা হইল। ভামিনী চঞ্চলা মেয়েদের মত ছুটাছুটি করিল না, গর্ব্বিতা ধনৈশ্বর্য্য-শালিনীর ন্যায় বহু অলঙ্কার-পত্র পরিয়া, সাজসজ্জা করিয়া, মাথা উঁচু করিয়া চলাফেরা করিল না। তাহার নম্র, সলজ্জ, বিনীত ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইলেন।

আহারাদি শেষ হইয়া গেলে, পান খাইতে-খাইতে সম-বয়স্কা দুইতিনটি রমণী বলিলেন,—"আমরা শুনিয়াছি, আপনার বহু গহনা, আমরা দেখিব।" বয়োবৃদ্ধাদেরও কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল, তাঁহারাও বলিলেন,—"দেখাও না, মা।"

ভামিনী লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইল। সমবয়স্কারা ছাড়িলেন না। "বৌ, কোন ঘরে? চলুন, দেখাতেই হবে।"

তাঁহারা ভামিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে শয়নকক্ষে লইয়া গেলেন। ভামিনী আর না দেখাইয়া পারিল না। চাবি দিয়া এক বৃহৎ দেরাজ-আলমারি খুলিয়া দিল। আলমারিতে সাড়ী, সেমিজ, জামা, জ্যাকেট সাজানো ছিল। আর তিন-চারি থাক দেরাজে মূল্যবান বিলাতী লেদারের তৈরি বিভিন্ন আকারের বাক্স, কৌটার মধ্যে পৃথক-পৃথক অলঙ্কার। মেয়েরা তাহা খুলিয়া-খুলিয়া দেখিলেন। একজন বলিলেন, —"আপনার এত অলঙ্কার; আজ আমরা আসিয়াছি,—অতি অল্প, সামান্য গহনা পরিয়া আপনি আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছিলেন!"

তখন আর একটি সমবয়স্কা নেকলেসের বাক্স খুলিয়া দেখিতেছিলেন। তিনি নেক্‌লেস্‌টি বাহির করিয়া বলিলেন, —"এটি এখনি পরিয়া আমাদিগকে দেখাইতে হইবে!"

ভামিনী জড়সড় হইয়া একটুক সরিয়া দাঁড়াইল,—আ-সীমন্ত ঘোমটা টানিয়া নামাইয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। মেয়েরা ছাড়িলেন না, তাহার মাথার কাপড় সরাইয়া ফেলিয়া সেই মণিমুক্তাময় নেক্‌লেস্ তাহার কমনীয় কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। যেমন মূল্যবান নেক্‌লেস, তেমনি ভামিনীর শ্রীঅঙ্গের শোভা, তেমনি তাহার গৌর মুখমণ্ডলের অলোকসামান্য লাবণ্য! রমণীরা তাহার রূপে মুগ্ধ, বিনয়ে-ব্যবহারে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইলেন। একটি বয়োবৃদ্ধা যতীন্দ্রের পিসীকে বলিলেন;—"আপনারা যে বধূ ঘরে আনিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। যতীনের বহু ভাগ্য, বড়ই সৌভাগ্য, এমন স্ত্রী তাহার লাভ হইয়াছে! আপনি তাহাকে আমাদের এই কথা জানাইবেন।—টাকা! দশ হাজার টাকা দিলেও অমন সম্ভ্রান্ত ঘরের এমন মেয়ে পাওয়া দুর্ঘট। যতীনের বহু পুণ্য ছিল, তাই এমন রূপবতীকে অত সুলভে সে ঘরে আনিতে পারিয়াছে!"

ভামিনী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সেইখানেই বসিয়া ছিল, সকলই শুনিল; টাকা—মূল্যের কথা, সুলভের কথাও শুনিল।

তার পর পরস্পর যথাযোগ্য প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার, অভিবাদন করিয়া রমণীগণ চলিয়া গেলেন। পিসীমার মুখে রমণীগণ কর্ত্তৃক স্ত্রীর প্রশংসাবাদ শুনিয়া যতীন্দ্রের চিত্ত আনন্দে উথলিয়া উঠিল।

(৪)

দুই-তিন দিন পরে যতীন্দ্রনাথ নিজের বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ঘটা করিয়া খাওয়াইলেন। সেদিনও ভামিনী খুব খাটিল। রাত্রিতে স্বামী যখন স্ত্রীর কক্ষে গেলেন, দেখিলেন—ভামিনী লেপ মুড়ি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। যতীন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। সারা দিনের পরিশ্রমে স্ত্রীর শরীর খারাপ হইয়াছে! শয্যার পার্শ্বে বসিয়া যতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি অসুখ বোধ করিতেছ? লেপ মুড়ি দিয়া রহিয়াছ কেন?"

ভামিনী বলিল,—"বড় মাথা ধরিয়াছে, সমস্ত গা ব্যথা করিতেছে।"

"আমাকে ডাকিয়া পাঠাও নাই! ললিতাকে কাছে ডাকিলেও ত সে তোমার হাত-পা টিপিয়া দিত! আজ

ক'টা দিন তোমার অত্যন্ত খাটুনি চলিতেছে। এই তোমার প্রথম কলিকাতা আসা, প্রথমবারেই এত সহিবে কেন?"

ভামিনী লেপে মাথা ঢাকিয়া ছিল, যতীন্দ্র তাহার মাথার কাছে হাত দিয়া বলিলেন,—"আমি দেখিব?"—বলিয়াই হাত বাড়াইলেন। ভামিনী কোন উত্তর দিল না। কিন্তু স্বামী যখন তাহার ললাট, কপোলদেশ স্পর্শ করিলেন, ভামিনী তখন যেন কেমন করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বোধ হয় স্বামীর শীতল স্পর্শেই ভামিনীর ওরূপ হইল।

"তোমার মাথা কিছু গরমই হইয়াছে, হাতখানা দেখি!" যতীন্দ্র সাবধানে স্ত্রীর বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সামান্য একটু জ্বর-জ্বরই হইয়াছে।

"গা-পায়ে খুব ব্যথা?"

"হাঁ।"

"ললিতাকে ডাকি, সে আসিয়া তোমার হাত পা টিপিয়া দিক্।"

"না—না; সারা দিন খাটিয়াছে, তাকে আর কষ্ট দিও না।"

"আমি দিব?"

লেপের আবরণ হইতে মুখ কতকটা বাহির করিয়া ভামিনী বলিল,—"অমঙ্গলের কথা কেন বল? তোমাকে দিয়া—টিপাইয়া লইব!"

"কি দোষ? তোমার অসুখ করিয়াছে, আমি দেখিব না?" যতীন্দ্র সরিয়া গিয়া স্ত্রীর পায়ের কাছে বসিলেন। ভামিনী পা সরাইয়া শয্যার অপর প্রান্তে নিল; লেপের আবরণ হইতে মুখ সম্পূর্ণ বাহির করিয়া বলিল,—"ওগো, ওখানে কেন? এদিকে সরিয়া ব'স।"

যতীন্দ্র শয্যা হইতে নামিয়া দরজা খুলিয়া ললিতাকে ডাকিলেন। ভামিনী বলিল,—"কেন তাহাকে ডাক?"

"তোমার পা টিপিয়া দিবে; তুমি কোন আপত্তি করিও না।"

ললিতা আসিল। যতীন্দ্র বলিলেন,—"বাছা, ইহাঁর গা, পায়ে বড় ব্যথা হইয়াছে, তুমি একটুকু টিপিয়া দাও।"

ললিতা পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল। যতীন্দ্র পালঙ্কের অনতিদূরেই একখানি কেদারায় বসিয়া টেবল হইতে একখানা পুস্তক তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন। ললিতা শয্যার পাশে বসিয়া ভামিনীর পা টিপিতে আরম্ভ করিল।

"তোমার কষ্ট হইবে, ঝি।"

"আমার কষ্ট? আমি সারা রাত বসিয়া তোমার পা টিপিয়া দিব, তা'তে আমার কোন কষ্ট হইবে না।"

যতীন্দ্রনাথ সেই কেদারায় বসিয়া বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন এবং পাঁচ মিনিটে সাতবার করিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। আধ ঘণ্টা পরে ভামিনী কহিল,—"ঝি, খুব হইয়াছে; আমার ব্যথা কমিয়া গিয়াছে। এখন তুমি শুয়ে থাক গিয়ে।"

"আর একটু দিব না?"

"না, ঝি। আমি বেশ ভাল আছি। আর কোন দরকার নাই।"

ললিতা তাহার পা-দু'খানি লেপ দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। যতীন্দ্র শয্যা-পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কেমন আছ?"

"বেশ আছি, আমার আর কোন কষ্ট, গ্লানি নাই। তুমি শু'য়ে থাক।"

ভামিনী মনে মনে ভাবিল,—"এঁর কি দোষ? যত্ন, আদর, স্নেহের কোন ত্রুটি নাই। ভালবাসাও—"

যতীন্দ্র বলিলেন,—"আর একবার হাতখানা দেখিব?"

ভামিনী লেপের তলা হইতে একখানা হাত বাহির করিয়া দিল। যতীন্দ্র নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"না, এখন অনেকটা ভাল। আমি মহা চিন্তায়ই পড়িয়াছিলাম।"

ভামিনী স্বামীর হাতে হাত রাখিয়াই বলিল,—"আমার একটুকু গা ব্যথা হইয়াছিল, তা'তেই অত চিন্তা কেন?"

"কেন যে চিন্তা আসে, তা বুঝাইতে পারিব না।"

"এখন আমার একটু-একটু ঘুম পাইতেছে।"

"বেশ, খুব ভাল।"

যতীন্দ্র আস্তে-আস্তে স্ত্রীর হাতখানি লেপের নীচে রাখিলেন। চারি দিকে লেপ গুঁজিয়া দিয়া স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন।

ভামিনী বলিল,—"তুমিও ঘুমোও।"

যতীন্দ্র একখানি বালাপোষ গায়ে দিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

প্রভাতে জাগরিত হইয়া যতীন্দ্র দেখিলেন, স্ত্রী শয্যা ত্যাগ করিয়াছে। তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া স্ত্রী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। যতীন্দ্র বলিলেন,—"এত ভোরে উঠিয়াছ কেন? কাল—এ ক'দিন অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর খারাপ হইয়াছে, একটুকু বেলা করিয়া শয্যা ছাড়িলেই ত ভাল হইত।"

"আমি বেশ আছি, পরিশ্রমে আমার শরীর খারাপ হয় না। এখানে তুমি আমাকে কোন কাজ করিতে দিবে না, কিছু না করিয়া বসিয়া থাকিতে-থাকিতে আমার শরীর খারাপ হইতেছে।"

"বটে!"

"তুমি নিত্য চা খাও, কে তৈরি করিয়া দেয়?"

"কানাই চাকর।"

"বাড়ীতে থাকার সময় আমি প্রতি দিন দাদার চা করিয়া দিতাম, আমি শিখিয়াছি। আজ থেকে তোমার চা আমি করিয়া দিব।"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে যতীন্দ্র বলিলেন,—"তোমার হাতে চা অমৃততুল্য হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি এখনি কানাইকে দিয়া সমস্ত সরঞ্জাম তোমার কাছে পাঠাইয়া দিতেছি।"

যতীন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিছু কাল পরেই কানাই চাকর চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া দিল। ষ্টোভে জল গরম করিয়া ভামিনী চা প্রস্তুত করিল। স্বামী আসিয়া সেই চা পান করিয়া খুব প্রশংসা করিলেন।

"রোজ করিয়া দিবে?"

ভামিনী হাসিয়া উত্তর দিল,—"রোজই দিব।"

"তোমার শরীর ভাল আছে?"

"আমি বেশ আছি।"

"তবে আমি এখন আসি?"—যতীন্দ্র দাঁড়াইলেন।

ভামিনীও দাঁড়াইল, বলিল,—"একটা কথা। কোন কাজ নাই, শুধু বসিয়া-বসিয়া দিন আর ফুরায় না। তুমি কয়েকখানি ভাল বাঙ্গলা বই আমায় কিনিয়া দিবে?"

যতীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"দিব কি!—দশটার সময় বইয়ের দোকান খুলিবে—এগারটার মধ্যে তুমি বই পাইবে। এখন আসি।"

যতীন্দ্রনাথ সে দিন আফিসে যাইবার পথে বইয়ের দোকান হইতে বাছিয়া-বাছিয়া অনেকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া বাড়ীতে পাঠাইলেন। কানাই চাকর মাথায় করিয়া আনিয়া পুস্তকের বোঝা ভামিনীর ঘরে টেবিলের উপর রাখিল এবং তাহার বন্ধনসূত্র কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পুস্তকের রাশি দেখিয়া ভামিনীর মুখ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রামায়ণ, মহাভারত—মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্র, বঙ্কিম, দীনবন্ধু—আরও কত গ্রন্থকারের পুস্তকে টেবিল ছাইয়া গেল।

ভামিনী আরও দেখিল, প্রত্যেক পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই স্বামীর নিজের হাতে লেখা গ্রন্থস্বামিনীর নাম—শ্রীমতী ভামিনীসুন্দরী দেবী।

সেই কক্ষের দেওয়ালে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো যতীন্দ্রনাথের একখানি বড় এনলার্জড্ ফটো খাটানো ছিল। ভামিনী পুস্তকের স্তূপ হইতে মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিল।

"কালো?—কেন তুমি দু'দিন পরে সে টাকা দিলে না! শ্যামা, বামা,—লোকে কি তা' হ'লে আর কোন কথা বলিতে পারিত?" ভামিনীর চক্ষে জল আসিল।

ঠিক সেই সময়ে আফিসে বসিয়া যতীন্দ্র ভাবিতেছিলেন,—"না, সময় বেশী লাগিবে না! লাগিবে কি? অনেক, অনেকটা তা অনুকূল!" যতীন্দ্রের চক্ষে আশার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাঙ্গালায় অনুজ্ঞা

[শ্রীঅনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সাধারণ কয়েকটি কথা

১। বাঙ্গালায় যতগুলি মূল ধাতু আছে, সকল গুলিকে প্রধানতঃ চারি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) আকারান্ত ধাতু যথা—মারা, করা, ধরা ইত্যাদি।

(খ) "ওয়া" অন্ত ধাতু যথা—দেওয়া, লওয়া, খাওয়া ইত্যাদি।

(গ) "হা"-অন্ত ধাতু যথা—বহা, কহা, রহা ইত্যাদি।

(ঘ) "আন"-অন্ত ধাতু যথা—করান, মারান, ধরান, বহান, কহান, লওয়ান ইত্যাদি।

২। প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয়ের পূর্ব্বে বিকল্পে "ই"র আগম হয়।

৩। পরে সুবিধা হইবে এই ভাবিয়া, সাধারণ কয়েকটি নিয়ম বাহির করিবার জন্য এ প্রবন্ধটি একটু বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে। উদ্ধৃত উদাহরণগুলি দিবার অর্থ—কবে হইতে কোন্ রূপ প্রচলিত আছে, তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে।

অনুজ্ঞা

৪। ইংরাজীতে ইহাকে Imperative mood কহে। কাহাকেও কোনও কিছু করিতে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্ব্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি করিতে এবং শাসাইতে, ও ভর্ৎসনা করিতে হইলে, অনুজ্ঞার প্রয়োগ হয়; সংস্কৃত ভাষায় লোট্। ইংরাজীতে তুমি অথবা তোমরা, বা, তুই বা তোরা এই চারি পদমাত্র অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারে। অপর দুই পুরুষ সম্বন্ধে let him or me (লেট্ হিম্ অর্ মি) আমাকে বা তাহাকে করিতে দাও বলিয়া অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিতে হয়। বাঙ্গালায় তুমি, তোমরা, তুই ও তোরা এই চারি ব্যক্তিমাত্র। অনুজ্ঞা-জ্ঞাপক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারেন। :যথা :—আদর অভ্যর্থনা, আরে আপনি আসুন—আসুন—আমাদের পরম সৌভাগ্য।

আদেশ :—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।

আশীর্ব্বাদ বা প্রার্থনা :—ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক, আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি [ইংরাজী Optative Mood]—বঙ্কিম।

বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান হও।—বঙ্কিম। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক হে দয়াময়।

শাসন :—থাক্ থাক্ থাক্ কাটাইব নাক
আগে ত রাজারে কহি।—ভারত।
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।—ভারত (ভর্ৎসনা)।

তুমি ও তোমরা অনুজ্ঞাজ্ঞাপক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে :—

৫। মূল ধাতুর উত্তর প্রথম-প্রথম "অ" প্রত্যয় হইত।

হঠ ন করিঅ হঠু কর যোহি পার।—বিদ্যা।

হমে অবলা, তুয় হৃদয় অগাধ।
বড় ভএ খেমিঅ সকল অপরাধ॥—বিদ্যাপতি।

আমি অবলা, তোমার হৃদয় অগাধ, বড় হইয়া আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিও। উচ্চারণ ভেদে এই "অ"-"য়"কার হইয়া যাইত।

সাহস ন করিয় সংশয় ঠাম।—বিদ্যাপতি।
যোহি সনিঅ ভাগিনী দোসরি জনু হোঅ।—বিদ্যা।
যে অঙ্গিরিয় তা ন হইঅ উদাস।—বিদ্যাপতি।
ভলমন্দ জানি করিঅ পরিণাম। ঐ
আয়তি পড়লে বুঝিঅ বিবেক॥ ঐ

৬। প্রচলিত বাঙ্গালায় "আ"কারান্ত ধাতুর আকারের লোপ এবং "অ" আগম হয়। এই "অ"র পূর্ব্বে পঞ্চম উদাহরণগুলির মত "ই" আগম হয় না।

করা + অ হইতে কর্ + অ = কর।
করা + অ " কর্ + ই + অ — করিঅ।
মারা + অ " মার্ + অ — মার।
মারা + অ " মার্ + ই + অ = মারিঅ।

এইরূপে বক, কহ, বহ, ধর, শুন, বল ইত্যাদি।

আরতি ন কর কানু ন ধর চীর।—বিদ্যাপতি।
উঠ উঠ বলি করে ধ'রে তুলি বসান যতন ক'রে।—চণ্ডী।
শুন কমলিনী চল কুল রাখি।—চণ্ডী।
না বল না বল সখি না বল এমনো।—চণ্ডী।
উঠ উঠ প্রাণপতি প্রবাহ ভেদিয়ে।
কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে।—দীন।

দেখ দেখ রাধা-রূপ অপার
অপরূপ কে বিহি আনি মিলাওল
খিতিতলে লাবণি সার।—বিদ্যাপতি।

৭। আকারান্ত মূল ধাতুর "আ"কারের লোপ এবং "ও" আগম হয়।

আসা+ও=আস্+ই+ও=আসিও।
করা+ও=কর্+ই+ও=করিও।
আর না করিও নাম।—চণ্ডী।
কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।—চণ্ডী।
মারা+ও=মার্+ই+ও=মারিও।

৮। আজকাল আবার অনেকে মারো, ধরো, করো ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেটা অন্য কিছু নহে, "ই"র আগম বিকল্পে না করিলেই হইল।

করা+ও=কর্+ও=করো
মারা+ও=মার্+ও=মারো
ধরা+ও=ধর্+ও=ধরো
বকা+ও=বক্+ও=বকো
রাখা+ও=রাখ্+ও=রাখো।

৯। আমরা পড়ি :—
মধুহীন ক'রো নাগো তব মনঃ কোকনদে।—মধু।
ওঠো, ওঠো, আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব, উঠিয়া ব'সো।—বঙ্কিম।
তোমরা যা পার তা ক'রো।

এখানে ক'রো ব'সো উচ্চারণ করো, মারো ধরো হইতে ভিন্ন। ক'রো উচ্চারণ করিতে হইলে কোরো পড়িতে হয়। ব'সো=বোসো। অর্থাৎ এ সকল স্থলে উপধা "অ"কারের 'ও'র মত উচ্চারণ হয়। অষ্টম এবং নবম এই উচ্চারণে প্রভেদ ছাড়া অর্থেও প্রভেদ আছে। করো=হুকুম, ক'রো অনুনয়, বিনয় বুঝায়।

১০। আন-অন্ত ধাতুর "ন"র লোপ এবং 'ও' আগম হয়।

করান+ও=করা+ও=করাও
করান+ও=করা+ই+ও=করাইও
দেখান+ও=দেখা+ও=দেখাও
দেখান+ও=দেখা+ই+ও=দেখাইও।
রাখান+ও=রাখা+ও=রাখাও।
রাখান+ও=রাখা+ই+ও=রাখাইও।

তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করাও, কর্ম্মাও। পরেশ এই নূতন এখানে এসেছে, ওকে সব দেখাও, শুনাও। ওকে দেশী জিনিষ কেনাও ও পরাও দেখি, তবে বুঝবো বাহাদুরী। ফিরিয়া দাঁড়াও, তোমার চাঁদ মুখ চাই।—চণ্ডী। আমাপানে চাও।—চণ্ডী। এ মিনতি রাখ, ঐ খানে থাক—আঙ্গিনাতে না আইস।—চণ্ডী।'

১১। "ওয়া" অন্ত ধাতুর মূলের "য়া"র লোপ হয় মাত্র, না "ওয়া"র লোপ এবং "ও" আগম হয়?

তুমি যাওয়া, লওয়া, পাওয়া, দেওয়া (উচ্চারণ দ্যাও) খাওয়া, নাওয়া (স্নান করা) চাওয়া, [লওয়া হইতে নাও হয়, নেও (উচ্চারণ ন্যাও) হয়]। যাও চলি যথা মনের মানুষ যেখানে মন যে টানে।—চণ্ডী (ভর্ৎসনা+শ্লেষ)।

১২। "ওয়া"-অন্ত মূল ধাতুর প্রথম স্বরবর্ণ স্থানে একার হয় এবং "য়া"র লোপ হয়।

যাওয়া হইতে ১১সূত্রে যাও ; যাওয়া=য+আ+ও—য়া=য+এ+ও=যেও,

দেওয়া হইতে দাও, দেও, দিও,
লওয়া, নেওয়া " লও, লেও, নেও। নিও, লিও বলিতে শুনিয়াছি।
চাওয়া " চাও, চেও
পাওয়া " পাও, পেও,
খাওয়া " খাও, খেও,

ছেদন করিয়া দেও পীরিতের ডরি।—চণ্ডী।

ভারতচন্দ্র আবার "যেয়ো" বানান করিয়াছেন :—
এস বৈস এয়ো হোক মেনে যেয়ো
বল সে কেমন জন।

এ স্থলে মনের আবেগে, আদর, আপ্যায়ন কাকুতি মিনতি সব অনুজ্ঞায় বুঝাইতেছে।—

দাও=হুকুম—এখনি তামিল করিতে হইবে এমন হুকুম।

দিও=উপদেশ, অনুরোধ—কাল গৌণে দান করিও তবে কাযটা নেহাত করা হয় যেন। ইত্যর্থঃ।

১৩। "ওয়া"-অন্ত ধাতুর "ওয়া"র লোপ হয় এবং 'ও' যোগ হয়।

খাওয়া+ও=খা+ই+ও=খাইও। ই না আসিলে খাও,।
যাওয়া+ও=যা+ই+ও=যাইও। " " " যাও।
হওয়া+ও=হ+ই+ও=হইও। " " " হও।
চাওয়া+ও=চা+ই+ও=চাইও। " " " চাও।
পাওয়া+ও=পা+ই+ও=পাইও। " " " পাও।
লওয়া+ও=ল+ই+ও=লইও। " " " লও।

সমরি ভিন হোইহ (হইও) তনু।—বিদ্যা।

১৪। "আ"কারান্ত ধাতু যাহার আদিতে "আ"কার আছে, বা যাহার আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে আকার যুক্ত আছে, এমন সব ধাতুর আদ্য আকার বা আদ্য ব্যঞ্জনে যুক্ত "আ"কার "এ"কারে পরিণত হয়, অন্ত্য "আ"কারের লোপ হয় এবং "ও" বা "অ" আগম হয়। এ স্থলে "ই"র আগম হয় না।

ধাতুমূল ধাতুমূল অনুজ্ঞায় ব্যবহৃতরূপ
থাকা=থ্+আ+ক্+আ=থ্+এ+ক+"ও" বা "অ"=থেকো বা থেক।

রাখা=র্+আ+খ্+আ=র্+এ+খ+ও বা অ=রেখো বা রেখ।

চালা = চ্ + আ + ল্ + আ = চ্ + এ + ল + ও বা অ = চেলো বা চেল।

মারা = ম্ + আ + র + আ = ম + এ + র + ও বা অ = মেরো বা মের।

আনা = আ + ন্ + আ = এ + ন্ + ও বা অ = এনো বা এন।

আসা = আ + স্ + আ = এ + স্ + ও বা অ = এসো বা এস।

আঁটা = আঁ + ট্ + আ = এঁ + ট্ + ও বা অ = এঁটো বা এঁট।

আঁকা = আঁ + ক্ + আ = এঁ + ক + ও বা অ = এঁকো বা এঁক।

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।—মধু।
ও বেটা নিকটে এলে ঢেকো মুখ মানে।—মধু।
ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেকো না ভুলিয়ে।—দীন।

এস এস বন্ধু করুণার সিন্ধু রজনী গোঁয়ালে ভালে।—চণ্ডী।

১৫। মূল ধাতুর আদ্য দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়—বিকল্পে।

১	২	৩
ফোলা	ফোলো, ফোল,	ফুলো
তোলা	তোলো·তোল	তুলো, তুল
ধোয়া	ধোও,	ধুয়ো, ধুইও, ধুও (?)
নোয়া (নত হওয়া)	নোও,	নুও (?) নুইও।
পোড়া	পোড়, পোড়ো,	পুড়ো পুড়।
পোড়ান,	পোড়াও,	পুড়োও পুড়িও,:
শোনা	শোন, শোনো	শুন, শুনো
ছোঁয়া	ছোঁও,	ছুঁও, ছুঁইও।
মোতা	মোত, মোতো	মুত, মুতো
ছেলা	ছেলি	ছিল, ছিলো
চরো	চের	চির, 'চরো
ফেরা	ফের	ফির, ফিরো
গেলা	গেল	গিল, গিলো
মেলা	মেল	মিল, মিলো,
মেশা	মেশ	মিশ, মিশো,
ফেলা	ফেল, ফেলো	× • ×
ছেঁড়া	ছেঁড়	ছিঁড় ছিঁড়ো
হেরা	হের	× ×
দেখা	দেখ	× ×
ঘেরা	ঘের	ঘির, ঘিরো

ছুঁইও না ছুঁইও না বন্ধু ঐখানে থাক।

মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ॥—চণ্ডী।

শোনো শোনো তোমার মহীনদার কথা একবার শোনো।—রবীন্দ্র। শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।—বিদ্যাপতি। আবার স্থলে স্থলে শুনু বা "সুনু" ব্যবহার করিয়াছেন।

শুনু শুনু বিনোদিনী রাই। (শুনুন এর 'ন' লোপ এ স্থলে ত মনে ধরা চলে না)। সুন" বানানও দেখা যায়।

সুন সুন মাধব সুন মোরি বাণী।—বিদ্যা।

বিদ্যাপতি শুনু শুনু, সুনু এই রকম বানানও লিখিয়াছেন। এখানে কি "শুনুন" এর "ন"র লোপ মনে করিতে হইবে না কি?

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভলিখিত রূপগুলিতে অর্থগত পার্থক্যও আছে। শোন—আদেশ। শুন, শুনো বলিতে নম্রস্বর দরকার ও শ্রোতব্য বিষয় পরে বা কালগৌণে শুনিলেও চলিবে এই অর্থ বুঝায়।

১৬। সংস্কৃত লোটের "হি" সংযোগ করিয়া সিদ্ধ ক্রিয়াপদ (অবিকল) 'তুমি'র সহিত ব্যবহৃত হয়।

কৃপাং কুরু কমলাক্ষ! রক্ষ এ দীন পামরে।—দাশরথী
এক্ষণে ঈশ্বর তুমি চিন্তয় মম হিতে।—বৃন্দাবন।
সাবিত্রী সমানা স্তব কহে বিপ্রগণ।—রামপ্রসাদ
নিন্দ বিধাতায় তুমি নিন্দ বিধুমুখি। মধু
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি।—রামগতি।
রোষ পরিহর হর দুর্গতি আমার।
করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার॥—রঙ্গলাল।
পরম পদলাভ সম মোদে চিরে হৃদয়রম।—বিদ্যাপতি।

১৬ক। কোনও কোনও স্থলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত মূলধাতুর উত্তর 'ও' তথা 'হ' আগম করিয়া অনুজ্ঞা পদ সিদ্ধ করা হয়।

১৭। "৬" সূত্রে যে সব রূপ দেখান হইয়াছে, সেই অনুজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দের অন্তে "হ" যোগ করিয়া দেওয়া হয় (প্রধানতঃ পদ্যে)। আন(হ) অনল সই মরিব পুড়িয়া।—চণ্ডী। করহ আমার প্রীতি খণ্ডাহ বিস্ময়।—কাশী। না মারহ বৃহন্নলা পড়ি তব পদে। কাশী। ভুলে নাহি পাড়হ বিপদে।—মুকুন্দ। কলিকাতা ট্রামযাত্রী সকলেই "পশ্চাদ্ভাগ দেখহ" পড়িয়াছেন। পদ্যে অন্য উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ।—কাশী। মারিহ হইলে বেশ হইত। এ সথে, এ সথে না বোলহ আন।—বিদ্যা। জানি তোহে (তুমি) করহ বিধান।—বিদ্যা। চতুরী বেচহ গাছ টাম।—জ্ঞান।

১৮। ৭ এবং ১১ সূত্র অনুসারে সিদ্ধ রূপের অন্ত্য "ও" স্থানে অনেক স্থলে "হ" ব্যবহৃত হয়।

তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।—চণ্ডী। কহে শুন শুন ভাই, করিহ পালন মম চরম বচন।—রঙ্গ।

১৯। "হা"-অন্ত ধাতুর "হা"র লোপ হয় ও "ও" আগম হয়।

কহা + ও = ক + ও = কও ; কহিও, কহ।
চাহা হইতে চাও ; চাহিও ; চাহ।
বহা „ বও ; বহিও, বহ।
রহা „ রও ; রহিও, রহ।

মুখপানে চেয়ে, দুখ ভুলাইয়ে, ভাল ক'রে আজি কথাটী কও।
—রজনী সেন।

রও ছুঁচো, দেখ্‌চি, আমিও তোমার উপর এক চাল চাল্‌ব।

চোক চাও ত গা।

২০। "হি" যোগ করিয়া সিদ্ধ সংস্কৃত অনুজ্ঞা পদের পর আবার "হ" যোগ করা হয়।

প্রণমহ দ্বিজ পদসরসিজ
সৃজন-পালন-নাশা—কাশী।

২১। নিম্নলিখিত রূপগুলি কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন নহে।

আমায় কেন দোষ—দোষহ—কপালা মুকুন্দ।

যাও সহচরী জানিয়া আসহ বঁধুয়া আসে না আসে।
—চণ্ডী। ১৮ দ্রষ্টব্য।

গিয়া ঐ দেশে আসে বা না আসে জানিয়া আইস নেহা।—চণ্ডী।

আইস আইস বৈস ওহে প্রাণ সখে। [হিন্দী বৈঠনা]

তোমার বদন পূর্ণ চন্দ্রমা নিরখি :—কাশী।

এই করবালে ছেদহ (ছিন্ধি) দক্ষিণ বাহু

হৌক মম সুখেতে মরণ।—রঙ্গলাল।

ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি।—ভারত।

পার্থেরে রহিচ স্থূল দেহ (দেহি) মনোহর।—কাশী।

২২। অকারান্ত ধাতুর উত্তর "ই" আগম হইয়া যেখানে 'ও' যোগ হয়, সেখানে "ও"র স্থানে "হ" প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

চণ্ডীদাস বলে তুমি না ভাবিহ (ভাবিও) চিতে। দেবীর চরণে মন রাখিহ (রাখিও) সব্বথা।—মুকুন্দ।

দক্ষিণ মসানে মোর বধিহ জীবন।—ভারত। হঠ ন করিহ সহ ন পুরত কামে।—বিদ্যা।

(খ) আন অন্ত ধাতুর উত্তর যেখানে 'ই' না আসে, সে স্থলে "ও" এবং "হ" হয়। করাহ, দেখাহ।

(গ) "ওয়া" অন্ত ধাতুর শুধু "য়া" কাটিয়া যেরূপ সিদ্ধ হয়, তাহার অন্ত্যস্থিত 'ও' স্থানে "হ" হয়। যাহ, লহ, দেহ, খাহ, চাহ ইত্যাদি।

(ঘ) "হা" অন্ত ধাতুর কহহ, বহহ, চাহহ ইত্যাদি রূপও দেখা যায়।

বাঙ্গালা অনুজ্ঞার এই অ, ও এবং হ; সংস্কৃত "হি" হইতে উৎপন্ন কি?

২২। ক। বাঙ্গলা অনুজ্ঞা পদের পর লোট হি যোগ বিদ্যাপতিতে পাওয়া যায়।

দুতি দয়াবতি কহহি বিসেখি।

পুনুবেরা এক কইসে হো এত দেখি॥ হি পাদপূরণে নহে ত?

তুই বা তোরা অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে:—

২৩। "আ"কারান্ত যাবতীয় ধাতুর "অন্ত্য" আকার লোপ করিলে যে হসন্ত রূপ হয় তাহাই ব্যবহৃত হয়।

মার্, বক্, চল্, চাঁচ্, ফেল্, ধর্, কাড়্, ছেঁড়্ ইত্যাদি।

কাঁদ্ কাঁদ্ কাঁদ্ সখি কাঁদ্ মন দিয়ে।—দীনবন্ধু। আমার শরীরটা কেমন কেমন ক'র্‌ছে—তুই আমার কাযগুলা কর্ না।—বঙ্কিম। ছেলেটাকে ধর্ না।

২৪। "ওয়া"-অন্ত ধাতুর 'ওয়া'র লোপ হয় মাত্র।

দেওয়া—দে চাওয়া—চা গাওয়া—গা
ধোওয়া—ধো পাওয়া—পা থোওয়া—থো
নাওয়া—না খাওয়া—খা
লওয়া } ল ছাওয়া—ছা
নেওয়া } নে হওয়া—হ

২৫। "হা"-অন্ত ধাতুর "হা"র লোপ হয়।

কহা হইতে ক চাহা হইতে চা
বহা " ব বাহা " বা
রহা " র

দ্রষ্টব্য:—চলা হইতে "চ" হয়। তোর মনের কথা তুই জানিস্, এখন "চ":—বঙ্কিম।

২৬। "আন"-অন্ত ধাতুর "ন"র লোপ হয়।

খাওয়ান হইতে খাওয়া চাপড়ান—চাপড়া
দেখান " দেখা, বিগড়ান—বিগড়া
পড়ান " পড়া দাঁড়ান—দাঁড়া
নড়ান " নড়া দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে রে মুখ যবন:—নবীন।

২৭। ধাতুর উত্তর "স্" প্রত্যয় হয়।

(ক) "স্" প্রত্যয়ের পূর্ব্বে "ই" আগম হয় নিত্য।

করা + স্ – কর্ + ই + স্ = করিস্, বকিস্, মারিস্, ধরিস্ ইত্যাদি।

(খ) "ওয়া" অন্ত ধাতুর, "স্" পরে থাকিলে বিকল্পে "ই" আগম হয়।

খাইস্, খাস্, গাইস, গাস
যাইস্, যাস্, চাইস, চাস ইত্যাদি।

২৭। (গ) "আন" অন্ত ধাতুর, "স্" পরে থাকিলে উত্তরে বিকল্পে "ই" আগম হয়।" "ন"র লোপ হয়।

খাওয়ান—খাওয়াস, খাওয়াইস্। বুঝান—বুঝাইস, বুঝাস্।

চাওয়ান—চাওয়াস, চাওয়াইস্। মানান—মানাস, মানাইস।

মাড়ন—মাড়াস্, মাড়াইস। চাপ্‌ড়ান—চাপড়াস্, চাপ্‌ড়াইস্

জড়ান—জড়াস্, জড়াইস।

মোচ্‌ড়ান—মোচ্‌ড়াস, মোচ্‌ড়াইস্।

ছুমড়ান—ছুমড়াস্, ছুমড়াইস্।

(ঘ) "হা"-অন্ত ধাতুর "হা"র বিকল্পে লোপ হয়।

অন্তরূপ

কহা + স্ = ক + স্ = কস্, কহিস্; কইস্ কৈস

বহা + স্ = ব + স্ = ব'স্, বহিস; বইস্ বৈস

রহা + স্ = র + স্ = র'স্, রহিস্; রইস্ রৈস

চাহা + স্ = চা + স্ = চাস্, চাহিস্; চাইস্

কেহ এই রূপগুলি চালান না! Phonetic বানানের চূড়ান্ত হইবে।

বসা হইতে বৈস, এইরূপে হয় নাই ত?

বচনে রস হোসি (হইস) তনু॥—বিদ্যাপতি।

২৮। অনুজ্ঞা আবার স্থলবিশেষে উপহাস বা অবজ্ঞার সূচনা করে।

যত শক্তি আছে বেটা তত শক্তি হান্ —কৃত্তি।

যা কর্‌বার তা কর্।

২৯। বিরক্তি বা অগ্রাহ্য ভাব প্রকাশে অনুজ্ঞাসূচক পদ ব্যবহৃত হয়।

যা যা, তোর আর বড়াই করিতে হ'বে না।

যা যা, আমি তোমাদের মত মন্দ হইনি।—শিবনাথ।

দূর হ আমার সম্মুখ থেকে।

৩০। ইংরাজীতে 'Let' যে কার্য্য করে, আমাদের উক্ ও উন্ সেই কার্য্য করে।

বর্ত্তমান প্রচলিত উক্ (ক্রিয়ার অন্তস্থিত) বিদ্যাপতির আমলে কেমন ছিল?

মানিনি আবহু (এখনও) পলটি (ফিরিয়া) চল, পিয়াকা পথ (পদে) পল (পড়) মেটও (মিটুক) সবে (সকল) অপরাধ।

৩১। চণ্ডীদাসে "উ" ও উক্ হইয়া দাঁড়াইল।

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।

তাহার অধিক ধিক পরবশ হ'য়ে॥

৩২। আধুনিক বাঙ্গলায় উক্।

(ক) উক্ পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর আকারের লোপ হয় মাত্র।

মরা + উক্ = মর্ + উক্ = মরুক্।

থাকা + উক্ = থাকুক।

দেখা + উক্ = দেখুক।

সে নারী মরুক্ জলে ঝাঁপ দিয়া

যে করে পরের প্রেম।—চণ্ডী।

জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে।—দীনবন্ধু।

প্রকাশ করিয়া বল শুনুক সর্ব্ব কুরু।—কাশী।

৩৩। উক্ যোগ হইলে "ওয়া" অন্ত ধাতুর "ওয়া"র লোপ হয়।

হওয়া হইতে হউক। পাওয়া হইতে পাউক।

যাওয়া " যাউক। খাওয়া " খাউক।

মুনি ঠাকুরের শাপে যে হয় সে হউক।

রাজ্য আর স্ত্রী অর্থ যার সে যাউক॥—বৃন্দাবন।

৩৪। "ওয়া," "হা" ও "আন" অন্ত ধাতুর পর "উকের" "উ"র বিকল্পে লোপ হয়।

হওয়া—হউক, হ'ক, বহা—বহুক্, বক্, বউক

যাওয়া—যাউক, যাক্ রহা—রহুক, রক্, রউক

খাওয়া—খাউক, খাক্ সহা—সহুক, স'ক

মাড়ান—মাড়াউক, মাড়াক। ছাড়ান—ছাড়াউক, ছাড়াক

দাঁড়ান—দাঁড়াউক, দাঁড়াক। থাকা—থাকুক, থাক

চাহা—চাউক, চাক, চাহুক,

উচ্চারণ-অনুযায়ী হৌক, লৌক ইত্যাদি রূপও দেখা যায়।

দাঁড়াক সকলে এখানে আসিয়া।—হেম।

হাতের ন ক্ষয় যাক্ পাল দশ জনে।—দীনবন্ধু।

যে হ'ক্ হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে।—রঙ্গলাল।

যুদ্ধের আছুক কায দেখি ছন্ন হৈনু।—কাশী।

আছুক কোন্ ধাতু?

অপমান ঘোষণা যাক্ দেশে দেশে

সে মোর চন্দন চুয়া। জ্ঞান।

৩৫। "উক্" ও "স্" পরে থাকিলে ধাতুর আদ্য স্বর হ্রস্ব হয়।

শোনা হইতে শুনুক, শুনিস্।

লওয়া—নেওয়া হইতে লক, লউক, নেক, নিক্, নিউক, নিস্।

দেওয়া—দিউক, দিক্, দেক্, দিস্।

ছোঁওয়া—ছুঁউক, ছুঁক্, ছোঁক (হয়?) ছুঁস্।

শোওয়া—শুক্, শুউক, শোক্ (হয়?) শুস্।

৩৬। কখনও-কখনও 'উকে'র "ক"র লোপ দেখা যায়।

কি করিতে পারে গুরু দুরজন হয় হউ অপযশ।—চণ্ডী।

লোক হাসি হউ কুল জাতি যাউ

তবু না ছাড়িয়া দিব।—চণ্ডী

জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণ নাম।—বৃন্দাবন, চৈতন্য-ভারত।

তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবী হউ তনু।—জ্ঞান।

অনুক্ষণ সোধনি করু অনুরাগ। - জ্ঞান।

৩৭। আইস = এস = আসিও, আয়।

আইস্ = আ + ই + স = এস।

একে বিশ্লেষণ করিয়া আ + ই করা হইয়াছে।

আয় কেমন করিয়া হয়?

৩৮। মাননীয় ব্যক্তিকে কোনও কিছু করিতে উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি করিতে হইলে উক না হইয়া "উন" প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। উকের প্রয়োগে যে যে নিয়ম খাটে, উনেও সেই সেই নিয়ম খাটে।

খাউন—খান বউন—বন, বহুন করাউন—করান

যাউন—যান কউন—কন, কহুন ধরাউন—ধরান

হউন—হ'ন রউন—র'ন, রহুন চালাউন—চালান

লউন—লন

নেন—নিন, নিউন; [নেউন হয় না]।

দেন—দিন, দিউন।

আকারান্ত ধাতুর পরস্থ "উনে"র "উ"র লোপ ...

মারুন, ধরুন, বসুন, চলুন, আসুন, আমুন, আঁকুন, ঢাকুন, জুড়ুন, থামুন।

৩৯। কখনও বা "উক" এই দুই বর্ণ স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া "কু"-তে পরিণত হয়।

বল বামনারে ভূত দেখাকু আমায়।—ভারত।
জোয়ার ভাটিয়া যাউক, টুটি যাকু জল।—মুকুন্দ।
নারীগণ রয় ভাল ভাল শশিমুখি! তোর শশিভাল
হকু ধনহীন পণ্ডিত তো বটে।—দাশরথি।

৩৯ ক। "উন্" এই দুই বর্ণকে কখনও স্থান-পরিবর্ত্তন করিয়া "নু"তে পরিণত হইতে দেখি নাই।

৪০। পূর্ববঙ্গে "উন্" স্থানে "এন" ব্যবহৃত হয়।

খাএন-খায়েন রাখেন ইত্যাদি।
যায়েন রহেন রএন (উচ্চারণ)
মারেন কহেন কএন (উচ্চারণ)
থাকেন

৪১। ইংরাজিতে যেমন You shall বলিলে Command করা বুঝায়, বাংলায় তেমনই "বে,-ইবে," "বি-ইবি" যোগে অনুজ্ঞা বুঝান হয়। যথা:—

কাল সকালে সকলের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে, হাতের চুড়ি খুলে, এই থান পরবে, কথা শুনবে, তার পর সকলের সঙ্গে হবিষ্যি করবে।—শিবনাথ। রামী চাকরাণীকে বাড়ী রাখবেন না।—শিবনাথ।

জব পরীহরি চল এ চাহি। বুটিল নয়ানে হেরবি তাহে।—বিদ্যা

৪২। অনুজ্ঞাজ্ঞাপক ক্রিয়ার সহিত—

সে
সিয়া } যুক্ত থাকিতে দেখা যায়।
গে

"সের" অর্থ এসে
সিয়ার „ আসিয়া
গে „ গিয়া

ইহা যোগ করিয়া (১) অনুজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন (২) অনুরোধ বা আহ্বান (৩) "চিপটেন" ভাবে উচ্চারণ করিলে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, শ্লেষ ও ঈষৎ অব্যক্ত হাস্য প্রকাশ করা হয়।

শ্যাম সোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবহ সিয়া।—চণ্ডী

আমরা অনেক সাধ্য সাধনা করলুম তুমি একবার সাধগে অমনি দেখিবে! সে যাহা ইচ্ছা করুকগে আমি কিছু ব'লব না। চুলোয় যাকগে। ঘরে কে ব'সে রহিয়াছেন দেখগে।

এ সম্বন্ধে ৺রমণীমোহন মল্লিক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও অত্র উদ্ধৃত হইল:—সেবহ সিয়া অর্থাৎ সেবা কর। অনেক কথার সহিত সিয়া শব্দ যোগ থাকা দেখা যায়। যথা দেখসিয়া [দেখসে,] খাওসিয়া [খাওসে]।" কিন্তু এ টিপ্পনী ততদূর আমার মনঃপূত নহে।—

৪৩। এই দফাটি ২৯এর পরে হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, যখন সেখানে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তখন এইখানে লিখিয়া দেওয়া গেল। কতকগুলি ধাতু আছে, যাহার আদ্য ব্যঞ্জনে 'ইবা' "উ"কার যুক্ত ও অন্তে "আন" আছে। এইরূপ ধাতুর উত্তর "স্" ["তুই এর পর] হইলে "আন"র লোপ এবং "উ" আগম্ হয় বিকল্পে।

লুকান	হইতে	লুকাইস্,	লুকাস্	লুকুস্
গুঁতান	„	গুঁতাইস্,	গুঁতাস্	গুঁতুস্
শুকান	„	শুকাইস্,	শুকাস্	শুকুস [যথা চুল]
চুকান	„	চুকাইস্	চুকাস	চুকুস
মুতান	„	মুতাইস্	মুতাস	মুতুস
নিকান	„	নিকাইস্	নিকাস্	নিকুস
বিকান	„	বিকাইস্	বিকাস্	বিকুস
ঢুকান	„	ঢুকাইস্	ঢুকাস্	ঢুকুস্
বুলান	„	বুলাইস্	বুলাস্	বুলুস
লুটান	„	লুটাইস	লুটাস	[লুটুস হয়?]
কুটান	„	কুটাইস	কুটাস	[কুটুস হয়?]
গুটান	„	গুটাইস	গুটাস	গুটুস
খুঁটান	„	খুঁটাইস	খুঁটাস	[খুঁটুস হয়?]
ছুটান	„	ছুটাইস	ছুটান	ছুটুস [ঘোড়া]
লুটান	„	লুটাইস	লুটাস্	লুটুস [কাপড়]

এইরূপে নিবুস, ঝিমুস, চিবুস,—

৪৪। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সাধারণতঃ—

১। প্রত্যয় পরে থাকিলে "আ"কারান্ত ধাতুর "আ"র লোপ হয়।
২। „ „ „ "আন" অন্ত „ "ন"র লোপ হয়।
৩। „ „ „ "ওয়া" অন্ত „ "ওয়া"র লোপ হয়।
৪। „ „ „ "হা" অন্ত „ "হা"র লোপ হয়।
৫। "ওয়া" ও "হা" অন্ত ধাতুগুলিকে প্রথমতঃ "আ"কারান্ত তথা "ওয়া" ও "হা" অন্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। যখন "ওয়া" ও "হা"র অন্তে "আ" আছে, তখন উহারা আকারান্ত নহে এ কথা কে বলিবে? আন অন্ত ধাতুর মধ্যে নিজন্ত ছাড়া অনেক অনিজন্ত ধাতু আছে। শেষের পাঁচটী নিয়মের ব্যতিক্রম অতঃপর যে যে স্থলে দেখা যাইবে, শুধু সেই সেই স্থলে, অপর প্রবন্ধে, পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইবে।—ইতি

বিষাঙ্গনা

[অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ]

কবিবর বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে প্রতিপক্ষ চন্দ্রগুপ্তের মারণার্থ মহানন্দের অমাত্য রাক্ষস কর্ত্তৃক "কর্ণেনেব বিষাঙ্গনৈকপুরুষ-

ব্যাপাদিনী রক্ষিতা" ইহার উল্লেখ দেখিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন—"বিষাঙ্গনা বলিতে কি বুঝেন, —ইহা কি বিষময়ী কৃত্রিম কন্যাকৃতি পুত্তলিকা, নীতি-বিদগণ কর্ত্তৃক শত্রুর বিনাশার্থ মারণ রূপে প্রযুক্ত হইত, যাহা বাস্তবিক রূপবতী কন্যা ভ্রমে আলিঙ্গনাদি করিতে যাইয়া বিষলিপ্ত হইয়া শত্রু মৃত্যুমুখে পতিত হইত? অথবা বস্তুতই শ্বাসপ্রশ্বাসাদিযুক্তা কোনও বিষাত্মিকা কন্যা?" তৎকালে উক্ত পুস্তকের নানা সংস্করণে মুদ্রিত বিবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা আলোড়ন করিয়াও কোন সিদ্ধান্তই নির্ণীত হয় নাই,—বোধ করি ব্যাখ্যাতৃগণ এই শব্দটী তুচ্ছ বোধেই ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। প্রসিদ্ধ কোষ ও অভিধান গ্রন্থেও এ শব্দটীর কোন প্রসঙ্গই দৃষ্ট হইল না। ভূয়োদর্শন পণ্ডিতমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন ফলোদয় হইল না। একজন নানাশাস্ত্র-বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিলেন—চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে নাকি বিষকন্যা-প্রয়োগাধিকার বলিয়া একটা অধ্যায় আছে। তাহাতে নাকি ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার এই উত্তরে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম, এবং অর্থশাস্ত্রের মত দুর্লভ গ্রন্থে পণ্ডিতমহাশয়ের গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া যথার্থই হৃদয় উল্লসিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন কি জানিতাম যে, আজকালকার প্রত্নতত্ত্বাভিমানি পণ্ডিতপুঙ্গবগণের নিকট যে কোন বিষয়ের অবতারণা করা হউক, তাঁহারা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের দোহাই দিবেন? এই সকল "হস্তিবিদ্যা" মহাপুরুষদিগের দ্বারাই জগৎটা এতদিন বঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। অর্থশাস্ত্রের "ঔপনিষদিকম্" নামক অধিকরণের "পরঘাত প্রয়োগ" প্রকরণে—এই অংশটী দেখিতে পাই—"কালকূটাদিঃ বিষবর্গঃ শ্রদ্ধেয় দেশবেশ-শিল্পভাজনাপদেশৈঃ কুব্জবামন কিরাতমূকবধির জড়ান্ধচ্ছদ্মভিঃ ম্লেচ্ছজাতীয়ৈরভিপ্রেতৈঃ স্ত্রীভিঃ পুংভিশ্চ পরশরীরোপ ভোগেষ্বা ধাতব্যঃ।" অর্থাৎ বিশ্বাস-সম্পাদক বেশভূষাদি দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী কর্ত্তৃক শত্রুশরীরে কালকূটাদি বিষপ্রয়োগ করিতে হয়। ইহা দ্বারা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগেরই নির্দ্দেশ করা হইতেছে মাত্র; ইহাতে বিষময়ী কন্যা বা বিষকন্যার কোনও প্রসঙ্গ আসিতেছে কি না, তাহা বিচক্ষণ পাঠক নির্দ্ধারণ করুন। নীতি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রি এম এ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন—নীতি-শাস্ত্রে ইহা অপেক্ষা বিষকন্যার উল্লেখ আর ত পাই নাই।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বিষকন্যা সম্বন্ধে তাঁহার জীবনশিক্ষা পুস্তকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্বান মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য—তাই এখানে তাহার সার উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—তিনি বলেন—"আগমে একটী কথা আছে 'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে বৈ সন্তি কলেবরে।' ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদি, গিরি নদী প্রভৃতি,...প্রাণি উদ্ভিদসমূহ স্থূলরূপে বিরাজ করিতেছে, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াস্বরূপ ক্ষুদ্র কলেবরেও ঐ সমুদয় বস্তুই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। তিমির অপনোদন পূর্ব্বক আলোক প্রকাশ করে বলিয়া চক্ষুদ্বয় হইলে যেন সূর্য্য ও চন্দ্র,—রসনা হইল রসবাহিনী সরিৎ, জঠরানল যেন বহ্নি, ভূতলে কুশকাশাদির মত শরীরে কেশ রোমাদি, অরণ্যে পশ্বাদির মত শরীরে কৃমি কীটাদি। এইরূপে দোষে ও গুণে শরীর ও ব্রহ্মাণ্ডের সাম্য সহজেই অনুভূত হইয়া থাকে। পুনরায় বহির্জগতে অমৃত ও বিষ যেমন স্থূলরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্তঃশরীরেও সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান। দশনাগ্রে, নখপ্রান্তে বিষ বিদ্যমান। বসা শুক্র প্রভৃতিও বিষবিশেষ বুঝিতে হইবে।

প্রাণিশরীর মাত্রেই বিষ ও অমৃত ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। অসাধুগণের শরীরে পাপ নামক বিষ বহুল পরিমাণে অবস্থিত হয়। তাহাদের সহিত একত্র পান, ভোজন, আলাপনাদি দ্বারা তদীয় বিষ পুরুষান্তরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। পাপরূপ বিষের সংস্পর্শে সাধুও অসাধু হয়; এই জন্যই প্রবাদ আছে—"সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি।" আরও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত সংসর্গ দ্বারা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হয়, অপরের সহিত সংসর্গে শীর্ণ ও কৃশ হয়, এ সকলই সংসর্গের ফল। প্রাচীন মহর্ষিগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা কাহার শরীরে বিষ বা অমৃত অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে, তাহা জানিতে পারিতেন। কন্যার সহিত কিরূপ বরের মিলন হইতে পারে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি আমরা বাহ্যলিঙ্গ হইতে শরীরাভ্যন্তরস্থ বিষাদির অস্তিত্ব জানিতে পারি না।

পূর্ব্বকালে বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ক্লীবের পরীক্ষা হইত, যথা—

> ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি।
> মেঢ্রশ্চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে।

এইরূপ উপায়ে বর ও কন্যার পরীক্ষা হইত। কন্যার পরীক্ষা, যথা—

> "ত্রীণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাটমুদরং ভগম্।
> ক্রমেণ ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিম্॥"

এক্ষণে কালবশতঃ কন্যা ও বরের পরীক্ষণ-পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই অকাল-বৈধব্য প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং দম্পতি প্রণয় সুবিরল হইয়াছে।

বারংবার দংশন দ্বারা বিষধর ভুজঙ্গের বিষ-বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়, পুনঃপুনঃ দষ্ট ব্যক্তি প্রথমবার দংশন অপেক্ষা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার দংশনে বিষজ্বরে ততটা অভিভূত হয় না। পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মানব-শরীরেও বিষ ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান; বয়সের সহিত ঐ বিষ ক্রমশই বর্দ্ধিত হয়। বাল্য কৈশোর ক্রমে যখন শরীরে যৌবন প্রস্ফুটিত হয়, তখন শরীরাভ্যন্তরে বিষাঙ্কুরও উদ্ভিন্ন হয়। অতএব সমুচ্ছলিত বিষবেগা প্রৌঢ়যৌবনা রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত সংলাপ ও সংসর্গাদি দ্বারা তাহার বিষবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথম পতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়; ইহাতে তাহার বিষ-প্রকোপ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে দ্বিতীয় পতি বা সংসর্গকারী সুখে তাহার সহিত দিনযাপন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে রামদাস কবিবল্লভ কৃত জ্যোতিষার্ণবের বচনটী এই—

ভূমি নম্পৃশ্যতে যস্যা অঙ্গুল্যা চ কনিষ্ঠয়া
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্যাৎ দ্বিতীয়ঞ্চাভিনন্দতি ॥

যে রমণীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলী ভূমিস্পর্শ করে না, তাহার প্রথম পতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দ্বিতীয় পতি তাহার সহিত সুখে কালযাপন করে।

পুনশ্চ—

যস্যা মধ্যং ভবেদ্দীর্ঘং সা স্ত্রী পুরুষঘাতিনী।
ভূমির্ণস্পৃশ্যতেঽঙ্গুলা সা নিহন্যাৎ পতিত্রয়ম্ ॥ ১
প্রদেশিনী ভবেদ্দীর্ঘা সা স্যাৎ সৌভাগ্যশালিনী।
বৃদ্ধা যস্যা ভবেদ্দীর্ঘা পতিং হন্তি চতুষ্টয়ম্ ॥ ২
লম্বোদরী স্থূলজঙ্ঘা স্থূলনাসা চ যা ভবেৎ।
পতয়ো হষ্টৌ শ্রিয়েরন্ সা নবমেতু প্রসীদতি ॥ ৩
বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণজিহ্বিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়মপি বিন্দতি ॥ ৪
যস্যা অত্যুৎকটৌ পাদৌ বিস্তৃতঞ্চ মুখং ভবেৎ।
উত্তরোষ্ঠে চ লোমানি সা শীঘ্রং ভক্ষয়েৎ পতিম্ ॥

যে স্ত্রীর মধ্যভাগ দীর্ঘ সে পুরুষঘাতিনী। যাহার অঙ্গুলী ভূমিস্পর্শ করে না, তাহার তিনটী পতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাহার প্রদেশিনী অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলীটি দীর্ঘ হয়, সে সৌভাগ্য-শালিনী। যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘ, তাহার চারিটি পতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহার উদর লম্বা জঙ্ঘা স্থূল নাসিকাও স্থূল, তাহার আটটী পতি মৃত হয়, নবম পতি প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালযাপন করে। যাহার দন্তগুলি বিরল,—জিহ্বা কৃষ্ণ, অক্ষি ও কৃষ্ণ তাহার প্রথম পতি বিনষ্ট হয়। যাহার পদযুগল উৎকট, মুখ বিস্তৃত, এবং উপর ঠোঁটে লোম, সে শীঘ্র পতি ভক্ষণ করিয়া থাকে।

বিষযোগে জাত কন্যাও বিষকন্যা হয়। বিষযোগ যথা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে—

"দ্বাদশী বারুণঃ সূর্য্যে বিশাখা সপ্তমী কুজে।
মন্দেঽশ্লেষা দ্বিতীয়া চ বিষযোগা ত্রয়োমতা ॥"

[যবনাচার্য্য কৃত স্ত্রীজাতক]

অর্থাৎ রবিবারে দ্বাদশী তিথি ও শতভিষা নক্ষত্রের যোগ হইলে, এবং শনিবারে দ্বিতীয়া তিথি ও অশ্লেষা নক্ষত্র হইলে বিষযোগ হয়; উহাতে জাত কন্যা বিষকন্যা হয়।

জ্যোতিঃ সারার্ণব গ্রন্থের ষষ্ঠ-তরঙ্গে বিষকন্যার স্পষ্ট উল্লেখ, যথা—

রিপুক্ষেত্র গতৌ দ্বৌ তু লগ্নে যদি শুভগ্রহৌ।
ক্রূরস্তত্র গতোঽপ্যেকো ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা ॥
ভদ্রা তিথির্যদাশ্লেষা শতভিষাচ কৃত্তিকা।
মন্দার রবিবারেষু ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা ॥

যদি কন্যার জন্মলগ্নে দুইটী শুভগ্রহ রিপুক্ষেত্রগত হয় এবং একটী ক্রূর গ্রহ তাহার সহিত মিলিত হয়, তবে সেই কন্যা বিষকন্যা। আর যদি শনি, মঙ্গল বা রবিবারে, দ্বিতীয় চতুর্থী ও দ্বাদশী তিথি এবং অশ্লেষা, শতভিষা ও কৃত্তিকা নক্ষত্র মিলিত হয়, তবে তাহাতে জাত কন্যা বিষকন্যা হয়।

বিষকন্যার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিলেন। অশুভগ্রহ, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতিতে জাত কন্যা বিষময়ী হয় এবং ঐরূপ কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইলেও তাহার সহিত সহবাসাদি দ্বারা অতি বলীয়ান পুরুষও অকালে কালকবলে পতিত হইয়া থাকে।

সামুদ্রিক-শাস্ত্রে এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—

"যদঙ্গং নাভি বাঞ্ছন্তি নশকা বা জলৌকসাঃ।
মক্ষিকাশ্চ স্ত্রিয়ং তাং বৈ নোপগচ্ছেৎ কদাচন ॥
যন্মূত্রে তেজসা ভৌমা ম্রিয়ন্তে চ মহীলতাঃ।
পিপীলিকাশ্চ কীটাশ্চ তাং নারীং বিষবৎ ত্যজেৎ ॥

অর্থাৎ সে রমণীর অঙ্গ মশক ও জলৌকা প্রভৃতি কীট দংশন করে না, করিতে ইচ্ছাও করে না, ইত্যাদি সেই নারীকে বিষের ন্যায় ত্যাগ করিবে। ইহারাই বিষাঙ্গনা।

এইরূপ কন্যার মারণ-শক্তি অব্যর্থ মনে করিয়া অমাত্যপ্রবর রাক্ষস চন্দ্রগুপ্ত-নিধনের জন্য বাস্তবঃ পরমসুন্দরী অন্তর্বিষময়ী রমণী প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, ইহা সঙ্গত মনে হয়। আর একজাতীয়া বিষাঙ্গনা আছে—তাঁহাদের শ্রীমুখের এক একটী বাক্য তীব্র বিষ উদ্গীরণ করিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, ননদ ও দেবর পত্নীগণকে জ্বালায় অস্থির করে, কিন্তু স্বামীর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে—এইরূপে সোণার সংসার ছারেখারে দেন,—স্বামীর হৃদয় হইতে বিমল মাতৃভক্তির উচ্ছেদ সাধন করেন,—স্বর্গীয় ভ্রাতৃ প্রেমের অমল স্বচ্ছ ধারাকে কলুষিত ও পঙ্কিল করেন। যাঁহারা এইরূপ রমণীর সহিত পরিচিত, তাহাদের বিষের যে কিরূপ তীব্রতা, তাহা তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া থাকেন।

এই জাতীয় বিষাঙ্গনা প্রায়ই অসৎ-কুলোদ্ভবা ও অশিক্ষিতা হইয়া থাকে। পিতা মাতা সাধু চরিত্র হইলে, এবং বংশ নিষ্কলঙ্ক হইলে,—এবং একটু ধর্ম্মশিক্ষা থাকিলে, মেয়েরা কখনই এমন সর্ব্ব-সংহারক বিষ দ্বারা সংসার উচ্ছন্ন দিতে পারে না। যাহা হউক এইরূপ রমণীগণ কিন্তু স্বামীর নিকট অমৃতময়ী হইয়া থাকে।

শাপ-প্রভাবে যে রমণী বিষময়ী হয়, তাহা কল্কিপুরাণের তৃতীয়াংশান্তর্গত চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান কল্কিদেবের কাঞ্চনীপুরী-প্রয়াণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানটি এইরূপ :—

"কল্কি সেনাগণের সহিত কাঞ্চনীপুরী গমন করিলেন। সেই নগরী মণিকাঞ্চন-চিত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নাগকন্যাগণ দ্বারা বিভূষিত। তথায় হরিচন্দন বৃক্ষসমূহ বিরাজিত, কিন্তু জনমানবশূন্য। ইহা দেখিয়া কল্কি সহগামিভূপতি-বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—"ইহা সর্পগণের নগরী, মানবগণের ভয়দায়িনী—ইহা নাগরমণীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত—ইহার মধ্যে যাইব কি না বল।" যখন কল্কি ঐরূপ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন, সেই সময় অশরীরিণী বাক্ আকাশে শ্রুত হইল—"হে দেব, তুমি স্বয়ং ইহা প্রথমে না দর্শন করিয়া সেনাগণের সহিত ইহার ভিতর প্রবেশ করিও না, কেন না ইহার অভ্যন্তরে একটী "বিষকন্যা"

আছে, তাহার দৃষ্টি দ্বারা আপনি ভিন্ন, আর সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতএব প্রথমে আপনি একাকী প্রবেশ করুন।” এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া কল্কিদেব একাকী খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সত্বর সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় গমন করিয়া বীরগণের ধৈর্য্যনাশিনী এক অসামান্যা রূপবতী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই রমণী কল্কিদেবকে দেখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন—“এই সংসারে কত বীর্য্যশালী ভূপতি, কত অগণ্য মানব, কত সুর অসুর আমার নয়নপথগতি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই হতভাগিনী এক্ষণে আপনার নেত্রকমলদ্বয়ের দৃষ্টিরূপ সুধা দ্বারা প্লাবিতা হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছে। ইহা আমার সামান্য তপস্যার ফল নহে, যে, দীনা ভাগ্যহীনা, বিষেক্ষণা আমার নিকট অদ্য অমৃত ফল আপনি, স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন।” তখন কল্কিদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কে? কেনই বা তোমার দৃষ্টি বিষময়ী হইয়াছে?”—তখন বিষকন্যা বলিলেন—“হে মহামতে! আমি গন্ধর্ব্ব চিত্রগ্রীবের ভার্য্যা, নাম সুলোচনা। একদা পতির সহিত বিমানারোহণ পূর্ব্বক গন্ধমাদন কুঞ্জে গমন করতঃ আমোদ-আনন্দ ভোগ করিতেছিলাম। তখন যক্ষ নামক মুনিকে বিকৃতাকার ও আতুর অবস্থায় দেখিয়া রূপ ও যৌবনগর্ব্বে মত্ত হইয়া কটাক্ষ দ্বারা বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। আমার সেই বিদ্রূপ ও অপ্রিয় পরিহাস শ্রবণ করিয়া মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ দিলেন, তাহাতেই আমি “বিষদর্শন” হইয়াছি, এবং এই সর্পপুরে কাঞ্চনীনগরীতে নাগিনীগণের সহিত বিষবর্ষিণী হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। জানি না অদ্য কোন্ তপস্যার ফলে আপনি আমার নয়নগোচর হইয়াছেন, যাহার ফলে আমি শাপমুক্ত হইয়া পতিলোকে চলিলাম।” * * এই কথা বলিয়া সেই বিষকন্যা অর্কপ্রভ বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

এইরূপে শাপপ্রভাবে কন্যার বিষময়ীত্ব সিদ্ধ হইল। ইহা ব্যতীত কৃত্রিম উপায়দ্বারাও রমণীগণ বিষময়ী হইয়া থাকে। এরূপ শুনা যায়, পাশ্চাত্য দেশে নাকি অঙ্গরাগার্থ অথবা গৌরী করণার্থ আর-সেনিক বা অন্য একপ্রকার বিষ বরাঙ্গনাগণ ভেষজরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ কথা একজন বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি। বৈদ্যশাস্ত্রে নাকি বিষাঙ্গনার বিষয় আলোচিত আছে। বৈদ্যকে আমার প্রবেশ না থাকায় এই স্থানেই নিবৃত্ত হইলাম। *

মৃৎশিল্পী

যদুনাথ পাল

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এ]

যাঁহার জীবন-কথা বলিতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের অতি নিকট সম্বন্ধ। সে জন্য পাল মহাশয়ের জীবনী আলোচনা করার আগে তাঁহার পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে এই শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল, আলোচনা করা যা'ক।

মৃৎশিল্পের চর্চ্চা কৃষ্ণনগরে বহুপূর্ব্ব হইতেই আছে। তবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের পূর্ব্বে এই শিল্পের অবস্থা এখানে কেমন ছিল, বিশেষ জানা যায় না। আমরা ক্ষিতীশ-বংশাবলী হইতে জানিতে পারি, শিল্পানুরাগী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই নদীয়াতে স্থাপত্য, মৃৎ-শিল্প প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। কলিকাতা মিউজিয়ামে কৃষ্ণনগর হইতে আনীত কড়ির পালিস দেওয়া রঙ্গীন ইষ্টক রক্ষিত আছে। এই ইষ্টকগুলি কারু ও শিল্পকার্য্যে গৌড় বা পৃথিবীর অন্য কোন প্রাচীন স্থান হইতে আনীত সমবর্ত্তী যুগের ইষ্টক অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় মৃৎ-শিল্পের চর্চ্চাও পূর্ণবেগে চলিতে থাকে; তাঁহারই সময়ে বঙ্গদেশে প্রতিমা গড়িয়া জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয়।

নদীয়া গেজেটিয়ারে কৃষ্ণনগরের বর্ত্তমান মৃতশিল্প বিষয়ে লিখিত আছে—

"At Ghurni, a subburb of Krishnagar, clay-figures of remarkable excellence are manufactured. They find a ready sale wherever offered and have received medals at European Exhibitions." প্রধানতঃ যদুবাবু হইতেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ইহার বর্ত্তমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভায় কৃষ্ণনগরের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব।

যদুনাথ পালের পিতা আনন্দ পাল একজন দক্ষ কারিগর ছিলেন। যদুবাবু প্রথমে পিতা ও খুড়া মহাশয়ের নিকটে মৃৎশিল্প বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন।

বাল্যকালে পড়াশুনায় যদুবাবুর আদৌ মন ছিল না। তিনি কেবল “গুলটী ডাঁটুল খেলিয়া বেড়াইতেন”। একদিন পিতার ঠাট্টাতে পুতুল গড়িতে তাঁহার মন গেল। ইহার পরে বাজে খেয়াল তাঁহার বড় একটা ছিল না। তাঁহার খুড়া-মহাশয় তাঁহাকে হাতী ঘোড়ার “টিপ্‌নে” করিতে দিতেন। তিনি ষাঁড় দেখিয়া মৃত্তিকাতে তাহার অনুকৃতি প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেন। “গঙ্গারাম” নামক বিখ্যাত ষাঁড় তাঁহার মডেল ছিল। বাড়ীতে ভিখারী আসিলে তিনি তাহাকে পয়সা দিয়া তাহার মুখ দেখিয়া গড়িতে চেষ্টা করিতেন। এ সময়ে তিনি কাজে তন্ময় হইয়া যাইতেন।

এক সময়ে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক কৃষ্ণনগরের একজন মৃৎশিল্পীকে কলিকাতা আর্টস্কুলে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হন। তিনি নদীয়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্‌স সাহেবকে একজন উপযুক্ত শিল্পী চাহিয়া পত্র লিখেন। মিঃ ষ্টিভেন্‌স যদুবাবুকে মনোনীত করিলেন ও তাঁহার কাজ বড়লাট বাহাদুরকে দেখাইলেন। যদুবাবুর বয়স তখন ২০ বৎসর মাত্র। তিনি ৪০৲ বৃত্তিতে কলিকাতা আর্ট স্কুলে ক্লে-মডেলিংএর ছাত্র ও শিক্ষক হইয়া প্রবেশ করিলেন। এ স্থানে ষ্টিভেন্‌স সাহেবের লেখার খানিকটা উদ্ধৃত করিলাম—

* এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়া তাঁহার সম্পাদিত “বিদ্যোদয়” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"Lord Northbrooke (when Viceroy) desired to have one of the Krishnagar modellers educated at the Calcutta School of Art at his expenses and I (then being the Magistrate of Nadia) was asked to select a suitable person. I chose Jadunath Pal as being the cleverest of the modellers and at the same time young enough to profit by study.'

যদুবাবুর কলিকাতা আর্টস্কুলে অবস্থানকালে তাঁহার একটী ছাত্র কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনীতে 'বাষ্ট' গড়িয়া দিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়। লক সাহেব তখন স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি বাষ্ট নির্ম্মাণে ব্যবহৃত 'প্লাষ্টা'রের দাম কাটিয়া লওয়াতে যদুবাবু আর্ট-স্কুলের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

ইহার পর যদুনাথ রাণীগঞ্জে বার্ণ কোম্পানীর পটারি ওয়ার্কসে নক্সার কাজে ৫০, বেতনে প্রবেশ করেন। পুরাতন ম্যানেজারের মৃত্যু ঘটিলে তিনি কিছুদিন বাড়ীতে আসিয়া অবস্থান করেন; পরে পুনরায় রাণীগঞ্জে যান।

যদুবাবুর রাণীগঞ্জে অবস্থানকালে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ সহরে প্রদর্শনী হয়। লক সাহেব প্রদর্শন দ্রব্য প্রেরণের অনুরোধ করিয়া যদুবাবুকে পত্র লেখেন। তদনুসারে তিনি লাঙ্গল, হাতী, উট, মহিষ ও ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকায় গড়িয়া পাঠাইলেন। প্রদর্শনীতে তাঁহার দ্রব্য রৌপ্যপদক, পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র পাইল। ইহার পর যখন হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম সহরে প্রদর্শনী হইল, তখনও যদুবাবু রাণীগঞ্জে। ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশ পাইয়া তিনি চাষা, বেনিয়া ও কাপড়-বেচা মাড়োয়ারী গড়িয়া পাঠাইলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা-প্রদর্শনীর জন্য পুতুল গড়ার প্রয়োজন হয়। গভর্ণমেণ্ট যদুবাবুর হাতের কাজ দেখিয়া তাঁহাকে এ কাজে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বার্ণ কোম্পানীকে অনুরোধপত্র দেন। যদুবাবু কলিকাতায় মাসিক ১০০৲ বেতনে আসিলেন। গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত কিছু ভাতারও বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি আন্দামানী ও নিকোবারী কন্যার মডেল বেশ সফলতার সহিত তৈয়ার করিলেন। প্রদর্শনী হইয়া গেলে মূর্ত্তিগুলি মিউজিয়মে রাখা হয়।

তার পর কলিকাতা আর্ট-স্কুল বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অধীন হইল। ভারত-গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বাক্ সাহেব যদুবাবুকে ১০০৲ টাকা দিয়া আর্ট স্কুলে নিযুক্ত করিলেন। মাষ্টার জবিন্‌স তখন স্কুলের অধ্যক্ষ। জবিন্‌স সাহেবের মত গুণগ্রাহী লোক শীঘ্রই যদুবাবুর গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে জবিন্‌স সাহেবের মৃত্যু ঘটিলে হ্যাভেল সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মিঃ হ্যাভেলের সহিত শীঘ্রই যদুবাবুর মনোমালিন্য ঘটিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি হ্যাভেল সাহেব গড়েন; কিন্তু সেটী অপছন্দ হওয়ায় ফেরৎ দেওয়া হয়। যদুবাবুর উপর মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের ভার পড়িল। তিনি প্রশংসার সহিত কাজ সমাপন করিলেন। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে ঠাকুরবাড়ীর কেহ তাঁহার প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। ইহাতে হ্যাভেল সাহেব মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। কাজেই যদুবাবুর ন্যায় তেজস্বী লোকের আর তাঁহার অধীনে কর্ম্ম করা পোষাইয়া উঠিল না। তিনি পদত্যাগ করিয়া দেশে আসিলেন।

যদুনাথ পালের নাম ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের শিল্পী-মহলে জানা আছে। তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাহিরে অনেক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন-দ্রব্য প্রেরণ করিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৬৭ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্যারী-প্রদর্শনী, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন কলোনিয়াল এণ্ড ইণ্ডিয়ান শিল্প প্রদর্শনী, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড এগ্রিকাল্‌চারাল প্রদর্শনী ও অন্যান্য অনেক প্রদর্শনীতে প্রশংসাপত্র, পুরস্কার ও রৌপ্য এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি গভর্ণমেণ্টের আদেশে বিভিন্ন প্রকারের দেশীয় সৈনিকের মূর্ত্তি প্যারী-প্রদর্শনীর জন্য গড়িয়া দেন। এবার তিনি ব্রোঞ্জপদক প্রাপ্ত হন। 'বাষ্ট'-নির্ম্মাণেও যদুবাবুর খ্যাতি অল্প নহে। তাঁহার নির্ম্মিত 'বাষ্ট'গুলি জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। তাঁহার হাতের পুতুল এখন দেশ বিদেশে আদৃত হইয়া থাকে। যদুবাবুর হাতের মাটির কাজ কালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানের মিউজিয়মে আদরের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়মে তাঁহার হাতের কাজ অনেক আছে। মৃৎশিল্পে তিনি এক অভিনব প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে চিত্রবিদ্যা (painting) ও শিল্পের (clay-modelling)এর বিচিত্র সমন্বয়-সাধন করা হইয়াছে। এগুলিকে মৃৎচিত্র (clay-pictures) নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। পৌরাণিক দৃশ্যাবলীই ইহার বিষয়ীভূত। যদুবাবুর প্রতিভার বিষয়ে মাননীয় স্যর ই. বাক্ সাহেব লিখিয়াছেন—

'Jadunath Pal was the prince of modellers in the 1880 90 decade and is I believe as good now. He made the life-size models for the 1886 exhibition and others of scientific measurement. In the Ethnographical Museum the groups he did very cleverly."

গত বৎসর বঙ্গেশ্বর মাননীয় লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের অবস্থা পরিদর্শন উপলক্ষে যদুবাবুর বাটীতে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। এক সময়ে যদুবাবুর হাতের কাজ দেখিয়া ভারতেশ্বরী সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে বিলাতে কাজ করিবার জন্য লইয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু সামাজিক বাধার জন্য ও মাতার অনুরোধে তাঁহার ভাগ্যে ইংলণ্ডে গমন ঘটিয়া উঠে নাই।

যদুনাথ কর্ম্মত্যাগের পর হইতেই কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর তাঁহার পল্লী-ভবনেই অবস্থিত আছেন। তিনি প্রায়ই মৃত্তিকার দ্বারা নানাবিধ মডেল গড়িয়া সময়াতিপাত করেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে 'বাষ্ট' ও প্রতিমাও প্রয়োজন হইলে গড়িয়া থাকেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বক্কেশ্বর পাল মূর্ত্তিগঠনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। যদুবাবুর মধ্যম পুত্রের পুত্র শ্রীমান তরণীকুমার অল্পবয়সেই পিতামহের

পদাঙ্ক অনুসরণে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার নবীন উদ্যম প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান লেখকও তাঁহার পিতৃবন্ধু যদুবাবুর নিকট মধ্যে-মধ্যে চিত্র-বিদ্যা বিষয়ে উপদেশ পাইয়া থাকেন। যদুবাবু এখন বার্দ্ধক্যে উপনীত। তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৭ বৎসর হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে দারুণ পুত্রশোকে তিনি মুহ্যমান হইয়াছেন। তাদৃশ উৎসাহের অভাবে এই গুণী শিল্পী এখন নিতান্তই হীনভাবে দিনযাপন করিতেছেন। উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের বিয়োগে দুরবস্থাগ্রস্ত বৃদ্ধ শিল্পীর মুখপানে দেশের ধনী ও শিল্পানুরাগিগণ চাহিবেন কি?

জেব-উন্নিসা

(আওরংজীব-দুহিতা)

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

মুঘল-সম্রাট্ আওরংজীবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেব-উন্নিসা দিল্‌রাস বানু বেগমের গর্ভজাত। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী দৌলতাবাদে তাঁহার জন্ম হয়।

জেব-উন্নিসা শৈশবে হাফিজা মরিয়ম নামে জনৈক বিদুষী মহিলার নিকট শিক্ষালাভ করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই জেবের জ্ঞান-লাভের স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল। তিনি আরবীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল, এবং তিনি আরবী ও ফার্সী অতি সুন্দরভাবে লিখিতে পারিতেন। তাঁহার পুস্তকাগারে ধর্ম্ম ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল।

জেব-উন্নিসা শৈশবে কুরাণ শুনিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার ধীশক্তি এরূপ প্রখর ছিল যে, একদিন পিতার নিকট তিনি সমস্ত কুরাণখানি আবৃত্তি করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আওরংজীব বালিকা জেবকে ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন ও অন্তঃপুরে কন্যার সুবিধার জন্য কয়েকজন কৃতবিদ্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেন।

আওরংজীব পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে জেব-উন্নিসাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। জেব অধিকাংশ সময়ই পিতার সহিত একত্র ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতেন। পিতা ও পুত্রীর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা চলিত, তাহা "ফয়াজুল-কওয়ানীন্" নামক হস্ত-লিখিত পুস্তকের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত জেব-উন্নিসাকে লিখিত আওরংজীবের একখানি পত্র হইতে জানা যায়।

পত্রখানির মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম:—

[আরবীতে লিখিত] ভগবানকে বন্দনা করিয়া ও প্রেরিত পুরুষকে (রসুল) প্রণিপাত করিয়া—

খোদার আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক! পুণ্যাহ মাস রমজান আসিয়াছে; পরমেশ্বর তোমার উপর উপবাস-রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই মাসে স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়-নরকদ্বার রুদ্ধ থাকে; বিপ্লবকারী শয়তানেরা কারারুদ্ধ থাকে। এই মাসের ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যেন তোমার ও আমার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ পতিত হয়।

[ফার্সীতে] বৎস! তোমার ও আমার মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার হয়, তাহাতে যেন আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়। ইহজগতের সুখরাশির নেশায় বিভোর মূর্খ মানবের ন্যায় আর কতকাল আমরা পারত্রিক ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া ভগবানের সাক্ষাৎকার হইতে দূরে থাকিব?

[আরবীতে] একমাত্র ভগবানের অনুগ্রহ আমাকে সুপথে পরিচালিত করিতে প্রবুদ্ধ করে। সেই প্রকৃত মহান্ ঈশ্বর বলিয়াছেন,—আমি জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছি।

বিদুষী জেব-উন্নিসা সাহিত্যের উৎসাহদাত্রী ছিলেন। বহু দুঃস্থ লেখক তাঁহার নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহান্বিত হইয়াছিল। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে জেব অনেক সুপণ্ডিত মৌলবীকে উপযুক্ত বেতনে নূতন পুস্তক প্রণয়নের জন্য, অথবা তাঁহার নিজের ব্যবহারার্থ দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথির নকলকার্য্যের জন্য, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে সমস্ত লেখক তাঁহার চেষ্টায় যশস্বী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মুল্লা সফিউদ্দিন অর্দ্দেলীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'জেব-উৎ তফসির' নাম দিয়া আরব্যভাষায় কুরাণের মহাভাষ্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সফিউদ্দীন এই গ্রন্থখানি জেব-উন্নিসার নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ জেবের নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেগম এই সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

জেব-উন্নিসা একজন স্বভাবকবি ছিলেন। প্রকৃতিদত্ত দৈহিক সৌন্দর্য্যের সহিত তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যও বিকাশলাভ করিয়াছিল। সম্রাট্ আওরংজীব কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন না; এই কারণে কোন কবিই রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সকলেই জেব-উন্নিসার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। জেব "মখ্‌ফী" (অর্থাৎ গুপ্ত ব্যক্তি) নাম ব্যবহার করিয়া পারস্য ভাষায় কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন; কিন্তু যে 'দিউয়ান-ই-মখ্‌ফী' আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, তাহার রচয়িতা কে—তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই; কারণ "মখ্‌ফী" নাম গ্রহণ করিয়া মুঘলরাজ-পরিবারের অনেক-গুলি বেগম সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা হইয়াছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ অকবর-মহিষী সলীমা সুলতান বেগম ও জহাঙ্গীর-মহিষী নূরজহানের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

জেব-উন্নিসা ভ্রাতা মুহম্মদ অক্‌বরকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি অক্‌বর অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। জেব-উন্নিসার উপর অক্‌বরের অগাধ বিশ্বাস ছিল—তিনি ভগিনীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তিও করিতেন। জেবকে লিখিত একখানি পত্রে অক্‌বর বলিতেছেন—"যাহা তোমার, তাহাই আমার; এবং যাহা আমার তাহাতে সর্ব্ব

সময়ে তোমার অধিকার আছে।" পুনরায়—"দৌলৎ ও সাগরমলের জামাতাদের কার্য্যে নিয়োগ করা বা কর্ম্মচ্যুত করা—তোমার ইচ্ছাধীন। তোমারই আদেশে আমি তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছি। সমস্ত বিষয়েই আমি তোমার আদেশ কুরাণ ও প্রেরিত পুরুষের 'হদীশের' (Traditions) ন্যায় পবিত্র মনে করি এবং তাহা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য।" যে সময়ে মুহম্মদ অক্‌বর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'ন, তাহার অনতিকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেবের সহিত অক্‌বরের পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। যখন অক্‌বর পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, এবং যখন অজমীরের সন্নিকটস্থ তাঁহার শিবির, রাজকীয় সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, সেই সময়ে অক্‌বরকে লিখিত জেব-উন্নিসার পত্রগুলি আবিষ্কৃত হয় (১৬ই জানুয়ারী, ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। আওরংজীব কন্যার এই পত্র-ব্যবহারের জন্য তাঁহার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। জেবের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল—তাঁহার বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ হইল;—আর, দিল্লীর সেলিমগড় দুর্গে জেবউন্নিসা আমরণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন (১৬৮১-১৭০২ খৃঃ)।

১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ মে তারিখে দিল্লীতে জেব উন্নিসার মৃত্যু হয়। প্রাণপ্রিয় কন্যার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ আওরংজীবের পাষাণ হৃদয়ও শোকভারাক্রান্ত হইয়াছিল—তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। আওরংজীব এই সংবাদে শোক সংবরণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে অতি কষ্টে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, তিনি কন্যার আত্মার শান্তি-কল্পে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বহু অর্থ দান-খয়রাৎ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আওরংজীব আরও স্থির করিয়া দিলেন যে, দিল্লীর কাবুলী তোরণের বহির্ভাগে জহান-আরা কর্ত্তৃক প্রদত্ত, 'তিস্‌হাজারী' উদ্যানে যেন জেবকে সমাহিত করা হয়। রাজপুতানা-মালওয়া রেলপথ নির্ম্মাণ সময়ে জেব-উন্নিসার সমাধি-ভবন বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু তাঁহার শবাধার এবং সমাধিস্তম্ভের খোদিতলিপি এক্ষণে অক্‌বরের সমাধিভবন—সেকেন্দ্রায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ

(আলোচনা)

[শ্রীযামিনীকান্ত সোম, বিদ্যারত্ন।]

গত কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষে "বিশ্ব-কীর্ত্তি" নামক প্রবন্ধে দিল্লীর লৌহস্তম্ভের প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন "আনন্দপালেরও সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত লৌহস্তম্ভ এখনও দিল্লীর সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকের হৃদয়ে বিস্ময়োদ্রেক করিতেছে। * * * উপরে যে অশোক-স্তম্ভের কথা বলিলাম, তাহা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য * * * প্রথমতঃ ইহার প্রাচীনত্ব। মহারাজ অশোক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭২-২৩১ অব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং স্তম্ভটীর বয়স ২০০০ বৎসরেরও অধিক। দ্বিতীয়তঃ স্তম্ভটী লৌহনির্ম্মিত, ইত্যাদি ইত্যাদি।" স্তম্ভটী যে লৌহ-নির্ম্মিত এবং বহু পুরাতন তাহাতে মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক যে এই লৌহস্তম্ভটীর নির্ম্মাতা বা স্থাপয়িতা নহেন, প্রাচীন এবং আধুনিক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতামত এ বিষয়ের সাক্ষ্যদান করিতেছে। লেখক মহাশয় বলিয়াছেন তৃতীয়তঃ স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ-লিপি প্রত্নতত্ত্ববিদের চক্ষে বহু অর্থ ও রহস্যপূর্ণ। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ চতুর্দ্দশটী আদেশ লিপিবদ্ধ করেন, এবং ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে স্তম্ভগাত্রে ঐ আদেশগুলি উৎকীর্ণ করাইয়া প্রজাসাধারণকে ঐগুলি পালন করিতে উপদেশ দেন। দিল্লীর অশোক-স্তম্ভগাত্রেও ঐরূপ কতকগুলি আদেশ লিপিবদ্ধ আছে।" বলা বাহুল্য, লেখক মহাশয় এ স্থলে অশোক-স্তম্ভ বলিতে উপরোক্ত লৌহস্তম্ভকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু দিল্লীস্থ অশোক-স্তম্ভ এবং লৌহস্তম্ভ যে সম্পূর্ণ পৃথক্-পৃথক্ জিনিষ তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত স্তম্ভ দুইটীর পার্থক্য স্থিরীকৃত না হওয়ায়, উহাদের সংস্থান-স্থলও অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। লেখক মহাশয় বলিতেছেন—"দিল্লীর পাঠান বাদশাহ ফেরোজ-শা দিল্লীর নিকটে ফেরোজাবাদ নামে একটী নগরের পত্তন করেন এবং যমুনা-তীরবর্ত্তী তোপরা নামক স্থান হইতে ঐ স্তম্ভটী উঠাইয়া আনিয়া উক্ত ফেরোজাবাদ নগরে দুর্গপ্রাকারে স্থাপন করেন। তদবধি উহা সেইখানেই রহিয়াছে। * * * ফেরোজাবাদ নগরটী অধুনা ধ্বংসস্তূপে পরিণত; কিন্তু স্তম্ভটি বর্ত্তমান দিল্লী নগরীর প্রাচীর-বহির্ভাগে সেই ধ্বংসরাশির মধ্যে অক্ষত-শরীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।" এই বর্ণনা সত্য ও যথাযথ বটে, কিন্তু ফিরোজাবাদের ধ্বংস-স্তূপে যে স্তম্ভটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহা প্রস্তর-নির্ম্মিত—লেখকের বর্ণনানুযায়ী লৌহ-বিনির্ম্মিত নহে। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় যে স্তম্ভটীর প্রতিকৃতি প্রদান করিয়া তাহাকে অশোক-স্তম্ভ নামে অভিহিত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা অশোক-স্তম্ভ নহে। তাহা দিল্লীস্থ স্বনাম-প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ। ইহার অবস্থিতিস্থল ফিরোজাবাদের ধ্বংস স্তূপ নহে—ইহা বিশ্ব-বিশ্রুত কুতবমিনারের পাদদেশে, প্রাচীন হিন্দুনরপতিগণের ধ্বংসাবশেষ মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থিত। এ স্থান "দিল্লী নগরীর প্রাচীর-বহির্ভাগে" অবস্থিত নহে, এ স্থান নগর হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরবর্ত্তী।

প্রকৃত অশোক-স্তম্ভের একখানি ছবি প্রদত্ত হইল। সম্রাট অশোক স্বয়ং স্তম্ভটী এখানে স্থাপিত করেন নাই। ইহা প্রথমতঃ অম্বালা জেলাস্থ জগধী পরগণার ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তোপ্‌রা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। তথায় প্রায় ১৬০০ বৎসর থাকিবার পর ফিরোজশা তোগলক নিজ রাজধানীর গৌরব বর্দ্ধনার্থ স্তম্ভটীকে বহু

আয়াসে ও যত্ন সহকারে উঠাইয়া আনিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নগরী ফিরোজাবাদে স্থাপিত করেন। তদবধি প্রায় ৫৫০ বৎসর ধরিয়া ইহা এইখানেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সম্রাট ফিরোজ-শা মীরাট অঞ্চল হইতে এইরূপ আরও একটী স্তম্ভ আনয়ন করিয়া উহা 'কুস্ক-ই-শীকার' অর্থাৎ শীকার প্রাসাদে স্থাপিত করেন। এই স্তম্ভটী বর্তমান দিল্লী নগরীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত ফতেগড় পাহাড়ের সানুপ্রদেশে অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাও একটি অশোক-স্তম্ভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই স্থানের নিকটবর্তী বারুদখানায় ভীষণ অগ্নি-কাণ্ড ঘটাতে স্তম্ভটী ৫খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। পরে সেগুলি একত্র জোড়া দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্তম্ভটি উক্ত স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

এক্ষণে, লৌহস্তম্ভটির বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার সহিত বৌদ্ধ-সম্রাট অশোকের কোনও সম্বন্ধ নাই। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ-লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 'চন্দ্র'নামধারী এক নরপতি এই স্তম্ভটীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বঙ্গদেশ এবং বহ্লিকপ্রদেশ জয় করিয়া দক্ষিণ-সমুদ্র পর্য্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। উক্ত 'চন্দ্র' নামধারী ভূপতি 'গুপ্ত' বংশীয় কি না, তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অদ্যাবধি যে সকল আবি-ষ্ক্রিয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোনও-কোনও ঐতিহাসিক ইহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র এবং কুমারগুপ্তের পিতা। রাজা চন্দ্রগুপ্ত বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া ভারতে একাধিপত্য লাভ করেন এবং বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ এই লৌহনির্ম্মিত কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া দেবাদিদেব বিষ্ণুর নামে উৎসর্গ করেন। যে প্রাচীন বিমিশ্র অক্ষরে স্তম্ভগাত্রে লিপি খোদিত রহিয়াছে, বলা বাহুল্য, তাহা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। দিল্লীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাঁকেরায় নওল গোস্বামী মহাশয় উহার যে পাঠোদ্ধার লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার অবিকল নকল এখানে প্রদান করিলাম।

যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্‌সমেত্যাগতা-
ন্বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনেভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকা
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দক্ষিণা
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য গাং নরপতের্গামাশ্রিতস্যেতরাং
মূর্ত্ত্যা কর্ম্মজিতাবনীং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো
মহান্নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরং চৈকাধিরাজ্যং ক্ষিতৌ
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্রচন্দ্রসদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়ং বিভ্রতা
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ভাবেন বিষ্ণৌ মতিং
প্রাংশুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণোর্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ

অস্যার্থঃ—বঙ্গদেশে যুদ্ধার্থ সমবেত শত্রুগণকে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে ধ্বংস করায় বিজয়কৃপাণ যাঁহার বাহুযুগলে কীর্ত্তি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল; যিনি সিন্ধুনদের সপ্তমুখ অতিক্রম করিয়া বাহ্লিকদিগকে জয় করিয়াছিলেন; যাঁহার বীরত্ব-বিস্ফুরিত-বীর্য্যানিলে দক্ষিণ-সমুদ্র অদ্যাপি অধিবাসিত রহিয়াছে; প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দ্বারা মহারণ্য নিঃশেষ হইয়া শান্ত হইলেও যেমন উত্তাপ তিরোহিত হয় না, তদ্রূপ যাঁহার বিপুল প্রতাপে শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইলেও এখনও যাঁহার অমিত তেজ পৃথিবী হইতে অপসৃত হয় নাই; যিনি এই লোক পরিত্যাগ করিয়া (যেন কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়াই) স্বোপার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গ-লোকে গমন করিলেও নিজ কীর্ত্তিদ্বারা সশরীরে এই পৃথিবীতেই অবস্থান করিতেছেন; যিনি স্বভুজার্জ্জিত একাধিপত্য লাভ করিয়া জগতে বহুকাল রাজ্য-সম্পদ ভোগ করিয়াছিলেন; পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট 'চন্দ্র' নামধারী ভূপতি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়াই বিষ্ণুপদ নামক পর্ব্বতে এই বিষ্ণুস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত লিপি হইতে গোস্বামী মহাশয় এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তদীয় পুত্র কুমারগুপ্ত উহাতে লিপি উৎকীর্ণ করেন। খোদিত লিপিতে কোনও তারিখের উল্লেখ না থাকায় কোন্ সময়ে উহা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নিরূপণ করা যায় না। অক্ষরগুলির আকৃতি দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত হেনরি প্রিন্সেপ ঐগুলিকে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ফার্গুসনও ঐ মতের পোষকতা করেন। অক্ষরগুলি ৩৬৩ কিংবা ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের বলিয়া তাঁহার অনুমান। স্তম্ভটী গুপ্তবংশীয় চন্দ্র নামধারী কোনও ভূপতির কীর্ত্তি বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলি প্রাচীন এবং ভ্রমপূর্ণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অধুনা এই লইয়া আরও অনেক গবেষণা হইয়াছে। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েকটী নূতন তথ্য প্রকটিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা উপরিউক্ত সিদ্ধান্তগুলি ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।* শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে 'চন্দ্র'নাম দেখিয়াই ইহাকে গুপ্তবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট করিলে চলিবে না। কারণ, যে সময় গুপ্তবংশীয় রাজাগণ প্রবল পরাক্রমের সহিত পাটলী-পুত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে 'বর্ম্মণ' নামধারী এক স্বাধীন রাজবংশ পশ্চিম ভারতে সগৌরবে রাজ্যবিস্তার করিতেছিল। এই বংশের আদিপুরুষের নাম জয়বর্ম্মণ। জয়বর্ম্মণের পুত্র সিংহ-বর্ম্মণ। সিংহবর্ম্মণের দুই পুত্র—চন্দ্রবর্ম্মণ ও নরবর্ম্মণ। চন্দ্রবর্ম্মণ রাজা সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। এই চন্দ্রবর্ম্মণ এবং লৌহ-

* "Indian Antiquary," vol. XLII, Part DXXXIV.

বর্ত্তমান মহাসমরে আমরা সকলেই স্থলযুদ্ধের ব্যাপারের কথা ভাবিয়া বিস্ময়াতঙ্কে ডুবিয়া আছি। আমরা কোন দিন ভাবি না যে, এই স্থলযুদ্ধের দুর্দ্ধর্ষ প্রবাহের পশ্চাতে একটা জলযুদ্ধের ভীষণ বন্যা অপেক্ষা করিতেছে।

জর্ম্মণী অধুনা প্রধানতঃ তাঁহার Submarineএর উপর সমধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছেন। তিনি জানেন যে, সংখ্যানুপাতে ইংরাজ রণতরীর অপেক্ষা তাঁহার বল কত ন্যূন। কোন দিন যদি ইংরেজ নৌ-সেনার সহিত জার্ম্মাণ নৌ-সেনার সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে তাহা দিন দিন নিজ স্থানে থাকিয়া জীর্ণ হইতেছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদিগকে অবরোধের প্রথম লাইনে নিযুক্ত করিয়া জর্ম্মাণগণকে ফ্লাণ্ডার্সের উপকূলে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করা হইতেছে। এই সকল জাহাজ বর্ত্তমান যুদ্ধ-ব্যাপারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শত্রুকে ফাঁদে ফেলা ও উদ্বাস্তু করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, অষ্টেণ্ড Submarine base হইলেও তাহাতে জার্ম্মাণীর বিশেষ সুবিধা হইতেছে না; কাজেই তাহারা ইংরাজের Grand Fleetএর কোন ক্ষতি করিতে পারিতেছে না।

ষ্টীম ট্রলার কর্ত্তৃক সমুদ্র হইতে 'মাইন' (জাহাজবিধ্বংসী কল) উত্তোলন

জীব্রুজীতেও শত্রুর সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়াছে; কেবল তাহাদের টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে। শান্তির সময় এখানে যে বুদ্ধির ও ক্ষমতার দ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া বন্দরের মুখ উন্মুক্ত রাখা হইত, এখন তাহা প্রকৃতির কুটিল গতিতে ক্রমশঃ বুজিয়া যাইতেছে। এমন কি আন্টোয়ার্প যাহার উপর শত্রু সম্পূর্ণ আশা করিয়াছিল, তাহাও নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইল। যদিও এখানে অনেক Submarine তৈয়ারী হইতেছে; কিন্তু যাহারা বাহির হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অল্প জাহাজ পুনরায় ফিরিতে পারিতেছে। কারণ আন্টোয়ার্প হইতে জর্ম্মণ সবমেরিন বাহির হইয়া এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে, যেন ইঁদুরকে খাঁচা হইতে ছাড়িয়া দিয়া বিড়ালের মুখে সমর্পণ করা হইতেছে।
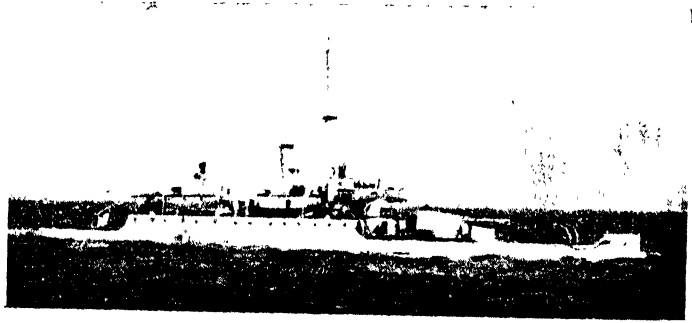
যে কি শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইবে, তাহা মানস চক্ষে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য জর্ম্মণী তাঁহার জাতিগত সম্পূর্ণতার ও বন্দোবস্তের উপর নির্ভর করিয়া, মগ্ন তরী (under-water fighting ships) প্রভূত পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই জন্য নানাস্থানে এই সকল জাহাজের অংশ-সমূহ নির্ম্মাণকার্য্যে তৎপরতা অবলম্বন করিতেছেন।

মণিটর রণতরী

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আন্টোয়ার্প জাহাজ নির্ম্মাণের (Shipbuilding centre) কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আন্টোয়ার্পের উন্নতিকল্পে জর্ম্মণগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তাহারা অনুমান করিয়াছিল যে, সুযোগ উপস্থিত হইলে এই স্থানে (Submarine) মকরবাহিনী নির্ম্মাণ করিবার কেন্দ্র স্থাপন করা যাইতে পারিবে; আর জিব্রুজী মিডলকার্ড ও অষ্টেণ্ড হইতে এই মকরবাহিনী ডোভার, ব্যাটহাম এবং হারউইচের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে।

জার্ম্মাণীর কল্পনা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং তাহারা সকল দিকে দেখিয়া শুনিয়া, এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে তাহারা একটী বিষম ভ্রম করিয়াছে। তাহারা ইংরাজ নৌ-বাহিনীর মধ্যে অনেকগুলি পুরাতন জাহাজ ছিল; তাহারা এত-

নৌযুদ্ধের দুটি দিক আছে;—প্রথমটি সংরক্ষণ ও দ্বিতীয়টি আক্রমণ। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জগুলি প্রথম অবস্থা অনেকদিন অতিক্রম করিয়াছে; কিন্তু এই দিনগুলি অতিশয় দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছে। কেহ-কেহ বলেন যে, জর্ম্মাণ নৌ-নীতি (Naval policy) তাহার যুদ্ধ-নীতির অনুরূপ;—অর্থাৎ Strike hard and quickly.

প্রথম-প্রথম মনে হইয়াছিল যে, যদ্যপি এই মহাসমর নৌযুদ্ধের জয়পরাজয়ে স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলে জর্ম্মণ-রণতরিগুলি ধ্বংস

"জুড়াই খানিক বঁধু, এস লো গাছের ছায়ায়,
বিরামদায়িনী সুধা দিব পাত্র পরিপূর্ণ করি।"

ওমর গীতি শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্ত হইলেও ইংরাজ রণতরী এরূপভাবে জখম হইবে যে, তাহাতে জর্ম্মাণ Submarineএর কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে।

জর্ম্মণীর ইংলণ্ড-আক্রমণের সঙ্কল্প বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে; এবং এই সময় সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত। এই উদ্দেশ্যে জর্ম্মাণী সম্পূর্ণ-রূপে প্রস্তুত। ক্যালের পতন হইলে জর্ম্মণী নিশ্চয়ই উত্তর-সাগরের (North Sea) নিম্নভাগ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলিত। বাস্তবিক মহা সংঘর্ষে ইংলণ্ড অগ্রণী হইয়াছে। ইংরাজ রণতরী ক্ষিপ্রতা ও কার্য্যকুশলতার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে তাহারা জগতে অজেয় এবং বিপদ যেরূপভাবে আসুক না কেন, তাহাকে অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ। জর্ম্মণী নিজের অবস্থার উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড North Sea অধিকার করিয়াছেন

ডেষ্ট্রয়ার-যোগে বর্ত্তমান রণক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ

বাস্তবিক যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ নৌ-বাহিনীর চিন্তার কথা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহাকে বাণিজ্য-পথ রক্ষা করিতে হয়, জর্ম্মণ নৌ-বাহিনীকে আটক করিতে হয়, সমুদ্রপথ সকল উন্মুক্ত করিতে হয়, শত্রু-পক্ষের ক্ষুদ্র তরিগুলিকে ধরিতে, নষ্ট করিতে এবং ধ্বংস করিতে হয়। ফল কথা, ইহার কাণ্ড দেখিলে আমরা চমৎকৃত হইয়া যাই।

এদিকে জর্ম্মণ Submarineএর উৎপাত ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। বাস্তবিক নৌ যুদ্ধে এটা একটা নূতন ব্যাপার; কাজেই ইহার ফল ও ক্ষমতার বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকিয়া সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কিন্তু কালক্রমে ইংরাজ রণকৌশলে পরাভূত হইয়া জর্ম্মণ দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তজ্জন্য British Naval Science Circleএ ধন্য-ধন্য পড়িয়া গেল। ইংরাজ Anti Submarine, operations এরূপ নূতন ধরণে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, তাহাতে উত্তম ফল প্রসব করিয়াছে।

বাস্তবিক নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে Submarine-যুদ্ধ একটা Sneaking Warfare মাত্র। কিন্তু তথাপি জর্ম্মণগণ ইহার উপর এত আস্থা স্থাপন করিয়া এই মহাসমরে ব্যাপৃত হইতেছে। বাস্তবিক এই পোতগুলি অতি গোপনে অগ্রসর হইয়া অন্য তরীকে আক্রমণ করিতে পারে, তাই এত লোভ। বাস্তবিক সবমেরিনের ক্ষমতা যে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করা

রণতরী হইতে সৈন্যগণের সালোনিকায় অবতরণ

গিয়া শেষে প্রায় স্থির হইয়া যায়—কিন্তু ইহার পতন কালে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ইহাকে ভূমিতে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

কাজেই দেখা যায় রণতরীর কামান Howitzerএর কার্য্য কখনই সমভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না। আমাদের মনে পড়িতে পারে যে, জাপানীগণ Port Arthur আক্রমণকালে কামানগুলিকে অনেক উর্দ্ধে তুলিয়া Howitzerএর ন্যায় কার্য্যক্ষম করিয়া লইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংরাজ নৌ-বাহিনী কোথায়? এ কথার অর্থ নাই; তবে বলা যাইতে পারে, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ইহা যে কেবল North Sea, the Baltic, the Balkan, and Gallipoli Peninsulas, and Coast line of German East Africa—এই সকল স্থান অবরোধ করিয়া আছে তাহা নহে, ইহারা Persian Gulfএ বিচরণ করিয়া Mesopotamia আক্রমণ ব্যাপারে সজাগ আছে। এই বাহিনী পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ছাইয়া আছে। অষ্ট্রেণ্ড হইতে উত্তর সাগর, বলটিক প্রদেশ, উত্তর আটল্যান্টিক, আইরিশ ও স্কটিশ সমুদ্রতীর হইতে জীব্রল্টার, মেডিটারেনিয়ান ও সুয়েজ হইতে ভারত সমুদ্র এমন কি ভারত হইতে জাপান—সকল দেশেই আছে। মোট কথা সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া বৃটিশ নৌ-বাহিনী সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিতেছে।

আজ ইংরাজ নৌবাহিনীতে যে কত শত রণতরী নিযুক্ত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে যে কেবল যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত করা জাহাজ আছে তাহা নহে; শত-শত পোত যাহারা শান্তির সময়ে অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, আজ তাহারা অনায়াসে এই মহাসমরে ব্যাপৃত আছে।

সপ্ত সাগরের বক্ষে আজ ক্ষমতা ও আয়তন অনুরূপ বাস্পীয় পোত সকল বিচরণ করিতেছে। কোন-কোন স্থানে সামান্য জেলে-ডিঙ্গি (trawlers) অবধি নিযুক্ত হইয়াছে। কোন স্থানে (Private Yachts) সখের তরণী সকল শত্রুপক্ষের গমনাগমন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

শত-শত ক্ষুদ্র ও কুৎসিৎ তরণী কয়লা, অস্ত্র ও রসদ বহন এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বড়-বড় জাহাজ সকল নিয়মিতরূপে শত্রুর প্রেরিত পণ্যদ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার মানসে সমুদ্রে ঘূরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের পাহারা এত কড়া যে, বোধ হয় অতি কষ্টে দুএকখানি জাহাজও ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে কি না সেটা সন্দেহের বিষয়।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে ব্রিটিস 'নৌবাহিনীর নিমিত্ত কোটী-কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড কি নিরাপদ হইয়াছেন? অবশ্য সাধারণ লোকে বলে যে—ইংরাজ Navy কে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক, নৌ-বিভাগ যে কি কার্য্য করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহা জনসাধারণ কেহই জানেন না। তবে এই বলা যাইতে পারে যে ইহা প্রথমতঃ ইংলণ্ড-আক্রমণ বিভীষিকা দমন করিয়াছে। ইহা আরও একটি মহৎ কার্য্য করিয়াছে; ভবিষ্যতে জার্ম্মণ রাজ্য আক্রমণের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ইহার দ্বারা ইংলণ্ডের অবাধ-বাণিজ্য পরিচালনের ও আহার্য্য সামগ্রী আনয়নের পথ সুগম হইয়াছে। মোট কথা, ইংরাজ নৌবাহিনী জর্ম্মণীকে সমুদ্র হইতে একবারে বিতাড়িত করিয়া ধীরে-ধীরে তাহার নৌ শক্তিকে মৃত্যুর পথে প্রেরণ করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বিপুল ইংরাজ বাহিনী, যত দিন যাইতেছে, ততই পুষ্টিলাভ করিতেছে। অধিক কি, এ বিষয়ে জর্ম্মণী অনেক পশ্চাৎপদ হইয়াছে। বাস্তবিক ইংরাজের dock-yard গুলিতে দিন রাত কাজ চলিতেছে। এখানে জাহাজ ও তাহার আবশ্যক উপাদান নির্ম্মিত হইতেছে। জর্ম্মণগণ স্বীকার করে যে জাহাজ নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইংরাজ মজুর ও কারিকরগণ জর্ম্মণদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তার পর নির্ম্মাণ-যন্ত্রের উৎকর্ষে ইংরাজ অনেক শ্রেষ্ঠ।

কায করিবার লোক ও যন্ত্র ছাড়া আর একটী জিনিষ আছে, যাহার নিমিত্ত কার্য্যে বিশেষ ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়। সেটা কেবল Raw Materialএর অভাব। জর্ম্মণগণ এই জিনিষের অভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; তাহারা continuous supply পাইতেছে না। যত দিন ইংরাজ Baltic আক্রমণ করেন নাই, তত দিন জর্ম্মণী লৌহের অবাধ যোগান পাইতেছিল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতে ক্রুপ ক্রমাগত লৌহ লইতেছিল। কিন্তু এক্ষণে আর সে সুবিধা নাই।

বিজ্ঞান ও নৌবিদ্যার (Naval Engineering) উন্নতির সহিত নৌ-যুদ্ধের প্রণালীর উন্নতি হইতেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আজ ইংরাজ এই সুবিধা একটুও নষ্ট করিতেছেন না। যদিও শত্রুপক্ষ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তথাপি তাহারা কোন বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারে নাই।

জল-যুদ্ধের ফলে ইংরাজ কি শিখিয়াছেন? লোকে মনে করিতে পারে যে, এই সকল সংঘর্ষে বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় নাই। এ কথাটি ভুল। অনেক শিক্ষালাভ হইয়াছে এবং তাহার ফলে নৌ শক্তিকে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করা হইয়াছে। হেলিগোল্যাণ্ড যুদ্ধে যে সকল ত্রুটী হইয়াছিল, সেগুলি এখন শোধরাইয়া লওয়া হইয়াছে। মকর-পোতের (Submarines) অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। মনিটার জাহাজগুলি পুনরায় প্রচলন হইয়াছে।

শেষ কথা, ইংরাজ বাহিনী অজেয়। ইহা এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জয়লাভ করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান মহাসমরে জর্ম্মণ রণতরীর ধ্বংসলাভ যুদ্ধের শেষ ফল নহে। ফরাসী বীর নেপোলিয়ন ট্রাফালগার যুদ্ধে ইংরাজের নিকট পরাজিত হইলেও, তাহার সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপনের দুঃস্বপ্ন টুটিতে আরও দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল।*

---

* এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে The World's Work নামক ইংরেজী মাসিকপত্রের ১৯১৬, জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত মিঃ ফ্রেডরিক এ, ট্যালবট প্রণীত The Might of the British Navy প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, এবং ছবিগুলিও ঐ মাসিকপত্র হইতে গৃহীত।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য*

(নক্সা)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

'গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।'

'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।'

'A little learning is a dangerous thing.'

গৌরচন্দ্রিকা

পরের জিনিশ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া ফেলিয়াছি (১) অথচ ঘরের জিনিশ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ঐরূপ একটা ইতিহাস লিখিতে পারিলাম না, এ জন্য বন্ধুরা প্রায়ই খোঁটা দেন। আমরা যে অনেকেই "ঘর করেছি বাহির, বাহির করেছি ঘর ;" সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি ? ইংরেজী পঠিত বিদ্যা, সংস্কৃত অপঠিত বিদ্যা। তবে ভরসা এই যে, পণ্ডিত-বংশে জন্মবশতঃ (অপঠিত হইলেও) সংস্কৃত ভাষায় উত্তরাধিকারসূত্রে 'অশিক্ষিত-পটুত্ব' জন্মিয়াছে, অর্থাৎ 'না-পড়ে'-পণ্ডিত' হইয়া পড়িয়াছি। আজকাল প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণার ক্ষেত্রে, বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় 'না-পড়ে'-পণ্ডিতে'র সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নহে। অতএব অকুতোভয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যে একটা প্রকাণ্ড জাল (forgery), আগাগোড়া কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণদিগের বানানো ঝুটা জিনিশ, তাহা অশেষ-শেমুষী-সম্পন্ন দার্শনিক ডিউগ্যাল্ড্‌-ষ্টুয়ার্ট ইউরোপে এই ভাষার আবিষ্কারের সমকালেই হাতে-হাতে ধরাইয়া দেন। (২) জালীয়াতী-জুয়াচুরী ব্যাপারে যে আমাদের দেশের লোক সিদ্ধহস্ত, তাহা মেকলে সাহেবের (৩) প্রসাদে সকলেই অবগত আছেন। চাণক্য হইতে আশুতোষ পর্য্যন্ত জম্বুদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ যে কুশাগ্রীয়ধী এবং আফলোদয়-কর্ম্মা, অর্থাৎ একটি কায আরম্ভ করিলে শেষ না দেখিয়া ছাড়েন না, তাহাও আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি। সুতরাং ব্রাহ্মণ-জাতির ষড়যন্ত্রে এরূপ একটা কটমট কৃত্রিম ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভাবন কোন প্রকারেই অসম্ভাব্য বা অবিশ্বাস্য ব্যাপার নহে। কিন্তু জালীয়াতী কাণ্ড জানিয়াও যে অদ্যাপি ইউরোপীয়গণ এই অর্ব্বাচীন ভাষার আলোচনা করিতে বিরত হয়েন নাই, তাহার কারণ—তাঁহারা একবার যাহা ধরেন, তাহা ভুলই হউক আর ঠিকই হউক, কিছুতেই ছাড়েন না,—Settled fact বলিয়া মানিয়া লয়েন, এটি তাঁহাদিগের জাতীয় প্রকৃতি।

সংস্কৃতভাষাসৃষ্টিতে যে ব্রাহ্মণজাতির অসদভিপ্রায় (criminal intention) ছিল, তাহার কয়েকটি প্রমাণ একটু প্রণিধান করিলেই লক্ষ্য হয়।

[৵০] হিন্দুরা উত্তমর্ণকে ফাঁকী দিবার মতলবে সম্পত্তি দেবোত্তর (দেবত্রা) করে, ইহা আপামর-সাধারণে বিদিত আছেন। এই প্রকার কু-অভিসন্ধিতেই ইঁহারা ভাষাটাকে দেবভাষা বলিয়া রাখিয়াছেন,—তাহা হইলে আর এই নবসৃষ্ট ভাষার সম্পর্কে অন্য ভাষার নিকট ঋণ-স্বীকার করিতে হইবে না। তথাপি দুই-একজন গৃহশত্রু বিভীষণ—পিক,

(১) প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৩। 'ফোয়ারা'য় পুনর্মুদ্রিত।

(২) Dugald Stewart, the philosopher, wrote an essay to prove that not only Sanskrit literature but also the Sanskrit language was a forgery made by the crafty Brahmans.—*Macdonell's* History of Sanskrit literature, *Introductory.*

(৩) Chicanery, perjury, forgery are the weapons, offensive and defensive, of the people of the Lower Ganges.—*Macaulay's Essay on Warren Hastings.*

তামরস প্রভৃতি শব্দ ম্লেচ্ছ ভাষা হইতে ঋণরূপে গৃহীত, এই ঘরের কথা বাহির করিয়া দিয়াছেন !

(৶০) বেনামীতে সম্পত্তিরক্ষাও হিন্দুদিগের আর একটি জুয়াচুরি বুদ্ধি। সংস্কৃত ভাষায়ও এই ফন্দী খাটাইয়া বহু ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ একজনের নামে চালান হইয়াছে। যথা—পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, বেদান্তসূত্র, পাতঞ্জল দর্শনের টীকা, সমস্তই বেদব্যাসের রচিত! এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্কলিত। পতঞ্জলি দর্শন-ব্যাকরণ-বৈদ্যকশাস্ত্র—ত্রিবিধ বিষয়েই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন! কালিদাস একাধারে কবি, নাটককার, ছন্দঃশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদ্! দণ্ডী—কাব্য ও অলঙ্কার উভয় বিভাগেই গ্রন্থরচনা করিয়াছেন! অথচ তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসী! এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেন গুরুঠাকুরের নামে বিষয় বেনামী করার মত। এই বেনামীর চূড়ান্ত কাণ্ড মৃচ্ছকটিকের বেলায় দেখা যায়। মৃচ্ছকটিক রাজা শূদ্রকের বেনামীতে চালান হয়, অথচ শূদ্রক দশদিনাধিক শতবর্ষ বাঁচিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিলেন—এ কথাও স্পষ্ট করিয়া গ্রন্থারম্ভে বলা আছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

(৵০) পাছে লোকে সহজে তাঁহাদিগের মতলব বুঝিতে পারে, এই জন্য কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ সুপ্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষর ছাড়িয়া এমন কাঁকড়া অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা যাহার তাহার পক্ষে দন্তস্ফুট করিবার যো নাই। সুতরাং গোঁজামিল দিবার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। স্কুল-কলেজের ছাত্রগণও বাণান ভুল সামলাইবার জন্য দুষ্টামি করিয়া সন্দিগ্ধ অক্ষরগুলি অস্পষ্ট করিয়া লেখে বটে, কিন্তু ইহা তদপেক্ষাও গর্হিত ব্যাপার। এই কৌশলে দুরাত্মা ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রে 'অগ্রে' পাঠে 'অগ্নে' ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়া বিধবাদিগকে স্বামীর চিতায় পোড়াইয়া তাহাদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিত। ধর্ম্মের নামে কি ঘোরতর প্রবঞ্চনা! শেষে সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এই নৃশংস প্রথা রহিত করেন।

বেদ

যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা অনেক জাল-জুয়াচুরি কাণ্ড করিলেও এই উদ্ভট ভাষার উদ্ভাবয়িতা বলিয়া সম্পূর্ণ প্রশংসা (credit) পাইতে পারেন না। ভাষাটা মূলে বেদিয়াদিগের সৃষ্টি। ইহার প্রমাণ, এই ভাষার আদিগ্রন্থের নাম 'বেদ'। বেদের ভাষা বড় কাঁচা, কেন না অল্পবুদ্ধি বেদিয়ারা পাকা জালিয়াত ছিল না। পরে কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ কৌশলে ভাষাটি আত্মসাৎ করিয়া ইহাকে বেশ পাকাইয়া তোলেন, এবং বেদের আদিম অংশের সহিত তাঁহাদিগের রচনা সুড়িয়া দেন। বেদব্যাস (৪) উভয় অংশ পৃথক্ করিয়া সাজাইয়া বেদিয়াদিগের রচিত অংশের নাম দিলেন 'মন্ত্র' এবং ব্রাহ্মণদিগের রচিত অংশের নাম দিলেন 'ব্রাহ্মণ'। ব্রাহ্মণেরা বেদিয়াদিগের হাত হইতে ভাষাটা শোধন করিয়া লইলে, ইহার নাম হইল, 'সংস্কৃতভাষা' বা সংক্ষেপে 'ভাষা'।

বেদিয়াদিগের রচিত 'মন্ত্র' অংশ সাপের মন্তর। ইহা সুর করিয়া পঠিত হইত। ইহা ছন্দে রচিত, তজ্জন্য বেদের ভাষার নাম 'ছন্দঃ'। এই সকল সাপের মন্তরের কোন অর্থ নাই; যাঁহারা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদিব্যাপারে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা ভালরূপেই জানেন। ইহা কেবল শুনিতে ও শুনাইতে হয়, তজ্জন্য ইহার আর এক নাম 'শ্রুতি'। কোন-কোন মহাপণ্ডিত বলেন, বেদ চাষার গান। কিন্তু এ কোন কাযের কথা নহে। চাষার গান হইলে ইহাতে স্পষ্টতা অর্থাৎ প্রসাদগুণ থাকিত, সহজে অর্থগ্রহ হইত, রবিবাবুর কবিতার মত হেঁয়ালি হইত না। এই অর্থাভাব হইতে বুঝা যায় যে, বেদ চাষার গান নহে, সাপের মন্তর।

ইংরেজী সভ্যতার আলোক এ দেশে বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বে লোকে বনে-জঙ্গলে বাস করিত। ইহার বহু প্রমাণ বৃহদারণ্যকে, রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে, মহাভারতের বনপর্ব্বে, কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রথম সর্গে এবং অমরকোষের বনৌষধিবর্গে সঞ্চিত রহিয়াছে। আশা করি, রাধাকুমুদ বাবুর ন্যায় কোন প্রত্নতাত্ত্বিক এই সকল মালমশলার সদ্ব্যবহার করিবেন। বেদের কাণ্ড, শাখা, প্রতিশাখ্য প্রভৃতি শব্দ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, বিলাতী সভ্যতা আমদানী হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ শাখামৃগের ন্যায় বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা প্রভৃতিতে বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে খুব বাঁধাবাঁধি ছিল,

---

(৪) এই বেদব্যাস আধা ব্রাহ্মণ, আধা বেদিয়া ছিলেন; অর্থাৎ তিনি পুরাপুরি আর্য্যরক্তসম্ভূত ছিলেন না। তাঁহার জন্মবৃত্তান্তে এই রহস্য উদ্ভাসিত। সুতরাং তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপক্ষপাত দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

কেহ নিজের শাখা ছাড়িয়া অন্য শাখায় আরোহণ করিলে তাহা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অত্র প্রমাণং যথা—স্বশাখাশ্রয়মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ং তু যঃ। কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্মেধা মোঘং তস্য চ যৎকৃতং॥ যাহারা অধিকতর বুদ্ধিমান্, তাহারা জঙ্গলের মধ্যেই এক-একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিত; বেদের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রগুলি তাহাদিগের রচিত।

অরণ্যবাসকালে সর্পভীতি স্বাভাবিক। এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সাপুড়িয়া বেদিয়াদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণগণ গৃহহীন অর্থাৎ ভবঘুরে বেদিয়াদিগের কুঁড়েঘর তুলিয়া দিবেন, বেদিয়ারাও মন্ত্রের চোটে সাপ মারিবে, এইরূপ 'রামসুগ্রীবয়োরিব' মিলন হইল। ইহারই ফলে বেদমন্ত্রের প্রচার। এই সর্পবিদ্যাই যে আসল বেদ, এ কথা বেদের বহু স্থলে স্পষ্ট লেখা আছে। 'The Sarpavidya is the Veda.' *MAX MULLER*—History of Ancient Sanskrit Literature, *Introduction.*

বেদিয়াদিগের মন্ত্রবলেই হউক, আর হাত-সাফাইএর গুণেই হউক, বহু বিষধর সর্প ধৃত ও হত হইয়াছিল। কিন্তু সাপ মরিলেও বাতাস পাইয়া বাঁচিয়া উঠে, সুতরাং জড় মারিবার জন্য আগুনে পোড়াইতে হয়। এই অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজনে বেদবিহিত হোম, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ডের আয়োজন হইয়াছিল। সর্পজাতির অগ্নিসংস্কারের একটা মোটামুটি ইতিহাস 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। কিন্তু এই ইতিহাস বিকৃত আকারে লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় অপক্ষপাতী বেদব্যাসের রচনার উপর কলম চালাইয়া ব্রাহ্মণেরা ইহাতে নিজেদের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন, এবং বেদিয়াদিগের কৃতিত্ব-কথা একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের বহু স্থলে ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ কারসাজির পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার সাহেবের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের অবতরণিকায় বিস্তারিত আলোচনা আছে।

উপনিষদ্ ও দর্শন

কালাপানির ওপার হইতে লালপানি আমদানি হইবার পূর্ব্বেও এ দেশের লোকের নেশা-করা অভ্যাস ছিল। তবে সে নেশা গাঁজা, চরস, ভাঙ্গ, আফিঙ প্রভৃতিতেই আবদ্ধ থাকিত, জলপথে চলিত না। নেশার চরম অবস্থায় যে লেখা বাহির হইত, তাহার নাম 'উপনিষদ্'। (৫) ইহাই হইল পরা বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই নেশা একবার অভ্যাস হইলে আর কিছুই ভাল লাগে না, পৃথিবীর আর সব বস্তু ভ্যাপসা বলিয়া বোধ হয়, এবং সব ছাড়িয়া এই নেশার উপরই ঝোঁক পড়ে। এই জন্যই জার্ম্মানীর শোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন,—'It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.' অস্যার্থঃ —ইহা আমার জীবনের সান্ত্বনা হইয়াছে, এবং মৃত্যুকালেও সান্ত্বনা হইবে। ব্রাহ্মণগণ নেশায় যে আনন্দ উপভোগ করিতেন, সেই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন— 'আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। রসো বৈ সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' এই রসের জন্যই 'চরস' নামের উৎপত্তি; তুরিতানন্দ বা তুরীয়ানন্দের নামকরণও ইহার প্রসাদাৎ। আনন্দগিরি এই আনন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উক্ত আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সাধুসন্ন্যাসিগণ গঞ্জিকা সেবন করেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, নেশার উপর টেক্স হওয়াতে এক্ষণে দেশে তত্ত্বচিন্তার অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে। কেবল বহুমূত্রগ্রস্ত বৃদ্ধগণ কালাচাঁদের কৃপায় দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া আজও ভারতীয় তত্ত্বচিন্তাস্রোতঃ অব্যাহত রাখিয়াছেন, তাঁহারাই যাহা-কিছু ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করেন।

নেশার গোলাপী অবস্থায় সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি অনেকরূপ অজ্ঞের অপ্রত্যক্ষ পদার্থ দেখা যায়; তদনুসারে উপনিষদের নামকরণ হইয়াছে—মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানও এইরূপ নেশার ঝোঁকে। এই সকল ভুল দেখা সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে আলোচনা আছে, তাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে। মীমাংসাদর্শনে এই সকল ভুল দেখার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। কেহ-কেহ 'তৈলে ভাণ্ডমস্তি' কি

(৫) নেশার 'শ' ও উপনিষদের 'ষ' এক নহে বলিয়া গোলযোগ করিবার প্রয়োজন নাই। শ ষ স বিভেদ পূর্ব্বে ছিল না। পরিষদের সংগৃহীত অমুদ্রিত পুস্তকাবলি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনার পর খ্রীষ্টান পাদরী কে, এম, বানার্জ্জি হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য পশ্চিম অঞ্চল হইতে পাণিনি আমদানি করিয়া এই সব উৎপাত ঘোটাইয়াছেন।

'ভাণ্ডে তৈলমস্তি' স্থির করিতে না পারিয়া নেশার ঝোঁকে ভাঁড় মাথায় ভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করিয়াছেন। ইহাতে বহু পরিমাণ মধ্যমনারায়ণ প্রভৃতি কবিরাজী তৈল নষ্ট হওয়ায় 'হিন্দু-রসায়ন'-প্রণেতা সুধী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার' সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন।

বীটনের অভিধানে 'গঙ্গেশ্বর ফতোয়াশিচর্ন্তামণি,' 'প্রতীক্ষা টীপ্পনী' 'অনুমাক দীধুতি' (a treatise on memory) এই তিনখানি দার্শনিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। সে-গুলির এ দেশে চল নাই। সম্ভবতঃ পুঁথিগুলি বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের মত কোন অধ্যবসায়শীল প্রত্নতাত্ত্বিক তথা হইতে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে পারেন না কি? মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় নেপাল-ভ্রমণকালে পুঁথি তিনখানির খোঁজ করিলে ভাল হয়। চীন বা তিব্বতীয় ভাষায় এগুলির অনুবাদ আছে কি না,তদ্‌বিষয়ে সন্ধান লইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করি।

কাব্য

আদিকাব্য—রামায়ণ।

সংস্কৃতভাষায় বহু উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ সর্ব্বপ্রধান। বাল্মীকি আদিকবি অর্থাৎ আদিরসের কবি এবং রামায়ণ আদিকাব্য অর্থাৎ আদিরসের কাব্য। তবে 'লোকরহস্যে' যে লিখিয়াছে, ইহাতে অল্পস্বল্প করুণরসও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ফলতঃ রামায়ণে আদি ও করুণরসে মিলিয়া রস-সঙ্করের উদ্ভব হইয়াছে; এই কারণে অনেকে ইহাকে 'কাব্য' না বলিয়া 'আখ্যান' বলেন। বীটনের অভিধানে অতি অল্প কথায় এই গ্রন্থের সারনিষ্কর্ষ করিয়া দিয়াছে। যথা—"Their oldest poet, Valmiki, sang in plaintive strains the murder of a youth who lived happily with his mistress in a beautiful wilderness and was mourned by her in heart-rending lamentations." এই প্রেমিক যুবক বালী কি সুগ্রীব, এবং যুবার প্রেয়সী তারা কি শূর্পনখা, ঠিক বুঝা গেল না। নিষাদবাণবিদ্ধ চক্রবাকের জন্য চক্রবাকীর খেদ কি এই আকার ধারণ করিয়াছে? জানি না, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের ধোপার্ হাতে ধোপদস্ত হইয়া সীতার কাহিনী বিলাতে এই আকারে পৌঁছিয়াছে কি না।

রামায়ণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, ইহাতে সুন্দরবনের চাষ আবাদ প্রভৃতির কথা বর্ণিত আছে, সুন্দরকাণ্ডে ইহার সবিশেষ তথ্য রহিয়াছে। রাম লাঙ্গলধারী চাষী ও সীতা লাঙ্গলের ফাল ভিন্ন আর কিছুই নহে।(৬) কেহ বলেন, ইহা গ্রীক হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসী হইতে চুরি করা, হেলেন-হরণ ও ইউলিসিসের ধনুর্ভঙ্গের অনুকরণ ইহাতে জাজ্বল্যমান (৭)। কেহ বলেন, ইহা আগাগোড়া রূপক, (৮) সূর্য্য কর্ত্তৃক ধরার অন্ধকার-দূরীকরণের কথা, তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। (বীর হনুমান্ সেই রাগে সূর্য্যকে বগলে পুরিয়াছিলেন।) এত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এ সকল মতের বিচার করা চলে না। পাঠকবর্গকে একাদশ সংস্করণের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা এবং ম্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস দেখিতে অনুরোধ করি।

রামায়ণের নামকরণ সম্বন্ধেও বহু মতভেদ আছে। কেহ বলেন, রামের অয়ন অর্থাৎ বনগমন, রামবনবাস ইহার আসল আখ্যানবস্তু; সীতাহরণ, রাবণবধ, সীতার বনবাস প্রভৃতি সমস্ত প্রক্ষিপ্ত! কেহ বলেন, রামের কথা আছে এই অর্থে 'অয়ন' প্রত্যয়, যথা শিবায়ন, রসায়ন! 'লোকরহস্যে'র লেখক—'রামা যবন' হইতে রামায়ণ হইয়াছে—এইরূপ রহস্যভেদ করিয়াছেন। কিন্তু এই শেষোক্ত মত বিচারসহ নহে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মুসলমান-বিদ্বেষ ছিল না। স্বয়ং নবীনচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—

যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতিহেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতাজিত বৈরিভাব—ইত্যাদি।

সুতরাং মুসলমানদিগের সম্বন্ধে 'রামা' এবং 'যবন' এইরূপ অবজ্ঞাসূচক পদপ্রয়োগ সম্ভবপর নহে। আমার মনে হয়, 'রামা' ও 'জন' এই দুই পদে 'শাকপার্থিবাদিত্বাৎ

(৬) Lessen and Weber.

(৭) Weber. (৮) Max Muller.

সমাসঃ' হইয়া 'রামাজন' হইয়াছে ; অর্থাৎ রামের স্ত্রী 'রাম' সম্বন্ধে যে সব জনপ্রবাদ রটিয়াছিল, পুস্তকে সেই সমস্ত বর্ণিত। জনপ্রবাদ নানারূপ, সুতরাং রামায়ণও নানারূপ, —যথা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্মীকীয় বা আর্ষ রামায়ণ, বালরামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ ; ইহা ছাড়া বহু অত্যদ্ভুত রামায়ণের খবর দীনেশবাবুর নিকট পাওয়া যায়। আজকাল যেমন অনেকে খেয়ালের বশে 'কাজ' না লিখিয়া 'কায' লিখিতেছেন, সেই রূপ লিপিকরের খেয়ালে 'রামাজনে'র বর্গ্য জ অন্তঃস্থ য হইয়া গিয়াছে—এবং পরে পদমধ্যবর্ত্তী 'য' বাঙ্গালীর মুখে উচ্চারণের সুবিধার জন্য 'য়' হইয়া অনর্থ ঘটাইয়াছে। 'রামাজন'ই ইহার প্রকৃত বাণান ও উচ্চারণ। হিন্দুর 'রামাজন' ও মুসলমানের 'রমজান' মূলে এক ব্যাপার, কেবল আকারের ফেরফের !

অন্যান্য কাব্য

সংস্কৃতভাষায় আরও কতকগুলি কাব্য আছে, যথা— মনোরমা, লীলাবতী, সুবোধিনী, পঞ্চদশী, ইত্যাদি। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইংরেজী নভেল রোমোলা, প্যামেলা প্রভৃতির অনুকরণে প্রথম দুইখানির নায়িকার নামে নামকরণ হইয়াছে। (ইংরেজীতে 'লীলা' নামে নভেলও আছে—লিটনের লিখিত।) প্রথমখানি কিছু বাড়াইয়া এবং কয়েকটি নূতন চরিত্রসৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন ; এবং পাছে ধরা পড়েন সেই ভয়ে 'মনোরমা' নাম চাপিয়া রাখিয়া 'মৃণালিনী' নামে চালাইয়াছেন। (বঙ্কিমচন্দ্র পরের জিনিশ নিজস্ব করিয়া লইয়া কিছুতেই তাহা কবুল করিতেন না, এ অভ্যাস তাঁহার ছিল।) দ্বিতীয়খানিকে ৺দীনবন্ধু মিত্র নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। 'সুবোধিনী' আসলে 'সুরধুনী' অর্থাৎ ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' কাব্যের সহিত অভিন্ন, লিপিকর-প্রমাদে এরূপ বর্ণবিন্যাস দাঁড়াইয়াছে। শুধু হাতের লেখা পুঁথিতে কেন, মুদ্রিত পুস্তকেও অনেক সময় 'র' 'ব' লইয়া গোলযোগ ঘটে, ফলে নায়িকার নাম 'বাণী' কি 'রাণী' তাহা (৯) সাব্যস্ত হইয়া উঠে না। চতুর্থখানিতে নায়িকার বয়স সূচিত—তিনি কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা। ইংরেজীতে 'Sweet Seventeen' নামে একখানি নভেল আছে। 'পঞ্চদশী' উহারই সংস্কৃত সংস্করণ (১০)। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যৌবনারম্ভ শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা শীঘ্র হয় বলিয়া (সমাজ-সংস্কারকগণ যদিও এ কথা আমলে আনেন না)—প্রতীচীর সপ্তদশীকে প্রাচীর পঞ্চদশী বানাইতে হইয়াছে। যে সময়ে এই পুস্তক প্রণীত হয়, তখন অবশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায়—শ্রীবিষ্ণুঃ—মাতৃকুলসনে বয়স লইয়া কড়াক্কড় হয় নাই, ষোড়শীবিবাহের ধুয়াও উঠে নাই।

'কবিকল্পদ্রুম' ও 'কাব্যপ্রকাশ' Palgrave's Golden Treasury'র মত অনেকগুলি স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট কবিতার সমষ্টি, বাঙ্গালা 'পদকল্পতরু'র সমশ্রেণীর। 'মুগ্ধবোধ' ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সহজ কবিতায় পূর্ণ, অনেকটা Children's Treasury'র মত ; কবিতাগুলি এত সরল যে মূর্খেও অক্লেশে বুঝিতে পারে, তজ্জন্যই পুস্তকের নাম 'মুগ্ধবোধ' অর্থাৎ মুগ্ধান্ মূঢ়ান্ বোধয়তি। এত ক্ষুদ্র অথচ এত সহজ কবিতা জগতের সাহিত্যে অন্য কুত্রাপি নাই। একটি নমুনা দেখুন—'সহর্ণেঃ।' (ইহার অর্থ যদি না বুঝেন তবে পাঠক বৈষ্ণবই নহেন।) বীটনের অভিধানে এই পুস্তককে Beauty of Knowledge by Goswami বলা হইয়াছে। (ইংরেজী Dodd's Beauties of Shakespeare প্রভৃতি পুস্তকের নাম ইহার সহিত তুলনীয়।) এই গোস্বামীই কি ছাত্রপাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা H. Gossain ?

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃতভাষায় রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, রসরত্নাকর, প্রভৃতি বহু রসাল কাব্য আছে। অধুনা পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত প্রোফেসার প্রফুল্লচন্দ্রের পাল্লায় পড়িয়া এগুলি কিমিয়াশাস্ত্রের কেতাব হইয়া পড়িয়াছে ! এই জন্যই কথায় বলে, 'পয়োঽপি শৌণ্ডিকীহস্তে বারুণীত্যভিধীয়তে'। আবার হয় ত কোন্ দিন প্রফুল্লচন্দ্রের প্রসাদাৎ শুনিব যে, কৃষ্ণনগরের রসসাগর কিমিয়াশাস্ত্রের রস্কো (Roscoe) এবং ঐ অঞ্চলের শারদীয়া পূজার ভোজের পাতে পরিবেষিত সুশুভ্র রসকরা পারায় ভরা।

(৯) 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'মন্ত্রশক্তি' নামক গল্পের নায়িকা।

(১০) ইহার তুলনায় ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'যোল ছুরে পেত্নী' নামকরণ নিতান্ত গ্রাম্য।

দৃশ্যকাব্য—নাটক

অনেকের ধারণা, সংস্কৃতভাষার নাটক গ্রীকভাষার নাটকের অনুকরণ। কিন্তু গ্রীকজাতির সহিত হিন্দুদিগের যে সময়ে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, সে সময়ে যে এই জাল ভাষার জন্মই হয় নাই, এই মোটা কথাটা তাঁহার ভুলিয়া যান। পক্ষান্তরে, ম্যাকডনেল সাহেব যে দেখাইয়াছেন, রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের নাটকের সহিত সংস্কৃতভাষার নাটকের যথেষ্ট মিল আছে, (১১) এই কথাটা প্রণিধান-যোগ্য। আমার বিবেচনায়, শেক্‌স্‌পীয়ার প্রভৃতির নাটকের অনুকরণেই কালিদাসাদির নাটক রচিত হইয়াছিল। এই জন্যই কালিদাসকে The Shakespeare of India বলে। শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক স্যর টমাস্‌ রো ভারতবর্ষে রাজদূত হইয়া আসেন; তাঁহার দপ্তরে অবশ্যই শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলি ছিল, তদ্দৃষ্টে হিন্দুরা অনুকরণ করে।

এই অনুকরণের একটি স্পষ্ট প্রমাণ—ইংরেজী নাটকের নামকরণে যেমন Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার নাম গাঁটছড়া-বাঁধা, তেমনই সংস্কৃত নাটক নলোদয়, আনন্দলহরী, চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি, পরিভাষেন্দুশেখর, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, ভামিনী-বিলাস, রাজত রঙ্গিণী, মদনপা-রিজাত প্রভৃতিতেও নায়ক-নায়িকার নাম গাঁটছড়া-বাঁধা। গ্রীক নাটকে এ প্রথা নাই। কোথাও বা নায়কের নাম আগে, নায়িকার নাম পরে বসিয়াছে, কোথাও বা ইংরেজী Ladies and Gentlemen এর নজিরে নায়িকার নাম আগে নায়কের নাম পরে বসিয়াছে। শেষের প্রথাই শিষ্টসম্মত—'পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ' তাহার সাক্ষী।

'নলোদয়' বিখ্যাত কবি কালিদাস-কৃত। ইহার নায়িকা নলা' ইলার গর্ভজাতা, নায়ক উদয় উদয়নের সংক্ষেপ। উদয়ন বহুবিবাহ-প্রবণ ছিলেন, সুতরাং বাসবদত্তা-রত্নাবলী পদ্মাবতীর উপর তিনি গণ্ডা পুরাইবার জন্য নলা-নাম্নী নারীরও পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন, ইহাতে পাঠকবর্গের চমকিত হইবার কারণ নাই। ফলতঃ, এই কারণেই উদয়নকথা' গ্রামবৃদ্ধদিগের নিকট এত সরস ও মনোজ্ঞ।

'আনন্দ-লহরী'তে আনন্দ নায়ক, লহরী নায়িকা। এইরূপ 'চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি'তে চতুর্ব্বর্গ নায়ক, চিন্তামণি নায়িকা। চিন্তামণি ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গলে'র প্রসাদে সুপরিচিতা। চতুর্ব্বর্গ কি বিল্বমঙ্গলেরই নামান্তর? এই দুইখানি নাটক ইংরেজী Moralities শ্রেণীর রূপক (allegory)। 'পরিভাষেন্দুশেখরে' পরিভাষা নায়িকা, ইন্দুশেখর নায়ক; ইন্দুশেখর শিবের নামান্তর, এবং পরিভাষা শক্তির নামান্তর; তিনি, ভাষা অর্থাৎ শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মল্লিনাথ বায়ুপুরাণ হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন,—শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে শর্ব্বস্য বল্লভা। অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ॥ 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী'তে সিদ্ধান্ত নায়ক, কৌমুদী নায়িকা। সিদ্ধান্ত সিদ্ধার্থের অপপাঠ বলিয়া সন্দেহ হয়। ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের 'কৌমুদী-সুধাকর' উহারই জীর্ণ-সংস্কার।

"ভামিনী-বিলাসে' ভামিনী নায়িকা বিলাস নায়ক। এই নাটকের রচয়িতা জগন্নাথ রাজা আইন আকবরীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ব্রুয়ার সাহেবের Dictionary of Phrase and Fable হইতে উক্ত রাজার নাম জানা যায়। (১২) রাজত-রঙ্গিণীতে রাজত নায়ক, রঙ্গিণী নায়িকা। কেহ কেহ এখানিকে 'রাজ-তরঙ্গিণী' উচ্চারণ করিয়া ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করেন। (যেমন 'শশাপ সা' 'শশা পসা' উচ্চারণ করিয়া অনেকে রঘুবংশে শশার সন্ধান পান।) হিন্দুরা কখন ইতিহাস লেখে নাই, এবং কেন লেখে নাই, সে সব তথ্য ম্যাক্সমুলর, ম্যাকডনেল প্রভৃতি বিলাতী পণ্ডিত সুনিপুণভাবে (১৩) নিরূপণ করিয়াছেন। তবে 'ইতিহাস' শব্দটা যে তাহাদের ভাষায় রহিয়াছে, তাহা 'শ্রুতৌ তস্করতা স্থিতা'র মত।

'মদনপা-রিজাতে' মদনপা নায়িকা, অরিজাত নায়ক। লোকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য মদন-পারিজাত করিয়া

(১১) Macdonell's History of Sanskrit Literature, Ch. 13.

(১২) King Ayeen Akbery sent a learned Brahman &c—Art. *Juggernaut*, *Brewer's* Dictionary of Phrase and Fable, New Edition, Revised, Corrected and Enlarged.

(১৩) *Macdo ell's* History of Sanskrit Literature; *Introductory*. *Max Muller's* History of Ancient Sanskrit Literature; *Introduction*.

ফেলে (যেমন ইংরেজী pre-sentimentকে অনেকে presenti-ment করিয়া ফেলে।) 'মদনপা' মদনিকা-মদয়ন্তিকার মাসতুতো ভগিনী, 'অরিজাত' অজাতশত্রুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমাদের কবি হেমচন্দ্র ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

কাব্য সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। কেন না অনেকের ধারণা, সংস্কৃতভাষায় কেবল আদিরসাশ্রিত কাব্যই আছে, অন্য কিছুই নাই। এই ভ্রান্ত মত-নিরসনের জন্যই আমাদের লেখনী-ধারণ। আমরা ক্রমে দেখাইব যে, এই ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, মুদ্রাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর বিষয়ের, এবং পানাহার, প্রসাধন-কলা, নৃত্যগীত-বাদ্য, প্রভৃতি হাল্‌কা বিষয়ের গ্রন্থের অভাব নাই।

চিকিৎসাশাস্ত্র

আজকালকার নানা রোগের প্রাদুর্ভাবের দিনে চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাই আগে বলি। কালিদাস কবি বলিয়াই খ্যাত, কিন্তু ইংরেজ কবি গার্থ এবং মার্কিন কবি হোমসের মত তিনিও একাধারে কবি ও চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহার কবিত্বরসাভিষিক্ত চিকিৎসা-কার্য্য দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দেন; তদবধি লোকে চিকিৎসক-মাত্রকেই 'কবিরাজ' আখ্যা দিয়া থাকে (যেমন তিলের নির্য্যাস তৈলের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া সর্ষপ প্রভৃতির স্নেহকেও লোকে 'তৈল' বলিয়া থাকে।) স্ত্রীরোগে কালিদাসের অসাধারণ বিচক্ষণতা ছিল; এমনও শুনা যায় যে তিনি স্ত্রীলোকের প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য মধ্যে-মধ্যে স্ত্রীবেশ ধারণ করিতেন। তাঁহার প্রণীত 'কুমার-সম্ভব' ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁহার আর কয়েকখানি পুস্তক পত্নীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত; আমাদের সাহিত্যে গিরিজা বাবুর 'গৃহলক্ষ্মী'তে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। কালিদাসের পত্নী বিখ্যাত বিদুষী ছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। উক্ত পত্নী (গ্রাম্যভাষায় মাঘ) 'শিশুপালবধ' রচনা করিয়াছেন। ইহা শিশুচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়, ইংরাজ-রাজ্যেই যে পরীক্ষা দেওয়ার ভয়ে শিশুগণ তাড়াতাড়ি ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে তাহা নহে, ইংরাজ-রাজ্য-স্থাপনের পূর্ব্বেও শিশুমড়ক (infant-mortality) একটা সমস্যা (problem) হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

'অমরকোষে' অমরত্ব লাভের জন্য জীবনী সালসা (elixir of life) প্রস্তুত করিবার প্রণালী নির্দিষ্ট আছে। যাঁহারা 'অমরকোষ' কণ্ঠস্থ করেন, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘায়ুঃ হয়েন দেখা যায়। ইহা এই চিকিৎসা-প্রণালীর অমোঘ ফলের পরিচয়। (১৪) 'শারীরক-ভাষ্যে' শরীর-পোষণের এবং 'শ্রীভাষ্যে' দেহের কান্তিবিকাশের তত্ত্ব বিবৃত। গ্রন্থদ্বয় চুণীবাবুর 'শারীর-স্বাস্থ্যবিধানে'র সঙ্গে সমান আসনের যোগ্য। ইহা ছাড়া বৃহৎ জাতক, লঘু জাতক, প্রভৃতি সুপ্রজননবিদ্যা (eugenics) সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

জীবন-চরিত

সংস্কৃত ভাষায় বহু জীবনচরিত বর্ত্তমান। জীবনচরিত-রচনার আর্ট এই ভাষায় এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে শুধু গদ্যে কেন, পদ্যে এবং গদ্যপদ্যময় নাটকাকারে পর্য্যন্ত জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছিল। হর্ষচরিত ও দশকুমারচরিত গদ্যে লিখিত; নৈষধচরিত, বুদ্ধচরিত ও নবসাহসাঙ্কচরিত পদ্যে লিখিত; মহাবীরচরিত, উত্তররামচরিত, মহানাটক ও বিক্রমোর্ব্বশী— এই জীবনচরিত-চতুষ্টয় নাটকাকারে লিখিত। 'মহাবীরচরিতে' মহাবীর অর্থাৎ হনুমানের অবদানপরম্পরা মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু, বর্ণনায় সরসতা সঞ্চারের জন্য অন্যান্য সমসাময়িক ব্যক্তির বৃত্তান্তও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, রামতনু লাহিড়ির জীবন-চরিত এবং নবপ্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনচরিত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জীবনচরিতে এই প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে।

---

(১৪) অনেকে অমরকোষকে অভিধান বলিয়া ভ্রম করেন। অভিধান-খানির নাম অমরকোষ নহে, অমরসিংহ। নামের আংশিক সাম্যে এই ভ্রম ঘটে। (যেমন শাঙ্গর্ধর পদ্ধতি ও শাঙ্গর্ধ রসংহিতা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ।) হুইটন লিখিয়াছেন:—'There are in all 18 dictionaries of high reputation but the Amarsinha is deemed the best.'

ইংরেজীতে ম্যাসন-প্রণীত মিল্‌টনের জীবনচরিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের অগ্রণী। 'উত্তররামচরিত' উত্তর অর্থাৎ পরশুরামের পরবর্ত্তী দাশরথি রাম অর্থাৎ রাম দি সেকণ্ডের জীবন-কথা (উত্তম অর্থাৎ সর্ব্বশেষ রাম, বলরাম বা রাম দি থার্ডের নহে।) 'মহানাটক' মহাবীর-চরিতের ন্যায় মহাবীর হনূমানের জীবনচরিত, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বরচিত আত্ম-জীবনচরিত, মহাবীরের লিখিত বলিয়া মহানাটক বলিয়া অভিহিত (যেমন অনেকে মনে করেন ভট্টিকবির লিখিত বলিয়া ভট্টিকাব্য নাম।) ইহা অনেকটা Confessions of Rousseau, Confessions of St. Augustine, এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্রে'র (১৫) মত। হনূমানের নাটকীয় প্রতিভা (dramatic faculty) খুবই প্রখর ছিল। তাঁহার বংশধরগণ টেক্সের ভয়ে মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিলেও আকার-ইঙ্গিতে এই শক্তির পরিচয় দেন। (ইংরেজীতে এই শ্রেণীর নাটকীয় কলাকে mime বা pantomime বলে।) আমাদের দেশে কবির লড়াইএও এইরূপ মূক অভিনয় হইত। 'বিক্রমোর্ব্বশী' বিক্রমাদিত্যের জীবনচরিত, তাঁহার সভাকবি কালিদাসের রচিত (যেমন হর্ষচরিত হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচিত।) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় 'সাবধানী' ঐতিহাসিকও হর্ষচরিতের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন। আশা করা যায়, তিনি ও তাঁহার সহযোগী ভ্রাতৃবৃন্দ ক্রমে-ক্রমে দশকুমারচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতিরও ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিবেন। বাস্তবিক এই গ্রন্থগুলি কুলপঞ্জিকাদির ন্যায় হাসিয়া উড়াইবার জিনিশ নহে। এগুলিতে ইতিহাসের খাঁটি মাল যথেষ্ট আছে।

ভূগোল

ভূগোলশাস্ত্রে 'বিশ্বকোষ' ও 'মেদিনীকোষ' Complete Gazetteer, 'আর্য্যভট্ট' বা 'আর্য্যভটে' আর্য্যাবর্ত্তের বিবরণ, 'বাস-বদত্তা'য় যে সকল দেশে মনুষ্যের বাস আছে সেই সকল দেশের বিবরণ। 'কথাসরিৎসাগরে' পৃথিবীর জলভাগের ও 'হিতোপদেশে' স্থলভাগের বিবরণ, সরল গল্পের আকারে লিখিত—অনেকটা Story of the Earth, Land and Seaর মত। 'বৃহৎকথা'য় জলস্থল উভয় ভাগের কথা একত্র ছিল; কিন্তু এই গ্রন্থ এক্ষণে লুপ্ত। কথাসরিৎসাগর ও হিতোপ-দেশের একটি বিশিষ্টতা এই যে, উভয় গ্রন্থেই শুধু স্থানের নীরস তালিকা নাই, সঙ্গে-সঙ্গে তত্তৎস্থানের রাজহংস, ময়ূর প্রভৃতি জলচর-স্থলচর প্রাণীর বৃত্তান্তও আছে। যাঁহারা সেকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ক্লার্ক সাহেবের জিওগ্রাফি পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রণালীটা সহজে ধরিতে পারিবেন।

হিতোপদেশের প্রকৃত রচয়িতা কে জানা যায় না। হিন্দুরা সত্যগোপনের জন্য নারায়ণভট্ট বা বিষ্ণুশর্ম্মার নামে চালাইয়াছেন। জয়দেবও বিষ্ণুর অন্যতম কীর্ত্তি 'ভূগোল-মুদ্‌বিভ্রতে' বলিয়া গিয়াছেন। হিতোপদেশে বর্ণিত কর্পূর-দ্বীপ শ্বেতদ্বীপ অর্থাৎ Albionএর সহিত অভিন্ন। উক্ত গ্রন্থের বর্ণিত জরদ্গব-নামক গৃধ্র=গিধ্বর=শিয়াল=Jackal (Wilkinsকৃত হিতোপদেশের ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য) ইউরোপের Reynard the Foxএর সহিত এক কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। আর এক কথা, এই 'হিতোপ' কি Utopiaর সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরানুবাদ (transliteration)? তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা ইংরেজী পুস্তকের তর্জ্জমা। দেশশ্চাসৌ কর্পূরদ্বীপঃ স্বর্গ এব, রাজা চ দ্বিতীয়ঃ স্বর্গপতিঃ—ইত্যাদি দেখিয়া Ideal Commonwealthএর কথাই ত মনে হয়।

এই ভাষায় স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্থান সম্বন্ধেও পুস্তক আছে। যথা কাশিকাবৃত্তি=কাশীর বৃত্তান্ত=Benares Commentary (ইংরেজীটুকু ম্যাকডনেলের তর্জ্জমা); এখানি বাঙ্গালা 'কাশী-পরিক্রমা'র মত গাইডবুক। যাঁহারা পূজাবকাশে কাশীতে সৌখীন তীর্থযাত্রা করেন, তাঁহারা এই গাইড-বুক একখানি খরিদ করিলে যথেষ্ট উপকার পাইবেন।

প্রাণিবৃত্তান্ত।

কথাসরিৎসাগর ও হিতোপদেশ ছাড়া এই ভাষায় স্বতন্ত্র প্রাণিবৃত্তান্তও আছে। এগুলির নাম 'পুরাণ।' পুরাণে মৎস্যকূর্ম্মবরাহ প্রভৃতি জলচর প্রাণী এবং দ্বিপদ, চতুষ্পদ

(১৫) ছিন্নপত্রের সহিত সাদৃশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের বাতিল খসড়া যেমন সংগৃহীত হইয়া ছিন্নপত্র নাম ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ হনূমানের ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেইগুলি উদ্ধার করিয়া মহানাটক সঙ্কলিত হইয়াছে। মধুসূদন বা দামোদর (একই কথা) মিস্ত্রী এই সব পাথর যোড়া দেন।

ষট্‌পদ, অষ্টাপদ, লোমপাদ, উত্তানপাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার জানোয়ারের বৃত্তান্ত আছে। নৃসিংহ পুরাকালের ম্যামথ-ম্যাষ্টোডনের মত এক প্রকার অতিকায় জীব ছিল।

হংসদূত, কোকিলদূত প্রভৃতি গ্রন্থে (carrier pigeon) সংবাদবাহী পারাবতের ন্যায় হংস-কোকিল প্রভৃতিকেও সংবাদবহন-কার্য্যে নিয়োগ করার নিদর্শন পাওয়া যায়। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে এইরূপ হংসের দৌত্যের কথা আছে। পক্ষিজাতি সম্বন্ধে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার সহজ অর্থ—এতৎপাঠে পক্ষী (শকুন্ত) চিনিবার (অভিজ্ঞানের) উপায় শিক্ষা হয়। এই চিড়িয়াখানায় বিশ্বামিত্র বক ধার্ম্মিক, কণ্ব গরুড়, দুর্ব্বাসাঃ গৃধ্র, দুষ্যন্ত শ্যেন, বিদূষক বাবদূক শুক, শকুন্তলা কপোতী ও সখীদ্বয় বাস্ত ঘুঘু।

উদ্ভিদবিদ্যা

উদ্ভিদবিদ্যায় এই ভাষায় অনেকগুলি ভাল-ভাল গ্রন্থ আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় সে সকলের কোন সন্ধান না রাখিয়া বিদেশীর দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। আশা করি, তিনিও একদিন মাইকেল মধুসূদনের মত ইহার জন্য আক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিবেন।

'রঘুবংশ' ও 'হরিবংশে' বাঁশের আওলাত সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা আছে। বাঁশের উচ্চতা দেখিয়া কালিদাস ইহাকে 'সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ' বলিয়া অতিশয়োক্তি করিবেন এবং উচ্চ বাঁশের সঙ্গে ক্ষুদ্র কচার তুলনা করিবেন (ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ কচাল্পবিষয়া মতিঃ), কিছুই আশ্চর্য্য নহে। (অনেকে যেমন সরস্বতী লিখিতে স্বরস্বতী লিখিয়া বসেন, সেইরূপ অজ্ঞ লিপিকরগণ 'কচা' না লিখিয়া 'কচা' লিখিয়া বসিয়াছে।) কচা অর্থাৎ ভেরাণ্ডা (এরণ্ড) ক্ষুদ্রতার আদর্শ। এই জন্যই প্রবাদবাক্য আছে,—নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

রঘু অর্থাৎ বিখ্যাত রঘুডাকাত (শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর রঘুয়োলও স্মর্ত্তব্য) যে বাঁশের লাঠী লইয়া ডাকাতী করিত, এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সেই বাঁশের কথা আছে। এই রঘু ডাকাত ভবিষ্যতে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হয়েন। (ডাকাতেরা রাজবংশের আদিপুরুষ, এই তত্ত্ব বিলাতী লেখক রাস্‌কিন বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।) 'রঘুণামন্বয়ং বক্ষে' অর্থাৎ রঘু অন্যায় করিয়া লোকের বুকে বাঁশ ডলিত—ইত্যাদি শ্লোকে কালিদাস রঘু ডাকাতের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে রঘুর কার্য্যটি যে 'অন্যায়' এই স্পষ্ট বাক্য বলিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন!

বাঙ্গালাদেশে বাঁশের আওলাত বেশী এবং এই দেশেই রঘু ডাকাতের বাসভূমি ছিল, অতএব কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, অত্র সন্দেহো নাস্তি। আবার নদীয়া জেলায় ভেরাণ্ডাকে 'কচা' বলে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, কালিদাস নদীয়া জেলার বাসিন্দা ছিলেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ কয়েক বৎসর হইল নবদ্বীপবাসী গবেষকগণ সংগ্রহ ও প্রচার করিয়াছেন। পিষ্টপেষণে প্রয়োজন নাই।

রঘুবংশে নানা রকমের বাঁশের কথা আছে, তন্মধ্যে শেষবর্ণিত অগ্নিবর্ণেরই রঙ্গের জন্য জৌলুস বেশী। প্রাগ্-বংশবাসী রামচন্দ্র অপেক্ষা শেষোক্ত বাঁশেরই না কি আজকাল উন্নতি। পরশুরামের মত 'নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে' ত একেবারেই লোপ পাইয়াছে।

'হরিবংশে'র হরি ডাকাবুকো ডাকাত ছিলেন না, তবে দধিদুগ্ধ, ননীমাখন, সুযোগ পাইলে আহিরিণী-গোয়ালিনী-দিগের কাপড়খানা-চোপড়খানা পর্য্যন্ত চুরি করিতেন। তিনি লাঠিবাজীর ধার ধারিতেন না, সরল বাঁশের বাঁশী লইয়া তাঁহার কারবার ছিল। শেষে তাঁহার ঘরে 'মুষলং কুলনাশনম্' জন্মিয়াই বংশনাশ করিল।

'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'য় শাল কাঠ ছেদন-ভেদন-ভঞ্জন-কর্ত্তন করিয়া কিরূপে কড়ি-বরগা তৈয়ারি করিতে হয়, তাহার প্রণালী বর্ণিত।

ফুলের চাষ সম্বন্ধে এই ভাষায় এত সুন্দর-সুন্দর পুস্তক রহিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ফুলের ফসল' না বাহির করিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। যাক, অবান্তর কথা ছাড়িয়া পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করি। যথা,—সুপদ্ম, কুবলয়ানন্দ, পুষ্পবনবিলাস (পুষ্পবাণ ভুল বাণান), মল্লিকা-মারুত, মালতীমাধব, কুসুমাঞ্জলি, ছন্দোমঞ্জরী, বীজগণিত। যাঁহাদিগের ফুলবাগানের সখ আছে, তাঁহাদিগকে 'মালতী-মাধবে'র 'বকুলবীথী' নামক প্রথম অংশটি পাঠ করিতে বলি। কুসুমাঞ্জলির বহু স্থলে 'সরিষার ফুল' দেখা যায়। ইহা তখনকার একটা প্রধান ফসল ছিল। 'বীজগণিতে' বীজ

বপন সম্বন্ধে উপদেশ আছে, এবং কয়টি বীজে কতটা ফসল হয় তাহার গণনা সম্বন্ধে সঙ্কেত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়,—কৃষিবিদ্যা হিন্দুদিগের হাতে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এখনও ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ।

বিবিধ

মুদ্রাতত্ত্ব (numismatics) সম্বন্ধে মুদ্রারাক্ষস ও চক্রদত্ত উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়খানিতে সর্ব্ববিধ চক্রাকার মুদ্রার বিবরণ প্রদত্ত। 'মৃচ্ছকটিকে' কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত-করণের রহস্য উদ্ঘাটিত। ইহার আসল নাম মিছ্ছ কড়ি—false coin, কৃত্রিম মুদ্রা (পূর্ব্বে কড়িই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত)। এই নাম সাধুভাষায় 'মৃচ্ছকটিক' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ বিটচেট দ্যূতকার (gambler) প্রভৃতি লোকে কৃত্রিম মুদ্রা চালাইবার প্রয়াস করে, সেই জন্য উক্ত পুস্তকে ঐ সকল শ্রেণীর লোকের কথা আছে।

রত্নপরীক্ষা সম্বন্ধে রত্নপ্রভা, রত্নাবলী, উজ্জ্বলনীলমণি, মন্বর্থমুক্তাবলী, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ও ভামতীর নাম করা যাইতে পারে। ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ—এ বিষয়ে লাখ কথার এক কথা।

'মাল-বিকা-গ্নিমিত্রে' মহাজনদিগের বিক্রেয় মাল সম্বন্ধে Fire Insuranceএর ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ইহা (political economy) অর্থশাস্ত্রের একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন।

সংহিতাগুলি যৌথ কারবার এবং Co-operative Credit Society প্রভৃতি-সংক্রান্ত তথ্যে পূর্ণ। ইহার প্রকৃত বাণান 'সংহতি'—চ্যুত-সংস্কৃতিতে 'সংহিতা' হইয়া গিয়াছে। এই সংহতির গুণেই বহু বিপ্লবের মধ্যেও হিন্দু-সমাজ আজও টিকিয়া আছে।

তন্ত্রে তাঁত ও বয়নবিদ্যার আলোচনা। এগুলি শিব বা শিবার মুখনিঃসৃত উপদেশ অর্থাৎ লেক্‌চার। তাঁহারা জগৎকে বস্ত্র যোগাইয়া নিজেরা দিগম্বর-দিগম্বরী। ভারতের বয়নশিল্পের দশাই যে আজ এইরূপ! তন্ত্রের মধ্যে কাতন্ত্র ও পঞ্চতন্ত্র সুবিদিত। পঞ্চতন্ত্রে সোমিলক প্রভৃতি কয়েক-জন প্রসিদ্ধ তন্তুবায়ের জীবনচরিত আছে। কাত্যায়নসূত্র, পিঙ্গলসূত্র, কল্পসূত্র, প্রভৃতিতে নানানবর্ণী সূতার বিবরণ আছে।

নৃতত্ত্বে (ethnology) 'পার্ব্বতী-পরিণয়' বা পার্ব্বতীয় পরিণয়—Marriage-customs of the hill-tribes বহু তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। 'ভট্টিকাব্যে,' পদ্মিনী উপাখ্যানে উল্লিখিত ভট্টি জাতির বিবরণ আছে। 'নাগানন্দ' Communism সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি না থাকিলেই নাগা-সন্ন্যাসীদিগের আনন্দ, সেই কারণে পুস্তকের এইরূপ নামকরণ।

'ভাবপ্রকাশ' মনোবিজ্ঞান (psychology) সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' শব্দ (Sound) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। 'মিতাক্ষরা' ও 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ভাষা-তত্ত্ব (philology) সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। শেষখানিতে Grimm, Bopp, Pott প্রভৃতির চর্ব্বিতচর্ব্বণ। এই গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয় বলিয়া রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে বরং মূল বুঝা যায়, তথাপি অনুবাদ বুঝা যায় না। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!

ব্যবহারাজীবগণ আশ্বস্ত হউন, তাঁহাদিগের প্রাণপ্রিয় ব্যবহারশাস্ত্রের গ্রন্থেরও এই ভাষায় অভাব নাই। যথা, কিরাতার্জ্জুনীয়, রাঘবপাণ্ডবীয়, বৃহন্নারদীয়, বাক্যপদীয়, ইত্যাদি। এগুলি Law Reports, এগুলিতে কয়েকটা ভারী-ভারী মামলার নজীর আছে, বাদী প্রতিবাদীর নাম একত্র করিয়া এবংবিধ নামকরণ।

যুদ্ধবিদ্যা পলাশীর লড়াইএর পূর্ব্বেও হিন্দুদিগের অজ্ঞাত ছিল না। 'মহামুদ্গর' (অনেকে 'মোহমুদ্গর' উচ্চারণ করেন) ইহার প্রমাণ। 'গোলাধ্যায়ে' গোলাগুলির ব্যাপার, তিতুমীরের ধ্যানলব্ধ। ইহার একটি সূত্র 'গুলি খা ডালা' সকলেই শুনিয়াছেন।

'সেতুবন্ধ' (building of a bridge) কুলী-মজুরের বুঝিবার সুবিধার জন্য দেশভাষায় লিখিত।

মহাভারত হিন্দুদিগের এন্‌সাইক্লোপীডিয়া (১৬); এই জন্যই প্রবাদ-বাক্য, 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে'। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বীটন হিন্দুদিগের অভিধান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'There are in all 18 dictionaries of high reputations'। সম্ভবতঃ

(১৬) It is not an epic at all, but an encyclopædia —*Macdonell's* History of Sanskrit Literature, Ch. 10.

ইহা সুবিখ্যাত ফরাসী এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার অনুকরণ বা অনুবাদ, ফরাশডাঙ্গায় লিখিত।

গণিত ও জ্যোতিষ

গণিতশাস্ত্র বড় নীরস, তথাপি প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার জন্য তাহারও কিছু উল্লেখ আবশ্যক। বৃত্তরত্নাকর—Geometry of the circle, ইউক্লিডের জ্যামিতির নকল। হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকট এই শাস্ত্র ধার করিয়াছে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। (Arithmetic) পাটীগণিতে বেতাল-পঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, চৌরপঞ্চাশিকা, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, দশরূপক, এই কয়খানি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তখানি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে ইহা নারায়ণের দশাবতারস্তোত্র, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ইহাতে দশমিক প্রণালী (decimal system) বিবৃত। হিন্দুরাই যে এই প্রণালীর উদ্ভাবয়িতা, এ কথা ইউরোপীয়গণও স্বীকার করেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী—Theory of Numbers। 'যোগশাস্ত্রে' নানা প্রক্রিয়ার যোগ (তেরিজ) যথা হঠযোগ, রাজযোগ, গুহ্যযোগ, ইত্যাদি এবং 'দায়ভাগে' নানা প্রক্রিয়ার ভাগের কৌশল উপদিষ্ট।

ফলিতজ্যোতিষে 'জাতকমালা' উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে' চন্দ্রসম্বন্ধে, 'বীরমিত্রোদয়ে' সূর্য্যসম্বন্ধে (মিত্র সূর্য্যের নামান্তর, বীর হনূমান্ তাঁহার সহিত মিতা পাতাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম) এবং 'চন্দ্রালোক' ও 'প্রক্রিয়া-কৌমুদী'তে (operation of the moonlight) শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ-ভেদে চন্দ্রের আলোকের তারতম্য বিচার।

'পবনদূত' ও 'মেঘদূত' নভোবিজ্ঞান (meteorology) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। বীটন মেঘদূতকে নাটক বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন ('another great drama, Meghaduta')। গ্রন্থখানি পদ্যে লিখিত এবং শেষার্দ্ধ 'উত্তরমেঘ' নামে অভিহিত দেখিয়া প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথন (dialogue) বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবে।

মেঘদূতে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং এই যে চারি প্রকার মেঘের শ্রেণী-বিভাগ আছে ইহা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের Stratus, nimbus, cumulus, cirrus এর সহিত অভিন্ন। 'ধূম' অর্থাৎ ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ (stratus); এই মেঘ দেখিলেই ময়ূর জাতীয় কবিগণ কবিতা লেখেন (কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই মেঘদূতের সাতিশয় পক্ষপাতী)। 'জ্যোতিঃ' অর্থাৎ বিদ্যুতে ভরা মেঘ (nimbus) ; এই মেঘ হইতে বজ্রপাত হয়। 'সলিল' অর্থাৎ জলে ভরা মেঘ (cumulus) ; এই মেঘে বৃষ্টি হয়। 'মরুৎ' (cirrus) অর্থাৎ এই মেঘ হইলেই ঝড় উঠিয়া মেঘখানি উড়াইয়া লইয়া যায়। তখন আর 'মন্দং মন্দং নুদতি পবনঃ' নহে, একেবারে 'অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ'!

গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয় ছাড়িয়া এক্ষণে নৃত্যগীতবাদ্য, প্রসাধনকলা ও পানাহার প্রভৃতি হালকা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

নৃত্যগীতবাদ্য

সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে এই ভাষায় অনেকগুলি ভাল-ভাল গ্রন্থ আছে, সেগুলির সাধারণ নাম 'গীতা'। এতৎসম্বন্ধে উপদেশও আছে—গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। কেন না, ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরং, গানাৎ পরতরং ন হি।

'গুরুগীতা'য় চড়া বা কড়ি সুরের গীত সন্নিবিষ্ট। 'ষড়্‌জগীতা'য় ষড়্‌জ অর্থাৎ সঋগম প্রভৃতি সপ্ত সুরের প্রথম স এর সুর সাধা সম্বন্ধে উপদেশ। 'পিতৃগীতা'য় পিতৃশ্রাদ্ধে, যে কীর্ত্তনগান হয় তাহাই সন্নিবিষ্ট। 'বৈষ্ণবগীতা'য় বৈষ্ণব ভিখারীদিগের গান। তুলসীপত্র তুলিতে-তুলিতে গুন-গুন করিয়া যে গান গাহিতে হয়, 'তুলসীগীতা'য় তাহাই আছে। মঙ্কিগীতা (Kipling) কিপ্‌লিঙের Song of the Banderlogues এর সহিত অভিন্ন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় মহাদেব শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে গীতশিক্ষা দিয়াছেন। অনেকের ধারণা এ স্থলে ভগবান্ অর্থে শ্রীকৃষ্ণ ; কিন্তু সে ধারণা ভুল ; ভগবান্ অর্থে মহাদেব, কেন না মহাদেবই শিঙ্গাডমরু বাজাইয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রচার করেন। 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত' এখানেও দেখা যায়। ভূতনাথ মহাদেবই ভগবান্। মহাত্মা ম্যাকডনেল বলিয়াছেন, মূল মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের নামগন্ধও ছিল না (১৭) ; পরে বৈষ্ণবেরা এই মহাগ্রন্থ নিজস্ব করিয়া লইয়া তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রক্ষিপ্ত করে। ভগবদ্‌গীতায়ও অবশ্য এইরূপে বৈষ্ণবেরা শিবকে সরাইয়া তাঁহার আসনে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়াছেন। খাঁটি গীতা যে শিবেরই উপদিষ্ট, তাহা

(১৭) *Macdonell's* History of Sanskrit Literature, Ch. X.

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যায়। 'Siva puts on the form of his charioteers and gives him a lesson' &c —Preface to the *Hitopadesha* by B. Half-Wortham (The New Universal Library)। সাহেবেরা শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব হইতে দূরে থাকাতে নিরপেক্ষভাবেই লিখিবেন। অতএব এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের মতই শিরোধার্য্য।

সঙ্গীতশাস্ত্রে গীতগোবিন্দ শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে গোবিন্দ অধিকারী তাঁহার সমগ্র কৃষ্ণযাত্রা সংস্কৃতভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। (কৃষ্ণযাত্রা ও গীতগোবিন্দ যে একই জিনিশ তাহা ম্যাকডনেল পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের ১৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) পূজারী ঠাকুর ইহার টীকা লিখিয়াছেন। জয়দেব গোবিন্দ অধিকারীরই রাশিনাম, তিনি স্বতন্ত্র লোক নহেন। সংস্কৃতভাষায় ডাকনাম ছাড়িয়া রাশিনাম বলিতে হয়, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি উপলক্ষে সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাচ ও নাচের জের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নাট্য ও নৃত্য, নট-নটী ও নর্ত্তক-নর্ত্তকী মূলে একই জিনিশ। (সেই জন্যই থিয়েটারের চলিত নাম 'নাচঘর' এবং আমাদের দেশের থিয়েটারের এ নামও সার্থক।) ভরত যৌবনে খুব নৃত্যশীল ও নাট্যকুশল ছিলেন, পরে ভারিক্কি হইয়া ও সব ছাড়িয়া জড়ভরত হইয়া পড়েন। শুনিয়াছি, যাঁহারা যৌবনে জিমন্যাষ্টিক করেন, তাঁহারা প্রবীণ হইয়া ও-সব ছাড়িলেই বাতে পঙ্গু হইয়া পড়েন।

'নৃত্যকর্ম্মপদ্ধতিতে'ও নাচ সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ব্রাহ্মণগণ আহ্নিকের সময় এই সকল নাচের কসরত দেখান। অনেকে অশুদ্ধ করিয়া পুস্তকখানির নাম উচ্চারণ করেন—'নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি'! আমরা 'শুদ্ধ' করিয়া দিলাম।

মুরারি নাচগান ছাড়িয়া বাজনার দিকে ঝুকিয়াছিলেন, এই জন্যই কথায় বলে, 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'। দেবতা মুরারি যমুনায় স্নানরতা গোপীদিগকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বাঁশী বাজাইতেন, মানুষ মুরারি বাঁশীর পয়সা না যোটাতে কুলনারীদিগের স্নানঘাটের সোপানস্থিত ঘড়া লইয়া বাজাইতেন। (কলিকাতার রাস্তায় ভিক্ষুকের হাঁড়ি বাজান অনেকে শুনিয়াছেন। ভিক্ষুকের ঘড়াও যোটে না।) স্ত্রীলোককে না শুনাইলে কবির কাব্য, ওস্তাদের গীতবাদ্য কিছুই সার্থক হয় না, তাই কালিদাসের ঋতুসংহার ও শ্রুতবোধের প্রিয়া ও মেঘদূতের মালিনী এবং কূপারের মিসেস্ আন্‌উইন ও লেডীঅষ্টেন। (অনেক ফক্কড় যুবক এই কারণেই স্ত্রীলোক দেখিলেই গান ধরিয়া দেন।) মুরারি ঘড়ার বাজনা সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন, তাহার নাম—অনর্ঘড়ারবঃ। মুদ্রিত পুস্তকে ছাপাখানার ভূতের উৎপাতে আনাগোনা 'ঘ'এর দুইবার আনাগোনায় অনর্ঘরাঘব হইয়াছে! (এই দুঃখেই খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুদ্রিত পুস্তক স্পর্শ করেন না।) ঘড়ার বাদ্য সম্বন্ধে একটি শ্লোক অনেকেই জানেন।

রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ
কক্ষচ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমার্গে প্রকরোতি শব্দং
ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ছঃ॥

প্রসাধন-কলা

শরীরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য প্রসাধন-কলার চর্চ্চা হিন্দুদিগের মধ্যে ইংরেজী ও ফরাশী ফ্যাশান আমদানির পূর্ব্বেও ছিল। এই শাস্ত্রের সাধারণ নাম 'অলঙ্কারশাস্ত্র'। 'সাহিত্যদর্পণে' দর্পণের সাহায্যে কেশ-বেশ বিন্যাসের প্রণালী প্রকটিত। এই দর্পণ বিলাসি-বিলাসিনীদিগের 'সহিত' অর্থাৎ সঙ্গে-সঙ্গেই থাকিত, তজ্জন্য ইহার নাম 'সাহিত্য-দর্পণ'। এখনও সৌখীন লোকের পকেটে বা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে ছোট আয়না থাকে। তবে তখনকার দর্পণ অবশ্য ধাতুনির্ম্মিত ছিল, তখনও বিলাত হইতে সস্তা কাচের আমদানি ও কাঞ্চনমূল্যে কাচক্রয়ের প্রচলন হয় নাই। (আজও বিবাহে ধাতুময় দর্পণ বরের হস্তে প্রদত্ত হয়।) 'কাব্যাদর্শ'ও এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

'বেণীসংহারে' বেণীবন্ধনের প্রণালী বর্ণিত। ভীমসেন বিখ্যাত হেয়ার-ড্রেসার ছিলেন। 'প্রিয়দর্শিকা'য় স্ত্রীলোকদিগের বেশবিন্যাসের কথা আছে; প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেষঃ—ইহার মূলমন্ত্র। 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' রকম-রকম কণ্ঠাভরণ অর্থাৎ হার নেক্‌লেস প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। সরস্বতী রূপজীবিনীদিগের প্রিয়দেবতা, সুতরাং অলঙ্কারের কেতাবে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে থাকিবে, বিচিত্র কি? বামনের 'কাব্যালঙ্কারবৃত্তি'তেও গয়না-গাঁটির কথা। বামন বড়

অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। সাধারণতঃ কদাকার কুৎসিত লোকেরই অলঙ্কারের উপর ঝোঁক অধিক হয়।

পানাহার

এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। ব্রাহ্মণগণ স্বকর্ম্মজ্ঞ, অর্থাৎ আহার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ, এই খোসনাম তাঁহাদিগের বহু কাল হইতেই আছে। পুরাণাদিতে দেখা যায়, তাঁহারা আহারের আবদার ধরিয়া বহু রাজাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভোজনব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকখানি সারবান্ পুস্তক লিখিয়া তাঁহারা থিওরি ও প্র্যাক্‌টিসের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন; অর্থাৎ হাতে-কলমে তাঁহাদিগের সিদ্ধবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকগুলির নাম—ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচম্পু, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য। শেষোক্তখানি চুণী বাবুর 'খাদ্য' অপেক্ষাও উপাদেয়। ভোজচম্পুতে চপাটি, রুটি, পরোটা প্রভৃতি প্রস্তুতকরণের প্রণালী বর্ণিত। চর্ব্বির অবাধ বাণিজ্য না হওয়াতে তখনও লুচির তত রেওয়াজ ছিল না। 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে' খাঁড়গুড় দিয়া নানারূপ মিষ্টান্নমোদক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া প্রকটিত। তখন জার্ম্মানী ও জাভা হইতে চিনি আমদানী না হওয়াতে—'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' ব্যবস্থানুসারে চিনির অনুকল্প খাঁড়গুড় দিয়াই মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। মিষ্টান্নের ময়লা রং বলিয়া কেহ নাক সিটকাইত না। ইংরেজের আমলে 'কালা বাঙ্গালী' গালাগালি হইয়া পড়াতে সকল কাল জিনিশই অবজ্ঞাস্পদ হইতেছে। মিষ্টান্ন ত মিষ্টান্ন, জুতা পর্য্যন্ত কাল চামড়ার না হইয়া বাদামী রঙ্গের হইতেছে। আশা করি, শীঘ্রই বাদামী রঙ্গের ছাতারও চলন হইবে।

'কলাপে' সুপক্ব কদলী সম্বন্ধে মুখরোচক আলোচনা; অনুমান, ইহা হনুমানের রচনা। 'কলাপক্ব' মুখে-মুখে বিকৃত হইয়া 'কলাপে' দাঁড়াইয়াছে। 'কারিকা'তে কারি (curry) রন্ধনের প্রথা এবং 'বার্ত্তিকে' বার্ত্তাকু অর্থাৎ বেগুন পোড়া, ভাজা, বেগুনি প্রভৃতি ভাজিবার কথা। 'পাণিনি' পানীয় জল সম্বন্ধে চুণী বাবুর ন্যায় গবেষণা করিয়াছেন। 'পাতঞ্জলে' পাতকূয়ার জল সম্বন্ধে আলোচনা। কলের জলের উদ্ভবের পূর্ব্বে কলিকাতায় পাতকূয়াই সম্বল ছিল। আবার এখন দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, দীঘি-পুকুর মজিয়া যাওয়ায় পল্লীগ্রামে পাতকূয়াই সম্বল হইতেছে। সুতরাং হরে-দরে হাঁটুজল দাঁড়াইয়াছে। 'জলায়বায়াবোহচীচঃ' সূত্রে কোথাকার জল কোথায় যায় ও কোথা হইতে আসে, ইত্যাদির বিচার আছে। 'কর্পূরমঞ্জরী'তে কর্পূর দ্বারা পানীয় জল সুবাসিত করিবার সঙ্কেত আছে। (তখনও জাতিধর্ম্মনাশা কেওড়ার জলের চল হয় নাই।) এই পুস্তকের একটি শ্লোক বড় মিষ্টি—

অপাং হি তৃষ্ণায় ন বারিধারা
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা।

'কাদম্বরী' সুরা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিবন্ধ—'কাদম্বরীরসভরেণ মত্ত' হইয়া বাণভট্ট ও ভূষণবাণ বাপবেটায় এক বৈঠকে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহারা কবুল জবাব দিয়াছেন—'মত্তো ন কিঞ্চিদপি চেতয়তে জনোঽয়ম্।'

উপসংহার

ভারতের এই ভুঁইফোঁড় ভাষা Jonah's gourd বা অকালকুষ্মাণ্ডের মত রাতারাতি খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন ইহার আর বাড়ের মুখ নাই। রোগীকে কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টার ন্যায়, অধুনা এই ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাদি কৃত্রিম উপায় দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'বিদ্যোদয়' নামক মাসিকপত্রও এই ব্যাপারে কাঠবিড়ালীর কার্য্য করিতেছে। ইহা উক্ত পত্রের পরিচালকদিগের নিষ্ঠার পরিচায়ক বটে। কিন্তু শত্রুপক্ষ বলে, এই পত্রের প্রসার—ইহাতে প্রকাশিত বিদ্যা ও উদয় ইতি নামধারী নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলাত্মক অফুরন্ত ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাসের কল্যাণে। এ কথা সত্য হইলে দেখিতেছি, সংস্কৃত মাসিকেরও বাঙ্গালা মাসিকের রোগে ধরিয়াছে। বাস্তবিক, আধুনিক পাঠকপাঠিকাগণ এমন গল্পখোর যে কাঁকড়া-অক্ষরে কেন, কিষ্কিন্ধ্যার ভাষায়ই হউক বা কামস্কটকার ভাষায়ই হউক, গল্প পাইলেই তাঁহারা তাহা গলাধঃকরণে ব্যগ্র। যাহা হউক, এ সকল লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া মনস্বী সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সনামা কবির স্পর্দ্ধাবাক্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিবেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

দয়ার মূল্য

[শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম-এ, এম্-আর-এ-এস, এফ্-আর-এইচ-এস, ইত্যাদি]

ভায়া, আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল আমাদের আফিসে সংবাদ আসে যে সহরের——গলির—নং বাড়ীতে গোলাপ নাম্নী একজন বারবিলাসিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তদন্তের ফলে সংবাদের সত্যতা প্রকাশ পায়। নাওয়ারিস মালামাল হেফাজতে লওয়ার সময় নিম্নলিখিত পত্রখানি আমার হস্তগত হয়। তুমি পড়িয়া দেখিও।

শ্রীঅতুলচন্দ্র সোম
পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার
——সার্কেল, কলিকাতা।

"আমার নাম গোলাপ নয়। আমি কলিকাতা সহরতলির বেশ্যা, কিন্তু আমার নাম গোলাপ নয়। আমি ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে; ব্রাহ্মণের স্ত্রী। দুই বৎসর—সে যে কত বড় সুদীর্ঘ দুই বৎসর—তাহা আমি ছাড়া আর কেহ জানে না। দুই বৎসর বেশ্যাবৃত্তির পর আমার এ অহঙ্কার সাজে না; কিন্তু এই কথাগুলি না বলিতে পারিলে আমার জীবনের এই ক্ষুদ্র বিবরণ লিখিবার উদ্দেশ্য সফল হইবে না; তাই লিখিতে হইল। আমার নাম গোলাপ নয়। আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা—ব্রাহ্মণের স্ত্রী। আমার নাম—; নাম লিখিবার প্রয়োজন আছে কি? বেশ্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, সব চেয়ে ঘৃণ্য সত্যটাকে বলিতে যখন কুণ্ঠিত হইলাম না, তখন আমার জন্ম ও বিবাহের এ খবর-টুকু কি বিশ্বাস্য নয়? মরিবার দিন আজ মিথ্যা লিখিতে বসি নাই।

কলিকাতায় কেন আসিলাম, তাহার পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম, আজ আমার মনে সে ইতিহাস লিখিবার মত শক্তি নাই। সে অনেক কথা, সে সব লিখিতে গেলে চোখের জলে দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আসে।

রুগ্ন স্বামীকে লইয়া যখন কলিকাতায় চিকিৎসা করাইতে আসিলাম, তখনো আমরা একেবারে রিক্ত হস্ত হই নাই। কলিকাতায় বাড়ীভাড়া ও ডাক্তারের ব্যয়, অল্প-বেতনভোগী স্কুল-মাষ্টারের সঞ্চিত অর্থ দুই-তিন মাসে শুষিয়া লইল। রোগশয্যাশায়িত, সহায়-হীন, কপর্দ্দকশূন্য স্বামীর চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয় আমি না যোগাইলে, তাঁহাকে নিজের হাতে মরণের মুখে ঠেলিয়া দিতে হইত, ইহা কাহাকে বুঝাইব? আজ দুই বৎসর যে প্রশ্ন প্রতি-দিন প্রতিক্ষণে আমার মনে জাগিয়া আছে, তাহার উত্তর কেহ দিল না। স্থির করিয়াছি ওপারে গিয়া,—জীবনের সব প্রহেলিকা, সকল সমস্যার সৃষ্টি যিনি করিয়াছেন,—তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিব যে, তিনি দারিদ্র্যের মত এত বড় পাপের সৃষ্টি কেন করিয়াছিলেন। স্থির করিয়াছি, এবার উত্তর না লইয়া ছাড়িব না।

শুনিয়াছিলাম, সতী সাবিত্রী সাধনার বলে স্বামীর জীবন যমরাজের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়াছিল; কিন্তু আমার মত করিয়া কেহ বুঝি স্বামীর জীবনের জন্য মরণের সঙ্গে যুঝে নাই। সত্যযুগের যমরাজা বুঝি এত কঠোর, এত নির্ম্মম ছিল না। আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছিলাম,—এতটুকুও রাখি নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা যাহা কঠিন, প্রতিদিন পলে-পলে তাহা বহিয়াছি। সাবিত্রী সতী রহিয়া যাহা পাইল, আমি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সেই সাধনায় সতীত্ব পর্য্যন্ত বলিদান দিয়া তাহা হারাইলাম কেন?

প্রভু আমার, হে আমার নারায়ণ, যে কৈলাসে তুমি গিয়াছ, সেখানে আমি ব্যতীত আর কাহারো তোমার পদসেবার অধিকার নাই। ক্ষমা করিয়া সেখানে তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে কি? আমি যাহা করিয়াছি, হে দেবতা আমার, সে কেবল তোমারই জন্য। তুমি ভুল বুঝিও না। আমি আজ ক্ষমা চাহিব কেবল তোমার কাছে; সংসারের কাছে, সমাজের কাছে, কোন দোষে আমি দোষী নই প্রভু! আমি যাহা সহিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি নাই; তোমার রোগশয্যার অসহ্য যন্ত্রণা আমি কেমন করিয়া বাড়াইব? ধনীর দুয়ারে আমার মত কাঙ্গালিনীর নিত্য কি লাঞ্ছনা, তাহার কেহ খোঁজ রাখে কি? এত বড় একটা সহরে রক্ত-মাংস দিয়া গড়া একটি হৃদয়ও নাই, সহরের বাড়ী ও রাস্তার মত সবই কেবল ইট আর পাথর; দরিদ্রের অশ্রু তাহার উপর রেখামাত্র

আঁকিতে পারে না। রাস্তায় চলিতে-চলিতে পথিকের অশ্লীল ব্যঙ্গ যেন পিশাচের মত আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত। নিত্য সন্ধ্যায় আমার রিক্ত ভিক্ষাঞ্চল অপমানের ভারে এত বড় বোঝা হইয়া উঠিত যে, মনে হইত, সেই বেদনার পেষণে যদি গুঁড়া হইয়া যাইতাম, তাহা হইলে বাঁচিতাম। আমার মত হতভাগিনীকে ব্যথার বিষে জর্জ্জরিত করিয়াও—বাঁচিবার শক্তি দিয়া যে পরিহাস করিল, লোকে তাহাকে কি বলিয়া ডাকে—ভগবান না অদৃষ্ট? কিন্তু আজ আমি যে তাহাকে পরিহাস করিয়া মরিলাম, ইহা সে জানিল কি?

হে আমার স্বামী, তুমি মরিয়া আজ বাঁচিয়াছ। আমার মত একটা জীবন্ত নরকের সঙ্গে নিত্য বাস তোমার শান্ত শুদ্ধ ব্রহ্মণ্যকে যে পীড়া দিতেছিল, ইহা তুমি বুঝিতে না। কিন্তু আমার যে আর পথ ছিল না প্রভু! তোমার ক্লেশ এতটুকু লাঘব করিতে, তোমার মুখের আহারটুকু যোগাইতে ইহা ছাড়া আমার আর যে পথ ছিল না! আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, সব ভিক্ষা উপেক্ষা করিয়া এই পাষাণ-নগরীর নির্ম্মম সমাজ আমাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল, "ওই তোমার পথ।" সহরের সকল জনকোলাহল অট্টহাসি হাসিয়া নিত্য বলিয়া উঠিত, "ওই তোমার পথ।" যে হাটে দয়া কিনিয়া লইতে হয়, সেখানে সওদা করিয়া মূল্য দিবার জন্য শরীর ছাড়া আমার যে আর কিছুই ছিল না!

তোমার জন্য যাহা দিয়াছি, যাহা হারাইয়াছি, তাহার জন্য আমার মনে আজ এতটুকুও দুঃখের গ্লানি নাই। দেবতার সেবায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া, দেবতার মন্দিরে আমার সকল বলিদান করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। দুঃখ রহিল যে, যে আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল, সে তোমাকে ফিরাইয়া দিল না।

সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইয়া আমি একদিনও একবিন্দু অশ্রু আমার চক্ষু উছলিয়া পড়িতে দিই নাই,—পাছে তোমার অমঙ্গল হয়। সব সহিয়াছি তোমার জন্য। সেই অপমানের কথা, সেই ব্যথার স্মৃতি আজ আমার অসহ্য হইয়াছে। আজ ত তুমি নাই,—আজ আমার বহিবার শক্তি হারাইয়াছি। বাঁচিয়া থাকা আজ আমার কত কঠিন হইয়াছে, তাহা কেহ বুঝিবে না। মৃত্যু আমাকে আজ তোমার স্বরে কি আকুল আহ্বানে ডাকিয়াছে, তাহা আর কেহ শুনিতে পাইবে না। আজ একাকিনী আমি বড় ভয় পাইয়াছি প্রভু! দুই বৎসর তোমার জন্য যাহা নীরবে সহিয়াছি, সেই নরকের স্মৃতিতে আমি আজ শিহরিয়া উঠিতেছি। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার শরীরের মূল্যে দয়া বিকাইবার জন্য যাহারা রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিবে, তাহাদের লালসাতপ্ত অগ্নিমুষ্টি হইতে আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও। হে আমার স্বামী, আজ তোমার মৃত্যু-শীতল হস্ত-স্পর্শে আমার বুকের আগুন নিভাইয়া—আমার দগ্ধ জীবন, আমার এ ব্যর্থতা স্নিগ্ধ কর, সফল কর!

মূর্খ শাস্ত্রকার লিখিয়াছিল—সতীত্ব অমূল্য রত্ন। আজ দুই বৎসর বাজারে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি—তাহার মূল্য এতই অল্প কয়েকখণ্ড রৌপ্যমুদ্রা—যাহা দিয়া একটি রোগীকে মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইয়া আনা যায় না। জীবন-মরণের দেবতা কেহ যদি থাকে, আমাকে বলিয়া দাও, শাস্ত্র কেন মিথ্যা হইল? আমার কত যুগান্তের সাধনালব্ধ নারী-জীবনের এই অমূল্য রত্ন কাড়িয়া লইয়া, তাহার বিনিময়ে একটিমাত্র জীবন আমাকে ফিরাইয়া দিলে না কেন?

আমার স্বামী, হে আমার অন্তর্যামী দেবতা, বুঝি বা তোমাকে কিছু লুকাইতে পারি নাই। তুমি বুঝি বা সব বুঝিয়াছিলে, সব জানিয়াছিলে। লুকাইয়া আমি যে ব্যথা সহিতাম, তুমি বুঝি বা সে বেদনার বোঝা নিজের বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলে। তোমার দৃষ্টির অন্তরালে আমি যে অপমান, যে লজ্জা গোপন রাখিয়া, তোমাকে মিথ্যা কথায় প্রবঞ্চনায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা বুঝি বা বৃথা হইয়াছে। এই কলিকাতা সহরে দাসীবৃত্তির উপার্জ্জনে, বাড়ীভাড়া চিকিৎসকের প্রণামী ও রোগীর পথ্যের ব্যয়-সঙ্কুলান যে হয় না, তাহা তুমি জানিতে। আমার এই প্রতারণার করুণ বেদনার আঘাত হইতে তোমাকে বুঝি বা আমি রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমার মুখে যে পথ্যটুকু ধরিতাম, তোমার মুখরোচক যে আঙ্গুর-বেদানাটুকু ছাড়াইয়া দিতাম, কত মূল্য দিয়া তাহা কিনিয়াছি, তাহা তোমার কাছে বুঝি লুকাইতে পারিলাম না।

সেই ভাল। তুমি যে জানিয়া গিয়াছ যে সম্বলহীনা, পথহারা, একাকিনী আমি—আমি তোমার স্ত্রী; সতী হই, অসতী হই, তোমার স্ত্রী আমি কেবল তোমার মুখ চাহিয়া, তোমাকে আমার ভালবাসার চরম জানিয়া, তোমাকে আমার

সকল সাধনার পরম জানিয়া, কত দুঃখে, কত অভাবে কেবল তোমারি জন্য তোমারি ধন সংসারের হাটে বিকাইয়াছি। তুমি যে ইহা জানিয়া গিয়াছ, ইহা আমার সান্ত্বনা প্রভু!

তাই বুঝি পরপারের যাত্রার আরম্ভে আজ আমাকে কাছে ডাকিয়া নিলে। কত যত্নে, কত সোহাগে রোগ-শীর্ণ, দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে সিঁথিতে আমার শেষ যে সিন্দূর-রেখা আঁকিয়া দিয়াছ, তাহা আমি মুছিব না। নিজের হাতে আমার ললাটে যে ক্ষমার চিহ্ন লিখিয়াছ, আমি তাহা গর্ব্বে ধারণ করিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মরণের অভিসার-পথে চলিলাম। আমার দুই বৎসরব্যাপি এই দুঃসহ বেদনার ক্ষতে তুমি আপন হাতে যে শান্তি-প্রলেপ দিয়াছ, তাহাতে আমি সব ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছি।

* * * * *

আজ মরণের দিনে এই কথাগুলি আমি যে লিখিতেছি তাহা সমাজকে দুষিবার জন্য নহে। সমাজ যাহা চির দিন তাহাই থাকিবে। আমার মত একজন অভাগিনীর দুঃখ ও মৃত্যুর কাহিনী তাহার কোনও পরিবর্ত্তন করিবে না। আজ সমাজের কাছে শেষ বার দয়া ভিক্ষা করিব। তোমরা আমার ৺স্বামীর ও আমার সৎকার করিও। মনে করিও জীবনে যাহারা কৃপা জানে নাই, তাহারা এই শেষ-বার তোমাদের কাছে করুণার ভিখারী। একটিবার ভাবিয়া দেখিও, আমার আর কোনও পথ ছিল না, আর কোনও উপায় ছিল না। শেষবার এই দয়াটুকু তোমাদের কাছে আমরা ভিক্ষা চাই, যেন আমাদের ব্রাহ্মণোচিত সৎকার হয়।"

পুঃ—মৃতার বাক্সে প্রাপ্ত কুড়িটি টাকা দিয়া স্বামী-স্ত্রীর ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করাইয়াছি। চিরজীবন যে দয়ায় বঞ্চিত ছিল, মরণের পরও অর্থবিনা কেহ তাহাকে দয়া দেখাইতে প্রস্তুত হয় নাই। ইতি শ্রীঅতুলচন্দ্র সোম, পুলিস্ ইন্‌সপেক্টর।

সেই দেশ

[রাণী শ্রীসরোজিনী দেবী]

কোথা মম সেই সুখের আলয়
  কোন্ পথে যাব বল?
খুঁজিতে-খুঁজিতে হলাম যে সারা
  দিনমণি ডুবে গেল।
সুপথ হারায়ে বিপথে পড়িয়ে
  ভ্রমি পাগলিনী পারা,
ঘোরা কাদম্বিনী ঘিরেছে অম্বর
  অন্ধকারে দিশেহারা;
আজনম দুঃখে জীর্ণ কলেবর
  শ্রান্ত চরণ এবে,
পারি না যে দেব সে পথে যাইতে
  ভুলিয়াছি এসে ভবে!

আর কি যাইব, আবার দেখিব—
  সুখময় সেই স্থান?
বড়ই সুন্দর সে দেশ আমার
  জুড়ায় নয়ন-প্রাণ।
শোভার তুলনা নাহিক কোথায়
  প্রকৃতির প্রিয় ভূমি,
হিংসা-দ্বেষ-হীন পূত সেই দেশ
  ভক্তি-নত শিরে নমি।
ভুলায়ে অবোধে কেন নির্ব্বাসন,—
  কি দোষ করেছি আমি?
ক্ষমি অপরাধ, দেখাও সে দেশ
  দয়াল জগত-স্বামী॥

কৃষ্ণদেউলের যাত্রী

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

(১)

অরুণ স্তম্ভ

সাগরপারে সে ঘুমন্ত দেবপুরী আজ আপন স্তব্ধতায় আপনি আত্মহারা! একদিকে সমুদ্রের হু-হু, একদিকে মরু-ভূমির ধূ-ধু, একদিকে চন্দ্রভাগার কুলু-কুলু, আর-একদিকে দূর-দিগন্তে ক্ষীণ বনান্তরেখা এবং মাথার উপর নির্ম্মল নীলিমার অসীম বর্ণোচ্ছ্বাস! কৃষ্ণদেউলের সুমুখে প্রকৃতি তাঁর ভাঁড়ারঘর একেবারে উজাড় করিয়া বসিয়াছেন—এ কি সুষমার মেলা, এ কি অপূর্ব্বতার স্বর্গ! বসন্ত, অতীতের মায়া ভুলিয়া, আজও এখান হইতে বিদায় লইতে পারে নাই—তার গুঞ্জনগান, তার কোমল কান্তি, তার মধুর স্পর্শ এখানে অনন্ত! কিন্তু চিরবসন্তের প্রচুর রসধারা পান করিয়াও কণারকের কৃষ্ণ-দেউল অনন্ত-যৌবন হইতে পারে নাই;—সে যেন মধুমাসের একটি কুসুম, হেলায় খসিয়া আজ পথের ধূলায় পড়িয়া আছে!... ... ...

নিবিড় তিমিরের তরল প্রাচীরের পর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া, তীর্থযাত্রীর গো-যান মন্থরগমনে চলিয়াছে। পথের এ-পাশে জঙ্গল, ও পাশে জঙ্গল,—গাড়ীর ক্ষুদ্র দীপের কম্পমান পাণ্ডুর শিখায় তাহারা ঈষৎ-উজ্জ্বল; পথের দু'ধার হইতে পল্লবঘন তরুশ্রেণী সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, নীরবে নিভৃতে পরস্পরের মুখচুম্বন করিতেছে; শকট-চক্রের কর্কশ ঘর্ঘরশব্দে অন্ধকার যেন চকিত ও সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিতেছে! ... ... আঁধার আর আঁধার আর আঁধার—আরো কত দূরে এ আঁধারের অবসান? ভীত যাত্রীরা আড়ষ্ট হইয়া পরস্পরকে আঁকড়িয়া—আর-একটু ভিতরে সরিয়া বসিলেন।

এই যে, গ্রাম! ... ... আলো, হাসি, জনতা! দৃষ্টিব্যাপী সে তিমির-পাহাড়ের সারি পিছনে পড়িয়াছে,

সামনে এখন আশা-ভরা নূতন পথ, নূতন ছবি, নূতন দেশ!... .. ...দু-ধারে ঢালু খড়ো চালের এবড়ো-খেবড়ো মেটে ঘর, দাওয়ার উপরে কোথাও বিকি-কিনির জিনিষ সাজানো, কোথাও বাক্যবীর উড়িয়ারা গালি-যুদ্ধে মত্ত, কোথাও কাঠের করতাল বাজাইয়া রাত-ভিখারী গান গায়িতেছে, কোথাও কতকগুলো দিগম্বর, পেট-মোটা ছেলে কোমরে পয়সার হার পরিয়া হাসিয়া-নাচিয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে-মাঝে হাঁটুর-উপর-কাপড়-তোলা, হলুদমাখা, উড়িয়া-রূপসীরা নাকের বেঢপ বেসর দোলাইয়া সকৌতুক চোখে গাড়ীর পানে কটাক্ষ-বাণ বর্ষণ করিতেছে! কিন্তু চলন্ত গাড়ীর মধ্যে "Bar-at-Law"র জ্বলন্ত চশমা ও চুরোট দেখিয়া লজ্জিত কটাক্ষে তাহারা সসঙ্কোচে পিছন ফিরিয়া বসিতেছে।

গ্রাম পিছনে পড়িল। গরুর গলায় ঘণ্টা বাজাইয়া তীর্থযাত্রীর গাড়ী কচ্ছপ-গতিতে সমান চলিয়াছে। পথের উপর অস্থি-চর্ম্মসার গেঁয়ো কুকুরগুলো ঘুমাইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। ঘণ্টার শব্দে জাগিয়া দু-একটা কুকুর অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ল্যাজ গুটাইয়া পথ হইতে সরিয়া গেল; কোন-কোনটা একেবারে নির্জ্জীবের মত; তারা কোনক্রমে মুখ তুলিয়া কাতর করুণ-নেত্রে গাড়োয়ানের দিকে তাকাইল মাত্র। তারা যেন ধুঁকিতে-ধুঁকিতে গাড়োয়ানকে মিনতি করিয়া বলিতেছিল, "হে মহাপুরুষ, শরীর বড়ই খারাপ, একটু পাশ কাটিয়ে গেলে বাধিত হব। দয়া করে আর গাড়ী-চাপাটা দেবেন না!"

ঝপাং করিয়া শব্দ হইল—ব্যাপার কি? মুখ বাড়াইয়া দেখা গেল, গরুরা প্রায় সাঁতার দিতে-দিতে গাড়ী টানিতেছে। বর্ষার ময়লা জলে পথঘাট সব জলে-জলাকার,—পথের দু'ধারে খালি কলাগাছের সবুজ পতাকার সারি!
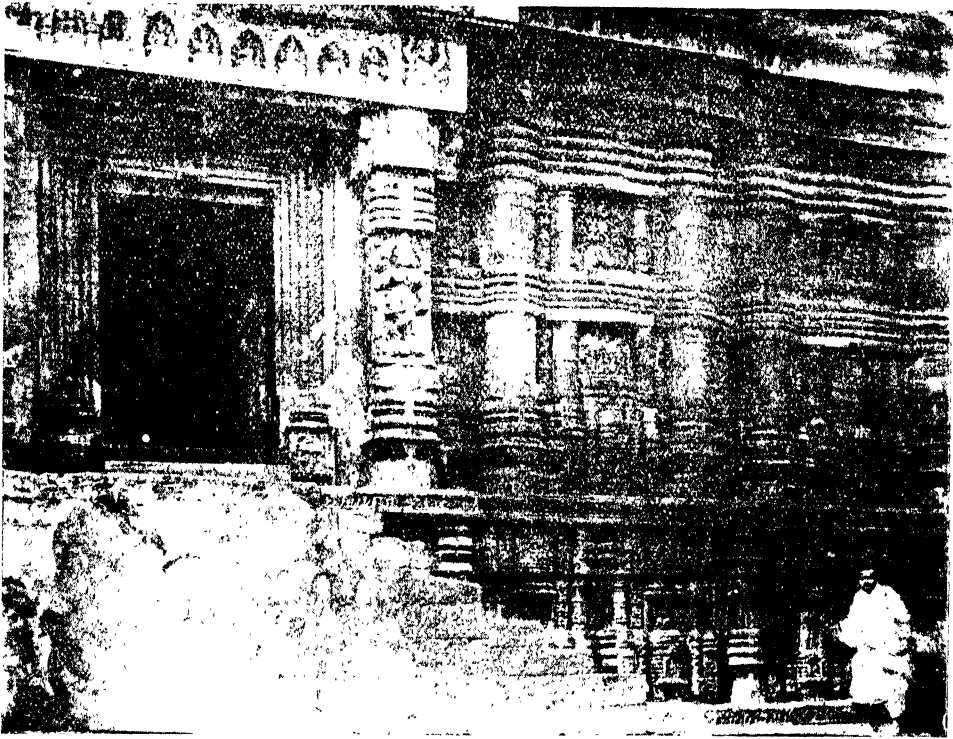
পুরীর মন্দিরের ভোগমণ্ডপ (এই কারুকার্য্যের নিদর্শনটী কণারক হইতে জগন্নাথের মন্দিরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল)

মিঃ ভড় হচ্ছেন, গৃহপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির একটি প্রথম-শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শুভ্র শয্যায় ভোজনতৃপ্ত উদর এলাইয়া দিবা ও নৈশ নিদ্রার চরম আয়েস ছাড়িয়া কণারকে আসিতে তাঁর পরম আপত্তি ছিল,—কিন্তু শ্রীমান হরিদাস গঙ্গো যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, "ভালয়-ভালয় না এলে তাঁকে 'চ্যাং-দোলা' করে তুলে আনা হবে";

তখন প্রতিজ্ঞাকারীর বিপুল বপু এবং নিজের ক্ষুদ্র দেহের দিকে ম্রিয়মান দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, "এ-ক্ষেত্রে সুড়্সুড়্ করে গাড়ীতে গিয়ে ওঠাই হচ্ছে সব-চেয়ে নিরাপদ।" কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া যখন দেখিলেন যে জলে-স্থলে-আঁধারে—সর্ব্বত্রই এই বিষম গাড়ীর অবাধ গতি, তখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া মিঃ ভড় ভয়ানক ভড়্কাইয়া গেলেন। এবং ঘন-ঘন মাথা নাড়িয়া বার'বার 'ফাটি-ফাটি' করিতেছিল। এমন অবস্থায় আর বেশী ক্ষণ গাড়ীতে থাকিলে, হয় মিঃ ভড়্ তাঁর ভুঁড়ির চাপে পতঙ্গবৎ আমার ক্ষীণ অঙ্গ পিষিয়া ফেলিবেন, নয় আমার অত্যধিক সূক্ষ্মদেহের খোঁচায় তাঁহার এই যত্নবর্দ্ধিত ভুঁড়ি-রত্নটি বিলকুল ফাঁসিয়া যাইবে। ও-গাড়ীতে দীর্ঘবপু হরিদাস ও হ্রস্বতনু নরেন্দ্রবাবুর ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল! কেন না, তাঁহাদের দু'জনেরই উদরদেশের পরিমাণ (শ্রীভগবানের ইচ্ছায়) মিঃ
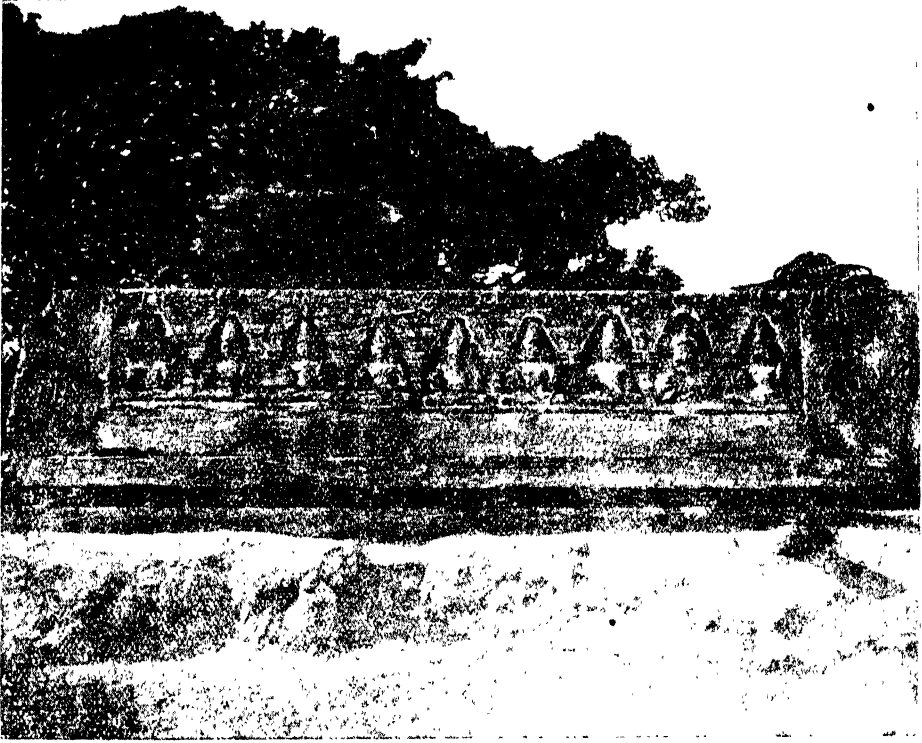
নবগ্রহ শিলা

আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, "আনাড়ির হস্তগত হয়ে প্রাণটা বুঝি মাঠে-মারা গেল!"

কলা-বাগানের অন্তরালেই চন্দ্রালোকদীপ্ত প্রশান্ত প্রান্তর। এক-একখানি গাড়ীতে আমরা দু'জন করিয়া আরোহী। জায়গা এতই কম যে, পরস্পরকে প্রায় আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া থাকিতে হইয়াছিল। আমি আর মিঃ ভড় ছিলাম এক গাড়ীতে। মিঃ ভড়ের একেই ত একটু নেয়াপাতি-জাতীয় ভুঁড়ি ছিল; পুরীতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসুর দৈনিক অতিথি-সৎকারের বিপুল আয়োজনে সেই ভুঁড়ি লম্বায়-চওড়ায় আরও বিশাল হইয়া ভড়ের চাইতেও কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের উদরে-উদরে collisionর পরিণাম বলা শক্ত; কারণ, এখানে "কে হারে, কে জেতে—দু'জনে সমান!"

অতএব, আমি আর হরিদাস গাড়ী হইতে চালাকের মত টপাটপ্ নামিয়া পড়িয়া এই বিষম 'ভুঁড়ি-সমস্যা'র সুন্দর সমাধান করিলাম।

আমাদিগকে 'শ্রীচরণ-ভরসা' করিতে দেখিয়া নরেন্দ্রবাবু ও মিঃ ভড় তার স্বরে সপ্রমাণ করিতে বসিলেন যে, "সাপে কামড়ালে মানুষ নিশ্চয়ই বাঁচে না। হেঁটে যাবেন না—সাপে কামড়াবে।"

মনে মনে বলিলাম :—

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ !"

সুতরাং, এখন বন্ধুদের কোনই মানা না মানিয়া পাগল প্রাণ অবলম্বন করিল—

"আঁকাবাঁকা রাঙ্গা মাটির লেখা
ঘরছাড়া ঐ নানা দেশের পথ।"

সেকালে স্পেন প্রভৃতি দেশে Inquisitionএ যন্ত্রণা দিবার যে সব বেয়াড়া যন্ত্র ছিল ;—আমার বিবেচনায়, এ-দেশে মানুষ-চড়া গরুর গাড়ী সেই শ্রেণীরই স্বদেশী যন্ত্রবিশেষ। বন্ধুদ্বয়ের সহানুভূতিকে ধন্যবাদ,—এই হাড়ভাঙ্গা গাড়ীতে তাঁরা টানা সতেরো ঘণ্টা কাল বসিয়া-বসিয়া নিরানন্দ নৃত্য করিয়াছিলেন! রাতে সাপের এবং দিনে রোদের ভয়! নরেন্দ্রবাবু গাড়ী থেকে নামেন নাই, পাছে রোদে তাঁর ননীর মত দেহ গলিয়া যায়! মিঃ ভড় যদিও নিজের দেহকে ননী বলিয়া সন্দেহ করেন না,—তবু তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, পাছে তাঁহার উত্তমাঙ্গের ক্রমবর্দ্ধমান 'টাক'টি সূর্য্যদেবের অপার মহিমায় অচিরাৎ কেশলেশহীন হইয়া কণারকের মরুভূমির একটি miniatureএ পরিণত হয়!

(২)

ধূ ধূ ধূ-ধূ মাঠ—এধার-ওধার চোখ চলে না। চারিদিকে বালু, সুধু বালু! সে অসীম বালুকাবিতানের মধ্যে পড়িয়া আকাশও সীমাহারা!

কণারকের দ্বারপথ

থালি পায়ে দুই বন্ধুতে অগ্রসর হইলাম, সুমুখের সেই অজানা রূপ রাজ্যের দিকে! আকাশ-মেদিনীতে এখন সৌন্দর্য্যের বিকিকিনি চলিতেছে, প্রকৃতি এখন মুখের ওড়না খুলিয়া দিয়াছেন—এ-সময়ে চোখ মুদিয়া গাড়ীতে পড়িয়া থাকিয়া এমন মাহেন্দ্রক্ষণকে কি হেলায় হারানো যায়? আমরা নগরের জীব,—ইট-কাঠের মধ্যে দিবারাত্রি বন্দীর মত বদ্ধ থাকিয়া, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের শক্তি এতটা ভোঁতা হইয়া গিয়াছে যে, প্রকৃতিকে যখন স্বরূপে হাতের কাছটিতে পাই, তখনও তাঁহার যথার্থ প্রাণের রসটি আমরা আদোপেই উপভোগ করিতে পারি না। সব জায়গাতেই আমরা ক্ষুদ্র দেহের আরাম খুঁজি বলিয়া, সব চেয়ে বড় যে মনের আরাম সেটুকু আমাদের অনুভূতির ভিতরে আসে না। প্রকৃতিকে পূরোপূরি গ্রহণ করিতে গেলে নিজেকেও কিছু-কিছু ত্যাগস্বীকার করিতে হয়।
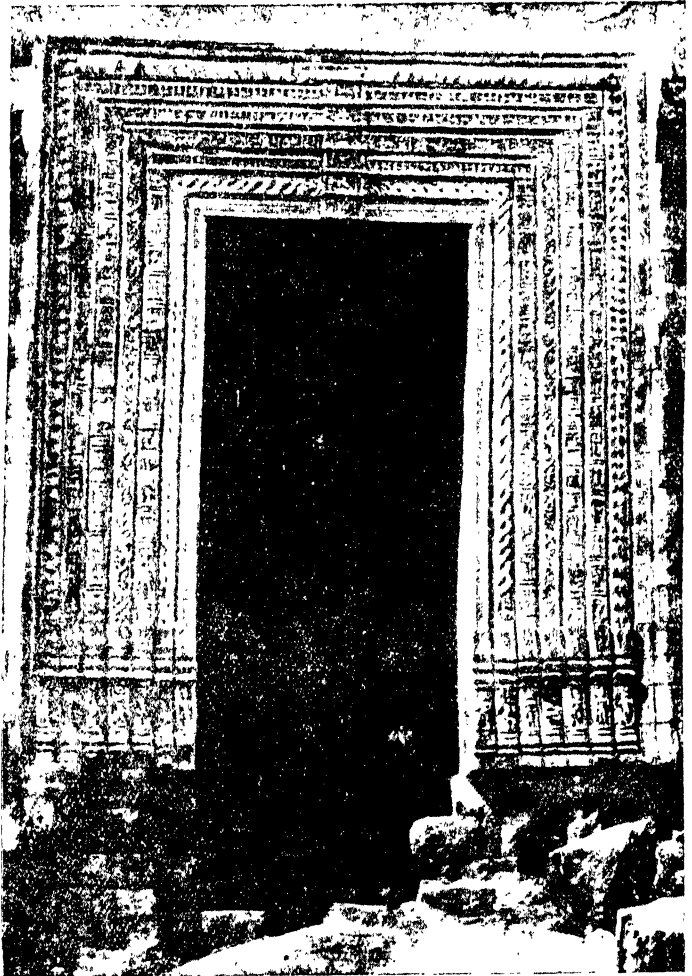
চারিদিক কি নিরালা, প্রান্তর কি নির্জ্জন! খুব দূরে—দূরে, দু-একটা তরুকুঞ্জ দাঁড়াইয়া আছে,—যেন মরুভূমির সোণার স্বপনে বিভোর! মাঝে মাঝে আবছায়ার মত এক-

একটা কালো-কুচ্‌কুচে ঝোপ যেন ওৎ পাতিয়া, গুঁড়ি মারিয়া আছে; সে দিকে চাহিলেই প্রাণের ভিতরটা কেমন যেন ছাঁৎ-ছাঁৎ করিতে থাকে! কোথাও বা কতকগুলো ফণীমনসার জঙ্গল একসঙ্গে দঙ্গল বাঁধিয়া শত-শত গোখুরার মত ফণা তুলিয়া আছে;—আমরা যেন ঠাকুরমায়ের রূপ-কথার রাজ্যের অজ্ঞাত যাত্রী,—আর এরা সব সেই পথ আগুলিয়া দলে-দলে সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত।

দিগন্তনিলীন বালুকা-শয়নে বিগলিত চন্দ্রকরধারা! সে যে কি অপূর্ব্ব, বলিয়া তা বুঝান যায় না। প্রকৃতি যেন তাঁহার সাঁচ্চা বসনখানি পৃথিবী ঢাকিয়া মেলিয়া দিয়াছেন—দ্রৌপদীর শাটির মত তাহা বিশাল,—যত দূরে চাই, যত আগাইয়া যাই, তাহার সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই!

কৃষ্ণদেউল। জগমোহনের ধ্বংসাবশেষ

পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, আলো-আঁধারের সাদা-কালো রঙ্গে-আঁকা সারি-বাঁধা একদল নারিকেল তরু, সেই গম্ভীর নির্জ্জনতায় নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,—যেন কোন পরিত্যক্ত ভগ্নপুরীর ছাদশূন্য স্তম্ভশ্রেণীর মত! আর, তাহাদেরই পিছনে, পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ভাঙ্গা মেঘে রূপের ঢেউ তুলিয়া পূর্ণশশী হাসিয়া বিস্নাকুল!

আমাকে গানে পাইয়া বসিল। বন্ধুও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। এমন সময়ে এমন জায়গায় অন্তরঙ্গ সঙ্গে থাকিলে অন্তর-অঙ্গ একসঙ্গে যে কতটা আনন্দিত হইয়া উঠে, সে দিন তাহা বুঝিয়াছিলাম। সেই বিপুল নীলিমার তলায়, সেই পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে, সেই ছায়ালোকবিচিত্র জনশূন্য প্রান্তরের তন্দ্রা-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমরা গানের পর গান ধরিলাম—কখনো রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সঙ্গীত, কখনো দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ সঙ্গীত, কখনো নিধু গুপ্তের প্রেম-সঙ্গীত এবং কখনো-বা রামপ্রসাদের ভক্তি-সঙ্গীত! সে কি মুক্তি—সে কি স্বাধীনতা! সুরের তরঙ্গে আমাদের প্রাণ ছাপাইয়া মাঠ ভরিয়া সে সঙ্গীত যেন নীলাম্বরের নির্ম্মলতাকে স্পর্শ করিতে শূন্যের দিকে উঠিতে চাহিতেছিল। সে ত ওস্তাদের গান নয়—সে যে আনন্দের সঙ্গীত! মনে হইল, এ নিখিল বিশ্ব যেন সেই প্রাণের গানের শরীরী বিকাশ!

এই জ্যোৎস্নার মধ্যে একটি সুর আছে,—আমার কাছে জ্যোৎস্না সুরময়ী। দেহের কাণে এ সুর শোনা যায় না,—প্রাণের কাণে এর আভাস পাওয়া যায়। হাল্কা মেঘের ধারে ধারে সে সুর কড়িতে উঠে, অপার প্রান্তরে সে কোমলে নামে, ঝিল্‌মিলে গাছের পাতায়-পাতায় তার মূর্চ্ছনা, সমুদ্রের তটচুম্বী তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার 'আরোহী' ও 'অবরোহী'! আকাশে চাঁদকে উঠিতে দেখিলেই তাই আমার মনে হয়, নিখিল বিশ্বের মর্ম্মান্তর যেন সুরের মোহন লীলায় ভরপুর হইয়া উঠিতেছে। সে সুর আমি চোখে দেখি, কাণে শুনি, প্রাণে অনুভব করি—সে সুররূপিনী, বিশ্বপ্লাবিনী জ্যোৎস্না আমাকে রূপের মদে মাতাল করিয়া দেয়।

* * * *

যেখানে শৈলবৎ বালিয়াড়ির উচ্চ স্তূপ আপন বালু-গাত্রে, খানিক কালো খানিক আলো মাখিয়া, ধবল সিকতার জ্যোৎস্না-শয্যায় কৃষ্ণচ্ছায়া ফেলিয়া নীরবে নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমাদের গো-যানগুলি সেইখানে আসিয়া থামিল।

এখানে নিম্নভূমিতে বাদল-ধারা নামিয়া একটি ছোট পুষ্করিণীর সৃষ্টি করিয়াছিল। চন্দ্রকরোজ্জ্বল নীলাম্বরের এক-টুকরা ভাঙ্গিয়া সেই জলে পড়িয়া থর-থর কাঁপিতেছিল—বালির 'ফ্রেমে'-বাঁধানো ঠিক-একখানি জীবন্ত ছবির মত।

এরই মধ্যে শ্রীমান হরিদাসের পথের নেশা কাটিয়া যাওয়াতে, পদযুগলের ব্যবহার বন্ধ করিয়া তিনি গাড়ীর মধ্যে গুঁতোগুঁতির দ্বারা একটুখানি আশ্রয় যোগাড় করিয়া লইয়াছিলেন। ততক্ষণে গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনির তালে-তালে, গাড়ীর ভিতর হইতে বন্ধুগণের নাসায় চমৎকার 'কন্‌সার্ট' বাজনা সুরু হইয়া গিয়াছে! আমার তখনো নূতনত্বের

কৃষ্ণ-দউল। জগমোহনের একদিকের কারুকার্য্য

বিস্ময় ঘুচে নাই,—পথ তখনো আমাকে ডাকিতেছে। সুধু কি পথের ডাক? পরীস্থানের মত বালিয়াড়ির ঐ শিখর ডাকিতেছে, 'আয় আয়'; জ্যোৎস্নার ফুলঝুরি-ঝরানো ঐ বালু প্রান্তরের অসীমতা ডাকিতেছে, 'আয় আয়'; আকাশ-বাতাস-আঁধার-আলো সবাই ডাকিতেছে, 'আয় আয়'! "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে!"—কিন্তু, সেই আনন্দ-গানের ছন্দ ও তাল কাটিয়া শূন্যে কোথায় কাতর চাতকের তৃষিত কণ্ঠে হঠাৎ ধ্বনিয়া উঠিল, "ফটিক জল! ফটিক জল! ফটিক জল!" হে চাতক, আজিকার এই বিশ্বপ্লাবী চন্দ্রকরধারাও কি তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারিল না? স্তব্ধ হও, রে অতৃপ্ত!

বালুকার উপরে দীর্ঘ-দীর্ঘ পদক্ষেপ করিয়া, আপাদ-মস্তক কাপড়-মুড়ি দিয়া, কে-একজন পথ পার হইয়া চলিয়া গেল—নীরবে, নীরবে; গভীর রজনীর মূর্ত্তিমান রহস্যের মত। ধীরে-ধীরে সে মরুভূমির শূন্যতার মধ্যে একটা চলন্ত ছায়ার মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল; আমার নিমেষহারা নেত্র চাহিয়া রহিল, সেই নিঝুম রাতের নীরব পথিকের পানে।... ...

বালুকার উপরে দেহ এলাইয়া দিলাম।

* * * *

ভোর হয়-হয়। গাড়ী আবার থামিল।

সুমুখে—প্রথমেই চোখে পড়িল, সামনের দিকে হেলিয়া-

মন্দির গাত্রস্থ নাগনাগিনী প্রভৃতির মূর্ত্তি
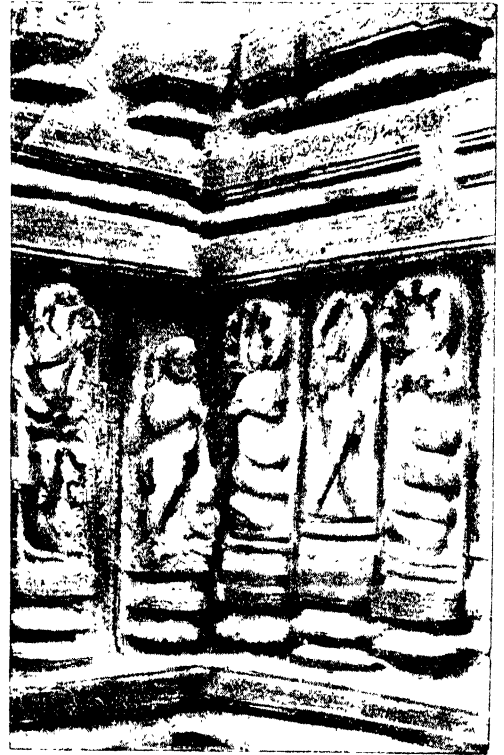
বাঁকিয়া-পড়া একটিমাত্র অস্পষ্ট নারিকেল গাছ। তার নীচেই কালির মত কালো বনজঙ্গলে ঢাকা একখানি ছোট গ্রাম,—ঘুম-পাড়ানিয়া মাসী ঝিল্লী তানে এখনো সেখানে বসিয়া ঘুমের সুর ধরিয়া আছেন। গ্রামের নীচেই 'নেয়াখেয়া' নদীর শীর্ণ জলধারা, নানা পশু-পক্ষীর পদচিহ্ন আঁকা সৈকতের মধ্য দিয়া প্রকৃতির হাতের সাধের এক

তারাটির মত গানের তানে উছলিয়া-উছলিয়া বহিয়া যাইতেছে।

গ্রামের পিছন হইতে বহুদূরের দিগ্বলয়-রেখায় গিরি-শ্রেণীর মত কৃষ্ণ মেঘের শ্রেণী ধীরে-ধীরে জাগিয়া
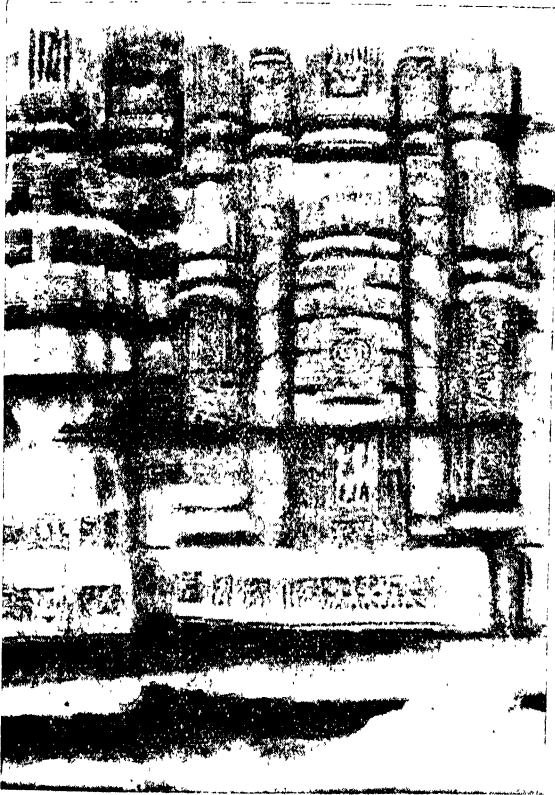
কৃষ্ণদেউল। জগমোহনের অপর দিকের কারুকার্য্য

উঠিতেছে। মেঘমালার উপরে নীল, বেগুনী ও কমলা-লেবুর রঙ্গে কোন্ অদৃশ্য পটুয়া একমনে আকাশ-পটে রঙ্গিন ভোরের ছবি আঁকিতেছে।

সেই তরল আঁধার গায়ে মাখিয়া তিনটা জেলের মূর্ত্তি স্থিরভাবে, নদীর হাঁটুভোর জলে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—যেন চিত্রলিখিত! রাজহাঁসের মত প্রকাণ্ড কি-একটা পাখী বেগে সাঁতার দিতে-দিতে নদীর মধ্যে একটা সাদা চরের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তার পর—নিস্তব্ধ প্রাতঃসন্ধ্যার সেই শান্ত ছায়ালোক-লীলার মাঝে, আস্তে-আস্তে অল্পে-অল্পে গোলাপরাঙ্গা প্রভাতের রক্তপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। গাছে-গাছে পাখীদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল।

নদীর ও-পারে আবার বিস্তীর্ণ বালুকার দেশ। সেই-খানে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে দেখিলাম, অনেক মাইল তফাতে, মরুভূমির শেষপ্রান্তে, বনশ্যামল ভূমির উপরে, সূর্য্য-দেবের কৃষ্ণদেউলের উন্নত ললাট, প্রভাত-ভানুর কনক-কিরণপাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

৩

কৃষ্ণদেউলের পবিত্র ছায়া সেই দিশাহারা তৃষাভরা মরু-ভূমিকে রূপে-রসে মনোহরা করিয়া তুলিয়াছে।

এখানে অতীত স্মৃতির বেদনাব্যথিত ঘুঘুর কণ্ঠ, তরুকুঞ্জের অন্তরাল হইতে করুণ আর্ত্তস্বরে পথিকের মনকে বিষণ্ণ করিয়া দেয়; বনে-বনে, গাছে-গাছে, ডালে-ডালে, দুঃখপাগল পবন রহিয়া-রহিয়া ছুটিয়া মরে,—শুক্নো পাতা উড়াইয়া, পুষ্পিত পল্লব ঝরাইয়া, দীর্ঘশ্বাসে মর্ম্মর-ক্রন্দন তুলিয়া, হা-হা-হা-হা হাহাকারে! দেউলের কালো পাথরের গায়ে রবি-করের সোণার আল্পনা দেখিয়া মনে হয়—বিধবার বুকে যেন শিশুর হাসি! আর, তাহারই চরণচুম্বিত শৈবাল-শ্যাম শিলা-সমাকীর্ণ মরু-জলাভূমি দেখিলে মনে হয়, এই শোক-স্মৃতির তীর্থক্ষেত্রের ছায়ায় আসিয়া, নির্দ্দয় মরু বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াও অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিতেছে!

পাহাড়ের মত ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ, যতদূর চক্ষু চলে খালি ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস! চলিতে চলিতে প্রতি-পদক্ষেপে সূক্ষ্মশিল্পবিচিত্র ভগ্নচূর্ণ ইতস্ততঃ-বিকীর্ণ অসংখ্য তীক্ষ্ণ শিলাখণ্ডে চরণ আহত ও ব্যথিত হইয়া উঠে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়া যতই অগ্রসর হই, মন্দির যেন ততই মহান, তাহার মাথা যেন ততই উচ্চ হইয়া উঠে! কৃষ্ণদেউল দূর হইতে কাহারও মন মোহিত করিতে পারে না—ভক্তের মত যে তার কাছে আসে, ছায়ায় বসে, তাকেই সে মুগ্ধ করিতে পারে। আজ আর তার বাহিরের চটক কিছুই নাই। তার রূপপুষ্পের সমস্ত পাপড়ি কঠিন কালের শীতল স্পর্শে একে-একে খসিয়া পড়িয়াছে;—কণারকের তপ্তবালুকায় আজ যাহা পড়িয়া আছে, তাহা সেই একদা-সুষম কুসুমের অতিদীন, রসহীন, বিমলিন বৃন্তমাত্র!

কণারক, উৎকল শিল্প-ইতিহাসের চতুর্থ ভাগ,—যাহার প্রথম ভাগ হইতেছে খণ্ডগিরি, দ্বিতীয় ভাগ ভুবনেশ্বর ও তৃতীয় ভাগ জগন্নাথের মন্দির; সর্ব্বপ্রথমে আত্মপ্রকাশ করিয়াও খণ্ডগিরির শৈল-শিল্প আজও প্রায় অটুট আছে;

প্রাচীনতর ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথ জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আজও বর্ত্তমান; কিন্তু সকলের চেয়ে আধুনিক হইয়াও কৃষ্ণদেউলের অধিকাংশই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। উড়িষ্যার দ্বাদশবর্ষের রাজস্ব গ্রাস করিয়াও কণারকের অর্ক মন্দিরের প্রাণ দীর্ঘস্থায়ী হইল না।

প্রধানতঃ দুটি কারণে কণারকের পতন হয়। এক—সমুদ্রের সর্ব্ববিনাশী আলিঙ্গন। দুই—"যবনের স্পর্শদোষ"! দ্বিতীয় কারণটি যদি অমূলক প্রবাদ না হয়, তবে দুঃখের কথা! কেন না, আমাদের মত দেবতাদেরও 'স্পর্শদোষে' জাতি যায়? হায়, সঙ্কীর্ণতা!

আমরা দুই আদর্শের মাঝে পড়িয়া কেবলই ইতস্তত করিতেছি। এক—উদার হিন্দুর ধর্ম্ম আদর্শ; আর এক—সংকীর্ণ হিন্দুর সামাজিক আদর্শ। প্রথমে দেখি, রামচন্দ্র চণ্ডালকেও কোলে টানিতেছেন, যবন হরিদাসও হরিনাম করিয়া তরিয়া যাইতেছেন। দ্বিতীয়ে দেখি, অমুকের ছায়া মাড়াইয়া তুমি পতিত, অমুকের হাতে জল খাইয়া আমি জাতিচ্যুত। আমরা দ্বিতীয় আদর্শই গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু প্রথমটিকেও ছাড়ি নাই,—কারণ, কেউ যদি হিন্দুকে নিন্দা করে, তবে প্রথম আদর্শের দৃষ্টান্তে নিন্দাকারীর মুখবন্ধ করিতে পারিব।...... কেন এ ছলনা—কেন এ আত্ম-প্রবঞ্চনা? কেন আমরা অটলভাবে মুক্তপ্রাণে উদারতার, মানবতার এবং পুরুষত্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে পারি না? 'পাছে লোকে কিছু বলে?'—এ ভয় কাপুরুষের ভয়!

কণারকের ইতিহাস বিচিত্র। সে কথা অন্যত্র বলিয়াছি, আর তার পুনরুক্তিতে লাভ নাই। যাঁরা ইতিহাস জানিতে চান, তাঁরা সে লেখাটি পড়িতে পারেন। *

৪

না-জানি তাদের হাতের কি কায়দা ছিল, যাদের হাতের বাটালি এই কঠিন পাষাণেও এমন ফুল-মুকুলের মত কোমল ছবির পর ছবি ক্ষুদিয়া তুলিয়াছে! ভিত থেকে ছাদ অবধি কে-যেন অলঙ্কারের ঘেরাটোপে ঢাকিয়া রাখিয়াছে—এমন ফাঁক কোথাও নাই—যেখানে একটি মাছি বসিতে পারে! এ কি যাদুবিদ্যা?

* ভারতী, ১৩১৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ, ৮৯ পৃষ্ঠা: মৎপ্রণীত "কণারক" নামে প্রবন্ধ দেখুন।

কণারকের প্রধান মন্দির পড়িয়া গিয়াছে—জগমোহনটি এখনো কোনরকমে মরণের মার সহিয়াও খাড়া আছে; নাটমন্দিরেরও উপরাংশ বিলুপ্ত। শোনা যায়, উচ্চতা-গৌরবে প্রধান মন্দিরটি জগন্নাথের মন্দিরকেও খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিল। আবুলফজল লিখিয়াছেন, কৃষ্ণদেউলের চূড়া আগে গগনস্পর্শ করিত!

চন্দ্রভাগা-তটে কঠোর সূর্য্য-তাপে সিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব পিতৃশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তার পর শাম্ব এখানে সূর্য্য-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। উড়িষ্যার ধার্ম্মিক রাজা লাঙ্গুল্য নরসিংহদেবের দ্বারা সেই সূর্য্যমূর্ত্তির উপরে কৃষ্ণদেউল প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্ম্মাণকাল লইয়া যথেষ্ট গোলযোগ আছে। তবে পূর্ব্ব-আলোচনায় (ভারতীতে) আমরা বুঝিয়াছি, ইহার নির্ম্মাণকাল ১২৫০ খৃঃঅব্দের পরে।

কৃষ্ণদেউলের আকারে বেশ একটু নূতনত্ব আছে—দেখিতে ইহাকে প্রকাণ্ড রথের মত। চূড়া, চক্র, সারথি, অরুণ ও অশ্ব—কিছুই বাদ পড়ে নাই। জগমোহনের একদিকে ছিল অধুনাভগ্ন মূলমন্দির; তাহার নিম্নাংশমাত্র এখন বর্ত্তমান—সেখানটি দেখিতে ঠিক মস্ত একটি ইঁদারার মত। তাহারই ভিতরে একদা-পূজিত দেবতাশূন্য রত্নবেদী, আপন পাষাণ-গাত্রে লতা-পাতা-ফুল এবং নর-নারী-জন্তুর কমনীয় চিত্রমালা লইয়া এখনো অটুট আছে। মনে পড়ে, আগ্রা-ফোর্টে দিল্লীশ্বরের এবং ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-কক্ষে বঙ্গেশ্বরের শূন্য সিংহাসন দেখিয়া আমার নেত্র অশ্রু-সজল হইয়া উঠিয়াছিল। আজ বিশ্বেশ্বরের এই ত্যক্ত বেদী দেখিয়াও আমার বুকের ভিতর হইতে কেমন-একটা কান্না জাগিয়া-জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে দিন গিয়াছে,—যে দিন কতশত সান্ত্বনাপ্রার্থী আত্মা এই রত্নবেদী আলিঙ্গন করিয়া প্রাণের কান্না কাঁদিয়াছে, কত তপ্ত হৃদয়ের ঝরঝর অশ্রুধারা এই পাষাণকে অভিষিক্ত করিয়াছে, কত ধূপ-ধূনায় কত ফুলে-মুকুলে কত সুগন্ধ বারিতে দেবতার এই মহিমময় পূজাপীঠ সুবাসিত হইয়া উঠিয়াছে! বেদী-গাত্রে হস্তার্পণ করিতে গেলে দেহ এখনো রোমাঞ্চিত হয়—মনে হয়, দেবতার মূর্ত্তি নাই—কিন্তু তাঁহার আত্মা এখনো ঐ শীতল পাষাণের অণুতে-অণুতে সজাগ হইয়া আছে!

দুপুর বেলা। সূর্য্যমূর্ত্তিহীন রত্নবেদীর উপরে সূর্য্যের

উজ্জ্বল কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে! সে পরিপূর্ণ আলোকে বিষণ্ণ দেবী যেন আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল,—সে আলোকে কণারকের সহস্র-সহস্র মৃত ও ভক্ত শিল্পীর প্রাণের কামনা ও সাধনা যেন ফুটিয়া উঠিল! নির্ব্বাসিত বটে আজ দেব-মূর্ত্তি, পরিত্যক্ত বটে আজ রত্নাসন,—কিন্তু মানুষ যাহা ত্যাগ করিয়াছে, দেবতা আজও সেই প্রিয় নিকেতনের মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই!

ভুবনেশ্বরের ও জগন্নাথের মন্দিরের মত এখানেও চারিদিকে দেড়শো হাত উঁচু ও উনিশ হাত চওড়া প্রস্তর-প্রাচীর ছিল। প্রধান প্রবেশপথের সামনেকার অষ্টকৌণিক অরুণস্তম্ভ এখন স্থানচ্যুত; জগন্নাথের মন্দিরের সুমুখে, আজ সেই অপূর্ব্বগঠন কারুকার্য্যখচিত পথধূলিমলিন স্তম্ভটি নিঃসঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাঙ্গণে আগে আটাশটি ছোট-বড় নানা দেবতার মন্দির ছিল—এখন মাত্র গুটিকয়েকের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সে ভগ্নস্তূপগুলিও দেখিলে বোঝা যায়, গঠন-সৌন্দর্য্যে তাহারাও একসময়ে সকলের নয়নরঞ্জন করিত।

শুনিতে পাই, প্রাচ্য-কলার নামে অনেক প্রাচ্যদেশ-বাসীর গায়ে নাকি থরহরি জ্বরের কাঁপুনি আসে!—এমন-ধারা কাঁপুনিতে যতটা নিজেদের অজ্ঞতা জাহির হয়, ততটা শিল্পজ্ঞান ও দেশহিতৈষিতা প্রকাশ পায় না। কণারক, ভুবনেশ্বর, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, সাঞ্চী, অমরাবতী, ইলোরা, এলিফান্টা, অজন্তা, কারলী, ভরত, শিগিরি, গান্ধার, দিল্লী, আগ্রা, তিব্বত, নেপাল ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানের ও প্রদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন এবং মোগল-শিল্পের সঙ্গে যাঁহাদের সামান্য পরিচয় আছে,—আমার বিশ্বাস তাঁহারা তথাকথিত জ্বরের কাঁপুনির অব্যর্থ ঔষধ লাভ করিবেন। প্রাচ্যকলার কোন নমুনা দেখিয়া নাক সিঁটকাইবার আগে, তাহার আদর্শ কি, সেটা বোঝা দরকার। কেন না সাধারণ ব্যক্তিগত রসজ্ঞানে ভ্রান্তির আশঙ্কা পদে পদে। আদর্শ না বুঝিলে শিল্প-বিবেচনা অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত নানাস্থানের নানাজাতীয় প্রাচ্যশিল্পের প্রধান যা আদর্শ, প্রধান যা ভাব, প্রধান যা শ্রী-ছাঁদ, আধুনিক প্রাচ্য-চিত্রকলায় সাধারণতঃ তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। তা-ছাড়া আধুনিক কলা-পদ্ধতিতে আর যে-সব সামান্য পার্থক্য চোখে পড়ে, সে হচ্ছে যুগধর্ম্মের পার্থক্য, ক্রমোন্নতির পার্থক্য, শিল্পীদের ব্যক্তিগত অঙ্কন-ভঙ্গী বা বিশেষত্বের পার্থক্য।

আগেই বলিয়াছি, কৃষ্ণদেউলের ভিত্ থেকে চূড়া পর্য্যন্ত কারুকার্য্যে রমণীয়। বাটালির রেখায়-রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে,—আনতবৃন্তে পুষ্পপল্লব, সহস্রদল পদ্মদল, অপূর্ব্ব শৃঙ্গাররসলীলা, তন্বঙ্গী রূপসীর ভ্রূভঙ্গীবিলাস, আলিঙ্গনোদ্যত পুরুষের কামুকতা, সশস্ত্র বীরের যুদ্ধযাত্রা, শিকারের উৎকট আনন্দ, শান্তসরল গার্হস্থ্য-জীবন, হিন্দু দেবদেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি, ধ্যানতদ্গত সাধক, দেবপূজানিরত পুরোহিত, গীত-তন্ময় গায়ক, বাদননিপুণ বাদক, যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর প্রভৃতি নরকল্পনায় যাহা-কিছু সম্ভব। কোন-কোন মূর্ত্তির কারুকার্য্য দেখিলে মন একেবারে মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়। এক-একটি মূর্ত্তির মুখে এমন মধুর হাসি, গড়ন এমন সুডৌল, ভঙ্গী এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, তাহাদের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়া কঠিন হইয়া উঠে! কোথাও হাতের আঙ্গুলগুলি শিল্পী কি চমৎকার ক্ষুদিয়াছে,—ঠিক যেন চাঁপার কলি! কোথাও দেহধৃত বসনে ভাঁজের পর ভাঁজের সারি,—ছায়ালোকপাতে তাহা পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। জানি না, এ অতুল শিল্প কোন্ ভারতীয় ফিডিয়াস গড়িয়া তুলিয়াছেন! প্রাণহীন জড় পাষাণও যেন তাঁহার কুহকমন্ত্রে রূপের রসে, ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে এবং জীবনের চঞ্চলতায় স্বরূপ, সরস, ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে; এই বিচিত্রমূর্ত্তিখোদিত পাথরগুলির গায়ে হাত ছোঁয়াইলেও যেন তাহাদের প্রাণের তপ্ততা অনুভব করা যায়,—আমাদের সভ্যতার ব্যঙ্গদৃষ্টিতে আহত হইলে শিল্পীর এ-সকল মানস-প্রতিমা যে-কোন মুহূর্ত্তেই যেন ফুকারিয়া উঠিতে পারে,—'আমরা আছি! আমরা আছি! ওগো, আমরা মৃত নই!'

মনে-মনে বলিলাম, "হে অতীতের অজ্ঞাত ভাস্কর! তোমার এক অক্ষম স্বদেশীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ কর!"—হায়, আজ আমরা শুধু অতীতের শক্তিই হারাই নাই—তাহাকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও হারাইয়াছি!

কৃষ্ণদেউলের শিল্পীরা যে কুসুমকেতুর বিচিত্র মহিমায় একেবারে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, মন্দিরের সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় জ্বলন্ত। এমন কি, মকরকেতনের নিকটে এখানকার প্রধান দেবতা দেব-দেব সূর্য্যদেবের প্রখর জ্যোতিঃও বুঝি পরিম্লান হইয়া গিয়াছে!

প্রাচীন গ্রীক শিল্পের প্রথম অবস্থায়—Pheidias, Ictinos, Praxiteles, Scopas, Bryaxis, Timotheos ও Leochares প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রীক ভাস্করগণ জন্মগ্রহণ করিবার বহুপূর্ব্বে, সে-দেশের প্রাথমিক শিল্পীরা নরমূর্ত্তির চেয়ে জীবজন্তুর মূর্ত্তি-গঠনেই অধিক শক্তি ও নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফ্রান্সের আদিমযুগের শিল্পেও এই ব্যাপার দেখা যায়। কণারকের শিল্পীরাও জীবজন্তু-গঠনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এটি সকল দেশের প্রাচীন শিল্পের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সূর্য্য-মন্দিরে জীবজন্তুর মূর্ত্তির সংখ্যা হয় না। নাদুস্-নুদুস্ হাতীর দল, তেজীয়ান ঘোড়া, বেগবান হরিণ, বলবান সিংহ, হিংস্র বরাহ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ পক্ষী, সপ্তফণ ফণী, মৎস্য, মকর ও কুম্ভীর প্রভৃতি জল-স্থল-আকাশের অনেক জীবের চেহারাই এখানে নজরে পড়িয়া যায়। অনেক মূর্ত্তির স্বাভাবিক ভাবটি বেশ নিপুণতার সহিত ফুটোনো।

প্রধান তিনটি দরজার চারিপাশে ও প্রতি কার্ণিশের থাকে-থাকে, সূক্ষ্ম শিল্পের যে কারিকরি এখনো অটুট আছে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে রাস্কিনের হাত হইতেও কলম খসিয়া পড়িবে। আর,—ঐ যে মস্ত-মস্ত লম্বা-চওড়া পাথর—যাহাদের এক-একখানির উপরে জনকয়েক লোক বেশ আরামে শুইয়া ঘুমাইতে পারে—ও-গুলিকে কি-করিয়া অত-উঁচু মন্দিরের টঙ্গে তোলা হইয়াছিল? নিকটে পাহাড় নাই—অথচ এতবড় মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য যে বিপুল শিলা-স্তূপের দরকার হইয়াছিল—কোথা হইতে, কেমন করিয়া তাহা আসিয়াছিল? সে কথাও কেহ বলিতে পারে না। মন্দিরের অখণ্ড নবগ্রহশিলাকে দ্বিখণ্ড করিয়া, গভর্মেণ্টের লোকেরা অনেক চেষ্টাসত্বেও সেখানিকে মন্দির-সীমার বাহিরে আনিতে পারেন নাই;—অথচ কণারকের কারিকরেরা তার চেয়ে ঢের বড়-বড় পাথর কত ক্রোশ তফাৎ হইতে এখানে বহিয়া আনিয়াছে! এই উন্নত এ-কালের যন্ত্রবলেও যাহা অসম্ভব, সেকালের কোন্ আসুরিক বলে সে অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হইয়াছে? আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও এর সদুত্তর খুঁজিতে গেলে আমাদের মাথা গুলাইয়া যায়। ভাঙ্গা নাটমন্দিরের থামগুলিও কি সুন্দর—তার দু-একটা কলিকাতায় থাকিলে, সুধু তাই দেখিতেই বোধ করি কাতারে-কাতারে লোক ছুটিয়া আসিত। কণারকে আসিয়া ইংরেজ সমালোচকে তাই বলিয়াছেন, "I do not exaggerate when I say that it is, for its size, the most richly ornamented building—externally at least—in the whole world."—যিনি এমন সুখ্যাতি করিয়াছেন, তিনিও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখিয়াছেন! কণারকের অধুনাভগ্ন মূল মন্দির অতীতে যে কত সুন্দর ছিল, এখন তাহা কল্পনাতীত!

জগতের সব দেশেই, প্রাচীন মন্দিরগুলি আজকালকার পুস্তকের কাজ করিত। য়ুরোপের পুরানো চার্চ্চগুলিতে বাইবেলের নানা আখ্যায়িকা চিত্রে-ভাস্কর্য্যে অঙ্কিত হইয়া নিরক্ষর দর্শকদের প্রচুর শিক্ষাদান করিত। ভারতীয় মন্দিরগুলিও হিন্দু-বৌদ্ধের ধর্ম্ম-অবদানের চিত্রে পরিপূর্ণ। আর-একটি কথাও মনে রাখিবার মত। সকল দেশেরই প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য-চিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়েই প্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে প্রাচীন শিল্পের সংস্রব বড়ই ঘনিষ্ঠ।

কৃষ্ণদেউলের ক্ষোদিত চিত্রে সেকালকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর একটি সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। তখনকার রুচি-অরুচি, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য্য জিনিষ-পত্র কি রকম ছিল, ছবিগুলি দেখিলে সে-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়। রাজা-রাজড়া, সাধু-সন্ন্যাসী, সৈনিক ও সাধারণ লোকেরা কেমন কাপড়-চোপড় পরিতেন, রূপসীরা কেমন করিয়া খোঁপা বাঁধিতেন, কতরকমের গয়নায় বরতনু সাজাইতেন, বাদকেরা কতরকমের বাজনা বাজাইতেন—এ সব কিছুই জানিতে বাকি থাকে না।

লর্ড কার্জ্জন আমাদের জাতীয় জীবনের অনেকদিকে অপকার করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের শিল্পক্ষেত্রগুলি তাঁহার যত্নে যেমন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সকলেরই হৃদয় তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিবে। কণারকের কৃষ্ণদেউল ও ভুবনেশ্বরের অনেক মন্দির কার্জ্জনের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। গভর্মেণ্টের অর্থব্যয়ে কণারকের মন্দিরের বিরাট ধ্বংসস্তূপ এখন পরিষ্কৃত হইয়াছে,—মন্দিরের অনেক জায়গা যতটা-সম্ভব মেরামত করাও হইয়াছে। নবনির্ম্মিত মিউজিয়মে ভাঙ্গা-অভাঙ্গা

অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া রাখা আছে—তাহাদের মধ্যে কণারকের সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ নবগ্রহ-শিলাপট সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নিষ্ঠুর কাল-গ্রাস হইতেও কণারকের যেটুকু শিল্পসুষমা অব্যাহতি পাইয়াছিল, নির্ব্বোধ মানবের হাত হইতে সেটুকুও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। কণারকের অতুল শিল্প-ভাণ্ডার হইতে যে যাহা পাইত, লুঠিয়া লইয়া যাইত। পুরীর যেথানে-সেথানে সূক্ষ্মশিল্পের যে-সব নমুনা দেখিয়া দর্শকেরা অবাক্ হইয়া যান, সেগুলি এই কৃষ্ণদেউলেরই লুণ্ঠিত ভগ্নাংশ। যে দিন হইতে গভর্মেণ্ট মন্দিরের রক্ষক, সেই দিন হইতেই এই যথেচ্ছ লুণ্ঠন-কার্য্য বন্ধ।

জগমোহনের 'পিরামিড'-আকৃতির ছাদে উঠিলে চোখের সামনে এক আশ্চর্য্য মায়া-চিত্র ভাসিয়া উঠে। চারিদিকে অগাধ এবং অপার বালুকা-সাগরের নিস্তরঙ্গ বিস্তার,—প্রথম সূর্য্যকরে তাহা উজ্জ্বল রত্নের মত ঝলকিয়া উঠিতেছে। যেথানে-সেথানে তৃণভূমির শ্যামলতা,—সেথানে গরুর পাল ছাড়িয়া দিয়া পাচন-বাড়ির উপরে হেলিয়া রাখাল-বালক ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। বালির উপর এঁকিয়া-বেঁকিয়া হাঁটাপথটি কোথায় চলিয়া গিয়াছে—দুপুরে, সে পথে অজানা দেশের কোন পথিক নাই। সূর্য্য এখন মধ্যগগনে,—রৌদ্র যেন বিগলিত অগ্নির মত। মাঝে মাঝে আকাশের চলন্ত মেঘশ্রেণী সেই জ্বলন্ত মরুক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী ছায়াস্বর্গ রচনা করিতেছে,—সেদিকে চাহিলে আলোকপীড়িত তৃষিত নয়ন স্নিগ্ধতার আরামে যেন তন্দ্রাতুর হইয়া আসে!

আর-একদিকে শুভ্র বালুপ্রান্তরপ্রান্তে নীল পাড়ের মত কি সে? সমুদ্র! সমুদ্র! অনন্ত তরঙ্গবাহুর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে কৃষ্ণদেউলকে ধ্বংসে-চূর্ণে পরিণত করিয়া সাগর আজ দূরে সরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিজয়গর্ব্বের জয়ধ্বনি ও নৃত্যরঙ্গ আজও বন্ধ হয় নাই। অট্টহাস্যের সহিত বিকসিতফেন-দন্তে এখনো সে কণারকের দিকে ফুলিয়া-ফুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে—কিন্তু ধরিত্রী তাঁহার সবল বাহু দিয়া তাহাকে আবার দূরে ঠেলিয়া দিতেছেন। সুদূর হইতে উচ্চস্থানে উঠিয়া সাগরকে দেখিলে, তাহাকে কত ছোট দেখায়! তখন তাহার রুদ্রত্ব ও বৃহত্ত্ব থাকে না—তাহার দুই তটের অসীম ব্যবধানও যেন কমিয়া যায়। মনে হয়, সে যেন একটি বিগলিত নীল নদীর রেখা; তখন সে সুন্দর, কিন্তু গম্ভীর নহে!

৫

সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া যখন শ্রান্ত বিষণ্ণ প্রাণে কৃষ্ণ-দেউলের বিশাল ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, মনের মাঝে তখন কত ভাবের কত কথাই গুমরিয়া উঠিতেছিল। ভারতের অধিকাংশ প্রাচীন শিল্পক্ষেত্রই কেমন-একটা বিষাদের ভাবে আচ্ছন্ন। সে-সব জায়গায় গেলেই মনে হয়, এ-যেন শ্মশান,—এ-যেন সমাধিভূমি!

হাঁ,শ্মশানই বটে! মৃত্যু আর ধ্বংস,—মৃত্যু আর ধ্বংস! কোথাও ছাদহীন গৃহ, কোথাও টলটল ভগ্নস্তম্ভ, কোথাও ভূপতিত মন্দিরচূড়া, কোথাও ভূপ্রোথিত ভগ্নসৌধ, কোথাও অতি উচ্চ শিলাস্তূপ, কোথাও ক্ষয়প্রাপ্ত সোপান-চত্বর, কোথাও মস্তকহীন মূর্ত্তি, কোথাও দেহহীন মুণ্ড—মহা-কালের এ রণক্ষেত্র আজ বিজন, নিস্তব্ধ, পরিত্যক্ত! যেদিকে তাকাই—কোনদিকেই যেন জীবনের এতটুকু লক্ষণ বর্ত্তমান নাই। দিবসেও অন্ধকার ঐ-যে গম্ভীর বনস্থল—উহার মধ্যেও যেন মৃত্যুর নীরব অভিশাপ জাগ্রত হইয়া আছে! প্রতিপদক্ষেপে প্রতিধ্বনি শুনি, আর প্রাণটা যেন ছম্‌কাইয়া উঠে—বুকের ভিতরটা যেন হু-হু করিতে থাকে! শ্মশানই বটে!

দেবালয়ের ফাটলে-ফাটলে আজ বন্য লতাপাতা মাথা তুলিয়াছে, ভগবান বিভাবসুর পবিত্র রত্নবেদীর উপরে আজ ভক্তপদশব্দে বিরক্ত বিষধর ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিতেছে, চারিদিকের দেবদেবীর পূজাপীঠ আজ শৃগাল ব্যাঘ্রের নিরাপদ বিরাম-নিকেতন! যাজপুর, ভুবনেশ্বর, সাক্ষী-গোপাল ও পুরীর দেবতারাই যাত্রীদের সকল অর্ঘ ও ভক্তি নিঃশেষে লুণ্ঠন করেন,—এই ধূ ধূ মরুভূমির দীর্ঘ ও শীর্ণ পথরেখা পার হইয়া, শ্রান্তচরণে ক্লান্তপ্রাণে এই দেবতাশূন্য দেবালয়, এই ভগ্নচূর্ণ শিলাস্তূপ, এই গৌরবের নিস্তব্ধ সমাধিক্ষেত্র দেখিতে কে আসিবে?

পদতলে একটি মাংসহীন অস্থিসার নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছিল। বাঘের কবলে কোন্ অভাগার প্রাণ গিয়াছিল,—এই করোটি সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যেরই শেষ চিহ্ন! মড়ার মাথাটি হাতে-করিয়া তুলিয়া ধরিলাম—একদিন এই মুখই রক্তে মাংসে, রূপে-জীবনে পরমসুন্দর এবং প্রিয়জনের

চুম্বনাস্পদ ছিল! আস্তে-আস্তে একটি উঁচু পাঁচিলের উপরে নর-কপালটি উঠাইয়া রাখিলাম—তাহার দৃষ্টিশূন্য দৃষ্টি কোটর কৃষ্ণদেউলের ভগ্নকঙ্কালের দিকে ফিরাইয়া! ... ... শ্মশানের যোগ্য আভরণ!

* * * *

ঘুঘুর বুকভাঙ্গা বিষাদ-রাগিণী তখন থামিয়া গিয়াছে—ঝাউবনের উপর হইতে দিবসান্তের মায়া-প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে। মৌন সন্ধ্যার তরল ছায়া-যবনিকায় চারিদিক অস্পষ্ট।

কণারকের মন্দিরে-মন্দিরে আজ আলোক-সম্রাটের উদ্দেশে গম্ভীর বিদায়-স্তোত্র ধ্বনিয়া উঠিল না, শঙ্খ ঘণ্টা-কাঁসরের অনাহত ঐক্যতানে আকাশ-বাতাস ভরিয়া গেল না, দেবদাসীদের কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গীতে এবং পেলব চরণের নূপুর-নিক্বনে চারিদিকে সুরের লহর লীলায়িত হইল না। আজ:—

—"ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে বীণ—
অফুরাণ' গান অবসান!
ভোর উৎসবের রাতি,
নিবেছে নিবেছে বাতি,
নাট্যশালা হয়েছে শ্মশান!"—

ঐ কালো মেঘের পাহাড়ে-পাহাড়ে রহিয়া-রহিয়া বিজলীর চপল কটাক্ষ জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং সেই বিদ্যুতে প্রদীপ্ত কৃষ্ণজলদপটে কৃষ্ণতর কৃষ্ণদেউল, যেমন কোন শাপগ্রস্ত, পাষাণীভূত প্রেতাত্মার নিরানন্দ বিপুল বপুর মত নিস্পন্দ হইয়া দিগন্তচুম্বী সমুদ্রের অনন্ত প্রলাপ-বাণী শ্রবণ করিতেছে।... ... ...

... ... ফেরার পথে দেখিলাম, সুমুখে আবার সেই নিদ্রা-নিঃশব্দ মরু প্রান্তরের বিচিত্র স্বপ্ন-দৃশ্য এবং পিছনে, গগনপটে-লেখা মন্দিরশিখরে অর্দ্ধগুপ্ত, মড়ার মুখের মতন পাণ্ডুর পঞ্চমীর শশিপ্রভা!

মধু-সমাধি

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

বিদেশী বিধর্ম্মী মাঝে স্বদেশের মহাকবি
অনন্ত সুপ্তির ঘোরে আছেন সমাধি লভি!
মনে হয় এ একান্তে কি নিঃসঙ্গ কবিবর!
আপন আবাসভূমে অচেনা অজ্ঞাত পর।
মধুচক্র-রচয়িতা, গৌড়ের গৌরব-রবি,
আবৃত প্রাবৃট জালে—বিষাদ-করুণ-ছবি!
জননীর সুররত্ন, বাড়াল যে মাতৃ মান,
তাঁর এ কি নির্ব্বাসন—তাঁর এ কি প্রতিদান!
বাঙ্গালী পথিক কোথা, কবির আহ্বানে হায়,
দাঁড়াবে বারেক হেথা সসম্ভ্রমে মুগ্ধ প্রায়!
সবাকার শীর্ষে যাঁর মহিমামণ্ডিত স্থান,
কোন্ প্রান্তে পড়ে তিনি, কে রাখে সে অভিজ্ঞান!
কভু কোন ভক্ত শুধু এদীন ভক্তের সম
নীরবে গাঁথিয়ে আনে অশ্রু-মালা নিরুপম!
ভক্তি আর শ্রদ্ধাভরে কবিরে অর্চ্চিয়ে তায়,
তেমনি নীরবে বুঝি ক্ষুব্ধ-চিত্তে ফিরে যায়!

তার পর স্তব্ধ সব শব্দহীন সুগভীর
নির্জ্জনে একাকী কবি অলক্ষিতে জগতীর!
"ব্রজাঙ্গনা" "বীরাঙ্গনা" "মেঘনাদ" দান যাঁর
তাঁর প্রতি বাঙ্গালার এ কি যোগ্য-ব্যবহার!
বাণীর মন্দির যদি হেথা হ'ত বিনির্ম্মিত
কবির বিগ্রহ তায় হ'ত যদি প্রতিষ্ঠিত,
মিলিত প্রত্যহ যদি বাণীর সেবকগণ
কবির প্রাণদ ব্রতে সমর্পিতে প্রাণ-মন!—
তবে তো কবির হ'ত উপযুক্ত সমাদর
হাসিত কবির আত্মা উজলিয়া চরাচর!
তাঁর দেশবাসী বলে বিশ্বজনে পরিচয়
পারিতাম দিতে গর্ব্বে তবে মোরা সুনিশ্চয়!
জানি না সফল কভু হবে কি এ স্বপ্ন মোর,
তথাপি তাহারি ধ্যানে সারা জন্ম র'ব ভোর!
যদি কভু নেমে আসে দেবতার আশীর্ব্বাদ
ধন্য হব লভি' তবে মধু-কবি-পরসাদ!

সাময়িকী

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মহামান্য ভারত-সম্রাটের নিকট হইতে 'সার' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহা যে আনন্দের সংবাদ, তাহার সন্দেহমাত্র নাই। তবে এই উপাধিলাভের জন্য শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্রকে আমরা অভিনন্দিত (congratulate) করিতে পারিতেছি না; আমরা ভারত-সম্রাট মহোদয়ের গুণগ্রাহিতার জন্য কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করিতেছি। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আমাদের নিকট যে আসনে অধিষ্ঠিত, এই 'সার' উপাধির সম্মান সে আসনের নিকট পৌঁছিতেও পারে না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া অতুল যশঃ উপার্জ্জন করিতে থাকুন।

কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাপান-ভ্রমণ শেষ করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। আমেরিকার সাহিত্যিকগণ তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহাতে আমরা বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছি। আমেরিকার অনেক পণ্ডিত লোক তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, এ সংবাদও আমরা পাইতেছি। অল্প দিন হইল, মিঃ রোলাণ্ড টমাস (Mr. Roland Thomas) নামক একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সার রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কবিবরের যে কথোপকথন হইয়াছিল, নিউ-ইয়র্ক ওয়ারল্ড (New York World) নামক পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই কথোপকথনের দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মিঃ রোলাণ্ড টমাস রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমেরিকা-সম্বন্ধে আপনার মনের ভাব (impression) কি, তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি ও আমি দুই বিভিন্ন সভ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনার দেশের সভ্যতা আমার দেশের সভ্যতা অপেক্ষা বহু প্রাচীন এবং বিভিন্নও বটে। আমি শুনিতে চাই যে, এই দুই সভ্যতা কি-কি বিষয়ে বিভিন্ন। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল?" সার রবীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আমার মনে হইতেছে, আপনি জানিতে চান যে, আমি আপনাদের দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কি মত পোষণ করি।" মিঃ টমাস বলিলেন, "প্রশংসা বা নিন্দা করিতে বলিতেছি না,—তুলনা করিতে বলিতেছি।" রবীন্দ্রনাথ তখন বলিলেন—"If you wish for the difference between East and West as I seem to notice it, I can give it to you very briefly. West is eager for things, East is eager for God. West rewards its doers. East reverences its seers. For, East has learned—or thinks it has learned—through its long centuries of experience and experiment, that man is spiritual. His eventual wants are spiritual wants. His hardest strivings are spiritual strivings. And his final attainment—his only attainment which can bring trustworthy satisfaction—must be spiritual attainment. West has been engaged in the mastery of things. East has been an explorer in the realm of spirit. When the two have been combined, when the full mastery of Nature has set men free to live, and when religion and philosophy—unpedantic philosophy and deep, true, all-embracing religion—have permeated things with spiritual significance—then human civilization will have come to its flowering.

উপরি-উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের সার মর্ম্ম এই—প্রাচ্য ও

প্রতীচ্যের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রতীচ্য বস্তু (things) পাইবার প্রয়াসী, আর প্রাচ্য ভগবানের প্রয়াসী। প্রতীচ্য কর্ম্মীকে পুরস্কৃত করে, প্রাচ্য ঋষিকে ভক্তি-উপহার দেয়। প্রাচ্য সহস্র-সহস্র বৎসরের সাধনায় জানিয়াছে যে, মনুষ্য পরমার্থ-পরায়ণ (spiritual) অধ্যাত্ম; পরমার্থলাভই তাহার জীবনের চরম কামনা। প্রতীচ্য বস্তুর উপর, জড়ের উপর আধিপত্য-বিস্তারই একমাত্র কামনার বিষয় করিয়াছে। প্রাচ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, নিবিষ্ট-চিত্ত। যখন এই দুই ধারার সম্মিলন হইবে, যখন প্রাচ্য অধ্যাত্ম-বাদ ও প্রতীচ্য জড়বাদ মিলিত হইয়া এক শাশ্বত ধর্ম্মে পরিণত হইবে, তখনই প্রকৃত সভ্যতা পুষ্পিত হইবে।" বহুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার ধর্ম্ম-সঙ্ঘে (Parliament of Religion) দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসী, আমাদের এই বঙ্গবাসী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বলিয়াছিলেন, এই বাণীই শুনাইয়াছিলেন।

সার রবীন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া মিঃ টমাস বলিলেন,—"And you think that it will happen ? you expect such a conjunction ? You do not believe that East will always be East and West be West, and never the twain shall meet ?" অর্থাৎ—"আপনার মনে হয়, ইহা সঙ্ঘটিত হইবে ? আপনি আশা করেন, এই সম্মিলন ঘটিবে ? তাহা হইলে আপনি এ কথা বিশ্বাস করেন না যে, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে; এবং এই দুই কখন মিলিত হইবে না ?" রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "They are twain, but they will meet. Each has something which it must sooner or later give the other. We are all men together. We have each of us learned something by living. And soon or late, our separate experiences will fuse into one experience and knowledge—the matured wisdom of the unified human race." ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, ইহারা দুই হইলেও সম্মিলিত হইবে। এই দুইয়ের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, একে অন্যকে দিবেই। আমরা সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; আজই হউক বা দশ দিন পরেই হউক, এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্মিলিত হইয়া সমগ্র মানব সমাজের সভ্যতায় পরিণত হইবে।

আমরা শুনিয়াছি যে, সার রবীন্দ্রনাথ জাপানে গমন করিয়াও এই অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন; জাপানের লোকে না কি এ তত্ত্ব গ্রহণ করিতে চায় নাই; তাহারা এখন জড়ের সহিত যুদ্ধেই ব্যস্ত; তাহাদের এখন এ সকল কথা শুনিবার অবকাশ নাই। কিন্তু হিন্দু-সন্তান রবীন্দ্রনাথ এই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ব্যতীত আর কি প্রচার করিতে পারেন ? প্রতীচ্য জড়বাদ প্রচার করিবে, বিজ্ঞানের কথা বলিবে, ঐহিকের কথা বলিবে; আর ভারতবর্ষ চিরদিন অধ্যাত্ম-তত্ত্বই প্রচার করিবে, এই বাণীই সে শুনাইবে। স্বামী বিবেকানন্দ, সার রবীন্দ্রনাথ বা ভারতের অন্যান্য মনস্বী কেহই ত কোন দিন এ কথা বলেন নাই যে, বিজ্ঞান ত্যাগ কর, জড়ের দিকে চাহিও না, সুধু অধ্যাত্ম-তত্ত্বেই নিমগ্ন হও। তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন, জড়ের সংস্পর্শ কি ত্যাগ করা যায় ? বিজ্ঞানের উন্নতিকে কে বাধা দিতে পারে বা বাধা দিতে চাহে ? জড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাই সব নহে; তাহাতেই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সাধিত হয় না। বিজ্ঞানের সঙ্গে যখন প্রজ্ঞার যোগ হইবে, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ যখন সম্মিলিত হইবে, তখনই মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে, তাহাই সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ। তাই আমাদের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন যে, ও দেশ হইতে কর্ম্ম আসুক, আর আমাদের দেশ হইতে ধর্ম্ম যাউক; প্রতীচ্য কর্ম্মবাদ এ দেশে আসুক, আর ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম-বাদ ওদেশে পাঠাক; এই দুই শক্তির মিশ্রণে যে সভ্যতা গঠিত হইবে, তাহাই মানব-সভ্যতার আদর্শ।

য়ুরোপে যে বিরাট সমর আরম্ভ হইয়াছে, আজ দুই বৎসরের অধিককাল যে নররুধিরে ধরণীপৃষ্ঠ প্লাবিত হইতেছে, তাহার জন্য সমগ্র য়ুরোপ নানা অসুবিধায় পতিত হইয়াছে। সহস্র-সহস্র লোক রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন

দিতেছে; নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদিও অগ্নিমূল্য হইয়া পড়িয়াছে; অনেক দ্রব্য একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে; জর্ম্মণীতে ত হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও যে সে প্রবল তরঙ্গের আঘাত লাগে নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না; ভারতবর্ষেও নানা অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু—তাহা হইলেও, য়ুরোপ যে কষ্ট স্বীকার করিতেছে, ইংরাজ জাতি এই যুদ্ধে যে ভাবে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছেন, কোন কষ্ট কোন অসুবিধাতেই তাঁহারা বিচলিত হইতেছেন না, বীরের জাতি বীরের ন্যায় রণসমুদ্রে ঝাঁপ দিতেছেন, আমাদের দেশে তাহার কিছুই হয় নাই; আমরা সে কষ্টের, সে আত্মত্যাগের কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াই নিরস্ত হইতেছি। কিন্তু এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নাই। ইংরাজ এবার বিপুল বিক্রমে শত্রুজয়ে নিযুক্ত হইবেন; তাহার জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছে। আমরা সম্রাটের প্রজা; আমরা তাঁহার সুখে সুখী হইব, তাঁহার বিপদে বিপন্ন হইব; ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভারতবাসী সে কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই; ভারতীয় সৈন্যগণ রণ-ক্ষেত্রে অতুল বিক্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে; রাজার জন্য তাহারা প্রাণ দিতেছে। এখন কিন্তু আরও অধিক আয়োজন করিতে হইবে; ইংরাজ সৈন্যবল বর্দ্ধিত করিতে হইবে। তাই আমাদের গবর্ণমেণ্ট আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতে যে সমস্ত ইংরাজ নানা কার্য্যোপ-লক্ষে এখনও অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বাধ্য করা হইবে। আবশ্যক হইলে তাঁহাদের অনেককে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে; অবশিষ্টভাগকে ভারতবর্ষের নানা স্থানে থাকিতে হইবে। ভারতবাসীদিগকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সৈন্য-দলে গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। তবে, তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে না; যাহারা স্বেচ্ছায় সৈন্য দলে প্রবিষ্ট হইতে চাহিবে, স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে তাহা-দিগকেই গ্রহণ করা হইবে; সুতরাং এখন বাঙ্গালী যুব-কেরাও অনায়াসে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন, পূর্ব্বে ডবল কোম্পানী প্রস্তুত হইয়াছিল; এখন বাঙ্গালীর সৈন্য-দলে অবাধ-প্রবেশ বিধিবদ্ধ হইল।

এই বাধ্যতামূলক সৈন্য-সংগ্রহের আদেশ প্রচারিত হওয়াতে এ দেশবাসী ইংরাজ-মহলে বড়ই কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। এখন এ দেশে যে সমস্ত ইংরাজ আছেন, তাঁহারা কতক রাজকার্য্যে এবং অবশিষ্ট অংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্য চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যেই থাকিতে হইবে; যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা অন্য চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহা-দিগকেই সৈনিক-দলভুক্ত হইতে হইবে; তবে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাহাকে-কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বে-সরকারী ইংরাজ-দিগের মধ্যে এই কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; এবং অনেকের মনে ভীতির সঞ্চারও হইয়াছে। ইহা প্রাণনাশের ভয় নহে, ইংরাজ প্রাণ দিতে ভয় পায় না। কিন্তু এই ভাবে যদি তাঁহাদিগকে সৈনিক ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে; অনেককে একেবারে জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইতে হইবে; অনেককে মহা কষ্টে পড়িতে হইবে। একেই এই যুদ্ধ-উপলক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য অত্যন্ত নরম পড়িয়া গিয়াছে; তাহার উপর যদি সকলকে সৈনিক-ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক কারবার উঠিয়া যাইবে।

কথাটা যে ঠিক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ওদিকে এই সমরের জন্য যে বিপুল আয়োজন করিতেই হইবে, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ অবস্থায় কিসে সকল দিক রক্ষা পায়, সে বিষয়ে সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা মনে হয়। আমাদের এই ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমন অনেক জাতি আছে, যাহারা যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী; যাহাদের শৌর্য্য বীর্য্যের পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে এ শ্রেণীর লোক এখনও যথেষ্ট আছে। তাহাদিগকে পারদর্শিতা-অনুসারে, বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যথাযোগ্য বেতনে উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, তাহারা যুদ্ধে যাইতে সম্মত হইবে। যে সমস্ত ইংরাজকে বাধ্য করিয়া সৈনিক-ব্রত গ্রহণ করান হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে; এবং তাহারা যে 'সরকারের' জন্য প্রাণ দিতে পারে,

সে বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ নাই। এই সকল শ্রেণী হইতে অধিক সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলে, অনেক বে-সরকারী ইংরাজকে সৈনিক-ব্রত গ্রহণে বাধ্য না করিলেও চলিতে পারে। তবে তাহাদিগকে সেই সামান্য সিপাহী হিসাবে লইলে কাজটা ঠিক হইবে না; তাহাদের মধ্যে যাহারা যোগ্য, তাহাদিগকে সৈনিক বিভাগে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিতে হইবে।

তাহার পর বাঙ্গালীর কথা। বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী বন্দুক ধরিতে জানে না, বাঙ্গালী গোলমাল দেখিলেই ভয়ে পলায়ন করে, বাঙ্গালী দুর্ব্বল, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা এতকাল আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, এবং এই সকল অভিযোগও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমাদের এম্বলান্স দল, আমাদের ডবল কোম্পানী এই অল্প দিনের মধ্যেই সৈনিক বিভাগের উচ্চতম অধিনায়কগণের নিকট হইতে যে প্রকার প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহাতে এখন হয় ত আমরা একটু মাথা তুলিয়া বলিতে পারি যে, কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভীরু বাঙ্গালীও সাহস প্রদর্শন করিতে পারে, আদেশ প্রদান করিলে তাহারাও রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারে। কেহ হয় ত বলিবেন যে, তাহা হইলে দলে-দলে বাঙ্গালী যুবক সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতেছে না কেন—এখন ত অবাধ-প্রবেশের আদেশ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি কথা আছে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গালা দেশের একটু প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার অন্যের হইতে একটু পৃথক; বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা এই ব্রত অবলম্বন করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। বাঙ্গালা দেশে এই শ্রেণীর লোকই অধিক,—বড়মানুষ বা অবস্থাপন্ন লোক আর কয় জন! এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী যুবকদিগের উপার্জ্জনের উপর অনেক সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে। সাধারণতঃ সিপাহীকে যে মাসিক এগার টাকা তন্‌খা দেওয়া হয়, তাহাতে বাঙ্গালী যুবকের চলে না—এক জনেরই চলে না। এত দিনের অভ্যাস ত আর দশদিনেই ত্যাগ করা যায় না। এই জন্যই অনেকে এই সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইতেছে না। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য গবর্ণমেণ্ট ত অনেক করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি, আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের শিক্ষা-বিধানের জন্য, তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। এ ক্ষেত্রেও ত তাহাই করিতে পারেন। অবশ্য বাঙ্গালী এই প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতেছে, তাহার উপযুক্ত তন্‌খা সেই নির্দ্দিষ্ট এগার টাকাই। কিন্তু যাহাদিগকে ভীরু, অনুপযুক্ত, অযোগ্য বলিয়া এত দিন দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগের উন্নয়নের জন্যই না হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের তন্‌খা কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। কার্য্যের হিসাবে এ প্রার্থনা নহে, সৈনিক-ব্রতে বাঙ্গালীকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার কথা ভাবিয়াও ত তাহাদিগের উপর এই বিশেষ অনুগ্রহ গবর্ণমেণ্ট দেখাইতে পারেন। ইহার ফল যে পরিণামে শুভ হইবে, এ কথা বিবেচকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা কথাটা খুলিয়াই বলিলাম। যাঁহারা বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী গঠিত করিয়াছেন এবং এখনও বাঙ্গালী যুবক সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। সে দিন একখানি সংবাদপত্রে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে, যে প্রকার অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালীকেও সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য বাধ্যতামূলক একটা কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে; নতুবা বাঙ্গালী এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে না। তাঁহার কথারও উত্তর স্বরূপ আমরা উপরি-উক্ত কথাই বলিতেছি।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুরেশ মনে-মনে অসংশয়ে অনুভব করিতেছিল যে, কথাটা মহিম যেমন করিয়াই উড়াইয়া দিক্, সে তাহারই একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই, এতদিন অচলার সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সে যত ভালই বাসুক, এখন পর্য্যন্ত সে যে একটা ব্রাহ্ম-মেয়ের কাছে তাহার আশৈশব বন্ধুকে খাটো করিতে পারে না, এমন কথা কাল শুনিলেও সুরেশের বুকখানা গর্ব্বে দশ হাত ফুলিয়া উঠিত। আজ কিন্তু তাহার নির্জ্জন শয্যায় এ চিন্তা তাহাকে লেশমাত্র আনন্দ দিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, একদিন-না একদিন হাসি-গল্পে, উপহাসে-পরিহাসে বিচিত্র হইয়া সমস্ত কথা অচলার কাণে উঠিবে। সে দিন সুখের ক্রোড়ে বসিয়া, সে তাহার স্বামীর এই অপদার্থ বন্ধুটার নিষ্ফল ঈর্ষার কোন তাৎপর্য্যই খুঁজিয়া পাইবে না, অথচ, হাসির ছলেও সেই স্বল্পভাষিণী কোন দিন কোন প্রশ্নই তাহাকে করিবে না। হয় ত বা, শুধু মনে-মনে একটুখানি হাসিয়া বলিবে, এই লোকটা বন্ধুত্বের অতি-অভিমানে কত পণ্ডশ্রমই না করিয়াছে! ব্যর্থ আক্রোশে কত অন্তর্দাহেই না জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিয়াছে!

রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইল না। যত-বার ঘুম ভাঙিল, তত-বারই এই সকল তিক্ত-চিন্তা তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া গেল,—পরের জন্য এমন উৎকট মাথা-ব্যথার রোগ তোমার কবে সারিবে সুরেশ?

সকালবেলা উঠিয়া সে দিনের কোন কাজে মন দিতে পারিল না; এবং, বেলা বাড়িতে-না-বাড়িতে গাড়ী করিয়া কেদারবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেহারা জানাইল, বাবু আলিপুর আদালতে বাহির হইয়া গিয়াছেন,—ফিরিতে তিন চার ঘণ্টা দেরি হইতেও পারে। সুরেশ ফিরিতে উদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দু'জনেই বেরিয়ে গেছেন?"

প্রশ্নটা বেহারা বুঝিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "সে তো আমি জানিনে বাবু।"

সুরেশ মুস্কিলে পড়িল। গৃহস্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁহার যুবতী কন্যার সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করা ব্রাহ্ম-পরিবারের মধ্যেও শিষ্টতা-বিরুদ্ধ কি না, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না; অথচ, এই কন্যাটিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। চিন্তা করিয়া কহিল, "তোমার বাবুর ফিরতে এত দেরি নাও হতে পারে ত? আমি এক-আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেই দেখি।"

বেহারা সুরেশকে বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইয়া বলিল, "দিদি ঠাকরুণ বাড়ী আছেন, তাঁকে খবর দেব কি?" বলিয়া উত্তরের জন্য চাহিয়া রহিল। অচলা এই ভদ্রলোকটির সুমুখে যে বাহির হন, তাহা সে কালই দেখিয়াছিল। সুরেশ অন্তরের আগ্রহাতিশয্য প্রাণপণে নিবারণ করিয়া নিস্পৃহভাবে কহিল, "তাঁকে আবার খবর দেবে? আচ্ছা দাও,—ততক্ষণ না হয় তাঁর সঙ্গেই দুটো কথা কই।" বেহারা চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই অচলা পার্শ্বের দরজার পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিল। সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মহিম যে বাড়ী চলে গেল? এত করে' বললুম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে—কিন্তু কোন মতেই কথা শুনলে না। এমন একটা—"

অচলার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য শাদা হইয়া গেল। কিন্তু নমস্কার করিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "যাওয়া বোধ করি খুব বেশি দরকার। বাড়ীতে কারও শক্ত অসুখ-বিসুখ করেনি ত?"

নমস্কার করিতে দেখিয়া সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া প্রতি-নমস্কার করিল; এবং নিজের অনাবশ্যক উত্তেজনার সঙ্গে অচলার শান্ত-ধীর কথাগুলি ওজন করিয়া শতগুণ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সহজ ও

স্বাভাবিক করিয়া বলিল, "দরকার যাই হোক্—সে এমন কি ভয়ানক হতে পারে যে, অন্ততঃ দু'মিনিটের জন্যে এসেও একবার আপনাকে সে বলে যেতে পারে না? আর যখন কবে ফিরবে তার কোন ঠিকানা নেই! আপনিই বলুন, বাড়ীতেই বা তার আছে কে—যার অসুখের জন্য তাকে এ ভাবে যেতে হয়? আমি ত মরে গেলেও কখনো এমন করে চলে যেতে পারতুম না।"

অচলার মুখের উপর দিয়া একটা সলজ্জ, স্নিগ্ধ হাসি খেলিয়া গেল। কহিল, "আপনার এখনো কেউ হয়নি বলেই এ কথা বল্‌লেন; কিন্তু হলে, ঠিক ওঁর মতই অবহেলা করে চলে যেতেন— এ আমি নিশ্চয় বল্‌চি।"

সুরেশ তাহার বসিবার চৌকির হাতলের উপর সজোরে একটা চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "কখ্খনো না। আমাকে আপনি চেনেন না, তাই এ কথা বল্‌তে পারলেন; কিন্তু চিন্‌লে পারতেন না।"

অচলা কহিল, "বেশ ত, এখন থেকে ত চিন্‌তে পারব; আর-কেউ হলে জান্‌তেও পারব। কি বলেন?"

সুরেশ কহিল, "নিশ্চয়! একশ বার! তা ছাড়া, মহিমের মত আমি বন্ধুর কাছে কোন কথা গোপন করে রাখতেও পারিনে, রাখা ভালও মনে করিনে।" বলিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি বল্‌চেন, হলে জান্‌তে পারবেন, কিন্তু আমি বল্‌চি যে, আপনাকে না জানিয়ে, আপনার মত না নিয়ে, এ সব কখনো হবেই না; কারণ, আপনাকে মহিমের সঙ্গে পৃথক করে দেখবার সাধ্য আর আমার নেই; আপনারা আমার কাছে আজ অভিন্ন।"

অচলা সলজ্জ হাসি-মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনাকে যাচাই করার শুভ-দিন না আসা পর্য্যন্ত আমি কিন্তু আপনার বন্ধুকে দোষী করতে পারব না, সুরেশবাবু।"

সুরেশ সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, "সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে যাচাই করবার শুভ-দিন এ জন্মে ঘটবে কি না, সন্দেহ। কিন্তু সে যাক্। আজ সকালেই কেন আপনাদের কাছে এসেছি জানেন? কাল রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি—না এলে আজও পারব না, তাও জানতুম। আমি অনেক অপরাধ করেছি—তার সমস্ত একটি-একটি করে আজ আপনার কাছে স্বীকার করে আমি যাব। আমি তাই এসেছি।"

তাহার প্রবল বিরুদ্ধতা অচলার অবিদিত ছিল না। তাই সে শঙ্কিত মুখে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরেশ বলিতে লাগিল, "কাল সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখি, মহিম বসে আছে। ভাল কথা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন—আমি ব্রাহ্মদের দু'চক্ষে—অর্থাৎ কি না, ব্রাহ্ম-সমাজটাকে আমি তেমন ভাল মনে করিনে।"

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল "হাঁ, আমি জানি।"

সুরেশ বলিতে লাগিল,—"জান্‌বেন বই কি। কিন্তু এ কথাটাও ভুলবেন না যে, আমি তখন আপনাকে চিন্‌তুম না। তাই মহিমকে অনুরোধ করি, সে যেন অন্ততঃ একটা মাস এখানে না আসে। কেন জানেন?"

অচলা পুনরায় মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। তবে বোধ হয় আপনি ভেবেছিলেন, পুরুষ-মানুষের ভুল্‌তে একটা মাসই যথেষ্ট সময়। তার বেশি বিলম্ব হওয়া সঙ্গত নয়।"

আঘাতটা সুরেশ বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমি চিরদিনই নির্ব্বোধ। হয় ত, এমনিই কিছু একটা মনে করে থাক্‌ব। তা ছাড়া, আরও একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আপনার বিরুদ্ধে আমার ছিল। আমি শপথ করেছিলুম, এই একটা মাসের মধ্যেই আর কোথাও পাত্রী স্থির করে মহিমের বিয়ে দেব। যেমন করেই হোক্ তাকে আট্‌কাতে হবে। আমার বন্ধু হয়ে সে যে একটা নারীর মোহে নিজেদের সমাজ ছেড়ে চলে যাবে, এ যেন কিছুতেই না ঘট্‌তে পায়।"

অচলা রুদ্ধ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তার পরে?"

তাহার পাংশু মুখের পানে চাহিয়া সুরেশ একটুখানি হাসিল; কহিল, "তার পরে আর ভয় নেই। এ পাপ সঙ্কল্প যে ত্যাগ করেছি, আজ সেই কথাই আমি স্বীকার করে যাব। আপনাকে দেখা দেবার জন্যে কাল রাত্রে তাকে অনেক অনুরোধ করেচি। এক দিন আমার অন্যায় অনুরোধটা সে রেখেছিল, কিন্তু কালকেই এই অনুরোধটা রাখলে না—আপনাকে দেখা না দিয়েই সে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল।"

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, "যাবার কোন কারণ দেখিয়েছিলেন?"

সুরেশ কহিল, "না। দরকার আছে—এই মাত্র।"

অচলা আর একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যেন আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল—"দরকার! দরকার! চিরকাল তাঁর মুখে এই কথাই শুনে আস্‌চি—এই আচরণই দেখে আস্‌চি—চিরদিন প্রয়োজনই তাঁর সর্ব্বস্ব!"

সুরেশ কহিল, "একটা চিঠি লিখেও ত সে আপনাকে জানাতে পারত।"

অচলা ধীরে-ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। চিঠি তিনি লেখেন না।"

সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; বলিল, "কি প্রয়োজন; তাও কখনো বলে না। তার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সমস্তই তার একার। স্বার্থপর! কখনো কাউকে তার ভাগ দিলে না। এই নিয়ে কত দুঃখ সে যে ছেলেবেলা থেকে আমাকে দিয়ে এসেছে, বোধ করি তার সীমা-পরিসীমা নেই। নিষ্ঠুর! দিনের পর দিন নিজে নিঃশব্দে উপোস কোরে, আমার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা তিক্ত বিষাক্ত করেচে,—কিন্তু কখনো কোন দিন আমার মুখ চেয়েও আমার হাত থেকে কিছু নেয়নি। আমার ভয় হয়, যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হতে পারবেন!" বলিতে বলিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখ দুটো অশ্রুজলে ঝক্‌-ঝক্‌ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, "দেখুন, আমার বাইরেটা ভারি শক্ত দেখ্‌তে, কিন্তু, ভেতরটা তেম্‌নি দুর্ব্বল। মহিমের ঠিক তার উল্টো।—তবুও আমাদের মত বন্ধুত্ব সংসারে বোধ করি খুব কমই ছিল।"

অচলা নতমুখে, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সে আমি জানি, সুরেশবাবু। এবং আরও জানি যে, সে বন্ধুত্ব আজও তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে।"

শৈশবের সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি সুরেশের বুকের ভিতর আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যখন জানেনই, তখন এই ভিক্ষা আজ আমাকে দিন যে, অজ্ঞানে যে শত্রুতা আপনাদের করেচি, সে অপরাধ আর যেন আমার বুকে না বেঁধে!" বলিতে-বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে পুনরায় রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার এই একান্ত ব্যাকুলতায় অচলার নিজের বুকের ভিতরটাও যেন দুলিয়া-দুলিয়া উঠিল। সে উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়াই দেখিল, তাহার পিতা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কেদারবাবু সুরেশকে দেখিয়া খুসি হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে সুরেশবাবু!"

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল।

কেদারবাবু আসন গ্রহণ না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিমের খবর কি? তাকে ত দেখ্‌চিনে!"

সুরেশ কহিল, "মহিম অত্যন্ত প্রয়োজনে সকালের গাড়ীতেই বাড়ী চলে গেল—এই খবর জানাবার জন্যেই আমি এলুম।"

কেদারবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন—"বাড়ী চলে গেল!" বলিয়াই সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিলেন—"সে বাড়ী যাক্‌, থাক্‌, আমাদের তাতে আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু, তুমি বাবা সুরেশ, যখন খুসি, যখন সময় পাবে, বাড়ীর ছেলের মত এখানে এসো, যেয়ো—আমার বড় আনন্দ হবে,—কিন্তু তোমার সেই মিথ্যাচারী, ভণ্ড বন্ধু-রত্নটি যেন আর কখনো এ বাড়ীতে মুখ না দেখায়। দেখা হলে বলে দিয়ো, তার আর কোন লজ্জা না থাকে—অন্ততঃ অপমানের ভয়টা যেন থাকে।" সুরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার মনের ভাব অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া কেদারবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "না না, সুরেশ, তোমার লজ্জা বোধ করবার ত এতে কোনই কারণ নেই। বরঞ্চ কর্ত্তব্য করার গৌরব আছে। তুমি বুঝতে পারছ না যে, কি বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেছ, এবং কত দূর পর্য্যন্ত আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি কাল থেকে এই বড় আশ্চর্য্য হচ্চি, অচলা, সে লোকটা সুরেশের মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল কি করে; আর, কি করেই বা এতদিন ধরে সেটা বজায় রেখেছিল!" একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "যে এ পারে, সে যে আমাদের মত দুটি নিরীহ মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে, এ বেশি কথা নয়, মানি; কিন্তু, এও বড় কম আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় যে, এই লোকটা বাস্তবিক কি, কেমন,—এটুকু অনুসন্ধান করার কথাও আমার মত প্রবীণ বয়সের লোকের মনেও একটা দিন ওঠেনি! আশ্চর্য্য!"

সুরেশ কথা কহিল না,—কেদারবাবুর মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পর্য্যন্ত পারিল না। কেদারবাবু ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজের পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার অনেক কথা জিজ্ঞেসা করিবার আছে, বাবা; কিন্তু, একটু বোসো, আমি এইগুলো ছেড়ে আসি।" বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই, সুরেশ অনেক কষ্টে বলিয়া ফেলিল, "আমারও বেলা হয়ে গেছে। আজ যাই, আর একদিন আস্‌ব।" তাহার এখনো যে স্নানাহার হয় নাই, তাহা তাহার শুষ্ক, রুক্ষ মাথার পানে একটু নজর করিলেই চোখে পড়ে। কেদারবাবুরও পড়িল এবং এক নিমিষেই একেবারে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন—"আঁ, এখনও নাওয়া-খাওয়া হয় নি? না, আর এক মিনিট দেরি নয়, সুরেশ। এইখানেই স্নান করে যা পারো দুটো খেয়ে নাও। মা অচলা, একটু তাড়া দেও—বেলা বারোটা বেজে গেছে! বেয়ারা—" ইত্যাদি উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি করিতে-করিতে তিনি নিজেই বাহির হইয়া গেলেন।

অচলা এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ছিল; এখনও কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। পিতা চলিয়া যাইবার পর আস্তে-আস্তে বলিল, "আপনি আমাদের এখানে কি কিছু খেতে পারবেন?"

সুরেশ মুখ তুলিয়া অচলার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি কি বলেন?"

"আপনি কখনই ত ব্রাহ্ম বাড়ীতে খান্ না।"

"না, খাইনে। কিন্তু আপনি এনে দিলে আজ খাবো।" একটু থামিয়া,—"আপনি বোধ হয় ভাব্‌চেন, আমি তামাসা করচি; কিন্তু তা নয়। আপনি হাতে করে দিলে, আমি সত্যিই খাবো।" বলিয়া চাহিয়া রহিল। এইবার অচলা একটুখানি মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল; কহিল, "যথার্থই আমি ভাবছিলুম, আপনি ঠাট্টা করচেন। কাল পর্য্যন্তও যাদের বাড়ীতে খেতে আপনার ঘৃণার অবধি ছিল না, আজ তাদেরই একজনের ছোঁয়া খেতে কি করে যে আপনার প্রবৃত্তি হবে, আমি ত ভেবে পাচ্ছিনে, সুরেশ বাবু।"

সুরেশ ম্লান মুখে, ব্যথিত স্বরে কহিল, "তবে কি এই ভেবে এতক্ষণ পরে পেলেন যে, আপনার হাতে খেতে আমার ঘৃণা হবে?"

অচলা বলিল, "কিন্তু এই ভাবনাই ত স্বাভাবিক, সুরেশবাবু। আপনার মত একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের চিরদিনের বদ্ধমূল সামাজিক সংস্কার হঠাৎ এক দিনে অকারণে ভেসে যাবে, এইটেই কি ভাবতে পারা সহজ?"

সুরেশ কহিল, "না, সহজ নয়। কিন্তু অকারণে ভেসে যাচ্ছে—তাই বা ভাবচেন কেন? কারণ থাক্‌তেও ত পারে" বলিয়া এমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল যে, জবাব দিতে গিয়া অচলা একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার কথাটায় সে যে আঘাত পাইয়াছে, তাহা সে মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল; এবং এক প্রকারের হিংস্র আনন্দও উপভোগ করিতেছিল। কিন্তু সে বেদনা যে অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত মুখখানাকে একেবারে ছাইয়ের মত শুষ্ক করিয়া দিতে পারে—তা সে ভাবেও নাই, ইচ্ছাও করে নাই। তাই নিজেও ব্যথা পাইয়া কথাটাকে সহজ রহস্যালাপে পরিণত করিতে, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তবেই দেখুন, আপনার মত কঠোর-প্রতিজ্ঞ লোকও—"

সুরেশ বলিল, "হাঁ, ভেসে যায়।" তাহার গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল; কহিল, "আপনি একটা দিনের কথা বল্‌ছিলেন,—কিন্তু জানেন আপনি, একদিনের ভূমিকম্পে অর্দ্ধেক দুনিয়াটা পাতালের মধ্যে ডুবে যেতে পারে? একটা দিন কম সময় নয়—" বলিয়া আবার নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। অচলা ভীত হইয়া উঠিল। সুরেশের মুখের উপর কি একপ্রকার শুষ্ক পাণ্ডুরতা,—কপালের শির দুটা রক্তে স্ফীত, চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে—যেন কি একটা সে ছোঁ মারিয়া ধরিতে চায়!

একে এই গরম, তাহাতে এত বেলা পর্য্যন্ত স্নানাহার নাই—গত রাত্রে একটুকু ঘুমাইতে পারে নাই,—তাহার পায়ের নীচের মাটিটা পর্য্যন্ত যেন অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। আরক্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ব্রাহ্মদের ঘৃণা করি কি না, সে জবাব ব্রাহ্মদের দেব, কিন্তু আপনি আমার কাছে তাদের অনেক, অনেক উপরে—" তাহার উন্মাদ ভঙ্গীতে অচলা ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল। কোন মতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সভয়ে কহিতে গেল, "বেহারাটা—"

কিন্তু সে অস্ফুট মৃদুস্বর সুরেশের উত্তপ্ত উচ্চ কণ্ঠে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে তেমনি তীব্র স্বরে কহিতে লাগিল, "দুটো দিনের পরিচয়! তা বটে! কিন্তু জানো অচলা,

"কিবা কাজ ভাবনায়, বৃথা তর্ক, কেন অনুমানে —
সাধ শুধু সুধাপান, নিন্দা কর, কি ক্ষতি আমার?"

ভ্রমরগীতি — শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

Emerald Ptg. Works

দিন; ঘণ্টা, মিনিট দিয়ে মহিমকে মাপা যায়—কিন্তু সুরেশকে যায় না। সে স্থান-কালের অতীত! তুমি ভূমিকম্প দেখেচ? যা পৃথিবী গ্রাস করে—" অচলা ব্যাধ-ভীত হরিণীর মত চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আপনার স্নানের জোগাড়—" বলিয়া পা বাড়াইতেই সুরেশ সহসা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অচলার ডান হাত ধরিয়া টান দিল। সেই উন্মত্ত ও আকস্মিক আকর্ষণ সহ্য করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নয়। সে উপুড় হইয়া সুরেশের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। ভয় ও বিস্ময় অতিক্রম করিয়া তাহার আর্ত্ত-কণ্ঠের অস্ফুট "মা গো!" আহ্বান তাহার কম্পিত ওষ্ঠপুট ত্যাগ করিতে-না-করিতে সুরেশ তাহার দুই হাত নিজের বুকের উপর সজোরে টানিয়া লইয়া ডাকিল "অচলা!"

অচলা চোখ তুলিয়া মূর্চ্ছিত মায়ামুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল এবং সুরেশও ক্ষণকালের জন্য কথা কহিতে পারিল না—শুধু তাহার অপরিমেয়, পিপাসাদগ্ধ ওষ্ঠাধর হইতে কেমন যেন একটা স্তব্ধ তীব্র জ্বালা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে থাকিয়া সুরেশ আর-একবার অচলার দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল—"অচলা, একটিবার ভূমিকম্পের এই প্রচণ্ড স্পন্দন নিজের দুটী হাতে অনুভব করে দেখ—কি ভীষণ তাণ্ডব এই বুকের ভেতরটায় তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। এ কি পৃথিবীর কোন ভূমিকম্পের চেয়ে ছোট? বল্‌তে পার অচলা, পৃথিবীতে কোন জাত, কোন ধর্ম্ম, কোন মতামত আছে, যা এই বিপ্লবের মধ্যে পড়েও ডুবে রসাতলে তলিয়ে যাবে না!"

"ছেড়ে দিন—বাবা আস্‌চেন" বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া, অচলা তাহার চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া শান্ত হইয়া বসিল, এবং পরক্ষণেই কেদারবাবু ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "তাই ত, একটু দেরি হয়ে গেল—আর এই বেয়ারা ব্যাটা যে থেকে-থেকে কোথায় যায়, তার ঠিকানা নেই। মা, অচলা,—ও কি রে, তোর কি কোন অসুখ করেচে? মুখ শুকিয়ে যেন একেবারে—"

অচলা কোনমতে একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, —"না বাবা, অসুখ করবে কেন?"

"তবু মাথা-ধরা-টরা? যে গরম পড়েচে তা—"

"না, আমি বেশ আছি বাবা, আমার কিছুই হয়নি।"

কেদারবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "তবু ভাল। মুখ দেখে আমার ভয় লেগে গিয়েছিল। তবে, তুমিই একটু দেখ দেখি মা, যদি—"

অচলা বলিল, "বেশ ত বাবা, আমি এক মিনিটে সমস্ত জোগাড় করে দিচ্চি। কিন্তু এইমাত্র আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম সুরেশবাবুকে—আমাদের এখানে নাওয়া-খাওয়া করতে ত তাঁর আপত্তি নেই?"

কেদারবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপত্তি কেন থাকবে! না—না, সুরেশ, আমি ত তোমাকে বলেইচি যে, এক দিনেই তোমাকে আমি ঘরের ছেলে মনে করেচি। এ বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী।" মেয়ের দিকে চাহিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, "আর, তাই যদি না হবে অচলা, আমাদের উদ্ধার করবার জন্য ভগবান ওঁকে পাঠাবেন কেন! কিন্তু আর দেরি করা ভাল হবে না বাবা, এসো আমার সঙ্গে—স্নানের ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে দি গে।" কিন্তু সেই যে সুরেশ, কেদারবাবু প্রবেশ করা পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করিয়া ছিল, কিছুতেই আর সে মাথা সোজা করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিল না।

অচলা বলিল, "কাজ কি বাবা পীড়াপীড়ি কোরে? আমাদের ব্রাহ্ম বাড়ীতে খেতে হয় ত ওঁর বিশেষ বাধা আছে। তা ছাড়া, অপ্রবৃত্তির ওপর খেলে অসুখ করতেও পারে।"

কেদারবাবু একেবারে মুসড়িয়া গেলেন। সুরেশ বড়-লোকের ছেলে—স্বাধীন। ঘরের গাড়ী করিয়া যাতায়াত করে। তাহাকে খাওয়াইয়া-মাখাইয়া যেমন করিয়া হৌক আত্মীয় করা যে তাঁর চাই-ই। হঠাৎ তাহার আনত মুখের একাংশে নজর পড়ায় কেদারবাবু বিস্ময়ে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ? এ হয়েচে কি সুরেশ? শুকিয়ে সমস্ত মুখখানা যে একেবারে কালীবর্ণ হয়ে গেছে! ওঠো, ওঠো, —মাথায় মুখে জল দিতে আর এক মিনিট বিলম্ব কোরো না।" বলিয়া হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর কোনমতেই কেদারবাবু এই রৌদ্রের মধ্যে সুরেশকে ছাড়িয়া দিলেন না। বিশ্রামের নামে সমস্ত

দুপুরটা একটা ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সে চোখ বুজিয়া কৌচের উপর পড়িয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘরের বাহিরে মধ্যাহ্নসূর্য্য আকাশে জ্বলিতে লাগিল, ভিতরে অসংযমের আত্মগ্লানি ততোধিক ভীষণ তেজে সুরেশের বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এম্‌নি করিয়া সমস্ত বেলাটা অন্তরে-বাহিরে পুড়িয়া আধমরা হইয়া যখন সে উঠিয়া বসিয়া সুমুখের জানালাটা খুলিয়া দিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। কেদারবাবু প্রসন্ন-মুখে ঘরে ঢুকিয়া জোর করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ—গরমটা একবার দেখেচ সুরেশ? আমার এতটা বয়সে কলকাতায় কস্মিন-কালেও এমন দেখিনি। বলি, ঘুমটুম একটু হয়েছিল কি?"

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"না, দিনের বেলা আমি ঘুমোতে পারিনে।"

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আর পারা উচিতও নয়। ভয়ানক স্বাস্থ্যহানি হয়। তবুও আমি তিন-চার বার উঠে-উঠে দেখি, তোমার পাখাওয়ালা টানচে না ঘুমোচ্ছে। এরা এত বড় সয়তান যে, যে মুহূর্ত্তে তুমি একটু চোখ বুজবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেও চোখ বুজবে। যাহোক্, একটু সুস্থ হতে পেরেচ ত! আমি নিশ্চয় জানতুম—এ রোদে বাইরে বেরুলে আর তুমি বাঁচতে না।"

সুরেশ চুপ করিয়া রহিল। কেদারবাবু ঘরের অন্যান্য জানালাগুলা একে-একে খুলিয়া দিয়া, বসিবার চৌকি-খানা কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আমি ভাবচি সুরেশ, আর গড়ি-মসির প্রয়োজন নেই। সমস্ত স্পষ্ট করে মহিমকে একখানা চিঠি লিখে দিই। কি বল?"

প্রশ্নটা সুরেশের পিঠের উপর যেন মর্ম্মান্তিক চাবুকের বাড়ি মারিল। সে এম্‌নি চমকিয়া উঠিল যে, কেদারবাবু দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য যে কি কোরে করতে হয়, সে শিক্ষা ত তুমিই আমাকে এতকাল পরে দিলে সুরেশ; এখন তোমার ত পেছুলে চল্‌বে না বাবা!"

এ ত ঠিক কথা! সুরেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আপনার কন্যারও এ সম্বন্ধে একটা মতামত নেওয়া চাই।"

কেদারবাবু অল্প হাসিয়া কহিলেন, "চাই বই কি।"

"তিনি কি স্পষ্ট করে চিঠি লিখে দিতেই বলেন?"

কেদারবাবু ইহার সোজা জবাবটা এড়াইয়া গিয়া কহিলেন, "তা' একরকম তাই বই কি। এ সব বিষয়ে মুখোমুখি সওয়াল-জবাব করাটা সকলের পক্ষেই কষ্টকর। কিন্তু সে ত বড় হয়েচে; রীতিমত শিক্ষাও পেয়েচে;—এ সকল ব্যাপার দিন থাক্‌তে পরিষ্কার করে না নিলে, এর পাগ্‌লামিটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, এ ত সে বোঝে! তাই ভাবচি, আজ রাত্রেই কাজটা সেরে ফেল্‌ব।"

সুরেশ ম্লান হইয়া কহিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন? দু'দিন চিন্তা করাও ত উচিত।"

কেদারবাবু বলিলেন, "এর ভেতরে চিন্তা কোরব আর কোন্‌খানে? ওর হাতে মেয়ে দিতে পারব না, সে নিশ্চয়;—তখন এই বিশ্রী ব্যাপারটা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ত মঙ্গল।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল "আমার উল্লেখ করাও কি প্রয়োজন?"

কেদারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "বুড়ো হয়েচি, এটুকু বিবেচনাও কি আমার নেই, মনে কর? তোমার নাম কোন দিনই কেউ তুল্‌বে না।" সুরেশের মুখ দিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস পড়িল; কিন্তু সে আর কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই নিঃশ্বাসটুকু কেদারবাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সুরেশের আরও দু'-একটা আচরণ ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়া মনে-মনে একটা অনুমান খাড়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে অন্ধকারে একটা ঢিল ফেলিলেন; কহিলেন, "মস্ত উপকার আমাদের যেমন তুমি করলে, বাবা, কিন্তু এর চেয়েও বড় উপকার তোমার কাছে আমরা দু'জন প্রত্যাশা করচি। আমরা ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু সে রকম ব্রাহ্ম নয়। আর আমার মেয়ে ত তার মায়ের মত মনে-মনে হিন্দুই রয়ে গেছে। সে আমাদের ব্রাহ্মগিরি-টিরি একে-বারেই পছন্দ করে না।"

সুরেশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার এই নীরব ঔৎসুক্য কেদারবাবু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তাই, মেয়েকে আমি কিছুতেই চিরকাল আইবুড় রাখতে পারব না। এ বিষয়ে আমি তোমাদের মতই সম্পূর্ণ হিন্দু-মতাবলম্বী। একটি সম্বন্ধ

যেমন তোমা হতে ভেঙ্গে গেল সুরেশ, তেমনি আর একটি তোমাকেই গড়ে তুলতে হবে বাবা।"

সুরেশ কহিল, "যে আজ্ঞে; আমি প্রাণপণে চেষ্টা কোরব।"

তাহার মুখের ভাব পড়িতে-পড়িতে কেদারবাবু সন্দিগ্ধ-স্বরে কহিলেন, "সমাজে এই নিয়ে যথেষ্ট গোলযোগ হবে দেখতে পাচ্চি। কিন্তু যত শীঘ্র পারা যায়, অচলার বিয়ে দিয়ে এই সব আলোচনা থামিয়ে ফেল্‌তে হবে। তবে, একটা শক্ত কথা আছে, সুরেশ।" বলিয়া একবার দরজার বাহিরে চাহিয়া, আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিলেন, "শক্ত কথা হচ্চে এই যে, পাত্র রূপেগুণে ভাল হলেই যে হিন্দু সমাজের মত তাকে ধরে এনে মেয়ে দিতে পারব, তা নয়। ও চিরকাল যে শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেচে, তাতে ওর অমতে কিছুই করা যাবে না। কিন্তু মত সে কোন মতেই দেবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দু'জনের মধ্যে এমন একটা-কিছু—বুঝ্‌লে না সুরেশ?"

কথাবার্ত্তার মধ্যেই সুরেশ কতকটা যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রণয়-ইঙ্গিতটা যেন আর-একবার নূতন করিয়া আঘাত করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। দুপুর বেলার তাহার নিজের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়-নিবেদনের বীভৎস, উৎকট আচরণ স্মরণ হওয়ায়, নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখখানা তাহার রাঙ্গা না হইয়া একেবারে কালী-বর্ণ হইয়া গেল; এবং সকালের যে খবরের কাগজখানা এতক্ষণ পায়ের কাছে মেজেতে পড়িয়া ছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনের পাতাটার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কেদারবাবু ইহা দেখিতে পাইলেন, এবং এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া, মনে-মনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন; এবং সুযোগ বুঝিয়া একটা বড়রকম চাল চালিয়া দিলেন। কহিলেন, "আমি বরাবর এই বড় একটা আশ্চর্য্য জিনিস দেখে আসচি সুরেশ, যে, কেন জানিনে, একটা লোককে আজন্ম কাছে পেয়েও একতিল বিশ্বাস হয় না, আর, একটা মানুষকে হয় ত দু'ঘণ্টা মাত্র কাছে পেয়েই মনে হয়, এর হাতে নিজের প্রাণটা পর্য্যন্ত সঁপে দিতে পারি। মনে হয় যেন জন্মান্তরের আলাপ—শুধু দু'ঘণ্টার নয়। এই যেমন তুমি। কতক্ষণেরই বা পরিচয় বল দেখি?"

ঠিক এম্‌নি সময়ে অচলা ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেশ মুহূর্ত্তের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার সংবাদপত্রের প্রতি মনঃ-সংযোগ করিল।

"বাবা, তুমি এবেলা চা, না কোকো খাবে?"

"আমি কোকোই খাব মা।"

"সুরেশ বাবু, আপনি চা খাবেন ত?"

সুরেশ কাগজের দিকে চোখ রাখিয়াই অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমাকে চা-ই দেবেন।"

"আপনার পেয়ালায় চিনি কম দিতে হবে না ত?"

"না, আর পাঁচজন যেমন খায়, আমিও তেমনি খাই।"

অচলা চলিয়া গেল। কেদারবাবু তাঁহার ছিন্ন প্রসঙ্গের সূত্র-যোজনা করিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, "এই দেখ না সুরেশ, আমার এই মা টির জন্যেই যে এই বুড়ো-বয়সে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েচি, সে কথা তোমার কাছে ত গোপন রাখতে পারলুম না! নইলে, নিজের দুর্দ্দশা-দুরবস্থার কাহিনী সহজে কি কেউ অপরের কাণে তুল্‌তে পারে? কখনো যা পারিনি, এত বন্ধু-বান্ধব থাক্‌তে সে কথা শুধু তোমার কাছেই বল্‌তে কেন সঙ্কোচ বোধ হচ্চে না? এর কি কোন গূঢ় কারণ নেই মনে কর!"

সুরেশ বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। কেদারবাবু বলিতে লাগিলেন, "এ ভগবানের নির্দ্দেশ—সাধ্য কি গোপন করি? আমাকে বল্‌তেই হবে যে!" বলিয়া চৌকির হাতলের উপর তিনি সজোরে একটা চাপড় মারিলেন।

কিন্তু, তাঁহার এই বিস্তৃত ভূমিকা সত্ত্বেও তাঁহার দুর্দ্দশা-দুরবস্থাটা যে মেয়ের জন্য কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সুরেশ আন্দাজ করিতে পারিল না। কেদারবাবু তখন সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া তাঁহার অমন অর্ডার-সপ্লায়ের ব্যবসাটা নিছক প্রবঞ্চনা ও কৃতঘ্নতার আগুনে পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেলেও, তিনি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবং ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া গেলেও একমাত্র কন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ব্যয়-সঙ্কোচ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, গুটি-পাঁচ-ছয় ডিক্রি-জারির ভয়ে তাঁহার আহার-বিহার বিসময়, এবং খুচরা

ঋণের তাগাদায় জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিলেও, তিনি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না। অথচ, এই কলিকাতা সহরেই এমন অনেক বন্ধু আছেন, যাঁহারা টাকাটা অনায়াসেই ফেলিয়া দিতে পারেন।

একটুখানি থামিয়া, কি যেন চিন্তা করিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, তোমাকে যে জানালুম—এতটুকু দ্বিধা সঙ্কোচ হোলো না—এ কি শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট আদেশ নয়?" বলিয়া পরম ভক্তিভরে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন।

সুরেশের ভগবানে বিশ্বাস ছিল না,—সে বৃদ্ধের উচ্ছ্বাসে যোগ দিল না। বরঞ্চ, তাহার মনটা কেমন যেন ছোট হইয়া গেল। ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ঋণ কত?"

কেদারবাবু বলিলেন, "ঋণ? আমার ব্যবসাটা বজায় থাক্‌লে কি এ আবার একটা ঋণ! বড়-জোর হাজার তিন-চার।" তিনি আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এম্‌নি সময়ে অচলা বেহারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিল।

কেদারবাবু গরম কোকো এক চুমুকে খানিকটা খাইয়া লইয়া, হর্ষসূচক একটা অব্যক্ত নিনাদ করিয়া, পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ সুরেশ, আমার ওপর ভগবানের এই একটা আশ্চর্য্য কৃপা আমি বরাবর দেখে আস্‌চি যে, তিনি কখনো আমাকে অপ্রস্তুত করেন না। মহিমকে কথাটা বলি বলি করেও যে কেন বল্‌তে পারতুম না—তিনি বরাবর আমার যেন মুখ চেপে ধরতেন—এত দিনে সেটা বোঝা গেল!" বলিয়া আর একবার কপালে হাত ঠেকাইয়া তাঁহার অসীম দয়ার জন্য নমস্কার করিলেন।

সুরেশ তাহার পেয়ালাটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "টাকাটা কবে আপনার প্রয়োজন?"

কেদারবাবু মুখ হইতে কোকোর পেয়ালাটা পুনরায় নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "প্রয়োজন আমার ত নয় সুরেশ, প্রয়োজন তোমাদের।" বলিয়া একটুখানি উচ্চ অঙ্গের হাস্য করিলেন। হেঁয়ালিটা বুঝিতে না পারিয়া সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল অচলা জিজ্ঞাসু মুখে পিতার মুখের পানে চাহিয়া আছে। তিনি একবার কন্যার মুখে, একবার সুরেশের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "এর মানে বোঝা ত শক্ত নয়। বাড়ীটা আমি ত সঙ্গে নিয়ে যাবো না! যায় তোমাদেরই যাবে, আর থাকে তোমাদের দু'জনেরই থাক্‌বে।" বলিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

দু'জনের চোখোচোখি হইল,—এবং চক্ষের পলকে উভয়েই আরক্ত মুখে মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল।

পেয়ালা-দুই কোকো নিঃশেষ করিয়া কেদারবাবুর এক-খানা জরুরি চিঠি লেখার কথা স্মরণ হইল। অবিলম্বে উঠিয়া দাড়াইয়া কহিলেন, "আজ তোমার খাওয়ার ভারি কষ্ট হল, সুরেশ, কাল দুপুর-বেলা এখানে খাবে—" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পশ্চিম দিকের দরজাটা খুলিয়া তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

খোলা দরজা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যের এক ঝলক রাঙা আলো সুরেশের মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে ঘাড় ফিরাইয়াই দেখিতে পাইল, অচলা তাহার প্রতি এক-দৃষ্টে চাহিয়া আছে,—সেও দৃষ্টি অবনত করিল। মিনিট দুই বড় ঘড়িটার খট্‌-খট্‌ শব্দ ছাড়া সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

[ক্রমশঃ]

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

অনাথ-বন্ধু—১৩২৩, কার্ত্তিক

এই নবপ্রকাশিত মাসিক-পত্রখানি হাতে করিয়া ইহার মলাটের নীচের দিকে চাহিবামাত্র গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল! এ কি দেখিতেছি?—বাঙ্গালা মাসিকের 'বার্ষিক মূল্য দশ টাকা!'

দারিদ্র্য দেশের বুকে দিন-দিন চাপিয়া বসিতেছে।—এমন সময়, এই দুর্দ্দিনে এরূপ বহুমূল্য মাসিকের আবির্ভাব দেখিয়া তাহার অর্থ-নির্ণয়ের জন্য কাগজখানির ভিতর দিকটাও একটু উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলাম, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। Quantity বা Quality এই দুইয়েরই ইহাতে সমান দৈন্য দেখিলাম! আকারে ইহা যেমন, প্রকারেও ইহা তেমনি!

কাগজখানির পত্র-সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ;—এই পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মধ্যে আটখানি পৃষ্ঠা কেবল হিন্দী লেখা ও সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ। ইহা ছাড়া, 'মুষ্টিযোগ', 'টোট্‌কা ঔষধ' ও 'সচিত্র পেঁপে' প্রভৃতির উপদ্রবও ইহাতে বিলক্ষণ আছে! অতএব, এই লেখার জন্য,—যাহা 'আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ' বা 'স্বাস্থ্য সমাচারে'র পাতা খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার জন্য যে এই কাগজ কেহ দশ টাকা খরচ করিয়া কিনিয়া পড়িবে, এ কথা স্বপ্নেও মনে হয় না!

আর ছবি?—তাহার অবস্থাও 'তথৈবচ'। যে চারিখানি চিত্র ইহাতে আছে, তাহার মধ্যে একখানি হইতেছে উপরি-উক্ত পেঁপে গাছের! এবং আর দুইখানি ঠাকুর-দেবতার ছবি হইলেও খুব সম্ভব তাহা ক্ষুদ্র পঞ্জিকা হইতে সংগৃহীত। কারণ, আকারের প্রতিযোগিতায় এ দুইখানি ছবিই বোধ করি দেশলাইয়ের বাক্সের ছবির কাছেও হার মানিয়া যায়!

তবে কি কোন বিশেষত্ব ইহাতে নাই?—আছে! সে বিশেষত্ব ইহার—"দিন-পঞ্জিকা"।—এক পয়সার পকেট-পঞ্জিকার অভাব দুর করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ ইহা 'অনাথ-বন্ধু'তে ছাপা হইয়াছে! কিন্তু ইহার লোভে পড়িয়া যে কেহ দশ টাকা খরচ করিয়া এ কাগজের গ্রাহক হইবে, এমন আশা কি করা যায়?

এই সব দেখিয়া-শুনিয়া নিজের চক্ষুর উপর সন্দেহ জন্মিল। তখন চক্ষু দুইটি ভাল করিয়া মুছিয়া 'অনাথ-বন্ধু'র মলাটের নীচের দিকে আবার চাহিলাম; এবারেও কিন্তু সেই লেখা—"অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ টাকা!" ভাবিলাম, এ কি রহস্য,—না, বিদ্রূপ?

এমন সময় সহসা মনে পড়িল যে, ধর্ম্মের নামে এ দেশে হাত পাতিলে এমন কাগজের জন্য দশটাকা কেন,—দুইশত টাকা দিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হইতে না পারেন! হইয়াছেও তাহাই! এই "অনাথ-বন্ধু" পত্র 'অন্নপূর্ণা-আশ্রমে'র সাহায্যার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, উক্ত নামধেয় কোনও আশ্রমের অস্তিত্ব সমগ্র ভারতবর্ষ হাতড়াইয়া বেড়াইলেও কেহ খুঁজিয়া পাইবেন না,—বর্ত্তমানে উহা শুধু পরিচালক মহাশয়ের মস্তিষ্ক মধ্যেই বিরাজ করিতেছে; কিন্তু ইহার এই নিরাকার অবস্থাতেই ইহার পরিপুষ্টির জন্য অর্থের প্রয়োজন! তাই জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহের উপায় স্বরূপ এ কাগজখানির মূল্য দশ রুপেয়া ধার্য্য হইয়াছে! 'অন্নপূর্ণা-আশ্রম'—অর্থাৎ এই নামে যে পদার্থ ভবিষ্যতে তৈয়ারী হইবে, তাহার যে উদ্দেশ্য এখন কাগজে-কলমে বিবৃত হইয়াছে, তাহা পড়িলে অনেকেরই প্রাণ গলিয়া যাইতে পারে! সে উদ্দেশ্য এই যে,—'উক্ত আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্রই আপন-আপন সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া নিজের ও আশ্রমের সেবা করিবে।'—এ সকল লম্বা-চওড়া কথার বাহার দেখিয়া আমাদের কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র 'ধর্ম্ম-ভবনে'র কথাই কেবল মনে পড়িতেছে!—মাঝে-মাঝে ভাবিতেছি,—ভগবান্, এমন সব দয়ার শরীরকে কি কেবল এই অধম বাঙ্গালা দেশেই পাঠাইতে হয়!

শুধু জন-সাধারণ নহে;—দেশের অর্থশালীদেরও দোহন করিবার উৎকৃষ্ট উপায় ইহাতে উদ্ভাবিত হইয়াছে! যে কোনও বদান্য ব্যক্তি পাঁচশত মুদ্রা ফেলিতে পারিবেন, তাঁহার জীবন-কথা ও রঙ্গীণ চিত্র এই 'অনাথ-বন্ধু'তে প্রকাশিত হইবে। আরও একটি লোক-হিতকর কার্য্যে এই কাগজ-পরিচালক মহাশয় প্রাণপাত করিতেছেন—সেটি ভারতীয় অভিজাতবর্গের 'য়্যালবাম'-প্রকাশ। মাত্র তিনশত টাকা খরচ করিলেই যে কেহ উক্ত পুস্তকের (এটিও 'অন্নপূর্ণা আশ্রমে'র মত মস্তিষ্ক মধ্যেই বসবাস করিতেছে—কি চমৎকার মস্তিষ্ক!) এক কাপি পাইতে পারিবেন! অতএব, দেখা গেল যে, উক্ত মহোদয় শুধু অনাথ-বন্ধু নহেন,—ধনবানেরও বন্ধু বটেন!

এই 'অন্নপূর্ণা-আশ্রম'রূপ স্বর্ণ-সৌধ কবে নির্ম্মিত হইবে, বলিতে পারি না। উদ্যোক্তা মহাশয়ের বয়স এখন সত্তর—বাইবেলের মতে সাধারণ মানুষের আয়ুঃ তিনি পার হইয়া গিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি জীবিত কালেই এ আশ্রমটি দেখিয়া যাইতে পারিবেন?

মানসী ও মর্ম্মবাণী—ফাল্গুন, ১৩২৩

রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহা আলোচনা নহে।—১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের যে কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাই এই "রবীন্দ্র-নাথ"-প্রসঙ্গ নাম দিয়া বাহির হইয়াছে।—ধন্য ৭ই অগ্রহায়ণ!

এখন কথা হইতেছে, বৈঠকখানার সকল কথাই কি পাঠক-সমাজে প্রকাশ-যোগ্য? এই রচনার এক স্থানে আছে,—"চন্দ্রনাথ বাবুকে

বঙ্কিমবাবু সাহিত্য হিসাবে যে বিশেষ খাতির করিতেন, তাহা নহে। একদিন আমি বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম,—'আচ্ছা, আপনি এইটি মানে করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন দেখি;—অনন্ত নীলাকাশে অনন্ত পক্ষী অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া অনন্ত স্বরে অনন্ত প্রতিধ্বনি জাগাইয়া—ইত্যাদি; তিনি বলিলেন—'আপনিও যেমন; ওর মাথামুণ্ডু কিছুই মানে হয় না।'—চন্দ্রনাথ বাবু অনেক লিখিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই রহিল না, তাঁহার লেখার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা দিন কতকের জন্যও টিকিতে পারে।...চন্দ্রনাথবাবু হিন্দু ছিলেন সত্য, কিন্তু ভূদেব বাবুর মত wide out look, সে রকম philosophic depth তাঁহার ছিল না।"—চন্দ্রনাথবাবু এখন স্বর্গারূঢ়, বঙ্কিমচন্দ্রও নাই;—চন্দ্রনাথের লেখার 'মাথা-মুণ্ড' আছে কি না, এবং বঙ্কিম তাঁহাকে 'সাহিত্য হিসাবে' সম্মান করিতেন কি না, এ সকল কথার যাথার্থ্য কে প্রমাণ করিবে? রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বাবুকে অনেক বিদ্রূপ করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু আজ তিনি যাঁহার লেখার মধ্যে 'এমন কিছুই নাই' বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, অনেক দিন পূর্ব্বে (১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসের ভারতী ও বালকে) সেই রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু পরম ভাবুক, জ্ঞানবান ও সহৃদয়। তাঁহার শকুন্তলা-সমালোচন তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। আমি যতদূর জানি বাঙ্গলায় এরূপ গ্রন্থ আর নাই।" পাঠকগণ এখনকার আর তখনকার কথা মিলাইয়া দেখিবেন কি? কোনও যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়া তাঁহার 'Philosophic depth' সম্বন্ধে অমন মন্তব্য প্রকাশ করাটা কি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বা চন্দ্রশেখরের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বক্তৃতা' দুঃখজনক হইলেও কোন রকমে হজম করা চলে; কিন্তু চন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার ঐ বক্র কটাক্ষ কি পরিপাক করা যায়? চন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু আর কেন? তাঁহার 'Philosophic depth' এর কাছে রবীন্দ্রবাবুর যুক্তি-তর্ক যে বহুবার আছাড় খাইয়াছিল, তাহা জানি; কিন্তু সে রাগ কি এখনও পুষিয়া রাখিতে আছে? বঙ্কিমচন্দ্র একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার একটি তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সেই সমালোচনা পুনঃ প্রকাশের সময় বঙ্কিমবাবু লেখেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন তাহা পারা যায় না।...অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি।"—এ সৌজন্যের—এ উদারতার অনুকরণ করা কি আমাদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য? রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে চন্দ্রনাথ বাবুর এক লেখার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি নাকি বলিয়াছিলেন,—"ওর মাথা-মুণ্ড কিছুই মানে হয় না।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমবাবু জীবিত থাকিয়া যদি আজ রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি" পড়িতেন, তাহা হইলে ও রকম উত্তর না দিয়া হয়ত তিনিও বলিতেন,—"উহাতে বুঝিবার কিছুই নাই—ও যে কেবল গন্ধ!"

আসল কথা, এ রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই শুধু আমরা দোষ দিই না;—দোষ তাঁহারই বেশী, যিনি ইহা মাসিকের পৃষ্ঠায় জাহির করিয়াছেন। প্রতিভা বলিয়া কি প্রতিভার হুঙ্কারকেও পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? শুধু নিন্দা নহে,—ভুলও ইহাতে আছে। নব-বঙ্গদর্শনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—"সমালোচনা করিতে আমি একেবারেই রাজি ছিলাম না। শৈলেশ যখন সমালোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, আমি বলিলাম, 'আমি সমালোচনা করিব না; যদি সমালোচনা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা কর, তাহা হইলে তুমি আলাদা লোক ঠিক কর, তাঁহার স্বাক্ষর দিয়া সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। শৈলেশের প্রস্তাবে চন্দ্রশেখর বাবু রাজি হইয়াছিলেন।"—কিন্তু 'বঙ্গদর্শনে'র ফাইল খুলিয়া দেখিলে রবীন্দ্র বাবুর এ উক্তি সত্যের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়! গ্রন্থ সমালোচনার ভার চন্দ্রশেখর বাবুর হাতে পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' যে "মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা চন্দ্রশেখর বাবুর লেখা নহে।—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাহা লিখিয়াছিলেন।

নারায়ণ—মাঘ, ১৩২৩

কমলের দুঃখ।—ইহা প্রবন্ধ নহে,—ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। ইহা শুধু কমলের দুঃখ নহে—পাঠকেরও দুঃখ! এমন কুরুচিপূর্ণ গল্প এই 'নারায়ণ' ব্যতীত অন্য কোথাও দেখি নাই। এমন কদর্য্য লেখা বোধ করি, 'নারায়ণে'র এই লেখক ব্যতীত আর কেহ লিখিতেও পারেন না! যাঁহাদের সন্দেহ হয়, তাঁহারা ১৩২২ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'নারায়ণে' প্রকাশিত "হাসির দাম" পড়িবেন,—এই সংখ্যার ২৩৬ পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিবেন। আমরা সে সব লেখা উদ্ধৃত করিয়া 'ভারতবর্ষে'র বক্ষ কলঙ্কিত করিব না!

'মনুষ্য-হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও যে তদ্রূপ', এ কথা আমরা জানি। কিন্তু বঙ্কিমের ভাষাতেই বলি যে, 'নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কোন্ ভাগ বর্জ্জনীয়, কোন্ ভাগ অবলম্বনীয়, তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন, তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।' বেশ্যা-চরিত্র লইয়া এমন কে কি ছবি আঁকিবেন, যাহা গিরিশ-রচিত নাটকে নাই! থাক, চিন্তামণি হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি উজ্জ্বলা, কুমুদিনী প্রভৃতি নানারকম বারাঙ্গনার ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সব চিত্রের একখানিও মানুষের মনে লালসার উদ্রেক করে না; বরং পাপের প্রতি ঘৃণাই জন্মাইয়া দেয়। প্রকৃত artistএর ইহাই কাজ। গিরিশচন্দ্রের মুখেই শুনিয়াছিলাম—'ইয়োরোপে একজন উচ্চ শিল্পী কামের ছবি প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়াছেন। মূর্ত্তি একটি পরমা সুন্দরী রমণীর। রমণী নগ্না, কিন্তু হাব-ভাব এত ঘৃণার উদ্দীপক যে, সে মূর্ত্তি দর্শনে অতি বড় কামুকের হৃদয় হইতেও

কাম-ভাব তিরোহিত হয়।'—এরূপ ঘৃণিত ছবি আঁকিতে পারা যে সম্ভব, তাহা আমরা গিরিশের সৃষ্ট বারাঙ্গনা-চরিত্র দেখিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু 'নারায়ণে'র লেখক ঠিক ইহার উল্টা পথে চলিয়াছেন। তিনি চিনি মাখাইয়া বিষের বড়ি পাঠক-সমাজে আমদানী করিতেছেন! তাঁহার অঙ্কিত বেশ্যা-চরিত্র বটতলার পুস্তকেও শোভা পায় না!

শুনিতে পাই, এমন বাস্তববাদীও এক-আধজন এদেশে আছেন, যাঁহারা এরূপ রচনার পক্ষপাতী। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, মানুষের মনের সকল অবস্থার সকল চিত্রই অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে চিত্র অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু এ কথার কোনও মূল্য আছে, মনে করি না। যাহা অশ্লীল ও হেয়, তাহা কোনও মতে কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। 'আসল কথা, বাস্তববাদীগণ নিজেদের শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারাই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তি বশতঃ ইঁহারা Real ও অশ্লীল এই দুইটা জিনিষকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন;—যেন Real হইলেই অশ্লীল।* কিন্তু তাঁহাদের ধারণা যাহাই হউক, দেশের পক্ষে যে এ জিনিষ বিষম অস্বাস্থ্যকর, এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্ততঃ দেশের মুখ চাহিয়াও 'নারায়ণে'র এ জিনিষ বন্ধ রাখা উচিত।

বাঙ্গালার গীতি-কবিতা—গীতি-কবিতা, অলঙ্কার-শাস্ত্র, ন্যায়-শাস্ত্র, ব্যবস্থা-শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ, এই কয়টা জিনিষ বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া বিলক্ষণ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।—এই কয়টা জিনিষই বাঙ্গালার গৌরব। যদি কোনও জাতি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের বাঙ্গালী জাতি এমন কি জিনিষ লিখিয়াছেন, যাহা আমাদের পড়িবার যোগ্য বা শিখিবার যোগ্য?—তাহা হইলে আমরা ঐ পাঁচটা জিনিষেরই নাম করিতে পারি। জোর গলায় বলিতে পারি যে, পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির মধ্যেই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত, বিশ্বনাথ-কুল্লুকভট্ট, রঘুনন্দন-জগন্নাথ, চক্রদত্ত-মাধবকর জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহারা যে রত্ন-রাজি আমাদের উপহার দিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীতে তাহার তুলনা হয় না।

ঐ পাঁচটি বিষয়ের একটিকে অবলম্বন করিয়া, এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহার 'অভিভাষণ' লিখিয়াছেন। সে বিষয়টি—বাঙ্গালার গীতি-কবিতা। গীতি-কবিতা সম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ খুব কম একটা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভাবে ভাষায় ইহা চমৎকার হইয়াছে। বাঙ্গালা গীতি-কবিতার খাঁটি সুরটি যে কি, সভাপতি মহাশয় তাহা বেশ মিষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এবং ঐ খাঁটি সুর হইতে যে বাঙ্গালার আধুনিক গীতি-কবিরা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িতেছেন, সে কথাও তিনি আভাষে-ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। ইহাতে ভাবিবার ও জানিবার যোগ্য অনেক কথাই আছে।

সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন,—"চণ্ডীদাসের সময় সেই গীতি-কাব্যের বিকশিত অবস্থা। কিন্তু তার আগে অনেক গীতি-কাব্য না লেখা হইয়া থাকিলে এরূপ কবিতা সম্ভব হয় বলিয়া আমার মনে হয় না।"—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যতটুকু জানি, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালা গীতি-কবিতার জন্ম—

"ললিত লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল মলয় সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীরে";

জয়দেবের নিকট সকল বৈষ্ণব কবিই ঋণী। 'গীত-গোবিন্দ' পড়িবার সময় কেবলই মনে হয়, তাহার আগাগোড়া যেন এই কথাই বলিতেছে,—'শ্যাম নামে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, শিরায়-শিরায় শোণিত ছুটে, প্রত্যেক ধমনী কাঁপিয়া উঠে;—আমার বক্ষ বিস্ফারিত হয়, লক্ষ্য বিচলিত হয়, চিত্ত এবং চক্ষে চাঞ্চল্য চমকে। আমি শ্যাম দেহে দেহ মিলাইয়া শ্যামের সহিত এক হইব।—শ্যাম-সৌন্দর্য্য সাগরে শরীর ডুবাইব।'—গীতগোবিন্দের এই ভাব সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে জড়ান-মাখান আছে। পরিসর অল্প; নহিলে দেখাইতাম, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেরও এমন অনেক লাইন আছে, যাহা জয়দেব হইতে গৃহীত।

সভাপতি মহাশয় বাঙ্গালা গীতি-কবিতার যে প্রাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া কেহ-কেহ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রও এক দিন এ কথাই আর একরকম করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া ছিলেন,—"এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গা-তীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষ কাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচি-বিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন-হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকর-মালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেন্দায় বসিয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগী-রথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম। এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম।"—এই কথাই দাশ মহাশয় কতকটা কবিত্বের ঢংএ ফেলিয়া বলিতেছেন,—

"চম্পক-বরণী, হরিণ-নয়নী * * *
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর।"

* সাহিত্য—পঞ্চম বর্ষ।

—ইহাই বাঙ্গালা গীতি-কবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক, আর নাই জানুক, বুঝুক, আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গালার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে।"

এই 'অভিভাষণের আর একটি কথা লইয়া গোল উঠিয়াছে; সে কথাটি—'রূপান্তর'। ইংরাজীতে যাহাকে Transfiguration বলে, সভাপতি মহাশয় তাহারই বাঙ্গালা করিয়াছেন—'রূপান্তর'। প্রেমের প্রথম কথা—'আমি তোমার'; তার পর হয়—'তুমি আমার'; শেষে দাঁড়ায়—'আমিই তুমি'।—ইহারই নাম রূপান্তর। এই অর্থেই এ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, মনে হয়। বৈষ্ণব-কবিতা এই রূপান্তরের অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

'অভিভাষণে'র একস্থানে আছে,—"একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাসকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।"—কথাটি বর্ণে-বর্ণে সত্য। তবে সত্য হইলেও এ কথা এমন জোর-গলায় চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্বে আর কেহ বোধ করি বলেন নাই। শুধু তাহাই নহে। এ কবিওয়ালাদের নাম করিতে গিয়া বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই এক-একবার নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, সেই কবিওয়ালাদের নামও সভাপতি মহাশয় নিজ 'অভিভাষণ' মধ্যে সগৌরবে গাঁথিয়া দিয়াছেন।

তার পর, আশার কথা শুনাইয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার 'অভিভাষণ' শেষ করিয়াছেন। উপসংহারে বলিতেছেন,—

"বাঙ্গলা জাগিতেছে। দিনের নাগাল পাইবই পাইব। আবার সেই বাঙ্গালা কবিতা শুনিব। সে সাধক আসিবেই আসিবে। আমি যে তাহার আগমনীর সুর শুনিতে পাইতেছি।"—আশার কথাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল—একমাত্র সান্ত্বনা। আশা করি, চিত্তরঞ্জনের আশা নিরাশায় পরিণত হইবে না।

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, বি-এ]

হিন্দী

সরস্বতী, ডিসেম্বর, ১৯১৬।

"জীবিকা ঔর নাগরিক জীবন।"—লেখক, গোপালনারায়ণ সেন সিংহ, বি-এ। ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের আদি আচার্য্য ও এ দেশের রাষ্ট্রীয়তার জন্মদাতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে বলেন—"ভবিষ্যতে দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্রের আবশ্যকতা বাড়িয়া যাইবে। সেই সময় গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যদি আমরা শুধু কৃষি দ্বারাই পূরণ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই পরিণাম হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, কৃষি ব্যতীত জীবিকা অর্জ্জনের অন্য পন্থার আবিষ্কার করা। দেশের লোকদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা ভিন্ন-ভিন্ন উপায়ে অর্থাগমের চেষ্টা করে। অর্থাৎ যাহাতে ব্যবসায় ও নাগরিক জীবনের প্রসার হয়, সেই চেষ্টা দেখা উচিত।"

আজকাল আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রামের অধিক সংখ্যক লোকই কৃষির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এরূপ লোকের সংখ্যা প্রতি দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে জমির আয়তনের কোনও বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হইতেছে না। এই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। ১৯০০ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে জমীহীন, নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য চাষীর সংখ্যা ১,৬৭,৩৬,০০০ বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে গ্রামের অলস জীবন হইতে উদ্ধার করিয়া নগরে আনয়ন পূর্ব্বক বিবিধ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা উচিত। এতগুলি হৃষ্টপুষ্ট শ্রমজীবীর উদ্যম ও ক্ষমতা কাজে লাগাইবার কোনও সুবিধা না হওয়ায় দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে।

বস্তুতঃ কার্য্যের অভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ,—অন্নের অভাব নহে। যে বৎসর ফসল হয় না, সে বৎসর চাষাগণ বেকার বসিয়া থাকে—কাজ পায় না। অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা না পাওয়ায় অন্ন ক্রয় করিতে পারে না। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ হয়। কোটি-কোটি লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অথচ সেই বৎসরই ২,২৪,০০,০০০ মণ চাল কলিকাতা হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হয়। আসল কথা এই যে, অন্নের অভাব এ দেশে হয় না—অন্ন ক্রয় করিবার মূল্যের অভাবেই চাষারা কষ্ট পায়। এক বৎসর অজন্মা হইলে চাষাগণ রিক্তহস্ত হইয়া বসে।

সেই জন্য সরকার হইতে কতকগুলি ব্যবসায় খুলিয়া দেওয়া উচিত। যখন ফসল কাটা হইবে ও কৃষকগণের হাতে কাজ থাকিবে না, সে সময় তাহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত অথবা পৃষ্ঠপোষিত এই সকল Subsidiary Industriesএ কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। ইহাতে দুইটি মঙ্গল সাধিত হইবে—১। উত্তম ফসল হইলেও লোকে অবসর সময়ে কাজ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে পারিবে; ২। দেশের শ্রমশিল্প সকল উন্নতিলাভ করিবে।

কিন্তু এ জন্য একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। সেটা হইতেছে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা। একটি জনসঙ্ঘ এক স্থানে বাস করিয়া আপনাদের ভিন্ন-ভিন্ন রুচি, যোগ্যতা ও পুঁজি অনুসারে

পরস্পরকে সহায়তা করিতে না শিখিলে—কোনও শিল্প বা ব্যবসায়-কার্য্যে উন্নতি হইতে পারে না। ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্ম নগরের ও নাগরিক জীবনের বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে নগরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এক লক্ষ অধিবাসীসম্পন্ন নগরের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ।

অবশ্য নগর-বাসের অনেক অসুবিধা আছে। আর আমরা পাশ্চাত্য দেশের সহরগুলির ইতিহাস হইতে দেখিতে পাই—এক সময় সেখানকার শ্রমজীবিগণ কি শোচনীয় জীবন যাপন করিত। কিন্তু আজকাল civics নামক নগর-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইতেছে, আর অধ্যাপক Geddes নগরের ভবিষ্যত উন্নতির যে আদর্শ আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন—তাহাতে আশা করা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশের প্রথম অবস্থার অসুবিধাগুলি আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না।

জাতীয় চরিত্রের উপর নাগরিক জীবনের প্রভাব মনে রাখা উচিত। গ্রামে জীবন-সংগ্রাম ততটা জটিল নয়—অভাবও কম; অল্পতেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকে। তাই সেখানকার লোক নিরীহ, অল্পে সন্তুষ্ট, নিরক্ষর, ভীরু, সাহসহীন এবং মানুষের অধিকারগুলির প্রতি উদাসীন হয়। সহরে আসিয়া প্রথম হইতেই সংগ্রাম করিতে হয়। তাহাতে চরিত্রে দৃঢ়তা আসে, আত্ম-ক্ষমতায় আস্থা আসে ও civic অধিকার পাইবার স্পৃহা বলবতী হয়।

২। সরস্বতী, জানুয়ারী ১৯১৭—

"পণ্ডিত বিশননারায়ণ দর"—লেখক শ্রীজ্বালাদত্ত শর্ম্মা। গত ১৯শে নভেম্বর প্রসিদ্ধ দেশ-সেবক ও সাহিত্য-রথী পণ্ডিত বিশন-নারায়ণ দর পরলোকে গমন করিয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক আকাশের আর একটি জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল।

পণ্ডিত বিশননারায়ণ দর ১৮৬৪ খৃঃঅব্দে বড়বাঁকি জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে উর্দ্দু ও ফারসী ভাষাদ্বয় শিক্ষা করেন। তার পর ইংরাজী শিখিবার ইচ্ছা হওয়ায় এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হন। এণ্ট্রান্স ক্লাসেই ইনি ইংরাজী ভাষায় এরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন যে, কার্লাইলের Hero and Hero worship গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেন। স্মাইলের সুপ্রসিদ্ধ নীতি-পুস্তকগুলি ইনি নীচের ক্লাসে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া লক্ষ্নৌ-ক্যানিং কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইনি বিলাত গমন করেন। সেখানে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যয়নেই অধিক সময় ব্যয় করিতেন, এবং তাহার ফলে এমন সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন যে, সে সময় মিঃ এন্. এন্ ঘোষ ব্যতীত আর কেহই বোধ হয় সেরূপ ইংরাজী লিখিতে পারিতেন না। লণ্ডনের অনেক পত্রিকাতেই ইহার লেখা বাহির হইত।

পণ্ডিত বিশননারায়ণ ১৮৮৭ খৃঃঅব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও কাশ্মীরি পণ্ডিত বিলাত যান নাই। একদল লোক দর মহাশয়কে জাতিচ্যুত করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দর মহাশয় তাঁহাদের তুচ্ছ করিয়া নিজের একটি দল গঠন করিলেন—আজ পর্য্যন্ত সে দল বিশন-সভা নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যে বৎসর ইনি দেশে ফিরিলেন, সেই বৎসর মান্দ্রাজে কংগ্রেস হইতেছিল। সেখানে ইনি একটি বক্তৃতা করেন। হিউম সাহেব ঐ বক্তৃতাটি এত পছন্দ করেন যে, তাহার কিয়দংশ তিনি কংগ্রেসের বিবরণীর আরম্ভে উদ্ধৃত করিয়া দেন। সেই হইতে নিয়মিতরূপে ইনি কংগ্রেসে যোগদান করিতেন। অবশেষে ১৯১১ সালে দেশবাসী তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচন করিয়া সম্মানিত করেন। তৎকালে তাঁহার অভিভাষণের অদ্ভুত শব্দবিন্যাস, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া স্বর্গীয় গোখলে মহোদয় বলিয়াছিলেন—"Doctor Rashbehari Ghosh and you are two literary public men." সেই অভিভাষণের শেষ কথাগুলি কিরূপ আশাপূর্ণ দেখুন—Patience, courage, self-sacrifice are needed on your part, and wisdom, foresight, sympathy and faith in their own noble traditions on the part of our rulers; and I firmly believe, that both are beginning to realise their duty, and that the day will come—be it soon or late—when their period of suffering and strife shall come to an end, and India, on the stepping-stones of her dead self, shall rise to higher stages of national existence.

লক্ষ্নৌএর এডভোকেট পত্রের ইনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন। প্রয়াগের "লীডার" পত্রে ইনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। ইঁহার বিখ্যাত ইংরাজী প্রবন্ধ—Signs of Times 'যুগচিহ্ন' নির্ভীকতায়, তেজস্বিতায় ও ভাষার সৌন্দর্য্যে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চমকিত করিয়া দিয়াছিল।

লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় ইনি কিছু দিনের জন্ম ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন।

৩। ইন্দু, অক্টোবর ও নভেম্বর—১৯১৬—

"কৃষি ও ব্যবসায়"—লেখক শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসাদ এম্-এ, এল্ এল্-বি। প্রত্যেক বৎসরই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া রহিয়াছে। বিদেশিগণ ত ইহাকে 'দুর্ভিক্ষের দেশ' আখ্যা দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে নানা জন নানা কথা বলেন। কিন্তু তবু জলকষ্ট, অনাবৃষ্টি, জনসংখ্যার বৃদ্ধিই যে দুর্ভিক্ষের কারণ—তাহা বলিলে চলিবে না। প্রতিকারের যে পথ আছে তাহা আমরা দেখি না—প্রতিকারের চেষ্টাও আমরা করি না।

এ দেশের বিদ্বানগণের মত—"শুধু কৃষিকার্য্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। যত দিন পর্য্যন্ত লোকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে হাত না দিবে, তত দিন আমাদিগকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রপীড়িত হইতে হইবেই। প্রফেসর জেভন্স প্রমুখ বিদেশীয়গণ বলিবেন—"ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি কৃষির উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে।" ইঁহাদের মতে

রতে শিল্প ও বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের কোনও প্রয়োজন নাই ! ইঁহারা লন—"কৃষির উন্নতি হইলে—ফসলের উন্নতি হইবে। তখন বিদেশীয়- কাঁচা মাল বা raw material অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবেন। হা হইলেই দেশে টাকা আসিবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার অধিবাসি- ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ায় দেশের উন্নতি হইয়াছে বলিয়াই যে সেই নীতি রতবর্ষে খাটিবে, তাহা মনে করা ভুল।" প্রফেসর সাহেব ঠিক কথা লয়াছেন। কিন্তু তিনি কি ইহা জানেন না যে প্রতি বৎসর ভারতে কসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে? ইহারা চাষ করিবার জমি পায় না, চ দেশের অন্ন ধ্বংস করে। ইহারা যাহাতে উপার্জ্জন করিয়া শর আয় বাড়াইতে পারে, তাহা দেখিতে হইবে না কি? ১৮৭৮ অব্দের ফেমিন-কমিশনের মত এই ছিল যে ব্যবসায়ের যাহাতে তি হয়, তাহাই করিতে হইবে। দেশের যে সকল কাঁচা মাল হয়ে যায়, সেগুলিকে দেশেই যদি বিবিধ পণ্যে পরিণত করা , তাহা হইলে অতিরিক্ত পয়সা দিয়া বিদেশ হইতে সেগুলিকে রাইয়া আনিতে হয় না, অথচ দেশের পয়সা দেশেই থাকিয়া যায়।

কোনও দেশ কখন শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে র না, দেশের শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইতেও পারে না। কালে বাণিজ্য ও কৃষি উভয়েরই উপরই দেশের লক্ষ্য ছিল। ব্যতীত ব্যবসায়ের উন্নতি না হইলে সামাজিক ও রাজনৈতিক তিও সুদূরপরাহত।

"মেরী করেলীকে বিচার।"—লেখক শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল শ্রীবাস্তব। রী করেলীর বিখ্যাত উপন্যাস থেলমা পাঠ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা ন্ধে ও স্ত্রী-অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার মত জানা যায়। উপন্যাসের য়িকা থেলমা একজন নরওয়েজীয়ান রমণী। ইহার মুখ দিয়া থিকা যে সকল কথা বলাইয়াছেন—পড়িলে মনে হয়—সেই কথাগুলি দুরমণীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। লেখিকার আদর্শের হত হিন্দু আদর্শের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

গ্রন্থের নায়ক এরিংটনের বন্ধু লরিমার বলিতেছেন—"বজ্রকে শ আনা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোক জেদ ধরিলে, তাহাকে বশ করা ঠল।"

থেলমা—"আপনি ও কি ভুল বলিতেছেন? উহা অসম্ভব। স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাচারিণী হইতেই পারে না।"

লরিমার—"আপনি কি তাই মনে করেন?"

থেলমা—"আমি কেন—সকলেই তাই মনে করে। স্ত্রীগণ যদি রুষের আজ্ঞাধীন না থাকে, সেটা কত বড় মূর্খতা—ভেবে দেখুন খি।"

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে থেলমার পিতা বলেন—"Your 'higher ucation' is not the fit thing for a woman. Thelma ows nothing about mathematics or algebra. She n sing and read and write—and what is more,— e can spin and sew......I wanted her disposition trained......Teach her self-respect and make her prefer death to a lie."

"তোমাদের আধুনিক "উচ্চশিক্ষা" মেয়েদের উপযুক্ত নয়। থেলমা অঙ্ক বা বীজগণিতের কিছুই জানে না। সে গাহিতে, লিখিতে ও পড়িতে জানে—এমন কি সে বুনিতে ও সেলাই করিতে জানে। ওর স্বভাব ও প্রকৃতিকে শিক্ষা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাকে আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিও—যেন সে অসত্য হইতে মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে।"

থেলমাকে শিখান হইয়াছিল যে, The three principal virtues of a woman are chastity, morality and obedience—মেয়েদের প্রধান গুণ হইতেছে—সতীত্ব, নম্রতা ও বাধ্যতা। থেলমার পতিভক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—To her mind he was all that was great, strong and noble and beautiful—he was her master, her king—and she loved to pay homage by her exquisite humility......She could not understand the possibility of any wife not rendering instant and implicit obedience to her husband even in trifles."

"তার কাছে তার পতি ঔদার্য্যে এবং সৌন্দর্য্যে—জগতের মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, মহত্ত্বে, শক্তিতে পতি ছিলেন তার প্রভু ও রাজা। তাঁকে সে একান্ত নম্রতা দ্বারা উপাসনা করিত। সে বুঝিতে পারিত না যে কোনও স্ত্রী সামান্য বিষয়েও স্বামীর অবাধ্য হইতে পারে।"

আজকালকার উন্নতির সম্বন্ধে থেলমার পিতা বলেন—"Progress! not a bit of it! It is all going backward; it may not seem apparent—but it is so......and all these things happen to all nations when money becomes more precious to the souls of people than honesty and honour.

"উন্নতি! কিছু না! আজকাল জগৎ পিছন দিকে চলিয়াছে; এটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও, কথাটা সত্য। যখন সততা ও আত্মমর্য্যাদা অপেক্ষা অর্থের আদর বেশী হয়, তখন সব দেশেই এই অবস্থা হয়।"

আসামী

১। আলোচনী, পৌষ, ১৩২৩—

'আসাম শিল্প বা কারিকরী ব্যবসায়।'—লেখক শ্রীকনকলাল বড়ুয়া। আসামী শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়নই প্রধান। এ দেশে রেশম, এণ্ডি, মুগা ও পাট যথেষ্ট জন্মে। সকলেই জানেন যে, আসামের ঘরে-ঘরে অল্প-বিস্তর কাপড় প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আসামে প্রস্তুত বস্ত্রের মূল্য কিরূপ ও উহাতে কিরূপ আয় হওয়া সম্ভব, অনেকে তাহা জানেন না। ১৯১৫-১৬ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত হিসাবে আসামে কার্পাস সূতার আমদানী হয়—

	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা	সুরমা উপত্যকা
বিদেশী সূতা—	১৪১৮০০০০ টাকা।	৫৯৬০০০৲ টাকা।
ভারতবর্ষীয় সূতা—	৩৮৪০০০০ "	১৭০০০০৲ "
	১৮০২০০০০	৭৬৬০০০
বিদেশী কাপড়—	৭৮৫০০০০৲ "	১৩৯৫০০০০৲ "
ভারতবর্ষীয় "	২০৫০০০০৲ "	১৫০০০০৲ "
	৯৯০০০০০৲ "	১৪১০০০০০৲ "

উপরের হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সূতা বেশী আসে, কিন্তু প্রস্তুত কাপড় কম আসে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লোকসংখ্যা সুরমা উপত্যকার লোকসংখ্যার প্রায় সমান। দুই স্থানেই বৎসরে প্রায় সমান কাপড় লাগে। আসামীরা প্রায়ই দেশে কাটা সূতা বা আমদানী হওয়া সূতা হইতে কাপড় তৈয়ারী করিয়া পরিধান করে। এই উপায়ে সুরমা উপত্যকা হইতে বৎসরে ৪২ লক্ষ টাকা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় থাকিয়া যায়। আসামীরা বিদেশী মিহি সূতার অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় মোটা সূতার কাপড় বেশী পছন্দ করে। এই কারণে এ দেশে 'ম্যাকেষ্টারী' কাপড়ের ব্যবহার কম।

রায় বাহাদুর ভূপালচন্দ্র বসুর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আসামে যে রেশম, এণ্ডি, মুগা উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য বৎসরে ৩১ লক্ষ টাকার উপর। আজকাল রেশম পোকার রোগ হওয়ায়, এবং ভাল বীজের অভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম রেশম উৎপন্ন হয় এবং সূতাও ভাল হয় না। এই ব্যবসায়টিকে ভাল করিয়া দাঁড় করাইতে পারিলে, দেশের মহতী উপকার হইবে। সুখের বিষয় যে, অধুনা গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি এ দিকে পতিত হইয়াছে।

এই দুইটি ব্যবসায় আসামীগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, উঁহাদের উন্নতি ও বিস্তার সহজ হইবে। কলে কাটা সূতার নিকট হাতে কাটা সূতা চলিতে পারে না। কলে কাটা সূতা না হইলে চলিবে না। কিন্তু হাতে কাটে সূতা একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। যে কাপড় হাতে বয়ন করা হইবে তাহাতে কলে তৈয়ারী সূতা লাগিবে না। অতএব ব্যবসায়টী দুই রকমে চালান যায়। Cottage ও factory system। Cottage system আমাদের দেশে আছে। দ্বিতীয়বিধ ব্যবসায়টি অর্থাৎ factory system of handloom weaving চালাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে cottage systemএর বিনাশ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ মিহি কাপড় হাতে না হইলে হইবে না। ওদিকে মার্কিণ কাপড়, থান প্রভৃতি কলে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

আজকাল মধ্যশ্রেণীর লোকের ভাত কাপড় পাওয়া মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী চাকরী বা চাবাগানের চাকরী সকলের ভাগ্যে হয় না। অল্প মূলধনে উক্ত ব্যবসায় করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না। এ দেশে তেলের ইঞ্জিন বসাইয়া automatic loom দ্বারা বোধ হয় কাজ চালান যায়।

সংস্কৃত

১। শারদা, ভাদ্র, ১৯১৬—

"শবরস্বামী"—লেখক শ্রীবালচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাবাচস্পতি। ভারতের প্রধান-প্রধান গ্রন্থপ্রণেতৃগণের জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, কারণ তাঁহারা কেহই আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের বড় বেশী সঙ্কোচ ছিল। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে প্রত্নতত্ত্বের সহায়তা লইতে হয়। অথচ তাহাতে আমরা খুব কমই সফল হইয়া থাকি। সমসাময়িক লেখকগণের গ্রন্থে কখন-কখন তাঁহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাহা হইতেই আমরা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। শবরস্বামী একজন ঐরূপ লেখক। ইনি মীমাংসকপ্রবর শাবরভাষ্য প্রণেতা।

ইঁহার জন্ম কবে হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু শবরস্বামীর লেখার মধ্যে অন্ধ্রাজ্যের উল্লেখ পাইয়া থাকি। ঐ দেশীয় আচার-ব্যবহার ইনি যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় ইনি অন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন। বোধ হয় শবরস্বামী খৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন; অথবা কুমারিলভট্ট ও শঙ্করের সমকালীন হইতেও পারেন। আমাদের মনে হয়, ইনি কুমারিলভট্টের সমসাময়িক লেখক ছিলেন।

শাবরভাষ্যের যে বহুল প্রচার হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে "তত্ত্বসমন্বয়াৎ" এই সূত্রের টীকা করিতে শাবরস্বামীর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মীমাংসা-ভাষ্য-দর্শনে বুঝা যায় যে, শবরস্বামীর পূর্ব্বেও অনেক মীমাংসকগণ ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ভর্ত্তৃমিত্র, ভবদাস ও উপবর্ষাচার্য্যের নামই শুনা যায়। উপবর্ষাচার্য্য বৃত্তিকার ছিলেন। তাঁহার মীমাংসাবৃত্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ভর্ত্তৃমিত্র ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ নামেও খ্যাত। হরিকারিকা ইঁহারই গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শবরস্বামী কাহার পুত্র তাহা আমরা জানি না। তবে অনেকের মত যে ইনি শূদ্রাগর্ভজাত। আদিত্যদেব ও ভাস্করদেব শবরস্বামীর নামান্তর।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির

আজ সমগ্র ভারতে যে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, ভারতবাসী প্রত্যেক কার্য্যেই যে নবজীবন অনুভব করিতেছেন, কি সমাজ-সংস্কার, কি ধর্ম্ম-সংস্কার—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে উদ্যম, যে আশা, যে উন্নতির ও জাতীয় জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, এ সকলের মূলে আমরা কোন্ মহাপুরুষের শক্তি দেখিতে পাই? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ ভারতের এক মহাযুগ-পরিবর্ত্তনের সময়। ঐ সময়ের ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা ইতিহাসের প্রত্যেক পাঠকই বিদিত আছেন। এই যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় যে মহাপুরুষ ভারতের ভাগ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন, যে মহাপুরুষ ভারতের ধর্ম্ম-স্রোত ও ধর্ম্মভাবকে ফিরাইয়া জ্ঞান ও সত্যের অভিমুখী করিয়া দিয়াছেন, সে মহাপুরুষ আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে "যুগ-প্রবর্ত্তক" মহাপুরুষ যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যভূমিতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার উপযুক্ত কোনও স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। ইহা যে একটী ঘোর জাতীয় কলঙ্কের কথা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে তাঁহার একটী উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। গত ২২ এপ্রেল ন্যূনাধিক ৩০০০ লোকের সম্মুখে বাঙ্গালা দেশের জনৈক শিক্ষিতা মহিলা—রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারস্থা শ্রীমতী হেমলতা দেবী কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরের ভিত্তি প্রোথিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য ঐ প্রস্তাবিত মন্দিরের একটি নক্সা এই প্রবন্ধের সহিত সংযুক্ত হইল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ Engineer ও Architect শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত সরকার মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। এই নক্সাটীও তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত; এবং যাহাতে এই স্মৃতি-মন্দিরটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তিনি সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবেন। মন্দিরটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার নিমিত্ত রাধানগর স্মৃতি-মন্দির কমিটী স্থির করিয়াছেন যে উহা চুনার কিংবা মীর্জাপুর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। মন্দিরটী দেখিলেই বোধ হইবে যে উহা কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মিত হয় নাই। মন্দিরটীর চতুর্দ্দিকে একটি বিস্তৃত উদ্যান নির্ম্মিত হইবে। উহার পরিধি প্রায় ১০ কি ১২ বিঘা হইবে।

ভূমির স্বত্বাধিকারী ঐ সমস্ত জমী, মন্দির-নির্ম্মাণার্থ দান করিয়াছেন।

মন্দিরটীর জন্য অনুমান পঞ্চদশ সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি কার্য্য এই মন্দিরের সহিত সংসৃষ্ট আছে। রাজার মন্দিরের সম্মুখে যে বিস্তৃত উদ্যান থাকিবে তাহার মধ্যে রাজার একটি শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত পূর্ণাকৃতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য প্রায় ১০০০৲ টাকা আবশ্যক। একটি বাঙ্গালী মহিলা এই কার্যটির ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

রাধানগর যাহাতে বর্ত্তমান যুগের আদর্শানুসারী একটি অসাম্প্রদায়িক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়—তাহার জন্য একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ আবশ্যক। এই কার্য্যের নিমিত্ত প্রায় ২৫০০০৲ টাকা আবশ্যক। রাজার নামে একটি সরোবর প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্য ও পশ্চাত্য দর্শন ও ধর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্য বিশিষ্ট অধ্যাপকের আসন স্থাপন, রাজার বাল্যভবনের পূর্ণ সংস্কার ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্য আপাততঃ স্মৃতি-মন্দিরের অঙ্গীভূত হইবে। এই সকল কার্য্যের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। এই মহৎ কার্য্যটী কয়েকজন লোকের চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে

অরণ্যষষ্ঠী ব্রত

শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে

Emerald Ptg. Works

বৈশাখ, ১৩২৪

দ্বিতীয় খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

নিদাঘ-বরণ

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

স্বাগত সন্ন্যাসীবর, শুষ্কতায় কি মহাবিকাশ ;
দাবদগ্ধ হৃদি হ'তে ওঠে ও কি রুদ্রমধুহাস
প্রকটিয়া পাংশুমুখে। আজি কি গো সফল সাধনা ?
বিশ্বের জীবন লাগি' সাঙ্গ করি' দীর্ঘ আরাধনা,—
উঠিলে সমাধি হ'তে আপন সর্ব্বস্ব রিক্ত করি',
তনু-রসরক্তরাশি সুমহান্ ত্যাগেতে বিতরি'।

নিখিলেরে দিতে রূপ শূন্য করি' আপন ভাণ্ডার,
মগ্ন দরিদ্রের বেশে বরি' নিলে তীব্র হাহাকার।
তাই বুঝি প্রেমব্রত গৌরবের আত্ম-বলিদানে,
ভীমরুদ্র প্রকৃতির শুষ্ক মহামরু-মাঝখানে,

শ্লাঘাভরা শীর্ণ-বুকে জাগিয়াছ সমাধি' শয্যায়,
নিদাঘের মূর্ত্তি লভি' শুষ্ক হাসি দীপ্ত-মহিমায়।

প্রচণ্ড উদাস-চিত্র কে চিনিবে মহারহস্যের,
জটিল ও বিশ্লেষণ কে বুঝিবে তোমার ভাষ্যের ?
নিজেরে করিয়া শুষ্ক তরমুজ-বক্ষে দিলে জল,
প্রতিদান তরে তাই কৃতজ্ঞতা-অশ্রু ছল-ছল্,—
দাঁড়াইয়া মৃত্তিকায় তরুরাজ্যে নত লতাশির,
তব-দত্ত প্রাণরস অর্ঘ্য দিবে চিরিয়া রুধির।

সুপক্ক রসাল আজি উচ্ছ্বসিত আবেগ-বিহ্বল,
সারি-সারি রম্য ডাব বৃক্ষশিরে লয়ে স্নিগ্ধ জল ;
শ্রান্ত পান্থ-স্মৃতিমাঝে বিছাইতে তৃপ্তি-ঘুমজাল,
আত্মহারা অপেক্ষায় চেয়ে আছে প্রতি দণ্ডকাল।
মৌন কৃতজ্ঞতা-ভরে লাজনম্র ছল-ছল চোখ্,
নিদাঘরূপে হে ঋতু, কি রচিলে অমৃতের শ্লোক !

রবিদগ্ধ তপ্ত বুকে স্নিগ্ধতার এ কি গো সৃজন,
নিঙাড়িয়া আপনায় সর্ব্বতরে সুখ-আয়োজন।
নীরস-কঙ্কাল বুকে এ কি গুপ্ত তরল নির্ঝর,
পুষি' রেখেছিলে ঋষি ! বিশ্বপ্রেমে গলি' ঝর-ঝর,-
কালি সে বরষাধারে ডুবাইতে চা'বে যে নিখিল,
মানবের বুকে এ কি খুলে দিলে রহস্যের খিল !

ঋগ্বেদে বিশ্ব-সৃষ্টি

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

এই বিশ্ব-সংসার কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ঈশ্বর এক কি বহু, দেবতাদিগের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, মনুষ্যের সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ, মনুষ্যের মুক্তি বা নির্ব্বাণ আছে কি না, থাকিলে তাহা কিরূপ,—প্রভৃতি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ঋষিগণ কি মত পোষণ করিতেন, তাহা জানিতে হিন্দু-মাত্রেরই ইচ্ছা হয়। ইহা জানিতে হইলে, তাঁহাদের রচিত সূক্তগুলির যথার্থ অর্থ করা আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনেকে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু দেখা যায়, সায়নাচার্য্য অনেক ঋকের অর্থ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই ; সেই জন্য অনেক সূক্ত পাঠ করিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হয়। অনেক স্থলে বৈদিক যুগের প্রচলিত মত বা শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অর্থ করিয়াছেন। কোন-কোন স্থলে পরবর্ত্তিকালে উদ্ভূত জ্ঞান ও মতের সাহায্যে ঋক্ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা শব্দের বৈদিক-যুগ-প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া এবং সেই কালের মত অবলম্বন করিয়া প্রথমে কতকগুলি প্রধান-প্রধান সূক্তের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণে চেষ্টা করিব। মূল সূক্তগুলি প্রকাশ করিবার অর্থ এই যে, অতি অল্প লোকের গৃহে মূল ঋগ্বেদ বর্ত্তমান। মূল দেখিয়া হিন্দু মাত্রেরই বৈদিক ভাষা সম্বন্ধেও একটু জ্ঞান জন্মিবে। আমাদের মন্তব্য মূল অনুসরণ করে কি না এবং উহা যুক্তিযুক্ত কি না, জানিলে পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন, এই বিশ্বাসে আমরা এই রীতি অবলম্বন করিলাম।

নাসদীয় সূক্ত।

ন। অসৎ। আসীৎ। নো। সৎ। আসীৎ। তদানীং
ন। আসীৎ। রজঃ। নো। ব্যোম। পরঃ। যৎ।
কিং। আ। অবরীবঃ। কুহ। কস্য। শর্ম্মন্
অম্ভঃ। কিং। আসীৎ। গহনং। গভীরম্॥ ১

ন। মৃত্যুঃ। আসীৎ। অমৃতং। ন। তর্হি
ন। রাত্র্যাঃ। অহ্নঃ। আসীৎ। প্রকেতঃ।
আনীৎ। অবাতং। স্বধয়া। তৎ। একং
তস্মাৎ। হ। অন্যৎ। ন। পরঃ। কিং। চন। আস॥২

তমঃ। আসীৎ। তমসা। গূঢ়ং। অগ্রে
অপ্রকেতং। সলিলং। সর্ব্বং। আঃ। ইদম্।
তুচ্ছ্যেন। আভু। অপিহিতং। যৎ। আসীৎ
তপসঃ। তৎ। মহিনা। অজায়ত। একম্॥ ৩

কামঃ। তৎ। অগ্রে। সং। অবর্ত্তত
অধি। মনসঃ। রেতঃ। প্রথমং। যৎ। আসীৎ।
সতঃ। বন্ধুং। অসতি। নিঃ। অবিন্দন্
হৃদি। প্রতীষ্য। কবয়ঃ। মনীষা॥ ৪

তিরশ্চীনঃ। বিততঃ। রশ্মিঃ। এষাং
অধঃ। স্বিৎ। আসীৎ। উপরি। স্বিৎ। আসীৎ।
রেতোধাঃ। আসন্। মহিমানঃ। আসন্
স্বধা। অবস্তাৎ। প্রযতিঃ। পরস্তাৎ॥ ৫

কঃ। অদ্ধা। বেদ। কঃ। ইহ। প্র। বোচৎ
কুতঃ। আজাতা। কুতঃ। ইয়ং। বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাক্। দেবাঃ। অস্য। বিসর্জনেন
অথ। কঃ। বেদ। যতঃ। আ বভূব॥ ৬

ইয়ং। বিসৃষ্টিঃ। যতঃ। আ বভূব
যদি। বা। দধে। যদি। বা। ন।
যঃ। অস্য। অধ্যক্ষঃ। পরমে। ব্যোমন্
সঃ। অঙ্গ। বেদ। যদি। বা। ন। বেদ॥ ৭

অর্থঃ—অসৎ ছিল না, তখন সৎও ছিল না॥ রজ-লোক ছিল না, যাহা শ্রেষ্ঠ ব্যোম (তাহাও) ছিল না। কি আবরণ ছিল? কোথায় কাহার শর্ম (ছিল)? গহন গভীর অম্ভ কি ছিল? ১

মৃত্যু ছিল না, তখন অমৃত (ছিল) না; রাত্রি দিনের চিহ্ন ছিল না। সেই 'একং' স্বধা দ্বারা অবাত, (১)

(১ ঋগ্বেদের অনেক স্থলে 'অবাত' শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সায়ন কোন-কোন স্থলে ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিতেছি।

গূঢ়প্রাণ হইয়াছিলেন। তাহা হইতে অন্য কিম্বা শ্রেষ্ঠ কেহই ছিল না। ২

প্রথম তম তমদ্বারা আবৃত ছিল; এই সর্ব্ব (দেশে) চিহ্নহীন সলিল ছিল। যাহা ছিল, তুচ্ছের (অর্থাৎ অন্ধকার বা শূন্য) দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। সেই এক (ক্লীবরূপে) তপস্যার মহিমায় জন্মিয়াছিলেন। ৩

অতঃপর অগ্রে কাম সম্যক উৎপন্ন হয়; যাহা অধিকারী মনের প্রথম রেত ছিল। কবিগণ হৃদয়ে স্থিতা ধী দ্বারা বিচার করিয়া অসতে সতের উৎপত্তি কারণ (বা যোগ) স্থির করিয়াছেন। ৪

ইহাদের (অর্থাৎ জলদিগের) রশ্মি তির্য্যকভাবে (২) বিস্তৃত হইল; কি নিম্নে ছিল, কি উপরে ছিল? রেতধারিণীগণ ছিলেন, মহিমাসম্পন্নগণ ছিলেন; স্বধা (বা ভোগ্য) নিকৃষ্ট (৩) ভোক্তা শ্রেষ্ঠ। ৫

কে নিশ্চয় জানে? কে ইহলোকে বলিয়াছে? কোথা

স হি বিশ্বাতি পার্থিবা রয়িং দাশন্ মহিত্বনা। বম্বন্ অবাতো অস্তৃতঃ ॥৬১৬.২০

সয়ানের ব্যাখ্যা—স হি সখম্বগ্নিঃ বিশ্বানি সর্বানি পার্থিবা পৃথিব্যাং ভবানি ভূতজাতানি মহিত্বনা মহত্বেন স্বমহিম্না অতিক্রামন্ রয়িং ধনং দাশৎ অস্মভ্যং দদাতু। যদ্বা সর্বং পার্থিবং বিদ্যমানং ধনং অতিশয়েন দদাতু। তেজসা বম্বন্ কাষ্ঠানি শত্রূন্ বা হিংসন্ অবাতঃ অন্যৈঃ শত্রুভিঃ অপ্রতিগতঃ অস্তৃতঃ কেনাপি অহিংসিতঃ।

এখানে 'অবাতঃ' অর্থে—'শত্রু ভরপ্রতিগতঃ' দেখিতেছি। অর্থাৎ শত্রু যাহার নিকট যাইতে পারে না। অতএব 'স্বধয়া অবাতং' অর্থে স্বধা যাহার নিকটে যাইতে পারে না। যেমন অগ্নিশিখা বায়ু দ্বারা কম্পিত না হইলে অবাত বা অকম্পিত বলা যাইতে পারে, এখানে সেইরূপ একং স্বধা দ্বারা কম্পিত হন নাই। 'বাত' অর্থে প্রার্থিত ধরিয়া সায়ন এক স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

শুভ্র মন্দো দেব বাত মর্ম্মধূতো নৃভিঃ সুতঃ। ৯৬২.৫

যৎ দেব বাতং দেবৈঃ প্রার্থিতং শুভ্রং শোভনং মন্দ্রোন্নং নৃভির্নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সুতো অভিষুতঃ সন্ অপ্সু বসতী বরীবৃধুঃ শোধিতোভবতি।

স্বধা শব্দের প্রকৃত অর্থ—স্বকে যিনি ধারণ করেন। কাষ্ঠাদি অগ্নির স্বধা। অতএব স্বধা অর্থে অন্ন হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে ভগবান্ আছেন। অন্ন ভোজন না করিলে দেহে তিনি থাকেন না। এইরূপে স্বধা অর্থে ভোগ্যবস্তু হইয়াছে। সায়নের মতে এ স্থলে স্বধার অর্থ মায়া। কিন্তু তিনি এই সূক্তের অপর একটী ঋকের কি অর্থ করিয়াছেন দেখুন।

স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ। ১০।১২৯।৫

সায়ন—তত্রচ ভোক্তৃ ভোগ্যয়োর্মধ্যে স্বধা অন্ননামৈতৎ ভোগ্য প্রপঞ্চঃ অবস্তাৎ অবরঃ নিকৃষ্ট আসীৎ। প্রযতিঃ প্রযতিতা ভোক্তা পরস্তাৎ পরঃ উৎকৃষ্ট আসীৎ।

আনীৎ—এই শব্দ অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। প্র+অন=প্রাণ—অর্থাৎ যখন জীবন ব্যক্ত হয় তাহাই প্রাণ। ইংরাজী Animal শব্দও অন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ভগবান যখন প্রলয়-দশায় অবস্থান করেন, তখন আসীৎ না বলিয়া আনীৎ বলা হইয়াছে।

(২) মূলে "তিরশ্চীনঃ" শব্দ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অর্থাৎ ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে আমরা নিম্নলিখিত অংশ দেখিতে পাই। মূল উদ্ধার করিয়া তাহার সায়ন-কৃত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে।

স যদূর্ধ্বঃ প্রথম স্তাহ স্তস্মাদয়মগ্নি রূর্দ্ধ উদ্দীপ্যত। উর্দ্ধা হোতস্য দিক্। যত্তির্যঙ্ মধ্যম স্তস্মাৎ অয়ং বায়ু স্তির্যঙ্ পবতে। তিরশ্চীরাপো বহন্তি। তিরশ্চী হ্যেতস্য দিক্। যদ অর্বাঙ্ উত্তম স্তস্মাৎ অসা বর্বাঙ তপতি অর্বাঙ্ বর্ষত্য র্বাঞ্চি নক্ষত্রাণি — —।

১৯ অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ২৫

পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ শাস্ত্রী কৃত পুস্তকের ৫১৪ পৃষ্ঠা।

যোঽয়ং নবরাত্রে প্রথম স্তাহঃ সোঽয়মূর্দ্ধো বা আরোহ প্রকার এব। যস্তু মধ্যম স্তাহঃ সোঽয়ং তির্যঙ বর্ত্ততে। তস্মাৎ অয়ং তির্যঙ। য উত্তম স্তাহঃ সোঽর্বাঙ ধো মুখঃ।

... ...

বায়ুনা প্রেরিতা আপঃ তিরশ্চী স্তির্যগ্ ভূতাঃ প্রবহন্তি।

সায়ন বলিতেছেন, বায়ু দ্বারা প্রেরিত জল তিরশ্চী (অর্থাৎ তির্যক্) প্রবাহিত হয়। কিন্তু মূলে আমরা তিন প্রকার গতির নাম দেখিতেছি। উর্দ্ধ, তির্যক্ ও তিরশ্চী। আপদিগের গতি তিরশ্চী। তিরশ্চী অর্থ যাহাই হউক, তিরশ্চী শব্দ দ্বারা নাসদীয় সূক্তের 'এষাং' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে—অর্থাৎ ভগবানের মনে কাম হইলে, স্বধার দ্বারা যুক্ত হইয়া তিনি আপ করিলেন।

(৩) স্বধা অর্থে অন্ন, ভোগ্য বস্তু প্রভৃতি বুঝাইত। অনুমান করি, ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, যখন অরণিযোগে অগ্নি উৎপাদন করা যায়, তাহা অতি সামান্য থাকে; কিন্তু তাহাতে কাষ্ঠাদি প্রদান করিলে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অগ্নিকে স্ব বলিলে, কাষ্ঠাদি স্বধা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। যখন কোন লোক অন্নাদি গ্রহণ না করে, তখন সে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। অতএব দেহস্থিত প্রাণরূপী অগ্নিকে ধারণ করিতেও স্বধার আবশ্যকতা। ঋষিগণ ভগবানকে প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিতেন যে, স্বধাই সেই প্রাণস্বরূপকে ধারণ ও বর্দ্ধিত করেন। উপনিষদের অনেক স্থলে, ঋষিগণ এই বিষয় শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য নানা প্রকার উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধার করা গেল না।

হইতে উৎপন্ন, কোথা হইতে এই সৃষ্টি? ইহার সৃষ্টির দ্বারা দেবগণ পরবর্ত্তী। অতএব কে জানে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? ৬

যাহা হইতে এই সৃষ্টি হইয়াছে (তিনি কি, এই জ্ঞান) ধারণ করেন কিম্বা করেন না? যিনি ইহার অধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ ব্যোম (আছেন)—তিনি নিশ্চয় জানেন, কিম্বা জানেন না। ৭

এই সূক্তে ঋষি প্রলয় অবস্থার বর্ণনা করিয়া, পরে সৃষ্টি কিরূপে আরম্ভ হয়, তাহাই দেখাইতেছেন। ঋষি বলিতেছেন যে, অসৎ যখন না থাকে, তখন সৎও থাকে না। তখন ভগবান 'একং' অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থার উৎপত্তি ভগবানের তপস্যা দ্বারা সাধিত হয়। বৈদিক যুগে ভগবান্‌কে স্ব নামেও বলা হইত। ঋষি প্রকাশ করিলেন, এই প্রলয় অবস্থায় স্ব, স্বধা দ্বারা অবাত বা অপ্রাপ্ত হন। স্বধা শব্দের ধাতুগত অর্থ—স্বকে যিনি ধারণ করেন। যখন স্বধা দ্বারা অপ্রাপ্ত হন, তখন ভগবান একং বা ক্লীবত্ব ও একত্ব প্রাপ্ত হন। ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি তখন সৃষ্টি করেন না, বুঝাইতেছে। একত্ব দ্বারা বিশ্ব সংসারে অপর কোন জীব রহিল না, বলা হইতেছে। কারণ স্ব-ই প্রাণবান্, এবং তাঁহার প্রাণ দ্বারা অপর প্রাণবান্ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋষির মতে, কামনাই প্রকৃত অসৎ অর্থাৎ নষ্ট হইতে পারে; ভগবানের তপস্যা দ্বারা তাঁহার সঙ্কল্পের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হইতেছে।

যখন প্রলয় অন্তে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন একের মনে কাম উদয় হয়। কামনার আবির্ভাবে ক্লীবত্ব ত্যাগ করিয়া ভগবান পুরুষত্ব গ্রহণ করেন; সেই জন্য একঃ, যঃ, সঃ, অধ্যক্ষঃ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সেই অবস্থা, বেদের নানা স্থানে বর্ণিত দেখিতে পাই। যদি 'এক' সংজ্ঞক ঈশ্বরের মনে কামনার নিরোধ বা উদ্রেক হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরাতিরিক্ত এক কাম্য বস্তু থাকা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। 'এক' স্বধার দ্বারা অবাত হইলেন—বর্ণনায় আমরা স্বধায় ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। ঋষির মতে, স্ব যখন স্বধার প্রতি কামনা ত্যাগ করেন, তখন সৎ (অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ বা ব্যাবহারিক সত্বা) নষ্ট হয় ও স্বধা সর্ব্বদেশব্যাপী চিহ্নহীন সলিলরূপে অবস্থান করেন। স্বধা তখন প্রাণহীনা হইয়া থাকেন।

ঋষির মতে, এই অবস্থার কথা কামনাযুক্ত ঈশ্বরও না জানিতে পারেন।

হিরণ্যগর্ভ সূক্ত

হিরণ্যগর্ভঃ। সং। অবর্ত্তত। অগ্রে
ভূতস্য। জাতঃ। পতিঃ। একঃ। আসীৎ।
সঃ। দাধার। পৃথিবীং। দ্যাং। উত। ইমাম্
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ১

যঃ। আত্মদাঃ। বলদাঃ। যস্য। বিশ্বে। উপাসতে
প্রশিষং। যস্য। দেবাঃ।
যস্য। ছায়া। অমৃতং। যস্য। মৃত্যুঃ
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ২

যঃ। প্রাণতঃ। নিমিষতঃ। মহিত্বা
একঃ। ইৎ। রাজা। জগতঃ। বভূব।
যঃ। ঈশে। অস্য। দ্বিপদঃ। চতুষ্পদঃ
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ৩

যস্য। ইমে। হিমবন্তঃ। মহিত্বা
যস্য। সমুদ্রং। রসয়া। সহ। আহুঃ।
যস্য। ইমাঃ। প্রদিশঃ। যস্য। বাহূ
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ৪

যেন। দ্যৌঃ। উগ্রা। পৃথিবী। চ। দৃঢ়া
যেন। স্বঃ। স্তভিতং। যেন। নাকঃ।
যঃ। অন্তরিক্ষে। রজসঃ। বিমানঃ
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ৫

যম্। ক্রন্দসী। অবসা। তস্তভানে
অভি। ঐক্ষেতাং। মনসা। রেজমানে।
যত্র। অধি। সূরঃ। উদিতঃ। বিভাতি
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ৬

আপঃ। হ। যৎ। বৃহতীঃ। বিশ্বং। আয়ন্
গর্ভং। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। অগ্নিম্।
ততঃ। দেবানাং। সম্। অবর্ত্তত। অসুঃ। একঃ
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ৭

যঃ। চিৎ। আপঃ। মহিনা। পর্য্যপশ্যৎ
দক্ষং। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। যজ্ঞম্।

যঃ। দেবেষু। অধি। দেবঃ। একঃ। আসীৎ
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ৮

মা। নঃ। হিংসীৎ। জনিতা। যঃ। পৃথিব্যাঃ
যঃ। বা। দিবং। সত্যধর্মা। জজান।
যঃ। চ। অপঃ। চন্দ্রাঃ। বৃহতীঃ। জজান
কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম ॥ ৯

প্রজাপতে। ন। ত্বদেতান্য। ন্যো
বিশ্বা। জাতানি। পরিতা। বভূব।
যৎ। কামা। স্তে। জুহুম। স্তন্নো। অস্ত
বয়ং। স্যাম। পতয়ো। রয়ীণাম্ ॥ ১০

অর্থ:—সকল উৎপন্ন প্রাণীর অদ্বিতীয় পালনকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ সকলের প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী, দিব্যলোক ও ইহাকে (অর্থাৎ অন্তরিক্ষকে) ধারণ করিয়াছিলেন। কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ১

যিনি আত্মা (ও) বল দান করেন, যাঁহার আজ্ঞা সকলে পালন করে, দেবতা যাঁহার; যাঁহার ছায়া অমৃত, মৃত্যু যাঁহার। কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ২

যিনি মহিমা দ্বারা প্রাণযুক্ত, নিমেষযুক্ত, (ও) গমনশীল-দিগের অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছেন; যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ-দিগের ঈশ্বর। কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ৩

এই সকল হিমবান্ পর্ব্বত যাঁহার মহিম-দ্বারা; নদী সহিত সমুদ্রকে (লোকে) যাঁহার বলিয়া থাকে; এই দিক সকল (অর্থাৎ ঈশান, অগ্নি প্রভৃতি কোণ সকল) যাঁহার, —(উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ সকল) যাঁহার বাহু; কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ৪

যাঁহার দ্বারা দিব্য লোক উগ্র (অর্থাৎ উন্নত) ও পৃথিবী দৃঢ়া (অর্থাৎ অচলা) হইয়াছে; যাঁহার দ্বারা স্বর্গ (ও) নাকলোক বিধৃত; যিনি অন্তরিক্ষে রজলোক সকল (বা উদক সমূহ) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন্ দেব-তাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ৫

কম্পমানা, ক্রন্দনকারিণী, স্তম্ভিতাদ্বয় (অর্থাৎ ভূমি ও বায়ুলোক) (৪) যাঁহার অভিমুখে রক্ষা-কামনা করিয়া চাহিয়াছিলেন; যাহার উপরে সূর্য্য উদিত হইয়া উজ্জ্বল হন। কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ৬

বৃহৎ জলরাশি অগ্নি উৎপাদন করিতে-করিতে যে গর্ভকে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে) ধারণ করিয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ৭

যিনি দক্ষধারণকারিণী, যজ্ঞউৎপাদনকারিণী জল সকলকে মহিমা দ্বারা দর্শন করিয়াছিলেন; যিনি দেবতা-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব (ও) অদ্বিতীয় ছিলেন। কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ৮

যিনি পৃথিবীর জনক, যে সত্যধর্ম্মা দিব্যলোককে উৎপাদন করিয়াছেন, এবং যিনি আহ্লাদকর বৃহৎ জলরাশি জন্মাইয়াছেন, (তিনি) যেন আমাদিগকে হিংসা (অর্থাৎ ধ্বংস) না করেন। কোন্ দেবতাকে হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব? ৯

হে প্রজাপতি! তোমা হইতে অপর কেহ এই সকল ভূতজাতকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া নাই। যে কামনা করিয়া (আমরা) তোমাতে হোম করিব, তাহা আমাদের হউক্। আমরা সকলে ধনসমূহের স্বামী হইব। ১০

মন্তব্য:—এই সূক্তে দেখিতেছি, একের মনের কামরস স্বধায় মিলিত হওয়ায় হিরণ্যগর্ভদেব উৎপন্ন হইলেন। ইনিই সকল উৎপন্ন জীবদিগের মধ্যে প্রথম; ইঁহাকে ভগবানের একমাত্র পুত্র বলা যাইতে পারে। ইঁহাকে প্রাণের ও শক্তির উৎস-স্বরূপ বলিতে পারি। ইনিই হিন্দুর সগুণ ব্রহ্ম, সৎস্বরূপ, এবং সকল প্রাণময় জীবের জনক। যতদিন ভগবানের মনে কামনা থাকিবে, ততদিন হিরণ্যগর্ভদেবের

(৪) সায়নাচার্য্য 'রেজমানে' শব্দের অর্থ 'দীপ্যমানে' এবং 'ক্রন্দসী' অর্থে দ্যাবা পৃথিব্যৌ করিয়াছেন। এই ঋকে দেবীদ্বয় রক্ষা কামনা করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহারা ভয় পাইয়াছেন বলিতে হইবে। সেইজন্য আমাদের মনে হয় 'রেজমানে' অর্থে কম্পমানাদ্বয় ও ক্রন্দসী অর্থে ক্রন্দনকারিণীদ্বয় হইবে। ক্রন্দসীদ্বয় যে ভূমি ও বায়ুলোক হইবে, তাহার কারণ এই দুই স্থানে মর্ত্ত্যগণ বাস করে। বায়ুলোকে পক্ষী ও ভূমিতে পশু মনুষ্য প্রভৃতি বাস করে। ইহারা মৃত্যুভয়ে ক্রন্দন করে। ইহারা স্তম্ভিতা হইয়াছে, অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াছে। দিব্য-লোক দেখা যায় চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু ভূমি ও বায়ুলোক সেরূপ ভ্রমণ করে না।

অস্তিত্ব এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন সংসারেরও অস্তিত্ব থাকিবে। কিন্তু যখন স্ব-এর মন হইতে স্বধা-ভোগ-কামনা দূর হইবে, তখন সকল প্রাণময় জীবের প্রাণ স্ব-মধ্যে প্রবেশ করিয়া গূঢ়ভাবে অবস্থান করিবে। অতএব কোন স্থানে প্রাণের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। স্ব ব্যতীত অপর কোন ইচ্ছাযুক্ত ও প্রাণযুক্ত জীব বিশ্ব-সংসারে থাকিবে না।

স্বধা দ্বারা গৃহীত-স্ব প্রথম জল সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টি শুধু হিরণ্যগর্ভের দর্শন দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। কারণ, যে অন্ধকারময় চিহ্নহীন সলিল স্বধারূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহা এক্ষণে প্রাণযুক্ত হওয়ায় দ্রষ্টার নিকট জলরাশিরূপে প্রতিভাত হইল। এই জলরাশির মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত বলিয়া ভগবান হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইয়াছেন। তিনি জ্যোতির্ম্ময় ছিলেন বলিয়া হিরণ্য নামের অধিকারী। যখন ভগবান সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপনাকেই আপনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই ভাব পরের সূক্তে বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূক্তে শুধু দেখা যাইতেছে, জলরাশি দক্ষকে ধারণ করিয়াছিল, ও যজ্ঞকে উৎপাদন করিয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বধা যেরূপ স্ব-এর ভোগ্যা, জলসকল সেইরূপ দেবতাদিগের উপভোগ্যা রূপে মনে করা হইত।

বিশ্বকর্ম্মা সূক্ত

১০।৮১

যঃ। ইমা। বিশ্বা। ভুবনানি। জুহ্বৎ
ঋষিঃ। হোতা। নি। অসীদৎ। পিতা। নঃ।
সঃ। আশিষা। দ্রবিণং। ইচ্ছমানঃ
প্রথমচ্ছৎ। অবরান্। আ। বিবেশ ॥১

কিং। স্বিৎ। আসীৎ। অধিষ্ঠানং
আরম্ভণং। কতমৎ। স্বিৎ। কথা। আসীৎ।
যতঃ। ভূমিং। জনয়ন্। বিশ্বকর্ম্মা
বি। দ্যাং। ঊর্ণোৎ। মহিনা। বিশ্বচক্ষাঃ ॥২

বিশ্বতঃ চক্ষুঃ। উত। বিশ্বতঃ মুখঃ
বিশ্বতঃ বাহুঃ। উত। বিশ্বতঃ পাৎ।
সং। বাহুভ্যাং। ধমতি। সং। পতত্রৈঃ
দ্যাবাভূমী। জনয়ন্। দেবঃ। একঃ ॥৩

কিং। স্বিৎ। বনং। কঃ। উঁ। সঃ। বৃক্ষঃ। আস
যতঃ। দ্যাবা পৃথিবী। নিঃ ততক্ষুঃ।
মনীষিণঃ। মনসা। পৃচ্ছত। ইৎ। উঁ। তৎ
যৎ। অধি অতিষ্ঠৎ। ভুবনানি। ধারয়ন্ ॥৪

যা। তে। ধামানি। পরমাণি। যা। অবমা
যা। মধ্যমা। বিশ্বকর্ম্মন্। উত। ইমা।
শিক্ষ। সখিভ্যঃ। হবিষি। স্বধাবঃ
স্বয়ং। যজস্ব। তন্বং। বৃধানঃ ॥৫

বিশ্বকর্মন্। হবিষা। ববৃধানঃ। স্বয়ম্
যজস্ব। পৃথিবীং। উত। দ্যাম্।
মহ্যন্তু। অন্যে। অভিতঃ। জনাসঃ
ইহ। অস্মাকম্। মঘবা। সূরিঃ। অস্তু ॥৬

বাচঃ। পতিম্। বিশ্বকর্মাণং। উতয়ে।
মনঃ জুবং। বাজে। অদ্য। হুবেম।
সঃ। নঃ। বিশ্বানি। হবনানি। জোষৎ
বিশ্ব শম্ভুঃ। অবসে। সাধুকর্মা ॥৭

যিনি এই সকল ভূতজাত হোম করিয়া একাকী অবস্থান করিয়াছিলেন, (তিনি) আমাদিগের ঋষি, হোতা, (ও) পালনকর্ত্তা। (৫) তিনি আশিষ দ্বারা দ্রবিণ ইচ্ছা করতঃ প্রথমকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, অবর (অর্থাৎ নিকৃষ্ট) সকলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।১

কি (স্থান তাঁহার) আশ্রয় ছিল? কি প্রকার উপাদান, কি প্রকারে ছিল, যাহা হইতে সর্ব্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা মহিমা দ্বারা ভূমি জন্মাইয়া দিব্যলোক বিস্তার করিয়াছিলেন?২

সকল দিকে চক্ষু ও সকল দিকে মুখ, সকল দিকে বাহু ও সকল দিকে পদ—এক (বা অদ্বিতীয়) দেবতা বাহু-

---

(৫) আমরা নাসদীয় সূক্তে দেখিয়াছি, প্রলয়ের সময় ভগবান একাকী থাকেন। কিন্তু প্রলয় অবসানে একের মনে ভোগেচ্ছা জন্মায়। এখানেও আমরা দেখিতেছি ঋষি ও হোতা, দ্রবিণ বা ভোগ ইচ্ছা করতঃ, প্রথমকে আবৃত করিয়া নিকৃষ্ট পদার্থে (অর্থাৎ স্বধায়) প্রবেশ করিয়াছেন। সায়ন 'আশিষা' অর্থে 'সূক্ত বাকাদিনা' করিয়াছেন। আমরা অনুমান করি 'আশিষ' শব্দ দ্বারা স্বধাকে বুঝাইতেছে। নাসদীয় সূক্তে স্বধাকে অবর (অর্থাৎ নিকৃষ্ট) বলা হইয়াছে।

দ্বয়ের দ্বারা (ও) সঞ্চালিত পদ সকলের দ্বারা দিব্যলোক ও ভূমি উৎপাদন করিয়া (কর্ম্মকারের মত) ফুৎকার দিতেছেন।৩

কোন্ বনের কি সে বৃক্ষ ছিল, যাহা হইতে দিব্যলোক ও পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছিল? হে মনীষিগণ! (তোমরা) মনের দ্বারা তাহাই জিজ্ঞাসা কর, যথায় (অর্থাৎ কোথায়) ভুবন সকল ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন।৪

হে বিশ্বকর্ম্মা! তোমার যে সকল উৎকৃষ্ট শরীর, যে সকল নিকৃষ্ট ও যে সকল মধ্যম (শরীর), এবং এ সকলই (অর্থাৎ সকলের জ্ঞান) সখাদিগকে দাও। হে স্বধাবান্! তনুকে বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনাকে হবিতে (অর্থাৎ হবি করিয়া) যজ্ঞ কর।৫

হে বিশ্বকর্ম্মা! স্বয়ং বর্দ্ধিত (তুমি) পৃথিবী ও দিব্য-লোককে হবি দ্বারা যজ্ঞ কর। অন্য সকল লোক মোহ প্রাপ্ত হউক। এই (যজ্ঞে) আমাদিগের ধনদাতা স্বর্গদাতা হউন।৬

অদ্য যজ্ঞে বাক্যের পতি, মনোগতি বিশ্বকর্ম্মাকে রক্ষার্থ আহ্বান করি। তিনি আমাদের সকল হব্যদ্রব্য সেবা করুন। সকলের মঙ্গলকারী, সাধুকর্ম্মা রক্ষার্থ (হউন)।৭

মন্তব্য:—এই সূক্ত হইতে আমরা জানিতেছি যে, বিশ্বকর্ম্মা ঋষি, হোতা, এবং দ্যাবা পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা। তিনি যখন বিশ্বসংসার হোম করিয়া সংহার করেন, তখন একাকী অবস্থান করেন। পরে যখন ভোগেচ্ছা মনে উদয় হয়, তখন তিনি স্বধাবান্ হন এবং আপনার তনুকে বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজেই যজ্ঞ করেন। তিনিই যজ্ঞপুরুষ। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া তাঁহার প্রথম (বা এক) অবস্থা আবৃত করেন। তিনিই সকল প্রকার জীবে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাতেই সকল ভুবন অবস্থান করিতেছে। তবে তিনি সকলকে ধারণ করিয়াও সকলের শ্রেষ্ঠরূপে এক স্থানে অধিষ্ঠান করেন। এই সূক্তে আমরা জানিতে পারি না, কোন্ উপাদান হইতে দ্যাবা পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ভগবান কোন্ স্থানে থাকিয়াই বা তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মাত্র দেখিতেছি, বিশ্বকর্ম্মা দ্যাবা পৃথিবী গঠনের সময় আপনার অসংখ্য হস্ত-পদ সঞ্চালন করিয়াছিলেন ও ফুৎকার দিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? মনে রাখিতে হইবে, দ্যাবা পৃথিবী ঋষিদিগের মতে জড় নহেন—তাঁহারা দেবতা, প্রাণযুক্তা ও দেহধারিণী। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে তাঁহারা দেবীদ্বয়রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। আমরা হিরণ্যগর্ভ সূক্তে দেখিয়াছি, জল প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল। তৎপরে দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা ১০৮২ সূক্তে দেখিব। যখন সকল স্থলে জল থাকে, তখন দ্যাবা পৃথিবী উৎপাদন করিতে গেলেই সেই জল এক স্থান হইতে দূর করিতে হইবে। ঋষির মতে বিশ্বকর্ম্মা বা হিরণ্যগর্ভ দেব জলেই অবস্থান করিয়া অসংখ্য হস্তপদ দ্বারা জল ঠেলিয়া একটি শূন্য স্থান প্রস্তুত করিলেন, এবং ফুৎকার দিয়া তাহা প্রাণরূপী বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন।

অন্তরাত্মা সূক্ত

১০৮২

চক্ষুষঃ। পিতা। মনসা। হি। ধীরঃ
ঘৃতং। এনে। অজনন্। নম্নমানে।
যদা। ইৎ। অন্তাঃ। অদদৃহন্ত। পূর্বে
আৎ। ইৎ। দ্যাবা পৃথিবী। অপ্রথেতাম্॥১

বিশ্বকর্মা। বিমনাঃ। আৎ। বিহায়াঃ
ধাতা। বিধাতা। পরমা। উত। সন্দৃক্।
তেষাং। ইষ্টানি। সম্। ইষা। মদন্তি
যত্র। সপ্তঋষীন্। পরঃ। একং। আহুঃ॥২

যঃ। নঃ। পিতা। জনিতা। যঃ। বিধাতা
ধামানি। বেদ। ভুবনানি। বিশ্বা।
যঃ। দেবানাং। নামধাঃ। একঃ। এব
তং। সং প্রশ্নং। ভুবনা। যন্তি। অন্যা॥৩

তে। আ। অযজন্ত। দ্রবিণং। সং। অস্মৈ
ঋষয়ঃ পূর্বে। জরিতারঃ। ন। ভূনা।
অসূর্তে। সূর্তে। রজসি। নিসত্তে
যে। ভূতানি। সং অকৃণ্বন্। ইমানি॥৪

পরঃ। দিবা। পরঃ। এনা। পৃথিব্যা
পরঃ। দেবেভিঃ। অসুরৈঃ। যৎ। অস্তি।

কং। স্বিৎ। গর্ভং। প্রথমং। দ্রধ্রে। আপঃ
যত্র। দেবাঃ। সং অপশ্যন্ত। বিশ্বে।৫

তং। ইৎ। গর্ভং। প্রথমং। দধ্রে। আপঃ
যত্র। দেবাঃ। সং অগচ্ছন্ত। বিশ্বে।
অজস্য। নাভৌ। অধি। একং। অর্পিতং
যস্মিন্। বিশ্বানি। ভুবনানি। তস্থুঃ ॥৬

ন। তং। বিদাথ। যঃ। ইমা। জজান
অন্যৎ। যুষ্মাকং। অন্তরং। বভূব।
নীহারেণ। প্রাবৃতাঃ। জল্প্যা। চ
অসুতৃপঃ। উক্‌থশসঃ। চরন্তি॥৭

অর্থ:—চক্ষুর (অর্থাৎ জ্যোতিঃর) পালনকর্ত্তা, মনের দ্বারা ধী-যুক্ত (৬) (প্রথম) উদক, (পরে) চঞ্চল এই দুইটিকে (অর্থাৎ দ্যাবা পৃথিবীকে) উৎপাদন করেন। যখন ইহাদের অন্তসকল দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল, তখন হইতে ইহারা দ্যাবা পৃথিবী নামে খ্যাত হইয়াছে।১

বিশ্বকর্ম্মা মহৎ মনবিশিষ্ট, মহান্, ধাতা, বিধাতা, শ্রেষ্ঠ ও সম্যক্ দ্রষ্টা। যথায় তাঁহাদিগের (অর্থাৎ সপ্তর্ষিদিগের) যজ্ঞসকল ইষ (৭) দ্বারা মত্ত হয় (সেই সকল সপ্তর্ষিদিগেরও উপরে (যিনি আছেন) তাঁহাকে (লোকে) এক (অর্থাৎ অদ্বিতীয়) বলে। ২

যিনি আমাদের পালক (ও) জনক, যিনি বিধাতা, (তিনি) বিশ্বের ভূতজাত ও দেহধারীদিগকে জানেন; যিনি দেবতাদিগকে (সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে) নাম ও কার্য্য দান করিয়াছেন; (যিনি) অদ্বিতীয়; অন্য সকল ভূতজাত তাঁহাকে (জানিবার জন্য) প্রশ্নযুক্ত হয়। ৩

স্তোত্রকারীর মত সেই সকল প্রাচীন ঋষি ভূমা (অর্থাৎ যজ্ঞ পুরুষ) দ্বারা সম্যকরূপে হবি (করিয়া) ইঁহার (বিশ্বকর্ম্মার) নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অসুরলোকে, সুরলোকে রজলোকে অবস্থিত এই সমস্ত ভূতজাতকে যাঁহারা সম্যক করিয়াছিলেন(৮)। ৪

দিব্যলোক হইতে উর্দ্ধে, এই পৃথিবীর উর্দ্ধে, দেবতা (ও) অসুরদিগের উর্দ্ধে যাহা আছে (তাহা এমন). কি গর্ভ (যাহাকে) জল সকল প্রথম ধারণ করিয়াছিল, যাহাতে সকল দেবতা সম্যক দর্শন করিয়াছিলেন? ৫

আপ সকল সেই গর্ভকেই প্রথম ধারণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সকল দেবতা সম্যক আগমন করিয়াছিলেন। অজের নাভির উপর 'একং' অর্পিত (ছিলেন) যাঁহাতে সকল ভূতজাত ছিল। ৬

যিনি এই সকল জন্মাইয়াছেন তাঁহাকে (তোমরা) জান না; অন্য (অর্থাৎ অজ) তোমাদের অন্তর হইয়াছেন। জল্পনাকারীগণ, অসুতৃপ্ত যাঁরা, ও উক্‌থ উচ্চারণকারীগণ কুয়াশায় আবৃত হইয়া বিচরণ করেন। ৭

মন্তব্য:—এই সূক্ত হইতে আমরা জানিতেছি যে, ঋষি 'অজ' নাম দ্বারা স্বএর কল্পনা করিয়াছেন। গর্ভ (বা হিরণ্যগর্ভ) তাঁহার সহিত যুক্ত এবং জলবেষ্টিত। এই গর্ভ হইতেই দেবগণ ও প্রাণীসমূহ উৎপন্ন। হিরণ্যগর্ভরূপী ভগবান পৃথিবী, দিব্যলোক, সুরলোক, অসুরলোক হইতেও উর্দ্ধে থাকেন। দিব্যলোক, সুরলোক ও অসুরলোক—এই তিন লোক লইয়া ত্রিদিব বা স্বর্গ। ইহারও উপরে যে পরম ব্যোম আছেন, ভগবান্ তাহাতে থাকেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিশ্বকর্ম্মা জলরাশি অপসারিত করিয়া দ্যাবা পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ফুৎকার দিয়া ইহাদিগের প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। বায়ুই দ্যাবা পৃথিবীর প্রাণস্বরূপ। কিরূপে অপরাপর দেবগণ

(৬) মনসা নহি মৎসমোস্তি কশ্চিৎ ইতি বুদ্ধ্যাহি খলু ধীর ধৃষ্টো ইতি সায়ন। সায়ন ১,১৬৪,২১ ঋকে ধীরঃ শব্দের অর্থ ধীমান করিয়াছেন।

(৭) সায়ন 'ইষ্টানি' অর্থে 'স্থানানি শরীরাণি বা' বলিয়াছেন। কিন্তু বৈদিকযুগে ইষ্টশব্দের সাধারণ অর্থ যজ্ঞ। 'ইষ' অর্থে সায়ন উদকেন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইষ অর্থে সোমরস, কারণ সোমরস পানেই মত্ততা জন্মে।

(৮) সায়ন এই ঋকের নিম্নলিখিত রূপ অর্থ করেন:—সেই সকল প্রাচীন ঋষিগণ এই (বিশ্বকর্ম্মাকে) দ্রবিণ (অর্থাৎ পুরোডাশাদি লক্ষণ ধন) দিয়া সম্যকরূপে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। স্তোত্রকারীগণ মহৎ (স্তোত্র) দ্বারা যেমন (যজ্ঞ করেন সেইরূপ) যে সকল (মহর্ষি) স্থাবর, জঙ্গম (স্বরূপ) রজলোকে নিশ্চল অবস্থিত এই সকল ভূতজাতকে সম্যক (ধন দ্বারা) পূজা করিয়াছিলেন।

আমরা এই ঋকের এইরূপ অন্বয় করি:—পূর্ব্বে জরিতারঃ ন তে ঋষয়ঃ ভূনা দ্রবিণং সং (কৃণ্বন্) অস্মৈ আ অযজন্ত। যে (ঋষয়ঃ) অসূর্ত্তে সূর্ত্তে রজসি নিসত্তে ইমানি ভূমানি সং অকৃণ্বন্।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে ঔষুয়া এইরূপ যজ্ঞের বর্ণনা দেখিতে পাই।

ও প্রাণীগণ সৃজিত হইয়াছিল, তাহা এখানে প্রাপ্ত হইতেছি না। অন্য সূক্তে এই সকল বর্ণিত হইয়াছে, পরে দেখান যাইতেছে।

দেবতা ও আদিত্যদিগের জন্মসূক্ত

১০।৭২

দেবাং। নু। বয়ং। জানা। প্র। বোচাম। বিপন্যয়া
উক্‌থেষু। শস্যমানেষু। যঃ। পশ্যাৎ। উত্তরে। যুগে ॥ ১

ব্রহ্মণঃ। পতিঃ। এতা। সং। কর্মারঃ ইব। অধমৎ
দেবানাং। পূর্ব্যে। যুগে। অসতঃ। সৎ। অজায়ত ॥ ২

দেবানাং। যুগে। প্রথমে। অসতঃ। সৎ। আজায়ত
তৎ। আশাঃ। অনু। অজায়ন্ত। তৎ। উত্তানপদঃ। পরি ॥৩

ভূঃ। জজ্ঞে। উত্তানপদঃ। ভুবঃ। আশাঃ। অজায়ন্ত
অদিতেঃ। দক্ষঃ। অজায়ত। দক্ষাৎ। উঁ। অদিতি। পরি ॥ ৪

অদিতিঃ। হি। অজনিষ্ঠ। দক্ষ। যা। দুহিতা। তব
তাং। দেবাঃ। অনু। অজায়ন্ত। ভদ্রাঃ। অমৃত বন্ধবঃ ॥ ৫

যৎ। দেবাঃ। অদঃ। সলিলে। সুসংরব্ধাঃ। অতিষ্ঠত
বঃ। নৃত্যতাংইব। তীব্রঃ। রেণুঃ। অপ। আয়ত ॥ ৬

যৎ। দেবাঃ। যতয়ঃ। যথা। ভুবনানি। অপিন্বত
অত্র। সমুদ্রে। আ। গূঢ়ং। আ। সূর্য্যং। অজভর্তন ॥ ৭

অষ্টৌ। পুত্রাসঃ। অদিতেঃ। যে। জাতা। তন্বঃ। পরি
দেবান্‌। উপ। প্র। ঐৎ। সপ্তভিঃ। পরা। মার্তাণ্ডং।
আস্যৎ ॥ ৮

সপ্তভিঃ। পুত্রৈঃ। অদিতিঃ। উপ। প্র। ঐৎ। পূর্ব্বং।
যুগম্‌
প্রজায়ৈঃ। মৃত্যবে। ত্বৎ। পুনঃ। মার্ত্তাণ্ডং। আ।
অভরৎ ॥ ৯

অর্থ:—আমরা দেবতাদিগের জন্মকথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি; ভবিষ্যৎকালে (এই) সকল সূক্ত উচ্চারিত হইলে যে (কেহ) দেখিবেন। ১

ব্রহ্মণস্পতি ইঁহাদিগকে (অর্থাৎ দেবতাদিগকে) কর্ম্মকারের মত ফুৎকার দিয়াছিলেন। দেবোৎপত্তির পূর্ব্বকালে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিলেন। ২

দেবতাদিগের যুগে প্রথম অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিলেন। তৎপরে আশা সকল জন্মিয়াছিল, তাহা (অর্থাৎ এই জন্ম) উত্তানপদ হইতে চতুর্দ্দিকে (ব্যাপ্ত ছিল)। ৩

উত্তানপদ হইতে ভূ জন্মিয়াছিল; ভূ হইতে আশা সকল জন্মিয়াছিল। অদিতি হইতে জন্মিয়াছিলেন; দক্ষ হইতে অদিতি চতুর্দ্দিকে (ব্যাপ্ত ছিলেন)। ৫

হে দক্ষ! যিনি তোমার দোহনকারিণী সেই অদিতি জন্মাইয়াছিলেন। তাঁহার (অর্থাৎ অদিতির) পরে অমৃতের বন্ধুগণ, ভদ্রগণ জন্মিয়াছিলেন। ৫

হে দেবগণ! যখন ঐ সলিলে সুন্দররূপে সৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে, নৃত্যকারীর ন্যায় তোমাদিগের তীব্র রেণু বহির্গত হইয়াছিল। ৬

যখন গমনশীলদিগের ন্যায় দেবগণ ভুবন সকল পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, এই সমুদ্রে গূঢ়ভাবে অবস্থিত সূর্য্যকে আহরণ করিয়াছিলেন। ৭

অদিতির তনুর চারিদিকে যে আটটী পুত্র জন্মিয়াছিল, সাতটীর সহিত দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন; মার্তাণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৮

পূর্ব্বকালে অদিতি সাত পুত্রের সহিত (দেবতাদিগের) নিকট গমন করিয়াছিলেন; প্রাণীদিগের উৎপত্তি ও মৃত্যুর জন্য মার্তাণ্ডকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ৯

মন্তব্য:—এই সূক্তে দেব, আদিত্য, অদিতি, দক্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। নাসদীয় সূক্তের মত অবলম্বন করিয়া প্রথম অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হন, এই উক্তি এখানে দেখিতে পাই। তৎপরে 'সৎ' অপর দেবতাদিগকে উৎপাদন করেন। এই সূক্তে সেই সৎরূপী ব্রহ্মকে ব্রহ্মণস্পতি আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি দেবতাদিগকে ফুৎকার দ্বারা গঠন করেন। কিরূপে জল, দ্যাবা পৃথিবী ও অপরাপর প্রধান দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিস্তার বর্ণনা এই সূক্তে নাই। আমরা এইখানে উত্তানপদ হইতে ভূ (অর্থাৎ ভূমি) এবং ভূ হইতে দিক্‌ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হই। আরো দেখিতে পাই, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছেন; কিন্তু এই জন্ম কিরূপ? অদিতি দক্ষকে দোহন করিয়া নিজ গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, হিরণ্য-

গর্ভ যদিও জলদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের গর্ভরূপে অবস্থিত। এখানেও সেইরূপ দেখিতেছি যে, দক্ষরূপী ভগবানকে অদিতি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দক্ষ—কে? ঋষি বলিতেছেন যে, দেবতাদিগের দেহ হইতে একটী তীব্র রেণু বহির্গত হইয়া সমুদ্রে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ছিল। এই তীব্র রেণুই সূর্য্যস্থ অগ্নি। ইনিই দক্ষরূপী অগ্নি। ইনি বাক্য উচ্চারণ করিয়া অদিতিতে আদিত্যগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। (৯) ঋষির মতে আটজন আদিত্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৭জনকে লইয়া অদিতি দেবতাদিগের নিকট গমন করেন।

অষ্টম মার্ত্তাণ্ডকে তিনি মর্ত্ত্য জীবের জন্য গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। ঋষিদিগের মতে পিতাই পুত্ররূপে উদ্ভূত হন। অতএব দক্ষ প্রথম অমর সাতটীর পরে অদিতির গর্ভে যত সন্তান উৎপাদন করিতেছেন, তাহারা মর্ত্ত্য হইতেছে। তাহারা সকলেই মার্ত্তাণ্ড বা মৃত অণ্ড। দক্ষরূপী পিতা মার্ত্তাণ্ড বা সূর্য্যমণ্ডলরূপী সন্তানে যেন পুনঃ উৎপন্ন হইতেছেন। এই জন্য সেকালের ঋষিগণ বলিতেন সূর্য্য নানা বা বহু। (১০)

এই সূক্তে উত্তানপদ নাম দেখিতে পাই। সায়ন ইহার অর্থ করেন 'বৃক্ষ'। সেকালের ঋষিগণ সোমরসকেই ভগবানের কামনা-রস মনে করিতেন, পরে ইহা বিস্তৃতভাবে দেখান যাইবে। অতএব উত্তানপদকে বৃক্ষরূপী সোম বলিতে পারি। ইনিই পুরুষরূপে আপনাকে হবি করিয়া দেবতাদিগের যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছেন। এই সর্ব্বহুত যজ্ঞ দ্বারাই মরজগৎ উৎপন্ন। পুরুষ সূক্ত ব্যাখ্যাকালে ইহা জানা যাইবে। অতএব ভূমি ও মর্ত্ত্য জীব উত্তানপদ হইতে উৎপন্ন। তবে এই উৎপত্তির পূর্ব্বে সূর্য্যাগ্নি আবশ্যক। কারণ দেবতাদিগের এই সর্ব্বহুত যজ্ঞে দেখিতে পাই, তাঁহারা অগ্নিকে উৎপাদন করিয়া পুরোহিত করিয়াছিলেন। এই সূক্তে দেখিতেছি যে, দেবগণ আপনাদিগের হইতে একটা তীব্র অণু উৎপাদন করিয়াছেন। দেবতাগণ হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎপন্ন—সেই জন্য তাঁহারা সকলেই অমর। কিন্তু দেবতাদিগের হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি বা দক্ষ—তিনি যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ৭টী অমর, অপর সকল মর্ত্ত্য।

তাহা হইলে, স্ব ও স্বধাযুক্ত হইয়া যিনি উৎপন্ন, তিনি ব্রহ্মাগ্নি। সেই ব্রহ্মাগ্নি যখন জলে পতিত হয়, তখন দেবগণ উৎপন্ন হন। অতএব স্বর্গীয় জল ও ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন। দেবগণ হইতে যে তেজ বহির্গত হইয়া সমুদ্রে রহিল, তাহাই অদিতি বা অন্তরিক্ষ ধারণ করিলেন। এই তেজ ও অদিতি যোগে সাতটা অমর আদিত্য উৎপাদন করিয়াছে। আদিত্যগণ ক্ষত্র। অতএব দেবগণে ব্রহ্মাগ্নি এবং ক্ষত্রগণে ক্ষত্রাগ্নি বর্ত্তমান। দেবতাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ। ঋষিদিগের মতে দক্ষ এখনও অদিতি গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন। কিন্তু তাহারা মর্ত্ত্য। অদিতি দক্ষের তেজ ধারণ করিতে প্রতিদিন নূতন-নূতন দেহের সৃষ্টি করেন। কিন্তু উহারা ঐ তেজ ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়া মার্ত্তাণ্ড নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

পুরুষ সূক্ত

১০।৯০

সহস্র শীর্ষা। পুরুষঃ। সহস্রাক্ষঃ। সহস্রপাৎ।
সঃ। ভূমিং। বিশ্বতঃ। বৃত্বা। অতি। অতিষ্ঠৎ। দশাঙ্গুলম্॥১

পুরুষঃ। এব। ইদং। সর্বং। যৎ। ভূতং। যৎ। চ। ভব্যম্।
উত। অমৃতত্বস্য। ঈশানঃ। যৎ। অন্নেন। অতিরোহতি॥২

এতাবান্। অস্য। মহিমা। অতঃ। জ্যায়ান্। চ। পুরুষঃ।
পাদঃ। অস্য। বিশ্বা। ভূতানি। ত্রিপাৎ। অস্য। অমৃতং। দিবি॥৩

ত্রিপাৎ। উর্দ্ধ্বঃ। উৎ। ঐৎ। পুরুষঃ। পাদঃ। অস্য। ইহ। অভবৎ। পুনঃ।
ততঃ। বিষ্বঙ্। বি। অক্রামৎ। সাশনানশনে। অভি॥৪

---

(৯) যূয়ং হিষ্ঠা রথ্যো ন স্তুনূনাং যূয়ং দক্ষস্য বচসো বভূব। ৬।৫১।৬
অর্থ:—তোমরা আমাদিগের শরীরের নেতা হও। তোমরা দক্ষের বচন হইতে হইয়াছ।

(১০) সপ্ত। দিশঃ। নানা সূর্য্যাঃ। সপ্ত। হোতারঃ। ঋত্বিজঃ। দেবাঃ। আদিত্যাঃ। যে। সপ্ত। তেভিঃ। সোম। অভি। রক্ষ। নঃ ইন্দ্রায়। ইন্দো। পরি। স্রব॥ ৯। ১১৩।৩

অর্থ:—সাত দিক, বহু সূর্য্য, সাতজন ঋত্বিগ্ হোত, যে সাতজন আদিত্য দেব (আছেন) সেই সকলের দ্বারা, হে সোম! আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। হে ইন্দু! ইন্দ্রের নিমিত্ত স্রবণ কর।

তস্মাৎ। বিরাট্। অজায়ত। বিরাজঃ। অধি। পুরুষঃ।
সঃ। জাতঃ। অতি। অরিচ্যত। পশ্চাৎ। ভূমিং। অথো। পুর॥৫

যৎ। পুরুষেণ। হবিষা। দেবাঃ। যজ্ঞং। অতন্বত।
বসন্তঃ। অস্য। আসীৎ। আজ্যং। গ্রীষ্মঃ। ইধ্মঃ। শরৎ।
হবিঃ॥৬

তং। যজ্ঞং। বর্হিষি। প্র। ঔক্ষন্। পুরুষং। জাতং। অগ্রতঃ।
তেন। দেবাঃ। অযজন্ত। সাধ্যাঃ। ঋষয়ঃ। চ। যে॥৭

তস্মাৎ। যজ্ঞাৎ। সর্বহুতঃ। সং ভৃতং। পৃষদাজ্যম্।
পশূন। তান্। চক্রে। বায়ব্যান্। আরণ্যান্। গ্রাম্যাঃ। চ।
যে॥৮

তস্মাৎ। যজ্ঞাৎ। সর্বহুতঃ। ঋচঃ। সামানি। জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি। জজ্ঞিরে। তস্মাৎ। যজুঃ। তস্মাৎ। অজায়ত॥৯

তস্মাৎ। অশ্বাঃ। অজায়ন্ত। যে। কে। চ। উভয়াদতঃ।
গাবঃ। হ। জজ্ঞিরে। তস্মাৎ। তস্মাৎ। জাতঃ। অজাবয়ঃ॥১০

যৎ। পুরুষং। বি। অদধুঃ। কতিধা। বি। অকল্পয়ন্।
মুখং। কিং। অস্য। কৌ। বাহূ। কৌ। উরূ। পাদৌ
উচ্যেতে॥১১

ব্রাহ্মণঃ। অস্য। মুখং। আসীৎ। বাহূ। রাজন্যঃ। কৃতঃ।
উরূ। তৎ। অস্য। যৎ। বৈশ্যঃ। পদ্ভ্যাং। শূদ্র। অজায়ত॥১২

চন্দ্রমাঃ। মনসঃ। জাতঃ। চক্ষোঃ। সূর্যঃ। অজায়ত।
মুখাৎ। ইন্দ্রঃ। চ। অগ্নিঃ। চ। প্রাণাৎ। বায়ুঃ। অজায়ত॥১৩

নাভ্যাঃ। আসীৎ। অন্তরিক্ষং। শীর্ষ্ণঃ। দৌঃ। সং। অবর্তত।
পদ্ভ্যাং। ভূমিঃ। দিশঃ। শ্রোত্রাৎ। তথা। লোকান্
অকল্পয়ন॥১৪

সপ্ত। অস্য। আসন্। পরিধয়ঃ। ত্রিঃ। সপ্ত। সমিধঃ। কৃতাঃ।
দেবাঃ। যৎ। যজ্ঞং। তন্বানাঃ। অবধ্নন্। পুরুষং। পশুম্॥১৫

যজ্ঞেন। যজ্ঞং। অযজন্ত। দেবাঃ। তানি। ধর্মাণি। প্রথমানি।
আসন্।
তে। হ। নাকং। মহিমানঃ। সচন্ত। যত্র। পূর্বে। সাধ্যাঃ।
সন্তিঃ। দেবাঃ॥১৬

অর্থ:—পুরুষ অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য পদ-বিশিষ্ট। তিনি ভূমিকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া দশাঙ্গুলকে (অর্থাৎ তাঁহার দশাঙ্গুলের তুল্য যে ভূমি তাহাকে) (১১) অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন।১

যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সে সকলই পুরুষ; এবং অমৃতেরও (তিনি) ঈশ্বর, (ও) যাহা অন্নের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ মর্ত্ত্য তাহারও ঈশ্বর)।২

এই সকল তাঁহার মহিমা; পুরুষ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। বিশ্বের প্রাণী সকল তাঁহার একটী অংশ; তাঁহার অমৃত তিন অংশে দিব্যলোকে।৩

পুরুষ তিন অংশ (লইয়া) উর্দ্ধে গিয়াছেন; তাঁহার এক অংশ ইহলোকে পুনঃপুনঃ আসিতেছে। সেইজন্য বিশ্বভূতে (তিনি) ভোজনকারী ও অভোজনকারী (অর্থাৎ প্রাণী ও জড়) রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছেন।৪

তাঁহা হইতে বিরাট জন্মিয়াছিলেন; পুরুষ বিরাটের অধিকারী (বা উপরে) তিনি (অর্থাৎ পুরুষ) জন্মিয়াই অধিক (অর্থাৎ আপনাকে বিভক্ত করিয়া) হইয়াছিলেন। প্রথম পুরোবর্ত্তি তাবা পৃথিবী পশ্চাৎ (ভূমিকে সৃজন করিয়াছিলেন)।৫

যখন দেবগণ পুরুষ-হবি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বসন্ত (ঋতু) ইহার আজ্য (অর্থাৎ ঘৃত), গ্রীষ্ম, (ঋতু) কাষ্ঠ (ও) শরৎ (অর্থাৎ বৎসর) (১২) হবি হইয়াছিল।৬

সকলের অগ্রে উৎপন্ন সেই যজ্ঞ পুরুষকে বর্হির উপর (অর্থাৎ কুশের উপর) বলি দেওয়া হইয়াছিল। দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ যাঁহারা (ছিলেন) তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৭

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে দধি, ঘৃত উৎপন্ন হইয়াছিল; বায়ব্য, আরণ্য ও গ্রাম্য পশু যাহারা তাহাদিগকে (উৎপাদন) করা হইয়াছিল।৮

সেই সর্ব্বহুত যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম সকল জন্মিয়াছিল;

---

(১১) এই সূক্তের ১৪ ঋক দেখুন।

(১২) পুরুষ যখন হবি হইয়াছিলেন, পুনরায় শরৎকে হবি বলা হইয়াছে কেন? আমরা দেখিয়াছি হিরণ্যগর্ভ দেবই প্রথমজাত ও প্রজাপতি। ঋষিগণ প্রজাপতিকে সংবৎসর আখ্যাও প্রদান করিতেন। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলে। এই ব্রাহ্মণে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখিতে পাই।

"সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতির্যজ্ঞঃ। ৭ম অধ্যায়, ৭ম খণ্ড, ঋগ্বেদের যুগে শরৎ শব্দ দ্বারা বৎসরও বুঝাইত।

তাহা হইতে ছন্দ সকল জন্মে ; তাহা হইতে যজু জন্মিয়াছিল ।৯

তাহা হইতে অশ্বগণ জন্মিয়াছিল ; যে সকল উভয়-দন্তবিশিষ্ট, ও গো সকল তাহা হইতে জন্মিয়াছিল। ছাগ ও মেষ সকল তাহা হইতে উৎপন্ন হয় ।১০

পুরুষকে বধ করিয়া কয়ভাগে কল্পনা করা হইয়াছিল ? তাঁহার মুখকে, বাহুদ্বয়কে, উরুদ্বয়কে, পাদদ্বয়কে কি বলা হয় ? ১১

তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ (আখ্যা) পাইয়াছিল ; বাহুদ্বয়কে রাজন্য করা হইয়াছে ; তৎপরে তাঁহার উরুদ্বয়কে বৈশ্য (করা হইয়াছিল) ; পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল । ১২

মন হইতে চন্দ্রমা জন্মে ; চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিল ; ইন্দ্র ও অগ্নি মুখ হইতে, এবং প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছে । ১৩

নাভি হইতে অন্তরিক্ষ হইয়াছিল ; মস্তক হইতে দিব্যলোক সম্যক প্রকারে বর্ত্তমান হইয়াছিল। পদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌সকল, তৎপরে লোকসকল কল্পিত হইয়াছিল । ১৪

যখন দেবগণ পুরুষ পশুকে বধ করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সাতটী পরিধি ছিল ; ২১টী সমিধ করা হইয়াছিল । ১৫

দেবগণ যজ্ঞ (পুরুষ) দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সকল ধর্ম্ম কার্য্যই প্রথম হইয়াছিল। সেই মহিমাসম্পন্নগণ নাক (অর্থাৎ স্বর্গ) লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন— যথায় পূর্ব্বকালীন সাধ্য দেবগণ আছেন। ১৬

মন্তব্য :—স্ব ও স্বধার মিলনে যে পুরুষ উৎপন্ন হন, তাঁহাকে ঋষিগণ যজ্ঞপুরুষ, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি, ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়াছেন। তিনি দৃষ্টি দ্বারা জল এবং হস্তপদের শক্তি দ্বারা দিব্যলোক ও অন্তরিক্ষ সৃজন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার অংশ হইতেই দেবতাদিগকে সৃজন করেন। এই দেবতা যে কে কে—তাঁহাদের উল্লেখ নাই। তবে ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থলে দেখিতে পাই, দেবতাগণ সর্ব্বহুত যজ্ঞ করিবার জন্য অগ্নিকে উৎপাদন করেন। তিনিই এই যজ্ঞের পুরোহিত বা দক্ষ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি—কিরূপে দেবতাদিগের নৃত্য হইতে উহার উদ্ভব হইয়াছিল। এই যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ মর্ত্ত্যলোক সৃজন করেন। অতএব এক্ষণে ভূমি সৃজিত হইয়াছিল। এই সৃষ্টির পর যজ্ঞপুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ এই বিশ্ব-সংসার হইলেন—ইহাতে অমর ও মরলোক এবং জড় বর্ত্তমান। এই অবস্থাকে ঋষি বিরাট নাম দিয়াছেন। এই বিরাট-দেহে চন্দ্র, সূর্য্য বর্ত্তমান। ঋষি বলিতেছেন, চন্দ্রেই পুরুষের মন বিশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিত। অতএব স্ব-এর কামনা চন্দ্রেই উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এই কামনাই জগৎ-সংসারের উৎপত্তি ও স্থিতির একমাত্র কারণ। এই রসই সোমরস বা অমৃত। দিব্যলোকে ইহা জ্যোতিঃ স্বরূপ। এই জ্যোতিঃ দেব ও পিতৃগণ পান করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হন। এই স্বর্গীয় সোমরস পীত হয় বলিয়াই চন্দ্রের হ্রাস হয়। কিন্তু ভগবানের মনে স্বধার প্রতি অনুরাগ বর্ত্তমান আছে বলিয়াই পুনরায় চন্দ্র সোমরসে পূর্ণ হইয়া পূর্ণিমার চন্দ্রে পরিণত হন। চন্দ্রের জ্যোতিঃই ব্রহ্মবর্চস ; ইহা তীক্ষ্ণ তেজশূন্য জ্যোতিঃ—বড়ই মনোরম ও আনন্দদায়ক। মনুষ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে এইরূপ মনোরম হন। তিনি কাহাকেও ক্লেশ দেন না। কিন্তু সূর্য্যে যে অগ্নি বর্ত্তমান তাহা তীক্ষ্ণ ও উগ্র। রাজপুরুষ যেরূপ উগ্র (অর্থাৎ magestic), এবং পাপের শাস্তি দ্বারা লোকের মনে তাপ দেন, সূর্য্যরশ্মিও সেইরূপ। ইহাকে ঋষিগণ ক্ষত্রবচস নাম দিয়াছেন।

ইহা ভগবানের চক্ষু। লোকের মনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া তাহার পাপের সন্ধান করেন। রাজা যেমন পাপ-পুণ্যের বিচার করেন, সূর্য্যাগ্নিও যেন সেইরূপ কার্য্য করে। ভূমিতে বিরাট-পুরুষের পদদ্বয় রহিয়াছে। তাঁহার মস্তক দিব্যলোকে। নাভি যেরূপ মনুষ্যের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান, সেইরূপ অন্তরিক্ষ ভগবানের নাভিস্থানীয়। ভগবান প্রাণস্বরূপ। তাঁহার প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়া সকলকে প্রাণবান্ করিয়াছেন। অগ্নি ও ইন্দ্র তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন। ইন্দ্র, বজ্রের দেবতা এবং অগ্নি বিদ্যুতে বর্ত্তমান। তাঁহার মুখ হইতে যে বাক্য বহির্গত হয়, তাহাই বজ্র-নির্ঘোষের শব্দ ; উহার সহিত বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়।

বিরাট-পুরুষের মুখ হইতে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ; তাঁহার হস্ত হইতে উৎপন্ন হইলে বলশালী ক্ষত্রিয় হয়। তাঁহার উরু হইতে যাহারা

উৎপন্ন তাহারাই বৈশ্যবৎ গুণশালী হয়। পদদ্বয় হইতে জন্মলাভ করিলে তাহারা শূদ্রের মত গুণবান হয়।

যেমন বিশ্ব-সংসারে ভগবান্ বিরাট-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ ও পালন করিতেছেন, সেইরূপ কোন মনুষ্য-সমাজ ধারণ ও পালন করিতে হইলে, এই চারি প্রকার গুণবিশিষ্ট লোকের প্রয়োজন। তাহাদের পরস্পর সদ্ভাব দ্বারাই সমাজ সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহীর ন্যায় অবস্থান করিতে সক্ষম হয়।

প্রজাপতিকে বৎসর বলায়, আমরা ভগবান্‌কে কাল-ভাবে দেখি। কালের জ্ঞান কার্য্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। সেই জন্য কালরূপী ভগবানকে যজ্ঞপুরুষ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি নিজেকে নিজেই যজ্ঞ করিয়া দিব্যলোক প্রভৃতি সৃজন করিয়াছেন; দেবতাগণ সেই কালরূপী ভগবানকে বুঝিবার জন্য তাঁহাকেই যজ্ঞ করিয়াছেন। সেই জন্য কালের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম ভাগ, এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ ভাগ সম্ভব হইতেছে।

এই সূক্ত দ্বারা ঋষি আরো দেখাইতেছেন যে, মৃত্যুই প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধি পাইবার একমাত্র উপায়। যে নিজেকে বলি না দেয়, সে ক্ষুদ্র; তাহার উন্নতি বা বৃদ্ধি নাই। স্বার্থত্যাগই, স্বার্থ প্রাপ্তির উপায়। ভগবান দেবতাদিগকে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য আপনাকে তাঁহাদের যজ্ঞে হবি-রূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। যাহা ভগবানের স্বভাব, তাহা সকলেরই স্বভাব; কারণ সকলের মধ্যেই ভগবান বর্ত্তমান। অতএব আমরা স্বার্থত্যাগ ও স্বার্থ বলিদান দিয়াই প্রকৃত মহত্ত্ব ও আনন্দ প্রাপ্ত হই, এই শিক্ষা দিবার জন্যই ঋষি পুরুষসূক্ত রচনা করিয়াছেন। ইহাই জাগতিক অপরি-বর্ত্তনীয় নিয়ম।

কর্ণভার

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল সরস্বতী, এম্-এ, বি-এল্]

[মন্তব্য]

“কর্ণভার” মহাকবি ভাস-বিরচিত একখানি একাঙ্ক দৃশ্য-কাব্য। “অনন্তশয়ন গ্রন্থাবলী”র ২২ সংখ্যক গ্রন্থরূপে এখানি প্রকাশিত হইলেও, দৃশ্যকাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সম্পাদক গণপতি শাস্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই—‘কর্ণভার’ বাক্যটির অর্থ, কর্ণের ভার, অর্থাৎ সেনাপতির কার্য্য-নির্ব্বাহ। দৃশ্যকাব্য-খানিতে কিন্তু কর্ণের পরাক্রমসূচক কোনও যুদ্ধ-বর্ণনা নাই। যে অংশটুকু ছাপা হইয়াছে, তাহাতে কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইয়াছেন, শল্য রথ চালাইতেছেন, এমন সময় কর্ণ দুর্লক্ষণ দেখিলেন। তাঁহার অস্ত্র বিফল হইবে—পরশুরামের এই অভিশাপও তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন কর্ণ শল্যরাজকে ঐ শাপের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। কিরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া কর্ণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে বজ্রমুখ নামক কীটবিশেষ-দষ্ট হইয়াও, গুরুর নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া রক্তাপ্লুত উরুতে বসিয়া থাকাতে, পরশুরাম তাঁহার ধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং শাপ দিয়াছিলেন যে, প্রয়োগকালে কর্ণের কোন অস্ত্র সফল হইবে না, এই সকল কথা বিশদভাবে শল্যরাজকে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বর্ণনা শেষ হইলে উভয়ে রথে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ একে-একে ইন্দ্রকে সহস্র গাভী, সহস্র-সহস্র অশ্ব, অসংখ্য হস্তী, অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ, সমগ্র পৃথিবী, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল, এমন কি নিজ শির পর্য্যন্ত প্রদান করিতে চাহিলেন। ইন্দ্র তাহা গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়াতে, কর্ণ সহজাত কবচ ও কুণ্ডল-যুগল দিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্র সাগ্রহে তাহা প্রার্থনা করিলে, কর্ণ নিজের মনের সন্দেহ এবং শল্যের

নিষেধ সত্ত্বেও ইন্দ্রকে তাহা দান করিলেন। ইন্দ্র চলিয়া গেলে শল্য কর্ণকে বলিলেন, "তুমি প্রতারিত হইলে।" কর্ণ বলিলেন, "না, ইন্দ্রই প্রতারিত হইয়াছেন। কেন না, কিরীটি (অর্জ্জুন) নিজ আয়ত্তে থাকিলেও যে ইন্দ্র কৃতার্থ হইতে পারেন নাই, তাঁহাকে আমি কৃতার্থ করিয়াছি।"

এই কথা শেষ হইতেই ব্রাহ্মণরূপে দেবদূত আসিয়া বলিল, "কবচ-কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া অনুতপ্ত ইন্দ্র পাণ্ডবদের মধ্যে একজনের বধের নিমিত্ত অমোঘবীর্য্য 'বিমলা' নামক শক্তি দান করিয়াছেন।" কর্ণ প্রথমে ইহা লইতে স্বীকৃত হন নাই; পরে ব্রাহ্মণের বাক্য অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রথারোহণ করিলেন। নেপথ্যে অর্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইল। কর্ণ শল্যরাজকে সেইদিকে রথ চালাইতে বলিলেন।

এইখানে মুদ্রিত নাট্যের সমাপ্তি। তাই গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন, বোধ হয়, অন্ততঃ আর এক অঙ্ক ইহার পরে ছিল, যাহাতে যুদ্ধে কর্ণের পরাক্রম বর্ণিত থাকা সম্ভব।

দুইখানি পুঁথি হইতে 'কর্ণভার' মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার একখানি পুঁথিতে "ভরতবাক্য" নাই। কর্ণ শল্যকে অর্জ্জুনের নিকট রথ চালাইতে বলাতে শল্য বলিলেন, "আচ্ছা।" ইহার পরই লেখা আছে "কর্ণভার সমাপ্ত হইল।" দ্বিতীয় পুঁথিতে "আচ্ছা" শব্দের পর "ভরতবাক্য" রূপ একটি শ্লোক আছে, কিন্তু সেই শ্লোকের পর "কর্ণভার সমাপ্ত হইল" এই বাক্যের পরিবর্ত্তে "কবচাঙ্ক সমাপ্ত হইল" এই কথা লিখিত আছে। কিন্তু ইহা হইতে কিছু নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ, প্রথম পুঁথিতে 'ভরতবাক্য' না থাকাতে, মনে হইতে পারে যে, এই স্থল নাট্যের শেষ নহে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই স্থলেই লেখা রহিয়াছে, "কর্ণভার সমাপ্ত হইল।" আবার যে পুঁথিতে 'ভরতবাক্য' আছে, সে পুঁথিতে নাট্যের শেষ হইল বলিয়া উল্লেখ নাই,—লেখা আছে "কবচাঙ্ক সমাপ্ত হইল।" প্রত্যেক অঙ্কের বিষয় অনুসারে সেই-সেই অঙ্কের নামকরণ যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রথম অঙ্কের বিষয় কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান বলিয়া, ইহার 'কবচাঙ্ক' সংজ্ঞা হইয়াছে, বলিতে হইবে। পরে অন্য অঙ্ক থাকিতে পারে,—তাহার অন্য নাম হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আবার 'ভরতবাক্য' থাকে কিরূপে? নাট্য শেষ না হইলে, অঙ্কের শেষে 'ভরতবাক্য' প্রয়োগ হইতে পারে না। কাজেই, যদি প্রথম পুঁথিতে 'কবচাঙ্ক সমাপ্ত' এই কথা থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে 'ভরতবাক্য' নাই বলিয়া, আর একটি অঙ্ক আছে—অনুমান করিয়া লইতে পারিতাম। আবার, দ্বিতীয় পুঁথিতে "কবচাঙ্ক সমাপ্ত" লেখা থাকিলেও, তৎপূর্ব্বে 'ভরতবাক্য' থাকায় নাট্যখানির শেষই ধরিয়া লইতে হইতেছে। অন্য কোনও পুঁথি পাওয়া না গেলে এ সন্দেহের নিরাকরণ করা যাইবে না।

দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে দুই স্থলে কাম্বোজদেশীয় অশ্বের উল্লেখ ও প্রশংসা আছে। এক স্থলে 'অগ্নিষ্টোম' নামক বৈদিক যজ্ঞের মহৎ ফলের প্রসঙ্গও বিদ্যমান। নারায়ণের নৃসিংহমূর্ত্তির স্তবে দৃশ্যকাব্যের আরম্ভ। ভাসের সকল নাট্যের ন্যায় এখানিতে একেবারেই সূত্রধার প্রবেশ করিয়া ঐ স্তব আবৃত্তি করিতেছে। নান্দী পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে একটি শ্লোকের একটি পংক্তি কালিদাস-রচিত রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের একটি শ্লোকের একটি পংক্তির সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। সেই দুইটি শ্লোকই এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"অনেক যজ্ঞাহুতি তর্পিতো দ্বিজৈঃ
কিরীটিমান্ দানবসঙ্ঘমর্দ্দনঃ।
সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলি-
র্ময়া কৃতার্থঃ খলু পাকশাসনঃ॥

[কর্ণভার, ২৩ শ্লোক]

"হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ
সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।
ভুজে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে
স্বনামচিহ্নং নিচখান শায়কম্॥"

[রঘুবংশ, তৃতীয় সর্গ, ৫৫ শ্লোক]

ভাস কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে কালিদাসকেই ঋণ স্বীকার করিতে হইবে।

দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে কর্ণের চরিত্রই প্রধান। অল্প পরিসরের মধ্যে কর্ণের ধৈর্য্য, সাহস, উদারতা, ভ্রাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া খেদ, ব্রাহ্মণের প্রতি

ঐকান্তিকী ভক্তি ও অপূর্ব্ব দানশীলতা সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্য কোন চরিত্র কর্ণের মত ফুটে নাই।

অনুবাদ যাহাতে মূলানুগত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। তবে মূলের শ্লোক-ঝঙ্কার মদীয় অক্ষম লেখনী দ্বারা প্রকটিত করা অসাধ্য। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মহাকবি শ্রীভাস-প্রণীত

কর্ণভার

(নান্দী শেষ হইয়া গেলে তাহার পর সূত্রধার প্রবেশ করিল)

সূত্রধার

নরসিংহ মূর্ত্তি হেরি সন্ত্রস্ত নর ও নারী,
দেব, দৈত্য, পাতালের অধিবাসিগণ;
দীর্ণ দৈত্য-পতি বক্ষ নখবজ্রে হ'ল যাঁর,
দৈত্যবলহারী আজ সেই নারায়ণ
করুন করুণা করি শুভ বিতরণ ॥

মহাশয়দের এইরূপ জানাইতেছি। আরে, আমি জানাইতে ব্যগ্র হইবামাত্র কিসের শব্দ শোনা যাইতেছে? ও—বুঝিয়াছি।

(নেপথ্যে)

ওহে! মহারাজ অঙ্গাধিপতিকে জানাও—জানাও।

সূত্রধার।

ও—জানিতে পারিয়াছি।

এইবার বাজিয়াছে সংগ্রাম ভীষণ;
দুর্য্যোধন আজ্ঞা পেয়ে, সন্ত্রান্ত সে ভৃত্য ধেয়ে
কর্ণপাশে যোড়-হাতে করে নিবেদন ॥

[নিষ্ক্রান্ত হইল।]

প্রস্তাবনা।

(তাহার পর ভট প্রবেশ করিল)

ভট। ওহে, মহারাজ অঙ্গাধিপতিকে জানাও, জানাও —যুদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনের রথধ্বজ- সম্মুখে নৃপতিগণ
অশ্ব, গজ, রথে আজি সিংহনাদ ক'রে;
মহাবীর দুর্য্যোধন শুনিয়া শক্রর রব
দ্রুত প্রবেশিছে এবে দুর্ব্বার সমরে ॥

(ইতস্ততঃ বেড়াইয়া ও দেখিয়া)

ও—এই যে অঙ্গরাজ যুদ্ধবেশ পরিধান করিয়া, শল্যরাজের সহিত নিজ ভবন হইতে বহির্গত হইয়া এই দিকেই আসিতেছেন। এ কি! যাঁহার পরাক্রম রণে দৃষ্ট, আজ যুদ্ধে উদ্যত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব খেদ দেখিতেছি কেন?

বিশাল উজ্জ্বল কান্তি যুদ্ধে অগ্রগণ্য বীর
শোকাকুল আসিছেন করিবারে রণ।
মেঘরাশি রুদ্ধ হ'য়ে নিদাঘে প্রখরতেজ
সূর্য্যসম শোভা কর্ণ করেন ধারণ ॥

এখান হইতে সরিয়া যাই। [নিষ্ক্রান্ত হইল।]

(তাহার পর যথোক্তরূপ কর্ণ ও শল্য প্রবেশ করিলেন)

কর্ণ। থাক্, থাক্—আসিছে কি জীবিতাবশেষ
নৃপগণ, লক্ষ্যভূত হ'য়ে মোর শরে।
কুরুদের প্রিয়কার্য্য কর্ত্তব্য আমার
অর্জ্জুনে দেখিতে পাই যদ্যপি সমরে ॥

শল্যরাজ! যে দিকে সেই অর্জ্জুন, সেই দিকেই আমার রথ চালান।

শল্য। আচ্ছা। [রথ চালাইলেন]

কর্ণ। অহো—

পরস্পর শস্ত্রাঘাতে ছিন্নগাত্র যোদ্ধৃগণে
অশ্ব, গজ, রথে পূর্ণ সংগ্রাম মাঝারে।
ক্রুদ্ধ যম-সম ভ্রমি আমি যে, আমারও হৃদে
বৈক্লব্য উদয় হয় যুদ্ধ করিবারে ॥

ওঃ—কি কষ্ট!

কুন্তী গর্ভে জন্ম লভি সুবিখ্যাত 'রাধেয়' আখ্যায়।
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি এ পাণ্ডবেরা অনুজ যে হায় ॥
ক্রমপ্রাপ্ত এসেছে সে কাল সুশোভন,
এসেছে সে গুণযুক্ত দিবস এখন।
শিখেছি বৃথায় হায় যত অস্ত্রগণ,
জননী আবার মোরে করেছে বারণ ॥

মদ্ররাজ। আমার অস্ত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

শল্য। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য আমারও কৌতূহল আছে।

কর্ণ। পূর্ব্বে আমি পরশুরামের নিকট গিয়াছিলাম।

শল্য। তার পর? তার পর?

কর্ণ। তার পর—

ক্ষত্রান্তক মুনিবর শিরে তুঙ্গ জটাজাল
বিদ্যুতের মত যার পিঙ্গল বরণ,
ঊর্দ্ধে বিকসিছে প্রভা সেই সে পরশু করে
ভৃগুবংশ চূড়া মুনি, প্রণমি চরণ,
নিভৃতে নিকটে তাঁর করিনু গমন॥

শল্য। তার পর? তার পর?

কর্ণ। তার পর সেই পরশুরাম আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি? কি জন্য এখানে আসিয়াছ?"

শল্য। তার পর? তার পর?

কর্ণ। আমি বলিলাম, "ভগবন্! আমি সমুদয় অস্ত্র শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।"

শল্য। তার পর? তার পর?

কর্ণ। তার পর ভগবান আমায় বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণদিগকে শিক্ষা দিই; ক্ষত্রিয়দের নহে।"

শল্য। ক্ষত্রিয়বংশে জাত পুরুষগণের সহিত ভগবানের পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা আছে। তার পর? তার পর?

কর্ণ। তার পর 'আমি ক্ষত্রিয় নই' এই বলিয়া অস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম।

শল্য। তার পর? তার পর?

কর্ণ। তার পর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে এক দিন গুরু ফল, মূল, সমিৎ, কুশ, পুষ্প আহরণের জন্য গমন করিলে, আমি তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গিয়াছিলাম। তাহার পর সেই গুরু বন-ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া আমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

শল্য। তার পর? তার পর?

কর্ণ। তার পর

অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊরু-যুগলেরে মোর
বজ্রমুখ নামে কৃমি—সুতীক্ষ্ণ দশন;
পাছে নিদ্রাভঙ্গ হয় গুরুর, এ আশঙ্কায়
ধৈর্য্য ধরি' সহেছিনু বেদনা তখন॥
হ'য়ে রক্তসিক্ত কায়, জাগিয়া, দেখিয়া তায়,
সহসা হইয়া দীপ্ত রোষের অনলে—
চিনিয়া স্বরূপ মোর গুরু শাপিলেন ঘোর
"বিফল হইবে অস্ত্র প্রয়োগের কালে॥"

শল্য। ওঃ—তিনি কি নিদারুণ বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন!

কর্ণ। অস্ত্রের বৃত্তান্তটা এইবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।

(সেইরূপ করিয়া)

এই অস্ত্রগুলি এখন নির্বীর্য্যের মত দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া—

খেদে নিমীলিত আঁখি এই তুরঙ্গমগণ
থেকে-থেকে হইতেছে স্খলিতচরণ,
সপ্তচ্ছদ তরু সম মদগন্ধে করিগণ
রণে পরাভব আজি করিছে সূচন॥

শঙ্খ ও দুন্দুভি সকলও নীরব হইয়াছে।

শল্য। ওঃ—এ বড় দুঃখের কথা।

কর্ণ। শল্যরাজ! বিষাদের প্রয়োজন নাই।

হত হ'লে স্বর্গলাভ, কীর্ত্তিলাভ হয় যদি জয়।
দুই-ই সমাদৃত লোকে নিষ্ফলতা রণে নাহি হয়॥

তা ছাড়া—

শোভন কাম্বোজকুলে সমুৎপন্ন এই সব
তুরঙ্গম, গরুড়ের মত বেগে ধায়।
যুদ্ধে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে নাই কদাচন,
রক্ষাযোগ্য হই যদি রক্ষিবে আমায়॥

গো-ব্রাহ্মণ অক্ষয় হউন; পতিব্রতাগণ অক্ষয় হউন; রণে অপরাঙ্মুখ যোদ্ধৃগণ অক্ষয় হউন। আসন্নকাল আমারও অক্ষয় হউক। এই দেখুন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি।

প্রবেশিয়া পাণ্ডবের অসহ্য সমরমুখে
গুণযুত যুধিষ্ঠিরে করিয়া বন্ধন।
শ্রেষ্ঠ শরে বধি পার্থে করিব সে রণভূমি
সুপ্রবেশ, হয় যথা সিংহ-হীন বন॥

শল্যরাজ! এইবার রথে আরোহণ করি।

শল্য। আচ্ছা।

(উভয়ে রথারোহণের অভিনয় করিলেন)

কর্ণ। শল্যরাজ! যেখানে সেই অর্জ্জুন, সেই দিকেই আমার রথ চালাম।

(নেপথ্যে—)

ওহে কর্ণ! মহৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

কর্ণ। (শ্রবণ করিয়া) ওঃ—কি তেজোযুক্ত বাক্য!

রূপবান শুধু নহে দ্বিজবর
প্রভাব ইহাঁর মহান্ ভায়।
স্বর শুনি যাঁর সুমধুর ধীর
চিত্রার্পিত তুরগ-কায়॥
উর্দ্ধ কর্ণ, নিমীলিত আঁখি
বক্র গ্রীবায় স্থাপিত মুখ;
সহসা অবশ মোর হয়গুলি
যেন কি অতুল লভিছে সুখ॥

এই ব্রাহ্মণকে ডাকুন। না—না—আমি নিজেই ডাকিতেছি। ভগবন্, এই দিকে—এই দিকে আসুন।

(তাহার পর ব্রাহ্মণের বেশধারী ইন্দ্র প্রবেশ করিলেন)

ইন্দ্র। ওহে মেঘ সকল! তোমরা সূর্য্যের সহিত ফিরিয়া যাও। (কর্ণের নিকট গিয়া) ওহে কর্ণ! মহৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

কর্ণ। ভগবন্! অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

নৃপ-মুকুটের মণি-রঞ্জিত চরণ
জগতে কৃতার্থ আমি হইনু যে সার।
দ্বিজবর-পদধূলি-পবিত্রিত শির
এই কর্ণ আপনারে করে নমস্কার॥

ইন্দ্র। (স্বগত) কি বলিব? যদি বলি 'দীর্ঘায়ু হও', তাহা হইলে দীর্ঘায়ু হইবে। যদি না বলি, মূর্খ বলিয়া আমায় অবজ্ঞা করিবে। সুতরাং এই দুই-দিক বাঁচাইয়া কি বলি? আচ্ছা—স্থির করিয়াছি। (প্রকাশ্যে) কর্ণ! সূর্য্যের ন্যায়, চন্দ্রের ন্যায়, হিমালয়ের ন্যায়, সাগরের ন্যায় তোমার যশঃ স্থায়ী হোক্।

কর্ণ। ভগবন্! 'দীর্ঘায়ু হও' কি বলিবেন না? অথবা ইহাই শোভন। কেন না—

বহু যত্নে করিবেক ধর্ম্মের সাধন।
নৃপশ্রী চপলা অহি-জিহ্বার মতন॥
ঘৃণিত হ'লেও কায়, প্রজা-পালনের দায়
ধর্ম্মের নিলয় তাহা বুঝি গুণগণ
দেহের আশ্রয় আসি করে সে গ্রহণ॥

ভগবন্! কি প্রার্থনা করেন? আমি কি দিব?

ইন্দ্র। মহৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করি।

কর্ণ। মহৎ ভিক্ষাই আপনাকে দিব। আমার বৈভবের কথা শ্রবণ করুন।

বৎসগণ দুগ্ধপানে তৃপ্ত হ'লে, পরে
অমৃতের তুল্য যারা দান করে দুগ্ধধারা
এ হেন সুগুণযুত সহস্র ধেনুরে
স্বর্ণে ভূষি' শৃঙ্গচয় যাহে প্রার্থনীয় হয়
পবিত্র যাগেতে আর সুতরুণ কায়
দ্বিজবর! দিব দান বাঞ্ছা যদি তায়॥

ইন্দ্র। সহস্র গাভী? এক মুহূর্ত্ত দুগ্ধ পান করিব। চাই না, কর্ণ, চাই না।

কর্ণ। কি বলিলেন? ভগবান চান না। আরও শ্রবণ করুন—

সূর্য্যের তুরগ-সম রাজলক্ষ্মী আনে বহি,
সকল নৃপতি-মান্য বহু গুণবান্।
কাম্বোজ-কুলেতে জাত, যুদ্ধে দৃষ্ট বল যার
পবন সমান বেগে হয় ধাবমান।
সহস্র-সহস্র হয় করিব প্রদান॥

ইন্দ্র। অশ্ব? এক মুহূর্ত্তে আরোহণ করিব। চাই না, কর্ণ, চাই না।

কর্ণ। কি? ভগবান চান না? আরও শ্রবণ করুন—

কপোল বহিয়া ঝরে মদধারা
ভ্রমরেরা জুটে তায়,
মেঘ-গর্জ্জন সদৃশ নিনাদ
গিরিসম শোভে কায়।
শুভ্র বর্ণ নখ ও দশন
যুদ্ধে করিবে অরির দলন
হেন গুণযুত অনেক বারণ
দিব হে আমি তোমায়॥

ইন্দ্র। হস্তী? মুহূর্ত্তমাত্র আরোহণ করিব। চাই না, কর্ণ, চাই না।

কর্ণ। কি? ভগবান চান না? আরও শুনুন। অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ প্রদান করিব।

ইন্দ্র। লইয়া যাইব। [কিছু দূরে গিয়া] চাই না, কর্ণ, চাই না।

কর্ণ। তবে পৃথিবী জয় করিয়া প্রদান করিব।

ইন্দ্র। পৃথিবী লইয়া কি করিব ?

কর্ণ। তবে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল দান করিব।

ইন্দ্র। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞফলে কি হইবে ?

কর্ণ। তবে আমার শির প্রদান করিব ?

ইন্দ্র। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

কর্ণ। ভয় নাই, ভয় নাই। ভগবান প্রসন্ন হউন। আরও বলি—শ্রবণ করুন—

অঙ্গের সহিত জাত　　আমার এ দেহরক্ষা,
দেবাসুর অস্ত্রে যাহা না পারে ভেদিতে ;
আহ্লাদেতে সে কবচ　　যুগল কুণ্ডল সহ,
রুচি যদি হয় তব, পারি আমি দিতে ॥

ইন্দ্র। (সহর্ষে) দাও, দাও।

কর্ণ। (স্বগত) এই ইঁহার অভিপ্রায় ? এ কি সেই অনেক প্রকার কপট-বুদ্ধিধারী কৃষ্ণের ছল ? তা হোক্। আমার এ অনুচিত অনুশোচনায় ধিক্। কোনও সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) লউন।

শল্য। অঙ্গরাজ ! দিবেন না ! দিবেন না !

কর্ণ। শল্যরাজ ! নিষেধ করিবেন না। দেখুন—

কালবশে শিক্ষারও হয়ে থাকে ক্ষয়,
দৃঢ়মূল তরুচয় হয় ভূপতিত,
শুষ্ক হয় সাগরের সলিলনিচয়,
যজ্ঞে হুত, দানে দত্ত, থাকে অবিকৃত ॥

অতএব লউন। [কাটিয়া অর্পণ করিলেন]

ইন্দ্র। (গ্রহণ করিয়া স্বগত) এগুলি লইলাম। পূর্ব্বে অর্জ্জুনের বিজয়ের জন্য সমস্ত দেবতারা যাহা সমর্থন করিয়াছিলেন, আমি ত এক্ষণে তাহা করিলাম। অতএব আমি ঐরাবতে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ বিশেষ দর্শন করি।　　[নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

শল্য। অঙ্গরাজ ! আপনি প্রতারিত হইলেন।

কর্ণ। কাহার দ্বারা ?

শল্য। ইন্দ্রের দ্বারা।

কর্ণ। না। ইন্দ্রই আমার দ্বারা প্রতারিত হইলেন। কেন না—

বহু যজ্ঞে আহুতিতে　　তৃপ্ত করে দ্বিজগণ
যাঁহারে, কিরীটধারী দানবদমন
ঐরাবত তাড়নায়　　কর্কশ অঙ্গুলি যাঁর,
সেই ইন্দ্রে করিয়াছি কৃতার্থ এখন ॥

(ব্রাহ্মণ-রূপধারী দেবদূত প্রবেশ করিয়া)। কর্ণ! কবচ-কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া অনুতপ্ত ইন্দ্র তোমায় অনুগ্রহ করিয়াছেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে যে কোনও এক পুরুষের বধনিমিত্ত অমোঘ অস্ত্র বিমলা নামক এই শক্তি গ্রহণ কর।

কর্ণ। ধিক্। যাহাকে দান করি, তাহার নিকট দান গ্রহণ করি না।

দেবদূত। ব্রাহ্মণের বচন গ্রহণ কর।

কর্ণ। ব্রাহ্মণের বচন ? ইহার পূর্ব্বে ত কখনও লঙ্ঘন করি নাই। কখন পাইব ?

দেবদূত। যখন স্মরণ করিবে, তখনই পাইবে।

কর্ণ। আচ্ছা। অনুগৃহীত হইলাম। আপনি আসুন।

দেবদূত। আচ্ছা।　　[নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

কর্ণ। শল্যরাজ ! এস, রথে আরোহণ করি।

শল্য। আচ্ছা। [উভয়ে রথারোহণ-অভিনয় করিলেন]

কর্ণ। কি শব্দ শুনা যাইতেছে ? এ কি ?

প্রলয়ে সাগর-রব-　　সম এই শঙ্খধ্বনি
অর্জ্জুনের, কৃষ্ণের ত নয়।
যুধিষ্ঠির-পরাজয়ে　　ক্রুদ্ধমতি পার্থ আজি
যথাসাধ্য যুঝিবে নিশ্চয় ॥

শল্যরাজ, যেখানে সেই অর্জ্জুন, সেই দিকে আমার রথ চালান।

শল্য। আচ্ছা।

[ভরতবাক্য]

সর্ব্বত্র সম্পদ্ হোক্,
বিপদের হোক্ বিনাশন।
রাজগুণযুত রাজা　　একচ্ছত্র ধরামাঝে
তোমাদের করুন শাসন ॥

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

কর্ণভার সমাপ্ত।

———

চূর্ণ-অভিমান

[শ্রীভবানীচরণ ঘোষ]

(৫)

কিন্তু আফিস হইতে ফিরিয়াই যতীন্দ্র দেখিলেন, ভামিনীর বেশ জ্বরই হইয়াছে; তিনি গায়ে-মাথায় লেপ দিয়া শুইয়া রহিয়াছেন, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যতীন্দ্র জানিলেন। আহারাদির পর স্ত্রী শয্যায় শুইয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন; তাঁহার শরীর যেন কেমন খারাপ বোধ হইতে থাকে। শেষে জ্বরই আসিয়াছে। পিসী ঠাকুরাণী, কি কোন চাকরাণীকে কিছু না বলিয়া, সেই হইতেই তিনি শুইয়া রহিয়াছেন।

যতীন্দ্র তখনই ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন, বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই, দু'এক দিনের মধ্যেই রোগিনী সুস্থ হইয়া উঠিবেন। যতীন্দ্র রাত্রি জাগিয়া স্ত্রীকে ঔষধ সেবন করাইলেন।

পরদিন প্রভাতেও ভামিনীর জ্বর ছাড়িল না। জ্বর বেশী নহে, শরীরের তাপ ১০১ মাত্র। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন করিলেন; বিকালে জ্বর ছাড়িল। ডাক্তার কুইনাইন দিলেন। পর দিন ভামিনীর আর জ্বর হইল না।

বিবাহের পর এগার-বার দিন অতীত হইল। বিবাহান্তে ভামিনীকে বিষ্ণুপুর হইতে লইয়া আসিবার সময় শ্বশুর-ঠাকুর যতীন্দ্রকে বলিয়া দিয়াছিলেন, বার-দিন পরেই শ্রীমতীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, নবীনচন্দ্র যাইয়া লইয়া আসিবেন। তার পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে কথা চিঠিতেও যতীন্দ্রকে লিখিয়াছেন। নবীনচন্দ্র আসিয়াছেন। আজ দু-দিন ভামিনীর জ্বর হয় নাই, কিন্তু তাহার শরীর দুর্ব্বল। ডাক্তার বলিলেন, এই প্রথম আসিয়াছেন, এবার আর বেশী দিন রাখা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, দেশে গেলে ইহাঁর শরীর শীঘ্র ভাল হইয়া উঠিবার খুব সম্ভাবনা। যতীন্দ্র সম্মত হইলেন।

স্বামী রেলওয়ে-ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া স্ত্রীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। বিদায় সময়ে গোপনে স্ত্রীর হাত একটু টিপিয়া দিলেন, স্ত্রীও বুঝি বা হাতে-হাতেই তাহার মৃদু উত্তর দিলেন। নবীনচন্দ্র ভামিনীকে লইয়া গেলেন।

শ্বশুর-ঠাকুর এবং নবীনচন্দ্রের জন্য ভাল-ভাল ধুতি, উড়নি যতীন্দ্র কলিকাতাতেই নবীনচন্দ্রের নিকট দিয়াছিলেন। সম্বন্ধীর স্ত্রী রাধারাণী এবং তাঁহার কন্যার জন্য সাড়ী-সেমিজ তিনি স্ত্রীর ট্রাঙ্কের মধ্যে দিয়াছিলেন, ভামিনী নিজের হাতে দিবেন। পিত্রালয়ে পৌছিয়া সেই দিনই বিকালে ভামিনী তাহা বাহির করিল। বধূ-ঠাকরাণীকে সাড়ী-সেমিজ দিয়া প্রণাম করিল। রাধারাণী বলিলেন, "আমাকে ত আসিয়াই একবার প্রণাম করিয়াছিস্, ঠাকুর-ঝি; আবার কেন? এবার কি জামাই বাবুর প্রতিনিধি হইয়া প্রণাম করিতেছিস্?"

ভামিনী হাসিয়া বলিল, "তোমাকে দু'বার প্রণাম করিলেও ত আমার জাতি যাইবে না!"

তখন দুই জনেই হাসিয়া ফেলিলেন। বারাণসী সাড়ী ও সিল্কের রঙ্গিন সেমিজ দেখিয়া রাধারাণী খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্মিত মুখে বলিলেন, "বুড়ো মাগী আমি, এই রঙ্গিন সেমিজ আর বারাণসী সাড়ী আমি পরিব!"

ভামিনী হাসিয়া বলিল, "তোমার বুড়ি হইবার এখনো অনেক বিলম্ব আছে!"

রাধারাণী সাড়ী-সেমিজের খুব প্রশংসা করিলেন। ছয় বছরের মেয়ে কুমিকে ডাকিয়া আনিয়া ভামিনী তাহার পরণের মলিন সাড়ী খুলিয়া ফেলিল। অতি সুন্দর একটি ক্ষুদ্র লাল সেমিজ বাহির করিয়া কুমিকে পরাইল। তার পর একখানি সাচ্চা বুটীদার ঝক্‌ঝকে কামদার আঁচলাযুক্ত ছোট বারাণসী সাড়ী বাহির করিয়া সেই সেমিজের উপর পরাইয়া দিল। কুমি তখন দৌড়িয়া বাবার কাছে যাইবার উদ্যোগ করিল। ভামিনী তাহাকে যাইতে দিল না; ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে নীল-কাগজে-জড়ান গোলাপফুল-পাতার নক্‌সা-করা দু'গাছি সুন্দর সোণার বালা বাহির করিয়া

কুমির হাতে পরাইয়া দিল। কুমি স্বভাবতঃই অতি সুন্দরী; পিসী-মা সাজাইয়া দিলে, তাহাকে পরীটীর মত দেখা যাইতে লাগিল।

রাধারাণী মেয়েকে বলিলেন,—"কুমি, কুমি, পিসী-মাকে প্রণাম কর্।"

কুমি হর্ষোৎফুল্ল মুখে পিসি-মাকে প্রণাম করিল। ভামিনী নিজের অঞ্চলে কুমির মুখ মুছাইয়া দিয়া কুমির দিকে চাহিয়াই বলিল,—"বৌদি, কুমি খুব সুন্দরী হইয়া উঠিবে!"

রাধারাণী বলিলেন,—"তোমার মত আর হইবে কি?"

ভামিনী মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"আমি ত আমি, রূপে কুমি তোমাকেও হারাইবে!"

"আমাকে?—ভারি ত!" (হাসিয়া)—"চল্, দেখাইয়া আসি।"

নিজের সাড়ী, সেমিজ লইয়া, কুমিকেও সঙ্গে লইয়া, ভামিনীর হাত ধরিয়া রাধারাণী স্বামীর বসিবার ঘরে গেলেন। নবীনচন্দ্র কুমির সাজ-পোষাক দেখিয়া অবাক্ হইলেন; বিস্মিত মুখে বলিলেন,—"এ কি! কোথায় পাইল?"

রাধারাণী বলিলেন, "ঠাকুর-ঝি দিয়াছে।"

ঠাকুর-ঝি তখন লজ্জায় মুখ নত করিল।

নবীনচন্দ্র হাত ধরিয়া কুমিকে নিজের কাছে নিলেন। তাহার হাতে সেই নূতন বালা দেখিয়া বিস্মিত নবীন বলিলেন, "এ কি! ও মিনি, বালাও দিয়াছিস্?"

"কুমির হাতে ভাল বালা নাই, তাই—"

"তাই তুমি দিয়াছ! বেশ, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, দিয়াছ; কিন্তু"—হাসিয়া—"দেখিও, দিদি, আমাদের লোভ বাড়িও না।"

ভামিনীও মৃদু-মৃদু হাসিল। তখন রাধারাণী কুমিকে বলিলেন, "যা, দাদা-মশায়কে দেখিয়ে আয়; বলিস্—পিসী-মা দিয়াছেন।"

কুমি চলিয়া গেলে রাধারাণী স্বামীকে বলিলেন, "ও গো, দেখ, ঠাকুর-ঝি আমাকে কি দিয়াছে!"

বারাণসী আর সেমিজ দেখিয়া নবীনচন্দ্র স্মিতমুখে ভামিনীকে বলিলেন, "মিনি, কেন এত টাকা খরচ করলি?"

ভামিনী মুখ নত করিয়া বলিল, "আমি কি আর করিয়াছি!"

"বটে! যতীন্দ্রকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। তা যা হউক,"—(স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ভগিনীর সাক্ষাতেই) "কুমি ত তার সেমিজ-সাড়ী পরিয়া আমাকে দেখাইল। তুমি আর তা পারিলে না?"

তখন স্বামী, স্ত্রী, ভগিনী সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। স্বামীর দিকে কুটিল কটাক্ষপাত ও ভ্রূভঙ্গি করিয়া রাধারাণী বলিলেন, "চল্, ঠাকুর-ঝি, আমরা অসভ্য কথা শুনতে চাই না!"

হাসিতে-হাসিতে ভামিনী ও রাধারাণী চলিয়া গেলেন।

নবীনচন্দ্রের মনে হইল—মিনী নিশ্চয়ই নরম হইয়াছে। টাকা, মূল্য!—অভিমান আর নাই। অমন বাড়ী-ঘর, বস্ত্র-অলঙ্কার, টাকা-কড়ি, চাকর-চাকরাণী, পাচক-ব্রাহ্মণ! স্ত্রীলোকের চিত্ত! অভিমান আর ক'দিন থাকে? তবে তার সুন্দর মুখ কিছু মলিন দেখায় বটে। ব্যারাম থেকে উঠিয়া আসিয়াছে, তাই মলিন!

কিছু কাল পরে শ্যামা আসিল। বামা, তারা, বুচি, কেলী, নফরার-মা আসিল। শ্যামা বলিল, "কোথায় গো, ও বৌদি!

রাধারাণী বারান্দায় বসিয়া চুলের ফিতা, আয়না, চিরুণী, মাথার কাঁটা, তেল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভামিনীর চুল বাঁধিয়া দিবেন। সাড়া পাইয়া রাধারাণী বলিলেন, "কে ও? শ্যামা ঠাকুর-ঝি যে! এসো, এসো।"

শ্যামা, বামা, তারা—সকলই কাছে আসিল। রাধারাণী উঠিয়া কাহাকেও ছোট পিঁড়িখানি, কাহাকেও আসনখানা বসিতে দিলেন। একটা মাদুরও পাতিয়া দিলেন। শ্যামা বলিল, "কিগো, মিনি আসিয়াছে, আমাদিগকে খবরটাও দাও নি!"

"অত বেলায় ঠাকুরঝি আসিয়াছে, স্নানাহার করিয়া একটুকু ঠিক্ঠাক্ হইতেই তোমরা আসিলে।"

"কৈ? মিনী কৈ?"

"ঠাকুরের ঘরে গিয়াছে, এখনি আসিবে।"

এমন সময় সেই সাড়ী-সেমিজ-বালা-পরা কুমি ফুল্লমুখে সেখানে আসিল। আনন্দে সে এতক্ষণ এ-বাড়ী ও-

বাড়ী ছুটাছুটি করিয়াছে। বামা বলিল, "ও মেয়েটি কে গা?"

রাধারাণী হাসিয়া বলিলেন, "চিন্‌তে পার্‌লে না? ও যে কুমি!"

শ্যামা বলিল, "কুমি না কি?—ও কুমি, এ দিকে আয়। এ সাড়ী-সেমিজ কোথায় পেলি?"

কুমি বলিল, "পিসী-মা দিয়াছে!"

শ্যামা তখন কুমির সাড়ীর অঞ্চল উঁচু করিয়া দেখিল। নূতন বালার গোলাপপাতা কেমন, দেখিল।

"বালাও দিয়াছে?"

"হাঁ।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে নিত্য ছেঁড়া ময়লা কাপড়পরা নিজের আট বছরের মেয়ের কথা শ্যামার মনে পড়িল। কপাল, পোড়া কপাল!

রাধারাণী বলিলেন:—"ঠাকুর-ঝি আমাকেও কাপড় দিয়াছে, দেখিবি?"

রাধারাণী ঘর হইতে ভামিনীর-দেওয়া সাড়ী-সেমিজ বাহির করিয়া আনিয়া শ্যামার হাতে দিল। বামা, তারা, বুঁচি, নফরার মা পর্য্যন্ত মুখ বাড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। শ্যামা বলিল, "বেশ! বেশ!—ও-বাড়ীর পাঁচীর বে আসচে, এই রঙ্গিল সেমিজ, আর আঁচলাদার সাড়ী পরে' য'াস, খুব মানাবে; একটা নোলকও পরিস ভাই!"

সকলেই হাসিয়া উঠিল। তার পর সকলে মিলিয়া সেই সাড়ী-সেমিজের প্রশংসা করিল। থাক বলিল, "আমি ত আগেই বলিয়াছি, তোদের সুদিন আসিতেছে! বে'র আগেই অত টাকা! পরে' এখনও কতই দিবে।"

ভামিনী সেই ঘরের মধ্য দিয়াই আসিতেছিল, বামার কথাগুলি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার অন্তরে যেন সূচ ফুটিয়া উঠিল। আবার সেই কথা! ভামিনী বারান্দায় আসিল। শ্যামা বলিল, "ও মিনী, এ দিকে আয়। বড়মানুষ হইয়াছিস্, খাট-পালঙ্ক ছেড়ে পা আর মাটিতে পড়ে না!—আমাদের চিন্‌তে পারিস্ ত?"

ভামিনী যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া, প্রণমিত হইয়া, সেই মজলিসেই বসিল। রাধারাণী তখন তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে চাহিলেন। ভামিনী স্বীকার হইল না, পরে বাঁধিবে। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছিস্?"

"ভালই আছি।"

"মুখখানি ময়লা দেখায় কেন রে?"

শ্যামা ভাবিল, কালো বর বুঝি মিনীর মনে ধরে নাই। রাধারাণী বলিলেন, "কলিকাতায় ঠাকুর-ঝির জ্বর হইয়াছিল, তাই একটুকু অমন দেখায়।"

শ্যামা মনে করিল, তাই কি?—বুড়ো বর, মনের স্ফূর্ত্তি থাকে কি? প্রকাশ্যে বলিল—'কৈ, বৌ? আমরা শুনিয়াছি, এই বে'র বারই মিনী না কি অনেক গহনা পাইয়াছে। ওর গায়ে ত বড় কিছু দেখি না!"

"দু'দিনের জন্য পাড়াগাঁয়ে আসিয়াছে, বেশী কিছু সঙ্গে আনে নাই।"

"আনিলে আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতাম; আমি চুরি করিতাম? না, তুমি করিতে?"

"আমি করিলে ত ঘরেই থাকিত!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। বামা বলিল, "আমরাও চোর নই লো, বৌ!—তা একদিন দেখিবই। আমাদের বে'র বেলা কত চেষ্টা করিয়া, কত টাকা দিয়ে, মা-বাপ বর আন্‌লেন; আর তোদের কেমন কপালের জোর, আগাম টাকা লইয়া মিনীকে দিলি! তার কি আর গয়না গাঁটির অভাব হইবে!"

ভামিনীর বুক ব্যথা করিয়া উঠিল। শ্যামা ভামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে রুসুয়ে বামুন আছে?"

"আছে।"

"কজন চাকরাণী?"

"দু'জন।"

"বেশ্, বেশ্; ভগবান তোকে সুখে রাখুন।"

আরও অনেক কথাবার্ত্তার পর শ্যামা, বামা সকলে চলিয়া গেল।

সে দিন রাত্রিতে ভামিনীর বড়ই অসুখ বোধ হইতে লাগিল; ভাল নিদ্রা হইল না,—তাহার যেন একটু জ্বরই হইল।

(৬)

রাত্রিতে ভামিনীর সুনিদ্রা হয় নাই, তাহার অসুখই হইয়াছে। সারারাত ভামিনী ভাবিয়া কাটাইয়াছে।

এ কলঙ্ক যায় নাই, যাইবার নহে। স্বামীর আমার কি দোষ? লোকজন, বাড়ীঘর, পুকুরবাগান, ধনরত্নের

অভাব নাই; যত্ন-আদর, ভালবাসারও কোন ত্রুটি নাই! ছ'দিন পরে দিলেই ত হইত! আর, অত টাকাই যদি দিলেন, তবে আমা অপেক্ষা সুন্দরী, গুণবতী, ভাগ্যবতী আর কাহাকেও কেন বিবাহ করিলেন না? (এইখানে ভামিনীর শরীর কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল।) তিনি অভাগিনী-কেই তাঁহার উপযুক্ত, মনের মত ভাবিয়াছিলেন? তাই যদি হইয়া থাকে, তিনি স্বামী, তাঁহার সুখ-সুবিধা, ঘর-সংসার আমাকে দেখিতেই হইবে। তাহা ত আমার কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য বলিয়া নহে, কেমন যেন বোধ হয়, সব প্রাণও যে সেই দিকে'! কালো?—কৈ কালো। মুখে একটুকু বিষাদের ভাব দেখিলে আমার প্রাণ যে কাঁদিয়া উঠিতে চায়! কিন্তু আমি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি! এখনো ত মনপ্রাণ খুলিয়া কিছু বলি নাই, করি নাই! লজ্জায় বলিতে পারি নাই! না, তা ত নহে! যাহা কিছু করিয়াছি, কর্ত্তব্য বলিয়া করিয়াছি। প্রাণের টানে, অন্তরের আবেগে যে কিছু করিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। ক্রীতার ভয়, সন্দেহ—অভিমান ত রহিয়া গিয়াছে!

ক্রীতা! এ কলঙ্ক যায় নাই, যাইবার নহে। শ্যামা, বামা ত বলিতে ছাড়িবে না। আমাকে দেখিলেই ত লোকের মনে পড়িবে—ক্রীতা দাসী! দাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা ত অন্তরে জাগিয়াছে, কিন্তু—ক্রীতা দাসী!

ভোরবেলায় শয্যা হইতে উঠিয়া ভামিনী নিজের অসুখের কথা কাহাকেও বলিল না। ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়া, উঠান-আঙ্গিনায় গোবরজলের ছিটা দেওয়া ইত্যাদি তাহার চিরকালের অভ্যস্ত কাজ আরম্ভ করিল। রাধারাণী নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া, তাহা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি ভামিনীর কাছে আসিলেন; বলিলেন, "ও কি, ঠাকুর-ঝি? এ সব তুমি করিতেছ! দু'দিনের জন্য আসিয়াছ, তোমাকে দিয়া এ সব করা'ব? ছাড়, ঝেঁটা ফেলিয়া দাও!"

"দু'দিন আর-এক জায়গায় থাকিয়া আসিয়াই কি আমি এ সব ভুলিয়া গিয়াছি! এ সব ত ছেলেবেলা হইতে আমার নিত্য অভ্যাস!"

"হউক গিয়ে নিত্য অভ্যাস! হাত-পা ধু'য়ে তুমি ঘরে যাও।"

"এইটুকু সেরে নি?"

"না। আমাকে গাল্ খাওয়াবে?—আমিই বা তোমাকে করিতে দিব কেন?"

"এ সব করিতে আমার ভাল লাগে, বৌদি, তাই করিতেছি।"

"ভাল লাগে?" রাধারাণী হাসিয়া বলিলেন—"কলি-কাতা যাইয়া কি করিবি?"

"তা যা হয় করিব। তুমি যাও, আমি বাকী এইটুকু সেরে ফেলি।"

"তা ছাড়বে না, আজ কর। উনি যেন দেখিতে না পান। কাল থেকে তুমি এ সব কাজে হাত দিও না, শুন্‌ছ ঠাকুর-ঝি?"

ঠাকুরঝি তখন উঠান ঝেঁটাইতে ব্যস্ত!

ভামিনী সে দিন স্নান করিল না। রাধারাণীর জিজ্ঞাসায় জানাইল, রাত্রিতে তাহার শরীর কিছু খারাপ বোধ হইয়া-ছিল। সে দিন রাত্রিতে তাহার অল্প-অল্প জ্বর হইল। পরদিনও সে কথা কাহাকেও জানাইল না। কিন্তু তাহার মুখ মলিন দেখিয়া রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঝি, মুখখানি অমন শুক্‌নো-শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? —রাত্রিতে ঘুমোস্ নাই?"

"হাঁ, বৌদি; ভাল ঘুম হয় নাই।"

"কেন?" হাসিয়া কহিলেন, "কেন?—এই ত দু'দিন এখানে আসিয়াছিস্, এর মধ্যেই কলিকাতার জন্য তোর প্রাণ হাঁস্-ফাঁস কোচ্ছে নাকি?"

"তোর কথা শুনিয়া আমারও হাসি পায়,—সেখানেই বা ক'দিন ছিলাম!"

"তবে ঘুম নাই কেন? সুন্দর মুখখানি শুক্‌নো মলিন কেন?"

"রাত্রিতে আমার একটুকু জ্বরই হইয়াছিল।"

"জ্বর? বলিস্ কি!"

রাধারাণী তাহার ললাট, কপোলে হাত দিয়া বলিলেন;—"কৈ?—তেমন গরম নয় ত!"

রোগের প্রকোপ যার অন্তরে, গা ত তার তেমন গরম হয় না! ভামিনী বলিল, "বেশী কিছু নয়, কমিয়া গিয়াছে। তবে আজ আর ভাত খাইব না; সাবধান থাকাই ভাল।"

"ওঁদের বলি গিয়া?"

"না, না!"—ভামিনী রাধারাণীর অঞ্চল ধরিয়া টানিল, —"মিছামিছি কেন? সামান্য একটুকু জ্বর হইয়াছিল, এখন নাই।"

"না বলা কি ভাল? ডাক্তার—"

"কোন দরকার নাই।"

"তা দেখিস্ ভাই।"

"কোন চিন্তা নাই, বৌদি; ভাবনার বিষয় কিছুই নাই।"

ভামিনী সে দিন দিনের বেলায় কিছুই খাইল না। রাত্রিতে শুধু একটুকু দুধ খাইল। রাত্রিতে আবার তার জ্বর আসিল। প্রভাতে রাধারাণী ভামিনীর ঘরে যাইয়া দেখিলেন, ভামিনী জাগিয়া শয্যায় শুইয়াই রহিয়াছে। রাধারাণীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল।

"আজ একটুকু বেশী জ্বরই হইয়াছে, বৌদি; এখনো ছাড়ে নাই।"

রাধারাণীও তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বেশ জ্বর আছে। বিলম্ব না করিয়া তখনই তিনি স্বামীর ঘরে গেলেন। কিছুকাল পরেই নবীনচন্দ্র আসিলেন। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার কিছু ব্যুৎপত্তি ছিল; ভামিনীর অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া তিনি ঔষধ দিলেন। তিন দিনের চিকিৎসায় ভামিনীর জ্বর সারিয়া গেল। জ্বর গেল, কিন্তু অন্তরের ব্যথা ত আর ঔষধে যাইবার নহে!

শ্যামা, বামা ছাড়িল না। আলাপে, গল্পে, রহস্যে ইঙ্গিতে—পারিলে তাহারা একটুকু খোঁচা না দিয়া ছাড়িত না; কিন্তু সেই সকল সামান্য খোঁচাই ভামিনীর বুকে বজ্রের মত বিঁধিত।

পাঁচ সাত দিন পরে-পরেই ভামিনীর অসুখ হয়, জ্বর আসে, মাথা ঘুরে, বুক বেদনা করে। ভামিনী অতিশয় শীর্ণ, রোগা হইতে লাগিল। যতীন্দ্র তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য নবীনচন্দ্রের নিকট চিঠি লিখিলেন। কিন্তু চৈত্র মাস, সধবার যাত্রা নাই; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমতি দেন নাই। কোন চিন্তার কারণ নাই, মিনীর কোন বিশেষ গুরুতর পীড়া নহে। ভাল দিন দেখিয়া বৈশাখ মাসে লইয়া গেলেই হইবে।

যতীন্দ্র মধ্যে-মধ্যেই স্ত্রীর কাছে চিঠি লিখিতেন। টিকিট-যুক্ত কতকগুলি খামের উপর নিজের নাম ও ঠিকানা নিজের হাতে লিখিয়া যতীন্দ্র স্ত্রীর সঙ্গেই দিয়াছিলেন। ভাল কাগজ কলম, দোয়াত কালীও দিয়াছিলেন; বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, রোজ তাঁহার নিকট চিঠি লিখিতে হইবে। কিন্তু রোজ দূরে থাকুক, আট-দশ দিন পরে-পরেও ভামিনী চিঠি লিখিত না।

চিঠি লেখার প্রতিবন্ধকও অনেক। অতি গোপনে লিখিতে হইবে; শ্যামা, বামা টের পাইলে পাড়ায় ঢোল পড়িবে—কাল হইয়া গেল যে, আজই চিঠি লেখার ঢলাঢলি! যতীন্দ্র যে মিনীর কাছে চিঠি লিখিতেন, শ্যামা-বামারা তাহা জানিত; কিন্তু কি লিখিতেন, তাহারা অবশ্যই তাহা জানিত না। কিন্তু তাহা জানিবার জন্য এবং মিনী কোন উত্তর দেয় কি না, বিশেষতঃ কি উত্তর দেয়, জানিবার জন্য তাহারা দিবারাত্রি উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। জানিতে পারিলে মনের মত করিয়া তাহার এক মৌখিক সংস্করণ তাহারা প্রচার করিত!

প্রথম দিন কাগজ-কলম হাতে লইয়া ভামিনী ভাবিতে লাগিল—কি পাঠ লিখিবে—কি-ই বা লিখিবে? যতীন্দ্র ত ছাইভস্ম কত কি লিখিয়া চারি পৃষ্ঠা পূরণ করিতেন। কিন্তু ভামিনীর ত মনে যা আসে, কলমে তা উঠে না; কলমে যা উঠিতে চায়, মনে তা আসে না! কোন কথা লজ্জা আসিয়া বারণ করে, অভিমানের মৃদু ছায়া পড়িয়া আবার কোন-কোন ভাব বিকৃত হইয়া পড়ে! সে দিন আর ভামিনীর চিঠি লেখা হইল না।

শেষে এক দিন ভামিনী একখানা চিঠি লিখিয়া শেষ করিল। ক্ষুদ্র চিঠি; তাহার শেষ ভাগে লিখিল,—"আমি এখন ভালই আছি, তুমি কোন চিন্তা করিও না।" নাম স্বাক্ষর করিবার সময় অভিমানের সেই ছায়াটা ঘনাইয়া আসিল। ভামিনী লিখিল, "তোমার দাসী", তাহার নিম্নে "ভামিনী" লিখিতেছিল, "ভা" পর্য্যন্ত লিখিবার পরই যেন ছায়াটা পাতলা হইয়া আসিল। ভামিনী "ভা" মুছিয়া ফেলিয়া তাহার পাশেই "মিনী" লিখিল। তখন যেন ছায়াটা সরিয়াই গেল। ভামিনী চিঠির নিম্নভাগে একটা পুঃ নিঃ জানাইল;—"এখানে বড়ই গরম পড়িয়াছে, আমার জন্য একটা পাতলা জামা পাঠাইও। ইতি—মিনী।"

পরে আরও দু'একখানা চিঠি ভামিনী স্বামীর নিকট লিখিয়াছিল।

ভামিনীর কলিকাতা-যাত্রার বড়ই বিলম্ব হইতে লাগিল। শ্যামা ভাবিল, মিনীকে কলিকাতা লইয়া যায় না কেন? তাহার মনে হইল, জামাই বুঝি তেমন পছন্দ করে নাই, নতুবা এই সোমত্ত স্ত্রীকে বাপের বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়াছে! তাই কি? অনেক পুরুষ ত ধে'ড়ে কনে পছন্দ করে না! অত বড় ধনী, হয় ত মনেই করিয়াছে—রোগা, বুড়ো, গেলেই বাঁচি—টাকার অভাব নাই, পছন্দমত আবার একটী কিনিয়া আনিবে!

শ্যামা প্রায়ই আসিত। এক দিন রাধারাণীর সাক্ষাতেই ভামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কলিকাতা কবে যাইবি?"

"আমি কি জানি?"

"কবে নিতে আসিবে? তোর কাছে লেখে না!"

রাধারাণী উত্তর দিলেন, "দেরি আছে। যাত্রার ভাল দিন পাওয়া যাইতেছে না।"

শ্যামা মনে মনে কহিল, "হুঁ?"

ভামিনীর কলিকাতা যাইবার দিন ১৭ই বৈশাখ ঠিক করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ২রা বৈশাখ তারিখে যতীন্দ্র-নাথের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫ই বৈশাখ অতি আবশ্যক এক কাজে যতীন্দ্রকে একবার কাশীতে যাইতে হইবে। হঠাৎ এই কাজটা উপস্থিত হইয়াছে। কাশীতে অন্ততঃ ছয় সাত দিন তাঁহার থাকিতে হইবে। ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে লইয়া গেলে সাতআট দিন শুধু পিসী মা ও চাকর-চাকরাণীর ভরসায় কলিকাতায় রাখিয়া যাইতে হয়। তাহা যতীন্দ্রের অভিমত নহে। ২৫এ তারিখেও যাত্রার ভাল দিন আছে। ২৪এ তারিখে যতীন্দ্র বিষ্ণুপুর যাইয়া ২৫এ তারিখে লইয়া যাইবেন—এই প্রস্তাব করিয়া যতীন্দ্র শ্বশুর-ঠাকুরের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। সেই দিনই ভামিনীর কলিকাতা-যাত্রা ঠিক হইয়াছে।

স্ত্রীর চিকিৎসা-ব্যয়ের সাহায্য জন্য যতীন্দ্র নবীনচন্দ্রের নিকট দুইবার টাকা পাঠাইয়াছেন, ভামিনী তাহা দাদার মুখে শুনিয়াছে। স্ত্রীর কাছে যতীন্দ্র তাহা লেখেন নাই।

এক দিন শ্যামা গৃহমধ্যস্থা ভামিনীর শ্রবণযোগ্য স্বরে বারান্দায় বসিয়া রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মিনী এত ভুগিতেছে, তোমরা তার চিকিৎসায় অত টাকা ব্যয় করিতেছ, জামাই কিছু সাহায্য করে না?"

"করে না?—এখান থেকে পাঠাইতে নিষেধ করিলেও জামাই মানে না, কবার টাকা পাঠাইয়াছে।"

"তাই ত, তাই ত! অত টাকা দিয়া নিল, তার প্রাণটা বাঁচাইতে খরচ করিবে না? বেশ, বেশ!—কিন্তু ভাই, অনেক যায়গায় শুনা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া লোকে খুব অর্থ উপার্জ্জন করে; কিন্তু ঘরে স্ত্রী মরিতে বসিলেও তার চিকিৎসায় একটা টাকা ব্যয় করিতে চাহে না!"

"যতীন্দ্রবাবু সে রকম লোক নয়। টাকা? যতীন্দ্রবাবু ঠাকুর-ঝির জন্য প্রাণ দিতে পারে!"

"বটে? দু'দিনেই এমন!—বেশ, বেশ!"

এ দিকে ভামিনীর শরীর ক্রমেই বেশী খারাপ হইতে লাগিল। সামান্য জ্বর, মধ্যে-মধ্যে হয়, ঔষধ খাইলেই সারিয়া যায়; কিন্তু তাহার শরীর খুব শীর্ণ হইতে লাগিল।

রাধারাণীর মনে পূর্ব্বে যা কিঞ্চিৎ দ্বিধা ভাব ছিল, সমস্ত চলিয়া গিয়াছে। প্রাণপণে তিনি ননদের সেবা-শুশ্রূষা করেন, পথ্যের ব্যবস্থা করেন। সময় পাইলেই পাখার বাতাস করেন, গল্প-প্রসঙ্গে ভামিনীর চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করেন।

কিন্তু শ্যামা-বামাকে দেখিলেই ভামিনীর বুক ব্যথা করিয়া উঠে, গায়ে জ্বর আসে। দিন-দিন তাহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ, অমন গৌর কান্তি বিবর্ণ হইতে লাগিল।

নির্দ্ধারণ দিনে যতীন্দ্র, ললিতা ঝি এবং কানাই চাকরকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন।

(৭০)

যতীন্দ্রনাথ ভামিনীকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু তাহার জীর্ণ শীর্ণ রক্তহীন দেহে আর সে শ্রী নাই, সে উজ্জ্বল গৌর দেহ মলিন, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যৌবনফুল্ল সে সুন্দর মুখ ক্ষীণ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রবিম্ববৎ পরিপাণ্ডু হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সুগোল, মাংসল বাহু হইতে অনন্ত খুলিয়া পড়িয়া যায়, ভামিনী তাহা খুলিয়াই রাখিয়াছে। হাতের বালাও বুঝি আর হাতেও থাকে না। ভামিনী কোনরূপে হাতে পরিয়া রহিয়াছে।

যতীন্দ্র কাতর কণ্ঠে শয্যাশায়িনী স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি এমন কাতর, আমাকে জানাও নাই কেন!"

"প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে ত আমাকে কলিকাতা আনিবার কথাই চলিতেছিল।"

"আমার দোষ, আমি কেন তোমাকে আগেই কলিকাতা আনিলাম না! অর্থের ক্ষতি! এখন তোমাকে হারাইতে বসিয়াছি।"

"যদি—যদি—"

যতীন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভামিনী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "দুদিনের পরিচয় মাত্র। যদি আমি চলিয়াই যাই, তুমি—তুমি—"

কেমন করিয়া যেন শ্যামার মনের কথা ভামিনীর চিত্তে আসিতেছিল—চলিয়া যায়, আর একটি কিনিয়া আনিবে!—কিন্তু ভামিনীর চিত্ত তত কঠোর ছিল না, সে বলিতে চাহিয়াছিল—ভাল দেখিয়া আর একটি বিবাহ করিবে—কিন্তু স্বামীর কাতর দৃষ্টিতে থামিয়া গেল। যতীন্দ্র বলিলেন, "আমি শূন্যগৃহ, শূন্যসংসার হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিব!" ভামিনী আপনার শীর্ণ হস্তে স্বামীর হস্ত গ্রহণ করিল।

ডাক্তার আসিয়া ভামিনীকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। এই দু'মাস মধ্যেই এমন ভয়ানক পরিবর্ত্তন! অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন; চলিয়া যাইবার সময় কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন পক্ষে যতীন্দ্রকে বিশেষ সাবধান থাকিতে বলিয়া গেলেন।

কিন্তু আটদশ দিনের চিকিৎসাতেও কোন উপকার লক্ষিত হইল না। প্রতি দিন রাত্রিতেই ভামিনীর একটু-একটু জ্বর হইতে লাগিল। শুধু তাহার মুখের বিবর্ণতা যেন একটু দূর হইল। চিকিৎসক তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভরসা পাইলেন, পুনরায় ঔষধের নূতন ব্যবস্থা করিলেন। পরামর্শ করিবার জন্য আর একজন ডাক্তার আনার কথা যতীন্দ্র উত্থাপন করিলেন; কিন্তু তখনও তাহার আবশ্যকতা তিনি বোধ করিলেন না।

আরও এক সপ্তাহে কোন উপকার না দেখিয়া ডাক্তার মহাশয় আর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসককে সঙ্গে আনিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিলেন। এ দিকে ঔষধ-পথ্য, যত্ন চেষ্টা, সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইল না। যতীন্দ্র আফিস কামাই করিয়া স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন; ঝি, চাকর, চাকরাণীরা সকলে দিবারাত্রি তাহার সাহায্য করিতে লাগিল। পিসী-মা অনবরত যত্ন, চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভামিনী যেন ক্রমেই অধিকতর কাতর হইতে লাগিল। এত দিন ঘরে বারান্দায় ভামিনী একটু-একটু হাঁটিয়া বেড়াইত। ক্রমে তাহার সে শক্তিও রহিল না। ভামিনী প্রায় সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইল। বিষ্ণুপুর হইতে পিতাঠাকুর আসিয়া মধ্যে-মধ্যে দেখিয়া যাইতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া দুইতিন দিন থাকিয়া যাইতেন। রাধারাণী আসিতে পারেন না, সংসার চলে না।

চিকিৎসক এবং বন্ধুবান্ধবদিগের পরামর্শে যতীন্দ্র কলিকাতার একজন অতি প্রধান ডাক্তারকেও আনিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসাতেও ইনি অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি পূর্ব্ব চিকিৎসকগণের চিকিৎসা-প্রণালী এবং রোগিনীর অবস্থা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া পৃথক কক্ষে যাইয়া যতীন্দ্রকে বলিলেন;—"রোগ কঠিন, কিন্তু চিকিৎসার বাহিরে নয়। অল্প দিনের মধ্যেই রোগিনী এত দুর্ব্বল, এত রক্তশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা শুধু শারীরিক পীড়া বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। ইঁহারা যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেছেন, তাহা অতি উত্তম, তাহাতেই রোগিনী নিরাময় হইবার কথা; কিন্তু তাহা কিছুই হইতেছে না। আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি এমন কিছু জানেন, যাহাতে আপনার অনুমান হইতে পারে যে, রোগিনী কোন আন্তরিক আঘাত—মনোকষ্ট পাইয়াছেন, যাহা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে? আমরা চিকিৎসক, আমাদিগকে বলিতে বাধা নাই। তবে আপনি সমস্ত খুলিয়া বলিতে না পারিলেও আপনার স্ত্রীর ঐরূপ কোন আন্তরিক কষ্ট আছে বলিয়া আপনি সন্দেহ করেন কি না?"

যতীন্দ্রনাথ কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ঐরূপ সন্দেহ করিবার কারণ ছিল; কিন্তু আমি মনে করিয়াছিলাম, সে হেতু দূর হইয়াছে; এখন আপনাদের কথায় বোধ হইতেছে, এখনও তাহা দূর হয় নাই।"

প্রধান ডাক্তার বলিলেন;—"আমরা চিকিৎসা করিতেছি, খুব যত্ন সহকারেই করিব। কিন্তু ঐরূপ কোন কারণ থাকিলে, আপনি তাহা দূর করিবার খুব চেষ্টা করিবেন, নতুবা ইহাকে আরাম করিয়া তোলা অতি কঠিন হইবে।—আর একটি কথা। রোগিনী রক্তাল্পতার জন্য

এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, আমরা অন্য একটি উপায়ও অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করিতে পারি।"

যতীন্দ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার বলিলেন; "আমার মনে হইতেছে, অন্য কোন সুস্থকায় সবল ব্যক্তির রক্ত ইহার ধমনীতে প্রবিষ্ট ও পরিচালিত করিতে হইবে। এমন সুস্থ, সবলকায়, কষ্টসহিষ্ণু হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় কেহ আছেন?"

যতীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকটেই কেদারায় বসিয়া ছিলেন; কেদারা ছাড়িয়া উঠিলেন, গায়ের জামা অপসারিত করিয়া নিজের সুগঠিত, বলিষ্ঠ দেহ দেখাইয়া বলিলেন, "আমার কোন পীড়া নাই, আমি সবল; আমার রক্তে হইবে?"

ডাক্তার যতীন্দ্রের হাত তুলিয়া লইলেন, বাহুর পেশী টিপিয়া দেখিলেন; বলিলেন, "বেশ হইবে। আপনার বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না, সাহস থাকিলেই যথেষ্ট হইবে।"

যতীন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সাহস খুব আছে।"

ডাক্তার সানন্দে তাহার হস্ত মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আজ যে ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগিনী তাহা এক সপ্তাহ-কাল সেবন করুন; তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিব।"

চিকিৎসকেরা চলিয়া গেলে যতীন্দ্র মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন—মানসিক অসুখ? অন্তরে আঘাত?—হা জগদীশ্বর! সেই টাকা! টাকা দিয়া আনিয়াছি! মূল্য! —দু'দিন পরে দি' নাই। সেই অভিমান এখনও অন্তরে শঙ্কুবৎ বিঁধিয়া রহিয়াছে। কলঙ্ক! ভাবিয়াছিলাম, সে অভিমান চলিয়া গিয়াছে। কৈ? এখনো রহিয়াছে—শরীর ধ্বংস করিতেছে! কেমন করিয়া এ অভিমান দূর করিব?—শুনিয়াছি, প্রেমে সংসার জয় করা যায়, আমি কি আমার স্ত্রীর অভিমান জয় করিতে পারিব না? প্রাণপণে চেষ্টা করিব!

বংশানুক্রম ও সুপ্রজনন-বিদ্যা

(HEREDITY AND EUGENICS)

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এল্-এম্-এস্]

বর্ত্তমান সময়ে heredity ও eugenics (বংশানুক্রম ও সুপ্রজনন-বিদ্যা) সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইতেছে। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত দুই বিষয়ে দুই-চারিটা কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

Eugenics (ইউজেনিক্স্) শব্দের ধাতুগত অর্থ "well-born" অর্থাৎ "সুজাত।" অতএব বাঙ্গলায় ইউজেনিক্স্ বিদ্যাকে "সুপ্রজনন-বিদ্যা" বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়। ইউজেনিক্স্ (eugenics) শব্দটি বেশী দিনের নয়; একটু পুরাতন অভিধানে শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দটি নূতন হইলেও, ইহাতে যে ভাব প্রকাশ পায়, তাহা কিন্তু নূতন বলা যায় না। প্রাচীন কালের দার্শনিক গ্রন্থাদিতে এ ভাবের অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকজাতি যাহাতে দুর্ব্বল ও রুগ্ন না হইয়া পড়ে, তাহার জন্য প্রাচীন গ্রীসে নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিবাহাদির বিষয়ে সে সময় গ্রীস দেশে বড় কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। যাহারা নিখুঁৎ, সুশ্রী ও বলবান, তাহারাই বিবাহ করিতে পারিত। প্লেটো তাঁহার Laws নামক পুস্তকের এক স্থানে বলিয়াছেন—বিবাহ-বন্ধনটাকে শুধু গার্হস্থ্য ব্যাপার মনে করিলে চলিবে না; ইহার উপর জাতীয় কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে Burton সাহেব Anatomy of Melancholy নামক এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ ভাবের অনেক কথা দেখা যায়। তিনি বলেন, পিতামাতার দোষে সন্তান কষ্ট পায়, দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়; অতএব বিবাহাদি বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীন ভারতেও বিবাহাদি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কথিত আছে, গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতেও দুর্ব্বল, বিকলাঙ্গ

শিশুদের বড় হইতে দেওয়া হইত না, শিশুকালেই তাহাদের মারিয়া ফেলা হইত।

অতএব সুপ্রজনন-বিদ্যা যে নূতন জিনিস, তাহা নহে। কিন্তু বিজ্ঞান হিসাবে ইহার অস্তিত্ব খুব বেশী দিনের বলা যাইতে পারে না। সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলভিত্তি বংশানুক্রমের উপর সংস্থাপিত। বংশানুক্রম-বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা সবে মাত্র ৫০ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে বংশানুক্রম-বিষয়ে লোকের জ্ঞান কেবল দুইটি পরস্পর-বিরোধী কথার মধ্যে নিহিত ছিল। সে কথা দুইটি হইতেছে—"Like begets like" অর্থাৎ "সদৃশ হইতে সদৃশেরই উৎপত্তি হয়" এবং Nature never uses the same mould twice" "প্রকৃতি এক ছাঁচ দুবার ব্যবহার করে না।" বলা বাহুল্য, এই দুইটা কথার কোনটাই মিথ্যা নয়।

সুপ্রজনন-বিদ্যার মূল-ভিত্তি যখন বংশানুক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন ইহাকে জানিতে হইলে, বংশানুক্রম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। এই কারণে বংশানুক্রম সম্বন্ধে এই স্থানে একটু আলোচনা করিব।

আমরা জানি, সদৃশ হইতে সদৃশেরই উৎপত্তি হয়; কিন্তু কেন হয়, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। সকলগুলিই যে বিশ্বাস ও গ্রহণের যোগ্য, তাহা বলা যায় না। কতকগুলি একেবারে বিশুদ্ধ কল্পনামূলক—সম্পূর্ণ অসঙ্গত; আবার কতকগুলিকে ঠিক কল্পনা বলা যায় না বটে, তথাপি তাহারা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, এ কথাও বলা চলে না। এ কথাগুলি বেশ কৌশলযুক্ত—হঠাৎ সত্য বলিয়া মনে ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। আর বাকিগুলিকে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক (scientific) বলা যায়। বংশানুক্রম বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মতটি এই যে, ডিম্বকোষ (ovum)এর মধ্যে জনক সূক্ষ্মতম আকারে থাকে বলিয়াই, সন্তান জনকের আকার-অবয়বাদি প্রাপ্ত হয়। বংশানুক্রম-বিষয়ে Haekel (হেকেল্) যাহা বলেন, তাহাতে শুধু তাঁহার কল্পনাশক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, Organic Molecule (জৈব পরমাণু) সমূহেরও সেই রকম তরঙ্গ আছে। Organic Moleculeদের এই সব তরঙ্গ harmonious অর্থাৎ উহাদের মধ্যে মিল আছে এবং ইহারা পুরুষানুক্রমে প্রধাবিত হয়; অর্থাৎ moleculeসমূহ যে তালে নৃত্য করিতে শিখে, তাহা তাহারা ভুলিতে পারে না।

বংশানুক্রম সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত মতটি হইতেছে Weisman (উইজ্‌ম্যান্)এর Continuity of the Germ Plasm Theory। এই মতটি বুঝিতে হইলে ভ্রূণ দেহের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। সকলেই জানেন, পুরুষ কোষ (sperm) ও ও স্ত্রী-কোষ (ovum)এর মিলনে যে কোষটি হয় (fertilised ovum), তাহা হইতেই ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। এই কোষটি (fertilised ovum) প্রথমে দুইটি কোষে বিভক্ত হয়, উহারা আবার চারিটি কোষে বিভক্ত হয়। এই রূপে কালক্রমে অনেকগুলি কোষের উদ্ভব হয়। তখন উহাদের মধ্য হইতে একটি কোষ ভ্রূণ-দেহ গঠনের জন্য নিরূপিত হয়। এখন হইতে এই কোষটিরই বিভাগ হইতে থাকে, অন্য কোষগুলির আর কোন বিভাগ হয় না। ভ্রূণ দেহের জন্য যে কোষটি নির্দ্দিষ্ট হয়, সেটির বারবার বিভাগ ও পুনর্বিভাগ দ্বারা কালক্রমে উহা হইতে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই কোষগুলিই হইতেছে ভ্রূণ-দেহের উপাদান। ভ্রূণ-দেহ ইহাদের দ্বারা গঠিত হয়। আর বাকি কোষগুলির কি হয়? ইহারা ভ্রূণদেহ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে—ইহাদের দ্বারা ভ্রূণদেহের কোন অংশই গঠিত হয় না। ইহারা ভ্রূণদেহ মধ্যে বীজ-কোষ (germ plasm)রূপে অবস্থিতি করে মাত্র। এই কোষগুলিই কালক্রমে স্ত্রী-কোষ (ovum) বা পুরুষ-কোষ (sperm) রূপে পরিণত হয়। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, বীজ কোষ (germ cell) ব্যক্তিগত জিনিস নয়; ইহা পূর্ব্ব পুরুষের বীজকোষ হইতেই সাক্ষাৎভাবে সঞ্জাত। যাহার বীজ-কোষ, সে উহার ভাণ্ডারী মাত্র। গ্যাল্টন্ (Galton) বংশানুক্রম-ধারাকে একগাছা নেক্‌লেস্ (neck-lace)এর সঙ্গে, আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে নেক্‌লেসের এক-একটি দোলকের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; যথা—

f f f f
অ আ ই ঈ

এই চিত্রের শৃঙ্খলটিকে germ cells (বীজ-কোষ) মনে করা যাইতে পারে, অ, আ, ই, ঈ চারি পুরুষের চারি ব্যক্তি। ইহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎভাবে যোগ না

থাকিলেও, গৌণভাবে germ plasm (বীজ-কোষ) দ্বারা বিলক্ষণ যোগ আছে।

ইহার পর বংশানুক্রম বিষয়ে আর কিছু জানিতে হইলে, Mendelism (মেনডেলিজ্‌ম্) ব্যাপারটা কি, তাহা জানা আবশ্যক। Gregor Mendel (গ্রেগর্ মেণ্ডেল্) প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, দুই প্রকার বিভিন্ন জাতীয় মটর লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করেন। ইহাদের একটি দীর্ঘ জাতীয়—লম্বায় ৬ ফুট; আর অন্যটি খর্ব্বজাতীয়—লম্বায় ১৮ ইঞ্চি মাত্র। মেণ্ডেল (Mendel) ইহাদের মিলনের দ্বারা এক প্রকার সঙ্কর মটর উৎপন্ন করিলেন। এই সঙ্কর (hybrid) মটর হইতে যে সকল গাছ হইল, তাহারা ৩ ফুটও নয়, ৪ ফুটও নয়, ঠিক ৬ ফুট। এই সকল গাছের বীজ হইতে যে সব গাছ হইল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দীর্ঘ, আর কতকগুলি খর্ব্ব হইতে দেখা গেল; শুধু তাই নয়, একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে দীর্ঘ ও খর্ব্ব হইতে দেখা গেল। অর্থাৎ তিনটি যদি দীর্ঘ হইল, তাহা হইলে, একটি খর্ব্ব হইতে দেখা গেল। এই সব গাছের বীজ পুঁতিয়া যে সব গাছ হইল, তাহাদের মধ্যেও পূর্ব্বের হারে দীর্ঘ ও খর্ব্ব গাছ হইতে লাগিল। তবে একটা জিনিস এই দেখা গেল, খর্ব্ব গাছ হইতে শুধু খর্ব্ব গাছই হইতে লাগিল, আর দীর্ঘ গাছের বীজের তিন ভাগের একভাগ হইতে কেবলমাত্র দীর্ঘ গাছই হইতে লাগিল। নিম্নের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়টা অনেক স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। দ=দীর্ঘগাছ; খ=খর্ব্বগাছ।
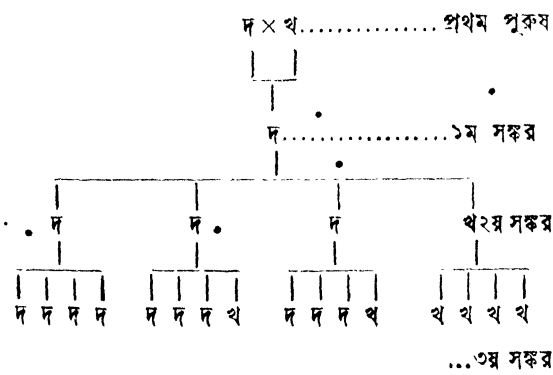
এই চিত্রের দিকে একটু বিশেষভাবে মনোযোগ দিলে দুইটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হইতেছে "dominance" প্রাধান্য বা প্রকাশ; অর্থাৎ দীর্ঘ মটর ও খর্ব্ব মটরের মিলনে যে সঙ্কর (hybrid) মটর হইল, তাহাতে পূর্ব্বগামীদের একজনের বিশেষত্ব (দীর্ঘত্ব) প্রকাশ পাইল এবং অপর জনের বিশেষত্ব (খর্ব্বত্ব) অপ্রকাশ রহিল। দ্বিতীয় বিষয়টি হইতেছে "segregation" বা পৃথক্-করণ; অর্থাৎ সঙ্কর মটরবংশে যে সকল মটর জন্মাইতে লাগিল, তাহারা সকলেই যে দীর্ঘ হইল, তাহা নয়, কতকগুলি দীর্ঘ হইল, কতকগুলি খর্ব্ব হইল, এবং তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে হইতে লাগিল। তাহা হইলে এই দেখা যাইতেছে যে, সঙ্কর মটরে পিতামাতা উভয়েরই বিশেষত্ব বর্ত্তমান রহিল, তবে একটা প্রকাশাবস্থায় অন্যটা অপ্রকাশাবস্থায়। ইহাদের বংশে কিন্তু যে সব মটর হইল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পিতৃধর্ম্ম (দীর্ঘত্ব) ও কতকগুলি মাতৃধর্ম্ম (খর্ব্বত্ব) প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তাহা আবার একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে হইতে লাগিল।

মেণ্ডেল দীর্ঘত্ব ও খর্ব্বত্বকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা দীর্ঘত্বকেই গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন এবং খর্ব্বত্বকে দীর্ঘত্বের অভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন, খর্ব্বত্ব একটা গুণ নয়, ইহা অ-দীর্ঘ অর্থাৎ দীর্ঘ নয়, এই মাত্র। পূর্ব্বেকার চিত্রে যদি খ স্থানে (দ) দেওয়া যায় তাহা হইলে চিত্রটি এইরূপ দাঁড়ায়।—
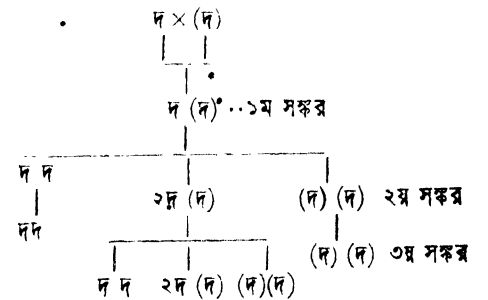
এই চিত্রে দ দ গাছ দীর্ঘ শ্রেণীভুক্ত; ইহাদের বীজ হইতে যে সকল গাছ হইবে, তাহারা কেবলই দীর্ঘ গাছ হইবে। (দ) (দ) খর্ব্ব গাছ; ইহার বীজ হইতে যে সকল গাছ হইবে, তাহারা কেবলই খর্ব্ব হইবে। দ (দ) যদিচ দীর্ঘ গাছ বটে, কিন্তু ইহার বীজ হইতে যে সকল গাছ হইবে, তাহাদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে দীর্ঘ ও খর্ব্ব গাছ হইবে।

যদি কাহারও একটিমাত্র বিশেষত্ব না থাকিয়া দুইটি

থাকে, তাহা হইলেও পূর্ব্বের নিয়মেই কার্য্য হইতে থাকিবে; তবে ব্যাপারটা কিছু জটিল হইয়া পড়িবে। একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইতে চেষ্টা করি। মনে কর, দু'রকম ভেড়া হইতে সঙ্কর ভেড়া উৎপন্ন করিতে হইবে। ইহাদের এক রকমের রঙ্‌ কালো এবং তাহাদের শিঙ্‌ নাই; দ্বিতীয় শ্রেণীর রঙ্‌ লাল এবং ইহাদের শিঙ্‌ আছে। এই দুই শ্রেণীর ভেড়ার মিলনে যে সকল সঙ্কর ভেড়া হইল, তাহারা সকলেই কালো ও শৃঙ্গবিহীন; কিন্তু এই কালো শৃঙ্গহীন ভেড়াদের যে সকল সন্তানাদি হইল, তাহাদের বার-আনা ভাগের রঙ্‌ কালো এবং সিকি ভাগের রঙ্‌ লাল। শুধু তাই নয়; এই কালো ভেড়াদের বার আনা ভাগের শিঙ্‌ নাই এবং লাল রঙের ভেড়াদের বার আনা ভাগের শিঙ্‌ নাই।

মেণ্ডেলের সিদ্ধান্তটি যে নির্ভুল, তাহা অনেক স্থলেই সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। পশুপালকেরা ও উদ্যানবিদেরা মেণ্ডেলের নিয়মটি খাটাইয়া বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগারও করিতেছেন।

উদ্ভিদ্‌ ও পশুর বেলায় মেণ্ডেলের নিয়মটি প্রয়োগ করা সহজ কার্য্য হইলেও মানুষের বেলায় ইহার প্রয়োগ তত সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষত্ব এত বেশী যে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তথাপি নিয়মটি যে মানুষের বেলায় খাটে না, সে কথা অবশ্য কেহই বলিতে পারেন না। কতকগুলি, রোগ ও দুর্ব্বলতা মেণ্ডালের নিয়মানুসারে যে উত্তর-বংশীয়দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ইহা আমরা কতবার দেখিয়াছি। কিন্তু এ রকম দৃষ্টান্ত যে খুব বেশী, তা অবশ্য বলা যায় না। এই কারণে মানুষের বেলায় বংশানুক্রম ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে শুধু Mendelism (মেণ্ডেলিজম্‌) এর উপর নির্ভর করিলে চলিতে পারে না। ইহার জন্য statistics বা সংখ্যাতালিকার উপর নির্ভর করিতে হয়। Francis Galton (ফ্রান্‌সিস্‌ গ্যালটন্‌) পিতাপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রভৃতির তুলনা করিয়া, বংশানুক্রম সম্বন্ধে একটা নিয়ম খাড়া করিয়াছেন। এই নিয়মটি Galton's Law নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পিতামাতা উভয়ে মোটের উপর সন্তানকে তাঁহাদের গুণের অর্দ্ধেক দিয়া থাকেন। এই যে অর্দ্ধেক গুণ সন্তান পিতা-মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, ইহার সিকি অংশ পিতার নিজস্ব, সিকি অংশ মাতার নিজস্ব। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষ হইতে মোটের উপর সিকি অংশ সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়; অর্থাৎ পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী ইহারা প্রত্যেকে এক আনা করিয়া দিয়া থাকেন।

মানুষের দৈর্ঘ্য যেমন মাপ করা চলে, ধৈর্য্য, সাহস প্রভৃতি গুণের তেমন করিয়া মাপ করার উপায় নাই। এই কারণে দৈর্ঘ্য গুণটির বংশানুক্রমিকতা যেমন সহজে ঠিক করা যায়, অন্য গুণগুলির বেলায় তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না। তথাপি এ বিষয়ে যে চেষ্টা না হইয়াছে, এমন নহে। Galton (গ্যাল্‌টন্‌) প্রমাণ করিয়াছেন, কোন লোকের যদি কোন বিষয়ে অসাধারণ মানসিক শক্তি থাকে, তাহা হইলে, সেই শক্তিটি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইতে পারে। Karl Pearson (কার্ল পিয়ার্সন্‌) এবং তাঁহার শিষ্যেরা এ বিষয় লইয়া বিস্তর পরীক্ষা করিয়াছেন। এক-একটী লোক যেন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকে, বিষাদ কাহাকে বলে তাহা একেবারেই জানে না; তেমনি ইহার বিপরীত প্রকৃতিরও মানুষ যে না আছে, এমন নয়। পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, এ সকল গুণ বংশানুক্রমে দেখা দেয়। এই রকমে, হাতের লেখা, বা গান গাহিবার শক্তির জন্যও সন্তান বাপ-মার নিকট ঋণী। ইহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, পিতা-মাতার সহিত সন্তানের-আকার অবয়ব বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য আছে, মানসিক গুণ সম্বন্ধেও তেমনি সাদৃশ্য আছে; সত্য কথা বলিতে কি, বর্ত্তমান কালে, বংশানুক্রম সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ স্থির হইয়াছে, বুদ্ধির (intellect] উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার (environment) বড় বেশী হাত নাই। যাহার ঘটে কোন Intellect (বুদ্ধি) নাই, শিক্ষার দ্বারা তাহাকে কেহই intelligent (বুদ্ধিমান্‌) করিয়া তুলিতে পারে না। অতএব জাতীয় উন্নতি কেবলমাত্র শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। কোন জাতির মধ্যে যে সকল feeble-minded (দুর্ব্বলচিত্ত) শিশু আছে, তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ রকম ব্যবস্থা করিলেও কোন ফল হয় না। কেহ যদি এমন মনে করেন, যাহারা দুর্ব্বলচিত্ত তাহাদের যদি সবলচিত্তদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত জাতির উন্নতি অসম্ভব নয়;—ইহার

উত্তরে আমরা এই কথা বলি যে, এ আশা যে শুধু দুরাশা তা' নয়, তাহার অপেক্ষা আরও মন্দ কিছু। ইহাতে জাতির মধ্যে দুর্ব্বলচিত্তের সংখ্যা বাড়িবে বই আর কিছুই হইবে না। মানসিক গুণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, শারীরিক গুণাদি বিষয়েও সেই কথাই খাটে। এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনার ফলেই Eugenics বা সুপ্রজনন-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে।

সুপ্রজনন-বিদ্যা বিষয়ে কিছু বলিবার আগে, বংশানুক্রম সম্বন্ধে মানুষের মনে যে দুই-একটা ভুল সংস্কার আছে, তাহার আলোচনা করা যাক্। সংখ্যা-তালিকার সাহায্যে প্রমাণ করা অসম্ভব নয় যে, tuberculosis (যক্ষ্মারোগ) বংশানুক্রমে দেখা দেয়। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে রোগটা বংশানুক্রমিক নয়, রোগ-প্রবণতাটাই বংশানুক্রমিক। Tubercular (যক্ষ্মারোগগ্রস্ত) বাপমার ছেলেরা উক্ত রোগের পক্ষে অনেকটা অনুকূল, সুবিধাজনক ক্ষেত্র, এই মাত্র।

আর একটি প্রশ্ন এই উঠিতে পারে—মানুষের স্বোপার্জ্জিত গুণ (acquired characters) বংশানুক্রমিক কি না? কেহ যদি নিজের চেষ্টায় কোন বিশেষত্ব লাভ করে, সেটা তাহার পুত্রকন্যাদের মধ্যে বর্ত্তাইবে কি না? বংশানুক্রমবাদীরা এ বিষয় একবারে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, স্বোপার্জ্জিত গুণ কোন মতেই বংশানুক্রমিক হইতে পারে না। ইহার বিপক্ষে যে কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না, এমন নয়; কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে, উল্লেখ করাই অনাবশ্যক।

এইবার আমরা Eugenics বা সুপ্রজনন-বিদ্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চারিটা কথা বলিতে চেষ্টা করিব। এ কথা খুবই ঠিক, যে বর্ত্তমান সময়ে আমরা অনেক বিষয়েই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি,—আমাদের শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, আমাদের আবিষ্কার করিবার শক্তির উন্নতি হইয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়েও আমাদের জ্ঞান যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত উন্নতির মধ্যে আমরা কি আমাদের সহজাত-গুণের (inborn qualities) উন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিব? সুপ্রজনন-বাদীরা কহিবেন —নিশ্চয়ই নয়, কারণ, তাহা হইলে যে আমাদের অবনতি অনিবার্য্য। সুপ্রজনন-বাদীদের এ কথাটা যে শুধু কল্পনার উপর স্থাপিত, তাহা বলা যায় না। ইহার জন্য তাঁহারা বিস্তর শ্রমসাধ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি এমন প্রমাণ করিতে পারেন, (তাহা যে তাঁহারা পারিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই) যে, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ব্যক্তিরা টিকিয়া থাকিয়া বিবাহাদি করিয়া বংশবিস্তার করিতে থাকিলে, কালক্রমে সমাজ মধ্যে এমন সব লোকের উদ্ভব হইবে, যাহারা বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের পক্ষে একেবারে উপযুক্ত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃত উন্নতি যে সুদুর-পরাহত, তাহাতে সন্দেহ আছে কি?

সুপ্রজনন-বাদীদের অস্ত্রটি হইতেছে, বংশানুক্রম-বিজ্ঞান (Science of Heredity)। এই বিজ্ঞানের মূল মন্ত্রটি হইতেছে—"Inborn qualities depend directly and solely upon the qualities of germ plasms." বীজকোষের (germ-cell) দোষ-গুণের উপরই যে প্রধানতঃ ও সাক্ষাৎভাবে সহজাত (inborn) দোষগুণ নির্ভর করিয়া থাকে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথা। বীজকোষে যদি দোষ থাকে, তাহা হইলে, সন্তানেও যে দোষ বর্ত্তিবে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তথাপি সুপ্রজনন-বাদীদের এ কথাও মানিয়া লইতে হইবে যে, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা (education and environment) প্রভৃতিরও ব্যক্তির উপর বড় কম হাত নাই। সত্য বটে, এ সকলের দ্বারা কাহারও innate character (স্বাভাবিক গুণ) এর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না; তথাপি শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা এই ফল হয় যে, কাহারও মধ্যে যে সকল ভাল গুণ থাকে, অনুশীলন দ্বারা সেগুলির বিকাশ ও স্ফূরণ হয় এবং অনুশীলনের অভাবে মন্দ গুণগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট ও লুপ্ত হইয়া যায়। তাহা হইলে এই দেখা গেল, মানুষের এবং সেই জন্য জাতির উন্নতি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে,—১ম বংশানুক্রম (heredity); ২য় শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment)।

সভ্যতার জন্য মানবজাতির মধ্যে যে অবনতির সূচনা হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধান করাই সুপ্রজনন-বাদীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের স্বাভাবিক উপযোগিতা যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহারই জন্য তাঁহারা বিশেষ সচেষ্ট। সুপ্রজনন-বাদীরা বলেন, যাহারা উপযুক্ত, তাহারাই কেবল বিবাহাদি করিয়া বংশ-বিস্তার করিতে থাকুক; আর যাহারা

অনুপযুক্ত, তাহারা বিবাহ হইতে বিরত থাকুক। মানুষ যখন সভ্য হয় নাই, তখন যাহারা উপযুক্ত, তাহারাই শুধু বংশরক্ষা করিতে পারিত। যাহারা অনুপযুক্ত, তাহারা শিশুকালেই মারা পড়িত ; কেন না সে সময় এখনকার মত হাইজিন্ (hygiene) ছিল না। এখন যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (natural selection)এর অবসর নাই, তখন কাল্পনিক নির্ব্বাচনের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সে কাল্পনিক নির্ব্বাচনটি হইতেছে, বংশবিস্তার বিষয়ে সকলের অধিকার থাকিতে না দেওয়া। সুপ্রজনন-বিদ্যা অবশ্য এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করিতে পারে নাই ; তা না পারুক, তথাপি ব্যাপারটা যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইন্দোর ও উজ্জয়িনী

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

সন্ধ্যার সময় বোম্বাই মেল জব্বলপুর ছাড়িল। আমি একটি নূতন কামরায় উঠিলাম। যে দিকেই তাকাই, দেখি, পাগড়ী ও টুপির বাহার। শেষে আমারই মত ধুতি ও পিরান পরিহিত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক নজরে পড়িলেন। তাঁহার পার্শ্বে একটু স্থান পাইলাম। পরিচয়ে জানিলাম, তিনি কুমারটুলীর একজন কবিরাজ। তিনি ইন্দোর ছাড়াইয়া আরও খানিকটা যাইবেন। দুইজনে বেশ আনন্দে কতকটা সময় কাটাইলাম। রাত্রি দুইটায় আমরা উভয়ে খাণ্ডোয়ায় নামিলাম। এইখানে বি, বি, সি, আইএর ছোট গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িতে ৪টা বাজিল।

প্রভাত-সূর্য্যের রশ্মিপাতে অন্ধকার অদৃশ্য হইল; আমরাও নর্ম্মদার তীরে আসিয়া পড়িলাম। তখন গ্রীষ্মকাল, তায় পার্ব্বত্য নদী ; কূলে কূলে ভরিয়া উঠে নাই, তথাপি নর্ম্মদার সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। বর্ষার বারিপাতে নর্ম্মদার নর্ম্মলীলা সত্য-সত্যই হৃদয় কাড়িয়া লয়। বাষ্পীয় শকট হু-হু শব্দে আমাদের বাড়োয়া ষ্টেশনে আনিয়া ফেলিল। ওঁকার মান্ধাতার যাত্রীরা নামিয়া গেল। মান্ধাতা ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানকার দৃশ্য অতি রমণীয়। নানা কারণে আমার সেখানে যাইবার সুবিধা হয় নাই ; কিন্তু যাহা শুনিলাম, তাহাতে সেই তীর্থস্থানটি অতুলনীয় বলিয়াই বোধ হয়।

ক্রমে পাতালপাণী ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। এখানকার ঝরণাটি দেখিবার যোগ্য। বর্ষাকালে ইহার গর্জ্জন অতি মধুর বলিয়াই বোধ হয়। গ্রীষ্মের প্রকোপে হ্রদের জল সবুজবর্ণ হইয়াছে। ষ্টেশনটি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। লৌহ-রথ এতক্ষণ বিন্ধ্যাচলের উপর দিয়া মন্থর গতিতে আসিতেছিল। ক্রমে-ক্রমে ৭টি টানেল পার হইল। এখন সমতল ভূমি পাইয়া রথ বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে মৌএর বারাকশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। মৌ একটি বড় ষ্টেশন, মধ্য ভারতের প্রধান সেনানিবাস। এখান হইতে ইন্দোর ১৪ মাইল। মধ্যে রাও নামক ষ্টেশন। ডাক্তার তাঁবের অতুল কীর্ত্তি—"রাও স্বাস্থ্যনিবাস" ষ্টেশন হইতে দেখা যাইতেছিল।

ইন্দোরে ১০টার পর ট্রেণ থামিল। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যথারীতি বিদায় লইলাম। আমার দাদা ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। একখানা টঙ্গা লইয়া দুইজনে সহরের দিকে রওনা হইলাম। মিনিট পাঁচেক আসিবার পর দেখি, আমাদের টঙ্গা থামিল ও দুইজন লোক ছুটিয়া আসিল। কিন্তু অগ্রজ সঙ্গে থাকায় টঙ্গা পুনরায় চলিতে লাগিল। পরে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, ইহার নাম নাকা। সোজা কথায় যাহাকে কাষ্টম অফিস বলে—শুল্ক আদায়ের স্থান। অগ্রজের পরিচিত বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল, তাহা না হইলে আমাদের ট্রাঙ্ক ও মালপত্র খুলিয়া দেখিত। এখানে সব জিনিসেরই শুল্ক দিয়া তবে তাহা সহরের ভিতর আনিতে হয়।

দুপুর বেলা একটু বিশ্রাম করিয়া, বৈকালে একখানা টঙ্গা লইয়া 'ছাউনী' হইয়া পলাশিয়ার এন্‌জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। ভদ্রলোক বড় অমায়িক। পশ্চিমে বাঙ্গালী যেরূপ হইয়া থাকে—সরল-হৃদয়। যে কয় দিন ছিলাম, মন্মথ বাবুর কুঠিতে প্রায়ই আমাদের বৈঠক বসিত। এ দিক্‌টাতে ভদ্রলোকের বাস বেশী নাই। মাঠের মধ্যে চিফ্ এন্‌জিনীয়ারের অফিস ও তাহারই পূর্ব্ব ধারে কয়েকখানা বাংলা। রাস্তা অতি পরিষ্কার। মাঝে-মাঝে ইংরাজি ফ্যাশানে বাংলা নির্ম্মিত হইতেছে।

পাতাল-পানী—ইন্দোর

পরদিন প্রাতঃকালে দাদার সহিত বর্ত্তমান হোলকার বাহাদুরের খুল্লতাত সর্দ্দার যাদো রাও হোলকারের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র-লোকের সহিত পরিচিত হইলাম। সর্দ্দার বাহাদুর এখানে 'ভেইয়া সাহেব' নামে অভিহিত। ইনি ভূতপূর্ব্ব হোলকার তুকাজি রাওএর পুত্র। তবে ইনি মুসলমানীর গর্ভ-জাত। এখানকার রাজপ্রথা এইরূপ যে, যদি রক্ষিতা মুসলমানীর পুত্রের রাজপ্রাসাদে নাড়ীচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে সে হিন্দু হইবে। ইনিও সেই প্রথানুসারে হিন্দু (যদিও ইঁহার মাতুল ও মাতামহ-বংশ একেবারে খাঁটা মুসলমান;) ইনি আমার সহিত ইংরাজিতে আলাপ করিলেন। ইঁহার পোষাকের কোন জাঁক-জমক দেখিলাম না। বেশ প্রাণ খুলিয়া সকলের সহিত আলাপ করিলেন। পরেও ইঁহার সহিত কয়েকবার দেখা হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাকে উচ্চশিক্ষিত বলিয়াই মনে হয়। শুনিলাম ভেইয়া সাহেব তাঁহার শিশু পুত্রকে বিলাতে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন।

ভেইয়া সাহেবের বাটীর সম্মুখেই পুরাতন প্রাসাদ। সম্মুখে সিংহদ্বার। প্রাসাদটি সাত-তালা, পুরাতন ও সেকেলে ধরণের; প্রস্তর ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। উপর-তালায় প্রত্যহ নহবৎ বাজে। ভিতরে এখন দেওয়ানি-আম ও রাজ-সিংহাসন আছে। মহা-রাজের গদীর নিকট শুনিলাম, প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় বীণ বাজান হয় ও যে কেহ কক্ষে প্রবেশ করিলেই কুর্ণিশ করিতে হয়।

প্রাসাদের সম্মুখভাগে অনেকটা জমি পড়িয়া আছে। বামদিকে একটি পথ গিয়াছে; ইহাই সহরের প্রধান রাজপথ। নিকটেই ইন্দোর পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী। এই

এড ওয়ার্ড হল—ইন্দার

লালবাগ প্রাসাদ—ইন্দোর

রাওজি আমাকে আনন্দের সহিত তাঁহাদের পশুশালা দেখাইলেন। নানাবিধ পক্ষী পিঞ্জরাবদ্ধ রহিয়াছে; এমন কি একটি চকোর পাখীও দেখিলাম।

পূর্ব্বদিকে আরও অগ্রসর হইলেই রেলের লাইন পাওয়া যায়। এইবার টুকুগঞ্জের রাস্তা আরম্ভ হইল। এইটি নূতন সহর। এখানে সব ইংরাজী ধরণের বাংলা। বেশ সুন্দর রাস্তা, বিদ্যুতালোকিত। আর মাঝে-মাঝে এক-একখানি বাংলা। রেল-লাইনের পরই স্থানীয় সরাই, প্রকাণ্ড বাড়ী

"প্রেম পান পাত্র হাতে, মৃত্যু ওষ্ঠ ক'রব চুম্বন,
আলিঙ্গন হাসি মুখে, এ হৃদয় কাঁপবে না ত্রাসে।"

শিল্পী — শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রেসিডেন্সি—ইন্দোর

রেসিডেন্সি-উদ্যান—ইন্দোর

প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই পথেরই বামধারে সরকারী উদ্যান। এখানে মাঝে-মাঝে ব্যাণ্ড বাজে। উদ্যানটি এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। ইহারই খানিক দূরে লালকুটী অবস্থিত। এটী একটি ছোটখাট প্রাসাদ। এখানে সার চন্দাবরকর দেওয়ান হইবার পর বাস করিতেন। ইহার নিকটেই ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত নানকচাঁদের বাসভবন। বর্ত্তমান মহারাজ যখন নাবালক ছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত নানকচাঁদই ইন্দোর রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

ইহার পর কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, খাণ্ডোয়ার উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কুঠি। "মধ্য-ভারত
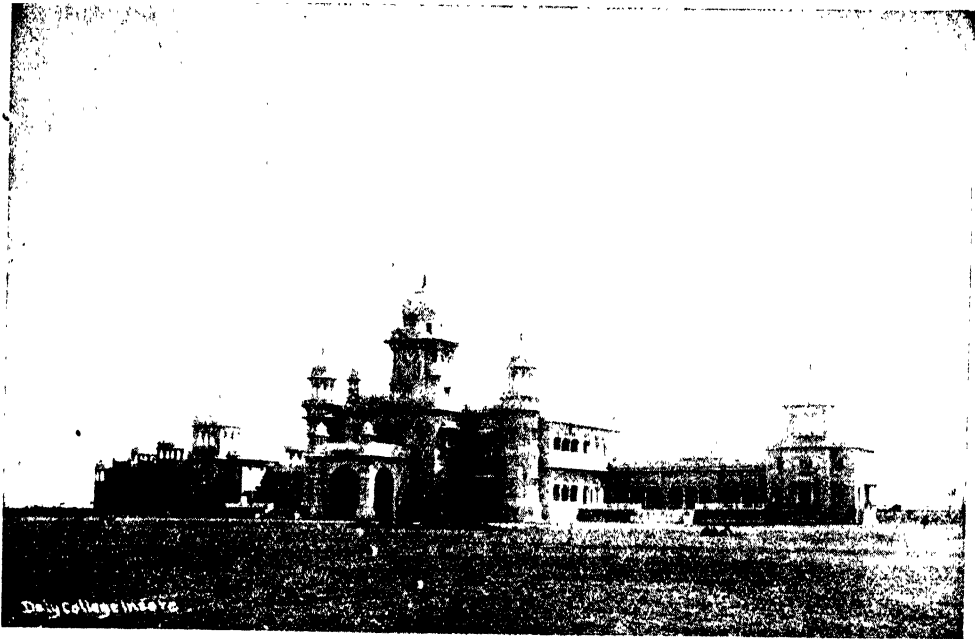
ডেলি কলেজ- ইন্দোর
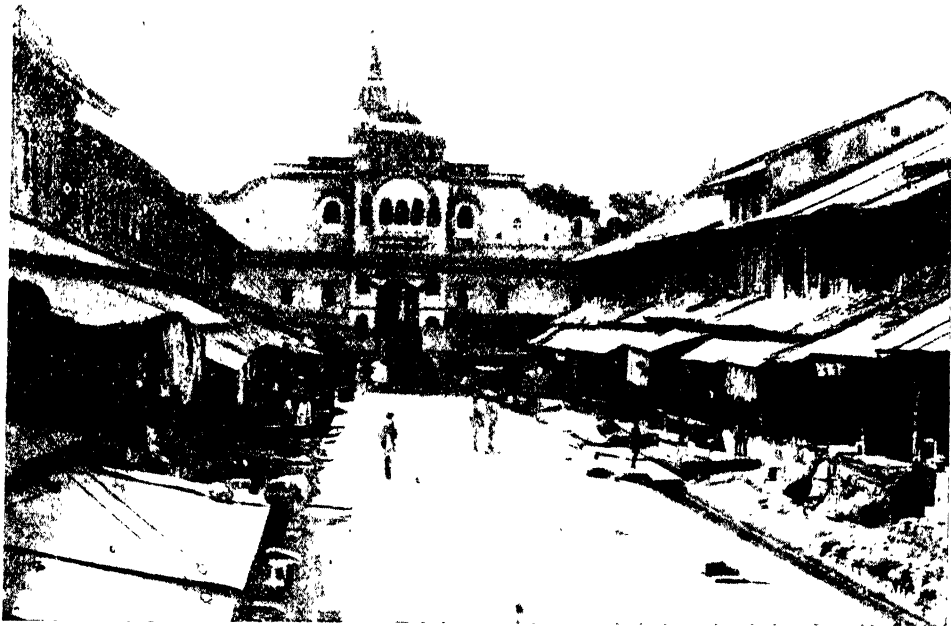
গোপাল মন্দির—উজ্জয়িনী

হিন্দী সাহিত্য-সমিতি" এইখানে অবস্থিত। পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার সরফপ্রসাদ রায় সাহেব ইহার সম্পাদকদ্বয়। স্থানীয় বণিক-প্রধান রায় বাহাদুর হুকুমচাঁদ ইহার সভাপতি। সমিতির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ইঁহারা সমগ্র ভারতে নাগরী-লিপি বিস্তার করিতে চান। বাঙ্গালা-দেশ ব্যতীত উত্তর-ভারতের অন্য সব প্রদেশেই

কালিয়াদহের মহল—উজ্জয়িনী
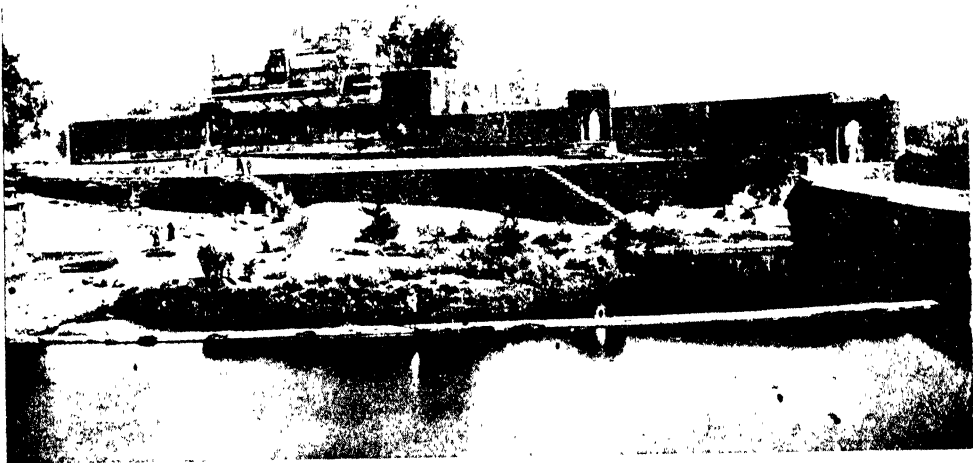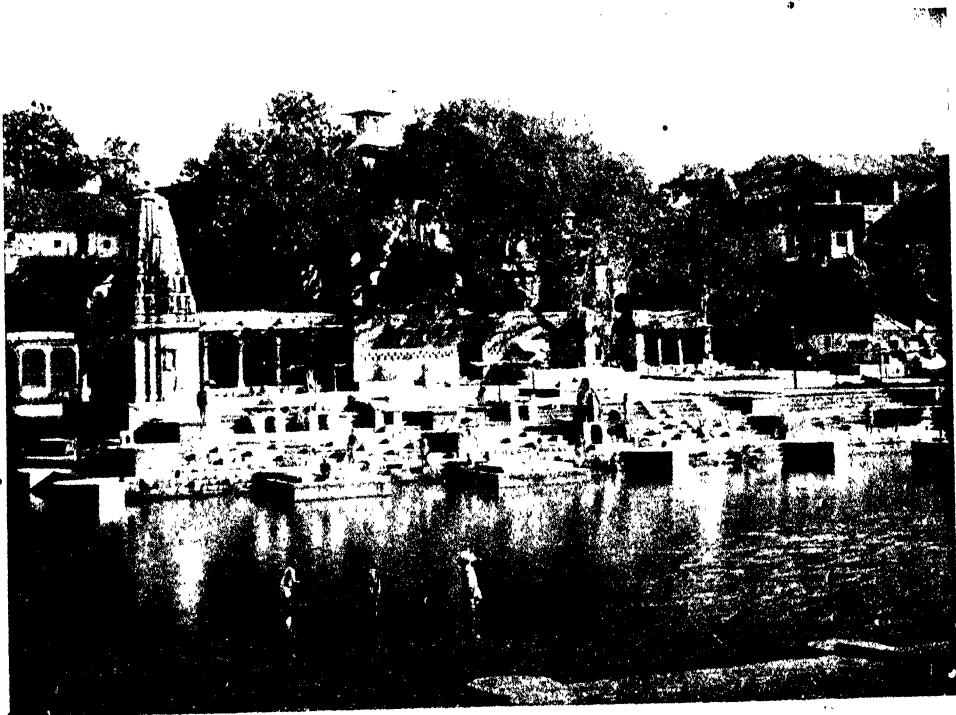
শিপ্রাতটে বাজাবাঈএর মন্দির—উজ্জয়িনী

নাগরী-লিপি প্রচলিত। বাঙ্গালা দেশেও কলিকাতা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় একলিপি-বিস্তার-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহাতে কোন বাঙ্গালীই নাগরী-লিপির পক্ষপাতী বলিয়া ত বোধ হয় না।
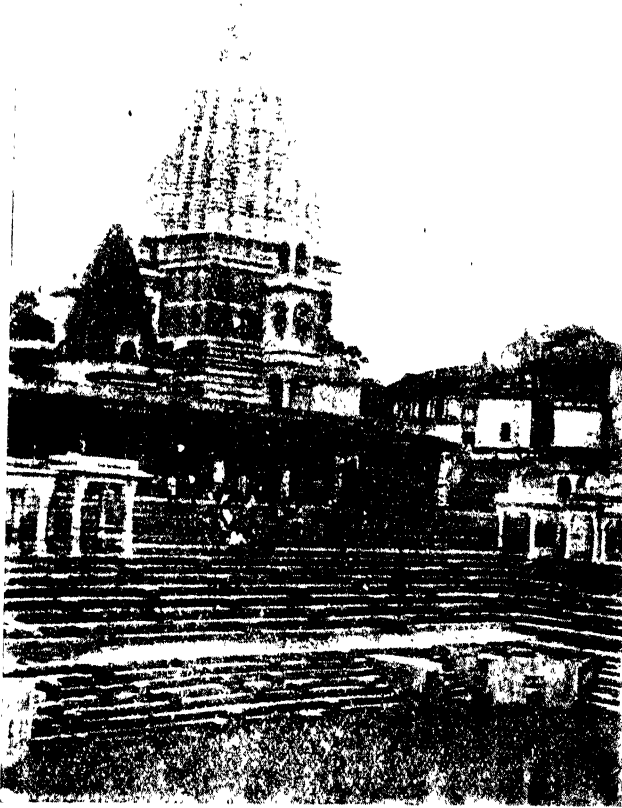
মহাকালের মন্দির—উজ্জয়িনী

যে কয় দিন ইন্দোরে ছিলাম, এই সমিতিই আমার গন্তব্য স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। এখানকার কর্ম্মচারীর সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হওয়ায় সকালে-বৈকালে তথায় যাতায়াত করিতাম। হিন্দী, মারাঠি ও গুজরাটী পুস্তকে কয়েকটী আলমারি সজ্জিত হইরাছে। কয়েকখানা ইংরাজী, হিন্দী ও মারাঠি সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকা টেবিলের উপর সুসজ্জিত থাকে। পুস্তকালয়ের এখনও কিছু হয় নাই বলিলেই হয়। তবে কয়েকজন ধনকুবের ইহার পৃষ্ঠপোষক; এবং সম্পাদকদ্বয়ের অধ্যবসায়ে সমিতিটি কালে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এখান হইতে ১০ মিনিটের পথ অতিক্রম করিলে, বিখ্যাত শেঠ-ভ্রাতৃত্রয়ের আবাস। শেঠ হুকুমচাঁদ, কল্যাণমল ও কস্তুরচাঁদ—কয়জনেই ইংরাজ-সরকার হইতে রায়-বাহাদুর খেতাব পাইয়াছেন। ইঁহারাই সাহিত্য-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ভ্রাতৃত্রয়ের ভিতর হুকুমচাঁদের গৃহটিই সুরম্য। ইঁহারা দিল্লীর বণিক-সম্প্রদায়ভুক্ত।

পুরাতন প্রাসাদটি সহরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহারই উত্তর দিকে আর একটি প্রাসাদ আছে। এইখানে মহারাজ কালে-ভদ্রে থাকেন। সহরের পশ্চিম অংশ 'বড় সরাফা' নামে অভিহিত। এখানে বড়-বড় ব্যবসায়ীর দোকান। অনেকেই 'সাট্টা' জুয়া-খেলা লইয়া ব্যস্ত। বর্ষাকালে জলের খেলা ও অন্যান্য সময়ে তুলার খেলায় অনেকেই কপর্দ্দকহীন হইয়া পড়ে। সরাফার ভিতর জৈনদিগের একটি মন্দির আছে। এই রাস্তার পূর্ব্ব সীমায় গোপাল-মন্দির বিরাজ করিতেছে। সহরের মধ্যে এই বড় সরাফাই ধনী লোকদিগের গতিবিধির প্রধান স্থল। এখানকার মিষ্টান্নের দোকান সহরের ভিতর খুব প্রসিদ্ধ; অধিকাংশই ক্ষীরের সামগ্রী।

এখান হইতে দুই মাইল দূরে লালবাগ প্রাসাদ অবস্থিত। এ স্থানটি অতি নির্জ্জন ও রমণীয়। হোলকার বাহাদুর বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এইখানে থাকেন। মন্মথবাবুর সাহায্যে আমার প্রাসাদ দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। প্রাসাদটি যে খুব বড় তা নয়, তবে বেশ সজ্জিত। পশ্চাৎ দিকে মহারাণার জন্য কয়েকটা গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। দরবার-গৃহ বেশ সজ্জিত। বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে প্রাসাদ। এক পার্শ্বে খান নদী নৌকা-বিহারের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততর হইতেছে। উদ্যানের সম্মুখভাগের রমণীয়তা আরও বর্দ্ধিত হইতেছে। উদ্যানের এক পার্শ্বে মহারাজের পশুশালা। মন্মথবাবু রান্নাগৃহ পর্য্যন্ত আমাকে অতি যত্নের সহিত দেখাইলেন। মহারাজ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন।

প্রথমা স্ত্রীর একটি পুত্র-সন্তান; ইনি কুমার বালাসাহেব নামে পরিচিত। উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমা রাণী বর্ত্তমানেও বিবাহ করায় অনেকেই মহারাজের উপর অসন্তুষ্ট। অনেকে বলেন, সার চন্দাবরকর এই জন্যই দেওয়ান-পদে ইস্তফা দেন। মহারাজের পিতা শিবাজী রাওকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট গদীচ্যুত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাড়োয়া নামক স্থানে নজরবন্দী থাকিতে হইয়াছিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল না। তিনি সম্রাট সাজাহানের ন্যায় সুন্দর-সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। লালবাগ ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রাসাদ স্থানে-স্থানে আছে।

ষ্টেশনের পশ্চিমে শিবাগঞ্জ। এখানকার ব্যবসায়ীরা প্রায় সকলেই বোরা মুসলমান। ইহারা গুজরাটী হিন্দু ছিল; কিন্তু মুসলমানদিগের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহারা হিন্দুদিগের অনেক ছুতমার্গ মানিয়া চলে; মাংস স্পর্শ করে না। ইহাদিগের পরিধানে—চাপকান, পায়জামা; ইহারা পায়ে শুড়-তোলা জুতা ও মাথায় জরির তাজ ব্যবহার করে। তবে সকলেই একখানা উড়ানি বগলে লইয়া পথে বাহির হয়। মুর্গীহাটায় আমরা অনেক বড়-বড় বোরা মুসলমান দেখিতে পাই। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ইহারা হিন্দু আইন মানিয়া চলে।

শিবাগঞ্জ হইতে দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিলে ক্যাম্প অর্থাৎ ছাউনী পাওয়া যায়। ইহাকে রেসিডেন্সি বলে। এখানে সেনানিবাস আছে। মধ্য-ভারতের এজেণ্ট বাহাদুরের ইহাই কর্ম্মস্থল। ইন্দোরের রেসিডেণ্টও এইখানে থাকেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এইখানেই থাকেন। টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট অফিসও এই স্থানে আছে; ষ্টেটের আর স্বতন্ত্র ডাকঘর নাই। রেসিডেন্সিতে এজেণ্ট-বাহাদুর মধ্যে-মধ্যে দরবার করেন; তাহাতে মধ্য-ভারতের সকল রাজা-মহারাজাকে উপস্থিত হইতে হয়। সেই জন্য অনেকেরই রেসিডেন্সির নিকট এক-একখানা বাড়ী আছে। এইরূপে রেসিডেন্সির নিকটবর্ত্তী সুদৃশ্য অট্টালিকাসমূহে সুশোভিত হইয়াছে। রেসিডেন্সি-ভবনটি অনেক দিনের; সিপাহী বিদ্রোহের চিহ্ন ইহার অঙ্গে আছে। রাজনৈতিক মোকদ্দমা প্রথমে রেসিডেণ্টের নিকট শুনানি হয়, তাহার পর এজেণ্ট বাহাদুরের নিকট আপীল হয়; তাহার পর মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নিকট পেশ হয়; শেষ, বিলাতে ভারত-সচিবের নিকট চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। রেসিডেন্সির উদ্যানটি মন্দ নয়। খান নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইংরাজদিগের প্রধান গুণ, তাঁহারা যেখানেই থাকেন, সে স্থানটা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও চিত্তাকর্ষক করিয়া রাখেন। রেসিডেন্সির নিকটে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। উদ্যানের রাস্তাটি অনেকখানি লম্বা। নদীর উপর সুন্দর একটি সেতু আছে।

রেসিডেন্সির আর একটি আকর্ষণ—এখানে মিশনারীদিগের একটি কলেজ আছে; বি-এ অবধি পড়ান হয়। কানাডিয়ান মিশনের উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়ও উল্লেখযোগ্য। বালকদিগের জন্যও আর একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এখানকার হাঁসপাতালটি উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার সরফপ্রসাদ এখানকার একজন চিকিৎসক। এতদ্ব্যতীত হোলকার কলেজ অন্যত্র অবস্থিত। এখানেও বি-এ অবধি পড়ান হয়। সহরের ভিতর হোলকার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ও আছে। সকল কলেজ ও স্কুলই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইহা ছাড়া রাজকুমারদিগের জন্য ডেলি কলেজ (Daly College) নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ সুন্দর ভবন এ অঞ্চলে নাই বলিলেই হয়। ডেলি সাহেব এখানে বড়লাটের এজেণ্ট ছিলেন। মধ্য-ভারতের রাজকুমার ও যুবরাজদিগকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দিবার জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজমীরের রাজকুমার-কলেজও এইরূপ শিক্ষালয়। রাজকুমারদিগের বাসের জন্য স্বতন্ত্র বাটী বা হোষ্টেল আছে; সেগুলি কলেজ-সংলগ্ন।

মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের ভিতর পর্দ্দা নাই; তাহারা ১৬ হাত কাপড়ে কাছা ও কোঁচা দিয়া, জুতা পরিয়া রাস্তায় বেশ নিঃসঙ্কোচে বাহির হয়। সধবা রমণীরা মাথায় কাপড় দেয় না; কিন্তু বিধবারা নগ্ন-পদে থাকে ও ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে। তাহারা ঘোমটা দেয়। সকলেরই অঙ্গে কাঁচুলী থাকে। হিন্দুস্থানী রমণীরা ঘাগরায় দেহ আচ্ছাদিত করে। তাহারা জুতা পায়ে দেয় না; তবে মাথায় কাপড় দেয়। মুসলমান রমণীরা পায়জামা ব্যবহার করে। আমাদের দেশের নব্য-যুবকদিগের মত আগুলফলম্বিত চুড়ীদার পিরাণের মত জামা

ও তদুপরি ওড়না ব্যবহার করে। পায়ে চটী জুতা দেয়। ইহাদের ভিতর আবরুর বিশেষ বন্দোবস্ত।

হিন্দু রমণীরা যখন কুটুম্ব-বাড়ী কোনও তত্ত্ব পাঠান, তখন তাঁহারা নিজেরাও সঙ্গে যান এবং বাদ্যকরেরা ঢাক বাজাইতে-বাজাইতে গান করিয়া থাকে। বর হয় ত বিবাহ করিতে যাইতেছে; তাহার সঙ্গে কেহ নাই। বর ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে, আর বাদ্যকর বাজনা বাজাইতেছে। এখানে সামান্য কারণেই ঢাক বাজিতে থাকে।

গ্রীষ্মকালে সহরে বড় জলকষ্ট হয়। মধ্যে-মধ্যে এক-একটা জলের চৌবাচ্ছা আছে; সেগুলিকে 'নাহার' বলে। এক দিক হইতে হিন্দু ও অপর দিক হইতে মুসলমানেরা জল লয়। কয়েকটি ভাল ইন্দারা আছে, তাহাতেই ভদ্রলোক-দিগের জলাভাব দূর হয়। জলের কল তৈয়ার হইতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম; এত দিনে রাস্তায়-রাস্তায় ও গৃহস্থ-বাটীতে কলের জল সরবরাহ হইতেছে। রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার। সহরের ভিতর প্রায় সকল রাস্তাতেই বৈদ্যুতিক আলোক আছে। আমোদ-প্রমোদেরও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। সহরের ভিতর দুইটি রঙ্গালয় আছে। আমি যে সময়ে ছিলাম, তখন একটি রঙ্গালয়ে গুজরাটী সম্প্রদায় অভিনয় করিতেছিল; তাহাদের সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোক নাই; পুরুষেই স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে বোম্বাই বা অন্যান্য সহরে মহারাষ্ট্রী রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীবর্গ অভিনয় করিয়া থাকে।

মোটর ট্যাক্সি আজকাল প্রাসাদ হইতে ষ্টেশন অবধি যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিতেছে। প্রথম শ্রেণীর টঙ্গাগুলি বেশ সুন্দর, চাকায় রবার দেওয়া। চারজন লোক বেশ স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। এগুলিকে বরোদার টঙ্গা বলে। তবে ছাউনীর টঙ্গাগুলি একটু অন্য ধরণের; পশ্চাৎদিকে কেবল দুই জনের বসিবার স্থান আছে।

ইন্দোর এক্ষণে মধ্যভারতের একটি প্রধান সহর। ইংরাজেরা এখানকার জলবায়ু বড় পছন্দ করেন; তবে আজকাল বৎসরে একবার করিয়া প্লেগ হইতেছে, তাহাতে অনেক ক্ষতি হয়। অহল্যা বাঈ ইন্দোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই মহীয়সী নারীর নাম সমগ্র ভারতে বিদিত। ইহার অতুল কীর্ত্তি প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্টি-গোচর হয়। পূর্ব্বে নর্ম্মদার তীরে মাহেশ্বরে তাঁহার রাজধানী ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, এই মাহেশ্বরী পুরী প্রবীরের পিতা নীলধ্বজের রাজধানী ছিল। যে দিন হইতে অহল্যা বাঈ ইন্দোরের সৌষ্ঠব-বর্দ্ধনে মনোযোগ দিলেন, সেই দিন হইতেই মাহেশ্বর হতশ্রী হইয়াছে। তবে অহল্যা বাঈএর সমাধি-মন্দির ও তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তি-মন্দিরাদি ইহার নাম একে-বারে মুছিয়া ফেলে নাই। এখানকার নিসর্গ-সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। একে নর্ম্মদার সৌন্দর্য্য, তাহার উপর পবিত্র দেব-মন্দির ও নির্জ্জনতা ইহার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। মাহেশ্বর বাড়োয়া হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

উজ্জয়িনী নগর ইন্দোরের অতি নিকটেই অবস্থিত। একদিন একাকীই তথায় যাইব, স্থির করিলাম। বড় সরাফার ডাক্তার অনুকুল বাবু একখানা পরিচয়-পত্র দিলেন। আড়াইটার ট্রেণে যাত্রা করিলাম। ফতেহাবাদে গাড়ী বদল করিয়া পাঁচটার সময় উজ্জয়িনীতে পৌছিলাম। ট্রেণ যখন শিপ্রা নদী অতিক্রম করিতেছিল, তখনই পুরাতন সহরের কিছু-কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। দূর হইতে নূতন প্রাসাদের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। ষ্টেশনে নামিলাম বটে, কিন্তু তথায় পরিচিত কেহই নাই। একজন মাত্র আছেন, যাঁহার সহিত ইন্দোরে এক দিন আলাপ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি গোয়ালিয়র রওনা হইয়াছেন, এইরূপ শুনিয়া-ছিলাম। আমার পরিচিত ভদ্রলোকটির নাম শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ চৌধুরী; ইনি এখানকার এন্‌জিনীয়ার। ভাবিলাম, একবার তাঁহার চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি; কেন না যাঁহার নামে পরিচয়-পত্র ছিল, তাঁহার বাটীর ঠিকানা অনুকুল বাবু বা অন্য কেহই আমাকে বলিতে পারেন নাই। কাজেই দ্বিজেন বাবুর চাকর ভিন্ন আমার গত্যন্তর ছিল না। চাকরকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'বাবুসাহেব ত হ্যায় উপরমে।' আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। এই অপরিচিত সহরে কাহারও সন্ধান পাওয়া দুর্ঘট। মনে করিতেছিলাম, হয় ত বা সরাইয়ে রাত্রি-বাস করিতে হইবে।

উপরে উঠিয়া দেখি, সত্যই দ্বিজেন্দ্র বাবু পোঁটলা-পুঁটলী বাঁধিতেছেন। তিনি সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেণে গোয়ালিয়র যাত্রা করিবেন। আমি তাঁহাকে সে দিনটা থাকিয়া যাইবার

জন্য অনুরোধ করিলাম। এমন সময়ে দ্বিজেন বাবুর ভগিনীপতি রাজকুমার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়াতে, তিনি আমাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

সে দিন দ্বিজেন বাবুর আর যাওয়া হইল না। সন্ধ্যার সময় আমরা কয়জনে একখানা টঙ্গা লইয়া গোপাল-মন্দিরের নিকট বেড়াইয়া আসিলাম। এখানকার টঙ্গাগুলি অতি কদর্য্য; ঘোটক ত পক্ষীরাজবিশেষ। রাস্তাগুলি বড় সরু ও পাথর-দেওয়া। তবে সে উজ্জয়িনী আর নাই। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী মহাকবি কালিদাসের উজ্জয়িনী—এ নয়। কত কথাই মনে পড়িল। উজ্জয়িনীর নাম ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী—সমগ্র ভারতের রাজন্যবর্গ এক দিন ইহার দিকে সগর্ব্বে চাহিয়া থাকিতেন। কল্পনা-হীরার-খনি কালিদাস হইতে মৃচ্ছকটিকে পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষিত হইয়াছে। সে শিপ্রা এখনও উজ্জয়িনীর পদতল ধৌত করিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার সে পূর্ব্ব গৌরব কোথায়? সে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্ন কোথায়?

পুরাতন সহরের চিহ্নমাত্র নাই। ভূমিকম্পে সব উলট-পালট হইয়াছে। একদিন এইখানে অশোক পিতার প্রতি-নিধি হইয়া রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তারপর বিক্রমা-দিত্যের নবরত্ন এই শিপ্রাতট পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। তার পর কালের কত অত্যাচার সহ্য করিয়া এই নগর শেষে মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হয়। তাঁহারা মাণ্ডুতে স্বতন্ত্র নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। হায়! সেই মাণ্ডুর এখন কি দুর্দ্দশা! তার সে সৌভাগ্য এখন কোথায়? তাহার অভেদ্য দুর্গ আজ জঙ্গলাকীর্ণ, হিংস্র শ্বাপদের আবাস হইয়াছে। সম্রাট আকবর উজ্জয়িনীকে পুনরায় দিল্লীর কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। তাঁহার স্মৃতি কালিয়াদহের মহলের সহিত জড়িত। এই মহলটি এক্ষণে গোয়ালিয়র মহারাজের এলাকাভুক্ত। মহারাজ-বাহাদুর প্রাসাদের নূতন ভাবে মেরামত আরম্ভ করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়ে উজ্জয়িনী আবার হিন্দুর রাজধানী হইল। এইবার উজ্জয়িনীর কিছু সৌভাগ্য ফিরিল। সিন্ধে মহারাজারা ১৮১০ খৃঃ পর্য্যন্ত এইখানে রাজত্ব করেন। তার পর দৌলত রাও সিন্ধে গোয়ালিয়র দুর্গে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন; সেই অবধি উজ্জয়িনী অবজ্ঞাত। তথাপি উজ্জয়িনী এখনও মালবের রাজধানী ও গোয়ালিয়র ষ্টেটের ভিতর দ্বিতীয় সহর। সিন্ধে মহারাজা-দিগের কীর্ত্তি এখনও ইহাকে শ্রীহীন হইতে দেয় নাই। রাণী বাজা বাঈএর প্রাসাদ ও শিপ্রাতটে তাঁহার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

গোপাল-মন্দিরের বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য নাই। মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাই সহরের প্রধান রাজপথ। এখানে বোরা মুসলমান কিছু বেশী দেখিলাম বলিয়া বোধ হইল। এই রাস্তার উপরই বাজা বাঈএর প্রাসাদ; অট্টালিকাটি পুরাতন ধরণের। এখানে এখন দপ্তরখানা ও কাছারী হয়। নূতন প্রাসাদ সহর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সহরের দক্ষিণ অংশে জয়সিংহের মান-মন্দির দৃষ্ট হয়। হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাসে উজ্জয়িনীর মানমন্দিরের নাম প্রথিত।

রাত্রিতে দ্বিজেন বাবুর বাসায় পুরী-ভোগের ব্যবস্থা হইল। রাজকুমার বাবু আমাকে ছাড়িলেন না। একখানা টঙ্গা ভাড়া করিয়া রাত্রি ১০টার পর প্রাসাদের দিকে রওনা হইলাম। রাত্রি বড়ই অন্ধকার। আমাদের টঙ্গা মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; মনে হইতেছে, যেন আমরা একটি বৃহৎ জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছি। প্রায় ১ ঘণ্টার পর প্রাসাদের আলো দেখা গেল। সম্মুখের সিংহদ্বার দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম না। সশস্ত্র প্রহরীর মধ্য দিয়া আমরা রাজকুমার বাবুর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া শয়ন করিলাম। কক্ষটি বেশ সজ্জিত। স্প্রীংয়ের খাট, টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আলমারি, ইলেট্রিক আলো ও পাখা সবই বন্দোবস্ত আছে। তাহার সহিত আধুনিক ফ্যাশানের স্নানাগারও সংলগ্ন।

প্রাসাদটি আজকাল রাজ-অতিথিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৎসরের ভিতর কালে-ভদ্রে খোলা হয়। বর্ত্ত-মান গোয়ালিয়র মহারাজের ভ্রাতা অর্থাৎ ভেইয়া সাহেব এখানে দুই দিনের জন্য আসিয়াছেন। ইঁহার নাম প্রিন্স বলবন্ত রাও। ইনিও ইন্দোরের ভেইয়া সাহেবের মত মুসলমানীর গর্ভজাত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় ইঁহার চিকিৎসক; কাজেই ভেইয়া সাহেব যেখানে যান, ইঁহাকেও তথায় যাইতে হয়। সম্প্রতি ইঁহারা সুরাট,

বোম্বাই ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রভাতে উঠিয়া গরম জলে স্নান শেষ করিলাম। রাজকুমার বাবু প্রাসাদের অভ্যন্তর, দরবার হল, অন্দর মহল, রাণীদিগের আবাস, সজ্জাঘর; রান্নাঘর ইত্যাদি সকল তন্নতন্ন করিয়া দেখাইলেন। প্রাসাদটি ছোট হইলেও বেশ সুন্দর কেতায় নির্ম্মিত। চা পান করিলাম। রাজকুমার বাবু বলিয়াছিলেন যে, ভেইয়া সাহেবের মোটর পাওয়া যাইবে; কিন্তু ৯॥০ অবধি অপেক্ষা করা গেল, মোটর আসিল না; তখন পদব্রজেই দ্বিজেন বাবুর বাসাভিমুখে চলিলাম। প্রাসাদটি মাঠের মধ্যে, কাজেই একখানা টঙ্গাও মিলিল না। একটি চাকরকে সঙ্গে লইয়া দ্বিজেন বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। পুরী-ভোগের চূড়ান্ত হইল। রাজকুমার বাবুও আসিলেন। আহার শেষ করিয়া দ্বিজেন বাবুর সহিত একখানা টঙ্গা লইয়া মহাকাল দর্শনে বাহির হইলাম।

মহাকাল একটি মহাতীর্থের মধ্যে গণ্য। মন্দিরটি দেখিবার যোগ্য। অন্যান্য গুম্ফা ইত্যাদি যাহা আছে, সবই আধুনিক। ১৫ মিনিট পরে আমাদের টঙ্গা এক যায়গায় থামিল। সমতল ক্ষেত্র হইতে এ স্থানটা কিছু উচ্চ। দ্বিজেন বাবুর সহিত একটি পাষাণ দ্বার দিয়া কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া একটি প্রকাণ্ড উঠান পাইলাম। সম্মুখেই একটি মন্দির—ইহাই মহাকালের নূতন মন্দির। আর একটি দ্বার দিয়া আরও ৩।৪ হাত নীচে নামিলাম; সম্মুখে একটি পুষ্করিণী—চারিদিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান এবং গৃহশ্রেণী।

পুষ্করিণীর জল একেবারে সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এখনও বর্ষা নামে নাই; আর, এ প্রদেশে বৃষ্টি খুব কমই হয়; তাহার উপর, বহিঃ-প্রদেশ হইতে পুষ্করিণীর ভিতর জল আসিবার কোনও সুযোগ নাই; কাজেই জলের উপর একটা সবুজ সর পড়িয়াছে। এইখানে জুতা রাখিয়া, আমরা পুষ্করিণীতে হাত পা ধুইয়া, মন্দিরের ভিতর যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় একজন পাণ্ডা চীৎকার করিল—"হো, বাঙ্গালী বাবু আয়া।" দুই তিন বার চীৎকার করাতে আমি দ্বিজেন বাবুকে বলিলাম, "ব্যাপার কি?" তিনি বলিলেন, "এখানে একটি বাঙ্গালী সাধু আছেন; তাঁহাকে জানাইতেছে যে বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছে।" শুনিলাম সাধুজি মন্দির-সংলগ্ন উদ্যানে গিয়াছেন।

গোটাকয়েক সিঁড়ি দিয়া আরও ২।৩ হাত নীচে নামিতে হইল। একটি অন্ধকার ঘরের ভিতর মহাকাল বিগ্রহ বিরাজিত। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বৃহৎ প্রদীপ জ্বলিতেছে। পাণ্ডারা ফুল-বিল্বপত্র লইয়া বসিয়া আছে। আমরা কেহই তীর্থ করিতে আসি নাই; কেবলমাত্র পুরাতন মন্দির দেখিতে আসিয়াছি;—কাজেই ক্ষুধার্ত্ত পাণ্ডাদিগের উদর পূরণের কোনও সুবিধা হইল না। একজন বলিতেছে—"এইখানে হাত দাও, আর পয়সা দাও।" আর একজন বলিতেছে—"এই ফুল লও, আর পয়সা দাও।" কিন্তু যখন দেখিল, ইহারা সে রকম বাবু নয়, তখন হতাশ হইয়া বাহিরে আসিল।

শিবলিঙ্গের কোনও পারিপাট্য নাই। শুনিলাম, পুরাতন মন্দিরেই বিগ্রহ-দেব ছিলেন। যখন মুসলমানদিগের অত্যাচার অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে হিন্দুদের মন্দিরাদি চূর্ণীকৃত হইতে থাকে, তখনই মহাকালকে এই অন্ধকূপের ভিতর রাখা হয়। তাই পুরাতন মন্দির এখন শূন্য। নূতন মন্দিরের স্তম্ভগুলি দেখিলেই মনে হয়—জৈন মন্দির। বিশেষ কারুকার্য্য নাই; তবে পুরাতন মন্দিরটি খুব উচ্চ। নূতন মন্দিরে প্রবেশ করিবার এই একমাত্র সুড়ঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনও পথ নাই।

বাহিরে আসিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধ সাধুটি আসিয়াছেন। দ্বিজেন বাবুকে দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা দুইজনেই তাঁহার পদধূলি লইলাম। আমার পরিচয় পাওয়ায় তিনি আরও সুখী হইলেন; তাঁহার অধরে হাসি আর ধরে না। তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল, তিনি মেদিনীপুর কিম্বা উড়িষ্যা দেশবাসী। হিন্দুস্থানী পাণ্ডারা এই সাধুটির খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, এরূপ সরল প্রকৃতির লোক খুব কমই দেখা যায়। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, মস্তকে জটাভার, শ্মশ্রুগুম্ফবর্জ্জিত মুখমণ্ডলে কেবলই হাসির রেখা।

আমার ক্ষীণ দেহ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কুর্ত্তা খোল।" একটি তৈল আনিয়া স্বহস্তে আমার বক্ষে মালিশ করিয়া দিলেন। তাঁহার পরার্থপরতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। দ্বিজেন বাবুকে তৈল প্রদান করিলেন। আমরা

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় লইলাম। তিনি ছাড়িলেন না, আমাদের সঙ্গে টঙ্গা পর্য্যন্ত আসিলেন। একটি পয়সারও প্রত্যাশা করিলেন না। দ্বিজেনবাবু বলিলেন—তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে, ৭।৮ মাইলের ভিতর যে সকল তীর্থস্থান আছে, তাহা ঘুরিয়া বেড়ান। কেবল মাত্র রাত্রে আহার করেন। কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন না। কোথা হইতে ৫৲ টাকা বৃত্তি পান, তাঁহাতেই চলিয়া যায়। তাঁহার আর একটী মহত্ত্ব এই যে, রাত্রে অভুক্ত কেহ যদি মন্দিরে আসে, তবে তাহাকে নিজ আহার্য্য দিয়া স্বয়ং উপবাস করিয়া থাকেন। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

দ্বিজেন বাবুর বাসায় আসিয়া দেখি—দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ৬টার সময় ট্রেণ; কাজেই তখনই আমাকে বিদায় লইতে হইল।

চড়া দরের কড়া কথা *

[অধ্যাপক শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম-এ]

ইউরোপে যুদ্ধ চলিতেছে; ভারতবর্ষের দর চড়িতেছে। তাহাতে চড়া দরের উপর কড়া কথা চলিতেছে। কিন্তু দর বেচারীর কোন অপরাধ আছে কি না, সে কথার কোন বিচার কেহ ত করেন না। সকল দেশেই এমন একদল লোক আছেন—এবং তাঁহারাই বোধ হয় অধিক সংখ্যক—যাঁহারা বিচার করেন না, কিন্তু দণ্ডবিধান করেন। এঁদের বুদ্ধি যতদূর ভোঁতা, কথার খোঁচাটা সেই হিসাবে মর্ম্মান্তিক। এই ধরুন না, দরের কথা। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে ও অন্যান্য কারণে গত দুই বৎসর যাবত দর চড়িয়া যাইতেছে। তাই 'দর' বেচারীর উপর যে অন্যায় উৎপীড়ন চলিতেছে, তাহা কে না জানেন?

শরীরের উত্তাপ ১০৫° বলিয়া দিলে, থার্ম্মোমিটার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজের অর্থ নষ্ট করিবার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু তাহাতে ভাঙ্গা থার্ম্মোমিটার জোড়া না লাগিলেও 'চড়া' উত্তাপ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই। বেরোমিটারের পারদ নীচে পড়িয়া গেলে, তাহাতে ঝড়ের আশঙ্কা বুঝিয়া ঘর শক্ত করাইত হুসিয়ারী; যন্ত্রটিকে ভাঙ্গিয়া 'রাগ' প্রকাশ করা যাইতে পারে—আক্কেল প্রকাশ পায় কি না, আপনারাই বিবেচনা করুন।

দর বেচারী সমাজের মঙ্গলের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই বাঁচিয়াও আছে। দর, দেখুন, অশরীরি—তাহার দেহ নাই। "টাকা"র ভিতর দিয়া সে আত্মপ্রকাশ করে। আবার সে কখন, কি আকারে, কোথায় যে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা নাই। সে "অণু হইতে পরমাণু", আবার বিশাল হইতেও বিশালতর। এ সকল তাহার মানবাতিরিক্ত গুণ—তাহার "ঐশ্বর্য্য"। অপর দিকে তাহার অভিমান নাই—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুতেও তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিবেন। বৃহত্তমের বিরাটত্ব তাহাকে ভীত করিতে পারে না। যেখানে তাহার ডাক পড়ে, সেখানেই সে হাজির। বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মিলনের পুণ্যফলে "দরের" জন্ম। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যখন কসাকসি চলিতে থাকে, তখন তাহার বিরোধ মিটাইয়া দেয়—এই দর। ইহার "বাহন" টাকা। ইহার জন্মস্থান বাজার বলিয়া, ইহাকে কখন-কখন "বাজার দর"ও বলা হয়।

অতি প্রাচীনকালে সমাজের যখন শৈশব অবস্থা, যখন শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি ছিল না, যখন যে পবিত্র হস্ত যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিত, তাহাই সময়ান্তরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিত,—তখন বাজারও ছিল না, বাজার-দরও ছিল না। ক্রমে সমাজের ক্রমবিকাশের বৃদ্ধির ফলে যে দিন শ্রম বা কার্য্যবিভাগ আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে প্রতি কার্য্যই অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা গোলও বাধিয়া বসিল। যে চাষা ধান বুনে, তার হয় ত কাপড় চাই। যে কামার অস্ত্র তৈয়ার করে, সে হাঁড়ি পায় কোথা? চাষা হয় ত ধান মাথায় করিয়া তাঁতির নিকট হাজির হইল। কামার দা কুড়াল লইয়া কুমারের বাড়ী উপস্থিত। এখানে যদি কাজটা হাসিল হইয়া যায়,

* শ্রীহট্ট কাছাড় সাহিত্য সম্মিলনের মৌলবীবাজার অধিবেশনে পঠিত।

তাহা হইলে মন্দ নয়। কিন্তু তাঁতি যদি ধান না চায়, তা' হইলেই ত গোল। তা' হলে সারাদেশ ঘুরিয়া তাহাকে বাহির করিতে হইবে—কোন্ তাঁতি ধান চায়। কিন্তু যে দিন রাজা বা রাজশক্তি, প্রজারক্ষার জন্য "টাকা"র সৃষ্টি করিয়া দিলেন, সে দিন সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হইল। চাষা ধান যাহার নিকট বিক্রয় করিল, সে কামার কি কুমার—তাহাতে এখন আসে যায় না; ধানের টাকায় কাপড় সে অনায়াসেই কিনিতে পায়। সেই দিন হইতে দরের বাহন হইল টাকা। এখন আর আমরা বলি না, এক জোড়া জুতার দাম এক মণ চাউল। আগে দরের বাহন ছিল দ্রব্য,—অর্থাৎ দ্রব্যই ছিল মূল্য; এখন দরের বাহন, (বৈয়াকরণিকের ভাষায় একটি "সর্ব্বনাম") —টাকা।

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যেখানে কসাকসি আরম্ভ হয়, সেখানে ওকালতী করেন—টাকা। ক্রেতা যদি বলেন ১০৲ টাকা, আর বিক্রেতা যদি ১২৲ টাকা বলিয়া গম্ভীর হইয়া থাকেন—তাহা হইলে সে বিরোধের মীমাংসা করিবে কে? —"বাজার দর"। এই বিষয়ে ইহার কথাই শেষ কথা।

বাজারে যদি বিক্রয়ের জন্যে ১০০টি মাছ আসে, এবং ৫০ জন লোক মাত্র ॥০ আনা দরে কিনিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে বিক্রেতাকে দর কমাইয়া দিতে হইবে। হয় ত ।০ চারি আনা দর হইলে কিনিবার লোক হইবে ১৫০ জন। তখন ক্রেতারা কাড়াকাড়ি করিয়া দর বাড়াইয়া দিবে। এমন হইতে পারে ।৴০ ছয় আনা হিসাবে কিনিবার জন্য ১০০ লোকই প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের জন্য ১০০টি মাছই আছে। তখন দর ধর্ম্মতঃ বিচার করিয়া "রায়" প্রকাশ করিবেন, "ছয় আনা"। তাহাতে যে ৫০ জন ক্রেতা ।০ হিসাবে কিনিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল, তাহারা যদি "দর"কে গালি দেয়, অথবা ॥০ আনা হিসাবে বিক্রয় করিতে না পারিয়া যদি কোন অব্যবসায়ী বিক্রেতা দরের উপর দোষারোপ করে, তাহাতে কি উহাদের নিরেট মূর্খতারই পরিচয় পাওয়া যায় না?

মাছ জিনিষটা যদি "রাখিয়া দিবার" মত জিনিষ হইত, তাহা হইলে হয় ত বিক্রেতারা জোট করিয়া ॥০ আনা দরে ৫০টা বিক্রয় করিয়া বাকী ৫০টা ফিরাইয়া লই; এবং ক্রেতাদের মধ্যে যাহাদের আগ্রহ বেশী, তাহারাই ॥০ আনা দরেই ৫০ টা কিনিত; বাকী সকলেই ফিরিয়া যাইত।

এই সোজা কথাটা সওয়াল জবাব করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয় না। অথচ দর যখনই বাড়িয়া যায়, তখনই আপনারা তাহাকেই গালি দিতে আরম্ভ করেন। কেহ-কেহ এমন বদ্‌রাগীও আছেন যে, মাথা ধরিলে বেদনাটাকে রোগ ভাবিয়া তাহারই উপর চটিয়া উঠেন। কিন্তু সে যে স্বাস্থ্যের পাহারাদার, রোগ আসিবার আগেই নিজে আসিয়া বলিয়া দেয় "হুসিয়ার"—তাহাকে যদি কেহ ধন্যবাদ করিবার ভাণ করেন, সে তাহার পৃষ্ঠদেশে পীড়া জন্মাইবার অজুহাত মাত্র। দরেরও সেই দুর্দ্দশা;—তাহার চড়্‌তি-পড়্‌তি যে লোকসমাজের হিতের জন্য, সে দিকে কেহ দৃক্‌পাত করে না। দর চড়িল,—অমনি যত তামাকের আড্ডায়, চায়ের টেবিলে, বিবাহের মজলিসে "দরের" নিন্দা, কুৎসা আরম্ভ হইল। উপকারের কি এই প্রতিদান?

দর জিনিষটার জন্মই হচ্ছে অভাবে। যেখানে যে জিনিষের অভাব নাই, সেখানে তাহার কোন কদরও নাই। সুতরাং সেটাকে কেউ বাজারেও নেয় না; তার বাজার-দরও নাই। বায়ু যদিও প্রাণ-ধারণের জন্যই দরকার; তথাপি তাহা এতই পর্য্যাপ্ত যে, তাহা আর ক্রয়-বিক্রয়ের গণ্ডীতে আসে না। আবার কোন জিনিষ এমন আছে, যাহা কেহ বিক্রয় করিতে চায় না।—এদের সঙ্গেও দরের কোন সম্পর্ক নাই। ক্রয় করা যায় না, এমন জিনিষও আছে, যেমন গায়ের রং। লক্ষপতির নির্ব্বোধ পুত্রকে যদি কেহ বুদ্ধি জিনিষটা পৌছাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার সঞ্চিত ধনরাশির ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিয়াও কৃপণ-হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও উদার হইয়া উঠিত। মুস্কিলটা এইখানে, যে, বুদ্ধি জিনিষটাকে সরকারী চাকুরীয়ার মত আবশ্যক-বোধে বদলি করা যায় না। আমাদের শারীরিক-মানসিক গুণ, দেশের জলবায়ু প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা বদলি হইতে গররাজি। সুতরাং বাজারের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। এদের কোন দর নাই। এদের ব্যবহারের জন্য ভাড়া স্বরূপ মজুরী বা বেতন পাওয়া যায়। সুতরাং বাজার-দরের সঙ্গে তেমন জিনিষেরই সম্পর্ক, যাহা ক্রয়যোগ্য ও ক্রয়লভ্য, যাহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসিলে ক্রয় করা যায়। ক্রয়োপযোগী জিনিষের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা ও

উপকারিতার যেমন তারতম্য আছে, তেমন তাহাদের অভাব, সুলভতার প্রভেদও আছে। লোকে প্রথমে চায় সেই জিনিষটা, যাহা তাহার সর্ব্বাধিক আবশ্যক; যেমন আমাদের চাউল। উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা-ভেদে ক্রেতার "টানের" (Demand) উনিশ-বিশ হয়। অপর দিকে, দ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ ও উৎপাদন করিবার কষ্টের (Difficulty) ও খরচের অনুপাতে তাহার "যোগান" (Supply) বা আমদানীরও কমবেশী হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের খরচ যত বেশী, আমদানী তত কম, দর তত বেশী। দর যদি এত কম হয় যে, খরচও না পোষায়—তাহা হইলে উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে, আমদানী কমিবে; তখন দর আবার বাড়িবে। পুকুরের পানার মত কোন-কোন জিনিষ আছে, যাহা একে ত অপর্য্যাপ্ত—তার পর আবার তাহার দরকার এত সামান্য যে, তাহার মূল্য ত নাই-ই, বরং তাহা খরচের হেতু। ধানের ও পাটের ক্ষেতের আগাছা তুলিয়া ফেলিবার জন্য যথেষ্ট খরচ; এই জন্য কেহ-কেহ বলেন, এদের মূল্য ঋণাত্মক, যেমন ২৲ টাকা। কারণ, ঐ টাকাটা প্রণামী দিয়া তবে রক্ষা।

যে কোনও জিনিষের আমদানি যদি হঠাৎ বাড়িয়া বা কমিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দরও কমিয়া বা বাড়িয়া যাইবে। ধরুন, যেমন কাগজ;—যুদ্ধের ফলে হঠাৎ কাগজের আমদানি কমিয়া গিয়াছে, অথচ ক্রেতাদের টান কমে নাই, তাই দর বাড়িয়া গিয়াছে; এবং একদল ক্রেতা যাহারা কম দামে না পাইলে কাগজ কিনিত না, তাহারা এখন কাগজ কেনা বন্ধ করিয়াছে; এবং অন্য একদল লোক কাগজের ব্যবহার কমাইতে না পারিয়া হিসাব মিল রাখিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পতর-আবশ্যক অন্য জিনিষ ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে।

ইহাতে অন্য জিনিষের টান (Demand) কমিয়া দর কমিবার আশঙ্কা আছে (যদি না ঐ সকল জিনিষের উৎপাদনের বা সংগ্রহের খরচ বাড়িয়া যায়); অন্ততঃ এই সকল দ্রব্যের দর বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা কমিয়া যাইবে।

দর বৃদ্ধি হইবার কারণ দুই প্রকার; (১) টান-বৃদ্ধি (২) উৎপাদনের ব্যয়-বৃদ্ধি হেতু আমদানীর হ্রাস। লোক-সংখ্যার উপর টানের (Demand) পরিমাণ নিভর করে। তবে লোকসংখ্যা মড়ক বা যুদ্ধ ছাড়া হঠাৎ কমিয়া যাইবার, অথবা বর্ষাকালে ভেক-বংশের মত হঠাৎ বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা নাই। ফ্রান্সে লোক-সংখ্যা এক-প্রকার স্থির। আমাদের ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির অনুপাত ১০ বৎসরে শতকরা ৭জন মাত্র। অভ্যাস বা আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তনও অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটে না। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু একটা সমগ্র দেশের আয় হঠাৎ বাড়িয়া যায় না। সুতরাং "টান" হঠাৎ বাড়িবার কথা নাই। তবে ক্রেতার টান ক্রমাগত অল্পাধিক বাড়িতেছে ও কমিতেছে। এটা সকল ব্যবসায়ীই জানেন। ২৫ বৎসর আগে যে বাজারে মিঠাই-য়ের দোকান একখানাও ছিল না, সেখানে এখন কি আর সেই অবস্থা আছে? যে শ্রেণীর লোকের এক সময় গুড়ই একমাত্র "মিষ্টি" ছিল, এখন সন্দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিয়া গিয়াছে। আমাদের আরামের আদর্শটা (Standard of comfort) বাড়িয়া চলিতেছে।

অপর দিকে আমদানীরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে শস্যনাশ হইলে তাহার আমদানী বাড়াইবার একমাত্র উপায়—ভিন্ন স্থান হইতে তাহা সংগ্রহ করা। তাহাতে জাহাজ ও রেলের খরচ আছে। এদিকে ক্রেতার টান কমে না; কারণ, ভাতের খরচ বাড়ান যেমন শক্ত, তেমনি কমানও বিপজ্জনক। ফলে, এমন অবস্থায় দর বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। যে ধান ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তর হইতে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে পৌছিতেছে, তাহাকে কত যানে আরোহণ করিয়া, কত কারবারীর হাত ছুঁইয়া আসিতে হইতেছে; এবং প্রতি পদে তাহার খরচের ঘরে, ভাড়া ও ব্যবসায়ীর লাভ যোগ হইয়া যাইতেছে। এ সমস্ত খরচ দিতে যদি কোন গ্রাম নারাজ হয়, তাহা হইলে সহরের ব্যবসায়ী সেখানে "মাল" পাঠাইতে গররাজি ত হইবেই।

যে সকল জিনিষ হাতে বা কলে তৈয়ার হয়, তাহারও উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইতে পারে। যেমন কাঁচা মালের দরবৃদ্ধি। তুলার ফসল যদি খারাপ হয়, তাহা হইলে কাপড়ের দর বাড়ে। চা-বাগানের কুলীর বা অন্য মজুরের মজুরী যদি বাড়ে, তাহা হইলে তাহাদের পরিশ্রমে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার দরও বাড়িয়া যাইবে। ধার করিয়া অনেক সময়ই কারবার চালাইতে হয়; সুতরাং টাকার সুদ বাড়িলেও খরচ বাড়ে। ব্যবসায়ে যদি ক্ষতি

হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়, তাঁহা হইলে ব্যবসায়ীরা বেশী লাভ না পাইলে ক্ষতিটা পোষাইতে পারে না। যেমন আজকাল সমুদ্রগামী জাহাজের ভাড়া। রেলভাড়া বা জাহাজভাড়া যদি কোন কারণে বাড়িয়া যায়, তাহা হইলেও আমদানীর খরচ বাড়িবে। আসামের যে সকল জিনিষ আমাদের এ অঞ্চলে আসে, আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের সোজা রাস্তা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সে সকল জিনিষ অনেক দূর ঘুরিয়া আসিতেছে। তা'তে অনেক জিনিষের আমদানী বন্ধই হইয়া গিয়াছে; আর যে সকল জিনিষের আমদানি আছে, তাহাদের দর বাড়িয়া গিয়াছে। এই জন্যেই দুর্ভিক্ষ প্রশমনের একটি সহায়—রেলপথ-বিস্তার। আবার কোন ব্যবসায়ে আনুসঙ্গিক জিনিষের (By-products) বিক্রয়ের সঙ্গে মূল জিনিষের দরের ঘনিষ্ঠ যোগ। যেমন তৈলের ব্যবসায়ে খৈল, গুড়ের ব্যবসায়ে চিটা, তূলার ব্যবসায়ে তূলার বীজ। যদি কোন কারণে এই সকল আনুসঙ্গিক জিনিষের দর পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আসল জিনিষটার দর চড়িয়া যাইবে। আমাদের দেশে যদি কাগজের কল বাড়িতে থাকে ও তাহাতে খড়ের *দর বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে ধানের দর কমিতে পারে। আবার ধানের ক্ষেতে পাটের চাষ করা অধিকতর লাভজনক বলিয়া ধানের চাষ স্থানে স্থানে বরং কমিয়াই যাইতেছে। তাতে চাউলের দর চড়িতেছে। চাউল যদি মদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে তাহার রপ্তানী কমিয়া গিয়া দর "পড়িবে"। তূলার বীজের আগে মূল্যই ছিল না, এখন তাহার খুব টান, সুতরাং দরও আছে; তাতে তূলার দর কমিয়াছে। চা-বাগান হওয়ায় এক দিকে যেমন নিকটবর্ত্তী স্থানের খাদ্যাদির দর বাড়িয়াছে, তেমনি গরুর সংখ্যা চা-বাগানে বাড়িয়া গিয়া দুধের দর কমিয়াছে। আনুসঙ্গিক ব্যবসায়ের উপর মূল ব্যবসায়কে নানা ভাবে নির্ভর করিতে হয়। এদেশে যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের চাষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শুধু যে মাছের দর কমিবে, তাহা নয়, পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে। হাঁসের সংখ্যাও সহজেই বাড়িবে। আবার যে সকল জিনিষ-রপ্তানীর সুবিধা বাড়ে, তাহাদের সেই পরিমাণে আমদানী না বাড়িলে দর চড়িয়া যায়। যেমন রেল হওয়ায় আমাদের জেলার মাছ, কমলা প্রভৃতির দর বাড়িয়াছে। রেলওয়ে যেমন ভিন্ন স্থানের জিনিষ আনিয়া দুর্লভ জিনিষের দর কমায়, তেমনি ঘরের জিনিষ দূরে পাঠাইয়া তাহাদের দর বাড়ায়। সকল স্থানে দরকে যথাসম্ভব সমান রাখাই রেল-পথের এক কার্য্য।

একচেটিয়া ব্যবসায় যেখানে আছে, সেখানে খরচ ও দরের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না। ব্যবসায়ী বেশী জিনিষ বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ করিতে চায় না; সে কম মেহনতে বেশী রোজগারের দিকে নজর করে। যেমন বাঙ্গালা দেশের পাটের ব্যবসায়। কোন-কোন স্থলে ব্যক্তি-বিশেষের বা দেশ-বিশেষের একচেটিয়া কারবার না থাকিলেও সমগ্র ব্যবসায়ের একটা বড় অংশ তাহাদের হাতে আছে; সুতরাং তাহারা অনেক সময় জোর করিয়া দর বাড়াইয়া দিতে পারে। সে বৎসর জাপানে কয়েকজন ব্যবসায়ী এত ধান কিনিয়া রাখিয়া দিয়াছিল যে, তাহাতে বাজারে চাউলের অভাব হইয়া দর চড়িয়া যায়, তখন আস্তে আস্তে তাহারা সেই ধান বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। আমেরিকার ষ্ট্যান্‌ডার্ড অয়েল কোম্পানী (Standard Oil Co.) এই কয় মাসে লক্ষ-লক্ষ পিপা কেরোসিন তৈল গুদামজাত করিয়া আমেরিকায় কেরোসিনের দর বাড়াইয়া দিয়াছেন। রেলওয়ে ব্যবসায়টা সর্ব্বদাই একচেটিয়া—তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। রেলওয়ে-কোম্পানী তাহাদের ইচ্ছামত ভাড়া নির্দ্দেশ করিতে পারে। এই জন্য আমাদের দেশেও রেল-ওয়ের জন্য বিশেষ আইন আছে। ইহাদের কার্য্য নিয়মিত করিবার জন্য রেলওয়ে-বোর্ড আছে। অনেক সময় বিক্রেতারা জোট করিয়া জিনিষের দর বাড়াইয়া দেয়। আবার দেখাদেখিও (Sympathetic) কখন কখন দর বাড়ে। ধানের দর-বাড়িলে, অন্য দিকেও দর বাড়াই-বার একটা চেষ্টা থাকে।

এক কথায় বলিতে গেলে স্বাভাবিক (natural) কারণে খরচ বাড়িয়াই হোক্, আর ব্যবসায়ীর জোটেই হউক, ক্রেতার টানের অনুপাতে যে জিনিষের অভাব যত বেশী, তাহার দর তত চড়া।

এই ত গেল "চড়তির" কথা। পড়তিও ত আছে। দুর্ভিক্ষের কালে চাউল ছাড়া অন্য জিনিষের টান কমিয়া যায়। সুতরাং যে সকল ব্যবসায়ে একচেটিয়া কারবার বা জোট (combine) প্রভৃতি নাই, তাহাদের জিনিষের দর

* খড় হইতে কাগজ তৈয়ার করা যাইতে পারে।

পড়িয়া যাইবার কথা। ফলে, যে সব ব্যবসায়ী কম দামে জিনিষ প্রস্তুত করিতে অক্ষম, তাহারা একেবারে "গণেশ উল্টাইয়া" "লালবাতি জ্বালাইতে" বাধ্য হয়। ১৯০৭—৮ অব্দে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী একটা এই প্রকার "দুঃসময়" (Depression) আসিয়া দেখা দেয়। ফলে, বহু ব্যবসায়ী দেউলিয়া হইয়া যায়। কি কৃষি, কি শ্রম-শিল্প, সকল ব্যবসায়েই তিন, সাত, অথবা বার বৎসর পরে-পরে একটা "নাশের" (Crisis) সময় দেখা দেয়। আমাদের অঞ্চলে প্রবাদ আছে, তিন বৎসর ফসলের পর এক বৎসর (কাহার-কাহার মতে তিন বৎসর) অজন্মা হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে। নানা মনীষী ইহার নানা কারণ স্থির করিয়াছেন।

সূর্য্যের গতি হেতুই হউক বা অন্য কারণেই হউক, এক বৎসর ভয়ানক ধননাশের পর আবার দর চড়িতে থাকে। সাধারণতঃ সপ্তম বৎসরে দরটা সর্ব্বাধিক হয়; তাহার পর আবার "পড়িতে" থাকে। আর চারি বৎসরে বহু ব্যবসায়ের ধ্বংস-সাধন করিয়া তবে সে স্রোত ফিরে।

যে সকল কারণ উপস্থিত হইলে দর বাড়ে, তাহার অভাবেই আবার দর কমে। এক কথায় বলিতে গেলে, যে আবশ্যক দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত নয়, অথচ "টানের" অনুপাতে যাহার আমদানী যথেষ্ট, তাহার দরই কম। আমদানীর ব্যয় স্থির থাকিলেও যে দর "পড়িয়া" যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত বিহারের নীলের চাষ। জার্ম্মাণিতে কৃত্রিম নীলের উৎপাদন অল্প ব্যয়সাধ্য হওয়ায়, স্বভাবজ নীলে টান একেবারে পড়িয়া গেল।

ফলতঃ, মোট কথাটাই এই যে, বাজার-দর নির্ভর করে এক দিকে ক্রেতার "টান" ও সেই "টানের" জোরের উপর (Elasticity of demand), অপর দিকে বাজারের আমদানীর উপর। যে জিনিষ চাবিবদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার সঙ্গে দরের সম্পর্ক নাই, সে কথা বলিয়াছি। দরের কার্য্য—বিচার করিয়া ঠিক বলিয়া দেওয়া—কোথায় "টান" "যোগানের" সামঞ্জস্য রহিয়াছে—কি দরে বিক্রয় করিলে বাজারের সব জিনিষ বিক্রয় হইতে পারে। ইহাতে কোন বিক্রেতার "দাঁও" মারিবার আশা যদি বিফল হয়, বা দর যদি কোন ক্রেতার "সামর্থ্যের" বাহিরে যায়, তবে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করা দরের কর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত বিচারই তাহার কার্য্য। এজন্য যদি আপনারা ধর্ম্মরাজ যমের সহিত তাহার তুলনা করেন, তাহা হইলে কোন বিচারক-সম্প্রদায় আপনাদের উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়,—শত্রুকে প্রতি-আক্রমণ (Counter attack) করা। ইহাই আধুনিক রণনীতি। সুতরাং এই আধুনিকতার দিনে সেই নীতিই অবলম্বনীয়। সাফাই ত দেওয়া গেল। এখন আপনাদের কড়া কথার জবাবে চড়া দর যদি মিহি সুর পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেটা যতই বেপছন্দ হোক, আশা করি সহিয়া লইবেন—কেন না অসীম ধৈর্য্যই না কি মহত্ত্বের লক্ষণ।

দর হয় বাড়ে, না হয় কমে—নিশ্চল হইয়া থাকার মত জড়ত্ব তাহার কোষ্ঠীতে আজকাল লেখে না। কারণ, দরের ভীমরতি সে দিনই উপস্থিত হয়, যে দিন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কসাকসি বন্ধ হয়। দর যদি নিস্পন্দ হইয়া যোগাসনে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ক্রেতারা সব মহাজ্ঞানী না হয় পুতুল—যাঁদের পছন্দও নাই, বেপছন্দও নাই; অপর দিকে বিক্রেতাও অর্থকে অনর্থ জানিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। যে দেশের এই অবস্থা দাঁড়ায়, সে দেশের শিল্পের চৈতন্য লোপ পায়। ক্রেতারা বাঁচে বটে, কিন্তু সে রেলের ইঞ্জিনের মত,—একটা প্রাণহীন গতি মাত্র—বাঁচিয়া থাকার একটা বিরাট উপহাস। সুতরাং দর যে দিন বলিয়া দেয়, "আমি জরাগ্রস্ত, চলচ্ছক্তি রহিত," সে দিন ক্রেতা-বিক্রেতাকে সে ইঙ্গিতে বলিয়া দেয়, "তোমরা উভয়েই মরণের পথে চলিয়াছ—সাবধান।" কিন্তু তাহার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিবার আগ্রহ আপনাদের ছিল কি? না আছে?

দর যখন বাড়ে, তখন সে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই হুসিয়ার করিয়া দিতেই আসে। ক্রেতাকে বলিয়া দেয়—"হিসাব করিয়া চল"; বিক্রেতাকে বলে, "পার ত আমদানী বাড়াও—লাভের 'দাঁও' যায়।" কিন্তু এই কথাটা এ দেশে কেহ গ্রাহ্য করিয়াছেন কি? কয় বছর আগে জার্ম্মাণ সরকারের সাহায্যে জার্ম্মাণির বণিকেরা এ দেশে খরচ অপেক্ষাও কম দরে চিনি বেচিতে আরম্ভ করে। তখন ভারত-সরকার জার্ম্মাণির চিনির উপর মাশুল বসাইয়া তাহার দর বাড়াইয়া দেন—উদ্দেশ্য ছিল, এই সুবিধায় ভারতীয় কারবারীগণ মাথা তুলিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু সে

সুযোগ "বৃথা গেল হায় খসিয়া"—মরা গাঙ্গে বাণ আসিল না। এই যুদ্ধের ফলে জাহাজের ভাড়া এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, ভারতে প্রস্তুত জিনিত অনেক কম দরে বিক্রী করা যাইতে পারে। সাধারণ সময়ে জাহাজ ভাড়া অত অল্প থাকে যে, আমাদের দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে যে রেল-খরচ পড়ে, তার চেয়ে অনেক কমে বিদেশ হইতে মাল আসিয়া পৌছিতে পারে। রেল কখনো জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। মধ্যপ্রদেশ হইতে রেল-পথে কলিকাতায় মাল পৌছিতে যে খরচ পড়ে, তার চাইতে কম খরচে ইউরোপ হইতে অনেক মাল আনান যায় বলিয়া, বিদেশী জিনিষই সুলভ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং জাহাজ-ভাড়ার এই চড়তি এক হিসাবে দেশের শিল্প-জাগরণের এক সহায়। কিন্তু চড়া দরের সে ইঙ্গিত শোনে কে? ইউরোপীয় শত্রুরাজ্যের কত শিল্প-দ্রব্য আমাদের বাজার হইতে অদৃশ্য হইতেছে, সুতরাং এদের দর বড় চড়া। এই সুযোগে চেষ্টা করিলে সে সকল শিল্প হয় ত খাড়া করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে যে "দর চড়িল" তাই লইয়াই যত আলোচনা। শিশু-শিল্পের দোষটাই এই যে, সে শিশু—তাহাকে আস্তে-আস্তে বসিতে, দাঁড়াইতে, হাঁটিতে শিখিতে হয়। শিল্প জিনিষটা নিতান্তই অহীরাবণ নয় যে, ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইউরোপের প্রৌঢ়দের সঙ্গে লড়িতে পারে। এই দ্বন্দ্বের ফলে কত শিশু-শিল্পের অকাল-মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা কে না জানেন? এবং সে কথা স্মরণ করিয়া দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে "রায়" প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে আশার লেশমাত্র থাকে কি না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। দশটা কলকারখানা "ফেল" হইয়াছে; সুতরাং আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, এ দেশের জল-বায়ুতে শিল্প জিনিষটা গজায় না। অথচ সত্য কথাটা এই যে, শিল্প নামক বৃহৎ অনুষ্ঠান সফল করিবার জন্য যথেষ্ট "বলি" (sacrifice) আমরা এখনো প্রদান করি নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের যৌথ-কারবারে কত কোটী টাকা নষ্ট হইয়াছিল, তাহার সংবাদ আমরা রাখি না; অথচ আমাদের দেশেই শিল্প নষ্ট হয়, কারখানা বন্ধ হয়—ইহা অনায়াসে গ্রহণ করি। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য কি প্রচেষ্টা হইয়াছে ও চলিতেছে, তাহার সংবাদ লওয়া কি আমরা আবশ্যক মনে করি? আমাদের গরীব দেশের অনুপাতে হয় ত "দণ্ডটা" একেবারে লঘু হয় নাই। তবে এ কথাটাও স্থির যে, নবীন উৎসাহ বক্তৃতায় বীর্য্য প্রদান করিতে পারে—কিন্তু দিনেকের মধ্যে ব্যবসায়ের পরিচালক, বিশেষজ্ঞ বা কারিগর তৈয়ার করিয়া দিতে পারে না। আমাদের শিক্ষা-নবিশেরা কলেজে পড়িয়া বিশেষজ্ঞ হইয়া ফিরিয়াছেন, কিন্তু অধ্যক্ষতা করিবার মত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সময় বা সুযোগ ঘটিয়াছিল কয়জনের? সাময়িক উত্তেজনার বশে উপযুক্ত বৈদেশিকের অভিজ্ঞতাকে আমরা ঘৃণাভরে দূরে রাখিয়া দিয়াছি; অথচ সেই অভাবটাই আমাদের বহু স্থলে 'কাল' হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ছাড়াও ব্যবসায়ে "ব্যবসায়জ্ঞ" একজন অধ্যক্ষের প্রয়োজন—তাহা আমরা প্রতি পদেই ভুলিয়া গিয়াছি। এমন এক দিন ছিল, যখন কারিগরী করিতে পারিলেই ব্যবসায়ে লাভ হইত। বর্ত্তমান বাণিজ্যে, বাজারে "জিনিষ চালানটা" (marketing)ও একটা মস্ত সমস্যা। বহু দেশীয় শিল্প এই কারণে ক্রেতা জুটাইতে না পারিয়া অচিকিৎসিত রোগীর ন্যায় বৃথা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কলকারখানার বিস্তৃতি ও উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে শিল্প-প্রতিষ্ঠার ব্যয়—অর্থাৎ মূলধনও বাড়িতেছে। আমেরিকার চিনি, ইস্পাত ও তৈলের কারবারে—বড়-বড় কারখানা ছোটগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইংলণ্ডে ছোট-ছোট প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সকলের শাখাত্ব প্রাপ্ত হইয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। আমাদের বহু ক্ষুদ্র কারখানা এই একই কারণে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাতে এই মুল্লুকের মাটির দোষটা কোন্ জায়গায়, তাহা ত বুঝা যায় না! পৃথিবীতে যতদিন আইন আদালত থাকিবে, ততদিন কেবল ব্যবসায়ে কেন, সর্ব্ব বিষয়েই জুয়াচোরের ভয় থাকিবে। যে সকল দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সে দেশে কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্য ভিন্ন-এক প্রকার ব্যবসায়ী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ের লাভালাভ বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া, জনসাধারণ এদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই "অংশ" কিনিয়া থাকে। আমাদের দেশে এই প্রকার বিশেষজ্ঞ দালাল সৃষ্টি করা আবশ্যক। "অংশের বাজারে" এই দালাল নামক পুলিশ না থাকায় জুয়াচুরি সহজ হইয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধি মাত্রেই সাধনা-সাপেক্ষ। যাহা তিষ্ঠিতে পারিলে লক্ষ-লক্ষ নরনারীর

"ভাত-কাপড়ের" ব্যবস্থা করিবে, সেই শিল্প-প্রতিষ্ঠাতেই কি শুধু সাধনার আবশ্যকতা নাই? অতীতের কোন অজ্ঞাত তপোবনে ঋষি আজ্ঞা করিয়াছিলেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" যাবৎ অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তাবৎ নিবৃত্ত হইও না। সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সিদ্ধিমাত্রই সাধনা-সাপেক্ষ।

বেহার-চিত্র

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

হেমন্তের সূর্য্য অস্তগত। দূরে কুয়াসার জাল গাছের মাথা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। ক্ষেতের কতক ধান কাটা হইয়াছে, কতক এখনো বাকি। কাটা ক্ষেতের উঞ্ছ সংগ্রহের জন্য গ্রামের দরিদ্র, অনাথেরা তখনও এদিক-ওদিক করিতেছে।

পথের ধারে একবোঝা লেরুয়ার উপর একটি তিন-বছুরে শিশু বসিয়া একখণ্ড রাঙ্গাআলু চুষিয়া নোংরা কোর্ত্তার বুকটা ভিজাইয়া ফেলিয়াছে। ছেলেটির হাত-পা গোল-গাল, রং মেটে-মেটে। তাহার মা কাছেই ক্ষেতের উপর পড়া-ধান কুড়াইতেছে।

একরাশ ধূলা উড়াইয়া, বিকট ক্যাঁচ্-কোঁচ শব্দ করিতে-করিতে একখান গরুর গাড়ী সেই পথ দিয়া চলিতেছে। গাড়ীর উপর চালক বসিয়া মৃদুমন্দ তান ধরিয়াছে। পৈরুর বয়স বত্রিশ হইবে। এ দেশে এ বয়সে অবিবাহিত কেহ থাকে না। পৈরুর ঘরে স্ত্রী ছিল না। সে আর তার বুড়া বাপ ছাড়া তাহাদের সংসারে অপর কেহ নাই। পৈরুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। আবার বিবাহ করিবার ইচ্ছাও খুব; কিন্তু ঘটিয়া উঠিতেছে না।

পৈরুর বাপ শিঙ্গেশ্বর বড় হিসাবি লোক। বহুদিনের নানাবিধ অভিজ্ঞতায় সে পাকিয়া ঝুনো হইয়াছিল। বিবাহের সাতাশ বখেড়া—কি জানি কি হয়! জমা টাকায় হাত না পড়ে! আশী বৎসর বয়সে শিঙ্গেশ্বরের দাঁত ছিল, চক্ষের জ্যোতিঃও কমে নাই; কিন্তু কাণ একেবারে গিয়াছিল। একেই এক-বগ্‌গা লোক,—তাহার উপর কাণে না শুনাতে, তাহাকে বোঝান শক্ত।

গাড়ীখানা থামাইয়া পৈরু ডাকিল, "হে গে তেৎরী, অগ্ ছে?" মাঠের মধ্যে তেৎরী সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কোঁচড়ে এক-কোঁচড় ধানের শীষ। তেৎরী হৃষ্ট-পুষ্ট; বয়স কুড়ি হইবে—যৌবনের সৌন্দর্য্য এখনো অস্তমিত হয় নাই। সে বলিল, "আগ্ তো ছে—তাম্‌কুল নেহি' ছে।" পৈরু তাহার নিজের তামাক-রাখা বাঁশের চোঙাটা হাতে করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তেৎরী পাশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে-করিতে দেখিতে পাইল যে, তাহার লুলু রাঙ্গা আলু খাইয়া জামাটার সামনের দিকটা একদম ভিজাইয়াছে। সে ছুটিয়া গিয়া শিশুকে কোলে করিয়া চুমা খাইয়া আদর করিতে লাগিল। ধূমপান শেষ হইলে পৈরু তেৎরীকে আহ্বান করিল। পৈরুর কোলে ছেলে দিয়া তেৎরী ধূমপান করিল। পৈরু ভিক্ষণার মুখ-চুম্বন করিয়া তাহাকে তাহার মার কোলে ফিরাইয়া দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তেৎরী লেরুয়ার বোঝা মাথায় করিয়া ছেলে কোলে তুলিয়া হেলিতে-দুলিতে গ্রামের দিকে চলিল। পৈরু লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার যৌবন-লাবণ্য দেখিয়া ঊর্দ্ধে চাহিয়া কপালে ডান হাত ঠেকাইয়া বলিল, "নসীব"। তাহার পর বলদ-জোড়া সচকিত হইয়া উঠিল, এবং গাড়ী আবার ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দে চলিতে লাগিল।

পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৈরুর বিবাহের ইচ্ছা সম্প্রতি তেৎরীর উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। বরের ক'নে পছন্দ হইয়াছে, কনেও বর পছন্দ করিয়াছে; তবুও কেন যে প্রজাপতি সন্তুষ্ট হইতেছেন না, তাহা এখানে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই বিবাহের প্রতিবন্ধক এই শিশু ভিক্ষণটা। এটি তেৎরীর প্রথম বিবাহের স্মৃতি। গোয়ালা তেৎরীর ঘর অন্ধকার করিয়া দু-বছর আগে মহাপ্রস্থান করিয়াছে। পিছনে এই স্মৃতিটুকু তাহার পড়িয়া

আছে। ভিক্ষণার ভার পৈরু গ্রহণ করিতে রাজি। সে বলে, ওটা ত বোঝার উপর শাকের আঁটি। কিন্তু বুড়া বাপ অটল—অবুঝ।

২

পৈরু ঘরে ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ক্ষুধার জ্বালায় রাঙ্গা-আলু বর্শিতে পোড়াইয়া খাইতেছে। পৈরুকে দেখিয়া বলিল, "পথে-ঘাটে সাঁঝে-অবেলায় এত কি দেরী করিতে আছে? লে বেটা, দু মুঠো চাল চট্‌পট্ সিদ্ধ করে নে।" পৈরুর মাথা চন্ করিয়া গরম হইয়া উঠিল। সে বাঁ হাতে চুঙ্গি তৈরী করিয়া তাহাতে মুখ লাগাইয়া বাপের কাণের কাছে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি আর রান্না-বান্না—মেয়েদের কাজ করতে পারব না। সমস্ত দিনের হায়রাণির পর যদি এক তিল সুখ না পাই ত' কিসের জন্য এত দুঃখ করি?" শিঙ্গেশ্বরের অভিজ্ঞতা জানিত যে, রাগের সময় প্রতিবাদ করিলে রাগটাকে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। পুত্রের ক্রোধবহ্নি নিবাইবার জন্য সে অচিরে এক কলিকা তামকুল সাজিয়া, তাহাতে দু-একটা নিষ্ফল টান মারিয়া, পুত্র-হস্তে সমর্পণ করিল। পৈরু তামাক খাইয়া দোহর মুড়ি দিয়া লেরুয়ার বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। সে আজ কিছুতেই রাঁধিবে না। বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ আরো কয়েকটা রাঙ্গা-আলু বর্শির আগুনে গুঁজিয়া দিল। ইত্যবসরে সে কোলের উপর নিজের মাথাটি ঝুঁকাইয়া দিয়া মৃদু মৃদু দোল খাইতে লাগিল।

বাহিরে গাভী ও বাছুর দোহনের অপেক্ষা করিতেছিল। দেরী দেখিয়া উভয়েই ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। অবশ্য বৃদ্ধের কাণ পর্য্যন্ত সে শব্দ পৌছিল না। কিছুক্ষণ পরে পৈরু উঠিয়া গাই দুহিল। ঘুরের মধ্যে কয়েকটা ঘুঁটে ফেলিয়া দিয়া দুধের কেঁড়েটা বসাইয়া দিয়া বাপের গায়ে হাত দিল। শিঙ্গেশ্বর মাথা তুলিয়া বলিল, "কি?" পৈরু দুধের ভাঁড়টা দেখাইয়া দিয়া, তাহার মধ্যে যে দুধটুকু ছিল তাহা বাপকে খাইতে ইসারা করিল। বাপ বলিল "আর তুই?" পৈরু মাথা নাড়িল। পৈরু জানিত যে, শিঙ্গেশ্বর দুধ কিছুতেই খাইবে না। সে এত কৃপণ ছিল যে, দুধ খাওয়াটাকে সে বাদশার উপযুক্ত বিলাসিতা মনে করিত। কিন্তু পৈরুর তখন আর রাঁধিবার সময় ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। সে গিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও যদি পেটটা না ভরে, ত' ঘুম হওয়া শক্ত; তাই পৈরু শুইয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। তাহার মনে তেৎরী, তাহার সহজ সুন্দর মাধুরীর সহিত দেখা দিল। মনে হইল যে, তেৎরীকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে। কিন্তু তেৎরীকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ভিক্ষণা যদি তাহার নিজের ছেলেই হইত? বুড়ার এ কি অন্যায় জেদ! না হয় সে পৃথক থাকিবে! বাপের বিষয়ের কোন অংশ সে চায় না। দিন-মজুরি সে করিবে, তেৎরি করিবে,—তাহাতে অনায়াসে দিন-গুজরাণ্ হইবে। দোহরের মুড়ি খুলিয়া সে দেখিল যে, বৃদ্ধ আবার রাঙ্গা-আলু খাইতেছে। সে উঠিয়া, কাছে গিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবু, আমি নিশ্চয় তেৎরীকে নিকা করব।" বৃদ্ধ—"আমার জিন্‌দিগি থাক্‌তে তা' হতে দেব না বেটা।" পৈরু—"আমি তোমার সঙ্গে ফরক্ হয়ে যাব।" বৃদ্ধ—"তা বেশ।" পৈরু কথা না কহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শিঙ্গেশ্বর এক লোটা জল খাইয়া ঢেঁকুর তুলিতে-তুলিতে মাচানের উপর উঠিয়া শুইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার নাসিকা গর্জ্জন করিতে লাগিল। পৈরুর সমস্ত রাত প্রায় অনিদ্রায় কাটিল।

৩

পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া, দুধের ভাঁড় হাতে করিয়া, পৈরু সাঁঝোরি গ্রামের দিকে যাত্রা করিল। পূবের আকাশ লাল হইয়াছে; পৃথিবী কুয়াসায় ঢাকা। উত্তর দিক হইতে ঝির্-ঝির্ করিয়া শীতের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিল; পৈরুর মস্তিষ্কের উত্তেজনা একটু কমিল। পিতার উপর রাগটাও একটু নরম হইল। সে তখন মনে করিল যে, বাপের উপর রাগ করিয়া এ বয়সে তাহাকে ছাড়িয়া গেলে নিশ্চয়ই অন্যায় হইবে। কিন্তু তাহারও একটু সেবা-যত্ন যে চাই। দ্বিধাক্রান্ত হৃদয়ে সে গিয়া গুরুজীর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

গুরুজী ব্রাহ্মণ। আশ-পাশের পাঁচ সাতখানি গ্রামের দেবার্চ্চনার কাজ-কর্ম্ম করেন; বাকি সময়ে চাষার ছেলে-দের বিদ্যাদান করিয়া নিজের অস্ত্রকে শানিত রাখেন। গুরুজী স্বার্থত্যাগী—দেশের লোকের কাছে যথেষ্ট খাতির আছে। তাঁহার কথা ঠেলিতে বড় কেহ সাহস

করে না। তিনি যাহা বলেন, তাহা বেদ এবং শাস্ত্রের নির্য্যাস-মাত্র। তাঁহার কথা না মানিলে শাস্ত্রকে অপমান করা হয়। গুরুজী তখন মহাবীরের পূজার জন্য ফুল তুলিতেছিলেন ; পৈরুকে দেখিয়া বলিলেন, "কিরে বেটা, এত সকালে কি মনে করে ?" পৈরু প্রণাম করিয়া বলিল, "গোড়ে লাগি মহারাজ।" "জীতে রহো বেটা।" পৈরু গিয়া গুরুজীর বারাণ্ডার এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিল। এতটা পথ শীতে আসিয়া তাহার ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। দোহরের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কেবল নাক ও চোখটি বাহির করিয়া রাখিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হাই উঠে, তাই খইনির ডিবেটি বাহির করিয়া হাতে খইনি মলিতে লাগিল। ইত্যবসরে গুরুজী ফুল রাখিয়া আসিলেন। একটি জলচৌকির উপর তাঁহার আসন। খড়ম ছাড়িয়া আসনে বসিয়া কহিলেন, "খবর কি পৈরু মাতো? বাপজী ভাল আছে ত? গাঁয়ের সব কুশল-মঙ্গল ?" পৈরু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জী মহারাজ।" পৈরু অবিলম্বে নিজের কাহিনী গুরুজীর চরণে নিবেদন করিল ; বলিল, তাঁহার কথা বুড়া ঠেলিতে পারিবে না। কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া গুরুজী বলিলেন, "তেৎরী ছাড়া আর কি তোমাদের গাঁয়ে কোন মেয়ে নাই ?" মাটির দিকে চাহিয়া পৈরু বলিল, "সেও আমাকে চায়—আমিও তাকে চাই।—দু'জনের মন বসে গেছে।" গুরু—"বেশ আজ দুপুরে আমি বেলসরে আসব। শিঙ্গেশ্বরা কি আমার বাৎ মানবে ?" পৈরু—"নিশ্চয়, ঠাকুর বাবা।" কেঁড়ের ক্ষীরটা একটা বাটিতে ঢালিয়া দিয়া প্রসন্ন মনে পৈরু ঘরে ফিরিল।

৫

বেলসরে বিবাহের ধুম-ধাম উপস্থিত ; গুরুজীর প্রসাদে পৈরু আজ তেৎরীর পাণিগ্রহণ করিতেছে। বৃদ্ধ শিঙ্গেশ্বর গুরুজীর বাক্য ঠেলিতে পারে নাই। কয়েক দিন শিঙ্গেশ্বর বিষণ্ণ-মুখে, নির্ব্বাক ভাবে সময় কাটাইতেছে। স্ফূর্ত্তি তাহার বড়-একটা ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি তাহার একান্তই অভাব হইয়াছে। বেলসর গ্রামে বিবাহের কাজ সম্পন্ন হইত না। নিকটেই গোঁসাইজি-থানে বর এবং বধূসহ দুইপক্ষ একত্র হইয়া বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অশুভ হয়।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পৈরু কিছু উত্তম "দহি" এবং "চূড়ার" অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল; ফিরিতে বেলা একটা হইল। আসিয়া দেখিল যে শিঙ্গেশ্বর তখনো মাচানের উপর দোহর এবং কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রিত ; পৈরু তাহাকে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। বৃদ্ধ একটা গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া বলিল, সর্ব্বাঙ্গে তাহার ভীষণ 'দরদ' ; সে আজ উঠিতে পারিবে না। পৈরু চটিয়া গিয়া বলিল, "বুড়োর বিল্‌কুল সয়তানি।"

শীতের ছোট বেলা দেখিতে-দেখিতে পড়িয়া আসিতে লাগিল। গোঁসাইজি-থানে যাত্রা করিবার উদ্যোগ প্রায় সম্পূর্ণ। ঢাকের উপর বড়-বড় শকুনের পালক গুঁজিয়া ঢাক-পিঠে ঢাকি আসিয়া ঢাকে 'বাড়ি' দিতেই গ্রামের বালক-বালিকা সেখানে জড় হইল। ঢাকি বৃত্তাকারে বাদ্য-সহযোগে নাচিয়া-নাচিয়া ছেলেদের দলকে খুসী করিয়া তুলিল। এ দিকে মাটির কড়াতে এককড়া কেরোসিন তেল ঢালিয়া তাহার মধ্যে এক রাশ ঘুঁটে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই তৈল-সিক্ত ঘুঁটেগুলি পঙ্কের মধ্যে অচিরে রক্ষিত হইয়া অগ্নি-সংযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। অন্য দিকে টুক্‌রা সালুতে সুসজ্জিত একটি পক্ষীরাজের বংশধর নিমতলায় লেকুয়ার স্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া, মধ্যে-মধ্যে মাটিতে খুর ঘসিয়া হ্রেষারব করিতে লাগিল। এত কল-কোলাহলেও শিঙ্গেশ্বর তাহার শয্যা হইতে মাথা তুলিল না। অগত্যা তাহাকে পিছনে ফেলিয়াই পৈরু বিজয়-গর্ব্বে অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া স্ত্রীরত্ন লাভ করিতে বাহির হইয়া পড়িল। গোঁসাইজি ও গুরুজীর কল্যাণে 'চুমানার' কাজ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর ভোজ সুরু হইল। সারি-সারি শালপাত পড়িয়া গেল ; এবং তাহার উপর পর্ব্বত-প্রমাণ 'চূড়া' দেওয়া হইল। তাহার উপর হইতে বেগবতী নদীর মত 'দহি' নিম্ন ভূভাগ সরস করিয়া ছুটিয়া চলিল। এবং প্রতিমা সাজাইয়া ঘামতেল দেওয়ার মত এক খাবলা করিয়া শর্করা সেই স্তূপের উপর দেওয়া হইল। আহার সুরু করিবার আর দেরী কি ?

এমন সময়ে অদূরে আলো এবং ছায়ার মধ্যে দেখা গেল, একজন লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া, লাঠির উপর ভর দিয়া

ছুটিয়া আসিতেছে। একটা হরিধ্বনি উঠিল, "বুড়্‌ঢা ত আ গেয়া"। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে শিঙ্গেশ্বর আসিয়া, একখানা পাতের সাম্‌নে বসিয়া পড়িয়া মুখে খানিকটা চিঁড়ে দই পুরিয়া দিল। নিমন্ত্রিতেরা পরস্পর গা-টেপাটিপি করিয়া হাসা-হাসি করিতে লাগিল। রসিক বনখণ্ডি বৃদ্ধের কাণের কাছে মুখ দিয়া বলিল, "বুড়ো, সবুর সইল না?" শিঙ্গেশ্বরের তখন কথার জবাব দিবার ফুরসৎ ছিল না।

৫

পৈরু তেৎরীকে পাইয়া সুখী হইল। বাইরের যা-কিছু কাজ সে নির্ব্বাহ করিত। ঘরে তেৎরী নিখুঁত করিয়া সংসার চালাইতে লাগিল। বৃদ্ধ আপনার আহার ছাড়া আর সব বিষয়ে গভীর ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিল। সকালে উঠিয়া উঠানের কৎবেল গাছের নীচে তালের চাটাই পাতিয়া শুইয়া রোদ পোহাইত। ভাত তৈরী করিয়া পুত্রবধূ সেইখানেই এক থাল দিয়া আসিত। বৃদ্ধ এক নিঃশ্বাসে তাহা খাইয়া চুপ করিয়া থালের পাশে বসিয়া থাকিত। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত না; আবার ভাত দিলে খাইয়া ফেলিত। এক-একদিন ভিক্ষণা তাহার সহিত খাইবার জন্য জেদ ধরিত। বৃদ্ধ তখন রোষ-কষায়িত নেত্রে বালকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাতের এবং মুখের কাজ দ্বিগুণ জোরে সারিত। বালক অত্যন্ত কান্না-কাটি করিলে উঠিয়া পড়িয়া একটা কঞ্চি দিয়া বেদম ঠেঙাইয়া দিত।

গরুর যে টুকু দুধ হইত, তাহা দিনে বিক্রয় হইত, এবং রাত্রের দুধ দই-পাতা থাকিত,—হাটে তাহা দু-এক পয়সায় বিক্রী হইত। প্রথম-প্রথম এই রাত্রের দুধটুকু ভিক্ষণা পাইতে লাগিল; কিন্তু যে দিন বৃদ্ধ জানিল যে ভিক্ষণা তাহা খায়, সেই দিন হইতে সেই দুধটুকু নিজেই পান করিয়া ফেলিত। সে তেৎরীর সহিত এক দিনের জন্যও কথা কহে নাই; এবং বিবাহের পর হইতে পৈরুর সহিতও কথা কহিত না, বিরক্ত সকলের উপরেই হইয়াছিল; কিন্তু এই নিরীহ অনাথ বালকটী তাহার বিষম বিষনেত্রে পড়িয়াছিল। কেবল তাহার জননীর অসীম স্নেহ এবং সতর্কতা তাহাকে কবচের মত রক্ষা করিত। সে-বছর গাঁয়ে ধান ভাল হইয়াছিল; খামার হইতে কৃষকেরা তাহা ঘরে তুলিবার সময় দেখিল যে তাহা আশাতীত বেশী। গ্রামে নূতন বিবাহ হইলে এ দেশের চাষারা ধানের ফলনের অনুপাতে কনের 'পয়' নির্দ্দেশ করে।

শীত কাটিয়া গিয়া বসন্তের হাওয়া বহিতে লাগিল। ক্ষেতের মধ্যে শিয়ালকাঁটা-ফুলগুলি বিস্ফারিত চক্ষে বসন্তের লীলা দেখিতে লাগিল। আমগাছ মুকুলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে এক-আধটা কোকিলের সমাগম যে না হইল, তা নয়। কিছু বেশী লাভের আশায় এবার পৈরু আলুর চাষ কিছু বেশী করিয়া করিয়াছিল। তাহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া সে পীড়িত হইয়া পড়িল। দশ বার দিন গেল, কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। তেৎরী চিন্তিত হইয়া পড়িল। প্রথম-প্রথম পৈরু উঠিতে-বসিতে এবং কিছু-কিছু খাইতেও পারিত। ক্রমে সে অচৈতন্য হইয়া প্রলাপ বকিতে লাগিল। অজ্ঞান অবস্থায় সে যে সকল কথা বলিত, তাহা অপ্রযুক্ত হইলেও একেবারে অর্থহীন ছিল না। যেন কি একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে—দেবতা তাহারই শাস্তি দিবার জন্য উদ্যত। সে অবিরত মার্জ্জনা চাহিত। তের দিনের দিন শিঙ্গেশ্বর আসিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় হাত দেওয়াতে পৈরু চোখ চাহিল। আস্তে-আস্তে হাত দুটি তুলিয়া সে বৃদ্ধের পায়ের উপর রাখিয়া ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ যখন উঠিয়া মাচানের উপর বসিল, তখন পৈরুর দেহকে মৃত্যু তাহার কঠিন আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছে।

৬

মানুষ মরে, কিন্তু সংসারের শেষ হয় না। শিঙ্গেশ্বরের সংসার চলিল; কিন্তু বড় দুঃখে-কষ্টে। বৃদ্ধ রোজ মাচান হইতে যেন উঠিতেই পারে না; অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ভিন্ন প্রথম-প্রথম সে নীচেই নামিত না। বৃদ্ধের সেবা, সংসার দেখা-শুনা, ঘর-কন্নার কাজ—তেৎরীর পক্ষে ক্রমেই অসামাল হইয়া পড়িল। কিন্তু উপায় কি? সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া তেৎরীর শান্তি ছিল না—রাত্রে দুর্ভাবনায় তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইত না। গ্রীষ্ম কাটিয়া বর্ষা আসিয়া পড়িল—মাঠের কাজ কে করে? বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে আর একদিকে মুখ ফিরায়; কথা সে কহিবে না। সে-দিন সকালে ইঁদারায় অত্যন্ত ভিড় ছিল। জল লইয়া ফিরিতে তেৎরীর অনেক দেরি হইয়া গেল। ছেলের জন্য ভয়ে তাহার বুক কাঠ হইয়া গিয়াছিল! যখন

সে জল আনিতে আসিতেছিল, বৃদ্ধ শ্বশুর তখনও মাচানের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিল। এখন দ্রুতপদে চলিতে-চলিতে সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, ছেলেটার ক্ষুধার্ত্ত চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া বৃদ্ধ নীচে নামিয়া নিরিবিলি পাইয়া তাহাকে মারিয়া-মারিয়া আধমারা করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাড়ী ঢুকিয়া ভিক্ষণার গোঙানির পরিবর্ত্তে তাহার কল-হাস্যটাই তাহার কাণে গেল। সে একেবারে অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখিল, ছেলেটা হৃষ্টচিত্তে আঙিনার উপর খেলা করিতেছে এবং বৃদ্ধ শিঙ্গেশ্বর কৎবেল-তলায় চাটাই পাতিয়া বসিয়া আছে। রাত্রির যে দুধটুকু কেঁড়েয় ছিল, ইতিমধ্যে ঘুঁটের আগুনে তাহাকে গরম করা হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ তখনও বর্শির উপর কটোরায় অবশিষ্ট ছিল; এবং বাকিটুকুর সুস্পষ্ট চিহ্ন ভিক্ষণারই ঠোঁটে-মুখে শুকাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে-দিনের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম দুঃখ-ধান্দা তেৎরীর কাছে যেমন হাওয়ার মত হাল্কা হইয়া গেল। কিন্তু মাঠের কাজ কে করে? চাষ-আবাদের সময় যে বহিয়া যাইতে লাগিল! তেৎরীর নিকট-সম্পর্কের কেহই ছিল না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে, আর একটা বিবাহ করা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। একদিন সকালে সে রাঁধিয়া-বাড়িয়া বৃদ্ধকে বলিল, সে দূর গ্রামে তাহার মাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে। হাঁড়ির মধ্যে রাত্রের জন্য রুটি রহিল। বৃদ্ধ না হাঁ কিছুই উত্তর দিল না। তেৎরী ভিক্ষণাকে লইয়া বেলা দুইটার সময় তাহার গ্রাম-সম্পর্কের এক মাসীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সুখ-দুঃখের সব কথা বলিয়া শেষকালে লজ্জার মাথা খাইয়া অন্য বিবাহের কথা বলিল। সেই মাসীর একটি ভাই গলগ্রহ হইয়া তাঁহার স্কন্ধেই ছিল। মাসী সেইটিকেই পাত্র স্থির করিয়া তেৎরীর সহিত পাঠাইয়া দিয়া নিজের সংসার হাল্কা করিলেন। এই শুভ-সংবাদ গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুতের আলোর মত রটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে বেল্‌সরে সংবাদ আসিল যে, তেৎরী পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া আসিতেছে। এমন খোস খবর বৃদ্ধকে শুনাইবার কাহার না ইচ্ছা হয়?

বৃদ্ধ শুনিল যে, তাহার পুত্রবধূ অন্য পতি গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সে কথা কহিল না। ইতিপূর্ব্বে সে রাঙা-আলু পুড়াইতেছিল—তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তেৎরী তাহার মাসীর ভাইকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী পৌছিল। ভীক্ষণা মঙ্গরুর কোলে ছিল। বৃদ্ধ তাহাদের দেখিয়াই শুইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধিয়া তেৎরী শিঙ্গেশ্বরকে দিল। দিনে খাওয়া হয় নাই, কিন্তু আজ সে ভাতের থালাটার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না। নীচে ভিক্ষণা ও মঙ্গরু খাইতে-ছিল। তীব্র কটাক্ষে বৃদ্ধ সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে, ঘরের ভিতর অত্যন্ত গরম,—বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে লাঠি হাতে বাহিরে চলিয়া গেল। মঙ্গরু পথশ্রমে পরিশ্রান্ত ছিল—সে নীচের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

বাসন মাজিয়া, হাঁড়ি তুলিয়া তেৎরী ঘরে আসিয়া দেখিল, ভিক্ষণার গলায় কি-একটা চক্‌চক্ করিতেছে। ঝুঁকিয়া ঠাহর করিয়া দেখিল, একটা সোনার হাঁসুলি! তখনো শিঙ্গেশ্বর ফেরে নাই। তেৎরী উঠানে বাহির হইয়া চারিদিক খুঁজিল—কোথাও সে নাই।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১৮)

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মধুসূদন একটি মকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়ায় গমন করেন। সেখানেও তাঁহার স্বভাবসুলভ কবিতানুশীলনের বিরাম ছিল না। পুরুলিয়ায় অবস্থান-কালে একদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মধুসূদন ডাক্-বাঙ্গালার বারান্দায় পাদচারণা করিতেছেন, এমন সময় অতি দূরে গগন-গাত্রে পরেশনাথ পর্ব্বতের অস্পষ্ট ছায়া

অবলোকন করিয়া তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি তৎক্ষণাৎ রচনা করেন ;—

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে ঊর্দ্ধশিরঃ তোমার গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি ;
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ মূরতি ?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে ?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজবীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার ? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে,
সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্যশিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে !
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনীরে,
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত-আশে
ইন্দ্রকীল নীলচূড়ে দেব-ধূর্জটীরে।

পুরুলিয়ার খ্রীষ্টিয়-সম্প্রদায় মধুসূদনকে তত্রত্য মিশন-হাউসে অভ্যর্থনা করেন। মহাকবি তাঁহাদের অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া স্থানীয় খ্রীষ্টিয়-ধর্ম্মমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া একটি কবিতা উপহার দেন। কবিতাটি সেই সময়ে 'জ্যোতিরিঙ্গণ' অথবা 'বঙ্গমিহির' নামক খ্রীষ্টিয় মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে রেভারেণ্ড সূর্য্যকুমার ঘোষ 'অবকাশ-রঞ্জনে' উহা উদ্ধৃত করেন। আমরা মধুসূদনের রচিত খ্রীষ্টিয় বাঙ্গালা কবিতা এই প্রথম প্রকটিত করিলাম ;—

পুরুলিয়া মণ্ডলির প্রতি

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল শস্য তথা কখন কি ফলে ?
কিন্তু কত মহানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে ! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে !
শ্রীভ্রষ্ট সরসী সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;
এবে রাশি-রাশি পদ্ম ফুটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে !
প্রভুর কি অনুগ্রহ ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে ?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে !
উজ্জ্বলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে ;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি।

উপরিউক্ত কবিতাটি ভিন্ন মধুসূদনের আরও একটি খ্রীষ্টিয় কবিতা 'খ্রীষ্টিয়-বান্ধব' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

পঞ্চকোটের মহারাজা স্বর্গীয় নীলমণি সিংহ বাহাদুর মধুসূদনের দুর্লভ গুণাবলীর বিষয় পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন পুরুলিয়াতে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, মহারাজা, মধুসূদনকে পঞ্চকোটে লইয়া যাইবার জন্য লোকলস্কর, হস্তী, অশ্ব, পাল্‌কী প্রভৃতি পুরুলিয়াতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজের লোকজন পুরুলিয়ায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তখন মধুসূদনকে দেখিবার জন্য মহারাজের আগ্রহ এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহাকে কলিকাতা হইতে আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে মহারাজা তাঁহাকে রাজ্যের ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা হইতে পঞ্চকোটে আনয়ন করিলেন। মধুসূদন তখন ভগ্নস্বাস্থ্য ; তদুপরি উত্তমর্ণদিগের যেরূপ ব্যবহার, তাহাতে কলিকাতায় মাসিক পাঁচহাজার টাকা উপার্জ্জন করিলেও তাঁহার নিষ্কৃতি ছিল না। কাযেই তিনি মহারাজের প্রদত্ত পদটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তখন মধুসূদনের পার্থিব লীলা-সংবরণে আর বড় বিলম্ব নাই।

পঞ্চকোটে উপস্থিত হইয়া মধুসূদন রাজ্যের অবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল দেখিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই প্রায় দায়িত্বজ্ঞানশূন্য। উৎকোচ-প্রবাহ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে! কেহ কাহারও আজ্ঞা মানিয়া চলে না, সকলেই স্ব-স্ব প্রধান! রাজ্যের অধীশ্বর যিনি, তিনি পারিষদ-দলের মন্ত্রণায় পরিচালিত। তন্মধ্যে এক ক্ষৌরকার মহারাজের উপর এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যে, রাজার কর্ণকুহরে তাহার মুখ-নিঃসৃত একটি ফুস্‌ফুসই রাজ্যের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর ভাগ্য-বিপর্য্যয় করিতে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত।

স্বাধীনচেতা মধুসূদন এই সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপনের নিমিত্ত অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিলেন। তিনি উৎকোচ-প্রবাহের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে কর্ম্মচারী-মহলে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তাহারা সকলেই বিষম চিন্তিত হইয়া, কি উপায়ে মধুসূদনের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সেই ধূর্ত্ত নাপিতের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পঞ্চকোটে মধুসূদন প্রায় ৮ মাস কাল অবস্থান করেন। সেই শৈলকাননকুন্তলা ছোটনাগপুরের রম্যপ্রদেশ তাঁহার কবিচিত্তের উপযোগী হইলেও, উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে তিনি প্রবাসবাস বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করিয়াছিলেন! পরিবারবর্গ সঙ্গে ছিলেন না, মধুসূদন একাকীই সেই মৌলমধুদ্রুমদল-সমাচ্ছন্ন বিহঙ্গ-কূজিত অরণ্য-প্রদেশে, তাঁহার বিরহ-বিধুর প্রবাসবাস যাপন করিতেন। কিন্তু চিরপ্রফুল্ল কবিপ্রাণ কখনই আসন্ন হইবার নহে। তিনি রাজকার্য্যের অবসরে তাঁহার প্রকৃতি-সুলভ কবিতা-চর্চ্চা, অধ্যয়ন, এবং হাস্য-পরিহাসে কালক্ষেপণ করিতেন। অবকাশ সময়ে শীধু-পানে প্রফুল্ল হইতেন। আমরা শুনিয়াছি, তত্রত্য কোন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক তাঁহার নিমিত্ত শাস্ত্রানুযায়ী মৃতসঞ্জীবনী সুরা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন উহা স্পর্শ করেন নাই। তিনি তদ্দেশীয় সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতির আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীত, পার্ব্বণ, উৎসব প্রভৃতি দেখিয়া পুলকিত হইতেন ও তাহাদিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতেন।

পঞ্চকোট-শৈলস্থিত মন্দির, মঠ, গড়, প্রাসাদ, পরিখা প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। তিনি ঐ সকল প্রাচীন পুণ্যকীর্ত্তির সংস্কার-কল্পে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবিধ বাধায় তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই।

মধুসূদনের পঞ্চকোটের কার্য্য পরিত্যাগ সম্বন্ধে নানাস্থানে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে একটি বিশেষ প্রচলিত বলিয়া আমরা নিম্নে উল্লেখ করিলাম;—

এরূপ কথিত আছে যে, মধুসূদন যখন রাজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তখন একখানি সৌগন্ধযুক্ত রুমালে মুখ ঢাকিয়া রাখিতেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি ইহা করিতেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, তিনি অতিশয় মদ্যপান করিতেন,—রাজা যাহাতে সুরাঘ্রাণ না পান, সেই জন্য তিনি মুখ ঢাকিয়া কথা কহিতেন।

এক দিন রাজা তাঁহার কোন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের যে নূতন ম্যানেজার সাহেব আসিয়াছেন, তিনি কেমন লোক? তাঁহার কাজকর্ম্ম কিরূপ?" উত্তরে পূর্ব্বোক্ত ধূর্ত্ত ক্ষৌরকারের শিক্ষামত কর্ম্মচারী বলিলেন, "মহারাজ, এরূপ উপযুক্ত ম্যানেজার পঞ্চকোটে পূর্ব্বে কখনও আসেন নাই; ইনি যেরূপ কার্য্যদক্ষ তেমনিই ভদ্রলোক। তবে ইনি একটি অন্যায় কার্য্য করেন।" রাজা বিষম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অন্যায় শীঘ্র বল।" উত্তরে কর্ম্মচারী বলিলেন, "মহারাজ, আপনার যে রাজগাত্রে আমরা স্বর্গের পারিজাতের সৌরভ পাইয়া থাকি,—আর ইনি বলেন কি না, সেই সৌরভিত গাত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত!" এই কথায় চপলচিত্ত রাজা বিচলিত হইয়া উঠিলেন; উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা ইহার প্রমাণ দিতে পার?' উত্তরে সকলে বলিল, "হাঁ, মহারাজ, অবশ্য পারিব; এবার যখন তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তখন আমরা আপনাকে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিব।" পরে এক দিন মধুসূদন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, রুমালে মুখ ঢাকিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, সেই সময়ে রাজার পশ্চাৎ-ভাগ হইতে সেই ধূর্ত্ত ক্ষৌরকার জনান্তিকে অতি ধীরে-ধীরে রাজাকে বলিল, "মহারাজ, ঐ দেখুন, আপনার পারিজাত-বাসিত গাত্র দুর্গন্ধময় ভাবিয়া, ম্যানেজার সাহেব খবরদার রুমালে মুখ ঢাকিয়া কথা কহিতেছেন!" ঐ কথা সত্য বলিয়া রাজার বিশ্বাস হইল; তিনি সেই দিন হইতেই মধুসূদনের প্রতি বীতস্পৃহ হইলেন। প্রকাশ্যে তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, কার্য্যতঃ বড় ভাল ব্যবহার করিলেন না। মধুসূদনের ১৬০০৲ টাকার অধিক বেতন বাকী পড়িয়াছিল, রাজা তাহার হিসাব-নিকাশ করিলেন না। মধুসূদন বেগতিক বুঝিয়া, আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুলিয়ায় চলিয়া আসিলেন। পঞ্চকোট পরিত্যাগের সময় তাঁহাকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি যে,

মধুসূদন যাহাতে পাল্‌কী বেহারা কুলী বেগারি না পান, এরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন সেই রাজবংশীয় কোন সহৃদয় বন্ধুর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে পুরুলিয়ায় পৌঁছিয়াছিলেন।

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মধুসূদনের পঞ্চকোটের কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"He (Michael Madhusudan) said that after he was for a few days with the Raja, the idea struck him, that he could be happily compared to a street-hydrant of the Calcutta Water Works. Anybody who chose had only to pull it by the ear and then drink his fill! Mr. Datta was obliged to give up the appointment after a few months' service. He found it intolerable and quite at the mercy of the Raja's barber and other menials, a whispered hint from whom was enough to mar the fortunes even of his high officials. Mr. Datta began to grow worse after he left the Raja's service.

Reminiscences of Michael Madhu Sudan Datta.
—Raja Peary Mohan Mookerjee.

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা মধুসূদনের পঞ্চকোট-প্রবাসের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে পারিলাম না। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি যে, কাশী কবিরাজ নামক তত্রত্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত ছিলেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়াও কবিরাজ মহাশয়ের বর্ত্তমান অবস্থিতি-স্থান অবগত হইতে পারি নাই। আমরা শুনিয়াছি, যদিও মধুসূদন ৭৮ মাসের অধিক সে প্রদেশে অবস্থান করেন নাই, তত্রাচ তাঁহার সেই স্বল্পকালস্থায়ী প্রবাস-কাহিনী বিবিধ কৌতুকাবহ ঘটনা-সমূহে পরিপূর্ণ। কিন্তু আপাততঃ সে কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় নাই।

পঞ্চকোটাধিপতির বিরাগভাজন হইলেও মধুসূদন তাঁহার স্বভাবসুলভ সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া রাজ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতি-বিধানের জন্য কতদূর আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, রাজকার্য্যের প্রতি বিভাগে বিধি-নিয়ম-শৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত তিনি কত অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, নিজে পীড়িত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও তিনি কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলী কতদূর মনঃসংযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, কর্ম্মচারিগণের দুর্নীতি দূরীভূত করিতে, শত বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কতরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন ;—যাঁহার মঙ্গলের জন্য মধুসূদনের এই প্রাণপাত পরিশ্রম ও চেষ্টা, তিনি স্বয়ং পরহস্তচালিত হইয়া, তাঁহার প্রতিকূলাচরণে তৎপর, তত্রাচ মধুসূদনের হৃদয়ের মহত্ত্ব, উপচিকীর্ষাপ্রবৃত্তি, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি নিরবচ্ছিন্ন, প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতে,—সুকঠোর সংঘর্ষণে কিরূপ প্রদীপ্ত ছিল, সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিবার উপকরণ যদি আমরা প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি—মধুসূদনের জীবনের একটি অপূর্ব্ব পরিচ্ছেদ জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত হইত ; পাঠক-পাঠিকা তাঁহার প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী প্রসারতা অনুধাবন করিতে পারিতেন।

পঞ্চকোটের রাজকার্য্য মধুসূদনের ইহজীবনের শেষ কর্ম্ম। পঞ্চকোট হইতে বিদায়গ্রহণকালে মহাপ্রাণ মধুসূদন যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার লুপ্তাবশেষ পঞ্চকোট-স্মৃতি সমাপ্ত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, এই কবিতায় মধুসূদনের হৃদয়ের মহানুভবতা রাজার ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই।

পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত।

হেরেছিনু, গিরিবর ! নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন !
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন করে
দ্বিতীয় তপন !
যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন !

হে সখে! পাষাণ তুমি, তবু তব মনে,
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

(অসম্পূর্ণ)

পুরুলিয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে মধুসূদন তাঁহার সোদরোপম বন্ধু কুমার বিশ্বেশ্বর মালিয়ার অনুরোধে সিয়ারসোলে গমন করেন। বিশ্বেশ্বর মালিয়া প্রমোদ-উৎসবের আয়োজন করিয়া মধুসূদনের অভ্যর্থনা করেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মধুসূদন পুরুলিয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া যখন পুনর্ব্বার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি কণ্ঠনালীর প্রদাহ, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, রক্তবমন ও তদনুচর জ্বর প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন! সেই অনিন্দ্যসুন্দর, অনবদ্য স্বাস্থ্য, সেই মত্তমাতঙ্গাধিক শারীরিক শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে—সেই মনোহর দিব্যশ্রীমণ্ডিত মুখকান্তি আর নাই--মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু পাঠক-পাঠিকা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, তাঁহার সেই অমিত তেজঃপূর্ণ মানসিক বল তেমনিই অটুট ও অক্ষুণ্ণ ছিল! সেই নিবিড় জীবন-তিমিরে তাঁহার মানসিক তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিষ্মান ছিল; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রভাতের শুক্রগ্রহের ন্যায় শুভ্র হীরকোজ্জ্বল আলোকে দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিল।

মধুসূদন তাঁহার দেশীয় উত্তমর্ণগণকে নানামতে বুঝাইয়াও সুস্থির রাখিতে পারিলেন না। মধুসূদনের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, পত্নীর মূল্যবান পরিচ্ছদাদি ও অলঙ্কার, নানাবিধ বহুমূল্য সৌখীন দ্রব্যাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই তাহাদিগকে প্রদান করিলেন! কিন্তু তাহাতে কি হইবে? প্রজ্বলিত দাবানলে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাঁহার রক্তপিপাসু উত্তমর্ণগণের তৃষ্ণা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া, তাঁহার সমধিক ক্লেশের হেতু হইয়া উঠিল! পীড়া-হেতু তাঁহার ব্যবসায় একেবারে বন্ধ হইল! রোগ-যন্ত্রণায় ও মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মধুসূদন অবিরাম মদ্যপানে বিভোর হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে এক দিন মনোমোহন ঘোষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন, দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া মধুসূদন উগ্রতেজ, নির্জ্জলা, অগ্নিময়ী সুরা পান করিতেছেন! মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "এ কি, আপনি এ কি করিতেছেন? ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কি আপনি জানেন না?" মধুসূদন বলিলেন, "এরূপ মদ্যপান ও আত্মহত্যা একই যে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; তবে কণ্ঠে অস্ত্রাঘাতাপেক্ষা ইহাতে ক্লেশ কিছু অল্প।" মধুসূদনের শেষ কথাটি এই;—"This is a process equally sure, but less painful."

মধুসূদনের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার বন্ধু ও বয়স্য ডাক্তার গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে উগ্র মদিরার পরিবর্ত্তে দ্রাক্ষাসব (wine) ব্যবহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মধুসূদন উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলেন, "গুডিভ্! মরিয়া ত গিয়াছি, আর পরিবর্ত্তনের সময় কোথায়?"

এই সময়ে মানসিক অশান্তিতে মধুসূদন এতই আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, কোন বিষয়েই তাঁহার স্থিরতা ছিল না। মানসিক আবেগে কত কবিতাই রচনা করিতেন, কিন্তু রচনার পর সেগুলির কোন সংবাদই তিনি রাখিতেন না। নিজের সমাধি-লিপির জন্য 'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে' কবিতাটি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া তিনি ছিন্ন কাগজপত্রের ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন;—তাঁহার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা উহা দেখিতে পাইয়া পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা উহা তুলিয়া না রাখিলে আমরা তাঁহার স্বরচিত সমাধি-লিপি পাঠে বঞ্চিত থাকিতাম। কবির মৃত্যুর পর ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুগণ উহা সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইংরাজিতে লিখিত তাঁহার 'রিজিয়া' নামক নাট্যকাব্য-খানি যে কাহাকে দিয়াছিলেন, সে কথা কাহাকেও বলিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

'ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে হে রমাসুন্দরি!' 'ইত্যাদি কবিতাটি একখানি চিঠির খামের উপর লিখিয়া তিনি যে কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিত না;

এক দিন হঠাৎ তাঁহার 'বাবু' স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু উহা কুড়াইয়া পাইয়া প্রভুর চিতাভস্মের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিশপ মিলম্যান ইটালী হইতে একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রীক গ্রন্থ বহু অর্থব্যয় করিয়া রেভারেণ্ড গোপালচন্দ্র মিত্রকে আনাইয়া দেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মধুসূদন কোন পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে সেই দুর্লভ বহুমূল্য গ্রন্থখানি গোপালচন্দ্র মিত্রের নিকট হইতে লইয়া যান। কি দুর্ব্বহ মানসিক অশান্তিই তাঁহার হইয়াছিল,—সেই গ্রন্থরত্ন তিনি যে কোথায় হারাইয়া ফেলিলেন, তাহার সন্ধান কেহই দিতে পারিলেন না। মধুসূদন সর্ব্বদাই বলিতেন, 'ভারতবর্ষে গোপালচন্দ্র মিত্রের ন্যায় গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত কেহই নাই।' কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে বলিতেন, 'গ্রীকে তাঁহার অধিকার জন্মে নাই।'

কলিকাতার বিখ্যাত বাবু ৺আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটার নামক নাট্যশালা স্থাপন করেন। তিনি সকল বিষয়েই মধুসূদনের সুপরামর্শ ও উপদেশানুসারে নাট্যশালা গঠিত করিয়াছিলেন। স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয়ে অভিনেত্রী প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা মধুসূদনই প্রথমে প্রদান করেন। তাঁহার এই পরামর্শ অতিশয় যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ সাদরে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করেন। এই নাট্যশালার জন্য 'মায়াকানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক দুইখানি নাটক-রচনায় মধুসূদন হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের প্রদত্ত পারিশ্রমিকে মধুসূদনের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় মধুসূদন গ্রন্থদ্বয় সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মধুসূদনের শেষ স্মৃতি 'মায়াকানন' লইয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতৃগণ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথমে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। মধুসূদন তখন ইহজগতে নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন নাটক-রচনায় আরব্ধ হইয়াছিল, নাটক রচনান্তেই চিরাবসান হইল।

"উদেতি সবিতাতাম্র স্তাম্র এবাস্ত মেতিচ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতা মেকরূপতা ॥"

বিপন্ন হইয়া মধুসূদন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরকে তাঁহাকে রাজকবি (Poet Laureate) নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বন্ধু হইলেও বর্দ্ধমানাধিপতি মধুসূদনের গুণবৈগুণ্যে তাঁহার অনুরোধ-রক্ষায় মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

এই সময়ে মধুসূদন বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি নীতি-বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। এই সকল কবিতায় তাঁহার সহজ, সরস, ভাবময়, সুন্দর শব্দ-সম্পন্ন রচনাশক্তি দেখিয়া আমরা প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রতিভাবহ্নি চিরতরে মহানির্ব্বাণ লাভ করিবার পূর্ব্বে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' 'ময়ূর ও গৌরী' 'কাক ও শৃগালী' 'কুক্কুট ও মণি' 'সিংহ ও মশক' 'দেবদৃষ্টি' 'সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি' 'মেঘ ও চাতক' প্রভৃতি কবিতাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে, এ শ্রেণীর কবিতা রচনায়ও মধুসূদন কিরূপ শক্তিমান ছিলেন। তদ্ভিন্ন 'বঙ্গ-দর্শনের' ন্যায় একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিবারও তাঁহার বাসনা জন্মিয়াছিল; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ তাহা প্রচারিত হয় নাই। উপরিউক্ত কবিতাগুলি অনেকে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া বিশেষ ধনবান হইয়াছিলেন।

মহাকবি মধুসূদন সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা (Literary Genius) ছিলেন। তাঁহার যশঃজ্যোতিঃ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে দেখিয়া, সপত্নীদ্বেষিণী কমলা সপত্নী-পুত্রের বিশ্ব-বিশ্রুত গৌরবে অন্তর্দ্দাহে জর্জ্জরীভূতা হইতেছিলেন। মধুসূদনকে নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধীভূত করিয়াও তাঁহার প্রজ্জ্বলিত রোষ ও ঈর্ষানল কিছুতেই প্রশমিত হইতেছিল না। তাই মহামতি মধুসূদন আক্ষেপে কমলাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন;—

"ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে, হে রমা-সুন্দরি!
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনঃ জ্বলে।
ভেবেছিনু, হায়! দেবি, ভ্রান্তি ভাব ধরি
ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্রমে এই তরী;
অদয়ে! অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে?"

মধুসূদন অতুল্য গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন; অথচ তাঁহারই গ্রন্থাবলীর বিক্রয়-লব্ধ অর্থে বহু ব্যক্তি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া নানা ভোগ-সুখে বাস করিতেছেন। অথচ তাঁহারা মহাকবির স্মৃতি-রক্ষার্থে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ-দর্শী মধুসূদন স্বয়ং লিখিয়াছিলেন —"A time will come when these works of mine will fill the pockets of printers, booksellers, painters *et hoc genus omne* and now I am obliged to "shell out."

কবির নিজের তাৎকালিক অবস্থা তাঁহারই ভাষায় বিবৃত হইল। কোন-কোন চরিত-লেখক এ সম্বন্ধে মহাকবির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মধুসূদনের দুঃখ তাঁহার আত্মকৃত কর্ম্মের ফল। প্রসঙ্গতঃ, এ সম্বন্ধে এ স্থলে আমাদিগকে দুই চারিটি কথা বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। মনস্বী নিজে চিরদিন কীর্ত্তি কিরণে সমুজ্জ্বল, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক থাকেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার 'শ্রীমধুসূদন' নাম লিখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন, মনস্বী রমেশচন্দ্র যাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়াছেন, নরেন্দ্রনাথ যাঁহাকে ঈশ্বর-জানিত লোক বলিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল যাঁহাকে 'অমর, অমিত-প্রভাব অক্ষয়কীর্ত্তি' বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, তাঁহার কৃত কার্য্য ও ঘটনাবলীর উপর কোন-রূপ টীকা-টিপ্পনী না করিয়া, যথাযথ বিবৃত করাই কর্ত্তব্য। পাঠক পাঠিকা তাহা হইতেই সেই অসাধারণ পুরুষকে চিনিয়া লইতে পারিবেন। এই পৃথিবীতে কত-শত মহা-কীর্ত্তিমান মহাত্মগণের কতপ্রকার যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। মহা-সমুদ্রেই বাড়বাগ্নি জ্বলে, গগনস্পর্শী মহামহীরুহে বা দুর্গচূড়েই বজ্রপাত হয়; হিমাদ্রি-বক্ষেই দুরন্ত ঝটিকা তাণ্ডব নৃত্য করে; মহারণ্যেই দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, মহাকাশেই মহাগর্জ্জন অনুভূত হয়;—মধুসূদনের ন্যায় মহাপুরুষের মহাভাগ্যেই বিধাতার বিচিত্র, দুর্জ্ঞেয় লীলা প্রকটিত! সীতাদেবী ও রামচন্দ্রের দুঃখ কে না জানেন? তাঁহারা কেন অত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারেন, কি? মধুসূদনের প্রসঙ্গে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সক্রেতিস্ ও যীশু-খ্রীষ্টের দেশীয়েরা তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানেন?" কবিগুরু হোমর দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিতেন; ভার্জ্জিল, অভিদ, দান্তে সুদূর সমুদ্র-তীরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; তাসো ও বনিয়ন বহুকাল কারা-রুদ্ধ ছিলেন; লর্ড বায়রণ গ্রীসের মিসলংহিতে বিপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! যাঁহারা মহাপ্রাণ, তাঁহারা কঠোর দুঃখেই অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান! সুবর্ণ-পালঙ্কে নিদ্রা কীর্ত্তিমানদিগের জন্য নহে, মুহূর্ত্তের পতঙ্গ ধনী-দিগেরই পক্ষে উহা শোভন। আমাদের মধুসূদনের শেষ জীবনে ভীষণ দুঃখের লীলাভিনয় হইয়াছিল বলিয়াই ত তিনি মহামৃত্যুঞ্জয় হইয়া রহিয়াছেন! অথচ, তাঁহার সমসাময়িক কত কুবেরতুল্য রাজা মহারাজা জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসাগরের অতল জলে মিশিয়া বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। কে তাঁহাদের সংবাদ লয়? মনস্বীর দুঃখের ও ধনীর সুখের প্রভেদ এইরূপেই বিধাতা মানবকে বুঝাইয়া দেন! মধুসূদনের জীবনের কার্য্য ও ঘটনাবলীর উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা উপরিউক্ত কারণ বশতঃ নিবৃত্ত হইলাম। যুগ-প্রবর্ত্তকের কার্য্যের উপর আবার মন্তব্য প্রকাশ কি? সুধী Ascroft Noble যথার্থই বলিয়াছেন "The mighty masters are a law unto themselves and the validity of their legislation will be attested and held against all comers by the splendour of unchallengeable success."

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে শারীরিক পীড়া মধুসূদনের পক্ষে বড়ই দুঃসহ হইয়া উঠিল। মহাসহিষ্ণু মধুসূদন তাঁহার অসহিষ্ণু উত্তমর্ণগণকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়া স্থির রাখিতে না পারিলেও, অতি ধীরতার সহিত তাহাদের প্রপীড়ন সহ্য করিতে লাগিলেন। এই অবস্থাতেও তাঁহার মনের মহত্ত্ব কতদূর প্রসারিত ছিল, তাহা নিম্নলিখিত দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে।

রাজা দিগম্বর মিত্রের ভগিনীপতি, হুগলী দেবানন্দপুর-নিবাসী মুন্সী গোবর্দ্ধন দত্তের ওয়েলেস্লি ষ্ট্রীটে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতির দোকান ছিল। তিনি মধুসূদনকে বহু আস্বাব সরবরাহ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন বাবু বলিতেন যে, তিনি যখনই মধুসূদনের নিকট তাগাদায়

জন্য যাইতেন, মধুসূদনের কথা শুনিয়া ও তাঁহার উদারতা দেখিয়া, তিনি হৃদয়ে এতাদৃশ ক্লেশানুভব করিতেন যে, টাকা চাহিবার প্রবৃত্তিই তাঁহার হইত না। একদিন তিনি উপস্থিত হইলে, মধুসূদন বলিলেন, "দত্তজা, তোমার প্রাপ্য টাকা যে পরিশোধ করিতে পারিব, সে আশা আর আমার নাই; তা' তুমি এক কাজ কর, আমার গৃহে এই যে মহাকবিগণের অর্দ্ধমূর্ত্তিগুলি রহিয়াছে, এ সকল আমি য়ুরোপ হইতে আনিয়াছি; আর অনেক দুর্লভ গ্রন্থাবলীও রহিয়াছে। তুমি এ সকল লইয়া যাও। এ সকল যোগ্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলে তোমার প্রাপ্য টাকার পরিশোধ হইবে।" মহৎ-হৃদয় গোবর্দ্ধন কিছুই লইতে চাহেন না দেখিয়া, মধুসূদন তাঁহাকে আর একদিন বলেন, "মুন্সী! আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আছে, সেগুলি তবে তুমি গ্রহণ কর, তাহা ছাপাইলে নিশ্চয়ই আমার ঋণ পরিশোধ হইবে।" মধুসূদনকে বিপন্ন দেখিয়া গোবর্দ্ধন দত্ত উহাও লইতে কাতর হইয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনের বন্ধুরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি করিয়া হাজার দেড়-হাজার টাকা ছাড়িয়া দিবে?" উত্তরে গোবর্দ্ধন বলেন যে, "মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় দেশবিখ্যাত মহানুভব ব্যক্তির গৃহ শূন্য করিয়া সজ্জোপকরণ লইয়া আসিতে আমি কিছুতেই পারিব না।" তিনি মধুসূদনের নিকট হইতে কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন নাই।

একবার অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে সামান্য অর্থের জন্য প্রপীড়িত করায় তিনি তাঁহার পত্নীর বিশেষ সখের একটী বহুমূল্য দ্রব্য দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এইরূপে জীবন-সায়াহ্নে সর্ব্ব-সংহারক গ্রহবৈগুণ্যে বহু বিড়ম্বনার অধীন হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য মধুসূদন কিছুদিনের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি নিঃসম্বল! সঙ্গতি না থাকায়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন বন্ধু উত্তরপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুরম্য লাইব্রেরী-ভবনে কিছুদিনের জন্য বাসের ইচ্ছা করিয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও একবার কিছুদিনের জন্য তিনি উক্ত লাইব্রেরী-ভবনে বাস করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পত্র প্রাপ্তিমাত্রেই মহানুভব জয়কৃষ্ণ বাবু "You are always welcome" বলিয়া তাঁহাকে সমাদরে আহ্বান করিলেন। মধুসূদনও সপরিবারে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথমে উত্তর-পাড়ায় আসিয়া প্রায় দুই মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। মহাযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার পত্নী এই মর্ত্ত্যনিবাসে উত্তরপাড়াতেই কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বিশ্রাম,—শান্তি ও তৃপ্তিপ্রদ হয় নাই। নিদারুণ অনাটন, মৃত্যু-বিভীষিকাপূর্ণ রোগশয্যা ও উত্তমর্ণ-দিগের প্রেরিত নিষ্ঠুর বাক্যবাণদিগ্ধ পত্রাবলী তাঁহার অন্তিম শয্যা কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছিল। উত্তরপাড়ার শেষ প্রবাসে তিনি একটি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও শান্ত ছিলেন না। কলিকাতা হইতে যে অর্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উত্তর-পাড়া পরিত্যাগের পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র সুধীবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনের উত্তরপাড়া-প্রবাসকালে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। একমাত্র রাসবিহারী বাবুই মহাকবির উত্তরপাড়া-প্রবাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে মধুসূদনের প্রথম ও দ্বিতীয় বারের উত্তরপাড়া-স্মৃতি একত্র করিয়া কয়েকটি আখ্যায়িকা ও কথা পাঠক-পাঠিকা-দিগকে প্রদান করিলাম;—

"Mr. Michael Modhu Sudan Datta came twice to Uttarpara, once in 1869 and the second and last time in 1873, to live in the first floor of the Public Library house. On both these occasions his wife and children accompanied him. During the first visit, and indeed, all through that sojourn of about three months, it could be easily perceived, that his buoyant and cheerful spirit, and his gay, lively manner amid the wreck of his fortune and the pinch of poverty, had not for a moment left him. That frankness or enthusiasm of manner which the Frenchman calls *abandon* was then, as it had been before, pre-eminently his own. * * * But when, in 1873, disease had been hurrying him to

an untimely grave, and the gradual and conscious waste of vital power had given him warning that his end was near, a far different picture of the man, the poet, and the *galantuomo* presented itself. Then, all cheerfulness was gone, and those grand black eyes of his shone no more with the light of day, but were dimmed and dejected as it were by the sad thought of his long home; and if ever one chanced, on occasion, to find in them their former brightness, it was the sheen of the tear-drop, rather, whereof they were then often so full. * * * The thought of the fate of his wife and children, and, more especially, of the education of the latter distracted him. A fonder husband and a fonder father it is difficult to find anywhere, I believe.

Reminiscences of Michael Modhu Sudan Datta. —*Rash Bihary Mukerjee.*

উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে মধুসূদন তাঁহার স্বাভাবিক মধুর বচনে, (যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন) সকলকেই পরিতুষ্ট করিতেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় শ্রীরামপুর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র সহকারী সম্পাদক আলারডিস্ সাহেব (Mr. Alexander Allerdyce) তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত মধুসূদন সাহেবের নিকট তাঁহার য়ুরোপ-ভ্রমণকাহিনী এরূপ ভাষায় বর্ণন করিয়াছিলেন যে, সাহেব চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

মধুসূদনের গভীর সঙ্গীতানুরাগের বিষয় বহু বার উক্ত হইয়াছে। প্রথমবার (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) উত্তরপাড়ায় বাসকালে একদিন অপরাহ্নে তিনি গান শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। মধুসূদনের পত্নী পিয়োনো বাজাইতে লাগিলেন, কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ইংরাজি গান গাহিতে লাগিলেন। অবশেষে শর্ম্মিষ্ঠার জননীও কোকিলকণ্ঠে কন্যার সহিত যোগদান করিলেন। মধুসূদন এতক্ষণ পিয়োনোর উপর ভর দিয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন; তাঁহার পত্নী গাহিতে আরম্ভ করিবামাত্র তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি এতদূর হর্ষে মগ্ন হইলেন যে, নয়ন হইতে বড়-বড় ফোঁটায় অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার কপোল বাহিয়া নির্ঝরের ন্যায় গড়াইতে লাগিল। তিনি শর্ম্মিষ্ঠাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, ঘন-ঘন তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রাসবিহারীবাবু নিকটে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে, ইংরাজী গীতি অধিকাংশ ভারতবাসীর কর্ণে ঝঙ্কারময় হইলেও শ্রুতিকটু, তাহা কি করিয়া আপনাকে এতদূর মুগ্ধ ও আয়ত্বাধীন করিল?" তিনি উত্তর দিলেন;—"I am Europeanised, as regards music; but, of course, I like Bengali songs, if not so well, at least well enough to bear to hear them sung for hours at a stretch."

মধুসূদনের প্রথমবারের (খ্রী ১৮৬৯) উত্তরপাড়ায় অবস্থানকালে একদিন কিশোরীচাঁদ মিত্র উত্তরপাড়া হিতকরী সভায় কৃষিবিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা দিবার জন্য গিয়াছিলেন। কিশোরীবাবু সদলবলে লাইব্রেরীর নিকট দিয়া যাইতে-যাইতে দেখিলেন, মাইকেল মধুসূদন উপরের বারান্দায় রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দলস্থ, মধুসূদনের পরিচিত জনৈক বন্ধু, মধুসূদনকে বক্তৃতায় যোগদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, তিনি বক্তৃতার বিষয় 'কৃষিবিদ্যা' শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন,—"It is all humbug; কৃষি বিষয়ে আবার বক্তৃতা কি? চাষারা কি জানে না, কি করিয়া ধান্য-রোপণ করিতে হয়। খাচ্চ কি করিয়া? তাহাদের আবার কৃষিবিদ্যা (Agriculture) কি শিখাইবে?"

রাসবিহারীবাবু বলেন, মধুসূদনের কৃতজ্ঞতার আদি-অন্ত ছিল না। তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, প্রদীপ্ত ভাষায়, মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতেন। এমন দিন, এমন ঘণ্টা ছিল না, যে দিন তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী এই তিনজনের অপরিসীম বদান্যতার বিষয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ না করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের আশা না থাকায় মধুসূদনের ক্ষোভের সীমা ছিল না।

যখন ডাক্তারি চিকিৎসায় কোন উপকার হইতেছিল

না, তখন একদিন রাসবিহারীবাবু মধুসূদন ও তাঁহার পত্নীকে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কবিরাজ রমানাথ সেন মহাশয়ের চিকিৎসাধীন হইবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। মৃত্যু আসিয়া শিয়রে অধিষ্ঠান করিলেও, মধুসূদন দেশীয় চিকিৎসা অগ্রাহ্য করিলেন।

এই সময়ে চরম অভাবের বিকট গ্রাসে পতিত হইয়া, মধুসূদন তাঁহার পত্নীর ১০০৲ টাকা (£ 70) মূল্যের তুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্যারিস গাউন, যে কোন মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য কাতরভাবে রাসবিহারী বাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শেষ সময়ে অর্থাভাবে অনাহার উপস্থিত হইলে, অভিমানী মধুসূদন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, অরুচি হইয়াছে বলিয়া, দেশীয় আহার্য্য পাঠাইতে বলিলেন। উত্তরপাড়ার কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার টাকার অভাবের কথা তাঁহাদিগকে জানিতে দেন নাই। যে মদিরা তাঁহার জীবন-সহচরী ছিল,—রাসবিহারীবাবু বলেন,—তাহার জন্যও তিনি কাহাকেও কোন দিন কোন প্রকার অনুরোধ করেন নাই।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতেই উত্তরপাড়ায় মধুসূদন দিন-দিন হীনবল হইতে লাগিলেন। ক্রমে চলচ্ছক্তি, পরে উত্থানশক্তি বিরহিত হইলেন। কিন্তু মনঃশক্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই ছিল। রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মধুসূদনের এই সময়ের অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

"The few weeks that Mr. M. M. Datta was here, he was in a very weak condition. He could not take any exercise or devote any time to reading. * * He spent most of his time in bed or in a reclining chair and sometimes took a short walk on the terrace or on the varandah. He was then a complete wreck of his former self, but he did not even for a moment lose his natural cheerfulness of disposition or show any irritability of temper. On the contrary he was always ready to amuse his visitors with a smart anecdote or humorous saying. * * * He did not hope to survive the illness and was fully resigned to his fate. The only subject on which he sometimes showed any anxiety was the future of his wife and children."

Reminiscences of Michael
Madhu Sudan Datta
—*Raja Peary Mohan Mookerjee.*

মধুসূদনের বন্ধু বাবু গৌরদাস বসাক ও ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (Mr. W. C. Bonerjee) তাঁহাকে উত্তরপাড়ায় প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। ক্রমেই তাঁহার পীড়া সাঙ্ঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটাও বিষম জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। এই সময়ে গৌরদাস বাবু গিয়া দেখিলেন, শয্যাশায়ী মধুসূদনের মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে—তিনি রোগ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া হাঁফাইতেছেন—আর তাঁহার পত্নী জ্বরঘোরে ভূতলে লুণ্ঠিতা হইতেছেন। গৌরদাস বাবুকে হলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, মধুসূদন অতি কষ্টে একটু উঠিয়া বসিলেন, প্রবল বেগে অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার গণ্ড ও বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নিজের যন্ত্রণা অপেক্ষা পত্নীর শোচনীয় অবস্থা তাঁহার পক্ষে সমধিক মর্ম্ম-পীড়াদায়ক হইয়াছিল। পত্নীর রোগযন্ত্রণা দেখিয়া নিজের যমযন্ত্রণা ভুলিয়া মধুসূদন অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই গৌরদাসকে দেখিয়াই মধুসূদন কেবলমাত্র বলিয়া উঠিলেন, "Afflictions in battalions." তৎপরে গৌরদাস বাবু যখন অবনত হইয়া অভাগিনী হেনরিয়েটাকে দেখিতে গেলেন, তখন চিরপতিপ্রাণা সাধ্বী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া উঁহাকে দেখুন, উঁহার শুশ্রূষা ও যত্ন করুন, আমি মরিতে ভয় করি না।" গৌরদাস তৎক্ষণাৎ মধুসূদনকে সুচিকিৎসার নিমিত্ত কলিকাতায় প্রত্যাগত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে, মধুসূদন বলিলেন, যে, তিনি পর-দিবস কলিকাতায় ইটিলীতে প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। *

* মধুসূদনের জীবন-চরিতে তাঁহার উত্তরপাড়া-প্রবাস অধ্যায়ে মধুসূদনের পুত্রদ্বয়ের পর্য্যুষিত অন্নভক্ষণ সম্বন্ধে একটী বীভৎস শোকাবহ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আমাদের অনুরোধে মধুসূদনের যে স্মৃতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম ;—

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

"যে সকল মহাত্মা সার্ব্বজনীন ; যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত অথবা দেশবিখ্যাত ; যাঁহারা স্ব স্ব কীর্ত্তিকলাপের জন্য চিরস্মরণীয়, তাঁহারা যে-যে গুণের জন্য বিখ্যাত, সেই-সেই গুণের নিদান, প্রসর, কাষ্ঠাগতি কি-কি প্রণালী দিয়া ধারাবাহিক ও অকুণ্ঠ-রূপে চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব অনুশীলন পরবর্ত্তী লেখকের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের চরিত্রগত দোষ, বা পানদোষ, বা অর্থলিপ্সা, অথবা অদম্য আচরণ লইয়া আলোচনা করা ব্যর্থ এবং নিষ্প্রয়োজন। মানুষ এক জীবনে, এমন কি বহুসংখ্যক জীবনেও একটী মাত্র গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। ভগবান তথাগত দশটী পারমিতায় এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গে বহু জন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন কবি ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাদি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। অতএব তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করা বিধেয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ সেন—এই কয়েকজনের পর সর্ব্বোচ্চ আসনে তদীয় নাম-নির্দ্দেশ অকুণ্ঠিতভাবে করিতে পারা যায়। রামপ্রসাদের নামোল্লেখে হয় ত কেহ-কেহ বিস্মিত হইতে পারেন, উল্লসিতও হইতে পারেন। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বিবেচনায় তাঁহার "কালীকীর্ত্তনের" সমতুল্য কাব্য বঙ্গদেশে আর একটী কেহ দেখাইতে পারেন কি না, সন্দেহস্থল। কবিত্বে, প্রতিভায়, ভাষার লালিত্যে, মধুর বর্ণনায়, তত্ত্বকথার বিস্তারে "কালী-কীর্ত্তন" অদ্বিতীয় বস্তু!

৺গৌরদাস বসাক—(প্রৌঢ়ে)

বাবুকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রতিবারেই তিনি সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, 'ও কথা কথাই নয়'। একখানি পত্রে তিনি আমাদিগকে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, "উত্তরপাড়ায় তাঁহার (মধুসূদনের) মহত্ত্বোচিত মর্য্যাদা, সম্মান, আদর, যত্ন প্রভৃতির কিছুমাত্র ক্রটী হয় নাই, যোগীন্দ্র বাবু ভুল লিখিয়াছেন।"

"এখন মধুসূদন সম্বন্ধে প্রস্তাবনা করা যাউক। আমি যত দিন তাঁহার সৎসঙ্গলাভে চরিতার্থ হইয়াছি, তাঁহার প্রতি কথায় প্রতি দেশের অথবা প্রতি পর্ব্বতের অথবা প্রতি সমুদ্রের বর্ণনায়, এমন কি ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, ও আমেরিকায় রেল-গাড়ীতে যাতায়াতের বিবরণে তাঁহার নৈসর্গিক কবিত্বের ভূরি-

৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভূরি পরিচয় পাইয়াছি। তাহা হইতে মনে হয়, কবিত্ব তাঁহার জন্মগত ধন; তাঁহার পেশীতে-পেশীতে, অস্থিতে-অস্থিতে, শিরায়-শিরায় কবিত্ব ঘুরিয়া বেড়াইত! এ স্থলে অনুধাবনীয়, ঈদৃশ কবিত্ব তাঁহার পঠদ্দশা হইতে পরিলক্ষিত হইত কি না। বুদ্ধি, বিদ্যা এবং উচ্চশিক্ষার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর সহিত মাইকেল সম্বন্ধে যতবার আন্দোলন হইয়াছে, ততবারই তিনি আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন "আমাকে তোমরা বুদ্ধিমান বল, আমি বাস্তবিকই বুদ্ধিমান, আমার সকল শক্তি চিঙ্‌ড়িমাছের বসা, মল প্রভৃতির মস্তকে উঠিবার ন্যায় আমার মস্তকে উঠিয়াছে, কিন্তু মাইকেলের তুলনায় আমি অতিশয় হীন; তাঁহার বুদ্ধিমত্তার, প্রতিভার ও মেধার সমকক্ষ আমি অদ্যাপি দেখি নাই।" উত্তরপাড়ায় সাধারণ-পুস্তকালয় বাটীতে তাঁহার দুই বার অবস্থিতিকালে প্রতি পদে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছি; কি গ্রীক্‌, কি রোমক, কি ইতালীয়, কি ফরাসী কি ইংরাজী —যে কোনও কবির উল্লেখ হইবামাত্র তাঁহার আভ্যন্তরিক, তাঁহার মজ্জাগত প্রতিভা ফুটিয়া উঠিত, তিনি "দেবো ভূত্বা দেবং যজেত" হইয়া কবিদের বর্ণনা করিতে বসিতেন। বাল্যকাল হইতে আমি কবিতা-প্রিয় ছিলাম; তাঁহার সহবাসে আমার রুচি মার্জ্জিত, আমার কবিগণের আসঙ্গলিপ্সা বর্দ্ধিত, এবং আমার অকিঞ্চিৎকর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরে যখন গেটে পাঠ করিয়া তাঁহাকে জগতের সর্ব্বপ্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া জানিলাম, তখন স্মরণ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে, অথবা অপর কোনও জর্ম্মন্‌ কবি সম্বন্ধে তিনি কখনও কোনও কথা বলেন নাই। তিনি হোমর, দান্তে, সেক্‌সপিয়র, মিল্‌টন্‌, মোলিয়ার, ভিক্টর হ্যুগো, বায়রণ্‌, শেলি, কীট্‌স, টেনিসন—এই সকল কবির স্তুতিবাদক ছিলেন।

"বিলাতে অবস্থিতি কালে সুবিখ্যাত অদ্বিতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভাষায় সুপণ্ডিত আচার্য্য গলড্‌ষ্টিউকারের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া মধুসূদন একদিন তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যান; গিয়া দেখেন, তাঁহার পাঠগৃহে অথবা প্রকোষ্ঠে পা বাড়াইবার স্থান নাই, পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকে প্রকোষ্ঠ আকীর্ণ; এবং আচার্য্য মুহুর্মুহুঃ চুরুট ও সিগারেট পান করিতেছেন। ইঙ্গরাজীতে মধুসূদন আলাপ আরব্ধ করিলে গল্ড-ষ্টিউকার বলিলেন 'আমি বিস্মিত হইতেছি, আপনি আর্য্যসন্তান এবং ভারতবাসী হইয়া সংস্কৃতে

কথাবার্ত্তা কহিতেছেন না।' মধুসূদনের মর্ম্মে-মর্ম্মে এ উক্তি লাগিয়াছিল।*

"তিনি তাঁহার কন্যাকে ও জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলিয়া দিয়াছিলেন 'রাসবিহারীকে সর্ব্বদা ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিবে এবং ছোট ছোট বাক্য বলিতে শিখাইবে।' ফরাসি ভাষা শিখিবার সেই আমার প্রথম উৎসাহ ও উদ্যম। মধুসূদন বলিতেন ফরাসির ন্যায় প্রাঞ্জল, সুমার্জ্জিত, দ্ব্যর্থসম্ভাবনা-পরিশূন্য ভাষা জগতে নাই। ফরাসিদের যেমন তীক্ষ্ণ, সুমার্জ্জিত মস্তিষ্ক, তাঁহাদের ভাষাও তেমনই স্বচ্ছ।

দূতের প্রথম শ্লোক "কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ" এবং ভারতচন্দ্রের "কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট, খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট" উচ্চারণ করিয়া দেখাইলেন সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষা কত বেশী সুললিত ও মধুর। তিনি বলিতেন 'ইতালীয় ভাষা অপেক্ষা বঙ্গভাষা অধিকতর মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।'

"এক দিন নিজের এবং পত্নীর অরোচক ভাণ করিয়া বাঙ্গালীর সুক্ত, চড়চড়ি, মাছের ঝোল, মুগের দাল প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অরুচির কথা শুনিয়া
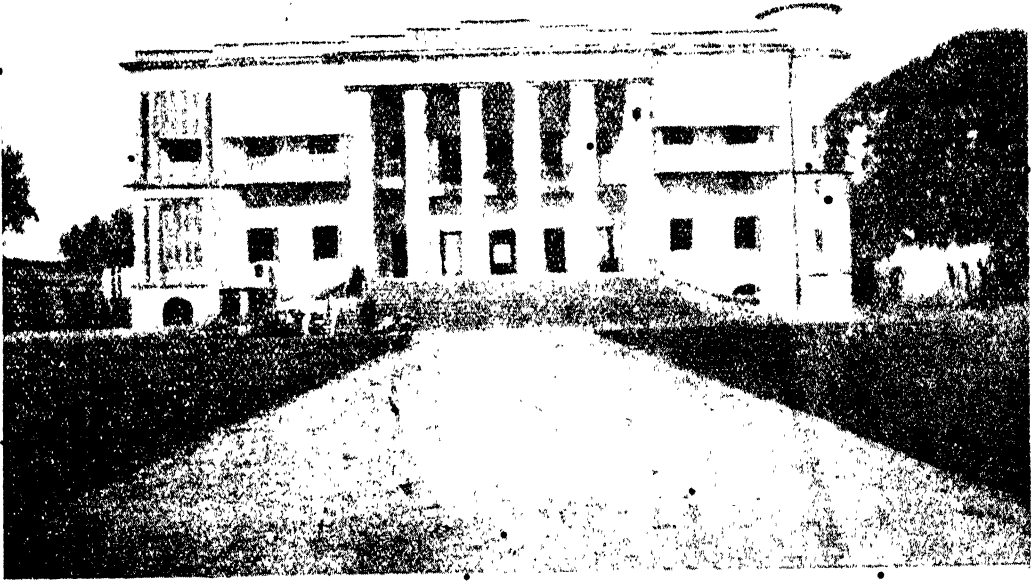
উত্তরপাড়ার লাইব্রেরী

"এক দিন ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর জগদম্বাকে পার করার উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি এই বর্ণনা করিতে পাইতাম, তাহা হইলে স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথীর সংস্পর্শযুক্ত রাঙ্গা অবিশ্বসুলভ পা-দুখানির কতই মহিমা বাড়াইতাম, কতই ভক্তমনোহারী করিয়া আঁকিতাম!'

"প্রথম বার উত্তরপাড়ায় অবস্থিতিকালে আমাকে আদেশ করিলেন, 'এক দিন কবিত্ব সম্বন্ধে আমার একটি বক্তৃতার আয়োজন কর।' সেই বক্তৃতায় মধুসূদন মেঘ-

আমরা তরকারি ব্যতীত আচার, মোরোব্বা, চাট্‌নি প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছিলাম। কলেজ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন তাঁহার নিকট গেলাম, তখন খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রশংসায় কাব সহস্র কবাট খুলিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমাকে একান্তে লইয়া বলিলেন 'বাবা! শুধু আজ নহে, আমরা যতদিন থাকিব, এইরূপ খাদ্যসামগ্রী দিয়া আমাদিগকে উপবাস হইতে বাঁচাইও। আমাদের খাইবার কিছু নাই।' . . . . .

"তাঁহার পত্নীর ফরাসিজাতি-সুলভ সৌজন্য এবং সাদর সম্ভাষণ চিরকাল হৃদয়ে গাঁথিয়া থাকিবে। তাঁহার সকরুণ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আমি কখনও ভুলিব না।

* এই আচার্য্য গোল্ডষ্টিউকারই মধুসূদনের বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে লণ্ডনের যুনিভার্সিটী কলেজের বঙ্গভাষার অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

"একদিন সন্ধ্যার পর শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন (তখন আর কাষ্ঠাসনে বসিয়া থাকিবার শক্তি নাই) পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে অকস্মাৎ তাঁহার কন্যার আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমাকে বলিলেন, 'দেখ, বুঝি, ব্রাহ্মণী দেহত্যাগ করিলেন!' আমি দেখিলাম তিনি মূর্চ্ছিতা, সংজ্ঞামাত্র নাই, দাঁতকপাটী লাগিয়াছে। শর্ম্মিষ্ঠা ও আমি অনেক যত্নে ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থা করিলাম। সেই দিনই মধুসূদন বলিলেন 'তোমাদের লাইব্রেরীর উদ্যানে আমার এবং আমার পত্নীর মৃতদেহ প্রোথিত করিবে কি? কালই আমাদিগকে স্থানান্তরিত কর।' পর দিন বজ্‌রা আনাইয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় পাঠান হইল। তাহার পনের কি কুড়ি দিন পরে মধুসূদনের জেনেরল হাঁসপাতালে, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বেনিয়াপুকুরে তাঁহার জামাতার ভগিনীদের বাটীতে মৃত্যু হইল।

উত্তরপাড়া
২১।২।১৭ } শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

মধুসূদনের উত্তরপাড়া-প্রবাসের সকরুণ কাহিনী শেষ হইল। তাঁহার জীবনের আশা ফুরাইয়াছে; সকল পার্থিব অভিলাষই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনরশ্মি লইয়া সেই মহাপ্রতিভা মহাক্ষোভে একবার বহুদূরগত অতীতের পানে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন,—তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যময়ী, কল্পনাময়ী, কবিত্বময়ী ধরণীর পরাগকেশরকুসুমাস্তীর্ণ সুখশয্যা শ্মশানের ভস্মাসনে পরিণত! মহাপ্রস্থানের পথে মুক্তানিভ শেষ অশ্রুবিন্দু মুছিতে-মুছিতে, সেই ঘনঘোর জীবন-নিশীথে জীর্ণদেহ, মুমূর্ষু মহাকবি ও তাঁহার ইহজীবনের চিরদুঃখভাগিনী মৃতকল্পা জীবন-সঙ্গিনী উভয়ে মিলিয়া এ বিষজ্বালাময়ী মর্ত্ত্যাহুতাশের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের জন্য, বজরারোহণে কলিকাতাভিমুখে ধীরে—নীরবে যাত্রা করিলেন। এই তাঁহার শেষ যাত্রা! পতিতপাবনী সুরধুনী আর তাঁহার ভক্ত সন্তানকে কোলে করিতে পান নাই; ভাগীরথীতীরে কবির চিতানলও তিনি দর্শন করিতে পান নাই; কবির জ্বালাপীড়িত শেষ অস্থি-খণ্ডও তাঁহার বক্ষে পতিত হইয়া জুড়াইতে পায় নাই। সেই দিন যে তরণী গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়াছিল, তাহা আর উত্তরপাড়ার তীরে লাগিল না। যে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ গঙ্গাতীর হইতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তাহা আর স্বজাতির স্কন্ধারূঢ় হইয়া পতিতপাবনীর তীরে আসিল না।

"POET OF NATURE, thou hast wept to know
That things depart which never may return;
Childhood and youth, friendship, and love's first glow,
Have fled like sweet dreams, leaving thee to mourn.
Thou hast like to a rock-built refuge stood
Above the blind and battling multitude:
In honoured poverty thy voice did weave
Songs consecrate to truth and liberty.
Deserting these, thou leavest us to grieve,
Thus, having been, that thou shouldst cease to be."

সীমান্তে

[শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ]

দুই পাটী দন্ত বিকাশ করিয়া বন্ধুবর যখন জানাইয়া গেলেন—শীঘ্রই পেশোয়ায় যাত্রার একটা সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন মনে হইয়াছিল, 'নিশার স্বপন সম তো'র এ বারতা রে দূত!' কিন্তু শীঘ্রই সে সুযোগ আসিয়া বাস্তবিকই উপস্থিত হইল। সুতরাং হঠাৎ উদ্যোগ-পর্ব্বের সূচনা দেখিয়া যাহারা অন্ততঃ একটু উপদেশ দিবারও দাবী রাখেন, তাঁহারা জানিতে চাহিলেন "তোমাদের এই উদয়াচল হইতে পেশোয়ার যাত্রার উদ্দেশ্য কি?" বন্ধুবরকে শিখণ্ডী স্বরূপ অগ্রে রাখিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম, দেশভ্রমণ ভিন্ন ইহার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, (বিশেষতঃ "গৌরীসেন" যখন
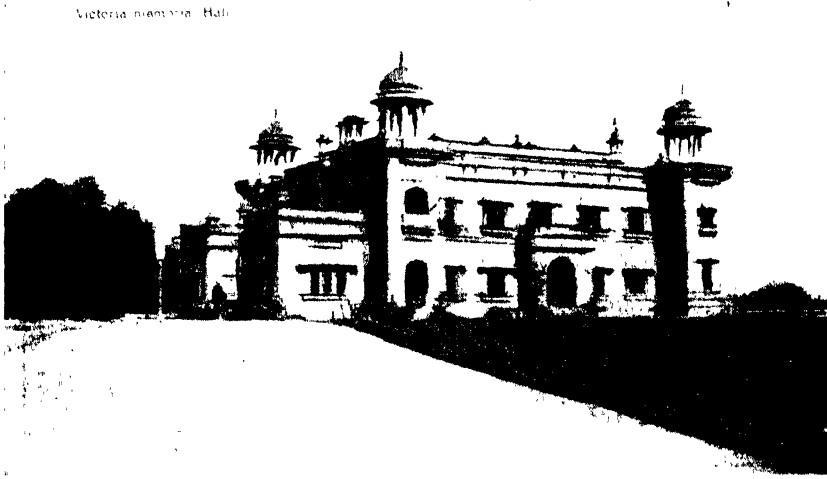
ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়েল হল
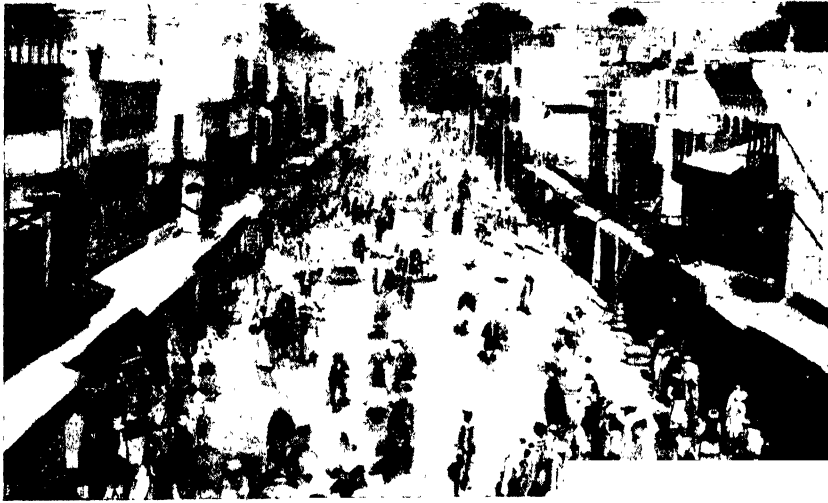
কিশাখানি বাজার—পেশোয়ার

টাকা সরবরাহ করিতেছেন)! বাস্তবিক আমরা যাহা করি, অন্ততঃ তাহার অৰ্দ্ধেকও যদি বুঝিয়া করিতাম, তবে পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টও সেই অনুপাতে কমিয়া যাইত। কি উদ্দেশ্য লইয়া যে চলিয়াছিলাম, তাহা তখনও বলিতে পারি নাই, এখনও বলিতে পারিব না। লক্ষ্যহীন উল্কাপিণ্ডের মত যে এ সংসারে ঘুরিয়া মরিতেছে, তাহার 'সব-পেয়েছির দেশটী' বোধ হয় এ পৃথিবীর সকল স্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে—কেবল 'কুটীরখানি' তুলিতেই যা কষ্ট ও অন্তরায়।

হাওড়া হইতে পঞ্জাব মেল্ যখন ছুটিয়া চলিল, তখনও আমাদের 'প্রোগ্রাম' ছিল, পথে প্রধান-প্রধান ২।৪টি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া যাইব। কারণ যে সময়টুকু হাতে ছিল, তাহাতে বেশী দেখা অসম্ভব। বিশেষতঃ, আমাদের উভয়েরই পশ্চিমের জ্ঞান হাওড়ার পুল ছাড়াইয়া বেশী অগ্রসর হয় নাই। কাজেই ট্রেণখানা দ্রুতগতিতে চলিলে রাত্রি জাগিয়া জানালা-পথে বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এ-ভাবে ছিলাম এবং কখন নিদ্রিত হইয়াছিলাম, বলিতে পারি না। ভোরে উঠিয়াই দেখি গাড়ী বাঁকিপুরে দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকে ছোট খেলার ঘর, তাহাদের পশ্চাতে সহরখানা back-groundএর মত দাঁড়াইয়া আছে। এবার ট্রেণ
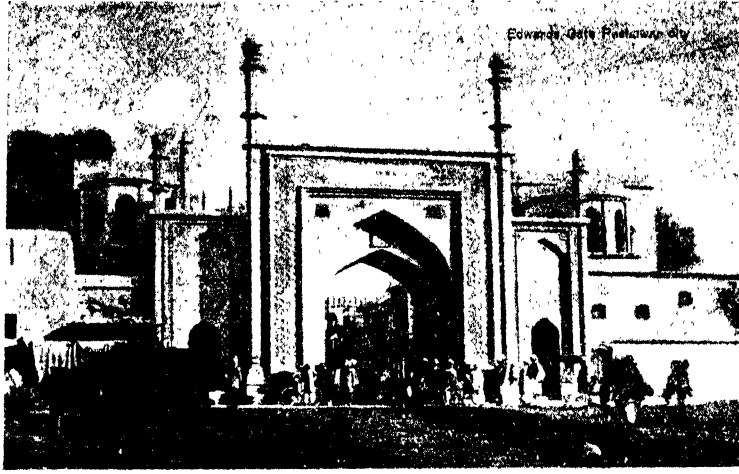
এডওয়াড গেট—পেশোয়ার

রেশমের বাজার - পেশোয়ার

দর্শন করিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তারপর ট্রেণখানা যখন কতকগুলি কাদার পাহাড়ের পাশ দিয়া চলিতে-চলিতে অবশেষে প্রকৃত পাহাড়ের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মনে হইল এইবার বুঝি ভারতের শেষ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু গাড়ী ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিল। চারিদিকে পাহাড়ের সমুদ্র, বুঝি এ পাহাড়-সমুদ্রের অন্ত নাই! মধ্যে-মধ্যে ছোট-ছোট টানেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম, রাস্তাটী বড় সুগম নয়। অবশেষে রাওয়ালপিণ্ডিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম পাহাড় শেষ হইয়াছে, সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছি। তখন রাত্রি নয়টা। গাড়ীতেই বেশ গরম-গরম পোলাও মাংস পাওয়া গেল। রাত্রি ১১টায় আবার গাড়ী চলিল। ক্রমাগত অনাহার ও অনিদ্রায় শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। প্রভাতে যখন গাড়ীখানা পেশোয়ার নগরীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বুঝিতে পারিলাম আটকে সিন্ধুর উপরে যে সেতুটী দেখিব বলিয়া মনে এত আগ্রহ ছিল, নিদ্রার ঘোরে তাহা হইয়া উঠে নাই। ভুবন-বিজয়ী মহাবীর আলেক্‌জান্দার সেইস্থানেই সিন্ধুনদী পার হইয়া পুরুকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ফিরিবার সময়ে দেখিব বলিয়া মনকে আপাততঃ আশ্বস্ত করিতে হইল।

পেশোয়ার নগরের দ্বারেই ষ্টেসন; অদূরেই দুর্গের সম্মুখে Wireless Telegaphyর আকাশস্পর্শী থামগুলি প্রথমেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেথান হইতে আমাদের গন্তব্য পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট বা ছাউনি দুই মাইল মাত্র দূর। অত্যল্পকাল মধ্যেই ট্রেণ ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার নামিবার পালা। গাড়ী হইতে নামিয়াই দেখিলাম গোয়েন্দা-বিভাগের একজন লোক আমাদের বংশ-পরিচয় লিখিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও যথাযথ পরিচয় প্রদান করিয়া যথাস্থানে চলিলাম।

পেশোয়ার যাত্রা করিবার সময় আমরা কোথায় থাকিব, কোথায় উঠিব, তাহার কোনও ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। এই সুদূর দেশে কোনও পরিচিত লোকের প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। থ্যাকারের ডাইরেক্টরীতে ২।৩ জন বাঙ্গালীর নাম পাওয়া গিয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহারা কে এবং এখনও সেথানে আছে কি না, তাহা সন্দেহস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ভবিতব্যতার উপরই নির্ভর করিয়াছিলাম। অবশেষে পথে আসিয়া জানিতে পারিলাম পেশোয়ারে একটি "কালীবাড়ী" আছে, তাহাই পথিক-বাঙ্গালীর একমাত্র আশ্রয়স্থল। গাড়োয়ানকে সেইদিকেই গাড়ী হাঁকাইতে বলা হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়াই ২।৩ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। মন্দিরে যিনি পূজক, তিনি যথন সহাস্যমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন মনে হইল তিনি যেন আমাদের কতকালের পরিচিত; বাস্তবিক, তাঁহার ন্যায়, সরল অমায়িক, সুশিক্ষিত লোক সরকারী চাকুরীর গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াও পূজা-অর্চ্চনা, অতিথিসেবা প্রভৃতি যেরূপ নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা দেখিলে সত্যসত্যই ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁহার গৃহে বাঙ্গালীর চিরপরিচিত ডাল ভাত চচ্চড়ীর আস্বাদন লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম বঙ্গের "মা অন্নপূর্ণা" এথানেও অন্নের থালি হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাহা হউক, এই কালীবাড়ী এবং পশ্চিমের বাঙ্গালী-প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী মাত্রই রসদ-বিভাগের বাঙ্গালী বাবুদের কীর্ত্তি। পথিক-বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা আপনার জিনিষ। দুর্গাপূজা এবং কালীপূজা উপলক্ষে এই স্থানেই আমরা বাঙ্গালী সৈন্যদলের ৫০ জনের সাক্ষাৎলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

পেশোয়ার বলিতে সাধারণতঃ পেশোয়ার সহর ও ক্যাণ্টনমেণ্ট দুইটীকেই এক সঙ্গে ধরা হয়। বাস্তবিক এ দুটী স্বতন্ত্র স্থান; ক্যাণ্টনমেণ্ট সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সরকার-বাহাদুরের প্রথম-শ্রেণীর একটি মিলিটারী ষ্টেসন। সীমান্ত-প্রদেশের চিফ কমিশনার ও তাঁহার সমস্ত আফিস-আদালত এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। ক্যাণ্টনমেণ্টটি সরকার-বাহাদুরের সীমান্তের প্রধান আড্ডা। এই স্থানের চারিদিকে দূরে-দূরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুতর দুর্গ ও চৌকী প্রভৃতি রহিয়াছে। আফ্রিদি, জাথাথেল্, মোমন্দ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিদিগের আক্রমণ হইতে ভারত-সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। বাস্তবিক ক্যাণ্টনমেণ্ট দেশী ও বিলাতী সৈন্যদিগের বাসস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি নাই; এথানে দ্রষ্টব্যও বিশেষ কিছুই নাই। ২।৩টী প্রাথমিক ও হাইস্কুল, খৃষ্টান মিশনরীদিগের পরিচালিত এডওয়াড্‌স্ কলেজ নামক একটি কলেজ, কয়েকটি শিখ ও আর্য্য-সমাজী উপাসনালয় এবং ক্ষুদ্র একটি ধরমশালাই মাত্র উল্লেখযোগ্য স্থান। তবে এ স্থানের Victoria Memorial Hall—আজব্ ঘর বা Museum দর্শকের পক্ষে সামান্য বা উপেক্ষণীয় নহে। এস্থানে Archeological Departmentএর বহু সাধনার ফলসমূহ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। পেশোয়ারের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান এবং সীমান্ত-প্রদেশের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত নানাপ্রকার বৌদ্ধ ও হিন্দু পৌরাণিক মূর্ত্তি, শিলালিপি, নানা প্রাচীন দ্রব্য-সামগ্রী, পার্ব্বত্য-জাতিদিগের স্বহস্ত-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র, লৌহ-শৃঙ্খলময় বর্ম্ম ইত্যাদি অনেক দর্শনীয় জিনিষ এথানে আছে। মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে ৫।৬ ফিট্ উচ্চ প্রকাণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তিই ৫।৬টী,—উপবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন, ক্ষুদ্র বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ও গৌতম বুদ্ধের জীবনকথা লইয়া রচিত নানাপ্রকারের প্রস্তর ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তির সংখ্যা ২০০।৩০০ কম নহে। ইহার পরে হিন্দু পৌরাণিক মূর্ত্তিও প্রচুর সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির গঠন-নৈপুণ্য এবং ভাবব্যঞ্জনা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। শিলা-লিপিগুলির কোনও-কোনটি সুদূর তিব্বত-সীমান্ত হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির সমস্তই সীমান্ত-প্রদেশের নানাস্থানে মাটী খুঁড়িয়া উদ্ধার করা হইয়াছে।

সুদূর সীমান্ত-প্রদেশেও বৌদ্ধপ্রভাব কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, মূর্ত্তিগুলিই তাহার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে।

ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং সহর উভয় স্থানই একটা প্রকাণ্ড Valleyর উপরে স্থাপিত। চারিদিকে ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাহাড়গুলি ১০।১২ মাইল ব্যাসে একটি পরিধি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। সমতল ক্ষেত্রের ভিতরে স্থাপিত বলিয়া উভয় স্থানেই ধূলি এত বেশী যে, একবার একটু ঘরের বাহির হইলে আর রক্ষা নাই—সমস্ত শরীর এবং বস্ত্রাদি ধূলিতে মলিন হইয়া যায়। ইহার উপর যদি একটু সামান্য বাতাস হয়, তবে ধূলিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। ক্যাণ্টনমেণ্ট অপেক্ষাকৃত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ নহে। তথাপি ইহাকে পরিচ্ছন্ন স্থান বলা চলে না। এখানকার "মলরোড্" এবং অন্য ২।১টী রাস্তা ভিন্ন অন্যান্য রাস্তাগুলির অবস্থাও তেমন ভাল নহে।

পেশোয়ার সহরে উপস্থিত হইলেই মনে হয়, যেন ভারতের বাহিরে কোনও একটা স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। সহরটি প্রাচীন, বোধ হয় মুসলমান-আমলে স্থাপিত হইয়াছিল। ২।১টা বড় রাস্তা ভিন্ন অন্য সব গলি সরু, অন্ধকার ও আবর্জ্জনাপূর্ণ; তারপর গলিগুলি এরূপ বাঁকিয়া গিয়াছে যে, একবার চলিতে আরম্ভ করিলে মনে হয় ইহার বুঝি আর শেষ নাই! গলির দুই পাশেই ২।৩ এমন কি চারিতলা মাটী ও কাঠের বাড়ী, পায়রার খোপের মত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দ্বারবিশিষ্ট ও অপ্রসর। তাহাতে রৌদ্র ও বাতাস প্রবেশ করিবার কোন পথ নাই। প্রায় সকল গলিরই দুইদিকে নানাপ্রকার জীবের মাংস সিদ্ধ, দগ্ধ ও অন্যপ্রকারে রান্না হইয়া বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। সেগুলি হইতে এমন দুর্গন্ধ উঠিতেছে যে, বমনোদ্রেক না হইয়া যায় না। বাস্তবিক, মাংস ভক্ষণে পেশোয়ারীরা নির্ব্বিকার —চতুষ্পদের মধ্যে গো, মহিষ কিছুই বাদ পড়ে না, পাখীর মধ্যে চড়ুই হইতে আরম্ভ করিয়া কাক চিল পর্য্যন্ত তাহাদের রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। পেশোয়ার সহরটী অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান রাজত্বের যুগ হইতে একটুও অগ্রসর হয় নাই।

তথাপি এ সহরে আসিলে মনে একটু আনন্দ না হইয়া যায় না। সহরের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কত লোক নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এ দেশের সাধারণ এবং মধ্যবিত্ত লোক এখনও চাকুরীর মোহে ততটা আবিষ্ট হয় নাই; প্রায় সকলেই একটা-একটা ব্যবসা করিতে ভালবাসে। কেহ মাংসের, কেহ রুটীর, কেহ তরকারীর, কেহ ফলের, কেহ বা শিল্পদ্রব্যের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। সহরে উপস্থিত হইলেই ব্যস্ততা ও তৎপরতার একটা ভাব সকলের ভিতরেই লক্ষিত হয়। রেশম, কার্পেট, জুতা, বাঁশের ও বেতের নানাপ্রকারের কাজ, তামার বাসন এবং তাহার উপরে কলাই করার কাজ অনবরত চলিতেছে। ইহা ছাড়া মাটীর উপরে একপ্রকার এনামেলের কাজ এবং নানাপ্রকার কাপড়ের জমির উপরে মোমের কাজ (wax work) এখানকার অভিনবত্ব। অন্য কোথাও এ কাজ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কোনও কোনও কাজ এত সুন্দর এবং মজবুত হয় যে, বিদেশী, আপাতঃ-রমণীয় দ্রব্যসামগ্রী তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে পারে না। পেশোয়ার সহরে দর্শনীয় জিনিষ বিশেষ কিছু না থাকিলেও শিল্পদ্রব্যাদি দেখিবার জিনিষ বটে। কাবুল, পারস্য এবং তুর্কীস্থানের সহিত কারবারী লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কার্পেট, ফল এবং পশমী বস্ত্রাদিই প্রধান পণ্যদ্রব্য। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই এ সকল ব্যবসায় চালাইয়া থাকে।

পেশোয়ারের রেসমবাজার (Silk market) এবং উটের বাজার (Camel market) দুইটি উল্লেখযোগ্য। রেসম বাজারে নানাপ্রকার রেসমী কাপড় প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। উটের বাজারে শত শত উট বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হয়। পার্ব্বত্য-পথে উটই প্রধান যান ও বাহন; এ জন্য তাহার ক্রয়-বিক্রয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে।

সহরটি খুব বড় নহে। লোকসংখ্যা স্থানের অনুপাতে খুব বেশী। তথাপি স্বাস্থ্য সাধারণতঃ মন্দ নহে। বৎসরে দুইটি মাত্র ঋতু—শীত ও গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি এবং শীতকালে অনাবৃষ্টি হইলে সীমান্ত-প্রদেশে এবং পঞ্জাবের উত্তরাংশে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। শীত যেমন হাড়ভাঙ্গা, গ্রীষ্ম তেমনই ভয়ানক। প্রবল গ্রীষ্মের সময়ে সারারাত্রি লোকজন ঘরের ছাদে অথবা খোলা যায়গায় শয়ন করিয়া কাটায়,—তথাপি নিদ্রা হয় না। দিনের বেলায় বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাও কঠিন।

চারিদিক ঝাঁ-ঝাঁ করিতে থাকে। সে সময়ে অনেকেই চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়।

পেশোয়ার সহরের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রাচীর-বেষ্টিত (walled city)। পার্ব্বত্য পাঠান-জাতি এখানে আসিয়া প্রায়ই লুঠ-তরাজ করিত; সেই জন্যই বোধ হয় এ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রাচীরের স্থানে-স্থানে ৮।১০টী প্রবেশদ্বার আছে। রাত্রিতে প্রায় সকল-গুলিই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সহর-প্রাচীরের বাহিরে 'পঞ্চতীর্থ' নামক একটি তীর্থস্থান আছে। তাহাতে পাঁচটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাঁধান পুকুর বা কুণ্ড আছে। অগভীর জলে সর্ব্বদা স্নান করায় জল এত অপরিষ্কার যে, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। বাস্তবিক ইহাকে তীর্থ না বলিয়া স্নানাগার বলিলেই চলে। ২।১ জন সাধু এবং ২।১টী দেবমূর্ত্তিও এখানে দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার মধ্যে মহাদেব ও হনুমানজীর মূর্ত্তিই প্রধান। কুণ্ড-গুলির এক পার্শ্বে একটি কূপ আছে। তাহার জল শীত-গ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে কাণায়-কাণায় পূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। লোকের বিশ্বাস, ইহার জলে স্নান করিলে অনেক রোগের উপশম হয়।

পঞ্চতীর্থ হইতে অল্প দূরে 'সাহীবাগ' নামক একটা বিস্তৃত বাগান। তাহাতে কয়েক প্রকার বিলাতী গাছ ও আঙ্গুর প্রভৃতি দেশীয় বৃক্ষলতাও যথেষ্ট রোপন করা হইয়াছে। সাহীবাগের একাংশ সরকারী পশুশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, ক্যাঙ্গারু, হরিণ প্রভৃতি পশু, এবং অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতীয় কয়েক প্রকার পক্ষীই প্রধান। যাঁহারা কলিকাতার পশুশালা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নূতন দেখিবার কিছুই নাই। পারস্য-দেশীয় গর্দ্দভ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের নেকড়েবাঘ উল্লেখযোগ্য। এই নেকড়েকে আমরা প্রথমতঃ শৃগাল বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু খাঁচার খুব নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এ শৃগাল মানুষ দেখিয়া ভয় করে না। একখণ্ড কাগজে তাহাদের বংশবৃত্তান্ত লেখা রহিয়াছে।

পেশোয়ারে আসিলে 'খাইবার পাশ' (Khyber pass) দেখিবার একটা প্রবল আগ্রহ না জন্মিয়া যায় না। তবে 'পাশে' প্রবেশ করিতে হইলে পাস্ বা অনুমতি-পত্র চাই; বিশেষতঃ এ সকল স্থানে ভ্রমণ করা নিরাপদ নহে। পাঠান দস্যুরা অনেক সময়ে যাত্রীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এবং একটা মূল্য (Ransom) আদায় না করিয়া ছাড়ে না। সুতরাং 'খাইবার' দর্শনের আশা ছাড়িয়া দিয়া ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ সীমা এবং খাইবারের প্রবেশদ্বারটি দেখিবার জন্য একদিন যাত্রা করিলাম। পেশোয়ার হইতে সে স্থান ১২।১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। পেশোয়ার হইতে যামরুদ পর্য্যন্ত ১২ মাইল রেলপথ আছে; সেখান হইতে খাইবারের প্রবেশদ্বার ১ মাইলের বেশী হইবে না। ক্যান্টনমেন্টের সীমা অতিক্রম করিয়াই ট্রেণ এক বিস্তৃত প্রান্তরের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। চারিদিকে শূন্য প্রান্তর দিগন্তে পাহাড়ের চরণমূলে যাইয়া প্রহত হইতেছে; ক্বচিৎ ২।১ খানা মাটির ঘর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রামের সূচনা করিতেছে; তাহাও আবার আনার (ডালিম) এবং আঙ্গুরের বাগানে এত ঘেরা যে, এই প্রান্তরে মনুষ্যের বাস আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রান্তরের ভিতর দিয়া সরু রূপার রেখার ন্যায় ২।১টি অগভীর স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পার্শ্বে ২।১ খানা শস্যক্ষেত্র ও ২।১ দল গরু, মহিষ, সিম্বা ভেড়া দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ট্রেণ ইস্‌লামিয়া কলেজ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্র একটি ষ্টেসনকে সম্মুখে রাখিয়া কলেজের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দালানগুলি উন্মুক্ত, জনশূন্য প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আছে। কলেজটি Residential সুতরাং ছাত্র এবং অধ্যাপকদিগের বাসস্থান প্রভৃতি একত্র করিলে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়াই কলেজের অবস্থিতি। এখানে বি-এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ইহাই সীমান্ত প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেজ। শিক্ষা-প্রণালীতে বিশেষ কিছু নূতনত্ব না থাকিলেও কলেজের অবস্থিতি-স্থানটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। লোকালয়ের বাহিরে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে এই শিক্ষা-মন্দিরটিকে দেখিবামাত্র প্রাচীন কালের মহর্ষিদিগের তপোবনের কথা মনে পড়িয়া যায়। অধ্যাপকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ইউরোপীয়, ২।৩ জন দেশীয় শিক্ষকও আছেন।

ইহার পরে হরিসিং নামক একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসন। নামের সহিত একটু ইতিহাস জড়িত আছে। এই স্থানে মহারাজা

রণজিৎ সিংহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মহারাজা হরিসিংহ একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মহারাজা হরিসিংহ কঠোর শাসনে পাঠানদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। পেশোয়ার সহর তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। শুনিতে পাই, এখনও নাকি পাঠানেরা হরসিংহের নাম শুনিলে ভয় পাইয়া থাকে।

বেলা পাঁচটার সময় যামরুদে গাড়ি পঁহুছিল। ট্রেণ থামিবামাত্র গলায় কার্ট্রিজের মালা পরিয়া, সঙ্গীন-চড়ান বন্দুকহস্তে টিকিট-কলেক্টর মহোদয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম, পাঠানের ভয়েই নাকি তাঁহার এই রণবেশ। ষ্টেসনের অদূরেই যামরুদ দুর্গ; তাহা ছাড়া এ স্থানে গৃহ কিম্বা বৃক্ষাদিও নাই। একটু দূরেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তরেখা অঙ্কিত করিয়া শৈলশ্রেণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশাল সমতল প্রান্তর হইতে হঠাৎ এই পাহাড়গুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী, বিস্তৃত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে যেন গর্ব্বভরে বলিতেছে—"Thus far and no farther"। সম্মুখেই দুইটি উচ্চ পাহাড় এবং তাহাদের অন্তরালেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খাইবার গিরিপথের প্রবেশদ্বার। দুইটি ব্রিটিশ পতাকা পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খাইবারের উপর ইংরেজ প্রভাবের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছে। এ স্থানে আসিলে কত যুগযুগান্তের পুরাতন স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথেই আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ভারতে পদার্পণ করেন। এই পথেই বিদেশী বীরগণ বার-বার ভারতাক্রমণ করিয়া তাহাকে পদানত করিয়াছিলেন। যামরুদের প্রান্তরের প্রতি ধূলিকণা কত সাধু ও মহাবীরের পদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে, কে তাহা বলিতে পারে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এস্থানে মহর্ষি যমদগ্নির আশ্রম ছিল।

ফিরিবার সময় সৌভাগ্যক্রমে গাড়ীতে মেলটাঙ্গা ড্রাইভারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পেশোয়ারে এক্কাকে টাঙ্গা বলে। যে টাঙ্গায় যামরুদ হইতে লাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত ডাক যাতায়াত করে, তাহাকেই মেলটাঙ্গা নাম দেওয়া হইয়াছে। ড্রাইভার খাইবার গিরিপথের অভ্যন্তর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল;—"যামরুদ হইতে লাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত খাইবার পাশের দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ মাইল। পাশটী বেশ চওড়া; দুইখানা মোটর কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী অনায়াসে পাশাপাশি চলিতে পারে। পাশের বাহিরে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের কোনও অধিকার নাই, এমন কি বাহিরে কোনও খুন-খারাপি হইলে সরকার-বাহাদুর তাহার প্রতীকার করিতে বাধ্য নহেন। যামরুদ হইতে ১১ মাইল দূরে আলি মসজিদ্ নামক একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ও ছাউনি আছে। লাণ্ডিকোটালও দুর্গ এবং এখানেও সৈন্যাদি আছে। মেলটাঙ্গা যখন ডাক লইয়া পাশের ভিতর দিয়া যাতায়াত করে, তখন চারিজন অশ্বারোহী তাহার প্রহরী হইয়া সঙ্গে থাকে। তাহা ছাড়া অল্প দূরে দূরে ঘাঁটি আছে; সেখানকার প্রহরীরা মেল্ যাওয়ার এবং আসিবার সময় রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাহারা দিতে দিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়। লাণ্ডিকোটালই ব্রিটিশ রাজ্যের শেষ সীমা; তাহার পরে কাবুলের অধিকার। সপ্তাহে দুই দিন অর্থাৎ মঙ্গল ও শুক্রবারে বণিক-সম্প্রদায় পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া কাবুলে যায় এবং ভারতে আসে। উষ্ট্রই তাহাদের যান এবং বাহন। এই দুই দিনকে Cabul day বলে। পাশে চলিবার পক্ষে এই দুইদিন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

সীমান্ত-প্রদেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে পঞ্জাবী হিন্দু, মুসলমান এবং শিখই অধিক। আচার-ব্যবহারে তাহারা পঞ্জাবে প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করিয়া থাকে। বেশভূষায় হিন্দু মুসলমানে কোনও প্রভেদ নির্ণয় করা সহজ নহে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাজামা এবং কামিজ ব্যবহার করে। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা আপাদমস্তক ঘেরাটোপে ঢাকিয়া রাস্তায় বাহির হয়। হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ভিতরেও অবরোধ-প্রথা অত্যন্ত শিথিল। সকলেই রাস্তায় ঘাটে একাকিনী বাহির হইতেছে। আহারাদি সম্বন্ধে জাতিভেদ খুব কমই রক্ষা হয়। ছোওয়া-ধরাতে কোনও দোষ নাই। হিন্দুর অখাদ্য কোনও জিনিষ ভোজন না করিলেই হইল। নিমন্ত্রণাদিতে বিছানার উপরে বসিয়া আহার করা হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত। শৌচ এবং আচমনে জল প্রায়ই ব্যবহার করা হয় না। বিবাহে কন্যার বয়স-নিরূপণের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। কনের বয়স বরের চেয়ে বেশী হইলেও কোনও দোষ নাই। পঞ্জাবে হিন্দুদিগের ভিতরে নাকি মেয়ের সংখ্যা কম সুতরাং কন্যাপণ না থাকিলেও বিবাহ দেওয়া এখানেও একটি গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশে কন্যার পিতার মান খুব বেশী। শুনিতে পাই পাঁচ বৎসরের বরের সঙ্গে ১৫

রুসিয়ায় ক্ষেত্রপূজা

[চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি রাক্ষার জন্য পুরোহিত ভূমিতে পবিত্র বারি সেচন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষকেরা বীজ বপন করিয়া যাইতেছে।]

Fine Art Ptg. Works.

বৎসরের কনের বিবাহও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ বরের পিতা সুযোগ পাইলে পুত্রের বিবাহটা পূর্ব্বাহ্ণেই সারিয়া রাখেন। তবে তাহাতে যে সকল বিষময় ফলোৎপন্ন হয়, তাহাও সবংশে উপভোগ করিয়া থাকেন। এ সমস্তই যে মুসলমান প্রভাবের ফল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এখানকার হিন্দুদিগের ভিতরে পারিবারিক জীবন বলিতে বিশেষ কিছুই নাই। অনেকের বাড়ীতে রান্নাবান্না প্রায়ই হয় না। প্রায় সকলেই দোকান হইতে রুটী তরকারী কিনিয়া খায়। দিনের বেলা আহারাদির পরে পুরুষেরা নিজ-নিজ কাজে চলিয়া যায়, মেয়েরাও হয় ত কোনও এক বাড়ীতে একত্র হইয়া জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হয়। খেলা যদিও মেয়েদের ভিতরেই আবদ্ধ থাকে, তথাপি এ কুপ্রথাকে পুরুষেরা মন্দচক্ষে দেখে না, কারণ তাহাতে নাকি পারিবারিক বিপ্লব বাধিবার সম্ভাবনা!

সীমান্ত-প্রদেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে পাঠানজাতির বাস। তাহাদের কেহ-কেহ সমতল-ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজ্যে ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পার্ব্বত্য পাঠানের সংখ্যাই অধিক। উহাদের মধ্যে নানা প্রকার জাতি বা খেল্ আছে। দুই একটি খেল্ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশই স্বাধীন। তাহারা "পস্ত" নামক এক প্রকার পারস্য ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। আকার ও বেশভূষায় কাবুলীদিগের সহিত তাহাদের বিশেষ প্রভেদ নাই। অনেকেরই ব্যবসা ডাকাতি। বস্তুতঃ ইহাদের মত দুর্দ্দান্ত জাতি পৃথিবীতে খুব কম আছে। তাহাদের কেহ-কেহ পাহাড়ের উপরে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করে, কেহ-কেহ বা গহ্বরের ভিতরেও বাস করে। শুনিতে পাই, ভয়ানক নিষ্ঠুর-প্রকৃতি হইলেও উহারা না কি খুব অতিথিবৎসল এবং বন্ধুত্ব-পরায়ণ। অতিথিরূপে কিম্বা বন্ধু বলিয়া কেহ গৃহে উপস্থিত হইলে, গৃহস্বামী যথাশক্তি তাহার অভ্যর্থনা ও সেবা করিয়া থাকে; এমন কি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

পেশোয়ারে ১৫।২০ জন বাঙ্গালী একপ্রকার স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলে সরকারের দপ্তরে কেরাণী। একমাত্র ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ এল, এম, এস, স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া থাকেন। সুখের বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার ঔষধালয়ের সঙ্গে একটী স্বদেশী দ্রব্যের দোকানও চালাইতেছেন। কোনও বাঙ্গালী এস্থানে আসিলে অন্ততঃ দুই-এক দিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া নিস্তার পান না। সম্প্রতি তিনি নৌসেরায় বাঙ্গালী সৈনিকদিগের সুখ-সুবিধার জন্য যে প্রকার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

দেবদাস

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি বোধ হয় একটা বাজিয়া গিয়াছে। তখনও ম্লান জ্যোৎস্না আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। পার্ব্বতী বিছানার চাদরে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া ধীর-পদক্ষেপে সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল,—কেহ জাগিয়া নাই। তাহার পর দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়াগ্রামের পথ, একেবারে স্তব্ধ, একেবারে নির্জ্জন—কাহারও সহিত সাক্ষাতের আশঙ্কা ছিল না। সে বিনা বাধায় জমিদার-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ীর উপর বৃদ্ধ দরওয়ান কিষণ সিংহ খাটিয়া বিছাইয়া তখনও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছিল; পার্ব্বতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ না তুলিয়াই কহিল, "কে?" পার্ব্বতী বলিল, "আমি।"

দ্বারবানজী কণ্ঠস্বরে বুঝিল স্ত্রীলোক। দাসী মনে করিয়া, সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতে লাগিল। পার্ব্বতী চলিয়া গেল। গ্রীষ্মকাল; বাহিরে উঠানের উপর কয়েকজন ভৃত্য শয়ন করিয়া ছিল;

তাহাদের মধ্যে কেহ-বা নিদ্রিত, কেহ-বা অর্দ্ধ-জাগরিত। তন্দ্রার ঘোরে কেহ-বা পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু দাসী ভাবিয়া কথা কহিল না। পার্ব্বতী নির্ব্বিঘ্নে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। এ বাটীর প্রতি কক্ষ, প্রতি গবাক্ষ তাহার পরিচিত। দেবদাসের ঘর চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কপাট খোলা ছিল, এবং ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। পার্ব্বতী ভিতরে আসিয়া দেখিল, দেবদাস শয্যায় নিদ্রিত। শিয়রের কাছে কি এক-খানা বই তখনও খোলা পড়িয়া ছিল,—ভাবে বোধ হইল, সে এইমাত্র যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সে দেবদাসের পায়ের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল। দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়ীটা শুধু টক্-টক্ শব্দ করিতেছে, ইহা ভিন্ন সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত সুপ্ত।

পায়ের উপর হাত রাখিয়া পার্ব্বতী ধীরে-ধীরে ডাকিল, "দেবদা!—" দেবদাস ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন ডাকিতেছে। চোখ না চাহিয়াই সাড়া দিল "উঁ—"

"ও দেবদা—" এবার দেবদাস চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতীর মুখে আবরণ নাই, ঘরে দীপও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে; সহজেই দেবদাস চিনিতে পারিল। কিন্তু প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। তাহার পর কহিল—"এ কি! পারু না কি?" "হাঁ, আমি।" দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় বাড়িল—কহিল,"এত রাত্রে?" পার্ব্বতী উত্তর দিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে কি একলা এসেছ না কি?' পার্ব্বতী বলিল, "হাঁ।" দেবদাস উদ্বেগে, আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, "বল কি! পথে ভয় করেনি?" পার্ব্বতী মৃদু হাসিয়া কহিল, "ভূতের ভয় আমার তেমন করে না!" "ভূতের ভয় না করুক, কিন্তু মানুষের ভয় ত করে! কেন এসেচ?"

পার্ব্বতী জবাব দিল না, কিন্তু মনে-মনে কহিল, "এ সময়ে আমার তাও বুঝি নেই।" "বাড়ী ঢুক্‌লে কি কোরে? কেউ দেখে নি ত?" "দরওয়ান দেখেচে।" দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিল,—"দরওয়ান দেখেচে? আর কেউ?" "উঠানে চাকরেরা শুয়ে আছে—তাদের মধ্যেও বোধ হয় কেউ দেখে থাক্‌বে।" দেবদাস বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। "কেউ চিন্‌তে পেরেছে কি?" পার্ব্বতী কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, "তারা সবাই আমাকে জানে। হয় ত বা কেউ চিনে থাক্‌বে।" "বল কি? এমন কাজ কেন কর্‌লে পারু?" পার্ব্বতী মনে-মনে কহিল, "তা' তুমি কেমন কোরে বুঝ্‌বে?" কিন্তু কোন কথা কহিল না,—অধোবদনে বসিয়া রহিল। "এত রাত্রে! ছি—ছি! কাল মুখ দেখাবে কেমন কোরে?" মুখ নীচু করিয়াই পার্ব্বতী বলিল, "আমার সে সাহস আছে।" কথা শুনিয়া দেবদাস রাগ করিল না, কিন্তু নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "ছি ছি—এখনও কি তুমি ছেলেমানুষ আছ? এখানে, এ ভাবে আস্‌তে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হল না?" পার্ব্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, "কিছু না।" "কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না?" প্রশ্ন শুনিয়া পার্ব্বতী তীব্র অথচ করুণ দৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া অসঙ্কোচে কহিল, "মাথা কাটাই যেতো—যদি না আমি নিশ্চয় জানতুম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।" দেবদাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "আমি! কিন্তু আমিই কি মুখ দেখাতে পারব?"

পার্ব্বতী তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—"তুমি? কিন্তু তোমার কি দেবদা?" একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, "তুমি পুরুষ মানুষ। আজ না হয় কাল তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলবে; দু'দিন পরে কেউ মনে রাখবে না—কবে কোন্ রাত্রে হতভাগিনী পার্ব্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে সমস্ত তুচ্ছ কোরে এসেছিল।" "ওকি পারু?" "—আর আমি—" মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবদাস কহিল—"আর তুমি?" "আমার কলঙ্কের কথা বোল্‌চ? না,—আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম বলে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না।" "ও কি পারু? কাঁদ্‌চ? "দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?" সহসা দেবদাস পার্ব্বতীর হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিল—"পার্ব্বতী!" পার্ব্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদা!" তাহার পর দুই

জনেই চুপ করিয়া রহিল। দেবদাসের পা বহিয়া অনেক ফোঁটা অশ্রু শুভ্র শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে দেবদাস পার্ব্বতীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?" পার্ব্বতী কথা কহিল না। তেমনি করিয়া পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পড়িয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শুধু তাহার অশ্রু-ব্যাকুল, ঘন দীর্ঘশ্বাস ফুলিয়া-ফুলিয়া, ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। টং টং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল। দেবদাস্ ডাকিল, "পারু?" পার্ব্বতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"কি?" "বাপমায়ের একেবারে অমত, তা শুনেচ?" পার্ব্বতী মাথা নাড়িয়া জবাব দিল যে, সে শুনিয়াছে। তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, দেবদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"তবে আর কেন?"

জলে ডুবিয়া মানুষ যেমন করিয়া অন্ধভাবে মাটী চাপিয়া ধরে, সেটা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, ঠিক তেমনি করিয়া পার্ব্বতী অজ্ঞানের মত দেবদাসের পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। মুখপানে চাহিয়া কহিল,—"আমি কিছুই জান্‌তে চাইনে, দেবদা!" "পারু, বাপমায়ের অবাধ্য হব?" "দোষ কি! হও।" "তুমি তা' হলে কোথায় থাক্‌বে?" পার্ব্বতী কাঁদিয়া বলিল "তোমার পায়ে—"আবার দুইজন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘড়ীতে চারিটা বাজিয়া গেল। গ্রীষ্মকালের রাত্রি, আর অল্পক্ষণেই প্রভাত হইবে দেখিয়া দেবদাস পার্ব্বতীর হাত ধরিয়া কহিল—"চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি—" "আমার সঙ্গে যাবে?" "ক্ষতি কি? যদি দুর্ণাম রটে, হয় ত কতকটা উপায় হতে পার্‌বে—" "তবে চল।" উভয়ে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন পিতার সহিত দেবদাসের অল্প ক্ষণের জন্য কথাবার্ত্তা হইল।

পিতা কহিলেন, "তুমি চিরদিন আমাকে জ্বালাতন করিয়াছ, যতদিন বাঁচিব ততদিনই জ্বালাতন হইতে হইবে। তোমার মুখে এ কথায় আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।"

দেবদাস নিঃশব্দে অধোবদনে বসিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, "আমি ইহার ভিতর নাই। যা ইচ্ছা হয়, তুমি ও তোমার জননীতে মিলিয়া কর!" দেবদাসের জননী এ কথা শুনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,—"বাবা, এতও আমার অদৃষ্টে ছিল!"

সেই দিন দেবদাস তোড়জোড় বাঁধিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল।

পার্ব্বতী এ কথা শুনিয়া কঠোর মুখে আরও কঠিন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। গত রাত্রের কথা কেহই জানে না, সেও কাহাকে কহিল না। তবে মনোরমা আসিয়া ধরিয়া বসিল, "পারু, শুন্‌লাম, দেবদাস চলে গেছে?" "হাঁ—"

"তবে, তোর কি উপায় করেচে?" উপায়ের কথা সে নিজেই জানে না, অপরকে কি বলিবে? আজ কয় দিন হইতে সে নিরন্তর ইহাই ভাবিতেছিল; কিন্তু কোন ক্রমেই স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, তাহার আশা কতখানি এবং নিরাশা কতখানি। তবে একটা কথা এই যে, মানুষ এমনি দুঃসময়ের মাঝে আশা-নিরাশার কুল-কিনারা যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্ব্বল মন বড় ভয়ে-ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া ধরিয়া থাকে। যেটা হইলে তাহার মঙ্গল, সেইটাই আশা করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেইদিক পানেই নিতান্ত উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতে চাহে। পার্ব্বতীর এই অবস্থায় সে কতকটা জোর করিয়া আশা করিতেছিল যে, কাল রাত্রের কথাটা নিশ্চয়ই বিফল হইবে না। বিফল হইলে তাহার দশা কি হইবে, এটা তাহার চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল।—তাই সে ভাবিতেছিল, "দেবদাদা আবার আবার আসিবে, আবার আমাকে ডাকিয়া বলিবে, 'পারু, তোমাকে আমি সাধ্য থাকিতে পরের হাতে দিতে পারিব না'।"

কিন্তু দিন-দুই পরে পার্ব্বতী এইরূপ পত্র পাইল—

"পার্ব্বতী, আজ দুই দিন হইতে তোমার কথাই ভাবিয়াছি। পিতা-মাতার কাহারও ইচ্ছা নহে যে আমাদের বিবাহ হয়। তোমাকে সুখী করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এত বড় আঘাত দিতে হইবে, যাহা আমার দ্বারা অসাধ্য। তা ছাড়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ কাজ করিবই বা কেমন করিয়া? তোমাকে আর যে কখন পত্র লিখিব, আপাততঃ এমন কথা ভাবিতে পারিতেছি না। তাই এই

পত্রেই সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি। তোমাদের ঘর নীচু। বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে মা কোনমতেই ঘরে আনিবেন না; এবং ঘরের পাশে কুটুম্ব, ইহাও তাঁহার মতে নিতান্ত কদর্য্য। বাবার কথা,—সে ত তুমি সমস্তই জান। সে রাত্রের কথা মনে করিয়া বড় ক্লেশ পাইতেছি। কারণ, তোমার মত অভিমানিনী মেয়ে কত বড় ব্যথায় যে সে কাজ পারিয়াছিল, সে আমি জানি।

"আর এক কথা—তোমাকে আমি যে বড় ভালবাসিতাম তাহা আমার কোন দিন মনে হয় নাই;—আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না। শুধু এই আমার বড় দুঃখ যে, তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে। চেষ্টা করিয়া আমাকে ভুলিও, এবং, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সফল হও।

দেবদাস।"

পত্রখানা যতক্ষণ দেবদাস ডাকঘরে নিক্ষেপ করে নাই, তত ক্ষণ এক কথা ভাবিয়াছিল; কিন্তু রওনা করিবার পর-মুহূর্ত্ত হইতেই অন্য কথা ভাবিতে লাগিল। হাতের ঢিল ছুড়িয়া দিয়া সে একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। একটা অনির্দ্দিষ্ট শঙ্কা তাহার মনের মাঝে ক্রমে-ক্রমে জড় হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এ ঢিল্‌টা তাহার মাথার কি ভাবে পড়িবে। খুব লাগিবে কি? বাঁচিবে ত? সে রাত্রে পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সে কেমন করিয়া কাঁদিয়াছিল, পোষ্টাফিস হইতে বাসায় ফিরিবার পথে প্রতি পদক্ষেপেই দেবদাসের ইহাই মনে পড়িতেছিল। কাজটা ভাল হইল কি? এবং সকলের উপর দেবদাস এই ভাবিতেছিল যে, পার্ব্বতীর নিজের যখন কোন দোষ নাই—তবে কেন পিতা-মাতা নিষেধ করেন? বয়সের বৃদ্ধির সহিত, এবং কলিকাতায় থাকিয়া, সে এই কথাটা বুঝিতে পারিতেছিল যে, শুধু লোক দেখান কুলমর্য্যাদা এবং একটা হীন খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া নিরর্থক একটা প্রাণনাশ করিতে নাই। যদি পার্ব্বতী না বাঁচিতে চাহে,—যদি সে নদীর জলে অন্তরের জ্বালা জুড়াইতে ছুটিয়া যায়, তা হইলে বিশ্বপিতার চরণে কি একটা মহা-পাতকের দাগ পড়িবে না?

বাসায় আসিয়া দেবদাস আপনার ঘরে শুইয়া পড়িল। আজকাল সে একটা মেসে থাকে। মাতুলের আশ্রয় সে অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছে,—সেখানে তাহার কিছুতেই সুবিধা হইত না। যে ঘরে দেবদাস থাকে, তাহারই পাশের ঘরে চুণিলাল বলিয়া একজন যুবক আজ নয় বৎসর হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই দীর্ঘ কলিকাতা বাস বি-এ, পাশ করিবার জন্য অতিবাহিত হইয়াছে—আজিও সফলকাম হইতে পারেন নাই বলিয়া এখনো এই-খানেই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে। চুণিলাল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন,—ভোর নাগাইদ বাটী ফিরিবেন। বাসায় আর কেহ এখনও আসেন নাই। ঝি আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল, দেবদাস দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার পর একে-একে সকলে ফিরিয়া আসিল। খাইবার সময় দেবদাসকে ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে উঠিল না। চুণিলাল কোন দিন রাত্রে বাসায় আসে না, আজিও আসে নাই।

তখন রাত্রি ১টা বাজিয়া গিয়াছে। বাসায় দেবদাস ব্যতীত কেহই জাগিয়া নাই। চুণিলাল গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ কিন্তু আলো জ্বলিতেছে; ডাকিল, "দেবদাস কি জেগে আছ না কি হে?" দেবদাস ভিতর হইতে কহিল, "আছি। তুমি এর মধ্যে ফির্‌লে যে?" চুণিলাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"হাঁ শরীরটা আজ ভাল নেই" বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দেবদাস একবার দ্বার খুলিতে পার? "পারি, কেন?" "তামাকের জোগাড় আছে?" "আছে।" বলিয়া দেবদাস দ্বার খুলিয়া দিল। চুণিলাল তামাক সাজিতে বসিয়া কহিল, "দেবদাস, এখনো জেগে কেন?" "রোজরোজই কি ঘুম হয়? "হয় না?" চুণিলাল যেন একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "আমি ভাবতুম তোমাদের মত ভাল ছেলেরা কখনো দুপুর রাত্রের মুখ দেখেনি—আমার আজ একটা নূতন শিক্ষা হ'ল।" দেবদাস কথা কহিল না। চুণিলাল আপনার মনে তামাক খাইতে-খাইতে কহিল, "দেবদাস, বাড়ী থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত যেন ভাল নেই। তোমার মনে যেন কি ক্লেশ আছে।" দেবদাস অন্যমনস্ক হইয়াছিল। জবাব দিল না। "মনটা ভাল নেই না হে?" দেবদাস হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ব্যগ্রভাবে তাহার

মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা চুণিবাবু, তোমার মনে কি কোন ক্লেশ নেই?" চুণিলাল হাসিয়া উঠিল—"কিছু না।" "কখন এ জীবনে ক্লেশ পাওনি?" "এ কথা কেন?" "আমার শুনতে বড় সাধ হয়।" "তা'হলে আর একদিন শুনো।" দেবদাস বলিল, "আচ্ছা চুণি, তুমি সারা রাত্রি কোথায় থাক?" চুণিলাল মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা কি তুমি জান না?" "জানি, কিন্তু ঠিক জানিনে।" চুণিলালের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এসব আলোচনার মধ্যে আর কিছু না থাক, একটা চক্ষু-লজ্জাও যে আছে, দীর্ঘ অভ্যাসের দোষে সে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিল। কৌতুক করিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিল, "দেবদাস, ভাল কোরে জানতে হোলে কিন্তু ঠিক আমার মত হওয়া চাই। কাল আমার সঙ্গে যাবে?" দেবদাস একবার ভাবিয়া দেখিল। তাহার পর কহিল, "শুনি সেখানে নাকি খুব আমোদ পাওয়া যায়। কোন কষ্ট মনে থাকে না; এ কি সত্যি?" "একেবারে খাঁটি সত্যি।" "তা' যদি হয়, ত আমাকে নিয়ে যোয়ো—আমি যাবো।"

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে, চুণিলাল দেবদাসের ঘরে আসিয়া দেখিল, সে ব্যস্তভাবে জিনিসপত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া লইতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে, যাবে না।" দেবদাস কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, "হাঁ, যাবো বই কি।" "তবে এসব কি কোরচ?" "যাবার উদ্যোগ করচি।" চুণিলাল ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, মন্দ উদ্যোগ নয়; কহিল, "ঘরবাড়ী কি সব সেখানে নিয়ে যাবে না কি হে?" "তবে কার কাছে রেখে যাব?" চুণিলাল বুঝিতে পারিল না। কহিল, "জিনিসপত্র আমি কার কাছে রেখে যাই? সব ত' বাসায় পড়ে থাকে?" দেবদাস যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া চোখ তুলিল। লজ্জিত হইয়া কহিল,—"চুণিবাবু আজ আমি বাড়ী যাচ্চি।" "সে কি হে? কবে আসবে?" দেবদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি আর আসব না।" বিস্ময়ে চুণিলাল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেবদাস কহিতে লাগিল,—"এই টাকা নাও, আমার যা' কিছু ধার আছে, এই থেকে শোধ করে' দিয়ো। যদি কিছু বাঁচে, বাসার দাসী-চাকরকে বিলিয়ে দিয়ো। আমি আর কখনো কলকাতায় ফিরব না।" মনে-মনে বলিতে লাগিল, "কলকাতায় এসে আমার অনেক গেছে, অনেক গেছে।" আজ যৌবনের কুয়াসাচ্ছন্ন আঁধার ভেদ করিয়া তাহার চোখে পড়িতেছে—সেই দুর্দ্দান্ত, দুর্ব্বিনীত কিশোর বয়সের সেই অযাচিত পদ-দলিত রত্ন আজ সমস্ত কলিকাতার তুলনাতেও যেন অনেক বড়, অনেক দামী। চুণিলালের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "চুণি, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, উন্নতি—যা কিছু, সব সুখের জন্য। যেমন কোরেই দেখ না কেন, নিজের সুখ বাড়ানো ছাড়া এ সকল আর কিছুই নয়—" চুণিলাল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে তুমি কি আর লেখাপড়া কোরবে না, না কি?" "না। লেখাপড়ার জন্যে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আগে যদি জানতাম, এত-খানির বদলে আমার এইটুকু লেখাপড়া হবে, তা'হলে আমি জন্মে কখনো কলিকাতার মুখ দেখতাম না।" "তোমার হয়েছে কি?" দেবদাস ভাবিতে বসিল; কিছু-ক্ষণ পরে কহিল,—"আবার যদি কখন দেখা হয়, সব কথা বলব?" রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। বাসার সকলে এবং চুণিলাল নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, দেবদাস গাড়ীতে সমস্ত দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া চিরদিনের মত বাসা পরিত্যাগ করিয়া বাটী চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে চুণিলাল রাগ করিয়া বাসার অপর সকলকে বলিতে লাগিল,—"এই রকম ভিজে-বেরাল-গোছ লোকগুলোকে আদতে চিনিতে পারা যায় না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সতর্ক এবং অভিজ্ঞ লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা চক্ষুর নিমিষে কোন দ্রব্যের দোষগুণ সম্বন্ধে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করে না—সবটুকুর বিচার না করিয়া, সবটুকুর ধারণা করিয়া লয় না; দুটো দিক দেখিয়া চারি দিকের কথা কহে না। কিন্তু আর এক রকমের লোক আছে, যাহারা ঠিক ইহার উল্টা। কোন জিনিস বেশিক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার ধৈর্য্য ইহাদের নাই। কোন কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে—ইহা ভাল কিংবা মন্দ। তলাইয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া লয়। এ সকল লোক যে জগতে কাজ করিতে পারে না, তাহা নহে; বরঞ্চ অনেক সময়ে বেশি কাজ করে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ইহাদিগকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে দেখিতে পাওয়া

যায়। আর না হইলে, অবনতির গভীর কন্দরে চিরদিনের জন্য শুইয়া পড়ে; আর উঠিতে পারে না, আর বসিতে পারে না, আর আলোকের পানে চাহিয়া দেখে না; নিশ্চল, মৃত, জড়পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ দেবদাস। পরদিন প্রাতঃকালে সে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "দেবা, কলেজের কি আবার ছুটি হ'ল?" দেবদাস "হাঁ" বলিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় চলিয়া গেল। পিতার প্রশ্নেও সে এম্‌নি কি-একটা জবাব দিয়া পাশ-কাটাইয়া সরিয়া গেল। তিনি ভাল বুঝিতে না পারিয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া কহিলেন, "গরম এখনো কমেনি বলে আবার ছুটি হয়েচে।" দিন-দুই দেবদাস ছটফট্‌ করিয়া বেড়াইল। কেন না, যাহা কল্পনা—তাহা হইতেছে না—পার্ব্বতীর সহিত নির্জ্জনে মোটেই সাক্ষাৎ হইল না। দিন-দুই পরে পার্ব্বতীর জননী দেবদাসকে সুমুখে পাইয়া বলিলেন, "যদি এসেছিস বাছা, ত পারুর বিয়ে পর্য্যন্ত থেকে যা।" দেবদাস কহিল "আচ্ছা।"

দুপুরবেলা আহারাদি শেষ হইবার পর পার্ব্বতী নিত্য বাঁধে জল আনিতে যাইত। কক্ষে পিত্তল কলসী লইয়া আজিও সে ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিতে পাইল, অদূরে একটা কুলগাছের আড়ালে দেবদাস জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। একবার তাহার মনে হইল ফিরিয়া যায়; একবার মনে হইল নিঃশব্দে জল লইয়া প্রস্থান করে;—কিন্তু তাড়াতাড়ি কোন কাজটাই সে করিতে পারিল না। কলসীটা ঘাটের উপর রাখিতে গিয়া বোধ হয় একটু শব্দ হওয়ায় দেবদাস চাহিয়া দেখিল। তাহার পর হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, "পারু, শুনে যাও।" পার্ব্বতী ধীরে-ধীরে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেবদাস একটিবার মাত্র মুখ তুলিল, তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে জলের পানে চাহিয়া রহিল। পার্ব্বতী কহিল, "দেবদা, আমাকে কিছু বোল্‌বে?" দেবদাস কোন দিকে না চাহিয়া কহিল,—"হুঁ,—বোসো।" পার্ব্বতী বসিল না, আনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত যখন কোন কথাই হইল না, তখন পার্ব্বতী এক-পা, এক-পা করিয়া ধীরে-ধীরে ঘাটের দিকে ফিরিয়া চলিতে লাগিল। দেবদাস একবার মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার পর পুনরায় জলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, "শোন।" পার্ব্বতী ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তথাপি দেবদাস আর কোন কথা কহিতে পারিল না, দেখিয়া সে আবার ফিরিয়া গেল। দেবদাস নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সে ফিরিয়া দেখিল, পার্ব্বতী জল লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে। তখন সে ছিপ গুটাইয়া ঘাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "আমি এসেচি।" পার্ব্বতী ঘড়াটা শুধু নামাইয়া রাখিল, কথা কহিল না। "আমি এসেছি পারু!" পার্ব্বতী কিছুক্ষণ কথা না কহিয়া, শেষে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" "তুমি আস্‌তে লিখেছিলে, মনে নেই?" "না।" "সে কি পারু! সে রাত্রের কথা মনে পড়ে না?" "তা পড়ে। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি?" তাহার কণ্ঠস্বর স্থির, কিন্তু অতি রুক্ষ। কিন্তু দেবদাস তাহার মর্ম্ম বুঝিল না; কহিল, "আমাকে মাপ কর, পারু। আমি তখন অত বুঝিনি।" "চুপ কর। ও সব কথা আমার শুন্‌তেও ভাল লাগে না।" "আমি যেমন করিয়া পারি, মা-বাপের মত করিব। শুধু তুমি—" পার্ব্বতী দেবদাসের মুখপানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"তোমার মা-বাপ আছেন, আমার নেই? তাঁদের মতামতের প্রয়োজন নেই?" দেবদাস লজ্জিত হইয়া কহিল, "তা' আছে বৈ কি পারু, কিন্তু তাঁদের ত অমত নেই,—তুমি শুধু—" "কি কোরে জান্‌লে, তাঁদের অমত নেই? সম্পূর্ণ অমত।" দেবদাস হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিল,—"না গো, তাঁদের একটুকুও অমত নেই—সে আমি বেশ জানি। শুধু তুমি—" পার্ব্বতী কথার মাঝখানেই তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"শুধু আমি! তোমার সঙ্গে? ছিঃ—" চক্ষের পলকে দেবদাসের দুই চক্ষু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে কহিল "পার্ব্বতী! আমাকে কি ভুলে গেলে?" প্রথমটা পার্ব্বতী থতমত খাইল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া শান্ত-কঠিন স্বরে জবাব দিল, "না ভুল্‌ব কেন! ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসচি, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত ভয় কোরে আস্‌চি—তুমি কি তাই আমাকে ভয় দেখাতে এসেচ? কিন্তু আমাকেই কি তুমি চেনো না?" বলিয়া সে নির্ভীক দুই চক্ষু তুলিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে দেবদাসের বাক্য-নিঃসরণ হইল না; পরে কহিল, "চিরকাল ভয় কোরেই আমাকে এসেচ,—আর কিছু না?" পার্ব্বতী দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আর কিছুই না।" "সত্যি বলচ?" "হাঁ, সত্যিই

বল্‌চি। তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নেই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান, বুদ্ধিমান,—শান্ত এবং স্থির। তিনি ধার্ম্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল-কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মত একজন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দ্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতে দেবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।" একবার দেবদাস একটুখানি ইতস্ততঃ করিল; একবার যেন একটু পথ ছাড়িতেও উদ্যত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়পদে মুখ তুলিয়া কহিল— "এত অহঙ্কার!" পার্ব্বতী বলিল, "নয় কেন? তুমি পার, আমি পারিনে? তোমার রূপ আছে, গুণ নেই—আমার রূপ আছে, গুণও আছে। তোমরা বড়লোক, কিন্তু আমার বাবাও ভিক্ষে করে বেড়ান না। তা' ছাড়া, দু'দিন পরে আমি নিজেও তোমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন থাকবো না, সে তুমি জানো?" দেবদাস অবাক্ হইয়া গেল। পার্ব্বতী পুনরায় কহিয়া উঠিল,— "তুমি ভাবচ যে, আমার অনেক ক্ষতি কর্‌বে। অনেক না হোক, কিছু ক্ষতি করিতে পার বটে, সে আমি জানি। বেশ, তাই কোরো। আমাকে শুধু পথ ছেড়ে দাও।" দেবদাস হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, "ক্ষতি কেমন কোরে কোরব?" পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল— "অপবাদ দিয়ে। তাই দাওগে যাও।" কথা শুনিয়া দেবদাস বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"অপবাদ দেব আমি!" পার্ব্বতী বিষের মত একটুখানি ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, "যাও, শেষ সময়ে আমার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়ে দাওগে; সে রাত্রে তোমার কাছে একাকী গিয়েছিলাম, এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র কোরে দাওগে। মনের মধ্যে অনেক খানি সান্ত্বনা পেতে পারবে।" বলিয়া পার্ব্বতীর দর্পিত ক্রুদ্ধ ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া-কাঁপিয়া থামিয়া গেল। কিন্তু দেবদাসের বুকের ভিতরটায় রাগে, অপমানে অগ্ন্যুৎ-পাতের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। সে অব্যক্তস্বরে কহিল, "মিথ্যে দুর্ণাম রটিয়ে মনের মধ্যে সান্ত্বনা পাব আমি?" এবং পরক্ষণেই সে ছিপের মোটা বাঁটটা সজোরে ঘুরাইয়া ধরিয়া ভীষণ কণ্ঠে কহিল, "শোন পার্ব্বতী,—অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়।" বলিয়া গলাটা একটু খাট করিয়া কহিল,—"দেখতে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কাল দাগ; পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভোম্‌রা বসে থাকে। এস, তোমারও মুখে কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।" দেবদাসের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে দৃঢ়-মুষ্টিতে ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া লইয়া সজোরে পার্ব্বতীর মাথায় আঘাত করিল; সঙ্গে-সঙ্গেই কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচে পর্য্যন্ত চিরিয়া গেল। চক্ষের নিমিষে সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল। পার্ব্বতী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "দেবদা, কোরলে কি!" দেবদাস ছিপটা টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে-দিতে স্থিরভাবে উত্তর দিল "বেশী কিছু নয়,—সামান্য খানিকটে কেটে গেছে মাত্র।" পার্ব্বতী আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—"ও গো, দেবদা!" দেবদাস নিজের পাতলা জামার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, জলে ভিজাইয়া পার্ব্বতীর কপালের উপর বাঁধিতে-বাঁধিতে কহিল, "ভয় কি পারু! এ আঘাত শীঘ্র সেরে যাবে —শুধু দাগ থাক্‌বে। যদি কেউ কখনো এ কথা জিজ্ঞাসা করে, মিথ্যা কথা বোলো; না হয়, সত্য বোলে নিজের কলঙ্কের কথা নিজেই প্রকাশ কোরো।" "ও গো, মা গো" "ছিঃ, অমন করে না পারু। শেষ বিদায়ের দিনে শুধু একটুখানি মনে রাখবার মত চিহ্ন রেখে গেলাম। অমন সোণার মুখ আরসিতে মাঝে-মাঝে দেখ্‌বে ত?" বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিতে উদ্যত হইল। পার্ব্বতী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "দেবদাদা গো—" দেবদাস ফিরিয়া আসিল। চোখের কোণে এক-ফোঁটা জল। বড় স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল, "কেন রে পারু!" "কাউকে যেন বোলো না।" দেবদাস নিমেষে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পার্ব্বতীর চুলের উপর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, "ছিঃ—তুই কি আমার পর পারু? তোর মনে নেই, দুষ্টামি কোরলে ছেলেবেলায় কত তোর কাণ মলে দিয়েছি।" "দেবদাদা—মাপ কর আমাকে।" "তা' তোকে বল্‌তে হবে না ভাই। সত্যিই কি পারু, আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস? কবে তোর ওপর রাগ কোরেছিলাম? কবে মাপ করিনি?" "দেবদাদা—" "পার্ব্বতী, তুমি ত জানো, আমি বেশী কথা বল্‌তে পারিনে; বেশি ভেবে-চিন্তে কাজ কোরতেও পারিনে। যখন যা মনে হয় করি।" বলিয়া দেবদাস পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ

করিয়া বলিল, "তুমি ভালই করেছ। আমার কাছে তুমি হয় ত সুখ পেতে না; কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটত।"

এই সময় বাঁধের অন্য দিকে কাহারা আসিতেছিল। পার্ব্বতী ধীরে-ধীরে জলে আসিয়া নামিল। দেবদাস চলিয়া গেল। পার্ব্বতী যখন বাটী ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুরমা না দেখিয়াই কহিতেছিলেন, "পারু, পুকুর খুঁড়ে কি জল আন্‌চিস দিদি!" কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পার্ব্বতীর মুখপানে চাহিবা-মাত্রই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও মা গো! এ সর্ব্বনাশ কেমন কোরে হ'ল!" ক্ষত-স্থান দিয়া তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল; বস্ত্রখণ্ড প্রায় সমস্তটাই রক্তে রাঙা। কাঁদিয়া কহিলেন, "ও গো মা গো! তোর যে বিয়ে পারু!" পার্ব্বতী স্থিরভাবে কলসী নামাইয়া রাখিল। মা আসিয়া কাঁদিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এ সর্ব্বনাশ কি কোরে হোলো, পারু!" পারু সহজভাবে বলিল, "ঘাটে পা-পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম। ইঁটে মাথা লেগে কেটে গেছে।" তাহার পর সকলে মিলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেবদাস সত্য কথাই কহিয়াছিল,—আঘাত বেশি নয়। চার-পাঁচ দিনেই শুকাইয়া উঠিল। আরো আট-দশ দিন অমনি গেল। তাহার পর এক দিন রাত্রে হাতীপোতা গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী বর সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। উৎসবে ঘটা-পটা তেমন হইল না। ভুবনবাবু নির্ব্বোধ লোক ছিলেন না,—প্রৌঢ় বয়সে আবার বিবাহ করিতে আসিয়া ছোকরা সাজাটা ভাল বোধ করেন নাই।

বরের বয়স চল্লিশের নীচে নহে,—কিছু উপর; গৌর বর্ণ, মোটা-সোটা নন্দদুলাল ধরণের শরীর। কাঁচা-পাকা গোঁফ, মাথার সামনে একটু টাক। বর দেখিয়া কেহ হাসিল, কেহ চুপ করিয়া রহিল। ভুবনবাবু শান্ত, গম্ভীর মুখে, কতকটা যেন অপরাধীর মত, ছালনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাণমলা প্রভৃতি অত্যাচার-উপদ্রব হইল না; কারণ, অতখানি বিজ্ঞ-গম্ভীর লোকের কাণে কাহারই হাত উঠিল না। শুভদৃষ্টির সময় পার্ব্বতী কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। ওষ্ঠের কোণে একটু হাসির রেখা,—ভুবনবাবু ছেলেমানুষটির মত দৃষ্টি অবনত করিলেন। পাড়ার মেয়েরা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রবীণ জামাতা লইয়া তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জমীদার নারাণ মুখুয্যে আজ কন্যাকর্ত্তা। পাকা লোক—কোন পক্ষে, কোন দিকেই ত্রুটি হইল না। শুভকর্ম্ম সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে চৌধুরী মহাশয় এক বাক্স অলঙ্কার বাহির করিয়া দিলেন। পার্ব্বতীর সর্ব্বাঙ্গে সে সকল ঝল্-মল্ করিয়া উঠিল। জননী তাহা দেখিয়া আঁচল দিয়া চোখের কোণ মুছিলেন। নিকটে জমিদার-গৃহিনী দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি সস্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আজ চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস্‌নে দিদি!" সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মনোরমা পার্ব্বতীকে একটা নির্জ্জন ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া আশীর্ব্বাদ করিল,—"যা হল, ভালই হল। এখন থেকে দেখ্‌বি—কত সুখে থাক্‌বি।" পার্ব্বতী অল্প হাসিয়া বলিল, "তা থাক্‌ব। যমের সঙ্গে কাল একটুখানি পরিচয় হয়েছে কি না!"

"ও কি কথা রে!" "সময়ে সব দেখ্‌তে পাবি।" মনোরমা তখন অন্য কথা পাড়িল; কহিল, "একেবার ইচ্ছে করে, দেবদাসকে ডেকে এনে এই সোণার প্রতিমা দেখাই!" পার্ব্বতীর যেন চমক ভাঙ্গিল। "পারিস্ দিদি? একবার ডেকে আনতে পারা যায় না?" কণ্ঠস্বরে মনোরমা শিহরিয়া উঠিল—"কেন পারু!" পার্ব্বতী হাতের বালা ঘুরাইতে-ঘুরাইতে অন্যমনস্কভাবে কহিল,—"একবার পায়ের ধূলা মাথায় নেব—আজ যাব কি না!" মনোরমা পার্ব্বতীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, দু'জনে বড় কান্না কাঁদিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘর অন্ধকার—পিতামহী দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইতে কহিলেন, "ও পারু, ও মনো, তোরা বাইরে আয় দিদি!" সেই রাত্রিতেই পার্ব্বতী স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আর দেবদাস? সে রাত্রিটা সে কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনের একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার খুব যে ক্লেশ হইতেছিল, যাতনায় মর্ম্মভেদ হইতেছিল, তাহা নয়। কেমন একটা শিথিল ঔদাস্য ধীরে-ধীরে

বুকের মধ্যে জমা হইয়া উঠিতেছিল। নিদ্রার মধ্যে শরীরের কোন একটা অঙ্গে হঠাৎ পক্ষাঘাত হইলে, ঘুম ভাঙিয়া সেটার উপর যেমন কোন অধিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং বিস্মিত, স্তম্ভিত মন মুহূর্ত্তে ঠাওরাইতে পারে না, কেন তাহার আজন্ম-সঙ্গী, চিরদিনের বিশ্বস্ত অঙ্গটা তাহার আহ্বানে সাড়া দিতেছে না ; তাহার পর ধীরে-ধীরে বুঝিতে পারা যায়, ধীরে-ধীরে জ্ঞান জন্মে যে, এটা আর তাহার নিজের নাই, দেবদাস এমনি ধীরে-ধীরে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বুঝিতেছিল যে, সময়ে সংসারটার অকস্মাৎ পক্ষাঘাত হইয়া, তাহার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার উপর মিথ্যা রাগ-অভিমান আর কিছুই খাটিবে না। সাবেক অধিকারের কথাটা ভাবিতে যাওয়াই ভুল হইবে। তখন সূর্য্যোদয় হইতেছিল। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, কোথায় যাই? হঠাৎ স্মরণ হইল, তাহার কলিকাতার বাসাটা। সেখানে চুণিলাল আছে। দেবদাস চলিতে লাগিল। পথে, বার-দুই ধাক্কা খাইল,—হোঁচট খাইয়া অঙ্গুলি রক্তাক্ত করিল,—টাল খাইয়া একজনের গায়ের উপর পড়িতেছিল,—সে মাতাল বলিয়া ঠেলিয়া দিল। এমনি করিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দিন শেষে মেসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুণিবাবু তখন বেশ-বিন্যাস করিয়া বাহির হইতেছিলেন—"এ কি, দেবদাস যে?"

দেবদাস নীরবে চাহিয়া রহিল। "কখন এলে হে? মুখ শুক্‌নো,—স্নানাহার হয়নি—ও কি—ও কি?" দেবদাস পথের উপরেই বসিয়া পড়িতেছিল। চুণিলাল হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। নিজের শয্যার উপর বসাইয়া, শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি, দেবদাস?"

"কাল বাড়ী থেকে এসেচি।" "কাল? সমস্ত দিন তবে ছিলে কোথায়? রাত্রেই বা কোথায় ছিলে?" "ইডেন গার্ডেনে।" "পাগল না কি! কি হয়েচে, বল দেখি?" "শুনে কি হবে?" "না বল, এখন খাওয়া-দাওয়া কর। তোমার জিনিষপত্র কোথায়?" "কিছুই আনিনি।" "তা, হোক্, এখন খেতে বোস।" তখন জোর করিয়া চুণিলাল কিছু আহার করাইয়া, শয্যায় শুইতে আদেশ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিতে-করিতে কহিল, "একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, আমি রাত্রে এসে তোমাকে তুল্‌ব।" বলিয়া সে তখনকার মত চলিয়া গেল। রাত্রি দশটার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দেবদাস তাহার বিছানায় গভীর নিদ্রায় সুপ্ত। না ডাকিয়া, সে নিজে একখানা কম্বল টানিয়া লইয়া, নীচে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সারারাত্রির মধ্যে দেবদাসের ঘুম ভাঙ্গিল না—প্রভাতেও না। বেলা দশটার সময় সে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "চুণিবাবু, কখন এলে হে? "এইমাত্র আস্‌চি।" "তবে তোমার কোন রকম অসুবিধা হয় নি!" "কিছু না।" দেবদাস কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "চুণিবাবু, আমার যে কিছু নেই ; তুমি আমাকে প্রতিপালন কোরবে?" চুণিলাল হাসিল। সে জানিত, দেবদাসের পিতা মহাধনবান ব্যক্তি ; তাই হাসিয়া কহিল," আমি প্রতিপালন কোরব! বেশ কথা। তোমার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাক, কোন ভাবনা নেই।" "চুণিবাবু, তোমার আয় কত?" "ভাই, আমার আয় সামান্য। বাটীতে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহা দাদার কাছে গচ্ছিত রেখে এখানে বাস করি। তিনি প্রতি মাসে ৭০৲ টাকা হিসাবে পাঠিয়ে দেন। এতে তোমার-আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।" "তুমি বাড়ী যাও না কেন?" চুণিলাল ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "সে অনেক কথা।" দেবদাস আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে আহারাদির জন্য ডাক পড়িল। তাহার পর দুইজনে স্নানাহার শেষ করিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিলে, চুণিলাল বলিল,—"দেবদাস, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছ?" "না।" "আর কারো সঙ্গে?" দেবদাস তেমনি জবাব দিল—"না।" তাহার পর চুণিলালের হঠাৎ অন্য কথা স্মরণ হইল, কহিল, "ও হো, তোমার এখনো বিয়েই হয় নি যে।" এই সময় দেবদাস অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণেই চুণিলাল দেখিল, দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া আরও দুই দিন অতীত হইল। তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে দেবদাস সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। মুখ হইতে সেই ঘন ছায়া যেন অনেকটা সরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। চুণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, "আজ শরীর কেমন?"

"বোধ হয় অনেকটা ভাল। আচ্ছা, চুণিবাবু, রাত্রে তুমি কোথায় যাও?" আজ চুণিলাল লজ্জিত হইল ; বলিল, "হাঁ তা' যাই বটে, কিন্তু সে কথা কেন? আচ্ছা, আজ কেন তুমি কলেজ যাও না!" "না—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি।" "ছিঃ, তা' কি হয়? মাস-দুই পরে তোমার

পরীক্ষা। পড়াও তোমার মন্দ হয় নি, এবার কেন পরীক্ষা দাও না।"

"না। পড়া ছেড়ে দিয়েছি।" চুণিলাল চুপ করিয়া রহিল। দেবদাস পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাও—বল্‌বে না? তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।" চুণিলাল দেবদাসের মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"কি জান দেবদাস, আমি খুব ভাল যায়গায় যাইনে।" দেবদাস যেন আপনার মনে-মনে কহিল—"ভাল আর মন্দ! ছাই কথা—চুণিবাবু আমাকে সঙ্গে নেবে না?" "তা' নিতে পারি। কিন্তু, তুমি যেয়ো না।" "না, আমি যাবই। যদি ভাল না লাগে, আর না হয় যাব না। কিন্তু তুমি যে সুখের আশায় প্রত্যহ উন্মুখ হয়ে থাকো—যাই হোক্ চুণিবাবু, আমি নিশ্চয়ই যাবো।" চুণিলাল মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, "আমার দশা!" মুখে বলিল, "আচ্ছা, তাই যেয়ো।"

অপরাহ্ণ-বেলায় ধর্ম্মদাস জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। দেবদাসকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"দেবতা, আজ তিন-চার দিন ধরে মা কত যে কাঁদচেন—" "কেন রে?" "কিছু না বলে হঠাৎ চলে এলে কেন?" একখানা পত্র বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, "মা'র চিঠি।" চুণিলাল ভিতরের খবর বুঝিবার জন্য উৎসুক ভাবে চাহিয়া রহিল। দেবদাস পত্র পাঠ করিয়া রাখিয়া দিল। জননী বাটী আসিবার জন্য আদেশ ও অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। সমস্ত বাটীর মধ্যে তিনিই শুধু দেবদাসের অকস্মাৎ তিরোধানের কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্মদাসের হাত দিয়া লুকাইয়া অনেক টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। ধর্ম্মদাস সেগুলি হাতে দিয়া কহিল, "দেবতা, বাড়ী চল।" "আমি যাব না—তুই ফিরে যা।"

রাত্রিতে দুই বন্ধু বেশ-বিন্যাস করিয়া বাহির হইল। দেবদাসের এ সকলে তেমন প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু, চুণিলাল কিছুতেই সামান্য পোষাকে বাহির হইতে রাজী হইল না। রাত্রি নয়টার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী চিৎপুরের একটা দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চুণিলাল দেবদাসের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামিনীর নাম চন্দ্রমুখী—সে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এইবার দেবদাসের সর্ব্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। সে যে এই কয় দিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে নারীদেহের ছায়ার উপরেও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সে নিজেই জানিত না। চন্দ্রমুখীকে দেখিবামাত্রই অন্তরের নিবিড় ঘৃণা দাবদাহের ন্যায় বুকের ভিতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। চুণিলালের মুখপানে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "চুণিবাবু, এ কোন্ হতভাগা যায়গায় আন্‌লে?" তাহার তীব্র কণ্ঠ ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া চন্দ্রমুখী ও চুণিলাল উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরক্ষণেই চুণিলাল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দেবদাসের একটা হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, "চল, চল, ভেতরে গিয়ে বসি।" দেবদাস আর কিছু কহিল না—ঘরের ভিতরে আসিয়া নীচের বিছানায় বিষণ্ণ, নত মুখে উপবেশন করিল। চন্দ্রমুখীও নীরবে অদূরে বসিয়া পড়িল। ঝি, রূপা-বাঁধানো হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল—দেবদাস স্পর্শও করিল না। চুণিলাল মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঝি কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া, অবশেষে চন্দ্রমুখীর হাতেই হুঁকাটা দিয়া প্রস্থান করিল। সে দুই-একবার টানিবার সময়, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেবদাস তার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, হঠাৎ নিরতিশয় ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল—"কি অসভ্য! আর কি বিশ্রীই দেখ্‌তে!" ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রমুখীকে কেহ কখনো কথায় ঠকাইতে পারে নাই। তাহাকে অপ্রতিভ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু দেবদাসের এই আন্তরিক ঘৃণার সরল এবং কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। ক্ষণকালের জন্য সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে আরও বার-দুই গড়-গড় করিয়া শব্দ হইল; কিন্তু চন্দ্রমুখীর মুখ দিয়া আর ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন চুণিলালের হাতে হুঁকা দিয়া সে একবার দেবদাসের মুখপানে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নির্ব্বাক তিনজনেই। শুধু গুড়-গুড় করিয়া হুঁকার শব্দ হইতেছে,—কিন্তু তাহাও যেন বড় ভয়ে-ভয়ে। বন্ধুমণ্ডলীর মাঝে তর্ক উঠিয়া হঠাৎ নিরর্থক একটা কলহ হইয়া গেলে, প্রত্যেকেই যেমন নীরবে নিজের মনে ফুলিতে থাকে, এবং ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ মিছামিছি কহিতে থাকে, "তাই ত!" এম্‌নি তিনজনেই মনে-মনে বলিতে লাগিল—"তাই ত! এ কেমন হইল!"

যেমনই হোক, কেহই স্বস্তি পাইতেছিল না। চুণিলাল

হুঁকা রাখিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল, বোধ করি আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইল না,—তা'ই। ঘরে দুইজনে বসিয়া রহিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া কহিল, "তুমি টাকা নাও?" চন্দ্রমুখী সহসা উত্তর দিতে পারিল না। আজ তার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। এই নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু, এমন আশ্চর্য্য লোক সে একটী দিনও দেখে নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"আপনার যখন পায়ের ধূলো পড়েছে—"দেবদাস কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "পায়ের ধূলোর কথা নয়। টাকা নাও ত?" "তা' নিই বৈ কি! না হ'লে আমাদের চল্‌বে কিসে?" "থাক্,—অত শুন্‌তে চাইনে।" বলিয়া সে পকেটে হাত দিয়া একখানা নোট বাহির করিল, এবং চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়াই চলিতে উদ্যত হইল—একবার চাহিয়াও দেখিল না কত টাকা দিল। চন্দ্রমুখী বিনীতভাবে কহিল, —"এরি মধ্যে যাবেন?" দেবদাস কথা কহিল না—বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমুখীর একবার ইচ্ছা হইল, টাকাটা ফিরাইয়া দেয়; কিন্তু কেমন একটা তীব্র সঙ্কোচের বশে পারিল না; বোধ করি বা একটু ভয়ও তাহার হইয়াছিল। তা' ছাড়া, অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করা অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া চৌকাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—দেবদাস সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সিঁড়ির পথেই চুণিলালের সহিত দেখা হইল। সে আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্চ দেবদাস?" "বাসায় যাচ্চি।" "সে কি হে?" দেবদাস আরও দুই-তিনটা সিঁড়ি নামিয়া পড়িল। চুণিলাল কহিল, "চল, আমিও যাই।" দেবদাস কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "চল।" "একটু দাঁড়াও, একবার উপর থেকে আসি।" "না; আমি যাই, তুমি পরে এসো" বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল। চুণিলাল উপরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী তখনও সেই ভাবে চৌকাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া কহিল, "বন্ধু চলে গেল?" "হাঁ।" চন্দ্রমুখী হাতের নোট দেখাইয়া কহিল, "এই দেখ। কিন্তু ভাল বোধ কর ত নিয়ে যাও; তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ো।" চুণিলাল কহিল,—"সে ইচ্ছে করে দিয়ে গেছে, আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কেন?" এতক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী একটুখানি হাসিতে পারিল; কিন্তু হাসিতে আনন্দ ছিল না। কহিল,—"ইচ্ছে করে নয়, আমরা টাকা নিই বলে রাগ কোরে দিয়ে গেছে। হাঁ, চুণিবাবু, লোকটি কি পাগল?" "একটুও না। তবে, আজ ক'দিন থেকে বোধ করি ওর মন ভাল নেই।" "কেন মন ভাল নেই,—কিছু জানো?" "তা' জানিনে। বোধ হয় বাড়ীতে কিছু হয়ে থাক্‌বে।" "তবে এখানে আনলে কেন?" "আমি আন্‌তে চাইনি, সে নিজে জোর করে এসেছিল।" চন্দ্রমুখী এবার যথার্থই বিস্মিত হইল। কহিল, "জোর করে' নিজে এসেছিল? সমস্ত জেনে?" চুণিলাল একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তা' বই কি! সমস্তই ত জান্‌ত।—আমি ত আর ভুলিয়ে আনিনি।" চন্দ্রমুখী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া কহিল, "চুণি, আমার একটি উপকার কোরবে?" "কি?" "তোমার বন্ধু কোথায় থাকেন?" "আমার কাছে।" "আর এক দিন তাঁকে আন্‌তে পারবে?" "তা' বোধ হয় পারব না। এর আগেও, কখনো সে এ সব যায়গায় আসেনি, পরেও বোধ হয় আর আস্‌বে না। কিন্তু কেন বল দেখি?" চন্দ্রমুখী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল,—"চুণি, যেমন কোরে হোক্, ভুলিয়ে আর একবার তাকে এনো।" চুণি হাসিল; চোখ টিপিয়া কহিল, "ধমক্ খেয়ে ভালবাসা জন্মালো না কি?" চন্দ্রমুখীও হাসিল; কহিল, "না দেখে নোট দিয়ে যায়—এটা বুঝ্‌লে না?"

চুণি চন্দ্রমুখীকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না—না, নোট্-ফোটের লোক আলাদা—সে তুমি নও। কিন্তু সত্যি কথাটা কি বল ত?"—চন্দ্রমুখী কহিল, "সত্যিই একটু মায়া পোড়েচে।" চুণি বিশ্বাস করিল না। হাসিয়া কহিল, "এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে?" এবার চন্দ্রমুখীও হাসিতে লাগিল। বলিল "তা হোক্। মন ভাল হ'লে আর একদিন এনো—আর একবার দেখ্‌ব। আন্‌বে ত?" "কি জানি!" "আমার মাথার দিব্যি রইল।" "আচ্ছা—দেখ্‌ব এখন।"

(ক্রমশঃ)

মেদিনীপুরে তিনরাত্রি

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

গত ৯ই মার্চ্চ শুক্রবার—দোল পূর্ণিমার পরদিন মেদিনীপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় সুহৃদ 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক মহাশয় 'মেদিনীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনী'র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; এবার সভাপতি হইয়াছিলেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই মহোদয়। তাই জলধর বাবু এবার সভাস্থলে বলিয়া আসিয়াছেন,'মেদিনীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনী'র এই উন্নতি ঠিক যেন প্রাইমারী ক্লাসের ছাত্রকে এম-এ ক্লাসে 'প্রমোসন' দেওয়া! সম্মিলনীর সভাপতি করিবার জন্য শাস্ত্রী মহোদয়ের ন্যায় মহাপণ্ডিত সাহিত্য-গুরু তাঁহারা আর কোথায় পাইতেন? অন্য যে বিষয়েই হউন, বিনয়-প্রকাশে জলধর বাবু কাহারও অপেক্ষা খাটো নহেন।

বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতি হইয়া শাস্ত্রী-মহাশয়কে বিস্তর কটু কথা শুনিতে হইয়াছে; তাহার পর তিনি যে শীঘ্র কোন সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি হইতে সম্মত হইবেন, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কটু কথায় বিচলিত হইলে তিনি বোধ হয় মেদিনীপুরস্থ সারস্বত-সমাজের আবেদনে কর্ণপাত করিতেন না। কিন্তু যখন উক্ত সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে কয়েকটি ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার নৈহাটির বাড়ীতে গিয়া 'ধরণা' দিলেন, তখন আর তিনি তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ, মেদিনীপুরে তাঁহার অন্য একটু আকর্ষণ ছিল। তাঁহার প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু এম-এ, বি-এল, সরস্বতী মহাশয় মেদিনীপুরে পদধূলি দান করিবার জন্য শাস্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শিষ্য-বৎসল শাস্ত্রীমহাশয় সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্ব-দিন কার্য্যোপলক্ষে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল; সেই দিন অপরাহ্ণ-কালে জলধর বাবু তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবার শক্তি আমার নাই; সুতরাং দোলের দিন "বোম্বাই মেলে" কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরে যাত্রা করাই স্থির হইল। আমরা চারি-জন,—জলধরবাবু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ ও থিয়েটারের প্লাকার্ডের আদর্শে পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়—এই 'অধম'—জলধর বাবুর বাসা হইতে বৃহস্পতিবার বেলা ১টার সময় একত্র হাওড়া যাত্রা করিব—সান্ধ্য-বৈঠকে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে, মজ্‌লিস ভঙ্গ হইল।

আমার হাতে কতকগুলি কাজ ছিল—তাহা শেষ করিতে রাত্রি আড়াইটা বাজিল; আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। বৃহস্পতিবার বেলা ১টার সময় একখানি পুষ্পকরথ ডাকাইয়া, তাহাতে চারিজনে বড়বাজারের সঙ্কীর্ণ গলি অতিক্রম করিয়া হাওড়া অভিমুখে ধাবিত হইলাম। বড়বাজার সে দিন আবীর ও ফাগ-কুঙ্কুমে লালে লাল হইয়া গিয়াছিল; আমরা অতি কষ্টে সেই ভীতিপ্রদ পল্লী পার হইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদের 'সেথো' উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—বৃহস্পতিবারের বারবেলার ভয়ে পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয় ট্রেণ ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বেই ষ্টেসনে আসিয়া, গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও মহাজনের পন্থার অনুসরণ করিয়া বোম্বাই মেলের একখানি কামরা দখল করিয়া বসিলাম। শাস্ত্রীমহাশয় জলধরবাবুকে তাঁহার কামরায় উঠিতে অনুরোধ করিলে, —জলধরবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "ছোঁড়ারা চুরুট-ফুরুট টানে, আপনার সঙ্গে এক কামরায়'—ইত্যাদি। শাস্ত্রীমহাশয় এই অমোঘ যুক্তির প্রতিবাদ করিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তখন বেলা আড়াইটা। ট্রেণের গতিবেগ লক্ষ্য করিয়া মনে হইল, "ইহা কি বোম্বাই মেল?"—কিন্তু হাওড়ার

পরবর্ত্তী ষ্টেসন 'রামরাজাতলা' ছাড়াইয়া ট্রেণের বেগ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমি একটি জানালার সম্মুখে বসিয়া, খর-রৌদ্র-পীড়িতা প্রান্তর-প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।—উচ্চ রেলপথের দুই দিকে অকর্ষিত ধান্যক্ষেত্র। ধান উঠিয়া গিয়াছে, ধানের শুষ্ক 'মোথা' ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়িয়া তাহার অতীত-গৌরব ঘোষণা করিতেছে। স্থানে-স্থানে অপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী। বিল, পুষ্করিণী, 'ন্যাসা' জমি; ভিতরে নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদ ও শৈবাল। দূরে-দূরে বিক্ষিপ্ত অট্টালিকা, টিনের ঘর, মৃৎকুটীর। স্থানে-স্থানে দোতলা মেটে কোঠা। কোথাও পুষ্করিণীর চারি পাড়ে নারিকেল বৃক্ষ। কোথাও মাঠের মধ্যে বৃহৎ তালগাছ। অধিকাংশ বৃক্ষ প্রায় নিষ্পত্র। স্থানে-স্থানে শ্রেণীবদ্ধ মাদার গাছ। নিষ্পত্র শাখাপল্লবগুলি লাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। কোথাও আম্র-কুঞ্জ, কোথাও বাঁশ-বন। সঙ্কীর্ণ-কায় নদী বা খালের উপর দিয়া বোম্বাই মেল ঝড়ের ন্যায় বেগে ছুটিতে লাগিল। দামোদরের সেতু অতিক্রম করিয়া, ভাগীরথীকে বামে রাখিয়া ক্রমে আমরা উলুবেড়ে ষ্টেসন পার হইলাম। কোলাঘাটের নিকট আসিয়া ট্রেণ মুহূর্ত্তের জন্য থামিল। তাহার পর এক মিনিটে রূপনারায়ণের প্রকাণ্ড লৌহ-সেতু অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরের সীমায় প্রবেশ করিল।

বোম্বাই মেল হাওড়া ষ্টেসন ছাড়িয়া একদমে খড়্গাপুরে আসিয়া হাঁপ ছাড়ে। এই সুদীর্ঘ ৭৬ মাইল পথ দুই ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া, অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকার সময় আমরা খড়্গাপুর ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

খড়্গাপুর ষ্টেসনের প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র 'ওয়েটিংরুমে' প্রবেশ করিয়া দেখি, মেদিনীপুরের কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাদের জলযোগের অথবা চা-যোগের সকল উপকরণ টেবিলের উপর থরে-থরে সজ্জিত। আঙ্গুর, আপেল ও কমলা, কুল, কলা এবং পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি নানাজাতীয় সুপক্ক, সুরস, রসনাতৃপ্তিকর ফল হইতে মিহিদানা, মুগের বরফী ও রসমুণ্ডি, ক্ষীরের মিঠাই পর্য্যন্ত নানাপ্রকার মিষ্টান্ন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুঞ্জীকৃত। চারি-পাঁচজন দূরের কথা, দশজনেও তাহা খাইয়া শেষ করিতে পারে না। তাহার উপর সুপেয়, সুগন্ধি অত্যুৎকৃষ্ট গরম চা! শাস্ত্রীমহাশয় সেই কক্ষের এক কোণে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া ভোজনবিলাসী সাহিত্যিকগণের ঔদরিকতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান, সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ রেল-ষ্টেসনে জল-গ্রহণ করিবেন,—ইহা স্বপ্নের অতীত। তথাপি আমাদের সঙ্গীরা শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহাকে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।—প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে মেদিনীপুরগামী ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে উপস্থিত হইল। এবার শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমাদিগের সকলকে এক কামরায় উঠিতে হইল, কারণ এই ট্রেণখানিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা একখানির অধিক ছিল না। বোম্বাই মেলের গাড়ীর তুলনায় তাহাও অত্যন্ত খেলো ও নিতান্ত 'ফক্‌রে।' আমাদের অধমতারণ ই, বি, আর লাইনের 'বকেয়া' দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি ইহার অপেক্ষা অনেক ভাল; আসাম মেল, দার্জ্জিলিং মেলের গাড়ীগুলির ত কথাই নাই!

খড়্গাপুর হইতে মেদিনীপুরের দূরত্ব আট মাইল মাত্র। শুনিলাম, মেদিনী দ্বিখণ্ডিতা হইয়াছেন, খড়্গাপুরে নূতন জেলা হইবে। হুকুম বাহির হইয়াছে; এখন আফিস-আদালত খুলিয়া বসিতে যে কিছু বিলম্ব। এই ভাগ-বাটোয়ারায় মেদিনীপুরের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই; কারণ, মেদিনীপুরের মধ্যে যে উপবিভাগগুলি ঐশ্বর্য্যশালী, সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন, তাহাই খড়্গাপুরের অংশে পড়িল; খড়্গাপুরই 'সুয়ো রানী' হইবে। তবে মেদিনীপুরের স্থায়ী অধিবাসিগণ যে ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া, খড়্গাপুরে গিয়া নূতন বাড়ী পত্তন করিবেন, এরূপ মনে হয় না। অনেকে সাইকেলে এবং 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' হইয়া আফিস চালাইলে ট্রেণের সংখ্যা বাড়িবে, 'চাকার'ও অধিক চলন হইবে।

মেদিনীপুরের গাড়ীতে বসিয়া আমাদের এই সকল কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়ও আমাদের সহিত গল্পে যোগদান করিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় শিক্ষাবিভাগের একজন শিরোমণি ছিলেন। প্রত্নবিদ্যার অনেক সাগরার্ণব, বারিধি শাস্ত্রীমহাশয়ের কৃপায় সাহিত্য-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন,—কেহ-কেহ কমলার বরপুত্র হইয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় শাস্ত্রীমহাশয় 'পরশমণি'-বিশেষ, তাঁহার স্পর্শে অনেক লোহা সোণা হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাতেও কত মজার কাণ্ড

ঘটে,—মেদিনীপুরে যাইতে-যাইতে শাস্ত্রীমহাশয়ের মুখে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা সকলেই বড় আমোদ বোধ করিলাম। সে সকল 'বড় ঘরের' কথা প্রকাশ না করাই ভাল, বিশেষতঃ, আমরা 'আদার ব্যাপারী'—বিশ্ব-বিদ্যালয় সদাগরী জাহাজ!

আট মাইল পথ অতিক্রম করিতে বড় অধিক সময় লাগিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেদিনীপুর ষ্টেসনের প্লাট-ফর্ম্মে গাড়ী থামিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া দেখি, মেদিনীপুরের বহু সম্রান্ত ব্যক্তি সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আসায় আমাদেরও অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। উৎসাহশীল স্বেচ্ছা-সেবকেরা দলে-দলে আসিয়া আমাদের লটবহর লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। আনন্দ ও উৎসাহে সকলেরই হৃদয় পূর্ণ। জলধর বাবু মেদিনীপুরে বিশেষ পরিচিত, তিনিই আগন্তুকগণের নিকট আমাদের পরিচয় দিলেন। অবশেষে শাস্ত্রীমহাশয়কে একখানি মোটর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করা হইল। আমরা চারিজন, মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষি বাবুর সহিত একখানি প্রকাণ্ড খোলা গাড়ীতে শাস্ত্রীমহাশয়ের অনুসরণ করিলাম। রেল-ষ্টেসন হইতে নগরের দূরত্ব এক মাইলেরও অধিক। ইষ্টক-বদ্ধ সুপ্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিয়া আমরা যখন নাড়াজোল-পতির কাছারী-বাড়ীতে উপনীত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ণিমার চন্দ্র পূর্ব্বাকাশ হইতে তাঁহার সুধা-ধবল কিরণ-সম্পাতে সমগ্র প্রকৃতি হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন; এবং সেই সুরম্য অট্টা-লিকার দ্বিতলস্থ কক্ষগুলি বর্ত্তিকালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উৎসব-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল।

সেই দোল-পূর্ণিমার রাত্রিতে মেদিনীপুর-রাজের নগর-ভবনে স্থানীয় বহুসংখ্যক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে আমরা কতদূর আনন্দলাভ করিয়াছিলাম—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির ভাইস চেয়ারম্যান, এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চৌধুরী যাদবেন্দ্র-নন্দন-নন্দ-মহাপাত্র বি-এ, মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গের আলোচনায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্র বাবু পাঁচেটগড়ের জমি-দার। তিনি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন, সঙ্গীতবিদ্যাতেও তাঁহার অসামান্য দক্ষতা। হাস্যরসে সুরসিক, প্রকাণ্ড মজলিসী লোক, এবং একাই একশো! —এতদ্ভিন্ন আর এক মহাত্মার নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বেলেবেড়ের সুপ্রসিদ্ধ ভূস্বামী, সনাতন-ধর্ম্মের অলঙ্কার স্বরূপ, শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর। শুনিলাম, কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার ধানের গোলায় আগুন লাগিয়া আট হাজার টাকার ধান ব্রহ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। ইহা বড় সামান্য ক্ষতি নহে; কিন্তু এই নিদারুণ ক্ষতিতেও সেই সদানন্দ পুরুষকে মুহূর্ত্তের জন্য বিমর্ষ বা বিচলিত দেখিলাম না। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, প্রহরাজ মহাশয়ও শাস্ত্রানুশীলন-তৎপর, নিষ্ঠাবান, প্রগাঢ় পণ্ডিত। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে নিবিড় প্রণয় স্থাপিত হইল, যেন তাঁহাদের কত দিনের আলাপ!

মেদিনীপুরে আসিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমরা দুইটি বন্ধু লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের একজন স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ; দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু বি-এ,—স্কুলের সহকারী হেড্‌মাষ্টার। সত্যেশবাবু বীরভূমবাসী, যতীশবাবু কাঁথির অধিবাসী। ইঁহারা আমা-দিগকে যে কিরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা যে তিন দিন মেদিনীপুরে বাস করিয়া-ছিলাম, সেই কয় দিনই ইঁহাদের সাহচর্য্যে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়েই স্ব-স্ব কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি করিয়া, আরাম-বিরাম তুচ্ছ করিয়া, সর্ব্বস্থানে আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন, এবং মেদিনীপুরের যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, তাহা দেখাইবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা, তাঁহাদের প্রীতি ও শিষ্টাচার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাদের স্মরণ থাকিবে। কিন্তু জীবনে আর কখন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না, কে বলিতে পারে? ভগবান তাঁহাদের চিরসুখী করুন।

রাজভবনে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর নাড়াজোল-রাজের সুযোগ্য ম্যানেজার প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু (ইনি যতীশবাবুর দাদা) সবিনয়ে আমাদিগকে হাত-পা ধুইতে

অনুরোধ করিলেন। সুরসিক শাস্ত্রীমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "উঁহারা খড়্গাপুরে উত্তমরূপে হাত পা ধুইয়াছেন, আবার কি এত শীঘ্র হাত-পা ধুইবেন ?"—কিন্তু ছাড়ে কে ? হাত-পা ধোয়া হইল না বটে, কিন্তু চায়ের স্রোত বহিল, সঙ্গে-সঙ্গে নানাপ্রকার ফলমূল, মিষ্টান্ন ! খড়্গাপুরের বোঝার উপর মেদিনীপুরের শাকের আঁটি অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। শাস্ত্রীমহাশয়ের তখনও সন্ধ্যা-বন্দনাদি হয় নাই। তিনি সেখানে পদ-প্রক্ষালন না করিয়াই প্রহরাজ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাসায় চলিলেন। আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল হইল এবং উৎসাহের সহিত গুড়ুক চলিতে লাগিল।

জলযোগের পর কিছুকাল বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। জলধর বাবু প্রহরাজ মহাশয়ের বাড়ীর দিকে গেলেন; আমরা তিনজন একজন ভলন্টিয়ার সঙ্গে লইয়া চিড়িয়ামারসাহীতে (ব্যাধ-পল্লী ?) ফণীবাবুর এক আত্মীয়-গৃহে চলিলাম। মেদিনীপুরের পথগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিশেষতঃ, পূর্ণিমার রাত্রি, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। আমরা দুই ঘণ্টা পথে-পথে ঘুরিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও, অনুরোধে পড়িয়া রাত্রিতে কিছু খাইতে হইল। আহারান্তে ঢালা ফরাসে প্রসারিত দুগ্ধফেননিভ, সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া মশক-গুঞ্জন শুনিতে-শুনিতে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। মশা অনেক স্থানেই আছে, কিন্তু মেদিনীপুরে মশার উৎপাত কি ভয়ানক ! বস্তুতঃ মশা, হনুমান ও কাক—এই তিনজাতীয় জীবের মধ্যে মেদিনীপুরে কাহার আধিপত্য অধিক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। এই প্রসঙ্গে 'সঙ্গতে'র উল্লেখ অসঙ্গত। "বুঝ লোক যে জান সন্ধান !"

পর দিন প্রভাতে আমাদের দলস্থ সকলে 'গোপ' নামক স্থান সন্দর্শনে চলিলেন। ইহা মেদিনীপুর সহর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর এখানে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শুনিলাম, রাজা বাহাদুর নাড়াজোলে আছেন, অপরাহ্ণে মোটর-যোগে মেদিনীপুরে আসিয়া সম্মিলনীতে যোগদান করিবেন। গোপ অঞ্চলে বিরাট রাজার কীর্ত্তিও আছে; বন্ধুরা তাহাই দেখিতে চলিলেন। আমি কাগজ-কলম লইয়া বসিলাম। সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে আসিয়াছি; সভায় দুই-চারি কথা বলিবার জন্য নিশ্চয়ই অনুরুদ্ধ হইব; সুতরাং সে জন্য একটু প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তাই আমার গোপে যাওয়া হইল না। ঢেঁকি স্বর্গে আসিয়াও ধান ভানিতে লাগিল। চারুবাবু পণ্ডিত লোক, তিনি কোন্ ফাঁকে সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সারবান, সুন্দর, সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই। জলধর বাবুরা বেলা প্রায় এগারটার সময় বাসায় ফিরিলেন। মধ্যাহ্নে গুরুতর আহারের পর বিশ্রাম। বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় আমরা সদলবলে সভায় চলিলাম। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের অগ্রগামী হইলেন।

সভায় তখন অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। মণ্ডপটি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। মণ্ডপের এক-প্রান্তে রঙ্গমঞ্চের উপর প্রধান-প্রধান লোকের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সভাস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মার, এবং এডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, ই, ল্যাম্বোও উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ল্যাম্বোও সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি অল্প কথায় মেদিনীপুরের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া উপবেশন করিলেন। নাড়াজোলাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর তৎপূর্ব্বেই মোটর-যোগে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজকুমার ও রাজার দৌহিত্র তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাভাজন জলধর বাবু সময়োচিত দুই চারিটি কথা বলিয়া সমাগত ভক্তমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিলেন, এবং উপসংহারে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ মহোদয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে সভাপতির আসনে উপবেশন করিলেন।

সভারম্ভ হইলে একটি ভদ্রলোক হারমোনিয়াম্ সহযোগে কয়েকটি গান করিলেন; গানগুলি কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইলেও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। একজন পণ্ডিত একটি সুন্দর সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে যে গানটি গীত হইয়াছিল, তাহা মেদিনীপুরের অতীত-গৌরব-গাথা। এই গানটি কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের—"বঙ্গ আমার, জননী আমার—"নামক

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতের অনুকরণে রচিত। আমাদের মনে হইয়াছিল, এই গানটি একজনের পরিবর্ত্তে কয়েকজন গায়ক দ্বারা 'কোরাসে' গাহিবার ব্যবস্থা করিলে আরও চিত্তাকর্ষক এবং শ্রুতি-মধুর হইত। এরূপ সুদীর্ঘ কয়েকটি সঙ্গীত গাহিবার ভার একই লোকের উপর ন্যস্ত থাকায় মেদিনীপুরে সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের দৈন্যই প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানের সাহিত্য-সম্মিলনীতে পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়ের 'সম্বোধন' শ্রবণ করিয়া অনেকে নিরাশ হইয়াছিলেন, ইহাই জনরব। সাময়িক পত্রাদিতেও কিছু-কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিয়াছিল; কিন্তু মেদিনীপুরের এই সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ সর্ব্বজন-প্রীতিকর হইয়াছিল। অভিভাষণের গৌরচন্দ্রিকায় শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার নিকট তোমরা কি চাও ?"—কত রকম জিনিষ চাওয়া যাইতে পারে—শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার যে সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াই আমাদের চক্ষু স্থির ! মানুষ যে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির নিকট এত রকম জিনিস চাহিতে পারে, তাহা আমরা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। মেদিনীপুরের প্রাচীন ইতিহাস ও নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ আরম্ভ হইবার পুর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি চৌধুরী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি-এ মহাশয় সুললিত ভাষায় মেদিনীপুরের পুরাকীর্ত্তি ও প্রত্নসম্পদ এবং বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুরের স্থান প্রভৃতি নানাবিষয়ের আলোচনা-পূর্ণ একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্ মহাশয় গতবর্ষের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। ইহা হইতে আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতির জন্য মেদিনীপুরবাসিগণের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নের পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাদের সাধনা সফল হউক।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শেষ হইলে প্রথমে রাজা বাহাদুর, তাহার পর সাহেবেরা সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। সেই সঙ্গে অনেক দর্শকই চলিয়া যান। অনন্তর বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহী সেবক কাঁথিনিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র বসু মহাশয়ের রচিত 'মেদিনীপুরের প্রাচীন সীমা-নির্দ্দেশ' নামক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ প্রবন্ধটি তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু বি-এ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। অতঃপর আমাদের প্রতি প্রবন্ধ-পাঠের আদেশ হইল। আমার ন্যায় অকিঞ্চনের অক্ষম লেখনী হইতে যে দুই চারি ছত্র বাহির হইয়াছিল, তাহা পাঠ করা হইল; শ্রীযুক্ত চারু বাবু 'লোক-সাহিত্য' সম্বন্ধে যে চিন্তাশীলতাপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি আবেগপূর্ণ স্বরে পাঠ করিলেন।

রাত্রি ক্রমেই অধিক হইতেছিল, সমবেত জনমণ্ডলীও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন; সুতরাং কয়েকটি প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু মেদিনীপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য ও মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় অতঃপর মেদিনীপুরের দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহের যে বিবরণটি পাঠ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকেরই চাঞ্চল্য দূর হইয়াছিল।—মহেন্দ্র বাবু শতাধিক প্রাচীন পুঁথির পরিচয় দিয়াছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন কবিদিগের সরস কবিতার আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদের সুমধুর কবিত্ব-রসের আস্বাদনে সাহিত্যরস-লিপ্সু শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত অনেকগুলি পুঁথিই বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য। প্রাচীন যুগে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্বন্ধে যেরূপ সমৃদ্ধ ছিল, বঙ্গের অনেক জেলাই সেরূপ ছিল না। পূজনীয় শাস্ত্রীমহাশয়ও বলিয়াছিলেন, যে মেদিনী কর মেদিনীপুর নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিও বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। অনেক কবি, অনেক গ্রন্থকার তাঁহার আশ্রয়ে মাতৃভাষার সেবায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এইভাবে সভার কার্য্য শেষ হইবার অনতিকাল পূর্ব্বে, চোগা-চাপকানধারী এক ভদ্রলোক সভাপতি মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সভামধ্যে অকস্মাৎ গাত্রোৎপাটন করিলেন। কেহ-কেহ তাঁহার চাপ্‌কান আকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সভাস্থলে আবেগ-পূর্ণ ভাষায় তাঁহার দুঃখের কাহিনী বর্ণিতে লাগিলেন। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগকে 'জন্তু' মনে করে এবং তাঁহাদের ভাষা শুনিয়া বলে, হাঁড়ীর ভিতর কড়ি রাখিয়া খটাখট্ শব্দ করিতেছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের সাহিত্যে যে সকল কাব্যগ্রন্থ

আছে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যে সেরূপ নাই! দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দুই-একটি 'পয়ার' আবৃত্তি করিলেন; তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পরিচয় লইয়া জানিলাম, এই ভদ্রলোকটি স্থানীয় মোক্তার। তিনি ওড়িয়া বংশধর, নাম শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাস, হাল নিবাস দাঁতুন। রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া তিনি যে ভাবে তাঁহার দুঃখ-কাহিনীর বর্ণনা করিলেন, তাহা রঙ্গমঞ্চের 'কমিক' অভিনেতারই উপযুক্ত; তাঁহার কথা শুনিয়া সভাস্থলে হাসির গর্রা পড়িয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, 'লোকের ঠাট্টা কাণে না তুলিলেই পারেন; তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না?' তখন তিনি আর এক দফা বক্তৃতার সূত্রপাত করিলেন; এমন সময় একটি ভদ্রলোক তাঁহাকে বলিলেন, "মশায়ের ছাতা কোথায়?"—বটেই ত! তিনি বক্তৃতার লোভে তাঁহার ছত্রটি সেই বিপুল জনারণ্যের মধ্যে কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, হঠাৎ তাহা স্মরণ হওয়ায় সবেগে রঙ্গমঞ্চ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে সভার কার্য্যও শেষ হইল। প্রহরাজ মহাশয় শাস্ত্রীমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাসায় চলিলেন; সত্যেশ বাবু, যতীশ বাবু প্রভৃতির সহিত আমরা রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলাম।—সেই রাত্রেই স্থির হইল, প্রভাতে সত্যেশ বাবুর গৃহে চা পান শেষ করিয়া আমরা মেদিনীপুরের পুরাকীর্ত্তি কর্ণগড় দেখিতে যাইব। শুনিলাম, শাস্ত্রী মহাশয়ও স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া সেখানে যাইবেন, এবং সেখানেই কর্ণগড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়ার প্রসাদ পাইবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাকাদির ব্যবস্থার জন্য ম্যানেজার বাবু সেই রাত্রেই যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন।

প্রভাতে ছয়টার সময় আমাদের কর্ণগড় যাইবার কথা; কিন্তু প্রত্যূষে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও গাড়ী না পাওয়ায় আমরা এই তীর্থের 'সেথো, সত্যেশ বাবু ও যতীশ বাবুর সঙ্গে সত্যেশ বাবুর বাসায় আসিলাম। সত্যেশ বাবুর বহির্দ্বারে কাঠের গুঁড়ির মতন একটি গুরুভার পদার্থ নিপতিত দেখিলাম। সত্যেশবাবুকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "উহা বকাসুরের হাড়!" ব্যাপার কি? বকাসুর কি মহামহিমান্বিত শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুরের সন্নিকটে আসামী রূপে হাজির হইবার জন্য সমন পাইয়া, স্বকীয় মৃত্যু-নিবন্ধন জীবিত দেহের পরিবর্ত্তে তাহার এই 'অস্থি' পাঠাইয়া বৃটীশ 'পিনাল কোডের' সম্মান-রক্ষা করিয়াছে? ইহার উত্তরে সত্যেশ বাবুর নিকট বড় এক মজার গল্প শুনিতে পাইলাম। মেদিনীপুরের সান্নিধ্যেই না কি মহাপরাক্রান্ত ভীমসেন বকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; ইহাই প্রচলিত জনশ্রুতি। বকাসুরের হাড় ভূগর্ভে প্রোথিত আছে শুনিয়া সেট্‌ল্‌মেণ্ট কার্য্যের ব্যপদেশে সত্যেশ বাবু সেইস্থানে গমন করিয়া ভূগর্ভ হইতে এই হাড় উত্তোলনে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু কোন হিন্দু মজুর তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হয় না; অনেকে তাঁহাকে এ ভয়ও দেখাইয়াছিল যে, যদি তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ব্বংশ হইতে হইবে, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু সত্যেশ বাবু ইহাতে ভয় পাইলেন না; তিনি অহিন্দু মজুরের সাহায্যে মৃত্তিকা খনন করাইয়া ভূগর্ভ হইতে এই বকাসুরের হাড় আবিষ্কার করেন। গাড়ীতে করিয়া তাহা তুলিয়া আনিতে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই তাঁহার গৃহদ্বারে নিপতিত থাকিয়া তাঁহার প্রত্নতত্ত্বানুরাগের পরিচয় দিতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা কাহারও হাড় নহে, ভূগর্ভস্থিত কোনও প্রকাণ্ড বৃক্ষের কাণ্ড, বহু শতাব্দী ভূগর্ভে থাকিয়া প্রস্তরীভূত হইয়াছে; কিন্তু এখনও কাঠের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জিনিষটি সেই আকারের কাঠ অপেক্ষা প্রায় দশগুণ অধিক ভারি; আমরা তাহা নড়াইতে পারিলাম না; সহজে তাহা ভাঙ্গিতেও পারা যায় না।

চা ও গুরু জলযোগের পর দুইখানি গাড়ী লইয়া আমরা ছয়জন যাত্রী কর্ণগড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কর্ণগড় অতি প্রাচীন রাজধানী। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় তৎপ্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে মেদিনীপুর' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে কর্ণগড় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন, "কর্ণগড়াধিপতি রাজা যশোবন্ত সিংহ ও তাঁহার খ্যাতনামা পিতা রাজা রামসিংহের নাম বাঙ্গালীর ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। রাজা রামসিংহ ইতিহাসে 'মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রাজা রামসিংহ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাজা যশোবন্ত সিংহ বহুদিন যাবৎ

ঢাকার দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথিত আছে, তাঁহার সময়ে দেশীয় লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সীমা ছিল না। যৎকালে শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, তখন তিনি টাকায় আট মণ করিয়া চাউল বিক্রয় করাইয়াছিলেন, এবং এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত ঢাকা নগরের পশ্চিম দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার উপর লিখিয়া দিয়াছিলেন, যিনি চাউল এতাদৃশ সুলভ করিতে না পারিবেন, তিনি এই দ্বার খুলিতে পারিবেন না।—দেওয়ান যশোবন্ত সিংহ পুনরায় টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় করাইয়া সেই পশ্চিম দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করেন।"—যশোবন্ত সিংহ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন;—সে আজ কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসরের কথা। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে চাউল টাকায় আট মণ দরে বিক্রীত হইয়াছিল, দুইশত বৎসর পরে তাহা আট টাকায় মণ বিক্রয় হইতেছে! অথচ শুনিতে পাই, আমাদের 'প্রস্পরিটির' সীমা নাই; তালপাতের ছাতা ত্যাগ করিয়া বিলাতী ছাতা মাথায় দিয়া আমরা জীবন ধন্য করিয়াছি।

এরূপ প্রজারঞ্জক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ কর্ম্মবীরের গৌরবপূর্ণ শ্মশানভূমি সন্দর্শন করিতে আমাদের আগ্রহ হইবে সন্দেহ কি? জলধর বাবু ও আমি 'প্রবীণ'—উভয়ে যতীন বাবুকে লইয়া এক গাড়ীতে চলিলাম। 'নবীনেরা' তিন জনে অন্য গাড়ীতে চলিলেন। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আমরা নগর-প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। এইস্থানে মেদিনীপুরের প্রাচীন রাজবংশের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে, শুনিয়া আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া তাহা দেখিতে চলিলাম। দেখিলাম প্রাচীন প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা কতকালের প্রাসাদ, কে বলিবে? এই প্রাসাদ 'আবাস গড়' নামে বিখ্যাত। আবাসগড়ে এখন আর কিছুই নাই, কেবল এই প্রাচীন ভগ্ন-মন্দির অতীত যুগের বিপুল সমৃদ্ধির নির্ব্বাক সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। মন্দিরটির নিম্নভাগ পাষাণ-নির্ম্মিত, কিন্তু উর্দ্ধাংশ ইষ্টক-নির্ম্মিত। এই মন্দিরের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে দুইটি দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার জল অতি স্বচ্ছ। পূর্ব্বদিকের দীর্ঘিকার ন্যায় প্রকাণ্ড দীঘি এ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই: দক্ষিণ দিকের দীঘিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর হইলেও সাধারণ পুষ্করিণী অপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ। এই প্রাচীন রাজবংশ কিরূপে ধ্বংস হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই; জনশ্রুতি ঘোষণা করিতেছে—রাজার তিনজন প্রধান অমাত্য—সেনাপতি, মন্ত্রী ও নগরাধ্যক্ষ,—ষড়যন্ত্র করিয়া রাজার প্রাণ-সংহার পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য অপহরণ করেন। সাধ্বী রাজ্ঞী অভিসম্পাত করেন,—বিশ্বাসঘাতকেরা নির্ব্বংশ হইবে।—সেই অভিসম্পাত সফল হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা রহস্যান্ধকার-সমাচ্ছন্ন। মেদিনীপুরের বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর মাতুল-বংশের এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।

'আবাসগড়' সন্দর্শন শেষ হইলে আমরা শকটযোগে কর্ণগড় অভিমুখে ধাবিত হইলাম। প্রশস্ত পথ; পথের দুই দিকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাঁওতাল কুটীর; সাঁওতাল রমণীগণ শুষ্ক কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া নগরে বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুষ্ক তৃণ ও কণ্টকপূর্ণ অনুচ্চ ক্ষেত্র। অধিকাংশ স্থল প্রস্তরাবৃত; দুই চারিটা আম, বাবলা বা অন্যান্য বৃক্ষ অতি কষ্টে রস-সঞ্চয় করিয়া কোনমতে প্রাণ-রক্ষা করিতেছে। দূরে উচ্চ রেলপথ দেখিতে পাইলাম; শুনিলাম এই পথ শালবনী, গোদাপিয়াশাল প্রভৃতি স্থান দিয়া বাঁকুড়ার দিকে গিয়াছে। রাঁচি যাইতে হইলে এই পথেই যাইতে হয়। দক্ষিণে বামে বহুদূর-বিস্তৃত শালবন। বসন্ত-কালে শালবৃক্ষে নব-পত্রোদ্গম হইয়াছে; দূর হইতে তাহা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা ক্রমে ইষ্টকবদ্ধ রাজ-পথ ছাড়িয়া বালুকা-কঙ্কর সমাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ, বন্ধুর মেঠোপথে প্রবেশ করিলাম; গাড়ী শালবনের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। পথ দুর্গম না হইলেও গাড়ী তেমন দ্রুত অগ্রসর হইল না। আমরা দুই ঘণ্টায় আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দশটার সময় কর্ণগড়ে উপস্থিত হইলাম।

কর্ণগড় সমতল-ক্ষেত্রে অবস্থিত নহে; গড়ের কিছু দূর হইতে গাড়ী ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। আমরা চারিদিকে চাহিয়া কত ভগ্ন-প্রাকার, প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্ন-স্তূপ, পরিখার লুপ্তাবশিষ্ট নিদর্শন করিলাম। অবশেষে গাড়ী 'মহামায়ার' মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া থামিল। অনেকখানি স্থান পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত, তন্মধ্যে কয়েকটি মন্দির; মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রাচীন প্রাঙ্গণ ও দুর্গপ্রাকার বিধ্বস্ত হইলেও মন্দিরগুলির জীর্ণ-সংস্কার হওয়ায় তাহা তেমন পুরাতন বলিয়া মনে হইল না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নাড়াজোলপতি দেবদেবীর প্রাত্যহিক পূজার

ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। নগর হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী এই নিস্তব্ধ প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমাদের হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইল। মন্দির দেখিয়া বোধ হইল, তাহা বাঙ্গালী স্থপতির হস্তনির্ম্মিত নহে, মন্দিরগুলি উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের আদর্শে নির্ম্মিত, এবং তাহাদের বহির্ভাগ বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক কোণে একটি গভীর কুণ্ড দেখিলাম; ইহার নাম "সিদ্ধি কুণ্ড"। শুনিলাম কুণ্ডে দশহাত জল আছে। তীর্থযাত্রীগণ দেবদর্শনে আসিয়া সিদ্ধি কুণ্ডের নিকট যে যাহা মানস করে, তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে। মন্দিরের এক পাশে জামদগ্নি মূর্ত্তি; এই মূর্ত্তি জাম্‌দারগড় নামক স্থান হইতে কোন্ অতীত যুগে এই মন্দির-মধ্যে আনীত হইয়াছিলেন। অদূরে একটি শিবলিঙ্গ দেখিলাম। 'শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ'—শাস্ত্রে শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত করিবার বিধান নাই; কিন্তু শিবঠাকুর নাড়াজোল-রাজের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা ম্যানেজার ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে (যিনি পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক ছিলেন, পরে নাড়াজোলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন) স্বপ্নাদেশ করেন, যেন তাঁহাকে জাম্‌দারগড় হইতে কর্ণগড়ে লইয়া যাওয়া হয়। তদনুসারে কৃষ্ণবাবু শিবলিঙ্গটি এই স্থানে আনিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

সিদ্ধি কুণ্ডের অদূরে জামদগ্নির অন্য পার্শ্বে মহামায়া ও অভয়ার মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তি ঢাকা, উপরে কৃত্রিম মুখ সন্নিবিষ্ট, দেহের অবশিষ্টাংশ বস্ত্রাবৃত; এক পাশে পঞ্চমুণ্ডির আসন। এই আসনে বসিয়া মেদিনীপুরের স্বনামধন্য কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই 'শিবায়ন' গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কবি রামেশ্বরের প্রসঙ্গে "বঙ্গ সাহিত্যে মেদিনীপুর' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ঘাটাল নগরীর নিকটবর্ত্তী বরদা পরগণার যদুপুর গ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব-নিবাস ছিল; কিন্তু বরদা পরগণার জমিদার হেমৎ সিং অন্যায়রূপে তাঁহার উক্ত যদুপুরস্থ গৃহ ভগ্ন করিয়া দিলে, কবি মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া উক্ত পরগণাস্থিত অযোধ্যাগড় গ্রামে কাঁশাই বা কংশাবতী নদীর তটে বাস স্থাপন করেন।—রামেশ্বর সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। কর্ণগড়াধিপতি সেই কারণে তাঁহাকে রাজবাটীর পুরাণ-পাঠ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রামেশ্বর কেবল যজমানী পুরাণ-পাঠক ছিলেন না; তিনি যে হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার 'শিবায়ন' গ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।—মুকুন্দরাম ও কাশীদাসের নামের সঙ্গে তাঁহাদের আশ্রয়দাতা মহাত্মাগণের নাম যেরূপ জড়িত, সেইরূপ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নামের সঙ্গে তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা যশোবন্ত সিংহের মহত্ত্ব চিরদিন জড়িত থাকিবে।—যশোবন্ত সিংহের উৎসাহেই রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাহার শিবায়ন কাব্য রচনা করেন।"—বস্তুতঃ মহামায়ার মন্দিরস্থিত পঞ্চমুণ্ডির আসনে অনেক সাধক ভক্ত তান্ত্রিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শেষ সিদ্ধপুরুষের নাম শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার পর আর কোন ব্যক্তি এই আসনে উপবেশনের যোগ্যতা লাভ করেন নাই।

মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তর-বদ্ধ প্রাঙ্গণে প্রস্তর-নির্ম্মিত খর্পর, অদূরে যূপকাষ্ঠ; বলির রক্ত এই খর্পরে সংরক্ষিত হয়। অদূরে উলঙ্গ ভৈরবী মূর্ত্তি; এই মূর্ত্তি ভৈরবী বলিয়া পূজিত হইলেও তাহা দেখিতে মহাবীরের মূর্ত্তির মত।

মহামায়ার মন্দির সন্দর্শন করিয়া আমরা যণ্ডেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দির দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; বহিঃপ্রকোষ্ঠে যণ্ডেশ্বর দেবের মূর্ত্তি, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে দণ্ডেশ্বর। কিন্তু দণ্ডেশ্বরের কোনও মূর্ত্তি দেখিলাম না, একটি প্রস্তরবদ্ধ গোলাকার কূপবৎ গর্ত্তই দণ্ডেশ্বরের নামে খ্যাত। পূজার উপকরণ, দুগ্ধাদি এই গর্ত্তে ঢালিয়া দিতে হয়। শুনিলাম, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিকুণ্ডের সহিত ইহার যোগ আছে। সেই জন্যই পুষ্প-বিল্বদলাদি সময়ে-সময়ে সিদ্ধিকুণ্ডে ভাসিতে দেখা যায়। যে পূজারী-ঠাকুর আমাদিগকে দেবমূর্ত্তি দেখাইলেন, তিনি মন্দির-মধ্যবর্ত্তী আর একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন দেখাইয়া বলিলেন, শিবায়ন-প্রণেতা রামেশ্বর এই আসনেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই উক্তি প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইল না। 'বঙ্গসাহিত্যে-মেদিনীপুর' নামক গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় যোগেশ বাবুও লিখিয়াছেন, "তিনি (রামেশ্বর) সেই স্থানে ভগবতী মহামায়ার সম্মুখে পঞ্চমুণ্ডি যোগাসনে বসিয়া যোগ-সাধন করতঃ সিদ্ধ হইয়াছিলেন।"

এই মন্দিরটি তিন তলায় বিভক্ত। প্রথম [illegible] প্রভৃতি দেবের উপাসকগণের আসন; দ্বিতলে অনেকগুলি আসন

দেখিলাম; পশ্চিমে বৈষ্ণবাসন, মধ্যে শাক্তাসন, পূর্ব্বে শৈবাসন; এতদ্ভিন্ন উত্তরে ও দক্ষিণে উত্তর-সাধকগণের উপবেশনের জন্য দুইটি স্থান। ত্রিতলে সূর্য্যাসন; এই আসনে উপবেশন করিয়া সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নিরীক্ষণ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ একই মন্দিরে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য,—সর্ব্বমতাবলম্বী হিন্দুর আসন সংরক্ষিত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম, এরূপ বৈচিত্র্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দির-সংলগ্ন একটি দ্বিতল কক্ষ খালি পড়িয়া আছে, শুনিলাম তাহা 'Guest house' রূপে ব্যবহৃত হয়। নিম্নতলে গ্রাম্য-পাঠশালা; দেখিলাম অনেকগুলি শিশু পাঠশালায় বসিয়া হট্টগোল করিতেছে; তখনও গুরুমহাশয়ের শুভাগমন হয় নাই।

আমরা এই মন্দির দেখিয়া বাহির হইলাম, এমন সময় পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে না লইয়া ফাঁকি দিয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে আসিয়াছি, বলিয়া তিনি আমাদের কিঞ্চিৎ উপহাস করিলেন। আমরা গুরুবাক্যের প্রতিবাদ করিলাম না। কিন্তু প্রকৃতই কি আমরা অপরাধী? তিনি পূজা-আহ্নিক শেষ করিয়া, অনেক বেলায় বাহির হইয়া আসিয়াছেন; মন্দিরেই তাঁহার দেবপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে; আর আমরা রাজ-বাড়ীতে ফিরিয়া দক্ষিণ-হস্তের কার্য্য সম্পন্ন করিব; বিশেষতঃ সন্তোশ বাবুকে মেদিনীপুরে ফিরিয়া কোর্টে গিয়া যথারীতি হাকিমী করিতে হইবে, যতীশবাবুকেও স্কুলে গিয়া ছাত্র ঠেঙ্গাইতে হইবে। এ অবস্থায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহযাত্রী হওয়া আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রসাদের ব্যবস্থা হইতে লাগিল, আমরা মন্দির ত্যাগ করিয়া কোচম্যানদের গাড়ী জুতিতে বলিতাম; কিন্তু কোচম্যান-সহিসেরা তখন কোথায় ঘোড়ার ঘাস কাটিতে গিয়াছিল! প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মন্দির-সন্নিহিত বটবৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিলাম; সহিসেরা আসিলে আমরা গাড়ীতে উঠিয়া দুর্গ-প্রাকারের বাহিরে আসিলাম।

সমভূমিতে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। পথের ধারে জগন্নাথের মন্দির। আমরা মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া মন্দিরমধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি-লাম; ... শালগ্রামশিলা ও রাধামাধব মূর্ত্তিও সংরক্ষিত হইয়াছে। একটি বালক, বোধ হয় পূজারী, আমাদিগকে যাত্রী মনে করিয়া আমাদের সকলের হস্তে চরণামৃত, তুলসী-পত্র প্রদান করিল, আমরা তাহা আগ্রহ-সহকারে মস্তকে গ্রহণ করিলাম। তাহার পর পদব্রজে ঘুরিতে-ঘুরিতে একটি সঙ্কীর্ণকায়া পার্ব্বত্য নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। মধ্যাহ্নের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—কাহারও ছত্র নাই, অগত্যা গাত্রাচ্ছাদন-বস্ত্রে মস্তক আবৃত করিয়া জুতা খুলিয়া নদী পার হইলাম। এই নদীর নাম 'পারাং' নদী। নদীতে এক হাঁটু জল; অতি শীতল ও স্বচ্ছ জল; ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মাছগুলি জলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। জল অল্প হইলেও বেশ স্রোত আছে; নদীগর্ভে শীতল বালুকারাশি; সেই শীতল সলিল-সংস্পর্শে আমাদের গা যেন জুড়াইয়া গেল! জল হইতে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

নদী পার হইয়া আমরা একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের ধ্বংসা-বশেষ দেখিতে পাইলাম। অদূরে শ্যামসুন্দরের ভগ্ন চাঁদনী। তাহাতে বিগ্রহ নাই; চাঁদনী এখন চর্ম্মচটিকা, তৈল-পাইক ও সরীসৃপের বাসস্থলীতে পরিণত হইয়াছে। অদূর-বর্ত্তী জয়দুর্গার মন্দিরেরও এই অবস্থা। দেবী মন্দির ত্যাগ করিয়াছেন, শোভা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই—যেন দেব-মহিমার অতীত শ্মশান! আমরা ভগ্নস্তূপের উপর দিয়া মন্দির-শিখরে আরোহণ করিলাম, দূরে-দূরে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইল। শুনিলাম এই প্রাসাদে রাণী শিরোমণিই শেষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাব হইলে এই সম্পত্তি নাড়াজোলাধিপের হস্তগত হয়। এক সময় এই স্থানে দস্যু-তস্করের আড্ডা ছিল। কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রাসাদের ভগ্ন-প্রাকারে আরোহণ করিলাম। প্রাসাদের বহির্মহল, অন্দরমহল প্রভৃতির নিদর্শন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; তোরণদ্বার প্রস্তরস্তূপে পরিণত হইলেও তাহার পরিচয় পাইতে কষ্ট হইল না। প্রাসাদের ভগ্ন-প্রাকারে দণ্ডায়মান হইয়া শৈবালাচ্ছন্ন একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম এই পুষ্করিণীর নাম "জলহরি।" পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি ভগ্ন-মন্দির; মন্দিরটি বৃক্ষ-লতায় সমাচ্ছন্ন, বট-পাকুড়ের গাছ মন্দির আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধে শাখা-বাহু প্রসারিত করিয়াছে। সেই স্থান হইতে নামিয়া ভূমি-সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ দ্বারের ভিতর দিয়া বহু কষ্টে আমরা বাহিরে আসিলাম। শ্রদ্ধাভাজন জলধর বাবু সেই গহ্বর-পথে বহির্গমন অতি ক্লেশকর বুঝিয়া, কাঁটা-

জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, কণ্টকাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অন্য দিক দিয়া বাহির হইলেন। কিন্তু সম্মুখেই দুর্গ-প্রাকার; সেখানে তখনও জল, এবং জল অপেক্ষা কাদাই অধিক ছিল। তিনি বহু কষ্টে সেই মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার-লাভ করিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আমরাও কণ্টকাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া কয়েক মিনিট পরে তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম, এবং সকলে একত্র মিলিত হইয়া নদী পার হইয়া আর একটি জীর্ণ ও দেব-পরিত্যক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এ মন্দিরটি কোন্ দেবতার, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু মন্দিরটির গঠন-কৌশল অতি সুন্দর। ইহার একটু বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করিলাম। এই মন্দিরটি বাঙ্গলা দেশের মন্দিরের আদর্শে নির্ম্মিত;—ইহা উড়িষ্যা-প্রদেশ-সুলভ বিশেষত্ববর্জ্জিত।

এই মন্দির হইতে নামিয়া, একটি মাঠের উপর দিয়া আমরা পথের দিকে অগ্রসর হইলাম। সেই প্রান্তরে বিস্তর অস্থি-কঙ্কাল নিপতিত দেখিলাম। শুনিলাম, ব্যাঘ্র যে সকল গরু মারিয়াছে, ইহা তাহাদেরই কঙ্কাল,—অদূর-বর্ত্তী শালবনে ব্যাঘ্রাচার্য্যগণের বাস! আমরা ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে প্রান্তর অতিক্রম পূর্ব্বক পথি-প্রান্তবর্ত্তী শাল-বৃক্ষ-মূলে বিশ্রাম করিতে বসিলাম।

সেই মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে শালতরুচ্ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বহু-প্রাচীন ভগ্ন ও বিধ্বস্ত রাজধানীর দিকে চাহিতে-চাহিতে কত কথাই মনে আসিতে লাগিল। কত সুখ, কত ঐশ্বর্য্য, কত আনন্দ-উৎসবে এই স্থান পূর্ণ ছিল! কত-শত বৎসর পূর্ব্বে এমনই দোলের দিন ফাগ-কুঙ্কুমের লোহিত রাগে ঐ সুবিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত; সমুচ্চ নহবৎখানা হইতে প্রহরে-প্রহরে সুমিষ্ট বাদ্যধ্বনি সমুত্থিত হইয়া উৎসব-বার্ত্তা দিগন্তে বিঘোষিত করিত! এবং উচ্চ অবরোধ-অন্তরালবর্ত্তী রাজান্তঃপুরে হর্ষ ও বিষাদের, মিলন ও বিরহের কত অভিনয় চলিত! কাহার পাপে, কাহার অভিশাপে এমন সুন্দর রাজপুরী ধ্বংস হইল? এই গৌরবান্বিত রাজবংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস কি? ইহার প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড অতীত যুগের কত সুখ-দুঃখের মৌন ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া অনাদরে, উপেক্ষায় মাটির সহিত মিশিয়া আছে! এই সুবিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপে অতীতের কত বিস্মৃত ইতিহাস সংগুপ্ত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কত মূল্যবান্ উপকরণ এখানে আহরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের সে চক্ষু নাই, সে চেষ্টা-যত্ন নাই; সেরূপ পরিশ্রমেরও শক্তি নাই। আমরা কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য দেখিতে আসিয়াছি,—যাহা চোখে পড়িল দেখিয়া চলিলাম। দু'দিন পরে এ সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে।

বিশ্রামান্তে গাড়ীতে উঠিয়া বাসায় চলিলাম। বেলা একটার পর বাসায় পৌঁছিয়া স্নানাহার শেষ করিতে বেলা তিনটা বাজিল। কাছারীর কাজ শেষ করিয়া সত্যেশ বাবু বেলা পাঁচটার সময় পুনর্ব্বার আমাদের নিকট হাজির। যতীশ বাবুও আসিলেন। আমরা নাড়াজোল-রাজের অতিথি। তাঁহার আদর, যত্ন ও সৌজন্যের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ কর্ত্তব্য মনে করিয়া, বেলা পাঁচটার পর তাঁহার প্রাসাদে গমনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া প্রহরাজ বাহাদুর আমাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কর্ণগড়ে দেবপ্রসাদ লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া তিনটার সময়ে নগরে ফিরিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়া যে অন্যায় করিয়াছিলাম, সে ত্রুটি তিনি স্বীয় ঔদার্য্যগুণে নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার স্বভাব-সুলভ রসিকতার হস্ত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইলাম না। সকলে একত্র হইয়া রাজাবাহাদুরের গোপ-প্রাসাদে যাত্রা করিলাম। সূর্য্যাস্তকালে তাঁহার সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। রাজা বাহাদুর আমাদের সকলকে তাঁহার প্রাসাদের দ্বিতলস্থ বারান্দায় লইয়া গিয়া যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যা-সমাগমে আমরা নানা পথ ঘুরিয়া, জলধর বাবুর কুটুম্বশ্রেষ্ঠ মুন্সেফ রোহিণীবাবুর বাসায় কয়েক মিনিট উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়া প্রহরাজ মহাশয়ের বাসায় চলিলাম। পথিমধ্যে গৌরাঙ্গ-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গৌর-নিতাই মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। অতি সুন্দর মূর্ত্তি! শুনিলাম, রাত্রিকালে রাম রসায়ন গান হইবে। অধিকারী মহাশয় আমাদিগকে গান শুনিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। জলধর বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বেই প্রহরাজ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা সেখানে পদার্পণ করিয়াই

দেখি, অতিথি-সৎকারের বিপুল আয়োজন—চা ও জল-যোগের মহাঘটা। সেখানে সৎসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিল। শাস্ত্রী মহাশয় নানা সরস গল্পে আমাদিগকে আমোদিত করিলেন। অনন্তর আমরা থিয়েটার দেখিতে চলিলাম।

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকগণ 'সরলার' অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। অভিনেতারা সকলেই সুশিক্ষিত যুবক, তাঁহাদের অনেকেই স্থানীয় উকিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রবাবু, সম্মিলনীর সহকারী সভাপতি ও শাস্ত্রী-মহাশয়ের ভক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু এম-এ, বি-এল, সরস্বতী প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাদিগকে মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথে রঙ্গমঞ্চের সন্নিধানে উপস্থিত করিলেন। বাঙ্গালার ঔপন্যাসিকেরা অন্দরের পথ দিয়াই সদরে উপস্থিত হন; এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। ভীড় ঠেলিয়া সদরের পথে যায়, কাহার সাধ্য?

থিয়েটারের আসর তখন দর্শকবর্গে পূর্ণ,—অসংখ্য লোক অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। আর তিল-ধারণেরও স্থান ছিল না। ভদ্রমহিলাগণ পর্য্যন্ত চিকের আড়ালে বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছিলেন। সরলা তাঁহাদেরই দেখিবার যোগ্য নাটক বটে। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, শিক্ষাপ্রদ, সুরুচিপূর্ণ, সকরুণ গার্হস্থ্য নাটক বাঙ্গালায় দ্বিতীয় নাই। আমরা বহু কষ্টে একটু স্থান পাইলাম; তখন অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক মিনিট পরে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর অভিনয় দেখিতে আসিয়া আমাদের ঠিক সম্মুখেই বসিলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি অভিনয়-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বস্তুতঃ, অভিনয় যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; সখের থিয়েটারে এরূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় সর্ব্বদা দেখা যায় না। রবিবার প্রত্যূষে মান্দ্রাজ মেলে আমরা কলিকাতায় ফিরিব, সুতরাং আমরা রাত্রি ১১টার সময় বাসায় ফিরিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এক ঘুমে রাত্রি কাটিল। জলধরবাবু প্রত্যূষে পাঁচটার পূর্ব্বেই শয্যা-ত্যাগ করিয়া চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে-টানিতে উভয় হস্তের সঞ্চালনে মশা তাড়াইতে লাগিলেন, এবং মধ্যে-মধ্যে করুণ স্বরে আমাদের গাত্রোত্থানের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তত সকালে কে ওঠে? অবশেষে চারিদিক পরিষ্কার হইলে, আমরা উঠিয়া প্রাতঃ-কৃত্যাদি শেষ করিলাম। ম্যানেজার সতীশবাবুর সুবন্দোবস্তে তত সকালেও চায়ের অভাব হইল না। একখানি গাড়ী দরজায় অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা চারিজনে তাহাতে উঠিয়া ষ্টেসনের দিকে চলিলাম। পথিমধ্যে সত্যেশ বাবু দ্বিচক্র-যানে আমাদের সহিত যোগদান করিলেন; ষ্টেসনে যতীশবাবু আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। বিদায়ের সময় এই দুই বন্ধুকে পাইয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

ট্রেণ ছাড়িবার সময় উত্তীর্ণ হইল, তথাপি ট্রেণ ছাড়িল না! খড়্গপুরে মান্দ্রাজ মেল ধরিবার আশা ক্রমেই সুদূর-পরাহত হইল। সত্যেশ বাবুকে আমরা খড়্গপুর পর্য্যন্ত ধরিয়া লইয়া চলিলাম। আমাদের কোন অনুরোধ রক্ষাতেই তাঁহার আপত্তি নাই।

ট্রেণ ছাড়িল। খড়্গপুরে আসিয়া শুনিলাম, 'মান্দ্রাজ মেল' আসিতে তখনও বিলম্ব আছে; ট্রেণ লেট হইয়াছে। 'মান্দ্রাজ মেল' আসিলে আমরা একটি জনাকীর্ণ কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। একটি নব্য বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া, বসিয়া-বসিয়া নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। হায়দরাবাদ-প্রত্যাগত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক একটি মান্দ্রাজীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন। বংশীধ্বনি করিয়া ট্রেণ ছুটিল। আমরা সত্যেশ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিলাম। তিন দিন মাত্র তাঁহার সহিত আলাপ, কিন্তু এই তিন দিনেই তিনি আমাদের হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছেন,—তাহা বুঝিতে পারিলাম। কে জানে ইহাই শেষ দেখা কি না? মেদিনীপুরের এই কয় দিনের মধুর স্মৃতি দীর্ঘকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।

প্রবোধের ভুল

[শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

"কি, প্রবোধ বাবু যে! কোথায় যাচ্ছেন?" বারান্দা হইতে শরৎবাবু প্রবোধকে সম্ভাষণ করিলেন।

"এই একবার চাঁদনীচকে—ছেলেদের জুতো কিন্‌তে যাব।" বলিয়া প্রবোধ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলে শরৎবাবু বলিলেন, "আহা, দাঁড়ান্ না, আমিও একবার Bengal Bankএ যাব। হরে, বৈঠকখানার দোরটা খুলে দে ত রে।"

প্রবোধ আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল। কিছুক্ষণ পরে শরৎবাবু আসিয়া বলিলেন, "চলুন। কই রে, একটাও পানটান দিস্‌নি? তোদের ভদ্রয়ানা নেই যে রে। আচ্ছা, এই নোটখানা ধরুন্ ত, পান নিয়ে আসি।"

"আমি ঐ ছবিটা দেখবো।" "দেখাচ্ছি রে বেটা, দেখাচ্ছি; দিন্।"

"আপনি এলেই বেটারা যেন কি পায়। থাম্ থাম্ বিরক্ত করিস্ নি।"

শরৎবাবুর আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ছেলেরা আবার গোলমাল আরম্ভ করিল। কেহ ছবি দেখিতে চাহিল; কেহ গল্প শুনিতে চাহিল; কেহ বা কাকাবাবুকে 'সন্দেশের' 'নীরেট গুরুর কাহিনী' না বলিয়া থাকিতে পারিল না। সকলে মিলিয়া খুব একটা হৈ-চৈ করিয়া তুলিল।

"ওরে তোরা করছিস্ কি রে?" বলিয়া শরৎবাবু পানের ডিবা হাতে প্রবেশ করিলেন। ছেলেরা সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাঁহারা দুজনে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। "আজ ত Gazetted holiday নয়; Bank খোলা পাব কি?"

"হাঁ, খোলা থাক্‌বে" বলিয়া প্রবোধ এ-পকেট, ও-পকেট—ভিতরের জামার পকেটে হাত দিয়া কি খুঁজিতে লাগিল।

"কি!..ও রকম কচ্চেন কেন?"

"নোটখানা খুঁজে পাচ্চি নি যে!"

"বলেন কি" বলিয়া শরৎ বাবু প্রবোধের পকেটগুলি বেশ করিয়া দেখিলেন। বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে অনেক খুঁজিলেন। ছেলেদের ডাকাইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। নোট মিলিল না। প্রবোধের মুখ চূণ হইয়া গেল, সে রাস্তার এদিক-ওদিক খুঁজিতে লাগিল।

প্রবোধ Comptroller General অফিসের ৪০৲ টাকা বেতনের সামান্য কেরাণী, শরৎবাবু সেখানকার Superintendent, মাহিনা ৪০০৲। দু-জনে সমবয়সী, বাসাও পাশাপাশি—কাজেই বন্ধুত্ব হইয়াছে। অফিসে যেমনই হউন না কেন, শরৎবাবু বাড়ীতে খুব অমায়িক। অহঙ্কার মোটেই নাই। লোকের কাছে যথেষ্ট সুনাম আছে। বয়স কম হইলেও, বিদ্যা ও বুদ্ধির জন্য লোকে তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিয়া থাকে। তিনি খোসামোদ দেখিতে পারেন না; কিন্তু একেবারে যে তাঁহার মোসাহেব ছিল না, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। দোষের মধ্যে তিনি বড় বদরাগী—তা' বাড়ীতেই কি, আর অফিসেই কি!

নোটখানি পাওয়া গেল না। প্রবোধ বেশ করিয়া কাপড়-জামা ঝাড়িল। "কাপড় ঝেড়ে আর কি হবে। আশ্চর্য্য! গেল কোথায়? কেউ ত আর আসে নাই যে, সন্দেহ করা যাবে?"

বাসায় ফিরিয়া প্রবোধ অকূল পাথার দেখিল; ভাবিয়া কোন কিনারাই করিয়া উঠিতে পারিল না। ছেলেটা আদর করিয়া বাপের কাছে আসাতে, মার খাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে মায়ের কাছে ফিরিয়া গেল। ছেলের মাও সাহস করিয়া কাছে ঘেঁসিতে পারিল না।

শরৎবাবুর বাড়ী নোট খোঁজার হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বৈঠকখানায় ঝাড়ু দেওয়া ছাড়িয়া ক্রমে ধোয়া আরম্ভ হইল। এ-দিকের আলমারি ও-দিকে করা হইল। এঘর-ওঘর—সব ঘর খোঁজান হইল; নোট কিন্তু পাওয়া গেল না।

"বইগুলো খুঁজে দেখেছিলে, ঠাকুরঝি? কোন বইয়ের ভেতর ভুলে রেখে দেয়নি ও? ঐ রকমই একটা কি হয়েছে।"

"থাম বৌ, থাম! কিছু বাকী রাখিনি। তুমি রাঁধ গে,

আর যা'ই বল বৌ, ওরা লোক ভাল নয়। এক একমাস হল দু'খানা পোষ্টকার্ড নিয়ে গেল, কই দিলে? সেই সে-দিন মাছের জন্য ক' পয়সা ধার করে নিয়ে গেল, কই উপুড়-হস্ত কর্‌লে? এ ত একশ' টাকার নোট! কার মনে কি আছে!"

"তুই বলিস্ কি! নোটখানা কি চুরি করে নিয়ে গেল? কাপড় ঝেড়ে ত দেখালে ভাই!"

"তোমরা থাম। খুঁজতে পার ত খোঁজ, না পার চলে যাও।" রাগভরে শরৎবাবু বাটী হইতে চলিয়া গেলেন।

২

পর দিন প্রবোধ সর্দ্দারীমলের বাটী হইতে ফিরিবার সময় শরৎবাবুকে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন, এই নোটখানি নিন।"

"পেয়েছেন না কি? কোথায় ছিল? এ যে দশ-টাকার নোট!"

"আপনার কত টাকার?"

"দিন-দিন আপনি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্চেন। কত বার করে শুনবেন, একশ' টাকার নোট! দশ টাকার নোট নিয়ে কি Bankএ যাচ্ছিলুম?" বলিয়া নোটখানি ফেলিয়া দিয়া শরৎবাবু বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

হা অদৃষ্ট! একশ' টাকা? দশ টাকাই যে জোটে না! তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। অত টাকা কোথায় পাইবে? পরিবারের গহনা নাই যে, বন্ধক দিয়া টাকার জোগাড় করিবে। যখন তার কাছ থেকে গেছে, তখন তাহারই দেওয়া উচিত। ভাবিল, ধার করিয়া দিবে; কিন্তু ধার দিবে কে? যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কেহই টাকা ধার দিল না। উপরন্তু অনেকেই কানাঘুষা করিতে লাগিল, প্রবোধই টাকাটা আত্মসাৎ করিয়াছে।

* * * *

একদিন ছেলেকে বৈকালে কাপড়জামা পরাইবার সময় প্রবোধের স্ত্রী দেখিল, ছেলের জুতাজোড়াটী খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ভাবিল, হয় ত শরৎবাবুদের বাসায় ফেলিয়া আসিয়া থাকিবে। শরতের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, ছোনে তোমাদের-বাড়ী জুতা ফেলে গেছে?"

শরৎবাবুর পিসি শরৎবাবুকে কিসের হিসাব বুঝাইতে-ছিলেন,—তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন মা, আমরা কি সেটা লুকিয়ে রাখ্‌ব না কি? এ ত আর নোট নয়? আমাদের বাছা নজর অত ছোট নয়।"

প্রবোধের স্ত্রী কাঁদিতে-কাঁদিতে বাটী ফিরিল। পিস্-শাশুড়ি—বৌএ একটু বচসাও হইয়া গেল। শরৎবাবু স্ত্রীকে ধমকাইয়া দিলেন—বৌ-মানুষ বৌ-মানুষের মত থাকিবে; এ সম্বন্ধে তাহার কথা কহিবার আবশ্যক কি?

ভিতরে এই সব গোলমাল চলিতেছে, এমন সময় রমানাথবাবু আসিয়া শরৎবাবুকে ডাকিলেন। রমানাথবাবুও ঐ এক অফিসে কাজ করেন। ইনি না কি দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। প্রবোধের বাপ তখন Superintendent সাহেবকে বলিয়া ইঁহার চাকরি করিয়া দেন। গত বৎসর বসন্তে প্রায় পচিয়া গিয়াছিলেন, কেহ কাছে যাইতে সাহস করে নাই। প্রবোধ একাই ডাক্তার-ডাকা, শুশ্রূষা-করা প্রভৃতি সমস্তই করিয়াছিল।

রমানাথবাবু অফিসের কি একটী case উপলক্ষে শরৎবাবুর পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন। কার্য্য শেষ করিয়া বলিলেন, "কি একটা কথা শুন্‌চি—প্রবোধ না কি আপনার একশ' টাকার নোট চুরি করেচে?"

"অ্যাঁ?—না, তা না, চুরি নয়। তবে একখানি নোট হারিয়েছে বটে" বলিয়া আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বলিয়া ফেলিলেন।

"তবেই ত—চুরি নয় ত আর কি? ঐ দিনই ত—, হাঁ, হাঁ—ঐ দিন রাত্রেই সর্দ্দারীমলের একশ কত টাকা ধার শোধ দিয়ে ফেল্লে। আমি ভাবলুম, এত অল্প মাহিনা পেয়েও প্রবোধ ছোকরা যে কিছু জমাতে পেরেছে, সে ত সুখের কথাই। কার মনে কি আছে মশায়, বোঝবার জো কি?"

"না, না—প্রবোধ কি এত বিশ্বাসঘাতকতা করবে?"

রমানাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন "অত ভালমানুষ হলে কি আজকাল চলে? বাজার পড়েছে কি রকম? আচ্ছা! বলুন না রাতারাতি টাকাটা সে পেলে কোথায়? আমরা হলে মশায় নিশ্চয়ই পুলিশ কেস্ করতুম।"

শরৎবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিলেন।

"এ খবরটা যে আমার কাছ থেকে পেলেন, এটা যেন প্রকাশ না হয়" এই বলিয়া রমানাথ বাবু চলিয়া গেলেন। শরৎ বাবু ভিতরে আসিয়া বলিলেন "পিসি শুনেছ?"

"দোরের ফাঁক থেকে সব শুনিচি বাছা। বল্‌না তোর মাকে আর বৌকে। ও আর নতুন কথা কি? আমার সঙ্গে কত ঝগড়াই না কল্লে!"

শরৎবাবুর স্ত্রী বলিল, "হতে পারে না পিসিমা, হতে পারে না! ওরা আমাদের—"

"মিথ্যে বক্-বক্ কর না। যারা চোখে দেখেছে, তারাই ত বলে গেল।" শরৎবাবু ধমকাইয়া উঠিতে সকলে চুপ হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি করা যায়! পুলিশে দেওয়াটা কি ভাল?

প্রবোধের স্ত্রী প্রবোধকে বলিল, "মিথ্যা ভেবে শরীর নষ্ট করে লাভ কি? শরৎবাবুকে বলে-কয়ে না হয় মাসে-মাসে দশটাকা করে দেবার বন্দোবস্ত কর; আর না হয়, দেশের কা'কেও চিঠিপত্র লিখে দেখ, যদি টাকাটা ধার পাওয়া যায়। লোকে কত-কি বলা-কহা কচ্চে। যদুর পিসি সে দিন বল্লে, হয় ত পুলিশ-হাঙ্গামাই বা হবে?"

"অ্যাঁ—পুলিশ,—কেন? আমি চুরি করিচি না কি? আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে সত্য, তা' বলে আমি ত আর চুরি করিনি। শরৎবাবু কি এ রকম কথা বলেছেন? না, কখনো নয়, আমার ত বিশ্বাস হয় না।"

"পাঁচজনে এই রকম বল্‌ছে। কত লোকে কত ঠাট্টা করচে"—প্রবোধের স্ত্রী আর বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

"কে ঠাট্টা করে? কেন তাদের কি ধার করে খেয়েছি না কি? তাদের বলবার কি ধার ধারি?"

বেড়াইতে আসিয়া বেহারির-মা ঘরের বাহির হইতে সমস্ত শুনিলেন, এবং তখনি গিয়া শরৎবাবুর পিসির নিকট ডালপালা দিয়া সমস্ত বলিয়া দিলেন। তিনিও সেটাকে বেশ বাড়াইয়া শরৎবাবুর কাণে তুলিতে ছাড়িলেন না। "ওরে শরৎ, শুনেছিস্? প্রবোধ বলে কি না, 'আমি শরতের খাই, না পরি? নোট আমি হারিয়েছি, না, তার ছেলেরা ফেলে দিয়েছে? টাকা চায়, টাকা ফেলে দেব; আর তাই বা কেন দেব? নালিশ করে নিগ্‌গে'।"

শরৎবাবু কিছুই বলিলেন না বটে, কিন্তু বাটী-শুদ্ধ লোক বুঝিল—তিনি রাগিয়াছেন।

৩

এক দিন ছোট সাহেব প্রবোধকে ডাকিয়া নোটের কথাটা পাড়িলেন। প্রবোধ বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। যথাযথ ঘটনা সাহেবকে বলিল। সাহেবের সে সব কথা বিশ্বাস হইল কি না, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। তার মনে হইল, সাহেব যেন তার উপর একটু বিরক্ত। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিল না। ভাবিল, কেহ হয় ত লাগাইয়া থাকিবে; অফিসে ও সব ত আর কিছু নূতন কথা নয়। যাহা হউক, তাহার মনটা আরও অস্থির হইয়া পড়িল। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিল। লিখিতে-লিখিতে হাতের কলম হাতে থাকিয়া যাইত। কত ভাবনা আসিয়া জুটিত। চমক ভাঙ্গিলে দেখিত, I have the honour পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে। কি যে লিখিতেছিল—স্মরণ করিতে পারিত না। আবার caseটি সমস্ত পড়িয়া লইতে হইত। অপরে তাহার এই ভাবটা লক্ষ্য করিয়া হাসাহাসি, ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রবোধ সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না। কাজকর্ম্ম তার আর ভাল লাগিত না। ক্রমাগত ভুলচুক হইতে লাগিল। একটি ভুলের জন্য তাহাকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল; আর একটা ভুলে চার স্থান নামিতে হইল।

"মশায় একটি ভুল হয়ে গেছে বলে একেবারে চার-চার place গেল, আপনি একটা কথাও বল্লেন না" এই বলিয়া প্রবোধ Superintendentএর সম্মুখে হাজির হইল।

"এক আধটা হয়, বলা যায়। বার-বার কথা থাকবে কেন? আপনাদের ভুল হলে বলব, ক্ষমা করা হক; আর এ-দেশীদের বেলা ঝুলিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করব। এটা কি ভাল? আর সাহেবেরা তাতে কি ভাববে?"

শরৎবাবুর কথা শুনিয়া প্রবোধ ভাবিল, কথাটা ঠিকই ত বটে। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া আসিল।

কিছু দিন পরে উপরের একটি লোক অবসর লওয়ায়, প্রবোধ ভাবিল, সে ঐ স্থান পাইবে; কিন্তু তাহা হইল না; তাহার নিম্নের লোক সেইটা পাইল। কেহ-কেহ বলিল, "কি হে, Superintendent চটে গেছেন না কি?" কেহ বলিল, "বাঙ্গালীর আর কাল নাই। বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীর জন্য কোন চেষ্টা করে না। এ জাতের কি কখন উন্নতি হইবে?" কেহ বা বড়বাবুকে আবার ভুল করিয়া ধরিতে পরামর্শ দিল।

"মশাই বরাতে যা আছে, তা হবে,—তা শরৎবাবু বলুন,

আর নাই বলুন। আমার জন্য নিশ্চয়ই তিনি সাহেবকে বলে থাকবেন। আর আমি অনুরোধ করিলে তিনি বলিবেন —এ রকম যদি হয়, তার চেয়ে তাঁর না বলাই ভাল।"

অনেকদিন হইতে অফিসে reduction হইবে গুজব চলিতেছিল। ক্রমে হুকুমও আসিল। অফিসে পূর্ব্বে প্রবোধের যথেষ্ট সুনাম ছিল; কিন্তু আজকাল তাহার বিপরীত হইল। কয়েকবার warned হইয়াছে, কয়েক-বার degrade হইয়াছে। শেষে চাকরিটি পর্য্যন্ত গেল।

সে শরৎবাবুকে অনেক করিয়া ধরিল, কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি বলিলেন, যদিও তিনি list তৈয়ার করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন হাতই নাই। দুই-একজনের জন্য সুপারিস করিয়াছেন, কারণ তাহাদের case স্বতন্ত্র। সকলের পরামর্শে সে ছোট-সাহেবকে ধরিতে গেলে, তিনি বলিলেন, "তোমার মত লোক অফিসে থাকা উচিত নয়। তোমার সব কথা শুনিচি। এত দিন কবে তোমায় dismiss করিতাম; reductionএর খবর এসেছিল, তাই দয়া করে করিনি। এখনও যে কয়টা টাকা পেন্সন পাইবে, তাহা আর খোওয়াইও না।"

সাহেবের কথা শুনিয়া তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল। কিন্তু সে কোনও প্রতিবাদ করিল না।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে এত দিনের পুরাতন অফিসের নিকট চিরবিদায় লইয়া প্রবোধ গৃহে ফিরিল। চাকরি গিয়াছে শুনিয়া তাহার স্ত্রী বলিল "তা' ভাল করে টুনুর বাপকে একবার ধর্‌লে না কেন?, টুনুর মাকে বল্‌ব?"

"আহা, তাঁর হাত থাক্‌লে কি আমার চাকরিটি গেল —আর তিনি চুপ করে রইলেন? তিনি যে বলেন নি এ কথা কে বল্লে? সাহেবকে পাঁচজনে পাঁচ কথা লাগিয়েছে, —সাহেবই রাজী নয়।" মুখে যাহাই বলুন, ভিতরে-ভিতরে তাহার চাকরির জন্য শরৎবাবু যে চেষ্টা করেন নাই— এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না।

"না, রাজী নয়! টুনুর মা বলে সাহেব টুনুর বাপের হাত-ধরা; যা বলেন তাই শোনে। ঐ ত নিমাইবাবুর চাকরি যাবার কথা হয়েছিল—তার স্ত্রী এসে টুনুর মাকে বল্লে, অমনি টুনুর বাপ চাকরি ত বজায় করে দিলে। ঐ যে শশীর মা এসে টুনুর মাকে ধর্‌লে, শশীর চাকরি ত হল। আর তোমার সঙ্গে এত ভাব—তোমার চাক্‌রিটা রাখ্‌তে পাল্লেন না?"

"চাকরি করে দেওয়া এক, আর যাওয়া-চাকরি রাখিয়ে দেওয়া আর এক!" "খোসামোদ কর্‌লে কি না হয়! তিনি তোমার উপর রাগ করেচেন। নোটখানি তুমি চুরি করেছ—এইটি উহাঁদের বিশ্বাস হয়েচে। নিজের মনে না হলেও পাঁচজনে তাঁর মন ভেঙ্গে দিয়েচে।"

"খোসামোদ তিনি পছন্দ করেন না। আর আমার উপর তাঁর রাগও নাই। তবে নোট সম্বন্ধে ও-কথা মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তিনি যে তাই মনে করেছেন, তা আমার বিশ্বাস হচ্চে না।"

"বিশ্বাস তোমার যে কিসে হবে, তা ত বল্‌তে পারি না। আর তাই ভেবেই বা কি হবে? এখন খাও-দাও; পরে অন্য চাকরির চেষ্টা করো। ভগবান যখন জীব দিয়েছেন, আহার তিনি জুটিয়ে দেবেনই।"

৪

সময় যখন মন্দ পড়ে, তখন লোকের কোন দিকেই সুবিধা হয় না। আজ দুই মাস হইল প্রবোধের চাকরি গিয়াছে;—সে কোথাও চাকরির জোগাড় করিতে পারিল না। দশ টাকা মাত্র pension—তাহা আজও মঞ্জুর হয় নাই। তিনটি ছেলে-মেয়ে, নিজে, স্ত্রী; বাটীতে ভাই, বোন, মা আছেন। আবার শীঘ্রই একটি ভগিনীর বিবাহও দিতে হইবে। তাহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। রেল অফিসে একটি চাকরি খালি ছিল। সাহেবের দিতেও ইচ্ছা ছিল। বড়-বাবু হেমন্তকুমার শরৎবাবুর বাটীর ঘটনা সমস্ত জানিতেন। তিনি সাহেবকে বলিয়া দিলেন, সুতরাং 'অমন লোকের' চাকরি সেখানে হইল না। বাঙ্গালী স্কুলে মাষ্টারি পাওয়াও সম্ভব হইল না। Merchant officeএ বাঙ্গালী লইবে না। কালীবাড়ীর পুরুতগিরি করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু সেখানে মাহিনা পাওয়া যায় না। কি করিবে প্রবোধ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ভাবিল, Provident fundএ দেড়শত টাকা আছে, তাহা লইয়াই দেশে চলিয়া যাইবে। টাকা তুলিবার সময় ছোট সাহেব বলিলেন, "প্রবোধ, আমার বিশ্বাস তুমি শরৎবাবুকে এ থেকে একশ' টাকা দিয়ে দেবে।"

সর্ব্বনাশ! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং জিনিষপত্রাদি লইয়া

দেশে যাইবে—এই দেড়শ' টাকাতেই কুলাইবে না ; তাহার উপর, ইহা হইতে একশ' টাকা দিলে ত দেশে যাওয়া আর হয় না। আজ কয়েকদিন স্বামী-স্ত্রীতে একবেলা আহার করিতেছে। ধার পাওয়া যাইতেছে না, তাহার উপর একটি ছেলের আজ চারদিন জ্বর। অগ্রিম মূল্য না দিলে ডাক্তারে ঔষধ দিবে না। প্রবোধ এই সমস্ত কথা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিল। দেশে গিয়া যেমন করিয়াই হউক টাকা পাঠাইয়া দিবে, তাহাও অঙ্গীকার করিল। সাহেব কোন কথাই কাণে লইলেন না। খাজাঞ্জির উপর ১০০৲ টাকা কাটিয়া লইবার হুকুম হইয়া গেল।

৫

প্রবোধ শরৎবাবুর মাকে নিজের মার মতন ভক্তি করিত। তাঁর কাছে ছেলের মত আবদার করিত। তাঁর যখনই যে কোন কাজের আবশ্যক হইত, সে দ্বিধা না করিয়া তখনই তাহা করিত। তিনি তাহাকে বড় ভালবাসিতেন, পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। প্রবোধ আহারটা কিছু ভাল বুঝিত, সুতরাং মধ্যে-মধ্যে নিমন্ত্রণ ত ছিলই, তার উপর সময়ে-সময়ে ভালমন্দ খাবার প্রস্তুত হইলে তাহার বাদ যাবার জো ছিল না। প্রবোধ ভাল না বলিলে কোন জিনিষ ভাল বলিয়া মঞ্জুরই হইত না। তাহার আজ এই দুরবস্থা। তাহার পরিবারবর্গ সকল দিন দু'বেলা খাইতে পাইতেছে না। তার উপর কি না জবরদস্তি করিয়া এত টাকা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে! শরৎবাবুর মা মনে বড়ই আঘাত পাইয়াছেন। ননদের ভয়ে ছেলেকেও কোন কথা বলিবার যো নাই—কি উপায় করিবেন! কাল উহারা দেশে যাইবে। জিনিষপত্র বেচিয়াও টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। রাত্রিতে তাঁহার ঘুম হইল না। সকালে চুপি-চুপি প্রবোধদের বাটী আসিলেন; কিন্তু প্রবোধ বাটী নাই। প্রবোধের স্ত্রীকে বলিলেন, "বৌমা, তোমাদের গাড়ীভাড়া কুলুবে না—এই কয়টি টাকা নাও বাছা, প্রবোধ এলে দিও।"

"না মা, খাওয়া জুটছে না—আবার টাকা নিয়ে শোধ দেব কি করে? জিনিষপত্র বেচে-কিনে যা হয়েছে, তাতে দাদার কাছ পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে। সেখানে দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেশে যাওয়া হবে। পরের টাকায় আবার হাত?"

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাটী ফিরিতেছেন, এমন সময়ে প্রবোধ আসিয়া উপস্থিত। "কেন মা, চক্ষে জল কেন? কি হয়েছে?" সমস্ত শুনিয়া বলিল, "বেশ ত, আমি আর শরৎবাবু কি ভিন্ন? নাই যদি শোধ দিতে পারি, তাতে কি হয়েছে।" হাসিতে-হাসিতে প্রবোধ টাকা কয়টি লইল। চোখ মুছিয়া শরৎবাবুর মা বাটী ফিরিলেন।

প্রবোধকে টাকাটা ফেরৎ দিবেন কি না—শরৎবাবু এই সমস্যায় পড়িয়াছেন। অফিস হইতে আসিয়া ঐ কথাটাই মনে তোলাপাড়া করিতে-করিতে বাগানে বেড়াইতে গেলেন। টাকাটা ফেরৎ দিবেন—এই সিদ্ধান্ত করিলেন। বাটী আসিয়া শুনিলেন, প্রবোধ চলিয়া গিয়াছে। সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। মা বলিলেন, "ওরে যা হবার হয়ে গেছে। প্রবোধ আজ চলে গেল। ছেলেপুলে নিয়ে যাচ্ছে,—গাড়ীতে তুলে দেওয়া দূরে থাক, একবার তার সঙ্গে দেখাও কর্‌লিনি? যাবার সময় কত কেঁদে গেল। বল্লে, 'শরৎবাবু ছোট ভাইয়ের উপর এত রাগ কর্‌লেন যে, শেষ দেখাও কর্‌লেন না? মা, প্রবোধ আর তোমাদের জ্বালাতন করতে আসবে না' " বলিয়া মা আঁচলে চক্ষু মুছিলেন।

"মা, আমি Station এ চল্লুম" বলিয়া শরৎবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। Express ছাড়িবার ১০ মিনিট মাত্র সময় ছিল। শরৎবাবু দৌড়িয়া-দৌড়িয়া Station এ আসিলেন। যাই ৮নং প্লাটফর্ম্মে পা দিলেন, অমনি গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল। "জেঠাবাবু" বলিয়া প্রবোধের ছেলে চীৎকার করাতে শরৎবাবু সেই দিকে ছুটিলেন। "কই রে?" "এই যে শরৎবাবু, নমস্কার চল্লুম"—প্রবোধ মুখ বাড়াইয়া আরও যেন কি বলিল। গাড়ী বাহির হইয়া গেল। শরৎবাবু বুঝিতে পারিলেন না, ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে-দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৃতীয় বৎসর Budget এর সময় ছোট সাহেব কি এক Commission এর printed report খানি দেখিতে চাহেন। বইখানি উলটাইতে-উলটাইতে ১০০ টাকার একখানি নোট বাহির হইয়া পড়িল। সাহেব তখনই শরৎবাবুকে দেখাইলেন। "অ্যাঁ" বলিয়া শরৎবাবু চুপ করিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন, "বইখানি পড়িবার জন্য বাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম। প্রবোধ তাহ'লে এর ভেতরই নোট রেখে ভুলে গিয়েছিল।" তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

"প্রবোধের ভুল? সে না ঐ টাকা নিয়ে দেনা শোধ

করেছিল ?" রমানাথ বাবু শরৎবাবুকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি ত সে দিন বলেছিলাম যে, প্রবোধ ছোকরা এই সামান্য মাহিনা পেয়ে অতগুলি টাকা জমাতে পেরেছে, সে ত সুখেরই কথা। আমার সম্মুখেই ত একশ' দশটাকা সর্দ্দারীমলকে গুণে দিয়েছিল।"

রমানাথ বাবুকে বাধা দিয়া বৃদ্ধ রামতারণ বাবু বলিয়া উঠিলেন "আহা, জমাবার কথা কি, ওর নামের একটা মণি-অর্ডার আমার ছেলে প্রবোধ নিয়েছিল। কুপন দেখে বুঝতে পেরে, আমি ওকে দিয়ে দি।"

সাহেব বলিলেন, "তোমরা এখন যাও। Budget আজ এই পর্য্যন্তই থাক, আমার শরীর ভাল নয়।" শরৎ বাবুকে বলিলেন, "প্রবোধের কথাগুলা তখন আমার বোধ হয়েছিল শঠতায় পূর্ণ। এখন বুঝিলাম সে অকপট ভাবেই সব বলেছিল।" শরৎ বাবু কোন জবাব দিলেন না, সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বাড়ীতে তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কেহই কাছে যাইতে সাহস করিল না। তিনি জলখাবার খাইলেন না। চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িবার ভাণ করিয়া অন্যমনস্কে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। একে-একে সকলে ঘরের ভিতরে আসিতে-যাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু শরৎ ফিরিয়াও দেখিলেন না। অবশেষে তাঁহার মা বলিলেন, "শরো, আজ জল খেলিনি, কি হয়েছে রে ? ঐ যে তোর সাহেব হবার কথা ছিল, তা বুঝি হল না ? তাতে আর কি হয়েছে ?" শরৎ বাবু Enrolled Officer হইয়াছেন। পূর্ব্বে গুজবটী শুনিয়া মাকে বলিয়াছিলেন। আজ Gazetteএ যদিও সে খবর প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য ঘটনা তাঁহাকে অনুতাপে দগ্ধ করিতেছিল। আনন্দের পরিবর্ত্তে তাঁহার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। "এই নাও তোমার নোট, প্রবোধ চুরি করে নি—একটা বইএর ভিতর রেখে ভুলে গিয়েছিল।" "ঠাকুরঝি শুন্‌লি ? আমি কি বলেছিলুম ? আমার কথাটা কেউ কাণেই নিলিনি।"

সকলেই নীরব; দেখিল, শরৎ বাবুর চক্ষু দিয়া টস্‌-টস্‌ করিয়া জল পড়িতেছে।

* * * *

দশ-বার দিন পরে প্রবোধের বাটীর ঠিকানায় প্রেরিত একখানি Insured letter প্রেরক শরৎ বাবুর নিকট ফিরিয়া আসিল। মোড়কের উপর লেখা আছে—"মালিকের উদ্দেশ পাওয়া গেল না।"

বিবিধ প্রসঙ্গ

নৌ-সাধনোদ্যত বঙ্গ (১)

(অতি প্রাচীনকাল হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্য্যন্ত)

[শ্রীতারানাথ রায়]

উপক্রমণিকা

ক্যাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা এসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথেনীয় জাতি সদৃশ। বাস্তবিক, একদিন বাঙ্গালীরা—আর কিছুতে না হউক—উপনিবেশিকতায় এথেনীয়দের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরাজিত ও পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালীদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমান করেন। তাম্রলিপ্তী ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।

বাঙ্গালী নৌ-সাধনোদ্যত,—বাঙ্গালীর আবার জাহাজ ছিল, বাঙ্গালী আবার সমুদ্র-পথে দেশজয় করিত—কথাটায় হাসি আসে। কিন্তু হাসিতে হয় মুখে কাপড় দিয়া হাসুন! বাঙ্গালী সত্যসত্যই নাবিকের জাতি। পায়ের তলে যার নীল সাগর—ঘরের নীচে যার গঙ্গানদী—দুয়ার যার বানের ডাক—সে দেশ যে নাবিকের দেশ, সে দেশের নাবিক যে সমাজের

(১) প্রবন্ধটি প্রথমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর সম্পাদনে 'রাজসাহী সাহিত্য সভায়' পঠিত হয়। তৎপরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশনে উহা প্রবন্ধ-নির্ব্বাচক-সমিতি কর্ত্তৃক পঠিত [illegible] গৃহীত হয়। অধ্যাপক রাধাকুমুদ বাবু ইহা অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে উহা হারাইয়া যাওয়ায় তাহা হয় নাই।—লেখক।

ভয়ে তার সাধের "তরীখানি" বাহিবে না—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

"এখনও বাঙ্গালী লস্কর সমুদ্র-পথে পৃথিবীর সকল দেশেই যাতায়াত করিতেছে। এখন আর তাহাদের নিজেদের অর্ণবপোত নাই। কিন্তু তাহারা অভিজ্ঞ পোতচালক ছিল বলিয়াই, পাশ্চাত্য বণিকবর্গ এ দেশে আসিয়া, তাহাদিগের চিরাভ্যস্ত কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সাহসে, অকুতোভয়তায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়, আত্মত্যাগে, পরিমিতাচারে, প্রভুভক্তিতে তাহারা সভ্য-সমাজের পোতচালকগণের মধ্যে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।"

পুরাণের কথা

রামায়ণে বঙ্গের নৌ-পারদর্শিতার কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। তবে মহাভারতে ভীমকে, শর্ম্মক (Siamese) ও বর্ম্মক (Burmese) দিগকে জয় করিয়া সুহ্ম ও প্রসুহ্ম (Midnapore District) জয় করিতে দেখিয়া, বোধ হয়, তাহা পোত দ্বারাই হইয়াছিল।

স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে উল্লিখিত আছে, কুটিলকেশগণ ভারত হইতে শঙ্খদ্বীপে গমন করেন। ইঁহারা পুরাকালে কপিলাশ্রমের সন্নিকটে সাগর-সঙ্গমে (অতএব আধুনিক বঙ্গদেশে) বাস করিতেন। যজ্ঞপূত অশ্বের অনুসন্ধানে কপিলের আশ্রমে গমনকালে কুটিলকেশগণ সগরের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল এবং সগর-বংশ ধ্বংসের পর তাহারা শঙ্খদ্বীপে যাইয়া বাস করে। তথায় দেবনহুষের সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও কালীতট হইতে বিতাড়িত হইয়া, তাহারা শঙ্খদ্বীপের অন্তর্ভাগে পলায়ন করে, এবং তথায় বাস করিতে থাকে। এই দেবনহুষই Dionysus ও কুটিলকেশগণই Gaituli (Gaityli) জাতি। Africa শঙ্খদ্বীপ ও Nileই কালীনদী। ইহার প্রমাণ মিশরীয় কবি Nonnus ও বিখ্যাত গ্রীক্ পণ্ডিত Philostratus। Philostratus তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-কালে ব্রাহ্মণ-প্রধান Iarchas (যাস্ক)এর নিকট শ্রবণ করেন,—"They (কুটিলকেশগণ) resided, formerly in this country under the dominion of a king named Ganges (গাঙ্গেয়); during whose reign the gods took particular care of them......but having slain their king, they were considered by other Indians as defiled and abominable......Their sovereign, a son of the river Ganges (গাঙ্গেয়) was near ten cubits high (?) and a most majestic personage, that ever appeared in the form of man : under him they left India and migrated to Sanchadwip."

যদি কুটিলকেশগণের গমন বঙ্গ হইতেই হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই নৌ দ্বারা সম্পাদিত হয়। আর সেই নৌ দুই-একখানি নয়, একটি সম্প্রদায়ের গমনোপযুক্ত নৌ-বল। কাপ্তেন স্পীকও আমাদের এই উক্তির সমর্থন করেন।

রঘুর দিগ্বিজয়কালে বঙ্গের নৃপতিবর্গ তাঁহার প্রবল প্রতাপ তুচ্ছ করিয়া নৌ যোগে তাঁহাকে আক্রমণ করেন; কিন্তু রঘু সেই "নৌ-সাধনোদ্যত" বাঙ্গালীকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাস্রোতোন্তরস্থিত দ্বীপে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। (২)

ভার্জ্জিলের সময়

ভার্জ্জিলের সময় (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) বারগোসা (ভৃগুকচ্ছ বা ভরোচ) এবং গঙ্গা রিডির (গঙ্গা রাষ্ট্র) প্রধান নগর "গঙ্গে" ভারতের প্রধান বন্দর ছিল; এবং এই দুইটি বন্দর হইতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পাদিত হইত। "পিরিপ্লাস্ ইরিথ্রি মেরি" নামক (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত) একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,—"গঙ্গে" বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানী হইত। (৩)

এই "গঙ্গে"র স্থান নিরূপণের জন্য যথেষ্ট প্রযত্ন হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

Rhys Davidএর মতে প্রাচীনকালে ভৃগুকচ্ছ (ভরুকচ্ছ), পাটনা, বারাণসী, সৌবীর প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতে ব্যাবিলোন, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য-পোত প্রেরিত হইত।

পালি-সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় পালি সাহিত্যেও প্রাচীন বঙ্গের সমুদ্র-যাত্রা ও সমুদ্র-বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায়। পালি গ্রন্থ "রাজাবলী" বলেন, যে জাহাজে যুবরাজ বিজয় সিংহ ও তাঁহার অনুচরবর্গ সিংহবাহু রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, তাহাতে সাত শত আরোহীর স্থান-সঙ্কুলান হইত। বঙ্গীয় নৃপ-কুমারের এই সিংহল-যাত্রা বঙ্গীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ঠিক যে দিন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভ হয়, সেই দিনই সিংহকুমার সিংহলে পদার্পণ করেন। (৪)

মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ পোতচিত্র দর্শনে আমরা বুঝিতে পারি, কিরূপে নিম্নবঙ্গবাসীগণ আপনাদের ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য, আপনাদের নিজ বাণিজ্য ও ধর্ম্ম-প্রচারার্থ সিংহল, যাভা, সুমাত্রা, চীন ও জাপানে গমন করিতেন। মহাবংশ ও অন্যান্য বৌদ্ধ-গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি, কিরূপে সেই পুরাকালে (৫৫০ খৃঃ পূঃ) বঙ্গের বিজয়রাজ সপ্তশতী অনুচরসহ সিংহলে প্রভাব ও উপনিবেশ বিস্তার করেন ও সেই দ্বীপকে স্বীয় বংশের নামানুসারে সিংহল নামে অভিহিত করেন। (৫) কথিত আছে, ইহারও পূর্ব্বে চম্পাবাসী

(২) রঘুবংশ—৪.৩৮।

(৩) গৌড় রাজমালা—পৃঃ ৩।

(৪) Upham's Sacred Books of Ceylon II, 128, 168.

(৫) তত্ত্ববোধিনী—১৭৯৮ শক। আশ্চর্য্যের বিষয় রাধাকুমুদ বাবুর Indian Shippingএর সহিত তত্ত্ববোধিনীর এই প্রাচীন অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখার আশ্চর্য্য মিল আছে।

বাঙ্গালী কোচিনচীনে উপনিবিষ্ট হন ও তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মাতৃভূমির নামানুসারে তাহার নামানুকরণ করেন। (৬)

ব্রহ্মযোগ

ব্রহ্ম-বণিক্-ভ্রাতৃদ্বয়—তাপুসা ও পেলকট্‌ পঞ্চশত শকটপূর্ণ আপন পণ্যসহ পোতে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গান্তর্গত Adzeitta বন্দরে উপনীত হন। এই বন্দর মগধান্তর্গত সুভমার পথে। দাঠা-বংশে (দংষ্ট্রা বংশে) বর্ণিত আছে, দন্তকুমার দন্তপুর হইতে সিংহলে পোত-যাত্রা করেন। এই যাত্রা বঙ্গের তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল-যাত্রী নৌ মধ্যে একটি পোত দ্বারা সম্পাদিত হয়। (৭)

মহাজন ফটকের যুবরাজ যে জাহাজে চম্পা (বর্ত্তমান ভাগলপুর) হইতে সুবর্ণভূমি (ব্রহ্ম) অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে সাত দল অশ্বারোহী সৈন্য ও তাহাদের অশ্বাদি ছিল।

ব্রহ্মীয় ধর্মগ্রন্থ ও মুদ্রা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের কতিপয় অংশ ও মলক্কা প্রধানতঃ বঙ্গ ও কলিঙ্গ হইতে উপনিবিষ্ট হয়। (৮)

মলয় উপদ্বীপের Province Wellesleyতে Captain James Law, M. A., S. E আবিষ্কৃত গোদিত-লিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে (অক্ষর দৃষ্টে) বুদ্ধগুপ্ত নামে এক মহানাবিক (পোতাধ্যক্ষ, Master Mariner) "রক্তম্রিত্তিক" দেশ হইতে মলয় দেশে বাণিজ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিতেন। মলয় দেশের রাণী তখন "নাচ্ছিয়াতি"। "রক্তম্রিত্তিক" (রক্তমৃত্তিক) দেশ উত্তর ভারতে তিনটি—রাঙ্গামাটী, আসাম; রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম; রাঙ্গামাটী মুর্শিদাবাদ। কেহ বলেন, "ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও আসামের রাঙ্গামাটী সম্ভবতঃ বুদ্ধগুপ্তের আবাস-স্থান ছিল না; কারণ, এতদুভয় সমুদ্র হইতে বহু-দূরবর্ত্তী; সুতরাং চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটী বুদ্ধগুপ্তের আবাস-স্থান।" (৯) কিন্তু সমুদ্র-সমীপবর্ত্তী না হইলেই যে বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইতে পারে না, এমন প্রমাণ নাই। চম্পাও একদিন বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, বুদ্ধগুপ্তের আবাস মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটীতেও হইতে পারে।

যাভাদিতে উপনিবেশ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর বলেন,—কোন মাগধী বিবরণ সুমাত্রা হইতে যাভায় নীত হয়। এই বিবরণ হয় বঙ্গ, না হয় উড়িষ্যার উপকূল হইতে গৃহীত। (১০) এমন কি, হিন্দুর সুমাত্রা-উপনিবেশ প্রায় সমস্তই ভারতের পূর্ব্ব সমুদ্রতট হইতে; এবং বঙ্গ, উড়িষ্যা, মসলিপত্তন যে যাভা, কাম্বোড়িয়ায় উপনিবেশের প্রধান অংশী ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। (১১)

গুপ্তবংশ ও হর্ষবর্দ্ধনের অধীনতায় উত্তর-ভারতে হিন্দু-সম্রাটের প্রভুত্বকাল খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত। এই সময়েই পূর্ব্ব-ভারতস্থিত বঙ্গ, কলিঙ্গ, এবং করমণ্ডল উপকূল হইতে ভারতোপ-নিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল। (১২) উক্ত উপনিবেশগুলি নিশ্চয়ই স্থলপথে হয় নাই, নৌ দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল।

প্রাচীন নৌ-বাণিজ্য-কেন্দ্র

অতি পূর্ব্বকালে সাতগাঁও, পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান বন্দর সোনারগাঁও, চম্প প্রভৃতি নৌ-বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের সময়ে সাতগাঁওকে ত্রিহোত্রপুর বলিত। Ptolemy ইহাকে বহুবিস্তৃত রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চম্প হইতে বণিক্‌বর্গ সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এই সুবর্ণভূমিই ব্রহ্ম-উপকূল। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয়—তাম্রলিপ্ত। এই বৌদ্ধ-বন্দরের আখ্যা প্রতি ভারত-পর্য্যটকের প্রশংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তাম্রলিপ্ত

৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাহিয়ান যখন তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহলে যাত্রা করেন, তখন বঙ্গীয় পোতেই গমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে আছে—"At this time some merchants pulling to sea in large vessels, shaped their course to the south-west; and in the beginning of winter, the wind being then favourable, after a navigation of 14 nights and as many days he arrived at the kingdom of Lions." (১৩)

তামলিপ্তের লোকেরা বলিয়াছিল, সিংহল তাহাদের দেশ হইতে ৭০০ যোজন অন্তরে (২৮৭০ ক্রোশ) এক উপদ্বীপোপরি স্থাপিত। ইহা পূর্ব্বে-পশ্চিমে পঞ্চাশৎ যোজন (২০০ ক্রোশ) দীর্ঘ (?) এবং ত্রিংশৎ যোজন (১২০ ক্রোশ) উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত (?)। ইহার বামে একশত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে।

এই সময় এই তাম্রলিপ্ত বা তমলুক হইতে ব্যবসায়ী-পোত সিংহল এবং সমুদ্র-পারস্থিত অন্য স্থানে গমন করিত। চৈনিক পরিব্রাজক I-Tsing বলিতেছেন—"This is the place where we embarked when returning to China." তিনি বলেন, সুচুয়ান দ্বীপ হইতে তাম্রলিপ্তে অর্ণবপোতে যাইতে ১২ দিন লাগিয়াছিল। (১৪)

(৬) Phys David's Buddhist India—p. 351.

(৭) Indian Shipping—p. 71—72.

(৮) History of Burma by A. P. Phayres.

(৯) প্রবাসী—১৩১৮, আশ্বিন।

(১০) Journal, Bombay branch of R. A. S. XVII. —Dr. R. G. Bhandarkar.

(১১) Bombay Gazetteer—Vol. I. Part. I. p. 493.

(১২) Indian Shipping—p. 11.

(১৩) Foe Kan cki—Bangabasi reprint—p. 360.

(১৪) Takakusa's I-Tsing—XXXIII, XXXIV.

হিউয়েন্ সাঙ্ এইখানে "enquired about Ceylon, and he learned that ships often sailed thither from this port."

মেগাস্থেনিসের সময়েও এই স্থান অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মেগাস্থেনিস বলেন—"It was in old times the main emporium of the trade carried on between Gangetic India (বঙ্গ) and Ceylon." (১৫)

এক সময় এই তাম্রলিপ্তের প্রাচীন আর্য্যরাজবংশ,—ময়ুরবংশের লোপ হইলে, তথাকার সমুদ্রগামী জাতীয় (কৈবর্ত্ত) বণিকমণ্ডলী আপনাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিয়া কালুভুঞাকে রাজা করে। (১৬) তথাকার অর্ণব-বাণিজ্য কালে জন-প্রবাদে ও গল্পে পরিণত হইয়াছিল। একটি গল্পের নমুনা;—ধনপতি নামে এক বিখ্যাত সওদাগর বাণিজ্যার্থ সিংহল গমনকালে এখানে আগমন করেন। তথায় একদা একজনের হস্তে স্বর্ণ-ভৃঙ্গার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় উহা পাইলে?" সে বলিল—"সহরের নিকটেই এক জঙ্গলে এক কুণ্ড আছে—তাহাতে পিত্তল ভৃঙ্গার ডুবাইতেই উহা স্বর্ণময় হইয়াছে।" ধনপতি বাজারের যত পিত্তল-কাঁসার জিনিষ কিনিয়া ঐ কুণ্ডজলে ডুবাইয়া রাখিলেন; সমস্তই স্বর্ণময় হইল এবং তাহা লইয়া তিনি সিংহলে গমন করিয়া প্রভূত অর্থলাভ করিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে ঐ কুণ্ডের নিকট তিনি বর্গভীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

এই তাম্রলিপ্তের অবনতিতেই বঙ্গের হিন্দু নৌ-বাণিজ্যের অবনতি—এমন কি নৌ-শিল্পেরও অবনতি। হাণ্টার বলেন—"The ruins of Tamluk, a seat of maritime commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be a sea going people. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east, west and colonised the Islands of the Archapelago............Religious prejudices combined with the changes of nature to make Bengalis unenterprising upon the ocean."

"সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ" এই বিধি-নিষেধই যদি বঙ্গের নৌ-প্রভাব লোপ করিয়া থাকে, তবে তাহা পূর্ব্বেও করিতে পারিত। আচার রক্ষা করিয়া—বিধি-নিষেধ মানিয়া বাঙ্গালী নৌ-অপারদর্শী হয় নাই; হইলে কেদার-প্রতাপ-রামচন্দ্রের নৌ-ক্ষেপণী-বিক্ষেপে বঙ্গোপসাগর-সলিল মথিত, বিক্ষিপ্ত হইত না—আচারনিষ্ঠ হিন্দুর দর্প নিনাদ ঝঙ্কৃত হইয়া থাকিত না,—"তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ।"

পাল-সেন-শাসনে

পাল ও সেন শাসনসময়ে (৮১২—১১৯৪ খৃঃ) গৌড়ের চারিদিক নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল; এবং এই প্রাকৃতিক সুযোগেই "গৌড়-জনকে" নৌ-সাধনোদ্যত করিয়া তুলিয়াছিল।

পাল ও সেনরাজগণের অশ্বারোহী, পদাতিক ও গজ সৈন্য ত থাকিতই; সেই সঙ্গে নৌ-সৈন্যও ছিল। গজ-সৈন্যের তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল বটে, কিন্তু নৌ-যুদ্ধে বিক্রমপুরাধিপতি সেন-রাজগণের খ্যাতিও সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে এক-প্রকার দ্রুতগামী সুদীর্ঘ নৌকা ব্যবহৃত হইত; সে সকল "কোষা" নৌকা বলিয়া পরিচিত। এই সকল কোষা নৌকায় বহু দাঁড় থাকিত এবং কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল, ভুঁই-মালী প্রভৃতিই সাধারণতঃ বাহন করিত। যুদ্ধার্থ কোষা ছাড়া আর এক প্রকার বৃহৎ নৌকাও ব্যবহৃত হইত। (১৭)

সমুদ্রে গমনকালে তাঁহারা এক জাতীয় বিহঙ্গম সঙ্গে লইতেন। অকূল সাগর মধ্যে কোন্ দিকে গমন করিলে কূল পাওয়া যাইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নাবিকেরা একটা পাখী ছাড়িয়া দিতেন। পাখীটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া পোতে ফিরিয়া আসিলে, নাবিকেরা বুঝিতেন সেদিকে ভূমি নাই। পাখী যদি না ফিরিত, তাহা হইলে উহার গমনের দিক ধরিয়া নাবিকগণ দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া লইতেন!

গৌড়ে লোহাগড় ও পাতালচণ্ডী নামক স্থানে পূর্ব্বে বাণিজ্য-তরণী রক্ষিত হইত। ঐ স্থানেই তখন পোতাশ্রয় ছিল। এই স্থানে প্রস্তরময় সুন্দর নৌ-রক্ষাস্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এই যে, ঐখানে নৌ রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তরগাত্রে লৌহশৃঙ্খল আবদ্ধ থাকিত। অনেকে তাহা দেখিয়াছেনও। (১৮)

৪১৭ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপালদেবের সময় গৌড়াধিপের নৌ-বল খলিমপুরের তাম্রশাসনে প্রকট রহিয়াছে—"স খলু ভাগীরথী পথ প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক সম্পাদিত সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখরশ্রেণী বিভ্রমাৎ......"

"যেখানে (জয়স্কন্ধাবারে) ভাগীরথী প্রবাহ প্রবর্ত্তমান নানাবিধ নৌবাটক (রণতরণী) (সুবিখ্যাত) সেতুবন্ধ-নিহিত শৈলশিখরশ্রেণী-রূপে (লোকের মনে) বিভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে—"

মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালীকে "নৌ-সাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পালবংশীয় নরপালগণ বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহাদের জয়স্কন্ধাবারে হস্ত্যশ্বপদাতিকের ন্যায় "নৌবল" দেখিতে পাওয়া যাইত; এবং রাজকবি তজ্জন্যই "নৌবাটক" শব্দের ব্যবহারে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাই যে 'নৌবাটক' শব্দের প্রকৃত অর্থ, সৌভাগ্যক্রমে বৈদ্যদেবের (কৌমলিগ্রামে আবিষ্কৃত)

(১৫) Mc. Crindle's Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. p. 138.

(১৬) Antiquities of Orissa—W. W. Hunter, Vol. I. p. 310.

(১৭) ঐতিহাসিক চিত্র—১৩১৩—পৃঃ ২১০।

(১৮) সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩০৭। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় এই স্থান দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহার দর্শন সময়ে প্রস্তরগাত্রে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল ছিল, তাহার এক প্রান্ত প্রস্তর-সংলগ্ন, অপর প্রান্ত তৎসমীপবর্ত্তী তটিনীর গর্ভে নিহিত ছিল। শৃঙ্খল টানিলে কিছু দূর উঠিয়া আসিত, তাহার পর আর আসিত না।

তাম্রশাসনে (একাদশ শ্লোকে) উল্লিখিত (নৌযুদ্ধ বর্ণনায় ব্যবহৃত) 'নৌবাট—হীহীরব' তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। নৌবাট নৌ-বিভাগ প্রভৃতি শব্দ যে নৌ-বাহিনীর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা এইরূপে বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান শাসন সময়ে এই "নৌ-বাট" "নওয়ারা" নামে পরিচিত হইয়াছিল।" (১৯)

দেবপালদেব ও নারায়ণপালদেবের সময়েও গৌড়সাম্রাজ্যের এই নৌ-বল অক্ষুন্ন ছিল। কৌমলিগ্রামে প্রাপ্ত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে আছে (১১১৫ খৃঃ)—

"যস্যাপুত্তর বঙ্গ সঙ্গরজয়ে নৌবাট হীহীরব
ত্রস্তৈর্দ্দিক্‌করিভিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তিতদগম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুক-কেমিপাত-পতন-প্রোত সর্পিতৈঃ শীকরৈ
বাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥"

"দক্ষিণবঙ্গের সমরবিজয় ব্যাপারে (চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত) তদীয় "নৌবাট হীহীরবে" সন্ত্রস্ত হইয়াও, দিগ্‌গজসমূহ গম্যস্থানের অসদ্ভাবেই (স্বস্থান হইতে) বিচলিত হইতে পারে নাই। (কিন্তু) উৎপতনশীল, ক্ষেপণীবিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে, (শীকরবিধৌত) চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত।" (২০)

কলঙ্ক ইহাই যে, বিপক্ষসম্মুখে নৌসেনা স্থির থাকিতে সমর্থ হয় নাই, পরাজিত হইয়া আসিয়াছিল। এই শ্লোকে নদীবহুল দক্ষিণবঙ্গেই জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৌর গঙ্গপতির সহিত যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার উল্লেখ নাই ; কিন্তু বৈদ্যদেবের পরাজয় লাভ উহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। (২১)

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে রামপাল মিত্রসৈন্য সম্মিলিত হইয়া বরেন্দ্র Cromwell ডামরার কৈবর্ত্তরাজ ভীমকে জয় করিবার কালে,—"The allied army threw a bridge of boats on the Ganges, crossed the river and advanced and destroyed Damara." ¶

নবাবিষ্কৃত বিক্রমপুরের বৌদ্ধ নৃপ শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনেও নৌ অধ্যক্ষের কথা পাওয়া যায়।

সেনরাজগণের কতিপয় তাম্রফলকেও তাঁহাদের সমরপটুতা-সাধনের মধ্যে নৌবলেরও উল্লেখ আছে। আপুলীয়া ও সুন্দরবনে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে নৌরক্ষকের কথা শ্রুত হয় (নৌপল হস্ত্যশ্ব নোমহিষাজাবিকাদিত্যা)।

উমাপতি ধর লিখিয়াছেন, (একাদশ শতাব্দীর ২য় পাদে) "গৌড়রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ (পাশ্চাত্যচক্র) জয় করিবার জন্য বিজয়সেন যে "নৌবিতান" প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।" (২২)

বল্লালী আমলে, বল্লাল, পুত্র লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য মহেশ মাঝিকে আদেশ দেন। মহেশ রাজভোগ্য প্রমোদতরণী সহায়ে লক্ষ্মণকে শীঘ্র আনয়ন করেন। ইহাতেই তাঁহার পুরস্কার হয়, মহেশপুর। মহেশ ছিল সেনরাজার নৌ-অধ্যক্ষ (Naval captain)।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে—

"যাহারা নক্ষত্রমাত্র সম্বল করিয়া অকূল পাথারে তরণী ভাসাইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বহির্গত হইত, পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের কথা একেবারে অপরিচিত ছিল না। তাহাদের কথা বাঙ্গালীর গৃহে-গৃহে বণিকপুত্রের অসীম সাহসের অসামান্য কাহিনী প্রচারিত করিয়া জনসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিত ; তদীয় বিরহ বিধুরা প্রাণ-প্রিয়তমার "বারমাসিয়া" করুণ গীতে বাঙ্গালীর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখিত।" † (২৩)

বঙ্গসাহিত্যে প্রাচীনতম নৌবর্ণনা আমরা নারায়ণদেবের চাঁদ-সদোগরের সমুদ্রযাত্রায় অতি সুন্দররূপে পাই। বংশীদাসও অনতি-রঞ্জিতভাবে, উপাখ্যান বর্ণনা ত্যাগ করিয়া এই সম্বন্ধে আর একটি বিশ্বাস্য বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি নারায়ণদেবেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ কবিকঙ্কণ, কেতকদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন সাহিত্যকার-গণের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

ভাণ্ডারী আসিয়া রাজাকে কহিল,—

"অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়,
চন্দন নাহিক এক তোলা।
যত সাধু ছিল ঋণী, এবে তারা হৈল ধনী,
সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা॥
বিংশতি বৎসর হৈল, রঘুপতি দত্ত মৈল,
তরী ভরা আনিত চন্দন।
আর সব সওদাগর, তিলেক না ছাড়ে ঘর,
না পাই চন্দন অন্বেষণ॥"

এইখানে যেন বাঙ্গালার সমুদ্রবাণিজ্যের অবনতির একটা ক্ষীণ আভাষ পাওয়া যায়। পূর্ব্বের মতন বাঙ্গালী সওদাগরেরা যেন তেমন সমুদ্র-বাণিজ্যে উৎসাহান্বিত নয়—যেন সে সমস্ত বিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছে।

সাধুকে রাজা সিংহলে যাইতে বলিলেন। সাধু বলিল,—

"এবার পাঠাও প্রভু অন্য এক জন॥
এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে।
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে॥

---

(১৯) গৌড়লেখমালা—পৃঃ ২৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

(২০) গৌড়লেখমালা—

(২১) আনন্দবাজার পত্রিকা ১০।১০।১৯ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়।

(২২) গৌড়রাজমালা—পৃঃ ৬৫।

(২৩) সাগরিকা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পানী ভেদী ডিঙ্গা মোর হৈল পুরাতন।
কেমনে যাইব তাহে সিংহল পাটন।"

এগুলা যেন ইউলিসিসের পোতবাহন-ক্লান্ত, অবসন্ন নাবিকদের বাণী। রাজা সে কথা শুনিলেন না; তিনি সাধুকে চড়িবার ঘোড়া, লক্ষ তঙ্কা ডিঙ্গার ধন ও অঙ্গের আভরণসহ বিদায় দিলেন। তখন যেন সেখানকার নাবিককুলে সাড়া পড়িয়া গেল,—

"সিংহল যাবে সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা
নাইয়া পাইঠের কলকলি, ঘন বাজে শিঙ্গা॥"

খুল্লনা সব শুনিল। বঙ্গরমণীসুলভ কোমলতায় স্বামীকে অনুনয় করিয়া কাতর বচনে কহিল,—

"প্রাণনাথ হে!
বহুত মিনতি মাঙ্গি অর্ণবে না লও ডিঙ্গী
পাটা যার শতেক যোজন।
কি করে ঠকম শিঙ্গা পক্ষে ছুয়া লয় ডিঙ্গা
সেই কার্য্যে শঙ্কট জীবন॥
যাবে সাগর বায়া সে দেশে না জীয়ে নায়া
পরাণ শঙ্কট লোনা বায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে মকর মনুষ্য কাটে
ধি থাকুক সিংহল উপায়॥" ইত্যাদি

বলিয়া রাখা ভাল যে, শিঙ্গার শব্দে তখন আগন্তুক অন্য কোন নৌকার সহিত সংঘর্ষণ হইবার ভয়ে সাবধান করিয়া দিত।

গোধূলির সময় ডুবুরীরা ভ্রমরার জল হইতে সপ্ত ডিঙ্গা তুলিল। তখনকার নৌ-নামকরণে যে কবিত্ব দৃষ্ট হইত, তাহা পাঠকের প্রীতিকর হইতে পারে।

প্রথমে তুলিল তরী নাম মধুকর।
সর্ব্বশুদ্ধ স্বর্ণ যার বৈঠকী ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চপিয়া তাতে বসিতে গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নাম গুয়াবেকী।
দুপ্রহরের পথে যায় মালুম কাঠ দেখি॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে শংখচূল।
আগী গজ পানি ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপাল।
যাহার আগমনে দুই কূল করে আলো॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোট-মুটি।
চাতে চালন্তরা চাই বায়াম্ন পউটি॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে নাটশালা।
তাহাতে দেখয়ে সবে গাবরের মেলা॥"

বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গলেও এইরূপ বর্ণনা আছে। এই সময় সুদীর্ঘ অভিযানের জন্য উপযুক্ত বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ বঙ্গীয় পোতে স্বদেশের অধন দ্রব্যের বিনিময়ে সমুদ্রপারস্থিত দেশ হইতে মূল্যবান্ দ্রব্য আনিত। বিনিময়-ব্যাপারে বঙ্গীয় সওদাগর কি আশা করিত, শুনুন—

কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শংখ।
বিড়ঙ্গা বদলে, লবঙ্গ পাব,
শুঠের বদলে টঙ্ক॥
পতিঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল পাব
বহরা বদলে গুয়া॥
পাটশণ বদলে, ধবল চামর পাব
কাচের বদলে নীলা (নীল)।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব
জোয়ানী বদলে হীরা॥
চুয়ার বদলে, চন্দন পাব
ধুতির বদলে গড়া।
শুকুতি বদলে, মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥"

কবির ছন্দমিলের খাতিরে বঙ্গীয় সওদাগরগণ এ সব পাইত কি না, তাহা জানি না। তবে এইটুকু পাওয়া যায়, এমন কি বঙ্গীয় ব্যবসায়ী "মূলার বদলে" "গজদন্ত"ও পাইত। ধনপতির উদ্দেশে তদীয় পুত্র শ্রীমন্ত শতগজ দীর্ঘ ও বিংশগজ প্রশস্ত পোতসহ সিংহল যাত্রা করেন। এই সকল পোতের মস্তক মকর, গজ বা সিংহমুখ ছিল।

একটা আশ্চর্য্যের কথা—প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে সমুদ্রগামী বঙ্গীয় বণিকেরা কেবল সওদাগরী করিতে "সিংহল পাটনেই" যাইত। বোধ হয় এই সময় ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব বশতঃ সমুদ্র-পারস্থিত দেশমাত্রই বাঙ্গালীর নিকট সিংহল বলিয়া কথিত হইত।

ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত পালশাসন সময়ের আর একটি দৃষ্টান্তে বঙ্গের নৌ-ব্যবহার অবগত হই। ইহাতে পাই যে, দেবপালের সেনাপতি লাউসেন ত্রিষষ্টিগড় (ঢেকুর বা ময়নাগড়) হইতে "সংযাত সহিত" "হাকন্দে আনন্দ স্কন্ধে" "উপনীত" হন। কিন্তু হাকন্দ কোথায়, তাহা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব। তবে পাঁচালী-বর্ণিত স্থান ধরিয়া গেলে পাঞ্জাবের অন্তর্গত কোন স্থানে হয়। (২৪)

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে পাই—

"আনল নিশানে নৌকা ছোটে ঐরাবত।
শিশারু মালুম কাঠে দিশাকরে পথ॥"

(২৪) দেবপালের সেনাপতি এই লাউসেনের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ অনেকেই সন্দেহ করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি ইহা পাঁচালীকারের কল্পনাই মনে করেন।

ইহা হইতে বোধগম্য হয় যে 'দিশাই' সেই কালের "পাইলট্।"

ময়নামতী পুঁথিতে পাওয়া যায়, একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রিপুরা জেলার মেহারকুল পরগণায় গোবিন্দচন্দ্র পিতৃদেব মাণিকচাঁদের সিংহাসন গ্রহণ করেন। এই গোবিন্দচন্দ্রের অধীন "বত্রিশ কাহোন নাও" "গাঙ্গেতে এড়িয়া" যাইত। তাঁহার রাজ্যাধীন নয়ানগরে (ত্রিপুরাজেলার নবিনগর) "উনশত বাণিয়ার" বাস ছিল।

মালদহের একটি গম্ভীরাতে আছে যে, ধনপৎ নামে এক সওদাগর দিল্লী হইতে গৌড়ে জাহাজে আসিতেছেন। "পানীহারী" (জল আনয়নকারী দাসী) বলিতেছে,—

"গৌড় কিনারা হায় ভাগীরথী নদী।
জাহাজ সে ছানিয়া হায় ধনপতি॥
সব ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বোহারা সে।
নাহি আদ্‌মি পাবে পানি ভর্‌নে॥"

ধারণা করুন, সে জাহাজখানা কেমন?

জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে গৌড়ের নৌ-নির্ম্মাণ-শিল্পের বিষয় বহু জানা যায়। বণিক চান্দ সওদাগর "কুশাই কামিলাকে" স্বীয় সমীপে ডাকিয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা নির্ম্মাণে আদেশ দিলেন। কুশাই স্বীয় অধীন "শিষ্যগণ সাথে" অরণ্যে নৌকাষ্ঠ সংগ্রহার্থ গমন করিল। তথায়—

"শাল পিয়ল কাটে খরি তেতলি।
কাটিল নিম্বের গাছ গাম্ভারি প্যারলি॥
আম্র কাঠাল কাটে, কাটে যে বকুল।
চম্পা খিরনি কাটি করিল নির্ম্মূল॥"

ঐ সমস্ত কাষ্ঠ তখন নৌ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত।

তখন নৌ-সাধন এত বিস্তৃত ছিল যে, ঐতিহাসিক মুক্তকণ্ঠে ধ্বনি করিতে সঙ্কুচিত হন নাই যে,—"Our Indian Srimanta represented to possess merchantmen trading to the Coromondal coast, to Ceylon, to Malacca, Java and China. (২৫)"

বঙ্গীয় নৌ সমূহের পরিচালন-কার্য্যে পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গীয় নাবিকগণ গৃহীত হইত। তাই রাঢ়ীয় কবি কবিকঙ্কণ ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন,—"ধনপতি সওদাগরের জাহাজ কালীদহের বিপুল আবর্ত্ত মধ্যে বিপন্ন হইলে, "বাঙ্গাল মাঝিরা" জীবন-মায়ায় সন্তপ্ত হইয়া উঠিল—

"আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়ে হাত।
হলদি গুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় ময়া থো।
বিদেশে রহিন্তু না দেখিনু পো॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি ঐ তাপে মৈল।
কালীগুয়ী দুটী মাগু (স্ত্রী) সেই কোণা গেল॥" ইত্যাদি

পাঠকের সহানুভূতি হয় কি?—যখন কুম্ভীরদহ, কাঁকড়াদহ উত্তীর্ণ হইতে হইবে, অস্বাভাবিক কাঁকড়া (Octopus?) আসিয়া পোত রোধ করিল, নাবিকবর্গের কুশলায় পোত রক্ষা পাইল। রাঢ়ীয় কবিকণ্ঠ অমনি বাঙ্গাল মাঝির প্রশংসা করিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"বড়ই সেয়ান সব উত্তর্‌য়া বাঙ্গাল।"

মুসলমান-শাসন-প্রারম্ভে

মুসলমান-শাসন-প্রারম্ভে গৌড়ের উত্তর-পূর্ব্ব স্থানে "চিড়াইবাড়ী" নামে এক স্থান ছিল। প্রবাদ আছে, সেই সময় এইখানে এক বিস্তীর্ণ নৌ-নির্ম্মাণ-কার্য্যালয় ছিল। এইখানে সহস্রাধিক শিল্পী গৌড়ের সমস্ত আবশ্যক নৌ-নির্ম্মাণ করিত। ভগ্ন, জীর্ণ নৌসমূহের এই স্থানে সংস্কার হইত। নৌ-নির্ম্মাণার্থ সেথানে যে কাঠ চিরাই হইত, তাহা এত দূর হইতে শ্রুত হইত যে, পথিকগণ ঐ স্থান দিয়া যাইতে বিরক্ত হইতেন। প্রত্যহ দেশী-বিদেশী বহু বণিক বড়-বড় নৌকা ক্রয়ার্থ এই চিড়াইবাড়ীতে আসিত।

পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে "পালখান দীঘি" নামে এক প্রাচীন দীঘি আছে। ইহার নিকট "বেণিয়াপাড়া" নামে একটি গ্রাম আছে। ইহার কিছু দক্ষিণে "বল্লাল কাঠাল।" ইহার নিকট "না-ঘাটা" নৌ-শিল্পের এক প্রাচীন স্থান ছিল। বেণিয়াপাড়ার বণিকগণের বাণিজ্য-পোত ছিল। তাঁহারাও চাঁদসদাগরের মতন পুনর্ভবা বহিয়া বড়-বড় নৌকায় পণ্য সহ গৌড় ও সাতগাঁ হইয়া সিংহল যাইতেন।

অলঙ্কার কুণ্ড নামে ভালুকীর এক বেণে ছিল। ১৬০০ বেণের শিরোমণি বর্দ্ধমানের ধুসা দত্ত, ইছানীর লক্ষপতি সাধু, গৌড়ের সাকরমা গ্রামের গর্ভেশ্বর দত্ত বাণিজ্যার্থ বাণিজ্য-নৌযোগে দেশ বিদেশে গমন করিত। কিন্তু মুসলমান কর্ত্তৃত্বে বঙ্গের হিন্দু নাবিককুল লোপ পাইতে বসিয়াছিল।

রাজশাহী প্রদেশে বহু নদী, বহু বিস্তৃত বিল আছে, তাই এই জেলার বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথেই হইত। পশ্চিম বরেন্দ্রের ধান্য সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে পদ্মা দিয়া সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হইত। চলন-বিলের তটে কলম হইতে কাংশ শিল্পদ্রব্য সমগ্র বঙ্গ সরবরাহ করিত। এই স্থানের কার্পাস ও পট্টবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইত।

মুসলমান-শাসনে

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঘীসুদ্দীন্ তোগড়াল যখন দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া দুইবার সম্রাট-সৈন্য বিধ্বস্ত করিলেন, তখন সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া বহু বল সংগ্রহ করতঃ স্বয়ং বিদ্রোহ দমনার্থ যাত্রা করিলেন। হুকুম হইল যমুনা ও গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য নৌ বল সজ্জিত হউক। বর্ষাকালে স্বীয় ভ্রাতা বগোরা খাঁর সহিত তিনি বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাট গৌড়ে আসিলেন—বিদ্রোহী যাজনগরে পলায়ন করিল। যখন সম্রাট-সৈন্য সোণারগাঁয়ে উপনীত হইল, তখন তথাকার রাজা দিনাজরাজ সম্রাটের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করতঃ বিদ্রোহীবর্গের বিপক্ষে জলপথে আপন নৌবল সজ্জিত রাখিলেন।

---

(২৫) Indian Shipping—P. 223.

এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও সোণারগাঁর হিন্দু-শিল্পীর নৌ-বিদ্যা অক্ষুন্ন ছিল।

বেটুটার কথা

খৃষ্টীয় ১৩৩০ অব্দে ইবন্ বেটুটা বঙ্গ-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই নদীবক্ষে (ব্রহ্মপুত্র) অগণ্য অর্ণবপোতও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার প্রত্যেকটিতে এক-একটি করিয়া দামামা আছে। দুইখানি জাহাজ যে সময় প্রথম একস্থানে উপস্থিত হয়, সেই সময় উভয় জাহাজের নাবিকবৃন্দই উহা নিনাদিত করিয়া পরস্পরের সহিত সম্ভাষণ করে।.........এই নদীবক্ষে পনর দিন অতিবাহিত করিয়া আমরা সোণারগাঁয়ে উপনীত হই। তথায় আমি এক "জঙ্ক" (বৃহৎ চৈনিক পোত) দেখিতে পাই। তাহা যাভা দেশাভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। সোনারগাঁ হইতে যাভা যাইতে হইলে সমুদ্রে ৪০ দিন কাটাইতে হয়। আমি এই জাহাজে আরোহণ করত: ১৫ দিবস পরে বড়নগরে (Barahnagar?) উপনীত হই।" (২৬)

মুসলমান-শাসনকালে গৌড়ের নৌ-শ্রী কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত হয়। গৌড় বাদশাহ আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ একদল রণতরী রক্ষা করেন, সেই পোতের সহায়তায় এক দিন তিনি আসাম আক্রমণ করেন। (২৭) এই সময় হইতে বঙ্গীয় প্রতি মুসলমান নৃপতিই স্বীয় অশ্ব সৈন্যের সহিত নৌ-সৈন্যও রক্ষা করিতেন।

ভারথেম্ বাণী

Veithem বলেন (১৫০৩—৮), "From the city of Banghella sail every year fifty ships laden with cotton and silk stuffs."

এই City of Banghellaকে অধ্যাপক রাধাকুমুদ বলিয়াছেন গৌড়; কিন্তু কি প্রমাণে যে লিখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু "খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সমূহ ও তদবলম্বনে লিখিত তৎকালীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত "বাঙ্গালা" নামক একটি নগরীর বহুস্থানে উল্লেখ দৃষ্ট হয়।" এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর মহাশয়ের আলোচনাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। (২৮)

(২৬) ৺হরিনাথ দে মূল হইতে ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যালের বঙ্গানুবাদ—ঐতিহাসিক চিত্র—১৩১৪, বৈশাখ। কেহ বলেন বেটুটার যাভা আধুনিক সুমাত্রা; তৎকালে উহাকে যাভা বলিত। তিনি বলিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বাঙ্গালা রাজ্য ও লক্ষ্মণাবতী রাজ্য ভ্রমণ করা যায়।

(২৭) Blochman's Koochbehar and Assam, p. 3.
J. A. S. B. 187. p. 1. No. 1.

(২৮) 'বাঙ্গালা', নগরী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর
—সম্মিলনী ১৩২১।

দাউদ খাঁর অধীনেও বঙ্গে বহু শত রণতরী ছিল—ইতিহাসে দেখিতে পাই।

আকবর-রাজত্বে

আকবরের রাজত্বকালে সমস্ত রাজ্যই রণপোতে বলীয়ান ছিল; কিন্তু ভারতে নৌ নির্ম্মাণের প্রধান কেন্দ্র ছিল বঙ্গ ও কাশ্মীর। ঢাকায় তথন সম্রাটের "নওয়ারা" থাকিত। আইন ই আকবরীতে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বে সামুদ্রিক জাহাজ কেবল বাঙ্গালা দেশেই তৈয়ারী হইত। সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত বাজুহাস্ সরকারে নৌকা-নির্ম্মাণের যথেষ্ট কাষ্ঠ জন্মিত। বঙ্গীয় জমীদারেরা সম্রাটকে ৪৪০০ খানি করিয়া রণপোত দিতেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবর, খাঁ আলম্ নামক মোগল সেনাপতিকে গাজীপুর অধিকার করিতে আদেশ দেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থ বিহার প্রদেশের জমীদার রাজা গজপতির প্রতি হুকুম জারী করেন। খাঁ আলম্ গজপতি-সহ তরী দিয়া গঙ্গা পার হইয়া গাজীপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাজীপুর দুর্গ-রক্ষক ফতে খাঁ প্রবল বেগে বাধা দিলেন। সম্রাট সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া, "despatched three large boats filled with volunteers, to their assistance" এই স্বেচ্ছাসেবী নৌ-সৈন্যের সহিত ফতে খাঁর অষ্টাদশ রণপোতের বিষম সংঘর্ষ হয়।

রুসিয়া উদ্দেশে

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ভিগুশেথ নামে গৌড়ের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী রেশম ও কাপাস-বস্ত্র সহ তিনখানি বাণিজ্যপোত লইয়া রুসিয়া অভিমুখে গমন করেন; পথে পারস্য উপসাগরের নিকট তাহার দুইখানি জলমগ্ন হয়। (২৯)

রাল্ফ্-ফিচের বিবরণী—

ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভ্রমণকারী Ralph Fitch (১৫৮৬) বঙ্গীয় কতিপয় বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। টাঁড়া (Tanda) হইতে নৌ যোগে কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র; বাক্লা হইতে বিস্তর পরিমাণে চাউল, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র এবং শ্রীপুর হইতে বহু পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হইত। চতুর্থ স্থান সোনারগাঁ—"Here is best and finest cloth made of cotton that is in all India......Great stores of cotton cloth goeth from here and much rice, wherewith they serve all India, Ceylon, Pegu, Malacca, Sumatra, and many other places."

সাতগাঁও আর একটী বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভ্রমণকারী বলিতেছেন,—Satgaon is a fair city of the Moors, and very plentiful of all things. Here in Bengal they

(২৯) W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. vii, p. 95. Also Sir George Wood.

came every day, in one place or other, a great market which they call "Chandeum", and they have many great boats which they call "pencese" (পানি কোষা), wherewithal they go from place to place and buy rice and many other things ; their boats have 24 or 26 oars to row them, they be of great burthen." (৩০)

এই সময় বঙ্গ লবণ বাণিজ্যের জন্যও বিখ্যাত ছিল। ইহার কেন্দ্র ছিল "সনদ্বীপ"। সেই স্থান হইতে বৎসরে ৩০০ জাহাজ লবণ বোঝাই হইয়া যাত্রা করিত।

হিন্দু নৌ-উত্থান—

মানসিংহের শাসনকালে (১৫৮৯—১৬০৪) আমরা বঙ্গের নৌ সাধনের এক বিস্তৃত বিবরণ পাই। তখন বঙ্গের কতিপয় স্বাধীন হিন্দুরাজপুর মধ্যে নিস্তব্ধ ভাবে হিন্দু নৌ-বলের পুনরুন্নতি হইতেছিল। ওদিকে মোগল সম্রাটের "নওয়ার।" ঢাকায় বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই হিন্দু নৌ-সাধনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীপুর, বাক্‌লা বা চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর (Chandecan)। কেদার রায় তখন শ্রীপুরের রাজা ছিলেন। তিনি যে নৌ-বল ও নৌ সৈন্যে বিশেষ বলীয়ান্, তাহা কেহই জানিত না, কিন্তু তাঁহার রণতরী সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত।

কুচবিহারাধিপতি লক্ষ্মণ নারায়ণও এই সময় এক সহস্র রণতরীর অধিকারী ছিলেন।

কেদার-দর্প—

কেদার রায় প্রথমতঃ বহু রণতরী নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেদারের অবিরাম আক্রমণে বাধ্য হইয়া তাহারা সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। কেদারও সেই সমস্ত 'ফিরিঙ্গী' দিগকে আপনার রণতরী ও কামান-বন্দুক পরিচালনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলের নিকট হইতে সনদ্বীপ জয় করিয়া তাহার রাজত্বভার আপনার পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালোকে (Carvalius) প্রদান করেন। এই ব্যাপারে এরাকানরাজ সেলিম ভীত ও রাগান্বিত হইয়া সনদ্বীপ জয় করিতে ছোট বড় ১৫০ খানি যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইলেন। কেদার রায়ও আপন সামন্তকে সাহায্য করিতে তৎক্ষণাৎ ১০০ রণতরী প্রেরণ করিলেন। কেদারের মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিয়া, বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণপোত অধিকার করিলেন। সেলিম দ্বিতীয়বার সহস্র রণতরী সহ কেদারের মিত্রপক্ষকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু সেই সময়েই কেদারকে আর একজন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

বঙ্গাধিপ মানসিংহ তখন কেদার-প্রভুত্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এই সুযোগে ১০০ রণতরী সহ মন্দা রায়কে পাঠাইলেন। যুদ্ধে মন্দা রায় নিহত হইল। (৩১)

এই যুদ্ধের পূর্ব্বে এক স্থলযুদ্ধেও মোগলবাহিনী বিক্রমপুরাধিপতির প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অনিচ্ছায় পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। এই উভয় সংবাদ শ্রবণ করতঃ মানসিংহ আপনার মানরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ শ্রীপুরের নিকট সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া কেদারের ভ্রাতা চান্দ রায়কে লিখিলেন,—

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয়-গজ-নরনৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি,
বিষম সমরসিংহো মানসিংহ প্রযাতি।"

কেদারও পঞ্চশত রণতরী লইয়া মোগলের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং "বিষম সমরসিংহ মানসিংহ"কে সগর্ব্বে প্রত্যুত্তর দিলেন,—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং।
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্॥
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে।
তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ॥"

দেশভক্তের সদর্প প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্ত সিংহ শ্রীপুর অবরোধার্থ একদল সৈন্য পাঠাইলেন। মোগল সেনাপতি কিল্‌মাক্ শ্রীনগরে বন্দী হইয়া শৃঙ্খলগ্রন্থি গণিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ মোগল কামান দ্বারা আক্রমণ চলিল, কেদার বন্দী হইয়া মানসিংহ সকাশে আনীত হইলেন। (৩২)

বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ ও ভুলুয়া—

বরিশাল প্রদেশস্থ বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন তখন রামচন্দ্র রায়। ইনি যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন। যখন তিনি বিন্দুমতীকে বিবাহ করিতে যশোহরে যান, তখন আরাকানরাজ সেলিমসাহ বাক্‌লা জয় করেন। প্রতাপাদিত্য সেলিমকে তুষ্ট করিবার জন্য কেদার রায়ের সেনাপতি কার্ভালোকে হত্যা করেন ও স্বীয় একাধিপত্য স্থাপনার্থ জামাতা রামচন্দ্রের

---

(৩০) সাহাবাজ খাঁর শাসন কালে Ralph Fitch বঙ্গে আগমন করেন।

(৩১) "Cadry (কেদার রায়) lord of the place (শ্রীপুর), where he was suddenly assaulted with one hundred corser (কোষা রণতরী), sent by Mansing, Covernor under the Mogal who having subjected that tract to his master sent forth this Navie against Cadry. Mandry (মন্দা রায়) a man famous in these parts being Admiral; where after a bloudie fight Mandry was slain."

Parchas, and His Pilgrimes, Pt. VI. Book V. Page. 513.

(৩২) Eliot's history of India, Vol. vi. P. 166.

হত্যারও উদ্যোগ করিতেছিলেন। বিন্দুমতীর মুখে এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র স্বীয় সামন্ত রামনারায়ণ মল্লকে সমস্ত ঘটনা জানান। প্রভুভক্ত রামনারায়ণ,—

শ্রুত্বা সকল সংবাদং নৃপস্য প্রমুখাত্ততঃ॥
চতুঃষষ্টি দণ্ডযুতা নৌরানীতা মহামতিঃ।
নালীকৈঃ সজ্জিতা স্বৈঃ সৈন্যাদৈঃ পরিরক্ষিতা॥
তস্যারোহণং কৃত্বা প্রগৃহ্য নালীকায়ুধম্।
তুর্ণং গমন বার্ত্তাং নালিকধ্বনিভির্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শত্রুপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগমঃ॥ (৩৩)

নৌ কেমন? না, ৬৪ ক্ষেপণীযুক্ত, কামান-সজ্জিত, নৌ সৈন্য পরিরক্ষিত!

রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যসংলগ্ন ভুলুয়া পরগণার অধিপতি লক্ষ্মণ-মাণিক্যকে শিক্ষা দিবার জন্য সসৈন্যে ভুলুয়ার উপস্থিত হন। লক্ষ্মণও তদীয় আগমনে তাঁহাকে রণতরী দ্বারা আক্রমণ করেন। (৩৪)

যশোহর প্রতাপ—

হিন্দু নৌ-সাধনার প্রধান স্থান ছিল যশোহর। (Chandecan) এ নৌসাধন প্রতাপাদিত্য দ্বারা পুষ্ট হয়। প্রতাপাদিত্যের Spiritএর সহিত প্রীহা ছিল কি না, তাহা সমালোচকেরা জানেন; কিন্তু ঐতিহাসিক বলিতে পারেন, তাহার Spiritএর উন্নতির সহিত নৌ-উন্নতি হইয়াছিল। (৩৫) বহু সমরপোত সদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত।

তাঁহার সমর নৌ প্রস্তুতের ও সংস্কারের তিনটি স্থান ছিল—ধুবালি, জাহাজঘাটা ও চাকশ্রী।

রায়নগর, পর্ত্তুগীজ-দস্যু গঞ্জালো, পর্ত্তুগীজপ্রভাব—

রায়নগর আর একটি নৌসাধন স্থান ছিল। তথায় সুবুদ্ধি রায় নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। মগ জলদস্যুগণ হইতে রাজ্য-রক্ষার্থ তিনি আপনার রাজ্য নৌ-রক্ষিত করিয়াছিলেন তাঁহার উত্তরাধিকারী-বর্গ ঐ চেষ্টার অনুপ্রাণিত হইলেন। রায়নগর ক্রমে নৌবলীয়ান্ ও বহির্বাণিজ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল। দক্ষিণবঙ্গে, সাগরকূলে, প্রাচীন এথেন্স কার্থেজাদির মত একটি প্রবল সমৃদ্ধ রাজ্যের সৃষ্টি হইল। ৯৯৮ সালে রাজা তোডরমল্ল যখন বঙ্গে মোগল রাজপ্রতিনিধি, তখন রায়নগররাজ দুর্গাদাস মোগলকে যুদ্ধ সময় ২০খানি করিয়া রণপোত দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। (৩৬)

(৩৩) রামচন্দ্র শ্বশুরপুরী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন অনেকে এই অপবাদ দেন; কিন্তু শত্রুপুরী কাঁপাইয়া নালীকধ্বনিতে অবগত করানটা পলায়ন নয়। আর প্রতাপও নৌপ্রতাপে নিতান্ত অপোগণ্ড ছিলেন না।

(৩৪) ঐতিহাসিক চিত্র—১৩১৫—পৃঃ ১৩।

(৩৫) "পেঁচিয়ে কথা কইলে রূঢ়, বুঝতে পারি নইক মূঢ়।"

(৩৬) ঐতিহাসিক চিত্র—১৩১৪—পৃঃ ৩৬২-৬৫।

১৫৩৭ কি ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য সংস্থাপন করিবার কয়েক বৎসর পরে বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেল ও হুগলী নগরে Gollin বা Gallo নামে এক উপনিবেশ, দুর্গ ও বন্দর প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময় সরকার সপ্তগ্রামে। সপ্তগ্রাম ও হুগলী নামক ক্রোশার্দ্ধ ব্যবহিত দুইটি বন্দরই ফিরিঙ্গীহস্তে ছিল, কেবল শেষোক্ত বন্দরের রাজস্ব আদায় হইত। যে সকল বাণিজ্য-জাহাজ বা নৌকা হুগলীর নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, পর্ত্তুগীজেরা নবাবের বিনা অনুমতিতে তাহাদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতে লাগিল। সম্রাট, বঙ্গাধিপ কাশিমখাঁ জোবানীকে বঙ্গ হইতে পর্ত্তুগীজ তাড়াইতে আদেশ দিলেন। কাশিমের সৈন্য দ্বারা বহু পর্ত্তুগীজ-বীর নিহত হইল। মোগলেরা দুর্গ জয় করিল।

বহু পর্ত্তুগীজ নিহত হইল, অবশিষ্ট পলায়ন করিয়া জাহাজে আশ্রয় লইতে গিয়া নদীর জলে ডুবিয়া মরিল। যাহারা কোন প্রকারে জাহাজে পৌঁছিল, তাহারাও জলযুদ্ধে মোগলের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। মোগলেরা পূর্ব্বেই সব সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল; এখন নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগের পলায়নপথ রোধ করিল। ৬৪ খানি বড় জাহাজ, ২৩ মাস্তুলবিশিষ্ট ৫৭ খানি মাঝারি ও ২০০ খানি এক-মাস্তুলী ছোট জাহাজ মোগল হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল।

এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গের নৌসাধন ব্যাপারে কৃতকার্য্য ও অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়া পর্ত্তুগীজগণই অংশী হইল। তাহাদের এই নৌযোগে মনুষ্য-মৃগয়া ও দস্যুবৃত্তিতে আরাকনবাসী মঘেরাও অনেক সময়ে সহচর হইত।

কবিকঙ্কণের এক স্থানে আছে,—

"ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে॥"

হরমাদ অর্থাৎ Armada, নৌসেনাবাহিত পোত। চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীন হইলে, উপকূলবর্ত্তী রাজ্যের নৌবল বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশাগত নৌসমরকুশল পর্ত্তুগীজদিগের সহিত প্রথম হইতেই সদ্ভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই ষোড়শ শতাব্দীর সৌহার্দ্দ স্থাপনই বোধ হয় পাশ্চাত্য-দেশের ভারতভূমে অধিকার স্থাপনের একটি বিশেষ সহায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ জলদস্যু সিবেস্তা গঞ্জালো বঙ্গোপসাগরবক্ষে এক জেলেডিঙ্গী সহায়ে লবণের ব্যবসায় করিতে যাইয়া আরাকান-রাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত হইল। অনুপায় ব্যবসায়ী বাধ্য হইয়া দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। তাহার দস্যুবৃত্তি-লব্ধ লুণ্ঠিত দ্রব্য বাক্লার রাজা রামচন্দ্রের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার দেশে বিক্রয় করিত।

সন্দ্বীপ এই সময় সমস্ত জাতির নিকটেই অত্যন্ত লোভনীয় স্থান ছিল। গঞ্জালো সন্দ্বীপের অর্দ্ধেক রাজস্ব দিবে স্বীকার করিয়া

রামচন্দ্রের নিকট হইতে কিছু সৈন্য সাহায্য চাহিল। রামচন্দ্রও অর্থলোভে দুইশত অশ্বারোহী ও কয়েকখানি জাহাজ প্রেরণ করিলেন। সনদ্বীপের নায়েব ফতেখাঁর সহিত গঞ্জালো আপনার অধীন ৪০০ পর্ত্তুগীজ সেনা, ৩৪০ খানি জাহাজ এবং রামচন্দ্রের সেনা ও নৌ-সহায়ে সনদ্বীপ অধিকার করেন। এই সময় বঙ্গের ও অন্যান্য প্রদেশের বন্দরের পর্ত্তুগীজেরা তাহাকে দলপতি করিয়া একত্র মিলিত হইল। সিবেস্তা গঞ্জালো হইল সনদ্বীপের স্বাধীন রাজা। শেষে বন্ধুত্বের প্রতিদান স্বরূপ বাক্‌লার রাজার নিকট হইতেও সাবাজপুর ও পাটেলবঙ্গ নামক দুই দ্বীপ অধিকার করিল।

নৌসাধক ভুলুয়া ওদিকে প্রবল হইতেছিল। দিল্লীর মোগল বাদশাহ ভুলুয়া রাজ্য জয়ে লোক পাঠাইলেন। ভুলুয়ারাজ গঞ্জালোর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন যে, সে মোগলের রাজ্যপ্রবেশে বাধা দিবে। রাজা ২০০ পোতও পাঠাইলেন। মোগল রাজাকে পরাজিত করিল, রাজা ১০ জন মাত্র অনুচরসহ চট্টলে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এ দিকে প্রতারক পর্ত্তুগীজ দস্যু রাজার কোষাধ্যক্ষদের নিজের পোতে আহ্বান করিয়া হত্যা করিল ও পোতগুলি চুরি করিয়া সনদ্বীপে ফিরিল। *

গঞ্জালোর আন্তরিক ইচ্ছা নৌবলসিদ্ধ, শিল্প ও সামুদ্রিক বাণিজ্য-সমৃদ্ধ রায়নগর দখল করিয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বাজ্জিত সনদ্বীপের সীমা-বৃদ্ধি করে।

১৬১৩ সালে মোগল নৌবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রায়নগরের সহিত গঞ্জালোর প্রথম সন্ধি হয়। তখন রায়নগরের রাজা বিভূতিশেখর রায়। তারকনাথ সিংহ তাঁহার রাজ্য-ভোগেচ্ছু নূতন মন্ত্রী। রাজ-পরিবারের ধ্বংস-সাধন করিয়া নিজে মোগলের অধীনে সামন্ত রাজা হইবার আশায় তারকনাথ শেষে গোপনে মোগল সেনার সাহায্য চাহিল। যখন সাহায্যের সময় আসিল, তখন বঙ্গীয় রাজন্যকুলের ঘোর শত্রু মানসিংহ বঙ্গে অধিষ্ঠিত। মন্ত্রী মানকে কতক চিনিত; তাই তাহার মনে স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত-আশঙ্কা জন্মিল। আবশ্যকমত মোগলসেনা ফিরাইবার জন্য তারক গোপনে গঞ্জালোর সঙ্গেও মিলিল। মন্ত্রীকে ঠকাইয়া গঞ্জালো নিজের চির অভিলাষ পূরণের প্রয়াসী হইল। তবে রাজ্যের নৌবাহিনী রাজভক্ত বলিয়া পর্ত্তুগীজ দস্যুর আশার মুখে ছাই পড়িল। রায়-নগরের প্রধান বন্দর ছিল তখন "রায়মঙ্গল"। †

সিবেস্তার এই সকল বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণাম ভয়াবহ হইল। চারিদিকে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, বঙ্গীয় হিন্দু-পোত-বিক্রমে বঙ্গোপসাগর-বক্ষে গঞ্জালোর অবস্থান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভয়ে সে গোয়ার শাসনকর্ত্তার কাছে মগমুলুকের অর্থলোভ দেখাইয়া সাহায্য চাহিল। ফ্রান্সিস্কো রোজোর অধীনে ১৪খানি বড় রণতরী আসিল। গঞ্জালো অর্দ্ধশত রণনৌ লইয়া আবার আসরে নামিল—প্রাণে বড় আশা! ভীষণ যুদ্ধে চট্টল বীর নাবিক-মণ্ডলীর অসাধারণ বিক্রমে সেনাপতিসহ পর্ত্তুগীজ চতুঃষষ্টি রণতরণী সাগরতলে আশ্রয় লইল। গঞ্জালোও পৃথিবীর ভার না হৌক, বঙ্গীয় নৌসাধনোদ্যত রাজন্যবর্গের স্কন্ধভার লাঘব করিল। *

গঞ্জালোর পরও পর্ত্তুগীজ নৌক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাক্‌লাধিপতি রামচন্দ্র বহু চেষ্টাতেও তাহা সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। কিন্তু—

"কীর্ত্তি নারায়ণোবীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেক শূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈনিকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বান তাড়য়ৎ॥"

রামচন্দ্র-সুত কীর্ত্তিনারায়ণই নৌযুদ্ধে ফিরিঙ্গীদিগকে বিতাড়িত করেন।

এখনও নোয়াখালী জেলার সমুদ্রতীরে, সনদ্বীপের চারিপার্শ্বে—বেতের বন্ধনযুক্ত নৌকাসকল সমুদ্রপথে যাতায়াত করে। ইহাদের নৌনির্ম্মাণ-পদ্ধতি ভোজের ব্যবস্থা অনুসারে হইয়া থাকে। ভোজের ব্যবস্থা, অর্থাৎ—

"ক্ষত্রিয়ে কাষ্ঠে ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদং নৌকা॥" ক্ষত্রিয় কাষ্ঠ দৃঢ়াঙ্গ ও লঘু। †

কিন্তু এই কালের নৌসাধন যে সকল যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। নৌবল তখন শান্তিপূর্ণ ব্যাপারেও নিবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গ-ভ্রমণকারীরা বঙ্গের বৈদেশিকী বাণিজ্যজাত ধন ও বঙ্গের বন্দরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

রিচার্ড টেম্পলের কথা

Sir Richard Temple, Indian Antiquaryতে একখানি সপ্তদশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আছে—

Bengala—

Fol. 73. "He found 5 saile of Bengala in ye roade: Fol. 84; 93.

Ceylon—

Fol. 79. 'He found 5 saile of Bengala in ye roade newly arrived from Ceylon. *

ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু বুঝা যায় যে, সে সময় পর্য্যন্তও সিংহল ও বঙ্গে বাণিজ্য-সংযোগ ছিল। বাঙ্গালা পোতের মধ্যে একপ্রকার পক্ষ-পালযুক্ত পোত ছিল।

---

* Portuguese in India, vol II.

† ঐতিহাসিক চিত্র—১৩১৪—পৃঃ ৩৬৫।

* Portuguese in India. vol. II.

† বঙ্গদর্শন—১২৮৭।

* Some Anglo-Indian terms from a 17th century M. S.—Sir R. Temple.

ইহার পর বঙ্গীয় নৌসাধন সংবাদ, বঙ্গীয় "নওয়ারা"র কথা। নানা ইতিহাসে এই নওয়ারার ইতিহাস পূর্ণ পরিস্ফুট।

শাহ্‌জাহান বাদশাহীতে

শাহজাহান বঙ্গীয় রণনৌ দ্বারাই ইলাহাবাদ (Allahabad) জয় করেন। এই বঙ্গীয় রণপোত-প্রভাবের মর্ম্ম ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে গর্বীত পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল।

ব্রহ্মপুত্র নদ স্বভাবতঃই নৌদ্বারা দুরতিক্রম্য; কিন্তু এই রুদ্র নদের প্রবলস্রোত তুচ্ছ করিয়া একদিন বঙ্গ-প্রতিবাসী আসামীগণ পঞ্চশত নৌদ্বারা নৌসাধন বঙ্গ আক্রমণ করেন; কিন্তু বঙ্গীয় নৌ ও নৌসেনার সমক্ষে তাহাদিগকে বেশীক্ষণ টিকিতে হয় নাই।

দিল্লী সিংহাসনের জন্য সেই অন্তর্বিগ্রহের দিনেও সুজার বঙ্গীয় পোত ভ্রাতৃ-বিবাদের সঙ্গী হইয়া বারাণসী-বাহিনী গঙ্গায় নাচিয়াছিল। এই সময় বঙ্গের জলপথ-রক্ষার্থ ঢাকায় বাদশাহী সরকারের যে "নওয়ারা" রাখার নিয়ম ছিল, তাহার খরচ, মাল্লা ও কর্ম্মচারীদের বেতনের জন্য জায়গীর ও ১৪ লক্ষ টাকা নিরূপিত ছিল। সুজার সময় সরকারী আমলাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ফলে এই সমস্ত নওয়ার মহালগুলিতেও প্রজারা উৎসন্ন গিয়াছিল এবং নৌসেনা ও কর্ম্মচারীরা বেতন না পাইয়া অতি দুরবস্থায় পড়িয়াছিল।*

ঔরঙ্গজেব-আমলে

মিরজুম্লা নওয়ারার নূতন বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া পুরাতন নিয়মগুলি উ'টাইয়াছিলেন। ইংরাজ বণিক তাঁহার এক যুদ্ধজাহাজ ধৃত করে, মির তাহা শাসাইয়াই আদায় করেন। দুই বৎসর পর আসাম-প্রবাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় আসাম-জয়সঙ্গী বহু রণনৌ তথায় বিনষ্ট হইল, সঙ্গে-সঙ্গে সরকারী নওয়ারার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িল। মিরের নব-নিয়ম প্রবর্ত্তন আর ঘটিল না।

তাহার পর ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে প্রথমে জলদস্যুরা আসিয়া ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত কাঁদিয়া পরগণা লুণ্ঠন করিয়া "সারের আব" (cruising admiral) মুনাফের খাঁকে পরাজিত করিল। এই পরাজয়ের প্রভাবে বাঙ্গালার "নওয়ারা" নামে মাত্র রহিল।

সায়েস্তা খাঁ মামুদ বেগ নামক নওয়ারার এক দারোগাকে (Inspector) রণতরীর পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া নওয়ারার "মুশরুরফ্" এর সহিত ঢাকায় পাঠাইলেন। নূতন নৌ প্রস্তুত করিতে হইবে। কাষ্ঠ ও শিল্পীর প্রয়োজন। নবাবী পরোয়ানা লইয়া পেয়াদাগণ গ্রামে-গ্রামে কাষ্ঠ ও নৌ-শিল্পী সংগ্রহ করিয়া ঢাকায় পাঠাইতে লাগিল। হুকুম আসিল, হুগলী, বালেশ্বর, মুরঙ্গ চিলমারী, যশোহর, কড়িবাড়ী, প্রভৃতি বন্দরে যত সম্ভব নৌ প্রস্তুত করিতে হইবে। রাজধানী রাজমহলে Dutch Captain ছিলেন। নবাব তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমরা বাঙ্গালা হইতে প্রতি বৎসরই বিনা শুল্কে বহু টাকা উপার্জ্জন কর। এই মহা অনুগ্রহের প্রতিদান-স্বরূপ তোমাদের নিজ-নিজ যুদ্ধ জাহাজ দিয়া আরাকানী মগদের বিনাশ কর। নচেৎ বাদশাহের রাজ্যে তোমরা আর বাণিজ্য করিতে পাইবে না।" নবাব Governor General of the Dutch Indiesকে জীনপোশ (Saddle Cever) ও পরোয়ানা পাঠাইলেন।

এ দিকে নৌ-নির্ম্মাণে বিশেষ পরিশ্রম হইতে লাগিল। পোত-খানার অধ্যক্ষ হইলেন হাকিম মহম্মদ হোসেন; নওয়ারার মুশরুরফ হইলেন মহম্মদ মকীম এবং কিশোরদাস নওয়ারা-পোষণ-পোত, তত্ত্বাবধান ও নৌ-সেনার বেতন এবং জায়গীর বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে বঙ্গীয় নওয়ারার ত্রিশত পোত নির্ম্মিত হইল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে 'সংগ্রামগড়ের' ভগ্নাবশেষের উপর নবাব নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তাহা রণপোত বেষ্টিত করতঃ মগ ফিরিঙ্গীর বঙ্গ-প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিলেন। ফিরিঙ্গী নাবিকগণ নোয়াখালীতে নবাবের সহিত যোগ দিল। শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অভিযানে মনোনিবেশ করিলেন।

বঙ্গীয় "নৌ-বাটকের" চট্টল বিজয়—

মিরমর্ত্তুজা, ইব্‌ন্ হোসেন, মুসব্বর খাঁ প্রভৃতি নেতারা নোয়াখালী হইতে ফিরিঙ্গী পোত সহ চট্টগ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন, ইব্‌ন্ হোসেনেরই ২৮৮ খানা সমর-নৌ ছিল। ২২ জানুয়ারি মগের ১০ খানা "খরাব্" জাহাজ ও ৪৫ খানি "জল্‌বা" নৌকার সহিত নওয়ারার যুদ্ধ বাধিল। তাহাতে বঙ্গীয় নৌবল জয়ী হইল।

পরদিবস হর্লার মগদের "খালু" ও "ধুম" নামে দুইখানি প্রকাণ্ড রণপোতের নিশান দেখা গেল। বঙ্গ-নৌ-সেনা হর্লার দিকে ধাবিত হইলে মগগণ সংবাদ পাইয়া সমুদ্রে আসিয়া নৌশ্রেণী রচনা করিল। বঙ্গীয় নৌ হইতে তোপ চলিতে লাগিল, কিন্তু যুদ্ধ হইল না।

পরদিন প্রাতে বঙ্গীয় নৌবাহিনী রণডঙ্কা বাজাইয়া শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হইল। সর্ব্ব বৃহৎ "সব" জাহাজশ্রেণীর উপর কামান ছিল; তাহাই অগ্রে; মধ্যে মধ্যম আকারের "খরাব্" জাহাজ, পশ্চাতে "কুছা", "জল্‌বা" ও অন্যান্য ক্ষুদ্র তরণী। মগপোত পিছু হটিল। ওদিকে কর্ণফুলী নদীতটস্থ দেশ-দুর্গ দগ্ধীভূত হইল। নদীর মোহানাও মোগলের হাতে; মগের পলায়ন-পথ বন্ধ। মগেরা জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, অনেকে ধরা দিল। ১৩৫ খানা রণতরী বঙ্গ-করায়ত্ত হইল।

২৭শে জানুয়ারী চট্টল দুর্গ মোগলের হস্তগত হইল। বিজয়-বাদ্য বাজাইয়া নওয়ারা ঢাকায় প্রবেশ করিল। মাল্লারা এক মাসের বেতন পুরস্কার পাইয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত আনন্দে মিলিত হইল।

ঔরঙ্গজেবের প্রধান উজীর, লিখিয়া পাঠাইলেন—"নববিজিত প্রদেশের জমা (রাজস্ব) কত?"

নবাব উত্তর দিলেন,—"জমা—বঙ্গে মুসলমানের জমায়ৎ (শান্তি),

* প্রবাসী—১৩১৩।

কর—ইসলাম প্রভাব বৃদ্ধি, নগদ আয়—বাদসাহীর স্থায়িত্বের জন্য প্রজার আশীর্ব্বাদ।*

এবার এই পর্য্যন্ত! বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকার প্রকার কিরূপ ছিল? কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্ ও লগ্‌বুক ভিন্ন কি প্রকারে নৌযাত্রা নির্ব্বাহ করিত? বালী ও যবদ্বীপ সত্যসত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ? প্রমাণ কি?" এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিক-উত্থানের দিনেও যে কতদূর কঠিন, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। তবে সকলেই ইহার উত্তর আশা করেন। যদি কেহ উপযুক্ত থাকেন অগ্রসর হন। অগ্রসর হইবেন বটে, কিন্তু পরিশ্রম চাই। শুধু পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকবর্গের কষ্ট-রচিত গবেষণা বেমালুম গায়েব করিয়া অনুবাদ প্রকাশ করিলে সম্মান পাইতে পারেন, কিন্তু সত্য প্রাপ্তি হইবে না। মনে রাখিবেন, সত্যই কলির ধর্ম্ম!

বলিয়া রাখা ভাল, এ প্রবন্ধ গবেষণা নহে, সঙ্কলন।

প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্বন্ধ বিচার

[অধ্যাপক শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা এম-এস-সি]

উদ্ভিদের অবস্থানুযায়ী উপযোগিতার ব্যবস্থা

মানবগণ যেরূপ জলবায়ু, স্থান ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে স্থান, কাল ও পাত্র-অনুযায়ী দ্রব্যসমূহের (যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ ইত্যাদির) পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করিয়া স্বীয়-স্বীয় শরীর-ধ্বংসের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, উদ্ভিদও পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক দ্রব্য-সমূহের তদ্রূপ পরিবর্ত্তন বা সংস্কার-সাধনে সক্ষম নহে জন্য অন্যান্য নানা উপায়ে (যথা—ত্বক্, পত্র-সংস্থান, দৈর্ঘ্য ও স্থূলতা ইত্যাদির পরিবর্ত্তন সাধন দ্বারা) নিজ-নিজ দেহকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। প্রভেদ এই যে, মানবের পক্ষে যাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্যের ফল, উদ্ভিদের পক্ষে তাহাই প্রকৃতিদত্ত শক্তি-প্রভাবে (বাহ্যতঃ অনায়াসে) সম্পাদিত কার্য্যের ফল হইয়া দাঁড়ায়। শীতপ্রধান-দেশ-সুলভ উদ্ভিদসমূহের পত্র, পুষ্প ইত্যাদি অংশের স্থূলতা ইত্যাদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উদ্ভিদের ন্যায় নহে। শীতপ্রধান দেশে অতি শীতে এবং বরফ-পাতেও যাহাতে অনিষ্ট না হইতে পারে, এ জন্য পত্রাদির আকার, স্থূলতা ইত্যাদির অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আবার মরুপ্রদেশে অত্যধিক উষ্ণতা ও জলাভাব বশতঃ যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে না হয়, এ জন্য উদ্ভিদের পত্রাবলীর অনুরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন যে, বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা-নিহিত সারের পরিমাণের পার্থক্য হেতু সর্ব্বদেশেই সর্ব্বপ্রকার হীন প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে না। মেরু-প্রদেশস্থ চিরবরফমণ্ডিত হিমসাগর-জীবি সীল মৎস্য অথবা শীতপ্রধান-দেশ-সুলভ উদ্ভিদ্‌কে যদি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে উহাদের যেমন উপযুক্ত জলবায়ু অভাবে এবং অবস্থা-পরিবর্ত্তন হেতু নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, তদ্রূপ গ্রীষ্মপ্রধান-দেশ-সুলভ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীসমূহকে শীতপ্রধান দেশে স্থানান্তরিত করিলেও অনুরূপ ফলই হইবে। কিন্তু বহুবর্ষব্যাপী চেষ্টা করিলে বা নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌সমূহকে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীসমূহ এরূপ ভাবে স্থানান্তরিত হইয়া বিশেষ অনুকূল অবস্থায় পতিত না হইলে উহারা নানারূপে খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়। ইহার একটী সাধারণ উদাহরণ দিতেছি। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যে সমস্ত বৃক্ষ সাধারণ অবস্থায় বিশাল আকার ধারণ করে, সে গুলিকে অঙ্কুরাবস্থা হইতে 'টব' ইত্যাদি অল্পায়তন বিশিষ্ট পাত্রে রোপণ করিলে খর্ব্বাকৃতি হয়। বাল সূর্য্যোদয় ভূমি (Land of the rasing sun) জাপানের বিচক্ষণ কৃষিবিদেরা নানা কৃত্রিম উপায়ে এরূপ বিশাল বৃক্ষের বীজসমূহকে সংকীর্ণ স্থানে রোপণ করতঃ খর্ব্বকার করিয়া এবং দুই তিন শত বৎসরাধিক কাল জীবিত রাখিয়া ও উহাদের শাখা-প্রশাখাসমূহকে পশু পক্ষী ইত্যাদির আকৃতির অনুকরণে নানা আকৃতি প্রদান করিয়া, ধনবানদিগের চিত্তবিনোদন এবং পাশ্চাত্য-জগতের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন। বসন্তকালে বৃক্ষাদির নব পত্রোদ্গম ও শীত ঋতুর প্রারম্ভে পত্রত্যাগাদি রূপ পরিবর্ত্তনও এই উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের নিদ্রা

মানুষ যেমন অত্যধিক উত্তাপে বা কঠোর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে উজ্জ্বলালোকে আলোকিত স্থানে স্বচ্ছন্দে নিদ্রিত হইতে কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অন্ধকার স্থলে বা রাত্রিতে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শ্রমোপনোদন করে, তদ্রূপ উদ্ভিদ্‌সমূহের মধ্যেও এতদনুরূপ ব্যাপারের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকেই হয় ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিরীষকুসুম, শিম এবং বনচাঁড়াল ইত্যাদি উদ্ভিদের পত্রসমূহ প্রতিদিনই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে অধোমুখ হয়। উহাদের পত্রাবলী দিবসে সজীবভাবে সূর্য্যকিরণ সম্ভোগ করিয়া সূর্য্যাস্তের প্রায় সমসময়ে ক্রমশঃ নির্জ্জীবভাবে মূলকাণ্ডে বা বৃন্তে বিলম্বিত হইয়া থাকে। সে সময়ে উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, যেন উহারা ক্রমশঃ ঘুমের ঘোরে এলাইয়া পড়িতেছে। ঐরূপ অবস্থাকেই উদ্ভিদশাস্ত্রবিদ্‌গণ উদ্ভিদের "নিদ্রা" বা "নিদ্রাবৎ গতি" (sleep movement) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, এরূপ গতি আলোকের প্রখরতার পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে এবং শুধু পূর্ব্বোক্ত

---

* শায়েস্তাখাঁর চট্টলবিজয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে—প্রবাসী—১৩১৩।

Leguminous উদ্ভিদ্‌সমূহেই দেখা যায়। কিন্তু স্বনামধন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইহা শুধু উক্ত Leguminous উদ্ভিদেরই বিশেষত্ব জ্ঞাপক নহে, উহা অল্পাধিক সকল বৃক্ষেই (যথা, আম্র, কাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষেও) দেখা যায় এবং উহার সহিত আলোক বা অন্ধকারের কোন সম্বন্ধ নাই; বরং উহা উদ্ভিদ-অভ্যন্তরস্থ রসের পরিমাণের পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতী লতাকে প্রতিনিয়ত সাড়া দিতে বাধ্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহা দিবাশেষে নিদ্রা যায় না, বরং শেষরাত্রি হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা গিয়া অবশিষ্ট সময় জাগ্রত থাকে (১)। অন্যান্য বৃক্ষের উপর স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করিলে এরূপ ভাবে প্রত্যেক বৃক্ষেরই নিদ্রা যাওয়ার বিশেষ সময় কোন্‌টী, তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

উদ্ভিদের জনন-প্রক্রিয়া

উন্নত প্রাণীসমূহের (উদাহরণ স্তন্যপায়ী-প্রাণী, যথা হস্তী, ঘোটক, মেষ প্রভৃতি পশ্বাদির) জনন-ক্রিয়াতে যেমন পুং ও স্ত্রী উভয়ের সম্মিলন আবশ্যক, সেইরূপ প্রায় সমস্ত উদ্ভিদের (Diatoms ইত্যাদি অতি হীন উদ্ভিদ ব্যতীত অন্য সমস্ত উদ্ভিদের, বিশেষতঃ বৃক্ষের) জনন-ক্রিয়াতেও পুং কোষ ও স্ত্রী-কোষের সম্মিলন আবশ্যক হয় (২)। তবে মানব বা অন্য চলচ্ছক্তিসম্পন্ন প্রাণীর পক্ষে এই সম্মিলন ক্রিয়া, অন্য বাধা না থাকিলে, সর্ব্বত্র এবং কালবিশেষে হওয়া সম্ভব; কিন্তু কতিপয় হীন উদ্ভিদ ব্যতীত প্রায় সমস্ত উদ্ভিদই চলচ্ছক্তি বিহীন বলিয়া এই বিষয়ে নানা অসুবিধা বর্ত্তমান থাকা হেতু প্রকৃতির বিধানানুসারে জল, বায়ু ও কীটপতঙ্গাদির সাহায্য প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ জল, বায়ু বা কীটপতঙ্গাদির সাহায্যে ঐ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় (৩)। সাধারণতঃ পরস্পর যথেষ্ট সন্নিকটবর্ত্তী না হইলে বা একই বৃক্ষের বিভিন্ন উদ্ধাধঃ বৃন্তে সন্নিবিষ্ট না হইলে বৃক্ষস্থ এক পুষ্পের পুং-কোষ (পরাগ) অন্য পুষ্পের স্ত্রী-কোষে (গর্ভকেশরে) পতিত হইতে পারে না; এজন্য ঐ চলচ্ছক্তিবিহীন পরাগসমূহ জলস্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে বা বাত্যা-তাড়িত হইয়া অথবা কীট-পতঙ্গাদির গাত্রলগ্ন হইয়া দূরস্থ অন্য পুষ্পের গর্ভ কেশর-সমূহের সন্নিধানে আনীত বা তন্মধ্যে পাতিত হয় এবং কালক্রমে বীজোৎপাদনে সক্ষম হয়। উদ্ভিদ-রাজ্যের এই ব্যাপারের মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তার কত যে গভীর কৌশল নিহিত আছে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

উদ্ভিদ্‌রাজ্যে নিষিদ্ধ-বিবাহ

ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত ব্যাপার লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, সভ্য মানব-সমাজে যেমন স্বপরিবারে (স্বগোত্রে) বিবাহ বিষয়ে সর্ব্বত্রই বিরাগ লক্ষিত হয় এবং ভূয়োদর্শনের ফলেও জানা গিয়াছে যে, এরূপ সম্মিলন শুধু অস্বাস্থ্যকারী নহে, এমন কি ভাবী বংশধরগণেরও শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির ও অবনতির কারণ হয়; তেমনি উদ্ভিদ সম্বন্ধেও দেখা গিয়াছে যে, যে পুষ্পে পরাগ ও গর্ভকেশর একত্র আছে (উভয়লিঙ্গ পুষ্প Hermaphrodite flowers) সে স্থলে সেই পরাগ সেই পুষ্পস্থ গর্ভকেশরের সহিত সম্মিলিত হইলে (ইহাকে Autogamy কহে) বীজকোষস্থ বীজ সুস্থ ও সবল হয় না। কিন্তু কোন-কোন উদ্ভিদ্‌বিদের ধারণা এই যে, যে স্থলে পুষ্পের পরাগ ও গর্ভকেশরের সম্মিলন বিষয়ে জল, বায়ু বা কীট-পতঙ্গাদির সাহায্য সুলভ নহে, সে স্থলে এরূপ এক প্রাথমিক পরাগের সহিত গর্ভকেশরের সম্মিলন হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম (৪)। এ স্থলে কোন্‌টী স্বাভাবিক ও নিয়মসঙ্গত, তাহা কালক্রমে স্পষ্টই স্থির হইবে। ইহা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মানবশরীরাভ্যন্তরস্থ বীজকোষের (ovary) অনুযায়ী অপুষ্ট (rudimentary) বীজকোষ কোন-কোন উদ্ভিদদেহেও দেখা যায় এবং উহার মধ্যেই উদ্ভিদ্‌ বীজ জন্মলাভ করে ও বর্দ্ধিত হয়।

কতিপয় সাধারণ বিষয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের সাদৃশ্য

(ক) প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে কোন শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌ অন্য শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদের অনুরূপ নহে; অর্থাৎ প্রত্যেকেরই শ্রেণীগত একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। হস্তী ও ঘোটক উভয়েই চতুষ্পদ ও স্তন্যপায়ী জীবশ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও উহাদের মধ্যে আকৃতিগত এমন পার্থক্য আছে, যদ্দ্বারা আমরা সহজেই উহাদিগকে পৃথক করিতে পারি। অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য; এবং আমরা প্রতিনিয়তই ইহার উদাহরণ পাইতেছি। প্রধানতঃ এই পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিপ্রবর ডারুইন তাঁহার বিজ্ঞান-রাজ্যে নবযুগ প্রবর্ত্তনের কারণ স্বরূপ "অরিজিন্‌ অব স্পিসিজ" (Origin of Species) বা শ্রেণীরচনা শীর্ষক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ধর্ম্মযাজক জন গ্রেগর মেণ্ডেল (John Gregor Mendel) সাহেবের (Heredity) ও হিউগো ডি ভ্রাইস (Hugo de Vries) সাহেবের "মিউটেসন" (Mutation) নামক সিদ্ধান্তদ্বয় ডারুইনের মতের বিরুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মেণ্ডেল কতিপয় বিষয়ে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীতে একেবারে নূতন কোন জিনিষ হয় না, বংশধরগণের গুণ ও আকৃতি ইত্যাদির তারতম্য পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ ও আকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দুই বা ততোধিক বিভিন্ন আকৃতিগত বৈষম্য সম্পন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের সম্মিলনে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উপর যে ফল হয়, তিনি তাহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হইয়া

---

(১) Discourse delivered at the Royal Institution by Dr. Sir J. C. Bose on May. 29 1914.

(২) Haeckel's Evolution of Man এবং Scott's Structural Botany দ্রষ্টব্য।

(৩) Darwin's Fertilisation of Orchids.

(৪) Wallace's Darwinism.

থাকে বলিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি পুরোহিতের কার্য্যে ব্যাপৃত বলিয়া এ বিষয়ে অধিক কালক্ষেপ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য-দেশে অনেকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়া পরীক্ষাদি করিয়া সফলকাম হইতেছেন। অধ্যাপক হিউগো ড ভ্রাইস বলেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতে মধ্যে-মধ্যে যে নিয়মের মধ্যে অনিয়ম, কুৎসিতের মধ্যে সুন্দর, সুন্দরের মধ্যে কুৎসিত, স্বাভাবিকের মধ্যে অস্বাভাবিক হঠাৎ আবির্ভূত হইতে দেখা যায়, এইরূপ ভাবেই প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতে নূতন পদার্থের (speciesএর) সৃষ্টি হইয়াছে; (ডারুইনের মতে) ক্রমবিকাশের ফলে নহে।

(খ) পিতামাতার আকৃতিগত বিশেষত্ব সন্তানে অল্পাধিক রূপে বর্ত্তে এবং সেই বিশেষত্ব বিভিন্ন পরিবারে স্থায়ীলক্ষণরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব। অন্য কারণ না থাকিলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় রাজ্যেই এ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

(গ) চেষ্টা করিলে এবং নানা কৌশল বা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে ঐ বিশেষত্ব সাহায্যে মূল হইতে বিভিন্নাকৃতির প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। কৃষি-কুশলেরা ভিন্ন-ভিন্ন পুষ্পবৃক্ষের বৃন্ত একত্র সংযোগ করতঃ কালক্রমে ঐ সংযুক্ত বৃক্ষ-সমূহের পুষ্পাভ্যন্তরস্থ বীজ হইতে বিচিত্রবর্ণের পুষ্পসমূহ উৎপাদন করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য-দেশে প্রাণীজগতেও এই উপায়ে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিসম্পন্ন প্রাণী উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

(ঘ) সংসারে যত প্রাণী ও উদ্ভিদ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যে অনুপাতে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, চিরকাল সেই অনুপাতেই বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে এবং নবজাত শিশুমাত্রই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে এক হাজার বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে কাহারও দাঁড়াইবারও স্থান জুটিবে না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিস্তর লোক দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অন্যান্য আকস্মিক এবং দৈব দুর্ঘটনাবশে প্রতিনিয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে বলিয়াই শত-সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ স্থানাভাব বোধ করিতে হয় নাই। ইহাও হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটি পুং ও একটি স্ত্রী হস্তী (সাধারণতঃ হস্তীর সন্তান-সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অল্প) হইতে (সমস্ত সন্তান জীবিত থাকিলে) সাতশত পঞ্চাশ বৎসরে একশত নব্বই লক্ষ হস্তী হইতে পারে। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি একটি-মাত্র বৃক্ষ হইতে প্রতিবৎসর দুইটিমাত্র বীজ উৎপন্ন হয় এবং যদি ঐ বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া দীর্ঘকাল জীবনধারণে সক্ষম হয় এবং ঐরূপ অনুপাতে বীজ উৎপন্ন করে, তবে ঐ আদি বৃক্ষ ও সন্তান সন্ততিগণ হইতে বিশ বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। যদি ইত্যাকার অবস্থায় প্রতিবৎসর পঞ্চাশটী বীজ উৎপন্ন হয়, তবে দশ বৎসরকালমধ্যে পৃথিবীতে অন্য উদ্ভিদের স্থান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক বীজই যে অঙ্কুরিত হয়, এমত নহে। যত বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহার মধ্যে কয়টীই বা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।

প্রাণী ও উদ্ভিদের ভূভাগানুযায়ী বৈষম্য বা বিশেষত্ব

প্রাণীসমূহ যেরূপ বিভিন্ন শ্রেণী (species) অনুসারে ভূমণ্ডলের বিভিন্নাংশ অধিকার করিয়া বা ব্যাপিয়া আছে, (সকল দেশে সকল প্রকার প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না) এবং ইহা সকলেই জানেন যে জলবায়ু, স্থান ইত্যাদি ভেদে প্রাণীগণের আকৃতি-প্রকৃতিগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ বিভিন্ন উদ্ভিদ্ বিভিন্ন দেশ ব্যাপিয়া আছে এবং উদ্ভিদের মধ্যেও জলবায়ু ইত্যাদি ভেদে বৈষম্য দেখা যায় (৫)। উষ্ণ-দেশের অধিবাসীগণ সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ও স্বল্পজীবি হইয়া থাকে, শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীগণ সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘজীবি হইতে দেখা যায়। শীতপ্রধান স্থানোপযোগী যে সমস্ত উদ্ভিদ আল্‌স্ বা হিমালয় পর্ব্বতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়, তাহা গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে বা অত্যুষ্ণ সাহারা মরুভূমিতে থাকা সম্ভবপর নহে। তেমনি যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ্ সমুদ্রে বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সমুদ্র বা সমুদ্র-সংলগ্ন স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পুরাকালে যে সমস্ত স্থান ভিন্ন ভাবে গঠিত ছিল, সে সকল স্থানে অদ্যাপিও প্রাচীনকালের প্রাণী ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিমাংশেও তৎসন্নিহিত প্রদেশ প্রাচীনযুগে সমুদ্র-গর্ভনিহিত ছিল বলিয়া আজও সিমলা-শৈলের নিকটস্থ শিভালিক পর্ব্বতমালায় সামুদ্রিক জীবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে জীবন-সংগ্রাম

প্রাণী-জগৎ ও উদ্ভিদ্ জগৎ উভয়ত্রই খাদ্য, স্থান ইত্যাদির জন্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই সংগ্রামকেই "জীবন-সংগ্রাম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা নানা বলে বলীয়ান, তাহারাই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নানা সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে সমর্থ; কিন্তু এই দীর্ঘ-জীবন ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য বলহীনের লভ্য নহে। মানব-জগতে যেমন সর্ব্বত্রই বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও জন ইত্যাদির বলে বলীয়ান ব্যক্তিগণ নানা উপায়ে দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের খাদ্য, স্থান ও অর্থ ইত্যাদি নিজ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতেছে, তদ্রূপ উদ্ভিদজগতেও প্রতিনিয়ত দুর্ব্বল সবল কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়া অবশেষে কালের করাল-কবলে পতিত হইতেছে।

প্রতাপান্বিত ব্যক্তির অধিকৃত স্থানে যেমন দরিদ্র ব্যক্তির স্বেচ্ছামত বাস করা অসম্ভব, তদ্রূপ বিশাল বিটপীতলস্থ লতাগুল্ম ইত্যাদিও আবশ্যক আলোক, উত্তাপ ও খাদ্যাভাবে অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বর্ষাকালে পথে, ঘাটে, মাঠে নানা প্রকার উদ্ভিদের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, কিন্তু শীতকালে ইহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়। ইহাও জীবন-সংগ্রামেরই ফল। যাহারা বিস্তৃত বা দীর্ঘপ্রোথিত মূল দ্বারা

(৫) Sehimper's Geography of Plants দেখুন।

মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অবশিষ্ট জল গ্রহণে সমর্থ, তাহারাই জীবিত থাকে; অবশিষ্টগুলি ক্ষণিকের তরে বা চিরকালের মত বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বর্ষা-আগমনে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ মূল বা নিহিত বীজ হইতে পুনরায় উদ্গত হইয়া থাকে। যাহাদের বীজ হয় নাই বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারা নূতন ভাবে আর দেখা দেয় না।

আমরা যে সর্ব্বত্র সকল প্রকার উদ্ভিদের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই না, ইহাও জীবন-সংগ্রামেরই ফল। বিভিন্ন স্থানের জল, বায়ু ও মৃত্তিকা ইত্যাদি সকল উদ্ভিদের পক্ষে সমান উপযোগী নহে। তাই সকল উদ্ভিদই সর্ব্বত্র তিষ্ঠিতে পারে না।

প্রাণী ও উদ্ভিদের বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু

সুখময় শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত করিয়া প্রাণীগণ যেরূপ বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলে নিস্তেজ ও সামর্থ্য-বিহীন হইয়া পড়ে এবং জীবনীশক্তির হ্রাস হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ (যদিও কতিপয় বৃক্ষের জীবনকাল অতি দীর্ঘ) উদ্ভিদেরাও কালক্রমে বার্দ্ধক্যের চরমসীমায় উপস্থিত হইলে উপরিউক্ত কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য হয়। জন্ম এবং মৃত্যু উভয় বিষয়েই প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। আচার্য্য বসু মহাশয় এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া যে প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। তিনি লজ্জাবতী লতাকে তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র-সাহায্যে নিরূপিত সময়ান্তে সাড়া দিতে বাধ্য করিয়া দেখিয়াছেন, যে, যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ নিয়মিতরূপে সাড়া দেয়, ঘুমাইয়া পড়িলে ইহার ব্যতিক্রম হয়, ইহা পূর্ব্বে উদ্ভিদের নিদ্রা-সম্পর্কে বলা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ভাবে সাড়া দেওয়ার মধ্যে হঠাৎ লতাটীকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আঘাত করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা জীবনের শেষ সাড়া—মৃত্যুর সাড়া, অতি প্রবল ভাবে দেয়। চিরদিনের মত নিশ্চল হইয়া পড়ে। সংসারে মানব-জীবনেও মাঝে মাঝে এরূপ অবস্থা ঘটিতে দেখা যায়। বাহ্যতঃ সুস্থ ও সবল ব্যক্তি চলিতে চলিতে হঠাৎ হৃদ্‌স্পন্দন-ক্রিয়া বন্ধ (Heart failure) হইয়া মারা যায়। সন্তানগণ ব্যস্ত ভাবে 'বাবা' বা 'মা' বলিয়া বারংবার ডাকে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গণের কিঞ্চিৎমাত্র বল থাকে, ততক্ষণ জবাব আসে 'হুঁ'। শেষ মুহূর্ত্তে যখন তাঁহারা জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ কাটাইয়া চলিয়া যান, তখন একবার শেষ "হুঁ" বলিয়া সাড়া দিয়াই চিরদিনের মত নীরব হইয়া পড়েন। এই শেষ "হুঁ" সাড়া নির্ব্বাণোন্মুখ শক্তির শেষ চিহ্ন। এই সময়ে একটা তুমুল প্রবাহ মরণোন্মুখ ব্যক্তির বা উদ্ভিদের অভ্যন্তর আলোড়িত করিয়া তুলে এবং একটা আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ শরীরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। মৃত্যু হইবামাত্র উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর বাহ্যিক আকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন হয় না। মৃত্যু ঘটিবার বহুক্ষণ পরে জড়শরীর শীর্ণ, ও অবসন্ন হইয়া থাকে। (৬)

(৬) Discourse delivered at the Royal Institution by Dr. Sir J. C. Bose on May. 29.—1914

কষ্টিপাথর

পর্ব্বতের জন্মকথা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের চক্ষে পৃথিবীর পর্ব্বতগুলি এক একটী মহা গ্রন্থ-স্বরূপ। ধরিত্রী-দেবী যেন নিজের জীবনের ইতিহাস পর্ব্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সেই মহা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পৃথিবীর জীবন-কাহিনী অবগত হইতে পারেন। সাধারণ মানব হয় ত মনে করিতে পারেন যে, পর্ব্বতই স্থিতিশীল এবং সমুদ্রই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু পৃথিবীর জীবনেতিহাস যাঁহারা যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন সমুদ্রই অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল, এবং পরিবর্ত্তনশীলতা পর্ব্বতেরই প্রধান ধর্ম্ম। শান্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে সমুদ্র যখন সুপ্ত থাকে, তখন তাহার এক রূপ; আর, প্রকৃতি-দেবী যখন প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল সমুদ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। তাহা দেখিয়া আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, সমুদ্রই চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু সমুদ্রের সেই চঞ্চলতা, সেই তরঙ্গলীলা অস্থায়ী ও সাময়িক; প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেই সমুদ্রের স্থিতিস্থাপকতা গুণে তাহার পূর্ব্ব রূপ ফিরিয়া আসে। আর, যাহাকে আপাত দৃষ্টিতে চির অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে হয়, সেই পর্ব্বতের পরিবর্ত্তনশীলতা অতি মৃদু, সাধারণ মানবের পক্ষে অবোধগম্য হইলেও তাহা স্থায়ী। মানবের সাধারণ পরমায়ু শত বৎসর ধরিলে, সেই শত বৎসরের মধ্যে পর্ব্বতের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। তিন-চারি বা পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী মানব-সমাজ কোন পর্ব্বতকে যেরূপ ভাবে, যে আকারে দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই পর্ব্বতের সেই রূপ, সেই আকারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমান কালের মানব সেই বর্ণনার সহিত সেই পর্ব্বতের বর্ত্তমান আকার বা রূপ মিলাইয়া দেখিলে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিবেন না।

তথাপি, বলিতে হয়, পর্ব্বতই পরিবর্ত্তনশীল; তবে সেই পরিবর্ত্তনশীলতা অতি মৃদু, এবং সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তিনি কি জীবিত? তাহার কি প্রাণশক্তি আছে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তাহা আমরা জানি। কোন ভারবিশিষ্ট পদার্থ শূন্য-প্রদেশে নিরবলম্ব ভাবে অবস্থান করিতে পারে না; তাহাকে ভূতলে পতিত হইতেই হয়। ইহা সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহ্য লক্ষণ। পৃথিবীর গতিশক্তি আছে; যথা, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি। পৃথিবী প্রতি অহোরাত্রে ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করেন এবং এক বৎসরে একবার সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসেন। ইহাতেই ঐ উভয় গতি সম্পন্ন হয়। যে শক্তির বলে পৃথিবীর এই দুই গতি নির্ব্বাহ হয়, তাহা সৌরজগতের শক্তির অংশ মাত্র। কিন্তু কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, কি আহ্নিক গতিশক্তি, কি বার্ষিক গতিশক্তি—ইহাদের কোনটিকেই পৃথিবীর প্রাণশক্তি বলা যাইতে পারে না।

বিজ্ঞানের অনুন্নত অবস্থায় এই ভূমণ্ডলে জড় ও চেতন—এই দুই প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইত। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় মানবের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমাদেরই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে জড়দেহে প্রাণশক্তির আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, অবস্থা-বিশেষে সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে জড়দেহে প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যাইতে পারে। সুতরাং জড়দেহেও যে প্রাণশক্তি আছে, এবং প্রক্রিয়া-বিশেষে সেই সুপ্ত (latent) প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করিয়া ঐ জড়ের চেতনা সম্পাদন করা যাইতে পারে, এ কথা বোধ হয় এখন আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পৃথিবী এই সকল জড়-পদার্থের সমষ্টি মাত্র। ব্যষ্টিভাবে জড়ে যদি প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের সমষ্টি এই পৃথিবীতে প্রাণশক্তির কল্পনা করিলে তাহা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক বা অবাস্তব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আর, এই প্রাণশক্তির কথা যে কেবলমাত্র কল্পনা নয়, তাহাও কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যতীত আরও একটী শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। আগ্নেয়গিরি, উষ্ণ-প্রস্রবণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপার সেই শক্তির বাহ্য বিকাশ। এই শক্তির মূল যাহা, তাহাকে যদি পৃথিবীর প্রাণশক্তি বলা যায়, তাহা হইলে ভুল হইবে কি?

আমাদের প্রাচীনকালের ঋষিগণ পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগণকে প্রাণশক্তিবিশিষ্ট দেবতারূপে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণে ইহারা সকলেই ক্রিয়াশীল, জীবিত ব্যক্তিরূপে কথিত হইয়াছেন। কথিত আছে যে, পর্ব্বতসকল পূর্ব্বে পক্ষবিশিষ্ট ছিল। তাহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে উড়িয়া গিয়া জনপদ ধ্বংস করিত বলিয়া সৃষ্টিনাশাশঙ্কায় ইন্দ্র পর্ব্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদ করেন। হিন্দুশাস্ত্রের, বেদপুরাণের এই সকল উক্তি কতটা সত্য, কতখানিই বা কাল্পনিক, সে বিচার করিবার কোন প্রয়োজন এখানে নাই; কেবল আমরা দেখাইতে চাহি যে, বৈদিক বা পৌরাণিক যুগেও পৃথিবীর প্রাণশক্তি কল্পনা করা হইত। ইহার সত্যাসত্যতার মীমাংসা ভবিষ্যৎ যুগের বিজ্ঞান করিবেন।

মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বলে সময়ে-সময়ে উল্কা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর আকর্ষণসীমার মধ্যে আসিয়া ভূপতিত হয়। এরূপ ঘটনা নিত্য নিয়মিতভাবে ঘটিয়া থাকে; এইরূপে পৃথিবীর আকার ও ভার কিছু কিছু করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনও ধীরে-ধীরে ঘটিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পর্ব্বতপৃষ্ঠ পরীক্ষা করিয়া এই পরিবর্ত্তনের স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

পৃথিবীর পর্ব্বত-সংস্থান সৃষ্টির আদি হইতে ছিল না; পর্ব্বতগুলি নিতান্ত হঠাৎও তাহাদের বর্ত্তমান উচ্চ আকার ধারণ করে নাই। সমতল ভাবই জলের সাধারণ ধর্ম্ম; এই কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেই সাধারণতঃ পর্ব্বতের উচ্চতা নির্দ্ধারণ করা হয়। কিন্তু এ নিয়ম সর্ব্বত্র সমানভাবে খাটে না; কারণ, সমতল ভাব জলের সাধারণ ধর্ম্ম হইলেও, সমুদ্রপৃষ্ঠ সর্ব্বত্র সমতল নহে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পানামা খাল। এই খাল খনন করিবার সময় দেখা যায়, যে জলের একদিকের সমুদ্রপৃষ্ঠ অপর পার্শ্বের সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা অনেকটা নীচু; অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের পৃষ্ঠদেশ সমোচ্চ নহে। সুতরাং খাল খনন শেষ হইবামাত্র একটি প্রবল সমুদ্রস্রোত উন্নত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্নতর সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং খাল খননের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এইজন্য খালের মধ্যে স্থানে-স্থানে দ্বার বসাইয়া জলের ক্রমোচ্চতা রক্ষা করিতে হইয়াছে। এই কারণে যত্র-তত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে পর্ব্বতের উচ্চতা নির্ণয় করা চলে না, বলিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার একটা গড় হিসাব প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পর্ব্বতসমূহের আপেক্ষিক উচ্চতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

ভূপৃষ্ঠস্থ উচ্চতম পর্ব্বতসমূহের শিখরদেশে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, সেই সকল স্থান এককালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল; অন্ততঃ জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল সেই স্থান পর্য্যন্ত আগমন করিত এবং তথায় সামুদ্রিক জীবজন্তু বাস করিতে পারিত। হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯০০০ ফিট। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল যতই উচ্চতা লাভ করুক, তাহা কখনই হিমালয়ের শৃঙ্গ প্লাবিত করিতে পারে না, করেও না। অথচ, অনুসন্ধানে, পৃথিবীর মধ্যে সেই সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গেও শম্বুক, কূর্ম্ম প্রভৃতি জলচর জীবের অস্থি-কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, হিমালয়ের যে শৃঙ্গ আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ, চিরদিন তাহার এইরূপ উন্নত অবস্থা ছিল না। এক সময়ে সেই পর্ব্বত এতটা অনুন্নত ছিল যে, অন্ততঃ জোয়ারের সময় তাহা

সমুদ্র-জলে মগ্ন থাকিত। আবার পক্ষান্তরে, অনেক স্থলে দেখা যায়, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কোন পর্ব্বত ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের কিয়দংশ জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে; আবার ভাটার সময় জল সরিয়া গেলে তাহার অনেকটা অংশ অনাবৃত

পর্ব্বত সংস্থানের এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাসই পৃথিবীর জীবন-কাহিনী। মোটামুটি, এই পরিবর্ত্তন আভ্যন্তরীণ শক্তির ক্রিয়া এবং সেই শক্তিকেই আমরা পৃথিবীর প্রাণশক্তি বলিতে চাহি।

এই পর্ব্বতের জীবন-কাহিনীই আমরা আলোচনা করিব, এবং

পর্ব্বত, উপত্যকা, নদী ও সমুদ্রে পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে

কোমল প্রস্তরের ক্ষয়প্রাপ্তি

স্তরে স্তরে গঠিত পর্ব্বত-গাত্র।

হইয়া পড়ে। সেই অনাবৃত অংশে মহারণ্যজাত এমন সকল বৃক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়, যে সকল জাতীয় বৃক্ষ সমুদ্র-সান্নিধ্যে বা জলাভূমিতে জন্মে না; শুধু, উন্নত পর্ব্বতপৃষ্ঠ ভিন্ন অন্যত্র সেই সকল জাতীয় বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। সুতরাং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, যে, ঐ পর্ব্বতটীর একাংশ অধুনা সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা নিম্নতর হইলেও এক সময়ে উহা সু-উচ্চ ছিল। এইবার আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি যে, ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন নিত্যই সাধিত হইতেছে, ভূপৃষ্ঠের

এই আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, সমুদ্রতলস্থ ভূভাগ ক্রমশঃ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে পর্ব্বতের আকার ধারণ করিতেছে।

সমুদ্রতলস্থ ভূমিভাগ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তির বলে ক্রমশঃ উন্নত হইতে-হইতে শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতের আকার ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রপৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া কিছুদূর মাথা খাড়া দিয়া উঠিলেই তাহার উপর বাহ্য-প্রকৃতির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি নৈসর্গিক প্রভাবে

চূণা-পাথরের স্তর

গ্র্যানাইটের পাহাড়

চিরতুষারের দেশ

তাহা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। তবে এই সকল নৈসর্গিক প্রভাব অপেক্ষা ভূগর্ভস্থ শক্তি বলবত্তর বলিয়া পর্ব্বতসকল কিছু কিছু ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াও ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে, ক্রমশঃ জলবায়ুর গুণে তাহার অঙ্গ কঠিন হইয়া উঠে; এবং তাহা নির্দ্দিষ্ট কিছুদূর উন্নতিলাভ করিলে চিরতুষারাবৃত হইয়া তাহার ক্ষয়প্রাপ্তি অনেকটা স্থগিত হয়। তবে তখনও বৃষ্টির জলে তাহার দেহ ধৌত হইয়া ধ্বস্ ভাঙ্গিয়া ক্ষয়-কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে চলিতে থাকে। পক্ষান্তরে, যখন কোন উন্নত পর্ব্বত ক্রমশঃ ভূগর্ভে বসিয়া যাইতে থাকে, তখন তাহার ক্ষয়-কার্য্যও অধিকতর বেগে সম্পন্ন হয়। উন্নতির পর অবনতি, বা অবনতির পর উন্নতি যেমন পৃথিবীর সাধারণ ধারা, পর্ব্বতসকলও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে। তবে তাহাদের উন্নতি বা অবনতি সাধিত হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়।

পৃথিবীর সকল স্থান একই প্রকার পদার্থে গঠিত নহে; সুতরাং পর্ব্বত-দেহও বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থে গঠিত হইয়া থাকে। এই সকল পদার্থের নৈসর্গিক ক্ষয়কারী শক্তির প্রতিষেধ করিবার ক্ষমতাও সমান নহে; সুতরাং ক্ষয়ের পরিমাণও সর্ব্বত্র সমান হইতে পারে না। যে সকল পর্ব্বতগাত্র গ্র্যানাইট-প্রস্তরে গঠিত, তাহা অত্যন্ত দৃঢ় হওয়ায় নৈসর্গিক কারণে অতি অল্প মাত্রায় ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। তবে রাসায়নিক কারণে তাহারা ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাও অতিশয় মৃদু।

কিন্তু বেলে-পাথর, চূণা-পাথর, স্লেট-পাথর প্রভৃতি আগ্নেয়গিরির

গহ্বর হইতে দ্রবীভূত ভাবে উত্থিত হইবার সময় পর্ব্বতগাত্রে স্তরে-স্তরে স্থাপিত হয়, গ্র্যানাইট পাথরের ন্যায় ঘনীভূত ভাবে থাকে না। ইহাদের উপর বাহ্য-প্রকৃতির প্রভাব বেশী এবং রাসায়নিক ক্রিয়াও ইহাদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ব্বাহ হয়। এই কারণে ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ধ্বংসশীল। এইরূপে তাহারা অনেক স্থলেই জমান সমুদ্র-তরঙ্গের আকার প্রাপ্ত হয়।

সহিত ঘর্ষণে আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে পরিণত হয়। প্রস্তরের স্তরসমূহের মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকার স্তর থাকিলে বৃষ্টির জলে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া বাহির হইয়া যায়। তাহাতেও উপরের কঠিন প্রস্তরের স্তর ভগ্ন হইয়া পতিত হইতে থাকে। এইরূপে কখনও ক্রোশাধিকব্যাপী পাথরের চাঁই ভগ্ন হইতে দেখা যায়। সে কিরূপ বিরাট ব্যাপার, তাহা পাঠকেরা কল্পনা করুন। ইহার ফলে কত

গ্র্যানাইটের ভগ্নস্তূপ

ঝড়-বৃষ্টি পর্ব্বতাঙ্গে আপনাদের শক্তি পরিচালনের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে

যে সকল পর্ব্বত ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের স্তরে গঠিত, তাহার স্তরগুলির মধ্যে যাহা অপর স্তরের অপেক্ষা অধিকতর কোমল বা ক্ষয়শীল, সেইগুলিই সর্ব্বাগ্রে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ স্তর যদি নিম্নে থাকে, এবং তাহার উপর কঠিন প্রস্তরের স্তর থাকে, তবে নিম্নের স্তর শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া স্থানচ্যুত হইলে, উপরের কঠিন প্রস্তরের প্রকাণ্ড খণ্ডসকল অবলম্বনবিহীন হইয়া প্রচণ্ড বেগে পতিত হয় এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তার পর বর্ষাকালে জলের স্রোতে পরস্পরের

জনপদ যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এইরূপে সুদূর অতীতে কোন সমৃদ্ধ গ্রাম নগর যে ভগ্ন প্রস্তরস্তূপের নিম্নে সমাহিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

এইরূপে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের পতনের ফলে, কিম্বা তাহাদের পরস্পরের ঘর্ষণের ফলেও সময় সময় ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। জননী যেমন তাঁহার শিশু-সন্তানের সকল প্রকার উপদ্রব সানন্দে সহ্য করিয়া থাকেন, পৃথ্বীদেবীকেও সেরূপ অত্যাচার অম্লান সহ্য করিতে

পর্ব্বতমালা-মধ্যস্থ উপত্যকা
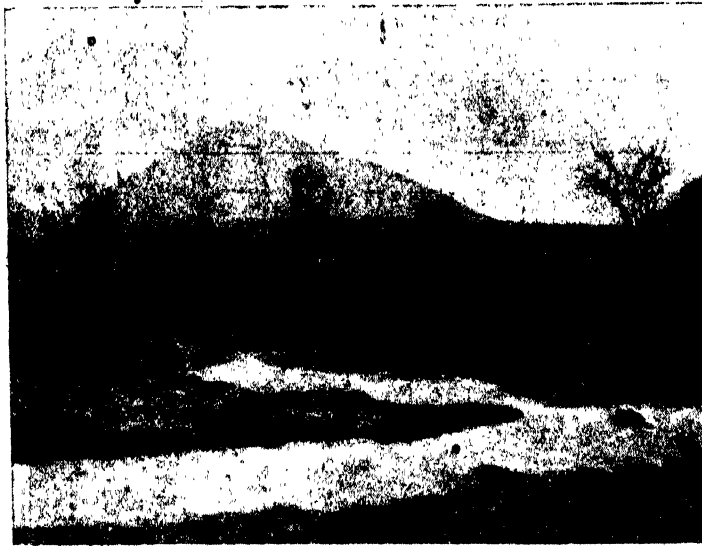
স্লেটপাথরের পাহাড়

প্রকাণ্ড সমুদ্র-তরঙ্গ তাহার গাত্রে আঘাত করিয়া তাহাদের ক্ষয় সাধন করে। পর্ব্বতের যে সকল অংশ অপেক্ষাকৃত কোমল, প্রথমে সেই সকল অংশই ধৌত হইয়া জলের সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইয়া সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই উপায়েই প্রধানতঃ পর্ব্বতগাত্রে গুহা উৎপন্ন হয়।

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" পর্ব্বতও এই সাধারণ নিয়মের অতীত নহে। পর্ব্বতও মরণশীল। নৈসর্গিক শক্তিসমূহের ধ্বংসকরী ক্রিয়ার ফলে পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রস্তরখণ্ড-সকল ভগ্ন হইতে-হইতে ক্রমে তাহার অস্তিত্ব লোপ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, ঐ সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকাদি পর্ব্বতের পার্শ্বে জমিতে থাকে এবং ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে; অবশেষে পর্ব্বতটী সমস্ত অংশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া মালভূমিতে পরিণত হয়। তখন আর পর্ব্বতের কোন চিহ্ন থাকে না। ইহাকে পর্ব্বতের মৃত্যু বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

পণ্ডিত-ম'শাই

পণ্ডিত ম'শায়

"সহ র্ণেয়—শেষ বিসর্গ
ক্ষীর্ণ হয়ে আসে ক্রমে,
ঝুলে পড়ে দেহ ; খুলে যায় মুখ,
মাথা পশ্চাতে নমে ;

গভীর গভর তুঙ্গ নাসিকা
আগ্নেয়গিরি চূড়া,
গুরু-গরজনে আকাশ জুড়িয়া
উগারে নস্যগুঁড়া।

ডেপুটীবাবু

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

"রমেশ করেছে দেশ্‌লাই চুরি।"
লিখে নিই ওটা, রও দেখি।
"রমেশ করেনি দেশলাই চুরি কখ্‌খনো!"
ভাল, তাও লিখি।
উকীল শুধায়—"তোম মারা হায়?"
আসামী কহিছে, "হাম্‌ নহি।"
ডাক্তার বলে "মেরেছ বৈ কি।"—
সার্টিফিকেটে নাম সহি।
সকলের কথা আমি লিখে মরি,
লেখা 'এভিডেন্স' নিই টুকে,
সকলের কথা শেষ হয় যবে,
তখনও লিখি হেঁট মুখে।
সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় লেখা,
কাছারীতে লেখা দিস্তা ছয়;
হাই তুলে দুটো তুড়ি দোবো,
তার সময়টুকুও সস্তা নয়।
রাত্রে ঘুমাই,—তাতেও কামাই নেইক,—
স্বপ্নে পেন ঘসি,
আবার ওদিকে সকাল না হ'তে
কলম হস্তে ফের বসি।

সাময়িকী

আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্‌ড্‌সে মহোদয়ের হস্তে বাঙ্গালার শাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশে গমন করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থশরীরে জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করুন; বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতির কথা কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ রাখিবে। নবাগত গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্‌ড্‌সে মহোদয়কেও আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। তিনি বাঙ্গালা দেশে অপরিচিত নহেন; এখানকার অবস্থাও তিনি অবগত আছেন। তাঁহারই শাসনকালে দেশের উন্নতি হইবে, এ আশা আমরা করিতেছি। তিনি শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভের অধিকারী হউন, ইহাই আমাদের কামনা।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন, বাঙ্গালীর গৌরব রবি শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় জাপান ও আমেরিকা-ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি কবে কলিকাতায় পৌঁছিবেন, তাহা নিশ্চিত জানিতে না পারায়, যেদিন তিনি কলিকাতায় আগমন করেন, সেদিন অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আউট্‌রাম ঘাটে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তবুও তাঁহার গুণমুগ্ধ অনেকেই তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আমরা গৌরব অনুভব করিয়া থাকি; তাঁহার নাম করিয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি। আমেরিকায় তিনি যে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান রবীন্দ্রনাথেরই যোগ্য হইয়াছিল। আমেরিকার একটি সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—"You think you are able to manage your own affairs better than another, better than your Providence, and so you are crushed beneath the terrific, the deadening weight of organisation and abstractions. You pile system upon system, and when one system fails, you turn and devise another, and yet another, and refuse to recognize that you will never have peace in your hearts until you substitute soul for system." ইহার ভাবার্থ এই যে, তোমরা মনে কর, তোমাদের কাজকর্ম্ম অপরের অপেক্ষা তোমরা অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পার; তোমরা মনে কর, তোমরা বিধাতার অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে পার; তাহার ফলে তোমরা শুধু বিধি-ব্যবস্থার পেষণেই চূর্ণ হইয়া যাও। তোমরা বিধানের উপর বিধান চাপাও; একটা বিধান যখন কার্য্যোপযোগী হয় না, তখন সেটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা ধর, সেটা না খাটিলে আর একটা ধর; কিন্তু তোমরা এ কথা মোটেই স্বীকার করিতে চাহ না যে, যতদিন বিধানের উপর আত্মার প্রতিষ্ঠা না করিবে, ততদিন তোমরা কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।" সার রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় যে কয়টী বক্তৃতা করিয়াছেন, সকল বক্তৃতাতেই এই ভাবের কথাই বলিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে এখন এই আত্মার বাণীই শুনাইতে হইবে। আজ হয় ত কেহ এ কথা শুনিবে না,—ইহাকে কবির স্বপ্ন বলিয়া অভিহিত করিবে; কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যখন এই বাণী শুনিতেই হইবে; এবং তখনই বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা হইবে।

বিলাতের গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ-পরিচালনে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য করিবার জন্য, ভারত-গবর্ণমেণ্ট এ দেশে যে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন, "ভারতবর্ষে"র গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পাঠক-পাঠিকা মাত্রেরই সেই ঋণের "কোম্পানীর কাগজ" নিজ-নিজ সামর্থ্য ও সুবিধামত ক্রয় করা উচিত। ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাতী গবর্ণমেণ্টকে দেড়শত কোটি টাকা দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই টাকা ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করা হইবে; ইহার সুদ এবং পরে আসল

টাকা কর-বৃদ্ধি ও ব্যয়-সঙ্কোচের দ্বারা পরিশোধ করা হইবে। ভারতবর্ষ হইতে বিলাতী গবর্ণমেণ্টকে এই যুদ্ধের সময়ে যথাসাধ্য প্রেরণ করা যে উচিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ সে কর্ত্তব্য পালনে উদাসীনও নহেন। সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া এবং ভারতীয় সেনার যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ স্বীয় কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাহায্যের অতিরিক্ত আরও কিছু—অর্থাৎ নগদ দেড়শত কোটী টাকা সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভারতবাসী মাত্রেরই এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা উচিত।

———

এই সমর ঋণ সম্বন্ধে আমাদের লাভালাভের পরিমাণ খতাইয়া দেখাইতেছি। যে টাকা আমরা ঋণ-স্বরূপ দিব, তাহা রাজস্ব হইতে যে কোনরূপেই হউক কয়েক বৎসর পরে শোধ করিয়া দিতে হইবে। এখন, কোন্‌টাতে আমাদের লাভ বেশী? আমরা মনে করি, গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দেওয়ায় প্রজার হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের লাভ বেশী। যাহা আমরা খাজনা দিই, তাহা আমাদের খরচ। সে টাকাটা আমাদের সংসার-খরচের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। আমাদের ঘর-খরচা বাদে উদ্বৃত্ত যে টাকা আমরা বাক্সে তুলিতে পারি, তাহাই যথার্থ আমাদের নিজস্ব। এই টাকা যদি আমরা ঘরে না রাখিয়া ব্যাঙ্কে রাখি, তাহা হইলে, উহার যে যৎকিঞ্চিৎ সুদ পাওয়া যায়, তাহা আমাদের সঞ্চয়ের উপরে 'লাভ'। কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিলে ঐ টাকার আসল আমাদের ঘরেই মজুত থাকিবে; উপরন্তু উহার উপর শতকরা বার্ষিক সাড়ে পাঁচ টাকা হারে সুদ পাইতে পারিব। যে টাকাটা আমরা ঋণ-স্বরূপ প্রদান করিব, তাহার সুদ ত পাইবই, অধিকন্তু নির্দ্ধারিত সময় অন্তে আসলও ফেরত পাইব। সুতরাং ঋণ-স্বরূপ আমরা গবর্ণমেণ্টকে যত বেশী টাকা দিতে পারি, ততই আমাদের লাভ। এরূপ স্থলে, যাঁহার যতটুকু সাধ্য, তিনি তদনুরূপ কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করেন, ইহাই আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কেবল ধনী নহেন, নির্ধন মধ্যবিত্ত দরিদ্র গৃহস্থও যাহাতে এই মহদনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট এবার তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। পোষ্টাফিস সমূহে দশটাকা পর্য্যন্ত মূল্যের কোম্পানীর কাগজ পাওয়া যাইবে। আমাদের বিশ্বাস সমর-ঋণের টাকা অল্পদিনের মধ্যেই সংগৃহীত হইবে।

———

পরম শ্রদ্ধাভাজন, জননায়ক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়কে আমরা The Grand Old man of Faridpur বলিয়া থাকি। তিনি সত্যসত্যই একটা মানুষের মত মানুষ। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত চেষ্টার কথা মনে হইলে পুলকিত হইতে হয়। বাঙ্গালী-সৈন্য-সংগ্রহের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। সেদিন একটি সভায় তিনি বলিয়াছেন—"If you cannot do that, you have no right to ask for any of the privileges which you demand, and you must be content to remain a nation of Munsiffs, Deputy Magistrates and clerks"—অর্থাৎ যদি তোমরা সৈন্যদলে যোগ না দাও, তাহা হইলে তোমরা এতদিনে যে সমস্ত দাবী করিয়া আসিতেছ, সে সকল কিছুই প্রার্থনা করিবার তোমাদের অধিকার নাই; তাহা হইলে তোমাদিগকে মুনসেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কেরাণীর জাতি হইয়াই থাকিতে হইবে।" কথটা বড়ই ঠিক! যাঁহারা সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে চাহিবেন না, যাঁহারা এই সময়ে রাজার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবেন না, তাঁহারা কোন্‌ মুখে রাজার নিকট স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রার্থনা করিবেন। সকলকেই এই সময় রাজার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে, এই যে সমর-ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে, ইহাতে বাঙ্গালীর নাম রক্ষা করিতে হইবে। জগৎকে দেখাইতে হইবে যে, বাঙ্গালী সুধু কথাই বলে না, বাঙ্গালী কাজও করিতে পারে, বাঙ্গালী স্বার্থত্যাগও করিতে পারে।

———

বিগত মাঘ মাসের 'নব্যভারতে' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার 'প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেন; চৈত্র মাসের 'প্রবাসী' বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে?' এই নাম দিয়া সেই

আলোচনা উদ্ধৃত করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'কষ্টি-পাথরে বাজে দাগ' নাম দিয়া একখানি পত্র ছাপাইয়া বাঙ্গালা দেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রসমূহে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মুদ্রিত পত্র হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমগ্র প্রবন্ধটীতে প্রমাণ করিতে প্রয়াস করা হইয়াছে যে, (১) "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তন স্যার আশুতোষের দ্বারাই হইয়াছে"—এই যে সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, "ইহা বিচারসহ" নহে। (২) "তিনি (স্যার আশুতোষ) সুদীর্ঘকাল ভাইসচ্যান্সেলাররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন; * * * যথোচিত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা দেখিতে না পারিয়া অপ্রশংসারই ভাজন হইয়াছেন।" (৩) "নূতন বিধানে বাঙ্গালাভাষা যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তাহাতে স্যার আশুতোষের উদ্ভাবিত নূতন কিছু আছে বলিয়া তো দেখা যাইতেছে না।" (৪) "পরবর্ত্তী বর্ষের (১৮৯৬) মার্চ্চ মাসে ফ্যাকাল্‌টি অব্ আর্টসএর অধিবেশনে + + + বহু আলোচনার পরে এতদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণকল্পে একটি কমিটি গঠিত করা হয়, তাহাতেও স্যার গুরুদাস বলেন। স্যার আশুতোষ ঐ কমিটীতে ছিলেন। তবে তিনি যে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপরিউক্ত কয়েকটি মন্তব্যের সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন, "১৮৫৭ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন মাত্র প্রবেশিকা ও বি-এ—এই দুই পরীক্ষার বিধান ছিল। এফ-এ, পরীক্ষার তখন আদৌ সৃষ্টিই হয় নাই। সেই সময়ে প্রবেশিকা এবং বি-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা বৈকল্পিক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা এই দুইএর যেটী যাহার ইচ্ছা লইতে পারিত। ইহাতে একটি কুফল এই হইতেছিল যে, প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই বাঙ্গালা লইত, সংস্কৃতের দিকে বড় কেহ যাইত না। ১৮৬১ অব্দে এফ-এ পরীক্ষার সৃষ্টি হয়, তাহাতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত (Optional) রূপে নির্ব্বাচিত হয়। শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, সকলেই বাঙ্গালা পড়িত, সংস্কৃত কেহই পড়িতে চাহিত না। এই বিষয়ের প্রতিকারকল্পে ১৭৬৮ অব্দে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য হইতে বাঙ্গালাভাষা উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবেশিকায় বাঙ্গালা পূর্ব্ববৎ (Optional) থাকিয়া যায়। ইহার ফলও ঠিক বিপরীত হইল। এফ-এ, বি-এ-তে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বলিয়া প্রবেশিকায় কেহই আর বাঙ্গালা লইত না, সংস্কৃতই পড়িত। সুতরাং প্রবেশিকায় বাঙ্গালা রহিল বটে, কিন্তু সে থাকা একপ্রকার না থাকারই তুল্য। * * *

"১৮৮৭ অব্দের ১৯শে নভেম্বর তারিখে "ফ্যাকল্‌টি অব আর্টস" এর মিটিংএ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে Under-graduates Associationএর আবেদন বিবেচিত হয়। সেই মিটিংএ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে রায় ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী এতদ্দেশীয় এই তিন জন জীবিত আছেন। উক্ত সভা ঐ পূর্ব্বোক্ত আবেদনে প্রার্থিত বঙ্গভাষা এফ-এ পরীক্ষায় Second Language রূপে নির্দ্ধারিত করিবার প্রস্তাব করেন এবং ৺গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় তাহার সমর্থন করেন। ঐ সভায় স্যার এলফ্রেড ক্রফট, কে, এম, ম্যাকডোনেল প্রমুখ পাঁচজন সাহেব ও মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী, মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণি মুখোপাধ্যায়, ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ৪ জন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ইহা সত্বেও বাঙ্গালা ভাষার পক্ষ ভোটে হারিয়া যান। বাঙ্গালা ভাষার দ্বার রুদ্ধই থাকিয়া যায়। (Minute for 1887-88. P. 163) তারপর, ১৮৯১ সালের ১৪ই মার্চ্চ সিণ্ডিকেট সভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত আর্টস্ পরীক্ষায় অর্থাৎ এফ, এ, বি, এ, ও এম, এ পরীক্ষায়, বঙ্গভাষার কথা বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি বলিয়াছিলেন যে, যাহারা সংস্কৃতে Second Langnage লইবে, তাহাদের বাঙ্গালা হিন্দি বা উড়িয়া ইহার কোন একটা ভাষাতে পাঠ্য-পুস্তকের পরীক্ষা দিতে হইবে। এ সময়ে স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস্‌চেন্সলার। এই দিনের সিণ্ডিকেটেও স্যার গুরুদাসই সভাপতি ছিলেন। স্যার আশুতোষের ঐ প্রস্তাব-

গুলি "ফ্যাকলটি অব্ আর্টস্" কমিটীতে বিবেচনার জন্ত প্রেরিত হয়। (Minute 1890 91 P. 414-15) তারপর ১৮৯১ অব্দের ১১ই জুলাইএর ফ্যাকলটি আর্টস সভায় সিণ্ডিকেট হইতে প্রেরিত আশুতোষের ঐ প্রস্তাবাবলী পুনরুত্থাপিত হয়। সিণ্ডিকেট এবং "ফ্যাকলটি অব আর্টস"এর এই মিটিংএর মধ্যে প্রায় চারিমাস কাল ব্যবধান ছিল। বাঙ্গালাভাষা যাহাতে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিতে না পারে, এ পক্ষে বঙ্গের **সুসন্তানগণের** অনেকে এই চারি মাস কাল চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ফ্যাকল্টি মিটিংএ ভাইসচ্যান্সেলর স্যার গুরুদাস উপস্থিত হন নাই। এই সভায় স্যার আশুতোষ প্রস্তাব করেন যে, "সিণ্ডিকেট হইতে প্রেরিত মদীয় প্রস্তাবিত বঙ্গভাষা প্রভৃতির আর্টস পরীক্ষায় নির্ব্বাচন বিষয়ে বিবেচনার নিমিত্ত শিক্ষিত একটা কমিটি গঠিত হউক।"

তৎপরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন, "ফ্যাকল্টির এই মিটিংএ স্যার আশুতোষের এই প্রস্তাব লইয়া যে বিষম মতভেদ হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা প্রচার হইয়া পড়ে। এই দিন যদি ভাইসচ্যান্সেলর স্যার গুরুদাস উপস্থিত থাকিতেন,—তবে হয় ত বঙ্গভাষার "অদৃষ্ট প্রসন্ন" হইতে এত কালবিলম্ব ঘটিত না। স্যার গুরুদাসের অনুপস্থিতিতে, স্যার এল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট এই দিন সভাপতির কার্য্য করেন। এই মিটিংএ সর্ব্বসমেত ৩৫ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন ইংরাজ এবং ৩০জন বাঙ্গালী। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্যার আশুতোষের প্রস্তাব সমর্থন করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়, স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বাবু চন্দ্রনাথ বসু ডাক্তার ম্যাকডোনল্ড, মিঃ আনন্দমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ১১ জন ব্যক্তিও স্যার আশুতোষের প্রস্তাব অনুমোদন করেন,—কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্যার আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট, বাবু সারদাচরণ মিত্র, নবাব আব্দুল লতিফ প্রভৃতি অবশিষ্ট সভ্যের বিরুদ্ধতায় স্যার আশুতোষের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। বঙ্গভাষা দীর্ঘকালের জন্য বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। (Minute fo 1891-92 P. 56-57) ১৮৮৭ অব্দে "আণ্ডার গ্রাজুয়েটঃ এসোসিয়েসনের" আবেদনানুসারে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশ বাঙ্গালা ভাষাকে এফ-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করিয়া যখন ভোটের যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন দেশের মধ্যে একটা বেশ হুলস্থুল পড়িয়া যায়। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যাপারে দুঃখিত হন। সাময়িক সংবাদ পত্রাদিতেও বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বঙ্গ-সন্তানগণের এই অদ্ভুত আতিথ্যে নানা আলোচনা আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃ প্রবিষ্ট হউক, দেশের লোকের এই সঙ্গত অভিলাষের বা ন্যায্য দাবির প্রতিচ্ছবি তাই অতি স্পষ্টভাবে স্যার গুরুদাসের কন্‌ভোকেসন্-অভিভাষণে দেখিতে পাওয়া যায়।"

সর্ব্বশেষে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন—"তার পর ১৯০৪ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধির কথা।—সে আইনে যে কাহার কতটা কৃতিত্ব, তাহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের আলোচনা না করিলেই শোভন হইত। উক্ত রেগুলেশনে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকায় বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া, আসামিজ, উর্দ্দু, বার্ম্মিজ, আর্ম্মানি, তিব্বতীয় ও খাসিয়া ভাষায় রচনার (Composition) কথা সন্নিবিষ্ট করিয়া উক্ত নূতন বিধানের কর্ত্তা স্যার আশুতোষ তদীয় দীর্ঘকালের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। অথবা শুধু ইহাই নহে—মাট্রিকুলেশনে যাহারা ইতিহাস লইবে, তাহারা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতিতে উত্তরপত্র পর্য্যন্ত লিখিতে পারিবে, এই বিধান করিয়া স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীচ্য সৌধে প্রাচ্যের বাগ্‌দেবতার সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মাট্রিকুলেশন, এফ-এ ও বি-এ—ত্রিবিধ পরীক্ষাতেই বাঙ্গালা-ভাষা পাঠ্য করিয়া স্যার আশুতোষ, সেই ১৮৯১ অব্দের পরাজয়ের প্রতীকার করিয়াছেন, আজীবন যাহা অভিপ্রেত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

১। সরস্বতী, ফেব্রুয়ারী ১৯১৭—

"সিংহল দ্বীপমেঁ সেঙ্গরোঁ কা রাজ্য।"—লেখক কুমার শিবনাথ সিংহ সেঙ্গর। ক্ষত্রিয়গণের ছত্রিশটি মুখ্য রাজবংশের মধ্যে সেঙ্গর বংশ একটি। ১৯১১ সালের লোকগণনায় যুক্তপ্রদেশে সেঙ্গরদিগের সংখ্যা ছিল ৫৪,২০৪। রেবা, মধ্যভারত, বিহার এবং রাজপুতানায়ও ইহাদের বাস আছে।

এখন সেঙ্গরদিগের কোনও স্বতন্ত্র রাজ্য নাই। কিন্তু চৌহানগণ যখন দিল্লীতে ও গহরওয়ারগণ যখন কনৌজে আপন-আপন শক্তির ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল, সে সময় সেঙ্গরগণ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। তাহাদের বিভিন্ন শাখার অবশিষ্ট এখনো জালোন, ইটাওয়া, উনাও, বালিয়া এবং রেওয়ার কয়েকখানি তালুকে জীবিত রহিয়াছে।

আধুনিক সেঙ্গরগণের সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ পাওয়া যায়। হালোন জেলার ১৯০১ সালের সরকারী রিপোর্টে আছে —"Sengurs are considered practically the equals of Kachhawahas and inter-marry with them. They are naturally warlike and turbulent."

বালিয়া জেলার সরকারী গেজেটিয়ারে লিখিত আছে—"Their history is remarkable, for, at all times, they were renowned for their strength and courage......When Mr. Duncan assumed control of Benares, the Sengars were considered the most independent and troublesome of all the subjects of the Company."

বহু দিন হইতে সেঙ্গরদিগের মধ্যে জনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, সিংহলদ্বীপে ইহাদের রাজ্য ছিল। ইহাদের পুরাতন বংশাবলীতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ়, সিংহল, মেঙ্গরপত্তন (দাক্ষিণাত্যে), গুজরাত, মগধ, ডাহর, বান্ধবগড়, কালিঞ্জর, কর্ণাবতী প্রভৃতি স্থানে ইহারা রাজ্য-স্থাপন করে। অবশ্য একই সময়ে সকল স্থানে ইহাদের রাজ্য ছিল না।

কংগ্রেসের জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় হিউম মহোদয় যখন যুক্তপ্রদেশে ইটাওয়া জেলার কালেক্টর ছিলেন, সেই সময়ে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার রিপোর্টে তিনি সেঙ্গরগণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন —"Claiming like the Gautam Rajputs to be descended from Shringi Rishi......they pretend that their own Immediate ancestor......migrated southward and established an independent kingdom in the Deccan, or, as most will have it, in Ceylon. The constant allusion to a monarchy of Rajput in Ceylon which haunts us at every turn of their old traditions may embalm some long-forgotten reality, but nothing, as yet discovered, warrants our treating it as anything but a pure myth."

এই কিম্বদন্তীর পোষক কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শনও পাওয়া যায়।

(১) সিংহলের ইতিহাস মহাবংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিংহবাহুর পুত্র বিজয়রাজ ভারতবর্ষ হইতে যাইয়া লঙ্কায় রাজ্য-স্থাপন করেন। সেঙ্গরদিগের বংশাবলীতে আছে যে, ঋষ্যশৃঙ্গের (দ্বিতীয়, পুত্র ভোজরাজ লঙ্কা জয় করেন। ভোজরাজ আর বিজয়রাজ একই নামের বিভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে না কি?

(২) মহাবংশে লিখিত আছে, বিজয় লাঢ় দেশ হইতে আগমন করেন। সেঙ্গরগণ বলেন বিজয় রাঢ় দেশ হইতে গমন করেন।

(৩) রাঢদেশে যে সেঙ্গরগণের রাজ্য ছিল, এ কথা রাজপুতানার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক, বুন্দির রাজকবি শ্যামলজী বলিয়া গিয়াছেন। যোধপুর হইতে প্রকাশিত ইঁহার বংশভাস্করে আছে—

> ঈশ্বর ১৪২১ ভয়ো কমাসুর ঈশ্বর
> দোয়বরে পরশে জগদীশ্বর।
> উপক্রম দোর কিয়া মুড়িআঁতা
> বসুধা অচল কৈরে জস বাঁতা।
> বহুদবলে অরু কটক নিবেসণ
> সকর ভূপ অপর তিম সম্মণ।
> কুল সেঙ্গর অরু বৈস কহাবৈ
> পরদলগঞ্জ সদা জয় পাবৈ।
> সেঙ্গর নৃপ সঙ্করসুতা
> নবনন্দা জিণনাম।
> বৈসবংশ সম্মন-সুতা
> রুচিরাগুণ অভিরাম।

উদ্ধৃত কবিতার ভাবার্থ এই যে, আদি চৌহানের পর ১১২ সংখ্যক রাজার নাম ছিল ঈশ্বর। তিনি দুইবার জগন্নাথপুরী যাত্রা করেন।

সেখান হইতে ফিরিবার সময় প্রথমবার বর্দ্ধমানের সেঙ্গরবংশীয় রাজা শঙ্করের কন্যা রাজকুমারী নবনন্দার পাণিগ্রহণ করেন, এবং দ্বিতীয়বার কটকের বৈষ্ণবংশীয় রাজা সম্বনের কন্যা রুচিরাকে বিবাহ করেন।

(৪) বর্দ্ধমানের চতুঃপার্শ্বস্থিত দেশেরই নাম রাঢ়দেশ।

(৫) সেঙ্গরদিগের বংশাবলীতে আছে যে, ভোজরাজার ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ণদেবও লঙ্কায় যাইয়া কিছুকাল রাজত্ব করেন। কিন্তু পরে আপনার এক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া জম্বুদ্বীপে ফিরিয়া যান। কোনও-কোনও স্থানে পূর্ণদেবের স্থলে ভোজরাজের অনুজ পাদমজু দেবের নাম পাওয়া যায়। সিংহলের ইতিবৃত্তেও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। মহাবংশে উল্লিখিত আছে যে, বিজয় যে যক্ষিণীর সাহায্যে সিংহলে রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার দ্বারা তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। কিন্তু তাঁহার রাণী মদুরা-রাজকুমারীর কোনও সন্তান না থাকায় বিজয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রকে রাঢ়দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠান। সুমিত্র সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই রাঢ়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সেইজন্য আপনি যাইতে না পারিয়া পুত্র পাণ্ডুবাসকে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে বিজয় গতায়ু হন, এবং পাণ্ডুবাসের না আসা পর্য্যন্ত প্রধান সরদার উপতিস্‌স রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। মহাবংশে পাণ্ডুবাসের দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কোনও কথা পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তদীয় সন্তানগণের নিকট হইতে সিংহল রাজ্য কাড়িয়া ল'ন—এ কথা জানা যায়।

(৬) সিংহলরাজবংশের এবং সিংহলজাতির বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করার উৎসাহ দেখিয়া, এবং কপিলবস্তুর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইলে, গৌতম-বংশের রাজকুমারগণ (একজন ব্যতীত) সকলেই যে আগ্রহের সহিত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া সিংহলে উপস্থিত হন—ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, বুদ্ধ ভগবানের (গৌতম) বংশের সহিত বিজয়ের বংশের জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিল। বোধ হয় এ ধারণা সত্য; কারণ যুক্তপ্রদেশের গৌতম ক্ষত্রিয়গণ এখনও আপনাদিগকে ঋষ্যশৃঙ্গের বংশজ বলিয়া পরিচিত করেন। সেঙ্গরগণের আদিপুরুষও এই শৃঙ্গ ঋষি।

(৭) ১১৯১ বিক্রমাব্দে (১১৩৪ খৃঃ অব্দে) রাপড়ীর সেঙ্গররাজ বৎসরাজের একখানি দানপত্রে সেঙ্গর স্থানে সিঙ্গর শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। সিংগর ও সিংহল হয় ত একই মূল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, ঋষ্যশৃঙ্গের নামের শৃঙ্গ শব্দ হইতে সিঙ্গর শব্দ আসিয়াছে। লোক-ভাষায় সংস্কৃত শৃঙ্গ শব্দ শিং রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে 'সিংহ' (সংস্কৃত) শব্দের দেশীয় রূপান্তর সিং বা সিঙ্গি। ক্ষত্রিয়দের সিংহান্ত নামের উচ্চারণ সিং-সিঙ্গ্-সিঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে হয়ত সিংহল্ সিঙ্গল হইয়া গেল। আর 'র' ও 'ল'য়ের পরস্পর অদলবদলের ভূরি-ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। অতএব দেখিতেছি, সিংহল হইতে সিঙ্গর শব্দের উৎপত্তি কিছু বিচিত্র নহে।

ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীন রাজকুলের বংশাবলী ও বংশপরম্পরাগত কিম্বদন্তী হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। এরূপ কিম্বদন্তী যে অনেক স্থলে সত্য হয়, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। গহরওয়ার ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের বংশজ বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে এ কথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতাম; কেন না "পৃথ্বীরাজরাসো" প্রভৃতি গ্রন্থে জয়চাঁদকে রাঠোর বলা হইয়াছে। পরে যখন জয়চাঁদ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের দানপত্র হস্তগত হইল, তখন তাহাতে দেখা গেল যে, জয়চাঁদ গহরওয়াল বংশসম্ভূত বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। এখন, রাঠোর ও গহরওয়ারগণ যে একই শ্রেণীর ক্ষত্রিয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইতেছে।

"য়োরপ কি এক বিচিত্র গ্রন্থ।"—লেখক, শ্রীজগন্নাথ খন্না বি-এস্‌-সি, (কর্পোরেশন অফ লণ্ডন)। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই মহিলাগণ পুরুষ অপেক্ষা লজ্জাশীলা হন। এই লজ্জার জন্য, যদি কোনও যুবতী কোনও পুরুষের প্রেমে পতিত হন, তাহা হইলে তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিতে পারেন না। যুরোপে পূর্ব্বে আমাদের দেশের মত পিতা-মাতাই কন্যার জন্য বর নির্ব্বাচন করিতেন। কিন্তু আজকাল সে প্রথা বর্ত্তমান নাই। কিন্তু এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও কোনও রমণী আপনার প্রেমপাত্র যুবার নিকট ভালবাসা ব্যক্ত করিয়া বিবাহের দাবী করিতে পারেন না, প্রেমিক যুবকেই বিবাহের প্রার্থনা করিতে হয়। কন্যার পক্ষে কোনও যুবার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করা সভ্য-সমাজের নীতিবিরুদ্ধ।

ইংরাজী অব্দ-গণনায় প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরকে লীপ্‌ইয়ার বলে। এই লীপ্‌-ইয়ারে কুমারীগণ আপন-আপন প্রেমিকের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব করিতে পারে। স্কটল্যাণ্ডের রমণীরা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। যখন এই দেশ ইংলণ্ড হইতে পৃথক্ ছিল—সেই সময়, ১২৮৮ খৃঃ অব্দে সে দেশে একটি আইন ছিল—"It is Statut and ordaint that during the rein of his maist blissit Megeste, for ilk yeare knowne as lepe yeare, ilk mayden ladye of both highe and lowe estait shall hae liberte to bespeke ye man she likes, albeit he refuses to taik hir to be his lawful wyfe, he shall he mulcted in ye sum one pundis or less, as his estait may be; except and awis gif he can make it appeare that he is betrothit aue ithea woman he than shall be free" অর্থাৎ রমণী আগ্রহ প্রকাশ করিলে পুরুষ যদি অন্য রমণীকে কথা না দিয়া থাকে তবে বিবাহে স্বীকৃত হইতেই হইবে, নহিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ফ্রান্সেও এইরূপ একটি আইন পাশ হয়। আজকাল য়ুরোপে স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রচার হওয়ায়, মেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মাত্রা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ফলে, যে পুরুষ প্রথমে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে না, মেয়েরা তাহার নিকট আপনার

প্রেমের কথা স্বীকার করা অপমানজনক মনে করে। তাহা হইলেও এখনো লীপইয়ারে রমণীর উপযাচিকা হইয়া পুরুষের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব করার প্রথা য়ুরোপ ও আমেরিকায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে বৎসর লীপইয়ার হয়, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র নানারূপ ব্যঙ্গ-চিত্র ও গল্প প্রকাশ করিয়া রমণী-সমাজকে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। লেখক নিজ অভিজ্ঞতার একটি গল্প প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকায় লেখকের কলেজের কোনও যুবক বন্ধু একটি যুবতীকে ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না—সেই জন্য তখন বিবাহ করিলে উচ্চশিক্ষার আশা ত্যাগ করিয়া অল্প বেতনে চাকরী করিতে হইবে, এই ভয়ে ইচ্ছা সত্বেও তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিতেছিলেন না। কন্যার পিতামাতা বিবাহের পর বরের বিদ্যাধ্যয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েকে স্বগৃহে রাখিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু উন্নতচেতা যুবক তাহাতে স্বীকৃত হইতেন না।

বহুদিন পর্য্যন্ত বিবাহের আশায় উদ্বিগ্ন থাকিয়া অবশেষে যুবতী নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ১৯১২ সাল লীপইয়ার ছিল। বন্ধুগণের পরামর্শে তিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়া যুবককে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন। যুবক দেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। বিবাহের পর উভয়ে আমাদের দেশের কলেজের ছাত্রদের মত আপন আপন শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন।

৩। লক্ষ্মী, ১৫শ ভাগ ১ম সংখ্যা—জানুয়ারী ১৯১৭।

"রাষ্ট্রভাষা হিন্দী"—লেখক, শ্রীযুত গণেশ শঙ্করজী বিদ্যার্থী। ব্যক্তিত্বের ও জাতীয়তার বিকাশের এই যুগে যে সকল শক্তি দেশকে ও জাতিকে পূর্ণতার পথে লইয়া যায়, তাহার মধ্যে ভাষা একটি প্রধান শক্তি। মুসলমানগণ যে সকল দেশে গিয়াছিলেন—স্পেনের পার্ব্বত্য দেশ হইতে জাভা ও সুমাত্রার সবুজ সমতল পর্য্যন্ত সকল দেশেই তাঁহারা আরবী ও ফারসী ভাষা লইয়া যান। মুসলমান-গৌরবের দীপ্ত সূর্য্য যদিও পশ্চিম-গগনে চলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উর্দ্দু ও ফারসী আজ পর্য্যন্ত পূর্ণ তেজে বাঁচিয়া রহিয়াছে। আমরা অন্ধ ও অলস; আমাদের মগজ বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা তৈয়ারী করিতে পারি না। মানুষের বুদ্ধিই মানুষের তেজ; কিন্তু আমাদের বুদ্ধি বানরের আক্কেলের মত নকল করিতেই খরচ হইয়া যায়। এ দেশে বাংলা, মারাঠী ও গুজরাতী ভাষা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। এই ভাষাগুলির বিভিন্ন অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পুষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু ইহারা অঙ্গহীন নহে। হিন্দী সেই হিসাবে পঙ্গু। হিন্দীভাষার এই অবস্থা আর কত দিন রহিবে?

সংস্কৃত

১। বিদ্যোদয়ঃ, ১৩২৩ বঙ্গীয়াব্দীয়-আশ্বিন কার্ত্তিকয়োঃ।

"বারেন্দ্ররাঢ়ীয়মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণানামিতিবৃত্তম্"—লেখক, শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন। বল্লালসেনের পর লক্ষ্মণসেন পিতৃরাজ্য পাইলেন। আহ্লানাদি যে ঊনবিংশতি ব্রাহ্মণকে বল্লালসেন কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করেন। লক্ষ্মণসেন ইহা অবগত হইয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট কুলকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিলেন। কৌলিন্য আচার ও মর্য্যাদা প্রভৃতি অনুসারে একবিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণকে কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কেশব যবনগণ কর্তৃক রাজ্য হইতে নিষ্কাষিত হইলেন। মুসলমানগণ ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। সেই সময় দানৌজমাধব যবনগণকে পরাভূত করিয়া গৌড় অধিকার করিলেন। একদা রাজা মাধব ব্রাহ্মণগণের কুলবিপর্য্যয়ের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক অষ্টাধিক পঞ্চশত ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য প্রদান করিলেন। এই সময় নির্ব্বাসিত কেশব দানৌজমাধবের রাজ্যপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া তাঁহার সভায় আগমন করেন। মাধব কেশবকে পারিষদরূপে গ্রহণ করিলেন। এক দিন কথায়-কথায় মাধব কেশবের নিকট বল্লাল-নির্দ্ধারিত কুলবৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলে, কেশব কুলপণ্ডিত এড়ু মিশ্রকে তাহা বর্ণনা করিতে কহিলেন। এড়ু মিশ্রের বিবরণ শুনিয়া মাধব পুনরায় ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদের নব গুণ বিচার করিয়া চতুর্বিংশতি ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে শ্রোত্রিয়গণ শুদ্ধ ও কষ্ট এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এখন সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারি এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মাধবের মৃত্যু হয়।

মাধবের পরে যবনগণের প্রাবল্য হেতু ব্রাহ্মণগণ উৎপীড়িত হইতেন। তখন রাঢ় বারেন্দ্রের ব্রাহ্মণগণ বিভেদ ভুলিয়া পরস্পর কন্যাদানপ্রদানে কুলাকুল বিচার ও শ্রেণীভেদ ত্যাগ করিয়া শত বৎসর অতি কষ্টে যাপন করিলেন।

কংসনারায়ণের রাজত্বকালে বিপ্রগণের প্রার্থনায় নৃপতি অমাত্য দত্তখাসকে কুলগ্রন্থানুসারে দোষগুণ বিচার করিয়া কুল-বন্ধনের আদেশ করিলেন। দত্তখাস বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন গোত্রের বহু বিভাগ দেখিয়া চিন্তাকুল হইলে কাঁটা দিয়া বন্দ্যানশরনিবংশজ ঈশান তাঁহাকে বলিলেন—

> আচারাদি নব গুণৈর্যুক্তা যে যে দ্বিজাতয়ঃ।
> হৃষ্যা বল্লালসেনেন কুলীনত্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
> তদ্বংশীয়বিপ্রাণাং বহূনৈকৈব সাম্প্রতম্।
> আচারাদিগুণানাঞ্চ লেশমাত্রং ন বিদ্যতে॥
> ইদানীন্ত কুলীনানাং কুলাচার্য্যাগতং কুলং
> গুণানাং নবসংখ্যানাং বিচারো নৈব দৃশ্যতে॥
> দোষা বহুবিধা প্রাপ্তা কুলীনাং কুলেঽধুনা
> কুলং গুণগতং জ্ঞেয়ং ন বংশগতমেব চ॥
> অতঃ পরীক্ষণং কৃত্বা গুণানামেব সাম্প্রতম্
> ষট্‌পঞ্চাশদ গ্রামিণাং বৈ কুরু ত্বং কুলবন্ধনং॥

ঈশানের কথায় বহু কুলীন সম্মত হইলেন না। কিন্তু দত্তখাস নিম্নলিখিত কুলীনগণকে নবগুণ হইতে ভ্রষ্ট না দেখিয়া কুলীন করিয়া

দিলেন—ফুলিয়া-মুখজ বিদ্যাধর, কাচণ্ন-মুখজ সদাশিব, অবসথী চট্টজ বলভদ্র, কাঁটাদিয়া বন্দ্যজ আদিত্য, কাঁটাদিয়া বন্দ্যজ দিগম্বর, কাঞ্জিজ বাসুদেব, গাঙ্গজ মাধব ও পুতিজ শিষ্ঠ। বহু ব্রাহ্মণ এই বিচারে রুষ্ট হইয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। দত্তখাসও ইঁহাদিগকে বলিলেন—

মমাবমাননাং কৃত্বা গতা যে যে দ্বিজাতয়ঃ।

মচ্ছাসনাদ্ ভবদ্ভির্ন ব্যবহার্য্যাঃ কদাচন॥

দত্তখাসের এই কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া দ্বাবিংশতি গ্রামের চল্লিশজন ব্রাহ্মণ জ্ঞাতির অপ্রিয় হইয়া বাস করা সমীচীন বোধ না করিয়া সপরিবারে রাঢ়দেশে যাইয়া বসতি করিলেন। সেই হইতে ইঁহারা মধ্যশ্রেণী আখ্যাত হন। অতঃপর দত্তখাস পুনরায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য দান করিয়া ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণগণের সম্মতি অনুসারে শোভাকরকে কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিলেন।

কংসনারায়ণের পুত্র যদু যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়ন আবার আরম্ভ হইল। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে হোসেনসাহ গৌড়ের অধীশ্বর হইলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কুলরক্ষার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি দেবীবরকে কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কুলগ্রন্থ সকল যবনগণ কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। কামাখ্যাদেবীর প্রসাদে দেবীবর ত্রিকালজ্ঞতা লাভ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মেলবন্ধন সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি মেলবন্ধনার্থ মধ্যদেশে গমন করিলে—সেখানে মধ্যদেশীয় দ্বিজগণ "শুদ্ধানাং নো মেলবন্ধো বিফলো ন্যূনতপ্রদঃ। ত্রিকালজ্ঞেন ভবতা কিমর্থমনুভূয়ত" বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দেবীবর স্বদেশে ফিরিয়া ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ধ্রুবানন্দ মিশ্র মেলকারিকা নামক কুলগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আসামী

১। আলোচনা, ফাল্গুন, ১৮৩৮।

"আমার দেশর আদি-বাসী মানুহ"—লেখক, শ্রীআনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা। কোচ, মেছ বা কছারী, গারো, খশ, বরাহী, মিকির, চুটিয়া, নাগা, ভোট, আকা, ডফলা, মিরি, মিশ্‌মি, চিংফৌ প্রভৃতি জাতিকে আসামের আদিম অধিবাসী বলা হয়। পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে এই সব জাতি সম্বন্ধে যাহা অনুমান করা যায়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

কোচ, কোঁচ, কুচ বা কচ একই কথার নামান্তর। গুবালপাড়া ও কোচবিহারের অনেক কোচ আপনাদের নামের শেষে রাজবংশী লিখিয়া থাকে। অতীত কালে কুচ বা কোচদিগকে কুওয়াচ বলা হইত।

পুরাতন ভারতে মৎস্যরাজ্য ছিল। পশ্চিম হইতে আর্য্যগণ আগমন পূর্ব্বক সেই রাজ্য অধিকার করিলে, সেখানকার অধিবাসীগণ পূর্ব্বদেশে পলায়ন করিয়া কুওয়াচগণের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মৎস্য দেশ হইতে আগত বলিয়া তাহাদিগকে "মৎস্য" বলা হইত 'মেছ' এই মৎস্যেরই অপভ্রংশ। কেহ কেহ বলেন, 'ম্লেচ্ছ'—(বিদেশী হইতে 'মেছ' শব্দের উৎপত্তি।

যে সকল মৎস্যদেশবাসী কুওয়াচদিগের সহিত মিলিয়া থাকিতে পারিল না, তাহারা কুওয়াচ দেশের সিংহাসনের জন্য কুওয়াচগণের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে লাগিল। তাহার পর সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা আরও পূর্ব্বদিকে চলিয়া আসিল। কুওয়াচদিগের সহিত শত্রুতা করায় ইহারা কুওয়াচারী নাম পাইল। কুওয়াচারী ক্রমে 'কচারী'তে পরিণত হইল। ইহারাই বর্ত্তমান "কাছাড়ি"দিগের আদিপুরুষ।

বর্ত্তমান গারো পর্ব্বতের পৌরাণিক নাম 'গরুড়াচল'। তথাকার অধিবাসিগণকে গরুড় বলা হইত। "গরুড়" হইতে "গারো" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুরাণে ও রামায়ণে 'খস্' বলিয়া একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। খাসিয়াগণ কি 'খস্' জাতি হইতে উৎপন্ন ?

অতীত কালে প্রাগজ্যোতিষপুরের পূর্ব্বদিকের পর্ব্বতমালাকে "বরাহ" পর্ব্বত বলা হইত। তথাকার অধিবাসীগণ 'বরাহী' নামে পরিচিত ছিল। কাছারিদিগের উৎপাতে ত্রিপুরাসুর বংশের একজন রাজা উত্তরকাছাড় পর্ব্বতমালা পার হইয়া নিজ প্রজাগণসহ দক্ষিণে পলাইয়া যান।

মিকিরগণ কিরাত জাতির বংশধর বলিয়া মনে হয়। 'মি' -মানুষ। 'কির'=কিরাতের অপভ্রংশ। কিরাত দেশের দক্ষিণে "কুক্ষি" নামে এক পর্ব্বত ছিল। 'কুকী'গণ বোধ হয় এই 'কুক্ষি' পর্ব্বতবাসী ছিল। নাগাগণ নাগবংশীয় বলিয়া মনে হয়।

রামায়ণে চীন ও মহাচীন দুটি নাম আছে। 'চিংফৌ'গণ এই চীন জাতির বংশধর এবং মিশ্‌মিগণ মহাচীন হইতে জাত।

গন্ধর্ব্বদিগের একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম ছিল ইরা। মিরিগণ বোধ হয় ইরাবংশসম্ভূত।

আকা-ডফলা পর্ব্বতে বোধ হয় কুবেরের রাজ্য ছিল; প্রাচীন ভারতের মানচিত্রানুসারে ভোট, আকা, ডফলা, মিরি ও আবর প্রভৃতি পর্ব্বত 'দেবভূমি' বা 'সুরলোকে'র মধ্যে পড়ে। আকা বোধ হয় যক্ষ হইতে আসিয়াছে। পশ্চিমে 'য'য়ের উচ্চারণ "য়"। যক্ষাঃ=য়ক্ষাঃ=য়কা বা অকা। এই অকা ক্রমে আকায় দাঁড়াইয়াছে।

ডফলাগণের পূর্ব্বনাম 'গুহ্যক' ছিল বোধ হয়। ডফলা পর্ব্বতমালার মধ্যে গহসুর নামে একটি স্থান আছে—ইহার প্রাচীন নাম "গুহ্যকপুর"। 'দেবপলোয়া' বা 'দেবপালা' হইতে 'দফলা' ও পরে 'ডফলা' আসিয়াছে।

ভুটান পর্ব্বতের কোনও স্থানে বোধ হয় মহাদেব থাকিতেন। বোধ হয় তাঁহার "ভূত"গণই বর্ত্তমান ভোট। (!!)

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল সুরেশ। কহিল, "হঠাৎ, আচ্ছা একটা কাণ্ড করে বস্‌লুম।"

অচলা কথা কহিল না। সে পুনরায় কহিল, "আপনার নিশ্চয়ই আমাকে একটা রাক্ষস বলে মনে হচ্চে। একলা বসে থাকতে বোধ করি আপনার সাহস হচ্চে না। না?" বলিয়া টানিয়া-টানিয়া হাসিতে লাগিল। অচলা এখনও মুখ তুলিল না। কিন্তু, তুলিলে দেখিতে পাইত, সুরেশের ওই একান্ত চেষ্টার নিষ্ফল হাসিটা শুধু তাহার নিজের মুখখানাকেই বারম্বার অপমানিত করিয়া লজ্জায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

আবার সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং সেই দেয়ালের গায়ের ঘড়িটাই শুধু খট্‌-খট্‌ করিয়া স্তব্ধতার পরিমাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে এই কঠিন নীরবতা যখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সুরেশ তাহার সমস্ত দেহটাকে ঋজু এবং শক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "দেখুন, যা' হয়ে গেছে তার পরে আর আমাদের মধ্যে চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। বেলা গেল—আমি এবার যাবো। কিন্তু তার আগে গোটা-দুই কথার জবাব শুনে যেতে চাই। দেবেন?"

অচলা মুখ তুলিল। তাহার চোখ দুটি ব্যথায় ভরা। কহিল, "বলুন।"

সুরেশ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, "আপনার বাবার দেনাটা পরিশোধ করে দিতে কাল-পরশু একবার আসব, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হবার প্রয়োজন নেই। আমি জান্‌তে চাই, আমাদের দুজনের সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় কি? আপনি জানেন?"

অচলা কহিল, "আমাকে তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি।"

সুরেশ বলিল, "আমাকেও না। তবুও, আমার বিশ্বাস, তিনি আমাকেই—, কিন্তু আপনি বোধ করি রাজী হবেন না?"

অচলা কহিল, "না।"

"কোন দিন না?"

অচলা দৃষ্টি অবনত করিয়া কহিল, "না।"

"কিন্তু, মহিমের আশা যদি না থাকে?"

অচলা অবিচলিত স্বরে কহিল, "সে আশা ত নেই-ই।"

সুরেশ প্রশ্ন করিল, "বোধ করি, তবুও না?" অচলা মুখ তুলিল না, কিন্তু তেমনি শান্ত দৃঢ় সুরে কহিল, "না, তবুও না।" সুরেশ কোচের পিঠে ঢলিয়া পড়িয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "যাক্‌, এ দিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাঁচা গেল।" বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "কিন্তু, আমি এই একটা মুস্কিলের কথা ভাব্‌চি, যে, আপনার বাবার দেনাটা তা'হলে শোধ হবে কি কোরে?"

অচলা ভয়ে-ভয়ে একটুখানি মুখ তুলিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, "আর ত আপনি দিতে পারবেন না?"

"পারব না? কেন?" প্রশ্ন করিয়া সুরেশ তীক্ষ্ণ-ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির সম্মুখে অচলা পুনরায় মাথা হেঁট করিয়া ফেলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া সুরেশ হাসিল। কিন্তু এবার তাহার হাসিতে আনন্দ না থাক্‌, কৃত্রিমতাও ছিল না। কহিল, "দেখুন, আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্য্যন্ত আমার কোন আচরণকেই যে ভদ্র বলা যেতে পারে না, সে আমি নিজেও জানি; কিন্তু, আমি অত ছোটও নই। আপনার বাবাকে আমি এই টাকাটা ঘুষ দিতে চাইনি, তাঁর বিপদে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম। সুতরাং আপনার মতামতের ওপর আমার দেওয়াটা নির্ভর করচে না, নির্ভর করচে তাঁর নেওয়াটা। এখন, কি কোরে যে তিনি নেবেন, আমি তাই ভাব্‌চি। বরং, আসুন এ সম্বন্ধে আমরা একটা পরামর্শ করি।"

অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, "বলুন।"

সুরেশ বলিতে লাগিল, "দৈবাৎ অনেক টাকার মালিক আমি। অথচ টাকা-কড়ির ওপর কোন দিন কোন মায়াই আমার নেই। হাজার-চারেক টাকা আমি স্বচ্ছন্দে হাত-ছাড়া করতে পারি। আর আপনার সুখের জন্য ত আরও ঢের বেশি পারি। তা' সে যাক্। এখন কথা এই যে, আপনার বাবার ধারণা, এ টাকাটা শোধ দেবার আর আবশ্যক হবে না, অথচ, সে এক রকম শোধ দেওয়াই হবে! বুঝলেন না?"

অচলা মাথা নাড়িয়া অস্ফুটে কহিল, "হাঁ।"

সুরেশ বলিতে লাগিল, "কথাটা স্পষ্ট বল্‌চি বলে মনে কিছু করবেন না। বুঝতে পারচি টাকাটা তাঁর চাই-ই, অথচ, এত টাকা ধার নিয়ে শোধ করবার অবস্থা তাঁর নেই। যদিচ, আমার নিজের তরফ থেকে তার আবশ্যকও কিছুমাত্র নেই, কিন্তু,—আচ্ছা, এতো সহজেই হতে পারে? পরশু পর্য্যন্ত আপনার মনের ভাব তাঁকে না জানালেই ত আর কোন গোল থাকে না। কেমন, পারবেন ত?" অচলা তেম্‌নি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সুরেশ কহিল, "টাকার লোভে আপনি যে মত দিলেন না, এতে আমার ঢের বেশি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বরঞ্চ মত দিলেই হয় ত আমি নিজেই শেষে ভয়ে পেছিয়ে দাঁড়াতুম। আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়। আচ্ছা, চল্লুম—" বলিয়া সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটু হাসিয়া বলিল—"আমার বল্‌বার আর মুখ নেই,—তবু, যাবার সময় একটা ভিক্ষে চেয়ে যাচ্চি যে, আমার দোষ-অপরাধগুলো মনে করে রাখ্‌বেন না।" একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "নমস্কার। খারাপ কাজের জাহাজ বোঝাই কোরে নিয়ে বিদেয় হ'লুম—কিন্তু বাস্তবিক, পিশাচও আমি নই। যাক্—বিশ্বাস করবার যখন এতটুকু পথ রাখিনি, তখন বলা বৃথা।" বলিয়া দুই হাত কপালে তুলিয়া নমস্কার করিয়া সুরেশ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধীরে-ধীরে তাহার পদশব্দ সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল, অচলা শুনিতে পাইল; এবং তাহার পরেই নিতান্ত অকারণে তাহার দুই চোখ দিয়া টপ্-টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কেদার বাবু ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "সুরেশ?"

অচলা তাড়াতাড়ি চোঁখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "এইমাত্র চলে গেলেন।"

কেদার বাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল? কাল এখানে খাবার কথাটা তুমি যাবার সময় স্মরণ করে দিয়েছিলে ত?"

অচলা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমার মনে ছিল না বাবা।"

"মনে ছিল না! বেশ!" বলিয়া কেদার বাবু নিকটস্থ চৌকিটার উপর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া পড়িলেন। মেয়ের চাপা কণ্ঠস্বরে তাঁর মনের মধ্যে একবার একটা খট্‌কা বাজিল বটে, কিন্তু, সন্ধ্যার আঁধারে তাহার মুখের চেহারাটা দেখিতে না পাইয়া সেটা স্থায়ী হইতে পারিল না। বলিলেন, "এই বুড়ো বয়সে যা নিজে না কোরব, যে দিকে না চাইব, তাতেই একটা না একটা গলদ্ থেকে যাবে—তাই হবে না। যাই, বেয়ারাটাকে দিয়ে এখ্‌খুনি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিইগে। সুরেশের বাড়ীর ঠিকানাটা কি?" বলিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন।

"আমি ত জানিনে বাবা!"

"তাও জান না? বল কি!" বলিয়া বৃদ্ধ চেয়ারের উপর পুনরায় হেলান দিয়া পড়িলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া বসিয়া রুক্ষভাবে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা নিজের হাত-পা যদি নিজেই কেটে ফেল্‌তে চাও, ত, কাটোগে, মা, আমার ঠেকাবার দরকার নেই। ভাল, এটা ত একবার ভাব্‌তে হয়, যে এক-কথায় এতগুলো টাকা দিতে চায়, সে লোকটা কি দরের? তার বাড়ীর ঠিকানাটাও কি জিজ্ঞাসা করে রাখ্‌তে নেই? তুমি যত বড় হ'চ্চ, ততই যেন কি রকম হয়ে যাচ্চ অচলা।" বলিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

অচলা কথা কহিল না। সে যে মনে-মনে অতিশয় লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে, কেদার বাবু ইহাই নিশ্চিত অনুমান করিয়া প্রীত হইলেন।

বেয়ারা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। তিনি সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মহিমের সম্বন্ধে কোন খোঁজ কোন দিনই তুমি নিলে না। আচ্ছা সে না হয় ভালই হয়েছে। ভগবান যা' করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কিন্তু, সুরেশের সম্বন্ধে ত এ সব খাটুতে পারে না। দেখ্‌লে না—অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বয়ং যেন হাত ধরে এঁকে দিয়ে গেলেন! করুণাময়! তোমার পদে কোটী-কোটী

নমস্কার!" বলিয়া বৃদ্ধ দুই হাত জোড় করিয়া ললাটে স্পর্শ করিলেন।

অচলা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ বাবুর কাছ থেকে কি তুমি টাকা ধার নেবে বাবা?" কেদার বাবুর ভগবদ্ভক্তি হঠাৎ বাধা পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ—না, ঠিক ধার নয়; কি জানো মা, সুরেশ নাকি বড় ভাল ছেলে—এ কালে অমন একটি সৎ ছেলে লক্ষর মধ্যে একটি মেলে। তার মনোগত ইচ্ছে যে, বাড়ীটা ধারের জন্যে না নষ্ট হয়। থাক্‌লে তোমাদেরই থাক্‌বে—আমি আর কত দিন—বুঝ্‌লে না মা?" অচলা চুপ করিয়া রহিল। কেদার বাবু উৎসাহ-ভরে বলিতে লাগিলেন, "জানো ত, আমি চিরকাল স্পষ্ট কথা ভালবাসি। মুখে এক ভিতরে আর আমার দ্বারা হবার নয়। কাজেই খুলে বলে দিলুম যে, এখন সমস্ত জেনেশুনে মহিমের হাতে মেয়ে দেবার চেয়ে তাকে জলে ফেলে দেওয়া ভাল। সুরেশেরও যখন তাই মত, তখন বল্‌তেই হ'ল যে, তার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের কথাটা যখন অনেক দূর জানাজানি হ'য়ে গেছে, তখন, সম্বন্ধ ভাঙ্‌লেই চল্‌বে না—একটা গড়ে তুলতেও হবে; না হ'লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু যাই বল, ছেলে বটে এই সুরেশ! আমি মঙ্গলময়কে তাই বার-বার প্রণাম জানাচ্চি।"

পিতার প্রণাম জানানো আর একবার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইবার পর অচলা ধীরে-ধীরে কহিল, "এঁর কাছ থেকে এত টাকা না নিলেই কি নয় বাবা?"

কেদারবাবু শঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না নিলেই নয় কি না! বেশ!"

"কিন্তু, আমরা ত শোধ দিতে পারব না।"

"শোধ দেবার কথা কি সুরেশ—" কথাটা উদ্বিগ্ন-সংশয়ে বৃদ্ধ শেষ করিতেই পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত মুখ শাদা হইয়া গেল। অচলা সে চেহারা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইল। তাড়াতাড়ি বলিল, "তিনি বল্‌ছিলেন, পরশু এসে টাকা দিয়ে যাবেন।"

"শোধ দেবার কথা—"

"না, তা, তিনি বলেন নি।"

"লেখাপড়া টড়া—"

"না, সে ইচ্ছে বোধ হয় তাঁর একেবারে নেই।"

"ঠিক তাই!" বলিয়া পরিতৃপ্তির রুদ্ধ শ্বাস বৃদ্ধ ফোঁস্‌ করিয়া ত্যাগ করিলেন। এবং চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া পা দুটা সুমুখের টেবিলের উপর তুলিয়া দিলেন। আনন্দে এবং আরামে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষণকালের জন্য শিথিল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পা নামাইয়া উদ্দীপ্ত স্বরে কহিলেন, "একবার ভেবে দেখ দিকি মা, কোত্থেকে কি হোলো? সেই সর্ব্বশক্তিমানের হাত কি এতে তুমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চ না?" অচলা নীরবে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বলিতে লাগিলেন, "আমি চোখের উপর দেখ্‌তে পাচ্চি এ শুধু তাঁর দয়া। তোমাকে বোল্‌ব কি মা, এই দুটো বৎসর একটা রাত্রিও আমি ভাল করে ঘুমোতে পারিনি—শুধু তাঁকে ডেকেচি। আর সুরেশকে দেখ্‌বামাত্রই মনে হয়েচে, সে যেন পূর্ব্ব-জন্মে আমারই সন্তান ছিল।"

অচলা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পিতার সাংসারিক দুরবস্থার কথা সে যে একেবারেই জানিত না, তাহা নহে; কিন্তু তাহা যে এতটা দূর পর্য্যন্ত ভিতরে-ভিতরে অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাই জানিত না। আজ দুই বৎসরের একাগ্র আরাধনায় তাঁহার দুঃখের সমস্যা যদি বা মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে অকস্মাৎ লঘু হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার নিজের সমস্যা একেবারে ভীষণ জটিল হইয়া দেখা দিল। সুরেশের কাছে টাকা লওয়া সম্বন্ধে সে এইমাত্র মনে-মনে যে সকল সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। লেশমাত্র বাধা দিবার কথা সে আর মনে করিতেই পারিল না। যাই হোক, টাকাটা তাহাদের গ্রহণ করিতেই হইবে।

সান্ধ্য-উপাসনার জন্য কেদার বাবু উঠিয়া গেলেন। অচলা সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যে দুই বন্ধু আজ অকস্মাৎ তাহার জীবনের এই সন্ধি-স্থলে এমন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের এক-জনকে যে আজ 'যাও' বলিয়া বিদায় দিতেই হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই;—কিন্তু কাহাকে? কে সে? সে মহিম

তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে, যে জানে কোন্ কর্ত্তব্যের আকর্ষণে, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগে বসিয়া আছে, তাহার শান্ত স্থির মুখখানা মনে করিতেই একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে অচলার দুই চক্ষু পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন দিন যে কোন অপরাধ করে নাই, অথচ, যাও বলিতেই সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে। এ জীবনে, কোন সূত্রে, কোন ছলেই আর তাহাদের পথে আসিবে না। অচলা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, সেই অভাবনীয় চির-বিদায়ের ক্ষণেও তাহার অটল গাম্ভীর্য্য এক তিল বিচলিত হইবে না। কাহাকেও দোষ দিবে না, হয় ত কারণ পর্য্যন্তও জানিতে চাহিবে না—নিগূঢ় বিস্ময় ও তীব্র বেদনার একটা অস্পষ্ট রেখা হয় ত বা মুখের উপর দেখা দিবে, কিন্তু, সে ছাড়া আর কাহারো তাহা চোখেও পড়িবে না।

তাহার পরে একদিন সুরেশের সঙ্গে বিবাহের কথা তাহার কাণে উঠিবে। সেই মুহূর্ত্তের অসতর্ক অবসরে হয় ত বা একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িবে, না হয়, একটু মুচকিয়া হাসিয়াই নিজের কাজে মন দিবে। ব্যাপারটা কল্পনা করিয়াও এই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে তাহার চোখ মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় রাঙা হইয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

দিন দশ-বারো কাটিয়া গেছে। কেদারবাবুর ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয় এত স্ফুর্ত্তি বুঝি তাঁহার যুবা-বয়সেও ছিল না। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিবার পথে গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া তিনি হঠাৎ গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "সুরেশ, আমি, এইটুকু হেঁটে সমাজে যাবো বাবা, তোমরা বাড়ী যাও" —বলিয়া হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে-ঘুরাইতে বেগে চলিয়া গেলেন। সুরেশ কহিল, "তোমার বাবার শরীরটা আজ-কাল বেশ ভাল বলে মনে হয়।"

অচলা সেই দিকেই চাহিয়াছিল, বলিল, "হাঁ, সে আপনারই দয়ায়।"

গাড়ী মোড় ফিরিতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না। সুরেশ অচলার ডান-হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, "তুমি জানো, এ কথায় আমি কত ব্যথা পাই। সেই জন্যেই কি তুমি বারবার বল, অচলা?"

অচলা একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এত বড় দয়া পাছে ভুলে যাই বলেই যখন-তখন স্মরণ করি। আপনাকে ব্যথা দেবার জন্যে বলিনে।"

সুরেশ তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া বলিল, "সেই জন্যেই ব্যথা আমার আরো বেশি বাজে।"

অচলা—"কেন?"

সুরেশ—"আমি বেশ বুঝতে পারি, শুধু এই দয়াটা স্মরণ করেই তুমি মনের মধ্যে জোর পাও। এ ছাড়া তোমার আর এতটুকু সম্বল নেই। সত্যি কি না বল দিকি?"

অচলা—"যদি না বলি?"

সুরেশ—"ইচ্ছে না হয় বোলো না। কিন্তু, আমাকে 'তুমি' বল্‌তেও কি কোন দিন পারবে না?"

অচলার মুখ মলিন হইয়া গেল। আনত মুখে ধীরে-ধীরে বলিল, "একদিন বল্‌তেই হবে, সে তো আপনি জানেন।" তাহার ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া সুরেশ নিঃশ্বাস ফেলিল। কহিল, "তাই যদি হয়, দুদিন আগে বল্‌তেই বা দোষ কি?" অচলা জবাব দিল না। অন্যমনস্কের মত পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মিনিটখানেক নিঃশব্দে থাকিয়া সুরেশ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমার মনে হয় মহিম সমস্তই জান্‌তে পেরেচে।"

অচলা চমকিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার একটা হাত এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুরেশের হাতের মধ্যেই ধরা ছিল, সেটা সহসা টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কোরে জান্‌লেন?"

তাহার ব্যগ্র কণ্ঠ সুরেশের কাণে খট্ করিয়া বাজিল। কহিল, "নইলে এতদিন সে আস্‌ত। পোনর যোল দিন কেটে গেল ত!"

অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "আজ নিয়ে উনিশ দিন। আচ্ছা, বাবা কি তাঁকে কোন চিঠিপত্র লিখেচেন, আপনি জানেন?"

সুরেশ সংক্ষেপে কহিল, "না, জানিনে?"

"তিনি বাড়ী থেকে ফিরে এসেচেন কি না জানেন?"

"না, তাও জানিনে।"

অচলা গাড়ীর বাহিরে পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল "তা'হলে খোঁজ নিয়ে একখানা চিঠিতে তাঁকে

সমস্ত কথা জানানো বাবার উচিত। হঠাৎ কোন দিন আবার মা এসে উপস্থিত হন।"

আবার কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব হইয়া রহিল। সুরেশ আর একবার তাহার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল, "আমার সব চেয়ে কষ্ট হয় অচলা, যখন মনে হয়, আমাকে তুমি কোন দিন শ্রদ্ধা পর্য্যন্তও করতে পারবে না। তোমার চিরকাল মনে হবে, শুধু টাকার জোরেই তোমাকে ছিঁড়ে এনেচি। আমার দোষ—"

অচলা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বাধা দিয়া বলিল, "এমন কথা আপনি বল্‌বেন না—আপনার কোন দোষ আমি দিতে পারিনে।" একটু থামিয়া বলিল, "টাকার জোর সংসারে সর্ব্বত্রই আছে, এ তো জানা কথা; কিন্তু সে জোরে আপনি ত জোর খাটান নি! বাবা না জান্‌তে পারেন, কিন্তু আমি সমস্ত জেনে-শুনে যদি আপনাকে অশ্রদ্ধা করি, ত আমার নরকেও স্থান হবে না।"

চিরদিন সামান্য একটু করুণ কথাতেই সুরেশ বিগলিত হইয়া যায়। অচলার এইটুকু প্রিয় বাক্যেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে জল সে অচলার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া তাহাতেই মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "মনে কোরো না, এ অপরাধের, এ অন্যায়ের পরিমাণ আমি বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু, আমি বড় দুর্ব্বল! বড় দুর্ব্বল! এ আঘাত তুমি সইতে পারবে—কিন্তু আমার বুক ফেটে যাবে!" বলিয়া একটা কঠিন ধাক্কা যেন সাম্‌লাইয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, "তুমি যে আমার নয়, আর এক জনের, এ কথা আমি ভাব্‌তেই পারিনে। তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নীচের মাটী পর্য্যন্ত যেন টল্‌তে থাকে!"

সেইমাত্র পথের ধারে গ্যাস জ্বালা হইতেছিল। গাড়ী তাহাদের গলিতে ঢুকিতেই একটা উজ্জ্বল আলো সুরেশের মুখের উপরে পড়িয়া তাহার দুই চক্ষের টল্‌টলে জল অচলার চোখে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের করুণায় সে কোন দিন যাহা করে নাই, আজ তাহাই করিয়া বসিল। সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিয়া ফেলিল, "আমি কোনদিনই বাবার অবাধ্য নই? তিনি আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন।" সুরেশ সেই হাতটি অচলার নিজের মুখের উপর টানিয়া লইয়া বারম্বার চুম্বন করিতে-করিতে বলিতে লাগিল—"এই আমার সকলের বড় পুরস্কার অচলা, এর বেশি আর চাইনে। কিন্তু এটুকু থেকে যেন আমাকে বঞ্চিত কোরো না!"

গাড়ী বাটীর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস দ্বার খুলিয়া সরিয়া গেল, সুরেশ নিজে নামিয়া সযত্নে সাবধানে অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া, উভয়েই এক-সঙ্গে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সুমুখে মহিম দাঁড়াইয়া। এবং সেই নিমিষের দৃষ্টিপাতেই এই দুটি নর-নারী একেবারে যেন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

পরক্ষণেই অচলা অব্যক্ত আর্ত্তস্বরে কি একটা শব্দ করিয়া সজোরে হাত টানিয়া লইয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

মহিম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, "সুরেশ, তুমি যে এখানে?"

সুরেশের গলা দিয়া প্রথমে কথা ফুটিল না। তারপরে সে একটা ঢোক গিলিয়া পাংশু-মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"বাঃ—মহিম যে! আর দেখাই নেই। ব্যাপার কি হে? কবে এলে? চল চল, ওপরে চল।" বলিয়া কাছে আসিয়া তাহার হাতটা নাড়িয়া দিয়া হাসির ভঙ্গীতে কহিল, "আচ্ছা মজা করলেন কিন্তু আপনার বাবা। তিনি গেলেন সমাজে, আর পৌঁছে দেবার ভার পড়ল এই গরীবের ওপর। তা একরকম ভালই হয়েচে—নইলে মহিমের সঙ্গে হয় ত দেখাই হোতো না। বাড়ীতে এত দিন ধরে করছিলে কি, বল ত শুনি?"

মহিম কহিল, "কাজ ছিল।" বিস্ময়ের প্রভাবে তাহার অচলাকে একটা নমস্কার করিবার কথাও মনে হইল না।

সুরেশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, "আচ্ছা লোক যাহোক! আমরা ভেবে মরি, একটা চিঠি পর্য্যন্ত দিতে নেই? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ওপরে চল।" বলিয়া তাহাকে এক রকম জোর করিয়াই উপরে ঠেলিয়া লইয়া গেল। কিন্তু বসিবার ঘরে আসিয়া যখন সকলে উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহার অস্বাভাবিক প্রগল্‌ভতা একেবারে থামিয়া গেল। গ্যাসের তীব্র আলোকে মুখখানা তাহার কালীবর্ণ হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন কেহই কোন কথা কহিল না। মহিম একবার

বন্ধুর প্রতি, একবার অচলার প্রতি শুষ্কদৃষ্টি পাত করিয়া তাহাকে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "খবর সব ভাল ?"

অচলা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না। মহিম কহিল, "আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেছি—কিন্তু, সুরেশের সঙ্গে তোমাদের আলাপ হল কি কোরে ?"

অচলা মুখ তুলিয়া ঠিক যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিল, "উনি বাবার চার হাজার টাকা দেনা শোধ করে দিয়েছেন।" তাহার মুখ দেখিয়া মহিমের নিজের মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"তারপরে ?"

"তারপরে তুমি বাবাকে জিজ্ঞেসা কোরো" বলিয়া অচলা ত্বরিত-পদে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে বন্ধুর প্রতি চাহিয়া কহিল, "ব্যাপার কি সুরেশ ?"

সুরেশ উদ্ধত ভাবে জবাব দিল, "তোমার মত আমার টাকাটাই প্রাণ নয়। ভদ্রলোক বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে আমি দিই—বাস্, এই পর্য্যন্ত। তিনি যদি শোধ দিতে না পারেন, ত আশা করি, সে দোষ আমার নয়। তবু যদি আমাকেই দোষী মনে কর ত, একশবার করতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই।" বন্ধুর এই অসংলগ্ন কৈফিয়ৎ এবং তাহা প্রকাশ করিবার অপরূপ ভঙ্গী দেখিয়া মহিম যথার্থই মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "হঠাৎ তোমাকেই বা দোষী ভাব্‌তে যাব কেন, তার কোন তাৎপর্য্যই ত ভেবে পেলুম না, সুরেশ। দয়া করে আর একটু খুলে না বল্‌লে ত বুঝ্‌তে পারব না।"

সুরেশ তেম্‌নি রুক্ষস্বরে কহিল, "খুলে আবার বল্‌ব কি ! বল্‌বার আছেই বা কি !" মহিম কহিল, "তা আছে। আমি সেদিন যখন বাড়ী যাই, তখন এদের তুমি চিন্‌তে না। এর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলই বা কি কোরে, আর একটা ব্রাহ্ম-পরিবারের বিপদে চার-হাজার টাকা দেবার মত তোমার মনের এতখানি উদারতা এল কোথা থেকে, আপাততঃ এইটুকু বুঝিয়ে দিলেই আমি কৃতার্থ হব সুরেশ।"

সুরেশ বলিল, "তা' হতে পারো। কিন্তু আমার গল্প করবার এখন সময় নেই—এখুনি উঠ্‌তে হবে। তা ছাড়া, কেদার বাবুকেই জিজ্ঞাসা কোরো না, তিনি সমস্ত বল্‌বার জন্যেই ত অপেক্ষা করে আছেন।"

"তাই ভাল" বলিয়া মহিম উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "শোন্‌বার ভারি কৌতূহল ছিল, কিন্তু তবু এখন তাঁর অপেক্ষায় বসে থাক্‌বার সময় নেই। আমি চল্‌লুম—"

সুরেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

মহিম বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইল সুমুখের রেলিঙ ধরিয়া, এই দিকে চাহিয়াই অন্ধকারে অচলা দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সে কাছে আসিবার বা কথা কহিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না, দেখিয়া সেও নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে-ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েকটা অত্যন্ত জরুরি ঔষধ কিনিতে মহিম কলিকাতায় আসিয়াছিল, সুতরাং রাত্রের গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিয়া গেল। সুরেশ সন্ধান লইয়া জানিল, মহিম তাহার বাসায় আসে নাই। দিন-চারেক পরে বিকাল-বেলায় কেদার বাবুর বসিবার ঘরে বসিয়া এই আলোচনাই বোধ করি চলিতেছিল। কেদার বাবু বায়স্কোপে নূতন মাতিয়াছিলেন; কথা ছিল, চা খাওয়ার পরেই তাঁহারা আজও বাহির হইয়া পড়িবেন। নীচে সুরেশের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল—এম্‌নি সময়ে দুর্গ্রহের মত ধীরে-ধীরে মহিম আসিয়া অকস্মাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল এবং সকলের মুখের ভাবেই একটা পরিবর্তন দেখা দিল।

কেদার বাবু বিরস মুখে, জোর করিয়া একটু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, "এস মহিম। সব খবর ভাল ?"

মহিম নমস্কার করিয়া ভিতরে আসিয়া বসিল। বাড়ীতে এতদিন বিলম্ব হইবার কারণ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে শুধু জানাইল যে, বিশেষ কাজ ছিল। সুরেশ টেবিলের উপর হইতে সে দিনের খবরের কাগজটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল, এবং অচলা পাশের চৌকি হইতে তাহার সেলাইটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল। সুতরাং কথাবার্ত্তা একা কেদার বাবুর সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময়ে অচলা বাহিরে উঠিয়া গিয়া মিনিট-

খানেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল, এবং অনেক পরেই মাথার উপরে টানা-পাখাটা নড়িয়া দুলিয়া ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল। হঠাৎ বাতাস পাইয়া কেদার বাবু খুসি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবু ভাল। পাখাওয়ালা ব্যাটার এতক্ষণে দয়া হল।"

সুরেশ তীক্ষ্ণ, বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল, মহিমের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দিয়াছে। কেন অচলা উঠিয়া গিয়াছিল, কেন পাখাওয়ালার অকারণে দয়া প্রকাশ পাইল, সমস্ত ইতিহাসটা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে খেলিয়া গিয়া, যে বাতাসে কেদারবাবু খুসি হইলেন, সেই বাতাসেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সে হঠাৎ ঘড়ি খুলিয়া তিক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "পাঁচটা বেজে গেছে—আর দেরি করলে ত চল্‌বে না কেদার বাবু!"

কেদার বাবু আলাপ বন্ধ করিয়া চা-য়ের জন্য হাঁকা-হাঁকি করিতেই বেয়ারা সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া হাজির করিয়া দিল। সেলাই রাখিয়া দিয়া অচলা পেয়ালা-দুই চা তৈরি করিয়া সুরেশ ও পিতার সম্মুখে আগাইয়া দিতেই, তিনি, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খাবে না মা?"

অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না বাবা, বড় গরম।"

হঠাৎ তাঁহার মহিমের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও কি, মহিমকে দিলে না যে! তুমি কি চা খাবে না মহিম?"

সে জবাব দিবার পূর্ব্বেই অচলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে কহিল, "না, এত গরমে তোমার খেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া এ বেলায় ত তোমার চা সহ্য হয় না।"

মহিমের বুকের উপর হইতে কে যেন অসহ্য গুরুভার পাষাণের বোঝা মায়ামন্ত্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে কথা কহিতে পারিল না, শুধু অব্যক্ত বিস্ময়ে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। অচলা কহিল, "একটুখানি সবুর কর, আমি লাইম-জুস্ দিয়ে সরবৎ তৈরি করে আন্‌চি।" বলিয়া সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সুরেশ আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া, কলের পুতুলের মত ধীরে-ধীরে চা খাইতে লাগিল বটে, কিন্তু, তাহার প্রতি বিন্দু তখন তাহার মুখে বিস্বাদ ও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চা-পান শেষ করিয়া কেদার বাবু তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া তৈরি হইয়া আসিয়া দেখিলেন, অচলা নিজের যায়গায় বসিয়া একমনে সেলাই করিতেছে। ব্যস্ত এবং আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "এখনো বসে কাপড় সেলাই করচ, তৈরি হয়ে নাওনি যে?"

অচলা মুখ তুলিয়া শ্রান্তভাবে কহিল, "আমি যাব না বাবা।"

"যাবে না! সে কি কথা?"

"না, বাবা, আজ তোমরা যাও—আমার ভাল লাগ্‌চে না।" বলিয়া একটুখানি হাসিল।

সুরেশ অভিমান ও গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া কহিল, "চলুন কেদার বাবু, আজ আমরাই যাই। ওঁর হয় ত শরীর ভাল নেই, কাজ কি পীড়াপীড়ি করে?" কেদার বাবু তাহার প্রতি চাহিয়াই তাহার ভিতরের ক্রোধ টের পাইলেন। মেয়েকে কহিলেন, "তোমার কি কোন রকম অসুখ করচে?"

অচলা কহিল, "না বাবা, অসুখ করবে কেন, আমি ভালই আছি।"

সুরেশ মহিমের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিল না; বলিল, "আমরা যাই চলুন কেদার বাবু। ওঁর বাড়ীতে কোন রকম আবশ্যক থাক্‌তে পারে—জোর করে নিয়ে যাবার দরকার কি?"

কেদার বাবু কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে তোমার কাজ আছে?"

অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

কেদারবাবু অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, "তবে, বল্‌চি চল। অবাধ্য, একগুঁয়ে মেয়ে!"

অচলার হাতের সেলাই স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। সে স্তম্ভিত মুখে দুই চক্ষু ডাগর করিয়া প্রথমে সুরেশের, পরে তাহার পিতার, প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ মুখ কালী করিয়া কহিল, "আপনার সব তাতেই জবরদস্তি। কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারিনে—অনুমতি করেন ত যাই।"

কেদার বাবু নিজের অভদ্র আচরণে মনে-মনে লজ্জিত

হইতেছিলেন,—সুরেশের কথায় রাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু, রাগটা মহিমের উপর। সে নিরতিশয় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি-উঠি করিতেছিল; কেদারবাবু বলিলেন, "তোমার কি কোন আবশ্যক আছে মহিম?"

মহিম আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "না।"

কেদারবাবু চলিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন "তা'হলে আজ আমরা একটু ব্যস্ত আছি, আর একদিন এলে—"

মহিম কহিল, "যে আজ্ঞে, আস্‌ব। কিন্তু আসার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?"

কেদারবাবু সুরেশকে শুনাইয়া কহিলেন, "আমার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। তবে যদি দরকার মনে কর এসো—দু'একটা বিষয় আলোচনা করা যাবে।"

তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নীচে আসিয়া মহিমকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া সুরেশ কেদার বাবুকে লইয়া তাহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; কোচমান গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মহিম খানিকটা পথ আসিয়াই পিছনে তাহার নাম শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, কেদার বাবুর বেহারা। সে বেচারা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কাছে আসিয়া এক টুকরা কাগজ হাতে দিল। তাহাতে পেন্সিল দিয়া শুধু লেখা ছিল "অচলা"। বেহারা কহিল, "একবার ফিরে যেতে বল্‌লেন।"

ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল —অচলা সুমুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার আরক্ত চক্ষুর পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে। কাছে আসিতেই কহিল, "তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্য রেখে গেলে? যে তোমার ওপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্চ কি বলে?" বলিয়াই ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মহিম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিনিট-দুই পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, "আমার লজ্জা করবার আর সময় নেই। দেখি তোমার ডান-হাতটি।" বলিয়া নিজেই মহিমের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া নিজের আঙুল হইতে সোণার আংটিটি খুলিয়া তাহার আঙুলে পরাইয়া দিতে-দিতে কহিল, "আমি আর ভাব্‌তে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি কোরো।" বলিয়া গড় হইয়া পায়ের কাছে একটা নমস্কার করিয়া ধীরে-ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

মহিম ভাল-মন্দ কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রেলিংটার উপর ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পুনরায় ধীরে-ধীরে নামিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

কাব্য-পরিক্রমা

[শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, মূল্য দশ আনা]

এই 'কাব্য পরিক্রমা' কবিবর শ্রীযুক্ত স্যর রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়; বিস্তৃত পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া একেবারে অসম্ভব। লেখক শ্রীযুক্ত অজিত বাবু সময়ে সময়ে মাসিক-পত্রিকাদিতে স্যর রবীন্দ্রনাথের দুই চারিখানি কাব্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটি এই পরিক্রমায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে সাতটী সন্দর্ভ আছে,—জীবন-দেবতা, ডাকঘর, জীবন-স্মৃতি, ছিন্নপত্র, ধর্ম্মসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য। স্যর রবীন্দ্রনাথের উপরি উক্ত রচনাগুলি পাঠ করেন নাই, এমন সাহিত্য-সেবক বা পাঠক বাঙ্গালীর মধ্যে নাই; সুতরাং শ্রীযুক্ত অজিত বাবুর এই আলোচনা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই কি, আর এখনই কি, কবিবর অনেক সময় অল্প কথায় অনেক গভীর তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন; সেগুলির বিশেষ আলোচনা না করিলে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় না; শ্রীযুক্ত অজিত বাবুর ন্যায় তত্ত্বদর্শী সুলেখক এই কার্য্যের ভারগ্রহণ করিবার যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এ কথা সাহিত্যিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা এই প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিলাম। সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই সংগ্রহের সুন্দর নামকরণ করিয়াছেন। তীর্থ পরিক্রমের ন্যায় এই কাব্যক্ষেত্রেও শুদ্ধ, শান্ত ও একাগ্রচিত্তে পরিক্রম করিতে হয়। অজিত বাবু এই পরিক্রমে পথি প্রদর্শক হইয়া আমাদের পুণ্যার্জ্জনের সহায়তা করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

রাঠোর-দুহিতা

[শ্রীদেবব্রত বিদ্যারত্ন, এম্, এ, প্রণীত, মূল্য এক টাকা]

এখানি ঐতিহাসিক নাটক। যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে, তাহা ঘটনা সংস্থান নাটক লিখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত; গ্রন্থকার মহাশয় ঐতিহাসিক ঘটনা কোন প্রকারে বিকৃত না করিয়া নাটকখানি লিখিয়াছেন এবং ইহাতে অনাবশ্যক বাহুল্য বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই। যে কয়েকটী চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়।"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

স্বর্গীয় ঠাকুরদাস ও শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথের পত্র

স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম এখনকার অনেক পাঠকেরই নিকট অপরিচিত। কেবল পাঠক কেন? আধুনিক অনেক লেখকের সহিতও তাঁহার লেখার তেমন পরিচয় নাই।—পরিচয় থাকিলে, তাঁহাদের লেখার মধ্যে ঠাকুরদাস লিখিত প্রবন্ধের অধ্যয়ন-ফল কিছু না কিছু অবশ্যই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তাঁহারা ইব্‌সেন, বার্ণাড্‌শ, মেটারলিঙ্ক ও টলষ্টয় প্রভৃতি বিদেশী লেখকগণের উচ্ছিষ্ট অজীর্ণ অবস্থায় নিত্যই উদ্গার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের ঘরের দুয়ারে যে এক দিন অত বড় এক চিন্তাশীল লেখক ছিলেন, সে সংবাদ তাঁহারা বড় রাখেন না।

তবে এজন্য পাঠক বা লেখকগণের আমরা খুব বেশী দোষ দিই না। কারণ, ঠাকুরদাসের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার প্রবন্ধ-প্রচারও একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি সাময়িক-পত্রে ও সংবাদপত্রে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সমস্তই এখনও চাপা পড়িয়া আছে। সে লুপ্তপ্রায় রত্নরাশি উদ্ধার করা এখন একান্ত প্রয়োজন। যত দিন না তাহার উদ্ধার হইতেছে, ততদিন পাঠকেরা তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিবেন না,—তত দিন তিনি তাঁহার প্রাপ্য গৌরব হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। পুরাতন পত্রিকাদির কুক্ষি হইতে তাঁহার প্রবন্ধ-সকল বাহির করিয়া সেগুলিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে, পাঠক-সমাজে সে গ্রন্থের যথেষ্টই আদর হয়, আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার পুত্রেরা এ বিষয়ে উদাসীন কেন, ঠিক বলিতে পারি না।

ঠাকুরদাসবাবুর লেখাকে 'রত্ন' বলিতেছি বলিয়া হাস্য করিবেন না। ইহা অত্যুক্তির অভিব্যক্তি নহে। উচ্ছ্বাসের অতিরঞ্জন নহে। তাঁহার লেখার সহিত যাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় আছে, তিনিই আমাদের কথায় সায় দিবেন। সত্য-সত্যই সে রচনা-ভঙ্গীর তুলনা হয় না। প্রবীণ লেখকদের মধ্যে কেহ-কেহ তাঁহার রচনা-রীতির অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার রচনায় গাম্ভীর্য্যের ও তারল্যের—তত্ত্বের ও ব্যঙ্গের যে সম্মিলন দেখিতে পাই, বাস্তবিকই তাহা অপূর্ব্ব। কাজেই সে লেখাকে 'রত্ন' না বলিয়া থাকা যায় না।

এই লেখার গুণে সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই লেখার গুণে নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারকনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতির সহিত তিনি সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সে সব কথা এ 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' খুলিয়া বলিবার সুযোগ হইবে না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্য-শক্তির আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন যাহা বলিবার জন্য এই ভূমিকাটুকু লিখিলাম, তাহাই বলি। রবীন্দ্রনাথ ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুরদাসবাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্রগুলি আমরা তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহার ভিতর হইতে কয়েকখানি পত্র বাছিয়া লইয়া এখানে আমরা উদ্ধৃত করিলাম। একজন বড় লেখক অন্য এক বড় লেখককে পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া যে উহা ছাপাইতেছি, তাহা নহে। পত্র কয়খানিতে রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জীবন-কথা এবং কিছু সাহিত্য-রস আছে মনে করিয়াই উহা এই 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে'র মারফতে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম —

(১)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর, ২৭ অক্টোবর, ১৮৯৪।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম।—

সংবাদপত্র সম্বন্ধে আমার ভালরূপ অভিজ্ঞতা নাই। মাসিকপত্রে স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যপ্রিয় পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট সন্তোষলাভ করা যায়। কিন্তু সংবাদপত্রের পরিসর তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বিস্তৃত করিতে না পারিলে তাহার সফলতা থাকে না। এই অব্যবস্থিত-চিত্ত সহস্রশীর্ষ সর্ব্বসাধারণ নামক ব্যক্তির মন কোন্ খানে আছে এবং সে মন কি মন্ত্রে পাওয়া যায়, তাহা এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সংবাদপত্র বাহির করিতে হইলে সেই মন্ত্র লইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। এই পাবলিকের কর্ণটা একবার ধরি পাওয়া যায়, তবে মাঝে মাঝে ঝিকা মারিলে ক্ষতি নাই বরং চলিবে ভাল। কিন্তু এরূপ পরামর্শের কোনও মূল্য নাই। যদি এখানে আসিতে পারেন অথবা আমি যখন কলিকাতায় ফিরিব তখন সাক্ষাতে এবিষয় ও অন্যান্য বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। আমার পরামর্শে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন এমন আশা করি না এবং আপনাকে আশা করিতে পরামর্শ দিই না। কারণ, কমন্‌সেন্স পদার্থটা সংসারে নিতান্ত কমন নহে জানিবেন এবং আমার ভাগে অতি সামান্যই পড়িয়াছে—অথচ সংবাদপত্রের আয়োজন

করিতে হইলে যদি কোনও জিনিষের জন্ত কোনও রূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হয় তবে তাহা নিম্ন রূপ হইবে—

Wanted.—Common-sense

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

ওঁ শান্তিনিকেতন

বোলপুর ৭ই কার্ত্তিক।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আমি সম্ভবতঃ কার্ত্তিক মাসটা এইখানেই যাপন করিব। আমি এখানে একাকী আছি। নিশ্চিন্তচিত্তে লিখিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু কলিকাতা হইতে অসুস্থ শরীর লইয়া আসিয়াছি। সেইজন্ত কিছু ব্যাঘাত হইতেছে। এখানে আসিয়া অনেকটা স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি, বোধ হয় শীঘ্র রীতিমত-কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিব।

সাধনার সাইজ ও কাগজ কমানো সম্বন্ধে অনেক হিতৈষী বন্ধু আপত্তি করাতে অবশেষে তাঁহাদের অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার হইয়াছি। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে সাধনার কোষ্ঠীতে ব্যয়ের ঘরে এ বৎসরেও শনির দৃষ্টি আছে, আয়ের ঘরে যদি রাহু থাকেন তাহা হইলে মৃত্যু অতি সন্নিকট।

যাহা হউক এ বৎসরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যদি আবশ্যক বোধ করি ত আগামী বৎসরে ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা করিব। পূর্ব্বের ন্যায় ব্যয়বাহুল্য রহিল বলিয়া আপনাকে সাধনার সম্পাদকপদে নিয়মিত নিযুক্ত করিতে সাহস করিলাম না। আপনি প্রবন্ধ-প্রতি কিরূপ মূল্য গ্রহণ করিতে পারেন আমাকে জানাইবেন—অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। আগামী বৎসর হইতে সাধনায় কোনও লেখকের নাম থাকিবে না।

আপনি যে সাপ্তাহিকপত্র বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তাহার কতদূর অগ্রসর হইল? ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৩)

নমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

দিন দুয়েক হইতে রীতিমত ঝড়ের ঝাপটে পড়িয়াছি। কতকটা সাইক্লোনের মত। বোট দুইটা, দড়াদড়ি নোঙর শিকল প্রভৃতির যোগে ডাঙার বক্ষ প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে—তাহাদের সেই কাষ্ঠময় বক্ষ-পঞ্জর অহর্নিশি থর থর শব্দে কম্পায়মান। আমাদের হৃৎপিণ্ডটাও মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ দ্রুতবেগে আন্দোলিত হইতেছে। স্ত্রী এবং বন্ধু আমার স্কন্ধে থাকাতেই আশঙ্কা।

আমাদের কারবার চলিতেছে ভাল—কেবল উপযুক্ত লোকের অভাবে হিসাব এখনো খসড়াবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য হইতে, খসড়া খাতার মধ্যে মজ্জমান হিসাবকে উদ্ধার করিবার জন্ত একটি লোক নিযুক্ত হইবে। পাকা খাতায় উঠিলে একবার আপনাকে স্মরণ করিব।

এই ঝড়টার অবসান-প্রতীক্ষায় আছি। একবার পরিষ্কার হইয়া গেলে ওপারে নির্জ্জন বালির চরে গিয়া আশ্রয় লইব। আজকাল পরিপূর্ণ মাত্রায় আলস্য সাধনায় নিযুক্ত আছি। ইতি ১৬ই আশ্বিন ১৩০২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৪)

ওঁ

নমস্কার সম্ভাষণমিদং—

সাধনার মায়াবন্ধন একেবারে ছেদন করিয়াছি। শত্রু-পক্ষে হাসিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু শত্রু পক্ষের হাস্যোচ্ছ্বাস নিবারণের উদ্দেশে নিজের ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন করিতে পারি না। জীবন অনিশ্চিত, তাহার মধ্য হইতে আর একটা সুদীর্ঘ বৎসর নিশ্চিত অপব্যয় করিতে পারি না। কিছুদিন নির্জ্জন-সমাধি অবলম্বন করিয়া খ্যাতি-হীন অগাধ শান্তি ভোগ করিবার জন্ত চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে। সম্পাদক হইয়াই যদি জীবনের সার অংশ যাপন করি, তাহা হইলে আসল কাজগুলি সম্পন্ন করা হয় না—অতএব মাতৃ-ভূমির চরণে নমস্কার করিয়া এই কাজটীতে ইস্তফা দিলাম—তাঁহার ইসমনবিশিতে সম্পাদক পদধারীর অভাব নাই।

আমি সম্ভবতঃ আগামী রবিবারে কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি ৬ই কার্ত্তিক ১৩০২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

ওঁ শান্তিনিকেতন

বোলপুর

সবিনয় সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার চিঠি বিচিত্র পোষ্ট অপিসের চক্র-লাঞ্ছনে আদ্যোপান্ত অঙ্কিত হইয়া আমার সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ফিরিয়াছে—অবশেষে জীর্ণ মলিন পথশ্রান্ত বেশে আজ শান্তি-নিকেতনে আমার হস্তগত হইল। আমি ত্রিপুরা হইতে শিলাইদহ, সেথান হইতে কলিকাতা (একদিনের জন্ত), কলিকাতা হইতে বোলপুর, বোলপুর হইতে পুনরায় কলিকাতা, এবং সেথান হইতে পুনশ্চ বোলপুরে আসিয়াছি। এই ঘুরপাকের মধ্যে আমার মুহূর্ত্তমাত্র অবসর ছিল না, সেইজন্ত গতিবিধি সম্বন্ধে কাহাকেও কোন খবর দিতে পারি নাই। ত্রিপুরার মহারাজের অতিথিরূপে যথেষ্ট সমাদরে ছিলাম। সেথান হইতে ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার আমার সঙ্গে শিলাইদহে ও বোলপুরে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বস্থানে রওনা করিয়া দিয়া আমি বোলপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। দীর্ঘকাল গোলেমালে কাটিয়াছে, এখন আর সম্পাদকের কাজে একদিনও অবহেলা করিবার সময় নাই। সুতরাং আজ প্রাতেই লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু সায়াহ্নের গাড়ীতে কয়েকজন অতিথি আসিবার কথা আছে। তাঁহারা যে

কয়দিন থাকেন লিখিতে সময় পাইব না। আপনার দৈন্য দুশ্চিন্তার মধ্যে কি আপনি লিখিতে মনস্থির করিতে পারিবেন ?

* * * * * *

আপনাকে পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছি—আমার অবস্থা লক্ষ্মীর বিড়ম্বনায় ও প্রবঞ্চকের কুচক্রে শোচনীয় হইয়াছে—কাহাকেও আশ্রয় দিবার শক্তি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছি, বিষয়ের ভারও স্কন্ধ হইতে নামাইতেছি—আমি এখন্ হইতে নিভৃতে আপনকার কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—নিজেকে যথাসম্ভব নিরাকুল নিরাসক্ত নির্লিপ্ত রাখিতে ইচ্ছা করি—জীবনটাকে চক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের মত খণ্ডাকারে চারিদিকে ছড়াইতে ইচ্ছা করি না। আমাকে আপনারা এখন হইতে এক প্রকার বাণপ্রস্থ-আশ্রমধারী বলিয়াই মনে করিবেন। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩০৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry.

সাদর সম্ভাষণমেতৎ—

শোকের দিনে আপনার সান্ত্বনাপত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

আপনার সংবাদ লইবার জন্য আমার অনেক দিন ঔৎসুক্য ছিল কিন্তু আপনি কোথায় আছেন কিছুই জানিতাম না। আমাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর হইতে আপনার আর কোনও চিঠিপত্র পাই নাই এবং লোকমুখে শুনিয়াছিলাম আমাদের প্রতি আপনার মনের ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি সাধ্যমত আপনার হিত চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু যদি কোনও কারণে আপনার ক্ষোভের কোন হেতু ঘটিয়া থাকে তবে এক্ষণে তাহা বিস্মৃত হইবেন। আমি কিছু-কাল হইতে সপরিবারে শিলাইদহের নূতন কুঠিবাড়ীতে শান্তি ভোগ করিতেছি। জননী কলিকাতার জনাকীর্ণ ক্রোড়ে আর স্থান হয় না—বিমাতার শরণাপন্ন হইয়াছি,—এখানে আহার বিহারের কিঞ্চিৎ টানাটানি হইলেও আকাশ বাতাস এবং আলোকের অজস্র সচ্ছলতায় আরাম বোধ করি। আমার এই পল্লীর জীবনযাত্রা আপনার ত অগোচর নাই।

আপনার পত্রের ঠিকানায় দেখিলাম আপনি চট্টগ্রামে আছেন। জায়গাটার নাম শুনিয়া একটি তরুচ্ছায়াময় পাহাড় পর্ব্বতের দৃশ্য মনে উদয় হয় এবং দূর দিগন্তের কাছে একটি চির-চঞ্চল সমুদ্রের নীল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করি সেখানে সপরিবারে সুখে ও শান্তিতে আছেন। চট্টগ্রামের আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী আপনার কিরূপ লাগিতেছে লিখিবেন, আমাদের সমস্ত কুশল। ইতি ৭ই কার্ত্তিক ১৩০৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিওয়ালা

ইংরেজী-নবিশ বাঙ্গালী কবিরা বাঙ্গালার কবিওয়ালাদের উপর তেমন সন্তুষ্ট নহেন। সম্প্রতি 'সাহিত্য' পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যে একটি বৃহৎ পুরাতন ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ বাহির হইতেছে, তাহার একস্থানে লেখা দেখিলাম,—"নবদ্বীপের কবিদিগের পরবর্ত্তী যুগে এবং বর্ত্তমান যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের সময়ে সাহিত্যের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, বোধ হয়, সাহিত্যের ইতিহাসে উহার আর তুলনা নাই।......সৌভাগ্যবশতঃ এই আবর্জ্জনার স্তূপ এক্ষণে সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।" তারপর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণ-স্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।"—কিন্তু এ কথা কি সত্য ? বাঙ্গালার হাটে মাঠে, প্রাসাদে কুটীরে যে সব গান নিত্য শুনিয়া থাকি, সে সব গান তবে কাহার ?—কবিওয়ালাদের নয় কি ?

প্রত্যক্ষ দর্শন তাহাই বলিতেছে।—কবিওয়ালাদেরই গান বটে! বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় সাহিত্য-রথিগণের কলমের খোঁচা খাইয়াও তাঁহারা অদ্যাবধি জীবিত আছেন। কেনই বা জীবিত না থাকিবেন ? স্বয়ং কবিই বলিয়াছেন,—"কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।" সুতরাং কবিওয়ালাদের মৃত্যু কোথায় ? বঙ্কিম একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার চেয়ে যিনি বড় সমালোচক, সেই কালের বিচারে কবিওয়ালাদের অনেক সঙ্গীতই অমরত্বের তরণীতে স্থান পাইয়াছে। কালের প্রশংসা-পত্র যাহার কপালে জুটিয়াছে, তাহাকে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবায় কাহার সাধ্য ?

শুধু কি তাহাই ? বঙ্গদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যে প্রসার-প্রতিপত্তি আজিও হয় নাই, কবিওয়ালাদের অদৃষ্টে তাহাও ঘটিয়াছে। তাঁহাদের গান কোন্ বাঙ্গালী না শুনিয়াছেন ? কেহ এক কলম সমালোচনা করিল না, কেহ কখনও বিজ্ঞাপন দিল না, তবু নিধুগুপ্ত, রামবসু, হরু-ঠাকুর ও শ্রীধর কথক প্রভৃতির নাম জানে না, এমন বাঙ্গালী কয়জন আছে ? অথচ বঙ্কিমের সার্টিফিকেট পাইয়াও কত কবি বিস্মৃতির সাগরে তলাইয়া গেল, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

আসল কথা,—কাব্য-মধ্যে যিনি যে পরিমাণে হৃদয় ছড়াইতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে হৃদয় কুড়াইতেও পারিয়াছেন। এ বিষয়ে কবিওয়ালারা আধুনিক কবিগণের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী।

কবিওয়ালারা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই গাইয়াছিলেন। আধুনিক কবিরা যাহা পড়িয়াছেন, তাহাই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। একজন—বনের বিহঙ্গ, অন্য জন—পিঞ্জরের পোষা পাখী। একজন হৃদয়ের রুদ্ধ উৎস কাঁদিন প্লাবিয়া ছড়াইয়াছেন, অন্য জন পরের পেড়া-বুলি মিষ্ট করিয়া কপচাইতেছেন। একজনের গানে তেমন গঠনের সৌন্দর্য্য নাই বটে, কিন্তু ভাবের গৌরব আছে; অন্য জনের গানে গঠনের পারিপাট্য আছে বটে, কিন্তু তাহা কৃত্রিমতাপূর্ণ। এই সকল কারণে কবিওয়ালাদের গান ক্রমশঃই মিষ্ট বোধ হইতেছে;—ভুলিবার শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না।

কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, এবং লজ্জাও হয় যে, এমন ভাল সামগ্রীর ভাল সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত বাহির হইল না। কত নাটক-নভেল, কত ছাই-ভস্ম ছাপাখানার গর্ভ হইতে আরশোলার মত নিত্য প্রসব হইতেছে, কিন্তু কবিওয়ালাদের গান তেমন ভাল করিয়া কেহ আজিও ছাপাইলেন না। 'সাহিত্য-পরিষদ' কত বাজে বহি বাহির করিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার যাহা খাঁটি জিনিষ—বাঙ্গালার যাহা গৌরব, সেদিকে পরিষদের একটুও দৃষ্টি পড়িল না। অথচ নিধুবাবু বা রামবসুর গানের উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিলে যে শুধু সৎ-সাহিত্যের প্রচার হয়, তাহা নহে,—সঙ্গে-সঙ্গে বিলক্ষণ দুই পয়সা ঘরেও আসে। দেশের বড় বড় পুস্তক-ব্যবসায়ীরা এ পক্ষে উদাসীন কেন, বুঝিতে পারি না। এ পুস্তকের বিক্রয় সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে বটতলায় প্রকাশিত 'নিধুর গান' স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। এ পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ এবং ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ; তবুও সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপা হইতেছে।—বিক্রয় না হইলে কি এত সংস্করণ বাহির হয়?

আশ্বাস

[শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, এম, এ, বি, এল]

তোমারি সে ছিল, গেছে তব পাশে;
তবু কেন মিছে এ যাতনা আসে।
ক্ষম দয়াময়, এই মোহ-ঘোর
তোমারি সে, তবু প্রিয় ছিল মোর।
সে তো প্রিয় ছিল, এবে প্রিয়তর,
মিশিয়া তোমাতে অসীম সুন্দর।
দিয়াছিলে তুমি, তুমিই নিয়াছ,
(বুঝি) অমর করিতে মরণ দিয়াছ।

তোমারি ইচ্ছায় জীব আসে যায়,
তোমারি ইঙ্গিতে, তব করুণায়
জনম তাহার; পুনঃ তার লয়
তোমারি বিধানে হে মঙ্গলময়!
মৃত্যু নহে মৃত্যু, অনন্ত জীবন,—
ক্ষুদ্র ও বিরাটে অনন্ত মিলন;
ডুবে যাক্ শোক এ মহা বিশ্বাসে,
জুড়াক পরাণ এ মহা আশ্বাসে।

বিশ্ব-দূত

লিগ ও কন্‌ফারেন্স

আগামী ৭ই, ৮ই ও ৯ই এপ্রিল তারিখে বরিশালে যথাক্রমে শিক্ষা সমিতি ও মোছলেম লিগের অধিবেশন হইবে। মান্তবর মৌলবী আবুল কাসেম সাহেব লিগের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। শিক্ষা সমিতির সভাপতি এই মন্তব্য লেখার সময় পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হন নাই। পূর্ব্বে যাঁহার কথা স্থির হইয়াছিল, অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি সভায় যোগদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় সম্ভবতঃ এই প্রকার বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। এবার বরিশালের উভয় সভাতেই নানা প্রকার অত্যাবশ্যকীয় সমাজ ও দেশহিতকর প্রসঙ্গের আলোচনা হইবে। দুনিয়ায় এই পরিবর্ত্তনের যুগে, আইস ভাই মুসলমান! গৃহকোণ ও আলস্য শয্যা ত্যাগ করিয়া একবার বরিশালে আসিয়া সমবেত হও, এবং মহা আলোচনা ও পরিবর্ত্তনের দিনে জাতির হিসাবে তোমার কি কর্ত্তব্য আছে, তাহা সকলে আলোচনা কর। মুসলমানের অভাব সকল দিকেই, বেদনা তাহার প্রত্যেক অঙ্গেই। সুতরাং সকলে মিলিয়া মিশিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। আশা করি, বঙ্গের প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলমান ভ্রাতাগণ দলে দলে এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

—"মোহাম্মদী।"

মদ্য প্রস্তুতে খাদ্যের অপচয়

খাদ্যশস্যের সারভাগ দিয়াই মদ তৈয়ারি হইয়া থাকে। এখন খাদ্যেরই টানাটানি হইয়াছে; ফলে মদ তৈয়ারি বন্ধ। শুধু গ্রেট বৃটেনে মদ তৈয়ারির জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতেই একটা রাজ্যের দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতে পারে। ১৯১৬ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে গ্রেট বৃটেনে মদ তৈয়ারির জন্য কত খাদ্যশস্য লাগিয়াছিল, তাহার একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়,—যব, চাউল, ভুট্টা, চিনি প্রভৃতি লাগিয়াছে, সর্ব্বপ্রকারে ১৭,৩৫,০০০ সতের লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টন অর্থাৎ প্রায় ৪,৬৮,৪৫০০০ চারি কোটী আটষট্টি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার মণ। এখন অবশ্য নূতন অবস্থায় নেশার জন্য এত খাদ্য অপচয় হইতে পারিবে না। খাদ্যের অভাব হইয়াছে, তাই এই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু যদি পূর্ব্ব হইতে অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে হয় ত এখন খাদ্যের এতটা অভাব হইত না।

—"বঙ্গবাসী।"

যৌথ-কারবার

লোকে কথায় বলে "সরিষা কুড়াইতে কুড়াইতে বেল হয়।" দেশের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই প্রবাদই আমাদের মূলমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রবাদের এ স্থানে ব্যাখ্যা এই যে সামান্য মূলধনে সামান্যরূপ ব্যবসা হইতেই বড় বড় ব্যবসা হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ কারবারগুলি চালাইতে শিক্ষা করিলে বড় বড় যৌথকারবার চালাইবার বিদ্যা আপনিই মাথায় আসিবে। যাহার যে বিষয়ে ভাল জ্ঞান আছে, যাহার যে বিষয়ে কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, ব্যবসাক্ষেত্রে তাঁহার সেই বিষয়েই ধাবিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের যৌথকার নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, অগ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথকারবার করিয়া সে ভ্রম দেশ হইতে দূর করিতে হইবে। কোনও কারণে যৌথকারবারের প্রারম্ভে ক্ষতি হইলে তাহা দেশব্যাপী একটি নৈরাশ্যের ভাব সঞ্চার করিয়া দেয়। ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধির মুখে কণ্টক পতিত হয়। আমাদের যৌথকারবারগুলির মুখে যে কলঙ্ক কালিমা পড়িয়াছে, সেই কলঙ্ক মোচন করিতে সম্প্রতি বৃহদাকার কারখানার পরিবর্ত্তে সামান্য মূলধনের সহিত আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতার যোগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ-কারবারে উন্নতি দেখাইতে হইবে। তবে ত যৌথকারবারের কলঙ্ক দূর হইবে। আমরা যদি এইরূপ শনৈঃ পন্থা অবলম্বন করি, তাহা হইলে আশা হয় একদিন পর্ব্বত লঙ্ঘনও করিতে পারিব।

—"স্বরাজ।"

চা ব্যবসায় ও চায়ের দোকান

এখন ভারতবর্ষে এক বৎসরে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ সের চা বিক্রয় হইতেছে। কেবল কলিকাতা নগরের দোকানগুলিতেই ৭৯ হাজার সের চা বিক্রয় হয়। পূর্ব্বে এই নগরে ৪৪৪টা চায়ের দোকান ছিল। এক বৎসরে ৩৮২টা বৃদ্ধি হইয়াছে। মোট দোকান সংখ্যা ৮২৯ হইয়াছে। এই দোকানগুলি চা-কোম্পানীর প্রতিনিধিদিগের উদ্যোগে বসিয়াছে। ইহা ছাড়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও অনেকে চায়ের দোকান খুলিয়াছেন। সেইগুলি সমেত মোট দোকান সংখ্যা ১১২৫টা হইবে। অনেক খাবারের দোকানেই এখন চা থাকে। চায়ের দোকানে প্রত্যহ ২ হইতে ৩ টাকা লাভ হয়। বড় দোকানে ২ শত হইতে ৩ শত টাকা মাসিক উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

—"সময়।"

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত মহানিশা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পরিণীতা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲ টাকামাত্র।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রূপের বালাই" আট আনা সংস্করণ ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

আট আনা সংস্করণের ১৪।১৫ সংখ্যক পুস্তক শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সোনার পদ্ম" ও শ্রীমতী হেমনলিনী দেবীর "নৌকা" যন্ত্রস্থ; বৈশাখেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরীর "সাধের পরিণয়" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ॥৴০।

কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর তৃতীয় ভাগ 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের 'শিবশক্তি'র সচিত্র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লক্ষ্যহীন' প্রকাশিত হইল মূল্য ১।০।

কবিবর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'ঋতুমঙ্গল' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর নূতন কবিতা-পুস্তক "রাকা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় কৃত 'মার্কিন বণিক রাজ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ॥৴০।

স্থানান্তরে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের আলোক-চিত্র প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রবাবুর অঙ্কিত অনেক বহুবর্ণ ও ত্রিবর্ণ চিত্র 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে এবং সকলেই সে সকল চিত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

"দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ" (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩২৩, ৫২৮ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধটিতে মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ কয়েকটি ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে। সেজন্য আমরা লেখক ও পাঠকবর্গের নিকট বিনীতভাবে ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। একটি মারাত্মক ভুলের সংশোধন করা অতীব প্রয়োজন।

প্রবন্ধশেষে ফুটনোটে ছাপা হইয়াছে,—তাহার উচ্চতা ৩৭ ফিট, নিম্নের পরিধি ৯৩ ফিট এবং উর্দ্ধদেশের পরিধি ৭২ ফিট। ৯৩ ফিট ও ৭২ ফিট স্থলে যথাক্রমে ৯ ফিট ৪ ইঞ্চি এবং সাড়ে ছয় ফিট হইবে।

প্রবন্ধে লিখিত আছে (প্যারা ২) "প্রকৃত অশোকস্তম্ভের এক খানি ছবি প্রদত্ত হইল।" প্রবন্ধটি সচিত্র করিয়া ছাপিবারই আমাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যথা সময়ে ব্লক প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই এবং যে সময়ে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় তখন ব্লক প্রস্তুত করিবার সময়ও ছিল না। অনবধানতা বশতঃ উপরি উক্ত কথাটি রহিয়াই গিয়াছে। এই কারণে ঐ বাক্যটি পরিত্যজ্য হয় নাই।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Choudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

ভিনিস সুন্দরী

শিল্পী - লীটন

Emerald Ptg. Works
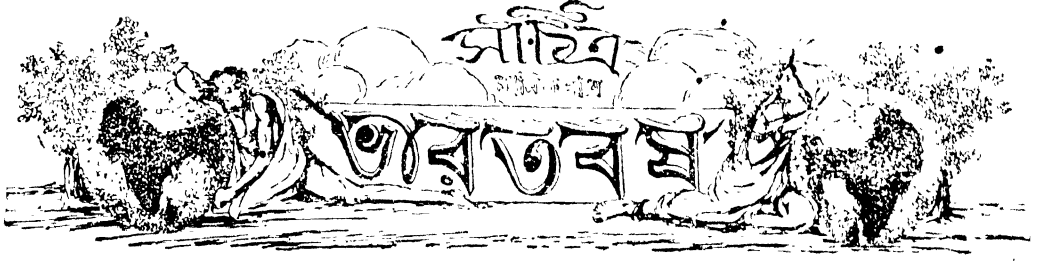
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

দ্বিতীয় খণ্ড] চতুর্থ বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

বর্ষ শেষ

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

দিন যায়, নাহি রহে,— জীবন-প্রবাহ বহে
মহাকাল মহার্ণবে হইতে মিলিত ;
পদ্মদলগত জল টল-টল বিচঞ্চল
কে জানে কখন কবে হইবে স্খলিত।
আজি কালি করি কত, একে-একে অবিরত
হল গত তিনশত-পঞ্চষষ্টি দিন ;
ফুরাইল বার মাস ; পূরাইল কোন্ আশ ?
দৃঢ় মাত্র কাল-পাশ কণ্ঠে সুকঠিন।
আজি বর্ষ-সমাপনে কত কথা উঠে মনে ;
ভেসে আসে স্মৃতি-সনে কিশোর-যৌবন ;

সোণার স্বপন লয়ে গিয়েছে সে দিন বয়ে ;
সয়ে-সয়ে আছি, হয়ে পাষাণ যেমন।
কত মুখ মধু-মাখা স্মরণে রয়েছে আঁকা ;
নিবিড় নিস্তব্ধে ঢাকা কত কণ্ঠস্বর ;
অতীত কাহিনী প্রায় লেখা পাষাণের গায়,
মুছিতে কি পারে তায় নয়ন নির্ঝর ?
ফুরায়ে এসেছে বেলা, শেষ হয়ে এল খেলা ;
বল, পাগলের মেলা দেখিলে কেমন ?
কৃতঘ্নতা হাসি মুখে আসি ছুরি দেয় বুকে ;
এই ত সংসার-সুখে জীবন-যাপন !
জীবনের অবসানে চেয়ে দেখ পিছু পানে ;—
ঝঞ্ঝাবাত, বারি-পাত রয়েছে কেবল ;
অন্বেষিয়ে দেখ ভাই, হৃদয়ের পোড়া ছাই
বিনা আর কিছু নাই জীবন-সম্বল।
দিন যায় আয়ু হরে'— সে কথা কে মনে করে ?
জাগিয়ে ঘুমায়— দেখে অনিত্য স্বপন ;
নিয়ত সকাল, সাঁঝে আশা-নিরাশার মাঝে
দোলে, হেলে, খেলে—কভু না মেলে নয়ন।
জটিল স্বার্থের রণে কেবা নাহি বুঝে মনে
সুখ-আশে দুঃখ-পাশে বন্ধন কেবল ;
তবু ভ্রান্তি নাহি যায়, শান্তি-সুধা নাহি চায়,
আজীবন পিপাসায় হৃদয়-বিকল।

প্রলয় এবং সৃষ্টি

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

প্রাচীন ভারতের যোগিগণ মনকে নিরুদ্ধ করিয়া যখন সমাধিতত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কতকগুলি অতি গূঢ় মনস্তত্ব তাঁহাদিগের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, মনকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে, প্রথমে কামনা ত্যাগ করা আবশ্যক। মন যতক্ষণ কামনা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ মন চঞ্চল হইয়া নানা বিষয়ে বিচরণ করে। কিন্তু যেমনি মন হইতে সকল কামনার লোপ হয়, অমনি নামরূপ-ময় বিশ্বের অস্তিত্ব যোগীর মন হইতে অপসারিত হয়,—কেবল "আছে" বোধমাত্র বিদ্যমান থাকে। যাহা থাকে তাহা এক,—বিভিন্ন বস্তু-সমবায়ে এক নহে। যদি কোন কিছুকে সৎ বলিতে হয়, তবে আধুনিক কালের ভাষায় ইহাই সৎ। কারণ ইহার অস্তিত্বের লোপ করা যায় না। বৈদিক ঋষি এই অবিনশ্বর এক বস্তুকে "এক" নাম প্রদান করিয়াছেন। সেকালে দেবগণই সৎ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনের এই অবস্থাকে উহা জগতের প্রলয় বলিতে পারা যায়। পুনরায় যখন মনে কামনার উদয় হয়, তখনই নামরূপময়, নানা-বস্তুপূর্ণ এই বিশ্ব ক্রমশঃ জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের সমাধি দ্বারা তাঁহার জগতেরই প্রলয় উৎপন্ন হয়। অপর মনুষ্যের জগৎ পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকে, কারণ বদ্ধ ত সমাধিস্থ নহেন। তিনি যদি সমাধিস্থ হন, তবে সমগ্র বিশ্বের অবস্থা কি হইবে? কোন ঋষি ঐ অবস্থারি বর্ণনাই ঋগ্বেদের "নাসদীয়" সূক্তে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নিম্নে উহার ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের অনুমান প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

নাসদাসী ন্নোসদাসী ত্তদানী নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরাযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ১

অর্থ—তখন অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না। রজ (জ্যোতিঃ ও মেঘের আধার স্বরূপ অন্তরীক্ষ) ছিল না, তাহার পরবর্ত্তী ব্যোমও নহে। কিছু আবরণ ছিল কি? কোথাও কাহারও সুখকর বস্তু (বা গৃহ) ছিল কি? গহন, গভীর অম্ভ (জল) ছিল কি?

এই ঋকের "অসৎ" শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সায়ন ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ ঘোর প্রমাদপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করি। সায়ন "নাসৎ" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—জগতোমূল কারণং তৎ নাসৎ শশবিষাণবৎ নিরুপাখ্যং নাসীৎ নহি তাদৃশাৎ কারণাদস্য সতো জগত উৎপত্তিঃ সম্ভবতি। অর্থাৎ জগতের মূল কারণ সেই "নাসৎ" শশকের শৃঙ্গের মত অপ্রত্যক্ষ ছিল না; তাদৃশ কারণ হইতে এই সৎরূপ জগতের উৎপত্তি অসম্ভব। এই ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে, জগতের মূল কারণ "নাসৎ"। তাহা হইলে "নোসৎ আসীৎ" ইহার ব্যাখ্যা কি "অসৎ ছিল" করিতে হইবে? "নাসৎ" ও "নোসৎ" যে কি, তাহার কূট ব্যাখ্যা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এখানে তাহাতেও কুলাইবে না—Contradictory হইয়া পড়িবে। আমরা মনে করি যে, বেদের অর্থ পরবর্ত্তী বেদান্ত-দর্শন দ্বারা স্থির করা কর্ত্তব্য নহে, বেদের দ্বারাই করিতে হইবে। বৈদিক ঋষিদিগের মতে সৎ পদার্থ অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে আমরা এই ঋক্ প্রাপ্ত হই।

ব্রহ্মণস্পতি রেতাসং কর্ম্মারইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যেযুগে অসতঃ সদজায়ত ॥২

ব্রহ্মণস্পতি ইহাদিগকে (দেবতাদিগকে) কামারের মত গড়িয়াছিলেন। দেবোৎপত্তির পূর্ব্বকালে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল। এ স্থলে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, দেবতা-দিগের উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা ত গেল বেদের অপর সূক্তের মত। কিন্তু আমরা যে সূক্ত ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহাতেই এই মত প্রচারিত হইয়াছে। এ স্থলে ৪র্থ ঋক্ উদ্ধৃত করা গেল।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধিমনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা
॥১০।১২৯।৪

এই ঋকের ব্যাখ্যা পরে প্রদান করা যাইবে। তবে দ্বিতীয় ছত্রের অর্থ দ্বারা ("যোগী হৃদিবদ্ধ মনের দ্বারা জানিয়াছেন যে,

অসৎ সতের বন্ধু") জানা যাইতেছে যে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়। এই অসৎ শব্দের অর্থ কামনা। এই ঋক্ হইতেই এই অর্থ পাওয়া যায়। অতএব আমরা সূক্ত-দ্রষ্টা ঋষির অর্থ অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য।

যতক্ষণ জগদীশ্বরের মনে অসৎ বা কামনা বিদ্যমান, ততক্ষণ নামরূপময় জগৎ সকলের সমক্ষে প্রকাশিত থাকে। কিন্তু যখনই তাঁহার মন হইতে "অসৎ" বা কামনা দূর হইবে, অমনি সৎ বা নামরূপময় বিশ্বের অস্তিত্ব থাকিবে না। "সৎ ছিল না" ইহার ব্যাখ্যা ঋষি নিজেই করিতেছেন; যথা—রজ বা অন্তরীক্ষ, এবং তাহার পরবর্তী যে ব্যোম, তাহা রহিল না; অর্থাৎ তাহাদের ভেদ নষ্ট হইয়া গেল। মানবের সুখকর গৃহপূর্ণ পৃথিবী ও গভীর জলপূর্ণ সমুদ্র একাকার হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে বিভেদ করে এরূপ কোন চিহ্ন রহিল না। তাহাদের যাহা আবরণ করিত, তাহাও রহিল না। কখন্ এইরূপ অবস্থা হইল?

পরমেশ্বর যখন কামনা ত্যাগ করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইলেন, তখনি ভূমি, জল, রজ, ব্যোম ও তাহাদের আবরণ একাকার হইয়া গেল—অর্থাৎ সৎ রহিল না। এই ভাব আরো পরিস্ফুট করিবার জন্য, এবং প্রলয়ে যে জগৎ একেবারে শূন্য হইল না তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, দ্বিতীয় ঋক্ উচ্চারিত হইয়াছিল।

ন মৃত্যুরাসীদ মৃতং ন তহি নরাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যংনপরঃ কিংচনাস ॥২

অর্থ:—তখন মৃত্যু (মরণ-ধর্ম্মী) ছিল না, অমৃত (অমরণ-ধর্ম্মী) নহে; রাত্রি-দিবার চিহ্ন (চন্দ্র, সূর্য্য) ছিল না। তখন স্বধা বা ভোগেচ্ছা দ্বারা অকম্পিত "এক" প্রচ্ছন্ন-প্রাণ হইয়া ছিলেন। তাঁহা হইতে অন্য ও শ্রেষ্ঠ কিছুই ছিল না।

ঋষি এই ঋকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি মরণধর্ম্মী এবং অমর দেবগণও রহিলেন না। চন্দ্র ও সূর্য্য তিরোহিত হইল। কখন্ এই অবস্থা উৎপন্ন হইল? যখন "এক," ভোগেচ্ছা বা কামনা দ্বারা অবিচলিত হইয়া, প্রচ্ছন্ন-প্রাণ হইলেন। গতিই প্রাণের লক্ষণ। "একের" মধ্যে কোন গতি রহিল না—ভোগেচ্ছার দ্বারা মন যেমন চঞ্চল নহে, একাকার যে বস্তু রহিয়াছে তাহাও গতিহীন। দৃশ্যমান বিশ্ব যখন রহিল না, তখন কিন্তু "এক" রহিল। কারণ "একের" উৎপত্তি নাই; তাহা অজ—অতএব তাহার নাশ নাই। সকলের ধ্বংস হইলেই, অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার লোপ হইলেই "একে" পরিণত হয়। যখন "এক" অবস্থান করেন, তখন তাহা হইতে অপর ও শ্রেষ্ঠ কিছুই থাকে না। কারণ, তাহা হইলে "এক" হইতেই পারে না।

এই ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ন 'স্বধা' অর্থে মায়া করিয়াছেন। "স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্ত ইতি স্বধা মায়া তয়া তদ্ব্রহ্ম এক অবিভাগান্নমাসীৎ সহযুক্তে প্রধান ইতি তৃতীয়া।" (সায়ন)। কিন্তু বেদে স্বধা অর্থে অন্ন। এই সূক্তের ৫ম ঋকে স্বধা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তথায় স্বধা অর্থে ভোগ্য-বস্তু। অতএব সায়ন মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষির ভাব ব্যক্ত না করিয়া বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। কারণ, ঋষি বলিতেছেন যে, সেই "এক" ভিন্ন অপর ও শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। যদি একের সহিত তাঁহার মায়া থাকেন, তবে দুই হইয়া যায়। কিন্তু ইহা ঋষির ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

যে "এক" বর্ত্তমান, তাঁহার কি-কি গুণ রহিল,—যাহাতে বুঝা যায় যে "এক" আছে? পরের ঋকে ঋষি তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

তম আসীত্তমসা গূঢ় মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব মাইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপস স্তন্ মহিনা জায়তৈকম্ ॥৩

অর্থ:—অগ্রে তম (অন্ধকার) তম দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। চিহ্নবর্জিত সমগ্র সলিল ইহাই ছিল। শূন্যে আবৃত না হইয়া যাহা ছিলেন, তপস্যার মহিমা দ্বারাই "এক" হইয়াছিলেন।

এই ঋকের "তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ" এই অংশের সায়ন নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তুচ্ছ অর্থাৎ যাহা সহজে নষ্ট হয়, এরূপ বস্তু দ্বারা অপিহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত যাহা ছিলেন। অতএব সায়নের মতে "এক", স্বধা (বা মায়া) যুক্ত এবং তুচ্ছের দ্বারা আবৃত। অথচ মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি বলিতেছেন যে, কোন আবরণ ছিল না (১ম ঋক); অন্য ও শ্রেষ্ঠ কিছু ছিল না (২য় ঋক্) এবং তপস্যার মহিমা দ্বারা "এক" জন্মিয়াছিলেন (৩য় ঋক্)। আমরা এখানে তুচ্ছ অর্থে শূন্য অর্থ এবং "তুচ্ছে (৭মী বিভক্তি) অপিহিত ন আভূ" এইরূপ অন্বয় বা পদচ্ছেদ করি। তাহা হইলে এই ঋক্ হইতে বুঝিতেছি যে, যে "এক" (বা একাকার)

এক্ষণে বর্ত্তমান, তাঁহার ভিতরে ও বাহিরে অন্ধকার, সর্ব্বত্র অন্ধকার। অন্ধকার ও আলোকের বিভেদ থাকিলে "এক" হইবে কিরূপে? তাহা চিহ্নহীন সলিলবৎ সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। তাহা কি শূন্য দ্বারা আবৃত? না, তাহা নহে। এক দেশ শূন্য, অপর দেশ সলিল বা বস্তুপূর্ণ, এইরূপ হইলেও একত্ব নষ্ট হয়। অতএব শূন্য দ্বারাও এক আবৃত ছিল না। এই বস্তু (বা matter) কে সলিল বলায় ইহা সহজেই গতিযুক্ত হইতে পারে, এমন পদার্থ বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। তবে তখন শূন্য-দেশ না থাকায় গতির সম্ভাবনাই নাই। বস্তু এক,—ইহার মধ্যে এমন কোন চিহ্ন নাই, যাহা দ্বারা বিভাগ করিয়া দুই করা যায়। শূন্য নাই—যে, গতি হইতে পারে। গতি না থাকায় বিকার নাই, এবং বিকার না থাকায় সময়ের জ্ঞান সম্ভব নহে। অতএব জগতের সমস্ত স্বতন্ত্র পদার্থের লোপ হইলে এরূপ "এক" রহিল, যাহার একত্ব দেশ বা কালে খণ্ডিত নহে। এই অবস্থা তপস্যা বা যোগের মহিমাতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও ঋষি আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। এই "এক" কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই ঋষি পরবর্ত্তী ঋকে প্রচার করিতেছেন।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমঃ যদাসীৎ।
সতো বন্ধু অসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪

অর্থঃ—তাহার পর অগ্রে কাম সম্যক্ বর্ত্তমান হইল, ইহা অধিকারী মনের প্রথম রেত ছিল। কবিগণ (যোগিগণ) হৃদিবদ্ধ মনের দ্বারা দর্শন করিয়া অসতে (কামে) সৎএর (দেবতাদিগের বা নামরূপধারীর) বন্ধু (উৎপত্তি কারণ) স্থির করিয়াছেন।

যোগের মহিমা দ্বারা যে "এক" ছিলেন, তাহা মনবিশিষ্ট "এক"—এই ঋকে তাহা দেখা যাইতেছে। "এক আছে" এই বোধ না থাকিলে, "এক"ই থাকে না। সেই জন্য দেখিতেছি যে, আকার ও রূপহীন "এক" বস্তু রহিয়াছে, এবং সেই বস্তুর অধিকারী মন জানিতেছে যে "এক" আছে। এই "এক"-বোধ দ্বারাই কেবল মনের অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। মনকে "অধিকারী মন" বলা হইল কেন? ঋষি মনকে তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবেন নাই। ইহারা দুই নহে—একের দুই দিক্। যেমন একটী রেখার দুই দিক্, বা কাগজের দুই পৃষ্ঠা। Abstraction দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক। মন আছে কেন? না, দেহ আছে বলিয়া;—যেমন জ্ঞানের বিষয় না থাকিলে জ্ঞান থাকে না। অতএব যে "এক" বর্ত্তমান, তাহা মন-বিশিষ্ট। তবে সেই মনে "এক" আছে—এই অস্তিত্ব বোধ ব্যতীত অপর কোন জ্ঞান নাই। "একের" অস্তিত্ব ব্যতীত অপর গুণ নাই। "একের" মনে যতক্ষণ কামনার উদয় না হয়, ততক্ষণ এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু যেমনি কাম (কামনা) উৎপন্ন হয়, তখনই বিকার বা সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঋষি বলিতেছেন যে, কাম মনের প্রথম রেত স্বরূপ। বোধ হয় "একের" মনে 'এক আছে, এবং আমি তাহার অধিকারী' —এই দুই জ্ঞান প্রথম উৎপন্ন হয়। আবার বলিতেছেন যে, যোগী হৃদয়ে মন আবদ্ধ করিয়া (অর্থাৎ সমাধি দ্বারা) জানিয়াছেন যে, অসৎই সতের বন্ধু। অতএব সৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অসতের উৎপত্তি আবশ্যক। "একের" মনে প্রথম কাম উৎপন্ন হইল, দেখা গিয়াছে। অতএব ঋষি কামকেই যে অসৎ নাম প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, "এক" প্রাণহীন নহেন; তবে প্রচ্ছন্ন প্রাণবিশিষ্ট। এক্ষণে দেখা গেল, "এক" মনোযুক্ত। দেশ ও কালের দ্বারা অখণ্ডিত তমোময় "এক" আছে; অতএব তাঁহার জ্ঞান "আছে" ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেইজন্য মনে "এক" বোধ বর্ত্তমান। আরো দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে মনেই নূতন সৃষ্টির উদ্ভব হয়; কারণ, মনেই "কাম" উৎপন্ন হয়। কেন যে উৎপন্ন হয়, তাহা ঋষি বলেন নাই। তবে যাহাতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাতেই তাহার লয় হওয়া স্বাভাবিক। "একের" দেহ হইতে বহির্জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার লয় হইয়া "এক" উৎপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ "একের" মনের কামনা হইতে যে কামনাপুঞ্জ উৎপন্ন হইয়া-ছিল, সেই বিশ্ব-কামনা মনে লয় প্রাপ্ত হইলে, কামময় বিশ্বও বিলীন হইল। "একের" মনের অস্তিত্ব কিন্তু তাঁহার কামনার উপর নির্ভর করে না। মন হইতে সর্ব্ব কামনা বিদূরিত হইলেও "আছে" এই "এক জ্ঞান" থাকিয়া যায়। অতএব মনের এক জ্ঞানের ধ্বংস নাই। সেইজন্য ইহাকে অবিনশ্বর বলিতে পারা যায়। ঋষি এই মনকে বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সেই জন্য সমগ্র বিশ্বের প্রলয় হইলেও "মনোযুক্ত একবস্তু" বিদ্যমান থাকে। প্রলয় অবস্থায়

কামনা থাকে না বলিয়া, তাহাকেই অসৎ নাম দেওয়া হইয়াছে। আর, কামনার উৎপত্তি না হইলে পুনরায় সৃষ্টি হয় না, এই জন্য অসৎ হইতে বৈদিক ঋষি সৎ উৎপন্ন হইয়াছে, বলিয়াছেন। কামনার অভ্যুদয়ে "একের" মধ্যে কিরূপ বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাই পর ঋকে ঋষি প্রকাশ করিতেছেন।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরিস্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫

অর্থ:—ইহাদের রশ্মি উপর ও নিম্ন দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। অধোদেশে কি ছিল, উপরে কি ছিল? রেতোধারিগণ ছিলেন, মহিমাসম্পন্নগণ ছিলেন। স্বধা (ভোগ্য-বস্তু) নিম্নে, প্রযতি (ভোক্তা) উপরে ছিল।

সৎ পদার্থ অসৎ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব "একের" মনে কামনা উদ্ভূত হইলেই সৎ পদার্থ সকল উৎপন্ন হইল। তাহারা জ্যোতির্ম্ময়। তাহাদিগের জ্যোতিঃ উপরে ও নিম্নে বিস্তৃত হইতে লাগিল। উপরে মহিমাসম্পন্নগণ হইলেন, এবং নিম্নে রেতোধারী (কামনাপ্রধান) জীব রহিলেন। এই সকল জীবের ভোগ্য-বস্তু (স্বধা) উৎপন্ন হইল। কারণ, যিনি সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারই ভোগ-কামনা হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন। তবে অমৃত মহিমাসম্পন্নদিগের এবং অন্ন রেতোধারী জীবের ভোগ্য। আবার ভোক্তা ও ভোগ্য-বস্তুর মধ্যে ভোক্তা উপরে রহিলেন এবং ভোগ্য নিম্নে। এইরূপে উচ্চ ও নীচ, ভোগ্য ও ভোক্তা, মহিমাসম্পন্ন ও রেতোধা—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বিভেদ হইল।

এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় আমরা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাই। এই ক্রমবিকাশে কাল উৎপন্ন হইল। আলোকের আবির্ভাবে দেশের উৎপত্তি হইল; কারণ, তাহার বিভেদ জানা গেল। এইরূপে দেবগণের যে উৎপত্তি, তাহা কোন্ দেবতার নিকট আমরা জানিতে পারি—ঋষির মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল। পরবর্ত্তী ঋকে তাহাই বিশদ হইবে।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আজাতা ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব॥ ৬

অর্থ:—কে প্রকৃত জানে? কে ইহলোকে বলিয়াছে কোথা হইতে এই সৃষ্টি জন্মিয়াছে? দেবতা সকল এই সৃষ্টির পরে (জন্ম লাভ করিয়াছেন)। অতএব যাহা হইতে উৎপন্ন তাহা কে জানে?

দেবতাগণ যে সৃষ্ট পদার্থ এবং সৃষ্টির মূল কারণ নহেন, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত হইল। সৃষ্ট পদার্থ বলিয়াই তাঁহাদের লয় আছে। সেইজন্য প্রলয়-কালে তাঁহাদের বিভিন্ন সত্তার লোপ হয়। অতএব "এক" হইতে কিরূপে প্রথম সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানেন না। তবে, তাঁহারা উৎপন্ন হইবার পর যে সকল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের বিষয় জানেন। মনুষ্য চিরজীবী নহে। দেবতা ভিন্ন অপর কাহার নিকট তাহারা সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে? সেইজন্য দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও পূজা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইলে যজ্ঞ আবশ্যক। সেই যজ্ঞরূপ পথ দ্বারা মনুষ্য বেদ বা বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বেদেই এই সকল মত প্রচারিত। এই সূক্তের ঋষির মনে কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, দেবতাগণের সৃষ্টির পূর্ব্বের কথা আমরা কাহার নিকট শিক্ষালাভ করিব। সমাধি-কালে ঋষির মানস-পটে প্রলয়ের যে চিত্র প্রতিফলিত হইল, তাহা ভ্রম-প্রমাদশূন্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। এই প্রলয়-অবসানে যে সৃষ্টির ছবি তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহা কোন্ দেবতা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন? পর ঋকে আমরা ইহার উত্তর প্রাপ্ত হই।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গবেদ যদি বা ন বেদ॥৭

অর্থঃ—যাহা হইতে এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, (উহা) কি ধারণ করেন, করেন না কি? যিনি ইহার অধ্যক্ষ (দ্রষ্টা) শ্রেষ্ঠ ব্যোমে আছেন (বা শ্রেষ্ঠ ব্যোম স্বরূপ), তিনি নিশ্চয় জানেন, জানেন না কি?

"এক" হইতে এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই "একেই" ইহা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—তা কি নয়? এই বলিয়াই ঋষির সন্দেহ হইল যে, সে একাকার অবস্থা ত এখন নাই। কিরূপে বলি যে, এই সৃষ্টি "একের" দ্বারা ধৃত? তখন ঋষি বলিতেছেন যে, এই সৃষ্টির যিনি অধ্যক্ষ বা দ্রষ্টা, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যোম স্বরূপ, তিনি নিশ্চয় জানেন। কারণ, তাঁহার সমাধি হইয়াই ত প্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ত বর্ত্তমান। অতএব সৃষ্টির আদি হইতে তিনি সকলই জানেন। জানেন না কি? ঋষির মনে একটু খট্‌কা লাগিল। ঈশ্বর স্বীয়

একত্ব স্মরণ করিলেই যদি বিশ্ব-সংসারে প্রলয় উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তবে কিরূপে তিনিই বা আমাদের জানাইবেন, এবং আমাদের অস্তিত্বের অভাব হইলে আমরাই বা কিরূপে জানিতে পারিব? অতএব এই অবস্থা কেবল যোগীর ধ্যেয়। খণ্ড ভাবে যোগী যে অবস্থার আভাষ প্রাপ্ত হন, তাহাই সমগ্র ভাবে পরমেশ্বরে বর্তমান হইলে, জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়, ইহাই হিন্দু ঋষির বিশ্বাস। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

"নুনের ছবি সমুদ্র মাপ্‌তে গিছিল। কিন্তু যেই নেমেছে, অমনি গলে গেছে! সমুদ্র কত গভীর, কে খবর দিবে? যে দিবে, সে মিশে গেছে। সপ্তম ভূমিতে মনের নাশ হয়, সমাধি হয়। কি বোধ হয়, মুখে বলা যায় না।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ১ম ভাগ, ৭৩ পৃঃ।

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

অবধান

মানুষের মন প্রায়ই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—নানা বিষয়ে, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত। কখনও স্পর্শ, কখনও শ্রবণ, কখনও দর্শন, কখনও আস্বাদন ইত্যাদি নানাকার্য্যে মন সতত লিপ্ত। বাহিরের কোলাহলে এবং অন্তরের ভাবসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে অনবরত চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হইতেছে।

"অন্তরে দুর্দ্দান্ত হৃদি পড়িছে উঠিছে,
বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিকা ছুটিছে;
যা কিছু ধরিতে চাই, কিছুই খুঁজে না পাই,
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মত
দিগ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞান-হত।"

মন যতক্ষণ এইরূপ বিক্ষিপ্ত এবং অসংযত থাকে, ততক্ষণ মনের কোন কার্য্য স্থায়ী হয় না, ফলদায়ক হয় না। সুতরাং, মনকে সংযত এবং কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। মনের প্রসার চিত্তসংযমের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করা যাইতে পারে। অপরাপর সাধারণ বস্তু হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর উপর নিয়োজিত করাই চিত্তসংযোগ বা অবধান।

"মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি এই সৃষ্টির পাথারে
অস্থির হইয়া, শেষে শ্রান্ত আপনারে
কোথায় হারায়ে ফেলে! তাই, সে নীরবে, ধীরে-ধীরে,
চিত্তেরে করিয়া স্থির, পশিয়া মন্দিরে,
প্রতিমারে করে পূজা ভাবিয়া বিশ্বের মূলাধার।"

কোন একটি সূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু আলোকের অপ্রাচুর্য্য হেতু সেটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। আমার চক্ষু এবং সেই বস্তুটির মধ্যে একখণ্ড স্বচ্ছ প্রস্তর রাখিয়া বিক্ষিপ্ত আলোককে একত্রীভূত করিলাম। আলো ঘনীভূত হইল, তেজ বৃদ্ধি পাইল এবং জিনিসটি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।
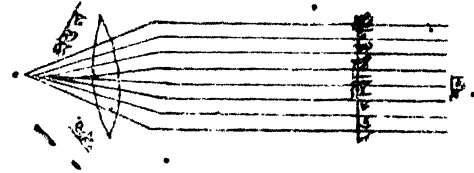
তেমনি আলোকের মত মনের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে যত কেন্দ্রীভূত করিতে পারা যায়, মনের গ্রহণ-শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়। আমি একখানি পুস্তক পড়িতেছি। একটি অস্পষ্ট শব্দ আমার কাণে আসিতেছে। কিন্তু সে শব্দে আমার পড়ার ব্যাঘাত হইতেছে না। প্রথমতঃ সে শব্দটি কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। পুস্তকের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শব্দের দিকে লক্ষ্য করিলাম। শব্দটি ক্রমশঃই স্পষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে শব্দের কারণ এবং স্থান নির্ণয়ে সমর্থ হইলাম। গঙ্গার উপকূলে বসিয়া সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিতেছি। কোন বিশেষ বিষয় ভাবিতেছি না, কোন বিশেষ বস্তু

দেখিতেছি না। কখনও বাড়ীর কথা, কখনও বিদ্যালয়ের কথা, কখনও আমার বন্ধুর কথা ইত্যাদি কত কথাই মনে হইতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ একটি মৌমাছি আসিয়া আমাকে দংশন করিল। চিন্তা এখন বহুমুখী নহে—ইহা এখন একদিকে, সেই মধুমক্ষিকা-দংশনজনিত যন্ত্রণার দিকে ধাবিত হইল। এখন আর ঘরবাড়ীর কথা, বন্ধুবান্ধবের কথা ভাবিতেছি না। মন এখন অন্য বিষয়ে অনাসক্ত—মাত্র একটি বিষয়ে আসক্ত। মনের এই প্রকার এক-নিষ্ঠতাই অবধান।
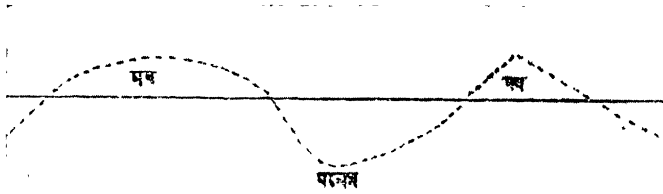
মধুমক্ষিকা-দংশনের পূর্ব্বাবস্থা, মধুমক্ষিকা-দংশনের পর-অবস্থা

অবধান ব্যতীত পরিস্ফুট চিন্তা, সুস্পষ্ট অনুভূতি এবং সুবিচারসঙ্গত ইচ্ছা থাকিতে পারে না। অবধান মনের একটি বিশেষ অবস্থা নহে। মানসিক ব্যাপারমাত্রেই ইহার প্রয়োজন আছে।

বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছি। একটি বিকট শব্দ হইল। আমরা উভয়েই চমকিত হইলাম। কথা-বার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। আমরা ইচ্ছা করিয়া চমকিত হই নাই, ইচ্ছা করিয়া কথোপকথন বন্ধ করি নাই—ইহা ইচ্ছা ব্যতীত আপনা-আপনি হইয়া গেল। বাহিরের শব্দ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিল। এরূপ চিত্ত-সংযোগে আয়াসের প্রয়োজন হইল না—ইহা অনিচ্ছা-প্রসূত।

"আপনা আপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আনমন হ'য়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছুক্ষণ সেইখানে"।

এবম্বিধ চিত্তসংযোগের নাম নিরপেক্ষাবধান। ইহার উত্তেজক বাহিক—বাহিরের শক্তি-প্রভাবেই আমাদের মন আকৃষ্ট হইতেছে। এই শক্তির উপর আমাদের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব নাই—আমরা ইচ্ছা করি, বা না করি—এ শব্দ আমাদিগকে শুনিতেই হইবে—ইহা আমাদের মন আকর্ষণ করিবেই।

"এক দিন অকস্মাৎ জলধির বাঁশরী কোথায়
আকুল-আহ্বান-সুরে বাজিয়া উঠিল 'আয়' 'আয়'!
ভেঙ্গে গেল সুখ-স্বপ্ন, ভেঙ্গে গেল প্রেম-কারাগার,

* * * *

আমার সকল চেষ্টা, শত বাধা, সহস্র ক্রন্দন,
তোমার উত্তাল স্রোতে ভেসে গেল তৃণের মতন!"

এরূপ অবধান ক্ষণস্থায়ী—যতক্ষণ বাহ্য-শক্তির স্থিতি, ততক্ষণ ইহার স্থিতি। তৎপরে শব্দটির কারণ এবং স্থান নির্ণয়ার্থ মনোনিবেশ করিলাম। কেন এমন শব্দ হইল? এ শব্দটি কিসের? কোথা হইতে আসিতেছে? ইত্যাদি নিরাকরণের নিমিত্ত অবধানের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এরূপ অবধান আমরা না করিলেও পারিতাম। ইহার কারণ নির্ণয় করা না করা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এখানে চিত্তসংযোগ ইচ্ছাপ্রসূত—ইহা সাপেক্ষাবধান।

"উচ্ছিষ্ট চরণামৃত শ্রীচৈতন্য কদাচিত
নিজেচ্ছায় না দেন কাহারে।
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া নিজোচ্ছিষ্ট আনাইয়া
আপনে দিলেন কর্ণপুরে।"

এখানে চেষ্টা করিতে হইতেছে, যত্ন করিতে হইতেছে। এখানে কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হইতেছি না—ভিতর হইতে কোন শক্তি মনকে একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে চালাইয়া দিতেছে;—এ শক্তির উপর আমাদের যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব আছে—এ শক্তির উদ্বোধন বা সংগোপন আমাদের ইচ্ছাধীন। এরূপ অবধানের ফল স্থায়ী। যতক্ষণ ইচ্ছা, ততক্ষণ অবধান করিতে পারি।

"এখনও যুবতী বসি চাহি পথ-পানে
বিবশা, আপনাহারা, না দেখে নয়নে
রণক্ষেত্র; বনক্ষেত্রে না শুনে কাকলী।
কিছুক্ষণ ভ্রমি ঋষি অজ্ঞাতে পশ্চাতে
ডাকিলা—"মনসে"! বামা শুনিল না কাণে,
চিত্রিত প্রতিমা মত রহিল বসিয়া।

"পাপীয়সি"!—স্বপ্নোত্থিতা, চমকিয়া বামা
দেখিল ফিরিয়া ঋষি।"

এখানে বামা সাপেক্ষাবধানে তন্ময় ছিল; কিন্তু যখন "পাপীয়সী" আহ্বানে "স্বপ্নোত্থিতা, চমকিয়া বালা দেখিল ফিরিয়া ঋষি" তখন নিরপেক্ষাবধানের উৎপত্তি হইল। একজন শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে একবিন্দু নর-শোণিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অদূরে একটি গর্দ্দভ চীৎকার করিতেছে। কিন্তু সে চীৎকারে পণ্ডিতের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে না। শোণিতবিন্দুর ত কোন স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি নাই,—কিন্তু সে শক্তি গর্দ্দভের চীৎকারে যথেষ্ট পরিমাণে আছে; তবে গর্দ্দভের চীৎকারে তাঁহার চিত্ত কেন আকৃষ্ট হইতেছে না? তুমি-আমি কত সময়ে কত রক্ত দেখিয়াছি; কিন্তু কৈ, আমাদের মনে ত উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কৌতূহল জন্মে নাই! কিন্তু গর্দ্দভের চীৎকার ত সকল সময়েই আমাদের মন আকর্ষণ করিয়াছে! কেন ঐ পণ্ডিত, যেটি অবধান করা অতি সহজ সেটিকে অবধান না করিয়া, অন্যটিতে তন্ময় হইয়াছেন? যেটি অন্য সময়ে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত, এখন তাহা কিসে এত নিস্তেজ হইল? প্রশ্নটি জটিল হইলেও, ইহার উত্তর সহজ। পণ্ডিতবর যখন শারীরবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল,—অনেক যত্ন, অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ক্রমশঃই তাঁহার শারীর-বিজ্ঞানে আস্থা জন্মিল, অবধান-কার্য্য সহজ হইল—আর তত যত্ন করিতে হইল না—আর তত বেগ পাইতে হইল না। অবশেষে এমন হইল যে, অবধান করা অপেক্ষা অবধান না করা অসম্ভব হইল। সাপেক্ষাবধান নিরপেক্ষাবধানে পরিণত হইল। ইহা অভ্যাসজনিত নিরপেক্ষাবধান।

"ধ্যানমগ্ন হে ঋষি তোমার, অকলঙ্ক শুভ্র পদতলে
ভক্ত আসি' নৈবেদ্য সম্ভার দিয়া গেছে তপ্ত অশ্রুজলে;
তবু তব ধ্যান ভাঙে নাই, কি গভীর, হে চির-কুমার,
কি গভীর ধ্যানযোগ তব, কি অটল প্রতিজ্ঞা তোমার!"

গৃহের একদিকে একটি তৈলবর্ত্তিকা, এবং অপর-দিকে একটি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। অবশ্য বৈদ্যুতিক আলোকেই আমাদের চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হইবে। উজ্জ্বল আলোক বা উচ্চ শব্দে আমাদের চিত্ত যত সহজে আকৃষ্ট হয়, ক্ষীণ আলোকে বা মৃদু শব্দে তত সহজে হয় না। উদ্বোধকের শক্তি অধিক হইলেই অবধান-কার্য্য সহজ হয়। অতএব অবধান উদ্বোধকের শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। একই উত্তেজকের উপর মন অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমার সম্মুখের ঘড়িটি অনবরত টিক্-টিক্ করিতেছে, সে শব্দের দিকে আমার মন আকৃষ্ট নয়; কিন্তু যেই ঘড়িটি বন্ধ হইয়া যায় ও তাহার শব্দ থামিয়া যায়, আমার চিত্তও অমনি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। গৃহে আলো জ্বলিতেছে, ক্ষুদ্র শিশুটি কাঁদিতেছে;—আলোটি নিবাইয়া দাও, শিশুর ক্রন্দন থামিয়া যাইবে। অন্ধকার গৃহে শিশু ক্রন্দন করিতেছে, বাতিটি জ্বালিয়া ফেল, শিশুটি অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য আর কাঁদিবে না। বক্তা একই রকম স্বরে বক্তৃতা করিলে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত তেমন আকর্ষণ করিতে পারেন না—তাঁহাকে তাঁহার স্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হয়।

"সংসার যদি সমান চলিত
একটানা একঘেয়ে,
কত না তত্ত্ব গুমরি' মরিত
প্রকাশের পথ চেয়ে;
তপনের ছটা যদি না ফুরাত
ফুরালে দিনের নাট,
তা' হ'লে কি কভু ফুটিত প্রদোষে
ফুল্ল-তারার হাট।"

অতএব একই প্রকার উদ্বোধকে চিত্তসংযোগ স্থায়ী হয় না। উদ্বোধকের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক। আবার উদ্বোধকের সহিত জড়িত সুখ-দুঃখের দ্বারাও চিত্তসংযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্ষুদ্র একটি বালক আঙ্গিনায় ক্রীড়া করিতেছে। একদিকে একজন অপরিচিতা আর একদিকে তাহার মাতা কথোপকথন করিতেছে। এরূপ স্থলে বালকের চিত্ত তাহার মায়ের স্বরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, কারণ মায়ের স্বরের সহিত তাহার সুখ-স্মৃতি জড়িত। কেহ-কেহ মনে করেন যে, ধন-যশ-মান প্রভৃতি পার্থিব বস্তু হইতেই সুখ-লাভ হয়; সুতরাং ঐ সকল বস্তু সহজেই তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। আবার কেহ কেহ ঈশ্বর-আরাধনায় হৃদয়ের শান্তি আছে ভাবিয়া, ঐ পার্থিব বস্তু সকলকে উপেক্ষা

করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। অতএব

"আশে-পাশে কত ছড়ান রতন,
সে সব কিছু না চাই,
দেব-সেবা মোর ছিল পুণ্যকাজ,
শান্তি তাহাতে পাই"।

এবং সেই জন্যই

"সব ভেসে গেল রতন মাণিক
কিছু না দেখিনু চেয়ে,
আত্মহারা হয়ে ভুলে গেনু সব
দেবতা হৃদয়ে লয়ে।"

অতএব স্বার্থ-বিজড়িত উদ্বোধকই: আমাদের চিত্তকে সহজে আকর্ষণ করে। উদ্বোধকের প্রকৃতি অনুসারে অবধানের প্রকৃতিও নির্ণীত হইয়া থাকে।

আমি যাহা অবধান করিব, তাহা যত সুস্পষ্ট হইবে, অবধান-কার্য্যও তত সহজ হইবে। অবধান-শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য উদ্বোধক আবশ্যক। উদ্বোধক একবারে নিস্তেজ এবং নিষ্প্রভ হইলে, অবধান শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে অক্ষম হইবে। যে শক্তি ইন্দ্রিয়-স্পন্দন সম্পাদনে সক্ষম নয়, কিংবা সক্ষম হইলেও যে স্পন্দন মন পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না, সে শক্তি কেমন করিয়া আমাদের মন আকর্ষণ করিবে? একজন স্পষ্ট, আর একজন অস্পষ্ট স্বরে কথা কহিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির কথা অবধান করা কি অধিক সহজ নহে? অবধানের বিষয় যত সুস্পষ্ট হয়, অবধান-কার্য্যও তত সহজ হয়। উদ্বোধকের শক্তি-প্রাচুর্য্য অবধান-কার্য্যের পরম সহায়।

"অকস্মাৎ গীতপূর্ণ নির্জ্জন গহ্বরে
ভাসিল চীৎকার-ধ্বনি; ভৈরব গর্জ্জনে
কাঁপিল পর্ব্বত-রাজ্য; ভাঙ্গিল হঠাৎ
গীতমুগ্ধ যুবকের জাগ্রত স্বপন"।

এক সেকেণ্ডের নিমিত্ত তোমার সম্মুখে একখানি ছবি ধরিলাম। উহা কিসের প্রতিকৃতি, তুমি বুঝিতে পারিলে না। আবার ধরিলাম, এখনও বুঝিতে পারিলে না। আবার ধরিলাম, আবার ধরিলাম,—এইরূপে বারংবার ধরিতে-ধরিতে তুমি ছবিটির সকল অংশে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলে, এবং অবশেষে কিসের প্রতিকৃতি, বুঝিতে পারিলে। অতএব অবধান যে কেবল উদ্বোধকের শক্তির উপর নির্ভ করে, তাহা নহে। উদ্বোধক যদি স্থায়ী না হয়, যদি প্রকাশ মাত্রই অন্তর্হিত হয়, তবে অবধান-কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকি যায়। অবধান-কার্য্য সময়সাপেক্ষ, সুতরাং অবধান বিষয়ে স্থায়িত্ব আবশ্যক।

যদি উদ্বোধক একান্তই ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে ইহার পুন পুনঃ সংঘটন আবশ্যক। পুরাতন জিনিস অপেক্ষা নূত জিনিসে আমরা অধিক আকৃষ্ট হই।

"জগতের কোন কাজে করি নাই মনোযোগ
চাহি নাই কিছুই জানিতে;—
সুচারু বদন তব তারে হেন অভিনব
সাজায়েছে আমার আঁখিতে।"

নূতন জিনিস সহজেই আমাদের মন আকর্ষণ কে বালকেরা নূতন ছবি, নূতন পুস্তক বড়ই ভালবাসে কিছুদিন পরে সেই ছবি, সেই পুস্তক পুরাতন হইয়া গে আর সে দিকে মন দেয় না।

"পুরাতনের মাঝে হেরিলে নূতন
নূতনে হয় কিন্তু চিত্ত মগন।"

আবার—

"নূতন রহে না চির নূতন—
প্রথা ইহা চির চিরন্তন।"

সুতরাং উদ্বোধকের নূতনত্বও অবধান-বিষয়ে বি সহায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব অবধান-কার্য্যের আর এ সহায়। যদি একটি উদ্বোধকের আর একটি প্রতি উদ্বোধক না থাকে, তবে চিত্তসন্নিবেশ করা সহজ হ কিন্তু একসঙ্গে যদি কতকগুলি উদ্বোধক উপস্থিত তবে চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। একসঙ্গে চারিটি বা চারি রকমে নৃত্য করিতেছে। তোমার চারিজনেরই দেখিবার ইচ্ছা। তোমার মন একটি হইতে আর একা ধাবিত হইতেছে—কোন একটিতে স্থির থাকিতেছে চিত্তমধ্যে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান একই সময়ে উদিত হ পারে না।

"মন যে আমার পড়েছে সই, উভয়-সঙ্কটে।
এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণ-নাম শুনিব
আর এক কর্ণ বলে আমি বধির হ'য়ে র'ব।

এক করে সাধ করে' ধরে কৃষ্ণ-করে
আর এক করে করে নিষেধ করে তারে।
এক পদে কৃষ্ণপদে যাইবারে চায়
আর এক পদে, পদে পদে বারণ করে তায়।"

পরামর্শাতিশয্য (শক্তি-প্রাচুর্য্য), পৌনঃপুন্য, স্থায়িত্ব, নূতনত্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব—এই কয়টি অবধান-কার্য্যের বিশেষ সহায়। এই সহায়গুলি বাহ্যিক, কারণ ইহারা অবধানের বিষয় বা উদ্বোধক-সংক্রান্ত। উদ্বোধকের প্রকৃতি অনুসারেই যে অবধান-কার্য্য পরিচালিত হয়, এমন নহে; অবধানকর্ত্তার শক্তি দ্বারাও ইহা নিয়ন্ত্রিত। আত্ম-শক্তির উপর চিত্তসংযোগ-ক্ষমতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। যখন আমার শরীরে স্ফূর্ত্তি থাকে না, মনে প্রফুল্লতা থাকে না, যখন নৈরাশ্যের পদাঘাতে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, যখন

"রোগে, শোকে, নৈরাশ্য-পীড়নে,
অপমানে,—শত নির্য্যাতনে
নিরন্তর ক্লিষ্ট হ'য়ে, হায়
জীব সবে যবে ঊর্দ্ধে চায়
সজল নয়ন মেলি'"

তখন কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অবধান-কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না। যখন শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন,—তখন চিত্তসংযোগের ক্ষমতাও ক্ষীণ। যখন তুমি নিতান্ত নিদ্রাক্লিষ্ট, তখন তুমি তোমার আসন্ন বিপদের কথাও ভাবিতে পার না। স্বার্থ ব্যতীতও অবধান অসম্ভব। যখন যে দিকে যে বিষয়ে চিত্তনিবেশ কর না কেন, দেখিবে, তাহার মূলে স্বার্থ। বস্তু বা বিষয় আমরা অবধান করি সত্য, কিন্তু সে অবধান বস্তু বা বিষয়ের খাতিরে নহে। সেই বস্তু বা বিষয়ের সহিত স্বার্থের, সুখ-দুঃখের সংস্রব আছে বলিয়া, উহা আমাদের অবধানান্তর্গত। স্বার্থের আকর্ষণেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়া থাকি।

"প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে,
করিতে আমার পূজা ?"

অবশ্য স্বার্থের জন্য। মধুমক্ষিকা-দংশনে যদি যন্ত্রণা না থাকিত, অর্থ লাভে যদি সুখ না থাকিত, তবে কি উহারা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত? স্বার্থ ব্যতীত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না; উদ্দেশ্য ব্যতীত নিরপেক্ষাবধান থাকিতে পারে না। সংসারে বীতশ্রদ্ধ মহাপুরুষ স্বার্থের জন্যই ধ্যানস্তিমিত লোচনে তাঁহার ইষ্টবস্তুতে চিত্তনিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

"সৌম্য শান্ত কেশব ভারতী আঁখি মেলি চাহি দেখে,
পদতলে তাঁর বসি করযোড়ে কিশোর নিমাই ভাসে আঁখিজলে,
সুন্দর তনু স্বর সুকুমার তরুণ মূরতি এ কে ?
সে যে ভুলে গেল সব ধ্যান;—
চাহিয়া রহিল নিমাইয়ের মুখে—ফিরিল না সে নয়ন"।

এখানে নিমাইয়ের সুন্দর মূর্ত্তি হইতে স্বার্থের উদ্রেক হইল; সুতরাং চিত্তও আকৃষ্ট হইল। অবধানের আর একটি সহায়—প্রতীক্ষা। যদি নিশীথ রাত্রিতে সহসা করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাই, তখন সেই ধ্বনিতে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইলেও, সে ধ্বনি কিসের এবং কোথা হইতে আসিতেছে, ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করিতে সময় আবশ্যক, চেষ্টা আবশ্যক হয়। শব্দ শ্রুত হইবামাত্র চিত্তসংযোগ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ঐরূপ শব্দ শুনিবার জন্য যদি আমি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিতাম, তাহা হইলে শব্দটি শুনিবা-মাত্র উহা পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইত। কিসের শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে ইত্যাদি সমস্তই যুগপৎ বুঝিতে পারিতাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময় আমরা দুইজনে গল্প করিতেছি। রোজ আটটার সময় তোপধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। আজ আমার ঘড়িটি তোপের সহিত মিলাইব। বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছি এবং তোপের শব্দেরও প্রতীক্ষা করিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে শব্দ হইল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, আমার বন্ধু হয় ত শুনিতে পাইল না, তাহার কারণ, আমি ঐ শব্দের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

ঘনতিমির রজনী, সচকিত সজনি
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য!
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ বিষণ্ণ!
নীল আকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওয়ত গান,

পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিতাবল্লিবিতান।
তৃষিত নয়নে, বনপথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখি ফিরাওয়ে
গাঁথে বনফুলমালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওয়ল কালা।"

অতএব আত্মশক্তি, স্বার্থ এবং প্রতীক্ষা—ইহারাও অবধান-কার্য্যের সহায়। এ সহায়গুলি মনঃসম্বন্ধীয়।

আমি একখানি পুস্তক খুলিলাম। পুস্তকখানি আরব্য ভাষায় লিখিত। আমি আরব্য ভাষা জানি না। পুস্তকের কোন একটি পত্রে চক্ষুসংযোগ করিলাম। পরে চিত্তসংযোগের নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম। চিত্তসংযোগ করিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিলাম। অবশেষে আমার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। মন অবসন্ন হইয়া আসিল। পুস্তকের অক্ষরগুলি হইতে আমার কোন ভাবেরই উদয় হইল না। কোন সুখ-দুঃখের স্মৃতি জাগরিত হইল না। শেষে হতাশ হইয়া পুস্তকখানি নিক্ষেপ করিলাম। পুস্তকের কথিত বিষয় বুঝিতে পারিলাম না। পুস্তকে কোন স্বার্থ দৃষ্ট হইল না, সুতরাং চিত্তসংযোগ অসম্ভব হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে বিষয়ে কোন স্বার্থচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, যে বিষয় হইতে মনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না, ইচ্ছাশক্তি সে বিষয়ে মন আকর্ষণ করিতে অক্ষম। কেবল ইচ্ছাপ্রভাবেই বস্তুর সহিত মনের মিলন হইতে পারে না—স্বার্থের প্রয়োজন। স্বার্থই মিলন-রজ্জু।

"শোনো নিবেদন—
এ নহে পুতুল-খেলা ; ল'য়ে প্রাণ-মন
আপন খেয়ালে কেহ—ইচ্ছা হ'ল ব'য়ে'—
পারে না সঁপিতে অন্যে খেলিবার ছলে
এতই সহজে। প্রাণ দিতে নাহি হয়,—
প্রেমের উদ্ভবে তাহা আপন আলয়
আপনিই লহে খুঁজি।"

যখন আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে থাকি, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি ; যখন ছাত্রদের মধ্যে—তখন কাব্য-বিষয় আলোচনা করি ; যখন ভৃত্যগণের মধ্যে—তখন বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি। যখন কোন একটি বিষয়ে চিত্তনিবেশ করি, তখন অপর বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করি। যখন দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করি, তখন কাব্যশাস্ত্রের বিষয় ভাবি না ; এবং যখন কাব্যশাস্ত্রের বিষয় ভাবি, তখন গণিতশাস্ত্রের কথা মনে স্থান দিই না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইচ্ছাশক্তি সাহায্যে আমরা চিত্তকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চালিত করিতে পারি। বিষয় এবং স্থানবিশেষে স্বার্থের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এক-এক স্বার্থ এক-এক সময় কার্য্যকর। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই সময়বিশেষের স্বার্থের প্রতি আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ঘণ্টা বাজিল, আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। চাকরের হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া গেল, আমার দৃষ্টি সেই দিকেই গেল। অদূরে পিয়ানো বাজিল, আমার মন সেই দিকেই ধাবিত হইল। এই সকল ব্যাপারে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে আমি বাধ্য হই। এরূপ স্থলে চিত্ত সংযত করিবার ক্ষমতা সকল সময় থাকে না। সুতরাং নিরপেক্ষাবধান অনেক সময় আমাদের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা হরণ করিয়া থাকে।

"আঁকিতেছে চিত্র, কিন্তু চিত্রকর
কি আঁকে না জানে,—আপনা-হারা।
মিশিল বীণায় কণ্ঠ উত্তরার,
বীণায় জীবন্ত বীণার লয়!

* * * *

"ওই যা! আঁকিলাম কি আঁকিতে কি?"
কহে অভিমন্যু।"

অবধান সময়ে শরীরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যখন কোন বিষয়ে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করি, তখন আমাদের শরীর যেন নিশ্চল হয়, মাংসপেশী সজাগ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত হয় এবং হৃদয় দ্রুতবেগে, সজোরে স্পন্দিত হয়। শারীর ক্রিয়ার স্থৈর্য্য-সম্পাদন করিতে পারিলে, অবধান-কার্য্য সহজ হয়।

"একটি তরুতে যুবা পার্শ্ব হেলাইয়া
সঙ্গীত শুনিতেছিলা—অপলক নেত্র,
অনিশ্বাস নাসা, প্রাণযন্ত্র অচঞ্চল,
বিশ্রামে বঙ্কিম গ্রীবা তরু পরশিয়া।"

হৃদয়-স্পন্দন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হইলেও, শিক্ষা এবং অভ্যাসের বলে আমাদের পেশীসমূহ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত হইতে পারে। এই জন্য আসন এবং প্রাণায়াম শিক্ষার প্রয়োজন। শরীর চঞ্চল থাকিলে মনও চঞ্চল থাকিবে। মানুষ শৈশবাবস্থায় বড়ই চঞ্চল থাকে। ক্রমে-ক্রমে এ চঞ্চলতা নষ্ট করা উচিত।

আমরা বহুক্ষণ ব্যাপিয়া কোন বিষয়ে অবধান করিতে পারি না। অবধান-তরঙ্গের উত্থান-পতন, হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। সময়নিরূপণ যন্ত্রের দোলকের ন্যায় ইহা অবিরত দুলিতেছে —আসিতেছে এবং যাইতেছে। ত্রিশ সেকেণ্ডের অধিক বোধ হয় মনকে কোন একটি বিষয়ে এককালে নিবিষ্ট রাখিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ মনোযোগ ৫ হইতে ৬ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। একটি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ মনোনিবেশ করিতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু বাস্তবিক সে বিষয়টি এক নহে—তাহার পৃথক-পৃথক অংশ আছে, পৃথক-পৃথক অবস্থা আছে। অবধান এক অংশ হইতে অন্য অংশে, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় ধাবিত হইতেছে। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবিটি দেখিতেছি সত্য, কিন্তু ইহার কোন এক অংশে আমার চিত্ত অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। কখনও ইহার নয়নে, কখনও ইহার নাসিকায়, কখনও ইহার অধরে আমার দৃষ্টি স্থাপিত হইতেছে—কিন্তু কোন একটিতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছে না। ঐ দেখ, একজন হতভাগ্য নিতান্ত অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার উপেক্ষিতা স্ত্রীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এখানে চিন্তার বস্তু এক হইলেও তাঁহার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে।

"ওই টুকু বক্ষে গুণ-সমুদ্রের এ প্লাবন
কেমনে —কি ভাবে এল ? ও জীবন-মাঝে, আহা—
এত বুদ্ধি, এত সহ, এত পবিত্রতা, যাহা
আমাদেরো এ জীবনে হ'ল নাক সঞ্চারিত—
কেমনে ও হিয়ামাঝে হ'ল তাহা বিকসিত !
করিয়াছি অবহেলা,—সত্য, বিনা দোষে, মরি—
তোমারে গো এতকাল নিয়তই তুচ্ছ করি' !
এত গুণ তব ! তবে, করিবে না কি গো ক্ষমা—
আমার সে শত দোষ দেখি ?
চির মনোরমা সত্যই এ নারী-জাতি !
রূপে ? নহে—তাহা নহে !
অতুল গুণেরি প্রভা নিত্য দীপ্ত হ'য়ে রহে
ওই পুণ্য তনু 'পরে ; স্বচ্ছ ঐ দেহ যেন
করিতেছে বিকীরণ অন্তরের আভা হেন।
তাই তুমি মধুময়ী,—অপরূপ রূপবতী !
তাই বিশ্বে নানা ভাবে ওঠে নিত্য এ আরতি
তোমাদের হে সুন্দরি !"

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া একখানি পুস্তক পড়িতেছি। একই বিষয়ে নানা বিষয়ের সমন্বয় আছে— আমার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে। এক পুস্তকে নানা ভাবের সমাবেশ আছে—আমার মন ভাব হইতে ভাবান্তরে যাইতেছে। বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে,—ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই সামান্য—অতি সামান্য ব্যবধানের মধ্যেই অবধানের বিশ্রামলাভ ঘটিতেছে ; সুতরাং অবধান-শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে না।

লোকে বলে একসঙ্গে একাধিক কাজ করা যায় না ; কিন্তু ইহা সকল সময়ে সত্য নহে। চিত্রকর অঙ্কন করিতেছে, ধূমপান করিতেছে এবং কথোপকথন করিতেছে। অভ্যাসের বলে একসঙ্গে এক সময়ে ৪।৫ প্রকার কাজ করিতে পারা যায়। কিন্তু একই সময়ে একের অধিক বস্তু কি অবধান করা যায় ? তোমার সম্মুখে ক খ গ এই তিনটি অক্ষর লিখিলাম। তুমি কি তিনটিকেই একসঙ্গে দেখিতেছ ? না, প্রথমে ক পরে খ—এই প্রকারে এক-একটি করিয়া তিনটি ক্রমান্বয়ে দেখিতেছ ? কেহ-কেহ বলেন যে, আমরা এক সময়ে একের অধিক বস্তু অবধান করিতে পারি না। এখানে প্রথমে ক, পরে খ, পরে গ অবধান করিতেছি। তিনটিকে একসঙ্গে অবধান করিতেছি না—এক-একটি করিয়া তিনটিকে অবধান করিতেছি। এই তিনটি অবধানের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত কম বলিয়া আমাদের ইহা বোধগম্য হইতেছে না ;—সেই জন্য মনে হইতেছে যে, তিনটিই আমরা এক সময়ে অবধান করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আবার কেহ-কেহ বলেন যে, আমরা ৪।৫টি বস্তু এক সময়ে অবধান করিতে পারি। এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন।

একাধিক বস্তুতে এক সময়ে চিত্তসন্নিবেশ করিতে পারিলেও, সকলেই একসঙ্গে সমান ভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না। সকলেরই ছায়া সমানভাবে চিত্তফলকে প্রতিফলিত হয় না। "সম্মুখের চিত্রখানিতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর। ইহার সকল অংশই কি সমানভাবে, অতি পরিস্কার রূপে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে? সম্পূর্ণ ছবিখানি দেখিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার প্রত্যেক অংশেই সমান মনোযোগ দিতে পারিতেছ না। যখন ছবিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ, তখন সমস্ত ছবিটি তোমার দৃষ্টি-গোচর হইলেও—ইহার কোন একটি অংশ তোমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই, এবং সেই অংশটি অপর অংশ অপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট দেখাইবে। যখন ইহার চক্ষুতে তোমার বিশেষ দৃষ্টি ন্যস্ত হইবে, তখন নাসিকা, কপোল, ওষ্ঠ প্রভৃতি তোমার দৃষ্টির অগোচর হইবে না; কিন্তু চক্ষু যত সুস্পষ্ট বোধ হইবে, উহারা তত সুস্পষ্ট বোধ হইবে না। বহুদর্শী শিক্ষককে শিক্ষাদানকালে এককালে অনেক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। তাঁহার বক্তব্যের মূল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়—সঙ্গে-সঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের আনুসঙ্গিক বিষয়েও মনঃসংযোগ করিতে হয়। বক্তব্য বিষয়টি কেমন করিয়া বলিতে হইবে, কোন্‌টির পর কোন্‌টি বলিতে হইবে, কোন্ উদাহরণটি কোন্ সময়ে বলিতে হইবে—ইত্যাদি নানাবিষয়ে চিত্তসন্নিবেশ প্রয়োজন। বক্তৃতার সময়ে শিক্ষক বুঝিতে পারেন—কোন্ ছাত্রটি মনোযোগী এবং কোন্‌টি অমনোযোগী; কে চঞ্চল এবং কে স্থির। সুতরাং এই প্রকার বাহ্যিক বিষয়েও তাঁহাকে মনঃসংযোগ করিতে হয়। এইরূপে শিক্ষককে একসঙ্গে বহু বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইতেছে সত্য, তথাপি তাঁহার মন মূল আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট।

"সংসারের নানা কাজে কর আত্ম-নিবেদন
যতনে রাখি হৃদয়ে বিভু-চিন্তা অনুক্ষণ।"

মনকে এইরূপে একসঙ্গে সংযত এবং বিক্ষিপ্ত রাখিতে অভ্যাস এবং সাধনার প্রয়োজন। শিক্ষকের মন সংযত এবং বিক্ষিপ্ত, কিন্তু ছাত্রের মন বিক্ষিপ্ত নহে—ইহা সংযত। শিক্ষককে বহু বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়—ছাত্রকে মাত্র একটি বিষয়ে—শিক্ষকের কথিত বিষয়ে।
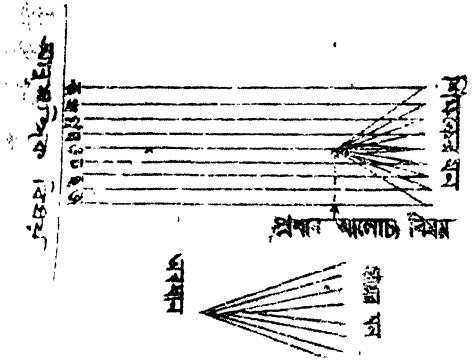
অতএব দেখা যাইতেছে যে, অবধানের মাত্রা আছে। সকল বিষয়ে বা সকল সময়ে সমানভাবে মনোনিবেশ করা যায় না। বালক-বালিকাদিগকে অন্য সময় অপেক্ষা প্রাতঃকালে অধিক মনোযোগী দেখা যায়। শিক্ষা-বর্ষের প্রারম্ভে ছাত্রগণকে যত মনোযোগী দেখা যায়, পরে আর ততটা দেখা যায় না। নিস্পৃহ ছাত্র অপেক্ষা স্পৃহাবান ছাত্রই অধিক মনোযোগী হয়।

শারীরিক দুর্ব্বলতা অবধানের অন্তরায়। যাহার শরীর দুর্ব্বল, যে ব্যাধিগ্রস্ত, সে অবধান-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না। শারীরিক অপটুতা বংশানুগত হইতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কিংবা দূষিত বায়ু সেবনেও শরীর অপটু হইয়া পড়ে। যে কারণেই হউক, অপটু শরীরে মন পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল থাকে। এরূপ মনের অবধান-ক্রিয়াও চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী হইবে। গমনশীল শকটযানে বসিয়া একখণ্ড কাগজে যেমন কোন অক্ষর সুন্দর ভাবে লিখিতে পারা যায় না, তেমনি এবম্বিধ মনের উপর কোন ভাবেরই সুন্দর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না।

পারিপার্শ্বিক বাহ্যিক অবস্থাও আমাদের অবধান-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। বাহিরের গোলমাল এবং উপদ্রব আমাদের চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল উপদ্রব হইতে মনকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য।

"বিক্ষিপ্ত হৃদয়-অণু
বাহিরের শত কাজে,
আপনা হারা'য়ে ফেলি
চঞ্চল বিশ্বের মাঝে।"

যে স্থানে সুবিমল বায়ু-সঞ্চালনের পথ নিরুদ্ধ, সে স্থানে অবধান-কার্য্য ভাল হয় না। নির্ম্মল বায়ুর অভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবাধগতির প্রতিবন্ধকতা হয়, শরীরে অবসাদ উপস্থিত হয়—মনের শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মানসিক ক্রিয়ার জন্য শারীরক্রিয়াও আবশ্যক। শরীর নিষ্ক্রিয় রাখ, মনও নিষ্ক্রিয় হইবে। সকলেরই মন এক রকম নহে। তুমি যাহা সহজে অবধান করিতে পার, আমি হয় ত তাহা বহু কষ্টেও অবধান করিতে পারি না। সেইজন্যই একজন দার্শনিক, আর একজন বৈজ্ঞানিক হইতেছেন। সেই জন্যই কেহ যুদ্ধবিদ্যায়, কেহ কলাবিদ্যায়, কেহ চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। অতএব মনের গ্রাহিকা-শক্তি অবধানের অন্তরায়ও বটে, সহায়ও বটে—উপযুক্ত বিষয়ে সহায়, অনুপযুক্ত বিষয়ে অন্তরায়। কোন্ বিষয়টি কোন্ মনের অনুরূপ, ইহার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। কখন-কখন মানুষের অতিবিশ্বাস হইতেও অনবধানতা আসিয়া পড়ে।

"বাছা রে! করিস রণ।
না করিস তুচ্ছ,　　　হয় যদি শত্রু
অতি ক্ষুদ্র তৃণোপম।"

এ বিষয়টি আমার পক্ষে অতি সহজ, ইহাতে আমার আয়াসের প্রয়োজন হইবে না, যত্ন আবশ্যক হইবে না, যখন ইচ্ছা ইহাকে আয়ত্ত করিয়া লইব—এই প্রকার বিশ্বাস হইতে অনবধানতা আসিয়া পড়ে। চিত্তের অশান্তি এবং অপ্রসন্নতা অনবধানতার আর একটি হেতু।

"পতি-সঙ্গহীনা
বনবিহঙ্গিনী মত করিছে নবীনা
ছট্ ফট্ শিবিরেতে উঠিয়া-বসিয়া।
এবার বসিল বামা বীণাটি লইয়া।
গাহিতে লাগিল, কণ্ঠ হয় না মধুর।
এত যত্ন তবু বীণা বাজিছে বেসুর।
আবার বাঁধিতে বীণা ছিঁড়ে গেল তার।"

শৈশবকালের অবধান সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ অবধান। অবধান-ক্রিয়াকে ইচ্ছামত সংযত এবং সঞ্চালিত করিবার শক্তি শিশুদের থাকে না। ইহাদের অবধান এক্ষণে বাহ্যশক্তির দান। যাহা দেখিতেছে, যাহা শুনিতেছে, তাহাতেই ইহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। একটি শব্দ হইল, শিশুর চিত্ত সেই দিকেই ধাবিত হইল। বাহ্যশক্তিই শিশুর চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু উদ্বোধক যদি ক্ষীণ হয়, যদি অস্পষ্ট হয়—তাহা হইলে শিশুর মন তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না। শিশুর মনকে আকর্ষণ করিতে হইলে, উদ্বোধকের যথেষ্ট শক্তি-প্রাচুর্য্য থাকা আবশ্যক। একটি ক্ষুদ্র শিশুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আস্তে-আস্তে করতালি দিতে থাক, দেখিবে, সে উহা শুনিতে পাইতেছে না। একটি উচ্চ শব্দ কর, অচিরাৎ শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। কিছু দিন পরে দেখিবে, সামান্য শব্দেও শিশুর চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে যে শব্দ শিশু লক্ষ্য করিত না, এখন তাহা লক্ষ্য করিতেছে। এখন আর উদ্বোধকের তত শক্তি-প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন হয় না। এই হইল অবধানের প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় যদি শিশুটির সম্মুখে একটি বাতি জ্বাল, শিশুর দৃষ্টি সেই দিকেই যাইবে। আবার সেই সময়ে যদি একটি শব্দ কর, শিশুর মন সেই দিকেই যাইবে। এখন ইহার মন চঞ্চল—অতি সহজে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ধাবিত হয়। অবধানের দ্বিতীয় অবস্থায় এই চাঞ্চল্যের উপশম হইতে আরম্ভ হয়। শিশুর মন আর তত সহজে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায় না। এখন শিশুটির সম্মুখে একটি বাতি জ্বাল, দেখিবে, সে উহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছে। এখন তুমি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করতালি দিতে থাক—দেখিবে শিশুটি আলোর দিকেই তাকাইয়া আছে—তোমার কৃত শব্দে তাহার মন যাইতেছে না। এখন সে আকৃষ্ট বস্তুতে মনকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে। এখনও ইহার অবধান নিরপেক্ষ—এখনও বাহ্যবস্তুই মন আকর্ষণ করিতেছে। তবে যাহাতে মন আকৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে কিয়ৎকাল স্থায়ী হইতেছে। মনকে একটি বিষয়ে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট রাখিবার শক্তি হইয়াছে। এ শক্তি বাহিরের নয়—ভিতরের; এ শক্তি বাহ্যবস্তুর নয়—মনের। এই শক্তিই সাপেক্ষাবধানের প্রথম সূচনা। নিরপেক্ষাবধান সাপেক্ষাবধানে পরিণত হইবার এই প্রথম উপক্রম। এই অবস্থাটিকে অবধানের দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। তার পর ক্রমে-ক্রমে সাপেক্ষাবধানের পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল। ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। শিশু মনকে সংযত করিতে সমর্থ হইল। ইহাই অবধানের

তৃতীয় অবস্থা। ঐ দেখ, শিশুটি কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার পদধ্বনি শ্রবণে কিঞ্চিৎকাল প্রয়াস পাইল। মা আসিলেন না। বালক পুনরায় ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। পদধ্বনি-শ্রবণে আয়াসের প্রয়োজন। ক্রন্দন বন্ধ করিতে এবং আরম্ভ করিতেও আয়াসের প্রয়োজন। সুতরাং এ সকল কার্য্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অবধান সাপেক্ষাবিধান।

চূর্ণ-অভিমান

[শ্রীভবানীচরণ ঘোষ]

৮

যতীন্দ্রনাথ স্ত্রীর শয়ন-কক্ষে গেলেন। ভামিনী পালঙ্কে শুইয়া ছিলেন; যতীন্দ্র পার্শ্ববর্ত্তী তক্তপোষের উপর বসিলেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন;—"বড় ডাক্তার কি বলিলেন?" "বলিলেন, তুমি শীঘ্রই আরাম হইয়া উঠিবে।" "আমি আরাম হইলে তুমি সুখী হইবে?" যতীন্দ্র নীরবে ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সুখী?—লোকে স্বর্গসুখ কামনা করে, তুমি আরাম হইয়া উঠিলে, আমি যে মর্ত্ত্যেই সে সুখ—অপার আনন্দ লাভ করিব? তাহাতে কি তুমি সন্দেহ কর?"

মৃদু হাসিয়া স্ত্রী উত্তর দিলেন,—"না। তুমি স্বামী, তোমাকে সুখী করিতে পারিলে, আমার নারীজন্ম সফল হইবে। কিন্তু আমার নীরোগ হইয়া উঠা, না উঠা ত দেবতার হাতে!"

"দেবতা অবশ্যই আশীর্ব্বাদ করিবেন; কিন্তু কতকটা তোমার নিজের চেষ্টার উপরও নির্ভর করে।" "আমার উপর! কেমন করিয়া?—তুমি ত চেষ্টার, চিকিৎসার কোন ত্রুটি করিতেছ না!" "চিকিৎসা হইতেছে, আরও হইবে; কলিকাতায় যতদূর হইতে পারে, তাহা হইবে। কিন্তু—" "কিন্তু কি?" "একটী কথা,—তোমার কোনরূপ মনোকষ্ট আছে?" "মনোকষ্ট! তুমি ত—আমি অনুক্ষণ দেখিতেছি—তুমি ত আমার কষ্ট নিবারণের জন্য, আমার সুখ-সুবিধার জন্য দিবা-রাত্রি চেষ্টা করিতেছ!—আমি অন্ধ নই—প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ!" "আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ?"

"তোমার অপরাধ!—তুমি অপরাধী!—আমার নিকট! আমাকে পাপ-সমুদ্রে ডুবাইও না!" "একটী কথা তোমাকে বলিব। সেই—সেই সাহায্য—তোমার পিতা-ঠাকুরকে যে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম—" "তুমি সেই কথা বলিতেছ?—তাহাতে তোমার কি অপরাধ?" "তোমার কলঙ্ক!" ভামিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল;—"দেখ, ছেলেবেলা হইতে আমার না কি বড়ই অভিমান। বাবা একটুকু শাসন করিলে, মা একটুকু গালি দিলে আমি অত্যন্ত অভিমান করিতাম। বোধ হয়, সেই ছেলেবেলার স্বভাব তখনও আমার একেবারে যায় নাই, তাই অভিমানে কলঙ্কের কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু শোন, তাহার পর যখন তোমাকে দেখিলাম, তোমার অন্তর বুঝিতে আরম্ভ করিলাম, সেই হইতে আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। আমার অভিমান চলিয়া যাইতে লাগিল; বোধ হয়, এখন একেবারেই নাই।"

যতীন্দ্র স্ত্রীকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলেন। ভামিনী বলিতে লাগিল,—"শুধু লোকের কথায় সময়-সময় মনে একটুকু লাগে মাত্র, এখন তাহাও নাই, আর লাগিবে না।" ভামিনী নিজের হাত স্বামীর দিকে একটুকু বাড়াইলেন। যতীন্দ্র অতি যত্নে, অতি সাবধানে হাতখানি দুই হাতে ধরিয়া একটু উঁচু করিলেন। ভামিনী বলিল,—"আজ এ কথা তুলিলে কেন?" "ডাক্তারের সন্দেহ হইয়াছে, তোমার মনে বা কোন গুপ্ত কষ্ট আছে। তাহা দূর হইলেই তুমি শীঘ্র-শীঘ্র সারিয়া উঠিবে; আর আমার অপার আনন্দ হইবে।" হাসিয়া ভামিনী বলিল,—"তাহা দূর হইয়াছে, লেশমাত্রও রহিল না। তুমি সুখী হইলে কি আমার সুখ হইবে না—হয় না?—তুমি একটুকু এগিয়ে এদিকে বস'।" যতীন্দ্র ইতস্ততঃ করিলেন—ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু কাছে আসিবার জন্য ভামিনী স্বামীকে ইঙ্গিত করিল। যতীন্দ্র

কিঞ্চিৎ এগিয়ে বসিলেন। ভামিনী হঠাৎ স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া বলিল,—"আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি!" যতীন্দ্র দ্রুতহস্তে নিজের পদপ্রান্ত হইতে স্ত্রীর হাত তুলিয়া লইয়া তাহাতে প্রগাঢ় চুম্বন করিলেন; বলিলেন,—"তুমি আমাকে কষ্ট দাও নি, আমাকে স্বর্গসুখের অধিকারী করিয়াছ!" ভামিনী আপনার স্মিত-প্রফুল্ল মুখ বাড়াইয়া স্ফুরদধরে এরূপ আগ্রহ অভিব্যক্ত করিল যে, চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামী সে স্বতঃ অনুকূল ইঙ্গিত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তখন স্মিত মুখে ভামিনী বলিল,—"তুমি আর চিন্তা করিও না, কোন সন্দেহ করিও না। আমার কোন কলঙ্ক নাই, অভিমান-অহঙ্কার নাই!—আমি আরাম হইব?" হর্ষোৎফুল্ল যতীন্দ্র বলিলেন,—"অবশ্যই হইবে।" "তোমাকে সুখী করিতে পারিব?" "পরম সুখী করিবে।" পরদিন ডাক্তার রোগিনীকে দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন; যতীন্দ্রনাথকে জানাইয়া গেলেন, পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা অবস্থা ভাল। তিন চারি দিন মধ্যে ভামিনীর অবস্থা সকলের নিকটই কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইল। জ্বর অতি সামান্য মাত্র, দুর্ব্বলতাও কম, আহারেও রুচি হইয়াছে; মুখের বর্ণও যেন কতকটা ফিরিয়াছে। যে মুখ এতদিন চিন্তা ও বিষাদের ছায়াপাতে মলিন দেখাইত, এখন যেন তাহাতে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি-ই দেখা যাইতে লাগিল।

ভ্রাতৃবধূ রাধারাণীকে আনাইবার জন্য ভামিনী স্বামীকে শক্ত করিয়া ধরিল। যতীন্দ্র এমন অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন যে, নবীনচন্দ্র কন্যা এবং স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। রাধারাণীকে পাইয়া ভামিনীর খুব আনন্দ হইল। সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া ভামিনীর চিত্ত প্রফুল্লই হইয়া উঠিল। কুমি ত সমস্ত ঘড়বাড়ী আনন্দ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিয়া তুলিল। রাধারাণী দু'এক দিনের মধ্যেই ভামিনীর ঘর-বাড়ী, দালান, পুকুর, বাগান সমস্ত ঘুরিয়া দেখিলেন। তৈজসপত্র, আস্‌বাব—সমস্ত দেখিলেন। অলঙ্কারপত্র দেখিতে চাহিলেন। সে সমস্ত বাহির করিয়া দেখাইবার উপযুক্ত সামর্থ্য ভামিনীর ছিল না। সে চাবি বাহির করিয়া দিল। রাধারাণী দেরাজ-আলমারি খুলিয়া, সে সমস্ত স্মিতচক্ষে দেখিলেন। সর্ব্বোপরি দেখিলেন, লক্ষ্য করিলেন, যতীন্দ্রের ব্যবহার;—তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সেবা-শুশ্রূষা, যত্ন-চেষ্টা, আর স্ত্রীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম, প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা। দেখিয়া-শুনিয়া রাধারাণী মুগ্ধ হইলেন। কত পুণ্যের ফলে এমন স্বামী, এমন ঘরসংসার লাভ! এক দিন রাধারাণী ভামিনীকে বলিলেন,—"কি পুণ্য করিয়াছিলি, ভাই ঠাকুরঝি?" "কি বলিতেছ, বৌদি?" "কত পুণ্যই তুই করিয়াছিলি। জন্ম-জন্মান্তরের কত সুকৃতি লইয়া তুই এবার সংসারে আসিয়াছিস্, ভাই!" ভামিনী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল। রাধারাণী বলিলেন,—"এমন ঘরবাড়ী, এমন ধনসম্পত্তি, আর এমন স্বামী বহু জন্মের সঞ্চিত বহু পুণ্যের ফলে স্ত্রীলোকের লাভ হইয়া থাকে। তুই ভাই এমনি ভাগ্যবতী!"

ভামিনী মৃদু-মৃদু হাসিল। মনে-মনে স্বামীর চরণোদ্দেশে প্রণাম করিল; বলিল,—"এমনি যদি হইয়া থাকে, তবে তোমাদের আশীর্ব্বাদে, বৌদি; আমার কোন পুণ্য নাই।"

দৌড়িয়া কুমি আসিল। বাগানের মালী তাহাকে একটা সুন্দর ফুলের তোড়া বানাইয়া দিয়াছে, তাহার আঁচল ভরিয়া গোলাপ, বেল, যুঁই, চামেলি ফুল দিয়াছে। কুমি দৌড়িয়া আসিয়া তক্তপোষে মায়ের নিকট বসিয়া পালঙ্ক-শায়িনী ভামিনীকে বলিল,—"পিসীমা, তুমি নেবে?"—বলিয়া ফুলের তোড়াটী পিসীমার হাতে দিল। আঁচল হইতে সেই গোলাপ, বেল, যুঁই, চামেলি বাহির করিয়া স্মিত-মুখে কুমি পিসীমার শয্যাপার্শ্বে ছড়াইয়া দিল। পিসীমা উঠিয়া বসিলেন, কুমিকে কাছে আনিয়া বেল, গোলাপ, চামেলি ফুলে তাহার খোঁপা সাজাইয়া দিলেন, কাণে ফুল পরাইয়া দিলেন। তখন পিসীমা সেই সুন্দর মুখ চুম্বিত করিলেন। কুমি ছুটিয়া নীচে নামিল, দেয়ালে খাটানো বৃহৎ আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের সজ্জিত প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

ভামিনী রাধারাণীকে বলিল, "আমি বাঁচিয়া থাকিলে কুমির বে আমি দিব, বৌদি।" "তুই সারিয়া ওঠ্, ঠাকুরঝি; কুমি ত তোরই।" এমন সময় যতীন্দ্রের আগমনের সাড়া পাইয়া রাধারাণী তক্তপোষ হইতে নীচে নামিলেন। যতীন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"ও কি! আপনি বসুন; উঠিলেন কেন? বসুন, বসুন।" রাধারাণী আসীমন্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া ভ্রূ-সীমা পর্য্যন্ত নামাইয়া তক্তপোষের উপর

সঙ্কুচিত হইয়া বসিলেন। সম্পর্কে ছোট হইলেও বয়সে বড় ঠাকুরজামাই, সঙ্কোচ ত স্বাভাবিক। কিন্তু যতীন্দ্রের অনুরোধ, প্রার্থনা, আগ্রহ, অবশেষে হাস্যময় কোপপ্রকাশে রাধারাণী তাঁহার সঙ্গে দুই-একটি করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বেলা কেমন দেখিতেছেন ?" রাধারাণী মৃদু স্বরে বলিলেন,—"অনেক ভাল।" শয্যায় বিক্ষিপ্ত ফুলের রাশি দেখিয়া যতীন্দ্র বলিলেন,—"এ কি! এত ফুলের ছড়াছড়ি!—কে আনিল ?" ভামিনী সঙ্কেতে আরসীর নিকটস্থা কুমিকে দেখাইয়া দিল। যতীন্দ্র ডাকিলেন,—"ও কুমি, এ দিকে আয়।" যতীন্দ্র নিজেই অগ্রসর হইয়া হাত ধরিয়া কুমিকে কেদারার নিকটে আনিলেন। তাহার খোঁপায় এবং কাণে দিব্য পুষ্পসজ্জা! যতীন্দ্র আদরে তাহার মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন,—"ওগো, কুমি যে রূপে তার মাকেও পরাস্ত করিবে!" রাধারাণী হাসিয়া বলিলেন,—"মায়ের ত ভারি রূপ!" যতীন্দ্র বলিলেন,—"আমাদের চক্ষু আছে!" রূপের প্রসঙ্গ উঠিতেই কুমি অতর্কিতে বলিয়া ফেলিল,—"আমার পিসীমার মত সুন্দরী কেহই নাই!" তখন মা, পিসীমা, পিসেমশায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। কুমি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। হাসির বেগ থামিলে যতীন্দ্র বলিলেন,—"খুব ভাল ঘরে, সুন্দর বর দেখিয়া বে দিব, কেমন গো, কি বল ?" ভামিনী হাসিলেন। রাধারাণী প্রফুল্লমুখে ভামিনীকে বলিলেন,—"তোরা এমনি করিয়া এক মন, এক প্রাণে একই কথা ভাবিস্ না কি, ঠাকুরঝি ?" (যতীন্দ্রের দিকে মুখ কিঞ্চিৎ ফিরাইয়া),—"ঠাকুরঝিও ত ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন!" "তবে ত দেখিতেছি, আমরা এক—এক মন-প্রাণই হইয়াছি!" রাধারাণী ভামিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিলেন। ভামিনী প্রসন্নমুখে গ্রীবা বক্র করিয়া তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষক্ষেপ করিল।

(৯)

বাস্তবিক এই ছয়-সাত দিন মধ্যে ভামিনীর শরীরে বেশ একটা শুভ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। মুখে স্ফূর্ত্তি ও হাসি-খুসির ভাব দেখা দিল, লাবণ্যও ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সপ্তম দিবসে বড় ডাক্তার আসিলেন। অন্য দুইজনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা রোগিনীর অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া খুব আশান্বিত হইলেন। পৃথক কক্ষে যাইয়া বড় ডাক্তার যতীন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনার স্ত্রীর অবস্থা অনেক ভাল। এখন আমাদের খুব ভরসা হইতেছে। সে দিন আমি যে একটি অনুমান করিয়াছিলাম—ইহাঁর কোনরূপ একটা কিছু মানসিক কষ্টের কথা, তাহা কি—" "হাঁ, ঐরূপ একটা কিছু হেতু ছিল। কিন্তু আমার বোধ হয় এখন তাহা দূর হইয়াছে।" "আমারও তাই মনে হয়। বেশ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে। তবে আপনি যদি আমার পূর্ব্ব পরামর্শ—" "রক্ত সঞ্চালন ?" "হাঁ।" "আমি আজই প্রস্তুত।" "তাহা করিলে, ভরসা করি, ইনি অতি শীঘ্রই নিরাময় ও সবল হইয়া উঠিবেন। কিন্তু আজ আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। আপনার অভিমত হইলে আমি আগামী পরশ্ব অস্ত্রাদি লইয়া আসিব।" তাহাই ঠিক হইল। যতীন্দ্র সে কথা কাহাকেও জানাইলেন না। পরামর্শের সময় নবীনচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি গোপনে রাধারাণীকে জানাইলেন, কিন্তু ভামিনীকে বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন চিকিৎসকগণ আসিলেন। আসিয়াই প্রথমে ভামিনীকে একটি ঔষধ সেবন করাইলেন। অন্য কক্ষে যাইয়া যতীন্দ্রকেও একটি ঔষধ খাওয়াইতে চাহিলেন। যতীন্দ্র বলিলেন,—"আমাকে কেন ?" ডাক্তার বলিলেন,—"আপনার কিছু কষ্ট হইতে পারে, সেই জন্য—" "সেই জন্য আমাকে কিঞ্চিৎ চেতনাহীন করিতে চাহেন ?" "হাঁ।" "আমার শরীর হইতে কি পরিমাণ রক্ত আবশ্যক হইবে ?" "অতি অল্প।" "তার জন্য আমাকে অজ্ঞান করাইবেন ?—কোন প্রয়োজন নাই। আমি স্থির হইয়া থাকিব। আমার কোন কষ্ট হইবে না।" "আচ্ছা, তবে আপনার আর ঔষধের প্রয়োজন নাই।" ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া দেখিলেন, রোগিনী নিদ্রিতা হইয়াছেন। তখন সময় বুঝিয়া স্বামীর বাম বাহু হইতে উপযুক্ত অস্ত্র ও যন্ত্র সহযোগে স্ত্রীর দক্ষিণ বাহুতে রক্ত সঞ্চালন করিয়া দিলেন। নবীনচন্দ্র ব্যতীত বাড়ীর আর কেহ সে ঘরে উপস্থিত রহিলেন না; কিন্তু রাধারাণী জানালার ফাঁক দিয়া গোপনে সমস্তই দেখিলেন। তিনি মনে-মনে কহিলেন,—"যাকে বলে স্বামী!—ক'জনের এমন সৌভাগ্য!" যতীন্দ্র নির্ব্বিকার-চিত্তে স্থির হইয়া

বসিয়া রহিলেন। রক্ত-সঞ্চারণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, ডাক্তার ভামিনীর সামান্য ক্ষতে ঔষধ লাগাইয়া বাহু জড়াইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন; বলিলেন,—"ইনি কিছুকাল নিদ্রা যাইবেন, সে নিদ্রা কেহ যেন ভঙ্গ না করেন; ইনি নিজেই সুস্থদেহে জাগিয়া উঠিবেন। এ ঘরে বেশী লোক থাকার কোন প্রয়োজন নাই।" ডাক্তার অন্য ঘরে চলিয়া গেলে নবীনচন্দ্র, রাধারাণী ও ললিতা ঝিকে সে ঘরে থাকিয়া নীরবে ভামিনীকে বাতাস করিতে বলিয়া গেলেন। ডাক্তার যতীন্দ্রের বাহু ক্ষতেও ঔষধ দিয়া সেইরূপ একটী ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন; বলিলেন,—"আপনি আজ আর আফিসে যাইবেন না, বাড়ীতেই বিশ্রাম করিবেন। অপারেসন খুব সুন্দর হইয়াছে, রোগিনী শীঘ্রই সবল হইয়া উঠিবেন। আপনার খুব সাহস ও সহিষ্ণুতা! যদি আবার এইরূপ অপারেসন করিতে হয়—" "আমি প্রস্তুত।" "তাহা বুঝিতে পারিতেছি। তবে, বোধ হয় আর আবশ্যক না-ও হইতে পারে। এক সপ্তাহ পরে আমি আসিয়া দেখিব।" যতীন্দ্রনাথের করমর্দ্দন করিয়া চিকিৎসকেরা চলিয়া গেলেন। তিন ঘণ্টা পরে ভামিনী জাগ্রত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। রাধারাণীকে বলিল,—"আমি অসময়ে এমন ঘুমাইলাম!" "ডাক্তারের ঔষধেই বোধ হয় তোমার ঘুম আসিয়াছিল।" "তাই ত, এখনো আমার অলস ভাবটা যাইতেছে না।" (নিজের দক্ষিণ বাহুর আস্তিন গুটানো এবং তাহাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখিয়া)—"এ কি? ব্যাণ্ডেজ কেন?" "খুলিও না, ডাক্তার ওখানে যেন কি ঔষধ দিয়াছেন, তাই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।" ভামিনীকে বারংবার দ্বারের দিকে চাহিতে দেখিয়া রাধারাণী বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন,—"যতীনবাবু আজ আফিসে যান নাই, ওঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন। "ঘুম? এমন সময় ত তিনি কোন দিন ঘুমোন না!" "ডাকিব?" "না, না। কিন্তু—" "দেখিয়া আসিব?—আচ্ছা, আমি যাই।" রাধারাণী সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কিছু কাল পরেই যতীন্দ্র সে ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাধারাণীও আসিতেছেন ভাবিয়া ভামিনী মাথার কাপড় টানিয়া নামাইতেছিল, কিন্তু রাধারাণী আসিলেন না। যতীন্দ্র প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কেমন আছ?" "আমি বেশ আছি। তুমি ঘুমিয়েছিলে? তোমার কোন অসুখ করিয়াছে?" "না। এই একটুকু বিশ্রাম করিতেছিলাম।" "আমার জন্যই তোমার শরীর গেল।" "পাগল তুমি!" "এমন গরমের দিনে অমন মোটা জামাটা পরিয়াছ কেন?"

নিজের বাহুর ব্যাণ্ডেজ অদৃশ্য রাখিবার জন্যই যে মোটা জামা পরিয়াছেন, যতীন্দ্র অবশ্যই তাহা বলিলেন না। তিনি বলিলেন,—"হাতের কাছে এইটাই পাইলাম, তাড়াতাড়ি পরিয়াছি।" "আচ্ছা।—দেখ, ডাক্তার আমার হাতে কি যেন ঔষধ দিয়া কেমন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছেন।" "আমি দেখিয়াছি; আমি ত তখন তোমার কাছেই ছিলাম। কোন ব্যথা আছে?" "কিছু না।" এমন সময় রাধারাণী আসিয়া যতীন্দ্রকে বলিলেন,—"আপনি যান্, আপনার ভাত আনিয়াছে।" "এঁর?" "এই আনিতেছে।" যতীন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আহারে এই বিলম্ব দেখিয়া স্ত্রী নিতান্তই ক্ষুব্ধ, দুঃখিত হইয়াছেন,—একটা ছোট খাটো বাক্‌যুদ্ধই বা উপস্থিত হয়! তিনি বিলম্ব না করিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। ভামিনী রাধারাণীকে বলিল,—"উনি এখনো অনাহারে আছেন?" "হাঁ, আমি অনেকবার বলিয়াছি, তিনি শুনিলেন না। তোমাকে সুস্থ অবস্থায় না দেখিয়া কোন মতেই স্বীকার হইলেন না"—(হাসিয়া) আমার কি দোষ?" "তোমার আহার না হওয়া পর্য্যন্ত দাদা অনাহারে থাকেন?" "তুমি যে পীড়িত!" "তোমার কি ব্যাম-পীড়া নাই? তুমি কাতর হইয়া মরিতে বসিলেও যে, দাদা না খাইলে তুমি পথ্য কর না!" "আমরা পাড়া-গেঁয়ে মানুষ।" "আর আমি দু'দিন সহরে আসিয়াই সব উল্টো করিব?" রাধারাণী হাসিয়া বলিলেন, "তা, ভাই, ঝগড়া করিতে হয়, করিস্; আমার সঙ্গে কেন?" "তা করি, আর নাই করি।" (হাসিয়া) "বিষ্ণুপুর যাইয়া এর প্রতিশোধ আমি এক দিন লইব। দাদার আগেই আমি তোকে লইয়া খাইতে বসিব।" "তোর গলায় ঠেকিবে যে!" তখন দুইজনেই হাসিয়া ফেলিলেন। পর দিন বিকালে নবীনচন্দ্র এবং যতীন্দ্রনাথ একটু বেড়াইতে বাহির হইলেন। এদিকে রাধারাণীর মন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ নিজের রক্ত দিয়া ভামিনীর

পীড়া আরোগ্যের সাহায্য করিলেন, কেহ তাহা ভামিনীকে বলিল না! স্বামী স্ত্রীর জন্য অতদূর করিলেন, স্ত্রী তাহা জানিল না! আজ দু'দিন ত দু'জনেই বেশ ভাল আছেন, তবে বলিবার আর বাধা কি? রাধারাণী আর থাকিতে পারিলেন না। ভামিনীর কাছে গিয়া বসিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছিস্, ঠাকুরঝি?" "আজ ত আমি বেশ আছি, শরীর ভাল, সুস্থই ত বোধ হইতেছে। পোড়া মেয়েমানুষের কপালে এত সেবা-শুশ্রূষা, এত চিকিৎসা! ভাল হইব না?" "যত্ন-চেষ্টা-শুশ্রূষার চেয়েও যে বেশী হইতেছে, তা জানিস্?" ভামিনী সকৌতূহল নেত্রে চাহিয়া রহিল। রাধারাণী বলিলেন, "মেয়েমানুষের পোড়া কপাল আজকাল একটু ফিরিয়াছে, অনেক স্থলেই এমন চিকিৎসা হয়। কিন্তু তোর যে,—" "কি বৌদি?" "যতীনবাবু তোর জন্য গায়ের রক্ত"—"জল করিতেছেন, তা ত দিন-রাত দেখিতেছি।" "সেও ত অল্প কথা; তোর জন্য তিনি যে নিজের গায়ের সদ্য, জীবন্ত, টাট্‌কা রক্ত—" "বলিস্ কি, বৌদি? আমার যে গা কাঁপে!" "ভয়ের কোন কারণ নাই, তোর সৌভাগ্যের কথাই বলিতেছি। তোর হাতে ব্যাণ্ডেজ কেন?" "তুমিই ত বলিয়াছ, ঔষধ লাগাইয়া ডাক্তার বাঁধিয়া দিয়াছেন।" "সে ত আর আসল কথা নয়! তোকে বলা নিষেধ ছিল, কিন্তু আর না বলিয়া পারিতেছি না। বড় ডাক্তার বলিয়াছিলেন, তোর শরীরে রক্ত নাই, রক্ত জন্মিতে বিলম্ব হইবে। যদি তোর কোন সুস্থকায় সবল আত্মীয় নিজের গায়ের রক্ত তোর গায়ে দিতে পারেন, তবে তুই অতি শীঘ্রই সবল, সুস্থ হইয়া উঠিবি। যতীনবাবু তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে স্বীকার করিলেন।" ভামিনীর চক্ষু চমকিত, সজল হইয়া উঠিল। ভামিনী বলিল, "তার পর?" "কাল তোকে ঔষধ খাওয়াইয়া নিদ্রিত করিয়া ডাক্তার জামাইবাবুকে তোর কাছে বসাইয়া তাঁর বাঁ হাতের রক্ত কলের চুঙ্গি না কি পিচ্‌কারী দিয়া তোর ডান হাতে চালাইয়া দিয়াছেন। সামান্য না কি একটা ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়াছেন!" জলভরা চক্ষে ভামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে তখন কে-কে ছিল?" "তিনজন ডাক্তার, জামাইবাবু, আর—" "দাদা?" "হাঁ, আর কেহ না।" "তুমি কেমন করিয়া দেখিলে?" "আমি গোপনে ঐ জানালার ফাঁক দিয়া দেখিয়াছি।" "কতখানি রক্ত?" "তা কেমন করিয়া জানিব? রক্ত ত আর দেখা গেল না, তাঁর গা হইতে বাহির হইয়া তোমার গায়ে প্রবেশ করিল। তবে ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরিয়া কলটা টিপিলেন, দেখিয়াছি।" "তখন তুমি ওঁর মুখ দেখিতে পাইতেছিলে?" "হাঁ, তিনি নির্ব্বিকার মুখে বাগানের দিকে চাহিয়া ছিলেন।" "কোন কিছু আশঙ্কা, কষ্ট, বেদনার ভাব?—" "কিছুমাত্র না! সুন্দর মুখে হাসিই যেন লাগিয়া ছিল। তার পর কার্য্য শেষ হইলে, ডাক্তার যখন তোর হাতে ব্যাণ্ডেজ দিতেছিলেন, জামাইবাবু এমনি করিয়া তোর মুখের দিকে চাহিলেন যে, আমার প্রাণ পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিল। স্নেহ, ভালবাসা, চিত্তের আবেগ, প্রাণের টান—সমস্ত তাঁহার মুখে, চক্ষের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল। তুই তখন যদি সে মুখ, সে দৃষ্টি দেখতিস, ঠাকুরঝি, তুই পাগল হইয়া যাইতিস্।" ভামিনী রাধারাণীর বক্ষে মুখ রাখিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। রাধারাণী পরম স্নেহে, আদরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ভামিনী মুখ তুলিল, চক্ষু মুছিয়া ফেলিল; রাধারাণীর পদে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিল; বলিল, "বৌদি, তুমি না জানাইলে এ কথা যে আমাকে কেউ বলিত না!" "জানিনি, এখন ত্থাখ্, তোর কেমন সৌভাগ্য। লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে একটীরও এমন স্বামী-সৌভাগ্য নাই। ধনরত্ন, ঘরবাড়ী, ঐশ্বর্য্যের কথা ছাড়িয়া দে, অনেকের তা থাকে; কিন্তু হীরা-মণি-মুক্তায় সাজানো কত রাজরাণী, পাটেশ্বরী নির্জ্জনে ফুঁপিয়ে গুমরিয়া কাঁদিয়া মরে—স্বামীর ভালবাসা নাই!"

এমন সময় কুমি আসিল। তাহার গলায় ফুলের মালা, বড়-বড় দুইটী সুন্দর মালা কুমি হাতে করিয়াও আনিয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'কে দিবি, কুমি?" "একটা পিসী মাকে"—"আর একটা পিসেমশায়কে দিবি?" "পিসেমশায় মালা পরেন না, তুই পরিবি, মা?" ভামিনী হাসিয়া বলিল,—"বেশ, বেশ বুদ্ধি করিয়াছিস্, কুমি।" কুমি একটী মালা ভামিনীর এবং অপরটী মায়ের গলায় পরাইয়া দিয়া, হাস্যমুখে চলিয়া গেল। মালা পরিয়া দুইজনে হাসিতে লাগিলেন। তখন নবীনচন্দ্র এবং যতীন্দ্র সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালাধারিণীরা মালা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই যতীন্দ্র বলিলেন,—"আজ আমা-

দের বাড়ীতে এই আষাঢ়ের শেষভাগেই ফুলদোল—রাস!" ভামিনী হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। রাধারাণী পলায়নোদ্যতা! নবীনচন্দ্র বলিলেন,—"দেখেছ, যতীন বাবু, বুড়ো মানুষেরও ফুলের মালা পরিবার কেমন সাধ!" রাধারাণী সে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিন্ন মালিকা হইতে পলায়ন-পথে পুষ্পবৃষ্টি হইল! ক্ষণকাল পরেই নবীনচন্দ্র স্ত্রীর অনুসরণ করিলেন। তখন ভামিনী আর যতীন্দ্রে যে যে কথা হইল—রক্ত-সঞ্চারের কথা, আরও কত কথা, আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। সে অশ্রুবর্ষণ, সে হাস্যময় সান্ত্বনা, পদস্পর্শের সে চেষ্টা, কমনীয় হস্তে সে মধুর চুম্বন—সে সমস্ত ঘটনা আমরা বর্ণনা করিব না।

১০

এ কয়েক দিনে ভামিনীর স্বাস্থ্যের আশাতীত উন্নতি হইল। আহারে অরুচি এখন একেবারেই নাই। শরীরে রক্ত হইয়াছে, বলও হইয়াছে। ভামিনী সমস্ত ঘর বারান্দা বেড়াইতে পারে। গত কল্য ত রাধারাণী আর কুমিকে সঙ্গে লইয়া নীচে ফুলবাগানেই বেড়াইয়া আসিয়াছে। বড় ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যই হইলেন। এত শীঘ্র যে ভামিনীর এত উপকার হইবে, তিনিও তাহা মনে করেন নাই। যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সকলের সমক্ষেই রোগিনীকে বলিলেন, "আপনি ত আরামই হইয়াছেন! নিয়মমত থাকিয়া আর কয়েকটা দিন ঔষধ সেবন করিলেই আপনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন। খুব খাইবেন।"—সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।—"হাঁ, খুব খাইবেন। খুব বল হইবে। খুব দুধ খাইবেন!" যতীন্দ্রের দিকে চাহিয়া—"গোয়ালা-বাড়ীর দুধ?" "হাঁ।" "তা হইবে না; ভাল দেখিয়া একটা গাই কিনিয়া আনুন, বাড়ীতেই খাঁটি দুধ পাইবেন।" ডাক্তারের কথায় এবং উৎসাহে রোগিনীর অবগুণ্ঠিত মুখও হাসিময় হইয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ সকলের মনই প্রফুল্ল হইল।

চলিয়া যাইবার সময় ডাক্তার যতীন্দ্রনাথকে বলিয়া গেলেন;—রক্ত-সঞ্চালনের আর কোন প্রয়োজন নাই। এখন ঔষধেরও কম প্রয়োজন; তথাপি কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিলাম। নিয়মমত চলা, ভাল-ভাল পুষ্টিকর খাদ্য, খুব ভাল খাঁটি দুধ, সকল বিষয়ে যাহাতে রোগিনীর চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে তাহার চেষ্টা,—এই সব হইলে, ইনি দুই-তিন সপ্তাহ মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবেন; আর কোন চিন্তার কারণ নাই।" কয়েক দিন পরে নবীনচন্দ্র স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া বিষ্ণুপুরে চলিয়া গেলেন। ভামিনী রাধারাণীকে ছাড়িয়া দিতে খুব আপত্তি করিল। কিন্তু বাড়ীতে পিতাঠাকুরের যে নিতান্ত অসুবিধা হইতেছে, তাহা মনে করিয়া শেষে স্বীকার হইল। রাধারাণী বলিলেন,—"এখন তুই আরামই হইয়াছিস্, আমার থাকার আর কি দরকার?" "তুমি আসিয়াছিলে বলিয়াই ত, তোমার চেষ্টা-যত্নেই ত আমি ভাল হইয়াছি!" রাধারাণী ভামিনীর হাতে একটি ছোট চিম্‌টি কাটিয়া বলিলেন,—"বাড়ীর লোকে ত তোমার কোন কিছুই করে নাই!" তখন উভয়েরই হাসি পাইল। ভামিনী বলিল,—"শ্রাবণ মাসটা আমরা এখানে আছি। পরামর্শ হইয়াছে, জলবৃষ্টি থামিয়া গেলে, ভাদ্রমাসে আমরা মধুপুর যাইব। তার আগে তোমাকে একবার এখানে আসিতেই হইবে।"—হাসিয়া—"তখন খুব ভাল লেংড়া আমেরও আমদানি হইবে!" "তোকে দেখিবার সাধও যদি না হয়, আমের লোভে আসিব, স্বীকার হইলাম!"

এইরূপ হাসি-খুসি-রহস্যের মধ্যে চক্ষুর জল ফেলিতে-ফেলিতে ভামিনী রাধারাণীকে বিদায় দিল। স্বামীকে দিয়া পিতা, ভ্রাতা, ভাইবৌ এবং কুমির জন্য ভাল-ভাল ধুতি, উড়ুনি, সাড়ী ভামিনী আনাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা সমস্ত রাধারাণীর ট্রাঙ্কে সাজাইয়া দিল। কুমির কাণের ক্ষুদ্র মাকড়ীটা খুলিয়া রাধারাণীর হাতে দিল, চুণি-মতি বসানো সুন্দর একজোড়া ছোট ইয়ারিং বাহির করিয়া ভামিনী কুমির কাণে পরাইয়া দিল; বলিল, "ওর জন্য ভাবিস্ না, বৌদি; ওর ভার আমরা নিয়াছি।" পিতাঠাকুরের জন্য উৎকৃষ্ট আম, ভাল নিচুফল ও কমলা নেবু ঝুড়ি ভরিয়া ভামিনী রাধারাণীর সঙ্গে দিল। গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার সময় গোপনে আর একটা কথা ভামিনী রাধারাণীকে বলিয়া দিল,—"শ্যামা-দি যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে বলিস্ বৌদি, আমি পরম সুখে আছি!" "তুই শ্যামাকে ভাল করিয়া চিনিস্?" "খুব চিনি; তাই ত তাকে বলিবার জন্য এ কথাটা তোকে বলিয়া দিতেছি!"

তখন উভয়ে উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন। নবীনচন্দ্র স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তিন সপ্তাহ যাইতে-না-যাইতে ভামিনী নীরোগ হইয়া উঠিল। বয়সোচিত স্বাস্থ্য তাহার প্রায় ফিরিয়া আসিল। বিবাহান্তে প্রীতিশূন্য অন্তরে গুপ্ত অভিমান, প্রচ্ছন্ন ব্যাধি লইয়া ভামিনী কলিকাতায় আসিয়াছিল। তখনি ত স্বামীর চক্ষে তাহার কত সৌন্দর্য্য, কত লাবণ্য প্রতিভাত হইয়াছিল! এখন ত তার অন্তরের সে কালিমা, সে ব্যাধি দূর হইয়াছে; স্বতঃঅনুভূত পতিপ্রেমে তাহার হৃদয়, মন, দেহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; এখন ত দিন-দিন যতীন্দ্রের চক্ষে তাহার রূপ অপার্থিব—স্বর্গীয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একদিন আফিসে যাইবার পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীর হস্ত হইতে পানের থিলি গ্রহণ করিয়া তাহার লাবণ্যময় মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কোন্ স্বর্গ, অমরাবতী হইতে তুমি আমার এই ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়াছ, মিনু?" "কোথা হইতে আসিয়াছি জানি না; কিন্তু বহুপুণ্যফলে যে এই স্বর্গপুরে পৌছিয়াছি তা জানি।" যতীন্দ্র স্ত্রীর কুসুম-সুকুমার হস্তে অধর স্পর্শ করিয়া স্মিতমুখে দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

মধ্যাহ্ন-আহারের পর ভামিনী কোন দিন ঘুমাইত না। শয্যায় শুইয়া, টেবলের সম্মুখে কেদারায় বসিয়া, অথবা সুবিধা হইলে বারান্দায় কৌচের উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় পুস্তক পড়ে, কোন দিন রেসম দিয়া রুমালে, বালিসের আস্তরণে সুন্দর-সুন্দর ফুল-লতা-পাতা তোলে, কিংবা কার্পেটে উলের কাজ করে। আর একটি কাজও ভামিনীর যুটিয়াছিল। পিসিমার সঙ্গে ভামিনী কিছু-কিছু কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি ধরিয়া বসিলেন, মধ্যে-মধ্যে তাঁহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে হইবে। কোন-কোন দিন ভামিনীকে সে-কাজও করিতে হইত।

আজ কোন-কাজই তাহার ভাল লাগিল না। স্বামী বলিয়াছেন,—"স্বর্গ হইতে আসিয়াছ!" ললিতা তাহার চুল বাঁধিয়া দিবার সময়, মুকুরের দিকে চাহিয়া বার-বার সে কথা ভামিনীর মনে পড়িতে লাগিল। চুল বাঁধা শেষ হইলে ভামিনী ললিতাকে দিয়া অনেকগুলি মিঠাপানের থিলি আনাইল। তখন কক্ষের দ্বার আঁটিয়া দিয়া দেরাজ-আলমারি খুলিয়া লালরঙ্গের একটা পাতলা সেমিজ, বুটি আঁচলাদার খুব ভাল একখানা ঢাকাই সাড়ী এবং সরু সিল্কের একটা রঙ্গিন বডিস্ ভামিনী বাহির করিল। পৃথক-পৃথক বাক্স হইতে অনেকগুলি গহনাও বাহির করিল। শেষে সেই সেমিজ, সাড়ী, বডিস অতি যত্ন করিয়া নিজেই পরিল। এমন সময় ললিতা-ঝি থালায় করিয়া বাবুর জলযোগের সন্দেশ রসগোল্লা লইয়া আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিল। ভামিনী দরজা খুলিয়া দিলে, ঝি থালাখানি টেবিলের উপর আনিয়া রাখিল। ভামিনী একটা বৃহৎ ঢাকনির তলা ভাল পরিষ্কার রুমাল দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া খাবারের থালা ঢাকিয়া রাখিল।

ভামিনীর বেশভূষা এবং খোলা গহনার বাক্সগুলি দেখিয়া ললিতা বলিল,—"আজ কি কোথায়ও নেমতন্ন আছে?" "না ঝি।" "থিয়েটারে যাবে?" ভামিনী হাসিয়া বলিল, তাও না, ঝি!" মনে-মনে কহিল,—"আজ ঘরেই একটা নাটক করতে যাচ্ছি!" "তবে কি?" "কিছু না!" ভামিনী একটু হাসিল। ললিতা চলিয়া গেল। তাহার বয়সও ত্রিশ-বত্রিশের বেশী নয়। সেও মনে করিল, এরা ঘরেই আজ একটা ব্যাপার করিবে, দেখ্‌ছি!

ভামিনী তখন পুনরায় দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া, আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সোণার কাঁটা, চিরুণী ও প্রজাপতি প্রশস্ত কবরীতে পরিল। বাহুতে অনন্ত, তাড়, বাজু; হাতে বালা, ব্রেসলেট, চুড়ি, রুলি—কত কি পরিল; কণ্ঠে হার, আর সেই নেক্‌লেস্; কাণে হীরা-মুক্তা-জড়িত ইয়ারিং পরিল। অতি যত্নে সিঁথায় সিঁদুর পরিল। বাঁ হাত উঁচু করিয়া নোয়াগাছি মাথায় ছোঁয়াইয়া, শেষে তাহাকে মৃদু চুম্বনও করিল। তখন সেই বৃহৎ আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত, নব স্বাস্থ্যে প্রভাসিত নিজের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভামিনীর মুখ স্মিত-বিকশিত হইয়া উঠিল। এমন রূপসী অনেক আছেন, যাঁহারা রূপের দর্পে, অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলিতে চাহেন না; আবার এমন রূপবতীও অনেক আছেন, যাঁহারা রূপের গৌরব করিয়া বেড়ান না, অহঙ্কার করেন না, অরূপবতীকে অবহেলা করেন না, ধূলো বালিতে জড়িত হইয়াও সংসারের কাজ করেন। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগিনী না হইলে নিজের রূপকে কোন রমণী তুচ্ছও করেন না—করাও উচিত নয়। রূপ ত' প্রিয়-

জনের চিত্ত প্রফুল্ল করে। প্রিয়জনের চিত্ত প্রফুল্ল করা, প্রিয়জনকে সুখী করা ত রমণীমাত্রেরই কামনা।

ভামিনী মুকুরে নিজের রূপ দেখিয়া গর্ব্বিতা হইল না; কিন্তু প্রিয়জন যে দেখিয়া সুখী হইবেন, তাহা মনে করিয়া তাহার মুখ বিকশিত, অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। আর, অলঙ্কার?—স্বামীর চিত্রের দিকে চাহিয়া ভামিনী মনে-মনে কহিল,—তুমি দিয়াছ, পরিব না? পরিলে তুমি সুখী হও, পরিব না? পাইয়া আমি সুখী, পরিয়া তোমাকে সুখী করিব না?

ভামিনী সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া নিজের আরক্ত অধরোষ্ঠ মৃদু স্পন্দিত করিল।

তখন অল্প-অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। ভামিনী স্বামীর গায়ের একখানা দোরখা কাজকরা আলোয়ান বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে নিকটেই রাখিল। মিঠা পান খাইয়া ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ করিয়া ফেলিল। সিসি হইতে এক ফোঁটা দেল্‌খোস্ গায়ের জামায় ফেলিল। আরসীর দিকে চাহিয়া পরিষ্কার রুমালে মুছিয়া ওষ্ঠাধরের অতি গাঢ় রক্তবর্ণ একটুকু শমিত করিল।

সাড়ে পাচটা বাজিয়া উঠিল, স্বামী ত এখনি আসিবেন! ভামিনী তাড়াতাড়ি দেরাজ-আলমারি বন্ধ করিয়া ফেলিল। নীচে গাড়ীর শব্দ স্বামীর গৃহে আগমন সূচিত করিল। ভামিনী দ্রুত-হস্তে সেই আলোয়ান দিয়া শুধু মুখখানি ব্যতীত আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বেশ করিয়া আবৃত করিল।

যতীন্দ্রনাথ আফিসের পোষাক ছাড়িয়া হাত-পা ধুইয়া স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন, স্ত্রী তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। চমকিত চিত্তে স্বামী বলিলেন,—"এ কি! তুমি অমন করিয়া আলোয়ানে গা-মাথা ঢাকিয়া রহিয়াছ কেন?—কোন অসুখ করিয়াছে?" "না, না; বেশ আছি। বড় জল হইতেছে, তাই গা, মাথা ঢাকিয়াছি।" —ভামিনীর চক্ষে কিন্তু বিদ্যুৎ খেলিতেছিল! "বেশ করিয়াছ, যে দুর্য্যোগ, খুব ঠাণ্ডাই পড়িয়াছে।"

যতীন্দ্র হাত ধরিয়া স্ত্রীকে টেবিলের কাছে লইয়া গেলেন। ভামিনী ঢাকনি সরাইয়া থালাখানা স্বামীর নিকটে এগিয়ে দিলেন। স্বামী খাইতে-খাইতে স্ত্রীকে বলিলেন,—"এ সন্দেশ খুব ভাল, তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। খাবে?—এস, আমি মুখে তুলিয়া দি!" যতীন্দ্র একখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া কতকটা হাতে করিয়া তুলিলেন; ভামিনী হাসিতে-হাসিতে সরিয়া গেল।

"ডাক্তার যে তোমাকে খুব খাইতে বলিয়াছেন। ওগো, এস, এস।" "বুড়ো ডাক্তারের লজ্জা নাই।" এক পাত্র হইতে পরস্পরের মুখে সন্দেশ, রসগোল্লা, তুলিয়া দিবার কৌতুকময় সরস ভাব এত অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠে নাই। শুধু পানের খিলির এরূপ প্রচলনটা বুঝি আরম্ভ হইয়াছে!

স্বামীর জলযোগ শেষ হইলে ডিবাশুদ্ধ সেই মিঠা পানের খিলিগুলি ভামিনী স্বামীর সম্মুখে ধরিল। যতীন্দ্র দু'টি খিলি নিজের মুখে দিয়া আর একটি তুলিয়া স্ত্রীর মুখের কাছে ধরিলেন। ভামিনী সরিয়া যাইতে চাহিল। যতীন্দ্র এক হাতে স্ত্রীর হাত ধরিয়া অন্য হাতে খিলিটা স্ত্রীর মুখে গুঁজিয়া দিলেন। ভামিনী আর তখন কি করে? মুখ একটুকু ফিরাইয়া মৃদু চর্ব্বণ আরম্ভ করিল।

মেঘ দুর্য্যোগের জন্য ঘরে আলো কমিয়া যাইতেছিল, যতীন্দ্র ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইয়া দিলেন। ঘর পূর্ণ আলোকিত হইলে যতীন্দ্র বলিলেন,—"ওগো, দেখ, আজ তোমার ভাগ্যে কি লাভ হইয়াছে!"

আফিস হইতে আনীত নোটবুকের মধ্য হইতে একখানি চেক্ বাহির করিয়া যতীন্দ্র স্ত্রীকে দেখাইলেন। কাগজখণ্ড দেখিয়া স্ত্রী আর কি বুঝিবেন? ভামিনী জিজ্ঞাসা করিল;—"কি এখানা?" "সাত হাজার কয়েক শত টাকার চেক্।" "চেক্ কি?" "দেখ, তোমার প্রথম কলিকাতায় আসার পরদিন এখানকার এক বড় সওদাগর আফিসে তোমার নাম করিয়া আমি বর্ম্মা চালের একটা আগাম খরিদ কারবার করি। আজ তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ বাদে তোমার এই লাভ হইয়াছে!"

ভামিনী হাসিয়া বলিল,—"আমার?" "হাঁ, তোমার। আমি চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা তোমাকে আনিয়া দিব।" "আমি কি করিব?" "তোমার ইচ্ছামত খরচ করিবে। এ টাকা তোমার নিজের,—বুঝিতে পারিতেছ? তোমার নিজের টাকা, তুমি যা' ইচ্ছা হয়, করিবে।" "বটে! আমার একটা পৃথক্ তহবিল হইবে?" "হাঁ।" "আমাকে কি ভিন্ন, পৃথক্ করিয়া দিতেছ?" "তোমাকে ভিন্ন, পৃথক্—?"

যতীন্দ্র কেদারা ছাড়িয়া উঠিলেন, দুই বাহু অর্দ্ধ-বিস্তার করিয়া স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভামিনী তখন গায়ের আলোয়ান খুলিয়া শয্যার উপর ফেলিয়া দিল।

সুপরিচ্ছদে সুশোভিত, রত্নালঙ্কারে সজ্জিত ইলেক্‌ট্রিক আলোকে ঝল্‌মলায়মান স্ত্রীর শ্রী-অঙ্গের শোভা দেখিয়া যতীন্দ্রের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল অবাক্ থাকিয়া শেষে বলিলেন,—"ও মিনু! মিনু! আজ এ কি?" 'আজ আমার এক নূতন জীবনের আরম্ভ! একটি কথা—" বিস্মিত নেত্রে যতীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা, মিনু?" "অনেকদিন যাবৎ কথাটা বলিব-বলিব মনে করিয়া আসিতেছি, কিন্তু বলিতে পারি নাই, আজ বলিব। দেখ, অভিমানে তোমাকে এক দিন বলিয়াছিলাম—(ভামিনীও একটু অগ্রসর হইল)—বলিয়াছিলাম, আমি তোমার ক্রীতা দা—স্ত্রী।" "আবার সেই কথা, মিনু?" "না। আমি তোমার ক্রীতাদাসী নই। স্বয়ং বিক্রীতা—কায়মনোবাক্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ বিক্রীতা—তোমার চিরদিনের দাসী!"

যতীন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন;—"স্বয়ংবরা!" "তা যা-ই বল!—আমাকে ক্ষমা করিয়াছ?" "ক্ষমা?" "জানি, তুমি ক্ষমা করিয়াছ;—তুমি যে দেবতা!"

ভামিনী যা-তা আরও যেন কত কি বলিতেছিল; কিন্তু যতীন্দ্র স্ত্রীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, হাতে গাঢ় চুম্বন করিলেন; বলিলেন,—"দেখ, তুমি আমার প্রাণাধিকা স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী; আমার প্রত্যেক কার্য্যের, প্রত্যেক ইচ্ছার, মনের একমাত্র পরিচালিকা, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী—"

যতীন্দ্রও যেন মাথামুণ্ডু আরও কত কি বলিতেছিলেন, কিন্তু ভামিনী আপনার রত্নালঙ্কারমণ্ডিত সুগঠিত ললিত দুই বাহু তাঁহার দুই স্কন্ধে স্থাপন করিয়া মুখ উঁচু করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

তখন উভয়ের হর্ষ-প্রফুল্ল উচ্ছ্বাসময় ওষ্ঠাধর যুগপৎ প্রগাঢ় পরিচুম্বিত হইল।

সমাপ্ত।

কাশ্মীর-যাত্রা

[শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আমাদের জন্য একখানা house-boat ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই house-boat তরীকে তরী, বাড়ীকে বাড়ী। চাই কি ঘাটে বাঁধা থাকুক, চাই কি বাঁধন খুলে বেড়িয়ে পড়। এই ভাসমান গৃহের অভ্যন্তরে হাল্ ফ্যাসনের সব আস্‌বাব রহিয়াছে। সাধারণতঃ ইহাতে দুইটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি বসিবার ও দুইটি স্নানের ঘর থাকে। খাট, পালং, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি আবশ্যক বস্তুর কোন অভাব নাই। শীতাধিক্যে হল্-কামরায় অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থারও ত্রুটি দেখিলাম না। মোট কথা, এই জলযানের আশ্রয়ে বাস করিতে গিয়া, তোমাকে সতত ভুলিয়া থাকিতে হয় যে, ইহা এক গতিশীল বিচেতন পদার্থ,—অচল, অটল মোটেই নয়। কেবল মাঝে-মাঝে কি মনে করিয়া, সেই মন্থরগামিনী রাজনন্দিনী আকাশের সঙ্গে আড়ি করিতে গিয়া, এক অহেতুক ঝড়-ঝাপটার সৃজন করতঃ আমাদিগের এ হেন ভুল-ভ্রান্তির বিলোপ করাইয়া দিত। আর ভুল ভাঙ্গাইয়া দিত আমাদের এই তরীর তত্ত্বাবধারক শ্যামদু। সে যখন তার সুবিশাল দেহ লইয়া এ তরীতে পদার্পণ করিতে যাইত, তখনি সে কৌতুকময়ী রাজার ঝি রঙ্গভরে হেলিয়া-দুলিয়া তাহার চরণাশ্রিত জনের কূলের চমক ভাঙ্গাইয়া দিত। এই বিপুল দেহধারী শ্যামদুকে দেখিলে আমাদের আর কোন ভয়-ভাবনা থাকিত না। কেন না, এ কলির ভীমের কাছে চোর-ডাকাতরা নিশ্চয়ই নাচার আছে, এইটি আমাদের মনের ধ্রুব ধারণা ছিল। এই বোটের সঙ্গে একখানা ছোট নৌকা থাকে, তাকে সিকারা বলে। এই সিকারায় চড়িয়া সাঝে সকালে বেশ সখের চলা-ফিরা চলে। আর একখানাতে রান্নাবাড়া হয়।

চাকরদের যাতায়াতের জন্য বড় নৌকার দুই পাশে লম্বা কাঠ জোড়া আছে। কামরার মধ্য দিয়া আনাগোনা আবশ্যক হয় না। ঝিলমের জলে স্নান-পান চলে না বলিয়া, বহু দূরস্থিত এক ঝরণা হইতে কলসী করিয়া জল আনিতে হয়। শীতাধিক্যেও বঙ্গনারীর নিত্য-নৈমিত্তিক

উলার হ্রদে কাশ্মীরি শস্যের নৌকা

স্নান-বিধির ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না দেখিয়া, আমাদের বেতনভোগী জলবাহক মনে-মনে হয় ত একটু বিরক্তির ভাব পোষণ করিত।

দরিদ্র দেশ বলিয়া এথাকার আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী অতি সস্তা দরে বিক্রীত হয়। তা' ছাড়া রাস্তা দুর্গম, বস্তুজাত রপ্তানী হইতে পারে না, তাহাতেই ফলমূলাদি এত সুলভ। শীতপ্রধান-দেশোচিত তাবৎ ফলই এখানে মিলে। বিশেষ পেয়ার্স, গ্রেপস্, আপেল অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম-প্রথম এদের দর শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইত না যে, একশত কিনিতে একটা টাকাও লাগে না। তার পর, ফলের বাগানে যাও, ত দেখিবে, গাছ ঝাপিয়া ফল পাকিয়া রহিয়াছে, দয়া করিয়া ইহাদিগকে বৃন্তচ্যুত করিলেই হয়, দাম দেওয়া ত দূরের কথা। আমরা সখ করিয়া এক আঙ্গুর-ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, ছোট-ছোট গাছে স্তবকে-স্তবকে আঙ্গুর ঝুলিয়া আছে; তুলিবার লোক নাই বলিয়া কতক শুকাইয়া গিয়াছে। আমরা স্বেচ্ছামত এই দ্রাক্ষারস পান করতঃ ভবিষ্যতেও এই লোলুপ রসনায় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত যথেষ্ট যোগাড় করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ব্যয়ের মধ্যে সেই দীন-দরিদ্র মালীর হস্তে গণ্ডাচারি পয়সা বক্‌সিস বাবদ; তাও তোমার মরজি-সাপেক্ষ, না দিলে জবাবদিহি করিবার কথা নাই। তার পর দুগ্ধ ননি-সর তুমি খাবে কত? টাকায় ৴১০ সের দুধ তোমার সাধিয়া দিয়া যাইবে এবং তাহাতে কোন কৃত্রিমতা নাই। এ হেন গব্য-বস্তু হইতে কিরূপ নবনী বাহির হয়, তাহা ত সহজেই অনুমান করা যায়। শাক-সবজীর কথা শুনিলে আরো তাজ্জব হইতে হয়। ছোট-ছোট সিকারা করিয়া হাউস-বোটের কাছ দিয়া এ সকল সামগ্রী লইয়া সারা-দিন চলা-ফিরা চলিতেছে। সুতরাং এক-রকম ঘরে বসিয়াই তুমি সব জিনিস কিনিতে পার। চারিটি পয়সা খরচ করিলে পঞ্চাশটি বেগুন, একটি পয়সায় ৪।৫ টা লাউ, দেড় পয়সা দিলে ৴১ সের আলু ইতি প্রকার। কিন্তু দেশ এতই দরিদ্র যে, পয়সা দিয়া এ সবও কিনিতে পারে না। সাধারণ লোকে শুধু শাক ভাত খায়। কলমা বলিয়া এক রকম শাক পাওয়া যায়; তার এক পয়সার শাকে ১০।১২ জন বয়স্থ লোক একবেলা খায়। সে শাক-গুলি দেখিতে অনেকটা ফুলকপির পাতার মত বড়-বড়। সেগুলি আস্ত রাখিয়া তাতে তেল-হলুদ মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া ভাতের সঙ্গে খায়। ইহা এতই না কি উপাদেয় যে, ধনীরাও প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কলমা শাক ভিন্ন অন্ন-ধ্বংস করেন না। কাশ্মীরি সকল জাতিই দুইবেলা অন্ন আহার করিয়া থাকে। শ্রমজীবীরা সকলেই পূর্ব্বরাত্রির গচ্ছিত অন্ন প্রত্যূষে ভক্ষণ করিয়া আপন-আপন কাজে চলিয়া যায়। কেন না, পূর্ব্বাহ্ণ ৭-ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইহাদের কর্ম্মকাল নির্দ্ধারিত। এই বার ঘণ্টার পারিশ্রমিক অতি সামান্য। বালকেরা দিনে ৴১০, যুবকেরা ৵১০ এবং প্রবীণেরা ৶০ কি বড় জোর ।০ পাইয়া থাকে।

সুতরাং এ দেশ যে দারিদ্র্য-পূর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

দুইচার দিনের মধ্যেই আমাদিগের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়া গেল। আমরা আছি বড় সুখে। কিন্তু কেবল শ্রীনগরে বসিয়া হাউস-বোটে দিন কাটাইলে কাশ্মীরে আসার সার্থকতা হয় না ; কেন না শ্রীনগর নাম শুনিতে যাহা বুঝায়, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহার বিপরীতই। সৌন্দর্য্য-বোধ-বিবর্জ্জিত কোন্ মহাজন এই শ্রীবিহীন পুরীর নাম শ্রীনগর রাখিয়াছিলেন, তাই ভাবি। বস্তুতঃ শোভাসম্পদ যত কিছু, সকলি এ রাজধানীর বাহিরে। এ পুরী হইতে বাহির না হইলে আর সে যাদুকরীর সন্ধান মিলে না। তখন একেবারে মাতোয়ারা-গোছ,—আর তোমাতে তুমি থাক না।

কাশ্মীরে—তাম্বুতে

আমরা সর্ব্বপ্রথমে গুল্‌মার্গ যাইতে মানস করিলাম। ইহা শ্রীনগর হইতে প্রায় ২৫০০।৩০০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত। আমরা প্রথমে Motorএ গিয়া পরে চড়াই পথ ডাণ্ডিতে উঠিয়াছিলাম। এক প্রহরের সময় রওনা হইয়া সেখানে পৌঁছিতে বেলা দ্বি-প্রহরের বেশী হইয়াছিল। চড়াই পথের চতুর্দ্দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য ! দেখিব কত ! কিয়দ্দূর উঠিতেই আমাদের শৈলজার সর্ব্বাবয়ব বিলুপ্ত হইয়া শুধু যেন এক অপূর্ব্ব ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখায় পরিণত হইয়া গেল। তাহার কথা—"আজ ঊর্দ্ধের বৈভবে আত্মহারা হইয়া তোমরা কেমন জড়বৎ নিস্পন্দ হইয়া যাইতেছ ! আর দেখ, আমি এই ঊর্দ্ধে জন্ম লইয়া ঊর্দ্ধকে ছাড়িয়া নিম্নগামী হইয়াই প্রাণ পাইয়া কেমন আনন্দে চলিয়াছি ! তোমাদের আনন্দে আর আমার আনন্দে এত তফাৎ ! স্পন্দনের মর্ম্ম তোমরা কি বুঝিবে ? স্পন্দনেই যে জীবন, পাষাণ তোমাদিগকে সে শিক্ষা দিবে কেমন করিয়া ? গতি বিনা মুক্তি কোথায় ?" আমরা মায়াময় মর্ত্ত্যের জীব, আমাদের কোন গতিরই বিধি জানা নাই ; কাজেই এ সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, আনমনে অন্যের স্কন্ধে ভর রাখিয়া উঠিয়া চলিলাম।

গুল্‌মার্গ একটি উপত্যকাভূমি। হিমগিরিতে পরিবেষ্টিত, তজ্জন্য শীতের প্রকোপ বড় বেশী। আমরা তথাকার ডাক-বাঙ্গালাতে আশ্রয় লইলাম। গৃহমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে হস্ত-পদাদির গতি করাইয়া তবে দেহ হইতে দৃষ্টিকে বাহির করাইয়া দিলাম। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পরে জলদেরা যখন তাহাদের গুরু ভার লঘু করতঃ অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন ভানুদেবের সাক্ষাৎ

মার্ত্তণ্ডের ভগ্নাবশেষ

মিলিল। দেখিলাম, সম্মুখস্থ পাষাণের গায়ে বারিবিন্দু সকল সদ্য তুষারে পরিণত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। তদুপরি তপনদেবের তরুণ কনক-

কান্তি! যেন সোণায় সোহাগা! ভাবিলাম, ধন্য, হে ধন্য! তুমি সুনিপুণ শিল্পি! ধন্য তব নিত্য নব রচনা-কৌশল! হে বর-কারিগর! যদি দয়া করিয়া এই দৃষ্টিকে অতৃপ্ত করিয়া সৃজন করিয়াছ, তবে যেন স তোমার অফুরন্ত সৃষ্টিকে এমনি করিয়া পান করিতে প্রলুব্ধ হয়!

উৎফুল্ল মনে আমরা এই উপত্যকাটার সমগ্র প্রদক্ষিণ করতঃ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার ডাণ্ডিবাহকদের স্কন্ধকে পীড়িত করিতে-করিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

"মার" খালের ধারে বণিকদিগের বাড়ী

যাইতে যাইতে পথে ইহাদের সঙ্গে বাক্যালাপে জানিলাম, ইহারা নিতান্ত দীনদরিদ্র; দিনান্তে সকল দিন শাকান্নও জোটা ভার। বড় শীতের দিনে যখন অহর্নিশ বরফ পড়িতে থাকে, তখন আর মজুরীও মিলে না। তখন ভাবিলাম, এ রাজধানীর প্রতি রাজলক্ষ্মীর এ কেন বিতৃষ্ণা কেন? তাহে এ যে সাক্ষাৎ স্বর্গধাম। অথবা বাণিজ্য
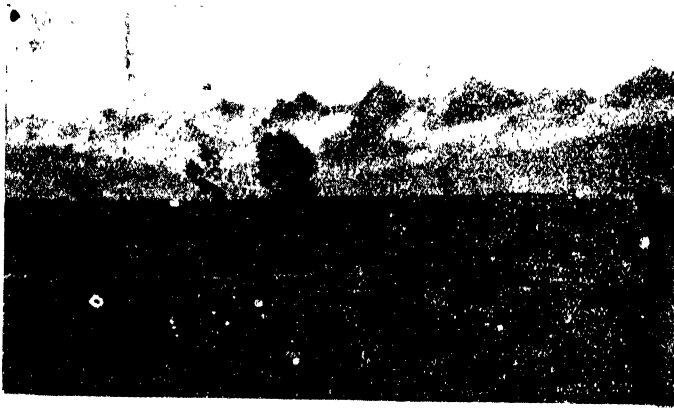
নাঙ্গা পর্ব্বত-চূড়া

ভিন্ন তাঁর বসতি কে কবে দেখেছে! বণিক্ ভিন্ন অমন অনন্যমনে কে তাঁর ভজনা জানে? বস্তুতঃ ভক্ত-চিত্তবাস ছাড়িয়া কে কবে স্বর্গবাস কামনা করে?

সমভূমিতে ফিরিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন আবার বাষ্পীয় শকটে আরোহণ এবং প্রাণে-মরা-গোছ গতিতে গমন। কিন্তু চালক আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ক্ষত্রিয়পুত্র বলিয়া মাতাজিরা পূর্ব্ববৎ হো খাতির-জমা। আমাদিগকে যথাসময়ে বাড়ী ফিরাইয়া আনিয়া লম্বা সেলাম ঠুকিল, আমরাও একটু লম্বা হাতেই বক্‌সিসের ব্যবস্থা করিলাম। সেটা সেলামের কুহকে নয়, মাতৃভক্তির অনুরোধেই বটে! আমাদের খয়ের-খাঁ শ্যামডু লণ্ঠন-হস্তে আমাদের অপেক্ষায় দাড়াইয়া ছিল, সাবধান মত আমাদিগকে তরীতে তুলিয়া দিবে বলিয়া। প্রত্যহই সে এই করিত। আমাদের এই বিচিত্র বাসভবনের প্রতি আমাদের কেমন একটা টান হইয়া গিয়াছিল যে, বেশীক্ষণ ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে অন্তর মধ্যে কেমন একটা তাগিদ বোধ করতাম। ইহাকেই বলে "মায়াময় এ সংসার"—কিবা চেতন, কিবা বিচেতন—বিচার বোধ নাই। দুই দিনেই আসক্তির শিকড় গুড়ি বাঁধিয়া বসে। উপড়াইতে যেন নাড়ীতেই টান পড়ে। কি উৎপাত!

পরদিন Dal Lake দর্শন আমাদের তালিকাভুক্ত হইল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সিকারায় চড়িয়া যাত্রা করিলাম। "মার-কেনেল" ইত্যাদি ছোট-ছোট নালার মধ্য দিয়া সে হ্রদে পৌঁছুতে হয়। ঘণ্টা দুই লাগে। যতক্ষণ বাড়ী-ঘরের কিনারা দিয়া চলিলাম, ততক্ষণ দিল্ খোস্ হইবার মত কিছুই দেখিলাম না। আস্তে-আস্তে যখন এরা তফাতে সরিতে লাগিল, তখনই লীলাময়ীর প্রকৃত লীলা আরম্ভ হইল। শত-শত শতদলের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে কার যেন এক সব-ভোলান হাসির বিকাশ দেখিতে লাগিলাম! যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে!

কি? যে দিকে নয়ন ফিরাই, আর ফিরাইতে নাহি চাই গোছ। নারী-জন্মের বিড়ম্বনা বহুতর হইলেও আজ এই নারীজন্ম সার্থক গণিলাম। নতুবা এ দৃশ্য দেখা কপালে ঘটিত কি? এখন বুঝিলাম যে, এস্থলে অবরোধ-প্রথা এক মস্ত বাঁচোয়া! বিধির মঙ্গল-বিধানেই—যারা নজর দিতে জানে, তাদের হেথায় প্রবেশাধিকার নাই। নয় ত দুর্গম পথই বল, আর অর্থসাধ্য যাত্রাই বল,—কিছুতেই সুদূর দেশের লোলুপ নেত্রকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিত না। তখন ঘরে-ঘরে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাইয়া এক বিভ্রাট ঘটাইত। তামাসা ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতে গেলে তখনকার মনের ভাব

"যে শিল্প গড়িল এই সুধাংশু-বদন,
তাহার স্মরণে পড়ে নয়ন জীবন।"

কে সে সুমহান এই সৃষ্টি করিয়াছে? কার এ মনো-মোহন সৌন্দর্য্য-কল্পনা? দু'দিনের দুনিয়ায় এ মহা সম্পদের বিকাশ কেন? অথবা স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা কি আপন রূপ-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য আপনিই এই মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া-ছেন? বুঝি বা তাই!

ভাগ্যক্রমে সে গৃহে সে দিন বিবাহোৎসব ছিল। নব-বধূর মুখারবিন্দ নিরীক্ষণের জন্য বহু বামলোচনার সমাবেশ হইয়াছিল। আমরা প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইতেই, গৃহকর্ত্রী আসিয়া আমাদিগকে সাদরে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। যে সোপানাবলি অবলম্বনে আমরা দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত হই-লাম, তাহার যথাযথ বর্ণনা রুচিসঙ্গত হইবে না বলিয়া ক্ষান্ত দিলাম। কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে, বুঝিয়া পা না ফেলিলে পদদ্বয়ের বিড়ম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা বিস্তর ছিল। যাহা হউক, সন্তর্পণে অবরোহণ-কার্য্য সমাধা করিয়া দেখিলাম, মসী-বিনিন্দিত, রজঃকণা-পরিপূরিত এক কার্পে-টের উপর অবগুণ্ঠনবতী আনতা নববধূ আসীনা। এক রূপসী রমণী সে অবগুণ্ঠন উত্তোলন পূর্ব্বক ব্রীড়া-নম্র নিমীলিতাক্ষীর চন্দ্রমুখ দেখাইতেছেন। সে মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন আরব্য-উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যের এক মায়া পৈরী, মানবী নয়! ভুলিয়া গেলাম পথের যত কিছু কষ্ট, ভুলিয়া গেলাম ইহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আচার-পদ্ধতির শুচি-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা। তার পর চা-পানের সুনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াই কেমনে, সমস্যা ইহাই এক্ষণে। ইহাদের সৌজন্যে বড় আপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু অন্তরের শুচি-সংস্কার বিষম বিদ্রোহ বাধাইয়া বসিল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় পথশ্রান্ত, পিপাসিত প্রাণ পর্য্যন্ত চা-পানে বীতস্পৃহ। সকলেরই এক কথা যে, এই নাসা-পীড়াকর স্থানে চা-পানে রুচি হইবে কি করিয়া? অগত্যা সময়ের অল্পতা জ্ঞাপন করতঃ গা তুলিয়া প্রস্থান করিলাম।

পথে এক বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন আমাদের অন্যতর দ্রষ্টব্যের তালিকাভুক্ত আছে; সুতরাং সেখানে যাইতেই হইল। বাহির হইতে দেখিয়া সে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু কি করি! সেই বিদেশিনীর সহৃ-দয়তার কাছে আমাদিগের সকল সঙ্কীর্ণতা বলিদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ছোট-ছোট কয়েকটি প্রকোষ্ঠ পার হইয়া একটি খোলা বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলাম। এই বারাণ্ডাটি ঝিলমের ঠিক উপরে অবস্থিত। তথায় মেঝের উপর বসিয়া প্রায় পঞ্চাশটী বালিকা লিখন-পঠন-বুননাদি করিতেছে। তাহাদের রূপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। যে অপরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়া কাশ্মীরি রমণীদের রূপকে যাচাই করিয়া লইতে হয়, এখানে তাহা সহজ, সুন্দর রূপে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিশনারী মহোদয়াগণের অপ্রতিহত যত্নে ইহারা সত্য-সত্যই স্বর্গরাজ্যোচিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই চপলমতি বালিকাগণ আপন-আপন সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া আরো সুখদর্শন হইয়াছে। এ দেশে ঘোর অবরোধ-প্রথা প্রচলিত। নবম বর্ষীয়া বালিকাকে আর স্বেচ্ছামত রাজপথে চলিতে দেওয়া হয় না। দুর্ভেদ্য প্রাকার মধ্যে তার রূপযৌবন জন্মের মত বাঁধা পড়িল! এমন কি, কোন কোন সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহিতা ভগিনীর সঙ্গে আপন বয়স্থ সহোদরের সাক্ষাৎও অসঙ্গত বিবেচিত হয়! ইহাদের ধরণ-ধারণে বালিকাসুলভ চপল-তার লেশ মাত্র নাই, সকলেই যেন ধীরা, গম্ভীরা —এক-একটী মাতৃমূর্ত্তি। খেলাধূলার এখানেই ইতি। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। ইচ্ছা হইয়াছিল, পিঞ্জরাবদ্ধ এই শাবকগুলিকে উদ্ধার করিয়া একবার মুক্ত আকাশে ছাড়িয়া দিই। একবার সন্নিবদ্ধ পক্ষপুট বিস্তার পূর্ব্বক ইহারা উল্লাসে উড়িয়া বেড়াক, দেখিয়া বিশ্বজন বিমোহিত হউক, আর সেই বিশ্বস্রষ্টার সৃজনী-

শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবন ধন্য করুক।' এখানেই সে দিনকার মত ভ্রমণকার্য্য সমাধা করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে সর্ব্ববিধ বিভ্রাটের পুনরাবৃত্তি হইল। বিব্রত নাসার কাছে শত খৎ দিয়া তবে আঁখির কথায় সায় দিতে সাহসী হইয়াছিলাম।

ঘরে বসিয়া সে দিন আর কিছুতে মন দিতে পারি নাই। থাকিয়া-থাকিয়া কেবল সে রূপের হাটের কথাই ভাবিতেছিলাম; আর ভাবিতেছিলাম, বিধাতার পক্ষপাতিতার কথা! কিছু সে-দিকে, কিছু এ-দিকে দেও! এক-দিকে পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি, আর এক-দিকে ছিটা-ফোঁটা নিয়ে কাড়াকাড়ি। এ যে বিধির ন্যায়-বিধান—কেমন করিয়া মানি বল!

"ন যত্র দুঃখম্ ন সুখম্ ন চিন্তা; ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদ্ ইচ্ছা"। সে শান্ত-রস উপভোগ করিবার মত বড় প্রাণ ত এখনও ধরি না; সুতরাং আমাদের এই দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া কেহ যেন নিন্দুকের মত বিদ্রূপ না করেন, এই সবিনয় নিবেদন।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-বি]

কবিরাজ

"প্রস্রাব সরল হয় না? আচ্ছা, নাড়ীটা দেখি।"

বামুন ঠাকুর

বামুন-ঠাকুর

আমার কাপড় গামছা তেলকুচ্‌কুচে,
সেই ত আমার গর্ব্ব।
শুধু বাবুর্চ্চিরাই কম্‌তে ডরায়
ধোপার খরচ খর্ব্ব।
জানি, দক্রু আমার অঙ্গভূষণ,
নিন্দার কি বা ইথে?
আছে সর্ষপতেলে জব্‌জবে চুল
ধব্‌ধবে সাদা সিঁথে।
আমি বাস করি বটে বেশ্যা-আলয়ে,
টানি বটে গাঁজা-গুলি,
তবু গলায় ত আছে পৈতের গোছা,
জবর হজ্‌মি-গুলি।
আমি চুরিটা আশ্‌টা করে থাকি,
তাতে নেইক তেমন লাজ,
শুধু ব্রাহ্মণ হয়ে পতিত হইব,
করিনি এমন কাজ।
আমি পড়িনি কখনো Hegel বা Mill,
মজিনি বিলাতে গিয়ে,
আমি শিখিনি কখনো কৃশ্চানী বুলি,
করিনি বিধবা-বিয়ে।
আমি হোটেলে, টেবিলে, সাহেবের সাথে
খাইনি কারি ও ভাত,
আমি ধর্ম্ম রেখেছি অক্ষত,
আমি অটুট রেখেছি জাত।
ক্রমে ভারত-শুদ্ধ এক-ঘরে হবে,
সকলেই জানে সেটা।
শুধু, আমি টিঁকে রব হিন্দু সমাজে,
আমারে তাড়ায় কেটা?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

অয়ন-চলন

[অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র রায়, এম-এ]

অয়ন-বিচার প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইতে সূর্য্যের ছয় রাশি-ভ্রমণ-কালকে উত্তরায়ন বলে। অর্থাৎ মহাবিষুব বিন্দু অয়ন-গণনার আদি বিন্দু। পঞ্জিকা খুলিলে দেখিতে পাই যে, ৯ই চৈত্র দিবারাত্রি সমান ; অর্থাৎ উক্ত দিবসই বর্ত্তমান সময়ে মহাবিষুব দিন। সুতরাং ৯ই চৈত্র হইতে ছয় মাস উত্তরায়ন-কাল।

মহাবিষুব-বিন্দু যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে উত্তরায়ন সময়ের মাসগুলির কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কিন্তু যদি উক্ত বিন্দুটি গতিশীল হয়, তবে এই মাসগুলিরও প্রভেদ হইবে। অতএব প্রথমে উক্ত বিন্দুটির অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করাই কর্ত্তব্য।

ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে, বিষুবরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দূরত্ব (অক্ষাংশ), এবং কোন নির্দ্দিষ্ট মান-মন্দির হইতে পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে দূরত্ব (দ্রাঘিমা) জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে, মহাবিষুব-বিন্দু হইতে পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে দূরত্ব এবং বিষুববৃত্ত বা ক্রান্তি হইতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে দূরত্ব জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়।

উত্তর ধ্রুব ও জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়া একটি বৃহদ্বৃত্ত বিষুববৃত্তের উপর লম্বভাবে অঙ্কন করিতে হইবে। বিষুববৃত্তের যে অংশ মহাবিষুববিন্দু ও ঐ বৃহদ্বৃত্তের অন্তর্বর্ত্তী, তাহাকে জ্যোতিষ্কের বিষুবাংশ (Right Ascension) বলে। ঐ বৃহদ্বৃত্তের যে অংশ জ্যোতিষ্ক এবং বিষুববৃত্তের মধ্যে অবস্থিত, তাহাকে জ্যোতিষ্কের অপম বা ক্রান্তি (Declination) বলে। উত্তর-ধ্রুবনক্ষত্র বিষুববৃত্ত হইতে নব্বই অংশ (৯০) উত্তরে অবস্থিত। ইহাই উত্তরধ্রুবনক্ষত্রের ক্রান্তি। জ্যোতিষ্কের অবস্থান বিষুববৃত্তের উত্তর বা দক্ষিণ ভেদে ক্রান্তি বা অপমকে উত্তর বা দক্ষিণ বলা হয় ; কিন্তু কোন দিকেই নব্বই অংশের অতিরিক্ত হইতে পারে না। ক্রান্তি বৃত্তের উত্তরধ্রুব ও জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়া একটি বৃহদ্বৃত্ত ক্রান্তি-বৃত্তের উপর লম্বভাবে অঙ্কিত করিলে, উহার যে অংশ জ্যোতিষ্ক ও ক্রান্তিবৃত্তের অন্তঃপাতী, তাহাকে ঐ জ্যোতিষ্কের শর বা বিক্ষেপ (Latitude) বলে। ক্রান্তিবৃত্তের যে ভাগ মহাবিষুববিন্দু এবং ঐ বৃহদ্বৃত্তের অন্তঃপাতী, তাহাকে ঐ জ্যোতিষ্কের ভোগ বা রাশ্যংশ (Longitude) কহে। ক্রান্তিবৃত্তের উত্তর বা দক্ষিণ ভাগে জ্যোতিষ্কের অবস্থানভেদে শর উত্তর বা দক্ষিণ হয় ; কিন্তু কোন দিকেই নব্বই অংশের অতিরিক্ত হয় না। ভোগ-গণনা বা রাশ্যংশ-গণনা মহাবিষুব-বিন্দু হইতে পূর্ব্বাভিমুখে করিতে হয়। ইহার মান ১২ রাশি বা ৩৬০ অংশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। বিষুবাংশ গণনাও ভোগ-গণনার ন্যায়।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবস্থান কিছুদিন পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের ভোগাংশ, বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ প্রতি বৎসরই পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, আমাদিগকে আপাততঃ দুইটি কারণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়।

প্রথমতঃ—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্বকীয় গতি এই পরিবর্ত্তনের কারণ স্বরূপ অনুমিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—মহাবিষুববিন্দুর গতি দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রকৃত কারণ, তাহা অল্পায়াসেই নিরূপিত হইতে পারে। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্বাভাবিক গতি আছে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন-ভিন্ন জ্যোতিষ্কের পক্ষে ভিন্ন-ভিন্ন। নক্ষত্রসমূহের নিশ্চলতা আপেক্ষিক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে উহারা গতিশীল। এই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের তুলনায় সূর্য্য নিশ্চল ; কিন্তু ইহাও অতি বেগে অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতেছে। ইহার গতির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪ মাইল। স্বাতিনক্ষত্র (Arcturus) প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫৪ মাইল ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ অন্যান্য নক্ষত্র ভিন্ন-ভিন্ন গতিতে শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। অথচ ইহাদের বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ মানের পরিবর্ত্তন সকল নক্ষত্রেরই একই রকম। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনের কারণ নক্ষত্রসমূহের স্বীয় গতি হইতে পারে না। বরং কোন একটি সাধারণ হেতুই এই পরিবর্ত্তনের কারণ স্বরূপ অঙ্গীকৃত হইবে ; অর্থাৎ মহাবিষুববিন্দুর গতি দ্বারাই এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। এই বিষুবদ্বয়ের গতিকেই অয়ন-গতি বা অয়ন-চলন বলে। অয়নগতি বিলোম,—অর্থাৎ বিন্দুদ্বয় যেন পশ্চাদ্দিকে হটিতেছে। ইহার ফলে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ক্রান্ত্যংশ ও বিষুবাংশ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে। একটি নক্ষত্রই যে উত্তরধ্রুব নামে অভিহিত হইবে, তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। অদ্য যাহাকে আমরা উত্তরধ্রুব নক্ষত্র বলিয়া স্বীকার করিতেছি, দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বা পরে অন্য কোন নক্ষত্রের সেই স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার কথা।

প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষিগণ অয়ন-গতি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিংশৎকৃত্বোযুগে ভানাং চক্রং প্রাক্‌পরিলম্বতে।
তদ্‌গুণাদ্ভূদিনৈর্ভক্তাদ্‌ ।গণাদ্যদবাপ্যতে ॥

তন্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশাং অয়নাভিধাঃ।
তৎ সংস্কৃতাৎ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্॥

সূর্য্য-সিদ্ধান্ত
ত্রিপ্রশ্নাধিকার, ৯ম, ১০ম শ্লোক।

এক মহাযুগে অয়নাংশভগণ ৬০০ বার। ইষ্টাহর্গণকে ৬০০ দিয়া গুণ করিয়া এক মহাযুগের অহর্গণ দ্বারা ভাগ দিলে, ভাগফলের ভুজাংশকে ৩ দ্বারা গুণ করিয়া ১০ দ্বারা ভাগ দিলে পর ভাগফল ইষ্ট সময়ের অয়নাংশ হইবে। অয়নাংশ শোধিত গ্রহ হইতে ক্রান্তি ছায়া, লগ্ন, চর ইত্যাদি সাধন করিতে হইবে। ভাস্করাচার্য্য তৎ-প্রণীত সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলাধ্যায়ের গোলবন্ধাধিকারে বলিয়াছেন, "বিষুব ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্পাত বর্ত্তমান সময়ে মেষরাশির আদি বিন্দুতে নহে। এই পাতবিন্দুর গতি বশতঃ মেষরাশির আদি বিন্দুর পশ্চাদ্ভাগে কতক অংশ ব্যবধানে ক্রান্তিবৃত্তে বিষুবদ্বৃত্ত লগ্ন। প্রত্যক্ষই ইহার উপলব্ধির হেতু।............ইহার পরিমাণ যত অংশই হউক না কেন, নিপুণ ব্যক্তি যাহা স্থির করিবেন তাহাই প্রকৃত। বিলোমগ ক্রান্তিপাত হইতে গ্রহের ক্রান্ত্যংশ সাধিত হইবে।"

গর্গসংহিতা ও পরাশর-সংহিতাতে অয়নগতি সম্বন্ধে উক্তি আছে। বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতাতে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়েও প্রত্যেক পঞ্জিকাতে অয়নাংশমান দেওয়া আছে।

আধুনিক জ্যোতিষিগণ অয়নচলনের পরিমাণ যাহা নির্দ্দেশ করিতে-ছেন, প্রাচীন হিন্দুগণ তাহা হইতে কিছু বেশী স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহার বাৎসরিক মান ৫৪" বিকলা, এবং আধুনিক পণ্ডিতবর্গের মতে ৫০"২ বিকলা। পূর্ব্ব সময় হইতে বর্ত্তমান সময়ে উৎকৃষ্টতর যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ স্বীকার করিলে, শেষোক্ত মানই গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ অয়নবিন্দু ১ বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা পশ্চাদ্দিকে গমন করে। এই হিসাবে অয়নবিন্দু প্রায় ৭২ বৎসরে এক অংশ এবং প্রায় ২১৬০ বৎসরে ৩০ অংশ বা ৬ রাশি (এক সৌর মাস) পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যায়। এই বৎসর যে তারিখে বিষুব দিন হইবে ২১৬০ বৎসর পরে একমাস পূর্ব্বে ও ২১৬০ বৎসর পূর্ব্বে একমাস পরে এই বিষুবদিন হওয়ার কথা। আধুনিক মনস্বিগণের মতে অয়নগতির ফলে অয়নবিন্দু প্রায় ২৬০০০ বৎসরে পশ্চাদ্দিকে ভ্রমণ করিয়া রাশি-চক্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইল যে, বিষুবদিন বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখে হইবে, তাহা অপ্রকৃত। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের প্রবৃত্তি অয়নবিন্দুর উপর নির্ভর করে। অয়নবিন্দুর বিলোম-গতি বশতঃ বিষুবদিনের বৈলক্ষণ্য জন্মিলে, উত্তরায়ন ও তৎসঙ্গে দক্ষিণায়ন প্রবৃত্তি দিবসেরও বৈলক্ষণ্য ঘটিবে। কোনও সময়ে যদি মকররাশির প্রথম বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুববৃত্তের সম্পাত হওয়াতে ঐ বিন্দু হইতে উত্তরায়ন গণনার আরম্ভ হয়, তাহা হইলে, ৭২ বৎসর পরে ধনুরাশির শেষ অংশের আদি বিন্দুতে ক্রান্তিপাত বা উত্তরায়ন গণনার আরম্ভ হইবে। এইরূপ ৭২ বৎসর পূর্ব্বে মকররাশির দ্বিতীয় অংশের প্রথম বিন্দু হইতে উত্তরায়ন গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং অতি প্রাচীন কালের কোনও এক সময়ে মকর রাশির প্রথম বিন্দুতে সূর্য্যের স্থিতিকালে অর্থাৎ সৌর মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে যদি উত্তরায়ন গণনা হইয়া থাকে, ২১৬০ বৎসর পরে সৌর পৌষ মাসের প্রথম দিবস হইতে উত্তরায়ন গণনার আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপ প্রতি ২১৬০ বৎসর পরে-পরে-এক একমাস পূর্ব্বে উত্তরায়ন গণনা আরম্ভ হওয়ার কথা। অতএব বরাবরই যে মাঘাদি ছয় মাস উত্তরায়ন ও অপর ছয় মাস দক্ষিণায়ন হইবে, ইহা ঠিক নহে। প্রতি ২১৬০ বৎসরে এক-এক মাস সরিয়া কতকালে মাঘমাসের প্রথম দিবস হইতে ৯ই চৈত্র বিষুবদিন বিলোম-গতিতে হটিয়া আসিতে পারে, তাহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে ৯ই চৈত্র হইতে ছয় মাস উত্তরায়ন এবং ৯ই আশ্বিন হইতে ছয় মাস দক্ষিণায়ন।

শিখগুরুদিগের ইতিহাস

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরী]

পঞ্চম গুরু "অর্জ্জুন"

(১৫৫৩—১৬০৬)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুরু অর্জ্জুন ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৫৮১ খৃঃ অব্দে গুরু রামদাসের মৃত্যু হইল। অর্জ্জুন পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। গুরু রামদাস স্বীয় প্রিয় পত্নী ভেনির অভিপ্রায় অনুসারে অর্জ্জুনকেই গুরু নির্ব্বাচিত করেন। সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুইজন সহোদর বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও শিখেরা তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করে। কথিত আছে যে, তদীয় উন্নতিতে ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর পৃথী বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ-হননের চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পৃথী ভ্রমান্ধ—দু'দিনের তরে পৃথিবীতে আসিয়া সামান্য মলিন স্বার্থের জন্য এরূপ অমানুষিক দুষ্কার্য্য সম্পাদন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ক্ষণেকের তরেও চিন্তা করেন নাই যে, পরিণামে সকলেরই সমান দশা—সকলের উপরই মৃত্যুর করাল ছায়া পতিত হইবে, সকলের অঙ্গই ধূলিতে শেষ হইবে।

"কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়।"

ধনী-নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে সকলকেই কালের বক্ষে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে হইবে, সকলকেই অতীতের তিমির গর্ভে মিলাইয়া যাইতে হইবে। অতএব বৃথা ভোগ-বিলাসের জন্য পরের অনিষ্ট করায় কোন পৌরুষ নাই। আর তাহাতে সুখই বা কি? দুষ্কর্ম্মের জন্য পরিণামে ফলভোগী হইতে হয়, পরিণামে অনুতপ্ত হইতে হয়। অর্জ্জুন ও পৃথী উভয়েই

পরলোকগত, উভয়েরই ইতিহাস এখন উপকথায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তথাপি অর্জ্জুনের স্মৃতি সমুজ্জ্বল শশধরের ন্যায় সকলেরই অন্তরে স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করে, আর পৃথ্বীর স্মৃতি কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত, তাহার নামে সকলেরই মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়। সকলেই তাহাকে মানকের কলঙ্ক বলিয়া মনে করে। তাঁহার স্মৃতি বহুদিন পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইত, কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত বিজড়িত বলিয়া আজও বর্ত্তমান। পৃথ্বীর ন্যায় জগতে অনেক লোক আছে,—তাহাদের কবির এই উক্তিটি স্মরণ রাখা উচিত—

> "স্ফীত বক্ষে প্রভাব দেখায়ে কিছুক্ষণ,
> নতশিরে ভেঙ্গে পড়ে, করে অন্তর্দ্ধান ;
> মানব ভঙ্গুর অতি তরঙ্গ সমান।"

শিখগুরুগণ এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত যোগীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেন। ফকিরের সামান্য বসন-ভূষণই তাঁহাদের ভূষা ছিল, ফকিরের সামান্য খাদ্যই তাঁহাদের আহার ছিল। প্রকৃতির প্রিয় নিকেতনেই তাঁহারা অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন, অজস্র অর্থ থাকা সত্ত্বেও কখনও বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। অধিকন্তু সে অর্থ-সমূহ ধর্ম্মের জন্য, দরিদ্রের জন্য ব্যয় করিতেন। ইহাতেই তাঁহারা পরম সুখ লাভ করিতেন। ইহাই তাঁহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল। গুরু অর্জ্জুনের প্রকৃতি ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। তিনি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিলেন। ফকিরের বসন-ভূষণ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি পূর্ব্বপুরুষগণ-পরিহিত সামান্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার ন্যায় আড়ম্বরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

বহুমূল্য পরিচ্ছদ তাঁহার গাত্রের শোভা সম্পাদন করিল। বহু দ্রুতগামী অশ্ব, অগণ্য মাতঙ্গ, দীর্ঘ ভল্ল-ধারী ভীমকায় সৈন্যগণ তাঁহার পতাকাতলে সংগৃহীত হইল। সুধাধবলিত বহু মণি-মাণিক্য-খচিত সুরম্য হর্ম্ম্য তাঁহার প্রাসাদে পরিণত হইল। তূর্য্য-নিনাদে তাঁহার আদেশ ঘোষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ, তিনি শিখগুরুগণের ফকিরের পবিত্র আসন নরপতির সিংহাসনে পরিণত করিলেন। এতদূর বিলাসিতায় মগ্ন হইলেও তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক মহৎ গুণেরই অধিকারী হইয়াছিলেন। দয়া, পরোপকারিতা তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। শিখ ধর্ম্মের উন্নতিকল্পে তিনিও প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার এ বিলাস-প্রিয়তা বিশেষ দোষের মধ্যে গণ্য করা উচিত নয়। কারণ, মানুষ সর্ব্বদাই মানুষ। সে কখনও সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। হইলে, এ মর ভূমি দেবভূমিতে পরিণত হইত।

উচ্চ আশা না থাকিলে জগতে কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হয় না। আশা কুহকিনী হইলেও আশাই মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে। আশাই মানুষকে উচ্চ হইতে উচ্চতর আসনে লইয়া যায়। আশা ফলাভিলাষী। জগতে সকলেরই লক্ষ্য ভবিষ্যৎ। এমন কি যোগী ঋষিরাও ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাগ-যজ্ঞ করেন। গুরু অর্জ্জুনের কার্য্যকলাপেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শিখধর্ম্মের উন্নতি ও স্বীয় প্রভুত্ব-বিস্তার—এই দুইটী তাঁহার ফলাভিলাষিতার পরিচায়ক। তিনি কার্য্য করিয়াছেন শুধু এই দুইটীর জন্য। গুরু অর্জ্জুন যেরূপ উদ্যমশীল, সেইরূপ উচ্চাভিলাষী ছিলেন। গুরু পদে উন্নীত হইয়াই তিনি আশ্রম অমৃতসরে স্থানান্তরিত করিলেন। অচিরেই তথায় তাঁহার জন্য বিচিত্র সৌধরাজি নির্ম্মিত হইল।

তিনি শতদ্রু (Sutlej) ও বিতস্তার (Bias) সঙ্গমস্থলে তরণ-তারণ সহরে এবং অমৃতসরে অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে না পারিলে পরাক্রান্ত বা ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া যায় না দেখিয়া, তিনি প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রভাব বিস্তারই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কারণ ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা যেরূপ লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করা যায়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিখগণকে একটী পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত করিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মসংস্কারক লুথারের (Luther) ন্যায় তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিখ-সংস্কারক ছিলেন। ভারতবর্ষ একটী সুবৃহৎ দেশ। এ দেশ বহু ভাষাভাষীর আবাসস্থল। তদুপরি, ধর্ম্মও এক নহে। সামাজিক বন্ধনও বিভিন্ন। গুরু নানক-প্রচারিত পবিত্র উপদেশাবলী প্রতি মানব-হৃদয়ে সমভাবে প্রভাব বিস্তার করে কি না, তাহা সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করাই তিনি প্রথমে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলেন। নানকের সকল শিষ্যকে সমসূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক সঙ্কলন করিলেন। ইহা শিখগণের অতি পবিত্র পুস্তক, "গ্রন্থসাহেব" নামে পরিচিত। গ্রন্থখানি জাঠদিগের মাতৃভাষায় লিখিত। এই পুস্তকে অর্জ্জুন নিজের ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র উপদেশসমূহ এবং তদানীন্তন অন্যান্য ধর্ম্ম সংস্কারকগণের পবিত্র উপদেশ সন্নিবেশিত করিলেন। "গ্রন্থ"খানি তিনি হরমন্দিরে রাখিলেন। উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্ব গগন রঞ্জিত হইলে, বিহগের কলতানে সারা জগৎ মুখরিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে পবিত্র অমৃত সরসে স্নানার্থ সমবেত জনগণের নিকট ইহা বাদ্য যন্ত্রাদি সহযোগে প্রত্যহ গীত হইত। তথায় বহু গায়কও ছিল। তাহারা সুললিতস্বরে ভগবানের বন্দনা গাহিত, এবং গুরুগণের জীবনী আদর্শ করিয়া, সকলকে এই দুর্গম সংসারে কিরূপে চলিতে হইবে, কিরূপে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে, কিরূপে সকলের প্রীতিভাজন হইতে হইবে—এই সমস্ত অনাবিল উপদেশ চলিত ভাষায় প্রচারিত হইত। গুরু অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রথম শিখরাজ্যের বীজ বপন করেন। তাঁহার লিখিত শাসন-প্রণালী কালে শিখ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি শিখদিগকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য শিখগণের উপর কর ধার্য্য করিলেন। এই কর 'নাজারানা' নামে পরিচিত। "নজারানা" আদায়ের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। প্রতিনিধিগণ বাৎসরিক একটি সভায় সংগৃহীত কর গুরুকে প্রদান করিতেন। গুরু অর্জ্জুন স্বদেশের উন্নতির জন্য স্বীয় অনুচরগণকে বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরণ করিতেন। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এই উপদেশটি

তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরূক ছিল। তাঁহার অনুচরবর্গের অধিকাংশই তাতার জাতীয় অশ্বের ব্যবসায় করিত। এরূপে ক্রমে শিখগণের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রামদাস অমৃত-সরোবরটী সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্জ্জুন তাহা সম্পূর্ণ করিলেন। এতৎব্যতিরেকে তিনি তথায় আর একটি সরোবর খনন করেন। তাহা কৌলসর নামে পরিচিত। অমৃতসর জেলার সুবিখ্যাত "তরণতারণ" সরোবর তাঁহারই অন্যতম কীর্ত্তি। সুবিখ্যাত কবি গুরুদাস গুরু অর্জ্জুনের একজন শিষ্য। চত্বারিংশৎ অধ্যায়যুক্ত "জ্ঞান-রত্নাবলী" তাঁহারই রচিত। ইহাতে তিনি বাবা নানকের জীবনী বিশদ ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নানককে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের সমান পদে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান নানককে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। "জ্ঞানরত্নাবলী"খানি শিখগণের অতীব প্রিয়। তাহারা সকলেই ইহা আগ্রহের সহিত পাঠ করে।

চণ্ডুসাহার সহিত গুরু অর্জ্জুনের বিরোধ—তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। চণ্ডুসাহা তৎকালীন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তিনি লাহোরে বাস করিতেন। গুরু অর্জ্জুনের পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু গুরু তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত বিবাহ-বাক্‌দান সম্বন্ধীয় উপঢৌকন ফেরত পাঠান, চণ্ডুসাহা তাঁহাকে কদর্য্য ভাষায় অবমানিত করেন। পরে গুরুর ক্রোধ প্রশমনার্থ তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু গুরু অটল রহিলেন। লজ্জিত, ক্রুদ্ধ মোগল-সচিব তাঁহার ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বাদশাহের পুত্র খসরু তখন বিদ্রোহী। তাঁহার মঙ্গলার্থ অর্জ্জুন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন—এই মিথ্যা অপবাদে চণ্ডুসাহা তাঁহাকে বন্দী করিলেন। বাদশাহের নিকট তাঁহার বিচার হইল। ফলে তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। বাদশাহ তাঁহার নিকট দণ্ড স্বরূপ বহু অর্থ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাগারে অশেষ নির্য্যাতন অশেষ অবমাননা সহ্য করিয়া অতি ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে লাহোরের সন্নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র কারাগৃহে অর্জ্জুন প্রাণত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি মোগল-সম্রাটের আদেশ লইয়া রক্ষী সৈন্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতে স্নানার্থ গমন করেন এবং স্নানকালে সকলের সমক্ষে অদৃশ্য হইয়া যান। বর্ত্তমান লাহোর দুর্গের নিকট তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি তাঁহার সমাধি "বৈচিত্র্য মাঝারে চির সনাতন" ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শিখগণ স্বভাবতঃই উদার-হৃদয় ও শান্তিপরায়ণ। অবমাননার কশাঘাতে অতি মৃদুস্বভাব ব্যক্তিও বিচলিত হয়, ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের সহিষ্ণুতা, কোমলতা সবই তিরোহিত হয়। ইহা স্বাভাবিক। ইহা সংসারের নিয়ম। শিখগণেরও এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল, তাহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। গুরুর মৃত্যুতে শিখগণের সহিত মুসলমানগণের বিরোধের প্রথম সূত্রপাত হয়। ক্রমে তাহাদের ধর্ম্মবহ্নি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে; এবং পরিশেষে প্রতিহিংসা সাধন বাসনায় চালিত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে।

সারনাথ-সংগ্রহ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

[শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য বি-এ, এম-আর-এ-এস]

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্‌ সারনাথের আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি দেখিয়া তাঁহার বিখ্যাত শিল্প-বিষয়ক গ্রন্থে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, শুধু এক সারনাথের শিল্প-নিদর্শন হইতেই অশোকের সময় হইতে মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত ভারতীয় সমগ্র ভাস্কর্য্য-বিদ্যার ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে উদাহৃত হইতে পারে(১)। এ কথায় অতিরঞ্জন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পতত্ত্ব জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে সারনাথের ঐতিহাসিক সংগ্রহ একটি আদর্শ গুরুকুল বিশেষ। প্রাচীন ভারতে যত প্রকার শিল্পকলা-রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার সকলেরই উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট নিদর্শন এখানে যথেষ্টরূপে সজ্জিত হইয়া আছে। "ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি"র নব্য সেবকগণ যদি তাঁহাদিগের উদ্ভট কল্পনার নির্ব্বাসন করিয়া, কিছুদিনের জন্য এ স্থানে শিল্পরীতি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে আর প্রাচীন শিল্পাদর্শের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্য নানাভাবে তাঁহাদিগের হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কল্পনাক্ষেত্র হইতে ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ লাভ করা যে সম্ভবপর নহে, আধুনিক অনুসন্ধানের যুগে এ কথা বুঝিবার দিন অবশ্যই আসিয়াছে। তথাপি, আত্মনির্ভরশীল নব্য চিত্রকরগণের নিকট অবশ্য এ কথা ব্যর্থ বলিয়াই গৃহীত হইবে। সারনাথের ঐতিহাসিক সংগ্রহ শিল্পের দিক ছাড়া মূর্ত্তিতত্ত্বের (Iconography) দিক দিয়াও সমধিক মূল্যবান্। কোন্ যুগে কোন্ মূর্ত্তির পূজা আদৃত হইয়াছি., কোন্ শ্রেণীর মূর্ত্তি কোন্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আরাধ্য ছিল, কোন্ সম্প্রদায় তৎপূর্ব্ব সম্প্রদায়ের উপর বিবিধ পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল, ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য কথা আমরা সারনাথের মূর্ত্তি প্রভৃতি ভাস্কর্য্য-নিদর্শন হইতে অবগত হইতে পারি। বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈনগণের নানামূর্ত্তির অপূর্ব্ব সঙ্গতি নানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। কালে বিশেষজ্ঞগণ বহু-সময়ব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। সারনাথের ভাস্কর্য্য-সংগ্রহ হইতে ভারতীয় পুরাণতত্ত্বেরও নানা বিষয় প্রকাশিত হইয়া

(১) "* * * the History of Indian Sculpture from Asoka to the Mahommedan Conquest might be illustrated with fair completeness from the finds at Sarnath alone."—V. A. Smith's "A History of Fine Art in India and Ceylon", p. 148.
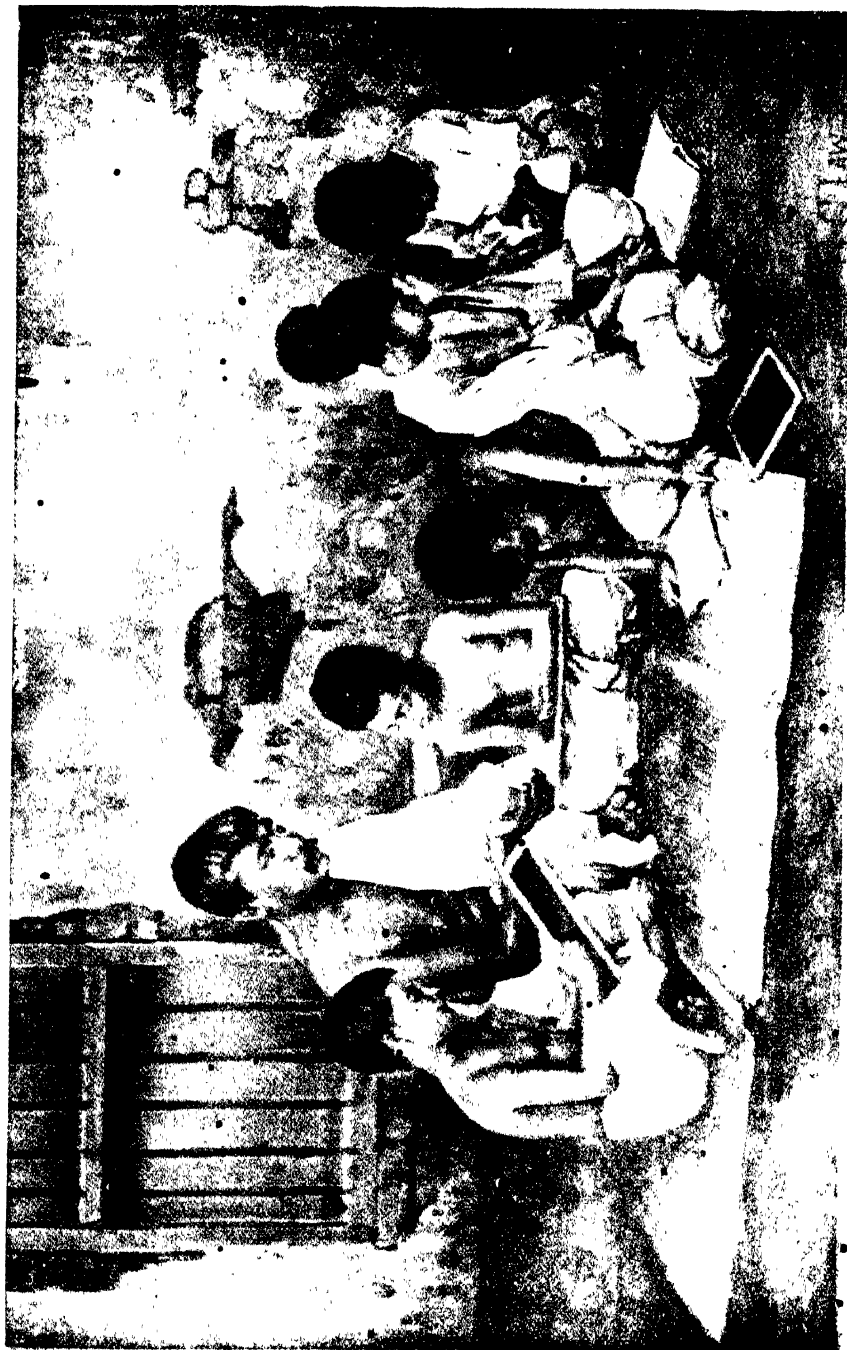
পড়িয়াছে। সংগৃহীত বিবিধ প্রস্তর ফলকে পুরাণান্তর্গত জাতকের ঘটনাবলি অঙ্কিত রহিয়াছে (২)। শিল্পতত্ত্ব, মূর্ত্তিতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব ব্যতীত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বেও সারনাথের ভাস্কর্য্য-সংগ্রহ যথেষ্ট মূল্যবান্। এখানকার অনেক মূর্ত্তির গঠন বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মূর্ত্তির পাদলগ্ন লিপির কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে। অনেক মূর্ত্তির প্রস্তরমাত্র দেখিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পিগণের পরস্পর ভাব-বিনিময় অবধারিত হইয়াছে। এখানকার কোন একটী লিপি হইতে,—অশোকের সময়ে মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত না বলিয়া লোকের যে অন্ধ বিশ্বাস ছিল, তাহা নিরাকৃত হইতে পারিয়াছে (৩)। আবার কোন কোন স্তূপের শিল্প-পদ্ধতি হইতে সিংহলের শিল্পিগণের সহিত যে সারনাথের স্থপতিগণের সম্বন্ধ ছিল, তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, সারনাথের মিউজিয়াম ও ধ্বংসাবশেষ ঐতিহাসিকের ও প্রত্নতত্ত্ববিদের একটী অবশ্য-দর্শনীয় শিক্ষাগার। যন্ত্রশালা বা 'ল্যাবোরেটরি'তে না শিখিলে যেরূপ বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, সেইরূপ মিউজিয়ামে না শিখিলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিকও হওয়া যায় না। এ কথাটি এ দেশে এখনও লোকে বুঝিতেছেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। সেই জন্যই কোন কোন শিল্পশাস্ত্রবিশারদ মিউজিয়াম-গঠনের সার্থকতার প্রতিও তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া যথেষ্টরূপে লজ্জিত ও ধিকৃত হইতে পারেন নাই। য়ুরোপে মিউজিয়াম না দেখিলে—দেশভ্রমণ না করিলে শিক্ষা সমাপ্ত হইতে পারে না। আমরা য়ুরোপের নানা বিষয়ের অনুকরণ করিতে পশ্চাৎপদ না হইলেও, এ বিষয়ে বোধ হয় নিতান্তই পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছি। তথাপি আশা হয়, দেশের বাতাস ফিরিতেছে, নানাস্থানে জাতীয় চেষ্টায় মিউজিয়াম স্থাপিত হইতেছে, কেহ কেহ এ যুগকে ঐতিহাসিক যুগও বলিতেছেন। তবে মিউজিয়ামে নানা মূর্ত্তির তথ্য-নির্ণয়-চেষ্টা এখনও আশানুরূপ ফলবতী হয় নাই। মিউজিয়ামে অনুসন্ধানকারীর যে কত আলোচ্য বিষয় থাকিতে পারে, তাহারই প্রদর্শনের জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

সারনাথ-সংগ্রহে মৌর্য্যযুগের বিচিত্র কারুকার্য্যময় স্তম্ভাদি, কুষাণ-যুগের 'মোঙ্গলিয়ান' ধরণের মুখবিশিষ্ট বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, গুপ্তযুগের অপূর্ব্ব ভাবময় স্বভাব-সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি এবং অন্যান্য মূর্ত্তি বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এ স্থলে কেবলমাত্র মারীচী নামক বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগের একটী মূর্ত্তির বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

কারণ, প্রথমতঃ, বঙ্গদেশে অন্যান্য যুগের মূর্ত্তি অপেক্ষা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগেরই মূর্ত্তি অধিক পরিমাণে নয়নগোচর হয়। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গদেশ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক প্রভাবের আদি-ভূমি বা লীলাভূমি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে (৪)। তৃতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ, মারীচী মূর্ত্তি আজকাল বঙ্গদেশের বহু স্থানে আবিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং মারীচীর এই আলোচনা হয় ত তাঁহাদিগের মূর্ত্তি-নিরূপণে সহায়তা করিতে পারিবে।

সারনাথের মারীচী মূর্ত্তিটীর মিউজিয়াম তালিকায় সংখ্যা B. (f), 23। মূর্ত্তিটী প্রত্যালীঢ়পদা, যোদ্ধৃবেশে দণ্ডায়মানা, দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। মূর্ত্তির তিন মুখ ও ছয়টী হস্ত। মধ্যভাগের মুখ অপর দুইটী মুখ অপেক্ষা বৃহত্তর,—বামদিকের মুখটী শূকরের ন্যায়। দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে বজ্র থাকিবার চিহ্ন রহিয়াছে। এই জন্য সম্ভবতঃ মারীচীমূর্ত্তির আর একটী নাম বজ্র-বারাহী। এই দিকের দ্বিতীয় হস্তে বাণ ও তৃতীয় হস্তে অঙ্কুশ বর্ত্তমান। বামপার্শ্বের প্রথম হস্তে অশোক পুষ্প ছিল বলিয়া অনুমান হয়। দ্বিতীয় হস্তে চাপ, তৃতীয় হস্ত "তর্জ্জনীধর" মুদ্রায় বক্ষে স্থাপিত। কোন-কোন স্থানে প্রাপ্ত মারীচী-মূর্ত্তিগুলি অষ্টভুজা, কিন্তু এটি ষড়্ভুজা। তিনটি মুখের পক্ষে আট অপেক্ষা ছয়টি হাত থাকাই সঙ্গত। আমাদের মনে হয়, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তির ছয়টি হস্তই ছিল, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে আর দুইটী হাত সংযুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং সারনাথের মারীচী মূর্ত্তিটী যে এই শ্রেণীর মূর্ত্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে। আলোচ্য মূর্ত্তির মধ্যভাগের মস্তকে সাধনানুসারে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পাদপীঠে সাতটী ক্ষুদ্রকায় বরাহ পাশাপাশি খোদিত আছে। এগুলি মারীচীর রথের বাহন; বাহনগুলির মধ্যভাগে একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি রথচালিকারূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সাধনে ইহার উল্লেখ নাই। পাদপীঠে একটী ক্ষুদ্র লিপি দেখা যায়, কিন্তু অতিরিক্ত অস্পষ্টতায় তাহা পাঠের উপায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি ব্যতীত মগধ, উৎকল ও বঙ্গে বিভিন্ন কালে বহু মারীচী-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়ামে, লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে, রাজসাহীর বরেন্দ্রানুসন্ধান-সমিতি ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের আবিষ্কৃত ময়ূরভঞ্জ-সংগ্রহে নানা আকারের মারীচী-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকটে ঢাকা হইতে সংগৃহীত একটী পিত্তল-নির্ম্মিত মারীচীমূর্ত্তিও দেখিয়াছি। কলিকাতার মূর্ত্তিটীর চিত্র ফুসের মূর্ত্তিতত্ত্বের পুস্তকে সংযুক্ত হইয়াছে

---

(২) ক্ষান্তিবাদ জাতক

(৩) কুমর দেবীর লিপি, Ep. Ind. IX. p. 319f. Cf. "The worship of these gods and goddesses (of Sarnath) no doubt, formed a part of the popular religion of India at an early stage, in fact it may in many cases go back to pre-Buddhist times." Vogel, Sarnath Catalogue p. 22. ইঁহাদের কথার এক-বাক্যতা নাই। Ibid p. 7.

(৪) লক্ষ্য করিবার বিষয়—পেশোয়ারের মিউজিয়াম ত দূরের কথা, মথুরা মিউজিয়ামেও বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের কোন মূর্ত্তি দেখা যায় না। Look up, Catalogue of the Archaeological Museum at Mathura.

(৫)। এই মূর্ত্তিখানি ও ময়ূরভঞ্জের মূর্ত্তিখানি (৬) সারনাথের মূর্ত্তি অপেক্ষা সুচারুতর এবং এই শ্রেণীর মূর্ত্তির পরিণতাবস্থার বিজ্ঞাপক। সারনাথের মূর্ত্তিখানিই যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, এ কথা হইতেও তাহার অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। মারীচী-মূর্ত্তির সহিত সূর্য্য-মূর্ত্তির সম্বন্ধ দেখাইতে অনেকে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই একটী বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন না। স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, মারীচী 'মরীচি', শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মরীচি অর্থে সূর্য্যের কিরণ। সুতরাং এই মূর্ত্তি সূর্য্যের শক্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সূর্য্যমূর্ত্তির নিম্নে অরুণচালিত "সপ্তসপ্তিবহঃ প্রীতঃ" ইত্যাদি ধ্যানানুসারে যেরূপ সপ্তাশ্ব আছে, এ মূর্ত্তির নিম্নেও সেইরূপ স্ত্রীচালিত সপ্তবরাহ আছে। ডাঃ ভোগেল প্রমাদবশতঃ সূর্য্যের সপ্তাশ্বকে সপ্ত দিনের রূপক মনে করিয়াছেন এবং মারীচীমূর্ত্তিকে উষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সূর্য্যতেজের সাতটী বর্ণই (Vibzure) পৌরাণিক ভাষায় সপ্তাশ্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আবার মারীচীর সপ্ত বরাহ তামসীর অন্ধকার দণ্ডদ্বারা ভেদ করিয়া সূর্য্যের উদয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। বরাহের উদ্ধারশক্তি হিন্দুর নিকট সুবিদিত। মারীচীর বরাহচিহ্নের ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য্য। বারাণসীধামে বারাহীর একটি মন্দির আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভিন্ন সে মূর্ত্তির পূজা দর্শন করিবার অধিকার কাহারও নাই। আবার, বিষ্ণুর এক অবতারের নাম বরাহ; অতএব তাঁহার শক্তি বারাহী। আদিত্য বা সূর্য্য যে বিষ্ণুরই রূপ তাহা বৈদিক সাহিত্যে ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। (৭) সুতরাং দেখা যাইতেছে, বারাহী বা মারীচী মূর্ত্তির তত্ত্ব বড়ই জটিল ও রহস্যময়। শাক্যমুনির মাতার এক নাম মারীচী, এরূপ অবগত হওয়া যায়। ইহার সহিত সূর্য্যশক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করা আরও দুরূহ ব্যাপার। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ময়ূরভঞ্জে যে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন-কোন স্থানে মারীচীকে চণ্ডী নামে পূজিতা হইতে দেখিয়াছেন। সকলেই জানেন, সূর্য্যের একটি যোগরূঢ় নাম "চণ্ডাংশু"। সুতরাং শক্তির তাৎপর্য্য ইহা হইতেও ধরিতে পারা যায়। ময়ূরভঞ্জে বসু মহাশয় কর্ত্তৃক যে দুইটি বারাহী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার একটির সহিত "মন্ত্রমহোদধি"র ধ্যানের মিল আছে (৮)। ইহাতেও বারাহীর বাহন আছে, পৃথিবীর উদ্ধারের কথা ("বসুধরা দংষ্ট্রাতলে শোভিনীং) আছে। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে যখন সমুদ্রের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে বরাহদণ্ডের ন্যায় প্রথম শ্বেত জ্যোতিঃ উঠিতে থাকে, তখন জলধি হইতে, অন্ধকারের বিভীষিকা হইতে ধরা-দেবীও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন (৯)। বিষ্ণু সম্বন্ধে, মারীচী সম্বন্ধে জগতের প্রতিদিনের এই মহাসত্য রূপক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তিব্বতেও মারীচী ও বজ্রবারাহীর পূজা প্রচলিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রুণওয়েডেলের তিব্বত-সংক্রান্ত মূর্ত্তিতত্ত্বের পুস্তকে মারীচীর তিব্বতীয় নাম 'od zer-cau ma প্রদত্ত হইয়াছে। তিব্বতীয় মারীচী মূর্ত্তিও ষড়ভুজা, সপ্তবরাহচালিত রথারূঢ়া, ত্রিমুখী ও নানালঙ্কার ভূষিতা। মূর্ত্তিটি অবশ্য প্রত্যালীঢ়পদা নহে—উপবিষ্টা (১০)। আবার তিব্বতীয় বজ্রবারাহীর নাম, Dorje Phagmo। এই মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব আছে। প্রথম দেখিবামাত্র এটীকে আমাদের কালী-মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মে। গলে মুণ্ডমালা, নিম্নে পদতলে শায়িত শব, দুই দিকে ডাকিনী ও যোগিনী। মূর্ত্তির মুখ অবশ্য শূকরের ন্যায় (১১)। তিব্বতীয় মূর্ত্তিতে এরূপ বিভিন্নতা হইল কেন, ইহা অবশ্য অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক-একটি মূর্ত্তির সম্বন্ধে কতই না গবেষণা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সকল আলোচনায় অনুসন্ধিৎসুগণ মনোযোগী হইয়া সময়ক্ষেপ করিবেন কি?

---

(৫) এই মূর্ত্তির সাধন:—"* * * সূর্য্যে পীতমাংকারং (?) ধ্যাত্বা তদ্বিনির্গত রশ্মিনিবহৈঃ আকাশে সমাকৃষ্য ভগবতীং অগ্রতঃ স্থাপয়েৎ, গৌরীং, ত্রিমুখীং, ত্রিনেত্রাং, অষ্টভুজাং, রক্তদক্ষিণ-মুখীং, নীলবিকৃতবামবরাহমুখীং, বজ্রাঙ্কুশশরসূচীধারি দক্ষিণ চতুঃকরাং, অশোকপল্লবচাপসূত্রতর্জ্জনীবামস্থিতাং রক্তাম্বর কঞ্চুকোত্তরীয়াং সপ্ত-শূকর রথারূঢ়াং প্রত্যালীঢ় পদাং * * *।—Foncher's "Iconographic Buddhique" p. 92.

(৬) Mayurvanja Archæological Survey, p. xcii.

(৭) "আদিত্‌প্রত্নস্য চেতসো জ্যোতিষ পশ্যন্তি বাসরম্‌" প্রঃ মণ্ডল, ৫ম ১০ ঋক্‌ ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র সূর্য্যনারায়ণেরই স্তুতি। গায়ত্রীর মন্ত্র, বিষ্ণুর ধ্যান "ধ্যেয়ঃ যদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ" ইত্যাদি মন্ত্র, ছান্দোগ্যোপনিষদের হিরণ্ময় পুরুষের স্তব তুলনা করিলে বিষ্ণুই যে সূর্য্য, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া শতপথ-ব্রাহ্মণে (১০২১পৃঃ। XIV. 1st. Bap. 11.—12) কি করিয়া বিষ্ণু আদিত্যরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহার রূপক রহিয়াছে।

(৮) Mayurvanja Archæological Survey by N. N. Vasu, Vol. I, p. LXXII. ফুটনোটে যে ধ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার শেষ চরণের পাঠ শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। "যথা, "বারাহী মনুচিন্তয়ে স্ববাহনারূঢ়াং শুভালঙ্কৃতীং"। ইহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে। "বারাহী মনুচিন্তয়ে স্ববাহনারূঢ়াং শুভালঙ্কৃতিং" এরূপ পাঠ থাকিলে ঠিক হয়।

(৯) "উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা" ইত্যাদিতে "শতবাহু" অর্থ সূর্য্যের শত শত কিরণ। পাতাল বা রসাতলের প্রকৃত অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজ্য। প্রতিদিনই পাতাল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার হইতেছে। তাই মহাকবি কালিদাস সমুদ্রকে ধরাদেবীর অবগুণ্ঠন বলিয়াছেন। "রসাতলাদাদি ভবেন পুংসা। ভুবঃ প্রযুক্তোদ্বহন ক্রিয়ায়াঃ। অস্যাচ্ছমম্ভঃ প্রলয়প্রবৃদ্ধং। মুহূর্ত্তবক্ত্রাভরণং বভুব॥ রঘু, ১৩শ, ৮ম শ্লোক। অন্ধকার ও তাহার পর্য্যায় শব্দগুলি অমরকোষের পাতালবর্গেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(১০) Grunwedel's "Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei" p. 145.

(১১) Ibid, p. 157.

উল ও উলী-বস্ত্র

[শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী]

(রঞ্জন-প্রক্রিয়া)

উলকে রং করিতে হইলে, উলের সূতাকেই রং করিতে হয়। রং করার প্রণালী কিরূপ, তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে। সূতার গোছা প্রথমে ফুটন্ত জলে ছাড়িতে হয়, ও তাহাতে রে(প্রত্যেক গ্যালনে ১ পাউণ্ড) এবং সাজিমাটী প্রক্ষেপ করা চাই।

উল প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া এই জলে পড়িয়া থাকিবে। পরে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া উষ্ণ থাকিতে-থাকিতে নিংড়াইয়া শুষ্ক করিতে হয়। অতঃপর শীতল জলে ধৌত করিলেই উল পরিষ্কার, নরম, এবং অন্যান্য বর্ণোপযোগী হইবে।

রং প্রস্তুতের বিবরণ বলিতেছি।

কাল রং

(ক) হরিতকী এবং হীরাকস জলে নিক্ষেপ করিয়া ফুটাইয়া দিলে কয়েকবার ধৌত করণান্তর শুষ্ক করিলেই কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

(খ) তিন গ্যালন জল অগ্নির উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। তাহাতে এক পাউণ্ড হীরাকস, তিন পাউণ্ড বাবলা বীজ এবং চার পাউণ্ড ঝামা ইষ্টকের গুঁড়া দিবে। এক ঘণ্টা ফুটলে উলের গোছা তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া অধিক সময় পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। অনন্তর ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে।

লাল রং

(ক) একভাগ হরিতকীর গুঁড়া ১৬ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া উলের গোছা তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে ফটকিরীর জলে ছাড়িয়া দিবে। অনন্তর "আঁলের" (আচ morenda citrifolia) মূল চূর্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করতঃ ফুটাইতে হইবে।

(খ) ভুটিয়াগণ উতিসের ছাল এবং মাজেঠির (মঞ্জিষ্ঠা) মূল সিদ্ধ করিয়া লাল রং তৈয়ার করে। ঝিঙ্গন গাছের পাতা ও গালা সিদ্ধ করিলেও লাল রং হইয়া থাকে।

আগরা জেলে নানা প্রকার লাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে ; যথা :—

রিঠাকে সামান্য জল দিয়া এক প্রস্তরের উপর উত্তমরূপে কুটিয়া ১২ ঘণ্টা কাল উলকে তাহাতে চাপিয়া রাখার পর জল মিশ্রিত করিয়া উলকে ডুবাইয়া দিতে হয়। অনন্তর উঠাইয়া লইয়া উত্তমরূপে ধৌত করতঃ শুষ্ক করিতে হইবে।

অন্য পাত্রে ৪ ছটাক গালা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ৬ ছটাক Muriate of tin মিশ্রিত করণান্তর ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হয়। পরে উল ছাড়িয়া যতক্ষণ না রং তাহাতে ধরে, ততক্ষণ নাড়িতে হয়।

ইতিমধ্যে ১½ সের গালা ১½ সের Muriate of tin এবং ১২ ছটাক Cream of tartar একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে।

উলকে উঠাইয়া লইয়া উল্লিখিত পদার্থ ফুটন্ত জলে ছাড়িয়া দিতে হয়। স্মরণ রাখিও, যেন জল ফুটিতে থাকে।

উলকে পুনরায় ছাড়িয়া একখণ্ড বাঁশ দ্বারা দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া নাড়িতে হয়। পরে উলকে উঠাইয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার জলে ধৌত করতঃ যখন দেখা যায় যে রং আর উঠিতেছে না, তখন ফট্‌কিরির জলে উলকে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

ফিকা লালের হিন্দী নাম "গুলনার" এবং "গুলাবি"। ইহা তৈয়ার করিতে হইলে উল্লিখিত বস্তু কম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

Terra cotta তৈয়ারি করিতে হইলে গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) এবং সামান্য গালা ফুটাইতে হয়। গালার মাত্রা অধিক হইলেই গুলাবি রং হইয়া থাকে।

বেগুনি রং তৈয়ার করিতে হইলে উলকে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসারে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ৫ সের চুণের জল মিশ্রিত করিয়া জলটাকে ফেলিয়া দিয়া উলকে ডুবাইয়া দিতে হয়। এরূপ প্রক্রিয়া আশুফলপ্রদ।

কানপুরে লাল রং তৈয়ার করিবার প্রক্রিয়া যথা :—

চুনের জলে কাপড়কে তিন ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিয়া ধৌত করিতে হইবে। কতকগুলা গালার বাতি চূর্ণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষার মিশ্রিত করণান্তর একটা কাপড়ের উপর রাখিতে হয়। তন্নিম্নে কোন পাত্র স্থাপিত করিলে কাপড় দিয়া জল চোয়াইয়া পড়ে। এই জলে আটা (গম চূর্ণ) নিক্ষেপ করিলে গ্যাজলা উঠিতে থাকিবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল লালবর্ণে পরিণত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাপড়কে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে। তিন দিন ব্যাপিয়া কাপড় ডুবাইয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইল। রংটা পাকা কি না, ধৌত করিয়া দেখিতে হইবে। পরে কোন "ভেজার" (সির্কা), লেবুর আরক এবং জল একত্রে ফুটাইয়া প্রক্রিয়ার অবসান করিবে।

উল্লিখিত লাল রং একটু পরিবর্ত্তিত প্রক্রিয়ায় নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

প্রথমে উলের কাপড় রেহের (reh) খারে ফুটাইতে হয়। পরে কাপড়কে উঠাইয়া লইয়া ধৌত করতঃ শুষ্ক করিতে হইবে। জবের আটা (ময়দা) প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া একটা মৃণ্ময় কলসীতে রক্ষা করিতে হইবে। গালা উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ জবচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করণান্তর, কলসীর মুখ দুই তিন দিনের জন্য আবৃত করিতে হইবে। কলসীর মুখ সূর্য্যের দিকে থাকিবে। গ্যাজলা উঠিলে উলি সূতার গোছা কলসীর মধ্যে ভরিয়া দিয়া কলসীর মুখ আবৃত করিতে হইবে। সূতার গোছা প্রত্যেক দিন স্পন্দিত না করিলে চলিবে না। দশ-বারদিন পরে সূতাকে উঠাইয়া লইয়া ধৌত করতঃ শুষ্ক করিতে হয়। অতঃপর হরিদ্রার জলে কথঞ্চিৎ অম্ল মিশ্রিত করিয়া সূতার গোছাকে ফুটাইতে হইবে। পরে উলকে উঠাইয়া লইয়া ধৌত করণান্তর শুষ্ক করিলেই অতি চমৎকার পাকা রং হইয়া থাকে।

গুলাবি তৈয়ার করিতে হইলে, মিশ্রিত জবের ময়দা এবং গালার

যখন গাঁজলা উঠে, তখন সূতার গোছাকে লইয়া পাঠানি লোধ (Symploos racemosea) আমের আমসি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই বা তিন ঘণ্টা ফুটাইতে হইবে। অনন্তর সূতাকে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে।

মল্লা রং

পূর্ব্বে গুলাবি প্রসঙ্গে আমরা যে ময়দা (আটা) ও গাজার জলের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তদ্দ্বারা উলের সূতাকে ধৌত করিয়া নিমজ্জিত করিতে হয়। দুই-তিন দিন সূতা ভিজিলে পর, ধৌত করতঃ শুষ্ক করিলেই দেখিবে যে, মল্লা রং প্রস্তুত হইয়াছে। রংটা পাকা।

গাঢ় সোণালি রং

উলকে জলে ধৌত করিয়া টেসু (পলাশ) ফুলের রসে ডুবাইতে হয়। দুই বা তিন দিন অতীত হইলে উলকে উঠাইয়া লইয়া একটা প্রস্তর নির্ম্মিত তক্তায় আছড়াইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করাই বিধি। অতঃপর সূতাকে লোধের জলে ফুটাইয়া রের খারে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

হাল্কা সোণালি রং

রের খারে সূতাকে না রাখিয়া কেবলমাত্র খয়ের এবং লোধের সহিত ফুটাইয়া শুষ্ক করিলেই হাল্কা সোণালি রং প্রস্তুত হইল।

গাঢ় নীল রং

রং-সাজগণ নীলের ভাটিতে এই রং প্রস্তুত করে। উলকে জলে ধৌত করিয়া নীলের ভাঁটিতে রাখিতে হয়।

কৃষ্ণাভ নীল

রের খারে উলকে ফুটাইয়া লইয়া নদীতে ধৌত করতঃ নীলের ভাঁটিতে নিমজ্জিত করিতে হয়। দুই বা তিন ঘণ্টা পরে উঠাইয়া লইয়া নিংড়াইতে হইবে। অতঃপর প্রায় দুই ঘণ্টা কাল রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। পুনরায় ভাঁটিতে দুই ঘণ্টা নিমজ্জিত করতঃ পরে নিংড়াইয়া জমির উপর সূর্য্য কিরণে শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর নদীর জলে ধৌত করিয়া উন্মুক্ত বায়ুতে টাঙ্গাইয়া দিবে। যদি রংটা অধিক কাল স্থায়ী করিতে চাহ, তবে নীলের ভাঁটি হইতে সূতাকে উঠাইয়া লইয়া ফট্‌কিরির জলে প্রক্ষালিত করিবে। ধৌত করণান্তর নীলের ভাঁটিতে নিমজ্জিত করিবে ও পরে শুষ্ক করিতে দিবে।

আগরা জেলে কৃষ্ণাভ নীল রং যেরূপে প্রস্তুত হয়, তাহার বিধি নিম্নে বর্ণনা করিতেছি :—

দুইসের নীল উত্তম করিয়া পেষণ করতঃ একটা কঠিন পাত্রে রাখিয়া ছয় সের sulphuric acid মিশ্রিত করিতে হয়। অতঃপর উলকে তাহাতে ডুবাইয়া ৪৮ ঘণ্টা এইরূপে থাকার পর ৫ বা ৬ ঘণ্টা সমানভাবে নাড়িতে হইবে। উলকে চূণের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া কয়েকবার পরিষ্কার জলে ধৌত করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। যতক্ষণ না ঠিক রংটি হয়, ততক্ষণ ফুটন্ত জলে উল্লিখিত sulphuric acid এবং নীল সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করণান্তর উলকে ডবাইয়া দিতে হয়। রং ধরিয়া যাইলে উলকে উঠাইয়া লইয়া শীতল জলে ও তৎপরে ফট্‌কিরির জলে ধৌত করিতে হইবে।

আসমানী রং

সূতাকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া রংসাজকে দেওয়া হয়। রং-সাজ এক ঘণ্টাকাল নীলের ভাঁটিতে উহা ডুবাইয়া রাখে। উলকে শুষ্ক করিয়া পরে ধৌত করতঃ পুনরায় শুষ্ক করিতে হয়।

সবুজ রং

উলকে প্রথমে জলে এবং রের খারে ফুটাইয়া লইয়া নদীতে ধৌত করতঃ রংসাজকে দেওয়া হয়। রংসাজ "হাল্কা নফরম্যান" রঙ্গায়। পরে ইহাকে "পিউয়ারে" অর্থাৎ গোমূত্রে রাখিয়া হরিদ্রা এবং টেসু (পলাশ) ফুল মিশ্রিত করে। এক বা দুই দিন ধরিয়া উল এই জলে ভিজিতে থাকে। পরে উলকে উঠাইয়া লইয়া ছায়ায় শুকাইতে হয়। (এই রংটা পাকা নহে, সূর্য্যের উত্তাপে ফিকা হইয়া যায়)।

আগ্রা জেলে সবুজ রং যে প্রকারে তৈয়ার করা হয়, তাহা উক্ত হইতেছে :—

চূণের জলে উলকে ডুবাইয়া ধৌত করতঃ শুষ্ক করিতে হয়। হলুদ উত্তমরূপে কুটিয়া অত্যন্ত গুঁড়া করিয়া উলকে তাহাতে চাপিয়া রাখিতে হইবে। তিন সের হলুদে ১০ সের উল হওয়া চাই। দুই সের নীল এবং ৬ সের sulphuric acidএ সিদ্ধ করিয়া চার ছটাক ফটকিরির জলে ধৌত করিতে হইবে। সবুজের হাল্কা রং "ধানি" নামে খ্যাত। ইহা উক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরন্তু নীল এবং sulphuric acidএর পরিমাণ কম হওয়া আবশ্যক।

পিসতাই (পীতবর্ণাভ সবুজ)

রংসাজ প্রথমে হাল্কা নীল রং প্রস্তুত করে। উলের গোছাকে হরিদ্রা এবং Muriatic acidএ ফুটান হয়। পরে শীতল জলে ডুবাইয়া, নিংড়াইয়া ছায়ায় শুষ্ক করা হয়।

ময়ূরের রং

উলকে রের খারে সিদ্ধ করিতে হয়। ধৌত করণান্তর রংসাজকে "গহেরা সুরমাই" রঙ্গাইতে দেওয়া হয়। পরে সূতার গোছাকে পিউরা (গোমূত্র) হরিতকী এবং হরিদ্রার জলে রাখিতে হয়। এক বা দুই দিন ধরিয়া উল ভিজিতে থাকে। (রংটা পাকা)।

সব্জী রং

উলকে নদীর জলে ধৌত করিয়া তাহাকে টেসু (পলাশ) ফুলের আরকে দুই দিন ভিজাইতে হয়। পরে উলকে উঠাইয়া আতপতাপে শুষ্ক করিতে হইবে। অতঃপর ইহাকে হীরাকস (sulphate of Iron) এবং হরিতকীর জলে ফুটাইতে হইবে; অথবা এই দুই দ্রব্যের মিশ্রিত জলে দুই বা তিন দিন ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। (রংটা পাকা)।

পিঙ্গল বর্ণ

টেসু (পলাশ) পুষ্পের আরকে ডুবাইয়া রাখিয়া উলের সুতাকে খয়ের এবং লোধের জলে ফুটাইয়া চুণের থারে রাখিতে হয়। সুতা এইরূপে প্রায় ১২ ঘণ্টা ভিজিতে থাকে। পরে তাহাকে নিংড়াইয়া একটা মৃণ্ময় কলসীতে রাখিয়া ৪।৫ দিন সূর্য্য-কিরণে রাখিতে হইবে। অতঃপর সুতার গোছাকে উঠাইয়া ধৌত করণান্তর শুষ্ক করিতে হইবে। (রংটা পাকা)।

পাম্বা বা জরদ রং

এই রংটি নানা প্রকারে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রক্রিয়া এইরূপ:—২০ সের টেসু (পলাশ) ফুলের সহিত উলকে এরূপভাবে মিশ্রিত করিতে হইবে, যেন প্রত্যেক উলের স্তরের পার্শ্বদ্বয়ে পলাশ ফুল থাকে। অতঃপর পাত্রটি জলপূর্ণ করিয়া ২৪ ঘণ্টা ভিজাইতে হইবে। পরে উলকে উঠাইয়া লইয়া অন্য একটি পাত্রে শীতল জলে ধৌত করতঃ, একসের Muriate of tin ছাড়িয়া দিতে হইবে। উত্তমরূপে নাড়িয়া উলকে ছাড়িয়া প্রায় দুই ঘণ্টা আলোড়িত করিতে হইবে। উলে উপযুক্ত রং ধরিয়া যাইলে, ফট্‌কিরির জলে নিমজ্জিত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। রংটা টেসু (পলাশ) ফুলের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য প্রক্রিয়া না করিলে রংটা স্থায়ী হয় না।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া:—হরিদ্রা, অকলবীর (Datioca Cannabira) এবং ফট্‌কিরির গুঁড়ায় রং তৈয়ার হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রক্রিয়া:—টেসু (পলাশ) ফুলের আরকে ডুবাইয়া হরিদ্রার সহিত ফুটাইয়া লইলেই জরদ রং প্রস্তুত হইয়া থাকে। (রংটা কাঁচা)।

মলাই রং

উলী সুতাকে রে'র থারে ফুটাইয়া লইয়া ধৌত করণান্তর পিউরীর (গোমূত্র) আরকে এবং শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে তাহা হইতে উঠাইয়া লইয়া পাথরের তক্তায় আছড়াইয়া শুষ্ক করিতে হয়।

অন্য প্রক্রিয়া:—সুতাকে চুণের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া ধৌত করতঃ "পিউরীর" আরক এবং জলে রাখিয়া দিতে হয়। (রংটা পাকা)।

উঠের রং

রে'র থারে উলের সুতাকে ফুটাইয়া লইয়া নদীতে ধৌত করতঃ হরিতকীর আরক এবং জলে ফুটাইয়া লইয়া ধৌত করণান্তর শুষ্ক করিতে হইবে।

খয়রা রং

খয়ের, গালা এবং অম্ল, ইহাদিগের আরকে সুতাকে ফুটাইয়া লইয়া ধৌত করতঃ লোধের জলে তেঁতুল পাতা অথবা আমের আমুসি দিয়া তদনন্তর ফুটাইয়া সুতাকে শুষ্ক করিতে হয়।

থাকি রং

উলের সুতাকে ধৌত করিয়া হিরাকস (sulphate of iron) বাবলা ছাল এবং টেসু (পলাশ) ফুলের আরকে রাখিয়া পরে উঠাইয়া লইয়া সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিতে হয়। (রংটা পাকা)।

খাটমলি রং (ছারপোকার রং)

সুতাকে জলে ধৌত করতঃ গালার বাতি, লোধের তেজাব (সির্কা) এবং আমের আমসির আরখে রাখিতে হয়। পরে সুতাকে উঠাইয়া লইয়া নদীতে ধৌত করিতে হয়।

য্যানিলিন রং (Aniline dye)

য্যানিলিন রঙ্গের প্রচলন এ দেশে অধিক হইয়াছে মির্জাপুরে। ঐ রং Nuremberg হইতে আইসে। ইহা নিম্ন শ্রেণীর রং, সহজেই উঠিয়া যায়। সুলভ বলিয়া রংসাজগণ ইহার বহু পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার ভূরি ব্যবহারের ফলে রং-করা-বিদ্যাটা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ভারতের সকল রংই এক প্রকার লোপ পাইয়াছে; কেবল মাত্র একা নীল বিদ্যমান আছে। সুন্দররূপে রং-করা এখন রংসাজদিগের উদ্দেশ্য নহে, তাহারা সময়, পরিশ্রম ও পয়সা বাঁচাইতে চাহে। তাহাদিগের এ উদ্দেশ্য বিদেশীয় রং ব্যবহার করা ভিন্ন সুসিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং রংসাজদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইতে আর অধিক দিন নাই। অস্তিত্ব যে আছে তাহাই বা কি করিয়া বলিব। দেশে রংসাজ থাকিলে কি আর মির্জাপুরের তেজিরি কোম্পানিকে পঞ্জাব হইতে রংসাজকে আনাইতে হয়?

রং উড়ান:—রং উড়াইবার প্রায়ই আবশ্যক হয় না। যদি হয়, তবে গন্ধক জ্বালাইয়া কাপড়ে ধুম লাগান হয়; অথবা তাহাকে রিঠার জলে ধৌত করা হয়।

কার্পেট প্রস্তুতির খরচ

এক্ষণে কার্পেট তৈয়ার করিতে হইলে কিরূপ খরচ পড়ে তাহার কথা বলিতেছি।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইতেছে তাহাতে দেখিতে পাইবে যে ১২ বর্গগজ সাধারণ কার্পেটে কত খরচ পড়ে। ১২×৯ ফুট=১২ বর্গগজ।

	টাঃ আঃ পাঃ
উলের সুতা ১০ সের ৮ ছটাক ৪২ টাকায় মণ হিসাবে	১১—০—৩ ৪/৫
তানা ৩ সের ১০ ছটাক ১৩ আনায় সের হিসাবে	২—১৫—১ ২/৫
পড়েনের ৭ সের ৮ ছটাক	৩—০—০
পড়েনের রং করা	০—৪—০
উপকরণ রঙ্গান ১০ আনায় ৪ সের হিসাবে ...	১—১০—৩
এই কার্পেটটা প্রায় ১১ দিনে বুনা হইবে এবং ৪ জন লোক নিযুক্ত হইবে। বুনার দাম এক টাকায় ৮ "লিহান"	৯—০—০
মোট	২৭—১৩—৩ ৩/৫

এই কার্পেটটা বিক্রয় করিতে হইলে ২।৶০ প্রত্যেক বর্গ ফুট হিসাবে প্রায় ৩১৷৷০য় বিক্রয় হইবে। বাকী বাঁচিল ৩ টাকা দশ আনা দুই পাই। ইহাতে সুতা খোলা, রং করা এবং ওস্তাদের বেতন সামিল নাই। সুতা খুলিবার এবং রং করিবার মজুরি প্রায় ১০ আনা ৩

পাই। বয়ন যন্ত্রের মালিক তাহার বেতন ব্যতীত প্রত্যেক বর্গ ফুটে ৬ পাই হইতে এক আনা পাইয়া থাকে। বেতন বাদ দিলে কোন লাভ নাই। কার্পেট বুনিতে বিলম্ব এবং দুঃসময় বাদ দিলে তাঁতিদিগের গড়ে ৬ হইতে ৭ টাকা মাসিক আয়। ইহাতে লাভ, রং করার মজুরি, কার্য্য পর্য্যালোচনা, নমুনা তৈয়ার ইত্যাদি সমস্ত সামিল আছে।

কানপুরে Elgin, Muir, Victoria Mills এবং J. J. Bell কোম্পানির দোকান আছে। এতদ্ব্যতীত, দেশীয় দোকান যে নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। চুক্তি করিয়া কার্য্য লওয়াই কানপুর মিলের প্রথা। তাহাদিগের মতলব ঠিকাদারের সহিত। বাঁধা দরে ঠিকাদারকে দরি তৈয়ারির উপকরণাদি দেওয়া হয়। মিলের ভিতর কার্পেটের যন্ত্র লাগান এবং কারিকর নিযুক্ত করার ভার ঠিকাদারের উপর। দরি তৈয়ার হইলেই ঠিকাদারকে মূল্য দেওয়া হয়। হিসাবটা অবশ্য প্রত্যেক মাসেই হইয়া থাকে। ঠিকাদারকে নিম্নলিখিত হিসাবে মূল্য দেওয়া হয়। অবশ্য ইহা হইতে উপকরণাদির দাম কাটান গিয়া থাকে।

	টাকা	আনা	পাই
দরি বর্গ গজ ১০ নং সুতা	১	০	৬
	১	১	০
ঐ ৬ ঐ	০	১৫	০
ঐ ৪ ঐ	০	১৩	০
ঐ ফুলদার	২	৪	০
	২	৮	০

ঠিকাদার প্রত্যেক বর্গ গজে প্রায় ১ আনা লাভ করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত তালিকায় প্রত্যেক এক টাকা মূল্যের দরিতে গড়ে কত পড়ে তাহা দেখান হইতেছে।

	টাকা	আনা	পাই
তানা নং ১০	০	৭	৩
পড়েন নং ১০	০	১	৩
খোলা এবং বয়ন করা	০	০	৬
রং করা	০	১	৬
দরি পরিষ্কার করা এবং যন্ত্র রিপু করা	০	০	৬
বয়ন করা	০	৪	৩
মোট—	০	১৫	৩

এই দরি খানা এক টাকায় বিক্রীত হইবে। লাভ ৯ পাই অর্থাৎ তিন পয়সা মাত্র।

কাজ যদি খারাপ হয় তবে দরি লওয়া হয় না, সে ক্ষেত্রে ঠিকাদারের জরিমানা করা হয়।

তাঁতিকে সকল কার্য্যই করিতে হইবে। তাঁনা প্রস্তুতি, রং করা, সুতাকে শৃঙ্খলায় লইয়া আসা, "ভেরি" তৈয়ার, দরি বয়ন হইলে তাহাকে পরিষ্কার করা প্রভৃতি সকল কার্য্যই তাঁতির উপর ন্যস্ত। বৃহৎ দরি প্রস্তুতি সময় সাপেক্ষ। মনে কর প্রত্যেক তাঁতি যদি কেবলমাত্র ৩ ফিট লম্বা দিকে বয়ন করে তবে প্রথমে ৩×১২ বর্গ ফিট=৪ বর্গ গজ বুনিবে এবং পরে ৩×৪=১৩ বর্গ গজ বয়ন করিবে। সচরাচর দুই জন তাঁতি ১১ ফিট চওড়া দরি বুনিবার জন্য নিযুক্ত হয়। ইহাতে তাহাদিগের অত্যন্ত ক্লান্তি হইয়া থাকে এবং বয়নও ঢিলা হয়।

রংসাজগণ রং করিতে হইলে নিম্ন লিখিত হিসাবে মজুরি লইয়া থাকে:—

৮ সের তুলার সুতি হাল্কা নীল রং করিতে হইলে···১ টাকা সের।
৪ ঐ গাঢ় নীল ঐ ···১ টাকা সের।

কার্পেটের নমুনা

কার্পেটের নমুনাতে সিংহ, হরিণ প্রভৃতির চিত্র দেখা যায়। এই সকল আকৃতির আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। তাঁতিরা এক্ষণে সে অধ্যাত্ম অর্থ বিস্মৃত হইয়াছে। কেবল সাজাইবার উদ্দেশ্যে ফুল বা জন্তুর আকৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কার্পেট মাত্রেই হরিণ, মৎস্য, শুকপক্ষী এবং বিড়ালের আকৃতি দেখা যায়। বৃক্ষের গুঁড়ির মধ্যে পত্র বা ফুলের নমুনা দেওয়া হয়। ফুলের নমুনার মধ্যে গোলাপ এবং সূর্য্যমুখীরই প্রচলন অধিক। কার্পেটের ধারিতে নানারূপ নমুনা থাকে। "পান কি বেল," "আঙ্গুরিয়া বেল" এবং "গোলাপ কি বেল" সচরাচর আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয়।

সুতির কার্পেটে ফুলের নমুনাই অধিক। ফুল ও পশুর আকৃতি ব্যতীত "ধব্বেদার" "চরখাদার" ইত্যাদি নমুনাও দেখা যায়। জায়নমাজ মুসলমানদিগের পূজার আসন। ইহাতে মস্‌জিদের শীর্ষদেশ মক্কার দিকে থাকে।

পুরুষানুক্রমে যে নমুনা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের সংঘর্ষে প্রায় লোপ পাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের নমুনা নকল করিতে গিয়াই এই ক্ষতিটা হইয়াছে। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের চলৎচিত্ততা-নিবন্ধন নমুনারও সংখ্যা নাই। সুতরাং তাহাদিগের মনের মত কাজ করিতে গিয়া ভারতীয় সুন্দর নমুনা লোপ পাইয়াছে। য়ুরোপ হইতে যে সকল নমুনা ভারতে আইসে, তাহা গণনা করিয়া লেবিল লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহা কিরূপ বর্ণের হইবে, তাহাও এই নমুনাতে থাকে। বৈতনিক কর্ম্মচারী কার্য্য-পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে। এই নমুনা নকল করিতে পারিলেই, তাঁতির পারদর্শিতা সাব্যস্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় তাঁতিগণ নকল করিতে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং তাঁতিদিগের কোন দোষ নাই। উদরপূর্ত্তি অগ্রে, না নমুনার উত্তমতা অগ্রে? নমুনার উত্তমতা দেখিতে যাইলে তাঁতিকে লাল বাতি জ্বালিতে হয়। সুতরাং বেচারা করে কি? উপায় নাই। ভারতবাসিগণ যদি উত্তম কার্পেট বুনিবার উৎসাহ দেয়, তবেই উৎকর্ষতা রক্ষা হইতে পারে। এ কর্ত্তব্য ভারতবাসীর—অন্য কাহারও নহে।

জীবন-সংগ্রামে বাঙ্গালী।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ]

কিছু দিন হইল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় "বাঙ্গালী জাতির মস্তিষ্কের অপব্যবহার" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা যে বড় কু-আদর্শে চালিত হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, বাঙ্গালী জাতি জীবন-সংগ্রামে কিরূপ ভাবে আপনাকে চালাইতেছে, আমি তাহারই আলোচনা করিব।

আমরা বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের একটা ভারি গর্ব্ব আছে। রেলের গাড়ীতে ধনী বোম্বাইওয়ালা বা ভাটিয়া উঠিলে, আমরা নাক সিঁটকাইয়া তাহাকে 'ছাতু' বলিয়া ঠাট্টা করি। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, বাঙ্গালী একটা "মস্ত জাত"। বুদ্ধিমত্তায় বাঙ্গালী ভারতেরই অন্যান্য জাতিবৃন্দের মস্তিষ্ক স্বরূপ। বাঙ্গালীর বুদ্ধির নিকট ভারতের আর কোন জাতি দাঁড়াইতে পারে না। কথাটার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, তাহাই দেখা যাক।

কলিকাতার প্রতিষ্ঠার পর, কলিকাতাপ্রবাসী ইংরাজ বণিকগণ বাঙ্গালীকে আদর করিতেন। তাঁহারা বিলাত হইতে মাল আমদানী করিয়া তাহা এদেশে চালাইবার ভার, এবং এ দেশ হইতে বিলাতের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার ভার আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের উপরই দিতেন। এই জন্যই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত বাঙ্গালীদিগকে 'বেনিয়ান' বা হাউসের মুচ্ছুদ্দি বলা হইত। এই মুচ্ছুদ্দিগিরিতে বেশ দু-পয়সা ছিল এবং ঐ মুচ্ছুদ্দিগিরি বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল! তাহার পর বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইতে আরম্ভ হয়। বিলাতী কাপড় এ দেশে কাটাইবার প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালী মুচ্ছুদ্দিগণ পুরুষানুক্রমে দু-তিন পুরুষ মুচ্ছুদ্দিগিরি করিয়া ইতিমধ্যে বেশ দু'-পয়সা উপার্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জমিদারী ক্রয় করিয়া গদিয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। যখন বিলাতী বণিকগণ তাঁহাদিগকে গ্রামে-গ্রামে যাইয়া বিলাতী কাপড় কাটাইতে বলিলেন, তখন তাঁহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল; তাঁহারা বলিলেন, সে কার্য্য করিতে তাঁহারা পারিবেন না। অভিমানে বাঙ্গালী মুচ্ছুদ্দিগিরি ত্যাগ করিল। এমন সময়ে মাড়োয়ারীগণ দলে-দলে আসিয়া বিলাতী কাপড় মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এমন কি, অতি দুর্গম স্থানেও বিলাতী কাপড়ের ফেরি করিতে বাহির হইল। সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালী তাহার মুচ্ছুদ্দিগিরি এবং কাপড়-ফেরিওয়ালার ব্যবসায় হারাইল।

আমরা যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, কলিকাতার সমস্ত বড়লোকেই প্রথমে ব্যবসায় করিয়া বড়-লোক হইয়াছিলেন। তাহার পর উন্নতির সহিত জমিদারী অর্জ্জন করিয়া বাবু হইয়া উঠেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে "ছোটলোকের কাজ" ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন। স্থান শূন্য থাকিবার নহে। লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিলে তিনি চঞ্চলা হইবেনই। বাঙ্গালীর পায়ে-ঠেলা বাণিজ্য-লক্ষ্মী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়া, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, ভাটিয়া প্রভৃতি নবাস্তকের গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন। আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িলাম।

তাহার পরে আমাদের প্রধান অবলম্বন হইল—আমাদের চাকুরী। ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ হওয়ায় ইংরাজগণ আমাদিগকে বিশেষ খাতির করিতেন; তাঁহাদের দরবারে আমাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল; কাজেই বড়-বড় রাজকার্য্য আমাদের হস্তগত হইত। ব্রিটিশসিংহ বাঙ্গালার ন্যায় অপরাপর প্রদেশগুলিও একটির পর একটি করিয়া জয় করিলেও, তাঁহারা বাঙ্গালীর ন্যায় ঐ সকল প্রদেশবাসীদিগকে ততটা খাতির করিতেন না; কাজেই অপরাপর প্রদেশগুলি জিত হইলেও, রাজ-কার্য্যগুলি আমাদের হস্তচ্যুত হয় নাই। তাহার পর ক্রমে-ক্রমে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল, ভারতময় ব্রিটিশ-সিংহের অভয় বৈজয়ন্তী উড়িল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতেও বাঙ্গালার শান্তি ফিরিয়া আসিল। এখন সকলই এক রাজার প্রজা হইল। রাজার কর্ত্তব্য সকলকে এক চক্ষে দেখা। কাজেই এত দিন বাঙ্গালী ইংরাজের নিকট হইতে প্রথম-প্রথম যে প্রকার অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছিল, অতঃপর স্বভাবতঃই সে রকম অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করা তাহার পক্ষে অন্যায় হইতে লাগিল। রাজা বলিলেন, প্রতিযোগিতায় যে দাঁড়াইতে পারিবে, তাহাকেই রাজ-কার্য্য দিব। অনুগ্রহের দিন চলিয়া গেল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিন আসিল। বাঙ্গালার Stamina যে কত ছোট; তাহা ক্রমশঃ ধরা পড়িতে লাগিল। উচ্চ রাজ-পদে বাঙ্গালীর সংখ্যা কমিতে লাগিল। ব্যবসায় ছাড়িয়া, সরকারী চাকুরী লইয়া বাঙ্গালী নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিল—কেন না, ব্যবসা-বাণিজ্য ছোটলোকের কাজ; কিন্তু রাজকার্য্যেও বাঙ্গালী হটিতে লাগিল।

বাঙ্গালী বাক্যবীর—এ কথা বাঙ্গালী, ইংরাজ সকলের মুখেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। বাঙ্গালী আর কিছু করিতে পারুক, না পারুক, বাঙ্গালীর মুখের দৌড় আছে—এই কথা সকলেই স্বীকার করিত। ভগবান কিন্তু সে দিকেও চাকা ঘুরাইয়া দিলেন। জগৎ-প্রসিদ্ধ "বাক্যবীর" আজ "বাক্য-কাপুরুষে" পরিণত হইয়াছে। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের পরে নাম করিবার মতন বক্তা আমাদের আর নাই।

এইরূপে জীবন-সংগ্রামের প্রতি পদেই আমরা হারিয়া চলিয়াছি। আমরা স্বাবলম্বন ছাড়িয়া ক্রমশঃ পরবশ হইয়া উঠিতেছি। বাবুগিরি, বংশাভিমান আমাদের শিরায়-শিরায়, রক্তমাংসের সহিত মাখানো, মিশানো; তাহার উপর আবার, আমরা ক্রমশঃ কুঁড়ের বাদশা হইয়া উঠিতেছি।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের ব্যবহারে লাগে, তাহার কতটা আমরা নিজে উৎপন্ন করি?

প্রাতঃকালেই উনান জ্বালিবার জন্য কয়লা ও ঘুঁটের দরকার।

ঘুঁটের ব্যবসা কলিকাতায় ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে সমূহে ক্রমশঃ হিন্দুস্থানীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী ঘুঁটেওয়ালা বা ঘুঁটে-ওয়ালী বড়ই বিরল। কয়লার খাদ বা খনি কতক বাঙ্গালীর হাতে থাকিলেও, খুচরা কয়লার কারবার ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হাত হইতে খসিয়া যাইতেছে।

তাহার পর জল ও চায়ের দরকার। কলের জলের কথা ছাড়িয়া দিলে, গঙ্গার জল বহন করিবার জন্য কলিকাতা ও তাহার suburbএ একটিও বাঙ্গালী ভারি মিলিবে না। চা উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার Retail বিক্রয় অবধি বাঙ্গালীর হাতে নয়। তাহার পর ভাত রাঁধিবার পালা। পূর্ব্বে কলিকাতায় পূর্ব্ববঙ্গীয় মহাজনগণ গোলদারী দোকান করিতেন। এখন কিন্তু কেন করেন না, তা' জানি না; সেই সব গোলদারী দোকানের জায়গায় মাড়োয়াড়ী মহাজনদের দোকান হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। কামাইবার প্রয়োজন হইলে, বাঙ্গালী নাপিতের অভাব—সেও হিন্দুস্থানী নাপিতের কাছে গিয়া তাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঘোড়ার গাড়ীতে আফিস যাইতে হইলে, মুসলমান গাড়োয়ান কোচমানের হাতে পড়িতে হয়। বিকাল বেলা আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দোকানের খাবার খাইতে গেলে হিন্দুস্থানী ময়রার দোকানে যাইতে হইবে। বাঙ্গালী ময়রা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। রাত্রে কেরাসিন তেল জ্বালিবার জন্য, কেরাসিন তেল-বিক্রেতা হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হইতে হইবে। তাহার পর আমাদের মৃত্যু হইলেও আমাদের নিস্তার নাই; কেন না মুসলমান খাট বিক্রেতা খাট না দিলে গঙ্গাযাত্রা কেমন করিয়া হয়?

এইরূপে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরবশ হইয়া উঠিতেছি। তাঁতীর ছেলে তাঁতের কাজ ছাড়িয়া দিয়া, তাঁত জ্বালাইতেছে। কামার হাফরে বসিতে নারাজ। নাপিত ক্ষুর ধরিলে পাছে জাতে পতিত হয় এ জন্য সে ক্ষুর-ধরা নাপিত নয়—এই বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। বাঙ্গালী ধোপাগণ কাপড়-কাচা কাজ ছাড়িয়া ক্রমশঃ কাপড়-না-কাচা ধোপায় পরিণত হইতেছে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য জাতিগণ, ঐ ব্যবসাগুলি নিজেদের করতলগত করিয়া লইতেছে। গুজরাটী বা মাড়োয়ারীগণ ধোপার কাজটাকে modernise করিয়া লইয়া কাপড় কাচার কারখানা খুলিল; বেহারী নাপিত আসিয়া Hair-Dressing Saloon খুলিল; বোম্বাইওয়ালা Weaving Syndicate খুলিয়া কাপড় বয়ন আরম্ভ করিল। আর আমরা কি করিতেছি? আমরা ধোপার কাজ করিব না, নাপিত হইয়া ক্ষুর ধরিব না—সত্য, কিন্তু বিদেশী ধোপার ধোলাই কারখানায় বা বেহারী নাপিতের Hair-Dressing Saloonএ আমরা ১৫ টাকা মাহিনায় চাকুরী করিব!

আমরা ধোপাগিরি করিব না, কিন্তু ধোপার অধীনে চাকুরী করিব। এই আমাদের Ideal, এই আমাদের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের ইহা অপেক্ষা অপব্যবহার আর কি হইতে পারে? এখন বাঙ্গালায় বাঙ্গালী ফেরীওয়ালা নাই, বাঙ্গালী মুটে মেলা একান্ত অসম্ভব, বাঙ্গালী নাপিতের দল ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, বাঙ্গালী ধোপা আর নাই বলিলেই হয়।

আমরা যে এইরূপে পায়ে-পায়ে জীবন-সংগ্রামে হটিতেছি, তাহ আমাদেরই দোষে। আমরা বাবু হইয়াছি। আমাদের আত্মম্ভরিতা অসম্ভবরূপে বাড়িয়াছে। Literary education আমাদিগকে "ভদ্র-লোক" করিয়া তুলিয়াছে। আমরা ফিটফাট থাকিব, কাপড় কুঁচাইয়া পরিব, পায়ে ডসনের বুট দিব। খাইতে না পাইলেও এসেন্স-পমেটমে দেহকে সুরভিত করিয়া রাখিব।

তাই বলিতেছিলাম, মান-অভিমান ছাড়িয়া হাতে কোদাল ধরিতে না পারিলে, অভিমান করিয়া জাতীয় ব্যবসাগুলি ত্যাগ করিলে, আমাদের হটিয়া যাওয়া থামিবে না; শেষে হয় ত জীবন-সংগ্রামে অন্যান্য প্রদেশবাসীদের কাছে আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

বিজ্ঞান-রহস্য

[শ্রীহরিদাস হালদার]

অঙ্গার

অঙ্গার অতি হেয় বস্তু, শতধৌত করিলেও তাহার মলিনত্ব যায় না, —এটি হচ্চে অজ্ঞানের কথা। বিবেকী ও জ্ঞানীর নিকট অঙ্গার ও মণিমাণিক্যে কোনও প্রভেদ নাই। বিজ্ঞানের চক্ষেও কয়লা ও হীরা অভেদ বস্তু। রসায়ন শাস্ত্র এই কাল মাণিকের কদর বুঝিয়া ইহাকে সকল ভূতের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অঙ্গাররাজ হচ্চেন এক মহাযোগী পুরুষ। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতির একএকটি পরমাণু ঊর্দ্ধ সংখ্যায় পাঁচ-সাতটি অপর ভূতের পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু অঙ্গার বা কার্ব্বণের এক-একটি পরমাণু বিভিন্ন জাতীয় শতাধিক পরমাণুকে যোগবলে নানা ছাঁদে বাঁধিয়া অসংখ্য প্রকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার যোগবল অসীম। গুড়, চিনি, ময়দা, চাল হইতে আরম্ভ করিয়া, ঘৃত, চর্ব্বি, তেল, তুলা, পাট, এমন কি, মদ, সিরকা, ঈথার, ক্লোরোফরম্ পর্য্যন্ত সকল পদার্থের জন্মদাতা হচ্চেন—এই কার্ব্বণ। এই সকল অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে যথেষ্ট কয়লা আছে। উদ্ভিদ ও জীবদেহের অধিকাংশই হচ্চে অঙ্গার; প্রমাণ, কাঠ পোড়াইলেই কয়লা, আর আমাদের এই চন্দনচর্চ্চিত দেহ দগ্ধ হইলেই অঙ্গার ও ভস্ম। এই জন্য অঙ্গার-বিষয়ক কিমিয়া-বিদ্যার স্বতন্ত্র নামই হচ্চে, অর্গানিক বা জৈবিক কেমিষ্ট্রি।

কার্ব্বণের সঙ্গে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যোগে অম্ল, চিনি, চর্ব্বি ও সুরার উৎপত্তি হয়; কেবল ঐ তিনটি ভূত-পদার্থের ভাগের ইতর-বিশেষের জন্যই এই সকল দ্রব্যের পার্থক্য। "সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান" পত্রের সম্পাদককে একজন পাঠক লিখিয়াছিলেন,

"মহাশয়! শুনিলাম, পুরাণ ছেঁড়া নেকড়া থেকে না কি চিনি প্রস্তুত হচ্চে! এ আজগুবি খবর কি সত্য?" উত্তরে সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন, "হওয়া অসম্ভব নয়; তুলা ও চিনিতে অতি নিকট রাসায়নিক সম্বন্ধ—একটি অপরটির রূপান্তর মাত্র।"

অন্ন ও গুড় হইতে মদ প্রস্তুত হয়, ইহা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। এই জন্য পাঁড় মাতালেরা কিছু দিন ভাত না খাইয়াও, কেবল মদ খাইয়াই, জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের দেহের মধ্যে সুরা অন্নের কাজ করে। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও-কোনও মদ্যপায়ী ব্যক্তি শুধু মদ খাইয়া মোটা হইতেছে; বুঝিতে হইবে, মদ ইহাদের দেহে চর্ব্বিতে পরিণত হয়। এই সকল দেখিয়া অঙ্গাররাজ নিশ্চয়ই হাস্য করেন। তিনি অন্নরূপে আমাদের পেটে গিয়া দেহের ইঞ্জিন চালাইয়া থাকেন; সুরারূপে মাতালের উদরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পথপার্শ্বে নর্দ্দমাশায়ী করেন; এবং চর্ব্বিরূপে বড়লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার মেদাস্থি উৎপাদন করেন।

বড়-বড় রাসায়নিক কারখানায় পারফিউমারি ও রঙ্ প্রস্তুতের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক উদ্ভিদ ও জীবদেহের মধ্যে অঙ্গাররাজের এইরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা আছে, এবং তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই কাজ চলিতেছে। জীব ও উদ্ভিদের ভিতরকার এক-একটি cell বা জীবকোষ হচ্চে এইরূপ এক-একটি আনুবীক্ষণিক রাসায়নিক কারখানা। এই কারখানাগুলির মধ্যে বসিয়া অঙ্গাররাজ নিয়ত হরেক রকম অতি অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিষ তৈরি করিতেছেন। ইনি খেজুর, আঙ্গুর প্রভৃতি মিষ্ট ফলের মধ্যে শর্করা, ফুলের মধ্যে বিবিধ পারফিউমারি ও রঙ্ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সিনকোনা গাছের ছালের ভিতর কুইনাইন্, পোস্তঢেঁড়ীর ভিতর মরফিয়া এবং কুচিলার ভিতর ষ্ট্রিক্‌নিয়া ইনিই প্রস্তুত করেন; মানুষ এগুলি সংগ্রহ করে মাত্র, ইহাদের এক রতিও প্রস্তুত করিবার তাহার সাধ্য নাই।

আমাদের দেহের রক্তমাংস, মেদমজ্জার প্রধানাংশ হচ্চে অঙ্গার। আমাদের প্রশ্বাসের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে অঙ্গার বাহির হয়। খাদ্যরূপে অঙ্গারকে উদরস্থ করিয়াই আমাদের চিন্তাশক্তি ও চিত্তবৃত্তির স্ফূরণ হয়। ইনিই রন্ধনশালার ইন্ধন; আবার ইনিই আমাদের অন্তর্জ্জগতে কামক্রোধাদির ইন্ধন। আমাদের দেহ, মন ও প্রাণের জন্য আমরা অঙ্গাররাজের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। মৃত্যুকালে চিতায় শয়ন করিয়া ইঁহার প্রাপ্য গণ্ডা প্রত্যর্পণ করিতে হয়; তখন অঙ্গারময় দেহের ভঙ্গুরত্ব সপ্রমাণ হয়।

অঙ্গারের সংমিশ্রণে কেবল নরদেহ কেন, লোহা পর্য্যন্ত ভঙ্গুর হইয়া দাঁড়ায়। লোহা ঢালাই করিয়া জয়েষ্ট, রেলিং ও কাস্তিকড়া প্রভৃতি যে সকল কাষ্ট্ আয়রণের জিনিষ তৈরী হয়, তাহাতে অঙ্গার বা কার্ব্বণ মিশ্রিত থাকে, এবং তজ্জন্যই তাহাদের ভঙ্গুরত্ব—হাতুড়ীর ঘা মারিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। আধুনিক সভ্যতার প্রধান অবলম্বন হচ্চে, 'কোল্' বা পাথুরে কয়লা। ইহা ভূগর্ভ-প্রোথিত বহুপ্রাচীন উদ্ভিদস্তরের পিষ্ট অঙ্গারাংশ মাত্র। এই কারণেই সম্ভবতঃ কেহ-কেহ আধুনিক অঙ্গারময় সভ্যতাকে ভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন। উড্‌পেন্‌সিলের সীসাও অঙ্গারের মূর্ত্তিভেদ; তাহার নাম গ্রাফাইট্। সেই জন্যই বোধ হয় তাহা এত ভঙ্গুর।

শ্রীধরাচার্য্য*

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

এই সে দিন পাণ্ডিতকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "অদ্বৈতবাদখণ্ডন," "মায়াবাদনিরাস," "দীধিতিকৃন্ন্যূনতাবাদ", "গদাধরন্যূনতাবাদ", "বিবিধবিচার" প্রভৃতি গ্রন্থের অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায়, এই অবনতির যুগেও বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক হইতে কত সূক্ষ্মতম দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্রে—বিশেষতঃ ন্যায়বৈশেষিকে স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালীরা আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর দার্শনিক প্রতিভা কিরূপ গৌরবান্বিত ছিল, আজ তাহারই পরিচয়রূপে শ্রীধরাচার্য্যের প্রসঙ্গ, "ভারতবর্ষে"র পাঠক-পাঠিকার নিকটে উপস্থাপিত করিলাম।

দুই-একটি সামান্য বিষয়ে কথঞ্চিৎ মতভেদ থাকিলেও, ন্যায় ও বৈশেষিক—এই উভয় শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য একই। পদার্থ সম্বন্ধে এই উভয় দর্শনের যে কোনও মতবিরোধ নাই, তাহা প্রবন্ধান্তরে প্রতিপাদন করিয়াছি। ["ভারতবর্ষ", পৌষ, ১৩২৩, "আন্বীক্ষিকী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।] দুই জন মহর্ষি, এই দুই দর্শনের রচয়িতা। ন্যায়শাস্ত্র গৌতমের রচিত, বৈশেষিক-শাস্ত্র কণাদের প্রণীত। কণাদকৃত সূত্রাত্মক গ্রন্থসন্দর্ভের ভাষ্য রচনা করেন,—প্রশস্ত-

* বারাণসী সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

পাদাচার্য্য। প্রবন্ধ-প্রতিপাদ্য শ্রীধরাচার্য্য, এই প্রশস্তপাদ-ভাষ্য বা 'পদার্থ-ধর্ম্মসংগ্রহে'র টীকা-রচয়িতা। এই টীকার নাম "ন্যায়কন্দলী"। শ্রীধরাচার্য্য ব্যতীত ব্যোমশিবাচার্য্য 'ব্যোমবতী বৃত্তি' নামে, উদয়নাচার্য্য 'কিরণাবলী' নামে, শঙ্কর মিশ্র 'কণাদরহস্য' নামে, পদ্মনাভ 'সেতু' নামে ও জগদীশ 'সূক্তি' নামে এই ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। এই সকল টীকার মধ্যে 'ব্যোমবতী বৃত্তি' পাওয়া যায় না, 'কিরণাবলী' গ্রন্থকার সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই,—বুদ্ধি-নিরূপণ পর্য্যন্তই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। 'কণাদ-রহস্য' সম্পূর্ণ কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। দ্রব্য-নিরূপণ পর্য্যন্তেরই 'সেতু' ও 'সূক্তি' দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও দুর্লভ। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের এই সকল টীকার মধ্যে শ্রীধরাচার্য্যের 'ন্যায়কন্দলী' ভাবের বৈশদ্যে সহজবোধ্য ও ভাষার পারিপাট্যে সুখপাঠ্য।

চিন্তাশীল মনীষিগণের চিত্তে স্বতঃই যে সকল দার্শনিক শঙ্কা উপস্থিত হয়, এই 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থ অবহিত হইয়া অধ্যয়ন করিলে সহজেই সেই সকল নানাবিধ আশঙ্কার অপনোদন হইয়া থাকে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই গ্রন্থানুসারে জাগতিক সৃষ্টি-রহস্যের আংশিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

বীজাঙ্কুরের ন্যায় অদৃষ্ট-প্রবাহ অনাদি। সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া পুণ্য ও পাপের ক্ষয় না হইলে জীব পরম-পুরুষার্থ নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকারী হইতে পারে না। ভোগের দ্বারা অদৃষ্টকে ক্ষয় করিতে হইলে, শরীরাদির একান্ত আবশ্যকতা আছে। ভোগায়তন শরীরাবচ্ছেদেই জীবের সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সম্পাদক স্রকচন্দনাদি বা অহিকণ্টকাদি বিবিধ বস্তুসমূহেরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং জাগতিক সৃষ্টি না হইলে অদৃষ্টের ক্ষয় হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে,—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।"—ভোগ না হইলে শতকোটি কল্পেও অদৃষ্টের ক্ষয় হয় না। জীবগণ যাহাতে স্ব-স্ব অদৃষ্ট-প্রবাহ ক্ষীণ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর পুনঃ-পুনঃ জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর যদি জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তবে তাহা সুখময়ী করিলেন না কেন,—এ আশঙ্কার সমাধান এই যে, তিনি জীবের বিচিত্র কর্ম্মবিপাকের অনুসারেই সৃষ্টি করিয়াছেন,—সুতরাং জগতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর দুঃখের সৃষ্টি করিলেও তাঁহার করুণাময়তার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। অনবরত দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত পাইতে-পাইতেই লোকের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং সেই বৈরাগ্যের প্রসাদে পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। সুতরাং দুঃখ হেয় নহে,—এক হিসাবে উপাদেয়।

পরমেশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হইলেও, সর্ব্বদা সৃষ্টি বা সংহার হয় না কেন?—তত্তৎকালবিশেষরূপ সহকারী কারণের সঙ্ঘটনায়, কখনও তাহা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, কখনও বা সংহারের উদ্দেশ্যে প্রকটিত হয়। সৃষ্টির প্রতি কেবল ঈশ্বরেচ্ছাই ত কারণ নহে,—তত্তৎকালাদিও সহকারী কারণ। কারণ-কূটের সম্বলন না হইলে কোনও কার্য্যই হইতে পারে না।

ঈশ্বর যদি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়াই সৃষ্টি করেন,—সৃষ্টি সম্বন্ধে যদি তাঁহার কোনও স্বাধীনতা না থাকে, তবে আর তিনি ঈশ্বর হইলেন কিরূপে—এরূপ আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। তিনি সমস্ত প্রাণীর কর্ম্মানুসারে ফল দেন, ইহা কি তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা সামর্থ্যের পরিচায়ক নহে? কর্ম্মের তারতম্যানুসারে যিনি ভৃত্যবর্গের পুরস্কার বা তিরস্কারের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাকে কি প্রভু বলিব না? চোর যদি পরস্বাপহরণ না করিত, দস্যু যদি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী না হইত, তাহা হইলে তাহা-দিগের দণ্ড হইত না—পরস্বাপহরণ বা নরহত্যার জন্যই চোর বা দস্যুকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। অপরাধের ঈদৃশ তারতম্যানুসারে যিনি দণ্ডের বিধান করেন, তাঁহাকেই ত আমরা রাজা বলিয়া অভিনন্দিত করি। অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেন, দণ্ডবিধানে রাজার স্বাধীনতা নাই,—এই জন্য কেহ কি তাঁহার কোনরূপ অসামর্থ্য কল্পনা করে?

শ্রীধরাচার্য্য, ভাষ্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'ন্যায়কন্দলী'তে এইরূপ নানাবিধ জ্ঞাতব্য দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। 'অন্ধকার' সম্বন্ধে শ্রীধরাচার্য্যের মতের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকেরা অন্ধকারকে দ্রব্য বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'অন্ধকার' বলিয়া কোনও বস্তু নাই, এ কথা বলিতে পার না—অন্ধকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ। তাহার যখন নীল রূপ ও গতিশীলতা আছে, তখন তাহাকে দ্রব্য বলা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু

'অন্ধকার', ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী, মনঃ—এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে একটীরও অন্তর্ভূত হয় না। যে হেতু তাহার যখন গন্ধ নাই, তখন পৃথিবী হইতে পারে না—পৃথিবীর লক্ষণই গন্ধসমবায়ি কারণত্ব—"তত্র ক্ষিতির্গন্ধহেতুঃ"; তার পর তাহাতে যখন নীল রূপ আছে, তখন জলাদি অবশিষ্ট আটটি দ্রব্যের মধ্যেও তাহার অন্তর্ভাব হয় না। কেন না, জলের রূপ শুক্ল ও তেজের রূপ শুক্ল-ভাস্বর; মরুদাদির ত রূপই নাই। কাজে-কাজেই অন্ধকাররূপ দশম দ্রব্য মানিতেই হইবে।

"তমঃ খলু চলং নীলং পরাপরবিভাগবৎ।
প্রসিদ্ধদ্রব্যবৈধর্ম্ম্যাৎ নবভ্যো ভেত্তুমর্হতি॥"

অন্যান্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে আলোকের আবশ্যকতা আছে, অন্ধকারের প্রত্যক্ষে আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুঃই কারণ।

তার্কিকেরা ইহার উপরে বলেন যে, তেজের অভাবকেই অন্ধকার বলিলে যখন উপপত্তি হয়, তখন দ্রব্যান্তর কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অন্ধকারের রূপ ও ক্রিয়া কিছুই নাই, উহাতে রূপপ্রতীতি ও ক্রিয়াপ্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র। আলোক সরাইয়া লইলে বোধ হয় যেন অন্ধকার চলিয়া গেল। অন্ধকারকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়া মানিলে, তাহার অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিতে হইবে—আবার সেই অবয়বের ধ্বংস প্রাগভাব কল্পনা করিতে হইবে—ইহাতে অত্যন্ত গৌরব হয়। সুতরাং অন্ধকার অতিরিক্ত নহে,—তেজের অভাবের নামই অন্ধকার। অন্ধকারকে দ্রব্য স্বীকার করিয়া তাহার অভাবই তেজঃ, ইহা বলা যায় না। তেজে অভ্রান্তভাবে উষ্ণস্পর্শ-বুদ্ধি হইয়া থাকে; এখন তেজকে যদি দ্রব্য না বলিয়া অভাব বলা হয়, তাহা হইলে উষ্ণস্পর্শবুদ্ধি অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কারণ, অভাবে গুণ থাকে না,—গুণ দ্রব্যেই থাকে। এই জন্য তেজকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

তার্কিক হইলেও 'ন্যায়কন্দলী'কার শ্রীধরাচার্য্য ঈদৃশ মতাবলম্বী নহেন। তিনি অন্ধকারকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়া মানেন না সত্য, কিন্তু আরোপিত নীল রূপকেই অন্ধকার বলেন। অন্ধকার যে তেজের অভাব, শ্রীধরাচার্য্য এরূপ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অন্ধকার-বিষয়ে যখন নিষেধমুখে প্রতীতি হয় না, তখন ইহা অভাব হইতে পারে না।—"ন চ প্রতিষেধমুখপ্রত্যয়স্তস্মান্নাভাবোঽয়ম্।" অন্ধকার যে তেজের অভাব নহে, ইহার প্রমাণরূপে তিনি প্রাচীন কারিকাও উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ন চ ভাসামভাবস্য তমস্ত্বং বৃদ্ধসম্মতম্।
ছায়ায়াঃ কার্ষ্ণ্যমিত্যেবং পুরাণে ভূগুণশ্রুতেঃ॥
দূরাসন্নপ্রদেশাদিমহদল্পচলাচলা।
দেহানুবর্ত্তিনী ছায়া ন বস্তুত্বাদ্ বিনা ভবেৎ।"

মহর্ষি কণাদ, "দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদ্ভাভাবস্তমঃ" (২।৫।১৯)—এই সূত্রে যে তেজের অভাবকেই অন্ধকার বলিয়াছেন, শ্রীধরাচার্য্য এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তেজের অত্যন্তাভাব ঘটিলে অন্ধকারের উপলব্ধি হয়, এই জন্য সূত্রে তেজের অভাবকে অন্ধকার বলা হইয়াছে। সুতরাং সূত্রবিরোধ হইতেছে না (১)।

সাঙ্খ্যসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ, "নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" (১।৫৬)—এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 'অন্ধকার' সম্বন্ধে 'কন্দলী'কার শ্রীধরাচার্য্যের যে মত, তাহাই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র দ্রব্যগ্রন্থের ব্যাখ্যায় মহাদেবভট্ট "যত্তু আরোপিতং নীলরূপং তম ইতি কন্দলীকারমতম্। তন্ন—" বলিয়া কন্দলীকারের মতে দোষোদ্ভাবন করিয়াছেন। অন্যান্য তার্কিকেরাও শ্রীধরাচার্য্যের এই নবীন সিদ্ধান্তে দোষ দেখাইয়াছেন।

শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলীতে আমরা আর একটি নূতন মত দেখিতে পাই। ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই বেদ-কর্ত্তা ঈশ্বর ইহা পুনঃ-পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। রাগাদি দোষনির্ম্মুক্ত ঈশ্বরের রচিত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। "দৃষ্টানাং দৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োগোঽভ্যুদয়ায়" (১০।২।৮), "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" (১০।২।৯)—এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র স্পষ্ট লিখিয়াছেন, যে পুরুষ রাগ-দ্বেষাদির প্রভাবে অভিভূত, সে-ই মিথ্যা কথা বলে; ঈশ্বর সেই সকল দোষ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত, সুতরাং তিনি কি মিথ্যা কথা বলিতে পারেন? সুতরাং বেদবাক্য মিথ্যা নহে। বেদে স্বর্গ ও অপূর্ব্বাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল অলৌকিক পদার্থ

(১) "নন্বেবং তর্হি সূত্রবিরোধঃ দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদ্ভাভাবস্তম ইতি ন বিরোধঃ ভাভাবে সতি তমসঃ প্রতীতের্ভাভাবস্তম ইত্যুক্তম্।"—ন্যায়কন্দলী, ১০ পৃঃ।

বিষয়ে যাঁহার প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান আছে, তাদৃশ পুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ নহে (২)।

জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরই যে বেদের রচয়িতা এবং তাঁহার রচিত বলিয়াই যে বেদের প্রামাণ্য, ইহা গৌতমসূত্রের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাকার জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও স্বকৃত "ন্যায়মঞ্জরী'তে লিখিয়াছেন (৩)। কিন্তু শ্রীধরাচার্য্য ভাষ্যের অনুবর্ত্তন করিয়া 'ন্যায়কন্দলী'তে—

"আম্নায়ো বেদস্তস্য বিধাতারঃ কর্ত্তারো যে ঋষয়ঃ—" (২৫৮ পৃঃ) ইত্যাদি গ্রন্থে ঋষিগণকেই বেদের কর্ত্তা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"—এই বৈশেষিক সূত্রোক্ত 'তৎ'পদে ঋষিই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন (৪)।

"ন্যায়কন্দলীর" বিবিধ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া এস্থলে সম্ভবপর নহে। সুতরাং এইবার আমরা গ্রন্থকার শ্রীধরাচার্য্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। শ্রীধরাচার্য্য যে নানা দেবতার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি দৃষ্টি করিলে জানিতে পারা যায়। শ্রীধরাচার্য্য তাঁহার রচিত সাতটি মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকে ঈশ্বরকে, দ্বিতীয় শ্লোকে পুরুষোত্তমকে, তৃতীয় শ্লোকে শেষপর্য্যঙ্কশায়ী লক্ষ্মীপতিকে, চতুর্থ শ্লোকে অর্দ্ধেন্দুমৌলি মহেশ্বরকে, পঞ্চম শ্লোকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই ত্রিমূর্ত্তিধারী পরমাত্মাকে, ষষ্ঠ শ্লোকে পিতামহ ব্রহ্মাকে ও সপ্তম শ্লোকে শিবকে নমস্কার করিয়াছেন।

(২) "রাগাজ্ঞানাদিভির্বক্তা গ্রস্তত্বাদনৃতং বদেৎ। তে চেশ্বরে ন বিদ্যন্তে স ব্রূয়াৎ কথমন্যথা॥ ইতি * * যঃ স্বর্গাপূর্ব্বাদিবিষয়ক সাক্ষাৎকারবান্ তাদৃশশ্চ নেশ্বরাদন্য ইতি সূক্ষ্ম।"—উপস্কার, ১৯৪-৯৫ পৃঃ।

(৩) "কর্ত্তা য এব জগতামখিলাত্মবৃত্তি
কর্ম্মপ্রপঞ্চপরিপাকবিচিত্রতাজ্ঞঃ।
বিশ্বাত্মনা তদুপদেশপরাঃ প্রণীতা
স্তেনৈব বেদরচনা ইতি যুক্তমেতৎ॥
আপ্তং তমেব ভগবন্তমনাদিমীশ
মাশ্রিত্য বিশ্বসিতি বেদবচঃসু লোকঃ।"

ন্যায়মঞ্জরী, ২৪০ পৃঃ।

(৪) "তদিদ্যোনাগতাবেক্ষণন্যায়েনাস্মদ্বুদ্ধিভ্যো লিঙ্গমৃষেরিতি সূত্রে প্রতিপাদিতস্তাস্মদ্বিশিষ্টস্য বক্তুঃ পরামর্শঃ।"

ন্যায়কন্দলী, ২১৬ পৃঃ।

শ্রীধরাচার্য্য কঠোর দার্শনিক বিষয় লইয়া এই টীকাগ্রন্থ রচনা করিলেও, তাঁহার ভাষার মাধুর্য্য অনুভব করিলে চিত্ত চমৎকৃত হয়। ভাষার সৌন্দর্য্যের জন্য এই দুরূহ বিষয়ক গ্রন্থ পড়িতেও পাঠকের শ্রান্তি হয় না। শ্রীধরাচার্য্য ন্যায়কন্দলীর ভাষায় বহুস্থানে শব্দালঙ্কারের পর্য্যন্ত সমাবেশ করিয়াছেন। একটি স্থান উদ্ধৃত হইল—

"ন হ্যনপেক্ষিতদৃঢ়মুষ্টিনিপীড়িতো জাল্মকরপঞ্জরোদরে বিলুঠন্নপি কঠোরধারঃ কুঠারঃ প্রতিতিষ্ঠতি নিষ্ঠুরস্যাপি কাষ্ঠস্য ছেদায়।"—১৭৩ পৃঃ।

শ্রীধরাচার্য্যের রচিত গদ্য ও পদ্যের শৈলী অনুভব করিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি গ্রন্থের উপসংহারে যে শ্লোকগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্লেষানুপ্রাণিত উপমা প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্লোকগুলি আমরা উদ্ধৃত করিলাম—

"সুবর্ণময়সংস্থানরম্যাসর্ব্বোত্তরস্থিতিঃ।
সুমেরোঃ শৃঙ্গবীথীব টীকেয়ং ন্যায়কন্দলী॥
অক্ষীণনিজপক্ষেষু খ্যাপয়ন্তী গুণানসৌ।
পরপ্রসিদ্ধসিদ্ধান্তান্ দলতি ন্যায়কন্দলী॥
আসীদ্ দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥
অম্ভোরাশেরিবৈতস্মাদ্ বভূব ক্ষিতিচন্দ্রমাঃ।
জগদানন্দনাদ্ বন্দ্যো বৃহস্পতিরিব দ্বিজঃ॥
তস্মাদ্ বিশুদ্ধগুণরত্নমহাসমুদ্রো বিদ্যালতাসমবলম্বনভূরুহোঽভূৎ।
স্বচ্ছাশয়ো বিবিধকীর্ত্তিনদীপ্রবাহপ্রস্যন্দনোত্তমবলো বলদেবনামা॥
তস্যাভূদ্ ভূরিযশসো বিশুদ্ধকুলসম্ভবা।
অচ্ছোকেত্যর্চ্চিতগুণা গুণিনো গৃহমেধিনী॥
সচ্ছায়ঃ স্থূলফলদো বহুশাখো দ্বিজাশ্রয়ঃ।
তস্মাৎ শ্রীধর ইত্যুচ্চৈরর্থিকল্পদ্রুমোঽভবৎ॥
অসৌ বিদ্যাবিদগ্ধানামসূত প্রবণোচিতাম্।
ষট্পদার্থাহিতামেতাং রুচিরাং ন্যায়কন্দলীম্॥
ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশাকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা।
শ্রীপাণ্ডুদাসযাচিতভট্টশ্রীশ্রীধরেণেয়ম্॥"

এই শ্লোকাবলীর মধ্যে শ্রীধরাচার্য্যের আত্মপরিচয় নিবদ্ধ

আছে। তাঁহার পিতার নাম 'বলদেব'। এই বলদেবও যে বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন, তাহা "বৃহস্পতিরিব" "বিদ্যালতাসমবলম্বনভূরুহোঽভূৎ", "বিবিধকীর্ত্তিনদীপ্রবাহপ্রস্রবণোত্তমবলো", "ভূরিযশসো"—এই অংশে কথিত হইয়াছে। শ্রীধরাচার্য্যের মাতার নাম—'অচ্ছোকা'। ইনিও বিশুদ্ধকুলোৎপন্না ও গুণবতী ছিলেন। শ্রীধর অচ্ছোকার পরিচায়করূপে "বিশুদ্ধকুলসম্ভবা" ও "অর্চ্চিতগুণা" এই বিশেষণদ্বয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ে ভূরিসৃষ্টি গ্রামে শ্রীধরের নিবাস ছিল। এই গ্রামে যে অনেক পুণ্যকর্ম্মা দ্বিজাতি ও ধনবান্ শ্রেষ্ঠিগণ বাস করিতেন, শ্রীধর তাহারও পরিচয় দিয়াছেন,—"দ্বিজানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্" "ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ। এই ভূরিসৃষ্টি বা ভূরিশ্রেষ্ঠিক গ্রাম যে অভিজাতবর্গের বাসস্থান বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিল, তাহা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় (৫)। বর্ত্তমান সময়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত, হেতমপুরের নিকটে 'ভুরকুণ্ডা' নামক যে গ্রাম আছে, তাহাই বোধ হয় ভূরিসৃষ্টি গ্রাম।

এই ন্যায়কন্দলী টীকা 'পাণ্ডুদাস' নামক কোনও ধনবানের অভিপ্রায়ানুসারে রচিত হয়, ইহা এই গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীধরাচার্য্য, 'ন্যায়কন্দলী' রচনার সময়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—৯১৩ শকাব্দে (৯৯১ খৃঃ) এই গ্রন্থ রচিত হয়। পাণ্ডুদাস যে গুণরত্নাভরণ কায়স্থকুলতিলক ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থেই 'সংস্কার' নিরূপণ প্রস্তাবে প্রসঙ্গতঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে (৬)। "ত্র্যধিকদশোত্তর—" ইত্যাদি অন্তিম শ্লোক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীধরের কৌলিক উপাধি 'ভট্ট' ছিল।

"কুসুমাঞ্জলি" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা উদয়নাচার্য্য অপেক্ষা শ্রীধরাচার্য্য প্রাচীন ছিলেন, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস। কারণ, উদয়নাচার্য্য, প্রশস্তপাদভাষ্যের 'কিরণাবলী' টীকায়—

"দুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎ প্রদীপ সন্ততিবদিত্যাচার্য্যাঃ।" (৯ পৃষ্ঠা, Benares Sanskrit series.)—এইরূপ পঙক্তি লিখিয়াছেন। এখানে 'আচার্য্য' পদে শ্রীধরাচার্য্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেন না, শ্রীধরাচার্য্যই 'ন্যায়কন্দলী'তে উদ্দেশ প্রকরণে লিখিয়াছেন,—

"দুঃখসন্ততির্ধর্ম্মিণী অত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাদিতি তার্কিকাঃ।" (৪ পৃঃ)

'ন্যায়কন্দলী'র এই পংক্তির কথাই যে উদয়নাচার্য্য স্বকৃত 'কিরণাবলী'তে "ইত্যাচার্য্যাঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, 'ন্যায়কন্দলী'তে এই স্থানে "তদযুক্তং" বলিয়া শ্রীধরাচার্য্য যে দোষোদ্‌ভাবন করিয়াছেন, উদয়নাচার্য্যের 'কিরণাবলী'তে তাহার উদ্ধার আছে। 'ন্যায়কন্দলী'র "সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো লক্ষণার্থঃ" (২৮ পৃঃ)—এই পঙক্তিও উদয়নাচার্য্য 'কিরণাবলী'তে "তথা চাচার্য্যাঃ" (৪২ পৃঃ) বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উদয়নাচার্য্য যে শ্রীধরাচার্য্য অপেক্ষা পরবর্ত্তী, সে সম্বন্ধে আর এক বলবৎ প্রমাণ এই যে, শ্রীধরাচার্য্য অন্ধকারকে আরোপিত রূপবিশেষ বলিয়াছেন (৭), উদয়নাচার্য্য "পার্থিব মেবেদমারোপিতং রূপমিত্যপি ন সমীচীনম্।" (১৭ পৃঃ) ইত্যাদি গ্রন্থে নানা বিচারের অবতারণা করিয়া অন্ধকার সম্বন্ধীয় শ্রীধরের অভিনব সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীধর যে বলিয়াছেন, অন্ধকারের যখন প্রতিষেধমুখে প্রতীতি হয় না, তখন ইহা অভাব হইতে পারে না (৮), উদয়নাচার্য্য শ্রীধরের এ ব্যবস্থারও ব্যভিচার দেখাইয়াছেন (৯)। শ্রীধরাচার্য্যের নামোল্লেখ না করিলেও উদয়নাচার্য্য যে 'অন্ধকার' সম্বন্ধীয় 'কন্দলী'কারের মত উত্থাপন করিয়াই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা "যত্ত্বেবমারোপিতং রূপং ন তমো ভাবাবস্থ

(৫) "অহঙ্কারঃ—আঃ কথমস্মাকমপি কুলশীলাদিকমিদানীং পরীক্ষিতব্যম্। শ্রূয়তাম্—

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।"
প্রবোধচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক, ৭ম শ্লোক।

(৬) "গুণরত্নাভরণঃ কায়স্থকুলতিলকঃ পাণ্ডুদাস ইত্যাদিষু পূর্বাচার্য্যনামেষু—"ন্যায়কন্দলী ২৭৯ পৃঃ।

(৭) "তস্মাদ্ রূপবিশেষোঽয়মত্যন্তং তেজোঽভাবে সতি সর্ব্বতঃ সমারোপিতস্তম ইতি প্রতীতে।" ন্যায়কন্দলী, ৯ পৃঃ।

(৮) "ন চ প্রতিষেধমুখপ্রত্যয়স্তস্মাদ্‌নাভাবোঽয়ম্।" ৯ পৃঃ।

(৯) "বিধিমুখস্য প্রত্যয়োঽসিদ্ধঃ। নহি নঞোঽপ্রয়োগ ইত্যেব বিধিঃ। প্রলয়বিনাশাবসানাদিষু ব্যভিচারাৎ।"—কিরণাবলী, ১৯ পৃঃ।

তম ইতি বিনিগমনায়াং কো হেতুরিতি চেৎ—" (২০পৃঃ) ইত্যাদি 'কিরণাবলী' গ্রন্থের টীকায় বর্দ্ধমানোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন (১০); সুতরাং শ্রীধরাচার্য্য যে উদয়নাচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন—অন্ততঃ 'কিরণাবলী' যে 'ন্যায়-কন্দলী'র পরে রচিত, এরূপ অবধারণ অসঙ্গত নহে। জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী'তেও আমরা 'ন্যায়কন্দলী'র লিপির অনুসরণ দেখিতে পাই (১১)। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ঔলুক্য দর্শনের বিচার প্রসঙ্গে মাধবাচার্য্যও শ্রীধরাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন (১২)। ফল কথা, ন্যায়কন্দলী-প্রণেতা শ্রীধরাচার্য্য যে একজন সুপ্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থকার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীধরাচার্য্য "তত্ত্বপ্রবোধ" ও "তত্ত্বসংবাদিনী" নামক যে আরও দুইখানি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ এই 'ন্যায়কন্দলী'তেই দেখিতে পাওয়া যায়।—

"প্রপঞ্চিতশ্চায়মর্থোঽস্মাভিস্তত্ত্বপ্রবোধে তত্ত্বসংবাদিন্যাঞ্চেতি নাত্র প্রতন্যতে।" (৮২ পৃঃ)

"মীমাংসাসিদ্ধান্তরহস্যং তত্ত্বপ্রবোধে কথিতমস্মাভিঃ।" (১৪৬ পৃঃ)

'ন্যায়কন্দলী'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী, "বিস্তরস্ত্বদ্বয়সিদ্ধৌ দ্রষ্টব্যঃ" (৫ পৃঃ) এবং "ইতি কৃতং গ্রন্থবিস্তরেণ সংগ্রহটীকায়াম্" (১৫৯)—ন্যায়কন্দলীস্থ এই লিপিদ্বয় দেখিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, শ্রীধরাচার্য্য "অদ্বয়সিদ্ধি" ও "সংগ্রহটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ও প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপ নির্দ্ধারণ একেবারেই অসমীচীন। কারণ, "অদ্বয়সিদ্ধি" যে শ্রীধরাচার্য্যের নিজের প্রণীত, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তার পর তিনি দ্বৈতবাদী তার্কিক হইয়া যে "অদ্বয়সিদ্ধি" রচনা করিবেন, ইহা কোনও রূপেই সম্ভবপর নহে। শ্রীধরাচার্য্য—"কিং পুনরাত্মনঃ স্বরূপং যেনাবস্থিতি র্মুক্তিরুচ্যতে। আনন্দাত্মতেতি কেচিৎ তদযুক্তম্।"—ইত্যাদি গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের খণ্ডনই করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয়, "বিস্তরস্ত্বদ্বয়সিদ্ধৌ দ্রষ্টব্যঃ" এখানে শ্রীধরাচার্য্য অন্য গ্রন্থকারের প্রণীত "অদ্বয়সিদ্ধি"রই উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিবেদী মহাশয় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করিয়াছেন, অথচ "ইতি কৃতং গ্রন্থবিস্তরে সংগ্রহটীকায়াম্" এই লেখা দেখিয়া 'সংগ্রহটীকা' নামক শ্রীধরাচার্য্য প্রণীত গ্রন্থান্তর আছে, ইহা কিরূপে অবধারণ করিলেন, বুঝিলাম না। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তির অর্থ এই যে 'সংগ্রহটীকায় আর গ্রন্থ বাড়াইয়া কি হইবে।' 'সংগ্রহটীকা' শব্দে এখানে 'ন্যায়কন্দলী'কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। টীকা গ্রন্থে মূলবহির্ভূত অধিক বিচার অনাবশ্যক, ইহাই উক্ত পঙ্‌ক্তির মর্ম্ম। 'ন্যায়কন্দলী'ই সংগ্রহের টীকা। যে হেতু প্রশস্তপাদ ভাষ্যের নাম—'পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ' (১৩)।

'ন্যায়কন্দলী' অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায় যে শ্রীধরাচার্য্যের কিরূপ অসাধারণ ভূয়োদর্শিতা ও চিন্তাশীলতা ছিল। তিনি এই 'ন্যায়কন্দলী'তে স্বমতের মণ্ডন ও পরমতের খণ্ডনের উদ্দেশ্যে নামোল্লেখ পূর্ব্বক অনেক প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার, এমন প্রসন্ন গম্ভীর দার্শনিক সন্দর্ভ প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা আমাদের কম শ্লাঘার বিষয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এ যুগে (প্রাচীন যুগের) বলা যাইতে পারে না। রঘুনন্দন ও জগন্নাথ (রঘুনাথ ?) উভয়েই ইদানীন্তন যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" (১৪) বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীধরাচার্য্যের পরিচয় জানিলে কখনও এরূপ কথা কহিতেন না। দুঃখের বিষয় শ্রীধরাচার্য্য ও তাঁহার রচিত 'ন্যায়কন্দলীর' কথা আজ বঙ্গদেশীয় বহু পণ্ডিত—এমন কি নৈয়ায়িকেরাও জানে না। এই সকল প্রাচীন পণ্ডিতের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে সঙ্কলিত না হইলে, বাঙ্গালার ইতিহাস কখনই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারিবে না।

---

(১০) "কন্দলীকারমতমুত্থাপয়তি যদ্যোবমিতি—" প্রকাশ, ১১২ পৃঃ।

(১১) "তচ্ছাশরীরস্যাপি নির্ব্বহতি যথা স্বশরীরপ্রেরণায়ামাত্মনঃ।"—ন্যায়কন্দলী, ৫৭ পৃঃ।

"স্বশরীরপ্রেরণে চ দৃষ্টমশরীরস্যাপি আত্মনঃ কর্তৃত্বম্।"—ন্যায়মঞ্জরী, ২০২ পৃঃ।

(১২) "তথা হি ধ্রবাং তম ইতি ভাট্টা বেদান্তিনশ্চ ভনন্তি আরোপিতং নীলরূপমিতি শ্রীধরাচার্য্যাঃ।"—আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, ৯০ পৃঃ।

(১৩) "প্রণম্য হেতুমীশ্বরং মুনিং কণাদমন্বতঃ।
পদার্থধর্ম্মসংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়ঃ।"

—প্রশস্তপাদভাষ্য, ১ম শ্লোক

(১৪) "সাহিত্য," মাঘ, ১৩২৩, ৬৯২ পৃষ্ঠা।

অরণ্য-বিহার

[কুমার শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

১৮ই মার্চ্চ—আমরা সকালেই শিকারে বাহির হইলাম; কিন্তু সুদীর্ঘ চারি পাঁচঘণ্টা কাল জঙ্গল ওলট-পালট করিয়াও শিকার মিলাইতে পারিলাম না। অগত্যা হতাশ হইয়া সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইল—মনে হইল দিনটা বৃথা গেল; মনে ভয়ঙ্কর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও হরিনাম মুখে না আনিলে ধার্ম্মিকের মন যেমন অশান্তি ভোগ করে, আমাদের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল। কিন্তু আমাদের এই পণ্ডশ্রমের জন্য খুঁজিই দায়ী। সে আমাদিগকে যে জঙ্গলে লইয়া গিয়াছিল, তাহা যে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের প্রশস্ত ক্ষেত্র, তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম? সেই জঙ্গলে কিছু মিলিবে কি না, তাহা পর্য্যন্ত সে খোঁজ লয় নাই; অনর্থক আমাদিগকে হয়রাণ করিয়া মারিল! ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। যদি সেকালের মত একালের ব্রাহ্মণের মুখে আগুন থাকিত, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে হয় ত আমরা কয়টি ব্রাহ্মণ নন্দন তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিতাম।

১৯এ মার্চ্চ—আমরা হরিণ-শিকারে বাহির হইলাম। শাস্ত্রে মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা আছে; আমরা বাঘের অভাবে হরিণ শিকার করি। কিন্তু আজ হরিণ শিকারের সময়, আমরা যে দিকে তিন্‌চারিজন ছিলাম—সে দিক হইতে গুলি মারিবার সুবিধা একবারও পাইলাম না। আমার পিতৃদেব তিনটি এবং মদন দাদা একটি—মোট চারিটি হরিণ শিকার করা হইল। আমি ফিরিবার সময় একটি সজারু মারিলাম।

হঠাৎ এক বিভ্রাট! আমাদের কমলকলি হাতীটা তাহার মাহুতকে কাঁধের উপর হইতে আচম্বিতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। তাহাকে ধরিবার জন্য কতকগুলি হাতী পাঠাইতে হইল, কাজেই শিকার বন্ধ রাখিতে হইল। নতুবা, আরও দুই-একটি হরিণ শিকারের আশা ছিল। যাহা হউক, আমরা তাঁবুতে ফিরিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর সবে স্নান করিয়া আসিয়াছি, এমন সময় কালীপুরের 'তাউই' মহাশয় —শ্রীযুক্ত ধরণীবাবু, ও তাঁহার পুত্র—আমার ভগিনীপতি নরেন্দ্রবাবু তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী বিজন অরণ্যপ্রান্তে এই প্রকার পরমাত্মীয়ের সমাগম যে আমাদের কিরূপ আনন্দদায়ক হইয়াছিল, তাহা কেবল অনুভবযোগ্য। আমাদের পার্টিও বেশ বড় হইল; হাতীর সংখ্যাও অনেক বাড়িয়া গেল। আমাদের সঙ্গে ৩৪।৩৫টা হাতী ছিল; তাউই মহাশয় আসায় উঁহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়া ৫০টি হইল। ইহাতে আমাদের বড়-বড় জঙ্গল দেখিবার সুবিধা হইল।

২০এ মার্চ্চ—আমরা সকালেই শিকারে বাহির হইলাম। লাইনটি বেশ বড় হইলেও, 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া' হইল, মনের মত শিকার মিলিল না। পিতৃদেব একটি মহিষ শিকার করিলেন; কাকা ও মদনদাদা এক-একটি হরিণ পাইলেন। সন্ধ্যার পর মেঘ করিল, এবং রাত্রিকালে তুমুল ঝটিকা ও মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল। এমন রাত্রে, এমন স্থানে, এরূপ আবাসে নিশ্চিন্ত-মনে নিদ্রাদেবীর আরাধন করে—গৃহীর মধ্যে এমন সংযত-চিত্ত লোক কে আছে? নরেন্দ্র আমাদের তাঁবুতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ঝড়ে তাঁহার তাঁবুর অবস্থা শোচনীয় হইল। এক তাঁবুর ভিতর পূর্ব্ব হইতেই আমরা সাত জন ছিলাম, তাঁহাদের দুইজনকে লইয়া নয় জন হইলাম। আমাদের তাঁবুটি বার ফিট, চতুষ্কোণ, double fly Rowti; পাশেও দুইটি 'কোঠা' আছে। বৃষ্টির তোড় দেখিয়া জিনিষপত্রগুলি পূর্ব্বেই খাটিয়ার নীচে রাখা হইয়াছিল। সুতরাং সভৃত্য নরেন্দ্রনাথ আমাদের তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করায়, আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইল না; কিন্তু নিদ্রা সুখ সে রাত্রে বিসর্জ্জন দিতে হইল; কারণ,—আলোচনা, তর্ক, গল্প, হাসি, গান, এমন কি, হুড়োমুড়ি, 'ভেঙ্গানো', চিম্‌টিকাটা প্রভৃতি নিদ্রানিবারক যে সকল অশিষ্ট মুষ্টিযোগ প্রচলিত আছে—

তাহা যথাযোগ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে, চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারে এমন লোক বিশ্বসংসারে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

২১এ মার্চ্চ—প্রভাতে রীতিমত বর্ষার আভাষ পাওয়া গেল। সমস্ত দিন—কখন প্রবল ধারায়, কখন টুপটাপ বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বায়ুবেগও বেশ প্রবল, সুতরাং সে দুর্য্যোগে আর কে শিকারে বাহির হয়? ঝটিকায় নরেন্দ্রের তাঁবু—'বরজে সজারু পশি বারুইর যথা ছিন্নভিন্ন করে তারে' তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূপতিত তাঁবুটি বহু পরিশ্রমে উত্তোলিত হইল।—সমস্ত রাত্রি জাগিয়া-জাগাইয়া কাটাইয়াছি, মধ্যাহ্নে সুনিদ্রার ব্যবস্থা করা গেল।

২২এ মার্চ্চ—আমি শিকারে বাহির হই নাই; আর সকলেই শিকারে বাহির হইলেন। শুনিলাম, শিকারের সময় একটি বাঘ 'লাইন' কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে; এ দিন একটি বয়ার-শিশু ও দুইটিমাত্র হরিণ মারা পড়িয়াছিল। প্রথমে ব্যাঘ্র-শিকারের চেষ্টায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায়, শিকারের সংখ্যা এত অল্প হইল। পূর্ব্ব হইতে যদি সাধারণ শিকারের আদেশ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় শিকারের পরিমাণ অধিক হইত।

২৩শে মার্চ্চ—দিনটি বেশ পরিষ্কার ছিল; বসন্তের নীলাকাশ মেঘ-সংস্পর্শশূন্য; শীতল সমীরণ স্নিগ্ধকর। আমরা মহিষখোলায় উপস্থিত হইলাম। মনে পড়ে, ১৩০৭ সালে যখন বিয়রপাড়ে আসিয়াছিলাম, সেই সময় মহিষখোলায় 'কৈ'-মাছে উদরদেবের পূজা হইয়াছিল। সেবার এককুড়ি কৈমাছের মূল্য একআনা মাত্র ছিল। মহিষখোলার কৈ—পশ্চিমবঙ্গের যশুরে কৈ'য়ের মত আমাদের এ অঞ্চলে বিখ্যাত। এক-একটি বড় কৈ-মাছের পরিধি আট হইতে বার ইঞ্চি,—অর্থাৎ এক ফুট, দৈর্ঘ্যেও তদ্রূপ! আমরা মহিষখোলায় আসিয়া বাজারের দিন এই প্রকার কৈ-মাছ কতকগুলি ক্রয় করিলাম। কিন্তু এবার দশ পয়সা কুড়ি!—এখনও চারিআনায় কুড়ি পাওয়া যায়,—ইহা আমাদের দর। শুনিলাম, আমরা এ অঞ্চলে যতদিন থাকি, ততদিন কৈ মাছের দর এই রকম চড়া থাকে। চারিআনায় এককুড়ি বিরাট-দেহ কৈ-মাছ—তথাপি আমি 'চড়াদর' বলিতেছি, শুনিয়া বোধ হয় কলিকাতা অঞ্চলের ভোক্তৃবৃন্দ হাস্য-সংবরণ করিতে পারিবেন না।

মহিষখোলা দুই জেলার সীমান্তবর্ত্তী।—ইহার বাজার শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত; অন্য অংশ ময়মনসিংহ জেলা ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের সীমাপ্রান্ত বিধৌত করিঃ প্রবাহিত; জল স্ফটিক-বিমল, মধুর। মহিষখোলা চড়ায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়; আমরা উ কুড়াইয়া পোড়াইয়া লই, এবং আমাদের কয়লার গাড়ীর অংশ খালি হয়, তাহা পূর্ণ করি।

মহিষখোলা পাহাড়ের অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত। দাদ মহাশয়, ডাক্তার এবং আরও অনেকে সেই পাহাড়ে বা সেবন করিতে চলিলেন। তাঁহারা 'পূড়ার' পূর্ব্বপ দিয়া চলিলেন, পাহাড় এই পাড়েরই নিকটে। পূ পাড়েই আমাদের তাঁবু, সেখানে জঙ্গলও কম। তা মহাশয় এবং আর কয়েকজন পশ্চিম-পাড় দিয়া পাহাে দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই পাড়ে বিজন অরণ এই জঙ্গলে বন্য-কুক্কুট আছে! বন্য-কুক্কুট প্রকা হিন্দুর নিষিদ্ধ নহে। বন্য-কুক্কুটের লোভে তাঁহারা ি চারিটি ছররার বন্দুক সহ অরণ্য-বিহারে যাত্রা করিলে তাঁহারা মুরগীর সন্ধান পাইয়া একটি শিকার করিে কিন্তু মুরগী-শিকারে শিকার-বিভ্রাট উপস্থিত! এক বন্দুক ছুড়িবার সময় দৈবক্রমে কতকগুলি 'ছররা' এক পিয়াদার পায়ে বিদ্ধ হয়।

ছররা শিকারী-হস্ত নিক্ষিপ্ত হইয়া দুই কারণে প লাগিতে পারে; অনবধানতাবশতঃ তাহা পায়ে বিদ্ধ হ সম্ভব; কিন্তু অনেক সময় ছররা গাছের ডালে বা ব লাগিয়া প্রতিহত হইয়াও লাগিতে পারে; ইহাকে Gla বলে। গুলি Glance করিবার অনেক গল্প শুনিয়াছি জ্যেঠামহাশয়ের (মহারাজা সূর্য্যকান্ত) নিকট শুনিয় একবার লক্ষ্মীপুরের চিৎলির হাওড়ে, তাঁহাদের কোনও শিকারীর গুলি Glance করিয়া এক মাইল দূর একটি গৃহস্থের পায়ে বিদ্ধ হয়। সেই লোকটি তখ বাড় বসিয়া বাঁশ চাঁচিতেছিল। যাহা হউক গুলি তাহার গৌরব নষ্ট করিতে পারে নাই—অর্থাৎ তাহার পা হাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে চলৎশক্তিহীন করিতে পারে ন অপরাহ্নে এই দুর্ঘটনার সংবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হ তাঁহাদের সঙ্গে যে ডাক্তার ছিলেন, তাঁহাকে তাঁ বেচারার চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

নিহত মুরগী লইয়া সকলেই তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার আহত পেয়াদাটির পায়ের ক্ষতস্থান ছুরি দিয়া কাটিয়া ছররাগুলি বাহির করিয়া লইলেন; যথাযোগ্য ঔষধাদিও দেওয়া হইল। দাদামহাশয়েরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁবুতে ফিরিলেন। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। ক্রমে আকাশে মেঘের সঞ্চার। শেষে রাত্রি ১০৷৷০ টা, কি ১১টার সময় তুমুল ঝটিকা, আর মুষলধারে বর্ষণ! ঝড়ের বেগে তাঁবু পড়িতে-পড়িতে বহু কষ্টে রহিয়া গেল। আকাশে একটু মেঘের সঞ্চার হইতে-না হইতে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, ইহা এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। বিশেষতঃ, এই চৈত্র-বৈশাখ মাসে এদিকে নিত্যই এরূপ হইয়া থাকে। শীতকালে ঝড় কিছু কম হয় বটে, কিন্তু একটু মেঘ হইলেই 'ঝমাঝম' বর্ষণ আরম্ভ হয়। মেঘ চাইতেই জল—কথাটা এ অঞ্চলে প্রবাদ-বাক্যের মত অমোঘ।

২৪ এ মার্চ্চ—একটি বাঘের খবর পাইয়া তাহার সন্ধানে যাত্রা করিলাম। বেলা দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত খুঁজিলাম, কিন্তু পরিশ্রম বৃথা হইল, কিছুই মিলিল না। বেলা একটার পর আমরা একস্থানে নামিয়া জলযোগ করিতেছি—সেইস্থানে পদচিহ্ন লক্ষিত হইল। তখন নবোৎসাহে আরও দেড়-ঘণ্টা কাল জঙ্গল ভাঙ্গিলাম। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! আর কোন চিহ্নই পাইলাম না। অগত্যা তাঁবুতে প্রত্যাগমন করা গেল। সেখানে আসিয়া শুনিলাম, দুইটি হস্তীশাবক নিরুদ্দেশ! একটির নাম 'দুঃখিনী' অন্যের নাম 'গোবিন্দ প্রসাদ'। সমস্ত দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও তাহাদিগকে পাওয়া যায় নাই। অনুমান হইল, পূর্ব্বরাত্রে ঝড়-বৃষ্টির সময় হয় ত ভয় পাইয়া কোথাও পলায়ন করিয়াছে। পাহাড় খুব নিকটে বলিয়া ভয়েরও বিশেষ কারণ ছিল। নূতন হাতী, পাহাড়ের সঙ্গ পাইলেই, পলায়নের জন্য তাহাদের 'মন ছোঁ ছোঁ' করে। লুঙ্গি মাহুতকে তাহাদের সন্ধানে প্রেরণ করা হইল।

রাত্রিকালে পুনর্ব্বার ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় পূর্ব্বেই সমস্ত হাতী বাঁধা হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিযোগে 'চমৎকারিণী' যুথভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ভূমিকম্পের একটি ফাটলের ভিতর লুকাইয়া রহিল। এই ভাবে পলায়ন করা ইহার প্রকৃতিসিদ্ধ। ঝড়ের সময় তাহাকে কোন খোলা যায়গায় বা গাছের তলায় বাঁধিয়া রাখে[illegible] ঝড উঠিলেই সে আশ্রয়ের সন্ধানে ধাবিত হয়। যদি নিকটে কোন গৃহস্থের বাড়ী থাকে, তাহা হইলে সে সেই বাড়ীর কোন এক কোণে, কিম্বা কোন 'নালা' পাইলে তাহার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। যদি এ সকল কিছু না থাকে, এবং নিকটে কোন নদী বা পুষ্করিণী থাকে, তাহা হইলে সে ঝড়ের সময় বড় এক অদ্ভুত কাজ করে,—জলে নামিয়া তাহার প্রকাণ্ড শরীরটা জলমগ্ন করিয়া কেবল চোখ দুটি ও নাকের ডগাটুকু বাহিরে রাখে বোধ হয় মনে করে, খুব নিরাপদ স্থানে লুকাইয়াছে।

* উপায়

এক-একটি হাতীর এক-এক প্রকার বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। চমৎকারিণীর ঝটিকাতঙ্কের কথা বলিলাম। জুতাতঙ্ক ও ছাতাতঙ্কের ন্যায় হাতীর দলে অন্য আতঙ্কেরও অস্তিত্ব আছে। আমাদের আর একটি 'কুন্‌কী' আছে—তাহার নাম "চমক্‌তারা।" চমক্‌তারা খর্ব্বাঙ্গী কুন্‌কী। শৃঙ্খলাতঙ্কই তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব। কিন্তু এই শৃঙ্খলাতঙ্ক সকল সময় তাহাকে আকুল করিতে পারে না। সুপক্ব কাঁঠালের গন্ধে সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়। তাহাকে যত স্থূল ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলেই আবদ্ধ করা হউক, পাকা কাঁঠালের সুমিষ্ট গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেই, সে শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া কাঁঠালটি উদরসাৎ না করিয়া স্থির হইবে না। সে শিকল ভাঙ্গিবার কৌশল যেমন জানে, অন্য কোনও হাতী তেমন জানে না। এই কৌশলটিতে তাহার বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে তাহার শুঁড়ের সাহায্যে শিকলের একটি কড়া অন্য একটি কড়ার উপর সাবধানে তুলিয়া এমন একটি চাপ দেয় যে, চক্ষুর নিমিষে কড়া ভাঙ্গিয়া যায়। একটি কড়া ভাঙ্গিতে পারিলেই মুক্তিলাভ। আবার এক-এক সময় সে অন্য কৌশলেও শৃঙ্খল ছিন্ন করে। শিকলটা একটু ঢিলা করিয়া লইয়া, তাহাতে এমন একটা 'হ্যাঁচ্‌কা' টান দেয় যে, তাহা ভাঙ্গিতে এক মিনিটও সময় লাগে না! অগত্যা শৃঙ্খল ভঙ্গের কারণ ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিতে হয়। হাতীর এত প্রখর বুদ্ধি থাকিলেও, 'হস্তীমূর্খ' প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে কেন, কে বলিবে?

২৫এ মার্চ্চ,—আজ আমরা গোলাপপুরের বন্দে শিকার করিতে চলিলাম। ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ বন্দ। ইহাতে না পাওয়া যায়—এরূপ জানোয়ার নাই। বাঘ, মহিষ, হরিণ—সর্ব্বপ্রকার শিকারই এখানে পাওয়া যায়।

সুন্দর বন্দে এক দিনে শিকার করিয়া উঠা যায় না। আমরা এই বন্দে তিন-চারিদিন শিকার করি। তাউই মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, এই বন্দে তিনি একবার এরূপ একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র দেখিয়াছিলেন যে, তাহাকে গুলি করিতেই তাঁহার সাহস হয় নাই!—এরূপ বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য মহাশয় আমাদিগকে কোন দিন দর্শন দিয়া আমাদের মনুষ্যজন্ম সফল করেন নাই।

অদ্য প্রথমেই ছয়টি হরিণ মারা পড়িল। তাহার পর একপাল মহিষ দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেগুলি প্রাণভয়ে অদৃশ্য হইল। কেবল একটি 'কাকৃনী' মারা পড়িল। তাহার একটি বাচ্চা তাহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার অল্প শিঙ্গ উঠিয়াছিল। শিশু হইলেও সেটি 'বয়ার'। আমরা সেখানে উপস্থিত হইতেই সে 'চার্জ্জ' করিল। আমরা ভবিষ্যতের আশায় তাহাকে না মারিয়া 'লাইন' কাটাইয়া দিলাম। মনে করিলাম, সে বোধ হয় বাহির হইয়া চলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে চার্জ্জ করিয়াছে। কিন্তু সে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া দাঁড়াইয়াছে, পলায়ন করিল না। পলায়ন দূরের কথা—সে পিতৃদেবের হাতীর পশ্চাতে আসিয়া তাহাকে শৃঙ্গাঘাতে ঠেলিতে লাগিল। তাহার সেই নবোদ্গত শৃঙ্গ হস্তীদেহে বিদ্ধ না হইলেও, হস্তী সেই আঘাতে বিচলিত হইল। মহিষ-শাবক শিংএর গুঁতায় হাতীকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল! হাতীটার মনেও বোধ হয় বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হইয়াছিল!—যাহা হউক, তাহাকে তাড়াইবার জন্য প্রথমে 'জাঁঠা' (বর্শাকৃতি অস্ত্রবিশেষ) দ্বারা খোঁচা দেওয়া হইল; কিন্তু সে তাহাতেও রণে ভঙ্গ দিল না। তখন অগত্যা আমাদিগকে অগ্নিবাণে তাহার মহিষ-লীলা শেষ করিয়া দিতে হইল। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাহাকে বধ করিতে হইল।

তাঁবুতে ফিরিয়া দেখিলাম, লুপ্ত আহত হাতী লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। হাতী দুইটি পাহাড় অতিক্রম করিয়া দুই মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে, তাহাদের উদ্ধার-সাধন কঠিন হইত। কারণ, তাহারা ৩টি টিলা পার হইয়াছিল, আর দুই-তিনটি পার হইয়া একটি বড় উপত্যকায় উপস্থিত হইতে পারিলেই, তাহাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকিত না। কোন্ বন্দী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না করে?

২৬এ মার্চ্চ—আজও পুনর্ব্বার গোলাপপুরের বন্দের অভিমুখে চলিলাম। আজ চারিটি হরিণ শিকারের পর একপাল মহিষ দেখিতে পাইলাম। আমরা দ্রুতবেগে তাহাদের অনুসরণ করিলাম। আমরা একটি বয়ারকে তাড়া করিয়া যাইতেছি, এমন সময় একটি মহিষ সম্মুখে আসিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। আমি ও কাকা সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম, আর আর সকলে দূরে ছিলেন। কাকা তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিলেন। সে আমাদের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া, সেই পাল যে দিকে গিয়াছিল, সেই দিকে চলিল। আমরা দূর হইতে আর দুইটি গুলি করিলাম। গুলি খাইয়া সে হুমড়ি খাইয়া পড়িল; কিন্তু উঠিয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল। আমরা তাহার আশা ত্যাগ করিয়া—যদি বয়ারটিকে পাওয়া যায় এই প্রত্যাশায়, তথনও তাহার পশ্চাৎ ছাড়িলাম না; চলিতে-চলিতে একটা জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। মহিষটা তখন আমাদের প্রায় তিনশত গজ সম্মুখে চলিয়া গিয়াছিল। সে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী জলা ভাঙ্গিয়া প্রায় অন্য পারে উঠিয়াছে, কিন্তু আমরা তখনও জলায় নামিতে পারি নাই। জলাতে 'দাব' ছিল বলিয়া, মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হইবার ভয়ে, মহিষকে লক্ষ্য করিয়া সেই স্থান হইতেই গুলি করিলাম। এত দূর হইতে গুলি করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করা অতি কঠিন; সে পড়িল না। তখন আমরা ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বোক্ত আহত মহিষটাকে বিস্তৃত অনুসন্ধানে বাহির করিলাম। দেখিলাম, তাহার চলৎশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। আমরা তাহাকে যেখানে শেষবার গুলি করি—সে তাহার অদূরেই ছিল। আর দুইটি গুলিতেই তাহাকে 'নির্দ্দম' করা হইল।

এই 'নির্দ্দম করা'র একটি বড় মজার গল্প আছে এখানে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের পিতৃবন্ধু বগুড়ার নবাব সাহেব স্বর্গীয় আবদুল্ সোভান চৌধুরী প্রধান শিকারী ছিলেন। তিনি প্রায় প্রতি বৎসর জ্যেঠা মহাশয়ের (মহারাজা সূর্য্যকান্ত) সঙ্গে শিকারে যাইতেন। এতদ্ভিন্ন স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাবেও কখন-কখন শিকার করিতেন। তাঁহার শিকারের এবং হাতীর বিলক্ষণ সখ ছিল। তিনি বগুড়ার নবাব হইবার পূর্ব্বে আমাদের জেলার লোক ছিলেন। বগুড়ার সম্পত্তি [illegible]

লাভ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান ময়মনসিংহের দেলদুয়ারে। নবাব সাহেবের ভ্রাতা আবদুল জব্বর চৌধুরী এখনও দেলদুয়ারে আছেন; ইঁহারাই দেলদুয়ারের জমীদার। দেলদুয়ারের গজনবী ও চৌধুরী বংশ পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন। এ অঞ্চলেও নবাব সাহেবের জমিদারী আছে; তিনি প্রায়ই মধুপুরে শিকার করিতে আসিতেন।

নবাব সাহেব একদিন গল্প করিলেন,—একদিন প্রখর রৌদ্রে তাঁহারা 'লাইন' করিয়া যাইতেছিলেন; তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হওয়ায় একটি সোডা খুলিয়া তাহা পান করিতেছেন, এমন সময় একটি হরিণ হঠাৎ বাহির হইয়া লাইনের সমান্তরাল ভাবে দৌড়িতে লাগিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করা হইল; কিন্তু Easton সাহেব মিস্' করিলেন, হলো সাহেবও হরিণটাকে মিস্ করিলেন। দুই সাহেবের গুলি এড়াইয়া হরিণটা যখন নবাব সাহেবের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখনও তাঁহার সোডা পান শেষ হয় নাই। তিনি গ্লাসটি নামাইয়া রাখিবারও অবসর পাইলেন না; বামহস্তে গ্লাস ধরিয়াই দক্ষিণ হস্তে একটি পাতলা বন্দুক লইয়া গুলি করিলেন; সঙ্গে-সঙ্গে হরিণ পপাত চ মমার চ!" নবাব সাহেব এই কাহিনীর বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন,"ভাই, এমন লাগাই লাগ্‌ল যে, এক গুলিতেই নির্দ্দম!" বৈষ্ণব মতাবলম্বিনী গোস্বামী-বধূরা 'কাটাকে' কাটা না বলিয়া 'বানানো' বলেন। এমন কি, মাছ কুটাকেও 'মাছ বানানো' বলা হয়। নবাব সাহেব বৈষ্ণব না হইলেও, 'মারা' বা 'বধ করা', 'হত্যা করা' প্রভৃতি রূঢ় শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'নির্দ্দম' বলিতেন। কথাটি বেশ মোলায়েম ও শ্রুতিমধুরও বটে, শিকারের অভিধানে স্থান পাইবার যোগ্য। হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন নবাব বাহাদুর গত বৎসর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সেই অমায়িকতা, সৌজন্য এবং সরস গল্পগুলি বহুকাল আমাদের স্মরণ থাকিবে। নবাব সাহেবের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও 'নির্দ্দম'-শব্দটিই ব্যবহার করিয়া থাকি।

চুনার

[শ্রীনিখিলনাথ রায় বি,-এল্]

দুর্গের দ্রষ্টব্য স্থান

চুনারদুর্গের ইতিহাস ও তাহার সাধারণ দৃশ্যের কথার উল্লেখ পূর্ব্বে অন্যত্র * করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাতে অবস্থিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে। সেই স্থানগুলি আজিও ইহার প্রাচীন স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। চুনার দুর্গের সহিত যে সমস্ত পুরাতত্ত্ব ঘটিত বৃত্তান্ত ও ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে, এই স্থানগুলি হইতে তাহার কতক-কতক পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

চরণ-পাদুকা

চুনার দুর্গের প্রবেশ-দ্বার পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। প্রথম দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি ক্রমোচ্চ পথ দিয়া দ্বিতীয় দ্বারের নিকট গমন করিতে হয়। পরে সেই দ্বিতীয় দ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করার নিয়ম। এই ক্রমোচ্চ বা ক্রমনিম্ন পথের মধ্যে একটি স্থানে দুইটি চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। তাহাকে চরণ-পাদুকা কহে। উহা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন বলিয়া কথিত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত চুনার দুর্গের যে কোনই সম্বন্ধ ছিল না। এই স্থানটিকে আবার ধোঞার পাটও কহিয়া থাকে।

রাজনৈতিক অপরাধীর কারাগার

(State Prison)

দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে প্রস্তরের স্তম্ভযুক্ত একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত দালান দৃষ্ট হয়। উহার একটি

* উপাসনা পত্রিকায়।

প্রকোষ্ঠ রাজনৈতিক অপরাধিগণের কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তাহা দেখিলে কারাগৃহ বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। এইস্থানে মহারাষ্ট্রীয় ত্র্যম্বকজী দাঙ্গেঙ্গলিয়া ১৮১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক বন্দীরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বন্দীর নিবাস-স্থানটি অদ্যাপি সুরক্ষিত ভাবেই বিদ্যমান আছে।

বিশাল কূপ

এই কারাগারের পার্শ্ব দিয়া পশ্চিম দিকে গমন করিতে-করিতে সংশোধনীর (Reformatory) পাকশালা দৃষ্টি-গোচর হয়। তাহার পার্শ্ব দিয়া আরও কিছুদূর পশ্চিমে গমন করিলে, উত্তর-দিকৃস্থিত একটি উপর চত্বরের প্রবেশ-দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দ্বার দিয়া পূর্ব্ব মুখে আসিলে এক বিশাল কূপ নয়ন-পথে নিপতিত হয়। এই কূপই পূর্ব্বে দুর্গের জল-সরবরাহ করিত। এই বিশাল কূপের ব্যাস ২৩½ ফিট, পরিধি ৯০ ফিট ও গভীরতা ১৩২ ফিট, ইহা পর্ব্বত গাত্রে নিখাত হইয়াছে। আলোক ও বায়ু প্রবেশের জন্য মধ্যে-মধ্যে জানালার ব্যবস্থা আছে। জল উত্তোলনের জন্য সোপানশ্রেণীও গ্রথিত রহিয়াছে। ইহার উত্তর দিকে ডাক-বাঙ্গালা অবস্থিত।

সোনওয়া বুরুজ

কূপের চত্বর হইতে পশ্চিমোত্তর দিকে একটি উচ্চতর চত্বরে প্রবেশ করিলে, একটি প্রস্তরময় ভবন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবনের মধ্যস্থলে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ বিশাল গম্বুজ মস্তকে ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছে। গৃহের চারিপার্শ্বে বারাণ্ডা। চারিটী দ্বারের উপরে আর্‌বী অক্ষর খোদিত আছে। এই প্রস্তর-ভবনটি সোনওয়া বুরুজ নামে খ্যাত। এই ভবনে দুর্গের পূর্ব্বতন অধীশ্বর—কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের সামন্ত রাজা সহদেবের কন্যা সোনওয়ার সহিত মহোবার অধিপতি চন্দেলরাজ পরিমলের সেনাপতি আলার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, ইহা সোনওয়ার বিবাহ-মণ্ডপ বা সোনওয়া বুরুজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আলা ও উদল দুই ভ্রাতায় রাজা সহদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সোনওয়াকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলা ও উদল কোন্ সময়ে চুনার দুর্গ জয় করেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পৃথ্বীরাজ-রাসো গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আলা ও উদল মহোবারাজ পরিমলের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া জয়চন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তাঁহারা চুনার দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, কি তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের দ্বারা চুনার জিত হয়, তাহা আলোচনার বিষয়। আমরা মনে করি যে, আলা ও উদল পূর্ব্বেই চুনার দুর্গ জয় করিয়া চন্দেলবংশের অধিকারে আনয়ন করিয়া ইহার চন্দেলগড় নাম প্রদান করেন। উক্ত চন্দেলগড় হইতে চুনার চণ্ডাল-গড় হইয়াছে। চুনার গুহক চণ্ডালের আবাস-স্থান ছিল না এবং তাহা হইতে ইহার চণ্ডালগড় নাম হয় নাই। বিবাহ-মণ্ডপের নিকটে একটি পাতালগৃহ আছে। তথায় রাজা সহদেব পরাজিত রাজাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উপর হইতে পাতালগৃহে যাওয়ার জন্য সোপানেরও ব্যবস্থা আছে; এবং খাদ্যদ্রব্য প্রদানের জন্য দুইটি ক্ষুদ্র দ্বারও রহিয়াছে। রাজা সহদেবের সময়ে এই চত্বর নির্ম্মিত হইলেও, পরে মুসলমান-অধিকারে যে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহের দ্বারের উপর আরবী অক্ষর খোদিত থাকাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তদ্ভিন্ন, এই পাতালগৃহ যে মুসলমান-অধিকার সময়ে বন্দিগণের কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাও বেশ বুঝা যায়। সে যাহা হউক, এই চত্বরের সহিত হিন্দু ও মুসলমান উভয় রাজত্বকালের সম্বন্ধ আছে।

ভর্ত্তৃহরি চবুতারা

সোনওয়া বুরুজের উত্তরে একটি অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহা বারুদঘর (Powder magazine) রূপে ব্যবহৃত হইত; এক্ষণে ইহা সংশোধনীর পাঠাগাররূপে অবস্থিত। এই গৃহের বারাণ্ডার পশ্চিম দিকে ভর্ত্তৃহরির সমাধি আছে। একটি চবুতারার নীচে ভর্ত্তৃহরি সমাহিত। সমাধির উপরে একটি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী। তাহা সিন্দূর-লেপিত। এই সমাধির উপর হিন্দু-মুসলমান সমভাবে পূজা প্রদান করিয়া থাকে। এই স্থানে কয়েকটি দেবমূর্ত্তিও আছে। পর্ব্বতের পশ্চিমদিকের গুহা-মন্দির হইতে মূর্ত্তি-গুলি আনিয়া এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। মুসলমান-অধিকার সময়ে এই অট্টালিকাটি অন্দর-মহল ছিল। দুর্গের

ঝরকায় বসিয়া মহিলাগণ নাচ দেখিতেন। ভর্তৃহরির একটি প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূর্ব্বে এইখানে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে তাঁহা অন্য স্থানে রহিয়াছে।

ভর্তৃহরির সহিত যে চরণাদ্রির বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার সমাধি তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভর্তৃহরি উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজাবলীতে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রপুত্র গন্ধর্ব্বসেন পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া দিবসে গর্দ্দভ ও রাত্রিতে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধার নগরে বাস করিতেন। ধার-রাজার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই পরিণয়-ফলে বিক্রমাদিত্যের জন্ম। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের জন্মের পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বসেন কর্ত্তৃক এক দাসী-গর্ভে ভর্তৃহরির জন্ম হয়।

"অথ কালেন কিয়তা রমমাণো মহীতলে।
দাস্যাং গন্ধর্ব্ব সেনস্তু পুত্রমেকমজীজনৎ॥
তস্য ভর্তৃহরীত্যেবং নাম চক্রে মহামতিঃ।

রাজাবলী।

বিক্রমাদিত্যের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে গন্ধর্ব্বসেনের গর্দ্দভদেহ শ্বশুর ধার-রাজ কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, তিনি শাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। বিক্রমাদিত্য ভূমিষ্ঠ ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ধার-রাজ তাঁহাকে মালবের আধিপত্য প্রদানে ইচ্ছুক হন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভর্তৃহরিকে রাজার এবং তাঁহাকে মন্ত্রীর পদ প্রদান করিতে মাতা-মহকে অনুরোধ করিলে, ধার-রাজ সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। 'বত্রিশ-সিংহাসনে'ও বিক্রমাদিত্যের পিতার ঔরসে তাঁহার মাতৃ-সখীর গর্ভে ভর্তৃহরির জন্মগ্রহণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ-কেহ উভয়কে সহোদর ভ্রাতাও বলেন।

ভর্তৃহরির অনঙ্গা ও পিঙ্গলা নামে দুই রাণী ছিলেন। অনঙ্গার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া ভর্তৃহরি রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইয়া পড়েন। বিক্রমাদিত্য সতর্ক করিয়া দিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিক্রমাদিত্যকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন। বিক্রমাদিত্য ভর্তৃহরির সে আজ্ঞা পালনে ত্রুটি করেন নাই। অনঙ্গার প্রতি রাজার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল বটে, তিনি কিন্তু অপরে আসক্তা হন। পিঙ্গলা কিন্তু ভর্তৃহরি-গত-প্রাণা ছিলেন। রাজা উভয়ের প্রণয়-পরীক্ষার জন্য, মৃগয়াচ্ছলে বনে গমন করিয়া লোকমুখে আপনার কল্পিত মৃত্যুসংবাদ দিয়া পাঠান। পিঙ্গলা সে সময়ে একটি স্তম্ভ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা ছিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। অনঙ্গা কিন্তু মনে-মনে সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, পিঙ্গলা স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। অনঙ্গা রাজার উপস্থিতিতে কপট শোক প্রকাশ করিয়া, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদের জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি আবার রাজাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। একদিন রাজসভায় এক তপস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়া, রাজাকে একটি ফল দান করিয়া কহিলেন যে, এই ফল ভক্ষণ করিলে মনুষ্য অজর ও অমর হয়। রাজা অনঙ্গাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকে সেই ফলটি প্রদান করেন। অনঙ্গা স্বীয় প্রণয়-পাত্রকে তাহা উপহার দেন। সে আবার লাক্ষা নামে এক বারাঙ্গনাকে ভালবাসিত; সে তাহারই হস্তে সেই ফলটি অর্পণ করে। লাক্ষা রাজাকে উপহার দিবার জন্য ফল-হস্তে রাজসভায় উপস্থিত হয়। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া ফলটি চিনিতে পারেন, এবং অনঙ্গার কাপট্য বুঝিতে পারিয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হন। সেই সময়ে তিনি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ
অস্মৎ কৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ।"

অবশেষে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও মহাত্মা গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উজ্জয়িনী হইতে একক্রোশ উত্তরে শিপ্রা-নদী-তীরে ভূগর্ভস্থ অট্টালিকা মধ্যে ধ্যানস্থ ভর্তৃহরি, তাঁহার গুরু গোরক্ষনাথ ও রাজ্ঞী পিঙ্গলার মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইহাকে লোকে ভর্তৃগুহা কহিয়া থাকে। ভর্তৃহরি সুশাসনেই রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় রাজ্যকেও সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন। সিন্ধুনদের তীরে অদ্যাপি তাঁহার নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ভর্তৃহরি পুষ্করতীর্থের নিকট-

বর্ত্তী নাগা পর্ব্বতে, আল্মোয়ারে, পরে কাশীধামে অবস্থিতি করেন। অবশেষে চরণাদ্রিতে আসিয়া আশ্রয় লন, এবং চরণাদ্রিতেই তিনি সমাহিত হন। এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, ভর্ত্তৃহরি সেই তপস্বীপ্রদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া অমর হইয়া আছেন। চুনারে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে দুর্গ ও নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা আবার ভগ্নদশায় পতিত হয়। নগর ও দুর্গের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে—

"সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রঞ্চ তৎ-
পার্শ্বং তস্য চ সা বিদগ্ধ পরিষৎ তা শ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ।
উদ্ধৃতঃ স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনতাঃ কথাঃ
সর্ব্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায়তস্মৈ নমঃ॥

এই শ্লোকটি ভর্ত্তৃহরি কৃত বৈরাগ্যশতকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভর্ত্তৃহরির রাজ্য পরিত্যাগের পর বিক্রমাদিত্য মালব অধিকার করিয়া উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ভর্ত্তৃহরির অন্বেষণে বহির্গত হইয়া চরণাদ্রিতে উপস্থিত হন ও ভর্ত্তৃহরিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। ভর্ত্তৃহরি কিন্তু যাইতে অসম্মত হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে—

"মহাদেবো দেবঃ সরিদপি চ সৈবামর সরিৎ
গুহা এ বাগারং বসনমপি তা এব হরিতঃ।
সুহৃদ্বা কালোহয়ং ব্রতমিদ মদৈন্যব্রতমিদং
কিয়দ্বা বক্ষ্যামো বটবিটপ এবাস্ত দয়িতা॥"

উপরিউক্ত শ্লোকটিও বৈরাগ্যশতকে দেখা যায়। এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, তিনি অবশেষে বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ভর্ত্তৃহরি শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক নামে শত শ্লোকাত্মক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলির ভিন্ন-ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন-কোন পুস্তকে শতাধিক শ্লোকও দেখা যায়। এই শতকত্রয় ১৬৭০ খৃঃ অব্দে প্রথমে ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়। পরে লাটিন, জর্ম্মাণ ও ইংরেজি ভাষায়ও তাহাদের অনুবাদ হইয়াছিল। ব্যাকরণশাস্ত্রেও ভর্ত্তৃহরির অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহার প্রণীত বাক্যপদীয় বা হরিকারিকাসূত্র পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায় আদৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, তিনি মহাভাষ্য-দীপিকা ও মহাভাষ্যত্রিপদী-ব্যাখ্যা নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কেহ-কেহ তাঁহাকে ভট্টিকাব্য-প্রণেতাও বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ভট্টিকাব্য-প্রণেতা স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ভর্ত্তৃহরি হইতে এক যোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা বাদ্যযন্ত্র-হস্তে ভর্ত্তৃরাজের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কাশীধাম তাহাদের প্রধান স্থান। ভর্ত্তৃহরির সম্পর্কে চুনার যে গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, যোগী ও পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল বলিয়াই বোধ হয়। নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক পাঠ করিলে তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকৃত ব্যাকরণগ্রন্থসমূহে তাঁহার পাণ্ডিত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। যখন বৈরাগ্যের শতকের—

"মাতর্মেদিনি তাত মারুতসখে তেজঃ সুবন্ধোজন
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গ বশোপজাত সুকৃতস্ফার স্ফুরন্নির্ম্মল
জ্ঞানাপাস্ত সমস্ত মোহ মহিমা লীয়ে পরব্রহ্মণি॥"

প্রভৃতি শ্লোক পাঠ করা যায়, তখন সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে আমাদেরও প্রণামাঞ্জলি-বদ্ধ করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে।

নাচঘর

ভর্ত্তৃহরি চবুতারার পূর্ব্বে একটি চত্বরে প্রস্তরের স্তম্ভযুক্ত একটি প্রস্তরনির্ম্মিত দালান আছে। পূর্ব্বে তাহা নাচঘর রূপে ব্যবহৃত হইত। তাহার পর তাহা হাসপাতালে পরিণত হয়। এক্ষণে ডাকবাঙ্গলারূপে অবস্থিত। ইহাতে এইরূপ একখানি প্রস্তর-লিপি ছিল বলিয়া কোন-কোন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়—"এই চত্বর ও দালান নবাব ইমাদউদ্দৌলার সময়ে কর্ণেল জানদাদ জঙ্গ বক্স, এবং তদারককার বহরমজঙ্গ বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে ১১৯৭ হিজরীতে নির্ম্মিত হয়।" ১১৯৭ হিজরী বা ১৭৮২—১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে এই চত্বর নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। কিন্তু নবাব ইমাদউদ্দৌলা কে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। চুনার দুর্গের সহিত অযোধ্যার

নবাব-উজীরদিগের কিছুকাল সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহাদের বংশে ইমাদউদ্দৌলা নামে কোন নবাবের নাম দৃষ্ট হয় না, এবং ১৭৮২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে চুণার ইংরেজের অধিকারে আসে। নবাব ইমাদউদ্দৌলার সহিত ইংরেজ-সেনানীর কোন সম্বন্ধ থাকাই সম্ভব।

জাহাঙ্গীরী মহাল

রক্ষীগৃহের (Guard room) কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র গৃহ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহা জাহাঙ্গীরী মহাল নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহার প্রস্তরলিপির মর্ম্মার্থ এই,—"ন্যায়বান্, উদার ও প্রজাবর্গের সন্তোষবিধায়ক সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ জগৎ একটি সঞ্চরমান দৃশ্যমাত্র। ইহা একটি পান্থশালার স্বরূপ। এখানে কাহারও স্থায়ী আবাস নাই, সকলে অল্পকালমাত্র এখানে অবস্থিতি করে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এরূপ ন্যায়পর ছিলেন যে, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনুযোগ করিতে পারে নাই।"

আলমগীরী মসজীদ

দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভৈরব-বুরুজের নিকটে বাদশাহ আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এক মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহাকে আলমগীরী মসজীদ কহিত। এই মসজীদটি হিন্দুদিগের গুহা-মন্দিরের উপর উত্থিত হইয়াছিল। ভারতের অনেক স্থানে আরঙ্গজেবের যে হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়, এখানেও তাহার অভাব ঘটে নাই। মসজীদটি অনেকদিন হইল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহার পশ্চিম দিকের দেওয়ালটিমাত্র বর্ত্তমান আছে। তাহাতে সংলগ্ন প্রস্তরফলকে এইরূপ লিখিত আছে,—"সর্ব্বশক্তিমানের প্রসাদে, বাদশাহ আরঙ্গজেবের অভিপ্রায়ানুসারে, মির্জ্জা বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে, ১০৮০ হিজরীতে এই মসজীদ নির্ম্মিত হয়।" দুর্গের যে স্থানটিতে এই মসজীদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আকার পায়ের বা জুতার গোড়ালির মত, এবং সেইজন্য সমস্ত পর্ব্বতটিকেও পায়ের বা জুতার ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। পর্ব্বতটির নামও সেইজন্য চরণাদ্রি; তাহার উপরিস্থিত দুর্গও সেই আকারে নির্ম্মিত [illegible]

বাউলি বা সন্তরণাগার

দুর্গের উত্তর-পশ্চিম ভাগে দুর্গমধ্যে জল-প্রবেশের জন্য জল দরজা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদ্‌শাহের আদেশে উহা নির্ম্মিত হয়। দরজা দিয়া জল-প্রবেশ করিয়া একটি স্থানে সঞ্চিত থাকিত। তাহাতে সৈন্যগণ স্নান, সন্তরণ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ করিত। সোপান-শ্রেণীর দ্বারা সেইস্থানে অবতরণ করা হইত। এক্ষণে জল-দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিম দরজা

চুনার দুর্গের পশ্চিম-দরজা দুর্গের একটি দর্শনীয় অংশ। ইহাও আকবর বাদ্‌শাহের সময় নির্ম্মিত হয়। ৯৮১ হিজরীতে সরীফ মহম্মদ খাঁ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গের মধ্যে ও বাহিরে দরজার উপরে নির্ম্মাণের সময় ও বিবরণ লিখিত আছে। উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই দরজা স্বর্গের গৌরবকেও পরাজিত করিয়াছে, এবং ইহা স্বর্গ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই দরজা দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে, লোকে যেন স্বর্গে প্রবেশ করিতেছে—মনে করিয়া থাকে। পশ্চিম দরজা দিয়া গঙ্গা-তীরে যাইবার সুন্দর পথ আছে। এই পথ দিয়া যাইতে-যাইতে গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা নয়নের প্রীতি সম্পাদন করে।

হেষ্টিংস্ কোয়াটার

দুর্গের পূর্ব্বভাগে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি লাল রঙ্গের অট্টালিকা আছে। কাশীর চেত্‌সিংহের হাঙ্গামা হইতে পলায়ন করিয়া, ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহার দেওয়ান—কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুও ছিলেন। অদ্যাপি ইহাকে হেষ্টিংস কোয়ার্টার বলে। এইখানে হেষ্টিংসের আদেশে একটি Sundial বা সূর্য্যঘড়ি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—

ERECTED BY ORDER OF
The Honourable Warren Hastings Esqr.,
GOVERNOR GENERAL etc., etc.,
IN 1784.
Latitude 25, 07, 36 N.
Longitude 83, 09, 15 E. from Greenwich.

এই অট্টালিকার উত্তরে হেষ্টিংসের আদেশে একটি Citadel বা রক্ষণ-দুর্গ ও তাহার অভ্যন্তরে একটি অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। রক্ষণ-দুর্গের দরজায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"This citadel and the within buildings erected by Col. William Blare under the auspices of the Honourable Warren Hastings Esqr., Governor General. A. D. 1783.

রক্ষণ-দুর্গের উপরিভাগ এক্ষণে ডাক্তারের আবাসস্থল এবং অট্টালিকাটি হাসপাতাল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

রিফরমেটরী বা সংশোধনী

চুনার দুর্গ এক্ষণে Reformatory বা অল্পবয়স্ক অপরাধিগণের সংস্কার-গৃহে পরিণত হইয়াছে। আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপরাধী বালকদিগকে জেলে না দিয়া, এখানে পাঠাইয়া চরিত্র-সংশোধন ও শিক্ষা-প্রদান করা হয়। কাজেই, ইহা একরূপ শিক্ষাগার। সেই জন্য ইহা ইউ-নাইটেড প্রভিন্সের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের অধীন। বালকগণ এখানে শিক্ষালাভ করিয়া ভবিষ্যতে জীবিকার উপায় করিয়া থাকে। প্রাতঃকালে ইহাদিগকে ছুতার, তাঁতী, কুমারের এবং বেতের ও পাথরের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নে তাহারা মাতৃভাষায় লিখন পঠন ও সামান্যরূপ অঙ্ক শিক্ষা করে। বৈকালে খেলা করিতে পায়। প্রাতে জলযোগ খাইয়া তাহারা কার্য্য-শিক্ষা আরম্ভ করে। সাধারণতঃ ইহাদিগকে ভাত, রুটি, ডাল, তরকারী ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হয়। ইহার পরিচালনার জন্য একজন য়ুরোপীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার একজন সহকারী আছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষকেরও ব্যবস্থা আছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটি পরিদর্শক-সমিতিসহ ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই রিফরমেটরী বেরিলীতে ছিল; ১৯০২ খৃঃ অব্দে চুনারে উঠিয়া আসে। বালকগণ দুর্গের সৈন্যাবাসে অবস্থিতি করে। শিক্ষাগার ও কারখানা সৈন্যাবাসের মধ্যে। বালকদিগকে দুর্গের বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না। পূর্ব্বদিক্ দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার পথের দক্ষিণ ভাগে একটি উচ্চ চত্বরে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবস্থিতি করেন। পূর্ব্বদরজার উপর তাঁহার সহকারীর আবাসস্থান। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দরজা ব্যতীত উত্তর দিকেও একটি দরজা দেখা যায়। কিন্তু তাহার পর দুর্গের কোন-কোন চত্বর আছে। দুর্গ-প্রাচীরের পার্শ্বে দুর্গের উত্তর দিকে দুর্গ পরিভ্রমণ করার জন্য পথও রহিয়াছে।

গুহা-মন্দির

চরণাদ্রির গাত্রে দুইটি গুহা খোদিত আছে; তাহা মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। একটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বুরুজের নীচে অবস্থিত। উহা পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হওয়ায়, হনুমান-প্রসাদ নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সংস্কার করাইয়া দেন। গুহামধ্যে পর্ব্বত-গাত্রে হরগৌরী, গণেশ, ভৈরব, সিংহবাহিনী মূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গও খোদিত আছে। এই সকল মূর্ত্তির পূজাও হইয়া থাকে। গুহা লৌহের রেলিং দ্বারা বেষ্টিত। সেখানে যাওয়ারও বেশ পথ আছে। দ্বিতীয় গুহাটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তাহাতে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। ইহাও মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। ইহার মূর্ত্তিগুলি ভর্তৃহরি-চত্বরে লইয়া যাওয়া হয়।

দুর্গের সমাধিক্ষেত্র

দুর্গের নিম্নে দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে একটি য়ুরোপীয় সমাধিক্ষেত্র আছে। দুর্গে ব্রিটিশ সৈন্যগণের বাসকালে মৃতব্যক্তিদিগকে এইখানে সমাহিত করা হইত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সমাধিটির তারিখ ২১শে অক্টোবর ১৭৮২ খৃঃ অব্দ। ইহা জনৈক সৈনিক-কর্ম্মচারীর সমাধি।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান

টিকুর দরগা

চুনার দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার নাম টিকুর বা 'টুক-আউর'। এই গ্রামে সাধারণতঃ গরীব গৃহস্থের বাস। তবে দুই-একটি পাকা বাঙ্গলাও দেখা যায়, এবং তাহা ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে। দুই-একটি মন্দির এবং মসজীদও আছে। যে পাথরের কাজের জন্য চুনার সুপ্রসিদ্ধ, টিকুরে তাহা অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হয়। এইখান হইতে পাথরের দ্রব্যসকল নৌকাযোগে কাশী প্রভৃতি স্থানে গিয়া থাকে। টিকুরে দুই-একটি বাঁধা ঘাটও আছে।

টিকুরের সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য—সা-কাশীম সোলেমানের দরগা। সা-কাশীম জাতিতে পাঠান ছিলেন। ১৫৪৯ খৃঃ অব্দে পেশোয়ারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া ২৭ বৎসর বয়সে ফকীরি অবলম্বন করেন। পরে তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে মক্কা, মদিনা প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হন। সেথান হইতে প্রত্যাগত হইয়া, নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অনেক চেলা জুটিয়া যায়। হিন্দুস্থানের মস্‌নদের প্রতিও না কি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিছু দিন পর্য্যন্ত লাহোর তাঁহার প্রধান আড্ডা হইয়া উঠে। আকবর তাঁহার কার্য্যকলাপের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য রাখেন নাই। জাহাঙ্গীর কিন্তু তাঁহাকে কু-অভিসন্ধিপূর্ণ মনে করিয়া এ জগৎ হইতে অপসারিত করিতে অভিলাষী হন। পরে কয়েকজন সাধু লোকের পরামর্শে কাশীমের নিকট দুইটি পাত্র পাঠাইয়া দেন। একটি পাত্রে ঢাল ও তরবারি এবং আর একটি পাত্রে বেড়ী ও শিকল ছিল। কাশীম বেড়ী-শিকলই গ্রহণ করেন। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে বকি খাঁ তাঁহাকে চুনারে লইয়া আসেন। কাশীম খাঁ আজিমের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। প্রবেশ-দ্বারের উপরিস্থ মস্‌জীদে তাঁহার উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন হইত। উক্ত মসজীদ অনেক দিন হইল ভূমিসাৎ হইয়াছে। এইরূপ কথিত আছে যে, নমাজের সময় কাশীমের শিকলাদি খুলিয়া যাইত। জাহাঙ্গীর তাহা দেখিতে চাহিলে, কাশীম তাহাতে অসম্মত হন। সেই অবধি তৈমুরবংশীয়েরা আর তাঁহার দরগায় আসেন নাই।

১৬০৭ খৃঃ অব্দে কাশীম দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নিজ সমাধির স্থাননির্ণয়ের জন্য দুর্গ হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তীর নিকটে পড়িলে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'টুক-আউরা' অর্থাৎ 'আরও একটু' বলিলে একটি তীর কিছু দূরে গিয়া পড়ে, এবং সেইখানে তাঁহার সমাধি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়। ক্রমে উহা 'টুক আউরা' বা টিকুর নামে অভিহিত হইয়া উঠে। কাশীমের সমাধির জন্য জাহাঙ্গীর ৩০ বিঘা জমি দিয়াছিলেন। শাজাহান ও ফরখ্‌শিয়ার আরও ভূমি দান করেন। ফরখ্‌শিয়ার ১১খানি মৌজা দেন, তাহার বার্ষিক আয় প্রায় ৫০০০৲ টাকা। তাহাতে অতিথি-অভ্যাগতের সেবা হইয়া থাকে। এথানে অতিথিরা তিন দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে পারেন।

একটি বিশাল দরজা পার হইয়া দরগা মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। উক্ত দরজার মধ্য দিয়া চুনার-মির্জাপুরের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ইহার নাম লথাড়ি দরজা। ইহাতে দুইটি হস্তীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দরগা-ভবনে সা-কাশীমের সমাধি অবস্থিতি করিতেছে। তাহা প্রস্তরের জালির দ্বারা বেষ্টিত। বিরাট্ গম্বুজতলে সা-কাশীম সমাহিত। সমাধি-তল গালিচায় আবৃত। চত্বরে তাঁহার অনেকগুলি শিষ্যের সমাধি আছে। কাশীমের সমাধির পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র মহম্মদ্ ওয়াশিন্ ও পৌত্রদ্বয় মহম্মদ্ আফ্‌জল ও মহম্মদ হাকিমের সমাধি দৃষ্ট হয়। একই গম্বুজের তলে তাঁহারা সমাহিত। মধ্যস্থলে ওয়াশিনের এবং দুই পার্শ্বে তাঁহার দুই পুত্রের সমাধি।

এই সমাধিগুলি ব্যতীত রঙ্গমহাল, ফোয়ারা, শাওয়ল ভাদুন ও মস্‌জীদ্ প্রভৃতিও দরগার দ্রষ্টব্য বিষয়। রঙ্গমহালের গাত্রে কয়েকটি ফার্‌সী কবিতা লিখিত আছে। কাশীমের সমাধি তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ১০১৬ হিজরী বা ১৬০৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। সমাধির প্রবেশদ্বারে নির্ম্মাণের তারিখ খোদিত আছে। অন্যান্য গৃহ তাঁহার পুত্র মহম্মদ্ ওয়াশিন্ ১০২৮ হিজরী বা ১৬১৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করেন, রঙ্গমহালের পাদদেশে তাহা খোদিত দেখা যায়।

এই বিশাল দরগা দেখিয়া বিশপ হিবার ইহাকে "very solemn and very striking" বলিয়াছিলেন, সা-কাশীমের সমাধি-ভবন বাস্তবিকই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও মনোরম। গঙ্গাতীরে অবস্থানের জন্য ইহার রমণীয়তা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কথিত আছে যে, ইহা দেখিয়া না কি তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছিল। চৈত্রমাসের বৃহস্পতিবারে এখানে মেলা বসিয়া থাকে।

কদম রসুল

টিকুরে একটি বৃহৎ মসজীদ আছে। উহা সেথ ইমাম-বকস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তাহার একটি প্রকোষ্ঠে মহম্মদের পদচিহ্ন আছে বলিয়া, মসজীদটি সাধারণতঃ কদম রসুল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে, বাদশাহ ফরখ্‌শিয়ারের সময় হাজী মরুফ নামে এক ব্যক্তি মক্কা হইতে দুইখানি চরণচিহ্ন আনিয়াছিলেন। তাহার একখানি দিল্লীতে ও অপরখানি চুনার দুর্গে স্থাপন করা হয়।

ইংরেজ সৈন্যাবাসের সময় উহা দুর্গ হইতে এই মসজীদে আনীত ও স্থাপিত হইয়াছিল। মসজীদটি ১৭৭১ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। এই কদম রসুলকে হিন্দুরা ভগবানের দক্ষিণ চরণের চিহ্ন বলিয়া থাকে। তাঁহার দক্ষিণ চরণ চুনার দুর্গে ও বাম চরণ গয়ায় পতিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চুনারে ভগবানের দক্ষিণ চরণ পতিত হওয়ার বিষয় কোন্ পুরাণে আছে, তাহা আমরা অবগত নহি।

এই সকল স্থান ব্যতীত জুম্মা-মসজীদ, জাহাঙ্গীরের নাজিম ইকতপ খাঁর কন্যা সরফ্‌উন্নেসা বেগমের মসজীদ, ইকতপ খাঁর দরগা, রইস সৈয়দ বাহাদুর আলির সমাধি প্রভৃতিও দর্শনীয়।

দুর্গা-খো

চুনার ষ্টেসন হইতে অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। উহা কয়েকটি শৃঙ্গে ভূষিত। দুইটি শৃঙ্গের মধ্য দিয়া একটি পার্ব্বত্য পথ আছে। পথের দুই পার্শ্বে ও সমস্ত পর্ব্বত-গাত্রে শেফালিকাদি বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। এই পথ দিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গতলে একটি মন্দিরে যাওয়া যায়। উক্ত মন্দিরে দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটি পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত। মন্দিরমধ্যে সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দেবীর নামানুসারে স্থানটির নাম দুর্গা-খো বা দুর্গাকুণ্ড হইয়াছে। প্রবাদ, এখানে দেবী দুর্গাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, দুর্গাদেবী বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিয়া দুর্গাসুরকে নিহত করেন। এই পর্ব্বতটি বিন্ধ্যাচলের শাখা বলিয়া, এখানকার লোকে এইখানেই দুর্গাসুরের বধের কথা বলে ও সুরথ-রাজা কর্ত্তৃক এইখানেই দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু দেবী এখানে, কি বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্য-বাসিনী হইয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। বিন্ধ্যাচলেও তাঁহার অসুর-বধের কথা আছে। কিন্তু তাহাদের নাম শুম্ভ-নিশুম্ভ। পুরাণের অনেক রহস্য ভেদ করা যায় না। সে যাহা হউক, এ স্থানটি এতদঞ্চলের মধ্যে যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দেবীমূর্ত্তি পর্ব্বতের একটি ফাট হইতে নির্গত হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। লোকে সে স্থানটিও নির্দ্দেশ করে। পর্ব্বতগাত্রে একটি নির্ঝর ঝর্‌ঝর রবে বহিয়া যাইতেছে। জলরক্ষার জন্য তথায় একটি চৌবাচ্ছাও নির্ম্মিত হইয়াছে; যাত্রীদিগের জন্য গৃহাদিও আছে। এখানে চৈত্র ও শ্রাবণ মাসে মেলা হয়। কমলপুরী নামে একজন সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন, পর্ব্বতগাত্রে তাঁহার সমাধিও রহিয়াছে।

গঙ্গেশ্বরনাথ ও চক্রাদেবী

গঙ্গাতীরের নিকট গঙ্গেশ্বরনাথ নামে মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। তিনি এক মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে নিহিত ছিলেন। গঙ্গার জলরাশি উক্ত স্তূপ ধৌত করিয়া দিলে, শিবলিঙ্গ লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। কোন একব্যক্তি তাহা উত্তোলন করিয়া নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন; কিন্তু অনেকদূর খনন করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায় ক্ষান্ত হন; পরে সেই-খানেই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আরঙ্গজেব মুদ্গর-প্রহারে উক্ত শিবলিঙ্গ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই বলিয়া কথিত হয়। লোকে আঘাতের চিহ্নও দেখাইয়া থাকে। গঙ্গেশ্বরনাথের সঙ্গে একটি গোলাকার প্রস্তরও বাহির হয়। তাহা চক্রাদেবী নামে প্রসিদ্ধ। গঙ্গেশ্বরনাথের মন্দিরের নিকট চক্রাদেবীরও মন্দির আছে।

ভর্ত্তৃনাথ, ভৈরব প্রভৃতি

ভর্ত্তৃহরির মূর্ত্তি পূর্ব্বে দুর্গমধ্যে তাঁহার সমাধির নিকটেই ছিল। পরে তথা হইতে আনিয়া বেনবীর নামে মহল্লায় স্থাপন করা হইয়াছে। এই মূর্ত্তির নিত্য-পূজা হইয়া থাকে। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে, ভৈরববুরুজে ভৈরবের মূর্ত্তি ছিল; তাহা তথা হইতে আনিয়া প্রথমে দুর্গের নীচে নিম্ববৃক্ষের তলে রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা ভর্ত্তৃহরির মূর্ত্তির সঙ্গেই আছে। এতদ্ভিন্ন, এখানকার হনুমানজীর ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য কূপ

চুনার দুর্গ হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি রমণীয় স্থান আছে। উহা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ তীর্থ। তথায় একটি কূপ আছে, তাহা আচার্য্য-কূপ নামে অভিহিত হয়। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য লক্ষ্মণভঙ্গ নামে তেলিগু ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারাণসীর কোন ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত বিবাহ-পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। পূর্ণগর্ভা পত্নীকে লইয়া তিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত

হন। চুনারে আসিয়া তাঁহার পত্নী এক পুত্র প্রসব করেন। পুত্রটিকে লইয়া যাওয়ার অসুবিধা বিবেচনা করায়, তাঁহারা তাঁহাকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিতে পান যে, একটি পুরুষ বালকটিকে কোলে লইয়া কূপের নিকট বসিয়া আছে। সে আচার্য্য-পত্নীকে কহিল যে, তোমার পুত্রটিকে তুমি কূপে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিলে; এই তাহাকে লও। বল্লভের গৃহে ভগবানের জন্ম লওয়ার কথা ছিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, স্বয়ং ভগবানই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্য পুত্রের বিঠ্ঠলনাথ নাম দেন। সেই কূপটি বাঁধাইয়া তাহার নিকটে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরে বিঠ্ঠলনাথ বা বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বল্লভাচার্য্যের গদী আছে। এখানে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে, তাহাদের থাকিবারও ব্যবস্থা আছে। দুইটি পুষ্করিণী বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রস্ফুটিত পদ্মে তাহাদের শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। আচার্য্য-কূপকে আবার আশ্চর্য্য-কূপও বলিয়া থাকে। বিঠ্ঠলনাথ-সংক্রান্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটার জন্য উহা উক্ত নামেও অভিহিত হয়। বিঠ্ঠলনাথের অবতারত্ব সম্বন্ধে বল্লভাচারী সম্প্রদায় এইরূপ কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

কৃষ্ণো বুদ্ধো বিঠ্ঠলেশঃ কল্কির্ম্লেচ্ছনিকৃন্তনে।
পূর্ণো কৃষ্ণো বুধশ্চাংশঃ পরমানন্দো বিঠ্ঠলঃ॥"

অগ্নিপুরাণে ভবিষ্যোত্তর খণ্ডে—

"অগ্নিরূপো দ্বিজাচার্য্যো ভবিষ্যামীহ ভূতলে।
বল্লভস্যাগ্নিরূপস্য বিঠ্ঠলঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

কিঞ্চগোরীতন্ত্রে মহাদেবোক্তিঃ অগ্নিসংহিতায়াং অধ্যায় ১৪।

পৌষকৃষ্ণ নবম্যাঞ্চ বিঠ্ঠলেশেতি সংজ্ঞকঃ।
দ্বিজালয়ে মহাদেবি! কাশ্যাং সন্নিহিতো হরিঃ॥
গুপ্তবৃন্দাবনং যত্র নানা পক্ষিসমাকুলং।
গিরিরাজ কনিষ্ঠস্য চরণাদ্রেশ্চ গহ্বরে॥
ভবিষ্যতি ফলের্মধ্যে প্রথমে নন্দনন্দনঃ।
ধনুর্মাসস্য কৃষ্ণস্য নবম্যাং মুনিসত্তম॥
গোপাবতারঃ কৃষ্ণস্য দ্বিজরূপেণ ভূতলে।
ভবিষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞো দৈবাহুদ্ধরণায় চ॥
বল্লভস্য গৃহে নূনং গিরিরাজধরো হরিঃ॥

সতী-বাঢ়

পূর্ব্বে যেখানে সতীদাহ হইত, তাহা এক্ষণে সতী-বাঢ় নামে প্রসিদ্ধ। এখানে কতকগুলি সতীর মন্দির আছে। তন্মধ্যে ভজন তেওয়ারীর পত্নী তলাশী দেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পুত্র গুরুপ্রসাদ মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। গুরুপ্রসাদের পুত্র ভানুপ্রসাদ চুনারের এক ক্ষুদ্র ইতিহাস লেখেন। বৃহৎ মন্দিরের উপর বটবৃক্ষ জন্মিয়া তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

ইংরেজটোলা

চুনারের ইংরেজটোলা একটি সুদৃশ্য স্থান। এখানে অনেক ইংরেজ পেন্সন লইয়া বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করেন। যাঁহারা বেশী পেন্সন পান, তাঁহাদের বাটীগুলি নাতিবৃহৎ। বাটীগুলি সুপরিষ্কৃতভাবে অবস্থিত। এই সকল পেন্সনভোগী ইংরেজের মধ্যে অনেকে কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকেন। ইংরেজটোলাটি দেখিলে একটি ক্ষুদ্র বিলাতী পল্লী বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজ-টোলার নিকটে চুনার তহশীলের কাছারী। কাছারী-বাটীটি বেশ সুন্দর। তাহার নিকটে হাসপাতাল, তাহাতে সাহেব-দিগের থাকিবার জন্য একটি সুন্দর ভবন আছে। ইংরেজ-টোলায় দুইটি গির্জা ও দুইটি সমাধিভবন দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন, চুনারে আরও দুই-একটি সমাধিভবন আছে। ইংরেজটোলার বড় সমাধি-ভবনে ১০১ বৎসর বয়স্ক কোন লোকের সমাধি রহিয়াছে। চুনারে খৃষ্টান মিসনারিগণ অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের একটি Anglo-Vernacular School আছে। তদ্ভিন্ন, চুনারে গবর্ণমেণ্টের একটি Middle English Schoolও রহিয়াছে। ইংরেজটোলায় গঙ্গার ধারে একটি অশ্বত্থবৃক্ষতলে একখানি প্রস্তরখণ্ড প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্কেতস্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে Lover's Tryst কথাটি খোদিত রহিয়াছে।

ফুলবাড়িয়া

আচার্য্য-কূপের নিকট ফুলবাড়িয়া নামে একটি স্থান আছে। এখানে সোনাদেবী এক উদ্যানের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তথা হইতে দুর্গাপূজার জন্য ফুল যাইত। উদল এখানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ফুলবাড়িয়াতে মহম্মদ সাহ নামে এক ফকীর বাস করিতেন।

ইহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ঢালুতে, একটি ক্ষুদ্র মসজীদের গাত্রে কয়লা দিয়া এইরূপ লিখিত ছিল :—

"This is the place of confinement of Anee Wood, wife to Lieutenant John Wood, taken prisoner by Jaffer Beg, Commandant to Sir Roger Dowler, taken out of the house at Calcutta, where so many unhappy gentleman suffered; the Said Jaffer Beg obtained promotion of Segour Dowler for his long service Fauzdar of Chunar Gur." I, Alexander Campbell was taken along with the unfortunate lady, at eleven years old, by the same persons who afterwards made me an eunuch, my only employment was to attend this lady, which I did in this place four years 1762 May 3rd, the said Jaffer Beg sent to acquaint the lady that if she did not consent to live with him the 4th. of the said month, she should be strangled, and by my hands. The 3rd, at midnight, we jumped out of this window and got to the river side, where I hired boat for fifty gold rupees, to carry us safe to Chinsurah, where we arrived on the 11th. The first news we heard was that Lieutenant Wood died for grief. Soon as she heard this she fell sick and died the 27th. of the month."

"Mr. Drake behaved with the greatest imprudence, he did deserve to be shot! shot! shot! Alexander Campbell, I am now in Dowlah's service."

"N. B.—Mrs. Wood's apartment, and which is all the house consists of is 9 feet 5 inches by 8 feet 9 inches and 7 feet 9 inches high; the window 18 inches." (E. Bucklis Bengal Artillery, 1852, p. 73.)

হলওয়েল ইহাদের কথার উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এই জাফর বেগ কে? সিরাজউদ্দৌলার Commandant বা সেনাপতি হওয়ায় তাঁহাকে মীরজাফর বলিয়া বোধ হয়, এবং কলিকাতা আক্রমণের সময় মীরজাফরের অধীন কর্ম্মচারী মির্জা আমীর বেগের হস্তে কতকগুলি বিবি পড়িয়াছিলেন; এবং মীরজাফরের আদেশে তিনি তাঁহাদিগকে যে নৌকা করিয়া ড্রেক সাহেবের জাহাজে পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন, ইহা মুতাক্ষরীণ হইতে জানা যায়। মুতাক্ষরীণে এইরূপ লিখিত আছে :—

"To all appearance it is in this affair that some Bibies amongst the women of the English fell in the hands of Mirza Amir Beg. This was a gentleman attached to Mir-djafer-qhan, one of the Generals of the army. The Mirza, with all the abstinence and reserve that became a man of education and honour, kept them decently and untouched, but in secret, and at night he informed his master of the whole matter, who gave him a Bhovaliat or swift boat, in which he put the Bibies and let his boat drive, as if by accident, with the stream. Being soon got past the army guards, He rowed with vigour, and in a little time he arrived at twelve cosses below, where Mr. Drake's ship lay at anchor. There he delivered the Bibies, and these ladies having rendered an honourable testimony to Emir-beg's modest behaviour, made such an impression on their husbands, that the latter, although nearly destitute themselves, collected some jewels, to make him a handsome present, in acknowledgment of his generous conduct,

but it was refused by the Mirza, who said to one of them, Gentleman, what I have done, was not for the sake of a present, for as you are a chief man in your nation, and a man of distinction and sentiments, so, I am a gentleman in my own nation, and a man of honour and humanity. I have done nothing but what was required by a sense of honour, and what might entitle me to your remembrance. After saying this, he got into his boat and rowing all night he rejoined his master before day-break."

আলেকজাণ্ডার কাম্বেলের লিখিত জাফর বেগের চরিত্র হইতে মির্জ্জা আমীর বেগ ও তাহার প্রভু মীর জাফর খাঁর চরিত্র পৃথক্ বলিয়াই বোধ হইতেছে। কাম্বেল জাফর বেগকে চুনার দুর্গের ফৌজদার বলিয়াছেন; আবার এরূপ কোন লোক সিরাজদ্দৌলার Commandant বা সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ফলতঃ, জাফর বেগ সম্বন্ধে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।

দেবদাস

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(সেপ্টেম্বর—১৯০০)

দশম পরিচ্ছেদ

পার্ব্বতী আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মস্ত বাড়ী। নূতন সাহেবী ফ্যাসানের নহে, পুরাতন সেকেলে ধরণের। সদর-মহল, অন্দর-মহল, পূজার দালান, নাট-মন্দির, অতিথিশালা, কাছারিবাড়ী, তোষাখানা, কত দাসদাসী,—পার্ব্বতী অবাক্ হইয়া গেল। সে শুনিয়াছিল, তাহার স্বামী বড়লোক, জমীদার।—কিন্তু এতটা ভাবে নাই। অভাব শুধু লোকের। আত্মীয়, কুটুম্ব, কুটুম্বিনী কেহই প্রায় নাই। অতবড় অন্দরমহল জনশূন্য। পার্ব্বতী বিয়ের কনে'—একেবারে গৃহিণী হইয়া বসিল। বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য একজন বৃদ্ধা পিসি ছিলেন। ইনি ভিন্ন কেবল দাসদাসীর দল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একজন সুশ্রী, সুন্দর বিংশবর্ষীয় যুবা-পুরুষ প্রণাম করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, আমি তোমার বড় ছেলে।" পার্ব্বতী অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া ঈষৎ চাহিয়া দেখিল, কথা কহিল না। সে আর একবার প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি তোমার বড় ছেলে—প্রণাম করি।" পার্ব্বতী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন কপালের উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া এবার কথা কহিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল—"এস, বাবা, এস।" ছেলেটির নাম মহেন্দ্র। সে কিছুক্ষণ পার্ব্বতীর মুখ পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল; তৎপরে অদূরে বসিয়া পড়িয়া বিনীত স্বরে বলিতে লাগিল, "আজ দু'বছর হ'ল, আমরা মা হারিয়েছি। এই দু'বৎসর আমাদের দুঃখে-কষ্টেই দিন কেটেচে। আজ তুমি এলে,—আশীর্ব্বাদ কর মা, এবার যেন সুখে থাক্‌তে পাই।" পার্ব্বতী বেশ সহজ গলায় কথা কহিল। কেন না, একেবারে গৃহিণী হইতে হইলে, অনেক কথা জানিবার এবং বলিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু, এ কাহিনী অনেকের কাছেই হয় ত একটু অস্বাভাবিক শুনাইবে। তবে যিনি পার্ব্বতীকে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, অবস্থার এই নানারূপ পরিবর্ত্তনে, পার্ব্বতীকে তাহার বয়সের অপেক্ষা অনেকখানি পরিপক্ক করিয়া দিয়াছিল। তা ছাড়া, নিরর্থক লজ্জা-সরম, অহেতুক জড়তা-সঙ্কোচ তাহার কোন দিনই ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার আর সব ছেলে-মেয়েরা কোথায় বাবা?" মহেন্দ্র

একটু হাসিয়া কহিল, "বল্‌চি। তোমার বড় মেয়ে, আমার ছোট বোন তার শ্বশুরবাড়ীতেই আছে। আমি চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু যশোদা কিছুতেই আস্‌তে পার্‌লে না।" পার্ব্বতী দুঃখিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "আস্‌তে পার্‌লে না, না, ইচ্ছে করে এলো না?" মহেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, "ঠিক জানিনে মা।" কিন্তু তাহার কথায় ও মুখের ভাবে পার্ব্বতী বুঝিল, যশোদা রাগ করিয়াই আইসে নাই; কহিল, "আর আমার ছোট ছেলে?" মহেন্দ্র কহিল, "সে শীগ্‌গীর আস্‌বে। কল্‌কাতায় আছে, পরীক্ষা দিয়েই আস্‌বে।"

ভুবন চৌধুরী নিজেই জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন। তা' ছাড়া, স্বহস্তে নিত্য শালগ্রাম শিলার পূজা করা, ব্রত-নিয়ম-উপবাস, ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালায় সাধু, সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা—এই সব কাজে তাঁহার সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। নূতন বিবাহ করিয়া কোন প্রকার নূতন আমোদ আহ্লাদ তাঁহাতে প্রকাশ পাইল না। রাত্রে কোন দিন ভিতরে আসিতেন, কোন দিন বা আসিতে পারিতেন না। আসিলেও অতি সামান্যই কথাবার্ত্তা হইত,—শয্যায় শুইয়া, পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া, চোখ বুজিয়া বড় জোর বলিতেন, "তা' তুমিই হলে বাড়ীর গৃহিণী; সব দেখে-শুনে, বুঝে-পড়ে' নিজেই নিয়ো—" পার্ব্বতী মাথা নাড়িয়া বলিত, "আচ্ছা।" ভুবনবাবু বলিতেন, "আর দেখ, তা' এই ছেলে-মেয়েরা,—হাঁ, তা' এরা তোমারই ত সব—" স্বামীর লজ্জা দেখিয়া পার্ব্বতীর চোখের কোণে হাসি ফুটিয়া বাহির হইত। তিনি আবার একটু হাসিয়া কহিতেন, "হাঁ, আর এই দেখ, —এই মহেন তোমার বড় ছেলে,—সেদিন বি-এ পাশ করেচে,—এমন ভাল ছেলে,—এমন দয়া-মায়া—কি জান, —একটু যত্ন-আত্মীয়তা—" পার্ব্বতী হাসি চাপিয়া বলিত, "আমি জানি, সে আমার বড় ছেলে—" "তা জান্‌বে বৈ কি! এমন ছেলে কেউ কখন দেখেনি—। আর আমার যশোমতী; মেয়ে ত' নয়—প্রতিমা। তা' আস্‌বে বৈ কি! আস্‌বে বৈ কি! বুড়ো বাপ্‌কে দেখ্‌তে আস্‌বে না? তা' সে এলে তাকে—" পার্ব্বতী নিকটে আসিয়া টাকের উপর মৃণাল হস্ত রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিত, "তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। যশোকে আন্‌বার জন্য আমি লোক পাঠাব,—না হয়, মহেন নিজেই যাবে।" "যাবে? যাবে? আহা, অনেক দিন দেখিনি—তুমিই লোক পাঠাবে?" "পাঠাব বৈ কি! আমার মেয়ে, আমি আন্‌তে পাঠাব না?—" বৃদ্ধ এই সময়ে উৎসাহে উঠিয়া বসিতেন। উভয়ের সম্বন্ধ ভুলিয়া পার্ব্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতেন—"তোমার ভাল হবে। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌চি—তুমি সুখী হবে—ভগবান তোমাকে দীর্ঘায়ু করবেন।" তাহার পরে হঠাৎ কি সব কথা বৃদ্ধের যেন মনে পড়িয়া যাইত। পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া মনে-মনে বলিতেন, "বড় মেয়ে, ঐ এক মেয়ে,—সে বড় ভালবাস্‌ত—" এই সময় কাঁচা-পাকা গোঁফের পাশ দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িত। পার্ব্বতী মুছাইয়া দিত। কখনো-কখনো বা চুপি-চুপি বলিতেন, "আহা, তারা সবাই আস্‌বে, আর একবার বাড়ী, ঘর, দোর জম্‌-জম্‌ কর্‌বে—আহা, আগে কি জমকাল সংসারই ছিল। ছেলেরা, মেয়ে, গিন্নি,—হৈ চৈ—নিত্য দুর্গোৎসব। তার পর একদিন সব নিবে গেল। ছেলেরা কলিকাতায় চলে গেল, যশোকে তার শ্বশুর নিয়ে গেল,—তার পর অন্ধকার শ্মশান—" এই সময় আবার গোঁফের দু'পাশ ভিজিয়া, বালিশ ভিজিতে সুরু করিত। পার্ব্বতী কাতর হইয়া, মুছাইয়া দিয়া কহিত,—"মহেনের কেন বিয়ে দিলে না?" বুড়া বলিতেন "আহা, সে ত আমার সুখের দিন। তাই ত ভেবেছিলাম,—কিন্তু কি যে ওর মনের কথা, কি যে ওর জিদ্‌—কিছুতেই বিয়ে করলে না। তাই ত বুড়ো বয়সে—বাড়ী ঘর খাঁ-খাঁ করে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়ীর মত সমস্তই মলিন, একটা জৌলস্‌ কিছুতেই দেখ্‌তে পাইনে—তাইতেই—" কথা শুনিয়া পার্ব্বতীর বড় দুঃখ হইত। করুণ স্বরে, হাসির ভাণ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিত, "তুমি বুড়ো হলে, আমিও শীগ্‌গির বুড়ো হয়ে যাব। মেয়ে-মানুষের বুড়ো হতে কি বেশী দেরী হয় গা?" ভুবন চৌধুরী উঠিয়া বসিয়া, একহাতে তাহার চিবুক ধরিয়া নিঃশব্দে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন। কারিকর যেমন করিয়া প্রতিমা সাজাইয়া, মাথায় মুকুট পরাইয়া দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে থাকে,—একটু গর্ব্ব, আর অনেকখানি স্নেহ সেই সুন্দর মুখখানির আশে পাশে জমা হইয়া উঠে, ভুবনবাবুর ও ঠিক তেমনি হয়। কোন দিন বা তাঁহার অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে,—"আহা,—ভাল

করিনি—" "কি ভাল করনি গো?" "ভাব্‌ছি—এখানে তোমাকে সাজে না—" পার্ব্বতী হাসিয়া উঠিয়া বলিত, "খুব সাজে। আমাদের আবার সাজাসাজি কি?" বৃদ্ধ আবার শুইয়া পড়িয়া যেন মনে মনে বলিতেন,—"তা' বুঝি—তা' বুঝি। তবে, তোমার ভাল হ'বে। ভগবান তোমাকে দেখবেন।"

এমনি করিয়া প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল। মধ্যে একবার চক্রবর্ত্তী মহাশয় কন্যাকে লইতে আসিয়াছিলেন,—পার্ব্বতী নিজেই ইচ্ছা করিয়া গেল না। পিতাকে কহিল, "বাবা, বড় অগোছাল সংসার, আর কিছুদিন পরে যা'ব।" তিনি অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া হাসিলেন! মনে-মনে বলিলেন, "মেয়েমানুষ এমনি জাতই বটে!" তিনি বিদায় হইলে, পার্ব্বতী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, "বাবা, আমার বড় মেয়েকে একবার নিয়ে এস।" মহেন্দ্র ইতস্ততঃ করিল। সে জানিত, যশোদা কিছুতেই আসিবে না। কহিল, "বাবা একবার গেলে ভাল হয়।" "ছিঃ! তা' কি ভাল দেখায়? তা'র চেয়ে চল আমরা মা-ব্যাটায় মেয়েকে নিয়ে আসি।" মহেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল,—"তুমি যাবে?" "ক্ষতি কি বাবা? আমার তা'তে লজ্জা নাই; আমি গেলে যশোদা যদি আসে,—যদি তা'র রাগ পড়ে, আমার যাওয়াটা কি এতই কঠিন!" কাজেই মহেন্দ্র পর দিন একাকী যশোদাকে আনিতে গেল। সেখানে সে কি কৌশল করিয়াছিল জানি না, কিন্তু চারিদিন পরে যশোদা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন পার্ব্বতীর সর্ব্বাঙ্গে বিচিত্র নূতন বহুমূল্য অলঙ্কার। এই সে দিন ভুবনবাবু কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিয়াছিলেন—পার্ব্বতী আজ তাহাই পরিয়া বসিয়া ছিল। পথে আসিতে-আসিতে যশোদা, ক্রোধ অভিমানের অনেক কথা মনে-মনে আবৃত্তি করিতে-করিতে আসিয়াছিল। নূতন বৌ দেখিয়া সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। সে সব বিদ্বেষের কথা তাহার মনেই পড়িল না। শুধু অস্ফুটে কহিল—"এই!" পার্ব্বতী যশোদার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। কাছে বসাইয়া, হাতে পাখা লইয়া কহিল, "মা, মেয়ের উপর না কি রাগ করেচ?" যশোদার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল। পার্ব্বতী তখন সে সমস্ত অলঙ্কার একটির পর একটি করিয়া যশোদার সর্ব্বাঙ্গে পরাইতে লাগিল। বিস্মিতা যশোদা কহিল "এ কি?" "কিছুই না। শুধু তোমার মেয়ের সাধ।" গহনা পরিতে যশোদার মন্দ লাগিল না;—এবং পরা শেষ হইলে তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির আভাস দেখা দিল। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া নিরাভরণা পার্ব্বতী কহিল,—"মা, মেয়ের উপর রাগ করেচ।" "না, না—রাগ কেন? রাগ কি?—" "তা' বৈ কি মা, এ তোমার বাপের বাড়ী;—এতবড় বাড়ী, কত দাসদাসীর দরকার। আমি একজন দাসী বৈ ত নয়! ছিঃ মা, তুচ্ছ দাসদাসীর ওপর কি তোমার রাগ করা সাজে?" যশোদা বয়সে বড়, কিন্তু কথা কহিতে এখনো অনেক ছোট। সে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। বাতাস করিতে-করিতে পার্ব্বতী আবার কহিল,—"দুঃখীর মেয়ে, তোমাদের দয়ায় এখানে একটু স্থান পাইয়াছি;—কত দীন, দুঃখী, অনাথ তোমাদের দয়ায় এখানে নিত্য প্রতিপালিত হয়;—আমি ত মা, তা'দেরই একজন। যে আশ্রিত—" যশোদা অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল; এখন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল—"তোমার পায়ে পড়ি মা—" পার্ব্বতী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। যশোদা কহিল—"দোষ নিও না মা।" পর দিন মহেন্দ্র যশোদাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল—"কি রে, রাগ থেমেচে?" যশোদা তাড়াতাড়ি দাদার পায়ে হাত দিয়া কহিল—"দাদা, রাগের মাতায়—ছি, ছি,—কত কি বলেচি। দেখো, যেন সে'সব প্রকাশ না পায়।" মহেন্দ্র হাসিতে লাগিল। যশোদা কহিল,—"আচ্ছা দাদা, সৎমায়ে এত যত্ন-আদর করতে পারে?" দিনদুই পরে যশোদা পিতার নিকট নিজে কহিল—"বাবা—ওখানে চিঠি লিখে দাও—আমি এখন দু'মাস এখান থেকে যাব না।" ভুবনবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কেন মা?" যশোদা লজ্জিতভাবে মৃদু হাসিয়া কহিল—"আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই—এখন দিন-কতক ছোটমা'র কাছে থাকি!"

আনন্দে বৃদ্ধের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সন্ধ্যার সময় পার্ব্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন—"তুমি আমাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েচ। বেঁচে থাক—সুখে থাক।" পার্ব্বতী কহিল—"সে আবার কি?" "কি, তা' তোমাকে বোঝাতে পারিনে। নারায়ণ! কত লজ্জা, কত আত্মগ্লানি থেকে আজ আমাকে নিষ্কৃতি দিলে।" সন্ধ্যার আঁধারে পার্ব্বতী

দেখিল না যে, তাহার স্বামীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। আর বিনোদলাল। সে ভুবনবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র। পরীক্ষা দিয়া সে বাড়ী আসিয়া, আর পড়িতেই গেল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পর দুইতিনদিন দেবদাস মিছামিছি পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। অনেকটা পাগলের মত। ধর্ম্মদাস কি কহিতে গিয়াছিল, তাহাকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া ধমকাইয়া উঠিল। গতিক দেখিয়া চুনিলালও কথা কহিতে সাহস করিল না। ধর্ম্মদাস কাঁদিয়া বলিল,—"চুনিবাবু, কেন এমন হ'ল?" চুনিলাল বলিল—"কি হয়েচে ধর্ম্মদাস?" একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভিতরের খবর দু'জনের কেহই জানে না। চোখ মুছিতে-মুছিতে ধর্ম্মদাস বলিল, "চুনিবাবু, যেমন করিয়া হোক দেবতাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। আর লেখাপড়া যদি করবে না, ত এখানে থেকে কি হবে?" কথাটা খুব সত্য। চুনিলাল চিন্তা করিতে লাগিল। চারি-পাঁচদিন পরে একদিন ঠিক তেমনি সন্ধ্যার সময় চুনিবাবু বাহির হইতেছিল—দেবদাস কোথা হইতে আসিয়া হাত ধরিল—"চুনিবাবু, সেখানে যাচ্ছ?" চুনিলাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে গেল—"হাঁ—না—বল ত আর যাইনে।" দেবদাস কহিল, "না, যেতে বারণ করচিনে; কিন্তু, একটি কথা বল,—কি আশায় সেখানে তুমি যাও?" "আশা আর কি? এমনি সময় কাটে।" "কাটে? কৈ, আমার সময় ত কাটে না। আমি সময় কাটাতে চাই।" চুনিলাল কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল—বোধ করি তাহার মনের ভাব মুখে পড়িতে চেষ্টা করিল। তাহার পর কহিল—"দেবদাস, তোমার কি হয়েছে, খুলে বল্‌তে পারো?" "কিছুই ত হয় নি।" "বল্‌বে না?" "না চুনি, বল্‌বার কিছু নেই।" চুনিলাল বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া কহিল,—"দেবদাস, একটা কথা রাখবে?" "কি?" "সেখানে আর একবার তোমাকে যেতে' হবে। আমি কথা দিয়েচি।" "যেখানে সেদিন গিয়াছিলাম—সেইখানে ত?" "হাঁ—" "ছিঃ—আমার ভাল লাগে না।" "যাতে ভাল লাগে, আমি করে দেব।" দেবদাস অন্যমনস্কের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, চল যাই।"

অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া দিয়া চুনিলাল কোথায় সরিয়া গিয়াছে। একা দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে নীচে বসিয়া মদ খাইতেছে। অদূরে বসিয়া চন্দ্রমুখী বিষন্ন-মুখে চাহিয়া-চাহিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল—"দেবদাস, আর খেয়োনা।" দেবদাস মদের গ্লাস নীচে রাখিয়া ভ্রূকুটী করিল,—"কেন?" "অল্পদিন মদ ধরেচ, অত সইতে পারবে না।" "সহ্য করব বলে মদ খাইনে। এখানে থাক্‌ব বলে শুধু মদ খাই।" এ কথা চন্দ্রমুখী অনেক-বার শুনিয়াছে। এক-একবার তাহার মনে হয়, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে রক্তগঙ্গা হইয়া মরে।—দেবদাসকে সে ভালবাসিয়াছে। দেবদাস মদের গ্লাস ছুড়িয়া ফেলিল। কৌচের পায়ায় লাগিয়া সেটা চূর্ণ হইয়া গেল। তখন আড় হইয়া বালিশে হেলান দিয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া কহিল—"আমার উঠে যাবার ক্ষমতা নেই, তাই এখানে বসে থাকি—জ্ঞান থাকে না, তাই তোমার মুখের পানে চেয়ে কথা কই—চন্দ—র—তবু অজ্ঞান হইনে—তবু একটু জ্ঞান থাকে—তোমাকে ছুঁতে পারিনে—আমার বড় ঘৃণা হয়।" চন্দ্রমুখী চক্ষু মুছিয়া ধীরে-ধীরে কহিতে লাগিল—"দেবদাস, কত লোক এখানে আসে, তা'রা কখন মদ স্পর্শও করে না।" দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিল—টলিয়া-টলিয়া ইতস্ততঃ হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"স্পর্শ করে না? আমার বন্দুক থাক্‌লে তাদের গুলি ক'র্‌তাম। তারা যে আমার চেয়েও পাপিষ্ঠ—চন্দ্রমুখী!" কিছুক্ষণ থামিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার পর আবার কহিল—"যদি কখন মদ ছাড়ি—যদিও ছাড়্‌ব না,—তাহ'লে আর কখন ত এখানে আস্‌ব না। আমার উপায় আছে; কিন্তু তাদের কি হবে?"—একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিল—"বড় দুঃখে মদ ধরেছি—আমাদের বিপদের, দুঃখের, বন্ধু! আর তোমাকে ছাড়তে পারিনে—" দেবদাস বালিশের উপর মুখ রগড়াইতে লাগিল। চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল। দেবদাস ভ্রূকুটী করিল—

"ছিঃ, ছুঁয়ো না—এখনো আমার জ্ঞান আছে। চন্দ্রমুখী, তুমি ত জান না—আমি শুধু জানি। আমি কত যে তোমাদের ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করব—তবু আস্‌ব, তবু বস্‌ব, তবু কথা কব—না হলে যে উপায় নেই। তা' কি তোমরা কেউ বুঝবে? হাঃ—হাঃ—লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে মাতাল হই—এমন উপযুক্ত স্থান জগতে কি আর আছে! আর তোমরা—" দেবদাস দৃষ্টি সংযত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আহা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব—স্ত্রীলোকে যে কত সইতে পারে—তোমরাই তার দৃষ্টান্ত!" তাহার পর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া, চুপি-চুপি কহিতে লাগিল—"চন্দ্রমুখী বলে, সে আমাকে ভালবাসে—আমি তা' চাইনে—চাইনে—চাইনে—লোকে থিয়েটার করে,—মুখে চূণকালি মাখে—চোর হয়—ভিক্ষা করে—রাজা হয়,—রাণী হয়,—ভালবাসে—কত ভালবাসার কথা বলে—কত কাঁদে—ঠিক যেন সব সত্য! চন্দ্রমুখী আমার থিয়েটার করে, আমি দেখি! কিন্তু তা'কে যে বড় মনে পড়ে—একদণ্ডে কি যেন সব হোয়ে গেল। কোথায় সে চলে গেল—আর কোন পথে আমি চলে গেলাম। এখন একটা সমস্ত জীবনব্যাপী মস্ত অভিনয় আরম্ভ হয়েচে। একটা ঘোর মাতাল—আর এই একটা—হোক্, তাই হোক—মন্দ কি! আশা নেই, ভরসা নেই—সুখও নেই, সাধও নেই—বাঃ! বহুত আচ্ছা—" তাহার পর দেবদাস পাশ ফিরিয়া বিড়-বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল—চন্দ্রমুখী তাহা বুঝিতে পারিল না। অল্পক্ষণেই দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী তখন কাছে আসিয়া বসিল। অঞ্চল ভিজাইয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, সিক্ত বালিশ বদলাইয়া দিল। একটা পাখা লইয়া, কিছুক্ষণ বাতাস করিয়া, বহুক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিল—রাত্রি তখন প্রায় একটা; দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুই ভাই দ্বিজদাস ও দেবদাস ও গ্রামের অনেকেই জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের সৎকার করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। দ্বিজদাস চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়াছে—পাড়ার পাঁচজন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আর দেবদাস শান্তভাবে একটা থামের পার্শ্বে বসিয়া আছে। মুখে শব্দ নাই, চোখে এক ফোঁটা জল নাই। কেহ তাহাকে ধরিতেছে না—কেহ সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস করিতেছে না। মধুসূদন ঘোষ নিকটে গিয়া একবার বলিতে গিয়াছিল,—"তা' বাবা কপালে—" দেবদাস হাত দিয়া দ্বিজদাসের দিকটা দেখাইয়া বলিল—"ওখানে।" ঘোষজা মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া—"হাঁ—তা উনি—কত বড় শোক" ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আর কেহ নিকটে আসিল না। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে দেবদাস অর্দ্ধমূর্চ্ছিত জননীর পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিল। সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। পার্ব্বতীর পিতামহীও উপস্থিত ছিলেন। ভাঙ্গাগলায় সদ্যবিধবা, শোকার্ত্ত জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বউমা, চেয়ে দেখ মা, দেবদাস এসেচে।" দেবদাস ডাকিল "মা!" তিনি একবারমাত্র চাহিয়া বলিলেন, "বাবা!" তাহার পর নিমীলিত চোখের কোণ হইতে অজস্র অশ্রু বহিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের দল কলস্বরে রৈ-রাই করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবদাস জননীর চরণে কিছুক্ষণ মুখ ঢাকিয়া রহিল; তাহার পর ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল। গেল, মৃত পিতার শয়নকক্ষে। চোখে জল নাই; গম্ভীর শান্তমূর্ত্তি। রক্তনেত্র উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। যে কেহ সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে বোধ করি ভীত হইত। কপালের দুই পার্শ্বে উভয় শিরা স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, বড়-বড় রুক্ষ কেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ কালীমাখা হইয়াছে—কলিকাতার জঘন্য অত্যাচারের পর এই দীর্ঘ রাত্রি-জাগরণ, তাহার পর পিতার মৃত্যু! এক বৎসর পূর্ব্বে যে কেহ তাহাকে দেখিয়াছিল—এখন বোধ হয় তাহাকে হঠাৎ সে চিনিতে পারিত না। কিছুক্ষণের পর পার্ব্বতীর জননী সন্ধান করিয়া দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন—"দেবদাস!" "কেন খুড়িমা!" "এমন করলে ত চল্‌বে না বাবা!" দেবদাস তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল—"কি করেচি খুড়িমা?" খুড়িমা তাহা বুঝিতেন,

কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না। দেবদাসের মাথাটা কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন—"দেবতা—বাবা!" "কেন খুড়িমা!" "দেবতা চরণ—বাবা—" বুকের কাছে মুখ রাখিয়া দেবদাস এইবার এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

শোকার্ত্ত পরিবারেরও দিন কাটে। ক্রমে প্রভাত হইল, কান্নাকাটী অনেক কমিয়া আসিল। দ্বিজদাস একেবারে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার জননীও উঠিয়া বসিয়াছেন,—চোখ মুছিতে-মুছিতে দিনের কাজ করিতেছেন। দুই দিন পরে দ্বিজদাস দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দেবদাস, পিতার শ্রাদ্ধকার্য্যে কত ব্যয় করা উচিত?" দেবদাস অগ্রজের মুখপানে চাহিয়া কহিল, "যেমন উচিত বিবেচনা করেন।" "না ভাই, এখন শুধু আমার বিবেচনায় চলবে না। তুমি বড় হয়েছ, তোমার মত জানা আবশ্যক।" দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, "কত নগদ টাকা আছে?" "বাবার তবিলে দেড় লাখ টাকা জমা আছে। আমার বিবেচনায় হাজার দশেক টাকা খরচ করলেই যথেষ্ট হবে—কি বল?" "আমি কত পাব?" দ্বিজদাস একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা' তুমিও অর্দ্ধেক পাবে। দশহাজার খরচ হলে, তোমার ৭০ হাজার ও আমার ৭০ হাজার থাকবে।" "মা কি পাবেন?" "মা নগদ টাকা কি করবেন? তিনি বাটীর গিন্নী—আমরা প্রতিপালন করব।" দেবদাস একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"আমার বিবেচনায়, আপনার ভাগের পাঁচহাজার টাকা খরচ হোক এবং আমার ভাগের পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হবে। বাকী ৫০ হাজারের মধ্যে আমি ২৫ হাজার নেব, বাকী ২৫ হাজার টাকা মায়ের নামে জমা থাকবে। আপনার কি বিবেচনা হয়?" প্রথমে দ্বিজদাস যেন লজ্জিত হইলেন; পরে কহিলেন, "উত্তম কথা। কিন্তু আমার, কি জান,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে; তাদের বিয়ে, পৈতা দেওয়া,—অনেক খরচ। তা' এই পরামর্শই ভাল।" একটু থামিয়া বলিলেন, "তা একটু লিখে দিলেই—" "লেখাপড়ার প্রয়োজন হবে কি? কাজটা ভাল দেখাবে না। আমার ইচ্ছে, টাকাকড়ির কথা এ সময়ে গোপনেই হয়।" "তা' ভাল কথা; কিন্তু কি জানো ভাই—" "আচ্ছা, আমি লিখেই দিচ্চি।" সেই দিনই দেবদাস লেখাপড়া করিয়া দিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে দেবদাস নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির পার্শ্বে পার্ব্বতীকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতী মুখপানে চাহিয়াছিল—চিনিতে যেন তাহার ক্লেশ হইতেছিল। দেবদাস গম্ভীর, শান্তমুখে কাছে আসিয়া কহিল, "কখন এলে পার্ব্বতী!" সেই কণ্ঠস্বর! আজ তিনবৎসর পরে দেখা। অধোমুখে পার্ব্বতী কহিল—"সকাল বেলা এসেচি।" "অনেক দিন দেখা হয়নি। বেশ ভাল ছিলে?" পার্ব্বতী মাথা নাড়িল। "চৌধুরী মশায় ভাল আছেন? ছেলে মেয়েরা সব ভাল?" "সব ভাল।" পার্ব্বতী একটীবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একটিবার জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, তিনি কেমন আছেন—কি করিতেছেন। এখন যে কোন প্রশ্নই খাটে না। দেবদাস কহিল, "এখন কিছুদিন আছ ত?" "হাঁ।" "তবে আর কি—" বলিয়া দেবদাস বাহিরে চলিয়া গেল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেছে। সে কথা বলিতে গেলে, অনেক লিখিতে হয়, তাই তাহাতে প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধের পরদিবস পার্ব্বতী ধর্ম্মদাসকে নিভৃতে ডাকিয়া তাহার হাতে একগাছা সোনার হার দিয়া কহিল, "ধর্ম্ম, তোমার মেয়েকে পরতে দিয়ো—" ধর্ম্মদাস মুখপানে চাহিয়া আর্দ্র চক্ষু আরো আর্দ্র করিয়া বলিল, "আহা, তোমাকে কতদিন দেখিনি; সব খবর ভাল ত দিদি?" "সব ভাল। তোমার ছেলেমেয়ে ভাল আছে?" "তা' আছে পারু।" "তুমি ভাল আছ?" এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধর্ম্মদাস কহিল, "কৈ আর ভাল? এইবার যেতে ইচ্ছা করে—কর্ত্তা গেলেন—।" ধর্ম্মদাস শোকের আবেগে কত কি হয় ত কহিত; কিন্তু পার্ব্বতী তাহাতে বাধা দিল। এ সব সংবাদ শুনিবার জন্য সে হার দেয় নাই। পার্ব্বতী কহিয়া উঠিল, "সে কি কথা ধর্ম্ম, তুমি গেলে দেবদাদাকে দেখ্‌বে কে? ধর্ম্মদাস কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "যখন ছেলেমানুষটী ছিল, তখন দেখেচি। এখন না দেখতে হলেই বাঁচি পারু!" পার্ব্বতী আরো নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, "ধর্ম্ম, একটী কথা সত্য বলবে?" "কেন বলব না দিদি!" "তবে সত্যি করে বল, দেবদা' এখন কি করে?" "করে আমার মাথা আর মুণ্ডু।" "ধর্ম্মদাস, খুলে বল না?" ধর্ম্মদাস পুনরায় কপালে করাঘাত করিয়া

বলিল, "খুলে আর কি বল্‌ব দিদি! এ কি আর বল্‌বার কথা। এবারে কর্ত্তা নাই, দেবতার হাতে অগাধ টাকা হ'ল; এবার কি আর রক্ষা থাক্‌বে?" পার্ব্বতীর মুখ একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে আভাস-ইঙ্গিতে কিছু-কিছু শুনিয়াছিল। শুষ্ক হইয়া কহিল, "বল কি ধর্ম্মদাস?" সে মনোরমার পত্রে যখন কতক শুনিয়াছিল, তখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ধর্ম্মদাস মাথা নাড়িয়া কহিতে লাগিল—"আহার নাই, নিদ্রা নাই, শুধু বোতল-বোতল মদ। তিন দিন, চার দিন ধরিয়া কোথায় পড়ে থাকে—ঠিকানা নাই। কত টাকা উড়িয়ে দিলে,—শুন্‌তে পাই, কত হাজার টাকার না কি তা'কে গয়না গড়িয়ে দিয়েচে!" পার্ব্বতীর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল—"ধর্ম্মদাস, এ সব সত্যি?" ধর্ম্মদাস নিজের মনে কহিতে লাগিল,—"তোর কথা হয় ত শুন্‌তে পারে—একবার বারণ ক'রে দে! কি শরীর কি হয়ে গেল—এমনধারা অত্যাচারে কটা দিন বা বাঁচবে? কা'কেই বা এ কথা বলি? মা, বাপ, ভাই—এদের এ কথা বলা যায় না—" ধর্ম্মদাস শিরে পুনঃ-পুনঃ করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ইচ্ছে করে, মাথা খুঁড়ে মরি পারু, আর বাঁচ্‌তে সাধ নেই।" পার্ব্বতী উঠিয়া গেল। নারাণ বাবুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এ বিপদের সময় দেবদাসের কাছে যাওয়া একবার উচিত। কিন্তু, তাহার এত সাধের দেবদাদা এই হইয়াছে!—কত কথাই যে মনে পড়িতে লাগিল, তাহার অবধি নাই। যত ধিক্কার সে দেবদাসকে দিল, তাহার সহস্রগুণ আপনাকে দিল;—সহস্রবার তাহার মনে হইল, সে থাকিলে কি এমন হইতে পারিত? আগেই সে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছিল, কিন্তু, সে কুঠার এখন তাহার মাথায় পড়িল। তাহার দেবদাদা, এমন হইয়া যাইতেছে—এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত! পরকে আপনার ভাবিয়া সে নিত্য অন্ন বিতরণ করিতেছে, আর তাহার সর্ব্বস্ব,—আজ অনাহারে মরিতেছে! পার্ব্বতী প্রতিজ্ঞা করিল, আজ সে দেবদাসের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে!

এখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে,—পার্ব্বতী দেবদাসের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবদাস শয্যায় বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল, চাহিয়া দেখিল। পার্ব্বতী ধীরে-ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর বসিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া হাসিল। তাহার মুখ বিষণ্ণ, কিন্তু শান্ত। হঠাৎ কৌতুক করিয়া কহিল, "যদি অপবাদ দিই?"

পার্ব্বতী সলজ্জ, নীলোৎপল চক্ষু দুটি একবার তাঁহার পানে রাখিয়া পরক্ষণেই অবনত করিল। মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দিল,—এ কথা তাহার বুকের মাঝে চিরদিনের জন্য শেলের মত বিঁধিয়া আছে;—আর কেন? কত কথা বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। দেবদাসের কাছে সে কথা কহিতে পারে না। আবার দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, "বুঝেছি রে, বুঝেচি! লজ্জা হচ্চে, না?" তবুও পার্ব্বতী কথা কহিতে পারিল না। দেবদাস কহিতে লাগিল, "তাতে আর লজ্জা কি? দু'জনে মিলে-মিশে একটা ছেলে-মানুষি করে ফেলে—এই দেখ দেখি—মাঝে থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বল্‌লি; আমিও কপালের ওপরে ঐ দাগ দিয়ে দিলাম। কেমন হয়েচে?" দেবদাসের কথার ভিতর শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র ছিল না; প্রসন্ন হাসি-হাসি মুখে অতীতের দুঃখের কাহিনী। পার্ব্বতীর কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে কাপড় দিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনে-মনে বলিল, 'দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল! তুমি আমাকে ভালবাসিতে—তাই দয়া করে, আমাদের বাল্য ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েছ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী!'

"পারু"! মুখ হইতে অঞ্চল না খুলিয়া পার্ব্বতী কহিল, "কি?" "তোর উপর আমার বড় রাগ হয়"—এইবার দেবদাসের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইতে লাগিল—"বাবা নাই, আজ আমার কি দুঃখের দিন; কিন্তু তুই থাক্‌লে কি ভাবনা ছিল! বড় বৌকে জানিস্ ত, দাদার স্বভাবও কিছু তোর কাছে লুকনো নেই; বল দেখি, মা'কে নিয়ে আমি এ সময়ে কি করি! আর আমারই বা যে কি হবে, কিছুই বুঝে পাই না। তুই থাক্‌লে নিশ্চিন্ত হয়ে—সব তোর হাতে ফেলে দিয়ে—ও কি রে পারু!" পার্ব্বতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবদাস কহিল, "কাঁদচিস্ বুঝি? তবে আর বলা হ'ল না।" পার্ব্বতী চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিল "বল।" দেবদাস মুহূর্ত্তে কণ্ঠস্বর

পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "পারু, তুই না কি খুব পাকা গিন্নি হয়েছিস্ রে?" ভিতরে-ভিতরে পার্ব্বতী চাপিয়া অধর দংশন করিল; মনে-মনে বলিল, "ছাই গৃহিনী! শিমুল ফুল দেবসেবায় লাগে কি?" দেবদাস হাসিয়া উঠিল; হাসিয়া কহিল—"বড় হাসি পায়! ছিলি তুই এতটুকু—কত বড় হলি! বড় বাড়ী, বড় জমিদারী, বড়-বড় ছেলে-মেয়ে—আর চৌধুরী মশাই, সবই বড়—কি রে পারু।" চৌধুরী মশাই পার্ব্বতীর বড় আমোদের জিনিস; তাঁকে মনে হইলেই তাহার হাসি পাইত। এত কষ্টেও তাই তার হাসি আসিল। দেবদাস কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, "একটা উপকার কর্‌তে পারিস?" পার্ব্বতী মুখ তুলিয়া কহিল, "কি?" "তোদের দেশে ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?" পার্ব্বতী ঢোক গিলিয়া, কাসিয়া বলিল—"ভাল মেয়ে? কি করবে?" "পেলে বিয়ে করি। একবার সংসারী হ'তে সাধ হয়।" পার্ব্বতী ভালমানুষটীর মত কহিল—"খুব সুন্দরী ত?" "হাঁ, তোর মত।" "আর খুব ভালমানুষ?" "না, খুব ভালমানুষে কাজ নেই—বরং একটু দুষ্টু,—তোর মত আমার সঙ্গে যে ঝগড়া কর্‌তে পারবে।" পার্ব্বতী মনে-মনে কহিল, "সে-ত কেউ পারিবে না দেবদাদা; কেন না, তাতে আমার মত ভালবাসতে পারা চাই।" মুখে কহিল—"পোড়ার মুখ আমার, আমার মত কত হাজার তোমার পায়ে আসতে পেলে ধন্য হয়।" দেবদাস কৌতুক করিয়া হাসিয়া বলিল, "একটি আপাততঃ দিতে পারিস দিদি।" "দেবদাদা, সত্যি বিয়ে করবে?" "এই যে বললাম।" শুধু এইটি সে খুলিয়া বলিল না যে, তাকে ভিন্ন এ জীবনে অন্য স্ত্রীলোকে তার প্রবৃত্তি হইবে না।

"দেবদাদা একটি কথা বলব?" "কি?" পার্ব্বতী আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল "তুমি মদ খেতে শিখ্‌লে কেন?" দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, "খেতে কি কোন জিনিস শিখ্‌তে হয়?" "তা নয়, অভ্যাস করিলে কেন?" "কে বলেচে, ধর্ম্মদাস?" "যেই বলুক, কথাটা কি সত্যি?" দেবদাস প্রতারণা করিল না; কহিল, "কতক বটে!" পার্ব্বতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কত হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দিয়েচ না?" দেবদাস হাসিয়া কহিল, "দিইনি; গড়িয়ে রেখেচি। তুই নিবি?" পার্ব্বতী হাত পাতিয়া বলিল, "দাও। এই দেখ, আমার একটীও গয়না নেই।" "চৌধুরী মশাই তোকে দেন নি?" "দিয়েছিলেন;—আমি সমস্ত তাঁর বড় মেয়েকে দিয়ে দিয়েছি।" "তোর বুঝি দরকার নেই?" পার্ব্বতী মাথা নাড়িয়া মুখ নীচু করিল। এইবার সত্যই দেবদাসের চোখে জল আসিতেছিল। দেবদাস অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিল, কম দুঃখে আর স্ত্রীলোকে নিজের গহনা খুলিয়া বিলাইয়া দেয় না। কিন্তু চোখের জল চাপিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "মিছে কথা, পারু। কোন স্ত্রীলোককেই আমি ভালবাসিনি, কাউকেই গয়না দিইনি।" পার্ব্বতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে কহিল, "তাই আমি বিশ্বাস করি।"

অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর পার্ব্বতী কহিল, "কিন্তু, প্রতিজ্ঞা কর—আর মদ খাবে না!" "তা' পারিনে। তুমি কি প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পার, আমাকে আর একটীবারও মনে করিবে না?" পার্ব্বতী কথা কহিল না। এই সময়ে বাহিরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি হইল। দেবদাস চকিত হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া কহিল, "সন্ধ্যা হ'ল, এখন বাড়ী যা পারু!" "আমি যাব না; তুমি প্রতিজ্ঞা কর।" "আমি পারিনে।" "কেন পার না?" "সবাই কি সব কাজ পারে?" "ইচ্ছে কর্‌লে নিশ্চয় পারে।" "তুমি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পার?" পার্ব্বতীর সহসা যেন হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতসারে অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "তা' কি হয়?" দেবদাস শয্যার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল—"পার্ব্বতী, দোর খুলে দাও।" পার্ব্বতী সরিয়া আসিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিল, "প্রতিজ্ঞা কর?"

দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীর ভাবে কহিতে লাগিল—"পারু, জোর করিয়া প্রতিজ্ঞা করানটা কি ভাল, না, তাতে বিশেষ লাভ আছে? আজকার প্রতিজ্ঞা কাল হয় ত থাকবে না—কেন আমাকে আর মিথ্যাবাদী করিবি?" আবার বহুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। এমনি সময়ে কোথায় কোন ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। দেবদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কহিল, "ওরে পারু, দোর খুলে দে—" পার্ব্বতী কথা কহে না।—"ও পারু—" "আমি কিছুতেই যাব না" বলিয়া পার্ব্বতী অকস্মাৎ রুদ্ধ আবেগে সেইখানে লুটাইয়া পড়িল—বহুক্ষণ ধরিয়া বড় কান্না

কাঁদিতে লাগিল। ঘরের ভিতর এখন গাঢ় অন্ধকার—কিছুই, দেখা যায় না। দেবদাস শুধু অনুমান করিয়া বুঝিল, পার্ব্বতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে—ধীরে ধীরে ডাকিল—"পারু?" পার্ব্বতী কাঁদিয়া উত্তর দিল—"দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট।" দেবদাস কাছে সরিয়া আসিল। তাহার চক্ষেও জল—কিন্তু, স্বর বিকৃত হইতে পায় নাই। কহিল, "তা কি আর জানিনে রে?" "দেবদা, আমি যে মরে যাচ্চি। কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার যে আজন্মের সাধ—" অন্ধকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস কহিল—"তারও ত সময় আছে।" "তবে আমার কাছে চল। এখানে তোমাকে দেখবার যে কেউ নেই!" "তোর বাড়ী গেলে খুব যত্ন করবি?" "আমার ছেলে বেলার সাধ! স্বর্গের ঠাকুর! আমার এ সাধটী পূর্ণ করিয়া দাও! তার পর মরি—তাতেও দুঃখ নেই।" এবার দেবদাসের চোখেও জল আসিয়া পড়িল। পার্ব্বতী পুনরায় কহিল, "দেবদা, আমার বাড়ী চল।" দেবদাস চোখ মুছিয়া বলিল, "আচ্ছা যাব।" "আমাকে ছুঁয়ে বল, যাবে?" দেবদাস অনুমান করিয়া পার্ব্বতীর পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, "এ কথা কখন ভুলব না। আমাকে যত্ন করলে যদি তোমার দুঃখ ঘুচে—আমি যাব। মরবার আগেও আমার এ কথা স্মরণ থাকবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পিতার মৃত্যুর পর ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত বাটীতে থাকিয়া, দেবদাস একেবারে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সুখ নাই, শান্তি নাই—নিতান্ত একঘেয়ে জীবন। তা'র উপর ক্রমাগত পার্ব্বতীর চিন্তা; আজকাল সব কাজেই তাহাকে মনে পড়ে। আর, ভাই দ্বিজদাস এবং পতিব্রতা ভ্রাতৃ-জায়া দেবদাসের জ্বালা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন।

গৃহিণীর অবস্থাও দেবদাসের ন্যায়। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর সমস্ত সুখই ফুরাইয়া গিয়াছে। পরাধীন ভাবে এ বাড়ী তাঁহার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ কয়দিন হইতে তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প করিতেছেন; শুধু দেবদাসের বিবাহ না দিয়া যাইতে পারিতেছেন না। কেবলই বলিতেছেন—"দেবদাস, একটি বিয়ে কর—আমি দেখে যাই।" কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? একে অশৌচ অবস্থা, তাহার উপর আবার মনোমত পাত্রীর সন্ধান করিতে হইবে। আজকাল তাই গৃহিণীর মাঝে-মাঝে দুঃখ হয় যে, সে সময় পার্ব্বতীর সহিত বিবাহ দিলেই বেশ হইত। একদিন তিনি দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেবতা, আর ত পারিনে—দিন কতক কাশী গেলে হয়।" দেবদাসেরও তাহাই ইচ্ছা; কহিল, "আমিও তা'ই বলি। ছয় মাস পরে ফিরে এলেই হবে।" "হাঁ বাবা, তাই কর। শেষে, ফিরে এসে, তাঁর কাজ হয়ে গেলে, তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখে, আমি কাশীবাস করব।" দেবদাস স্বীকৃত হইয়া, জননীকে কিছু দিনের জন্য কাশীতে রাখিয়া আসিয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেল। কলিকাতা আসিয়া তিন চারি দিন ধরিয়া দেবদাস চুণিলালের সন্ধান করিল। সে নাই, বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় দেবদাস চন্দ্রমুখীর কথা স্মরণ করিল। একবার দেখা করিলে হয় না? এতদিন তাহাকে মোটেই মনে পড়ে নাই। দেবদাসের যেন একটু লজ্জা করিল,—একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই চন্দ্রমুখীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ ডাকা-ডাকির পর, ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল—"এখানে নয়।" সম্মুখে একটা গ্যাস পোষ্ট ছিল, দেবদাস তাহার নিকট সরিয়া আসিয়া কহিল, "বলিতে পার, লোকটি কোথায় গিয়াছে?" জানালা খুলিয়া কিছুক্ষণ সে চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"তুমি কি দেবদাস?" "হাঁ।" "দাঁড়াও,—দোর খুলে দিই।" দ্বার খুলিয়া সে কহিল, "এস—।" কণ্ঠস্বর যেন কতকটা পরিচিত, অথচ ভাল চিনিতে পারিল না। একটু অন্ধকারও হইয়াছিল। সন্দেহে কহিল, "চন্দ্রমুখী কোথায় বলতে পার?" স্ত্রীলোকটি মৃদু হাসিয়া কহিল, "পারি; ওপরে চল।" এবার দেবদাস চিনিতে পারিল—"অ্যাঁ, তুমি?" "হাঁ আমি। দেবদাস আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?" উপরে গিয়া দেবদাস দেখিল, চন্দ্রমুখীর পরণে কালাপেড়ে ধুতি, কিন্তু মলিন। হাতে শুধু দুগাছি বালা, অন্য অলঙ্কার নাই। মাথার চুল এলো-মেলো। বিস্মিত হইয়া বলিল, "তুমি?" ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কৃশ হইয়াছে। কহিল, "তোমার অসুখ হয়েছিল?" চন্দ্রমুখী হাসিয়া কহিল, "শারীরিক একটুও নয়। তুমি ভাল করিয়া বোস।"

দেবদাস শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিল, ঘরটির একেবারে আগাগোড়া পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গৃহস্বামিনীর মত তাহারও দুর্দ্দশার সীমা নাই। একটীও আসবাব নাই—আলমারি, টেবিল, চেয়ারের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। শুধু একটি শয্যা; চাদর অপরিস্কৃত—দেয়ালের গায়ে ছবিগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে—লোহার কাটী এখনো পোতা আছে,—দুই-একটায় লাল ফিতা এখনও ঝুলিতেছে। উপরের সেই ঘড়িটা এখনো ব্র্যাকেটের উপর আছে, কিন্তু নিঃশব্দ। আশে-পাশে মাকড়সা মনের মত করিয়া জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। এক কোণে একটা তৈল-দীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে—তাহারই সাহায্যে দেবদাস নূতন ধরণের গৃহসজ্জা দেখিয়া লইল। কিছু বিস্মিত, কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—"চন্দ্র, এমন দুর্দ্দশা কেমন করে হল?" চন্দ্রমুখী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "দুর্দ্দশা তোমাকে কে বল্লে? আমার ত ভাগ্য খুলেচে।" দেবদাস বুঝিতে পারিল না; কহিল, "তোমার গায়ের গয়নাই বা গেল কোথায়?" "বেচে ফেলেচি।" "আসবাব পত্র?" "তাও বেচেচি।" "ঘরের ছবিগুলোও বিক্রী করেচ?" এবার চন্দ্রমুখী হাসিয়া সম্মুখের একটা বাড়ী দেখাইয়া কহিল, "ও-বাড়ীর ক্ষেত্রমণিকে বিলিয়ে দিয়েছি।" দেবদাস কিছুক্ষণ মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"চুণিবাবু কোথায়?" "বলতে পারিনে। মাস দুই হল, ঝগড়া করে চলে গেছে, আর আসেনি।" দেবদাস আরও আশ্চর্য্য হইল—"ঝগড়া কেন?" চন্দ্রমুখী কহিল, "ঝগড়া কি হয় না?" "হয়। কিন্তু কেন?" "দালালি করতে এসেছিল, তাই তাড়িয়ে দিয়েছিলুম।" "কিসের দালালি?" চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, "পাটের।" তা'র পর কহিল, "তুমি বুঝ্‌তে পার না কেন? একজন বড়লোক ধরে এনেছিল—মাসে দু'শ টাকা, একরাশ অলঙ্কার আর দরজার সুমুখে এক সেপাই। বুঝ্‌লে?" দেবদাস বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, "কই সে সকল কিছুই ত দেখিনে।" "থাক্‌লে ত দেখবে? আমি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।" "তা'দের অপরাধ?" "অপরাধ বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।" দেবদাস বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিল, "সেই পর্য্যন্ত আর কেউ এখানে আসেনি?" "না। সেই পর্য্যন্ত কেন, তুমি যাবার পরদিন থেকেই এখানে কেউ আসে না। শুধু চুণি মাঝে-মাঝে এসে বস্‌ত, কিন্তু মাসদুই থেকে তাও বন্ধ!" দেবদাস বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল। অন্য দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে কহিল, "চন্দ্রমুখী, তবে দোকানপাট সব তুলে দিলে?" "হাঁ—দেউলে পড়েচি।" দেবদাস সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল,—"কিন্তু খাবে কি করে?" "এই যে শুন্‌লে; কিছু গহনাপত্র ছিল, বিক্রী করেচি।" "সে আর কত?" "বেশী নয়। প্রায় আট-ন'শ টাকা আমার আছে। একজন মুদীর কাছে রেখে দিয়েছি—সে আমাকে মাসে কুড়ি টাকা দেয়।" "কুড়ি টাকায় আগে ত তোমার চলত না?" "না আজও ভাল চলে না। তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী; তাই মনে করচি, হাতের এই দুগাছা বালা বিক্রী করে সমস্ত পরিশোধ করে দিয়ে আর কোথাও চলে যাব।" "কোথায় যাবে?" "তা' এখনো স্থির করিনি। কোন শস্তা মুলুকে যাব—কোন পাড়াগ্রামে যেখানে কুড়ি টাকায় মাস চলে।" "এতদিন যাও নি কেন? যদি সত্যই তোমার আর কিছু প্রয়োজন নেই, ত এতদিন মিথ্যা কেন ধার কর্জ্জ বাড়ালে?" চন্দ্রমুখী নতমুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল। তাহার জীবনে এ কথাটা বলিতে আজ তাহার প্রথম লজ্জা করিল। দেবদাস বলিল, "চুপ করলে যে?" চন্দ্রমুখী শয্যার একপ্রান্তে সঙ্কুচিত ভাবে উপবেশন করিয়া ধীরে-ধীরে কহিল—"রাগ কোরো না। যাবার আগে আশা করেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে ভাল হয়। ভাবতাম, তুমি হয় ত আর একবার আস্‌বে। আজ তুমি এসেছ, এখন কালই যাবার উদ্যোগ করব। কিন্তু কোথায় যাই, বলে দেবে?" দেবদাস বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল; কহিল, "শুধু আমাকে দেখবার আশায়? কিন্তু, কেন?" "একটা খেয়াল। তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করতে। এত ঘৃণা কেউ কখনো করেনি, বোধ হয় তাই। আজ তোমার মনে পড়িবে কি না জানিনে, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে,—যে দিন তুমি এখানে প্রথম এলে, সেই দিন থেকেই তোমার উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। তুমি ধনীর সন্তান তা' জানতাম; কিন্তু ধনের আশায় তোমার পানে আকৃষ্ট হইনি। তোমার পূর্ব্বে কত লোক এখানে এসেছে গেছে,—কিন্তু কারো ভেতরে কখনো তেজ দেখিনি। আর—তুমি এসেই

আমাকে আঘাত করলে; একটা অযাচিত, উপযুক্ত অথচ অনুচিত রূঢ় ব্যবহার; ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইলে, শেষে তামাসার মত কিছু দিয়ে গেলে। এ সব মনে পড়ে কি ?" দেবদাস চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রমুখী পুনরায় কহিতে লাগিল—"সেই অবধি তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। ভালবেসে নয়, ঘৃণা করেও নয়। একটা নূতন জিনিস দেখলে যেমন তা খুব মনে থাকে, তোমাকেও তাই কিছুতেই ভুলতে পারিনি—তুমি এলে বড় ভয়ে-ভয়ে সতর্ক হয়ে থাকতাম, কিন্তু না এলে কিছুই ভাল লাগত না। তার পর আমার কি যে মতিভ্রম ঘটল—এই দুটো চোখে অনেক জিনিসই আর একরকম দেখতে লাগলাম। পূর্ব্বের 'আমি'র সঙ্গে এমন করে বদলে গেলাম—যেন সে 'আমি' আর নয়। তার পরে তুমি মদ ধরলে। মদে আমার বড় ঘৃণা। কেউ মাতাল হলে তার ওপর বড় রাগ হ'ত। কিন্তু তুমি মাতাল হলে রাগ হত না; কিন্তু বড্ড দুঃখ পেতাম।" বলিয়া চন্দ্রমুখী দেবদাসের পায়ের উপর হাত রাখিয়া ছল-ছল চক্ষে কহিল—"আমি বড় অধম,—আমার অপরাধ নিয়ো না! তুমি যে কত কথা কইতে,—কত বড় ঘৃণায় সরিয়ে দিতে; আমি কিন্তু তোমার তত কাছে যেতে চাইতাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লে—থাক্, সে সব বলব না, হয় ত, আবার রাগ করে বসবে।" দেবদাস কিছুই কহিল না—নূতন ধরণের কথাবার্ত্তা তাহাকে কিছু ক্লেশ দিতেছিল। চন্দ্রমুখী গোপনে চক্ষু মুছিয়া কহিতে লাগিল,—"এক দিন তুমি বল্‌লে—আমরা কত সহ্য করি। লাঞ্ছনা, অপমান,—জঘন্য অত্যাচার, উপদ্রবের কথা—সেই দিন থেকেই বড় অভিমান হয়েচে—আমি সব বন্ধ করে দিয়েছি।" দেবদাস উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু দিন চলবে কি করে ?" চন্দ্রমুখী কহিল, "সে ত আগেই বলেচি।" "মনে কর, সে যদি তোমার সমস্ত টাকা ফাঁকি দেয়—" চন্দ্রমুখী ভয় পাইল না। শান্ত, সহজ ভাবে কহিল,—"আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু তাও ভেবেচি। বিপদে পড়লে তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চেয়ে নেব।" দেবদাস ভাবিয়া কহিল,—"তাই নিয়ো। এখন আর কোথাও যাবার উদ্যোগ কর।" "কালই কোরব। বালা দুগাছা বেচে, একবার মুদীর সঙ্গে দেখা কোরব।" দেবদাস পকেট হইতে পাঁচখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বালিশের তলে রাখিয়া কহিল, —"বালা বিক্রী কোরো না, তবে মুদীর সঙ্গে দেখা কোরো। কিন্তু যাবে কোথায় ? কোন তীর্থস্থানে ?" "না দেবদাস। তীর্থধর্ম্মের উপর আমার তত আস্থা নেই। কলিকাতা থেকে বেশী দূরে যাব না। কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে থাকব।" "কোন ভদ্র পরিবারে কি দাসীবৃত্তি করবে ?" চন্দ্রমুখীর চোখে আবার জল আসিল। মুছিয়া কহিল, "প্রবৃত্তি হয় না। স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দে থাকব। কেন দুঃখ করতে যাব ? শরীরের দুঃখ কোন দিন সইনি, এখনো সইতে পারব না। আর, বেশী টানাটানি করলে হয় ত ছিঁড়ে যাবে।" দেবদাস বিষণ্ণ মুখে ঈষৎ হাসিল; কহিল, "কিন্তু, সহরের কাছে থাকলে আবার হয় ত প্রলোভনে পড়বে—মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই।" এবার চন্দ্রমুখীর মুখ প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া কহিল,—"সে কথা সত্যি; মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই বটে; কিন্তু আমি আর প্রলোভনে পড়ব না। স্ত্রীলোকের লোভ বড় বেশি তাও মানি, কিন্তু যা' কিছু লোভের জিনিস, যখন ইচ্ছে করেই ত্যাগ করচি, তখন আর আমার ভয় নেই। হঠাৎ যদি ঝোঁকের ওপর ছাড়তাম, তা'হলে হয় ত সাবধান হবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু এত দিনের মধ্যে একটা দিনও ত আমাকে অনুতাপ করতে হয় নি! আমি যে বেশ সুখে আছি।" তথাপি দেবদাস মাথা নাড়িল; কহিল, "স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল—বড় অবিশ্বাসী!" এবার চন্দ্রমুখী একেবারে কাছে আসিয়া বসিল। হাত ধরিয়া কহিল, "দেবদাস!" দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিল, এখন আর বলিতে পারিল না,—"আমাকে স্পর্শ কোরো না।" চন্দ্রমুখী স্নেহ-বিস্ফারিত চক্ষে, ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে, তাহার হাত দুটী নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিল—"আজ শেষ দিন, আজ আর রাগ কোরো না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার বড় সাধ হয়—" বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে দেবদাসের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "পার্ব্বতী তোমাকে কি বড় বেশি আঘাত করেচে ?" দেবদাস ভ্রূকুটী করিল; বলিল, "এ কথা কেন ?" চন্দ্রমুখী বিচলিত হইল না। শান্ত, দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমার কাজ আছে। তোমাকে সত্যি বলচি, তুমি দুঃখ পেলে আমারও বড় বাজে। তা' ছাড়া, আমি বোধ হয় অনেক কথাই জানি। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে তোমার

মুখ থেকে অনেক কথাই শুনেচি। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস হয় না যে, পার্ব্বতী তোমাকে ঠকিয়েচে। বরঞ্চ মনে হয়, তুমি নিজেই নিজেকে ঠকিয়েচ। দেবদাস, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, এ সংসারের অনেক জিনিস দেখেচি। আমার কি মনে হয় জান? নিশ্চয় মনে হয়, তোমারই ভুল হয়েচে। মনে হয়, চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বলিয়া স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়। অখ্যাতি করতেও তোমরা, সুখ্যাতি করতেও তোমরা। তোমাদের যা বল্‌বার—অনায়াসে বল; কিন্তু তারা তা' পারে না। নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না; পার্‌লেও, তা সবাই বোঝে না। কেন না, বড় অস্পষ্ট হয়—তোমাদের মুখের কাছে চাপা পড়ে যায়। তার পরে অখ্যাতিটাই লোকের মুখে-মুখে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।" চন্দ্রমুখী একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল,—"এ জীবনে ভালবাসার ব্যবসা অনেক দিন করেচি, কিন্তু একটীবার মাত্র ভালবেসেচি। সে ভালবাসার অনেক মূল্য। অনেক শিখেচি। জান ত, ভালবাসা এক, আর রূপের মোহ আর। এ দুয়ে বড় গোল বাধে, আর পুরুষেই বেশী গোল বাধায়। রূপের মোহটা তোমাদের চেয়ে আমাদের না কি অনেক কম, তাই, এক দণ্ডেই আমরা তোমাদের মত উন্মত্ত হয়ে উঠিনে। তোমরা এসে যখন ভালবাসা জানাও, কত কথায়, কত ভাবে যখন প্রকাশ কর, আমরা চুপ করে থাকি। অনেক সময়ে তোমাদের মনে ক্লেশ দিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, সঙ্কোচে বাধে। মুখ দেখতেও যখন ঘৃণা বোধ হয়, তখনও হয় ত লজ্জায় বল্‌তে পারিনে—আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তার পরে একটা বাহ্যিক প্রণয়ের অভিনয় চলে; একদিন, যখন তা শেষ হয়ে যায়, পুরুষ মানুষ রেগে অস্থির হয়ে বলে, কি বিশ্বাসঘাতক! সবাই সেই কথা শোনে, সেই কথাই বোঝে: আমরা তখনও চুপ কোরে থাকি। মনে কত ক্লেশ হয়, কিন্তু কে তা দেখ্‌তে যায়?" দেবদাস কোন কথা কহিল না। সেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "হয় ত একটা মমতা জন্মায়; স্ত্রীলোক মনে করে এই বুঝি ভালবাসা! শান্ত, ধীর ভাবে সংসারের কাজকর্ম্ম করে, দুঃখের সময় প্রাণপণে সাহায্য করে, তোমরা কত সুখ্যাতি কর,—মুখে-মুখে তার কত ধন্য-ধন্য! কিন্তু হয় ত তখনও তার ভালবাসার বর্ণপরিচয়ও হয় না। তার পরে যদি কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তাহার বুকের ভেতরটা অসহ্য বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন—" বলিয়া সে দেবদাসের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তখন তোমরা চীৎকার কোরে বোলে ওঠো—"কলঙ্কিনী! ছিঃ ছিঃ!" অকস্মাৎ দেবদাস চন্দ্রমুখীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—"চন্দ্রমুখী, ও কি!" চন্দ্রমুখী ধীরে-ধীরে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, "ভয় নেই দেবদাস, আমি তোমার পার্ব্বতীর কথা বলচিনে।" বলিয়া সে মৌন হইল। দেবদাসও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অন্যমনস্কের মত কহিল,—"কিন্তু, কর্ত্তব্য আছে ত! ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে ত!" চন্দ্রমুখী বলিল, "তা' ত আছেই। আর আছে বলেই, দেবদাস, যে যথার্থ ভালবাসে, সে সহ্য কোরে থাকে। শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি—যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ-অশান্তি আনতে চায় না। কিন্তু কি বলছিলাম, দেবদাস,—আমি নিশ্চয় জানি, পার্ব্বতী তোমাকে এক বিন্দু ঠকায়নি, তুমি আপনাকেই ঠকিয়েচ। আজ এ কথা বোঝবার তোমার সাধ্য নেই, আমি জানি; কিন্তু যদি কখনো সে সময় আসে, তখন হয় ত দেখ্‌তে পাবে, আমি সত্য কথাই বলেছিলাম। দেবদাসের দু' চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আজ কেমন করিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, চন্দ্রমুখীর কথাই সত্য। এই চোখের জল চন্দ্রমুখী দেখিতে পাইল, কিন্তু মুছাইবার চেষ্টা করিল না। মনে-মনে বলিতে লাগিল, "তোমাকে আমি অনেকবার অনেক রকমে দেখেচি। আমি তোমার মন জানি। বেশ বুঝেচি, সাধারণ পুরুষের মত তুমি সেধে ভালবাসা জানাতে পারবে না। তবে রূপের কথা;—রূপ কে না ভালবাসে? কিন্তু তাই বলেই যে তোমার অতখানি তেজ রূপের পায়ে আত্মবিসর্জ্জন করে ফেল্‌বে, সে কথা কিছুতে বিশ্বাস হয় না। পার্ব্বতী হয় ত খুব রূপবতী; কিন্তু, তবু মনে হয়, সে-ই তোমাকে আগে ভালবেসেছিল, আগে সে কথা জানিয়েছিল।" মনে-মনে বলিতে বলিতে সহসা তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইয়া পড়িল, "নিজেকে দিয়েই বুঝেছি, সে তোমাকে কত ভালবাসে!" দেবদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া

বসিয়া কহিল, "কি বল্‌লে ?" চন্দ্রমুখী কহিল, "কিছু না। বলছিলাম যে, সে তোমার রূপে ভোলেনি। তোমার রূপ আছে বটে, কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র, রুক্ষ রূপ সকলের চোখেও পড়ে না। কিন্তু যার পড়ে, সে আর চোখ ফিরুতে পারে না।" বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি যে কি আকর্ষণ, তা' যে কখন তোমাকে ভালবাসিয়াছে, সেই জানে। এই স্বর্গ থেকে সাধ করে ফিরে যাবে, এমন মেয়েমানুষ কি পৃথিবীতে আছে!" আবার কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু-মৃদু বলিতে লাগিল,—"এ রূপ ত চোখে পড়ে না! বুকের একেবারে মাঝখানটিতে এর গভীর ছায়া পড়ে। তার পরে দিন শেষ হ'লে, আগুনের সঙ্গে চিতায় ছাই হয়ে যায়।" দেবদাস বিহ্বল-দৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, "আজ এ সব তুমি কি বল্‌চ ?" চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া বলিল, "এমন বিপদ আর নেই দেবদাস, যাকে ভালবাসি না—সে যদি জোর করে ভালবাসার কথা শোনায়! কিন্তু আমি শুধু পার্ব্বতীর জন্য ওকালতি কর্চ্ছিলাম—নিজের জন্যে নয়।" দেবদাস উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিল—"এবার আমি যাই।" "আর একটু বোসো। কখনো তোমাকে সজ্ঞানে পাইনি,—কখনো এমন করে হাত দুটি ধরে কথা বল্‌তে পাইনি—এ কি তৃপ্তি!" বলিয়াই হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

দেবদাস আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "হাস্‌লে যে!" "ও কিছুই নয়, শুধু একটা পুরানো কথা মনে পড়ে গেল! সে আজ দশ বছরের কথা,—যখন আমি ভালবেসে ঘর ছেড়ে চলে আসি। তখন মনে হোতো, কত না ভালবাসি, বুঝি প্রাণটাও দিতে পারি। তার পরে এক দিন তুচ্ছ একটা গয়না নিয়ে দু'জনের এমনি ঝগড়া হয়ে গেল যে, আর কখন কেউ কারো মুখ দেখ্‌লাম না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, সে আমাকে মোটেই ভালবাস্‌ত না,—না হলে একটা গয়না দেয় না ?"

আর একবার চন্দ্রমুখী নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই শান্ত, গম্ভীর মুখে মৃদু-মৃদু কহিল—"ছাই গয়না! তখন কি জান্‌তাম, একটু সামান্য মাথা-ধরা সারাবার জন্যেও অকাতরে এই প্রাণটা পর্য্যন্ত দেওয়া যায়! তখন না বুঝ্‌তাম সীতা-দময়ন্তীর ব্যথা, না বিশ্বাস করতাম জগাই-মাধায়ের কথা। আচ্ছা দেবদাস, এ জগতে সকলই সম্ভব, না ?" দেবদাস কিছুই বলিতে পারিল না; হতবুদ্ধির মত ফ্যাল-ফ্যাল্ করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি যাই—" "ভয় কি, আরো একটু বোসো। আমি তোমাকে আর ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাইনে—সে দিন আমার কেটে গেছে। এখন তুমিও আমাকে যতখানি ঘৃণা কর, আমিও আমাকে ততখানি ঘৃণা করি;—কিন্তু দেবদাস, একটা বিয়ে কর না কেন?" এতক্ষণে দেবদাসের যেন নিঃশ্বাস পড়িল; একটু হাসিয়া কহিল—"উচিত বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না।" "না হলেও কর। ছেলেমেয়ের মুখ দেখলেও অনেক শান্তি পাবে। তা'ছাড়া, আমারও একটা উপায় হয়। তোমার সংসারে দাসীর মত থেকেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারব।" দেবদাস সহাস্যে কহিল, "আচ্ছা, তখন তোমাকে ডেকে আন্‌ব।" চন্দ্রমুখী তাহার হাসি যেন দেখিতেই পাইল না; কহিল, "দেবদাস, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে।" "কি ?" "তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কইলে কেন ?" "কোন দোষ হয়েচে কি ?" "তা' জানিনে। কিন্তু নতুন বটে! মদ খেয়ে জ্ঞান না হারালে, কখন ত পূর্ব্বে আমার মুখ দেখ্‌তে না!" দেবদাস সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বিষণ্ণ মুখে কহিল, "এখন মদ ছুঁতে নেই—আমার পিতার মৃত্যু হয়েচে।" চন্দ্রমুখী বহুক্ষণ করুণচক্ষে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এর পরে আর খাবে কি ?" "বল্‌তে পারিনে।" চন্দ্রমুখী তাহার হাত দুটী আর একটু টানিয়া লইয়া অশ্রু-ব্যাকুল স্বরে কহিল,—"যদি পার, ছেড়ে দিয়ো;—অসময়ে এমন সোণার প্রাণ নষ্ট কোরো না।"

দেবদাস সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি চললাম। যেখানে যাও, সংবাদ দিয়ো—আর যদি কখন কিছু প্রয়োজন হয়,—আমাকে লজ্জা কোরো না।" চন্দ্রমুখী প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ কর, যেন সুখী হই। আর একটা ভিক্ষা,—ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন দাসীর প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ কোরো।" "আচ্ছা" বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল। চন্দ্রমুখী যুক্ত-করে কাঁদিয়া বলিল, "ভগবান! আর একবার যেন দেখা হয়।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বৎসর দুই হইল, পার্ব্বতী মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। জলদবালা বুদ্ধিমতী ও কর্ম্ম-

পটু। পার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে সংসারের অনেক কাজ সে-ই করে। পার্ব্বতী এখন অন্য দিকে মন দিয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই। নিজের ছেলেপুলে নাই বলিয়া, পরের ছেলেমেয়ের উপর তাহার বড় টান। গরীব-দুঃখীর কথা দূরে থাক্, যাহাদের কিছু সংস্থান আছে, তাহাদিগের পুত্রকন্যারও অধিকাংশ ব্যয়ভার সে-ই বহন করে। ইহা ভিন্ন, ঠাকুরবাড়ীর কাজ করিয়া, সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, অন্ধ-খঞ্জের পরিচর্য্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। স্বামীকে প্রবৃত্তি দিয়া পার্ব্বতী আর একটা অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছে। সেখানে নিরাশ্রয়, অসহায় লোক ইচ্ছামত থাকিতে পারে,—জমীদার-সংসার হইতেই তাহার খাওয়া-পরা মিলে। আর একটা কায পার্ব্বতী বড় গোপনে করে, স্বামীকেও তাহা জানিতে দেয় না। দরিদ্র ভদ্রপরিবারে লুকাইয়া অর্থসাহায্য করে। এটি তাহার নিজের খরচ। স্বামীর নিকট হইতে প্রতি মাসে যাহা পায়, সমস্তই ইহাতে ব্যয় করে। কিন্তু যেমন করিয়া যাহাই ব্যয় হউক, সদর-কাছারীর নায়েব-গমস্তার তাহা জানিতে বাকী থাকে না। নিজেদের মধ্যে তাহারা বকাবকি করিতে থাকে। দাসীরা লুকাইয়া শুনিয়া আসে যে, সংসারের ব্যয় আজকাল ডবলের বেশি বাড়িয়া গিয়াছে; তহবিল শূন্য,—কিছুই জমা হইতেছে না। সংসারে বাজে-খরচ বৃদ্ধি পাইলে, দাসদাসীর যেন তাহা মর্ম্মান্তিক হয়। তাহাদের কাছে জলদ এ সব কথা শুনিতে পায়। এক দিন রাত্রে সে স্বামীকে কহিল,—"তুমি কি এ বাড়ীর কেউ নয়?" মহেন্দ্র বলিল, "কেন, বল দেখি?" স্ত্রী কহিল, "দাস-দাসীরা দেখতে পায়, আর তুমি পাও না? কর্ত্তার নূতন-গিন্নী-অন্ত প্রাণ,—তিনি ত আর কিছু বলবেন না; কিন্তু তোমার বলা উচিত।" মহেন্দ্র কথাটা বুঝিল না, কিন্তু উৎসুক হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের কথা?" জলদবালা গম্ভীর হইয়া স্বামীকে মন্ত্রণা দিতে লাগিল—"নতুন মা'র ছেলে-মেয়ে নাই, তাঁর কেন সংসারে টান হবে,—সব যে উড়িয়ে দিলেন, দেখতে পাও না?" মহেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কি কোরে!" জলদ কহিল, "তোমার চোক থাক্‌লে দেখতে পেতে। আজকাল সংসারের দ্বিগুণ খরচ,—সদাব্রত, দান-খয়রাত, অতিথ-ফকির। আচ্ছা, তিনি যেন পরকালের কাজ করছেন; কিন্তু তোমারও ত ছেলেমেয়ে হবে? তখন তারা খাবে কি? নিজের জিনিস বিলিয়ে দিয়ে কি শেষে ভিক্ষে করবে না কি?" মহেন্দ্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি কার কথা বলচ, মার কথা?" জলদ কহিল, "আমার পোড়া কপাল, যে, এ সব আবার মুখ ফুটে বল্‌তে হয়।" মহেন্দ্র কহিল, "তাই তুমি মার নামে নালিশ করতে এসেছ?" জলদ রাগ করিয়া বলিল, "আমার নালিশ-মকদ্দমার দরকার নেই; শুধু ভেতরের খবরটা জানিয়ে দিলুম, নইলে শেষে আমাকেই দোষ দিতে।" মহেন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমার বাপের বাড়ীতে রোজ হাঁড়ি চড়ে না, তুমি জমিদারের বাড়ীর খরচের ব্যাপার কি বোঝ?" এবার জলদও রাগিয়া উঠিল; বলিল, "তোমার মার বাপের বাড়ীতেই বা ক'টা অতিথশালা আছে শুনি?"

মহেন্দ্র আর তর্কাতর্কি না করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সকালে উঠিয়া পার্ব্বতীর কাছে আসিয়া কহিল, "কি বিয়ে দিলে মা, একে নিয়ে সংসার করাই যে যায় না। আমি কলকাতায় চললুম।" পার্ব্বতী অবাক হইয়া কহিল, "কেন বাবা?" "তোমাদের নামে কটু কথা বলে—আমি ওকে ত্যাগ করলুম।" পার্ব্বতী কিছুদিন হইতেই বড় বৌয়ের আচরণ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু, সে ভাব চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, "ছিঃ বাবা, সে যে আমার বড় ভাল মেয়ে!" তাহার পর সে জলদকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, "বৌমা, ঝগড়া হয়েছে বুঝি?" সকাল হইতেই জলদ স্বামীর কলিকাতা-যাত্রার আয়োজন দেখিয়া মনে-মনে ভয় পাইয়াছিল; শাশুড়ীর কথায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "আমারই দোষ মা। কিন্তু ঐ দাসীরাই খরচপত্রের কথা নিয়ে বলাবলি করে।" পার্ব্বতী তখন সমস্ত শুনিল। নিজে লজ্জিত হইয়া বধুর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, "বৌমা, তুমি ঠিক বলেচ। কিন্তু আমি, মা, তেমন সংসারী নই, তাই খরচের দিকটা আমার স্মরণ ছিল না।" তাহার পর মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা, বিনাদোষে রাগ কোরো না—তুমি স্বামী, তোমার মঙ্গল-চিন্তার কাছে স্ত্রীর আর সব তুচ্ছ হওয়া উচিত। বৌমা তোমার লক্ষ্মী!" কিন্তু, সেই দিন হইতে পার্ব্বতী হাত গুটাইয়া আনিল। অতিথি-

শালার, ঠাকুরবাড়ীর আর তেমন সেবা হইল না; অনাথ, অন্ধ, ফকির অনেকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কর্ত্তা শুনিয়া পার্ব্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, "কনে-বৌ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কি ফুরাল না কি?" পার্ব্বতী সহাস্যে উত্তর দিল, "শুধু দিলেই চল্‌বে কেন? দিন কত জমা করাও ত চাই—দেখ্‌চ না, খরচ কত বেড়ে গেছে!" "তা' যাক্। আমার আর ক'দিন? দিনকতক সৎকর্ম্ম কোরে পরকালের দিকটা দেখা উচিত।" পার্ব্বতী হাসিয়া কহিল, "এ যে বড় স্বার্থপরের মত কথা গো! নিজেরটাই দেখ্‌বে, আর ছেলেমেয়েরা কি ভেসে যাবে? দিন কতক আবার চুপ করে থাকো, তার পর আবার সব হবে। কাজ মানুষের ত আর ফুরিয়ে যায় না!" কাজেই চৌধুরী মহাশয় নিরস্ত হইলেন।

পার্ব্বতীর এখন কাজ কমিয়াছে, তাই ভাবনাটা কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সমস্ত ভাবনারই একটা ধরণ আছে। যাহার আশা আছে, সে এক রকম করিয়া ভাবে; আর যাহার আশা নাই, সে অন্য রকমে ভাবে। পূর্ব্বোক্ত ভাবনার মধ্যে সজীবতা আছে; সুখ আছে, তৃপ্তি আছে, দুঃখ আছে, উৎকণ্ঠা আছে; তাই মানুষকে শ্রান্ত করিয়া আনে—বেশী ক্ষণ ভাবিতে পারে না। কিন্তু, আশাহীনের সুখ নাই, দুঃখ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, অথচ তৃপ্তি আছে। চোখ দিয়া জলও পড়ে, গভীরতাও আছে—কিন্তু নিত্য নূতন করিয়া মর্ম্মভেদ করে না। হাল্কা মেঘের মত যথাতথা ভাসিয়া চলে। যেখানে বাতাস লাগে না, সেখানে দাঁড়ায়; আর যেখানে লাগে, সেখান হইতে সরিয়া যায়। তন্ময় মন উদ্বেগহীন চিন্তায় একটা সার্থকতা লাভ করে। পার্ব্বতীর আজকাল ঠিক তাই হইয়াছে। পূজা-আহ্নিক করিতে বসিয়া অস্থির, উদ্দেশ্যহীন, হতাশ মনটা চট্ করিয়া একবার তালসোনাপুরের বাঁশঝাড়, আমবাগান, পাঠশালাঘর, বাঁধের পাড় প্রভৃতি ঘুরিয়া আসে। আবার হয় ত এমন কোন স্থানে লুকাইয়া পড়ে যে, পার্ব্বতী নিজেকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। আগে হয় ত ঠোঁটের কোণে হাসি আসিয়াছিল, এখন হয় ত এক ফোঁটা চোখের জল টপ্ করিয়া কোশার জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তবু দিন কাটে। কাজ করিয়া, মিষ্ট কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরোপকারি, সেবা-শুশ্রূষা করিয়াও কাটে, আবার সব ভুলিয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতও কাটে। কেহ কহে লক্ষ্মীস্বরূপা অন্নপূর্ণা!' কেহ কহে অন্যমনস্কা উদাসিনী! কিন্তু কাল সকাল হইতে তাহার অন্য এক রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। যেন কিছু তীব্র, কিছু কঠোর। সেই পরিপূর্ণ, থম্‌থমে, জোয়ার গঙ্গায় যেন হঠাৎ কোথা হইতে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। বাড়ীর কেহ কারণ জানে না, শুধু আমরা জানি। মনোরমা কাল গ্রাম হইতে একখানা পত্র লিখিয়াছে। যাহা লিখিয়াছে, তাহা এইরূপ :—

"পার্ব্বতী, অনেক দিন হইতে দুজনের কেহ কাহাকেও পত্র লিখি নাই; সেজন্য দোষটা উভয়তঃ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা একটা মিটমাট্ হইয়া যায়। দুজনেই দোষ স্বীকার করিয়া অভিমানটা কম করি! কিন্তু আমি বড়, তাই আমিই মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম। ভরসা করি শীঘ্র উত্তর দিবে। আজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছি। আমরা গৃহস্থঘরের মেয়েরা শারীরিক ভালমন্দটা তেমন বুঝি না। মরিলে বলি, গঙ্গায় গিয়াছে; আর বাঁচিয়া থাকিলে বলি, ভাল আছে। আমিও তাই ভাল আছি। কিন্তু এ তো গেল নিজের কথা। বাজে কথা। কাজের কথাও এমন যে কিছু আছে, তা'ও নয়; তবে একটা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কাল হইতে ভাবিতেছি দিব কি না। দিলে তোমার ক্লেশ হইবে, না দিলেও আমি বাঁচি না;—যেন মরিচের দশা হইয়াছে। দেবদাসের কথা শুনিয়া তোমার ত দুঃখ হইবেই; কিন্তু আমিও যে তোমার কথা মনে করিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে, তুমি যে অভিমানিনী,—তা'র হাতে পড়িলে, এতদিনে, হয় জলে ডুবিতে, না হয় বিষ খাইতে। আর তা'র কথা আজ শুনিলেও শুনিবে, দুদিন পরে হইলেও শুনিবে; কেন না, যে কথা সংসার-শুদ্ধ লোকে জানে, তার আর চাপাচাপি কি?

"আজ প্রায় ৬।৭ দিন হইল, সে এখানে আসিয়াছে। তুমি ত জান, জমিদার গৃহিণী কাশীবাসী হইয়াছেন, আর দেবদাস কলিকাতাবাসী হইয়াছে। বাড়ী আসিয়াছে শুধু দাদার সহিত কলহ করিতে, আর টাকা লইতে! শুনিলাম, এমন সে মধ্যে-মধ্যে আসে;—যতদিন টাকার জোগাড় না হয়, ততদিন থাকে,—টাকা পাইলেই চলিয়া যায়।

"তাহার পিতা মরিয়াছেন আজ আড়াই বছর হইল।

শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, এইটুকু সময়ের মধ্যেই সে না কি তাহার অর্দ্ধেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। দ্বিজদাস না কি বড় হিসাবী লোক, তাই কোন'মতে পৈত্রিক সম্পত্তি নিজে রাখিয়াছে, না হইলে এতদিনে পাঁচজনে লুটিয়া লইত। মদ ও বেশ্যায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? এক পারে যম! আর তা'রও বোধ হয় বেশী দেরি নাই। সর্ব্বরক্ষা—যে বিবাহ করেনি।

"আহা, দুঃখও হয়! সে সোণার বর্ণ নাই, সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই,—এ যেন আর কেহ! রুক্ষ চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, নাক যেন খাঁড়ার মত উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। কি কুৎসিত যে হইয়াছে, তোমাকে আর তা কি বলিব! দেখিলে ঘৃণা হয়, ভয় করে। সমস্ত দিন নদীর ধারে, বাঁধের পাড়ে বন্দুক-হাতে পাখী মারিয়া বেড়ায়। আর রৌদ্রে মাথা ঘুরিয়া উঠিলে, বাঁধের পাড়ে সেই কুলগাছটার তলায় মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ী গিয়া মদ খায়,—রাত্রে ঘুমায় কি ঘুরিয়া বেড়ায়, ভগবান জানেন।

"সেদিন সন্ধ্যার সময় নদীতে জল আনিতে গিয়াছিলাম; দেখি, দেবদাস বন্দুক-হাতে ধারে-ধারে শুষ্ক মুখে চলিয়া যাইতেছে। আমাকে চিনিতে পারিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—আমি ত ভয়ে মরি! ঘাটে জনপ্রাণী নাই—আমি সেদিন আর আমাতে ছিলাম না। ঠাকুর রক্ষা করিয়াছেন যে কোনরূপ মাতলামি কি বদমায়েসী করে নাই। নিরীহ ভদ্রলোকটীর মত শান্তভাবে বলিল, "মনো, ভাল আছ'ত দিদি!" আমি আর করি কি, ভয়ে-ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, "হুঁ"। তখন সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সুখে থাক বোন্. তোদের দেখ্‌লে বড় আহ্লাদ হয়।" তার পর আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল। আমি উঠি ত পড়ি—প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইলাম। মাগো! ভাগ্যে হাত-টাত কিছু ধরিয়া ফেলে নাই! যাক্ তা'র কথা—সে সব দুর্ব্বৃত্তের কথা লিখিতে গেলে চিঠিতে কুলায় না।

"বড় কষ্ট দিলাম কি বোন? আজিও তাহাকে যদি না ভুলিয়া থাক ত কষ্ট হইবেই; কিন্তু উপায় কি? আর, সে জন্য রাঙ্গা পায়ে যদি অপরাধ হইয়া থাকে ত নিজ গুণে তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী মনো দিদিকে ক্ষমা করিয়ো।"

কাল পত্র আসিয়াছিল। আজ সে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, "দুটো পাল্কি আর বত্রিশ জন কাহার চাই, আমি এখনি তালসোনাপুরে যাব।" মহেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "পাল্কি বেহারা আনিয়ে দিচ্চি, কিন্তু দুটো কেন মা?" পার্ব্বতী কহিল, "তুমি সঙ্গে যাবে বাবা। পথে যদি মরি, মুখে আগুন দিবার জন্য বড় ছেলেকে প্রয়োজন।" মহেন্দ্র আর কিছু কহিল না। পাল্কি আসিলে দুইজনে প্রস্থান করিল। চৌধুরী মহাশয় শুনিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া দাসদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কিন্তু কারণ বলিতে পারিল না। তখন তিনি বুদ্ধি খরচ করিয়া, আরও পাঁচ-ছয় জন দারওয়ান, দাসদাসী পাঠাইয়া দিলেন। একজন সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল, "পথে দেখা হলে পাল্কি ফিরিয়ে আন্‌তে হবে কি?" তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "না তা'তে কাজ নেই। তোমরা সঙ্গে যেয়ো—যেন কোন বিপদ-আপদ ঘটে না।" সেই দিন সন্ধ্যার পরে পাল্কি দুইটা তালসোনাপুরে পৌঁছিল, কিন্তু দেবদাস গ্রামে নাই। সেইদিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। পার্ব্বতী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, অদৃষ্ট! মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। মনো বলিল, "পারু কি দেবদাসকে দেখ্‌তে এসেছিলে?" পার্ব্বতী বলিল, "না, সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম। এখানে তার আপনার লোক ত কেউ নেই।" মনোরমা অবাক্ হইল। কহিল, "বলিস্ কি? লজ্জা করত না?" "লজ্জা আবার কা'কে? নিজের জিনিষ নিজে নিয়ে যাব—তাতে লজ্জা কি?" "ছিঃ ছিঃ—ও কি কথা? একটা সম্পর্ক পর্য্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে এনো না।" পার্ব্বতী ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "মনো দিদি, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা করে আছে, এক আধবার তা' মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন তাই এ কথা শুন্‌লে।" পর দিন প্রাতঃকালে পার্ব্বতী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় পাল্কিতে উঠিল।

রাজধানী দিল্লী

[শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র রায়]

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড হার্ডিং যখন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন, তখন আমাদিগের অনেকের কাছে ইহা একটি প্রকাণ্ড বিপ্লব ও প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইয়াছিল। দিল্লী সম্বন্ধে আমার মত, ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাদিগের মত হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক ও স্বতন্ত্র। ইংরেজের ভারতবর্ষ-জয়, এবং এ দেশে ইংরেজ-শাসনের আরম্ভ হইতে, ইংরেজ নামের সহিত বঙ্গদেশ ও কলিকাতার প্রাধান্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছিল। সেই ইংরেজ দেড়শত বৎসরাধিক কাল কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রাজশক্তির বিকাশ করিয়া এখান হইতে একহাজার মাইল পশ্চিমে বিস্তার। ইংরেজ সমুদ্র দিয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানেই প্রথমে রাজ্যাধিকার লাভ করেন। সে ইতিহাস বলিবার স্থান এ নয়! কিন্তু সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী রাজধানী কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে রাজধানী স্থাপন করা যে সম্ভব, ইহা কখনও বাস্তব রাজনীতি-চর্চ্চায়, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রশ্ন বলিয়া পূর্ব্বে কাহারও মনে উদিত হয় নাই। সে যাহা হউক, লর্ড হার্ডিং রাজধানী দিল্লীতে পরিবর্ত্তিত করিয়া ইংরেজ শাসননীতির বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন কি না, আমি এ স্থলে তাহার বিচার করিতে চাহি না। তবে আমার নিজের বিশ্বাস, একমাত্র
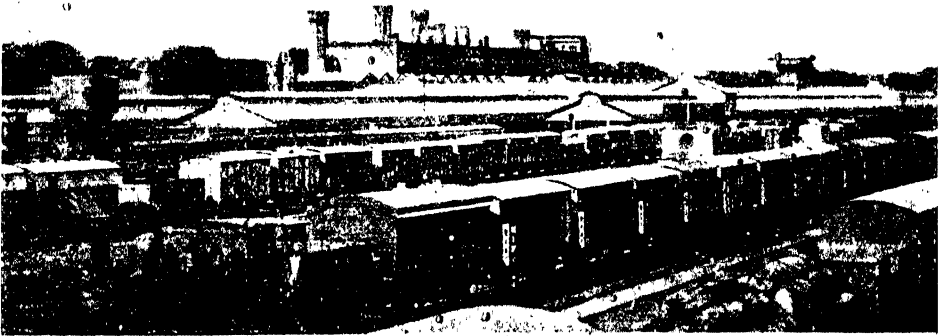
দিল্লী ষ্টেশন

রাজধানী স্থাপন করিলেন কেন, ইহার গূঢ় তত্ত্ব আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি নাই। দিল্লীই ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী হইবার উপযুক্ত স্থান।

ইংরেজের রাজশক্তির এত অদ্ভুত বিকাশের প্রথম ও প্রধান কারণ—সমুদ্রের উপর ইংরেজের অলৌকিক ক্ষমতা-

আমি গত পঁচিশ বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। পেশওয়ারের পশ্চিম লাণ্ডিকোটাল হইতে ব্রহ্ম-

তীরবর্ত্তী কামাখ্যা তীর্থ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় ত দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ও

আধুনিক যত স্থান দেখিয়াছি,—দিল্লীর ন্যায় রাজধানীর উপযুক্ত স্থান আর কোথাও দেখি নাই।
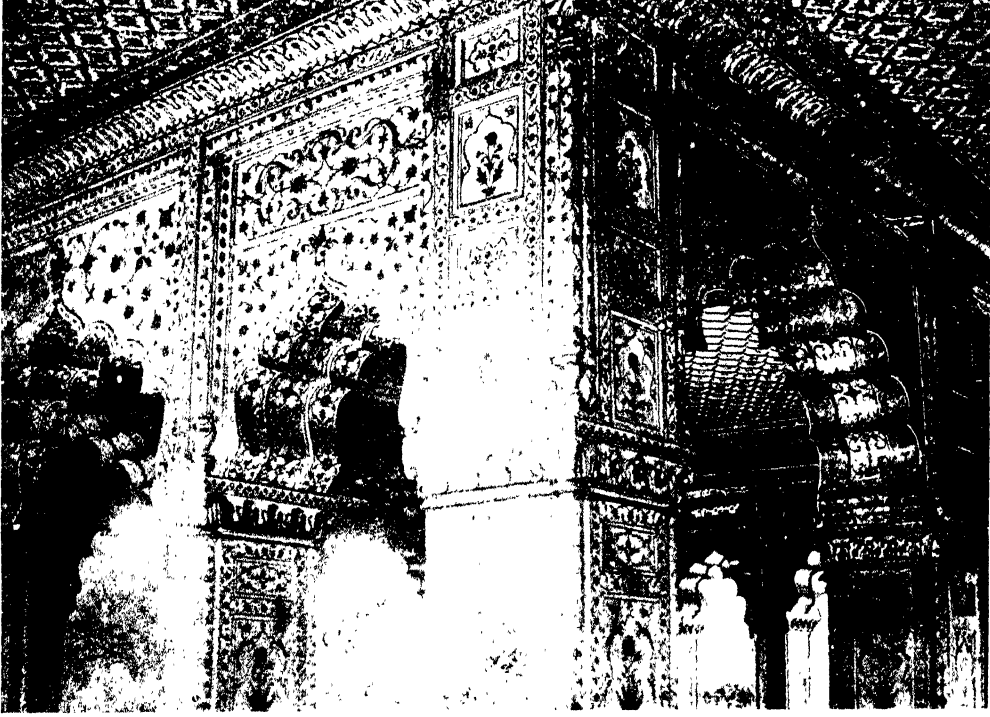
দেওয়ান ই খাস
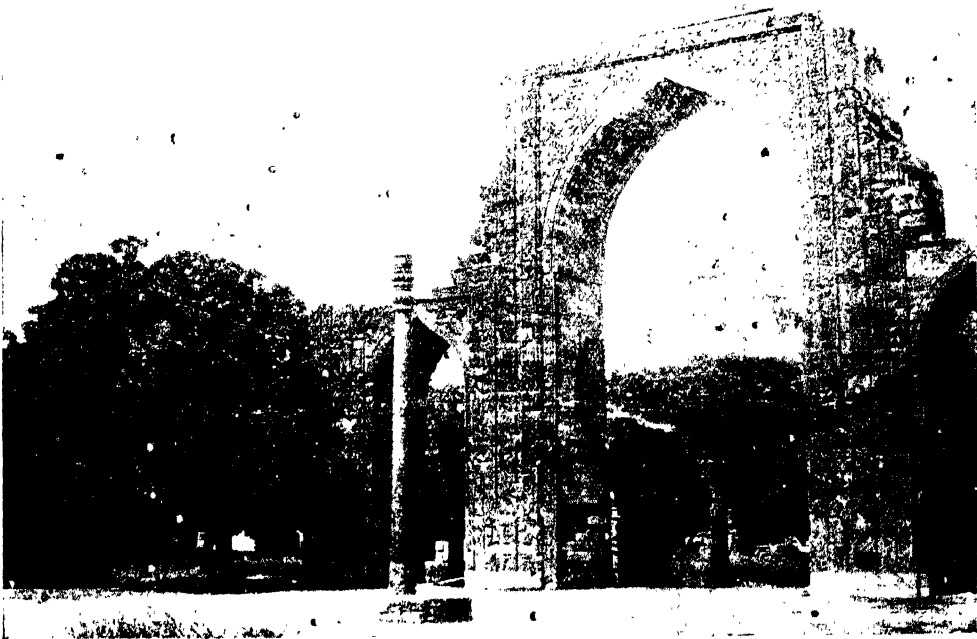
অশোক-অনুশাসন-স্তম্ভ
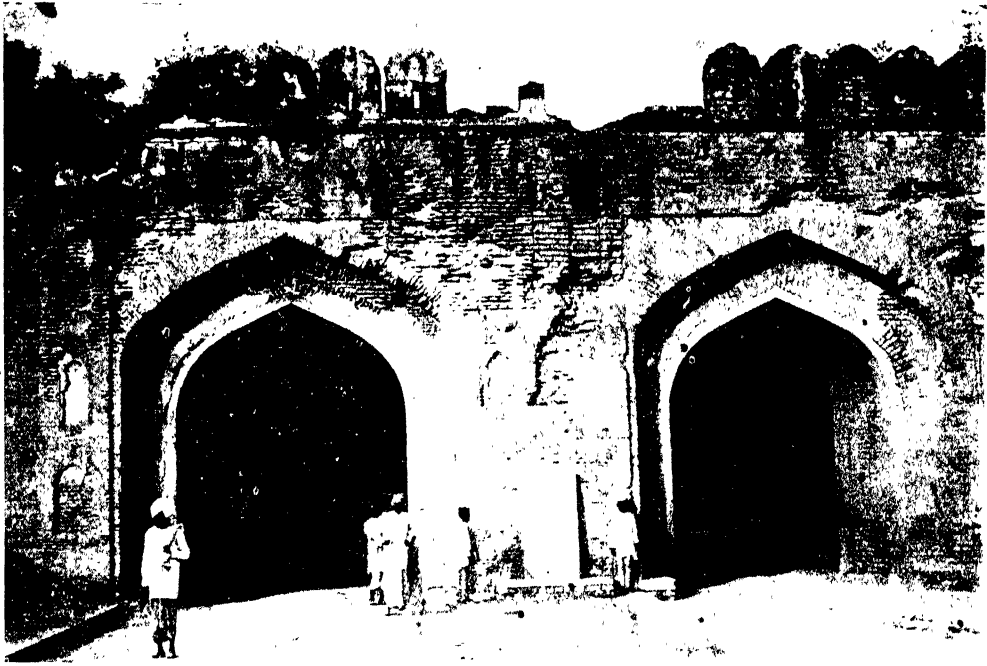
কাশ্মীর গেট
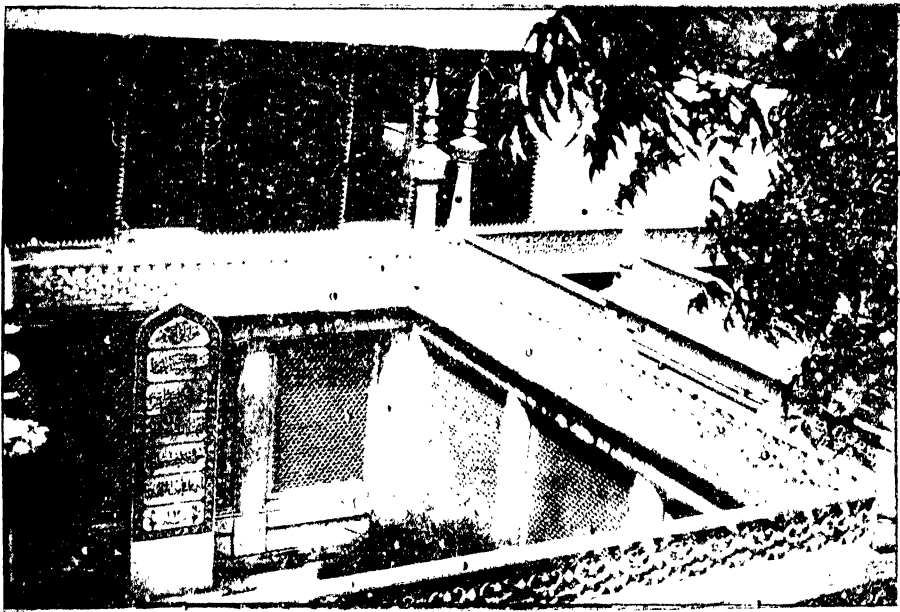
জাহানারার সমাধি

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যত সাম্রাজ্য স্থাপিত ও ধ্বংস হইয়াছে,—দিল্লীই তৎসমুদয়ের একমাত্র স্মৃতিস্তম্ভ ! দিল্লী অথবা তান্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন ঋক্ রচিত, কিম্বা সাম গান উচ্চারিত হইয়াছিল কি না, ইতিহাস্ সে তথ্য এখনও পরিস্কার রূপে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম যে উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই আর্য্যাবর্ত্তে দিল্লীই যে সর্ব্বপ্রধান রাজধানী ছিল, সে বিষয় সন্দেহ করিবার বিশেষ

কোন কারণ নাই। ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি—প্রাতঃস্মরণীয় ভারত-সম্রাট যুধিষ্ঠির এই দিল্লীর অন্তর্বর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে হিন্দু-সভ্যতার প্রাধান্য প্রচার করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে যোগমায়া মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতার অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই যোগমায়া মূর্ত্তি এখনও কুতব-প্রাঙ্গণে বিরাজমানা
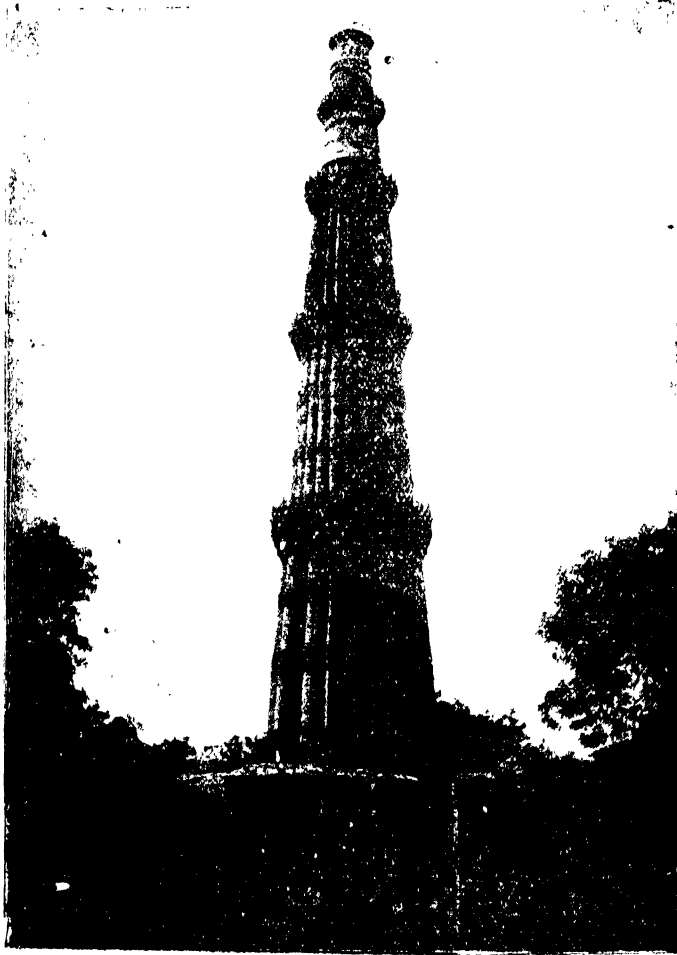
কুতব মিনার

রহিয়াছেন। বৌদ্ধসভ্যতার অরুণোদয়ে রাজর্ষি অশোক যে সকল অনুশাসন-স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার দুইটি এখনও দিল্লীর দুইটি বিভিন্ন স্থানে মস্তকোত্তোলন করিয়া গৌতমের ধর্ম্মনীতির চরমোৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিৎ পাণ্ডব-প্রবর যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকারী ছিলেন। পরীক্ষিৎ হইতে পাণ্ডুবংশীয় ৬৬ জন নরপতি এই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের শেষ রাজার নাম রাজপাল। কথিত আছে, মহারাজা রাজপাল কুমায়ুন রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়া কুমায়ুনরাজ সুখবন্ত কর্ত্তৃক নিহত হন। জয়োল্লাস-মত্ত সুখবন্ত দেশবৈরী রাজপালের ইন্দ্রপ্রস্থ নগর অধিকার করিলেন; কিন্তু তাহা অধিক দিন ভোগ করিতে পারিলেন না। রাজচক্রবর্ত্তী তুয়ার-নৃপতি স্বনামধন্য বিক্রমাদিত্য সুখবন্তের গ্রাস হইতে ইন্দ্রপ্রস্থ উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব শোভার পুনরুদ্ধার না করিয়া, নিজরাজ্য উজ্জয়িনীতে চলিয়া গেলেন। বহুদিন অবধি ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। এই শূন্য শ্মশানতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থকে যিনি নিজ ক্ষমতাবলে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলেন, তাঁহার নাম অনঙ্গপাল। তুয়ার-বংশ-অবতংশ মহারাজা অনঙ্গপাল ৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রপ্রস্থকে দিল্লী নামে অভিহিত করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। মহারাজ অনঙ্গপালের পর বিংশতি জন নরপতি ইন্দ্রপ্রস্থে শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এই তুয়ার-বংশের শেষ রাজার নামও অনঙ্গপাল ছিল। এই দ্বিতীয় অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রকে অতিক্রম করিয়া, কনিষ্ঠ দৌহিত্র—সর্ব্বগুণাধার চৌহান-বীর পৃথ্বীরাজকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বার্দ্ধক্যে শান্তিময়ী মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই চৌহান কুলরত্ন রাজপুত-গরিমা পৃথ্বীরাজ যখন লাল-কোটে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তখন হিন্দু-সাম্রাজ্যের জীবনসন্ধ্যা। ভ্রাতৃবিচ্ছেদরূপ কাল মেঘ ভারত-গগনকে ধীরে-ধীরে চিরতরে আচ্ছন্ন করিতেছিল। ভ্রাতৃবিরোধই পৃথ্বীরাজ এবং সমগ্র হিন্দু-স্বাধীনতার পতনের মূল কারণ। মহাবীর পৃথ্বীরাজ বারবার মহম্মদ ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াও হিন্দু-স্বাধীনতা এবং আপনার সিংহাসন রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভ্রাতার পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার ভ্রাতাকে ভোগ করিতে হয়,—ইহাই বিধাতার নিয়ম ও অনুশাসন। বিধাতার নিয়ম

প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের অসাধ্য; তাই চৌহান কুলকেশরী পৃথ্বীরাজ বীরশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়াও ভ্রাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপনার হৃদয়-শোণিত দান করিয়া অক্ষয় বীরলোক প্রাপ্ত হইলেন।' পৃথ্বীরাজের সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দুর গৌরব-রবিও চিরতরে অস্তমিত হইল। ভারত-ইতিহাসের গৌরবময় পরিচ্ছেদের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন এখন দিল্লী সগর্ব্বে বহন করিয়া পুরা-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

পৃথ্বীরাজের প্রসিদ্ধ দুর্গ ভাঙ্গিয়া সেই সব উপাদানে আলাউদ্দিন, আল্‌তামাস ও কুতবউদ্দিন যে সব কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। সে আজ সাত আট-শত বৎসরের কথা। তার পর ঐ স্থানের পাঁচ মাইল পূর্ব্বে আরাবল্লি পর্ব্বতের অনুন্নত শিখরে মহম্মদ সাহ টুগ্‌লগ্‌ তাঁহার রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন ঐ বিস্তৃত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন দেখিবার আর কিছুই নাই। কুতব হইতে টুগ্‌লগাবাদ হইয়া দিল্লীতে ফিরিতে হইলে, পথিমধ্যে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির দৃষ্ট হয়। এই হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরের আদর্শে সাজাহান আগ্রায়—পৃথিবীর ভিতরে স্থপতি বিদ্যার চরমোৎকর্ষ—ভুবনমোহিনী, সৌন্দর্য্যময়ী, মন্মরবিলাপ তাজমহল স্থাপন করেন। ঐ রাস্তা দিয়া ফিরিয়া আসিতে সাজাহানের দুর্গ ও তাঁহার ভুবনবিখ্যাত রাজধানী নয়ন-গোচর হয়। এই রাজধানীর প্রধান-প্রধান সৌষ্ঠব নানাদেশীয় বিজেতৃগণ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তথাপি য়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে সহস্রাধিক লোক প্রতি বৎসর এই অপরূপ রাজধানীর বিচিত্র মহিমা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে আসিয়া থাকেন। এক সময় এই রাজধানীর দেওয়ান-ই-আমে ভুবনবিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন অবস্থিত ছিল।

সাজাহানের দুর্গ হইতে কিছু দূর উত্তরে আসিয়া দিল্লীনগরের প্রসিদ্ধ কাশ্মীর-গেট দৃষ্ট হয়। ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই কাশ্মীর-গেটেই ইংরাজ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ জয় করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়, তখন সিপাহীরা ইংরাজ-শক্তিকে দিল্লী হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়াছিল। দিল্লী সহর আয়ত্ত করিয়া সিপাহীরা ইংরেজকে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। সে দুরাশা ফলবতী হইলে, আজ ভারতের ইতিহাস ভিন্ন প্রকারে লিখিত হইত। এই দিল্লী পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া ইংরেজ এ দেশে তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই, দিল্লীশ্বর না হইতে পারিলে,

মিউটিনী মনুমেণ্ট

ভারত-সাম্রাজ্যের ঈশ্বর হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই কথার এত বহুল প্রচার হইয়াছিল।

যে স্থানে দাঁড়াইয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের ইতিহাস—কুরু, পাঞ্চাল ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত, বিপুল শক্তিশালী রাজপুত, মোগল, পাঠান ও আফগানের কীর্ত্তিস্তম্ভ দৃষ্ট

দেওয়ান-ই আম

হয়, যেখানে কলিযুগেও ভারতের অদৃষ্ট বারবার পরীক্ষিত হইয়াছে, সেরূপ স্থানে যদি রাজধানী স্থাপিত না হয়—তবে ভারতবর্ষে অন্য কোনও যোগ্যতর স্থান আছে কি না, তাহা আমি জানি না।

এই যমুনা-তীরবর্ত্তী দিল্লীর অনতিদূরে—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে রাজপুতনা, পশ্চিমে পঞ্চনদী, পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত,—ভারতের মানচিত্রে রাজধানীর ইহাই উপযুক্ত স্থান। এবং অতি পুরাকাল হইতে ইহাই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট রাজধানী। যখনই কোন দিগ্বিজয়ী ভারতবর্ষ জয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন—এই দিল্লীতে আসিয়াই তাঁহাদিগকে বল এবং ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে হইয়াছে। কত-কতবার হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ এই দিল্লীতেই তাঁহাদের ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। যে স্থান শিখ, রাজপুত, হিন্দুস্থানী ও পার্ব্বতীয় বীর্য্যের কেন্দ্রভূমি—সেই স্থানে ভারতের ভাগ্য ও বীরের বাহুবল পরীক্ষা না হইয়া আর কোথায় হইবে? অপর দিকে ভারতের মানচিত্র খুলিয়া দেখুন,—যেখানে ভারতের মরুভূমি শেষ হইয়াছে, যেখানে যমুনার সুশীতল জলে আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুরা ভৌগোলিক উপদ্রব হইতে শান্তি পাইয়াছিলেন, সেই স্থানের নামই দিল্লী। যে দিকে যত দূর চলিয়া যাইবেন,—দিল্লীর চারিদিকেই জানিবার, শিখিবার ও দেখিবার অনেক ঐতিহাসিক দৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং দিল্লীর চতুর্দ্দিক প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি ও সাতটি সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে এখনও বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট সাতটি রাজধানী আধুনিক দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত। সে সাতটির নাম এই,—১ম সাজাহানাবাদ, ২য় ফিরোজাবাদ, ৩য় ইন্দ্রপ্রস্থ, ৪র্থ সিরি (অনেকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে) ৫ম জাহানাপানা, ৬ষ্ঠ টুগ্‌লগাবাদ, ৭ম অনঙ্গপাল ও পৃথ্বীরাজের রাজধানী লালকোট। এই লালকোটেই কুতবমিনার অবস্থিত। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই মিনার কুতবউদ্দীনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী; ইহা কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, চৌহান বীর পৃথ্বীরাজ যমুনা-দর্শনান্তে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় কন্যাকে এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই স্তম্ভের তুলনায় রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ এবং কলিকাতার মনুমেণ্ট অতি নিষ্প্রভ ও হীন বলিয়া মনে হয়।

যে দিকে চলিয়া যান,—কোন দিকে পাইবেন আগ্রা, কোন দিকে পাইবেন মথুরা-বৃন্দাবন, কোন দিকে ধর্ম্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্র। দিল্লীর রাস্তারও অবধি নাই, বিস্তৃতিরও অবধি নাই। সেই জন্যই বোধ হয় বিখ্যাত ফকির নিজামুদ্দিনের ভাষায় "দিল্লী হানাজ দুরাষ্ট" (দিল্লী এখনও বহু দূরে) এই কথা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আমি দিল্লী সম্বন্ধে এ যাবৎ যাহা বলিয়াছি, তাহা পড়িয়া অনুগ্রহ করিয়া কেহই মনে করিবেন না যে, দিল্লীর বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই। দিল্লীর বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা এই—ইহা ভারতবর্ষের ত্রিংশ শতাব্দীর মহা শ্মশানভূমি। স্বাভাবিক মৃত্যু ছাড়া যুদ্ধে, বিগ্রহে ও বিপ্লবে, নাদেরসা-আহাম্মদসার অমানুষিক অত্যাচারের সময় ও সিপাহী-বিদ্রোহান্তে এই দিল্লী কতশতবার মনুষ্যরক্তে প্লাবিত হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক স্মৃতি অতি অপ্রীতিকর; এবং শ্মশানভূমির বিরুদ্ধে মানুষের যে বিরাগ দৃষ্ট হয়, দিল্লীর বিরুদ্ধেও সে বিরাগ স্বাভাবিক। তার পর সাজাহানাবাদ অতি অশোভন ও অস্বাস্থ্যকর বাসভূমি; এবং উত্তর-ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থরের ন্যায় মশা ও মাছিতে পরিপূর্ণ। গরমের সময় দিল্লী এত উত্তপ্ত হয় যে, সে সময় তথায় বাস করা অত্যন্ত অসুখকর। রাজধানী দিল্লীতে পরিবর্ত্তিত হইবার পরে দিল্লীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গত ছয়বৎসরের ভিতর দিল্লী-সহরে যে সকল রাস্তা-ঘাট ও উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। সাজাহানাবাদের প্রাচীরের বহিঃপ্রদেশে ইংরেজ যে বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আরব্য-উপন্যাসের গল্প বলিয়া মনে হয়। এ কয় বৎসরে দিল্লীর স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং আশা করা যায় যে, আর কিছুদিন পরে দিল্লীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার থাকিবে না।

দিল্লীর রাজপথ

দিল্লীতে রাজধানী হইয়া দেশীয় রাজন্যবর্গেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা ভারতবর্ষের এত পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত যে, রাজকার্য্যে এবং রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে, আসিতে রাজগণের বিশেষ অসুবিধা হয়। দূর ও অসুবিধার কথা ছাড়িয়া দিলেও, একসঙ্গে অনেক রাজার সমাগম হইলে, কলিকাতায় তাঁহাদের স্থান পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। যে সকল নৃপতি

দিল্লীর রাজপথ (অপর পার্শ্ব)

ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশ শাসন করিতেছেন, সেই রাজন্যবর্গের বিশেষ অসুবিধা করিয়া কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হওয়া সম্ভবপর নয়। নূতন দিল্লীতে দেশীয় রাজাদিগের জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট বিস্তৃত ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

আর একটি কথা এই যে, যুদ্ধান্তে যখন ভারতবর্ষের সহিত য়ুরোপের লৌহবর্ত্মের সংস্রব সংস্থাপিত হইবে, তখন দিল্লীকেই ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। এখনই দিল্লী ভারতবর্ষের ভিতরে একটি প্রধান রেলওয়ে ষ্টেসন। ভারতবর্ষে যত রেলওয়ে আছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান পাঁচটির দিল্লীই বর্ত্তমান কেন্দ্রস্থল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, আউদ্ (অযোধ্যা) রোহিলখণ্ড রেলওয়ে, বম্বে-বরদা সেণ্ট্রল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং জি-আই-পি রেলওয়ে,—এইপাঁচটি প্রধান-প্রধান রেলওয়েই দিল্লীতে আসিয়া মিশিয়াছে। ইহা ছাড়াও, দিল্লী আরও তিন-চারিটি রেলওয়ের মিলন-কেন্দ্র।

প্রাচীনকালে রোম সম্বন্ধে লোকে বলিত "All roads lead to Rome." দিল্লীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ বলা যাইতে পারে All roads lead to Delhi বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, ইটালীতে রোম যেমন Eternal City বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষে দিল্লীও সেইরূপ Eternal City.

কল্পতরু

ডেলাক্রয়

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ফার্ডিনাণ্ড ভিক্টর ইউজিন ডেলাক্রয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী চিত্রকর বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে এপ্রেল), সেই সময়ে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল। ডেলাক্রয়ের 'লিখিত চিত্রাবলীর পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, ফ্রান্স দেশের তৎকালীন অবস্থা এই চিত্রকরের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কাব্যে যেমন কবির মানসিক ভাব, চিন্তাপ্রণালী, পারিপার্শ্বিক অবস্থা,—সমাজ ও রাজনৈতিক প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিফলিত হয়, চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রেও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ, ডেলাক্রয়ের অঙ্কিত চিত্রকলকে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। ফ্রান্সের ডেলাক্রয়,—ইটালীর মাইকেল এঞ্জেলো, হলণ্ডের রেমব্রাণ্ট, স্পেনের ভেলাসকোয়েজ ও ইংলণ্ডের টার্ণারের সমশ্রেণীর চিত্রকর এবং

সর্ব্ববিষয়ে ইঁহাদের সমকক্ষ। এই সকল শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এবং চিত্রের নির্ব্বাচিত বিষয়-সমূহ বিভিন্ন প্রকারের হইলেও, একটি বিষয়ে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান—অর্থাৎ ইঁহাদের সকলেরই অঙ্কিত চিত্রাবলীর উপর তাঁহাদের নিজ-নিজ দেশের সমসাময়িক অবস্থা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই হিসাবে, ডেলাক্রয়কে কেবল ফ্রান্সের নহে, তাঁহার সমসাময়িক সকল দেশেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলা যাইতে পারে। ডেলাক্রয়ের সকল চিত্রই মৌলিক এবং সময়োপযোগী—তাঁহার চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এবং বিষয়-নির্ব্বাচন-প্রণালী সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার নিজস্ব; অথচ, চিত্রাঙ্কন-প্রতিভার স্ফুরণ বিষয়ে তিনি টিশিয়ান হইতে রুবেন্স পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের শ্রেণী-বহির্ভূত নহেন। তাঁহার চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা কোন বিষয়বিশেষে আবদ্ধ ছিল না; এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী যে-কোন বিষয়েরই চিত্র অঙ্কিত করুন না কেন, সর্ব্বত্রই সফলতা লাভ করিতে পারিতেন।

ডেলাক্রয় কেবল যে চিত্রকর ছিলেন, তাহা নহে; তিনি সাহিত্য-চর্চ্চাও করিতেন এবং সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত দর্শনশাস্ত্র-সংক্রান্ত গ্রন্থ, সমালোচনা ও আত্মজীবনচরিত ফরাসী সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ হইতে তাঁহার শিল্প-জীবনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রোজনামা এবং পত্রাবলী সুখ-পাঠ্য রচনা। ইহা ব্যতীত তিনি সাময়িক ও মাসিক পত্রাদিতে বহু প্রবন্ধ লিখিতেন। এই সকল বিবরণ হইতে ডেলাক্রয়ের জীবনী-লেখকগণ প্রচুর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
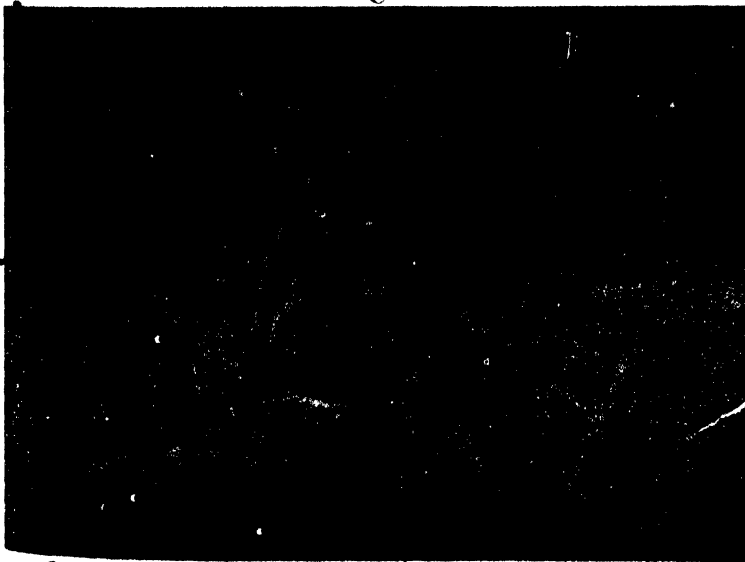
দেসদেমোনার প্রতি তাঁহার পিতার অভিশাপ

দাস্তে ও ভার্জিল

কাল্পনিক বা বাস্তব—উভয় শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে ডেলাক্রয় সমানভাবে দক্ষতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস, কিম্বদন্তী অথবা কল্পনা—সকল বিষয় হইতেই তিনি চিত্রের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিতেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারগণের নাটক, বা উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রসকল চিত্রে প্রতিফলিত করিতে তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। এইরূপে সেক্সপীয়র ও সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস-নাটকের অনেক চরিত্র ডেলাক্রয়ের ঐন্দ্র-

ইউজিন ডেলাক্রয়

জালিক তুলিকাস্পর্শে বাস্তব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দর্শকগণের চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অফেলিয়া, হ্যামলেট, টাসো, পাগানিনি, বায়রণ, ডন জুয়ান এবং আরও বহু চিত্র ডেলাক্রয়ের কলাকুশলতার নিদর্শনস্বরূপ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। আবার বাস্তব ঘটনাসমূহেরও তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহারাও তাঁহার মানসী চিত্রগুলির সহিত তুলনায় কোন অংশে হীন নহে। টেইলিবুর্গের যুদ্ধ (Battle of Taillebourg), খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যোদ্ধৃগণের (Crusaders) কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রবেশ, ন্যান্সীর যুদ্ধ প্রভৃতির চিত্র তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তিনি চিত্রজগতে অনেক নূতন অনাবিষ্কৃত তথ্যের উদ্ভাবন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। ডেলাক্রয় সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী এবং স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সঙ্গীতানুরাগের ফলে তাঁহার কল্পনা অনেক মহৎ ও জটিল বিষয়ের চিত্রাঙ্কনে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছে, এবং অনেক গভীর তত্ত্বের সমাধান করিয়াছে। ডেলাক্রয় কবিগণের এমন ভক্ত ছিলেন, এবং সুকবির কবিত্বের এমন পক্ষপাতী ছিলেন যে, কাব্যগ্রন্থ পাঠকালে তিনি ঐ সকল কাব্যের রচয়িতৃগণের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। দান্তে, সেক্সপীয়র, বায়রণ ও গেটের কল্পনা ও চিন্তা ডেলাক্রয়ের

চিলনের বন্দী

কেটোর মৃত্যু

আলজিয়াসের পুরমহিলা

তুলিকার সঞ্চালনে চিত্রপটে অবিকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ডেলাক্রয় চিত্রের উচ্চ আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তবের অনাদর করিতেন না। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিতেন, কিন্তু প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ করিতেন না; তিনি প্রকৃতি হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে স্বীয় কল্পনার প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার চিত্রে অভিনবত্বের আরোপ করিতে পারিতেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল প্যারীর নিকটবর্ত্তী সিউ (Sceaux) নামক স্থানের সন্নিহিত চারেণ্টন গ্রামে ডেলাক্রয় জন্মগ্রহণ করেন।

সিও নগরের হত্যাকাণ্ড

লাইসি লুই লে গ্র্যাণ্ড নামক বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যকালে তিনি লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগী ছিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কিছুমাত্র আভাষ পাওয়া যায় নাই, অথবা শৈশবে তাঁহার চিত্র-প্রতিভার কোনরূপ স্ফুরণ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার হৃদয়ে চিত্র-শিল্পের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে একবার তিনি নর্ম্মাণ্ডি প্রদেশের অন্তর্গত য়্যাবি-অব-ভ্যালমণ্ট নামক একটি পুরাতন, ভগ্ন, জীর্ণ গির্জ্জা দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেই দৃশ্য তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। উত্তর কালে তিনি চিত্রবিদ্যাকে তাঁহার জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া যখন বায়রণ, ওয়াল্টার স্কট প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত ঘটনাসমূহ চিত্রে প্রতিফলিত করিতেছিলেন, তখন বাল্যকালে দৃষ্ট ঐ গির্জ্জার চিত্রটী সর্ব্বদা তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইত। আত্ম জীবনীতে এবং পত্রাবলীতে তিনি এই ধর্ম্মমন্দিরের বর্ণনা করিয়াছেন। গভীর রজনীতে শুদ্ধ প্রকৃতির ক্রোড়ে ঐ প্রাচীন, অর্দ্ধভগ্ন গির্জ্জায় ভগ্ন, উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া শন্-শন্ শব্দে বায়ু প্রবাহিত হইত, বাদুড়েরা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইত; তাহাদের পক্ষ-সঞ্চালন-শব্দে ভবিষ্যৎ চিত্রকরের নিদ্রাভঙ্গ হইত; সেই সময়ে তিনি সেই গির্জ্জার অন্ধকারময় দালানের ভিতর দিয়া স্বপ্ন-সঞ্চালিতের ন্যায় ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পদধ্বনি শুষ্ক গির্জ্জার দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হইত, এবং তাঁহার চিত্ত বিচিত্র কল্পনায় ভরিয়া উঠিত। তাঁহার পছন্দ অদ্ভুত রকমের হইলেও,—এই ঘটনা হইতে তাঁহার নির্জ্জনতাপ্রিয়তা, কল্পনা-প্রবণতা, এবং অতীত বিচিত্র ঘটনাবলীর প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর তিনি গুয়েরিণের চিত্রশালা এবং মিউসি ডু-লুভ্রে নামক চিত্র-বিদ্যালয় দর্শনে গমন করেন। ইহা হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। তাঁহার জীবনী লেখকেরা বলেন, ডেলাক্রয়ের প্রকৃতি এরূপে গঠিত হইয়াছিল যে, তিনি যে কোন বিষয় অবলম্বন করিতেন, তাহাতেই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিতেন। কথিত আছে, এডমিরাল নেলসন শৈশবকাল হইতেই এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই বালক যে কোন বৃত্তিই অবলম্বন করুক না কেন, তাহাতেই সমানভাবে কৃতকার্য্য হইবে, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারিবে। নেলসন নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান নৌ-সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি যদি সাহিত্যিক হইতেন, ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যবিদ হইতে পারিতেন; কিম্বা যদি আইন শিক্ষা করিতেন, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতেন। ডেলাক্রয়ের প্রতিভাও এইরূপ সর্ব্বতোমুখী ছিল।

ডেলাক্রয় গুয়েরিণের চিত্রশালায় চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন বটে, কিন্তু, তিনি অন্ধভাবে গুরুর অনুকরণ করিতে পারিতেন না। স্বয়ং স্বাধীনভাবে উদ্ভাবন করাই প্রতিভার বিশেষত্ব; ডেলাক্রয়ও প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়া, তিনি চিত্রে স্বীয় প্রতিভার প্রয়োগ করিয়া নব-নব কলাকৌশলের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি কয়েকটী বন্ধু লাভ করেন। তন্মধ্যে একজনের নাম জে, বি, সুলিয়ার। এই বন্ধুর প্ররোচনায় ডেলাক্রয় জলীয় বর্ণে চিত্রাঙ্কন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অপর এক বন্ধু—বনিংটনের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, বনিংটন রাফেলের সমতুল্য চিত্রকর।

পলোনিয়াসের মৃতদেহের সম্মুখে হ্যামলেট

ডেলাক্রয় তরুণ যৌবনে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করেন, তন্মধ্যে 'দান্তে ও ভার্জিল' নামক চিত্রখানি সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে; এবং চিত্রকরের যশঃ-প্রভায় সমগ্র ফ্রান্স উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। নারকীয় ডিস নগরের প্রাচীর বেষ্টন করিয়া যে হ্রদ বিস্তৃত রহিয়াছে, দান্তে ও ভার্জিল সেই হ্রদ পার হইতেছেন এবং ফ্লেজিয়াস তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন—ইহাই চিত্রের বিষয়। চিত্রখানি এখন লুভ্রে চিত্রশালায় রক্ষিত হইতেছে। এই বিখ্যাত চিত্রে শিল্পী দেখাইয়াছেন যে, তরীখানি বৈতরণী নদীর উপর ভাসিতেছে, দূরে দিগ্বলয়-রেখা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্গত রক্তবর্ণ আলোকরেখায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে; নদীগর্ভে পাপীদের আত্মা নরকযন্ত্রণার কল্পনায় ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতেছে। কবিদ্বয় সভয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছেন, নিমজ্জমান আত্মা সকল তরীখানি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে, অথবা ধরিয়া প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চিত্রে তরুণ শিল্পীর পরিকল্পনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার চিত্র-প্রতিভা সম্যক স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে।

পরবর্তী চিত্রখানির বিষয় সিও নগরের হত্যাকাণ্ড। এই প্রবন্ধের সহিত সিওর হত্যাকাণ্ডের চিত্রের যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল, তাহা চিত্রকরের সমগ্র চিত্র নহে, তাহার একটী অংশ মাত্র। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—

অফেলিয়ার মৃত্যু

মরক্কোদেশে ইহুদিদিগের বিবাহ-সভা

এরূপ বীভৎস বিষয়ের চিত্রাঙ্কনেও শিল্পী কিরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং চিত্রখানি কিরূপ স্বাভাবিক হইয়াছে। য়ুরোপের পূর্ব্বাঞ্চলের তাৎকালীন অবস্থা অতি ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কবির কাব্যে ও শিল্পীর চিত্রে স্বভাবতঃই এই সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রতিফলিত হইতেছিল।

ডেলাক্রয় বেশ সামাজিক লোক ছিলেন। তিনি যাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, সে-ই মুগ্ধ হইত। তাঁহার সামাজিক আচার-ব্যবহারও মধুর ছিল। তাঁহার জীবনী-লেখক,—কবি ও সাহিত্যিক, বডিলেয়ার শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, ডেলাক্রয় অতি ভদ্রলোক ছিলেন। অপরিচিতের সঙ্গে ব্যবহারে প্রথম-প্রথম তিনি কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেও, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপে তিনি রসিকতার উৎস খুলিয়া দিতেন। তবে তিনি স্বভাবতঃ কিছু চাপা

হ্যামলেট ও কবর-খনক

লোক ছিলেন বলিয়া অপরিচিত আগন্তুকের সহিত প্রথম হইতেই মন খুলিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু কিশোর অবস্থা হইতেই তিনি অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি বন্ধুগণের সহিত নাচগান, আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে বড় ভালবাসিতেন। তবে পরিণত বয়সে তিনি চিত্রকলার চর্চ্চায় এত গভীর ভাবে অভিনিবিষ্ট হন যে, তখন আর আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবার বা শৈশব-বন্ধুগণের সহিত সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করিবার অবসর পাইতেন না। তখন তাঁহার বন্ধুসংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া আসে, এবং সে সময় তিনি কয়েকটী বিশেষ বন্ধুর সহবাসে অবসর যাপন করিতেন।

প্রাচ্যখণ্ডের চিত্রাঙ্কন ডেলাক্রুয়ের অন্যতম বিশেষত্ব। মিউসি ডু লুভ্রের চিত্রশালায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের কনষ্টান্টিনোপলে প্রবেশ নামক যে চিত্র আছে, তাহা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। মরক্কোদেশে ইহুদিদিগের বিবাহ বিষয়ক চিত্রখানিও এই শ্রেণীর। ইহার একখানি প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। আর একখানি প্রাচ্য চিত্রের নাম আলজিয়ার্সের পুরমহিলা। ইহা ব্যতীত, ক্লিওপেট্রা, The Sortie of Sultan Abd-el-Rahman, Arab Comedians, Algerian Smokers প্রভৃতি তাঁহার আরও কয়েকখানি প্রাচ্যজগতের দৃশ্যমূলক চিত্র আছে।

ইটালীর বিখ্যাত চিত্রকরগণের ন্যায় তিনি প্যারীর চেম্বার অব ডেপুটীজ (Chamber of Deputies) প্রাসাদের অন্তর্গত Salon du Roi নামক কক্ষটী চিত্রভূষিত করেন। এখানে তাঁহাকে বহু চিত্র অঙ্কিত করিতে হয়। কয়েক বৎসর পরে তিনি ঐ অট্টালিকার লাইব্রেরী-গৃহ চিত্রিত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। তদনুসারে তিনি ২০টী

আবিডোসের 'কন্যা' (The Bride of Abydus)
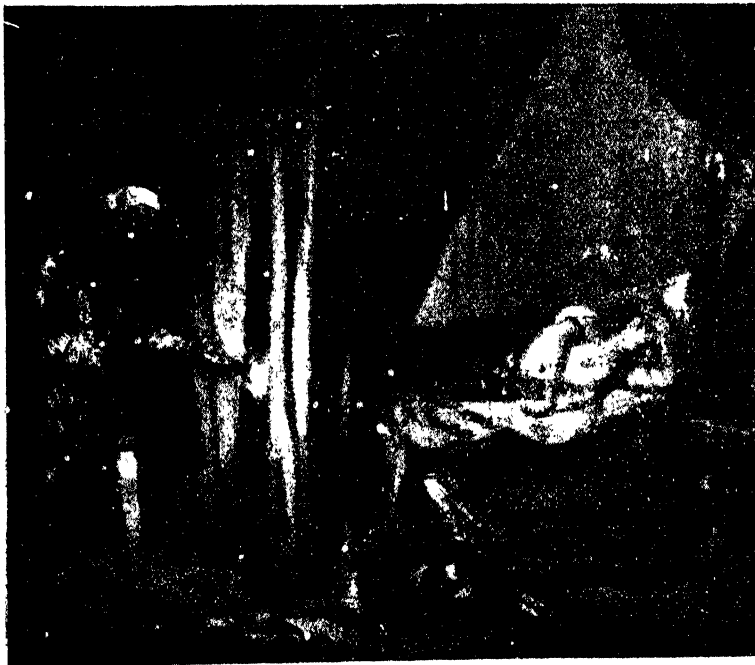
ওথেলো ও দেস্‌দেমোনা

বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করেন। এই সকল চিত্রের বিষয়-নির্ব্বাচনে তাঁহাকে যথেষ্ট মস্তিষ্ক-চালনা করিতে হইয়াছিল গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস, কিম্বদন্তী ও বাইবেল হইতে এই সকল চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কেহ-কেহ বলেন, কক্ষ-প্রাচীর সুচিত্রিত করিতে ডেলাক্রয় অদ্বিতীয়। এমন কি, কোন-কোন স্থলে এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে তিনি ইটালীয়ান চিত্রকরগণের অপেক্ষা অধিক দক্ষতার পরিচয়

জল্লাদহস্তে সেণ্ট জন দি ব্যাপ্টিষ্টের মৃত্যু

দিয়াছেন। চেম্বার অব ডেপুটীজ এবং সেনেট সভা-গৃহ চিত্রিত করিতে তাঁহার নয় বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৫১ অব্দে তিনি লুভ্রে প্রাসাদে চিত্রাঙ্কন-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। এইখানে তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কলানিপুণতার চরম নিদর্শন। ইহার চারি বৎসর পরে তিনি হোটেল ডিভিলি নামক প্রাসাদের সেলন ডি লা পেক্স কক্ষটী চিত্রভূষিত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অগ্নিকাণ্ডে এই প্রাসাদ ভস্মীভূত হওয়ায় তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট হইয়া যায়।

ডেলাক্রয়ের প্রায় সমুদায় চিত্রই বিয়োগান্ত দৃশ্যমূলক। তাঁহার সমালোচকেরা ইহার কারণ নির্দ্ধারণের অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। হত্যাকাণ্ড, খুনজখম, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনা তাঁহার এত প্রিয় ছিল কেন,—ইহা তদানীন্তন চিত্র-সমালোচকগণের মহা চিন্তা এবং তর্কবিতর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তদুত্তরে আর এক শ্রেণীর সমালোচক বুর্বোঁ রাজপ্রাসাদে এবং সেনেট সভাগৃহে অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্রগুলির উল্লেখ করিয়া ডেলাক্রয়ের সমর্থন করিয়া থাকেন।

একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কবির জীবিত কালের মধ্যে তাঁহার কাব্যের তাদৃশ সমাদর হয় না। আমাদের নব্যবঙ্গের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনে এই প্রবাদটী বর্ণে-বর্ণে ফলিয়া গিয়াছিল। কবিগণের ন্যায় চিত্রকরও এই প্রবাদের বহির্ভূত নহেন। ডেলাক্রয়ের চিত্র তাঁহার জীবিতাবস্থায় কেবল বিশেষজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণের নিকট মাত্র প্রশংসিত হইয়াছিল; সর্ব্বসাধারণ তখন তাঁহার শিল্পপ্রতিভা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; এমন কি, তাঁহার এমন অনেক শত্রু জুটিয়াছিল, যাহারা তাঁহার চিত্রের বিরুদ্ধ-সমালোচনা ও নিন্দা করিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট ডেলাক্রয়ের মৃত্যু হয়। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সাধারণে ডেলাক্রয়ের চিত্রের সমুচিত আদর হয় নাই।

ডেলাক্রয়কে বিবিধ বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য কোন কালেই ভাল ছিল না। তাহার উপর, তিনি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তৎকালে ফরাসী বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলতা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই। দেশে অশান্তি বিরাজমান থাকিতে চিত্রকলা সম্যক্‌রূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী ইউজিন ডেলাক্রয় এতাদৃশ অসুবিধা সহ্য করিয়াও জীবনসংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৯ অব্দ হইতে ১৮৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি ৮৫৩ খানি তৈলচিত্র, ১৫২৫ খানি ক্রেয়ন ড্রয়িং, ওয়াটার-কলার ও ওয়াস-ড্রয়িং, ৬৬২৯ খানি ড্রয়িং, ২৪টী এনগ্রেভিং, ১০৯টী লিথোগ্রাফ এবং ৬০ খানি স্কেচ-বুক প্রস্তুত করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আদর্শ চিত্রের সংখ্যা ১৬০। এইগুলি দেশবিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার চিত্রের ক্রেতা বা উৎসাহদাতার সংখ্যা অতি অল্প ছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর হইতে লোকে যেমন তাঁহার চিত্রের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে থাকে, তাহাদের মূল্যও সঙ্গে-সঙ্গে সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধুনা তাঁহার চিত্রাবলী দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। যাঁহাদের নিকট তাঁহার চিত্র আছে, তাঁহারা নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত বা বিপন্ন না হইলে, সহজে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র হস্তান্তর করিতে চাহেন না।

বিকাশ *

[শ্রী——————

গূঢ় রাজনীতি লইয়া আলোচনা করিবার জন্য সহরের এক প্রান্তে যে বাড়ীখানি ভাড়া লইলাম, সেখানি খুবই ভাল লাগিল। বাহিরের ঘরের জানালার ও-পারেই অপ্রশস্ত স্যাঁৎসেঁতে রাস্তা। সেই জানালার কাছে বসিয়া অধ্যয়ন, চিন্তা, পত্রাদি লিখন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে। এই ছোট্ট বাড়ীখানি অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে অবস্থিত বটে, কিন্তু স্থানবিশেষে এমন হইয়াছে যে, সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত অবধি বাড়ীতে দিব্য রৌদ্র লাগে। বায়ু চলাচল বেশ হয়। মাতা ভিন্ন সে স্থানে বাসের কথা কাহাকেও জানাইলাম না। 'সভ্যদের' নিকট হইতে পত্রাদি মাতার কাছে আসে। দিবসের কোন সময়ে গিয়া সেগুলি লইয়া আসি। ভদ্রসমাজ জানিল না—আমি এখানে বাস করি।

এখানে আসিয়া এক নূতন উপগ্রহ জুটিল;—সে হচ্চে দরিদ্রদের জন্য চিন্তা। এই পাড়ায় ধনীর বসতি নাই, আছে কেবল দরিদ্র গৃহস্থের। তাহাদের দেখিয়া হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হইত। রাজনীতি হইতে দরিদ্রের জন্য যে চিন্তা উঠে, এ সে চিন্তা নয়। এ চিন্তায় অন্তরের উচ্ছ্বাস আছড়াইয়া পড়িতেছে। এ চিন্তা রিক্ততার আগু-পিছু কিছু ভাবিতে পারে না; কেবল অন্তরের মধ্যে দৈন্য—দৈন্য করিয়া হাঁক দেয়। এ চিন্তায় কিছু নির্দ্ধারণ করা চলে না। শেষে স্থির করিলাম, ইহা কবির পাগলামির সমান।

(২)

রাজনীতি আর রাজনীতি—অন্ত নাই। কত প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে, আবার নূতন প্রশ্ন উঠিতেছে—এই ত ব্যাপার। এমন জটিল শাস্ত্র বোধ হয় জগতে আর নাই। কিন্তু এ শাস্ত্র যাহাদের চাপিয়া ধরে, তাহাদের নেশার মতই চাপিয়া ধরে। আমাকে শুধু চাপিয়া ধরে নাই;—আজ তিন বৎসর হইল, রাজনীতি সম্বন্ধে আমার পাণ্ডিত্যের কথা দেশময় ব্যাপিয়া গিয়াছে। দিনের মধ্যে কত সমজদার ব্যক্তি বাড়ীতে আমার দেখা পায় না, মাতার কাছে তাহাদের নাম-ধাম রাখিয়া দিয়া যায়; এবং সুযোগ মত আমি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি।

একদিন গবাক্ষের ধারে বসিয়া একটা প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছিলাম। কাগজ লইয়া পাতার-পর-পাতা লিখিতে লাগিলাম। কত গ্রন্থ, সংবাদ-পত্র বিশৃঙ্খলভাবে সাম্‌নে ছড়ানো রহিয়াছে। লিখিতেছি,—সমস্ত চিন্তা সংযত করিয়াই লিখিতেছি। একবার লিখিত অংশ পাঠ করিয়া, নিজের অন্তর্দৃষ্টি বুঝিতে পারিয়া, তন্ময় হইয়া গেলাম—আবার লিখিতে লাগিলাম। ক্ষুদ্র ঘরখানি নিস্তব্ধ, লেখনীর গতির শব্দটুকুও শুনা যাইতেছে। সহসা গবাক্ষের ও-দিক হইতে কে বলিল,—"মহাশয়, কিছু ভিক্ষা দিন।"

হায় রাজনীতিজ্ঞ! সকল চিন্তা গেল কোথায়? গবাক্ষের কাছে যে দরিদ্র ভিক্ষা চাইচে। রাজনীতিজ্ঞের মস্তিষ্কে ত অনেক আঘাত লাগে,—আজ এই প্রথম হৃদয়ে আঘাত লাগিল। মনে হইল—"দরিদ্রেরা বোধ হয় ভাবে, যারা রাজনীতি ব'লে একটা মস্ত শাস্ত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া করে, তারা কি ক'রে দরিদ্রের কথা ভাব্‌বে!" এই কথাই হৃদয়ে সবলে আঘাত করিল! দরিদ্র আমার কাছে ভিক্ষা চাইচে? এস, এস—আমার যা' আছে, সব নাও। তুমি আমার দেশের দরিদ্র, তোমাকে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে হয়। মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে প্রাণ বিষিয়ে উঠে—হৃদয়ে লাগ্‌লে প্রাণ কেঁদে উঠে! উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, এক নারী মলিন বসন পরিয়া, একটি যষ্টি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাহিরে গেলাম; দেখিলাম, নারী খঞ্জ। একটি যষ্টি তাহার ক্ষুদ্র পদের কার্য্যে নিযুক্ত। তাহাকে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলাম। দরিদ্র—অতি দরিদ্র। মুখখানি দারিদ্র্যের পীড়নে সৌন্দর্য্য হারাইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া এত ব্যথা লাগিল যে, তাহার বাহু নিজের বাহুর উপর রাখিয়া বলিলাম,—"চল, ঘরের মধ্যে চল।"

সেই দারিদ্র্য-পীড়িত বিবর্ণ বদন ভয়ে আরও বিবর্ণ

* এটী বিলাতী গল্প হইলেও অনুবাদ নহে, ছায়া অবলম্বনেও লিখিত নহে, এ কথা হলফ করিয়া বলিতেছি।—লেখক।

হইয়া গেল। এত অনুগ্রহ!—হয় ত হইবারই ত কথা!' ঘরের মধ্যে আসিয়া নারী নিজের যষ্টির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। রুটি-মাখন আনিয়া তাহার হাতে দিলাম। আমার মুখের দিকে সে যে ভাবে চাহিয়া রহিল, জগতের শ্রেষ্ঠ কবিও সে-ভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া বিনীত হইয়া ক্ষমা চাহিবে। সে কি কাতর ও করুণ দৃষ্টি! তাহার চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

এই অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আমার কাছে ত বিশ্বের বিশালতা নাই! ধনীর গগনচুম্বী বিলাসিতা যখন—দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করা—পূর্ব্ব-জন্মের পাপ মনে করিবে, এবং সেই জন্যই ধনীর পথের কাঁটা বাছিবার জন্য দরিদ্রকে নিযুক্ত করিবে, তখন দরিদ্র হয় বিপ্লব বাধাইবে, না হয় অনুর্ব্বর অসীম ও মরীচিকাপূর্ণ মরুভূমির দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিবে। বিশ্বের এই ভয়ঙ্কর বিশালতা—তাহাও তাহারা সাদরে গ্রহণ করিবে।

যাহাই হোক্, তাহাকে খাইয়া লইতে বলিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার আপনার লোক কেহ জীবিত আছে কি না। সে বলিল, তাহার কেহই নাই। আমি অনুচ্চ স্বরে বলিলাম,—বেশ দৈন্যের পূর্ণতা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি থাক কোথায়?" সে বলিল, নিকটে যে একটা নাচ্-ঘর আছে—তাহার নীচের তলায় দালানের মত খানিকটা স্থান আছে। সেখানে সে ও আরও কয়েকজন পুরুষ থাকে।

"সেখানে কোন স্ত্রীলোক নাই?"

"না—"

"সেই পুরুষেরা কি করে?"

সে বলিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন কলে কাজ করে, আর একজন কিছুই করে না। আরও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে নিজে সেলাইএর কাজ করে, কিন্তু কা'ল তাহার সেলাই করিবার সমস্ত জিনিস হারাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর সে কি করিবে। সে মৌন হইল। মৌন ত হইবেই। আমি বলিলাম,—"তোমার ছুঁচ-সুতো সব হারিয়ে গেছে—এই নাও, পয়সা নাও। আবার সেই সব কিনে, দরিদ্রের মত দিন কাটাও।" তাহার হাতে একটা শিলিং দিলাম। সে গ্রহণ করিল, এবং নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার চিন্তায় সে দিন আমার আর কোনও কাজ হইল না। তাহার মুখখানি বেশ সুশ্রী। লাবণ্যের উপর দারিদ্র্য একটা যবনিকা টানিয়া দিয়াছে মাত্র—আর কিছু নয়। বয়স তাহার বেশী নয়, অনুমান বিশ বৎসর। দারিদ্র্যেই যৌবন যেন কুঞ্চিত ও বিবর্ণ হইয়া, একপাশে জড়ের মত বসিয়া গিয়াছে। সেখানে আশার অস্ফুট স্বর ভাসিয়া আসে না, অনুভূতির একটা দিক নাই। সেখানে যৌবন নিদ্রিত হইয়া থাকে, আর বয়স একদিন জীবনের সীমা পার হইয়া চলিয়া যায়।

সে দিন আর কোন কাজ হইল না। একখানি পুস্তক লইয়া মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম।

(৩)

সে দিন—উপরিলিখিত ঘটনার তিন-চারি দিন পরে—সন্ধ্যার পর গলির মোড় হইতে বাসার দিকে আসিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, সেই খঞ্জ নারী যষ্টিতে ভর দিয়া রাস্তার ও-দিক দিয়া যাইতেছে। জানি না কেন, তাহাকে দেখিয়া থামিয়া গেলাম। সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। মনে-মনে ঠিক করিলাম, তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ যাই,—দেখি সে কোথায় যায়।

সে খোঁড়াইয়া চলিতে লাগিল। যাহাতে সে আমাকে দেখিতে না পায়, তজ্জন্য অনেক দূরে থাকিয়া তাহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম।

কিছু দূর আসিয়া সে যখন দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল, তখন আর নিজেকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন রাস্তায় একটিও লোক ছিল না। তাহার নিকটে গিয়া একেবারে তাহার হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিলাম; কিন্তু কি বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। সে প্রথমে ভয়ে চমকিয়া উঠিল; কিন্তু আমাকে চিনিতে পারিয়া মুখ নত করিয়া, একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। সেও বোধ হয় কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না।

ইচ্ছা হইল, তাহাকে বলি,—আমি দরিদ্র ভালবাসি। কিন্তু আমার উন্মত্ততা ইহা স্বপ্ন বলিয়া মনে করিল। আমি একেবারে বলিয়া বসিলাম,—"চল, আমার বাড়ী চল। একবার চল; তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"

বিনীত স্বরে সে বলিল,—"চলুন।" সে খোঁড়াইয়া-খোঁড়াইয়া চলিল। আমি ভাবিলাম, এ নারীর জগতে

কেহই নাই, আমি যদি একে আশ্রয় দিই, যত্ন করি, তাহাতে পুণ্য হয়;—না, আমি তা মনে করতে চাই না। তাহাতে কোন পাপ হয় না—তা'হলেই যথেষ্ট। তাহাকে নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া থাকিতে দিব না। আমার ঘরের সব কাজ সে করিবে। স্ত্রীলোক সে, নিশ্চয়ই সে সব কাজ জানে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। তাহাকে ধরিয়া শয়ন-গৃহে লইয়া গেলাম, এবং একটি চেয়ারে বসিতে বলিলাম। আমি আর একটি চেয়ারে বসিলাম। কিন্তু উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম। সেদিনকার মতই তাহাকে কিছু খাইতে দিলাম; কিন্তু সে বলিল, সে খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি খাইয়াছ?" সে যে আহার্য্যের নাম করিল, তাহার নাম করিবার প্রয়োজন বুঝি না। তাহাতে যে তাহার ক্ষুধার তৃপ্তি হইয়াছে, বিশ্বাস হয় না। আমি জোর করিয়া বলিলাম,—"তোমায় খাইতেই হইবে।" সে অগত্যা আহার করিল।

তার পর তাহাকে বলিলাম,—"এইবার তোমাকে কেন ডাকিয়াছি, বলি। আগে বল, সংসারের কি-কি কাজ তুমি জান।"

"পিতার জীবিতাবস্থায় আমাকেই সংসারের সকল কাজ করিতে হইত। আপনি কি—"

"আমি তোমাকে আমার এই ছোট্ট সংসারে রাখিব। এইখানকার কাজ তোমাকে করিতে হইবে। রাজী না হবার ত কোন কারণ দেখি না।"

সে একটুও বিচলিত হইল না, কেবল শির নত করিয়া রহিল।

"তোমার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইবে,—এখন নিজের কর্ত্তব্য ভুলিও না। বল—রাজী; আর আমার বাড়ীর সমস্ত কাজ আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লও।"

"আমার সুখের জন্ম আপনি—"

"সুখ-দুঃখ বুঝি না—ভগবান যদি তোমার সুদিন দেন, তাহা কি তুমি চাও না?"

সে বোধ হয়, কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

"মনে কর, আমি তোমার সুখ-দুঃখের কিছু জানি না। মনে কর, এই ছোট্ট সংসারের জন্ম একজন দাসী খুঁজছিলাম। এখন তোমাকেই আমার মনের মত ঠেকিয়াছে, তোমাকেই এই বাড়ীর সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করতে চাই—তুমি রাজী কি না? এখানে নিয়মিত আহার্য্য মিলিবে, ঋতুর উপযোগী পরিচ্ছদ মিলিবে, বাসের জন্ম স্বতন্ত্র ঘর মিলিবে—তুমি রাজী আছ কি না বল।"

"আমার মত খঞ্জকে—"

"আমি ও-সব কোন কথা শুনতে চাই না। আমি একজন খোঁড়া বা কাণা দাসীই খুঁজছিলাম।"

"আপনি সে-দিন ত এ কথা আমাকে বলেন নি! আজ যদি হঠাৎ পথের মাঝে আমাকে না পাইতেন, তা'হলে কি করিতেন?"

"এই ক'দিন আমি তোমার বাসস্থানের খোঁজ করছিলাম। আজ তোমাকে পেলাম, আর বাড়ীতে ডেকে এনে এই কথা বলছি। তুমি রাজী কি না?"

সে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার চিন্তাপূর্ণ মলিন মুখখানি কি সুন্দর! এ খঞ্জ নারীকে কিছুতেই নীচ-বংশের বলিয়া মনে হয় না। সে একটু পরে বলিল,—"আমি আপনাকে কা'ল বলিব।"

"কেন, আজ বলতে তোমার কি?—তোমার কি কাহারও সাথে পরামর্শ করতে হবে?"

"না, না—কাহারও সাথে পরামর্শ করতে হবে না—নিজে একবার চিন্তা করে দেখব।"

"বেশ; আমার এখানেই বসে, শুয়ে, সমস্ত রাত ধরে চিন্তা কর না কেন? সত্য করে বল, তুমি কি কাহাকেও ভালবাস, যার সঙ্গে—"

"জগতে কোনও পুরুষ বা নারী জীবিত নাই, যাহার সাথে আমি পরামর্শ করিতে পারি।"

"তবে আর কথা নাই—এখানেই চিন্তা কর। এখানেই রাত্রিবাসের আয়োজন করিয়া দিতেছি।" বলিয়া উঠিলাম। একেবারে উন্মত্তের মত হইয়া গিয়াছি। আর কিছু হোক না হোক, তাহাকে এখানে একরাত্রের জন্য আশ্রয় দিতে হইবে—তা সে ভিক্ষা করুক আর না করুক!

"এখানে আমি থাকিতে পারি না,—এই দেখুন পরের জিনিস আমার সঙ্গে রয়েছে। এ সব তাদের আজই গিয়া দিতে হইবে।"

"এ সব কোট, পা-জামা কার?"

"আমার কাছে মেরামত করতে একজন দিয়েছে—আজই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

আমি বলিলাম,—"আমাকে দাও, কি ঠিকানা বল—আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।"

সে একটু হাসিয়া বলিল,—"আপনি কি বলেন! আপনার মত একটি লোক গিয়ে তাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়ালে, তারা ভয়ে—"

"কেন, আমি কি যম?"

"আপনি গিয়ে তাদের বাড়ীর কাছে দাঁড়ালে কি ভাল দেখাবে?"

"কিসে ভাল দেখায়, কিসে মন্দ দেখায়,—তা তোমায় দেখিয়ে দিতে হবে না। তুমি আমাকে ঠিকানা দাও।"

"ঠিকানা দিলেও, সে গলির মধ্যে বাড়ী খুঁজে বার করতে পারবেন না।"

"তুমি এখানে থাক—দেখ আমি দিয়ে আসতে পারি কি না।" কাগজ-পেন্সিল লইয়া বলিলাম,—"বল, নাম ঠিকানা বল।"

ঠিকানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

৪

যখন কোটটি ফেরৎ দিয়া মজুরী আনিয়া তাহার হাতে দিলাম, যখন নূতন পরিচ্ছদ ও একপাটি জুতা কিনিয়া আনিয়া তাহারি কাছে রাখিয়া বলিলাম, "এগুলি তোমার," সে তখন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিজের ওভারকোট খুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে বলিলাম,—"আমার জন্য একটু চা তৈয়ারী কর দেখি।" দেখাইয়া দিলাম, কোথায় কি আছে।

সে আমার জন্য চা'য়ের জল গরম করিতে লাগিল। আমি শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। পরে চা পান করিলাম, ও তাহাকে পান করিতে বলিলাম। সে এবার কোন কথা না বলিয়া পান করিল। পানান্তে শয়ন করিলাম, তাহাকে পার্শ্বের চেয়ারে বসিতে বলিলাম। পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া তাহাকে কত কি প্রশ্ন করিলাম।

প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে লেখাপড়া জানে কি না।

সে বলিল, যৎসামান্য। তাহার মাতা তাহাকে শিখাইতেছিলেন, তার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে তাহার লেখাপড়া বন্ধ,—সে আজ দু'বৎসরের কথা।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কোন গল্পের বই পড়েছ?"

"হ্যুগোর তিনখানা বই পড়েছি—"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলাম,—"তুমি ভিক্টর হ্যুগোর বই পড়েছ না কি? কি কি বই, শুনি। তুমি ত তা'হলে বেশ পড়েছ;—আমি ভাবছিলাম, তুমি যৎসামান্য লেখাপড়া জান। কি কি বই, বল দেখি।"

সে যে-তিনখানি উপন্যাসের নাম করিল, সে ক'খানি হ্যুগোর অতি আদরের ধন। হ্যুগো যদি এখন শোনেন যে, তাঁর বই এক দরিদ্রা তার কুটীরে বসিয়া পড়ে, হ্যুগো তা'হলে নিজের সার্থকতা বুঝিতে পারেন। আমার ইচ্ছা হল, হ্যুগোকে গিয়া এ কথা বলিব—এই এক মাইল দূরে ত হ্যুগোর বাস।

অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কবিতা কিছু পড়েছ?"

"হাঁ—কিন্তু সে খুব কম।"

"কার কবিতা বল—কমের জন্য কিছু আসে-যায় না।"

"হ্যুগোরই কবিতা পড়েছি।"

বেশ, সুন্দর! বলিলাম,—"তোমার মত এমন স্ত্রীলোককে কাছে রাখতে কার না ইচ্ছা হয়।"

সে মৌন হইল। এত যে পড়েছে, সে নিশ্চয়ই প্রেমের কিছু বুঝে। আমি কিন্তু এতক্ষণে স্থির করিয়াছিলাম—স্থির করিতে আনন্দও হইয়াছিল যে—সে প্রেমের কিছুই জানে না। সে তা'হলে দারিদ্র্যের এতটুকু ফাঁক হইতে প্রণয়ের আলো দেখিয়াছে। তাহাকে বলিলাম,—"হ্যুগোর কবিতা পড়ব—তুমি শুনবে? ঐ আলমারী থেকে হ্যুগোর কবিতার বইখানা আনতে পারবে?"

সে "হুঁ" বলিয়া আনিতে গেল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে বইখানি টানিয়া বাহির করিল, এবং সব বইগুলি দেখিতে লাগিল।

"পেলে?"

"হাঁ, পেয়েছি।"

আমাকে বইখানি দিয়া সে চেয়ারে বসিল। বইখানির পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে বলিলাম,—"আলমারীতে কি দেখ্‌ছিলে?"

"এত রাজনীতির বই আপনি কি করেন?"

হাসিতে-হাসিতে বলিলাম,—"বইগুলো সব দেখ্‌ছিলে বুঝি? রাজনীতির বই-ই ওখানে সব—দুই-একটা অন্য বই

পাবে। রাজনীতি নিয়েই আমাকে থাকতে হয়। রাষ্ট্র-নীতিই আমার সব—এ কথাটা মনে রেখো।"

তাহার মুখের দিকে না চাহিয়াই বুঝিতে পারিলাম, সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি খুঁজিতেছে। বন্ধুর উপহার-প্রাপ্ত পুস্তক হইতে একটি কবিতা বাহির করিয়া বলিলাম,—"শোন।" দুখানি হাত কোলের উপর রাখিয়া সে শুনিতে লাগিল।

একটি, দুইটি করিয়া দশ-বারটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতা পড়িলাম। কখন, কি ঘটনায় সেগুলি লেখা হইয়াছে, তাহা বলিলাম। সে আগ্রহের সহিত সব শুনিল। রাত অনেক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, পার্শ্বের কক্ষে তাহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। তার পর আরও কথা হইল। আমি যা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারই সে উত্তর দিল—নিজে একটা কথাও কহিল না।

কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, সে সদ্বংশজাতা। তাহার পিতামহের বেশ ভাল অবস্থা ছিল; কিন্তু তিনি শেষ-বয়সে মদ্যপান করিয়া, জুয়া খেলিয়া সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দেন। তার পর তাঁহাদের বাসগৃহ বিক্রয় হইয়া যায় ইত্যাদি।

আমি তাহাকে বলিলাম,—"আমার এখানে থাকতে তোমার যদি কোনও আপত্তি থাকে, নিঃসঙ্কোচে বল—কাল হোক, পরশু হোক বলো।"

"আচ্ছা" বলিয়া সে বিনীত ভাবে, উঠিবার জন্য যষ্টিতে হাত দিল। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার নামটা কি বললে না?"

"আমার নাম—ডোরা ক্লেয়ার।" বলিয়া সে উঠিয়া গেল। গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি বলিলাম,—"আর যার বাড়ীতে থাকবে, তার নামটা জিজ্ঞাসা করলে না?"

"আপনার নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছলাম—ক্ষমা করবেন।"

"না, না—আমি যখন জোর করে মান্য চাইটি, তখন তা না দেখাতে পারলে ক্ষমা চাইবার দরকার নাই। আমার নাম হচ্চে জন মার্যাস!"

সে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি তখন কহিলাম,—"আর কি জানতে চাও, বল। আমি কি কাজ করি, বোধ হয়?"

মাথা নীচু করিয়া সে বলিল,—"হাঁ তাই-ই।"

হাসিতে-হাসিতে বলিলাম,—"কিছু না। নিজেকে ভরণপোষণ করবার জন্য আমাকে কোনও কাজ করতে হয় না। তোমাতে-আমাতে অনেক তফাৎ—তুমি হচ্চ দরিদ্র, আর আমি ধনী। যাও, এখন ঘুমাওগে—অনেক রাত হয়ে গেল।"

৫

ডোরা যখন দাসী হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, এই কুণ্ঠার গোড়ায় হচ্চে পুরুষের সঙ্গে বাস। এখন সে তাহার আবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ঘরে বসিয়া হ্যুগোর উপন্যাস পড়িতেছে। মাতার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি গো, কি স্থির করলে!" সে বলিল,—"আমি আপনার দাসী হব।" আমি বলিলাম,—"বেশ; সে কথা আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি।" কিন্তু বলিবার সময় অন্যমনস্ক ছিলাম—যন্ত্র-চালিতের মতই কথা কয়টা বলিয়া গেলাম।

সে কেন আমার দাসী হইতে চাহিবে! মাতার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে আসিতেছিলাম। তার যে একটা কুণ্ঠা, তা'—আমি ধনী বলিয়া নয়, ভাগ্যের অতর্কিত পরিবর্ত্তনের জন্য নয়, আমার কাছে খুব যত্ন পাইবে বলিয়া নয়—সেটা, আমি একলা বাস করি বলিয়া। এখানে যদি মাতা বাস করিতেন, তা' হলে বোধ হয় তাহার কোন কুণ্ঠাই থাকিত না। একবার স্থির করিলাম, তাহার কাছে কথাটা খুলিয়া বলিব। আবার স্থির করিলাম, তাহাতে কাজ নাই,—তাহাতে সে অনিচ্ছা সত্বেও থাকিবে বলিতে পারে। এই-রূপ নানা চিন্তা করিতে-করিতে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাকে যখন স্থিরচিত্তে উপন্যাস পড়িতে দেখিলাম, তখন চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি গো, কি স্থির করলে?" সে বলিল,—"আমি আপনার দাসী হব।"

সে না হ্যুগোর উপন্যাস পড়িতেছে? সে কি যৌবনের আগমনের কোন কথা জানে না? সে কি জানে না যে, সুখের সঙ্গে আশার অস্ফুট স্বর একদিন ভাসিয়া আসিবে? সে কি জানে না, চিন্তাশূন্য মনই সোনালি-রূপালি স্বপ্ন দেখে?......সে পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য

যষ্টিতে হাত দিল। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার দাসী হ'তে তুমি কেন কুণ্ঠা বোধ করছিলে বল।"

"কুণ্ঠা বোধ?—সব কাজই ভেবে-চিন্তে করতে হয়; তাই ভাবছিলাম, কাজটা মন্দ, না ভাল।"

"কোন কাজের মধ্যে অনেক ভাল ও একটা মন্দ থাকলেও লোকে কাজটা গ্রহণ করে, আর মন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। তোমার এই কাজে কোনও মন্দ দিক দেখতে পাচ্ছ কি?"

"মন্দ দিক? না, কোনও মন্দ ত দেখতে পাচ্ছি না—তবে মন্দ দেখতে পেলে, মন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করবো।"

তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলাম,—"তাই করো, মন্দ দেখতে পেলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করো।"

"মন্দ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কি এখানে অনেক দিন থাকবেন? কিছু দিন পরে চলে যাবেন, বোধ হয়?—"

"চলে যাই ত তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব—তুমি আমার দাসী হয়েই থাকবে।"

"আপনি যদি তখন আমাকে না নিয়ে যেতে চান, আমার মত খোঁড়া দাসীর যদি তখন আর কোনও প্রয়োজন না থাকে—এখন যেমন আমাকে দাসী বলে গ্রহণ করচেন, তখন যদি আর না করেন, তা' হলে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, যাতে আপনি আমাকে গ্রহণ করেন।"

"সে ত ভাল কথা—তা তোমার করা উচিত।"

সে কি মন্দটা এই দিক হতে দেখচে? সে কি তার অঙ্গের বিকলতার উপর এমনই একটা নির্ভরতা রাখিয়াছে যে, অন্য কোন কথা তার মনে হইবে না? মুহূর্তেই তাহার প্রতি একটা স্নেহে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। মনে-মনে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহাকে যত্ন করিব। ভগবান কি দানই আমাকে দিলেন! সে দরিদ্রের মত ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিল, আমি ত ভিক্ষা দিয়া তাহাকে দরিদ্রের মত ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম; কিন্তু শেষে তা হইল না। সে যেন জনতার মধ্য হইতে উঠিয়া আসিল; আমার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল ...

একদিন, দুইদিন করিয়া একমাস কাটিয়া গেল। সে সামনে একটা আসনে বসিয়া থাকে, আর আমি অধ্যয়ন করি। আমি যখন বক্তৃতার জন্য কিছু লিখি, সে তখন আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এখন কি আমার কাছে সে বিশ্বের বিশালতা পাইয়াছে? গম্ভীর মুখে বিশালতার কিছু কি সে পাইয়াছে? না দেখিয়াও বুঝিতে পারি, সে আমারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

ডোরা খঞ্জ; কিন্তু এই ছোট্ট সংসারের কোন কাজেই বিঘ্ন ঘটে না। সে যষ্টি ধরিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যায়, আহারাদি আনিয়া দেয়। তাহাকে এমনিভাবে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছি যে, সহানুভূতি দেখাইবার পথ বন্ধ। "তোমার কষ্ট হচ্চে—আমাকে দাও" বলিবার পথ কি রাখিয়াছি? গোড়াতেই তাকে যে বলিয়াছি, আমার একটি খঞ্জ দাসীর দরকার! আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইতেছে; বেশ বুঝিতে পারিতেছি,—তার অঙ্গের বিকলতার জন্যই এই বিলম্ব—একটু সাহায্য করিবার উপায় নাই! যা স্নেহ করিতে পারি, তা' তাকে উত্তম ভরণ-পোষণ দিয়া! কিন্তু দাসীর মতই ভরণপোষণ করিতে হইবে। তাকে মূল্যবান পরিচ্ছদ দিলে চলিবে না—আমার ও তার একই আহারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলে চলিবে না।......

ঠক্, ঠক্, ঠক্,—এইবার সে আহার্য্য আনিতেছে। আমি টেবিলের উপর মাথা দিয়া রাজনীতির একটা কথা চিন্তা করিতেছিলাম। সে বলিল,—"আপনার আহার্য্য এনেছি। ওঃ, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। আধঘণ্টা আগে আহার্য্য দিবার কথা।"

এ কথায় কি বলিব, ঠিক করিতে পারিলাম না; বলিলাম,—"আজ আমায় একটু দূরে যেতে হবে। রাত্রে থাক্‌ব না।"

সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ভাবছ?"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"যেখানে যাব, সেখানকার নাম তুমি জান না।"

"আচ্ছা, কত দূর হবে?"

"দশ-বার মাইল হবে।"

সে মৌন হইল। একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল, আর বাতায়ন দিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া রহিল।

"কি গো, কি ভাবছ? কি করতে যাব, জিজ্ঞেসা করলে না?" তার পর নিজেই বলিতে লাগিলাম,—"আমি সেখানে কাজে যাব না। সেখানে আমার এক বন্ধুর বিবাহ

হইবে, আমি নিমন্ত্রিত। সেখানে নাচ-গান, স্ফূর্ত্তি হবে। কাল সকালে আন্দাজ ১০টার সময় এখানে ফিরে আসব। তুমি একলা থাকতে পারবে ত?" কি বলে শুনিবার জন্য এখানে থামিয়া গেলাম। সে বলিল,—"একলা আমি খুব থাকতে পারব।"

আমি আরও কিছু শুনিতে চাই; তাই বলিলাম,—"আচ্ছা, তুমি যদি থাকতে না পারতে, বল ত কিসের জন্য পারতে না?"

নির্ব্বোধের মত সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, এ প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে—সে প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। প্রায় দুই মিনিট পরে বলিল,—"ভয়ের জন্য বলছেন?"

"আমি আর কি বলব, আমি ত জিজ্ঞাসা করছি। তা'হলে তুমি ভয়ের জন্যই থাকতে পারতে না?"

ডোরা একটু বিচলিত হইল; কিন্তু বলিল,—"আর কোন কারণে থাকতে পারতাম না—আমার মনে হয় না।"

আর কোন কথা না বলিয়া আহার করিতে লাগিলাম। তাহার চিরন্তন মৌনতার মধ্যে কথাগুলি তোলপাড় করিতে লাগিল। মৌনতা যে তার অন্তরের মৌনতা। তাহার অন্তরের একদিকে মৌনতা কারুণ্যের চুম্বন পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে! সে যে কথার অর্থ-অনর্থ কিছুই বুঝে না!

উভয়ে নীরব হইয়া রহিলাম। আহার হইয়া গেল। আধঘণ্টার মধ্যে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, বিদায়ের জন্য তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

"কি, আপনি যাচ্ছেন না কি?" বলিয়া সে উঠিবার চেষ্টা করিলে, তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম "বসো।" বিদায়ের সময় কি বলিবে, তা স্থির করিতে না পারিয়াই বোধ হয় বলিল,—"আপনাকে একজন লর্ডের মত দেখাচ্চে।"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম; বলিলাম,—"তোমার প্রভু শীঘ্রই একজন লর্ড হবেন।"

সে একটু বিচলিত হইল, কিন্তু কিছুই বলিল না। আমি বলিলাম,—"তোমার প্রভু যখন লর্ড হবেন, তুমি নিশ্চয়ই তখন লর্ডের দাসী হবে।"

"ভগবান করুন, তাই যেন হই—"

"এখন তোমার প্রভুকে কি বলে বিদায় দেবে?"

"পথে প্রভু যেন নিরাপদে যান, সেখানে নিরাপদে থাকেন, আর যেন নিরাপদে ফিরে আসেন।"

"আর তোমার প্রভু তার দাসীর কাছ হতে কি বলে বিদায় নেবে?"

সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"সে ত আপনি জানেন—তার আমি কি বলব!"

"আমি কি বলব ঠিক করতে পারচি না—"

"তাঁর দাসী কেন তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া কৃতঘ্নের মত পলাইয়া না যায়—"

একটু গম্ভীর হইয়া বলিলাম,—"এই কথা বলে কি বিদায় নিতে হয়?"

"এ ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না—"

"কি কথা বলতে হয় জানি না—কিন্তু একটা নূতন কথা সৃষ্টি করিয়া বলিতে পারি! সেটা তোমার কাছে একটু নূতন ঠেকবে।"

"দাসীকে আশীর্ব্বাদ করবেন না?"

"না, থাক; সেটা বলব না। তুমি আমার দাসী—আমার একলার দাসী।" অতটা স্বাধীনতা নেওয়া ভাল নয়।

তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম,—"ডোরা, আমি আসি। বাড়ীর বাহিরে যেও না। ভগবান তোমায় সকল বিপদ হতে রক্ষা করুন।"

৬

যতই কেন ব্যর্থতা, চাঞ্চল্য বা কবিত্বে গা ঢালিয়া দিই না, সেই রাজনীতিকে লইয়া দিন কাটাইতে হইবে; তখন সকল চাঞ্চল্যকে, উদ্দামতাকে বিদায় দিয়া নীরসকে লইয়া স্থির থাকিতে হইবে। কিন্তু যখনই রাজনীতির কাছ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, তখনই উদ্দামতা ঝড়ের মত আসিয়া হৃদয়ের দ্বার যেন ভাঙিতে চাহিল।

ছাদের উপর বসিয়া সন্ধ্যার সময় তারকা গণিতেছি, ডোরা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার বন্ধুর কেমন বিবাহ হইল?"

"বোস ডোরা—বলছি। বেশ সুন্দর বিবাহ হইল। বন্ধুর স্ত্রী অনিন্দ্যা সুন্দরী; তাহার কোন অহঙ্কার নাই—বেশ আমোদপ্রিয়, সরলা।"

"আপনাকে অসুস্থ দেখিতেছি;—সেখানে কি আপনার কোন কষ্ট হইয়াছিল?"

"কোনও কষ্ট হয় নাই—সেখানে বেশ আমোদে ছিলাম। আমাকে অসুস্থ দেখিতেছ?—আমার শরীর ত সম্পূর্ণ সুস্থ।"

সে আর কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—আমাদের ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

আজই গ্রীষ্মাধিক্যে সন্ধ্যায় ছাদে আসিয়াছি। চন্দ্রের কিরণ হৃদয়ের দ্বারের বাহির হইতে বলিল,—"খোল, খোল, দ্বার খোল।" শেষে সবলে দ্বারের উপর আঘাত করিল—চারিদিক অন্ধকার করিয়া কি একটা ঝড় উঠিল। তাহাকে বলিলাম,—"ডোরা, দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে!"—সে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া আবার মুখ নত করিল। আমি বলিলাম,—"তুমি অত প্রশান্ত কেন? তোমার কি চাঁদের দিকে চাহিলে কোনই আনন্দ হয় না? তোমার হৃদয় কি একটুও চঞ্চল হয় না? তুমি এত ধীর, এত শান্ত! এমনি তোমার উদারতা!"

সে বিচলিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

"এ কি! তুমি কি ভীত হলে? দেখ, আবার দেখ—মাথার উপর চাঁদ উঠেছে, তার কিরণ তোমার গায়ে পড়েছে, তোমার একটা ফুটন্ত ছায়া পড়েছে।"

সে আরও সরিয়া গেল; চন্দ্রের দিকে চাহিতে পারিল না।

"আমি তোমায় কি বলছি যে, তুমি সরে যাচ্ছ? এ কি! তোমার এ ভাব দেখে আমার কষ্ট হচ্চে। তোমার মাথার উপর চাঁদ উঠেছে।—তুমি ত চঞ্চল হচ্ছ না—ভীত হচ্ছ! খোল—হৃদয়ের দ্বার খোল; দেখ, মাথা তুলে চাঁদের দিকে চেয়ে দেখ। এসো, আমার কাছে এগিয়ে এসো—"

সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, আমি পারিলাম না। চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম—উন্মত্তের মত চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলাম। একবার মনে হইল, পায়ের নীচে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে! ডোরার কোন কথাই ভাবিতে পারিলাম না। ঘর্ম্মে পরিচ্ছদ আর্দ্র হইয়া গেল। নিজেকে বুঝিতে পারিলাম না, বুঝান ত দূরের কথা। চেয়ার ছাড়িয়া ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলাম।

যখন শীত করিতে লাগিল, তখন ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম। আমার ঘরে সমস্ত আহার্য্য সাজাইয়া রাখিয়া, ডোরা নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, সে পাশ ফিরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। যখন দেখিলাম, অশ্রুতে তাহার শয্যা ভিজিয়া গিয়াছে, তখন মস্তিষ্কের শিরায়-শিরায় একটা আঘাত পাইলাম; মনে হইল, সমস্ত রক্ত যেন মুখের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে।

তৎক্ষণাৎ অন্য শয্যা আনিয়া ধীরে-ধীরে ডাকিলাম, "ডোরা, ডোরা।" সে চক্ষু মেলিল। বলিলাম,—"একবার ওঠো—বিছানাটা বদলে দিই।" সে যন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া বসিল। নিজে তাহার শয্যা পাতিয়া দিয়া বলিলাম—"কিছু খাবে, চল—"

সে বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই।

"আচ্ছা, তা'হলে শুয়ে ঘুমোও।"

ঘরে আসিয়া আহারে বসিলাম, কিন্তু ক্ষুধা নাই। অল্প পরিমাণে ভোজন করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। চিন্তা করিবার শক্তিতেও যেন বঞ্চিত। কি এক অবসাদ আসিয়াছে—বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম।

অনেক বেলায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। রৌদ্রের কিরণ ঘরে খেলা করিতেছে। উঠিয়া দ্বার, গবাক্ষ সমস্ত খুলিয়া দিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, ডোরা নাই। ডোরা যে প্রাতরুত্থানে অভ্যস্ত। তবে একটা অঘটন ঘটিয়াছে—যাহার ভয় করিতেছিলাম! ডোরার ঘরে গিয়া দেখি, সে শুইয়া আছে। কপালে হাত দিয়া বুঝিলাম, ভয়ানক জ্বর হইয়াছে—হা অভাগিনি!

ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিলাম। অপরিচিত ডাক্তার বলিল,—"কি মশায়?"

"আপনাকে একবার আসতে হবে—আমার দাসীর বড় জ্বর হয়েছে।"

দাসীর জ্বর হইয়াছে, তার জন্য এত ছুটাছুটি! লোকটা তেমন গ্রাহ্য করিল না।

"আপনার যত টাকা দরকার দিব,—আপনি একবার চলুন।"

"বসুন, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি" বলিয়া সে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

পথে আসিতে আসিতে সে আমার নাম জিজ্ঞাসা

করিলাম। স্বনাম গোপন করিয়া অন্য একটা নাম বলিলাম। তাঁহাকে ডোরার কাছে লইয়া গেলাম। ডোরা জ্বরের ঘোরে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে। ডাক্তার তাহার লক্ষণগুলি দেখিয়া বলিল,—"একটা অতর্কিত বেদনা পাইয়া তাহার এই জ্বর হইয়াছে; ভয়ের কোন কারণ নাই—দু-একদিনের মধ্যে সারিয়া যাইবে।"

আমি ধীরে-ধীরে বলিলাম,—"আপনি বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করুন। মনে রাখবেন, আমি ধনী। যত টাকার প্রয়োজন হবে, দিতে পারব।"

ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ডাক্তার বলিল,—"আপনি ধনী না জানলেও যেমন চিকিৎসা করব, জানলেও তেমনি চিকিৎসা করব।"

ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া বিদায়ের জন্য ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"পথ্য ?"

"যদি কিছু খাইতে চায় ত দিবেন।"

"আমার দাসী কিছুই খাইতে চাহিবে না।"

"ক্ষুধা পাইলেও চাহিবে না ?"

"না—ক্ষুধা পাইলেও না।"

তখন ডাক্তার পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

ঔষধালয় হইতে ঔষধ আনিলাম, পথ্য কিনিয়া আনিলাম। রাজনীতিকে বিদায় দিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া রহিলাম। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় জ্বরের প্রকোপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, সে উঠিয়া বসিল। বলিলাম,—"ডোরা, কোথায় যাবে ?"

সে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "বড় জ্বর হয়েছে, মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে।"

টেবিলের উপর ঔষধ-পথ্য দেখিয়া বলিল,—"এ সব কখন আনলেন ?"

"সে কথা জানবার দরকার নাই। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, তুমি শুয়ে পড়, ডোরা।"

সে আবার শুইয়া পড়িল, আমি তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ডোরা, কিছু খাবে ?"

সে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার এসেছিল কি না।

"হাঁ, ডাক্তার এসে তোমার জ্বরের ওষুধ দিয়ে গেছেন। তুমি দু'দাগ খেয়েছ।"

"আমার তাহলে ভয়ানক জ্বর হয়েছে;—আমি ডাক্তারকেও দেখিনি; কখন ওষুধ খেলাম, তাও মনে নাই। আচ্ছা, ডাক্তার কিসের জন্য জ্বর হয়েছে বল্লেন ?"

এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিব বুঝিতে পারিলাম না, অথচ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—"তোমার সামান্য জ্বর হয়েছে—ভাবলেই জ্বর বাড়বে।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দিন আগে।"

"ডাক্তার বললেন, শরীরের উপর যত্ন না রাখার জন্য এ জ্বর হয়েছে।"

"আমার তা' বোধ হয় না।"

"তোমার তা' না বোধ হতে পারে, কিন্তু ডাক্তার বললেন তা।"

"আমি তা বলছি না—আমি বলছি, আমার বোধ হয় না ডাক্তার এই বলেছেন।"

"আচ্ছা, তুমি সুস্থ হয়ে উঠে ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞাসা করো।"

সে মৌন হইল। পথ্য আনিয়া তাহার কাছে ধরিলাম। সে হাত নাড়িয়া বলিল, "না, আমি কিছু খাব না।"

"আমার কথা শোন ডোরা, খাও কিছু। কাল রাত্রে কিছু খাওনি, আজ সকালে কিছু খাওনি।"

এবার সে পথ্য খাইয়া শয়ন করিল। আমি শিয়রে বসিয়া রহিলাম। বেলা পড়িতে লাগিল। সে নিদ্রা যাইতেছে, আর আমি তাহার কাছে বসিয়া আছি।

সূর্য্য অস্ত গেল; তেমনই বসিয়া রহিলাম। সে একবার বলিল, আমার তাহার কাছে বসিয়া থাকিবার দরকার নাই। তা বলিলে কি চলে। তোমার অসুখ সারিবে তবে আমার অন্য কাজ। আমার এখন ত কোন কাজ নাই।

তার পর আঁধার ঘনাইয়া উঠিলে, ঘরে একটি দীপ জ্বালাইয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। স্তব্ধ রাত্রে হৃদয়ের স্পন্দন অবধি শুনিতে পাইলাম। কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া রহিলাম। নিদ্রা ? নিদ্রায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। রাত্রে নিদ্রা না যাইলে আমার কোনও ক্ষতি নাই। তাহার শিয়রে বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলাম। মধ্যরাত্রে সে যখন "জল" বলিয়া উঠিল, তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল; তাহাকে জলপান করাইলাম। কপালে হাত দিয়া দেখি জ্বর ছাড়িয়াছে। তন্দ্রা

ছুটিয়া গেল। ঔষধ পান করান হইল। কি করি? এমন কোন কাজ করিলে যদি তাহার জ্বর এক মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া যায়, তা করিতে প্রস্তুত; আমার মন যে সকল শান্তি হারাইয়াছে। কিন্তু তেমন কোন কাজ নাই, সব ভগবানের হাত।

জানু পাতিয়া মস্তক নত করিয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলাম। ডোরার এই অসুস্থতার গোড়ায় যদি আমার কোন দোষ থাকে—তা আছে, ভগবন্,—আমাকে তার জন্য ক্ষমা করুন। তার জন্য যে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় করবো। ভগবন্, ডোরাকে নীরোগ করুন। আমি প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা করছি,—সে যদি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠে তবে, হে ভগবন্, বুঝিব আমার প্রার্থনা আপনি শ্রবণ করেছেন। তার পর আমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহৎ আয়োজন করিব। পুণ্যের রাজ্যে গিয়া ধূলি মাথায় করিয়া লইব; জিজ্ঞাসা করিব, আমাকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি করিতে হইবে। ভগবন্, ডোরাকে নিরাময় করুন। আমাকে অভিশাপ দিবেন না……

প্রার্থনার পর সেখানেই বসিয়া রহিলাম। শেষরাত্রে নিদ্রায় নয়ন জুড়িয়া গেল। চেয়ারের উপর বসিয়া নিদ্রা গেলাম।

(৮)

প্রাতে ডাক্তার আসিয়া বলিল,—"অনেকটা ভাল।" ভাল হলেই বাঁচি। কি একটা ঔষধ বদলাইয়া দিয়া গেল। ডাক্তার ভাল বলিল বটে, কিন্তু জ্বরের ঘোর কেন যায় না! মনটা উদাস হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল, একজন বড় ডাক্তারকে আনাইয়া দেখাই, কিন্তু এখানে থাকে কে? দিবা দ্বিপ্রহরের সময় একবার ভাবিলাম, ছুটিয়া গিয়া একজন বড় ডাক্তার ডাকিয়া আনি। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিব। যাব কি না, প্রথমে স্থির করিতে পারিলাম না। সেই ভাবনা—এখানে থাকে কে? বাড়ীতে যে একটাও লোক নাই।...

যাইবার আগে চেয়ারে বসিয়া তাহার মুখখানি বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। এ কি জ্বর হইল—এ যে ছাড়ে না। ডাক্তারটা কিছুই জানে না; ঔষধে ত কোন ফল দেখা যাইতেছে না। সে চক্ষু মুদিয়া, হাত গুটাইয়া, কুঞ্চিত হইয়া শুইয়া আছে। আমার এখানে আসিয়া তাহার মুখে লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়াছিল, নিটোল হইয়াছিল—কিন্তু জ্বরে সে সব কোথায় গেল! বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আর থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া ভাল নামজাদা ডাক্তার ডাকিতে চলিলাম।

ডাক্তার ফাগুসনের নাম প্যারীর খুব কম লোকের কাছেই অপরিচিত। তিনি ডোরাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, দেখি।" তিনি ঔষধ দেখিলেন, পুরাতন ও নূতন ব্যবস্থাপত্র দেখিলেন। বলিলেন,—"কল্যকার ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া বড়ই খারাপ করা হইয়াছে। ডাক্তার বড়ই ভুল বুঝিয়াছেন। ডাক্তারদের যেখানে ভুল করিলে বিপদের সম্ভাবনা, বলিয়া দেওয়া হয়, সেখানেই দেখচি ইনি ভুল করেছেন।"

কথা কয়টা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ডোরার দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে—কেবল বক্ষের মধ্যে অতি ধীরে শ্বাস চলিতেছে। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার নূতন ব্যবস্থা-পত্র লিখিলেন।

"মহাশয়, কি হয়েছে, বেশ ভাল করে বলুন। খুব খারাপ অবস্থা—"

বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"খুব খারাপ অবস্থা নয় বটে, তবে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ, বুকে সর্দ্দি জমিয়াছে, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে—"

"তিনি ত আমায় সর্দ্দির কথা কিছু বলেন নি?"

"বলেন কি—সে কি কথা! যাই হোক। এই ঔষধ আনিয়া খাওয়াইবেন। আর বুকে এই ঔষধের প্রলেপ লাগাইয়া ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিতে বলিবেন। আমি সন্ধ্যাবেলা আবার আসিব। কোন চিন্তা নাই—ভীত হইবেন না।"

ফাগুসনের বাড়ী এ স্থান হইতে বেশী দূরে নয় বলিয়া তিনি পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। একটা নিরাশা যেন সকল উদ্যম ব্যর্থ করিবার জন্য আগাইয়া আসিল। এই দক্ষিণ হস্তে কোনও বল পাইলাম না। চারি দিক অন্ধকার হইয়া আসিল। চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলাম। ডোরা একটা কথা কয় না;—কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মন বলিল,—এখনই নূতন ঔষধ আনিতে

হইবে, এটাত স্থির। বাহির হইলাম; দেখিলাম, দূরে ফাগুর্সন দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন। মন বলিল,—সাহস কর, মনে কর নিজের বল অসীম।

ছুটিতে-ছুটিতে ফাগুর্সনকে ধরিলাম। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আমি বলিলাম, "চলুন—দাঁড়াইবার দরকার নাই। আমার একটু উপকার করতে হবে—"

"বলুন কি উপকার।"

"আমাকে সাহায্য করিবার কোন লোক আমার বাড়ীতে নাই।"

"ও বাড়ীতে তা'হলে আপনি একলা থাকেন?"

"আজ্ঞে হাঁ—আর কোন লোকের প্রয়োজন বুঝি নাই—"

"দেখুন, বিপদ-আপদ নিত্য লেগে আছে—এখন বুঝচেন ত। যে ভাবে বাস করচেন, সে ভাবে বাস করা ঠিক নয়। আপনার নিশ্চয়ই কেহ-না-কেহ আছে?"

"আজ্ঞে হাঁ। তাঁরা কিন্তু এখানে থাকেন না।"

"তবে দেখুন দেখি। আসুন আমার ডাক্তারখানায়, একজন ধাত্রী লইয়া যান।"

"ডাক্তার ফাগুর্সন, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনি ঠিক বুঝেছেন—দাসীর রোগ দেখিয়া আমার কিরূপ কষ্ট হইতেছে। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব—"

"থাক্, থাক্,—ও-সব কাজ নাই। কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ রাখবার আমার আর যায়গা নাই।—আচ্ছা, আপনি কি করেন?"

"এই কাছেই আমার একটা মনিহারী দোকান, আর একটা চায়ের দোকান আছে।"

ধাত্রী আসিয়া সমস্ত কার্য্য তাহার নিজের হাতে তুলিয়া লইল। ধাত্রীতে আমাতে বসিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। ধাত্রী অতি সুন্দর প্রকৃতির লোক। সে আমাকে একজন দরিদ্র ঠিক করিয়া লইল। দাসীর প্রতি এত যত্ন দেখিয়া সে আমার কত প্রশংসা করিল। তাহার বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। সে বলিল, দরিদ্রের মধ্যে যে সরলতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ থাকে—ধনীর মধ্যে সেরূপ থাকে না। ধনীরা অর্থ পাইয়া ভাবে, দরিদ্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করা পাপ। আমি আমার দাসীর চিকিৎসার জন্য যে ফাগুর্সনের মত অতবড় ডাক্তারের কাছে গিয়েছি, সে আমি দরিদ্র বলিয়াই পারিয়াছি; ইত্যাদি অনেক কথা বলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পূর্ব্ব দিনের মতই দীপ আনিয়া একধারে রাখিয়া দিলাম। ধাত্রী তাহার শয্যা আনিয়া গৃহের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। রাত্রি বাড়িতে চলিল। সে ডোরার শিয়রে বসিয়া; আর আমি একটু দূরে একটা গণ্ডে হস্ত রাখিয়া বসিয়া আছি। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা করিয়া—তিন ঘণ্টা হইয়া গেল। ধাত্রী আমাকে বলিল,—"আপনি রাত জাগবেন না—শুতে যান। আমি বসে থাকি।"

"তা' কি হয়। আর শুয়েই বা কি করবো, ঘুম ত হবে না; বরং তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"আমি ঘুমুলে চলবে না—আমি ডাক্তারির কিছু-কিছু জানি, কখন কি অবস্থা হয়, ঠিক বুঝিতে পারিব।"

তাহার অনুনয়-বিনয়ে শুইতে গেলাম। সেবা-শুশ্রূষার ডোরার যে কোনও ত্রুটী হইতেছে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হইলাম। মনে-মনে ভাবিলাম, "ভগবান জানেন, কি হবে!" শুনিতে পাইলাম, ধাত্রী আপন-মনে বলিতেছে, —"আহা! মেয়েটির এমন কাঁচা বয়স—ছেলেমানুষ—" যেন কিসের বার্ত্তা কাণে আসিয়া পৌঁছিল! শ্রান্তি ও চিন্তায় শরীর-মন অবসন্ন—বিছানায় কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গভীর নিদ্রায় মগ্ন—এমন নিদ্রাও এ সময়ে আসে! রাত্রি কয়টা জানি না, ধাত্রী আসিয়া ধীরে-ধীরে আমাকে জাগাইল। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম,—"কি?"

"একবার আসুন—জ্বরের ঘোরে দাসী কি বকছে।"

গিয়া দেখি, ডোরা বিছানায় শুইয়া ছটফট করিতেছে। বেণীর বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে, এক-একবার বলিতেছে,—"প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন—আপনার চরণ একবার স্পর্শ করতে দিন; ঐ চরণই ত আমাকে মরণ অবধি স্পর্শ করে থাকতে হবে। আমাকে আপনি ক্ষমা করে আশীর্ব্বাদ করুন—আশীর্ব্বাদ, আশীর্ব্বাদ..."

সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। ধাত্রী আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—একটা কথাও বলিল না। ঔষধ পান করান হইল। আমি জানিতাম, এইরূপ রোগে রোগীর সঙ্গে কথা কহিতে হয়। তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলাম,

"ডোরা, প্রভু তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি সুস্থ হও। প্রভু তোমাকে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন।"

সে আঁখি মেলিল, আমার দিকে চাহিল; কিন্তু কোন কথা কহিল না। তাহার মুখের উপর হইতে কুন্তলভার সরাইয়া দিলাম।

"ডোরা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

সে আঁখি মুদিল, কোন কথাই বলিল না। ঢং-ঢং করিয়া গীর্জ্জার ঘড়িতে দুইটা বাজিল। তাহার কাছে বসিয়া রহিলাম। তৈলাভাবে দীপটি মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা একেবারে নীরব হইয়া দু'জনে বসিয়া রহিলাম। তার পর ধাত্রী বলিল,—"আপনি গিয়া শয়ন করুন—।" বাধা দিয়া বলিলাম,—"আমি খুব ঘুমিয়েছি,—এবার আপনি ঘুমুন।"

"আমি ত—ঐ দেখুন বিছানা পাতা রহিয়াছে—ওখানে ঘুমুচ্ছিলাম। একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল।"

রাত্রি-জাগরণে আমার অনভ্যাস সম্বন্ধে কত কথা কহিয়া ধাত্রী আমাকে শয়ন করিতে পাঠাইল। এখন আমার কোন রোগ হইলে যে কত বিপদের কথা, তাই বলিয়া আমাকে যেন জোর করিয়াই গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিল।

শয্যায় শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। চিন্তাই স্থির নয়—সবই যেন হা-হুতাশ। তবুও তন্দ্রা আসিল। যখন ধাত্রী ঝড়ের মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"শীগগীর ও-ঘরে চলুন!" তখন ভোরের আলোক জানালার ফাঁক দিয়া দেখা দিয়াছে।

কেন গো! আমার অভাগিনীর কি হ'ল! সে জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে না কি?

সত্যই তাই! মৃত্যু তার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে—সে জোরে শ্বাস টানিতেছে! ডাক্তারের কাছে ছুটবার জন্য ওভারকোটে হাত দিলাম। ধাত্রী বলিল,—"আর গিয়ে কি হবে—কি করবেন" বলিয়া আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিল। তাহার স্বর ভঙ্গ হইল, সে বালিকার মত ডোরার কাছে বসিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। আমি সব জানালা খুলিয়া দিলাম। ভোরের নূতন আলোকে, নূতন বাতাসে ঘরখানি ভরিয়া গেল—পুরাতন বাতাসের সঙ্গে পুরাতন জীবন বাহির হইয়া গেল।

গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। হৃদয়ের মধ্যে কাহার নিঃশ্বাস বহিয়া গিয়াছে! চক্ষু ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু এক ফোঁটাও অশ্রু পড়িল না!

* * *

তার পর—তার তিনচার বৎসর পরেও রাজনীতি লইয়া আছি। কেমন করিয়া বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি—সে অন্য কাহিনী।

চোর।

[শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়]

দিই দিবানিশি, এ দেহ মন্দিরে পাহারা যতন ক'রে।
দেখিতেছি তবু বিভব আমার কোথা হতে চোরে হরে॥
ছিল মোর শিরে, অতি সুশোভন চিকণ চাঁচর কেশ।
একটি-একটি করিয়া হরেছে, নাহিক তাহার লেশ॥
গোঁপ দাড়ি হতে, কি জানি কেমনে, কাল রঙ্গ তার তুলে।
সে চতুর চোর জায়ে দিয়াছে খড়ী মাটী তাহে গুলে॥
দেখিব বা দিয়া—উজল প্রদীপ যুগল নয়ন মোর।
তিল-তিল করি তার তেলটুকু হরণ করিছে চোর॥
শ্রবণ বিবরে পশিয়া সে চোর ছিঁড়েছে শ্রুতির তার।
ঢক্কা-নিনাদ, শ্রবণ আমার শ্রবণ করে না আর॥
অশনী সদৃশ পেষণী আমার ছিল যে দশনগুলি।
একটি-একটি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া লয়েছে সেগুলি তুলি॥
দুরাচার চোর, কঠোর চরণে দেহকে আমার দলি।
লোলিত করেছে চিকণ চর্ম্ম, পাড়িয়াছে তাহে বলি॥
দশন বিহনে অশন গিয়াছে, শরীর হয়েছে দড়ি।
শকতি হারায়ে আমার এখন সম্বল এবে নড়ী॥
ছিল যাহা কিছু হরিয়া সে সব ফকীর করিছে মোরে।
তবুও তাহাকে ধরিতে পারি না,—বলিহারি যাই চোরে॥

প্রতিধ্বনি

সমর-ঋণ।

সমর-ঋণ সংগ্রহের জন্য সমগ্র ভারতে—সাগরাম্বু-চুম্বিত-চরণা কন্যাকুমারী হইতে হিমাচলের পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত—ভারতের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব-স্ব গণ্ডীর মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, বঙ্গ ও বোম্বাই প্রদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিঞ্চিৎ খরতর হইয়া উঠিয়াছে। এ যেন ঘোড়দৌড়ের বাজী! একদিন বাঙ্গলা বোম্বাইকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিতেছে, আবার পরদিনই বোম্বাই বাঙ্গলার মুখ ম্লান করিয়া দিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা কি সত্যই বোম্বাইকে পারিয়া উঠিবে? বোম্বাই যে 'কমলার কলকাটি'—আর বাঙ্গলা?—কবির ভাষায় বলিতে পারি—'কাঞ্চন-খনি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিক যুটে!'—কিন্তু তথাপি সমগ্র ভারতের সম্মান রক্ষার জন্য, ভারতসম্রাটের কিরীটভূষা বাঙ্গলার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য—আমাদের যা কিছু যুটে, 'পর্ণপুটে' সাজাইয়া দাও বাঙ্গালী! দানে, সদ্ব্যয়ে বোম্বাই চিরদিন মুক্তহস্ত। কিন্তু দেবতার কার্য্যে বাঙ্গলার অনেক রাজবংশ নিঃস্ব হইয়াছেন; বাঙ্গলা রাজার কার্য্য—দেশের কার্য্য, দেবতার কার্য্যই মনে করে! যে বাঙ্গলায় বৃটিশের সিংহলাঞ্ছিত-পতাকা সর্ব্বাগ্রে উড্ডীন হইয়া ভারতে ইংরাজ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাহিনী দিগন্তে বিঘোষিত করিয়াছিল, সেই বাঙ্গলা বৃটনের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে, তাহার আপদ নিবারণের চেষ্টায় সকলের পুরোবর্ত্তী হইতে পারিবে—এ আশা কি অলীক? আমরা এ পর্য্যন্ত ইংরাজের নিকট অনেক চাহিয়াছি; কত দিয়াছি এবং কি পাইয়াছি—তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিবার সময় এখন নাই। যাঁহারা আমাদের রক্ষার-ভার লইয়াছেন—তাঁহাদের রক্ষার জন্য ধন দিয়া ও প্রাণ দিয়া সাহায্য না করিলে আমরা কি কোনদিন মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে তাঁহাদের নিকট কোন দাবী করিতে পারিব?—গবর্ণমেণ্ট সমর-ঋণ দানের সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই; সুদের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে এবং সমবেত মিত্রশক্তির জয়লাভে কোন সন্দেহের কারণ নাই; এ অবস্থায় সকলে স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে গবর্ণমেণ্টকে ঋণ প্রদান করিলে ভবিষ্যতে সকলেই লাভবান হইবেন, অথচ এই ভীষণ ধনজন-ক্ষয়কর যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল হ্রাস হইবে, দেশে শান্তি ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হইবে। আমরা এই বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যের রক্ষার কার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, ইহা প্রতিপন্ন করিবার সময় আসিয়াছে।—সমর-ঋণ সংগ্রহের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এদেশের সংবাদপত্র-সমূহে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। আমরা নিম্নে কোন-কোন বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম।—

কলিকাতার 'দর্শক' লিখিয়াছেন,—

"তার পর টাকার কথা। বাঙ্গলা দেশ গরীব বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় ধনকুবেরেরও অভাব নাই। এই সময় সমর-ঋণে টাকা দিলে টাকার আয়ত্ত হবে, সঙ্গে-সঙ্গে রাজার কাজে সাহায্য করে রাজার অনুগ্রহ পাবে। এ মাহেন্দ্র সুযোগ ছাড়া কি উচিত? কলিকাতা চিরকাল ইংরাজের ভারতের রাজধানী, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী ছিল। সে নামটা এই টক্কাটক্কিতে ডুবে যাচ্ছে। বোম্বাই বাঙ্গলাকে হারিয়ে দিয়েছে। তা' ছাড়া বোম্বাই এমন উঠে পড়ে লেগেছে যে, বাঙ্গলাকে ঢের পেছনে পড়ে থাকতে হবে। এখন থেকে যদি এই টক্কাটক্কিতে আদাজল খেয়ে না লাগা যায়, বাঙ্গালীর হার নিশ্চিত। সত্যই কি বাঙ্গালী এই টাকার লড়ায়ে বোম্বায়ের কাছে হার স্বীকার করবে? ভারতের পুরাতন রাজধানী, বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বাঙ্গালার রাজধানী কি এমনি নিশ্চেষ্ট থাকবে? বাঙ্গলার জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল ভোগ করে শেষে কি লজ্জায় মুখ হেঁট করে থাকবে?

"বাঙ্গালার রাজধানী, ভারতের পুরাতন রাজধানীতে কি এমন ধনী নাই যে টাটার চেয়ে বেশী টাকার রণঋণ কিনে বাঙ্গলাকে জিতিয়ে দেয়? কলিকাতার এত যে বড় বড় ইংরাজ সওদাগর—এদের টাকা সব গেল কোথা? এরা হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন? বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্স কার্য্যক্ষেত্রে বোম্বাইকে হারিয়ে রেখেছে। টাকার বেলায় তারা এগুচ্ছে না কেন? বোম্বাই বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কত দূর স্থান পায়? কিন্তু কলিকাতা, ভারত ও বঙ্গ সর্ব্বত্র যে বাণিজ্যক্ষেত্র বিস্তার করে বসে আছে। এক-এক ইংরাজ কোম্পানীর যে টাকা

আবদ্ধ হয়ে আছে, সেই টাকার রহস্য খুলে মুখ রক্ষা হয়—সঙ্গে সঙ্গে টাকা সুদে আসলে কত বেড়ে যায়। তার সঙ্গে জমিদার, দিশি ব্যবসায়ীর দল, ধনাঢ্যের দল—বাঙ্গলার জিত হতে কি বাকি থাকে? চুণাপুঁটির দলও সাগর বাঁধিতে কাঠবিড়ালীর মত সাহায্য করবে।

"এক-এক ইংরাজ কোম্পানী বছরে কত টাকা লাভের অংশ অংশীদারদের দেন। এক-একটী পাটের কলে অংশীদারগণ বছরে টাকায় দুই টাকা লাভ পান। সব টাকাই যে বিলাসিতায় বা খাওয়া-দাওয়ানয় চলে যায়, তাও নয়। সকলেরই মোটামুটী টাকা জমা আছে। তাঁরা আসরে নামলেই টাকার অভাব কেটে যায়। বাঙ্গলার টাকা নিয়ে বড় লোক যাঁরা, তাঁরা বাঙ্গালার মুখ-রক্ষা করুন। আর সঙ্গে-সঙ্গে সম্রাটের যুদ্ধে জয় হবার জন্য সাহায্য করুন। এ টাকাতে আয় বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং বড় দিশি ও বিলাতী সওদাগরেরা এইবার হাত খুলুন। রাজভক্তি দেখাবার, আর টাকার আয় বাড়াইবার এমন সুযোগ আর হবে না।"

চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' লিখিয়াছেন,—

"এক মাস পূর্ব্ব হইতে ভারতের সর্ব্বত্র সমর-ঋণ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে। এক মাসের চেষ্টায় ১০ কোটীর বেশী প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ভারতের দরিদ্রতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করেন, তাঁহারাই এই টাকা দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অল্প সুদে টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা এখনও অগ্রসর হন নাই। ১৯১১ সনের ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবে দেখা যায় কলিকাতার উপর ৫৭ কোটী ৪০ লক্ষ এবং বোম্বাইতে ৩৩ কোটী ৬ লক্ষ টাকা অল্পসুদে লোকে খাটাইয়াছিল। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে কলিকাতায় ২৫৭ কোটী এবং বোম্বাইতে ১৭৬ কোটী টাকা খাটিতেছিল। তদ্ব্যতীত ৩৷০ টাকার প্রমিশরী নোটে প্রায় ৬০ কোটী টাকা খাটিতেছিল। ব্যাঙ্কে ও প্রমিশরী নোটে যাঁহাদের টাকা আবদ্ধ আছে, তাঁহারা অনায়াসে ঐ সমস্ত টাকা এই সমর-ঋণে খাটাইতে পারেন।"

'নোয়াখালী-সম্মিলনী' লিখিয়াছেন,—

"সমর-ঋণ দানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, ইহা দ্বারা যেরূপ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করা হইবে, তদ্রূপ জগতের এক মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের দরুণ প্রত্যেক বিষয়ে আমরা আজকাল যেরূপ মহা অসুবিধা ভোগ করিতেছি তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর দর্প চূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত দেশের লোকের সুখ শান্তি সুদূর-পরাহত। এই কার্য্যের জন্য অর্থের আবশ্যক; তাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রয়োজন। বড়ই সুখের বিষয়, দেশের জনসাধারণ এই সকল দানের আবশ্যকতা যথোচিত উপলব্ধি করিয়াছে।

শ্রীহট্টের 'পরিদর্শক' লিখিয়াছেন,—

"শ্রীহট্ট সহরের জনসাধারণ অন্যান্য সহরের জনসাধারণ অপেক্ষা সঙ্গতিহীন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন হইলেও তাহারা War Loanএর উপকারিতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। সামান্য বেতনভোগী কনেষ্টবল হইতে কেরাণী মোক্তার উকিল হাকিম মার্চ্চেণ্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অপরিমিত War Loan দিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং দিতেছেন। যাঁহাদের কোন চাকুরী নাই, বাজে উপায়ে জীবনযাপন করিতেছেন, তাঁহারাও War loanএ টাকা দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আশা করি, War loan কমিটির সদস্যগণ কেবল কাছারী ও বড় বড় মার্চ্চেণ্টগণের নিকট War loan সংগ্রহ করিবার জন্য ভ্রমণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইল বলিয়া ভাবিবেন না, যাহাতে সহরের সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে War loan সংগ্রহ করা যায়, তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। কারণ সর্ব্বসাধারণের অনেকেই কোথায় কি ভাবে War loanএর টাকা দিতে হয়, তাহা অবগত নহে। সুতরাং অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও, টাকা গচ্ছিত করিবার উপায় জানা না থাকায় তাহারা War loanএ টাকা দিতে অসমর্থ হইবে।"

স্বাবলম্বন।

এ দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের স্বাবলম্বন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে-সঙ্গে যদি ইহার গভীরতা বর্দ্ধিত হইত, তাহা হইলে আমরা স্ব-স্ব জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সকলেই সোৎসাহে চাকরীর দরখাস্তের মুসাবিদায় সকল শক্তি ব্যয় করিতাম না। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হইতেছে, অন্ন-সমস্যা দিন-দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে; সুখের বিষয় এই উৎকট সমস্যার কথা লইয়া অনেকেই মধ্যে-মধ্যে আলোচনা করিতেছেন, দেখিয়া-শুনিয়া আমাদের আশা হইয়াছে, যখন আমরা স্বাবলম্বন ও স্বাধীনভাবে অন্ন-সংস্থানের উপযোগিতা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিব, তখন আমরা নানা প্রতিকূল অবস্থার জটিলতার ভিতর দিয়া কর্ত্তব্যপথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া 'দর্শক' লিখিয়াছেন,—

"বাঙ্গালী যখন চাকুরী করিতে শিখে নাই, তখন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রগৃহস্থ মাত্রেরই কিছু না কিছু জমিজমা বাগান পুকুর এবং বাস্তুভিটা ছিল। তাহাতে তাহাদের "মোটা ভাত মোটা কাপড়ের" সংস্থান

হইত। এখন কিন্তু হয় না। জমি-জমা কতক লোকের আছে, কতক লোকের হস্তান্তর হইয়াছে। যাহাদের নাই, তাহাদের কথাই নাই; কিন্তু যাহাদের আছে, তাহারাও সেই জমিজমার আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। কেন? ইহার একমাত্র কারণ,—বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এখন আর নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, তাহার লোভ বাড়িয়া গিয়াছে—তাই তাহাদের মধ্যে পাপের সঞ্চার হইয়াছে এবং মৃত্যুও কাযেই তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আর একটা কারণ, চাকুরীর মোহ। বাঙ্গালীর মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে যে, যেমন-তেমন একটা চাকুরী জুটিলেই আর ভাবনা নাই। এই ভ্রান্ত ধারণাই তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। চাকুরী যে কতখানি হেয় কাজ, সে জ্ঞান আমাদের নাই। আত্মসম্মান-জ্ঞান যে কি, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা শ্রম-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছি। বুদ্ধিমান্ বলিয়া এককালে আমাদের যে সুখ্যাতি ছিল, সেই বুদ্ধি এখন 'অতি'তে দাঁড়াইয়াছে; কাজেই তাহার গলায় দড়িও পড়িয়াছে। পরের দোযাংশের অনুকরণ আমাদের একমাত্র সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার মহত্ত্ব আমরা হারাইয়া বসিয়াছি; তাহার স্থলে নীচতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, প্রভৃতি গুণনিচয় আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে। এ সকল কথা অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। এই সব দোষের কথা ঢাকিয়া রাখিয়া,—কোন্ অন্নপ্রাশনের সময় একটু ঘী খাইয়াছি—কোন সুদূর অতীতে আমরা জাহাজে চড়িয়া দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতাম,—সমুদ্র পার হইয়া কোথায়-কোথায় উপনিবেশ ও রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলাম—সেই সব মান্ধাতার আমলের পুরাতন কথা তুলিয়া গর্ব্ব করিতে গেলে সর্ব্বনাশকে আরও আদর করিয়া কাছে টানিয়া লওয়া হইবে। এখন আমাদের নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। নচেৎ রোগ দুরারোগ্য হইয়া উঠিবে। তাহার পরিণাম—ধ্বংস-প্রাপ্তি।"

মালদহের সুযোগ্য সহযোগী 'গম্ভীরা'ও এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গার্হস্থ্য-জীবনে সঙ্কট' শীর্ষক সারবান্ প্রবন্ধে 'গম্ভীরা' আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী কোন-কোন সামগ্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, তাহাতে ভাবিবার কথা যথেষ্ট আছে। আমরা নিম্নে 'গম্ভীরা'র উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। গম্ভীরা বলিতেছেন,—

"এখন স্থির হইয়া সকলে মিলিয়া একবার ভাবিয়া দেখি, আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অন্ততঃ ২।৪টি বিষয়েও নিজেদের কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় কি না। কোন কোন বিষয়ে যে না হইতে পারে, এমন নহে। আমরা দেখিতে পাইতেছি—কেরোসিন তৈল, কয়লা, প্রভৃতির দ্বারা ভারতীয় গৃহস্থদের যথেষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। ভারতবর্ষের কোথাও কেরোসিন তৈলের খনি নাই। আসামে, ব্রহ্মদেশে যাহা আছে, তাহাও গভর্ণমেণ্ট মজুত রাখায় দরিদ্রের অর্থাৎ প্রায় সর্ব্বত্র ভারতীয় পরিবারেরই কষ্ট হইতেছে। এদেশে সরিষার তৈল, রেড়ীর তৈল, বাদাম তৈল, কুসুমফুলের তৈল প্রস্তুত হয়। এগুলির কোন-কোনটী রন্ধনে ও আলোকের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। সরিষা ও রেড়ীর তৈল খুব ঘন বলিয়াই জ্বালানি কার্য্যে কেরোসিনের মত সুবিধাপ্রদ নহে। এদেশের দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে সরিষার ও রেড়ীর তৈল চিরদিনই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কেরোসিনে চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয় এবং উহার ধূমও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, ইহাই এদেশের গৃহস্থের ধারণা এবং ইহা মিথ্যাও নহে। কিন্তু লোকে একটু আরামের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেও ইতস্ততঃ করে না। সরিষার ও রেড়ীর তৈল, কিরূপ হইলে উত্তমরূপে জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্ধারণ করুন। যে জিনিষ গাঢ় অবস্থায়ও জ্বালানি কাজের অনুপযুক্ত নহে, রূপান্তরিত হইলে তাহা নষ্ট হইবে মনে হয় না। বরং অন্য কোন পদার্থের মিশ্রণে উহার মূল্যও কম হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে শুধু আলোকের জন্য সুবিধায় চাষপ্রধান আমাদের দেশে কেরোসিনের কোন প্রয়োজনই নাই।

"অভাব-অসুবিধাই মানুষকে পাণ্ডিত্যের সিংহাসনে স্থান দেয়। অভাব-অসুবিধা হইতেই সভ্যতার সৃষ্টি। কেরোসিনের মত কয়লা-সমস্যাও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সহরে জল-আলোক যেমন মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, রেলওয়ে যেমন কোম্পানীর অধীনে, ভারতীয় কয়লার খনিও সেইরূপ এক একটী কোম্পানীর অধীন থাকিলেও আজ তাহা গভর্ণমেণ্টের আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। দেশী-বিদেশী কারবারীদিগের কারবার বন্ধ থাকিলেও এই সমরসঙ্কটে গভর্ণমেণ্ট অনবরতই ভবিষ্যত অভাবের কথা ভাবিতেছেন ও প্রচুর কয়লা মজুত রাখিতেছেন। আজকাল প্রায় গ্রামেই কয়লার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। কাঠের রন্ধন এক-রকম বন্ধ হইয়াই যাইতেছিল; কিন্তু আজ যে সমস্যার সম্মুখে দেশ উপস্থিত, তাহাতে কাঠ ব্যতীত রন্ধনের অন্য উপাদান কোথায়?

"বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে, ততদিন কয়লার অভাব ও অনটন হইবেই। দুই মাসের মধ্যে কয়লার মূল্য সাত আনা হইতে আঠার আনায় পরিণত হইয়াছে। এই মূল্যবৃদ্ধি দীর্ঘকালের জন্য অভাব ও অনটনের সূচনা করিতেছে। সুতরাং ইন্ধনের ব্যবস্থা করিতে হইলে এখন হইতেই উপযুক্ত উদ্ভিদের চাষ করা উচিত। যাহাতে শস্য এবং কাঠ উভয়ই সংগৃহীত হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে অধিকতর লাভের কথা। বিশেষজ্ঞগণ

স্থির করুন, উভয় প্রকার লাভের জন্ত কি কি উদ্যমের চাবের প্রয়োজন।"

আমাদের দেশে অন্ন ও বস্ত্র-সমস্যাই এখন প্রধান সমস্যার বিষয় হইয়াছে। কাপড় ভিন্ন কাহারও এক মুহূর্ত্ত চলিবার উপায় নাই; কিন্তু দিন-দিন কাপড়ের বাজারের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতেছে—তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে; গত কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের বাজারে আগুন লাগিয়াছে; বিলাতি কাপড় বলুন, আর 'মিলে'র কাপড়ই বলুন, কয়েক মাসের মধ্যে 'প্রমাণ-কাপড়ে'র মূল্য প্রতি জোড়া বার আনা হইতে এক টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থের ব্যবহারযোগ্য ধুতি সাড়ী সম্বন্ধেই এ কথা। এই জটিল বস্ত্র-সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া, আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা দেখাইয়াছেন। 'জ্যোতিঃ' বলিতেছেন,—

"সূত্র ও বস্ত্র-ব্যবসায়।—সূত্রোৎপাদন এবং বস্ত্রনির্ম্মাণ প্রত্যেক মানবসমাজের একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও এই কথাটি আমাদের দেশের লোককে বুঝাইবার বা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। প্রত্যেক বাড়ীতেই কিছু কিছু সূতা জন্মাইত, উচ্চ নীচ প্রত্যেক পরিবারের মেয়েরা সূতা কাটিতেন। যিনি যেমন কাপড় পরা পসন্দ করিতেন, তিনি তেমন সূতা কাটিয়া নিজের তাঁতীকে জোগাইতেন। বিলাতে কলের আবিষ্কার হওয়ার ফলে আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের সেই নিত্য-কর্ত্তব্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে। * * * এতদিন কলের কাপড় বলিলে আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের ও বোম্বাইর কাপড়ই বুঝিতাম। অতঃপর আমেরিকা, জাপান ও চীনের কথাও শুনিতে হইবে। জাপানী কলের কাপড় আমাদের বাজারে আসিয়াছে। চীনের বস্ত্রব্যবসায়ীরা বলিতেছে, আমরাও শীঘ্রই আসিতেছি। চীনে উৎকৃষ্ট সূতা জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে। তথাকার বৈজ্ঞানিক-কৃষিতত্ত্ব-বিদেরা আমেরিকার তুলার বীজ লইয়া গিয়া আমেরিকার কৃষকদের ন্যায় উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইবার উপায় করিতেছে। চীনে ৪০ কোটী লোকের বাস, এখনও তথায় ৫০০০ পাঁচ হাজারের অধিক তাঁত বসে নাই। জাপানে ৫ কোটী ২০ লক্ষ লোক, তথায় ২৪০০০ তাঁত বসিয়াছে। চীনের উদ্যমশীল ব্যবসায়ীরা বলিতেছে,—'আমরা অচিরে বিশাল চীনরাজ্যে বস্ত্রের বিরাট ব্যবসা খুলিয়া ফেলিব। আমাদের দেশের ৪০ কোটী লোকেরা সূতার কাপড়ই ব্যবহার করে। তাহা আমরাই জোগাইব। পরের কাছে যাইব কেন?' বোম্বাইর ৮৭টি কারখানায় ৫১০০০টি তাঁত চলিতেছে। এই সমস্ত মিলের অধিকাংশ কাপড় চীন জাপান ষ্ট্রেইট সেটেলমেন্ট প্রভৃতি রাজ্যে যায়। ভারতের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ কাপড় ম্যাঞ্চেষ্টারই যোগাইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ব্রিটেনের মোট রপ্তানীদ্রব্যের মূল্য ৪১ কোটী ১৪ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। তন্মধ্যে ১২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের শুধু কাপড় ও সূতা। তথায় ৫০ কোটী পাউণ্ড (৭৫০ কোটী টাকার) ঐ ব্যবসায়ে খাটিতেছে। তথাকার প্রায় এক কোটী লোক ইহাতে জীবিকার্জ্জন করিতেছে। আমাদের বুদ্ধিমান পাঠকগণ এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়া একবার ভাবিয়া দেখুন, পৃথিবীর জাতিসমূহ কে কোন্ দিকে কি ভাবে জীবিকার্জ্জনের ও আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন।"

দেশের বর্ত্তমান দুঃসময়ে নিরাশ্রয়, বিপন্ন, আর্ত্তগণের দুঃখ-কষ্ট প্রশমনের জন্য স্থানে-স্থানে দুই একটি সেবা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল সমিতির মধ্যে রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এইরূপ সমিতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, এবং দিন-দিন তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের দেশেও এই শুভানুষ্ঠানের সূচনা নানাস্থানে দেখা যাইতেছে। 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ' দেশের সুসন্তানগণ বদ্ধপরিকর হইতেছেন। দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ভার গ্রহণের জন্য বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি, এবং পরদুঃখ-কাতর, উদারহৃদয় ছাত্রসম্প্রদায় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, দেশের পক্ষে ইহা সুলক্ষণ। এই প্রসঙ্গে আসামের 'সুরমা' লিখিয়াছেন,—

"সুরমা-'উপত্যকার' আর্ত্তত্রাণসমিতির কার্য্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। দেখা যায় বিগত জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৩০৫২৸৵০ আনা কমিটীর আয় হইয়াছে এবং ১৯৮৯৷৶০ আনা ব্যয়িত হইয়াছে। প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে আমাদের বড়লাটবাহাদুর ৪০০৲ আমাদের জনপ্রিয় শাসনকর্ত্তা স্যার আর্কডেল আর্লবাহাদুর ৫০০৲ এবং মেট্রপলিটান্ কলেজের ছাত্রগণ প্রদত্ত ৫০০৲ টাকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্যাক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যকল্পে স্থানে-স্থানে স্থানীয় সমিতি গঠিত হয়। ঐ সকল সমিতি নিজেও চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন ও কেন্দ্রসমিতি হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন:—

	আয়	ব্যয়
লক্ষ্মীপুর	১০৩২৲	৪০১৲
বড়খলা	১৮৬৲	৬৫৲
কাটিগড়া	১৩২৲	১৮০৲
করিমগঞ্জ ও জলাবাজার	৮০৭৲	৪৬৲

হইলাকান্দি, বিক্রমপুর, কানাইঘাট ও গোয়াইনঘাটের কমিটী-

সমূহ কেন্দ্রসমিতি হইতে প্রেরিত সাহায্য ভবিষ্যৎ দুঃসময়ের জন্য জমা রাখিয়াছেন।

নদীনালার সংস্কার।

বঙ্গের প্রাচীন নদনদী ও পয়ঃপ্রণালীগুলি দিন-দিন হস্মজিয়া মজিয়া যাইতেছে। ইহাতে কেবল যে ম্যালেরিয়া ও নানা সংক্রামক পীড়ার আক্রমণে বঙ্গদেশে বিপুল জনক্ষয় হইতেছে, এরূপ নহে; আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পথও সঙ্কীর্ণ ও রুদ্ধ হইতেছে, দেশের লোকের ধনপ্রাণ উভয়ই বিপন্ন হইতেছে। মফস্বলের অধিবাসিগণ ইহা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। পাবনার 'সুরাজ' এ সম্বন্ধে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য এবং বিষয়টি আলোচনার যোগ্য। 'সুরাজ' লিখিয়াছেন,—

"দেশের নদীনালাসমূহ মজিয়া যাওয়াতে * * * রাজসাহী বিভাগেরই, বিশেষতঃ খাস রাজসাহী ও পাবনা জেলারই অধিকতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। রাজসাহী বিভাগে আজকাল একমাত্র পদ্মা ব্যতীত এমন একটি নদীও আছে কি না সন্দেহ, যাহাতে বড় নৌকা বৎসরের বারোমাস অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। এমন কি পদ্মার মাঝখানেও অনেক সময়ে নৌকা আটকাইয়া যায়। ইচ্ছামতী, বড়ল, নারদ, গদাই, আত্রাই প্রভৃতি নদ শুকাইয়া যাওয়াতে তত্তৎ-তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের অবস্থা যে কি ভয়াবহরূপে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাঁড়া সিরাজগঞ্জ রেল-লাইনের ফলে উহার উত্তর-দিকবর্ত্তী স্থানসমূহ কিরূপ 'জলডোবা' দেশে পরিণত হইয়াছে, 'সুরাজে'র স্তম্ভে বহুবার আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি।"

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ

[শ্রীবিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত, এম্‌-বি]

১

বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সেকেলে, চৈতন্যধারী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—রীতিমত স্নানাহ্নিক না করিয়া, বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলার মাথায় ফুল-বিল্ব-পত্র না দিয়া জলটুকু গ্রহণ করেন না।

প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইবার আগেই গঙ্গা-স্নান করিয়া যখন গৃহে ফিরিতেন, তখন রীতিমত বেলা হইত। বালকেরা ঘুম হইতে উঠিয়া পাঠশালায় যাইবার আগে, রাস্তায় তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলেই, সকলে সমস্বরে "ওরে বুড়ো ঠাকুর যাচ্ছেন" বলিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত। তখন শুচিগ্রস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর কনে'-কউয়ের মত একধারে গুটাইয়া গিয়া, কাতর কণ্ঠে বলিতেন, "ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে—তোদের নোংরা কাপড়—আমি চান করে ফিরে আস্‌ছি।" বালকেরা তাহাতে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিত।

বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের দেখাদেখি তাঁহার একমাত্র পুত্র শচীন্দ্রও নিষ্ঠাবান হইয়া উঠিল। পুত্র ইংরাজী পড়িয়া ম্লেচ্ছ-স্বভাব হইবে, এই ভয় করিয়া, তিনি তাহাকে আচার্য্যের টোলে সংস্কৃত পড়িতে দিলেন।

গ্রামের অধিকাংশ লোকই নব্যশিক্ষিত। তাহাদের আচার-ব্যবহার দর্শন করিয়া—বাড়ীতে কেহ দেখা করিতে আসিলে, তিনি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার সে ভাব অবলোকন করিয়া, কেহ অসন্তুষ্ট না হইয়া, মনে-মনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিত। কেন না, কেহই এ কথা অস্বীকার করিতে পারিত না যে, একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকা, কোন নিয়মের অধীন না থাকার চেয়ে যথেষ্ট কষ্টকর—এবং তাহাতে মনের বল বেশী প্রকাশ পায়।

এমনি ভাবে তাঁহার জীবনটি নিঃসঙ্গ বেশ চলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন সদ্য-বিধবা কন্যা নিরালঙ্কারা হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে দৃশ্যে তাঁহার অন্তরে একটি ক্ষণিক হাহাকার উঠিলেও, তাহা বিধবার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বলিয়া, তিনি নীরবে শুধু এক ফোঁটা অশ্রু মুছিলেন।

একাদশীর দিনে গৃহিণী ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো, দয়া কর—হেমাকে আমার এক ফোঁটা জল খেতে অনুমতি দাও; সে অতি শিশু। তোমাদের শাস্ত্রে কি অতি শিশুর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা

নেই ?" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরীয় দ্বারা চক্ষু মুছিয়া অটল হইয়া বলিলেন, "কর্ম্মফল, গৃহিণী—কর্ম্মফল! আমি কি করিব ?"

সেবার বোসেদের বাড়ীর বড়-গৃহিণী বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণীর কাছে আসিয়া জোড়হস্তে অনুমতি চাহিলেন, "ঠাকুরকে বলিয়া আমার বিলাত-ফেরৎ জামাইটার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করুন! ঠাকরুণ, এই মেয়ে আমার এক-মাত্র সন্তান।" প্রিয়ংবদা দেবী তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া বলিলেন, "ভয় কি বোন্, ব'লব বৈ কি! তবে তাঁর অভি-রুচি! ঠাকুর যেন তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।"

শুনিয়া বাসুদেব ঠাকুর মাথা নাড়িলেন, "সে ব্যবস্থা ত আমি দিতে পা'রব না।" গৃহিণী মাথা নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অন্যায় মাফ ক'রো—একবার ব'লবে কি, কেন পারবে না ?" ঠাকুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "শাস্ত্রে ব্যবস্থা নেই।" তথাপি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া, কাঞ্চনপুরে সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিত।

২

দুই বৎসর পরে পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীগ্রামে ভয়ঙ্কর কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী অকালে এই দুরন্ত রোগের কবলে পতিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই ভয়ে সে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চনপুরে আশ্রয় লইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটু সঙ্কটে পড়িলেন। স্থান নাই বলিয়া, অন্দরের দুইটি ঘর শশধর ও তর্করত্ন ঠাকুরকে ছাড়িয়া দিয়া, মাত্র দুইখানি ঘর নিজের পরিবারবর্গের জন্য রাখিলেন; তন্মধ্যে একটিতে ভোজন ও একটিতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। কাজেই তাঁহার শুচিতা বজায় রাখিতে বেশ একটু বেগ পাইতে হইল।

এ গ্রামেও ক্রমে দু'একটি কলেরা দেখা দিল। যখন দুচারি জন লোক মারা যাইতে আরম্ভ করিল, তখন বাধ্য হইয়া দেশবাসী সকলে বাসুদেব ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, "ঠাকুর! একটি রক্ষাকালী পূজা না করিলে ত এ মড়ক যাইবে না। আপনার অনুগ্রহ করিয়া এ কাজে পৌরোহিত্য না ক'রলে চল্‌ছে না। আপনার উপরেই আমাদের অগাধ বিশ্বাস।" বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি প্রদান করিলেন। পূজা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল বটে, কিন্তু ব্যারামের প্রকোপ কিছুতেই কমিল না; বরং উত্তরোত্তর বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাসুদেব ঠাকুরের চমক লাগিল। হাত জোড় করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ অজানিত পাপে এই শাস্তি দিতেছ মা! আমি ত কায়মনোবাক্যে তোমার পূজা করেছিলাম।"

হরি গোয়ালিনীর একমাত্র পুত্র গঙ্গা,—সে দিন ভোর হইতে তাহার ব্যারামের সূত্রপাত হইল। হরিমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরণে আসিয়া পড়িল, "ঠাকুর, তুমি না বাঁচালে কেউ বাঁচাতে পারবে না। রক্ষে কর ঠাকুর—প্রসন্ন হও।"

গ্রামে অশিক্ষিতদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, বাসুদেব ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ! তাঁহার অর্চ্চনায় দেবতা সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না। যদি কোন কারণে তাঁহার অসন্তুষ্টি হয়, তবে দেবতার শাস্তি অনিবার্য্য। পূর্ব্ব বৎসর পুত্রের জ্বর-বিকার হওয়ায় হরিমতী পুত্রের কল্যাণে সওয়া-সের চিনি মানত করিয়াছিল। এবার রক্ষাকালী পূজায়, ভুলিয়া গিয়াই হউক, অথবা ঔদাস্য করিয়াই হউক, হরিমতী তাহা পরিশোধ করে নাই। সে বুঝিল, সর্ব্বজ্ঞ বাসুদেব ঠাকুরের তাহা অবিদিত নাই। তাঁহারই ক্রোধে তাহার এই শাস্তি হইতেছে। সে জোড়হাত করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "এবার ক্ষমা করো ঠাকুর! বছো আমার ভুল হইলে দুগুণ পুজো দেবো। ঠাকুর! প্রসন্ন হও।" অটল, স্থিরনেত্র বাসুদেব ঠাকুর বলিলেন, "যাও মা, ঘরে যাও! আমি তোমার জন্য মায়ের কাছে ভিক্ষা চাইব। দেখি, মা তা দেন কি না।"

হরিমতী আশ্বস্ত হইয়া চক্ষু মুছিয়া গৃহে ফিরিল। বাসুদেব ঠাকুর পূজার ঘরে এক-মনে আরাধনা করিয়া ভিক্ষা চাহিলেন, "দেবী প্রসন্না হও! আমার পাপে দেশবাসীদের আর শাস্তি দিও না। যদি পূজায় কোন ত্রুটী হইয়া থাকে, তার শাস্তি আমাকে দাও, আমিই সে জন্য দায়ী।" বিকালে ঠাকুর শুনিতে পাইলেন, গঙ্গা মারা গিয়াছে। একেলা ঘরে মাটীর উপর পড়িয়া বারবার মনে-মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কার পাপে, মা, কার পাপে—একবার ব'লে দাও।"

৩

নিধিরাম জাতিতে চণ্ডাল। দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; তাহার উপরে, সর্ব্বদা মলিন বসনে থাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বে তাহাদের বাড়ী। বিগত রক্ষাকালী পূজার সময় নিধিরাম যখন কালীমায়ের পাদপদ্ম দর্শন করিতে প্রায় মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন সকলে একবাক্যে দূর দূর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আজ মনে হইল, সেই গোলযোগের সময় তিনি প্রায় একদণ্ড মন স্থির করিয়া পূজা করিতে পারেন নাই। নিধিরামের এই অপবিত্রতায় বোধ হয় মায়ের অসন্তুষ্টি হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ঠাকুর শচীন্দ্রকে ডাকাইলেন, বলিলেন, "দেখ, এই অপরাধেই দেশের দুর্গতি যাইতেছে না। আমিও মনের সাধে মায়ের আরাধনা করিতে পারি নাই। তুমি শিরোমণি মহাশয়কে আবার পূজার বন্দোবস্ত করিতে আমার অনুমতি জানাও।" দেশের লোকে শুনিয়া একবাক্যে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। মোড়ল মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে ঠক্‌-ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"নিয়ে আয় সে পাজী বেটাকে—বাড়ী থেকে মার্‌তে-মার্‌তে নিয়ে আস্‌বি। বেটা চণ্ডাল হ'য়ে মায়ের মন্দিরে গিয়েছিল!"

তিনচারিজনে মিলিয়া নিধিরামকে ধরিয়া আনিল। তাহাদের নির্দ্দয় প্রহারে এই পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় বালকের অবস্থা দর্শন করিয়া দু' একজন চোখের জল রোধ করিতে পারিলেন না। শচীন্দ্র আস্ফালন করিয়া বলিল, "তোর জন্য দেশের এ মড়ক। তোকে খুন করে তোর রক্ত দিয়ে মায়ের পূজা দেবো। ভেবেছিস্‌ কি?" সকলে মিলিয়া বালককে উত্তম-মধ্যম দিয়া গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দিল।

আবার মহা সমারোহে পূজা হইতে লাগিল। গভীর রাত্রিতে সকলে উন্মত্তের মত হোমকুণ্ড সমীপে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কপালিনীর লোহজিহ্বার মত লক্‌-লক্‌ করিতে-করিতে শূন্যে উঠিতে লাগিল। সমস্ত গ্রাম যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে সকলে সভয়ে দেখিল, নিধিরাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাহার একটি অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া রক্তাক্ত অঙ্গুলিটি মায়ের চরণতলে নিক্ষেপ করিল। কেহ বাধা দিবার আগেই সে উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিল, "মা, আমারই পাপে না কি এ সব! আমি রক্ত দিচ্ছি, এই নে মা রক্ত নে, মড়ক থামিয়ে দে মা!"

বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিমূর্ত্তিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আবার অশুচি! আবার অশুচি! চণ্ডালের রক্ত মায়ের চরণে! খুন কর, খুন কর! নইলে ওর পাপেই দেশ উৎসন্ন যাবে।"

যখন সকলে মিলিয়া নিধিরামকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, তখন অতিরিক্ত রক্তস্রাবে বালকের অৰ্দ্ধমৃত দেহ পৃথিবী চুম্বন করিয়াছে! শচীন্দ্র বিকট হাসি হাসিয়া বলিল—"মা আগেই তাকে নিয়ে গেছেন, আর ভয় নেই।"

৪

সেই নির্জ্জন মন্দিরের কাছে বালকের যখন চেতনা হইল, তখন রজনীর সমস্ত উৎসব থামিয়া গিয়া এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। বালক চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ক্লান্তিবশে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

গ্রামের একধারে বনের পার্শ্বে বাসরেশ্বরীর মন্দির। যখন সে রাত্রির সে বিভীষিকাময়ী স্মৃতি অল্পে-অল্পে কমিয়া আসিতে লাগিল, তখন একে-একে আবার সকলে সে পথে চলিতে লাগিল।

প্রথমে একজন, তার পরে অন্যজন,—এইরূপ ধীরে-ধীরে দেশের লোকে জানিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা হেমলতা নিধিরামকে সকলের অগোচরে সেই মন্দিরের মধ্যে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়াছে! যখন কথাটা বাসুদেব ঠাকুরের কাণে গেল, তিনি ভয়ে ও রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে মন্দিরের কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

তখন হেম বালকের ক্ষতস্থানে ঔষধ দিতেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশি! করেছিস্‌ কি? মায়ের মন্দির অপবিত্র করলি!"

বালক শুনিয়া সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছল-ছল নেত্রে হেমের ভয়-বিহ্বল মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "মা, আমায় ছেড়ে দাও—আমি ভাল হ'য়ে গিইছি। আমার জন্য দেশে আর মড়ক বাড়িয়ো না মা!"

হেম বালককে জড়াইয়া ধরিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, মন্দির ত অপবিত্র হয় নাই। দেশের ব্যারাম ত থামিয়া গিয়াছে!"

বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রোধে কাঁপিতে-কাঁপিতে বলিলেন, "এখনই পরিত্যাগ কর, ভাল চাস ত এখনই ওকে ছেড়ে দে! ওকে স্পর্শ করেছিস ব'লে তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

বালক অশ্রু মুছিতে মুছিতে তাহার সেই মাতৃরূপা, দেবী-স্বরূপা, বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, "আমি সেরে উঠেছি মা! যেটুকু বাকী আছে, ঐ পায়ের ধূলোতে সেরে যাবে। আমি এখানে থাকলে আবার না কি মড়ক হবে—আমি যাই মা!" এই বলিয়া চক্ষু মুছিতে-মুছিতে মন্দিরে বার-বার প্রণাম করিয়া নিধিরাম প্রস্থান করিল।

বাসুদেব বলিলেন—"চল্, তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেম উত্তর করিল—"ক্ষমা ক'রো বাবা! আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রব না।" হেমের স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা হইল।

৫

তিন দিন পরে গৃহিণী কাঁদিতে-কাঁদিতে ঠাকুরঘরে ধ্যানমগ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরণে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—"ওগো, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল।" বন্দ্যোপাধ্যায় বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" প্রিয়ংবদা দেবী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বলিলেন, "সেই কাল্ রোগ! ওগো তুমি একবার এসো, একবার তাকে দেখ! সে তোমার কাছে মরবার আগে একবার ক্ষমা-ভিক্ষা চাচ্ছে।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই অটল ব্রাহ্মণের হৃদয় স্পন্দিত হইল। অন্তরের মধ্য হইতে একটা শূন্য হাহাকার তাঁহার শূন্য হৃদয়ের মাঝখানে একটা দারুণ আঘাত করিল। কিন্তু তখনই সেই নিষ্কাম, ত্যাগী পুরুষ উত্তর করিলেন, "সে পতিতা! দেবপূজা ফেলে তার কাছে যেতে পারব না।" এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইতে-গড়াইতে ব্রাহ্মণের উত্তরীয় সিক্ত করিল। গৃহিণী মাটিতে পড়িয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া আবার কহিলেন—"এস, একবার এস, ওগো নিষ্ঠুর, একবার এস।" মহাযোগী উত্তর করিলেন—"না।"

তখন ধীরে-ধীরে প্রাণ যেন আবার সেই জড়দেহে ফিরিয়া আসিতেছিল। হেমের সেই মলিনপ্রায় দীপ্তিহীন চক্ষু দু'টি নিধিরামের মুখের উপর নিপতিত হইল—এক-ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নিধিরাম তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া আস্তে-আস্তে বলিল—"ভয় নেই মা, আমি এসেছি! দেবতার সঙ্গে লড়াই ক'রে তোকে ফিরিয়ে নেব মা! মা—আমার মা!"

বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী উচ্ছ্বাসে বালককে বুকে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—"ওরে মায়ের ভক্ত সন্তান! তুই তোর মাকে বাঁচাতে এসেছিস্! তুই আপন রক্ত দিয়ে দেশকে বাঁচিয়েছিস! তুই চণ্ডাল হ'লেও আর তোকে ছাড়ছি নে। তুই আমার চেয়েও পবিত্র।"

এমন সময় কম্পিতপদে বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন—"এসো না, এসো না—আমাকে ছুঁয়ো না; আমি নিধিকে বুকে নিয়েছি।"

ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না—তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে ধীরে-ধীরে বলিলেন "মা রঙ্গময়ি! এ তোর কি রঙ্গ মা! এতদিন পরে এমন ক'রে কি বুঝাতে হয় মা—**চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ।**"

ধ্রুবের তপস্যা সিদ্ধি

শিল্পী— শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

Emerald Ptg. Works

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, বি-এ]

হিন্দী

১। মর্য্যাদা,—ফাল্গুন।

"দোষী কওন—মাতা, পিতা য়া সমাজ?"—লেখক "বাসুদেব"। বোম্বাই সহরের সেশন জজ একটি মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। অ্যানা ফার্ণাণ্ডিজ নামক একটি ত্রিশ বৎসর বয়স্কা খৃষ্টান রমণী আপনার নবজাত শিশুপুত্রের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টার জন্য অভিযুক্তা হইয়াছিল। প্রবন্ধকার বলেন—

"গত ১১ই ডিসেম্বর উক্ত রমণী একটি শিশু ক্রোড়ে করিয়া কোনও একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করে। কয়েক মিনিট পরে শুধু হাতে সে ঐ গলি হইতে বাহির হইয়া আসে। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এক স্ত্রীলোক তাহার পায়খানা হইতে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া শিশুটিকে উদ্ধার করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। রমণী ধৃত হয়। এজেহারে সে বলে যে তাহারই কোনও সঙ্গী চাকর ঐ শিশুর পিতা। বিচারে রমণীর একমাস কারাদণ্ড হয়।

"এরূপ নৃশংস কুমাতার যে শাস্তি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; এবং কোনও শাস্তিই ইহার পক্ষে বেশী হইবে না। কিন্তু আমরা এ কথাও বলিতে বাধ্য যে, ইহা একদিক হইতে দেখিলে অন্যায় অত্যাচার। এই মাতা দোষী নিশ্চয়, কিন্তু ঐ শিশুর পিতা—তাহার দোষ কি তিলমাত্রও কম? রমণী শিশুর প্রাণনাশ করিবার কল্পনা করিতেছিল; কিন্তু পুরুষটি শিশুর ভরণপোষণের ভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া হত্যার কাজ বহুপূর্ব্বেই সমাধা করিয়াছে। রমণী যদি culpable homicide not amounting to murder অর্থাৎ হত্যার চেষ্টার দোষে দোষী হয়—তবে পুরুষটি murder-হত্যার অপরাধে অপরাধী।

"আবার দোষ যে শুধু ঐ বিশেষ পুরুষ বা বিশেষ রমণীর, তাহাও নহে। দোষ সেই সমাজের, যে সমাজ বলে,—যে, "শিশু রাষ্ট্রের সম্পত্তি; এবং যে ব্যক্তি শিশুকে হত্যা করিতে চায়—অথবা কোনও প্রকারে উহার ক্ষতি করিতে চায়, তাহাকে দণ্ড দিব; কিন্তু বস্তুতঃ যে সমাজ এইরূপে উৎপন্ন শিশুর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখিতে চায় না—তাহাকে outcaste বলিয়া ঘৃণা করে, হীন দৃষ্টিতে দেখে—সব সময়েই তাহাকে "দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়া দেয়, এবং শিশুর মাতাকে ত দুধের মাছির মত সমাজ হইতে নিষ্ক্রান্ত করে।

"এইরূপ শিশু-হত্যা ফাঁসি ও জেল দ্বারা রোধ করা যাইবে না। সমাজ বলিতেছে, "হে রমণী, তুমি তোমার সন্তানকে মারিয়া ফেলিয়ো না—তাহা হইলে তোমাকেও আমি মারিয়া ফেলিব। তুমি উহাকে আদর কর, শিক্ষা দাও—তাহাকে মহৎ হইতে শিক্ষা দাও; কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করিব—প্লেগের মত দূরে ঠেলিয়া রাখিব…তাহাতে কি?" এরূপ তর্কে এই রকম শিশুর জন্মও রোধ করা যাইবে না, কিম্বা তা' শিশুর প্রাণরক্ষা করাও চলিবে না। পুরুষ ও স্ত্রী যখন মাতা ও পিতা হওয়ার দাবী করিয়াছেই, তখন যাহাতে ঐ কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ মারিয়া দাগী না করিয়া দেওয়া হয়, সমাজের তাহাই দেখা উচিত। ঐ সব শিশুকে সমাজে অধিকার ও স্থান দিতে হইবে।"

"কিন্তু দেশের, সমাজের আইন বলে—"দেখো, হত্যা কোরো না—যদি কর, তোমাকেও আমি হত্যা করবো। তুমি শিশুকে অজ্ঞান অবস্থায় হত্যা করিতে চাও,—তাহার যখন মানমর্য্যাদার কোনও জ্ঞান নাই, তাহাকে তখন মারিয়া ফেলিয়া চিরকালের জন্য পৃথিবীর কষ্ট-ভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে চাও। কিন্তু আমি কি করিব জান? আমি তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাহাকে সজ্ঞানে পলে-পলে হত্যা করিব। তাহাকে সমাজের রাখিয়া মর্ম্মন্তুদ কষ্ট দিব—সমাজে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া তিলে-তিলে তাহাকে মারিয়া ফেলিব।" এই ত সমাজের বিচার!!

"আমরা ব্যভিচার সমর্থন করিতেছি না। আমরা বলি অন্যায় দ্বারা ন্যায়ের পক্ষসমর্থন করা চলে না। সমাজ তাহার আইনের সংশোধন করুক, তার পর এইরূপ অপরাধের বিচার করুক। শুধু রমণীর উপরেই জাত-সন্তানের ভরণপোষণ ও পালনের ভার দিলে চলিবে না; সন্তানের জন্মদাতাকেও সে জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিতে হইবে।

"খৃষ্টান সমাজের কথা ছাড়িয়া দাও। হিন্দুসমাজ কি করিতেছে? বিধবা ও কুমারীদের প্রকারান্তরে বলিতেছে—"যাহা ইচ্ছা করো—দেখিও, সন্তানের জন্ম দিও না।" সমাজ স্বীকার করে যে, সন্তান যত বলিষ্ঠ হবে, উন্নত হবে, সুসম্পন্ন হবে—রাষ্ট্রও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্র বলিতেছে—"সাবধান, শিশুর জন্ম দিও না।" আমরা পবিত্রতা চাই। কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে, ন্যায়ের দ্বারাই ন্যায় সমর্থিত হয়—ছি ছি ও দূর দূর করিয়া দোষকে তাড়ান যায় না। তোমার আইনে গলদ রহিয়াছে—তাহার সংশোধনের চেষ্টা কর। আইনের উদ্দেশ্য শুধু শাস্তি দেওয়া নহে—আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য রক্ষা করা। "চুপ চুপ" বলিয়া তিরস্কার করিলে পাপকে ঢাকিয়া, চাপিয়া রাখা হয়—তাহার প্রতিরোধ হয় না।

"রাজনৈতিক জীবনে যেমন স্বাতন্ত্র্য না হইলে রাষ্ট্রের হীনতা ও দারিদ্র্য দূর হয় না সেইরূপ সমাজ-জীবনেও কতকটা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে, সমাজ শীঘ্রই পঙ্গু হইয়া পড়ে। মেয়েদের যে আত্মা আছে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই দুইটি কথা মনে রাখিয়া আমরা Hypocrisy, দম্ভ ও কপটতাকে বয়কট করিব। আমরা চাই chastity, সতীত্ব, ব্যভিচারহীনতা। সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, যদিও বলিতে, শুনিতে, আর নিয়মের খাতিরে আমরা সকলে monogamist একপত্নীক, এবং একপত্নীত্বই শ্রেষ্ঠ মনে করি; কিন্তু লুকাইয়া ঢাকিয়া সকল দেশের সমাজেই যে বহুপত্নীত্ব প্রচলিত রহিয়াছে, সে জিনিসটা কি? আমরা বলি যে, আমাদের মেয়েরা এক-একটি সীতা-সাবিত্রী হোক্; কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, সীতা—সীতা ও সাবিত্রী—সাবিত্রী কি প্রকারে হইলেন? আমাদের মনেই থাকে না যে, ঐ গুলা প্রেম-বিবাহ Love marriage ছিল; আর আজকাল marriage of convenienceই সংসারের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"বিবাহকে যে duty to society সমাজের প্রতি কর্তব্য বলা হয়—সেটা একটা প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কি? পরের জন্যে মানুষ যথেষ্ট করিতে পারে বটে—কিন্তু পরের জন্য আপনাকে হত্যা করা যায় কি? পরের জন্য আপনার ব্যক্তিত্বকে হীন ও বিনষ্ট করা যায় কি? আত্ম-পিপাসার শান্তি মানুষের সর্ব্বপ্রথম ও অনিবার্য্য ধর্ম্ম। যদি আমার ব্যক্তিগত বৃদ্ধি ও বিকাশ দ্বারা সংসারের বৃদ্ধি ও উন্নতি হয়, তবেই আমি সমাজের জন্য চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু যদি সেই জন্য আত্মাকে বিনাশ করিতে হয়, তবে লোক-দেখান যাহাই করি না কেন, সমাজের প্রাণের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না।

"বেশ্যাদের কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। সমাজে বেশ্যা একটি (necessary evil) দরকারী দোষ নয়। সমাজের জীবনের জন্য বেশ্যার প্রয়োজন, একথা বলা ভুল। কোনও পুরুষে একজন স্ত্রী ও কোনও রমণীতে একজন পুরুষ এরূপ ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারেন যে, তাঁহাদের আর কাহারও নিকট যাইবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হয় না। ইহা সম্ভব ও প্রতিনিয়তই হইতেছে। একজন বেশ্যার জন্য ত অনেক পুরুষ সর্ব্বস্ব হারাইতে প্রস্তুত। সেরূপ স্থলে যদি ইহারা পরস্পর বিবাহ করিয়া বাস করিবার অধিকার পাইত—যদি ঐ বেশ্যা—বা স্ত্রীবিশেষের সন্তানগণ সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে ব্যভিচার কমিয়া যাইত কি না? এ কি রকম নীতি বুঝি না যে, একদিকে পবিত্রতা, সতীত্ব, ও একপত্নীত্বের জয় ঘোষণা করিতেছি, আবার সেইমুখেই আমরা বেশ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছি!

"আবার যে সব রমণী সমাজে পবিত্রা বলিয়া অভ্যর্থিতা হন তাঁহাদের কথা কি বলিব?—

"So long as 'pure' women take pleasure in the cruel sport of the cat, so long as with facile changes of the mood of the serpentine dancer they evade the responsibilities of their flirtations, so long as they delight in provoking jealousy as a homage to themselves, so long will they be helping to breed the hell-broth around which 'the men will celebrate the witche's sabbath in the company of the bat-winged bevies of the night. There are more men led astray by 'pure' or 'so-called pure' than by impure women."

"দুজন প্রেমিক যাহারা একসঙ্গে থাকিতে চাহে, তাহাদের জন্য কোনও বিশেষ সংস্কার বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি? অথবা যাহারা একসঙ্গে থাকিতে চাহে না; এরূপ পুরুষ ও রমণীকে সমাজের নিয়মে বাঁধিয়া রাখা কি উহাদের ব্যক্তিগত মানবীয় অধিকার এবং human dignityর মূলে কুঠারাঘাত করা নয়? এ সব কথাও আমাদের ভাবিতে হইবে।

"Matriarchy ও Patriarchy দ্বারা সমাজ-গোলোকধাঁধাঁর গ্রন্থি উন্মোচিত হয় নাই। এখন আমাদের ঝোঁক দিতে হইবে—century of the child এর প্রতি—সন্তানযুগের প্রতি।' পিতা বা মাতার হিত দেখিলে সমাজ বাঁচিবে না। যদি বাস্তবিক আমরা সমাজের উন্নতির আশা করি, ভবিষ্যৎ সমাজের যারা বীজাণু সেই শিশুদের হিত ও অহিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।"

লেখক 'বাসুদেব' এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, দুইচারিটী অপ্রিয় সত্যও বলিয়াছেন। তাঁহার সকল কথাই যে বিচারসহ ও সমীচীন, তাহাও বলা যায় না। তিনি যে সকল সামাজিক সমস্যার কথা বলিয়াছেন, তথা-কথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সে প্রকার আন্দোলন যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু আমাদের হিন্দু সমাজ যে ইহার কোন কথাতেই কিছুতেই সায় দিতে পারেন না। তাহার কি?

চিত্রময় জগৎ, ফেব্রুয়ারী।

"স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক আন্নাসাহেব পটবর্দ্ধন।"

বিগত মাঘ মাসের একাদশ দিবসে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পুণা নগরে পটবর্দ্ধন সাহেব পরলোকে গমন করিয়াছেন। পরোপকার ইঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। দীন-দুঃখীর ব্যথায়, অন্যায়-পীড়িত সংসারের কষ্টে ইঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই করুণায় বিচলিত হইত। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের বাহিরে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও ইঁহার নাম আমরা বড় একটা জানি না; কিন্তু মহামতি রাণাডে হইতে লোকমান্য তিলক পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশহিতৈষী কর্ম্মীর ইনি দক্ষিণহস্ত স্বরূপ নীরবে ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের আড়ম্বর ইনি ভালবাসিতেন না এবং সেইজন্য সাধারণ্যে ইঁহার নামের প্রচারও সেরূপ হয় নাই। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম—ডাক্তার বিনায়ক রামচন্দ্রজী পটবর্দ্ধন বি-এ, এল্‌এম্-বি, এল্ এম্।

সততা, দৃঢ়তা, ঔদার্য্য, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি গুণগুলি যেন

তাঁহার নিজস্ব—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনিস ছিল। ইঁহার পিতা রামচন্দ্র রাও পুণার প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, এবং উক্ত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন। আপ্পাসাহেবের মাতা জানকীবাই একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। ইঁহার পিতামাতার উপর ভক্তি কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কারণ আপ্পাসাহেব অন্তিমকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে "জানকী রামচন্দ্রাভ্যাং নমঃ" বলিয়া পিতামাতার উদ্দেশে প্রণাম করিতেন।

প্রবেশিকা পাশ করিয়া তিনি পুণা কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে সৎসাহস, নির্ভীকতা ও সচ্চরিত্রতায় অধ্যক্ষ ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া তিনি ডাক্তারী ও ওকালতী পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে ইনি সেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এইকাজে বুদ্ধি, বিদ্যা ও সামর্থ্যের বিশেষরূপ প্রয়োজন হয় এবং এই তিনটিই ইঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। স্বচ্ছল অবস্থা ছিল বলিয়া ইনি স্থির করিলেন যে, ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া, ভালরূপে ডাক্তারী ও কবিরাজী অধ্যয়ন করিয়া লোকের দুঃখ দূর করিবেন। যে সময়ে অন্য লোকে ধনোপার্জ্জন ও আত্মসুখে সব ভুলিয়া যায়, ইনি সে বয়সে নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃঢ়ব্রত উদ্‌যাপিত করিলেন। তিনি আজীবন কখনও সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই।

বোম্বাই Grant College এ অধ্যয়নকালে ইনি রাণাডে মহোদয়ের সঙ্গে পরিচিত হন ও কিছুকাল "ইন্দুপ্রকাশ" নামক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। তাহার পর প্রসিদ্ধ বৈদ্য প্রাণাচার্য্য বালশাস্ত্রী লাগানকরের সহিত পরিচিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছুদিন বিনামূল্যে দরিদ্র-দিগকে ঔষধ ও ব্যবস্থা দান করিতেন। এই সময় হায়দ্রাবাদ ও কারবট রাজ্যদ্বয় ইঁহাকে কোনও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইনি দেখিলেন এই ব্যাঙ্ক দ্বারা দেশের সমূহ লাভ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যাহাতে ঐ ব্যাঙ্কের কার্য্য সফল হয়, সেজন্য তিনি উঠিয়া-পড়িয়া পরিশ্রম করিলেন। হায়দ্রাবাদের কার্য্য ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। কিন্তু কারবট-রাজের মৃত্যু হওয়ায় সে কার্য্য স্থগিত থাকে। তাহার পর ইনি মান্দ্রাজ গমন করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। শেষ-জীবন ইনি আধ্যাত্মিক সাধনাতেই অতিবাহিত করেন। ইনি সাধন বলে কর্ম্মযোগী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শেষজীবনে আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে ইনি বাহিরের কর্ম্মজীবন একেবারে ত্যাগ করেন নাই।

এরূপ নিস্পৃহ, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী অথচ নীরব সাধক আজকাল আমাদের দেশে কয়জন আছেন?

৩। নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা—জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭।

"রাষ্ট্রলিপি"। গত ১৩ই জানুয়ারী কাশী নাগরী-প্রচারিণী-সভায় শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস, বি. এ. "রাষ্ট্রলিপি" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল—

"রাষ্ট্রলিপি সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই, আরও দুইটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। সে দুইটি হইতেছে, রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় শিক্ষা। এই তিনটি বিষয়েরই পরস্পরের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে, একটিকে বাদ দিয়া আর দুইটির আলোচনা চলে না। রাষ্ট্র, জাতি, সমাজ ও অর্থ—সকল বিষয়েই আজকাল একটি একটানা একতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ইহা অস্বীকার করা ভণ্ডামী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই উন্নতির ধারা যাহাতে সমস্ত দেশবাসীকে স্পর্শ করিয়া চলিতে পারে, তাহাই করা উচিত। কোনও প্রকার বিভিন্নতা থাকিলে, সে উন্নতি সত্য নহে; এবং তাহার সফলতা-লাভও সুদূরপরাহত। যাহাতে প্রত্যেক উদ্যম ও চেষ্টার ভাব ও বিচার দেশের সকল প্রান্তের সকল লোকের নিকট সহজগম্য হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, প্রত্যেক লোকই যাহাতে তাহার ক্ষমতা অনুসারে ঐ বিশিষ্ট মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত প্রাণ মিশাইয়া যোগ দিতে পারে ও তাহার সফলতার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে পারে—সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কয়েকজন লোক বুঝিল, ও কয়েকজন লোক বুঝিল না—অথচ আমরা নূতন প্রেরণার বার্ত্তা গাহিয়া গেলাম, সেরূপ প্রকারে কোনও ফল নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ত প্রান্তীয় ভাষায়ই কাজ চলে। কিন্তু একটি ভাব একই সময়ে যাহাতে সমস্ত দেশ বুঝিতে পারে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয়তার জন্য—রাষ্ট্রীয় একতার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন—এক-ধর্ম্ম, এক-শাসনতন্ত্র, এক-ভাষা।

ধর্ম্মসম্বন্ধে একতা হওয়া কঠিন; এবং উহা আজকাল না হইলেও চলে। কিন্তু নজর রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া বিরোধ না বাধে। লোকে যাহাতে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মকে বিদ্রূপ ও পরিহাস না করিয়া চলিতে পারে শিক্ষা ও আইন দ্বারা সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদের দেশে শাসনতন্ত্র সকল স্থানেই এক। ব্রিটিশ-রাজ আইনের চক্ষে আমাদের সকলকেই সমান করিয়া দিয়াছেন।

এইজন্য কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোনও লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজীই এদেশের রাষ্ট্রভাষা হইবে। যদিও ইংরাজী আমাদের রাজ-ভাষা, এবং সেই জন্যই দেশের একটি সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে —তথাপি, ইংরাজী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবে বা হইতে পারে, এরূপ মনে করাই ভুল। এদেশে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার বিদ্যার্থী ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা পাইয়া থাকে। এরূপ ভাবে চলিলে, সমস্ত ভারতবর্ষের লোককে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিতে কত দিন লাগিবে, সেটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আর একটি ভুল আমরা করিয়া থাকি। আমরা বিদ্যা ও ভাষাকে একই জিনিস বলিয়া ধরিয়া লই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইংরাজী ভাষা ব্যতিরেকেও আমরা বিদ্যার্জ্জন করিতে পারি। অবশ্য সেজন্য

আমাদের ভাষার দৈন্য আগে দূর করিতে হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের কর্ত্তব্য। জাতির উন্নতি যদি ইংরাজী ভাষার দ্বারা দুই হাজার বৎসরে সম্ভব হয়, তবে সেই বিদ্যা যদি আমরা মাতৃভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা করি, তবে জাতির পূর্ণ বিকাশের জন্য পাঁচশত বৎসর লাগিবে।

রাষ্ট্রলিপিও এক সময় ইংরাজীরই হইবার সম্ভাবনা ছিল। আজকাল সে আশঙ্কা নাই। দেশীয় লিপির প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভারতবর্ষীয় লিপি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত।

আজকাল রাষ্ট্রভাষা লইয়া উর্দ্দু ও হিন্দীতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কিন্তু উর্দ্দু কি হিন্দী হইতে কোনও স্বতন্ত্র ভাষা? হিন্দী ও উর্দ্দুর বাস্তবিক বিভিন্নতা তাহাদের লিপিতে—ভাষায় নহে। আজকাল আমরা যে উর্দ্দু ভাষা দেখি—তাহা বাস্তবিক উর্দ্দু নহে—উহা পারসিক ও আরবী। পূর্ব্বে যে হিন্দী—পারসী বর্ণমালা দ্বারা লিখিত হইত, সেইটাকেই উর্দ্দু বলিত। অবশ্য অনেক শব্দ তখন হিন্দীরূপে গৃহীত হইয়াছিল। সেটা স্বাভাবিক। তাই বলিয়া, পারসী ও আরবী বহুল যে ভাষাকে আমরা আজকাল উর্দ্দু বলি, সেটা আসলে উর্দ্দু নহে।

আমরা মনে করি, দেবনাগরী লিপিই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রলিপির স্থান গ্রহণ করিবে—এবং উচিতও তাহাই। যদি সমস্ত দেশের জন্য আমরা একটি জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রস্তুত করিতে চাই, যদি সমস্ত দেশবাসীর চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেচনা ও স্বার্থ একই ছাঁচে ঢালাই করা দেখিতে চাই, তবে শীঘ্র যাহাতে একটি রাষ্ট্রলিপি ও রাষ্ট্রভাষা গঠিত হয় সে দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত।"

সংস্কৃত

১। বিদ্যোদয়: নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯১৬।

"বল্লভাচার্য্য—চরিতম্" লেখক শ্রীরামস্বামী। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে রায়পুর জেলান্তর্গত রাজমগ্রামে বল্লভাচার্য্যের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই ইনি উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সময়েই এই লোকোত্তরশক্তিসম্পন্ন আচার্য্য দার্শনিক মতগুলির দোষ ও গুণ বিচার করিয়া সুনিপুণভাবে দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার সতীর্থগণ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইনি যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাঁহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। শুধু মায়াবাদই নহে—রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও ইনি যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করেন।

একাদশ বৎসর বয়সে বল্লভ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। সেই সময়ে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বল্লভ বারাণসীধামে আগমন করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। তাহার পর ইনি দক্ষিণভারতের বিদ্যাপীঠগুলি দর্শন করিয়া বেড়ান। পণ্ঢরপুর হইতে ইনি বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া আবার ভ্রমণে বহির্গত হন। অষ্টাদশ বৎসর ধরিয়া ইনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া ফিরেন। অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ৫২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন। Wilson নামক একজন য়ুরোপীয় ইঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে এই কথা বলেন—"হনুমান-ঘাট নামক স্থানে ইনি গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়া 'নতকার হইয়া' অন্তর্ধান করিলেন। কিম্বদন্তী আছে যে, সেই সময় জলরাশির ভিতর হইতে একটি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হয়।"

বল্লভাচার্য্য-রচিত গ্রন্থের মধ্যে এইগুলি প্রসিদ্ধ—(১) তত্ত্বার্থ দীপনিবন্ধ (২) অণুভাষ্যম (৩) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। (৪) পূর্ব্ব-মীমাংসা ভাষ্য।

আসামী

১। বাঁহী, জানুয়ারী, ১৯১৭।

"সম্পাদকর চরা"—সম্পাদক। আর্য্যসভ্যতার অভ্যুদয়ের সময়ে ব্রাহ্মণগণ যে আসামে আগমন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য আর্য্যগণ এখানকার আদিম অধিবাসী নহেন, তাহা ঠিক। সে সময় আসাম অঞ্চলের সকলেই অনার্য্য ছিল এবং ভূত, প্রেত ইত্যাদির পূজা করিত। ফলে আসামের ব্রাহ্মণদের আর্য্যধর্ম্ম, অনার্যদের কুসংস্কার এবং দেওপুজার সহিত মিলিত হইয়া একটি ভীষণ শাক্তধর্ম্মরূপে নূতন আকার ধারণ করিল। অনুগ্রহ, ক্ষমতা, গৌরব ও সম্পত্তির লোভে ব্রাহ্মণগণ আসামের রাজগণকে হিন্দু করিয়া লইয়া তাহাদের যশঃকীর্ত্তন করিয়া গৌরব বাড়াইয়া দিলেন এবং রাজাদের সকলকে কাল্পনিক ক্ষত্রিয়-বংশাবলি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে আসামের অনার্য্য রাজগণ ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। নরক, বাণ, ও ভগদত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ বিরচিত পুরাণে আসামের নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই নৃপতিগণ আসলে অনার্য্য ছিলেন। শিব প্রভৃতি হিন্দুদেবতাগণের পূজা আসামে এই সকল ব্রাহ্মণদের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এখন তাম্রলিপি প্রভৃতিতে লিখিত গুণ ও বংশাবলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, সেই সকল ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে ভুল হওয়াই সম্ভব। কোনও রাজা কোনও ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিলেন—ব্রাহ্মণ সেই রাজার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে তুলিয়া দিলেন। বলবর্ম্ম এবং ভগদত্তের দ্বারা প্রোথিত বজ্রদত্তের তাম্রফলকে—তাঁহারা শিবপূজা করিতেন,—এরূপ উক্তি পাওয়া যায় বলিয়া, সমস্ত আসামেই শিবপূজা সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল – এরূপ ধরিয়া লওয়া বিচার-বিমূঢ়তার পরিচায়ক। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সঙ্গে যখন আসামে আসেন, সে সময় দেশে হিন্দু-ধর্ম্মই বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। রাজা ভাস্করবর্ম্মা ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি বৌদ্ধ সম্রাট শিলাদিত্যের একজন বন্ধু ছিলেন। বৌদ্ধ রাজ্য হইতে অনেক ব্রাহ্মণ ভাস্কর-বর্ম্মার রাজ্যে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই আসামবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সময় আহোম ও কোচ রাজগণের প্রাধান্য ছিল, সে সময় বিস্তর ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ এবং কায়স্থ আসামে আসিয়া বসতি করে। হিন্দু জনসংখ্যা এতটা বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও, তখনও আসামের অধিবাসিগণ ভূত, প্রেত, ডাকিনী ও যোগিনীর পূজা করিত—ইহার উল্লেখ গুরুচরিত্রে পাওয়া যায়।

সাময়িকী

আমরা জাতীয় মহাসমিতি (National Congress) বা প্রাদেশিক সমিতি (Provincial Conference) সম্বন্ধে কোন দিনই কোন আলোচনা করি না, কারণ রাজনীতির আলোচনা আমাদের সাহিত্যিক গণ্ডীর বাহিরে। কিন্তু এতদিন পরে, এবার আমরা বাঙ্গালার প্রাদেশিক সমিতি (Provincial Conference) সম্বন্ধে কিছু বলিবার, পাঠক-পাঠিকাগণকে কিছু শুনাইবার শুভ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি।

এই সেদিন কলিকাতা ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অনেকগুলি মামুলী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, অনেকে সাধা গলায় সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল কথা আমরা বলিতে বসি নাই; আমরা এবার প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি বারিষ্টার-প্রবর, সুধী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের সুন্দর, মনোহর, প্রাণস্পর্শী অভিভাষণের কথাই বলিব। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন এবার বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের যদি ভুল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে—পাবনায় যে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়, তাহাতে কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন; আর কেহ কখন বাঙ্গালার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বাঙ্গালা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করেন নাই। ইহা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বাবুর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগেরই পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সেই মামুলী 'খাড়া-বড়ি-থোড়' 'থোড়-বড়ি-খাড়া' দিয়াই অভিভাষণ পূর্ণ করেন নাই; বলিতে হয় বলিয়া তিনি কথা বলেন নাই, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার জন্যও তিনি বক্তৃতা পাঠ করেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রাণের কথা; তিনি যে কথা চিন্তা করিয়া থাকেন, যে কথা ভাবিয়া প্রাণে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, এই অভিভাষণ তাহারই অভিব্যক্তি। তাই ইহা এমন প্রাণস্পর্শী, এত মধুর হইয়াছিল; তাই আমরা চিত্তরঞ্জনকে দশমুখে প্রশংসা করিতেছি।

এইবার চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণের পরিচয় প্রদান করিব। দেশের দুর্দ্দশার কথা—দেশব্যাপী হাহাকারের কথা—অন্নহীন, জলহীন, স্বাস্থ্যহীন বাঙ্গালার জনসাধারণের কথা—আমাদের গ্রামপল্লীর শ্রীহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন—

"বাঙ্গলায় নাই কি! ছিল না কি! কি জোরে, কি কল-কল স্রোতে গঙ্গা সাগরের সঙ্গে মিশিতেছে! আজিও পদ্মা জলোচ্ছ্বাসে কি উদ্দাম ভাবের ভাঙ্গন অটুট রাখিয়াছে, কি তোড়ে ব্রহ্মপুত্র কলকলনাদে গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া যায়, আর যখন দামোদর ঘোর ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠে, আজিও তাহার গতি কেহ ত রোধ করিতে পারে না, সাগরের অশ্রান্ত গর্জ্জন আজও ত থামে নাই। বৃদ্ধ হিমালয় তাহার দুই বাহু লইয়া আজিও তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন, তমালতালি-বনরাজিনীলা আজিও আছে;—যাহার উপরে বাঙ্গলার প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার স্বভাবধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সব ত তেমনি আছে, তবে নাই কি? বাঙ্গালার যে মন্দিরে-মন্দিরে, মস্‌জিদে-মস্‌জিদে, সাধন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইত, আজিও ত সেই মন্দির আছে, মস্‌জিদ আছে, তবে নাই কি?: সে বল, সে স্বাস্থ্য, সে ধৈর্য্য, সে আত্মস্থ, জাগ্রত অবস্থা সবই তমের অবসাদে ডুবিয়াছে। দেশ আছে, দেশের আদর্শ চলিয়া গেল কেন? জাতি আছে, সেই জাতির যে প্রাণসঞ্চারিণী-শক্তি তাহা ভাসিয়া গেল কেন? সে গ্রাম নাই কেন? পল্লী নাই কেন? সে পল্লী-সমাজ নাই কেন? বাঙ্গলার যে শত-শত গ্রাম লইয়া শত-শত সমাজ ছিল, সে সমাজ নাই কেন? খর্ব্ব, নগ্ন, স্বাস্থ্যহীন, রুক্ষকেশ, কঙ্কালসার প্রাণীর দল ক্ষয়গ্রস্ত মরণাহত পশুর মতন পানপুকুরের ধারে, পথে পড়িয়া ধুঁকিতেছে কেন? আজ যে বাঙ্গালীর মেয়ে আধপেটা খাইয়া লোকচক্ষের অন্তরালে চোখের জল চোখে শুকাইতেছে, তাহার কথা ভাবি না কেন? মায়ের ছেলে

ম্যালেরিয়ায়, প্লীহা-যকৃতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহার খোঁজ রাখি না কেন? আজ যে আমরা Industrialism, Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, Joint Stock Company—বনিয়াদি জুয়াচুরির জন্য অহোরাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছি, কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড়রকমের ধার-করা Indian Nation তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? কেহ কি আমায় বলিয়া দিতে পার, আজ দুইশত বৎসরের ভিতর কয়টা নূতন পুষ্করিণী খনন হইয়াছে, কয়টা নূতন দেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নূতন অন্নছত্র খোলা হইয়াছে, গঙ্গার তীরে-তীরে কয়টা ঘাট নূতন বাঁধান হইয়াছে, পথে-পথে অশ্বত্থ বটের বিবাহ দিয়া তাহার তলাখানি সান্-বাঁধাইয়া—পথশ্রান্ত নরনারীর বিশ্রাম-সেবার জন্য—কয়টা নূতন বট-অশ্বত্থের সেবা সংস্কার হইয়াছে? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পার—কয়টা পল্লী, কয়খানা গ্রাম আজ বাঙ্গলায় আছে? ঘর ভাঙ্গিয়াছে, ব্যবসা গিয়াছে, বাণিজ্য গিয়াছে, রস-কস্ যাহা ছিল সকলই ফুরাইয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তবু কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? সে কালে যখন গ্রামে-গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লীতে-পল্লীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল, তখন সকল গৃহস্থ, সকল গ্রাম কেমন এক পরিবার হইয়া উঠিত, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাস, উৎসব একসঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম। এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই! এখন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ হয় না; খুড়া, ভাইপো, ভাইঝি Cousin হইয়াছে;—পরিবারের সে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। একটা প্রবল সভ্যতার সংঘাতে আমরা শক্তিহীন, আরও দুর্ব্বল, শতছিন্ন হইয়া, বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই, এখনও মিল-ফ্যাক্টরির কথা ভাবিতে গেলে, আমাদের জিবে জল আসে, আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সামান্য কিছু টাকা আছে, তাঁহারা cheap labourএর কথা ভাবিয়া লোভে, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন,—এই যে দাসসুলভ অনুকরণ-মোহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমাদের জীবনের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাকে না সরাইতে পারিলে আমাদের বাঁচিবার আশা নাই।"

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন—"একটা অলীক শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তারিত হইতেছে, ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন, এত রকম আড়ম্বরের মধ্যে যে শিক্ষার প্রাণটুকু মরিয়া যায়। দেশে টাকা নাই, ছেলেরা বই কিনিতে পারে না, বই কিনিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়; তবু যেখানে একখানা বই হইলে চলে সেখানে পাঁচখানা বইয়ের ব্যবস্থা। এই ছেলেদের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না। আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে অঙ্ক কসিতাম, কলেজে পর্য্যন্ত সেই কাগজেই আমাদের কাজ চলিত। এখন স্কুলের নিম্নশ্রেণী হইতে রুল-করা ভাল কাগজের বাঁধান খাতা না হইলে না কি লেখাপড়া হয় না। যে বিলাসকে বর্জ্জন করাই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়, এই উচ্চ-শিক্ষার প্রণালী ও ব্যবস্থা সেই বিলাসকেই বাড়াইয়া দিতেছে। বড়-বড় কলেজের বোর্ডিংএর জন্য খুব বড়-বড় বাড়ীর আবশ্যক। এই সব দ্বিতল, ত্রিতল বাড়ীতে থাকা যাহাদের অভ্যাস হইতেছে, তাহারা কি আর তাহাদের নিজ-নিজ পল্লীগ্রামের কুটীরে গিয়া থাকিতে পারিবে? এই যে শিক্ষা-বিস্তারের উপায়, ইহা ত আমাদের দেশের উপায় নয়; তবে কেন আমরা ইহার বিপক্ষে আন্দোলন করি না! লাভ ত এইটুকু মাত্র যে, বিলাতের ফ্যাক্টারিতে যেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আমাদের এই ইউনিভারসিটী-ফ্যাক্টারিতে বি-এ, এম-এ, পিএচ্-ডি, পি-আর-এস, এইরূপ কতকগুলি জীব তৈয়ার হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ার হয় না। শিক্ষা-দীক্ষার যে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়। এই শিক্ষাতে আমাদের ছাত্রদিগের আত্ম-সম্বিতকে জনমের তরে বিসর্জ্জন দিবার পথ করিয়া দেয়। এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী। সে আত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া জ্ঞানের রাজ্যে দাসখত লিখিয়া দেয়, আর বিজ্ঞানের বড়াই করে। তাই বলিতে-ছিলাম, ইহার জন্য এত আড়ম্বর কেন? এত ধন ব্যয় কেন?"

আমরা প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে উপরে যে দুইটী অংশ

উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই পাঠক-পাঠিকাগণ এই অভিভাষণের সুর বুঝিতে পারিবেন; ইহার মধ্যে যে কি গভীর আন্তরিকতা আছে, তাহারও পরিচয় পাইবেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের এই অভিভাষণ সহস্র সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হইয়া দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র বিতরিত হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। প্রাদেশিক সমিতি দুই দিনের জন্য সমবেত হইয়া, দশটা বক্তৃতা করিয়া যে কার্য্য সাধন করিবার বৃথা আশা করেন, এই অভিভাষণ মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র বিতরিত হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল হইবে।

———

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত দেখিবার জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ দেশের সংবাদপত্রের কয়েকজন প্রতিনিধিকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া বাসরায় প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালা-সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের মধ্যে 'বসুমতী'-সম্পাদক আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই সম্মানে তিনিই যে শুধু সম্মানিত হইয়াছেন, তাহা নহে; বাঙ্গালা সংবাদপত্রও সম্মানিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তি, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা-সংবাদপত্রক্ষেত্রে যে কয়জন মহারথ বিচরণ করিতেছেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা সকলের নিকট প্রকাশ করুন।

———

আমাদের সবেধন নীলমণি, অতিপ্রিয় সাহিত্য-পরিষদে দলাদলির সূত্রপাতে বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। যেখানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, অজাত-শত্রু যতীন্দ্রনাথ, মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর, সুধী হীরেন্দ্রনাথ কর্ণধার, সেখানে স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ আধিপত্য করিতে পারিবে কেন, কে বলিবে?

———

পরিষদ এখনও সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই; পারিলে, আজ পরিষদের সভ্যসংখ্যা দুই সহস্রাধিক না হইয়া বিশসহস্রাধিক হইত। আবার যখন দেখি যে, উহার মধ্যে সাত শতের অধিক সভ্যের দুই বৎসরের অধিক সময়ের দেয় চাঁদা বাকী, বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র-গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের কাহারও বা বার-চৌদ্দ বৎসরেরও অধিক সময়ের দেয় চাঁদা বাকী আছে; যখন দেখি, পরিষদ কাতরকণ্ঠে সিকি টাকায় তাঁহাদের দেয় চাঁদা রফা করিতে স্বীকৃত হইয়া বৃথা তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছেন, তখন ঘৃণায়, লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

———

পরিষদের সভ্যসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা, বহু পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু গত ফাল্গুন মাসের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট, উৎসাহী সভ্য প্রায় ৭০ সত্তর জন ভদ্রলোকের নাম পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে, পরিষদের প্রাচীন সভ্যদিগের অন্যতম শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই সমস্ত ভদ্রলোকের নির্ব্বাচনে আপত্তি করেন; আপত্তির কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, বা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। বলা বাহুল্য, পরিষদের জন্মাবধি সভ্যনির্ব্বাচনে কখন কোন আপত্তি উঠে নাই। আমরা স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, ইহা কখনই মন্মথ বাবুর ব্যক্তিগত আপত্তি নহে; কোন ভদ্রলোক ব্যক্তিগত-ভাবে ৭০ জন (সম্ভবতঃ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মন্মথবাবুর অপরিচিত) ভদ্রলোকের নির্ব্বাচনে কখনই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। তবে কি উহা পরিষদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়, পরিষদের আসন্ন, ঘনীভূত বিপদ হইতে ইহাকে মুক্তি দিবার শুভ-সঙ্কল্প প্রসূত? শুনিতে পাই যে, বৈশাখের বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের প্রয়াস হইয়াছিল। অবশ্য তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং এ কথা বিশ্বাস করিলে, এই সত্তর জন নির্ব্বাচনপ্রয়াসী ভদ্রলোককে অযথা, অন্যায় সন্দেহ করা হয়; এবং এরূপ সন্দেহ বিশিষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যতীত কাহারও করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ঈপ্সিত কর্ম্মচারিবর্গের নির্ব্বাচনের ব্যতিক্রম আশঙ্কা করিয়াই এই সকল সভ্য নির্ব্বাচনে আপত্তি উঠিয়াছিল। আপত্তিকারীরা যদি কোন অভীষ্ট-নির্ব্বাচন-ধর্ম্মী না হইতেন, তাহা

হইলে তাঁহারা তাহার ব্যতিক্রম-আশঙ্কায় বিচলিত হইতেন না। ইহার আরও প্রমাণ এই যে, সে দিনের নির্ব্বাচন-প্রার্থী আরও জনকতক ভদ্রলোকের (আপত্তিকারীদের মতে বোধ হয় যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহাদের মতের অনুগামী হইবেন) নির্ব্বাচনে তাঁহারা আপত্তি করেন নাই। অবশ্য ঐ সত্তর জনের প্রস্তাবকারীরা বা যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ঐ সকল নির্ব্বাচনকামী সভ্যেরও নির্ব্বাচনে আপত্তি তুলিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচনও 'বন্ধ' করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াও কোন নির্ব্বাচনে আপত্তি করেন নাই এবং তাহাতেই তাঁহাদের নিঃস্বার্থপরতা, ভদ্রতা ও শিষ্টতা সূচিত হইতেছে।

এই সকল দলাদলি ও সঙ্কীর্ণতায় বিপন্ন ও বিরক্ত হইয়া আচার্য্য জগদীশ পরবর্ত্তী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপদেশ দেন যে, শুনিতে পাওয়া যায়—পরিষদে নানা নীচ সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ-লাভ করিয়াছে; উহা হইতে পরিষদকে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায়, সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা। আচার্য্যের কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিয়া সেই অধিবেশনেই অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যের মতানুসারে স্থির হয় যে, ঐ সত্তর জন ব্যক্তির নির্ব্বাচন বার্ষিক অধিবেশনের পর যে কোন এক মাসিক অধিবেশনে হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। সাহিত্য-পরিষদের আদালত ঐ সকল ব্যক্তির পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের তিনমাস হাজতবাসের হুকুম দিলেন। যদি মনে করা যায় যে, ঐ সকল নূতন নির্ব্বাচিতের নূতন ভোট পরিষদের কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, তাহা হইলেও, তাঁহাদের নির্ব্বাচন বার্ষিক অধিবেশনে হইবার কোন বাধা আমরা কল্পনা করিতে পারি না; কারণ, বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যাবলীর মধ্যে "সভ্য-নির্ব্বাচন" বলিয়া একটা দফা ছিল, এবং অধিবেশন শেষে নির্ব্বাচিত নূতন সভ্যের ভোট কর্ম্মচারি-নিয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত না। এক্ষণে যদি সাধারণে মনে করে, পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির নির্ব্বাচন ইচ্ছা করেন না এবং বিধিমতে বাধা দেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের কি বলিবার আছে? এই যে সত্তর জন ভদ্রলোক বাণীর সেবায় অগ্রসর হইয়া—জগদীশচন্দ্র সভাপতি থাকিতেও—অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়া পরিষদের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইবার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার জন্যই বা দায়ী কে? এই ব্যাপারের পর বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমোদন না পাইলে আর কোন সভ্য পরিষদের নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতে, বা কোন ভদ্রলোকই পরিষদের সভ্য-পদ-প্রার্থী হইতে সাহসী হইবেন না! আমরা পরিষদের সকল সাধারণ সভ্যকেই অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা মাত্র মাসিক আট আনা চাঁদা দিয়াই পরিষদ সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্য শেষ করিলাম মনে না করিয়া পরিষদের সকল কার্য্যেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করুন।

পরিষদের উন্নতিকল্পে স্যার জগদীশচন্দ্র পরিষদে প্রতি বৃহস্পতিবারে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং বাণীর কৃতী সন্তানদের আহ্বান করিয়া পরিষদে বক্তৃতা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিষদে প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব তাঁহার গল্প ও উপন্যাসে। এ পর্য্যন্ত কোন গল্পলেখক বা ঔপন্যাসিক তাঁহার লিখিত কথা-সাহিত্য পাঠ করিবার জন্য পরিষদ হইতে অনুরুদ্ধ হন নাই। আজ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সভাপতিত্বে কথা-সাহিত্য পরিষদে এ গৌরব লাভ করিল। কিন্তু যে ৭০ জন ভদ্রলোক পরিষদের সভ্যরূপে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়া বিফলকাম ও অপমানিত হইয়াছেন, এই শরৎবাবুও তাঁহাদের একজন। যাঁহাকে পরিষদের সভাপতি মহাশয় পরিষদে-প্রবন্ধপাঠ করিবার জন্য সাদর অনুরোধ করিতেছেন, তাঁহাকেই কিন্তু পরিষদ 'সভ্য'-পদে নির্ব্বাচিত করিতে আপত্তি করিতেছেন। এ রহস্যের মীমাংসা কি?

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

মহাকবি নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী

গত সংখ্যার 'ভারতবর্ষে', রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশ করিয়াছি, এ সংখ্যায় নবীনচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী লইয়া পাঠক-সমীপে উপস্থিত হইলাম। পত্র—দর্পণবিশেষ। তাহার ভিতর লেখক বা কবির অনেকটা ছায়া থাকে। বলা বাহুল্য, নবীনচন্দ্রের পত্রেও তাঁহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পত্রগুলিতে পাঠকবর্গ নবীনচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার দোষ ও গুণ দুই-ই ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। জানিবার যোগ্য কথাও ইহাতে যথেষ্ট আছে। কংগ্রেস সম্বন্ধে—তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে—ঠাকুরদাস বাবুর সমালোচনা-শক্তি সম্বন্ধে যে সব কথা পত্রগুলিতে লেখা আছে, তাহা বহু মূল্যবান বলিয়াই আমরা মনে করি; এবং ঐরূপ মনে করি বলিয়াই, এ পত্রগুলি অপ্রকাশিত অবস্থায় ফেলিয়া না রাখিয়া সাদরে—সাগ্রহে পাঠকবর্গকে উপঢৌকন দিতেছি।

(১) ফেণী

শিবির, ফেণী-তীর।

৬।৩৮৯

প্রীতিভাজন,

বড় বিপদের কথা। বাঙ্গালাতে পত্র লিখিতে হইলে, প্রথমতঃ সম্বোধন লইয়া এক মহা সঙ্কটে পড়িতে হয়। একবার ভাবিয়াছিলাম, "প্রিয় ঠাকুরদাস বাবু!" লিখিব। বাঙ্গালা কবিতার ও অর্দ্ধ-সরকারী (demi-official) এবারতের কল্যাণে 'প্রিয়' শব্দটি এমনি অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার পর ভাবিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ, 'নমস্কার নিবেদনঞ্চমেতৎ' লিখিব। কিন্তু আপনি আমার প্রতি একদিনের মাত্র আলাপে যেরূপ সহৃদয়তা ও সমহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, এই ভক্তিপূর্ণ পুরাতন 'সরকারী এবারত' আপনার মনোমত হইবে কি না সন্দেহ হইল। তাই পাঁচ-পোয়াও নহে, সাতপোয়াও নহে, ভিন্দিপাল গোছের এক 'প্রীতিভাজন' আপনার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম।

কাল শিবিরে—জানেন, আমরাও ধর্ম্মাবতার। আমাদেরও শিবির আছে, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আছে! রথের স্বরূপ কাষ্ঠাসনে বসিয়া অর্থী-প্রত্যর্থী স্বরূপ কৌরব-পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ সাধন করি। পুলিশ নাগপাশ, আপিল-আদালত—ব্রহ্মাস্ত্র। উকীল-মোক্তার—শৃগাল-কুকুর। টুণি মহাশয়েরা—কাক-শকুনি। * * * তৃতীয় সংখ্যা 'মালঞ্চ' পাইলাম। পৌরাণিক গন্ধমাদনও কি এরূপ কোনও জিনিস ছিল? শিবিরে পঁহুছিয়া এক নিশ্বাসে শেষ করিলাম। শেষে যথা ব্যবস্থা শেম্পেন-সংযুক্ত "রস" পান করিয়া শরীরের গ্লানি দূর করিলাম। ভরসা করি মালঞ্চ 'এই ব্যবস্থাটির 'পেটেণ্ট' লইবেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য-রোগের ইহা একটি অমোঘ ঔষধ।

আপনি জানেন লোকের বিজ্ঞতায় আঘাত করিলে বড় প্রাণে লাগে। যখন 'মালঞ্চ' বাহির করিবার প্রস্তাব করেন—উঃ নামটি কি অশ্লীল—আমি বিজ্ঞতার সহিত বলিয়াছিলাম—

"ওরে কেলে সোণা। করি তোরে মানা,
নিদ্রাগত প্যারী, বাঁশি বাজাও না।"

আমাদের সাহিত্য-সিংহদের মুরুব্বিয়ানাতে শ্রীমতী বঙ্গভাষার এখন সুষুপ্তি যুগ উপস্থিত। এখন 'বঙ্গবাসীর' পেশাদারি হিন্দুয়ানীর ও বিডন ষ্ট্রীটের হরি-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে আপনার বাঁশি বাজিতেছে ভাল। একদিকে উপরোক্ত পেশাদারি সাহিত্যের ষড়জ রব, অন্য দিকে 'প্রচার' 'নবজীবনে'র ধর্ম্মান্দোলনের গভীর ধৈবতের মধ্যে মালঞ্চের কড়ি-মধ্যম বড়ই মধুর লাগিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপে আমার বিজ্ঞতায় আঘাত করা আপনার ভাল কার্য্য হইতেছে না।

অনেকদিন পরে বিহারী বাবুর কবিতা পড়িলাম। পড়িয়া মোহিত হইলাম। বহুদিন পরে যেন একটি প্রকৃত বাঙ্গালা কবিতা পড়িলাম। শুনিয়াছি, বিহারীবাবু—ঠাকুরবাড়ীর 'কবি-গুরু'। একদিন জনৈক বন্ধু রবিবাবুর কবিতা সম্বন্ধে বলিতেছিলেন যে তাঁহার কবিতা তাঁহার কবিতার দ্বারাই সমালোচনা করা যায়—"গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে!"

"বসন্তের বাতাসটুকু মত,
ও সে ব'য়ে গেল, ক'য়ে গেল না।
ও সে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল না!"

তিনি বলিলেন, রবিবাবুর কবিতাও বসন্তের বাতাসটুকু মত 'বয়ে যায়, ক'য়ে যায় না; ছুঁয়ে যায়, নুয়ে যায় না।' বলা বাহুল্য, ইহা সমালোচনা নহে—caricature। যাহা হউক, বিহারীবাবুর কবিতা ত সেরূপ নহে। উহা বয়েও যায়, কয়েও যায়, ছুঁয়েও যায়, নুয়েও যায়।

'মালঞ্চ' অতি সুন্দর হইয়াছে। 'কংগ্রেস' প্রবন্ধটি পড়িয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। উহা আপনার লেখনীর অযোগ্য। তাহার একটি প্রমাণ—'বঙ্গবাসী' উহা মুরুব্বিয়ানার সহিত উদ্ধৃত করিয়াছিল। ভগবান করুন, এ দুর্দ্দশা যেন মালঞ্চের আর না ঘটে।

আপনার তৃণগুচ্ছের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র তৃণকেও দেখিয়া প্রীত হইলাম। ধন্যবাদ দিব কি? বড় বাসি জিনিস।

আমার পদ্য যেমন, গদ্যও তেমন, হাতের অক্ষর ততোধিক খোসখত। অতএব পত্রখানি পড়িতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

প্রীতি-প্রার্থী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

(২)

ফেণী

২৫।৩।৮৯

ভাই ঠাকুরদাস,

তবে আর ভাই, আবরণ রাখিব না।

"তারে পারি না ছাড়িতে, মন কহে ফিরাইতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁও না।"

—বড় কবিত্বের কথা বটে, কিন্তু বড় মনোকষ্টের কথাও বটে। এরূপ শিষ্টাচারের আবরণ বড় রাখিতে আমি জানি না, পারি না। এ জীবনে সেই জন্য অনেক দুর্ভোগ ভুগিয়াছি।

তোমার পত্রবাহক আসিল। স্ত্রী দিবা-নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজে পাঠ করিতে লাগিলেন। তোমার উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুললিত ভাষা, আর তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ কণ্ঠ, কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। কিন্তু তোমার মত লোক যদি একটি ক্ষুদ্র মানবকে এরূপ করিয়া বাড়াও, তবে সে কি প্রকারে মাথা স্থির রাখিবে? একবার হেম বাবুর কথা মনে করিও—

"নাচের পুতুল হয় কি মানুষ
তুললে উঁচু করে?"

'মালঞ্চে' আমার 'আবাহন' কবিতার উল্লেখ দেখিয়া আমিও মনে করিয়াছিলাম কথাটা কি জিজ্ঞাসা করিব! না করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। ইহার সহিত তোমার যে এরূপ একটি জীবন্ত শোকের স্মৃতি জড়িত ছিল, আমি ভাবি নাই। পড়িতে পড়িতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে অশ্রুপাত করিলাম। দুঃখ তোমার আমার উভয়ের। সংসারের বলিলেও ক্ষতি নাই। এ সংসারে হৃদয়ের সংখ্যা এত অল্প! তোমার পত্রখানি পড়িয়াছি পর্য্যন্ত কি যেন তাহার একটি শোকোদ্দীপক ছায়া আমার হৃদয়ে ভাসিতেছে। আমি যেন কখনও তাহা ভুলিতে পারিব না।

তুমি বলিয়াছ, কংগ্রেসের দোষ দেখাইয়া সমালোচনা শত্রুতা নহে। এলাহাবাদ কংগ্রেসের সময় আমি মদনমোহন মালবীর কাছে অপরিচিত ভাবে গিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল তাহার দোষের আলোচনা [illegible] আবেগে যেন উন্মত্ত হইয়া চির পরিচিতের মত গলাগলি করিয়া আসি। সে অনেক কথা। দোষ-প্রদর্শন এক। বিদ্বেষ আর। আমি তোমার হৃদয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বিদ্বেষের স্থান হইতে পারে না। আমি বুঝিয়াছিলাম তোমার প্রবন্ধটিতে কেবল রহস্যের ছড়াছড়ি, মূর্খ কথা অল্প। তবে গভীর রহস্য (Humour) যে অল্প লোকেই বুঝে, বঙ্গবাসীর মুরুব্বিয়ানা তাহার প্রমাণ।

কোনো একটি কার্য্যের সমালোচনা করিতে হইলে কার্য্যটাই দেখা কি উচিত নহে? হয় তো ইহাতে কেহ নামের জন্যে, কেহ স্বার্থের জন্যে, কেহ কেবল গোলে হরিবোল দেওয়ার জন্যে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু যদি কার্য্যটি ভাল হয়, তাহার উদ্দেশ্য ভাল হয়, আমি তাহাতেই যথেষ্ট প্রীত হই। মানুষ অপূর্ণ, তাহার কার্য্যাবলীও অপূর্ণ। অতএব মানুষের সমস্ত কার্য্যে দোষ ত থাকিবারই কথা। মহামতি Cobden বহুবর্ষ Corn law আন্দোলনের পর বলিয়াছিলেন—"We have so long been talking sad rubbish." আমি এই কংগ্রেসের মধ্যে ভগবানের হস্ত দেখি। ইহার আদর্শ সেই রাজসূয় যজ্ঞ। তাহার পর আর এরূপ যজ্ঞ ভারতে সংঘটিত হয় নাই। যেই কৃষ্ণ-নীতির ফল রাজসূয়, সেই কৃষ্ণনীতি ইংরাজ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া, আজ তাহার ফল—এই জাতীয় কংগ্রেস।

তুমি রৈবতক-সমালোচনায় না নিজেই এই গভীর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস দিয়াছিলে? যখন ভগবানের রাজসূয়ে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তখন এ মানবের রাজসূয়ে ঘটিবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে যে দোষ ও অভাব আছে, তাহা সহৃদয়তার সহিত ধীর ভাবে, বিনীত ভাবে, দেখাইয়া দেওয়া অতি মহৎ কার্য্য। বিনীত ভাবে—কারণ আমার মত কি ভ্রান্ত হইতে পারে না? দেশের এতগুলি উচ্চদরের লোকের মত কি আমার মতের অপেক্ষা অভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নহে? তাহাতে কি আমাদের শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত নহে? দেশের মাননীয় ব্যক্তিগণকে মান্য করিতে জানি না, ইহাই আমাদের বাঙ্গালী জাতির একটী প্রধান কলঙ্ক ও প্রধান দুরদৃষ্ট।

দুইটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইলাম। খৃষ্ট জীবনী তোমার হাতে দিতে পারি, যদি মালঞ্চে ছাপিবার সঙ্গে সঙ্গে একখানি pamphlet ছাপিয়া দেও। অতিরিক্ত ব্যয় আমি দিব। তবে একসঙ্গে পারিব না।

বেড়াইবার সময়ে স্ত্রীর কাছে সকল স্থান হইতে এক এক পত্র লিখিয়াছি। তাহা ছাপিতে দিতে পারি। ডায়ারী ফায়ারী আমার ছিল না, ভাই।

তোমারই

নবীন।

(৩)

ভাই ঠাকুরদাস,— ফেণী, ১৮।৪ ৮৯

তোমার বিপদের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমাদের উভয়েরি অদৃষ্ট যেন সমান বোধ হইতেছে। আর কিছু গুণ থাকুক না থাকুক উভয়েরই কপালে আগুন আছে। আমারও দেশস্থ বাসা-

বাড়ীটি পুড়িয়া গিয়াছে। পরিবারেরা রক্ষা পাইয়াছে—ইহার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আমার কাছে, বহুদিনের রোগ-শয্যায় অনুবাদিত Mid Summer Night's Dream আছে। তুমি যদি চাহ, বরং তাহা পাঠাইয়া দি। ইহা 'মালঞ্চে'র উপযোগী হইতে পারে। অনুবাদ শেষ হয় নাই। তবে যাহা হইয়াছে, তাহা ছাপিতে ছাপিতে অবশিষ্ট শেষ করিয়া দিতে পারিব। তবে সবটা তোমাকে revise করিতে হইবে। সে সময় কি প্রবৃত্তি আমার নাই। তাহা ছাড়া কেমন একটা রোগ আছে, যাহা লিখি—কাটিতে পারি না।

কংগ্রেস সম্বন্ধে আর মস্তক-কণ্ডুয়ণ করিব না। যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রবন্ধটি ফিরাইয়া পাঠাইলাম। এইটি তোমার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তুমি ভাই তোমার কল্পনার সৃষ্টিগুলি যদি সংসারে খোঁজ, তাহা হইলে শুধু পণ্ডশ্রম হইবে। কেহ কখনো ঐ সকল ideal বা আদর্শ সংসারে পাইয়াছে কি না জানি না, আমি পাই নাই। বৃন্দাবনের কি কবিত্বপূর্ণ, ধীর সমীর যমুনতীর-মধুর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-পূর্ণ, চিত্রই কল্পনার 'চক্ষে' দেখিতাম! আর সেই বৃন্দাবন দেখিলাম রামচন্দ্রের ঐতিহাসিক অনুচরবর্গের রাজ্য! এখন আমার কল্পনায় জয়দেব খুড়ার কবিত্বে বাড়াবাড়ি ছিল বলিয়া সে দোষ বৃন্দাবনের নহে।

আমার বহুমূল্য "উপদেশ"রাশি তুমি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পার। গালি দেবে না ত? তোমার সমালোচক জাতিকে দেখিলে যে ভয় হয়!

ভাল কথা মনে পড়িয়াছে। এবার 'মালঞ্চে' ফুল্লরাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ফুল্লরা ফুলটি লেখনীর কোমলস্পর্শে কি সুন্দরই ফুটিয়াছে! আমি তোমাকে পূর্ব্বে লিখিব মনে করিয়াছিলাম যে 'মালঞ্চে' সমালোচনাটা যেন নিয়মিত হয়। আমি, বোধ হয় এলাহাবাদে তোমাকে বলিয়াছিলাম সমালোচনার অভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। 'বঙ্গবাসী'র মডেলভগিনীতে আর বিজ্ঞাপনীতে বাজার গরম। যদি কালে-ভদ্রে একখানি ভাল পুস্তক বাহির হয়, তাহা জানিবার যো নাই; কারণ কে বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করিয়া বহি কিনিবে—ঘোরতর মূর্খ ভিন্ন? অথচ সকল পুস্তক সমালোচনা করিতে গেলে তোমার সময়ের ও সুনামের উভয়েরই শ্রাদ্ধ হইবে। অতএব তুমি যদি ভাল বহিগুলা মাত্র সমালোচনা কর, তাহা হইলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ উপকার হইবে এবং তাহারা এই বিজ্ঞাপনের জুয়াচুরি হইতে রক্ষা পাইবে। অথচ মন্দ পুস্তককে নিন্দা করিলে যে লেখকের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, তাহা হইতেও রক্ষা পাইবে। তোমার অসাধারণ সমালোচন-শক্তি আছে বলিয়াই এই কয়টি কথা বিশেষ করিয়া লিখিলাম।

প্রীতি-আকাঙ্ক্ষী—নবীন।

(৪)

প্রীতিভাজন— ফেণী ১.৫.৮৯

আজ ডাকে Mid Summer Night's Dream যত দূর অনুবাদিত আছে, পাঠাইলাম। নাম 'অপূর্ব্ব স্বপ্ন' কি 'নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন' যাহা ভাল বুঝেন, দিবেন। আর প্রত্যেকবার Proof দেখিবার সময় বেশ করিয়া সব সংশোধন করিয়া দিতে হইবে? বড় তাড়াতাড়ি লেখা। যখন চাকরী যায়-যায় হইয়াছে, মাথার উপর ঝড় বজ্র গর্জ্জন করিতেছে—রোগে শয্যাশায়ী—সেই গভীর মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভুলিবার জন্যে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া এই অনুবাদ করি। এরূপ একটী সূচনা দিয়া ছাপিতে আরম্ভ করিবেন। আমার নাম দিবেন না। সুকবি-টুকবি যাহা বলিতে হয় বলিবেন।

ভ্রমণের পত্রের কথা বারান্তরে হইবে। চাকরী অসুখের হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু কবি বলিয়াছেন—"অসুখের শেষ চাকরী করা।" চাকরী সর্ব্বত্র দুঃখের। অতএব অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া হঠাৎ কিছু একটা করিয়া ফেলিবেন না।

আর একটি কবিতা পাঠাইলাম। ব্যক্তিগত, যদি উচিত বুঝেন, ছাপিতে পারেন।

প্রীতি-প্রার্থী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

(৫)

ভাই ঠাকুরদাস বাবু— ফেণী, ১৮.৩.৯১

আজ 'বুকপোষ্ট' আমার 'কুরুক্ষেত্র' পাঠাইলাম। স্নেহের উচ্ছ্বাসে আপনি যে বেগার খাটিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ভরসা করি হস্তলিপির পরিমাণ ও অসারত্ব দেখিয়া অনুতাপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যাহা হউক, 'মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত।" যখন কথা দিয়াছেন, চারা নাই। এ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি অনুরোধ আছে।

১। এরূপ কাব্য একচোটে পড়িয়া না গেলে তাহাতে যদি রস কিছু থাকেও তাহার সম্যক উদ্রেক হয় না। তাহার দোষ-গুণও ভাল বুঝা যায় না। তবে আমার মত জগদ্বিখ্যাত মহাকবিবরের মহাকাব্য—কেমন 'বঙ্গবাসী'র ধরণের হইল ত?—এক চোটে পড়া একটি ঘোরতর ত্যাগ-স্বীকারের কথা, তাহা জানি। তবে যখন স্নেহের দায়ে এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এই ক্লেশটুকু স্বীকার করিতে হইবে।

২। বলা বাহুল্য প্রশংসার কিছু থাকিলেও তাহা শুনিবার জন্যে এই ভার গ্রহণ করিতে বলিব কি?—আপনার প্রশংসা শুনিতে চাহিতেছি না। অতএব চোখ হইতে চক্ষুলজ্জার ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে আপনি কেবল দোষ অনুসন্ধান করিবেন, এবং যেমনি পড়িয়া যাইবেন অমনি হস্তলিপিতে পেন্সিলে দোষযুক্ত স্থানে এক-একটি আঁক কি অক্ষর বসাইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাগজে নোট করিয়া স্পষ্ট ভাষায় দোষটা দেখাইয়া দিবেন! সমস্ত কাব্যখানি পড়া শেষ হইলে দু-চার কথায় মোটের উপর আপনার কাছে কেমন

লাগিল লিখিয়া কাগজখানি হস্তলিপি-শুদ্ধ 'বেয়ারিং বুকপোষ্টে' আমার কাছে পাঠাইবেন।

৩। মহাপুরুষ ভূতনাথের আবির্ভাব আপনার কাছে কিছু অসঙ্গত বোধ হইতে পারে। দুর্ব্বাসা এরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্রের মধ্যে এরূপ একটা মূর্খকে রাখিবেন কেন? কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন যে এরূপ মূর্খকে রাখা বরং সঙ্গত। বিশেষতঃ সে অন্য কোনও কথার ধার ধারিত না। কেবল শিব সাজিয়াছিল, তাহাও যে কেন, সে জানিত না। কেবল জানিত যে দুর্ব্বাসা ঋষি বলিয়া ছদ্মনামে নাগবালার বিবাহ করিয়াছে। দুর্ব্বাসা জানিতেন যে এই হস্তীমূর্খ ভয়ে কখনও একথা প্রকাশ করিবে না।

৪। জরৎকারু ঠাকুরাণীর প্রতি কৃষ্ণের মনের ভাব যে এখনো খুলিয়া বলিলাম না, জানি না আপনি কি মনে করেন! এরূপ mysteryতে কি একটুক মিষ্টত্ব, একটুক গভীরত্ব নাই? বিচক্ষণ সমালোচকের কাছে Mysteryও বড় নহে।

৫। শেষের দিকে সর্গগুলো একটুক বেশি দীর্ঘ হইয়াছে কি? একাদশ সর্গে অভিমন্যুর ভাবী গৃহ বর্ণনাটা একটুকু বেশি হইয়াছে কি? এইটা কমানো যায়, কিন্তু আর সকল সর্গ যে কমাইতে পারিব বোধ হয় না।

৬। পুরাতন তামাদি ধরণে কাব্যের শেষে একরূপ পুরাতন—নবীনভাবে ভণিতা দুইটা দেওয়া হইয়াছে।—নম্বর A ও B। দুইটার মধ্যে কোন্‌টা আপনার ভাল লাগিল এবং দিব কি না, লিখিবেন।

৭। "কুরুক্ষেত্রে'র আখ্যান-ভাগ 'রৈবতকের' সঙ্গে গাথা। যাহারা 'রৈবতক' পড়ে নাই, তাঁহাদের পড়িবার জন্যে 'রৈবতকের' আখ্যানটি কুরুক্ষেত্রের মুখপত্রে দেওয়া উচিত কি না লিখিবেন। যদি উচিত বুঝেন তবে আমার নিজের অপূর্ব্ব ভাষায় তাহা না দিয়া আমি আপনার 'রৈবতকের' সমালোচনাটা (উদ্ধৃত অংশ বাদ দিয়া) দিতে চাহি। আপনার সেই সৌন্দর্য্য ও সোহাগভরা লীলাময়ী ভাষা আমি কোথায় পাইব? অবশ্য ইহাতে একটুকু দোকানদারী ভাব থাকিবে। এই বঙ্গবাসী ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাপন-যুগে কিঞ্চিৎ আত্ম-প্রশংসা না হয় করিলামই বা। 'সাহিত্য' আপনার কাছে পাঠাইতে বলিয়াছিলাম। তাহাতে—রৈবতকের সমালোচনা পড়িয়াছেন কি? কেমন লাগিল? তাহা হইতেও স্থানে স্থানে আখ্যানভাগ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারি। তবে লেখককে আমি চিনি না। সম্পাদককেও না। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ চাহিয়া পত্র লেখেন মাত্র। আমি আপনাকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম।—যা শত্রু পরে পরে। তবে আজ এ পর্য্যন্ত। বলা বাহুল্য আপনার মতের জন্যে আমি পথ চাহিয়া থাকিব। যত শীঘ্র পারেন পাঠাইলে বড় আপ্যায়িত ও উপকৃত হইব। কাব্যখানির প্রাপ্তি সংবাদ একখানি কার্ডে লিখিবেন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

পুঃ—আর একটি কথা না বলিলে কাব্যের আরম্ভভাগ বুঝিতে সম্যক পারিবেন না। 'নীরেন্দ্র' আমার প্রথম শিশুটির নাম ছিল। তাহাকে দশমাস বয়সে পদ্মাতীরে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন একটি ১২ বৎসরের পুত্রই আমার একমাত্র সন্তান। তাহার নাম 'নির্ম্মল'। রৈবতকের আরম্ভে স্ত্রীর নাম আছে। মানুষের মন কি অচিন্ত্য পদার্থ!

(৬)

ফেণী ২০।৩।৯১

ভাই ঠাকুরদাস বাবু,

'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে আর গোটা দুই কথা লিখিতে ভুলিয়াছিলাম।

১। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্বাদশ দিবসের অপরাহ্ণ হইতে 'কুরুক্ষেত্র' আরম্ভ হইয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় ষোড়শ সর্গ শেষ হইয়াছে।—অর্দ্ধাধিক এক অষ্ট প্রহর দিনের ঘটনামাত্র লইয়া এই কাব্যখানি। কেবল সপ্তদশ সর্গটি যুদ্ধের পরদিবস রাত্রির শেষ ভাগে আরম্ভ করিয়া প্রভাতে শেষ করিতে হইয়াছে।

২। সমুদায় শবদাহ একদিবসে হইয়াছিল যেন, মহাভারত পড়িয়া এরূপ বোধ হয়। তাহাতেই এ সর্গটি সরাইয়া পিছাইয়া নিতে হইয়াছে। কিন্তু ১৮ দিন পর্য্যন্ত মহারথীদের শব এ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া পচিতেছিল ও কুকুর শৃগালের আহার্য্য হইয়াছিল—কথাটা কেমন বড় অসঙ্গত বোধ হয় না কি? কিন্তু এ সর্গটি আগাইয়া আনিবারও যো নাই। তাহা হইলে 'মহাভারত' স্থাপন করিয়া কাব্যখানি শেষ করা যায় না।

৩। শেষ তিন সর্গ যখনই পড়িতে বসিবেন, তখনই সময় হাতে রাখিয়া পড়িবেন, যাহাতে এক নিশ্বাসে শেষ করিতে পারেন। এটি আমার বিশেষ অনুরোধ। তাহা হইলে আমি যে উচ্ছ্বাসে আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এ তিন সর্গ লিখিয়াছি, তাহার—কথঞ্চিৎ আপনার হৃদয়ে উদ্রেক হইবার সম্ভব। তবে যে হৃদয়ের আবেগে আমি নির্জ্জন শিবিরে অধীর হইয়া কাঁদিয়াছিলাম, তাহার ভাষা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

(৭)

ফেণী ১০।২।৯২

ভাই ঠাকুরদাস বাবু,

অনেক দিন পত্র পাই নাই। কিছু দিন হইল আপনার কাছে লিখিয়াছিলাম যে আমি একটি বৃহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় ব্যাপারটি একপ্রকার শেষ হইয়াছে। আপনি জ্বালাতন ভোগ করিতে যে আগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অবসর হইবে কি? নূতন কাব্যখানিকে 'রৈবতকে'র দ্বিতীয় বা উত্তর ভাগ বলিলেও চলে। আপনি 'রৈবতকে'র প্রথম ও প্রধান সমালোচক। অতএব ক্লেশ স্বীকার করিয়া যদি প্রেসে যাইবার পূর্ব্বে কাব্যখানি আপনি একবার দেখিয়া দিতে পারেন, বড় অনুগৃহীত হইব।

আমি যেরূপ নির্জ্জন প্রদেশে নিঃসহায় অবস্থায় এই দুরাশার কার্য্য করি, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব এমন একটি লোক পাই না। কাব্যখানি দেখিবার জন্যে পাঠাইতে পারি—আপনি ভিন্ন এমন বন্ধুও আর দেখি না।

ভরসা করি ভাল আছেন। 'মালঞ্চ' বুঝি নিতান্ত গা ঢাকা দিলেন! আমার নৈদাঘ নিশীথ স্বপনের কি হইল? ফেরত পাওয়া যাইবে কি?

প্রীতিপ্রার্থী—
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

(৮)

LAHORE
The 25th November.

My Dear Sir,

I am now on a trip to the N. W. and got your letter at Lahore. I cannot sufficiently thank you for it, and the three pamphlets, you have so kindly sent me. The one, that bears your name, is sufficeintly worthy of your pen But with due respect to brother Okhoy Baboo's opinion—I call him dada—I still think that it ought to have come out as a magazine article. In its present stage, I doubt if it will receive the attention, which it deserves. As for your juvenile efforts, I found some of them really entertaining. Poets in all countries have been more or less credited with prophecy. You have done me the honour of calling me by the former name. I will therefore, repay the compliment with a prophecy. I predict a glorious literary future for you, only if you would develop and *conserve* your rising powers. It was no compliment, your critique on "Raibatak" would have done credit to any of our literary lions. I am not at all surprised to hear that it proved distasteful to some of them, for some of them have done and are doing still—may their shadow never grow less—their utmost to destroy me, and if I still live, it is no fault of theirs. In the present instance, I think the sting of the offence lay not a little on the very superior ability displayed in the review—so different from paragraphs laid on paragraphs of fulsome and loathsome adulation.

Thanking you again for your kind expressions, which I only wish I could deserve, and looking forwards with pleasurable expectation for making your personal acquaintance. I remain, in a hurry

Yours very sincerely
Nobin Ch Sen.

(৯)

FENI
23,12,92.

My Dear Thakurdas Bhaya,—

I am indeed sorry to hear that you have left your late service and turned on a new leaf since. On which paper staff are you serving now and what are your prospects? Are you quite happy here? If not, can I do anything for you?

I have read that great book, "অমিয়-নিমাই চরিত" of Shishir K. Ghose, editor of Amrita B. Patrika, which I wish you to review in your best form in নব্যভারত বা সাহিত্য। The review should be done with a heart full of love and admiration for its distinguished author, and still more for the *truly divine subject* of the book. It should be such as to melt even stones. I am writing to *Moti Dada* (Babu Motilal Ghose) to send you a copy of the book. I think a far better arrangement would be for you to see him personally with this letter. It will introduce you to them as a brother of mine, and will enable you to know many things which will be of much use in writing out the review. Further if you are in difficulties now, Confide them to their noble hearts—you will not find truer and warmer in the world, and I am sure they will give you a helping hand. I need only say, Shishir Babu,—I call him Shejda, is my ideal. See him once at any cost, and you will return a changed man, with a heart full of love. May wish me to publish the review over my signature. If written by you, I shall have no objection to sign it, but I am sure, your own name will be as good a recommendation for the book.

I would have written the same myself, though it is not in my line, and with an unpleasant transfer hanging over my head I am ill at ease. If it falls, I shall have to take leave of all literary work for 3 years.

Yours affectionately,
Nobin Ch. Sen.

আসার আশায়

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

জীবনটাকে কি গানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না? ক্ষতি কি?

গানের মত জীবনেরও একটা লয় থাকে। সেই লয় কোনটায় দ্রুত—কোনটায় ঢিমে। কেউ যুদ্ধের বাজন বাজিয়ে দ্রুত তালে চলে যাচ্ছে—আর কেউ বা ঢিমে তালে দীর্ঘ দিন ধরে পিছনে পড়ে থাকচে!

যারা একসঙ্গে পা ফেলে চলে যেতে পারে, তাদের ভাগ্য ভাল!

আমার ভাগ্যে তা হ'ল না। তিনি বিজয়-গর্ব্বে কবে চলে গেছেন—আর আমি! পোড়া কপাল আমার!

আমাকে দেখে তোমরা নিশ্চয় পাগল মনে করছ? তা' করতে পার। আমার সাজের সঙ্গে জীবনের যে বিষম গরমিল রয়েছে!

আমার হাতে চুড়ি ঝক্‌ঝক্ করচে। আমার সিঁথেয় সিঁদুর ডগ্ ডগ্ করচে। আমার পরণে কস্তাপেড়ে সাড়ি!

কিন্তু যাঁর জন্যে এই সব—তিনিই ত নেই!

সত্যি বল্‌চি—ওগো তোমরা অমন করে হেস না। গা-টেপা-টিপি করে বলো না, আমি পাগল। সত্যি বলচি—আমি পাগল নই। তবে আমি কি? ওগো! ও-কথা বলতেও যে আমি বড় ভয় পাই! বাস্তবিক তিনি কি নেই?

আমি কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি;—কত সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা খুঁড়েছি—কিন্তু কেউ কি আমার কথার জবাব দেবে না! তবে বুঝি এ কথার জবাব নেই!

তোমরা যদি কেউ বলতে পার ত'—এই অভাগিনীর বড় উপকার হবে।

বলতে পারবে? আঃ—ভগবান তোমাদের সুখী করুন—আর কি বলব—দীর্ঘজীবী হও বলতে যে ভয় করে,—ভয় হয়, আশীর্ব্বাদ করতে না শাপ দিয়ে বসি!

তবে, বলি, শোন:—

ব'শেখ মাসে বেলার গাছ দেখেচ? কত পাতার আবরণে ঘন দলের বুকের মধ্যে কুঁড়িটি ঘুমিয়ে থাকে! বসন্তের কোকিলের ডাক তাকে জাগাতে পারে না! মলয় বাতাসের সব আরাধনাকে সে তুচ্ছ করে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে!

তার পর, বসন্ত যখন হায়-হায় করতে-করতে চলে যায়—তখন অভাগী কুঁড়ি ধড়-ফড় করে তিন দিনের মধ্যে ফুটে উঠে। তখন তার সাতশ' খোয়ার। কড়া সূর্য্যির তাত তার উপর কি নির্দ্দয় ভাবে পোড়ে বিদ্রূপ করতে থাকে! দাঁড়কাকের হাহাকার শুনতে-শুনতে দিন-শেষে সে ডালের নীচে এলিয়ে পড়ে।

আমি ফুল নই। তাই এলিয়ে পড়লুম না। ঝরে পড়লে ত সব চুকেই যেত!

* * * *

খুব গরীবের ঘরে আমার জন্ম হয়নি। বাবা এমন ডাকসাইটে বড়লোকও কিছু ছিলেন না। কিন্তু কাল হলো আমার পোড়া রূপ।

শুনতে পাই—আমার দুধে রঙে আল্‌তার আভা ছিল। কালো চুল পা অবধি লুটিয়ে পড়ত। আরো কত-কি!

এ-সব আমার শোনা কথা। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। তোমরা কি তার পরিচয় কিছু পাচ্ছ?

কি দেখচ? না, না—ও রং নয়—আমার ঠোঁট অর্দ্ধনিতরই! এটা? টিপ নয়—এটা একটা তিল। ওটা জন্ম থেকেই আছে।

তাই দেখেই ও সন্ন্যাসী মিন্সে বলেছিল যে, আমি হব রাজ-রাণী। আহা! যদি না বলতো! মিন্সে যা বল্‌লে, তাই হলো গা!

আহা, যদি না সেদিন সকালে সাজি হাতে বেরুতাম! গঙ্গাজলে কি শিব-পূজো হয় না? মার ছিল সব তাতেই যেন বাড়াবাড়ি! ফুল তাঁর চাই-ই, নইলে শিব-পূজো হবে না! আর তিনিই বা জান্‌বেন কি করে! আর রাজারই বা কি আক্কেল! দুনিয়ায় এত পথ থাকতে—তাঁর যাবার রাস্তা হলো সেই আমাদের পুকুরের ধারের সরু গলিটা দিয়ে!

শুনলাম, রাজা আস্‌চেন, রাজা আস্‌চেন—হাঁ করে রাজা দেখ্‌চি। মনে করলাম, বুঝি বা তাঁর চারটে হাত দেখব। হায় রে, তখন যদি ছুট্‌ মেরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ি!

রাজা ত বাপু কত লোক দেখেছিল। কপাল ত' আর কারুর ধরল না।

সেদিন থেকে লোকের হাসি সইতে পারি নে। মনে হয়, ওই হাসির নীচে যেন ছুরির বাঁকা ধারটা ঝিক্‌-ঝিক্‌ করচে।

রাজা হেসে বল্লেন, "মা, কি তোমার নাম ?"—আমি ত লজ্জায় মরে গেলাম। ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলাম। নাম মনে এল না। কাণের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। নাকের উপর, বিন্‌কি-বিন্‌কি ঘাম দেখা দিলে।

রাজা বল্লেন, "কি শান্ত—কি লক্ষণ—কি শ্রী—এ যে শুধু আমার ঘরেরই উপযুক্ত।"

সেদিন থেকে চারিদিকে কাণাঘুষো পড়ে গেল। আমার মনের মধ্যে ছট্‌-ফটানি ধর্‌লো। কৈ, রাজার খবর আসে না কেন ? হায় পোড়াকপালী!—শেষে তোর সাধ মিটল।

যখন ডাক পড়ল, তখন একেবারে চুলের মুটি ধরে। আর সবুর সইল না। জানিনে, কবে কোন্‌ ফাঁকে কুমার আমাকে দেখে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে বস্‌লেন।

পাঁজি-পুঁথি ধরে গোণকার বিয়ের দিন ঠিক করলেন,—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমেতে।

কি জল, কি ঝড় সে রাতে! সত্যি বলচি—সে বাতাসে বিয়ের মন্তরগুলো সব উড়ে গেল। শুধু আমরা দু'জনে দু'জনকে দেখ্‌লাম—মাত্র একটিবার! তার পর ঝড়ে সব বাতি নিবে গেল—আমাদের গলার যুঁইএর গড়ে ছিঁড়ে-খুড়ে খণ্ড-খণ্ড হয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল।

আমি কুমারের বুকের কাছে জড়সড় হয়ে বল্লুম "ওগো, আমার যে বড় ভয় করচে।" তিনি মুখের কাছে মুখ এনে বল্লেন—"আরো সরে এস—আমার এই বুকের মধ্যে।"

আমি কাঁপতে-কাঁপতে ঝড়ের মধ্যে—পাখীর ছানা যেমন করে তার নীড়ের মধ্যে ঘুমোয়,—তেমনি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, কই. রাজকুমার,—এ যে আমাদের বুড়ো ঝির বুকের মধ্যে রয়েছি।

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, দু-চোক বেয়ে তার জল পড়চে। কথা কইতে সাহস হল না।

দেখলাম, বাইরে মেঘ থেকে অজস্র জল পড়চে—দেখলাম, বাড়ীর সকলের চোক থেকে জল গড়াচ্চে। গাছের মধ্যে দিয়ে সোঁ-সোঁ করে বাতাস বইচে। আমার বুকের মধ্যে মনে হলো অনেকখানি বাতাস তেমনি করে গুমরে উঠ্‌চে। মনে হলো কাঁদি। কান্না এল না। অবাক্‌ হয়ে রইলাম। এক রাতের মধ্যে আমার বুকের সব রক্ত—চোখের সব জল এমন নিঃশেষ করে কে শুষে নিলে!

তার পর আর কুমারের সঙ্গে দেখা হল না। লজ্জায় কারুকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, তিনি কোথায়।

মস্ত বড় বাড়ীর মধ্যে খাঁচার পাখীর মত আট্‌কা পড়ে রইলুম। যে আমাকে দেখে সেই কাঁদে—আমি অবাক্‌ হয়ে চেয়ে থাকি।

শেষকালে একদিন রাজপুত্তুর দেখা দিলেন। সেদিন কি ঘুমেই না পেয়েছিল আমাকে! কত কথা তিনি বলেছিলেন; তার মানে তখন বুঝিনি। এখনই কি ছাই বুঝতে পেরেচি!

তিনি বল্লেন, আবার দেখা হবে; কবে তা বলেন নি। বলেছেন, তিনি আমাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবেন না। তিনি মানা করেছেন,—আমাকে সিঁথির সিঁদুর মুছ্‌তে—আমার হাতের চুড়ি খুলে ফেল্‌তে।—তাই এই সিঁদুর—তাই আজও এই পোড়া হাত দুটোতে সোনার চুড়ি ঝক্‌-ঝক্‌ করে।

এখন তোমরা কি কেউ দয়া করে আমাকে বলতে পার, কবে তিনি আস্‌চেন ?

ও কি! তোমরাও যে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইলে! চোখের অমন উদাস চাউনি যে আমি সইতে পারিনে।

ওগো, তোমরা কি সব ছবি ? কথা কও না ? হায়-হায়—এ কোন্‌ দেশে তুমি আমায় রেখে গেছ, কুমার! ওমা! চোখের কোণে তোমাদের ও কি গা ? জল নয় ত! সে কি, তোমরাও কথা কইবে না ? তবে কে আমায় বলে দেবে—কবে তুমি আস্‌বে কুমার!

'বাদশাহী কথা'

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি]

(সমসাময়িক আলেখ্য হইতে)

আম্-খাস্

মুঘল বাদশাহগণের 'আম্‌খাস্' চতুষ্কোণ অঙ্গন ও তোরণবিশিষ্ট সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রত্যেক তোরণ প্রাচীর দ্বারা পৃথক হইলেও, যাতায়াতের জন্য প্রাচীর মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বার এবং প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বের মধ্যস্থলে প্রশস্ত দরবার-গৃহের প্রধান দ্বারের উর্দ্ধদেশে নহবতখানা অবস্থিত ছিল। এই স্থানে দিবারাত্রি নিরূপিত সময়ে বাদ্যধ্বনি হইত। এক-সঙ্গে দশ কি দ্বাদশটি শানাই ও করতাল বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বাদিত হইয়া শ্রুতিমধুর ঐক্যতান সৃষ্টি করিত।

যে সিংহদ্বারের উপরে নহবত অবস্থিত, তাহারই অন্য দিকে প্রাঙ্গণ অতিক্রমকালে কয়েক পংক্তি স্তম্ভ-সুশোভিত একটী বৃহৎ ও অত্যুত্তম কক্ষ ছিল (এখনও দিল্লীতে এই কক্ষ দৃষ্ট হয়)। স্তম্ভ ও কক্ষের ছাদ সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত ও সুবর্ণমণ্ডিত ছিল। অন্তঃপুর ও কক্ষের মধ্যস্থ প্রাচীরের মধ্যস্থলে এবং মনুষ্যের অগম্যস্থানে একটী প্রশস্ত গবাক্ষ ছিল। এই গবাক্ষে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরকালে দক্ষিণে ও বামে পুত্রগণপরিবেষ্টিত হইয়া বাদশাহ সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। যোদ্ধৃগণ বাদশাহের নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা কীট-পতঙ্গাদি দূরীভূত করিত; বৃহৎ ব্যজনী সহকারে সপুত্র বাদশাহকে বাতাস করিত, অথবা নিজ-নিজ কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্যবিশেষ গভীর মনোযোগ এবং যথোচিত নম্রতাসহকারে সম্পন্ন করিত। সিংহাসনের নিম্নেই রৌপ্যের রেলিংবেষ্টিত স্থানে ওমরাহ, রাজা ও দূতগণ মস্তক নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। সিংহাসন হইতে দূরে মনসবদারগণ বিশেষ ভক্তিনম্র অবস্থায় ঐরূপে দণ্ডায়মান থাকিতেন। প্রশস্ত কক্ষের অপরাংশ ও প্রাঙ্গণ সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ থাকিত। এই কক্ষ হইতেই বাদশাহ তাঁহার সকল প্রজাকে প্রত্যহ দর্শন দিতেন।

যতক্ষণ এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইত, ততক্ষণ, রাজকীয় অশ্বসমূহের যথোচিত পরিচর্য্যা হইতেছে কি না বুঝিবার জন্য, কতকগুলি অশ্বকে বাদশাহের সিংহাসনের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। অশ্বের পর হস্তী-সমূহ প্রদর্শিত হইত। হস্তীগুলির চর্ম্ম উত্তমরূপে ধৌত এবং মসীবর্ণে চিত্রিত হইত। তাহাদের মস্তকের উর্দ্ধদেশ হইতে শুণ্ডের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত দুইটী লোহিত বর্ণের রেখার দ্বারা অঙ্কিত করা হইত। কারুকার্য্য-সুশোভিত আস্তরণ দ্বারা ইহারা সুসজ্জিত হইয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইত, এবং শুণ্ডটি উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত করিয়া দীর্ঘ বৃংহিত করিত। পরে আরও নানাপ্রকার জন্তু প্রদর্শিত হইত।

এই সময়ে বাদশাহ আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করিতেন। আমখাসে উপস্থিত জনসঙ্ঘের প্রত্যেকের আবেদন বাদ-শাহের নিকটে আনীত এবং তাঁহার সমক্ষে পঠিত হইত। আবেদনকারিগণ বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলে অনেক সময় সেই স্থানেই তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার হইত। বাদশাহের মুখ হইতে কোন কথা বহির্গত হইলেই, (তাহার যেরূপ অর্থই হোক না কেন), নিকটবর্ত্তী জনসঙ্ঘ সেই কথা "লুফিয়া" লইত, এবং প্রধান ওমরাহবর্গ স্বর্গের দিকে হস্তউত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন "কারামৎ! কারামৎ!" প্রকৃত পক্ষে বাদশাহের ওমরাহবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি নিম্নোক্ত শ্লোক অনবগত ছিলেন এবং ইহার আবৃত্তি না করিতেন—

"যদি বাদশাহ বলেন, দিন নয়, এ ঘোর রাত্রিকাল,
তবে বল্‌বে অমনি—চাঁদ-তারকা দিচ্ছে কিরণজাল।"

ঘুসলখানা

বাদশাহের গোপনীয় মন্ত্রণাগারের নাম ছিল "ঘুসলখানা"। ঘুসলখানা অর্থাৎ স্নানাগার। আকবরের স্নানাগারের স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। আমখাসের সুবৃহৎ কক্ষের অভ্যন্তর দিয়া অধিকতর নিভৃত কক্ষ ঘুসলখানায় গমন করা যাইত। অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এই কক্ষে গমন করিবার অনুমতি পাইত। ইহার

প্রাঙ্গণ, আমখাসের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও, এই কক্ষটীও সুন্দর, বৃহৎ ও চিত্রিত ছিল। এই স্থানে বাদশাহ ওমরাহ পরিবৃত ও আসনে উপবিষ্ট হইয়া কর্ম্মচারিগণকে, নিভৃতে সাক্ষাৎ-দান, তাঁহাদের নিকট হইতে সংবাদ-গ্রহণ এবং গুরুতর রাজকার্য্য সংক্রান্ত পরামর্শ করিতেন। দ্বিপ্রহরে আমখাসে অনুপস্থিত হইলে প্রত্যেক ওমরাহ যেরূপ দণ্ডভোগ করিতেন, সন্ধ্যাকালে এই স্থানে অনুপস্থিত হইলেও তাঁহারা সেইরূপ দণ্ডভোগ করিতেন।

এই সম্মিলনে একটি বিশেষ আচার অনুষ্ঠিত হইত। প্রহরীর কর্ম্মে নিযুক্ত সকল মনসব্দারই বাদশাহের সম্মুখ দিয়া গমনকালে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন।

আমখাসে উৎসব

উৎসবকালে আমখাসের দৃশ্য দেখিয়া কোন বৈদেশিক পর্য্যটক বলিয়াছেন যে, ইহা অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য কোনদিন তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। বহু মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিহিত বাদশাহ সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। তাঁহার সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত শ্বেত বর্ণের জামা অত্যুৎকৃষ্ট রেশম ও কামদানীর দ্বারা প্রস্তুত হইত। সুবর্ণ বর্ণ উষ্ণীষে একটি ক্ষুদ্র বক চিত্রিত থাকিত; ইহার পাদদেশ অত্যন্ত বৃহৎ এবং বহু মূল্যবান হীরক ও 'টোপাজ'-প্রস্তর-সমন্বিত ছিল। তাঁহার গলদেশে সুবৃহৎ মুক্তা শোভিত কণ্ঠহার শোভা পাইত। ছয়টি সুবর্ণ-নির্ম্মিত পদের উপরে সিংহাসন স্থাপিত হইত এবং এই ছয়টি পদ পদ্মরাগ, মরকত ও হীরকে গঠিত ছিল।

সিংহাসনের পাদমূলে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ-ভূষিত ওমরাহগণ রৌপ্যের রেলিংবেষ্টিত উচ্চ মঞ্চের উপরে সমবেত হইতেন। এই স্থান কিংখাবনির্ম্মিত ও সুবর্ণের ঝালর-সমন্বিত চাঁদোয়া দ্বারা আবৃত থাকিত। কক্ষের স্তম্ভগুলি সুবর্ণখচিত, কিংখাব-বিজড়িত এবং কক্ষের ঊর্দ্ধদেশে রেশমের রজ্জুযুত কারুকার্য্যসমন্বিত সাটীর চাঁদোয়া শোভা পাইত। মহার্ঘ রেশমের সুবৃহৎ কার্পেট দ্বারা কক্ষতল আবৃত হইত। কক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর একটী পট্টাবাস বহির্দ্দেশে স্থাপিত হইত এবং পট্টবাসের ঊর্দ্ধদেশ কক্ষের সহিত সংযোজিত থাকিত। এই পট্টাবাস অঙ্গনের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিত, ইহা সম্পূর্ণরূপে রৌপ্যপাতমণ্ডিত ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণীদ্বারা ধৃত থাকিত। পট্টাবাসের স্তম্ভগুলি রৌপ্যাবৃত্ত এবং বহির্দ্দেশ লোহিতবর্ণের ও অভ্যন্তর মছলিপট্টনের ছিট দ্বারা আবৃত হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিত। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ তোরণের এক-একটি মঞ্চ প্রত্যেক ওমরাহ নিজ-নিজ ব্যয়ে সুসজ্জিত করিতে আদিষ্ট হইতেন এবং বাদশাহের প্রীতি সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত। এইজন্যই সকল তোরণের মঞ্চগুলি কিংখাব ও মূল্যবান কার্পেটে আচ্ছাদিত হইত।

উৎসবের তৃতীয় দিবসে প্রথমে বাদশাহ ও পরে কয়েক জন ওমরাহকে বিশেষ আচার সহকারে সুবৃহৎ তুলাদণ্ডে ওজন করা হইত। তুলাদণ্ড ও ওজনগুলি নিরেট সুবর্ণনির্ম্মিত ছিল। এই বাৎসরিক উৎসবে একটী প্রাচীন আচার অনুষ্ঠিত হইত। ইহা অবশ্য ওমরাহগণের পক্ষে প্রীতিকর ছিল না। নিজ নিজ বেতনানুসারে প্রত্যেক ওমরাহকে অল্প বা অধিক মূল্যের উপহার বাদশাহকে প্রদান করিতে হইত। কোন-কোন ক্ষেত্রে অত্যধিক জাঁকজমক দেখাইবার জন্য এবং কোন সময় বা—শাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময়ে তাঁহারা যে প্রজাপীড়ন করিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে বাদশাহকে বিরত করিতে, অথবা বাদশাহের অনুগ্রহলাভ ও বেতন বৃদ্ধির জন্য কেহ-কেহ এই অবসরে অত্যাশ্চর্য্য মূল্যবান উপহারও প্রদান করিতেন। কথিত আছে যে, এই প্রকার এক উৎসবে আওরংজেব জাফর খাঁ নামক তাঁহার এক উচ্চপদারূঢ় ওমরাহের বাটীতে নবনির্ম্মিত গৃহ দেখিবার ছলে গমন করিয়াছিলেন, এবং উজীর প্রচুর অর্থ ও বহুমূল্য একটী মরকত আওরংজেবকে প্রদান করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বাদশাহী মেলা

রাজকীয় মহলে একটি অদ্ভুত মেলার অনুষ্ঠান হইত। ইহা ওমরাহ ও প্রধান-প্রধান মনসবদারগণের সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও সৌন্দর্য্যশালিনী পত্নীগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সুদৃশ্য কিংখাব, কামদানী বস্ত্র, সুবর্ণের উষ্ণীষ ও অন্যান্য নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য এই মেলায় প্রদর্শিত হইত। এই সকল মোহিনী, রূপসী রমণীগণ বণিকবৃত্তির অভিনয় করিতেন এবং বাদশাহ, বেগম বা বাদশাজাদীগণ এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। এই মেলায় হাস্যরস-কৌতুকের যথেষ্ট অভিনয়

হইত। এক পয়সার মূল্যের তারতম্য লইয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহ দস্তদস্তুর করিতেন। বিক্রেত্রী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে দ্রব্যের যথাসম্ভব অধিক মূল্য গ্রহণের চেষ্টা করিতেন; এবং যখন বাদশাহ কম মূল্য প্রদানে ইচ্ছা বা ইচ্ছার ভাণ করিতেন, তখন অপর পক্ষ নির্ভয়ে তাঁহাকে মূর্খ, বালক, দ্রব্যাদির মূল্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ক্রেতা বলিয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করিতেন। ক্রেতা-বিক্রেত্রীর কলহে এবং উচ্চ চীৎকারে হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য অভিনীত হইত। অবশেষে সম্রাট ও বাদশাজাদীগণ নগদমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতেন এবং অনেক সময় রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে দুই-একটী অতিরিক্ত সুবর্ণমুদ্রাও প্রদান করিতেন।

শাহজাহানের সময় 'কেঞ্চন' নাম্নী নর্ত্তকীগণও এই মেলায় প্রবেশাধিকার পাইত; কিন্তু আওরংজেব এই আদেশ রহিত করিয়াছিলেন।

উপসংহার।

দিল্লী পুনরায় হিন্দুস্থানের রাজধানী হইয়াছে। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাট্ দিল্লীতে আসিয়া ঝারোকায় উপবিষ্ট হইয়া কোটী-কোটী নরনারীকে দর্শন দিয়াছিলেন; কিন্তু সে আমখাস্, সে নৌরোজ, সে ময়ূরতক্ত—তাহারা আজ কোথায়?

রজনী

[শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস]

অন্ধ পুষ্প-নারী ছিলে, পুষ্প-সুকোমল প্রাণ।
কঠিন পুরুষ-স্পর্শে, কেন হলে হতজ্ঞান?
প্রস্ফুট কুসুম হ'তে আশ্চর্য্য বিস্ময়ময়
শচীন্দ্রের করস্পর্শ এত হ'ল মধুময়!
পুষ্পপর্ণে, পরিমলে না মিটায়ে মনোআশ,
আকাশ-কুসুম সম শচীন্দ্রেতে অভিলাষ।
মল্লিকা, মালতী, যাঁতি বিকশিত ফুলদলে।
না রাখিয়া অনুরাগ, প্রেমের মোহন বলে
অন্ধ হৃদয়েতে তব হেন প্রেম কে জাগালে?
নীচ সহবাসে রহি পরিচয়ি নীচকুলে।
অথবা প্রেমের রীতি সারা ভূমণ্ডল মাঝে।
নাহি মানে ব্যবধান স্থান, কাল, লোকলাজ॥
যেমতি পঙ্কের মাঝে সুহাসিনী পঙ্কজিনী।
লভিয়া জনম সদা বিঘ্নবাধা নাহি মানি।
শতেক যোজন দূরে রবি প্রতি চাহি রয়।
অতিক্রমি পৃথিবীর যত কিছু শোভাময়॥
নীলাকাশে শশধর কুমুদে প্রফুল্ল করে।
বিধির বিধান ইহা পরিব্যাপ্ত চরাচরে॥
কল্লোলিনী তরঙ্গিনী হের কিবা সুষমায়।
শত বাধা অতিক্রমি পুলকে সাগরে ধায়॥
এ প্রেম কুসুম তব হৃদয়ে রহি সঞ্চিত।
স্বীয় রবিকর স্পর্শে এবে হ'ল বিকশিত॥
বিশ্বনিয়ন্তার বিধি তুমি বা কেন এড়াবে?
কোন বাধা নাহি মানি শচীন্দ্র তোমার হবে।
ব্রহ্মচারী সুকৌশলে ধরিয়া তাহার কর।
"অমরনাথের" হৃদে হানিয়া বিষাক্ত শর॥
অন্ধনেত্র উন্মীলন করি শুভদৃষ্টি মাঝে।
কবির প্রতিভা ধন্য করিয়া জগত মাঝে।
"অমরপ্রসাদে" ধরি সুকোমল বক্ষোপরে।
জন্মান্ধ হৃদয় প্রেম ব্যক্ত কর ধরা'পরে॥

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর নত-মস্তকে ধীরে-ধীরে মহিম যখন তাহার বাসার দিকে পথ চলিতেছিল, তখন, তাহার মুখ দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে, ঠিক সেই সময়ে তাহার সমস্ত প্রাণটা যন্ত্রণায় বাহিরে আসিবার জন্য তাহারই হৃদয়ের দেয়ালে প্রাণপণে গহ্বর খনন করিতেছিল। কি করিয়া সুরেশ এখানে আসিল, কেমন করিয়া এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিল—এই সব ছোটখাটো ইতিহাস এখনো সে জানিতে পারে নাই বটে, কিন্তু, আসল জিনিসটা আর তাহার অবিদিত ছিল না। কেদারবাবুকে সে চিনিত। যেথানে টাকার গন্ধ একবার তিনি পাইয়াছেন, সেথান হইতে সহজে কোন মতেই যে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইবেন না, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। সুরেশকেও সে ছেলেবেলা হইতে নানারূপেই দেখিয়া আসিয়াছে। দৈবাৎ যাহাকে সে ভালবাসে, তাহাকে কাছে পাইবার জন্য সে কি যে দিতে না পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। টাকা ত কিছুই নয়—এ তো চিরদিনই তাহার কাছে অতি তুচ্ছ বস্তু। একদিন তাহারই জন্য যে মুঙ্গেরের গঙ্গায় নিজের প্রাণটার দিকেও চাহে নাই, আজ যদি সে আর একজনের ভালবাসার প্রবলতর মোহে সেই মহিমের প্রতিও দৃক্‌পাত না করে, ত তাহাকে দোষ দিবে সে কি করিয়া? সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা একটা মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করা ব্যতীত, কাহারও উপর সে বিশেষ কোন দোষারোপ করিল না। কিন্তু এই যে এতগুলা বিরুদ্ধ ও প্রচণ্ড শক্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, এতগুলি প্রতিহত করিয়া অচলা যে তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না। তাই তাহার শেষ কথা, তাহার শেষ আচরণ ক্ষণকালের নিমিত্ত চঞ্চল করা ভিন্ন মহিমকে সত্যকার ভরসা কিছুই দেয় নাই। আঙটিটার পানে বারংবার চাহিয়াও সে কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিল না। অথচ, শেষ নিষ্পত্তি হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। এমন করিয়া নিজেকে ভুলাইয়া আর একটা মুহূর্ত্তও কাটানো চলে না। যা হবার তা হোক্, একটা চরম মীমাংসা করিয়া সে লইবেই। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াই, আজ সে তাহার দীন-দরিদ্র ছাত্রাবাসে গিয়া রাত্রি আটটার পর হাজির হইল।

পরদিন অপরাহ্নকালে কেদারবাবুর বাটীতে গিয়া খবর পাইল, তাঁহারা এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায় নিমন্ত্রণ আছে। তাহার পরদিন গিয়াও দেখা হইল না। বেহারা জানাইল, সকলে বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। সকলে যে কে, তাহা, প্রশ্ন না করিয়াও, মহিম অনুমান করিতে পারিল। অপমান এবং অভিমান যত বড়ই হোক, উপর্য্যুপরি দুই দিন ফিরিয়া আসাই তাহার মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারিত; কিন্তু, হাতের আঙটিটা তাহাকে তাহার বাসায় টিকিতে দিল না, পরদিন পুনরায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিল। আজ শুনিতে পাইল, বাবু বাড়ী আছেন—উপরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছেন। মহিমকে দ্বারের কাছে দেখিয়া কেদারবাবু মুখ তুলিয়া গম্ভীর স্বরে শুধু বলিলেন, "এসো মহিম।" মহিম হাত তুলিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিল।

দূরে খোলা জানালার ধারে একটা সোফার উপর পাশাপাশি বসিয়া অচলা এবং সুরেশ। অচলার কোলের উপর একটা ভারি ছবির বই। দু'জনে মিলিয়া ছবি দেখিতেছিল। সুরেশ পলকের জন্য চোখ তুলিয়াই, পুনরায় ছবি দেখায় মনঃসংযোগ করিল; কিন্তু অচলা চাহিয়াও দেখিল না। তাহার অবনত মুখখানি দেখা গেল না বটে, কিন্তু সে যেরূপ একান্ত আগ্রহ ভরে তাহার বইয়ের পাতার দিকে ঝুঁকিয়া রহিল, তাহাতে এমন মনে করা একেবারেই অসঙ্গত হইত যে, পিতার কণ্ঠস্বর, আগন্তুকের পদশব্দ—কিছুই তাহার কাণে যায় নাই। মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখান চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। কেদারবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

আর কোন কথা কহিলেন না—একটু-একটু করিয়া চা-পান করিতে লাগিলেন। বাটিটা যখন নিঃশেষ হইয়া গেল, এবং আর চুপ করিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন সেটা মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "তা' হ'লে এখন কি কচ্চ? তোমাদের আইনের খবর বার হতে এখনো ত মাসখানেক দেরি আছে বলে মনে হচ্চে।"

মহিম শুধু কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

কেদারবাবু বলিলেন, "না হয় পাশই হলে,—তা পাশ তুমি হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই,—কিন্তু কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস্ কোরে হাতে টাকা কিছু না জমিয়ে ত আর কোন দিকে মন দিতে পারবে না? কি বল সুরেশ, মহিমের সাংসারিক অবস্থা ত শুনতে পাই তেমন ভাল নয়।"

সুরেশ কথা কহিল না। মহিম একটু হাসিয়া আস্তে-আস্তে বলিল, "প্র্যাক্‌টিস করলেই যে হাতে টাকা জমবে, তারও কোন্ নিশ্চয়তা নেই।"

কেদারবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, তা নেই,—সে ঈশ্বরের হাত; কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন 'পুরুষ সিংহ'; তোমাকে সেই পুরুষসিংহ হতে হবে। আর কোন দিকে নজর থাকবে না—শুধু উন্নতি, আর উন্নতি। তার পরে সংসার-ধর্ম্ম কর,—যা ইচ্ছা কর, কোন দোষ নেই—তা নইলে সে যে মহাপাপ!" বলিয়া সুরেশের পানে একবার চাহিয়া কহিলেন, "কি বল সুরেশ,—তাদের খাওয়াতে পরাতে পারব না, সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারব না—এম্‌নি কোরেই ত হিন্দুরা উচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও যদি সৎ দৃষ্টান্ত না দেখাই, তা হলে সভ্য-জগতে কোনও মতে কারো কাছে যে মুখ দেখাতে পর্য্যন্ত পারব না। ঠিক কি না? কি বল সুরেশ?" সুরেশ পূর্ব্ববৎ মৌন হইয়া রহিল; মহিম ভিতরে-ভিতরে অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "আপনার উপদেশ আমি মনে রাখ্‌ব। কিন্তু আপনি কি এই আলোচনা করবার জন্যই আমাকে আসতে বলেছিলেন?" কেদারবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, "না শুধু এই নয়, আরও কথা আছে কিন্তু—" বলিয়া তিনি সোফার দিকে চাহিলেন।

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমরা তাহ'লে ও-ঘরে গিয়ে একটু বসি" বলিয়া হেঁট হইয়া অচলার ক্রোড়ের উপর হইতে ছবির বইখানা তুলিয়া লইল। তাহার এই ইঙ্গিত-টুকু কিন্তু অচলার কাছে একেবারে নিষ্ফল হইয়া গেল। সে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি রহিল, উঠিবার লেশমাত্র উদ্যোগ করিল না। কেদারবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা দু'জনে একটুখানি ও-ঘরে গিয়ে বোসোগে, মা, মহিমের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

অচলা মুখ তুলিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া শুধু কহিল, "আমি থাকি বাবা।" সুরেশ কহিল, "আচ্ছা, বেশ, আমিই না হয় যাচ্চি" বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই হাতের বইটা অচলার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া সশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কন্যার অবাধ্যতায় কেদারবাবু যে খুসি হইলেন না, তাহা তিনি তাঁহার মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু, জিদ্‌ও করিলেন না। খানিকক্ষণ রুষ্ট-মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মহিম, তুমি মনে কোরো না আমি তোমার ওপর বিরক্ত; বরঞ্চ, তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাই আছে। তাই বন্ধুর মত উপদেশ দিচ্চি যে, এখন কোন প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে নিজেকে অকর্ম্মণ্য কোরে তুলো না। নিজের উন্নতি কর, কৃতি হও, তার পরে দায়িত্ব নেবার যথেষ্ট সময় পাবে।"

মহিম মুখ ফিরাইয়া একবার অচলার পানে চাহিল। সে চক্ষের পলকে চোখ নামাইয়া ফেলিল। তখন তাহার পিতার পানে চাহিয়া কহিল, "আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু, আপনার কন্যারও কি তাই ইচ্ছা?"

কেদারবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়!" মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, "অন্ততঃ এটা ত নিশ্চয় যে, সমস্ত জেনে-শুনে তোমার হাতে আমি মেয়েকে বিসর্জ্জন দিতে পারব না।" মহিম শান্তস্বরে কহিল, "ইংরেজদের একটা প্রথা আছে, এ রকম অবস্থায় তারা পরস্পরের জন্য অপেক্ষা কোরে থাকে। আপনার সেই অভিপ্রায় কি আমি বুঝ্‌ব?" কেদারবাবু অকস্মাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "দেখ মহিম, আমি তোমার কাছে হলফ্ নেবার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। তুমি যে রকম ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেচ, তাতে আর কোন বাপ হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যেত। কিন্তু আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় লোক, কোন রকমের গোলমাল, হাঙ্গামা ভালবাসিনে বলেই, যতটা সম্ভব

মিষ্টি কথায় আমাদের মনের ভাব তোমাকে জানিয়ে দিলুম। তাতে তুমি অপেক্ষা কোরে থাকবে, কি থাকবে না, সাহেবেরা কি করে, না করে, এত কৈফিয়তে ত আমাদের প্রয়োজন দেখিনে। তা'ছাড়া, আমরা ইংরেজ নই, বাঙালী; মেয়ে আমাদের বড় হয়ে উঠ্‌লেই বাপ-মায়ের চোখে ঘুম আসে না, মুখে অন্ন-জল রোচে না, এ কথা তুমি নিজেই কেন্ না জানো?"

মহিমের চোখ-মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু, সে আত্ম-সংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, "আমি কি ব্যবহার করেচি, যার জন্যে অন্যত্র এত বড় কাণ্ড হতে পারত —এ প্রশ্ন আপনাকে আমি কর্ত্তে চাইনে। শুধু আপনার কন্যার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই, তাঁরও এই অভিপ্রায় কি না!" বলিয়া নিজেই উঠিয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "কেমন, এই ত?"

অচলা মুখ তুলিল না, কথা কহিল না।

একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্প মহিম সবলে নিরোধ করিয়া পুনরায় কহিল, "তোমার মনের কথা নিভৃতে জানবার, জিজ্ঞেসা না কোরে জানবার অবকাশ আমি পেলুম না—সে জন্যে আমি মাপ চাচ্চি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝোঁকের উপর যে কাজ কোরে ফেলেছিলে, তার জন্যেও তোমাকে কোন জবাব-দিহি করতে হবে না! শুধু একবার বল, সেই আঙটিটা ফিরে চাও কি না!"

সুরেশ ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "আমাকে মাপ করতে হবে কেদারবাবু, আমার আর এক মিনিট অপেক্ষা করবার যো নেই।"

উপস্থিত সকলেই মৌন-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া চাহিল। কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সুরেশ অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত দুটো সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "না, না,—এ ভুলের মার্জ্জনা নেই। আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ আজ প্লেগে মৃতকল্প, আর আমি কি না সমস্ত ভুলে গিয়ে, এখানে বোসে বৃথা সময় নষ্ট কর্চি!"

কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "বল কি সুরেশ, প্লেগ? যাবে না কি সেখানে?"

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়! অনেক পূর্ব্বেই আমার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।"

কেদারবাবু অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কিন্তু প্লেগ'যে! তিনি কি তোমার এমন বিশেষ কোন আত্মীয়—"

সুরেশ কহিল, "আত্মীয়! আত্মীয়ের অনেক বড়, কেদারবাবু!" মহিমের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই প্রথম কথা কহিল; বলিল, "মহিম, আমাদের নিশীথের কাল রাত্রি থেকেই প্লেগ হয়েচে, বাঁচে যে, এ আশা নেই। আমার তোমাকেও একবার বলা উচিত—যাবে দেখ্‌তে?"

মহিম নিশীথ লোকটিকে চিনিতে পারিল না। কহিল, "কোন্ নিশীথ?"

"কোন্ নিশীথ! বল কি মহিম? এরই মধ্যে আমাদের নিশীথকেও ভুলে গেলে? যার সঙ্গে সমস্ত সেকেণ্ড ইয়ারটা পড়্‌লে, তাকে তার এত বড় বিপদের দিনে আর মনে পড়চে না?" বলিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, একবার অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া লইয়া, স্নেহের স্বরে বলিল, "তা' পড়বে না বটে! প্লেগ কি না!" এই খোঁচাটুকু মহিম নীরবে সহ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি ভবানীপুর থেকে আস্‌তেন?"

সুরেশ ব্যঙ্গ করিয়া জবাব দিল—"হাঁ, তাই। কিন্তু নিশীথ ত আমাদের দু'চার জন ছিল না মহিম, যে, এতক্ষণ, তোমার মনে পড়েনি। বলি, যাবে কি?"

মহিম চিনিতে পারিয়া কহিল, "নিশীথ কোথায় থাকে এখন?"

সুরেশ কহিল, "আর কোথায়? নিজের বাড়ীতে—ভবানীপুরে। এ সময়ে তাঁকে একবার দেখা দেওয়া কি কর্ত্তব্য বলে মনে হয়? আমি ডাক্তার, আমাকে ত যেতেই হবে; আর অতবড় বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে না থাকো ত তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পারো। কেদারবাবু, আপনাদের কথা বোধ করি শেষ হয়ে গেছে। আশা করি, অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও ওকে একবার ছুটি দিতে পারবেন?"

এ বিদ্রূপটা যে আবার কাহার উপর হইল, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, কেদারবাবু উদ্বিগ্ন মুখে একবার মহিমের, একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই বড়লোক ভাবী-জামাতাটির মান-অভিমান যে কিসে এবং কতটুকুতে, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, আজও বৃদ্ধ তাহার কুল-কিনারা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার

মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; মহিমও হতবুদ্ধির মত নীরবে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে-দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া, হাতের বইখানা সুমুখের টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া এতক্ষণ পরে কথা কহিল; বলিল, "তুমি ডাক্তার, তোমার ত যাওয়াই উচিত; কিন্তু ওঁর ওকালতির কেতাবের মধ্যে ত প্লেগের চিকিৎসা লেখা নেই? উনি যাবেন কি জন্যে শুনি?"

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাবে সুরেশ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল, "আমি সেখানে ডাক্তারি করতে যাচ্চিনে, তার ডাক্তারের অভাব নেই। আমি যাচ্চি বন্ধুর সেবা করতে। বন্ধুত্বটা আমি প্রাণটার চেয়েও বড় বলে মনে করি।"

একটা নিষ্ঠুর হাসির আভাস অচলার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল; কহিল, "সকলেই যে তোমার মত মহৎ হবে, এমন ত কোন কথা নেই। অতবড় বন্ধুত্বজ্ঞান যদি ওঁর না থাকে, ত আমি লজ্জার মনে করিনে। সে যাই হোক, ও যায়গায় ওঁর কিছুতে যাওয়া হবে না।"

সুরেশের মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। কেদারবাবু সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। সভয়ে বলিতে লাগিলেন, "ও সব তুই কি বল্‌চিস্ অচলা? সুরেশের মত—সত্যই ত—নিশীথবাবুর মত—"

অচলা বাধা দিয়া কহিল, "নিশীথবাবুকে ত প্রথমে চিন্‌তেই পারলেন না। তা ছাড়া, উনি ডাক্তার—উনি যেতে পারেন। কিন্তু আর একজনকে বিপদের মধ্যে অনর্থক টেনে নিয়ে যাওয়া কেন?"

আহত হইলে সুরেশের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, যা মুখে আসিল উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি ভীরু নই—প্রাণের ভয় করিনে!" মহিমকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ নেমক-হারামটাকেই জিজ্ঞেসা কোরে দেখ, আমি ওকে মরতে-মরতে বাঁচিয়েছিলুম কি না!"

অচলা দৃপ্ত স্বরে কহিল, "নেমকহারাম উনি! তাই বটে! কিন্তু, যাকে এক সময়ে বাঁচানো যায়, আর এক সময় ইচ্ছে করলে বুঝি তাকে খুন করা যায়?"

কেদারবাবু হতবুদ্ধির মত বলিতে লাগিলেন, "থাম্ না অচলা, থামো না সুরেশ! এ সব কি কাণ্ড বল দেখি!"

সুরেশ রক্ত চক্ষে কেদারবাবুর প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি প্লেগের মধ্যে যেতে পারি তাতে দোষ নেই! মহিমের প্রাণটাই প্রাণ, আর আমারটা কিছু নয়! দেখ্‌লেন ত আপনি!"

লজ্জায়, ক্ষোভে অচলা কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল—"ওঁর প্রাণ উনি দিতে পারেন—আমি নিষেধ করতে পারিনে; কিন্তু যেখানে বাধা দেবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আমি বাধা দেবই। আমি কোন মতেই অমন যায়গায় ওঁকে যেতে দিতে পারব না।" বলিয়া সে প্রস্থানের উপক্রম করিতেই, কেদারবাবু চেঁচাইয়া উঠিলেন, "কোথায় যাস্ অচলা?"

অচলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "না বাবা, দিন-রাত্রি এত পীড়ন আর আমি সহ্য করতে পারিনে। যা একেবারে অসম্ভব, যা প্রাণ থাক্‌তে স্বীকার করবার আমার একেবারে যো নেই, তাই নিয়ে তোমরা আমাকে অহনিশ বিঁধচ—" বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে-চাপিতে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধ কেদারবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত খানিক-ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বারবার বলিতে লাগিলেন—"যত সব ছেলেমানুষ—কি সব কাণ্ড বল ত!" (ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

সঙ্গীত চন্দ্রিকা দ্বিতীয় ভাগ

[শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ছয় টাকা]

ইতঃপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা'র ১ম ভাগের সমালোচনা হইয়াছিল ; এক্ষণে উহার দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থখানি সমালোচনার্থে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। ইহাতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি সুন্দর ভাবে দেওয়া হইয়াছে। গানগুলি অতি উৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থদ্বারা যে সঙ্গীতের বিশেষ উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে আর একটা নূতনত্ব এই দেখিলাম যে, পরিশিষ্টে রাগরাগিনীর ও সপ্তস্বরের যে 'রস' নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। রাগরাগিনীর বাদী, সংবাদী প্রভৃতি বিশুদ্ধ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গীত, সঙ্গীত, ধাক, ছন্দ, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, হপ্তরঙ্গ—ইত্যাদি যাহা আজকাল আর শুনিতে পাওয়া যাইত না, তাহাও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। রাগরাগিনীর মধ্যে ১৮র কানড়া ; ১৩ মল্লার, ইত্যাদির গান প্রায় সমস্তগুলিই আছে, এবং তাহাদের ঠাট বিশুদ্ধ হইয়াছে। এইগুলি লুপ্ত হইলে সঙ্গীত হীনশ্রী হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার যে, সঙ্গীতে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার এই "সঙ্গীত চন্দ্রিকা" গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে যাহা কাট দেওয়া হইয়াছে, তাহা শিক্ষার্থিগণ অল্পায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়। গানের এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ এই প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থকার যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, গ্রন্থকারের মহদাশ্রয় বর্দ্ধমানের শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও তদ্রূপ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন ; সুতরাং উভয়েই অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই উভয়ের নিকট ঋণী। গ্রন্থে যেরূপ বিষয় সন্নিবেশিষ্ট হইয়াছে, এবং গ্রন্থখানি যেরূপ সুবৃহৎ, সে হিসাবে ইহার মূল্য বেশি বলিয়া বোধ হইল না। আশা করি, এই গ্রন্থ সকলের ঘরে-ঘরে বিরাজ করিবে। ইহাতে মহারাজ বাহাদুরের ও গ্রন্থকারের দুইখানি হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্য-পঞ্জিকা

যাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কপ্রসূত বঙ্গভাষার প্রথম অর্থনীতি সংক্রান্ত পুস্তক বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছে, তিনি এবং শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয় 'সাহিত্য-পঞ্জিকা' প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানির ৩২০ পৃষ্ঠায় ত্রয়োদশটী অধ্যায়ে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সম্পাদকগণকে যে এজন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, পুস্তকের প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্রও আছে। আজ কাল কাগজের বাজার যেরূপ তাহাতে ১৲ মূল্য নিতান্তই কম বলিতে হইবে। গ্রন্থে অবশ্য ভুলও আছে ; কিন্তু সে ভুল সংশোধনের ভার সমগ্র বঙ্গভাষাভাষীদের স্কন্ধে লওয়াই কর্ত্তব্য। ২,৪,১০ জনে এ সকল ভুল সংশোধন করিতে পারেন না। বঙ্গভাষায় এ পুস্তক নূতন—অর্থাৎ যাহাকে আমরা Original বলি—সুতরাং আমাদের বিশেষ আশা আছে যে, সকলেই শ্রীমান্ সমাদ্দার ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজকে আবশ্যক সংবাদ দিয়া গ্রন্থখানির সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করিবেন। নিবেদনে সম্পাদকদ্বয় লিখিয়াছেন—"মারে সাহেবের অক্সফোর্ড অভিধান প্রণয়নের সময় সকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায় লক্ষাধিক "রেফারেন্স" দিয়াছিলেন। আর আমাদের দেশে পত্র লিখিয়া, উত্তরের জন্য টিকিট দিয়া, টেলিগ্রাম করিয়া, সামান্য সামান্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" ইহা বড় কলঙ্কের কথা। আমরা আশা করি, সম্পাদকদ্বয়কে ১৩২৩এর নিবেদনে এরূপ কথা লিখিতে হইবে না।

পাগলাঝোরা

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম-এ প্রণীত

মূল্য পাঁচ সিকা।

এই 'পাগলা ঝোরা'র সর্ব্বশুদ্ধ আঠারটি প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; এবং ইহাতে 'তামাকু-তত্ত্ব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'কাশীবাস' পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু 'কাশীবাস' প্রস্তাবটী এই সংগ্রহপুস্তকে না দিলেই হইত, কারণ, ঐ প্রস্তাবটিই এই সংগ্রহের শেষ কথা। সেই মর্ম্মভেদী শেষ কথা পাঠ করিবার পর আর কোন কথা বলিবার যো থাকে না। গোড়া হইতে গ্রন্থকার যে রহস্যের ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, শেষ প্রস্তাব আরম্ভ করিবার সময় সে ভাণ্ডারের দ্বার বন্ধ করিয়া আমাদিগকে এক শ্মশানক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সেখানে বসিয়া পুত্রশোকাতুর গ্রন্থকারের সঙ্গে মিলিয়া কাঁদিতেই ইচ্ছা করে। এই সব কথা ভাবিয়াই বুঝি গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন—'পাগলা-ঝোরা'। এই গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্র ও শেষ প্রস্তাব 'কাশীবাস' প্রথমে বাদ দিয়া পাঠকগণ এই পুস্তকখানি পড়িবেন, তাহা হইলে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবেন, লেখকের মুন্সীয়ানায় মুগ্ধ হইবেন, শত মুখে প্রশংসা করিবেন। তাহার পর 'কাশীবাস' ও উৎসর্গপত্র পড়িয়া লেখকের গভীর বেদনার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিবেন—'পাগলাঝোরা' নাম সার্থক হইবে।

তাপসী

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত

মূল্য বাঁধান ১৷৹ ; কাগজের মলাট ১৲

ইহাতে দশটী ধর্ম্মশীলা নারীর জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যথা, মীরাবাই, সংঘমিত্রা, তপস্বিনী রাবেয়া, সেণ্ট টেরেসা, সেণ্ট এলিজাবেথ, সেণ্ট ক্যাথেরিণ, ম্যাডাম গেঁয়ো, ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কব, রাণী শরৎসুন্দরী, দেবী অঘোরকামিনী। জীবনচরিত লিখিতে হইলে লেখকের যে প্রকার ভক্তিমান হওয়া কর্ত্তব্য, শ্রীযুক্ত অমৃতবাবুতে তাহার অভাব নাই; সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি সুন্দর হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। অমৃতবাবু প্রবীণ লেখক; তাঁহার ভাষায় অযথা আড়ম্বর নাই। যে কয়েকটী দেবীচরিত্র তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের মহিলাবৃন্দের অনুকরণযোগ্য। এই গ্রন্থখানি বালিকাবিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

সাধের পরিণয়

শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী প্রণীত, মূল্য নয় আনা।

এখানি একটী ছোট গল্প; লেখক মহাশয় বিবাহ ব্যাপারের রহস্য এই গল্পে উল্লেখ করিয়াছেন। আজকাল বিবাহে দুই এক স্থানে যে কি প্রকার হাস্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাই ইহাতে বেশ সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, ঘটনাটী বাস্তব। লেখকের লিপিকুশলতা আছে, বলিবার ভঙ্গীও বেশ সুন্দর।

পূজার ফুল

শ্রীনিশিকান্ত সেন প্রণীত, মূল্য আটআনা

এখানি গল্পপুস্তক। ইহাতে পাঁচটী গল্প আছে। গল্প কয়টীর আখ্যানভাগ বেশ। লেখকের লিপিকুশলতাও আছে। 'কনকচাঁপা'র লেখকের নিকট হইতে আমরা উত্তরোত্তর ভাল জিনিসেরই আশা করি; 'পূজার ফুল' পাঠ করিয়া আমাদের সে আশা বর্দ্ধিত হইয়াছে। 'পূজার ফুল' এই সংগ্রহের শেষ গল্প; ৮৮ পৃষ্ঠায় পুস্তক শেষ, কিন্তু তখনও যে গল্পটা শেষ হইয়াছে, তাহা ত মনে হইল না।

সোণার পদ্ম

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত

মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্ প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুর্দ্দশ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত সরোজবাবু কয়েকখানি মাসিক পত্রে যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া এই 'সোণার পদ্ম' ফুটাইয়াছেন; প্রথম গল্পের নামানুসারেই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। গল্প কয়টীই আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে; আমাদের হিন্দুপরিবারের উন্নত ও উচ্চ আদর্শ দেখাইবার জন্য লেখকের এই প্রয়াস সফল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার গল্পের প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। এই সোণার পদ্মের যথেষ্ট আদর হইবে।

মাতৃ-মন্দির

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য একটাকা

এখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত এই উপন্যাসখানি পাঠ করিতে বসিয়াছিলাম; কিন্তু লেখক মহাশয়ের অনবধানতায় পদে-পদেই ব্যথিত হইয়াছি। গল্পটীর আখ্যানভাগের নিন্দা করা যায় না, কিন্তু তিনি ভাষা সম্বন্ধে বড়ই অমনোযোগী; শব্দের অযথা-প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ, অকারণ-বাহুল্য প্রভৃতিতে পুস্তকখানি বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। বারান্তরে তাঁহার এই ত্রুটী সংশোধিত হইলে, পুস্তকখানি পাঠোপযোগী হইবে।

শোক-সংবাদ

এবার কয়েকটী নিদারুণ শোক-সংবাদ আছে। সর্ব্বপ্রথমেই আমরা আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয়, মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের গভীর পুত্র-শোকের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। মাননীয় লাট বাহাদুরের একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক পুত্র এই কাল মহাসমরে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; ইংলণ্ডের সুসন্তান, উপযুক্ত পিতার বংশধর দেশের জন্য, জন্মভূমির জন্য হৃদয়ের শোণিত দান করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। মাননীয় বড়লাট বাহাদুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর এ মর্ম্মান্তিক শোকে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি; বীরের সন্তান বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

তাহার পর আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, প্রবীণ সাহিত্যিক, সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার

পাত্র জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানেন্দ্রবাবুর নাম জানেন, তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রের প্রথম আমলে তিনিই সম্পাদক ছিলেন; তিনিই বাঙ্গালা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে 'পতাকা' হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আমাদের এই 'ভারতবর্ষের' প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা প্রকৃতই একজন সাহিত্যরথী হারাইলাম।

অগ্রদ্বীপের জমিদার, স্বদেশ হিতৈষী, পরহিতব্রত রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের অকালে পরলোক-গমনে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি দেশের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; কত দরিদ্র, অসহায় ছাত্র যে তাঁহার কলিকাতার বাসায় আশ্রয় লাভ করিত, তাহা বলা যায় না। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে দেশের একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত [illegible]গণের শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছি।

রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের যোগেশচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়ও সে দিন পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন; হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি রাণাঘাট অঞ্চলের দীনদুঃখীকে অকাতরে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনে রাণাঘাট অঞ্চলের দীনদুঃখী বড়ই অভাব বোধ করিতেছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপিনচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের অকালে পরলোকগমনে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। বিপিনচন্দ্র নীরবে সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় সুহৃদাশয়, [illegible] বন্ধুর অকস্মাৎ পরলোকগমনের সংবাদে তাঁহার [illegible] ব্যক্তি মাত্রেই ব্যথিত হইবেন। আমরা রায় সা[illegible] হারাণচন্দ্রের, ও বিপিনচন্দ্রের শোকক্লিষ্টা সহধর্মিণী এবং পুত্রকন্যাগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

নারীর মূল্য

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

(১)

জীবনের প্রথম প্রভাতে মাতৃ-অঙ্কে স্তন্যপানে জীবনী সঞ্চার,
যৌবনের উদ্দাম লীলায় প্রেয়সীর আলিঙ্গনে প্রেম-সুধাধার!
সায়াহ্নের অস্ফুট আলোকে মাতৃছায়া কন্যারূপে করে
স্নেহদান,
জগতের সকল বাসনা পূর্ণ করে, তবু নারী লভে অসম্মান!

(২)

জন্ম যবে লভিল দুহিতা প্রসূতির দুই চক্ষে বহে অশ্রুধার,
মনে বুঝি পড়িল তাহার—জন্মে তার করেছিল মাতা
হাহাকার!
জন্মদাতা কাঁপিল সভয়ে; কন্যাগুলি ভাবে এ যে ঘটিল প্রমাদ;
ঊর্দ্ধতম পিতৃগণ তার আকাশের চারিধারে তুলে আর্ত্তনাদ!

(৩)

সংসারের প্রথম প্রবেশে কেহ নাহি তারে হেসে দিল
স্নেহকোল
জন্মে তার, মরণে যেমন,—চারিদিকে উঠে যেন ক্রন্দনের
রোল!
নারীজন্ম তারি অপরাধে, তাই যেন মৌনমুখে সহে অত্যাচার
সেবাব্রত যে জীবনে সার জন্ম তার সহিবারে যেন তিরস্কার!

(৪)

অপমানে অবসন্ন প্রাণ—প্রধূমিত বহ্নি শুধু জীবন-চিতায়,
বাঙ্গালায় তাই নিত্য হায় মরে নারী লেলিহান অনল-শিখায়!
আসে নারী মাতৃরূপ ধরি প্রেমে, স্নেহে, জগতেরে করে
ছায়াদান!
সংসারের সকল বাসনা পূর্ণ করে, তবু নারী লভে অসম্মান!

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিত 'দিল্লী রাজধানী' শীর্ষক প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী ছাপা হইয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ বাবু নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উক্ত প্রবন্ধের উপসংহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা সেই উপসংহার-ভাগ নিম্নে প্রকাশ করিলাম; পাঠকগণ মূল প্রবন্ধের পর এইটী পাঠ করিবেন—"দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিবার বিরুদ্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় দিল্লীতে কোন বিশিষ্ট শিক্ষিত সমাজ নাই। এই প্রকার শিক্ষিত সমাজের অভাবে যে রাজনৈতিক সমালোচনারও অভাব হইয়া পড়ে, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রাজকার্য্য ত দূরের কথা—কোন সাধারণ কার্য্যও সমালোচনার অভাবে সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন; কারণ সমালোচনার অভাবেই স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও সমালোচনার বাহিরে থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করা নিরাপদ বলিয়া মনে করেন না। কারণ, এরূপ অনেক ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে; এবং এরূপ ভ্রম-প্রমাদ প্রজা উভয়ের পক্ষেই ঘোর অমঙ্গলজনক। গত তিন র ভিতরে ব্যবহার-প্রণয়নে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কঠিন সমস্যার মীমাংসায়, স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের অনুপাত রক্ষায় (exchange difficulty) এবং মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-ব্যবস্থায় এমন কয়েকটী ভুল হইয়াছে যে, কলিকাতা কিম্বা বোম্বাইতে ভারত-রাজধানী থাকিলে ইহা কখনই সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এই দোষ কখনই চিরস্থায়ী হইবে না; দিল্লীতে ভারতের রাজধানী কিছুকাল স্থায়ী হইলেই, নানা প্রদেশের রাজনৈতিক নেতৃগণের নিশ্চয়ই সমাগম হইবে। এই প্রকার নেতৃ-সমাগম হইলেই, সংবাদপত্র প্রকাশ এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা, রাজনৈতিক সমালোচনার অভাব সহজেই দূরীকৃত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। এখন যাঁহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে রাজনীতি-চর্চ্চা ও শাসননীতির আলোচনা করেন, তাঁহাদের সকলকেই শীতকালে দিল্লীতে গিয়া বাস করিতে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলে রাজা এবং প্রজা উভয়েরই প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পালের "ঘরের লক্ষ্মী" প্রকাশিত হইয়াছে। ছয় টাকা ব্যয় করিলেই পাঠকেরা ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলিতে পারিবেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণের 'পঞ্চদশী' নামক গল্প-পুস্তক শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

পাবনার কিশোরীমোহন ছাত্র পাঠাগার হইতে "বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের কবি ও কাব্য" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে বীণাপাণি পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল; মুর্শিদাবাদ খাগড়া স্কুলের শ্রীমান্ রাধাবল্লভ নাগ এ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আট আনা-সংস্করণের পঞ্চদশ গ্রন্থ শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী-প্রণীত "লাইকা" যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় এবার "সম্পাদকের অদৃষ্ট" গণনা করিলেন। গ্রন্থকার স্বয়ং ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সুতরাং তাঁহার "অদৃষ্ট"-গণনাও নির্ভুল সন্দেহ নাই। এগার আনা দক্ষিণা দিলেই "সম্পাদকের অদৃষ্ট" আর কাহারও কাছে অদৃষ্ট থাকিবে না।

অধ্যাপক সমাদ্দারের 'সমসাময়িক ভারতে'র চতুর্থ খণ্ড শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-লিখিত সারগর্ভ ভূমিকা ও বহু চিত্রে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৩॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত অতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "চৈনিক সভ্যতা" ছাপা হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীনিরুপমা দেবী প্রণীত "অষ্টক" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Choudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.